বৈশাখ—আশ্বিন

৩১শ ভাগ, ১ম খণ্ড—১৩৩৮

বিষয় সূচী

বিষয় সূচী

চিত্র সূচী

লেখকগণ ও তাঁহাদের রচনা



রামচন্দ্র ও কাঠবিড়ালী

শ্রীকনু দেশাই

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

প্রবাসী

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"

"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৩১শ ভাগ
১ম খণ্ড

বৈশাখ, ১৩৩৮

১ম সংখ্যা

সোভিয়েট নীতি

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শ্রদ্ধাস্পদেষু

সোভিয়েট শাসনের প্রথম পরিচয় আমার মনকে বিশেষভাবে আকর্ষণ করেছে সে কথা পূর্ব্বেই বলেচি। তার কয়েকটি বিশেষ কারণ আছে সেটা আলোচনার যোগ্য।

সেখানকার যে-ছবিটি আমার মনের মধ্যে মূর্ত্তি নিয়েচে তার পিছনে দুলচে ভারতবর্ষের দুর্গতির কালো রঙের পট-ভূমিকা। এই দুর্গতির মূলে যে ইতিহাস আছে তার থেকে একটি তত্ত্ব পাওয়া যায়, সেই তত্ত্বটিকে চিন্তা ক'রে দেখলে আলোচ্য প্রসঙ্গে আমার মনের ভাব বোঝা সহজ হবে।

ভারতবর্ষের মুসলমান-শাসন-বিস্তারের ভিতরকার মানসটি ছিল রাজমহিমালাভ। সেকালে সর্ব্বদাই রাজ্য নিয়ে যে হাত-চালাচালি হ'ত তার গোড়ায় ছিল এই ইচ্ছা। গ্রীসের সেকেন্দর শাহ ধূমকেতুর অনলোজ্জ্বল পুচ্ছের মত তাঁর রণবাহিনী নিয়ে বিদেশের আকাশ ঝেঁটিয়ে বেড়িয়েছিলেন সে কেবল তাঁর প্রতাপ প্রসারিত করবার জন্যে। রোমকদেরও ছিল সেই প্রবৃত্তি। ফিনীশীয়েরা নানা সমুদ্রের তীরে তীরে বাণিজ্য ক'রে ফিরেচে কিন্তু তারা রাজ্য নিয়ে কাড়াকাড়ি করেনি।

একদা য়ুরোপ হ'তে বণিকের পণ্যতরী যখন পূর্ব্ব মহাদেশের ঘাটে ঘাটে পাড়ি জমালে তখন থেকে পৃথিবীতে মানুষের ইতিহাসে এক নূতন পর্ব্ব ক্রমশ অভি-ব্যক্ত হয়ে উঠল, ক্ষাত্রযুগ গেল চলে, বৈশ্যযুগ দেখা দিল। এই যুগে বণিকের দল বিদেশে এসে তাদের পণ্য-হাটের খিড়কি মহলে রাজ্য জুড়ে দিতে লাগল। প্রধানত তারা মুনাফার অঙ্ক বাড়াতে চেয়েছিল, বীরের সম্মান তাদের লক্ষ্য ছিল না। এই কাজে তারা নানা কুটিল পন্থা অবলম্বন করতে কুণ্ঠিত হয়নি, কারণ তারা চেয়েছিল সিদ্ধি, কীর্ত্তি নয়।

এই সময় ভারতবর্ষ তার বিপুল ঐশ্বর্য্যের জন্য জগতে বিখ্যাত ছিল—তখনকার বিদেশী ঐতিহাসিকেরা সে কথা বারংবার ঘোষণা ক'রে গেছেন। এমন কি স্বয়ং ক্লাইভ ব'লে গেছেন, যে, 'ভারতবর্ষের ধনশালিতার কথা যখন চিন্তা ক'রে দেখি তখন অপহরণ-নৈপুণ্যে নিজের সংযমে আমি নিজেই বিস্মিত হই।" এই প্রভূত ধন, এ কখনও সহজে হয় না—ভারতবর্ষ এ ধন উৎপন্ন করেছিল। তখন বিদেশ থেকে যারা এসে এখানকার রাজাসনে বসেছে তারা এ ধন ভোগ করেছে, কিন্তু নষ্ট করেনি। অর্থাৎ তারা ভোগী ছিল, কিন্তু বণিক ছিল না।

তারপর বাণিজ্যের পথ সুগম করার উপলক্ষ্যে বিদেশী বণিকেরা তাদের কারবারের গদিটার উপরে রাজতক্ত চড়িয়ে বসল। সময় ছিল অনুকূল। তখন মোগলরাজত্বে ভাঙন ধরেছে, মারাঠীরা, শিখেরা এই সাম্রাজ্যের গ্রান্থ-গুলো শিথিল করতে প্রবৃত্ত, ইংরেজের হাতে সেটা ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেল ধ্বংসের পথে।

পূর্ব্বতন রাজগৌরবলোলুপেরা যখন এদেশে রাজত্ব করত তখন এদেশে অত্যাচার অবিচার অব্যবস্থা ছিল না একথা বলা চলে না। কিন্তু তারা ছিল এদেশের অঙ্গীভূত। তাদের আঁচড়ে দেশের গায়ে যা ক্ষত হয়েছিল তা ত্বকের উপরে; রক্তপাত অনেক হয়েচে, কিন্তু অস্থিবন্ধনীগুলোকে নড়িয়ে দেয়নি। ধন-উৎপাদনের বিচিত্র কাজ তখন অব্যাহত চলছিল, এমনি কি নবাব বাদশাহের কাছ থেকে সে-সমস্ত কাজ প্রশ্রয় পেয়েছে। তা যদি না হ'ত তাহ'লে এখানে বিদেশী বণিকের ভিড় ঘটবার কোনো কারণ থাকত না,—মরুভূমিতে পঙ্গপালের ভিড় জমবে কেন?

তারপরে ভারতবর্ষে বাণিজ্য ও সাম্রাজ্যের অশুভ সঙ্গম-কালে বণিক রাজা দেশের ধনকল্পতরুর শিকড়গুলোকে কি ক'রে ছেদন করতে লাগলেন, সে ইতিহাস শতবার-কথিত এবং অত্যন্ত শ্রুতিকটু। কিন্তু পুরাতন ব'লে সেটাকে বিস্মৃতির মুখ-ঠুলি চাপা দিয়ে রাখ্‌বার চেষ্টা চলবে না। এদেশের বর্ত্তমান দুর্ব্বহ দারিদ্র্যের উপক্রমণিকা সেইখানে। ভারতবর্ষের ধনমহিমা ছিল, কিন্তু সেটা কোন্ বাহন যোগে দীপান্তরিত হয়েছে সেকথা যদি ভুলি তবে পৃথিবীর আধুনিক ইতিহাসের একটা তত্ত্বকথা আমাদের এড়িয়ে যাবে। আধুনিক রাষ্ট্রনীতির প্রেরণা-শক্তি বীর্য্যাভিমান নয়, সে হচ্চে ধনের লোভ, এই তত্ত্বটি মনে রাখা চাই। রাজগৌরবের সঙ্গে প্রজাদের একটা মানবিক সম্বন্ধ থাকে, কিন্তু ধনলোভের সঙ্গে তা থাকতেই পারে না। ধন নিশ্মম, নৈর্ব্যক্তিক। যে-মুরগী সোনার ডিম পাড়ে লোভ যে কেবল তার ডিমগুলোকেই ঝুড়িতে তোলে তা নয়, মুরগীটাকে-সুদ্ধ সে জবাই করে।

বণিকরাজের লোভ ভারতের ধন-উৎপাদনের বিচিত্র শক্তিকেই পঙ্গু ক'রে দিয়েছে। বাকী রয়েছে কেবল কৃষি, নইলে কাঁচা মালের জোগান বন্ধ হয় এবং বিদেশী পণ্যের হাটে মূল্য দেবার শক্তি একেবারে নষ্ট হয়ে যায়। ভারত-বর্ষের সদ্যঃপাতী জীবিকা এই অতি ক্ষীণ বৃন্তের উপর নির্ভর ক'রে আছে।

এ কথা মেনে নেওয়া যাক তখনকার কালে যে-নৈপুণ্য ও যে-সকল উপায়ের যোগে হাতের কাজ চলত ও শিল্পীরা খেয়ে প'রে বাঁচত যন্ত্রের প্রতিযোগিতায় তারা স্বতই নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েচে। অতএব প্রজাদের বাঁচাবার জন্যে নিতান্তই প্রয়োজন ছিল সর্ব্বপ্রযত্নে তাদের যন্ত্রকুশল ক'রে তোলা। প্রাণের দায়ে বর্ত্তমানকালে সকল দেশেই এই উদ্যোগ প্রবল। জাপান অল্প কালের মধ্যে ধনের যন্ত্রবাহনকে আয়ত্ত ক'রে নিয়েচে, যদি-না সম্ভব হ'ত তাহ'লে যন্ত্রী য়ুরোপের ষড়যন্ত্রে সে ধনে-প্রাণে মারা যেত। আমাদের ভাগ্যে সে সুযোগ ঘটল না, কেন-না লোভ ঈর্ষাপরায়ণ। এই প্রকাণ্ড লোভের আওতায় আমাদের ধনপ্রাণ মুষড়ে এল, তৎপরিবর্ত্তে রাজা আমাদের সান্ত্বনা দিয়ে বলচেন এখনও ধনপ্রাণের যেটুকু বাকী সেটুকু রক্ষা করবার জন্যে আইন এবং চৌকিদারের ব্যবস্থাভার রইল আমার হাতে। এদিকে আমাদের অন্নবস্ত্র বিদ্যাবুদ্ধি বন্ধক রেখে কণ্ঠাগত প্রাণে আমরা চৌকিদারের উর্দ্দির খরচ জোগাচ্চি। এই যে সাংঘাতিক ঔদাসীন্য, এর মূলে আছে লোভ। সকল প্রকার জ্ঞানে ও কর্ম্মে যেখানে শক্তির উৎস বা পীঠস্থান সেখান থেকে বহু নীচে দাঁড়িয়ে এতকাল আমরা হাঁ ক'রে উপরের দিকে তাকিয়ে আছি আর সেই উর্দ্ধলোক থেকে এই আশ্বাসবাণী শুনে আসচি, তোমাদের শক্তি ক্ষয় যদি হয় ভয় কি, আমাদের শক্তি আছে, আমরা তোমাদের রক্ষা করব।

যার সঙ্গে মানুষের লোভের সম্বন্ধ তার কাছ থেকে মানুষ প্রয়োজন উদ্ধার করে, কিন্তু কখনও তাকে সম্মান করে না। যাকে সম্মান করে না তার দাবিকে মানুষ যথাসম্ভব ছোট ক'রে রাখে; অবশেষে সে এত সস্তা হয়ে পড়ে যে, তার অসামান্য অভাবেও সামান্য খরচ করতে গায়ে বাজে। আমাদের প্রাণরক্ষা ও মনুষ্যত্বের লজ্জারক্ষার জন্যে কতই কম বরাদ্দ সে কারও অগোচর নেই। অন্ন

নেই, বিদ্যা নেই, বৈদ্য নেই, পানের জল পাওয়া যায় পাঁক ছেঁকে, কিন্তু চৌকিদারের অভাব নেই, আর আছে মোটা মাইনের কর্ম্মচারী, তাদের মাইনে গাল্‌ফ্‌ ষ্ট্রীমের মত সম্পূর্ণ চলে যায় ব্রিটিশ দ্বীপের শৈত্য নিবারণের জন্যে, তাদের পেন্সন জোগাই আমাদের অন্ত্যেষ্টি সৎকার খরচের অংশ থেকে। এর একমাত্র কারণ লোভ অন্ধ, লোভ নিষ্ঠুর—ভারতবর্ষ ভারতেশ্বরদের লোভের সামগ্রী।

অথচ কঠিন বেদনার অবস্থাতেও একথা আমি কখনও অস্বীকার করিনে যে ইংরেজের স্বভাবে ঔদার্য্য আছে, বিদেশীয় শাসন-কার্য্যে অন্য য়ুরোপীয়দের ব্যবহার ইংরেজের চেয়েও কৃপণ এবং নিষ্ঠুর। ইংরেজ জাতি ও তার শাসননীতি সম্বন্ধে বাক্যে ও আচরণে আমরা যে বিরুদ্ধতা প্রকাশ ক'রে থাকি তা আর কোনো জাতের শাসন-কর্ত্তাদের সম্বন্ধে সম্ভবপর হ'ত না; যদি বা হ'ত তবে তার দণ্ডনীতি আরও অনেক দুঃসহ হ'ত, স্বয়ং য়ুরোপে এমন কি আমেরিকাতেও তার প্রমাণের অভাব নেই। প্রকাশ্যভাবে বিদ্রোহ ঘোষণা কালেও রাজপুরুষদের কাছে পীড়িত হ'লে আমরা যখন সবিস্ময়ে নালিশ করি তখন প্রমাণ হয় যে ইংরেজ জাতির প্রতি আমাদের নিগূঢ় শ্রদ্ধা মার খেতে খেতেও মরতে চায় না। আমাদের স্বদেশী রাজা বা জমিদারের কাছে আমাদের প্রত্যাশা আরও অনেক কম। ইংলণ্ডে থাকার সময় এটা লক্ষ্য ক'রে দেখেছি, ভারতবর্ষে দণ্ডবিধান ব্যাপারে গ্লানিজনক ঘটনা ইংরেজ খবরের কাগজে প্রায় কিছুই এসে পৌঁছত না। তার একমাত্র কারণ এ নয়, পাছে য়ুরোপে বা আমেরিকায় নিন্দা রটে। বস্তুত কড়া ইংরেজ শাসনকর্ত্তা স্বজাতির শুভবুদ্ধিকেই ভয় করে, বেশ করেছি, খুব করেছি, দরকার ছিল জবরদস্তি করবার—এটা বুক ফুলিয়ে বলা ইংরেজদের পক্ষে সহজ নয়, তার কারণ ইংরেজের মধ্যে বড় মন আছে। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে আসল কথাগুলো ইংরেজ খুব কম জানে। নিজেদের উপর ধিক্কার দেবার কারণ চাপা থাকে। একথাও সত্য, ভারতের নিমক দীর্ঘকাল যে খেয়েচে তার ইংরেজী যকৃৎ এবং হৃদয় কলুষিত হয়ে গেছে অথচ আমাদের ভাগ্যক্রমে তারাই হ'ল অথরিটি। ভারতবর্ষে বর্ত্তমান বিপ্লব উপলক্ষ্যে দণ্ডচালনা সম্বন্ধে কর্ত্তৃপক্ষ বলেচেন তার পীড়ন ছিল ন্যূন্যতম মাত্রায়। একথা মেনে নিতে আমরা অনিচ্ছুক, কিন্তু অতীত ও বর্ত্তমানের প্রচলিত শাসননীতির সঙ্গে তুলনা ক'রে দেখলে কথাটাকে অত্যুক্তি বলতে পারব না। মার খেয়েচি, অন্যায় মারও যথেষ্ট খেয়েচি এবং সবচেয়ে কলঙ্কের কথা গুপ্ত মার, তারও অভাব ছিল না। একথাও বলব, অনেক স্থলেই যারা মার খেয়েচে মাহাত্ম্য তাদেরই, যারা মেরেচে তারা আপন মান খুইয়েচে। কিন্তু সাধারণ রাষ্ট্রশাসন নীতির আদর্শে আমাদের মারের মাত্রা ন্যূনতম বইকি। বিশেষত আমাদের 'পরে ওদের নাড়ীর টান নেই, তা ছাড়া সমস্ত ভারতবর্ষকে জালিয়ানওয়ালাবাগ ক'রে তোলা এদের পক্ষে বাহুবলের দিক থেকে অসম্ভব ছিল না। আমেরিকার সমগ্র নিগ্রো জাতি যুক্ত রাজ্যের সঙ্গে নিজেদের যোগ বিচ্ছিন্ন করবার জন্যে যদি স্পর্দ্ধাপূর্ব্বক অধ্যবসায়ে প্রবৃত্ত হ'ত তা হ'লে কি রকম বীভৎসভাবে রক্তপ্লাবন ঘটত বর্ত্তমান শান্তির অবস্থাতেও তা অনুমান ক'রে নিতে অধিক কল্পনাশক্তির প্রয়োজন হয় না। তা ছাড়া ইটালি প্রভৃতি দেশে যা ঘটেচে তা নিয়ে আলোচনা করা বাহুল্য।

কিন্তু এতে সান্ত্বনা পাইনে। যে-মার লাঠির ডগায় সে-মার দু-দিন পরে ক্লান্ত হয়ে পড়ে, এমন কি, ক্রমে তার লজ্জা আসাও অসম্ভব নয়। কিন্তু যে-মার অন্তরে অন্তরে সে তো কেবল কতকগুলো মানুষের মাথা ভেঙে তার পরে খেলাঘরের ব্রিজ্‌ পার্টির অন্তরালে অন্তর্ধান করে না। সমস্ত জাতকে সে যে ভিতরে ভিতরে ফতুর ক'রে দিলে। শতাব্দীর পর শতাব্দী তার তো বিরাম নেই। ক্রোধের মার থামে, লোভের মারের অন্ত পাওয়া যায় না।

টাইম্‌স্‌-এর সাহিত্যিক ক্রোড়পত্রে দেখা গেল Mackee নামক এক লেখক বলেচেন যে, ভারতে দারিদ্র্যের root cause—মূল কারণ হচ্চে এদেশে নির্বিচার বিবাহের ফলে অতিপ্রজন। কথাটার ভিতরকার ভাবটা এই যে, বাহির থেকে যে শোষণ চল্‌চে তা দুঃসহ হ'ত না যদি স্বল্প অন্ন নিয়ে স্বল্প লোকে হাঁড়ি চেঁচেপুঁছে খেত। শুন্‌তে

প্রাই, ইংলণ্ডে ১৮৭১ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৯২১ খৃষ্টাব্দের মধ্যে শতকরা ৬৬ সংখ্যা হারে প্রজাবৃদ্ধি হয়েছে। ভারতবর্ষে পঞ্চাশ বৎসরের প্রজাবৃদ্ধির হার শতকরা ৩৩। তবে একযাত্রায় পৃথক ফল হ'ল কেন? অতএব দেখা যাচ্চে root cause প্রজাবৃদ্ধি নয়, root cause অন্ন-সংস্থানের অভাব। তারও root কোথায়?

দেশ যারা শাসন করচে, আর যে-প্রজারা শাসিত হচ্চে তাদের ভাগ্য যদি এক কক্ষবর্ত্তী হয় তাহ'লে অন্তত অন্নের দিক থেকে নালিশের কথা থাকে না, অর্থাৎ সুভিক্ষে দুর্ভিক্ষে উভয়ের ভাগ প্রায় সমান হয়ে থাকে। কিন্তু যেখানে কৃষ্ণপক্ষ ও শুক্লপক্ষের মাঝখানে মহালোভ ও মহাসমুদ্রের ব্যবধান সেখানে অমাবস্থার তরফে বিদ্যা স্বাস্থ্য সম্মান সম্পদের কৃপণতা ঘুচতে চায় না, অথচ নিশীথ রাত্রির চৌকিদারদের হাতে বৃষচক্ষু লণ্ঠনের আয়োজন বেড়ে চলে। একথা হিসাব ক'রে দেখ্‌তে ষ্ট্যাটিষ্টিক্‌সের খুব বেশী খিটিমিটির দরকার হয় না যে. আজ একশো ষাট বৎসর ধরে ভারতের পক্ষে সর্ব্ববিষয়ে দারিদ্র্য ও ব্রিটেনের পক্ষে সর্ব্ববিষয়ে ঐশ্বর্য্য পিঠেপিঠি সংলগ্ন হয়ে আছে। এর যদি একটি সম্পূর্ণ ছবি আঁকতে চাই তবে বাংলা দেশে যে-চাষী পাট উৎপন্ন করে আর সুদূর ডাণ্ডিতে যারা তার মুনফা ভোগ করে উভয়ের জীবনযাত্রার দৃশ্য পাশাপাশি দাঁড় করিয়ে দেখতে হয়। উভয়ের মধ্যে যোগ আছে লোভের, বিচ্ছেদ আছে ভোগের. এই বিভাগ দেড়শো বছরে বাড়ল বই কমল না।

যান্ত্রিক উপায়ে অর্থলাভকে যখন থেকে বহুগুণীকৃত করা সম্ভবপর হ'ল তখন থেকে মধ্যযুগের শিভাল্‌রি অর্থাৎ বীরধর্ম্ম বণিকধর্ম্মে দীক্ষিত হয়েচে। এই নিদারুণ বৈশ্যযুগের প্রথম সূচনা হ'ল সমুদ্রযানযোগে বিশ্বপৃথিবী আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে। বৈশ্যযুগের আদিম ভূমিকা দস্যুবৃত্তিতে। দাস-হরণ ও ধন-হরণের বীভৎসতায় ধরিত্রী সেদিন কেঁদে উঠেছিল। এই নিষ্ঠুর ব্যবসায় বিশেষভাবে চলেছিল পরদেশে। সেদিন মেক্সিকোতে স্পেন শুধু কেবল সেখানকার সোনার সঞ্চয় নয়, সেখানকার সমগ্র সভ্যতাটাকেও রক্ত দিয়ে মুছে দিয়েছে। সেই রক্ত-মেঘের ঝড় পশ্চিম থেকে ভিন্ন ভিন্ন দমকায় ভারতবর্ষে এসে পড়ল। তার ইতিহাস আলোচনা করা অনাবশ্যক। ধন-সম্পদের স্রোত পূর্ব্ব দিক থেকে পশ্চিম দিকে ফিরল।

তারপর থেকে কুবেরের সিংহাসন পাকা হ'ল পৃথিবীতে। বিজ্ঞান ঘোষণা ক'রে দিলে যন্ত্রের নিয়মই বিশ্বের নিয়ম, বাহ্য সিদ্ধিলাভের বাহিরে কোনো নিত্য সত্য নেই। প্রতিযোগিতার উগ্রতা সর্ব্বব্যাপী হয়ে উঠল, দস্যুবৃত্তি ভদ্রবেশে পেল সম্মান। লোভের প্রকাশ্য ও চোরা রাস্তা দিয়ে কারখানা ঘরে, খনিতে, বড় বড় আবাদে, ছদ্মনামধারী দাসবৃত্তি, মিথ্যাচার ও নির্দ্দয়তা কি রকম হিংস্র হয়ে উঠেচে সে-সম্বন্ধে য়ুরোপীয় সাহিত্যে রোমহর্ষক বর্ণনা বিস্তর পাওয়া যায়। পাশ্চাত্য ভূখণ্ডে যারা টাকা করে আর যারা টাকা জোগায় অনেক দিন ধরে তাদের মধ্যে হাতাহাতি বেধে গেছে। মানুষের সব চেয়ে বড় ধর্ম্ম সমাজধর্ম্ম, লোভ রিপু সবচেয়ে তার বড় হন্তারক। এই যুগে সেই রিপু মানুষের সমাজকে আলোড়িত ক'রে তার সম্বন্ধ-বন্ধনকে শিথিল ও বিচ্ছিন্ন ক'রে দিচ্ছে।

এক দেশে এক জাতির মধ্যেই এই নির্ম্মম ধনার্জ্জন ব্যাপারে যে বিভাগ সৃষ্টি করতে উদ্যত তাতে যত দুঃখই থাক তবু সেখানে সুযোগের ক্ষেত্র সকলেরই কাছে সমান খোলা থাকে, শক্তির বৈষম্য থাকতে পারে, কিন্তু অধিকারের বাধা থাকে না। ধনের জাঁতাকলে সেখানে আজ যে আছে পেষ্য-বিভাগে কাল সে-ই উঠতে পারে পেষণ-বিভাগে। শুধু তাই নয়, ধনীরা যে-ধন সঞ্চয় করে, নানা আকারে সমস্ত দেশের মধ্যে তার কিছু-না-কিছু ভাগবাঁটোয়ারা আপনিই হয়ে যায়। ব্যক্তিগত সম্পদ জাতীয় সম্পদের দায়িত্ব-ভার অনেক পরিমাণে না-নিয়ে থাকতে পারে না। লোকশিক্ষা, লোকস্বাস্থ্য, লোকরঞ্জন, সাধারণের জন্যে নানাপ্রকার হিতানুষ্ঠান—এ সমস্তই প্রভূত ব্যয়সাধ্য ব্যাপার। দেশের এই সমস্ত বিচিত্র দাবি ইচ্ছায় অনিচ্ছায় লক্ষ্যত অলক্ষ্যত ধনীরা মিটিয়ে থাকে।

কিন্তু ভারতের যে-ধনে বিদেশী বণিক বা রাজ-পুরুষেরা ধনী, তার ন্যূনতম উচ্ছিষ্টমাত্রই ভারতের ভাগে

পড়ে। পাটের চাষীর শিক্ষার জন্যে, স্বাস্থ্যের জন্যে সুগভীর অভাবগুলো অনাবৃষ্টির নালা ডোবার মত হাঁ ক'রে রইল, বিদেশগামী মুনফা থেকে তার দিকে কিছুই ফিরল না। যা গেল তা নিঃশেষে গেল। পাটের মুনফা সম্ভবপর করবার জন্যে গ্রামের জলাশয়গুলি দূষিত হ'ল —এই অসহ্য জলকষ্ট নিবারণের উদ্দেশে বিদেশী মহাজনদের ভরা থলি থেকে এক পয়সা খসল না। যদি জলের ব্যবস্থা করতে হয় তবে তার সমস্ত ট্যাক্সের টান এই নিঃস্ব নিরন্নদের রক্তের উপরই পড়ে। সাধারণকে শিক্ষা দেবার জন্যে রাজকোষে টাকা নেই, কেন নেই? তার প্রধান কারণ, প্রভূত পরিমাণ টাকা ভারতবর্ষকে সম্পূর্ণই ত্যাগ ক'রে চলে যায়—এ হ'ল লোভের টাকা, যাতে ক'রে আপন টাকা ষোলো আনাই পর হয়ে যায়। অর্থাৎ জল উবে যায় এপারের জলাশয়ে আর মেঘ হয়ে তার বর্ষণ হতে থাকে ওপারের দেশে। সে দেশের হাঁসপাতালে, বিদ্যালয়ে এই হতভাগ্য অশিক্ষিত অসুস্থ মুমূর্ষু ভারতবর্ষ সুদীর্ঘকাল অপ্রত্যক্ষভাবে রসদ জুগিয়ে আসচে।

দেশের লোকের দৈহিক ও মানসিক অবস্থার চরম দুঃখ দৃশ্য অনেককাল স্বচক্ষে দেখে আসচি। দারিদ্র্যে মানুষ কেবল যে মরে তা নয়, নিজেকে অবজ্ঞার যোগ্য ক'রে তোলে। তাই স্যর জন সাইমন বললেন যে, "In our view the most formidable of the evils from which India is suffering have their roots in social and economic customs of long-standing which can only be remedied by the action of the Indian people themselves,"—এটা হ'ল অবজ্ঞার কথা। ভারতের প্রয়োজনকে তিনি যে-আদর্শ থেকে বিচার করচেন সেটা তাঁদের নিজেদের আদর্শ নয়। প্রচুর ধন-উৎপাদনের জন্যে যে অবারিত শিক্ষা যে সুযোগ যে স্বাধীনতা তাঁদের নিজেদের আছে, যে-সমস্ত সুবিধা থাকাতে তাঁদের জীবনযাত্রার আদর্শ জ্ঞানে কর্ম্মে ভোগে নানা দিক থেকে প্রভূত পরিমাণে পরিপুষ্ট হ'তে পেরেচে, জীর্ণবস্ত্র শীর্ণতনু রোগক্লান্ত শিক্ষা-বঞ্চিত ভারতের পক্ষে সে-আদর্শ কল্পনার মধ্যেই আনেন না,—আমরা কোনো মতে দিনযাপন করব লোকবৃদ্ধি নিবারণ ক'রে এবং খরচপত্র কমিয়ে, আর আজ তাঁরা নিজের জীবিকার যে পরিস্ফীত আদর্শ বহন করচেন তাকে চিরদিন বহুল পরিমাণে সম্ভব ক'রে রাখব আমাদের জীবিকা খর্ব্ব ক'রে। এর বেশী কিছু ভাববার নেই, অতএব রেমেডি-র দায়িত্ব সম্পূর্ণ আমাদেরই হাতে, যারা রেমিডি'কে দুঃসাধ্য ক'রে তুলেছে তাদের বিশেষ কিছু করবার নেই।

মানুষ এবং বিধাতার বিরুদ্ধে এই সমস্ত নালিশ ক্ষান্ত ক'রে রেখেই অন্তরের দিক থেকে আমাদের নির্জ্জীব পল্লীর মধ্যে প্রাণসঞ্চার করবার জন্যে আমার অতি ক্ষুদ্র শক্তিকে কিছুকাল প্রয়োগ করছি। একাজে গবর্মেণ্টের আনুকূল্য আমি উপেক্ষা করিনি, এমন কি ইচ্ছা করেছি। কিন্তু ফল পাইনি, তার কারণ দরদ নেই। দরদ থাকা সম্ভব নয়—আমাদের অক্ষমতা আমাদের সকল প্রকার দুর্দ্দশা আমাদের দাবিকে ক্ষীণ ক'রে দিয়েচে। দেশের কোনো যথার্থ কৃত্যকর্ম্মে গবর্মেণ্টের সঙ্গে আমাদের কর্ম্মীদের উপযুক্তমত যোগসাধন অসম্ভব ব'লেই অবশেষে স্থির করেচি। অতএব চৌকিদারদের উর্দ্দির খরচ জুগিয়ে যে-কটা কড়ি বাঁচে তাই দিয়ে যা সম্ভব তাই করা যাবে এই রইল কথা।

রাজকীয় লোভ ও তৎপ্রসূত দুর্বিষহ ঔদাসীন্যের চেহারাটা যখন মনের মধ্যে নৈরাশ্যের অন্ধকার ঘনিয়ে বসেচে এমন সময়েই রাশিয়ায় গিয়েছিলুম। য়ুরোপের অন্যান্য দেশে ঐশ্বর্য্যের আড়ম্বর যথেষ্ট দেখেছি; সে এতই উত্তুঙ্গ যে, দরিদ্র দেশের ঈর্ষাও তার উচ্চ চূড়া পর্য্যন্ত পৌঁছতে পারে না। রাশিয়ায় সেই ভোগের সমারোহ একেবারেই নেই, বোধ করি সেই জন্যেই তা'র ভিতরকার একটা রূপ দেখা সহজ ছিল।

ভারতবর্ষ যার থেকে একেবারেই বঞ্চিত তারই আয়োজনকে সর্ব্বব্যাপী করবার প্রবল প্রয়াস এখানে দেখতে পেলেম। বলা বাহুল্য, আমি আমার বহুদিনের ক্ষুধিত দেখার ভিতর দিয়ে সমস্তটা দেখেচি। পশ্চিম মহাদেশের অন্য কোনো স্বাধিকার-সৌভাগ্যশালী দেশবাসীর চক্ষে দৃশ্যটা কি রকম ঠেকে সে-কথা

ঠিক-মত বিচার করা আমার পক্ষে সম্ভবপর নয়। অতীতকালে ভারতবর্ষের কি পরিমাণ ধন ব্রিটিশ দ্বীপে চালান গিয়েছে, এবং বর্ত্তমানে কি পরিমাণ অর্থ বর্ষে বর্ষে নানাপ্রণালী দিয়ে সেইদিকে চলে যাচ্চে তার অঙ্ক-সংখ্যা নিয়ে তর্ক করতে চাইনে। কিন্তু অতি স্পষ্টই দেখতে পাচ্চি, এবং অনেক ইংরেজ লেখকও তা স্বীকার করেন যে, আমাদের দেশের রক্তহীন দেহে মন চাপা পড়ে গেছে, জীবনে আনন্দ নেই, আমরা অন্তরে বাহিরে মরচি;—এবং তার root cause যে ভারতবাসীরই মর্ম্মগত অপরাধের সঙ্গে জড়িত, অর্থাৎ কোনো গবর্মেণ্টই এর প্রতিকার করতে নিরতিশয় অক্ষম এ অপবাদ আমরা একেবারেই স্বীকার করব না। একথা চিরদিনই আমার মনে ছিল যে, ভারতের সঙ্গে যে পরদেশবাসী শাসনকর্ত্তার স্বার্থের সম্বন্ধ প্রবল এবং দরদের সম্বন্ধ নেই, সে গবর্মেণ্ট নিজের গরজেই প্রবল শক্তিতে বিধি ও ব্যবস্থা রক্ষা করতে উৎসাহপরায়ণ, কিন্তু যে-সকল ব্যাপারে গরজ একান্ত আমাদেরই, যেখানে আমাদের দেশকে সর্ব্বপ্রকার বাঁচিয়ে তুলতে হবে, ধনে মনে ও প্রাণে,—সেখানে যথোচিত পরিমাণে শক্তি প্রয়োগ করতে এ গবর্মেণ্ট উদাসীন। অর্থাৎ এ সম্বন্ধে নিজের দেশের প্রতি শাসনকর্ত্তাদের যত সচেষ্টতা, যত বেদনাবোধ, আমাদের দেশের প্রতি তার কিয়দংশও সম্ভব হয় না। অথচ আমাদের ধনপ্রাণ তাদেরই হাতে, যে উপায়ে, যে উপাদানে আমরা বিনাশ থেকে রক্ষা পেতে পারি, সে আমাদের হাতে নেই। এমন কি, একথা যদি সত্য হয় যে, সমাজ-বিধি সম্বন্ধে মূঢ়তাবশতই আমরা মরতে বসেচি তবে এই মূঢ়তা যে-শিক্ষা যে-উৎসাহ দ্বারা দূর হ'তে পারে সেও ঐ বিদেশী গবর্মেণ্টেরই রাজকোষে ও রাজ-মজ্জিতে। দেশব্যাপী অশিক্ষাজনিত বিপদ দূর করবার উপায় কমিশনের পরামর্শমাত্র দ্বারা লাভ করা যায় না—সে সম্বন্ধে গবর্মেণ্টের তেমনি তৎপর হওয়া উচিত যেমন তৎপর ব্রিটিশ গবর্মেণ্ট নিশ্চয়ই হ'ত যদি এই সমস্যা ব্রিটন দ্বীপের হ'ত। সাইমন কমিশনকে আমাদের প্রশ্ন এই যে, ভারতের অজ্ঞতা অশিক্ষার মধ্যেই এত বড় মৃত্যুশেল নিহিত হয়ে এতদিন রক্তপাত করচে এই কথাই যদি সত্য হয়, তবে আজ একশো ষাট বৎসরের ব্রিটিশ শাসনে তার কিছুমাত্র লাঘব হ'ল না কেন? কমিশন কি সাংখ্য-তথ্য যোগে দেখিয়েছেন পুলিসের ডাণ্ডা জোগাতে ব্রিটিশ-রাজ যে খরচ ক'রে থাকেন তার তুলনায় দেশকে শিক্ষিত করতে এই সুদীর্ঘকাল কত খরচ করা হয়েচে? দূরদেশবাসী ধনী শাসকের পক্ষে পুলিসের ডাণ্ডা অপরিহার্য্য, কিন্তু সেই লাঠির বশঙ্গত যাদের মাথার খুলি, তাদের শিক্ষার ব্যয়বিধান বহু শতাব্দী মুলতবী রাখলেও কাজ চলে যায়।

রাশিয়ায় পা বাড়িয়েই প্রথমেই চোখে পড়ল সেখানকার যে চাষী ও শ্রমিক সম্প্রদায় আজ আট বৎসর পূর্ব্বে ভারতীয় জনসাধারণেরই মত নিঃসহায় নিরন্ন নির্যাতিত নিরক্ষর ছিল, অনেক বিষয়ে যাদের দুঃখভার আমাদের চেয়ে বেশী বই কম ছিল না, অন্তত তাদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার এ অল্প কয় বৎসরের মধ্যেই যে-উন্নতি লাভ করেচে দেড়শো বছরেও আমাদের দেশে উচ্চশ্রেণীর মধ্যেও তা হয়নি। আমাদের দরিদ্রাণাং মনোরথাঃ স্বদেশের শিক্ষা সম্বন্ধে যে দুরাশার ছবি মরীচিকার পটে আঁকতেও সাহস পায়নি এখানে তার প্রত্যক্ষ রূপ দেখলুম দিগন্ত থেকে দিগন্তে বিস্তৃত।

নিজেকে এ প্রশ্ন বার-বার জিজ্ঞাসা করেছি—এত বড় আশ্চর্য্য ব্যাপার সম্ভবপর হ'ল কি ক'রে? মনের মধ্যে এই উত্তর পেয়েছি যে লোভের বাধা কোনোখানে নেই। শিক্ষার দ্বারা সব মানুষই যথোচিত সক্ষম হয়ে উঠবে একথা মনে করতে কোথাও খট্‌কা লাগচে না। দূর এশিয়ার তুর্কমেনিস্তানবাসী প্রজাদেরও পুরোপুরি শিক্ষা দিতে এদের মনে একটুও ভয় নেই, প্রত্যুত প্রবল আগ্রহ আছে। তুর্কমেনিস্তানের প্রথাগত মূঢ়তার মধ্যেই সেখানকার লোকের সমস্ত দুঃখের কারণ এই কথাটা রিপোর্টে নির্দ্দেশ ক'রে উদাসীন হয়ে বসে নেই।

কোচিন-চায়নায় শিক্ষাবিস্তার সম্বন্ধে শুনেচি কোনো ফরাসী পাণ্ডিত্যব্যবসায়ী বলেচেন যে, ভারতবর্ষে ইংরেজরাজ দেশী লোককে শিক্ষা দিতে গিয়ে যে ভুল

করেচেন ফ্রান্স যেন সে ভুল না করেন। একথা মানতে হবে যে, ইংরেজের চরিত্রে এমন একটা মহত্ত্ব আছে যেজন্যে বিদেশী শাসননীতিতে তাঁরা কিছু কিছু ভুল ক'রে বসেন, শাসনের ঠাস-বুনানীতে কিছু কিছু খেই হারায়, নইলে আমাদের মুখ ফুটতে হয়ত আরও এক আধ শতাব্দী দেরি হ'ত। একথা অস্বীকার করবার জো নেই যে, শিক্ষার অভাবে অশক্তি অটল হয়ে থাকে, অতএব অশিক্ষা পুলিসের ডাণ্ডার চেয়ে কম বলবান নয়, বোধ হয় যেন লর্ড কার্জ্জন সে কথাটা কিছু কিছু অনুভব করেছিলেন। শিক্ষাদান সম্বন্ধে ফরাসী পাণ্ডিত্যব্যবসায়ী স্বদেশের প্রয়োজনকে যে-আদর্শে বিচার করে থাকেন, শাসিত দেশের প্রয়োজনকে সে-আদর্শে করেন না। তার একমাত্র কারণ লোভ। লোভের বাহন যারা, তাদের মনুষ্যত্বের বাস্তবতা লুব্ধের পক্ষে অস্পষ্ট, তাদের দাবিকে আমরা স্বভাবতই খর্ব্ব ক'রে থাকি। যাদের সঙ্গে ভারতের শাসনের সম্বন্ধ তাদের কাছে ভারতবর্ষ আজ দেড়শো বৎসর খর্ব্ব হয়ে আছে। এই জন্যেই তার মর্ম্মগত প্রয়োজনের 'পরে উপরওয়ালার ঔদাসীন্য ঘুচল না। আমরা যে কি অন্ন খাই, কি জলে আমাদের পিপাসা মেটাতে হয়, কি সুগভীর অশিক্ষায় আমাদের চিত্ত তমসাবৃত তা আজ পর্য্যন্ত ভাল ক'রে তাদের চোখে পড়ল না। কেন না, আমরাই তাদের প্রয়োজনের, এইটেই বড় কথা, আমাদেরও যে প্রাণগত প্রয়োজন আছে, একথাটা জরুরি নয়। তা ছাড়া আমরা এত অকিঞ্চিৎকর হয়ে আছি যে, আমাদের প্রয়োজনকে সম্মান করাই সম্ভব হয় না।

ভারতের যে কঠিন সমস্যা, যাতে ক'রে আমরা এত কাল ধরে ধনে প্রাণে মনে মরেচি এ সমস্যাটা পাশ্চাত্যে কোথাও নেই। সে সমস্যাটি এই যে ভারতের সমস্ত স্বত্ব দ্বিধাকৃত ও সেই সর্ব্বনেশে বিভাগের মূলে আছে লোভ। এই কারণে রাশিয়ায় এসে যখন সেই লোভকে তিরস্কৃত দেখলুম তখন সেটা আমাকে যত বড় আনন্দ দিলে এতটা হয়ত স্বভাবত অন্যকে না দিতে পারে। তবুও মূল কথাটা মন থেকে তাড়াতে পারিনে সে হচ্ছে এই যে, আজ কেবল ভারতে নয়, সমস্ত পৃথিবীতেই যে-কোনো বড় বিপদের জাল-বিস্তার দেখা যাচ্ছে তার প্রেরণা হচ্ছে লোভ, সেই লোভের সঙ্গেই যত ভয়, যত সংশয়, সেই লোভের পিছনেই যত অস্ত্রসজ্জা, যত মিথ্যাক ও নিষ্ঠুর রাষ্ট্রনীতি।

আর একটা তর্কের বিষয় হচ্চে ডিক্‌টেটরশিপ্‌ অর্থাৎ রাষ্ট্র ব্যাপারে নায়কতন্ত্র নিয়ে। কোনো বিষয়েই নায়কিয়ানা আমি নিজে পছন্দ করিনে। ক্ষতি বা শাস্তির ভয়কে অগ্রবর্ত্তী ক'রে অথবা ভাষায় ভঙ্গীতে বা ব্যবহারে জিদ্‌ প্রকাশের দ্বারা নিজের মত প্রচারের রাস্তাটাকে সম্পূর্ণ সমতল করবার লেশমাত্র চেষ্টা আমি কোনো দিন নিজের কর্ম্মক্ষেত্রে করতে পারিনে। সন্দেহ নেই যে একনায়কতার বিপদ আছে বিস্তর ; তার ক্রিয়ার একতানতা ও নিত্যতা অনিশ্চিত, যে চালক ও যারা চালিত তাদের মধ্যে ইচ্ছার অসম্পূর্ণ যোগসাধন হওয়াতে বিপ্লবের কারণ সর্ব্বদাই ঘটে, তা ছাড়া সবলে চালিত হওয়ার অভ্যাস চিত্তের ও চরিত্রের বলহানিকর ; এর সফলতা যখন বাইরের দিকে দুইচার ফসলে হঠাৎ আঁজলা ভরে তোলে, ভিতরের শিকড়কে দেয় মেরে। জনগণের ভাগ্য যদি তাদের সম্মিলিত ইচ্ছার দ্বারাই সৃষ্ট ও পালিত না হয় তবে সেটা হয় খাঁচা, দানাপানি সেখানে ভাল মিলতেও পারে, কিন্তু তাকে নীড় বলা চলে না, সেখানে থাকতে থাকতে পাখা যায় আড়ষ্ট হয়ে। এই নায়কতা শাস্ত্রের মধ্যেই থাক, গুরুর মধ্যেই থাক, আর রাষ্ট্রনেতার মধ্যেই থাক, মনুষ্যত্বহানির পক্ষে এমন উপদ্রব কিছুই নেই। আমাদের সমাজে এই ক্লীবত্ব সৃষ্টি বহুযুগ থেকে ঘটে আসচে এবং এর ফল প্রতিদিন দেখে আসচি। মহাত্মাজী যখন বিদেশী কাপড়কে অশুচি বলেছিলেন আমি তার প্রতিবাদ করেছিলাম, আমি বলেছিলাম ওটা আর্থিক ক্ষতিকর হ'তে পারে, অশুচি হ'তেই পারে না। কিন্তু আমাদের শাস্ত্রচালিত অন্ধ চিত্ত ভোলাতে হবে নইলে কাজ পাব না, মনুষ্যত্বের এমনতর চিরস্থায়ী অবমাননা আর কি হ'তে পারে ? নায়কচালিত দেশ এমনি ভাবেই মোহাচ্ছন্ন হয়ে থাকে,—এক জাদুকর যখন বিদায় গ্রহণ করে, তখন আর এক জাদুকর আর-এক মন্ত্র সৃষ্টি করে।

ডিক্টেটরশিপ একটা মস্ত আপদ, সেকথা আমি মানি এবং সেই আপদের বহু অত্যাচার রাশিয়ায় আজ ঘটচে সেকথাও আমি বিশ্বাস করি। এর নঙর্থক দিকটা জবরদস্তির দিক, সেটা পাপ। কিন্তু সদর্থক দিকটা দেখেচি, সেটা হ'ল শিক্ষা, জবরদস্তির একেবারে উল্টো।

দেশের সৌভাগ্য-সৃষ্টি-ব্যাপারে জনগণের চিত্ত সম্মিলিত হ'লে তবে সেটার ক্রিয়া সজীব ও স্থায়ী হয়; নিজের একনায়কত্বের প্রতি যারা লুব্ধ, নিজের চিত্ত ছাড়া অন্য সকল চিত্তকে অশিক্ষা দ্বারা আড়ষ্ট ক'রে রাখাই তাদের অভিপ্রায়-সিদ্ধির একমাত্র উপায়। জারের রাজত্বে শিক্ষার অভাবে জনগণ ছিল মোহাভিভূত, তার উপরে সর্ব্বব্যাপী একটা ধর্ম্মমূঢ়তা অজগর সাপের মত সাধারণের চিত্তকে শত পাকে বেড়ে ধরেছিল। সেই মূঢ়তাকে সম্রাট অতি সহজে নিজের কাজে লাগাতে পারতেন। তখন য়িহুদীর সঙ্গে খৃষ্টানের, মুসলমানের সঙ্গে আর্ম্মাণির সকল প্রকার বীভৎস উৎপাত ধর্ম্মের নামে অনায়াসে ঘটানো যেতে পারত। তখন জ্ঞান ও ধর্ম্মের মোহদ্বারা আত্মশক্তিহারা শ্লথগ্রন্থি-বিভক্ত দেশ বাহিরের শত্রুর কাছে সহজেই অভিভূত ছিল। একনায়কত্বের চিরাধিপত্যের পক্ষে এমন অনুকূল অবস্থা আর কিছুই হ'তে পারে না।

পূর্ব্বতন রাশিয়ার মতই আমাদের দেশে এই অবস্থা বহুকাল থেকে বর্ত্তমান। আজ আমাদের দেশ মহাত্মাজীর চালনার কাছে বশ মেনেচে, কাল তিনি থাকবেন না, তখন চালকত্বের প্রত্যাশীরা তেমনি ক'রেই অকস্মাৎ দেখা দিতে থাকবে যেমন ক'রে আমাদের দেশের ধর্ম্মাভিভূতদের কাছে নূতন নূতন অবতার ও গুরু যেখানে-সেখানে উঠে পড়চে। চীন দেশে আজ নায়কত্ব নিয়ে জনকয়েক ক্ষমতালোভী জবরদস্তদের মধ্যে নিরবচ্ছিন্ন প্রলয় সংঘর্ষ চলেইচে, কারণ, জনসাধারণের মধ্যে সে-শিক্ষা নেই যাতে তারা নিজের সম্মিলিত ইচ্ছাদ্বারা দেশের ভাগ্য নিয়ামিত করতে পারে, তাই সেখানে আজ সমস্ত দেশ ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেল। আমাদের দেশে সেই নায়ক পদ নিয়ে দারুণ হানাহানি ঘটবে না এমন কথা মনে করতে পারিনে—তখন দলিতবিদলিত হয়ে মরবে উলুখড়, জনসাধারণ, কারণ তারা উলুখড়, তারা বনস্পতি নয়।

রাশিয়াতেও সম্প্রতি নায়কের প্রবল শাসন দেখা গেল। কিন্তু এই শাসন নিজেকে চিরস্থায়ী করবার পন্থা নেয় নি, একদা সে পন্থা নিয়েছিল জারের রাজত্ব, অশিক্ষা ও ধর্ম্মমোহের দ্বারা জনসাধারণের মনকে অভিভূত ক'রে এবং কষাকের কষাঘাতে তাদের পৌরুষকে জীর্ণ ক'রে দিয়ে। বর্ত্তমান আমলে রাশিয়ায় শাসনদণ্ড নিশ্চল আছে ব'লে মনে করিনে, কিন্তু শিক্ষা-প্রচারের প্রবলতা অসাধারণ। তার কারণ এর মধ্যে ব্যক্তিগত বা দলগত ক্ষমতা-লিপ্সা বা অর্থলোভ নেই। একটা বিশেষ অর্থ-নৈতিক মতে সর্ব্বসাধারণকে দীক্ষিত ক'রে জাতি বর্ণ ও শ্রেণী নির্ব্বিশেষে সকলকেই মানুষ ক'রে তোলবার একটা দুনিবার ইচ্ছা আছে। তা যদি না হ'ত তা হ'লে ফরাসী পণ্ডিতের কথা মানতে হ'ত যে, শিক্ষা দেওয়াটা একটা মস্ত ভুল। অর্থনৈতিক মতটা সম্পূর্ণ গ্রাহ্য কি না সে-কথা বলবার সময় আজও আসেনি—কেন-না এ মত এতদিন প্রধানত পুঁথির মধ্যেই টলে টলে বেড়াচ্ছিল, এমন বৃহৎ ক্ষেত্রে এত বড় সাহসের সঙ্গে ছাড়া পায়নি। যে প্রবল লোভের কাছে এই মত প্রথম থেকেই সাংঘাতিক বাধা পেত সেই লোভকেই এরা সাংঘাতিকভাবে সরিয়ে দিয়েছে। পরীক্ষার ভিতর দিয়ে পরিবর্ত্তন ঘটতে ঘটতে এ মতের কতটুকু কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে তা আজ নিশ্চিত কেউ বল্‌তে পারে না। কিন্তু এ কথাটা নিশ্চিত বলা যেতে পারে যে, রাশিয়ায় জনসাধারণ এতকাল পরে যে শিক্ষা নির্ব্বারিত ও প্রচুরভাবে পাচ্চে তাতে ক'রে তাদের মনুষ্যত্ব স্থায়িভাবে উৎকর্ষ এবং সম্মানলাভ করল।

বর্ত্তমান রাশিয়ায় নিষ্ঠুর শাসনের জনশ্রুতি সর্ব্বদাই শোনা যায়—অসম্ভব না হ'তে পারে। নিষ্ঠুর শাসনের ধারা সেখানে চিরদিন চলে এসেছে, হঠাৎ তিরোভূত না হওয়াই সম্ভব। অথচ সেখানে চিত্রযোগে সিনেমাযোগে ইতিহাসের ব্যাখ্যায় সাবেক আমলের নিদারুণ শাসনবিধি ও অত্যাচারকে সোভিয়েট গবর্মেণ্ট অবিরত প্রত্যক্ষ করিয়ে দিচ্চে। এই গবর্মেণ্ট নিজেও

য'দি এই রকম নিষ্ঠুর পথ অবলম্বন ক'রে থাকে তবে নিষ্ঠুরাচারের প্রতি এত প্রবল ক'রে ঘৃণা উৎপাদন ক'রে দেওয়াটাকে আর কিছুই না হোক অদ্ভুত ভুল বলতে হবে। সিরাজউদ্দৌলা কর্তৃক কালাগর্তের নৃশংসতাকে যদি সিনেমা প্রভৃতি দ্বারা সর্বত্র লাঞ্ছিত করা হ'ত তবে তার সঙ্গে সঙ্গেই জালিয়ানওয়ালাবাগের কাণ্ড করাটাকে অন্তত মূর্খতা বললে দোষ হ'ত না। কারণ এক্ষেত্রে বিমুখ অস্ত্র অস্ত্রীকেই লাগবার কথা।

সোভিয়েট রাশিয়ায় মার্কসীয় অর্থনীতি সম্বন্ধে সর্ব্বসাধারণের বিচারবুদ্ধিকে এক ছাঁচে ঢালবার একটা প্রবল প্রয়াস সুপ্রত্যক্ষ; সেই জেদের মুখে এ সম্বন্ধে স্বাধীন আলোচনার পথ জোর ক'রে অবরুদ্ধ ক'রে দেওয়া হয়েচে। এই অপবাদকে আমি সত্য ব'লে বিশ্বাস করি। সেদিনকার য়ুরোপীয় যুদ্ধের সময় এই রকম মুখ চাপা দেওয়া এবং গবর্মেণ্ট-নীতির বিরুদ্ধবাদীর মতস্বাতন্ত্র্যকে জেলখানায় বা ফাঁসিকাঠে বিলুপ্ত ক'রে দেওয়ার চেষ্টা দেখা গিয়েছিল। যেখানে আশু ফললাভের লোভ অতি প্রবল সেখানে রাষ্ট্রনায়কেরা মানুষের মতস্বাতন্ত্র্যের অধিকারকে মানতে চায় না। তারা বলে ওসব কথা পরে হবে, আপাতত কাজ উদ্ধার ক'রে নিই। রাশিয়ার অবস্থা যুদ্ধকালের অবস্থা; অন্তরে বাহিরে শত্রু। ওখানকার সমস্ত পরীক্ষাকে পণ্ড ক'রে দেবার জন্যে চারিদিকে নানা ছলবলের কাণ্ড চল্‌চে। তাই ওদের নির্ম্মাণকার্য্যের ভিৎটা যত শীঘ্র পাকা করা চাই, এজন্যে বলপ্রয়োগ করতে ওদের কোনো দ্বিধা নেই। কিন্তু গরজ যত জরুরিই হোক্, বল জিনিষটা এক তরফা জিনিষ। ওটাতে ভাঙে, সৃষ্টি করে না। সৃষ্টিকার্য্যে দুই পক্ষ আছে, উপাদানকে স্বপক্ষে আনা চাই। মারধোর ক'রে নয়, তার নিয়মকে স্বীকার ক'রে।

রাশিয়া যে-কাজে লেগেছে এ হচ্চে যুগান্তরের পথ বানানো; পুরাতন বিধি-বিশ্বাসের শিকড়গুলো তার সাবেক জমি থেকে উপড়ে দেওয়া; চিরাভ্যাসের আরামকে তিরস্কৃত করা। এ-রকম ভাঙনের উৎসাহে যে আবর্ত্ত সৃষ্টি করে তার মাঝখানে পড়লে মানুষ তার মাত্রানির আর অন্ত পায় না,—স্পর্দ্ধা বেড়ে ওঠে; মানবপ্রকৃতিকে সাধনা ক'রে বশ করবার অপেক্ষা আছে একথা ভুলে যায়, মনে করে তাকে তার আশ্রয় থেকে ছিঁড়ে নিয়ে একটা সীতাহরণ ব্যাপার ক'রে তাকে পাওয়া যেতে পারে। তার পরে লঙ্কায় আগুন লাগে তো লাগুক। উপযুক্ত সময় নিয়ে স্বভাবের সঙ্গে রফা করবার তর সয় না যাদের, তারা উৎপাতকে বিশ্বাস করে, অবশেষে লাঠিয়ে পিটিয়ে রাতারাতি যা গ'ড়ে তোলে তার উপরে ভরসা রাখা চলে না, তার উপরে দীর্ঘকালের ভর সয় না। যেখানে মানুষ তৈরি নেই, মত তৈরি হয়েচে, সেখানকার উচ্চণ্ড দণ্ডনায়কদের আমি বিশ্বাস করিনে। প্রথম কারণ, নিজের মত সম্বন্ধে আগেভাগে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করা সুবুদ্ধি নয়, সেটাকে কাজে খাটাতে খাটাতে তবে তার পরিচয় হয়। ওদিকে ধর্মতন্ত্রের বেলায় যে জননায়কেরা শাস্ত্রবাক্য মানে না, তারাই দেখি অর্থতন্ত্রের দিকে শাস্ত্র মেনে অচল হয়ে বসে আছে। সেই শাস্ত্রের সঙ্গে যেমন ক'রে হোক্ মানুষকে টুঁটি চেপে, ঝুঁটি ধরে মেলাতে চায়,—এ কথাও বোঝে না জোর ক'রে ঠেসে-ঠুসে যদি কোনো এক রকমে মেলানো হয় তাতে সত্যের প্রমাণ হয় না, বস্তুত যে পরিমাণেই জোর সেই পরিমাণেই সত্যের অপ্রমাণ। য়ুরোপে যখন খৃষ্টান শাস্ত্রবাক্যে জবরদস্ত বিশ্বাস ছিল, তখন মানুষের হাড়গোড় ভেঙে তাকে পুড়িয়ে, বিঁধিয়ে, তাকে ঢিলিয়ে ধর্ম্মের সত্যপ্রমাণের চেষ্টা দেখা গিয়েছিল। আজ বল্‌শেভিক মতবাদ সম্বন্ধে তার বন্ধু ও শত্রু উভয় পক্ষেরই সেই রকম উদ্দাম গায়ের জোরী যুক্তি প্রয়োগ। দুই পক্ষেরই পরস্পরের নামে নালিশ এই যে, মানুষের মতস্বাতন্ত্র্যের অধিকারকে পীড়িত করা হচ্চে। মাঝের থেকে পশ্চিম মহাদেশে আজ মানবপ্রকৃতি দুই তরফ থেকেই ঢেলা খেয়ে মরচে। আমার মনে পড়চে আমাদের বাউলের গান—

নিঠুর গরজী
তুই কি মানসমুকুল ভাজবি আগুনে?
তুই ফুল ফুটাবি, বাস ছুটাবি সবুর বিহনে।
দেখ্ না আমার পরমগুরু সাঁই,
সে যুগযুগান্তে ফুটায় মুকুল তাড়াহুড়া নাই।
তোর লোভ প্রচণ্ড, তাই ভরসা দণ্ড
এর আছে কোন্ উপায়?

কয় সে মদন, দিস্‌নে বেদন, শোন্ নিবেদন,
সেই শ্রীগুরুর মনে,
সহজধারা আপনহারা তাঁর বাণী শোনে,
রে গুরুজী।

সোভিয়েট রাশিয়ার লোকশিক্ষা সম্বন্ধে আমার যা বক্তব্য সে আমি বলেচি, তা ছাড়া সেখানকার পলিটিক্‌স্ মুনফা-লোলুপদের লোভের দ্বারা কলুষিত নয় ব'লে রাশিয়ারাষ্ট্রের অন্তর্গত নানাবিধ প্রজা জাতিবর্ণ নির্ব্বিশেষে সমান অধিকারের দ্বারা ও প্রকৃষ্ট শিক্ষার সুযোগে সম্মানিত হয়েছে এ কথাটারও আলোচনা করেচি। আমি ব্রিটিশ ভারতের প্রজা ব'লেই এই দুটি ব্যাপার আমাকে এত গভীরভাবে আনন্দ দিয়েচে।

এখন বোধ করি, একটি শেষ প্রশ্নের উত্তর আমাকে দিতে হবে। বল্‌শেভিক অর্থনীতি সম্বন্ধে আমার মত কি, এ কথা অনেকে আমাকে জিজ্ঞাসা ক'রে থাকেন। আমার ভয় এই যে, আমরা চিরদিন শাস্ত্রশাসিত পাণ্ডাচালিত দেশ, বিদেশের আমদানি বচনকে একেবারেই বেদবাক্য ব'লে মেনে নেবার দিকেই আমাদের মুগ্ধ মনের ঝোঁক। গুরুমন্ত্রের মোহ থেকে সামলিয়ে নিয়ে আমাদের বলা দরকার যে, প্রয়োগের দ্বারাই মতের বিচার হ'তে পারে. এখনও পরীক্ষা শেষ হয়নি। যে-কোনো মতবাদ মানুষ সম্বন্ধীয় তার প্রধান অঙ্গ হচ্চে মানবপ্রকৃতি। এই মানবপ্রকৃতির সঙ্গে তার সামঞ্জস্য কি পরিমাণে ঘটবে তার সিদ্ধান্ত হ'তে সময় লাগে। তত্ত্বটাকে সম্পূর্ণ গ্রহণ করবার পূর্ব্বে অপেক্ষা করতে হবে। কিন্তু তবু সে সম্বন্ধে আলোচনা করা চলে, কেবলমাত্র লজিক নিয়ে বা অঙ্ক কষে নয়,—মানবপ্রকৃতিকে সামনে রেখে।

মানুষের মধ্যে দুটো দিক আছে, একদিকে সে স্বতন্ত্র আর একদিকে সে সকলের সঙ্গে যুক্ত। এর একটাকে বাদ দিলে যেটা বাকী থাকে সেটা অবাস্তব। যখন কোনো একটা ঝোঁকে প'ড়ে মানুষ একদিকেই একান্ত উধাও হয়ে যায় এবং ওজন হারিয়ে নানাপ্রকার বিপদ ঘটাতে থাকে তখন পরামর্শদাতা এসে সঙ্কটটাকে সংক্ষেপ করতে চান্, বলেন অন্য দিকটাকে একেবারেই ছেঁটে দাও। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য যখন উৎকট স্বার্থপরতায় পৌঁছিয়ে সমাজে নানাপ্রকার উৎপাত মথিত করে, তখন উপদেষ্টা বলেন, স্বার্থ থেকে স্ব-টাকে এক কোপে দাও উড়িয়ে তাহ'লেই সমস্ত ঠিক চলবে। তাতে হয়ত উৎপাত কমতে পারে কিন্তু চলা বন্ধ হওয়া অসম্ভব নয়। লাগাম-ছেঁড়া ঘোড়া গাড়িটাকে খানায় ফেলবার জো করে,—ঘোড়াটাকে গুলি ক'রে মারলেই যে তার পর থেকে গাড়িটা সুস্থ ভাবে চলবে এমন চিন্তা না ক'রে লাগামটা সম্বন্ধে চিন্তা করার দরকার হয়ে ওঠে।

দেহে দেহে পৃথক ব'লেই মানুষ কাড়াকড়ি হানাহানি ক'রে থাকে, কিন্তু সব মানুষকে এক দড়িতে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে সমস্ত পৃথিবীতে একটি মাত্র বিপুল কলেবর ঘটিয়ে তোলার প্রস্তাব বলগর্ব্বিত অর্থতাত্ত্বিক কোনো জার-এর মুখেই শোভা পায়। বিধাতার বিধিকে একেবারে সমূলে অতির্দিষ্ট করবার চেষ্টায় যে পরিমাণে সাহস তার চেয়ে অধিক পরিমাণে মূঢ়তা দরকার করে।

একদিন ভারতের সমাজটাই ছিল প্রধানত পল্লী-সমাজ। এই রকম ঘনিষ্ঠ পল্লীসমাজে ব্যক্তিগত সম্পত্তির সঙ্গে সমাজগত সম্পত্তির সামঞ্জস্য ছিল। লোকমতের প্রভাব ছিল এমন যে, ধনী আপনার ধন সম্পূর্ণ আপন ভোগে লাগাতে অগৌরব বোধ করত। সমাজ তার কাছ থেকে আনুকূল্য স্বীকার করেছে ব'লেই তাকে কৃতার্থ করেছে—অর্থাৎ ইংরেজী ভাষায় যাকে 'চ্যারিটি' বলে এর মধ্যে তা ছিল না। ধনীর স্থান ছিল সেখানেই যেখানে ছিল নির্ধন, সেই সমাজে আপন স্থান-মর্য্যাদা রক্ষা করতে গেলে ধনীকে নানা পরোক্ষ আকারে বড় অঙ্কের খাজনা দিতে হ'ত। গ্রামে বিশুদ্ধ জল, বৈদ্য, পণ্ডিত, দেবালয়, যাত্রা, গান, কথা, পথঘাট সমস্তই রক্ষিত হ'ত গ্রামের ব্যক্তিগত অর্থের সমাজমুখীন প্রবাহ থেকে, রাজকর থেকে নয়। এর মধ্যে স্বেচ্ছা এবং সমাজের ইচ্ছা দুই মিলতে পেরেচে। যেহেতু এই আদানপ্রদান রাষ্ট্রীয় যন্ত্রযোগে নয়, পরন্তু মানুষের ইচ্ছা-বাহিত, সেইজন্যে এর মধ্যে ধর্ম্মসাধনার ক্রিয়া চল্‌ত, অর্থাৎ এতে কেবলমাত্র আইনের চালনায় বাহ্য ফল ফলত না, অন্তরের দিকে ব্যক্তিগত উৎকর্ষ সাধন হ'ত। এই ব্যক্তিগত উৎকর্ষই মানবসমাজের স্থায়ী কল্যাণময় প্রাণবান আশ্রয়।

বণিক-সম্প্রদায়,—বিত্ত খাটিয়ে লাভ করাটাই যাদের মুখ্য ব্যবসায়,—তারা সমাজে ছিল পতিত। যেহেতু তখন ধনের বিশেষ সম্মান ছিল না, এইজন্য ধন ও অধনের একটা মস্ত বিভেদ তখন ছিল বর্ত্তমান। ধন আপন বৃহৎ সঞ্চয়ের দ্বারা নয়, আপন মহৎ দায়িত্ব পূরণ ক'রে তবে সমাজে মর্য্যাদা লাভ করত, নইলে তার ছিল লজ্জা। অর্থাৎ সম্মান ছিল ধর্ম্মের, ধনের নয়। এই সম্মান সমর্পণ করতে গিয়ে কারও আত্মসম্মানের হানি হ'ত না। এখন সেদিন গেছে ব'লেই সামাজিক দায়িত্বহীন ধনের প্রতি একটা অসহিষ্ণুতার লক্ষণ নানা আকারে দেখা যাচ্ছে। কারণ ধন এখন মানুষকে অর্ঘ্য দেয় না, তাকে অপমানিত করে।

য়ুরোপীয় সভ্যতা প্রথম থেকেই নগরে সংহত হবার পথ খুঁজেছে। নগরে মানুষের সুযোগ হয় বড়, সম্বন্ধ হয় খাটো। নগর অতি বৃহৎ, মানুষ সেখানে বিক্ষিপ্ত, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য একান্ত, প্রতিযোগিতার মথন প্রবল। ঐশ্বর্য্য সেখানে ধনী নির্ধনের বিভাগকে বাড়িয়ে তোলে এবং চ্যারিটির দ্বারা যেটুকু যোগসাধন হয় তাতে সান্ত্বনা নেই, সম্মান নেই। সেখানে যারা ধনের অধিকারী এবং যারা ধনের বাহন তাদের মধ্যে আর্থিক যোগ আছে, সামাজিক সম্বন্ধ বিকৃত অথবা বিচ্ছিন্ন।

এমন অবস্থায় যন্ত্রযুগ এল, লাভের অঙ্ক বেড়ে চলল অসম্ভব পরিমাণে। এই লাভের মহামারী সমস্ত পৃথিবীতে যখন ছড়াতে লাগল তখন যারা দূরবাসী অনাত্মীয়, যারা নির্ধন, তাদের আর উপায় রইল না, চীনকে খেতে হ'ল আফিম, ভারতকে উজাড় করতে হ'ল তার নিজস্ব, আফ্রিকা চিরদিন পীড়িত, তার পীড়া বেড়ে চলল। এ তো গেল বাইরের কথা, পশ্চিম মহাদেশের ভিতরেও ধনী নির্ধনের বিভাগ আজ অত্যন্ত কঠোর; জীবনযাত্রার আদর্শ বহুমূল্য ও উপকরণবহুল হওয়াতে দুই পক্ষের ভেদ অত্যন্ত প্রবল হয়ে চোখে পড়ে। সাবেক কালে, অন্তত আমাদের দেশে, ঐশ্বর্য্যের আড়ম্বর ছিল প্রধানত সামাজিক দানে ও কর্ম্মে, এখন হয়েছে ব্যক্তিগত ভোগে। তাতে বিস্মিত করে, আনন্দিত করে না, ঈর্ষা জাগায়, প্রশংসা জাগায় না। সব চেয়ে বড় কথাটা হচ্ছে এই যে, তখন সমাজে ধনের ব্যবহার একমাত্র দাতার স্বেচ্ছার উপর নির্ভর করত না, তার উপরে ছিল সামাজিক ইচ্ছার প্রবল প্রভাব। সুতরাং দাতাকে নম্র হয়ে দান করতে হ'ত, শ্রদ্ধয়া দেয়ং, এই কথাটা খাটত।

মোট কথা হচ্চে আধুনিক কালে ব্যক্তিগত ধনসঞ্চয় ধনীকে যে প্রবল শক্তির অধিকার দিচ্চে তাতে সর্ব্বজনের সম্মান ও আনন্দ থাকতে পারে না। তাতে একপক্ষে অসীম লোভ, অপর পক্ষে গভীর ঈর্ষা, মাঝখানে দুস্তর পার্থক্য। সমাজে সহযোগিতার চেয়ে প্রতিযোগিতা অসম্ভব বড় হয়ে উঠল। এই প্রতিযোগিতা নিজের দেশের এক শ্রেণীর সঙ্গে অন্য শ্রেণীর, এবং বাহিরে এক দেশের সঙ্গে অন্য দেশের। তাই চারদিকে সংশয়হিংস্র অস্ত্র শাণিত হয়ে উঠচে, কোনো উপায়েই তার পরিমাণ কেউ খর্ব্ব করতে পারচে না। আর পরদেশী যারা এই দূরস্থিত ভোগরাক্ষসের ক্ষুধা মেটাবার কাজে নিযুক্ত তাদের রক্তবিরল কৃশতা যুগের পর যুগে বেড়েই চলেচে। এই বহুবিস্তৃত কৃশতার মধ্যে পৃথিবীর অশান্তি বাসা বাঁধতে পারে না, একথা যারা বলদর্পে কল্পনা করে তারা নিজের গোঁয়ার্ত্তমির অন্ধতার দ্বারা বিড়ম্বিত। যারা নিরন্তর দুঃখ পেয়ে চলেচে সেই হতভাগারাই দুঃখ-বিধাতার প্রেরিত দূতদের প্রধান সহায়, তাদের উপবাসের মধ্যে প্রলয়ের আগুন সঞ্চিত হচ্চে।

বর্ত্তমান সভ্যতার এই অমানবিক অবস্থায় বলশেভিক নীতির অভ্যুদয়। বায়ুমণ্ডলের এক অংশে তনুত্ব ঘটলে ঝড় যেমন বিদ্যুদ্দন্ত পেষণ ক'রে মারমূর্ত্তি ধরে ছুটে আসে এ-ও সেই রকম কাণ্ড। মানবসমাজে সামঞ্জস্য ভেঙে গেছে ব'লেই এই একটা অপ্রাকৃতিক বিপ্লবের প্রাদুর্ভাব। সমষ্টির প্রতি ব্যষ্টির উপেক্ষা ক্রমশই বেড়ে উঠছিল ব'লেই সমষ্টির দোহাই দিয়ে আজ ব্যষ্টিকে বলি দেবার আত্মঘাতী প্রস্তাব উঠেচে। তীরে অগ্নিগিরি উৎপাত বাধিয়েচে ব'লে সমুদ্রকেই একমাত্র বন্ধু ব'লে এই ঘোষণা। তীরহীন সমুদ্রের রীতিমত পরিচয় যখন পাওয়া যাবে তখন কূলে ওঠবার জন্যে আবার আকুপাকু করতে হবে। সেই ব্যষ্টি-বর্জ্জিত সমষ্টির অবাস্তবতা কখনই মানুষ চিরদিন সইবে না। সমাজ থেকে লোভের দুর্গগুলোকে জয়

ক'রে আয়ত্ত করতে হবে, কিন্তু ব্যক্তিকে বৈতরণী পার ক'রে দিয়ে সমাজরক্ষা করবে কে? অসম্ভব নয় যে, বর্ত্তমান রুগ্ন যুগে বল্‌শেভিক্ নীতিই চিকিৎসা, কিন্তু চিকিৎসা তো নিত্যকালের হ'তে পারে না, বস্তুত ডাক্তারের শাসন যেদিন ঘুচবে সেইদিনই রোগীর শুভদিন।

আমাদের দেশে আমাদের পল্লীতে পল্লীতে ধন-উৎপাদন ও পরিচালনার কাজে সমবায় নীতির জয় হোক্ এই আমি কামনা করি। কারণ, এই নীতিতে যে সহযোগিতা আছে, তাতে সহযোগীদের ইচ্ছাকে চিন্তাকে তিরস্কৃত করা হয় না ব'লে মানবপ্রকৃতিকে স্বীকার করা হয়। সেই প্রকৃতিকে বিরুদ্ধ ক'রে দিয়ে জোর খাটাতে গেলে সে জোর খাটবে না। এইসঙ্গে একটা কথা বিশেষ ক'রে বলা দরকার। আমি যখন ইচ্ছা করি যে, আমাদের দেশে গ্রামগুলি বেঁচে উঠুক, তখন কখনও ইচ্ছে করিনে যে গ্রাম্যতা ফিরে আসুক। গ্রাম্যতা হচ্ছে সেইরকম সংস্কার, বিদ্যা, বুদ্ধি, বিশ্বাস ও কর্ম্ম যা গ্রাম-সীমার বাইরের সঙ্গে বিযুক্ত। বর্ত্তমান যুগের যে প্রকৃতি তার সঙ্গে যা কেবলমাত্র পৃথক নয়, যা বিরুদ্ধ। বর্ত্তমান যুগের বিদ্যা ও বুদ্ধির ভূমিকা বিশ্বব্যাপী—যদিও তার হৃদয়ের অনুবেদনা সম্পূর্ণ সে পরিমাণে ব্যাপক হয়নি। গ্রামের মধ্যে সেই প্রাণ আনতে হবে যে-প্রাণের উপাদান তুচ্ছ ও সঙ্কীর্ণ নয়, যার দ্বারা মানবপ্রকৃতিকে কোনোদিকে খর্ব্ব ও তিমিরাবৃত না রাখা হয়। ইংলণ্ডে একদা কোনো এক গ্রামে একজন কৃষকের বাড়িতে ছিলুম। দেখলুম লণ্ডনে যাবার জন্যে ঘরের মেয়েগুলির মন চঞ্চল। শহরের সর্ব্ববিধ ঐশ্বর্য্যের তুলনায় গ্রামের সম্বলের এত দীনতা যে গ্রামের চিত্তকে স্বভাবতই সর্ব্বদা শহরের দিকে টানচে। দেশের মাঝখানে থেকেও গ্রামগুলির যেন নির্ব্বাসন। রাশিয়ায় দেখেছি, গ্রামের সঙ্গে শহরের বৈপরীত্য ঘুচিয়ে দেবার চেষ্টা। এই চেষ্টা যদি ভাল ক'রে সিদ্ধ হয় তাহ'লে শহরের অস্বাভাবিক অতিবৃদ্ধি নিবারণ হবে। দেশের প্রাণশক্তি, চিন্তাশক্তি দেশের সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হয়ে আপন কাজ করতে পারবে। আমাদের দেশের গ্রামগুলিও শহরের উচ্ছিষ্ট ও উদ্বৃত্তভোজী না হয়ে মনুষ্যত্বের পূর্ণ সম্মান ও সম্পদ ভোগ করুক এই আমি কামনা করি। একমাত্র সমবায় প্রণালীর দ্বারা গ্রাম আপন সর্ব্বাঙ্গীন শক্তিকে নিমজ্জনদশা থেকে উদ্ধার করতে পারবে এই আমার বিশ্বাস। আক্ষেপের বিষয় এই যে, আজ পর্য্যন্ত বাংলা দেশে সমবায় প্রণালী কেবল টাকা ধার দেওয়ার মধ্যেই ম্লান হয়ে আছে, মহাজনী গ্রাম্যতাকেই কিঞ্চিৎ শোধিত আকারে বহন করচে, সম্মিলিত চেষ্টায় জীবিকা উৎপাদন ও ভোগের কাজে সে লাগ্‌ল না। তার প্রধান কারণ যে-শাসনতন্ত্রকে আশ্রয় ক'রে আমলা-বাহিনী সমবায়-নীতি আমাদের দেশে আবির্ভূত হ'ল সে যন্ত্র অন্ধ বধির উদাসীন। তা ছাড়া হয়ত একথা লজ্জার সঙ্গে স্বীকার করতে হবে যে, চরিত্রে যে গুণ থাকলে সমবেত হওয়া সহজ হয় আমাদের সে গুণ নেই। যারা দুর্ব্বল, পরস্পরের প্রতি বিশ্বাস তাদের দুর্ব্বল। নিজের পরে অশ্রদ্ধাই অপরের প্রতি অশ্রদ্ধার ভিত্তি। যারা দীর্ঘকাল পরাধীন, আত্মসম্মান হারিয়ে তাদের এই দুর্গতি। প্রভুশ্রেণীর শাসন তারা নতশিরে স্বীকার করতে পারে, কিন্তু স্বশ্রেণীর চালনা তারা সহ্য করে না, স্বশ্রেণীকে বঞ্চনা করা এবং তার প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহার করা তাদের পক্ষে সহজ। রুশীয় গল্পের বই প'ড়ে জানা যায় সেখানকার বহুকাল নির্য্যাতনপীড়িত কৃষকদেরও এই দশা। যতই দুঃসাধ্য হোক্ আর কোনো রাস্তা নেই, পরস্পরের শক্তিকে মনকে সম্মিলিত করবার উপলক্ষ্য সৃষ্টি ক'রে প্রকৃতিকে শোধন ক'রে নিতে হবে। সমবায় প্রণালীতে ঋণ দিয়ে নয়, একত্র কর্ম্ম করিয়ে পল্লীবাসীর চিত্তকে ঐক্যপ্রবণ ক'রে তুলে তবে আমরা পল্লীকে বাঁচাতে পারব।

(শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে লিখিত)

পাঠান-বৈষ্ণব রাজপুত্র বিজুলী খাঁ

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী

১

আমার বিশ্বাস, নবাবী আমলের বঙ্গসাহিত্যের অন্তর থেকে অনেক ছোটখাট ঐতিহাসিক তত্ত্ব উদ্ধার করা যায়। বলা বাহুল্য, সত্য মাত্রেই ঐতিহাসিক সত্য নয়, যেমন fact মাত্রেই scientific fact নয়। সত্যেরও একটা জাতিভেদ আছে।

ইতিহাসেরও একটা Evidence Act আছে। যে-ঘটনা উক্ত আইনের বাঁধাধরা নিয়মের ভিতর ধরা না পড়ে, সে ঘটনা যে সত্য এ কথা ইতিহাসের আদালতে গ্রাহ্য হয় না। সুতরাং যে ঘটনা আমরা মনে জানি সত্য, তা যে ঐতিহাসিক সত্য এমন কথা মুখ ফুটে বলবার সাহস পাই নে, রীতিমত দলিলদস্তাবেজের অভাবে।

আর বাংলা সাহিত্যে যে শুধু ছোটখাট ঐতিহাসিক সত্যের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়, তার কারণ সেকালে কোন বাঙালী ইতিহাস লেখেন নি, লিখ্‌তে চেষ্টাও করেন নি। প্রসঙ্গতঃ এখানে-ওখানে এমন অনেক ঘটনার উল্লেখ করেছেন, যার গায়ে সত্যের স্পষ্ট ছাপ আছে। আর আমার বিশ্বাস যে, ইতিহাসের ক্ষেত্রে ছোটবড়র বিশেষ কোনও প্রভেদ নেই। সত্যের যদি কোন মূল্য থাকে, ত সে মূল্য ছোটর অন্তরেও আছে বড়র অন্তরেও আছে। সুতরাং সেকেলে বঙ্গসাহিত্যের অন্তরে যে-সকল ঐতিহাসিক তত্ত্বের সন্ধান পাওয়া যায়, সেগুলি তুচ্ছ ব'লে উপেক্ষা করবার জিনিষ নয়।

চৈতন্যচরিতামৃতের অষ্টাদশ পরিচ্ছেদে কবিরাজ গোস্বামী মহাশয় যে অদ্ভুত ঘটনার উল্লেখ করেছেন সে ঘটনা যে প্রকৃত, কবিকল্পিত নয়, এই আমার চিরকেলে ধারণা, এবং এর ফলে, যাঁরা ঐতিহাসিক গবেষণায় মনোনিবেশ করেছেন, উক্ত ঘটনাটির প্রতি তাঁদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবার ইচ্ছা আমার বরাবরই ছিল। পূর্ব্বে যে করিনি, সে কতকটা আলস্য ও কতকটা সঙ্কোচবশতঃ। সম্প্রতি শ্রীযুক্ত অমৃতলাল শীল উক্ত ঘটনা অবলম্বন ক'রে প্রবাসী পত্রিকায় একটি ঐতিহাসিক প্রবন্ধ লিখেছেন।

তিনি বলেন যে, তাঁরও বিশ্বাস ও-গল্পটি বৈষ্ণবদের কল্পিত নয়, সত্য ঘটনা। আমরা যদি সে যুগের ইতিহাসের অন্তর থেকে পাঠান-বৈষ্ণব বিজুলী খাঁকে বা'র করতে পারি, তাহ'লে কবিরাজ গোস্বামী বর্ণিত বিবরণ যে সত্য সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ হওয়া যায়। উক্ত কারণেই শীল মহাশয় বিজুলী খাঁর পরিচয় দিতে চেষ্টা করেছেন। তিনি বলেন, চৈতন্যচরিতামৃতে যাঁকে বিজুলী খাঁ বলা হয়েছে, তাঁর প্রকৃত নাম আহম্মদ খাঁ। আমার ধারণা অন্যরূপ। আমার বিশ্বাস, চৈতন্যের যুগে "বিজুলী খাঁ" নামে একটি স্বতন্ত্র ও স্বনামখ্যাত রাজকুমার ছিলেন এবং কবিরাজ গোস্বামী মহাশয় তাঁরই কথা বলেছেন। কি কারণ আমার মনে এ ধারণা জন্মেছে সেই কথাটাই এ প্রবন্ধে বলতে চাই।

২

চৈতন্যচরিতামৃত হ'তে যদি সমগ্র বর্ণনাটি পাঠকদের চোখের সুমুখে ধ'রে দিতে পারতুম তাহ'লে ঘটনাটি যে কত অদ্ভুত তা সকলেই দেখ্‌তে পেতেন। কিন্তু এ প্রবন্ধের ভিতর তার অবসর নেই, কারণ বর্ণনাটি একটু লম্বা। তাছাড়া যিনি ইচ্ছা করেন, তিনিই চৈতন্যচরিতামৃতে তা দেখে নিতে পারেন। আমি সংক্ষেপে এবং যতদূর সম্ভব কবিরাজ-মহাশয়ের জবানিতেই ব্যাপার কি হয়েছিল বলবার চেষ্টা করব। কারণ ঘটনাটি না জানলে, তার বিচার পাঠকদের মনে লাগবে না। ঘটনাটি অদ্ভুত হলেও যে মিথ্যা নয় এবং একেবারে বিচারসিদ্ধ ঐতিহাসিক সত্য – তাই প্রমাণ করবার চেষ্টা করব। সকলেই মনে রাখবেন যে ঐতিহাসিক সত্য, বৈজ্ঞানিক সত্য নয়। অতীতে যা একবার ঘটেছিল তা

পৃথিবীতে আর দু-বার ঘটে না। ইংরেজীতে যাকে বলে, historical fact তার repetition নেই। আর যে-জাতীয় ঘটনা বার-বার ঘটে এবং ঘটতে বাধ্য—সেই জাতীয় ঘটনা নিয়েই বিজ্ঞানের কারবার। সুতরাং ইতিহাসের ক্ষেত্রে আমরা যাকে প্রমাণ বলি, তা অনুমান মাত্র।

মহাপ্রভু বৃন্দাবন অঞ্চলে তীর্থভ্রমণ ক'রে দেশে যখন প্রত্যাবর্ত্তন করছিলেন, তখন একদিন পথশ্রান্তি দূর করবার জন্য একটি বৃক্ষতলে আশ্রয় নেন। তাঁর সঙ্গী ছিল, তিনটি বাঙালী শিষ্য আর দুটি হিন্দুস্থানী ভক্ত; একজন রাজপুত, অপরটি মাথুর ব্রাহ্মণ। এ দুই ব্যক্তিকেই তিনি মথুরাতে সংগ্রহ করেছিলেন। তিনি গাছতলায় বসে আছেন এমন সময়—

"আচম্বিতে এক গোপ বংশী বাজাইল।
শুনিতেই মহাপ্রভুর প্রেমাবেশ হইল॥
অচেতন হঞা প্রভু ভূমিতে পড়িলা।
মুখে ফেন পড়ে, নাসায় শ্বাসরুদ্ধ হৈলা॥
হেনকালে তাহাঁ আসোয়ার দশ আইল।
ম্লেচ্ছ-পাঠান, ঘোড়া হৈতে উত্তরিল॥
প্রভুকে দেখিয়া ম্লেচ্ছ করয়ে বিচার।
এই যতি পাশ ছিল সুবর্ণ অপার
এই পঞ্চ বাটোয়ার ধুতুরা খাওয়াইয়া।
মারি ডারিয়াছে, যতির সব ধন নেয়া॥
তবে সেই পাঠান পঞ্চজনেরে বান্ধিলা।
কাটিতে চাহে, গৌড়িয়া সব কাঁপিতে লাগিলা॥"

এর থেকে বোঝা যায় যে, ভয় জিনিষটে আমরা বিলেত থেকে আমদানি করিনি। বাঙালী তিনজন ভয়ে কাঁপতে লাগলেন দেখে মহাপ্রভুর ভক্ত হিন্দুস্থানী দুজন তাদের এই বিপদ থেকে উদ্ধার করলেন। কারণ

"সেই কৃষ্ণদাস রাজপুত নির্ভয় বড়
সেইত মাথুর বিপ্র নির্ভয় মুখে বড় দড়।"

সেই মুখে বড় দড় মাথুর ব্রাহ্মণ পাঠান আসোয়ারদের বললেন—

এই যতি ব্যাধিতে কভু হয়েত মূর্চ্ছিত।
অবহি চেতন পাবে হইবে সম্বিত॥
ক্ষণেক ইহাঁ বৈস, বান্ধি রাখ সবাকারে।
ইহাঁকে পুছিয়া তবে মারিহ সবারে॥

একথা শুনে,

"পাঠান কহে তুমি পশ্চিমা, সাধু দুই জন।
গৌড়ীয়া ঠগ এই কাঁপে তিন জন॥

বাঙালী বেচারারা ভয়ে কাঁপছে, তার থেকে প্রমাণ হ'ল তারাই মহাপ্রভুকে খুন করেছে। একালেও আদালতে demeanour থেকে অপরাধের প্রমাণ হয়। সুতরাং সে তিন বেচারার হাতে হাতে প্রাণদণ্ড দেওয়াই স্থির হ'ল। এক্ষেত্রেও উক্ত গোবেচারাদের প্রাণরক্ষা করলেন, সেই নির্ভীক রাজপুত বৈষ্ণব।

কৃষ্ণদাস কহে আমার ঘর এই গ্রামে।
দুইশত তুড়কী আছে শতেক কামানে॥
এখনি আসিবে যদি আমি ত ফুকারী।
ঘোড়া পিড়া লবে সব, তোমা সবা মারি॥
গৌড়িয়া বাটপাড় নহে, তুমি বাটপাড়।
তীর্থবাসী লুঠ আর চাহ মারিবার॥
শুনিয়া পাঠান মনে সঙ্কোচ বড় হইল।
হেনকালে মহাপ্রভু চেতন পাইল॥

এর পর পাঠানদের মধ্যে যে একজন পীর ছিলেন, তার সঙ্গে মহাপ্রভুর শাস্ত্রবিচার সুরু হয় এবং সে বিচারে পরাস্ত হয়ে পীর সাহেব মহাপ্রভুর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন, এবং

"রামদাস বলি প্রভু তাঁর কৈল নাম।
আর এক পাঠান তার নাম বিজুলি খাঁন॥
অল্প বয়স তার, রাজার কুমার।
রামদাস আদি পাঠান চাকর তাহার॥
কৃষ্ণ বলি সেই পড়ে মহাপ্রভুর পায়।
প্রভু শ্রীচরণ দিল তাহার মাথায়॥

এই হচ্ছে পূর্ব্বোক্ত ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

পীর ও প্রভুর শাস্ত্রবিচারের পরিচয় পরে দেব; কারণ সে বিচার অতি বিস্ময়জনক। তারপর কি কারণে রাজকুমার বিজুলী খানকে ঐতিহাসিক ব্যক্তি মনে করি তা বলব। প্রথমে এরকম ঘটনা ঘটা যে অসম্ভব নয় তাই দেখাবার জন্য দেশ-কালের কিঞ্চিৎ পরিচয় দেওয়া আবশ্যক।

৩

শীল মহাশয় অনুমান করেন যে, মহাপ্রভু যখন বৃন্দাবন অঞ্চলে তীর্থভ্রমণে যান, তখন সিকন্দর লোদি দিল্লীর পাতশা, এবং আগ্রা তাঁর রাজধানী। ১৫১৭ খৃষ্টাব্দে সিকন্দর লোদির মৃত্যু হয়। সুতরাং চৈতন্য-চরিতামৃতের উল্লিখিত ঘটনা সম্ভবতঃ ১৫১৬ খৃষ্টাব্দে ঘটে। আমার বিশ্বাস এ অনুমান সঙ্গত। কবিরাজ গোস্বামীর

কথা মেনে নিলেও ঐ তারিখই পাওয়া যায়। তিনি বলেছেন যে মহাপ্রভুর—

"মধ্যলীলার করিল এই দিগ্‌দরশন।
ছয় বৎসর কৈলে যৈছে গমনাগমন॥
শেষ অষ্টাদশ বৎসর নীলাচলে বাস।
ভক্তগণ সঙ্গে করে কীর্ত্তন উল্লাস॥
—চৈতন্যচরিতামৃত, ২৫ পরিচ্ছেদ, ১৮৫ শ্লোক

এখন ঐতিহাসিকদের মতে চৈতন্যদেব চব্বিশ বৎসর বয়সে ১৫০৯ খৃষ্টাব্দে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন এবং তার কিছু দিন পরেই তীর্থ-পর্য্যটনে বহির্গত হন। ঠিক কতদিন পরে তা আমরা জানিনে। যদি ধ'রে নেওয়া যায় যে তাঁর "গমনাগমন" সুরু হয় ১৫১০ খৃষ্টাব্দে, তাহ'লে তিনি কবিরাজ গোস্বামী মহাশয়ের হিসেব মত ১৫১৬ সালে "মথুরা হৈতে প্রয়াগ গমন" করেন। অপর পক্ষে তাঁর মৃত্যুর আঠার বৎসরের আগের হিসেব ধরলেও ঐ একই তারিখে পৌছানো যায়, কারণ মহাপ্রভুর তিরোভাবের তারিখ হচ্ছে ১৫৩৪ খৃষ্টাব্দ।

সিকন্দর লোদী ছিলেন, হিন্দুধর্ম্মের মারাত্মক শত্রু। উক্ত পাতশার পরিচয় নিম্নোদ্ধৃত কথা-কটি হ'তে পাওয়া যাবে।

"The greatest blot on his character was relentless bigotry. The wholesale destruction of temples was not the best method of conciliating the Hindus of a conquered district.
(*Cambridge History of India*, Vol. 3, p. 246.)

চৈতন্যদেব যখন বৃন্দাবনে উপস্থিত হন, তখন সে দেশে যে দেবমন্দির ও বিগ্রহাদির ধ্বংসলীলা চলছিল, তা চৈতন্যচরিতামৃতের নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকগুলি হতেই জানা যায়। মহাপ্রভু অতিকষ্টে গোপালজীর দর্শনলাভ করেন। কারণ,

"অন্নকূট নাম গ্রামে গোপালের স্থিতি।
রাজপুত লোকের সেই গ্রামেতে বসতি॥
একজন আসি রাত্র্যে গ্রামিকে বলিল।
তোমার গ্রাম মারিতে তুড়ুক ধাড়ি সাজিল॥
আজ রাত্র্যে পলাহ, গ্রামে না রহ একজন।
ঠাকুর লঞা ভাগ, আসিবে কাল যবন॥
শুনিয়া গ্রামের লোক চিন্তিত হইলা।
প্রথমে গোপাল লঞা গাঁঠলি গ্রামে থুইলা॥
বিপ্রগৃহে গোপালের নিভৃত সেবন।
গ্রাম উজার হৈল, পালাইল সর্ব্বজন॥
ঐছে ম্লেচ্ছ ভয়ে গোপাল ভাগে বারে বারে।
মন্দির ছাড়ি কুঞ্জে রহে, কভু গ্রামান্তরে॥

পূর্ব্বোক্ত ইংরেজ ঐতিহাসিক সিকন্দর লোদী সম্বন্ধে আরও বলেন যে,

The accounts of his conquests, resemble those of the protagonists of Islam in India. Sikandar Lodi's mind was warped by habitual association with theologians.

পাঠান বীরপুরুষেরা প্রথম যখন ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন, তখন তাঁরা যে-ভাবে হিন্দুর মন্দির মঠ দেবদেবীর উপর যুদ্ধঘোষণা করেন, তার পাঁচ শ' বৎসর পরে পাঠান রাজ্যের যখন ভগ্ন দশা, তখন আবার পাঠান পাতশারা হিন্দুধর্ম্মের বিরুদ্ধে নব জেহাদ প্রচার করেন কেন? যে-কালে সিকন্দর লোদী বৃন্দাবন অঞ্চলে দেবমন্দিরাদির ধ্বংস করেন, ঠিক সেই একই সময়ে গৌড়ের পাতশাহ হুসেন শাহ ও

ওড়্ দেশে কোটি কোটি প্রতিমা প্রাসাদ
ভাঙ্গিলেক কত কত করিল প্রমাদ॥
(চৈতন্য-ভাগবত, অন্ত্যখণ্ড, চতুর্থ অধ্যায়)

এই সময়েই হিন্দুধর্ম্ম নূতন প্রাণ পায়। তাই উক্ত ধর্ম্মের প্রতি পাতশাদের মনে নববিদ্বেষও জাগ্রত হয়। এই নব হিন্দুধর্ম্ম নবরূপ ধারণ ক'রে আবির্ভূত হয়। জ্ঞান কর্ম্মকে প্রত্যাখ্যান ক'রে এ ধর্ম্ম একমাত্র ভক্তি-প্রধান হয়ে ওঠে। পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে রামানন্দ যে ভক্তির ধর্ম্ম উত্তরাপথে প্রচার করেন, সে ধর্ম্ম বহুলোকের হৃদয়-মন স্পর্শ করে। "শুষ্ক জ্ঞান" ও "বাহ্যকর্ম্মের" ব্যবসায়ীদের অর্থাৎ হিন্দুসমাজের ধর্ম্মযাজকদের ও বেদান্ত-শাস্ত্রীদের যে এই ভক্তিধর্ম্মের প্রতি অসীম অবজ্ঞা ছিল, তার প্রমাণ বৈষ্ণবগ্রন্থে পাতায় পাতায় আছে।

অপর পক্ষে মৌলবীদের অর্থাৎ মুসলমান ধর্ম্ম-শাস্ত্রীদের বিদ্বেষের একটি বিশেষ কারণ ছিল। তাঁরা ভয় পেয়েছিলেন যে এই প্রবল ভক্তির স্রোতে অনেক মুসলমানও হয়ত ভেসে যাবে, এবং আমার বিশ্বাস, এই শাস্ত্রীদের দ্বারা প্ররোচিত হয়েই সেকালের মুসলমান পাতশারা এই নব হিন্দুধর্ম্মের উপর খড়্গহস্ত হয়ে উঠেন।

অন্ততঃ সিকন্দর লোদীর মন ত was warped by habitual association with theologians.

শ্রীযুক্ত অমৃতলাল শীল, সেকালের জনৈক ব্রাহ্মণের নব ধর্ম্মমত প্রচার করার অপরাধে প্রাণদণ্ডের কথা উল্লেখ করেছেন। *Cambridge History of India* থেকে উক্ত ঘটনাটির বিবরণ নিম্নে উদ্ধৃত ক'রে দিচ্ছি।

Sikandar had an opportunity while at Sambul of displaying the bigotry which was a prominent feature of his character. A Brahmin of Bengal excited some interest and, among precisians, much indignation, by publicly maintaining, that the Mahomedan and Hindu religions were both true, and were but different paths by which God might be approached. A'zam-i-Humayun, governor of Bihar, was directed to send the daring preacher and two rival doctors of Islamic law to court, and theologians were summoned from various parts of the kingdom to consider, whether it was permissible to preach peace. They decided that since the Brahman had admitted the truth of Islam he should be invited to embrace it, with the alternative of death in the event of refusal. The decision commended itself to Sikandar and the penalty was exacted from the Brahman, who refused to change his faith."

এ বাঙালী ব্রাহ্মণটি যে কে জানিনে। কিন্তু তাঁর সমকালবর্ত্তী কবীরের মতও ঐ, চৈতন্যেরও তাই। চৈতন্যের শিষ্য যবন হরিদাসের যখন গৌড়ের বাদশার দরবারে বিচার হয়, তখন হরিদাসও ঐ একই মত প্রকাশ করেন, এবং বাংলার ও আগ্রার মৌলবীদের মতে যে—it was not permissible to preach peace, তার কারণ তাঁরা ভয় পেয়েছিলেন যে উক্ত ধর্ম্মের প্রশ্রয় দিলে কোনও কোনও পাঠানও এই নব বৈষ্ণব মন্ত্রে দীক্ষিত হবে,—যেমন বিজুলী খাঁ পরে হয়েছিলেন। আমার বিশ্বাস আদিতে এই বৈষ্ণবধর্ম্ম একটি বিশেষ সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম ছিল না। পূর্ব্বোক্ত বাঙালী ব্রাহ্মণ যেমন স্বধর্ম্ম ত্যাগ না করেও মুসলমান ধর্ম্মের অনুকূল হয়েছিলেন, আমার বিশ্বাস কোন কোন পাঠানও তেমনি স্বধর্ম্ম ত্যাগ না করেও পরম ভাগবৎ হয়েছিলেন, এবং বিজুলী খাঁ তাঁদের মধ্যে অন্যতম।

৫

এখন প্রকৃত প্রস্তাবে ফিরে আসা যাক। যে অবস্থায় ও যে কারণে মহাপ্রভুর দলবল পথ চলতি তুরুখ-সোয়ারদের হাতে গ্রেপ্তার হন, তার পুনরুল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন। ঐ সূত্রে কবিরাজ গোস্বামী মহাশয় বলেছেন যে,—

"সেই ম্লেচ্ছ মধ্যে এক, পরম গম্ভীর।
কালোবস্ত্র পরে সেই, লোকে কহে পীর॥"

এই পীরের সঙ্গে মহাপ্রভু শাস্ত্রবিচার ক'রে তাঁকে স্বমতাবলম্বী করেন। পরে পাঠান রাজকুমার বিজুলী খানও স্বীয় গুরুর পদানুসরণ করেন। এই শাস্ত্রবিচারের কিঞ্চিৎ পরিচয় দেব, কারণ এ বিচার অদ্ভুত। সেই পীরের "চিত্ত আর্দ্র হইল প্রভুরে দেখিয়া" এবং সে

নির্বিশেষ ব্রহ্মস্থাপে স্বশাস্ত্র উঠাইয়া।
অদ্বয়ব্রহ্ম সেই করিল স্থাপন।
তারি শাস্ত্র যুক্তে প্রভু করিল খণ্ডন॥

মুসলমান পীর যে শঙ্করপন্থী অদ্বৈতবাদী, এ কথা কি বিশ্বাস্য? তার পর মহাপ্রভুর উত্তর আরও আশ্চর্য্য। তিনি বললেন,—

"তোমার পণ্ডিত সবের নাহি শাস্ত্রজ্ঞান।
পূর্ব্বাপর বিধি মধ্যে, পর বলবান॥
নিজশাস্ত্র দেখ তুমি বিচার করিয়া॥
কি লিখিয়াছে তাতে শেষ বিচারিয়া॥
* * * *
প্রভু কহে তোমার শাস্ত্রে কহে নির্বিশেষ
তাহা খণ্ডি সবিশেষ স্থাপিয়াছে শেষ॥
তোমার শাস্ত্রে কহে শেষে একই ঈশ্বর।
সর্ব্বৈশ্বর্য্য পূর্ণ তিঁহ শ্যাম কলেবর॥
সচ্চিদানন্দ দেহ পূর্ণব্রহ্মরূপ।
সর্ব্বাত্মা সর্ব্বজ্ঞ নিত্য সর্ব্বাদ্য স্বরূপ॥

মহাপ্রভুর মুখে এ কথা শুনে পীর উত্তর করলেন যে,

"অনেক দেখিনু মুঞি ম্লেচ্ছ শাস্ত্র হৈতে।
সাধ্যসাধন বস্তু নারি নির্দ্ধারিতে॥
আমি বড় জ্ঞানী এই গেল অভিমান॥

এই কথোপকথন আমাদের বড়ই আশ্চর্য্য ঠেকে, কারণ মুসলমান ধর্ম্মের God যে personal God, বহু দেবতাও নয়, এক নির্গুণ পরব্রহ্ম নয়, এ কথা আমরা সকলেই জানি। সুতরাং কোন পরমগম্ভীর মুসলমান পীরকে তা স্মরণ করিয়ে দেওয়া যে মহাপ্রভুর পক্ষে আবশ্যক হয়েছিল,

এ কথাটা প্রথমে নিতান্তই আজগুবি মনে হয়। কিন্তু যাঁদের মুসলমান ধর্ম্মের ইতিহাসের সঙ্গে কিঞ্চিৎ পরিচয় আছে তাঁরা জানেন যে কালক্রমে মুসলমান ধর্ম্মও নানা সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়ে পড়ে, এবং তাদের মধ্যে কোন কোনও সম্প্রদায়ও জ্ঞানমার্গ অবলম্বন করে। এবং কোন ধর্ম্মেরই জ্ঞানমার্গীরা সগুণ ঈশ্বর অঙ্গীকার করে না। উক্ত পীর যে কোন বিশেষ সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন, তা তাঁর পরিধানের কালো বস্ত্র থেকেই বোঝা যায়। সুফীদের সাম্প্রদায়িক বেশ স্বতন্ত্র। সুতরাং পীর মহাশয় সুফী নন, তবে তিনি কি? যাঁরা মুসলমান ধর্ম্মের ইতিহাস সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ তাঁরা বলতে পারেন।

তার পর আরও আশ্চর্য্যের বিষয় হচ্ছে মহাপ্রভুর মুসলমান-শাস্ত্রের বিচার। শ্রীচৈতন্য যে মহাপণ্ডিত ছিলেন তা আমরা সকলেই জানি, তবে তিনি যে আরবী শাস্ত্রের পারদর্শী ছিলেন, এ কথা কারও মুখে শুনিনি। তবে এ বিচারের কথাটা কি আগাগোড়া মিথ্যা? আমার ধারণা অন্যরূপ। আমার বিশ্বাস, সে যুগে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের পণ্ডিত-মহলে শাস্ত্রবিচার চলত এবং হিন্দু-মুসলমান শাস্ত্রীরা উভয় সম্প্রদায়ের ধর্ম্মমতের আসল কথা সব জানতেন। সিকন্দর লোদি গোঁড়া মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও তিনি তাঁর দরবারে জনৈক বাঙালী ব্রাহ্মণের সহিত মৌলবীদের শাস্ত্রবিচারের বৈঠক বসান। আমার এ অনুমান যদি সত্য হয় ত মহাপ্রভু যে মুসলমান-শাস্ত্রের বিচারে প্রবৃত্ত হন, এ কথা অবিশ্বাস করবার কোন কারণ নেই।

৬

কবিরাজ গোস্বামীর এসব কথা যদি সত্য হয়, এবং আমার বিশ্বাস তা মূলতঃ সত্য, তাহ'লে এই প্রমাণ হয় যে, মহাপ্রভু যেমন পুরীতে সার্ব্বভৌমকে, কাশীতে প্রকাশানন্দকে জ্ঞানমার্গ ত্যাগ ক'রে ভক্তিমার্গ অবলম্বন করতে বাধ্য করেছিলেন, তেমনি তিনি সৌরক্ষেত্রে জনৈক পরম গম্ভীর অদ্বৈতবাদী মুসলমান পীরকেও ভগবদ্ভক্ত ক'রে তুলেছিলেন, এবং একমাত্র কোরাণের দোহাই দিয়ে। এবং তিনি পূর্ব্বেও যেমন হিন্দু শাস্ত্রীদের নিকট মুসলমান ধর্ম্ম প্রচার করেন নি, এক্ষেত্রেও তেমনি তিনি মুসলমান-শাস্ত্রীর নিকট হিন্দুধর্ম্ম প্রচার করেন নি। কিন্তু উভয় ধর্ম্মমতেরই যা greatest common measure, অর্থাৎ ভগবদ্ভক্তি, তারই মর্ম্ম ব্যাখ্যা করেছিলেন। এবং আমার বিশ্বাস ইতিপূর্ব্বে সিকন্দর লোদী যে ব্রাহ্মণ বেচারাকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করেন, সে বেচারীর অপরাধ—সে একই মত প্রচার করে, কিন্তু তাই ব'লে স্বধর্ম্ম ত্যাগ ক'রে পর-ধর্ম্ম অঙ্গীকার করতে রাজী হয় না—প্রাণ বাঁচাবার খাতিরেও নয়।

ও-যুগটা ছিল এদেশের ধর্ম্মের internationalism-এর যুগ। আজও এমন বহু লোক আছেন যাঁরা internationalism কথাটায় ভয় পান, কারণ তাঁদের বিশ্বাস ও-মনোভাব nationalism-এর পরিপন্থী। সেকালেও অনেকে ধর্ম্ম বলতে বুঝতেন, হয় হিন্দুধর্ম্ম, নয় মুসলমান ধর্ম্ম। কিন্তু মানুষে যাকে ধর্ম্ম-মনোভাব বলে, তার প্রাণ যে ভগবদ্ভক্তি এ জ্ঞান যার আছে, তার অন্তরে নানা ধর্ম্মের ভেদজ্ঞানটাই অবিদ্যা। আমার বিশ্বাস, সে যুগে ভগবদ্ভক্ত ও বৈষ্ণব এ দুটি পর্য্যায়-শব্দ ছিল। সুতরাং ব্রাহ্মণের মত পাঠানও স্বধর্ম্ম রক্ষা ক'রেও পরমবৈষ্ণব অর্থাৎ পরম ভাগবৎ হ'তে পারত। সকল ধর্ম্মেরই কথা এক, শুধু ভাষা বিভিন্ন। বৈষ্ণব ধর্ম্মের মূলমন্ত্র হচ্ছে—"সর্ব্ব ধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।" এ কথা বলাও যা আর "স্বধর্ম্ম রক্ষা ক'রে মামেকং শরণং ব্রজ" এ কথা বলাও কি তাই নয়?

৭

হিন্দু যে স্বধর্ম্ম ত্যাগ ক'রে স্বেচ্ছায় মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করে, এ ঘটনা আজও ঘটে, কিন্তু মুসলমান যে স্বধর্ম্ম ত্যাগ ক'রে হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করে আজ তার কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। এই কারণেই চৈতন্যচরিতামৃতের কথা বিশ্বাস করা আমাদের পক্ষে কঠিন। কিন্তু আমরা ভুলে যাই যে, হিন্দুধর্ম্ম অর্থাৎ হিন্দু সমাজের দরজা আজ বন্ধ হ'লেও, অতীতে খোলা ছিল। আজ আমরা এ সমাজ থেকে অনেক হিন্দুকে বহিষ্কৃত করতে পারি, কিন্তু কোন অহিন্দুকে তার

অন্তর্ভূত করতে পারি নে, কারণ আজকের দিনে হিন্দু সমাজের অর্থ হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দুধর্ম্মের অর্থ হিন্দু সমাজ। আর হিন্দু সমাজ হচ্ছে অপর সকল মানবসমাজ হ'তে বিচ্ছিন্ন ও একঘরে। কিন্তু ঐতিহাসিক মাত্রই জানেন যে, হিন্দু যুগে অসংখ্য শক ও যবন বৌদ্ধ ধর্ম্মের শরণ গ্রহণ করেন। এবং বৌদ্ধধর্ম্ম হিন্দু ধর্ম্মেরই একটি শাখা মাত্র। আর এ ধর্ম্মমন্দিরের দ্বার বিশ্বমানবের জন্য উন্মুক্ত ছিল।

ভারতবর্ষের মধ্যযুগের এই নব বৈষ্ণবধর্ম্মও সনাতন হিন্দুধর্ম্মের একটি নব শাখা মাত্র। তবে এ নবত্বের কারণ, মুসলমান ধর্ম্মের প্রভাব। মুসলমান ধর্ম্ম যে প্রধানতঃ ঐকান্তিক ভক্তির ধর্ম্ম এ কথা কে না জানে? ভারতবর্ষের মধ্যযুগের বৈষ্ণব ধর্ম্ম যে মুসলমান ধর্ম্মের এতটা গা-ঘেঁষা, তার কারণ পাঁচ-শ বৎসর ধ'রে হিন্দুধর্ম্ম ও মুসলমান ধর্ম্ম পাশাপাশি বাস ক'রে আসছিল। একেশ্বরবাদ ও মানুষমাত্রেই যে ভগবানের সন্তান, এ দুটিই হচ্ছে মুসলমান ধর্ম্মের বড় কথা। তাই এই নব হিন্দুধর্ম্মে, অহিন্দুরও প্রবেশের পূর্ণ অধিকার ছিল। তা যে ছিল, তার প্রমাণ চৈতন্য-ভাগবৎ ও চৈতন্য-চরিতামৃতের মধ্যে দেদার আছে। সুতরাং শীল-মহাশয়ের আবিষ্কৃত মহম্মদ খাঁ নামক পাঠানও যে উক্ত ধর্ম্মে দীক্ষিত হন, এ কথা অবিশ্বাস করবার কোনও কারণ নেই। তবে বিজুলী খাঁ নামক যে একটি স্বতন্ত্র পাঠান রাজকুমার ছিলেন সে বিষয়েও সন্দেহ নেই, এবং খুব সম্ভবতঃ তাঁরই সঙ্গে চৈতন্যদেবের মথুরার সন্নিকটে দেখা হয়েছিল। *Tabakat-i-Akbari* নামক ফার্সী গ্রন্থে তাঁর নামধাম এবং তাঁর বাপের নামও পাওয়া যায়। আকবর কর্ত্তৃক কালিঞ্জর-দুর্গ আক্রমণসূত্রে গ্রন্থকার বলেন যে,

"This is a strong fortress, and many former Sultans had been ambitious of taking it. Sher Khan Afghan (Sher Shah) besieged it for a year, but was killed in the attempt to take it, as has been narrated in the history of his reign. During the interregnum of the Afghans, Raja Ram Chunder had purchased the fort at a high price from Bijilli Khan, the adopted son (Pisan-i-khwanda) of Bihar Khan Afghan." (Elliot's *History of India*, vol. v., p. 333).

এর থেকে জানা যায় যে, রাজকুমার বিজুলী খাঁ কালিঞ্জরের নবাবের পোষ্যপুত্র। এবং তিনিই এ রাজ্য রাজা রামচন্দ্রকে বিক্রী ক'রে চলে গিয়েছিলেন, সম্ভবতঃ বৃন্দাবনে। তবে তিনি যে কবে কালিঞ্জর-রাজ্য ত্যাগ করেন, তার তারিখ আমরা জানি নে, সম্ভবতঃ তাঁর পিতা বিহারী খাঁ আফগানের মৃত্যুর পর তিনি যখন স্বয়ং নবাব হন। শের শাহ্‌র মৃত্যু হয়েছিল ১৫৪৪ খৃষ্টাব্দে, বিজুলী খাঁ খুব সম্ভবতঃ এর পরেই কালিঞ্জর হস্তান্তর করেন। মহাপ্রভুর সঙ্গে তাঁর যখন সাক্ষাৎ হয়, তখন তাঁর "অল্প বয়েস" সুতরাং রাজা রামচন্দ্রকে তিনি যখন কালিঞ্জর-দুর্গ বিক্রী করেন, তখন তাঁর বয়েস আন্দাজ পঞ্চাশ। বিজুলী খাঁ কালিঞ্জরের নবাব হওয়া সত্ত্বেও যে পরম-ভাগবত ব'লে গণ্য হয়েছিলেন, এ ব্যাপার অসম্ভব নয়। বৌদ্ধযুগের বড় বড় রাজা-মহারাজারাও পরম সৌগত ব'লে গণ্য হতেন। তা ছাড়া, এ নব বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষিত হবার জন্য, বিষয়-সম্পত্তি ত্যাগ করবার প্রয়োজন ছিল না। 'ভোগে অনাসক্ত' হ'লেই বৈষ্ণব হওয়া যেত। মহাপ্রভু রঘুনাথ দাসকে এই কথা ব'লেই তাঁকে সংসার-ত্যাগের সঙ্কল্প হ'তে বিরত করেন।

মহাপ্রভু নিজে সন্ন্যাস গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু অপরকে সন্ন্যাস গ্রহণ করতে কখনও উৎসাহ দেন নি। এমন কি, বালযোগী অবধূত নিত্যানন্দকে সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম ত্যাগ ক'রে গার্হস্থ্য ধর্ম্ম অবলম্বন করতে বাধ্য করেছিলেন।

এই সব কারণে, আমার বিশ্বাস যে চৈতন্যচরিতামৃতে বর্ণিত উক্ত ঘটনাটি অন্ততঃ চৌদ্দ আনা সত্য, অতএব ঐতিহাসিক। কারণ আমরা যাকে ঐতিহাসিক সত্য বলি, তার ভিতর থেকে অনেকখানি খাদ বাদ না দিলে তা বৈজ্ঞানিক সত্য হয় না। ঐতিহাসিক সত্য হচ্ছে অসত্য ও বৈজ্ঞানিক সত্যের মাঝামাঝি এক রকম সত্যাসত্য মাত্র। আর এক কথা। আমরা যে প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের অনেক কথাই কবিকল্পিত মনে করি, তার কারণ সেকালের অনেক পুঁথিই আমরা কাব্য হিসেবে পড়ি, যদিচ কাব্যের কোন লক্ষণই তাদের গায়ে নেই, এক পয়ারের বন্ধন ছাড়া। আর সে পয়ারের

বন্ধন যে কত ঢিলে আর তার শ্রী যে কত চমৎকার, তা চৈতন্যচরিতামৃতের উদ্ধৃত শ্লোকগুলিতে সকলেই দেখ্‌তে পাবেন। তা ছাড়া ও-সব গ্রন্থে কবিকল্পিত, অর্থাৎ কবির কল্পনা-প্রসূত, ব'লে কোনও জিনিষই নেই। কবি-কল্পনার তাঁরা ধার ধারতেন না। সুতরাং তাঁদের কথার যদি কোন মূল্য থাকে, তা একমাত্র সত্য হিসাবে।

সুতরাং literature ওরফে রসসাহিত্য যাঁদের মুখরোচক নয় এবং যাঁরা মাত্র সত্যানুসন্ধী তাঁদের প্রাচীন বাংলা-সাহিত্যের নির্ভয়ে চর্চ্চা করতে অনুরোধ করি। তাঁরা ও-সাহিত্যের অন্তরে অনেক নীরস ঐতিহাসিক ও দার্শনিক তত্ত্বের সন্ধান নিশ্চয়ই পাবেন।

সাহিত্য ও সমাজ

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা, এম. এ.

সাহিত্য ও সমাজের সম্পর্ক-বিচার পুরাতন তর্ক। সেই পরিচিত কথার আলোচনায় ফল কি? অকারণে পুরাতনের পুনরুক্তি করিয়া লাভ নাই সত্য, কিন্তু সাহিত্যে পরিচিত বিষয়-বস্তুই বার-বার করিয়া নূতনভাবে দেখা দেয়। চিরপুরাতন সূর্য্য চিরদিন ধরিয়া বিজ্ঞানের নূতন তথ্য জোগাইতেছে, কেন-না সূর্য্য বহুদিক দিয়াই বিজ্ঞাতব্য। সত্য বহুমুখ। এক সত্য নানা জনের কাছে নানা রূপে প্রতিভাত।

মানুষ সামাজিক জীব। সে একেলা থাকিতে চায় না, সে একেলা থাকিতে পারেও না। নিজের পায়ের উপর ভর দিয়া দাঁড়াইতে তাহাকে পরের উপর নির্ভর করিতে হয়। এই নির্ভরতা আছে বলিয়াই তাহার জীবন দুর্ব্বহ হইয়া উঠে না। পরের সাহায্য সে পথে কুড়াইয়া পায়। সে যে চায় বলিয়াই পায় তাহা নয়। না পাইয়া তাহার উপায় নাই। তাহার অবস্থা, তাহার আশ্রয়, তাহার সভ্যতা, তাহার সংস্কৃতি, তাহার ঐশ্বর্য্য, তাহার অভাব, তাহার জীবন, তাহার সর্ব্বস্ব—পর হইতে প্রসূত। পর তাই চিরদিনই আপনার। ঘর হইতে বাহির হইলেই বাহির ঘর হইয়া যায়। সংসারে পর ও আপনার মধ্যে একটি চিরন্তন-বন্ধন রহিয়া গেছে। সে বন্ধন হইতে মুক্তি নাই। সে সম্বন্ধ অচ্ছেদ্য।

দুটি লোক কখনও সমান নয়। ব্যক্তি অসংখ্য। মানবের বৈচিত্র্য অশেষ। এত বিভেদ সত্ত্বেও মানুষ পরস্পরের সাদৃশ্য অনুভব করে। দেশ কাল ও জাতির বাধা অতিক্রম করিয়া মানবের মূলগত ঐক্য ফুটিয়া উঠে। এশিয়া ইয়োরোপ আফ্রিকা আমেরিকার ভেদ ঘুচিয়া যায়। মহাসাগরের বিস্তীর্ণ জলরাশি মানুষ হইতে মানুষকে পৃথক করিয়া রাখিতে পারে না।

যুগযুগান্তর ধরিয়া জীবনের ধারা বহিয়া আসিতেছে। সে প্রবাহ কোথাও ক্ষুণ্ণ হয় নাই। বর্ত্তমানের মানুষ অতীতের সৃষ্টি। আচার প্রথা রীতি নীতি ধর্ম্ম কৃষ্টি কলা ভাষা—সকলই আমরা পূর্ব্বপুরুষের নিকট হইতে উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করিয়াছি। বর্ত্তমান আমাদের ধাত্রী। আমরা মহাকালের সন্তান।

আমরা মানুষ। এক অজ্ঞাত সহানুভূতি আমাদের পরস্পরকে আকর্ষণ করিতেছে। তাই আমরা পরস্পরের জন্য খাটিয়া মরি। আমরা পরের জন্য বস্ত্র বয়ন করি, পরের জন্য ক্ষেত্র কর্ষণ করি। আমরা পরের সেবায় আত্ম-বিসর্জন করি। আমরা নিঃস্বার্থ নই। কিন্তু স্বার্থই আমাদের সর্ব্বস্ব নয়। না জানিয়া আমরা পরস্পরের আত্মীয়। জীবনের যোগসূত্র দেশ হইতে দেশান্তরে, যুগ হইতে যুগান্তরে বিস্তৃত হইয়া পড়ে। সে সূত্র ছিন্ন

হইবার উপায় নাই। ভবিষ্যৎ আমাদের দিকে চাহিয়া আছে। আমাদের কৃতকর্ম্মের উপর ভবিষ্যৎ প্রতিষ্ঠা-লাভ করিবে।

ইহাই মানব-সমাজ। অজ্ঞাত সহানুভূতি এবং অদৃশ্য সহযোগিতার বলে এ জগৎ চলিতেছে।

এ সকল কথা বলিবার তাৎপর্য্য এই।—

বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ভাষায় বিভিন্ন সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছে। সকল সাহিত্যেরই নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে। এই বৈশিষ্ট্য কিন্তু চরম সত্য নয়। ভাষার গণ্ডী লঙ্ঘন করিলে দেখিতে পাই এক মানব-জীবন বিচিত্র রূপে বিচিত্র বেশে বিবিধ সাহিত্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে। দেখিতে পাই—চিন্তা অনুভূতি ও কামনাসমূহ মানব সাধারণ। দেখিতে পাই—স্থান কাল অতিক্রম করিয়া জগৎ-জীবন সাহিত্যে আপনার ঐক্য প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। দেখিতে পাই—সাহিত্যে সুদূর নিকট এবং পর আত্মীয় হইয়া গেছে। সাহিত্যে আমরা বিদেশী বঁধুর বেদনায় কাঁদিয়া মরি, অচেনার কথায় অনুপ্রাণিত হই, অজানার পরিচয়ে মুগ্ধ হই। দেশ ও বিদেশের মধ্যে, গত আগত এবং অনাগতের মধ্যে সাহিত্য এক আনন্দময় গ্রন্থি। কালিদাস শেক্সপীয়র গ্যয়টে ইবসেন রবীন্দ্রনাথ তাই প্রাচ্যেরও নয়, প্রতীচ্যেরও নয়,—জগতের; আজিকার নয়, কালিকার নয়—চিরদিবসের। সকল জীবনের যোগসূত্র সাহিত্যে আসিয়া মিলিত হইয়াছে।

যে সহানুভূতি সাধারণ জীবনে অজ্ঞাত থাকে, সাহিত্যের মধ্যে সেই সার্ব্বভৌমিক মানবী সহানুভূতির সাক্ষাৎলাভ করি। যে আকর্ষণ অদৃশ্য তাহা প্রত্যক্ষ এবং যে প্রীতি প্রচ্ছন্ন তাহা প্রকাশিত হইয়া উঠে। সমাজে বিরোধ আছে, সাহিত্যে নাই। সাহিত্য সার্ব্বজনীন। জীবন দেশ কাল ও সংস্কারের মধ্যে গণ্ডীবদ্ধ নয়। সাহিত্য জীবনের প্রকাশ।

মানুষ সামাজিক জীব বলিয়া সাহিত্য সম্ভব হইয়াছে। মানুষ শুধু নিজের সুখদুঃখ লইয়া সন্তুষ্ট থাকিতে পারিলে তাহার আত্মপ্রকাশের প্রয়োজন হইত না। সে পরের কথা শুনিতে চায় এবং নিজের কথা পরকে শুনাইতে চায়। একজনের কাছে অন্যজনের আত্মপ্রকাশের মধ্যে পরম পরিতৃপ্তি আছে। ভাষা আত্মপ্রকাশের উপায়, সাহিত্য আত্মপ্রকাশের ফল।

সমবেদনা আছে বলিয়া একে অন্যকে বুঝিতে পারে। নিজের অনুভূতি দিয়া আমি পরের অনুভূতির পরিচয় পাই। যে বৃত্তি আমাদের অন্তশ্চক্ষু উন্মীলিত করে কল্পনা সেই বৃত্তি। কল্পনার জননী সহানুভূতি। অন্যের সহিত সমানভাবে অনুভব করি বলিয়া অপর জীবনের আনন্দ বেদনা কল্পনা করিতে পারি। এই সহানুভূতি-সঞ্জাত কল্পনা সাহিত্যের প্রাণ। বাহিরের চোখ দিয়া দেখে বলিয়া মানুষ অনেক বিষয়ে অন্ধ। অন্তরের তৃতীয় নেত্র খুলিয়া গেলে কবি দেখিতে পায়, বিভিন্ন দেশের রীতি ও আচরণের ছদ্মবেশে একই মানবজীবন লীলা করিতেছে। কবির সৃষ্ট সাহিত্যে সামাজিক মানুষ তাই আপনার স্বরূপ দেখিতে পায়।

বিশ্বসাহিত্য ও বিশ্বসমাজের কথা ছাড়িয়া দিয়া এইবার সঙ্কীর্ণতর সমাজে ফিরিয়া আসা যাক।

একদিকে মানুষের করুণার অন্ত নাই। অন্যদিকে সে তেমনি নিষ্ঠুর। দ্বন্দ্ব বিবাদ ও সংগ্রামের আর শেষ নাই। দিকে দিকে দেশে দেশে কালে কালে সে বহ্নি ছড়াইয়া পড়ে। প্রতিযোগিতার পেষণে নরনারী ক্লিষ্ট হয়, পিষ্ট হয়, চূর্ণ হয়। তবুও স্বেচ্ছায় মানব শান্তিকে সুদূরে রাখে। এই হৃদয়হীন প্রতিযোগিতা মানবের নিত্যপ্রত্যক্ষ। তাই অদৃশ্য প্রীতি তাহার কাছে অলীক বলিয়া মনে হয়। বিরোধকেই সে নির্ম্মম সত্য বলিয়া গ্রহণ করে।

সমাজে সংগ্রাম ও দ্বন্দ্ব আছে বলিয়াই সাহিত্যে ট্র্যাজেডি সম্ভব হইয়া উঠিয়াছে। শান্তি সুখ ও সৌখ্য অপেক্ষা দুঃখ বেদনা ও বিরোধের অনুভূতি তীব্রতর। সামাজিক ক্লেশে আমরা আর্ত্ত হই, কিন্তু সাহিত্যের বেদনা আমরা উপভোগ করি। কিন্তু সে অন্য কথা।

বিশ্বসমাজের পক্ষে যে কথা, খণ্ড সমাজগুলির সম্বন্ধেও সেই কথা প্রযোজ্য। মৈত্রী এবং বিরোধের মধ্য দিয়া সংসার চলিতেছে।

প্রাকৃতিক ভৌগোলিক ঐতিহাসিক রাষ্ট্রিক প্রভৃতি

নানা কারণে দেশে দেশে খণ্ড সমাজের প্রাদুর্ভাব সম্ভবপর হইয়াছে। প্রতিযোগিতার বিরুদ্ধ শক্তি ইহাদের বৈশিষ্ট্য তীব্র ও পরিস্ফুট করিয়া রাখিয়াছে। হিন্দু গ্রীক হিব্রু ল্যাটিন টিউটনিক প্রভৃতি সমাজ এইরূপে অভিব্যক্ত হইয়া উঠিয়াছে। এখন হইতে সঙ্কীর্ণ অর্থেই সমাজ কথাটি ব্যবহার করিব।

এক দেশে অবস্থিত কতকগুলি লোকের সমষ্টি মাত্র সমাজ নয়। সমাজ প্রাণবন্ত। সমাজের জন্ম আছে, বৃদ্ধি আছে, ক্ষয় আছে। সমাজ শুধু জীবনধর্ম্মী নয়; সমাজের মনও আছে। আমাদের রীতিনীতি ব্যবহার ধর্ম্ম এই সামাজিক মনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। সাহিত্যে সামাজিক মনের ছাপ পড়ে বলিয়া হিন্দু গ্রীক হিব্রু ল্যাটিন বা টিউটনিক সাহিত্য সম্ভবপর হইয়াছে।

একরাষ্ট্রত্ব অথবা একজাতীয়ত্বই সমাজের লক্ষণ নয়। শিক্ষা আচার ধর্ম্ম ইতিহাস অর্থাৎ বিশেষভাবে কৃষ্টি সমাজকে বিশিষ্টতা দান করে। তাই এক ভৌগোলিক বিভাগের মধ্যে বাস করিয়াও মুসলমান-সমাজ বৃহত্তর ভারত-সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া আছে। রাষ্ট্র কৃত্রিম, সমাজ স্বাভাবিক।

সমাজ বাহিরের জিনিষ, সাহিত্য মনের জিনিষ। সমাজ গড়িয়া উঠিয়াছে লোকের আচার আচরণ ব্যবহার কর্ত্তব্য লইয়া, আর সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছে আমাদের ভাবনা কামনা ও অনুভূতি লইয়া। কতকগুলি সম-অবস্থাপন্ন লোকের বংশানুক্রমিক চেষ্টার ফল সমাজ, আর তাহাদের চিন্তার ফল সাহিত্য। সাহিত্যে সামাজিক মন চরিতার্থতা লাভ করে।

রামায়ণ মহাভারত ইলিয়াড বা ওল্ড টেষ্টামেণ্ট এইরূপ সমাজগত সাহিত্য। এই সকল বিশাল ও গভীর রচনার মধ্যে রচয়িতা কোথায় হারাইয়া গেছে। কবিদের সরাইয়া সমাজ যেন নিজে এইরূপ সাহিত্যে আত্ম-প্রকাশ করিয়াছে।

কিন্তু সমাজ ত আর হাতে করিয়া সাহিত্য লেখে না। সাহিত্য রচনা করে ব্যক্তি। সমাজ ও ব্যক্তির সম্বন্ধ নির্ণয় করিবার পূর্ব্বে সাহিত্য জিনিষটা কি তাহা ভাল করিয়া বোঝা দরকার।

প্রথমত রূপ দেখিয়া সাহিত্য চিনিতে হয়। যেখানে সৌষ্ঠব সামঞ্জস্য এবং শব্দার্থের যথাযথ বিন্যাসে মন পরিতৃপ্তি লাভ করে, রচনা সেইখানে সাহিত্য। অর্থাৎ সাহিত্যে আর্ট থাকা চাই। আর্ট সৃষ্টিকৌশল।

সাহিত্যের প্রকৃতি নির্ণয় করিতে গেলে কিন্তু সাহিত্যের সীমা অনেকটা সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়ে। সেই সীমার মধ্যে সমাজ আসিয়া সাহিত্যের সঙ্গে মিলিত হইয়াছে।

সকল কলাবস্তু মানুষের কৌতূহলের সামগ্রী। কলা মাত্রেই মানবী সৃষ্টি। সেই হিসাবে সাহিত্যও কলা। সকল কলার সহিত আমাদের কামনা অনুভূতি ও চিন্তা জড়াইয়া আছে। কামনা অনুভূতি ও চিন্তা লইয়া আমাদের অন্তর-জীবন। সাহিত্য জীবনলীলার ইতিহাস এবং আলোচনা।

সাহিত্য আমাদের উপভোগের বস্তু। জীবনের আবেগ ও অনুভূতিগুলি সাহিত্যে ধরা পড়িয়া গেছে। সাহিত্যের জীবন আবেগশীল। কবির আবেগ সাহিত্যের ভিতর দিয়া সাহিত্যভোগীর হৃদয়ে সঞ্চারিত হয়।

যুক্তি ও প্রজ্ঞার ফল বিজ্ঞান। বিজ্ঞানের বিচার অপক্ষপাত। সাহিত্যে এই বৈরাগ্য নাই। আমাদের ভাল-লাগা মন্দ-লাগার উপর সাহিত্য-সৃষ্টি নির্ভর করে। আমাদের ইচ্ছা অনিচ্ছা অনুরাগ বিরাগ সাহিত্যকে নিয়ন্ত্রিত করে।

অতএব রস কি তাহার বিশেষ সংজ্ঞা না দিয়া বলিতে পারা যায়, সাহিত্য রসসৃষ্টি। পাশ্চাত্য ভাষায় রস কথাটির সমতুল্য কোনো কথা নাই। রসগোল্লার রস আমরা রসনা দিয়া গ্রহণ করি। সঙ্গীতের রসগ্রহণ করি কর্ণ দিয়া। বহিরিন্দ্রিয় দিয়া আমরা যে রস গ্রহণ করি, তাহা বস্তুগত—স্থূল। কিন্তু অন্তরিন্দ্রিয় দিয়াও আমরা বিষয়ের আস্বাদ প্রাপ্ত হই। সেই আস্বাদন বাহিরের জিনিষ নহে, তাহা মানসিক ব্যাপার। উপভোগ করি বলিয়া এই আস্বাদন রস নামে অভিহিত হইয়াছে। সাহিত্যস্রষ্টা এই রস পরিবেশন করেন।

বহুজনে বহুরূপে সাহিত্যের পরিচয় নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তবুও সাহিত্যের সংজ্ঞা সুনির্দ্দিষ্ট হইয়া উঠে নাই। কেহ বলেন সাহিত্য ভাবের অভিব্যক্তি,

কেহ বলেন সাহিত্য জীবনের ব্যাখ্যা, কেহ বলেন সাহিত্য শিক্ষার আনন্দময় উপায়, কেহ বলেন সাহিত্য সত্যের আধার, কেহ বলেন সাহিত্য সুন্দরের প্রকাশ। প্রত্যেক সূত্রটির মধ্যে সত্য আছে, তবু সম্পূর্ণ সত্য নাই। এগুলি সাহিত্য-বস্তুর বর্ণনা, সংজ্ঞা নহে।

অলঙ্কারের সূক্ষ্ম তর্কে প্রবেশ না করিয়া মোটামুটি বলিতে পারা যায় সাহিত্য রসসৃষ্টি। তবে কথার সুবিধার জন্য বিচারপ্রধান সাহিত্যকে জ্ঞান-সাহিত্য এবং অনুভূতি বা ভাবপ্রধান সাহিত্যকে রস-সাহিত্য নামে অভিহিত করিতে পারা যায়। সাহিত্য বলিতে সাধারণত রস-সাহিত্য বোঝায়।

সাহিত্যের উপকরণ মানুষের জীবন। জীবনের প্রতি সকলের দৃষ্টিপাতের ভঙ্গী সমান নয়। বিভিন্ন কবি বিভিন্ন ধরণে এই জীবনের আলোচনা করিয়াছেন। মানবজীবন কবির হৃদয়ে যে সাড়া জাগাইয়া দেয়, সাহিত্য তাহারই প্রতিধ্বনি। কবির হৃদয়ের ভিতর দিয়া যাত্রা-কালে মানবজীবন বা প্রকৃতি কবির মতি বা ধারণা অনুসারে রূপান্তর প্রাপ্ত হয়। সেই রূপান্তরিত ভাবই রসরূপে পাঠকের মনে আনন্দ উৎপাদন করে। মানব-জীবন সাহিত্যের উপাদান মাত্র, সাহিত্য রসসৃষ্টি।

কিন্তু এই উপকরণ না হইলে সাহিত্যসৃষ্টি সম্ভব হইত না। এইখানে সাহিত্যের সহিত সমাজের যোগ। মানবের জীবন দিয়া সমাজ গঠিত। সমাজ জীবনলীলার বাহ্য প্রকাশ। সংসার ও সমাজের মধ্যেই আমরা জীবনকে বিশেষভাবে উপলব্ধি করি। মানুষের সম্বন্ধে মানুষের ধারণা ও মানুষের প্রতি মানুষের ব্যবহার সমাজকে ব্যবস্থিত করে। এই ধারণা ও ব্যবহার সাহিত্যে ভাবমূর্ত্তি গ্রহণ করে।

সামাজিক মানুষ সাহিত্য রচনা করে এবং সামাজিক মানুষ সাহিত্য উপভোগ করে। বনে বসিয়া সাহিত্য রচনা করা চলে, কিন্তু সে রচনার উপাদান সমাজ হইতে আহরণ করিতে হয়। এক হিসাবে ইতিহাসও সাহিত্য। সামাজিক জীবনের স্থূল ব্যাপার লিপিবদ্ধ করে ইতিহাস। সমাজের অন্তরের কথা প্রকাশ করে সাহিত্য। একই জীবনের ক্ষেত্রে সাহিত্য ও ইতিহাস উভয়ই প্রতিষ্ঠিত।

সামাজিক জীবনের ঘটনাগুলি বাস্তব। ইতিহাসে এই বাস্তব ঘটনাবলীর বিবৃতি পাই। সাহিত্যে পাই ভাব-গত জীবনের ইতিহাস। যাহা ঘটে তাহা ইতিহাস, কিন্তু যাহা ঘটিতে পারিত অথবা পারে তাহা সাহিত্যের বিষয়। সাহিত্যের কারবার সম্ভাব্যতা লইয়া। তথ্যই শুধু সত্য নয়, জীবনের সম্ভাবনাগুলির মধ্যে যে সত্য নিহিত রহিয়াছে বাস্তব হইতেও সে সত্য শক্তিমান।

আমরা হিন্দু সমাজ হিব্রু সমাজের কথা বলিয়াছি। আরও সীমাবদ্ধ অর্থে সমাজের কথা আলোচনা করা যাক। সচরাচর এই সঙ্কীর্ণতর অর্থেই সমাজ কথাটি ব্যবহৃত হয়। যেমন বাঙালী সমাজ বা ইংরেজ সমাজ। এক ভাষা এক ইতিহাস এবং সমান প্রতিবেশের মধ্যে যাহারা বর্দ্ধিত হইয়াছে, তাহারা এক সমাজের লোক।

সমাজ হাতে করিয়া সাহিত্য রচনা করে না, ব্যক্তি করে। ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে একটা অঙ্গাঙ্গি যোগ আছে। মানুষ একদিকে স্বতন্ত্র, আর একদিকে সামাজিক। সামাজিক মানুষের অধিকার সীমাবদ্ধ। বাহিরের ব্যাপারে মানুষ সমাজের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। সাহিত্যে সে স্বাধীন।

কিন্তু এই স্বাধীনতার অর্থ কি?—সাহিত্য সৃষ্টিছাড়া জিনিষ নয়। সমাজে বা ব্যক্তির মনে যাহা ঘটে বা ঘটা সম্ভব, সাহিত্যে তাহার যথাযথ পরিচয় পাই। এই পরিচয় প্রদানে যথেচ্ছাচারের স্থান নাই। সাহিত্যিক স্বাধীনতার অর্থ এই।—কালবশে সমাজ কতকটা কৃত্রিম হইয়া পড়ে। সেই সকল রীতি ও প্রথাগত সামাজিক কৃত্রিমতা প্রকৃত সাহিত্য-সৃষ্টির অন্তরায়। কবি এই সকল বাধা সবলে দূর করিয়া স্বাভাবিক মানবজীবনের বার্ত্তা প্রদান করে।

বলিয়াছি সাহিত্যে রসই প্রধান বস্তু। দেশ ও কালের পরিবর্ত্তনে রসানুভূতির কিছু পরিবর্ত্তন সাধিত হয়, কেন-না রস—কবির মনোভাব কাব্যের বিষয় এবং সহৃদয় জনের হৃদয়ের উপর নির্ভর করে। মানব-জীবনে যাহা শাশ্বত রসের তাহাই অপরিবর্ত্তনীয় বস্তু। মানবের লৌকিক প্রকৃতি এবং প্রবৃত্তিগুলি এইরূপ অপরিবর্ত্তনীয়।

প্রবৃত্তিজাত ভাবগুলি প্রকাশের জন্য আধার চাই। সেই আশ্রয় অবলম্বন করিয়া ভাবসমূহ কাব্যে বা সাহিত্যে বিকশিত হইয়া উঠে।

শোক বা প্রেম রস নয়। শোক বা প্রেমের ভাব যখন কাব্য ও কাহিনীর বিশেষ পাত্রপাত্রী এবং তাহাদের কার্য্য ও আচরণের ভিতর দিয়া আমাদের হৃদয়ের দ্বারে উপস্থিত হয়, তখনই তাহা রস হইয়া ওঠে। এই পাত্র-পাত্রীরা সমাজ ও সৃষ্টিছাড়া হইতে পারে না। বিশেষ কাল ও দেশের মধ্যে তাহাদের স্থাপন করিতে হইবে, অর্থাৎ তাহাদের বিশেষ সমাজের লোক করিয়া আঁকিতে হইবে। সেই সমাজের বৈশিষ্ট্যটুকু বজায় না রাখিতে পারিলে রসের ব্যভিচার হইবে। ইংরেজের চিত্র আঁকিতে ইংরেজী সমাজভুক্ত লোকের চিত্র আঁকিতে হয়। ফরাসী আঁকিতে ফরাসী সমাজের ছবি আঁকিতে হয়। বাঙালী আঁকিতে বঙ্গসমাজের লোক আঁকিতে হয়। বাঙালী নায়ক-নায়িকা আঁকিতে জার্ম্মান রুশ সুয়েডিস অথবা ফরাসীকে বাঙালী সাজাইলে চলিবে না। আবেষ্টনের মধ্যে মানুষ যে বৈশিষ্ট্য অর্জ্জন করে, মানুষকে সেই বৈশিষ্ট্য না দিলে আর্ট ও রসের অঙ্গহানি হয়।

পরিপূর্ণ সামঞ্জস্যের উপর রস এবং আর্টের রমণীয়তা নির্ভর করে। অসঙ্গতি অতৃপ্তির কারণ। সমাজের সহিত সঙ্গত করিয়া মানবজীবনকে আঁকিতে না পারিলে আমাদের সৌন্দর্য্যবোধ ক্ষুণ্ন হয়। বাঙালী সমাজে যে সমস্যা এখনও আসে নাই তাহা পূরণ করিতে বসিলে, বাঙালীর মেয়ে বা বাঙালী পুরুষ যে-সব কথা বিশেষ করিয়া ভাবে না বাঙালী নায়ক নায়িকার মুখে সেই সব কথা বসাইলে রস ব্যাহত হইবে, অতএব সে রকমের রচনা প্রকৃত সাহিত্য হইবে না।

সেদিন আমাদের বৈঠকে সমাজ ও সাহিত্যের এই সম্পর্ক লইয়া কথা উঠিল। অধ্যাপক বলিলেন, "মানুষ সমাজ ছাড়িয়া বাঁচিতে পারে না। বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সমাজ। এক দেশের একই সমাজ কালের গতিতে হয়ত ধীরে ধীরে বদলাইয়া যায়। তৎসত্ত্বেও একই সমাজের অতীত ও বর্ত্তমানের মধ্যে যেটুকু অমিল, তাহার চেয়ে নিরবচ্ছিন্নতাটাই বেশী করিয়া চোখে পড়ে। কিন্তু দেশভেদে এক সমাজ হইতে অন্য সমাজের প্রভেদ স্পষ্ট এবং অনতিক্রমণীয়। সাহিত্য-স্রষ্টা সমাজকে—এবং বিশেষভাবে যে সমাজে সে জন্মগ্রহণ করিয়াছে সেই নির্দ্দিষ্ট সমাজকে—অতিক্রম করিতে পারে না, কেন-না সাহিত্য রচয়িতার মনোভাবকে প্রতিফলিত করে এবং সেই মনোভাবকে গড়িয়া তোলে সমাজ।"

ঈষৎ হাসিয়া মনোবিৎ কহিলেন, "সাহিত্যই বা কি, রসই বা কি? সাহিত্যের সহিত রসের সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ, এ কথা মানি। মনের অনুভূতি রসরূপে পরিণত হয় বলিলেই শেষ কথা বলা হইল না। রসবস্তুর বিশ্লেষণ করিতে হইবে। মানুষের মনে কতকগুলি বলবতী প্রবৃত্তি আছে। সেই প্রবৃত্তিগুলি নানাভাবে চরিতার্থ হইতে চায়। মনের যেমন একটি সজ্ঞান, তেমনি একটি নির্জ্ঞান অবস্থাও আছে। এই সংজ্ঞান নানা দিক দিয়া নির্জ্ঞানের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। কামনাসঞ্জাত মানব-প্রবৃত্তিগুলি মনের গোপনে—নির্জ্ঞানের গুহায় বন্দীভাবে বাস করে। সচেতন মনের ভিতর এই-সব কামনার সন্ধান পাওয়া যায় না, কেন-না অধিকাংশ গুপ্ত কামনাই অসামাজিক। মনের রুদ্ধ ইচ্ছাগুলিই বিচিত্র ছদ্মবেশের ভিতর দিয়া অভিব্যক্ত হইয়া স্বপ্নে ও সাহিত্যে কাল্পনিক পরিতৃপ্তি লাভ করে। যেখানে এই গোপন পরিতৃপ্তি, সেইখানে রস। জানিয়া-শুনিয়া সজ্ঞানে এই অসামাজিক ইচ্ছাগুলি ব্যক্ত করিতে গেলে রসহানি ঘটে। সাহিত্য-রচনায় সজ্ঞান অসামাজিকতা ক্ষমার যোগ্য নয়, কেন-না তাহা রসের পরিপন্থী।"

কথা এই, যে-অপূর্ণ নিরুদ্ধ কামনা কাব্যে রসসঞ্চার করে, তাহা নিগূঢ়। কবির অজ্ঞাতসারে কাব্যে এই রসসৃষ্টির ব্যাপার সম্পাদিত হয়। মনের অগোচরে সমাজ-নিন্দিত যে পাপ মনের গহনতলে লুকাইয়া থাকে অন্তরের চিরসতর্ক নিষেধ-প্রবৃত্তির বশে তাহা স্বরূপে ব্যক্ত হইতে পারে না, সামাজিক বাধা বিশ্বাস ও সংস্কারের ভিতর দিয়া আত্মপ্রকাশকালে রূপান্তর প্রাপ্ত হয়। এই গৃহীত রূপ সামাজিক আবরণের ছদ্মবেশে আবৃত। এইরূপ অসামাজিক কামনারহস্যে জন্ম বলিয়া রস যখন আর্ট

ও সাহিত্যে রূপ গ্রহণ করে, তখন তাহার আধার ও আবেষ্টন বিশেষভাবে সমাজ-স্বীকৃত ধারণার অনুবর্ত্তী হইলে তবেই হৃদয় তৃপ্ত হয়। সাহিত্য অজ্ঞাত আবেগশীল রুদ্ধ কামনা-প্রবাহ প্রকাশের একতর উৎস। সচেষ্ট ও জ্ঞানকৃত অসামাজিকতার সংস্থাপনে রসহানি অনিবার্য্য। মনের চাপা প্রবৃত্তিগুলি বিবর্ত্তিত হইয়া সুশোভন সামাজিক রূপ ধারণ করিয়া সুষমামণ্ডিত হয়। বিষ তখন অমৃতত্ব লাভ করে।

সাহিত্যের প্রখ্যাতনামা "পরশুরাম" বলিলেন, "দেখুন, আর্ট বা সাহিত্যের চমৎকারিত্ব অনেকটা অভ্যাসের উপর নির্ভর করে। যাহাতে আমরা অভ্যস্ত তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত হইলে তাহা আর্ট হইবে না। ইডিপাস কমপ্লেক্স-ঘটিত ব্যাপার দু-এক জনের ভাল লাগিতে পারে, কিন্তু সাধারণভাবে তাহা আর্ট হইবে না। আবার নিতান্ত অভ্যস্ত জিনিষও আর্টের অন্তর্গত নয়। বিবাহিত জীবন লইয়া দু-একখানি ভাল বই লেখা যাইতে পারে, কিন্তু সাধারণভাবে তাহা আর্টের বস্তু নয়। কিন্তু প্রেম জিনিষটি ঠিক সামাজিকও নয়, অসামাজিকও নয়, তাই প্রেম আর্টের বিষয়।"

সত্য কথা। জীবনের অভিজ্ঞতা হইতে যাহা দূরে অবস্থিত, তাহা লইয়া সাহিত্য গড়িতে গেলে প্রকৃত রসসৃষ্টি হয় না। মাত্র বস্তুজগতে যাহা অসম্ভব তাহা লইয়াও সাহিত্য রচনা করা যায়। রূপকথা বা আরব্যোপন্যাস তাহার বিশিষ্ট উদাহরণ। কিন্তু ভাব-জগতে যাহার সম্ভাবনা অল্প বা অনিশ্চিত তাহা লইয়া কিছু রচনা করিতে গেলে রস ব্যাহত হয় বলিয়া সাহিত্যসৃষ্টি অসম্ভব হইয়া উঠে। সাহিত্যের কারবার যথার্থ ঘটনা লইয়া নয়, ঘটিবার সম্ভাবনা লইয়া। এই ideal probability আছে বলিয়া আর্ট ও সাহিত্য আমাদের আকর্ষণের বস্তু। আমাদের সামাজিক অভ্যাস এই সম্ভাবনা চিনিয়া লয়।

তবুও সাহিত্যে সমাজের বৈশিষ্ট্য বাহিরের জিনিষ। এই বৈচিত্র্যের ভিতর দিয়া জীবনের ঐক্য সাহিত্যে সুষমা দান করে। সামাজিক বিশেষত্ব ভাবের চতুর্দ্দিকে পরিমণ্ডল রচনা করিয়া ভাবকে রসে পরিণত করে। রসের অমৃত গ্রহণ করিতে সে সমাজের ভেদাভেদ গ্রাহ্য করে না। তাই সাহিত্যে মানব-মন চরিতার্থতা লাভ করে। খণ্ড সমাজের অন্তরাল ভেদ করিয়া মানবের মর্ম্মবাণী জীবনে জীবনে গুঞ্জরিত হইয়া উঠে।*

* কাশীপুর ইনষ্টিটিউটে পঠিত।



আমাদের দেশের প্রথম সংবাদপত্র

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

আজকাল কোনো সভ্য, জনপূর্ণ এবং সমৃদ্ধিশালী দেশেই সংবাদপত্র প্রকাশ ও বিতরণের বন্দোবস্ত না থাকিলে চলে না। ইউরোপীয় জাতিদের মধ্যে গত দুই শত বৎসর ধরিয়া ছাপা সংবাদপত্রের বহুল প্রচার হইয়া আসিয়াছে। তাহার পূর্ব্বে ইংলণ্ডের মফস্বলবাসী বড়লোকেরা হাতে-লেখা সংবাদের চিঠি রাজধানী লণ্ডন হইতে পয়সা দিয়া আনাইতেন এরূপ প্রথা ছিল।

হাতে-লেখা সংবাদের চিঠি

আমাদের দেশেও মোগল আমলে বাদশারা প্রতি প্রদেশে এবং বড় বড় শহরে চর রাখিতেন; এই চরেরা স্থানীয় সংবাদ সংগ্রহ করিয়া কখনও মাসে একবার, কখনও বা সপ্তাহে সপ্তাহে তাঁহাদের লিখিয়া পাঠাইত। রাজকীয় গোপনীয় কথা না থাকিলে এই-সব সংবাদের চিঠি রাজদরবারে প্রকাশ্যে পড়া হইত এবং এইরূপে সভায় উপস্থিত সকল লোক নানাস্থানের সংবাদ পাইত। সেইরূপ বাদশাহের অধীন সেনাপতি শাসনকর্ত্তা এবং করদ-রাজারা বাদশাহের দরবারের ঘটনা, তাঁহার উক্তি এবং রাজধানীর ও অন্যান্য প্রদেশের সংবাদ জানিবার জন্য সম্রাটের সভায় নিজ নিজ সংবাদ-লেখক (ফার্সী নাম—ওয়াকেয়া-নবিস) রাখিতেন। ফৌজদার, থানাদারের মত ছোটখাট রাজকর্ম্মচারীরাও নিজ উপরিতন কর্ম্মচারী, অর্থাৎ সুবাদার বা প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তার সভায় নিজস্ব পত্র-লেখক নিযুক্ত করিতেন। এই সকল লেখকেরা নিজ নিজ প্রভুর নিকট নিয়মিতরূপে যে সংবাদ লিখিয়া পাঠাইত তাহাই সাধারণতঃ মুখে মুখে সমাজে প্রচারিত হইত। বড় বড় মহাজন এবং ধনী বণিকেরাও নিজ নিজ কারবারের দূরবর্ত্তী শাখা-গুলিতে অথবা বড় বড় শহরে প্রবাসী প্রতিনিধিদের নিকট হইতে নিয়মিতরূপে স্থানীয় সংবাদ পাইবার ব্যবস্থা করিয়া রাখিতেন। এইরূপে মোগল-যুগে সমাজের প্রায় সকল স্তরের লোকেরই মধ্যে সংবাদ জানিবার জন্য মানুষের যে একটা স্বাভাবিক কৌতূহল আছে, তাহা নিবৃত্ত করিবার উপায় ছিল। এই সকল সংবাদ-লিপির নাম ছিল 'আখ্‌বার,' বা ডবল বহুবচনে 'আখ্‌বারাৎ'। এগুলি ফার্সীতে লিখিত; মাড়ওয়ারী মহাজনদের প্রতিনিধিরা হিন্দী ভাষা ব্যবহার করিত। সংবাদপূর্ণ হইলেও এই পত্রগুলি আধুনিক সুপরিচিত সংবাদপত্র হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। আখবারাতে শুধু ঘটনার উল্লেখ মাত্র থাকিত,—রাজনৈতিক মন্তব্য অথবা শাসন-ব্যবস্থা সম্বন্ধে কোনো সমালোচনা থাকিত না।

প্রথম মুদ্রিত ইংরেজী সংবাদপত্র

ইংরেজ আমলে এই প্রাচীন ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন হইল। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ভারতবর্ষে মুদ্রাযন্ত্র প্রথম স্থাপিত হয়। সেই সুযোগে সকল শ্রেণীর সাহিত্য সৃষ্টির জন্য দেশময় উৎসাহ জাগিয়া উঠিল,—বিশেষতঃ সংবাদপত্র-প্রকাশে। ১৭৮০, ২৯ জানুয়ারি তারিখে প্রকাশিত হিকি সাহেবের 'বেঙ্গল গেজেট'ই ভারতবর্ষের প্রথম মুদ্রিত সংবাদপত্র। গভর্ণর-জেনারেল ওয়ারেণ হেষ্টিংসের স্ত্রী ও জনকয়েক পদস্থ লোকের বিরুদ্ধে মানহানিকর প্রবন্ধ প্রকাশ করিবার ফলে, দুই বৎসর যাইতে-না-যাইতেই এই সাপ্তাহিক কাগজখানির প্রচার বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। ইহার পর ইণ্ডিয়া গেজেট, ক্যালকাটা গেজেট, হরকরা ও আরও কতকগুলি কাগজ বাহির হয়। অধিকাংশ সংবাদপত্রেরই রচনা-ভঙ্গী উগ্র, এবং ভাষা ও ব্যবহার ইতর ও অশ্লীল বলিয়া গভর্ন্মেণ্ট মনে করিতেন। ১৭৯৯ সালের মে মাসে লর্ড ওয়েলেসলী সর্ব্বপ্রথম সংবাদপত্রের স্বাধীনতার সঙ্কোচবিধান করিলেন। নিয়ম হইল, অতঃপর

সেক্রেটারীর দ্বারা পরীক্ষিত হইবার পূর্ব্বে কোনো সংবাদ-পত্রই প্রকাশিত হইতে পারিবে না; নিয়ম ভঙ্গ করিলে সম্পাদককে ইউরোপে নির্ব্বাসিত হইতে হইবে। মনে রাখা দরকার, তখন পর্য্যন্ত সকল সংবাদপত্রই ইংরেজীতে এবং ইউরোপীয়ের সম্পাদকত্বে প্রকাশিত হইত।

প্রথম বাংলা সংবাদপত্র

ছাপার অক্ষরে প্রকাশিত দেশীয় ভাষার সংবাদপত্রের ইতিহাস খুব প্রাচীন নহে। ১৮১৬ সালের পূর্ব্বে এদেশে কোনো বাংলা সংবাদপত্রের প্রতিষ্ঠা হয় নাই। অনেকেই বলিয়া থাকেন, শ্রীরামপুরের ব্যাপ্‌টিষ্ট মিশনরীগণ কর্ত্তৃক ১৮১৮, ২৩এ মে তারিখে প্রচারিত 'সমাচার দর্পণ'ই বাংলার আদি সংবাদপত্র। এই মত সত্য নহে। কারণ একজন বাঙালী হিন্দুই যে ১৮১৬ সালে প্রথম বাংলা সংবাদপত্র প্রচার করেন তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে।

১৮৩১, ২৮এ মে তারিখের (৬৮০ সংখ্যক) সমাচার দর্পণে "ধর্ম্মদত্তস্য" এই নাম দিয়া একজন লেখক একখানি পত্র প্রকাশ করেন; সেই পত্রের গোড়ায় আছে,—

"এতদ্দেশে বাঙ্গলা সমাচারপত্র এইক্ষণে অষ্টস্থানে অষ্টপ্রকার সৃষ্ট হইয়া অষ্টাহে অষ্টাহে স্পষ্টরূপে চলিতেছে। তদ্বিশেষঃ প্রথম সমাচার দর্পণ, দ্বিতীয় সম্বাদ কৌমুদী, তৃতীয় সমাচার চন্দ্রিকা, চতুর্থ সম্বাদ তিমিরনাশক, পঞ্চম বঙ্গদূত, ষষ্ঠ সম্বাদ প্রভাকর, সপ্তম সুধাকর, অষ্টম সভা রাজেন্দ্র।"

উপরের চিঠিখানিতে 'সমাচার দর্পণ'কে বাংলা ভাষায় প্রথম সংবাদপত্র বলায় পরবর্ত্তী জুন মাসের ৬ই তারিখের (২৫ জ্যৈষ্ঠ ১২৩৮) 'সমাচার চন্দ্রিকা' নামে অপর একখানি বাংলা সংবাদপত্রে জনৈক পাঠক আপত্তি করিয়া লিখিলেন,—

শ্রীযুত চন্দ্রিকাপ্রকাশক মহাশয়েষু।—

বাঙ্গলা সমাচারপত্রের বিষয়ে কোন বিজ্ঞতম গত ৬৮০ সংখ্যক দর্পণে অনেক লিখিয়াছেন তন্মধ্যে এক কথা লেখেন যে—

'এই অপূর্ব্ব দর্পণাবতারের পূর্ব্বে প্রায় কাহারো কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইয়াছিল না যে বাঙ্গালা সমাচারপত্র নামে কোন পদার্থ আছে।' উত্তর ঐ লেখক মহাশয় বুঝি এতন্নগরবাসী না হইবেন কেননা ৺গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য্য যিনি প্রথম অন্নদামঙ্গল পুস্তক ছবি সহিত ছাপা করেন * তিনি বাঙ্গালা গেজেট নামক এক সমাচারপত্র সর্জ্জন করিয়াছিলেন তাহা নগরে প্রায় সর্ব্বত্র গ্রাহ্য হইয়াছিল কিন্তু ঐ প্রকাশক সাংসারিক কোন বিষয়ে বাধিত হইয়া তাঁহার নিজ ধাম বহরাগ্রামে গমন করাতে সে পত্র রহিত হয় তৎপরে দর্পণাবতার ঐ লেখক মহাশয়কে দর্শন দিয়াছেন। অতএব এ পদার্থ প্রথমে ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক অনেকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।"

উপরি উক্ত চিঠিখানি সম্বন্ধে 'সমাচার দর্পণ'-সম্পাদক মার্শম্যান সাহেব মন্তব্য করিলেন,—

"ইহাতে আমারদের এই উত্তর যে আমারদের প্রথম সংখ্যক দর্পণ প্রকাশ হওনের দুই সপ্তাহ পরে অনুমান হয় যে বাঙ্গাল গেজেটনামে পত্র প্রকাশ হয় কিন্তু কদাচ পূর্ব্বে নহে।" *

দেখা যাইতেছে, 'সমাচার দর্পণ'-সম্পাদক অতি স্পষ্ট-ভাবে 'বাঙ্গালা গেজেট'-এর অস্তিত্ব স্বীকার করিতেছেন, তবে তাঁহার "অনুমানে" উহা না-কি প্রথম সংখ্যা দর্পণ প্রকাশিত হইবার সপ্তাহ দুই পরে বাহির হয়! এ অনুমান সত্য না-ও হইতে পারে।

সমাচার চন্দ্রিকা একখানি সমকালিক সংবাদপত্র। এই চন্দ্রিকার সম্পাদক ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়েরও ধারণা ছিল যে বাঙ্গালা গেজেটই বাংলা ভাষায় প্রথম সংবাদপত্র। ডাকমাশুল বৃদ্ধির ফলে ১৮৩৪ সালের নভেম্বর মাসে দ্বিসাপ্তাহিক সমাচার দর্পণের 'বুধবাসরীয়' কাগজ বন্ধ করিবার প্রস্তাব উঠিলে ভবানীচরণ দুঃখ করিয়া লিখিয়াছিলেন,—

"আমারা অবশ্যই স্বীকার করি সমাচার দর্পণ উপকারক কাগজ এবং এতদ্দেশীয় ভাষায় যে কএক কাগজের সৃষ্টি হইয়াছে এসকলের অগ্রজ অনুমান হয় ইহার পূর্ব্বে বাঙ্গালা গেজেটনামক এক সমাচারপত্র সর্জন হইয়াছিল বটে কিন্তু অতি শৈশবকালে তাহার কালপ্রাপ্তি হয়। অতএব সমাচার দর্পণ প্রাচীন এবং বিবিধ সংবাদপ্রদ।" †

কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত তাঁহার 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রে ১২৫৯ সালের ১ বৈশাখ তারিখে বাংলা সংবাদপত্রের ইতিবৃত্ত প্রকাশ করেন। এই মূল্যবান্ প্রবন্ধটির ইংরেজী অনুবাদ সাপ্তাহিক 'ইংলিশম্যান' পত্রে প্রকাশিত হয়।‡ গুপ্ত কবির মূল প্রবন্ধটি সংগ্রহ করিতে না পারিলেও ইংরেজী অনুবাদ হইতে বাংলা ভাষায় প্রথম সংবাদপত্র সম্বন্ধে তাঁহার মন্তব্যটি উদ্ধৃত করিতেছি,—

* ১৮১৬ সালে মুদ্রিত এই দুষ্প্রাপ্য পুস্তকের একখণ্ড আমি রাজা রাধাকান্ত দেবের লাইব্রেরীতে দেখিয়াছি।

* সমাচার দর্পণ— ১৮৩১, ১১ই জুন, পৃঃ ১৯৪।

† সমাচার দর্পণ—১৮৩৪, ১৫ই নভেম্বর, পৃঃ ৫৪৭ দ্রষ্টব্য।

‡ "আমরা গত বৎসর [১২৫৯] প্রথম বৈশাখীয় পত্রে বাঙ্গালা সংবাদপত্রের ইতিহাস প্রকাশ করাতে তৎপাঠে পাঠক মাত্রেই অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছেন...বিশেষতঃ ১৮৫২ সালের ৮ই মে দিবসের সাপ্তাহিক ইংলিসম্যান্ পত্রে তৎসম্পাদক মহাশয় তদ্বিষয়ের সম্পূর্ণ অবিকলানুবাদ প্রকটন করত...।"—সংবাদ প্রভাকর, ১ বৈশাখ ১২৬০ (১২ এপ্রিল ১৮৫৩)।

"In the year 1222 or 23 (B. E.) appeared the first native paper. It was conducted by Gangadhar Bhattacharjee of Calcutta, who is said to have made a fortune by publishing an edition of Bharat Chundar's works. Thus it appears that journalism in Bengalee was not, as some would have us believe, projected by foreigners, nor has Serampore any right to arrogate to itself the credit of being the cradle of the indigenous press. Gangadhar's paper, the *Bengal Gazette*, did not continue long."* বাংলা ভাষায় প্রথম সংবাদপত্র যে শ্রীরামপুরের সমাচার দর্পণ নহে—কিন্তু গঙ্গাধর ভট্টাচার্য্যের 'বাঙ্গালা গেজেট'—একথা গুপ্তকবি দৃঢ়তার সহিত উল্লেখ করিয়াছেন।

গুপ্তকবির বাংলা সংবাদপত্রের ইতিবৃত্ত প্রকাশিত হইবার তিন বৎসর পরে—১৮৫৫ সালে—পাদরি লঙ ও ১৮১৬ সালে প্রকাশিত গঙ্গাধর ভট্টাচার্য্যের 'বাঙ্গালা গেজেট'কেই বাংলা ভাষায় প্রথম সংবাদপত্র বলিয়া উল্লেখ করেন।† ১৮৫০ সালে প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে তিনি কিন্তু সমাচার দর্পণকেই বাংলা ভাষায় প্রথম সংবাদপত্র বলিয়াছিলেন।‡ পাঁচ বৎসর পরে তিনি যে এই মত পরিবর্ত্তন করেন তাহার নিশ্চয়ই কোনো কারণ ছিল। আমার মনে হয়, পাদরি লঙ 'বাঙ্গালা গেজেট' সম্বন্ধে গুপ্তকবির কথারই প্রতিধ্বনি করিয়াছেন।

গুপ্তকবি ও লঙ সাহেব উভয়েই 'অন্নদামঙ্গল'-প্রকাশক গঙ্গাকিশোরকে ভ্রমক্রমে 'গঙ্গাধর' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। এই গঙ্গাকিশোরের বাড়ি ছিল শ্রীরামপুরের নিকটবর্ত্তী বড়া গ্রামে। তিনি প্রথমে কিছুদিন শ্রীরামপুর মিশনরীদের ছাপাখানায় কম্পোজিটার ছিলেন, 'সমাচার দর্পণ' হইতে উদ্ধৃত নিম্নলিখিত অংশে তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইবে—

"এতদ্দেশীয় লোকের মধ্যে বিক্রয়ার্থে বাঙ্গালা পুস্তক মুদ্রিতকরণের প্রথমোদ্যোগ কেবল ১৬ বৎসরাবধি হইতেছে ইহা দেখিয়া আমারদের আশ্চর্য্য বোধ হয় যে এত অল্পকালের মধ্যে এতদ্দেশীয় লোকেরদের ছাপার কর্ম্মের এমত উন্নতি হইয়াছে। প্রথম যে পুস্তক মুদ্রিত হয় তাহার নাম অন্নদামঙ্গল শ্রীরামপুরের ছাপাখানার এক জন কর্ম্মকারক শ্রীযুত গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য্য তাহা বিক্রয়ার্থে প্রকাশ করেন।" (১৮৩০, ৩০ জানুয়ারি)

গঙ্গাকিশোর পুস্তকের ব্যবসা করিয়া বেশ দু-পয়সা করিয়াছিলেন। ১৮১৮ সালের অক্টোবর মাসেও যে কলিকাতায় তাঁহার আপিস ছিল তাহার প্রমাণ 'সমাচার দর্পণে' প্রকাশিত এই বিজ্ঞাপনটিতে পাওয়া যাইবে :—

'নূতন কেতাব। ইংরেজী বর্ণমালা অর্থ উচ্চারণ সমেত প্রথম বর্ণাবধি সাত বর্ণ পর্য্যন্ত বাঙ্গালা ভাষায় তর্জ্জমা হইয়া মোং কলিকাতায় ছাপা হইয়াছে...। যে মহাশয়ের লইবার বাসনা হইবে তিনি মোং কলিকাতায় গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য্যের আপীসে কিম্বা মোং শ্রীরামপুরের কাছারি বাটীর নিকটে শ্রীজান দে রোজারু সাহেবের বাটীতে তত্ত্ব করিলে পাইতে পারিবেন।" (১৮১৮, ৩ অক্টোবর)

বাঙ্গালা গেজেট অল্পদিনই জীবিত ছিল। এই কারণেই বোধ হয় ইহার নাম সাধারণের মধ্যে তেমন প্রচলিত ছিল না। ইহার কোনো সংখ্যা এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই; কিন্তু তাই বলিয়া ইহার অস্তিত্ব উড়াইয়া দিতে পারা যায় না।

লর্ড হেষ্টিংসের নূতন বিধি

প্রকাশের পূর্ব্বে সংবাদপত্রের সমস্ত লেখাই—এমন কি বিজ্ঞাপন পর্য্যন্ত—মঞ্জুর করিবার জন্য সরকারের সেক্রেটারীর নিকট পেশ করিবার রীতি ছিল। সংবাদপত্র-শাসন কিরূপ কঠিনভাবে চলিয়াছিল তাহা শ্রীরামপুরের পাদরী জে. সি. মার্শম্যানের একখানি চিঠির এই অংশটি পাঠ করিলেই বেশ বুঝা যাইবে :—"সম্পাদকীয় মন্তব্যের স্থলে সংবাদপত্রের অনেক স্তম্ভই তারকা-চিহ্নিত হইয়া বাহির হইত; কেন-না সে-সব অংশে 'সেনসর' তাঁহার সাজ্যাতিক কলম চালাইয়াছেন,—শেষ মুহূর্ত্তে শূন্য অংশগুলি পূরণ করিয়া দেওয়া সম্ভব হয় নাই।" সংবাদপত্র-শাসন এইভাবে প্রায় ১৭ বৎসর চলিবার পর, ১৮১৮, ১৯এ আগষ্ট বড়লাট লর্ড হেষ্টিংস সম্পাদকদের এই বন্ধন-দশা মোচন করিলেন। তিনি সংবাদপত্র-পরীক্ষকের পদ তুলিয়া দিয়া তাহার পরিবর্ত্তে সম্পাদকদের পথনির্দ্দেশ-স্বরূপ এমন কতকগুলি সাধারণ নিয়ম

* "The Probhakar's Hist. of the Native Press."—*The Englishman and Military Chronicle*, 8 May 1852.

† "In 1816, the *Bengal Gazette* was started by Gangadhar Bhattacharji who had gained much money by popular editions of the Vidya Sundar, Betal and other works, illustrated with woodcuts; the paper was shortlived."—*Descriptive Catalogue of Bengali Works*, by Rev. J. Long, 1855, p. 66.

‡ "Early Bengali Literature and Newspapers"—*Calcutta Review*, 1850, p. 145.

বিধিবদ্ধ করিলেন যাহাতে সরকারের কর্তৃত্বহানিকর অথবা লোকহিতের পরিপন্থী কোনো আলোচনা সংবাদপত্রে স্থান না পায়। তখন দোষী সম্পাদকের একমাত্র শাস্তি ছিল ভারতবর্ষ হইতে নির্ব্বাসন, এ দণ্ড ভারতীয় সম্পাদকের উপর প্রয়োগ করা অসম্ভব। সুতরাং দেশীয় সম্পাদকগণকে শাসন করিবার ক্ষমতা তখন সরকারের হাতে না থাকায় কেবলমাত্র ইউরোপীয় সম্পাদকগণের জন্য সেনসারের পদ বাহাল রাখা লর্ড হেষ্টিংস সঙ্গত মনে করেন নাই। যাঁহারা বলেন লর্ড হেষ্টিংস উদারনৈতিক ছিলেন, অথবা সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ভালবাসিতেন বলিয়াই সংবাদপত্র-পরীক্ষকের পদ উঠাইয়া দেন, তাঁহারা প্রকৃত তত্ত্ব জানেন না। ঐ পদ উঠাইয়া দিয়া তিনি সংবাদপত্রকে শৃঙ্খলমুক্ত করেন নাই; তাঁহার প্রবর্ত্তিত নিয়মগুলিও সংবাদপত্রে স্বাধীন আলোচনার অন্তরায়-স্বরূপ হইয়াছিল। তবে ইহাতে লাভ হইয়াছিল সরকারের, কারণ সংবাদপত্র-পরীক্ষকের পদের বেতন ও মেহনৎ—দুই-ই-বাঁচিয়া গিয়াছিল।

লর্ড হেষ্টিংসের এই নিয়ম-প্রবর্ত্তন লোকে কিন্তু অতি আনন্দের সহিত গ্রহণ করিল এবং উৎসাহবশে কলিকাতায় দেশীয় ভাষায় ও ইংরেজীতে অনেকগুলি সংবাদপত্রের সৃষ্টি হইল। তন্মধ্যে সিল্ক বাকিংহামের 'ক্যালকাটা জর্ণাল' (২ অক্টোবর ১৮১৮) ও রাজা রামমোহন রায়ের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত 'সম্বাদ কৌমুদী'র (৪ ডিসেম্বর ১৮২১) নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

উর্দ্দু ভাষায় প্রথম সংবাদপত্র

সেকালে আমাদের দেশের অতি অল্পলোকই ইংরেজী জানিত, আর হিন্দী বাংলা প্রভৃতি দেশীয় ভাষাগুলি তখন পর্য্যন্ত এত সংস্কৃত-ঘেঁষা ও কঠিন ছিল যে সে-ভাষা সংবাদপত্রে ব্যবহৃত হইলে তাহা কেহই সহজে পড়িতে পারিত না। অন্যান্য ভাষার তুলনায় তখন ভারতবর্ষে উর্দ্দু ভাষার—অবশ্য চলিত কথাবার্ত্তায়—বহুল প্রচলন ছিল। প্রথম হিন্দুস্থানী বা উর্দ্দু সংবাদপত্রের নাম—জাম-ই-জাহান-নুমা, অর্থাৎ প্রাচীন পারশ্যরাজ জমশেদ যে-পেয়ালাতে সমস্ত জগতের প্রতিবিম্ব দেখিতে পাইতেন। ইহা ১৮২২, ২৮এ মার্চ তারিখে কলিকাতা হইতে প্রথম প্রকাশিত হয়। * লাহোর গভর্ন্মেণ্ট কলেজের আর্বী ভাষার অধ্যাপক, পরলোকগত মৌলভী মুহম্মদ হুসেন আজাদ তাঁহার 'আবে হায়াৎ' পুস্তকে লিখিয়াছেন যে তাঁহার পিতাই ১৮৩৩ সালে দিল্লী হইতে উর্দ্দু ভাষায় প্রথম সংবাদপত্র প্রকাশ করেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহার অনেক পূর্ব্বে একাধিক উর্দ্দু সংবাদপত্র কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হইয়াছিল।

গ্রাহকের অল্পতাবশতঃ ১৮২২ সালের ১৬ই মে (৮ম সংখ্যা) হইতে জাম্-ই-জাহান-নুমার পরিচালকেরা উর্দ্দু ও ফার্সী ভাষায় কাগজখানি প্রকাশ করিতে বাধ্য হইলেন। † অল্পদিন পরেই উর্দ্দু অংশ বর্জ্জন করিয়া শুধু ফার্সীতেই কাগজখানি বাহির হইতে থাকে।

কলিকাতার ইম্পিরিয়াল রেকর্ড আপিসে ১৮২৪ হইতে ১৮৪৫ পর্য্যন্ত, এবং রাজা রাধাকান্ত দেবের লাইব্রেরীতে ১৮২৪ ও ১৮২৯-৩০ সালের জাম্-ই-জাহান্-নুমার ফাইল আছে।

কলিকাতার ২৬ নং চোরবাগান হইতে ফার্সী ও উর্দ্দু ভাষায় প্রকাশিত "শমসুল্ আখবার" উর্দ্দু ভাষায় দ্বিতীয় সংবাদপত্র; ১৮২৩, ১৪ জুন তারিখে ইহার

---

* "The Jam-i-Jahan Numa made its first appearance on the 28th March last is understood to be the property of, and to be principally conducted by an English Mercantile House in Calcutta."—W. B. Bayley's Minute, dated 10 Octr. 1822 (See *Modern Review*, November 1928, pp. 553-60.)

† "By a notice among our advertisements it will be seen that the Hindoostanee Paper [Jam-i-Jahan Numa] set on foot same time ago and which had reached the Sixth Number, is to undergo considerable modification as regards the language in which it is written." "Native Press'—The *Calcutta Journal*, 8 May 1822, p. 109.

'ক্যালকাটা জর্ণালে' জাম্-ই-জাহান-নুমার কয়েক সংখ্যার বিষয়-সূচি উদ্ধৃত হইয়াছিল। ইহার ৮ম সংখ্যার বিষয়-সূচিতে "ফার্সী" ও "হিন্দুস্থানী" বিভাগের প্রবন্ধের তালিকা দেখিতেছি। (*Ibid.*, 22 June 1822, p 739.) সুতরাং ৮ম সংখ্যা হইতে যে কাগজখানি দ্বিভাষিক হইয়াছিল তাহা নিঃসন্দেহ।

প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়। মনিরাম ঠাকুর ইহার সম্পাদক, এবং মথুরামোহন মিত্র স্বত্বাধিকারী ছিলেন।*

ফার্সী ভাষায় প্রথম সংবাদপত্র

চলিত কথাবার্ত্তায় উর্দ্দু ভাষার বহুল প্রচলন থাকিলেও লেখ্য ভাষা হিসাবে ইহার তেমন চলন ছিল না। তখনকার দিনে দেশী সংবাদপত্রের পাঠকের সংখ্যা ছিল কম। যাঁহারা সংবাদপত্র পড়িতেন তাঁহারা দেশের সম্ভ্রান্ত লোক। এই শ্রেণীর লোকেরা আবার ফার্সী ভাষায় শিক্ষালাভ করিতেন, কাজেই তাঁহাদের নিকট উর্দ্দু সংবাদপত্রের আদর ছিল না। সভ্যসমাজের ভাষাই ছিল ফার্সী। বৃটিশ-শাসিত ভারতবর্ষে প্রায় ১৮৩৬ সাল পর্যান্ত দেওয়ানী আদালতের রায়, নিম্ন রাজকর্ম্মচারীদের রিপোর্ট এবং রাজনৈতিক পত্রাদি ফার্সী ভাষায় লিখিত হইত। কাজেই ফার্সী সংবাদপত্র পড়িবার ও পয়সা দিয়া কিনিবার মত গ্রাহক তখন এদেশের বড় বড় শহরে যথেষ্ট ছিল।

ফার্সী ভাষায় প্রথম সংবাদপত্র প্রকাশের গৌরব রামমোহন রায়ের। ইহার নাম—মীরাৎ-উল্-আখবার, বা সংবাদ-দর্পণ। কলিকাতার ধর্ম্মতলা হইতে মুদ্রিত হইয়া, ১৮২২ সালের ১২ই এপ্রিল (১ বৈশাখ, ১২২৯) শুক্রবার এই সাপ্তাহিক সংবাদপত্রখানি প্রথম প্রকাশিত হয়।

প্রথম সংখ্যা মীরাৎ-উল্-আখবারের গোড়ায় রামমোহন রায় যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহার মর্ম্ম এইরূপ :—

"সম্পাদক জনসাধারণকে জানাইতেছেন যে পাঠক-গণের মনোরঞ্জনের জন্য এই শহরে অনেকগুলি সংবাদ-পত্রের সৃষ্টি হইয়াছে সত্য, কিন্তু যাঁহারা ফার্সী ভাষায় সুপণ্ডিত অথচ ইংরেজীতে অনভিজ্ঞ—বিশেষতঃ উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের লোকেরা—তাঁহাদের পাঠের জন্য একখানিও ফার্সী সংবাদপত্র নাই; এই কারণে তিনি একখানি সাপ্তাহিক ফার্সী সংবাদপত্র প্রকাশের ভার লইয়াছেন।"

অতীব কৃতিত্বের সহিত এক বৎসর কাগজখানি চালাইয়া রামমোহন ইহার প্রচার বন্ধ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

নূতন প্রেস-আইন

ইংরেজী সংবাদপত্রগুলিতে—বিশেষতঃ সিল্ক বাকিং-হামের 'ক্যালকাটা জর্ণালে' অনেক লেখা বাহির হইতে লাগিল যাহা সরকারের নিকট আপত্তিজনক ও অনিষ্টকর, অতএব লর্ড হেষ্টিংসের নিয়ম বিরোধী বলিয়া মনে হইল। সরকার রুষ্ট হইয়া সংবাদপত্র-শাসনের জন্য বিধি-প্রবর্ত্তনের আয়োজন করিতে লাগিলেন। কলিকাতার লাটের মন্ত্রণা-পরিষদের সভ্যেরা ইংরেজী সংবাদপত্র সম্বন্ধে প্রতিকূল মত নিজ নিজ মিনিটে প্রকাশ করিলেন। উইলিয়াম বাটারওয়ার্থ বেলী তাঁহার ১৮২২, ১০ই অক্টোবরের দীর্ঘ মিনিটে দেশীয় ভাষার সংবাদপত্রে প্রকাশিত প্রবন্ধাদি হইতে সরকারের চক্ষে আপত্তিজনক অনেক অংশ উদ্ধৃত করেন। রামমোহন রায়ের মীরাৎ-উল্-আখবার সম্বন্ধে তিনি বলিতেছেন,—

'মীরাৎ-উল-আখবার কাগজখানি সুপরিচিত রামমোহন রায়ের। ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় তর্ক-বিতর্কে সম্পাদকের প্রবণতা আছে—ইহা জানা কথা, এবং সেই প্রবণতার বশে একটি সুযোগ পাইয়া খৃষ্টীয় ত্রিত্ববাদ সম্বন্ধে তিনি যে-সব মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা প্রচ্ছন্ন হইলেও অনিষ্টকারক। কলিকাতার বিশপ ডাঃ মিডলটনের মৃত্যু-সংবাদ লইয়া মীরাৎ-উল-আখবারে আলোচনাটির সূত্রপাত হয়। বিশপের বিদ্যা ও ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে কিছু প্রশংসাবাদের পর প্রবন্ধটি এইরূপ শেষ করা হইয়াছে—সংসার চিন্তা হইতে অব্যাহতিলাভ করিয়া বিশপ এখন 'পিতা, পুত্র ও হোলি ঘোষ্টের করুণার স্কন্ধে আরোহণ করিলেন।'

"লেখক ত্রিত্ববাদের বিরোধী—ইহা সকলেই জানে। তাঁহার লেখনী-প্রসূত এরূপ মন্তব্যকে বিদ্রূপাত্মক ছাড়া আর কিছু বলা চলে না। ইহা যে আপত্তিজনক ও অনিষ্টকর, অপর একখানি কাগজও এই মত প্রকাশ করিয়াছে। অন্যায় করিয়াছেন জানিয়া, মীরাৎ-উল-আখবারের সম্পাদক ইহা সম্পূর্ণ অনিচ্ছাপ্রসূত বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করিলেই ব্যাপারটি শেষ হইয়া যাইত। কিন্তু সম্পাদকের তার্কিক স্বভাব, এ উপায় তাঁহার মনে লাগিল না। ১৯এ জুলাই তারিখের পত্রে তিনি ইহার সমর্থক এক লম্বা কৈফিয়ৎ বাহির করিলেন। আপত্তির প্রকৃত মর্ম্ম ইচ্ছা করিয়া ভুল বুঝিয়া তিনি এমন কতকগুলি মতামত প্রকাশ করিলেন, যাহা আমার মনে হয় অপরাধ বাড়াইয়াই তুলিয়াছে। তিনি লিখিলেন,—'যখন হিন্দু-মুসলমানের উপস্থিতি অগ্রাহ্য করিয়া খৃষ্টান পাদ্রীরা সারা বৎসর ধরিয়া অবিরত গীর্জ্জায় গীর্জ্জায় উচ্চৈঃস্বরে আপনাদের ধর্ম্মমত প্রচার করেন, এবং বলিয়া থাকেন—একেই তিন, এই বিশ্বাসের উপরই শুধু মুক্তি নির্ভর করে,—তখন আমি যে ত্রিত্বের উল্লেখ করিয়াছি তাহা যে তাঁহারা বিশ্বাস করেন, তাহাতে কি সন্দেহ থাকিতে পারে?...দেখিতেছি, ফার্সী

* "ভারতবর্ষ" শ্রাবণ ১৩৩৭, পৃ. ২৯০ দ্রষ্টব্য।

ভাষায় খৃষ্টধর্ম্মের মূলনীতির উল্লেখেই বড়লাট ও তদনুচরবর্গ-সেবিত বিশ্বাসে আঘাত লাগে, অতএব ভবিষ্যতে এ দোষ হইতে বিরত থাকিব।

"৯ই আগষ্টের পত্রেও আলোচনাটি ঐ ধরণে চালানো হইয়াছে। প্রশ্ন করা হইয়াছে,—'কোনো হিন্দুর মৃত্যু-সংবাদে গঙ্গা অথবা অপর কোনো পূজ্য জিনিষের উল্লেখ থাকিলে হিন্দুরা কি রাগ করিবে?' তারপর তথাকথিত এক ফার্সী-কবির কাব্য হইতে একটি বয়েৎ উদ্ধৃত করা হইয়াছে, –'এমন যদি কাহারও ধর্ম্ম থাকে যাহার উল্লেখমাত্র লজ্জার কারণ হয়, তাহা হইলে বেশ অনুমান করা যাইতে পারে সেই ধর্ম্মই বা কি এবং সেই ধর্ম্মাবলম্বী লোকেরাই বা কিরূপ।'... অন্যান্য আপত্তিজনক অংশ উদ্ধৃত করিতে বিরত হইলাম।"

বেলীর দীর্ঘ মিনিট হইতে আমি সামান্য যেটুকু উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহা হইতে দেশীয় ভাষার সংবাদ-পত্রের প্রতি সরকারের মনোভাব বুঝিতে কাহারও বিলম্ব হইবে না।

১৮২২, ১৭ই অক্টোবর সকৌন্সিল লর্ড হেষ্টিংস সংবাদ-পত্রগুলিকে কঠিন শৃঙ্খলে বাঁধিবার উদ্দেশ্যে বিলাতের কর্ত্তৃপক্ষের নিকট নূতন ক্ষমতা প্রার্থনা করিলেন। পর বৎসরের ৯ই জানুয়ারি তারিখে লর্ড হেষ্টিংস বিলাত-যাত্রা করেন। অ্যাডাম অস্থায়িভাবে গভর্ণর-জেনারেল হইলেন। তিনি বিলাতের কর্ত্তৃপক্ষের সমর্থন পাইয়া ১৪ঠা মার্চ্চ তারিখে এক কড়া প্রেস আইন লিপিবদ্ধ করেন। পরবর্ত্তী এপ্রিল মাসের ৪ঠা তারিখে সুপ্রীম কোর্টে রেজেষ্ট্রীকৃত হইয়া এই আইন জারি হইল। এই আইন অনুসারে কোনো কাগজ বাহির করিবার পূর্ব্বে তাহার স্বত্বাধিকারী ও প্রকাশককে ভারত-গভর্ন্মেণ্টের নিকট হইতে 'লাইসেন্স' লইতে হইত। নূতন আইনের প্রথম ফল স্বরূপ মীরাৎ-উল্-আখবারের প্রকাশ বন্ধ হইয়া গেল। রামমোহন পত্রের শেষ সংখ্যায় জানাইলেন,—"এমন অপমানজনক সর্ত্তে রাজী হইয়া কাগজ প্রকাশ করিতে তিনি অসমর্থ।"

হিন্দী ভাষায় প্রথম সংবাদপত্র

কিন্তু এ যাবৎ আর এক শ্রেণীর পাঠকের জন্য কোনো সংবাদপত্রের সৃষ্টি হয় নাই, অর্থাৎ হিন্দী ভাষাভাষীদের।

'ভারতমিত্র'-সম্পাদক বালমুকুন্দ গুপ্তের "গুপ্ত নিবন্ধাবলী"র ৫৩ পৃষ্ঠায় বলা হইয়াছে যে, কাশী হইতে ১৮৩৫ সালে লিথোগ্রাফে মুদ্রিত 'বেনারস আখবার'ই প্রথম হিন্দী সংবাদপত্র। এই কাগজখানি রাজা শিবপ্রসাদের আনুকূল্যে, এবং গোবিন্দ রঘুনাথ থাট্টে নামক একজন মারাঠার সম্পাদকত্বে প্রকাশিত হইত।

ইহা হইতে বুঝা যায় যে হিন্দী ভাষাভাষীরাও তাঁহাদের মাতৃভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্রের আদি ইতিহাস জানেন না। প্রকৃত কথা এই যে ১৮৪৫ সালে 'বেনারস আখবার' লিথোগ্রাফে মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইবার বহু পূর্ব্বেই একাধিক হিন্দী সংবাদপত্র ছাপার হরফে কলিকাতা হইতে বাহির হইয়াছিল। তাহার প্রমাণ আছে।

কলিকাতার কলুটোলার ৩৭ নং আমড়াতলা গলি হইতে শ্রীযুত যুগলকিশোর সুকুল 'উদন্ত মার্ত্তণ্ড' নামে একখানি হিন্দী সাপ্তাহিকপত্র প্রকাশ করিতে ইচ্ছুক হইয়া ভারত-গভর্ন্মেণ্টের নিকট লাইসেন্সের জন্য আবেদন করেন। সরকার ১৮২৬ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারি তারিখে তাঁহাকে লাইসেন্স মঞ্জুর করিয়াছিলেন।*

যুগলকিশোর সুকুলের আদি নিবাস কানপুরে; তিনি সদর দেওয়ানী আদালতে কিছুদিন ওকালতিও করিয়া-ছিলেন বলিয়া জানা যায়। সরকারের নিকট হইতে উদন্ত মার্ত্তণ্ড প্রকাশের অনুমতি পাইয়া সুকুল মহাশয় প্রথমে একখানি অনুষ্ঠানপত্র প্রচার করেন। এই অনুষ্ঠান-পত্র সম্বন্ধে সমসাময়িক বাংলা সংবাদপত্র—'সমাচার চন্দ্রিকা'য় এইরূপ বিবরণ পাওয়া যায়:—

"নাগরীর নূতন সংবাদ পত্র॥—ইদানীং পাশ্চিমাত্য লোকেরদের মধ্যে গুণ প্রচার ও জ্ঞানের সঞ্চার হইবার কারণ যাহা অদ্যপর্য্যন্ত উক্ত দেশস্থ ব্যক্তিরদের মধ্যে এ বিষয়ে চর্চামাত্র ছিল না সংপ্রতি অন্তর্বেদ [দোয়াব] দেশান্তর্গত কাহ্নপুর গ্রামনিবাসি স্বদেশজনসুখাভিলাষি কান্যকুব্জ জাতীয় শ্রীযুত যুগলকিশোর সুকুল হিন্দুস্থানি ব্যক্তিরদিগের বিদ্যারূপ মণি এতাবতা যাহা জাড্যতারূপ তিমিরপ্রযুক্ত বর্ণের প্রকাশ পায় নাই এতদর্থে উদন্ত মার্ত্তণ্ডের উদয়ে গুণ ও জ্ঞানের উদয় করণ অভিপ্রায়ে শ্রীশ্রীযুত গবরনর জেনরল কৌন্সেলের সভায় তদ্বিষয়ে বিবরিয়া এক বিজ্ঞপ্তি পত্র উপস্থিত করাতে শ্রীশ্রীযুতের অনুমতিপ্রাপ্ত হইয়া এক অনুষ্ঠানপত্র দেবনাগর অক্ষরে হিন্দি ভাষায় এনগরে পূর্ব্বোক্ত সুকুলের কর্তৃত্বে এখানকার এবং অন্যান্য হিন্দুস্থান ও নেপালপ্রভৃতি দেশের সজ্জন মহাজন এবং ইংগ্লণ্ডীয় মহাশয়েরদিগের মধ্যে প্রচার হইয়াছে এবং হইতেছে। ঐ উদন্ত মার্ত্তণ্ড নির্ব্বাহানুকূল্য জন্য দ্বিমুদ্রা মাসিক স্থির পাইয়াছে যে২ মহাশয়ের ঐ সমাচার পত্র লইবার বাঞ্ছা হয় তাঁহারা মোঃ আমাড়াতলা গলির ৩৭ নং বাটীতে লোক পাঠাইলে জানিতে পারিবেন।" +

* *Home Dept. Procds. 16 Feby., 1826, Nos. 57-59.*

+ এই অংশটি শ্রীরামপুর মিশনরীদের 'সমাচার দর্পণ' পত্রে ১৮২৬, ১১ই মার্চ তারিখে উদ্ধৃত হইয়াছিল।

১৮২৬ সালের ৩০ মে উদন্ত মার্ত্তণ্ড নাগরী অক্ষরে মুদ্রিত হইয়া প্রথম প্রকাশিত হয়। ইহা প্রতি মঙ্গলবারে বাহির হইত; মাসিক চাঁদা ছিল দুই টাকা। উদন্ত মার্ত্তণ্ডের আবির্ভাবে একখানি সমকালিক বাংলা সংবাদপত্রে যাহা লিখিত হইয়াছিল, 'সমাচার দর্পণ'-সম্পাদক তাঁহার ১৮২৬, ১৭ জুন তারিখের কাগজে সেই অংশটি 'বাঙ্গলা সমাচারপত্র হইতে নীত' বিভাগে উদ্ধৃত করেন। অংশটি এইরূপ :—

"নাগরির সমাচারপত্র।—সংপ্রতি এই কলিকাতা নগরের মধ্যে উদন্তমার্ত্তণ্ডনামক এক নাগরির নূতন সমাচার পত্র প্রকাশিত হইয়াছে ইহাতে আমারদিগের আহ্লাদের সীমা নাই যেহেতুক সমাচারপত্রদ্বারা বিষয়সংক্রান্ত ও নানাদিগ্দেশীয় রাজসম্পর্কীয় বৃত্তান্ত প্রকাশিত হইয়া থাকে তাহা জ্ঞাত হওয়াতে অবশ্য উপকার আছে ইউরোপদেশে প্রায় দুই শত বৎসরের অধিক কালাবধি সমাচারপত্র প্রকাশ হইয়াছে তদ্দারা সামান্য [বিবিধ] সমাচার ও নানা বিষয়ের দোষগুণ প্রভৃতি প্রেরিত পত্রে উত্তর প্রত্যুত্তরদ্বারা প্রকাশিত হওয়াতে অনেক বিষয়ের নির্য্যাস ও সংশোধন হইয়াছে এবং ইংরাজীপ্রভৃতি সমাচারপত্র দৃষ্টান্তে এতদ্দেশে প্রথম বাঙ্গলা ভাষায় সমাচারপত্র প্রকাশ হয় পরে পারসী ভাষায় হয় এবং মধ্যে কিয়দ্দিবস গত হইল উরদু ভাষায় হইয়াছিল কিন্তু বাঙ্গলা ভাষাভিন্ন প্রেরিত পত্র প্রকাশ হয় না যাহা হউক এক্ষণে নাগরী ভাষায় এক সমাচারপত্র হওয়াতে কাশীপ্রভৃতি স্থানস্থ লোক যাহারা ঐ ইংরাজীপ্রভৃতি ভাষা অজ্ঞাতপ্রযুক্ত কিম্বদন্তীতে বিশ্বাস করিয়া প্রগল্ভতা পূর্ব্বক কালক্ষেপণ করেন তাঁহারা যদ্যপি অভিনব রীতি বলিয়া তুচ্ছ না করিয়া আলস্য ত্যাগপূর্ব্বক তাহা গ্রহণ করিয়া পাঠ করেন তবে তাঁহারদিগের পক্ষে যে ফলোদয় হইবে তাহা ক্রমে জানিতে পারিবেন।"

উপযুক্ত গ্রাহকের অভাবে উদন্ত মার্ত্তণ্ড বেশীদিন চলিল না। ১৮২৭, ৪ ডিসেম্বর ইহার শেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয়। সম্পাদক লিখিলেন,—

"আজ দিবস লৌ উগ্ চুক্যো মার্ত্তণ্ড উদন্ত্
অস্তাচলকো জাত হ্যায় দিন্‌কারদিন্ অব্ অস্ত্।"

অর্থাৎ, আজ পর্য্যন্ত উদন্ত মার্ত্তণ্ড উদিত ছিল; সে অস্তাচলে যাইতেছে—মার্ত্তণ্ডের আয়ু শেষ হইল।

শ্রীরামপুরের 'সমাচার দর্পণ' (১৫ ডিসেম্বর ১৮২৭) দুঃখ করিয়া লিখিলেন,—

"উদন্ত মার্ত্তণ্ড।—আমরা অবগত হইলাম যে এই অত্যুত্তম সমাচার-পত্র গ্রাহকের অপ্রতুলেতে কালপ্রাপ্ত হইয়াছে।'

উদন্ত মার্ত্তণ্ডের সম্পূর্ণ ফাইল (২য় সংখ্যা ছাড়া) আমি রাজা রাধাকান্ত দেবের লাইব্রেরীতে আবিষ্কার করিয়াছি। ইহা হইতে কিছু কিছু জ্ঞাতব্য তথ্য উদ্ধার করিয়া আগামী এপ্রিল সংখ্যা 'বিশাল ভারতে' প্রকাশ করিব।

উদন্ত মার্ত্তণ্ডের প্রচার রহিত হইবার দুই বৎসর পরে ১৮২৯, ৯ই মে কলিকাতা হইতেই হিন্দী ভাষায় দ্বিতীয় সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়। ইহার নাম—'বঙ্গদূত'। রাজা রামমোহন রায় এই কাগজের অন্যতম স্বত্বাধিকারী ছিলেন।*

* রামমোহন লাইব্রেরীতে পঠিত।



পোর্ট আর্থারের ক্ষুধা

শ্রীসুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

রুশ-জাপান যুদ্ধের পরিণাম পোর্ট-আর্থার বিজয়ের উপর অনেকাংশে নির্ভর করিয়াছিল বলিলে অত্যুক্তি হয় না। পোর্ট-আর্থারে জাপানী ও রুশ, উভয় পক্ষই অমিতবিক্রমে জীবন পণ করিয়া সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয়—তাই এই যুদ্ধের কাহিনী ইতিহাসে অমর হইয়া আছে। সেই দুর্ভেদ্য গিরিদুর্গ অধিকারের জন্য যে-সব জাপানী যুদ্ধ করিয়াছিল লেফ্‌টেন্যাণ্ট সাকুরাই তাদেরি একজন। ডান হাতখানি যুদ্ধে বিসর্জ্জন দিয়া বাঁ হাতে তাঁর প্রত্যক্ষলব্ধ অভিজ্ঞতা তিনি লিপিবদ্ধ করেন। আধুনিক যুগের যুদ্ধের সেই প্রোজ্জ্বল চিত্র—জাপানীর শৌর্য্যবীর্য্য, দেশভক্তি ও অপূর্ব্ব আত্মদানের নিগূঢ় পরিচয়—বাঙালী পাঠককে উপহার দিলাম।—অনুবাদক

আহ্বান

যুদ্ধযাত্রার আদেশ যখন পৌঁছিল তখন বসন্তকাল, চেরিগাছে ফুল ফুটিতে সুরু করিয়াছে। ভাবিতেছি, সত্যই কি এবার আমাদের অধীর প্রতীক্ষার অবসান হইল? খবরটা এতই ভাল যে বিশ্বাস করিতে ভয় করে!

এ দলের পতাকা বহন করা আমার কাজ। নায়ককে বলিলাম, কর্নেল! আমাদের আন্তরিক অভিনন্দন! এই মাত্র হুকুম পেয়েছি! কর্নেলের মুখে আনন্দের হাসি, কহিলেন, হাঁ শেষ পর্য্যন্ত এসেছে! আশা ছিল না, কি বল?

এমন সুখের দিন আর কখনো আসিয়াছিল কি? —কই মনে ত পড়ে না! ফুর্ত্তির চোটে কি করি কোথা যাই কিছুই ঠিক করিতে পারি না, ছুটাছুটি করিয়া জনে জনে খবরটা শুনাইয়া বেড়াই। সকলের অন্তর আচ্ছন্ন করিয়া যেন একটা অদ্ভুত তড়িৎপ্রবাহ বহিতে সুরু করিল—তার ফলে কি নায়ক কি সৈনিক, প্রত্যেকের মনে হইতে লাগিল, যেন সে একাই গোটা রুশিয়া দেশটার সঙ্গে লড়িতে পারে!

প্রথম ও দ্বিতীয় 'রিজার্ভ'-দলের লোকও অবিলম্বে নিজ নিজ পতাকাতলে জড়ো হইতে লাগিল। তাদের মধ্যে এমন সব গরীবও ছিল যারা যুদ্ধে গেলে তাদের পরিবারের অনাহারে থাকার সম্ভাবনা; কেউ বা স্থবির রুগ্ন বাপ-মাকে ঘরে ফেলিয়া আসিয়াছে—যুদ্ধযাত্রায় বাধা দিবার মত চিন্তা ও উদ্বেগ সকলেরই ছিল, কিন্তু "দেশের এই সঙ্কটকালে সাহস ও নিষ্ঠার সহিত দেশসেবা করিতে হইবে"—স্বজাতির জন্য প্রাণ দিতে পারা যে কত বড় সৌভাগ্য সকলে সেই কথাই ভাবিতে লাগিল।

নাকামুরা প্রথম 'রিজার্ভ'-দলের সৈনিক. তার ঘরে পীড়িতা পত্নী ও বছর তিনেকের এক শিশু। নিঃস্বের সংসার, কায়ক্লেশে দিন কাটে। পতির যুদ্ধযাত্রার আগের দিন দীনহীন অস্থিসার মেয়েটি তার স্বল্পাবশেষ শক্তির উপর নির্ভর করিয়া সহরতলী থেকে পোয়া দেড়েক চাল ও এক পয়সার জ্বালানি কাঠ কিনিয়া আনিল। পতির জীবনে যুদ্ধযাত্রার মহাসুযোগ উপস্থিত, বিদায়-ভোজের আয়োজন না করিলে মানায় কি? পত্নী মৃত্যুশয্যায়, শিশু অনাহারে অবসন্ন, পতি চলিয়াছে দেশের জন্য প্রাণ দিতে!

প্রথম ও দ্বিতীয় 'রিজার্ভ'-এর লোকেরা যথাসময়ে সৈন্যাবাসে পৌঁছিল। দুর্ব্বলতা বা ভগ্ন-স্বাস্থ্যের জন্য যারা বাতিল হইল, তাদের দুঃখ ও নিরাশার আর অন্ত নাই। তারা কাকুতি-মিনতি জুড়িয়া দিল—"দয়া ক'রে কোনো-রকমে আমায় নিতে পারেন না কি? দেখুন, গ্রাম থেকে আসার সময় তারা ভারি সমারোহে বিদায় দিয়েছে, ট্রেন ছাড়ার সময় বার বার জয়ধ্বনি ক'রে কত আনন্দ প্রকাশ করেছে। সঙ্কল্প ক'রে এসেছি, ঘরে আর ফিরব না! এখন উপায়? কেমন ক'রে ফিরি বলুন? তারা যে ভাববে আমি একটা অকেজো অপদার্থ—সে অপমান কি ক'রে সহ্য করব? দয়া ক'রে আমায় সঙ্গে নিন—দোহাই আপনার, দয়া করুন—আমায় ফেরাবেন না!"

কানন্‌জি বৌদ্ধমন্দিরে জনকয় লোক যুদ্ধযাত্রার অপেক্ষায় বাস করিতেছিল। স্থির ছিল, এ দলে তারা

যাইবে না, ডাক আসিলে পরে যাইবে। মিয়াতাকে তাদেরি একজন—দেহে মনে বেশ সুস্থ সবল। ঘর থেকে বিদায়ের সময় পণ করিয়া আসিয়াছে প্রথম দলের সঙ্গেই যুদ্ধে যাইবে! অথচ এমনি দুর্ভাগ্য, যুদ্ধে প্রাণদানের বদলে দেশের মধ্যেই নিষ্কর্ম্মা বসিয়া থাকা ধার্য্য হইল! কবে পাঠাইবে তারও ঠিকানা নাই। এ কি সহ্য হয়—মনে হইল মৃত্যুই তার পক্ষে শ্রেয়!

একদিন তখন অনেক রাত, মিয়াতাকের বন্ধুরা গভীর ঘুমে অচেতন। নিরিবিলি সে একখানি বিদায়-লিপি রচনা করিতে বসিল। তাহাতে লিখিল—কত সৈনিক যুদ্ধে গেল, দুর্ভাগা আমি এখনও পড়ে আছি—এ দুঃখ সহ্য করার ক্ষমতা নেই! কত সাধ্যসাধনা করেছি কেউ আমাকে সঙ্গে নিলে না! আমার রাজভক্তি ও দেশ-প্রীতি মরে' প্রমাণ করা ছাড়া ত উপায় দেখি না!...

মৃত্যুর জন্য তৈরি হইয়া সাদা কাঠের খাপ থেকে সে একখানি তীক্ষ্ণধার ছোরা বাহির করিল, তারপর সম্রাটের উদ্দেশে চাপাগলায় 'বান্‌জাই' বলিয়া 'হারাকিরি' করিল—অর্থাৎ তলপেটের এধার হইতে ওধার পর্য্যন্ত চিরিয়া ফেলিল! পুরানো দেবালয়ের নিভৃত নির্জ্জন প্রান্তে এই ভয়ানক কাণ্ড কেহ দেখিতেও পাইল না, কেহ জানিতেও পারিল না। বাহিরে তখন মৃদু বর্ষণের ঝির্‌ঝির্ শব্দ—আর কোনো শব্দ নাই।

দেশভক্ত সৈনিকের নিষ্ঠা বোধ করি বিধাতার বুকে বাজিল—হঠাৎ বন্ধুদের ঘুম ভাঙিয়া যাওয়ায় তার প্রাণরক্ষা হইল। শেষে একদিন তার সাধও পূর্ণ হইল—সে হাসপাতাল ছাড়িয়া যুদ্ধযাত্রা করিল!

লড়াই চলিতেছে। যুদ্ধের পর যুদ্ধ জয়ের খবরে মন অবশ্যই খুসি হয়, তবুও স্বীকার করা ভাল, আনন্দটি নিছক্ আনন্দ নয়। ভাবি—এইভাবে চলিলে আমরা যখন পৌঁছিব, তখন হয় ত যুদ্ধ চুকিয়া যাইবে! দিন কয় পরে না কি অপর একটি দল যাত্রা করিবে—আমাদের পালা কখন? এখানে হাত-পা গুটাইয়া বসিয়া আছি, ওদিকে উহারা লড়াই ফতে করিয়া বসিল যে! আরও বিলম্বে সেখানে গিয়া করিব কি?

যাক, শেষ পর্য্যন্ত হুকুম আসিয়াছে—ভোর ছয়টায় 'প্যারেড'-মাঠে সকলে জড়ো হইবে! অসীম আনন্দ—এতদিনে জীবনে মহোচ্চ কীর্ত্তির সুযোগ মিলিল! কথায় বলে, সাহসীর চোখে অবশ্য অশ্রু আছে, কিন্তু বিদায়কালে সে অশ্রু বর্ষণ করে না! ভালমন্দ সব কিছুর জন্য তৈরি বলিয়াই ত আমরা এ বিদায়কে চিরবিদায় না ভাবিয়া পারি না। মন কঠিন করিয়া মুখে হাসি ফুটাইয়াছি, তবু অন্তরের অশ্রু কেমন করিয়া নিরোধ করিব?

যাত্রার পূর্ব্ব রাত্রি। উলটিয়া পালটিয়া বন্ধুবান্ধবের ছবিগুলি বেশ করিয়া দেখিয়া লইলাম। পরে ডেস্কের টানার মধ্যে দরকারি কাগজপত্র গুছাইয়া রাখিলাম—যেন আমি মরিলে আমার বিষয়-ব্যবস্থার জন্য কাহাকেও বেগ পাইতে না হয়। তারপর স্বচ্ছন্দমনে মেঝের উপর ঘুমাইয়া পড়িলাম। বাড়িতে সেই শেষ নিদ্রা!

রাত তিনটায় পুরানো কেল্লায় গিরিশীর্ষ হইতে তিন বার কামান গর্জ্জন করিল। মুহূর্ত্তে শয্যা ছাড়িয়া নির্ম্মল জলে স্নান করিয়া সৈনিকের বেশে সাজিলাম। তারপর যে দিকে আমাদের মহামহিম সম্রাট বিরাজিত, সেই পূর্ব্বদিকে ফিরিয়া মাথা নত করিলাম। 'মিকাদো'র যুদ্ধ-ঘোষণা-পত্র শ্রদ্ধার সহিত পড়িয়া তাঁর উদ্দেশে কহিলাম—আমি আপনার নগণ্য অধম প্রজা, এইমাত্র যুদ্ধ যাত্রা করছি! বাস্তুপীঠের সামনে অন্তিম আরাধনা করার সময় সর্ব্বাঙ্গে কাঁটা দিল! মনে হইল পিতৃপুরুষেরা যেন বলিতেছেন—আজ থেকে তোমার দেহমন তোমার নয়! সম্রাটের মহিমা অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য, জাতিকে দারুণ বিপদ থেকে পরিত্রাণ করার জন্য তুমি চললে! অস্থি যদি চূর্ণ হয়, মাংস যদি ছিন্ন হয়, তা-ও সহ্য করবে—এই সঙ্কল্প ক'রে যাও! কাপুরুষতা দ্বারা কদাচ পূর্ব্ব পিতামহগণের অসম্মান ক'রো না!

পরিবার পরিজন আমাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল, বিদায়ের পানপাত্র হাতে তুলিয়া দিল, তাদের আন্তরিক শুভ ইচ্ছা ও আশীর্ব্বাদ জানাইল।

পিতা কহিলেন, সংসারের জন্য চিন্তা নেই! দীর্ঘ কালের সকল সাধু সঙ্কল্প এবার কাজে পরিণত ক'রো!

তোমার মৃত্যুর জন্য আমি প্রস্তুত হয়েছি—দেশের জন্য কীর্ত্তি অর্জ্জন ক'রে আমাদের পরিবারের নাম মহোচ্চ সম্মানের পুষ্পে বিভূষিত ক'রো!

আমি বলিলাম, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন—সৈনিকের জীবনে এর বাড়া স্বযোগ আর কি আসতে পারে? আপনার শরীর দুর্ব্বল, স্বাস্থ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখবেন!

যাত্রাকাল উপস্থিত। বাস্তপীঠ থেকে তলোয়ার তুলিয়া লইয়া কোমরে ঝুলাইলাম। তারপর মায়ের হাতের জল খাইয়া খুসিমনে ক্ষিপ্রপদে বাহির হইলাম।

সৈন্যদল 'প্যারেড'-ভূমিতে সারবন্দি দাঁড়াইয়াছে—যুদ্ধপতাকা মাঝখানে। জলদগম্ভীর স্বরে রণসঙ্গীত ধ্বনিত হইয়া উঠিল। কর্নেলের পানে চাহিলাম—তিনিই আমাদের কর্ণধার। সাহসী সৈনিকেরা অনুভব করিল, তারা যেন তাঁরই হাত-পা। পিতামাতাকে ছাড়িয়া আসিয়াছে, অতঃপর তিনিই তাঁদের স্থান অধিকার করিবেন! গৃহ হইতে চিরবিদায় লইয়াছে, অতঃপর মাঞ্চুরিয়ার অসীম প্রান্তরেই বসবাস করিতে হইবে!

সৈন্যশ্রেণীর উপর আগাগোড়া চোখ বুলাইয়া কর্নেল উচ্চকণ্ঠে তাঁর উপদেশ পড়িয়া শুনাইলেন। তাঁর কণ্ঠে কণ্ঠ মিলাইয়া দেশনায়ক সম্রাটের উদ্দেশে সকলে তিনবার 'বান্জাই'-ধ্বনি করিল।

—"এই যে শক্তিমান যোদ্ধদলের উদ্ভব হয়েছে, মহামহিম 'মিকাদো'র আদেশে এরা অস্ত্রচালনার প্রতিযোগিতায় অগ্রসর! এদের গতির সম্মুখে আকাশ বিদীর্ণ হবে, ধরণী চূর্ণবিচূর্ণ হবে!'

"পয়লা দল, আগে চল!"

বিলম্বিত সৈন্যশ্রেণী বিসর্পিত গতিতে পায়ে পায়ে চলিতে স্বরু করিল। তালে তালে পদক্ষেপ-শব্দের সহিত পোষাক ও অস্ত্রশস্ত্রের মৃদু ঘর্ষণধ্বনি মিশিল। নিকটে ও দূরে সৈনিকেরা তূর্য্যনিনাদে দেশবাসীকে বিদায়-অভিনন্দন জানাইতেছে। প্রবীণ ও তরুণের কণ্ঠ সম্মিলিত হইয়া ভৈরবরবে মুহুর্মুহু ঘোষণা করিল—'বান্জাই'—চিরজীবি হও, চিরজীবি হও!

জাহাজে উঠিলাম। ডেকের উপর পতাকা রাখিলাম। জলযান থরথর করিয়া কাঁপিতে লাগিল, তারপর পিছনে ঝলকে ঝলকে মসীবর্ণ ধূম উদ্গার করিয়া পশ্চিমে যাত্রা স্বরু করিল। সহসা আকাশে মেঘ দেখা দিল, অচিরে বর্ষণ আরম্ভ হইল—প্রথমে মৃদুমন্দ, তারপর তীব্রবেগে, মুষলধারায়।

২

সমুদ্রযাত্রা

জয়ধ্বনি এখনও যেন কানে বাজিতেছে, কল্পনা উধাও হইয়া ছুটিয়াছে, গিরিদরি নদীসমুদ্র অতিক্রম করিয়া বিরাট এক রণক্ষেত্রে—স্বদূর পশ্চিমে আমাদের যাত্রা। কোথায় চলিয়াছি, কোথায় নামিব, যুদ্ধ করিব কোন্‌খানে? আমাদের কর্নেল আর জাহাজের কাপ্তেন ছাড়া এ সব খবর কেহই জানে না। যাত্রাকালে তাঁরাও যে খুব বেশি জানিতেন তা নয়; স্থির ছিল, মাঝে মাঝে আদেশ আসিবে।

চেনান্‌পু না ইয়ালুনদীর মোহানা, হাইচেং না পোর্ট্-আর্থার অবরোধে—কোথায় যাইতেছি? কেবল অনুমান করিতে পারি, কল্পনা করিতে পারি, তার বাড়া কিছু নয়। কিন্তু যেখানেই নামি বা যুদ্ধ যেখানেই করি, ক্ষতিবৃদ্ধি নাই; অচিরে সম্রাটের আদেশে আমরা নিজ নিজ শৌর্য্যবীর্য্যের পরিচয় দিতে পারিব, ইহাই যথেষ্ট—কেবল এই চিন্তায় মশগুল হইয়া আছি।

সন্ধ্যার দিকে শিমনোসেকি প্রণালী ভেদ করিলাম। জাপানের পানে "শেষ বিদায়ের চাওয়া" চাহিলাম—বিচ্ছেদের শূল বুকে বিঁধিল।

মনে মনে কহিলাম, বিদায় য়্যামাতো!* জন্মভূমি—বিদায়, বিদায়!

সেদিন রাত্রে জাপান-সমুদ্র স্থির নিস্তরঙ্গ; দিনের বৃষ্টিশেষে আকাশ এখন মেঘমুক্ত ও নির্ম্মল। চারিদিক নীরব, তাহারই মাঝে হাজার হাজার যোদ্ধা গভীর ঘুমে অচেতন। যুদ্ধযাত্রার এই প্রথম রাত্রি—এ রাত্রে তাদের স্বপ্ন কোন্ পথে ধাবমান—পূর্ব্বে না পশ্চিমে? মৃদু

* জাপান।

তরঙ্গ, অবাধ মসৃণ গতি, মাঝে মাঝে একটা বিলম্বিত নিঃশ্বাসের শব্দ স্তব্ধতাকে আরও নিবিড় করিয়া তুলিতেছে।

পরদিন প্রভাতে স্বচ্ছ সুমার্জ্জিত আকাশ হাসিতেছে। মৃৎসুরে দ্বীপপুঞ্জের পাশ দিয়া জাহাজের পর জাহাজ হু হু করিয়া চলিয়াছে, বহুদূরে ৎসুশিমার পাহাড় দেখা দিয়াছে, এমন সময় হঠাৎ একটা বাজপাখী জাহাজের ডেকের উপর আসিয়া নামিল। এ পাখীর আবির্ভাব শুভ লক্ষণ, তাই সকলে খুশীমনে তার পিছু পিছু ছুটাছুটি সুরু করিয়া দিল। মাস্তলের উপরে বসিয়া, কখনও আবার জাহাজের উপরে উড়িয়া ফিরিয়া পাখীটা কিছুকাল আমাদের সঙ্গ ধরিয়া রহিল। তারপর, আশীর্ব্বাদ বিতরণ সাঙ্গ হইলে সে পিছনের জাহাজের সৈন্যদলকে উৎসাহ দিবার জন্য উড়িয়া গেল।

দিন কয় যাইতে-না-যাইতেই মনে হইতে লাগিল, সময় যেন আর কাটে না। দীর্ঘ সমুদ্রযাত্রার একঘেয়েমির তাড়নায় যার যেটুকু পুঁজিপাটা ছিল সমস্তই ক্রমে ক্রমে প্রকাশ করিতে হইল। কেহ বলিতে বসিল বিগত জীবনের অভিজ্ঞতা, কেহ শুনাইতে লাগিল ভূতুড়ে কাহিনী বা হাসির গল্প, আবার আবৃত্তি বা চল্‌তি প্রেমের গানে কেহ বা আসর জমাইয়া দিল। সভাদের রুচি ও প্রবৃত্তি অনুসারে অনেকগুলি ছোট ছোট বৈঠক গড়িয়া উঠিল। মাঝে মাঝে কোন তুখোড় লোক লম্ফঝম্ফ ধুপধাপ করিয়া পালোয়ানী নাচ দেখাইতে প্রবৃত্ত হয়, কেহ বা সৈনিকের পোঁটলাটিকে বই রাখার ডেক্সে পরিণত করিয়া হাতে পাখা নাড়িতে নাড়িতে পেশাদার কথকের অনুকরণ করে। জাহাজের মধ্যেকার সংকীর্ণ আকাশ ও পরিমিত পৃথিবী আনন্দকলরবে মুখর হইয়া ওঠে—অভিনেতাদের মুখে গর্ব্বের ভাব দেখা দেয়। সংক্রামক উৎসাহের ফলে সেই আলুর গাদার মত মানুষের পাল থেকে ক্ষণে ক্ষণে রকমারি খেলা দেখাইবার কত লোক যে বারি হয় তার আর ইয়ত্তা নাই।

সকলে যুদ্ধে চলিয়াছে—সে-যুদ্ধ থেকে কেহ ফিরিবার আশা রাখে না। তাই বোধ করি সৈনিকে ও নায়কে এত মাখামাখি, এমন ভাব—সকলে যেন আত্মীয়—একই বৃহৎ পরিবারের অন্তর্ভুক্ত। তাই সকলেরই চেষ্টা সকলকে খুশী করার। তাই তারা নিজ নিজ বিদ্যাবুদ্ধি অনুযায়ী খেলা দেখাইয়া, অভিনয় করিয়া সময়ের ভার কমাইতে চায়—তাই তাদের প্রাণখোলা খুশীর হাসিতে বাতাস কাঁপিতে থাকে—হাসির চোটে সকলের পেটে খিল ধরিয়া যায়।

পিছনে কুয়াসার আড়ালে ৎসুশিমাকে ফেলিয়া সাগরপথে উত্তরে চলিয়াছি—কোরিয়ার পর্ব্বতপুঞ্জ ও গিরিশৃঙ্গ এখনও দেখা যাইতেছে। দিনের পর দিন তেমনি ফুর্ত্তি—মাঝে মাঝে আনাড়ি হাতে পিয়ানোর বাদ্য, ডেকের উপর বাজখাই সুরে রণসঙ্গীত। খেলা-ধুলা কুস্তিতে বিতৃষ্ণা ধরিলে যুদ্ধচালনা-প্রণালী আলোচনা করিতে বসি। ইচ্ছা হয় রণক্ষেত্রের যবনিকা এই দণ্ডে উঠিয়া যাক, লড়াইয়ের বহর দেখাইয়া শত্রুকে তাক লাগাইয়া দিই—সমগ্র জগৎ সমস্বরে বলিতে থাকুক—সাবাস! সাবাস!

বেশ মনে পড়ে ২৩ মে তারিখে কাপ্তেন আমাদের হস্তাক্ষর চাহিলেন—যুদ্ধযাত্রার স্মৃতিচিহ্ন। একখানি কাগজের মাথার দিকে আমাদের চলন্ত জাহাজ "কাডোশিমামারু"র ছবি আঁকিলাম। তার তলদেশে কর্নেল আওকি ও অপর নায়কেরা সহি করিলেন। সবশুদ্ধ সাঁয়ত্রিশটি নাম—এখন তাদের মধ্যে ক'জনই বা বাঁচিয়া আছে!

চব্বিশ তারিখ সকালে এলিয়ট দ্বীপপুঞ্জের পাশ দিয়া যাইবার সময় দেখিতে পাইলাম অনেকগুলি ধূমধারা আকাশ ও জলের সমান্তরালে ভাসিতেছে—জাপানের সম্মিলিত রণপোতবাহিনী আগুসার হইয়া অভ্যর্থনা করিতে আসিয়াছে! মুক্ত সাগরের বুকে তাদের এই অপ্রত্যাশিত আবির্ভাবে সকলের অন্তরে সে যে কি উদ্দীপনার সঞ্চার হইল, বলা যায় না!

দেখিতে দেখিতে একখানি 'ক্রুজার' কাছে আসিয়া আমাদের সঙ্গ ধরিল, বোধ করি কোনো আদেশপত্র আনিয়াছে।

অবতরণের আর দেরি নাই—যুদ্ধক্ষেত্র সন্নিকট।

তবুও জানি না কোথায় নামিব বা কোন্ দিকে যাইব।

সকলেরই মনস্কামনা—পোর্ট-আর্থার!

৩

অবতরণ

আমরা নামিব কোথায়? সমুদ্র-যাত্রার সুরু হইতে শেষ পর্য্যন্ত এই প্রশ্ন কেবলই মনে জাগিয়াছে। এ সম্বন্ধে জল্পনা-কল্পনার অন্ত ছিল না। জাহাজের গতি পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে তারও ঘন ঘন বদল হইতে লাগিল, শেষে যখন জাহাজের যাত্রাপথের নক্সায় দেখিলাম আমরা এলিয়ট দ্বীপপুঞ্জের দক্ষিণে চলিয়াছি, তখন আমাদের গন্তব্যস্থল যে পোর্ট-আর্থারের পথে কোথাও হইবে তাহা সকলে নির্ব্বিবাদে মানিয়া লইলাম। সৈন্যবাহী জাহাজ শান্ত্রী জাহাজের সঙ্গে সেই দিকেই চলিল দেখিয়া আমাদের উত্তেজনা ও আনন্দের আর সীমা রহিল না।

কিছুকাল পরে ঘন কুয়াসার জাল ভেদ করিয়া গাঢ় পাণ্ডুবর্ণ দীর্ঘাকৃতি একফালি ভূখণ্ড অস্পষ্টভাবে দেখিতে পাইলাম। উহাই Liaotung উপদ্বীপ। ওখানেই দশ বৎসর আগে জাপানের কত একনিষ্ঠ সাহসী সন্তান অস্থি রক্ষা করিয়াছে। ঐ যুদ্ধ ক্ষেত্রেই আমাদের দেহও ফেলিয়া যাইতে হইবে!

কাল সন্ধ্যা হইতে আকাশ অন্ধকার, ধূসর কুয়াসা ও মেঘ ক্ষণে ক্ষণে আসা যাওয়া করিতেছে, মাস্তুলের মাথায় বাতাস শ্বসিতেছে, ঢেউয়ের পর ঢেউ জাহাজের মুখে আছাড় খাইয়া চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া তুষারকণার মত উড়িতেছে, ঝরাফুলের মত ছড়াইয়া পড়িতেছে। পিছনে কেবল মেঘ আর জল—তার আদি নাই, অন্ত নাই। ঐ মেঘেরও পশ্চাতে আছে জাপানের আকাশ! সুবিপুল জয়ধ্বনি, বৃদ্ধা নারীদের হাতে জপের গুটির শব্দ, নিষ্পাপ শিশুকণ্ঠের রণসঙ্গীত—সমস্তই যেন এখনও ঝোড়ো-হাওয়ার উপর ভর করিয়া কানে আসিয়া পৌঁছিতেছে!

উপদ্বীপের পূর্ব্বে Yenta-ao উপসাগর—চীন-সমুদ্রের এক ক্ষুদ্র শাখা। সেখানেই আমরা নামিব। নিকটে ভাল বন্দর কোথাও নাই, আছে এক তালিয়েন্‌ওয়ান্—তা'ও শত্রুর অধিকারে। অগত্যা দায়ে পড়িয়া বিপদের সম্ভাবনা সত্ত্বেও এইখানেই আমাদের নামিতে হইবে। এখানে সমুদ্র বা তার স্রোত, কিছুর উপরই বিশ্বাস নাই—সামান্য একটু ঝড় উঠিলে নামা ত দূরের কথা, নঙ্গর করিয়া থাকাও কঠিন। তা ছাড়া এখানকার জল অগভীর, বড় জাহাজ মাত্রেই তীরভূমি হইতে ক্রোশাধিক পথ দূরে নঙ্গর করে। বাতাস জোরে বহিলে জাহাজ ভাসিয়া কয়েক ক্রোশ তফাতে সরিয়া যাইতে পারে। এরূপ অবস্থায় অবতরণের তদ্বির যাঁরা করিবেন তাঁদের ক্লেশ ও উদ্বেগ সহজেই অনুমেয়।

পাখীর মা শাবককে যেমন করিয়া আগলায় আমাদের রণপোতগুলিও তেমনি নিকটে ও দূরে সতর্ক পাহারা দিতেছে, পাছে নামার সময় অতর্কিতে শত্রু আক্রমণ করে। বিপদ আসিল কিন্তু অন্যরূপে। সকালে যে বাতাস বহিতে সুরু করিয়াছিল, ক্রমেই তার বেগ বৃদ্ধি হইতে লাগিল। বীচিবিক্ষুব্ধ অশান্ত সাগর পাহাড়প্রমাণ হইয়া উঠিল—তার উপর সৈন্যবাহী জাহাজ ও 'সামপান'* উড়ন্ত পাতার মত দুলিতে লাগিল। বাতাসে বিপর্য্যস্ত ভাড়াটে চীনা নৌকার মাস্তুলগুলা অরণ্যের বৃক্ষরাজির মত—মনে হয় যেন হাকাতা উপসাগরে মোঙ্গল-আক্রমণের একখানি প্রকাণ্ড ছবি দেখিতেছি!

এমন ঝড়ে কি নিরাপদে নামা সম্ভব? তীরে পা দিয়াই কি শত্রু সম্মুখীন হইতে হইবে? আমাদের অবস্থা গাড়িতে জোতা ঘোড়ার মত—আশপাশের খবর কিছুই জানি না। কেবল কর্নেলই সমস্ত জানেন—তাঁরই হাতে আমাদের জীবন মরণ, সে যাই হোক, আমরা জানি আপাততঃ সম্মুখে আমাদের দুটি কাজ—তীরে নামা ও হাঁটিয়া চলা।

ক্ষণকাল অপেক্ষার পর বিপদের সম্ভাবনা সত্ত্বেও অবতরণ সুরু হইল—বোধ করি যুদ্ধের যে অবস্থা তাহাতে বিলম্ব সহে না। শত শত নৌকা, 'সাম্‌পান্' ও ষ্টিমার সৈনিক ও নায়কদিগকে বহিবার জন্য জাহাজ ঘিরিয়া

* চীন ও জাপানের ব্যবহৃত ছোট নৌকা—আমাদের পান্‌সির মত।

দিল। এ সব কোথা হইতে কিরূপে আসিল কে জানে? অতিকায় তরঙ্গ পাহাড়ের মত উঁচু হইয়া উঠিতেছে আবার পরক্ষণেই উপত্যকার মত গভীর গহ্বরে নামিয়া আরোহীসমেত নৌকাগুলাকে যেন গ্রাস করিয়া ফেলিতেছে। সময়োচিত গাম্ভীর্য্যের সহিত পতাকা লইয়া কর্নেলের সঙ্গে একই নৌকায় উঠিলাম।

এক এক ষ্টিমারের সঙ্গে অসংখ্য ছোট নৌকা বাঁধা—জপমালার গুটির মত। উঠিয়া পড়িয়া ধাক্কাধাক্কি করিয়া বাঁশি বাজাইয়া নৌকার মালা তীরের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। যথাসময়ে যুদ্ধপতাকা ঝড়জল তুচ্ছ করিয়া নিরাপদে তীরে উত্তীর্ণ হইল। শত্রু-অধিকৃত ভূমিতে পা বাড়াইলাম—একবার···দুইবার। মনে হইল মাত্র কাল যেন পিতৃভূমি ছাড়িয়াছি, আর এখন ইহারই মধ্যে, স্বপ্নে নয়, সত্যসত্যই আকাঙ্ক্ষিত দেশের উপর পদক্ষেপ করিতেছি!

মহামহিম সম্রাটের পতাকা পুনর্ব্বার Liaotung উপদ্বীপের বুকে প্রতিষ্ঠিত করিলাম—এ কি অপূর্ব্ব আনন্দ! ভ্রাতৃরক্তপূত এই ভূমি—এ-মাটির সঙ্গে জাপানের মাটিও যে অচ্ছেদ্য বন্ধনে জড়াইয়া আছে!

ঝড়ের বেগ বাড়িয়াই চলিল—মনে হইল সকলের তীরে পৌছান অসম্ভব, অথচ জাহাজে ফিরিবারও উপায় নাই। একমাত্র উপায়, নৌকা তীরের কাছাকাছি আনিয়া জলে ঝাঁপ দিয়া জলঝড়ের সঙ্গে যুঝিয়া কোনো গতিকে তীরে আসিয়া ওঠা।

কাপ্তেন ৎসুকুদো তাঁর অধীনস্থ ষাটজন আন্দাজ সৈনিক লইয়া একখানি নৌকায় চড়িয়া ছিলেন। ছোট একখানি 'ষ্টিমলঞ্চ' সেই নৌকা টানিয়া তীরাভিমুখে আসিতেছিল। উত্তাল তরঙ্গের মাঝে পড়িয়া নৌকাখানির দুর্দ্দশার একশেষ! উহা বলের মত ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল—মনে হইল সমুদ্র অচিরে উহাকে গ্রাস করিবে! গতিক দেখিয়া নৌকার বাঁধন কাটিয়া দিয়া লঞ্চখানি রণে ভঙ্গ দিল। কথায় বলে, যে অতিকায় 'হো' * দশ হাজার মাইল অবিরাম ছুটিতে সক্ষম, সমুদ্র-তরঙ্গ তার পাখাও না কি ভাঙিয়া দিতে পারে! মনে হইল, 'মাছের পেটে সমাধিলাভ' করা ছাড়া অতি দুঃসাহসিকেরও আর গতি নাই! উদ্ধার অসম্ভব, বিধির বিধান মানিতেই হইবে! মরণের জন্য তারা প্রস্তুত, কিন্তু হাতের কাছে যে-শত্রু তার প্রতি একবার অস্ত্রক্ষেপ করিবার আগেই সমুদ্রের জঞ্জালে পরিণতি···এ যে একেবারে অসহ্য।

কাপ্তেনের মাথার চুল খাড়া হইয়া উঠিল, চোখে রক্তের উচ্ছ্বাস—সৈনিকদিগকে রক্ষা করিবার জন্য তিনি প্রাণপণে যুঝিতে লাগিলেন। কিন্তু হায়! নির্জ্জন প্রান্তরে প্রাচীন পরিত্যক্ত কূপের মধ্যে নিপতিত ব্যক্তির মতই যে তাদের অবস্থা! ডুবিতেছে না, অথচ উঠিতেও পারে না—প্রাণরক্ষার আশায় লতাগুল্ম আঁকড়াইয়া ধরিয়া দেখে বন্য মূষিক তারও মূলোচ্ছেদ করিতে আরম্ভ করিয়াছে!

পরিশেষে মরিয়া হইয়া কাপ্তেন সমুদ্রে ঝাঁপ দিলেন, তারপর তীরের দিকে সাঁতার দিয়া চলিলেন—কিন্তু তাঁর অধীর অদম্য আগ্রহের কাছে নিষ্ঠুর তরঙ্গ হার মানিল না। তারা নির্দ্দয়ভাবে তাঁকে ক্ষণে গ্রাস ক্ষণে উদ্‌গার করিয়া তালগোল পাকাইয়া লোফালুফি করিতে সুরু করিল। তীরে পৌছিবার পূর্ব্বেই শ্রান্তিভারে অবসন্ন হইয়া তিনি জ্ঞান হারাইলেন।

বিধাতা কিন্তু তাঁহাকে পরিত্যাগ করিলেন না। জ্ঞানলাভ করিয়া তিনি দেখিলেন, সমুদ্রতীরে সম্পূর্ণ বিবস্ত্র অবস্থায় পড়িয়া আছেন। নগ্ন দেহ আবৃত করিবার তর্ সহিল না, তিনি তদবস্থায় তীরাবতীর্ণ সৈন্যদলের ছাউনিতে ছুটিয়া গেলেন। তারপর উন্মাদের ভঙ্গীতে ইসারায় ইঙ্গিতে নৌকারোহী অনুচরদের জন্য সাহায্য ভিক্ষা করিতে লাগিলেন! তখন তাঁর অশ্রু শুকাইয়া গেছে—কাঁদিবার শক্তিও নাই। আড়ষ্ট মুখে বাক্‌শক্তি লোপ পাইয়াছে!

শেষ পর্য্যন্ত তাঁর সৈন্যদল মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা পাইয়াছিল।

মনের মাঝে যে-দেশের ছবি আঁকিয়াছিলাম সে কি এই দেশ? দশবৎসর আগে জাপানী হৃদিরক্ত দিয়া এই

* কাল্পনিক পাখী

স্থান কিনিয়াছিল—আজ দেখিয়া ত বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না! ঐ যে রুক্ষ শুষ্ক জনহীন মরুপ্রান্তর, এক পরিত্যক্ত বালুকাবিথার, তরঙ্গায়িত ভূমির অসীম প্রসার! একঘেয়ে নগণ্য পটভূমিকার উপর কেবল যেন গাঢ় লাল আর তরল ধূসরের প্রলেপ! জাপানের যে বিচিত্র ও পরিপূর্ণ রূপ দেখিতে আমরা অভ্যস্ত, তার তুলনায় এ ছবির সর্ব্বত্র একটা অমার্জ্জিত অসম্পূর্ণ অযত্নের ভাব পরিস্ফুট।

অবতরণস্থলে ঘোড়া ও মালগাড়ি লইয়া কাজের প্রত্যাশায় শত শত চীনা জমা হইয়াছে—এও একটা নূতন দৃশ্য বটে! এরা মানুষ না জন্তু? ভুষমণ চেহারা, ফিসফিস করিয়া পরস্পরে কথা কয়, তারপর আগাইয়া চলে। দুষ্ট লোক হিসাবে তারা প্রীতিলাভের অযোগ্য সন্দেহ নাই, কিন্তু এই রুশ-শাসিত রাজ্যের প্রজা হিসাবে তারা নিশ্চয়ই অনুকম্পার যোগ্য।

গোড়ায় গোড়ায় তারা জাপানীকে ভয় করিত, দূরে দাঁড়াইয়া আমাদের লক্ষ্য করিত—নিকটে আসিত না। সম্ভবত রুশেরা তাদের ধনসম্পত্তি লুট করিয়াছে, স্ত্রীকন্যাকে বেইজ্জত করিয়াছে। স্থানীয় লোকেদের প্রতি যাহাতে ন্যায়ানুগত সহৃদয় ব্যবহার করা হয়, দৈনিক কর্ত্তব্য যাহাতে তারা নিরাপদে সম্পাদন করিতে পারে—সেদিকে জাপানী সৈন্যদল বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়াছিল। ফলে, অচিরে তাদের মন আমাদের প্রতি অনুকূল হইয়া উঠিল—সাগ্রহে তারা আমাদিগকে অভ্যর্থনা করিতে লাগিল। তবুও বলিতে হয়, তারা এমন জাতের লোক যারা অর্থলোভে নিজের জীবন পর্য্যন্ত বিপন্ন করিতে পারে, দশহাজার মোহর পকেটে থাকিতেও যারা শূকরের খোঁয়াড়ে বাস করে!

"আতা, আতা! য়ো, য়ো!"—সর্ব্বদা এই অদ্ভুত বুলি শুনিতে পাই—চীনারা এই বলিয়া গরু ঘোড়া চালনা করে। গৃহপালিত পশু পরিচালনায় তারা আমাদের চেয়ে ঢের বেশি নিপুণ। জীবজন্তু তাদের এমন আজ্ঞাবহ; দেখিয়া অবাক হই। ইসারার শব্দে তারা বামে বা দক্ষিণে যায়—চাবুকের ব্যবহার আদৌ নাই, অথচ তারা চলে চালকের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মতই সহজে। এই সব চীনা ও তাদের পালিত জীবদের মধ্যেকার সম্বন্ধ সুশিক্ষিত সৈন্যদলের সঙ্গে তাদের নায়কের সম্বন্ধের মত। যুদ্ধে পারদর্শিতা ও নিয়ম মানিয়া চলার মূলে বেত বা ধমকের ভয় নাই—আছে শ্রদ্ধা, প্রীতি ও বাধ্যতা।

অনেক হাঙ্গামার পর কয়েকটি দল তীরে নামিল। বাদবাকির অবতরণ ঝড়ের উপদ্রবে স্থগিত রাখিতে হইল। কর্নেল, দোভাষী ও রক্ষীর সঙ্গে রাত্রি-আবাস অভিমুখে যাত্রা করিলাম। ম্যাপ ও কম্পাস লইয়া আমরা যখন ব্যস্ত, দোভাষী তখন প্রশ্নের পর প্রশ্নে চীনাদের ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল। চীনা-জাপানী বাক্যালাপের বহিখানা বার করিয়া ভাঙা-ভাঙা ভাষায় জিজ্ঞাসা করিলাম, "রুশসৈন্য—তারা কি আসিয়াছে?" জবাব পাইলাম, "পোর্ট আর্থারে তারা পালাইয়াছে।" অবিলম্বে শত্রুসম্মুখীন হইতে না পারিয়া আমরা নিরাশ হইলাম।

বালুকাময় সমতলের উপর দিয়া প্রায় নয় ক্রোশ পথ হাটিয়া সন্ধ্যার সময় বৃষ্টি ও বাতাসের মধ্যে 'উইলো'-ঢাকা গ্রামে গিয়া পৌঁছিলাম। অজানা পাখীর দল তখন দ্রুতগতি নীড়ে ফিরিতেছে।

বোকাটে বুড়ো আর নোংরা ছোঁড়ার দল পিঁপড়ের মত চারিদিকে জড়ো হইয়া আমাদিগকে লক্ষ্য করিতে লাগিল। তাদের কৌতূহলের সীমা নাই।

বুড়োদের মুখে লম্বা লম্বা ধূমপানের নল—দেখিয়া মনে হয়, দেশে যে বিষম বিপদের সূচনা হইয়াছে, সে-সম্বন্ধে তারা সম্পূর্ণ উদাসীন অথবা অচেতন। যেমন সব বাড়ি তেমনি তাদের বাসিন্দা—সে যে কি নোংরা, ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। নবাগত আমরা উৎকট দুর্গন্ধে অস্থির হইয়া মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইলাম।

নামেহ ছাউন—বাড়ির আলসার তলে আশ্রয় লইয়াছি। এখানেও ছোট বড় চীনার ভিড়, তাদের গায়ে রসুনের গন্ধ ভুরভুর করিতেছে। ক্ষুধায় আমরা কাতর, তবুও গরম গরম ভাতের নাড়ু পেটের মধ্যে গিয়াই সেই দুর্গন্ধে আবার বাহির হইয়া আসিতে চায়।

Lioatung-এ প্রথম রাত্রি এইভাবে কাটিল। তৃণ-শয্যায় আধখোলা তাঁবুর তলে শীত ও বৃষ্টির উৎপাত

অগ্রাহ্য করিয়া অনেকে গভীর ঘুমে মগ্ন হইল। কেহ কেহ সারা রাত খড়ের ধোঁয়াটে আগুনের ধারে বিনিদ্র বসিয়া বসিয়া চিন্তার অতলে ডুবিয়া গেল। পাথরের দেওয়ালে খাবারের কৌটাগুলি ঝুলিতেছে, সেদিকে দৃষ্টি নাই—বিদায়কালে-পাওয়া খাবার তারা আনমনে চিবাইতেছে।

ভোর হয়-হয়, এমন সময় পশ্চিমাকাশ বিদীর্ণ করিয়া সহসা বিদ্যুৎ ঝলসিয়া উঠিল, মুহুর্মুহুঃ বজ্রধ্বনি হইতে লাগিল। ব্যোমচারী বিদ্যুৎ নয়—অগ্নিশিখা ; বজ্রনিনাদ নয়—কামানগর্জ্জন। প্রবল বাতাস উঠিয়া দৃশ্যটাকে আরও ভয়াবহ করিয়া তুলিল—দেখিতে দেখিতে আকাশে যেন রক্তের ছোপ ধরিয়া গেল!

নান্‌শানের যুদ্ধ সুরু হইয়াছে।

ক্রমশঃ

সত্য

স্বর্গীয়া উমা দেবী

১

সত্য বটে একদিন ভুলিবে আমায়
রাখিবে না ধ'রে মোরে তব ভাবনায়,
সেই স্নিগ্ধ আঁখিমাঝে সে নির্ব্বাক ভাষা,
বক্ষে মোর জাগাতো যা' আকুল পিপাসা,—
একদিন হবে দূর ; স্বপনের প্রায়
কালস্রোতে এ বেদনা মুছে যাবে হায়!
মনে পড়ে, বলেছিলে কবে একদিন—
"ভালবাসা নহে শান্তি বিরাম বিহীন,
অতৃপ্ত কামনা শুধু বেড়ে চলে যায়
অনন্ত বেদনা শুধু এ প্রেম আশায়।"
শুনি সেই দৃপ্তকণ্ঠে আশাশূন্য বাণী
সেদিন হাসিয়াছিনু। আজ আমি জানি
সেই শুধু সত্য হ'ল ; তুমি দূরে গেলে
আঁধার জীবনকক্ষে মোরে একা ফেলে ;—
সর্ব্বহারা ভিখারিণী, তবু চিত্তময়
স্মৃতির সম্পদ কেন অমর অক্ষয়?

২

জানি, জানি, একদিন ভুলিব আমিও
সবার অধিক তুমি ছিলে মোর প্রিয়,
ছিলে মোর প্রাণে মনে, নিঃশ্বাসে নিঃশ্বাসে,
একদিন এই স্মৃতি মিলাবে বাতাসে।
তা'র পরে, অন্যমনে, ভাবিব বসিয়া
যেতে যেতে সংসারের এক পথ দিয়া,
একদিন দুইজনে মুখোমুখি এসে,
চেয়েছিনু চোখে চোখে ; ক্ষণকাল হেসে
বলেছিনু মোহমুগ্ধ স্বপ্নভরা কথা ;—
সত্য হোক্, মিথ্যা হোক্, তবু সে বারতা
আকাশে বাতাসে মিশি দোঁহাকার মন
করেছিল ক্ষণতরে ব্যাকুল উন্মন!
কি জানি কি ভেবে মনে গেছ তা'র পরে
জীবনের অন্যপথে। সর্ব্ব অগোচরে
বেদনার অশ্রুজল করিয়া মোচন
দূর হ'তে জানায়েছি শেষ সম্ভাষণ ;—
সিক্ত আঁখি শুষ্ক করি, শান্ত করি মন,
একদিন হেসে ইহা করিব স্মরণ॥

যাদবপুর যক্ষ্মা-চিকিৎসালয়

শ্রীসুন্দরীমোহন দাস

যক্ষ্মা পদমর্য্যাদার অপেক্ষা রাখে না। কি রাজ-প্রাসাদে কি পর্ণকুটীরে, কি জরায়, কি যৌবনে, সকল স্থানে, সকল অবস্থায় ইহার প্রাদুর্ভাব। তবে দরিদ্রের কুটীরেই ইহার অধিক গতিবিধি, যৌবন ও যুবতীর উপরে ইহার আক্রোশ অতিরিক্ত। পনের হইতে কুড়ি বৎসর বয়স্ক যুবকের ঐ রোগে মৃত্যু হাজারে ১'১ ; ঐ বয়স্কা যুবতীদের মৃত্যু ৬.৬, অর্থাৎ ৬ গুণ। অন্য বয়সে ঐ রোগে যত মৃত্যু হয়, কুড়ি হইতে চল্লিশ বৎসরের ভিতর মৃত্যু ইহার দ্বিগুণের অধিক। আলোক-বাতাস-হীন গৃহে যাহারা অবরুদ্ধ, তাহাদের মৃত্যু সর্ব্বাপেক্ষা অধিক।

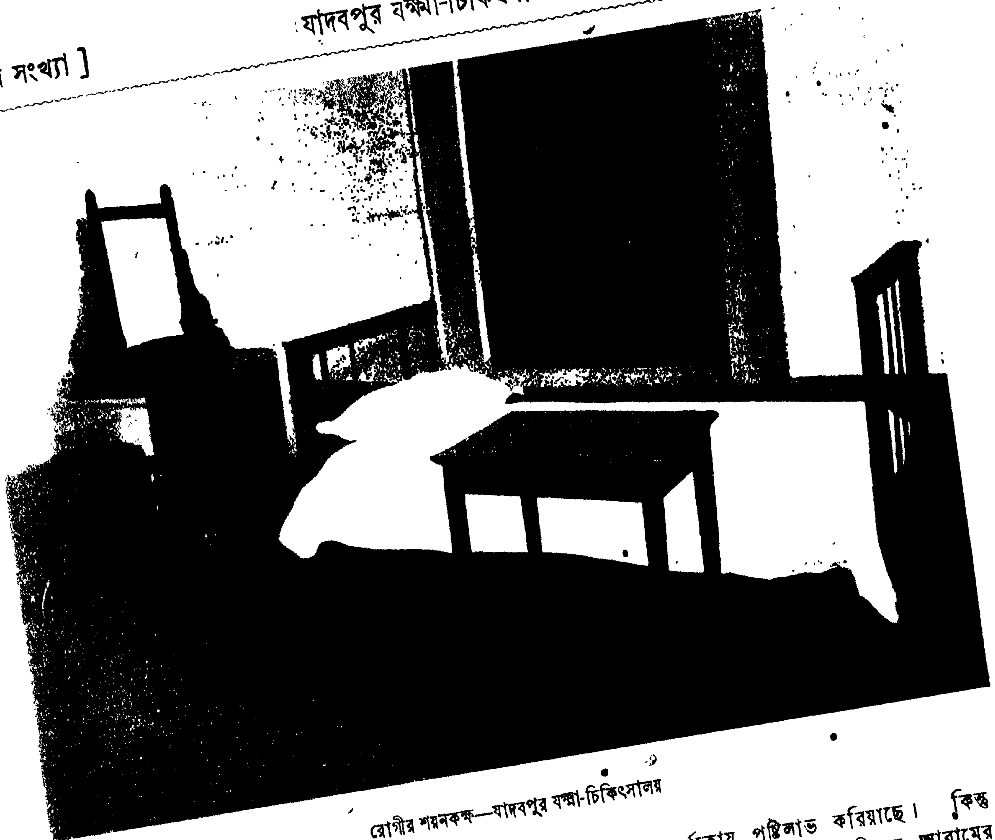
কলিকাতায় এই রোগে প্রতি বৎসর প্রায় **তিন হাজার** লোক মারা যায়, সমুদয় বাংলায় **এক লক্ষ**। মৃত্যুই যে একমাত্র ভয়ের কারণ তাহা নহে। কলিকাতায় **ত্রিশ হাজার** এবং সমস্ত বাংলায় প্রায় **দশ লক্ষ** জীবিত ব্যক্তি এই রোগ ছড়ায়। রোগীর থুথুর ভিতর এই রোগের বীজাণু। ধূলা ও মাছি এই রোগ ছড়ায়। যেখানে সেখানে থুথু ফেলা, রোগীর উচ্ছিষ্ট খাওয়া কিম্বা ব্যবহৃত পাত্রে খাওয়া, বহুলোক লইয়া এক আলো-বাতাসহীন ঘরে শয়ন, ইত্যাদি নানা কারণে রোগ ব্যাপ্ত হয়।

রোগব্যাপ্তি নিবারণের প্রধান উপায় রোগীকে স্বতন্ত্র রাখা কিম্বা হাসপাতালে পাঠাইয়া দেওয়া। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই প্রকার রোগীর প্রকৃত চিকিৎসালয় কলিকাতার নিকটে এক যাদবপুর ব্যতীত আর কোথাও নাই। প্রত্যেক রোগীর বিশুদ্ধ বায়ু সূর্য্যালোক সম্ভোগের বিশেষ ব্যবস্থা চাই।

আনন্দের বিষয়, ডাক্তার শ্রীযুক্ত কুমুদশঙ্কর রায় এবং বিধানচন্দ্র রায় প্রভৃতির নিঃস্বার্থ যত্নে যাদবপুরে একটি আদর্শ যক্ষ্মা চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

ব্যক্তিবিশেষের মৃত্যুশয্যায় এই প্রতিষ্ঠানের জন্ম। সুকিয়া ষ্ট্রীটের একটি প্রকোষ্ঠে বিংশবর্ষীয় একজন যুবক শয্যাশায়ী হইয়া মৃত্যুর দিন গণনা করিতেছিলেন। ভ্রাতা প্রভৃতি আত্মীয়স্বজন থাকিতেও জগতে তিনি একাকী। সেবা করিতেছে অপরে। অর্থের অভাব নাই। তাঁহার পিতা ৺চন্দ্রমোহন ঘোষ কলিকাতার একজন প্রসিদ্ধ ডাক্তার ছিলেন। পিতার সাধ ছিল পুত্র তাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণ করে। বিলাতে চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে গিয়া প্রভাসচন্দ্র ক্ষয়রোগে আক্রান্ত হইয়া দেশে ফিরিয়া আসেন। তিনি যখন আপনাকে সকল চিকিৎসার অতীত মনে করিলেন, তখন তাঁহার চিকিৎসক শ্রীযুক্ত ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়ের নিকট কোন হাসপাতালে দানের ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। বিধানবাবু অনুরোধ করিলেন ঐ সাংঘাতিক যক্ষ্মারোগ চিকিৎসার্থ একটি হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করিতে। যক্ষ্মাসম্বন্ধীয় চিকিৎসা ও গবেষণার জন্য ১,৭৪,৩৭৫৲ টাকার বিষয় দান করিয়া সেই উদারপ্রাণ যুবক জীবনের শেষ মুহূর্ত্তে শান্তিলাভ করিলেন। কিন্তু মৃত্যুও আত্মীয়-স্বজনের বিষয়কলহজনিত মনোমালিন্য দূর করিল না। তাঁহার সৎকারের জন্য কেহ আসিল না। দেশের কল্যাণের জন্য প্রায় দুইলক্ষ টাকা যে অকাতরে বিতরণ করিয়া বংশের মুখ উজ্জ্বল করিল, রজনীর অন্ধকারে ঘোর দুর্য্যোগে সেই ব্যক্তির মৃতদেহ ডাক্তার বিধানচন্দ্রের যানের উপর স্থাপিত করিয়া শ্মশান-ঘাটে লইয়া যাওয়া হইল। অবিরল বৃষ্টিধারা। মনে হইল দাতার উপরে বিধাতা কৃপাবারি বর্ষণ করিলেন।

প্রভাসচন্দ্রের আত্মা সোল্লাসে দেখিতেছেন, তাঁহারই দান উপলক্ষ্য করিয়া আট বৎসর পূর্ব্বে যাদবপুরে চারিজন



রোগীর শয়নকক্ষ—যাদবপুর যক্ষ্মা-চিকিৎসালয়

রোগীর জন্য যে ক্ষুদ্র কুটীর হাসপাতাল প্রতিষ্ঠিত হইয়া- ছিল, আজ সেইখানে পঞ্চাশ জন রোগীর জন্য একটি সুন্দর আদর্শ যক্ষ্মা চিকিৎসালয় নির্ম্মিত হইয়াছে। অক্লান্তকর্ম্মী ডাক্তার কুমুদশঙ্কর রায়ের সৌজন্যে আমি উক্ত চিকিৎসা- লয় ও সন্নিহিত পুষ্পকাননশোভিত বিস্তৃত প্রাঙ্গণ দেখিয়া আসিয়াছি। মুক্তবায়ুসেবিত সূর্য্যকিরণ উদ্ভাসিত প্রকোষ্ঠে রোগীরা আনন্দে সময় অতিবাহিত করিতেছে। সুচিকিৎসার সমুদয় উপকরণ সুসজ্জিত। প্রত্যেক রোগীর পকেটে একটি ছোট শোধক লোশনপূর্ণ নিষ্ঠীবন পাত্র আছে। রোগবীজপূর্ণ কফ আর কোথাও ফেলিতে হয় না।

মৃত্যু এবং নৈরাশ্যের ঘন অন্ধকারের ছায়া যাঁহার অন্তরে পতিত হয়, চিত্তপ্রফুল্লকর স্থান ও আয়োজন অনেক পরিমাণে সেই অন্ধকার দূর করে এবং সেই রোগীকে আরোগ্যের পথে অগ্রসর করে। যাদবপুরে সেই সমুদয় আয়োজন রহিয়াছে।

আনন্দের বিষয়, বঙ্গীয় সরকার, কলিকাতা কর্পোরেশন, মিঃ পি-সি, কর, ময়ূরভঞ্জের মহারাজা প্রভৃতির দানে চিকিৎসালয়ের অর্থকোষ পুষ্টিলাভ করিয়াছে। কিন্তু অর্থের আরও বিশেষ প্রয়োজন। রোগীদের আরামের জন্য আরও একশত বিঘা জমির প্রয়োজন। এতদ্ভিন্ন বাৎসরিক ব্যয় প্রায় ১০,০০০৲ এবং গৃহনির্ম্মাণ বাবদ ঋণ প্রায় এক লক্ষ। আশা করা যায়, সহৃদয় জনসাধারণ চিকিৎসালয়ের পূর্ণবিকাশ সম্বন্ধে কর্ত্তৃপক্ষদিগকে সাহায্য করিবেন।

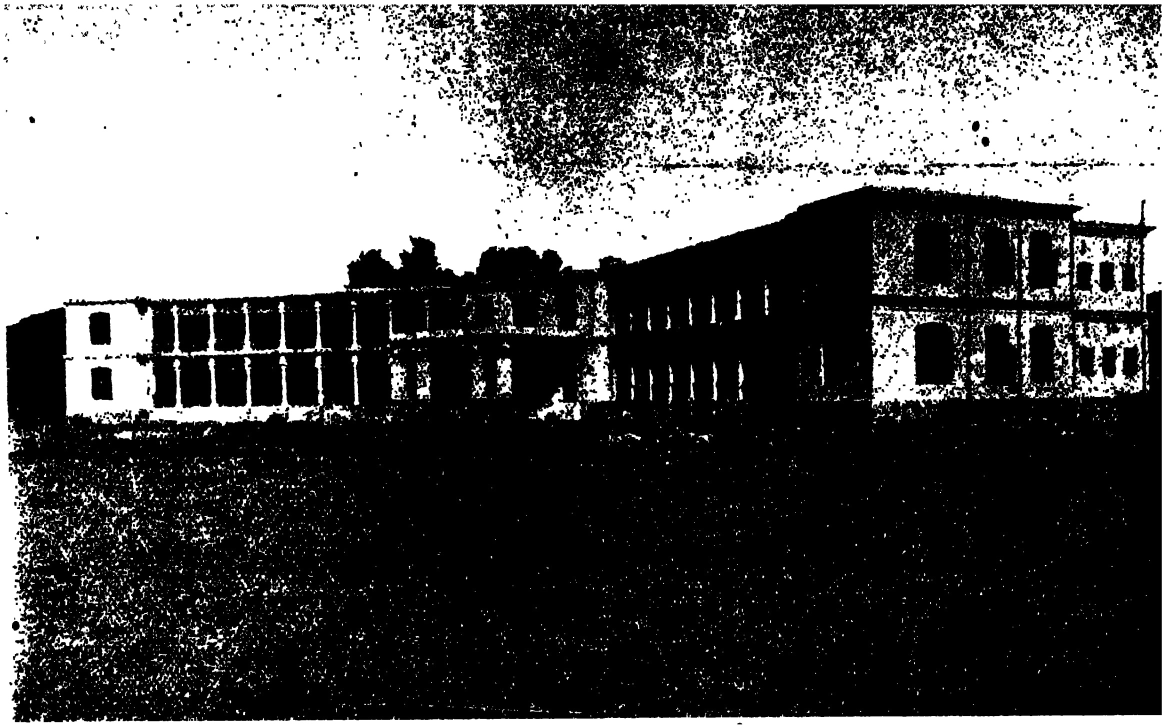
কর্ত্তৃপক্ষদের নাম :—

১। স্যার নীলরতন সরকার—সভাপতি
২ স্যার পি-সি- রায়
৩ স্যার হরিশঙ্কর পাল
৪ মিঃ পি-সি- কর
৫ মিঃ শরৎচন্দ্র বসু
৬ ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়
৭ শ্রীযুক্ত প্রভুদয়াল হিমৎসিংকা
৮ ,, সত্যানন্দ বসু, কোষাধ্যক্ষ
৯। ,, ডাক্তার কুমুদশঙ্কর রায়—সম্পাদক

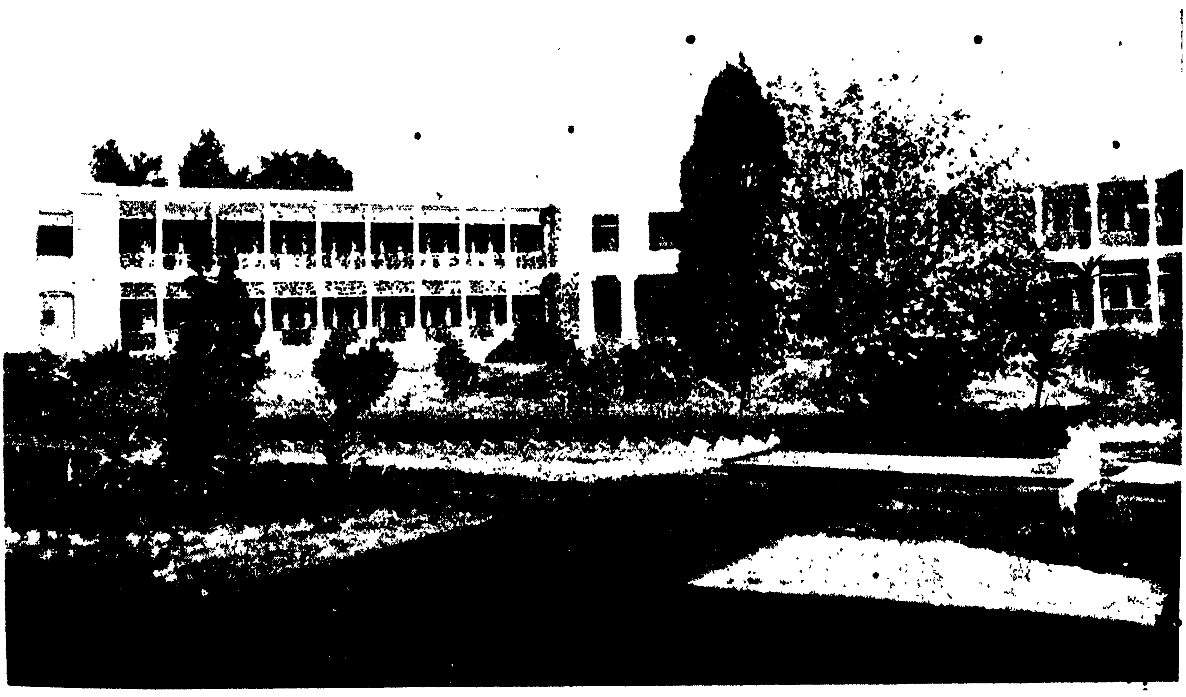


যাদবপুর যক্ষ্মা-চিকিৎসালয়ের ইলেক্ট্রিক জেনারেটর





যাদবপুর যক্ষ্মা-চিকিৎসালয়—বাহিরের দৃশ্য



যাদবপুর যক্ষ্মা-চিকিৎসালয়—ভিতরের দিকের দৃশ্য

বিষে বিষক্ষয়

শ্রীসীতা দেবী

"আঃ, কি জ্বালাতন! এখানে কি একটা জিনিষ ঠিকমত পাবার জো নেই? এরা সব আছে কি করতে?"

রমাপতির ক্রুদ্ধ গর্জ্জনে তখনই ফল ফলিল। বড় শুইবার ঘর হইতে একটি যুবতী একটা শেলাই হাতে বাহির হইয়া আসিল। পাশের ছোট ঘর হইতে একজন বৃদ্ধা খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে বাহির হইয়া আসিয়া বলিলেন, "মিথ্যে না বাছা। সকাল থেকে যে চেঁচামেচি সুরু হবে তা সারাদিন চলতে থাকবে। হাতের জিনিষ হাতের কাছে গোছান পাবার জো কি? সারাদিন আছে নিজের বিবিয়ানা নিয়ে। আমারও পোড়া দশা, পা নিয়ে কি নড়তে পারি? নইলে আমি কি কারও ধার ধারি? দুটো সংসারের কাজ এক হাতে করেছি, ছেলে-পিলেও মানুষ করেছি। সে সব এঁদের হাড়ে হবে?" বলিয়াই আবার তিনি খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে ঘরে ঢুকিয়া গেলেন।

শাশুড়ীর ঘরের দরজার দিকে একবার তাকাইয়া যুবতী বিরক্তিপূর্ণ চাপা-গলায় বলিল, "হয়েছে কি যে সকালেই চেঁচিয়ে বাড়ি মাথায় করছ?"

রমাপতি দাঁত খিঁচাইয়া বলিল, "হয়েছে কি? এতক্ষণে খোঁজ নিতে এলেন। বলি মাজনটা ঠিক ক'রে মুখ ধোবার জায়গায় রাখতে তোমায় কতবার বলেছি? এটুকু উপকার আর তোমার দ্বারা হবার নয়। একটা কথা শুনলে কি তোমার মাথা কাটা যায়?"

তরুবালারও মেজাজ চড়িয়া উঠিল। সে বলিল, "মাজন ত তৈরি করা রয়েইছে, দেরাজের উপর। একটু নিয়ে এলেই ত হ'ত, না-হয় চাইতেও ত পারতে? সবার আগে চীৎকার জুড়তে পারলে আর চাও না কিছু।"

রমাপতি আরও চটিয়া গেল। বলিল, "সকল জ্যাঠা সহ্য হয়, মেয়ে-জ্যাঠা সহ্য হয় না। আমাকে এলেন উপদেশ দিতে। গায়ের রক্ত জল ক'রে টাকা নিয়ে আসি, বসে বসে সব পায়ের উপর পা দিয়ে খান, আর একটা কথা বললে দশ গজী লেকচার ঝাড়েন। মেয়েমানুষকে বাড়ানো কিছু না, একেবারে মাথায় চ'ড়ে বসে।"

তরু কি যেন বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু শাশুড়ী আবার রণক্ষেত্রে আবির্ভূতা হইতেছেন দেখিয়া সে সরিয়া গেল। স্বামীর সঙ্গে অন্ততঃ মুখোমুখি জবাব দেওয়া যায়, কিন্তু শাশুড়ী মুখ ছুটাইলে নিতান্ত চক্ষুলজ্জার খাতিরেই তাহাকে চুপ করিয়া যাইতে হয়। বয়স যদিও তাহার কুড়ি বৎসর, তবু বিবাহ হইয়াছে মাত্র তিন বৎসর, কাজেই এখনও সে লজ্জাসঙ্কোচ একেবারে ত্যাগ করে নাই। শাশুড়ী ত নিত্য তাহার 'শহুরে বিবিয়ানা', 'জ্যাঠামি' 'কুড়েমি'র ব্যাখ্যায় ব্যস্ত থাকেন, সেগুলি শুনিতে তরুর কিছুমাত্র শ্রুতিমধুর লাগে না। সুতরাং বৃদ্ধাকে মুখ ছুটাইবার সুযোগ না দিতেই সে যথাসাধ্য চেষ্টা করে।

ঘরের ভিতর একটি দশ-বারো বৎসরের ছেলে বই খাতা লইয়া পড়া করিতেছিল, আর এক কোণে বসিয়া একটি বছর-নয়েকের মেয়ে উল এবং কাঁটা লইয়া মোজা বুনিবার বৃথা চেষ্টা করিতেছিল। তরু ভিতরে ঢুকিতেই ছেলেটি বলিল "মামী, আমায় এ অঙ্কটা আজ ব'লে দিতেই হবে, নইলে স্যর আমাকে বেতপেটা করবে।"

মেয়েটিও তৎক্ষণাৎ সুর ধরিল, "আমায় ত শেলাইটা দেখিয়ে দিলে না, মাষ্টারণী মেম আমাকে টুলে দাঁড় করিয়ে দেবে।"

নিজের হাতের শেলাইটা একটা দেরাজের ভিতর রাখিয়া দিয়া তরু বলিল, "তোর মামাবাবুকে বল্‌গে যা প্রাইভেট টিউটার রাখতে, আমি দুবেলা তোদের পড়াতে পারব না। আমি যাচ্ছি রান্নাঘরে, কেষ্টো এখনও বাজার থেকে আসেনি, ডাল পুড়ে গেলে এখনই তোদের দিদিমা আমার পিণ্ডি চট্‌কাতে বসবে।"

রমাপতি তোয়ালে দিয়া মুখ হাত মুছিতে মুছিতে ঘরে ঢুকিয়া বলিল, "কই, চা কই? না, সেটাও আমি নিজে ক'রে খাব?"

তরু বলিল, "আন্‌চি গো আন্‌চি। আঁতুড় ঘরে তোমার মুখে মধু দিতে কি ধাই মাগী ভুলে গিয়েছিল?" বলিয়াই সে ঊর্দ্ধশ্বাসে নীচে পলায়ন করিল, রমাপতিকে উত্তর দিবার আর সময়ই দিল না।

রমাপতি বসিয়া বসিয়া রাগে ফুলিতে লাগিল। তরুকে লইয়া তাহার হইয়াছে মহা জ্বালা। বহুদিন পর্য্যন্ত সে বিবাহ করে নাই। মা অনেক কান্নাকাটি করিয়াও ছেলের মত করাইতে পারেন নাই। বিয়ের কথা তুলিলেই সে বলিত, "এই ত মাইনে, নগদ একশোটি টাকা। এর ভিতর তুমি আছ, আমি আছি, রাধু রয়েছে, কালু রয়েছে। আবার একটা বউ যে নিয়ে আসব, সে খাবে কি?"

মা বলিতেন, "ওমা, তা একশো টাকা আয় যাদের, তারা কি আর কোনো জন্মে বিয়ে করে না? তোর বাপের ত যাট টাকা আয় ছিল, তাই ব'লে কি সংসার করেনি?"

ছেলে বলিত, "তখন সস্তাগণ্ডার দিন ছিল, তার উপর তোমরা ত থাক্‌তে পাড়াগাঁয়ে। কলকাতার শহরে অত কমে চলে কখনও? বাড়িভাড়া দিতেই ত মাইনের অর্দ্ধেক চলে যায়।"

দিন কাটিতে লাগিল। রমাপতির বয়স বাড়িয়া চলিল, মায়ের আফ্‌শোষও বাড়িয়া চলিল। সঙ্গে সঙ্গে রমাপতির মাহিনাটাও বাড়িতেছিল তাই রক্ষা। অবশেষে তাহার যখন চৌত্রিশ বৎসর বয়স, তখন আর মায়ের সঙ্গে পারিয়া না উঠিয়া সে সপ্তদশী তরুবালার পাণিগ্রহণ করিয়া বসিল। অবশ্য তাহার নিজের প্রাণেও কিছু সখ ছিল না বলিলে ঠিক সত্য কথা বলা হয় না।

তরু এক পাড়ারই মেয়ে। গলি দিয়া গিয়া চার পাঁচ-খানা বাড়ি পরে তাহাদের বাড়ি। রমাপতির মা মধ্যে মধ্যে তরুদের বাড়ি যাইতেন। মেয়েটিকে তাঁহার তখনকার নজরে ভালই লাগিত। এমন কিছু আহা মরি সুন্দরী নয়, তবে চেহারায় বেশ একটা শ্রী আছে। স্কুলে পড়ে, সেলাই জানে, গান জানে, আবার ঘরের কাজও জানে। আর না জানিলেই বা কি? রসি-বামনীর হাতে পড়িলে মাটির ঢেলা কাজ করিতে বসিয়া যায়, তা তরু ত জলজ্যান্ত মানুষ। রাসমণি নিজে ক্রমেই অক্ষম হইয়া পড়িতেছিলেন, এখন একটি বয়স্থা বধূর বিশেষ দরকার। তাঁহাকেই কে দেখে তাহার ঠিক নাই, তা তিনি আবার সংসার দেখিবেন, মা-মরা নাতি-নাত্‌নীকে মানুষ করিবেন? জামাইটাও আবার তেমনি কশাই। না-হয় স্ত্রীই মরিয়াছে, তাই বলিয়া ছেলেমেয়েও কি পর হইয়া গিয়াছে? একবার বাছাদের দেখিতে সুদ্ধ আসে না। এমন ছোটলোকের ঘরেও তিনি মেয়ের বিবাহ দিয়াছিলেন।

রমাপতিও তরুবালাকে দেখিয়াছিল। বেশ মেয়েটি। স্কুলের লম্বা গাড়ীটা যখন আসিয়া দাঁড়াইত, সহিস্ যখন হাঁক দিত, "গাড়ী আয়া বাবা," তখন তাহার অরসিক মনটাও যেন কেমন আন্‌চান্ করিয়া উঠিত, চোখ দুইটা তাহার অজ্ঞাতসারেই গাড়ীর দরজায় গিয়া ধর্ণা দিত। এই মেয়েটি হইলে কিন্তু বেশ হয়। কিন্তু উহারা কি রমাপতিকে কন্যা সম্প্রদান করিতে রাজী হইবে? উহাদের নিশ্চয়ই উচ্চাকাঙ্ক্ষা আছে, এত করিয়া মেয়েকে গানবাজনা, লেখাপড়া শিখাইতেছে। রমাপতি মাত্র আই-এ পাস, না হয় পিতৃপুণ্যফলে এখন সওদাগরি আপিসে দুশো টাকা মাহিনার কাজই করিতেছে।

কিন্তু কপাল তাহার অনেক দিকেই ভাল ছিল। তরুবালার মা বাবার উচ্চাকাঙ্ক্ষা হয়ত ছিল, কিন্তু পয়সা ছিল না। কাজেই রাসমণি যখন যাচিয়া প্রস্তাব করিলেন, পণের টাকা-সুদ্ধ লইবেন না কথা দিলেন, তখন তাঁহারা দু-একদিন ইতস্ততঃ করিয়া রাজী হইয়াই গেলেন। মা বলিলেন, "সাধা সম্বন্ধ কখনও ফেরাতে নেই, তাতে মঙ্গল হয় না।"

বাপ বলিলেন, "ছোক্‌রা পাস বেশী করেনি বটে, কিন্তু বুদ্ধিসুদ্ধি বেশ আছে, দেখ্‌ছ না এরই মধ্যে দুশো টাকা মাইনে, কালে আরও কত হবে। আমরা কতই আর ভাল পেতাম, টাকার জোর না থাক্‌লে সে

সব আশা করা বৃথা।" তরুর দাদা নীহার বলিল, "খুব ত বিয়ে দিতে চলেছ, তরুর মত নিয়েছ ?"

মা চোখ কপালে তুলিয়া বলিলেন, "ঐ এক ফোঁটা মেয়েরও মত নিতে হবে ? সে আমাদের চেয়ে বেশী বোঝে না-কি ?"

অতএব তরুর বিবাহ হইয়া গেল। সে নিজে খানিকটা নিরাশ হইল বটে, তবে মর্ম্মান্তিক বেদনা কিছু পাইল না। যেমনই হউক, ইহাকে লইয়াই তাহার চিরদিন ঘর করিতে হইবে, অতএব স্বামীকে ভালবাসিতে সে যথাসম্ভব চেষ্টাই করিতে লাগিল।

প্রথম প্রথম দিনগুলি মন্দ কাটিল না। শাশুড়ীও মেজাজের বিশেষ পরিচয় দিলেন না, স্বামীও আদরযত্ন খুবই করিলেন, সুতরাং তরু নিজেকে সুখী বলিয়াই ধরিয়া লইল। রমাপতির মনে মনে একটু ভয় ছিল যে, তরু হয়ত তাহাকে নিজের উপযুক্ত স্বামী মনে করে না, সেইজন্য অতিরিক্ত আদরেই সে সকল ত্রুটি সংশোধন করিতে চেষ্টা করিত।

কিন্তু সময়ে সব জিনিষের মোহই কাটিয়া যায়। রাসমণি ক্রমে নিজমূর্ত্তি প্রকাশ করিতে লাগিলেন। চিরজন্ম বউকে পটের বিবির মত সাজাইয়া বসাইয়া রাখিলেই ত চলিবে না। তাহাকে ঘরকন্নার কাজ শিখিতে হইবে, সংসার বুঝিয়া লইতে হইবে। অতএব তিনি মহোৎসাহে বধূকে শিক্ষা দিতে লাগিয়া গেলেন।

তরুরও প্রাণ অস্থির হইয়া উঠিল। সারাদিন কাজ আর শাশুড়ীর খোঁটা। না পায় একটু বই পড়িতে, না পায় একফোঁড় শেলাই করিতে। গানবাজনার কথা ত এ বাড়িতে তুলিবারই জো নাই। শাশুড়ী হুকুম জারি করিয়া রাখিয়াছেন, "এ বাড়িতে ও সব হবে-টবে না বাপু, ভদ্দর ঘরের বউ-ঝি সারাক্ষণ বাঈজীর মত গান গাইবে কি ? ও সব যা হবার তা হয়ে গেছে, এখন সাম্‌লে চল্‌তে হবে।"

স্বামী যদি আগের মতই থাকিতেন তাহা হইলে তরু কোনোমতে সহিয়া যাইত, তাহার জ্বালা জুড়াইবার একটা স্থান থাকিত। কিন্তু রমাপতিরও পরিবর্ত্তন আরম্ভ হইয়াছিল। ক্রমে ক্রমে সে নিজেকে বুঝাইয়া লইয়াছিল যে, তরু সম্বন্ধে তাহার সঙ্কোচটা মিথ্যা। রমাপতি কোনো-অংশেই তাহার অনুপযুক্ত নয়। হিন্দুর মেয়ে স্বামীকে দেবতাজ্ঞানে পূজা করিবে, সে যেমন স্বামীই হোক্। যে-রকম স্বামী সব আশেপাশে দেখা যায়, তাহার তুলনায় রমাপতি ত আকাশের চাঁদ। স্ত্রীকে মারেও না, ধরেও না। কোনোরকম কু-অভ্যাসও তাহার নাই। তাই বলিয়া চিরকাল স্ত্রীকে মাথায় করিয়া নাচা যায় না। এরই মধ্যে আপিসের সকলে স্ত্রৈণ বলিয়া তাহাকে ক্ষেপায়। প্রথম প্রথম সকলেই একটু অমন করে, কিন্তু কালে প্রকৃতিস্থ হইয়া যায়। তরুকে আর বেশী প্রশ্রয় দিলে, ইহার পর আর তাহাকে বাগ মানান যাইবে না। আজকালকার মেয়ে, স্বভাবতই উদ্ধত এবং স্বাধীন প্রকৃতির, তাহাকে একটু শক্ত হাতে চালাইতে হইবে।

সুতরাং রমাপতিও তরুর স্বভাব সংশোধনের চেষ্টায় লাগিয়া গেল। হিন্দু স্ত্রীর কর্ত্তব্য সে দুই কান ভরিয়া শুনিতে লাগিল, কিন্তু আশানুরূপ ফল ফলিল না। রমাপতির কেবলই মনে হইতে লাগিল তরু যেন সমস্ত জিনিষটাকে ঠাট্টা বলিয়া মনে করিতেছে। ইহাতে তাহার রাগে সারা শরীর জ্বালা করিত বটে, কিন্তু একেবারে বাড়াবাড়ি করিতে সে ভরসা করিত না। মনে মনে তরুকে একটু ভয় সে করিতই, হয়ত তরু তাহাকে সারাক্ষণ বিচার করিতেছে, এবং অতি নিকৃষ্ট শ্রেণীর জীব মনে করিতেছে। তরুর প্রতি টানও খানিকটা তাহার ছিল, সুতরাং হাঁকডাক করা ভিন্ন আর কিছু করা তাহার দ্বারা ঘটিয়াও উঠিত না।

মোটের উপর সকলের দিনই অতি অশান্তিতে কাটিতেছিল, রাধু এবং কালুর ছাড়া। মামী আসিবার আগে তাহাদের বড় অসুবিধা ছিল। মামাবাবু ত সারাদিন বাহিরেই কাটাইয়া দিতেন, আর দিদিমা বুড়ীকে তাহারা কোনো কথা বুঝাইতেই পারিত না। কালু ত বায়োস্কোপ যাইবার জন্য পয়সা চাহিয়া চাহিয়া হয়রান হইয়া যাইত, একদিনও পাইত না। বায়োস্কোপ যে কি জিনিষ তাহা বুড়ী বুঝিলে ত ? একটু পড়া বলিয়া দিবারও কেহ ছিল না, মামাবাবুকে জিজ্ঞাসা করিবার জো নাই,

তাহা হইলেই বুড়ী তাড়া করিয়া আসিবে, "সর্, সর্, সারাটা দিন তেতেপুড়ে এল, এখন তোরা আর তার পেছনে লাগিস্‌নে। কেন ইস্কুলে যাস্ কি করতে, মাষ্টারে পড়া বলে দেয় না?"

ইস্কুলের মাষ্টারের বেত এড়াইবার জন্যই যে ঘরে পড়া বলিয়া দেওয়া দরকার, তাহা বুড়ীকে কে বুঝাইবে?

রাধুরও শেলাই দেখাইবার, পড়া বলিয়া দিবার কেহ ছিল না। তাহার চেয়েও মুস্কিল ছিল এই যে, দিদিমা আধুনিক সাজ-সজ্জা সম্বন্ধে একেবারে অজ্ঞ। তাহাকে যেভাবে স্কুলে যাইতে হইত, তাহাতে রাধু বেচারীর মান থাকিত না। কিন্তু দিদিমাকে বোঝান তাহার সাধ্য ছিল না। বেশী কিছু বলিলে, চড়চাপড় ত খাইতে হইতই, গালাগালিরও শেষ থাকিত না। "বিবিয়ানী শিখেছেন, নিত্যি নূতন সাজ পোষাক চাই। নবাবের বেটি, বাপ ত ঝাঁটা মেরেও জিগ্‌গেষ করে না," ইত্যাদি শ্রুতিমধুর বাক্যে রাধু বেচারীর দুই কান বোঝাই হইয়া যাইত। অগত্যা চোখের জল মুছিতে মুছিতে, ময়লা সেমিজ এবং ছেঁড়া ডুরে শাড়ী পরিয়াই তাহাকে স্কুলে যাইতে হইত।

মামী আসার পর হইতে তাহারা বাঁচিয়া গিয়াছে। কালু এখন হরদম বায়োস্কোপ দেখে, মাঝে মাঝে মামা মামীর সঙ্গে যায়, একলা যাইবার পয়সাও মামীর কাছে বেশ পাওয়া যায়। পড়া বলিয়া দিবার লোকেরও অভাব নাই। মামী নিজে ম্যাট্রিক ক্লাস পর্য্যন্ত পড়িয়াছে, কালুর ফিফ্‌থ ক্লাসের পড়া সে দিব্য বলিয়া দেয়। এবার বাৎসরিক পরীক্ষায় কালু প্রাইজ-সুদ্ধ পাইয়াছে, রাধুও বাঁচিয়াছে। তাহার চক্ষুশূল, ছেঁড়া শাড়ী এবং ময়লা সেমিজ দুটা দূর হইয়াছে, সে এখন রকম-বেরকমের ফ্রক, জুতা মোজা পরিয়া স্কুলে যায়। মামী বলাতে মামা সব কিনিয়া দিয়াছে, ফ্রক ত প্রায় সবগুলাই মামী সুন্দর কাজ করিয়া শেলাই করিয়া দিয়াছে। দিদিমা প্রথম প্রথম একটু-আধটু বকাবকি করিতেন, এখন আর কিছুই বলেন না।

তরুর কিন্তু প্রাণ অস্থির হইয়া উঠিতেছিল। প্রায়ই বসিয়া সে প্রতিকারের উপায় ভাবিত, কিন্তু কিছুই ঠিক করিয়া উঠিতে পারিত না। বাপের ঘাড়ি ত গায়ের উপর, সুতরাং সেখানে যাইবার জন্য আবদার করিয়াও কোনো লাভ নাই। আত্মীয়-স্বজন কেহই এমন বিদেশবাসী নাই, যাহার কাছে পলাইয়া যাওয়া যায়। আর ইঁহারা যাইতেই বা দিবেন কেন? তরুর বড় দুঃখ হইত, লেখাপড়া সে আরও খানিকদূর করিল না কেন? সে যতটা শিখিয়াছে, তাহার উপর নির্ভর করিয়া স্বাধীনভাবে দাঁড়ান যায় না। আশ্রয়ের জন্য স্বামীর উপর নির্ভর না করিয়া তাহার উপায় নাই। তাহার সন্তানাদি কিছুই হয় নাই যে তাহাদের লইয়াও একটু অশান্তি ভুলিয়া থাকিবে। স্বামী মত করিলে সে বেশ পড়িয়া পরীক্ষা দিতে পারে, কিন্তু ইঁহাদের কাছে সে আশা করা বৃথা। স্বামীকে যদি বা সে বলিয়া কহিয়া রাজী করাইতে পারে, শাশুড়ী কোনোদিনও মত করিবেন না। কাজেই এইভাবে পচিয়া মরা ভিন্ন তাহার উপায় নাই।

আজও নীচে রান্নাঘরে গিয়া সে দুই একবার আঁচল দিয়া চোখ মুছিল, তাহার পর নিপুণহস্তে স্বামীর চা, জলখাবার সব গুছাইয়া একটা ট্রে-তে করিয়া উপরে লইয়া আসিল।

রমাপতি তখন কালুকে অঙ্ক বলিয়া দিতেছে, স্ত্রীকে দেখিয়া বলিল, "এত যে বিদ্যের বড়াই কর, ছেলেটাকে একটু পড়া ব'লে দিতে পার না?"

তরু ঠক্ করিয়া ট্রে-টা টেবিলের উপর নামাইয়া রাখিয়া বলিল, "আমি ত আর একসঙ্গে দু-জায়গায় থাকতে পারি না? বিদ্যে জানি ব'লে ভেলকি ত জানি না?" বলিতে বলিতে তাহার গলা বন্ধ হইয়া আসিল, চোখেও জল আসিয়া পড়িল।

রমাপতি একটু নরম হইয়া গেল। বাস্তবিক তরুকে কষ্ট দিবার তাহার কোনো ইচ্ছা ছিল না। সে যদি তাহার প্রভুত্বটা স্বীকার করিয়া লয় এবং মায়ের কথামত চলে, তাহা হইলে কোনো গোল থাকে না। কিন্তু সোজা কথাটা তরুকে বুঝাইবে কে?

চেয়ার টানিয়া বসিয়া, চায়ের পেয়ালা তুলিয়া লইয়া রমাপতি বলিল, "অমনি চোখে জল এসে গেল? যাই

বল, তোমার মত পান্‌সে চোখ আমি কারু দেখিনি। এ-রকম করলে আর সংসার করা চলে না।"

তরু উত্তর না দিয়া আবার নীচে নামিয়া গেল। কেষ্টো ততক্ষণ বাজার হইতে ফিরিয়া আসিয়াছে। তরু বঁটি লইয়া তরকারী কুটিতে বসিয়া গেল। সাড়ে ন'টার ভিতর ভাত না পাইলে আবার গালাগালির পালা সুরু হইবে।

এমন সময় দরজার কাছে হঠাৎ তাহার ছোটভাই বিনু আসিয়া দাঁড়াইল। তরু জিজ্ঞাসা করিল, "কি রে, তুই যে বড় এমন সময়?"

বিনু জিজ্ঞাসা করিল, "দিদি খদ্দরের শাড়ী কিন্‌বি? বেশ ভাল ভাল শাড়ী আছে।"

তরু বলিল, "আমার হাতে এখন টাকা নেই।"

বিনু বলিল, "তোমার স্বামীজীর পকেটেও কি নেই?"

তরু মুখ বাঁকাইয়া বলিল, "সে খোঁজ স্বামীজীর কাছে কর গিয়ে. উপরেই বসে আছে। তা তুই স্কুল ছেড়ে দিলি না-কি?"

বিনু বলিল, "হ্যাঁ, শুধু আমি না, অনেক ছেলেই দিয়েছে।"

তরু বলিল, "তা বেশ। এখন না-হয় বাপের পয়সায় খেয়ে দেশোদ্ধার করছ, এর পর কি খাবে, ঘাস?"

বিনু বলিল, "অত ভাব্‌তে গেলে আর কোনো কাজ করা চলে না। ভারি ত পাস করেই লাভ হ'ত, ত্রিশ টাকার মাষ্টারী। সে আমি মোট বয়েও আন্‌তে পারি।"

তরু বলিল, "সেই ভাল, আচ্ছা যা এখন, আমার কথা বলবার সময় নেই।"

বিনু উঠিয়া পড়িয়া বলিল, "না, তুই একেবারে বাজে। কত মেয়ে আজকাল মার খাচ্ছে, জেলে যাচ্ছে, আর তুই খালি ঘরে বসে লাউ কুটেই দিন কাটিয়ে দিলি।"

তরু কথা বলিল না, বিনু কাপড়ের পুঁটুলি লইয়া উপরে উঠিয়া গেল। রমাপতির কাছে অবশ্য বিশেষ আমল পাইল না। সে শ্যালককে দেখিয়া একটু ভয়ে ভয়েই জিজ্ঞাসা করিল, "কি হে, কি খবর?"

বিনু জিজ্ঞাসা করিল, "জামাইবাবু, খদ্দর কিনবেন? বেশ ভাল কাপড়।"

রমাপতি একটু অপ্রস্তুতভাবে বলিল, "বেশ লোকের কাছে এসেছ ভায়া। ও সব কি আর আমাদের জো আছে, তাহ'লে চাকরিটির মায়া ত্যাগ করতে হয়।"

বিনু বলিল, "না হয়, করলেনই ত্যাগ।" রমাপতি বলিল, "তা তোমরা বল্‌তে পার, ঝাড়া হাত পা নিয়ে আছ কি-না?"

বিনু কাপড়ের পুটুলি লইয়া চলিয়া গেল। রমাপতিও স্নান করিয়া খাইয়া আপিস যাত্রা করিল

সারাটা দিন তরুর মনটা ভার হইয়া রহিল। সত্যই ত, কত উচ্চ আশা, কত আকাঙ্ক্ষা লইয়া সে জীবন আরম্ভ করিয়াছিল, সব-কিছুর অবসান হইল এখন রান্নাঘরেই। তাহার আর কোনো কর্ম্মক্ষেত্রে নাই। স্ত্রীলোকের যে আবার ঘরের বাহিরে কোনো কাজ থাকিতে পারে, ইহারা ত তাহা স্বপ্নেও ভাবে না।

বিকালবেলা রমাপতি আপিস হইতে ফিরিয়া আসিল। হাতে তাহার কাগজে মোড়া কি একটা জিনিষ। তরু তখন ঘরেই বসিয়া ষ্টোভ জ্বালিয়া খাবার করিতেছিল, তাহার সামনে পুলিন্দাটা নামাইয়া দিয়া রমাপতি বলিল, "এই নাও।"

তরু বলিল, "ওর ভিতর কি আছে?"

রমাপতি বলিল, "খুলেই দেখ না, তাতে পাপ হবে না।" তরু কাগজের মোড়ক খুলিয়া দেখিল তাহার ভিতর গজ দুই রঙীন রেশম, এবং শেলাইয়ের জন্য নানা রঙের কয়েক গুচ্ছ রেশমের সুতা। মুখ গম্ভীর করিয়া বলিল, "তোমাকে না বলেছিলাম আমি, যে বিলিতি জিনিষ আমার জন্যে এনো না?"

রমাপতি বলিল, "সাহেবের টাকায় ত খাচ্ছ বসে, তাদের জিনিষ কিন্‌লেই যত দোষ হ'ল?"

তরু বলিল, "হ্যাঁ, সাহেবের টাকায় খাচ্চি না ত আরও কিছু। তারাই বরং দেশসুদ্ধ আমাদের টাকায় খাচ্ছে। খবর রাখ কোনো কিছুর?"

রমাপতি চটিয়া বলিল, "না, আমি আর খবর রাখ্‌ব কোথা থেকে? যত খবর তুমি বিদুষীই রাখ। এগুলো

চাই না ত তোমার তা হ'লে? এই রাধু, তুই নিয়ে যা ত এগুলো, তোকে দিলাম।"

রাধুরও বিলিতি জিনিষ লইবার তত ইচ্ছা ছিল না, কারণ ক্লাসের মেয়েরা তাহা হইলে তাহাকে অত্যন্ত হেয় জ্ঞান করিবে, কিন্তু মামার ভয়ে তখন আর সে কথা বলিতে সাহস করিল না, রেশম সুতা সব উঠাইয়া লইয়া চলিয়া গেল।

স্ত্রীকে খুশী করিবার জন্য রমাপতি পয়সা খরচ করিয়া জিনিষগুলি কিনিয়াছিল। সেগুলির ভাগ্যে এই রকম অভ্যর্থনা জোটাতে সে অত্যন্তই চটিয়া গেল। তরু তাহাকে খাবার গুছাইয়া দিতেই সে আবার সুরু করিল, "যাঁদের নিজেদের এক পয়সা আন্‌বার ক্ষমতা নেই, তারা টাকার দামও বোঝে না। এতগুলো টাকা যে জলে গেল, তা খেয়ালই নেই।"

তরু বিরক্তভাবে বলিল, "তোমায় হাজার বার বলেছি যে, বিলিতি জিনিষ আমার জন্যে এনো না, তবু যদি আন তা কার দোষ সেটা?"

রমাপতি বলিল, "হাজার বার লাখবার বলার কথা হচ্ছে না। অত স্বাধীনতা খাটাতে গেলে চল্‌বে না। স্বামীর ঘর করতে হ'লে, স্বামীর মতে চল্‌তে হয়, এ আক্কেলটা তোমার থাকা উচিত।"

তরু বলিল, "স্বামীর ঘরে থাক্‌ছি ব'লে কি আমি একটা মানুষ নয়? আমার কি একটা মতামত থাকতে নেই?"

রমাপতি বলিল, "মতামত রাখবার মুরোদ সব মানুষের থাকে না। নিজের পেটের ভাত, পরনের কাপড়ও যার অন্য লোকে দেয়, তার আবার মতামত কি? ভাইটি ত মোট বয়ে দেশোদ্ধার করছেন, তুমি এবার লেক্‌চার দিতে বেরোও, তা হলেই চারপোয়া পূর্ণ হয়। কোন্‌দিন আমার চাকরিটির মাথা তোমরা খাবে দেখ্‌ছি।"

তরু বলিল, "না গো না, তোমার চাকরি অক্ষয় হয়ে থাক্‌বে। শালার অপরাধে তোমার অপরাধ তোমার প্রভুরা নেবে না, আর আমি ত লেক্‌চার এখনও দিইনি, দিই যদি ত তোমার ঘরে বসে দেব না।"

রমাপতি বিদ্রূপ করিয়া বলিল, "বিষ-নেই-সাপেরই কুলোপানা চক্র হয়। এই সব ডেঁপোমী আমি দুচক্ষে দেখ্‌তে পারি না। ভালমন্দ বিচার করবার ক্ষমতা যাদের নেই, তাদেরই অন্য লোকে বাঁদর নাচায়।"

তরু ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। রাগে দুঃখে তাহার দুই চোখ দিয়া জল পড়িতেছিল। সে এমন কি অপরাধ করিয়াছে, যে, এই অপমান লাঞ্ছনা নিত্য তাহাকে সহ্য করিতে হইতেছে? দুমুঠা ভাত, দুখানা কাপড় সংগ্রহের ক্ষমতা কি সত্যই তাহার নাই? তাহার পথের বাধা যাহারা, তাহারাই আবার তাহার অক্ষমতা লইয়া তাহাকে বিদ্রূপ করে। তাহার ইচ্ছা করিতে লাগিল, গায়ের জোরে সকল বাধা ঠেলিয়া সে বাহির হইয়া যায়। কিন্তু হায়, যাইবে কোথায়? যাইবার স্থান তাহার নাই।

এই বাড়ির চারিটা দেওয়ালের ভিতর তাহার যেন দম বন্ধ হইয়া আসিতেছিল। কোথাও অল্পক্ষণের জন্য পলাইতে পারিলে সে বাঁচিয়া যায়। শাশুড়ীর কাছে গিয়া অত্যন্ত মিনতিপূর্ণ স্বরে সে বলিল, "মা, একবার ও-বাড়ি যাব? বাবার শরীরটা ভাল নেই শুন্‌ছিলাম, তাকে একবার দেখে আসব।"

শাশুড়ী অপ্রসন্ন মুখে বলিলেন, "কে বল্‌লে, তোমার ভাই বুঝি? অসুখ আবার কোথায়, এই ত দেখলাম কাল আপিস যাচ্ছে। তা যাও বাছা, আমি বারণ করব না, মনে মনে শাপ গাল দেবে ত? দেখো যেন রাত করে এসো না একেবারে, কেষ্টো তাহ'লে সব পিণ্ডি বানিয়ে রাখবে।"

তরু কেষ্টোকে একটু দাঁড়াইতে বলিয়া তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া পড়িল। বাপের বাড়ি পৌঁছিয়া দেখিল, ঘরে বিশেষ কেহই নাই, মা একলা রান্নার জোগাড় করিতেছেন। তাহাকে দেখিয়া বলিলেন, "কি রে, এমন সময়ে যে?"

তরু বলিল, "এই এলাম একটু, আস্‌তে কি নেই? বাবা কোথায়, দাদা, বিনু, চারু এরা সব কোথায়?"

তাহার মা বলিলেন, "তোমার বাবা কবে আবার এমন সময় বাড়ি থাকেন? নীহার আর বিনু কোথায় সভা

হচ্ছে, সেখানে গেছে, চারুটা সুদ্ধ জেদ ধরলে যাবার জন্যে, কিছুতেই ছাড়লে না।"

তরু বলিল, "চারুও গেছে? মেয়েদের সভা না-কি, মা?"

তাহার মা বলিলেন, "হ্যাঁ, তুই জানিস না, আজ যে শ্রদ্ধানন্দ পার্কে মেয়েদের সভা, বিলিতি কাপড় পোড়াবার।"

তরু মুখ আঁধার করিয়া বলিল, "আমার কি না কিছু জান্‌বার উপায় আছে, যে-ঘরে আমাকে দিয়েছ।"

তাহার মা চুপ করিয়া রহিলেন। রমাপতির সাহেব-ভক্তিটা এ বাড়ির কাহারও পছন্দ ছিল না, তবে পাছে তরু দুঃখিত হয়, এই ভয়ে তাহার সামনে কেহ কিছু বলিত না।

এমন সময় বিনু হঠাৎ আসিয়া হাজির হইল। তাহার মা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি রে ফিরে এলি যে?"

বিনু বলিল, "কতকগুলো বিলিতি কাপড় জমা ক'রে রেখেছিলাম, বনফায়ার করবার জন্যে, ভুলে সেগুলো ফেলে গিয়েছি, তাই নিতে এলাম। দিদি দেবে না-কি কিছু জামাই বাবুর কাপড়?"

তরু তাহার উপহাসে যোগ না দিয়া বলিল, "জামাই-বাবুর না দিই, নিজের গুলো দিচ্ছি। মা তোমার একটা শাড়ী আর জামা আমায় দাও ত।"

মা বলিলেন, "ঘরে আল্‌নায় আছে, নিগে যা। কিন্তু দেখিস বাছা, জামাইকে যেন চটাস নে।"

তরু উঠিয়া বলিল, "তোমার জামাইকে খুশী করলেই আমার সপ্তম স্বর্গ লাভ হবে আর কি? বিনু, তুই একটু দাঁড়া," বলিয়া সে দ্রুতপদে মায়ের ঘরে চলিয়া গেল।

অল্পক্ষণ পরেই মায়ের খদ্দরের শাড়ী জামা পরিয়া সে বাহির হইয়া আসিল। বিনুকে বলিল, "এই যে কাপড়। চল্, আমিও তোর সঙ্গে মিটিঙে যাব।"

বিনু বলিল, "এই ত চাই। চলো আও, 'না জাগিলে যত ভারত-ললনা, এ ভারত আর জাগে না, জাগে না'।"

তরুর মা শঙ্কাকুলনেত্রে তাকাইয়া রহিলেন, তাঁহার ছেলেমেয়ে গট্‌গট্‌ করিয়া বাহির হইয়া গেল।

রমাপতি বন্ধুদের আড্ডা হইতে যখন ফিরিল, তখন সন্ধ্যা হইয়া আসিতেছে। ঘরে ঢুকিয়াই, চৌকাটে হোঁচট খাইয়া চীৎকার করিয়া উঠিল, "সবাই কি মরেছে না-কি? ঘরে একটা আলো-সুদ্ধ এখনও জ্বলেনি?"

তাহার মা পাশের ঘর হইতে বলিলেন, "তা বাছা, আমি বুড়ো মানুষ, কত আর করব? তোমার বিবি-বউ বাপের বাড়ি বেড়াতে গেছেন, এখন অবধি তাঁর দর্শন নেই। শিগ্‌গীর আস্‌তে বলেছিলাম ব'লে বজ্জাতি ক'রে দেরি করছে। তা আলো জ্বালবে কে?"

রমাপতি আবার সিঁড়ি দিয়া নামিয়া চলিল। নাঃ, ভালমানুষের যুগ এ নয়। তরুকে এইবার ভাল-মতে শিক্ষা দিতে হইবে, না হইলে তাহাকে লইয়া ঘর করা অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইবে। শ্বশুর-বাড়িতে ঢুকিয়া সে একেবারে অবাক হইয়া গেল। কোথাও জনমনুষ্যের চিহ্নমাত্র নাই। তবে তরু গেল কোথায়?

হাঁকডাক করায় একটা চাকর বাহির হইয়া আসিল। রমাপতি চড়াগলায় জিজ্ঞাসা করিল, "বাড়িসুদ্ধ সব গেলেন কোথায়?"

চাকর বলিল, "শ্রদ্ধানন্দ পার্কে সভা করতে গেছে বাবু, বিলিতি কাপড় পোড়ান হবে।"

রমাপতির দুই চোখ কপালে উঠিয়া গেল। সে হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল, "বলিস্ কি রে? সবাই? তোদের বড় দিদিমণিও?"

চাকর হাসিয়া বলিল, "সবাই গেছে বাবু। বড়-দিদিমণি জোর ক'রে গেলেন বলেই ত মাও গাড়ী করে শেষে গেলেন, তাঁকে ফিরিয়ে আন্‌বার জন্যে।"

মনে মনে শ্বশুর-গোষ্ঠীর মুণ্ডপাত করিতে করিতে রমাপতি রাস্তায় ছুটিয়া বাহির হইয়া আসিল। একটা গাড়ী ডাকিয়া তাহাতে চড়িয়া বসিল, বলিল, "জল্‌দি হাঁকাও, শ্রদ্ধানন্দ পার্ক।"

গাড়োয়ান বলিল, "সেদিকে ত বড়ো মারপিট হোচ্ছে বাবু, সেদিগে যাবেন?"

রমাপতি তাড়া দিয়া বলিল, "তুমি চল ত, না-হয় একটু আগে আমি নেমে যাব।"

গাড়ী চলিতে লাগিল। জান্‌লা দিয়া যথাসম্ভব ঝুঁকিয়া পড়িয়া রমাপতি দেখিতে লাগিল।

শ্রদ্ধানন্দ পার্ক অবধি আর গাড়ী করিয়া যাইতে হইল না। রাস্তায় মহা ভিড়, লোকজন ছুটিয়া চলিয়াছে, পুলিসে লাঠি হাতে চতুর্দ্দিকে তাড়া করিতেছে, নির্ব্বিচারে যাহার উপর খুশী দুইচার ঘা বসাইয়া দিতেছে। গাড়োয়ান বলিল, "আপনি নেবে যান বাবু, আমি আর যাব না।"

তাহার পয়সা চুকাইয়া দিয়া রমাপতি নামিয়া পড়িল। সামনেই একজন খদ্দরধারী যুবককে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "মশায়, মেয়েরা সব কি চলে গেছেন?"

যুবক বলিল, "চলে আর যাবেন কোথায়? প্রিজন্ ভ্যান এসে দাঁড়িয়েছে, এর পর লালবাজার যাত্রা করবেন আর কি?"

রমাপতি পুলিসের ভিড়, লাঠি সব অগ্রাহ্য করিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া চলিল। দুচার ঘা যে তাহার পিঠে না পড়িল তাহা নহে, কিন্তু সেদিকে মন দিবার তাহার তখন অবসর ছিল না।

জেলখানার গাড়ীর কাছে আসিয়া তবে সে দাঁড়াইল। সম্মুখে চাহিয়া দেখিল একদল মেয়ে পুলিস-পরিবেষ্টিত হইয়া গাড়ীর দিকে অগ্রসর হইয়া আসিতেছে। সকলের দিব্য হাসিমুখ, যেন বেড়াইতে চলিয়াছে, এবং তাহাদের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম তাহার চোখ পড়িল যাহার উপরে, সে তাহার পত্নী তরু।

রমাপতি পাগলের মত চীৎকার করিয়া উঠিল, "তরু, তরু!"

মেয়ের দল তখন কাছে আসিয়া পড়িয়াছে। রমাপতি অনেক গুঁতা মারিয়া এবং খাইয়া তরুর অতি নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল, তরু স্বামীর দিকে চাহিয়া বলিল, "ছোট অত্যাচারীর হাত থেকে রক্ষা পেতে হ'লে বড় অত্যাচারীর শরণ নিতে হয়, আমি তাই নিলাম। স্বামিত্বের দাবি যতই বড় হোক্, পুলিসের দাবি তার চেয়েও কড়া।"

জেলের গাড়ী চলিয়া গেল। রমাপতি খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে বাড়ি ফিরিয়া আসিল। তাহার মা ছুটিয়া আসিলেন, "হ্যাঁ রে, বউ কোথা?"

রমাপতি সংক্ষেপে বলিল, "জেলে।"

রাসমণি হাউ-মাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন, "ওমা, কি সব্বনেশে কাণ্ড!"

রমাপতি গর্জ্জন করিয়া বলিল, "চুপ কর, চেঁচিও না। বউ ত গেছে, এর পর চাকরিও যাবে।"

পরদিন হাজতে অনেকের সঙ্গে রমাপতিও হাজির হইল। মিনতি করিয়া বলিল, "তরু, তুমি বল ত জামিন দিয়ে ছাড়িয়ে নিই।"

তরু বলিল, "আমি যাব না। একটু জেলখানা বদল করে দেখ ছি।"



গালার কাজ

শ্রীমণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত

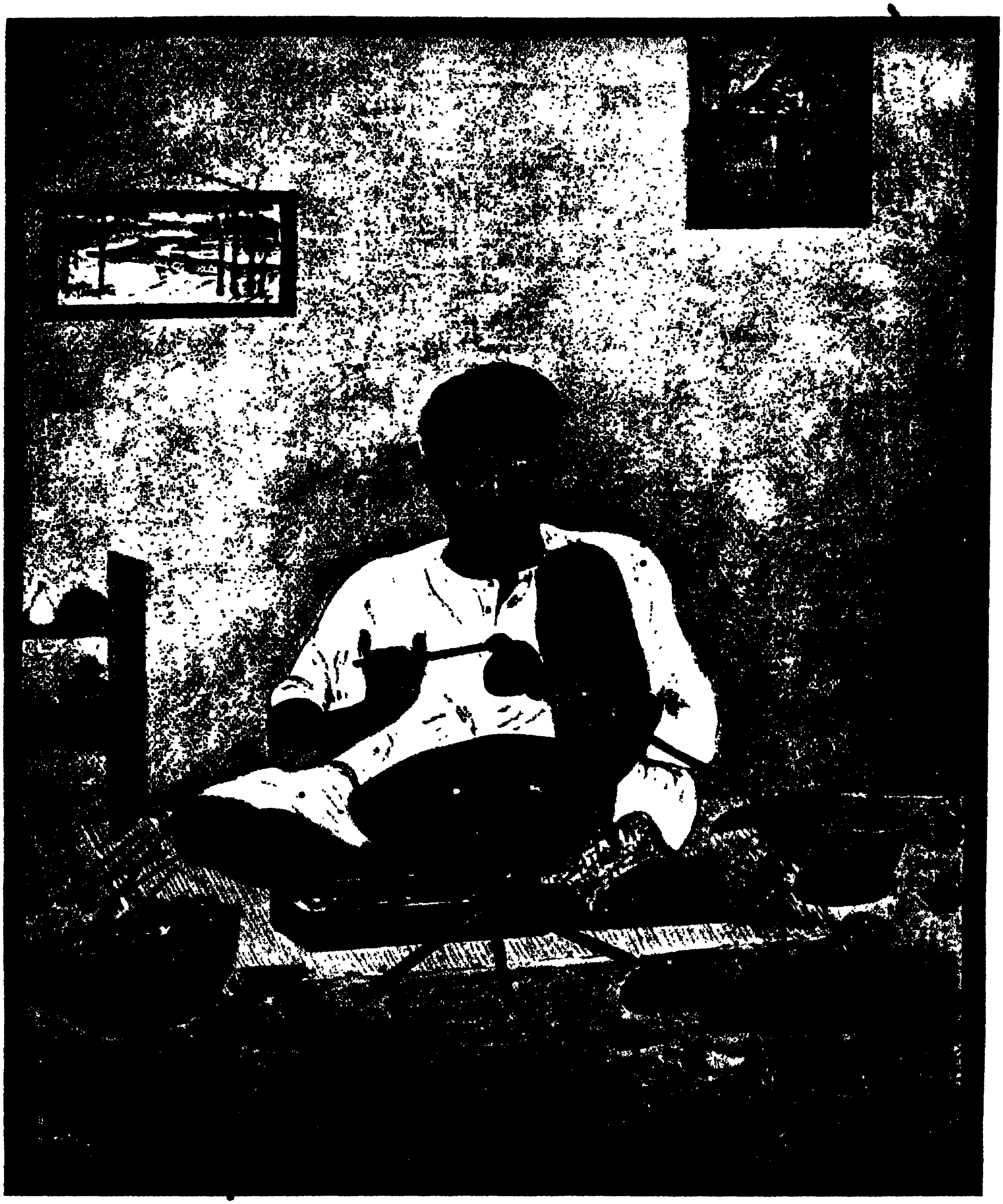
গালার কাজ খুব লাভজনক ব্যবসা। কিন্তু আমাদের দেশে তেমনভাবে ইহার উপর দৃষ্টি পড়ে নাই। পূর্ব্বে যেরূপ ভাবে গালার কাজ চলিত এখনও সেরূপভাবেই চলিতেছে—ইহার উন্নতির জন্য বেশী চেষ্টা হইতেছে না। বিশ্বভারতীতে শ্রীনিকেতনের কারু-বিভাগে ইহার কিছু পরীক্ষা চলিতেছে, এবং তাহার ফলে এই ব্যবসায়ের ক্ষেত্র কিয়ৎপরিমাণে বিস্তৃত হইয়াছে। মূলধনের অল্পতাহেতু যথেষ্ট পরিমাণে জিনিষ প্রস্তুত হইতেছে না, এবং বাজারে ইহার চালান তেমন করিয়া হইতেছে না। বাংলা দেশে একমাত্র বীরভূম জেলার অন্তর্গত ইলামবাজার গ্রামেই (বোলপুর ষ্টেশন হইতে এগার মাইল দূরে) গালার ব্যবসায় প্রচলন আছে। বাংলার বাহিরে পঞ্জাব, গুজরাট ও সিন্ধু প্রদেশে গালার কাজ হয়।

গালার কাজকে ইংরেজীতে বলে ল্যাকার ওয়্যার্ক। চীন ও জাপানের গালার কাজ খুব উন্নত—এই কাজ ভুল নামে অভিহিত, কারণ আমাদের দেশ হইতে এ কাজের তফাৎ এই—আমাদের গালা বা ল্যাক জৈবিক পদার্থ, আর ও দেশের গালা উদ্ভিজ্জ হইতে প্রস্তুত—গাছের রস হইতে উদ্ভূত। জাপানে ইহার নাম উরিশি, যে-গাছ হইতে এই রস পাওয়া যায় তাহার নাম উরিশি নো কি। ব্রহ্মদেশে উরিশি থিশি নামে পরিচিত।

বহু প্রাচীনকাল হইতে ভারতবর্ষে গালার কাজের প্রচলন আছে, কিন্তু ইউরোপে ইহার ব্যবহার প্রাচীন নয়। ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমল হইতেই ভারতবর্ষ হইতে ইউরোপে গালার চালান যাইতেছে, আসবাবপত্রের বার্ণিশে ইহা ব্যবহৃত হয়। মেথিলেটেড্ স্পিরিটে গালা গলাইয়া "ফ্রেঞ্চ পলিশ" প্রস্তুত হয়। আলতা গালা হইতে প্রস্তুত হয়, আলতা ইউরোপের বস্ত্রব্যবসায়ে বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হয়, রেশম ও পশম রং করিতে আলতার প্রয়োজন। আলতার ইংরেজী নাম 'ল্যাক ডাই'। হিন্দুরমণীর পদরাগ হিসাবে আমাদের দেশে আলতা সমাদৃত।

মহাভারতের জতুগৃহ-দাহনের আখ্যায়িকায় গালার উল্লেখ আছে। জতুগৃহ ছিল কাঠের ঘর, তাহা গালার কাজে সুশোভিত ছিল। গালা সহজদাহ্য পদার্থ।

ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলে ইলামবাজার খুব সমৃদ্ধিশালী গ্রাম ছিল। 'নুরি' জাতীয় বহু পরিবার গালার কাজ করিয়া যথেষ্ট অর্থ উপার্জ্জন করিত। গালার ব্যবসা 'নুরি' জাতির মধ্যেই কেবল আবদ্ধ ছিল। পরিবারের স্ত্রীপুত্রকন্যা সকলেই এই ব্যবসায়ে কারিগরকে সাহায্য করিত। বহু সহস্র টাকার গালার কাজ ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সাহেবরা ইউরোপে চালান দিতেন। প্রায় ৪০।৫০ বৎসর পূর্ব্ব পর্য্যন্তও এই ব্যবসা কোন রকমে টিঁকিয়া ছিল। শেষাশেষি ইন্দ্রনাথ খাণ্ডাইল নামে সাহেবের এক কর্ম্মচারী গালার ব্যবসা এবং রপ্তানী চালাইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পরে এই ব্যবসা কেহই গ্রহণ করে নাই, কাজেই ইলামবাজারের গালার ব্যবসা ধ্বংসোন্মুখ হইয়াছে। বাঙালীদের উদ্যোগের অভাবে একটি তৈয়ারী ব্যবসা নষ্ট হইয়া গেল। ইউরোপের



গালার কাজ

শ্রীমণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

রপ্তানীর উপরেই এই ব্যবসা চলিয়াছিল, সেটা বন্ধ হওয়ার জন্যই এই ব্যবসার অবস্থা খারাপ হইয়াছে। ইলামবাজারের কারিগররা এখন অল্প পরিমাণে খেলনা করিয়া থাকে,—কেবল মেলায় বিক্রীর জন্য। অনেক কারিগরের পৈত্রিক ব্যবসা ছাড়িয়া দিতে হইয়াছে। তাহারা এখন চাষবাস করিতেছে, কেহ কেহ সোনারূপার কাজ করিয়াও জীবিকা অর্জ্জন করে। গালার খেলনার যে অল্প পরিমাণে চাহিদা আছে, তাহাতে তাহাদের জীবিকানির্ব্বাহ হয় না, কাজেই তাহাদের অন্য উপায় অবলম্বন করিতে হইয়াছে।

এই প্রবন্ধে গালার প্রস্তুত-প্রণালী এবং ইহার ব্যবসায়ে প্রয়োগ সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইতেছে।

সংস্কৃত ভাষায় গালাকে বলা হয় লাক্ষা। লাক্ষা কীট অথবা কোকাস্ ল্যাকা (Coccus Lacca) হইতে গালার উৎপত্তি। গাছের ডালে লাক্ষাকীট দেহ হইতে এক প্রকার আঠাল রস বাহির করিয়া বাসা প্রস্তুত করে। দেখা গিয়াছে কুসুম, কুল, শাল, পলাশ, এবং পাকুরগাছে লাক্ষাকীট জন্মিয়া থাকে। ইহার ভিতর কুসুম গাছই সর্ব্বাপেক্ষা উপযোগী। ইলামবাজারের পশ্চিমদিককার জঙ্গল হইতে অনার্য্য-জাতীয় একপ্রকার লোক লাক্ষা-কীটের বাসা সংগ্রহ করিয়া বাজারে বিক্রীর জন্য আনে। গাছের ডালে কমলা হলুদ রঙের এক প্রকার স্বচ্ছ আঠাল পদার্থ জড়ানো থাকে, ইংরেজীতে ইহাকে বলে 'ষ্টিক ল্যাক'।

ষ্টিক ল্যাককে পরিষ্কৃত করিয়া সাধারণ গালা অথবা শেল্যাকে (shellac) পরিণত করা হয়। বাজারে শেল্যাকই চলে। নানা ব্যবসা বাণিজ্যে এরই ব্যবহার। বিলাতে শেল্যাকই চালান হয়।

গালা পরিষ্কার ও আলতা নিষ্কাশনের বিধি

ষ্টিক্ ল্যাক টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া ভাঙিয়া তাহা হইতে গাছের ডালগুলি সাফ্ করিয়া ফেলা হয়। পরে ২৪ ঘণ্টা মাটির পাত্রে ভিজাইয়া রাখা হয়। দুই হাতে এই জিনিষটাকে ঘষিলে যে তরল পদার্থ বাহির হইবে, তাহা ঘন-বোনা ঝুড়ি দিয়া ছাঁকিতে হইবে। পরে তাহা আবার কাপড়ে ছাঁকিয়া বড় মাটির পাত্রে শুকাইতে দিতে হয়। ছাঁকের যাহা অবশিষ্ট রহিল, তাহাতে আবার সোডা মিশাইয়া ঘষিতে হইবে এবং পূর্ব্বের ন্যায় ছাঁকিয়া ফেলিতে হইবে। এইরূপ বার-বার করিতে হইবে, যে-পর্য্যন্ত না লাল রং সম্পূর্ণরূপে উঠিয়া যায়। মাটির পাত্রের তরল পদার্থ শুকাইলে তৈয়ার হইবে আলতা বা ল্যাক্ ডাই।

আলতা নিষ্কাশন করিয়া যে ছাঁকনী অবশিষ্ট রহিল তাহার নাম হইল সীড্ ল্যাক (seed lac)। সীড্ ল্যাকের সহিত রজন মিশান হয়,—পরিমাণ ৪ ভাগ গালা, ১ ভাগ রজন। এই মিশ্রণ বালিশের খোলের মত একটা থলের ভিতর পুরিয়া আগুনে গলাইতে হয়। নিংড়াইলেই গালার পাতলা পাত বাহির হইবে। এই গালার পাতের নামই শেল্যাক্।

আগুনের পরিমাণ ঠিক-মত দেওয়া কঠিন ব্যাপার, উত্তাপ যথেষ্ট না হইলে থলের ভিতর হইতে কিছুই গলিবে না, আর যদি উত্তাপ বেশী হয় সমস্ত পদার্থ একেবারেই বাহির হইয়া যাইবে, অথবা পুড়িয়া যাইবে। শেল্যাক বাহির করিয়া লইলে থলের ভিতর যাহা অবশিষ্ট রহিল তাহার সহিত বেলে মাটি মিশাইয়া আগুনের উত্তাপ দিতে হইবে। এবার যাহা প্রস্তুত হইল তাহার নাম ক্রুড্ ল্যাক (crude lac)।

ইলামবাজারের কারিগরেরা তাহাদের পরিভাষায় ষ্টিক ল্যাক্, সীড্ ল্যাক, শেল্যাককে এবং ক্রুড্ ল্যাককে যথাক্রমে বলিয়া থাকে লাহা, জো, বরাগালা এবং মাটি-গালা অথবা মোটা গালা। বাংলায় শেল্যাক কোথাও কোথাও "চাঁচ্" বলিয়া পরিচিত।

গালা রং করাইবার বিধি

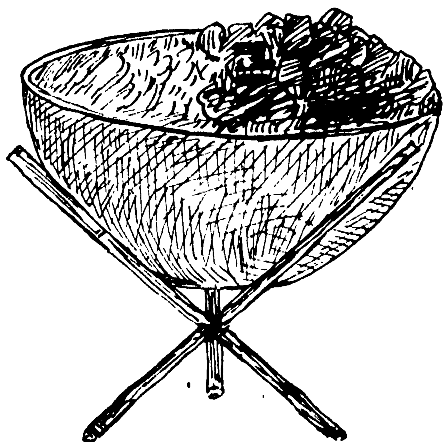
এক টুক্‌রা বরাগালাকে উত্তাপ দেওয়া হয়। নরম এবং নমনীয় হইলে হাত দিয়া টিপিয়া ইহাকে একটা বাটির আকার দিতে হইবে। গুড়া রং বাটির ভিতর রাখিয়া, মাথা এবং পিটানো হয়। আগুনে আবার গরম করিয়া মাথা এবং পিটানো হয়, যতক্ষণ না রং সম্পূর্ণরূপে গালার সঙ্গে মিশিয়া যায় ততক্ষণ এরূপ করিতে হইবে।

সিন্দুর, সবুজ, নীল, হলুদ এই কয় রং বেশ চলে। ব্রঞ্জ পাউডার রঙের সঙ্গে মিশাইয়া দিলে বেশ চাকচিক্য দেয়। সবুজের সঙ্গে ব্রঞ্জ পাউডার বেশ মিলে। তবক পাতাও গালার সঙ্গে মিশান চলে, মিশাইবার প্রথা রঙের মত এক প্রকারই। রং মিশান হইলে ছোট টুকরা করিয়া, কাটিয়া এক ফুট পরিমিত বাঁশের কাঠির ডগায় লাগাইয়া রাখা হয়।

গালার কাজের যন্ত্রপাতি

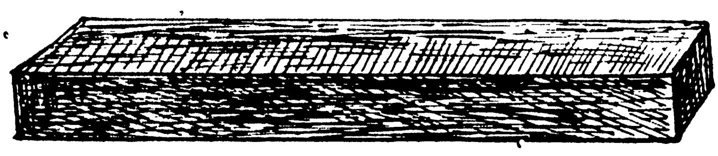
গালার কাজে যে-সব যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা হয়, তাহা নিতান্ত সামান্য—সহজেই তাহা সংগ্রহ করা যাইতে পারে। নিম্নে তাহার পরিচয় দেওয়া গেল।

(১) আগুন।

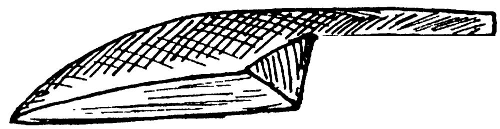


আগুন জ্বালিবার জন্য মাটির হাঁড়ি। ৩ খানা বাঁশের টুকরা মাঝখানে বাঁধিয়া, তার ভিতর হাঁড়ি রাখিতে হইবে। আগুনের জন্য শালগাছের কয়লা ব্যবহার করা প্রয়োজন। ফুঁ দিয়া আগুন ধরাইবার জন্য একটি বাঁশের চোঙা।

(২) দুই-তিন ফুট লম্বা চৌকোণা কাঠ।



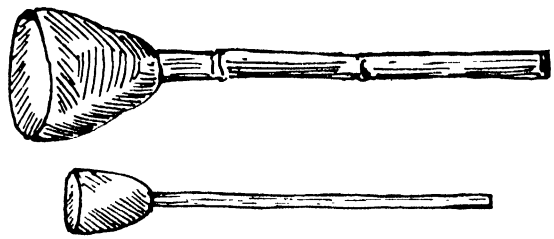
(৩) কাঠের 'হাতা'। হাতার ন্যায় ইহার ভিতর গর্ত্ত থাকিবে না, সম্মুখের দিকটা সমান থাকিবে।



(৪) চওড়া ফলাওয়ালা ভোঁতা ছুরি। পরিভাষায় কারিগরেরা ইহাকে বলিয়া থাকে "চেয়ার"।

(৫) চিমটা।

(৬) মাটিগালার টোপ-ওয়ালা হ্যাণ্ডেল। টোপ গোলাকৃতি, কিন্তু উপরের দিকটা চেপ্টা। খেলনা, পেপারওয়েট্ ইত্যাদি প্রস্তুত করিতে এই

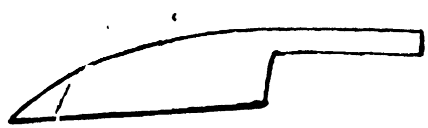


'করার জোড়া কাঠি'

জিনিষটির খুব প্রয়োজন। খেলনা প্রভৃতি যখন ইহার চেপ্টা দিকে লাগাইয়া উত্তাপ দেওয়া হয়, তখন অনেক সময় মাটিগালার টোপটি গলিয়া যায়; কিন্তু অনেক ব্যবহারে ক্রমশঃ শক্ত হয় ভাল কার্য্যোপযোগী হইতে অন্তত তিন বৎসর ব্যবহারের প্রয়োজন। কারিগরের পরিবারে এই যন্ত্রটি বংশানুক্রমে চলিতে থাকে। পরিভাষায় এই যন্ত্রের নাম 'করার জোড়া কাটি'।

গালার কাজের বিধি

ভাল গালার কাজ করিতে হইলে বহু অভ্যাসের প্রয়োজন। ভাল কারিগরের সঙ্গে কাজ করিলে



৪নং—ভোঁতা ছুরি বা 'চেয়ার'

মনে হয় দুই বৎসরের ভিতর শিল্পটিকে আয়ত্ত করা যায়। বিশ্বভারতীর শ্রীনিকেতনের কারুবিভাগে গালার কাজ শিক্ষা দিবার বিশেষ ব্যবস্থা আছে।

ইলামবাজারের গালার শিল্প এখানে অনেক উন্নত হইয়াছে। বাক্স, আসবাবপত্র প্রভৃতি এখন সুন্দর সুন্দর ডিজাইনে গালার কাজে সুশোভিত হইতেছে। শান্তিনিকেতনের শিল্পীরা তাহাদের পরীক্ষা এবং অধ্যবসায়ের ফলে স্থানীয় কারিগরদের সাহায্যে এই শিল্পটিকে কৃতকার্য্য করিয়াছেন। সন্তোষজনক ফল পাইতে প্রায় তিন বৎসর লাগিয়াছিল। কাঠের উপর গালা লাগাইতে গিয়া অনেক বেগ পাইতে হইয়াছে। বিভিন্ন কাঠের উপর গালা লাগাইয়া উপযোগী কাঠ মনোনয়ন করিতে হইয়াছে। কাঠের উপর গালা লাগাইতে এই কয়টি বাধা উপস্থিত হইয়াছে—

(১) গালা কাঠের উপর লাগিতে চায় না; (২) গালা লাগিলেও কিছু পরে ফাটিয়া যায়, অথবা ফোঁটা ফোঁটা দাগ পড়িয়া যায়। পরীক্ষা দ্বারা, 'গাম্ভার' কাঠকেই গালার কাজের পক্ষে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া মনোনয়ন করা হইয়াছে। ইহাতে গালা সমানভাবে লাগিয়া যায়, এবং পরে ফাটিয়া যায় না। সেগুনকাঠ ভাল নয়, এক বছর পরে দাগ পড়িতে থাকে। শালকাঠ চলনসই, কিন্তু তাহাতে ছুতার মিস্ত্রীর কাজ চলিতে পারে না।

কাঠের উপর গালা লাগাইবার বিধি

কাঠ এবং রঙীন গালা একসঙ্গে গরম করিয়া লাগাইতে হইবে। উত্তাপ পরিমিত না হইলে এই বিপদ উপস্থিত হইবে—

(১) কাঠের সঙ্গে গালা লাগিতে চাহিবে না। (২) কাঠ হইতে গালা চুলের আকারে সরু সরু নালে উঠিয়া আসিবে। (৩) যতটা প্রয়োজন তদপেক্ষা বেশী গালা এক জায়গায় পড়িয়া যাইবে।

গালা লাগান হইলে এক টুকরা সরকাঠি ঘষিয়া সমান করিয়া "হাতা" দ্বারা পালিশ করিতে হইবে। পরে তালপাতা দিয়া পালিশ করিলে চকচকে হইবে। ঘষার সময়ে মাঝে মাঝে কাঠ এক আধ সেকেণ্ডের জন্য গরম করিয়া লওয়া দরকার।

পেপারওয়েট্ প্রস্তুতবিধি

টেবিলের উপর কাগজপত্র চাপা দিবার জন্য সুদৃশ্য পেপারওয়েট্ হইয়া থাকে। প্রথমতঃ নির্দ্দিষ্ট আকারে মাটিতে পেপারওয়েট্ গড়িতে হইবে, ইহার উপর মাটিগালার প্রলেপ লাগাইতে হয়। রঙীন গালার কাজ ইহার উপর চলিবে। পালিশ করিবার বিধি পূর্ব্ববৎ।

ফাঁপা ফল প্রস্তুত বিধি

বড় আকারের ফল, যেমন—আম পেঁপে ইত্যাদি—ঠাসা প্রস্তুত হয় না, কারণ অনর্থক অনেক গালা নষ্ট হয়, সেজন্য ভিতরটা ফাঁপা রাখে। ফাঁপা এইরূপে করিতে হয়।—একটা কাঠির ডগায় দড়ি জড়াইয়া, ফলের আকারে মাটিগালা ইহার উপর লাগাইতে হয়। এর উপর রঙীন গালার কাজ। কোনো কোনো ফলে—যেমন পাকা আম দেখা যায়, একটা রঙের সঙ্গে অন্য রং মিশিয়া গিয়াছে—হলদের সঙ্গে সিন্দূরের মিশ্রণ। হলদে গালা প্রথম লাগাইতে হইবে, পরে একটা বলের ভিতর সিন্দূর পুরিয়া গরম করিয়া হলদের উপর লাগাইলে লাগিয়া যাইবে। তালপাতা দিয়া ঘষিলে পাকা আমের মত দেখাইবে।

ফিতার কাজ

বিভিন্ন প্রকারের ডিজাইন্ শিল্পীর রুচি এবং মৌলিকতার উপর নির্ভর করে। সব রকমের নমুনা বলা সম্ভব নয়। কয়েকটি নিম্নে দেওয়া গেল।

যে-সকল ডিজাইনে লাইন ব্যবহার করা হয়, তাহাকে ফিতার কাজ বলে। রঙীন গালা গরম করিয়া হাত দিয়া টানিয়া সরু ফিতার মত করা যায়; গরম করিয়া এগুলি লাগাইলেই লাইনের কাজ দিবে।

কাঁটার কাজ

খেজুর পাতার অথবা তালপাতার কাঁটার মত সরু ডগা এই কাজে লাগে। ফিতার কতকগুলি লাইন বসাইয়া, গরম করিয়া কাঁটা দিয়া টানিলে, লাইনগুলি বাঁকিয়া বাঁকিয়া যাইবে—কতকটা করাতের মুখের মত। কোনো ধাতুর কাঁটা ব্যবহার করা বিধেয় নহে—কারণ ধাতু শীঘ্র গরম হইয়া উঠে।

ফোঁটার কাজ

নানা রঙের ফোঁটা দিয়া ডিজাইন হইতে পারে। রঙীন গালা গরম করিয়া হাত দিয়া টিপিয়া তুলির মত করিতে হইবে। ইহার সরু ডগা দিয়া ফোঁটা দিতে হয়। ফোঁটাগুলি উঁচু হইয়া পড়ে; কাঠের বাক্সের উপর ফোঁটার ডিজাইন বেশ মানায়।

টেবিল, চেয়ার, ড্রেসিং টেবিল, চারপাই, আয়না, অথবা ছবির ফ্রেম প্রভৃতিতে গালার কাজ হইয়া থাকে। ছোট বাক্সের উপর গালার ডিজাইন খুবই মনোরম বস্তু। গহনার বাক্সরূপে অথবা সিগারেট কেস্ হিসাবে ইহার ব্যবহার চলে। কাঠের কৌটা—য়্যাশ-ট্রে হিসাবে চলে, ফুলদানী, সিন্দুরের কৌটা খালি গালার তৈরি।

গালার কাজের জিনিষ বিবাহাদিতে উপহার হিসাবে খুবই নয়নাভিরাম হইতে পারে।

আসবাবপত্রের উপর সাধারণ রং দিয়া আঁকিয়া, তাহার উপর গালার বার্ণিশ লাগান যাইতে পারে; এই উপায়েও কোথাও কোথাও আসবাবপত্র সুশোভিত হয়। ইহাকে গালার কাজ বা ল্যাকার ওয়ার্ক বলা চলে না। একেবারে রঙীন গালা দিয়া করার নামই গালার কাজ। গালার কাজের তুলনায় অন্য কাজ খেলো দেখায়। গালার কাজ বস্তুতঃ খুব সৌখীন সামগ্রী।

মোটবাহী

শ্রীমতী শান্তি সেন

প্রভাত হইতে-না-হইতেই গৃহস্থালীর কাজ সুরু হয়।

শাঁখা-পরা দুইখানি শীর্ণ হাত সারাদিন অবাধে চলিতে থাকে। বিশ্রাম বা আরাম বলিয়া যেন কিছুই নাই। ফাই-ফরমাস হইতে আরম্ভ করিয়া ভারী কাজ পর্য্যন্ত সবই ঐ দুইখানি হাতের উপর দিয়া অশ্রান্ত বেগে চলে। তবু কাহারও মন উঠে না।

সামান্য কথার উত্তর দিতে গিয়া একেবারে নাকাল হইতে হয়। রেহাই নাই!

বলে,—"কথা বল্‌তে লজ্জা হয় না? কিসের জোরে এত? তবু যদি সোয়ামীর জোর থাকৃত!"

স্বামীর জোর সত্যই তার নাই। থাকিলে কেনই-বা এ দুর্গতি হইবে? কিন্তু মা-বোনের মুখে একথা শুনিতে যেন বুক ভাঙিয়া যায়!

ভাঙিয়া গেলেও ভাঙাবুক লইয়াই চলিতে হইবে। সংসারের উপর অভিমান করিয়া বসিয়া থাকা তার সাজে না। দুঃখ যা আছে—থাক্!

কাহারও উপর রাগ হয় না,—কিছু বলেও না। কাঁদে। অদৃষ্টকে ধিক্কার দেয়।

স্বামী যার থাকিয়াও থাকে না, তার বিড়ম্বনার কি অবধি আছে?

স্বামীর কথা ভাবিতে মনটা বিরক্তিতে সঙ্কুচিত হইয়া আসে। লজ্জায় মুখ দেখাইতে ইচ্ছা হয় না, মৃত্যুর চির-অন্ধকারে ঢাকিয়া ফেলিতে চায়।

তারও উপায় নাই! অন্ততঃ ছেলে ও মেয়েটার জন্যই তাহাকে বাঁচিতে হইবে। দায়িত্বের দায় তাচ্ছিল্য করা ত যায় না! তারপর পেটের সন্তান, বাঁচিয়া থাকিলেই সার্থক!

আবার সে নূতন আশা, নূতন আনন্দ লইয়া কাজে নামিয়া পড়ে।

কাজ করিতে করিতে রাত্রি গভীর হইয়া আসে, নিস্তব্ধ পল্লী রাত্রির অন্ধকারে যেন ঝিমাইতে থাকে। গাছপালা বাড়িঘর অন্ধকারের কোলে একাকার হইয়া যায়।

সহসা অদৃশ্য জগতের অন্ধকার বুক চিরিয়া পুরাতন একখানি গৃহ তার চোখের সুমুখে স্পষ্ট হইয়া ওঠে।

একখানি পরিচিত আঙ্গিনা, গুটিকতক নরনারী, নিতান্ত আপনার একটি মানুষ। স্বামীর সংসার!

স্বামীহারা বিশ্বের এককোণে তাহাদের এই সংসার কত নগণ্যই ছিল। তবু অন্তরের স্বাদ ও আকাঙ্ক্ষার তৃপ্তি ছিল সেইখানেই।

কিন্তু পুরুষ যেখানে অলস, সেখানে নারীর শত কর্ম্মকুশলতাও সংসার ধরিয়া রাখিতে পারে না। পারিলও না।

ভাবিতে ভাবিতে মন ক্লান্ত হইয়া পড়ে। অন্তরে জ্বালার সৃষ্টি হয়। আর ভাবিতেও পারে না। সেই-খানেই সব ভাবনা শেষ করিয়া দেয়।

তারপর কাজ শেষ করিয়া নিজের ঘরে চলিয়া আসে।

ঘর অন্ধকার। হয়ত বাতাসে প্রদীপটা নিবিয়া গিয়াছে! ছেলে ও মেয়ের কোন সাড়াশব্দ পাওয়া যায় না। পড়িতে পড়িতে বোধ করি বা ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। আব্‌ছায়া অন্ধকারে তাহাদের একটু একটু দেখা যায়। ধীরে ধীরে তাহাদের গায়ে হাত দেয়। নিঃশব্দে পাশে বসিয়া থাকে।

ঐ ভাবেই খানিকক্ষণ কাটিয়া যায়।

পাশের ঘরে তার বাবার নাকের ডাক শুনিতে পায়। মায়ের কোনই সাড়াশব্দ নাই। উভয়েই হয়ত ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন।

তাঁহাদের ঘুম ভাঙিয়া যাইবে এই আশঙ্কায় অতি সন্তর্পণে উঠিয়া দরজাটা বন্ধ করিয়া দেয়, তারপর প্রদীপটা জ্বালায়।

দেখে,—বিছানাপত্র সব সব ওলট্‌পালট্‌। ময়লা জামা-কাপড় আর ভাঙা-চোরা বাক্স তক্তপোষের উপর এলোমেলো হইয়া আছে। ছেলে-মেয়ে দুইটি কাপড়-চোপড় জড়াইয়া শুইয়া পড়িয়াছে।

দারিদ্র্যের দৈন্য যেন সমস্ত ঘরখানাতে ফুটিয়া রহিয়াছে।

ধীরে ধীরে নিপুণতার সঙ্গে সমস্ত কাজ শেষ করে।

সন্তান দুইটি দুই পাশে শোওয়াইয়া সস্নেহে তাহাদের গায়ে হাত বুলায়। অন্তর যেন ভিজিয়া ওঠে। চোখ দিয়া দর্ দর্ করিয়া জল গড়াইয়া পড়ে। তারপর, এপাশ ওপাশ করিয়া কখন ঘুমাইয়া পড়ে।

নাম কনক। দেখিতে এমন কিছু সুন্দর নয়। কালো। অন্তরের বেদনা যেন তার চোখে মুখে ফুটিয়া আছে। মুখখানা ভারী মলিন। কিন্তু কথাগুলি খুব মিষ্টি।

মেয়েটি হইবার বছর-দুয়েক পরে ছেলেটিকে কোলে লইয়া সেই যে সে বাপের বাড়ি আসিয়াছে,—আর যায় নাই। তারপর ঐ একখানা ঘরেই আপনার স্থান করিয়া লইয়াছে। জায়গা হউক বা নাই হউক—তবুও তাহাকে মাথা গুঁজিয়া কোনরকমে কুলাইয়া লইতে হয়।

কিন্তু জায়গা হইলেই ত কেবল হয় না, তিন-তিনটি পেট! পেটেও ত কিছু চাই। অবশ্য বাপ যখন স্থান দিয়াছেন, খাইতে না দিয়াও পারেন না।

কিন্তু খাইতে বসিয়াও চোখের জল না ফেলিয়া খাইবার উপায় নাই।

কথা শুনাইতে বাপ মা কেহই কসুর করেন না।

কনকের বাবা কৃপণ লোক। পেটে না খাইয়াও তাঁর পয়সা জমাইবার অভ্যাস। খরচ করিতেই চান না।

যত মুস্কিল কনকের মায়ের। সংসারের যাবতীয় ব্যয় তাঁর হাত দিয়াই হয়, তিনি কিছুতেই কুলাইয়া উঠিতে পারেন না। কিন্তু সোজাসুজি এবং সহজভাবে কিছু হইবার সম্ভাবনা নাই দেখিয়া, স্বামীর অবসর সময়ে নানা কথার ভিতর দিয়া ঘুরাইয়া ফিরাইয়া কথাটা উত্থাপন করিতেন। বলিলেন, "এমাসে আমাকে ক'টা টাকা বেশী দিতে হবে।"

টাকার কথা শুনিয়া বৃদ্ধ বিরক্ত হইয়া উঠিতেন। বলিলেন, "টাকা? আবার টাকা কেন? কি দরকার?"

"দেবে কি না, তাই বল—"

কনকের বাবা ভ্রূ কোঁচ্‌কাইয়া বলিলেন, "না, এখন দিতে পার্‌ব না। এত বড়মানুষি করলে আর চলে না। আমি দেহপাত ক'রে পয়সা রোজগার করি—আর তোমরা এতগুলো লোক আমার ঘাড়ে চেপে ব'সে আরাম ক'রে খাও,—খেয়াল ত নেই—"

গৃহিণীর মনে আঘাত লাগে। তিনি মুখখানি ম্লান করিয়া রাগের সহিত বলিলেন,—"আমি আর একলা কত খাই?"

"তুমি না খাও—তোমার গুলোই ত খায়।"

কর্কশ কথাগুলি তিনি সহ্য করিতে পারিতেন না। বলিলেন, "আমার গুলো খায়, এ তোমার কেমন কথা? ওরা আমারই একলার—তোমার কেউ নয়?—তা যারই হোক্, না খেতে দিয়ে ত আর পারবে না? যেমন করে হোক্,—দিতেই হবে!"

"দিচ্ছি না? না খেয়ে থাকে?" বলিয়া বৃদ্ধ প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে রূঢ়ভাবে স্ত্রীর প্রতি তাকাইলেন।

জবাবে গৃহিণী বলিলেন, "দিচ্ছ, তা মানি। কিন্তু এ টাকায় কুলোয় না।"

বৃদ্ধ বলিলেন, "কুলোয়—না কুলোয়, আমি শুনতে চাই নে। আয় থেকে ব্যয় বেশী করতে পার্‌ব না—তা জেনে রেখ, তা তোমরা না-খেয়েই মর আর যাই কর।"

কথায় কথায় দুইজনের তুমুল ঝগড়া বাধিয়া যায়, তারপর আসল কথাই উঠিল।

কনকের বাবা বলিলেন, "আমার বরাতই খারাপ। সবাই মেয়েকে বে-থা দেয়—মেয়ে শ্বশুর-ঘর করে, চুকে যায় সব! আমার বেলা তার উল্টো।"

মাও উত্তর দিতে ছাড়েন না, বলিলেন, "আঃ কি দেখে-শুনেই দিয়েছিলে।"

"তখন কি জান্‌তাম এমন অপদার্থ! এমন হতভাগা! ওর জন্তেই আমার মাথা হেঁট ক'রে থাকতে হয়!"

কথাগুলি অত্যন্ত বিশ্রী শোনায়। পাশের বাড়ির ভাড়াটিয়ারা জানালা দিয়া মুখ বাড়াইয়া শুনিত। নিজেরা বলাবলি করিত, "কি বল্‌ছে, অ্যাঁ? কনকের বরের কথা নাকি?"

সকলের কাছেই রহস্য বোধ হয়।

যাহার উদ্দেশ্যে এত কথা, সেও সবই শুনিত। ঘৃণায় ও অপমানে তার মনটা শক্ত হইয়া উঠিত। দেহে নড়িবার শক্তিটুকুও যেন থাকিত না।

ভাবিত,—স্বামী? এই রকম স্বামী থাকিয়া কি লাভ? বিধবা হওয়া বোধ হয় এর চেয়েও ঢের ভাল, বিধবা হইলে কি স্বামীর কথা লইয়া এরূপ টানাটানি হয়? কিন্তু স্বামীর দোষে স্ত্রীর এ নির্যাতন কেন? তার কি দোষ?

তার দোষ—সে গলগ্রহ! সামান্য ভাতের জন্যই এই সব, কিন্তু ঝিয়েএর কাজ করিলেও ত ভাত পাওয়া যায়। তাহাতে অনেক শান্তি! স্বামীর কথাও ওঠে না, পরের মুখ চাহিয়াও থাকিতে হয় না!

প্রতিদিনের নির্যাতনে সহ্যশক্তি নিঃশেষ হইয়া আসে। কতই বা মানুষ সহিতে পারে?

ভাবিতে ভাবিতে তার ব্যথা যেন তার পৃথিবীকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে।

এমন করিয়াই দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর কাটিল।

জলে পড়িয়া তৃণ অবলম্বন করিয়াও না-কি মানুষ বাঁচিতে চেষ্টা করে। কনকের চেষ্টা ঠিক সেই রকম না হইলেও অনেকটা তাই। তবে এইটুকুই সান্ত্বনা যে, তৃণের মত এই শিশুগুলি অক্ষম হইলেও তৃণ ত নয়। ইহারাই একদিন বড় হইয়া উঠিবে, মানুষ হইবে, ইহাদের আশ্রয় করিয়া সে সংসারও পাতিবে।

সংসার পাতিবার মত উপযুক্ত না হইলেও ছেলে-মেয়ে দুটি বড়ই হইয়াছে। দুটিতেই ইস্কুলে যায়, লেখাপড়া করে। মেয়েটির বয়স ষোল, ছেলেটির চৌদ্দ। দেখিতেও বেশ বড়সড়, অযত্নে পালিত বলিয়া রোগা-হ্যাংলা নয়, হৃষ্টপুষ্ট।

মেয়েটি বড় হওয়ায় কনকের আবার এক দুর্ভাবনা বাড়িয়াছে, মেয়ের বিবাহ দিতে হইবে, কম দুশ্চিন্তা নয়!

কিন্তু মেয়ের বিবাহ হয়ত অর্থের অভাবেই হইবে না। নাই-বা হইল তার বিবাহ? —কনক ইহাই ভাবিত। ভাবিয়া নিশ্চিন্তও হইতে পারিত না, বিবাহ না দিলে লোকেও ত পাঁচ কথা বলিবে!

রান্নাঘরে বসিয়া কনক দুই হাতে কাজ করিত, আর এই সব চিন্তা করিত। নিরালায় বসিয়া ভাবিবার সময় বা সুযোগ তার হইত না। যা-কিছু প্রশ্ন ও তার মীমাংসা গৃহস্থালী কাজের সঙ্গে হুড়াহুড়ি করিয়া একত্র চলিতে থাকে।

শোভার ইস্কুলে যাইবার সময়। শোভা আসিয়া পিছনে দাঁড়াইয়া ডাকিল,—"মা, খেতে দাও।"

এরই মধ্যে তার ইস্কুলের ঝিও আসিয়া তাড়া সুরু করিল, "খুকী গো, এসো গো।" শোভা তাড়াতাড়ি যাইবার জন্য বলিল, "দাও মা, ঝি এসে পড়েছে।"

কিন্তু খাইতে-না-খাইতে ঝি কখন্ চলিয়া গেল। শোভা ঘরের কোণে বসিয়া কাঁদিতে সুরু করিল।

দেখিয়া দিদিমা রুষ্ট হইয়া উঠেন—বলিলেন, "কাঁদলে আর কি হবে, দেরি করবার বেলা মনে থাকে না? রোজই ত দেখছি অমনধারা, ঝি এলে ইস্কুলে যাবার কথা মনে পড়ে। কিসের জন্য দেরি হয়? সংসারের কোন কাজই ত করতে হয় না।"

গৃহিণীর গোলযোগ শুনিয়া কর্ত্তা ব্যস্তভাবে ছুটিয়া আসেন। ব্যাপার শুনিয়া তিনিও ক্রুদ্ধ হইয়া ওঠেন, বলিলেন, "অত গোলমালে কি দরকার? কালই স্কুল থেকে নাম কাটিয়ে দেব। ভাবলুম, বিয়ে ত দিতে পারব না, লেখা-পড়া শিখে যা-হোক রোজগার করে খাবে। তা যখন নয়, তবে আমি আর কি করব? থাক ঘরে বসে ঘরের কাজকর্ম্মই করুক, সে-ই ভাল। বিয়ের আশা মিছে, কে দেবে? একটা লোকও ত নেই যে আধ পয়সা দিয়ে সাহায্য করবে। আমারও কোন সাধ্য নেই, আমার ক্ষেমতায় কুলুবে না, অমনি থাক।……আপদ আর কি!"

সত্যই আপদ। সাহায্য করিবার মত তাহাদের একটি লোক বা এক আধলাও নাই। এত কথা কানে শুনিয়াও না-শুনি না-শুনি করিয়া চোখ বুজিয়া পড়িয়া থাকিতেই হয়।

পরের দিন সত্যসত্যই শোভাকে স্কুল হইতে নাম কাটাইয়া দেওয়া হইল।

এখন হইতে সে সংসারের কাজ করিতে শিখিবে। নারীর সংসারধর্ম্মের চেয়ে আর কোন কাজই শ্রেষ্ঠ নয়। ইহাই তাহাকে বলা হইয়াছে।

শোভা ইহার কি বুঝিল, কে জানে? তবে নিরালায় বসিয়া স্কুলের জন্য মাঝে মাঝে সে কাঁদিত, আর সারাদিন মায়ের পিছনে পিছনে ছায়ার মত ঘুরিয়া বেড়াইত। মায়ের ব্যথা অন্তর দিয়া অনুভব করিত। মাকে কত বুঝাইয়া বলিত, "কেঁদে আর কি করবে মা? তোমার এ দুঃখ আর কদিন? নারাণ ত বড় হয়ে উঠল। এবার নারাণই রোজগার করে খাওয়াবে!"

কনক মাথা নীচু করিয়া কথাগুলি শুনিত। কিন্তু বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া মনে করিত না। মাথা তুলিয়া উত্তর দিতে যাইতেই দেখিত, নারাণ উঠানে লাটিম খেলিতেছে।

কতক্ষণ একদৃষ্টে তাকাইয়া থাকিত, নারাণের চেহারায় যেন স্বামীর ছবিখানিই স্পষ্ট দেখিতে পাইত। সেই রূপ, সেই দেহ। ঠিক যেন সেই কাঠামেই তৈরি। কি অদ্ভুত সাদৃশ্য! দেহে লাবণ্য নাই, কি রকম যেন রুক্ষ শ্রী, চোয়াড়ের মত। চোখ দুইটি লাল, ভাব-চঞ্চল।

কনক চকিতে দৃষ্টি সরাইয়া লইয়া আসিত। ভয়ে আশঙ্কায় বুকটা দুলিয়া উঠিত, আবার অন্যমনস্ক হইয়া পড়ে।

নারায়ণই তাহার আশার স্থল। কিন্তু তাহার ভাবগতিক দেখিয়া কনক হতাশ হইয়া পড়িত। লেখা-পড়ায় মোটেই মনোযোগ নাই। কেবল খেলা আর খেলা। ঘুরিয়া বেড়াইয়া সারাদিন বাহিরে কাটাইয়া দিত। বাড়িতে আসিবার সময় নূতন ঘুড়ি, নূতন সুতা, নানারকম পেন্সিল, কলম ও খাতা কিনিয়া লইয়া আসিত।

যতক্ষণ বাড়িতে থাকিত ততক্ষণ কেবল ঐ করিত,

এটা নাড়া সেটা নাড়া, পেন্সিল কলমের হিসাব করা। নূতন ফাউণ্টেন্‌পেনটা লুকাইয়া একটু একটু দেখিত, আবার সন্তর্পণে লুকাইয়া রাখিয়া দিত। টাকা পয়সাগুলি ঠিক জায়গায় আছে কি-না, একটুখানি হাত লাগাইয়া দেখিত, তারপর আস্তে একটা টাকা ট্যাকে গুঁজিয়া ময়লা জামাটা গায়ে দিয়া ইস্কুলে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইত। ঘরে গিয়া খাইতে বসিত, বলিত, "শুবি ভাত দিয়ে যা। বুড়ো ধাড়ি মেয়ে সারাদিন কেবল লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়ায়।"

কথা শুনিয়া শোভা রাগিয়া উঠিত। বলিত, "ছি—ছি—ছি, এত বড় ছেলে হয়েছিস, কথাটা পর্য্যন্ত বল্‌তে শিখিস নি।"

নারায়ণ উত্তর দিত, "দেখ শুবি, তোর সর্দ্দারি কর্‌তে হবে না, শেষকালে কিন্তু কাঁদ্‌তে হবে, বলে দিচ্ছি।"

"ইস্, তোর কথায়ই কাঁদ্‌ব কি না—লেখাপড়াতে নেই, ছোটলোকের ছেলের সঙ্গে মিশে একেবারে গোল্লায় গেলি।"

"গোল্লায় গেলুম কিরে? কি দেখেছিস্ যে অত বড় বলিস্?"

"কি, না দেখি? তুই ত চোর! চোর না হ'লে তুই এত জিনিষ কোথায় পাস্?"

যেথানে ইচ্ছা সেখানে পাই—তোর কি, তুই বল্‌বার কে?

"ওরে আমার রে, বোল্‌ব না? চোর আবার কথা বলে!"

তুইজনের ঝগড়া শুনিয়া কনক কলতলা হইতে তাড়াতাড়ি উপস্থিত হইল। প্রশ্ন করিল, "কি? বুড়ো বুড়ো ছেলেপুলেগুলোও দিন-রাত্তির ঝগড়া কর্‌বি?"

নারায়ণই আগে চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। বলিল, "আমায় কেবল চোর চোর বল্‌ছে।"

কনক শোভাকে বলিল, "বুড়ো মেয়েটা ওর পেছনে লেগেই আছিস্।"

শোভা রাগে দুঃখে লাল হইয়া উঠিল। বলিল, "খেয়াল ত কিছু রাখ না। সারাদিন কোথায় কোথায় ঘুরে বেড়ায়, কোত্থেকে এত সব কিনে নিয়ে আসে, কিছু খোঁজ রাখ?"

মুহূর্ত্তে কনকের মুখখানা শাদা হইয়া গেল।

কিন্তু নারায়ণ কাঁদিয়া বলিল, "হঁ্যা—একখানা ঘুড়ি কিনেছি,—এই। তাও কেলোর। বিকেলেই আবার নিয়ে যাবে।"

মায়ের মুখখানা দেখিয়া শোভা ব্যস্ত হইয়া পড়িল। নারায়ণকে বলিল, "সে কথা আগে বলিস্‌নি কেন? কি-ই বা বলেছি—কেঁদে-কেটে অস্থির?"

নারায়ণ ও শোভার কথা শুনিয়া কনকের মনে একটু আশ্বাস আসিল। শোভাকে প্রশ্ন করিল, "আর কিছু কিনেছে না-কি?"

শোভা কথাটা লুকাইল। মাথা নাড়িয়া "না" বলিল।

কিন্তু সারাদিনই নারায়ণ কি করে, না করে, সব শোভা লক্ষ্য করিত। বুঝিতও সব। মাঝে মাঝে ধমকাইতে যাইত, কিন্তু সে এত চীৎকার করিয়া উঠিত যে, শোভার আর কিছু বলিতে সাহস হইত না। পাছে আবার কেউ জানিয়া ফেলে—ভয়ে চুপ করিয়াই থাকিত।

শোভার আশঙ্কাই শেষে সত্য হইয়া দাঁড়াইল।

সহসা বাড়িতে এক কাণ্ড ঘটিল, কর্ত্তার মনিব্যাগটা পাওয়া যাইতেছে না। কেহ কোথাও তুলিয়া রাখে নাই—লয়ও নাই। কি হইয়াছে কেহ বলিতেও পারে না।

আশঙ্কায় কনকের বুকটা দুরদুর করিয়া উঠিল। নারায়ণকে কত বুঝাইয়া বলিল, "নিয়ে থাকিস্ বের ক'রে দে, আমি কিছু ব'ল্‌ব না।"

নারায়ণ কিছুতেই স্বীকার করে না, জিজ্ঞাসা করিলে বরং আরও রাগ করিয়া ওঠে।

কনক সকলের অগোচরে শোভাকে বলিল, "দেখিস্ ত খুঁজে ওর জিনিষপত্র। আমার কপালে আর শান্তি নেই! কত যে দুর্ভোগ আছে কে জানে?"

শোভা বুঝিল নারায়ণ ছাড়া আর কেহ লয় নাই। তবু মাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিল, "আচ্ছা, দেখ্‌ব। কিন্তু ও নেয়নি, আমি জানি! কোনদিনও ত ওর সে অভ্যেস দেখিনি! ভুলে দাদামশাই হয়ত কোথাও রেখেছেন, খুঁজলেই পাওয়া যাবে।"

শোভা নারায়ণের জিনিষপত্র তন্ন তন্ন করিয়া ব্যাগটা বাহির করিল। চুপি চুপি নারায়ণকে শুধাইল, "নিয়ে থাক্‌লে স্বীকার কর্। আমি কাউকে বল্‌ব না।"

নারায়ণ অস্বীকার করিল। বলিল, "বাড়িতে এত লোক থাক্‌তে আমাকে বল্‌তে লজ্জা হয় না? আমি কি চোর, আমি কেন নিতে যাব?"

শোভার সহ্য হইল না, বলিল, "কেন নিতে যাবি? এখানে কে রেখেছে? মা, না আমি?"

নারায়ণ জবাব দিল, "তা আমি কি জানি?"

রাগে দুঃখে শোভা চীৎকার করিয়া বলিল, "হতচ্ছাড়া ছেলে—আবার মিছে কথা বলিস্?" বলিয়া নারায়ণকে মারিতে সুরু করিল।

নারায়ণ এত যে মার খাইল, তবু টুঁ শব্দটি পর্য্যন্ত করিল না।

শোভা এক সময় অতি সন্তর্পণে ব্যাগটা দাদামশায়ের বিছানার নীচে রাখিয়া আসিল।

নারায়ণ মার খাইয়া যা মুখে আসিল শোভাকে তাই বলিয়া গালাগালি করিল। এমন কি তাহার উপর কলঙ্ক দিতেও নারায়ণের মুখে বাধিল না।

শোভা না-কি লুকাইয়া কাহাকে দেখে, কি ইঙ্গিত করে! ছাদে দাঁড়াইয়া পাশের বাড়ির কাহার সঙ্গে ভাব করে,—এই সব!

কথাটা আশেপাশেও ছড়াইয়া পড়িল, পড়্‌শীরাও ইহা লইয়া কানাঘুষা করিতে সুরু করিল।

পাঁচজনে পাঁচ কথা বলিলে শুনিতেই হয়। পাঁচের মুখ বন্ধ করা যায় না।

শোভা এত বড় হইয়া উঠিয়াছে যে, তাহাকে না-কি ঘরে রাখাই অসাধ্য। হইবেও বা! কিন্তু তা'র জন্য শোভাকেই উঠিতে-বসিতে গালাগালি খাইতে হয়। যেন বড় হইয়া সে কত বড় অপরাধই করিয়াছে।

বিবাহ দিতে পারে না, নাইবা দিবে! তাহার উপর এই দোষারোপ যেন তাহার মাথাটি হেঁট করিয়া বুক ভাঙিয়া দিয়া গেল।

একদিন সত্যই আন্‌মনে জানালার কাছে দাঁড়াইয়া এক অপরাধ করিয়া বসিল।

শোভা এম্‌নি দাঁড়াইয়া ছিল, কিন্তু অন্য বাড়ি হইতে একটি বদ্‌ছেলে চোখ মুখ ও দেহের বিশ্রী ভঙ্গী করিয়া তা'র দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছিল।

বৃদ্ধ এই ব্যাপারটি কি করিয়া যেন দেখিয়া ফেলেন। শোভাই তাঁহার কাছে দোষী সাব্যস্ত হইল। কিন্তু বৃদ্ধ কাহাকেও বলিলেন না। শোভাকে কোনও রকমে পার করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। যেমন-তেমন একটা লোকের হাতে সঁপিয়া দিতেও তাঁর আপত্তি নাই। পুরুষমাত্রই যেন তার কাছে বরণীয় পাত্র, বাছ-বিচারের কথা যেন মনেই আসিল না।

কিন্তু ভাল পাত্রই জুটিয়া গেল। এ যেন শোভারই বরাত।

এই দুর্দ্দিনের মধ্যে কনক সুদিনের আলো এই প্রথম দেখিতে পাইল। সেই আলোতে তার অন্ধকার অন্তরটি রঞ্জিত হইয়া উঠিল, অন্তরের পুরাতন দাগগুলিও ক্ষীণ হইয়া আসিল।

সব গোছগাছ করিতে-না-করিতেই বিবাহের দিনটি আসিয়া পড়িল। আজ বাদে কালই শোভার বিবাহ।

আত্মীয়-স্বজনে ছোট বাড়িখানা একেবারে পরিপূর্ণ।

বিবাহের যত কাজ সবই কনকের এক হাতে। ভারী কাজেও শ্রান্তি বোধ করে না। রান্নাঘর হইতে দালানে, আবার দালান হইতে রান্নাঘরে কেবল ছুটাছুটি চলিল।

সারাদিন খাটিয়া খাটিয়া শুইতে রাত প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছিল। নিশুতি রাতে সকলেই ঘুমে অচৈতন্য। হাতের আলোটা নিবাইয়া দিয়া কনক অন্ধকারে হাতড়াইতে হাতড়াইতে ঘরে ঢুকিল।

ঘরের এককোণে একটা বাক্সের আড়ালে হ্যারিকেন লণ্ঠনটি মিট্ মিট্ করিয়া জ্বলিতেছে। অস্পষ্ট আলোকে পরিচিত ঘরটার কয়েকটা জিনিষ একটু একটু নজরে পড়িতেছিল।

কনক আপনার জায়গায় শুইয়া পড়িল। কিছুক্ষণ এপাশ ওপাশ করিতে করিতে তন্দ্রা আসিল, হাত হইতে পাখাখানা পড়িয়া গেল।

কিন্তু পাশে মেয়েটি একটু শব্দ করিয়া উঠিতেই আবার ঘুম ভাঙিয়া গেল। বাতাস দিবে বলিয়া হাত বাড়াইল। পাখার বদলে কাহারও হাতের মত কি যেন তার হাতে ঠেকিল। কনক তাড়াতাড়ি হাত বাড়াইয়া লণ্ঠনটি উজ্জ্বল করিয়া দিল। দেখিল একটি লোক মেয়েটির গলা হইতে হারছড়া লইবার চেষ্টা করিতেছে। লোকটির হাতখানা শক্ত করিয়া ধরিয়া 'চোর' বলিয়া চীৎকার করিতে গিয়াই কনক থামিয়া গেল। আলোতে পরিচিত মুখখানা দেখিয়া চমকিয়া উঠিল। চাপাকণ্ঠে প্রশ্ন করিল, "তুমি?—তুমিই চুরি কর্‌তে এসেচ?" লোকটিও চিনিতে পারিল। তার মুখখানি ফ্যাকাশে হইয়া গেল। লোকটি জোর করিয়া আপনাকে মুক্ত করিবার চেষ্টা করিল।

কনক লোকটির হাতখানা ধরিয়া বারাণ্ডায় লইয়া গেল। বলিল, "তোমার একটু লজ্জা হয় না? ছিঃ ছিঃ! তোমায় আমি পুলিসে ধরিয়ে দোবো!"

লোকটি স্বামিত্বের দোহাই দিয়া বলিল, "আমাকে পুলিসে দেবে? আমি না তোমার স্বামী?"

কনক রুষ্টকণ্ঠে জবাব দিল, "স্বামীই বটে, কিন্তু আজ ত স্বামী হয়ে আসনি! চোর হ'য়ে এসেছ! চোরকে আমি স্বামী ব'লে ভাব্‌তেও পারিনে! আমি তোমায় ঘৃণা করি!"

এত কথায়ও লোকটির মুখে কোন ভাবের পরিবর্ত্তন হইল না। হয়ত কনকের কোনো কথাই তার অন্তরকে বিদ্ধ করিল না।

কনক বিদ্ধই করিতে চায়। বলিল, "দাঁড়াও—আমি চেঁচাই, সবাই তোমায় মেরে হাড় গুঁড়িয়ে দিক্, আমি আজ তাই দেখ্‌ব।"

লোকটির অসহ্য বোধ হইল। কাপড়ের নীচে হইতে একটি ঝক্‌ঝকে ছোরা বাহির করিয়া কনককে ভয় দেখাইয়া বলিল, "শীগ্‌গির ছাড়,—নইলে ভাল হবে না!"

কনক বলিল, "না, কিছুতেই না, আমি ছাড়ব না। তুমি আমাকে খুন ক'রে ফেলো,—তাই আমি চাই! বেঁচে থেকে আমার কোন সুখশান্তি নেই।"

লোকটি কনকের হাত হইতে নিজের হাতখানি ছিনাইয়া লইয়া দীর্ঘ প্রাচীর টপকাইয়া পলাইয়া গেল।

কনক কতক্ষণ সেখানে দাঁড়াইয়া থাকিয়া তার স্বামীর পলায়ন-কৌশলই দেখিল। তারপর টলিতে টলিতে ঘরের দিকে ফিরিয়া গেল।

আসিয়া দেখিল তার পাশেই যে মেয়েটি শুইয়া ছিল সে দরজার কাছে দাঁড়াইয়া আছে।

কনককে দেখিয়াই মেয়েটি প্রশ্ন করিল, 'কে এসেছিল মাসীমা?"

উত্তর দিতে গিয়া কনক থতমত খাইয়া গেল। ঠিক করিয়া গুছাইয়া উত্তর দিতে পারিল না। বলিল, "কই? না—কেউ নয়। চল শুইগে।"

বলিয়া মেয়েটিকে এক রকম টানিয়া লইয়া বিছানায় শুইয়া পড়িল।

মেয়েটি চুপ করিয়াই থাকিল। তার কাছে সবই যেন রহস্য বোধ হইল।

পরের দিন সকালে উঠিয়া মেয়েটি সকলকে বলিয়া দিল,—কে যেন শেষরাতে আসিয়াছিল, কনক অনেকক্ষণ তাহার কাছে দাঁড়াইয়া ছিল। কি যেন কথাবার্ত্তাও হইয়াছে।

সকলেই কনককে নানাপ্রকার প্রশ্ন করিল। কনক বলিল, "কি যে বল তোমরা তার ঠিক নেই। একটা শব্দ শুনে রাতে একবার বাইরে গিয়েছিলাম, দেখ্‌লাম কেউ নয়।"

কিন্তু কাহারও বিশ্বাস হইল না। কথাটা অবিলম্বে রাষ্ট্র হইয়া পড়িল।

কনকের সাক্ষাতে অসাক্ষাতে তাহার চরিত্র সম্বন্ধে নানারূপ সমালোচনা চলিতে থাকিল। ব্যাপারটা অত্যন্ত হীন রূপ ধারণ করিল। বাড়িতে মস্ত কোলাহলের সৃষ্টি হইল। শেষে সমস্তই বরপক্ষের কানে গিয়া পৌঁছিল।

তাহারা এই মাসীর মেয়ে লইতে কিছুতেই রাজী হইল না। তাহাদের ছেলে লইয়া তাহারা দেশে ফিরিয়া গেল।

কনক মুহ্যমান হইয়া পড়িল। এরূপ যে হইবে, তাহা স্বপ্নেও সে কল্পনা করে নাই। এ দুঃখ রাখিবার যেন স্থান

নাই। তার মেয়ে কোথায় রাজরাণী হইবে, আর কি হইল ?

স্বামী যেন দুর্গ্রহের মতই আসিয়াছিল, একেবারে দুঃখের চূড়ান্ত করিয়া রাখিয়া গেল।

স্বামী যাহার অমানুষ, তাহাকে হয়ত জগতের সমস্ত প্রকারের দুঃখই সহ্য করিতে হয়!

করিতে হয় বলিলেই ত করা যায় না! সেও ত রক্তমাংসের মানুষ! আর দশজন যেমন, সেও তেমনি।

তাহার মত দুঃখ হয়ত আর কাহারও ভোগ করিতে হয় না। কিন্তু সেও একদিন জগতে সুখীই ছিল! সেদিন ছিল তার কত সম্মান, কত সমাদর! আর আজ ?

আপনার জীর্ণ ইতিহাসখানা একবার উল্টাইয়া-পাল্টাইয়া দেখিল।

কত স্মৃতিই মনে পড়িল!

বড় ঘরে তার বিবাহ হইয়াছিল। শ্বশুরের একমাত্র পুত্রবধূ, কোনদিন জ্বালা-যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় নাই। আদরই বরাবর পাইয়া আসিয়াছে। তারপর শ্বশুরের অভাবে স্বামী একে একে সব নষ্ট করিল। অবশেষে অভাবের তাড়নায় চুরি করিয়া একদিন জেলে গেল।

সেই অবধি দুঃখই চলিয়াছে। এর যেন আর শেষ নাই।

অন্ধকার ঘরে মাটির উপর শুইয়া শুইয়া কত কথাই কনক ভাবিত। খাওয়া নাই, ঘুম নাই, দেহের দিকে দৃক্‌পাতও করিত না।

সে না-খাইয়া মরিলে কা'র কি ?—সন্তান দুইটি হয়ত ভাসিয়া যাইবে। হঠাৎ নারায়ণের কথা মনে পড়িল। আজ সারাদিন সে বাড়িতে নাই। ডাকিল, "শোভা!"

শোভা জাগিয়াই ছিল, উত্তর করিল, "এ্যাঁ"

"নারাণ বাড়ি এসেছে ?"

"কই—না ? এখনও অসেনি।"

"এত রাত্তিরে বাইরে ঘুরে ঘুরে কি করে ? একেবারেই লক্ষীছাড়া হয়েছে! ওটাও মানুষ হ'ল না"—বলিয়া কনক একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া পাশ ফিরিয়া শুইল।

তখনই নারায়ণ পা টিপিয়া টিপিয়া ঘরে ঢুকিল। জামা ছাড়িয়া শুইয়া পড়িল।

কনক বলিল, "এত রাত অব্‌ধি এখনও বাইরে বাইরে ঘুরে বেড়াস্? নিজেদের অবস্থাও বুঝিস্‌নে! যা ইচ্ছে তাই কর্, আমি সবই সইতে প্রস্তুত আছি।"

কেহই কোনো উত্তর দিল না। কনক ঘুমাইতে চেষ্টা করিল।

দিন যায়, রাত ঘনাইয়া আসে। রাত পোহায়, আবার দিন আসে।

সুখে হউক্, দুঃখে হউক্, কনকের দিনগুলি কোন-রকমে কাটিয়া যাইতেছে।

নারায়ণ প্রায়ই অনেক রাতে বাড়ি ফিরিত।

কনক জিজ্ঞাসা করিলেই বলিত, "কাজ ছিল। কাজ না থাকলে কি বাইরে থাকি ?"

কনককে চুপ্ করিয়াই থাকিতে হয়। কিন্তু অত রাত্রিতে যে নারায়ণের কি কাজ থাকে, ভাবিয়া পাইত না। সন্দেহে মনটা আচ্ছন্ন হইয়া উঠিত। ভাবিত, কপালে আরও দুঃখ আছে, সেটুকু নারায়ণ পরিপূর্ণ না করিয়া ছাড়িবে না!

কনকের আশঙ্কা মিথ্যা নয়, নারায়ণ দলে পড়িয়া বাপের পথই অনুসরণ করিল।

সেদিন চুরি করিয়া কা'র একটা চাম্‌ড়ার তোরঙ্গ লইয়া আসিয়াছে।

কনক কি করিবে, কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া তোরঙ্গটি লইয়া তার পিতার কাছে উপস্থিত হইল। বলিল, "এবার ওকেও পুলিসে ধরবে, আর রক্ষে নেই। এই দেখুন, কি করেছে।"

দেখিবার কি আর আছে! বৃদ্ধ মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন। নারায়ণকে ডাকিয়া তিরস্কার করিলেন। শুধু তিরস্কারই নয়—মারিতেও কসুর করেন নাই। হিতে বিপরীত হইল।

পরদিন ভোরবেলা বৃদ্ধ ঘুম হইতে উঠিয়াই দেখেন তাঁর ঘরের দরজাটা খোলা। শিয়রের কাছে যে ক্যাস্ বাক্সটা ছিল তাহাও নাই। "সর্ব্বনাশ হয়েছে"—বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন।

চীৎকার শুনিয়া সকলেই ব্যস্ত হইয়া বৃদ্ধের কক্ষে

প্রবেশ করিল। ঘরের অবস্থা দেখিয়া কাহারও কিছু বুঝিতে বাকী রহিল না।

কনক শোভাকে প্রশ্ন করিল, "নারাণ কোথায় শোভা?"

শোভা তাড়াতাড়ি নারায়ণকে দেখিতে ছুটিয়া গেল।

কিন্তু নারায়ণ কোথায়, কে জানে? মশারির নীচে সে নাই, বিছানা খালি পড়িয়া আছে।

শোভা চীৎকার করিয়া বলিল, "কই—নারাণ ত ঘরে নেই, মা।"

"নেই? কি বল্‌ছিস্, নারাণ ঘরে নেই?" বলিতে বলিতে কনক উঠানে আসিয়া দাঁড়াইল। কিন্তু দাঁড়াইবার শক্তি যেন তার কে হরণ করিয়া লইয়াছে, আর দাঁড়াইতেও পারে না।

বৃদ্ধ তর্জ্জন-গর্জ্জন করিতে সুরু করিলেন। নারায়ণকে পাইলে তিনি আর রক্ষা রাখিবেন না, বারংবার সেই কথাই ঘোষণা করিতে লাগিলেন। কিন্তু বৃথাই তাঁহার আস্ফালন। নারায়ণকে হয়ত শীঘ্র আর পাওয়া যাইবে না।

কনক ভাবিল, জেলের কক্ষগুলি ইহাদের জন্যই তৈয়ারী হইয়াছে। জেলই ইহাদের উপযুক্ত স্থান!

কিন্তু,—সে কোথায় যাইবে? তার উপযুক্ত স্থান কি আজও তৈরি হয় নাই?

দুঃখের মোট বহিবার জন্যই জন্ম, জীবনব্যাপীই বহিয়া বেড়াইতে হইবে! শেষ আটটিও বুঝি ফেলিয়া যাইবার জো নাই।

পাষাণের পীড়ন

শ্রীঅজিত মুখোপাধ্যায়

আঙ্গিনায় মোর ফোটে নাকো কোনও ফুল
রোদের সোনাটি আসে নাকো অভিসারে
তাই ত বন্ধু পদে পদে হয় ভুল
প্রতি নিমেষেই ভুলি তোমা বারে বারে॥
শরৎ-শেফালি মৌন উষার মনে
গোপন দানের খুশী যবে দিল এঁকে
আমি পড়েছিনু পাষাণকারার কোণে
কেহ ত বন্ধু আনেনি বাহিরে ডেকে?
তৃণ-নিঃশ্বাসে শীতল শেফালি ঝরা
ধরার বুকেতে মরার সুখেতে হাসে
তাদেরই চরণে আকুল আঁচল ভরা
অচেতন মন চিরদিনই ভালবাসে!
কিন্তু বন্ধু, সে লগনও গেল বয়ে
মনের কুটীরে হ'ল না প্রদীপ জ্বালা
আলো, হাসি, খুশী সব গেল অপচয়ে
ঘিরিল তোমারে কভু আঁধি, কভু আলা!
ভোরের ভূপালী সোনালী রোদের সুরে
স্মৃতির সোহাগে আকুল করেছে পথ,
স্বপ্নকাতর প্রান্তর এল ঘুরে
আলো-দুলালের লক্ষ চাকার রথ!
ফিরে গেল আলো রুদ্ধ দুয়ারে হানি
শুকাল শেফালি সারা দুপুরের রোদে;
রেখে গেল বুকে ব্যথা বিস্মৃতিখানি
নির্ম্মল মন পঙ্কিল অবরোধে॥
তথাপি বন্ধু ক্ষণে ক্ষণে তোমা চিনি
পিয়াসী এ হিয়া ক্ষণে তোমা ভালবাসে;
মনের কোণেতে বেজে ওঠে কিঙ্কিণী
ভ্রষ্ট ক্ষণের নষ্ট স্মৃতিও আসে॥



চিরঞ্জীব শর্ম্মা

আদিশূর যে পাঁচ জন ব্রাহ্মণ বাঙ্গালায় লইয়া আসেন, তাঁহাদের মধ্যে দক্ষ একজন। ইনি কাশ্যপগোত্রের লোক ছিলেন। ইঁহার বংশে ষোল জন লোক গ্রাম প্রাপ্ত হন এবং গ্রামীণ উপাধি লাভ করেন। গ্রামীণদিগকে বাঙ্গালায় গাঞি বা গাঁই বলে। ঘটকদের কথায় বলিতে গেলে বলিতে হয়—কাশ্যপগোত্রে ষোল গাঁই। এই ষোল গাঁইয়ের মধ্যে চাটুতি গাঁইয়ের ছয় ঘর বল্লালের নিকট কৌলীন্য মর্য্যাদা লাভ করেন। তাঁহারা আপনাদের চট্টোপাধ্যায় বলিয়া পরিচয় দেন। তাঁহারা কখনও দক্ষের দোহাই দেন না।

আমাদের চিরঞ্জীব শর্ম্মা দক্ষের দোহাই দিয়া আত্মপরিচয় দিয়াছেন। তাহাতে বুঝিতে হইবে, তিনি কুলীন নন—চট্টোপাধ্যায় নন। কাশ্যপগোত্রের আর যে পনরটী গাঁই আছে, তাহার কোনওটীতে তাঁহার জন্ম হইয়াছে। সেটী কোন্ গাঁই, তাহা আমরা জানি না। তবে চিরঞ্জীব শ্রোত্রিয় ছিলেন, এটা ঠিক।

এই বংশে ইংরেজী ১৬০০ অব্দের কাছাকাছি কোন সময়ে কাশীনাথ নামে এক ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেন। তিনি জ্যোতিষশাস্ত্রে খুব পণ্ডিত ছিলেন। তিনি হাত দেখিয়া লোকের ভাগ্যের কথা বলিতে পারিতেন—তিনি লোকের আকৃতি দেখিয়াও তাহার স্বভাব-চরিত্র এবং ভূত-ভবিষ্যৎও বলিতে পারিতেন। হাত দেখিয়া ভাগ্য গণনার নাম সামুদ্রক শাস্ত্র। কাশীনাথের উপাধি ছিল—সামুদ্রকাচার্য্য।

তাঁহার তিন পুত্র ছিল—রাজেন্দ্র, রাঘবেন্দ্র, মহেন্দ্র। ইঁহারা সকলেই কবি ও পণ্ডিত ছিলেন। রাঘবেন্দ্রের প্রতিভা খুব উজ্জ্বল ছিল। ইনি অনেক শাস্ত্র পড়িয়াছিলেন। ইনি ভবানন্দ সিদ্ধান্তবাগীশের ছাত্র ছিলেন।

ভবানন্দ সিদ্ধান্তবাগীশ সুপ্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক। ন্যায়শাস্ত্রের মূলগ্রন্থ তত্ত্বচিন্তামণির উপর রঘুনাথ শিরোমণি যে দীধিতি নামে টীকা করেন, তিনি তাহার উপর প্রকাশিকা নামে টীকা লেখেন। এই গ্রন্থ পণ্ডিতসমাজে ভবানন্দী নামে প্রসিদ্ধ। ভবানন্দী বাঙ্গালা দেশে বড় চলে না। চলে পশ্চিমে, চলে মহারাষ্ট্রদেশে। মহাদেব পুন্তামকর নামে একজন মহারাষ্ট্রদেশীয় পণ্ডিত ভবানন্দীর উপর দুই টীকা লেখেন। একখানির নাম—সর্ব্বোপকারিণী। এখানি ছোট। আর একখানি বড় টীকা লেখেন। ইহার নাম ভবানন্দীপ্রকাশ। ভবানন্দী বাঙ্গালায় চলিল না কেন? ভবানন্দের টোল ছিল নবদ্বীপে। তিনি মুখোপাধ্যায় ছিলেন। বোধ হয়, তাঁহার কুল ভাঙ্গিয়াছিল। কিন্তু তিনি ঘোর তান্ত্রিক ছিলেন এবং তান্ত্রিক হইলে যাহা হয়—অত্যন্ত মাতাল ছিলেন। তাই নবদ্বীপের পণ্ডিতেরা তাঁহাকে নবদ্বীপ হইতে তাড়াইয়া দেন। তখন তিনি কাটোয়া ও দাঁইহাটের মধ্যে গঙ্গাতীরে নলাহাটী নামক স্থানে বাস করিতে থাকেন। তাঁহার বংশের পৌত্র ও দৌহিত্রে নলাহাটী এককালে একটা বড় পণ্ডিতসমাজ হইয়া উঠিয়াছিল।

রাঘবেন্দ্র নানাশাস্ত্রে পণ্ডিত ছিলেন এবং তাঁহার অসাধারণ স্মৃতি-শক্তিও ছিল। তাঁহার পাশে বসিয়া একশত জন লোকে একশতটী কবিতা পাঠ করিল। তিনি প্রত্যেক্যের কবিতা হইতে এক একটি কথা লইয়া নূতন এক শতটী কবিতা করিয়া দিলেন। এইটী তাঁহার অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল। লোকে তাঁহাকে শতাবধান বলিত। সাধারণতঃ শতাবধান বলিতে যে এক শত বিষয়ে মন দিতে পারে, তাহাকে বুঝায়। পর পর এক শত লোক কথা বলিল—সেই মনে করিয়া যে বলিতে পারে তাহাকে শতাবধান বলে। কিন্তু রাঘবেন্দ্র আর একরূপ শতাবধান। সমস্যাপূরণেও রাঘবেন্দ্রের যথেষ্ট ক্ষমতা ছিল। তিনি নানারূপ সমস্যা পূরণ করিতে পারিতেন। তিনি চারিখানি বই লিখিয়াছিলেন। একখানির নাম মন্ত্রদীপ, আর একখানির নাম রামপ্রকাশ। একখানি বৈদিকমন্ত্রের বই আর একখানির স্মৃতির। মন্ত্রের অর্থ না জানার দরুণ যে সকল বৈদিক কার্য্য তখনও চলিতেছিল—তাহাতে অনেক গোল ছিল। সেই গোল দূর করিবার জন্য তিনি মন্ত্রদীপ লেখেন। এখানি বোধ হয়, বৈদিকমন্ত্রের ব্যাখ্যা ও সিদ্ধান্তগ্রন্থ। রামপ্রকাশ ধর্ম্মকার্য্যের কালনির্ণয়ের বই।…

রাঘবেন্দ্রের একটী পুত্র হইয়াছিল। পিতা রাশি দেখিয়া নাম রাখিলেন—বামদেব। তাঁহার জেঠা মহাশয় তাঁহাকে আদর করিয়া বলিতেন—তুমি চিরঞ্জীব। তিনি জেঠার দেওয়া নামেই প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। বালককালে তাঁহার প্রতিভা দেখিয়া অনেকেই মুগ্ধ হইয়া যাইত। তিনি পিতার নিকট প্রায় সমস্ত শাস্ত্র পড়িয়াছিলেন। স্বীয় প্রতিভার বলে অপঠিত শাস্ত্রেরও তিনি অধ্যাপনা করিতেন।

তিনি অনেকগুলি বই লিখিয়াছেন এবং অনেক শাস্ত্রে বই লিখিয়া গিয়াছেন,—দর্শন, ন্যায়, কাব্য, নাটক, অলঙ্কার, ছন্দ ইত্যাদি। তিনি যশোবন্ত সিংহ নামক রাঢ় দেশের একজন জমিদারের সভাপণ্ডিত হইয়াছিলেন। এই যশোবন্ত সিংহ ঢাকার নায়েব দেওয়ান হইয়া প্রভূত যশ ও অর্থ উপার্জ্জন করেন। তখন মুর্শিদকুলি খাঁর জামাই বাঙ্গালার স্বাধীনপ্রায় রাজা—নামে মাত্র দিল্লীর সুবেদার। ঢাকায়ও তখন একজন ফৌজদার থাকিতেন। যশোবন্ত তাঁহারই কাছে নায়েব ছিলেন। ১৬৬২ সালের পর কয়েক বৎসর ধরিয়া শায়েস্তা খাঁ বাঙ্গালার সুবেদার ছিলেন। তখন ঢাকা বাঙ্গালার রাজধানী। শায়েস্তা খাঁর সময় বাঙ্গালায় আট মণ করিয়া চাউল টাকায় বিক্রয় হইত। এটা একটা মস্ত কথা। শায়েস্তা খাঁ এই ব্যাপারের স্মৃতি রক্ষার জন্য ঢাকায় একটা গেট নির্ম্মাণ করেন ও তাহা বন্ধ করিয়া দিয়া যান এবং বলিয়া দিয়া যান—আর যাহার রাজত্বকালে টাকায় আট মণ চাউল হইবে, সেই এই গেট খুলিতে পারিবে। ১৭৩৩ খৃষ্টাব্দে যশোবন্তের নায়েব-দেওয়ানির সময় আবার টাকায় আট মণ চাউল বিক্রয় হয়। তাই তিনি মহা সমারোহে শায়েস্তা খাঁর গেট খুলিয়াছিলেন। চিরঞ্জীব এই যশোবন্ত সিংহের বাড়ীর পণ্ডিত ছিলেন বা তাঁহার সভা-পণ্ডিত ছিলেন। তিনি যে অলঙ্কারের বই লিখিয়া গিয়াছেন, তাহার নাম কাব্যবিলাস।…

তিনি তাঁহার কাব্যবিলাসে জয়সিংহ নামক এক নৃপতির উল্লেখ করিয়াছেন।…

এই জয়সিংহ বোধ হয়, জয়পুরের রাজা। ইঁহার নাম ছিল—সেওয়াই জয়সিংহ।...

ইনি ১৭৩৪ সালে দক্ষিণ হইতে অনেক বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ আনাইয়া জয়পুরে অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন। এই সময় বাঙ্গালী এক বৈদিক ব্রাহ্মণ জয়পুরনগর পত্তন করেন। ইঁহার নাম বিদ্যাধর। ইঁহার পূর্ব্বে আম্বের জয়পুরের রাজধানী ছিল।...

জয়পুরের রাজা মানসিংহ সম্বন্ধেও চিরঞ্জীব অনেক কথা বলিয়া গিয়াছেন।...বাঙ্গালায়—বিশেষ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত মহলে মানসিংহের যথেষ্ট নাম ছিল। তিনি অনেককে অনেক ভূমি ইত্যাদি দান করেন।...

চিরঞ্জীব তাঁহার কাব্যবিলাসে বিজয়সিংহ নামক এক রাজার গুণের কথা বলিয়াছেন। এই বিজয়সিংহ সম্বন্ধে আমরা কিছু জানি না; তিনি বলিয়াছেন, মৃগমদ পাত্র হইতে সরাইয়া লইলেও যেমন অনেক দিন পর্য্যন্ত তাহার গন্ধ থাকে, সেইরূপ বিজয়সিংহের মৃত্যু হইলেও তাঁহার যশ ভুবনবিস্তৃত ছিল।...

চিরঞ্জীব অত্যন্ত পিতৃভক্ত ছিলেন। তাঁহার যা-কিছু লেখাপড়া, তাহা পিতার নিকট হইতেই শেখা। তিনি পিতাকে শিবস্বরূপ বলিয়া মনে করিতেন এবং তাঁহা হইতে বড় অন্য দেবতা কেহ আছেন বলিয়া জানিতেন না। মাধবচম্পূ নামে তাঁহার যে কাব্য আছে, তাহার প্রত্যেক সর্গের সর্গ-ভঙ্গ শ্লোকে তিনি তাঁহার পিতার গুণগান করিয়াছেন।...

তিনি এই গ্রন্থখানি কৌতুকবশতঃ বা বাল্যকালের চাপল্যবশতঃ লিখিয়াছিলেন। বোধ হয়, তাঁহার পিতা যখন কাশীবাস করেন, তখন তিনি সঙ্গে ছিলেন। পিতার কাশীপ্রাপ্তি হইলে তিনি নবদ্বীপে ফিরিয়া আসিয়া এই গ্রন্থ প্রচার করেন। তিনি অতি বিনয়সহকারে নবদ্বীপের পণ্ডিতদিগকে এই গ্রন্থখানি গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন,

> বাগ্‌দেবীবদনাদনাদিরচনাবিন্যাসদীব্যন্নব-
> দ্বীপপ্রাপ্তজনৈরনেকদিবসং বারাণসীবাসিনঃ।
> বিদ্যাসাগরজাগরোন্নতমতের্ভাব্যা মমৈষা কৃতি-
> র্বিদ্বদ্ভিঃ কৃপয়া কয়াপি সহসা মাৎসর্য্যমুৎসৃজ্য তৈঃ॥

ইনি ইহাতে যে বিদ্যাসাগরের উল্লেখ করিয়াছেন, তিনি কে, তাহা ঠিক বলা যায় না। বাঙ্গালায় যত পণ্ডিত ছিলেন, তাহার মধ্যে এক বিদ্যাসাগরের নাম সুবিখ্যাত, তিনি কলাপ ও ভট্টির টীকাকার। কিন্তু তাঁহার কাল নির্ণীত হয় নাই।

ইনি কাব্যবিলাসে গুরুবিষয়া রতির উদাহরণে গুরু রঘুদেব ভট্টাচার্য্যের নাম করিয়াছেন। বোধ হয়, ইনি ইঁহার নিকট ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। ইঁহার মতে রঘুদেবের নিকট যাঁহারা অধ্যয়ন করিতেন, তাঁহাদের আর অন্য গুরুর উপাসনা করিবার কোনও দরকার হইত না। রঘুদেব, জগদীশ তর্কালঙ্কারের সমসাময়িক লোক। ইনি জগদীশের ছাত্র ছিলেন। ন্যায়শাস্ত্রে ইঁহার লেখা অনেকগুলি বই আছে।...

চিরঞ্জীব শর্ম্মার একখানা কাব্যের নাম মাধবচম্পূ। গদ্যপদ্যময় কাব্যের নাম চম্পূ। এই চম্পূর নায়ক শ্রীকৃষ্ণ। তাঁহার রাজধানী মধুপুর। তিনি একবার মৃগয়া করিতে গিয়াছিলেন। মৃগয়ায় যে সকল পশু লক্ষিত হয়, কবি সে সকলের বেশ বর্ণনা করিয়াছেন। তাহাদের আকার, প্রকার, গতি প্রভৃতির বেশ বর্ণনা দিয়াছেন। কিন্তু তিনি বোধ হয়, কখনও মৃগয়া দেখেন নাই—কখনও শিকার খেলিতে যান নাই। তাঁহার গ্রন্থে শিকারের আমোদ আমরা পাই না। কিন্তু তবু তিনি জানোয়ারদের যেরূপ প্রকৃতি বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতে আশ্চর্য্য হইতে হয়। 'নহি কিঞ্চিদবিষয়ো ধীমতাম্।' এই মৃগয়াব্যাপারে শ্রীকৃষ্ণের এক সহচর ছিলেন, তাঁহার নাম কুবলয়াক্ষ। এ নাম আমরা পুরাণাদিতে পাই না। মৃগয়ার বর্ণনায় জানোয়ারদের পরস্পর লড়াইয়ের বর্ণনাই বেশী। হাতীতে হাতীতে লড়াই, কুকুরে হরিণে লড়াই, সিংহে শূকরে লড়াই, বানরের উকুন খাওয়া—এই সকলই দেখিতে পাই।

অনেকক্ষণ মৃগয়া করিয়া শ্রীকৃষ্ণের তৃষ্ণা পাইল, তিনি এক হ্রদের ধারে বসিলেন। সেখানে কলাবতী নামে একটী মেয়ে স্নান করিতে আসিল। শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে দেখিলেন—কলাবতীও শ্রীকৃষ্ণকে দেখিল। উভয়ে উভয়ের মন চুরি করিয়া চলিয়া গেলেন।

শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় পৌঁছিলে কিছুদিন পরে এক ব্রাহ্মণ আসিয়া তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া গেল—'উড়িষ্যার রাজার কন্যা কলাবতীর স্বয়ংবর। সেখানে অনেক দেশের রাজা আসিবেন, আপনিও চলুন।'

স্বয়ংবরে আসিয়াছিলেন বাঙ্গালাদেশের রাজা, গৌড়দেশের রাজা, মিথিলার রাজা, কাশীর রাজা, নেপালের রাজা, দক্ষিণদেশের রাজা, কাশ্মীরের রাজা ও মধুপুরের স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ। স্বয়ংবরের যাহা ফল, তাহা ত জানাই আছে। কলাবতী শ্রীকৃষ্ণের কণ্ঠে মাল্য অর্পণ করিলেন—শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে লইয়া চলিলেন। রাস্তায় রাক্ষসদের সঙ্গে তাঁহার যুদ্ধ হইল। সে যুদ্ধে জয়ী হইয়া তিনি মধুপুরে কিছুকাল কলাবতীকে লইয়া আমোদ আহ্লাদে বসবাস করিতে লাগিলেন। এমন সময় নারদ আসিয়া তাঁহাকে দ্বারকায় যাইতে বলিলেন। তিনি দ্বারকায় গেলে কলাবতী বিরহে ছট্‌ফট্ করিতে লাগিলেন।

কিছুদিন পরে তিনি এক হংসকে দূত করিয়া দ্বারকায় পাঠাইলেন। হংস কলাবতী বিরহের অবস্থা বর্ণনা করিলে শ্রীকৃষ্ণ প্রকাশ করিয়া দিলেন—'ভারতখণ্ডে বড় রাক্ষসের উপদ্রব। আমি তাহা নিবারণ করিতে চলিলাম।' এই বলিয়া তিনি মধুপুরে কলাবতীর নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

তাঁহার আর একখানি বই বিদ্বোন্মাদতরঙ্গিণী, ইহাতে আটটী তরঙ্গ আছে। প্রথমটীতে কবির নিজের এবং বংশের পরিচয়। দ্বিতীয় তরঙ্গ হইতে গ্রন্থের আরম্ভ। এক প্রভুর বাড়ীতে অনেক পণ্ডিতের নিমন্ত্রণ হইয়াছে। তাঁহারা ক্রমে আসিতেছেন। প্রথম আসিলেন বৈষ্ণব—নাক হইতে মাথা পর্য্যন্ত তিলক; সমস্ত শরীরে শঙ্খ, চক্র, পদ্মের ছাপ; হলুদে ছোপানো কাপড়; গলায় তুলসীর মালা; মুখে হরিনাম। তিনি আসিয়া প্রভুকে আশীর্ব্বাদ করিলেন,—'নারায়ণ আসিয়া তোমার চিত্তে আবির্ভূত হউন।' তাহার পর শৈব আসিলেন। তাঁহার মাথায় জটা, কোমরে ব্যাঘ্রচর্ম্ম, সর্ব্বাঙ্গে বিভূতি আর আধখানা শরীর রুদ্রাক্ষে ঢাকা। তার পর শাক্ত আসিলেন—মাথায় জবাপুষ্প, গলায় মল্লিকা ফুলের মালা, ললাটে রক্তচন্দনের তিলক, গায়ে চন্দন মাখা। তাহার পর আসিলেন হরিহরাদ্বৈতবাদী ও নৈয়ায়িক—নৈয়ায়িকের হাত ধরিয়া আছেন বৈশেষিক। তাহার পর মীমাংসক, বৈদান্তিক, সাংখ্য পণ্ডিত ও পাতঞ্জলপণ্ডিত, পৌরাণিক, জ্যোতির্ব্বিদ্, কবিরাজ মহাশয়, বৈয়াকরণ, আলঙ্কারিক, নাস্তিক পর পর আসিলেন। নাস্তিক ঝাঁটা দিয়া পথ পরিষ্কার করিতে করিতে এবং পাছে কীট পতঙ্গ মারা যায়, এই ভয়ে সাবধানে পা ফেলিতে ফেলিতে আসিতে লাগিলেন। তাঁহার মস্তক মুণ্ডিত—চুলগুলি উপড়াইয়া ফেলা হইয়াছে। তিনি বলিতে লাগিলেন,—বঞ্চকেরা তোমাদের শিখাইয়াছে—

দেবতাদের অর্চ্চনা কর, প্রতিদিন জন্মান্তরে ভোগের জন্য পুণ্য কর, মহাযজ্ঞের জন্য হিংসা কর। এই সকল কথা তোমরা শুনিও না। যাহাতে প্রত্যক্ষ পদার্থ নাই, এমন পথে তোমাদের এই বুদ্ধি যাউক অর্থাৎ ধর্ম্ম সম্বন্ধে তোমাদের বুদ্ধি কল্পনার বিষয় হউক। সকলে হাসিয়া উঠিল এবং বলিল,—এ দুরাত্মা পাপিষ্ঠ কে, কোথা হইতে আসিল? সে বলিল,—আমি পাপিষ্ঠ দুরাত্মা, আর তোমরা ভারী পুণ্যশীল—কেবল বৃথা পশু হিংসা কর। মীমাংসক সদর্পে বলিলেন,—যজ্ঞে হত পশু স্বর্গে যায়। তাহাতে দেবতাদের তৃপ্তি হয়,—যজমানের অভিপ্রায় সিদ্ধ হয়। এমন বৈধ হিংসাকে তুমি অন্যায্য বল। নাস্তিক বলিল,—কি ভুল, দেবতা কোথায়, যজ্ঞ কোথায়, জন্মান্তরই বা কোথায়? মীমাংসক বলিলেন,—এ কি, বেদ-পুরাণশাস্ত্রে যে সমস্ত জিনিষের প্রশংসা আছে, তাহাকে তুমি নিন্দা করিতেছ?

নাস্তিক—বেদ ত বঞ্চকের কথা। তাহার প্রামাণ্য কি? পুরাণেরই বা প্রামাণ্য কি? তাহারা অতীন্দ্রিয় বস্তুর কথা দিয়া সমস্ত জগৎকে বঞ্চনা করে মাত্র।

মীমাংসক—কর্ম্ম যদি না থাকে, কি কারণে লোক সুখ-দুঃখ ভোগ করে?

নাস্তিক—কর্ম্ম কোথায়? কে দেখিয়াছে? কে সেই কর্ম্ম অর্জন করিয়াছে? যদি বল, জন্মান্তরকৃত কর্ম্ম, তবে তাহার প্রমাণ কি? সুখ-দুঃখাদি ত প্রবাহধর্ম্ম। মানুষ কখন সুখ, কখন দুঃখ ভোগ করে তাহার ঠিকানা নাই। বস্তুতঃ জগৎটাই অসৎ। আর যাহা কিছু দেখিতেছি, সমস্তই ভ্রম।

এই কথা শুনিয়া মীমাংসক চুপ করিয়া গেলেন। তখন বেদান্তী আসিলেন। তিনি বলিলেন,—ঠিক বলিয়াছ, জগৎ মিথ্যা ঠিক। কেবল সত্য এক ব্রহ্ম আছেন। তাহাতেই মিথ্যা জগৎকে সত্য বলিয়া ভ্রম হয়। নাস্তিক বলিলেন,—বেশ, বেশ, তুমি ত আমার মতেই আসিয়াছ। তবে আবার একটা ব্রহ্ম কেন? তোমার ব্রহ্ম কিরূপ?

বেদান্তী—তিনি ক্রিয়াহীন, নিরাকার, নির্গুণ, সর্ব্বগামী, তেজস্বরূপ, তিনি পরমানন্দ ও বাক্য এবং মনের অগোচর।

নাস্তিক—তবে আর মিথ্যা আকারশূন্য ক্রিয়াশূন্য একটা ব্রহ্ম লইয়া কি করিবে?

এই কথা বলিলে বেদান্তী চুপ করিয়া গেলেন। তখন লোকে নৈয়ায়িকের মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল। নৈয়ায়িক গর্ব্বভরে বলিলেন,—তুমি আপনার মতটা আগে পরিষ্কার করিয়া বল, তার পর অন্য কথা কহিও। যে কানা সে যদি বলে—তোমার চক্ষু সুন্দর নয়, তবে লোকে কেবল হাসিবে। নাস্তিক ভাবিলেন,—আমরা যুক্তিধারা বর্ষণ করি। এ দেখিতেছি, ঝড় হইয়া আমাদিগকে উড়াইয়া দিতে আসিতেছে। কিছু ভাবিয়া বলিল,—আমাদের মত শোন—মাধ্যমিকদিগের শূন্যবাদ, যোগাচারদিগের ক্ষণিক বিজ্ঞানবাদ, সৌত্রান্তিকদিগের জ্ঞানাকারানুমেয় ক্ষণিকবাহ্যার্থবাদ, বৈভাষিকদিগের ক্ষণিক বাহ্যার্থবাদ, চার্ব্বাকদিগের দেহাত্মবাদ এবং দিগম্বরদিগের দেহাতিরিক্ত দেহ-পরিমাণবাদ, আমাদের এই ছয়টী প্রস্থান। আমাদের সকলেরই এই সিদ্ধান্ত—স্বর্গ নাই, নরক নাই, ধর্ম্ম নাই, অধর্ম্ম নাই, এ জগতের কর্ত্তা, হর্ত্তা, ভর্ত্তা কেহ নাই। প্রত্যক্ষ ভিন্ন প্রমাণ নাই। দেহ ভিন্ন কর্ম্মফলভোগী কেহ নাই। সমস্তই মিথ্যা এগুলিকে যে সত্য বলিয়া মনে হয় সে কেবল মোহ। অহিংসাই পরম ধর্ম্ম, আত্মপ্রপীড়ন মহাপাপ, অপরাধীনতাই মুক্তি, অভিলষিত বস্তু ভক্ষণের নাম স্বর্গ।

তার্কিক উপহাস করিয়া বলিলেন,—যদি তোমার প্রত্যক্ষ ভিন্ন আর প্রমাণ না থাকে, তবে তুমি যখন বিদেশে যাও, তখন তোমার স্ত্রী বৈধব্য আচরণ করুক; কেন না, বিদেশগত আর মৃত, এই দুই জনই অদর্শন বিষয়ে তুল্য।

নাস্তিক বলিলেন,—মৃতের পুনর্বার দর্শন হয় না। কিন্তু যে বিদেশে গিয়াছে, তাহার পুনর্বার দর্শনের সম্ভাবনা আছে।

তার্কিক জিজ্ঞাসা করিলেন,—কিরূপে সম্ভাবনা আছে? সে যখন বিদেশে গিয়াছে, তখন না-আছের দিকেই সম্ভাবনা বেশী। তাহা হইলে, কেন শোক না হইবে?

নাস্তিক—পত্রাদির দ্বারা যখন খবর পাওয়া যায়, তখন কেন তাহার জন্য শোক করিবে?

তার্কিক—তাহা হইলে পত্রাদি পড়িয়া অনুমান করিয়া লইতে হইবে ত? তবে অনুমানও ত প্রমাণ দাঁড়াইল, এইরূপে শব্দও প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে; কেন না, যদি আপ্তবাক্যে তোমার বিশ্বাস না থাকে, তবে চিঠিতে তোমার বিশ্বাস কি?

নাস্তিক অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়া বলিলেন,—মানিলাম, শব্দ ও অনুমান প্রমাণ হইল। কিন্তু তাহাতে ঈশ্বরসিদ্ধি হয় কি করিয়া?

নাস্তিক যদি অনুমান ও শব্দকে প্রমাণ বলিয়া মানিলেন, তাহা হইলেই ত তিনি হারিয়া গেলেন। তাঁহার আর সে সভায় কথা কহা উচিত নহে। কিন্তু চিরঞ্জীব শর্ম্মা তাঁহাকে দিয়া আরও কথা কহাইয়াছেন।

এইরূপে নাস্তিক প্রতি পদেই হারে এবং হারিয়া একটা নূতন প্রশ্ন তোলে। সকল কথায় সে হারিয়া গেল। তখন সভার যিনি প্রভু ছিলেন—তিনি প্রথম নৈয়ায়িককে, তাহার পর মীমাংসককে, তাহার পর সাংখ্যমতবাদীকে, তাহার পর যোগবাদীকে আপন আপন মত ব্যক্ত করিতে বলিলেন এবং অন্য অন্য দর্শনের সহিত যে যে বিষয়ে তাঁহাদের বিবাদ আছে, তাহা ব্যাখ্যা করিতে বলিলেন। যোগশাস্ত্রজ্ঞ তাঁহার মত ব্যাখ্যা করিলে পর শৈব বলিলেন,—যোগীকে মুক্তি দিবার কর্ত্তা শিব। বৈষ্ণব বলিলেন, না, বিষ্ণু। তাহার পর রামাইত আসিয়া বলিলেন,—রাম। তখন তিনজনে ঝগড়া বাধিয়া গেল। মাঝে আর একজন আসিয়া বলিলেন, না, না, মুক্তি ত রাধা দিবেন। এইরূপে চার পাঁচ জনে খুব তর্ক-বিতর্ক হইতেছে, এমন সময় একজন সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ পণ্ডিত সভায় প্রবেশ করিলেন। প্রভু তাঁহাকে জানিতেন, তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া বিচারের মীমাংসা করিয়া দিতে বলিলেন। তিনি মীমাংসা করিলেন—হরি ও হরের অদ্বৈত জ্ঞানই মুক্তির কারণ এবং উপসংহারে বলিলেন,—

যে চাত্মনো নূনমভিন্নতায়াং
শরীরভেদাদপি ভেদমাহুঃ।
তেষাং সমাধানকৃতে হরেণ
দেহার্দ্ধধারী হরিরপ্যকারি॥

এই বইএ চিরঞ্জীব শর্ম্মা লোকায়ত, দিগম্বর জৈন, আর বৌদ্ধদের চারি দার্শনিক সম্প্রদায়কে এক করিয়া তুলিয়াছেন। তিনি লোকায়তদের জৈনদের মত পথ ঝাঁট দিতে দিতে যাইবার কথা বলিয়াছেন। কিন্তু তাহারা এরূপ কখনও করিত না। তাহাদের মত যথার্থ নাস্তিক। কেন না, যাহারা পরকাল মানে না, তাহারাই প্রকৃত নাস্তিক। লোকায়তেরা পরলোক মানিত না। কিন্তু বৌদ্ধ ও জৈন উভয়েই পরলোক মানে। তাহাদিগকে লোকায়তদের সহিত এক করা ভাল হয় নাই। যদি বল, উহারা সকলেই নিরীশ্বর; সেইজন্য

নাস্তিক বলিব,—তাহা হইলে সাংখ্যবাদী এবং মীমাংসকদিগকেও নাস্তিক বলিতে হয়। চিরঞ্জীব মনে করিতেন—যাহারা বেদ মানে না, তাহারাই নাস্তিক।

দর্শন শাস্ত্র সম্বন্ধে বিদ্বোন্মাদতরঙ্গিণীতে যে সমস্ত কথা আছে তাহা দর্শন শাস্ত্রের চটি বইএর অপেক্ষা অনেক বেশী। চটি বইএ এক এক দর্শনের সিদ্ধান্তগুলি মাত্র পাওয়া যায়—অন্য দর্শনের মতের খণ্ডন-মণ্ডন পাওয়া যায় না। চিরঞ্জীব দুইই দিয়াছেন। তাহাতে চিরঞ্জীবের বই সাধারণের খুব উপযোগী হইয়াছে এবং নাট্যাকারেও একটু রসাল ভাষায় লেখা বলিয়া ইহা সাধারণের নিকট খুব মিষ্ট লাগে। প্রায় একশত বৎসর পূর্ব্বে শোভাবাজারের রাজা কালীকৃষ্ণ দেব বাহাদুর এই গ্রন্থখানির একটী বাঙ্গালা তর্জ্জমা করিয়াছিলেন, তর্জ্জমা এখন আর পাওয়া যায় না—কিন্তু বৃদ্ধদের মুখে শুনিয়াছি তিনি আরও রসাল ভাষায় তর্জমা করিয়াছেন—পড়িবার সময় লোকে হাসি থামাইতে পারিত না। এইরূপ আমাদের স্বদেশী বইএর এখন যদি প্রচার হয়, তাহা হইলে বাঙ্গালীকে এখন আর দর্শন শাস্ত্রের জন্যে পরের দ্বারে ভিক্ষা করিতে যাইতে হয় না।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা,

সপ্তত্রিংশ ভাগ, ৩য় সংখ্যা, ১৩৩৭] শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী

শিশু-পরিপুষ্টির পরিমাপ

নিজ সন্তানের কোন বিশিষ্ট কার্য্য দেখিয়া পিতামাতা অনেক সময় তাহাকে 'অতি বুদ্ধিমান' ভাবিয়া মনে মনে গর্ব্ব অনুভব করেন এবং এই সন্তান যে ভবিষ্যতে একজন খ্যাত ব্যক্তি হইবে এরূপ ধারণা করিয়া অত্যন্ত পুলকিত হন। পুনরায় কিন্তু সেই সন্তানেরই অন্য কোন কার্য্য দেখিয়া বা কোন নির্দ্দিষ্ট কার্য্য করিতে সন্তানকে অক্ষম দেখিয়া পিতামাতা তাহাকে অতি নির্ব্বোধ ভাবেন এবং সেই সন্তানের ভবিষ্যৎ ভাবিয়া হতাশ হইয়া পড়েন।...

পিতামাতা নিজ নিজ সন্তানদিগকে একবার সুবোধ এবং অন্যবার নির্ব্বোধ ভাবেন কেন?

শিশুদের কোন্ বয়সে কোন্ কোন্ কার্য্য করিবার ক্ষমতা উন্মেষিত হয়, সে সম্বন্ধে ঠিক জ্ঞান না থাকায় জনক-জননী এই প্রকার ভুল ধারণা করিয়া থাকেন।

দশ মাসের শিশুর নিকট হইতে কোন খেলনা লইয়া তাহার সম্মুখে বস্ত্রাবৃত করিলে শিশু সেই খেলনা বস্ত্রের ভিতর হইতে বাহির করিতে পারে। ইহা দশমাসের শিশুর পক্ষে স্বাভাবিক। কিন্তু এই ঘটনা দেখিয়া কোনও শিশুর মাতা অতি আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন এবং সেই শিশুর সম্বন্ধে তৎক্ষণাৎ একটা উচ্চ ধারণা পোষণ করিয়া ফেলিলেন।

আবার এখন দিন না রাত্রি একথার উত্তর তিন বৎসরের শিশুর নিকট হইতে না পাইয়া আমার একজন বন্ধু তাঁহার সন্তানের হীন-বুদ্ধির কথা ভাবিয়া চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখিলেন। তিন বৎসরের প্রায় সকল শিশুই যে এ কথার উত্তর দিতে পারে না, এ বিষয় সম্যক ধারণা না থাকায় তিনি এত অধীর হইয়া পড়িয়াছিলেন।...

কোন্ বয়সের শিশু কি কি প্রকার প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে ও তাহার কি কি প্রকার কার্য্য করিবার ক্ষমতা জন্মায়, তাহার একটা তালিকা শিশু পরীক্ষা করিয়া প্রস্তুত করিয়াছি। আপনাদের অবগতির জন্য সেই তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল। আপনারা নিজ নিজ সন্তানদের পর্য্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন, তাহারা বয়সোপযোগী কার্য্য করিতে সক্ষম কি না।

ছয় মাসের শিশুর যে তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইয়াছে, যদি আপনাদের ঐ বয়সের শিশু তাহার মধ্য হইতে দুইটি বা তিনটি কার্য্য করিতে অক্ষম হয়, তাহা হইলেও বুঝিবেন আপনার শিশুর ক্ষমতা স্বাভাবিক। কিন্তু যদি চার কিংবা ততোধিক কার্য্য করিতে অক্ষম হয়, তাহা হইলে তাহা অস্বাভাবিক বলিয়া মনে করিবেন এবং চিকিৎসক ও মনোবিৎ দ্বারা শিশুকে পরীক্ষা করাইবেন। অন্য বয়সের শিশুদের সম্বন্ধেও এই নিয়ম প্রযোজ্য।

কি ভাবে শিশুদের পরীক্ষা করিতে হয় সে সম্বন্ধে এখানে কিছু আলোচনা করিব।

পরীক্ষা আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে শিশুর বিদ্যাবুদ্ধি ও বিভিন্ন কার্য্য করিবার ক্ষমতা সম্বন্ধে কোনও প্রকার ধারণা পোষণ করা উচিত নয়। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, পরীক্ষকের শিশু সম্বন্ধে কোনরূপ ধারণা থাকিলে পরীক্ষাকালীন শিশুর কার্য্যাবলী তিনি ঠিক মত পর্য্যবেক্ষণ ও বিচার করিতে পারেন না।

শিশুদিগকে যাঁহারা পরীক্ষা করিবেন তাঁহাদের মনে রাখা উচিত, শিশুর উত্তর কেবল মাত্র তাহার বুদ্ধিমত্তা ও ক্ষমতার উপর নির্ভর করে না, পরীক্ষকের ব্যবহারেরও উপর যথেষ্ট পরিমাণ নির্ভর করে। প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবার ধরণের জন্য অনেক সময় শিশুদের নিকট হইতে যথাযথ উত্তর পাওয়া যায় না। পরীক্ষাকালে প্রশ্নগুলি যথাযথ হওয়া উচিত, নতুবা শিশুদের বুদ্ধি-বিচার ঠিক হয় না।

শিশুর মানসিক অবস্থার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া পরীক্ষা আরম্ভ করিবেন। শিশু যখন অন্য কাজে ব্যস্ত থাকে, সে সময় জোর করিয়া তাহাকে পরীক্ষা করিতে যাইবেন না। খেলার ছলে অল্প অল্প করিয়া শিশুদের পরীক্ষা করিবেন।...

তালিকা

৬ মাসের শিশু

১। চিৎ করিয়া দিলে উপুড় হইতে পারে।
২। উপুড় করিয়া দিলে মাথা ও বুক তুলিতে পারে।
৩। বসাইয়া দিলে মাথা খাড়া করিয়া রাখিতে পারে।
৪। হাত দিয়া জিনিষ ধরিতে পারে।
৫। হাতে জিনিষ ধরিয়া খেলা করিতে পারে ও তাহা সরাইয়া লইলে বুঝিতে পারে।
৬। এক হাতে একটা করিয়া দুই হাতে দুইটা জিনিষ ধরিতে পারে।
৭। মা-মা, বা-বা, দা-দা শব্দ করিতে পারে।
৮। উচ্চহাস্য করিতে পারে।
৯। মাকে চিনিতে পারে।
১০। হাসি মুখ দেখিয়া হাসে ও ভয় দেখাইলে কাঁদে।
১১। গান বাজনা শুনিয়া আনন্দ প্রকাশ করিতে পারে।

১৮ মাসের শিশু

১। চলিতে পারে।
২। বসিয়া বসিয়া সিঁড়ি নামিতে পারে।
৩। জিনিষ ছুঁড়িয়া নির্দ্দিষ্ট স্থানে দিতে পারে।

৪। হিজিবিজি আঁকিতে পারে।
৫। দেখাইয়া দিলে ছোট ছোট বাক্স (যেমন দেশলাইয়ের বাক্স) উপরি উপরি দুই তিনটা সাজাইতে পারে।
৬। দুই হাতে তিনটা জিনিষ ধরিয়া রাখিতে পারে।
৭। পাঁচ ছয়টা ছোট ছোট কথা বলিতে পারে।
৮। দেখাইতে বলিলে হাত মুখ দেখাইতে পারে।
৯। খাবে? শোবে? ইত্যাদি প্রশ্ন বুঝিতে পারে।
১০। দেখাইলে ছবি দেখে।
১১। হাত দিয়া খাইতে পারে।
১২। নির্দ্দিষ্ট স্থানে মলত্যাগ করিতে জানে।
১৩। কাপড় জামা সহজে পরাইতে দেয়।

২ বৎসরের শিশু

১। দেখাইয়া দিলে খাড়া রেখা টানিতে পারে।
২। দেখাইয়া দিলে কাগজ দুই ভাঁজ করিতে পারে।
৩। হাতে না পাইলে, ছড়ি দিয়া জিনিষ টানিয়া আনিতে চেষ্টা করে।
৪। তিন-চারটি ছোট বাক্স উপরি উপরি সাজাইতে পারে।
৫। দুই-তিনটি কথা দিয়া বাক্য বলিতে পারে।
৬। সাধারণ জিনিষের ছবি দেখিলে চিনিয়া নাম বলিতে পারে।
৭। জিনিষের 'ভিতর' 'বাহির' বুঝিতে পারে।
৮। যেখানে সেখানে প্রস্রাব করে না।
৯। ছবি দেখাইয়া গল্প বলিলে শোনে।

৪ বৎসরের শিশু

১। দেখাইয়া দিলে ঢেরা আঁকিতে পারে।
২। পাঁচ ছয়টা ছোট ছোট বাক্স সাজাইয়া ঘর ইত্যাদি তৈয়ারী করিতে পারে।
৩। দেখাইয়া দিলে কাগজ চার ভাঁজ করিতে পারে।
৪। বর্ণপরিচয়ের প্রথম ভাগের সব কথা উচ্চারণ করিতে পারে।
৫। নিজে স্নান করিতে, দাঁত মাজিতে, হাত ধুইতে, জামার বোতাম খুলিতে পারে।
৬। অন্য দুই একটি ছেলের সহিত খেলা করিতে পারে।
৭। তিন চারিটি অঙ্ক যথা ৪—৯—৫—৮ একবার শুনিয়া বলিতে পারে।
৮। ১ হইতে ১০ পর্য্যন্ত গুণিতে পারে।
৯। দুইটি রেখার মধ্যে ⚌ কোন্‌টি ছোট কোন্‌টি বড় বলিতে পারে।
১০। এখন দিন না রাত্রি বলিতে পারে।

আপনাদের শিশু পরীক্ষার ফলাফল আমাকে নিম্নোক্ত ঠিকানায় জানাইলে বিশেষ উপকৃত হইব।—লেখক। ৯২, আপার সারকুলার রোড, সায়ান্স কলেজ।

তন্তু ও তন্ত্রী : শ্রীগোপেশ্বর পাল এম্-এস্-সি.
অধ্যাপক, বিজ্ঞান কলেজ

ব্যবসা ও বাঙালী

শ্রীযোগেশচন্দ্র সেন

আমরা বহুদিন হইতে শুনিয়া আসিতেছি যে, বাঙালী ভাবপ্রবণ জাতি। শিক্ষা, বাগ্মিতা, কলা ও রাজনীতির ক্ষেত্রে সে প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিয়াছে, কিন্তু ব্যবসা ও বাণিজ্যে তাহার এমন কিছু জাতীয় ত্রুটি আছে যাহার জন্য সে সফলতা লাভ করিতে পারে না। ইহা যে শুধু অবাঙালীরা বলে তাহা নহে, অনেক শিক্ষিত বাঙালীরও এইরূপ ধারণা। অথচ কি প্রকারে এই ধারণা শিক্ষিত বাঙালীর অস্থিমজ্জাগত হইল তাহা ভাবিবার বিষয়। বঙ্গদেশে যাঁহারা বুনিয়াদি ঘর বলিয়া প্রসিদ্ধ, তাঁহাদের অনেকেরই ঐশ্বর্য্যের মূল ব্যবসা। এখনও কলিকাতা শহরে বড় বড় বাঙালী ব্যবসায়ীর অভাব নাই, কার্য্যদক্ষতা এবং প্রতিষ্ঠায় তাঁহারা কোনো অবাঙালী হইতে হীন নহেন। কলিকাতার বাহিরে আজও বঙ্গদেশের বাণিজ্য অধিকাংশ বাঙালীর করায়ত্ত আছে। অথচ এই যে একটা ধুয়া, যাহা রাস্তা-ঘাটে শোনা যায় যে বাঙালী আর সব পারে কিন্তু ব্যবসা করিতে পারে না, তাহার মূল্য কি? নিজের দোষ-ত্রুটির আলোচনা করিবার প্রয়োজনীয়তা এই যে, আমরা যেন সেগুলি সংশোধন করিতে পারি। কিন্তু যদি সেই দোষগুলি বাড়াইয়া তুলিয়া তাহারই আলোচনায় আমরা ব্যাপৃত থাকি, তাহা হইলে আমরা নিজ শক্তির উপর বিশ্বাসহীন হইয়া পড়ি। স্বামী বিবেকানন্দ বলিতেন, যে সর্ব্বদা মনে করে আমি পাপী, আমি হীন, সে শেষে তাহাই হইয়া পড়ে। আমাদেরও সেই

অবস্থা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। জাতীয় চরিত্রের দোষগুলি আলোচনা করিতে করিতে আমাদের ভিতর সেই দোষগুলি জন্মিয়াছে। জন্ম হইতে শিশুর কানে এই মন্ত্র দিয়া আমরা তাহার নিজের উপর এবং স্বজাতির উপর বিশ্বাস, শ্রদ্ধা নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছি।

ইহার ফলে এই দাঁড়াইয়াছে যে, সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া কোনো বড় কাজ বাঙালী করিতে পারিতেছে না। পূর্ব্বে ব্যবসা সীমাবদ্ধ ছিল গ্রামে এবং তাহার পাঁচ-দশ মাইল মধ্যে, তারপর প্রদেশে, প্রদেশ ছাড়াইয়া সমস্ত দেশে, এখন দেশের সীমা ছাড়াইয়া সমস্ত মহাদেশে ইহা পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সহিত আমাদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ হইয়াছে। নূতন নূতন আবিষ্কারে সময় এবং দূরত্ব অন্তর্হিত হইয়াছে। টেলিগ্রাফ, টেলিফোন, দ্রুতগামী জাহাজ, এরোপ্লেন ইত্যাদিতে এক দেশ হইতে অন্য দেশে মালসম্ভার সস্তায় এবং ক্ষিপ্রগতিতে লইয়া যাইতেছে। আজ ভারতের তুলা, গম ইত্যাদির দর নিরূপণ হইতেছে ম্যাঞ্চেষ্টার এবং লিভারপুলের দামের উপর। যদি মিশর এবং আমেরিকায় প্রচুর তুলা উৎপন্ন হয় তাহা হইলে ভারতবর্ষের তুলার দামও সেই অনুপাতে কম-বেশী হয়। মোট কথা এই যে, ক্ষেত্রজাত এবং খনিজ পদার্থের মূল্য পৃথিবীর সব স্থানেই প্রায় একপ্রকার, কেন-না—পাউণ্ড-প্রতি ধরিলে মালের ভাড়া এত কম যে, কোনো স্থানের দর বেশী হইলে সহজেই অন্য দেশ হইতে মাল আমদানি করা যায়। যখন ব্যবসা-বাণিজ্য আন্তর্জাতিক হইয়াছে তখন ঘরোয়া ব্যবসায়ে প্রতিযোগিতা করা কষ্টসাধ্য। ইহার দুইটি প্রধান কারণ, প্রথমতঃ, আজকাল ব্যবসায়ে এত বেশী টাকার প্রয়োজন হয় যে, অত টাকা একজনের নিকট প্রায়ই থাকে না, থাকিলেও তাঁহারা সব টাকা এক ব্যবসায়ে ফেলা যুক্তিকর মনে করেন না। দ্বিতীয়তঃ, এই সব কাজে নিজের অভিজ্ঞতা ছাড়া অনেক অভিজ্ঞ লোকের সহায়তার প্রয়োজন হয়। প্রায়ই দেখা যায় যে, ব্যবসা-বুদ্ধি উত্তরাধিকারী সূত্রে অবতরণ করে না। অনেকে গোমস্তা দিয়া সে ত্রুটি সংশোধন করিতে চেষ্টা করেন, কিন্তু যে-পর্য্যন্ত না সে লাভ-লোকসানের অংশী হয়, সে-পর্য্যন্ত তাহার নিকট হইতে উপযুক্ত কাজ পাওয়া যায় না। এইজন্যই আজকাল যৌথপ্রণালীতে সমস্ত বড় বড় শিল্প এবং বাণিজ্য পরিচালিত হইতেছে। বাংলা দেশে এইরূপ কোম্পানীর অভাব নাই। কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই উপযুক্ত মূলধনের অভাবে, দক্ষ পরিচালকের অভাবে, এবং সর্ব্বোপরি ব্যাঙ্কের সাহায্যের অভাবে তাহারা যথেষ্ট উন্নতি লাভ করিতে পারিতেছে না। ইহার ফলে বিদেশী এবং অবাঙালীর সহিত প্রতিযোগিতায় বাঙালী ব্যবসাক্ষেত্রে দাঁড়াইতে পারিতেছে না। বড় বাঙালী ব্যবসায়ী, বিদেশী এবং অবাঙালী ব্যাঙ্কের সাহায্য পাইয়া থাকেন, কিন্তু যাঁহারা ছোট ব্যবসায়ী তাঁহাদের দাঁড়াইবার স্থান নাই। অথচ দেশে শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতি না হইলে আমাদের ভবিষ্যৎ অন্ধকারময়। প্রত্যেক দেশেই বেশীর ভাগ লোক শিল্প ও বাণিজ্য দ্বারা প্রতিপালিত হয়, সরকারী চাকুরি কিংবা আইন এবং চিকিৎসা ব্যবসা দ্বারা অধিকসংখ্যক লোক প্রতিপালিত হয় না। ইংরেজী শিক্ষার দিন হইতে বঙ্গদেশে সরকারী চাকুরির উপর এত বেশী ঝোঁক দেওয়া হইয়াছে যে, আমাদের ছেলেদের জীবনের প্রধান ব্রত হইয়া দাঁড়ায় সরকারী চাকুরি লাভ করা। সরকারী চাকুরিতে নির্দ্দিষ্ট-সংখ্যক লোকই প্রতিপালিত হইতে পারে, তাহাতে দেশের অন্ন-সমস্যা মিটিতে পারে না। এই যে আজকাল ভদ্রলোকদের বেকার-সমস্যা লইয়া কল্পনা-জল্পনা চলিতেছে তাহার সমাধান কি করিয়া হইতে পারে? কেহ কেহ বলিতেছেন, ভদ্রলোকেরা যদি লাঙ্গল ধারণ করেন, তাহা হইলে এই সমস্যা মিটিয়া যাইবে। কিন্তু তাহা কি সম্ভব? বাংলা দেশের লোক-সংখ্যার অনুপাতে বিনাআবাদি জমির পরিমাণ বেশী নহে। যাহারা চাষ করে তাহাদের জমির আয়তন এত ক্ষুদ্র যে, তদ্দ্বারা তাহাদের জীবিকানির্ব্বাহ হয় না। এইস্থলে ভদ্রলোকেরা যাইয়া কি করিবে? সুন্দরবনের মত দুই এক স্থানে জমি আবাদ করিয়া চাষবাস করা যাইতে পারে, কিন্তু তাহাতে কতজন ভদ্রলোকের সংস্থান হইতে পারে? এই বিষয়টি ভাবিয়া দেখিবার প্রয়োজন। আবেগের বশবর্ত্তী হইয়া Back to the

land বলিয়া চীৎকার করিয়া লাভ নাই। ইহাতে আমরা প্রকৃত লক্ষ্য হইতে ভ্রষ্ট হইয়া বহুমূল্য সময় এবং শক্তির অপব্যয়ই করিব। মোট কথা, শিল্প এবং বাণিজ্যের উন্নতি ভিন্ন আমাদের আর্থিক অবস্থা উন্নত হইতে পারে না। এখন কি উপায়ে শিল্প এবং বাণিজ্যের উন্নতি হইতে পারে তাহা চিন্তা করা প্রয়োজন। অন্যান্য দেশ শত বৎসরের অভিজ্ঞতা দ্বারা ইহা বুঝিতে পারিয়াছে যে, ব্যাঙ্ক ভিন্ন দেশের উন্নতি হইতে পারে না। আজ ইংরেজ যে এই দেশের শিল্প-বাণিজ্য একচেটিয়া করিয়াছে, তাহার মূলে তাহাদের ব্যাঙ্ক; যদি তাহাদের ব্যাঙ্ক না থাকিত তাহা হইলে তাহারা ব্যবসা করায়ত্ত করিতে পারিত না। ভারতের অন্যান্য প্রদেশের লোকেরাও ইহা বুঝিতে পারিয়াছে, তাই তাহারাও নিজ নিজ প্রদেশে বড় বড় ব্যাঙ্ক স্থাপনা করিয়াছে। ইহার ফলে তৎপ্রদেশের লোকেরা তাহাদের ব্যবসা হস্তগত করিয়াছে। এখন তাহারা ভারতের সর্ব্বত্র ছাইয়া পড়িয়াছে। এইরূপে অন্যান্য প্রদেশেও ব্যবসাক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা করিতে পারিতেছে। আমাদের ব্যবসা ক্রমে ক্রমে তাহাদের হস্তগত হইতেছে। ব্যবসা তাহাদের হাতে আসাতে স্বভাবতঃ তাহারা নিজ প্রদেশের লোকদিগকে কার্য্য দিতেছে। ফলে এই দাঁড়াইয়াছে যে, এ সব আপিসে এখন কেরানীর চাকুরিও বাঙালীদের জুটিতেছে না। দিন-দিন জীবন-সংগ্রাম আরও কঠিন হইয়া পড়িতেছে। দেশের দুই-একজন চিন্তাশীল ব্যক্তি ছাড়া এই বিষয়ে কি কেহ ভাবিতেছেন? অন্য প্রদেশের লোকদের আমাদের মত শিক্ষা নাই, দীক্ষা নাই, উচ্চ আদর্শ নাই, ইহা লইয়া গৌরব করিবার কি আছে? যদি জীবন-সংগ্রামে অন্যের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় আমরা দাঁড়াইতে না পারি, তবে শিক্ষা, দীক্ষা, আদর্শ দ্বারা কি হইবে? যে-শিক্ষা পরস্পর পরস্পরকে বিশ্বাস করিতে না শিখায়, যে-দীক্ষা আমাদের সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া কাজ করিতে দেয় না, যে-আদর্শ একে অন্যের দোষ-ত্রুটি সমালোচনা করিতেই ব্যস্ত, তাহার মূল্য কি? বাংলা দেশের সব চেয়ে অবনতির মূল কারণ এই যে, আমরা নিজেদের উপর বিশ্বাস হারাইয়াছি। যদি তাহা না হইত তাহা হইলে বাঙালীর অর্থ লইয়া অবাঙালীরা এত প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারিত না। আমরা যে শুধু নিজেদের অবিশ্বাস করি তাহা নয়, অনবরত স্থানে অস্থানে আমাদের ত্রুটি জগৎ সমক্ষে প্রচার করি। যাহারা নিজেদের উপর বিশ্বাস হারাইয়াছে তাহাদিগকে অন্যেরা বিশ্বাস করিবে কি প্রকারে? এই হারানো বিশ্বাস আবার ফিরাইয়া আনিতে হইবে, শুধু কথায় নয়,—কাজে। পৃথিবীতে কোনো দেশে দুষ্ট লোকের অভাব নাই, অসততার জন্য ব্যবসা ফেল্ হইয়াছে এরূপ দৃষ্টান্ত জগতে বিরল নয়। কিন্তু তাই বলিয়া কি কেহ ব্যবসা-বাণিজ্য করিতেছে না? এই যে বেঙ্গল ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের পতন লইয়া আমরা বাগাড়ম্বর করিয়া থাকি তাহা কি আমাদের জাতীয় অধঃপতনের নিদর্শন নহে? অন্য দেশে কি ব্যাঙ্কের পতন হয় নাই? বোম্বাইএ ইণ্ডিয়ান স্পেসী ব্যাঙ্ক ফেল হইল, তাহাতে কি বোম্বায়ের অধিবাসীরা ব্যাঙ্কিং ব্যবসায় ছাড়িয়া দিয়াছে? কলিকাতায় য়্যালায়েন্স ব্যাঙ্ক অফ্ সিমলা ফেল হইল তাহাতে কি ইংরেজেরা ব্যাঙ্কের পাট তুলিয়া এ দেশ হইতে চলিয়া গিয়াছে? গত বৎসর আমেরিকাতে ১৩০০-র অধিক ব্যাঙ্ক ফেল হইয়াছে, তাহাতে কি সে দেশে সব ব্যাঙ্ক বন্ধ হইয়াছে? ব্যবসায়ে উত্থান-পতন দুই-ই আছে, কিন্তু সেই জন্য কেহ হাত গুটাইয়া বসিয়া থাকে না। তবে কেবল বাংলা দেশেই সে নিয়ম খাটিবে কেন? আর এই যে বেঙ্গল ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক ফেল হইল তাহার জন্য প্রকৃত দায়ী কি আমরা নহি? যে-কোন ব্যবসা-ই কুশল ব্যক্তিদ্বারা পরিচালিত না হইলে তাহার পতন অবশ্যম্ভাবী। উক্ত ব্যাঙ্কের ডিরেক্টরদের মধ্যে ব্যবসায়ী লোক কয়জন ছিলেন? আর যাঁহারা ছিলেন তাঁহারা কি ব্যাঙ্কের কাজের কোনো খবর রাখিতেন? ইহার পরিচালকেরা কি ব্যাঙ্কিং বিষয়ে অভিজ্ঞ ছিলেন? তাঁহাদের হাতে কার্য্যভার দেওয়ার জন্য দায়ী কি আমরা নহি? যখন দেখা গেল যে, অনুপযুক্ত লোকের হাতে ব্যাঙ্ক-চালনার কার্য্য অর্পিত হইয়াছে, তখন অংশীদার এবং আমানতকারিগণ কেন বাধা দেন নাই? এইজন্য দায়ী বাঙালী। অনেকে এইরূপ বলিয়া থাকেন

যে, এই ব্যাঙ্কে ফেল হইবার তাঁহার পরিপার্শ্বিক ঘটনায় বাঙালীর চরিত্রে যে কালিমা লিপ্ত হইয়াছে তাহা কোনকালে মুছিবার নয়। যদি তাহাই হয় তবে বাঙালীর নাম এ দেশ হইতে লুপ্ত হইবে। তাহাতে দুঃখ করিবার কিছুই নাই। কিন্তু আমি মনে করি না যে, বাঙালীর এখনও এতদূর অধঃপতন ঘটিয়াছে। আজও বাঙালী রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অসম সাহস ও চরিত্রবলের পরিচয় দিতেছে। চাই আমাদের শিক্ষা-পদ্ধতির পরিবর্ত্তন, চাই আমাদের লক্ষ্য স্থির করা। এই যে শত সহস্র যুবক বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষা লাভ করিতেছে তাহাতে কি তাহারা জীবিকা উপার্জ্জন করিতে সমর্থ হইতেছে? অল্পসংখ্যক ছাত্র ছাড়িয়া দিলে, বেশীর ভাগই শিক্ষার উদ্দেশে শিক্ষা করে না। শুধু আমাদের দেশে নয়, সব দেশেই এই অবস্থা। তাহারা পরীক্ষায় পাস করিয়া কি করিবে, কোথায় যাইবে স্থির করিতে পারে না, যেখানে যায় সেখানেই প্রবেশ অবরুদ্ধ। ইহাতে মন দমিয়া যায়, নিজের উপর বিশ্বাস হারায় এবং স্বাধীন জীবিকা উপার্জ্জনের অধ্যবসায় ও দৃঢ়তার হ্রাস হয়। এমনি করিয়াই কি কালস্রোতে দেশের ভবিষ্যৎ ভাসিয়া যাইবে? বাঙালী কি নিজের দোষে পৃথিবী হইতে তাহার নাম লুপ্ত করিয়া দিবে? স্বদেশী আন্দোলনের সময় হইতে ধরিলেও আমরা আজ কত পশ্চাতে পড়িয়া রহিয়াছি। মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় পরিল বাঙালী, লাভ করিল বোম্বাই এবং আমেদাবাদের মিলের মালিকেরা! স্বদেশীর জন্য স্বার্থত্যাগ বাঙালী যত করিয়াছে, তত অন্য কেহ করিয়াছে কি? অথচ সেই অনুপাতে বাঙালীর শিল্প, ব্যবসায় কোথায়? যতদিন পর্য্যন্ত বাঙালীর মুখ্য অভাব ব্যাঙ্ক-প্রতিষ্ঠা না হইবে ততদিন পর্য্যন্ত আমাদের উন্নতির আশা নাই। ভারতের প্রত্যেক প্রদেশে বড় বড় দেশীয় ব্যাঙ্ক গঠিত হইয়াছে, এখানে কেন হইতেছে না? প্রতিষ্ঠাবান্ এবং উপযুক্ত বাঙালী ব্যবসায়ীর অভাব নাই এবং ব্যাঙ্কিং বিষয়ে অভিজ্ঞ লোকেরও অভাব নাই। ইঁহারা মিলিত হইয়া কি অন্ততঃ একটি বড় ব্যাঙ্ক গঠন করিতে পারেন না? ব্যক্তিগতভাবে নিজেদের ঐশ্বর্য্য তাঁহারা সংগ্রহ করিতে পারেন, কিন্তু তাহাতে দেশের কি উপকার হইবে? যে দেশের শতকরা পঁচানব্বই জন অর্থ-হীন, সেই দেশের ভবিষ্যৎ অন্ধকারময়। ছিদ্রান্বেষণ অনেক হইয়াছে, আমাদের দোষের তালিকায় দেশ ছাইয়া গিয়াছে, এখন সময় আসিয়াছে আমাদের আত্মমর্য্যাদা বোধ জাগাইবার। ব্যাঙ্কের সফলতার জন্য যাহা প্রয়োজন তাহা কর, উন্নত চরিত্র, প্রতিষ্ঠাবান্, অর্থশালী লোকের বিশ্বাসভাজন, এইরূপ লোক বাছিয়া ব্যাঙ্কের ডিরেক্টর কর, ব্যাঙ্কের কার্য্যে কুশল, অভিজ্ঞ ও চরিত্রবান ব্যক্তি-দিগের উপর পরিচালনার ভার দাও, তাহা হইলে দেখিবে যে একটি সুদৃঢ় ও আদর্শস্থানীয় ব্যাঙ্ক গঠিত হইবে। এইরূপ একটি ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হইলে আরও ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা লাভ করিবে। ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠার সঙ্গে ব্যবসা ও বাণিজ্যের উন্নতি হইবে। যাহারা রাস্তা খুঁজিয়া পাইতেছে না তাহারা রাস্তা পাইবে, বাংলার শ্রী আবার ফিরিয়া আসিবে। রাজনীতিক্ষেত্রে যে আলোচনা চলিতেছে তাহার ফলে আশা করা যায় যে, অচিরে আমাদের হাতে শাসনক্ষমতা অনেকটা আসিবে, তখন ব্যবসাক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বিতা আরও বাড়িবে। সেই সময়ের জন্য এখন হইতে প্রস্তুত হওয়া প্রয়োজন। রাজনীতিতে লোকের পেট ভরিবে না, দেশের প্রত্যেক নর-নারীর যাহাতে উদরান্নের সংস্থান হয় তাহাই করিতে হইবে। ব্যবসা ও বাণিজ্যের উন্নতি ছাড়া কিছুতেই তাহা হইবে না।

আজ জাতি যখন জীবন-মরণের সন্ধিস্থলে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে তখন সকলেই এই বিষয়ে চিন্তা করুন, শুধু চিন্তা করিলে চলিবে না, রাস্তা নিদর্শন করুন। বাঙালী মরিতে বসিয়াছে, তিল তিল করিয়া তাহার জীবনীশক্তি ক্ষয় হইতেছে, তাহাকে বাঁচাইতে হইবে। আমাদের ভিতর আত্মবিশ্বাস জাগাইতে হইবে। বুঝাইতে হইবে যে, সব বাঙালী প্রতারক বা চোর নহে। আমাদের মধ্যে ব্যবসাক্ষেত্রে যাঁহারা প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন তাঁহাদিগকে নেতৃত্ব গ্রহণ করিতে হইবে। অসাধু এবং অব্যবসায়ী লোকের হাতে পড়িয়া আমরা জাতীয় মানসম্ভ্রম হারাইয়াছি। আজ আমরা উপেক্ষিত। তাঁহারা বলিতে পারেন—বেশ ত আমরা দু-পয়সা করিয়া

খাইতেছি, এসব গোলমালে যাওয়ার আমাদের প্রয়োজন কি ? প্রয়োজন আছে। যদি তাঁহারা অগ্রসর না হন তবে বাঙালীর রোখ্‌ ব্যবসা-বাণিজ্যের দিকে ফিরানো যাইবে না। বাঙালী যখন দেখিবে যে, উপযুক্ত লোক কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছে তখন তাহারা নিজেদের শক্তি-সামর্থ্য লইয়া পশ্চাতে দাঁড়াইবে। তাহাদের বলে বলীয়ান হইয়া আমরা অসম্ভবকে সম্ভব করিতে পারিব, আজ যাহা ভাবিতেও পারি না, কালে তাহা আমাদের নিকট সহজ হইবে। এমনি করিয়াই জাতি উন্নতির পথে অগ্রসর হয়। আজ দেশের দুর্দ্দিনে আমি তাঁহাদিগকে আহ্বান করিতেছি। এই কলিকাতা শহরে কি দশ-বারো জন ব্যবসায়ী লোক নাই, যাঁহারা দেশের বিষয়, জাতির বিষয় চিন্তা করিয়া কার্য্যভার গ্রহণ করিবেন না ? আমি বিশ্বাস করি, এইরূপ লোক আছেন। তাঁহারা দায়িত্ব গ্রহণ না করায় অসাধু ও অনভিজ্ঞ লোকেরা দেশের অশেষ অনিষ্টসাধন করিয়াছে। তাঁহারা দেখান যে এখনও বাঙালীর নাম জগৎ হইতে লুপ্ত হইবার দিন আসে নাই।

পঞ্চাশোর্দ্ধে

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী

পঞ্চাশোর্দ্ধে বনে যাবে – চলেছি তাই বনে,
মনটা তবু থেকে-থেকে টল্‌ছে ক্ষণে ক্ষণে !
কতদিনের ঘরের সাথে কতই পরিচয়,
কত দিকের কত বাঁধন, কত না সঞ্চয় ,
হাজার পাকে শিকড়-বেড়া চিত্ত-লতার জালে
কেমন ক'রে উপ্‌ড়ে আবার বাঁধ্‌ব গাছের ডালে !
বাক্যহারা ঘর-বধূ যে বাতায়নের ফাঁকে
অশ্রুজলের আব্‌ছায়াতে দৃষ্টি মেলে থাকে !

ভাব্‌ছি মিছে ; যেতেই হবে —এলই যখন ডাক,
মনের কানে ঢেউ তুলেছে সন্ধ্যালোকের শাঁক ;
দিনের দাহ জুড়িয়ে আসে দেহের সীমানায়,
অস্ত-রবির রঙটি লেগে বনটি কি মানায় !
সিন্ধুকূলের গন্ধ-আমেজ লাগ্‌ছে এসে নাকে,
এই অবেলায় ঘরের খেলায় বন্দী কি কেউ থাকে ?
সন্ধ্যাতারায় দৃষ্টি হারায়, সামনে পিছে কালো ;
পারের পথের যাত্রী যখন, এগিয়ে থাকাই ভালো !

আজ মনে হয়, বনের মানে মুক্তিরই স্বাদ চাখা,
বাঁধন যখন ছিঁড়তে হবেই, ভার কেন আর রাখা !
দেহের শিকল কাটার আগে আল্‌গা করি' মন
মুক্তপথে রাখাই ভালো মুক্তি নিমন্ত্রণ।
বৈতরণীর মন্দিরে যে পারের ঘণ্টা বাজে,
তক্‌মা তাবিজ তুল্লি কি আর লাগবে কোনো কাজে ?
দেহের ক্ষুধার জোগান দিয়ে ছুটির আগে আজ
মনের ক্ষুধার তৃপ্তি লাগি' নাই কি কোনো কাজ ?

যতই বলুন কবিরা সব, কোকিল ডাকার মানে
পঞ্চাশতের নীচে যারা, তারাই ভালো জানে ;—
চঞ্চলতার মাঝদরিয়ায় স্রোতের মুখে ভেসে
কবে কে আর দেখ্‌ল চেয়ে তটের সীমাদেশে ?
স্রোত কাটিয়ে বস্‌তে পেলে শান্ত হয়ে তটে,
কুঞ্জশোভা তখন পড়ে সহজ আঁখিপটে ;
আপন-হারা আকুল বনে কোকিল ডাকে মিছে ;
কুহুধ্বনি মারা পড়ে রক্তধ্বনির পিছে !

অন্ধ বকুল গন্ধ-পথে দেয় যে লিপিখানি,
প্রিয়ার খোঁপায় কে বুঝবে হায় তার বেদনার বাণী ?
মধু ঋতুর উৎসবে যে বাঁধ্‌তে চাহে ঘরে,
তার চোখে কি পুষ্পশোভার উৎস ধরা পড়ে !
লতার বেণী বাঁধন হয়ে বাঁধে তাহার মন,
মিথ্যা পাঠায় সৃষ্টি তারে দৃষ্টি-নিমন্ত্রণ !
নয়নপথে গ্রহণ যাহার, চয়নপথে নয়,
যে জন অবোধ, সেই রসবোধ তার কাছে কি হয় !

মিথ্যা ভাবা ঘরের কথা—কোথায় আমার ঘর ?
শাখার ফাঁকে ঐ দেখা যায় বিশ্ব-চিদম্বর !
সীমাহারা ঐ আকাশে মুক্ত হাওয়ার মাঝে
প্রাণের কানে শোন্ দেখি কোন্ না-শোনা সুর বাজে।
স্মৃতিকাধর রয় না যেমন গৃহবাসের ঘরে,
মাটির ইটের কাঠের ঘরের বদল পরে-পরে ;
দেহবাসের ঘরও যখন মনোবাসের নয়—
বনবাসেই যাক না দেখা শেষের পরিচয়।



সূর্য্য কি একটা বিরাট ইলেক্‌ট্রিক লাইট?—

সূর্য্য কেমন করিয়া আমাদের উত্তাপ এবং আলো দেয় এ সম্বন্ধে ডক্টর রস গান নামে আমেরিকার একজন বৈজ্ঞানিক এক নূতন তথ্য আবিষ্কার করিয়াছেন। তাহার মতে সূর্য্য একটি অতি প্রকাণ্ড ইলেক্‌ট্রিক লাইট। মানুষের তৈরী 'বাল্‌বে' যেমন 'ফিলামেণ্ট'খানা বিদ্যুৎপ্রবাহের দরুণ উত্তপ্ত হইয়া প্রদীপ্ত হইয়া উঠে, সূর্য্যেও তেমনি কোটি কোটি ভোল্ট বিদ্যুৎ সূর্য্যের উপরের স্তরের বায়ব পদার্থকে উত্তপ্ত করিয়া আলোকময় করিয়া তুলে। যে পরিমাণ শক্তি সূর্য্য অনবরত বিকীরণ করিতেছে, তাহা আমেরিকার সমস্ত ধনসম্পত্তি ব্যয় করিয়া এক সেকেণ্ডের ১০ লক্ষভাগের এক ভাগ সময়ের জন্য মাত্র উৎপাদন করা যাইতে পারে।



সূর্য্যের তাপ মাপিবার একটি যন্ত্র। এই যন্ত্রটি ক্যালিফর্ণিয়ার স্মিথসনিয়ান মান-মন্দিরে আছে। ডাইনের দিকের যন্ত্রটির নাম সেলোষ্টাট্। সূর্য্যের আলো এইটি হইতে প্রতিফলিত হইয়া ঘরের ভিতরে বোলো-মিটারে গিয়া পড়ে। সেই যন্ত্রটির দ্বারা সূর্য্যের আলোর তাপ এক ডিগ্রীর দশলক্ষ ভাগের একভাগ পর্য্যন্ত মাপা যায়।

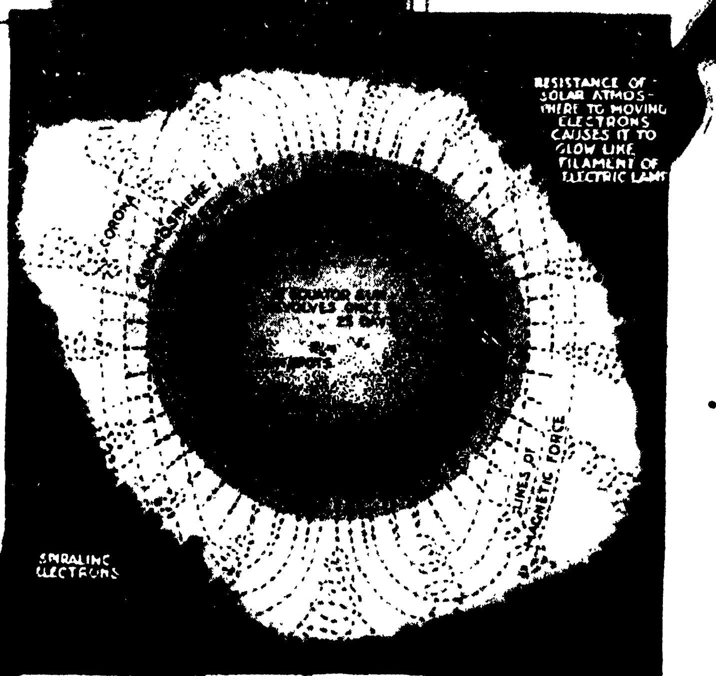
এই নূতন তথ্যের সাহায্যে সূর্য্য সম্বন্ধে এতদিনকার কতকগুলি অমীমাংসিত সমস্যার সমাধান করা যায়। ইহা এ তথ্যের সপক্ষে অতি বড় যুক্তি। প্রায় এক শতাব্দী ধরিয়া জ্যোতির্ব্বিদেরা সূর্য্যের ঘোরা সম্বন্ধে একটি অতি আশ্চর্য্য ব্যাপার লক্ষ্য করিয়া আসিতেছেন যে, সূর্য্যের বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন গতিতে ঘুরিতেছে। সূর্য্যের স্পটের গতির সাহায্যে সূর্য্যের গতি নির্দ্ধারিত করা হয়। সূর্য্যের বিষুব রেখার উপর একটা স্পটের একবার ঘুরিয়া আসিতে পঁচিশ দিন সময় লাগে; সূর্য্যের মেরু এবং বিষুবরেখার মাঝামাঝি জায়গায় ইহা অপেক্ষা দুই দিন বেশী সময় লাগে এবং মেরুতে ছয় দিন বেশী দরকার হয়। আরও দেখা গিয়াছে যে এ গতি চিরকাল স্থির থাকে না। পাঁচ ছয় বৎসরের মধ্যে এ গতির হ্রাস অথবা বৃদ্ধি হইয়া থাকে। ডক্টর গান এই সমস্যার এই মীমাংসা করিয়াছেন। সূর্য্যের গায়ে তিনটি স্তর আছে। সকলের নীচের স্তরের নাম reversing layer, তার উপর chromosphere এবং সকলের উপর corona। তাঁর ইলেট্রিক থিওরী হইল এই, সূর্য্যের ভিতর হইতে নেগেটিভ বিদ্যুৎকণা অনবরত বাহির হইয়া আসিতেছে। সূর্য্যের গায়ের কাছে আসিয়া তাহারা বাধা পায় এবং তাহারই ফলে সেখানকার গ্যাসগুলি উত্তপ্ত হইয়া উঠে। রিভার্সিং স্তর এবং ক্রোমোস্ফিয়ারের ভিতরে বিদ্যুৎকণার এই চাঞ্চল্যের ফলে সেখানে একটা বৈদ্যুতিক ঝড় উপস্থিত হয়। সেই ঝড়ের বেগ বিষুবরেখার কাছে ঘণ্টায় ১২০০ মাইল, কিন্তু মেরুর দিকে যতই যাইতে থাকে ঝড়ের বেগ ততই কমিয়া আসে। পৃথিবী হইতে আমরা সূর্য্যের সারফেস্ মাত্রই দেখি। সুতরাং সূর্য্যের নিজের গতির উপর এই ঝড়ের গতি আরোপিত হইয়া আমাদের কাছে দেখা দেয়। বিষুবরেখার কাছে ঝড়ের গতি বেশী, সুতরাং বিষুবরেখার উপর সূর্য্যের গতিও আমরা বেশী দেখিতে পাই। মেরুর কাছে



এই বিরাট যন্ত্রটি একটি ক্যামেরা। ইহার ওজন ২,৫০০ পাউণ্ড। ইহার সাহায্যে সূর্য্যগ্রহণের ফটোগ্রাফ তোলা হয়। উপরের গোল চিত্রটি পূর্ণগ্রাসের সময়ে সূর্য্যের। চারিদিকে করোনা দেখা যাইতেছে









উপরে বাঁ দিকের ছবি—ডক্টর গান তাহার থিওরী বুঝাইতেছেন।

উপরে ডানদিকের ছবি—সূর্য্যের গা হইতে যে প্রজ্বলিত গ্যাসের শিখা বাহির হইয়া আসে তাহা একলক্ষ মাইল পর্য্যন্ত লম্বা হইতে পারে।

মাঝের ছবি—এই ছবিতে সূর্য্যের বিভিন্ন অংশ দেখান হইয়াছে। ইহার সাহায্যে ডাঃ গানের থিওরী বুঝা যাইবে।

ঝড়ের গতি সবচেয়ে কম, সূর্য্যের গতিও আমাদের কাছে সেখানে সবচেয়ে কম বলিয়া মনে হয়। সূর্য্যের মোট গতির তারতম্য ঝড়ের গতির হ্রাসবৃদ্ধির উপর নির্ভর করে বলিয়া ডক্টর গানের ধারণা।

যে বিদ্যুৎপ্রবাহ সূর্য্যের গা হইতে বাহির হইয়া আসিতেছে এবং এই বিদ্যুৎ-প্রবাহ প্রেরণের জন্য যে ভোল্টেজ প্রয়োজন, তাহার পরিমাণ ডক্টর গান নির্দ্ধারিত করিয়াছেন। মানুষ সে শক্তির পরিমাণ ধারণা করিতে পারে না। এই অফুরন্ত বিরাট শক্তির মূল কি, তাহা অতি গুরুতর প্রশ্ন। আধুনিক Astro-Physicist-গণ এ-প্রশ্নের উত্তর দিয়াছেন। তাঁহাদের মতে সূর্য্যের মধ্যে অণুপরমাণুর ধ্বংসের লীলা চলিয়াছে। তাহার ফলে পদার্থ আর পদার্থ না থাকিয়া শক্তিতে পরিণত হইতেছে। ডক্টর গানের মতে এই শক্তি বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে আলো ও উত্তাপ রূপে ছড়াইয়া পড়িবার আগে বিদ্যুৎ প্রবাহে পরিণত হইতেছে।



শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন-সমস্যা

যত অনর্থের মূল শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের পুঁথিখানা সাধারণ্যে প্রকাশিত না হইলেই যেন ছিল ভাল। রচয়িতা বড়ু চণ্ডীদাস সম্বন্ধে আমাদের পূর্ব্বমত পরিহার করিতে হইয়াছে, না করিয়া উপায় নাই। মোটামুটি যাহা বলিবার, তাহা পূজনীয় মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের সংবদ্ধন-লেখমালার (যন্ত্রস্থ) দুই পৃষ্ঠায় বলিয়াছি। পুনরাবৃত্তি অনাবশ্যক। গত চৈত্র সংখ্যা প্রবাসীতে শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মহাশয়ের লিখিত 'চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন আসল না নকল' শীর্ষক প্রবন্ধ আগ্রহের সহিত পড়িয়াছি। অল্প কএক স্থলে খট্‌কা লাগে; তাই এই প্রসঙ্গ।

খ্রীষ্টীয় চতুর্দ্দশ-পঞ্চদশ শতকে রচিত বাঙ্গালা গ্রন্থ এবং বঙ্গভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন আশ্চর্য্যচর্য্যাচয়ের সহিত শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের তুলনামূলক আলোচনার ফলে আমরা কবির দেশ ও কালের অনুমান করিতে পারি।

বিদ্যাপতির সহিত চণ্ডীদাসের মিলন, না হয় নাই হইল। খ্রীষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতকের বাঙ্গলা পুস্তকে পাঁচ-সাতটা আরবী-ফারসী শব্দ থাকা বিচিত্র নহে। কৃত্তিবাসী রামায়ণে বিদেশী শব্দের অভাব নাই। পূর্ব্ব-বঙ্গের কবি বিজয় গুপ্তের পদ্মাপুরাণে আরবী-ফারসী শব্দ অজস্র। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের পুঁথির প্রতিলিপি হয়ত অধিক হয় নাই, হইলে অন্ততঃ আরও এক আধখানা পাওয়া যাইত। পুঁথির প্রাপ্তিস্থান বিষ্ণুপুরের উপর অতটা ঝোঁকই বা কেন দিতে যাই? পুঁথিখানা এখন কলিকাতা সাহিত্য-পরিষদে। সেই অজুহাতে কবি কলিকাতায় বসিয়া পুঁথিখানা লিখিয়াছিলেন, মনে করা সঙ্গত হইবে না। নূতন আবিষ্কার,—আবিষ্কর্ত্তা শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয়,—পুঁথির ৮৭ পত্রের অপর পৃষ্ঠায় 'শ্রীগুণরাজ খাঁ' এই নাম লেখা আছে। গ্রন্থ সম্পাদন-কালে আমাদের চোখ এড়াইয়া গিয়াছিল, সেইজন্য আমরা অত্যন্ত দুঃখিত। খুব সম্ভব পুঁথিখানা এক সময়ে গুণরাজ খাঁর অধিকারে ছিল। ইনি আবার যদি শ্রীকৃষ্ণবিজয়কার মালাধর বসু হয়েন, তাহা হইলে উহার উপাদেয়তা যথেষ্ট বাড়িয়া যায়। এবং পুঁথির প্রাচীনত্বে আর সংশয়ের অবসর থাকে না।

বিদ্যানিধি মহাশয়ের বিবেচনায় আবিষ্কৃত পুঁথির রচনা খাঁটি নয়, মিশাল। উহাতে দুই তিন দেশের, দুই তিন কালের, দুই তিন কবির হাত আছে। আমরা তাঁহারই কাছে উহার যথাযথ বিশ্লেষণ ও নানা সমস্যার সমাধান প্রত্যাশা করিতে পারি।

বিষ্ণুপুর এক সময়ে সঙ্গীতচর্চ্চার প্রধান কেন্দ্র ছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। সেখানে চণ্ডীদাসের পদের পুঁথি ডোর-বাঁধা পড়িয়া থাকে কেন? নীচে তাহার কতিপয় হেতু নির্দ্দেশ করা গেল।

(১) মহাকবির রচিত গ্রন্থ মূল্যবান ও পবিত্র বোধে যখন-তখন যাহাকে-তাহাকে স্পর্শ করিতে না-দেওয়া।

(২) রাজার পুঁথিশালায় রক্ষিত পুঁথি জনসাধারণের দুষ্প্রাপ্য হইয়াছিল।

(৩) পুঁথি যখন বিষ্ণুপুরে পৌঁছে, তখন উহার ভাষা অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বোধ্য এবং অক্ষর দুষ্পাঠ্য হইয়া থাকিবে। অধিকন্তু তদানীন্তন সঙ্গীত-সমাজের বিশেষ বিশেষ রাগ-রাগিণী ও তাল-মান-বিশিষ্ট গীতের প্রতি অনুরাগ বা বিরাগ বশতঃ গান আদৃত বা উপেক্ষিত হইতে পারে। ইত্যাদি নানা কারণে শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের বিরলপ্রচার।

আমরা লিখিয়াছি, 'এই অপূর্ব্ব গ্রন্থ ২৫০ বর্ষ পূর্ব্বে বিষ্ণুপুর রাজের পুঁথিশালায় সযত্নে রক্ষিত হইত।' যে লেখা দেখিয়া অনুমান করিয়াছিলাম, সম্প্রতি সেটা পাওয়া গিয়াছে এবং অন্যত্র তাহার প্রতিকৃতি প্রকাশের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। বিষ্ণুপুর ব্যতীত অপরত্র 'আসিনী বাসিনী' গ্রাম্য দেবীর সন্ধান মিলে।

> শ্রীরাম রূপেঁ তোহ্মে বধিলেঁ রাবণ।
> বুদ্ধ রূপ ধরিআঁ চিন্তিলেঁ নিরঞ্জন॥
> কলকী রূপেঁ তোহ্মে দলিলেঁ দুষ্টজন।
> এবেঁ উপজিলা কংশ বধের কারণ॥

এখানে কবি দশ অবতারের পৌর্ব্বাপর্য্য ভঙ্গ করিয়াছেন—ভাবিয়া আমরাও ভুল করিয়াছিলাম। সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় তাহা দেখাইয়া দেন। তাঁহার ভাষাতেই বলি, "আমাদের শাস্ত্র অনুসারে সৃষ্টি-প্রবাহ অনাদি ও অনন্ত। প্রত্যেক প্রলয়ের পরই আবার অবিকল পূর্ব্ব-ক্রমানুসারে সৃষ্টি-ক্রিয়া ও অবতারাদির উৎপত্তি চলিতে থাকে। ইহা স্বীকার না করিলে অনেক স্থলেই শাস্ত্রোক্তির সামঞ্জস্য রক্ষা করা যায় না। সুতরাং পূর্ব্বেও শ্রীকৃষ্ণ বুদ্ধ ও কল্কিরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন মনে করিয়াই যে বলরাম 'চিন্তিলে ও দলিলেঁ' বলিয়াছেন, তাহাতে কোন সন্দেহের কারণ নাই। চণ্ডীদাসের যে এই অর্থই অভিপ্রেত, তাহার অপর প্রমাণ এই যে, তিনি ইহার পূর্ব্বপদে লিখিয়াছেন,—

> বলভদ্র খাণিএক গুণিলান্ত মণে।
> মোহ পাম্বিল কাহ্নাঞি বিসরী আপণে॥
> পুরুব জাণাইআঁ আহ্মে করায়িউ চেতন।

* * * * [অন্যথা] এরূপ স্থলে 'পুরুব জাণাইআঁ' ইত্যাদি উক্তি কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে? জয়দেবও তাঁহার প্রসিদ্ধ দশাবতার স্তোত্রে কূর্ম্ম, বরাহ, বামন, পরশুরাম, শ্রীরাম, বলরাম, বুদ্ধ ও কল্কি অবতারের পক্ষে 'ভবিষ্যৎ-সামীপ্যে লট্' বলিয়া বর্ত্তমান-কালের ক্রিয়া-পদ সমর্থন করা গেলেও অন্য অবতারের পক্ষে তাহা খাটে না; সুতরাং সেখানেও অবতারগণের নিত্যত্ব স্বীকার না করিলে লট্ প্রয়োগ সমর্থন করা যায় না।"

একটা শব্দ-সাদৃশ্য, দুইটা বর্ণ-বাহুল্য ও কএকটা দীর্ঘস্বর কি প্রমাণরূপে গণ্য হইবে? ঝুমুরের গান যেমন বাঁকুড়া মানভূমে আছে, তেমনই বর্দ্ধমানের পশ্চিমাংশ, বীরভূম, এমন কি সুদূর বৈদ্যনাথেও আছে। অর্থাৎ প্রাচীন ঝাড়খণ্ডের অনেকখানির উপর ঝুমুরের প্রভাব দেখা যাইতেছে। সঙ্গীত-শাস্ত্রেও ঝুমুরগানের একটা নির্দ্দিষ্ট স্থান আছে। ধামালী সমগ্র উত্তর-বঙ্গে প্রচলিত। ঝুমুর বা ধামালী আধুনিক নয়। চৈতন্যমঙ্গলকার লোচনদাসের ধামালীর পদ প্রসিদ্ধ।

শ্রীযুক্ত সতীশ বাবু বলেন, ব্রহ্মবৈবর্ত্তে যখন শ্রীরাধার মাতার নাম 'কলাবতী' ও পদ্মপুরাণে 'কীর্ত্তিদা' তখন অপর কোন পুরাণ বা লৌকিক আখ্যায়িকা অনুসারে শ্রীরাধার জনক ও জননীর নাম সাগর গোয়াল ও পদ্মাবতী ছিল;' চণ্ডীদাস উহাই গ্রহণ করিয়াছেন—এরূপ মনে করা যাইতে পারে। কিন্তু আমরা জড়ে ব্যক্তিত্বের আরোপ লক্ষ্য করিয়াছিলাম।

পুরাণান্তরে মধুবনে কৃষ্ণগঙ্গা নামক সরিদ্বরার উল্লেখ আছে। বৈষ্ণব-সাহিত্যে মানসগঙ্গার বর্ণনা পাওয়া যায়।

নালিচা কাটিআঁ কাহ্নাঞি মাঝ জলে থুইল। প্রাকৃতপৈঙ্গলে,—

ওগগর ভত্তা রম্ভঅ পত্তা
গাঁইক ঘিত্তা দুধ্ধ সজুত্তা।
মোইণি মচ্ছা নালিচ গচ্ছা
দিজ্জই কন্তা খা পুণবন্তা॥

[নালিচগচ্ছা—নালিচবৃক্ষঃ, নালীচো গৌড়দেশে অনেনৈব নাম্না প্রসিদ্ধঃ শাকবিশেষ ইত্যর্থঃ।]

বাঙ্গী—'চীতি ত্রয়ং গোমুক ইতি ভবতঃ। বাঙ্গীতি খ্যাতে। কর্কটী বিশেষ স্যেতি রায়ঃ।' বনৌষধিবর্গ, অমর-টীকা। শব্দটি বীরভূমের লোকমুখে শুনিয়াছিলাম, উত্তর ও পূর্ব্ব-বঙ্গে প্রচলিত।

জারজার্থক 'কালিনী মাত্র' শব্দটি শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে দুইবার আছে, ঘনরামের ধর্ম্মমঙ্গলে আছে; আরও দু-এক স্থলে পাইয়াছি মনে হইতেছে। মৃচ্ছকটিকে, 'কাণেলীমাতঃ বামস্তস্য সার্থবাহস্যগৃহম।' ১ম অঙ্ক; 'কাণেলীমাতঃ অস্তি কিঞ্চিচ্ছিহ্নং যদুপলক্ষয়সি।' ১ম অঙ্ক। [কাণেলীমাতঃ। 'কাণেলী কন্যাকামাতা' ইতি দেশীপ্রকাশঃ। 'অসতী কাণেলী' ইত্যেকে।] এই কাণেলীমাতৃ শব্দেরই বিকারে 'কালিনী মাত্র'।

সাত্বত বা ভাগবত-ধর্ম্ম অতি প্রাচীন। বৈষ্ণব বলিতে আমরা গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্মী অথবা আধুনিক সাম্প্রদায়িকদের বুঝি। ইঁহারা আ য় ন বা আ ই হ ন শব্দকে অভিমন্যুতে পরিণত করিয়াছেন, কেমন করিয়া বলা যায়? কারণ শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনকার 'অভিমন্যু' ও 'আইহন' উভয় শব্দই ব্যবহার করিয়াছেন; যথা—'অভিমন্যুজনন্যাহং নিযুক্তা তব রক্ষণে।' পৃঃ ৮, 'অভিমন্যুপ্রসূঃ প্রাহ রাধায়া মথুরা গতিম্॥ পৃঃ ৩০। বড়ু চণ্ডীদাস বৈষ্ণবও ছিলেন না; এবং গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সমাজ তখনও গড়িয়া উঠে নাই। অভিমন্যু শব্দ কুমারপাল-চরিতে 'অহিবন্ন' ও বড় ভাষাচন্দ্রিকায় 'অহিবণ্ণ' আকারে পাওয়া যায়। 'আইহন' শব্দ প্রাকৃত 'অহিবন্নু'-রই প্রাচীন বাঙ্গালা রূপভেদ। প্রাচীন বাঙ্গালার স্বরধ্বনির পরিবর্ত্তন নিয়মে প্রাকৃত বা তৎসম শব্দের আদ্য অ-কার আ-কারে পরিণত হয়—এই বৈশিষ্ট্য এই শব্দের বঙ্গীয়ত্ব তথা প্রাচীনত্বের নিদর্শন (এ সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত সুনীতিবাবুর *Origin & Development of the Bengali Language* দ্রষ্টব্য)।

চণ্ডীদাস বাসলী (বাগীশ্বরী) বরে শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন রচনা করিয়াছিলেন। অবশ্য এ বাসলী তথাকথিত চণ্ডী নহেন। 'রামী-টামী' যে আরোপ বা নিছক কল্পনা তাহা আমরা প্রবন্ধান্তরে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি।

আলোচনা ইচ্ছা করিয়াই সংক্ষিপ্তরূপে করিলাম—আশা করি ইহাতে বিশেষজ্ঞগণের বুঝিতে অসুবিধা হইবে না।

শ্রীবসন্তরঞ্জন রায়

উত্তর

বসন্তরঞ্জন বাবু লিখিয়াছেন, প্রাচীনতম বাঙ্গালা গ্রন্থের সহিত "শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে"র তুলনামূলক আলোচনার ফলে আমরা কবির দেশ ও কালের অনুমান করিতে পারি।" দুঃখের বিষয়, কেহ সে কর্মে অগ্রসর হন নাই। যদি ইহার ফলে আমরা পুথীর দেশ বীরভূম-নানুর, এবং কাল ১৩০০—১৩৫০ খ্রীষ্টাব্দ জানিতে পারি, তাহা হইলে আর কোন তর্ক থাকিবে না। তখন স্বচ্ছন্দে বলিব, সে দেশে ১৩০০ খ্রীষ্টাব্দে, আর্বী ফার্সী শব্দ চলিতেছিল, লোকে 'মজুরি' করিত, 'মজুরিআ' ডাকিত, কৃষ্ণকীর্তনের ব্যাকরণে যে-সব বিভক্তি ও প্রত্যয় দেখিতেছি, সে-সব সে দেশে ১৩০০ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে চলিতেছিল। 'তোকে' বুঝাইতে 'তোক', 'তোতে', 'তোরে' বলা হইত। কিন্তু যতদিন পুথীর দেশ ও কাল জানিতে না পারি, ততদিন মনে করিব এক কবির লেখা নয়।

অল্পদিন হইল, ঐতিহাসিক শ্রীযুত নলিনীকান্ত ভট্টশালী আমায় এক পত্রে লিখিয়াছেন, বাঁকুড়া ও মেদিনীপুর হইতে তিনি ১৩৮৮ শকে লেখা বিষ্ণুপুরাণ ও ১৪২৩ শকে লেখা হরিবংশ সংগ্রহ করিয়াছেন, এবং ইহাদের লিপিপদ্ধতির সহিত কৃষ্ণকীর্তনের পুথীর চমৎকার মিল দেখিয়াছেন। আমি এইরূপ তুলনা খুজিতেছিলাম। যদিও ভট্টশালী মহাশয় রাখালবাবুকে সমর্থন করিয়াছেন, তাঁহার বিচারে ১৩০০—১৩৫০ খ্রীষ্টাব্দ নয়, ১৪৬৬—১৫০১ খ্রীষ্টাব্দের অক্ষরের সহিত মিল আছে। তিনি আরও এক শত বৎসর পরে লেখা অক্ষরের সহিত মিলাইয়াছেন কিনা, জানান নাই। তাঁহাকে লিখিয়াছি, এখনও উত্তর পাই নাই।

পাটের নিমিত্ত 'নালিচা'র চাষের উল্লেখ নাই। এই টুকুই যথেষ্ট। ফুটি অর্থে 'বাঙ্গী' শব্দ বাঁকুড়াতেও কদাচিৎ শুনিতে পাওয়া যায়। 'কালিনী' ও 'কাণেলী' দুই পৃথক শব্দ।

'অভিমন্যু' শব্দ সংস্কৃত-প্রাকৃতে 'অহিবন্নু'। তা হউক। আমার তর্ক, প্রথমে আয়ন নাম হইবার কথা। নামটি অভিমন্যু হইবার হেতু পাই না। আমি রূপক ভাবিয়া বলিতেছি। কৃষ্ণকীর্তনে অভিমন্যু নাম আছে, কিন্তু সংস্কৃত শ্লোকে। গানের পূর্বে শ্লোকটি বসিবার কথা, গানের শেষে কেন বসিল? আর একটি শ্লোক গানের আরম্ভে বসিয়াছে। তথাপি একটিতে শেষে দেখিয়া সন্দেহ হয়, পুথীর প্রথম সংস্করণে ছিল না, দ্বিতীয় সংস্করণে কোন পণ্ডিত বসাইয়া দিয়াছেন। কোন্ কোন্ প্রাচীন গ্রন্থে অভিমন্যু নাম আছে, বসন্তবাবু অনুসন্ধান করিবেন। এতদ্দ্বারা কৃষ্ণকীর্তন বুঝিবার সুবিধা না হউক, আমার এক প্রবন্ধে সাহায্য হইবে।

বসন্তবাবু লিখিয়াছেন, "চণ্ডীদাস বাসলী (বাগীশ্বরী) বরে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন রচনা করিয়াছিলেন। অবশ্য এ বাসলী তথাকথিত চণ্ডী নহেন।" তিনি এই দুই নূতন মত বিস্তার করিলে ধাঁদায় পড়িতে হইত না। এক চণ্ডীর কথা শুনিয়া আসিতেছি। সংস্কৃত মার্কণ্ডেয়-চণ্ডী হইতে আরম্ভ করিয়া বাঙ্গালা চণ্ডীমঙ্গল পর্যন্ত কোথাও বাগ্‌দেবীকে প্রচণ্ডামূর্তিতে দেখিতে পাই না। চণ্ডীকেও বাগ্‌দেবী রূপে ভাবিতে দেখি না।

সে যাহা হউক, আমি চণ্ডীদাস সম্বন্ধে উত্তর-প্রত্যুত্তর করিতে পারিব না।

বাঁকুড়া
১৩৩৭ সাল, ১৬ই চৈত্র।

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়

শুদ্ধিপত্র

গত চৈত্রমাসে প্রকাশিত "চণ্ডীদাসের কৃষ্ণকীর্ত্তন আসল না নকল" প্রবন্ধে

৯৫২ পৃষ্ঠে	১ পাটিতে	৬ পঙক্তিতে	'লিখিত। পদের' স্থানে 'লিখিত পদের' হইবে।
৯৫৩ ,,	২ ,,	শেষে ,,	'এক এক নূতন'…'এক নূতন'
৯৫৪ ,,	১ ,,	২৫ ,,	'শোনেন নাই'…'শোনান নাই'



ভারতবর্ষ

ভারতবর্ষে বহির্বাণিজ্য (১৯৩০)—

১৯৩০ সনের ভারতবর্ষের বহির্বাণিজ্যের হিসাব সম্প্রতি বাহির হইয়াছে। ১৯২৯ সনের তুলনায় এ বৎসর আমদানী চৌষট্টি কোটি টাকা এবং রপ্তানি সত্তর কোটি টাকা হ্রাস হইয়াছে। ১৯৩০ সালে বিদেশী বস্ত্র আমদানী হইয়াছে ১২৫'৪ কোটি গজ, মূল্য ২৯'৯৩ কোটি টাকা. পূর্ব্ব বৎসরের তুলনায় ৬৬'৫ কোটি গজ এবং ২১'৫৩ কোটি টাকা কম। কলিকাতা ইণ্ডিয়ান চেম্বার অফ্ কমার্স-এর সেক্রেটারি শ্রীযুক্ত এম্-পি, গান্ধীর হিসাবমতে ভারতবর্ষে ১৯২৯-৩০ সনে দেশী ও বিদেশী কাপড়ের কাট্‌তি হইয়াছিল ৫৫৮'৬ কোটি গজ। এই হিসাব সম্পূর্ণ সত্য হইলে, বাৎসরিক প্রয়োজনীয় বস্ত্রের তিন-চতুর্থাংশই ভারতবর্ষে প্রস্তুত হইয়াছে বলিতে হইবে। এ বৎসরে বিদেশী সূতাও ২,৮৭,৪৯,৯৪১ টাকা কম আমদানী হইয়াছে। নিম্নলিখিত জিনিষগুলিও কম আমদানী হইয়াছে। মোটর গাড়ীর আমদানী হ্রাস ১,৪৪,৯৮,২৫৯ টাকার, লৌহযন্ত্রাদি ১,১৪,৮৫,৫৩২ টাকার, কাচ এবং কাচের দ্রব্যাদি ৭২,৪৩,৬৮ টাকার, ইস্পাত ১,৩,২৯,৪৮০ টাকার, কাগজ ৫৪,৭৪,৮৯ টাকার, সিগারেট ৫৪,৪৬,৬৩২ টাকার এবং সাবান ৩১,৫৭,৪৪৬ টাকার। এ-বৎসর বিদেশ হইতে তুলার আমদানী সব চেয়ে বেশী হইয়াছে।

—'দি লীডার'

জামনগর রাজ্যে বিলাতী বস্ত্র বিক্রয় বন্ধ—

'ষ্টেটসম্যান' পত্রে আমেদাবাদ হইতে জনৈক সংবাদদাতা জানাইয়াছেন যে, জামনগর রাজ্যের অধিপতি জামসাহেব এই মর্ম্মে এক আদেশ জারী করিয়াছেন যে, তাঁহার রাজ্যে কেহ বিলাতী কাপড় বিক্রয় করিতে পারিবে না। এই আদেশের কারণ উল্লেখ করিয়া মহারাজা বলেন যে, তাঁহার প্রজাদের মধ্যে অধিকাংশ লোক তাঁহার রাজ্যে বিলাতী কাপড় বিক্রয়ের বিরোধী। এমন কি রাজ্যের ব্যবসায়িগণ পর্য্যন্ত এই মতাবলম্বী।

বর্ত্তমানে তিন মাসের জন্য এই আদেশ জারী হইয়াছে। কেহ এই আদেশ অমান্য করিলে তাহাকে শাস্তি দেওয়ার ব্যবস্থা হইয়াছে।

—আনন্দবাজার

চর্‌খা প্রতিযোগিতা—

মহাত্মা গান্ধী সর্ব্বোৎকৃষ্ট চর্‌খার জন্য সম্প্রতি একলক্ষ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করিয়াছেন। গুজরাট বিদ্যাপীঠ, সবরমতী আশ্রম, আহ্‌মদাবাদ— এই ঠিকানায় চর্‌খা প্রেরণ করিতে হইবে। শেঠ অমৃত-লাল, শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীদাস পুরুষোত্তম দাস এবং শ্রীযুক্ত অম্বাভাই মুলচাঁদ মেহ্‌তা বিচারক নিযুক্ত হইয়াছেন। এ-যাবৎ বিশটি নমুনার চর্‌খা গুজরাট বিদ্যাপীঠে আসিয়াছে। ইহাদের মধ্যে কোনটিই সন্তোষজনক না হওয়ায় পরিচালকগণ প্রতিযোগিতার সময় আরও বাড়াইয়া দিয়াছেন। যাঁহারা চর্‌খা-প্রতিযোগিতায় যোগদান করিতে ইচ্ছুক তাঁহারা গুজরাট বিদ্যাপীঠে স্ব স্ব চর্‌খার নমুনা প্রেরণ করিতে পারেন।

স্বরাজের মূল নীতি—

নিখিল ভারত জাতীয় কংগ্রেসের ৪৫তম করাচী অধিবেশনে অন্যান্য প্রস্তাবের সঙ্গে নিম্নলিখিত প্রস্তাবটিও পাস হইয়াছে। এই প্রস্তাবে স্বরাজের মূল নীতি বিঘোষিত হইতেছে :—

"এই কংগ্রেসের অভিমত এই যে, জনসাধারণের শোষণ বন্ধ করার জন্য রাজনৈতিক স্বাধীনতার মধ্যে বুভুক্ষু জনসাধারণের প্রকৃত আর্থিক স্বাধীনতা থাকা চাই। কংগ্রেস স্বরাজ বলিতে যাহা বুঝে, জন-সাধারণ যাহাতে তাহার মর্ম্মোপলব্ধি করিতে পারে, তজ্জন্য তাহাদের বোধগম্য করিয়া কংগ্রেসের কথা স্পষ্ট করিয়া নির্দ্দেশ করা বাঞ্ছনীয়। সুতরাং কংগ্রেস ঘোষণা করিতেছে যে, কংগ্রেসের তরফ হইতে যদি কোন রাষ্ট্রব্যবস্থা স্বীকৃত হয়, তবে তাহাতে নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলি থাকা চাই, অথবা স্বরাজ গবর্ণমেণ্টকে সে সমস্ত ব্যবস্থা করার ক্ষমতা দেওয়া চাই :—

(১) সর্ব্বসাধারণের কতকগুলি অবিসম্বাদী অধিকার ঘোষণা; যথা—

(ক) সমিতিবদ্ধ হওয়া।

(খ) স্বাধীন মত ব্যক্ত করা এবং সংবাদপত্রের স্বাধীনতা।

(গ) সাধারণের সুনীতি ও শান্তি নষ্ট না করিয়া যাহার যেরূপ অভিরুচি তাহাকে সেরূপ মত পোষণ করিতে এবং ধর্ম্মের অনুসরণ করিতে দেওয়া।

(ঘ) জাতি, বর্ণ বা ধর্ম্মের জন্য কেহ কোন সরকারী চাকুরি' অধিকার বা সম্মান অথবা কোন ব্যবসায় বা বৃত্তির অনুসরণ করার অনধিকারী বিবেচিত হইবে না।

(ঙ) পুরুষ-স্ত্রী নির্ব্বিশেষে সকল নাগরিকের সমান অধিকার ও বাধ্যবাধকতা স্বীকার করা।

(চ) সাধারণ রাস্তা, কূপ এবং সাধারণের ব্যবহারযোগ্য সকল স্থান ব্যবহার করিতে সকল লোকের সমানাধিকার।

(ছ) সাধারণের শান্তিরক্ষার্থ গঠিত কতকগুলি নিয়মাধীনে সকলকে অস্ত্র রাখার ও ব্যবহার করার অধিকার দেওয়া।

(২) ধর্ম্ম সম্পর্কে রাষ্ট্রের নিরপেক্ষতা।

(৩) শ্রমিকদিগকে জীবনধারণোপযোগী মজুরী দেওয়া, সীমাবদ্ধ সময় খাটান, কর্ম্মস্থলের পবিত্রতা রক্ষা, মালিকের লোকসানে শ্রমিককে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া হইতে রক্ষা করা; বার্দ্ধক্য, রোগ এবং বেকার অবস্থায় জীবিকার ব্যবস্থা করা।

(৪) দাসত্ব বা প্রায় দাসত্বের অবস্থা হইতে শ্রমিকদিগকে রক্ষা করা।

(৫) নারী শ্রমিকদিগকে রক্ষা করা এবং গর্ভাবস্থায় তাহাদের জন্য যথোচিত ছুটির ব্যবস্থা করা।

(৬) স্কুলে যাইবার যোগ্য বালক-বালিকাদিগকে কারখানার কার্য্যে নিয়োগ নিষিদ্ধ করা।

(৭) নিজেদের স্বার্থরক্ষার জন্য শ্রমিকদিগকে সঙ্ঘবদ্ধ হইবার অধিকার দেওয়া এবং শ্রমিকে মালিকে মতান্তর হইলে মিটমাটের জন্য মধ্যস্থের ব্যবস্থা করা।

(৮) ভূমির রাজস্ব বিশেষভাবে হ্রাস করা এবং অফলা জমির খাজনা যতদিন পর্য্যন্ত মকুব করা আবশ্যক ততদিন পর্য্যন্ত মকুব করা।

(৯) একটা নির্দ্দিষ্ট আয়ের উপর কৃষি-আয়ের ক্রমবর্দ্ধমান আয়কর ধার্য্য করা।

(১০) ক্রমিকহারে উত্তরাধিকার কর।

(১১) প্রত্যেক বয়স্ক ব্যক্তির ভোটাধিকার।

(১২) অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা।

(১৩) সামরিক ব্যয় বর্ত্তমান ব্যয়ের অন্ততঃ অর্দ্ধেক করা।

(১৪) দেওয়ানী বিভাগের ব্যয় ও বেতন বহুল পরিমাণে হ্রাস করিতে হইবে। বিশেষভাবে নিযুক্ত বিশেষজ্ঞ ব্যতীত রাষ্ট্রের কোন কর্ম্মচারীই একটা নির্দ্দিষ্ট টাকার বেশী বেতন পাইবে না। ঐ নির্দ্দিষ্ট টাকা সাধারণতঃ মাসিক পাঁচশত টাকার বেশী হইবে না।

(১৫) দেশ হইতে বিদেশী কাপড় ও বিদেশী সূতা বাহির করিয়া দিয়া দেশী কাপড়কে রক্ষা করিতে হইবে।

(১৬) মাদক পানীয় এবং মাদক দ্রব্য সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করিতে হইবে।

(১৭) লবণের উপর কোন কর থাকিবে না।

(১৮) মুদ্রাবিনিময়ের হার রাষ্ট্র কর্ত্তৃক এরূপভাবে নিয়ন্ত্রিত হইবে, যেন ভারতীয় শিল্পের সহায়তা এবং জনসাধারণের সহায়তা হয়।

(১৯) মৌলিক শিল্প এবং খনিজ সম্পদ রাষ্ট্র কর্ত্তৃক নিয়ন্ত্রণ।

(২০) প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কুসীদবৃত্তি নিয়ন্ত্রণ।

—

বাংলা

নারী সমবায় ভাণ্ডার—

নারীশিক্ষা সমিতির উদ্যোগে ও সহযোগিতায় কলিকাতা কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেটে "নারী সমবায় ভাণ্ডার" নামে একটি দোকান খোলা হইয়াছে। মেয়েদের পরিশ্রমজাত শিল্পদ্রব্য ও নিত্য ব্যবহার্য্য গৃহস্থালীর দ্রব্যাদি এই দোকানে বিক্রয়ার্থ মজুত থাকে। মহিলা কর্ম্মচারীরা ক্রেতাদের সাহায্যার্থ নিযুক্ত থাকেন।

মেয়েদের এই নূতন প্রচেষ্টায় শ্রীযুক্তা বাসন্তী দেবী খুব আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন এবং কলিকাতার নারী সমাজকে এই প্রচেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত করিতে অবহিত হইবার জন্য অনুরোধ জানাইয়াছেন।

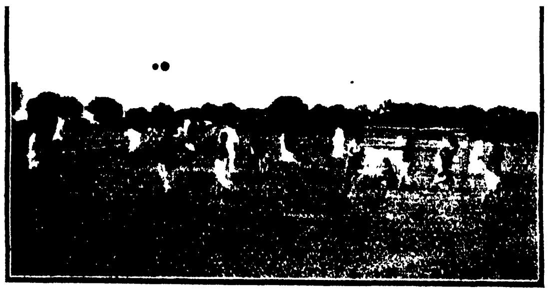
রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ—

বাংলা দেশে বালক-বালিকাগণের যেরূপ শিক্ষা হওয়া উচিত আমাদের গতানুগতিক স্কুলগুলিতে ঠিক তেমনটি হইতেছে না। ইহার কারণও যথেষ্ট আছে। শিক্ষার বাহন বিদেশী ভাষা হওয়ায় আমাদের বালক-বালিকারা যাহা কিছু শেখে তাহা নিতান্ত ভাসা-ভাসাই থাকিয়া যায়, মরমে প্রবেশ করিবার অবকাশ পায় না। এ ত্রুটি মূলগত। যতদিন শিক্ষানীতি এ বিষয়ে আমূল পরিবর্ত্তিত না হয়, ততদিন শিক্ষাদান এবং শিক্ষালাভ এ ভাবে ব্যাহত হইতেই থাকিবে। বর্ত্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায় এমন কতকগুলি দোষত্রুটিও আছে যাহা দূর করা আমাদের আয়ত্তের মধ্যে, এবং যাহা দূরীকৃত হইলেই তবে শিক্ষার সার্থকতা। ক্রীড়াকৌতুক, নির্দ্দোষ আমোদ-প্রমোদ, নানা স্থান পর্য্যটন—এ সকল বিষয়ের ব্যবস্থা করিয়া ছাত্রগণের শারীরিক শক্তি ও মানসিক বৃত্তির বিকাশসাধন প্রত্যেক শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের কর্ত্তব্য।



একটি স্কুল গৃহ

শহরের কলকোলাহল হইতে বহুদূরে পাহাড়ে জঙ্গলে ঘেরা স্বাস্থ্যনিবাস দেওঘরের প্রান্তদেশে রামকৃষ্ণ মিশনের কতিপয় কর্ম্মী কয়েক বৎসর ধরিয়া এরূপ একটি আদর্শ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিবার প্রয়াস পাইতেছেন। রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠের ছাত্রেরা বোর্ডিং-এ থাকিয়া শিক্ষকগণের তত্ত্বাবধানে অধ্যয়ন করিয়া থাকে। পুঁথিগত বিদ্যা ছাড়া সঙ্গীতচর্চ্চা, কারুশিক্ষা, নীতিশিক্ষা, গৃহস্থালী-শিক্ষা প্রভৃতিরও ব্যবস্থা আছে। এক কথায়, ছাত্রগণ স্বাবলম্বী হইয়া জীবন-সংগ্রামে যাহাতে জয়ী হইতে পারে সেই দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই এখানে শিক্ষা দেওয়া হয়। ক্রীড়া-কৌতুক, আমোদ-প্রমোদেরও আয়োজন আছে প্রচুর। গত বৎসর ছাত্রগণকে নালন্দা, রাজগৃহ ও পাটনা এই তিনটি ইতিহাস-প্রসিদ্ধ স্থান দেখানো হইয়াছে।



প্রাঙ্গণে ছাত্রেরা খেলা করিতেছে

ছাত্রগণকে জনসেবায় অনুপ্রাণিত করিবার ব্যবস্থাও বড় সুন্দর। ছাত্রগণকে কয়েকটি দলে বিভক্ত করা হইয়াছে। প্রত্যেক দলে তাহাদেরই এক একজন নেতা। তাহারা নিজেরাই নিয়ম গঠন করে এবং তাহা মানিয়া চলে। ইহারা সেবক নামে অভিহিত। আর্ত্তের সেবা, দুঃস্থের সাহায্য, বিপন্নের উদ্ধার ইহাদের কর্ত্তব্য।



স্কুলের মাঠ ও চারিদিকের দৃশ্য

এখানে ধর্ম্মশিক্ষারও বিশেষ ব্যবস্থা আছে, তবে তাহাতে গোঁড়ামির গন্ধ নাই, আবার উগ্র নবীনতারও স্থান নাই।

বিদ্যাপীঠে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য-তালিকা অনুসৃত হয়।

বাংলার পাট-চাষী সাবধান—

পাট বাংলার নিজস্ব সম্পদ হইলেও পাট-চাষীর দুর্দ্দশার অন্ত নাই। পাট ব্যবসায় বিদেশী বণিকের একচেটিয়া। পাটের দর তাহার হুমকির উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে। পাট-ব্যবসায়ী সঙ্ঘবদ্ধ, ধনকুবের, তাহার সঙ্গে লড়িতে হইলে নিধর্ন চাষীকেও সঙ্ঘবদ্ধ হইতে হইবে এবং এমন উপায় নির্দ্ধারণ করিতে হইবে, যাহাতে পাট-ব্যবসায়ীর কবল হইতে আশু মুক্ত হওয়া যায়। চাহিদা অপেক্ষা উৎপাদন বেশী হইলে সে-বার পাট-চাষীর দুর্দ্দশার আর অন্ত-অবধি থাকে না। গেল বৎসরই তাহার প্রমাণ। যে-পাট ১৯২৬ সনে কুড়ি টাকা মণ দরে বিক্রী হইত সেই পাট আজ তিন টাকা সাড়ে তিন টাকা দরেও বাজারে বিকাইতেছে না। গত বৎসর এত অধিক পাট উৎপন্ন হইয়াছে যে, চারি কোটি মণেরও বেশী অবিক্রীত থাকিয়া গিয়াছে।

চৈত্র বৈশাখ দুই মাস পাট বুনানীর সময়। পাট-চাষ-নিয়ন্ত্রণ সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র ঘোষ সকল পাট-চাষীকে সাবধান করিয়া সম্প্রতি এক ইস্তাহার প্রচার করিয়াছেন। তাহাতে তিনি বলেন—

(১) আপনারা কেহ সিকি পরিমাণের বেশী পাট চাষ করিবেন না।

(২) আপনারা যথেষ্ট পরিমাণ খাদ্যশস্যের চাষ করিবেন যাহাতে আপনাদিগকে উপবাস করিতে না হয়।

(৩) আপনারা প্রত্যেকে প্রতিজ্ঞা করিবেন যে, কেহ যেন অন্ততপক্ষে পাচ টাকা মণের কম দরে পাট বিক্রয় না করেন। কেহ কম দরে বিক্রয় করিতে চাহিলে অন্য সকলে তাহাকে নিষেধ করিবেন।

(৪) মনে রাখিবেন যে, একমণ পাট উৎপন্ন করিতে কিছুতেই ৫৲ টাকা খরচের কমে সম্ভবপর হয় না, সুতরাং ৫৲ টাকার কম দরে বিক্রয় করার চেয়ে উহা পোড়াইয়া ফেলাও ভাল।

(৫) গৃহস্থের ঘরে যদি যথেষ্ট পরিমাণ খাদ্যশস্য থাকে, তাহা হইলেই "পাচ টাকা মণের কম দরে পাট বিক্রয় করিব না" এই প্রতিজ্ঞা রক্ষা করা যাইবে। আর যদি আপনারা যথেষ্ট খাদ্যশস্যের চাষ না করেন, তাহা হইলে পুনরায় এই বৎসরের ন্যায় পেটের দায়ে তিন টাকা দরে পাট বিক্রয় করিতে হইবে।

আমরা আশা করি প্রত্যেক গ্রামসমিতি, ইউনিয়ন বোর্ড, পাট-পঞ্চায়েত এবং প্রত্যেক শিক্ষিত বাঙালী এ-বিষয়ে কৃষকগণকে ভালরূপ বুঝাইয়া দিয়া তাহাদিগকে ধ্বংসের পথ হইতে রক্ষা করিবেন।





যবদ্বীপকন্যা



মঙ্কুনগরোভবনে রবীন্দ্রনাথ

দ্বীপময় ভারত

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

(১৪) যবদ্বীপ—শূরকর্ত্ত

১২ই সেপ্টেম্বর, সোমবার।—

শূরকর্ত্ত আর তার দক্ষিণে যোগ্যকর্ত্ত, এই দুই নগর মধ্য-যবদ্বীপে অবস্থিত; এক হিসাবে এই অঞ্চলটা এখন যবদ্বীপের সভ্যতার কেন্দ্র, যবদ্বীপের হৃদয়-স্থল। মধ্য-যবদ্বীপেই যবদ্বীপের হিন্দু সভ্যতার প্রাচীনতম বিকাশ হয়; পরে পূর্ব্ব-যবদ্বীপে কেদিরি আর মজপহিৎ নগরকে অবলম্বন ক'রে এই সভ্যতা অর্ব্বাচীন যুগে একটু নোতুন রূপ পায়; এখন শূরকর্ত্ত আর যোগ্যকর্ত্ত এই দুটী রাজ্যকে অবলম্বন ক'রে সভ্যতার উৎস এ অঞ্চলে আবার ঘুরে এসেছে।

Goebeng গুবেঙ-ষ্টেশনে আমরা রেলে চ'ড়লুম। সুরাবায়ার সিন্ধী আর অন্য ভারতীয়েরা কবিকে তুলে দিতে এলেন, ডচ্ সজ্জনও কতকগুলি এলেন। শ্রীযুক্ত সুযান আমাদের সঙ্গে চ'ললেন। Krian, Modjokerto, Kertosono, Madioen—এই কয়টা শহরের পাশ দিয়ে আমাদের গাড়ী গেল। পূর্ব্ব-যবদ্বীপ আর মধ্য-যবদ্বীপের এই অংশটা খুব উর্ব্বর। সমস্ত পথ ধ'রে আখের ক্ষেত আর চিনির কল।

রেলের লাইন মিটার-গেজের—ছোটো লাইন। গাড়ীগুলি সব 'করিডর'-গাড়ী—ভিতর দিয়ে দিয়ে এক গাড়ী থেকে আর এক গাড়ীতে যাওয়া যায়। ইঞ্জিনের পিছনেই আহারের গাড়ী। খাবার জিনিস-পত্র একটু বেশী দামের ব'লে মনে হ'ল। রেলের যাত্রাটা মোটের উপরে বিশেষ আরাম-দায়ক হয় নি—গরমে আর ধুলোয়। এদেশে দুপুরবেলা গরমের সময়ে বরফ-দেওয়া কফি খাবার রেওয়াজ আছে দেখলুম।

আমরা দ্বিতীয় শ্রেণীতে যাচ্ছিলুম, কবি ছিলেন প্রথম শ্রেণীতে। একই গাড়ীর মধ্যে এই দুই শ্রেণী। দ্বিতীয় শ্রেণীতে একজন যবদ্বীপীয় ভদ্রলোক ছিলেন, প্রৌঢ় বয়সের,—ভদ্রলোক আমাদের সঙ্গে খুব কথা কইতে চান দেখলুম, কিন্তু ভাষার অভাবে আলাপ জ'মল না। আমরা ডচ্ বা মালাই দুইয়ের একটাও জানি না, আর এই দুই ভাষা ছাড়া অন্য কোনও আন্তর্জাতিক ভাষা এঁর জানা নেই। মনে হ'ল, ডচ বন্ধুদের সাহায্যে আমাদের সঙ্গে আলাপ ক'রতে যেন ইনি ততটা ইচ্ছুক নন। আমার ভাঙা ভাঙা মালাইয়ে একটু-আধটু কথা হ'ল। ভদ্রলোক ব'ললেন, তিনি থিওসফিষ্ট। ইউরোপে সব চেয়ে হলাণ্ডেই থিওসফিষ্টদের প্রভাব বেশী, আর দ্বীপময় ভারতেও যে এই মতবাদের প্রসার এখানকার ডচেদের দেখাদেখি স্থানীয় মুসলমান শিক্ষিত জনগণের মধ্যে ঘ'টছে তাঁরও বহু প্রমাণ পেয়েছি। থিওসফি-শাস্ত্রোক্ত দর্শন বা পরলোকবাদ হিন্দু দর্শন থেকেই নেওয়া—সে সব আভ্যন্তর মতবাদের 'সম্বন্ধে' কোনও মন্তব্য প্রকাশ করবার যোগ্যতা আমার নেই; তবে একটা বিষয়ে থিওসফির দল যে কাজ ক'রছেন তার জন্যে তাঁদের সাধুবাদ দিতেই হয়—এঁরা মানুষের মধ্যে ধর্ম্ম-বিষয়ে একটা উদারতা এনে দিচ্ছেন, সব জাতের ধর্ম্ম আর সংস্কৃতি সম্বন্ধে একটা অন্তর্নিহিত ঐক্যবোধ আর একটা শ্রদ্ধাশীল দৃষ্টি এনে দিচ্ছেন, আর এই দিক দিয়ে আধুনিক যুগে জাতিতে জাতিতে মানুষে মানুষে একটা সংস্কৃতিগত মৌলিক ঐক্যের সম্বন্ধে ধারণা সাধারণ্যে এসে যাচ্ছে। যবদ্বীপে থিওসফিষ্টদের অনেক স্কুল আর অন্য প্রতিষ্ঠান আছে, তাদের হাতে বহু যবদ্বীপীয় তরুণের মন গঠিত হ'চ্ছে। ট্রেনের যবদ্বীপীয় ভদ্রলোকটির গীতার প্রতি আস্থা খুব; তিনি ডচ্ অনুবাদে বইখানি প'ড়েছেন। 'বাহাসা সান্স্ক্রেতা' শেখবার জন্যে তাঁর ইচ্ছে হয় খুব। তিনি আমাদের আরও অনেক কথা

কইতেন, কিন্তু ভাষার অভাবে হ'য়ে উঠ্ল না। মাঝের কি একটা ষ্টেশনে তিনি নেমে গেলেন।

বিকাল তিনটের কিছু পরে আমরা শূরকর্ত্তাতে পঁউছুলুম। শহরটার নাম হ'চ্ছে সংস্কৃত 'শূর-কৃত' অর্থাৎ শূর বা বীরের কৃত বা নির্ম্মিত। এটার আর একটা সংক্ষিপ্ত নাম আছে, সে নামটা হ'চ্ছে Solo সোলো। ষ্টেশনে আমাদের নিতে এসেছিলেন কোপ্যারব্যার্গ—তিনি বলিদ্বীপে আমাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে যবদ্বীপে ফিরে এসে তাঁর Java Instituut-এর বার্ষিক সভা সম্পন্ন ক'রে আমাদের দলের সঙ্গে এখানে যোগ



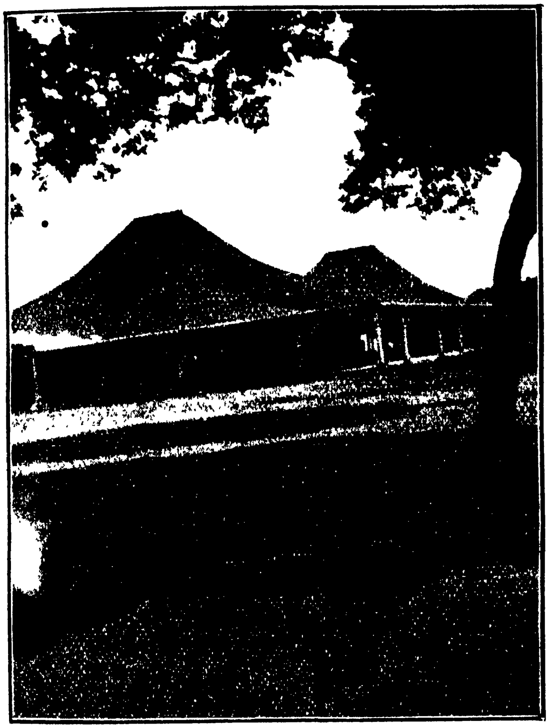
ডাক্তার রাজিমান

দিলেন; ডাক্তার Radjiman রাজিমান ব'লে একটী যবদ্বীপীয় ভদ্রলোক, আধুনিক উচ্চ-শিক্ষিত উদার-চরিত্র যবদ্বীপীয়দের প্রতিভূ-স্বরূপ; আর যাঁর অতিথি হ'য়ে সোলোতে আমরা অবস্থান ক'র্বো, সেই রাজা সপ্তম মঙ্কুনগরোর তরফ থেকে দুজন ভদ্রলোক এসেছিলেন।

শূরকর্ত্ত-তে দু জন রাজা আছেন—এক জনের উপাধি হ'চ্ছে Soesoehoenan 'সুসুহুনান' বা সংক্ষেপে Soenan 'সুনান', আর এক জনের 'মঙ্কুনগরো'। পদমর্য্যাদায় সুনান যবদ্বীপের তাবৎ দেশীয় রাজাদের মধ্যে প্রধান। এঁকেই যবদ্বীপীয়েরা জাতির মাথা ব'লে স্বীকার ক'রে থাকে, ইনিই নাকি প্রাচীন রাজবংশের বংশধর। যোগ্যকর্ত্ত নগরেও এই রকম দু জন রাজা আছেন—একজনের পদবী 'সুলতান', অন্য জনের পদবী 'পাকু আলাম'। সুলতান অনেকটা সুসুহুনানের সমকক্ষ; আর মঙ্কুনগরো আর পাকু-আলাম—এঁরা মর্য্যাদায় দ্বিতীয় শ্রেণীর।

মঙ্কুনগরোর প্রাসাদে আমাদের নিয়ে গেল। অনেকটা জায়গা জুড়ে এই প্রাসাদ—মহলের পরে মহল; তবে প্রায় সর্ব্বত্রই একতালা। মঙ্কুনগরোর নিজের বাসগৃহের মহলের লাগাও অতিথিদের জন্য কতকগুলি ঘর আছে,—উচ্চশ্রেণীর অতিথিদের জন্য একটা মহল ব'ল্লেই হয়। এইখানে আমাদের থাকবার ব্যবস্থা হ'য়েছিল। সমস্ত বন্দোবস্ত খুব হালের ধরণের; তবে এদেশের গুমট ভারতবর্ষের মতন হ'লেও, এখনও এরা বিজলীর পাখা ব্যবহার আরম্ভ করে নি। ডচেরা নাকি হুহু ক'রে হাওয়া বওয়াটা পছন্দ করে না, তাই তারা দ্বীপময় ভারতে পাখার প্রচলন করে নি। যবদ্বীপের বড়লোকদের প্রাসাদের একটা রীতি এই যে, প্রত্যেক প্রাসাদে এক বা একাধিক খুব প্রশস্ত তিন দিক বা চার দিক খোলা দোচালা বা চণ্ডীমণ্ডপ বা হল-ঘর থাকে,—এই হল-ঘরকে এরা pendopo 'পেণ্ডপো' বলে – শব্দটী আমাদের 'মণ্ডপ' শব্দেরই বিকারে উৎপন্ন ব'লে মনে হয়। আর থাকে একটা ঘরে একটি খুব জম্‌কালো গদী বা বিছানা,—বাড়ীতে বিয়ে হ'লে বর-ক'নে এই গদীতে বা বিছানায় বসে; আর কারও কখনও সেই গদীতে বসবার অধিকার নেই; গদীটাকে এরা বলে 'দেবী শ্রীর গদী'; প্রাচীন যবদ্বীপের হিন্দুযুগের স্মৃতি বহন ক'রে এই রীতি মুসলমান যবদ্বীপে এখনও বিশেষভাবে প্রচলিত আছে। যাক্, ফটক দিয়ে ঢুকেই খোলা চওড়া উঠান বা আঙিনা—তাতে দু চারটা গাছ; আঙিনার খানিকটা নিয়ে এই পেণ্ডপো; পেণ্ডপোর পিছনেই, বা তারই সংশ্লিষ্ট কতকগুলি বাসগৃহ। পেণ্ডপোর ছাত কাঠের বা টালির বা খড়ের বা করোগেটের হ'য়ে থাকে; ছাতটি থাকে অনেকগুলি কাঠের বা লোহার থামের উপরে। মেঝে সাধারণতঃ মারবেল-পাথরের হয়। আঙিনার জমি থেকে পেণ্ডপোর মেঝে অর্দ্ধ-হাত-টাক্ উঁচু হবে। চার দিক খোলা থাকায় বেশ হাওয়া চলে, দুপুর বেলা পেণ্ডপোর

এক কোণে ব'সে থাক্‌লে রোদ্দুর থেকে অনেক দূরে থাকা যায়, বেশ ঠাণ্ডার সঙ্গে ভিতরটায় একটু আঁধার-আঁধার ভাব থাকায় বাইরেকার রোদ্দুরের তুলনায় ভারী আরাম-দায়ক লাগে। আমাদের থাকবার ঘরের সংশ্লিষ্ট পেণ্ডপো ছাড়া, এটীর চেয়ে বড়ো আর একটী পেণ্ডপো মঙ্কুনগরোর প্রাসাদে আছে; ছোটো পেণ্ডপোটী আমাদের



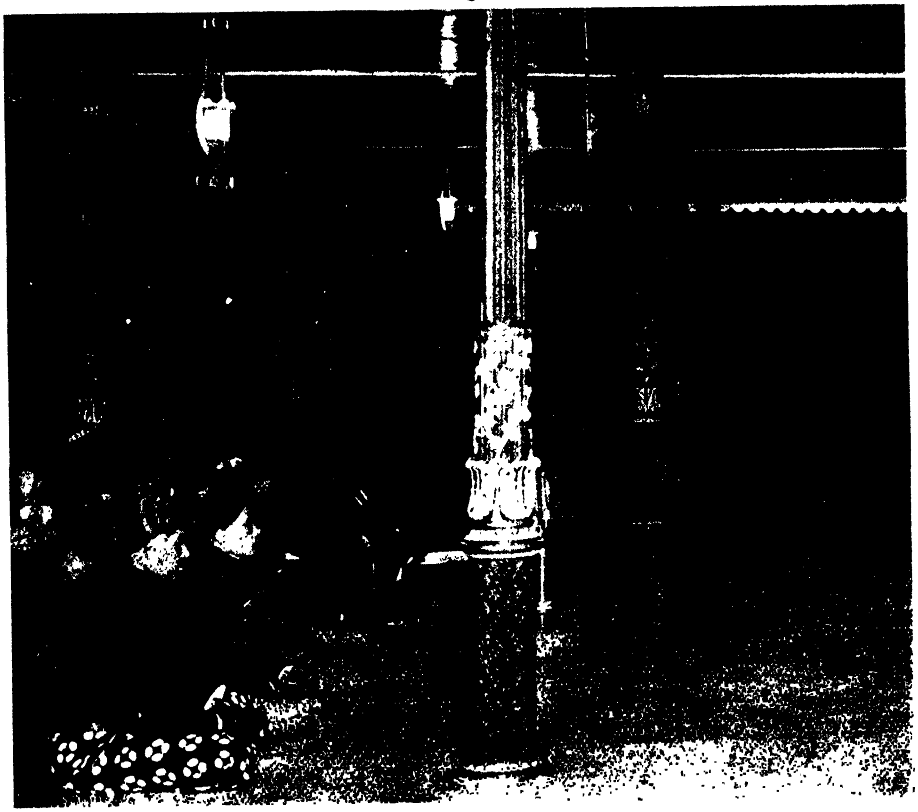
মঙ্কুনগরোর প্রাসাদের বড় মণ্ডপ
(শ্রীযুক্ত বাকে কর্ত্তৃক গৃহীত)

বৈঠকখানার মতন ব্যবহার ক'রতুম, ছোটো খাটো অনুষ্ঠান এখানেই হ'ত; এটীর মধ্যে এক পাশে গামেলান বাজনার দলের যন্ত্র-পাতি সাজানো আছে, প্রায়ই সন্ধ্যায় এই বাজনা, আর রাজার নর্ত্তকীদের নাচ হয়, সঙ্গে সঙ্গে গানও হয়। কাঠের থামগুলি সবুজ আর সোনালী রঙে রঙানো,—এই দুটী রঙ হ'চ্ছে মঙ্কুনগরোর ঝাণ্ডার রঙ। অন্য বড়ো পেণ্ডপোটীতে আরও বড়ো-বড়ো ব্যাপার—দরবার-টরবার—হয়। ছোটো মণ্ডপের ধারে দেয়ালে একদিকে বলিদ্বীপের কাপড়ে আঁকা ছবি কতকগুলি লাগানো, রামায়ণ-মহাভারতের ছবি; শুনলুম এগুলি বলিদ্বীপের কারেঙ-আসেমের রাজার উপহার,—তাঁর সঙ্গে মঙ্কুনগরোর বেশ হৃদ্যতা আছে। কবি সমস্ত মণ্ডপটীর সাজ-সজ্জা দেখে খুব প্রীত হ'লেন। আমরা সব গুছিয়ে নিয়ে মুখ হাত ধুয়ে একটু বিশ্রাম ক'রছি, ইতিমধ্যে মঙ্কুনগরো এসে কবির সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রলেন। বেশ সুপুরুষ দেখ্‌তে এঁকে, খুব হৃদ্যতার সঙ্গে আমাদের স্বাগত ক'রলেন। ইনি যবদ্বীপের একজন প্রধান সংস্কৃতি-নেতা, খুব বুদ্ধিমান, নিজের জাতির মধ্যে যা কিছু ভালো আছে সেগুলিকে রক্ষা করবার জন্য বিশেষ ভাবে চেষ্টিত। আমরা কয়দিন শুরকর্ত্ত তে থেকে এঁর নানা সদ্‌গুণের নানা বিষয়ে ঔদার্য্যের পরিচয় পেয়ে মুগ্ধ হ'য়ে গিয়েছিলুম। মঙ্কুনগরো ইংরেজী ভালো ব'লতে পারেন না, তবে প'ড়তে পারেন। আমাদের আলাপে ডাক্তার রাজিমান আর বাকে দোভাষীর কাজ ক'রলেন।

মণ্ডপে ব'সে আমরা চা খেলুম—সঙ্গে চালের গুঁড়ো, না'রকল আর গুড়ের তৈরী নানারকম যবদ্বীপীয় পিঠে আর বিস্কুট। ভরা বিকাল, সন্ধ্যে হয়-হয়। রাজবাড়ীর মণ্ডপের দেয়ালে রামায়ণ-মহাভারতের ছবি; সন্ধ্যে-বেলা রামায়ণ-মহাভারতের আখ্যান অবলম্বন ক'রে নাচ বা অভিনয় বা ছায়া-নাট্য প্রায়ই এই মণ্ডপে হ'য়ে থাকে; আবার সন্ধ্যের সময়ে রাজবাড়ীর মাইনে-করা দুই মোল্লা ঘরে ঘরে আরবী মন্ত্র প'ড়ে যাচ্ছে—শুনলুম, ভূত-প্রেত সব এতে ক'রে পালাবে।

কবির সঙ্গে সাড়ে ছটায় ডচ্ রেসিডেণ্ট সাহেবের ওখানে আমরা গেলুম। ডচ্ সরকারের প্রতিনিধি,—সেই হিসাবে ইনি সুনানের কাছ থেকে দাদার সম্মান পান—সব বিষয়েই রাজা এঁর ছোটো ভাইয়ের মতন অনুগত। রেসিডেণ্ট খুব খাতির ক'রে কবিকে স্বাগত ক'রলেন। বেশ লোক ইনি; এখানে আমাদের কাফি-পানের সঙ্গে নানা বিষয়ে খানিক ক্ষণ আলাপ হ'ল। রেসিডেণ্ট সাহেবের হিন্দু জাতি আর ধর্ম্ম সম্বন্ধে প্রগাঢ় সহানুভূতি আছে। বলিদ্বীপের হিন্দুধর্ম্মের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধেও কিছু কথা হ'ল। তারপর এঁদের শিষ্টাচারে বিশেষ প্রীত হ'য়ে আমরা Margkoenogoroan বা মঙ্কুনগরোর প্রাসাদে ফিরলুম।

সান্ধ্য আহারের পূর্ব্বে আমরা মণ্ডপে ব'সলুম। অতি মধুর তালে সমস্ত দেহ আর মনকে যেন স্নিগ্ধ ক'রে দিয়ে গামেলানের ঐক্যতান বাদন আরম্ভ হ'ল। যবদ্বীপের গামেলান বলিদ্বীপের চেয়ে আরও উন্নত, আরও সুকুমার, এখনও এই ভাবেই কাপড় পরে। কোমরে ফুল-কাটা রঙীন রেশমের কাপড়ের একটা কটীবস্ত্র, কোমর-বন্ধের মতন ক'রে বাঁধা, তার লম্বা দুই খুঁট নাচের সময়ে ওড়নার মতন হাতে ক'রে নিয়ে থাকে; এই রেশমের কাপড়



রাজবাড়ীর মণ্ডপে 'বীরেঙ্' নাচ — বামদিকে, গায়ক ও বাদকের দল

আরও কলাকৌশলময়, আরও মনোহর। দুটী মেয়ে তারপরে অতি সুন্দর পোষাক প'রে নাচ্লে—প্রায় ঘণ্টা-খানেক এই নাচ চ'ল্ল। এদের পোষাক ঠিক প্রাচীন যবদ্বীপীয় পোষাক নয়, তবে সেই পোষাকেরই আধারে, একটু-আধটু অদল-বদল ক'রে নেওয়া। গায়ে কাঁধ ঢাকা নীল সাটিনের জামা—কাঁধ পর্য্যন্ত দুই হাত খালি; প্রাচীন যবদ্বীপীয় পোষাকে গায়ে জামা পরার রেওয়াজ ছিল না, খালি বুকের উপরে একখান ওড়না জাতীয় কাপড় জড়িয়ে' রাখ্ত; এতে দুই কাঁধ অনাবৃত থাকে; মেয়েরা সাধারণ চলা-ফেরায় বা গৃহ-কর্ম্মে নিযুক্ত থাকলে ভারতবর্ষ থেকেই যায়,—এ কাপড় হ'চ্ছে সুরাটের বিখ্যাত 'পাটোলা' কাপড়। পা খালি। গায়ে গয়না বেশী নেই,—মাথার মুকুট, দু হাতে কনুইয়ের উপরে দুটি অলঙ্কার, গলায় একটি হার, তার ধুকধুকীটা অর্দ্ধচন্দ্র আকৃতির। যে নাচ নাচলে, তার নাম Golek নাচ। উদ্দাম ভাবের কিছুই নেই। নাচের সঙ্গে সঙ্গে গামেলান বাজ্ছে, আর সঙ্গে সঙ্গে বাজনার দলের সঙ্গে মাটিতে ব'সে কতকগুলি মেয়ে আর পুরুষ সুকণ্ঠে গান ক'রছে।

নাচ শেষ হ'ল না, খানিকক্ষণের জন্যে বন্ধ রইল; আমাদের গিয়ে সান্ধ্য ভোজন সারতে হ'ল, নাচের

মণ্ডপের পাশে একটি দর-দালানে। সেখানে গামেলানের আর গানের ধ্বনি আমাদের কানে আস্‌তে লাগ্‌ল। যবদ্বীপের সঙ্গীত আর বাদ্য নিয়ে কবি, মঙ্কুনগরো, ডাক্তার রাজিমান, কোপ্যারব্যার্গ আর বাকে আলোচনা স্বরলয়-যুক্ত ব্যাপার নয়, খালি তালের গতি মাত্র। আমাদের অশিক্ষিত কানে এই বৈশিষ্ট্যটুকু ধরা কঠিন, তবে এর ভাষা যে আমাদের শ্রুত ভারতীয় আর ইউরোপীয় যন্ত্র-সঙ্গীতের ভাষা থেকে অন্য ধরণের, সেটা



রাজবাড়ীর মণ্ডপে 'বীরেঙ্' নাচ—ডান দিকে, নর্ত্তকগণ

ক'রতে লাগলেন। শুন্‌লুম যে যবদ্বীপে দু রকম রীতির স্বর-গ্রাম প্রচলিত—একটিতে মাত্র পাঁচটী স্বর, এটি চীনেদের কাছ থেকে নেওয়া; আর একটিতে আমাদের মতন সাতটি স্বরই আছে—এটী ভারতবর্ষ থেকে গৃহীত। গামেলান মুখ্যতঃ ঘন, আতোদ্য আর আনদ্ধ যন্ত্রের সমাবেশে সৃষ্ট ঐক্যতান; এর মূল বা আধার হ'চ্ছে—তাল; যুগপৎ নানা সুরের যন্ত্রে খালি তাল দিয়ে গেলে তাদের ভিন্ন রেশের সমাবেশে ঐক্যতানে যে তাল-সমষ্টি ধ্বনিত হয়, তা থেকেই একটি মনোহর যন্ত্র-সঙ্গীতের উদ্ভব হয়; এ বাজনা আমাদের বীণা বা ইউরোপীয় পিয়ানোর মত আবছা-আবছা অনুমান করা যায়। ভাষা অশ্রুত-পূর্ব্ব বটে, কিন্তু তার কাকলি মর্ম্মস্পর্শী, একটা স্নিগ্ধতার আবেশে মনকে একেবারে ভরপূর ক'রে দেয়। এদের গান সম্বন্ধে কবির সঙ্গে সঙ্গীত-রসজ্ঞ বাকে আর অন্য ব্যক্তিদের যে আলোচনা হ'ল, তার সমস্তটা আমার বোধগম্য হ'ল না, কারণ আমি সঙ্গীতের ভিতরের কথা কিছুই জানি না; তবে কবির মন্তব্য সকলকেই মেনে নিতে হ'ল। দুটো কথা ব'লে এদের কণ্ঠ-সঙ্গীতের গুণ কবি নির্দ্দেশ ক'রেছিলেন—নানা লোকের গানে একই melodyর দ্রুত আর ঠায় গতিতেই এদের কণ্ঠসঙ্গীতে একটা harmony বা সংবাদিভাব

আসে, আর এদের গানে আরোহণ আছে, অবরোহণ নেই।



মঙ্কুনগরোর সভার নর্ত্তকী কন্যাদ্বয়
(শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ কর কর্ত্তৃক গৃহীত)

খাওয়া-দাওয়ার পরে আবার নাচ দেখা—এবার আর দুটী মেয়ে এল, একটু অন্য ধরণের পোষাকে; এই পোষাক কাঁধ-খোলা প্রাচীন যবদ্বীপীয় পোষাক। মেয়ে দুটী অতি সুশ্রী আর সুঠাম দেখ্‌তে, বয়স খুবই অল্প—মঙ্কুনগরো ব'ললেন এক জনের বয়স ষোলো, আর এক জনের চৌদ্দ,—আট বছর বয়স থেকে এরা এইসব নাচের সাধনা ক'রছে। এখন এরা যে নাচ দেখালে তার নাম হ'চ্ছে Kambiong; এরা রাজবাড়ীরই মেয়ে, তবে এদের সঙ্গে মঙ্কুনগরোর সম্পর্ক কি তা জানতে পারলুম না। একটা অতি চমৎকার সারল্য মাখা এদের মুখ; এক রকম সাদাটে রঙ মুখে প্রচুর পরিমাণে মাখার দরুন কোনও বিশেষ হাবভাব দেখাবার অবকাশ ছিল না;—তাতে ক'রে একটুখানি যেন লোকাতিগভাবের দ্যোতনাও এসে প'ড়ছিল। আর নাচের প্রত্যেক ভঙ্গীটী কি মহনীয় ছিল!—প্রত্যেকটী ছন্দোময় গতি-হিল্লোল যেন কল্প-লোকের আভাস আন্‌ছিল। সেকেলে পোষাকে যবদ্বীপের সম্ভ্রান্ত ঘরের তন্বী মেয়েদের অতি সুন্দর দেখায়—যদিও মুখের ছাঁচ অনেক স্থলে কতকটা নাক-চেপ্‌টা চীনা ধাঁজের, আমাদের চোখে হয় তো ততটা সুশ্রী বোধ হয় না। কিন্তু এরা বংশপরম্পরাগত একটী মনোহর গতিচ্ছন্দ পেয়েছে;—এ জিনিস ভারতেও এক সময়ে সুলভ ছিল, দারিদ্র্যের নিপীড়নে এখনও দুর্লভ হয় নি;—আর এই গতিচ্ছন্দটী নাচের সাধনার দ্বারা যেখানে আরও মার্জ্জিত হ'য়েছে সেখানে এই জিনিস যে একটী দেবভোগ্য শিল্পকলা হ'য়ে দাঁড়াবে তার আর আশ্চর্য্য কি? এই মেয়েদের নাচ গান পরে আরও কয়েকবার আমরা দেখি—কিন্তু প্রথম দিনে আমাদের যে ভাবে চমৎকৃত ক'রেছিল তার স্মৃতি এখনও মনে উজ্জ্বল ভাবে আছে;—যতদূর স্মরণ হ'চ্ছে, কবি যেন বলেছিলেন—যবদ্বীপের এই মেয়েরা যে ভাবে নাচলে, স্বর্গের অপ্সরাদের নাচ তার চেয়ে কতটা ভালো হ'তে পারে তা তাঁর কল্পনার অতীত:—আমাদের এই অপূর্ব্ব নাচ দেখে মুগ্ধ হ'য়ে যাওয়ায় বন্ধুবর সামুএল কোপ্যারব্যার্গের বড়োই আনন্দ—তাঁর প্রিয় যবদ্বীপের কৃষ্টির এই শ্রেষ্ঠ বস্তুটী যে কবির মতন রসজ্ঞের আন্তরিক সাধুবাদ অর্জ্জন ক'রেছে,—এইতেই তাঁর ফুর্ত্তি। কবি যবদ্বীপকে উদ্দেশ ক'রে যে বাঙলা কবিতা লিখেছিলেন, তার ইংরেজিও তিনি নিজে করেন; আর এই ইংরেজি থেকে ডচ অনুবাদ করেন বাকে; ডচ থেকে আবার যবদ্বীপীয় ভাষায় অনুবাদ করান মঙ্কুনগরো; আর এই যবদ্বীপীয় অনুবাদ এখন তাঁর গাইয়েরা গান ক'রে কবিকে শোনালে। মেয়ে দুটীও গানে যোগ দিলে—এদের গলাও চমৎকার।—রাত প্রায় সাড়ে বারোটা পর্য্যন্ত এই নৃত্য-দর্শন চ'ল্‌ল।

১৩ই সেপ্টেম্বর, মঙ্গলবার।—

আজ সকালে কোপ্যারব্যার্গের সঙ্গে আমরা মঙ্কুনগরোর

প্রাসাদ দেখলুম; সঙ্গে রাজবাড়ীর লোক ছিল, আমাদের নিয়ে বা'র-বাড়ী ভিতর-বাড়ী সব দেখালে। কবি বড়ো মণ্ডপটী দেখে মঙ্কুনগরোর কাছে গেলেন, তাঁর সঙ্গে গল্প ক'রতে লাগলেন—সঙ্গে দোভাষীর কাজ করবার জন্য লোক রইল। অন্দর বাড়ীর ভিতরে একটী গাছ-পালায় ছায়াময় আঙিনার ধারে দর-দালানে মঙ্কুনগরোর খাস-কামরা, তাঁর রাণী—এঁর উপাধি হ'চ্ছে Ratoe Timor 'রাতু-তিমর' বা 'প্রাচী রাজ্ঞী'—তাঁর খাস কামরা, বাগান, চিড়িয়াখানা, পর পর বড়ো বড়ো ছবিতে আর নানা জিনিসে সাজানো বিস্তর ঘর,—সব ঘুরে ঘুরে দেখলুম। প্রায় সবটাই একতালা; দোতালা ঘরও খানকতক আছে। রাজবাড়ীর মেয়েরা—অতি সুশ্রী সুঠাম চেহারার মেয়েরা সব—চলা-ফেরা ক'রছে, নানা শিল্প-কাজে ব্যাপৃত র'য়েছে। 'বাতিক' কাপড় ছাপার কাজ একাধিক জায়গায় হ'চ্ছে। এই কাপড় ছাপার রীতিটীর একটী বৈশিষ্ট্য আছে। যে নক্শাটী কাপড়ে ছাপ্‌তে হবে, তাতে হয় তো চারটে রঙ আস্‌বে। পাতলা ক'রে গরম মোম দিয়ে সমস্ত কাপড়খানায় অন্য রঙের অংশগুলি ঢেকে দিয়ে এক এক রঙে ছোপাবার ব্যবস্থা ক'রতে হয়। সমস্তটাই হাতের কাজ, আর অনেক সময়-সাপেক্ষ। বাতিকের কাপড়ে এই রকমভাবে হাতে ক'রে নক্শাগুলি মোমে ঢেকে ছোবানো হয় ব'লে, এর নকশার রঙে যে একটা কোমলতা এসে যায়, তা যন্ত্রের সাহায্যে—বিশেষতঃ বড়ো কলের সাহায্যে—ছাপা কাপড়ে পাওয়া অসম্ভব। কিন্তু বাতিক কাপড় বড়ো দামী, তাই এর চল ক'মে আস্‌ছে। তবুও হাতে তৈরী শিল্পের নিদর্শন হিসেবে ইউরোপের কলা-রসজ্ঞদের কাছে এর কদর হ'য়েছে ব'লে, আর যবদ্বীপের অভিজাত শ্রেণীর লোকেরা এই জিনিসকে এখনও ছাড়েনি ব'লে যবদ্বীপে এখনও বাতিকের যথেষ্ট সমাদর আছে। রাজ-রাজড়ার ঘরে ধনী লোকেদের ঘরে মেয়েরা এই শিল্পকে এখনও জাগিয়ে রেখেছেন। এক এক রাজার বা উচ্চবংশের এক একটী ক'রে বিশিষ্ট নক্শার প্রচলন থাকে, আর সেই নক্শার কাপড় বিশেষ বিশেষ বংশের লোক না হ'লে সাধারণ লোকে আগে প'রতে পারত না, এখনও আইনের বাধা না থাকলেও কেউ পরে না। মঙ্কুনগরোর বাড়ীতে মেয়েরা এই শিল্পকে বেশ জীবিত রেখেছেন দেখা গেল। আমরা এই ভাবে ঘুরে ফিরে, কবি আর মঙ্কুনগরো আর তাঁর রাণী যেখানে ছিলেন সেখানে এলুম। রাণীকে দেখ্‌লুম—দেখামাত্রই মনে একটা সম্ভ্রম জাগে। শুন্‌লুম ইনি যোগ্যকর্ত্তার এক রাজ-বংশের মেয়ে। যে কোনও দেশের লোকে এঁকে সুন্দরী ব'ল্‌বে। দেখ্‌তে তন্বঙ্গী, বর্ণে গৌরী, আর খুব ডাগর চোখ—আমাদের ভারতবর্ষে যে রকম চোখকে সৌন্দর্য্যের বিশেষ লক্ষণ ব'লে মনে করে সেই রকম চোখ। তাঁর রাণীরই মতন সৌজন্য-পূর্ণ ব্যবহার, তাঁর নিজের সহজ গৌরবে অবস্থান—আর সমস্তকে উদ্ভাসিত ক'রে ফেলে তাঁর অতি সুন্দর মিষ্টি হাসি। ইনি ইংরেজি জানেন না। মঙ্কুনগরো আমাদের পেয়ে তাঁর গ্রন্থাগার আর সংগ্রহশালা দেখালেন। ভারতবর্ষের সম্বন্ধে তাঁর অনেক বই আছে, আনন্দ কুমারস্বামীর Rajput Painting আছে দেখলুম, শুনলুম এখানি তাঁর একটী প্রিয় বই। যবদ্বীপের প্রাচীন কালের হিন্দু আমলের সোনার গয়না, পিতলের মূর্ত্তি, তৈজস-পত্র, এসব দেখালেন। প্রাচীন ছায়া-নাট্যকে ব্যবহৃত চামড়ায় কাটা পুতুল বিস্তর জড়ো করা র'য়েছে—এইগুলির চর্চ্চা তাঁর বড়ো ভালো লাগে। কথা-প্রসঙ্গে খানিকক্ষণ বেশ কাট্‌ল—এমন সময়ে চাকরে মঙ্কুনগরোকে আর আমাদের একবাটী ক'রে গরম সুপ আর বিস্কুট দিয়ে গেল। যবদ্বীপের রাজবাড়ীর একটা কায়দা লক্ষ্য ক'রলুম—রাজাকে কিছু দিতে হ'লে হাঁটু গেড়ে মাথায় ঠেকিয়ে তবে চাকরেরা দেয়, আর কেউ কিছু ব'লতে গেলে আগে দু হাত জোড় ক'রে তাঁকে প্রণাম করে, তারপরে কথা বলে, আর তাঁর মুখের কথা শুনেও দু হাত জোড় ক'রে মাথায় ঠেকিয়ে যেন তাঁর কথা গ্রহণ করে। এর পরে মঙ্কুনগরো আমাদের কয়েক খণ্ড দুর্ল্লভ বাতিক কাপড় উপহার দিলেন—এ কাপড় তাঁর বাড়ীতেই তৈরী, আর সেগুলির নক্শায়ও বৈশিষ্ট্য আছে। আমাকে যেখানি দিলেন সেটীর জমী ঘন খয়েরের রঙের, তার উপরে হল্‌দে সাদা আর কালো রঙে নক্শা—নকশাটী হ'চ্ছে পক্ষ বিস্তার ক'রে গরুড়ের; রাজবংশীয় ছাড়া

আর কারও এই নক্‌শার কাপড় পরার অধিকার আগে ছিল না।

এর পরে কোপ্যারব্যার্গের সঙ্গে তাঁর Java Instituut-এর বাড়ীতে গেলুম। কোপ্যারব্যার্গ এইখানেই থাকেন। এখানে Dr. Pigeaud পিঝো ব'লে একটী ডচ যুবকের সঙ্গে আলাপ হ'ল। ইনি যবদ্বীপের মধ্যযুগের হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে একখানি যবদ্বীপীয় ভাষার বই সম্পাদন আর তার অনুবাদ ক'রে হলাণ্ডের কোনও বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্‌টর উপাধি পেয়ে, কিছুকাল হ'ল যবদ্বীপে এসেছেন, যবদ্বীপীয় ভাষার একখানি বড়ো অভিধান সঙ্কলনের কাজে হাত দিয়েছেন। এঁর সঙ্গে বেশ শীঘ্রই আমার আলাপ আর হৃদ্যতা জ'মে উঠল; পরে এঁর সঙ্গে নানা বিষয়ে আমার আলাপ আলোচনা হয়—যবদ্বীপীয়দের হিন্দু সংস্কৃতিতে ইন্দোনেসীয় উপাদান কতটা, সে বিষয়ে কথা হয়,—দু একটা নোতুন কথাও শুনি এঁর কাছ থেকে। কোপ্যারব্যার্গ Java Instituut-এর তরফ থেকে কবির জন্য কতকগুলি সেকেলে যবদ্বীপীয় শিল্পদ্রব্য উপহার দিলেন—নাটকে ব্যবহৃত গয়না, ওষুধ রাখবার জন্য সাবেক কালের কাঠের ছোটো বাক্‌স, চামড়ার ওয়াইয়াং পুতুল, এই সব।

দুপুরে শ্রীযুক্ত সুযান বিদায় নিয়ে সুরাবায়ায় ফিরলেন—তিনি এখান পর্য্যন্ত এসে কবিকে প্রত্যুদ্‌গমন ক'রে গেলেন।

বিকালে শহরে আমাদের-অর্থাৎ সুরেনবাবুর ধীরেনবাবুর আর আমার—প্রাচীন মণিহারী জিনিসের সন্ধানে অভিযান হল। Kraton 'ক্রাতন' বা রাজপ্রাসাদের (সুনানের প্রাসাদের) একটা ফটকের বাইরে হরেক রকম জিনিসের হাট বা বাজার বসে, সেখানটাও ঘুরে এলুম। ক্রাতনের ভিতরে অনেকগুলি মহল; এর বাইরেকার দু একটা মহলও উপর-উপর একটু দেখে এলুম।

আজ রাত্রে সুসুহুনানের প্রাসাদে Bedojo 'বেডয়ো' নাচ দেখতে যাবো—ডিনারের পরে। কালো রেশমী আচকান আর টুপী প'রে আমরা তৈরী হ'লুম। তার পূর্ব্বে মঙ্কুনগরো কালকের মত আজও তাঁর প্রাসাদের ছোট মণ্ডপে নাচ দেখালেন। কালকের মেয়ে দুটি আজও নাচলে—তবে আজ পুরুষের বেশ প'রে, আর মুখে সঙের মুখস প'রে। আজ কেবল নাচ হ'ল না—অভিনয় হ'ল; এই সঙ-সাজা মেয়ে দুটির সঙ্গে অভিনয় ক'রলে একটি পুরুষ অভিনেতা-এরও মুখে সঙের মুখস। ব্যাপারটা যে খুবই হাস্যরসাশ্রিত হ'চ্ছিল তা শ্রোতাদের ঘন ঘন হাসির রোল থেকে বোঝা যাচ্ছিল। মঙ্কুনগরোর রাণী আজ এই নৃত্য বা অভিনয় সভায় তাঁর সহচরী পরিবৃত হ'য়ে এসেছিলেন, আর তা ছাড়া রাজবাড়ীর বিস্তর ছেলে বুড়ো আর মেয়ে ছিল—সবাই মণ্ডপের উপরে ভূঁয়ে ব'সেছিল আসর ক'রে। এই নৃত্যাভিনয়ের নাম শুনলুম Tembem 'তেম্বেম্' আর Batjak-dojok 'বাচাক্-দোয়্ওক্'।

মঙ্কুনগরোর বাড়ীতে প্রায় পৌনে নটা পর্য্যন্ত এই নৃত্যাভিনয় দেখবার পরে আমরা সুসুহুনানের প্রাসাদে গেলুম। সেখানকার 'বেডয়ো' নৃত্যের কথা আর যবদ্বীপের রাজ-দরবারের কথা পরে ব'ল্‌বো।

১৪ই সেপ্টেম্বর, বুধবার।—

প্রাতরাশের পরে কোপারব্যার্গ সঙ্গে আমরা রাজ-প্রাসাদের ফটকের লাগোয়া বাজারে পুরাতন জিনিসের দোকানে খানিকক্ষণ ঘোরাঘুরি ক'রলুম, কতকগুলি ভালো জিনিসও সংগ্রহ হ'ল। বাতিক কাপড়ের অনেক রকমের সুন্দর সুন্দর নক্‌শার পিতলের ছাপ যোগাড় করা গেল। তারপরে শূরকর্ত্তর মিউজিয়মে নিয়ে গেলেন কোপারব্যার্গ। প্রাচীন যবদ্বীপীয় পাথরের মূর্ত্তি আর ব্রঞ্জের মূর্ত্তি কতকগুলি আছে, যবদ্বীপীয় কীর্ত্তির শ্রেষ্ঠ নিদর্শন এগুলি। যবদ্বীপের আধুনিক কৃষ্টির পরিচায়ক নানা বস্তু এখানে আছে—'ওয়াইয়াং'-এর চামড়ায় কাটা পুঁতুল, নাটকে ব্যবহৃত মুখস, নানা রকম বাড়ীর আদর্শ, মাটির পুতুলে দেশের নানা শ্রেণীর লোকের চেহারার আর কাপড়-চোপড়ের আদর্শ, ইত্যাদি। মিউজিয়মের কর্ম্মচারীরা বিশেষ সৌজন্যের পরিচয় দিলেন, আর আমাদের যবদ্বীপীয় ভাষায় মুদ্রিত মিউজিয়মের সচিত্র ক্যাটালগও উপহার দিলেন।

মধ্যাহ্ন ভোজনের সময়ে শ্রীযুক্ত Moens মুন্‌স্ নামে

একটি ডচ্ ইঞ্জিনিয়ার মঙ্কুনগরোর অতিথি-রূপে আমাদের সঙ্গেই খেলেন—মঙ্কুনগরো আমাদের সঙ্গে এঁর পরিচয় ক'রিয়ে দিলেন। ইনি থাকেন যোগ্যকর্ত্তাতে, সরকারী কাজ করেন—বেশ সহৃদয় ব্যক্তি, যবদ্বীপের সভ্যতায় যা কিছু ভালো আছে তার অনুরাগী, হিন্দু ভারতেরও অনেক কথা জানেন,—যবদ্বীপে শিব-গুরুর পূজা সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখেছেন। এঁর স্ত্রীও যবদ্বীপের সভ্যতা রীতি-নীতির কথা নিয়ে প্রবন্ধ লেখেন। ইনি আজই চ'লে গেলেন—যোগ্যকর্ত্তাতে আমরা যখন যাবো তখন এঁর সঙ্গে আবার আমাদের আলাপ-পরিচয় হবে।

আজকে শ্যামদেশ বাঙ্কক থেকে আরিয়ামের তার এল—সেখান থেকে কবিকে নিমন্ত্রণ ক'রে স্থানীয় লোকেরা আহ্বান ক'রছে।

রাত্রে কবির সম্মাননার জন্য মঙ্কুনগরো একটি বড়ো ভোজ দিলেন, আর তিনি এই উপলক্ষে যবদ্বীপীয় নৃত্যের বিশেষ রূপে আয়োজন ক'রেছিলেন। তাঁর প্রাসাদের বিরাট বড়ো মণ্ডপটিতে এই নাচের আর ভোজনের অনুষ্ঠানটী হ'য়েছিল। বত্রিশ জন সম্মানিত অতিথি এসেছিলেন—এঁদের মধ্যে সুসুহুনানের দুই ছেলে—রাজকুমার Djatikoesoemo, জাতিকুসুম আর রাজকুমার Koesoemajoedo, কুসুমায়ুধ ছিলেন, আর সুনানের এক ভাই ছিলেন; আর ডক্টর রাজিমান ছিলেন, আর ছিলেন Karsten কার্সটেন ব'লে এক ডচ্ বাস্তুশিল্পী, ইনি সেমারাং শহরে একটু পরিবর্ত্তিত যবদ্বীপীয় ঢঙে অনেকগুলি সুন্দর বাড়ী ক'রেছেন; এ ছাড়া সুরাবায়ার শ্রীযুক্ত সিঙ্গি, আর কতকগুলি ডচ্ ভদ্রলোক ছিলেন; আর মঙ্কুনগরোর রাণীও ছিলেন।

টাইপে ছাপা নাচের প্রোগ্রাম বিতরণ হ'ল—এই গুলিই মুখ্য নাচ, সব যবদ্বীপের হিন্দু যুগের স্মৃতি-মণ্ডিত classical বা প্রাচীন প্রতিষ্ঠাপন্ন নাচ। এই নাচগুলি সমস্তই পুরুষের; বেশীর ভাগই ছিল নৃত্যকলায় যুদ্ধের একটী সুকুমার প্রকটন; আর যাঁরা নাচ্লেন তাঁরা সকলেই রাজার ঘরের আর অন্য অভিজাত বংশের যুবক। নাচের মধ্যে দিয়ে অভিনয়। সকলেরই বেশ পাতলা ছিপ্‌ছিপে চেহারা, আর পোষাকগুলি রঙে আর সোনার কাজের সমাবেশে অপূর্ব্ব সুন্দর ছিল—এই বেশকে প্রাচীন ভারতের রাজবেশের যবদ্বীপীয় সংস্করণ বলা যেতে পারে। আধুনিক যবদ্বীপের রুচির অনুমোদিত দুই চারটে জিনিসও এই পোষাকে এসে গিয়েছে—যথা, বাতিকের কাপড়ের ধুতির নীচে হাঁটু পর্য্যন্ত আঁট পাজামা পরা, আর গায়ে একটা জামা পরা; কিন্তু মাথার সোনার মুকুটের, আর গুজরাটের পাটোলা কাপড়ের চমৎকার বর্ণ-শোভায়, আর গলায় আধা-চাঁদের হারে বড় সুন্দর দেখায় এই পোষাক। ডাক্তার রাজিমান এই নৃত্যাভিনয়ের সময়ে আমাকে ব'ল্‌ছিলেন—নাচের প্রত্যেক গতিটি আর হাতের প্রত্যেক ভঙ্গীটী এই নৃত্যের শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট, হাতের ভঙ্গীগুলি প্রাচীন শাস্ত্রে বর্ণিত এক একটী কর-মুদ্রা। এই নৃত্যাভিনয়ের জন্য কোনও দৃশ্যপট থাকে না—মণ্ডপের উজ্জল মণিশিলাময় কুট্টিম বা মার্বেল-পাথরের মেঝের উপরেই নাচ হয়। দুই তিনজনের বেশী নট কোনও নাচে থাকে না। নাচের তালিকা এই—

1. Wireng Pandji henem (orde dans) প্রাচীন যবদ্বীপীয় ইতিহাসের আখ্যায়িকা বর্ণিত কোনও ঘটনার নৃত্যাভিনয়।

2. Wireng Raden Hindradjit kalijan Wanara Hanoman—রামায়ণের ঘটনা—রাজপুত্র ইন্দ্রজিৎ আর বানর হনুমানের যুদ্ধাভিনয়।

3. Bekaan Golek—এইটী স্ত্রীলোকের নৃত্য।

4. Wireng Lanah hoedoro—তীর-ধনুক নিয়ে নৃত্যাভিনয়—Abimanjoe অভিমন্যুর সঙ্গে Sambo শাম্বর পুত্র Wersokoesoemo বর্ষকুসুম বা বৃষকুসুমের যুদ্ধ।

5. Wireng Raden Werkoedoro kalijan Praboe Partipejo—রাজপুত্র বৃকোদরের সঙ্গে প্রভু বা রাজা প্রতীপেয়ের যুদ্ধ।

6. Petilan Langendrijo—Menak Djinggo den Damar Woelan—'দামার বুলান' নামক বিখ্যাত প্রাচীন যবদ্বীপীয় কথার ঘটনা-বিশেষ নিয়ে নৃত্যাভিনয়; দুই প্রতিপক্ষ মেনাক্-জিঙ্গ ও দামার-বুলানের যুদ্ধ।

আমাদের এই প্রোগ্রামের মধ্যেই ভোজন ঢুকোতে হ'ল। মণ্ডপের এক পাশে লম্বা টেবিলে অতিথিরা ব'স্‌লেন—নাচ তাঁদের সামনেই চ'ল্‌তে লাগ্‌ল। সমস্ত ক্ষণ গামেলানের বাজনা অবিশ্রান্ত চ'লছিল। তিনের আর চারের নাচ আমরা খেতে খেতে দেখ্‌তে লাগ্‌লুম। যে মেয়েটি গোলেক্‌ নাচ নাচ্‌লে, তাকে আগেকার দু দিনেও দেখেছি; আজকে তার একার নাচ—সে ভাষায় বর্ণনার অতীত একটী সুন্দর বস্তু হ'য়েছিল। সৌভাগ্য-ক্রমে শ্রীযুক্ত রাজিমান আর শ্রীযুক্ত সিঙ্গির মতন ইংরিজি-ব'লিয়ে দুই উচ্চ-শিক্ষিত যবদ্বীপীয় ভদ্রলোক আমার পাশে ছিলেন, এঁদের সঙ্গে কথা ক'য়ে অনেক বিষয়ে খবর পাচ্ছিলুম। এঁরা সত্যি-সত্যি নিজেদের জাতির নাচ আর সংস্কৃতির অন্য সব অঙ্গ প্রাণের সঙ্গে ভালোবাসেন, তাই যথাসম্ভব এগুলির রক্ষায় যত্নশীল।

খাওয়ার ভোজনতালিকা ইংরিজিতে ছাপানো হ'য়েছিল—তার উপরে লেখা—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সংবর্দ্ধনার জন্য মঙ্কনগরোর গৃহে নৈশ আহারের পদতালিকা। কবির যবদ্বীপের প্রতি কবিতাটীর ইংরেজী আর ডচ অনুবাদ বেশ চমৎকার ভাবে পুস্তকাকারে ছাপানো হ'য়েছিল, সেই বই সমাগত অতিথিদের মধ্যে বিতরিত হ'ল—কবির আর মঙ্কনগরোর হস্তাক্ষর সমেত। খাওয়ার পরে সকলের ফ্লাশ-লাইট ফটো নেওয়া হল। সমস্ত সন্ধ্যাটীতে বিশেষ ক'রে নানা বিষয়ে মঙ্ক-নগরোর হৃদ্যতার, কবির প্রতি আর ভারতের প্রতি তাঁর প্রগাঢ় শ্রদ্ধার, আর তাঁর রস-তন্ময় চিত্তের পরিচয় পেলুম। নাচ, খাওয়া-দাওয়া সব চুক্‌তে প্রায় সাড়ে এগারোটা হ'য়ে গেল।—খালি সম্মানিত অতিথিরাই থাক্‌বে, আর কারু এই জিনিস দেখবার অধিকার নেই, এ রকম বিসদৃশ জাতি-ভেদের মতন ব্যাপার এদেশে এখনও আরম্ভ হয়নি। বিস্তর ছেলে মেয়ে আর বুড়ো বিরাট মণ্ডপের ধারে, নিমন্ত্রিত অতিথিরা যে দিক্‌টায় ছিলেন সে দিকটা বাদ দিয়ে ব'সে ব'সে সারাক্ষণ ধ'রে এই বর্ণোজ্জ্বল মনোহর 'দেহের-সঙ্গীত' দেখ ছিল।

এই সব নাচে এক একটী পাত্র এ রকম একটা dignity, একটী মহিমা আর গাম্ভীর্য্যের সঙ্গে তাদের পার্ট ক'রছিল, যে তাতে মহাভারত আর রামায়ণের পাত্রদের বিরাট কল্পনা একটুখানিও ক্ষুণ্ণ হ'চ্ছিল না। ভীম যিনি সেজেছিলেন, যিনি মোটেই ভীমকায় নন, তবে তাঁর মুখখানি শ্মশ্রুমণ্ডিত ক'রে দেওয়ায় একটু গাম্ভীর্য্য এনে দেওয়া হ'য়েছিল; কিন্তু ধীর-মন্থর গতিতে চলাফেরার আর একটু ধীরে ধীরে মাথাটি তুলে সিংহাবলোকন করার ভঙ্গীতে কেমন একটা সহজ-সুন্দর ভাবে তাঁর চরিত্রের বিশালত্ব আর বীরত্ব ফুটে উঠ্‌ছিল। বাস্তবিক, এই নৃত্যাভিনয় অপূর্ব্ব সুন্দর বস্তু; আর এর মূল অনুপ্রাণনা আমাদের প্রাচীন ভারত থেকেই এসেছে, একথা ভেবে, এই জিনিসটী দেখে যেন আমাদেরই জাতির প্রাচীনের সঙ্গে আমাদের আবার নব পরিচয়



ঘটোৎকচ-বেশে নৃত্যাভিনয়-রত মঙ্কুনগরোর ভ্রাতা

ঘ'টল, এই ভাবে জিনিসটী আমাদের নিতান্ত আপন ব'লে মনে হ'চ্ছিল।

এই নৃত্যাভিনয়ের দুদিন পরে, মঙ্কুনগরোর এক ছোটো ভাই তাঁর নাচ দেখালেন। যবদ্বীপীয় নৃত্যকলার একজন প্রধান কলাবন্ত বলে এঁর খুব খ্যাতি আছে। ঐ দিন পুরুষের বেশ প'রে মঙ্কুনগরোর বাড়ীর দুটী মেয়ে Wireng নাচ দেখালে, তার পরে তাঁর ভাই শ্রীযুক্ত Soerjawigianto 'সূর্য্যবিগ্যান্ত' নৃত্যাভিনয় ক'রলেন—ভীমসেন-পুত্র ঘটোৎকচের বেশে। কি জানি কেন, যবদ্বীপে অর্জ্জুনের ছেলে অভিমন্যুর মতন ভীমের ছেলে ঘটোৎকচও বেশ জন-প্রিয় পাত্র হ'য়ে দাঁড়িয়েছেন। যবদ্বীপের ঘটোৎকচ প্রেমে পড়েন, বিবাহও করেন, খালি কুরুক্ষেত্রে প্রাণ দেন না। শ্রীযুক্ত সূর্য্যবিগ্যান্ত নৃত্যছন্দের দ্বারা প্রেমিক ঘটোৎকচের প্রেমাভিনয় দেখালেন। এই নাচের Symbolism অর্থাৎ রূপক বা প্রতীক-ভাব কি, তা সব বুঝলুম না। আশা নৈরাশ্য, প্রেমপাত্রীর জন্য অব্যক্ত আকুলতা আর সর্ব্বস্ব সমর্পণ, প্রেমিকাকে লাভের দুর্দ্দমনীয় ইচ্ছার ফলে অপরিসীম বীরকর্ম্ম দেখানোর চেষ্টা—এই সব জিনিস মূক অভিনয়ে, কেবল গমন-ছন্দে আর হাতের ভঙ্গীতে দেখানো হ'ল। জিনিসটি চমৎকার—এমন সুন্দর ভাবে যে এই সব জিনিসের প্রকাশ হ'তে পারে আমরা তা কল্পনাও করি নি।—এই নাচ হ'য়ে গেল, তার পরে শ্রীযুক্ত সূর্য্যবিগ্যান্ত নাচের ভঙ্গীতে তোলা তাঁর ছবি স্বাক্ষর ক'রে আমাদের দিলেন।

ক্রমশঃ

মুগ্ধ কবি

শ্রীনীলিমা দাস

তুমি তারে পাঠায়েছ ধরণীতে, হে বিধাতা,
চারুকণ্ঠে ভরি সুমহান্
সঙ্গীত-আসব, আর অর্কসম নেত্রপটে
দিব্যদৃষ্টি প্রখর উজ্জ্বল;
মুক্তপক্ষ সিন্ধুবিহঙ্গম সম স্বচ্ছন্দবিহারী করি
সৃজিয়াছ প্রাণ
শঙ্কাহীন নিরঙ্কুশ,—শতমৃত্যু মৃত্যু লভে যেন হেরি
নয়নকজ্জ্বল!
সেই কবি,—হারায়েছে সে কণ্ঠের ছন্দোবদ্ধ সুরমন্ত্র;
তব অফুরান্
সৌন্দর্য্য-ঐশ্বর্য্য হেরি তার দিব্যদৃষ্টি ভরি
জাগে তব সৃষ্টি-শতদল,—
আবেশে মুদিয়া আসে যুগ্মচক্ষু পক্ষ্মজাল,
ভাষা কণ্ঠতটে অন্তর্দ্ধান;
শতমৃত্যুজেতা প্রাণ মৃত্যু মাগে হেরি,
রক্ত-অলক্তক-রাঙা পদতল!

তাহারে করিও ক্ষমা; হে বিধাতা,
তব অনবদ্য বাণী ভুলিল যে কবি;
কণ্ঠে তার জ্বলিল না মহাব্যোমস্পর্শী সেই
প্রদীপ্ত সঙ্গীত হোমশিখা,
অক্ষিপাতে নামিল না কাব্যলক্ষ্মী,
রহিল সে নীহারিকা সম সুদূরিকা!
আজি শুধু রুদ্ধবাক্, মুগ্ধ আঁখি, সুন্দরের সমারোহ
হেরি চারি ভিতে;
তোমার ভুবনশোভা ভাষা-ভোলা কবিতার
হেমপদ্ম রচে তার চিতে,—
মৃগনাভি-লুব্ধ মত্ত মৃগ সম খুঁজে ফেরে
বাণীহীন সে কাব্য-সুরভি।

মহিলা-সংবাদ

কলিকাতার সত্যাগ্রহী মহিলাবৃন্দ



শ্রীমতী লক্ষ্মীবাই উপাধ্যায়



শ্রীমতী কপুরী দেবী



শ্রীমতী ভগবতী দেবী



শ্রীমতী সজ্জন দেবী

নওজোয়ানের রাষ্ট্রচিন্তা

শ্রীগোপাল হালদার

১

করাচী ভারতবর্ষের শহরগুলির মধ্যে 'নওজোয়ান'। ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে যখন স্যর চার্লস্ নেপিয়ার সিন্ধুদেশ জয় করেন তখনও আধুনিক করাচী ভাল করিয়া স্থাপিত হয় নাই। ১৭৩৯-এর পরে বালুচিস্তানের বাণিজ্যদ্বার খরক হইতে সরিয়া করাচীতে চলিয়া আসে—হিন্দু বণিকগণ মাটির দেওয়াল তুলিয়া তখনকার দিনে আত্মরক্ষার চেষ্টা করে। তখন দেশের শাসন-সংরক্ষণের ভার ছিল কালাত-এর খানদের উপর। ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে তালপুরের মীর-বংশ করাচী অধিকার করিল। মেনোরা দ্বীপের দুর্গ তাহাদেরই দ্বারা নির্ম্মিত। ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে সেই দ্বীপ ও করাচী ব্রিটিশের হাতে পড়িল—চার বৎসরের মধ্যে সিন্ধুদেশ ইংরেজের অধিকারে আসিল, কয়েক ঘর জেলে ও হিন্দু বেনের অধ্যুষিত ক্ষুদ্র শহর করাচীর সৌভাগ্যের সূচনা হইল। বিজেতা স্যর চার্লস্ নেপিয়ার তখনই দেখিলেন যে, একদিন এ শহর প্রাচীর গৌরব—'glory of the East' হইবে। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে স্যর রিচার্ড বার্টন কহিতেছেন, "এই শহর কতকগুলি নীচু ও উঁচু মেটে ঘরের সমষ্টি মাত্র। অন্ধকার অপরিসর গলিতে গাধা ছাড়া অন্য জীব আরামে চলিতে পারে না, ইহার কোনও নর্দ্দমা নাই।" আজ করাচীর সুপ্রশস্ত রাজপথে ট্রাম, বাস, মোটর, ভিক্টোরিয়া গাড়ী ছুটিয়া চলিয়াছে, দুইদিকে অগণিত সুধা-ধবল সৌধশ্রেণী। প্রায় আড়াই লক্ষ নরনারী আজ করাচীর অধিবাসী, সাড়ে ছাব্বিশ কোটি টাকা মূল্যের জিনিষ করাচীর আমদানি, সাড়ে পঁচিশ কোটি টাকা মূল্যের জিনিষ ইহার রপ্তানী। বাণিজ্য-কেন্দ্র হিসাবে করাচীর স্থান আজ ভারতবর্ষে কলিকাতা ও বোম্বাইর পরে। করাচীর এই সৌভাগ্যের কারণ কি? করাচীর বণিকনেতা স্যর মণ্টেগু ওয়েবই তাহা বিশ্লেষণ করিয়াছেন:—(১) ভারতবর্ষের শহর ও বাণিজ্যকেন্দ্রগুলির মধ্যে করাচীর জলবায়ু সর্ব্বোত্তম, (২) এখানে ভাল পানীয় জল ও খাদ্য স্বচ্ছল; (৩) বিশ্রামের ও খেলাধূলার স্থান প্রচুর; (৪) ব্যবসাপত্রের দিক হইতে অপেক্ষাকৃত কম খরচ; (৫) সমগ্র এশিয়া ও প্রাচ্যভূমিতে ইহার ভৌগোলিক অবস্থান অতুলনীয়; (৬) অতি অল্প খরচে এই বন্দর ও শহরতলী যত খুশী বিস্তৃত করা যায়। সক্করের লয়েড্ বাঁধ সম্পূর্ণ হইলে সিন্ধুনদের দুই তীর শস্য-শ্যামল হইয়া উঠিবে, তখন ৩৩০ মাইল দূরের এই বাণিজ্যকেন্দ্র যে কোন্ স্থান অধিকার করিবে কে বলিতে পারে? করাচীর ছয় মাইল দূরে ড্রিঘরোড্ ষ্টেশনের নিকট উড়ো জাহাজের ঘাঁটি। পূর্ব্ব-পশ্চিমের মিলন-পথ যেদিন সমুদ্রের উপর দিয়া ছিল সেদিন বোম্বাই ছিল ভারতবর্ষের দুয়ার। ভাবী কালের মিলন-পথ আকাশ বাহিয়া চলিবে; করাচী হয়ত পূর্ব্ব-পশ্চিমের সেই ভাবীদিনের মিলন-দ্বার। করাচীর পথঘাট, বাড়িঘর, সকল জিনিসেই যেন 'নওজোয়ানের' ছাপ পড়িয়াছে।

২

নওজোয়ান ভারত সভার প্রকাণ্ড প্যাণ্ডালের উপরে রক্তপতাকা উচ্চে মাথা তুলিয়া রহিয়াছে—তোরণের শিরে সোভিয়েট সাম্যবাদের প্রতীক কাস্তে ও হাতুড়ী;—'রাজগুরু ময়দানের' এই তোরণের নাম 'যতীন দাস নগর'। এই নবযৌবনের ঘাঁটি পার হইলে কংগ্রেস মণ্ডপে পৌছানো যায়। করাচীর দুই চোখ—এক চোখ সেই হরচন্দরায় নগরের দিকে, আর এক চোখ এই 'যতীন দাস নগরের' উপর। ২৩শে সন্ধ্যায় লাহোরের কারাগার-তলে তিনটি যুবকের প্রাণ নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে—ভারতবর্ষের লাল চোখ আজ নওজোয়ানের লাল পতাকার দিকে আশা ও উৎকণ্ঠায় তাকাইয়া আছে, হরচন্দরায়

নগরের স্তিমিত দীপ্তি চোখটিও লাল হইয়া উঠিবে না-কি?

বারো মাইল দূরে মালির ষ্টেশনে যখন দেশবরেণ্য নেতা অবতরণ করিলেন তখন নওজোয়ানের দল তাঁহাকে কালো ফুলে সম্বর্দ্ধনা করিয়াছে, ধিক্কারে অভিনন্দিত করিয়াছে; আর একটুকু হইলে তাহারা অভিনন্দনের চিহ্ন তাঁহার গায়ে রাখিয়া দিত। তাহারা অপর একজন সন্ধিপ্রার্থী নেতার গাড়ীর কাচ চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া ও সভাক্ষেত্রে তাঁহাকে চীৎকারে বসাইয়া দিয়া নওজোয়ানের হাওয়া কোন্ দিকে বহিতেছে তাহা জানাইয়াছে।

লাল ঝাণ্ডার তলে নওজোয়ানের সভা বসিল। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি স্বামী গোবিন্দানন্দ। কোমাগাতা মারুর সঙ্গে তাঁহার নাম বিজড়িত। এই লালে-লাল আকাশের তলে তাঁহার কথায় একটু 'রক্ত-রাগ' থাকিবারই কথা। তিনি কহিলেন,—ভগৎ সিংহের ফাঁসীর পরে ভারতবর্ষের নওজোয়ান আর ইংরেজের সঙ্গে কোনও রফা নিষ্পত্তিতেই রাজী হইতে পারে না। তাহারা চায় জনগণের শাসন। ভারতীয় পরিচ্ছদে তাহারা রুশের সাম্যবাদকে বরণ করিতে চাহে—সেই সাম্যতান্ত্রিক পূর্ণ স্বাধীনতার জন্যই যুবকদল প্রাণ দিবে। গান্ধী-আরুইন্ চুক্তিপত্র যৌবনের ধর্ম্মের বিরোধী। এই-সব ধনিক্ ও রাজনীতিকদের উড়াইয়া দিয়া, হে নওজোয়ান্! তোমরা কৃষাণ ও মজুর শক্তিকে সংগঠন কর।

'প্রমুখ' শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু বয়সে প্রবীণ ন'ন; 'তরুণের স্বপ্ন' ও 'নূতনের সন্ধান' তাঁহার জীবনের সাধনা। দেশের রাষ্ট্রনীতিক মঞ্চে তাঁহার আবির্ভাব এ পর্য্যন্ত ঝড়ো পাখীর মত ঝড়ের সূচনা করিয়াছে। ভারতবর্ষের এক বৎসরের বিক্ষুব্ধ ঝটিকা যখন শান্তভাব ধারণ করিতেছে, তখন পশ্চিমাঞ্চলের নওজোয়ানগণ তাহাকেই তাহাদের 'প্রমুখ' নির্ব্বাচিত করিয়া নূতন্ ঝড়ের অগ্রদূত করিতে চাহিতেছে। সুভাষচন্দ্রের বাণী কিন্তু সোজা সেই আসন্ন ঝটিকার বন্দনাগীতি হইল না—তিনি তরুণের স্বপ্ন বিবৃত করিলেন,—নওজোয়ানের কাজ আর্থিক ও সামাজিক নূতন বিন্যাস,—যাহাতে মানুষের প্রভূততম সুখ, পূর্ণতর মনুষ্যত্ব বিকাশের সম্ভাবনা তেমনিতর সমূহতান্ত্রিক (collective) ব্যবস্থাকে কার্য্যে পরিণত করা। এই আনকোরা নূতন সমূহতান্ত্রিক জীবন ধর্ম্মের গোড়াকার মন্ত্র—সুভাষচন্দ্রের মতে—কিন্তু অনেক পুরাতন—সেই সুবিচার, সাম্য, স্বাধীনতা, সুশৃঙ্খলা ও মৈত্রী। "আমার বক্তব্য স্বল্পকথায় এই যে, আমি চাই ভারতবর্ষে এক সাম্যবাদী (সোশ্যালিষ্টিক) সাধারণ-তন্ত্র। আমার বাণী পূর্ণ, ব্যাপক, 'নির্জ্জলা' স্বাধীনতা,—যতদিন অগ্রগামী বা বিপ্লবমুখীন্ শক্তি উদ্বুদ্ধ না-হয় ততদিন সে-স্বাধীনতা লাভ করা যাইবে না, আর সেই বিপ্লবী শক্তিকেও জাগানো সম্ভব নয়, যতক্ষণ পর্য্যন্ত না এমন এক মন্ত্রে তাহাকে অনুপ্রাণিত করিতে পারি, যে-মন্ত্র মানুষের অন্তর মথিত করিয়া উত্থিত হয় ও মানুষের অন্তরকে মথিত করিয়া দেয়।" কংগ্রেসের কার্য্যসূচী আজও সেই মন্ত্রকে বরণ করে নাই—বিপ্লবী শক্তিকে কংগ্রেস চেতন করিতে চাহে না। উহা চাহে ধনিকে শ্রমিকে, জমিদার রায়তে, উচ্চে-নীচে কোনও রকম একটা জোড়াতালি দেওয়া বন্দোবস্ত। তাই, স্বাধীনতা ঐ নীতিতে লাভ করা যাইবে না। স্বাধীনতা আয়ত্ত করিতে হইলে সুভাষচন্দ্রের মতে নিম্নরূপ কার্য্যক্রম গ্রহণ করা আবশ্যক:—

(১) সমাজতান্ত্রিক নীতি অনুসরণ করিয়া কৃষাণ ও মজুরের সংগঠন;

(২) কড়া শৃঙ্খলায় দেশের যুবক-শক্তিকে স্বেচ্ছা-সৈনিক বাহিনীতে নিয়ন্ত্রণ;

(৩) 'জাত পাত তোড়ন' ও সমস্ত সামাজিক কুসংস্কারের মূলোচ্ছেদ;

(৪) নারী সমিতি সংগঠন ও এই নূতন মন্ত্র ও নূতন সাধনায় তাঁহাদের দীক্ষিত করা;

(৫) ব্রিটিশ পণ্যদ্রব্য বয়কটের আন্দোলন জোর চালানো;

(৬) পল্লীতে পল্লীতে এই নূতন পথ ও নূতন দলের প্রচারকার্য্য চালানো;

(৭) নূতন মত প্রচারের জন্য নূতন সাহিত্য প্রকাশ।

এই নূতন কার্য্যসূচীর একটা বিশেষ প্রয়োজনীয়তা আছে। গান্ধী-আরুইন্ চুক্তি নাকচ করা সহজ নয়। উহা নিতান্ত অসন্তোষকর ও নৈরাশ্যজনক। সরকারের যে হৃদয় পরিবর্ত্তন হয় নাই তাহাও ভগৎ সিংহ প্রভৃতির ফাঁসীর পর আর বলিয়া দিতে হইবে না। এই চুক্তিবদ্ধ নিবিরোধকালে তাই এমন কিছু করা দরকার যাহাতে জাতির শক্তি বাড়ে ও জাতির দাবি পূর্ণ হইতে পারে। যদি উপরের কার্যক্রম বিপ্লবকামী দেশবাসী গ্রহণ করেন, তাহা হইলে কংগ্রেসের সঙ্গে অযথা কলহ করিবার কারণ থাকিবে না। এইরূপ কলহে এ সময়ে দেশের অনিষ্ট হইবারই সম্ভাবনা।

যিনি চিরদিন ঝড়ের আবাহন গাহিয়াছেন তাঁহার মুখে এমনি একটি নিমেষে, এমনি বিক্ষুব্ধ তরুণের মজ্‌লিসে, এতটা শান্ত কথা শুনিবার জন্য কি তাঁহার নওজোয়ান্ ভক্তদল প্রস্তুত ছিল?

প্রমাণও তাহার মিলিয়া গেল—লাল ঝাণ্ডার নীচে মস্ত বড় লাল কাপড়ে সোভিয়েট্-সম্মত বড় বড় বাণী শোভা পাইল, সঙ্গে সঙ্গে শোভা পাইল অভিমান-বিক্ষুব্ধ নওজোয়ানের নালিশ—Gandhi Saviour of the British Empire—"গান্ধী ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের পরিত্রাতা।" সর্ব্ববাদিসম্মতিক্রমে গান্ধী-আরুইন্ চুক্তি-পত্র অগ্রাহ্য হইল। 'প্রমুখ' সুভাষচন্দ্র লাল মণ্ডপের মধ্যে চিরদিনকার শ্বেত-চন্দনচর্চ্চিত পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয়কে কিছু 'সদুপদেশ' শুনাইবার জন্য আহ্বান করিলেন। কিন্তু লালের কানে শাদার কথা শুনাইবার সুসময় তখন নয়। চীৎকার উঠিল—'মালবীয় জী বৈঠ্ যাইয়ে, মালবীয় জী বৈঠ্ যাইয়ে।' মালবীয়জীকে বসিতে হইল না, সুভাষচন্দ্র উঠিয়া দাঁড়াইয়া নওজোয়ান সমাজে সভাপতির দাবিতে নিবেদন করিলেন, এবং অবশেষে বিফলকাম হইয়া মালবীয়জীর সহিত সভা ত্যাগ করিলেন।

ইহার পরে লাল দলের চৈতন্য উদয় হইল। কম্‌রেড্ রামচন্দ্র অনুশোচনা প্রকাশ করিলেন। প্যাণ্ডালে সভা বসিল, ফাঁসীর গান চলিল, গরম-গরম বক্তৃতা ও গরম-গরম প্রস্তাব পাস হইল। নওজোয়ানের সভা সাম্যবাদের জয় গাহিয়া, হিংসামূলক স্বাদেশিকতাকে অবজ্ঞা না করিয়া, ঝুনো রাষ্ট্রনীতিক ও পাকা বণিকদের অন্তিম দশা কামনা করিয়া নওজোয়ানের শহরে তাহাদের অধিবেশন সমাপ্ত করিল।

৩

নওজোয়ান সভায় কেহ স্থির বুদ্ধি প্রত্যাশা করে নাই। একেই ত তাহারা নওজোয়ান, তাহার উপর লাহোরের ফাঁসী দুইয়ে মিলিয়া তাহাদের চিন্তার বা কর্ম্মের একটা সুনির্দ্ধারিত স্থির পথ আবিষ্কারের বাধা দিল। নওজোয়ানের মত এমনি উগ্র যে তাহা প্রায় অস্পষ্ট, আর তাহার মন এমনি উত্তপ্ত যে তাহার ঠিক রূপ ধরা অসম্ভব। লাহোরের সুদীর্ঘ ছায়ায় করাচীর যুবকদের মন ও মত আচ্ছন্ন, ওই দুই বস্তুর সন্ধান এখানে পাওয়া যায় না।

আশ্চর্য্য এই যে, নওজোয়ানের স্থির মন ও স্থির বুদ্ধির পরিচয় এই মুহূর্ত্তে পাইতে হইলে লাহোরের দিকেই তাকাইতে হয়। মৃত্যুর ছায়া যখন জীবনের উপর স্থির হইয়া বসিয়াছে, তখন লাহোর জেল হইতে ভগৎ সিংহ তাহার তরুণ রাষ্ট্র কর্ম্মীদের লিখিতেছেন:—

"বর্ত্তমান আন্দোলন (কংগ্রেস আন্দোলন) একটা ফয়সলাতে পৌঁছাইতে বাধ্য। তাহা এখনই হইতে পারে, পরেও হইতে পারে। আমরা সাধারণত যেমন মনে করি, ফয়সলা মাত্রই তেমন অগৌরবের বা অনুশোচনার জিনিষ নয়। রাষ্ট্রীয় সংগ্রামে উহা এক অবশ্যম্ভাবী পরিচ্ছেদ। অত্যাচারীর বিরুদ্ধে যে জাতিই দাঁড়াইবে সে প্রথমত ব্যর্থকাম হইবে, মধ্যাবস্থায় রফা নিষ্পত্তির মারফতে আংশিক অধিকার পাইবে। শুধু সংগ্রামের শেষপাদে জাতির সমস্ত শক্তি ও সহায় সংগ্রহ করিয়া চূড়ান্ত আক্রমণের জন্য জাতি উদ্যত হয়—সে আক্রমণে অত্যাচারীর ক্ষমতা চূর্ণ হইয়া যায়, কিন্তু চূর্ণ না হইতেও পারে, তখন আবার রফা-নিষ্পত্তির প্রয়োজন। ইহার উৎকৃষ্ট প্রমাণ রুশ দেশ।...

"আমার বক্তব্য এই যে, যুদ্ধ যেমন-যেমন জমিয়া উঠে রফা-নিষ্পত্তিকেও তেমন-তেমন আবশ্যকীয় অস্ত্র

হিসাবে গ্রহণ করিয়া ব্যবহার করিতে হয়। কিন্তু আমাদের সম্মুখে সর্ব্বদা যাহা স্থির থাকা চাই তাহা আমাদের আন্দোলনের আদর্শ। আমাদের লক্ষ্য সম্বন্ধে আমাদের সুস্পষ্ট ধারণা থাকা উচিত,—মধ্যপন্থীদের যে জিনিষ আমরা ঘৃণা করি, তাহা তাঁহাদের আদর্শের অগভীরতা।...

"আমাকে অনেকে ভুল বুঝিতে পারে। মনে হইতে পারে যে, আমি ভীতি উৎপাদকদের (টেররিষ্ট) মতই কাজ করিয়াছি। আমি ভীতি-উৎপাদক নই। উপরে যেরূপ কার্য্যক্রম আলোচিত হইয়াছে আমি সেরূপ সংগ্রামময় কার্য্যক্রমের স্থির ধারণা পোষণ করি।...

"আমার বিশ্বাস, এই পথে (ভীতি-উৎপাদনের দ্বারা) আমরা কিছু পাইব না। শুধু বোমা ছোঁড়ায় কিছু লাভ নাই, বরং কখনও কখনও ক্ষতি হয়।"

রফা-নিষ্পত্তির সম্বন্ধে নওজোয়ান দল কোনও পথ ভাবিয়া স্থির করিতে পারে নাই। এই মৃত্যুপথিক যুবক তাহাদের অপেক্ষা স্থির চিন্তাশক্তির পরিচয় দিয়াছেন। রফা নওজোয়ানের স্বভাববিরোধী নয়; তাই বলিয়া এই রফাই বিপ্লবের চূড়ান্ত মীমাংসা নয়। ফাঁসীর দিনকয় পূর্ব্বে শুকদেব মহাত্মা গান্ধীর নিকটে যে পত্র লেখেন তাহাতে বিপ্লবী নওজোয়ানের মনোভাব বেশ স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে:—

"কংগ্রেস লাহোরের সঙ্কল্পে আবদ্ধ—পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ না-করা পর্য্যন্ত এই সংগ্রাম তাহারা সমানভাবে চালাইতে বাধ্য। সেই সঙ্কল্প অক্ষুণ্ণ থাকিতে এই রফা-নিষ্পত্তি ও শান্তি শুধু সাময়িক ব্যাপার—আগামী সংগ্রামে অধিকতর শক্তি ব্যাপকতররূপে নিয়োজিত করিবার জন্যই ইহার প্রয়োজন। এই হিসাবেই শান্তি ও রফার প্রস্তাব কল্পনা করা ও সমর্থন করা যায়।

"হিন্দুস্থান সোশ্যালিষ্ট রিপাব্লিকান্ পার্টির নাম হইতেই প্রমাণ যে ভারতবর্ষে সাম্যবাদী সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠাই ইহার উদ্দেশ্য, মাঝামাঝি কিছু নহে। তাহাদের লক্ষ্যে না-পৌছা পর্য্যন্ত ও আদর্শ উপলব্ধি না-হওয়া পর্য্যন্ত তাহারা এই আন্দোলন চালাইবেই। কিন্তু সময়ের ও আবহাওয়ার পরিবর্ত্তন হইলে তাহারা নিজেদের কার্য্য-পদ্ধতিও পরিবর্ত্তন করিবে। বিপ্লবীর আন্দোলন ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করে। উহা কখনও খোলা, কখনও গুপ্ত হয়; কখনও শুধুমাত্র আন্দোলন-মূলক, আবার কখনও জীবন-পণ কঠিন সংগ্রামরূপে দেখা দেয়। বর্ত্তমান অবস্থায় বিশেষ কোনও কারণ থাকিলেই বিপ্লববাদীগণ তাহাদের আন্দোলন বন্ধ রাখিতে পারে। আপনি তেমন কোনই স্পষ্ট কারণ নির্দ্দেশ করিতে পারেন নাই।"

৪

শুকদেব ও ভগৎ সিংহ রফা-নিষ্পত্তির কথাকে যে চোখে দেখিয়াছেন করাচীর কংগ্রেস সে ভাবে তাহা গ্রহণ করে নাই। বিপ্লবীদের নিকটে রফার প্রয়োজন নিজেদের সংগঠনের জন্য, বিপ্লবের প্রচার বন্ধ রাখিবার জন্য নয়। বিশেষত, এই রফা ত স্বাধীনতার আন্দোলনে নিতান্তই একটা সাময়িক কথা। করাচীর কংগ্রেস-প্রতিনিধিরা এই রফাকে নির্ব্বিবাদে মানিয়া লইয়াছে—তাহার কারণ এই যে, এই রফা বাপুজীর রফা, অতএব অবশ্য-মাননীয়। ইহাকে বুদ্ধি দিয়া, যুক্তি দিয়া, হৃদয় দিয়া, বিবেক দিয়া গ্রহণ করিয়াছেন হয়ত মাত্র একজন—স্বয়ং বাপুজী। আর সকলেই ইহাতে কমবেশী অসুখী, কিন্তু উপায় নাই। মানিতেই হইবে—ইহা বাপুজীর কাজ। তাই, করাচীর হরচন্দরায় নগরে প্রস্তাবে প্রস্তাবে অসামঞ্জস্য, অথচ তাহার প্রতিবাদ নাই,—বিচার-প্রহসনে যাহার ফাঁসী হইল তাহার প্রশংসা অথচ তাহার অজানিত ও অপ্রমাণিত কর্ম্মের নিন্দা, ঐরূপ সম-অপরাধে দণ্ডিত বাঙালীদের নামোল্লেখে কার্পণ্য, আধা-সমাজতান্ত্রিক প্রস্তাবসমূহ অতি দ্রুত গ্রহণ। করাচীর কংগ্রেসে কোনও কিছুতে আপত্তি নাই—কারণ, কংগ্রেসের চোখ এখন দেশের দিকে নয়, গোল টেবিলের দিকে।

নওজোয়ানের শহর করাচীতে নওজোয়ানের হার হইয়াছে—কারণ, নওজোয়ান এখনও চিরযৌবন ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারে নাই। এখন পর্য্যন্তও তাহার স্থির চিন্তার শক্তি বা কর্ম্মনিষ্ঠা গড়িয়া উঠে নাই।

অপরাজিত

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

২৫

নিঃসঙ্গ, নিরানন্দ দিনগুলির মধ্য দিয়া বৈচিত্র্যহীন সকাল ও সন্ধ্যা স্কুলমাষ্টারী জীবনের একঘেয়ে কর্ম্মের বোঝার হিসাব-নিকাশ লইতে লইতে মাসের পর মাস কাটিয়া চলিল—ক্রমে আসিয়া গেল আশ্বিন মাস ও পূজা।

স্কুলের সেক্রেটারী স্থানীয় বিখ্যাত চাউল ব্যবসায়ী রামতারণ গুঁই-এর বাড়ি এবার পূজার খুব ধূমধাম। স্কুলের বিদেশী মাষ্টার মশায়েরা কেহ বাড়ি যান নাই, এই বাজারে চাকুরীটা যদি বা জুটিয়া গিয়াছে, এখন সেক্রেটারীর মনস্তুষ্টি করিয়া সেটা তো বজায় রাখিতে হইবে? তাঁহারা পূজার কয়দিন সেক্রেটারীর বাড়িতে প্রাণপণ পরিশ্রম করিয়া লোকজনের আদর অভ্যর্থনা খাওয়ানো, বিলি বন্দোবস্ত প্রভৃতিতে মহাব্যস্ত, সকলেই বিজয়া দশমীর পরদিন বাড়ি যাইবেন। অপুর হাতে ছিল ভাঁড়ার ঘরের চার্জ্জ—কয়দিন রাত্রি দশটা এগারোটা পর্য্যন্ত খাটিবার পর বিজয়া দশমীর দিন বৈকালে সে ছুটি পাইয়া কলিকাতায় আসিল।

প্রায় এক বৎসরের একঘেয়ে পাড়াগেঁয়ে জীবনের পরে বেশ লাগে শহরের এই সজীবতা। এই দিনটার সঙ্গে বহু অতীত দিনের নানা উৎসবচপল আনন্দস্মৃতি জড়ানো আছে, কলিকাতায় আসিলেই যেন পুরানো দিনের সে সব উৎসবরাজি তাহাকে পুরাতন সঙ্গী বলিয়া চিনিয়া ফেলিয়া প্রীতিমধুর কলহাস্যে আবার তাহাকে ব্যগ্র আলিঙ্গনে আবদ্ধ করিয়া ফেলিবে। পথে চলিতে চলিতে নিজের ছেলের কথা মনে হইতে লাগিল বারবার। তাহাকে দেখা হয় নাই—কিন্তু সে বেশ কল্পনা করিতে পারে, কচি মুখখানি। বাঁকা ভ্রূধনু, ডাগর ছুটি চোখ, পাতলা পাতলা রাঙা ঠোঁট ছুটি—ভাবিয়াছিল পূজার সময় সেখানে যাইবে—কিন্তু যাওয়া এখন হইবে না, তাহা সে বোঝে, খোকার পোষাকের দরুণ পাঁচটি টাকা শ্বশুর বাড়িতে মনিঅর্ডার করিয়া পাঠাইয়া পিতার কর্ত্তব্য সমাপন করিয়াছে।

আজিকার দিনে শুধু আত্মীয় বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছা যায়। কিন্তু তাহার কোনো পূর্ব্ব-পরিচিত বন্ধু আজকাল আর কলিকাতায় থাকে না, কে কোথায় ছড়াইয়া পড়িয়াছে। গ্রে ষ্ট্রীটের মোড়ে দাঁড়াইয়া প্রতিমা দেখিতে দেখিতে ভাবিতে লাগিল—কোথায় যাওয়া যায়।

তার পরে সে লক্ষ্যহীন ভাবে চলিল। একটা সরু গলি ছুজন লোকে পাশাপাশি যাওয়া যায় না, ছুধারে একতলা নীচু স্যাঁতসেতে ঘরে ছোট ছোট গৃহস্থেরা বাস করিতেছে—একটা রান্নাঘরে ছাব্বিশ সাতাশ বছরের একটি বৌ লুচি ভাজিতেছে, ছুটি ছোট মেয়ে ময়দা বেলিয়া দিতেছে—অপু ভাবিল, একবৎসর পরে আজ হয়তো ইহাদের লুচি খাইবার উৎসব-দিন। একটা উঁচু রোয়াকে অনেকগুলি লোক কোলাকুলি করিতেছে, গোলাপী সিল্কের ফ্রক্ পরা কোঁকড়াচুল একটি ছোট মেয়ে দরজার পর্দ্দা তুলিয়া তাহার দিকে চাহিয়া আছে। একটা দৃশ্যে তাহার ভারী দুঃখ হইল। এক মুড়ির দোকানের প্রৌঢ়া মুড়িওয়ালীকে একটি অল্পবয়সী নীচশ্রেণীর পতিতা মেয়ে বলিতেছে—ও দিদি—দিদি? একটু পায়ের ধুলো দ্যাও। পরে পায়ের ধুলা লইয়া বলিতেছে, একটু সিদ্ধি খাওয়াবে না, শোনো—ও দিদি? মুড়িওয়ালী তাহার কথায় আদৌ কান না দিয়া সোনার মোটা অনন্ত পরা ঝি-এর সহিত কথাবার্ত্তা কহিতেছে—মেয়েটি তাহার মনোযোগ ও অনুগ্রহ আকর্ষণ করিবার জন্য আবার প্রণাম করিতেছে ও. আবার বলিতেছে—দিদি, ও দিদি?...একটু পায়ের ধুলো দ্যাও। পরে হাসিয়া বলিতেছে—একটু সিদ্ধি খাওয়াবে না, ও. দিদি?

অপু ভাবিল এ রূপহীনা হতভাগিনীও হয়ত কলিকাতায় তাহার মত একাকী, কোন্ খোলার ঘরের 'অন্ধকার গর্ভগৃহ হইতে আজিকার দিনের উৎসবে যোগ দিতে তাহার চুণুরী সাড়িখানা পরিয়া বাহির হইয়াছে। পাশের দোকানের অবস্থাপন্ন মুড়িওয়ালীর অনুগ্রহ ভিক্ষা করিতেছে, উৎসবের অংশ হইতে যাহাতে সে বঞ্চিত না হয়। ওর চোখে ওই মুড়িওয়ালীই হয়ত কত বড়-লোক!

ঘুরিতে ঘুরিতে সেই কবিরাজ-বন্ধুটির দোকানে গেল। বন্ধু দোকানেই বসিয়া আছে, খুব আদর করিয়া বলিল—এসো, এসো, ভাই, ছিলে কোথায় এতদিন? বন্ধুর অবস্থা পূর্ব্বাপেক্ষাও খারাপ, পূর্ব্বের বাসা ছাড়িয়া নিকটের একটা গলিতে সাড়ে তিনটাকা ভাড়াতে এক খোলার ঘর লইয়াছে—নতুবা চলে না। বলিল—আর, ভাই, পারিনে, এখন হয়েচে দিন আনি দিন খাই অবস্থা। আমি আর স্ত্রী দুজন মিলে বাড়িতে আচার চাটনি, পয়সা প্যাকেট চা—এই সব করে বিক্রী করি—অসম্ভব ষ্ট্রাগল্ করতে হচ্চে ভাই, এসো বাসায় এসো।

নীচু স্যাঁতসেতে ঘর। বন্ধুর বৌ বা ছেলে-মেয়ে কেহই বাড়ি নাই—পাড়ার মেয়েদের সঙ্গে গলির মুখে বড় রাস্তার ধারে দাঁড়াইয়া প্রতিমা দেখিতেছে। বন্ধু বলিল—এবার আর ছেলেমেয়েদের কাপড় টাপড় দিতে পারিনি—বলি, ওই পুরোণো কাপড়ই ধোপার বাড়ি থেকে কাচিয়ে কাচিয়ে পর্। বৌটার চোখে জল দেখে শেষকালে ছোট মেয়েটার জন্যে একখানা ডুরে সাড়ী—তাই। বসো বসো, চা খাও, বাঃ, আজকার দিনে যদি এলে। দাঁড়াও, ডেকে আনি ওকে।

অপু ইতিমধ্যে গলির মোড়ের দোকান হইতে আট আনার খাবার কিনিয়া আনিল। খাবারের ঠোঙা হাতে যখন সে ফিরিয়াছে তখন বন্ধু ও বন্ধুপত্নী বাসায় ফিরিয়াছে।—বাঃ রে, আবার কোথায় গিয়েছিলে—ওতে কি? খাবার? বাঃ রে, খাবার তুমি আবার কেন—

অপু হাসিমুখে বলিল—তোমার আমার জন্যে তো আনিনি? খুকী রয়েছে, ওই খোকা রয়েচে—এসো তো মামু—কি নাম -রমলা?...ও বাবা, বাপের সখ দ্যাখো—রমলা! বৌ ঠাকরুণ—ধরুনতো এটা।

বন্ধুপত্নী আধঘোমটা টানিয়া প্রসন্ন হাসিভরা মুখে ঠোঙাটি হাত হইতে লইলেন, সকলকে চা ও খাবার দিলেন। সেই খাবারই।

আধঘণ্টাটাক্ পরে অপু বলিল—উঠি ভাই, আবার চাঁপদানীতেই ফিরব—বেশ ভাল ভাই—কষ্টের সঙ্গে তুমি এই যে লড়াই করচ—এতেই তোমাকে ভাল করে চিনে নিলাম—কিন্তু বৌ-ঠাকরুণকে একটা কথা বলে যাই—অত ভালমানুষ হবেন না—আপনার স্বামী তা পছন্দ করেন না। দু-একদিন একটু আধটু চুলোচুলি, হাতা-যুদ্ধ, বেলুন-যুদ্ধ—জীবনটা বেশ একটু সরস হয়ে উঠবে—বুঝলেন না? এ আমার মত নয়, কিন্তু আমার এই বন্ধুটির মত—আচ্ছা আসি, নমস্কার।

বন্ধুটি পিছু পিছু আসিয়া হাসিমুখে বলিল—ওহে তোমায় বৌ-ঠাকরুণ বল্‌চেন, ঠাকুরপোকে জিগ্যেস্ কর, উনি বিয়ে করবেন, না, এইরকম সন্নিসি হয়ে হয়ে ঘুরে বেড়াবেন?...উত্তর দাও।

অপু হাসিয়া বলিল—দেখে শুনে আর ইচ্ছে নেই ভাই, বলে দাও।

বাহিরে আসিয়া ভাবে—আচ্ছা, তবুও এরা আজ ছিল বলে বিজয়ার আনন্দটা করা গেল। সত্যিই শান্ত বৌটি। ইচ্ছে করে এদের কোনো হেল্প, করি—কি হয়, হাতে এদিকে পয়সা কোথায়?

তাহার পর কিসের টানে সে ট্রামে উঠিয়া একেবারে ভবানীপুরে লীলাদের বাড়ী গিয়া হাজির হইল। রাত তখন প্রায় সাড়ে আটটা। লীলার দাদামশায়ের লাইব্রেরী-ঘরটাতে লোকজন কথাবার্ত্তা বলিতেছে—গাড়ীবারান্দাতে দুখানা মোটর দাঁড়িয়ে আছে—পোকার উপদ্রবের ভয়ে হলের ইলেকট্রিক্ আলো-গুলিতে রাঙা সিল্কের ঘেরাটোপ্ বাঁধা। মার্ব্বেলের সিঁড়ির ধাপ বাহিয়া হলের সাম্‌নের চাতালে উঠিবার সময় সেই গন্ধটা পাইল—কিসের গন্ধ ঠিক সে জানে না, হয়ত দামী আসবাবপত্রের গন্ধ, নয়ত লীলার

দাদামশায়ের দামী চুরুটের গন্ধ—এখানে আসিলেই এটা পাওয়া যায়।

লীলা—এবার হয়ত লীলা...অপুর বুকটা ঢিপ্ ঢিপ করিতে লাগিল।

লীলার ছোট ভাই বিমলেন্দু তাহাকে দেখিতে পাইয়া ছুটিয়া আসিয়া হাত ধরিল। এই বালকটিকে অপুর বড় ভাল লাগে—মাত্র বার দুই ইহার আগে সে অপুকে দেখিয়াছে, কিন্তু কি চোখেই যে দেখিয়াছে! একটু বিস্ময়মাখানো আনন্দের সুরে বলিল—অপূর্ব্ববাবু, আপনি এতদিন পরে কোথা থেকে? আসুন, আসুন, বসবেন। বিজয়ার প্রণামটা, দাঁড়ান।

—এস এস, কল্যাণ হোক, মা কোথায়?

—মা গিয়েছেন বাগবাজারে বাড়িতে—আস্‌বেন এখুনি—বসুন।

—ইয়ে—তোমার দিদি এখানে তো?—না?—ও।

এক মুহূর্ত্তে সারা বিজয়া দশমীর উৎসবটা, আজকার সকল ছুটাছুটি ও পরিশ্রমটা অপুর কাছে বিস্বাদ, নীরস অর্থহীন হইয়া গেল। শুধু আজ বলিয়া নয়, পূজা আরম্ভ হওয়ার সময় হইতেই সে ভাবিতেছে লীলা পূজার সময় নিশ্চয় কলিকাতায় আসিবে—বিজয়ার দিন গিয়া দেখা করিবে। আজ চাঁপদানীর চটকলে পাঁচটার ভোঁ বাজিয়া প্রভাত সুচনা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে অসীম আনন্দের সহিত বিছানায় শুইয়া শুইয়া ভাবিয়াছিল—বৎসর দুই পরে আজ লীলার সঙ্গে ও-বেলা দেখা হইবে এখন! সেই লীলাই নাই এখানে!...

বিমলেন্দু তাহাকে উঠিতে দিল না। চা ও খাবার আনিয়া খাওয়াইল। বলিল—বসুন, এখন উঠ্‌তে দেব না, নতুন আইসক্রিমের কলটা এসেচে—বড় মামার বন্ধুদের জন্যে সিদ্ধির আইস্‌ক্রিম হচ্ছে—খাবেন সিদ্ধির আইস্‌ক্রিম? রোজ দেওয়া—আপনার জন্যে এক ডিস্ আন্‌তে বলে এলুম। আপনার গান শোনা হয়নি কতদিন, না সত্যি, একটা গান করতেই হবে—ছাড়ছি নে।

—লীলা কি সেই রাইপুরেই আছে? আসবে-টাসবে না?...

—এখন তো আসবে না দিদি—দিদির নিজের ইচ্ছেতে তো কিছু হবার জো নেই—দাদামশায় পত্র লিখেছিলেন, জামাইবাবু উত্তর দিলেন এখন নয়, দেখা যাবে এর পর।

তাহার পর সে অনেক কথা বলিল। অপু এ-সব জানিত না। জামাইবাবু লোক ভাল নয়, খুব রাগী, বদ্‌মেজাজী। দিদি খুব তেজী মেয়ে বলিয়া পারিয়া উঠে না—তবুও ব্যবহার আদৌ ভাল নয়। নীচুসুরে বলিল—নাকি খুব মাতালও—দিদি তো সব কথা লেখে না, কিন্তু এবার বড়দিদির ছেলে কিছুদিন বেড়াতে গিয়েছিল কিনা গরমের ছুটিতে, সে এসে সব বললে। বড়দিদিকে আপনি চেনেন না? সুজাতাদি? এখানেই আছেন, এসেছেন আজ—ডাকব তাঁকে?

অপুর মনে পড়িল সুজাতাকে। বড়বৌরাণীর মেয়ে বাল্যের সেই সুন্দরী, তন্বী সুজাতা—বর্দ্ধমানের বাড়িতে তাহারই যৌবনপুষ্পিত তনুলতাটি একদিন অপুর অনমিত শৈশবচক্ষুর সুমুখে নারী-সৌন্দর্য্যের সমগ্র ভাণ্ডার যেন নিঃশেষে উজাড় করিয়া ঢালিয়া দিয়াছিল—বারো বৎসর পূর্ব্বের সে উৎসবের দিনটা আজও এমন স্পষ্ট মনে পড়ে!

একটু পরে সুজাতা হাসিমুখে পর্দ্দা ঠেলিয়া ঘরে ঢুকিল, কিন্তু একজন অপরিচিত, সুদর্শন, তরুণ যুবককে ঘরের মধ্যে দেখিয়া প্রথমটা সে তাড়াতাড়ি পিছু হটিয়া পর্দ্দাটা পুনরায় টানিতে যাইতেছিল—বিমলেন্দু হাসিয়া বলিল—বাঃ রে, ইনিই তো অপূর্ব্ব বাবু বড়দি? চিন্‌তে পারেন নি?

অপু উঠিয়া পায়ের ধুলা লইয়া প্রণাম করিল। সে সুজাতা আর নাই, বয়স ত্রিশ পার হইয়াছে, খুব মোটা হইয়া গিয়াছে, মাথার সামনের দিকে দু এক গাছা চুল উঠিতে সুরু হইয়াছে, যৌবনের চটুল লাবণ্য গিয়া মুখে মাতৃত্বের কোমলতা। এমন কি, যেন গৃহিণীপণার প্রবীণতাও। বর্দ্ধমানে থাকিতে অপুর সঙ্গে একদিনও সুজাতার আলাপ হয় নাই—রাঁধুনীর ছেলের সঙ্গে বাড়ির বড় মেয়ের কোন্ আলাপই বা সম্ভব ছিল? সবাই তো আর লীলা নয়! তবে বাড়ির রাঁধুনীবামুনীর ছেলেটিকে ভয়ে ভয়ে বড়লোকের বাড়ির

একতালার দালানে বারান্দাতে অনেকবার সে বেড়াইতে, ঘোরাফেরা করিতে দেখিয়াছে বটে।

সুজাতা বলিল—এসো, এসো, বসো। এখানে কি খবর? মা কোথায়?

—মা তো অনেকদিন মারা গিয়েছেন।

—তুমি বিয়ে থাওয়া করেছ তো—কোথায়?

অপু সংক্ষেপে সব বলিল। সুজাতা বলিল—তা আবার বিয়ে করনি? না না, বিয়ে করে ফেল, সংসারে থাকতে গেলে ও-সব তো আছেই, বিশেষ যখন তোমার মা-ও নেই। সে বাড়ির আর মেয়ে-টেয়ে নেই?

অপুর মনে হইল লীলা থাকিলে সে 'তোমার মা' এ-কথা না বলিয়া শুধু 'মা' বলিত, তাহাই সে বলে! লীলার মত আর কে এমন দয়াময়ী আছে যে, তার জীবনে, তার সকল দারিদ্র্যকে, সকল হীনতাকে উপেক্ষা করিয়া পরিপূর্ণ করুণার ও মমতার স্নেহপাণি সহজ বন্ধুত্বের মাধুর্য্যে তাহার দিকে এমন প্রসারিত করিয়া দিয়াছিল? সুজাতার কথার উত্তর দিতে দিতেই এ-কথাটা ভাবিয়া সে কেমন অন্যমনস্ক হইয়া গেল।

সুজাতা ভিতরে চলিয়া গেলে অপুর মনে হইল শুধু মাতৃত্বের শান্ত কোমলতা নয়, সুজাতার মধ্যে গৃহিণী-পণার প্রবীণতাও আসিয়া গিয়াছে। বলিল—আসি ভাই বিমল, আমার আবার সাড়ে দশটায় গাড়ী।

বিমলেন্দু তাহাকে আগাইয়া দিতে তাহার সঙ্গে সঙ্গে অনেক দূর আসিল। বলিল—আর বছর ফাগুন মাসে দিদি এসেছিল, দিন-পনেরো ছিল। কাউকে বল্‌বেন না, আপনার পুরোণো আপিসে একবার আমায় পাঠিয়েছিল আপনার খোঁজে—সবাই বললে তিনি চাকরি ছেড়ে চলে গিয়েছেন, কোথায় কেউ জানে না। আপনার কথা আমি লিখ্‌ব, আপনার ঠিকানাটা দিন্ না?··· দাঁড়ান, লিখে নি।

দিন এই ভাবেই কাটে। হঠাৎ এক গোলমালের সঙ্গে সে জড়িত হইয়া পড়িল।

মাঘীপূর্ণিমার দিনটা ছিল ছুটি। সারাদিন সে আশপাশের গ্রামগুলা পায়ে হাঁটিয়া ঘুরিয়া বেড়াইয়াছে। সন্ধ্যার অনেক পরে সে বাসায় আসিয়া শুইবামাত্র ঘুমাইয়া পড়িল। কত রাত্রে সে জানে না তক্তপোষের কাছের জানালাটাতে কাহার মৃদু করাঘাতের শব্দে তাহার ঘুম ভাঙিয়া গেল। শীত এখনও বেশী বলিয়া জানালা বন্ধই ছিল, বিছানার উপর বসিয়া বসিয়া সে জানালাটা খুলিয়া ফেলিল। কে যেন বাহিরের রোয়াকে জ্যোৎস্নার মধ্যে দাঁড়াইয়া! কে? ··উত্তর নাই। সে তাড়াতাড়ি দুয়ার খুলিয়া বাহিরের রোয়াকে আসিয়া অবাক্ হইয়া গেল—কে একটি স্ত্রীলোক এতরাত্রে তাহার জানালার কাছে দেয়াল ঘেঁষিয়া দাঁড়াইয়া আছে।

অপু আশ্চর্য্য হইয়া কাছে গিয়া বলিল—কে ওখানে? পরে বিস্ময়ের সুরে বলিল—পটেশ্বরী! তুমি এখানে এত রাত্রে! কোথা থেকে—তুমি তো শ্বশুরবাড়ী ছিলে, এখানে কি করে—

পটেশ্বরী নিঃশব্দে কাঁদিতেছিল, কথা বলিল না—অপু চাহিয়া দেখিল তাহার পায়ের কাছে একটা ছোট পুঁটুলি পড়িয়া আছে। বিস্ময়ের সুরে বলিল—কেঁদো না পটেশ্বরী, কি হয়েচে বল। আর এখানে এ-ভাবে দাঁড়িয়েও তো—শুনি কি হয়েচে? তুমি এখন আস্‌ছ কোথেকে বল তো?

পটেশ্বরী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—রিষ্‌ড়ে থেকে হেঁটে আস্‌চি—অনেক রাত্তিরে বেরিয়েচি, আমি আর সেখানে যাব না—

—আচ্ছা, চল চল, তোমায় বাড়ীতে দিয়ে আসি—কি বোকা মেয়ে! এত রাত্তিরে কি এ-ভাবে বেরুতে আছে?···ছিঃ—আর এই কন্‌কনে শীতে, গায়ে একখানা কাপড় নেই, কিছু না—এ কি ছেলেমানুষি!

—আপনার পায়ে পড়ি মাষ্টার মশাই, আপনি বাবাকে বল্‌বেন, আর যেন সেখানে না পাঠায়—সেখানে গেলে আমি মরে যাব—পায়ে পড়ি আপনার—

বাড়ির কাছাকাছি গিয়া বলিল—বাড়ীতে যেতে বড্ড ভয় কচ্ছে, মাষ্টার মশায়—আপনি একটু বল্‌বেন বাবাকে মাকে বুঝিয়ে—

সে এক কাণ্ড আর কি অত রাত্রে! ভাগ্যে রাত অনেক, পথে কেহ নাই!

অপু তাহাকে সঙ্গে লইয়া দীঘড়ী-বাড়ি আসিয়া পটেশ্বরীর বাবাকে ডাকিয়া তুলিয়া সব কথা বলিল। পূর্ণ দীঘড়ী বাহিরে আসিলেন, পটেশ্বরী আমগাছের তলায় বসিয়া পড়িয়া হাঁটুতে মুখ গুঁজিয়া কাঁদিতেছে ও হাড়ভাঙ্গা শীতে ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতেছে—গায়ে না একখানা শীতবস্ত্র, না-একখানা মোটা চাদর।

বাড়ির মধ্যে গিয়া পটেশ্বরী কাঁদিয়া মাকে জড়াইয়া ধরিল—একটু পরে পূর্ণ দীঘড়ী তাহাকে ডাকিয়া বাড়ীর মধ্যে লইয়া গিয়া দেখাইলেন পটেশ্বরীর হাতে, পিঠে, ঘাড়ের কাছে প্রহারের কালশিরার দাগ, এক এক জায়গায় রক্ত ফুটিয়া বাহির হইতেছে—মাকে ছাড়া দাগগুলা সে আর কাহাকেও দেখায় নাই, তিনি আবার স্বামীকে দেখাইয়াছেন। ক্রমে জানা গেল পটেশ্বরী না-কি রাত বারোটা হইতে পুকুরের ঘাটে শীতের মধ্যে বসিয়া বসিয়া ভাবিয়াছে কি করা যায়—দু ঘণ্টা শীতে ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিবার পরেও সে বাড়ি আসিবার সাহস সঞ্চয় করিতে না পারিয়া মাষ্টার মশায়ের জানালায় শব্দ করিয়াছিল।

মেয়েকে আর সেখানে পাঠানো চলিতে পারে না একথা ঠিক। দীঘড়ী মশায় অপুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহার কোনো উকীল বন্ধু আছে কি-না, এ সম্বন্ধে একটা আইনের পরামর্শ বিশেষ আবশ্যক—মেয়ের ভরণপোষণের দাবি দিয়া তিনি জামাইএর নামে নালিশ করিতে পারেন কি-না। অপু দিন দুই শুধুই ভাবিতে লাগিল এ ক্ষেত্রে কি করা উচিত।

সুতরাং স্বভাবতই সে খুব আশ্চর্য্য হইয়া গেল যখন মাঘী পূর্ণিমার দিন পাঁচেক পরে সে শুনিল পটেশ্বরীর স্বামী আসিয়া পুনরায় তাহাকে লইয়া গিয়াছে।

কিন্তু তাহাকে আরও বেশী আশ্চর্য্য হইতে হইল সম্পূর্ণ আর এক ব্যাপারে। একদিন সে স্কুল হইতে ছুটির পরে বাহির হইয়া আসিতেছে, স্কুলের বেহারা তাহার হাতে একখানা খামের চিঠি দিল—খুলিয়া পড়িল, স্কুলের সেক্রেটারী লিখিতেছেন, তাহাকে আর বর্ত্তমানে কোনো আবশ্যক নাই—এক মাসের মধ্যে সে যেন অন্যত্র চাকুরী দেখিয়া লয়।

অপু বিস্মিত হইল—কি ব্যাপার! হঠাৎ এ নোটিশের মানে কি? সে তখনই হেড্‌মাষ্টারের কাছে গিয়া চিঠিখানা দেখাইল। তিনি নানাকারণে অপুর উপর সন্তুষ্ট ছিলেন না। প্রথম, সেবাসমিতির দলগঠন অপুই করিয়াছিল, নেতৃত্বও করিত সে। ছেলেদের সে অত্যন্ত প্রিয়পাত্র তাহার কথায় ছেলেরা উঠে বসে। জিনিষটা হেড্‌মাষ্টারের চক্ষুশূল। অনেকদিন হইতেই তিনি সুযোগ খুঁজিতেছিলেন—ছিদ্রটা এতদিন পান নাই—পাইলে কি আর একটা অনভিজ্ঞ ছোক্‌রাকে জব্দ করিতে এতদিন লাগিত?

হেড্‌মাষ্টার কিছু জানেন না—সেক্রেটারীর ইচ্ছা, তাঁর হাত নাই। সেক্রেটারী জানাইলেন, কথাটা এই যে, অপূর্ব্ববাবুর নামে নানা কথা রটিয়াছে, দীঘড়ী বাড়ীর মেয়েটির এই সব ঘটনা লইয়া। অনেক দিন হইতেই এ লইয়া তাঁহার কানে কোন কথা গেলেও তিনি শোনেন নাই। কিন্তু সম্প্রতি ছেলেদের অভিভাবকদের মধ্যে অনেকে আপত্তি করিতেছেন যে, ও-রূপ চরিত্রের শিক্ষককে স্কুলে কেন রাখা হয়। অপুর প্রতিবাদ সেক্রেটারী কানে তুলিলেন না।

—দেখুন, ও-সব কথা আলাদা। আমাদের স্কুলের ও ছাত্রদের দিক থেকে এ-ব্যাপারটা অন্যভাবে আমরা দেখব কি-না? একবার যাঁর নামে কুৎসা রটেচে, তাঁকে আর আমরা শিক্ষক হিসাবে রাখতে পারিনে—তা সে সত্যিই হোক, বা মিথ্যেই হোক্।

অপুর মুখ লাল হইয়া গেল এই বিরাট অবিচারে। সে উত্তেজিত সুরে বলিল—বেশ তো মশায়, এ বেশ জাষ্টিস্ হ'ল তো? সত্যি মিথ্যে না জেনে আপনারা একজনকে এই বাজারে অনায়াসে চাকুরী থেকে ছাড়িয়ে দিচ্চেন—বেশ তো?

বাহিরে আসিয়া রাগে ও ক্ষোভে অপুর চোখে জল আসিয়া গেল। মনে ভাবিল—যাক্ ভালই হয়েচে, এত নীচতার মধ্যে আর না থাকাই ভাল। এ সব হেড্-মাষ্টারের কারসাজি—আমি যাব তাঁর বাড়ি খোসামোদ করতে? যায় যাক্ চাকরী! কিন্তু এদের অদ্ভুত বিচার বটে—ডিফেণ্ড করার একটা সুযোগ তো

খুনী আসামীকেও দেওয়া হয়ে থাকে, তা-ও এরা আমায় দিলে না!

কয়দিন সে বসিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল এখানকার চাকুরীর মেয়াদ তো আর এই মাসটা—তারপর কি করা যাইবে? স্কুলে এক নতুন মাষ্টার কিছু পূর্ব্বে কোন এক মাসিক পত্রিকায় গল্প লিখিয়া দশটা টাকা পাইয়াছিলেন। গল্পটা সেই ভদ্রলোকের কাছে অপু অনেক বার শুনিয়াছে। আচ্ছা, সে-ও এখানে বসিয়া বসিয়া একখানা খাতায় একটা উপন্যাস লিখিতে সুরু করিয়া দিল—মনে মনে ভাবিল—দশ বারো চ্যাপটার তো লেখা আছে, উপন্যাসখানা যদি লিখে শেষ করতে পারি, তার বদলে কেউ টাকা দেবে না? কেমন হচ্চে কে জানে, একবার রাম বাবুকে দেখাব।

নোটিশ মত অপুর কাজ ছাড়িবার আর বিলম্ব নাই, একদিন পোষ্টাপিসের ডাক ব্যাগ খুলিয়া খাম ও পোষ্টকার্ডগুলি নাড়িতে চাড়িতে একখানা বড়, চৌকা, সবুজ রংএর মোটা খামের উপর নিজের নাম দেখিয়া সে বিস্মিত হইল—কে তাহাকে এত বড় সৌখীন খামে চিঠি দিল! প্রণব নয়, অন্য কেহ নয়, হাতের লেখাটা সম্পূর্ণ অপরিচিত।

খুলিয়া দেখিলেই তো তাহার সকল রহস্য এখনই চলিয়া যাইবে, এখন থাক্, বাসায় গিয়া পড়িবে এখন। এই অজানার আনন্দটুকু যতক্ষণ ভোগ করা যায়।

রান্না-খাওয়ার কাজ শেষ হইতে মার্টিন কোম্পানীর রাত দশটার গাড়ি আসিয়া পড়িল, বাজারের দোকানে দোকানে ঝাঁপ পড়িল। অপু পত্রখানা খুলিয়া দেখিল—দুখানা চিঠি, একখানা ছোট চার পাচ লাইনের, আর একখানা মোটা সাদা কাগজে—পরক্ষণেই আনন্দে, বিস্ময়ে, উত্তেজনায় তাহার বুকের রক্ত যেন চল্‌কাইয়া উঠিয়া গেল মাথায়—সর্ব্বনাশ, কার চিঠি এ! চোখকে যেন বিশ্বাস করা যায় না—লীলা তাহাকে চিঠি লিখিতেছে! সঙ্গের চিঠিখানা তার ছোট ভাইএর—সে লিখিয়াছে দিদির এ-পত্রখানা তাহার পত্রের মধ্যে আসিয়াছে, অপুকে পাঠাইবার অনুরোধ ছিল দিদির, পাঠানো হইল।

অনেক কথা, ন' পৃষ্ঠা ছোট ছোট অক্ষরের চিঠি! খানিকটা পড়িয়া সে বাহিরের খোলা হাওয়ায় আসিয়া বসিল। কি অবর্ণনীয় মনোভাব, বোঝানো যায় না, বলা যায় না!

ভাই অপূর্ব্ব,

অনেক দিন তোমার কোনো খবর পাই নি—তুমি কোথায় আছ, আজকাল কি কর, জান্‌বার ইচ্ছে হয়েচে অনেকবার, কিন্তু কে বল্‌বে, কার কাছেই বা খবর পাব? সেবার কল্‌কাতায় গিয়ে বিনুকে একদিন তোমার পুরাণো ঠিকানায় তোমার সন্ধানে পাঠিয়ে ছিলাম—সে বাড়িতে অন্যলোকে আজকাল থাকে, তোমার সন্ধান দিতে পারেনি—কি করেই বা পারবে? একথা বিনু বলেনি তোমায়?

আমি বড় অশান্তিতে আছি এখানে, কখনো ভাবিনি এমন আবার হবে। কখনও যদি দেখা হয় তখন সব বল্‌ব। এই সব অশান্তির মধ্যে যখন আবার মনে হয় তুমি হয়তো মলিনমুখে কোথায় পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্চ—তখন মনের যন্ত্রণা আরও বেড়ে যায়। এই অবস্থায় হঠাৎ একদিন বিনুর পত্রে জান্‌লাম, বিজয়া দশমীর দিন তুমি ভবানীপুরের বাড়িতে গিয়েছিলে, তোমার ঠিকানাও পেলাম।

বর্দ্ধমানের কথা মনে হয়? অত আদরের বর্দ্ধমানের বাড়িতে আজকাল আর যাবার জো নেই। জ্যাঠামশায় মারা যাওয়ার পর থেকেই রমেন দা বড় বাড়াবাড়ি করে তুলেছিল। আজকাল সে যা করচে, তা তুমি হয়ত কখনও জীবনে শোনোও নি। মানুষের ধাপ থেকে সে যে কত নেমে গিয়েচে, আর তার যা কীর্ত্তি-কারখানা, তা লিখতে গেলে পুঁথি হয়ে পড়ে। কোন্ মাড়োয়ারীর কাছে নিজের অংশ বন্ধক রেখে টাকা ধার করেছিল—এখন তারই পরামর্শে পার্টিশন সুট আরম্ভ করেছে—বিনুকে ফাঁকি দেবার উদ্দেশ্যে। এ-সব তোমার মাথায় আস্‌বে কোনোদিন?...

* * * *

রাত্রে অপুর ভাল ঘুম হইল না। লীলা যাহা লিখিয়াছে তাহার অপেক্ষা বেশী যেন লেখে নাই। সারা পত্র-

খানিতে একটা শান্ত সহানুভূতি, স্নেহ প্রীতি, করুণা। এক মুহূর্ত্তে আজ দু বৎসরব্যাপী এই নির্জ্জনতা অপুর যেন কাটিয়া গেল—সংসারে তাহার কেহ নাই, এ-কথা আর মনে হইল না। লীলার মত আপনার লোকের স্পর্শ জীবনে যে কত অমূল্য, তাহা কি এত দিন সে জানিত?

লীলার পত্র পাইবার দিন বারো পরে তাহার যাইবার দিন আসিয়া গেল।

ছেলেরা সভা করিয়া তাহাকে বিদায়-সম্বর্দ্ধনা দিবার উদ্দেশে চাঁদা উঠাইতেছিল—হেড্‌মাষ্টার খুব বাধা দিলেন। যাহাতে সভা না হইতে পায় সেইজন্য দলের চাঁইদিগকে ডাকিয়া টেষ্ট পরীক্ষার সময় বিপদে ফেলিবেন বলিয়া শাসাইলেন—পরিশেষে স্কুল-ঘরে সভার স্থানও দিতে চাহিলেন না, বলিলেন—তোমরা ফেয়ারওয়েল দিতে যাচ্ছ, ভাল কথা, কিন্তু এসব বিষয়ে আয়রণ ডিসিপ্লিন্ চাই—যার চরিত্র নেই, তার কিছুই নেই, তার প্রতি কোনো সম্মান তোমরা দেখাও, এ আমি চাইনে, অন্তত স্কুল-ঘরে আমি তার জায়গা দিতে পারিনে।

সেদিন আবার বড় বৃষ্টি। মহেন্দ্র সাঁবুই-এর আটচালায় জন-ত্রিশেক উপরের ক্লাসের ছেলে হেড্‌মাষ্টারের ভয়ে লুকাইয়া হাতে লেখা অভিনন্দন-পত্র পড়িয়া ও গাঁদা ফুলের মালা গলায় দিয়া অপুকে বিদায়-সম্বর্দ্ধনা করিল, সভা-ভঙ্গের পর জলযোগ করাইল। প্রত্যেকে পায়ের ধূলা লইল, তাহার বাড়ি আসিয়া বিছানাপত্র গুছাইয়া দিয়া নিজেরা তাহাকে বৈকালের ট্রেনে তুলিয়া দিল।

* * *

অপু প্রথমে আসিল কলিকাতায়।

একটা খুব লম্বা পাড়ি দিবে—যেখানে সেখানে—যেদিকে দুই চোখ যায়—এতদিনে সত্যই মুক্তি। আর সে কোনো জালে নিজেকে জড়াইবে না—সব দিক হইতে সতর্ক থাকিবে—শিকলের বাঁধন অনেক সময় অলক্ষিতে জড়ায় গিয়া পায়ে?

ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীতে গিয়া সারা ভারতবর্ষের ম্যাপ ও য্যাটলাস কয়দিন ধরিয়া দেখিয়া কাটাইল—ড্যানিয়েলের ওরিয়েণ্টাল সিনারি ও পিঙ্কার্টনের ভ্রমন-বৃত্তান্তের নানা স্থান নোট করিয়া লইল—বেঙ্গল নাগপুর ও ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলের নানা স্থানের ভাড়া ও অন্যান্য তথ্য জিজ্ঞাসা করিয়া বেড়াইল। সত্তর টাকা হাতে আছে, ভাবনা কিসের?

কিন্তু যাওয়ার আগে একবার ছেলেকে চোখের দেখা দেখিয়া যাওয়া দরকার না? অপর্ণার মা জামাইকে এতটুকু তিরস্কার করিলেন না, এতদিন ছেলেকে না দেখিতে আসার দরুণ বরং এত আদর যত্ন করিলেন যে, অপু নিজেকে অপরাধী ভাবিয়া সঙ্কুচিত হইয়া রহিল।

ছেলে তিন বৎসর ছাড়াইয়াছে—ফুট্‌ফুটে সুন্দর গায়ের রং—অপর্ণার মত ঠোঁট ও মুখের নীচেকার ভঙ্গী, চোখ বাপের মত ডাগর ডাগর। কিন্তু সবশুদ্ধ ধরিলে অপর্ণার মুখের আদলই বেশী ফুটিয়া ওঠে খোকার মুখে। প্রথমে সে কিছুতেই বাবার কাছে আসিবে না, অপরিচিত মুখ দেখিয়া ভয়ে দিদিমাকে জড়াইয়া রহিল—অপুর মনে আঘাত লাগিলেও সে হাসিমুখে হাত বাড়াইয়া বারবার খোকাকে কোলে আনিতে গেল—ভয়ে শেষকালে খোকা দিদিমার কাঁধে মুখ লুকাইয়া রহিল।

সন্ধ্যার সময় কিন্তু খুব ভাব হইল। এত কথাও বলে খোকা! তাহাকে বাবা বলিয়া বার দুই তিন ডাকিয়াছে—বলে—ফাখী,—ফাখী—উই এত্তা ফাখী—ফাখা নেবই বাবা। অপু বলে—কই রে পাখী খোকা? চল আমরা বেড়িয়ে আসি—অনেক ধরে দেব, চল। এতদিন মুখ দেখে নাই, বেশ ছিল—কিন্তু দিন দুই ছেলেকে কাছে কাছে পাইবার পরে এমন এক মমতা ও অনুকম্পা ছেলের উপর বাড়িয়া উঠিল যে, একদণ্ড চোখের আড়াল হইলে অপু অস্থির হইয়া উঠিতে থাকে।

ছেলেকে লইয়া মাঠে, পথে বেড়াইতে ভাল লাগে—খোকা এ কয়দিনে বাবাকে খুব চিনিয়া লইয়াছে—কত কথা বলে কিন্তু বেশীর ভাগই বোঝা যায় না—উল্টো-পাল্টা কথা, কোন্ কথার উপর জোর দিতে গিয়া কোন্ কথার উপর দেয়—কিন্তু অপুর মনে হয় কথা কহিলে খোকার মুখ দিয়া যেন মাণিক ঝরে—সে যাহাই কেন বলুক না, প্রত্যেক ভাঙা, অশুদ্ধ, অপূর্ণ কথাটি অপুর

যেন মনে হয় এ সুধামাখা দেববাণী—কথার মধ্যে কি অপূর্ব্ব শব্দসঙ্গীত! তাহা ছাড়া প্রত্যেক কথাটা অপুর মনে বিস্ময় জাগায়। সৃষ্টির আদিম যুগ হইতে কোনো শিশু যেন কখনও 'বাবা' বলে নাই, 'জল' বলে নাই,—কোন্ অসাধ্য সাধনই না তাহার খোকা করিতেছে!

পথে বাবার সঙ্গে বাহির হইয়াই খোকা বকুনি সুরু করে। হাত পা নাড়িয়া কি বুঝাইতে চায়—অপু না বুঝিয়াই উৎসাহের সুরে ঘাড় নাড়িয়া বলে—ঠিক ঠিক! তার পর কি হ'ল রে খোকা?

একটা বড় সাঁকো পথে পড়ে, খোকা বলে—বাবা যাব—ওই দেখব। অপু বলে—আস্তে আস্তে নেমে যা—নেমে গিয়ে একটা কূ-উ করবি—

খোকা আস্তে ঢালু বাহিয়া নীচে নামে—জলনিকাশের পথটার ফাঁকে ওদিকের গাছপালা দেখা যাইতেছে—না বুঝিয়া বলে—বাবা, এই মধ্যে একতা বাঁগান—কু করো তো খোকা, একটা কু করো?

খোকা উৎসাহের সহিত বাঁশির মত সুরে ডাকে—কূ-উ-উ-উ—পরে বলে—তুমি কলুন বাবা?—

অপু হাসিয়া বলে—কু-উ-উ-উ-উ—

খোকা আমোদ পাইয়া নিজে আবার করে—আবার বলে—তুমি কলুন?...বাড়ী ফিরিবার পথে বলে, খপিছাক এনো বাবা—দিদিমা খপিছাক আঁড়্বে—খপিছাক ভালো—

—কপি তুই ভালবাসিস্ খোকা?...এবার খুব বড় দেখে আন্‌ব।

কলিকাতা ফিরিবার সময়ে অপর্ণার মা বলিলেন—বাবা, আমার মেয়ে গিয়েছে, যাক—কিন্তু তোমার কষ্ট হয়েছে আমার বেশী। তোমাকে যে কি চোখে দেখেছিলাম বল্‌তে পারিনে, তুমি যে এ-রকম পথে পথে বেড়াচ্ছ, এতে আমার বুক ফেটে যায়, তোমার মা বেঁচে থাক্‌লে কি বিয়ে না করে পারতে? খোকনের কথাটাও তো ভাব্‌তে হবে, একটা বিয়ে কর বাবা।

নৌকায় আবার পীরপুরের ঘাটে আসা। অপর্ণার ছোট খুড়তুত ভাই ননী তাহাকে তুলিয়া দিতে আসিতেছিল।

খররৌদ্রে বড়দলের নোনাজল চক্ চক্ করিতেছে। মাঝ নদীতে একখানা বাদাম-তোলা মহাজনী নৌকা, দূরে বড়দলের মোহনার দিকে সুন্দরবনের ধোঁয়া ধোঁয়া অস্পষ্ট সীমারেখা।

—আশ্চর্য্য! এরই মধ্যে অপর্ণা যেন কত দূরের হইয়া গিয়াছে! অসীম জলরাশির প্রান্তের ওই অনতি-স্পষ্ট বনরেখার মতই দূরের—অনেক দূরের!

অপুদের ডিঙিখানা দক্ষিণতীর ঘেঁষিয়া যাইতেছিল, নৌকার তলায় ছলাৎ ছলাৎ শব্দে ঢেউ লাগিতেছে, কোথায় একটা উঁচু ডাঙা, কোথাও পাড় ধসিয়া নদীগর্ভে পড়িয়া যাওয়ায় বাঁশঝোঁপের শিকড়গুলা বাহির হইয়া ঝুলিতেছে। একটা জায়গায় আসিয়া অপুর হঠাৎ মনে হইল, জায়গাটা সে চিনিতে পারিয়াছে—একটা ছোট খাল, ডাঙার উপরে একটা হিজল গাছ। এই খালটিতেই অনেকদিন আগে অপর্ণাকে কলিকাতা হইতে আনিবার সময়ে সে বলিয়াছিল—ও কলা-বৌ, ঘোম্‌টা খোল, বাপের বাড়ির দ্যাশটা চেয়েই দ্যাখো—

তারপর ষ্টীমার চড়িয়া খুলনা, বাঁ দিকে সে একবার চাহিয়া দেখিয়া লইল। ওই যে ছোট্ট খড়ের ঘরটি, প্রথম যেখানে সে ও অপর্ণা সংসার পাতে।

সেদিনকার সে অপূর্ব্ব আনন্দমুহূর্ত্তটিতে সে কি স্বপ্নেও ভাবিয়াছিল যে এমন একদিন আসিবে, যেদিন শূন্যদৃষ্টিতে খড়ের ঘরখানার দিকে চাহিয়া দেখিতে দেখিতে সমস্ত ঘটনাটা মনে হইবে মিথ্যা স্বপ্ন?

নির্ণিমেষ, উৎসুক, অবাক্ চোখে সেদিকে চাহিয়া থাকিতে থাকিতে অপুর কেমন এক দুর্দ্দমনীয় ইচ্ছা হইতে লাগিল—একবার ঘরখানার মধ্যে যাইতে, সব দেখিতে হয়ত অপর্ণার হাতের উনুনের মাটির ছিঁটা এখনও আছে—যেখানে বসিয়া সে অপর্ণার হাতের জলখাবার খাইয়াছিল। প্রথম যেখানটিতে অপর্ণা ট্রাঙ্ক হইতে আয়না-চিরুণী বাহির করিয়া তাহার জন্য রাখিয়া দিয়াছিল...

ট্রেনে উঠিয়া জানালার ধারে বসিয়া থাকে। ষ্টেশনের পর ষ্টেশন আসে ও চলিয়া যায়, অপু শুধুই ভাবে বড়-দলের তীর, চাঁদকাঁটার বন, ভাটার জল কল্‌কল্ করিয়া নামিয়া যাইতেছে...একটি অসহায় ক্ষুদ্র শিশুর অবোধ হাসি...

ক্রমশঃ

পুরাণে দেশ

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি

সূচনা।

পুরাণ বুঝিতে হইলে শ্রদ্ধার সহিত পড়িতে হইবে; পৌরাণিকের অন্তরে প্রবেশ করিতে হইবে। যে-কোন বই পড়ি, যে-কোন লোকের সহিত কথা কই, বক্তা ও শ্রোতা, উভয়ের অন্তরে অন্তরে যোগ না ঘটিলে, বইটা কিছু নয় লোকটাও ভাল নয়। আমরা পুরাণে পালিত হইয়াছি; আর, বায়ুপুরাণ বলিতেছেন, সে পুরাণ 'ব্রহ্মোক্ত', 'বেদ-সম্মিত'। আরও বলিতেছেন, "যিনি চারি বেদ ও উপনিষদসহ ষড়ঙ্গ জানেন, কিন্তু পুরাণ জানেন না, তিনি বিচক্ষণ হইতে পারেন না। ইতিহাস ও পুরাণ দ্বারা বেদজ্ঞান বৃদ্ধি করিবে। না করিলে সে অল্পবিদ্যকে বেদ ভয় করেন; মনে করেন প্রহার করিতে আসিতেছে।"

কিন্তু পুরাণ যে বুঝিতে পারি না।

ইহার কারণ আমরা পুরাণের দেশ, কাল, পাত্র, তিনে পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছি। শব্দের অর্থ চিরকাল এক থাকে না। আমরা এখন স্বর্গ বলিলে আকাশের দিকে তাকাই, পৃথিবী বলিলে ভূগোল বুঝি, পাতাল বলিলে ভূগোলের বিপরীত পৃষ্ঠ মনে করি। আমাদের কাছে, ঋষি তপস্যা কিম্বা যজ্ঞ করিতেছেন, দেব অশরীরী জীব, দানব বিকটাকার প্রাণী, ইত্যাদি। কিন্তু নূতন মানব ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য পদার্থ চিন্তা করে, অমূর্ত বস্তু কল্পনা করিতে পারে না। বহুকাল পরে চিন্তাশীল মানব দ্রব্যের গুণ পৃথক্ ভাবিতে শেখে। প্রথম প্রথম স্বর্গ উচ্চদেশ, পাতাল নিম্নদেশ, দেব সুন্দর প্রভাবশালী মানুষ। যক্ষ রক্ষঃ গন্ধর্ব কিন্নর, সবাই মানুষ। হিমালয়ের কন্যা প্রস্তরের হইতে পারে না; সকলেই বুঝে, হিমালয়-প্রদেশের রাজার কন্যা। ঋক্ষ এক পর্বতের নাম; ঋক্ষরাজ সে পার্বত্যদেশের রাজা। নাগকন্যা, নাগবংশীয় কন্যা। নাগবংশ এখনও আছে। উৎপত্তি যাহাই হউক, এখনও অগ্নিকুল, গঙ্গ-বংশ, সূর্যবংশ আছে। সৈন্ধব বলিলে সিন্ধুদেশজাত লবণ ও অশ্ব, দুই-ই বুঝায়। এইরূপ, গন্ধর্ব এক জাতি মানুষ, আর গন্ধর্বদেশজাত ঘোটকও (কাবুলী ঘোড়া) বুঝায়। একটি অর্থ সকল বাক্যে চলে না। সেইরূপ, দেব শব্দে সর্বদা অমর বুঝিয়াই অনর্থ হইয়াছে।

দেশ-সম্বন্ধেও এইরূপ ভ্রম হইয়াছে। আর্যজাতি এই সেদিন আকাশ হইতে ভূতলে অবতীর্ণ হন নাই। তাঁহারা কত যুগ ধরিয়া কোথায় কোথায় অবস্থিতি করিয়াছিলেন, কে বলিতে পারিবে। বেদে কোন্ কোন্ দেশের কোন্ কোন্ ঘটনার উল্লেখ আছে তাহার স্থিরনির্ণয় হয় নাই। এক এক বিদ্বানের এক এক মত। পুরাণ বেদ-সম্মত, স্বীকার করিলে পুরাণ হইতে বরং কিছু কিছু বুঝিতে পারি।

পরাশর-নন্দন অসামান্য-প্রতিভাসম্পন্ন কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদ বিভাগ করিয়াছিলেন। এই হেতু তাঁহার উপাধি বেদ-ব্যাস হইয়াছিল। তিনি বেদ-সংহিতা করিয়াছিলেন, ভারত-ইতিহাস ও একখানি পুরাণ-সংহিতা করিয়াছিলেন। তিনি খ্রীষ্টপূর্ব ত্রয়োদশ শতাব্দে ছিলেন। ইহার পূর্বে বেদ, ইতিহাস, পুরাণ অবশ্য ছিল। নচেৎ সংহিতা হইতে পারিত না। এই তিনের মধ্যে পুরাণ প্রথম, ইহা স্বতঃ-সিদ্ধ।

কিন্তু বেদের এত প্রামাণ্য ও পবিত্রতার হেতু কি? এই যে প্রাচীনেরা বলিয়াছেন, বেদ কতকগুলি ঋষির 'দৃষ্ট'; কেহ বেদ রচনা করে নাই, ইহা অনাদি, শাশ্বত; এই বিশ্বাসের কারণ অবশ্য ছিল। ঋষিরা ঘুম-পাড়ানীর গান করিলেন, সেটাও পবিত্র মন্ত্র হইয়া গেল; কত কাল গেলে এবং কি কারণে এরূপ হইতে পারে? আর্যেরা বুদ্ধিমান্ জাতি ছিলেন, জড়বুদ্ধি মূঢ় ছিলেন না।

একটা কল্পনা করি। মনে করি, তাঁহারা দশ পনর হাজার, এশিয়ার মধ্যভাগে বাস করিতেছেন। সে দেশে বৃষ্টি নাই, কৃষিকর্মের সুবিধা নাই। পর্বত ও নদী আছে, ঘাস আছে, অজ মেষ গো-চারণ দ্বারা তাঁহারা কায়ক্লেশে দিন-যাপন করিতেছেন। সে দেশে বন্য অশ্ব আছে; তাঁহারা সে অশ্ব ধরিয়া বাহন করেন, অশ্বের মাংসও খান। শীত ও গ্রীষ্ম, গ্রীষ্ম ও শীত, এই দুই ঋতু কখন্ আসে কখন্ যায়, তাহা বলিবার জো নাই। নিদারুণ শীত; ঈশান কোণ হইতে কন্‌কনে বাতাস বহিতে থাকে; আগুন না রাখিলে বাঁচিবার জো নাই। এমন দেশে অন্নচিন্তা সত্য-সত্য চমৎকার। তাহা হইলেও স্বদেশ! (গ্রীণলণ্ডেও মানুষের বাস আছে, তাহারা মনে করে, তেমন দেশ আর নাই।) তাঁহারা অন্নচিন্তা

করেন, শত্রুতা-মিত্রতা করেন, বর্তমান ও অতীত ধরিয়া সুখ-দুঃখ আলোচনা করেন। কেহ কেহ কবি, গান বাঁধেন; সে গানে নিজেদের দেশের কথাই থাকে। সকলে বুঝে, মনেও থাকে। কবিরা স্মরণীয় সব ঘটনা গানে বাঁধিয়া রাখেন না। কতক ঘটনা মুখে মুখে প্রচারিত হয়, লোকে ভুলিয়াও যায়, ছড়াভঙ্গ হইয়া যায়। মুখে মুখে যে-সব পুরাতন কাহিনী চলে, সে সবের নাম পুরাণ।

যাহারা এমন দেশে বাস করে, তাহারা একস্থানে অধিককাল থাকিতে পারে না। পশুর খাদ্যাভাব ঘটে। প্রাচীন আর্যজাতি যাযাবর ছিলেন। উত্তরে আরও কষ্ট, পূর্বে মরু, দক্ষিণে অসংখ্য দ্রোণী-বিভক্ত তৃণহীন বিস্তীর্ণ উচ্চ "পামীর"। গবাদি পশু লইয়া সে পথ ধরা চলে না। ইহার দক্ষিণে "করকোরম" পর্বতে একটা পথ (Pass) আছে বটে, কিন্তু গো লইয়া সে দীর্ঘ সঙ্কট অতিক্রম করা দুঃসাধ্য। তাঁহারা পশ্চিমে চলিলেন। সকলেই দেশত্যাগ করেন নাই। যাহারা সাহসী ও দরিদ্র, তাহারাই স্বদেশ ত্যাগ করে। দেশ প্রায় একই প্রকার। অল্পে অল্পে পারস্যে প্রবেশ করিলেন। মনে করি তাঁহারা "কাসগর" হইতে "তিহারণে" আসিয়াছেন। দেশটি অনেক বিষয়ে নূতন। কাস্‌গরে পরম গ্রীষ্ম (জুলাই মাসে) ৯২° ডিগ্রী, পরমশীত (জানুআরিতে) ১২° ডিগ্রী (জল জমিয়া বরফ হয় ৩২° ডিগ্রীতে), সম্বৎসরে বৃষ্টি ও তুষারপাত ৩-৪ ইঞ্চি। তিহারণে পরম গ্রীষ্ম (জুলাই) ৯৯°, পরমশীত (জানুআরি) ২৬° ডিগ্রী, সম্বৎসরে বৃষ্টি ও তুষার ৯ ইঞ্চি। যদি বর্ষাকাল বলিয়া কাল ধরি, কাস্‌গরে পরম বৃষ্টি (মে মাসে) ০·৭ ইঞ্চি। তিহারণে বর্ষাকাল নভেম্বর হইতে এপ্রেল, তন্মধ্যে মার্চ মাসে ২ ইঞ্চি।* এখানে কোন কোন আর্য প্রথম কৃষিকর্ম আরম্ভ করিলেন, পর্বতের উপত্যকায়। পশু-চারণ-ভূমিও সেই। উপত্যকার নীচে নদী। অসম ভূমি সমান করিয়া লইতে হয়, নদীর জল দ্বারা ক্ষেত পাওয়াইতে হয়। ধানচাষ নয়, যবের চাষ। গ্রীষ্ম ও বৃষ্টি, এই দুই না থাকিলে ধানচাষ হইতে পারে না। কিন্তু কৃষিকর্মের গুণ এই, এক স্থানে বাস করিতে পারা যায়। বহু আর্য গ্রাম-স্থাপন করিলেন। বোধ হয় স্বদেশের উত্তরে ও পশ্চিমেও এইরূপ অল্প করিয়াছিলেন।

কিন্তু দেশটি জনহীন ছিল না। সে দেশে কিম্বা নিকটে দৈত্য ও দানব জাতি বাস করে। উভয়ের নাম অসুর। তাহারা বলবান্, কারুকর্মে দক্ষ, অস্ত্রশস্ত্র-নির্মাণে সিদ্ধহস্ত। আর্যদিগকে গ্রাম স্থাপন করিতে দেখিয়া, বহু কাল পরে ভারতে যেমন ঘটিয়াছিল, সেদেশেও তদ্দেশবাসী ক্রুদ্ধ হইতে লাগিল। বিশেষতঃ নদীর ও খালের জল লইয়া দুই পক্ষে কলহ ও যুদ্ধ হইতে লাগিল। আর্যেরা তাঁহাদের স্বদেশে কি নামে খ্যাত ছিলেন, তাহা অজ্ঞাত। বোধ হয়, জন, কিম্বা মনু, এইরূপ মনুষ্য-বাচক নামে খ্যাত ছিলেন। যাঁহারা কবি, তাঁহারা ঋষি। যাঁহারা ধনবান্ প্রভাবশালী, তাঁহারা দেব। আর্যেরা এক দেবকে যুদ্ধ-সেনাপতি বরণ করিলেন। তাঁহার উপাধি, ইন্দ্র। দেবাসুরের যুদ্ধের কারণ, সেই চিরন্তন কথা, কে রাজা হইবে। দেবেরা পরাজিত হইতে লাগিলেন। (ভারতেও অনেকবার পরাজিত হইয়াছিলেন)। এই বিপদ না ঘটিলে আর্যেরা হয়ত সে দেশেই থাকিয়া যাইতেন।

পারস্যের মধ্যভাগে উত্তর-পশ্চিম হইতে দক্ষিণ-পূর্বদিকে এক বিস্তীর্ণ তৃণশূন্য ঊষর মরু। পূর্ব-দক্ষিণ ভাগ ও সমুদ্রের নিকটবর্তী ভূমি উর্বরা। আর্যেরা এদেশে চলিয়া আসিলেন। তাঁহারা পারস্যদেশে সিংহ দেখিলেন, বিস্তীর্ণ সমুদ্র সর্বদা দেখিলেন। উদুম্বর বৃক্ষ ও ব্রহ্মদার (তুঁত গাছ) গৃহকর্মে লাগাইতে শিখিলেন। কিন্তু প্রজাবৃদ্ধি হইতে লাগিল। আর্য কর্ষক ও পশুপালকেরা আবার নূতন দেশ খুজিতে গিয়া কতক বেলুচিস্থানে এবং কতক আফগানিস্থানে চলিয়া আসিলেন। যেখানে আসেন, সেখানেই শত্রু। গো-ধনই ধন, গো-ধন চুরি হইতে লাগিল। আফগানিস্থান পর্বতময়, প্রখর গ্রীষ্ম ও নিদারুণ শীতদেশ মনোরম নয়। এই দেশ হইতে তাঁহারা "খাইবার পাস" পথে পঞ্চনদ প্রদেশে প্রবেশ করিলেন। অন্য দল বেলুচিস্থানে অনেককাল থাকিয়া "বোলান পাস" দিয়া ক্রমশঃ কতক সিন্ধুর মুখের দেশে আসিয়া পড়িলেন। সিন্ধুতটে আসিয়া প্রচুর জল ও প্রচুর সমভূমি পাইলেন।*

আর্যেরা পারস্যদেশে নির্বিঘ্নে বাস করিতে পারেন নাই। কিন্তু এই দেশেই তাঁহারা সভ্যতার বীজ পাইয়াছিলেন। মানব-জাতি একদেশে নিরবচ্ছিন্ন বাস করিলে তাহার স্বাভাবিক উৎসাহ, প্রভাব, উদ্যম ক্ষীণ হইয়া পড়ে। অন্য জাতির সহিত সংঘর্ষ ও প্রতিযোগিতা পাইলে, এবং জড়বুদ্ধি না হইলে, সে জাতি প্রাণরক্ষার

* পেশাবর ও লাহোরে শীতকালে বৃষ্টি হয়, কিন্তু শরৎকালে হয় না। লাহোরে বর্ষাকাল আছে, পেশাবরে স্পষ্ট নয়। তিহারণে শরৎকালে বর্ষা আরম্ভ। কাবুল দেশের পশ্চিমে গ্রীষ্মকালে বর্ষা নাই বলা চলে। এই বিশেষ হইতে তাঁহাদের দেশ ও কাল, দুই-ই জানিতে পারা যায়। পাঠক এই এই বিশেষ স্মরণ রাখিবেন।

* বোধ হয় বহুকাল পরে এক দল তিব্বত হইয়া কাশ্মীর আসিয়াছিলেন।

নূতন নূতন উপায় অন্বেষণ করিতে থাকে। দুই পক্ষ প্রায় সমান হইলে উভয়েই উন্নত হয়। অসুরেরা অসভ্য বর্বর ছিল না। বোধ হয় তাহারা আর্য অপেক্ষা উন্নত ছিল। আর্যেরা তাহাদের নিকট অনেক বিদ্যা শিখিয়াছিলেন। সুর ও অসুরদিগের মধ্যে বিবাহও হইত।

পারস্যে অবস্থিতিকালে স্বদেশের সহিত আর্যগণের যোগ ছিল। উৎসবে নিমন্ত্রণ হইত, যুদ্ধে সাহায্য আসিত। পরে প্রবাসী আর্য দূরে আসিতে লাগিলেন, অল্পে অল্পে বিচ্ছেদও হইতে লাগিল। কালে পিতৃগণের স্মৃতিমাত্র রহিল। এইরূপই হয়। দুই চারিজন স্বদেশ ত্যাগ করিয়া দূর প্রবাসী হইলে কালে তাহাদের পুত্র-পৌত্রাদি সে দেশীয় হইয়া যায়। কিন্তু বহুজন বিদেশবাসী হইলে বহু কাল যাবৎ তাহাদের পুত্র-পৌত্রাদি "স্বদেশী" থাকে। কোন্ দেশ হইতে আসিয়াছে, বলিতে পারে; কিন্তু কত পুরুষ পূর্বে আসিয়াছে, তাহা বলিতে পারে না। বিদেশে তদ্দেশবাসী শত্রু না হইয়া যায় না; তখন প্রবাসীর স্বদেশভক্তি শতগুণে বাড়িয়া উঠে। স্বদেশ কি সুখেরই ছিল! স্বদেশের গান কি মধুময়! সে গান আর সামান্য গান থাকে না, পবিত্র স্মারক মন্ত্র হইয়া উঠে। যে জাতিই হউক, জন্ম বিবাহ মৃত্যু, এই তিনটি সংস্কার অবশ্য থাকে; বিদেশেও সে তিনটি স্বদেশের অনুকরণে যথাস্মৃতি সম্পাদন করে। ঋষিরা কবি ছিলেন, তাঁহারা পুরোহিত-বংশ-প্রবর্তক হইয়া পড়িলেন। উৎসবের নাম যজ্ঞ ছিল। সেখানেও পুরোহিত চাই। প্রাচীনকালে পিতৃভূমিতে কি কর্ম কেমনে করা হইত, তাহারা স্মরণ করিয়া রাখিতেন। শ্লোকবদ্ধ না হইলে স্মরণ থাকে না। অতীতের প্রতি মানুষের যে স্বাভাবিক আকর্ষণ ও ভক্তি আছে, সে বশেই ঋষিরা স্বদেশের গান, পারস্যে অবস্থিতিকালের গান মন্ত্রস্বরূপ জ্ঞান করিতে লাগিলেন। পঞ্চ-নদ প্রদেশে বাস-কালে অগ্নিরক্ষার প্রয়োজন ছিল না; কিন্তু এখানেও সেই প্রাচীন অগ্নি-স্থাপন রহিত হইল না। নূতন নূতন গানও রচিত হইল। ঋষিরা মন্ত্র-দ্রষ্টা ছিলেন। তাঁহারা মন্ত্রের বিষয় দেখিয়াছিলেন, শুনিয়াছিলেন। বর্তমান কবিও তাঁহার দৃষ্ট, শ্রুত, অনুভূত বিষয় লইয়া পদ্যরচনা করেন।

প্রথমে ঋষি সাতজন ছিলেন। পরে একজন, পরে আর দুইজন হইয়া দশজন হইলেন। ইঁহাদের উৎপত্তি কেহ জানে না। এইহেতু ইঁহারা ব্রহ্মার মানসপুত্র বিবেচিত হইতেন। ইঁহারা 'পিতৃ' নামে খ্যাত। যে-কোন বিষয়ে ব্রহ্মা আদি, সে-বিষয়েই বুঝিতে হইবে, পূর্ব ইতিহাস অজ্ঞাত। মৎস্যপুরাণ মতে (১৪৫ অঃ), ইঁহারাই ঋষি। ইঁহাদের পুত্র-পৌত্রাদি 'ঋষিক' বা ঋষি-পুত্র। ইঁহারা 'শ্রুতঋষি'। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য, তিন বর্ণ হইতেই শ্রুতঋষি জন্মিয়াছিলেন। ইঁহারা দ্বি-নবতি (৯২), এবং ইঁহারাই মন্ত্র বহিষ্কৃত করিয়াছিলেন। তিন জন বৈশ্য-বংশীয়, দুই জন ক্ষত্রিয়-বংশীয়, অবশিষ্ট ব্রাহ্মণ-বংশীয় 'মন্ত্রকৃৎ' ছিলেন।

উপরে আর্যজাতির পিতৃভূমি-ত্যাগ ও ভারতে আগমনের যে ইতিবৃত্ত সঙ্কলিত হইল, তাহার সমুদয় মনঃকল্পিত নয়। এখানে সেখানে, পুরাণে ও মহাভারতে, উপাদান রহিয়াছে, এখানে তাহার কয়েকটি লইয়া একটা সূত্রে গাঁথিয়া দেওয়া হইল। তিনটি দেশে লক্ষ্য রাখিতে হইবে, মধ্য-এশিয়া, পারস্য, ও ভারত। মহাভারতে ও পুরাণে পুনঃ পুনঃ উক্ত হইয়াছে, মানব দেবলোক হইতে চ্যুত হইয়া অমুক দেশে জন্মগ্রহণ করেন। সে দেবলোক কোথায়, বুঝিলেই প্রথম প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাইবে। প্রথমে দেখি, প্রাচীন দেশ-জ্ঞান। অর্থাৎ প্রাচীনেরা কোন্ কোন্ দেশ দেখিয়াছিলেন। এ নিমিত্ত মাত্র দিগ্‌দর্শন করিলেই চলিবে, পুরাণের সবিশেষ বর্ণনা-পরীক্ষার প্রয়োজন হইবে না। সে কর্ম সোজাও নয়।

(১০) পৃথিবী চতুর্দ্বীপা চতুঃ-সাগরা।

ঋষিগণ সূতকে জিজ্ঞাসিলেন, "কয়টি দ্বীপ, সমুদ্র, পর্বত, বর্ষ, নদী আছে? নদীসকলের নামই বা কি? এই মহাভূমির পরিমাণ কত?" সূত উত্তর করিলেন, "পৃথিবীতে সাতটি দ্বীপ ও তদন্তর্গত সহস্র সহস্র দ্বীপ আছে। আমি সমুদয় দ্বীপ বর্ণনা করিতে পারিব না।"

কিন্তু তিনি যে-সকলের নাম করিয়াছেন, সে-সকল খুঁজিতে গেলে দিশাহারা হইতে হয়। প্রাচীন পান্থেরা কাগজ-কলম-কোম্পাস-চেন লইয়া দেশভ্রমণে যাইতেন না। তাঁহারা পূর্বাদি চতুর্দিক নির্দেশ করিয়াছেন, ঈশানাদি চতুর্বিদিক্ করেন নাই। কখনও চিত্তাকর্ষী নিসর্গ দেখিয়া কখনও জ্ঞাতদ্রব্যের সাদৃশ্য পাইয়া, কখনও পুরাতন নামের আকর্ষণে পড়িয়া, নদীপর্বতাদির নাম করিতেন। বিদেশীয় নামও সংস্কৃত ভাষায় সংস্কৃতরূপ গ্রহণ করিত। চীনভাষার নাম সংস্কৃতের সহিত মেশে না। অন্নাম দেশে 'বঙ্গাল' নাম 'বং লং' হইয়াছিল। এইরূপ সকল ভাষাতেই হয়।

আরও গুরুতর কারণ ঘটিয়াছিল। মানুষের স্বভাব এই, স্বদেশ ত্যাগ করিয়া বিদেশে বাস করিবার সময় তাহারা স্বদেশের আচার-ব্যবহার, গ্রাম নদী পর্বত বন, সব সঙ্গে

লইয়া যায়, নূতন দেশে স্বদেশের পরিচিত নাম প্রয়োগ করে। বাস না করিলেও নূতন দেশের নিজের জ্ঞাত নাম দিয়া তুষ্ট হয়। ইহার ভূরি ভূরি উদাহরণ সকল জাতির মধ্যে পাওয়া যায়। ভারতবর্ষে, বঙ্গদেশে এইরূপ দুইটা দুইটা, তিনটা তিনটা, নাম কত আছে, তাহার সংখ্যা হয় না। যত্ন করিলে এইরূপ নাম হইতে বুঝিতে পারি কোন্ দেশের লোক কোথায় অধিবাস করিয়াছে।

আরও অসুবিধা আছে। বায়ু, মৎস্য, বিষ্ণুপুরাণ, তিন কালে পরিবর্দ্ধিত ও যৎসামান্য সংশোধিত হইয়াছিল। বৃহৎকালবিভাগ যেমন তিন প্রকার আছে, দেশবিভাগও তিন প্রকার আছে। এক-কালবিভাগের সহিত অন্য কালবিভাগ মিশিয়া গিয়াছে, প্রকৃত কাল ধরিতে পারা যায় না। তেমনই এক দেশবিভাগ হইতে অন্য একটি পৃথক্ রাখিতে না পারিলে দেশ-নির্ণয় দুষ্কর হইয়া উঠে। বহু কালান্তরে দেশের নামও পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে।

ভূগোলবর্ণন পড়িতে হইলে ব্রহ্মাণ্ড-পুরাণ কিম্বা বায়ুপুরাণ পড়া কর্তব্য। মৎস্য-পুরাণের ভূগোল-বর্ণন বায়ুপুরাণের অনুরূপ। তিন পুরাণেই স্থানে স্থানে পৌরাণিক বর্ণনচ্ছটা ও কবিত্বঘটার আধিক্যে দেশগুলি ঢাকা পড়িয়াছে। বিষ্ণুপুরাণে তৃতীয়কালের দেশ-বিভাগ অধিক ব্যক্ত হইয়াছে। এখানে ব্রহ্মাণ্ড বা বায়ু ও মৎস্য আশ্রয় করা যাইবে।

প্রাচীন দেশবিভাগের নাভি (centre) ছিল, মেরু। আমরা যেমন বঙ্গদেশ হইতে বলি, কাশী উত্তরে, মাদ্রাজ দক্ষিণে, প্রাচীন ঋষিগণও তেমনই স্বদেশ ধরিয়া অন্য দেশের অবস্থান নির্দেশ করিতেন। তাঁহাদের স্বদেশের নাম মেরু ছিল। এটিকে তাঁহারা দেবলোক বা স্বর্গ বলিতেন। "স হি স্বর্গ ইতি খ্যাতঃ।" মেরু শব্দের অর্থ উচ্চভূমি, পার্বত্য সানু, অর্থাৎ পার্বত্য বিস্তীর্ণ সমভূমি (plateau)। মেরু ও সুমেরু একই। পর্বত না থাকিলে মেরু হইতে পারে না, পর্ব বা গ্রন্থি বা ভাগ ভাগ, না থাকিলে পর্বত (mountain range) হয় না। পর্ব না থাকিলে গিরি। দুই পর্বতের মধ্যবর্তী দীর্ঘ নিম্নভূমি, দ্রোণী (valley)। পর্বত বিদীর্ণ হইলে দরী (gorge)। পর্বত দ্বিবিধ, বর্ষ-পর্বত ও কুল-পর্বত। যাহাকে আশ্রয় করিয়া সমাজ-বদ্ধ মানব বাস করে, তাহা বর্ষ-পর্বত। কুল-পর্বত, যে পর্বত দেশের দেহ, পঞ্জর-স্বরূপ হইয়া আছে। দীর্ঘ পর্বতের আশ্রয়ে, প্রায়ই দুই পর্বতের মধ্যে যে মনুষ্য-ব্যাসভূমি, তাহার নাম বর্ষ। দুই, তিন, কিম্বা চারি পার্শ্বে জলবেষ্টিত স্থলের নাম দ্বীপ। ভারত, বর্ষ ও দ্বীপ, দুই-ই। ভূমি দ্বারাও জলরাশি দুই তিন পার্শ্বে বেষ্টিত হইতে পারে, সে ভূমিও দ্বীপ। অর্থাৎ জল-সংলগ্ন উচ্চভূমি, দ্বীপ*। বিস্তীর্ণ নদী ও হ্রদ, সমুদ্র নাম পাইতে পারে। বর্ষের নিকটস্থ ও সমুদ্র দ্বারা অন্তরিত দ্বীপ, অন্তরদ্বীপ। দ্বীপের নিকটস্থ ক্ষুদ্রদ্বীপ, অনুদ্বীপ।

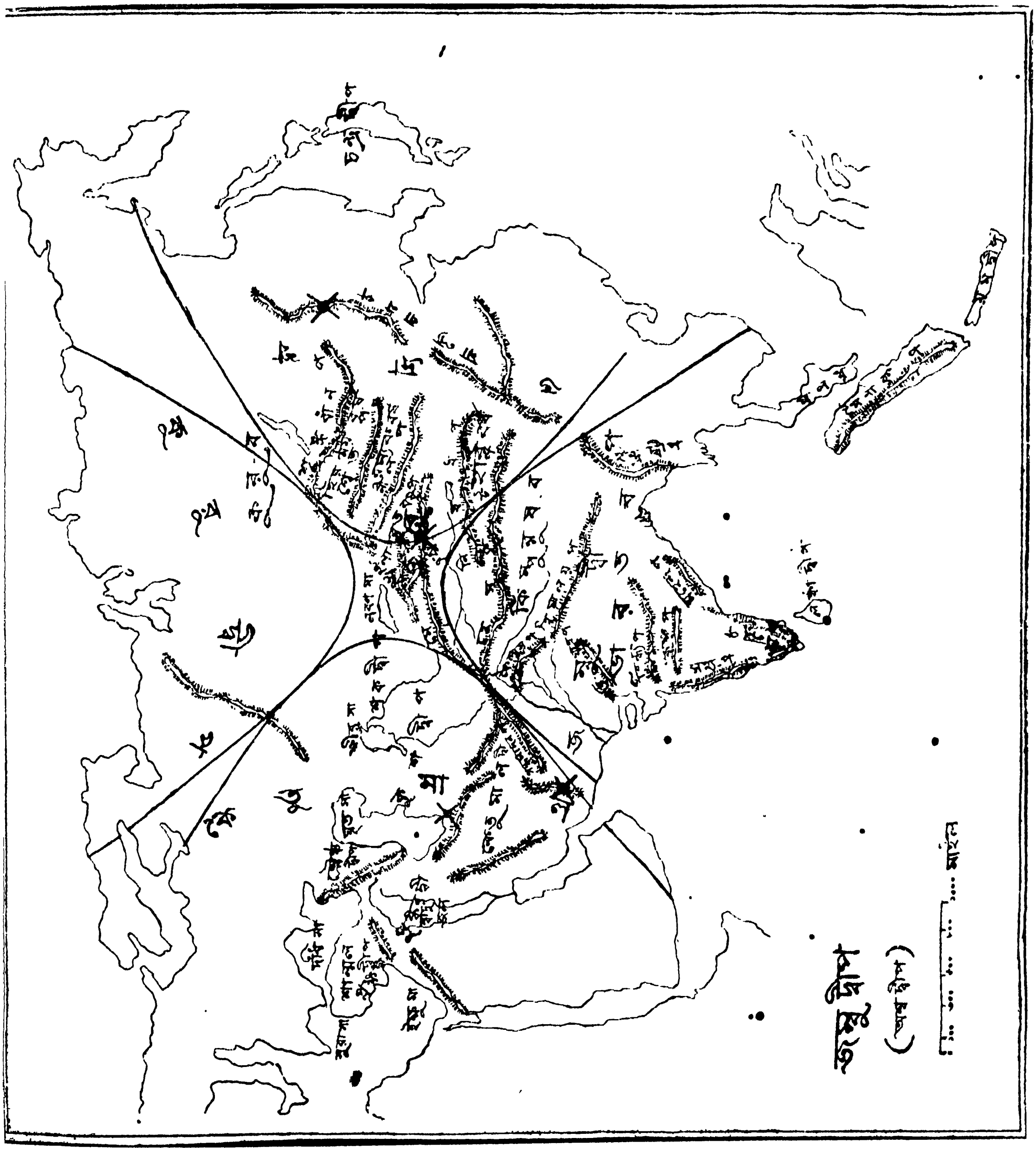
এখন দেখি। আদ্যকালে ঋষিগণ যেখানেই বাস করুন, সেটা মেরু ছিল। ইহার যে কত প্রশংসা, তাহা বলিবার নয়। মেরু, তাঁহাদের পৃথিবীর নাভি ছিল। পৃথিবী গোলাকার নয়, চক্রাকার। মেরু অল্প স্থান নহে। মেরুর চারিদিকে চারি দ্বীপ, এবং দ্বীপান্তে চারি সাগর। ব্রহ্মাণ্ড, বায়ু, মৎস্য, মহাভারত (ভীষ্মপর্ব) প্রভৃতি গ্রন্থে পৃথিবী চতুর্দ্বীপা, চতুঃসাগরা। সাগর চারিটি, ইহা এত প্রসিদ্ধ যে, প্রাচীনেরা ৪ অঙ্ক বুঝাইতে সাগর ও অব্ধি শব্দ ব্যবহার করিতেন। মেরুর উত্তরে কুরু, পূর্বে ভদ্রাশ্ব, দক্ষিণে জম্বু (ভারতের প্রাচীন নাম), পশ্চিমে কেতুমাল। মেরুর চারিদিকে দূরে চারিপর্বত-দ্বারা উক্ত চারি মহাদ্বীপ অবচ্ছিন্ন হইয়াছে। মেরুকে কেহ শতকোণ, কেহ সহস্রকোণ, কেহ সমুদ্রাকৃতি, কেহ শরাবাকৃতি, ইত্যাদি বলিতেন। পৌরাণিক বলিতেছেন, যে ঋষি ইহার যে পার্শ্ব দেখিয়াছিলেন, তিনি সে আকৃতি বলিয়াছিলেন। মেরুর উত্তর ও দক্ষিণ ভাগ উচ্চ, এই দুই উচ্চ স্থান উত্তরবেদি ও দক্ষিণবেদি। মেরু হইতে চারি মহানদী চারিদিকে প্রবাহিত হইয়া চারি সমুদ্রে পড়িয়াছে।

এখন এশিয়ার মাপচিত্র (১ম) দেখিলেই বুঝা যাইবে, এই মেরুদেশ বর্তমান পূর্ব বা চীন তুর্কীস্থান। ইহার চারিদিকে পর্বত। চারিদিক বলিতে ঠিক উত্তর-দক্ষিণ পূর্ব-পশ্চিম রেখায় নয়। কোন পর্বত এমন দিক্ ধরিয়া থাকে না। চারিদিকের চারিটি মহানদীর পূর্বদিকেরটি বর্তমান তরিম, দক্ষিণেরটি অক্‌সাস, পশ্চিমেরটি সীরদরিয়া, উত্তরেরটি ইর্তিষ।† মেরুদেশের দক্ষিণে জম্বু দ্বীপ। ভারতবর্ষকে জম্বুদ্বীপ বলা হইত, এবং জম্বু

---

* বাঙ্গালা ভাষায় এই প্রয়োগ প্রচুর আছে। আমি যে গ্রামে বসিয়া লিখিতেছি, তাহার নাম কেন্দুয়া-ডি। সংস্কৃত ভাষায় হইবে কেন্দু-দ্বীপ। ইহার দুই পার্শ্বে নিম্নভূমি, এইহেতু দ্বীপ। এককালে এই দ্বীপে হয়ত কেন্দু গাছ ছিল; এইহেতু কেন্দু-দ্বীপ। বিষমভূমি দেশে দ্বীপের সংখ্যা নাই। পূর্ববঙ্গের 'দি,' 'দিআ,' দ্বীপ। ডিহি শব্দের অর্থ ভিন্ন।

† বর্তমানে তরিম-দেশ বালুকাচ্ছন্ন হইয়াছে, নদীটি 'লবনর' সরোবরে অদৃশ্য হইয়াছে। পূর্বকালে এটি 'হোয়াংহো' নদী ছিল। বহু পরবর্তী কালে দক্ষিণের নদীটি অলকনন্দা গঙ্গা হইয়াছিল। পার্বত্যদেশের স্রোত নিরূপণ দুর্ঘট। তরিম দেশের পশ্চিম প্রান্তের বালি সরাইয়া পুরাতন পুর আবিষ্কৃত হইয়াছে। আরও নীচে গেলে পুরাকালের অবশেষ পাওয়া যাইতে পারে।

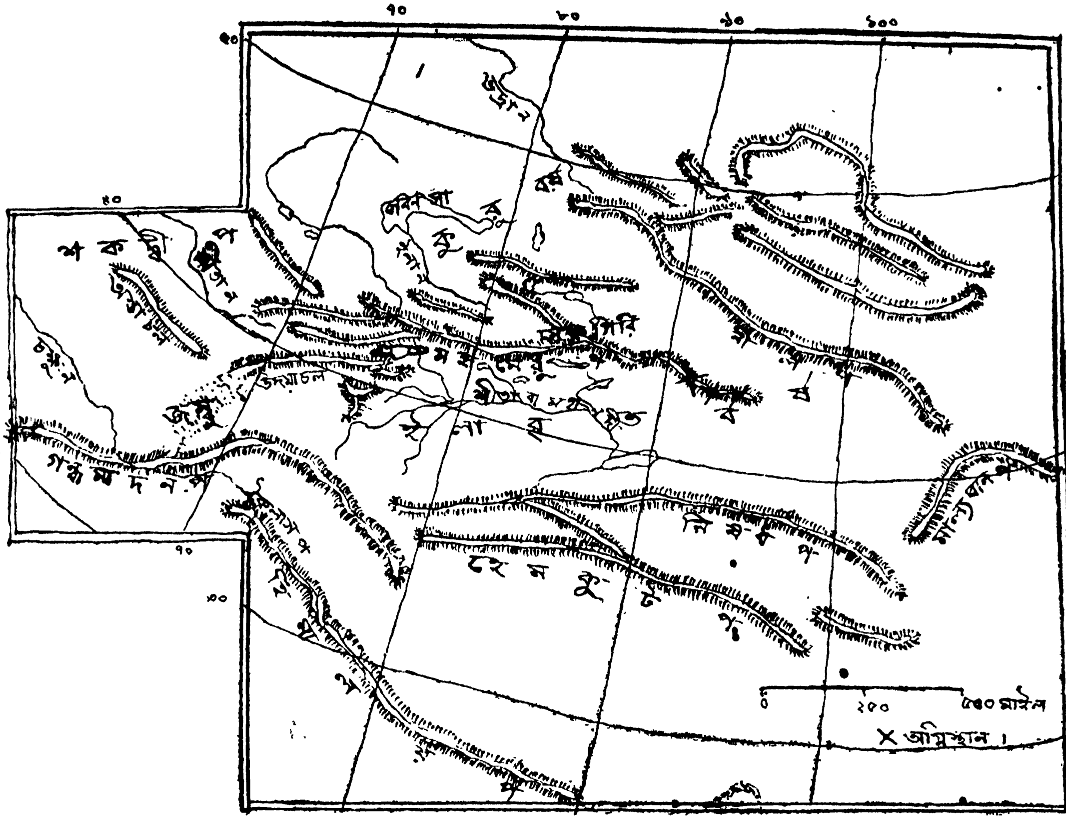


কাশ্মীর) নাম জম্বু শব্দের অপভ্রংশ। জম্বু নাম ইল কেন? বোধ হয়, "পামীর" সানু হইতে এই মের উৎপত্তি। জাম ফলকে লম্বদিকে ছেদ করিলে াল-পৃষ্ঠ যেমন দুই পাশে ঢালু হয়, "পামীর" সানুও মন। উত্তর দক্ষিণে দীর্ঘ, পূর্ব ও পশ্চিম পার্শ্বে লু। এখানে চারিটি পর্বত (হিন্দুকুশ, করকোরম, য়েনলুং, তিয়ানশান) মিলিত হইয়াছে। পৌরাণিকের নিকট দ্ব্যর্থ শব্দ লোমহর্ষণ উপাখ্যান রচনার আকর হইয়াছিল। অগ, নগ, শিখরী, এই তিন শব্দে পর্বত ও বৃক্ষ বুঝায়। যেটা জম্বু পর্বত, সেটা হইল জম্বু বৃক্ষ! এই বৃক্ষের ফল হস্তী-পৃষ্ঠাকার বলিয়া কৃষ্ণবর্ণ পর্বতপৃষ্ঠ নির্দেশ করা হইয়াছে। পাকা ফল পড়িবার সময় ভীষণ শব্দ হয়। সেটা বিচ্ছিন্ন শৈলপতন শব্দ। পামীরে অনেক সরোবর ও দ্রোণী আছে। দরী অসংখ্য। 'পামীর'

নামের অর্থ, দ্রোণী। দুই দুই দ্রোণীর মধ্যে এক এক জম্বুফল। পুরাণেও ইহাদের উল্লেখ আছে। পামীরে হঠাৎ ভীষণ ঝড় বহে। বাস করিতে গেলে দ্রোণীতে বাস করিতে হয়। চীন ও মঙ্গলিয়া লইয়া ভদ্রাশ্ব। চীনদেশের অশ্ব "ভদ্র" কি না, জানি না। এক জাতীয় বৃষ ও হস্তীর নাম ভদ্র ছিল। ভদ্র অশ্ব সেইরূপ এক অশ্বজাতি হইবে। মঙ্গলিয়ার অশ্ব বিখ্যাত। পুরাণে মঙ্গলিয়ার নাম, সুমঙ্গল। বোধ হয়, সুমঙ্গল অশ্ব, ভদ্রাশ্ব। "এশিয়া" নামে অশ্ব আছে কি না, চিন্তনীয়। অশ্বদ্বীপ নাম হইতে আশিয়া নাম হইতে পারে। পশ্চিম তুর্কীস্থান অশ্বের জন্মদেশ। সমরকন্দের অশ্ব প্রসিদ্ধ। ঋগ্বেদে অশ্ববাহন প্রসিদ্ধ। মেরুর পশ্চিমে কেতুমাল, পশ্চিম তুর্কীস্থান। উত্তরে কুরু, তিয়ানশান পর্বতের উত্তর দেশ। যে সাত ঋষি প্রথমে স্বদেশ ত্যাগ করিয়াছিলেন, তাঁহারা কুরুবাসী ছিলেন। এইহেতু তাঁহাদের নাম কুরু ছিল। তাঁহাদের বংশ ভারতে আসিবার পরেও কুরু নাম ভুলিতে পারেন নাই। তাঁহারা তাঁহাদের নূতন দেশেও কুরু নাম রাখিলেন। তখন প্রাচীন কুরু, উত্তর-কুরু বলিতে হইল। মেরুদেশে বাসকালে মানুষ ও দেব, এই দুই ভাগ ছিল। দুয়েরই প্রজাবৃদ্ধি হইত। বোধ হয় ধনবান্ ও প্রভাবশালী হইলে 'দেব' নাম হইত। সে দেশত্যাগের পর, বিশেষতঃ ভারতে বাসকালে প্রাচীন মেরুদেশ, দেবলোক ও স্বর্গ নামে স্মৃত হইত। তিয়ানশান পর্বত অতিশয় দীর্ঘ, উচ্চও বটে। ইহার মধ্যভাগ ২৩০০০ ফুট উচ্চ। চীনা ভাষায় নামের অর্থ স্বর্গের পর্বত। পুরাণও বলিতেছেন, "দেবলোকো গিরো তস্মিন্ সর্বশ্রুতিষু গীয়তে।" সকল শ্রুতিতেই দেবলোক নাম। আমাদের প্রাচীনেরা ইহার এক উচ্চ শিখরকে মেরুগিরি, এবং মেরু-সংলগ্ন দেশকে মেরু বা মেরুদেশ বলিতেন। মেরুতে এখনও স্বর্ণ পাওয়া যায়, কিন্তু অল্প। বোধ হয় পূর্বকালে অধিক ছিল; এবং তাহা হইতে মেরু সুবর্ণময় বলা হইত। আরও রবি-করে হিম-মণ্ডিত শিখর নির্ধূম পাবকবৎ দেখায়। ইহার দক্ষিণ শাখা-স্বরূপ জম্বু (পামীর)ও স্বর্ণময়। এই কারণে জাম্বূনদ অর্থে স্বর্ণ। এই যে বিস্তীর্ণ মেরুদেশ, এইটিই ইলা, ইরা, পৃথিবী। পরে ইহার নাম ইলাবৃত হইয়াছিল। ইলাবৃতের উত্তরে কুরুদেশ। প্রাচীন নিবাস-স্মৃতি এইখানেই শেষ। কুরুদেশের সীমা উত্তর সমুদ্র পর্যন্ত বটে, কিন্তু মেরুর নিকটবর্তী কুরু দেশেই তিয়ানশান পর্বতের উত্তর কিম্বা পশ্চিম পার্শ্বে ঋষিদের, অন্ততঃ সপ্তবংশের বাস ছিল। নতুবা মেরুর মাহাত্ম্য হইত না। মেরুর চারিদিকে চারি দ্বীপ লইয়া পরে চতুর্দল লোক-পদ্ম কল্পিত হইয়াছিল। এ বিষয়ে পরে বলা যাইবে।

এই দেশ-বিভাগ বহু প্রাচীন। বহুকাল পরে চারি মহাদ্বীপের মধ্যে উত্তর ও দক্ষিণ, এই দুই দ্বীপ তিন তিন বর্ষে বিভক্ত হইয়াছিল। এখন মহাদ্বীপ নাম গিয়া নয়টি বর্ষ হইল। এশিয়ার মাপচিত্রে পূর্ব-পশ্চিমে দীর্ঘ কয়েকটি পর্বত দেখা যাইবে। দক্ষিণ সমুদ্র হইতে উত্তরদিকে গেলে প্রথমে হিমালয়, পরে কুয়েনলুন্, পরে আলতিন্‌তাগ, এই তিন বর্ষপর্বতদ্বারা তিনবর্ষ; এবং উত্তরে প্রথমে দক্ষিণ আলতাই, পরে চাঙ্গাই, পরে উত্তর আলতাই পর্বত, এই তিন বর্ষপর্বতদ্বারা উত্তর সমুদ্র পর্যন্ত অপর তিন বর্ষ পাই। আলতিন, আলতাই নামে ইলা শব্দ থাকিতে পারে। এশিয়ার পশ্চিম হইতে পূর্বদিকের প্রাচীন তিন ভাগ, এখন তিনবর্ষ নাম পাইল। প্রাচীনকালে কেহ মাপচিত্র কিম্বা সামান্য রেখাচিত্রও করেন নাই। বোধ হয়, সপ্তঋষি ও বৈবস্বত মনুর নয় পুত্র হইতে প্রাচীনেরা সপ্ত ও নবভাগের অনুরাগী হইয়াছিলেন। সপ্ত ঋষির কাল কেহ বলিতে পারিবে না।

এশিয়ার মাপচিত্রে দেখা যাইবে, দক্ষিণ সমুদ্রের উত্তরে ভারতবর্ষ, পরে হিমালয়, পরে কিম্পুরুষ বর্ষ (তিব্বত), পরে হেমকূট পর্বত (কেয়নলুন), পরে হরিবর্ষ, পরে নিষধ পর্বত (আলতীন), পরে ইলাবৃত বর্ষ (চীন তুর্কীস্থান ও গোবিমরু), পরে নীলপর্বত (দক্ষিণ আলতাই), পরে রম্যক বর্ষ (মঙ্গলিয়া), পরে শ্বেত পর্বত (চাঙ্গাই), পরে হিরণ্ময় বর্ষ, পরে শৃঙ্গবান্ পর্বত (উত্তর আলতাই), পরে কুরুবর্ষ (সাইবিরিয়া), পরে উত্তর সমুদ্র। ইলাবৃতের পশ্চিমে গন্ধমাদন (হিন্দুকুশ), তৎপশ্চিমে কেতুমাল (পারস্য ও পশ্চিম তুর্কীস্থান)। পূর্বেমাল্যবান্ (চীন প্রাচীর), পরে ভদ্রাশ্ব (চীন)। ২য় চিত্র দেখিলে সব স্পষ্ট হইবে। এই সকল পর্বত ও বর্ষের নামের অর্থ অবশ্য ছিল, অর্থাৎ প্রাকৃতিক লক্ষণ দেখিয়া নাম হইয়াছিল। যেমন কিম্পুরুষ বা কিন্নর, কদাকার দেহ; হরিবর্ষ, যে বর্ষে হরি সুবর্ণাভ লোকের বাস, বোধ হয় চীনা। পৌরাণিক অনুমান করেন, ভদ্রাশ্ব নাম হইবার কারণ এই যে, সেখানে অশ্ববদন হরি আছেন, যাঁহার তেজে সর্বদ্বীপ আলোকিত হইয়াছে। এই "অশ্ববদন," চীনের উত্তর-পশ্চিমের ঔর্ব বা আগ্নেয়গিরি। ("ভারতবর্ষে" ঔর্বাগ্নি বর্ণনায় এই আগ্নেয়গিরির উল্লেখ করা হয় নাই)। বোধ হয় কেতুমাল নাম হইবার কারণ, মালভূমি, ইহার কেতু লক্ষণ। ইরাণের বিস্তীর্ণ মাল-ভূমি প্রসিদ্ধ। ইলাবৃতের পূর্বের পর্বত মাল্যবান্। পুরাণ বলিতেছেন, এটি সমুদ্রানুগ, সাগর যেমন বাঁকিয়াছে, পর্বতটিও তেমনি বাঁকিয়াছে। ইহা ইলাবৃতকে মাল্যাকারে বেষ্টন



২য় চিত্র। ইলাবৃত বর্ষ। ছোটবড় অনেক পর্বতে মেরুপর্বত। পুরাণ বলেন, 'প্লুতপ্রমাণ'; অর্থাৎ প্লুত, প্লব, কাঠের ভেলায় যেমন অনেক কাঠ পর পর থাকে। পুরাণে বড় বড় পর্বতের নাম আছে। মেরুপর্বতে অনেক সরোবর আছে। চিত্রে একটি বৃহৎ দেখা যাইবে। ইহার নাম মানস। পূর্বদিকে শীতা, পশ্চিমে সিতা। শীতা মন্থরা, সিতা শ্বেতা। মেরুপর্বতে নির্-ইন্ধন অগ্নি আছে। পুরাণে বর্ণনা আছে।

করিয়াছে। গন্ধমাদনের অপর নাম সুগন্ধ। বোধ হয় দেবদারুর গন্ধ হেতু নাম। ইলাবৃতের উত্তরস্থিত তিন পর্বতের ও প্রথম দুই বর্ষের নামে বিশেষ লক্ষণ পাওয়া যায় না। নীল পর্বত নীলবর্ণ, শ্বেত পর্বত হিম মণ্ডিত, শৃঙ্গবান্ পর্বতে তিনটি উচ্চ শৃঙ্গ আছে। হিরণ্যক বা হিরণ্ময় বর্ষ সোনার দেশ; যেখানে সোনা পাওয়া যায়। মাঞ্চুরিয়া ও মঙ্গলিয়া দেশে সোনা আছে।

(২) পৃথিবী সপ্তদ্বীপা সপ্তসাগরা।

পূর্বপরিচ্ছেদের পৃথিবীবিভাগ কতকাল পর্যন্ত চলিয়াছিল, তাহা বলিবার উপায় নাই। ভিন্ন ভিন্ন কালে জ্ঞাত দেশের বিভাগ ও নাম পরস্পর এত মিশিয়া গিয়াছে যে কালানুসারে পৃথক্ করা কঠিন। জ্ঞান-বৃদ্ধির ক্রম ধরিয়া স্থূলভাবে বলা যাইতেছে। মেরু অর্থে অতিশয় উচ্চ ভূমি, অতএব গিরি। মেরুর উপরে বাস অসম্ভব। ইহার উপত্যকা বাসোপযোগী। মেরুর সন্নিকটস্থ দেশ মেরুদেশ। এই দেশ মেরু গিরির চারিদিকেই থাকিতে পারে। ইলাবৃত বর্ষ, মেরুর পূর্বভাগে। কালক্রমে মেরুর পশ্চিম ভাগের কিয়দংশও ইলাবৃতের অন্তর্গত করা হইয়াছিল। বহুকাল পরে, মেরুকে ইলাবৃতের মধ্যস্থলে স্থাপিত করা হইয়াছিল। ইহার অক্ষাংশ ৪০ হইতে ৪৫ মধ্যে।

পৃথিবীকে নববর্ষভাগে, এশিয়ার পূর্ব ও পশ্চিমে মাত্র তিনটি বর্ষ (কেতুমাল, ইলাবৃত, ভদ্রাশ্ব) পাওয়া গিয়াছিল। পরে পশ্চিমে গমনাগমনকালে আর্যেরা সেদিকের দেশের নাম রাখিতে লাগিলেন। প্রাচীন নববর্ষ রহিয়া গেল, কেতুমালে খণ্ড খণ্ড ভূভাগের নাম দ্বীপ হইল। কেতুমাল ব্যতীত পৃথিবী এখন জম্বুদ্বীপ। এই দ্বীপ আর ছয়টি দ্বীপ লইয়া পৃথিবী সপ্তদ্বীপা হইল। বাস্তবিক আরও অনেক দ্বীপের নাম পাওয়া যায়। সে সব প্রসিদ্ধ হয় নাই।

পূর্বে দ্বীপ শব্দের অর্থ দেওয়া গিয়াছে। সমুদ্র, বিস্তীর্ণ জলরাশি, যাহার এপার হইতে ওপার দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহার দৃষ্টান্ত সিন্ধু। সিন্ধু নদ, সিন্ধু সাগর। আবার, নদী-মাত্রের নাম সিন্ধু। যেমন, আমরা গঙ্গানামের অপভ্রংশ গাং দ্বারা নদীমাত্র বুঝি। অর্থাৎ নদী হইলেও সমুদ্র নাম পাইতে পারে। জলরাশি বেষ্টিত ভূখণ্ড, দ্বীপ; আর যে ভূখণ্ড দ্বারা জলরাশি-বেষ্টিত, সেও দ্বীপ। দ্বীপের অন্য নাম অন্তরীপ, যে স্থানে যাইতে জল পার হইতে হয়। চতুর্দিকে জল-বেষ্টিত না হইতেও পারে। অগাধ-জল জলাশয়ের নাম, হ্রদ। বাংলায় বলি দহ। পুরাণে বহু সরস্ ও সরোবরের নাম আছে। সরোবর, বৃহৎ সরস্ বা সরসী। সরোবরে স্রোত থাকে, অর্থাৎ তাহাতে নদীর জল আসে, নদীর আকারে বহিয়াও যায়। কিন্তু হ্রদে ও সাগরে নদী প্রবেশ করে, কিন্তু নির্গত হয় না। অতএব বৃহৎ হ্রদ, সাগর। ঐ সকল প্রাচীন সংজ্ঞা বিস্মৃত হইলে সপ্তদ্বীপ খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না। তথাপি জম্বুদ্বীপ ব্যতীত অপর ছয় দ্বীপের নদী, পর্বত, প্রভৃতির বর্তমান নাম নির্ণয় কঠিন। পৌরাণিকেরা প্রত্যেক দ্বীপেই সপ্ত পর্বত, সপ্ত নদী, দেখিতেন। কিন্তু সকল দ্বীপে নববর্ষ পান নাই।

ব্রহ্মাণ্ড-পুরাণে ও বায়ু-পুরাণে এই ছয় দ্বীপের নাম এই,—প্লক্ষ বা গোমেদ, শাল্মল, কুশ, ক্রৌঞ্চ, শাক, পুষ্কর। মৎস্য-পুরাণে নাম এই,—শাক, কুশ, ক্রৌঞ্চ, শাল্মল, গোমেদ, পুষ্কর। নামের ক্রমে যেমন প্রভেদ, দ্বীপের বিস্তারেও তেমন কিছু কিছু প্রভেদ আছে। মৎস্য-পুরাণে একমত লিখিত হইয়াছে, অন্য পুরাণে অন্য মত। অতএব দুই পুরাণ মিলাইয়া দেখিতে হইবে। মৎস্য-পুরাণ দেখি।

১। শাকদ্বীপ। এই দ্বীপ লবণ-সমুদ্রকে বেষ্টন করিয়াছে। (তেনাবৃতঃ সমুদ্রোঽয়ং দ্বীপেন লবণোদধিঃ)। এই দ্বীপের একদিকে লবণ-সাগর, অন্যদিকে ক্ষীরোদ-সাগর। শাকদ্বীপের সাতটি কুলাচলের মধ্যে দেব-ঋষি-গন্ধর্ব-সমন্বিত মেরু-গিরি পূর্বদিকে অবস্থিত। ইহার নাম উদয়াচল। এখানে মেঘ হয়, চলিয়া যায়, বৃষ্টি হয় না। কিন্তু ইহার পশ্চিম পার্শ্বে জলধারা হয়। সর্ব পশ্চিমে সোমক নামে অস্তগিরি। শাকদ্বীপে বর্ণাশ্রম ধর্ম নাই, সর্বদা ত্রেতাযুগসম কাল বর্তমান। পাঁচটি দ্বীপেই এইরূপ। সে দেশে দণ্ডধর (রাজা) নাই। সে দেশে চতুর্বর্ণ আছে। শ্যামবর্ণ লোক মধ্যস্থলে বাস করে।

শাকদ্বীপ মেরুর পশ্চিমে অবস্থিত মৎস্য-পুরাণ মেরুকে এই দ্বীপের পূর্বসীমা ধরিয়াছেন। [বায়ু-পুরাণ মেরুর পশ্চিমের এক প্রত্যন্ত পর্বতকে উদয়াচল বলিয়া প্রভেদ রাখিয়াছেন।] শাকদ্বীপের উত্তরে লবণ-সাগর, এটি বলকাষ হ্রদ; দক্ষিণে ক্ষীর-সাগর, এটি আরাল হ্রদ। ইহাতে সীরদরিয়া নদী পড়িতেছে। (সে দেশের ভাষায় 'সীর' অর্থে নদী; ফার্সী 'দরিয়া' অর্থে সাগর। ফার্সী যীর, সং ক্ষীর অর্থও হইতে পারে।) আরাল হ্রদের নাম ক্ষীরোদ ছিল। এই হ্রদ বৃহৎ, ক্রমশঃ বুজিয়া যাইতেছে। ইহার জল ঈষৎ লোনা। নদীর জল দুগ্ধবৎ শ্বেতবর্ণ। বলকাষ হ্রদের জল লোনা। ইহা দীর্ঘে ৩০০, প্রস্থে ৫০ মাইল। শাক, শক একই। শাকদ্বীপ হইতে ভারতে ব্রাহ্মণ আসিয়া শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণ নামে পরিচিত হইয়াছেন। ইঁহারা সূর্যোপাসক ও জ্যোতিষী। এখান হইতে ক্ষত্রিয় আসিয়া ভারতে শক-ভূপতি হইয়াছিলেন। উদয়গিরির পূর্বপার্শ্ব শুষ্ক, শীতগ্রীষ্ম প্রখর। কিন্তু পশ্চিম পার্শ্ব তেমন নয়। বৎসরে ১০।১২ ইঞ্চি বর্ষণ হয়। অল্পস্বল্প কৃষিকর্মও হয়। শাকবৃক্ষ আছে বলিয়া শাকদ্বীপ নাম, ইহা পৌরাণিক ব্যাখ্যা। বস্তুতঃ সে দেশে শাক সেগুন গাছ জন্মিতে পারে না। এ দেশ দেবদারুর।

শাকদ্বীপের বর্ণনা হইতে আরও দুইটি বিষয় জানিতেছি।

ক। সূর্যের উদয়াচল ও অস্তাচল, এই দুই নাম শাকদ্বীপের দুই পর্বতের। এই দুই পর্বতের মধ্যস্থিত দেশের লোক পূর্বস্থিত পর্বতের উপর হইতে সূর্যোদয় দেখে, পশ্চিমস্থিত পর্বতের উপর দিয়া সূর্যাস্ত দেখে (৩য় চিত্র)। আমরা বলি, সূর্য পাটে বসিয়াছেন, পাট পর্বত। উদয়াচল পূর্ব দক্ষিণে এবং অস্তাচল পশ্চিম দক্ষিণে আয়ত হওয়া চাই। কাশ্মীরে এমন দুই পর্বত থাকিতে পারে, কিন্তু পঞ্জাবে নাই।

খ। শাকাদি কয়েক দ্বীপে ত্রেতাযুগের অবস্থা চলিতেছিল। এই ত্রেতাযুগ বর্তমান পাঁজির ত্রেতা নয়। স্বায়ম্ভুব মনুর ত্রেতাযুগে প্রিয়ব্রত রাজার কাল। সে যে বহুপ্রাচীন কাল। পৌরাণিকের বিশ্বাস, ত্রেতাযুগে লোকের বাদবিসম্বাদ ছিল না।

২। কুশদ্বীপ। কুশদ্বীপ দ্বারা ক্ষীরোদ পরিবেষ্টিত। ইহা শাকদ্বীপের দ্বিগুণ। ইহা ঘৃতোদক সমুদ্রদ্বারা পরিবেষ্টিত। ইহার সপ্তপর্বতের মধ্যে ষষ্ঠ পর্বতের নাম মহিষ অন্য নাম হরি। এই পর্বতে জল-জাত অগ্নি বাস করে। একটি পর্বতে বিশল্যকরণী ও মৃতসঞ্জীবনী নাম্নী মহৌষধি আছে। এই পর্বত অতিশয় দীর্ঘ। নাম দ্রোণ ও পুষ্পবান্। এই দ্বীপে কুশস্তম্ব (কুশের ঝাড়) আছে।

এই দ্বীপের একদিকে ক্ষীরোদ সাগর, অন্যদিকে

ঘৃতসাগর। আর পাইতেছি মহিষপর্বত, কাস্পিয়ান হ্রদের দক্ষিণে এলবার্জ পর্বত। ইহাতে এক আগ্নেয়-গিরি আছে। অতএব কুশদ্বীপ আরাল হইতে কাস্পিয়ান হ্রদ। কুশদ্বীপে কুশ জন্মে, দেবতাও বর্ষণ করে। কাস্পিয়ান হ্রদের দক্ষিণ-পূর্বভাগে কুশ বা এইরূপ তৃণ জন্মে। এই ভূখণ্ড কুশদ্বীপ। কাস্পিয়ান হ্রদ ঘৃতসমুদ্র। ভারতের পশ্চিমোত্তরে কনিষ্কাদির কুশান রাজ্য ছিল। বোধ হয় এই কুশদ্বীপের নাম হইতে কুশান।

৩। ক্রৌঞ্চদ্বীপ। এই দ্বীপ দ্বারা ঘৃতসমুদ্র পরিবেষ্টিত, এবং ইহা দধিমণ্ড-সাগরকে বেষ্টন করিয়াছে। এই দ্বীপের লোকেরা অধিকাংশ গৌরবর্ণ। এই দ্বীপের [বোধ হয়] উত্তর ভাগের বর্ণনা শতবর্ষেও করিতে পারা যায় না।

এই দ্বীপ ঘৃতসাগর কাস্পিয়ান হ্রদ এবং দধিমণ্ড কৃষ্ণসাগর মধ্যে আর্মিনিয়া। ককেশাস পর্বতের নাম ক্রৌঞ্চ। ইহার উত্তরে রূষা। পৌরাণিক রূষা দ্বীপ জানেন নাই।

৪। শাল্মলদ্বীপ। এই দ্বীপ দধিমণ্ডোদক সমুদ্রকে বেষ্টন করিয়াছে। এখানে দুর্ভিক্ষ নাই। এখানে মেঘ বর্ষণ করে না, বর্ণাশ্রম ব্যবস্থাও নাই। এই দ্বীপ সুরোদ সমুদ্রদ্বারা পরিবেষ্টিত।

অতএব শাল্মলদ্বীপ এশিয়া মাইনর। দধি-সমুদ্র কৃষ্ণসাগর, এবং সুরাসমুদ্র ঈজিয়ান সাগর।

৫। গোমেদ বা প্লক্ষদ্বীপ। ইহার দ্বারা সুরোদক সমুদ্র আবৃত এবং ইহা সুরোদসাগর অপেক্ষা দ্বিগুণ বিশাল ইক্ষুরস সাগরকে বেষ্টন করিয়াছে। এই দ্বীপ দুইটি পর্বতদ্বারা দুই বর্ষে, শৌনক বা ধাতকী এবং কুমুদ, বিভক্ত। এই দুই পর্বত পূর্ব ও পশ্চিম সাগর পর্যন্ত বিস্তৃত।

এই দ্বীপ এশিয়ার তুর্কীদেশ। ইক্ষুরস সাগর মেডিটেরেনিয়ান সাগর। দুইটি পর্বতের একটি টরাস।

৬। পুষ্করদ্বীপ। এই দ্বীপ ইক্ষুরস সাগরকে বেষ্টন করিয়াছে, এবং স্বাদুদক দ্বারা বেষ্টিত হইয়াছে। ইহার পশ্চিমার্দ্ধে সাগরবেলা সমীপে এক উন্নত পর্বত আছে। এই পর্বতের পূর্বার্দ্ধ দেশ দুই ভাগে বিভক্ত এবং স্বাদুদক সাগর দ্বারা পরিবেষ্টিত।

অতএব এই দ্বীপ সিরিয়া ও মেসোপটেমিয়া। য়ুফ্রেটিস্ ও টাইগ্রিস্' নদীর জল স্বাদু। তাহাকেই স্বাদু-উদধি বলা হইয়াছে।

•শকাদি ছয় দ্বীপের সন্নিবেশ হইতে বুঝিতেছি, প্রাচীন কেতুমাল-বর্ষের উত্তর ও পশ্চিম দেশ লইয়া এই ছয় দ্বীপ। বলা বাহুল্য, দুগ্ধ দধি ঘৃত সুরা ইক্ষুরস নাম দ্বারা তত্তৎদ্রব্য বুঝায় না। সাগরগুলির নাম চাই। পরিচিত রসদ্বারা তাহাদের নাম করা হইয়াছিল। হয়ত বা কূলের নিকটবর্তী জলে যৎকিঞ্চিৎ বর্ণ-সাদৃশ্য লক্ষিত হইয়াছিল। দ্বীপের নামেরও কারণ ছিল। শাকদ্বীপে শক্ত শাক, কুশদ্বীপে কুশ, প্লক্ষ ফলাকার প্লক্ষদ্বীপ। (এখানে প্লক্ষ গর্দভাণ্ড বৃক্ষ)। হয়ত ক্রৌঞ্চ পক্ষীর আকারে ককেশাস পর্বত দেখিয়া ক্রৌঞ্চ, এবং পুষ্কর পদ্ম দেখিয়া পুষ্কর দ্বীপ। কিন্তু শাল্মলদ্বীপ নামের কারণ কি? আসিরিয়া এককালে অসুর দেশ ছিল। অসুর জাতির এক রাজার নাম শাল্মলেশ্বর ছিল। তিনি বিখ্যাত রাজা ছিলেন। তিনি খ্রীষ্টপূর্ব ত্রয়োদশ শতাব্দে ছিলেন। তৎপূর্বে একটা দেশের নাম শাল্মল ছিল। পুরাণে আসিরিয়া ও বেবিলোনিয়া পুষ্করদ্বীপের অন্তর্গত। পুষ্করদ্বীপের পূর্বার্দ্ধদেশ দুই ভাগে বিভক্ত ছিল। কিন্তু নাম দেওয়া নাই। সে যাহা হউক, শাল্মল হইতে শাল্মল নাম হইয়া থাকিলে সপ্তদ্বীপ বিভাগ ভারতযুদ্ধের পূর্বে হইয়াছিল। কত পূর্বে, তাহা পুরাণমতে স্বায়ম্ভুব মনুর ত্রেতাযুগে। এই মনুর পুত্র প্রিয়ব্রত। তাঁহার দশ পুত্র হয়। তন্মধ্যে সপ্তপুত্র সপ্তদ্বীপের অধিপতি হইয়াছিলেন। তাঁহাদের পুত্রেরা সপ্তদ্বীপের এক এক বর্ষে রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। পৌরাণিক বলিতেছেন, প্রিয়ব্রতের পুত্রদ্বারা জম্বুদ্বীপ নিবেশিত হইয়াছিল। প্রিয়ব্রতের পৌত্র ঋষভ, এবং তাঁহার পুত্র ভরত হইতে ভারতবর্ষ নাম হইয়াছে। এক কালে পুষ্করদ্বীপ (মেসোপোটেমিয়া) যে আর্যগণ দ্বারা শাসিত হইত, তাহার প্রমাণ সে দেশের ভূগর্ভে প্রাপ্ত মিত্র বরুণ নাসত্য (অশ্বিনীকুমার) আর্যদেবের নাম। দেখা যায়, প্রত্যেক দ্বীপেই কোন-না-কোন পৌরাণিক কাহিনীর উদ্ভব হইয়াছিল। শাকদ্বীপে ক্ষীরোদমন্থন, শাল্মলদ্বীপে গরুড়ের জন্ম, ইত্যাদি। ভারতবর্ষের ও ভারতদ্বীপের যত, অন্য দ্বীপের তত নাই। সে প্রাচীনকালে পারস্য, কেতুমাল বর্ষের অন্তর্গত ছিল। বায়ু-পুরাণে ইহার বিস্তারিত বর্ণনা আছে। কিন্তু পর্বত, নদী ও দেশ-সমূহের নাম বুঝিতে পারা যায় না। বোধ হয়, কুব কাবুল, শ্বেত হিরাট, বাহ বাল্‌খ, মহিষ মেষেদ, ইত্যাদি।

উপরে মৎস্যপুরাণ-মতে দ্বীপ ও সাগরের নাম ও সন্নিবেশ দেওয়া গিয়াছে। ব্রহ্মাণ্ড ও বায়ু পুরাণে দ্বীপের বর্ণনা এইরূপ, কিন্তু কয়েকটার সন্নিবেশ ভিন্নপ্রকার। যথা, শাকদ্বীপ দধিসমুদ্রকে বেষ্টন করিয়াছে। মৎস্য-পুরাণের লবণ-সাগর এখানে দধিসাগর হইয়াছে। এইরূপ,

কুশদ্বীপ সুরাসাগরকে বেষ্টন করিয়াছে, ইত্যাদি। প্রাচীন পুরাণের পাঠক ও শ্রোতা পাঠ মিলাইতেন না, ইহা একমত বলিয়া নিশ্চিন্ত হইতেন। মৎস্য-পুরাণ লিখিয়াছেন, তিনি একমত দিতেছেন, অন্য পুরাণে অন্য মত আছে। মহাভারতের সহিত মৎস্য-পুরাণের ঐক্য আছে। অতএব এই মত গ্রাহ্য। দেশের বর্ণনার সহিত মিলাইলেও এই মত গ্রাহ্য। কি কারণে কে জানে, বায়ু-পুরাণের দ্বীপ ও সাগর বর্ণনা-পরিপাটি ও সন্নিবেশে ভুল হইয়াছে। মাপচিত্র দেখিলেও সন্দেহ হয়। বিষ্ণু-পুরাণ ও বায়ুপুরাণ একমত। ইহাতে মনে হয়, বহুকাল পূর্বে পাঠ-বিসম্বাদ ঘটিয়াছিল।

মহাভারত ও পুরাণে এক আকাঙ্ক্ষার কথা আছে। পৃথিবী (জম্বু) দুর্লক্ষ্য। যদি একটি বৃহৎ দর্পণ আকাশে স্থাপিত হইত, তাহা হইলে তাহাতে প্রতিবিম্ব দেখিয়া আমরা দ্বীপের স্বরূপ বুঝিতে পারিতাম। দৈবক্রমে চন্দ্র জলময়, এবং তাহাতে জম্বুদ্বীপের প্রতিবিম্ব দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার নাম সুদর্শন দ্বীপ, ইহার শশ-স্থান জম্বুদ্বীপের প্রতিবিম্ব।

ইদানী বিমানে বসিয়া প্রাচীনদিগের সে আশা পূর্ণ হইতেছে।

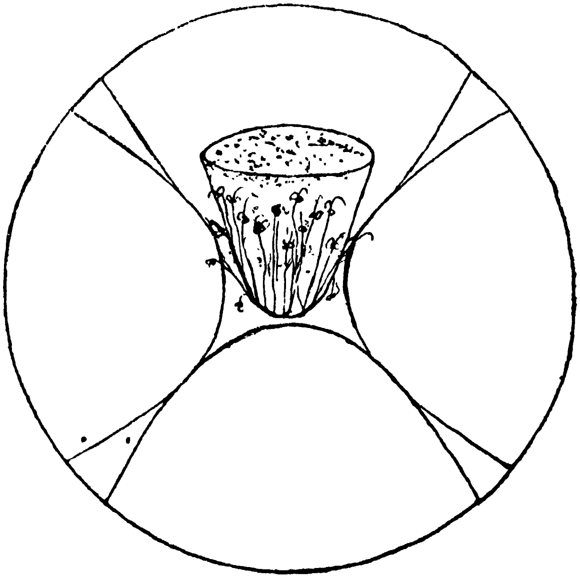
(৩) পৃথিবী সপ্তদ্বীপ-বলয়া।

এ যাবৎ পৃথিবীর যে বর্ণনা পাইয়াছি, পৌরাণিকের অত্যুক্তি ছাড়িয়া দিলে তাহা বোধগম্য বটে। ইহার কারণ, আমরা এশিয়ায় মাপচিত্রের সহিত মিলাইতে পারিতেছি। পূর্বকালে এই সুযোগ ছিল না, সকলে ভূপর্যটনও করিতেন না। ফলে পুরাণ-পাঠক এককে আর বুঝিয়া বসিলেন। বিষ্ণুপুরাণ লিখিতেছেন, "জম্বুদ্বীপ যেমন লবণ-সমুদ্র দ্বারা অভিবেষ্টিত, প্লক্ষদ্বীপ তেমন সে সাগরকে সংবেষ্টন করিয়াছে।" জম্বু, প্লক্ষ, শাল্মলি, কুশ, ক্রৌঞ্চ,শাক, পুষ্কর,—এই সপ্তদ্বীপ লবণ-ইক্ষু-সুরা-ঘৃত-দধি-দুগ্ধ-জল সমুদ্র দ্বারা পরে পরে বেষ্টিত। সকলের মধ্যস্থলে চক্রাকার জম্বুদ্বীপ, তারপর বলয়াকার দ্বীপ ও বলয়াকার সমুদ্র। সপ্তম সমুদ্রের পরে কি আছে? লোক-অলোক পর্বত, চন্দ্র সূর্য নক্ষত্রের গতি রুদ্ধ।

জৈন পুরাণকার এইরূপ বিশ্বাস করিয়া প্রত্যেক বর্ষের, বর্ষ-পর্বতের, সমুদ্রের বিস্তারাদি গণিবার সূত্র রচিয়াছিলেন। ডক্টর শ্রীযুত বিভূতিভূষণ দত্ত এক ইংরেজী প্রবন্ধে সে সকল সূত্রের গণিতবিদ্যা ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তিনি মনে করেন খ্রীষ্ট-পূর্ব ৫০০ হইতে ৩০০ অব্দ মধ্যে সে সকল সূত্র নির্মিত হইয়াছিল। সম্প্রতি তাহাতে আমাদের প্রয়োজন নাই। জনসাধারণ পৃথিবীকে চক্রাকার ভাবিলেও জ্যোতিষী গোলাকার বুঝিয়াছিলেন। কেমনে দুই মতের ঐক্য ঘটিল, তাহা জানিতে কৌতূহল হইতে পারে। এইহেতু একটু লিখিতেছি।

(৪) ভূগোল।

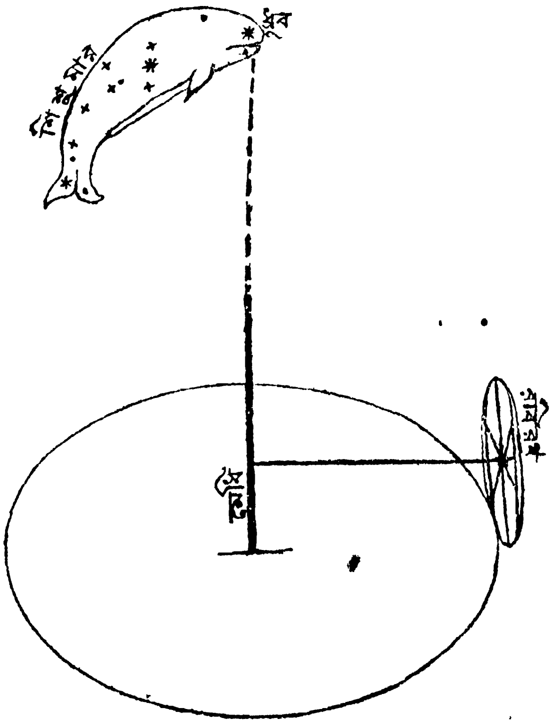
বোধ হয়, মেরুপর্বতে একটা উচ্চ শৃঙ্গ আছে, তাহা মেরুগিরি নামে আখ্যাত ছিল। এই গিরি পৃথিবীর নাভি। রথ-চক্রের মধ্যস্থলের নাম নাভি। পৃথিবী চক্রাকার, মেরু তাহার নাভি। আদ্য-কালের পৃথিবী-বিভাগে এই নাভির চারিদিকে চারিটি দ্বীপ, যেন পদ্মের কর্ণিকার চারিপাশে চারিটি দল (৩য় চিত্র)। প্রাচীন ঋষিগণ মেরুতে পদ্মযোনি ব্রহ্মার



৩য় চিত্র। ভূ-পদ্ম। বিষ্ণুর নাম পদ্ম-নাভ, ব্রহ্মার নাম পদ্ম-যোনি হইবার কারণ, এই রূপক। পদ্মের চতুর্দল চতুর্দ্বীপ, মধ্যে কর্ণিকা মেরু (নাভি), কর্ণিকার চারি পাশের কিঞ্জল্ক নানা পর্বত। ইহাদের দ্রোণীতে ইন্দ্রাদি দেবের সভা।

আবাস কল্পনা করিয়াছিলেন। কারণ মেরুদেশেই তাঁহারা বাস করিতেন, এবং নিসর্গের যাহা কিছু প্রত্যক্ষ করিতেন, সবই সে দেশে। কালান্তরে পদ্মের চতুর্দলের উত্তর ও দক্ষিণ দলে নববর্ষ, মনুষ্যবাস দেখিলেন। তখনও মেরু স্বস্থানচ্যুত হয় নাই। নানাদেশ-ভ্রমণের ফলে চন্দ্র-সূর্যের গতি সবিশেষ লক্ষ্য হইতে লাগিল। যে দেশে যান, সে দেশেই চক্র বটে, কিন্তু চন্দ্র সূর্যের পথ মস্তকের ঊর্ধ্বে একই দূরত্বে থাকে না, আকাশের নক্ষত্রও থাকে না। এক উদয়াচল, এক অস্তাচল নাই। পার্বত্য-দেশে ভূ-পৃষ্ঠ দেখিয়া পৃথিবীর গোলত্ব অনুভূত হয় না।

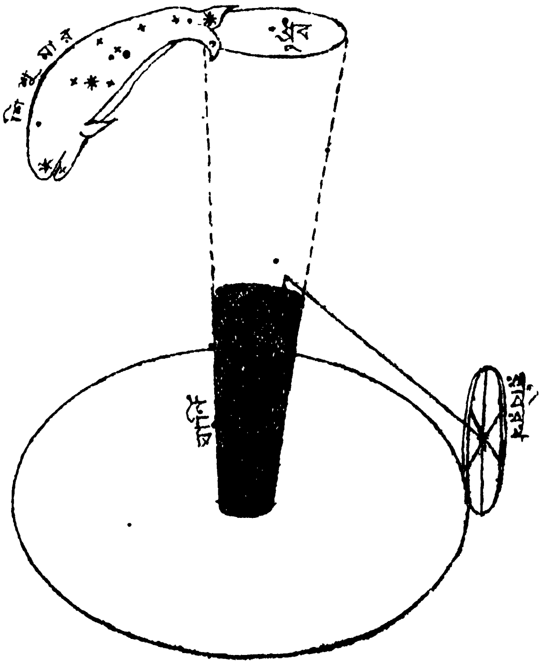
এই রূপ চিন্তা হইতে পৃথিবী গোল, অতিবৃহৎ বর্ত্তুলাকার, এই জ্ঞান জন্মিয়াছিল। সূর্যের উদয় নাই ; দেখা গেলেই উদয়, দেখা না গেলেই অস্ত। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে (৩।৪৪) এই ভাবের কথা আছে। এখন কথা, যদি ভূ গোলাকার, সূর্য প্রত্যহ সে গোল প্রদক্ষিণ করিতেছে, তাহার গমন-বৃত্তের নাভি (বা কেন্দ্র) কোথায় ? তখন প্রাচীন স্মৃতি জাগিয়া উঠিল, মেরুদেশে নিবাসকালে সূর্যকে পূর্বদিকে উদয়, পশ্চিমে অস্তগত হইতে দেখা যাইত। অতএব ভূ-গোলের নাভি, মেরু। ইহার ফল হইল, যে মেরু হিমালয়ের পশ্চিমোত্তরে এশিয়ায় প্রায় মধ্যস্থলে ছিল, সে মেরুকে এশিয়ার ও ভূ-গোলের সর্বোত্তরে কল্পনা করিতে হইল। ইহা জ্যোতিষিক কল্পনা। দৃষ্ট ঘটনার ব্যাখ্যা করিতে যেমন কল্পনা করিতে হয়, ইহাও তেমন। অর্থাৎ ভূ-গোলের উত্তর বিন্দুর নাম মেরু হইল। ইহাকেই সূর্য প্রত্যহ প্রদক্ষিণ করে।



৪র্থ চিত্র। ধ্রুব আকাশে নিশ্চল কাল্পনিক বিন্দু। ঘটনাক্রমে সে বিন্দু শিশুমারের মুখে আসিয়া পড়িয়াছিল। শিশুমার সিন্ধু ও গঙ্গার শিশুক। তাহার সাদৃশ্যে নক্ষত্রের নাম।

রাত্রিকালে দেখা গেল সকল নক্ষত্র পূর্বদিকে উদয় ও পশ্চিমে অস্তগত হয়, কিন্তু একটি নক্ষত্র হয় না। সে নক্ষত্রের নাম শিশুমার। আরও দেখা গেল, শিশুমারের মুখস্থিত তারাটি একটুও নড়ে না, নিয়ত একস্থানে থাকে। অতএব সেটি ধ্রুব। এই তারার ইংরেজী নাম 'থুবন'। ইহাকেই চন্দ্র ও যাবতীয় নক্ষত্র প্রদক্ষিণ করিতেছে। ধ্রুবতারা অত্যুচ্চ আকাশে যেন মেধি হইয়া আছে, এবং তাহাতে রশ্মিদ্বারা বদ্ধ হইয়া গ্রহ ও নক্ষত্র নিয়ত পরিভ্রমণ করিতেছে (৪র্থ চিত্র)। সূর্যও তাহাকে প্রদক্ষিণ করিতেছে। এই ঘটনা খ্রীষ্ট-পূর্ব প্রায় ত্রিসহস্রাব্দে হইত। বোধ হয়, সে সময়ে সূর্য-চন্দ্র নক্ষত্রের দৈনিক গতির ক্রম জানিবার আকাঙ্ক্ষা জন্মিয়াছিল।

অত্যুচ্চ আকাশে ধ্রুব। তাহারই নিম্নে ভূ-পৃষ্ঠে মেরু। এই মেরুকে অত্যুচ্চ গিরি কল্পনা না করিলে মেধি পাওয়া যায় না। ভূ-গোলের মধ্য হইতে সূর্য লক্ষ যোজন উর্ধ্বে। মেধি অর্থাৎ মেরুগিরিকে তত যোজন উচ্চ করিতেই হইবে। ভূগোলের ব্যাস বত্রিশ হাজার যোজন। মেরুর ষোল সহস্র যোজন ভূ-পৃষ্ঠের নীচে, চৌরাশী সহস্র যোজন উচ্চে। জৈনেরা ভূ-ব্যাসার্ধ এক সহস্র যোজন মনে করিতেন এবং মেরুর ততখানি মাটিতে পুতিতেন।

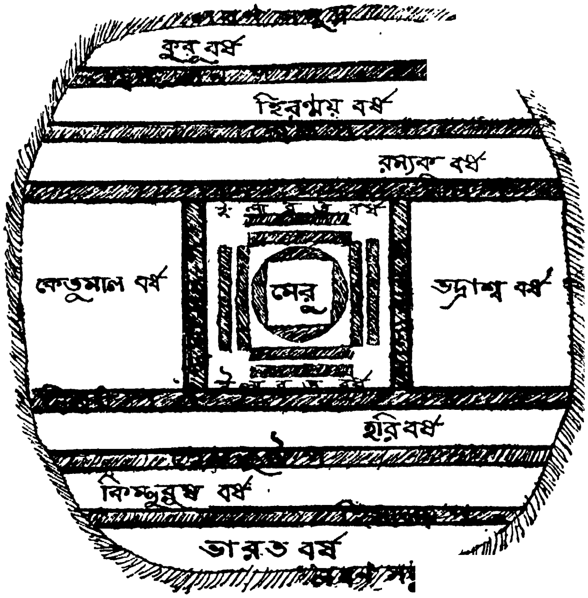


৫ম চিত্র। আকাশের ধ্রুব শিশুমারের মুখ হইতে দূরে সরিয়া গিয়াছে। পুচ্ছও দূরে। এই হেতু পুচ্ছ ধ্রুবকে প্রদক্ষিণ করিত। বর্ত্তমান কালে পুচ্ছের সন্নিকটে ধ্রুব।

চারি পাঁচ শত বৎসর যাবৎ শিশুমারের মুখস্থিত তারা, ধ্রুব হইয়াছিল। তখন বিবাহের নবদম্পতী ধ্রুব না দেখিলে বিবাহ পূর্ণাঙ্গ হইত না। ধ্রুব যেমন অচল, নবদম্পতীর পরস্পর প্রেমও তেমন অচল, এই ভাব জাগাইবার নিমিত্ত ধ্রুব দর্শন করিতে হইত। কালক্রমে তৎকালে-অজ্ঞাত কারণে সে ধ্রুবও, শিশুমারের অন্য তারার ন্যায়, ভ্রমণ করিতে দেখা গেল। তখন বিবাহের দম্পতীকে অরুন্ধতী ও বসিষ্ঠ তারা দেখাইবার বিধি হইল। কিন্তু ধ্রুবতারায় গ্রহনক্ষত্রের রশ্মি যেমন বদ্ধ ছিল, তেমন রহিল। এখন ঘাণি গাছের সহিত তুলনা চলিল (৫ম চিত্র)। পুরাণে এই তুলনা আছে। "তৈলপীড়ং যথা চক্রং ভ্রমতে ভ্রাময়তি বৈ।" (বিষ্ণুপুরাণে কুলালচক্রের দৃষ্টান্ত।) উচ্চ কাঠ, নিম্নভাগ সরু, উর্দ্ধভাগ মোটা, মাটিতে পোতা থাকে। মেরুগিরি অবিকল সেইরূপ। ঘাণির মধ্যস্থ "গাছের" অগ্র হইতে দোড়ী ঝুলিতে থাকে; গোরু সে দোড়ী টানিয়া চক্রপথে ভ্রমণ করে। ফলে "গাছ" ঘুরিতে থাকে। সেইরূপ, আকাশের ধ্রুব যেন ঘাণি-গাছের অগ্রবিন্দু, দোড়ী প্রবহ নামক বাত-রশ্মি, গোরু চন্দ্র-সূর্য-নক্ষত্র। পুরাণের শেষকালে শিশুমারের পুচ্ছস্থিত তারা ধ্রুব হইয়াছিল। এই তারা এখন প্রকৃত ধ্রুবের সন্নিকটে আসিয়াছে। এখন পুরাণ রচিত হইলে ঘাণি কল্পনা আবশ্যক হইত না, গোরু দিয়া ধান মাড়ার মেধিকাঠ পাইলেই চলিত। জৈনেরাও ঘাণি-সাদৃশ্য দেখিয়াছিলেন। কিন্তু সে ঘাণি নীচে মোটা, উপরদিকে ক্রমশঃ সরু।

জ্যোতিষিকের মেরু একটা সংজ্ঞামাত্র। কিন্তু লোকে বুঝিল না, পামীরের উত্তরস্থ তিয়ানশানের শৃঙ্গ ভূ-গোলের উত্তরে বসাইল, সঙ্গে সঙ্গে জম্বুদ্বীপের একার্ধ এশিয়াতে, অপরার্ধ আমেরিকাতে গিয়া পড়িল। ইলাবৃতবর্ষের মধ্যস্থলে মেরু। এখন ইলাবৃত, সাইবিরিয়া। এখানে ঐরাবত হস্তীর জন্ম। ঐরাবত ইংরেজী 'মামথ'। যে কুরুবর্ষ আর্যগণের লোভনীয় ছিল, সে এখন মেকৃসিকো। এক জম্বুদ্বীপেই ভূ-গোলের উত্তরার্ধ ঢাকিয়া ফেলিল, শাকাদি অন্য ছয় দ্বীপকে দক্ষিণার্ধে ফেলিতে হইল। বোধ হয়, দ্বীপ অর্থে জল-পরিবেষ্টিত ভূ-খণ্ড বুঝিয়া প্রাচীন ভূ-বর্ণন এই দশা পাইল। ভাস্করাচার্য এই রূপ করিয়াছিলেন। ৬ষ্ঠ চিত্র দেখিলেই বুঝিতে পারা যাইবে। এখন শাকদ্বীপাদি সবই কাল্পনিক।

জনসাধারণের জ্ঞানকে বিজ্ঞানে বসাইতে গেলেই এইরূপ বিপত্তি ঘটে। ভূ-পর্যটনের অভাবে ভারতের দুর্গতি হইয়াছিল। বৌদ্ধ-ভিক্ষু নানা দেশে যাইতেন, কত রাজ্য দেখিতেন। তাঁহাদের পূর্বেও নানা দেশের সহিত ভারতের পরিচয় ছিল। কোথায় ক্ষুদ্র জম্বু; সে জম্বু নামে ভারতবর্ষ বুঝাইত, তৎকালে জ্ঞাত পৃথিবী



৬ষ্ঠ চিত্র। পুরাণ-প্রদত্ত মানানুগত জম্বুদ্বীপের ছেদ্যক (diagram)। "আমাদের জ্যোতিষী ও জ্যোতিষ" গ্রন্থ হইতে অনুকৃত। সেখানে বিষ্ণুপুরাণ, সিদ্ধান্তশিরোমণি ও সূর্যসিদ্ধান্তের ভূ-গোল বর্ণন প্রদত্ত হইয়াছে। চিত্রটি ছেদ্যক হইলেও দেখা যাইবে ভারতের বিন্ধ্যপর্বতের দক্ষিণভাগ অজ্ঞাত ছিল। ১ম চিত্রে দক্ষিণাপথের পর্বতের ও লঙ্কাদ্বীপ নাম পরবর্তী কালের।

বুঝাইত। ভারতবর্ষ নামেও নবখণ্ড পৃথিবী বুঝাইত। পৃথিবীতে নববর্ষ, ভারতেও নবখণ্ড চাই। এই সকল নাম হইতে বুঝিতেছি, প্রথমে পৃথিবীভাগ, পরে ভারতভাগ হইয়াছিল। আর্যজাতি নববর্ষ পৃথিবীতে উপনিবিষ্ট হইয়াছিলেন, এ কথায় অবিশ্বাসের হেতু নাই।

মহাভারতে দেখি, যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চ পাণ্ডব ও তাঁহাদের সহধর্মিণী দ্রৌপদী স্বর্গারোহণ কামনায় হস্তিনাপুর হইতে দ্বারকায় এবং দ্বারকা হইতে উত্তরমুখে গিয়া হিমালয়ে উপস্থিত হইলেন। বোধ হয়, গন্ধমাদন (করকোরম) পার হইতে গিয়াছিলেন। সেখান হইতে বালুকাময় সমুদ্র (গোবি মরু) ও সুমেরু দেখিতে পাইলেন। অতএব সে সময় সুমেরু স্থানভ্রষ্ট হয় নাই। রামায়ণেও (কি। ৪৩) হিমালয়ের উত্তরে বিস্তীর্ণ শূন্য দেশ এবং তাহার উত্তরে উত্তর-কুরু, তাহার উত্তরে সমুদ্র। মহাভারতের কবি সুমেরুকে স্বর্গলোক মনে করিতেন।



চাষীর ঘর
শ্রীইন্দু রক্ষিত

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

এই দেশটি সামান্য নয়। কত বীর জাতি এই দেশ হইতে পশ্চিমে ও দক্ষিণে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। কোন্ আদ্যকালে আর্যজাতি এশিয়ার নানা দেশে উপনিবেশিত হইয়াছিলেন! সে দেশের উত্তরে শ্বেতবর্ণ (অন্যমতে রক্তবর্ণ), পূর্বে রক্তবর্ণ (অন্যমতে শ্বেতবর্ণ), দক্ষিণে পীতবর্ণ, এবং পশ্চিমে কৃষ্ণবর্ণ জাতি বাস করিত। আমরা আর্যনামে এক বর্ণ, শ্বেতবর্ণ জাতি বুঝি। কিন্তু যে কোন বর্ণ পথ দেখাইলে অন্য বর্ণ সে পথে চলে। কালে কালে শ্বেত, রক্ত, পীত, তিন বর্ণই ভারতে প্রবেশ করিয়াছিল। কতকাল পূর্ব হইতে এই স্রোত চলিয়াছিল, তাহা জানিবার উপায় নাই। এইটুকু জানি বেণ রাজার পরে পৃথু প্রথম ক্ষত্রিয় (রক্তবর্ণ) রাজা হইয়াছিলেন। সে সময়ে পীতবর্ণ বৈশ্যজাতি প্রথম কৃষিকর্ম আরম্ভ করে। কতকাল পরে শক ও হূণ সেই মধ্য-এশিয়া হইতে ভারতে আসে। আরও পরে সে দেশ হইতেই তুর্কী জাতি প্রাচীন শাল্মল ও পুষ্কর দ্বীপে ছড়াইয়া পড়ে। আরও পরে, সে জাতি ও পরে মঙ্গল জাতি আসিয়া দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করে। এই তুর্কী ও মঙ্গল জাতি মুসলমান না হইয়া বৌদ্ধ থাকিলে এদেশে ক্ষত্রিয় হইয়া যাইত।

অজানা

শ্রীপ্রবোধকুমার সান্যাল

গয়া লাইনের একটা জংশন ষ্টেশনে একখানা ট্রেণ এসে থাম্‌ল। গাড়ীখানা আস্‌ছে পশ্চিম থেকে, যাবে কল্‌কাতায়।

গ্রীষ্মকালের গভীর কালো রাত্রি, ফুর ফুর ক'রে হাওয়া বইছে। অত রাতে ভিড় তেমন বিশেষ নেই। দু-একজন উঠ্‌ল, চার পাঁচজন মাত্র নাম্‌ল। গাড়ীর জান্‌লাগুলির কাছ দিয়ে একটা পানওয়ালা হেঁকে গেল, আর একজন এসে হাঁক্‌ল, 'পুরী-মিঠাই',—একটি ছেলে ঝুম্‌ঝুমি বাজিয়ে তার মণিহারি জিনিষগুলির বিজ্ঞাপন ক'রে গেল, কিন্তু গাড়ীর ভিতরকার নিদ্রিত, অর্দ্ধজাগ্রত ও নিস্পৃহ যাত্রীদের কাছ থেকে কোনো সাড়াই এল না।

বাঁশী বাজিয়ে ধীরে ধীরে প্লাট্‌ফরম্ ছেড়ে যখন ট্রেণখানি পার হয়ে বহুদূর চ'লে গেল তখন আবার চারিদিকে নেমে এল রাত্রির নিঃশব্দ ছায়া। ঝিঁঝিঁর একঘেয়ে আওয়াজ সেই নিস্তব্ধতাকে আরও গভীরে ডুবিয়ে দিতে লাগ্‌ল, এবং প্লাট্‌ফরমের উদাসীন প্রদীপ-গুলি তেমনি করেই অপলক চোখে তাকিয়ে রইল অন্ধকারের দিকে।

যে-তিনটি যাত্রী এইমাত্র নাম্‌ল, তাদের সঙ্গে মালপত্র অতি সামান্যই। তিন জনের মধ্যে দুটি পুরুষ ও একটি মেয়ে। পুরুষ দুটির মাথায় বড় বড় পাগ্‌ড়ি বাঁধা। পরনে তিনজনেরই ঢিলা পায়জামা। জাতিতে বোধ করি তারা শিখ। পায়জামা ছাড়া মেয়েটির গায়ে একটি পাতলা কাপড়ের পাঞ্জাবী, মাথায় একটি সবুজ রংয়ের ওড়না কাঁধের ওপর দিয়ে গা বেয়ে নীচে নেমে এসেছে, এবং তারই পাশ দিয়ে মেয়েটির মাথার বেণী ঝুলে পড়েছে একেবারে কটির নীচে। পায়জামাটিতে তার ধূলোবালি এবং ট্রেণের দাগলাগা। পায়ে একজোড়া কালো চটিজুতো। পুরুষ দুটির মধ্যে একটি ছোক্‌রা, আর-একটির কিছু বয়স হয়েছে। কালো দাড়ির ভিতর দিয়ে তার বয়স সহজে ঠাওর কর্‌বার উপায় নেই।

ঝুমঝুমিওয়ালা তার মণিহারির ঝাঁপির দুই দিকের দুই আংটার সঙ্গে কাপড়ের দড়ি পাকিয়ে গলায় বেঁধে এতক্ষণ তাদের লক্ষ্য করছিল। আজ বোধ হয় তার বিক্রি বেশী হয়নি, ঝুম্‌ঝুমিটা একবার বাজিয়ে সে তাদের দিকে এগিয়ে গেল। ষ্টেশনের আলোয় তার সেই বিস্তৃত ঝাঁপির মধ্যে সৌখীন খেল্‌না ও মণিহারিগুলি ঝল্‌মল্ করছিল। আনন্দদীপ্ত দুটি চক্ষু নিয়ে মেয়েটি সেদিকে ফিরে দাঁড়াতেই বয়স্ক পুরুষটি চোখ রাঙিয়ে বল্‌ল, এত না রাত্‌মে ফেরি···যাও ভাগো···

ছেলেটি তার ঝাঁপি নিয়ে তাড়াতাড়ি সরে পড়ল। তিনটি নরনারী জিনিষপত্রগুলি হাতে নিয়ে তারপর খুঁজ্‌তে খুঁজ্‌তে প্লাট্‌ফরমের একান্তে একটি দ্বিতীয় শ্রেণীর 'ওয়েটিং রুম'-এ এসে প্রবেশ করল।

ভিতরে আর কোনো প্রতীক্ষমান যাত্রী ছিল না। দুটো বেঞ্চি এবং ইজি-চেয়ারটা তারা এসে দখল কর্‌ল। মালপত্রগুলি গুছিয়ে রাখ্‌ল মাঝখানের গোল টেবিলটার ওপর। মেয়েটি অতি চঞ্চল। ঘরের মধ্যে ঘুরে ফিরে,

চেয়ার ও বেঞ্চির চারিদিকে পায়চারি করে,' বড় আয়নাটায় মুখ দেখে, সঙ্গের যুবকটিকে বয়স্ক লোকটির অলক্ষ্যে একটি ঠোনা মেরে অল্পক্ষণের মধ্যেই সে এই মৃতকল্প পরিত্যক্ত ঘরখানিকে জীবনের মুখরতায়, উল্লাসে, দীপ্তিতে, গৌরবে একেবারে রোমাঞ্চিত ক'রে তুলল। দীর্ঘ পথ গাড়ীর মধ্যে অতিক্রম ক'রে এসে সে যেন মুক্তির আনন্দে অধীর হয়ে উঠেছে।

যুবকটি তন্দ্রায় কাতর হয়ে পড়েছিল, এই মেয়েটির সঙ্গে পাল্লা দিতে না পেরে সে আস্তে আস্তে একটা বেঞ্চিতে পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়ল। বয়স্ক লোকটি স্নেহের হাসি হেসে মেয়েটির দিকে তাকিয়ে সুন্দর পাঞ্জাবী ভাষায় বলল,—সমস্ত পথটা তুমি ঘুমিয়েছ, আর আমরা জেগে বসেছিলাম! এবার ঘুম পাচ্ছে, বিরক্ত করো না কিন্তু ·· চুপটি ক'রে বসে থাক লক্ষ্মীটি, গাড়ী আসতে এখন অনেক দেরী!

মেয়েটি ইজি-চেয়ারে বসে পা দুলিয়ে দুলিয়ে হাস্‌তে লাগ্‌ল। হাসি তার সব-কিছুতেই। ঘরের কড়িকাঠের দিকে তাকিয়েও তার হাসি থামে না।

কতক্ষণ কেটে গেছে। যুবকটির নাক-ডাকার বিচিত্র শব্দ শুনে মেয়েটি সকৌতুকে তার দিকে এক-একবার তাকাচ্ছিল। হঠাৎ তার চঞ্চল দুটি চোখের তারা স্থির হয়ে গেল 'স্প্রীংয়ের' দরজাটার দিকে তাকিয়ে। সোজা হয়ে সে উঠে বস্‌ল। মুখ ফিরিয়ে দেখলে, তাঁর 'চাচা' তন্দ্রায় কাৎ হয়ে পড়েছেন। পাছে শব্দ পেয়ে তিনি জেগে ওঠেন এজন্য চটিজুতোটি সে আস্তে আস্তে ছাড়ল, তারপর পা টিপে টিপে উঠে সে দরজার কাছে এল।

দরজার দুটি পাল্লার ঠিক নীচেই বাইরে সেই মণিহারীর ঝাঁপিটা নামিয়ে ঝুমঝুমিওয়ালা তার পাশে বসেছে। এতবড় লোভ আর সে সংবরণ করতে পারল না, একটুখানি সে হাস্‌ল, তারপর মাটিতে হেঁট হয়ে পড়ে দরজার নীচে দিয়ে একটি হাত গলিয়ে চুপি চুপি টপ্‌ করে একটি কাচের পুতুল তুলে হাত সরিয়ে নিল। ঝুমঝুমিওয়ালা কোনো সাড়াই দিল না।

মেয়েটির কিন্তু আগে তা মনে হয়নি। সে ভেবেছিল এ চুরি তার হাতে হাতে নিশ্চয় ধরা পড়বে, তারপর খানিকক্ষণ হবে কাড়াকাড়ি, এবং ঠিক তারপরেই জোর করে হাতটা ছিনিয়ে সে পালিয়ে আস্‌বে। ছেলেটি চেঁচামেচি করে ঘরে এসে ঢুক্‌বে, সে তখন বল্‌বে, ইস্‌ তুমি কি আমাকে নিতে দেখেছ? আমি ত ছিলাম দরজার এদিকে! কে হাত বাড়িয়েছিল তা আমি কি জানি?—ছেলেটিকে কাঁদো কাঁদো হতে দেখ্‌লে তবে সে পুতুলটা ফিরিয়ে দেবে! সমবয়সী ছেলেকে জব্দ করতে তার ভারি ভাল লাগে!

মুখের হাসি তার মিলিয়ে গেল। চাচার দিকে একবার তাকিয়ে দরজার একটা পাল্লা টেনে বাইরে সে মুখ বাড়িয়ে দেখ্‌ল, দেয়ালে মাথা হেলান্‌ দিয়ে অকাতরে ছেলেটি ঘুমিয়ে পড়েছে, ঝাঁপিসুদ্ধ চুরি গেলেও তার সে ঘুম হয়ত ভাঙ্‌ত না। সমস্ত দিন পরিশ্রমের একটি করুণ ক্লান্তির ছায়া তার নিদ্রিত মুখের ওপর ফুটে উঠেছে।

এ অবস্থায় কেউ যে এমন ক'রে ঘুমুতে পারে মেয়েটির তা ধারণায় এল না। হেঁট হয়ে সে তার স্বাভাবিক অপরূপ কোমল কণ্ঠে ডাকল, 'ইয়ারা'?

ফেরিওয়ালা জেগে তাড়াতাড়ি সোজা হয়ে বস্‌তেই সে বল্‌ল—তোমার জিনিষ যদি চুরি হয়ে যেত' এক্ষুণি?

ছেলেটি তার মাতৃ-ভাষায় বল্‌ল, চুরি? এঃ মাথা ভেঙে দেব না?

তারপরই সে একটা রবারের পাখী তুলে' তার পেট টিপে বাঁশী বাজিয়ে বল্‌ল,—লেও, ছে প্যায়সা!

মেয়েটি একটু হেসে পায়জামাটা গুটিয়ে ঝাঁপির কাছে উবু হয়ে বসে' বল্‌ল,—তোমার সব জিনিস ঠিক-ঠিক আছে? দেখ দেখি?

ছেলেটি একবার সেদিকে চোখ বুলিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে বল্‌ল,—তুমি নাও না, কি চাও,··· এই নাও 'মণি ব্যাগ'—দো আনা!

—ও আমার চাইনে।

—আচ্ছা, এই নাও জর্দার কৌটো—এক আনা। জরির ফিতা নেবে? সাত আনা গজ! তবে এই লাট্টু আছে, লাট্টু, দো দো প্যায়সা!

—লাট্টু আমার কি হবে,—মেয়ে মানুষ!

—তোবে কি লেবে? 'সিসা' চাই? মুখ দেখবার জন্যে? তোমার মুখ সুন্দোর আছে!

মেয়েটি তার বল্‌বার ভঙ্গী দেখে মুখের দিকে তাকিয়ে হেসে ফেল্‌ল। বল্‌ল,—চাইনে—তুমি দেখো তোমার মুখ, দুষ্টু!

নতুন 'লাইসেন্স্‌' পেয়ে ছেলেটি প্রথম কারবার সুরু করেছে, ক্রেতা চেন্‌বার অভিজ্ঞতা এখনও তার ভাল ক'রে হয়নি। সে বল্‌ল, তবে ত' হায়রাণি, তোমার কাছে কত পয়সা আছে বল, সেই মত জিনিষ বেছে দিচ্ছি।

পয়সা? পয়সা আমি পাব কোথায়?

ছেলেটি তার মুখের দিকে তাকাল, তারপর স্নেহের হাসি হেসে অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে বল্‌ল, যাও গিয়ে ঘুমোওগে। মিছামিছি এতক্ষণ—

মেয়েটি নড়্‌ল না, নানা রকমের চক্‌চকে ঝল্‌মলে খেল্‌না এবং নানা সৌখীন জিনিষের মধ্যে তার দৃষ্টি

গিয়েছিল হারিয়ে। বাঁ হাতের মুঠোর মধ্যে কাঁচের পুতুলটি সে বুকের কাছে চেপে ধরেছিল। হয়ত ভাবছিল, চুরির জিনিষ ফিরিয়ে দেবার লজ্জা সে কেমন ক'রে সাম্‌লাবে!

ছেলেটি আবার মুখ ফিরোল। এত বড় অবজ্ঞা সয়েও যে এমন ক'রে ব'সে থাকতে পারে তার প্রতি কেমন যেন একটু মায়া হ'ল। দু জনেই প্রায় সমবয়সী। একজনের কাছে এই বিশাল পৃথিবী শুধুই রূপকের কল্পলোক, আনন্দের অরণ্য, স্বপনের অমরাবতী; আর একজন ধূলি-কণ্টকাকীর্ণ রূঢ় বাস্তবের পথচারী, জীবন-সংগ্রামের অসহায় পদাতিক,—এ পৃথিবী তার কাছে দুঃখের, অসহনীয় অভিজ্ঞতার, অনন্ত বেদনার!

দু' জনে প্রায় পাশাপাশি বস্‌ল। একটি নদী যেন এক বিস্তৃত মরুভূমির প্রান্ত সীমায় এসে থেমেছে। তার সেই সুন্দর চোখের ভিতর তাকিয়ে ছেলেটি জিজ্ঞাসা কর্‌ল,—নাম কি?

—নাম? শুনবে? শেয়ান্তি দেবী। তোমার নাম?

ছেলেটি সেই নির্জ্জন ষ্টেশন আর অন্ধকার পথের দিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে ঈষৎ হেসে বল্‌ল— কি হবে আমার নাম শুনে? তোমার ত' মনে থাকবে না!

শান্তি বল্‌ল,—আমার নাম তবে জেনে নিলে কেন? বল শিগ্‌গির।

ছেলেটি এড়িয়ে গেল। নাম ব'লে এই নিভৃত আলাপের যবনিকা সে টান্‌তে চাইল না। বল্‌ল,—তুমি কিছু কিন্‌লে না, আমার কেমন ক'রে চলে বল ত? আজ সারাদিনে বল্‌তে গেলে কিছুই···তোমার মুলুক কোথায়?

শান্তি বল্‌ল, পান্‌জাব; অমির্‌তসর্‌।

—এদিকে এলে যে?

শান্তি এবার মুখ রাঙা ক'রে মাথা হেঁট করল। যে-প্রশ্নটা ছেলেটি উত্থাপন ক'রে বস্‌ল, সে-প্রশ্ন যেন কোনো নিকটাত্মীয়ের। ছোট মেয়ে, ইতিমধ্যে ভুলেই গেছে ছেলেটি পথের একটি সামান্য ফেরিওয়ালা, পূর্ব্ব-পরিচয় তার সঙ্গে একবিন্দুও নেই!

—চুপ ক'রে রইলে যে?'

শান্তি বল্‌ল—আমি এই প্রথম এলাম এ মুলুকে চাচার সঙ্গে।—আর ওই ছেলেটা, ওই যে গাঁ-গাঁ ক'রে নাক ডাক্‌ছে—ও-ও যাচ্ছে আমাদের সঙ্গে।—বলে সে দরজার ভিতর দিয়ে নিদ্রিত যুবকটিকে দেখাল।

—ও কে শেয়ান্তি? আবার যে চুপ করলে? বলবে না?

শান্তি শেষ পর্য্যন্ত স্বীকার কর্‌তে বাধ্য হ'ল, যুবকটির সঙ্গে তার বিবাহ হয়েছে। কাকা ওই ছেলেটার চাকুরি দিয়ে সংসার পেতে দেবার জন্য নিয়ে যাচ্ছেন কালিমাটিতে। চাচা তার টাটা কোম্পানীর বড় চাকুরে কি-না!

ছেলেটি তার জিনিষগুলির দিকে তাকিয়ে কিয়ৎক্ষণ কি যেন চিন্তা করল, তারপর একটি ছোট্ট অলক্ষ্য নিঃশ্বাস ফেলে বল্‌ল, এবার আমাকে যেতে হবে, ও-লাইনে গাড়ী আস্‌বে এখুনি। আর শোন, নাম জান্‌তে চাইছিলে না তখন? আমার নাম বদ্‌রি।

এই কথা কটি ব'লে সে ওঠ্‌বার চেষ্টা করতেই শান্তি বল্‌ল, এত রাতে কেউ তোমার জিনিষ কিন্‌বে না। আমিই-বা এখানে একলা ব'সে ব'সে কি করব?

এ একেবারে অদ্ভুত প্রশ্ন! সামান্য আধঘণ্টার পরিচয়ে এত বড় দাবি যে খাটানো যেতে পারে একথা বদ্‌রির জানা ছিল না। তার মনে হ'ল, শান্তি ত কম স্বার্থপর নয়! খেয়ালের খেলার মত তাকে খানিকক্ষণ নাড়াচাড়া ক'রে গাড়ী এলেই ত সে স্বামীর সঙ্গে পালিয়ে যাবে! তার জন্য শুধু রেখে যাবে নির্জ্জন উদাসীন ষ্টেশন, ক্রেতার জন্য ব্যর্থ খোঁজাখুঁজি, এবং একটি নিঃশ্বাস! আর একদিনের কি একটা গল্প তার মনে পড়ল। না, এ হ'তেই পারে না! ক্ষুব্ধ অভিমানের সঙ্গে সে বল্‌ল,—তুমি যাও ভাই, তোমার চাচার কাছে।

—যাব না, কি করবে তুমি? এই আমি বসে রইলাম।—বলে শান্তি খেল্‌নার ঝাঁপির একটা কানা হাতে চেপে বসে রইল।

বদ্‌রি বল্‌ল, আমার লোসকান দেবে কে?

শান্তি বল্‌ল—তোমার জিনিষ, তুমিই দেবে?

বদ্‌রি আবার তাকাল তার মুখের দিকে। বিদেশিনীর দুটি দীর্ঘায়ত গভীর কালো চোখে এক নির্লিপ্ত চাহনি। মাথার বেণীটি তার ঝুলে পড়েছে কোলের মধ্যে। নধর সুপুষ্ট হাতখানিতে একগাছি চিক্‌চিকে সোনার চুড়ি, ক'ড়ে আঙুলে একটি ছোট্ট আংটি, পা দুখানি ধুলো-বালি মেখে আরও সুন্দর হয়ে উঠেছে। শীতপ্রধান দেশের মেয়ে ব'লে মুখখানিতে রক্তের আভা স্পষ্টরূপে দেখা যাচ্ছিল। বহু যাত্রীগাড়ীতে বদ্‌রি বহু সুন্দরী মেয়েকেই দেখেছে, কিন্তু এত কাছাকাছি এমন রূপবতী নারী আর কোনোদিন তার চোখে পড়েনি। এই কিশোরীটির হাত ছাড়িয়ে চলে যাবার মানসিক দৃঢ়তা সে হারিয়ে ফেলেছিল।

বদ্‌রি অনেকক্ষণ তার চোখের ভিতর তাকিয়ে বল্‌ল,—আমি তোমাকে চিনি!

—দূর, কোনোদিন দেখেছ না-কি যে চিন্‌বে?

অভিভূত হয়ে বদ্‌রি বল্‌ল,—হ্যাঁ চিনি, নিশ্চয় চিনি, আমি তোমাকে দেখেছি এর আগে।

—কোথায় দেখেছিলে ?

ঘাড় ফিরিয়ে বদ্রি একবার রেল-পথের দিকে তাকালো। কোথায় দেখেছে তা সে কেমন করে বলবে? স্মরণের পরপার পর্য্যন্ত সে একবার হাতড়ে দেখল। সসাগরা ধরিত্রী আর নক্ষত্রখচিত অনন্ত আকাশ সে মনে মনে তোলপাড় ক'রে এল। তারপর ঘাড় বেঁকিয়ে বল্‌ল, হুঁ, ঠিক আমি চিনি তোমাকে—দেখেছি যে আগে।

তার দৃঢ় আত্মবিশ্বাসের দিকে তাকিয়ে শান্তি হাস্‌ল। হেসে বল্‌ল,—তাহলে এ জন্মে নয়!

দুজনে বসে গল্প চল্‌তে লাগ্‌ল। শান্তি বল্‌ল, তাদের বাড়ি অমৃতসরে 'জালিয়ান বাগের' কাছেই, আর একটু গেলেই 'ঘণ্টাঘর,'—ওই যেখানে রয়েছে সরোবরের মাঝখানে 'সোনেকা মন্দির'। পিতা তার রেশমের কারবার করেন। একবার কথে সে লাহোরে গিয়ে ঘোড়দৌড় দেখে এসেছিল!—বদ্রি বল্‌ল,—তাদের বাড়ি এই কাছেই গোয়ালামহল্লায়। বাপ তার দুধ বিক্রী করে। তার মামা হচ্ছে 'ধরমশালার' দারোয়ান। একবার ঝড়ে তাদের বাড়ি পড়ে গিয়েছিল। মা তার পাগ্‌লি। চম্পা নদীতে তারা প্রায়ই মাছ ধরতে যায়।

একজন থামে আর একজন বলে, এমনি করেই তাদের আত্মকাহিনী গড়িয়ে গড়িয়ে চল্‌ল। যে-বন্ধু নতুন এসে জোটে সে আনে নতুন বিস্ময়! তার হৃদয়টিকে আবিষ্কার করবার জন্য সমস্ত মনের কৌতুহলের আর সীমা থাকে না! মুখোমুখী দু'জনে বসে নিজ নিজ অন্তরের কপাট খুলে পরস্পরকে অভিনন্দিত করল। পথচারী ও গৃহবধূর মাঝামাঝি কোনো পার্থক্যই আর রইল না। সমবয়সের নিঃসঙ্কোচ-আলাপের ভিতর দিয়ে এমনি করেই তাদের হ'ল গভীর পরিচয়, প্রীতি, সখ্যতা এবং ভাবের আদান-প্রদান।

হঠাৎ তাদের আলাপে বাধা পড়ল একটি কুকুরের প্রাণপণ করুণ চীৎকারে। বেচারা বোধ হয় আহার-সংগ্রহ করতে নেমেছিল লাইনের ধারে, একখানা চলন্ত মালগাড়ীর চাকায় লেগেছে ধাক্কা। কুকুরটা চীৎকার করতে করতে এদিকের প্ল্যাট্‌ফরমে যখন উঠে এল, শান্তি দেখল, একটি পা সে উঁচু ক'রে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে বিকৃত আর্ত্তনাদ করতে করতে পালাচ্ছে, ঝর্ ঝর্ ক'রে রক্ত পড়ছে তার সেই পা খানি বেয়ে।

ভয়ে উত্তেজনায় বিবর্ণ আহত মুখে সে বদ্রির দিকে তাকাল। সর্ব্বাঙ্গ তখন তার থর থর ক'রে কাঁপছে। কিন্তু এত বড় একটা দুর্ঘটনা ঘটেও মাল গাড়ীর গতি এতটুকু ক্ষুণ্ণ হ'ল না, আগের মতই মন্থর গতিতে নিজের পথে চল্‌তে লাগ্‌ল।

বদ্রি তার দিকে তাকিয়ে একটু হাস্‌ল। বল্‌ল, এ ত দুবেলাই হচ্ছে। কত কুকুর এমনি···সেদিন একটা কুলী মোট্ নিয়ে পার হবার সময়—বাস্, দেখ্‌তে দেখ্‌তেই একটি পা তার আট্‌কে গেল চাকার তলায়··

শান্তি সাড়া দিল না। দূরে কোথায় গিয়ে থেকে থেকে কুকুরটা তখনও আর্ত্তনাদ করছিল, সেইদিকে সে তাকিয়ে রইল। মনে হ'ল, নিষ্ঠুর পৃথিবী! একটি অসহায় প্রাণী চিরজীবনের জন্য যে পঙ্গু হয়ে গেল, কেউ একবার সেদিকে ফিরেও তাকাল না! যে প্রতিবাদ করতে পারে না, অভিযোগ আন্‌তে জানে না, যার বেদনার কোনো ভাষা নেই; তার জীবন কি এত তাচ্ছিল্যের, এতখানি অনাদরের?

অশ্রুতে শান্তির চোখ দুটি পরিপূর্ণ হয়ে এল। এ শাস্তি যেন তাকেই সইল, এ আঘাত যেন তারই বুকে বাজ্‌ল। পরের ব্যথা যে বুঝতে পারে সে চিরদিনই দুঃখ পায়। শান্তি জীবনে সুখী হতে পারবে না!

বদ্রি বল্‌ল, আরও আছে, তুমি ত জানো না, কীই-বা দেখেছ আমরা ওদিকে আর ফিরেও তাকাইনে!

ওড়না দিয়ে চোখ মুছে সোজা হয়ে বস্‌তেই বদ্রি তাকে বোঝাতে লাগ্‌ল, এ দুনিয়ার কত দিকে কত করুণ দৃশ্যই প্রতিদিন দেখা যায়। এর চেয়ে তারা আরও নিষ্ঠুর, আরও ভীষণ, আরও মর্ম্মান্তিক!—বদ্রি হেসে বল্‌ল, তোমার মতন দুর্ব্বল হ'লে দুনিয়ায় আমাদের ঠাঁই হ'ত না।

বদ্রি বোধ হয় আরও কিছু বক্তৃতা দেবার চেষ্টা কচ্ছিল, সহসা চাচাকে শান্তির পাশে এসে দাঁড়াতে দেখেই তার কথা বন্ধ হয়ে গেল।

চাচা শান্তির হাত ধ'রে তুলে বল্‌লেন, এবার গাড়ী আসছে! 'কাপ্‌ড়া বদল্ কর্ লেও জল্‌দি। সোহন সিংকো উঠায় দেও।'

শান্তি গিয়ে নিদ্রিত সোহন সিংকে একটা খোঁচা দিয়ে জাগিয়ে কাপড়চোপড় নিয়ে গোসলখানায় ঢুকল। সে যে কেঁদে ফেলেছে এ জন্যে তার লজ্জার আর সীমা রইল না। ছেলেটা নিশ্চয়ই তাকে হেনস্তা করবে!

চাচা বল্‌লেন, আবার বুঝি জিনিষ বিক্রী করতে এসেছিলি আমার মেয়ের কাছে? বদ্‌মা!

বদ্রি বল্‌ল, গরীব আদ্‌মী সর্দ্দারজী, এমনি করেই ত আমার রোজগার!—এই বলে' সে তার ঝাঁপি

নিয়ে উঠে কিয়দ্দূর চলে গেল। চাচা যেন তাকে মনে করিয়ে দিলেন, শান্তির সঙ্গে তার অবস্থার কী তফাৎ, কতখানি সে কৃপার পাত্র!

জিনিষপত্র হাতে নিয়ে সবাই যখন আবার প্লাট্‌ফরমের ওপর বেরিয়ে এল, রাত তখন শেষ হয়ে আসছে। দূর থেকে শান্তিকে দেখে বদ্‌রি অবাক্ হয়ে গেল। ইতিমধ্যে সে পরিচ্ছদ বদল করেছে। পরণে তার বেগুনী মখ্‌মলের ওপর সোনালী জরির বিচিত্র কাজ-করা পায়জামা, গায়ে গরদের পাঞ্জাবী, মাথায় এবার নীল রংয়ের ওড়না, পায়ে জরির জুতো। শান্তি একবার চারিদিকে তাকালো। বদ্‌রির দিকে তার দৃষ্টি পড়ল না। কেনই-বা পড়বে! ব্যবধান যে তার সঙ্গে অনেকখানি! বদ্‌রি ভাবলো, এই মহীয়সীর সঙ্গে একটু আগে তার অনধিকার ঘনিষ্ঠতার কি কোনো যুক্তি আছে? অখ্যাত নগণ্য তার জীবনে শান্তি শুধু ভিক্ষার মত দিয়ে গেল সামান্য বন্ধুত্বের যৎসামান্য গৌরব, যৎকিঞ্চিৎ সৌভাগ্য! তুচ্ছতার ক্ষুদ্রতার লজ্জা ওই মেয়েটি যে তার গায়ে লেপে দিল, এ সে লুকোবে কেমন ক'রে? বদ্‌রি কাঙাল, কিন্তু নিজের স্পর্দ্ধাকে সে মার্জ্জনা করতে পারল না। রাজকন্যার সঙ্গে বন্ধুত্ব রাখাল বালকের? এ যে মিথ্যা, এ যে অসম্ভব, এ গল্প কেউ যে বিশ্বাস করতে চাইবে না!

কাঠের সাঁকোটা পার হয়ে ধীরে ধীরে সে ওদিকে চলে গেল। ছোট লাইনের গাড়ীটা এখুনি ছাড়বে। বদ্‌রি ঘুরতেই লাগ্‌ল, যাত্রীদের কাছে মিনতি জানিয়ে তার খেল্‌না ও মণিহারী বিক্রি করবার আর রুচি ছিল না। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কিয়ৎক্ষণ পরে তার চোখের সুমুখ দিয়েই গাড়ীখানা ছেড়ে ধীরে ধীরে চলে গেল।

এক জায়গায় সে এসে বস্‌ল। মুখের ভাষা তার যেন ফুরিয়ে গেছে! তার কোনো উৎসাহ নেই; সে শ্রান্ত! এই কদর্য্য ফেরিওয়ালাগিরি বেশীদিন সে হয়ত আর করতে পারবে না। বদ্‌রির মনে হ'ল, এইখানে কিছুক্ষণ শুয়ে চোখ বুজ্‌তে পারলে সে যেন বাঁচে।

ওদিকের লাইনে ততক্ষণে ডাকগাড়ী এসে গেছে। তিন মিনিট মাত্র দাঁড়াবে। ওঠো বদ্‌রি, সময় নেই! তোমার এই অকারণ অবসাদের মূল্য কি! কে বুঝ্‌বে এক পলকে কা'র জীবন কখন্ ব্যর্থ হয়ে গেল! তোমার গোয়ালা-পিতার নির্দ্দয় শাসনকে স্মরণ করে উঠে দাঁড়াও! কে বলেছে তুমি ক্লান্ত?

বদ্‌রি ঝাঁপি নিয়ে আবার তাড়াতাড়ি ছুট্‌ল।

কাঠের সাঁকো বেয়ে দ্রুতবেগে সে নেমে আস্‌ছিল, যাঃ—গেল তার ঝাঁপি একেবারে কাৎ হয়ে! ছড়্ ছড়্ ক'রে তার মণিহারীগুলি সিঁড়ির উপরেই ছড়িয়ে পড়ল। পিছন থেকে যারা আস্‌ছিল তারা কেউ গেল সেগুলি মাড়িয়ে, পা দিয়ে কেউ দিলে ঠিক্‌রে, কেউ দিল গালি, কেউ বলে গেল, আহা!

একে একে সেগুলি কুড়িয়ে সে যখন সবগুলি একত্র করল তখন ঘণ্টা প'ড়ে গেছে। কাছিটি গলার সঙ্গে ভাল ক'রে জড়িয়ে সে আবার নীচে নেমে এল। গাড়ীর কাছে আসতেই একজন তাকে দাঁড় করিয়ে এক প্যাকেট্ সিগারেট্ কিন্‌ল। তারপর নিল একটা দেশালাই।

—পয়সা দাও জল্‌দি বাঙালী বাবু?

আরে দাঁড়া বেটা, একদম লাটসায়েব।—ব'লে বাবুটি প্যাকেট্ খুলে সযত্নে একটি সিগারেট বা'র ক'রে দেশালাই জেলে ধরিয়ে বললেন, কত?

—তেরো পয়সা!

—ভাগ্, সবাই দেয় এগারো পয়সা আর তুই...সবসুদ্ধ তিন আনা দেবো।

—বেশ তাই দাও।

বাবুটি একটি টাকা বা'র করলেন। বোধ হয় টাকাটি ভাঙাবার উদ্দেশ্যই তাঁর ছিল। বদ্‌রিকে আবার বগ্‌লি বা'র ক'রে টাকার ভাঙানি গুণে গুণে দিতে হ'ল। একটা সিকি অচল ব'লে বাবুটি আবার সেটি বদ্‌লে চারিটি একআনি নিলেন।

আবার কয়েক পা এগোতেই আর একটা লোক তাকে বাধা দিয়ে বল্‌ল, এনামেলের চাম্‌চে কত ক'রে?

শান্তি যে তাকে ও-গাড়ী থেকে হাতছানি দিয়ে ডাক্‌ছে বদ্‌রির তা দৃষ্টি এড়ায়নি। সেদিকে একবার তাকিয়ে নিঃশ্বাস রোধ্ ক'রে সে বল্‌ল, দু-আনা, নেবেন?

—বেশ ট্যাক্সই হবে ত ? ছ' পয়সা পাবি।

তখন বাঁশী বেজেছে। বাবুটির কাছে চামচেখানি রেখেই সে দৌড়লো শান্তির দিকে, পয়সা নেবার আর সময় হ'ল না। গাড়ী তখন খুলে দিয়েছে !

কিন্তু শান্তির কাছে পৌছল সে অনেক দেরীতে। আর কিই-বা তার বল্‌বার ছিল ! কাছাকাছি পৌছতেই বিব্রত এবং বিপন্ন হয়ে শান্তি হাত বাড়িয়ে কাচের পুতুলটি তার ঝাঁপির মধ্যে ফেলে দিল। তারপর হেসে বল্‌ল, চুরি করেছিলাম !

ঝাঁপিটা পথের ওপরেই নামিয়ে কি জানি কেন বদ্‌রি ছুট্‌তে লাগল গাড়ীর সঙ্গে সঙ্গে—নিতান্ত শিশুর মত, অর্ব্বাচীনের মত। শান্তি গলা বাড়িয়ে বল্‌ল—কোথা ছিলে এতক্ষণ···আহা হা, পড়ে যাবে, থামো থামো ···পাগলের মতন···

গাড়ী তখন ছুট্‌ছে। বিদেশিনী মেয়েটি জান্‌লা দিয়ে আধখানি দেহ বাড়িয়ে হেসে কপালে হাত ঠেকিয়ে তাকে জানালো বিদায়-অভিবাদন ! মাঝখানের ব্যবধান ততক্ষণে দীর্ঘ হয়ে গেছে !

ফিরে এসে বদ্‌রি পুতুলটির দিকে একবার তাকাল। শান্তির হাতের ঘামে সেটি তখনও আর্দ্র ও উষ্ণ। এটি আর সে বিক্রী করবে না, তার পাতার ঘরের বাঁকারির বাঁধুনির মধ্যে গুঁজে রেখে দেবে। কেউ যেন জান্‌তে না পারে এ পুতুলটি তার জীবনের সবচেয়ে বড় ব্যর্থতার চিহ্ন !

গাড়ীটা যে-পথে অদৃশ্য হয়ে গেছে, সেইদিকে বহুদূর পর্য্যন্ত সে একবার তাকাল। কিছুই দেখা গেল না ; কেবল সেই পথের দুধারে বাব্‌লার ঘন জঙ্গলের সীমানায় ভোরের আকাশ একটু একটু ক'রে রাঙা হয়ে উঠছিল।

নূতন দিবসের ফিরি করবার জন্য বদ্‌রি ঝুমঝুমিটি তুলে নিয়ে একবার বাজাবার চেষ্টা করল, কিন্তু কেবল হাতই তার কাঁপ্‌ল, ঝুমঝুমিটি আর বাজ্‌ল না।



কংগ্রেসের সভা-মণ্ডপে সর্দ্দার বল্লভভাই পাটেলের আগমন

বর্গীর হাঙ্গামা

শ্রীযদুনাথ সরকার

(১)

১৭৪১ খৃঃ

৩ মার্চ্চ—আলীবর্দ্দী খাঁ কর্ত্তৃক রুস্তম-জঙ্গের ফুলবাড়ীতে (বালেশ্বরের নিকট) পরাজয় এবং আলীবর্দ্দীর কটক অধিকার।

আগষ্ট—রুস্তম-জঙ্গের জামাতা বাকর আলী কর্ত্তৃক কটক অধিকার।

ডিসেম্বর—আলীবর্দ্দী খাঁ কর্ত্তৃক কটকের নিকট বাকর আলীর পরাজয় ও কটক উদ্ধার।

১৭৪২ :—

১৬ এপ্রিল—বর্দ্ধমানে ভাস্কর কর্ত্তৃক আলীবর্দ্দী ঘেরাও হইলেন। ৩০এ তারিখে কাটোয়া পৌছিলেন।

৫ মে—মারাঠারা মুর্শীদাবাদ শহরের বাহিরে পৌছিয়া জগৎ শেঠের কুঠী লুট করিল। তাহার পরদিন আলীবর্দ্দী খাঁ কাটোয়া হইতে আসিয়া পড়ায় তাহারা পলাইয়া গেল।

জুন—মারাঠারা পাচেট হইতে ফিরিয়া কাটোয়াতে আড্ডা গাড়িল, হুগলী দুর্গ অধিকার করিল, পশ্চিম-বঙ্গ লুঠিতে থাকিল।

২৬ সেপ্টেম্বর—জমিদারদের নিকট হইতে বলে চাঁদা আদায় করিয়া ভাস্কর দুর্গাপূজা আরম্ভ করিল। কিন্তু অষ্টমীর রাত্রে (২৬ সেপ্টেম্বর) আলীবর্দ্দী অজয় পার হইয়া কাটোয়াতে মারাঠা-শিবির আক্রমণ করায়, ভাস্কর পলাইয়া গেল।

৭ ডিসেম্বর—বাদশাহের হুকুমে মারাঠা তাড়াইবার জন্য অযোধ্যার সুবাদার সফ্‌দর্‌ জঙ্গের পাটনায় আগমন। (পরবর্ত্তী জানুয়ারির মাঝামাঝি নিজ প্রদেশে প্রত্যাগমন।)

ডিসেম্বর—মারাঠাদের উড়িষ্যা হইতে চিল্কা হ্রদের দক্ষিণে তাড়াইয়া দিয়া আলীবর্দ্দী কটকে কিছুকাল থাকিলেন, এবং ফেব্রুয়ারি মাসে মুর্শীদাবাদ পৌছিলেন।

১৭৪৩ :—

১৩ ফেব্রুয়ারি—পেশোয়া বালাজী রাও রঘুজীর বিরুদ্ধে বিহার প্রদেশে প্রবেশ করিলেন।

২৬ মার্চ্চ—কলিকাতায় "মারাঠা খাল" খনন আরম্ভ।

৩১ মার্চ্চ—আলীবর্দ্দী ও বালাজী রাও-এর পলাশীতে সাক্ষাৎ।

১৫ এপ্রিল—আলীবর্দ্দীকে ছাড়িয়া, বালাজীর একা দ্রুতবেগে রঘুজীর পশ্চাদ্ধাবন ও আক্রমণ। রঘুজীর পরাজয় ও পলায়ন। বালাজীর গয়া কাশী করিয়া নিজদেশে প্রত্যাগমন।

২ মে—আলীবর্দ্দী পাটনা শহরের দশ ক্রোশ দূরে পৌছিলেন।

১৭৪৪ :—

ফেব্রুয়ারি—ভাস্কর কর্ত্তৃক বাংলা আক্রমণ।

৩১ মার্চ্চ—মানকরায় আলীবর্দ্দী কর্ত্তৃক ভাস্কর ও তাহার সেনাপতিদের হত্যা।

১৭৪৫ :—

জুন—রঘুজী কর্ত্তৃক বর্দ্ধমান জেলা আক্রমণ।

২৫ জুলাই—মারাঠারা বাংলা দেশ ছাড়িয়া গেল, কিন্তু অক্টোবরের প্রথমে আবার পাটনার পথে আসিল।

২২ ডিসেম্বর—মারাঠা কর্ত্তৃক মুর্শীদাবাদের শহরতলী পোড়ান।

১৭৪৬ :—

২৫ জানুয়ারি—রঘুজীর কাসিমবাজার দ্বীপ ছাড়িয়া বিষ্ণুপুরে গমন।

ফেব্রুয়ারী—মারাঠাদের কাটোয়ায় শিবির-স্থাপন।

(২)

বাহুবলে কটক শহর পুনরুদ্ধার করিয়া, নবাব আলীবর্দ্দী খাঁ সেখানে দুই তিন মাস থাকিয়া সেই প্রদেশ শাসনের সুবন্দোবস্ত করিয়া দিবার পর বাংলার

দিকে ফিরিলেন। পথে বালেশ্বরের নিকট কিছুদিন থামিয়া, ময়ূরভঞ্জের বিদ্রোহী রাজাকে দমন করিবার জন্য তাঁহার রাজ্যে প্রবেশ করিয়া গাঁ জ্বালান, লুটপাট এবং প্রজাদের বন্দী করিতে লাগিলেন। রাজা নিজ রাজধানী হরিহরপুর ত্যাগ করিয়া জঙ্গলে আশ্রয় লইলেন। জয়গড়ে নবাব সংবাদ পাইলেন যে, নাগপুরের মারাঠা রাজা রঘুজী ভোঁসলে তাঁহার প্রধান মন্ত্রী ভাস্কর রাম কোল্‌হট্‌কর নামক ব্রাহ্মণকে অগণিত সৈন্যসহ বাংলা দেশ জয় করিতে, অথবা তাহাতে অক্ষম হইলে বাংলা দেশ হইতে চৌথ আদায় করিবার জন্য, পাঠাইয়া দিয়াছেন, এবং ভাস্কর পাচেটের গিরিসঙ্কটের দিকে আসিতেছে। এই পাচেট (পঞ্চকোট) শহর হইতে মুর্শীদাবাদ আট দিনের পথ পূর্ব্বদিকে। নবাব অমনি বাংলার দিকে ফিরিলেন। ইতিমধ্যে মারাঠারা পাচেটের পথে বর্দ্ধমান জেলায় প্রবেশ করিয়াছে। আচালন সরাই নামক স্থানে* এই সংবাদ পাইয়া এক দিন-রাত্রি দ্রুতবেগে কুচ করিয়া নবাব বর্দ্ধমানে উপস্থিত হইয়া রাণীর দীঘির পাড়ে সেনানিবাস স্থাপন করিলেন।

পরদিন (১৬ এপ্রিল ১৭৪২) প্রভাতে নবাব উঠিয়া দেখেন যে রাত্রিতে মারাঠা সৈন্য নিঃশব্দে আসিয়া তাঁহার চারিদিকে ঘেরাও করিয়া ফেলিয়াছে। তাহাদের গতি এত দ্রুত † যে নবাবের গুপ্তচর ("হরকারা")গণ তাহাদের আগমনের সংবাদ আগে জানিতে পারে নাই। মারাঠাদের সৈন্যসংখ্যা পচিশ হাজার [সিয়র, ১১৭], যদিও লোকমুখে অতিরঞ্জিত হইয়া ঐ সংখ্যা চল্লিশ এবং ষাট হাজারে দাঁড়ায়। নবাবের সঙ্গে তিন-চার হাজার অশ্বারোহী এবং চার-পাচ হাজার বন্দুকধারী বর্কান্দাজ মাত্র। কিন্তু মারাঠারা যুদ্ধ না করিয়া দূরে দূরে থাকিয়া নবাব-সৈন্যের রসদ বন্ধ করিয়া দিল, দূরে একেলা পথ চলিতেছে এমন নবাবী সৈন্য বা ভৃত্যদের ধরিতে বা মারিতে লাগিল। প্রতিদিনই দুই পক্ষে এইরূপ সামান্য কাটাকাটি (light skirmish) হইয়া সন্ধ্যাবেলায় প্রত্যেকে নিজ নিজ শিবিরে ফিরিয়া আসিত। এইরূপে এক সপ্তাহ কাটিয়া গেল। ভাস্কর নিজের চৌদ্দজন সরদার (সেনাপতি) সহিত নবাবকে ঘিরিয়া রহিল, আর বাকী দশজন সরদারকে নিজ নিজ সৈন্য সহ চারিদিকের গ্রাম লুঠিতে পাঠাইয়া দিল। আর বণিকেরা পথ চলিতে পারে না; নবাব শিবিরে শস্য আসিতে পারে না, সেখানে আহারের অভাবে সৈন্যদের অতি ভীষণ দুর্দ্দশা উপস্থিত হইল। দুই পক্ষের মধ্যে দূতের আনাগোনা আরম্ভ হইল। ভাস্কর বলিল যে মুঘল সাম্রাজ্যের অন্য সব প্রদেশ মারাঠাদের চৌথ দিয়া আসিতেছে, শুধু বাংলা এতদিন দেয় নাই। এখন যদি নবাব দশ লক্ষ টাকা দেন তবে সে চলিয়া যাইবে। নবাবের সেনানীগণ বলিল যে শত্রুকে এইরূপ ঘুষ দিয়া সরানো অপেক্ষা ঐ টাকা নিজ সৈন্যদের মধ্যে বিলি করিয়া দিয়া তাহাদের উৎসাহ ও প্রভুভক্তি বৃদ্ধি করিয়া শত্রুকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া চিরদিনের জন্য দূর করিয়া দেওয়াই শ্রেয়ঃ।

তখন নবাব স্থির করিলেন যে নিজ শিবির ছাড়িয়া অতি প্রভাতে কুচ করিয়া মারাঠা সৈন্যনিবাসে পৌঁছিয়া তাহাদের হঠাৎ আক্রমণ করিবেন। কিন্তু ফল ঠিক উল্টা হইল। শিবিরের চাকর স্ত্রীলোক প্রভৃতি সেখানে বসিয়া থাকিবে এরূপ হুকুম দিয়াছিলেন, কিন্তু তাহারা মারাঠাদের ভয়ে সৈন্যদের সঙ্গ ছাড়িল না, এতগুলি যুদ্ধে অক্ষম লোকের ভিড়ে নবাব-সৈন্যের গতি অতি ধীর এবং গোলমালপূর্ণ হইয়া পড়িল; শীঘ্রই মারাঠারা আসিয়া তাহাদের ঘিরিয়া ফেলিল। বৈকাল চারিটার সময় নবাব-সৈন্য একেবারে

* তওয়ারিখ-ই-বাঙ্গালা (I.O.L.MS. 116*a*)তে এই স্থানের নাম "আচালন্ সরাই, বর্দ্ধমান হইতে তিন ক্রোশ দূরে।" রেনেলের ৭নং ম্যাপে Utcharlon বর্দ্ধমান হইতে ১২ মাইল দক্ষিণে এবং মোঘলমারী হইতে দুই মাইল দূরে। সিয়র (ফারসী ১১৭ পৃঃ)তে এই স্থানের নাম "মুবারক-মঞ্জিল বর্দ্ধমান হইতে একদিনের পথ।" মুবারক-মঞ্জিল নামটি শূজা খাঁর দেওয়া, কারণ এইস্থানে তিনি দিল্লী হইতে প্রেরিত নবাবীর সনদ পান, এবং এখানে একটি পাকা কাঠরা এবং সরাই নির্ম্মাণ করান। বর্দ্ধমান হইতে দুই ক্রোশ দূরে, দামোদরের দক্ষিণে "ভেটপুর" নামে এক গ্রাম আছে (*Agra & Calcutta Gazetteer*, iii. 327 map.) তাহাই কি শূজা খাঁর মুবারক-মঞ্জিল?

† চিত্রচম্পূর কবি মারাঠাদের সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—
"একদিনে তাহারা শতযোজন যায়।...
অদ্ভুতবেগশালী অশ্বসমূহ তাহাদের প্রধান বল।" ৩৪।

তওয়ারিখ-ই-বাঙ্গালার মতে আচালন সরাই হইতে বর্দ্ধমান পৌঁছিবার পূর্ব্বেই নবাব ঘেরাও হন এবং তাঁহার সেনার সম্পত্তি লুঠ হয়। সিয়ার ও অন্যান্য গ্রন্থের মতে উহা পথে ঘটে।

অসহায় হইয়া পড়িল, তাহারা না আগাইতে পারে, না পায় বর্দ্ধমানে ফিরিবার পথ। অগত্যা বৃষ্টিকাদাভরা এক ক্ষেতে থামিয়া রহিল। অসন্তুষ্ট আফঘান সৈন্যগণ যুদ্ধে অবহেলা করিল, তাহারা নবাবকে জব্দ করিবার জন্য ব্যগ্র। দু-একজন বীর শত্রুদের আক্রমণ করিয়া প্রাণ দিলেন, কিন্তু তাঁহাদের অনুচরগণ কোনরূপ সাহায্য না করিয়া নিরাপদে বসিয়া রহিল, নবাব-সৈন্য শত্রুব্যূহ ভেদ করিতে পারিল না। এই সুযোগে মারাঠারা তাহাদের সমস্ত তাম্বু ও সম্পত্তি কাড়িয়া লইল; যাহারা একটু দূরে গিয়াছিল তাহারা মারা পড়িল, কেহ কেহ পলাইল। বাকী সৈন্য সেই মাঠে অবরুদ্ধ হইয়া অনাহারে সমস্ত রাত্রি কাটাইল।

ফলতঃ আলীবর্দ্দীর এতদিন প্রধান বল ছিল আফঘান সৈন্যগণ। তাহারা এখন অবাধ্য এবং অলস হওয়ায় তাঁহার উদ্ধার পাইবার কোনই পথ রহিল না। [কেন যে এই সৈন্যগণ অসন্তুষ্ট এবং বিদ্রোহীপ্রায় হয় তাহার কারণগুলি সিয়র ১১৭-১১৮ পৃষ্ঠায় বিস্তারিত দেওয়া হইয়াছে; পাঠকেরা ইংরেজী অনুবাদ দেখিয়া লইবেন।]

আলীবর্দ্দী এখন একেবারেই বন্দী হইলেন। কিন্তু সময় লাভ করিয়া দূর হইতে সাহায্য ডাকিয়া আনিবার অভিপ্রায়ে তিনি আবার ভাস্করের নিকট সন্ধির প্রস্তাব পাঠাইয়া দিলেন। কিন্তু এখন মারাঠারা নিজ বল বুঝিয়াছে, তাহারা নবাবের সমস্ত হাতী এবং এক কোটি টাকা কর চাহিল। আলীবর্দ্দী এই অবসরে আফঘানদের প্রধান সরদার মুস্তাফা খাঁর হাতে-পায়ে ধরিয়া নিজের এবং শিশু দৌহিত্রের প্রাণ বাঁচাইবার জন্য মিনতি করিলেন। মুস্তাফা খাঁর আবেগপূর্ণ বাণীতে আফঘান সৈন্যগণ আবার যুদ্ধে মাতিয়া উঠিল। তখন বাংলার সৈন্য যুদ্ধ করিতে করিতে কাটোয়ায় অগ্রসর হইল। তাহাদের সমস্ত তাম্বু, খাদ্য ও সম্পত্তি হয় লুণ্ঠিত হইয়াছে, না-হয় বাহক অভাবে ফেলিয়া দেওয়া হইয়াছে। প্রতিদিন যুদ্ধ এবং কুচ করিতে কাটে, রাত্রে কোন বড় পুকুরের পাড়ে ঘুমায়, দিবারাত্রি আহার জোটে না, দু-চার জন ভাগ্যবান লোক গাছের মূল বা কাঁচা ফল পাইলে তাহা দিয়া আধপেট ভরায়। বাংলার সৈন্যদের সঙ্গে তোপ ছিল বলিয়া বর্গী অশ্বারোহীরা কাছে আসিতে পারিত না, জিজেলের গোলা যতদূর যায় তাহার বাহিরে অপেক্ষা করিত। নচেৎ সমস্ত নবাব-সৈন্য ধ্বংস হইত। পথের দু-দিকে দশ মাইল জুড়িয়া দেশে মারাঠারা লুটিয়া পোড়াইয়া দিয়াছিল, বাংলার সৈন্যগণ কোন খাদ্য বা আশ্রয় পাইল না। কিন্তু নবাব অদম্য সাহস ও কষ্টসহিষ্ণুতার সহিত দিনের পর দিন পথ চলিয়া দুই সপ্তাহ পরে কাটোয়ায় পৌছিলেন (৩০এ এপ্রিল ?)। তাঁহারা আশা করিয়াছিলেন যে এখানে আহার ও বিশ্রাম লাভ হইবে। কিন্তু নবাব পৌছিবার পূর্ব্বেই মারাঠারা কাটোয়ায় ঢুকিয়া সব জিনিষ লুটিয়া গ্রামটি পুড়াইয়া দিয়া চলিয়া গিয়াছিল। বাংলার সৈন্য কাটোয়ায় আসিয়া অগত্যা সেই আধপোড়া চাউল খাইয়া পেট ভরাইল। কাটোয়ার পূর্ব্ব পাশেই ভাগীরথী, তাহার পরপারে মুর্শীদাবাদের রাজপথ। সেই রাজধানী হইতে নবাবের প্রতিনিধি, তাঁহার অগ্রজ হাজী আহমদ, এখন কাটোয়ায় প্রচুর সৈন্য তোপ এবং রসদ পাঠাইয়া দিয়া আলীবর্দ্দীর সৈন্যগণকে উদ্ধার করিলেন। তাহারা বিশ্রাম ও খাদ্যের সচ্ছলতা পাইল।

কিন্তু এ সুখ বেশী দিন থাকিল না। বর্দ্ধমানের বাহিরের যুদ্ধে নবাবের উচ্চ কর্ম্মচারী মীর হবিব ঘোড়া হইতে পড়িয়া গিয়া মারাঠাদের হাতে বন্দী হয় এবং তাহার পর শত্রুপক্ষে যোগ দিয়া প্রাণপণ চেষ্টায় বঙ্গদেশের সমূহ ক্ষতি করে। ফলতঃ, এই ঘরের শত্রু বিভীষণ না থাকিলে বর্গীর হাঙ্গামা এত ভীষণ হইত না এবং আলীবর্দ্দী সহজেই স্থায়িভাবে এই বাৎসরিক আক্রমণ বন্ধ করিয়া দিতে সক্ষম হইতেন। একমাত্র মীর হবিবের তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, কর্ম্মকুশলতা, অক্লান্ত শ্রমশক্তি এবং আলীবর্দ্দীর প্রতি অজেয় হিংসা ও শত্রুতাই মারাঠাদের বাংলা-অভিযানকে এত সফল এবং দীর্ঘকালব্যাপী করিয়াছিল। সুতরাং তাহার জীবনী বর্ণনা করা আবশ্যক।

(৩)

মীর হবিব পারস্যের শিরাজ নগরে জন্মগ্রহণ করে, এবং সেজন্য লেখাপড়া একেবারে না জানিলেও অনর্গল

ভদ্র পারস্য ভাষায় কথা বলিতে পারিত। হুগলী বন্দরে অতি গরীব অবস্থায় পৌছিয়া স্থানীয় মুঘল অর্থাৎ পারসিক বণিকদের নিকট হইতে মালপত্র লইয়া, তাহা বাড়ি বাড়ি ফিরি করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করিত। এই সূত্রে নবাব সুজা খাঁর জামাতা রুস্তম-জঙ্গের সহিত পরিচিত হইয়া, মিষ্ট কথায় তাঁহার মনের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া, তাঁহার অধীনে চাকরি পাইল। যখন রুস্তম-জঙ্গ ঢাকার শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হন, তিনি মীর হবিবকে তাঁহার নায়েব করিয়া সঙ্গে লইয়া যান। মীর হবিব হিসাব-পত্র সূক্ষ্মভাবে দেখিয়া মিতব্যয়িতা দ্বারা এবং চুরি বন্ধ করিয়া সরকারী আয় অনেক বৃদ্ধি করে, এবং ত্রিপুরা রাজ্য আক্রমণ করিয়া বেশ ধনলাভ করে। রুস্তম-জঙ্গ পরে কটকের শাসনকর্ত্তা হইয়া গেলে, মীর হবিব সেখানেও তাঁহার নায়েবের পদ পায়, এবং দক্ষতার সহিত শাসন চালাইয়া, জমিদারদের বাধ্য রাখিয়া, রাজস্ব বাড়াইয়া অত্যন্ত প্রভাবশালী হয়। রুস্তম-জঙ্গের পরাজয় ও পলায়নের পর মীর হবিব আলীবর্দ্দীর অধীনে চাকরিতে প্রবেশ করে, কিন্তু তাঁহার প্রতি অন্তরে বিষম বিদ্বেষভাব পোষণ করিতে থাকে। বর্দ্ধমানের নিকট মারাঠাদের হাতে বন্দী হইবা মাত্র মীর হবিব পূর্ণ ইচ্ছা ও উৎসাহে তাহাদের সঙ্গে যোগ দিল, এমন কি বঙ্গে তাহাদের প্রধান মন্ত্রী ও কার্য্যকারক হইয়া দাঁড়াইল। [রিয়াজ ২৯৯-৩০২]।

মে মাসের প্রথমে যখন নবাব ও সৈন্যগণ কাটোয়া পৌছিয়া দম লইতেছিলেন, তখন মীর হবিব সাত শত উৎকৃষ্ট ঘোড়ায় চড়া মারাঠা সৈন্য সঙ্গে লইয়া রাতারাতি দ্রুত কুচ করিয়া, মুর্শীদাবাদের অপর পারে দাহাপাড়ায় পৌছিয়া, তথাকার বাজার পোড়াইয়া দিয়া, ভাগীরথী নদী পার হইয়া মুর্শীদাবাদ শহরে ঢুকিল। কেল্লার নিকট তাহার ভ্রাতা মীর শরিফের বাড়িতে হবিবের স্ত্রীপরিবার এবং সম্পত্তি ছিল। হবিব তাহাদের লইয়া গেল। এই সময় আলীবর্দ্দীর ভ্রাতা হাজী আহ্‌মদ শহর-রক্ষায় অসমর্থ হইয়া ভয়ে কেল্লায় লুকাইলেন। কেহই মারাঠাদের বাধা দিতে বা সম্মুখে আসিতে সাহস পাইল না। শহরের চারিদিকে কোন দেয়াল বা পরিখা ছিল না মীর হবিব ফতেচাঁদ জগৎ শেঠের বাড়ি লুঠিয়া প্রায় তিন লক্ষ টাকা পাইল। অন্যান্য মহল্লায় ধনীদের বাড়ি লুঠ করিয়া মারাঠারা তিরত-কোনায় (লালবাগের ৪ মাইল উত্তর-পশ্চিমে, এবং গঙ্গার অপর পারে) রাত্রে বিশ্রাম করিতে গেল। কিন্তু ইতিমধ্যে কাটোয়ায় আলীবর্দ্দী খাঁ মারাঠা দলের মুর্শীদাবাদের দিকে রওনা হইবার সংবাদ পাইবা মাত্র রাতারাতি দ্রুতবেগে সেইদিকে অগ্রসর হইলেন, এবং শেষরাত্রে মানকরা (বহরমপুর কাণ্টনমেণ্ট হইতে ৪ মাইল দক্ষিণে) পৌছিলেন, এবং প্রভাতে মুর্শীদাবাদ প্রাসাদে ঢুকিলেন। তাঁহার আগমনের সংবাদ পাইবা মাত্র মারাঠারা তিরতকোনো ও আশপাশের গ্রাম পোড়াইয়া দিয়া কাটোয়ায় শীঘ্র ফিরিয়া গেল (৭ই মে)। পূর্ব্বদিনের লুঠের সময় ইংরাজ ফরাসী ও ডচ বণিকগণ কাসিমবাজারে নিজ নিজ কুঠী ছাড়িয়া যথাসম্ভব মালপত্র লইয়া সরিয়া পড়িয়াছিল, কিন্তু নবাব প্রবল হইয়াছেন জানিয়া আবার ফিরিয়া আসিল।

(৪)

ইতিমধ্যে গঙ্গার পশ্চিম পারের জেলাগুলিতে মারাঠা সৈন্য লুঠ করিবার জন্য ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। তাহারা যে কিরূপে নানা নিষ্ঠুর অত্যাচার করিয়া টাকা আদায় করিত, স্ত্রীলোকদের দলবদ্ধভাবে ধর্ম্মনাশ করিত, ঘরবাড়ি পোড়াইত, তাহার হৃদয়বিদারক বর্ণনা সাহিত্য-পরিষৎ দ্বারা প্রকাশিত "মহারাষ্ট্র পুরাণে" আছে। এই বইটি পড়িলে কোন ভুক্তভোগীর রচনা বলিয়া বিশ্বাস হয়। আর একজন সেই সময়কার সাক্ষী, গুপ্তপাড়ানিবাসী কবি বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার, তাঁহার "চিত্রচম্পূ"কাব্যে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, গর্ভবতী স্ত্রীলোক, অপোগণ্ড শিশু প্রভৃতি সকল শ্রেণীর দয়ার পাত্রের প্রতি মারাঠাদের হৃদয়হীন অত্যাচার কাহিনী লিখিয়া গিয়াছেন। ইংরাজ কুঠীর কাগজপত্রেও বর্গীর হাঙ্গামার ফলে দেশ উৎসন্ন যাওয়া, বাণিজ্য বন্ধ, লোকের পলায়ন, এবং সর্ব্বত্র ভয়ের সঞ্চারের অনেক উল্লেখ দেখা যায়। বর্দ্ধমানে প্রথম বর্গী আসিবার

সংবাদেই (এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি) ইংরেজেরা কলিকাতার পুরাতন দুর্গের স্থানে স্থানে মেরামত আরম্ভ করিয়া দেন, কিন্তু বর্গীরা ফিরিয়া গেলে ১৭ই মে এই ব্যয়সাধ্য কাজ বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল। ঐ সময় শহর-রক্ষার জন্য দুই শত "বক্সরিয়া" বন্দুকধারী সৈন্য নিযুক্ত করা হয়, কিন্তু ১৭ই জুন তাহাদের আর আবশ্যক নাই বলিয়া ছাড়াইয়া দেওয়া হইল। মীর হবিব হুগলী দখল করিবার পর কলিকাতার ভয় বাড়িল, কিন্তু সুচতুর ইংরাজ নেতা (প্রেসিডেণ্ট অব কাউন্সিল) মীর হবিবকে ৪,৩১৭ টাকা (নামে মাত্র ঋণ বলিয়া) দিয়া হাত করিলেন।

(৫)

মে মাসের প্রথমে নবাব রাজধানীতে আসিলেন। বর্গীরা কাটোয়ায় ফিরিয়া গেল। কিছুদিন পরেই বর্ষা আরম্ভ হইবে এবং এই নদী-খাল-বিলে-ভরা বঙ্গদেশে সে সময় মারাঠা অশ্বারোহীরা যাতায়াত করিতে বা ঘোড়াকে খাওয়াইতে পারিবে না বলিয়া ভাস্কর বীরভূমের পথে নিজরাজ্যে রওনা হইল। কিন্তু মীর হবিব বীরভূম হইতে তাহাকে ধমকাইয়া এবং নানা প্রলোভন দেখাইয়া ফিরাইয়া আনিল (জুন)। কাটোয়া মারাঠাদের কেন্দ্র আর মীর হবিব তাহাদের প্রধান মন্ত্রী হইল ("মদার্-উল্ মহাম্"—সিয়র ১২২)। গঙ্গার পশ্চিমের জেলাগুলি তাহাদের হাতে পড়িল।

"তাহাদের থানা নানা স্থানে ছড়াইয়া রহিল, রাজমহল হইতে মেদিনীপুর ও জালেশ্বর পর্য্যন্ত বর্গীদের দখলে আসিল। ধনী ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা গৃহত্যাগী হইয়া গঙ্গার পূর্ব্বপারে আসিয়া প্রাণ ও মান বাঁচাইল।"
[সলিমুল্লা]

হুগলী বন্দরে মীর হবিবের অনেক পুরাতন বন্ধু, বিশেষতঃ পারস্যদেশীয় বণিক, ছিল। তাহাদের মধ্যে মীর আবুল হসন প্রধান। এই লোকটির নিকট গোপনে দূত পাঠাইয়া হবিব এক ষড়যন্ত্র করিল। হুগলীতে নবাবপক্ষের শাসনকর্ত্তা মুহম্মদ রেজা মদ্যপান ও নাচগানে মগ্ন থাকিত। নির্দ্দিষ্ট রাত্রে মারাঠা সর্দ্দার শেষ রাওএর অধীনে দু-হাজার অশ্বারোহী সঙ্গে লইয়া মীর হবিব হুগলী দুর্গের বাহিরে উপস্থিত হইল। আবুল হসন গিয়া মুহম্মদ রেজাকে সংবাদ দিল, "আপনার পুরাতন বন্ধু মীর হবিব দেখা করিবার জন্য ইচ্ছুক।" মদিরামত্ত কর্ম্মচারী বিনা-সন্দেহে দুর্গদ্বার খুলিবার হুকুম দিল, আর অমনি মীর হবিব ও মারাঠারা বেগে ঢুকিয়া দুর্গ দখল এবং নবাবের কর্ম্মচারীদের বন্দী করিল। হুগলীতে মারাঠা শাসন আরম্ভ হইল। শেষ রাওএর ন্যায়পরায়ণতা দয়া ও ভদ্র ব্যবহারে স্থানীয় লোকেরা, ঐ অঞ্চলের জমিদারগণ, এমন কি ইউরোপীয় বণিকগণও তাহার বাধ্য হইল। মীর হবিব কখনও হুগলীতে কখনও ভাস্করের নিকট কাটোয়ায় গিয়া থাকিত, এবং মারাঠাদের পক্ষে বাংলার দেওয়ান হইয়া জমিদারদের ডাকিয়া খাজনা আদায়ের বন্দোবস্ত করিত। সে কার্য্যতঃ এই দেশে অর্থাৎ পশ্চিম-বঙ্গে রাজপ্রতিনিধির মত চলিতে লাগিল। ঐ অঞ্চলে নবাবের আমল লোপ পাইল। মীর হবিব হুগলী অধিকারের ফলে সেখান হইতে কয়েকটি তোপ এবং একখানা যুদ্ধ জাহাজ (স্লুপ) লইয়া গিয়া কাটোয়ায় রাখিয়া মারাঠাদের যাহা একেবারেই হাতে ছিল না এবং পাইবার আশাও স্বপ্নাতীত, সেই দুই অস্ত্র এইরূপে জুটাইয়া দিয়া তাহাদের বলবৃদ্ধি করিল।

জুন জুলাই মাসে কলিকাতা হইতে কাপ্তেন হলকোম্-এর অধীনে ১৮০ জন সৈন্য মরিচায় পাঠাইয়া দেওয়া হইল। তাহারা আড়ঙ্গ হইতে আগত মাল পথে রক্ষা করিল, পাটনা ও কাসিমবাজার হইতে প্রেরিত দলের ভার লইয়া তাহাদের বলবৃদ্ধি করিল এবং মারাঠারা তাহাদের ছাড়িয়া নদীর উজানের জেলাগুলিতে যে যাইবে সে পথ বন্ধ করিল। আর, এই গোলযোগে নবাব-চৌকীর কর্ম্মচারী ও সৈন্যগণ লোকের মালপত্র লুঠ করিবার যে চেষ্টায় ছিল তাহাতে বাধা দিল। বর্গীরা বাংলা ছাড়িলে পর, সেই বৎসরের শেষে এই সৈন্যদল কলিকাতা ফিরিয়া আসিল।

(৬)

এদিকে আলীবর্দ্দী দিবারাত্রি বর্গীদের দেশ হইতে তাড়াইবার ভাবনায় আছেন। তিনি পাটনা ও পূর্ণিয়া

প্রদেশে নিজ নিজ নায়েবদের সৈন্য পাঠাইবার জন্য তাগিদ করিয়া পত্র লিখিলেন। ঐ দুই স্থান হইতে নূতন সৈন্য আসিয়া তাঁহার সঙ্গে জুটিল। ইতিমধ্যে মীর হবিব গঙ্গার উপর নৌকা দিয়া সেতু বাঁধিয়া বর্গীদের পার হইবার সুবিধা করিয়া দিয়াছিল, সেই উপায়ে তাহারা গঙ্গার পূর্ব্বপারে পলাশী, দাউদপুর পৌঁছিয়া লুঠপাট ও গৃহদাহ করিল, এমন কি কাসিমবাজারে পর্য্যন্ত আতঙ্ক পৌঁছাইল। কিন্তু নবাব অমনি সসৈন্যে তারকপুরে আসায় বর্গীরা তাহাদের থানা উঠাইয়া নদী পার হইয়া কাটোয়ায় পলাইয়া গেল।

তখনও বর্ষা শেষ হয় নাই। ভারতবর্ষে সর্ব্বত্রই এই নিয়ম পুরাতন কাল হইতে চলিয়া আসিয়াছে যে দশহরার পর জলকাদা শুকাইলে এবং নদীগুলির জল কমিয়া সহজে পার হইবার উপযোগী হইলে, তবে যুদ্ধযাত্রা করিতে হয়। কিন্তু পাটনা ও পূর্ণিয়া হইতে সৈন্য আসিবামাত্র আলীবর্দ্দী দশহরার জন্য অপেক্ষা না করিয়া বর্গীদের বিরুদ্ধে রওনা হইলেন। প্রথমতঃ মুর্শীদাবাদ জেলার পশ্চিমাংশ হইতে মারাঠাদের থানা তাড়াইয়া দিয়া কাটোয়ার সম্মুখে গঙ্গার পূর্ব্ব পারে (রহনপুর) মুর্চ্চা বাঁধিয়া কাটোয়ায় শত্রুশিবিরে তোপ চালাইতে লাগিলেন।

কাটোয়া শহরের পূর্ব্বদিকে গঙ্গা প্রবাহিত আর উত্তর ও কিছু পশ্চিম দিক অজয় নদী বেড়িয়া আছে। কাটোয়ার ঠিক পূর্ব্ব পাশে গঙ্গায় হুগলী হইতে আনীত জাহাজখানি খাড়া থাকায় আলীবর্দ্দীর পক্ষে সেখানে নদী পার হওয়া অসম্ভব হইল। নবাব তখন উত্তরদিকে অনেকদূর উজাইয়া উদ্ধরণপুরে গঙ্গার উপর বড় বড় নৌকা দিয়া এক সেতু বাঁধিয়া শত্রুর অগোচরে নিজ সৈন্য পার করিয়া গঙ্গার পশ্চিম কূলে এবং অজয়ের উত্তর পারে আনিয়া ফেলিলেন। আশ্বিন অষ্টমীর এক রাত্রে মাঝারি আকারের নৌকা দিয়া অজয়ের উপর আর একটি পুল বাঁধিলেন। বার হাজার বেলদারের পরিশ্রমে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে সেতুটি সম্পূর্ণ হইল। ইহা মারাঠা শিবিরের আধক্রোশ দূরে, কিন্তু তাহারা কিছুই জানিতে পারিল না। দেশময় জমিদারদের নিকট হইতে জোর-জবরদস্তির সঙ্গে চাঁদা ও ভোগের দ্রব্য আদায় করিয়া ভাস্কর সেখানে (ডাঁইহাটে) মহাসমারোহে জগজ্জননীর পূজায় ব্যস্ত ছিল। সপ্তমী অষ্টমী নির্ব্বিঘ্নে কাটিয়া গেল। অষ্টমীর শেষে গভীর অন্ধকার রাত্রে মশালের আলোয় নিঃশব্দে অজয়ের উপর ঐ পুল দিয়া পার হইয়া দুই তিন হাজার বাছা বাছা নবাব-সৈন্য অতি প্রত্যূষে কাটোয়ায় মারাঠা শিবির আক্রমণ করিল। ভীষণ কোলাহল ও গণ্ডগোল উঠিল। মারাঠারা শত্রু কত আসিয়াছে তাহা দেখিবার অবসর না পাইয়া, নবাব সমস্ত সেনা লইয়া উপস্থিত হইয়াছেন এই ভাবিয়া দিশাহারা হইয়া পলাইয়া গেল। তাহাদের সব সম্পত্তি ও শিবির নবাব-সৈন্য লুঠিয়া লইল। প্রভাত হইবার পর নবাব বিজয়-সংবাদ পাইয়া নিজের চড়িবার নৌকায় করিয়া ক্রমাগত সৈন্য, ঘোড়া, হাতী ও তোপ অজয় পার করিয়া পাঠাইতে লাগিলেন, এবং সর্ব্বশেষে নিজে আসিয়া পলাতক বর্গীদের কিছুদূর পর্য্যন্ত তাড়া করিলেন। (২৭ সেপ্টেম্বর ১৭৪২)। দু-পক্ষেই খুব কম লোক মারা গেল। মারাঠারা সব ছাড়িয়া পাচেটে এবং পরে রামগড়ে (হাজারিবাঘ জেলায়) পলাইয়া গেল; তাহাদের থানাগুলি বর্দ্ধমান, হুগলী হিজলী ও অন্যান্য জেলা হইতে সরিয়া পড়িল। ঘন জঙ্গলের জন্য আলীবর্দ্দী তাহাদের বেশীদূর পশ্চাদ্ধাবন করিতে পারিলেন না। আর তাহারাও নিজদেশের দিকে সহজে অগ্রসর হইতে পারিল না। তখন মীর হবিবের পরামর্শে ভাস্কর দক্ষিণ দিকে ঘুরিয়া বিষ্ণুপুর ও চন্দ্রকোণা হইয়া মেদিনীপুরে আবার মাথা খাড়া করিল। রাধানগর এবং অন্যান্য শহর লুঠিয়া পোড়াইয়া নারায়ণগড়ে বসিয়া রহিল। একদল মারাঠা অগ্রগামী সৈন্য জাজপুরের যুদ্ধে কটকের নায়েব সুবাদার শেখ মাসুমকে পরাস্ত ও নিহত করিয়া কটক দখল করিল। আলীবর্দ্দী ভাস্করের গতিবিধির সংবাদ পাইয়া পাচেট হইতে ফিরিয়া মেদিনীপুরের দিকে রওনা হইলেন। এই সংবাদে ভাস্কর বালেশ্বরের পথ ধরিল। যখন নবাব মেদিনীপুর হইতে দুই ক্রোশ দূরে পৌঁছিলেন ভাস্কর ফিরিয়া আসিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিল, কিন্তু পরাস্ত হইয়া ক্রমাগত পলাইতে লাগিল। নবাবও তাহার পিছু পিছু অবিরাম চলিতে লাগিলেন।

এইরূপে বর্গীদের চিল্কাহ্রদ পার করিয়া দাক্ষিণাত্যে তাড়াইয়া দিলেন (ডিসেম্বর)। তাহার পর কিছুদিন কটকে কাটাইয়া আলীবর্দ্দী খাঁ ১৭৪৩ সালের ফেব্রুয়ারির ৯ই ১০ই মুর্শীদাবাদে ফিরিলেন।

(৭)

ইতিমধ্যে বাংলার এক অভাবনীয় বিপদ উপস্থিত হইয়াছিল। বর্গীর প্রথম আক্রমণে আলীবর্দ্দী দিল্লীর বাদশাহের নিকট সাহায্য চাহিয়া দরখাস্ত পাঠান। বাদশাহ তাঁহার অযোধ্যার সুবাদার সফদর-জঙ্গকে গিয়া বিহার প্রদেশ রক্ষা করিতে আজ্ঞা দিলেন। সফদর-জঙ্গ নিজ রাজধানী ফয়জাবাদ হইতে রওনা হইলেন। সঙ্গে ছ-হাজার পারসীক সৈন্য (ইহারা নাদির শাহের রক্ত-পিপাসু পূর্ব্বতন অনুচর), দশ হাজার পরিপক্ক হিন্দুস্থানী অশ্বারোহী, এবং বড় বড় তোপ। কিন্তু তাঁহার সেনারা ঘোর উচ্ছৃঙ্খল, কাহাকেও মানিত না। তাহারা বিহারের লোকদের উপর নানা অত্যাচার করিতে লাগিল; (৭ই ৮ই ডিসেম্বর পাটনায় আগমন)। গুজব রটিল যে বাদশাহ সফদর-জঙ্গকে বাংলা বিহারের সুবাদারীর সনদ দিয়াছেন। সফদর জঙ্গও পাটনায় পৌছিয়া যেন তিনিই ঐ দেশের প্রভু এরূপ ব্যবহার করিতে লাগিলেন, সরকারী সম্পত্তি আত্মসাৎ করিলেন। আলীবর্দ্দীর মহা বিপদ, এদিকে দক্ষিণে মারাঠাদের ঠেকাইয়া রাখিতেছেন, আর তখন বন্ধুভাবে আগত এক শত্রু পশ্চিমে তাঁহার রাজ্য কাড়িয়া লইতে চাহিতেছে। তিনি সফদর-জঙ্গকে লিখিলেন যে তাঁহার মুর্শীদাবাদের দিকে আসার আবশ্যক নাই, কারণ আলীবর্দ্দী একমাত্র ঈশ্বরের উপর নির্ভর করেন, বর্গী তাড়াইবার জন্য কোন মানবের সাহায্য চান না। বাংলার সৌভাগ্যক্রমে সফদর-জঙ্গেরও দুটি প্রবল ভয়ের কারণ ছিল। এলাহাবাদের বাদশাহী সুবাদার তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী ও শত্রু, অযোধ্যার বিদ্রোহী সামন্ত-দিগকে তলে তলে উত্তেজিত করিতে উদ্যত। আর, বাদশাহের আহ্বানে পেশোয়া বালাজী রাও রঘুজীকে তাড়াইবার জন্য বিহারে আসিতেছেন; সফদর-জঙ্গের সহিত ইঁহার সম্বন্ধ বন্ধুত্বের বিপরীত। সুতরাং অমনি মুঙ্গেরের নিকট গঙ্গা পার হইয়া তিনি নিজ প্রদেশে ফিরিয়া গেলেন (জানুয়ারি ১৭৪৩-র মাঝামাঝি)। পাটনার লোকদের প্রাণ বাঁচিল।

(৮)

ফেব্রুয়ারির প্রথম দিকে বালাজী ৪০ হাজার সৈন্য লইয়া বিহারে প্রবেশ করিলেন। পথে যে কর বা ভেট দিল সেই বাঁচিল, আর যে না দিল তাহার সর্ব্বস্ব লুঠ হইল। যাহারা নিজসম্পত্তি রক্ষার চেষ্টা করিল, তাহারা যুদ্ধে মারা পড়িল! কিন্তু বালাজী পাটনা শহরে আসিলেন না; দাউদনগর হইতে টিকারী গয়া মানপুর ও বিহার হইয়া বাংলার পথ ধরিলেন এবং মুঙ্গের ভাগলপুর দিয়া অগ্রসর হইয়া জঙ্গল পর্ব্বত পার হইয়া বীরভূমে দেখা দিলেন এবং তাহার পর মুর্শীদাবাদের দিকে রওনা হইলেন। ইতিমধ্যে ভাস্করের আহ্বানে রঘুজী রামগড়ের পথে আবার কাটোয়ায় আসিয়া উপস্থিত (মার্চ্চ, ১৭৪৩)। বাংলায় দুইটি প্রকাণ্ড এবং পরস্পর-বিরোধী মারাঠা সৈন্যদলের সমাবেশ হইল। ইহাদের সংঘর্ষ কি ভীষণ এবং ইহাদের সম্মিলিত আক্রমণ হইলে কি ভীষণতর বিপদ এই প্রদেশের উপর আনিয়া দিবে!

আলীবর্দ্দী খাঁ আমিনাগঞ্জে মুর্চ্চা বাঁধিয়া সতর্ক হইয়া ছিলেন। সেখান হইতে পাচ ক্রোশ অগ্রসর হইয়া শুনিলেন যে বালাজী আরও পাচ ক্রোশ দূরে গঙ্গাতীরে পৌছিয়াছেন। নবাব অমনি নিজ জমাদার ঘুলাম মুস্তাফা এবং বালাজী রাওএর নিকট হইতে আগত দূত গঙ্গাধর রাও ও অমৃত রাওকে পেশোয়ার অগ্রগামী সেনার অধ্যক্ষ পিলাজী যাদবের নিকট পাঠাইলেন। পিলাজী আসিয়া নবাবের সহিত দু-ঘণ্টা আলোচনা করিয়া এবং পরস্পর বন্ধুত্বের শপথ ও আশ্বাসবাণী বিনিময় করিয়া বিদায় লইল। তাহার পর তিন ক্রোশ অগ্রসর হইয়া নবাব লাওয়া নামক গ্রামে শিবির স্থাপন করিলেন, সেখান হইতে বালাজীর শিবির তিন ক্রোশ দূরে। এই দুই স্থানের মধ্যে উভয়ের সাক্ষাতের জন্য তাঁবু খাটান হইল। বালাজী, পিলাজী যাদব, মলহার হোলকার এবং অন্যান্য সরদারদের সঙ্গে লইয়া মিলনের স্থানের দিকে

অগ্রসর হইলেন। বালাজী দাউদপুর পৌঁছিলে নবাব ঘুলাম মুস্তাফা খাঁকে অগ্রে পাঠাইয়া দিয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিলেন, এবং নিজে তাঁবু হইতে বাহির হইয়া কিছুদূর পর্য্যন্ত হাতীতে চড়িয়া গেলেন। পরস্পরের দেখা হইলে তাঁহারা দু-জনে হাতী হইতে নামিয়া আলিঙ্গন করিলেন এবং একত্রে তাঁবুতে বসিলেন। কথাবার্ত্তার পর তিনি বালাজীকে চারিটা হাতী, দুইটি মহিষ এবং পাঁচটি ঘোড়া উপহার দিয়া বিদায় দিলেন।

বাংলা দেশ হইতে সরকারী সংবাদ-লেখক দিল্লীর বাদশাহের নিকট যে বিবরণ (আখ্‌বারাৎ) পাঠায় তাহা উপরে দেওয়া হইল। ইংরাজ কুঠীর চিঠিতে জানা যায় যে, এই সাক্ষাৎ ৩১এ মার্চ্চ পলাশীতে ঘটে, এবং এই আলোচনার ফলে নবাব শাহু রাজাকে বাংলার জন্য চৌথ এবং বালাজীকে তাঁহার সৈন্যদের খরচ বাবতে বাইশ লক্ষ টাকা দিতে সম্মত হন, আর বালাজীও রঘুজীর সহিত চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করিয়া দিবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞা করেন। সিয়রের বিবরণ (১৩১ পৃ.) কিছু বিভিন্ন:—বালাজী মানকরার নিকট সেনানিবাস স্থাপন করেন, এবং প্রথম দিন আলীবর্দ্দী আসিয়া তাঁহার সহিত দেখা করেন ও পরদিন পেশোয়া নবাবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান। অসহায় নবাব নগদ চৌথ দিতে বাধ্য হন।

তাহার পর দুই মিত্র সসৈন্যে রঘুজীকে তাড়াইবার জন্য মুর্শীদাবাদ জেলা হইতে রওনা হইলেন। রঘুজী কাটোয়া ও বর্দ্ধমানের মধ্যে তাঁবু খাটাইয়া ছিলেন, শত্রুর আগমনের সংবাদে বীরভূমে পলাইয়া গেলেন। দুই-এক দিন কুচ করিবার পর বালাজী বলিলেন যে নবাবের সৈন্যগণ মারাঠাদের মত দ্রুত অগ্রসর হইতে পারে না, সুতরাং রঘুজীকে ধরিতে হইলে, তাঁহাকে একা অগ্রসর হইতে হইবে। তাহাই হইল; পরদিন ১৬ই (এপ্রিল) বালাজী দ্রুত কুচ আরম্ভ করিয়া কয়েক দিনের মধ্যে রঘুজীর সৈন্যের নিকট পৌঁছিয়া তাহাদের পরাজিত করিয়া* পর্ব্বতের পথে পলাইতে বাধ্য করিলেন। রঘুজীর শিবির ও সৈন্যদের সম্পত্তি প্রায় সবই পেশোয়ার হস্তগত হইল। [সিয়র ১৩১]

তাহার পর আলীবর্দ্দী কাটোয়ায় ফিরিয়া (২৪ এপ্রিল) শহরের তিন দিকে মূর্চ্চা বাঁধিয়া অজয় নদীর সঙ্গে যোগ করিয়া দিলেন এবং বর্গীদের খবরের অপেক্ষায় বসিয়া রহিলেন। বালাজীর দূত আসিয়া সংবাদ দিল যে রঘুজী মানভূম পার হইয়া সম্বলপুরের পথে থামিয়াছেন, এবং বালাজী পাচেট হইতে আট ক্রোশ দূরে পৌঁছিয়াছেন। কিছুদিন পর বালাজী গয়ায় গিয়া তীর্থকর্ম্ম করিয়া নিজ দেশে ফিরিয়া গেলেন, আর রঘুজী ও ভাস্কর মেদিনীপুর অঞ্চলে আবার মাথা তুলিল এবং নবাবের নিকট চৌথ দাবি করিয়া পাঠাইল।

বঙ্গে ১৭৪৩ সালের মার্চ্চ হইতে মে মাস পর্য্যন্ত মারাঠা-আক্রমণের প্রণালী ও ফল ঠিক পূর্ব্ব বৎসরের মতই। ইংরাজ কুঠীর চিঠিতে তাহার এইরূপ বর্ণনা আছে:—'লুঠ ও ধ্বংস করা ভিন্ন আর কিছুই ঘটিল না। অনেক শহর সত্যসত্যই পোড়াইয়া দিল। নবাবের সৈন্যগণও খুব লুঠ করিল। কলিকাতা কাসিমবাজার ও পাটনায় আমাদের কারবার কিছুদিনের জন্য একেবারে বন্ধ হইয়া গেল।...কলিকাতায় এক শত বক্‌সরিয়া সৈন্য নিযুক্ত করা হইল, এবং ৪ঠা এপ্রিল স্থানীয় সাহেবদের লইয়া এক মিলিশিয়া গঠন করা হইল।...কলিকাতার বণিকগণ প্রস্তাব করিল যে তাহাদের বাড়িঘর রক্ষা করিবার জন্য তাহারা নিজের খরচে শহর ঘিরিয়া একটা খাল খুঁড়িবে। আমাদের কাউন্সিল ২৯এ মার্চ্চ এই প্রস্তাব মঞ্জুর করিয়া চার জন প্রধান লোকের জামিনে তিন মাসে শোধ দিবার সর্ত্তে ২৫,০০০ টাকা ধার দিল। ৩রা ফেব্রুয়ারি ১৭৪৪-এর মধ্যে ঐ খাল ("মারাঠা ডিচ") ফোর্টের দরওয়াজা হইতে হ্রদ (সল্ট লেক্)এর দিকে যাইবার বড় রাস্তা পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ হইয়াছে। এখন গোবিন্দপুরে কোম্পানীর সীমানা পর্য্যন্ত তাহা লইয়া যাইবার কাজ আরম্ভ হইয়াছে।"

[ঐ ফোর্ট বর্ত্তমান জেনেরাল পোষ্টাপিসের জায়গায় ছিল।]

* আখ্‌বারতে বালাজী বাদশাহকে জানাইতেছেন, "রঘুজীর অনেক সর্দ্দার তাহার সঙ্গে ছাড়িয়া দিয়াছে, তাহারা নিজের মধ্যে যুদ্ধ করিয়াছে এবং অনেক মারাঠা হতাশায় ডুবিয়া গিয়াছে।"

বাঘ

শ্রীমনোজ বসু

হরিপুর গ্রামে এ রকম অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার কোনো দিন ঘটে নাই।

সকাল বেলা তিনকড়ি বাঁড়ুয্যে মহাশয় গাড়ু হাতে বাঁশ-বাগানের মধ্যে যাইতেছিলেন, এমন সময় যেন একটা কেঁদো বাঘ ডাকিয়া উঠিল। বাঁড়ুয্যে গাড়ু ফেলিয়া তিন লাফে বাগান পার হইয়া রাস্তায় আসিয়া পড়িলেন। ডাকটা কোন্ দিক্ হইতে আসিল তাহা সঠিক সাব্যস্ত করিতে পারিলেন না। কোন্ দিকে যে চূড়ান্ত নিরাপদ জায়গা তাহা নিরূপণ করিবার জন্য এদিক্ ওদিক্ তাকাইতেছেন, এমন সময় দেখা গেল জাল কাঁধে ছিদাম মাল উত্তর-মুখো বিলের দিকে চলিয়াছে।

"শুনিস্ নি ছিদাম ?"

ছিদাম কিছু শুনিতে পায় নাই।

"শেষকালে দিনমানেও কেঁদো ডাকতে আরম্ভ করলে! বিলকোলাচে পাতি বনের দিক্‌টায়—" কথার মাঝখানেই পুনরায় বাঘের ডাক এবং যেন আরও একটু নিকটে। ছিদামের মাছ ধরা হইল না, ফিরিল—পা-গুলি একটু ঘন ঘন ফেলিয়াই। বাঁড়ুয্যে মহাশয়ের বয়স হইয়াছে এবং বাতের দোষ আছে, তিনি ত দৌড়াইতে পারেন না।

কোনোগতিকে মিত্তিরদের চণ্ডীমণ্ডপের রোয়াকে উঠিয়া দেখিলেন, এক পাশে পাইক নিমাই বৈরাগী হুঁকা শোলক করিতেছে এবং ভিতরে রামমিত্তিরের সেজ ছেলে বুধো তারক চক্কোত্তির সঙ্গে দাবা খেলিতেছে। বাঁড়ুয্যে বাঘের বিবরণ আদ্যোপান্ত বলিলেন। তিন জনেই জোয়ান। বুধো এক দৌড়ে বাড়ির ভিতর হইতে সড়্‌কী বাহির করিয়া আনিল, নিমাই পাইক লইল তাহার পাঁচহাতি লাঠি. এবং হাতের কাছে জুতসই আর কোনো অস্ত্র না দেখিয়া তারক চক্কোত্তি একটানে একটা জিওলের বড় ডাল ভাঙিয়া কাঁধে করিল।

তিন বীরপুরুষ বাহির হইয়া পড়িল—আগে তারক, মাঝে বুধো, শেষে নিমাই।

"ঐ—ঐ—" আবার বাঘ ডাকে।

একেবারে পাড়ার মধ্যে! দীঘির পাড়ে কিংবা চন্দ ভুঁইয়ের মধ্যে। সর্ব্বনাশ—দিন দুপুরে হইল কি? তারক পিছাইয়া পড়িল। মাত্র জিওলের ডাল সম্বল করিয়া গোঁয়ার্ত্তুমিটা কিছু নয়। নিমাই কহিল, "ফেরা যাক্ সেজ-কর্ত্তা, পাড়ার সবাইকে ডেকে আনি—" বুধো তাড়া দিয়া উঠিল। কিন্তু আর আগাইল না, সড়্‌কীটা শক্ত করিয়া ধরিয়া সন্তর্পণে সেখানে দাঁড়াইল।

"ঐ—", ফের।

একেবারে আসিয়া পড়িয়াছে। আমবাগানের আড়ালে—দশহাতও হইবে না। বাবা রে! তারক ও নিমাই দৌড় দিল। বুধো একা একা কি করিবে কিছুই ঠিক করিতে পারিতেছে না, এমন সময়ে মোড় ঘুরিয়া সাম্‌নে আসিয়া পড়িল—

বাঘ নয়, দু-জন মানুষ!

একজনের মাথার উপরে চৌকা লাল্‌চে রঙের কাঠের ছোট বাক্স, বাক্সের উপরে গামছায় বাঁধা পুঁটুলী। অপরের বাঁ হাতে হুঁকা, ডান হাতে অবিকল ধুতুরা ফুলের মত গড়নের বৃহদাকার একটি চোঙা। সেই চোঙা এক একবার মুখে লাগাইয়া শব্দ করিতেছে আর যেন সত্যকার বাঘের আওয়াজ হইতেছে।

বুধো লোক দুইটিকে সঙ্গে লইয়া বাহিরের উঠানে দাঁড়াইল।

বাঁড়ুয্যে তখনও সেখানে ছিলেন। ইতিমধ্যে গ্রামের আরও দু'চারজন জুটিয়াছে। বাঘের গল্প হইতেছে—পাঠশালায় পড়িবার সময় একবার বাঁশের বাড়ি দিয়া ঘনশ্যাম মিত্তির একটা গোবাঘার সামনের দাঁত ভাঙিয়া দিয়াছিলেন—সেই সব অনেককালের কথা। গল্প ভাল জমিয়াছে, এমন সময়ে উহারা আসিল।

"কি আছে তোমাদের ওতে ?"

"গ্রামোফোন—গান আছে, এক্‌টো আছে, সাহেব-মেমের হাসি—একেবারে যেন ঠিক্ সত্যি, ছাদ ফেটে যাবে মশাই—"

বাঁড়ুয্যে বলিলেন,—"তুমি আর নতুন কি শোনাবে, বাপু? আমাদের এই গাঁয়ে যাত্রা বল, আর ঢপ্ কবি বৈঠকী বল, কোন কিছু বাকী নেই। গেলবারেও ঠাকুরবাড়ি যাত্রা হয়ে গেল—নীলকণ্ঠ দাসের দল। নীলকণ্ঠ দাসের নাম শোনোনি—হাকোবার নীলকণ্ঠ ?"

রাম মিত্তির বলিলেন,—"সাহেব মেম ত ইংরেজীতে হাসে। ও ইংরেজী-মিংরেজী আমরা কেউ বুঝতে পারব

না। তবে গান এক্‌টো—তা তুমি কি একলাই সব কর ? কিসের দল বল্‌লে তোমার ?"

চোঙা-হাতে লোকটি বলিল,—"গ্রামোফোন—কলের গান। আমি কিছু কর্‌ব না মশাই, সব এই কল দিয়ে করাব—" বলিয়া সে সঙ্গীর মাথার বাক্সটি দেখাইল।

পিরোনাথ থামের আড়ালে দাঁড়াইয়া তামাক খাইতেছিল গ্রামসম্বাদে রাম মিত্তিরের ভাইপো বলিয়া তাহার সাম্‌নে তামাক খায় না। একটা শেষ টান মারিয়া একটু আগাইয়া হুঁকাটা অশ্বিনী শীলের হাতে দিয়া সে বলিল,—"তোমার ঐ বাক্স এক্‌টো কর্‌বে। কাঠে কখনও কথা কয় ? মন্তোর-তন্তোর জান বুঝি ?"

বামুনপাড়ার নিত্যঠাকরুণ দীঘির ঘাটে স্নান করিয়া ঘড়াঘটী হাতে সবেগে মন্ত্র পড়িতে পড়িতে পথের সকল অশুচিতা হইতে আত্মরক্ষা করিয়া চলিতেছিলেন। কথাটা তাঁহার কানে গেল। মন্ত্র থামাইলেন না, কিন্তু দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া বৃত্তান্তটা শুনিলেন। এপাড়া ওপাড়ায় অবিলম্বে রাষ্ট্র হইয়া গেল—মিত্তিরবাড়ি এক আশ্চর্য্য কল আসিয়াছে, তাহা মানুষের মত গান গায় ও এক্‌টো করে। খুকীরা এবং যেসব ছেলে পাঠশালায় যায় না সকলেই ছুটিল। যাহাদের বয়স হইয়াছে তাহারা অবশ্য এমন গাঁজাখুরী গল্প বিশ্বাস করিল না—তবু দেখিতে গেল।

চোঙাওয়ালা লোকটার নাম হরসিত—জাতে পরামাণিক। উঠানে বেশ ভিড় জমিয়া গিয়াছে। সে কিন্তু নিতান্তই নিস্পৃহভাবে তামাক খাইতেছে ; এত যে লোক জমিয়াছে তাহার যেন নজরেই আসিতেছে না। চক্কোত্তিদের বুঁচি খানিক আগে আসিয়াছে। আঙুল দিয়া টেঁপিকে দেখাইয়া দিল,—ঐ সে কল। কিন্তু টেঁপিকে বোকা বুঝাইলেই হইল ! ছোট চৌকা কাঠের বাক্স—উহাই না-কি আবার গান গায়, যাঃ।

হরসিত চোখ বুজিয়া একমনে হুঁকা টানিয়া টানিয়া তামাকের ধোঁয়ায় পৌষমাসের সকালবেলার মত চারিদিকে নিবিড় কুয়াশা জমাইয়া তুলিল। এ যেন আরব্য উপন্যাসের সেই কলসীর ভিতর হইতে দৈত্য বাহির হওয়া—কেবলই ধোঁয়া, ধোঁয়া—তার মধ্য হইতে হরসিতের আবছায়া মূর্ত্তি। এইবার বুঝি প্রচণ্ড লাফ দিয়া একটা অত্যদ্ভুত কিছু করিয়া বসিবে। কিন্তু সে তাহা কিছু না করিয়া সহসা হুঁকার ভুড়্‌ভুড়ি থামাইল এবং চোখ খুলিয়া বলিল,—"তামাক যে বড় ফ্যাক্‌সা মশাই, গলায় সেঁকও লাগে না।" অমনি দুজন ছুটিল কামারপাড়ায় যাদবের বাড়ি, সে গাঁজা খায়, তাহার কাছে গলা সেঁকিবার উপযুক্ত একছিলিম কড়া তামাক মিলিতে পারে।

সকলে রাম মিত্তিরকে ধরিয়া ব'সল,—"তুমি কায়েতদের সমাজপতি, এ গান তোমাকে দিতে হবে।" রাম মিত্তিরের হইয়া সকলে দর কসাকসি আরম্ভ করিল। টাকায় আটখানি করিয়া গান, দুটাকায় সতেরো খানা অবধি হইতে পারে—তার বেশী নয়। এক্‌টোর দর অনুত্র হইলে বেশী হইত, কিন্তু এতগুলি ভদ্রলোক যখন বলিতেছেন তখন তা আর কাজ নাই। মোটের উপর হরসিতের বিবেচনা আছে। এক টাকায় নয়খানি রফা হইল।

তখন পকেট হইতে একটা চক্‌চকে গোলাকার বস্তু, হাতল, কাঁটার কৌটা প্রভৃতি বাহির করিয়া ধাঁ ধাঁ করিয়া চৌকা বাক্সে হরসিত সেগুলি পরাইয়া ফেলিল, চোঙাটিও বাক্সের গায়ে বসাইল। তারপর গামছার পুঁটুলী খুলিয়া হাত-আয়না চিরুণী ও কাপড় সরাইয়া বাহির করিল কালো কালো পাতলা পাথর।

কাহারও আর নিঃশ্বাস পড়ে না।

হাতল ঘুরাইতে ঘুরাইতে বলিল—"বায়নার টাকা দিন। অগ্রিম দেবেন না, বলেন কি মশাই ? আমার সাহেববাড়ির কল—" থালায় করিয়া টাকাটি আসরের ঠিক মধ্যস্থলেই রাখা হইল, যে যে পেলা দিতে চাহিবে, তাহাদের কাহারও যাহাতে কোনো অসুবিধা না হয়। তারপর হরসিত কলের উপর একখানা পাথর বসাইয়া কি টিপিয়া দিল আর পাথর চরকীর মত ঘুরিতে লাগিল। তারপর সেই ঘুরন্ত পাথরে যেই আর একটা মাথা বসাইয়া দেওয়া, অমনি একসঙ্গে বাজিয়া উঠিল—তবলা বেহালা, ইংরেজী বাজনা, ঢোল, করতাল—বোধ করি, পৃথিবীতে সুর-যন্ত্র যা-কিছু আছে সবগুলিই।

ইতিমধ্যে হৈ হৈ করিয়া একপাল ছেলে আসিয়া পড়িল, এই উপলক্ষ্যে পাঠশালার ছুটি হইয়া গিয়াছে। কিন্তু ছেলেরা আর কতটুকু গণ্ডগোল করিতে পারে ? কলের মধ্যে যেন এককুড়ি পাঠশালায় একত্রে সমস্বরে নামতা পাঠ হইতেছে। হাঁ, কল যে সাহেববাড়ির তাহাতে সন্দেহ নাই। হরসিত বলিয়াছিল,—"ছাদ ফেটে যাবে—" সেইটাই বুঝি বা সত্য সত্য ঘটিয়া বসে।

কিন্তু এত যে গোলযোগ, পাথরখানা বদলাইয়া দিতেই চুপচাপ। ক্রমশঃ শোনা গেল চোঙের ভিতর হইতে একলা গলায় গীত হইতেছে,-"ধিনতা ধিনা পাকা নোনা—" একেবারে স্পষ্ট আর অবিকল মানুষের গলা ! মানুষ দেখা যায় না, অথচ মানুষই গাহিতেছে। মণ্টুর অনেকক্ষণ হইতে মনে হইতেছিল ঐ চোঙার ভিতরে কাহারা বসিয়া বসিয়া বাজাইতেছে—

ঠিক তাহার বুড়োদাদা যেমন দুলিয়া দুলিয়া তেহাই দিয়া থাকেন তেমনি আবার তেহাই দেয়। এবারে গান শুনিয়া তাহার আর এক ফোঁটা সন্দেহ রহিল না। চোঙের অধিবাসী সেই গায়ক ও বাদক-সম্প্রদায়কে দেখিতে ছেলের দল ঝুঁকিয়া পড়িল, কিন্তু কলের ভিতরে হরসিত এমনি করিয়া দলশুদ্ধ পুরিয়া ফেলিয়াছে যে, কাহাকেও দেখিবার জো নাই।

বুঁচি খুব কাছে দাঁড়াইয়াছিল, সরিয়া দূরে দাঁড়াইল। শঙ্কা হইল—ঐ কলওয়ালা কতলোককে ত পুরিয়াছে, যদি কাছে পাইয়া তাহাকেও পুরিয়া ফেলে—তখন? কিন্তু টেপি বুঁচির চেয়ে দুবছরের বড়, বুদ্ধিও বেশী, সন্দেহ প্রকাশ করিয়া বলিল,—"বাক্স ত ঐটুকুন মোটে, বড় বড় মানুষ কি করে থাকে?"

বাক্সের ও মানুষের আয়তনের তারতম্য হিসাব করিলে মনে ঐ প্রকার সন্দেহের উদয় হইতে পারে বটে কিন্তু যখন স্পষ্ট মানুষের গলা শোনা যাইতেছে তখন যেমন করিয়া এবং যত ঠাসাঠাসি করিয়াই হউক তাহারা ত আছে নিশ্চয়।

বাঁড়ুয্যে ঠিক সামনে বসিয়াছেন। গান-বাজনার আসরে এই স্থানটি তাঁহার নিত্যকালের। হরিপুরে কত মজলিস হইয়া গিয়াছে, কিন্তু এমন ওস্তাদ ত একজন আসিল না যে, তিনকড়ি বাঁড়ুয্যের পায়ের ধূলা না লইয়া চলিয়া যাইতে পারিল। আগাগোড়া সভাসুদ্ধ লোক বিমুগ্ধ হইয়া শুনিতেছে, কেবল রাম মিত্তির বলিলেন,—"গলায় মোটে দানা নেই, দেখ্‌ছ বাঁড়ুয্যে? যতই হোক্ টিনের চোঙা আর সেগুনকাঠের বাক্স তো।

কে একজন নেপথ্যে মন্তব্য করিল,—"সক্কাল বেলা এই খরচান্ত, মিত্তির মশায়ের গায়ের জ্বালা কিছুতে মরছে না।"

রাম মিত্তিরের সঙ্গে বাঁড়ুয্যের মিতালি সেই নকুড় গুরুর কাছে পড়িবার কাল হইতে। কলের গানের জন্য সকলে ধরিয়া পড়িয়া রাম মিত্তিরের একটা টাকা খরচ করাইয়া দিল, সেজন্য মন খারাপ আছে নিশ্চয়। কিন্তু বাঁড়ুয্যের কেমন মনে হইল রাম তাঁহাকে খোসামোদ করিয়াই গানের নিন্দা করিতেছে—টাকার শোকে নহে। পিরোনাথ বলিল,—"যাই বলুন কাকা, এই নাপ্‌তের পো মন্তোর-তন্তোর জানে ঠিক্—ডাকিনী-সিদ্ধ। আমাদের বাঁড়ুয্যে মশায় গান বাজনায় চুল পাকালেন, কত গানই গেয়ে থাকেন, এমন স্বরলয় শুনেছেন, কখনও? আসলে, ও মন্তোরবলে অপ্সরী কিন্নরী সব ধ'রে এনে তাদের দিয়ে গান গাওয়াচ্ছে। তাদের গলার কাছে দাঁড়াবেন বাঁড়ুয্যে মশায়? বলুন না।"

গানের পর গান চলিল। একটা গানের এক জায়গায় ভারী তানের প্যাঁচ মারিতেছিল। অশ্বিনী শীল অকস্মাৎ উচ্ছ্বাসভরে বলিয়া উঠিল,—"কি কল বানায়েছে সাহেব কোম্পানী। দেবতা—দেবতা—বম্মা বিষ্ণুর চেয়ে ওরা কম কিসে? বাঁড়ুয্যে মশায়, আপনার সেতারের টুং টাং আর রামপ্রসাদীগুলো এবার ছাড়ুন—"

কলের বলবান্ রাগিণীর তলায় অশ্বিনীর গলা চাপা পড়িল বাঁড়ুয্যে তাঁহার সদুপদেশ শুনিতে পাইলেন না। কিন্তু বাঁড়ুয্যের আর আছে কি ঐ সেতারের টুং টাং ছাড়া? চক্‌মিলানো পৈতৃক প্রকাণ্ড বাড়ীটা খাঁ খাঁ করে—চামচিকার বসতি। সেখানে থাকিবার লোক তিনটি—মণ্টু, তার দিদিমা, এবং তিনকড়ি বাঁড়ুয্যে স্বয়ং। নারাণীও ছিল—সেই সকলের শেষ। সাত বছর আগে মণ্টুকে ছমাসের এতটুকু রাখিয়া সেও ফাঁকি দিয়া চলিয়া গেল। ছয় ছেলের মা বাঁড়ুয্যে-গিন্নী একে একে সব কটাকে বিসর্জ্জন দিয়া এই শেষের ধন মরামায়ের বুকের উপর আছাড় খাইয়া পড়িলেন। পাড়ার সকলে আসিয়া আর সান্ত্বনা দিবার কথা খুঁজিয়া পায় না। কিন্তু বাঁড়ুয্যের চোখে জল নাই। রাম মিত্তির কাঁদো-কাঁদো গলায় কহিলেন, "বুক বাঁধ বাঁড়ুয্যে, ভগবানের লীলা।" তখন বাঁড়ুয্যে স্ত্রীকে দেখাইয়া বলিলেন—"ঐ যে অবুঝ মেয়ে-মানুষ উঠোনের ধূলোয় গড়াগড়ি যাচ্ছে, ওকে গিয়ে তোমরা প্রবোধ দাও—আমার কাছে আস্‌তে হবে না ভাই।" শুধু তিনি তাকের উপর হইতে সেতারটি নামাইয়া দিতে বলিলেন। এতকাল বাদে কি-না অশ্বিনী শীল তাহাকে সেতার বাজনা ছাড়িয়া দিতে বলিল।

এক একটা গান হইয়া গেলে হরসিত কাঁটা বদলাইয়া আগের কাঁটা ফেলিয়া দিতেছিল। তাই কুড়াইতে ছেলে-মহলে কাড়াকাড়ি! একবার আর একটু হইলে কলের উপর গিয়া পড়িত, হরসিত তাড়া দিয়া উঠিল। বাঁড়ুয্যে মণ্টুকে ডাক দিলেন—"তুই দাদু, আমার কাছে আয়—এসে ঠাণ্ডা হয়ে বোস্ ত—" নারাণীর সেই ছ'মাসের মণ্টু এখন কত বড় হইয়াছে। কিন্তু মণ্টু আসিল না, উহার অনেক কাজ। কাঁটা কুড়ানো ত আছেই, গানও লাগিতেছে বড় ভাল, তা ছাড়া চোঙের ভিতর বসিয়া যে গায়ক গাহিতেছে তাহার মূর্ত্তিদর্শন সম্বন্ধে একেবারে নিরাশ হইবার কারণ এখনও ঘটে নাই। যখন ভাল করিয়া বুলি ফুটে নাই, বাঁড়ুয্যে তখন হইতেই মণ্টুকে তবলার বোল শিখাইতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। রোজ সন্ধ্যায় রাম মিত্তির প্রভৃতি দু'চারজন বাঁড়ুয্যে-বাড়ি গিয়া বসেন। শ্রাবণ মাসে বৃষ্টিবাদলা এক একদিন এমন চাপিয়া পড়ে যে, কেহ বাড়ির বাহির হইতে পারে না। না পারুক্, তাহাতে এমন কিছু অসুবিধা ঘটে না। সেদিন মণ্টুর সেতারশিক্ষা

আরও বিপুল উদ্যমে চলে। ভারী তাল কাটে, লজ্জা পাইয়া মণ্ট বলে,—"বুড়োদাদা, আজ আর হবে না, ঘুম পাচ্ছে—" কিন্তু ঘুম পাইলেই হইল? লাউয়ের খোলের ভিতর হইতে সুর আদায় করা সোজা কৰ্ম্ম নয়।

অশ্বিনী শীল হরিপুরের সুবিখ্যাত সংকীর্ত্তনের দলে খোল বাজাইয়া থাকে। পুনশ্চ উল্লসিত হইয়া সে বলিয়া উঠিল,—"আজই বাড়ি গিয়ে খোলের দল ছিঁড়ে খড়মে লাগাব। মরি, মরি, কি কীর্ত্তনটাই গাইলে রে! আমাদের গানের 'পরে আজ ঘেন্না হয়ে গেল।"

রাম মিত্তির ক্ষীণ আপত্তি তুলিয়া বলিলেন,—"মন দিয়ে শুনেছ বাঁড়ুয্যে? অন্তরার দিক্‌টায় তালে গোলমাল ক'রে গেল না?"

বলিয়াছিল বটে আমীর খাঁ ওস্তাদ "বাঁড়ুয্যিবাবু কা কান ডালকুত্তাকা মাফিক।" খাঁ সাহেব অনেক কায়দা করিয়াও বাড়ুয্যের কানকে ফাঁকি দিতে পারে নাই, কারচুপিটুকু ঠিক্ ধরিয়া ফেলিয়াছিলেন। দিল্লীওয়ালা আমীর খাঁ অবধি ভুল করিতে পারে, কিন্তু এই অত্যাশ্চর্য্য কাঠের বাক্সের গানে একবিন্দু খুঁৎ ধরিবার জো নাই। রাম মিত্তির তালের কিছু বোঝেন না, তিনি ভুলের কথা বলিলেন। কিন্তু জানিয়া শুনিয়া বাঁড়ুয্যে কি ভুল ধরিবেন?

বিকালেও আর এক বাড়ি বায়না—কামারপাড়ায়। মণ্টু শুনিতে গিয়াছে, বাঁড়ুয্যের মাথাটা কেমন টিপ্ টিপ্ করিতেছিল বলিয়া যাইতে পারেন নাই। আধঘুমের মধ্যে বাঁড়ুয্যের মনে হইল, কে যেন আসিয়া কপাল টিপিয়া দিতেছে, আর ডাকিতেছে, "বাবা!" মেজো ছেলে মাণিকের গলা না? দশ বছরেরটি হইয়াছিল। গোলাঘাটার বড় ইস্কুলে পড়িতে যাইত। কিন্তু মাণিক নয়, মাণিক গিয়াছে ঘুড়ি উড়াইতে—নারাণী—নারাণী। নারাণী ডাকিতেছে "বাবা, বাঘ এয়েছে খোকাকে ধর্‌লে যে—" নারাণী মাথা খুঁড়িয়া মরিতেছে। ঘরের মধ্যেই বাঘ? সেতারের তাল কাটিয়া গেল। মারো সেতারের বাড়ি বাঘের মাথায়—মারো—মারো। মণ্টকে ছাড়িয়া বাঘ সেতার কামড়াইয়া ধরিল, তার ছিঁড়িল, চিবাইয়া চিবাইয়া আগাগোড়া একেবারে তছ্‌নছ্। তা যাক, মণ্টু কই?—মণ্ট—মণ্টু! বাঁড়ুয্যে বিছানায় উঠিয়া বসিয়া ডাকিলেন—মণ্টু!

মণ্টু গান শুনিয়া ফিরিয়াছে। তাহার আনন্দ ধরিতে-ছিল না। বলিল, "বুড়োদাদা, তুমি শুন্‌লে না—আমরা শুনে এলাম দুই টাকার গান। এবেলা আরও খাসা খাসা। তুমি অমনি ভাল করে গাও না কেন দাদা?"

বাঁড়ুয্যে কহিলেন—"ভাল গাইনে?"

মণ্টু ঘাড় নাড়িয়া বলিল,—"না। তুমি গাও ছাই—বুধোকাকারা বল্‌ছে।"

বাঁড়ুয্যে একটুখানি চুপ করিয়া রহিলেন। তারপর—যেন কত বড় রসিকতার কথা—প্রবলবেগে হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—"জানিস্‌নে, ও মণ্টু, জানিস্‌নে—ও যে কোম্পানীবাহাদুরের কল, ওর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে আমি পারি? গোটা জেলাটা ওদের রাজ্যি, আর আমি বহ্মোত্তরের খাজানা পাই মোটে একান্ন টাকা সাত আনা—" বলিতে বলিতে সেতারটা পাড়িয়া লইলেন।

মণ্টু বলিল, "সেতারে কত ঝঞ্চাট, কলের গান আপনা-আপনি বাজে—আমাকে একটা কলের গান এনে দিতে হবে।"

বাঁড়ুয্যে বলিলেন—"দেব, আর সেই সঙ্গে কলের হাত পা নাক চোখওয়ালা একটা নাতবৌ, কি বলিস?" বলিতে বলিতে গলাটা যেন বুজিয়া আসিল, তবু বলিতে লাগিলেন—"ওস্তাদের কত গালাগাল খেয়েছি, সরস্বতী ঠাকুরুণকে কত চিনির নৈবিদ্যি খাইয়েছি। এখন আর কোনো ঝঞ্চাট নেই! তোরা যখন বড় হবি মণ্টু, ততদিনে সরস্বতী, দুর্গা, কালী, শালগ্রামটা পর্য্যন্ত কলের হয়ে যাবে। খুব কলের পুজো করিস্—"

সন্ধ্যা গড়াইয়া যায়। আজ বাঁড়ুয্যেবাড়ি কেহ আসে নাই। মণ্টুও নাই। কেবল রাম মিত্তিরের খড়মের ঠক্‌ঠকি সিঁড়িতে শোনা গেল।

"কি বাঁড়ুয্যে, একা একা খুব লাগিয়েছ যে—সুরটা পূরবী বুঝি—"

বাঁড়ুয্যে তদ্গত হইয়া সেতার বাজাইতেছিলেন। বলিলেন—"দোসর কোথায় পাই, ভাই? চাঁদা তুলে ঠাকুরবাড়িতে আবার কলের গান দিচ্ছে—মণ্টু গেছে সেখানে। একাএকাই বাজাচ্ছি—কেমন লাগ্‌ছে বল ত?"

রাম মিত্তির বলিলেন,—"এখন রেখে দাও, এ-সব ত রোজ শুন্‌ব। চল—ঠাকুরবাড়ি যাওয়া যাক্—"

বাঁড়ুয্যেকে লইয়া রাম মিত্তির ঠাকুরবাড়ির আসরে বসিলেন। হরসিতের কলে ইতিমধ্যে দুখানি গান সারা হইয়া একটা সুরু হইয়াছে—

'কি করিলি অবোধ বালিকা?
সুধা ভ্রমে হলাহল করিলি যে পান—'

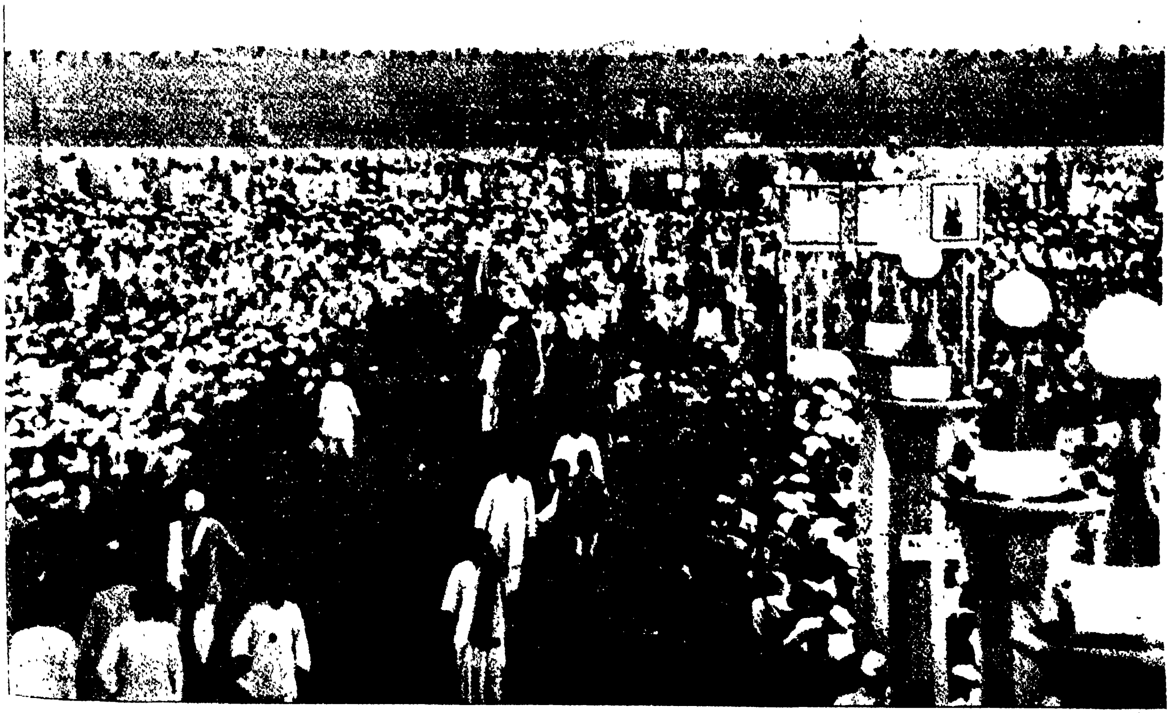
চেহারা ত দেখা যায় না, তবে হাঁ—গলা শুনিয়া একথা স্বচ্ছন্দে বলা চলে যে বক্তা ভীম, রাবণ বা অন্ততঃ পক্ষে তস্য পুত্র মেঘনাদ না হইয়া যায় না। বাঁড়ুয্যে

বলিলেন—"তুমি বাপু, একখানা পূরবী বাজাও ত।" হরসিত ঘোর প্যাঁচের মানুষ নয়, জবাব সোজা করিয়াই দিল—"হুকুম-টুকুম চল্‌বে না মশাই, যা বাজাই শুনে যান—আমার সাহেববাড়ির কল।" অতএব সাহেব-বাড়ির কলের যেরূপ অভিপ্রায় হইল, হরিপুরের সমুদয় শ্রোতা তটস্থ হইয়া তাহা শুনিতে লাগিল—ইহা আমীর খাঁ ওস্তাদের মজলিস্ নয় যে, ফরমায়েস খাটিবে।

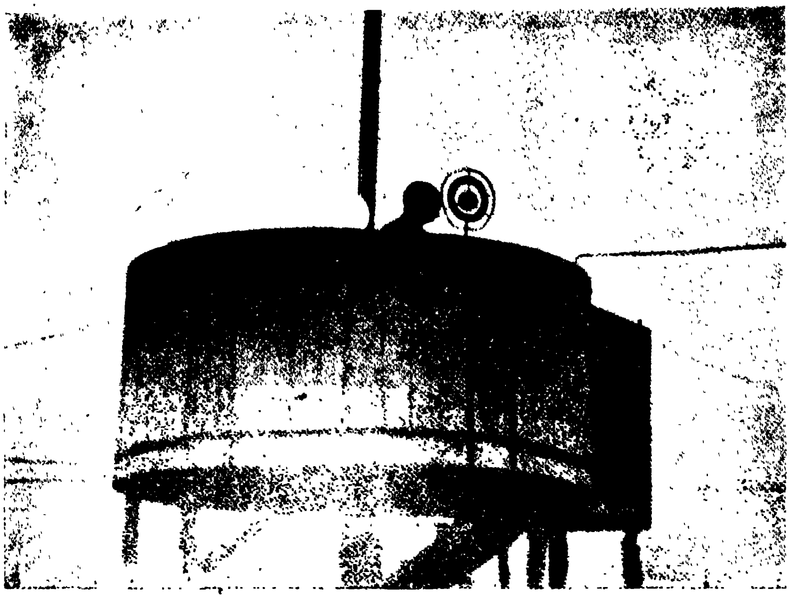
অকস্মাৎ—ঘটর্ ঘটর ঘ্যাস্। গান থামিয়া গেল। কলের কোথায় কি কাটিয়া গেছে। এতগুলি শ্রোতা বিরসমুখে বসিয়া রহিল। যন্ত্রপাতি বাহির করিয়া হরসিত কাঠের বাক্সটা খুলিয়া আলগা করিয়া ফেলিল। কলের ভিতর মানুষ নাই, কেবল লোহালক্কড়। হরসিত অনেক চেষ্টা করিল, কিন্তু মেরামত হইল না। তখন থালা হইতে বায়নার টাকা ও পেলার পয়সা তুলিয়া লইয়া উন্টাগাঁটে ভাল করিয়া গুঁজিয়া সে বলিল,—"রাত্তিরে আর নজর চলে না মশাই! সকালেই ঠিক্ ক'রে বাকী গানগুলো শুনিয়ে দেব, কিরূপা ক'রে মশাইয়া সকলে পদধূলি দেবেন।"

ঠাকুরবাড়িতে গ্রামস্থ সকল মহাশয়েরই সকালে যথাসময়ে ভিড় হইল, কিন্তু হরসিত নাই, কলের গান নাই, এমন কি নেত্য ঠাকরুণের পিতলের ঘটীটিও নাই। জল খাইবার জন্য হরসিতকে ঘটীটি দেওয়া হইয়াছিল।

করাচীতে জাতীয় মহাসভা



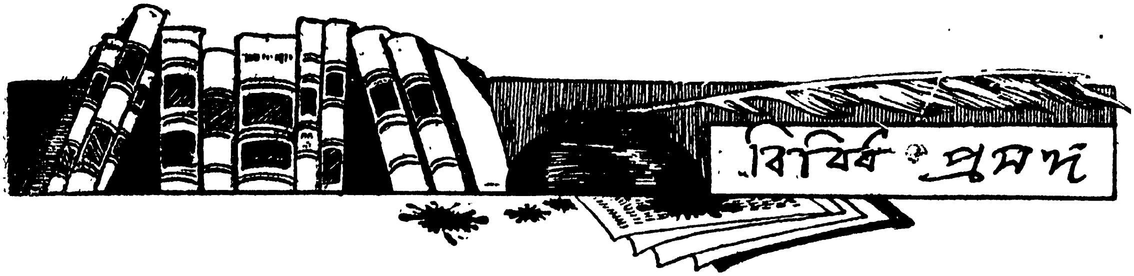
মঞ্চের উপর অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি ডাঃ চেথরাম পি গিডওয়ানি বক্তৃতা করিতেছেন



কংগ্রেস-সভাপতি সর্দ্দার বল্লভভাই পাটেল বক্তৃতামঞ্চে দাঁড়াইয়া বক্তৃতা করিতেছেন

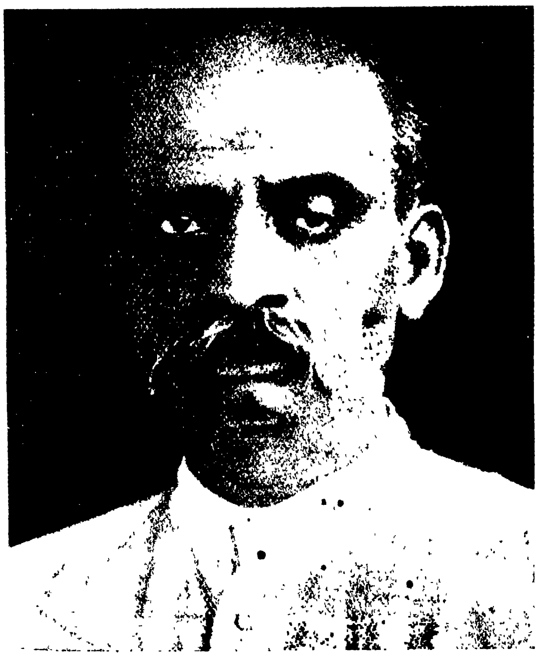


স্বর্গগত দেশনেতা দাদাভাই নওরোজীর কন্যা শ্রীযুক্তা পেরিন ক্যাপ্টেন এবং কংগ্রেসের স্বেচ্ছাসেবকগণ।



করাচিতে কংগ্রেস

চুয়াল্লিশ বৎসর ধরিয়া কংগ্রেসের অধিবেশন প্রতি বৎসর খ্রীষ্টিয়ানদিগের বড়দিনের ছুটিতে হইয়া আসিতেছিল। সেই সময়ে সমস্ত ব্রিটিশ-শাসিত ভারতবর্ষে কয়েকদিন আপিস আদালত কলেজ স্কুল বন্ধ থাকায় উকীল ব্যারিষ্টার এবং বেসরকারী স্কুল-কলেজের শিক্ষকদের কংগ্রেসে যাইবার সুবিধা হইত এবং স্কুল-কলেজ বন্ধ থাকায় কংগ্রেসের নানা কাজ করিবার জন্য ছাত্র স্বেচ্ছাসেবক পাওয়া যাইত। ডিসেম্বর মাসের শেষে কংগ্রেস না করিলে এই সব সুবিধা পাওয়া যাইবে না এবং উকীল ব্যারিষ্টার প্রভৃতি লোক রোজগারের ক্ষতি করিয়া কংগ্রেসে যাইতে রাজী হইবেন না, কতকটা এই আশঙ্কায়



সর্দ্দার বল্লভভাই পটেল

এত বৎসর কংগ্রেসের সময় বদলান হয় নাই। ১৯২৯ সালের ডিসেম্বর মাসে লাহোরে কংগ্রেসের যে



ডাঃ গিড্‌ওয়ানীর সঙ্গে মহাত্মা গান্ধী

অধিবেশন হয়, তাহাতে স্থির হয়, যে, তাহার পর হইতে ফেব্রুয়ারী বা মার্চ্চ মাসে কংগ্রেসের অধিবেশন হইবে। ডিসেম্বরের শেষে লাহোরের অত্যধিক শীতে অনেক



সভাপতির শিবিরে কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ

প্রতিনিধির অসুস্থ হইয়া পড়া এবং কষ্ট পাওয়া এই সময়-পরিবর্ত্তনের একটি কারণ। এই পরিবর্ত্তনের পর করাচীতেই কংগ্রেস প্রথম হইল। প্রতিনিধি, স্বেচ্ছাসেবক, দর্শক—কিছুরই অভাব এই অধিবেশনে হয় নাই। সকল রকমের লোকেরই যথেষ্ট সমাবেশ হইয়াছিল। ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে যে, কোন বৈষয়িক কাজের ক্ষতি না করিয়া, উপার্জ্জনের ক্ষতি না করিয়া, কেবল অবসর-সময়ে যাঁহারা কংগ্রেসে বক্তৃতাদির দ্বারা "দেশসেবা"



সর্দ্দার বল্লভভাই কর্ত্তৃক জাতীয় পতাকা উত্তোলন

করিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের আমল এখন আর নাই। এখন এমন এক দল লোকের কংগ্রেসে কর্ত্তৃত্ব জন্মিয়াছে যাঁহাদের মধ্যে অনেকে বাস্তবিক স্বদেশপ্রেমের প্রভাবে, কিম্বা অনেকে জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে যশের ক্ষমতার ও কর্তৃত্বের প্রলোভনে, কিম্বা কেহ কেহ পেশাদারীভাবে এবং অনেকে হুজুকের জন্য যে-কোন সময়ে কংগ্রেস করিতে ও তাহাতে উপস্থিত হইতে প্রস্তুত।

অতএব, এখন আর কংগ্রেসে ঠিক "উকীল-রাজ" নাই—যদিও এখনও, যাঁহারা এক সময়ে আইনজীবী ছিলেন বা হইতে পারিতেন, এরূপ অনেক লোকের প্রভাব কংগ্রেসে বেশী। "উকীল-রাজের" পরিবর্ত্তে কাহাদের রাজ হইয়াছে ঠিক্ করিয়া এখনও বলা যায় না। তবে ভবিষ্যতে চাষী ও কারখানার শ্রমজীবীদের প্রভাব খুব বেশী হইতে পারে মনে হয়—যদিও তাহাদের নামে "বুদ্ধিজীবী" ব্যক্তিরাই কর্ত্তৃত্ব করিতে পারিবেন। তাহার দৃষ্টান্ত বিলাতে ও অন্য কোন কোন পাশ্চাত্য দেশে দেখা যাইতেছে।

—

"হিন্দী" "হিন্দী"

কংগ্রেসে আর একটি পরিবর্ত্তন কয়েক বৎসর হইতে আরম্ভ হইয়াছে। আগে প্রাদেশিক কনফারেন্স-গুলিতে পর্য্যন্ত বক্তৃতা আদি ইংরেজীতে হইত, প্রস্তাব-গুলির মুসাবিদা ইংরেজীতে হইত। অন্য প্রদেশের কথা জানি না, কিন্তু বঙ্গের প্রাদেশিক কন্‌ফারেন্সে পাবনায় প্রথম রবীন্দ্রনাথ সভাপতির বক্তৃতা বাংলায় করেন। এ বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই, যে, প্রত্যেক প্রদেশের বা উপ-প্রদেশের সার্ব্বজনিক সভাদির কাজ তথাকার ভাষায় হওয়া উচিত। উপ-প্রদেশ বলিবার কারণ এই যে, কোন কোন প্রদেশে একাধিক ভাষা প্রচলিত। যেমন, বিহার-উড়িষ্যা প্রদেশে এক রকমের হিন্দী, ওড়িয়া এবং বাংলা প্রচলিত; বোম্বাই প্রেসিডেন্সীতে মরাঠী, গুজরাটী, কন্নাড প্রভৃতি প্রচলিত; মান্দ্রাজ প্রদেশে তেলুগু, তামিল, কন্নাড, মলয়ালম প্রচলিত।

সমগ্রভারতীয় সমুদয় সার্ব্বজনিক সভার সমুদয় কাজে কি ভাষা ব্যবহৃত হওয়া উচিত, সে-বিষয়ে কংগ্রেস কোন বিচার বা আলোচনা করিয়াছেন বলিয়া অবগত নহি। কিন্তু কার্য্যতঃ তাঁহারা হিন্দী উর্দ্দু বা হিন্দুস্থানী চালাই-তেছেন দেখিতে পাই। নেহরু কমিটির রিপোর্টেও আছে, যে, হিন্দুস্থানীই সমগ্রভারতীয় কাজের ভাষা হইবে। বিকল্পে ইংরেজীও চলিতে পারে। এবিষয়ে আমরা তর্কবিতর্ক করিব না। প্রধানতঃ কেবল পরিবর্ত্তনটি লক্ষ্য করিতে বলিতেছি। যাঁহারা

ইংরেজীতে বেশ ভাল বক্তৃতা করিতে পারিতেন, আগে কংগ্রেসে তাঁহাদের খুব প্রতিপত্তি ছিল। এখন তাহা নাই। বস্তুতঃ এখন বাগ্মিতার প্রভাব বেশী অনুভূত হয় না। সুযুক্তি ও সুপ্রযুক্ত তথ্যেরও যে বিশেষ প্রভাব আছে, তাহাও মনে হয় না। মহাত্মা গান্ধীর প্রভাব সকলের চেয়ে বেশী। তিনি যাহা বলেন, তাহার পশ্চাতে কোন যুক্তি ও তথ্য নাই বলিতেছি না; কিন্তু তাঁহার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সুযুক্তি ও সুপ্রযুক্ত তথ্য থাকিলেও কখন কখন তাঁহার সিদ্ধান্তই বজায় থাকে দেখিয়াছি। তাহার কারণ তাঁহার জীবন ও চরিত্র এবং কয়েক বার সত্যাগ্রহ দ্বারা সাফল্যলাভ। লর্ড আরুইনের সহিত সন্ধির ফলে যে সত্যাগ্রহ আপাততঃ স্থগিত আছে, তাহা সফল সত্যাগ্রহগুলির অন্যতম বলিয়া গণনা করিতেছি না; কারণ এই সন্ধির শেষ ফল না দেখিয়া তাহার সফলতা বা নিষ্ফলতা সম্বন্ধে কিছু বলা যাইবে না।

অন্য যাঁহাদের বেশী প্রভাব আছে, তাঁহারা মহাত্মাজীর সহকর্ম্মী বা দলভুক্ত, কিম্বা তাঁহারা প্রীতিভাজন অনুগ্রহের পাত্র।

হিন্দীর কথা বলিতে গিয়া অনেক দূরে আসিয়া পড়িয়াছি। আবার হিন্দীর কথাই বলি।

গান্ধীজী হিন্দীকে ভারতবর্ষের সার্ব্বজনিক কাজের ভাষা করিতে চান—সম্ভবতঃ অন্য সব ভারতীয় ভাষাকে চাপা দিয়া একমাত্র দেশভাষা করিতে চান না; কারণ তাঁহার গুজরাটী পত্রিকা আছে এবং তিনি গুজরাটীতে বহিও লিখিয়া থাকেন। তাঁহার হিন্দী ভাল হিন্দী নহে, তবে কাজচলা-গোছ বটে। করাচী কংগ্রেসের সভাপতি বল্লভভাই পটেল মহাশয়ের হিন্দীও সেইরূপ। তিনি বলিয়াছেন, কংগ্রেসের আগামী অধিবেশনে কেবলমাত্র ভার্ণাকিউলারে সব কাজ হইবে। ইহার অর্থ বোধ করি এই যে, উহা কেবল হিন্দীতে হইবে। এ বিষয়ে কোন তর্কযুক্তি বৃথা। কারণ আজকাল সংখ্যাবহুল এবং চীৎকারপটুদের প্রভুত্বের যুগ। কংগ্রেসের আগামী অধিবেশন উৎকলে হইবে—সম্ভবতঃ পুরীতে। প্রতিনিধি ও দর্শকদের অধিকাংশ নিশ্চয়ই ওড়িয়া হইবেন। অথচ ওড়িয়া ভাষাতেও বক্তৃতাদি হইতে পারিবে না, হিন্দীতেই হইবে, এ ব্যবস্থা যুক্তিসঙ্গত নহে।

কংগ্রেসের অভ্যর্থনা সমিতির নেতার বক্তৃতা এবং কংগ্রেসের সভাপতির বক্তৃতা ইংরেজীতে লিখিত হয়। তাহার পর তাঁহারা উহার লিখিত হিন্দী অনুবাদ পড়েন বা হিন্দীতে মৌখিক উহার তাৎপর্য্য বলেন, কখন কখন বেশীও বলেন। কংগ্রেসের প্রস্তাবগুলির ইংরেজীতে মুসাবিদা হয়, সংশোধনের প্রস্তাবাদিও ইংরেজীতে হয়। ইহা সত্ত্বেও, কেহ ইংরেজীতে বক্তৃতা করিতে উঠিলে, শ্রোতৃবর্গের মধ্যে কতকগুলি লোক "হিন্দী" "হিন্দী" বলিয়া চীৎকার করেন! আমাদের বিবেচনায় যাঁহাদের মাতৃভাষা হিন্দী, তাঁহাদের হিন্দীতে বক্তৃতা করা উচিত। যাঁহাদের মাতৃভাষা হিন্দী নহে, তাঁহারা হিন্দীতে বক্তৃতা করিতে পারিলে, কংগ্রেসের রীতি অনুসারে, তাহাই করা উচিত। না পারিলে, কাহারও "হিন্দী" "হিন্দী" বলিয়া তাঁহার নিকট হিন্দী বক্তৃতার দাবি করা অনুচিত।

ইংরেজী ভারতশাসকদের ভাষা ও বিদেশী ভাষা বলিয়া তাহার প্রতি বিরুদ্ধ ভাব থাকা অস্বাভাবিক নহে। কিন্তু অভ্যর্থনা সমিতির নেতার ও কংগ্রেসের সভাপতির বক্তৃতা এবং কংগ্রেসের প্রস্তাবগুলি যদি ইংরেজীতে লিখিত হইতে পারে, তাহা হইলে হিন্দী ভাষায় অনভিজ্ঞ কেহ ইংরেজীতে বক্তৃতা করিলে তাহাতে এমন কি অপরাধ হয়? ইংরেজী বিদেশী বলিয়া তাহা বর্জ্জন করা হইতেছে। কিন্তু করাচীতে সভাপতির সভাস্থলে আসিবার সময় তাঁহার আগে আগে বাদ্যকরদের মধ্যে স্কটল্যাণ্ডের ব্যাগ-পাইপ ও ভারতবর্ষের ঢাক বাজাইবার লোক ছিল! ব্যাগ-পাইপটা ত হিন্দী নয়।

হিন্দীতে বক্তৃতাদি করায় আপাততঃ যে কয়েকটি অসুবিধা হইতেছে, তাহা বলিতেছি। হিন্দী যাঁহাদের মাতৃভাষা তাঁহারা বলেন, যে, ভারতবর্ষের উত্তর অংশের সর্ব্বত্র লোকে হিন্দী বুঝে। ইহা ঠিক্ নহে। ইহা সত্য হইলেও, সাধারণ কেনাবেচার হিন্দী বুঝা এক কথা এবং হিন্দী বক্তৃতা বুঝা অন্য কথা। আমি সাধারণ কেনাবেচার এবং মামুলী ভদ্রতার ও দৈনন্দিন খবরাখবরের হিন্দী বুঝি ও বলিতে পারি।

কিন্তু হিন্দী বক্তৃতা সব বুঝিতে পারি না। মুসলমান ভারতীয়েরা যে হিন্দীতে (অর্থাৎ উর্দ্দুতে) বক্তৃতা করেন, তাহা আরও কম বুঝি। কোন কোন অমুসলমান ভারতীয়, যেমন পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরু বা কাশ্মীর পণ্ডিত ইক্‌বাল নারায়ণ গুর্ত্তু, যে হিন্দী বলেন, তাহা বস্তুতঃ উর্দ্দু। তাহা আমাদের মত লোকে বুঝিতে পারে না। করাচী কংগ্রেসে ডাক্তার আন্সারী যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাহা আমি বুঝিতে পারি নাই; সভাপতি পটেল মহাশয় বুঝিয়াছিলেন কিনা সে বিষয়ে আমার বিশেষ সন্দেহ আছে।

কংগ্রেসে সকলকে হিন্দীতে বক্তৃতা করিতে বাধ্য করিলে অনেকে শীঘ্র হিন্দী শিখিবে, বুঝিতে পারি। সকলে শিখিবে না। কিন্তু সকলে হিন্দী শিখিয়া ভবিষ্যতে হিন্দী বক্তৃতা করিবে, এই কারণে, আপাততঃ যাহারা ইংরেজীতে ভাল করিয়া নিজেদের মনের ভাব প্রকাশ করিতে পারে এবং সৎপরামর্শ ও সুযুক্তি দিতে পারে, তাহাদের কার্য্যকারিতা হ্রাস বা নষ্ট করা আমরা উচিত মনে করি না।

কংগ্রেসে বক্তৃতাদি যাহা হয়, দৈনিক সকল কাগজে তাহার রিপোর্ট বাহির হওয়া আবশ্যক। ভবিষ্যতে যাহাই হউক, বর্ত্তমানে হিন্দী ভাল করিয়া রিপোর্ট করিবার লোক হিন্দী কাগজওয়ালাদের নাই; ইংরেজী কাগজ-ওয়ালাদেরও—বিশেষতঃ পঞ্জাব ও যুক্তপ্রদেশ ছাড়া অন্য সব প্রদেশের—নাই। যাহারা আছে, তাহাদিগকে হিন্দীতে রিপোর্ট লিখিয়া তাহার ইংরেজী অনুবাদ খবরের কাগজসকলে পাঠাইতে হয়। এইরূপ অনুবাদিত রিপোর্ট কখনও যথাযথ হইতে পারে না।

হিন্দী যাঁহাদের মাতৃভাষা নহে তাঁহারা তাড়াতাড়ি হিন্দী শিখিয়া কোন প্রকারে বক্তৃতা করিতে সমর্থ হইলেও, হিন্দী যাঁহাদের মাতৃভাষা তাঁহাদের সকলের বক্তৃতা বুঝিতে তাঁহাদের বহু বিলম্ব ঘটিবে। হিন্দীতে তর্ক-বিতর্ক করাও তাঁহাদের পক্ষে কঠিন হইবে। আমরা বাল্যকাল হইতে ইংরেজী পড়িতেছি। তথাপি ইংরেজদের ও আমেরিকানদের সকলের সব কথাবার্ত্তা ও বক্তৃতা এখনও বুঝিতে পারি না। সুতরাং প্রাপ্তবয়স্ক হইবার পর অল্পদিন হিন্দী শিখিয়া অহিন্দীভাষীরা হিন্দীভাষীদের সব বক্তৃতাদি বুঝিয়া হিন্দীতে ভাল করিয়া আলোচনায় যোগ দিতে পারিবেন, এমন আশা করা যায় না।

হিন্দীকে ভারতবর্ষের সমুদয় সার্ব্বজনিক কাজের ভাষা করায় এখন যে ভাষাগত ও লিপিগত দাবি প্রধানতঃ পঞ্জাব আগ্রা-অযোধ্যা এবং বিহারে আবদ্ধ আছে, তাহা সমুদয় ভারতবর্ষে ছড়াইবে। ঐ প্রদেশগুলির মুসলমানেরা তত্তৎ অঞ্চলে প্রচলিত ভাষাকে হিন্দী বলিতে রাজী নহেন; তাঁহারা তাহাকে উর্দ্দু বা হিন্দুস্থানী বলেন এবং ভাষাটিকে নাগরী অক্ষরে না লিখিয়া আরবীয় অক্ষরে লিখিয়া থাকেন। অনেক অবিখ্যাত ও বিখ্যাত হিন্দুও তাহা করিতেন ও করেন। যেমন লালা লাজপৎ রায়ের দেশভাষায় লিখিত অধিকাংশ পুস্তক পুস্তিকা উর্দ্দুতে লিখিত। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত লাহোরের "বন্দে মাতরম্" নামক খবরের কাগজ উর্দ্দুতে লিখিত হয়। আগ্রা-অযোধ্যা প্রদেশে আগে আদেশ আদালতের যে-সব কাজ দেশ-ভাষায় হইত, সমস্তই উর্দ্দুতে করিতে হইত। পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয় প্রমুখ হিন্দুদিগকে অনেক চেষ্টা করিয়া আদালতে নাগরীরও ব্যবহারের সরকারী অনুমতি পাইতে হইয়াছে। হিন্দীকে কংগ্রেসের একমাত্র ভাষা করার অর্থ এই হইবে যে, উহার সমুদয় প্রস্তাব রিপোর্ট প্রভৃতি নাগরী ও আরবী অক্ষরে লিখিতে ও মুদ্রিত করিতে হইবে। যে-সকল স্বাজাতিক অর্থাৎ ন্যাশ্যান্যালিষ্ট মুসলমান কংগ্রেসে যোগ দিয়া থাকেন, এখন তাঁহাদের সংখ্যা বেশী নহে। পরে তাঁহাদের সংখ্যা বাড়িবে এবং তাঁহারা আরবী অক্ষরেও প্রস্তাব রিপোর্টাদি মুদ্রণের দাবি করিতে অধিকারী হইবেন। কংগ্রেস তাহা প্রকারান্তরে স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। কারণ করাচীর অধিবেশনে সর্ব্বসাধারণের যে সকল প্রাথমিক অধিকার স্বীকৃত হইয়াছে তাহার মধ্যে আছে, "protection of the culture language and scripts of the minorities," "সংখ্যালঘিষ্ঠদিগের কালচ্যর (কৃষ্টি), ভাষা এবং লিপিসমূহ সংরক্ষণ।"

অতএব দেখা যাইতেছে, যে, অতঃপর কংগ্রেসের প্রস্তাবাদি অভারতীয় দেশ ও মানুষদের জন্য ইংরেজীতে

এবং ভারতীয় মানুষদের জন্য নাগরী ও আরবী অক্ষরে হিন্দী ও উর্দ্দুতে ছাপিতে হইবে। পঞ্জাব, আগ্রা-অযোধ্যা, বিহার এবং মধ্যপ্রদেশের হিন্দীভাষী জেলাগুলি ছাড়া আর কোথাও সকলেই হিন্দী বা উর্দ্দু পড়িবে এমন আশা করা যায় না। সুতরাং যখন যে প্রদেশে কংগ্রেসের অধিবেশন হইবে, তখন তথাকার ভাষা ও লিপিতেও কংগ্রেসের প্রস্তাবাদি রচিত ও মুদ্রিত করিতে হইবে। অর্থাৎ আগামী বৎসর যখন উৎকলে কংগ্রেসের অধিবেশন হইবে, তখন ইংরেজী, হিন্দী, উর্দ্দ ও ওড়িয়াতে প্রস্তাবাদি মুদ্রিত করিতে হইবে। অবশ্য, কর্ত্তৃপক্ষ হয়ত কেবল হিন্দীতে (এবং পৃথিবীর অভারতীয় লোকদের জন্য ইংরেজীতে) করিতে পারেন। কিন্তু গণতান্ত্রিক কংগ্রেসের পক্ষে উড়িষ্যায় বসিয়া তথাকার অধিকাংশ লোকের একমাত্র বোধগম্য ওড়িয়া ভাষা ও লিপিকে বাদ দিলে তাহা যুক্তিসঙ্গত হইবে না।

—

লীগ অব্ নেশ্যন্সের ও ভারতীয় কংগ্রেসের ভাষা

লীগ অব নেশ্যন্সের দ্বারা ভারতবর্ষের কোন উপকার হউক বা না-হউক, সকল মহাদেশের অধিকতম সংখ্যক জাতির এত বড় প্রতিনিধিসভা পৃথিবীতে আর নাই। এই মহাজাতি-সংঘে পৃথিবীর ৫০টির উপর স্বশাসক জাতির প্রতিনিধিরা একত্র আলোচনা করেন, প্রস্তাব মঞ্জুর করেন, রিপোর্ট ও নানা প্রকার পুস্তক পুস্তিকা প্রকাশ করেন। ইউরোপের রুশীয় ছাড়া প্রধান সমস্ত জাতি ইহার সভ্য। এশিয়ার চীন জাপান ও ভারতবর্ষ ইহার সভ্য। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র ছাড়া আর সব প্রধান দেশ ইহার সভ্য। আফ্রিকার দক্ষিণ-আফ্রিকা ইহার সভ্য, মিশরও শীঘ্র সভ্য হইবে। ইহা হইতে বুঝা যাইবে, পৃথিবীর কতভাষাভাষী লোক এই মহাজাতি-সংঘের অধিবেশনে উপস্থিত হইয়া আলোচনাদি করে। তাহারা কি ভাষা ব্যবহার করে?

লীগের সাধারণ নিয়ম এই যে, ইহার এসেম্ব্লীর ও কমিটিসমূহের অধিবেশনে বক্তৃতাদি হয় ইংরেজীতে নতুবা ফ্রেঞ্চে করিতে হইবে। ইংরেজীতে বক্তৃতা করিলে তাহা শেষ হইবা মাত্র লীগের সুদক্ষ অনুবাদক ফ্রেঞ্চে তাহার অনুবাদ পাঠ বা আবৃত্তি করেন, ফ্রেঞ্চে বক্তৃতা করিলে তাহা শেষ হইবা মাত্র ঐরূপ সুদক্ষ অন্য অনুবাদক তাহার ইংরেজী অনুবাদ পাঠ বা আবৃত্তি করেন। ইংরেজী বা ফ্রেঞ্চ ব্যবহার না করিয়া কোন প্রতিনিধি নিজের মাতৃভাষাও ব্যবহার করিতে পারেন। ১৯২৬ সালে যখন আমি লীগের নিমন্ত্রণে জেনিভা গিয়াছিলাম, সেবার জার্মেনী প্রথম লীগে যোগ দেয়। তাহার পররাষ্ট্রসচিব হের্ ষ্ট্রেসেম্যান্ জার্ম্যান ভাষায় বক্তৃতা করেন এবং তাঁহার সঙ্গে আনীত অনুবাদকেরা তাহার ফ্রেঞ্চ ও ইংরেজী অনুবাদ পাঠ করেন। এক বৎসর আয়ার্ল্যাণ্ডের এক প্রতিনিধি তাঁহার মাতৃভাষা আইরিশে বক্তৃতা করেন। সভাস্থলে সমবেত লোকদের মধ্যে একমাত্র তিনিই উহা বুঝিয়াছিলেন। তথাপি, তিনি আইরিশ ভাষায় বক্তৃতা আরম্ভ করিলে শ্রোতাদের মধ্যে কেহ "ফ্রেঞ্চ ফ্রেঞ্চ" বা "ইংরেজী ইংরেজী" বলিয়া তাঁহাকে বাধা দেয় নাই। ভারতবর্ষের হিন্দীভাষীদের মধ্যে অনেকের ততটুকু সৌজন্য ও বিবেচনা না-থাকায় তাঁহারা কলিকাতার কংগ্রেসে পর্যান্ত "হিন্দী হিন্দী" বলিয়া চীৎকার করিয়াছিলেন। এবার করাচীতে হিন্দুমহাসভার অধিবেশনে সিন্ধু-দেশবাসী সিন্ধী একজন প্রধান বক্তাকে এইরূপ লোকেরা সিন্ধী ভাষায় বক্তৃতা করিতে দিলেন না, ইংরেজীতেও না! তাঁহাকে হিন্দীতে বক্তৃতা করিতে হইল। অথচ শ্রোতাদের মধ্যে অধিকাংশ লোক সিন্ধিই বুঝিত, হিন্দী নহে। উপদ্রবকারী হিন্দীভাষীরা ভুলিয়া যান যে, তাঁহারা যে হিন্দীভাষী এবং অন্যেরা নহে, তাহা আকস্মিক ঘটনা মাত্র, তাহাতে তাঁহাদের কোন কৃতিত্বগৌরব নাই এবং অন্যদের কোন অগৌরবও নাই। তাঁহারা হিন্দীকে ভারতবর্ষের সর্ব্বাপেক্ষা সমৃদ্ধ ও ভাবপ্রকাশক ভাষা এখনও করিতে পারেন নাই।

আমাদের বিবেচনায় লীগ অব নেশ্যন্সের সভ্য অধিকাংশ দেশের ভাষা ইংরেজী বা ফ্রেঞ্চ না-হওয়া সত্ত্বেও যেমন ঐ দুই ভাষায় উহার কাজ হয় এবং তদ্ভিন্ন

প্রত্যেক প্রতিনিধির নিজের মাতৃভাষা ব্যবহার করিবার অধিকার আছে, তদ্রূপ কংগ্রেসে ভারতবর্ষের সার্ব্বজনিক কাজে হিন্দুস্থানী ও ইংরেজী ব্যবহৃত হওয়া উচিত এবং তদ্ভিন্ন প্রত্যেক প্রদেশের লোকদের নিজেদের মাতৃভাষা ব্যবহার করিবার অধিকার থাকা উচিত—বিশেষতঃ সেই প্রদেশের মাতৃভাষা যেখানে কোন বৎসর কংগ্রেসের অধিবেশন হইবে। সাধারণ ভাষা রূপে ইংরেজীর ব্যবহার নেহরু কমিটির রিপোর্টেরও অনুমোদিত। আগামী বৎসর উৎকলে কংগ্রেসের অধিবেশন হইবে। অতএব ঐ অধিবেশনে হিন্দুস্থানী ইংরেজী এবং ওড়িয়া ব্যবহার করিবার অধিকার প্রতিনিধিবর্গকে দেওয়া উচিত।

মাতৃভাষা ব্যবহারের এই অধিকার উৎকল বা ভারতবর্ষের উত্তরার্দ্ধের অন্য কোন প্রদেশের চেয়ে মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর অন্ধ্রদেশ, তামিল নাড়ু (তামিল ভাষীদের দেশ), কর্ণাট, কেরল প্রভৃতি দেশের জন্য আরও অধিক দরকার। কারণ ভারতবর্ষের উত্তরার্দ্ধের প্রধান সব ভাষা সংস্কৃত বা প্রাকৃত হইতে উৎপন্ন ; মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর প্রধান ভাষাগুলি তাহা নহে। এই জন্য মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর অধিকাংশ লোকের পক্ষে হিন্দী না শিখিয়া বুঝা অসম্ভব ; বাঙালী, আসামী, ওড়িয়া, মরাঠা, গুজরাতীদের পক্ষে তাহা নহে। তাহারা হিন্দী না শিখিলেও সামান্য হিন্দী বুঝিতে পারে।

—

বাঙালীর হিন্দী শেখা উচিত

আমাদের বিবেচনায় অনেক দিক্-দিয়া হিন্দী অপেক্ষা বাংলার ভারতবর্ষের সাধারণ ভাষা হইবার উপযোগিতা বেশী আছে। কিন্তু ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের লোকেরা বাংলার পক্ষে প্রবল যুক্তি দেখাইলেও তাহাতে কর্ণপাত করিবেন না বলিয়া আমরা বাংলা ভাষার দাবি অবাঙালী ভারতীয়দের নিকট উপস্থিত করিতে চাই না।

বাংলা যাঁহারা বলেন ও বুঝেন, তাঁহাদের সংখ্যাও কম নহে। পাঁচ কোটির উপর লোকের মাতৃভাষা বাংলা। তদ্ভিন্ন ওড়িয়া ও আসামীরা বাংলা বলিতে ও বুঝিতে পারেন। বিহারের অনেক লোক বাংলা বুঝেন, কাশীরও তাই। ছোটনাগপুরের বিস্তর অবাঙালী বাংলা বুঝেন। বঙ্গদেশবাসী সাঁওতালরা বাংলা বুঝেন। শিক্ষা করিয়া নির্ভুল বাংলা লেখা, শিক্ষা করিয়া নির্ভুল হিন্দী লেখা অপেক্ষা সোজা। বাংলা লিপি নাগরী লিপি অপেক্ষা প্রাচীনতর এবং কম জটিল। আধুনিক বাংলা সাহিত্য আধুনিক হিন্দী সাহিত্য অপেক্ষা সমৃদ্ধ ও ভাবপ্রকাশক্ষম। কিন্তু এসব কথা সত্য হইলেও কংগ্রেসে বাংলা সাধারণ ভাষা বলিয়া গৃহীত হইবে না। অবাঙালীরা যদি বাংলা শেখেন, তাহা বাংলা সাহিত্যের উৎকর্ষের জন্যই শিখিবেন। আমাদের মাতৃ-ভাষা ও সাহিত্যের সেই উৎকর্ষ সাধনেই যত্নবান্ হওয়া দরকার—কংগ্রেসওয়ালাদের সহিত তর্কবিতর্ক করিবার প্রয়োজন নাই।

বাঙালীদের হিন্দী কেন শেখা উচিত বলিতেছি। প্রথমে একটা সম্ভবপর আশঙ্কা নিরসন করা আবশ্যক। কেহ যেন মনে না করেন, আমরা হিন্দী শিখিলে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ক্ষতি হইবে। আমরা ইংরেজ রাজত্বের আরম্ভ হইতে এপর্য্যন্ত বহু লক্ষ বাঙালী ইংরেজী শিখিয়াছি। তাহাতে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের কোন ক্ষতি হয় নাই, প্রসারও কমে নাই। বরং ইংরেজী শিক্ষা প্রাপ্ত প্রতিভাশালী বাঙালীদের দ্বারা আমাদের সাহিত্যের উন্নতিই হইয়াছে। বাংলা দেশের তুলনায় ওয়েল্‌স্ অতি ক্ষুদ্র দেশ, উহার লোক-সংখ্যা ২৫ লক্ষের বেশী নয়। ইংরেজী সাহিত্যের তুলনায় ওয়েল্‌সের সাহিত্যও নগণ্য। তথাপি, ওয়েল্‌স্ বহু শতাব্দী ধরিয়া ইংলণ্ডের সহিত যুক্ত থাকা সত্ত্বেও ওয়েল্‌সের ভাষা ও সাহিত্য লুপ্ত হয় নাই। ভারতবর্ষে বাঙালীদের প্রভাব যে অল্পাধিক পরিমাণে বিস্তৃত হইয়াছিল, তাহার অনেক কারণ আছে। সবগুলির উল্লেখ এখানে অনাবশ্যক। একটা কারণ, আমরা অন্য অনেক প্রদেশের লোকদের চেয়ে আগে ইংরেজী শিখিয়াছিলাম এবং আধুনিক যুগের উপযোগী আধুনিক চিন্তা ও ভাবধারা এবং কর্ম্মপদ্ধতির সহিত পরিচিত হইয়াছিলাম। তাহাতে ইংরেজদের

সরকারী বেসরকারী নানা কাজে দরকার পড়ায় নানা প্রদেশে আমাদের চাকরি ওকালতী ইত্যাদির সুযোগ হইয়াছিল। ইংরেজী শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে যদি আমরা প্রথম হইতে আধুনিক ব্যবসা-বাণিজ্যেও অধিক মন দিতাম তাহা হইলে ভাল হইত। কিন্তু গতানুশোচনা নিষ্ফল।

১৯১১ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বঙ্গের রাজধানী কলিকাতা ভারতবর্ষেরও রাজধানী ছিল। ইহাও বাঙালীর প্রভাব-বিস্তারের অন্যতম কারণ। এই কারণ কুড়ি বৎসর লুপ্ত হওয়ায় বাঙালীর প্রভাবও সেই পরিমাণে কমিয়াছে।

কয়েক বৎসর আগে পর্য্যন্ত কংগ্রেসের সব কাজ ইংরেজীতে হইত। বাঙালীদের মধ্যে ইংরেজী-জানা লোক বেশী থাকায় ও তাঁহাদের মধ্যে ধনী বুদ্ধিমান ও বাগ্মী লোক কতকগুলি থাকায় কংগ্রেসে বাঙালীর প্রতিপত্তি ছিল। কংগ্রেসে সাক্ষাৎভাবে ধনীর প্রতিপত্তি এখন না থাকিলেও, কংগ্রেস চালাইবার জন্য, আন্দোলনের জন্য, এমন কি সত্যাগ্রহের জন্যও, টাকার দরকার থাকায় পরোক্ষ ভাবে ধনীর মর্য্যাদা আছে। কিন্তু তাহা জমিদারীর মর্য্যাদা নহে, নগদ টাকা ওয়ালার এবং নগদ টাকা দিবার সামর্থ্যের মর্য্যাদা। সুতরাং ধনের পরোক্ষ (যদিও খুবই প্রকৃত) যে প্রতিপত্তি কংগ্রেসে এখনও আছে, তাহা মাড়োয়ারী ও ভাটিয়া টাকা-দেনেওয়ালা ধনীদের। বাঙালীর এখানে কোন স্থান নাই।

বাঙালীরাই ভারতীয়দের মধ্যে একমাত্র বুদ্ধিমান্ জাতি নহে। অন্য জাতির বুদ্ধিমান লোকদের মধ্যে ইংরেজীর চর্চ্চা যেমন বাড়িয়াছে এবং তাহারা যেমন যেমন ইংরেজীতে বাগ্মী হইয়াছে, সেই সঙ্গে সঙ্গে কংগ্রেসে তাহাদেরও প্রতিপত্তি বাড়িয়াছে। এই জন্য, যত বৎসর কংগ্রেসে ইংরেজীরই চলন ছিল, তাহার শেষের দিকে বাঙালীর প্রভাব ও কার্য্যকারিতা বিশেষ ভাবে কমিয়াছে। ইহাতে কেবল যে বাঙালীর প্রভাব ও কার্য্যকারিতাই কমিয়াছে, তাহা নহে, কংগ্রেসেরও ক্ষতি হইয়াছে। মহাত্মা গান্ধী বুদ্ধিমান্ লোক ও খুব মহৎ লোক। কিন্তু কোন মানুষ যত বড়ই হউন, সকল চিন্তা ভাব বুদ্ধির আকর তিনি হইতে পারেন না। সকল প্রদেশের লোকদের চিন্তা ভাব বুদ্ধির সমবেত শক্তির দ্বারা চালিত হইলে তবে কংগ্রেস ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র শক্তিশালী হইতে পারে। ইহা এখন সর্ব্বত্র শক্তিশালী নহে। কংগ্রেসের যাঁহারা বঙ্গীয় প্রাদেশিক ব্যাপারে কর্তৃত্ব করেন, বঙ্গে তাঁহাদের প্রভাব ও কার্য্যকারিতা যত বেশীই হউক না কেন, সমগ্র ভারতীয় ব্যাপারে তাঁহাদের প্রভাব বিশেষ ভাবে অনুভূত হয় না। সমগ্রভারতীয় ব্যাপারে তাঁহাদের কার্য্যকারিতা কম হইবার একটি কারণ যে তাঁহাদের হিন্দীজ্ঞানের অভাব বা অল্পতা, তাহাতে সন্দেহ নাই।

কংগ্রেসের কাজে কয়েক বৎসর হইতে হিন্দীভাষী ও ও গুজরাতীভাষী লোকদের অধিক কার্য্যকারিতার একমাত্র কারণ এ নয়, যে, ঐ দুই প্রদেশের লোকেরা হঠাৎ খুব বুদ্ধিমান ও কর্ম্মিষ্ঠ হইয়া গেলেন এবং অন্যান্য প্রদেশের লোকেরা হঠাৎ অকর্ম্মা ও নির্ব্বোধ হইয়া গেলেন। মহাত্মা গান্ধী গুজরাতী হইলেও সব গুজরাতী মহাত্মা গান্ধী নহে। হিন্দীভাষী প্রদেশগুলির কার্য্যকারিতা বৃদ্ধির একটি কারণ কংগ্রেসে হিন্দীর প্রচলন। গুজরাতীরা সংখ্যাবহুল জাতি নহে। সেই কারণে এবং তাহাদের সাহিত্যাভিমান বাঙালীর সাহিত্যাভিমানের মত নহে বলিয়া, তাহারা মহাত্মাজীর দৃষ্টান্তে শুদ্ধ ও অশুদ্ধ হিন্দী খুব বলিতেছে।

কংগ্রেসওয়ালা বাঙালীরা যদি কংগ্রেসে নিজ নিজ বুদ্ধিবিদ্যার প্রয়োগ করিয়া দেশের সেবা করিতে চান, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে শীঘ্র হিন্দী শিখিয়া ফেলিতে হইবে। মান্দ্রাজীরা চতুর জাতি। ইতিমধ্যেই কোন কোন মান্দ্রাজী কংগ্রেসওয়ালা হিন্দী শিখিয়াছেন। মান্দ্রাজীদের চেয়ে বাঙালীর পক্ষে হিন্দী শেখা সোজা। রোজ দুই এক ঘণ্টা সময় দিলে শিক্ষিত বাঙালীরা পাঁচ-ছয় মাসে হিন্দী শিখিয়া ফেলিতে পারিবেন।

ইহাতে কেবল যে কংগ্রেসে কাজ করিবারই সুবিধা হইবে তাহা নহে। সমগ্রভারতীয় হিন্দুমহাসভা প্রভৃতি অন্য যে-সব নিখিলভারতীয় প্রতিষ্ঠান আছে, হিন্দী জানিলে তাহাতে কাজ করিবারও সুবিধা হইবে। ভারতবর্ষে স্বরাজ স্থাপিত হইলে তাহার ব্যবস্থাপক সভার

কাজ হিন্দীতে হইবে। তখন সব বক্তৃতা ও তর্কবিতর্ক বুঝিতে হইলে এবং সকল সভাকে নিজের বক্তব্য জানাইতে বুঝাইতে হইলে হিন্দী জানিবার প্রয়োজন হইবে।

বাংলা দেশের কলকারখানার অধিক অংশ এখন অবাঙালীর করায়ত্ত। বাঙালীকে বাঁচিতে হইলে তাহাদের নিজস্ব কলকারখানা স্থাপন করিতে হইবে। তাহার বিস্তর মজুর কারিগর হিন্দীভাষী হইবে। সেই কারণে কলকারখানার মালিক বাঙালীদের হিন্দী জানা বাঞ্ছনীয়। বর্ত্তমানেও কলকারখানার অবাঙালী মালিক-দের হিন্দীভাষী মজুর ও কারিগরদিগের নেতৃত্ব বাঙালী-দিগকে করিতে হয়। তাঁহারা হিন্দুস্থানী যত ভাল জানিবেন ও বলিতে পারিবেন, তাঁহাদের নেতৃত্ব সেই পরিমাণে ফলপ্রদ হইবে।

ব্যবসা-বাণিজ্যে কৃতী হইতে হইলেও হিন্দুস্থানী জানা আবশ্যক। ব্যবসা-বাণিজ্যে নিযুক্ত অনেক ইউরোপীয় হিন্দুস্থানী শিক্ষা করেন।

সর্ব্বশেষে হিন্দী শিখিলে আমাদের অন্য একটি মহৎ লাভের উল্লেখ আবশ্যক। বর্ত্তমান সময়ের হিন্দী সাহিত্য খুব উৎকৃষ্ট না হইলেও, মধ্যযুগের হিন্দী সাহিত্য আধ্যাত্মিক সম্পদে বিশেষ সমৃদ্ধ। তাহা অধ্যয়ন করিতে পারিলে আমরা উপকৃত হইব।

—

করাচীর পথ

বাংলা দেশ হইতে বরাবর স্থলপথে করাচী যাইতে হইলে অন্ততঃ দুই জায়গায়—দিল্লীতে ও লাহোরে—ট্রেন বদলাইতে হয় এবং তিন রাত্রি ট্রেনে যাপন করিতে হয়। দিল্লী হইতে লাহোর না গিয়া কতকটা রাজপুতানার ভিতর দিয়াও যাওয়া যায়। তাহাতে দুই বার গাড়ী বদলাইতে হয়। করাচী যাইবার আর এক উপায় কলিকাতা হইতে সোজা বোম্বাই যাত্রা এবং বোম্বাই হইতে জাহাজে করাচী যাওয়া। কিন্তু বরাবর স্থলপথে যে দিক্ দিয়াই যাওয়া যাক্, সিন্ধুদেশের মরুভূমি পার হইতেই হইবে।

বস্তুতঃ সিন্ধুনদের উভয়তীরবর্ত্তী কতকটা স্থান ব্যতীত সিন্ধুদেশের সবটাই মরুভূমির সদৃশ বলা যাইতে পারে। কেবল সমতল বালুকা ও বালুকার ঢিবি এবং মধ্যে মধ্যে বাব্‌লাজাতীয় ও ঝাউজাতীয় গাছ, মনসাগাছ, এবং ছোট ছোট অন্য কাঁটাগাছের ঝোপ। স্বভাবজাত তৃণাস্তীর্ণ জমী প্রায় দেখাই যায় না। কেবল হায়দরাবাদ পৌছিবার কিছু আগে হইতে কিছু পরে পর্য্যন্ত সবুজ রঙের কতকটা প্রাধান্য দেখা যায়। যেখানে কৃত্রিম জলসেচনের উপায় আছে, সেখানে শস্যক্ষেত্র দেখা যায়।

সিন্ধুদেশ যে কিরূপ মরুময় তাহা বাঙালীকে বুঝাইবার একটা উপায়, বঙ্গের আয়তন ও লোকসংখ্যার সহিত সিন্ধুদেশের আয়তন ও লোকসংখ্যার তুলনা। সিন্ধুদেশের আয়তন ৪৬৫০৬ বর্গ মাইল, বঙ্গের ৭৬৮৪৩ বর্গমাইল। অর্থাৎ বাংলার আয়তন সিন্ধুর প্রায় দেড়গুণ। সিন্ধুর লোকসংখ্যা ৩২৭৯৩৭৭, বঙ্গের ৪৬৬৯৫৫৩৬। অর্থাৎ বঙ্গের লোকসংখ্যা সিন্ধুর চৌদ্দগুণেরও অধিক।

সিন্ধু মরুময় বলিয়া উহার ভিতর দিয়া যাতায়াত কষ্টকর—বিশেষতঃ গ্রীষ্মকালে। গরম ত আছেই, তাহার উপর ধুলাবালির প্রাচুর্য্য।

রেলে যাইতে যাইতে বেশ বড় গাছ দেখা যায় না বলিয়া করাচী পৌছিতে ৭৪ মাইল থাকিতে ঝিম্পীর নামক ষ্টেশনে তিনটি বটগাছ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ছায়াহীন সিন্ধুদেশে এই ছায়াতরুগুলির অস্তিত্ব বড় আরামদায়ক।

করাচী যাইবার সময় ও তথা হইতে আসিবার সময় ট্রেন কোথাও ঠিক সময়ে পৌছে নাই। প্রধানতঃ মহাত্মা গান্ধীকে, এবং অন্য কোন কোন নেতাকেও, দেখিবার জন্য ষ্টেশনে ষ্টেশনে এত ভিড় হইত, যে, গাড়ী যথাসময়ে ষ্টেশন ছাড়িতে পারিত না। তা ছাড়া, কোন কোন নেতা প্রায় প্রত্যেক ষ্টেশনেই বক্তৃতাও করিয়াছিলেন।

—

সিন্ধুদেশে দ্রষ্টব্য স্থান

সিন্ধুদেশে যত দ্রষ্টব্য স্থান আছে, সবগুলির উল্লেখ বা কোনটির বিশেষ বর্ণনা করা এখানে চলিবে না।

একটি প্রাচীন এবং একটি আধুনিক স্থানের উল্লেখ মাত্র করিব।

ভারতবর্ষে এ পর্য্যন্ত যত প্রাচীন নগর আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার সবগুলিরই ঐতিহাসিক উল্লেখ পাওয়া যায়। কিন্তু সিন্ধুদেশে যে মোহেন-জো-দড়ো নামক স্থান পরলোকগত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় আবিষ্কার করেন, তাহা প্রাগৈতিহাসিক। "মোহেন-জো-দড়ো" নামটির অর্থ মোহেন বা মোহনের উঁচু ঢিবি। এখানে ভিন্ন ভিন্ন যুগের তিনটি শহরের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গিয়াছে। আধুনিকতম নগরটি মোটামুটি ৫০০০ বৎসর আগেকার। আরও প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ আরও গভীর স্তরে আছে অনুমিত হইয়াছে, কিন্তু জল বাহির হওয়ায় তাহা এখনও খনিত হয় নাই। রাখালবাবু যাহা খনন করাইয়াছিলেন, তাহার একটি স্থান প্রত্নতত্ত্ববিভাগের মোহেন-জো-দড়ো স্থিত কর্ম্মচারী শ্রীযুক্ত ননীগোপাল মজুমদার ও শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত সৌজন্য সহকারে আমাকে দেখাইয়াছিলেন। তাঁহাদের নিকট আমি কৃতজ্ঞ। শীতকালে সেখানে গেলে ভাল করিয়া দেখিবার সুবিধা হয়। গরমের সময় দুই প্রহর রৌদ্রে দেখা আরামদায়ক নহে।

কথাপ্রসঙ্গে অবগত হইলাম, সিন্ধুদেশে আরও চব্বিশটি স্থান আবিষ্কৃত হইয়াছে, যাহার কোন-কোনটিতে হয়ত মোহেন-জো-দড়ো অপেক্ষাও প্রাচীনতর সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া যাইতে পারে। এগুলি এখনও যথারীতি খনিত হয় নাই।

মোহেন-জো-দড়ো ডোকরী নামক রেলওয়ে ষ্টেশন হইতে যাওয়া সুবিধাজনক। এই ষ্টেশন করাচী হইতে প্রায় ২৮০ মাইল। ষ্টেশন হইতে মোহেন-জো-দড়ো প্রায় ৯ মাইল। টঙ্গা বা মোটর গাড়ীতে যাওয়া যায়। রাস্তা ভাল। মোহেন-জো-দড়োতে আবিষ্কৃত কতক জিনিষ তথাকার মিউজিয়মে আছে। খুব মূল্যবান অনেক জিনিষ বিলাতে ও আমেরিকায় প্রেরিত হইয়াছে। কিছু কলিকাতার মিউজিয়মে আসিয়াছে। স্থানটির সচিত্র বৃত্তান্ত প্রত্নতত্ত্ববিভাগের ডিরেক্টর স্যর জন মার্শ্যাল লিখিয়াছেন। তাহা তিন চারি মাস পরে বাহির হইবে শুনিলাম।

এই প্রকার স্থান খনন করিয়া ভারতবর্ষের লুপ্ত সভ্যতার নিদর্শন আবিষ্কারে যত টাকা খরচ হয়, তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী টাকা খরচ করিয়া আরও অনেক স্থান খনন করা উচিত।

সিন্ধুদেশের আধুনিক যে বড় কাজটি সকলের দেখিবার যোগ্য, তাহা সক্কর শহরে সিন্ধুনদের বাঁধ। ইহা ১৯৩২ সালে মে-জুন মাসে শেষ হইবে। নদে বাঁধ দিয়া বৃহৎ জলাশয়ে যে জল সঞ্চিত হইতে থাকিবে, খালের দ্বারা তাহা শস্যক্ষেত্রে জলসেচনের জন্য ব্যবহৃত হইবে। বাঁধ ও খালসকলে কুড়ি কোটি টাকা খরচ হইবে অনুমিত হইয়াছে। আরও ৪।৫ কোটি টাকা বেশী খরচ হইতে পারে। বাঁধ ও খালগুলির নির্ম্মাণ শেষ হইয়া গেলে সিন্ধুনদের পূর্ব্ব ও পশ্চিম দিকের ৭৪,০৬,০০০ একার জমিতে জলসেচন করা চলিবে। তন্মধ্যে প্রতি বৎসর ৫৪,৫৩,০০০ একার জমিতে চাষ চলিবে। এক একার ৪৮৪০ বর্গ গজ, তিন বিঘার কিছু বেশী। সক্কর বাঁধের অন্যতম এঞ্জিনিয়ার শ্রীযুক্ত এম্ পি মথরানী নামক সিন্ধী ভদ্রলোকটির আতিথ্যে ও সৌজন্যে আমরা সক্করের বাঁধ দেখিতে সমর্থ হইয়াছিলাম। আমরা তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ।

—

করাচী কংগ্রেসের ব্যবস্থা ও কাজ

করাচীর কংগ্রেসওয়ালারা সমুদয় আয়োজন করিবার জন্য মোটে ২৪।২৫ দিন সময় পাইয়াছিলেন। সেই সময়ের মধ্যে তাঁহারা কংগ্রেসের প্রতিনিধিদের ও দর্শকদের থাকিবার ও খাইবার বন্দোবস্ত, নানা কমিটির কাজের জন্য মণ্ডপ-নির্ম্মাণ, খাদি-প্রদর্শনী, টিলক স্বদেশী বাজার প্রভৃতির আয়োজন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের কৃতিত্ব প্রশংসনীয়। প্রতিনিধি ও দর্শকদের



শেঠ হরচন্দ রায় বিষিণদাস। ইঁহার নামে কংগ্রেস-নগরের নামকরণ হইয়াছে

কুটীরগুলির এবং সিন্ধুর স্বর্গীয় নেতা হরচন্দ রায় বিষিণদাস মহাশয়ের নামে অভিহিত হরচন্দ রায় নগরের জন্য জল ও বৈদ্যুতিক আলোকের



শ্রীযুক্ত আব্দুল গফুর খাঁর নেতৃত্বে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের লাল কুর্ত্তা পরা স্বেচ্ছাসেবকদল

সুবন্দোবস্ত হইয়াছিল। বৃক্ষশূন্য প্রান্তরে এই নগর নির্ম্মিত হইয়াছিল। কুটীরগুলির দেওয়াল চাটাই বা চটের এবং ছাদ পাতার নির্ম্মিত বলিয়া দ্বিপ্রহরের সময় হইতে বেশী গরম অনুভূত হইত। কিন্তু এত অল্প সময়ের মধ্যে হাজার হাজার লোকের থাকিবার জন্য ইহা অপেক্ষা ভাল বন্দোবস্ত করা সম্ভবপর ছিল না। রাত্রি ঠাণ্ডা থাকায় নিদ্রার কোন ব্যাঘাত হইত না। আমরা কংগ্রেস শিবিরে ছিলাম না, শহরে ছিলাম। তাহাতে দেখিয়াছি, করাচীতে মশা নাই। সম্ভবতঃ কংগ্রেস শিবিরে কাহাকেও মশার উপদ্রব সহ্য করিতে হয় নাই।



জাতীয় পতাকার সম্মুখে সর্দার বল্লভভাই পটেল এবং তাঁহার দক্ষিণ পার্শ্বে এলাহাবাদের মহিলা ব্যারিষ্টার শ্রীমতী শ্যামকুমারী নেহরু

কংগ্রেসের বিষয়-নির্ব্বাচন কমিটি প্রভৃতির অধিবেশন মণ্ডপে হইত। কংগ্রেসের পূর্ণ অধিবেশন আকাশের নীচে খোলা জায়গায় হইত। সেইজন্য, রৌদ্রের প্রখরতা কমিয়া আসিলে অপরাহ্ণ ছয়টার সময় অধিবেশন আরম্ভ হইত এবং প্রায় মধ্যরাত্রি পর্য্যন্ত চলিত। বৈদ্যুতিক আলোকের প্রাচুর্য্য বশতঃ আঁধার একটুও অনুভূত হইত না।

প্রথম দিন কংগ্রেসের কার্য্যারম্ভে রবীন্দ্রনাথের "জনগণমন অধিনায়ক জয় হে ভারত ভাগ্যবিধাতা" গীত হয়। সিন্ধী বালিকারা ইহা গাহিয়াছিলেন। সুরের কোন বিকৃতি লক্ষ্য করি নাই, যদিও বাঙালীর কানে ধরা পড়িতেছিল যে, অবাঙালীর কণ্ঠ হইতে গান নিঃসৃত হইতেছে। সমস্ত গানটি গীত হয় নাই, তিনটি কলি গীত হইয়াছিল। আমরা শ্রীযুক্ত কেবলরাম দয়ারাম শাহানী নামক যে সিন্ধী ভদ্রলোকটির অতিথি ছিলাম, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, শ্রীমতী এনী বেসাণ্ট প্রতিষ্ঠিত মান্দ্রাজের ব্রহ্মচর্য্য বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ অধ্যাপক ডাঃ জেমস্ কাজিন্স সাহেব করাচীতে রবীন্দ্রনাথের এই গানটি প্রবর্ত্তিত করেন, সেখানে তিনটি কলিই গাওয়া হয়, এবং গানটি তথায় খুব লোকপ্রিয়। বস্তুত ভাবের উচ্চতা ও গভীরতা এবং সুরের গাম্ভীর্য্যে গানটি ভারতবর্ষের জাতীয় স্তোত্র হইবার সম্পূর্ণ উপযুক্ত। রবীন্দ্রনাথের এই গানটির পরে আর দুটি গান হইল—কথা বুঝিতে পারিলাম না;

বোধ হয় হিন্দুস্থানী "জাতীয় সঙ্গীত", কিন্তু সুর লঘু, নাচুনী ধরণের।

কংগ্রেসের কাজ মোটের উপর সুশৃঙ্খল ভাবে নির্ব্বাহিত হইয়াছিল। বেশীর ভাগ তর্কবিতর্ক বিষয়-নির্ব্বাচন ও প্রস্তাব মুসাবিদা করিবার কমিটিতেই হইয়া গিয়াছিল। তাহাতে তর্ক-বিতর্ক প্রধানতঃ হইয়াছিল তিনটি প্রস্তাব লইয়া—যথা, সর্দ্দার ভগৎ সিং ও তাঁহার দুই সঙ্গীদের ফাঁসী সম্বন্ধীয় প্রস্তাব, রাজনৈতিক কারণে বন্দীদের মুক্তির ঔচিত্য বিষয়ক প্রস্তাব, এবং গান্ধী-আরুইন সন্ধি বিষয়ক প্রস্তাব।

রাজনৈতিক কারণে বন্দীদের মুক্তির ঔচিত্য বিষয়ক প্রস্তাবের যে ইংরেজী মুদ্রিত মুসাবিদা প্রথমে বিষয়-নির্ব্বাচক কমিটির সম্মুখে স্থাপিত হয়, তাহাতে নানা প্রদেশের নানারকমের রাজ-নৈতিক বন্দী ও বিচারাধীন বন্দীর ফর্দ্দ ছিল, কিন্তু বিনাবিচারে বন্দীকৃত বঙ্গের বহু শত "অন্তরীন"দের উল্লেখ ছিল না। এই অনুল্লেখ অবশ্য কাহারও ইচ্ছাকৃত নহে। কিন্তু বঙ্গের প্রতি সরকারী অবিচার খুব বেশী হইলেও তাহা যে অন্যান্য প্রদেশের কংগ্রেস কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি এড়াইয়া যায় বা মনে থাকে না, ইহা তাহার একটি দৃষ্টান্ত হইতে পারে।



সভামণ্ডপে সর্দ্দার বল্লভভাই। করাচী মিউনিসিপালিটির কর্ণধার শ্রীযুক্ত জামশেদ এন্ আর্ মেহ্‌তা তাঁহার দক্ষিণ দিকে দণ্ডায়মান

গান্ধী-আরুইন চুক্তি কংগ্রেসওয়ালাদের "লেফ্‌ট উইং" ভুক্ত অনেকের মনঃপূত হয় নাই। তাঁহারা বিষয়-নির্ব্বাচক কমিটিতে এ বিষয়ে বাদপ্রতিবাদও করিয়া-ছিলেন। কিন্তু সুভাষবাবু বাদপ্রতিবাদটাকে বেশী দূর না লইয়া গিয়া সুবুদ্ধি ও সুবিবেচনার কাজ করিয়াছিলেন। এ বিষয়ে মতানৈক্য বেশী দূর অগ্রসর হইলে তাহাতে ভারতের স্বরাজলাভের বিরোধী ইংরেজ আমলাতন্ত্রের অভিপ্রায় সিদ্ধ হইত; এবং বোধ হয় ভোট লইলে "বামপক্ষ"ভুক্ত লোকদের পরাজয়ও হইত।

কংগ্রেসের পূর্ণ অধিবেশনে গান্ধী-আরুইন সন্ধির বিরুদ্ধে বোম্বাইয়ের শ্রীযুক্ত যমুনাদাস মেহ্‌তা বক্তৃতা করেন। বক্তৃতা ভালই করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি কংগ্রেসকর্ত্তৃক ঐ সন্ধিসমর্থনের বিরুদ্ধে যে-সব যুক্তি প্রয়োগ করিয়াছিলেন, তাহা আমাদিগকে তাঁহার মতানুবর্ত্তী করিতে পারে নাই। তবে, তিনি ভারতবর্ষের সরকারী ঋণ সম্বন্ধে যে-সব কথা বলিয়া কংগ্রেস পক্ষের তদ্বিষয়ক দাবির ব্যর্থতা প্রদর্শন করিতে চাহিয়াছিলেন, তাহা বিবেচনা ও চিন্তার যোগ্য মনে হইয়াছিল।

অভ্যর্থনা-কমিটির সভাপতি, কংগ্রেসের সভাপতি এবং বক্তাদের বক্তৃতার জন্য যে উচ্চ মঞ্চ নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহার কাষ্ঠময় গোলাকৃতি বেষ্টনী মহাত্মা গান্ধী প্রভৃতির ছবিতে নানাবর্ণে সুচিত্রিত হইয়াছিল। চিত্রিত করিবার ভার ছিল আহমেদাবাদের চিত্রকর শ্রীযুক্ত কনু দেশাইয়ের উপর। ইঁহার চিত্রের সহিত প্রবাসীর পাঠকেরা পরিচিত। ইনি এক সময়ে শান্তিনিকেতনে কলাভবনের ছাত্র ছিলেন। বক্তৃতামঞ্চের চিত্রের একটি ফটোগ্রাফ ছাপিবার আমাদের ইচ্ছা ছিল। কিন্তু তাহা এখনও আসিয়া পৌঁছে নাই। পরে যদি পাই এবং যদি তাহা হইতে ব্লক করিয়া ছাপিলে ছবি পরিষ্কার বুঝা যায়, তাহা হইলে মুদ্রিত করিব।

—

করাচীতে হিন্দু মহাসভা

কংগ্রেস সপ্তাহে সিন্ধুদেশের হিন্দুরা করাচীতে হিন্দু মহাসভার এক অধিবেশন করেন। ইহা নিয়মিত



করাচীতে হিন্দু মহাসভার অধিবেশন

বার্ষিক অধিবেশন নহে; হিন্দু মহাসভার উদ্দেশ্য সর্ব্ব-সাধারণকে বুঝাইয়া দিবার নিমিত্ত এবং সিন্ধী হিন্দুরা সিন্ধুকে একটি আলাদা প্রদেশে পরিণত করার বিরোধী, যুক্তি-সহকারে ইহা জানাইবার জন্য এই অধিবেশন হয়। করাচীতে সমবেত পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয় প্রমুখ হিন্দু নেতারা এবং অন্য হিন্দু কর্ম্মীরা প্রবাসীর সম্পাদককে সভাপতি নির্ব্বাচন করেন। এই জন্য কেবল দেখিবার শুনিবার জন্য আমাদের করাচী যাওয়ার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় নাই। সভাপতির অভিভাষণে ইহা বুঝাইয়া দেওয়া হয় যে, হিন্দু মহাসভার প্রধান উদ্দেশ্য



সভা-মণ্ডপে উপবিষ্ট কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ

রাজনৈতিক নহে, আত্মরক্ষার জন্য ইহাকে রাজনৈতিক বিষয়ে মত প্রকাশ করিতে হয়। সেই মত যে সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতা দ্বারা দূষিত নহে তাহা হিন্দু মহাসভার কার্য্য-নির্ব্বাহক কমিটির দ্বারা প্রকাশিত মতবর্ণনাপত্র হইতে বুঝা যায়। হিন্দু সংস্কৃতি ও সভ্যতা রক্ষা ও তাহার প্রভাব বৃদ্ধি, হিন্দু সমাজকে সুস্থ সবল ও জ্ঞানোন্নত রাখা, এবং হিন্দুর সংখ্যা-হ্রাস-নিবারণ ও সংখ্যা-বৃদ্ধিসাধন, হিন্দু মহাসভার এই সব উদ্দেশ্য বিবৃত ও ব্যাখাত হয়। হিন্দু সমাজের অনুন্নত শ্রেণীর লোকদিগের ও মুসলমানদের হিতসাধন যে "উচ্চ" শ্রেণীর হিন্দুদের কর্ত্তব্য এবং অক্রোধ ও সেবা দ্বারা যে বিদ্বেষকে পরাজিত করিতে হইবে, বক্তৃতায় তাহা বলা হয়। যে-সকল কারণে সিন্ধুদেশ একটি স্বতন্ত্র প্রদেশে পরিণত করা বর্ত্তমান অবস্থায় উচিত নয় তাহাও ব্যাখ্যাত হয়। অধিবেশনের দ্বিতীয় দিবসে অনেকগুলি প্রয়োজনীয় প্রস্তাব গৃহীত হয়।

কানপুরের দাঙ্গা ও হত্যাকাণ্ড

ভারতবর্ষের আধুনিক ইতিহাসে ইহা বহুবার ঘটিয়াছে যে, যখনই হিন্দু মুসলমানে দাঙ্গা মারামারি কাটাকাটি হইলে জাতীয় কোন মহৎ উদ্দেশ্য সিদ্ধির বা মঙ্গল সাধনোপায়ে ব্যাঘাত জন্মিবে, তখনই ঐরূপ অনিষ্টকর ঘটনা ঘটিয়াছে। কেন এরূপ হয়, তাহার অনুমান আলোচনা অনেকবার করিয়াছি। প্রাচীনকালে এইরূপ ঘটনা ঘটিলে হয়ত তখনকার লোকেরা ভয়ে দুর্দৈব বা আকস্মিকতা নামক কোন কল্পিত উপদেবতার মূর্ত্তি গড়িয়া তাহাকে প্রসন্ন করিবার নিমিত্ত পূজা বলি দিত। একালে তাহা হইবার জো নাই, এই জন্য এই সব ঠিক সময়োচিত অথচ "আকস্মিক" ভীষণ ঘটনার উৎপত্তির অন্য কারণ অনুমান ও আবিষ্কার করিতে হয়। অনুমানটাকে বিপথে চালিত করিবার নিমিত্ত সংবাদ সরবরাহকারী কোন এক এজেন্সী গোড়াতেই রটাইয়া দিল, ভগৎ সিংহের ফাঁসীর জন্য হরতাল উপলক্ষ্যে কংগ্রেস-ওয়ালারা জোর করিয়া মুসলমানদের দোকান বন্ধ করাইবার চেষ্টা করায় এই হাঙ্গামা ঘটিয়াছে। বস্, ইহাতেই দিল্লীতে সমবেত এক দল মুসলমান কংগ্রেসকে, কংগ্রেসওয়ালাদিগকে ও হিন্দুদিগকে আক্রমণ করিয়া ভয়ানক উত্তেজনাপূর্ণ বক্তৃতা করিলেন। ইহা নিতান্ত পরিতাপের বিষয়। কংগ্রেস পক্ষ যদি ইহা ঘটাইয়া থাকিবে, তাহা হইলে উহার স্থানীয় নেতা সম্পূর্ণ সাম্প্রদায়িক পক্ষপাতশূন্য পণ্ডিত গণেশশঙ্কর বিদ্যার্থী বিপন্ন হিন্দু ও মুসলমানদিগকে বাঁচাইতে গিয়া প্রাণ দিলেন কেন?

বস্তুতঃ কংগ্রেসওয়ালারা বা হিন্দুরা মুসলমান দোকান-দারদের উপর জুলুম করিয়াছিল, এরূপ কোন প্রমাণই পাওয়া যায় নাই। কংগ্রেসের হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে



পরলোকগত পণ্ডিত গণেশ শঙ্কর বিদ্যার্থী

সদ্ভাব স্থাপন ও বৃদ্ধির চেষ্টায় যাহাতে ব্যাঘাত জন্মে এরূপ কিছু করা কোন কংগ্রেসওয়ালার দ্বারা কেন হইতে পারে না তাহার নানা যুক্তি দেখাইয়া, কানপুর শহরের কংগ্রেস কমিটির সাধারণ সেক্রেটারী লালা প্যারেলাল আগরওয়ালা তাঁহার বর্ণনাপত্রে লিখিয়াছেন—

It would be proper to note a few points here which will clear some misunderstandings about Congress responsibility in this connection; (1) It is not a fact that Muslim shops were picketed at any time in order to force them to close their business whenever hartal was declared by the Congress Committee. No one had ever any sanction or authority from the Congress Committee to do that, nor did the Congress Committee ever encourage or condone any such practice. (2) The Congress Committee or its authorities never advised interference with traffic. (3) The news of Lahore executions arrived at Cawnpore about 9 A.M. in the morning of the 24th ultimo and spread like wild fire throughout the city. Most shopkeepers closed business immediately without waiting for formal proclamation of hartal by the Congress Committee. Muslim shops were also voluntarily closed and

most Anti-Congress Muslims observed hartal because these executions affected their feeling in spite of the Congress movement. (4) The accusation against the Vanar Sena is entirely baseless and false as its President, Secretary, Jathedars and other principal organizers had left Cawnpore for Karachi before the news of Lahore executions reached here. There is absolutely no evidence to associate any member of the Vanar Sena with any incidentt of the riot.

কানপুরের দাঙ্গা ও নরহত্যার সহিত কোন কংগ্রেস-ওয়ালার যোগ আছে এরূপ কোন প্রমাণ কাহারও নিকট থাকিলে লালা প্যারেলাল তাহা অবিলম্বে স্থানীয় কংগ্রেস কমিটিকে কিম্বা কংগ্রেস তদন্ত কমিটিকে জানাইতে অনুরোধ করিয়াছেন।

কানপুরের হিন্দুরা দাঙ্গা যে উৎপন্ন হইয়াছিল এবং শীঘ্র তাহার দমন হয় নাই, তজ্জন্য স্থানীয় সরকারী ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীদিগকে দায়ী করিয়া টেলিগ্রাফ করিয়াছেন। প্রাদেশিক ও ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় কোন কোন মুসলমান সভ্যও বলিয়াছেন যে, শীঘ্র শান্তি স্থাপনের জন্য স্থানীয় সরকারী লোকেরা কোন চেষ্টা করেন নাই। এসব কথা হিন্দু ও মুসলমান দেশী লোকদের কথা বলিয়া কেহ যদি তাহাতে আস্থা স্থাপন না করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের বিবেচনার জন্য অন্য প্রমাণ আছে। বোম্বাইয়ের টাইম্‌স্ অব্ ইণ্ডিয়া ইরেজদের কাগজ এবং হিন্দু-মুসলমানের মিলনের দ্বারা যাহাতে ভারতে স্বরাজ স্থাপিত হয় সেই চেষ্টা ও ঔৎসুক্যে বিনিদ্র নহে। তাহাতে কানপুরের ভীষণ ঘটনাবলীর প্রত্যক্ষদর্শী একজন ইউরোপীয়ের নিকট হইতে সাক্ষাৎ-ভাবে সংগৃহীত যে বৃত্তান্ত প্রকাশিত হইয়াছে, এলাহাবাদের দৈনিক লীডার তাহার নিম্নোদ্ধৃত চুম্বক দিয়াছেন।

The *Times of India* publishes an interview with a European eye-witness regarding the horrors prepetrated at Cawnpore. This eye-witness stated that it was strongly felt by many old residents in Cawnpore that not only the riots were planned in advance by some outside agencies but that 'for some mysterious reason they were allowed to take their course when prompt action might have confined what became a holocaust to the dimensions of any riot. The troops never fired a shot because they were never ordered to do so'. Dealing with the development of the trouble he stated that 'hell had broken loose without any apparent action on the part of authorities'. As regards the adequacy of the military and 'police force he expressed the view that the general belief was that it was 'adequate to nip the riots in the bud if prompt and energetic action had been taken'. As regards the troops, 'they had the terrible duty of standing by and constantly seeing the most horrible sight without taking any effective action'. Dealing with the question of arrests he points out that 'no arrests appear to have been made nor any systematic attempt to disarm the population until the arrival of the commissioner'. Concluding, he remarks that 'the troops were not allowed to do much'. The above only supports the view of the Indian citizens of Cawnpore about the inexplicable inactivity of the local authorities during the first two or three days of the disturbances. They have yet to know what were the prompt and energetic steps which, according to Mr. Emerson and Sir James Crerar, the authorities took to suppress the disorder.

লীডার কংগ্রেসওয়ালাদের কাগজ নহে, মডারেট দলের কাগজ।

—

ডাঃ চৈতরামের বক্তৃতা

করাচী কংগ্রেসের অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি ছিলেন ডাঃ চৈতরাম। তিনি অসুস্থ শরীর লইয়া অক্লান্তভাবে পরিশ্রম করিয়াছেন। তাঁহার বক্তৃতায় তিনি অনেকের প্রশংসা করিয়াছেন, নিজের প্রশংসা ত তাহাতে থাকিতে পারে না। কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যে কংগ্রেসের সব বন্দোবস্ত যে এত ভাল হইয়াছিল তাহার প্রশংসার কিয়দংশ তাঁহারও প্রাপ্য। অন্য যাঁহাদের প্রশংসা তিনি করিয়াছিলেন তাঁহারা সকলেই প্রশংসার যোগ্য। করাচী মিউনিসিপালিটীর পক্ষ হইতে উহার সভাপতি শ্রীযুক্ত জামশেদ মেহ্‌তা সহযোগিতা না করিলে কংগ্রেসের সুবন্দোবস্ত করা সম্ভবপর হইত না। করাচীর বণিকগণ ও স্বেচ্ছাসেবকেরা কংগ্রেসের প্রতি কর্ত্তব্য পূর্ণমাত্রায় করিয়াছিলেন।

মহাত্মাজীর উপদেশ অনুসারে বিস্তর সত্যাগ্রহী যে অহিংস সাহস ও দুঃখ-সহিষ্ণুতা দেখাইয়াছেন, তাহা সমুদয় মানবজাতিকে এক নূতন পথ দেখাইয়াছে, ডাঃ চৈতরামের এই উক্তি সত্য।

ডাঃ চৈতরামের এবং সভাপতি সর্দ্দার বল্লভভাই পটেলের বক্তৃতা সংক্ষিপ্ত ও বিশদ হইয়াছিল।

—

সভাপতি বল্লভভাই পটেলের বক্তৃতা

সভাপতি বল্লভভাই পটেলের ক্ষুদ্র বক্তৃতাটি আড়ম্বরশূন্য এবং কাজের কথায় পূর্ণ। মানুষটি যেমন, বক্তৃতাটিও তদ্রূপ। তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহার অধিকাংশ কথার আমরা অনুমোদন করি। দুই চারিটি কথা সম্বন্ধে আমরা সম্মানের সহিত কিছু বলিতে চাই।

—

সাম্প্রদায়িক সমস্যা সম্বন্ধে সর্দার পটেল

লাহোর কংগ্রেসে সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়ের লোকদের মধ্যে একতা সম্বন্ধে যে প্রস্তাব গৃহীত হয়, তাহা পাঠ করিয়া নিম্নলিখিত শেষ অংশের পর,

this Congress assures the Sikhs, Muslims and other minorities that no solution thereof in any future constitution can be acceptable to the Congress that does not give full satisfaction to the parties concerned."

পটেল মহাশয় বলেন,

"Therefore the Congress can be no party to any constitution which does not contain a solution of the communal question, that is not designed to satisfy the respective parties. As a Hindu, I would adopt my predecessor's formula and present the minorities with a swadeshi fountain pen and paper and let them write out their demands. And I should endorse them. I know that it is the quickest method. But it requires courage on the part of the Hindus. What we want is a heart unity, not patched up paper unity that will break under the slightest strain. That unity can only come when the majority takes courage in both hands and is prepared to change places with the minoritys. This would be the highest wisdom.

হৃদয়ের ঐক্য প্রভৃতি সম্বন্ধে পটেল মহাশয় যাহা বলিয়াছেন তাহা খুবই সত্য। কিন্তু তিনি সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহা আমাদের ঠিক মনে হইতেছে না। ভারতবর্ষে সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায় ত কেবল একটি নয়, অনেকগুলি। মুসলমানেরা অপেক্ষাকৃত অধিক দলবদ্ধ ও শক্তিশালী এবং আন্দোলন-পটু বলিয়া কার্য্যতঃ কেবল তাহাদিগকেই সংখ্যালঘিষ্ঠ মনে করা হইতেছে। ইহা ঠিক্ নয়। অন্যান্য সংখ্যালঘিষ্ঠ দলও আছে। সকলকেই যদি পটেল মহাশয় নিজ নিজ দাবি লিখিতে দেন এবং তাহা মঞ্জুর করেন, তাহা হইলে কার্য্যতঃ পরস্পরবিরোধী দাবি মঞ্জুর করিতে হইবে। তাহা সম্ভবপর নহে। পঞ্জাবের দৃষ্টান্ত লউন। পঞ্জাবের অধিবাসীসমষ্টির মোটামুটি শতকরা ১১ জন শিখ, ৫৫ জন মুসলমান, ৩৩ জন হিন্দু, ইত্যাদি। ঐ প্রদেশে মুসলমানেরা ব্যবস্থাপক সভায় শতকরা ৫৪।৫৫টি সভ্যপদই চান, শিখেরা চান শতকরা ৩০টি। বাকী থাকে শতকরা ১৫।১৬টি। তাহা হইতে ইংরেজ, ফিরিঙ্গী, দেশী খ্রীষ্টিয়ান প্রভৃতিকে কয়েকটি পদ দিতে হইবে। উহাদিগকে যদি শতকরা ১টি করিয়াও দিতে হয়, তাহা হইলেও ৩।৪টি বাহির হইয়া যায়। তাহা হইলে বাকী থাকে শতকরা ১২টি সভ্যপদ। সুতরাং পঞ্জাবের লোকসমষ্টির এক তৃতীয়াংশ (শতকরা ৩৩ জন) হিন্দুরা ব্যবস্থাপক সভায় মোট ১২টি সভ্যপদ পাইবে। এইরূপ মীমাংসার ন্যায্যতা অন্যায্যতার কথা তুলিব না। দেশের পক্ষে ইহা মঙ্গলকর কিনা, তাহাই বিবেচনা করিতে হইবে।

আমেরিকার সুবিখ্যাত দেশপতি স্বর্গীয় আব্রাহাম লিঙ্কন বলিয়াছেন, "No nation is good enough to rule another nation," "কোন নেশ্যন অন্য কোন নেশ্যনকে শাসন করিবার মত যথেষ্ট যোগ্যতা বা সাধুতা বিশিষ্ট নহে।" ইহার অনুরূপ অন্য একটি কথাও সত্য বলিয়া মনে করি। তাহা, "কোন ধর্ম্মসম্প্রদায়েরই অন্য কোন ধর্ম্মসম্প্রদায়কে শাসন করিবার মত যোগ্যতা ও সাধুতা নাই।" এই কারণে আমরা সমগ্র ভারতবর্ষে বা কোন প্রদেশে আইনের দ্বারা কোন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের লোকদের নিরঙ্কুশ প্রাধান্য চিরস্থায়ী করিয়া দিতে সম্পূর্ণ অনিচ্ছুক।

ইহা সত্য, সমুদয় ভারতবর্ষ ধরিলে হিন্দুরা সংখ্যাভূয়িষ্ঠ, এবং আইন দ্বারা তাহাদিগকে ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার অধিকাংশ সভ্যপদ দিয়া না দিলেও তাহারা সাধারণ নির্ব্বাচনেও অনেক সময় অধিকাংশ সভ্যপদ পাইবে। কিন্তু সব সময় তাহারা **নিশ্চয়ই** অধিকাংশ সভ্যপদ পাইবে, বলা যায় না। তা ছাড়া, হিন্দুদের মধ্যে রাজনৈতিক ভিন্ন ভিন্ন দল থাকায় তাহারা হিন্দু হিসাবে বরাবর একসঙ্গে ভোট দিবে না, রাজনৈতিক দল হিসাবে ভোট দিবে। এই কারণে, যখন যখন অধিকাংশ সভ্য হিন্দু থাকিবে, তখনও "হিন্দুরাজ" হইবে না। ইহাও মনে রাখিতে হইবে, যে, যোগ্যতা অনুসারে মুসলমান, খ্রীষ্টিয়ান, পার্সী প্রভৃতি সম্প্রদায়ের এত সভ্য নির্ব্বাচিত হইবেন, যে, রাজনৈতিক কোন-না-কোন দল যখনই প্রাধান্য পাইবেন, তখনই তাহার মধ্যে নানা ধর্ম্মসম্প্রদায়ের সভ্যেরা থাকিবেন। সুতরাং কোন রাজনৈতিক দলের প্রাধান্যকে কোন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের প্রাধান্য কোন সময়েই বলা চলিবে না। মনে রাখিতে হইবে, যে, আমরা সংযুক্ত সাধারণ নির্ব্বাচনের পক্ষপাতী। হিন্দুকে মুসলমান খ্রীষ্টিয়ান প্রভৃতিরও ভোট পাইয়া কৌন্সিলে যাইতে হইবে এবং মুসলমানকেও তদ্রূপ অমুসলমানদেরও ভোট পাইয়া নির্ব্বাচিত হইতে হইবে। এই জন্য কেবলমাত্র হিন্দু সমাজের একান্ত পক্ষপাতী হিন্দুর এবং কেবলমাত্র মুসলমান সমাজের একান্ত পক্ষপাতী মুসলমানের ব্যবস্থাপক সভার সভ্য হওয়া কঠিন হইবে। আমরা নানা ধর্ম্মের এরূপ সভ্যই চাই, যাঁহারা দেশের সকল ধর্ম্মের লোকেরই মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী; কারণ সকলেরই মঙ্গলামঙ্গল পরস্পরের সহিত জড়িত।

পটেল মহাশয় হিন্দুদিগকে সাহস করিয়া সংখ্যালঘিষ্ঠদিগের সহিত স্থানবিনিময় পূর্ব্বক তাহাদের

দাবি অনুসারে সব কিছু দিয়া ফেলিতে বলিয়াছেন। কিন্তু বিষয়টি শুধু সাহস ও বদান্যতার ব্যাপার নহে। দেখিতে হইবে, তাহাতে দেশের কাজ ঠিক-মত চলিবে কি না ও মঙ্গল হইবে কি না। আমাদের অভিজ্ঞতা প্রধানতঃ বঙ্গের। তাহা হইতে আমরা দেখিতেছি, যে, যদিও কোন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের লোকই স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া, সমালোচনার ভয় না থাকিলেও, অন্য সব সম্প্রদায়ের লোকদেরও মঙ্গল করিতে অভ্যস্ত নহে, তথাপি এ বিষয়ে হিন্দু ও মুসলমানে প্রভেদ আছে। বঙ্গের হিন্দুরা স্কুল-কলেজ স্থাপন করিয়া, বিশ্ববিদ্যালয়ে টাকা দিয়া, দুর্ভিক্ষাদিতে ও জলপ্লাবনাদিতে বিপন্নদের সাহায্যার্থ অর্থ সংগ্রহ ও পরিশ্রম করিয়া এবং অন্যান্য প্রকারে সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়ের হিত করিবার যতটা প্রবৃত্তি, সামর্থ্য ও অভ্যাস দেখাইয়াছেন, বঙ্গের মুসলমানেরা ততটা দেখান নাই। শিক্ষা প্রভৃতিতেও তাঁহারা অনগ্রসর। এই জন্য আমরা মুসলমান বাঙালীদিগকে বঙ্গদেশ শাসনের প্রধান ভার লইবার যোগ্য মনে করি না। একমাত্র হিন্দু বাঙালীদিগকেও ঐ কাজের যোগ্য মনে করি না। কিন্তু মুসলমানদের চেয়ে তাঁহাদিগকে সার্ব্বজনিক হিতসাধনে অধিক যোগ্য মনে করি, কারণ তাঁহাদের যোগ্যতা কার্য্য দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে। তথাপি, হিন্দু বাঙালীরা সকলে পক্ষপাতশূন্য ও কুসংস্কারশূন্য নহেন বলিয়া তাঁহারা মুসলমান খ্রীষ্টিয়ান প্রভৃতির সহযোগে দেশের কাজ করুন, ইহাই আমাদের মত।

বদান্যতা কথাটি শুনিতে বেশ ভাল। কিন্তু যাহার প্রতি ন্যায্য ব্যবহারের পরিবর্ত্তে বদান্যতা করা হয়, তাহাতে তাহার আত্মসম্মানে আঘাত করা হয় এবং তাহার শক্তি বিকাশের প্রয়োজন বিনাশ বা হ্রাস করিয়া তাহার অনিষ্ট করা হয়। যে চাহিলেই পায়, তাহার নিজ শক্তির বিকাশ ও যোগ্যতা অর্জ্জনের প্রয়োজন কি? বদান্যতা অযোগ্যের জন্য। মুসলমানরা মুসলমান বলিয়াই যদি ব্যবস্থাপক সভার অধিকাংশ সভ্যপদ ও অধিকাংশ চাকরি পান, তাহা হইলে তাঁহাদের হিন্দুর ও খ্রীষ্টিয়ানের সমকক্ষ হইয়া ব্যবস্থাপক সভায় ঢুকিবার ও চাকরি পাইবার ইচ্ছার প্রবলতা হ্রাস পাইবে না কি? মুসলমান বলিয়াই অপেক্ষাকৃত কম যোগ্য অনেকে চাকরি মুসলমানরা পাওয়ায় মুসলমান সমাজে শিক্ষার বিস্তার ও উন্নতিতে বাধা জন্মে নাই কি?

পটেল মহাশয় হিন্দুদিগকেই দেশের সব অংশে ও ব্যাপারে সংখ্যাভূয়িষ্ঠ ধরিয়া লইয়া তাহাদিগকেই সাহস ও সদাশয়তা পূর্ব্বক সংখ্যালঘিষ্ঠদিগকে তাহাদের প্রার্থিত সব কিছু দিয়া ফেলিতে বলিয়াছেন। সমগ্রভারতীয় ব্যাপারে হিন্দুদিগকে সংখ্যাভূয়িষ্ঠ বলিয়া ধরা ঠিক। কিন্তু ভারতবর্ষে অতঃপর যে প্রকার রাষ্ট্রীয় বিধান প্রবর্ত্তিত হইবার আভাস পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে প্রত্যেক প্রদেশ প্রায় সমুদয় আভ্যন্তরীণ বিষয়ে কর্ত্তৃত্ব লাভ করিবে। প্রত্যেক প্রদেশকে প্রায় একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্র মনে করা উচিত হইবে। বর্ত্তমানে তিনটি প্রদেশে মুসলমানরা সংখ্যাভূয়িষ্ঠ—উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, পঞ্জাব, ও বাংলা। সমগ্রভারতে এবং এই তিনটি ছাড়া অন্য সব প্রদেশে হিন্দুরা সংখ্যাভূয়িষ্ঠ বলিয়া যদি তাহাদিগকে সাহস ও সদাশয়তা সহকারে সংখ্যালঘিষ্ঠদিগকে তাহাদের দাবি অনুসারে সবকিছু ছাড়িয়া দিতে বলা সঙ্গত হয়, তাহা হইলে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে, পঞ্জাবে ও বঙ্গে মুসলমানেরা সংখ্যাভূয়িষ্ঠ বলিয়া ঐ তিনটি প্রদেশের সব ব্যাপারে মুসলমানদিগকেও সাহস ও সদাশয়তা সহকারে সংখ্যালঘিষ্ঠদিগকে সব কিছু ছাড়িয়া দিতে বলাই সঙ্গত হইবে। এই যুক্তি সম্বন্ধে সর্দ্দার পটেল মহাশয়ের মত জানি না। সম্ভবতঃ তাঁহার চিন্তা এ-পথে ধাবিত হয় নাই এবং তাঁহাকে কেহ এরূপ কথা বলে নাই।

—

চাকরির পাওনা এবং কৌন্সিলের সভ্যত্ব

পটেল মহাশয় তাঁহার বক্তৃতায় বলিয়াছেন :—

"The foregoing perhaps shows you how uninterested I am in many things that interest the intelligentsia. I am not interested in loaves and fishes, or legislative honours. The peasantry do not understand them, they are little affected by them."

তাৎপর্য্য। "এপর্য্যন্ত যাহা বলিয়াছি তাহা হইতে আপনারা বুঝিতে পারিবেন, শিক্ষিত শ্রেণীর লোকেরা যে-সব বিষয়ে মনোনিবেশ করেন, তাহার অনেকগুলিতে আমার মন বসে না। চাকরির টাকাকড়ি মুনফা এবং ব্যবস্থাপক সভার সভ্যত্বের সম্মানের দিকে আমার মন আকৃষ্ট হয় না। চাষীরা এসব বুঝে না, এ-সকলে তাহাদের কিছু আসে যায় না।"

পটেল মহাশয়ের শ্রোতাদের মধ্যে চাষী একজনও ছিলেন কিনা জানি না। গুজরাতে এবং অন্য কোথাও কোথাও চাষীরা সত্যাগ্রহ সংগ্রামে খুব সাহস, সহিষ্ণুতা ও আত্মোৎসর্গের পরিচয় দিয়াছেন সন্দেহ নাই এবং দেশে অন্য সব শ্রেণীর লোকের চেয়ে তাহাদের সংখ্যাও বেশী। কিন্তু স্বরাজলাভের জন্য এপর্য্যন্ত চেষ্টা ও নেতৃত্ব প্রধানতঃ শিক্ষিত শ্রেণীর লোকেরাই করিয়া আসিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যেও অনেক লোক সাহস সহিষ্ণুতা ও আত্মোৎসর্গের পরিচয় দিয়াছেন। দেশের উন্নতি, এমন কি চাষীদেরও অবস্থার উন্নতি করিতে হইলে মার্জ্জিত বুদ্ধি এবং নানা বিষয়ের গভীর

ও বিস্তৃত জ্ঞানের প্রয়োজন। তাহা এখন শিক্ষিত শ্রেণীর লোকদের যতটা আছে, চাষীদের ততটা নাই। মহাত্মা গান্ধী, পণ্ডিত মোতিলাল নেহ্‌রু, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস প্রভৃতি নেতারা কখনও চাষী ছিলেন না।

শিক্ষিত শ্রেণীর লোকেরা প্রধানতঃ টাকা ও সম্মানই বুঝে ও চায়, পটেল মহাশয় এরূপ ইঙ্গিত করিয়াছিলেন কিনা এবং করিয়া থাকিলে তাহা ঠিক্ হইয়াছিল কিনা, তাহার আলোচনা করা অনাবশ্যক। কিন্তু তিনি স্পষ্ট করিয়া যাহা বলিয়াছেন তাহার একটু আলোচনা আবশ্যক।

সরকারী চাকরির নানা দিক আছে। বেতন কেবল একটা দিক্। কিন্তু বেতনটাই সব নয়। ভারতবর্ষের বর্ত্তমান পরাধীন অবস্থায় সরকারী কর্ম্মচারীদিগকে ইংরেজের সহায় বলিয়া দেশের হিতকারী বলিয়া মনে না-করিবার কারণ থাকিতে পারে, যদিও বর্ত্তমান অবস্থাতেও তাঁহাদের মধ্যে অনেকে দেশের হিত করেন। কিন্তু দেশে যখন স্বরাজ স্থাপিত হইবে, তখনও কি মনে করিতে হইবে, যে, সব সরকারী চাকর্য়ে কেবল টাকার জন্য কাজ করিতেছেন? আমাদের মনে হয়, তখন ছোট বড় সরকারী চাকরি অনেকে দেশের কাজ হিসাবেই করিবেন। এখনকার কথা ছাড়িয়াই দিলাম। স্বরাজের আমলে কর্ত্তব্যপরায়ণ চৌকিদার কনষ্টেবল দারোগা কেরানী শিক্ষক হাকিম প্রভৃতির দ্বারা চাষীদের কি কোন প্রয়োজন সিদ্ধ হইবে না, কোন হিত হইবে না?

ভারতবর্ষের বর্ত্তমান অবস্থায় যাঁহারা কৌন্সিলের সভ্য হন, তাঁহাদের দ্বারা কোন হিতই হয় না, কোন অহিতই নিবারিত হয় না, এমন নয়;—অসহযোগ আরম্ভ হইবার পরেও দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস ও পণ্ডিত মোতিলাল নেহরুর মত নেতারা কৌন্সিলের সভ্য ছিলেন। তাঁহারা কি কেবল সম্মানের জন্য কৌন্সিলে গিয়াছিলেন? তথাপি কৌন্সিলের সভ্য হওয়াটা এখন প্রধানতঃ "সম্মান" বলিয়া ধরিয়া লইতেছি। কিন্তু স্বরাজের আমলেও ব্যবস্থাপক সভা থাকিবে, এবং তখন, ইংরেজের উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য নহে, দেশের কল্যাণের জন্যই ভাল আইন প্রণয়ন করিতে এবং মন্দ আইন রদ করিতে হইবে। তাহাতে চাষীদের কোন হিত হইবে না কি? কংগ্রেস চাষীদের জমির খাজনা খুব কমাইতে চান। তাহার জন্য আইন করিতে হইবে। অতএব স্বরাজের আমলে কৌন্সিলের মেম্বর হওয়াটা কেবল "সম্মান" থাকিবে না।

অনেক রাষ্ট্রীয় নেতা ওজন করিয়া কথা বলেন না। অনেকে দেশের "তরুণ"দিগকে এমন করিয়া বাড়ান যেন তাহারা একাধারে ব্রহ্মাবিষ্ণুমহেশ্বর। তাহাদের উৎসাহ, সাহস, শক্তি ও আত্মোৎসর্গের প্রমাণ কার্য্যতঃ পাইলে অন্য লোকদের মত তাহারাও প্রশংসার যোগ্য, কিন্তু বৃদ্ধ বলিয়াই যেমন কেহ বিচক্ষণতা, বিজ্ঞতা ও অভিজ্ঞতার সম্মান ও প্রশংসা পাইতে পারে না, তেমনি "তরুণ" বলিয়াই কোন শ্রেণীর লোক প্রশংসার যোগ্য হইতে পারে না। চাষীদিগকে, জনসাধারণকে দেশের সব ব্যাপারের লক্ষ্য ও কেন্দ্রস্থল করা এবং তাহারা যাহা বুঝে না বা চায় না তাহা তুচ্ছ জ্ঞান করাও আর এক রকমের ভ্রম। তাহাদের অবস্থার প্রতি খুব বেশী মন দেওয়া নিশ্চয়ই দরকার। কিন্তু তাহাদের চিন্তা জ্ঞান ইচ্ছা ও আদর্শকে দেশের সব কাজের একমাত্র কষ্টিপাথর করিলে, অন্যদের কথা দূরে থাক্ তাহাদেরও অনিষ্ট করা হইবে।

এ-পর্য্যন্ত চলিয়া আসিতেছিল অভিজাতদের, শিক্ষিতদের, "উচ্চ" জাতির লোকদের পূজা। এ অবস্থা ও ব্যবস্থা ভাল ছিল, কখনই বলা যায় না। এখন সর্ব্বত্র কেবল কুলি, মজুর চাষীদের স্তবস্তুতি বা তাহার গৌরচন্দ্রিকা ও আয়োজন লক্ষিত হইতেছে। ইহাও ভাল নয়। সমাজে সব শ্রেণীর মানুষেরই স্থান সম্মান ও কর্ত্তব্য থাকা উচিত।

—

সাম্প্রদায়িক একতা

পটেল মহাশয় বলিয়াছেন, ভারতবর্ষে সাম্প্রদায়িক একতা স্থাপিত না হইলে গোলটেবিল বৈঠকে বা তদ্রূপ অন্য কোন বৈঠকে উপস্থিত হওয়া নিষ্ফল। আমরা এই মতে সায় দিতে অসমর্থ। হিন্দু মুসলমানে মতভেদের

কিয়দংশ আপনা-আপনি উৎপন্ন হইয়া থাকিতে পারে। কিন্তু তাহার অনেক অংশ ভারতে স্বরাজস্থাপনের বিরোধী ইংরেজরা জন্মাইয়াছে এবং জীয়াইয়া রাখিতেছে। এখনও যে সব মুসলমান নেতা জিন্নার ১৪ দফা পরিমিত দাবি ধরিয়া বসিয়া আছেন, তাঁহাদের পশ্চাতে কোন কোন উচ্চপদস্থ সিবিলিয়ানের প্ররোচনার প্রলোভন ও উৎসাহবাণী আছে, এ-বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। সব দলের মুসলমানেরা একমত হইয়া হিন্দুদের সঙ্গে একটা রফা করিবে, এরূপ আশা করা বৃথা। গোলটেবিল বৈঠকে হিন্দু-মুসলমান সমস্যার সমাধানের ভার যে ভারতীয়দের উপর দেওয়া হইয়াছে এবং ভারতবর্ষের স্বরাজলাভ তাহার উপর নির্ভর করিবে, এইরূপ মত যে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা ভারতীয় স্বরাজবিরোধী ইংরেজদের একটা চা'ল মাত্র। তাহাদের হাতে একদল অনুগ্রহভিখারী মুসলমান আছে বলিয়া তাহারা জানে যে, ভারতীয়দের দ্বারা হিন্দু-মুসলমান সমস্যার সমাধান চেষ্টা তাহারা বরাবরই ব্যর্থ করিতে পারিবে সুতরাং স্বরাজলাভ যদি তদ্রূপ সমাধানের উপর নির্ভর করে তাহা হইলে ভারতবর্ষকে স্বরাজ দিতেও হইবে না। অতএব আমাদের নেতারা যদি বলেন, "আমরা হিন্দু মুসলমান ঐক্য ব্যতীত গোলটেবিল বা অন্য কোন বৈঠকে যোগ দিব না," তাহা হইলে তদ্দ্বারা তাঁহারা স্বরাজবিরোধী ইংরেজদেরই উদ্দেশ্যসিদ্ধির সহায় হইবেন।

ইউরোপে গোটাকুড়ি দেশে লীগ অব্ নেশ্যন্স্ সংখ্যালঘিষ্ঠদের সমস্যার সমাধান করিয়াছেন। এই সমাধান ভারত-গবর্মেণ্ট এবং ব্রিটিশগবর্মেণ্ট লীগের সভ্যরূপে অনুমোদন করিয়াছেন। গত জানুয়ারী মাসে লীগের কৌন্সিলের অধিবেশনে তাহার সভাপতি ব্রিটিশ পররাষ্ট্রসচিব হেণ্ডারসন সাহেব বলিয়াছেন, যে, লীগের দ্বারা অবলম্বিত সংখ্যালঘিষ্ঠদিগের রক্ষণ-পদ্ধতি এখন ইউরোপের এবং পৃথিবীর সাধারণ আইনের অন্তর্ভূত ("the system of the protection of minorities, now a part of the public law of Europe and of the world")। তিনি আরও বলেন :—

"Questions concerning the application of the Minority Treaties were not national questions, they were international questions; they were League of Nations questions; they were questions in which all had a common duty and a common interest."

তাৎপর্য্য। "সংখ্যালঘিষ্ঠদিগের সম্বন্ধে প্রণীত সন্ধি-সর্ত্তগুলির প্রয়োগবিষয়ক প্রশ্ন বিশেষ বিশেষ নেশ্যানের সমস্যা নহে, উহা অন্তর্জ্জাতিক সমস্যা; উহা লীগ অব্ নেশ্যান্সের সমস্যা; উহা এরূপ সমস্যা যাহাতে সকলের সাধারণ কর্ত্তব্য ও স্বার্থ আছে।"

তাহা হইলে লীগের সমাধান ভারতবর্ষে প্রয়োগ না করিয়া ব্রিটিশ গবর্মেণ্ট হিন্দু মুসলমানের সমস্যা মিটাইবার ভার কেন তাহাদেরই ঘাড়ে চাপাইয়াছেন? কতকগুলি ইংরেজ আশা দিতেছে, তোমাদের মধ্যে সন্ধি হইলেই তোমরা স্বরাজ পাইবে; অপর একদল যাহাতে সন্ধি না হয় গোপনে গোপনে তাহারই চেষ্টা নিয়ত করিতেছে। ইংরেজ রাজনৈতিক খেলোয়াড়দের এ খেলা কংগ্রেস নেতারা কি বুঝেন না?

তাঁহারা হয়ত মনে করেন, আমাদের ঘরোয়া বিবাদ আমরা না মিটাইতে পারিলে আমাদের লজ্জা ও অপমানের বিষয় হইবে। তাহা কতকটা সত্য বটে। কিন্তু এত দীর্ঘকাল যে আমরা পরাধীন আছি, এ অপমান ও লজ্জা তার চেয়ে বেশী নয়—এ অপমান ও লজ্জা তাহারই অন্তর্গত। এই লজ্জা ও অপমানের অনুভূতি এত প্রবল হওয়া উচিত নহে, যে, তাহাতে স্বরাজ অর্জ্জনের ব্যাঘাত জন্মে। ইউরোপের বিশ বিশটা স্বাধীন দেশে লীগের সমাধান হইল, তাহাতে গ্রহণকারী স্বাধীন জার্ম্মান, চেক্, পোল তুর্ক আর্মানিয়ান প্রভৃতি লজ্জায় মরিয়া গেল না; আর পরাধীন আমাদের লজ্জাবোধ এত বেশী যে আমরা আমাদের বিরোধী ইংরেজদের কৌশল অনুযায়ী কাজই করিতেছি।

তুরস্ক, পোল্যাণ্ড চেকোস্লোভাকিয়া প্রভৃতি স্বাধীন সাধারণতন্ত্রের লোকেরা লীগের সমাধান গ্রহণ করায় তাহাদিগকে কেহ স্বাধীনতার অনুপযুক্ত মনে করে নাই। আমরা ঐরূপ সমাধান দাবি করিলে বা গ্রহণ করিলে আমাদের স্বাধীন হইবার অধিকার কমিয়া যাইবে মনে করার মত নির্বুদ্ধিতা নেতাদের যেন না হয়।

লবণ ও সর্দ্দার পটেল

গান্ধী-আরুইন সন্ধির একটা সর্ত্তে আছে, যে, সমুদ্রতটবর্ত্তী যে-সব জায়গায় লবণ প্রস্তুত হয়, তথায় লোকেরা নিজেদের ব্যবহারের ও প্রতিবেশীদিগকে বিক্রয়ের জন্য লবণ বিনাশুল্কে করিতে পারিবে। এই জন্য লবণ সত্যাগ্রহ সম্পর্কে সভাপতি পটেল মহাশয় বলেন, "the poorest, on whose behalf the campaign was undertaken, are now virtually free from the tax"; "দরিদ্রতম লোকেরা, যাহাদের জন্য লবণ-সত্যাগ্রহ করা হইয়াছিল, এখন কার্য্যতঃ এই লবণ ট্যাক্স হইতে নিষ্কৃতি পাইয়াছে।" ইহা ঠিক্ নয়। সমুদ্রতটবর্ত্তী যে-সব জায়গায় লবণ প্রস্তুত হয়, তাহা বিশাল ভারতবর্ষের সামান্য অংশ মাত্র। এই বিস্তীর্ণ দেশের অধিকাংশ গ্রাম ও নগরের দরিদ্রতম ও সমৃদ্ধতম লোকদিগকে এখনও সমানে লবণ ট্যাক্স দিতে হইতেছে।

১৯২৯ সালে বিদেশী বর্জ্জনের ফল

রক্তপাতহীন রাজনৈতিক সংগ্রামে ভারতবর্ষের মধ্যে বাংলা দেশেই প্রথমে বিদেশী—বিশেষতঃ বিলাতী—পণ্যের বর্জ্জন রূপ অস্ত্র বঙ্গব্যবচ্ছেদের প্রতিকার কল্পে ব্যবহৃত হয়। এই উপায় মহাত্মা গান্ধীর প্রবর্ত্তিত অসহযোগ আন্দোলনেও ব্যবহৃত হইয়াছে। বঙ্গের বাহিরে অনেকের ধারণা বাংলা দেশে বিদেশী বর্জ্জন তেমন করিয়া হয় নাই যেমন বোম্বাইয়ে হইয়াছে। কিন্তু দিল্লী হইতে প্রকাশিত হিন্দুস্থান টাইমসে গত ৬ই এপ্রিলের সংখ্যায় যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহাতে মনে হয় বিদেশী বর্জ্জন বাংলা দেশেই বেশী হইয়াছে। দিল্লীর দৈনিক লিখিতেছেন :—

"Every province in the country has been equally hit by the present fall. Bengal's share in the loss on imports has been 29.5 per cent, and in terms of money Rs 2577 lakhs. Bombay comes next with a fall of 27.2 per cent, which works out at Rs. 2290 lakhs. Sind loses 26.1 per cent of her figures for 1929. Madras and Burma have had to meet a fall of about 15 per cent."

বঙ্গের আমদানি কমিয়াছে শতকরা ২৯.৫, বোম্বাইয়ের ২৭.২, সিন্ধুর ২৬.১ এবং মান্দ্রাজ ও ব্রহ্মদেশের প্রত্যেকের ১৫। বঙ্গের আমদানি কমিয়াছে ২৫ কোটি-৭৭ লক্ষ টাকার, বোম্বাইয়ের ২২ কোটি-৯০ লক্ষ টাকার।

১৯২৯ সাল অপেক্ষা ১৯৩০ সালে ঐরূপ কমিয়াছে।

—

বঙ্গে আইন অমান্য আন্দোলন

১৯৩০ সালের ১লা এপ্রিল হইতে ১৯৩১ সালের ২৮শে ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত বাংলা দেশে আইন অমান্য আন্দোলন উপলক্ষে যত লোক দণ্ডিত হইয়াছে, তাহার নিম্নমুদ্রিত তালিকা বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় দেওয়া হয়।

কলিকাতা	২২৮৯
মেদিনীপুর	১৪২৬
ময়মনসিংহ	১৪১২
বাঁকুড়া	৬৩৫
হাবড়া	৬১৯
ফরিদপুর	৫৯৫
বাখরগঞ্জ	৫৫৭
বর্দ্ধমান	৫৩৮
২৪-পরগণা	৫৩২
নদীয়া	৪৪৬
খুলনা	৪১৭
রঙ্গপুর	৪১৬
ঢাকা	৩৬৬
দিনাজপুর	৩২৯
হুগলী	৩০০
যশোহর	২৬৪
পাবনা	২০৯
ত্রিপুরা	২০৮
রাজশাহী	১৮৮
বগুড়া	১০২
বীরভূম	৯৪
মুর্শিদাবাদ	৮৮
নোয়াখালী	৮৩
জলপাইগুড়ী	৭৪
চট্টগ্রাম	৪৮
মালদহ	৪৬
দার্জ্জিলিং	৫
পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম	০

—

কংগ্রেসের রিপোর্ট

কংগ্রেসের ১৯৩০ সালের যে রিপোর্ট প্রস্তুত ও মুদ্রিত হইয়াছিল, তাহা প্রত্যাহৃত হইয়াছে। তাহাতে লেখা ছিল দক্ষিণ ভারতবর্ষ (অর্থাৎ মোটের উপর মান্দ্রাজ

প্রেসিডেন্সী) তাহার লোকসংখ্যা ও ক্ষমতার অনুরূপ কাজ সত্যাগ্রহ আন্দোলনে করে নাই। এরূপ তুলনাটা অপ্রীতিকর। কোন্ প্রদেশ কি করিয়াছিল বলা কঠিন। সংবাদপত্রের ও টেলিগ্রাফ আপিসের উপর কড়া শাসন সব জায়গায় সমান ছিল না; সুতরাং সকল প্রদেশ সংবাদ-প্রচারের সমান সুযোগ পায় নাই। তদ্ভিন্ন, হিন্দীর উপদ্রবে মান্দ্রাজকে কাবু করা হইয়াছে। তাহার কিছু পরোক্ষ ফল ফলিতে পারে না কি ?

বাংলা দেশ সম্বন্ধে কেবল লেখা হইয়াছিল, যে, মেদিনীপুর জেলা পুলিসের অত্যাচারের জন্য প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। কিন্তু মেদিনীপুরের লোকেরা এবং বঙ্গের অন্য অনেক জেলার লোকেরা আন্দোলনে যাহা করিয়াছিল, তাহার কোন উল্লেখ ছিল না।

সংবাদপত্রসমূহ তাহাদের কর্ত্তব্য করে নাই বলা হইয়াছিল। লেখা হইয়াছিল যে, তাহারা কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির আদেশ অনুসারে প্রকাশ বন্ধ করে নাই। তাহারা ত কংগ্রেসের চাকর নহে; কংগ্রেসের কমিটি ত তাহাদিগের মত পর্য্যন্ত লওয়ার ভদ্রতাটুকু করেন নাই। খবরের কাগজসমূহে সত্যাগ্রহের সংবাদ ঘন ঘন প্রকাশিত না হইলে আন্দোলন কখনই বিস্তৃতি লাভ করিত না। সংবাদপত্র সমূহের সম্বন্ধে কমিটি যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহা নিমকহারামী ভিন্ন আর কিছু নয়।

নূতন কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি

নূতন কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটিতে সব প্রদেশের লোক নাই। মান্দ্রাজের প্রদেশগুলি একেবারে বাদ পড়িয়াছে। গান্ধীজী ও পটেলজী যাহাই বলুন, ভারতবর্ষের মত বৃহৎ দেশের দক্ষিণ অংশটার কোন লোকই কমিটিতে না থাকা ভাল হয় নাই। সভাপতির মতে মত দিবার লোকই কমিটিতে থাকিবে, এ নিয়ম ভাল নয়। স্বাধীন মতের লোকও চাই।

বলা হইয়াছে, ২১টা প্রদেশ হইতে ১০ জন লোক লইতে হইবে, তাহাতে প্রত্যেক প্রদেশ হইতে কেমন করিয়া লোক লওয়া যায় ? কেন, ভারতবর্ষের মত বিশাল দেশের ওয়ার্কিং কমিটির সভ্য-সংখ্যা ২৫ হইলে কি কাজ অচল হইত ? তা ছাড়া, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীতে কংগ্রেসের কয়েকটা প্রদেশ আছে, তাহার কোনটা হইতেই কেন লোক লওয়া চলিল না ?

কংগ্রেসের কাজের সুবিধার জন্য ভারতবর্ষ একুশটি প্রদেশে বিভক্ত হইয়াছে। তাহার মধ্যে কমিটিতে গুজরাটের দুই, আগ্রা-অযোধ্যার এক, বিহারে দুই, সিন্ধুর এক, বাংলার দুই, বোম্বাই শহরের তিন, বেরারের এক, পঞ্জাবের দুই, এবং দিল্লীর একজন সভ্য আছেন। আজমীরের, অন্ধ্রের, আসামের, ব্রহ্মের, হিন্দুস্থানী মধ্যপ্রদেশের, মরাঠী মধ্যপ্রদেশের, কর্ণাটকের, কেরলের, মহারাষ্ট্রের, উ-প সীমান্তের, তামিল নাডের এবং উৎকলের একজনও নাই। ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের অবস্থা, সুবিধা-অসুবিধা, বুঝিয়া কার্য্যের ব্যবস্থা করিবার জন্য কার্য্যনির্ব্বাহক কমিটির সভ্যসংখ্যা বাড়াইয়া সকল প্রদেশ হইতে সভাপতির সুরে সুর-বাঁধা একজন করিয়া সভ্য অনায়াসে লইতে পারা যাইত এবং পারা উচিত ছিল। তাহা না-করায় কংগ্রেস যথেষ্ট শক্তিশালী হইবে না। এক এক প্রদেশ হইতে একাধিক সভ্য (মহাত্মা গান্ধী ছাড়া) না লইলেও চলিত।

সাম্প্রদায়িক সমস্যা ও হিন্দু মহাসভা

গত মার্চ্চ মাসের শেষ সপ্তাহে দিল্লীতে হিন্দু মহাসভার কার্য্যনির্ব্বাহক কমিটির দুটি কয়েকঘণ্টাব্যাপী দীর্ঘ অধিবেশনের পর সর্ব্বসম্মতিক্রমে সাম্প্রদায়িক সমস্যা সম্বন্ধে নিম্নমুদ্রিত মতবর্ণনাপত্র প্রকাশিত হয়। পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয় কমিটির অধিবেশন দুটিতে নেতৃত্ব করেন।

The Hindu Mahasabha desires to point out that it has throughout and consistently taken up a position which is strictly national on the communal issue. It believes that no form of national responsible self-government which India is struggling to achieve, and which England is

pledged to, agree to is compatible with separate communal electorate or representation in the legislature and administration, which function for the general good and secular well-being of the country as a whole. It is prepared to sacrifice, and expects all other communities to sacrifice, communal considerations to build up such responsible governments, which can be worked only by a ministry of persons belonging to the same political party and not necessarily to the same creed, so that agreement on public questions, economic, social and political, should be the basis of mutual confidence and co-operation.

The position of the Mahasabha is embodied in the following propositions :

(1) There should be one common electoral roll consisting of voters of all communities and creeds as citizens and nationals of the same State.

(2) There should not be any separate communal electorate, that is, grouping of voters by religion in community constituencies.

(3) There should not be any reservation of seats for any religious community as such in the legislature.

(4) There should not be any weightage given to any community, as it can be done only at the expense of another.

(5) The franchise should be uniform for all communities in the same province.

(6) The franchise should be uniform all over India for the Central or Federal Legislature.

(7) There should be statutory safe-guards for the protection of minorities in regard to their language religion, and racial laws and customs as framed by the League of Nations on the proposals of its original members, including India and His Majesty's Government, and now enforced in many a State of reconstructed Europe, including Turkey.

(8) There should be no question of the protection of majorities in any form.

(9) There should not be any alteration of existing boundaries of provinces without expert examination of linguistic, administrative, financial, strategic and other considerations involved, by a Boundaries Commission to be specially appointed for the purpose.

(10) In the proposed Federation, residuary powers should rest with the Central or Federal Government for the unity and well-being of India as a whole.

(11) Differences of religion, creed or confession shall not prejudice any Indian national in matters relating to the enjoyment of civil or political rights, as for instance, admission to public employment, functions and honours, or the exercise of professions and industries.

ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয় যে হিন্দু মহাসভা সীমান্ত প্রদেশ, পঞ্জাব এবং বঙ্গের সংখ্যালঘিষ্ঠ হিন্দুসম্প্রদায়ের জন্যও বিশেষ কোন অধিকার চান নাই। তাঁহারা সর্ব্বত্র গণতান্ত্রিক রীতির প্রচলনের পক্ষপাতী। বঙ্গের কয়েকটি মুসলমানপ্রধান জেলায় ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের নির্ব্বাচনে দেখা গিয়াছে, যে, কোথাও বা একজন হিন্দুও সভ্য নির্ব্বাচিত হন নাই, কোথাও বা ২।১ জন মাত্র হইয়াছেন। তথাপি মহাসভা বঙ্গের সংখ্যালঘিষ্ঠ হিন্দুদের জন্য ব্যবস্থাপক সভায় কতকগুলি সভ্যপদ আলাদা করিয়া রাখিবার দাবি করেন নাই। দিল্লীতে মহাত্মাজী হিন্দু মহাসভার প্রতিনিধিস্থানীয় কয়েকজন সভ্যের বক্তব্য শুনিতে চাওয়ায় তাঁহারা প্রবাসী-সম্পাদককে মুখপাত্র করিয়া তাঁহার সহিত দেখা করেন। এই সকল সভ্যের মধ্যে নানা প্রদেশের হিন্দু—যথা পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয় পঞ্জাবের ভাই পরমানন্দ—ছিলেন। মহাত্মাজীকে উপরে মুদ্রিত বর্ণনাপত্রের অনুরূপ কথা বলা হয়।

ব্রিটিশ পার্লেমেণ্টে গোলটেবিল বৈঠক সম্বন্ধে তর্কবিতর্কের সময় প্রধান মন্ত্রী মিঃ ম্যাকডনাল্ড যে শেষ বক্তৃতা করেন, তাহাতে তিনি যাহা বলিয়াছিলেন তাহাতে সংখ্যালঘিষ্ঠ কোন সম্প্রদায়ের জন্য কোন বিশেষ অধিকারের সমর্থন ছিল না। তিনি বলিয়াছিলেন :—

If every constituency is to be earmarked as to community or interest, there will be no room left for the growth of what we consider to be purely political organizations which would comprehend all communities, all creeds, all classes, all conditions of faith. This is one of the problems which has to be faced, because, if India is going to develop a robust political life there must be room for National Political parties based upon conceptions of *India's* interest, and not upon conceptions regarding the well-being of any field that is smaller or less comprehensive than the whole of India. Then

there is, a modified proposal regarding that; a proposal is made that there should not be community constituencies with a communal register, but that there should be a common register in the constituencies; but that with a common register, a certain percentage of representation should be guaranteed to certain communities. It is the first proposal in a somewhat more attractive, democratic form, but still essentially the same. . . .

'It is very difficult to convince these very dear delightful people (advocates of communal representation) that if you give one community weightage, you cannot create weightage out of nothing. You have to take it from somebody else. When they discover that, they become confused, indeed, and find that they are up against a brick wall.

তিনি আরও বলিয়াছিলেন :—

It is a very curious problem, and if Hon. Members who are interested in these constitutional and political points care to read carefully the Minorities Committee's Report, I promise them one of the most fascinatingly interesting studies which they have undertaken.

You build up a Legislature, as this is built up, by constituencies. Voting in constituencies is not to take place and cannot at the moment take place in the way that voting in our constituencies takes place, where you might have an aristocrat as one candidate and a working man as another. You would have your constituencies divided up into sections with a certain number of working class constituencies where nobody but working men could run as candidates, a certain number of, say, Church of England constituencies where nobody but communicating members of the Church of England could run, until you filled up the hundred per cent of your constituencies in this way. Then *before* any election took place it would be perfectly *certain* that Church of England people would have, say, 15 per cent. of the seats here, working class, say, 25 per cent, and so on.

Another problem that faces us from that point of view is, if your legislature is to be composed in these watertight compartments, those community-tight compartments, whom are you going to appoint your Executive? The claim is put that the Executive, *i.e.*, the Administration, the Cabinet, shall also be divided into watertight compartments."

এই রকমের কথা বিখ্যাত ব্রিটিশ সাংবাদিক ব্রেলসফোর্ড সাহেব বিলাতী নেশ্যান এণ্ড্ দি এথীনিয়ম কাগজে লিখিয়াছেন। যথা—

The advance will be perilous and unhappy unless the new constitution brings with it the reality with the forms of democracy.

On one condition there ought to be no hesitation. Parliamentary institutions cannot function on the basis of separate communal electorates. While these remain, no stable parties can be formed, nor can the electorate be trained to vote on the social and economic issues which clamour for constitutional handling. If the Moslem diehards veto any voluntary settlement with the Hindus, the British Government must be prepared to dictate. That way out of the *impasse* even the Muslims in their hearts might welcome. So much, in a talk which I had at Delhi, their ablest leader confessed. Back and forward we had argued when at last he startled me by blurting out: "A Government should govern. You all believe in a single electorate. Why don't you impose it?"

With this one change, the possibility of genuine democratic government would begin for India. Parties would be driven to seek support for programmes where today it suffices to appeal to religious prejudices."

হিন্দু মহাসভার পূর্ব্বোদ্ধৃত মতবর্ণনাপত্র পড়িয়া শ্রীমতী এনী বেসাণ্টের কাগজ নিউ ইণ্ডিয়া লিখিয়াছেন, যে, ইহা **"unexceptionable both in form and substance,"** "ইহাতে যাহা বলা হইয়াছে এবং যে-ভাবে বলা হইয়াছে, তাহাতে কিছু খুঁত ধরিবার জো নাই।" সমালোচনার কেবল একটি কথা নিউ ইণ্ডিয়া লিখিয়াছেন। বলিয়াছেন, হিন্দুমুসলমান সমস্যার সমাধানের কথা যদি নূতন করিয়া এখন উঠিত তাহা হইলে হিন্দু মহাসভার উক্তি সম্বন্ধে কিছু বলিবার থাকিত না; কিন্তু পূর্ব্বে (লক্ষ্ণৌ চুক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া) অনুরূপ ব্যবস্থা কিছু কিছু হইয়া আসিয়াছে বলিয়া এখন এমন কিছু করিতে হইবে যাহাতে হিন্দুদের অধিকার কিছু বলি দিতে হইবে।

এ-বিষয়ে আমাদের সাধারণ বক্তব্য এই যে, পূর্ব্বে কোন ভুল হইয়া গিয়া থাকিলে সেই ভুলটাকে চিরস্থায়ী করা যুক্তিসঙ্গত বা কল্যাণকর হইবে না। আলোচ্য বিষয়ে নিউ ইণ্ডিয়ার মন্তব্য সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য এই

যে, নির্দ্দিষ্ট কয়েক বৎসরের জন্ম হিন্দুরা তাহাদের কিছু অধিকার ছাড়িয়া দিতে পারে। কিন্তু গণতান্ত্রিক রীতির বিরুদ্ধে কিছুতে তাহারা রাজী হইতে পারে না—যেমন স্বতন্ত্র সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচন বা কোথাও সংখ্যাভূয়িষ্ঠ সম্প্রদায়ের জন্ম আইনের দ্বারা ব্যবস্থাপক সভার অধিকাংশ সভ্যপদ সংরক্ষণ।

—

মেদিনীপুরে ম্যাজিষ্ট্রেট হত্যা

মেদিনীপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ পেডিকে কে গুলি করায় তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। নরহত্যা ও নিষ্ঠরতা সকল-ক্ষেত্রেই নিন্দনীয় ও শোচনীয়। এস্থলেও তাহা নিন্দনীয় ও শোচনীয়। দুর্ব্বল ও অসহায়কে আসন্ন বিপদ হইতে রক্ষা করিবার জন্য স্থলবিশেষে দৈহিক বলের প্রয়োগ ও অস্ত্রের সাহায্য গ্রহণ আবশ্যক হইতে পারে। কিন্তু এক্ষেত্রে সেরূপ কোন কারণই বিদ্যমান ছিল না। স্থতরাং ঢাকায় মিঃ লোম্যান ও মিঃ হড্‌সনকে গুলি করা উপলক্ষ্যে আমরা টেরারিজম্‌ বা ভয়প্রদর্শন নীতি সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছিলাম, এখনও তাহাই বলিতেছি।

হিংস্র পন্থার বিরুদ্ধে আমরা আগে আগে অনেক কথা লিখিয়াছি। এখন আবার হিংস্র পন্থার বিরুদ্ধে কিছু বলিবার কারণ, সম্প্রতি পুলিসের উচ্চ ও নিম্নপদের কয়েকজন কর্ম্মচারীকে মারিবার জন্ম বোমা ও গুলি ছোঁড়া হইয়াছে। ইহাতে বোঝা যাইতেছে, দেশে এমন কতকগুলি লোক আছে যাহারা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া কিম্বা গুপ্ত উত্তেজক চরের প্ররোচনাবশতঃ এইরূপ গর্হিত কাজ করিতেছে। এইরূপ অবৈধ কাজ করিবার কারণ নানা রকম হইতে পারে। ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগত প্রতিহিংসা চরিতার্থ করিবার জন্ম কেহ ইহা করিতে পারে, কিম্বা কাহাকেও কোন লোকসমষ্টির পক্ষে আশঙ্কার কারণ অনুমান করিয়া ইহা করিতে পারে, অথবা সরকারী লোকদের মনে ভয় উৎপন্ন করিয়া স্বাধীনতা লাভ করিতে পারা যায় এইরূপ ধারণাবশতঃ কেহ কেহ এইরূপ কাজ করিতে পারে। এইরূপ অনুমান বা ধারণা কোনস্থলেই বিন্দুমাত্রও সত্য কি মিথ্যা, তাহার সহিত আমাদের এই আলোচনার কোন সম্পর্ক নাই।

সকল দেশেই অসভ্যতার যুগে যখন আইন আদালত ছিল না, তখন কেহ কাহারও দৈহিক বা অন্তবিধ অনিষ্ট করিলে অনিষ্টকারীকে শাস্তি দিবার ভার অত্যাচরিত উৎপীড়িত বা ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি বা তাহার আত্মীয়গণ লইত, এবং কেহ সাধারণভাবে অত্যাচারী মনে হইলেও তাহার শাস্তির জন্তও ব্যক্তিগত বা দলগত চেষ্টা হইত। কিন্তু সভ্যতার প্রগতিক্রমে যখন হইতে সভ্য দেশ সমূহে আইন আদালত প্রচলিত ও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তখন হইতে শাস্তি দিবার ভার ব্যক্তির বা দলের হাত হইতে রাষ্ট্রের হাতে গিয়াছে, এবং তাহা ভালই হইয়াছে। শাস্তি দিবার ভার রাষ্ট্রের হাতে যাওয়ায় সকল রকমের সব অনিষ্ট-কারীর দণ্ড সব স্থলে হইয়া থাকে, কিম্বা যাহাদের দণ্ড হয় তাহারা সবাই দোষী, অথবা কেবল দোষীদেরই দণ্ড হয়, এমন নয়। কিন্তু তাহা হইলেও, লোকস্থিতির জন্ম, আইনের সাহায্যে আদালতের দ্বারা বিচারের পর যথাযোগ্য শাস্তির ব্যবস্থাই শ্রেষ্ঠ। আইনের ও আদালতের দোষে যদি অনেক নিরপরাধ লোকের শাস্তি হয় এবং অনেক দুষ্টের শাস্তি হয় না দেখা যায়, তাহা হইলে শাস্তি দিবার ভার নিজেদের হাতে না লইয়া আইনের ও আদালতের পরিবর্ত্তন ও উন্নতির চেষ্টা করাই বিহিত। আইন আদালতের দোষত্রুটিবশতঃ যে-সব অপরাধীর শাস্তি হয় না, তাহাদের শাস্তির ভার বিশ্বের নিয়মের উপরও অর্পিত হইতে পারে। ব্যক্তিগত বা দলগত প্রতিহিংসার রীতিতে যে-সব দোষত্রুটি ঘটে, তাহার আলোচনা বা উল্লেখ খুব সংক্ষেপে করা যায় না।

লৌকিক ব্যবহারে কোন জাতি বা কোন গবর্মেণ্টের দ্বারাই এ পর্য্যন্ত শাস্ত্রের ও মহাপুরুষদের উচ্চতম উপদেশ পালিত হয় নাই। তথাপি তাহা পালনীয় মনে করি বলিয়া উল্লেখ করিতেছি। মহাভারতে উপদেশ আছে, প্রেমের দ্বারা অপ্রেমকে পরাজয় করিতে হইবে; বুদ্ধদেবের উপদেশও তাই। যীশু খ্রীষ্টের উপদেশও সেইরূপ।

রাজনৈতিক বিষয়ের আলোচনার মধ্যে এইরূপ কথা তোলায় অনেকে হাসিবেন। কিন্তু হাসিলেও, মহাপুরুষেরা যাহা বলিয়াছেন, তাহা সত্য বলিয়া স্মরণ করিতে হইবে।

বিশেষ করিয়া তাহা স্মরণ করিতে হইবে এইজন্ত, যে, জগতের ইতিহাসে এই প্রথম ভারতবর্ষে অহিংসার পথে স্বাধীনতালাভের চেষ্টা হইতেছে। মহাপুরুষদের বাণী মহাত্মা গান্ধীর জীবনে মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছে, এখন আর তাহা পুস্তকের পৃষ্ঠায় আবদ্ধ নাই। সত্যাগ্রহ অহিংসার উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া এবং হাজার হাজার সত্যাগ্রহী জীবন যন্ত্রণা সত্ত্বেও প্রতিশোধের চেষ্টা করেন নাই বলিয়া ভারতবর্ষ বিদেশে সম্মানিত হইতেছে। এবং ভারতবর্ষের আদর্শ সম্মানিত হইতেছে বলিয়াই আমাদের যাহারা বিরোধী তাহারা জগতকে ইহা বুঝাইতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছে, যে, হিংসাত্মক কাজ ভারতে যাহা কিছু হইতেছে, তাহা সত্যাগ্রহীদের দ্বারাই হইতেছে। শ্রেষ্ঠ পথ যাহা, তাহা শ্রেষ্ঠ পথ বলিয়াই অবলম্বনীয়। তাহার উপর, মহাত্মা গান্ধী যখন তাহার সাধ্যায়ত্ততা প্রমাণ করিয়া দিয়াছেন, তখন তাহা আরও অবলম্বনীয়।

উপরে যাহা লিখিলাম, তাহা মহাপুরুষদের উপদেশ ও আচরণ অনুসারে লিখিলাম। নিজের সাধনা এবং জীবনের অভিজ্ঞতা হইতে এই সব কথা লিখিতে পারিলে অধিকতর তৃপ্তিলাভ করিতাম, এবং আরও জোরের সহিত কথা কহিতে পারিতাম। কিন্তু তাহা পারিলাম না বলিয়া মহাপুরুষদের বাণী ও দৃষ্টান্তের মূল্য কম হইয়া যাইতে পারে না।

যাঁহারা আপনাদিগকে প্র্যাক্টিক্যাল মনে করেন, কাজ উদ্ধার কিসে হয় কেবল তাহাই দেখিতে চান, মহাপুরুষদের উপদেশ শুনিতে চান না, তাঁহারা বলিবেন, "অহিংস চেষ্টার দ্বারা দেশ স্বাধীন হইয়াছে, তাহার দৃষ্টান্ত দেখান।" তাহার উত্তরে আমরা বলি, অতীত ইতিহাসে যাহা ঘটে নাই, তাহা ঘটিতে পারে না, কেন মনে করেন? দু-হাজার, এক হাজার, পাঁচ শত, এক শত, পঞ্চাশ বৎসর আগে যাহা

ঘটে নাই, আজকাল সেরূপ অনেক ব্যাপার ঘটিতেছে। সুতরাং অহিংস চেষ্টা সফল হইবে না, অতীত ইতিহাস হইতে তাহা প্রমাণ হইতে পারে না। যাহা করিতে চাই, আত্মা তাহাতে সায় দেয় কি না দেখুন। শান্ত সমাহিত ধীরভাবে চিন্তার পর যাহা শ্রেষ্ঠ বলিয়া বুঝিব, নিশ্চয়ই সেই পথে সিদ্ধিলাভ হইবে—যদিও তাহাতে বিলম্ব হইতে পারে।

যাঁহারা ঐতিহাসিক প্রমাণ চান, তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করি, দু-এক জন, দু-দশ জন, বিশ-পঞ্চাশ জন বিদেশী বা স্বদেশী সরকারী কর্ম্মচারীকে বধ করিয়া কোনও পরাধীন দেশকে স্বাধীন করা গিয়াছে, তাহার একটাও ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত দেখাইতে পারেন কি? ইংরেজদের দৃষ্টান্তই ধরুন। তাহারা যত যুদ্ধ করিয়াছে, তাহাতে তাহাদের অনেক সেনানায়ক ও সাধারণ সৈনিক মারা পড়িয়াছে। কিন্তু কোন যুদ্ধেই মৃত লোকদের স্থান পূরণের জন্য ভয়ে অন্য কেহ অগ্রসর হইতেছে না, এরূপ শুনা যায় নাই। ইংরাজেরা অন্য জাতিদের চেয়ে সাহসী, বলিতেছি না। যে-কোন জাতি যুদ্ধ করে, তাহাদেরই অনেক লোক মরে, আবার মৃত লোকদের জায়গায় অন্যেরা আসিয়া দাঁড়ায়। ইংরেজ কর্ম্মচারীদিগকে মারিয়া যাঁহারা ইংরেজ মহলে আতঙ্ক জন্মাইতে চান, তাঁহারা জানিবেন, ইংরেজ কর্ম্মচারীরা মনে করিবে তাহারা যুদ্ধক্ষেত্রে আছে এবং তদনুরূপ সতর্কতা ও সাহস অবলম্বন করিবে। ইংরেজরা শ্রেষ্ঠ জীব বলিয়াই এরূপ ধারণা করিতে পারিবে, তাহা নয়। সরকারী বাঙালী কয়েকজন লোকেরও ত এপর্য্যন্ত ভীতি-উৎপাদক (টেরারিষ্ট) দলের হাতে প্রাণ গিয়াছে। কিন্তু তাহাদের জায়গায় কাজ করিবার জন্য বাঙালীর অভাব হয় নাই। অতএব ভয় জন্মাইয়া কাজ উদ্ধার করিবার নিমিত্ত যদি কেহ বোমা বা গুলি ছোঁড়েন, তিনি জানিবেন তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না। অবশ্য, ভীতি-উৎপাদক দলে এমন লোক থাকিতে পারেন, যাঁহারা ফলাফলের প্রতি দৃক্‌পাত করেন না, কেবল প্রতিহিংসার দ্বারাই চালিত হন। তাঁহাদিগকে শুনাইবার মত "কেজো" যুক্তি কিছু নাই। শাস্ত্রের ও মহাপুরুষদের বাণী আগেই শুনাইয়াছি। কেবল একটা কথা বলিবার আছে। বোমা ছুড়িলে প্রায় দু-একজন নিরপরাধ লোক হত বা আহত হয়, গুলিতেও তাহা হইতে পারে। এবং তাহা অপেক্ষাও শোচনীয় ব্যাপার এই যে, এইরূপ প্রত্যেক ঘটনার পর অপরাধী আবিষ্কার করিবার নিমিত্ত বিস্তর নিরপরাধ লোককে গ্রেপ্তার করা হয় এবং অনেককে প্রহার ও তদপেক্ষা দুঃসহ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়। যাহারা বধের চেষ্টা করে, তাহারা স্বয়ং হত হইলে বা আত্মহত্যা করিলেও তাহাদের দলে কেহ ছিল কি না আবিষ্কার করিবার চেষ্টা হয়। সেই চেষ্টার ফলে বিস্তর নিরপরাধ লোক যন্ত্রণাভোগ করে। এই সব কথার আধুনিক দৃষ্টান্ত পাঠকেরা সংবাদপত্রে পড়িয়াছেন।

সর্দ্দার ভগৎ সিংহ ও তাঁহার দুই জন সঙ্গীর ফাঁসী উপলক্ষ্যে মহাত্মা গান্ধী ভগৎ সিংএর সাহসের প্রশংসা করিবার সময় একথাও বলিয়াছিলেন, যে; কেহ যেন তাহাদের পন্থা অবলম্বন না করে। কিন্তু ভগৎ সিংএর দুঃসাহসের প্রশংসাই উত্তেজনাপ্রবণ প্রতিহিংসাপরায়ণ অনেক লোকের মনে স্থান পাইয়াছে, মহাত্মাজীর সতর্কতার উপদেশে তাহারা কর্ণপাত করে নাই।

মেদিনীপুরে তমলুক ও কাঁথি অঞ্চলে যে-সব অত্যাচারের অভিযোগ খবরের কাগজে বাহির হইয়াছিল, তাহা কি পেডি সাহেবের আমলের অভিযোগ? তাহা না হইলে ত প্রতিহিংসোন্মত্ততারও কোন কারণ দেখা যায় না।

অন্যান্য অনেক স্থানের মত মেদিনীপুরে হাকিম ও পুলিসের অত্যাচারে প্রকৃত বা অপ্রকৃত, যথাযথ বা অতিরঞ্জিত অনেক কাহিনী দেশময় ছড়াইয়াছিল। তৎসম্বন্ধে প্রকাশ্য তদন্তের একান্ত প্রয়োজন গবর্ন্মেণ্টকে জানান হইয়াছিল। সেইরূপ তদন্ত করিয়া কাহিনীগুলি গবর্ন্মেণ্ট মিথ্যা প্রমাণ করিয়া দিলে এরূপ সন্দেহের কোন কারণ থাকিত না, যে, অত্যাচার-কাহিনীকে সত্য মনে করিয়া উত্তেজিত প্রতিহিংসাপরায়ণ কেহ মেদিনী-পুরের গহিত হত্যাকাণ্ড করিয়াছে। কোন অভিযোগ সম্বন্ধে প্রকাশ্য তদন্ত না করিলেই লোকে তাহা মিথ্যা মনে করিবে, গবর্ন্মেণ্টের এরূপ মনে করা মহা ভ্রম। রাজনৈতিক হত্যাকারীদের নিন্দা আমরা বার-বার করিয়াছি; কিন্তু ইহাও আমাদিগকে বলিতেই হইবে, যে, গবর্ন্মেণ্ট সরকারী কর্ম্মচারীদিগের প্রতি প্রতিহিংসার ভাব উৎপাদন নিবারণের জন্য এবং তদ্দ্বারা তাহাদের প্রাণরক্ষার জন্য যথোচিত উপায় অবলম্বন করেন না।

১২০।২, আপার সার্কুলার রোড প্রবাসী প্রেস হইতে শ্রীসজনীকান্ত দাস কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত



স্বাধীনতার উষা
শ্রীমণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

প্রবাসী

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"

"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৩১শ ভাগ, ১ম খণ্ড | জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৮ | ২য় সংখ্যা

নীহারিকা

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বাদ্‌লা-শেষের আবেশ আছে ছুঁয়ে
তমাল-ছায়াতলে,
সজ্‌নে গাছের ডাল পড়েছে নুয়ে
দীঘির প্রান্তজলে।
অস্তরবির পথ-তাকানো মেঘে
কালোর বুকে আলোর বেদন লেগে ;—
কেন এমন খনে
কে যেন সে উঠ্‌ল হঠাৎ জেগে
আমার শূন্য মনে॥

"কে গো তুমি, ওগো ছায়ায় লীন,"
প্রশ্ন পুছিলাম।
সে কহিল, "ছিল এমন দিন
জেনেছ মোর নাম।

নীরব রাতে নিস্তুৎ দ্বিপ্রহরে
প্রদীপ তোমার জ্বেলে দিলেম ঘরে,
চোখে দিলেম চুমো।
সেদিন আমায় দেখ্‌লে আলসভরে
আধ্‌-জাগা আধ্‌-ঘুমো ॥

আমি তোমার খেয়াল-স্রোতে তরী,
প্রথম দেওয়া খেয়া।
মাতিয়েছিলেম শ্রাবণ-শর্ব্বরী
লুকিয়ে-ফোটা কেয়া।
সেদিন তুমি নাওনি আমায় বুঝে,
জেগে উঠে পাওনি ভাষা খুঁজে,
দাওনি আসন পাতি’।
সংশয়িত স্বপন সাথে যুঝে
কাট্‌ল তোমার রাতি ॥

তার পরে কোন্‌ সব-ভুলিবার দিনে
নাম হোলো মোর হারা।
আমি যেন অকালে আশ্বিনে
এক পসলার ।
তার পরে তো হোলো আমার জয় ;—
সেই প্রদোষের ঝাপ্‌সা পরিচয়
ভর্‌ল তোমার ভাষা,
তার পরে তো তোমার ছন্দোময়
বেঁধেছি মোর বাসা ॥

চেনো কিম্বা নাই বা আমায় চেনো,
তবু তোমার আমি।
সেই-সেদিনের পায়ের ধ্বনি জেনো
আর যাবে না থামি।

যে-আমারে হারালে সেই কবে
তারি সাধন করে গানের রবে
তোমার বীণাখানি।
তোমার বনে প্রোল্লোল পল্লবে
তাহার কানাকানি॥

সেদিন আমি এসেছিলেম একা
তোমার আঙিনাতে।
দুয়ার ছিল পাথর দিয়ে ঠেকা
নিদ্রা-ঘেরা রাতে।
যাবার বেলা সে-দ্বার গেছি খুলে'
গন্ধ-বিভোল পবন-বিলোল ফুলে,
রং-ছড়ানো বনে,—
চঞ্চলিত কত শিথিল চুলে
কত চোখের কোণে॥

রইল তোমার সকল গানের সাথে
ভোলা নামের ধুয়া।
রেখে গেলেম সকল প্রিয় হাতে
এক নিমেষের ছুঁয়া।
মোর বিরহ সব মিলনের তলে
রইল গোপন স্বপন অশ্রুজলে,—
মোর আঁচলের হাওয়া
আজ রাতে ঐ কাহার নীলাঞ্চলে
উদাস হয়ে ধাওয়া॥

১ এপ্রিল
১৯৩১

রূপ-কার

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

মানুষ আপনার যে সংসার রচনা ক'রচে তার নানা দিক। কিন্তু তার এই বিচিত্র সমাজের ক্রিয়া-কর্ম্ম পূজা অর্চ্চনা আর্থিক চেষ্টা জ্ঞানের অধ্যবসায়ের মূলে একটি জিনিষ রয়েচে সেটা হচ্চে বিশ্বের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধ-স্থাপনা, চিত্ত চরিত্র বুদ্ধির মধ্য দিয়ে। সব চেয়ে স্পষ্ট ক'রে চোখে পড়ে মানুষের সঙ্গে তার বিশ্বের প্রয়োজনের সম্বন্ধ। বিশ্বে রয়েছে বিচিত্র বস্তুর আয়োজন, আমাদের আছে বহুবিধ প্রয়োজন—এই দুইয়ে মিলে আমাদের বিপুলায়তন বৈষয়িক সংসার দেশে কালে আকার ধারণ করেচে। এই প্রয়োজনের তাগিদে মানুষের কত চেষ্টা, কত সংগ্রাম, কি নিরন্তর উদ্যোগ, অক্লান্ত সাধনা—এইখানে জীবজগতের অন্যান্য প্রাণীর সঙ্গে আমাদের মিল আছে। প্রভেদ এই যে, জন্তুদের জীবিকার পরিধি অত্যন্ত সামান্য,আমাদের পরিধি অসীম। তা ছাড়া দেখতে পাই প্রয়োজনের প্রয়াস সাধারণত জন্তুদের ব্যক্তিগত চেষ্টায় প্রবৃত্ত করে, তাদের মেলায় না,—মানুষের ক্ষেত্রে এখানেও তার সামাজিক সত্তা প্রকাশিত হয়, এইখানেই তার শক্তি। মৌমাছি বা পিঁপড়ে যেটুকু মেলে তাও যান্ত্রিকভাবে, সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর বাহিরে তার গতি নেই। মানুষ যেখানে যন্ত্রকে মেনেচে সেখানেও তার সামাজিক বুদ্ধি, তার সমষ্টিগত প্রেরণা, নিয়তই জয়ী হয়ে উঠেচে। জন্তু বেঁচে থাকে সামান্যের মধ্যে, আমাদের বাঁচতে হয় বৃহৎ ক'রে, মানুষের সমাজ নিয়তই বিস্তৃত ক্ষেত্রকে অধিকার ক'রে চলেচে।

আমরা কেবলমাত্র প্রয়োজনের সম্বন্ধে জগৎসংসারের সঙ্গে যুক্ত তা নয়, মানুষ জানতে চায়। জীবযাত্রার দাবি মানুষকে বিশ্বব্যাপী জাল ফেলিয়েচে, প্রাকৃতিক জগতকে সে নিয়তই দোহন করচে ধনের জন্যে, সামগ্রী আহরণের জন্যে। জ্ঞানের তাগিদেও মানুষের এমনিতর বহুসম্মিলিত ইচ্ছার দাবি বিশ্বজগৎকে তন্ন তন্ন ক'রে যাচাই করচে, কোথাও তার ফাঁক নেই। জন্তুরও জ্ঞানের প্রয়োজন আছে, ঋতুভেদে তার ব্যবহারের পরিবর্ত্তন করা চাই, শত্রু মিত্র বিচার, আহার্য্যের সন্ধান, প্রাণরক্ষার জন্যে সজাগ সক্রিয় অধ্যবসায়। কিন্তু সেখানেও তাদের গণ্ডী অত্যন্ত ছোট, কতকগুলি সঙ্কীর্ণ নিয়মতন্ত্রের মধ্যেই আবহমানকাল তারা আবর্ত্তিত হচ্চে, বাহিরে যেতে পারল না। বিশ্বের সঙ্গে জ্ঞানের যোগে মানুষ আপনার নিয়তবিবর্দ্ধমান সত্তার পরিচয় লাভ করচে, তার জানার অন্ত নেই, সেই জানার মধ্য দিয়ে আপনাকেও সে আবিষ্কার করচে। ইংরেজীতে প্রবাদ আছে, জানার দ্বারা আমরা শক্তিলাভ করি, এটা সত্য, কিন্তু জ্ঞানের বিশুদ্ধ প্রয়োজন আপনারই মধ্যে নিহিত, তার ফলাফল তুলনায় গৌণ। কিন্তু প্রয়োজনের সঙ্গে জ্ঞানের যোগও নিয়তই ঘটচে। ক্যালডিয়ার মেষপালক আকাশের তারার গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করেচে, রাতের পর রাত মাঠে শুয়ে শুধু জানবারই আগ্রহে, মেষপালনের সঙ্গে তার এই জানার যোগ ছিল না। অথচ নক্ষত্র-জগতের আবর্ত্তনপথ যতই সে সুস্পষ্ট জেনেচে সেই জানার ফলে অন্ধকার রাত্রে দিকনির্ণয় তার পক্ষে সহজ হয়েচে, একদিন পথচিহ্নহীন সমুদ্রে এই জানার ফলে তার তরণী কূলে এসে ভিড়তে পেরেচে।

প্রয়োজন এবং জ্ঞানের সম্বন্ধ ছাড়াও মানুষের সঙ্গে বিশ্বের অন্য সম্বন্ধ আছে। এই সম্বন্ধেই রূপসৃষ্টি। এই বিষয়ে আজ ভাবতে চাই। এইখানেই আর্টের মূলতত্ত্ব। আর্ট মানে কেবলমাত্র চিত্রকলা নয়, মানুষের বিচিত্র রস-সৃষ্টির কাজ।

মানুষের সংসারের দিকে যখন চেয়ে দেখি যুগ যুগ-সঞ্চিত মানুষের এই রসসৃষ্টির বিপুল অধ্যবসায় দেখে

বিস্মিত হ'তে হয়। সাহিত্যে, শিল্পে, বিচিত্র সৃষ্টিসাধনায় এই চেষ্টার আবেগ কত রূপক কত উপকরণকে অবলম্বন ক'রে কাষ্ঠফলকে, পাথরে, সোনায়, হাতির দাঁতে, ছবিতে, মূর্ত্তিতে, কথায়, গানে কি অন্তহীন প্রাচুর্য্যে বিশ্বময় জমে উঠেচে তার হিসাব দেওয়া শক্ত। বাণীতে সুরে রেখায় মানুষ এই যে বিপুল সৃষ্টির উৎস খুলে দিল এর মূল কোথায়, কোন্‌খানে এর প্রেরণা? দেখতে পাই আদিমতম যুগ হ'তে গুহাগাত্রে শিলায় মানুষ তা'র রূপভাবুক চিত্তের পরিচয় না দিয়ে পারেনি, মৃগয়া ক'রেচে, জন্তুর ছবি দেয়ালে এঁকেচে, যে-অস্ত্র দিয়ে বধ করেচে তাকেও সুন্দর ক'রে তোলবার দিকে তার মন। আত্মরক্ষার প্রয়োজন তখন তার কি একান্ত ছিল, নিরন্তর তাকে সংগ্রাম করতে হয়েচে, কিন্তু তারই মধ্যে সে জলপাত্রকে কিছু রূপ দিতে চেয়েচে, গুহাদ্বারকে চিত্রিত করেচে। কেবলমাত্র প্রয়োজনের দ্বারা বিশ্বসংসারকে সে পর্যাপ্ত দেখেনি— একটা কিছু তাকে স্পর্শ করেচে যা প্রয়োজনের অতীত।

এই যে প্রয়োজনের অতীত, জ্ঞানের অতীত, মানুষের চিত্তচেষ্টা—একে বল্‌ব মানুষের ইচ্ছার প্রেরণা। বিশ্বকে ব্যবহার করি, বিশ্বকে জানি, আবার বিশ্বকে আমরা ইচ্ছা করি—অর্থাৎ তার রস ভোগ করতে চাই। যে উপলব্ধিতে রস পাই সেই উপলব্ধিটি অব্যহিত। সত্তার এই উপলব্ধি সংবাদমাত্র নয় এটা অনুভূতি, স্বতঃপ্রতীত। ফুল আমার ভাল লাগল এ জন্য ন্যায়শাস্ত্রের প্রয়োজন নেই, বিচার বিবেচনা অনাবশ্যক। বস্তুত এই ফুলকে অনুভব করা নিজেকেই একটা বিশেষভাবে অনুভব করা। নিজেরই সত্তাকে একটা বিশেষ রসে রসিয়ে দেখি, গোলাপ আমারই আত্মবোধকে আনন্দ দ্বারা নিবিড় ক'রে তোলে; তাতে আমারই সত্তার বিকাশ। চতুর্দ্দিকের পরিবেশ যখন আমার আপন সত্তার বোধকে উদ্বোধিত করে তখন আমরা আনন্দিত হই। যা আমার কাছে অপরিচয়ের ছায়ায় অবগুণ্ঠিত আবৃত তাতে আমার আনন্দ নেই, কেন-না সেখানে আমার সত্তার বোধ ম্লান, নিস্তেজ, সেখানে তার পরিচয়ে আমার আপন সত্তার পরিচয় প্রবলভাবে স্পন্দিত হয়ে ওঠে না। মানুষের তাই সবচেয়ে বড় শাস্তি হচ্চে কারাগারের জনহীন প্রকোষ্ঠে নির্ব্বাসন, সেখানে আহার শয্যার সব সুবিধাই থাকতে পারে কিন্তু বাহিরের যে বিচিত্র স্পর্শদ্বারা নিজেকেই বিচিত্ররূপে উপলব্ধি করি সেটা না থাকাতে নিজের অস্তিত্ববোধ ম্লান হয়ে যায়, সেটা জীবন্মৃত্যুর মত। ভিতরকার কথাই এই যে, মানুষ পূর্ণভাবে আত্মচেতন হ'তে চায়, মনের রং যখন ফিকে হয়ে যায় তখন চৈতন্য অনুজ্জ্বল হয়। চিত্রকলায় যেমন পটভূমি—ছবি যদি তার উপযুক্ত পটভূমি পায় তবে তার চরিত্র সৃজিত হয়ে ওঠে ভাব ও রূপের সমাবেশে— চারিদিকের শূন্যতা তাকে অপ্রকাশের মরীচিকায় আচ্ছন্ন রাখতে পারে না। অজাগ্রত সত্তার নিরালোকে মানুষ নিষ্প্রভ মন-মরা হয়ে থাকে—যা-কিছু তাকে সত্তার আনন্দঘন উজ্জ্বলতায় উত্তীর্ণ করে তার প্রতি মানুষের গভীর আকর্ষণ।

এই হ'ল আমাদের অনুভূতির ক্ষুধা, প্রকাশের ক্ষুধা। আহারের ইচ্ছা নয়, জানবার নয়, অপ্রকাশের শূন্যতা হ'তে আপনাকে নিবিড় ক'রে চেতন ক'রে তোলবার প্রেরণা। এই আত্মানুভূতির ইচ্ছাকে আধ্যাত্মিক অর্থে ব্যবহার করচি না—এটা হচ্ছে কেবলমাত্র আপনার সম্বন্ধে স্পষ্টতরভাবে চেতন হবার তাগিদ—প্রত্যেকের মধ্যেই এটা আছে। সকলের শক্তি নেই যে এই তাগিদকে উজ্জ্বল ক'রে নিবিড় ক'রে তুল্‌তে পারে— কিন্তু এই চেষ্টার মূলে হচ্চে আর্টের উৎপত্তি।

এই যে আত্মচেতনার অনুভূতি আমরা খুঁজি— এই অনুভূতি সর্ব্বদাই আনন্দময়। আমি বলচি, মানুষের সর্ব্বপ্রকার অনুভূতিই আনন্দময়। দুঃখের, বেদনার, ভয়ের অনুভূতি কোনোটাকেই বাদ দিয়ে বলচি না। ধরা যাক, ভয়ের অনুভূতি, কোন্‌খানে এটা অসুখকর, না যেখানে এর সঙ্গে ক্ষতি বা অনিষ্টের আশঙ্কা জড়িত - যেমন পাড়ায় বাঘ এলে মানুষ উৎকণ্ঠিত হয়ে ওঠে। কিন্তু বাঘের গল্প

যখন পড়চি, শিকারীর রোমহর্ষক মৃত্যুর সঙ্গে খেলার প্রসঙ্গ, সেখানে যে নিবিড় ভয়ের অনুভূতির মধ্যে দিয়ে মনকে নিয়ে যায় তা সুখকর না হ'লে বাঘের গল্প আমরা পড়ব কেন? ভূতের ভয় সম্বন্ধেও একই কথা। পয়সা দিয়ে কথক ডেকে সীতার বনবাসের কাহিনী আমরা কেন শুনি? ঘরের পাশে যদি খুন হয় অনিষ্টের আশঙ্কায় আমরা পুলিস ডেকে বসি, কিন্তু ওথেলো যেখানে ডেসডিমোনার প্রাণ নিল সেখানে ব্যক্তিগত ক্ষতি নেই, বেদনার তীব্রতা সেখানে আমাদের প্রোজ্জ্বল অনুভূতির দীপ্ততেজে সমস্ত চৈতন্যকে উদ্ভাসিত ক'রে তোলে। হ্যামলেট নাটকের গভীর নৈরাশ্য বেদনার মধ্য দিয়েই তার পূর্ণ সার্থকতা, যদি ঐ নাটকের দুঃখভার কমিয়ে সুখের এবং স্বাচ্ছন্দ্যের ঘটনা দিয়ে ভরিয়ে তোলা যেত আমাদের আনন্দ কি বাড়ত? বীর যে সে ভয়ের কারণ ঘটিয়ে তার উপর জয়ী হ'য়ে আনন্দিত হ'তে চায়, সে পরিণামভীরু নয়, সে অনুভূতির পূর্ণতার মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলে। ভীরু যারা তাদের ব্যক্তিগত ভয়ভাবনার খোলস এতই কঠিন যে, তারা সঙ্কটের সংঘাতে এসে প্রাণলোকের প্রবল অনুভূতির তরঙ্গে চেতনাকে উদ্বেল ক'রে তুলতে জানে না, তারা দাওয়ায় ব'সে শাস্ত্র এবং জুজুবুড়ির ভয়ে আশঙ্কিত। মানুষের আত্মোপলব্ধির ক্ষুধা তাকে বিচিত্রের জগতে অগ্রসর করিয়ে দেয়—এই বীরত্বের অভিযান সকলভাবে আমাদের প্রত্যেকের ব্যক্তিগত জীবনে ঘটে ওঠে না, সেইজন্যে সাহিত্য এবং কলাবিদ্যার মধ্য দিয়ে বিচিত্র মানবের অনুভূতির নিবিড় রসাস্বাদন ক'রে আমরা আনন্দিত হই।

বাস্তবের অনুভূতি প্রবল হয় কিসে সে একটা রহস্য। গোলাপ সম্বন্ধে মন উদাসীন হয় না, কাঁকরটার দিকে তাকাইনে। কেন? আজকে সে প্রশ্নের আলোচনা করব না। আজকের কথাটা এই যে, বিশ্বের সঙ্গে আমার প্রয়োজনের যোগ, জ্ঞানের যোগ, আবার বিশুদ্ধ অনুভূতির যোগ। সেই যোগে বিশ্বের সঙ্গে আমার আত্মীয়তার সম্বন্ধ—যেখানেই বিশ্বে এই আত্মীয়তার অনুভূতি জাগে সেইখানেই আমি আনন্দিত। গোলাপফুল আমার মনে এই আনন্দ জাগায়, তার মধ্যে আমার সত্তা একটি পুষ্টি একটি তুষ্টি পায়। কেরোসিনের টিন দেখে মন খুশি হয় না, মাটির জলপাত্র দেখে ভাল লাগে—অথচ জল তোলার দিক থেকে দুয়ের ভেদ আমার কাছে গৌণ।

আমরা খুঁজচি মনের মানুষকে, শুধু মনের মানুষকে নয়, মনের মতনকে। রূপলোকে কাব্যলোকে আমরা সেই মনের মতনকে পাই, সেইখানে আমার নিজের সত্তার আনন্দ সুগভীর। যিনি রূপ দিচ্চেন তাঁকে তাই আমরা শ্রদ্ধা করি—যে রূপকার জলের পাত্রে রূপ দেন তাঁকে আমরা জলবাহক গিরধারিলালের চেয়ে বেশী খাতির করি। কারণ রূপকার বাস্তবকে আমার অতি কাছে এনে দেন, রিয়্যালিটির চেতনা আমার মধ্যে উজ্জ্বল ক'রে তোলেন। নানা পদার্থের মধ্যে বাস্তব ছড়িয়ে আছে, তাকে অব্যবহিত বিশুদ্ধরূপে সমগ্র ক'রে দেখতে পাই না—রসসৃষ্টির মধ্যে বাস্তব অব্যবহিতভাবে চেতনার সম্মুখে এসে দাঁড়ায়—তার রূপ দেখতে পাই। এইজন্যে বসবার ঘরে ধোপার গাধাকে আমরা ডেকে আনি না, স্থান দিই না, অথচ আর্টিষ্ট যখন গাধা আঁকেন বহুযত্নে সেই গাধার ছবি আমরা বসবার ঘরের দেয়ালে ঝুলিয়ে রাখি। আর্টিষ্টের দৃষ্টির মধ্য দিয়ে গাধাকে আমি দেখতে পাই, বর্ণের রেখার সমাবেশে সৃষ্টির যে রহস্য গাধার রূপে প্রকাশ পেয়েচে তাকে স্পষ্ট ক'রে মনের মধ্যে আনতে পারি। আর্ট আমাদের মনে বাস্তবের অনুভূতি জাগিয়ে তোলে, আমাদের সত্তার সঙ্গে তার নিবিড় সম্বন্ধ স্থাপন ক'রে গভীর আনন্দের চেতনা এনে দেয়।*

* শান্তিনিকেতন কলাভবনে প্রদত্ত বক্তৃতার অনুলিখন। ১২ই এপ্রিল, ১৯৩১

পোর্ট-আর্থারের ক্ষুধা

শ্রীসুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

৪

নান্‌শান্

নান্‌শানের দিকে সেই আগুনের খেলা ক্রমে ভীষণ ও উদ্দাম হইয়া উঠিল। লড়াইয়ের খবর কি? আমাদের দল সাহস ও অধ্যবসায়ের পরিচয় দিতেছে ত? জায়গাটা দখল হইল, না এখনও চেষ্টা চলিতেছে? এই আমাদের প্রথম যুদ্ধ—এ যুদ্ধে যোগ দিতে হইলে তৎপরতার প্রয়োজন, এমন সুযোগ হেলায় হারাইবার নয়। কিন্তু যাত্রার হুকুম আসে কই? মন নান্‌শানের পানে উধাও হইল, অসহিষ্ণুতার আর সীমা নাই।

ওদিকে, আমাদের অনুবর্ত্তী দল নিরাপদে তীরে অবতীর্ণ হইল কি না, জানি না। কর্নেলের হাতে মাত্র পাঁচ শ' লোক—নিতান্ত ছোট একটি দল। এই ক'জন সৈনিক লইয়া তিনি কি আগুসার হইবার সাহস করিবেন? তাঁর চিন্তাক্লিষ্ট মুখ দেখিয়া বুঝিলাম, অবিলম্বে আমাদিগকে রণক্ষেত্রে হাজির করা সম্ভব নয়। তবে কি কেবল দূর হইতে যুদ্ধটি দেখিব—সাহায্যে অগ্রসর না হইয়া? নদীর এপারে দাঁড়াইয়া ওপারের অগ্নিকাণ্ড দেখার মত?

মন নিরাশায় ভরিয়া উঠিল। অবশ্য যুদ্ধ দীর্ঘকাল চলার সম্ভাবনা—সবে যবনিকা উঠিয়াছে—এই নান্‌শান্ ত আর শেষ অঙ্ক নয়। কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রের এত কাছে আছি, অথচ শত্রু-সম্মুখীন হইবার উপায় নাই; যুদ্ধের আওয়াজ পাইতেছি অথচ সেদিকে যাইতে পারি না—এ অবস্থা বড়ই ক্লেশকর।

কথায় বলে—যে অপেক্ষা করে সবই তার কাছে আসে। একদিন আদেশ পৌঁছিল—কমাণ্ডার ওকুর নেতৃত্বে দ্রুতগতি নান্‌শান্ যাত্রা কর! কর্নেল আদেশটি ঘোষণা করিলে সকলে এমন খুশি হইল যেন দৈববাণী শুনিয়াছে! যাত্রার জন্য ত তারা পা বাড়াইয়াই আছে—এখন কেবল চল, চল, ছুটিয়া চল! পা দুইটা যথাসম্ভব বিস্তৃত করিয়া ক্ষেতের পর ক্ষেত, গ্রামের পর গ্রাম পদাঘাতে পশ্চাতে ফেলিয়া চলিলাম, কত ক্রোশ যে ছুটিলাম সে-চিন্তা একবারও মনে আসিল না। শত্রুর মূর্ত্তি চোখের সুমুখে যেন ভাসিতেছে, তাই বেদনা বা শ্রান্তিবোধ নাই। স্বেদবিন্দু আর পথের ধূলা মুখের উপর যেন মুখোস পরাইয়া দিল—কিন্তু তাহাতেই বা ক্ষতি কি? দেখিতে দেখিতে জলের বোতল খালি হইল, গলা শুকাইয়া কাঠ হইল, শ্বাসরোধ হইবার উপক্রম, তবুও একটি লোক শ্রেণীচ্যুত হইল না। শত্রুর কল্পিত আস্তানার দিকে চাহিয়া কামান গর্জ্জনের পানে ছুটিয়া চলিয়াছি—শ্রান্তি, বেদনা বা বাধাবিঘ্নের কথা আর মনে নাই।

"নান্‌শান্ এখনও টিঁকিয়া আছে ত?"

"লড়াই জমে' উঠেছে, চট্‌পট যাও!"

এমনি কথাবার্ত্তা নান্‌শান-ফেরতা কুলি ও সৈনিকদের মধ্যে প্রায়ই শোনা যাইতেছে! কথাটা শুনিতে বোকার মত হইলেও, কামনা করিতেছিলাম, যেন আমরা পৌঁছানর পূর্ব্বে নান্‌শানের পতন না হয়। হয় ত মনে আমাদের গর্ব্ব ছিল, আমাদের মত তাজা সৈন্য-দলের সাহায্য বিনা পরিশ্রান্ত যোদ্ধারা স্থানটা দখল করিতে পারিবে না!

পথে দেখিলাম জন দুই তিন শত্রুপক্ষীয় নায়ক বন্দী অবস্থায় জাপানী শিবিরে নীত হইতেছে। দেখিয়া মনে যুগপৎ আনন্দ ও আশঙ্কার সঞ্চার হইল। পরাজিত শত্রুর প্রথম দর্শন লাভে আনন্দ এবং নান্‌শান হয় ত ইতিমধ্যে অধিকৃত হইয়া গেল এই আশঙ্কা! পথ চলা অভ্যাস করিবার জন্য যখন সৈন্যদল 'মার্চ' করে; অথবা যুদ্ধের সময়, কিন্তু ঠিক লড়াইয়ে যোগ দিবার জন্য নয়—তখন তাদের বিশ্রাম ও আহারের যতদূর সম্ভব ব্যবস্থা

থাকে। কিন্তু যখন একটা চল্‌তি লড়াইয়ে যোগদানের জন্য তারা চলে, তখন ঝড়ঝঞ্ঝা উপেক্ষা করিয়া খাদ্যপানীয় ব্যতিরেকেই চলিতে হয়! প্রত্যেক সৈনিকের সঙ্গে সের দশেক ওজনের একটি করিয়া পুঁটুলি ও একবোতল করিয়া জল থাকে। বোতল খালি হইবার পর আর এক ফোঁটা জল পাওয়ার উপায় নাই। দিনের পর দিন মাঠের মাঝে তাঁবু গাড়িয়া বিশ্রাম বা নিদ্রা—ঝড়বৃষ্টি যতই হোক সেখানেই থাকিতে হয়, বাড়ির কার্নিশের তলেও আশ্রয় লইতে পারে না। শ্রান্তির অবসাদ বা ব্যথাবোধের অজুহাতে মুক্তি নাই। মুখের ঘাম মুছিবার সময় নাই, তাহা নোনা বাতাসের সংস্পর্শে অচিরে জমিয়া সাদা হইয়া ওঠে। শ্বাসরোধ হইবার উপক্রম, তবুও হাঁপাইতে হাঁপাইতে সে কোনোগতিকে অগ্রসর হয়।

মানুষকে এই অগ্নিপরীক্ষার মধ্যে ফেলা হয়ত নিষ্ঠুর বোধ হইতে পারে, কিন্তু কর্ত্তব্যের খাতিরে সুখসুবিধা সব যে ত্যাগ করিতেই হয়। একজন সৈনিকেরও ত পিছাইয়া পড়িলে চলে না—আক্রমণ যারা করিবে, তাদের দলে একটি বন্দুকের অভাবও যে মস্ত অভাব! এমনি দুরূহ 'মার্চের' পর সৈনিকেরা তখনই তখনই ভীষণ যুদ্ধে নিযুক্ত হয়! তবেই দেখা যাইতেছে, যুদ্ধে জয়-পরাজয় 'মার্চ' করিবার সময়েই একরকম নির্দ্ধারিত হইয়া যায়। এই জন্যই শান্তির সময়েও সৈনিকদিগকে জলপান না করিয়া 'মার্চ', রাত্রিকালে 'মার্চ' এবং দ্রুত 'মার্চে' তালিম দিতে হয়।

মহোৎসাহে ধাবিত হইতেছি—বলা উচিত, উন্মত্তের মত চলিতেছি—প্রথম যুদ্ধে মনে কেবল এই চিন্তা। ক্রমে গন্তব্য স্থানের কাছাকাছি পৌঁছিলাম, গাছের তলায় ও পাহাড়ের গায়ে ছুঁচলো শিবিরশ্রেণী চোখে পড়িল। সেগুলি হাসপাতাল। তাঁবুর সংখ্যা দেখিয়া যুদ্ধের ফল সম্বন্ধে ভাবনা হইল। খাটিয়ার পর খাটিয়ায় আহতেরা আসিতেছে। তাদের নামাইয়া বাহকেরা আবার ছুটিতেছে যুদ্ধক্ষেত্রে, আরও আনিবার জন্য। চলার শক্তি যাদের লোপ পায় নাই, তারা খাটিয়ার পিছু পিছু আসিতেছে, দলে দলে—সারা পথ হাঁপাইতে হাঁপাইতে। খাটিয়া-শায়িত বা পদচারী—সকলেরই দেহ রক্তে কাদায় মাখামাখি। শোণিতসিক্ত সাদা ব্যাণ্ডেজে সম্মানের ক্ষতচিহ্ন আবৃত—খাটিয়ার ভিতর দিয়া ফোঁটা ফোঁটা রক্ত পড়িয়া মাটিকে মহিমান্বিত করিতেছে! এমন সময়, যে-দূত আদেশ লইবার জন্য অগ্রগামী হইয়াছিল, সে ফিরিয়া আসিল, খবর দিল—নান্‌শান্‌ দখল হইয়াছে! সমস্ত 'রিজার্ভ' সৈন্য Chungchia-tunএর নিকটে আড্ডা গাড়িয়া নূতন আদেশের প্রতীক্ষায় থাকুক।

শুনিয়া নায়ক হইতে ঘোড়ার সহিস পর্য্যন্ত সকলেই দুঃখে ও নিরাশায় নির্ব্বাক হইল। সত্য বটে শত্রুপক্ষের কাছে নান্‌শান্‌ ছিল পোর্ট আর্থারের চাবির মত; সেই স্থান দখল হওয়ায় আমাদের ভবিষ্যৎ যুদ্ধপ্রণালী নিয়ন্ত্রিত করার পক্ষে বিশেষ সুবিধা হইল। শুভসংবাদে আনন্দ প্রকাশ করা উচিত ছিল, এবং আমরা অবশ্য তাই করিলাম। তবে নিরাশ হইলাম বলিয়া দোষ দিলেও চলিবে না। জাহাজ ছাড়িয়াই একদমে ছুটিয়া আসিয়াছি, তারপর যথাস্থানে পৌঁছিয়া শুনি, আমাদের কাজ অন্যে শেষ করিয়াছে!

মাত্র একটি পাহাড় আমাদের সম্মুখে—তারপর রক্তস্রোত আর মৃতদেহের স্তূপ। সেখানে পৌঁছিতেই শ্রবণবিদারী কামান-গর্জ্জন সহসা থামিয়া গেল—গিরি-শ্রেণী ও উপত্যকা আবার অনাদি স্তব্ধতার মাঝে অবগাহন করিল। আহতেরা অবিরাম চলিয়াছে—ইহাই কেবল দেখিতেছি। দেখা হইলেই তাদের সান্ত্বনা দিই—তাদের কীর্ত্তির জন্য সাধুবাদ করি।

এখন পাহাড়ের তলায় বিশ্রামের পালা। যুদ্ধফেরতা এক সহিস সগর্ব্বে লড়াইয়ের বর্ণনা সুরু করিল। মাথা দুলাইয়া হাত নাড়িয়া পেশাদার কথকের মত সে বলিতে লাগিল—শুনিতে শুনিতে আমাদের মনে ভারি উত্তেজনার সঞ্চার হইল। একটি জলের বোতল দেখাইয়া বলিল, সেটি এক রুশ সৈনিকের সম্পত্তি। তার বলার ভঙ্গীতে মনে হইতেছিল সে যেন একাই শত্রুপক্ষকে পরাভূত করিয়াছে! আমরা এখনও বন্দুকে টোটা ভরি নাই, খাপ হইতে তলোয়ার খুলি নাই - তার কথা শুনিয়া দমিয়া গেলাম, বিষম লজ্জা বোধ হইল। জানি, সহিসটা কিছু আর যুদ্ধ করে নাই, তবুও কেমন মনে হইতে লাগিল,

সে যেন একটা মস্ত বীরপুরুষ! প্রচুর তারিফ করিতে করিতে তার কাহিনী যেন আমরা গিলিতে লাগিলাম! কত প্রশ্নই যে তাহাকে করিতে লাগিলাম তার আর হিসাব নাই।

Chungchia-tun-এ রাত্রি বাস করার আদেশ আসিল। আবার একই রাস্তা ধরিয়া ক্রোশ দুই পথ পিছন পানে চলিতে হইবে! এবার আর উৎসাহ নাই—সৈনিকেরা যেমন ঘোড়াগুলাও তেমনি, মাথা নীচু করিয়া পায়ে পায়ে হাঁটিয়া চলিল। পথ হইতে পীতাভ ধূলা উড়িতে লাগিল, তার আবরণে ক্রমে আমাদের মূর্ত্তি হইল যেন হলদে-মটরগুঁড়ো-মাখানো ফুলরী। নান্‌শানের কথা ভাবিতে ভাবিতে দিনরাত অবিরাম যখন হাঁটিয়াছিলাম, তখন মোটেই পা ব্যথা করে নাই, এখন ফিরতি পথে সমস্তই উল্টাইয়া গেল। পা যেন আর চলে না—ইঁট পাটকেল মাড়াইয়া ফেলি, খানাখন্দে পা পড়ে, মেজাজ বিগড়াইয়া যায়, দেহে মনে কোথাও যেন আর শক্তি নাই—সমস্তই শিথিল হইয়া পড়িয়াছে। পুরুষানুক্রমে জাপানী যে-মনোভাব অর্জ্জন করিয়াছে, তার মধ্যে পিছুহটার স্থান নাই—নিশ্চিত মৃত্যুমুখেও নয়। যুগে যুগে কঠিন নিয়ম পালনের দ্বারা এই মনোভাব দৃঢ়তর হইয়াছে, তাই বোধ করি পিছন পানে চলিতে এত কষ্ট!

শেষ পর্য্যন্ত Chungchia-tun পৌঁছিলাম। জনশূন্য গ্রাম, মাঝ দিয়া এক স্রোতস্বতী প্রবাহিত। চাঁদের মুখ ম্লান পাণ্ডুর, আকাশ নক্ষত্রবিরল। মাতৃরূপা প্রকৃতি তৃণশয়নে নিদ্রিত, শ্রান্ত ক্লান্ত আশাহত সৈনিকের দুঃখের ভাগ যেন লইয়াছে···সেদিন যুদ্ধে যারা মরিয়াছে তাদের শোকে সে যেন মর্ম্মাহত। রাত অনেক, তবুও মাঝে মাঝে বিনিদ্র লোক চোখে পড়িতেছে—নব নব ভাবের আনাগোনায় বোধ করি মন তাদের অশান্ত। শূন্যপথে ধাবমান কোকিলের বিক্ষিপ্ত কুহুরব, ঘুমহারা সৈনিকের কণ্ঠে 'বিওয়া'* গানের দুই এক পদ গুন্‌গুনানি, রাত্রির কি বিষণ্ণ নিঃসঙ্গ মূর্ত্তি!

*তারের বাদ্যযন্ত্র

৫

যুদ্ধশেষে

কোনোগতিকে Chungchia-tun-এ সে রাত্রি কাটাইলাম। পরদিন সকালে নান্‌শানের তলায় এক গ্রামে আড্ডা গাড়িবার আদেশ আসিল। আমাদের রেজিমেণ্টের পঞ্চম ও ষষ্ঠ দল নান্‌শানের পাহারায় মোতায়েন হইবে।

নান্‌শানে পৌঁছিলাম। খাড়া পাহাড়টার মাথায় উঠিয়াই দেখি এক বহুবিস্তৃত তরঙ্গায়িত ভূমি। তার দক্ষিণে Kin-chou ও বামে Tahoshangsan পাহাড়। কালকের ভীষণ যুদ্ধ এখানেই হইয়াছিল।

সামনের এক পাহাড় হইতে সাদা ধোঁয়া উঠিতেছে—বহুদূর পর্য্যন্ত উহা একটা অদ্ভুত গন্ধ ছড়াইতেছিল। সাহসী সৈনিকদের মৃতদেহের সংকার হইতেছে—রণক্ষেত্রের বেদীর উপর দেশের জন্য যারা প্রাণ দিল তাদের দেহ ভস্মে পরিণত হইতেছে! ধূমাবরণে দেশভক্তের শত শত আত্মা স্বর্গে চলিয়াছে! টুপি খুলিয়া উদ্দেশে নমস্কার করিলাম। ঘরে যখন মা ছেলের কথা ভাবিতে ভাবিতে নাটাইয়ে সুতা জড়াইতেছে আর পত্নী শিশুকে পিঠে বাঁধিয়া সেলাই করিতে করিতে পতিচিন্তা করিতেছে, তখন যুদ্ধক্ষেত্রে সেই সব সন্তান ও পতি খণ্ড-বিখণ্ড চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া ধূমপুঞ্জে পরিণত হইতেছে!

উপত্যকার তলে বা পাহাড়ের ধারে মৃতদেহের স্তূপ—সেই-সব দেহে গাঢ় রক্তের কালো দাগ। মুখ নীল, চোখের পাতা ফুলো-ফুলো, রক্ত ও ধূলামাখা চুলে জট বাঁধিয়াছে, সাদা সাদা দাঁত ঠোঁট চাপিয়া বসিয়াছে। পোষাকের লালটাই কেবল বদল হয় নাই।

দৃশ্য দেখিয়া কাঁপিয়া উঠিলাম। মনে হইল, আমিও শীঘ্রই অমনি হইব—কাছে গিয়া ভাল করিয়া যে দেখিব এমন সাহস কাহারও হইল না। আতঙ্কে ও বিতৃষ্ণায় দূর হইতে আঙুল বাড়াইয়া দেখাইতে লাগিলাম। রক্তমাখা পাদচ্ছদ (gaiters), পোষাক,

টুপি ও অন্তর্বাসের (underwear) টুকরা সর্ব্বত্র ছড়াইয়া আছে—চারিদিকে পূতিগন্ধ, বীভৎস দৃশ্য। শত্রুপক্ষের খাতের (trench) ধারে ধারে অসংখ্য বারুদের বাক্স ও খালি কার্তুজের গাদা—তারা আক্রমণকারীদের উপর কতটা মরিয়া হইয়া গুলি চালাইয়াছে তাহারই স্পষ্ট প্রমাণ। শত্রুসৈন্যের মৃতদেহ দেখিলেই তাদের প্রতি সহানুভূতি জাগিতেছে। মনে হইতেছে, হোক শত্রু, তারাও ত স্বদেশেরই জন্য প্রাণ দিল!

সযত্নে তাদের সমাহিত করা হইল, কিন্তু এই পরাজিত বীরদের নাম আমরা জানি না—ভবিষ্যতে যারা আসিবে তাদের জন্য সে নাম রাখিয়া যাইতে পারিলাম না। গৃহে তাদের পিতামাতা, পত্নী বা সন্তানেরা জানিতে পারিবে না -কবে, কোথায়, কেমন করিয়া তাদের প্রিয় জন প্রাণ হারাইল। প্রায় সকলেরই বুকে ক্রুশচিহ্ন কিম্বা হাতে "আইকন"। আশা করি মৃত্যুকালে তারা ভগবানের করুণা লাভ করিয়াছে!

কারও কারও পোষাকে নম্বর ছিল, সেগুলি আমরা শত্রুপক্ষকে জানাইয়াছিলাম। তাহা দ্বারা মৃতের নাম নির্ণয় করা সম্ভব হইবে। কিন্তু যাদের সনাক্ত করিবার মত কোনো চিহ্ন ছিল না, তাদের নাম চিরতরে অজানার গর্ভে ডুবিয়া গেল।

আপাতত Yenchiatun-এ থাকার বন্দোবস্ত হইল। রাত্রিবাসের জন্য নির্দ্দিষ্ট চীনা বাড়িতে সবে পৌঁছিয়াছি, হঠাৎ পাশের বাড়ি হইতে মানুষের কাতরানির শব্দ কানে পৌঁছিল। ব্যাপার কি দেখিবার জন্য তাড়াতাড়ি ছুটিয়া গিয়া থমকিয়া দাঁড়াইলাম, এ যে একেবারে নরকের বিভীষিকা! উঠানে জন পনেরো ষোলো মরণাহত জাপানী ও একজন রুশ পরস্পরের গায়ের উপর গাদাগাদি পড়িয়া নিদারুণ যন্ত্রণায় ছটফট করিতেছে, আমাকে দেখিয়া একজন হাতজোড় করিয়া সাহায্য ভিক্ষা করিতে লাগিল। এমন অবস্থায় মানুষকে সাহায্য করিতে পারা তো ভাগ্যের কথা, এর জন্য আবার কাকুতি-মিনতি?

কেন যে হতভাগ্য সৈনিকেরা এ অবস্থায় পড়িয়া আছে, কিছুই বুঝিলাম না। আগে জানিলে ভাল রকম সাহায্যের ব্যবস্থা করা যাইত। যাই হোক, তখনই ডাক্তার ডাকিয়া তাদের যন্ত্রণা লাঘবের চেষ্টা সুরু হইল। ডাক্তারেরা যখন তাহাদের আহত অঙ্গের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত,তখন তারা অভিভূত কণ্ঠে কেবলই বলিতে লাগিল, "আপনার এ দয়া কখনও ভুলব না, আপনার কাছে চিরদিন কৃতজ্ঞ থাকব, আপনি আমাদের বাঁচালেন, বাঁচালেন!" অশ্রুধারা দেখিয়া বুঝিতে বাকি রহিল না, কথাগুলা তাদের অন্তর নিঙড়াইয়া বাহির হইতেছে—কেবল কথার কথা নয়।

শুনিলাম দু'দিন তারা এককণা খাবার বা এক বিন্দু জল পায় নাই। সকলেরই আঘাত গুরুতর—কারও পা ভাঙিয়াছে, কারও বাহু চূর্ণ হইয়াছে, কারও বা মাথায় অথবা বুকে গুলি লাগিয়াছে! কারও কারও পরমায়ু আর আধ ঘণ্টাও নয়—তারাই আবার পরস্পরের হাত ধরিয়া, গায়ে হাত বুলাইয়া, কত সমবেদনা জানাইতেছে, সান্ত্বনা দিতেছে! লড়াইয়ে আমাদের পক্ষেরই হতাহতের সংখ্যা চার হাজারের বেশী, ইচ্ছা করিলেই কি সকলের সেবা শুশ্রূষা সম্ভব?

দেখিতে দেখিতে দুজনের মুখ বিবর্ণ হইয়া উঠিল, শ্বাসপ্রশ্বাস ক্ষীণ হইয়া গেল। ধীরে ধীরে চোখ মুদিত হইল, অধরের কাঁপন থামিয়া গেল। পাশের এক সৈনিক আমাকে বলিল, "ওদের মধ্যে একজন বাড়িতে কেবল বুড়ী মাকে রেখে এসেছে!"

মৃত বা আহত যুদ্ধের ঘোড়াগুলিকে দেখিলে ভারি কষ্ট হয়। তারাও সমুদ্র পার হইয়া বিদেশে আসিয়াছে! গোলাগুলি উপেক্ষা করিয়া কামান গর্জ্জনে ভয় না পাইয়া প্রভুকে পিঠে লইয়া সানন্দে তারা যুদ্ধক্ষেত্রে ছুটিয়া ফিরিয়াছে! প্রভুর যত্ন ও দয়ার প্রতিদান দিতে পারিল, মৃত্যুকালে ইহাই যেন তাহারা ভাবিতেছে!

ভারি বোঝা বহিয়া, ভারি গাড়ি টানিয়া, মালবাহী ঘোড়াগুলিই কি নীরবে কম যন্ত্রণা সহ্য করে? যুদ্ধ জয় অবশ্য নির্ভর করে সাহসী সৈনিক ও নায়কের চেষ্টার উপর, কিন্তু এই সব অনুগত জীবের সাহায্যও ত ভুলিলে চলিবে না! মোটা খড় ও কাদাগোলা জলেই তারা তুষ্ট, অবিরাম বৃষ্টি বা তুষারপাতের মধ্যেও অসন্তোষ নাই, প্রভুর একটু

আদরই তাদের সবার বাড়া আরাম। কাজ তারা সৈনিকের মতই নিখুঁতভাবে সম্পন্ন করে, কিন্তু তারা ভাষাহীন—আঘাত বা যন্ত্রণার কথা বলিতে পারে না। অসুখ হইলে কখনও কখনও ঔষধ জোটে না, এমন কি একটুখানি আদর, একটু হাতের স্পর্শও নয়। যন্ত্রণায় ছট্-ফট্ করে, অবশেষে একদিন শেষ বিদায়ের ডাক ডাকিয়া প্রাণত্যাগ করে—কেহ একবার ফিরিয়াও চাহে না! অনাবৃত মুক্ত প্রান্তরে তাদের মৃতদেহ পড়িয়া থাকে, কাক ও নেকড়ে আসিয়া সে দেহ খাইয়া ফেলে! কঠিন স্থূল অস্থিগুলা দিনের পর দিন ঝড়-ঝাপটার তাড়নে বিপর্য্যস্ত হইয়া ক্রমে ক্রমে ক্ষয় পাইতে থাকে!

এই-সব অনুগত ঘোড়াও ত বীর—কর্ত্তব্য সাধন করিতে গিয়া ভীষণ মৃত্যুর কবলে পড়িয়াছে! কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধার সহিত তাদের স্মরণ করা উচিত নয় কি? বৌদ্ধ যতি নাকাবায়াষি আহতের সেবার জন্য স্বেচ্ছায় আমাদের সঙ্গে আসিয়াছিলেন। যুদ্ধক্ষেত্রে সেবাকার্য্যের অবসরে তিনি গোলার টুক্‌রা সংগ্রহ করিতেন। বলিতেন, তাহা দিয়া এক অশ্বারোহী 'ক্বানন' * মূর্ত্তি তৈরি করাইবেন। তার ফলে হয়ত যুদ্ধে নিহত ঘোড়াগুলির আত্মার পরিতৃপ্তি হইতে পারে!

শত্রুপক্ষের ব্যবস্থার পরিচয় লইবার জন্য একদিন নান্‌শানের পাহাড়ে উঠিলাম। আত্মরক্ষার বন্দোবস্ত নিখুঁত—এক মহা যোদ্ধাজাতির সম্পূর্ণ উপযোগী। তারের বেড়া, খানাখন্দ ও ভূমিগর্ভে বিস্ফোরক 'মাইনের' কথা নাই বলিলাম! পাহাড়ের চারিদিকে খাতের পর খাত—সর্ব্বত্রই 'মেশিন্‌গান্' চালাইবার রন্ধ্র। অনেক কেল্লার ভিতর হইতে অতিকায় কামান মুখ বাড়াইয়া আছে দেখিলাম। স্থানটি সুরক্ষিত করিবার প্রায় কায়েমি বন্দোবস্ত! সৈন্যাবাস, গুদামঘর কিছুরই অভাব নাই। গুদামে সর্ব্ববিধ শীতবস্ত্র—রেলপথ ও 'ব্যাটারি'ও রহিয়াছে। নায়কের বাড়ির সাজসজ্জা ও আরামের উপকরণ বিস্ময়ের উদ্রেক করে। ঘরের আসবাবপত্র চমৎকার—দেখিলে আর যুদ্ধক্ষেত্রের কথা মনে থাকে না। সবচেয়ে অদ্ভুত লাগিল, যখন দেখিলাম স্ত্রীলোকের রাত্রিবাস ও প্রসাধন-সম্ভার এবং শিশুর পোষাক-পরিচ্ছদ ইতস্তত ছড়াইয়া আছে!

দূরবীন দিয়া পূর্ব্ব সমুদ্রতীরে দেখি বেলাভূমির উপর অসংখ্য মানুষ ও ঘোড়ার মৃতদেহ—ধূসর তরঙ্গ তাদের উপর দিয়া আনাগোনা করিতেছে! ইহারা শত্রুর অশ্বারোহী সেনাদলের অবশেষ—পদাতিকদের ডান পাশ রক্ষা করিবার জন্য মোতায়েন ছিল। পশ্চিম তীর হইতে অতর্কিতে পিছন দিকে আক্রান্ত হইয়া পালাইবার পথ পায় নাই—বিতাড়িত হইয়া প্রায় সকলেই সলিল-সমাধি লাভ করিয়াছে! স্থানটা দুর্ভেদ্য বলিয়া ভাবিয়াছিল, তাই এই পরিণাম।

পাহাড়ের মাঝামাঝি উঠিতেই চোখে পড়িল একটি ভাঙাচোরা সন্ধানী আলো আর একগাদা হাউই। রাতের অন্ধকারে শত্রুর দিকে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা এইগুলিই বারবার পণ্ড করিয়াছে! স্থানটি দখলে আসিবার পর উহা ধ্বংস করিয়া আমাদের সৈনিকেরা প্রতিশোধ-প্রবৃত্তি মিটাইয়াছে।

ক্রমেই মৃতের সমাধি-ফলকের সংখ্যা বাড়িয়া চলিল। নান্‌শান্ হইতে কিন্‌চু পর্য্যন্ত দেখিতে দেখিতে চলিয়াছি। এক জায়গায় একটি আলগা মাটির ঢিপি, তার উপর একখণ্ড বাঁখারি পোঁতা। ব্যাপারটা কি দেখিবার জন্য পা দিয়াই চমকিয়া উঠিলাম—পায়ের তলায় এক রুশের মৃতদেহ! মৃতদেহ কখনও মাড়াই নাই—সেদিনকার সে-আতঙ্ক এখনও মনে পড়ে। যুদ্ধে তখনও নামি নাই, তাই যুদ্ধের শোকাবহ পাপপূর্ণ পরিণাম দেখিয়া শিহরিত হইলাম!

এখন ভাবিলে ব্যাপারটা অদ্ভুত মনে হয়। চলন্ত গোলাগুলির সাম্‌নে ঘুরিয়া ঘুরিয়া ক্রমে যুদ্ধের আতঙ্ক কমিয়া আসে—গোড়ায় যা বীভৎস, পীড়াদায়ক মনে হয়, তার প্রতি মন উদাসীন হইয়া ওঠে। অতিপরিচয়ের ফলে অনুভূতির তীক্ষ্ণতা কমিয়া যায়—নহিলে যুদ্ধের ধকল সহিয়া কে বাঁচিতে পারিত?

* জাপানী পুরাণোক্ত করুণা দেবী

৬

শত্রুর চর

Yengchia-tun হইতে Chungchia-tun বেশী দূর নয়, কিন্তু 'মার্চ্' করার কথা মনে হইলেই সেই পথের কথা না ভাবিয়া পারি না। পোর্ট্-আর্থারের আশপাশের ভূমি কেবল পাথরে ও নুড়িতে ভরা। অন্যত্র সবই মাটি—চালের কুঁড়ো বা ছাইয়ের মত। প্রবল বাতাসে সেই ধূলা উড়িয়া কণ্ঠরোধের উপক্রম করে—সর্পাকৃতি চলন্ত সৈন্যশ্রেণীকে গ্রাস করিতে উদ্যত হয়। অনেক সময় এতটুকু সম্মুখে দৃষ্টি চলে না—পদে পদে সৈনিকের ছোড়ভঙ্গ হওয়ার সম্ভাবনা ঘটে। ব্যাপার এমন যে, খাবারের কৌটার মধ্যে ভাত পর্য্যন্ত ধূলায় ভর্ত্তি হইয়া যাইত।

অন্য সময়ে দশ বিশ ক্রোশ বা ততোধিক পথ দিনরাত অবিরাম চলিয়া অতিক্রম করিয়াছি, দশ ক্রোশ হয়ত ছুটিয়াই গিয়াছি। কখনও পানীয় বিনা, কখনও গভীর অন্ধকারে চলিয়াছি—কিন্তু এই ধূলার উপর দিয়া 'মার্চ্' করার কষ্টের তুলনায়, সে-সব অভিজ্ঞতা নগণ্য। আসল যুদ্ধে যোগ দেওয়ার যে সম্মান, তাহা লাভ করিবার এই যদি মূল্য হয়, তবে নিশ্চয়ই সে-মূল্য আমরা দিয়াছি। পরিশ্রম ও কষ্টের জন্য অবশ্য প্রস্তুত ছিলাম, কিন্তু মন যখন বর্ষাফলক ও গোলাগুলির অপেক্ষায় আছে তখন প্রকৃতির সহিত এই দ্বন্দ্ব বড়ই যন্ত্রণাদায়ক—যেমন জনহীন প্রান্তর অতিক্রম করা, পাহাড়ে চড়া, বৃষ্টি বাতাস শীতাতপের সহিত সংগ্রাম আর তৃণশয্যায় শয়ন! ক্রমে আমরা ভাবিতে সুরু করিলাম, ইহাও যুদ্ধেরই একটা বিশিষ্ট অঙ্গ। শেষে এমন হইল, ভুট্টাক্ষেতে বা শিলাশয়নে শুইয়াও নিদ্রা উপভোগে ব্যাঘাত ঘটিত না। মুক্ত আকাশতলে চাঁদের পানে চাহিয়া পতঙ্গগুঞ্জন শুনিতে শুনিতে ভুলিয়াই যাইতাম যে, আমরা প্রাসাদ বা দুর্গকক্ষে সুখশয্যায় শুইয়া নাই।

অবিরাম 'মার্চ' করিয়া Chungchia-tun পৌছিবার পর তৃতীয় ডিভিজনের সৈন্যদল অবসর পাইল। তাদের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতে নিজেদের অনভিজ্ঞতায় ভারি লজ্জা বোধ হইতে লাগিল। সেখান থেকে সরিয়া যাইতে পারিলে যেন বাঁচি—নান্‌শানের কীর্ত্তির পর তারা যেন মহিমার মুকুট পরিয়াছে! মনে হইল, আমরা গেঁয়ো লোক, ট্রেন 'মিস' করিয়া ইঞ্জিনের বিলীয়মান ধূম-ধারার পানে বোকার মত হাঁ করিয়া তাকাইয়া আছি! তাদের উপর হিংসা হইতে লাগিল—কল্পনায় দেখিতে পাইলাম তাদের পোষাক ছিন্নভিন্ন রুধিরাক্ত, তাদের অঙ্গে সম্মানের তাজা ক্ষতচিহ্ন! শ্রদ্ধা ও প্রীতির দৃষ্টিতে তাদের পানে চাহিলাম—মনে মনে তাদের ধূলিমলিন টুপি ও রক্তমাখা পট্টির কত তারিফ করিতে লাগিলাম! চাহনি, ভাবভঙ্গী, সমস্তের মাঝ থেকেই যেন তাদের মহান কীর্ত্তির পরিচয় উঁকি দিতেছে!

শত্রুর সামনে এক পাহাড়। আমাদের সৈন্যশ্রেণীর মধ্যদেশ যেখানে তারই দক্ষিণে উহা দাঁড়াইয়া। Antzushan পাহাড় হইতে Taitzu-shan পাহাড় পর্য্যন্ত, প্রায় আট ক্রোশ ব্যাপিয়া জাপানী দলের বিস্তার। মাঝে Maotou-tzu গিরিসঙ্কট। তারই মাঝামাঝি এক জায়গায় আমরা আছি।

এই গিরিসঙ্কটের উত্তরে Lichia-tun গ্রাম। আমাদের নিজেদের দল দক্ষিণে এই গ্রাম হইতে নদীর ওপারে Yuchia-tun গ্রাম পর্য্যন্ত বিলম্বিত। তারপরে শৈলশ্রেণী। সেখানে সুদৃঢ় বাধা তুলিয়া, শত্রুর গতিবিধির উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিয়া আক্রমণ ও আত্মরক্ষার আয়োজনে আমরা ব্যস্ত হইয়া উঠিলাম। ইতিমধ্যে জেনারেল নোগি দলবল সহ Dalny-র প্রায় চার ক্রোশ উত্তর-পশ্চিমে এক গ্রামে গিয়া পৌছিলেন। তাঁর পৌছানর সঙ্গে সঙ্গে তৃতীয় আর্ম্মির সংগঠন সম্পূর্ণ হইল।

শত্রু নান্‌শানে পরাজিত হইলেও Dalny ত্যাগ করিবার ইচ্ছা তাদের ছিল না, কিন্তু কি করে, প্রাণের দায়ে স্ত্রী পুত্র লইয়া পোর্ট আর্থার অভিমুখে পালাইতে হইল। যাইবার পথে তারা Shanshili-pao গ্রাম পুড়াইয়া দিয়া গেল।

সন্ধানী দূত খবর দিল, শত্রুপক্ষ Panton, Luannichiao, Waitou, Shuangting প্রভৃতি পাহাড়ের যোগসাধন করিয়া সেই স্থান সুদৃঢ় ও সুরক্ষিত

রিয়াছে। রুশ ও জাপানী সৈন্যশ্রেণীর মধ্যে ব্যবধান তিন হাজার হইতে পাঁচ হাজার 'মিটার' *।

প্রথম দিনই খন্তা ও কোদাল লইয়া কাজ সুরু করিয়া দিলাম। এক একটি জায়গায় এক এক অশ্বারোহী বা পদাতিক দল নিযুক্ত হইল। দিন রাত 'ট্রেঞ্চ' বা খাত কাটা চলিতে লাগিল। সৈনিকেরা তার মধ্যে ওৎ পাতিয়া থাকিবে। এ কাজে কর্ম্মচারীরা হইল সর্দ্দার, আর সৈনিকেরা হইল কুলি। ওদিকে কাঁচা পাকা সেনানায়কেরা চরের কাজে বহাল হইয়া শত্রুর গতিবিধি লক্ষ্য করিতে লাগিল।

ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ দিন দিন অগ্রসর হইতেছে। প্রথম প্রতিবন্ধক—'ট্রেঞ্চ' ও অশ্বারোহীদের জন্য বোমা-নিবারক দেওয়াল ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠিতে লাগিল। Dalny হইতে আমদানি বোরার মধ্যে বালি ভরিয়া, সেই বোরা স্তূপাকারে সাজাইয়া এই দেওয়াল বা আড়ালের সৃষ্টি। অশ্বারোহী থাকিবে প্রথমে। তারপর যারা ওৎ পাতিয়া থাকিবে তাদের জন্য খাতের ব্যবস্থা। সাদাসিধা ধরণের তারের বেড়া খাড়া হইল, একটা ভাল রাস্তাও তৈরি হইল। এই রাস্তা হইতে মাকড়সার সূতার মত নানা সরু সরু ফেঁকড়ি পথ বাহির হইয়া ভিন্ন ভিন্ন দলকে পরস্পর সংযুক্ত করিল। সৈন্যেরা হয় পল্লীবাসীদের সহিত তাদের গৃহে, নয় প্রাঙ্গণে বা গাছের তলায় তাঁবু ফেলিয়া বাস করিতে লাগিল।

শত্রুর আক্রমণে যারা বাধা দিবে, রাত্রে তাদের নিশ্চিন্তে নিদ্রার জো নাই, শীত নিবারণের জন্য আগুন জ্বালিবারও উপায় নাই। রাত্রিকালেই সবিশেষ সজাগ ও হুঁসিয়ার থাকা প্রয়োজন। সৈন্যশ্রেণীর কাছাকাছি থাকে শাস্ত্রী, সামনে দূর পর্য্যন্ত থাকে চর, সব-কিছুর উপরেই তাদের লক্ষ্য রাখিতে হয়। সারাদিন পরিশ্রমে যতই শ্রান্ত হউক, রাত্রে এমন সজাগ থাকিতে হয় যাহাতে একটি সরব পতঙ্গ বা উড়ন্ত পাখীও তাদের দৃষ্টি এড়াইতে না পারে! ঠাণ্ডা মাথায় নিশ্বাস রোধ করিয়া খুব সতর্কতার সহিত চোখ কান ব্যবহার করিতে হয় পিছনের সমস্ত সেনাদলের জন্য।

"কে যায়? দাঁড়াও!"

শাস্ত্রীর এমনি চীৎকার রাত্রির উদ্বেগ ও নির্জ্জনতা বাড়াইয়া তোলে। সহসা অন্ধকারে দু'একবার বন্দুকের আওয়াজ হয়—হয় ত শত্রুর চর আবিষ্কৃত হইয়াছে। আবার সমস্ত নীরব - রাত বাড়িয়া চলে। পুঞ্জ পুঞ্জ কালো মেঘ উত্তর হইতে যাত্রা করিয়া অচিরে সারা আকাশে কালি লেপিয়া দেয়। ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি সুরু হয়।

আক্রমণ-প্রতিরোধের বন্দোবস্ত প্রায় সম্পূর্ণ, এমন সময় শত্রু মাথা তুলিতে সুরু করিল। শাস্ত্রীশ্রেণীর নিকটে প্রতি রাত্রেই বন্দুকের শব্দ শুনা যাইতে লাগিল।

অবিরাম খবর আসিতেছে—অমুক জায়গায় জন পাঁচ ছয় শত্রুর পদাতিক চর দেখা দিয়া তখনই উপত্যকার মধ্যে অদৃশ্য হইল। তাদের ধরিবার জন্য রকমারি ফাঁদ উদ্ভাবন করিতে সুরু করিলাম। এমনি একটি ফাঁদের কথা বলি। আমাদের এলাকা হইতে কিছু দূরে এক গাছা দড়ি দুই প্রান্তে দুই খোঁটায় মাটির উপর টানিয়া বাঁধা হইল। সেই দড়ির সঙ্গে অপর একগাছা দড়ির এক প্রান্ত বাঁধিয়া, অন্য প্রান্ত শাস্ত্রীর পায়ের কাছে আটকান রহিল। চলার সময় শত্রুর পা প্রথম দড়িতে লাগিলে তার কম্পন দ্বিতীয় দড়ি বাহিয়া শাস্ত্রীর নিকট পৌছিবে। তখন শাস্ত্রী ছুটিয়া গিয়া শত্রু-চরকে গ্রেফতার করিতে পারিবে।

এক দিন সঙ্কেত পৌছিল—শিকার জালে পড়িয়াছে! শাস্ত্রীদল উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া গেল। গিয়া দেখে—মানুষের টিকিও নাই, কেবল একটা মস্ত কালো কুকুর আকাশ পানে চাহিয়া দাঁত খিঁচাইয়া বেজায় ঘেউ ঘেউ করিতেছে!

ক্রমশঃ

* এক মিটার এক গজ অপেক্ষা ইঞ্চি তিনেক বড়।

শিক্ষার সার্থকতা

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

কল্যাণীয়েষু— মারবুর্গ

নলিন, শঙ্করাচার্য্য দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলেচেন, "নলিনীদলগতজলমতি" ইত্যাদি। আমাদের কিন্তু দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলবার কারণ ঘটল না। শান্তিনিকেতনের শিক্ষা-বিভাগ নলিনীদলগত হয়েও টলমল করচে যে তা বোধ হ'ল না। তোমার দলটিকে বেশ পাকা করেই তুলেচ। বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষায় ষোলো আনা ফল পেয়েছ শুনে পবনবাহন যোগে সাধুবাদ পাঠাচ্চি। আশা করি হস্তগত হবে। তবু একথাটা মনে করিয়ে দেওয়া ভাল যে, পরীক্ষার ফল যে খুব বেশী দামী একথা আমি কোনোদিন মনে করিনে, বাল্যকালেই তার পরিচয় দিয়েছি—বৃদ্ধকালেও যে মতের পরিবর্ত্তন হয়েচে তার লক্ষণ দেখিনে।

এখানে এসে ধারণা আরও দৃঢ় হয়েচে। ড্রেসডেনের কাছে একটি পুরাতন দুর্গ আছে পাহাড়ের উপর—অতি সুন্দর দৃশ্য। সেইখানে এদেশের যুবকসঙ্ঘের একদল বালকবালিকা থাকে। আমার মনে শান্তিনিকেতনের যে আদর্শ, এই জায়গায় সেই জিনিষটাকে চোখে দেখে যেমন আনন্দ পেলুম তেমনি দুঃখও লাগ্‌ল। এখানে দেখলুম সমগ্র জীবনের শিক্ষা—পরীক্ষা পাস তার মধ্যে কালো কালো আঁচড় কাটেনি। এরা প্রাণটাকে পূর্ণভাবে জাগিয়ে তুলচে—নাচে গানে ভ্রমণে ব্যায়ামে; শিক্ষাটা তারই একটা অংশমাত্র। এদের দলে য়ুরোপের নানা দেশের ছাত্র আছে—বর্ণান্ অনেকান্—সমস্তটা নিয়ে একটা সৃষ্টি-কার্য্য চলচে, বীর্য্য এবং সৌন্দর্য্য এবং বিদ্যার সাধনা। সরস্বতীকে এরা প্রাণকমলের কেন্দ্রস্থলে বসিয়ে উপাসনা করচে—সে যে পদ্মের পাতা—বর্ণে গন্ধে রূপে রসে সম্পূর্ণ—সে তো পুঁথির পাতা নয়—নীরস প্রাণহীন আনন্দহীন। আমি তো এতদিন ধ'রে এই কথাই ব'লে এসেচি যে, শিক্ষার যথার্থ সার্থকতা প্রাণের মধ্যে জ্ঞানের প্রতিষ্ঠা—দুইয়ের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে পরীক্ষা পাস করানো নয়। দুঃখের বিষয় এই যে, প্রথম থেকেই এই বিলাতী বিদ্যাটাকে নিয়ে এতকাল আমরা বণিকবৃত্তি করে আসচি। বোঝা শক্ত হয়েচে যে বিদ্যাকে প্রাণের জিনিষ করতে না পারলে তা ব্যর্থ হয়, আর তা করতে হ'লে প্রাণকে পূর্ণতা দেওয়া চাই। আনন্দ ব্রহ্মের প্রকাশ—প্রাণের প্রকাশও সেই আনন্দ—বিদ্যার প্রকাশও তাই। আনন্দ মানে সুখের বিলাস নয়, আনন্দে তপস্যা থাকা চাই—কিন্তু সেই তপস্যা নোট মুখস্থ করার তপস্যা নয়—জীবনকে সব দিক্ থেকে উদ্বোধিত করার তপস্যা। যে-বিদ্যালয়কে নিজের প্রাণশক্তি দ্বারা ছাত্ররা প্রতিদিন সৃষ্টি না করে সে-বিদ্যালয় বিদ্যার খাঁচা—সেখানে পায়ে শিকল দেওয়া পোষা পাখীরা মুখস্থ বুলি অভ্যাস করে। তোমার ছাত্ররা যতদিন আমাদের আশ্রমের সঙ্গে প্রাণের যোগ স্থাপন না করবে ততদিন তাদেরও অগৌরব, আমাদেরও ব্যর্থতা। দানের সঙ্গে গ্রহণের যোগ হ'লে তবেই গ্রহণ পূর্ণ হয়—সাধারণ বিদ্যালয়ে সে দান কেবল বেতন দানে এসেই ঠেকেচে। সেই জন্যেই আমাদের শিক্ষারীতি এমন বিকলাঙ্গ এবং শিক্ষা এতই অসম্পূর্ণ। ছাত্রদের প্রতি আমাদের বাণী এই—

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।

জাগরণে ও পরীক্ষা-তরণে প্রভেদ আছে, এ কথা ভুলো না ভুলো না। তোমার নলিনী দলে পরীক্ষাক্লিষ্ট জীবনের অশ্রুজল গ্রহণ কোরো না, গ্রহণ কোরো ভারতীর প্রসাদ থেকে অমৃতবিন্দু। ইতি ২৮ জুলাই ১৯৩০।

[বিশ্বভারতীর কলেজ-বিভাগের প্রিন্সিপ্যাল শ্রীযুক্ত নলিনচন্দ্র গাঙ্গুলীকে লিখিত]

মৃত্যু-বিজয়

শ্রীমাণিক ভট্টাচার্য্য

সিভিল ডিসোবিডিয়েন্সের যুগ। পিকেটিঙের তাড়নায় স্কুল শশব্যস্ত।

সমস্ত দিন স্কুলে পরিশ্রান্ত হইয়া সবেমাত্র বাসায় আসিয়া স্কুলের বস্ত্রাদি ছাড়িয়াছি, এমন সময় আমার ছয় বৎসরের পুত্র আসিয়া বলিল, "বাবা, একজন ভদ্রলোক আপনাকে ডাক্‌ছেন্।"

চার বছরের কন্যা বলিল, "বাবা, তিনি কাঁদছেন।"

জিজ্ঞাসা করিলাম, "কেন ডাক্‌ছেন?"

পুত্র কিছু বলিতে পারিল না।

কন্যা বলিল, "তোমার কাছে নালিশ করতে এসেছেন, আবার কেন?"

জিজ্ঞাসা করিলাম, "কিসের নালিশ রে?"

কন্যা বলিল, "কিসের আবার নালিশ? তাঁকে কে মেরেছে, তাই।"

হাসিয়া বলিলাম, "তুই কি ক'রে জান্‌লি?"

কন্যা উত্তর দিল, "বাঃ, তিনি যে কাঁদ্‌ছেন দেখলাম।"

বলিলাম, "ছেলেরা আমার কাছে নালিশ করতে আসে, মা, ছেলের বাপেরা আসে না।"

বুঝিলাম, নিশ্চয়ই কোনো ছেলের অভিভাবক হইবে। বাহিরে যাইতে উদ্যত হইলাম।

গৃহিণী বলিলেন, "খাবারটা দেওয়া হয়েছে, হাত মুখ ধুয়ে নিয়ে খেয়ে যাও।"

বলিলাম, "ভদ্রলোক কে এসেছেন দেখাটা ক'রে আসি।"

গৃহিণী একটু উষ্মার সহিত বলিলেন, "তা আসুন ভদ্রলোক, দু-মিনিট পরে গেলে মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে না।"

বলিলাম, 'মহাভারত কাব্যকথা—ধর্ম্মকথা, তার অশুদ্ধ হবার ভয় নেই। কিন্তু ভদ্রলোককে বাড়ির দুয়োরে দাঁড় করিয়ে রেখে নিশ্চিন্ত মনে খেতে বসলে যে আমার মনটার বড়ই দুর্গতি হবে।"

বাহিরের দিকে চলিলাম। গৃহিণী খাবার ঢাকিতে ঢাকিতে অনুচ্চস্বরে বলিলেন, "আর কিছু থাকুক্-না-থাকুক্, কথার বাঁধুনি খুব আছে,—চিরদিনকার বাক্যবীর!"

আর কিছু বলিলে বাহিরের ভদ্রলোকটিও দাম্পত্যালাপের অনেকটা রসাস্বাদ করিয়া যাইবেন ভাবিয়া আপনার গুণবর্ণনায় কান না দিয়া বাহিরে আসিলাম।

গৌরবর্ণ—দীর্ঘ দেহ ভদ্রলোক। খদ্দরের ধুতি, খদ্দরের মেরজাই, তাহার উপর খদ্দরের উড়ানী, মাথায় গান্ধী টুপি। কাষ্ঠাসনে বসিয়া ছিলেন; আমাকে দেখিয়া নমস্কার করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

আমি প্রতিনমস্কার করিয়া তাঁহাকে বসিতে বলিলাম। ভদ্রলোক তথাপি দাঁড়াইয়া রহিলেন। আমি বসিলে তবে বসিলেন। বিনীত স্বরে বলিলেন, "আপনাকে অসময়ে বড়ই কষ্ট দিলাম; মার্জ্জনা করিবেন। বড়ই বিপদে পড়িয়া আমি আপনার কাছে আসিয়াছি।"

আহ্বান শুনিয়া যেটুকু বিরক্তি মনে আসিয়াছিল ভদ্রলোকের কথার ভাবে তাহা দূরে গেল। বলিলাম, "ইহাতে মার্জ্জনা করিবার কি আছে? আপনার কি বিপদ বলুন। আমার মত সামান্য লোকের দ্বারা কি উপকার হইবে তাহাও বলুন। আপনার পরিচয় জানিতে পারি?"

তিনি বলিলেন, "আমার নাম রামসেবক সিংহ। কিন্তু আমার নাম বলিলে তো আমাকে চিনিবেন না। আমার ছেলে রামানুজ আপনার ছাত্র।"

"কোন্ রামানুজ? যে প্রথম শ্রেণীতে পড়ে?"

রামসেবক বলিলেন, "জী, হাঁ।"

রামানুজ ছেলেটি বড় ভাল। চৌদ্দ বৎসর বয়সে প্রথম শ্রেণীতে পড়িতে তাহাকে ছাড়া আর কোনো ছেলেকে আমি বিহারে দেখি নাই। লেখাপড়ায় সে ক্লাসের মধ্যে সবচেয়ে ভাল। কিন্তু ইহাই ছেলেটির সবটুকু পরিচয় নয়। পরের উপকার, দুর্ভিক্ষের জন্য চাঁদা তোলা, পড়া ফেলিয়া রাত জাগিয়া পীড়িত সতীর্থের সেবা করা,—এসব বিষয়ে সে স্কুলে অদ্বিতীয়। গৌর-বর্ণ ছোট্ট ছেলেটি, মুখখানি হাসি-হাসি, একহারা—অনেকটা বাঙালীর ছেলের মত দেখিতে। তাহাকে সবাই ভালবাসিত।

বলিলাম, "তারপর কি ব্যাপার বলুন।"

রামসেবক বলিলেন, "গ্রীষ্মের বন্ধে একদিন স্বেচ্ছা-সেবকের দল গান গাহিতে গাহিতে আমাদের গ্রামে যায় এবং সকলকে স্বেচ্ছাসেবক হইতে অনুরোধ করে। তারপর তাহারা চলিয়া আসে। সেই রাত্রেই রামানুজ আমাকে বলিল, 'আমি স্বেচ্ছাসেবক হইব।'

আমি কঠিন স্বরে বলিলাম, 'এখন লেখাপড়ার সময়; ও সব করিলে চলিবে না। ও কথা মুখে আনিও না।'

রামানুজ তবু বলিল, 'উহাদের গান শুনিয়া আর পরিচ্ছদ দেখিয়া আমার 'দিল' বড় 'উদাস' হইয়া গিয়াছে। আমি যাইব।'

আমি তো অবাক্। যে-রামানুজ মুখ তুলিয়া আমার সঙ্গে কখন কথা কহিত না তাহার মুখে 'দিল', 'উদাস' এই সব কথা!

দিন কাল বুঝিয়া তাহাকে ভৎর্সনা না করিয়া ইংরেজ রাজ্যের উপকারিতা ও ইহার বিরুদ্ধাচরণের ফলাফল যতদূর সাধ্য বুঝাইলাম। সে কিছু প্রতিবাদ করিল না; চুপ করিয়া রহিল। ভাবিলাম, কথাটা বুঝিয়াছে,—উপদেশ ধরিয়াছে।

পরদিন সকালে উঠিয়া দেখি সে বাড়িতে নাই। সমস্ত গ্রাম ধরিয়া, সকলের বাড়ি, মাঠ, বাগিচা সব খুঁজিলাম। কোথাও তাহাকে দেখিতে পাইলাম না। তাহার মা তো কাঁদিয়া ভাসাইতে লাগিল। একজন কৃষক বলিল, খুব ভোরে তাহাকে তেজপুরের পথে যাইতে দেখিয়াছে। ছুটিতে ছুটিতে দুপুরে এখানে আসিলাম। আসিয়া দেখি সে 'দারু'র দোকানে পিকেটিং করিতেছে। তাহার মায়ের কান্নার কথা বলিয়া, মাতৃহত্যার ভয় দেখাইয়া, তাহার সঙ্গীদের অনেক অনুনয়-বিনয় করিয়া ছেলেকে লইয়া গেলাম। তাহাকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য আমরা সবাই খদ্দর পরিতে আরম্ভ করিলাম, বিদেশী জিনিষ বাড়িতে আনা একেবারে বন্ধ করিয়া দিলাম। কয়েকদিন সে স্থির হইয়া থাকিল।

চার-পাঁচ দিন পরে আবার একদিন পলাইয়া আসিল। আবার আসিয়া কত করিয়া তাহাকে লইয়া গেলাম। সে-বার ঘরে বন্ধ করিয়া রাখিলাম। দু-দিন তাহাকে কিছু খাওয়াইতে পারিলাম না। খাইতে বলিলে শুধু বলে, 'বাবুজী, মেরা দিল্ রোতা হ্যায়, মুঝ্ কো মাফ্ কীজিয়ে।'

আর থাকিতে পারিলাম না, ঘরের দুয়ার খুলিয়া দিলাম। বলিলাম, 'তুই খা বাবু, তার পর তোর যা ইচ্ছা তাই করিস্।'

দুদিন খায় নাই। তাহার মা হাতে করিয়া খাওয়াইয়া দিল। খাওয়া হইলে অতি কাতর হইয়া বলিল, 'ববুয়া, তুই আমাদের একমাত্র সন্তান, তুই চলিয়া গেলে আমরা কি লইয়া থাকিব!'

তাহার মায়ের চোখে জল দেখিয়া রামানুজের চোখেও জল আসিল। সে ধীরে ধীরে বলিল, 'মাঈ, তুমি চুপ কর, আমি যাইব না।'

কিন্তু সে ঘরে থাকিতে পারিল না। দুই দিন হইল আবার চলিয়া আসিয়াছে। তাহার মা সেই হইতে অনাহারে পড়িয়া আছে। আমি প্রথমটা রাগ করিয়াছিলাম। শেষে আর থাকিতে পারিলাম না। এখন আপনার কাছে আসিয়াছি। আপনিই আমার শেষ ভরসা।"

আমি বলিলাম, "সে যখন আপনাদের কাহারও কথা রাখিল না, তখন আমি আর কি করিব?"

রামসেবক বলিলেন, "সে আপনাকে দেবতার মত ভক্তি করে। আপনি বলিলে সে আপনার কথা কিছুতেই ঠেলিতে পারিবে না। আপনি দয়া করিয়া তাহাকে এ পথ হইতে নিবৃত্ত করুন।"

আমি বলিলাম, "আমি ডাকিলে কি সে এখন আর আসিবে ?"

রামসেবক বলিলেন, "খুব আসিবে। আমি গিয়া আপনার নাম করিয়া তাহাকে আপনার কাছে আনিতেছি; আপনি তাহাকে আপনার কাছে রাখুন। কিছুদিন আপনি তাহার মনটা ফিরাইয়া রাখুন। আমরা আপনার দাস হইয়া থাকিব।"

বলিয়া রামসেবক অশ্রুসজলনেত্রে হাতজোড় করিয়া আমার সম্মুখে দাঁড়াইলেন। আমি তাহাকে বসাইয়া বলিলাম, "আপনি তাহাকে ডাকিয়া আনুন, আমার যথা-সাধ্য করিব।"

দুঃখের মধ্যেও রামসেবকের মুখে আনন্দ ফুটিয়া উঠিল। বলিলেন, "আপনি আমাকে কিনিয়া রাখিলেন।"

বলিয়া উত্তরীয়প্রান্তে চক্ষু মুছিয়া রামসেবক পুত্রের সন্ধানে উঠিয়া গেলেন।

আমিও উঠিয়া ভিতরে গেলাম। গৃহিণী একটু শ্লেষের সহিত বলিলেন, "এখনই ফিরলে যে! এখনও রাত হয়নি!"

আমি বলিলাম, "হুঁ।"

"বাক্যবীর" তখন বাক্যহত হইয়া গিয়াছে!

২

পরদিন সকালে রামসেবক রামানুজকে লইয়া ফিরিলেন। রামানুজ নত হইয়া আমার পায়ে হাত দিয়া প্রণাম করিয়া দাঁড়াইল।

রামসেবক আপনা হইতেই বলিলেন, "কাল রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত রামানুজের কার্য্যভার ছিল; সেজন্য রাত্রে আসা হইল না। দশটার পর আসিতে পারিতাম; কিন্তু আপনাকে কষ্ট দেওয়া হইবে বলিয়া রাত্রে না আসিয়া সকালে আসিয়াছি।"

রামানুজের দিকে চাহিলাম। তাহার পরণে খদ্দরের ধুতি, একটা গেরুয়া রঙের পাঞ্জাবী, মাথায় খদ্দরের টুপি—তাহাতে চরকার ছবি; ডানদিকে বুক-পকেটের উপর তিন রঙের জাতীয় পতাকার নিদর্শন বা স্বেচ্ছা-সেবকের চিহ্ন সুতা দিয়া সেলাই করা।

তাহাকে দেখিয়াই মনে হইল সে যেন মুক্তিপথের যাত্রী, হিংসাহীন কিশোর যোদ্ধৃদলের কিশোর সেনাপতি। সে ছাত্র,—আমি গুরু। কিন্তু তাহাকে দেখিয়া সম্ভ্রমে আজ আমার হৃদয় ভরিয়া গেল।

মুখে বলিলাম, "রামানুজ, তুমি আমাকে না বলিয়া ভলান্টিয়ার কেন হইলে? আমি কি তোমার কেহ নই?"

রামানুজ মুখ নত করিল, কিছু বলিল না। আমি তখন তাহাকে বুঝাইতে লাগিলাম—"ছাত্রানাং অধ্যয়নং তপঃ। অধ্যয়নই ছাত্রগণের তপস্যা—একমাত্র কর্ত্তব্য। এ পথ কেন ত্যাগ করিবে? আগে জ্ঞানার্জ্জন কর, শক্তিলাভ কর; তার পর দেশের সেবা করিও। অপরিপক্ব শক্তি, অপরিণত বুদ্ধি লইয়া কি কাজ তুমি করিবে? ফলটি পূর্ণ হইবার আগে, ফুলটি প্রস্ফুটিত না হইতে তাহাকে নিবেদন করিয়া দেশমাতাকে পূর্ণসেবা হইতে বঞ্চিত করিবার তোমার কি অধিকার আছে? আমার তুমি ছাত্র, আমার পুত্রোপম তুমি—আমাকে একটিবার জিজ্ঞাসা না করিয়াই তুমি আমাকে পরিত্যাগ করিয়া গেলে! অপরিচিত লোকে দুটা গান গাহিয়া তোমাকে ডাকিল, আর তুমি এতদিনকার সম্বন্ধ ভুলিয়া তাহাদেরই দিকে ছুটিয়া গেলে? এই তোমার ছাত্রজীবনের কর্ত্তব্য হইল?"

এই ভাবের আরও কত কথা তাহাকে বলিলাম। আমার প্রতি—তাহার গুরুর প্রতি—সে অবিচার করিয়াছে এ ভাবটাই যেন আমার কথায় আন্তরিকতার সহিত ফুটিয়া উঠিয়াছিল, গলাটাও বোধ হয় ভাবাবেশে একটু কাঁপিয়া থাকিবে। রামানুজ সজল চক্ষে করজোড়ে বলিল, "মাষ্টার সাহেব, আমাকে ক্ষমা করুন—আমি আর আপনার অবাধ্য হইব না।"

রামসেবকের চোখে মুখে কৃতজ্ঞতা ফুটিয়া উঠিল।

আমি বিজয়গর্ব্বে উৎফুল্ল হইলাম। রামানুজকে বলিলাম, "তুমি কিছুদিন আমার বাসায় থাকিয়া এখান হইতেই স্কুল যাওয়া-আসা করিবে। আমাদের হাতে খাইতে তোমার আপত্তি হইবে না তো?"

রামানুজ একবার মুখ তুলিয়া বলিল, "আমি আপনার

'জুঁঠা' (উচ্ছিষ্ট) খাইতে পারি ; হাতে খাওয়ার কথা কেন বলিতেছেন ?"

রামানুজ কথা কম বলে। কিন্তু বলিতে চাহিলে বেশ গুছাইয়া বলিতে পারে।

রামানুজ আমার কাছেই রহিল। রামসেবক সেই দিনই চলিয়া গেলেন। যাইবার সময় আর একবার বলিয়া গেলেন, "রামানুজের সব ভার আপনার উপর রহিল। আমি নিশ্চিন্ত হইয়া চলিলাম।"

৩

একটু বেশী রাত্রি জাগিয়া লেখাপড়া করা আমার অভ্যাস। রাত্রি বারটা বাজিয়া গিয়াছে। সকলে আহারান্তে নিদ্রিত। আমার পড়িবার ঘরের সম্মুখের ঘরটিতে রামানুজের শয্যা রচিত হইয়াছিল। ভাবিয়াছিলাম সেও ঘুমাইয়াছে। তাহাকে জাগ্রত ব্যক্তির মত পাশ ফিরিতে দেখিয়া ডাকিলাম, "রামানুজ!"

অভ্যাসমত শয্যা হইতে এক লাফে দাঁড়াইয়া উঠিয়া রামানুজ বলিল, "জী, মাষ্টার সাব্।"

তাহার এক অভ্যাস আমার ডাক শুনিলে বা দূর হইতেও আমাকে দেখা গেলে সে কিছুতেই বসিয়া বা শুইয়া থাকিবে না।

জিজ্ঞাসা করিলাম, "এখনও ঘুমাও নাই ?"

সে মৃদুস্বরে বলিল, "জী, না।"

"কেন ?"

"ঘুম আসিতেছে না।"

"এত রাত হইয়াছে তবু ঘুম আসিতেছে না কেন ?"

রামানুজ ইহার উত্তর দিল না। মাথা নীচু করিয়া রহিল। আবার জিজ্ঞাসা করিলাম, "কোনো অসুবিধা হইতেছে ?"

তাহাতেও বলিল, "জী, না।"

জিজ্ঞাসা করিলাম, "তবে কেন ঘুমাইতে পারিতেছ না ?"

একটু ইতস্ততঃ করিয়া রামানুজ বলিল, "বলিলে হয়ত আপনি অসন্তুষ্ট হইবেন।"

তাহাকে ভরসা দিয়া বলিলাম, "তুমি সত্য কারণ বল। আমি একটুও অসন্তুষ্ট হইব না।"

সাহস পাইয়া রামানুজ বলিল, "স্বেচ্ছাসেবকেরা সব নদীর ধারে সেই ভাঙা ঘরে চটের উপর শুইয়া আছে। আমার কেবল তাহাদের কথা মনে পড়িতেছে, আর এই ভাল ঘরে ও ভাল বিছানায় শুইয়া বড় দুঃখবোধ হইতেছে।"

এ কথার চট্ করিয়া কিছু জবাব দিতে পারিলাম না। একটু মুগ্ধও হইলাম। অন্তরের এই সূক্ষ্ম অনুভূতি বালক কোথায় পাইল ?

বলিলাম, "তুমি তো ইচ্ছা করিয়া আরাম করিতেছ না। তোমার পিতার অনুরোধে, আমার আহ্বানে তুমি ফিরিয়া আসিয়াছ। ওসব কথা না ভাবিয়া ঘুমাইবার চেষ্টা কর।"

বাধ্য শিশুর মত রামানুজ তৎক্ষণাৎ শয্যায় শুইয়া পড়িল।

কিছুক্ষণ পরে শুনিলাম—"মাষ্টার সাব্!"

মুখ তুলিয়া দেখিলাম রামানুজ আবার শয্যাত্যাগ করিয়া মাঝখানের দুয়ারটার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

একটু বিস্মিত ও বিরক্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম— 'আবার কি রামানুজ ?'

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া সে বলিল, "একটা কথা জিজ্ঞাসা করিব ?"

বলিলাম, "কি কথা, জিজ্ঞাসা কর।"

সে বলিল, "মাষ্টার সাব্, দারু পান করা খারাপ অভ্যাস তো ?"

বলিতে হইল—"হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।"

সে আবার জিজ্ঞাসা করিল—"যদি ভারতবর্ষে কেহই দারু না খায় তাহা হইলে কি দেশের মঙ্গল হয় না ?"

বলিলাম—"হয়।"

এবার একটু ভয়ে ভয়ে সে বলিল, "আমি তো শুধু লোককে দারু পান করিতে নিষেধ করিতেছিলাম। কাহারও গায়ে কোনো দিন হাত দিই নাই। দোকানের সম্মুখে যে আসিত তাহার পায়ের কাছে মাথা রাখিতাম,

হাতজোড় করিয়া নিষেধ করিতাম। ইহাও কি অন্যায় ?"

উত্তর যে কি দিব ঠিক বুঝিতে পারিলাম না। কেহ যদি নিজের ইচ্ছায় স্বার্থত্যাগ করিয়া এই কাজ করিতে নামে এবং অন্তরের সঙ্গে বিশ্বাস করে এই কাজ করিলেই তাহার দেশের মঙ্গল হইবে, তাহা হইলে তাহার কাজকে অন্যায় বলিবার শক্তি ও যুক্তি শীঘ্র জোগাইল না।

একটু ভাবিয়া বলিলাম, "দেখ রামানুজ, ও কাজ ছাড়িয়া আসিয়া তুমি এখনও মন স্থির করিতে পার নাই—তাই তুমি কেবল এই-সব কথাই ভাবিতেছ। সকল জিনিষেরই দুটা দিক আছে। তুমি এই জিনিষটাকে কেবল একদিক হইতে দেখিতেছ, তাই একরূপ দেখিতে পাইতেছ। অপরে অন্যদিক হইতে দেখিতেছে তাই অন্যরূপ দেখিতে পাইতেছে। যে দারু বিক্রয় করিতেছে একবার তাহার কথা ভাবিয়া দেখ। কত টাকা খরচ করিয়া সে গভর্ণমেণ্টের কাছ হইতে দোকান লইয়াছে, হয়ত ইহাতেই তাহার সর্ব্বস্ব ব্যয়িত হইয়াছে। এই দোকানের আয় হইতেই হয়ত তাহার সংসার চলে, তাহার স্ত্রী পুত্র কন্যার, পিতা মাতার সকলের ভরণপোষণ চলে। তাহার আহারের পথ তোমরা জোর করিয়া বন্ধ করিয়া দিলে সে কি করিবে? তাহার পরিবারবর্গ কি খাইবে? তারপর যারা মদ, গাঁজা ইত্যাদি নেশা করে তাহাদের কথা ভাব। হঠাৎ যদি তাহাদের নেশা বন্ধ করিয়া দাও তাহাদের কি অপরিসীম কষ্ট হইবে! কতজনের কঠিন পীড়া পর্য্যন্ত হইতে পারে। আর মনে করিতেছ দোকান হইতে কিনিতে না পারিলেই উহারা একযোগে মদ গাঁজা সব ছাড়িয়া দিবে। কিছুতেই নয়। উহারা নিজেরাই তখন মদ চোলাই ও গাঁজা তৈয়ারি আরম্ভ করিয়া দিবে ও পরিণামে বেশী করিয়া খাইতে থাকিবে। শেষে ধরা পড়িয়া জেলে যাইবে।"

এবার রামানুজ সোজা হইয়া দাঁড়াইল ও একবার আমার মুখের পানে চাহিয়া দৃষ্টি নামাইয়া লইয়া বলিল, "আপনি তো অনেকবার বলিয়াছেন, রাষ্ট্র বা সমাজের মঙ্গলের জন্য যখন কাজ করিবে তখন greatest good to the greatest number (অধিকতম লোকের প্রভূততম হিতসাধন) আমাদের কার্য্য, ইহা মনে রাখিতে হইবে। ব্যক্তিগত সুবিধা অসুবিধার কথা তখন বিচার্য্য নহে। আপনিই সেদিন বলিয়াছিলেন, কি করিয়া চীনদেশ অতি অল্প সময়ের মধ্যে চণ্ড ও বেণীর হাত হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছে। যাহা চীনে সম্ভব হইয়াছিল তাহা ভারতবর্ষে কেন সম্ভব হইবে না? End justifies the means ইহাও আপনার কাছ হইতে শিখিয়াছি। যদি একার্য্যে আমরা একটু কঠোরতাই করিয়া ফেলি তবে কি ক্ষমার্হ নহে?"

ইহার উত্তরে তাহাকে কি বলিব?

"তুমি বালক, লেখাপড়াই কেবল এখন তোমার কর্ত্তব্য, অন্য কথা তোমার বিবেচনার যোগ্য নহে।" —এ সব বাঁধা বুলি এবার মুখে আসিল না। এখন তাহার মুখ খুলিয়া গিয়াছে, বুদ্ধি তীক্ষ্ণ হইয়াছে, যদি বলিয়া বসে—বালক বই লইয়া পড়িতেছে, এমন সময় বাড়িতে আগুন লাগিয়া গেল, দাউ দাউ করিয়া আগুন জ্বলিয়া উঠিল, তখনও কি সে শান্ত ছেলের মত বই হাতে লইয়া বসিয়া থাকিবে, না, বই দূরে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া সেই হাতে দড়ি বাল্‌তি লইয়া ঘরের আগুন নিবাইবার জন্য—পিতৃপুরুষের গৃহখানি বাঁচাইবার জন্য জলের সন্ধানে ছুটিবে? তখন কি বলিব?

একটু ভাবিয়া বলিলাম—"রামানুজ, দেশের সেবা করিতে তো তোমাকে নিষেধ করিতেছি না। কিন্তু সেবার কি আর অন্য পথ নাই? যতদিন তুমি বালক আছ ততদিন যে-পথে এত বিপদ সে-পথে না গিয়া যদি অন্য পথ ধর, তাহা হইলেই বা ক্ষতি কি? তোমার বিপদে যদি আমাদের প্রাণে আঘাত লাগে তবু কি জোর করিয়া সে আঘাত আমাদের দিতে হইবে? তুমি তো স্বীকার করিয়াছ আমার কথা শুনিবে। তবে আবার কেন এ সব ভাবিতেছ? যাও, গিয়া শোও। রাত্রি অনেক হইয়াছে। আর জাগিলে অসুখ করিবে।"

রামানুজের মুখখানি আবার শুকাইয়া গেল।

"মাফ কিজীয়ে, মাষ্টার সাব," বলিয়া হাত জুড়িয়া

আমাকে প্রণাম করিয়া রামানুজ নির্জীবের মত শয্যা গ্রহণ করিল।

ইহার পর পুস্তকে আর মনোনিবেশ করিতে পারিলাম না। ঘণ্টাখানেক এ-বই সে-বই দেখিয়া চিন্তা করিয়া কাটাইলাম। তাহার পর উঠিয়া পড়িয়া ধীরে ধীরে রামানুজের শয্যাপার্শ্বে আসিয়া নিঃশব্দে দাঁড়াইলাম।

এতক্ষণ বালক যেন মনের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া ক্লান্তির ভরে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, চক্ষু দুটি নিমীলিত, গণ্ডে যেন অশ্রুর চিহ্ন।

বক্ষ ভেদ করিয়া একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস বাহির হইল। সে নিঃশ্বাসের শব্দে রামানুজ যেন নিদ্রার মধ্যেও চমকিয়া উঠিল।

আমি নিঃশব্দে তাহার কক্ষ ত্যাগ করিলাম।

৪

পরদিন একটু সকালেই স্কুলে গেলাম। অন্যান্য শিক্ষকদেরও সকাল করিয়া আসিতে বলা ছিল। দেখিলাম আজিও পিকেটিং আছে। তবে কল্যকার মত শারীরিক বলপ্রয়োগে স্বেচ্ছাসেবকেরা কাহাকেও ধরিয়া রাখিতেছে না। জনকয়েক শিক্ষককে বাছিয়া গেটের কাছে পাঠাইয়া দিলাম যাহারা আসিতে চাহে তাহাদিগকে সাহায্য করিবার জন্য ও পিকেটারদিগকে মিষ্ট কথায় নিবৃত্ত করিবার জন্য। তাঁহারা গেটের দিকে চলিয়া গেলেন।

আজিকার পিকেটিং সফল হইল না। শিক্ষকেরা আসিয়া বলিলেন, "একটি ছেলেকেও উহারা ফিরাইতে পারে নাই। তবে রামানুজকে লইয়া বড়ই বিপদে পড়িতে হইয়াছিল। রামানুজকে দেখিয়া পিকেটারের দল একেবারে ঘিরিয়া ফেলিল এবং বলিতে লাগিল—"তুমি কি বলিয়া আমাদের ছাড়িয়া আবার স্কুলে ফিরিলে? তোমাকে আমরা যাইতে দিব না।"

রামানুজ বলিল, "আমি মাষ্টার সাহেবের কাছে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি আমাকে স্কুলে যাইতেই হইবে।"

তাহারা বলে, "তুমি তো আমাদের কাছেও প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে। তবে কেন আমাদের কাছ হইতে চলিয়া আসিলে?"

তখন দুই চারি জন তাহার পায়ের কাছে 'বন্দে-মাতরম' বলিয়া শুইয়া পড়িল। রামানুজ থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল; তাহার চক্ষু দিয়া অশ্রু ঝরিতে লাগিল। হাতজোড় করিয়া সজলচক্ষে সে বলিল—"আমাকে তোমরা ভাই, আজ ছাড়িয়া দাও, আমি এই যজ্ঞোপবীত তোমাদের সম্মুখে ছিঁড়িয়া ফেলিতেছি, যতক্ষণ না তোমাদের সঙ্গে আবার মিশিব ততক্ষণ আর যজ্ঞোপবীত আমি পরিব না।"

বলিয়া সত্যসত্যই রামানুজ তাহাদের সম্মুখে যজ্ঞোপবীত ছিঁড়িয়া একধারে ফেলিয়া দিল। তখন আসিতে দিতে কেহ আপত্তি করিল না।

শিক্ষকেরা প্রায় সকলেই বলিলেন, আমারও মনে হইল রামানুজকে বাধা দেওয়া বৃথা। এ-পথ হইতে ইহাকে নিবৃত্ত করা আর সম্ভব হইবে না। "যতক্ষণ না যাইব ততক্ষণ যজ্ঞোপবীত ধারণ করিব না ইহার অর্থ, ততক্ষণ জল পর্য্যন্ত গলাধঃকরণ করিব না। মনে মনে রামানুজের জন্য বেশ একটু উৎকণ্ঠিত রহিলাম। ক্লাসে পড়াইবার সময় লক্ষ্য করিলাম, সে ক্লাসে যথাস্থানে বসিয়া আছে বটে,—কিন্তু ঠিক যেন একখানি পাষাণ মূর্ত্তির মত।

স্কুলের ছুটির পরও এক ঘণ্টা স্কুলে থাকিতে হইল। পাঁচটার সময় বাসায় ফিরিয়াই গৃহিণীর মুখে শুনিলাম—রামানুজ ছুটির পর বাসায় আসিয়াই চলিয়া গিয়াছে, হাতজোড় করিয়া বলিয়া গিয়াছে, 'মাইজী, আপনি মাষ্টার সাহেবকে বলিবেন আমি থাকিতে পারিলাম না। আমার প্রাণ দেশের কাজ করিবার জন্য, আমার সাথীদের জন্য সর্ব্বক্ষণ কাঁদিতেছে। আমি আর থাকিতে পারিতেছি না। আমাকে যেন মাষ্টার সাহেব ক্ষমা করেন।'

বলিবার সময় রামানুজের চোখ দিয়া জল পড়িয়াছিল—সে-কথাও গৃহিণী বলিলেন।

তাহার উপর রাগ করিতে পারিলাম না। এমন করিয়া যে অন্তরে সর্ব্বক্ষণ প্রেরণা অনুভব করে, সে কি করিয়া ঘরে থাকিবে?

তখনই একখানি চিঠি লিখিয়া রামানুজের পিতার

কাছে সংবাদ পাঠাইয়া দিলাম। দুই ক্রোশের মধ্যেই তাহাদের বাড়ি।

পরদিন প্রভাতে রামসেবক আসিয়া দেখা করিলেন। তাঁহাকে বসাইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "কি হইল? কি করিলেন?"

রামসেবককে ম্রিয়মান দেখিলাম। কিন্তু তাঁহার উদ্বেগ যেন অনেকটা কমিয়া গিয়াছে বলিয়া মনে হইল। তিনি বলিলেন,"আপনার চিঠি পাইয়া কাল রাত্রেই আমি আসিয়াছি। আসিয়াই উহাদের শিবিরে গিয়াছিলাম, রাত্রে সেখানেই ছিলাম। সারা রাত্রি ধরিয়া তাহাকে বুঝাইয়াছি—কিছু ফল হয় নাই। শেষে সে আমার পা দু-খানা জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, 'বাবুজী, আমায় ক্ষমা করুন, আমি দেশের কাজ না করিয়া থাকিতে পারিতেছি না। ঘরে ফিরিয়া গেলে আমার প্রাণ হাঁপাইয়া উঠে। কে যেন আমার মায়ের মত কাঁদিয়া কাঁদিয়া ডাকে—তুই চলে আয় রামানুজ, তুই ছুটে আয়। দুয়ার ভেঙে তুই আমার কাছে পালিয়ে আয়। এখানে এসে তবে আমি শান্ত হই। আমাকে আপনি দেশের কাছে ছাড়িয়া দিন্—আমি নিশ্চিন্ত মনে কাজ করি।' তাহার মুখের সেই কাতর ভাব, তাহার চোখের সেই জলের ধারা আমাকে টলাইয়াছে। বুঝিয়াছি, দেশের জন্য পাগল যে ছেলে তাহাকে জোর করিয়া ঘরে লইয়া গিয়া কি করিব? উহার প্রাণ এখানে পড়িয়া রহিবে—খালি দেহ লইয়া গিয়া কি করিব? ও বালক, এত উহার দেশভক্তি কোথা হইতে আসিল ভাবিয়া আমি অবাক্ হইয়া গেলাম। স্কুলে আপনারা দেশভক্তি শিখাইতে পারেন না, বাড়িতেও আমরা এ-সব কোন দিন শিখাই নাই। তবে কাহার কাছে বালক এ সব শিখিল? ভাবিলাম, যিনি এই বালকের হৃদয়ে এই দেশপ্রেম দিয়াছেন, তাঁহারই চরণে ইহাকে জন্মের মত সমর্পণ করিয়া যাই—হউক ও আমাদের একমাত্র সন্তান। যিনি এই কিশোর বয়সে উহার বুকে এই আগুন জ্বালাইয়া দিয়াছেন তাঁহারই কাছে ও থাকুক্। পুলিসের কাছে মার খাইবে, জেলে যাইবে এই ভয়ে বড় কাতর হইয়াছিলাম। আজ সে ভয় দূর করিয়া আসিয়াছি। আজ প্রাণ ভরিয়া জন্মের মত তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া আসিয়াছি। আর উহাকে ফিরাইতে আসিব না।" এই পর্য্যন্ত বলিয়া রামসেবক দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে কাঁদিয়া উঠিলেন।

আমার চক্ষুও সজল হইয়া উঠিল।

৫

যত দিন যাইতে লাগিল অবস্থা ততই গুরুতর হইতে চলিল। কখন কি হয় কিছুই বলা যায় না। যে-কোন মুহূর্ত্তে ছেলেরা 'বন্দে মাতরং' বা 'মহাত্মা গান্ধীকী জয়' বলিয়া দল বাঁধিয়া ক্লাস হইতে বাহির হইয়া আসিতে পারে। হঠাৎ কোনো একটা গোলমাল হইলেই আমার মনে হয় বুঝি সকলে দল বাঁধিয়াছে। যাহাদের উপর এই সেদিন এত ক্ষমতা ছিল, একটা ইঙ্গিতে যাহারা উঠিত বসিত, দেবতার মত মানিত—হঠাৎ কয়দিনে কোথা হইতে কি হইয়া গেল—আমরা তাহাদের আর কেহ নহি।

কত প্রদেশ হইতে কত সংবাদ আসিতে লাগিল। যে-কয়জন নেতা বাহিরে ছিলেন, সকলেই কারাগার বরণ করিয়া লইলেন। বাহিরে রহিল কেবল আমার মত ন যযৌ ন তস্থৌ গোছের লোকেরা। ক্রমশঃ 'ঘর হইল বাহির, বাহির হইল ঘর' - কারাগারই মুক্তি-কামীর স্থান, আর বাহিরটা কারাগার হইয়া উঠিল। চারিদিক হইতে অত্যাচারের সংবাদ আসিতে লাগিল। শুনিলাম, জেলে আর স্থান নাই। তাই লাঠির বিচারই চরম বিচার বলিয়া গণ্য হইতে লাগিল।

একদিন আমাদের তেজপুরেই এক কাণ্ড হইয়া গেল।

স্কুল হইতে এক অপরাহ্নে আসিয়া শুনিলাম মদের দোকানের সম্মুখে ভয়ানক দাঙ্গা হইয়া গিয়াছে। তাহার বিবরণ শুনিলাম এইরূপ।

পিকেটিঙের জন্য মদ বিক্রয় চতুর্থাংশে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। গাঁজা ভাং ইত্যাদিরও তদ্রূপ। সে জন্য পথেঘাটে বহু স্থানে এই সব-নিষিদ্ধ দ্রব্য বিক্রয়ের

ব্যবস্থা হইয়া গিয়াছে। ইহার জন্য নিযুক্ত দালাল পকেটে করিয়া এক একটা ছোটখাট আবগারি দোকান লইয়া ঘুরিতেছে ও ক্রেতা দেখিলেই বিক্রয় করিতেছে। সকলে না পারুক যাহারা "গুণী" এই সকল দোকানগুলি দেখিলেই চিনিতে পারিতেছে। মদের দালালেরা আরও পুণ্যের কাজ করিতেছে। তাহারা 'পূর্ণ' বোতল লুকাইয়া বাড়ি বাড়ি পৌছাইয়া দিতেছে। টের পাইলেই স্বেচ্ছাসেবকেরা তাহাদের পিছু পিছু যাইতেছে, পায়ে ধরিতেছে, হাতজোড় করিতেছে, দরকার হইলে পথ জুড়িয়া শুইয়া পড়িতেছে। এক স্বেচ্ছাসেবক এই রকম এক মদের দালালের পিছু পিছু ছুটিয়াছিল। মদ পৌছাইতে অসমর্থ হইয়া সে শেষটা ক্লান্ত ও অতিমাত্রায় ক্রুদ্ধ হইয়া পড়িল। বলিল, আর আমি কোথাও যাইব না, দোকানের মাল দোকানে ফেরৎ দিতে চলিলাম। তবুও স্বেচ্ছাসেবক তাহার সঙ্গ ছাড়িল না। শেষে দোকানের কাছে আসিয়া দালাল তাহাকে দাঁড়াইতে বলিয়া দোকানের মধ্যে প্রবেশ করিল। পরক্ষণে দোকানদার, দালাল ও আবগারি-বিভাগের একজন লোক এই কয়জনে মিলিয়া সেই বালককে অসম্ভবরূপে মারিতে লাগিল। একজন তাহাকে মাটিতে ফেলিয়া তাহার বুকের উপর দাঁড়াইল। একটু পরেই বালক চৈতন্য হারাইয়া ফেলিল।

এই সংবাদ লোকমুখে রাষ্ট্র হইবামাত্র দলে দলে লোক আসিয়া মদের দোকানে জড় হয়। যাহারা বালককে প্রহার করিয়াছিল তাহারা বেগতিক দেখিয়া দোকানের মধ্যেই লুকাইয়া পড়িয়াছিল। জনতার সঙ্গে প্রথম তর্ক, পরে বিবাদ, শেষে হাতাহাতি হইয়া গেল। অবশেষে পুলিস আসিয়া লাঠির সাহায্যে জনতা ছিন্নভিন্ন করিয়া দিল। দুই-চারিজনকে গ্রেপ্তারও করিল। যাহারা আহত হইয়াছিল তাহাদের হাসপাতালে পাঠাইয়া দেওয়া হইল। অচেতন বালকটিও হাসপাতালে প্রেরিত হইল।

শহরে সেই অচেতন স্বেচ্ছাসেবকের কথা সবারই মুখে। সকলেই বলিতেছে, আহা, অমন ছেলে হয় না। সে হাতজোড় করিয়া দাঁড়াইলে মদের দোকানের দিকে যাইতে অতি বড় মদ্যপিপাসুরও পা উঠিত না। এত যে মার খাইয়াছে তবু একটা কাতর শব্দ মুখ হইতে বাহির হয় নাই। একটি বার হাত উঠায় নাই, মারিও না বলে নাই। সে আর কিছুতে বাঁচিবে না। এতক্ষণ হয়ত হইয়া গিয়াছে।

এ বিবরণ শুনিয়া আমার মন বলিতে লাগিল, এ রামানুজ। হাসপাতাল আমার বাসা হইতে পোয়াটাক্ রাস্তা। ছুটিতে ছুটিতে আমি হাসপাতালে আসিয়া পৌছিলাম। শুনিলাম, দুই ঘণ্টা হইতে ডাক্তার রোগীর জ্ঞান করাইবার চেষ্টা করিতেছেন, এখনও ফিরে নাই—হয়ত বা ফিরিবে না। বালকের কাছে কাহারও যাইবার আদেশ নাই।

ডাক্তার আমার বিশেষ পরিচিত। একটা কাগজে লিখিয়া রোগীকে একবার দেখিবার অনুমতি চাহিলাম। অনুমতি মিলিল। গিয়া দেখি সত্যই এ রামানুজ!

তাহাকে দেখিয়া সমস্ত অন্তরাত্মা কাঁদিয়া উঠিল। আহ', পাষণ্ডেরা বালকের কি অবস্থাই করিয়াছে! মুখের তিন জায়গায় কাটিয়া গিয়াছে, মাথায় ব্যাণ্ডেজ বাঁধা, তদুপরি একেবারে অচৈতন্য।

ডাক্তার আরও খানিকক্ষণ চেষ্টা করিয়া বলিলেন, "আর দুঘণ্টার মধ্যেও যদি জ্ঞান না হয়, তাহা হইলে অজ্ঞানাবস্থাতেই ছেলেটির মৃত্যু হইবে।"

শুনিয়া শিহরিয়া উঠিলাম। ডাক্তারকে বলিলাম, "এটি আমার ছাত্র, রাত্রে আমি ইহার কাছে থাকিতে পাই না?"

ডাক্তার বলিলেন, "ইচ্ছা হয় থাকিবেন, ক্ষতি নাই। এখনও আমার কিছু করণীয় আছে। আপনি এক ঘণ্টা পরে আসিবেন।"

'একঘণ্টা পরেই আসিব' বলিয়া তাড়াতাড়ি বাসায় ফিরিলাম। গৃহিণীকে সংক্ষেপে সব কথা বলিয়া রামসেবকের কাছে একটা সংবাদ পাঠাইয়া দিলাম। যদি না বাঁচে—তবু একবার শেষ দেখা দেখিয়া যান্।

সব কথা শুনিয়া গৃহিণীর চক্ষে জল আসিয়া

চক্ষু মুছিয়া গৃহিণী বলিলেন, "আহা কচি ছেলেকে এমনি ক'রে মারে! ওদের কি ভাল হবে?"

আধ ঘণ্টা আন্দাজ হইয়াছে, এমন সময় হাসপাতালের চাকর ছুটিতে ছুটিতে আসিয়া বলিল, "ছেলেটির জ্ঞান হইয়াছে। আপনার সহিত দেখা করিতে চায়, শীঘ্র আসুন।" ডাক্তার বলিতেছেন, "হয়ত সে বেশীক্ষণ বাঁচিবে না।"

যেমন ছিলাম সেই অবস্থায় ছুটিলাম। সম্মুখেই গাড়ীর আড্ডা। দেরি সহিতেছিল না। একখানা ট্যাক্সি করিয়া তাহাতে উঠিয়া বসিলাম। দেখিতে দেখিতে হাসপাতালে আসিয়া পৌঁছিলাম।

রামানুজের জ্ঞান হইয়াছে। ডাক্তার তখনও কক্ষে বসিয়া তাহার বক্ষ পরীক্ষা করিতেছেন। আমাকে দেখিবামাত্র রামানুজ প্রণাম করিবার জন্য হাত তুলিতে গেল, কিন্তু পারিল না।

"থাক্, রামানুজ, থাক্," বলিয়া আমি তাহার সম্মুখে আসিয়া বসিলাম।

রামানুজ আমার পানে চাহিয়া বলিল, "আমাকে মার্জ্জনা করিবেন, মাষ্টার সাহেব। আমি আপনার আদেশ অমান্য করিয়াছি।"

আমি কিছু বলিবার আগেই সে আবার বলিল, "দেশ্ সে হামারা প্রেম হো গয়া, তাই আমি আপনার আদেশেও এ পথ ছাড়িতে পারি নাই। নহিলে আমি আপনার কথা শুনি না? আমাকে আপনি ক্ষমা করিবেন, নহিলে মরিলেও আমার আপ্ শোষ যাইবে না।"

এতদিন পরে তাহাকে প্রাণ খুলিয়া বলিলাম, "তুমি কোনো অপরাধ, কোনো অন্যায় কর নাই। যাহা উচিত, যাহা সন্তানের কর্ত্তব্য, যাহা দেশসেবকের কাজ, তুমি তাহাই করিয়াছ। আমি তোমার উপর একটুও অসন্তুষ্ট হই নাই। সর্ব্বান্তঃকরণে তোমাকে আমি আশীর্ব্বাদ করিতেছি তুমি জন্মজন্ম এম্‌নি করিয়া দেশের সেবা কর আর যুগযুগান্তর অমর হইয়া থাক।"

আমার কথায় রামানুজ বড় শান্তি পাইল। বলিল, "বাবুজীকে (বাবাকে) আপনি একটু বুঝাইবেন, আর বলিবেন, মায়ী যেন না কাঁদেন।"

তারপর আমার একখানা হাত ব্যাকুল আগ্রহে একবার দুই হাতে চাপিয়া ধরিয়া চক্ষু মুদিল। মুখে এক অপরূপ জ্যোতি ফুটিয়া উঠিল।

রামানুজ চলিয়া গেল। রামসেবকের সঙ্গে ইহ-জগতে আর দেখা হইল না। কিন্তু সেইদিন হইতে অসম্ভব সম্ভব হইল। দলে দলে লোক হাসপাতালে তাহাকে দেখিতে আসিল। বালক-বালিকা, যুবাবৃদ্ধ, অন্তঃপুর হইতে ভদ্রমহিলারা আসিয়া সদ্যমৃত বালকের উপর পুষ্পাঞ্জলি দিতে লাগিলেন। মদ্যপেরা এ সংবাদ শুনিয়া মদের দোকান হইতে মদ না কিনিয়া ফিরিল। ছুটিতে ছুটিতে তাহারাও হাসপাতালে আসিল। সেখানকার সেই দৃশ্য দেখিয়া রামানুজকে স্পর্শ করিয়া তাহারা প্রতিজ্ঞা করিল, জীবনে আর তাহারা মদ্যপান করিবে না।

সেই পুষ্পরাশির মধ্যে পুষ্প হইতেও সুন্দর ও মধুর তাহার সেই অপূর্ব্ব জ্যোতি-বিচ্ছুরিত মুখের পানে চাহিয়া মনে হইল অহিংসা ও মৃত্যুর মধ্য দিয়া রামানুজ আজ তাহার প্রবল প্রতিপক্ষকে জয় করিয়াছে।

গ্রন্থাগার-ব্যবস্থায় কলাকৌশল

শ্রীসতীশচন্দ্র গুহ-ঠাকুর

১

শিক্ষাবিস্তারের জন্য দেশে নানাবিধ শিক্ষায়তন, বিদ্যাপীঠ প্রভৃতি গড়িয়া উঠিতেছে, ইহা সুলক্ষণ সন্দেহ নাই। কিন্তু স্কুল-কলেজের পাস-করা ছেলে-মেয়ের সংখ্যাধিক্য হইলেই যে প্রকৃত শিক্ষা অগ্রসর হয় না, এ কথা বোধ হয় আজকালকার দিনে কেহ অস্বীকার করিবেন না। জ্ঞানের পিপাসা যদি না বাড়িল, বিদ্যার সহিত বিদ্যার্থীর চিরজীবনের অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ না ঘটিল, তবে ত শিক্ষা নিতান্তই একটা বাহিরের জিনিষ! গ্রন্থাগার ও নিরীক্ষণাগার প্রভৃতির ভিতর দিয়াই মানুষ প্রকৃতভাবে শিক্ষিত হইয়া উঠে,—পাস করার ভিতর দিয়া নহে। স্কুল-কলেজ এবং পরীক্ষা ছাত্রের ঔৎসুক্য বাড়াইয়া দিবে মাত্র।

কিন্তু স্কুল-কলেজ প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনের জন্য আমাদের দেশে যতটা আগ্রহ চেষ্টা ও অর্থব্যয় দেখিতে পাই, গ্রন্থাগার ও পঠনাগারের জন্য তার সিকি ভাগও পাই না। যে-সকল গ্রন্থাগার দেশের ভিতর রহিয়াছে, তাহার একটা তালিকা পর্য্যন্ত আমরা দিতে পারি না। কিন্তু স্কুল-কলেজগুলির সব রকমের বিবরণ বিশ্ববিদ্যালয়ের মারফৎ সংগৃহীত হয়। সমবেত চেষ্টার অভাবে গ্রন্থাগার-পরিচালন একটা কষ্টকর ব্যাপার বলিয়া বিবেচিত হইতেছে। কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে ইহা স্কুল-কলেজ পরিচালন অপেক্ষা সহজসাধ্য, অথচ উপযোগিতায় ইহার ক্ষেত্র অধিকতর প্রসারিত। স্কুল-কলেজ মানুষকে ছাড়িতে হয়, কিন্তু লাইব্রেরী কখনও ছাড়িতে নাই।

বরোদা-রাজ্যের বর্ত্তমান মহারাজা শ্রীসয়াজীরাও গায়কবাড় ঐ কথাটি উপলব্ধি করিয়া নিজ রাজ্যে বহু অর্থসাপেক্ষ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা অপেক্ষা গ্রামে গ্রামে লাইব্রেরী-স্থাপনের দিকে বেশী মন দিলেন। সেই লাইব্রেরীগুলির ভিতর দিয়া কত-ভাবে বরোদা-রাজ্যের জনসাধারণ শিক্ষিত হইয়া উঠিতেছে, ব্যষ্টি ও সমষ্টিগত ভাবে মানসিক উন্নতিসাধন করিতেছে, নিজ নিজ ব্যবসা-বাণিজ্য বা অপরবিধ বৃত্তির পরিপোষক কত নূতন তথ্য পাইয়া অনুশীলনাদি দ্বারা লাভবান হইতেছে। তার পর, কথা-সাহিত্যাদির ভিতর দিয়া নির্দ্দোষ আনন্দ উপভোগ করিতেছে, অক্ষরজ্ঞানহীন দিনমজুরও চিত্রাদি দেখিয়া কত শিক্ষা ও আনন্দলাভ করিতেছে।

এবম্বিধ উপযোগী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দেশের ভিতর কেন যে ভাল করিয়া গড়িয়া উঠিতেছে না, তাহার নানাবিধ কারণ রহিয়াছে। সকল দিক্ দিয়া সেগুলির আলোচনা হওয়া দরকার। যে-সকল বাধা কর্ম্মিগণের কলা-কৌশলের অভাবে ঘটিতেছে, আজ কেবল তাহারই কয়েকটি মাত্র আলোচনা করিব। এই সকল বাধা অতিক্রম করিতে আমাদিগকে অন্যত্র যাইতে হইবে না, কর্ম্মিগণই সমবেত হইয়া এগুলির ব্যবস্থা করিতে পারেন।

২

বিভিন্ন দেশের ক্যাটালগ বা গ্রন্থাগার সূচি-পত্রাদি একটু আলোচনা করিলে দেখিতে পাই, যে, এক একটা পদ্ধতি অনুসারে সেগুলি প্রস্তুত হয়। পশ্চিম দেশে ইউরোপ ও আমেরিকায় ত ইহার এক পরম্পরাক্রতু বা ট্রেডিশন সৃষ্টি হইয়াছে। সেখানে যে-কোন একটা লাইব্রেরীর ক্যাটালগ ব্যবহার করিতে অভ্যস্ত হইলে অপর যে-কোন লাইব্রেরীর নিয়ম-কানুন এবং ক্যাটালগ বুঝিতে কাহাকেও বড়-একটা বেগ পাইতে হয় না। বর্ণানুক্রমিক সূচীতে সে দেশে উইলিয়ম সেক্সপীয়রের নাটক খুঁজিতে গিয়া কেহ প্রথমে 'উইলিয়ম' নাম হাৎড়াইবে না,—সকল লাইব্রেরীই 'সেক্সপীয়র, উইলিয়ম' এইভাবে বর্ণানুক্রম করিয়া থাকে। আমাদের দেশে শ্রীবালগঙ্গাধর তিলক মহাশয়ের 'গীতা-রহস্য' গীতা

বিষয়ক পুস্তকগুলির মধ্যে রাখা হইবে বটে, কিন্তু কোনো গ্রন্থাগারে উহা তিলক, বালগঙ্গাধর, এই অনুক্রমে রাখা আছে, আবার কোনো গ্রন্থাগার-বা 'বালগঙ্গাধর তিলক' এই ভাবে রাখিয়াছে।

৩

লিখিত ভাষার জন্য পৃথিবীতে যে-কয়টি লিপি ব্যবহৃত হয়, তন্মধ্যে পাশ্চাত্য দেশে রোমক লিপিই প্রধান। প্রাচ্য দেশের সংস্কৃত, পালি, ফারসী, চীনা, তিব্বতী, জাপানী, প্রভৃতি ভাষার অনেক বই তাহারা রোমক লিপিতে প্রকাশ করিয়া থাকে। এই লিপ্যন্তর প্রণালীর একটা সুনির্দ্দিষ্ট ব্যবস্থা তাহারা করিয়া রাখিয়াছে। ভারতীয় প্রধান লিপি বিজ্ঞানসম্মত অকারাদি হকার পর্য্যন্ত দেবাক্ষর হওয়া সত্ত্বেও কোনো ইংরাজী বা ফরাসী শব্দ ভারতীয় লিপিতে লিখিতে গেলে বিশেষ বেগ পাইতে হয়; কারণ সুনির্দ্দিষ্ট লিপ্যন্তর প্রণালীর অভাব। লিপি রোমক লিপিতে পরিবর্ত্তিত করিবার রীতি অনেক পরিমাণে গঠিত হইয়াছে সত্য, কিন্তু দেশের ভিতরই নানা স্থানে নানা জনে নানা রকমের প্রণালী ব্যবহার করিতেছে। এই ত দেখুন,—সদ্যপ্রকাশিত 'স্পিরিট অব বুদ্ধিজ্‌ম্'-এর গ্রন্থকার দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্-চান্সেলর স্যর হরি সিং গৌড় মহাশয় আবার একটি অভিনব প্রণালীর উদ্ভব করিয়াছেন। তাঁহার মতে 'বুদ্ধ' কথাটি রোমক লিপিতে 'Buddh' হইবে (Buddha নহে); 'অশোক' শব্দটি তিনি লিখিবেন 'Ashoke' (Asoka নহে); এমন কি, 'জাতক' কথাটি তাঁহার মতে Jastak (Jataka নহে)—এই ভাবের লিপ্যন্তর প্রণালী তাঁহার ত্রিংশৎ শিলিং দামের প্রকাণ্ড পুস্তকে চালাইয়া নিজের লেখা স্থানে স্থানে সাধারণের দুর্ব্বোধ্য করিয়া ফেলিয়াছেন। বঙ্গীয় এশিয়াটিক সোসাইটির যে প্রণালী, কাশ্মীর সংস্কৃত সীরিজে ঠিক সেইটি দেখিতে পাই না; ত্রিবন্দ্রম্ সীরিজ, নির্ণয়সাগর প্রেস বা পাণিনি আপিসের বই—এদের প্রত্যেকেরই কিছু-না-কিছু বৈষম্য রহিয়াছে। দেশে বিশিষ্ট পদ্ধতি আজিও গড়িয়া উঠে নাই, অথবা বিদ্বজ্জনসাধারণ গ্রহণ করে নাই। পালি ভাষার যাবতীয় পুস্তকাদি বহুকাল হইতে পাশ্চাত্য দেশে রোমক লিপিতে ছাপা সম্ভব হইয়াছে এই কারণে, যে, জার্ম্মানী হইতে আমেরিকা পর্য্যন্ত সকল দেশে সকল বিদ্বৎপরিষৎ সেই একই লিপ্যন্তর প্রণালী মানিয়া লইয়াছে।

৪

বইয়ের 'লেন-দেন' ব্যাপারে দেখুন। আমাদের দেশের গ্রন্থাগারগুলিতে বিভিন্ন প্রকারের বিধিব্যবস্থা রহিয়াছে। পুস্তক লইবার অধিকার সাব্যস্ত হইয়া গেলেও কোনো গ্রন্থাগারের পাঠককে স্বয়ং আসিয়া প্রতি 'লেন-দেন' কালে খাতায় সহি দিতে বাধ্য করে, যতগুলি বই লইবার অধিকার আছে, তার চেয়ে বেশী বই লইলেও অনেক সময় কোনো কোনো গ্রন্থাগার অসংস্কৃত নিয়মের ফলে ধরিতে পারে না। কোন্ কোন্ বই, এবং মোট ক-খানা বই এই মুহূর্ত্তে গ্রন্থাগারের বাহিরে রহিয়াছে, এবং তার ভিতরকার কোন্‌গুলি আজই ফেরৎ পাইবার আশা করা যায়, এ-সব প্রশ্নের উত্তর দেওয়া ভারতীয় গ্রন্থাগারগুলির পক্ষে ত একেবারে অসাধ্য-সাধন! ইউরোপ ও আমেরিকায় এ সব ব্যাপার নিতান্তই সহজসাধ্য হইয়া গিয়াছে। যে-কয়টি চার্জিং সীষ্টেম রহিয়াছে (যথা একটির নাম নুআর্ক সীষ্টেম) তার প্রত্যেকটি কৌশলে ব্যাপারটি জলবৎ তরল করিয়া দিয়াছে। আমাদের দেশেও বরোদা, পঞ্জাব, মহীশূর প্রভৃতি স্থানে ঐ সকল কৌশল অবলম্বনে যথেষ্ট ফল পাওয়া গিয়াছে। কার্ডের সাহায্যে, এই আপাতদুরূহ কার্য্য ঠিক যেন তাস-খেলার মতন সহজ হইয়া গিয়াছে।

৫

ঐ সকল কলাকৌশল নিতান্ত সহজসাধ্য। অল্প চেষ্টাতেই অনুসৃত হইতে পারে। অপেক্ষাকৃত কষ্টকর বর্গীকরণ বিষয়ে, দেখিতে গেলে, আমরা বিষম সমস্যায় পড়িয়া আছি। কোন্ কোন্ এবং কতগুলি বিষয়ের মধ্যে পুস্তকগুলিকে ভাগ করিয়া রাখা হইবে, অর্থাৎ কি কি প্রধান বর্গ বা বিভাগ রাখা যায়, এবং তার অধীনে উপবর্গ অনুবর্গ প্রভৃতি কি হওয়া যুক্তিযুক্ত,

এই বিষয় লইয়া আমাদের দেশের প্রত্যেক নব্য পুস্তকাধ্যক্ষকে এত মাথা ঘামাইতে হয়, যে, আরম্ভেই অনেকে রণে ভঙ্গ দেন। যাঁহারা সহজে ছাড়েন না, তাঁহারাও একাকী অন্ধকারে হাৎড়াইতে থাকেন এবং এত পরিশ্রান্ত হইয়া পড়েন যে, শেষে আর তাঁহাদের ধৈর্য্য থাকে না। দেশে এমন কোনো বর্গীকরণ পদ্ধতি আজিও গড়িয়া উঠে নাই যাহা অনেক গ্রন্থাগারে অনুসৃত হইতেছে।

ইউরোপ ও আমেরিকায় যে তিন চারিটি প্রধান পদ্ধতি রহিয়াছে তাহার সব ক'টিই অল্পবিস্তর বিজ্ঞান-সম্মত। উহার প্রত্যেকটি মূলতঃ ব্যক্তি-বিশেষের মস্তিষ্কপ্রসূত হইলেও, বহু বিশেষজ্ঞের গবেষণার ফলে তাহার বর্ত্তমান আকার গঠিত হইয়াছে। গ্রন্থাগার পরিচালকগণকে সে সকল দেশে একটি মাত্র বর্গীকরণ পদ্ধতি বাছিয়া লইতে হয়, নূতন করিয়া প্রস্তুত করিতে হয় না। আমাদের দেশেও এই সকল সুবিধা থাকা আবশ্যক।

৬

উপরে মাত্র চারিটি বিষয়ের উল্লেখ করা হইয়াছে। ১। নাম সূচী, (২) লিপ্যন্তর প্রণালী, (৩) পুস্তকাদি লেন-দেন ; (৪) বর্গীকরণ। মোটামুটি দেখিতে গেলে, ঐ সকল বিষয়েই আমাদের প্রধান ত্রুটি এই যে, দেশের কর্ম্মিগণ আজিও সমবেত হইয়া ঐ সকল বিষয়ের মীমাংসা করিতেছেন না। বিষয়গুলির গুরুত্ব কতখানি তাহা বিবেচনা করার সময় উপস্থিত। এই সকল কাজ সামান্য হইলেও বহুদিনের উপেক্ষার ফলে ক্রমেই জটিল হইয়া উঠিতেছে, এবং প্রকৃত শিক্ষা-বিস্তারের পক্ষে যথেষ্ট বাধার কারণ হইয়া দাঁড়াইতেছে।

দেশের একটি নূতন পুস্তকাধ্যক্ষকে গ্রন্থকারাদির বর্ণানুক্রমিক সূচি প্রস্তুত করিতেই যে কত রকমের সমস্যায় পড়িতে হয়, তাহার একটু বিশদ আলোচনা করিয়া দেখা যাউক।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, লোকমান্য তিলক-মহারাজের "গীতা-রহস্য" 'তিলক' নামে রাখা হইবে, কি 'বালগঙ্গাধর' নামে রাখা হইবে, এই সামান্য কথার একটা নির্দ্দিষ্ট উত্তর দেশের কোনো পুস্তকাধ্যক্ষ স্পষ্ট করিয়া বলিতে পারে না। অথচ উইলিয়ম সেক্সপীয়রের নাম ইউরোপ ও আমেরিকায় প্রচলিত প্রথায় এদেশেও সকলেই পদবী ধরিয়া সূচি প্রস্তুত করে। আমাদের দেশে কেহ বলিবে পদবী ধরিয়া সূচি কর, আবার অনেকে বলিবে নামের আদ্যাক্ষর ধরিয়া সূচি প্রস্তুত করাই নিরাপদ। পরিষদ গ্রন্থাগারে আদ্যাক্ষর ধরিয়াই করা হয়, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার ফলগুলি সাধারণ পদবী ধরিয়াই করা হয়, আবার দেশের ভিতরই অন্য কোনো কোনো বিশ্ববিদ্যালয় আদ্যাক্ষর দিয়া করে।

৭

দেশীয় নামগুলির বিচিত্রতা অনেক। নিম্নে দশ রকমের উদাহরণ দিয়া দেখান যাইতেছে।

(ক) সকল নামেই 'পদবী' অথবা 'বংশ-নাম' থাকে না। যথা,—(লালা) লজপৎ রায়, (বাবু) ভগবান দাস, (বাবু) রাজেন্দ্রপ্রসাদ, (মৌলানা) মহম্মদ আলি। এই নামগুলির উভয়াংশ মিলিয়া এক একটি পূরা শব্দ হইয়াছে, শেষার্দ্ধগুলি বংশ-নাম বা উপাধি নহে। সুতরাং এমত অবস্থায় উভয়াংশ আলাদা করিয়া লিখিলে, মাঝে হাইফেন্ না রাখিলে বুঝিতে গোল হয়।

(খ) কতকগুলি পদবী সম্পূর্ণ নামটি হইতে বাছিয়া বাহির করা দুষ্কর। যথা ;- শ্রীযতীন্দ্রমোহন সেন গুপ্ত (গুপ্ত, না সেন-গুপ্ত ?), শ্রীজগদীশ দাস গুপ্ত (গুপ্ত, না দাস-গুপ্ত), শ্রীদেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী (চৌধুরী, না রায়, চৌধুরী ?), শ্রীভূদেব সিংহ রায় (রায়, না সিংহ-রায় ?), শ্রীরামভুজ দত্ত চৌধুরী (চৌধুরী, না দত্ত-চৌধুরী ?)

(গ) অনেকে নিজ বংশ-নামের উৎপত্তিগত সংস্কৃত আকার ত্যাগ করিয়া অপভ্রংশের আশ্রয় লয়। যথা—মিশ্র, মিশির ; ত্রিবেদী, তিবারী ; সিংহ, সিং ; মিত্র, মিত্তর (Mitter) ; চন্দ্র, চন্দর ; আবার,—উপাধ্যায়, ওঝা ; চট্টোপাধ্যায়, চাটুয্যে ; বন্দ্যোপাধ্যায়, বাঁড়ুজ্যে। এমন কি, পাল স্থলে পল (Paul), মাইতি স্থলে মেজর (Major), লাহিড়ী স্থলে লউরী, সিংহ স্থলে সুইন্ হো। ব্যক্তিগত নামও এইরূপে নগেন্দ্র স্থলে লউগিন (Laugin) হইতেছে।

(ঘ) সম্মানসূচক উপাধি অর্জ্জন করিলে, অনেক পণ্ডিত ব্যক্তি সম্পূর্ণ নাম হইতে বংশ-পদবী ছাড়িয়া দিয়া স্বোপার্জ্জিত উপাধিকেই বংশ-নাম রূপে ব্যবহার করিয়া থাকেন। যথা, পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় হইলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মহামহোপাধ্যায় ডক্টর হরপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য হইলেন হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, অধ্যাপক অমূল্যচরণ ঘোষ হইলেন অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, পণ্ডিত গীষ্পতি গুহ হইলেন গীষ্পতি কাব্যতীর্থ।

(ঙ) দক্ষিণ দেশে কেহ কেহ বংশ-নামের সঙ্গে নিজ নামের সংমিশ্রণে এক সংক্ষিপ্ত আকার এমনভাবে করিয়া লয় যে, তাহাই বংশ-নাম বলিয়া প্রতিভাত হয়। যথা—গ, অ, (=G. A.) নটেশ আয়ার হইলেন নটেশন; বৈদ্যরাম আয়ার হইলেন বৈদ্যরমন; স, (=S.) গণেশ আয়ঙ্গর হইলেন গণেশন।

(চ) স্ত্রীলোকের নামের পদবী ত প্রায় সকল দেশেই বিবাহের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্ত্তিত হয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েট শ্রীমতী কুমুদিনী মিত্র হইলেন বসু, শ্রীমতী সুধাময়ী দত্ত হইলেন মুখোপাধ্যায়।

(ছ) আমাদের দেশের অনেক স্ত্রীলোক ত বংশ-নামের ব্যবহার করিতেই চাহেন না। তাঁহারা মহিলাজনোচিত সাধারণ পদবী 'দেবী' 'বাঈ' প্রভৃতি শব্দকেই বংশ-নামের মতন ব্যবহার করেন। যথা, শ্রীমতী অনুরূপা দেবী, শ্রীমতী অবন্তিকা বাঈ, শ্রীমতী সীতা দেবী। (বিবাহিত হইলেও ইঁহাদের বংশ-নাম পরিবর্ত্তিত হইল না)। সম্প্রতি অনেকে আবার বংশনাম রক্ষার দিকে দৃষ্টি দিতেছেন; যথা, শ্রীমতী জ্যোতির্ম্ময়ী গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীমতী সরোজকুমারী বন্দ্যোপাধ্যায়।

(জ) ধর্ম্মান্তর-গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে অনেক সময় নামের আংশিক আমূল পরিবর্ত্তন হইতে দেখা যায়। মুসলমান-ধর্ম্ম গ্রহণ করিলে ত কথাই নাই, অবশ্য ইদানীং দুই-একটি উদাহরণ পাওয়া যায়, যেখানে দেখিতে পাই, মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিলেও পূর্ব্বেকার নাম পুরা বজায় থাকে; যথা, মিঃ মার্মাডিউক পিকথল নাম আদৌ পরিবর্ত্তিত হয় নাই, একটি বাঙালী ভদ্রলোক অবনীরঞ্জন ভট্টাচার্য্য নামের আংশিক পরিবর্ত্তন মানিয়া লইলেও পদবী ছাড়েন নাই। নূতন ধর্ম্মে তিনি আবদুল শোভান ভট্টাচার্য্য নামে পরিচিত।

(ঝ) আবার ধর্ম্মান্তর-গ্রহণ না করিয়াও যদি কেহ গার্হস্থ্যাশ্রম ত্যাগ করেন, তবে প্রায়শ তাঁহার নাম বদলায়। শ্রীনরেন্দ্রনাথ দত্ত হইলেন স্বামী বিবেকানন্দ; শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় হইলেন বাবা প্রেমানন্দ-ভারতী; (মহাত্মা) মুন্সীরাম হইলেন স্বামী শ্রদ্ধানন্দ। আবার প্রকৃত সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ না করিলেও যদি কেহ গার্হস্থ্যাশ্রম হইতে তফাৎ হইয়া সেবাব্রত গ্রহণ করেন তবে সেক্ষেত্রেও কখন কখন গুরুদত্ত নূতন নাম হয়। যথা, মিস্ মারগ্রেট নোবল হইলেন ভগিনী নিবেদিতা; শ্রীদেবেন্দ্রচন্দ্র সিংহ-রায় হইলেন কৃষ্ণদাস; মিস শ্লেড হইলেন মীরা বহিন।

(ঞ) ভারতের কোনো কোনো অঞ্চলে আবার এরূপও দেখা যায় যে, একই পরিবারে বিভিন্ন ব্যক্তি নিজ নিজ বৃত্তি অনুযায়ী পদবী গ্রহণ করেন। 'গুপ্ত' সাহেবের ভ্রাতা 'অগ্রবাল' সাহেব হইতে পারেন; শ্রীযুক্ত 'শর্ম্মার' পিতা ছিলেন হয়ত 'শ্রীযুক্ত চৌধারীজী।'

কেহ কেহ আবার পদবী একেবারেই ব্যবহার করেন না। একই পরিবারের ভিতর কর্ত্তার নাম বাবু ভগবান দাস (পদবী 'দাস' নহে); পুত্রেরা বাবু শ্রীপ্রকাশ, বাবু চন্দ্রভাল। কাহারই পদবীর বালাই নাই। আবার পুত্রদের পিতৃব্য বাবু সীতারাম অগ্রবাল। ইহারা অগ্রবাল সম্প্রদায়ভুক্ত বৈশ্য বলিয়া বৈশ্যবর্ণ জ্ঞাপক সাধারণ 'গুপ্ত' পদবী অথবা 'অগ্রবাল' শব্দ কেহ কেহ ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিতেছেন।

আবার এরূপ উদাহরণও আজকাল পাওয়া যায়, যাহাতে দেখিতে পাই, কেহ কেহ বৃত্তিবাচক বিদেশী (প্রায়ই ইংরেজী) শব্দ পদবীরূপে ব্যবহার করেন। যথা, শ্রীমণিলাল ডক্টর, শ্রীশঙ্কর লাল ব্যাঙ্কার, শ্রীফ্রামরজ মার্চেণ্ট, শ্রীচুগন লাল বকীল, ইত্যাদি।

দেখা গেল একমাত্র 'নাম' লইয়াই আমাদের এত গোল। এ ক্ষেত্রে সূচি-প্রস্তুতকারক কোন্ নিয়ম অবলম্বন করিবে,—পদবী ধরিয়া সূচী হইবে, কি আদ্যক্ষর লইয়া বর্ণানুক্রম সাজানো হইবে—এ বিষয়ে

একটা সাধারণ ব্যবস্থা থাকা চাই, বাংলা দেশের জন্য বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ এবং এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল একটা ব্যবস্থা দিতে পারে বটে, কিন্তু ইহাদের ব্যবস্থা ভারতের সর্ব্বত্র, সকল প্রদেশ, মানিয়া লইবে কি না জানি না। অল-ইণ্ডিয়া লাইব্রেরী এসোসিয়েশন নামে যে ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সৃষ্টি হইয়াছে তাহারা অদ্যাপি এবম্বিধ কর্ম্মে হস্তক্ষেপ করে নাই।

৮

'নাম-সূচি' প্রস্তুত ব্যাপারে আমরা যতটুকু সমস্যার ভিতর পড়িয়া আছি, 'বর্গীকরণ' প্রথা লইয়া ত আমরা ততোধিক সমস্যার ভিতর রহিয়াছি।

পাশ্চাত্য প্রথাগুলির একটিকে বাছিয়া লইয়া এদেশে হুবহু চালাইবার চেষ্টা যাঁহারা করিয়াছেন, তাঁহারাও স্বীকার করেন যে, দেশের প্রধান প্রধান বিষয়গুলিকে বড়ই কোণ-ঠাসা করিয়া রাখিতে হইতেছে। 'উপনিষৎ' 'বৌদ্ধ দর্শন' 'জরথুষ্ট্রীয় ধর্ম্মমত' 'মুসলীম আইন-কানুন', 'বৈষ্ণব মতবাদ' প্রভৃতি আমাদের পক্ষে বিশিষ্ট বিশিষ্ট বিষয়গুলি পাশ্চাত্য কোনো বর্গীকরণ মহাক্রমেই কাণ্ড, শাখা, এমন কি, নিকট প্রশাখা অবলম্বন করিতে পারে নাই। অথচ, আমাদের পক্ষে অপেক্ষাকৃত স্বল্প আলোচ্য 'রোমান্ আইন-কানুন' 'খৃষ্টীয় ভক্তিবাদ' বলিতে গেলে এক-একটি মূল শাখা দখল করিয়া রহিয়াছে।

আবার, যাঁহারা পাশ্চাত্য পদ্ধতিগুলি ধরিয়া এদেশে ব্যবহারোপযোগী ব্যবস্থা চালাইয়াছেন, তাঁহারাও কিছুদিন কাজ করার পরেই স্বীকার করিতেছেন যে, বিষয়টি তত সহজ নয়, যতটা বাহির হইতে প্রথম মনে হইয়াছিল। এই-খানেই বিদ্বানদের সমবেত চেষ্টার আবশ্যকতা। এখানেও গবেষণার যথেষ্ট স্থান রহিয়াছে। পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিবেচনা করিয়া প্রাচ্য-পাশ্চাত্য উভয় বিদ্যায় পারদর্শী পণ্ডিতগণ মিলিয়া ব্যবস্থা দিলে, তাহাতে বেশী খুঁৎ থাকিবার কথা নয়।

'বর্গীকরণ' কথাটাই হইতেছে বর্গ লইয়া, বর্গ চারিটি, – ধর্ম্ম, অর্থ, কাম (অথবা কলা) এবং মোক্ষ, যে-কোনো ভারতীয় পণ্ডিত সাধারণভাবে এই চারিটি ভাগে সব বিষয়গুলিকে ভাগ করিয়া দিতে পারেন। যে বইগুলি কোনো-মাত্র একটি বিষয়ে আবদ্ধ নহে (যথা, অভিধান, সাধারণ সাময়িক পত্র-পত্রিকা) সেগুলিকে স্বতন্ত্র পঞ্চম (অস্পৃশ্য পঞ্চম নহে) বলা যাইতে পারে, ইচ্ছা করিলে এই বর্গগুলিকে সহজেই দশমিক প্রণালী বদ্ধ করা যাইতে পারে। গত কয়েক বৎসর ধরিয়া আমি এ বিষয়ে কিছু কিছু কার্য্য করিতে চেষ্টা করিতেছি। চাতুর্ব্বর্গ্যানুসারে দশমিক বর্গীকরণের যে ঘূর্ণায়মান্ চার্টটি সম্প্রতি গ্রন্থাগার-প্রদর্শনীতে রাখা হইয়াছিল, তাহাই আপনাদিগের সম্মুখে ধরিতেছি। ইহাতে বর্গীকরণের দশমিক প্রথার কাঠামটি মাত্র থাকিলেও, ইহা দেখিলে স্বীকার করিতে হইবে যে, আমার প্রস্তাব অসম্ভব নহে।

এই বিষয়ে গবেষণা করিলে আমাদের দেশের বর্গী-করণ সমস্যার হয়ত একটি মীমাংসা হইয়া যাইতে পারে। পাশ্চাত্য প্রথাগুলি হইতে আমরা যথেষ্ট সহায়তা লাভ করিতে পারি। দেশের ভিতর নানা স্থানে যা-কিছু কাজ হইয়াছে, তাহা হইতে অনেক অভিজ্ঞতা লাভ হইতে পারে। কিন্তু এই বৃহৎ কর্ম্ম একটি মাত্র ব্যক্তি সম্পন্ন করিতে পারে না, করিলেও খুঁৎ অনেক থাকিয়া যাইবে। পণ্ডিতগণের সহকারিতা কার্য্যটিকে সম্ভব করিয়া তুলিতে পারে। তাঁহাদের সমালোচনা বিষয়টিকে নিখুঁৎ করিতে সহায়ক হইবে।

৯

আমি, বলিতে গেলে, কয়েকটি বিষয়ের উল্লেখমাত্র করিলাম। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে সকল দিক দিয়া এগুলির আলোচনা হওয়া দরকার। আমাদের দেশের গ্রন্থাগারগুলির প্রায় প্রত্যেকটি আলাদা ভাবেই গড়িয়া উঠিয়াছে, একের সঙ্গে অপর কোনো গ্রন্থাগারের বড় একটা যোগাযোগ নাই। তাহারই ফলে আজিও এই কলাকৌশল সম্বন্ধে আমরা অনেকটা অজ্ঞ রহিয়াছি। এই কূপমণ্ডূকতা বা একা থাকিবার প্রবৃত্তি স্বচ্ছন্দ জীবনের সহায়ক নহে। বিদ্বজ্জনমণ্ডলীর এ বিষয়ে দৃষ্টি আকৃষ্ট না হইলে দেশে শিক্ষাবিস্তারের একটি শ্রেষ্ঠ উপায়ের ফল-লাভে আমরা বহু পরিমাণে বঞ্চিত থাকিব।*

* ১৩৩৫, ১৪ই পৌষ, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের বিশেষ অধিবেশনে প্রদত্ত বক্তৃতার বিবরণ বক্তাকর্ত্তৃক যথাযথভাবে লিখিত।

জীবন ও মৃত্যু

শ্রীগৌরগোপাল মুখোপাধ্যায়

'কেমন আছ, নীতা ?'

'তেমন ভাল নয়, ডাক্তারবাবু।'—নীতার ঠোঁটে পলাতক একটু হাসির রেশ ; স্বর কোমল, কিন্তু কেমন-যেন ভাঙা-ভাঙা।

'কেন ? কি হয়েছে সব বল আমাকে।'

'এই জায়গার সেই বেদনাটা কাল সারা সন্ধ্যা, সারা রাত আমাকে জ্বালিয়েছে। আজ আবার সকালে দেখি কাশির সঙ্গে রক্ত ছিটেফোঁটা।'

'সেটা রাখা হয়েছে কি ?'

ঘাড় নেড়ে সে জানাল—'না, রেখে ফলই বা কি ?'

ডাক্তার বললেন—'তার দরকার ছিল খুবই।'

'আচ্ছা, এর পরের বারে আর ভুল হবে না।' স্বরে তার প্রচ্ছন্ন পরিহাস।—'জানেন, আবার কিন্তু জরও হচ্ছে আমার।' ডাক্তার জিজ্ঞাসা করলেন—থার্মোমিটার দিয়ে দেখা হয়েছিল কি-না।

'না দেখিনি ত ; ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছি সেটাকে, যা জ্বালাত আমায় ! ভারী বিশ্রী একটা যন্ত্র, যাই বলুন্ ! জর যখন আসে তখন নিজের হাতের চেহারা দেখেই আমি তা মালুম করে নিই।'

ডাক্তার বললেন—'ডিগ্রীটা জানাও যে দরকার।'

কি দরকার, ডাক্তারবাবু ? খালি মা'র দুঃখ বাড়ানো বই ত নয় ! এমনিতেই তাঁর কষ্টের অভাব ত কিছু নেই। বেচারী !'

'আমার উপদেশগুলো মেনে চলেছিলে কি ?'—ডাক্তার শান্তভাবে জিজ্ঞাসা করলেন। ওঁর ধৈর্য্যের যেন শেষ নেই !

'নিশ্চয়ই, ডাক্তারবাবু ; আপনার সব ওষুধই আমি খেয়ে থাকি, কারণ মা না খাইয়ে ছাড়েন না ; পথ্যের নিয়মেরও এতটুকু ব্যতিক্রম হবার জো নেই, ওই একই কারণে—'

আবার সেই হাসি, কৌতুকে উচ্ছল।

'বাকিগুলোর বেলায় কি ?'—

'অর্থাৎ ?'

'সকাল সকাল ঘুমোতে যাও ?'

'না ডাক্তারবাবু, রোজই খুব দেরি করি তাতে।'

'কারণ ?'

'এই গান গাই, নয় সেতার বাজাই, বন্ধুদের সঙ্গে গল্প করি, অথবা খেলি ব্রিজ—'

'পোষাক-পরিচ্ছদ সম্বন্ধে অতিরিক্ত সাবধানী নিশ্চয়ই নও ?'

'বাইরে গেলেও সেই পাতলা ক্রেপের শাড়ি ব্লাউজই আমার চাই।'

'সকালে বিকেলে কি কর ?'

'হয় রিক্সতে, নয়ত হেঁটেই বেড়াই। এদিক ওদিক পিকনিক করতে যাওয়াও আছে মধ্যে মধ্যে। এই যে সামনে 'টিব্‌বা'গুলো দেখছেন ও গুলোর উপরেও যে চড়ি না তাই বা বলি কেমন করে ?'

'দলের অভাব নিশ্চয়ই ঘটে না কখনও ?'

'কখ্‌খনোই না। জানেন, আমার আবার স্তাবকও জুটেছে ক-জন। ওঁদের মধ্যে বিশেষ ক'রে একজন স্তাবকের চেয়েও বেশী। সে আমাকে সত্যিই ভালবাসে। ওকে আমারও খুব ভাল লাগে। এদিকে জ্বালাতনও করি, দেখাই যেন ওর চেয়ে অন্যদের জন্যেই আমি কেয়ার ক'র বেশী।'

এইভাবে কথোপকথন বেড়ে চলল, ডাক্তার ধীর, শান্ত ; নীতা উত্তেজিত, চঞ্চল, পরিহাসে উচ্ছল—সময়ে সময়ে তা তীক্ষ্ণ ও তীব্র।

ডাক্তার বললেন—'অর্থ কি এই সব করার ? নিজেকে মেরে ফেলতে চাও ?'

হঠাৎ একটু গম্ভীর হয়ে সে উত্তর দিল—'যত শীগগির ছুটি পাওয়া যায়!'

'বাঁচতে কি চাও না তুমি?'

'না, চাইনে আমি এম্‌নি ক'রে বেঁচে থাক্‌তে, এই রোগে পঙ্গু হ'য়ে, আধ-মরা, মুমূর্ষু!'—স্বর তার আরও গম্ভীর এবারে।

'মা বেচারীকে তুমি একেবারে হতাশ করছ, নীতা—'

'তা হয়ত করছি। কিন্তু আমাকে ত তিনি হারাবেনই—কাজেই নৈরাশ্যে অভ্যস্ত হওয়া তাঁর পক্ষে মন্দ কি এখনই থেকেই?'

'দুঃখে দুঃখেই যে তিনি মারা যাবেন।'

'তা যাবেন, কিন্তু আমার আগে নয় নিশ্চয়ই! আমার সব শেষ হয়ে যাবে তার আগেই। তা দেখ্‌তে ত আর আমি থাক্‌ছি না'—গাঢ় হয়ে এল ওর স্বর। হঠাৎ আবার সে হাস্‌তে সুরু ক'র্‌ল। 'আচ্ছা, ডাক্তারবাবু, আপনি না-হয় নাই বল্‌লেন, কিন্তু আমি ত জানি আমার মাথার ওপরে যমের দণ্ড উদ্যত হয়েই আছে; অবিশ্যি এখনও হয়ত অনেক কালই আমি জীবনটাকে নিয়ে হেঁচ্‌ড়ে বেড়াতে পারি—এই সব ওষুধপত্তর, নিয়ম-কানুন মেনে চ'লে,—সকাল থেকে সন্ধ্যা অবধি নিজেকে কড়া পাহারায় রেখে, বুকটা পাছে হাঁপিয়ে ওঠে তাই মুখটি বুজে পড়ে থেকে। গান-বাজনা বন্ধ, আমোদ-আহ্লাদের পাঠ নেই, স্তাবকদের সংস্পর্শ এড়িয়ে—কি শীত কি গ্রীষ্ম এই নির্জ্জন পাহাড়ে অথবা কোনো স্যানাটোরিয়মে প'ড়ে থেকে। না, না ডাক্তারবাবু, এ-রকম বেঁচে থাকার সাধ আমার নেই; এর নাম কি বেঁচে থাকা? তার চেয়ে চুকে যাক্ আপদ্—এখনি চুকে যাক্!'

তার সেই স্নিগ্ধ আয়ত চোখের অতল কালো আঁখিতারা জীবন-মরণের দ্বন্দ্ববহুল আকাঙ্ক্ষার আলোতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠ্‌ল। তার পাণ্ডুর গালে এসে লাগল রক্তের গোলাপী উচ্ছ্বাস; কপালের সূক্ষ্ম নীল শিরাগুলো ফুলে ফুলে উঠ্‌ল। মরণাহত এক অপূর্ব্ব মাধুরীতে ওর মুখটি ভ'রে গেল।

'ডাক্তারবাবু, ডাক্তারবাবু!'—স্বরে তার আগেকার মিষ্টত্ব আর নেই।

'নিজেকে নির্ব্বাসিত করতে আমি চাইনে। চাইনে আমি বন্ধ ঘরের আওতায় থেকে বাঁচ্‌তে। হাতের নাগালে যা' পাব তা ছাড়তে আমি পার্‌ব না। সৌন্দর্য্যের প্রসাধন আমার চাই, চাই আমার ভালবাসা; সূর্য্যের আলোতে, সকালের হাওয়ায়, প্রেমে প্রাণে আমি উচ্ছ্বসিত ভরপূর হ'তে চাই। না-হয় কম দিনই বাঁচ্‌ব, খুবই কম দিন, কিন্তু যে-ক'টা দিন এই দুনিয়াতে রয়েছি, সে-ক'টা দিন জীবনের উচ্ছল স্রোতে গা ভাসিয়ে চল্‌তে চাই!'

যক্ষ্মারোগীর এই রহস্যে ভরা প্রলাপ শুন্‌তে শুন্‌তে ডাক্তার নীতার মুখের দিকে তাকালেন—জীবনের আকাঙ্ক্ষায় এত উদ্বেল, এত সুন্দর,—এত ভঙ্গুর! দেখ্‌তে দেখ্‌তে সারাটা দিনের ক্লান্তি ও কতজনের রোগ-যন্ত্রণা দেখার করুণ সহানুভূতির অবসাদের পর, এতদিনের শুষ্ক ও পাথর-চাপা তাঁর মন, আজ হঠাৎ যেন খুলে গেল ও নিঃসীম বেদনায় ভ'রে উঠ্‌ল এই তরুণীর জন্য,—যে আজ মরণকে আবাহন করছে, তাকে সাগ্রহে জড়িয়ে ধর্‌তে যে চায়—কারণ, জীবনের কোনো সম্পদই যে সে ছাড়তে রাজী নয়!

নীতার প্রলাপ আবার সুরু হ'ল—'আপনি কি এই-সব ছাড়তে পারতেন, ডাক্তারবাবু? ছাড়্‌তেন কি আপনি জীবনের এই সব সম্পদ্, জয়যাত্রা ও আনন্দ। ছাড়তে কি পার্‌তেন?'

রোগিণীর দিকে তিনি তাকালেন। সে দৃষ্টি যেমন রহস্যে ভারাতুর তেমনি শান্তিতে সংহত। অবিচলিত কণ্ঠে বল্‌লেন—'হ্যাঁ, আমি পার্‌তাম। আমি পেরেছি।'

ওঁর এই ছোট্ট উত্তর নীতাকে গভীর বিস্ময়ে আচ্ছন্ন করল। নির্ব্বাক্ আবেদনে তার সুন্দর চোখদুটি আকুল হয়ে উঠ্‌ল।

'জান কি তোমার মত রোগে যখন পড়ি তখন আমার বয়স কত?'

'আপনার অসুখ? আপনার?'—অবাক্ হয়ে সে শুধাল।

'বয়স যখন তেইশ, তখন এই একই রোগে ধরল আমায়। ডাক্তারী পড়তে আমি কল্‌কাতায় আসি, চার বছর ধ'রে থাকি সেখানে। জ্ঞান-লাভের কি অসীম উৎসাহ ও অন্তহীন আকাঙ্ক্ষা—তাতেই যেন আমি একেবারে ডুবে থাক্‌তাম। শিক্ষকেরা অনেক-কিছুই আশা করতেন আমার কাছে। শ্রান্তিহীন অধ্যয়ন ও একনিষ্ঠ সাধনার ফলে বিজ্ঞানের কোনো একটা বড় রহস্যের দুয়ার আমার কাছে খুলে যাবে, এই আশায় আমার সকল শ্রম মধুর হয়ে উঠ্‌ত।…হঠাৎ একদিন শীতের সন্ধ্যায় জোর এক পশলা বৃষ্টিতে গেলাম ভিজে। তার পরদিনই ফুস্‌ফুসের প্রদাহ। তার পর ক-দিন ধ'রে রক্ত ওঠা, সঙীন অবস্থা। যা-হোক, মরণের হাত থেকে কোনো রকমে সেবার ত বাঁচ্‌লাম, কিন্তু ছ-মাস পরে, তেইশ বছর বয়সে, আমার হ'ল যক্ষ্মা। যাঁরা আমার শুশ্রূষা করছিলেন তাঁরা চেষ্টা করলেন আমাকে ভুলিয়ে রাখ্‌তে। কিন্তু নিজে ডাক্তার, কাজেই দিন যে ঘনিয়ে আস্‌ছে তা বুঝ্‌তে কষ্ট হ'ল না বিশেষ। হাওয়া-বদ্‌লানোর জন্যে একজন এখানে আসতে পরামর্শ দিলেন আমাকে—ছ-মাস, কি বছরখানেকের জন্যে। জ্বরে মুহ্যমান, রক্তক্ষয়ে ক্ষীণ, অনিদ্রায় কাতর, আহারে অনাসক্ত—এক কথায়, নৈরাশ্যের যত-কিছু উপাদান সঙ্গে ক'রে আমি আসি এখানে। আজ আমার বয়স হ'ল আটচল্লিশ। পঁচিশ বছর ধ'রে এখানে রয়েছি, একটিবারের জন্যেও নামিনি।'

'একবারও না? একটি বারও না?' আশ্চর্য্য হয়ে নীতা জিজ্ঞাসা করল; কথাটা ভাবতেও তার মনটা যেন পর্য্যন্ত আলোড়িত হয়ে উঠ্‌ল।

'না। পঁচিশ বছর আগে এ জায়গাটা ছিল একেবারে জনহীন, জঙ্গল। কেমন যেন ভয়ার্ত্ত, বিষাদে ভারী। কোনোরকম যানবাহন, কোনো আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা, সভ্যতা ও রুচিসঙ্গত কোনো বিলাসের উপকরণই মিল্‌ত না তখন। নিঃসীম শব্দহীন দিগন্ত। ফুলে ফুলন্ত, সব প্রসারিত সানুদেশ। মানুষের পদচিহ্ন পড়েনি এমন সব পাহাড়,—সুন্দর ও ভয়ঙ্করের অপূর্ব্ব সমাবেশ!…অবস্থা ছিল বিশেষই খারাপ, কাজেই চাষীদের একটি ছোট্ট কুঁড়েঘরই হ'ল আমার আস্তানা। খাওয়া ছিল দুধ, তাজা সব্‌জি ও ফলমূল। কেউ এমন ছিল না যার সঙ্গে দুটো কথা বলি—তখনকার দিনেও লোকেরা এ-সব রোগীকে এড়িয়েই চল্‌ত। উঁচুনীচু পায়ে-চলা পথ দিয়ে পাহাড়ের গায়ে গায়ে একলাই বেড়াতাম, শ্রান্ত হ'লে ছিল ঝরণার জল, বরফের মত ঠাণ্ডা। পাহাড়ি ফুল কুড়িয়ে কুড়িয়ে ফির্‌তাম, তাদের মিষ্টি গন্ধে আমার ছোট্ট ঘরটি ভরে থাক্‌ত। পড়াশুনাও ছিল একটু আধটু। শীতকালে হিম ও তুহিনের মধ্যে আমার বন্দী অবস্থা দুঃসহ হয়ে উঠত, ব'সে ব'সে একেবারে ক্লান্ত হ'য়ে পড়ে সেই দারুণ কন্‌কনে ঠাণ্ডার মধ্যেই বেরিয়ে পড়তাম। বছর-খানেক পরে অসুখ গেল সেরে। ঝলমলে রোদ, ঝির্‌ঝিরে বাতাস, ঝরণার মিষ্টি জল, সরল শুদ্ধ জীবন, স্নিগ্ধ শান্তিদায়ী নির্জ্জনতা, সুগভীর অন্তর্মুখী দিনযাত্রা, সৃষ্টির প্রারম্ভ থেকে এই-সব প্রাচীন পাহাড়ের মধ্যে প্রাণশক্তির যে-সব সম্পদ প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে, যা শুধু বিনতি এবং যথার্থ স্বাস্থ্য-সন্ধানীর কাছে ধরা দেয়—এই সব মিলে আমাকে বাঁচিয়ে তুল্‌ল। তারপর এ জায়গা আমি ছাড়িনি; আর সবই আমি ছেড়েছি।'

নীতা সাগ্রহে সব শুনল, মুখে তার কথা নেই, চোখে অশ্রুর আষাঢ় ঘনিয়ে এল।

'যত-কিছু আনন্দ, যত-কিছু আমোদ, সমস্ত লাভের আশা ছাড়তে হয়েছে আমাকে। বিজ্ঞানের রাজ্যে কোনো নিহিত রহস্য আবিষ্কার ক'রে হয়ত আমি সমস্ত পৃথিবী চকিত ক'রে দিতাম। আজও যা অজানা, তেমন কোনো তথ্য হয়ত চিরদিনের জন্য আমার নামের সঙ্গে জড়িয়ে যেত, সমগ্র মানবজাতির কৃতজ্ঞতা অর্জ্জন আমি করতাম। প্রসিদ্ধি, সম্মান—সবই আমার দুয়ারে আস্‌ত—সবই আমি ছেড়েছি। কেউ হয়ত আমাকে ভালবাস্‌ত, আমিও ভালবাসতাম কারুকে—আপনার-চেয়েও-আপনার পুত্রকন্যার কলরবে সংসার আমার মুখর হয়ে উঠত—এ সবই ছাড়তে হয়েছে নীতা! রাজধানীতে হয়ত কর্ম্মক্ষেত্র হ'ত আমার, হয়ত বেরোতাম পৃথিবী-পরিভ্রমণে—অজানা

কত দেশ, দূরের কত মানুষ দেখতাম। সবই আমাকে ত্যাগ করতে হয়েছে। দেখতে গেলে শেষ পর্য্যন্ত আমার বলতে আছে কি? আজ আমার পরিচয়ই বা কি? হতভাগ্য যক্ষ্মারোগীদের হতভাগ্য ডাক্তার! এখানে ওখানে এক আধজনের পরমায়ু যথাসম্ভব বাড়ানোর চেষ্টা—এই-ই হ'ল আমার একমাত্র কাজ। পঁচিশটি বছর ধ'রে এই একই জায়গায় রয়ে গেছি—একটিবারের জন্যেও আর কোথাও যাইনি। আমি একেবারে একলা—আমাকে ভালবাসার কেউ নেই, আমিও ভালবাসি না কারুকে। আমার না আছে বিত্ত, না আছে গৌরব, না আছে প্রেম, না আছে পুত্রপরিজন!'

'কেন. এমনটা হ'ল? কেন?—' নীতা ব্যাকুল হয়ে শুধাল।

'কারণ, মানুষকে বাঁচতেই হবে—যতদিন সম্ভব; কারণ মানুষকে মরতে হবে, যত দেরিতে সে পারে—কারণ, বুঝলে লক্ষ্মী, মৃত্যুর সঙ্গে যুঝতে হবে তাকে।

'কিন্তু এই যে কঠোর ত্যাগ, এতে কি আপনার কষ্ট হয়নি? যা আপনার মেলেনি, যা আপনি আজ পাচ্ছেন না, তার জন্যে কি আপনার খেদ নেই?'

'এককালে এজন্যে আমার দুঃখ ছিল দুঃসহ, কষ্টের আর অন্ত ছিল না। এই সব পাহাড়, এই যে বন—এরা আমার সেদিনের চোখের জলের সাক্ষী। কিন্তু কিছুকাল পরে আমার সকল খেদের অবসান হ'ল।...এখন আমার যে কাজ তাই আমার জীবনের পাত্র মাধুর্য্যে ভরিয়ে রেখেছে। যদি কোনো অক্ষম পঙ্গু প্রাণীকে মরণের মুখ থেকে ছিনিয়ে নিতে পারি, তাহ'লে সে মধুর আত্মপ্রসাদের আর তুলনা নেই। ব্যস, এই পর্য্যন্তই, এর বেশী কিছু নয় আর। অনেক ছাড়তে হয়েছে, কিন্তু তার ক্ষতিপূরণেও ত কম-কিছু মেলেনি! তাই ত বলছি ছাড় নীতা, ছাড় তোমার ঐ সব উদ্দাম আনন্দ—যা শুধু মরণের দুর্ব্বার স্রোতে টেনে নিয়ে চলেছে তোমাকে। দু-এক বছর ধ'রে প্রকৃতির অবারিত এই সৌন্দর্য্যের ভাণ্ডার থেকে আহরণ কর জীবনের পাথেয়! এর প্রশান্ত প্রসন্নতার সুরে সুর মেলাও! এই আকাশ বাতাস, মেঘ, ওই আকাশ-ছোঁয়া পাহাড়, দূরের ওই অনন্ত তুষারশ্রেণী, নীচের ওই ছোট্ট নদীটি, ঘন দেওদার বন, মিষ্টি গন্ধ কত ঘাসের ফুল! মনের সঙ্গে মিতালি ক'রে এইখানে থেকে যাও, জীবনের ধারা অন্তর্মুখী কর। দেখচ না কি লক্ষ্মী? এই যে সুন্দর দেশ—এখানে এসে জুটেছে যত আমোদপিপাসু বিলাসী লোকের দল, তাতে করে যারা রুগ্ন, অসমর্থ, যারা এই পাহাড় পর্ব্বত যথার্থই ভালবাসে, তাদের আর স্থান হচ্ছে না এখানে। হোটেলে, বাংলোয় ছেয়ে গেছে চারিধার, আধুনিক যান-বাহনের দৌরাত্ম্যে এর মহিমা হয়েছে ক্ষুণ্ণ, যত রকমে সম্ভব এর রহস্য-ভরা সৌন্দর্য্য নষ্ট করবার চক্রান্ত চলেছে। কিন্তু তা কি কখনও হবার? এর যা সৌন্দর্য্য, এর যে মহিমা, তা আছে আদিকাল থেকে, থাকবেও অনন্তকাল পর্য্যন্ত। দুনিয়ার কোলাহল থেকে দৃষ্টি ফেরাও, লক্ষ্মী, যারা আমোদ লুটে বেড়াচ্ছে যেতে দাও তাদের। একলাটি তুমি থাক এইখানে—প্রাণশক্তি যেখানে নির্জ্জনে নিরন্তর উৎসারিত হচ্ছে। ভিড়ের খোঁজ আর কোরো না, তাতে খালি তোমার শক্তির অপচয় ও বিনাশ। মিশো না আর ওদের সঙ্গে, এড়িয়ে চল ওদের নিষ্ফল আমোদের উন্মত্ত আবর্ত্ত। পরিহার কর, একেবারে ছেড়ে দাও ওদের! এখানে একলাটি নীরব নির্জ্জনতায় প্রকৃতির কখনও শান্ত কখনও রুদ্র রূপের মধ্যে বাস কর। যুগান্ত ধ'রে এই পর্ব্বতের ভিতর সুস্থ জীবনের যে রহস্য নিহিত রয়েছে, যা শুধু আন্তরিক সাধনায় মেলে—তুমি তা পাবে। একদিকে মৃত্যু, আর একদিকে ত্যাগ। নিজের কথা আমি কবির ভাষায় বলি—

'মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে,
মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।'

'আপনার কথাই মেনে চলব আমি'—নীতা ধীরে ধীরে বলে। ডাক্তার উঠে দাঁড়ালেন। বন্ধুর মত ওর হাতে হাত রাখলেন। 'এই যে কঠোর ত্যাগ, এর পুরস্কারও মিলবে তোমার।'

নীতা তাঁর দিকে চেয়ে রইল—আঁখিতারকায় তার প্রশ্নভরা বিস্ময়।

'তোমাকে যে ভালবাসে ও তুমি যাকে ভালবাস সে যদি অপেক্ষা করতে জানে তাহ'লে তার প্রতীক্ষা ব্যর্থ হবে না।'

নীতার পাণ্ডুর অধরে একটু পরিপূর্ণ পরিতৃপ্তির হাসি ফুটে উঠল।

'আমার নিজের ভাগ্যে এতখানি জোটেনি কিন্তু—' ডাক্তারের স্বর প্রচ্ছন্ন বেদনায় নিবিড়! *

* Mathilde Serao.

পল্লীবধূর পত্র

শ্রীকৃষ্ণধন দে

পুঁই-মাচাতে মেটুলি আজ রাঙা,
কাঁকুড়-শসার ধরছে নূতন জালি,
সন্ধ্যা-সকাল দখিন্ হাওয়ায় ভাসে
আমের বোলের গন্ধটুকুই খালি,
সজ্‌নে-ডালে ফুলের ক'টি কুঁড়ি
মরছে লাজে এসে সবার আগে,
পথের ধারে কেষ্টচূড়োর গাছে
সিঁদুর-পরা ফুলগুলি রাত জাগে।
তুমিই শুধু এলে না আজ ঘরে
ফাগুন-দিনে মন যে কেমন করে!

ঘাটের পথে বেউড়বাঁশের ঝাড়ে
হল্‌দে পাখী—ঐ যে কি তার নাম,
কেবল আমায় কইতে কথা বলে,
ডাকার তাদের নাইকো যে বিরাম;
কোকিলটা হায় ক্ষেপেই গেল বুঝি
একঘেয়ে সুর গাইছে দিনেরাতে,
বউ-হারা সেই কাঁদছে পাপিয়াটা
'চোখ গেল'টাও জুটেছে তার সাথে;
তুমিই শুধু এলে না আজ ঘরে
ফাগুন-দিনে মন যে কেমন করে!

বনতুলসীর গন্ধ-ছাওয়া ঘাটে
কিসের ব্যথায় চোখ যে জলে ভরে,
বিকাল-বেলায় জল্‌কে এসে হেথা
নিত্যি যে হায়! তোমায় মনে পড়ে;
দিনের চোখে আস্‌ছে নেমে ঘুম,
রঙীন্ রোদে বাঁশের পাতা কাঁপে,
বাতাস যেন জিরিয়ে নিতে চায়
আমার পাশে ব'সে সিঁড়ির ধাপে;
তুমিই শুধু এলে না আজ ঘরে,
ফাগুন-দিনে মন যে কেমন করে!

এই যে আকাশ কতই রঙে ছাওয়া
তোমার চোখে দেয় না ধরা হাঁ গো?
কোন্ প্রবাসে একলা ঘরে শুয়ে
আমার মত সারাটা রাত জাগো?
সেথায় কি হায়! কনকচাঁপার বাসে
ঘুম-হারানো বাতাস বেড়ায় ঘুরে?
সেথায় কি হায়! জ্যোৎস্না-ভরা পথে
রাতের পরী জাগায় নূপুর-সুরে?
তুমিই শুধু এলে না আজ ঘরে,
ফাগুন-দিনে মন যে কেমন করে!

নিশীথ-রাতে কাঁপায় মেঠো হাওয়া
কঞ্চি-ঘেরা নূতন বেড়াটিরে
চম্‌কে উঠে উঠান-পানে চাই,
হয়ত তুমি হঠাৎ এলে ফিরে;
তোমার-দেওয়া শুকনো বকুলমালা
নিত্যি রাতে বক্ষে ধরি চেপে,
পথিকজনের পায়ের ধ্বনি শুনে
বুকটা যেন আশায় ওঠে কেঁপে;
তুমিই শুধু এলে না আজ ঘরে,
ফাগুন-দিনে মন যে কেমন করে!

হায় রে আপিস্! হায় রে পোড়া কাজ!
এমন দিনে একটু ছুটি নাই;
শনিবারের পথটি চেয়ে চেয়ে
কাট্‌ল বৃথা সারা-ফাগুনটাই।
এই চিঠিটায় মনের কপাট খুলে
জানিয়ে দিলাম গোপন ব্যথা যত
ফাগুন যে আজ আগুন হয়ে জ্বলে,
বুকের তলে জাগায় আশা শত!
তুমিই শুধু এলে না আজ ঘরে,
ফাগুন-দিনে মন যে কেমন করে!

অন্নসমস্যা—বাঙালীর অপারকতা ও শ্রমবিমুখতা

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়

(১)

এই অন্নসমস্যার দিনে জীবিকানির্ব্বাহক্ষেত্রে বাঙালীর পরাজয়ের কথা গত বিশ পঁচিশ বৎসরের মধ্যে আমি বার-বার আলোচনা করিয়াছি। বাঙালী কেবল ইউরোপীয় বা চীনা-জাপানীর সহিত নহে, ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের লোকের সহিত প্রতিযোগিতায়ও সর্ব্বত্র পরাস্ত হইতেছে। বর্ত্তমান সময়ে অন্নসমস্যা যে-প্রকার ভীষণ হইতে ভীষণতর হইয়া উঠিতেছে, তাহাতে মনে হয় বাঙালী যদি প্রাণপণ করিয়া অন্তত তাহাদের নিজের দেশে নিজের অন্নসংস্থান করিতে না পারে, তাহা হইলে তাহার আর কোন ভরসা নাই। বাঙালী জাতির অস্তিত্বও ধরাপৃষ্ঠ হইতে লোপ পাইতে পারে এ আশঙ্কাও নিতান্ত অমূলক নয়।

আলোচ্য প্রবন্ধে চোখে আঙুল দিয়া দেখাইব কেমন করিয়া নানা প্রদেশের অ-বাঙালীরা এই কলিকাতা শহরে কেবল মাত্র জুতার ব্যবসা করিয়া বৎসরে কম পক্ষেও সওয়া কোটী টাকা রোজগার করিয়া নিজেদের দেশে লইয়া যাইতেছে। ইহারা সামান্য মূলধন লইয়া ব্যবসা আরম্ভ করে, কিন্তু অধ্যবসায় এবং ধৈর্য্যের বলে প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করে।

গত অক্টোবর মাসে ষ্টেট্‌স্‌ম্যান পত্রিকার একটি সংবাদে জানা যায় যে, কলিকাতার কয়েক সহস্র পশ্চিমা চামার ধর্ম্মঘট করিয়া ময়দানে মনুমেণ্টের নীচে এক সভা করে। কলিকাতার কসাইতলা অর্থাৎ বেণ্টিঙ্ক ষ্ট্রীটে চীনা জুতাওয়ালাদের অধীনে প্রায় আট দশ হাজার পশ্চিমা চামার কাজ করে। ইহারা গড়ে প্রত্যেকে ৮০ হইতে ১৲ দিন-মজুরি পায়। যাহারা জুতার উপরের সাজ প্রস্তুত করে, তাহাদের দিন-রোজগার ১।০। এই হিসাবে দেখা যায়, ইহারা মাসে রোজগার করে প্রায় আড়াই লক্ষ টাকা, অর্থাৎ বছরে প্রায় ৩০ লক্ষ টাকা! এই ত গেল চীনাদের নিযুক্ত পশ্চিমা চামারদের কথা। ইহা ছাড়া টেরিটি বাজারে আমার বাল্যকাল হইতে দেখিতেছি তোতা, লাকচেঁদি, লালচাঁদ প্রভৃতি বড় বড় জুতাওয়ালাদের কারখানা আছে। সমগ্র উত্তর-কলিকাতা ব্যাপিয়া বহুশত পশ্চিমা জুতাওয়ালাদের ছোট ছোট কারখানাও আছে। এই সকল কারখানাতেও কয়েক হাজার পশ্চিমা কারিগর কাজ করে। এই সব ছোট ছোট জুতার কারখানার মালিকেরা এবং তাহাদের কারিগরগণ কম হইলেও বছরে আটত্রিশ লাখ টাকা রোজগার করে। তাহা হইলে দেখা যায় যে, সমস্ত পশ্চিমা চামার ও জুতা-ব্যবসায়িগণ বৎসরে প্রায় আটষট্টি লাখ টাকা আয় করে। ইহা ছাড়া কলিকাতার রাস্তায় রাস্তায় শত শত 'সেলাইবুরুষ' দেখা যায়। বাংলা দেশের প্রত্যেক জেলায় এবং মহকুমায় পর্য্যন্ত ইহাদের ছড়াছড়ি। এই সকল অ-বাঙালী চামার কারিগরগণ বাংলা দেশে আসিয়া নিজেরা পেট ভরিয়া খাইবার সংস্থান করিতেছে, সঙ্গে সঙ্গে বেশ দু-পয়সা জমাইয়া নিজের নিজের দেশেও পাঠাইতেছে। কিন্তু বাঙালী মুচিরা একমুঠা ভাতের-জন্য হাহাকার করিয়া মরিতেছে।

পূর্ব্বে কেবল চীনা জুতাওয়ালাদের কারিগরদের আয়ের কথা বলা হইয়াছে। ইহারাই যদি বৎসরে ত্রিশ লক্ষ টাকা পায়, তবে জুতাওয়ালারাও কম পক্ষে বৎসরে ষাট লক্ষ টাকা লাভ করে। চীনা জুতা-ব্যবসায়ীরা নিজেরাও কারিগর, এমন কি, তাহাদের স্ত্রীলোকেরাও ব্যবসায়ে পুরুষদের বিবিধ প্রকারে সাহায্য করে। ইহারা সমস্ত দিন ছাড়া রাত্রিতেও অনেক সময় কার্য্যে নিযুক্ত থাকে।

কলিকাতার ট্যাংরা অঞ্চলে চীনা এবং জাঠ মুসলমানদের বহু ছোটখাট ট্যানারি আছে। এই সকল

ট্যানারির মালিকদের মাসিক আয় গড়ে ২৫০৲ হইতে ৫০০৲ পর্য্যন্ত। এই সকল ট্যানারিতেও শত শত পশ্চিমা চামার আছে।

মোটের উপর দেখা যায় যে, এই সকল চীনা এবং অন্যান্য অ-বাঙালী ব্যবসায়ী ও চামারগণ বৎসরে দেড় কোটী টাকারও বেশী রোজগার করিতেছে।

কলিকাতার বাহিরে বাংলা দেশের প্রায় সর্ব্বত্র এবং পশ্চিমাঞ্চলের বহু স্থানে যে-সকল জুতা ব্যবহার হয়, তাহার অধিকাংশেরই প্রস্তুতকারক চীনা এবং ব্যবসায়ীও চীনা। ব্যবসায়ের লাভেরও শতকরা অন্তত ৪০৲ টাকা ইহারা পায়।

পূর্ব্বে যাহাকে সেলাইবুরুষ বলিলাম ইংরেজীতে তাহাকে "কব্‌লার" বলে। "কব্‌লার" এবং "শু-মেকারে" কি তফাৎ তাহা বোধ হয় সকলেই জানেন। শ্রীরামপুরের মিশনরী উইলিয়াম কেরীর নাম সর্ব্বজনবিদিত। ১৮০০ খৃষ্টাব্দে যখন লর্ড ওয়েলেস্‌লি সিভিলিয়ানদের বাংলা ভাষা শিক্ষা দিবার জন্য ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ স্থাপন করেন, তখন উইলিয়াম কেরী উক্ত কলেজে বাংলাভাষার অধ্যাপক নিযুক্ত হন। একদা লাটসাহেব অন্যান্য বহু ইংরেজ সদস্যের সঙ্গে কেরী সাহেবকেও ভোজে নিমন্ত্রণ করেন। ভোজে নিমন্ত্রিত একজন আভিজাত্যাভিমানী ব্যক্তি পার্শ্বস্থ আর একজনের কানে ফিস্ ফিস্ করিয়া বলেন যে, "এই কেরী না একজন 'শু-মেকার' ছিলেন?" কেরী সাহেব এই কথা শুনিতে পাইয়া বলিয়া উঠিলেন, "আপনি আমার প্রতি অবিচার করিবেন না, আমি 'শু মেকার' ছিলাম না, ছিলাম একজন সামান্য 'কব্‌লার' মাত্র!" ("I was never a shoe maker—but a cobbler").

সোভিয়েট রুশিয়ার বর্ত্তমান হর্ত্তাকর্ত্তা বিধাতা, যিনি এখন লেনিনের পদে অভিষিক্ত, তাঁহার নাম ষ্টালিন। ইঁহার একজন জীবনীলেখক বলেন যে, "at one time he used to cobble shoes।" ইউরোপ এবং আমেরিকার ইতিহাস পাঠে জানা যায় বহু ব্যক্তি সামান্য "সেলাইবুরুষ" হইতে দেশের রাষ্ট্রে উচ্চ স্থানে আরোহণ করিয়া সর্ব্বজনমান্য স্থান অধিকার করিয়াছিলেন।

আমাদের দেশের পরম দুর্ভাগ্য যে, অনাহারে প্রাণ বিসর্জ্জন পর্য্যন্ত করিবে কিন্তু লোকে এমন পরম লাভজনক চর্ম্ম এবং জুতার ব্যবসায় অবলম্বন করিতে পারে না। স্বাধীনভাবে তাহারা যেখানে মাসে দুই তিন শত টাকা উপার্জ্জন করিতে পারে, সেইখানে তাহারা সামান্য কুড়ি পঁচিশ টাকার কেরানীগিরি যোগাড় করিতে পারিলে নিজেদের ধন্য মনে করে। এখন দুই চারিজন ভদ্রলোক এই চর্ম্মব্যবসায়ে নামিয়াছেন, কিন্তু যথোপযুক্ত চেষ্টা এবং অধ্যবসায় না থাকায় চীনা ইত্যাদি অন্য জাতীয় ব্যবসায়ীদের সহিত পারিয়া উঠিতেছেন না। কিন্তু হাল ছাড়িয়া দিলে চলিবে না, চেষ্টা করিতে করিতে ক্রমশ তাঁহারা অন্য জাতীয় ব্যবসায়ীদের সহিত সমানে পাল্লা দিতে পারিবেন, ইহা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

ঢাকা শহরের রমনা অঞ্চলে বহু চামার-জাতীয় লোক বাস করে, ইহারা অর্দ্ধাশনে দিনযাপন করে, কখন কখনও বা ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করে। কিন্তু এই ঢাকা শহরেই বহুশত পশ্চিমা সেলাইবুরুষ বেশ দু-পয়সা রোজগার করে। বাঙালীর ব্যর্থতা আর অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই। যাহারা চোখে দেখিয়া ঠেকিয়াও শেখে না, তাহাদের কোনো আশা নাই।

যত প্রকার শিল্প আছে, চর্ম্মশিল্প যে তন্মধ্যে একটি অতি প্রয়োজনীয় শিল্প, সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই। এই শিল্পের প্রয়োজনীয়তা বাস্তব জগতে যে কত, তাহা অল্প-বিস্তর সকলেই অবগত আছেন। গত মহাযুদ্ধে এই চর্ম্মই আহার ও পানীয়ের আধাররূপে ব্যবহৃত হইয়া হাজার হাজার ক্ষুধিত ও তৃষিত ব্যক্তির প্রাণরক্ষা করিয়াছে। বস্ত্রশিল্প যেমন লজ্জা নিবারণের জন্য জগতে আবশ্যকীয়, চর্ম্মশিল্পও তেমনি নানা প্রয়োজনে আবশ্যকীয়। বস্ত্রশিল্প অপেক্ষা এই চর্ম্মশিল্প যে কোনও প্রকারে ন্যূন তাহা নয়। দেশের ধনাগম হিসাবে বিবেচনা করিলেও এই অবজ্ঞাত ব্যবসায়কে উচ্চ স্থান দিতে হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, বাংলায় এই শিল্প ও ব্যবসায় চিরকালই ঘৃণিত ও উপেক্ষিত হইয়া আসিয়াছে।

চামড়ার দুইটি বিশেষ গুণ আছে, যাহার জন্য ইহা নিত্যনৈমিত্তিক কার্য্যে বিশেষ প্রয়োজনীয়। (১) ইহা ক্ষণভঙ্গুর নয়; (২) ইহা অতি নমনীয় (flexible) অথচ স্থায়ী। দেশের শিল্পোন্নতির উপরই দেশের প্রকৃত উন্নতি নির্ভর করে। চর্ম্মশিল্প ও ব্যবসায় দ্বারা দেশে কিরূপ অর্থাগম হইতে পারে তাহা বিবেচনা করিলে এই শিল্পকে এই ভীষণ অন্নসমস্যার দিনে ঘৃণা ও উপেক্ষা করা যায় না।

আজ চৌদ্দ পনের বৎসর হইল আমাদের দেশে এই শিল্পের কিছু উন্নতি হইয়াছে। বাংলায় এক ন্যাশন্যাল ট্যানারি ভিন্ন বাঙালীর মূলধনে এবং বাঙালীর দ্বারা চালিত আর দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য কারখানা নাই। কাঁচড়াপাড়ায় জনৈক মাদ্রাজীর একটি উল্লেখযোগ্য কারখানা আছে। সম্প্রতি নোয়াখালীতে একটি কারখানা হইয়াছে। টালিগঞ্জে জনৈক মুসলমানের একটি বড় কারখানা আছে (জলন্ধর ট্যানারি)। বাংলা সরকার বাঙালীর ঘৃণিত ও উপেক্ষিত এই শিল্পের শিক্ষা বিস্তারের জন্য একটি বেঙ্গল ট্যানিং ইনষ্টিটিউট করিয়াছেন, ইহাতে দেশের প্রকৃত উপকার হইয়াছে। ইহার পূর্ব্বে এরূপ শিক্ষা পাইবার স্থান না থাকায় জনসাধারণ এই শিল্প সম্বন্ধে একেবারে অন্ধ ছিল, এবং এই শিল্পও উন্নত হইবার সুবিধা পায় নাই। বর্ত্তমানে বহু ভদ্রসন্তান জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে সেখানে শিক্ষালাভ করিয়া চর্ম্মশিল্প ও চর্ম্মব্যবসায়ে মন দিয়াছে। এই ভীষণ অন্নসমস্যার কালে ইহার দ্বারা বেকার সমস্যার কতটা সমাধান হইতে পারে, নিম্নে তাহার একটা মোটামুটি হিসাব দিলাম।

১। কাঁচা চামড়ার ব্যবসায়।—বহু মুসলমান ও ইংরেজ ধনী মফঃস্বলে লোক পাঠাইয়া স্থানীয় চামারদের নিকট হইতে অতি অল্প মূল্যে চামড়া কিনিয়া মজুত করে। পরে ভারতের বাহিরে রপ্তানি করিয়া লক্ষ লক্ষ টাকা উপার্জ্জন করে। এই প্রকার কাঁচা চামড়ার ব্যবসায়ী অধিকাংশই লক্ষপতি। বর্ত্তমানে আমেরিকা, জার্ম্মেনি, ইংলণ্ড প্রভৃতি স্থানে এই শিল্পের কিরূপ উন্নতি হইয়াছে, তাহা সামান্য লিখিয়া ব্যক্ত করা যায় না। কিন্তু ঐ সমস্ত দেশকে কাঁচা চামড়ার জন্য আমাদের দেশের চামড়ার উপর একান্ত নির্ভর করিতে হয়। বৎসরে আমাদের দেশ হইতে প্রায় কয়েক কোটী টাকার কাঁচা চামড়া রপ্তানি হয়।

কোনো বেকার বাঙালী সামান্য মূলধন লইয়া অন্ততঃ তাঁহার গ্রামের কাঁচা চামড়াগুলি সংগ্রহ করিয়া রপ্তানিওয়ালা ধনীদের নিকট বিক্রয় করিয়া তাঁহার নিজের বেকার ও অন্নসমস্যার সমাধান করিতে পারেন। তবে ইহাতে জাত্যভিমান ত্যাগ ও কষ্ট-সহিষ্ণুতা চাই, যাহা বাংলার যুবকদের মধ্যে দুর্ল্লভ।

২। কাঁচা চামড়া পাকাইবার ব্যবসা।—ভাল একটি কারখানা করিতে অনেক টাকার দরকার। সুতরাং সে-কথা এখন থাক। অল্প মূলধনে যাহা হইতে পারে, যাহাতে বেকার সমস্যার সমাধান হইতে পারে তাহাই আলোচনা করা আমার উদ্দেশ্য। অস্তরের (lining) জন্য যে চামড়ার দরকার হয়, তাহা করিতে কলকব্জার দরকার হয় না, মূলধনও খুব বেশী লাগে না। অল্প করিয়া ছাগল অথবা ভেড়ার চামড়া কিনিয়া (দেশের গ্রাম হইতে যোগাড় করিয়া আনিলে পড়তায় আরও কম পড়ে) হাত-পাকাই করিয়া (ক্রোম অথবা ছাল দ্বারা) দিলে বিক্রয়ের জন্য আদৌ ভাবনা হয় না। ব্যাপারীরা সন্ধান করিয়া গিয়া নগদ মূল্যে উহা লইয়া আসে। ঐ প্রকারে ফুটবল লেদার, সুটকেস লেদার, হুড লেদার, হুডবার্নিস্ লেদারও প্রস্তুত হইতে পারে, তবে ইহার প্রস্তুত-প্রণালীর শিক্ষা সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন। কলিকাতায় এইরূপ শিক্ষা পাইবার একমাত্র স্থান বাংলা সরকারের বেঙ্গল ট্যানিং ইনষ্টিটিউট। উহার বিস্তৃত বিবরণ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের নিকট পাওয়া যায়।

৩। জুতা প্রস্তুত।—যাহাদের মূলধন অল্প তাহাদের পক্ষে বাড়ি বাড়ি বা আপিস ঘুরিয়া অর্ডার সংগ্রহ করিয়া অর্ডার অনুপাতে চার পাঁচটি কারিগর রাখিয়া জুতা প্রস্তুত করিলে অর্থকষ্টের মোচন হয়। নিয়মিতভাবে কাজ করিলে প্রত্যেক কারিগর রোজ এক জোড়া করিয়া জুতা প্রস্তুত করিতে পারে। চারটি

কারিগর রাখিলে প্রত্যহ চার জোড়া জুতা প্রস্তুত হইতে পারে। প্রত্যেক জোড়ায় এক টাকা করিয়া লাভ রাখিলে দৈনিক ৪৲ টাকা করিয়া উপার্জ্জন হয়। সঙ্গে সঙ্গে ঐ চারটি কারিগরের সংসারও প্রতিপালিত হয়। গড়ে প্রত্যেক কারিগর খুব কম পক্ষে মাসিক ২৫৲ উপায় করিতে পারে এবং নিয়মিতভাবে কাজ করিলে কোনো ভাল কারিগর মাসে ৪০৲ পর্য্যন্তও উপায় করিতে পারে। কিন্তু হতভাগারা মদ খাইয়া তাহাদের উপার্জ্জনের অর্দ্ধেক নষ্ট ত করেই, তাহা ছাড়া নেশা করিয়া, কাজ কামাই করিয়া, নিয়মিতভাবে কাজ করিলে যাহা উপার্জ্জন করিতে পারে তাহার এক-তৃতীয়াংশ হইতে বঞ্চিত হয়। একটি ভাল জুতার কারিগর নেশা না করিয়া নিয়মিতভাবে কাজ করিলে আমাদের শিক্ষাপ্রাপ্ত কিন্তু অন্নকষ্টজর্জ্জরিত যে-কোনো গ্রাজুয়েট অপেক্ষা অধিক উপার্জ্জন করিতে পারে। জুতার সাইজ এবং কারিগরি হিসাবে জোড়া-প্রতি আট আনা হইতে দুই টাকা পর্য্যন্ত মজুরি পাওয়া যায়। এইরকম প্রতি জোড়ায় এক টাকা লাভ রাখিলে জুতার দাম যে বাজার দর অপেক্ষা খুব বেশী হয় তাহা নহে অথচ জিনিষটি ভাল হয়। এইরূপে বাড়িতে বাড়িতে, আপিসে আপিসে অর্ডার লইয়া কত চীনা নিজেদের পরিবারের গ্রাসাচ্ছাদন নির্ব্বাহ করিতেছে।

এ কারবারের মস্ত একটি অসুবিধা যে কারিগরদের দাদন দিতে হয় এবং অনেক সময় কারিগর এই দাদন লইয়া কিছুদিন কাজ করিয়া পলাইয়া গিয়া অন্য স্থানে নূতন দাদন লয়। অথচ দাদন না দিয়াও উপায় নাই, কারণ কারিগর রাখিলেই দাদন দিতে হইবে,—উহা একটা প্রথা এই প্রকারের জুতার কারবার কেন যে ফেল হয় তাহার একটি প্রধান কারণ এই। এমনও আজকাল দেখা যাইতেছে যে, চীনামুল্লুক হইতে নবাগত চীনা মাত্র দুই একটি এদেশী কারিগর সহকারী স্বরূপ লইয়া, নিজেরা স্ত্রীপুরুষে কাজ করিয়া স্বচ্ছন্দে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে। এ-প্রকার চীনাদের কোনো দোকান নাই, একটি মাত্র ঘর ভাড়া লয় এবং সেই ঘরই তাঁদের কারখানা, খাইবার স্থান এবং বাসস্থান। এমন কষ্টসহিষ্ণু এবং স্বল্পতুষ্ট জাত দেখা যায় না। দেখিতে ক্ষীণকায় হইলেও তাহাদের স্বাস্থ্য বেশ ভাল। সর্ব্বদাই কর্ম্মে ব্যাপৃত থাকে বলিয়া তাহারা যেন সর্ব্বদাই আনন্দসাগরে ডুবিয়া আছে বলিয়া মনে হয়।

৪। জুতার কারবারের মত সুটকেস্, এটাশেকেস্, হোল্ড-অল্, ডাক্তারী বাক্স, বেল্ট, বেডবাইণ্ডার প্রভৃতির কারবার অল্প মূলধন লইয়া এবং অল্প কারিগর লইয়া চলিতে পারে। অল্প মূলধনে ঐ প্রকার খুচরা অর্ডারি কাজই চলে কিন্তু তাহাতে যে-কোন লোক তাহার সংসার ভরণ-পোষণ করিতে পারে।

৫। আর একটি কারবার আছে তাহাতেও এমন কিছু মূলধনের দরকার হয় না। উহা জুতার উপরকার অংশ তৈয়ারী। মাত্র একটি জুতা সেলাইয়ের কল থাকিলেই হয় এবং তাহাও কিস্তিবন্দিতে পাওয়া যায়। এই প্রকার সাজ প্রস্তুত করিয়া স্বাধীনভাবে দৈনিক ন্যূনকল্পে ৪৲ টাকা উপার্জ্জন করা যায়। জুতার সাজ প্রস্তুত করিয়া কত শত চীনা স্বাধীনভাবে জীবিকার্জ্জন করিতেছে। স্বাধীন জাত না হইলে স্বাধীনতার কদর বুঝে না, তাই পরাধীন আমাদের এত দৈন্য। চীনারা যে জুতা সস্তায় দিতে পারে তাহার অন্যান্য কারণ ছাড়াও আর একটি প্রধান কারণ এই যে, তাহারা তাহাদের স্ত্রীজাতির নিকট হইতে অর্থোপার্জ্জন-ক্ষেত্রে বিশেষ সাহায্য পায়। স্ত্রীপুরুষে ক্ষমতানুযায়ী সমানভাবে পরিশ্রম করে বলিয়া তাহাদের আমাদের মত এত দরিদ্রতার পেষণে নিষ্পেষিত হইতে হয় না। অনেক সময় চীনা নারীরা জুতার সাজ প্রস্তুত করিয়া তাহাদের ব্যবসায়ের জন্য অর্থের সুবিধা করে। ঐ সাজ প্রস্তুত করার জন্য কোন কারিগর রাখিলে ন্যূনকল্পে ৬০৲ টাকাও দিতে হইত। সুতরাং ঐ ৬০৲ টাকাই তাহাদের ব্যবসায়ের জন্য বাঁচে, অর্থাৎ এই প্রকার সাজের কাজ করিয়া চীনা-গৃহিণীরা দৈনিক ২৲ করিয়া উপায় করিতে পারে। ইহা ছাড়া তাহাদের সাংসারিক গৃহস্থালীর কাজ ত আছেই। বর্ত্তমানে আমাদের দেশে নারী শিল্প শিক্ষার জন্য অনেক স্থানে অনেক প্রকার সাড়া দেখা যাইতেছে এবং কোথাও কোথাও বা দু-একটি

প্রতিষ্ঠানও হইয়াছে। ঐ সমস্ত প্রতিষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্য যদি অনাথ স্ত্রীলোককে অর্থোপার্জ্জন করিয়া স্বাধীনভাবে জীবিকার্জ্জন করিবার উপযোগী করাই হয়, তবে তাঁহাদিগকে অর্থকরী শিক্ষা দিবার জন্য যে-সমস্ত ব্যবস্থা আছে তন্মধ্যে এইরূপ সাজ প্রস্তুত অথবা ঐ প্রকার অন্য কোন শিক্ষার ব্যবস্থা হইলে অর্থোপার্জ্জন হিসাবে অতিশয় কার্য্যকরী হইবে, ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। এখানে একটি নজীর না দেখাইয়া থাকিতে পারিলাম না। ভবানীপুরনিবাসী কোন ভদ্রমহিলা মনিব্যাগ তৈয়ারী করিয়া মনোহারী দোকানে বিক্রয় করিয়া গড়ে মাসে চল্লিশ টাকা উপার্জ্জন করেন। সময়াভাবে রন্ধনকার্য্য করিয়া উঠিতে পারিতেন না বলিয়া তিনি একটি পাচক রাখিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার স্বামী একটু অসন্তুষ্ট হওয়াতে তিনি তাঁহার স্বামীকে এই বলিয়া বুঝাইয়াছিলেন যে, পাচক না রাখিয়া নিজে রন্ধন করিয়া তিনি সংসারের যাহা সাশ্রয় করিতেন, পাচক রাখিয়া সেই সময় এইরূপে ব্যবহার করিয়া তিনি তাহার তিন গুণ সাশ্রয় করিতেছেন। ঠিক এইরূপ ধারণা লইয়া অনেক চীনা মহিলা রন্ধনের হাঙ্গাম না করিয়া সেই সময় তাহাদের ব্যবসায়ের কাজ করিয়া অনেক বেশী সাশ্রয় করে। ইহাদের হোটেল হইতে গৃহে খাদ্য পৌঁছাইবার ব্যবস্থা থাকে। অধিকাংশেরই এই ব্যবস্থা দেখিয়া মনে হয় যে হোটেলে যাতায়াতের জন্য যে সময় নষ্ট হইবে সেই সময়টুকু বাঁচাইবার জন্যই বোধ হয় এই ব্যবস্থা। 'Time is money' ইহার তাৎপর্য্য ইহারা যে ভালভাবেই বুঝিয়াছে তাহা সামান্য সামান্য ব্যাপার হইতেই বুঝা যায়। আর একটি মহৎগুণ ইহাদের অধিকাংশের মধ্যে দেখা যায়—সততা। ব্যবসা বাণিজ্য ক্ষেত্রে যে-দুইটি গুণের একান্ত দরকার সেই দুইটি এই জাতিতে বর্ত্তমান। আমার পরিচিত কোনো ব্যক্তি ভুলক্রমে কোনো এক চীনা দোকানে তাহার মনিব্যাগ ফেলিয়া আসে। সে যেখানে যেখানে উহা ভুলিয়া রাখার সম্ভাবনা সেখানে সেখানে অনুসন্ধান করে। এই প্রকারে চীনার ঘরে অনুসন্ধান করিতে গেলে চীনা ব্যাগে কত টাকা আছে জিজ্ঞাসা করে। লোকটির হিসাব ছিল তাহার ব্যাগে কত আছে এবং সে তৎক্ষণাৎ তাহা বলে। লোকটির কথার সহিত টাকার মিল হওয়াতে চীনা দ্বিধা না করিয়া ব্যাগটি তাহাকে ফিরাইয়া দেয়। ব্যাগে তাহার প্রায় পঞ্চাশ টাকা ছিল। এই প্রকার সততার নানা পরিচয় উহাদের কাছে পাওয়া যায়।

পূর্ব্বোক্ত ট্যানারি ব্যতীত কলিকাতা ও শহরতলিতে ছোটবড় প্রায় তিন শত ট্যানারি আছে। ইহার মধ্যে যে-সমস্ত ট্যানারিতে ক্রোম চামড়া প্রস্তুত হয় তাহাদের অধিকাংশের মালিক চীনা। কতকগুলিতে শুধু তলার চামড়া প্রস্তুত হয়, তাহাদের মালিক সবই পাঞ্জাবী। আর কতকগুলিতে বানিশ-করা চামড়া প্রস্তুত হয়, তাহাদের মালিক অধিকাংশই মুসলমান।

বার্নিশ চামড়া এবং তলার চামড়া প্রস্তুত করিতে কলের সাহায্য না হইলেও চলিতে পারে বলিয়া ঐরূপ কোনো কারখানায় যন্ত্রাদি বিশেষ নাই। কিন্তু ক্রোম চামড়া যন্ত্রাদির সাহায্য ব্যতিরেকে হইতে পারে না। সেইজন্য চীনাদের অধিকাংশ কারখানায় কল স্থাপিত আছে। এই সমস্ত কারখানা ট্যাংরা, পাগলাডাঙ্গার দক্ষিণ ভাগ এবং ধাপা অঞ্চলে স্থাপিত। দিনের বেলায়ও সেই সব লোকালয়বিহীন স্থানে যাইতে ভয় হয়, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় কোনো কোনো চীনা মালিক কারখানায় সপরিবারে বাস করে। দেখিলে স্পষ্টই বোধ হয় ইহারা যেন সমস্ত ভুলিয়া শুধু অর্থের জন্য দুর্গম, জঙ্গলপূর্ণ জনহীন স্থানে পড়িয়া আছে। এরূপ একনিষ্ঠ পরিশ্রমশীল জাতি সচরাচর দেখা যায় না। যে-সমস্ত চীনা কারখানায় সপরিবারে আছে সে-সমস্ত কারখানায় মালিকের পরিবারবর্গ প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া কারখানায় কুলিদের কার্য্যের তদারক করে, এমন কি, কার্য্যের প্রণালী পর্য্যন্ত দেখাইয়া দিয়া তাহাদের নিকট হইতে কাজ আদায় করে। ততক্ষণ পুরুষেরা অন্যান্য দরকারী কাজ করিয়া সময়ের সদ্ব্যবহার করিয়া অর্থাগমের সাশ্রয় করে। নেহাৎ যে-সমস্ত কাজ পুরুষ ভিন্ন হইতে পারে না, সেই সব কাজ ব্যতীত অন্য সমস্ত কাজই নারীরা করিয়া থাকে। উহাদের কারখানায় উৎপন্ন চামড়াও

বাজারে সর্ব্বাপেক্ষা সুলভ। এই সমস্ত চামড়া বাজারে চীনাক্রোম্ বলিয়া বিখ্যাত। অধিকাংশ জুতা (শতকরা ৮০ ভাগ) এই চীনাক্রোম্ হইতে প্রস্তুত। কমদামী জুতার চাহিদাই বেশী, কাজেই সেই কমদামী জুতা প্রস্তুত করিতে এই চীনাক্রোম এবং চীনা জুতা প্রস্তুতকারক একান্ত দরকার। এই চীনাক্রোম্ যে শুধু কলিকাতায় কাট্‌তি হয় তাহা নহে, কলিকাতার বাহিরেও চলিত আছে। তবে ভারতের বাহিরে রপ্তানি কখনও হয় না, কারণ, চীনাক্রোম্ উৎকৃষ্ট চামড়া নয়।

চীনাক্রোম্ জুতার উপরকার সাজের জন্য ব্যবহৃত হয়। জুতার তলাকার জন্য যে চামড়া ব্যবহৃত হয় তাহার কারখানাও কলিকাতায় কম নহে। এই সমস্ত কারখানা বালিগঞ্জের নিকটবর্ত্তী ৪নং পুলের নীচেই আছে। ইহাদের মালিক সবই পাঞ্জাবী জাঠ মুসলমান। "বার্ক ট্যান্ড সোল" তৈয়ারির ব্যবসায় ইহাদের একচেটিয়া। একচেটিয়া হইবার একটি কারণ উহারা অত্যন্ত কষ্টসহিষ্ণু। "সোল লেদার" প্রস্তুত প্রণালীও অতিশয় শ্রম এবং সময় সাপেক্ষ। সেই শ্রম একমাত্র পাঞ্জাবীরাই সহ্য করিতে পারে বলিয়া উহারা এই ব্যবসায় একচেটিয়া করিয়াছে। আর কোনো সম্প্রদায়কে এ কাজে দেখা যায় না। ইহাদের কারখানায় প্রস্তুত তলার চামড়া বাজারে ৪নং সোল বলিয়া খ্যাত। কলিকাতার বাজারে যেমন ৮০% জুতার উপরকার সাজের চামড়ার জন্য চীনাক্রোম্ ব্যবহৃত হয়, ঐরূপ ৮০% ভাগ জুতার তলাকার জন্য এই ৪নং সোল ব্যবহৃত হয়। চীনাক্রোম্ যেমন ভারতীয় চামড়ার বাজারে প্রতিযোগিতায় সুলভ ঐ-রূপ এই ৪নং সোলও সর্ব্বাপেক্ষা সুলভ। কাজেই জুতার বাজারেও সমস্ত সুলভ জুতাই এই চীনাক্রোম ও ৪নং সোল দ্বারাই প্রস্তুত। সঙ্গে সঙ্গে ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে উৎকৃষ্ট শ্রেণীর এই জুতা নয়।

আর এক প্রকারের সোল লেদারের প্রচলন আছে, উহা জলন্ধর সোল নামে খ্যাত। এই সোল লেদার পাঞ্জাবের অন্তর্গত জলন্ধর হইতে আমদানি হয়। তথায় উহা কুটীরশিল্প। অধিকাংশ চামার উহা বাড়িতে প্রস্তুত করিয়া হাটে বিক্রয়ার্থ লইয়া আসে। ঐ হাট হইতে ধনীরা ক্রয় করিয়া মজুত করে। পরে রপ্তানি হয়। বাজার-দর এবং জিনিষ হিসাবে উহা ৫৫৲—৭৫৲ পর্য্যন্ত মণ বিক্রয় হয়। বলা বাহুল্য, কলিকাতার এই চামড়ার সব ব্যবসায়ী পাঞ্জাবী মুসলমান। মজ্‌বুতি হিসাবে এই সোল লেদার খুবই ভাল। জুতা প্রস্তুত করিবার জন্য আর এক প্রকার সোল লেদার ব্যবহৃত হয় উহাকে রোল্ড বা কম্‌প্রেসড্ সোল বলে। ইউরোপীয় দোকান এবং দুই একটি খ্যাতনামা দেশী দোকান ব্যতীত উহার ব্যবহার হয় না, কারণ উহার দাম খুব বেশী, তবে জিনিষ হিসাবে খুবই ভাল। কিন্তু আমাদের গরিব দেশে সস্তা জুতার চাহিদাই বেশী, কাজেই সাধারণ জুতায় উহা ব্যবহার হয় না। এই প্রকার দামী সোল ,ভারতবর্ষের মধ্যে কানপুর ও মাদ্রাজেই বেশী প্রস্তুত হয়। কলিকাতায় এক বার্ড কোম্পানী করিত। বর্ত্তমানে শিক্ষা দিবার জন্য গভর্ণমেণ্টের শিল্পবিভাগীয় ট্যানারিতে কিছু কিছু প্রস্তুত হয়।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, কলিকাতায় ও শহরতলিতে চামড়া প্রস্তুত ব্যাপারে তিনটি সম্প্রদায়কে দেখিতে পাওয়া যায়; তন্মধ্যে চীনারা ক্রোম্ চামড়া প্রস্তুত করে, পাঞ্জাবীরা সোল লেদার প্রস্তুত করে। আর এক সম্প্রদায়কে দেখিতে পাওয়া যায় ইহারা বাঙালী মুসলমান। ইহারা পাঞ্জাবী বা চীনাদের মত কোনো 'লাইন' আঁকড়াইয়া নাই। ইহাদের কেহ কেহ ভেড়ার ক্রোম্ পাকাই করিয়া অস্তরের চামড়া প্রস্তুত করে। কেহ কেহ গরুর ছাল পাকাই করিয়া হুড বার্নিশের চামড়া প্রস্তুত করে। কেহ কেহ সুটকেস্ লেদার প্রস্তুত করে। তবে উহাদের অধিকাংশই হুড বানিশ প্রস্তুত করে। এই হুড বানিশ্‌ড্ লেদারের কাট্‌তি খুব বেশী, কারণ, উহার তৈরি চটীজুতা এক কলিকাতা ব্যতীত আর কোথাও প্রস্তুত হয় না। অথচ ঐ চটীজুতার প্রচলন সর্ব্বত্র খুব বেশী। কাজেই এই হুড বানিশ প্রস্তুত কারবার কলিকাতায় একটি বড় কারবার। বাংলা দেশে

এই হুড বার্নিশের চটীজুতা শুধু পুরুষরাই ব্যবহার করেন, কিন্তু বাংলা ছাড়া পশ্চিমে এবং অন্যান্য দেশে স্ত্রী-পুরুষ উভয়ে খুব বেশী ব্যবহার করেন। যেখানে যেখানে এই চটীজুতার ব্যবহার আছে (ভারতবর্ষের প্রায় সর্ব্বত্র) সে-সকল স্থানে এক কলিকাতা হইতে এডেন পর্য্যন্ত উহা রপ্তানি হয়। এখানে একটি কথা বলা একান্ত আবশ্যক যে, এই চটীজুতার রপ্তানিওয়ালা ধনীরা সবই পাঞ্জাবী মুসলমান।

পরিশেষে মাত্র দু-একটি কথা বলিয়া এ প্রবন্ধ শেষ করিতে চাই। ভারতবর্ষে যত-প্রকার শিল্পের প্রতিষ্ঠান আছে তন্মধ্যে এই ঘৃণিত চর্ম্মশিল্প যে কাহারও অপেক্ষা হীন নহে তাহা নিঃসন্দেহে বলা যায়, কারণ যে-সমস্ত চর্ম্ম এদেশে একেবারে প্রস্তুত হয় না, তাহা ব্যতীত অন্য চর্ম্ম আমদানি একেবারে বন্ধ। ইহাতে দেশের কিছু অর্থ দেশেই থাকিয়া যাইতেছে, বরং রপ্তানি হইয়া দেশের ধনাগম বৃদ্ধি করিয়াছে। পূর্ব্বে যে-সমস্ত বিলাতী জুতা এদেশে আমদানি হইত, আজ কয়েক বৎসর যাবৎ আর তাহা হয় না বলিলেও চলে। কদাচিৎ দু-একটি বিলাতী দোকানে সামান্য রাখিতে দেখা যায়। বিলাতী দোকানের এবং বিলাতী স্ত্রী-পুরুষের জুতা ৯০% এদেশের প্রস্তুত। সুতরাং এই জুতার তরফ হইতেও বিবেচনা করিলে দেশে যথেষ্ট ধনাগম হইতেছে। কাজেই এই শিল্পকে সর্ব্বাপেক্ষা উন্নত শিল্প বলা হইয়াছে। সৌখীন ইংরেজ আমাদের প্রস্তুত জিনিষের মধ্যে এক জুতা ব্যতীত আর অন্য কোনো জিনিষ বিশেষ ব্যবহার করেন না। পূর্ব্বে আমাদের দেশে এক চটিজুতা ছাড়া, অন্য কোনো জুতা প্রস্তুত হইত না, তখন দেশের আপামর সাধারণের অবস্থার জন্যই হউক বা জুতার মূল্যাধিক্য বশতই হউক, জুতা পরিবার সুবিধা ছিল না। পরে এই একনিষ্ঠ, কঠোর পরিশ্রমী চীনা জুতা ব্যবসায়ী এদেশে জুতার ব্যবসায় আরম্ভ করার ফলে দেশের সর্ব্বসাধারণের পক্ষে জুতা ব্যবহার করিবার সুবিধা হইয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে বিলাতী জুতার আমদানিও বন্ধ হইয়াছে। ইহাতে দেশে কিঞ্চিৎ অর্থাগমের সুবিধা হইয়াছে। তবে চীনাদের দেশে বেশ কিছু টাকা চলিয়া যাইতেছে। ভারতবর্ষের অন্য কোনো প্রদেশের লোক যদি চীনাদের স্থলে আসিত, তবে আক্ষেপ হইত না, কিন্তু ভারতবর্ষে চীনাদের মত অধ্যবসায়ী এবং কঠোর পরিশ্রমী লোক দেখিতে পাই না।*

* এই প্রবন্ধের বহু জ্ঞাতব্য বিষয় এবং তথ্য কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেটের "সুট-অল্ কোং"এর স্বত্বাধিকারী শ্রীমান নিখিল রায়-চৌধুরী সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি



প্রতীক্ষা

শ্রীসত্যরঞ্জন সেন

১

সকল দেবতারই যেমন এক-একটা প্রকৃতিগত বিশিষ্টতা আছে, নিদ্রাদেবীরও তাই। কারুর আবাহন আরাধনায় সহজে তাঁর আসন টলে না। কিন্তু পাখাটানা কুলি কিংবা চৌকীদারের চক্ষে এসে ভর করবার জন্যে তিনি সর্ব্বদাই ঘুর্ ঘুর্ ক'রে বেড়ান! তাই গৌরীকে আজ তিনি কিছুতেই ধরা দিলেন না।

দুপুর-বেলা রোজকার মতন মায়ের সঙ্গেই খেতে বসেছিল সে। কিন্তু কি ক'রে যে আজ তার এত তাড়া-তাড়ি খাওয়া শেষ হ'ল, তা সে নিজেই বুঝতে পারলে না। খেয়ে উঠে পান মুখে দিয়ে, দু-চারটে খুচরো কাজ সেরে যখন সে ঘরে ঢুকল, মা তখনও রান্নাঘরে বসে ডাঁটা চিবচ্ছেন। মায়ের এই নিশ্চেষ্ট তন্ময় ভাব দেখে মেয়ে একটুখানি হেসে দরজা ভেজিয়ে দিলে।

ঘরে তক্তপোষের উপর বিছানা পাতা ছিল। কাছে গিয়ে গৌরী দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি খানিকটা ভাবলে, তার পর বিছানার উপর ব'সে একটু এদিক-ওদিক চেয়ে ভিজা চুলগুলি জানালার সামনে ছড়িয়ে দিয়ে ধীরে ধীরে শুয়ে পড়ল।

তারপরেই চোখদুটি বুজে ঘুমিয়ে পড়বার জন্যে নানা রকম সাধনা হতে লাগ্ল। কখনও এ-পাশ ফিরে, কখনও ও-পাশ ফিরে, যত রকম শোবার ভঙ্গি হ'তে পারে একে একে পরীক্ষা ক'রে ঘুম আসার পক্ষে কোনোটাই অনুকূল ব'লে মনে হ'ল না। চোখ না চেয়েই হাত বাড়িয়ে পাখাখানা তুলে নিয়ে সে ধীরে ধীরে একটু বাতাস আরম্ভ করলে। আঃ! মাথাটা বেশ ঠাণ্ডা বোধ হচ্ছে, এইবার নিশ্চয় ঘুম আসছে। যেন সত্যিই ঘুমিয়ে পড়ছি—এই মনে ক'রে গৌরী তার হাতখানা আলগা ক'রে দিলে, হাত যেন আর ঘুমের ঘোরে নাড়া যায় না, পাখাখানা পড়ে যায় আর কি! বার-বার এ রকম করেও সত্যিকার ঘুম কিন্তু এল না। বরং পাখাখানা মেজের উপর পড়ে যেন একটা কর্কশ বিদ্রূপ ক'রে উঠ্ল,—গৌরীর কল্পিত ঘুমের ঘোর ভেঙে গেল।

নিদ্রাদেবীর এই অদ্ভুত প্রকৃতির পরিচয় গৌরী তার চোদ্দ বছরের অভিজ্ঞতায় কখনও পায় নি, আজ সেটা ভাল করেই জানলে।

দিনের বেলা গৌরী প্রায় ঘুমোয় না, কিন্তু মায়ের একটু গড়ানো অভ্যাস আছে। তাই তিনি খাওয়া-দাওয়া সেরে এসে ঘরে ঢুকতে গিয়ে দেখলেন দরজা ভেজানো রয়েছে। নিঃশব্দে একটা কপাট একটুখানি খুলে উঁকি মেরে দেখলেন, মেয়ে তাঁর প্রাণপণে চোখদুটি বুজে চুপ ক'রে শুয়ে আছে।

আবার নিঃশব্দে দরজা টেনে দিয়ে গৌরীর মা দাওয়ার এক পাশে এসে দাঁড়ালেন। তাঁর চোখে-মুখে একটা আনন্দের দীপ্তি ফুটে উঠল, মনে পড়ল—আজ জামাই আস্‌বে। সেই সঙ্গে আরও মনে পড়ে গেল ত্রিশ বৎসর আগেকার কথা। তখন তিনিও এই গৌরীর মতনটি। পাড়া-বেড়ানো, আম-কুড়ানো, কাঁথা-শেলাই, কড়িখেলা সব ভুলে গিয়ে তিনিও কতদিন এমনি করে আশাকম্পিত হৃদয়ে নিদ্রাদেবীর আরাধনা করেছেন। ভাবলেন—এ ও যে ঠিক তেমনিই!

আজ আর তাঁর গড়ানো হ'ল না। কতদিন পরে আজ জামাই আস্‌ছে, তার জন্যে যাহোক কিছু ভাল-মন্দ খাবারের আয়োজন করতে হবে ত। বাছা সেই কোন্ বিদেশে বাসায় পড়ে থাকে,—খাওয়া-দাওয়ার কত কষ্ট!

গোটা-দুই নারকেল ভেঙে, কুরে রেখে গৌরীর মা পাড়ায় একটু ঘুরতে বেরুলেন।

২

গৌরীর মা আজ কেবল গৌরীরই মা। কিন্তু সে বেশী দিনের কথা নয়, যখন তিনি পুত্রকন্যা-পরিবেষ্টিতা স্বামী-

সোহাগিনী ভাগ্যবতী হয়ে নারী-হৃদয়ের অসীম কৃতজ্ঞতা দেবতার চরণে নিবেদন ক'রে গভীর তৃপ্তিলাভ করতেন। তার পর এই ক-বছরের মধ্যে একে একে তাঁর স্নেহের পুত্তলিগুলিকে হারিয়ে শেষ বজ্রপাতে যখন তিনি নিরাশ্রয় লতার মতন লুটিয়ে পড়লেন, তখন দশ বছরের মেয়ে গৌরীই তাঁর জীবনের একমাত্র অবলম্বন হয়ে রইল।

জমি-জমা যেটুকু ছিল তা থেকে দুটি প্রাণীর গ্রাসাচ্ছাদন হয়েও কিছু কিছু বাঁচত, গৌরীর মার হাতে সেটা জমতে লাগল। হিন্দুর ঘরের বিধবার পক্ষে জীবন-ধারণেরই কোনো উদ্দেশ্য থাকতে পারে না,—টাকা জমানোর ত কথাই নাই! কিন্তু গৌরীর মায়ের বেলায় দুটারই প্রয়োজন ছিল। গৌরীকে সৎপাত্রে দান করা—এই শেষ কর্ত্তব্যটুকু সারতে পারলেই তিনি নিশ্চিন্তমনে ইহসংসার থেকে ছুটি নিয়ে পরপারের সাজানো সংসারে গিয়ে প্রাণ জুড়াবেন।

প্রতিবেশীদের সাহায্যে গৌরীর মার মনস্কামনা পূর্ণ হয়েছে। হরলাল বেশ মনের মতন জামাই হয়েছে। বরকনের কোষ্ঠী মিলিয়েই না-কি রাজযোটক নির্ণয় হয়ে থাকে। দু-জনের দুরদৃষ্টের মিল হলেও যদি কোনো রকম যোটক হয়, তাহ'লে এক্ষেত্রেও হয়েছে। কারণ হরলালও গৌরীর মতন হতভাগ্য। সে অল্প বয়সে বাপ-মা-হারা হয়ে মামার আশ্রয়ে থেকে মানুষ হয়েছে।

কিন্তু তার জন্যে মামাদের বিশেষ কোনো চেষ্টা বা অর্থব্যয় করতে হয়নি। মামাতো ভাইদের পাতের ভাত খেয়ে যেমন তাদেরই মতন হরলালের দেহের পুষ্টি হয়েছে, তেমনি লেখাপড়া শেখার বেলায়ও হরলাল ভাইদের ছেঁড়া বই খাতা সংগ্রহ ক'রে, তাদের পড়া শুনে, লুকিয়ে হাত-মক্স ক'রে ঠিক তাদেরই সমান লেখাপড়া শিখেছে, সম্পূর্ণ নিজের চেষ্টায়।

হরলালের মামাতো ভাইয়েরা তাস-পাঁচালীর আড্ডায় তাদের অর্জ্জিত বিদ্যার কিরূপ সদ্ব্যবহার করে জানি না, কিন্তু হরলাল এই বিদ্যার জোরেই শহরে গিয়ে ছাপাখানায় একটা কাজ জুটিয়ে নিয়েছে।

হরলালের বিদ্যার পরিমাণ ঐ পর্য্যন্ত,—উপার্জ্জনের পরিমাণ মাসিক সাতাশ টাকা, তা'ছাড়া কিছু কিছু উপরি খাটার জন্য আরও দু-পাঁচ টাকা।

তবু গৌরী তাকে পেয়ে জীবন সার্থক জ্ঞান করে। যার জন্যে কতদিন ভোরে উঠে ফুল তুলে শিবপূজা করেছে—এ যেন ঠিক সেই। কারণ নারী-হৃদয়ের অনুরাগ পাবার জন্যে বিদ্যা কিংবা অর্থের চাইতে যা বেশী দরকার, হরলালের তা ছিল, রূপ আর গুণ। তার রূপের প্রশংসা ক'রে প্রতিবেশিনীরা বলেছেন যে, ঠিক 'হর গৌরীর' মিলনই হয়েছে বটে!

এতদিনে গৌরীর মার জীবনের ব্রত উদ্‌যাপন হয়েছে। তবু তিনি আয়ুর মেয়াদ আর একটু বাড়াতে চান। বলেন, গৌরীর কোলে একটি খোকা দেখলেই তাঁর সব সাধ পূর্ণ হয়। তখন তিনি অনায়াসে সংসারের মায়া কাটিয়ে যেতে পারবেন।

৩

নানা রকম কসরৎ করেও যখন কিছুতেই গৌরীর ঘুম এল না, তখন সে বিরক্ত হয়ে উঠে বস্‌ল। চুলে হাত দিয়ে দেখ্‌লে প্রায় শুকিয়ে এসেছে। সারা পিঠের উপর সেই একরাশ চুল বেশ ক'রে ছড়িয়ে দিতে দিতে সে খানিকক্ষণ ব'সে কি ভাবল। তারপর ঘর থেকে বেরিয়ে মাকে খুঁজতে লাগ্‌ল। ডেকে সাড়া না পেয়ে সে বুঝলে, খিড়কী দরজায় বাইরে থেকে শিকল তুলে দিয়ে তিনি কোথাও গিয়েছেন।

চোখ মুখ ধুয়ে, একটা পান সেজে মুখে দিয়ে, গৌরী উঠানের দড়ি থেকে কাপড় তুলে এনে কুঁচিয়ে রেখে দিলে। দেয়ালে একটা আয়না ঝুলানো ছিল, তার সাম্‌নে দাঁড়িয়ে রাঙা ঠোঁট দুখানির দিকে চেয়ে সে ফিক্ ক'রে হেসে ফেল্‌লে। তারপরেই নজর পড়ল মাথায়। যাত্রার দলের মা-যশোদার মতন ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুলগুলা দেখে আবার একচোট হাসি!

পাশেই কুলুঙ্গীতে চুল বাঁধার সরঞ্জাম থাকে। সেখান থেকে চিরুনিখানা নিয়ে একবার এদিক-ওদিক চেয়ে সিঁথি কাট্‌তে লেগে গেল। কিন্তু কিছুতেই আর ঠিক মতন কাটা হয় না,—হয় বাঁকাচোরা, নয়

একপেশে হয়ে যায়। চুল আঁচ্‌ড়ানো, খোঁপা-বাঁধা, টিপ-পরা, এ-সব ত রোজই আছে, কিন্তু এমন ত কোনোদিন হয় না! আজ কেবলই মনে হয়, সে যেন চুরি করতে এসেছে, ভয় হয় কে কখন কোথা থেকে দেখে ফেল্‌বে,—হাত কাঁপ্‌তে থাকে। আবার কোথায় খুট্‌ ক'রে শব্দ হয়, অমনি সে তাড়াতাড়ি চিরুনিখানা কুলুঙ্গীতে ছুঁড়ে ফেলে ধপ্‌ ক'রে তক্তপোষের উপর ব'সে পড়ে। আবার একটু পরে পা টিপে টিপে গিয়ে চিরুনি হাতে ক'রে আয়নার সাম্‌নে দাঁড়ায়।

এই রকম ক'রে কতক্ষণ গেল। এমন সময়ে বাইরে কা'দের গলার সাড়া পেয়ে সে ব্যস্তসমস্ত হয়ে পথের ধারে জানালায় গিয়ে দাঁড়াল। তখন পাঠশালার ছুটি হয়েছে। পড়ুয়ার দল বাড়ি ফিরছে, মুক্তির আনন্দে গ্রাম্যপথখানি মুখরিত ক'রে। গৌরী সেইদিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

"গোপাল, অ গোপাল, একবার আমাদের বাড়ি আস্‌বি না, ভাই?" জানালা থেকে গৌরী বল্‌লে।

গোপাল চোখ তুলে দেখ্‌লে, বল্‌লে,—"গৌরী-দি? আস্‌ছি ভাই, একবার বাড়ি হয়ে আসি।"

গৌরী বড় ব্যাকুল স্বরে বল্‌লে—"আগে শুনে যা না, একটা দরকার আছে। এইখানেই জলপান ক'রে বাড়ি যাস্‌খন। ক-দিন ধ'রে তোর জন্যে একটা জিনিষ রেখেছি, আসিস্‌ নি ব'লে দেওয়া হয় নি। আয় একবার লক্ষ্মীটি!"

গোপাল পাড়ার ছেলে। গৌরী তা'কে ছোট ভাইটির মতন ভালবাসে। গোপালও গৌরীর একান্ত অনুগত।

পুকুরঘাটে হাতমুখ ধুয়ে গোপাল দাওয়ায় এসে বস্‌তেই গৌরী তা'কে এক সরা গুড় মুড়ি এনে দিলে। এক খোরা নারকেল-কোরা ঢাকা দেওয়া রয়েছে দেখে তার বুঝ্‌তে দেরি হ'ল না যে, কিসের জন্যে রয়েছে। তবু একটু ইতস্ততঃ ক'রে, তা থেকে একমুঠো তু'লে গোপালকে না দিয়ে থাক্‌তে পারলে না।

গোপালকে খেতে দিয়ে গৌরী তার তোরঙ্গ খুলে কাপড়-চোপড় ওলট-পালট ক'রে কি বার ক'রে নিয়ে এল। হাতের মুঠোটা গোপালের সুমুখে ধ'রে বললে—"এতে কি আছে বল দেখি? বল্‌তে পারিস্‌ ত পাবি।"

গোপাল আন্দাজ ক'রে নানা রকম জিনিষের নাম করে। কিন্তু গৌরী হাসে, কেবলই বলে, হ'ল না। এই অপরূপ জিনিষটা যে কি তা নির্ণয় করতে না পেরে গোপালকে শেষে হার মান্‌তে হ'ল। গৌরী তখন হাতের মুঠো খুলে দেখালে—একজোড়া মার্বেল!

গোপাল চম্‌কে উঠ্‌ল। "ও, মার্বেল! বাঃ, বেশ সুন্দর ত! তার পর ব্যাকুল আগ্রহে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বল্‌লে,—"একবার দেখ্‌তে দেবে না, দিদি?" গৌরী হেসে বল্‌লে—"কোথাকার বোকা ছেলে রে! তোর জন্যেই ত আনিয়ে রেখেছি, আমি এ নিয়ে আর কি করব।"

মার্বেল হাতে পেয়ে গোপালের খাওয়া ঘুরে গেল। বেশ নিরীক্ষণ ক'রে দেখ্‌তে দেখ্‌তে বল্‌লে,—"এ কোথায় পেলে, দিদি?"

"সেদিন বুড়ীর মা হাটে গিয়েছিল, সেই এনে দিয়েছে।"

"কত দাম, দিদি?"

"সে খোঁজে তোর দরকার? নে, চট্‌পট্‌ খেয়ে নে।"

গোপাল থাবা থাবা করে মুড়িগুলা শেষ করলে।

তখন গৌরী একখানা চিঠি তার হাতে দিয়ে বল্‌লে—"গোপাল, ভাই, চিঠিখানা এইবার ভাল ক'রে পড় দেখি, শুনি।"

অতি সন্তর্পণে চিঠিখানার ভাঁজ খুলে গোপাল ধীরে ধীরে পড়তে আরম্ভ করলে। গৌরী হাঁ ক'রে তার মুখের দিকে চেয়ে রইল। দু-তিন ছত্র পড়েই গোপাল বল্‌লে—"ও দিদি, এ যে কত দিনের পুরনো চিঠি! এ আর কতবার পড়ে শোনাব?—পড়ে পড়ে ত প্রায় মুখস্থই হয়ে গেছে।"

গৌরী একটু ম্লান হেসে বল্‌লে—"মুখস্থ কি আমারই হয়নি? তবু সব কথা ত ঠিক মনে নেই,—আর একবার পড় না, শুনি।"

গোপাল হেসে বল্‌লে—"তার চাইতে একটু লেখাপড়া শিখে নিলে ত হয়,—নিজেই তা হ'লে চিঠি পড়তেও

পার, লিখতেও পার, কিন্তু এত করেও ত শেখাতে পারলাম না।”

লজ্জায় গৌরীর মাথা হেঁট হয়ে গেল। গোপাল আর বেশী কিছু না ব'লে চিঠিখানা পড়ে শুনালে।

চিঠিখানা হরলালের,—গৌরীকে লিখেছে। সে হ'ল আজ দু-হপ্তার কথা। তার মধ্যে খুব কম হবে ত বার-দশেক গৌরী গোপালকে দিয়ে পড়িয়ে শুনেছে। হরলাল অনেক কথা লিখেছে, কিন্তু তার অধিকাংশ গোপাল নিজেই পড়ে বুঝতে পারে নি। গৌরী বরং আন্দাজে কতকটা বুঝেছে। সারাংশ সংক্ষেপে এই যে, হরলাল গৌরীর কাছে আসবার জন্যে নিতান্ত ব্যগ্র থাকা সত্ত্বেও ছুটির অভাবে আস্‌তে পারে না। কিন্তু এবার সে ১৯এ বৈশাখ শনিবার দিন নিশ্চয়ই আস্‌বে। যদি ঠিক সময়ে নৌকা পাওয়া যায়, সন্ধ্যার পরেই পৌছাবে,—না হ'লে দেরি হ'তে পারে।

গৌরী বল্‌লে,—“হ্যাঁ গোপাল, আজ ত শনিবার ১৯এ বোশেখ, আজই, নয়?”

গোপাল মনে মনে কি হিসাব ক'রে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে ব'লে উঠ্‌ল—“ও দিদি, তাই ত বটে! দাদাবাবু তাহ'লে আজই আস্‌বে?”

গৌরীর মুখখানা হঠাৎ লাল হ'য়ে উঠ্‌ল, চোখ দুটি জ্বলজ্বল করতে লাগল।

এই সময়ে মাকে খিড়্‌কী-দরজা দিয়ে বাড়ি ঢুকতে দেখে গৌরী টপ্‌ ক'রে গোপালের হাত থেকে চিঠিখানা ছিনিয়ে নিয়ে হাতের মুঠার মধ্যে লুকিয়ে ফেল্‌লে। এই অতর্কিত ঘটনায় গোপাল যে-রকম সচকিত দৃষ্টিতে চেয়ে রইল, মনে হবে যেন দুজনে মিলে চুরি করতে এসে সে একাই ধরা পড়ে গিয়েছে।

গৌরীর মা জেলে-বাড়ি থেকে মাছ, আর প্রতিবেশীদের বাগানের পাঁচ রকম তরিতরকারি সংগ্রহ ক'রে এনে রান্নাঘরের দাওয়ায় সেগুলা ফেলে মেয়েকে একটু তাড়না ক'রে বল্‌লেন,—“এখনও নিশ্চিন্ত হয়ে ব'সে গল্প হচ্ছে? বেলা যে গেল, চুল-টুল বাঁধতে হবে না? নে, চট্‌ ক'রে দড়ি চিরুনি নিয়ে আয়। আমার এখনও সব কাজ পড়ে।”

গোপাল আস্তে আস্তে সরে পড়ল। গৌরী যত বাজে কাজ নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল, বল্‌লে—“সে হবে'খন, তুমি নিজের কাজ কর না বাপু!”

আসল কথা, গৌরী মায়ের কাছে চুল বাঁধ্‌তে রাজী নয়। তাঁর সেই সেকেলে ধরণের “পেটে পেড়ে” চুল বাঁধা,—অন্য দিন হ'লে চল্‌ত, কিন্তু আজ চলে না। আজ সে নিজে পছন্দমত ক'রে বাঁধবে।

“জানি না বাপু, যা খুশী কর্‌”—ব'লে গৌরীর মা রান্নার জোগাড়ে লাগলেন।

গৌরী ঘরে ব'সে অনেক্ষণ ধ'রে চুল আঁচ্‌ড়ে খোঁপা বাঁধলে। তারপর যখন সে পুকুর-ঘাটে গা ধুতে গেল মা কুট্‌নো কুট্‌তে কুটতে বল্‌লেন,—“আজ সেই খেজুর-ছড়ি ডুরেখানা বার করে পরিস্‌।”

ঝঙ্কার দিয়ে গৌরী বল্‌লে,—“হ্যাঁ, খেজুর-ছড়ি না আরও কিছু,—ভারি ত!”

মা রাগ ক'রে বল্‌লেন,—“তবে কি ময়লা চিরকুট কাপড়ই প'রে থাক্‌বি না-কি?”

তাচ্ছিল্যের স্বরে গৌরী জবাব দিলে,—“সে যা-হয় একখানা পরব'খন। ঐ জাম-রঙের শাড়ীটাই না হয়—”

মেয়ের অলক্ষিতে মুখ টিপে একটু হেসে গৌরীর মা নিজের কাজে মন দিলেন।

৪

সন্ধ্যার সময় কাল-বৈশাখীর ঝড় উঠ্‌ল। পথের ধূলায় আকাশ ভ'রে গেল, গাছপালাগুলা এক জায়গায় দাঁড়িয়েই তাণ্ডব নৃত্য আরম্ভ ক'রে দিলে। প্রকৃতির এই রুদ্রমূর্ত্তি দেখে গৌরীর বুক দুর্‌-দুর্‌ করতে লাগ্‌ল। শোবার ঘরের জানালা দরজা বন্ধ ক'রে সে রান্নাঘরে মায়ের কাছে গিয়ে বসল। রান্নাঘরের চাল খ'সে খ'সে ভিতরে পড়ছিল, গৌরীর মা খাবার জিনিষপত্রগুলা ঢেকে রেখে কাজ কামাই দিয়ে বসে রইলেন।

হরলালের এতক্ষণে ও-পারে এসে পৌছবার কথা। কিন্তু এ সময়ে নদী পার হওয়াও বিপজ্জনক। এই দুর্য্যোগে সে কোথায় কি করছে তাই ভেবে মায়ের মন

উদ্বেগে ভ'রে উঠ্‌ল। গৌরীও ম্লানমুখে উদাস দৃষ্টিতে আকাশের পানে চেয়ে ব'সে রয়েছে দেখে মা তাঁর মনের উদ্বেগ গোপন ক'রে বল্‌লেন—"এ ঝড় আর বেশীক্ষণ নয়, এখনই থেমে যাবে। আর ঝড় না থাম্‌লে ত কেউ নৌকা ছাড়বে না।"

কথাগুলা কিন্তু নিতান্ত ব্যর্থ হ'ল। উৎকণ্ঠা কারুরই গেল না। দুজনেই নীরব,—উভয়ের মনে একই চিন্তা, কিন্তু কেউ কাউকে মুখ ফুটে কিছু বল্‌তে পারে না।

ঝড়-বৃষ্টি যখন ক্রমশঃ প্রায় থেমে এল, তখন বেশ রাত হয়েছে। হরলাল তবু এল না। গৌরীকে তার মা খেয়ে নিতে বল্‌লেন,—হরলাল হয়ত আজ আর এল না।

গৌরী মার কথা শুনে নির্ব্বাক বিস্ময়ে চেয়ে রইল। মা বলে কি? সে আস্‌বে না? অত ক'রে লিখেছে যে নিশ্চয়ই আস্‌বে,—গোপাল খুব কম ক'রে হবে ত বিশ বার প'ড়ে শুনিয়েছে! কিন্তু মা সে কথা জান্‌বেন কি ক'রে, আর তাঁকে বোঝানোই বা যায় কি ক'রে?

সে কিছুতেই খেতে রাজী হ'ল না, বললে—আর একটু হোক্ না, আগে ভাগে খেয়ে ব'সে থাক্‌ব? আমি কি এখনও ছেলেমানুষটি আছি?"

মা ভাব্‌লেন—তাও ত বটে। গৌরী তাঁর কাছে সন্তান হ'লেও সে যে আজ শৈশবের সীমা ছাড়িয়ে এক ধাপ উঁচুতে উঠে পড়েছে। আর একজনের জন্যে নিজের সুখ-স্বার্থ ভুলে যাওয়ার যে বড় অধিকার সে পেয়েছে তা ছাড়বে কেন? একটা অব্যক্ত গৌরবে মায়ের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। আনন্দাশ্রুতে চোখদুটি ঈষৎ সিক্ত হয়ে ধীরে ধীরে বুজে এল।

গৌরী বল্‌লে,—"মা, তোমার ঘুম পাচ্ছে, তুমি একটু জল খেয়ে বরং শুয়ে পড়,—কাল ত আবার একাদশী।" তার গলার স্বরে একটা বেদনার সুর বেজে উঠ্‌ল।

মা দেখ্‌লেন গৌরী আজ হঠাৎ এত বড় হয়ে পড়েছে যে তাঁকেই আজ সে সন্তানের স্থানে বসিয়ে স্নেহের শাসনে নিজের ইচ্ছামত চালাইতে চায়। অসহায় শিশুর পূর্ণ নির্ভরতা নিয়ে তাঁর দীর্ঘ-ঝঞ্ঝা-ক্ষুব্ধ জীর্ণ বক্ষটি গৌরীর কোলে লুটিয়ে দিয়ে মা এক অপূর্ব্ব তৃপ্তি অনুভব করলেন।

কিছুক্ষণ আচ্ছন্নের মত প'ড়ে থেকে গৌরীর মা উঠে রান্নাঘরে গেলেন। সেখান থেকে দু-জনে মিলে খাবার ব'য়ে এনে শোবার ঘরে তক্তপোষের তলায় ঢাকা দিয়ে রেখে, নিজে একটু জলযোগ ক'রে ভাঁড়ার-ঘরে শুতে গেলেন। যাবার সময় গৌরীকে শুধু ব'লে গেলেন, দরকার হ'লে যেন তাঁকে ডাকে।

গৌরী বল্‌লে,—"আচ্ছা, কিন্তু কাল আমি রাঁধ্‌ব, মা।"

মা একটু হেসে বল্‌লেন,—"তা বেশ ত, হরলাল যদি আসে তুই রাঁধিস্‌খন। তা নয় ত, তোর একলার মতন দুটি আর রেঁধে দিতে পারব না?"

গৌরী কেন যে রাঁধ্‌তে চায় তা সে নিজেই জানে না। তাই হরলাল এলে রাঁধবে, কি না এলে রাঁধ্‌বে, তার কিছুই সিদ্ধান্ত করতে পারলে না। মায়ের কথার উপর তার আর কোনো কথা জোগাল না।

৫

বৃষ্টি ধ'রে গিয়ে আকাশ অনেকটা পরিষ্কার হয়েছে। কিন্তু হাওয়া তখনও বেশ জোরেই বইছে। দশমীর ভাঙা চাঁদ তখন পশ্চিমে ঢলেছে, তার আলোয় পৃথিবী আবার হাস্‌ছে,—জননীকে দেখে শিশুর অশ্রুসিক্ত বদনে যেন হাসি ছড়িয়ে পড়েছে। মাঝে মাঝে এক একটা খণ্ডমেঘ উড়ে-এসে চাঁদকে ঢাকা দেবার বিফল চেষ্টা ক'রে সরে পড়ছে।

গৌরী রোয়াকের খুঁটি ঠেস দিয়ে ব'সে কুচো মেঘগুলোর ছুটোছুটি দেখ্‌ছিল। তার মনে হ'ল, জগতের পুরুষগুলাও ঠিক এই রকম। তারাও এমনি ক'রে নিজের মনে, নানা কাজে কিংবা বিনা কাজে, অবাধে ছুটোছুটি ক'রে বেড়ায়, কোনো দিকে ভ্রূক্ষেপ নাই। যারা তাদের প্রতীক্ষায় নিশিদিন ধ'রে পথ চেয়ে ব'সে থাকে, তাদের প্রাণের উপর ক্ষণেকের জন্য একটা ছায়া ফেলে দিয়ে নিজের গন্তব্য পথে চলে যায়—ধরা দিতে চায় না।

এই ত হরলাল সেই কবে এসেছিল—দুদিনের তরে! তা'র পর এতকাল দিব্যি ভুলে আছে। আর সে বেচারী নিজে এখানে পড়ে—

কিন্তু না, সে ত তেমন নয়। তার কথাবার্ত্তা, ধরণ-ধারণ, আদর-সোহাগের ভিতর দিয়ে গভীর ভালবাসার পরিচয় পাওয়া যায় ত! সে যতটুকু সময় কাছে থাকে তার মধ্যে তার ভালবাসায় সন্দেহ করবার অবকাশ পাওয়া যায় না। তার পর, তার চিঠিপত্র? চিঠি সে বেশী লেখে না বটে, কিন্তু এ পর্য্যন্ত যে ক-খানা লিখেছে, তা'তে সে প্রাণের কতখানি আবেগ ঢেলে দিয়েছে—গোপালের পড়বার ভঙ্গীর দোষ সত্ত্বেও—তা বেশ বুঝ্‌তে পারে।

হরলাল একবার লিখেছিল,—মাঝে মাঝে মনে হয় যদি পাখী হতাম, ইচ্ছামতন উড়ে গিয়ে তোমায় দেখে আস্‌তাম; কিংবা ছাপাখানার ফটকের পাশে যে নিমগাছ আছে, তার ডালে বাসা বেঁধে তোমাকে নিয়ে থাকৃতাম।

গৌরী উঠে গিয়ে তোরঙ্গ খুলে একখানা হলুদ-ছোপানো নেকড়ায় বাঁধা একতাড়া চিঠি বা'র ক'রে বিছানার উপর সাজাতে লাগল। এগুলি সব হরলালের লেখা চিঠি—খান দশ-বারোর বেশী হবে না। গৌরী লেখাপড়া জানে না, কোন্ চিঠিখানা কবে এসেছে বল্‌তে পারে না, কিন্তু কোন্‌খানার পর কোন্‌খানা, আর কিসে কি লেখা আছে, মনে ক'রে মোটামুটি বল্‌তে পারে। সে খুব মনোযোগ দিয়ে চিঠিগুলা পর পর সাজিয়ে একখানা একখানা ক'রে খুলে দেখতে লাগল। তাকে তখন দেখলে মনে হবে কত মন দিয়েই না পড়ছে! কিন্তু পড়বে আর কি? চিঠি খুলে সেদিকে চাইলেই সব কথা তার মনে পড়ে যায়,—মনে মনে তারই পুনরাবৃত্তি ক'রে একটু হেসে আবার মুড়ে রেখে দেয়।

এই রকম ক'রে সব চিঠিগুলাই পড়া হয়ে গেল। তার পর একটা গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে, সে ব'সে ব'সে ভাব্‌তে লাগল। এই যে চিঠিগুলাতে এত ভালবাসার কথা লিখেছে, এ সবই কি মিথ্যা—শুধু তা'কে ভোলাবার জন্যে লেখা? তা যদি নয়, তবে আজ সে এল না কেন? ঝড়-বৃষ্টির জন্যে? কিন্তু এই রকম ঝড়-বৃষ্টিকে উপেক্ষা ক'রে যদি সে আস্‌তে না পারে, তবে আর ভালবাসা কি?

হঠাৎ সদর দরজায় শিকল-নাড়ার শব্দ হ'ল। গৌরী তাড়াতাড়ি চিঠিগুলা জড়ো ক'রে বালিশের তলায় চেপে রেখে, উঠি-কি-পড়ি ক'রে ছুট্‌ল। ঘর থেকে উঠানে নেমেই দেখ্‌লে আবার আকাশে মেঘ জমেছে, ঝড় উঠেছে, তড়্‌বড়্‌ ক'রে বৃষ্টিও এসেছে। সে জলে ভিজতে ভিজতেই গিয়ে সদর দরজার খিল্ খুলে দিয়ে দাঁড়াল।

কিন্তু কই! দোর ঠেলে ত কেউ এল না, কারুর কোনো সাড়াশব্দ ত নেই! সে তাড়াতাড়ি দরজাটা টেনে খুলে ফেল্‌লে। গলা বাড়িয়ে এ-দিক ও-দিক বার-কতক দেখ্‌লে—সত্যই কেউ ত নেই! তবে বোধ হয় দম্‌কা হাওয়ায় শিকলটা আপনিই বেজে উঠেছিল। সে ধীরে ধীরে কপাটে আবার খিল এঁটে দিয়ে, ক্লান্তদেহে পা টিপে টিপে ঘরে ফিরে এল—বৃষ্টিরও বেগ বাড়তে লাগ্‌ল।

গৌরী আবার ভাব্‌তে বস্‌ল। এত ঝড়-বৃষ্টি কি আজকের জন্যেই জমা ছিল! এই একবার দরজা খুল্‌তে গিয়েই তার কাপড় কতখানি ভিজে গিয়েছে! বাইরের অবস্থা তা হ'লে না-জানি কেমন? হরলাল যদি আজ আসে, এতক্ষণে যদি নদী পার হয়েও থাকে, ত কতদূরে এসে পৌছেচে, আর এই বৃষ্টিতে তার কত যে কষ্ট হচ্ছে তার কল্পনা করতে গিয়ে গৌরীর বুক কেঁপে উঠ্‌ল। প্রাণের ভিতরে একটা মর্ম্মান্তিক সুর বেজে উঠ্‌ল—

> "এ ঘোর রজনী মেঘের ঘটা
> কেমনে আইলা বাটে।
> আঙ্গিনার মাঝে বঁধুয়া ভিজিছে
> দেখে যে পরাণ ফাটে।"

অস্ফুট কাতর স্বরে গৌরী ব'লে উঠ্‌ল—হে মা কালী! তাকে সুমতি দাও,—আজ যেন সে না আসে।

কিন্তু সে যে আস্‌বে লিখেছে—নিশ্চয় আস্‌বে। সত্যি কি তাই লিখেছে? সব চিঠির মতন শেষের চিঠিখানাও গোপালকে দিয়ে বার-বার পড়িয়ে, তার প্রায় আগাগোড়া মুখস্থ হয়ে গিয়েছে। সব কথাই তার বেশ স্পষ্ট মনে পড়ছে, কিন্তু আসল কথাটা কিছুতেই স্মরণ হচ্ছে না। সে কি লিখেছে নিশ্চয় যাব, না খুব সম্ভব যাব, না যেতে চেষ্টা করব, না গেলেও যেতে পারি। এ সমস্যার সমাধান হবার ত উপস্থিত কোনো উপায় নাই!

গৌরী তবু হাল ছাড়্‌ল না। বালিশের তলা থেকে চিঠিগুলা বার ক'রে শেষের চিঠিখানা খুঁজতে লাগ্‌ল। তার পর মনে পড়্‌ল সে চিঠি ত এ তাড়ার ভিতর ছিল না, সে ত এখনও তুলে রাখ্‌বার মতন পুরনো হয়নি। বিছানার নীচে বাক্সর তলায়, মা কালীর পটের পিছনে, এই রকম জায়গাতেই এখন তার স্থান—যাতে দরকার হ'লে তৎক্ষণাৎ পাওয়া যায়। আজই ত বিকালে গোপালকে দিয়ে সেখানা পড়িয়েছে, তার পর কোথায় রাখ্‌ল? খুঁজ্‌তে খুঁজতে কুলঙ্গিতে চুল-বাঁধা বাক্সর নীচে থেকে বেরুল।

চিঠিখানা তাড়াতাড়ি খুলে·ধ'রে সে একমনে নিরীক্ষণ করতে লাগল। অন্তর্ভেদী দৃষ্টি দিয়ে না-কি পরের মনের কথাও জানা যায়। চিঠির লেখাগুলাও যদি তেমনি ক'রে পড়া যেত তা হ'লে গৌরীর বড় সুবিধা হ'ত।

আস্‌বার কথা চিঠির শেষের দিকে লেখা ছিল। আন্দাজ ক'রে সে জায়গাটা গৌরী খুঁজে বা'র করলে। কিন্তু তার পর? অনেক মাথা নেড়ে ভেবে ভেবে, সে আবার উঠে তোরঙ্গ খুলে একগাদা কাপড়ের তলা থেকে টেনে বার করলে—একখানা ছেঁড়া ময়লা "বর্ণপরিচয়"!

এখানি গৌরীকে লেখাপড়া শেখাবার উদ্দেশ্যে হরলালের দেওয়া উপহার। কিন্তু বইখানার তেমন সদ্ব্যবহারও হয়নি, আবার প্রণয়োপহারের উপযুক্ত যত্ন ক'রে তুলে রাখাও হয়নি। মাঝে মাঝে ঝোঁকের মাথায় গোপালকে শিক্ষাগুরুর পদে বরণ ক'রে সে বইখানা খুলে পড়তে বস্‌ত। কিন্তু কখনও নিজের, কখনও গোপালের ধৈর্য্যের অভাবে পাঠ অসমাপ্ত থেকে যেত। তবু, এই রকম অনিয়মিত সাধনার ফলে গৌরীর অক্ষর-পরিচয় অনেকটা হয়েছে। অবশ্য অক্ষরগুলাকে আচম্‌কা সে চিনতে পারে না। কিন্তু তাদের নামগুলা মুখস্থ থাকায়, হিসাব ক'রে ক'রে প্রায়ই ধ'রে ফেল্‌তে পারে।

গৌরী আজ তার বিদ্যার এই পুঁজি নিয়েই চিঠিখানার পাঠ-নির্ণয়ে লেগে গেল। কিন্তু দেখ্‌লে চিঠির অক্ষর ছাপার কোনো অক্ষরের সঙ্গেই মেলে না! অনেক খোঁজাখুঁজি ক'রে কারুর সঙ্গে কাউকে মেলাতে না পেরে গৌরীর কান্না পেয়ে গেল। প্রচণ্ড রোষে বইখানা ছুঁড়ে ফেলে সে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।

কিন্তু এ রাগটা কিসের জন্য? নিজের মূর্খতার জন্য?—না, গোপালের অধ্যাপনার ত্রুটির জন্য?—না। গৌরীর রাগটা গিয়ে পড়ল তার উপর—সে নিজে এত লেখাপড়া শিখেছে যে, ছাপাখানার কত বড় বড়, ভাল ভাল বই স্বহস্তে তৈরি কর্‌ছে, অথচ নিজের বৌটাকে মূর্খ করে রেখেছে, একটু লেখাপড়া শেখাতে পারে না! সে বিছানার একধারে শুয়ে পড়ে। আবার সদর দরজায় সেই শিকল-নাড়ার শব্দ। গৌরী ধড়মড় ক'রে উঠে মুখের উপর রোদ-বৃষ্টির বিচিত্র আলোছায়া খেলিয়ে, উর্দ্ধশ্বাসে ছুটল। কিন্তু এবারও কেউ কোথাও নাই। গৌরী তখন দরজা ভেজিয়ে দিয়ে ভাবতে লাগল—তাই ত, করি কি? এ রকম ক'রে কতবার জলে ভিজে ভিজে এসে ফিরে যাব? তা না-হয় পারি হাজার বার, কিন্তু সে যদি সত্যি সত্যি আসে আর আমি শুনতে না পাই,—কি শুনেও গ্রাহ্য না করি, তা' হ'লে ত বেচারী দোর-গোড়ায় দাঁড়িয়ে ভিজবে। তার চাইতে খিলটা খোলাই থাক। আমি ত আর ঘুমচ্চি না—এইদিকে চেয়ে ব'সে থাক্‌ব'খন।

তাই হ'ল। কিন্তু তক্তপোষখানা এমনভাবে পাতা ছিল যে, ব'সে থাক্‌লে সদর দরজা দেখা যায় না—শুলে দেখা যায়। গৌরী বালিশের উপর কনুইয়ের ভর দিয়ে মাথাটা হাতের উপর রেখে বিছানার একপাশে কাৎ

হয়ে দেখলে সদর দরজা ঠিক দেখা যায়। এইভাবে থাকতে থাকতে তার মাথাটা বারে বারে ঢুলে পড়ছিল, কিন্তু তখনই আবার সাম্‌লে নিয়ে বললে,—না, ঘুমই নি ত!

নিদ্রাদেবীর অদ্ভুত প্রকৃতির পরিচয় গৌরী আজই দুপুর-বেলা কতকটা পেয়েছিল, কিন্তু সবটা নয়। এইবার বাকীটুকু জানবার সুযোগ এল। বার-কতক ঢুলেই তার মাথাটা যখন বালিশের উপর প'ড়ে আর উঠল না, তখন 'ঘুমই নি' ব'লে আত্মপ্রতারণা করবার আর তার দরকার হ'ল না—প্রবল অনিচ্ছা সত্ত্বেও নিদ্রাদেবীর কুহকে প'ড়ে সে সব ভুলে গেল।

গৌরী কতক্ষণ যে ঘুমিয়েছিল তা সে কি ক'রে বল্‌বে? কারণ গাঢ় ঘুমের মাঝখানে তার এই বিশ্বাসটুকু অটল ছিল যে সে ঘুময় নি। তার মনে হচ্ছিল সে যেন কতক্ষণ ধ'রে তেম্‌নি ক'রে সদর দরজার পানে চেয়ে থেকে থেকে ক্রমশঃ হতাশ হয়ে পড়েছে। এমন সময়ে যেন হঠাৎ বিদ্যুৎ চম্‌কে উঠল আর সেই সঙ্গে সদর দরজা খুলে গিয়ে মুহূর্তের জন্য দেখা দিল—হরলালের সেই সুন্দর ঢল ঢল মুখখানি। নিষ্ঠুর কৌতুকের হাসি হেসে সে শুধু বললে—"কেমন! আস্‌ব ব'লে এলাম না - কেমন জব্দ!" পর মুহূর্তে গাঢ় অন্ধকারের কোলে সব মিশে গেল।

গৌরী ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠ্‌ল। রুদ্ধ শোকের আবেগে তার কচি বুকখানি ফুলে ফুলে উঠল, ঠোঁট দু-খানি কাঁপতে লাগল। পরক্ষণেই কিসের যেন কোমল স্নিগ্ধ স্পর্শে তার কম্পিত অধর শান্ত সংযত হয়ে গেল। যেন তার পাণ্ডুর শীতল কর্ণমূলে বসন্ত বায়ুর মৃদু আঘাত লেগে সারা অঙ্গ রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল।

সন্ত্রস্ত হয়ে উঠে দাঁড়াতেই গৌরী বিস্ময়পুলকিত নয়নে চেয়ে দেখল সে হরলালের নিবিড় বাহুবেষ্টনের মধ্যে গিয়ে পড়েছে। হরলাল বল্‌ছে—"নৌকার অভাবে সারা রাত পার হ'তে পারিনি, শেষে একটা জেলে ডিঙি ধরে যা-হোক ক'রে পেরিয়ে আস্‌ছি। আমি এলাম না ব'লে রাগ করেছিলে, গৌরী?"

এ কথার গৌরী কি উত্তর দিবে? জীবনে সে কখনও হরলালের উপর রাগ বা অভিমান করেছে কি-না, আজকার এই পরম মুহূর্তে সে স্মরণ করতে পার্‌ল না। অতীতের সকল দুঃখ-স্মৃতি এই আকস্মিক সৌভাগ্যের জলোচ্ছ্বাসে ভেসে গিয়েছে। হরলালের বুকের উপর মাথা রেখে গৌরীর মনে হ'ল তার আজীবনের সাধনা এতদিনে সফল হয়েছে, তার তপস্যায় প্রসন্ন হয়ে তার ইষ্টদেবতা বরাভয় বিতরণ করতে সশরীরে আবির্ভূত হয়েছে। নিজের সাফল্য গৌরবে অভিভূত হয়ে সে ভাবল জীবনের এমন চরম সার্থকতা আর কারুর ভাগ্যে কখনও ঘটেনি।

কিন্তু সে জানে না, সৃষ্টির কোন্ এক আদিম যুগে, তারই মতন আর একজন গৌরী, রাজার নন্দিনী হয়েও কত কৃচ্ছ্রসাধন ক'রে যেদিন এক কৌপীনধারী ভিখারীর কৃপা-কটাক্ষ লাভ ক'রে জীবন ধন্য জ্ঞান করেছিলেন, সেদিন থেকে যুগে যুগে কত সাধকের কঠোর সাধনা, কত সাধ্বীর দীর্ঘ নীরব প্রতীক্ষা এমনি এক একটা শুভমুহূর্তে পরিপূর্ণ সার্থকতায় গৌরবান্বিত হয়েছে। পম্পা-সরসী-তীরে শবরীর আজীবন-সঞ্চিত অর্ঘ্যভার-সজ্জিত আশ্রম-কুটীর রামচন্দ্রের পদার্পণে গভীর তৃপ্তিতে ভ'রে উঠেছিল, বৃন্দাবনের মাধবী-কুঞ্জে সাধকের আবির্ভাবে রাধিকার বিরহ-নীরব কণ্ঠে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিল—

"আজু মঝু গেহ গেহ করি মানমু
আজু মঝু দেহ ভেল দেহা।"



সমাচার দর্পণে সেকালের কথা

চরকা আমার ভাতার পুত

(সমাচার দর্পণ—৫ই জানুয়ারি ১৮২৮। ২২ পৌষ ১২৩৪)

ধুত সমাচার পত্রকার মহাশয়।

আমি স্ত্রীলোক অনেক দুঃখ পাইয়া এক পত্র প্রস্তুত করিয়া পাঠাইতেছি আপনারা দয়া করিয়া আপনারদিগের আপন২ সমাচারপত্রে প্রকাশ করিবেন শুনিয়াছি ইহা প্রকাশ হইলে দুঃখ নিবারণকর্ত্তারদিগের কর্ণগোচর হইতে পারিবেক তাহা হইলে আমার মনস্কামনা সিদ্ধ হইবেক অতএব আপনারা আমার এই দরখাস্তপত্র দুঃখিনী স্ত্রীর লেখা জানিয়া হেয়জ্ঞান করিবেন না।

আমি নিতান্ত অভাগিনী আমার দুঃখের কথা তাবৎ লিখিতে হইলে অনেক কথা লিখিতে হয় কিন্তু কিছু লিখি আমার যখন সাড়ে পাঁচ গণ্ডা বয়স তখন বিধবা হইয়াছি কেবল তিন কন্যা সন্তান হইয়াছিল। বৃদ্ধ শ্বশুর শাশুড়ী আর ঐ তিনটি কন্যা প্রতিপালনের কোন উপায় রাখিয়া স্বামী মরেন নাই তিনি নানা ব্যবসায়ে কালযাপন করিতেন আমার গায়ে যে অলঙ্কার ছিল তাহা বিক্রয় করিয়া তাঁহার শ্রাদ্ধ করিয়াছিলাম শেষে অন্নাভাবে কএক প্রাণী মারা পড়িবার প্রকরণ উপস্থিত হইল তখন বিধাতা আমাকে এমত বুদ্ধি দিলেন যে যাহাতে আমারদিগের প্রাণ রক্ষা হইতে পারে অর্থাৎ আসনা ও চরকায় সূতা কাটিতে আরম্ভ করিলাম প্রাতঃকালে গৃহকর্ম্ম অর্থাৎ পাটি ঝাটি করিয়া চরকা লইয়া বসিতাম বেলা দুই প্রহরপর্য্যন্ত কাটনা কাটিতাম প্রায় এক তোলা সূতা কাটিয়া স্নানে যাইতাম স্নান করিয়া রন্ধন করিয়া শ্বশুর শাশুড়ী আর তিন কন্যাকে ভোজন করাইয়া পরে আমি কিছু খাইয়া সরু টেকো লইয়া আসনা সূতা কাটিতাম তাহাও প্রায় এক তোলা আন্দাজ কাটিয়া উঠিতাম এই প্রকারে সূতা কাটিয়া তাঁতিরা বাটীতে আসিয়া টাকায় তিন তোলার দরে চরকার সূতা আর দেড় তোলার দরে সরু আসনা সূতা লইয়া যাইত এবং যত টাকা আগামি চাহিতাম তৎক্ষণাৎ দিত ইহাতে আমারদিগের অন্ন বস্ত্রের কোন উদ্বেগ ছিল না পরে ক্রমে২ ঐ কর্ম্মে বড়ই নিপুণ হইলাম কএক বৎসরের মধ্যে আমার হাতে সাত গণ্ডা টাকা হইল এক কন্যার বিবাহ দিলাম ঐ প্রকারে তিন কন্যার বিবাহ দিলাম তাহাতে কুটুম্বতার যে ধারা আছে তাহার কিছু অন্যথা হইল না রাঁড়ের মেয়্যা বলিয়া কেহ ঘৃণা করিতে পারে নাই কেননা ঘটক কুলীনকে যাহা দিতে হয় সকলি করিয়াছি তৎপরে শ্বশুরের কাল হইল তাঁহার শ্রাদ্ধে এগার গণ্ডা টাকা খরচ করি তাহা তাঁতিরা আমাকে কর্জ্জ দিয়াছিল দেড় বৎসরের মধ্যে তাহা শোধ দিলাম কেবল চরকার প্রসাদাৎ এতপর্য্যন্ত হইয়াছিল এক্ষণে তিন বৎসরাবধি দুই শাশুড়ী বধূর অন্নাভাব হইয়াছে সূতা কিনিতে তাঁতি বাটীতে আসা দূরে থাকুক হাটে পাঠাইলে পূর্ব্বাপেক্ষা সিকি দরেও লয় না ইহার কারণ কি কিছুই বুঝিতে পারি না অনেক লোককে জিজ্ঞাসা করিয়াছি অনেকে কহে যে বিলাতি সূতা বিস্তর আমদানি হইতেছে সেই সকল সূতা তাঁতিরা কিনিয়া কাপড় বুনে। আমার মনে অহঙ্কার ছিল যে আমার যেমন সূতা এমন কখন বিলাতি সূতা হইবেক না পরে বিলাতি সূতা আনাইয়া দেখিলাম আমার সূতাহইতে ভাল বটে তাহার দর শুনিলাম ৩।৪ টাকা করিয়া সের আমি কপালে ঘা মারিয়া কহিলাম হা বিধাতা আমাহইতেও দুঃখিনী আর আছে পূর্ব্বে জানিতাম বিলাতে তাবৎ লোক বড় মানুষ বাঙ্গালি সব কাঙ্গালী এক্ষণে বুঝিলাম আমাহইতেও সেখানে কাঙ্গালিনী আছে কেননা তাহারা যে দুঃখ করিয়া এই সূতা প্রস্তুত করিয়াছে সে দুঃখ আমি বিলক্ষণ জানিতে পারিয়াছি এমত দুঃখের সামগ্রী সেখানকার হাটে বাজারে বিক্রয় হইল না একারণ এ দেশে পাঠাইয়াছেন এখানেও যদি উত্তম দরে বিক্রয় হইত তবে ক্ষতি ছিল না তাহা না হইয়া কেবল আমারদিগের সর্ব্বনাশ হইয়াছে সে সূতায় যত বস্ত্রাদি হয় তাহা লোক দুই মাসও ভালরূপে ব্যবহার করিতে পারে না গলিয়া যায় অতএব সেখানকার কাটনিরদিগকে মিনতি করিয়া বলিতেছি যে আমার এই দরখাস্ত বিবেচনা করিলে এদেশে সূতা পাঠান উচিত কি অনুচিত জানিতে পারিবেন।

শান্তিপুর কোন দুঃখিনী সূতা কাটনির দরখাস্ত।"

('সমাচার চন্দ্রিকা' হইতে উদ্ধৃত)

——

রামমোহন রায়ের মানিকতলার বাগানবাটী নীলাম

(৯ জানুয়ারি ১৮৩০। ২৭ পৌষ ১২৩৬)

"ইশতেহার।—স্থাবরধন পবলিকসেলে অর্থাৎ নীলামে বিক্রয় হইবেক।

সন ১৮৩০ সালে আগামি ২১ জানুআরি বৃহস্পতিবার টালা কোম্পানি সাহেবেরা তাহারদের নীলামঘরে নীচের লিখিত স্থাবরধন পবলিকঅক্সেন অর্থাৎ নীলাম করিবেন বিশেষতঃ অপর সর্কুলর রোড শিমলার মানিকতলাস্থিত বাটী ও বাগান যাহাতে এক্ষণে বাবু রামমোহন রায় বাস করেন। ঐ বাটীর উপরে তিন বড় হাল অর্থাৎ দালান ছয় কামরা দুই বারান্দা ও নীচের তালায় অনেক কুটরী আছে এবং ঐ বাটীর অন্তঃপাতি গুদাম ও বাবুর্চিখানা ও আস্তবল প্রভৃতি আছে।

এবং ১৫ বিঘা জমীর এক বাগান ঐ বাগানে অতি উত্তম সমভূমি ও পাকা রাস্তা ও তাহাতে নানাবিধ ফলের গাছ ও তিনটা বৃহৎ পুষ্করিণী আছে ঐ বাগানে কলিকাতার সীমার মধ্যস্থ গবর্ণমেণ্ট হৌসহইতে গাড়ীতে বিশ মিনিট পঁহুচান যায়।

ঐ বাটি ও ভূমির চতুঃসীমা এই বিশেষতঃ উত্তরদিগে গদাধর মিত্রের বাগান দক্ষিণদিগে সুকেশের ষ্ট্রিটনামে রাস্তা পূর্ব্বদিগে সর্কুলর রোড নামে সড়ক এবং পশ্চিমে ও উত্তরপশ্চিমে রূপনারায়ণ মল্লিকের বাগান।

ঐ বাটী ও বাগান যিনি দেখিতে চাহেন তাঁহার দেখিবার কিছু বাধা নাই।'

আপার সার্কুলার রোডের যে-বাড়িতে এখন পুলিসের ডেপুটি কমিশনার থাকেন তাহাই রামমোহন রায়ের মানিকতলার উদ্যান-বাটীর অংশ-বিশেষ।"

(ভারতবর্ষ—বৈশাখ, ১৩৩৮) শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রাচীন ভারতে গ্রামের কথা

প্রাচীন ভারতের গ্রামের স্পষ্ট চিত্র আমরা প্রথমে পাই বৌদ্ধ সাহিত্যে। বাহিরের দিক থেকে দেখতে গেলে তখনকার আর এখনকার গ্রামে বড় একটা প্রভেদ দেখা যায় না। এখনকারই মত তখনও কতকগুলি গৃহস্থের বাড়ীর চারিদিকে খানিকটা জঙ্গল, গোচারণের মাঠ, আর চাষের জমি—এই নিয়ে ছিল গ্রাম। প্রভেদের মধ্যে তখন অনেক গ্রামেরই চারিদিক বেড়া অথবা দেয়াল দিয়ে ঘেরা ছিল। কিন্তু তখনকার গ্রাম্য জীবন আর এখনকার গ্রাম্য জীবনে কতকগুলি প্রভেদ ছিল। তখনকার গ্রাম্য জীবন সঙ্ঘবদ্ধ ছিল, এখনকার মত বিচ্ছিন্ন ছিল না। গোচারণের মাঠও যেমন সাধারণের সম্পত্তি, চাষের জমিও তেমনি সারা গাঁয়েরই সম্পত্তি ছিল। প্রতি গৃহস্থের জন্য আলাদা আলাদা জমি নির্দ্দিষ্ট ছিল, তাঁরা তাই চাষবাস করে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করতেন। কিন্তু তাঁরা কেউ সেই জমির স্বত্বাধিকারী বা মালিক ছিলেন না; ইচ্ছামত দখলী জমি বিক্রয়, মর্টগেজ বা উইল করে কাউকে দিয়ে যাবার ক্ষমতা বা অধিকার তাদের ছিল না। অপর দিকে জমিদার শ্রেণীরও অস্তিত্ব ছিল না। গ্রামের লোক মিলিত হয়ে গ্রামের সব ব্যবস্থা করত, গ্রামের জমির বিলি ব্যবস্থার ভারও তাদেরই উপর ছিল। রাজা নির্দ্দিষ্ট রাজকর পেতেন, মোট গ্রামের উপর থেকে—কোন নির্দ্দিষ্ট ভূখণ্ড তার কোন নির্দ্দিষ্ট অংশের জন্য দায়ী ছিল না। রাজা তাঁর এই প্রাপ্য কর কাউকে দান করতে পারতেন, কিন্তু এই নূতন জমিদার নির্দ্দিষ্ট কর পাওয়া ছাড়া গ্রামে আর কোন রকম অধিকার জারি করতে পারতেন না। গ্রামের বয়স্ক পুরুষেরা মিলে সভা হত, তারা একজন মোড়ল নিযুক্ত করত। এই মোড়ল ও গ্রাম্য সভা মিলে গ্রামের সকল কাজ নির্ব্বাহ করতেন, অফিস, কর্ম্মচারীর বালাই ছিল না।" রোদ পড়লে বট, তেঁতুল বা অন্য গাছের তলায়, বড় জোর গ্রাম্য মন্দিরের আঙিনায়, সভা বসত। সেইখানেই গ্রাম্য সমস্যার মীমাংসা, অপরাধীর বিচার, গ্রামের রাস্তাঘাট, পুকুর, মন্দির প্রভৃতির ব্যবস্থা সব মুখে মুখেই হ'ত।

কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে দেখতে পাই গ্রামের দিকে রাজার বেশ দৃষ্টি পড়েছে। আর গ্রামের শাসন ব্যবস্থাও বেশ একটু জটিল হয়ে উঠেছে। এখন আর রাজশক্তি গ্রাম সম্বন্ধে একেবারে উদাসীন নন। দেশের সমস্ত গ্রামগুলি নির্দ্দিষ্ট কতকগুলি ভাগে বিভক্ত করে কোন্ গ্রামে কি রাজকর দেবে তা নির্দ্দিষ্ট করে দেওয়া হ'ত। সকল গ্রামে এক রকম কর দিত না। গ্রাম বিশেষে নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক সৈন্য, ধান্যাদি, পশু, সুবর্ণ অথবা অন্যান্য ধাতু করস্বরূপ আদায় করা হ'ত। রাজার তরফ থেকে এ সকল পর্য্যবেক্ষণ করার জন্য একজন রাজকর্ম্মচারী থাকতেন—তাঁকে গোপ বলা হ'ত। সাধারণতঃ তিনি পাঁচ থেকে দশটি গ্রামের তত্ত্বাবধান করতেন। তাঁর কাজ ছিল বেশ দায়িত্বপূর্ণ। এখনকার কালের সেটেলমেণ্ট আর সেন্সেস্ অফিসার এই দুয়ে মিলে যে কাজ করেন একা গোপেরই সেই কাজ ছিল। প্রথমতঃ প্রতি গ্রামের সীমানা ঠিক করে তারপর রীতিমত প্রতি গ্রামের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ লিপিবদ্ধ করতে হ'ত। গোপের রেজেষ্ট্রী খাতায় প্রতি গ্রামে কোন্ কোন্ বিষয় লেখা হ'ত কৌটিল্য তার বেশ বড় রকম একটা তালিকা দিয়েছেন। এই তালিকাটি বড়ই মূল্যবান।...

প্রথমতঃ গ্রামের চতুঃসীমা নির্দ্দিষ্ট করে দিয়ে তার পরিমাণ ঠিক করে, গ্রামে কোন্ রকমের জমি কি পরিমাণ আছে তাও ঠিক করতে হ'ত। তারপর তাঁর রেজেষ্ট্রী খাতায় লিখতে হ'ত, প্রতি গ্রামে কত চাষযোগ্য ও চাষের অযোগ্য এবং টান ও জলো জমি আছে, উপবন, কদলী প্রভৃতির বাগান, ইক্ষু প্রভৃতির উৎপন্ন স্থান, ফলের গাছ, বাস্তুভূমি, চৈত্যবৃক্ষ, মন্দির, সেতু, শ্মশান, অন্নসত্র, জলসত্র, তীর্থস্থান, গোচারণ ভূমি, ও গাড়ী চলার রাস্তা, পায়ে চলার পথ প্রভৃতির সংখ্যা ও পরিমাণ সবই তাঁর বইয়ে লিখতে হ'ত।

এ ছাড়া জমির ক্রয় বিক্রয়, দান, কৃষককে খাজানা রেহাই বা ধান্যাদি দ্বারা কোন প্রকারে সাহায্য করিলে তাহাও লিপিবদ্ধ করতে হ'ত। তারপর প্রতি গৃহের পরিচয় ও কোন্ গৃহস্থকে কত কর দিতে হ'বে, কোন্ গৃহস্থকে কর দিতে হ'বে না, কর দিতে হ'লে তাহা টাকা পয়সা অথবা কায়িক পরিশ্রম দ্বারা—ইত্যাদি সমুদয়ই লিখতে হইত। গৃহস্থদের মধ্যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, কৃষক, গোপাল, বণিক, শিল্পী, দাস, কোন্ শ্রেণীর কত, এবং তাহাদের মধ্যে স্ত্রী, পুরুষ, বালকবালিকা, বৃদ্ধ বৃদ্ধা কত, এবং তাহাদের চরিত্র, জীবিকা-নির্ব্বাহের উপায়, আয়ব্যয় প্রভৃতি সমুদয় লিখিতে হ'ত। এ ছাড়া প্রতি গ্রামে দ্বিপদ, চতুষ্পদ প্রভৃতির সংখ্যা কত, কোন্ রকমে কত শুল্ক আদায় হয় ইত্যাদিও লেখা থাকত।

এই সমুদয় সম্বন্ধে গোপ যে হিসাব লিখতেন তাই চূড়ান্ত ব'লেয়া গ্রাহ্য হ'ত না। সরকার কর্তৃক নিযুক্ত গুপ্তচরেরা এ'সে এই সমুদয় বিবরণ কত দূর সত্য তা পরীক্ষা করেয়া যাইত।

কৌটিল্যের যুগেও গ্রামের সংঘবদ্ধ জীবন অনেকটা পূর্ব্বের ন্যায়ই চলেছিল। কিন্তু এই সংঘবদ্ধ জীবনের খুব বিস্তৃত পরিচয় কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে পাওয়া যায় না।

সংঘবদ্ধ গ্রাম-জীবনের সবচেয়ে বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায় দাক্ষিণাত্যের শিলালিপিতে। এই সমুদয় পাঠে জানা যায় যে প্রায় প্রত্যেক গ্রামেই একটি গ্রাম্য সভা ছিল। এই সভা গ্রামের যাবতীয় কার্য্য নির্ব্বাহ করতেন। অনেক স্থলেই গ্রামের সাবালক পুরুষেরা সকলেই এই সভার সভ্য থাকতেন। কোন কোন স্থলে এর ব্যতিক্রম দেখা যেত এবং বিভিন্ন প্রণালী অনুসারে সভ্য নির্ব্বাচিত হ'ত।

গ্রাম্য সভা সংঘবদ্ধভাবে জমি জমা, টাকা পয়সার মালিক হ'তে পারতেন এবং লোকে ধর্ম্ম ও দাতব্যের জন্য নির্দ্দিষ্ট সর্ত্ত অনুসারে ইঁহাদের হাতে জমি জমা, টাকা পয়সা, জমা রাখত। এই সভা গ্রামবাসীদের অপরাধের বিচার করতেন ও গ্রামে শান্তিরক্ষার ব্যবস্থা করতেন। হাট বাজারের ব্যবস্থা, বিক্রীত জিনিষের উপর 'টোল' আদায় এবং আবশ্যক বোধ করলে নির্দ্দিষ্ট কোন কার্য্যের জন্য ট্যাক্স ধার্য্য প্রভৃতি এবং গ্রামবাসীদের নিকট 'বেগার' দাবী করা ইঁহাদের ক্ষমতার মধ্যে ছিল। ইঁহারা গ্রামে পানীয় জলের ব্যবস্থা, মন্দির, বিদ্যালয়, পথ ঘাট, কূপ, পুষ্করিণী, বাগান ও দাতব্য অনুষ্ঠানগুলির তত্ত্বাবধান করতেন। ইঁহারা দুর্ভিক্ষের সময় লোকদিগকে সাহায্য করতেন। গবর্ণমেণ্ট এই সমুদয় সভার নিকট হইতে রাজার প্রাপ্য কর আদায় করিতেন এবং দুর্ভিক্ষ প্রভৃতির সময় ইঁহারা আবেদন করলে রাজার প্রাপ্য কর লাঘব অথবা একেবারে মাপ করা হত।

এই সমুদয় কার্য্যনির্ব্বাহের জন্য গ্রাম্য সভা অনেকগুলি ছোট ছোট সমিতি নিযুক্ত করতেন। বিভিন্ন শিলালিপিতে নিম্নলিখিত সমিতিগুলির উল্লেখ দেখা যায়।

(১) সাধারণ পরিদর্শন সমিতি; (২) দাতব্য সমিতি; (৩) পুষ্করিণী সমিতি; (৪) উদ্যান সমিতি; (৫) বিচার পরিদর্শন সমিতি, (৬) সুবর্ণ পরিদর্শন সমিতি; (৭) পাড়া সমিতি; (৮) ক্ষেত্র

পরিদর্শন সমিতি ; (৯) মন্দির পরিচালনা সমিতি ; (১০) সাধু সন্ন্যাসী পরিদর্শন সমিতি।

যুবা, বৃদ্ধ ও স্ত্রীলোক সকলে এই সমুদয় সমিতির সভ্য হতেন। প্রতি সমিতির কার্য্য মোটামুটি নাম থেকেই বুঝা যায়। ষষ্ঠ সমিতি সম্ভবতঃ আয় ও ব্যয় বিভাগ দেখতেন। অন্যান্য সমিতির অধিকারের অতিরিক্ত যা কিছু তাই সম্ভবতঃ প্রথম সমিতির অধীন ছিল।

যাঁহারা গ্রামের বিশিষ্ট কোন উপকার করিতেন গ্রাম্য-সভা তাঁদের প্রতি যথোচিত সম্মান দেখাবার ব্যবস্থা করতেন। একবার এক ব্যক্তি মুসলমান আক্রমণকারিগণের হাত থেকে একটি মন্দির রক্ষা করেছিল। গ্রাম্য সভা তাকে উক্ত মন্দিরে কয়েকটি বিশিষ্ট অধিকার দিলেন এবং নিয়ম করে দিলেন যে প্রতি কৃষক ধান কাটার সময় উৎপন্ন ধান্যের এক নির্দ্দিষ্ট অংশ তাহাকে দিবে। গ্রাম রক্ষার্থ যুদ্ধে আহত ব্যক্তিকে নিষ্কর জমি দেওয়ার উল্লেখ অনেক শিলালিপিতে আছে। এক ব্যক্তি এইরূপে গ্রাম রক্ষা করতে গিয়ে প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়েছিলেন। গ্রাম্য সভা স্থির করলেন, এই মহত্ত্বের স্মৃতি রক্ষার জন্য চিরদিন গ্রাম্য মন্দিরে একটি প্রদীপ জ্বালিয়ে রাখা হবে। একখানি শিলালিপিতে নিম্নলিখিতরূপে একটি গ্রাম্য সভার মন্তব্য উদ্ধৃত রয়েছে:—"এই গ্রামের অধিবাসিগণ, এই গ্রাম বা তাহার মন্দির প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের অনিষ্টকর কোন কার্য্য করিবে না, যদি করে তবে তাহাদিগকে 'গ্রামদ্রোহী'র উপযুক্ত শাস্তি দেওয়া হইবে এবং তাহারা মন্দিরের শিবলিঙ্গ স্পর্শ করিতে পারিবে না।"

(পল্লী-স্বরাজ, মাঘ ও ফাল্গুন, ১৩৩৭) শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার

—

মাইকেল মধুসূদন দত্ত ও বাংলা কাব্য

উনবিংশ শতাব্দের প্রারম্ভে যখন ঐশ্বর্য্যশালী ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্য হইতে আমাদের সাহিত্যে নূতন ভাবস্রোত প্রবাহিত হইয়াছিল, তখন সেই নবজীবন সঞ্চারের সঙ্গে সঙ্গে নূতন অভাব পূর্ণ করিবার জন্য নূতন বিধি ও নূতন সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হইয়াছিল। কিন্তু নূতন ও পুরাতনের সন্ধিস্থলে দাঁড়াইয়া যে সকল কবি নূতনকে গ্রহণ করিলেন, তাঁহারাও পুরাতনকে সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করিতে পারিলেন না। এমন কি মাইকেলও তাঁহার যুগান্তকারী প্রতিভা লইয়া অতীতের বন্ধন একেবারে ছিন্ন করিতে পারেন নাই; কিন্তু তিনি অতীতের নির্জ্জীবদেহে যে নূতন প্রাণের সঞ্চার করিয়াছিলেন, তাহাতেই তাঁহার ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যাইবে।

সে যুগে পশ্চিমের সঙ্গে হঠাৎ ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের ফলে যে নূতন ভাব, চিন্তা ও সাহিত্য এদেশে আসিল, তাহার প্রচণ্ড প্রভাবে বিস্মিত ও সচকিত বাঙ্গালী যুবক নূতনত্বের মোহে আকৃষ্ট ও অবশ হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু এই ভাব, চিন্তা ও সাহিত্য নূতন হইলেও বিজাতীয়; সেইজন্য পুরাতনকে আঁকড়াইয়া ধরিবার জন্য একটা প্রাণপণ চেষ্টা হইয়াছিল। এই স্থিতিশীল দলের নেতা ছিলেন ঈশ্বর গুপ্ত; কিন্তু ইংরেজী শিক্ষায় সুশিক্ষিত হইলেও রঙ্গলাল ও হেমচন্দ্রেরও পক্ষপাতিতা অনেকটা এই দিকেই ছিল। যদিও স্কট, মুর ও বায়রণের Verse-tale-এর অনুকরণে এবং সদ্য-আহৃত স্বাদেশিকতার ঝোঁকে, বিদেশী-শিক্ষাভিমানী রঙ্গলাল প্রভৃতি উপাখ্যান-কাব্য লিখিতে আরম্ভ করিলেন, তথাপি ভাষায়, ভাবে ও ভঙ্গীতে তাহাদের উপর পৌরাণিক আদর্শে রচিত চণ্ডী বা মনসা-কাব্যের প্রভাবও সুস্পষ্ট এবং ভারতচন্দ্রের প্রভাব সম্পূর্ণরূপে এড়াইবার সামর্থ্য তাঁহাদের ছিল না। সেইজন্য সমসাময়িক ইংরেজী Verse-tale-এ যেটুকু romantic ভাব ছিল এবং যাহার জন্য এই শ্রেণীর কাব্যের বৈশিষ্ট্য বা উপাদেয়তা, সেই ভাবটুকু তাঁহারা তাঁহাদের স্বকীয় উপাখ্যান-কাব্যে সঞ্চারিত করিতে পারেন নাই। শুধু ঘটনা-বৈচিত্র্য বা কথাবস্তু-মাত্র কবিতার প্রাণ নহে; কবির শক্তিও থাকা আবশ্যক। রঙ্গলালের এবং হেমচন্দ্রের বিষয়-বস্তুর প্রতি দৃষ্টি এতটা অধিক যে, তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখিতে গিয়া তাঁহারা উপাখ্যান কাব্যের প্রকৃত রূপটি ফুটাইয়া তুলিতে পারেন নাই।...

ইউরোপীয় সাহিত্যের ভাব, ছন্দ ও ভঙ্গী যে বাংলা-ভাষায় শুধু অনুকরণ করা যায় তাহা নহে, ফুটাইয়া তোলাও যায়, তাহা মাইকেল প্রথম দেখাইলেন।...

নূতন ইউরোপীয় সাহিত্যের যে প্রাণটি রঙ্গলাল বা হেমচন্দ্র কেহই মৃতকল্প বাংলা সাহিত্যের দেহে আনিয়া দিতে পারেন নাই, মাইকেল সে প্রাণটি আনিয়া সংযোজিত করিয়া তাহাকে নবজীবন দান করিলেন। মাইকেল দেখিলেন যে, পয়ার ও ত্রিপদী-ছন্দে রচিত, একভাবাপন্ন, ধর্ম্মজীবনের ক্ষুদ্র আয়তনে নিবদ্ধ, অথবা ছড়া, উপাখ্যান ও একঘেয়ে গীতি কবিতায় নিঃশেষিত প্রাচীন সাহিত্যের অনুকরণে কোন ফল নাই। এই নির্জ্জীব ও অধঃপতিত সাহিত্যকে সজীব ও উন্নত করিতে হইলে, বিদেশী সাহিত্য হইতে নূতন ভাব ও আদর্শের আমদানী করিতে হইবে। তাঁহার শিক্ষা, প্রতিভা ও দুর্দমনীয় আত্মবিশ্বাস তাঁহাকে এই কার্য্যের সম্পূর্ণ উপযুক্ত করিয়াছিল এবং তিনি একাই কাব্য সাহিত্যে যুগান্তকারী বিপ্লব আনয়ন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

অনন্যসাধারণ ক্ষমতা থাকিলেও মাইকেলের কোনও একখানি গ্রন্থ নিখুঁত বা সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর নহে। কিন্তু পরিবর্ত্তন-যুগের লেখকদিগকে শুধু এইরূপ মাপকাঠি দিয়া মাপিলে চলিবে না। সাহিত্য-সেবায় তাঁহারা যেটুকু নির্দ্দিষ্ট সাফল্য লাভ করিয়াছিলেন, তাহা অল্প হইতে পারে, কিন্তু তাহা তুচ্ছ নহে। তাঁহারা যাহা করিয়াছেন শুধু তাহাই নহে, পরন্তু যাহা করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন বা যাহা করিবার প্রথম পথ দেখাইয়াছিলেন তাহাও ধরিতে হইবে। শুধু সিদ্ধি হিসাবে নহে—সাধনা হিসাবেও এই সকল রচনা মূল্যবান। স্বল্পায়ু জীবনের প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত মাইকেল পথ খুঁজিয়াছিলেন, পথ প্রস্তুত করিয়াছিলেন। কাব্যে, নাটকে, গীতিকবিতায়, প্রহসনে, নূতন ছন্দের প্রবর্ত্তনে সর্ব্বত্রই তিনি জাতির সাহিত্যপথের পাথেয় সংগ্রহ করিয়াছিলেন। সর্ব্বত্র এই স্বাধীনচেতা পুরুষের স্বাধীনতাই মূলমন্ত্র ছিল। সাহিত্যের বহির্গঠনে ও অন্তর্গতভাবে সর্ব্বত্রই তিনি যে স্বাধীনতা খুঁজিয়াছিলেন, নূতন শিক্ষার নূতন আলোক তাঁহাকে সেই পথ দেখাইয়া দিয়াছিল।...

কিন্তু শুধু পথপ্রদর্শক হিসাবে নহে, কবি হিসাবেও তাঁহার কৃতিত্ব অসাধারণ। প্রকৃত কবিত্বশক্তির ব্যঞ্জনায় তাঁহার কাব্যের শুধু ঐতিহাসিক নহে, একটি স্বতন্ত্র অনন্যসম্বন্ধ মূল্য নির্দ্ধারণও সম্ভবপর। বাংলা সাহিত্যে মাইকেল অনেকগুলি নূতন প্রয়োগের পরীক্ষা করিয়াছেন, কিন্তু প্রকৃত কবিত্ব শক্তি না থাকিলে এই নূতন

প্রচেষ্টাগুলিকে রূপ দিতে পারিতেন না। এ বিষয়ে তাঁহার প্রধান কৃতিত্ব বাংলা ভাষায় অমিত্রাক্ষর ছন্দ। ইহার সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিলেই আমাদের বক্তব্য পরিষ্কার হইবে, কারণ এই একটি বিষয়ের প্রয়োগ-নৈপুণ্য হইতে বুঝা যাইবে যে, মাইকেলের কবিপ্রতিভা কত অসামান্য এবং কবিহিসাবে বাংলা সাহিত্যে তাঁহার স্থান কত পৃথক ও উচ্চ।

অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তন যিনি করিয়াছিলেন, তিনি কত বড় প্রতিভাবান কবি, এবং এই ছন্দের অপূর্ব ঝঙ্কার তাঁহার কবিত্বশক্তির কতখানি সাক্ষ্য দিতেছে, তাহা বুঝিতে গেলে প্রথমতঃ বুঝিতে হইবে যে, অমিত্রাক্ষর ছন্দের সঙ্গীত আয়ত্ত করিতে কতখানি শক্তির প্রয়োজন। বিদেশী ভাষার উৎকৃষ্টতম ও সর্বাপেক্ষা কঠিন ছন্দ তদানীন্তন অতি দুর্বল ও অপরিণত বাংলা কাব্যের দেহে (শুধু অক্ষর গণিয়া নহে, প্রকৃতরূপে) ধ্বনিত করিয়া তোলা যে কতখানি বিস্ময়কর ব্যাপার, তাহা একটু ভাবিয়া দেখিলেই বুঝা যায়। মাইকেল দুর্লভ প্রতিভা বলে বিদেশী কাব্যের আত্মাকে আত্মসাৎ করিয়াছিলেন, নতুবা তাঁহার ছন্দ এমন জীবন্ত হইয়া উঠিত না। দ্বিতীয়তঃ, এই সম্পূর্ণ নূতন ছন্দ, বাংলা কাব্যের সাধারণ রীতি ও প্রকৃতি এবং সেই সঙ্গে তাহার গতিও ফিরাইয়া দিল। তিনি বাংলা কাব্যের ছন্দভাণ্ডারে কেবলমাত্র একটি নূতন ছন্দ দান করেন নাই; এই প্রেরণার মূলে, একটি নূতন কল্পনা ও ভাবজগতের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। এই ছন্দের অন্তরালে একটি অপূর্ব কবি-মানসের পরিচয় পাওয়া যায়; শুধু বাংলা কবিতার বেড়ী ভাঙে নাই, সঙ্গে সঙ্গে নূতন পথের সন্ধান আসিয়াছে। বাংলার কবিপ্রকৃতি যে প্রাচীন ভাব, ভঙ্গী ও নিয়মসংস্কারের বন্ধনে নিৰ্জ্জীব হইয়া পড়িয়াছিল, এই ছন্দ-স্বাচ্ছন্দ্য তাহার মুক্তি-সাধন করিল; পরবর্তী কবিগণের অন্তরে নবসৃষ্টির দুঃসাহস ও স্বাধীনতার স্ফূর্তি সঞ্চার করিল। নূতনকে কেমন করিয়া কি ভাবে বরণ করিতে হয়, সেই মন্ত্র, এবং ইউরোপীয় সাহিত্যের অন্তর্গত ভাব ও রূপভঙ্গী বাংলা-কাব্যের কতখানি শ্রীসম্পাদন করিতে পারে, সেই বিশ্বাস ইহাদিগের কাব্য-প্রেরণাকে সঞ্জীবিত করিল। বাংলা-কাব্যে ও কবিকল্পনায় এই মুক্তি সাধনই মাইকেলের সর্বপ্রধান কীর্তি। তৃতীয়তঃ,—ভাবের দিক হইতে যেমন, তেমনি কবিতার বহিরঙ্গ, ভাষা ও ছন্দের ব্যাপারেও মাইকেলের অমিত্রাক্ষর অল্প সহায়তা করে নাই। বাংলা কবিতার আদিরূপ যে পয়ার—এবং যাহা বাংলা ছন্দের মেরুদণ্ড স্বরূপ সেই পয়ারের অন্তর্নিহিত শক্তি যে কত বৃহৎ, তাহা মাইকেলই প্রথম দেখাইলেন। অতঃপর এই পয়ারের শক্তি বহুপরিমাণে বাড়িয়া গেল; অসামান্য ধ্বনিবৈচিত্র্যে এই পয়ার সমৃদ্ধ হইয়া উঠিল।

কিন্তু এই অমিত্রাক্ষর ছন্দরচনা কেবল অভিনব কবিকৌশলের প্রমাণ নহে, ইহাতে আরও নিগূঢ় কবিশক্তির পরিচয় আছে। অমিত্রাক্ষরের সঙ্গীততরঙ্গে ছন্দসরস্বতীর যে সপ্তস্বর বাজিয়াছে তাহা সম্ভব হইল কেমন করিয়া? মাইকেল কি কেবল ছন্দ-কুশলী, ছন্দ-ধ্বনির সুনিপুণ কলাবিদ? যে অবস্থায় যে ভাবে এই বিদেশী সঙ্গীতকে তিনি স্বদেশীছন্দে ধরিতে পারিয়াছিলেন, তাহাতে শুধু কলা-নৈপুণ্যের পরিচয় ছাড়া মহত্তর কবিশক্তিরও পরিচয় পাওয়া যায়। বস্তুত মাইকেল যে ছন্দঃশাস্ত্রের বিশ্লেষণ বা বিশেষ আলোচনা করিয়া এই অপূর্ব ছন্দ সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাহার কোনও প্রমাণ নাই। যে আবেগ বা কবি-প্রেরণা সকল উৎকৃষ্ট কবিতার উৎস, যাহা কাব্যের ছন্দ-সঙ্গীতে রূপ গ্রহণ করে, সেই খাঁটি ভাব-প্রেরণাই তাঁহার অমিত্রাক্ষর ছন্দে স্পন্দিত হইয়াছে। তাঁহার কাব্যে আবেগের প্রাচুর্য্য, ও ভাবের বিরাট গম্ভীর বিপুলতা, ইহার বিষয়বস্তুকে ছাড়াইয়া সহৃদয় পাঠককে মুগ্ধ করে। এই ছন্দের অবারিত ঝঙ্কারের মধ্যেই আমরা কবিপ্রাণের পরিচয় পাই। তাঁহার কল্পনা বিশাল পক্ষ বিস্তার করিয়া এই ছন্দকে একমাত্র বাহন করিয়া একটি অতি ঊর্দ্ধ মহিমা-লোকে উড্ডীন হইবার প্রয়াস করিতেছে,—কবির যাহা বক্তব্য তাহা অপেক্ষা এই আবেগের মধ্যেই তাঁহার কবি-কল্পনার মহত্ত্ব আমরা উপলব্ধি করি। তাঁহার কাব্যে যে বাহিরের ছন্দোময় প্রকাশটুকু দেখিতে পাই তাহা শুধু বাহিরের বেশ নহে, তাহা ইহার অন্তরের ভাব-মূর্তি। কবির প্রাণে কবিতার যে আদর্শ রহিয়াছে, লোকাতীত কাব্যলোকে বিচরণ করিবার যে দুর্দমনীয় আকাঙ্ক্ষা জাগিয়াছে, সর্ব-বন্ধন মুক্তির যে অসীম আনন্দ তাঁহার কবিচিত্তকে উদ্বেল করিয়াছে, মেঘনাদবধের অমিত্রাক্ষর ছন্দের সাগর-কল্লোলবৎ গম্ভীরমধুর প্রাণোচ্ছ্বাসে তাহাই পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। মাইকেলের ভাবাবেগ ও কবিশক্তির প্রকৃষ্ট নিদর্শন এই সঙ্গীত—ইহাই তাঁহার কাব্যকীর্ত্তি। এইখানেই তাঁহার সৃষ্টিশক্তির পরিচয়। ইহা হইতেই তাঁহার কবিপ্রতিভার বৈশিষ্ট্য ও বাংলাকাব্যে তাঁহার দানের মূল্য বুঝিতে পারা যায়। তাঁহার একখানি কাব্যও পূর্ণাঙ্গ না হইলেও, তিনি যে প্রাণের স্ফূর্ত্তি ও কবিকল্পনার মুক্তি বাংলাসাহিত্যে আনিয়াছিলেন, তাহাই তাঁহার কবিকীর্ত্তির গৌরব বলিয়া প্রতীয়মান হইবে। এইজন্য আধুনিক বাংলা কাব্যে মধুচ্ছন্দা মধুসূদনের আসন এত স্বতন্ত্র ও অনন্যসাধারণ।

(শতদল—চৈত্র, ১৩৩৭) শ্রীমৃণাল দাশগুপ্তা

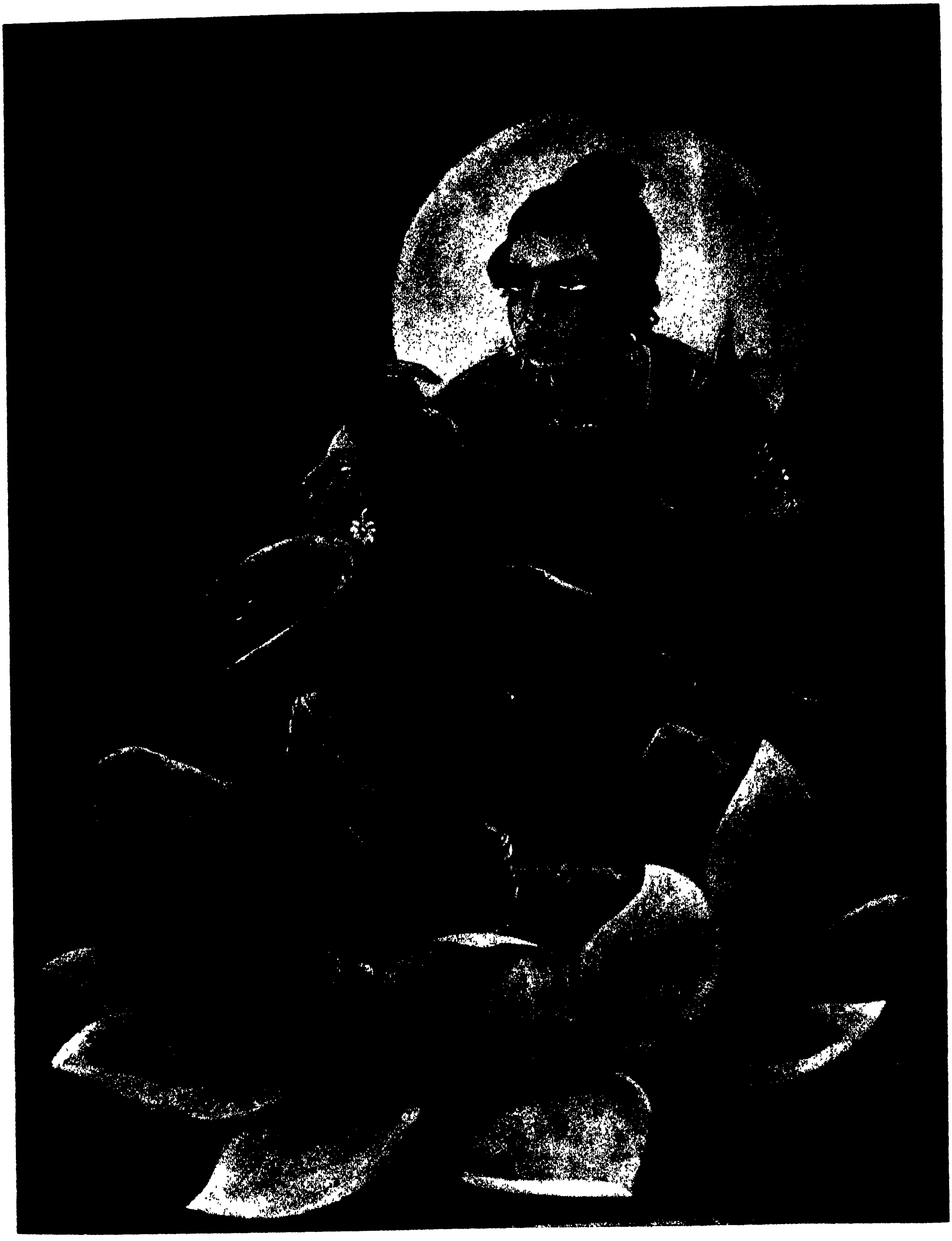
—

বাংলা দেশে মহিলা-সম্পাদিত পত্রিকার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

বাংলাদেশে মহিলা-সম্পাদিত পত্রিকা সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয়েছিল—১২৮০ সালে। শ্রীমতী ভুবনমোহিনী দেবী-সম্পাদিত "বিনোদিনী" নামক পত্রিকাই বাংলাদেশে প্রথম মহিলা-পরিচালিত পত্রিকা, কিন্তু দুঃখের বিষয় "বিনোদিনী" দীর্ঘ-জীবন লাভ করতে পারেনি, কয়েক সংখ্যা প্রকাশের পর বিলুপ্ত হয়ে যায়।...

শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী বাংলা-মাসিক পত্রিকার দ্বিতীয়া-সম্পাদিকা। ১২৯১ সালে স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর "ভারতী" পত্রিকার পরিচালন কর্ম্ম হ'তে অবসর গ্রহণ করলে, শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী "ভারতী"র সম্পাদনভার গ্রহণ করেন।...মাসিক পত্রিকা পরিচালনায় শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী যে কোনও অংশেই অযোগ্য ছিলেন না, "ভারতী"-সম্পাদিকার আসনে তিনি একাধিক বার প্রতিষ্ঠিতা থেকে তার প্রমাণ দেখিয়েছেন।

১২৯২ সালে শ্রীমতী জ্ঞানদানন্দিনী দেবী (শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণীর মাতা) "বালক" নামে একখানি মাসিক পত্রিকা



সূর্য্য ও কমল

শ্রীরবিশঙ্কর রাবল

সম্পাদন করেছিলেন। বিশ্ববরেণ্য কবি রবীন্দ্রনাথের তরুণ-যৌবনের বহু রচনা "বালকে"র বক্ষ অলঙ্কৃত করেছিল। সেই বালকে প্রথম আমরা বালক বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ও বালিকা সরলাদেবীর রচনা দেখতে পাই।...দু'বৎসর প্রকাশ হ'বার পর "বালক" ভারতীর সহিত যুক্ত হয়ে যায়। তারপরে ১৩০২ সালে শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবীর সুযোগ্যা কন্যাদ্বয়া স্বর্গীয়া হিরণ্ময়ী দেবী ও শ্রীমতী সরলা দেবী প্রসিদ্ধ "ভারতী" পত্রিকার ভার গ্রহণ করেন।

১৩০৪ সালে 'পুণ্য' নামে একখানি মহিলা-সম্পাদিত মাসিক পত্রিকা প্রকাশ হয়েছিল। পুণ্যের সম্পাদিকা ছিলেন, শ্রীমতী প্রজ্ঞাসুন্দরী দেবী। ইনি ১৩০৪ সাল থেকে ১৩০৮ সাল পর্য্যন্ত পাঁচ বৎসর পত্রিকাখানি পরিচালিত করেছেন।

১৩০৪ সালে আর একখানি তৎকালীন প্রসিদ্ধ মহিলা-সম্পাদিত মাসিক পত্রিকা প্রকাশ হয়েছিল—নাম "অন্তঃপুর"। "অন্তঃপুর" মহিলাদের রচনা দ্বারা পরিপুষ্ট হ'য়ে সাহিত্যক্ষেত্রে মাসে মাসে দেখা দিত। "অন্তঃপুর"-এর প্রথমা সম্পাদিকা ছিলেন শ্রীমতী বনলতা দেবী। ১৩০৪ সাল থেকে ১৩০৭ পর্য্যন্ত ইনি যোগ্যতার সহিত সুচারু-শৃঙ্খলায় "অন্তঃপুর" সম্পাদন করেছিলেন। তারপর তাঁর পরলোক গমনের পর 'অন্তঃপুরে'র সম্পাদন ভার গ্রহণ করেন শ্রীমতী হেমন্তকুমারী চৌধুরাণী। ১৩০৭ থেকে ১৩১০ পর্য্যন্ত ইনি 'অন্তপুরে'র সম্পাদিকা ছিলেন। এঁর পরে পত্রিকাখানির ভার গ্রহণ করেন, শ্রীমতী লীলাবতী মিত্র। ১৩১১ সালে এঁরই সম্পাদনায় "অন্তঃপুর" প্রকাশ হয়েছিল। কিন্তু অর্থাভাবে কাগজখানিকে তিনি বেশী দিন বাঁচিয়ে রাখতে পারেন নি।

১৩০৮ সালে প্রসিদ্ধ মাসিক পত্র "পরিচারিকা"র সম্পাদিকা হয়েছিলেন—শ্রীমতী মোহিনী দেবী। ১৩১০ সালে "পরিচারিকা'র ভার গ্রহণ করেছিলেন—শ্রীমতী সুচারু দেবী।

১৩১২ সাল থেকে 'ভারত মহিলা' নামে একখানি মাসিক পত্রিকা বিশিষ্ট ভাবে মহিলাদেরই জন্য প্রকাশিত হয়েছিল। "ভারত মহিলা"র সম্পাদিকা ছিলেন শ্রীমতী সরযূবালা দত্ত। ১৩১২ থেকে ১৩২০ পর্য্যন্ত নয় বৎসর এই পত্রিকাখানি বেশ প্রশংসার সহিত চলেছিল।

১৩১৬ সালে শ্রীমতী কুমুদিনী মিত্রে (বসু) সম্পাদিত "সুপ্রভাত" নামক সুন্দর একখানি মাসিক পত্রিকার উদয় দেখা যায়। 'সুপ্রভাত' কুমারী কুমুদিনী মিত্রের তত্ত্বাবধানে পাঁচ বৎসর কাল জীবিত ছিল।

১৩১৮ সালে "মাহিষ্য মহিলা" নামে কোনও এক সম্প্রদায়-বিশেষের একখানি মাসিক পত্র প্রকাশ হয়েছিল। এই কাগজখানির সম্পাদিকা ছিলেন শ্রীমতী কৃষ্ণভামিনী বিশ্বাস। ১৩২২ সাল পর্য্যন্ত পাঁচ বৎসর "মাহিষ্য মহিলা" জীবিত ছিল। এই সময়েই মহিলা কবি স্বর্গীয়া গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী 'জাহ্নবী' মাসিক পত্রের সম্পাদিকার আসন গ্রহণ করেন। তাঁর সম্পাদনায় "জাহ্নবী" দুই বৎসর প্রকাশ হয়েছিল।

১৩২৩ সাল থেকে মহিলা কবি শ্রীমতী নিরুপমা দেবী বিলুপ্ত "পরিচারিকা" পত্রিকার নবপর্য্যায় প্রকাশ করেন। ১৩২৩ থেকে ১৩৩০ পর্য্যন্ত 'নবপর্য্যায় পরিচারিকা' শ্রীমতী নিরুপমা দেবী বেশ সুষ্ঠু ভাবে প্রকাশ করেছিলেন।

১৩২৮ সালে সুপ্রসিদ্ধ "নব্য ভারত" পত্রিকার সম্পাদনভার গ্রহণ করেছিলেন শ্রীমতী ফুল্লনলিনী দেবী।

১৩৩১ সাল থেকে শ্রীমতী সরলাদেবী পুনরায় 'ভারতী' মাসিকের ভার গ্রহণ করেছিলেন।

১৩৩০ সাল থেকে ১৩৩৫ পর্য্যন্ত ৬ বৎসর শ্রীমতী সুরবালা দত্তকে আমরা 'মাতৃ-মন্দির' মাসিক পত্রিকার যুগ্ম-সম্পাদকের অন্যতর রূপে দেখতে পাই। তারপর ১৩৩৬ সাল থেকে শ্রীমতী সুশীলা নন্দী তাঁর স্থান অধিকার করেছিলেন।

১৩৩২ সাল থেকে ১৩৩৪ পর্য্যন্ত "বঙ্গলক্ষ্মী" নামক স্ত্রীশিক্ষা ও নারীজাতির সর্ব্ববিধ উন্নতিবিষয়ক মাসিক পত্রিকাখানির সম্পাদিকার আসনে শ্রীমতী কুমুদিনী বসুকে দেখতে পেয়েছি। ১৩৩৫ সালে "বঙ্গলক্ষ্মীর" সম্পাদিকার আসনে শ্রীমতী লতিকা বসুকে দেখা যায়। তারপর ১৩৩৫ থেকে আজ পর্য্যন্ত এই নারী উন্নতি-বিষয়ক মাসিক পত্রিকাখানি শ্রীমতী হেমলতা দেবীর তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হচ্ছে।

(জয়শ্রী—বৈশাখ, ১৩৩৮)   শ্রীরাধারাণী দত্ত





বর্গীর হাঙ্গামা

বৈশাখের "প্রবাসী"তে স্যর যদুনাথ সরকার বর্গীর হাঙ্গামার প্রথম দুই বৎসরের বিবরণ দিয়াছেন। বোধ করি, তিনি হাঙ্গামার শেষ দেখাইবেন। ইং ১৭৪২ সালের, বাং ১১৪৯ সালের চৈত্র মাসে হাঙ্গামা আরম্ভ হইয়া দশ বৎসর চৈত্র বৈশাখে চলিয়াছিল। বাঙ্গালার নবাব আলীবর্দী খাঁ মরাঠা ডাকাতদিকে বার্ষিক বার লক্ষ টাকা চৌথ ও ওড়িষ্যা ছাড়িয়া দিতে স্বীকার করিলে হাঙ্গামার নিবৃত্তি হয়।

হাঙ্গামা বলিলে অবস্থা ঠিক বুঝিতে পারা যায় না। নবাবের সহিত মরাঠার বিবাদ, বাংলা দেশের রাজা কে। যিনি রাজা, রাজস্ব তাঁহারই প্রাপ্য। প্রজা একজনকে রাজস্ব দিতে পারে, অনেককে পারে না। রাজায় রাজায় যুদ্ধ কর, যে জিতিবে, সেই রাজস্ব পাইবে। বর্গী দের সে যোগ্যতা ছিল না, ডাকাতি করিয়া, দেশ লুঠিয়া, প্রজাকে ধনে প্রাণে মারিয়া, গ্রামকে গ্রাম জ্বালাইয়া পোড়াইয়া দেশ অধিকার করিতে আসিয়াছিল। ঘোড়ায় চড়িয়া বন্দুক লইয়া ডাকাতের দল গ্রামে প্রবেশ করিলে কে বাধা দিতে পারিবে? বৎসর বৎসর কে বা টাকা দিতে পারিবে? ষাটি পঁয়ষট্টি বৎসর পূর্বে, অর্থাৎ হাঙ্গামার ১২০ বৎসর পরেও

> ছেলে ঘুমাল পাড়া জুড়াল
> বর্গী এল দেশে।
> বুলবুলিতে ধান খেয়েছে
> খাজনা দিব কিসে॥

এই ছড়া গাহিয়া ছেলেকে ঘুম পাড়াইতে শোনা যাইত। ডাকাতেরা ধনকড়ি লইয়া চলিয়া গেলে প্রজাদের সামলাইতে অন্ততঃ আর এক ফসল দেখিতে হইত। কিন্তু আবার ফাল্গুন চৈত্র মাসে ডাকাতি। প্রতি বৎসর সকল গ্রামে অত্যাচার হইত না বটে, কিন্তু সেটা ভাগ্য। আতঙ্ক থাকিত।

নৃশংস বর্বরেরা নারীর উপর যে লোমহর্ষণ অত্যাচার করিত, তাহা হাঙ্গামার অবসান কালে লিখিত "মহারাষ্ট্র পুরাণে" কিছু কিছু বুঝিতে পারা যায়। আমি বাল্যকালে বৃদ্ধা আয়ী ও পিসীর মুখে শুনিতাম, তাঁহারা তাঁহাদের পিতামহী মাতামহীর মুখে শুনিয়াছিলেন। বর্গী আসিতেছে, এই সংবাদ প্রচার হইলেই, কোথায় কে লুকাইবে, কোথায় কে পলাইবে, গ্রামবাসীর এই ভাবনা চলিতে থাকিত। একটা কথা শুনিতাম, অনেকে ঘর-দোর ফেলিয়া বনে পলাইত। কথাটা ভাল বুঝিতাম না। বন কোথায়, আর বনে রক্ষা কেমনে হইত? এখন ম্যালেরিয়া বন করিয়া বাসা বাঁধিয়াছে। কিন্তু এ বন, সে বন নয়। আমি হুগলী জেলার এমন স্থানের কথা বলিতেছি, যে স্থানে আমরা বার্ষিক বন-ভোজনের নিমিত্ত বন খুঁজিয়া পাইতাম না। পুকুর পাড়ের দুই দশটা গাছকে বন কল্পনা করিতে হইত। বন-ভোজন উৎসব নূতন নয়, বন ছিল। দেড় শত দুই শত বৎসর পূর্বে দশবারখানা গ্রামের পরে একক্রোশী আধক্রোশী জঙ্গল থাকিত, গ্রামের প্রান্তেও থাকিত, গৃহস্থকে জ্বালানি কাঠের চিন্তা করিতে হইত না।

গত অগ্রহায়ণ মাসে এই বাঁকুড়া শহরে বসিয়া বনে পলায়নের অর্থ বুঝিয়াছি। এক দল গোরা পল্টন মেদিনীপুর গড়বেতা বিষ্ণুপুর হইয়া এখানে আসিয়াছিল। অমুক দিন আসিবে, এই সংবাদ প্রচারিত হইবামাত্র শহরে ত্রাস জন্মিয়াছিল। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব ভেরী পিটাইয়া জানাইলেন, ভয় নাই; ছাপা বিজ্ঞাপনে লিখিলেন, গোরা সেনারা ভদ্রলোক। কিন্তু বাজার বন্ধ হইল; দুঃখী নারী খাটিয়া খায়, পথ ছাড়িল; কত শিক্ষিত ভদ্রলোক পুত্র-কন্যা দূরে পাঠাইয়া দিলেন, আরও শুনিলাম অনেক দুঃখী নারী চাল ও চিড়া লইয়া দুই তিন দিন তাহাদের বনপ্রান্তবাসী কুটুম্বের গৃহে চলিয়া গেল। এ কি বর্গীর অত্যাচারের স্মৃতি? কিন্তু এখানে বর্গী আসে নাই। পরে শুনিলাম, দুই এক বার এই পথে গোরা পল্টন যাতায়াত করিয়াছিল। বর্তমান আতঙ্ক; তাহার স্মৃতি। এবারে যাহারা আসিয়াছিল, তাহারা সত্য সত্য ভদ্র। তাহারা আসিলে তাহাদের শিবিরে কাতারে কাতারে লোক গিয়া দেখিত।

মরাঠা ডাকাতরা ধর্ম্মাধর্ম্ম কিছুই মানিত না। আশ্চর্য্য এই, তাহাদের দলপতি ভাস্কর পণ্ডিত কাটোয়ায় দুর্গোৎসবও করিয়াছিল। পূর্বকালের দেশী ডাকাত কালীপূজা করিয়া ডাকাতি-যাত্রা করিত। সকলেই বলিত, তাহারা নারীর গায়ে হাত তুলিত না। নারী যে কালী-মায়ের জাত। দেশী ও বিদেশী ডাকাতের চরিত্রে প্রভেদ আছে।

পশ্চিম ও দক্ষিণ দেশ হইতে রাঢ়ে প্রবেশের দুইটি পথ ছিল। একটি পথ উত্তরে, বর্দ্ধমান জেলার পশ্চিমোত্তর সীমায়। এখানে উত্তরে অজয়, দক্ষিণে দামোদর, উহাদের মাঝে বরাকর নদী তির্যক ভাবে দামোদরে পড়িয়াছে। ইহার দক্ষিণে পঞ্চকোট রাজ্য। বরাকর, আসানসোল, রাণীগঞ্জ তখন অরণ্যময়। উত্তরে অজয়ের দক্ষিণ তীর ও দক্ষিণে দামোদরের উত্তর তীর ভূমি দিয়া প্রাচীন সুহ্মে প্রবেশের পথ ছিল। এই পথ ভারতের উত্তর-পশ্চিম-সীমান্তের "খাইবার পাস"। কত রাষ্ট্রকূট, কত হৈহয়, কত গুর্জর বরাকর পার হইয়া রাঢ়ে বিজয় করিয়াছে। মরাঠা ডাকাতদেরও এই পথ ছিল।

রাঢ়ে প্রবেশের দক্ষিণের পথটি বালেশ্বর দাঁতন নারায়ণগড় মেদিনীপুর চন্দ্রকোণা দিয়া ছিল। চন্দ্রকোণা হইতে রামজীবনপুর মন্দারণ উচালন বর্দ্ধমান। কিংবা মন্দারণ হইতে পূর্বদিকে গোঘাট দিয়া জাহানাবাদ উচালন বর্দ্ধমান। ২২০ বৎসর পূর্বে ধর্মমঙ্গল-প্রণেতা ঘনরাম ঘাটাল হইতে বর্দ্ধমান আসিবার এই দুই পথ লিখিয়া গিয়াছেন। তিনি ঘাটালের শীলাই নদীর নাম কালিন্দী করিয়াছেন। জাহানাবাদ, বর্তমান নাম আরামবাগ, হইতে বর্দ্ধমানের পথ নাকি বাদশাহী। এক মোগল বাদশাহ এই পথ করাইয়াছিলেন। বোধ হয় কবিকঙ্কণের সময়ে (১৪৬৬ শক) এই পথ নির্মিত হয় নাই। হইলে তিনি এই পথে জাহানাবাদ আসিতেন, পূর্বদিকের মেঠো পথে আসিয়া বিপন্ন হইতেন না। মোগল বাদশাহ কাঁচা পথ করাইয়াছিলেন; পথটি অদ্যাবধি কাঁচাই আছে। বর্দ্ধমান ডিস্‌ট্রিক বোর্ডের টাকা নাই, এ যাবৎ পাকা হইতে পারে নাই। বর্ষা পড়িলেই পথটি অগম্য হয়। কোনও বাদশাহ ঘাটাল হইতে আরামবাগ ১২ মাইল পথ করান নাই, হুগলী ও মেদিনীপুর ডিস্‌ট্রিক বোর্ডের টাকা নাই, গোরুর গাড়ী যাইবার পথ নাই। ঘনরামের

লাউসেনকে পশ্চিমে গিয়া পূর্বে বাঁকিতে হইত, এখনও সেই অবস্থা। কবিকঙ্কণের সময়ে বলদের পিঠে মাল বহিতে হইত, এখনও বলদই বর্ত্তমানের "লরী"। বর্গীরা শ্‌খো দিনে আসিত, শ্‌খো থাকিতে থাকিতেই চলিয়া যাইত। মেদিনীপুর হইতে গড়বেতা দিয়া বিষ্ণুপুরে আসিত। ভাস্কর পণ্ডিত আসিলে ঠাকুর মদনমোহন নিজে 'দলমদন' নামক কামান দাগিয়া গড়টি রক্ষা করিয়াছিলেন। কিন্তু, দেশরক্ষা হয় নাই।

ঘনরাম লিখিয়াছেন,

লঘুপতি প্রবেশ করিল জানাবাজ ॥
দ্বারিকেশ্বর পার হয়ে পীরের চরণে।
সেলাম করিয়া প্রবেশিল উচালনে ॥
রাখিয়া মগলমারি পশ্চাতে আমিলা।
সৈয়দ মোকামে আসি সেন উত্তরিলা ॥
বরাকপুরের খাল পশ্চাতে রাখিয়া।
উত্তরে উড়ের গড়ে শ্রমযুক্ত হইয়া ॥ (৮৪ পৃঃ)

এইরূপ বর্ণনা তিন চারি স্থানে আছে। উড়ের গড়ের পরেই দামোদর। এই গড় কোথায়, এবং কেন এই নাম, জানি না। কবির নিবাস কৃষ্ণপুরে ছিল, উচালন ও বর্দ্ধমান, এই দুয়ের মধ্যে কিন্তু পথ হইতে কিছু দূরে। বর্দ্ধমান হইতে ১২ মাইল দক্ষিণে উচালন, এবং উচালন হইতে "জানাবাজ" আর ১২ মাইল। এই ২৪ মাইল পথে উচালন একমাত্র চটি। এখানে এক বড় দীঘী আছে। কে এই দীঘী করাইয়াছিলেন, কে জানে। ঘাটে একটা কাল পাথরের চাঙ্গড়া আছে। লোকে বলে অসুরে আনিয়াছে। তাহার সাক্ষী এক 'অ-চেনা' গাছ, ডাকিনীর বাহন আছে। এখনও গাছটি আছে কি না, জানি না। আমি পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বের কথা লিখিতেছি। উচালনের চারি মাইল উত্তরে মোগল-মারি, তার পর আমিলা, তারপর বাবুরকপুর। এইটি যদুবাবুর "মুবারক মঞ্জিল", দামোদর হইতে দুই মাইল, বর্দ্ধমান হইতে চারি মাইল দক্ষিণে। মঞ্জিলের মধ্যে এক পাকা খিলানের ঘোড়া-শালা আছে। "মোগল-মারি" নামে হানাহানি পাইতেছি, কিন্তু কেবল এইটি নয়, বর্দ্ধমান হইতে জাহানাবাদ, এই চব্বিশ মাইল পথ সত্যসত্যই ত্রি-প্রান্তর, নিকটে লোকালয় নাই, নির্ভাবনায় পথিক মারি ছিল। বোধ হয়, পূর্বে নিকটে নিকটে গ্রাম ছিল, মোগলমারির পর সে সব গ্রাম অদৃশ্য হইয়াছে। ফৌজ যাতায়াত করিতে থাকিলে পাশে গ্রাম তিষ্ঠিতে পারে না। মোগলমারির সাত মাইল পূর্বদিকে কবিকঙ্কণের নিবাস ছিল। তিনি দেশত্যাগী হইয়াছিলেন। উচালনের চারি মাইল পূর্বদিকে ধর্মমঙ্গল-প্রণেতা রূপরামের (১৫২৬ শক) নিবাস ছিল।

উচালনেও এক কবির নিবাস ছিল। তিনি গীতগোবিন্দের বাংলা পয়ার করিয়াছিলেন। আমার এক বন্ধু গ্রন্থের সমাপ্তি পাঠাইয়াছিলেন, কবির নাম দেন নাই।

সমাপ্ত করিল গজ ইষু রস সোমে।
কৃষ্ণপক্ষে আষাঢ়ের দিবস পঞ্চমে ॥
পটের তৃতীয়াক্ষর মধ্যেতে আকার।
সেই নদী নিকটে কেবল পূর্ব্বধার ॥
ইন্দ্রের বাহনোপরে দময়ন্তীপতি।
বিরচিল সেই গ্রামে করিয়া বসতি ॥

গ্রন্থসমাপ্তিকাল ১৬৫৮ শক। নদীর নাম পটোর? উচালনের পশ্চিমে একটা নগণ্য খাল আছে। বোধ হয়, সেটাই কবির বাগ্‌বিন্যাসে নদী হইয়াছে। কারণ স্বদেশের। গ্রামের নাম উচ্চ-নল; পামরে উচা-লন করিয়াছে। উচালনের দিকের পাঠক সত্যমিথ্যা বলিতে পারেন।

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়

আক্কেল সেলামী

শ্রীসীতা দেবী

বিজয় সেদিন একটু সকাল সকালই বাড়ির বাহির হইয়া পড়িয়াছিল। শ্যামবাজারে বোসের বাড়ি নিতান্তই একবার যাওয়া দরকার, ভাগ্‌নেটার অসুখের কথা অনেক দিন হইতে শুনিয়া আসিতেছে। আর দেরি করা চলে না, তাহা হইলে দিদি ইহার পর ঝাঁটা হাতে অভ্যর্থনা করিবেন। এমনিতেই ত ভাই এবং ভাজের প্রতি তাঁহার কিছু ভাল ভাব নাই।

যাক, এ যাত্রা সে ভালয় ভালয় উৎরাইয়া গেল। ছেলের জ্বরটা সকালে ছাড়িয়া যাইবার উপক্রম করিয়াছে দেখিয়া, দিদির মেজাজটা মোটের উপর ভালই ছিল। বিজয়কে দেখিয়া বলিলেন, "কি রে, আর যে ছায়াও মাড়াস না?"

বিজয় আম্‌তা আম্‌তা করিয়া বলিল, "বড় বেশী কাজের চাপ পড়েছিল—"

দিদি বাধা দিয়া বলিলেন,—"আহা, কাজ ত কত। ইস্কুল মাষ্টারের কাজের আবার চাপ, সে বরং বল্‌তে পার ওঁদের বটে। সকাল আটটা থেকে রাত আটটা ধরা আছে, তার ভিতর নিশ্বেস নেবারও সময় পায় না। তার ওপর বাড়িতে বারো ভূতের নেত্য। আজ এর জ্বর, কাল ওর সর্দ্দি, পরশু তার মাথাধরা। তোদের ত সেদিকেও নিশ্চিন্দি।"

বিজয় বলিল, "একেবারে নিশ্চিন্দি আর কই? মেয়েটা ত রয়েছে?"

দিদি হাসিয়া বলিলেন, "আঃ, ভারি ত একটা মেয়ে,

তার আবার ভাবনা। সে মেয়েও ত বছরের দশ মাস দিদিমার কাছে কাটিয়ে আসে। খুকি ক-মাস হ'ল গেছে রে?"

বিজয় বলিল, "তা মাস-চার ত হ'ল। এবার নিয়ে আস্‌ব ভাবছি। আজ মিণ্ট একটু ভাল আছে না দিদি?"

মিণ্টুর মা বলিলেন, "ভাল খানিকটা বই কি? যা ভোগাল এ ক'দিন। যাই বল্ বাপু, তোর বউয়ের কপাল ভাল। নিতান্ত একটাও না হ'লে, লোকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করে, তা মেয়ে একটি ত হয়েছে, তার ঝক্কিও পোয়াতে হয় না। আর আমার দশা দেখ না, নাটাপাটা খেয়ে মরচি সেই ইস্তিক। বউ কেমন আছে, ভাল?"

বিজয় বলিল, "ভাল, তবে কাশী যাবার জন্যে জেদ ধরেছে।"

দিদি একটু ঝাঁঝের সহিত বলিলেন, "কেন? এই ত সেদিন এল কাশী থেকে। দু-মাস অন্তর একবার ক'রে যেতে চায় নাকি? এখানে মন টেকে না?"

বিজয়ের পত্নী মন্দারকুমারীকে তাহার শ্বশুরবাড়ির লোকের নানা কারণেই বিশেষ ভাল লাগিত না। বিজয় বেচারা এইজন্য পারতপক্ষে স্ত্রীর কথা তুলিতে চাহিত না। কিন্তু সে না তুলিলেও তুলিবার লোকের অভাব ছিল না। ভাইয়ের বাড়ি বোনের বাড়ি, যেখানেই যাক, মন্দারের কথা ঘুরিয়া ফিরিয়া আসিয়া হাজির হইত। বিজয় একটু মুখচোরা মানুষ, স্ত্রীকে যদিও সে অত্যন্তই ভালবাসিত, তবু তাহার পক্ষ লইয়া কোমর বাঁধিয়া আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে লড়াই করিতে তাহার সঙ্কোচ বোধ হইত। অগত্যা তর্কের উপক্রম দেখিলেই সে যথাসম্ভব শীঘ্র সেখান হইতে সরিয়া পড়িত।

আজও দিদির মেজাজ গরম হইবার উপক্রম দেখিয়াই সে উঠিয়া দাঁড়াইল। বলিল, "আজ তবে আসি দিদি, কাল কি পরশু আর একবার এসে খবর নেব।"

দিদি বলিলেন "তা আয়। বউকে একদিন নিয়ে আসিস। যতই আমরা মুখ্যু, পাড়াগেঁয়ে হই না, তোর মায়ের পেটের বোন ত বটে? আমাদের সঙ্গে একেবারে সম্পর্ক তুলে দিলে চলবে কেন?"

বিজয়ের আর কথা বাড়াইবার ইচ্ছা ছিল না, সে তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া গেল। হন্ হন্ করিয়া খানিক দূর হাঁটিয়াই চলিল, ট্রামে একটু পরে উঠিবে। মানুষের আত্মীয়-স্বজন জীবগুলি বেশ আজব চীজ বটে। যতদিন বিবাহ করে নাই, ততদিন ত বিজয়ের মাথার চুলগুলি খালি তাঁহারা ছিঁড়িয়া ফেলিতে বাকি রাখিয়াছিলেন। আর এখন বিবাহ সে করিয়াছে বলিয়া সকলে এমন মূর্ত্তি ধরিয়াছেন যেন এহেন অপরাধ জগতে একেবারেই অমার্জ্জনীয়। বিজয়কে পারতপক্ষে খোঁচা দিবার কোনো সুযোগ কেহ কোনো দিন মাঠে মারা যাইতে দেন না।

অবশ্য মন্দারের যে দোষ নাই, তাহা নয়। সে ম্যাট্রিক পাস, কলেজেও এক বৎসর পড়িয়াছে। তাহার বাপের বাড়ির চাল-চলন বেশ আধুনিক। তাহারা টেবিলে খায়, অর্গ্যান বাজাইয়া গান গায়, বায়োস্কোপ দেখিতে ভালবাসে এবং অনাত্মীয় পুরুষ মানুষের সামনে বাহির হয়, এমন কি হাসিয়া গল্পও করে। মন্দারের বাবা বড়মানুষ নন বটে, তবুও মেয়ের সাজসজ্জা প্রভৃতিতে খরচ কম হইত না। মন্দার এই সবেই অভ্যস্ত তাহা ঠিক, তবু বিবাহ যখন একটু পুরাতনপন্থী পরিবারেই হইয়াছে, তখন কিঞ্চিৎ মানাইয়া চলিবার চেষ্টা করিলে ক্ষতি ছিল কি? মন্দার শুধু যে মানাইয়া চলে না তাহাই নয়, সময় বিশেষে ঠাট্টা-তামাসাও করে। ইহাতে ফল হয় বড় খারাপ। তাহার ছেলেমানুষীটাকে শ্বশুরবাড়ির লোকে ঠিক ছেলেমানুষীই মনে করে না, মনে করে মন্দার নিজের আধুনিক শিক্ষার জাঁকে ঐ প্রকার করিতেছে। নিজের বাপের বাড়ির চাল সে কিছুতেই ছাড়িতে রাজী নয়। সে টেবিলেই খায়, জা ননদ খোঁটা দিলে বলে, "তা কি করব, মাটিতে বসলে আমার পায়ে ভয়ানক ঝিঁঝিঁ ধরে।" সারাক্ষণ ফিট্-ফাট্ হইয়া থাকে. আত্মীয়ারা তাহার বাবুগিরি সম্বন্ধে মন্তব্য করিলে সেও তাঁহাদের পরিচ্ছদ সম্বন্ধে এমন-সব মন্তব্য করে যাহা শুনিয়া তাঁহারা মোটেই খুশী হন না। স্বামীর বন্ধু, দেবর প্রভৃতির সঙ্গে সমানে গল্প করে, নিষেধ মানে না। বিজয়ের নিজের এ-সকলে কোনো আপত্তি নাই, সে বরং সকল বিষয়ে আধুনিকত্ব পছন্দই করে। কিন্তু জ্যাঠাইমা, পিসীমা, দুই দিদি এবং এক বৌদিদির

বাক্যবাণ সহিয়া সহিয়া সে হায়রাণ হইয়া উঠিয়াছে। মাঝে মাঝে ইচ্ছা করে দেশ ছাড়িয়া চলিয়া যায়। কিন্তু মন্দারের মায়া কাটাইতে পারে না। স্ত্রীকে মধ্যে মধ্যে দু চার কথা শুনাইয়া দিতেও ইচ্ছা করে বটে; কিন্তু মন্দারের সামনে গিয়া পড়িলে, তার ডাগর চোখ আর রাঙা ঠোঁটের মহিমায় আর সব কথাই ভুলিয়া যায়।

দিদির বাড়ি হইতে বেশ খানিকটা উত্তপ্ত হইয়াই সে বাহির হইয়াছিল। হাঁটিতে হাঁটিতে সে ভাবটা কাটিয়া গেল, তখন ট্রামে চড়িয়া বসিল এবং কয়েক মিনিটের মধ্যেই বাড়ি আসিয়া পৌঁছিল।

ভাড়াটে বাড়ি, দুইখানি মাত্র ঘর, একফালি বারান্দা আর রান্নাঘর প্রভৃতি আনুষঙ্গিক ব্যাপার। ইহারই ভাড়া চল্লিশ টাকা। দিদির কাছে ইহার জন্যও খোঁটা খাইতে হয়। তিনি বলেন, "মানুষ ত দুটো, একখানা ঘরে কি কুলোয় না? এই যে আমরা এতগুলো মানুষ রয়েছি দু-খানা ঘরের মধ্যে, তা মারা ত যাইনি? যত সব বড়-মান্‌ষি ঢঙ ফলান।"

কিন্তু মন্দারের সঙ্গে বিজয় পারিয়া ওঠে না। সে ঠোঁট ফুলাইয়া বলে, "ওমা গো, একটা বসবার ঘরও থাকবে না? তা একটা বন্ধু-বান্ধব এলে কি রাস্তায় দাঁড় করিয়ে রাখব, না সিঁড়িতে বসাব?" শয়নকক্ষে সনাতন প্রথামতে অতিথি অভ্যাগতকে বসান চলে, কিন্তু তাহার ইঙ্গিতমাত্রেই মন্দার এমন করিয়া চোখ কপালে তুলিল যে, বিজয় আর সে কথা তুলিতে সাহসও করিল না। অগত্যা ঘর দুইখানাই লওয়া হইয়াছে, একটা মন্দার ফিটফাট করিয়া সাজাইয়া ড্রয়িং-রুম করিয়াছে, অন্যটি তাহাদের শয়নকক্ষ।

বিজয় বাড়িতে ঢুকিয়াই দেখিল, মন্দার স্বরলিপির সাহায্যে নূতন গান শিখিতে বসিয়া গিয়াছে। গান-বাজনায় তাহার সখ অসাধারণ। স্বামী বাড়ির বাহির হইলেই সে টেবল্ হার্মোনিয়মটি লইয়া পড়ে। পাড়ায় পাড়ায় আড্ডা দিয়া বেড়ানো অপেক্ষা এ কাজটা বিজয়ের কাছে ভালই মনে হয়, সুতরাং সে স্বরলিপির বই ইত্যাদি কিনিয়া দিয়া যথাসম্ভব উৎসাহ দেয়। নিজে গান-বাজনার বিশেষ কিছু বোঝে না, তবু মাঝে মাঝে ধৈর্য্য ধরিয়া গান শুনিতে বসে এবং অযথা স্থানে খুব বাহবা দেয়।

স্বামীকে দেখিয়া মন্দার উঠিয়া পড়িল, বলিল, "ভোর-বেলা উঠে দৌড় দিলে কোথায়? চা টা শুদ্ধ খেলে না?"

বিজয় বলিল, "রাস্তায় খেয়ে নিয়েছি। মিণ্টুটাকে একটু দেখে এলাম। অনেক দিন থেকে শুন্‌ছি অসুখে ভুগছে।"

মন্দার জিজ্ঞাসা করিল, "কেমন আছে মিণ্টু, একটু ভাল ত?"

বিজয় বলিল, "হ্যাঁ খানিকটা ভাল বই কি। আজ সকালে আর জ্বর নেই। তা, যদি পার ত, এক পেয়ালা চা আরও দাও, রাস্তার এই এক পেয়ালায় শানায় নি।"

চা খাইতে এবং খাওয়াইতে মন্দার সমান ওস্তাদ। স্বামীকে দিবার ছলে নিজেও এক পেয়ালা খাইয়া লইবে, এই উৎসাহে সে তাড়াতাড়ি চা করিতে ছুটিল। মিনিট-দশের ভিতরেই ট্রেতে করিয়া সব গুছাইয়া লইয়া ঘরে আবার আসিয়া ঢুকিল। বিজয় দুইটা পেয়ালা দেখিয়া বলিল, "বাঃ, নিজেও এই ফাঁকে আর একবার খেয়ে নিচ্ছ বুঝি?"

মন্দার চায়ে দুধ ঢালিতে ঢালিতে বলিল, "তা না হয় খেলামই, তাতে কি আর তোমার ব্যাঙ্ক ফেল্ পড়ে যাবে?"

বিজয় স্বামিত্বের গুরুত্ব বজায় রাখিবার জন্য বলিল, "শুধু শুধু চা গিলে স্বাস্থ্যটাকে মাটি করতে বসেছ।"

মন্দার নিজের পেয়ালাটি উঠাইয়া লইয়া এক চুমুক দিয়া বলিল, "ও, আজ দিদি বুঝি আমার চা খাওয়া নিয়ে পড়েছিলেন?"

বিজয় বিরক্ত হইয়া বলিল, "কেন, দিদি বল্‌তে যাবেন কেন? তোমার কোনো কিছুর সমালোচনা করলেই আগের থেকে ধরে নাও যে দিদি বলেছেন। আর কি বিশ্বে কেউ তোমার কোনো কাজের সম্বন্ধে একটা কথাও বলে না?"

মন্দার বলিল, "আহা, অত চটছ কেন? চটবার কথা ত কিছু হয়নি? তা দিদি আজ আমার কথা কিছুই

বলেন নি, তা আমি কি করে জানব ? কোনো দিন ত ফেলা যায় না।"

মন্দারের কথা বলার ধরণ দেখিয়া বিজয় হাসিয়া ফেলিল। বলিল, "না গো না, একেবারে বাদ যায় নি। তুমি মিণ্টুকে দেখতে যাওনি বলে দিদি রাগ করছিলেন।"

মন্দার চা খাইতে খাইতে বলিল, "সত্যি যাওয়া উচিত ছিল। তুমি কখন যে চুপচাপ সরে পড়লে তা জান্‌তেও পারলাম না, নইলে সঙ্গেই যেতাম। এখন তিন চার দিন ত সব এন্‌গেজমেণ্ট রয়েছে, যেতেই পারব না।"

বিজয় বলিল, "অত মেমসাহেবী আবার ভাল নয়। বাঙালীর ঘরে আবার এনগেজমেণ্ট কি? তুমি কি লাট সাহেবের মেম যে এনগেজমেণ্টের অত কড়াক্কড়ি? ওরই মধ্যে এক দিন সময় করে যাবে।"

মন্দার অত্যন্ত চটিয়া বলিল, "কেন লাটের মেম ছাড়া আর বুঝি কারও কথার কোনো মূল্য নেই? যাব বলেছি যখন তাদের, তখন যাবই। মিণ্টুও ত সেরে উঠেছে, এত কি তাড়া। এতদিন যখন যাইনি, তখন আরও দু-চার দিন দেরি হ'লে কিছু এসে যাবে না।"

বিজয় জিজ্ঞাসা করিল, "উপরি উপরি চার দিন কোথায় তোমার এন্‌গেজমেণ্ট শুনি? আমি কি সবগুলোর থেকে বাদ?"

মন্দার বলিল, "আহা, ন্যাকা আর কি? কিছু জান না। কালকে পরিমল বোসের বৌ-ভাত না? সেটা তুমি জান না আর কি?"

বিজয় বলিল, "হ্যাঁ, সেটা জানি বটে, মনে ছিল না, কিন্তু আর তিন দিন?"

মন্দার বলিল, "পরশু লটিদির মেয়ের জন্মদিন, শনিবারে ঝুনুনীকে দেখতে আসবে, আমি গিয়ে সাজিয়ে দেব কথা দিয়েছি, আর, রবিবারে অতসীর বেজায় ঘটা হবে।"

বিজয় বলিল, "যাক তোমার মেমারী আছে। আমি হ'লে এতগুলো ব্যাপার মনেই রাখতে পারতাম না। তা এর একটাও বাদ দেওয়া চল্‌বে না?"

মন্দার মুখভার করিয়া বলিল, "বাদ দেবার এমন কি গভীর প্রয়োজন উপস্থিত হয়েছে তা ত দেখতে পাচ্ছি না। মিণ্টু ত সেরে গেছে, দু-দিন পরে দেখতে গেলে কি-এমন চণ্ডী অশুদ্ধ হয়ে যাবে? বাইরে বেরতে কতই ত পাই। তা যাও বা দু-চারটা নেমন্তন্ন জুটেছে, সেগুলোও অমনি বাদ দিয়ে অন্য দিকে দৌড় দিতে হবে? বাবা. বিয়ে করলে কি ভীষণ পরাধীনই যে হয়ে যেতে হয়।"

মন্দারের এই ধরণের কথাকে বিজয় অত্যন্ত ভয় করিত। সে গরীব, তাহার আত্মীয়স্বজন কুসংস্কারাচ্ছন্ন, তাহার ঘরে আসিয়া মন্দার হয়ত সুখী হয় নাই, এ আশঙ্কা তাহার বরাবরই ছিল। মন্দারের মুখে কোনো আক্ষেপোক্তি শুনিলেই সে অতিমাত্রায় ব্যস্ত হইয়া উঠিত। মন্দারের কথার উত্তরে সে বলিল, "না বাপু, তোমায় আমি কোথাও যেতে মানা করছি না; তোমার যেমন খুশী তাই কর। তবে আমোদ করাটাই জীবনের সব নয়. কর্ত্তব্য বলেও একটা জিনিষ আছে।"

মন্দার গম্ভীর হইয়া বসিয়া রহিল। বিজয় চা শেষ করিয়া পাশের বাড়িতে চলিল। পশুপতিবাবু অনেকগুলি খবরের কাগজ রাখেন, এইজন্য সকালে তাঁহার বৈঠকখানায় জনসমাগম হয় বিস্তর।

স্বামী বাহির হইয়া যাইতেই মন্দারও উঠিয়া পড়িল। তাহার কাজের অভাব কি? প্রথমতঃ রান্নাঘরে গিয়া, চাকরকে কি কি রাঁধিতে হইবে, সব বলিয়া দিয়া আসিল। তাহার পর ঝাড়ন লইয়া চেয়ার. টেবিল, আলমারী, সব ঝাড়িয়া মুছিয়া রাখিল। এই কাজটা চাকর তাহার মনের মত করিতে পারে না বলিয়া সে সর্ব্বদা উহা নিজের হাতেই করে। গরীবের ঘর, জিনিষপত্র একবার নষ্ট হইলে আর একবার করিয়া তোলা শক্ত। বিবাহের সময় পিতা অনেক কষ্টে যা হোক কিছু দিয়াছেন, আর ত কেউ দিতে আসিবে না?

তাহার পর কাপড়ের দেরাজ খুলিয়া সে নিজের শাড়ী জামাগুলি নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিতে লাগিল। চারিদিন উপরি উপরি উৎসব, তাহার উপযুক্ত পরিচ্ছদাদি তাহার আছে কই? বিবাহের সময় শ্বশুরবাড়ি, বাপের বাড়ি মিলাইয়া গোটা তিন বেনারসী কাপড় পাইয়াছিল, সেগুলি মন্দ নয়। কিন্তু সর্ব্বঘটে আর বেনারসী পরিয়া যাওয়া যায় না, মানুষে হাসিবে যে? ভাবিবে

মন্দারের কাণ্ডজ্ঞান নাই, কাপড় দেখাইতেই সে ব্যস্ত। স্থান কালের উপযুক্ত সাজ ত করিতে হইবে। কিন্তু তেমন শাড়ী তাহার কোথায়? বিবাহের উৎসবে না হয় বেনারসী পরিল, সবাই তাহা পরে। কিন্তু বৌভাতে, বিশেষ করিয়া সে যখন বরের পক্ষের লোক, তখন অত জমকালো কাপড় না পরাই ভাল। একখানা দক্ষিণী শাড়ী কি মান্দ্রাজী শাড়ী হইলেই ঠিক হইত, কিন্তু তাহা ত নাই? দামী ঢাকাই শাড়ী হইলেও চলে, কিন্তু তাহাও নাই। বিবাহের সময় যা দু-চারখানা কাপড় পাইয়াছিল, তাহা এতদিন পরিয়াছে, ইহার পর কাপড়-জামা কিছু না করাইলে আর মান থাকে না। কিন্তু স্বামীকে বুঝাইতে তাহার প্রাণ বাহির হইয়া যাইবে। দুখানার বেশী কাপড়ে যে মানুষের কি প্রয়োজন থাকে, তাহা তিনি বুঝিতেই পারিবেন না। কিন্তু কাপড় একখানা অন্ততঃ না কিনিলেই চলিবে না। বিবাহটা বেনারসী পরিয়া চালানো যাইবে, অভাব পক্ষে বৌভাতটাও সারিতে হইবে, কিন্তু লটিদি'র মেয়ের জন্ম দিনে সে কি পরিবে? লটিদি'রা বড়মানুষ, সেখানে সঙ্ সাজিয়া গেলে কিছুতেই চলিবে না। স্বামী রাগই করুন আর যা ই করুন, একখানা ভাল স্থতি বেনারসী শাড়ী বা মান্দ্রাজী শ ড়ী তাহার চাই-ই। নাগরা জোড়াও ছিঁড়িয়া আসিবার উপক্রম করিতেছে, বদ্‌লাইতে পারিলে ভাল।

এমন সময় বিজয় পিছন হইতে বলিল, "কাপড়ের দেরাজে এমন কি পেলে যে একেবারে তন্ময় হয়ে বসে গেছে? মেয়েদের ঐদিকে স্থবিধে খুব, আর কিছু এন্‌টারটেন্‌মেণ্ট না থাক্ কাপড় নিয়ে বসলেই দিনটা দিব্যি কেটে যাবে।"

মন্দার বলিল, "আহা, কত না কাপড়, তাই নিয়ে একেবারে দিনের পর দিন কাটিয়ে দেব। একখানা কাপড়ও ত পরবার মত নেই।"

বিস্ময়ের আতিশয্যে বিজয়ের চোখ প্রায় ঠিক্‌রাইয়া বাহির হইয়া আসিল। সে বলিল, "কাপড় নেই? তোমার?"

মন্দার ঝঙ্কার দিয়া বলিল, "হ্যাঁ গো হ্যাঁ, আমারই। এই যে উপরি উপরি চারদিন আমায় বেরতে হবে তা কি প'রে বেরব?"

বিজয় বলিল, "কেন, তোমার শাড়ীগুলো কি চুরি হয়ে গেছে না-কি? সেই যে একগাদা বেনারসী শাড়ী ছিল?"

মন্দার বলিল, "আহা, একগাদা ত কত! একখানার বেশী হলেই তোমাদের কাছে একগাদা হয়ে যায়। তিনখানা ত শাড়ী ছিল মোটে।"

বিজয় বলিল, "তা সেগুলো কি পরা যায় না?"

মন্দার বলিল, "তা যাবে না কেন? অভাবপক্ষে সবই পারা যায়। তাই ব'লে জন্মদিনে বেনারসী শাড়ী প'রে যাব না কি? আমি কি ক্ষ্যাপা, না পাগল?"

এ সব ব্যাপারের আইন-কানুন বিজয়ের একেবারেই জানা ছিল না। ভাল জিনিষ যে আবার এখানে পরা যায়, ওখানে পরা যায় না, সকালে পরিলে পাপ হয়, বিকালে পরিলে পুণ্য হয়, তাহা সামান্য পুরুষ মানুষ সে কেমন করিয়া বুঝিবে? যে-সকল আত্মীয়াদের মধ্যে সে মানুষ হইয়াছে, তাঁহাদের ও-সকল আপদ-বালাই কোনকালেই ছিল না। একখানা গরদের শাড়ীর জোরে তাঁহার মা চিরকাল লোক-লৌকিকতা চালাইয়া দিয়াছিলেন, সেই শাড়ীখানি আজকাল দিদি দখল করিয়াছেন বলিয়া বোধ হয়। স্থতরাং এহেন পরিবারের ছেলে বিজয় যে মন্দারের শাড়ীর দুঃখ মোটেই বুঝিবে না, তাহা তাহার বুঝা উচিত ছিল।

বিজয় জিজ্ঞাসা করিল, "কেন জন্মদিনে কেউ বেনারসী পরে না?"

মন্দার মুখ ঘুরাইয়া বলিল, "যাদের মাথায় এক ছটাকও বুদ্ধি আছে, তারা পরে পারে না। যারা কাপড়ের বিজ্ঞাপন দিতে চায়, তারা পরতে পারে।

বিজয় আলোচনা ত্যাগ করিয়া সোজাসুজি জিজ্ঞাসা করিল, "তা আমাকে কি করতে হবে সেটাই শুনি।"

মন্দার নরম স্থরে বলিল, "একখানা মান্দ্রাজী কি স্থতি বেনারসী শাড়ী ভাল দেখে যদি কিনে দাও, আর এক জোড়া নাগরা, ত খুব ভাল হয়। জন্মদিনে সত্যি কেউ

বেনারসী প'রে যেতে পারে না। বিয়ে বউভাত কোনো রকমে চালিয়ে নেব এখন।"

বিজয় অত্যন্ত বিপন্নভাবে বলিল, "তোমার কি সুতোর কাপড় একটাও নেই? আমার যে এই মাসে আবার লাইফ ইন্‌শিউর্‌যান্সে প্রিমিয়াম্ দিতে হবে?"

মন্দার বলিল, "সুতি কাপড় ঢের আছে—মিলের। তাই প'রে যাব? সেই কোন্ যুগে একখানা ঢাকাই কাপড় কিনে দিয়েছিলে, সেখানা ত এই ছ-বছর ধ'রে পরলাম। চেনাশোনার মধ্যে কারও আর সে শাড়ীখানা চিন্‌তে বাকি নেই প্রায় ইউনিয়ন জ্যাকের সমান সুপরিচিত।"

কথাগুলিতে ঝাঁঝ যথেষ্ট। কাজেই বিজয় বুঝিল, এ বিষয়ে মন্দারের মনে অনেকখানি উত্তাপ সঞ্চিত হইয়া আছে। কিন্তু হট করিয়া এতগুলো টাকা সে পায়ই বা কোথায়? পাঁচ টাকার একখানা কাপড় কিনিয়া আনিলে মন্দার যে তাহা পরিয়া যাইবে না তাহা এতদিনে বিজয় বুঝিয়াছিল। শাড়ী, জুতা মিলাইয়া ত্রিশ চল্লিশ টাকার ঠেলা, কোথা হইতে জুটিবে? প্রিমিয়মের জন্য যে টাকাটা রাখিয়াছে, তাহা খরচ করা যায়, কিন্তু জামাই বাবুই ত এজেন্ট, কোনোমতে কথাটা দিদির কানে উঠিলে বিজয়ের যা অবস্থা হইবে, তাহা কল্পনা করিয়াই সে শিহরিয়া উঠিল। মন্দারের কথার কোনো উত্তর না দিয়া সে স্নান করিতে চলিয়া গেল।

খাওয়ার সময়ও বিশেষ কোনো কথা হইল না, তবে যাইবার সময় পান আনিয়া হাতে দিয়াই মন্দার বলিল, "ভুলে ব'সে থেকো না যেন। শেষে তাড়াহুড়ো ক'রে যা-তা একটা নিয়ে আসবে।

"তোমার ভাবনা নেই, যা-তা আমি আন্‌ছি না।" বলিয়া বিজয় বাহির হইয়া গেল। মনিব্যাগে নোট কয়খানা লইয়াই গেল, দেখা যাক সস্তায় ভাল জিনিষ যদি পাওয়া যায়, তাহা হইলে মন্দার বেচারীকে নিরাশ করিবে না। সে অন্যায় আবদার একটু করে বটে, কিন্তু বিজয়ও সত্যি কথা বলিতে এতদিনের মধ্যে তাহাকে বিশেষ কিছু দেয় নাই, সেই অতিবিখ্যাত ঢাকাই শাড়ীখানা ছাড়া।

টিফিনের আগের ঘণ্টায় তাহার ছুটি ছিল। হেড মাষ্টারকে বলিয়া সে একটু বাহির হইয়া পড়িল। দুই-চারিটা দোকান ঘুরিয়া আসা যাক, যদিই কিছুর সন্ধান মেলে।

সন্ধান মিলিল, শাড়ীর নয়, জামাইবাবুর। তিনি শ্যালককে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হে, তুমিও এজেন্টের যোগাড়ে এসেছ না কি?"

বিজয় সংক্ষেপে বলিল, "হ্যাঁ।" জামাইবাবু একখানা দশহাত লালপেড়ে শাড়ী পছন্দ করিয়া মহা দরকষাকষি লাগাইয়া দিলেন। বিজয় সুড়সুড় করিয়া বাহির হইয়া যাইতেছে দেখিয়া হাঁক দিয়া বলিলেন, "কি হে চল্‌লে যে? কাপড় নেবে না?"

বিজয় বলিল, "না; কাপড়ের বড় দাম।" জামাই বাবু উৎসাহিত হইয়া বলিলেন, "ঠিক বলেছ, কোনো জিনিষ কি ছোঁবার জো আছে? তোমার দিদির যে আবার শাড়ী ছাড়া কিছু পছন্দ না। তোমার বউ ত বিদুষী আছেন, বই-টই একখানা সস্তায় কিনে দাও গে। তিনি হাতে করে দিলে বেশ মানাবে।" ভগিনীপতির কথা শেষ হইবার আগেই বিজয় অদৃশ্য হইয়া গেল। কিন্তু সেদিন সে বিশেষ শুভলগ্নে বাহির হয় নাই, পাঁচ মিনিট পরেই জামাইবাবু হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিয়া তাহার সঙ্গ লইলেন। বলিলেন, "ওহে প্রিমিয়ম্ দেবার শেষের দিন হয়ে এল যে? এবার যেন দেরি ক'রে আবার ফাইন্ গুন্‌তে বসো না।" বিজয় হঠাৎ ফস্ করিয়া বলিয়া ফেলিল, "না, না, দেরি কেন হবে? টাকা ত আমি সঙ্গে নিয়েই বেরিয়েছি"

জামাইবাবু সোৎসাহে বলিলেন, "তাই না-কি? তবে দিয়ে দাও আমার হাতে, আমি ওদিকেই যাচ্ছি। তোমার পকেটে থাকলে বেশীক্ষণ থাক্‌বে না, বিশেষ করে দোকানের সাম্‌নে যখন ঘুরতে বার হয়েছ।"

কথাটা বলিয়া ফেলিয়াই বিজয়ের নিজের কান মলিতে ইচ্ছা করিতেছিল। কিন্তু এখন আর উপায় কি? মনিব্যাগ বাহির করিয়া, নগদ পঁয়ত্রিশ টাকা সে ভগিনীপতির হাতে গণিয়া দিল। ক্ষীণকায় ব্যাগটিকে পুনরায় পকেটে রাখিতে রাখিতে ভাবিল, যাক্, আপদ চুকিয়া গেল। শাড়ী কেনার কোনো

কথাই আর উঠিতে পারে না। বাকী যা গোটা-ছয়েক টাকা আছে, তাহাতে এক জোড়া ভাল নাগ্‌রা হইলেও হইতে পারে। তাহাই লইয়া যাওয়া যাইবে, বউ রাগ করিলে সে নিরুপায়।

এমন সময় একটা কাগজে জড়ানো বিপুল বাণ্ডিল লইয়া, একটি যুবক হুড় মুড় করিয়া তাহার ঘাড়ের উপর আসিয়া পড়িল। বাণ্ডিলটা ছিট্‌কাইয়া তাহার হাত হইতে ফুটপাথের উপর গিয়া পড়িল। বিজয় কোনোমতে নিজেকে সামলাইয়া লোকটির দিকে চাহিয়া দেখিল। একেবারে অপরিচিত নয়, তবে বন্ধু ব্যক্তিও নয়। ইহার নাম গুণেন্দ্র মিত্র, বিজয়দের বাড়ি হইতে খানিক দূরেই ইহাদের বাড়ি। বড়মানুষের ছেলে, বাপের পয়সা না-কি দুহাতে উড়াইতেছে।

লোকটি গা ঝাড়া দিয়া উঠিয়া বলিল, "মাপ করবেন, আপনার লাগেনি ত?"

বিজয় বলিল. "না, লাগ্‌বে কেন? দেখুন, জিনিষ-গুলো কিছু নষ্ট হল না ত?"

গুনেন জিনিষগুলি কুড়াইতে কুড়াইতে বলিল "না, হয়নি দেখছি। আর কিছুর জন্য চিন্তা ছিল না, এই শাড়ীখানা নষ্ট হলে অনেক টাকার মাল যেত।"

বিজয় চাহিয়া দেখিল, কচি দুর্ব্বাদলের মত শ্যামল রঙ্ চওড়া জরির পাড় ঝক্ ঝক করিতেছে, চমৎকার শাড়ীখানি বটে। উহা মান্দ্রাজী, কি দক্ষিণী, কি ঢাকাই তাহা বুঝিবার মত জ্ঞান বিজয়ের ছিল না, তবে সুন্দর জিনিষটি এবং এইরূপ একখানি দিতে পারিলে মন্দার খুব খুশী হইত তাহা বেশ বুঝিতে পারিল। কিন্তু গরীবের ঘোড়া রোগ থাকিলে চলে না, এখানার দাম নিশ্চয়ই অনেক টাকা।

যুবকের সহিত আলাপ জমাইবার বিশেষ ইচ্ছা তাহার ছিল না। ইহার সম্বন্ধে বহু দিন হইতে বিজয়ের মনে একটা বিদ্বেষের ভাব ছিল। কোনো এককালে না-কি মন্দারের সহিত ইহার বিবাহের কথা হয়। বিবাহ হইয়াই যাইত, তবে শেষের দিকে ছেলের মা বাঁকিয়া বসিল, মেয়ের রং ধবধবে ফরসা নয়, অত বড় লোকের বাড়ির একমাত্র বউ হওয়ার উপযুক্ত নয়। সুতরাং বিবাহ হইল না। গুণেনের প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়াই বিজয়ের উচিত ছিল, কিন্তু সে গেল চটিয়া। গুণেনের বিবাহ হইয়াছে মন্দারেরই এক সখীর সঙ্গে, সে খুব ফরসা বটে। একদিন মন্দারের সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছিল, কিন্তু নানা ওজর আপত্তি করিয়া, বিজয় এ পর্য্যন্ত বউকে গুণেনদের বাড়ি একবারও যাইতে দেয় নাই। সেখানে গেলে তুলনায় সমালোচনা অন্ততঃ মনে মনে সকলে করিবেই, এই ছিল তাহার বিশ্বাস। ইহা মনে করিতেই তাহার হাড় জ্বলিয়া যাইত।

নমস্কার করিয়া সে সরিয়া পড়িল। স্কুল ছুটি হইবার পর চলিল জুতা কিনিতে। নাগ্‌রার মাপ মন্দার সঙ্গেই দিয়াছিল। সাড়ে পাঁচ টাকা দিয়া এক জোড়া ভাল জুতা কিনিয়া বিজয় বাড়ি ফিরিয়া চলিল। শাড়ী কেন কিনিতে পারিল না, সে বিষয়ে ভাল ভাল কৈফিয়ৎ মনে মনে গুছাইয়া ঠিক করিতে লাগিল।

কিন্তু ভাল কৈফিয়ৎগুলি তাহার মনে মনেই থাকিয়া গেল। শাড়ী আসে নাই, শুধু জুতা আসিয়াছে শুনিয়া মন্দার এমন মুখ বানাইল, যে, বিজয় আর কথা বলিবার চেষ্টা না করিয়া, চায়ের পেয়ালা লইয়া বসিয়া গেল।

জুতা জোড়া একদিকে ঠেলিয়া সরাইয়া দিয়া মন্দার বলিল, "এইটে মাথায় করে গেলেই চল্‌বে?"

বিজয় রসিকতা করিবার চেষ্টা করিয়া বলিল, "জুতা কি লোকে মাথায় পরে আজকাল? হাল ফ্যাশান জানি না বটে।"

মন্দার বিদ্রূপ করিয়া বলিল, "তা যে জান না, তা দেখতেই পাচ্ছি। আট বছর একখানা শাড়ী পরে যার স্ত্রীর কাটাতে হয় তাকে ফ্যাশান্ সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ কেউ বল্‌বে না।"

বেগতিক দেখিয়া বিজয় আর কথা বলিল না। চা জলখাবার শেষ করিয়া আবার পশুপতিবাবুর বাড়ির আড্ডার দিকে প্রস্থান করিল। আগেকার লোকগুলিই ছিল সুখী। এখানকার মানুষের জ্বালা-যন্ত্রণা এতও বাড়িয়া উঠিয়াছে।"

কোনোদিন তাসের দলে সে যোগ দেয় না, কারণ তাস খেলিতে গেলেই অনেক রাত হয় এবং রাত

হইলে মন্দার অত্যন্ত বকাবকি করে। আজ কিন্তু বিজয় নিজেই উৎসাহ করিয়া ব্রিজ খেলার দলে ভিড়িয়া গেল, এবং রাত সাড়ে দশটা পর্য্যন্ত অবিচলিত নিষ্ঠাসহকারে খেলিয়া চলিল।

বাড়ি যখন ফিরিল, তখন এগারোটা বাজিতে মাত্র পনেরো মিনিট বাকি। বিজয়ের আশা ছিল মন্দার এতক্ষণে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, কিন্তু সদর দরজায় হাত দিয়াই বুঝিল তাহার আশা দুরাশা মাত্র। দরজা ভেজান রহিয়াছে, হুড়কা দেওয়া হয় নাই। এত রাতে দরজা খোলা রাখিয়া মন্দার নিশ্চয়ই ঘুমাইবে না। আস্তে আস্তে দরজা ঠেলিয়া সে ভিতরে প্রবেশ করিল।

বারান্দায় ভাঙা ইজি-চেয়ারটায় বসিয়া জামাইবাবু মহোৎসাহে মন্দারের সঙ্গে গল্প করিতেছেন। মন্দার বসিয়া আছে বটে, কিন্তু কথা বেশী বলিতেছে না, মুখের ভাব বেশী কিছু প্রসন্ন নয়। অন্যদিন হইলে এ হেন সময়ে জামাইবাবুকে আসর জমাইতে দেখিলে বিজয় মোটেই খুশী হইত না। কিন্তু আজ মহানন্দে তাহাকে সম্ভাষণ করিল, "কি মনে করে? বড় যে ছুটি পেলেন এমন সময়।"

জামাইবাবু বলিলেন, "আর ভায়া আমাদের আর এমন তেমন সময় কি? তোমার ভগিনী হুকুম করলেন এখানে আসতে, তাই যখন সময় পেলাম এলাম। কাল বৌভাতে যাবার সময় তোমরা ওকে নিয়ে যেও, আমার একটা কেস্ কাল পাকা করতে হবে, হয়ত একেবারেই যেতে পারব না।"

কাল বৌভাতে যাওয়া ব্যাপারটা যে খুব নির্ব্বিঘ্নে কাটিয়া যাইবে এমন দুরাশা বিজয়ের ছিল না। ইহার ভিতর আবার দিদি আসিয়া যদি ফোড়ন দেন, তাহা হইলে ত হইবে সোনায় সোহাগা। সে তাড়াতাড়ি আত্মরক্ষার খাতিরে বলিল, "আমিও ত সময় মত যেতে পারব না। আমাদের চাকরটা ওদের বাড়ি চেনে তার সঙ্গেই ওঁরা বেশ যেতে পারবেন।"

মন্দার স্বামীর দিকে যে অগ্নিবাণ নিক্ষেপ করিল, তাহা জামাইবাবুর চোখ এড়াইল না। কারণটা তিনি ঠিক বুঝিলেন না, বলিলেন, "তা তোমাদের ঝগড়াঝাঁটির তোমরা মীমাংসা কর বাপু, আমি চললাম। মোট কথা, তোমার দিদিকে নিয়ে যেতে ভুলো না, তাহলে আমার আর রক্ষা থাকবে না। ছেলেপিলের অসুখের উৎপাতে একেই ত কোথাও যেতে পায় না, তবু হতভাগারা এই কদিন ভাল আছে বলে যাবার জোগাড় করেছে। না যাওয়া হলে বড় চটে যাবে।" তিনি ছাতাটি তুলিয়া লইয়া প্রস্থান করিলেন।

জামাইবাবু সদর দরজা পার হইবা মাত্র মন্দার ক্রুদ্ধকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "কেন, আপনি ঠিক সময়ে যেতে পারবেন না কেন শুনি? কি দেশোদ্ধারে ব্যস্ত থাকবেন?"

বিজয় বলিল, "বৌভাত খাওয়া আর দেশোদ্ধার করা, এই দুটো মাত্র কাজই কি জগতে আছে?"

মন্দার এত চটিয়াছিল যে, আর ঝগড়াও করিল না। শুইবার ঘরে ঢুকিয়া ঝনাৎ করিয়া দরজাটা ভেজাইয়া দিল। বিজয়কে অগত্যা খাওয়া দাওয়া একলা বসিয়াই সারিতে হইল।

ভোরে উঠিয়াই সে বাহির হইয়া গেল। চাকরটাকে বলিয়া গেল, "দেখ্, সারাদিন হয়ত আমাকে বাইরে থাকতে হবে, তোর মা ঠাকরুণকে নিয়ে ঠিক সময় পরিমলবাবুদের বাড়ি যাবি। পিসিমাও তোদের সঙ্গে যাবেন। তিনি যদি এ বাড়ী না আসেন, তা হলে গাড়ী করে তাঁর ওখানে গিয়ে, তাঁকে তুলে নিয়ে যাবি।" মন্দার সব কিছুরই ব্যবস্থা করিবে, তাহা বিজয়ের জানাই ছিল, তবু চাকরকে খানিকটা উপদেশ দিয়া সে নিজের বিবেককে শান্ত করিল।

চা খাইল এক বন্ধুর বাড়িতে এবং ভাত খাইলই না। সোজা স্কুলে চলিয়া গেল। পড়াইতে পড়াইতে কেবলই ভাবিতে লাগিল, মন্দার না জানি কি ভীষণ চটিয়াছে। তাহার মান ভাঙাইবার অনেক রকম প্ল্যান সে মনে মনে করিতে লাগিল, কিন্তু কোনোটাই তেমন লাগসই হইবে বলিয়া বোধ হইল না।

স্কুল ছুটি হইবার পর খানিক লক্ষ্যহীনভাবে এদিক ওদিক ঘুরিয়া বেড়াইল। পরিমল বোস্ বন্ধু মানুষ, তাহার বৌভাত হইতে বাদ পড়িবার ইচ্ছা বিজয়ের ছিল না। কিন্তু মন্দারের সামনে ঠিক এখন গিয়া

পড়িতেও তাহার ভরসা হইতেছিল না। মন্দার উৎসব-ক্ষেত্রে চলিয়া গিয়াছে, জানিতে পারিলে সে বাড়ী গিয়া কাপড়চোপড় বদ্‌লাইতে পারে। পরের বাড়ি, লোকের ভিড়ে দেখা হইলেও ঝগড়ার ভয় নাই। তার উপর দিদি উপস্থিত থাকিলে ত কথাই নাই। উৎসবান্তে প্রায়ই মন্দারের মেজাজ ভাল থাকে, তখন মিট্‌মাট্ করিয়া ফেলা শক্ত হইবে না।

সন্ধ্যা হইয়া আসিল। বিজয় ভাবিল একবার পরিমলদের বাড়ির কাছাকাছি কোথাও গা ঢাকা দিয়া দাঁড়াইয়া অতিথিসমাগম দেখা যাক্। মন্দার আসিয়াছে কি-না তাহা হইলে বুঝা যাইবে। নিমন্ত্রণবাড়ি যাইতে বেশী দেরী সে প্রায়ই করে না। বিজয় ধীরে ধীরে অগ্রসর হইল।

পরিমল বোসের বাড়ির সামনে তখন রীতিমত ভিড় জমিয়া গিয়াছে। প্রাইভেট মোটর, ট্যাক্সি, ঘোড়ার গাড়ী, পদাতিক, সব মিলিয়া এমন একটা ধূম বাধাইয়া তুলিয়াছে যে, বেশী কাছে যাওয়ার আশা বিজয় ছাড়িয়াই দিল। বেশ খানিকটা দূরে দাঁড়াইয়াই সে জনসমাগম দেখিতে লাগিল। কিন্তু অতদূর হইতে কিছু বুঝিয়া উঠা কঠিন। সব মেয়েকেই প্রায় একরকম দেখায়। একবার মনে হইল যেন লালপেড়ে গরদপরা দিদি ঠাকুরাণীর মূর্ত্তি দেখা গেল, কিন্তু তাহাও নিশ্চিত করিয়া বুঝিবার কোনো উপায় ছিল না।

অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া বিজয়ের পা ব্যথা করিতে লাগিল। স্থির করিল, দিদির বাড়ি একবার খোঁজ করা যাক, তাহা হইলেই মন্দার গিয়াছে কি-না বুঝা যাইবে। দিদির বাড়ির দিকেই চলিল। বেশীদূর যাইতে হইল না, জামাইবাবুর দেখা মিলিয়া গেল। শ্যালককে দেখিয়া তিনি বলিলেন, "কি হে, তুমিও পলাতক নাকি ?"

বিজয় বলিল, "আমার কাজ ছিল বলে দেরী হয়ে গেছে। আপনি যাচ্ছেন বুঝি ? দিদিরা গিয়েছেন ?"

জামাইবাবু বলিলেন "আরে কোন্ কালে! ওরা কি আর আমাদের মত খালি খেতে যায় ? এর ওর শাড়ী দেখ্‌বে, গহনা দেখ্‌বে, গড়াবার ফন্দি করবে, সকলের হাঁড়ির খবর নেবে, নিজেদের হাঁড়ির খবর দেবে, তবে না ওদের বেরনো সার্থক ? ওরা সন্ধ্যে থেকে গিয়ে বসে আছে।"

বিজয়ের হাসি পাইল। বেচারী দিদি! শাড়ী গহনার ভারে তিনি ত একেবারে ভারাক্রান্ত, জামাইবাবু ত মুখ খুব ছুটাইয়া লইলেন। হইত মন্দারের মত বউ, তাহা হইলে ভদ্রলোকের অত কথা বলার কোনো অর্থ থাকিত। যাক, এখন নির্ব্বিঘ্নে বাড়ি গিয়া হাতমুখ ধোওয়া, কাপড় ছাড়া চলিতে পারে।

বাড়ি পৌছিয়া দেখিল, সদর দরজায় তালা লাগান। তাহাতে ভাবনা নাই, বিজয়ের কাছে সর্ব্বদাই ডুপ্লিকেট চাবি থাকিত। তালা খুলিয়া সে ভিতরে প্রবেশ করিয়া কাপড়চোপড় লইয়া স্নান করিতে চলিল। স্নান সারিয়া শুইবার ঘরে ঢুকিয়া চুল আঁচ্‌ড়াইতেছে, এমন সময় চোখে পড়িল মন্দারের জন্য কেনা নূতন নাগ্‌রা জোড়া। মন্দার পরিয়া যায় নাই দেখা যাইতেছে। বিজয়ের মনটা একটু দমিয়া গেল, মন্দারের মেজাজটা যে কি পরিমাণ গরম হইয়াছে, তাহা বুঝিতেই পারিল।

ফিট্‌ফাট্ হইয়া সে বন্ধুর বাড়ির উদ্দেশ্যে যাত্রা করিল। পথে আরও দুইজন সহযাত্রী ছুটিয়া গেল। তিন জনে মহানন্দে গল্প করিতে করিতে চলিতে লাগিল। উৎসবক্ষেত্রে পৌছিয়াও একেবারে ভিতরে ঢুকিল না। গেটের কাছে দাঁড়াইয়া গল্প করিতে লাগিল।

হঠাৎ বাড়ীর ভিতরে একটা ভয়ানক হুড়াহুড়ি, চেঁচামেচি শোনা গেল। অনেক লোক একসঙ্গে সেদিকে ছুটিয়া গেল। যাহারা নিতান্ত বাহিরের লোক, অন্দরে ঢুকিতে পারে না, তাহারাও ব্যস্তভাবে দরজা জান্‌লার কাছে গিয়া উঁকিঝুঁকি মারিতে লাগিল এবং ব্যগ্রভাবে সকলকে প্রশ্ন করিতে লাগিল।

বিজয় ছিল শেষের দলে। বাড়ীর একজন যুবককে ব্যস্তভাবে ছুটিয়া আসিতে দেখিয়া সে তাহাকে চাপিয়া ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "হল কি মশায় ? এত গোলমাল যে ?"

যুবক বলিল, "একটু য়্যাক্‌সিডেণ্ট হয়ে গেছে," বিজয় জিজ্ঞাসা করিল "কি হয়েছে, কি?"

যুবক বলিল, "বারান্দার রেলিং ছেড়ে যাওয়ায় একজন মেয়ে নীচে পড়ে অজ্ঞান হয়ে গেছেন। তাঁকে এখনি হাঁসপাতালে নিয়ে যেতে হবে, তাই গাড়ীটা এগিয়ে আন্‌তে হবে সিঁড়ির কাছে।"

বিজয়ের বুকের ভিতরটা ছ্যাঁৎ করিয়া উঠিল। কে মেয়েটি? মন্দার নয় ত? সর্ব্বনাশ, তাহাই যদি হয়? পরিমল বোসের গাড়ী ইতিমধ্যে সিঁড়ির কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। ভিতর হইতে যুবতীটিকে বহন করিয়া আনা হইতেছে। বিজয় ব্যাকুলভাবে গলা বাড়াইয়া দেখিতে লাগিল।

চার পাঁচজন যুবক এক জোটে বাহির হইয়া আসিতেছে। তাহাদের ভিতর একজনের কোলে অচেতন নারী মূর্ত্তি! ভাল করিয়া সেইদিকে তাকাইয়াই বিজয়ের মাথাটা বন্ বন্ করিয়া ঘুরিয়া উঠিল। পড়িতে পড়িতে কোনো মতে আর একজনের কাঁধে হাত দিয়া সে নিজেকে সাম্‌লাইয়া লইল। যে-যুবক তরুণীকে বহন করিয়া আনিতেছে, সে গুণেন্ মিত্তির, আর তরুণীটি মন্দার। মন্দারই ত? মুখ সে দেখিতে পাইল না, কিন্তু পরণে ঐ ত লাল ঢাকাই শাড়ী, জরীর বরফী কাটা, সেই কাপড়েরই ব্লাউস্। ভুল করিবার জো কি? বেচারী মন্দারই না ঠাট্টা করিয়া বলিয়াছিল, উহা প্রায় ইউনিয়ন জ্যাক্-এর মতই সুপরিচিত।

বিজয়ের মাথায় যেন রক্ত চড়িয়া গেল। মন্দার কি নাই? তাহার মন্দার, তাহার জীবনের অধিশ্বরী মন্দার! আর তাহাকে বহন করিয়া লইয়া চলিয়াছে কি-না হতভাগা গুণেন? বিজয় উন্মত্তের মত ছুটিল। কাহাকে ধাক্কা দিল, কাহাকে টানিয়া ফেলিল, তাহার যেন খেয়ালই ছিল না। একেবারে গুণেনের ঘাড়ের উপর পড়িয়া তাহার বাহুমূল চাপিয়া ধরিয়া বলিল, "এই ছেড়ে দাও!"

গুণেন কট্‌মট্ করিয়া তাহার দিকে তাকাইল। বিজয় একটু ঘাবড়াইয়া অচেতন তরুণীর দিকে ভাল করিয়া চাহিল। এ ত মন্দার নয়? কে এ?

থতমত খাইয়া বলিল "মাফ করবেন, ভুল হয়েছিল," গুণেন অগ্রসর হইয়া গেল।

পিছন হইতে একটি ছেলে তাহাকে নাড়া দিয়া বলিল, "মশায়, হলের ভিতর আপনাকে একবার আস্‌তে বল্‌ছেন।"

বিজয় উদ্‌ভ্রান্তভাবে তাকাইয়া বলিল "কে?"

ছেলেটি একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, "আপনারই কেউ আত্মীয়া হবেন।"

বিজয় কি করিবে ভাবিতেছে, এমন সময় হলঘরের দরজার কাছে একটি তরুণী মূর্ত্তি বাহির হইয়া আসিয়া ইঙ্গিতে বিজয়কে ডাকিল। ছেলেটি বলিল, "ঐ যে উনি।"

বিজয় চাহিয়া দেখিল, মন্দার। পরণে সবুজ রংয়ের অতি চমৎকার শাড়ী জামা। জরির চওড়া পাড় ঝক্ ঝক্ করিতেছে। এই শাড়ীখানাই না সে গুণেন মিত্তিরের হাতে কাল দেখিল?

হতবুদ্ধিভাবে সে স্ত্রীর নিকটে অগ্রসর হইয়া গেল। জিজ্ঞাসা করিল "কি বল্‌ছ?"

মন্দার হাসিয়া বলিল, "কাপড় চেন, আর মানুষ চেন না? প্রতিভাকে নিয়ে অমন টানাটানি করছিলে কেন? তুমি কি ক্ষ্যাপা?"

অপ্রস্তুতভাবে বিজয় জিজ্ঞাসা করিল "প্রতিভা কে?"

মন্দার বলিল, "গুণেনের স্ত্রী। বেচারী ভালয় ভালয় সেরে উঠলে বাঁচি। ভাগ্যে উঠানটা বাঁধানো নয়, মাথা ফেটে চৌচির হ'ত তা হলে। আচ্ছা, আচ্ছা, বাড়ি গিয়ে সব বল্‌ব যাও এখন।" অগত্যা বিজয় সরিয়া আসিতে বাধ্য হইল।

প্রথম ব্যাচে খাইয়া লইয়া মন্দার তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরিয়া আসিল। দিদির ভার আর এবার তাহাদের লইতে হইল না।

ঘরে ঢুকিয়াই বিজয় বলিল, "কি কাণ্ডখানা করলে বল দেখি? আর একটু হলেই আর একটা য়্যাক্‌সিডেণ্ট হ'ত।"

মন্দার বলিল, "তা তুমি যে অমন বোকা তা কি করে জানব? মেয়েরা অমন কাপড় বদ্‌লাবদলি করে ঢের পরে।

প্রতিভা দুপুরে এসেছিল, সে জেদ করল, তাই তার শাড়ী-খানা আমি পরলাম, সে আমার খানা পরল। ওটা তার পরা শাড়ীও নয়, একেবারে নতুন।"

বিজয় সংক্ষেপে বলিল "তা জানি।"

পরদিন সকালে টাকা ধার করিয়া, বিজয় প্রায় সারা বাজার ঘুরিয়া আসিল। সব চেয়ে ভাল যে মাদ্রাজী শাড়ীখানা পাইল, তাহাই লইয়া আসিয়া মন্দারের হাতে দিল। বলিল, "এই নাও, আর যখন যা দরকার হবে, আমায় বলো, নিজেকে বাঁধা দিতে হলেও এনে দেব। কিন্তু দোহাই তোমার, বন্ধুদের শাড়ী আর পরো না, নিজের গুলোও দান কোরো না।"

মন্দার হাসিয়া বলিল,"যাক্, ভালই হ'ল আমার। মাঝ থেকে প্রতিভাটা আছাড় খেয়ে মরল। তা আজ শুনছি বেশ ভাল আছে।"

ফারসী রামায়ণ

শ্রীফণীন্দ্রনাথ বসু

হিন্দুসমাজের চিন্তার ধারা বোঝ্‌বার জন্যে মুসলমান রাজত্বকালে অনেক সংস্কৃত গ্রন্থের অনুবাদ ফারসী ভাষায় হয়েছিল। ফারসী লেখকরা অনেক সময় সংস্কৃত গ্রন্থের অবিকল অনুবাদ না ক'রে সংস্কৃত বইয়ের আধার আশ্রয় ক'রেও অনেক বই রচনা করেছিলেন। হিন্দুসমাজে রামায়ণের স্থান যে অনেক উচ্চে, তা সকলেই জানেন। সেজন্য রামায়ণও ফারসীতে অনূদিত হয়েছিল। রামায়ণের প্রথম অনুবাদ হয় সম্রাট আকবরের সময়। তিনি ছিলেন হিন্দুপ্রেমী, হিন্দুসভ্যতার ধারাটি ঠিকভাবে ধরবার জন্য তিনি অনেক সংস্কৃত গ্রন্থ ফারসীতে অনুবাদ করতে ফারসী লেখকদের নিযুক্ত করেন। তাঁর আগ্রহে সংস্কৃত থেকে অথর্ব্ব বেদ, মহাভারত, রামায়ণ, লীলাবতী ফারসীতে অনূদিত হয়। সেজন্য অনেকের ধারণা যে, সম্রাট আকবরই প্রথম সংস্কৃত থেকে ফারসীতে নানা বই অনুবাদ করান। কিন্তু বাস্তবিক এ ধারণা ঠিক নয়। সম্রাট আকবরের অনেক আগে থেকেই সংস্কৃত বই ফারসীতে অনূদিত হয়েছে। এমন কি, খালিফ আল মামুনের রাজত্বকালেও হিন্দু চিকিৎসা-শাস্ত্র ও বীজগণিত মুসলমান লেখক দ্বারা আরবীতে অনূদিত হয়। আল বেরুণীও ভারতে এসে সংস্কৃত ভাষা শিখেছিলেন ও কয়েকখানি বই অনুবাদ করেছিলেন। খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে ফিরোজ শা তোগলক যখন নগরকোট-দুর্গ জয় করেন, তখন একটি বিরাট পুস্তকাগার তাঁর হস্তগত হয়। তিনি মৌলানা ইজুদ্দিন খালিদ খানিকে একখানি হিন্দু দর্শনের বই অনুবাদ করতে বলেন। তিনি ফারসীতে যে বইখানি অনুবাদ করেন, সেটির নাম "দলয়ল ই-ফিরুজশাহী।" প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ইলিয়ট সাহেব বলেন যে, ফিরোজ শা তোগলকের সময় একখানি জ্যোতিষের বইও অনূদিত হয়। এই বইখানি তিনি লক্ষ্ণৌতে নবাব জলালউদ্দৌলার লাইব্রেরীতে দেখেছিলেন। সিকন্দর লোদীর রাজত্বকালেও একখানি চিকিৎসা-বিষয়ক গ্রন্থ সংস্কৃত থেকে ফারসীতে অনূদিত হয়েছিল। এ বইটির নাম 'টিব্ব-ই-সিকন্দরী'।*

ফারসীতে রামায়ণের অনুবাদ প্রথম সম্রাট আকবরের সময় হয়। মহাভারত ও রামায়ণ—এ দুটি হিন্দু ধর্ম্মগ্রন্থের অনুবাদের ভার সম্রাট দেন মুল্লা আবদুল কাদির বদায়ুনীর উপর। এ দু-খানি বিরাট হিন্দু ধর্ম্মগ্রন্থ অনুবাদ করতে মুল্লা বদায়ুনীর তেমন আগ্রহ ছিল না।

* Ishwari Prasad : *Medieval India*, পৃঃ ৫৪৬-৪৭।

অনেকটা অনিচ্ছার সঙ্গে অদৃষ্টের উপর দোষ দিয়ে তিনি অনুবাদ করতে অগ্রসর হন। প্রথমে মহাভারতের অনুবাদ হয়। ফারসীতে মহাভারতের নাম হয় —"রজমনামা"†। ১৫৮২ খৃষ্টাব্দে মহাভারতের ফারসী অনুবাদ শেষ হয়। এর তিন বৎসর পরে ১৫৮৫ খৃষ্টাব্দে সম্রাট আকবর মুল্লা বদায়ূনীকে রামায়ণ ফারসীতে অনুবাদ করতে আদেশ দেন। চারি বৎসর পরে, ১৫৮৯ খৃষ্টাব্দে রামায়ণের অনুবাদ শেষ হয়। বলা বাহুল্য, অনুবাদটি ফারসী পদ্যে হয়েছিল। রামায়ণের অনুবাদ শেষ হবার পর সম্রাট আকবর তাঁর চিত্রশিল্পীদের দ্বারা বইখানি চিত্রিত ও সুসজ্জিত ক'রে নিজের পুস্তকালয়ে রেখে দেন। সম্রাটের আমীর ও সভাসদ্‌রাও এই সচিত্র ফারসী রামায়ণ এক এক খণ্ড ক'রে গ্রহণ করেন।

মুল্লা বদায়ূনীর অনুবাদ ছাড়া, রামায়ণের আর যে-সব ফারসী অনুবাদ আছে, তার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ সম্প্রতি শ্রীমহেশপ্রসাদ মৌলবী, আলিমফাজিল মহাশয় তাঁর একটি হিন্দী প্রবন্ধে দিয়েছেন। এই প্রবন্ধটি গোরখপুর থেকে প্রকাশিত হিন্দী পত্র "কল্যাণের"—"রামায়ণাঙ্ক" বা রামায়ণ-সম্বন্ধীয় বিশেষ সংখ্যায় (১৯৩০, জুলাই) প্রকাশিত হয়েচে। উক্ত লেখক আরও যে কয়েকটি ফারসী রামায়ণের কথা বলেছেন, তাঁর সংক্ষিপ্ত পরিচয় তাঁর প্রবন্ধ থেকে গ্রহণ করেছি। সেজন্য তাঁর কাছে ঋণস্বীকার করছি।

যদি বদায়ূনীর অনুবাদকে আমরা রামায়ণের প্রথম ফারসী অনুবাদ ব'লে ধরি, তবে দ্বিতীয় ফারসী অনুবাদ হচ্ছে—"রামায়ণ ফৈজী।" বার বৎসর আগে মহেশপ্রসাদজী "নদ্‌বতুল উল্‌মা" নামে লক্ষ্ণৌয়ের একটি প্রতিষ্ঠানে 'রামায়ণ ফৈজী'র হাতে লেখা প্রতিলিপি দেখেন। এর অধিকাংশ ফারসী গদ্যে ও খুব কম অংশ ফারসী পদ্যে লেখা। সম্রাট আকবরের রাজত্বকালে বদায়ূনী যে রামায়ণের অনুবাদ করেন, এ তা থেকে সম্পূর্ণ পৃথক মনে হয়, কারণ বদায়ূনীর রামায়ণ পদ্যতে লেখা ছিল, আর এর অধিকাংশ গদ্যে লেখা।

রামায়ণের তৃতীয় অনুবাদক—মুল্লা মসীহ। কেহ কেহ বলেন যে, ইনি পানিপত (করনাল) নিবাসী ছিলেন। ইনি সম্রাট জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে রামায়ণের ফারসী অনুবাদ করেন। এঁরও অনুবাদ ফারসী পদ্যে লেখা। এ অনুবাদ—"রামায়ণ মসীহী" ব'লে বিখ্যাত। সুখের বিষয়, এ বইখানি লক্ষ্ণৌয়ের মুন্সী নবলকিশোর সাহেবের প্রেস থেকে ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়েচে। ছাপা বইতে প্রায় ৩৩০ পৃষ্ঠা আছে।

শুধু যে মুসলমান লেখকরা ফারসীতে রামায়ণ অনুবাদ করেছেন তা' নয়, অনেক হিন্দুলেখকও রামায়ণের ফারসী অনুবাদ করেছিলেন। মুসলমান যুগে হিন্দুরাও রাজভাষা ফারসী শিখতেন ও ফারসীতে নানা বই রচনা করতেন। আমরা চারজন হিন্দু লেখকের অনূদিত ফারসী রামায়ণের উল্লেখ পাই। তাঁদের মধ্যে একজনের নাম—শ্রীচন্দ্রভাল 'বেদিল'। আমরা এঁকে রামায়ণের চতুর্থ অনুবাদক বল্‌তে পারি। ইনি ঔরংজেব বাদশাহের রাজত্বকালে রামায়ণ অনুবাদ করেন। তাঁর অনুবাদও ফারসী পদ্যে হয়েছিল। সুখের বিষয়, তাঁর বইখানাও নবলকিশোর প্রেস থেকে ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়েচে। ছাপা বইয়ের পৃষ্ঠা-সংখ্যা মোট ১১৪। অনেকে মনে করেন যে ইনি প্রথমে গদ্যে লিখেছিলেন, কিন্তু এঁর লেখা গদ্য রামায়ণ পাওয়া যায় না। যেটা লক্ষ্ণৌয়ের নবলকিশোর প্রেসে ছাপা হয়েছে, সেটি পদ্যে লেখা।

হিন্দুলেখকদের মধ্যে অপর একজনের নাম—লালা অমরসিংহ। তিনি জাতিতে কায়স্থ ছিলেন। তাঁকে আমরা রামায়ণের পঞ্চম অনুবাদক বল্‌তে পারি। তিনি সংবৎ ১৭৮৩ বা ১৭০৫ খৃষ্টাব্দে ফারসী গদ্যে রামায়ণ অনুবাদ করেন। তাঁর লেখা রামায়ণ সাধারণের মধ্যে—"রামায়ণ অমর প্রকাশ" বলে পরিচিত। এটিও পণ্ডিত মাধবপ্রসাদের উদ্যোগে ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে লক্ষ্ণৌয়ের নবলকিশোর প্রেস থেকে প্রকাশিত হয়েচে। এর পৃষ্ঠা-সংখ্যা ৫৪৪।

লালা অমানত রায়কে আমরা রামায়ণের ষষ্ঠ অনুবাদক বল্‌তে পারি। ইনি জাতিতে ক্ষত্রিয় ছিলেন।

† V. A. Smith : *Akbar*, পৃঃ ৪২৩।

তাঁর নিবাস ছিল—লালপুর গ্রামে। যদিও লালপুর গ্রামের অধিকাংশ লোক যুদ্ধব্যবসায়ী ছিলেন, তবু তিনি যুদ্ধবিদ্যায় আসক্ত ছিলেন না। তিনি বরং লেখাপড়ায় বেশী আসক্ত ছিলেন। দৈবযোগে গ্রামে বন্যা আসে, তাতে লালপুর গ্রামের অবস্থা খারাপ হয়ে যায়। তখন বিদ্যাব্যবসায়ী লালা অমানত রায় নিজের গ্রাম ত্যাগ ক'রে দিল্লীতে যান। তাঁর আসবার আগেই তাঁর বিদ্যার খ্যাতি সেখানে পৌঁছেছিল। তাঁর বিদ্যার খ্যাতি শুনে নবাব আমজদ আলী সাহেব তাঁকে একটি চাকরি করে দেন। কিছুকাল পরে নবাবের মৃত্যু হ'লে, তাঁর ভগ্নী রহীমুন্নিসা তাঁকে যথেষ্ট অর্থ-সাহায্য করেন। লালা অমানতরায় প্রথমে হিন্দুদের অপর ধর্ম্মগ্রন্থ "শ্রীমদ্‌ভাগবত" ফারসীতে অনুবাদ করেন। সাধারণের নিকট এটির উপযুক্ত আদর হ'লে পর ১৭৫৪ খৃষ্টাব্দে তিনি ফারসীতে রামায়ণ অনুবাদ করেন। তাঁর অনুবাদ ফারসী পদ্যেই হয়েছিল। এ অনুবাদ এত সুন্দর ও অনবদ্য যে, অনেকে এটিকে ফিরদৌসীর মহাকাব্য শাহনামার সঙ্গে তুলনা করেন। এ অপূর্ব্ব বইখানিও নবলকিশোর প্রেস থেকে ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে ছাপা হয়েচে। এটিতে ২৭৮ পৃষ্ঠা আছে।

রামায়ণের আর একখানি ফারসী অনুবাদ আছে। এটির লেখক লাহোরের বিখ্যাত পণ্ডিত বেলীরাম মিশ্রের পুত্র পণ্ডিত রামদাস। তিনি ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে রামায়ণের ফারসী অনুবাদ করেন। এটি এখনও মুদ্রিত হয়নি।

এগুলি ছাড়া ভারতবর্ষের বিভিন্ন পুস্তকালয়ে হয়ত আরও রামায়ণের ফারসী অনুবাদ আছে। কোনদিন হয়ত কৌতূহলী পাঠকের চেষ্টায় সেগুলির খবর আমরা জানতে পারব।

অপরাজিত

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

২৬

ফাল্গুন মাস। কলিকাতায় সুন্দর দক্ষিণ হাওয়া বহিতেছে, সকালে একটু শীতও, বোর্ডিঙের বারান্দাতে অপু বিছানা পাতিয়া শুইয়াছিল। খুব ভোরে ঘুম ভাঙিয়া উঠিয়াই মনে হইল আজ সমস্ত সময় তার নিজের, তাহা লইয়া সে যাহা খুশী করিতে পারে—আজ সে মুক্ত। ওই আকাশের ক্রমবিলীয়মান নক্ষত্রটার মতই দূর পথের পথিক—অজানার উদ্দেশে সে যাত্রার আরম্ভ হয়ত আজই হয়, কি কালই হয়। আর কাহারও মনস্তুষ্টি করিয়া চলিতে হইবে না।

বিছানা হইতে উঠিয়া নাপিত ডাকাইয়া কামাইল, ফর্সা কাপড় পরিল। পুরাতন সৌখীনতা আবার মাথা চাড়া দিয়া উঠার দরুণ দরজীর দোকানে একটা মটকার পাঞ্জাবী তৈয়ারী করিতে দিয়াছিল, সেটা নিজে গিয়া লইয়া আসিল। ভাবিল একবার ইম্পিরীয়াল লাইব্রেরীতে গিয়ে দেখে আসি নতুন বই কি এসেচে, আবার কতদিনে কল্‌কাতায় ফিরি, কে জানে?

যাইবার আগে একবার পরিচিত বন্ধুদের সহিত দেখা করিতে বাহির হইয়া বৈকালে সে সেই কবিরাজ বন্ধুটির দোকানে গেল। দোকানে তাহার দেখা পাওয়া গেল না, উড়িয়া ছোকরা চাকরকে দিয়া খবর পাঠাইয়া পরে সে বাসার মধ্যে ঢুকিল।

সেই খোলার-বাড়ির সেই বাড়িটাই আছে। সঙ্কীর্ণ উঠানের একপাশে দুখানা বেলেপাথরের শিল পাতা। বন্ধুটি নোড়া দিয়া কি পিষিতেছে, পাশে বড় একখানা খবরের কাগজের উপর একরাশ ধূসর রঙের গুঁড়া। সারা উঠান জুড়িয়া কুলায় ডালায় নানা শিকড়-বাকড় রৌদ্রে শুকাইতে দেওয়া হইয়াছে।

বন্ধু হাসিয়া বলিল, এস এস, তারপর এতদিন কোথায় ছিলে? কিছু মনে করো না ভাই খারাপ হাত, মাজন তৈরী করছি—এই দ্যাখো না ছাপানো লেবেল—চন্দ্রমুখী মাজন, মহিলা হোম ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল সিণ্ডিকেট—আজকাল মেয়েদের নামে না দিলে পাব্‌লিকের সিম্প্যাথি পাওয়া না, তাই ওই নাম দিয়েচি। বসো বসো···ওগো, বার হয়ে এস না। অপূর্ব্ব এসেছে, একটু চা-টা কর।

অপু হাসিয়া বলিল, সিণ্ডিকেটের সভ্য তো দেখচি আপাতত মোটে দুজন—তুমি আর তোমার স্ত্রী, এবং খুব যে য়্যাক্টিভ্ সভ্য তাও বুঝচি।

হাসিমুখে বন্ধু-পত্নী বাহির হইয়া আসিলেন, তাঁহার অবস্থা দেখিয়া অপুর মনে হইল অন্য শিলখানাতে তিনিও কিছুপূর্ব্বে মাজন-পেষা-কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। তাহার আসিবার সংবাদ পাইয়াই শিল ছাড়িয়া ঘরের মধ্যে পলাইয়াছিলেন। হাতে মুখে গুঁড়া ধুইয়া ফেলিয়া সভ্যভব্য হইয়া বাহির হইলেও মাথার এলোমেলো উড়ন্ত চুলে ও কপালের পাশের ঘামে সে-কথা জানাইয়া দেয়।

বন্ধু বলিল—কি করি বল ভাই, দিনকাল যা পড়েচে, পাওনাদারের কাছে দুবেলা অপমান হচ্চি,ছোট আদালতে নালিশ করে দোকানের ক্যাশবাক্স শীল্ করে রেখেচে। দিন একটা টাকা খরচ—বাসায় কোনোদিন খাওয়া হয়, কোনোদিন—

বন্ধু-পত্নী বাধা দিয়া বলিলেন, তুমি ও কাঁদুনি গেয়ো অন্য সময়। এখন উনি এলেন এতদিন পরে, একটু চা খাবেন, ঠাণ্ডা হবেন, তা না তোমার কাঁদুনি সুরু হল।

—আহা, আমি কি পথের লোককে ধরে বলতে যাই? ও আমার ক্লাসফ্রেণ্ড্, ওদের কাছে দুঃখের কথাটা বললেও—ইয়ে, পাতা চাএর প্যাকেট একটা খুলে নাও না? আটা আছে না-কি? আর দ্যাখো না হয় ওকে খান চারেক রুটি অন্তত—

—আচ্ছা, সে ভাবনা তোমায় ভাবতে হবে না। পরে অপুর দিকে চাহিয়া হাসিয়া বলিলেন—আপনি সেই বিজয়া দশমীর পরে আর একদিনও এলেন না যে বড়?

চা ও পরোটা খাইতে খাইতে অপু নিজের কথা সব বলিল,—শীঘ্রই বাহিরে যাইতেছে, সেকথাটাও বলিল।

বন্ধু বলিল তবেই দ্যাখো ভাই, তবু তুমি একা আর আমি স্ত্রী-পুত্র নিয়ে এই কলকাতা শহরের মধ্যে আজ পাঁচ পাঁচটি বছর যে কি ক'রে দিন কাটাচ্ছি তা আর—এই দ্যাখো 'মহিলা হোম ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল্ সিণ্ডিকেটে'র বড় লেবেল—রংটা কেমন?···এই সব নিয়ে একরকম চালাই, পয়সা প্যাকেট চা আছে, খদিরাদি মোদক আছে। দাঁতের মাজনটা করচি, ভাবচি একটা মাথার তেল কর্‌ব এবার, বোতল-পিছু দশ পয়সা ফেলে ঝেলে। মাজনের লাভ মন্দ না, কিন্তু কি জান, এই কৌটোটা পড়ে যায় দেড় পয়সার ওপর, মাজনে, লেবেলে, ক্যাপস্যুলে তাও প্রায় দু পয়সা—অথচ দাম মোটে চার পয়সা। তোমার কাছে আর লুকিয়ে কি কর্‌ব, স্বামী-স্ত্রীতে খাটি, কিন্তু মজুরী পোষায় কই? তবুও ত দোকানীর কমিশন ধরিনি হিসেবের মধ্যে। এদিকে চারপয়সার বেশী দাম করলে কম্‌পিট করতে পারব না।

খানিক পরে বন্ধু বলিল,—ওহে তোমার বৌঠাক্‌রুণ বল্‌চেন, আমাদের ত একটা খাওয়া পাওনা আছে, এবার সেটা হয়ে যাক্ না কেন?···বেশ একটা ফেয়ার-ওয়েল ফিষ্ট হয়ে যাবে এখন, তবে উল্টো, এই যা—

অপু মনে মনে ভারি কৃতজ্ঞ হইয়া উঠিল বন্ধু-পত্নীর প্রতি। ইহাদের মলিন বেশ ও ছেলেমেয়েগুলির শীর্ণ চেহারা হইতে ইহাদের ইতিহাস সে ভালই বুঝিয়াছিল। কিছু ভাল খাবার আনাইয়া খাওয়ানো, একটু আমোদ আহ্লাদ করা। কিন্তু হয়ত সেটা দরিদ্র সংসারে সাহায্যের মত দেখাইবে। যদি ইহারা না লয় বা মনে কিছু ভাবে?···ও পক্ষ হইতে প্রস্তাবটা আসাতে সে ভারী খুশী হইল।

—বেশ, বেশ, এ আর এমন একটা কথা কি?··· কালই হবে তবে তুমি একটা কাজ করো, বৌঠাক্‌রুণের কাছ থেকে জেনে এসো কি কি লাগবে—আমার ত কোনো ধারণাই নেই ও বিষয়ে—

ভোজের আয়োজনে ছ-সাত টাকা ব্যয় করিয়া অপু বন্ধুর সঙ্গে ঘুরিয়া বাজার করিল। কই-মাছ, গল্‌দা চিংড়ি, ডিম, কপি, আলু, ছানা, দই, সন্দেশ।

হয়ত খুব বড় ধরণের কিছু ভোজ নয়, কিন্তু বন্ধু-

পত্নীর আদরে হাসিমুখে তাহা এত মধুর হইয়া উঠিল, এমন কি-এক সময়ে অপুর মনে হইল আসলে তাহাকে খাওয়ানোর জন্যই বন্ধু-পত্নীর এ ছল।

অপুর চোখে জল আসিল, লোকে ইষ্টদেবতাকেও এত যত্ন করে না বোধ হয়। পিছনে সব সময় বন্ধুর বৌটি পাখা হাতে বসিয়া তাহাদের বাতাস করিতেছিল অপু হাত উঠাইতেই সে হাসিমুখে বলিল, ও হবে না, আপনি আর একটু ছানার ডালনা নিন্—ও কি মোচার চপ পাতে রাখলেন কার জন্যে? সে শুনব না—

এই সময় একটি পনর-ষোল বছরের ছেলে উঠানে আসিয়া দাঁড়াইল। বন্ধু বলিল, এসো, এসো কুঞ্জ, এসো বাবা, এইটি আমার শালীর ছেলে, বাগবাজারে থাকে। আমার সে ভায়রা-ভাই মারা গেচে গত শ্রাবণ মাসে। পাটের প্রেসে কাজ করত, গঙ্গার ঘাটের রেল লাইন পেরিয়ে আসতে হয়। তা রোজই আসে, সেদিন একখানা মালগাড়ী দাঁড়িয়ে আছে। তা ভাবলে, আবার অতখানি ঘুরে যাব? যেমন গাড়ীর তলা দিয়ে গলে আসতে গিয়েচে আর অমনি গাড়ীখানা দিয়েচে ছেড়ে। তারপরে চাকায় কেটে-কুটে একেবারে আর কি—দুটি মেয়ে, আমার শালী আর এই ছেলেটি, এক রকম করে বন্ধু-বান্ধবের সাহায্যে চল্‌চে। উপায় কি?...তাই আজ ভাল খাওয়াটা আছে, কাল স্ত্রী বললে যাও, গিয়ে কুঞ্জকে বলে এস—ওরে ব'সে যা বাবা, থালা ন, থাকে পাতা একখানা পেতে। হাতমুখটা ধুয়ে আয় বাবা—এত দেরী করে ফেল্‌লি কেন?

বেলা বেশী ছিল না। খাওয়া-দাওয়ার পরে গল্প করিতে করিতে অনেক রাত হইয়া গেল। অপু বলিল, আচ্ছা, আজ উঠি ভাই, বেশ আনন্দ হ'ল আজ অনেকদিন পরে—

বন্ধু বলিল, ওগো, অপূর্ব্বকে আলোটা ধরে গলির মুখটা পার করে দাও ত? আমি আর উঠতে পারি নে—

একটা ছোট্ট কেরোসিনের টেমি হাতে বৌটি অপুর পিছনে পিছনে চলিল।

অপু বলিল, থাক্, বৌঠাক্‌রুণ, আর এগোবেন না, এমন আর কি অন্ধকার, যান আপনি—

—আবার কবে আস্‌বেন?

—ঠিক নেই, এখন একটা লম্বা পাড়ি ত দি—

—কেন একটা বিয়ে থা করুন না?...পথে পথে সন্নিসি হয়ে এ রকম বেড়ানো কি ভাল?...মাও ত নেই শুনেচি। কবে যাবেন আপনি?...যাবার আগে একবার আস্‌বেন না, যদি পারেন।

—তা বোধ হয় হয়ে উঠবে না, বৌঠাক্‌রুণ। ফিরি যদি আবার তখন বরং—আচ্ছা, নমস্কার।

বৌটি টেমি হাতে গলির মুখে দাঁড়াইয়া রহিল।

*　　　*　　　*

পরদিন সে সকালে উঠিয়া ভাবিয়া দেখিল হাতের পয়সা নানারকমে উড়িয়া যাইতেছে, আর কিছুদিন দেরী করিলে যাওয়াই হইবে না। এখানেই আবার চাকুরীর উমেদার হইয়া দোরে দোরে ঘুরিতে হইবে। কিন্তু আকাশ-পাতাল ভাবিয়াও কিছু ঠিক হইল না। একবার মনে হয় এটা ভাল, এ আবার মনে হয় ওটা ভাল। অবশেষে স্থির করিল ষ্টেশনে গিয়া সম্মুখে যাহা পাওয়া যাইবে, তাহাতেই ওঠা যাইবে। জিনিষ-পত্র বাঁধিয়া গুছাইয়া হাওড়ার ষ্টেশনে গিয়া দেখিল আর মিনিট পনেরো পরে চার নম্বর প্ল্যাটফর্ম্ম হইতে গয়া প্যাসেঞ্জার ছাড়িতেছে। একখানা থার্ড ক্লাসের টিকিট কিনিয়া সোজা ট্রেনে উঠিয়া জানালার ধারের একটা জায়গায় সে নিজের বিছানাটি পাতিয়া বসিল।

অপু কি জানিত এই যাত্রা তাহাকে কোন্ পথে চালিত করিয়া লইয়া চলিয়াছে? এই চারটা বিশ মিনিটের গয়া প্যাসেঞ্জার—পরবর্ত্তী জীবনে সে ভাবিবে যে সে তো পাজি দেখিয়া যাত্রা সুরু করে নাই, কিন্তু কোন্ মহাশুভ মাহেন্দ্রক্ষণে সে হাওড়া ষ্টেশনের থার্ড ক্লাস টিকিট-ঘরের ঘুলঘুলিতে ফিরিঙ্গি মেয়ের কাছে গিয়া একখানা টিকিট চাহিয়াছিল—দশটাকার একখানা নোট্ দিয়া সাড়ে পাঁচটাকা ফেরৎ পাইয়াছিল! মানুষ যদি তাহার ভবিষ্যৎ জানিতে পারিত!

অপু বর্ত্তমানে এসব কিছুই ভাবিতেছিল না। এত বয়স হইল, কখন সে গ্র্যাণ্ড কর্ড লাইনে বেড়ায় নাই,

সেই ছেলেবেলায় দু'টি বার ছাড়া ঈষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলেও আর কখনও চড়ে নাই, রেলে চড়িয়া দূরদেশে যাওয়ার আনন্দে সে ছেলেমানুষের মতই উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছিল।

পরদিন বৈকালে গয়া। রাস্তার ধারে গাছপালা ক্রমশ কিরূপ বদ্‌লাইয়া যায়, লক্ষ্য করিবার ইচ্ছা অনেকদিন হইতে তাহার আছে কাল বৈকালে বর্দ্ধমান পর্য্যন্ত কতক চোখে দেখিতে দেখিতে আসিয়াছিল, কিন্তু তাহার পরই অন্ধকার হইয়া যায়। বড় হইয়া এই প্রথম পাহাড় দেখিল—পরেশনাথ পাহাড়টা কত বড়! উঃ! গয়ায় নামিয়া সে বিষ্ণুপদমন্দিরে পিণ্ড দিল। ভাবিল, আমি এসব মানি, বা না-মানি, কিন্তু সবটুকু তো জানিনে? যদি কিছু থাকে, বাপমায়ের উপকারে যদি লাগে! পিণ্ড দিবার সময়ে কি জানি কেন চোখে জল আসিল, ভাবিয়া ভাবিয়া ছেলেবেলায় বা পরে যে যেখানে মারা গিয়াছে বলিয়া জানা ছিল তাহাদের সকলেরই উদ্দেশে পিণ্ড দিল। এমন কি, পিসিমা ইন্দির ঠাকুরুণকে সে মনে করিতে না পারিলেও দিদির মুখে শুনিয়াছে, তাঁর উদ্দেশে—আতুরী ডাইনি বুড়ীর উদ্দেশে।

বৈকালে বুদ্ধগয়া দেখিতে গেল। অপুর যদি কাহারও উপর শ্রদ্ধা থাকে তবে তাহার আবাল্য শ্রদ্ধা এই সত্যদ্রষ্টা মহাসন্ন্যাসীর উপর। ছেলের নাম তাই সে রাখিয়াছে অমিতাভ।

বামে ক্ষীণস্রোতা ফল্গু কটা রঙের বালুশয্যায় ক্লান্ত দেহ এলাইয়া দিয়াছে, ওপারে হাজারীবাগ জেলার সীমান্তবর্ত্তী পাহাড়শ্রেণী, সারাপথে ভারী সুন্দর ছায়া, গাছপালা, পাখীর ডাক, ঠিক যেন বাংলাদেশ। সোজা বাঁধানো রাস্তাটি ফল্গুর ধারে ধারে ডালপালার ছায়ায় ছায়ায় চলিয়াছে, সারাপথ অপু স্বপ্নাভিভূতের মত একার উপর বসিয়া রহিল। একজন হালফ্যাসানে কাপড়-পরা তরুণী মহিলা ও সম্ভবত তাঁহার স্বামী মোটরে বুদ্ধগয়া হইতে ফিরিতেছেন, অপু ভাবিল হাজার হাজার বছর পরেও এ কোন্ নূতন যুগের ছেলেমেয়ে—প্রাচীনকালের সেই পীঠস্থানটি এখনও সাগ্রহে দেখিতে আসিয়াছিল? মনে পড়ে সেই অপূর্ব্ব রাত্রি, নবজাত শিশুর চাঁদমুখ···ছন্দক···গয়ার জঙ্গলে দিনের পর দিন সে কি কঠোর তপস্যা। কিন্তু এ মোটর গাড়ী? শতাব্দীর ঘন অরণ্য পার হইয়া এমন একদিন নামিয়াছে পৃথিবীতে, পুরাতনের সবই চূর্ণ করিয়া, উন্টাইয়া পাল্টাইয়া নবযুগের পত্তন করিয়াছে। রাজা শুদ্ধোদনের কপিলাবাস্তু মহাকালের স্রোতের মুখে ফেনার ফুলের মত কোথায় ভাসিয়া গিয়াছে। কোনো চিহ্নও রাখিয়া যায় নাই। কিন্তু তাঁহার দিগ্বিজয়ী পুত্র দিকে দিকে যে বৃহত্তর কপিলাবস্তুর অদৃশ্য সিংহাসন প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন—আর প্রভুত্বের নিকট এই আড়াই হাজার বৎসর পরেও কে না মাথা নত করিবে?

গয়া হইতে পরদিন সে দিল্লী এক্সপ্রেসে চাপিল—একেবারে দিল্লীর টিকিট কাটিয়া। গাড়ীতে বেজায় ভিড়। সৌভাগ্যের বিষয় সাসারামে কয়েকজন লোক নামিয়া যাওয়াতে এককোণে বেশ জায়গা হইল। পাশের বেঞ্চিতেই একজন বাঙালী ভদ্রলোক তাঁহার স্ত্রীও গুটি-দুই ছেলেমেয়ে লইয়া যাইতেছিলেন। কথায় কথায় ভদ্র-লোকটির সঙ্গে আলাপ হইয়া গেল। গাড়ীতে আর কোনো বাঙালী নাই, কথাবার্ত্তার সঙ্গী পাইয়া তিনি খুব খুশী। অপুর কিন্তু বেশী কথাবার্ত্তা ভাল লাগিতেছিল না। এত আনন্দ জীবনে কবে পাইয়াছিল মনে ত হয় না। এরা এ-সময় এত বক্‌বক্ করে কেন? মাড়োয়ারী দুটি ত সাসারাম হইতে নিজেদের মধ্যে বকুনি সুরু করিয়াছে, মুখের আর বিরাম নাই।

খুশীভরা, উৎসুক, ব্যগ্র মনে সে প্রত্যেক পাথরের নুড়িটি গাছপালাটি লক্ষ্য করিয়া চলিয়াছিল। বামদিকের পাহাড়শ্রেণীর পিছনে সূর্য্য অস্ত গেল, সারাদিন আকাশটা লাল হইয়া আছে, আনন্দের আবেগে সে দ্রুতগামী গাড়ীর দরজা খুলিয়া দরজার হাতল ধরিয়া দাঁড়াইতেই ভদ্রলোকটি বলিয়া উঠিলেন, উঁহু, পড়ে যাবেন, পাদানীতে স্লিপ্ করলেই—বন্ধ করুন মশাই।

অপু হাসিয়া বলিল, বেশ লাগে কিন্তু, মনে হয় যেন উড়ে যা'চ্ছি।

গাছপালা, খাল, নদী, পাহাড়, কাঁকর ভরা জমি,

গোটা শাহাবাদ জেলাটা তাহার পায়ের তলা দিয়া পালাইতেছে

অনেকদূর পর্য্যন্ত শোণ নদের বালুর চড়া জ্যোৎস্নায় অদ্ভুত দেখাইতেছে। নীল নদ? ঠিক এটা যেন নীল নদ। ওপারে সাত আট মাইল গাধার পিঠে চড়িয়া গেলে ফ্যারাও রামেসিসের তৈরি আবু সিম্বেলের বিরাট পাষাণ মন্দির—ধূসর অস্পষ্ট কুয়াসায় ঘেরা মরুভূমির মধ্যে অতীতকালের বিস্মৃত দেবদেবীর মন্দির এপিস্, আইসিস, হোরাস, হাথর, রা···নীলনদ যেমন গতির মুখে উপলখণ্ড পাশে ঠেলিয়া ফেলিয়া রাখিয়া পলাইয়া চলে—মহাকালের বিরাট রথচক্র তাণ্ডব-নৃত্যছন্দে সব স্থাবর জিনিষকে পিছু ফেলিয়া মহাবেগে চলিবার সময় এই বিরাট গ্র্যানিট মন্দিরকে পথের পাশে ফেলিয়া রাখিয়া চলিয়া গিয়াছে জনহীন মরুভূমির মধ্যে বিস্মৃত সভ্যতার চিহ্ন মন্দিরটা, কোন বিস্মৃত ও বাতিল দেবদেবীর উদ্দেশ্যে গঠিত ও উৎসর্গীকৃত।

একটু রাত্রে ভদ্রলোকটি বলিলেন, এ লাইনে ভাল খাবার পাবেন না, আমার সঙ্গে খাবার আছে, আসুন খাওয়া যাক।

তাঁহার স্ত্রী কলার পাতা চিরিয়া সকলকে বেঞ্চির উপর পাতিয়া দিলেন—লুচি, হালুয়া, ও সন্দেশ,—সকলকে পরিবেশন করিলেন। ভদ্রলোকটি বলিলেন, আপনি খানকতক বেশী লুচি নিন্, আমরা তো আজ মোগল-সরাই-এ ব্রেক্‌জার্নি করব, আপনি তো সোজা দিল্লী চলেছেন!

এ-ও অপুর এক অভিজ্ঞতা। পথে বাহির হইলে এত শীঘ্রও এমন ঘনিষ্ঠতা হয়! এক গলির মধ্যে শহরে শত বৎ বাস করিলেও তো তাহা হয় না? ভদ্রলোকটি নিজের পরিচয় দিলেন, নাগপুরের কাছে কোন্ গবর্ণমেণ্ট রিজার্ভ ফরেষ্ট্-এ কাজ করেন,ছুটী লইয়া কালীঘাটে শ্বশুর-বাড়ী আসিয়াছিলেন, ছুটী অন্তে কর্ম্মস্থানে চলিয়াছেন। অপুকে ঠিকানা দিলেন, অপু বন ভালবাসে, তাহার মুখে শুনিয়া বার বার অনুরোধ করিলেন সে যেন দিল্লী হইতে ফিরিবার পথে একবার অতি অবশ্য অবশ্য যায়, বাঙালীর মুখ মোটে দেখিতে পান না—অপু গেলে তাঁহারা তো কথা কহিয়া বাঁচেন। মোগলসরাই-এ গাড়ী দাঁড়াইল। অপু মালপত্র নামাইতে সাহায্য করিল। ছেলেমেয়ে দুটির হাত ধরিয়া নামাইয়া দিল। হাসিয়া বলিল—আচ্ছা বৌঠাকরুণ, নমস্কার, শীগ্‌গীরই আপনাদের ওখানে উপদ্রব করচি কিন্তু।

২১

দিল্লীতে ট্রেন পৌছাইল রাত্রি সাড়ে এগারটায়।

গাজিয়াবাদ ষ্টেশন হইতেই সে বাহিরের দিকে ঝুঁকিয়া চাহিয়া রহিল—যে-দিল্লীতে গাড়ী আসিতেছিল তাহা এস্ কপূর কোম্পানীর দিল্লী নয়, লেজিসলেটিভ্ য়্যাসাম্‌ব্লীর মেম্বারদের দিল্লী নয়,এসিয়াটিক পেট্রোলিয়মের এজেন্টের দিল্লী নয়—সে দিল্লী সম্পূর্ণ ভিন্ন,—বহুকালের বহুযুগের নর-নারীদের—মহাভারত হইতে সুরু করিয়া রাজসিংহ ও মাধবীকঙ্কণ—সমুদয় কবিতা, উপন্যাস, গল্প, নাটক, কল্পনা ও ইতিহাসের মালমশলায় তার প্রতি ইট্‌খানা তৈরি, তার প্রতি ধূলিকণা অপুর মনের রোমান্সের সকল নায়কনায়িকার পুণ্যপাদপূত--ভীষ্ম হইতে আওরঙ্গজেব ও সদাশিব রাও পর্য্যন্ত—গান্ধারী হইতে জাহানারা পর্য্যন্ত—সাধারণ দিল্লী হইতে সে দিল্লীর দূরত্ব অনেক—দিল্লী হানোজ দূর অস্ত, বহুদূর—বহুশতাব্দীর দূর পারে, সে দিল্লী কখনও কেহ দেখে নাই।

আজ নয়, মনে হয় শৈশবে মায়ের মুখে মহাভারত শোনার দিনগুলি হইতে, ছিরের পুকুরের ধারের বাঁশবনের ছায়ায় কাচা শেওড়ার ডাল পাতিয়া রাজপুত জীবন সন্ধ্যা ও মহারাষ্ট্র জীবনপ্রভাত পড়িবার দিনগুলি হইতে, সকল ইতিহাস, যাত্রা, থিয়েটার, কত গল্প, কত কবিতা এই দিল্লী আগ্রা, সমগ্র রাজপুতানা ও আর্য্যাবর্ত্ত—তাহার মনে একটি অতি অপরূপ, অভিনব, স্বপ্নময় আসন অধিকার করিয়া আছে—অন্য কাহারও মনে সে রকম আছে কি-না, সেটা প্রশ্ন নয়, তাহার মনে আছে এইটাই বড় কথা।

কিন্তু বাহিরে ঘন অন্ধকার, কিছু দেখা যায় না—অনেকক্ষণ চাহিয়া কেবল কতকগুলা, সিগ্‌ন্যালের বাতি

ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়ে না একটা প্রকাণ্ড ইয়ার্ড কেবিন লেখা আছে 'দিল্লী জংশন ঈষ্ট'—একটা গ্যাসোলিনের ট্যাঙ্ক—তাহার পরই চারিদিকে আলোকিত প্ল্যাটফর্ম্ম—প্রকাণ্ড দোতলা ষ্টেশন—পিয়ার্স সোপ, কিটিংস পাউডার, হল্‌স্‌ ডিস্‌টেম্পার, লিপটনের চা। আবদুল আজিজ হাকিমের রৌশনে-সেকাৎ, উৎকৃষ্ট দাদের মলম।

নিজের ছোট ক্যান্‌ভাসের সুটকেস ও ছোট বিছানাটা হাতে লইয়া অপু ষ্টেশনে নামিল—রাত অনেক, শহর সম্পূর্ণ অপরিচিত, জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল, ওয়েটিংরুম দোতলায়, রাত্রি সেখানে কাটানোই নিরাপদ মনে হইল।

সকালে উঠিয়া জিনিষপত্র ষ্টেশনে জমা দিয়া সে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। অর্দ্ধমাইল ব্যাপী দীর্ঘ শোভাযাত্রা করিয়া সুসজ্জিত হস্তীপৃষ্ঠে সোনার হাওদায় কোনো শাহাজাদী নগরভ্রমণে বাহির হইয়াছেন কি? দু'ধারে আবেদনকারী ও ওমরাহদল আভূমি তসলীম্‌ করিয়া অনুগ্রহভিক্ষার অপেক্ষায় করজোড়ে খাড়া আছে কি?

এ যে একেবারে—এমন কি মণিলাল জুয়েলার্সের বিজ্ঞাপন পর্য্যন্ত। দুজন লোক কলিকাতা হইতে বেড়াইতে আসিয়াছিল, টঙাভাড়া সস্তা পড়িবে বলিয়া তাহাকে তাহারা সঙ্গে লইবার প্রস্তাব করিল। কুতবের পথে একজন বলিল, মশাই, আরও বার দুই দিল্লী এসেচি, কুতবের মুরগীর কাট্‌লেট্‌ খান্‌ নি কখনও? না? আঃ—সে যা জিনিষ, চলুন এক ডজন কাট্‌লেটের অর্ডার দিয়ে তবে উঠ্‌ব কুতুব মিনারে।

বাল্যকালে দেওয়ানপুরে পড়িবার সময় পুরাণো দিল্লীর কথা পড়িয়া তাহার বন্দনা করিতে গিয়া বার বার স্কুলের পাশের একটা পুরাতন ইট্‌খোলার ছবি অপুর মনে উদয় হইত, আজ অপু দেখিল পুরাতন দিল্লী বাল্যের সে ইটের পাঁজাটা নয়। কুতব মিনার নতুন দিল্লী শহর হইতে যে এতদূর তাহা সে ভাবে নাই। তদুপরি সে দেখিয়া বিস্মিত হইল এই দীর্ঘ পথের দুধারে, মরুভূমির মত অনুর্ব্বর, কাঁটাগাছ ও ফণিমনসার ঝোপে ভরা রৌদ্রদগ্ধ প্রান্তরের এখানে ওখানে সর্ব্বত্র ভাঙ্গাবাড়ী, মীনার, মসজিদ, কবর, খিলান, দেওয়াল। সাতটা প্রাচীন, মৃত রাজধানীর মূক কঙ্কাল পথের দুধারে উঁচুনীচু জমিতে, বাবলাগাছ ও ক্যাক্‌টাস গাছের ঝোপঝাপের আড়ালে হৃতগৌরব নিস্তব্ধতায় আত্মগোপন করিয়া আছে—পৃথ্বীরায় পিথোরার দিল্লী, লালকোট্‌, দাসবংশের দিল্লী, তোগলকদের দিল্লী আলাউদ্দিন খিলিজীর দিল্লী, শিরি ও জাহানপনাহ., মোগলদের দিল্লী। অপু জীবনে এ রকম দৃশ্য দেখে নাই, কখন কল্পনাও করে নাই, সে অবাক্‌ হইল, অভিভূত হইল, নীরব হইয়া গেল, গাইড্‌-বুক উল্টাইতে ভুলিয়া গেল, ম্যাপের নম্বর মিলাইয়া দেখিতে ভুলিয়া গেল—মহাকালের এই বিরাট শোভাযাত্রা একটার পর একটা বায়োস্কোপের ছবির মত চলিয়া যাইবার দৃশ্যে সে যেন সম্বিৎহারা হইয়া পড়িল। আরও বিশেষ হইল এইজন্য যে, মন তাহার নবীন আছে কখনও কিছু দেখে নাই, চিরকাল আঁস্তাকুড়ের আবর্জ্জনায় কাটাইয়াছে অথচ মন হইয়া উঠিয়াছে সর্ব্বগ্রাসী, বুভুক্ষু। তাই সে যাহা দেখিতেছিল, তাহা যেন বাহিরের চোখটা দিয়া নয়, সে কোন্‌ তীক্ষ্ণদর্শী তৃতীয় নেত্র, যেটা না খুলিলে বাহিরের চোখের দেখাটা নিষ্ফল হইয়া যায়।

ঘুরিতে ঘুরিতে দুপুরের পর সে গেল কুতব হইতে অনেকদূরে গিয়াসুদ্দীন তোগলকের অসমাপ্ত নগর—তোগলকাবাদে। গ্রীষ্ম দুপুরের খররৌদ্রে তখন চারিধারের উষরভূমি আগুন-রাঙা হইয়া উঠিয়াছে। দূর হইতে তোগলকাবাদ দেখিয়া মনে হইল যেন কোনো দৈত্যের হাতে গাঁথা এক বিরাট পাষাণ দুর্গ! তৃণ-বিরল উষরভূমি, পত্রহীন বাবলা গাছ ও কণ্টকময় ক্যাক্‌টাসের পটভূমিতে খররৌদ্রে সে যেন এক বর্ব্বর অসুরবীর্য্য সু-উচ্চ পাষাণ দুর্গপ্রাচীর হইতে সিন্ধু, কাথিয়াবাড়, মালব, পঞ্জাব,—সারা আর্য্যাবর্ত্তকে ভ্রূকুটি করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। কোথাও সূক্ষ্ম কারুকার্য্যের প্রচেষ্টা নাই, বটে, নিষ্ঠুর বটে, রুক্ষ বটে কিন্তু সবটা মিলিয়া এমন বিশালতার সৌন্দর্য্য, পৌরুষের সৌন্দর্য্য,

বর্ব্বরতার সৌন্দর্য্য—যা মনকে ভীষণভাবে আকৃষ্ট করে, হৃদয়কে বজ্রমুষ্টিতে আঁকড়াইয়া ধরে। সব আছে, কিন্তু দেহে প্রাণ নাই, চারিধারে ধ্বংসস্তূপ, কাঁটাগাছ, বিশৃঙ্খলতা, বড় বড় পাথর গড়াইয়া উঠিবার পথ বুজাইয়া রাখিয়াছে মৃতমুখের ভ্রূকুটি মাত্র।

সাধু নিজামউদ্দিনের অভিশাপ মনে পড়িল—ইয়ে বসে গুজর্, ইয়ে রাহে গুজর্—

পৃথুরায়ের দুর্গের চবুতরার উপর যখন সে দাঁড়াইয়া—হি হি, কি মুস্কিল, কি অদ্ভুতভাবে নিশ্চিন্দিপুরের সেই বনের ধারের ছিরে পুকুরটা এ দুর্গের সঙ্গে জড়িত হইয়া আছে, বাল্যে তাহারই ধারের শ্যাওড়াবনে বসিয়া 'জীবন প্রভাত' পড়িতে পড়িতে কতবার কল্পনা করিত পৃথুরায়ের দুর্গ ছিরে পুকুরের উঁচু ওদিকের পাড়টার মত বুঝি!...এখনও ছবিটা দেখিতে পাইতেছে—কতকগুলি গুগ্‌লি শামুক, ও-পারের বাঁশঝাড় যাক্—চবুতরার উপর দাঁড়াইয়া থাকিতে থাকিতে দূর পশ্চিম আকাশে চারিধারের মহাশ্মশানের উপর ধূসর ছায়া ফেলিয়া সাম্রাজ্যের পর সাম্রাজ্যের উত্থান-পতনের কাহিনী আকাশের পটে আগুনের অক্ষরে লিখিয়া সূর্য্য অস্ত গেল। যে সব অতি পবিত্র, গোপনীয় মুহূর্ত্ত অপুর জীবনের, দেবতা তখন কানে কানে কথা বলেন, তাহার জীবনে এরূপ সূর্য্যাস্ত আর ক'টা বা আসিয়াছে? ভয় ও বিস্ময় দুই-ই হইল, সারা গায়ে যেন কাঁটা দিয়া উঠিল, কি অপূর্ব্ব অনুভূতি! জীবনের চক্রবান নেমি এতদিন যে কত ছোট, অপরিসর ছিল, আজকার দিনটির পূর্ব্বে অপু তাহা জানিত না।

নিজামউদ্দিন আউলিয়ার মস্‌জিদ প্রাঙ্গণে সম্রাট-দুহিতা জাহানারার তৃনাবৃত পবিত্র কবরের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া মস্‌জিদ দ্বারে ক্রীত দু-চার পয়সার গোলাপফুল ছড়াইতে ছড়াইতে অপুর অশ্রু বাধা মানিল না। ঐশ্বর্য্যের মধ্যে, ক্ষমতার দম্ভের মধ্যে লালিত হইয়াও পুণ্যবতী শাহজাদীর এ দীনতা, ভাবুকতা, তাহার কল্পনাকে মুগ্ধ রাখিয়াছে চিরদিন। এখনও যেন বিশ্বাস হয় না যে, সে যেখানে দাঁড়াইয়া আছে সেটা সত্যই জাহানারার কবরভূমি। পরে সে মসজিদ হইতে একজন প্রৌঢ় মুসলমানকে ডাকিয়া আনিয়া কবরের শিরোদেশের মার্ব্বেল ফলকের সে বিখ্যাত ফার্সী কবিতাটি দেখাইয়া বলিল, মেহেরবানি করকে পড়িয়ে, হাম্‌নে লিখ্ লেঙ্গে।

প্রৌঢ়টি কিঞ্চিৎ বখ্‌শিষের লোভে খামখেয়ালী বাঙালীবাবুটিকে খুশী করার জন্য জোরে জোরে পড়িল—

বিজুস্ গ্যাহ্ কসে ন-পোশদ্ মজার-ইমা-রা।
কি কবরপোষ্-ই-ঘরীবান্ হামিন্ মী গ্যাহ্ বস্ অস্ত্॥

পরে সে কবি আমীর খসরুর কবরের উপরও ফুল ছড়াইল।

পরদিন বৈকালে শাহ্‌জাহানের লালপাথরের কেল্লা দেখিতে গিয়া অপরাহ্নের ধূসর ছায়ায় দেওয়ান-ই-খাসের পাশের খোলা ছাদে একখানা পাথরের বেঞ্চিতে বহুক্ষণ বসিয়া রহিল। মনে হইল এ-সব স্থানের জীবন-ধারার কাহিনী কেহ লিখিতে পারে নাই। গল্পে উপন্যাসে, নাটকে, কবিতায় যাহা পড়িয়াছে, সে সবটাই কল্পনা, বাস্তবের সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নাই। সে জেব্‌উন্নিসা, সে উদিপুরী বেগম, সে মমতাজমহল, সে জাহানারা—আবাল্য যাহাদের সঙ্গে পরিচয়, সবগুলিই কল্পনাসৃষ্ট প্রাণী, বাস্তবজগতের মম্‌তাজ বেগম, উদিপুরী, জেব্‌উন্নিসা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। কে জানে এখানকার সে-সব রহস্যভরা ইতিহাস? মূক্ যমুনা তার সাক্ষী আছে, গৃহভিত্তির প্রতি পাষাণখণ্ড তার সাক্ষী আছে, কিন্তু তাহারা ত কথা বলিতে পারে না?

শতাব্দীর পার হইতে পুরসুন্দরীরা প্রতি জ্যোৎস্না রাত্রে হয়ত আজও এখানে নিঃশব্দচরণে নামিয়া আসিয়া জলহীন নহরের পাশে বসিয়া রাত কাটায়, সকল কক্ষ, অলিন্দ, প্রকোষ্ঠ, গৃহতল হয়ত আজও তাদের অদৃশ্য আবির্ভাবে জ্যোতির্ম্ময় হইয়া উঠে—কে জানে?

*
* *

তিন দিন পরে সে বৈকালের দিকে কাটনী লাইনের একটা ছোট্ট ষ্টেশনে নিজের বিছানা ও সুটকেশটা লইয়া নামিয়া পড়িল। হাতে পয়সা বেশী ছিল না বলিয়া প্যাসেঞ্জার ট্রেনে এলাহাবাদ আসিতে বাধ্য হয়—তাই এত দেরী। কয়দিন স্নান হয় নাই, চুল রুক্ষ, উস্কখুস্কো—

জোর পশ্চিম বাতাসে ঠোঁট শুকাইয়া গিয়াছে। মুস্কিল এই যে, ফরেষ্ট-রেঞ্জার ভদ্রলোকটিকে কোনো পত্রাদি দেওয়া হয় নাই, এখানে গাড়ী বা ঘোড়া কিছু আসে নাই।

ট্রেন ছাড়িয়া চলিয়া গেল। ক্ষুদ্র ষ্টেশন, সম্মুখে একটা ছোট পাহাড়। দোকান বাজারও চোখে পড়িল না।

ষ্টেশনের বাহিরের বাঁধানো চাতালে একটু নির্জ্জন স্থানে সে বিছানার বাণ্ডিলটা খুলিয়া পাতিল। কিছুই ঠিক নাই, কোথায় যাইবে, কোথায় শুইবে, মনে এক অপূর্ব্ব অজানার আনন্দ।

সতরঞ্চির উপর বসিয়া সে খাতা খুলিয়া খানিকটা লিখিল, পরে একটা সিগারেট ধরাইয়া স্যুটকেশটা ঠেস দিয়া চুপচাপ বসিয়া রহিল। টোকামাথায় একজন গোঁড় যুবককে কাঁচা শালপাতার পাইপ খাইতে খাইতে কৌতূহলীচোখে কাছে আসিয়া দাঁড়াইতে দেখিয়া অপু বলিল, উমেরিয়া হিয়াঁসে কেত্তাদূর হোগা? প্রথমবার লোকটি কথা বুঝিল না। দ্বিতীয়বারে ভাঁঙা হিন্দীতে বলিল, তিশ মীল্।

ত্রিশ মাইল রাস্তা! এখন সে যায় কিসে? মহামুস্কিল! জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল, ত্রিশ মাইল পথের দুধারে শুধু বন আর পাহাড়। কথাটা শুনিয়া অপুর ভারী আনন্দ হইল। বন, কি রকম বন? খুব ঘন? বাঘ পর্য্যন্ত আছে! বাঃ—

কিন্তু এখন কি করিয়া যাওয়া যায়?

কথায় কথায় গোঁড় লোকটি বলিল, তিনটাকা পাইলে সে নিজের ঘোড়াটা ভারা দিতে রাজী আছে।

অপু রাজী হইয়া ঘোড়া আনিতে বলাতে লোকটা বিস্মিত হইল। আর বেলা কতটুকু আছে, এখন কি জঙ্গলের পথে খাওয়া যায়? অপু নাছোড়বান্দা। সামনের এই সুন্দর জ্যোৎস্নাভরা রাত্রে জঙ্গলের পথে ঘোড়ায় চাপিয়া যাওয়ার একটা দুর্দ্দমনীয় লোভ তাহাকে পাইয়া বসিল—জীবনে এ সুযোগ ক'টা আসে? এ কি ছাড়া যায়?

গোঁড় লোকটি জানাইল, আরও একটাকা খোরাকি পাইলে সে তল্পী বহিতে রাজী আছে। সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে অপু ঘোড়ায় চড়িয়া রওনা হইল—পিছনে মোট মাথায় লোকটা।

স্নিগ্ধ রাত্রি—ষ্টেশন থেকে অল্প দূরে একটা বস্তী, একটি পাহাড়ী নালা, বাঁক ঘুরিয়াই পথটা একটা শাল বনের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল। চারি ধারে জোনাকী পোকা জ্বলিতেছে—রাত্রির অপূর্ব্ব নিস্তব্ধতা, ত্রয়োদশীর চাঁদের আলো শালপলাশের পাতার ফাঁকে ফাঁকে মাটির উপর যেন আলো-আঁধারের বুটি-কাটা জাল বুনিয়া দিয়াছে। অপু পাহাড়ী লোকটার নিকট হইতে একটা শাল পাতার পাইপ ও সে দেশী তামাক চাহিয়া লইয়া ধরাইল বটে, কিন্তু দুটান দিতেই মাথা কেমন ঘুরিয়া উঠিল—কাঁচা শাল পাতার পাইপটা ফেলিয়া দিল।

বন সত্যই ঘন—পথ আঁকা-বাঁকা, ছোট ঝরণা এখানে ওখানে, উপল-বিছান পাহাড়ী নদীর তীরে ছোট ফার্ণের ঝোপ, কি ফুলের সুবাস, রাত্রিচর পাখীর ডাক। নির্জ্জনতা, গভীর নির্জ্জনতা!

মাঝে মাঝে সে ঘোড়াকে ছুটাইয়া দেয়, ঘোড়া-চড়া অভ্যাস তাহার অনেকদিন হইতে আছে। বাল্যকালে মাঠের ছুটা ঘোড়া ধরিয়া কত চড়িয়াছে, চাঁপদানীতেও ডাক্তার বাবুটির ঘোড়ায় সে প্রায় প্রতিদিনই চড়িত।

সারা রাত্রি চলিয়া সকাল সাড়ে সাতটায় উমেরিয়া পৌছিল। একটা ছোট গ্রাম,—পোষ্টাপিস, ছোট বাজার ও কয়েকটা গালার আড়ত।

ফরেষ্ট-রেঞ্জার ভদ্রলোকটির নাম অবনীমোহন বসু। তিনি তাহাকে দেখিয়া বিস্মিত হইলেন, বলিলেন—আসুন, আসুন, আপনি পত্র দিলেন না, কিছু না, ভাব্‌লুম বোধ হয় এখনও আসবার দেরী আছে—এতটা পথ এলেন রাতা-রাতি? ভয়ানক লোক তো আপনি!

পথেই একটা ছোট নদীর জলে স্নান করিয়া চুল আঁচ্‌ড়াইয়া সে ফিট্‌ফাট হইয়া আসিয়াছে। তখনই চা ও খাবারের বন্দোবস্ত হইল। অপু লোকটিকে নিজের মনিব্যাগ শূন্য করিয়া চারটা টাকা দিয়া বিদায় দিল।

দুপুরে আহারের সময় অবনীবাবুর স্ত্রী দুজনকে

পরিবেশন করিয়া খাওয়াইলেন। অপু হাসিমুখে বলিল, এখানে আপনাদের জ্বালাতন করতে এলুম বৌঠাকরুণ।

অবনীবাবুর স্ত্রী হাসিয়া বলিলেন, না এলে দুঃখিত হতাম—আমরা কিন্তু জানি আপনি আস্‌বেন। কাল ওঁকে বল্‌ছিলাম, আপনার আসবার কথা, এমন কি, আপনার থাক্‌বার জন্যে সাহেবের বাংলাটা ঝাঁট দিয়ে ধুয়ে রাখার কথাও হ'ল—ওটা এখন খালি পড়ে আছে কি না?

—এখানে আর কোনো বাঙালী কি অন্য কোনো দেশের শিক্ষিত লোক নিকটে নেই?

অবনীবাবু বলিলেন, আমার এক বন্ধু খুরিয়ার পাহাড়ে তামার খনির জন্যে প্রস্‌পেক্‌টিং করছেন—মিঃ রায়-চৌধুরী, জিওলজিষ্ট, বিলেতে ছিলেন অনেকদিন—তিনি ওখানে তাঁবুতে আছেন—মাঝে মাঝে তিনি আসেন।

অল্পদিনেই ইহাদের সঙ্গে কেমন একটা সহজ মধুর সম্বন্ধ গড়িয়া উঠিল—যাহা কেবল এই সব স্থানে, এই সব অবস্থাতেই সম্ভব, কৃত্রিম সামাজিকতার হুমকি এখানে মানুষের সঙ্গে মানুষের স্বাভাবিক বন্ধুত্বের দাবীকে ঘাড় গুঁজিয়া থাকিতে বাধ্য করে না বলিয়াই। একদিন বসিয়া বসিয়া সে খেয়ালের বশে কাগজে একটা কথকতার পালা লিখিয়া ফেলিল। সেদিন সকালে চা খাইবার সময় বলিল, দিদি, আজ ওবেলা আপনাদের একটা নতুন জিনিষ শোনাব।

অবনী বাবুর স্ত্রীকে সে দিদি বলতে সুরু করিয়াছে। তিনি আগ্রহে বলিলেন, কি, কি বলুন না? আপনি গান জানেন—না? আমি অনেক দিন ওঁকে বলেচি আপনি গান জানেন।

—গানও গাইব, কিন্তু একটা কথকতার পালা শোনাব, আমার বাপের মুখে শোনা জড়ভরতের উপাখ্যান।

দিদির মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তিনি হাসিয়া স্বামীকে কহিলেন, দেখ্‌লে গো—দ্যাখো! বলিনি আমি? গলার স্বর অমন, নিশ্চয়ই গান জানেন—খাটল না কথা?

দুপুরবেলা দিদি তাহাকে তাস খেলার জন্য পীড়াপীড়ি করেন—সে বলে, এখন যে আমি লিখচি।—লেখা এখন থাক্‌। তাস জোড়াটা না খেলে খেলে পোকায় কেটে দিলে—এখানে খেলার লোক মেলে না—যখন ওঁর বন্ধু মিঃ রায়-চৌধুরী আসেন তখন মাঝে মাঝে খেলা হয়—আসুন আপনি। উনি, আমি আর আপনি—

অপু বলে, আর একজন?

—আর কোথায়? আমি আর আপনি বস্‌ব—উনি একা দুহাত নিয়ে খেল্‌বেন।

জোৎস্না রাত্রে বাংলোর বারান্দাতে সে কথকতা আরম্ভ করিল। জড়ভরতের বাল্যজীবনের করুণ কাহিনী নিজেরই শৈশব-স্মৃতির ছায়াপাতে, সত্য ও পূত হইয়া ওঠে, কাশীর দশাশ্বমেধ ঘাটের বাবার গলার স্বর কেমন করিয়া অলক্ষিতে তাহার গলায় আসে—শালবনের পত্র-মর্ম্মরে, নৈশ পাখীর গানের মধ্যে রাজর্ষি ভরতের সকলবৈরাগ্য ও নিস্পৃহ আনন্দ যেন প্রতি স্বর মূর্চ্ছণাকে একটি অতি পবিত্র মহিমময় রূপ দিয়া দিল। কথকতা থামিলে সকলেই চুপ করিয়া রহিল। অপু খানিকটা পরে হাসিয়া বলিল—কেমন লাগল?

অবনীবাবু একটু ধর্ম্মপ্রাণ লোক, তাঁহার খুবই ভাল লাগিয়াছে—কথকতা দুএকবার শুনিয়াছেন বটে, কিন্তু এ কি জিনিষ! ইহার কাছে সে সব লাগে না।

কিন্তু সকলের চেয়ে মুগ্ধ হইলেন অবনীবাবুর স্ত্রী। জ্যোৎস্নার আলোতে তাঁহার চোখে ও কপোলে অশ্রু চিক্‌ চিক্‌ করিতেছিল। অনেকক্ষণ তিনি কোনো কথা বলিলেন না।

স্বদেশ হইতে দূরে এই নিঃসন্তান দম্পতির জীবন-যাত্রা এখানে একেবারে বৈচিত্র্যহীন বহুদিন এমন আনন্দ তাঁহাদের কেহ দেয় নাই।

দিন দুই পরে অবনীবাবুর বন্ধু মিঃ রায়-চৌধুরী আসিলেন, ভারী মন খোলা ও অমায়িক ধরণের লোক, বয়স চল্লিশের কাছাকাছি, কানের পাশে চুলে পাক ধরিয়াছে, বলিষ্ঠ গঠন ও সুপুরুষ। একটু অতিরিক্ত মাত্রায় মদ খান, জব্বলপুর হইতে হুইস্কি আনাইয়াছেন কিরূপ

কষ্ট স্বীকার করিয়া, খানিকক্ষণ তাহার বর্ণনা করিলেন। অবনীবাবুও যে মদ খান অপু তাহা ইতিপূর্ব্বে জানিত না। মিঃ রায়-চৌধুরী অপুকে বলিলেন, আপনার গুণের কথা সব শুন্‌লাম, অপূর্ব্ববাবু। সে আপনাকে দেখেই আমার মনে হয়েচে। আপনার চোখ দেখ্‌লে যে-কোনো লোক আপনাকে ভাবুক বল্‌বে। তবে কি জানেন, আমরা হয়ে পড়েচি বড় ম্যাটার অফ্ ফ্যাক্‌ট্। আজ আপনাকে আর একবার কথকতা করতে হবে, ছাড়্‌চি নে আজ।

কথাবার্ত্তায়, গানে, হাসিখুশীতে সেদিন প্রায় সারা-রাত কাটিল। মিঃ রায়-চৌধুরী চলিয়া যাইবার দিন তিনেক পরে একজন চাপরাশী তাঁহার নিকট হইতে অপুর নামে একখানা চিঠি আনিল। তাঁহার ওখানে একটা ড্রিলিং তাঁবুর তত্ত্বাবধানের জন্য একজন লোক দরকার। অপূর্ব্ববাবু কি আসিতে রাজী আছেন? আপাতত মাসে পঞ্চাশ টাকা ও বাসস্থান। অপুর নিকট ইহা একেবারে অপ্রত্যাশিত। ভাবিয়া দেখিল, হাতে আনা দশেক পয়সা মাত্র অবশিষ্ট আছে, উঁহারা অবশ্য যতই আত্মীয়তা দেখান, গান ও কথকতা করিয়া চিরদিন তো এখানে কাটানো চলিবে না। আশ্চর্য্যের বিষয় এতদিন কথাটা আদৌ তাহার মনে উদয় হয় নাই যে কেন!

মিঃ রায়-চৌধুরীর বাংলো প্রায় মাইল কুড়ি দূর। তিনদিন পরে ঘোড়া ও লোক আসিল। অবনীবাবু ও তাঁহার স্ত্রী অত্যন্ত দুঃখের সহিত তাহাকে বিদায় দিলেন। পথ অতি দুর্গম, উমেরিয়া হইতে তিন মাইল উত্তর-পশ্চিমদিকে গেলেই ঘন জঙ্গলের মধ্যে ডুবিয়া যাইতে হয়। দুই তিনটা ছোট ছোট পাহাড়ী নদী, আবার ছোট ছোট ফার্ণ ঝোপ, ঝরণা, একটার জলে অপু মুখ ধুইয়া দেখিল জলে গন্ধকের গন্ধ, পাহাড়ে করবী ফুটিয়া আছে, বাতাস নবীন মাদকতায় ভরা, খুব স্নিগ্ধ, এমন কি যেন একটু গা শিরশির্ করে—এই চৈত্র মাসেও।

সন্ধ্যার পূর্ব্বে সে গন্তব্য স্থানে পৌঁছাইয়া গেল। খনির কার্য্যকারিতা ও লাভালাভের বিষয় এখনও পরীক্ষাধীন, মাত্র খান চার-পাঁচ চওড়া খড়ের ঘর। দুইটা বড় বড় তাঁবু, কুলীদের থাকিবার ঘর, একটা আপিস ঘর। সর্ব্বশুদ্ধ আট-দশ বিঘা জমির উপর সব। চারিধারে ঘেরিয়া ঘন, দুর্গম অরণ্য, পিছনে পাহাড়, আবার পাহাড়।

মিঃ রায়-চৌধুরী বলিলেন, খুব সাহস আছে আপনার, তা আমি বুঝেচি যখন শুন্‌লাম আপনি রাত্রে ঘোড়ায় চড়ে উমেরিয়া এসেছিলেন। ও পথে রাত্রে এদেশের লোকও যেতে সাহস পায় না। বন্দুক চালাতে পারেন তো? শিখিয়ে দেব।

অপুর এক সম্পূর্ণ নতুন জীবন সুরু হইল এদিনটি হইতে। এমন এক জীবন, যাহা সে চিরকাল ভালবাসিয়া আসিয়াছে, যাহার স্বপ্ন দেখিয়া আসিয়াছে। কিন্তু কোনদিন যে হাতের মুঠার নাগাল পাওয়া যাইবে তাহা ভাবে নাই।

তাহাকে যে ড্রিল তাঁবুর তত্ত্বাবধানে থাকিতে হইবে, তাহা এখান হইতে আরও সতেরো-আঠারো মাইল দূরে। মিঃ রায়-চৌধুরী নিজের একটা ঘোড়া দিয়া তাহাকে পরদিনই কর্ম্মস্থানে পাঠাইয়া দিলেন। নতুন স্থানে আসিয়া অপু অবাক্ হইয়া গেল বন ভালবাসিলে কি হইবে, এ ধরণের বন সে কখনও দেখে নাই। নিবিড় বনানীর প্রান্তে উচ্চ তৃণভূমি, তারই মধ্যে খড়ের বাংলা-ঘর, একটা পাতকুয়া, কুলীদের বাসের খুপড়ি, পিছনে ও দক্ষিণে পাহাড়, সেদিকের ঘন বন কত দূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত তাহা চোখে দেখিয়া আন্দাজ করা যায় না—ক্রোশের পর ক্রোশ ধরিয়া পাহাড়, একটার পিছনে আর একটা, আর গভীর জনমানবহীন অরণ্য, সীমা নাই, কূল-কিনারা নাই। চারি দিকের দৃশ্য অতি গম্ভীর। পিছনের পাহাড়-শ্রেণীর সানুদেশও বনজঙ্গলে ভরা - এক স্থানে পাহাড় আবার বেজায় খাড়া, উঁচু ও অনাবৃত—বিরাটকায় নগ্ন গ্র্যানিটের চূড়াটা বৈকালের শেষ রোদে কখনও দেখায় রাঙা, কখনও ধূসর, কখনও ঈষৎ তাম্রাভ কালো রংএর—এরূপ গম্ভীরদৃশ্য আরণ্যভূমির কল্পনাও জীবনে সে করে নাই কখনও!

অপুর সারাদিনের কাজও খুব পরিশ্রমের, সকালে স্নানের পর কিছু খাইয়াই ঘোড়ায় উঠিতে হয়, মাইল

চারেক দূরের একটা জায়গায় কাজ তদারক করিবার পরে প্রায়ই মিঃ রায়-চৌধুরীর ষোল মাইল দূরবর্ত্তী তাঁবুতে গিয়া রিপোর্ট করিতে হয়—তবে সেটা রোজ নয়, দুদিন অন্তর অন্তর। ফিরিতে কোনো দিন হয় সন্ধ্যা, কোনো দিন বা রাত্রি প্রহর দেড়প্রহর। সবটা মিলিয়া কুড়ি পঁচিশ মাইলের চক্র, পথ কোথাও সমতল, কোথাও ঢালু, কোথাও দুর্গম, ঢালুটাতে জঙ্গল আছে, তবে তার তলা অনেকটা পরিষ্কার, ইংরেজিতে যাকে বলে open forest—কিন্তু পোয়াটাক পথ যাইতে না যাইতে সে মানুষের জগৎ হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হইয়া ঘন অরণ্যের নির্জ্জনতার মধ্যে একেবারে ডুবিয়া যায়—সেখানে জন নাই, মানুষ নাই, চারি পাশে বড় বড় গাছ, ডালে পাতায় নিবিড় জড়াজড়ি, সূর্য্যের আলো দিনমানেও ঢোকে না, পথ নাই বলিলেও হয়, কখনও ঘোড়া চালাইতে হয় পাহাড়ী নদীর শুষ্ক খাত বাহিয়া, কখনও গভীর জঙ্গলের দুর্ভেদ্য বেত-বন ঠেলিয়া—যেখানে বন্য-শূকর বা সম্বর হরিণের দল যাতায়াতের সুঁড়ি পথ তৈরি করিয়াছে—সে পথে। ঘোড়া চালাইতে চালাইতে অপুর মনে হয় সে যেন জগতে সম্পূর্ণ একা, সারা দুনিয়ার সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নাই—শুধু আছে সে, আর আছে তাহার ঘোড়াটি ও চারিপাশের বিজন বন। আর কি সে নির্জ্জনতা! কলিকাতার বাসায় নিজের বন্ধ দুয়ার ঘরটার কৃত্রিম নির্জ্জনতা নয়, এ ধরণের নির্জ্জনতার সঙ্গে তাহার কখনও পরিচয় ছিল না। এ নির্জ্জনতা বিরাট, অদ্ভুত, এমন কিছু, যাহা পূর্ব্ব হইতে ভাবিয়া অনুমান করা যায় না, অভিজ্ঞতার অপেক্ষা রাখে। কত ধরণের গাছ, লতা, গাছের ডালে এখানে-ওখানে বিচিত্র রং-এর অর্কিড্ ও ম্যাগ্নোলিয়ার ফুল ফুটিয়া প্রভাতের বাতাসকে গন্ধভারাক্রান্ত করিয়া তোলে।

ভারী পছন্দ হয় এ জীবন, গল্পের বইয়ে টইয়ে যে রকম পড়িত, এ যেন ঠিক তাহাই। খোলা জায়গা পাইলেই ঘোড়া ছাড়িয়া দেয়, গতির আনন্দে সারা দেহে কোমল একটা উত্তেজনা আসে গতির নেশা—খানাখন্দ, শিলা, পাইওরাইটের স্তূপ কে মানে? নত শালশাখা এড়াইয়া দোদুল্যমান অজানা লতার পাশ ঘাটাইয়া পৌরুষ-ভরা উদ্দামতার আনন্দে তীরবেগে ঘোড়া উড়াইয়া চলে।

ঠিক এই সব সময়েই তাহার মনে পড়ে—প্রায়ই মনে পড়ে শীলেদের আপিসের সেই তিন বৎসর ব্যাপী বদ্ধ সঙ্কীর্ণ, অন্ধকার কেরানী জীবনের কথা। এখনও চোখ বুজিলে আপিসটা সে দেখিতে পায়, বাঁয়ে নৃপেন টাইপিষ্ট বসিয়া খট খট করিতেছে, রামধন নিকাশ-নবীশ বসিয়া খাতাপত্র লিখিতেছে, সেই বাঁধানো মোটা ফাইলের দপ্তরটা—নিকাশনবীশের পিছনের দেওয়াল চূণ বালি খসিয়া দেখিতে হইয়াছে যেন একটি পূজা-নিরত পুরুত ঠাকুর। রোজ সে ঠাট্টা করিয়া বলিত, 'ও রামধনবাবু, আপনার পুরুত-ঠাকুর আজ ফুল ফেল্‌লেন না? উঃ সে কি বদ্ধতা—এখন যেন সে সব একটা দুঃস্বপ্নের মত মনে হয়।

ক্রমশঃ



বিদ্যাসাগর-প্রসঙ্গ—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। মহামহোপাধ্যায় ডক্টর শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী সি. আই. ই. লিখিত ভূমিকা। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স। কলিকাতা ১৩৩৮। পৃঃ ২৮+১২৩।

বিদ্যাসাগরের জীবন-চরিতের অভাব নাই, কারণ সাগর-প্রসঙ্গ অগাধ ও অপরিমেয়। তাঁহার স্বরচিত অপূর্ণ প্রথম-জীবনের কাহিনী ছাড়া, সুবলচন্দ্র মিত্রের ইংরেজী জীবনী এবং বিদ্যাসাগর-সহোদর শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন, চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিহারীলাল সরকার রচিত তিনখানি সুবিদিত বাংলা জীবন-চরিত প্রচলিত আছে। সে-কালের বা এ-কালের অন্য কোনও বাঙালীর ভাগ্যে এতগুলি শ্রদ্ধাঞ্জলি ঘটে নাই। তবুও, আধুনিক সময়ে জীবনী বলিতে আমরা যাহা বুঝি, তাহার প্রমাণস্বরূপ ইহার একখানিকেও নির্দ্দেশ করা যায় না। ইহাদের প্রত্যেকটির রচনা-পদ্ধতিও বিচিত্র এবং বিভিন্ন। সাগর-দর্শন ভিন্নলোকের অদৃষ্টে ভিন্নপ্রকার ঘটিয়াছে। বিবিধ জ্ঞাতব্য বিষয়ে পূর্ণ হইলেও অনেক সময়ে এ-সকল জীবনীর কোনোটি খোসগল্পকে প্রাধান্য দিয়াছে, কোনোটি বিধবা-বিবাহ-বিদ্বেষী হিন্দু-গোঁড়ামির তরফ হইতে ওকালতী করিয়াছে, কোনোটি "ধন্য ধন্য বিদ্যাসাগর!" এই চিত্তবৃত্তির দ্বারা অনুপ্রাণিত, কোনোটি বা বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে যাহা কিছু তথ্য ও অতথ্য তাহা নির্ব্বিচারে লিপিবদ্ধ করিয়া শিব গড়িতে অন্য কিছু গড়িয়াছে। আমাদের দেশে ইতিহাসকে গল্পে ও গল্পকে ইতিহাসে পরিণত করিবার প্রবৃত্তি নূতন নহে; জীবন-চরিতেও অনেক সময় এই নির্ব্বিশেষ পদ্ধতি লক্ষিত হয়। অবতার-বাদী দেশে মহাপুরুষ সম্বন্ধে ভক্তিপ্রবণ অত্যুক্তিও বিরল নহে। বাংলায় চরিতামৃত আছে, কিন্তু চরিত নাই। সুতরাং ভাব-প্রধান বাঙালী লেখকের পক্ষে নিক্তির ওজনে জীবন-চরিত-রচনার অনেক অন্তরায় রহিয়াছে। উপরোক্ত কয়খানি জীবনীর মধ্যে প্রয়োজনীয় কথা ও তথ্যহিসাবে, চণ্ডীচরণ ও সুবলচন্দ্রের জীবনী উল্লেখযোগ্য; কিন্তু ইহাদের একটিও পূর্ণাঙ্গ, সতর্ক বা নির্ভরযোগ্য জীবন-ইতিহাস বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। সুতরাং এ-বিষয়ে যে-কোন নূতন গ্রন্থ নূতন তথ্যের সন্ধান দিবে, তাহার মূল্য যথেষ্ট। এই হিসাবে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের এই ক্ষুদ্র চেষ্টাও বাংলা সাহিত্যে আদরণীয়।

ব্রজেন্দ্রবাবু বিদ্যাসাগরের সম্পূর্ণ জীবনী লিখিবার চেষ্টা করেন নাই; শুধু ইহার অস্পষ্ট কয়েক পৃষ্ঠা নূতন ও উজ্জ্বল করিয়া লিখিয়াছেন। হয়ত যে-সব তথ্য সংগ্রহ করিবার সুযোগ তাঁহার হইয়াছিল, তাহার দ্বারা এরূপ বৃহৎ ব্যাপার সম্ভবপর হয় নাই। বোধ হয় সেইজন্য তিনি তাঁহার গ্রন্থের সবিনয় নামকরণ করিয়াছেন—"বিদ্যাসাগর-প্রসঙ্গ"; এবং আকারে ও প্রকারে তাঁহার রচনা মিতভাষী ও নিরভিমান। তথাপি, তাঁহার এই স্বল্প-পরিসর ও অল্পে-সন্তুষ্ট পুস্তিকাটি, পূর্ব্ববর্ত্তী এতগুলি বৃহদাকার জীবনীর অস্তিত্ব সত্ত্বেও, অনেক মূল্যবান তথ্যের সংবাদ দিয়াছে। ক্ষুদ্র শ্রদ্ধাঞ্জলি হইলেও, ইহাতে বিদ্যাসাগরের বিশাল কর্ম্মক্ষেত্রের একটি দিক্ যথার্থরূপে বুঝিবার ও বুঝাইবার চেষ্টা আছে। ঐতিহাসিক হিসাবে ব্রজেন্দ্রবাবুর নাম সুপরিচিত; তাঁহার ঐতিহাসিক পৃচ্ছা, শিক্ষা ও বিচারবুদ্ধি তিনি যে আধুনিক বাংলার ইতিহাস-উদ্ধারের চেষ্টায় নিযুক্ত করিয়াছেন, তাহা সত্যই সুখের বিষয়। আলোচ্য পুস্তিকার 'নিবেদনে' তিনি বিনীতভাবে বলিয়াছেন:—"ঐতিহাসিক তথ্যের দিক দিয়াও জীবনী লেখা যায়। আমি সে চেষ্টা করিয়াছি।" ইহা তাঁহার বিনয় হইলেও, গর্ব্বের বিষয়; তাঁহার এই আড়ম্বরহীন চেষ্টার মধ্যেও এরূপ গর্ব্ব করিবার যথেষ্ট কারণ রহিয়াছে। কোম্পানীর দপ্তরখানায় বিস্মৃত ও অজ্ঞাত নথিপত্রের মধ্যে তৎকালীন বাংলার যে ইতিহাস নিহিত রহিয়াছে, তাহার উদ্ধারের চেষ্টা এ পর্য্যন্ত খুব বেশী হয় নাই। বিদ্যাসাগরের কর্ম্মজীবনের অনেক অমূল্য উপাদান সেই দপ্তরখানার কাগজপত্রের মধ্যে যে থাকিতে পারে, এ কথা পূর্ব্বে আর কাহারও মনে উদিত হয় নাই। ঐতিহাসিকের তথ্যানুসন্ধান ও সূক্ষ্ম-পরীক্ষণের ফলে, সেই সব অপ্রকাশিত কথা ও ঘটনা আজ সর্ব্বপ্রথম বাঙালী পাঠকের জ্ঞান-গোচর হইল।* গালগল্প-বর্জ্জিত, অত্যুক্তিশূন্য বা অসাবধান-উক্তি-বিরহিত জীবন-ইতিহাস লিখিবার এই সত্যৈকদৃক ধারা বাংলা ভাষায় যতই প্রবর্ত্তিত হয় ততই মঙ্গল।

কিন্তু, এ দেশের শিক্ষা-বিস্তারে বিদ্যাসাগরের যে কীর্ত্তি-কলাপ, তাহাই প্রধানতঃ ও বিশেষভাবে বর্ত্তমান গ্রন্থে আলোচিত হইয়াছে। পুস্তকের ১২৩ পৃষ্ঠার মধ্যে প্রায় ৯৪ পৃষ্ঠা শুধু এই একটি বিষয়ই বিবৃত করিয়াছে। ব্রজেন্দ্রবাবু ঠিক বলিয়াছেন যে, (অল্পবিস্তর সুবলচন্দ্র মিত্রের জীবনী ছাড়া) বিদ্যাসাগরের পূর্ব্ববর্ত্তী জীবনীগুলি এ-বিষয়ে অপেক্ষাকৃত অসম্পূর্ণ; তাঁহার নিজের গ্রন্থ এই অভাব পূর্ণ করিয়াছে। কিন্তু বাঙালী পাঠকের স্বভাবতই দুঃখ হইবে যে, বিদ্যাসাগরের বিস্তৃত জীবনের অন্যদিকগুলিও ব্রজেন্দ্রবাবু সেইরূপ যত্ন ও পরিশ্রমের সহিত দেখাইতে চেষ্টা করেন নাই। এমন পাণ্ডা পাইয়া কে বা সাগরের একটি দিক দেখিয়া সন্তুষ্ট থাকিতে পারে? বিদ্যাসাগরের গ্রন্থাবলীর একটি সময়ানুযায়ী তালিকা দেওয়া হইয়াছে; তাহাতে ঐতিহাসিকের সাবধানতা ও অনুসন্ধানের পরিচয় আছে।+ কিন্তু বিদ্যাসাগরের সাহিত্য-প্রচেষ্টার কথা ব্রজেন্দ্রবাবু অতি সামান্যভাবেই বলিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্র ‡ ও রবীন্দ্রনাথের

---

* অনেক স্থলে এই সব নথিপত্র হইতে অনেক কথা বাংলায় তর্জ্জমা করিয়া উদ্ধৃত হইয়াছে। পাদটীকায় এগুলির ইংরেজী মূল দিলেও ভাল হইত।

+ বেতাল পঞ্চবিংশতির দ্বিতীয় সংস্করণ ও তাহার তারিখের উল্লেখ করা উচিত ছিল। কারণ, ইহার প্রথম সংস্করণ প্রায় অনুস্বার-বিসর্গ-বর্জ্জিত সংস্কৃত ভাষায় রচিত, দ্বিতীয় সংস্করণ আমূল নূতন করিয়া সহজ ভাষায় লিখিত।

‡ 'কলিকাতা রিভিউ' পত্রে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার বেনামী প্রবন্ধে এ-সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন তাহা প্রিয়ংবদ না হইলেও, বোধ হয় তাঁহার আন্তরিক সত্যাশংসী অভিমত। সুতরাং এই সূত্রে ইহারও উল্লেখ প্রয়োজনীয়।

সুবিদিত মত উদ্ধৃত করিয়া এবং বিদ্যাসাগরের ভাষার কতকগুলি সুপরিচিত নমুনা দিয়া, সাত আট পৃষ্ঠার মধ্যেই তিনি কাজ সারিয়াছেন। হয়ত সাহিত্যিক বা সমালোচক হিসাবে তাঁহার কোনও অভিমান নাই, সেইজন্য তিনি সতর্কভাবে এসব আলোচনা হইতে বিরত হইয়াছেন। কিন্তু বিদ্যাসাগরের সমাজ-সংস্কার, লোক-সেবা প্রভৃতি চিরবিশ্রুত কীর্ত্তির কথা, বাংলার সামাজিক ইতিহাস হিসাবে, তাঁহার মত ঐতিহাসিকের চিত্ত আকর্ষণ করা উচিত ছিল। যতটুকু তিনি দিয়াছেন তাহা মূল্যবান, এবং তাহার জন্য বাঙালী পাঠক কৃতজ্ঞ থাকিবে, কিন্তু তাঁহার এই মুষ্টিমেয় দানে ভবিষ্যৎ প্রত্যাশা আরও বাড়িয়া গিয়াছে।

শ্রীসুশীলকুমার দে

আত্মকথা অথবা সত্যের প্রয়োগ—প্রথম খণ্ড। মহাত্মা গান্ধী রচিত মূল গুজরাটী পুস্তক হইতে শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দাসগুপ্ত কৃত বঙ্গানুবাদ। শ্রীহেমপ্রভা দাসগুপ্তা কর্ত্তৃক খাদি-প্রতিষ্ঠান ১৫, কলেজ স্কোয়ার কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। মূল্য বারো আনা।

ভাস্কর যখন মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করেন তখন তাঁহাকে রক্ত মাংস গতি বাক্ বর্জ্জন করিয়া কেবল ভঙ্গী দ্বারা ভাব পরিস্ফুট করিতে হয়। কথাকারের উপাদান শব্দ মাত্র, কিন্তু তাঁহার প্রকাশের উপায় অনেক বেশী। তথাপি কোনো পাত্রের চরিত্র বর্ণনের সময় তাঁহাকে সংক্ষেপে সারিতে হয়, কারণ আদ্যোপান্ত বর্ণনা তাঁহার সাধ্য নয়। বাস্তব মানবস্বভাবে যে জটিল রহস্য আমরা নিত্য দেখি, কথাকার তাহার অনেক অংশ কাটিয়া ছাঁটিয়া কেবল কতকগুলি গ্রন্থির জট খুলিয়া পাঠকের সম্মুখে ধরেন। তিনি তাঁহার বর্ণনীয় চরিত্রের মাত্র কয়েকটি বিশেষ অংশে আলোকপাত করিয়া একটি সুসঙ্গত সুস্পষ্ট মানবের ধারণা জন্মাইতে চান। কোনো বিখ্যাত লোক যখন আত্মচরিত লেখেন, তখন তিনি প্রায় আরও সঙ্কীর্ণ ক্ষেত্রে লেখনী চালনা করেন, এবং সাধারণে তাঁহার জীবনের যে অংশের সহিত পরিচিত, কেবল তাহাই বিস্তারিত করিতে চেষ্টা করেন। কদাচিৎ কোনো কোনো লেখকের আত্মবিবরণে এই রীতির ব্যতিক্রম দেখা যায়—ইঁহারা বহু আপাত-তুচ্ছ বিষয় লিপিবদ্ধ করিয়া নিজ চরিত্রের অন্তস্তল পর্য্যন্ত উন্মুক্ত করিতে চেষ্টা করেন। মহাত্মা গান্ধীর আত্মকথায় ইহাই দেখা যায়। তিনি প্রস্তাবনায় লিখিয়াছেন—'সত্য-রূপ শাস্ত্রের পরীক্ষা দেখানোই আমার উদ্দেশ্য, আমি লোকটা কেমন তাহা বর্ণনা করার তিলমাত্র ইচ্ছাও আমার নাই।' মহাত্মা বিযুক্ত দ্রষ্টা এবং নিরপেক্ষ পরীক্ষকের আসন গ্রহণ করিয়া নিজের অভিজ্ঞতা লিখিয়াছেন, কিন্তু তিনি না চাহিলেও তাঁহার বর্ণনা হইতে 'মানুষটা কেমন' তাহা খুবই ফুটিয়া উঠিয়াছে। এই অদ্ভুতকর্ম্মা ব্যক্তির কার্য্যকলাপ সাধারণে মোটামুটি জানে। তিনি দেখিতে কেমন, কি খান, কি পরেন—তাহাও জানিতে বাকী নাই। যেটুকুর অভাব ছিল, লোকে এখন তাহাও পাইল। আত্মকথা লিখিয়া মহাত্মা তাঁহার আত্মার স্বরূপ পর্য্যন্ত নগ্ন করিয়াছেন। কোনও মহাপুরুষের পরিচয় এত ঘনিষ্ঠ ভাবে জানিবার সুযোগ জগতে বোধ হয় আর কখনও হয় নাই।

মহাত্মা গান্ধীর আত্মকথায় তাঁহার জীবনদ্বন্দ্বের মুখ্য ও গৌণ সকল অংশেই উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে। এই দ্বন্দ্বের মূলে আছে সত্যের প্রতি একান্ত আগ্রহ। তিনি যাহা সত্য বা কর্ত্তব্য বলিয়া বুঝিয়াছেন, সর্ব্ব বাধা অগ্রাহ্য করিয়া নিজের জীবনে তাহার প্রয়োগের চেষ্টা করিয়াছেন। এই সত্যানুরাগ সর্ব্বতোমুখ। কেবল রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নয়, আত্মিক দৈহিক পারিবারিক সামাজিক সকল বিষয়েই তিনি তাঁহার গৃহীত মতের অনুসারে চলিতে চেষ্টা করিয়াছেন। সাধারণ লোকের ন্যায় তাঁহার জীবনযাত্রার এক অংশ চেষ্টান্বিত আর এক অংশ গতানুগতিক ভাবে অবহেলিত নয়। তুচ্ছ ও গুরু সকল ব্যাপারই তাঁহার কাছে পরস্পর সংশ্লিষ্ট এবং নিয়মনের যোগ্য। অনেকে তাঁহার নির্দ্ধারণে ও আচরণে ত্রুটি দেখিয়াছেন। যে লোক তাঁহার সমগ্র জীবন হিসাব করিয়া চালাইতে চান এবং তাঁহার বিশ্বাস যুক্তি সাফল্য ব্যর্থতা সমস্তই পদে পদে প্রকাশ করেন, তাঁহার পর্ব্বতপ্রমাণ বা সর্ষপপ্রমাণ ভুল বাহির করা সহজ, এবং ভুল হওয়াও আশ্চর্য্য নয়। কিন্তু তাঁহার এই সর্ব্বাঙ্গীণ প্রয়াস সাধারণের সম্মুখে যে একটি অপরূপ মহৎ আদর্শ স্থাপন করিয়াছে তাহাতে কাহারও সংশয় হইতে পারে না।

মহাত্মা গান্ধীর ভক্তের অভাব নাই, কিন্তু তাঁহার শিষ্যের সংখ্যা মুষ্টিমেয় বলিলে অত্যুক্তি হয় না। যাঁহারা তাঁহার মার্গ সর্ব্বতোভাবে গ্রহণ করিয়াছেন, শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দাসগুপ্ত তাঁহাদের অগ্রণী। ইনি কায়মনোবাক্যে আচারে নিষ্ঠায় গান্ধীবাদ আত্মসাৎ করিয়াছেন। বাংলা ভাষায় গান্ধীর আত্মকথা অনুবাদ করিবার অধিকতর যোগ্যতা আর কাহারও নাই। সতীশবাবুর অনুবাদ অতি সরল, অল্প-শিক্ষিতেরও বোধ্য, গল্পের ন্যায় মনোহর। রচনার ভঙ্গীতে মনে হয় গান্ধী স্বয়ং কথা কহিতেছেন। এই সুমুদ্রিত বৃহৎ গ্রন্থের মূল্য এত কম যে কাহারও কিনিতে বাধা হইবে না। ইহা ধর্ম্মগ্রন্থ-রূপে বাঙালীর ঘরে ঘরে বিরাজ করুক—এই কামনা করি।

রা. ব.

মেঘদূত—শ্রীপ্যারীমোহন সেনগুপ্ত কর্ত্তৃক বাংলা কবিতায় অনুবাদিত। ইণ্ডিয়ান পাব্‌লিশিং হাউস, ২২।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য দুই টাকা।

মহাকবি কালিদাসের অমর কাব্য মেঘদূত সমগ্র পৃথিবীর কাব্য-রসিকের পরম সমাদরের সামগ্রী। সেই মধুর মনোহর কাব্যের এমন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর শোভন সংস্করণ এর আগে কোথাও কেউ প্রকাশ করেছেন ব'লে আমার তো জানা নেই। এর পূর্ব্বে বহু কবি পদ্যে মেঘদূত অনুবাদ ক'রে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে কয়েক জন প্রধান অনুবাদকের নাম আমার মনে আসছে—স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, বরদাচরণ মিত্র, এবং শ্রীযুক্ত গণেশচরণ বসু ও নরেন্দ্র দেব, এঁদের মধ্যে ঠাকুর-মহাশয়েরা অতি সেকেলে পয়ার ও ত্রিপদী ছন্দে এবং মিত্র মহাশয় পৃথক্ পৃথক্ কলিতে বিভক্ত পয়ার শ্লোকে অনুবাদ করেছিলেন; তার পরে গণেশচরণই বোধ হয় প্রথম মূল মেঘদূতের মন্দাক্রান্তা ছন্দের বাংলা অনুরূপ মাত্রাবৃত্ত ছন্দে অনুবাদ করেন; বাংলায় মন্দাক্রান্তা ছন্দের অনুরূপ মাত্রাবৃত্ত ছন্দ স্বর্গীয় সত্যেন্দ্রনাথ দত্তই প্রথম আবিষ্কার করেছিলেন। নরেন্দ্রবাবু বিচিত্র মধুর নানা ছন্দে অনুবাদ করেছেন। কিন্তু আমার বোধ হয় সবার সেরা মূলানুগ অনুবাদ করেছেন প্যারীমোহন। আরও কতকগুলি বিষয়ে প্যারীমোহনের জিত হয়েছে—মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় মেঘদূতের একজন শ্রেষ্ঠ রসজ্ঞ সমঝদার ব'লে প্রসিদ্ধিলাভ করেছেন; শাস্ত্রী মহাশয় প্যারীমোহনের মেঘদূত অনুবাদের মুখবন্ধে মেঘদূতের একটি সরস সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়েছেন। শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র সেন বাংলা ছন্দ সম্বন্ধে প্রবাসীতে ধারাবাহিক প্রবন্ধ লিখে সুপরিচিত হয়েছেন, তিনি এই পুস্তকের ভূমিকায় কালিদাসের আবির্ভাব-কাল, জন্মভূমি ও

জীবনকথা, কাব্য-পরিচয়, মেঘদূতের ছন্দ-বিচার ও অনুবাদের সহিত তুলনা, মেঘদূতের অনুকরণে বহু দূতকাব্যের রচনায় মেঘদূতের সমাদরের প্রমাণ, মেঘদূতের সংস্কৃত মূলের পাঠান্তর, প্রাচীন টীকাকারদের পরিচয়, মেঘদূতে উল্লিখিত দেশ নগর নদী পর্ব্বত প্রভৃতির বর্ত্তমান নাম ও সংস্থান নির্ণয়, দুরূহ শব্দাদির টীকা এবং তদানীন্তন কালের একটি মানচিত্র সংযোজনা ক'রে এই সংস্করণের উপাদেয়তা ও উপকারিতা বহু গুণে বর্দ্ধিত করেছেন। প্যারীবাবুর মেঘদূতের এই সংস্করণটি উপাদেয় হয়েছে। এতে কালিদাসের কাল কাব্য ছন্দ ও বাংলা অনুবাদের কাব্যরূপ ছন্দ প্রভৃতি দুজন বিশেষজ্ঞ দ্বারা অতি বিচক্ষণতার সহিত আলোচিত হয়েছে, যাতে ক'রে শুধু যে কেবল মেঘদূতের মূল ও অনুবাদ একত্র পাশাপাশি পাওয়া গেছে তা নয়, অনেক বিষয় নূতন ক'রে শেখ্‌বার, ভাব্‌বার উপকরণ একত্র পাওয়ার সুবিধা হয়েছে। গ্রন্থ-পরিশিষ্টে "মেঘদূত-প্রসঙ্গে' মেঘদূতের বিভিন্ন প্রসঙ্গের পরিচয়, এবং মানচিত্রে কালিদাসের সমসাময়িক জনপদ নদী পর্ব্বত প্রভৃতির সংস্থান জান্‌বার বিশেষ সুবিধা হয়েছে। বরদাচরণ মিত্র মহাশয়ের মেঘদূত অনুবাদে একখানি মানচিত্র প্রথম সংযোজিত হয়।

এইবার পুস্তকখানির সৌষ্ঠব সম্বন্ধীয় উৎকর্ষের কথা কিছু বলা দরকার। বইখানির আকার একটু অসাধারণ, সচরাচর যে আকারের বই বাজারে চোখে পড়ে সেই একঘেয়ে আকারের বই নয়। বইয়ের ছাপা কাগজ ভাল, বাঁধানো সুদৃশ্য, প্রচ্ছদ মেঘদূতের ভাবদ্যোতক চিত্রে পরিশোভিত। অভ্যন্তরে বিখ্যাত চিত্রকরদের অঙ্কিত একবর্ণের ও বহুবর্ণের কয়েকখানি সুন্দর নেত্রপ্রীতিকর ছবি পুস্তকের সৌন্দর্য্য বর্দ্ধিত করেছে।

শ্রীচারু বন্দ্যোপাধ্যায়

অণুকণা—শ্রীশৈলবালা দেবী প্রণীত। প্রকাশক ডাঃ জ্ঞানদাকান্ত সেন, ৪৪ হনুমান রোড, নিউ দিল্লী। মূল্য এক টাকা।

এই পুস্তকখানির অধিকাংশ কবিতা ভগবানের উদ্দেশে লিখিত। ইহার বিশেষত্ব এই যে, লেখিকার মনে যখন যে ভাব, আকাঙ্ক্ষা ও চিন্তার উদয় হইয়াছে, তিনি সরলভাবে সোজা কথায় তাহাই ঠিক্ প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। অতিরঞ্জনের, অতিশয়োক্তির বা সাজগোজের কোন চেষ্টা তিনি করেন নাই। যে ভাব বা চিন্তা যত প্রগাঢ়, তীব্র বা প্রবল, তাহাকে তদপেক্ষা গভীরতর, তীব্রতর বা প্রবলতর করিয়া বর্ণনা করিবার প্রয়াস কবিতাগুলিতে কুত্রাপি নাই।

ভগবানের উদ্দেশে লিখিত কবিতাগুলি ছাড়া অন্য কতকগুলি কবিতাও ইহাতে আছে। যেমন, "ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকদের প্রতি," "বাংলা দেশের মেয়ে," "কারলী গুহা," "স্বামী শ্রদ্ধানন্দ", "আমার দেশ," ইত্যাদি। "বাংলা দেশের মেয়ে" কবিতায়, বৃন্দাবনে বাংলার মেয়ের দুর্গতি দেখিয়া যে ব্যথা পাইয়াছেন ও ধিক্কার বোধ করিয়াছেন, তাহা ও অন্যান্য ভাব ব্যক্ত হইয়াছে। "আমার দেশ" কবিতাটি পড়িলে বুঝা যায়, ভারতবর্ষের কেবল যাহা কিছু মহান্ তাহাই কবির প্রিয় নহে, ধূলিকণাটি পর্য্যন্ত প্রিয়।

বহিখানির ছাপা ও কাগজ উৎকৃষ্ট।

র. চ.

মনুবংশ—(প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড) শ্রীরামহরি ভট্টাচার্য্য সাহিত্যভূষণ প্রণীত। মূল্য ১॥০ ১৬২ পৃ।

এই পুস্তকে মনুবংশ, ইক্ষ্বাকুবংশ, রঘুবংশ, চন্দ্রবংশ, পুরুবংশ, সুধন্বর বংশ প্রভৃতি সম্বন্ধে অনেকগুলি পৌরাণিক আখ্যায়িকা সঙ্কলিত হইয়াছে। পুস্তকের প্রথমাংশে গ্রন্থকার পুরাণের ঐতিহাসিকতা দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার সেই চেষ্টা বিফল হইয়াছে। ঐতিহাসিকতার লক্ষণ সম্বন্ধে তাঁহার স্পষ্ট ধারণা নাই। যাহা হউক, পৌরাণিক গল্প সত্যই হউক আর মিথ্যাই হউক, গল্পগুলি জানা আবশ্যক। এই জানা সম্বন্ধে এই পুস্তক অনেক পাঠকের সহায় হইবে, সন্দেহ নাই।

শ্রীসীতানাথ তত্ত্বভূষণ

সুতপা—শ্রীরামনারায়ণ কর, এম্. এ.। প্রাপ্তিস্থান গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্, ২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্। পৃঃ ৪৫৪। মূল্য ২১০।

এই সুবৃহৎ উপন্যাসখানি খুব মনোযোগ দিয়া আগাগোড়া পড়িলাম। গ্রন্থকারের আন্তরিকতার পরিচয় বহুস্থানে পাওয়া যায়, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও বইখানি পড়িয়া মনে রং ধরে না। চরিত্রগুলির কথাবার্ত্তার বাহুল্যে বইখানি ভারাক্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে, অথচ সে সকল উক্তি-প্রত্যুক্তির কোনো সার্থকতা খুঁজিয়া পাওয়া যায় না—এক পুস্তকের কলেবর বৃদ্ধি করা ছাড়া। বইয়ের ছাপাই ও বাঁধাই ভাল।

আরাতামা—শ্রীনগেন্দ্রনাথ গুপ্ত প্রণীত। প্রকাশক ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস, ২২।১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। পৃঃ ২১৯। মূল্য দুই টাকা।

লেখক প্রবীণ সাহিত্যিক। আলোচ্য গ্রন্থখানিতে তাঁহার কল্পনার বিস্তার ও ভাষার প্রাঞ্জলতা আমাদিগকে আনন্দ দান করিয়াছে। তবে একটা কথা মনে হয়, এ ধরণের উপন্যাস লিখিতে গেলে বাস্তবের ভিত্তি আরও দৃঢ় করা উচিত ছিল, অন্ততঃ প্রথম কয়েকটি অধ্যায়ে। গ্রন্থকার মহাশয় তাহা না করার দরুণ উপন্যাসের সকল চরিত্র ও ঘটনাবলী অস্বাভাবিক ও ধোঁয়া-ধোয়া ঠেকে। বইখানি শেষ করিয়া এজন্য সন্তুষ্ট হইতে পারা যায় না।

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

আলেয়া—শ্রীরাধাচরণ চক্রবর্ত্তী। প্রকাশক—দি সুশীল প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ লিঃ, ৪৮ পটলডাঙ্গা ষ্ট্রীট, কলিকাতা। দেড় টাকা।

রাধাচরণবাবু সুপরিচিত কবি। বহুদিন হইতেই বহু মাসিক পত্রিকায় তাঁহার কবিতা প্রকাশিত হইতেছে। তাঁহার কবিতার বিশেষত্ব—সেগুলি ক্ষুদ্র, অল্প কথায় ছোট ছোট ভাব পরিস্ফুট করে, ভাষা বেশ সরল, ছন্দ ত্রুটিহীন। কিন্তু এই গুণ-উল্লেখের সঙ্গে সঙ্গে এ কথা বলাও অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে, তিনি কোন গাঢ় বা গভীর ভাব মূলক কবিতা রচনায় দক্ষতা দেখান নাই; তাঁহার শক্তি চিত্রণ-কার্য্যে পটু, কিন্তু সে-শক্তিতে আবেগময় প্রগাঢ় উপলব্ধির অভাব। অথচ এই শেষোক্ত জিনিষটি কাব্যে অত্যন্ত বাঞ্ছনীয় বস্তু। আলোচ্য পুস্তকটিতে কবির এই গুণ ও ত্রুটি সমভাবে পরিস্ফুট। তথাপি, কবির রচনায় মিষ্টতা ও প্রসাদগুণের অভাব নাই। মোটের উপর, এই কবিতার বইটি আমাদের ভাল লাগিয়াছে। ছাপা ও বাঁধাই ভাল, তবে দাম বেশী বলিয়া মনে হয়।

শ্রীপ্যারীমোহন সেনগুপ্ত

হালুম বুড়ো—শ্রীপ্যারীমোহন সেনগুপ্ত। দাম ॥০।

ছেলেদের কবিতার বই। পুস্তকখানার ২য় সংস্করণ হইয়াছে, সুতরাং ছেলেদের নিকট ইহার আদর হইয়াছে বুঝা যায়।

গল্পে ইতিহাস—শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন। দাম ।৶১০ আনা।

গল্পচ্ছলে প্রাচীন কাল হইতে আরম্ভ করিয়া আধুনিক সময় পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের ইতিহাস বর্ণিত হইয়াছে। ইহা মামুলি এবং গতানুগতিক ধরণের ইতিহাস নহে—যতদূর সম্ভব সত্য এবং নির্ভীকভাবে সত্য জানাইবার চেষ্টা হইয়াছে। পুস্তকখানি কখনও টেক্স্ট বুক কমিটি কর্ত্তৃক পাঠ্য বলিয়া গৃহীত হইবে না। ছেলেদের এই বই পড়িতে ভাল লাগিবে—তাহারা উপকৃত হইবে।

অভিশপ্ত—শ্রীমতী লক্ষ্মীমণি দে। দাম দেড় টাকা।

মামুলি নভেল। কোনো নূতনত্ব নাই।

ভক্তিতত্ত্ব—স্বামী নির্ব্বাণানন্দ। দাম ।০।

ভক্তির অর্থ, মূলতত্ত্ব, মাহাত্ম্য, ইত্যাদি বিষয় সরলভাবে বুঝাইবার চেষ্টা হইয়াছে। যাঁহাদের ভক্তি আছে, তাঁহারা ইহা পাঠে আনন্দ ও উপকার লাভ করিবেন।

মানব-মিত্র—দীন মানবাত্মা প্রণীত। সর্ব্বসাধারণকে মাত্র ।৵০ আনায় নানা উপদেশ বিতরণ করা হইয়াছে।

সরল ধর্ম্মতত্ত্ব—শ্রীযতীন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী সঙ্কলিত। দাম ৸০।

পুস্তকখানিতে শ্রীরামদয়াল মজুমদার প্রভৃতি সাধকগণের বক্তৃতাদির সারাংশ দেওয়া হইয়াছে। পুস্তকখানি হিন্দুধর্ম্মে বিশ্বাসী ধার্ম্মিক সুধীবৃন্দের মনোরঞ্জন করিবে।

কাচ ও মণি—মৌলভী একরামদ্দিন। দাম ১॥০।

গ্রন্থকার "রবীন্দ্র-প্রতিভা," "নতুন-মা" ইত্যাদি গ্রন্থ লিখিয়া খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন। আলোচ্য উপন্যাসখানি পাঠ করিয়া আনন্দিত হইলাম। উপন্যাসের প্লট ভাল, লিখিবার ভঙ্গি এবং ভাষা সুন্দর। উপন্যাস-আমোদীগণ এই পুস্তকখানি পাঠে আনন্দ লাভ করিবেন। বইখানির ছাপা, বাঁধাই ভাল।

শ্রীহেমন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

বিদ্রোহী প্রাচ্য—শ্রীঅরুণচন্দ্র গুহ। ৯নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা (সরস্বতী লাইব্রেরী) হইতে গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ৩॥০, ১৩৩৬।

পুস্তকখানির বিষয়-সম্বন্ধে গ্রন্থকার ভূমিকায় লিখিয়াছেন—"তিন চার শত বৎসর পূর্ব্বে এশিয়ার সভ্যতাকে উচ্ছেদ করিয়া ইউরোপ তাহার সভ্যতার পত্তন করে। তাহাতে জগতের মঙ্গলই হইয়াছিল। কিন্তু আজ আবার জগতের কল্যাণের জন্য ইউরোপীয় সভ্যতাকে উচ্ছেদ করা দরকার—ইউরোপের রাষ্ট্রীয় প্রাধান্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা ভিন্ন আজ জগৎ-সভ্যতার উন্নতি অসম্ভব। এশিয়াকে আজ নূতন সভ্যতার পত্তন করিতে হইবে—তারই সূচনা নানাভাবে দেখা দিতেছে। এই যে বিদ্রোহ, ইহা আজ এশিয়ার বা সমস্ত প্রাচ্যের মর্ম্মকথা। এই বিদ্রোহই নূতন সৃষ্টির সূচনা করিতেছে। কিন্তু বাংলা ভাষায় এই সম্বন্ধে ব্যাপক ভাবে আলোচনা করিয়া কোন পুস্তক লেখা হইয়াছে বলিয়া জানি না। অনেকদিন যাবৎই এই জাতীয় একখানা বই লেখার ইচ্ছা ছিল। তাই ১৯২৩ অব্দে "বিদ্রোহী প্রাচ্য" নামে একখানা বই লিখিতে আরম্ভ করি। সে বই ২১ ফর্ম্মা ছাপা হওয়ার পরই জেলে যাইতে হয়। কাজেই বই ছাপা বন্ধ থাকিল। জেলে যাইয়া বইখানা আবার নূতন করিয়া লিখিতে আরম্ভ করি।...বাহিরে আসিয়া বইখানাকে স্থানে-স্থানে অদল-বদল করিয়াছি এবং ছাপাইবার মুখে বইখানিতে ১৯২৯ অব্দ পর্য্যন্ত ঘটনা দেওয়ার চেষ্টা করিয়াছি।"

চিরদিন রাজনির্যাতিত গ্রন্থকার আজ আবার অন্তরায়িত।

বিদ্রোহ জীবনের স্বাভাবিক অবস্থা নয়। আজ ইউরোপের সহিত এশিয়ার সম্বন্ধ খাদ্য-খাদকের অস্বাভাবিক সম্বন্ধ, তাই এশিয়া আজ বিদ্রোহী। ইউরোপীয় সভ্যতা তাহাকে গ্রাস করিয়াছে বলিয়া সে আজ আত্মরক্ষার জন্য ইউরোপকে আঘাত করিতে পারে, আত্মপ্রতিষ্ঠ হইতে পারিলে তাহাকে রূপান্তরিত করিতে চেষ্টা করিতে পারে, কিন্তু তাহাকে উচ্ছেদ করার কথা তাহার মনে কোনদিনও স্থান পাইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। প্রাচ্য সভ্যতা ও আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতার মৌলিক প্রভেদ এইখানেই।

যাহা হোক এই বিদ্রোহের সূত্র ধরিয়া গ্রন্থকার চীন, শ্যাম, পারস্য ও তুরস্ক দেশে যে নবজীবনের সূত্রপাত হইয়াছে তাহার বিশদ বিবরণ দিয়াছেন। প্রসঙ্গক্রমে তাঁহাকে ঐসব দেশের প্রাচীনকালের ইতিহাস সঙ্কলন করিয়া আধুনিক কালের নবজাগরণের ভূমিকা করিতে হইয়াছে। এশিয়ার এই প্রতিবেশী জাতিগুলির মধ্যে ইউরোপীয় সভ্যতার প্রতিক্রিয়া কি ভাবে চলিতেছে তাহা দেখাইতে গ্রন্থকার কৃতকার্য্য হইয়াছেন। তবে জাপান ভারতবর্ষ প্রভৃতি এশিয়ার অন্যান্য দেশগুলিতে ও প্রাচ্য ও প্রতীচ্য সভ্যতার সংঘাত বিশেষ বিশেষ রূপ সমস্যার সৃষ্টি করিয়াছে। সেগুলির কোন আলোচনা পুস্তকখানিতে অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভবপর হয় নাই। ইহাতে পুস্তকখানির পূর্ণতার হানি ঘটিয়াছে। ভবিষ্যৎ সংস্করণে এই ত্রুটি সংশোধিত হইলে পুস্তকের মূল্য বাড়িবে।

বইখানির ছাপা ও বাঁধাই বেশ ভাল। বর্ণাশুদ্ধি ও প্রাদেশিক পদপ্রয়োগ দূর করিতে পারিলে ভাষাও বেশ ভাল বলা যাইতে পারিবে।

শ্রীঅশ্বিনীকুমার ঘোষ



ভারতবর্ষ

করাচী কংগ্রেস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা—

কংগ্রেসের প্রতিনিধি।—করাচী কংগ্রেসে উপস্থিত প্রতিনিধিদের সংখ্যা এইরূপ,—আজমীঢ় ২০১, বোম্বাই ২১, আসাম ৩০, বেরার ৪৭, ব্রহ্ম ১৯০, বাংলা ২০৫, বিহার ২১৬, মধ্যপ্রদেশ (হিন্দুস্থান) ৯১, দিল্লী ৮৩, গুজরাট ১৭৪, কর্ণাটক ২০২, কেরল ৬২, মধ্যপ্রদেশ (মারাঠি) ৪২, তামিল নাড়ু ১৮৬, মহারাষ্ট্র ২০৭, পঞ্জাব ৩৪০, সিন্ধু ৬৭, যুক্তপ্রদেশ ৫৪৮, অন্ধ্র ২৪৬, উৎকল ৩৫, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত-প্রদেশ ৩০ জন। মোট ৩,২২৬ জন।

আয়-ব্যয়।—করাচী কংগ্রেসের আয়-ব্যয়ের হিসাব বাহির হইয়াছে। তাহাতে প্রকাশ, এবার কংগ্রেস-অভ্যর্থনা-কমিটির আয় হইয়াছে মোট দুই লক্ষ আশী হাজার টাকা। ইহার মধ্যে এককালীন দান আছে সত্তর হাজার টাকা। অনুমান ষাট হাজার হইতে আশী হাজারের মধ্যে টাকা উদ্বৃত্ত থাকিবে। নিখিল-ভারত কংগ্রেস কমিটিকে প্রতিনিধি-ফি বাবত পনর হাজার টাকা দেওয়া হইয়াছে।

তার-বার্ত্তা।—করাচীর কেন্দ্রীয় টেলিগ্রাম আপিস হইতে মোট পাঁচ লক্ষ শব্দ অর্থাৎ সংবাদ-পত্রের ছয় শত কলম সংবাদ প্রেরণ করা হইয়াছিল। দশ হাজার শব্দ বোম্বাই হইয়া ক্যানাডা, আমেরিকা এবং ইউরোপীয় বিভিন্ন খবরের কাগজে পাঠানো হইয়াছে।

ন্যাশনালিষ্ট মুসলমান দলের জাতীয়তাপাদক প্রস্তাব—

নিখিল-ভারত জাতীয় মুসলমান সম্মেলনের গত লক্ষ্ণৌ অধিবেশনে অন্যান্য প্রস্তাবের মধ্যে এই প্রস্তাবটিও গৃহীত হইয়াছে। কংগ্রেসের ভূতপূর্ব্ব সভাপতি ডাঃ এম এ আনসারী সভায় ইহা উত্থাপন করেন। প্রস্তাবটি জাতীয়তাপাদক হওয়ায় ইহাতে হিন্দু-মুসলমানের মিলন-সূত্র পাওয়া যাইবে। প্রস্তাবটির মর্ম্ম এইরূপ—

জাতীয় মুসলমান দলের অভিমত এই যে, ভারতের ভাবী রাষ্ট্রতন্ত্র প্রণয়নকালে এই কয়টি বিষয়ের উপর লক্ষ্য রাখিয়া নিখিল-ভারত এবং প্রাদেশিক রাষ্ট্র-সভা গঠন করিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। (১) সাবালক মাত্রেরই ভোটাধিকার, (২) যুক্ত নির্ব্বাচকমণ্ডলী, (৩) যে-যে লঘিষ্ঠ সম্প্রদায় সংখ্যায় শতকরা ত্রিশ জনের কম তাঁহাদিগের জন্য রাষ্ট্র-সভায় সংখ্যার অনুপাতে আসন-সংরক্ষণ। তাঁহাদের অতিরিক্ত সদস্য পদপ্রার্থী হইবারও ক্ষমতা থাকা চাই। কতকগুলি লোক বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে ঈর্ষ্যা দ্বন্দ্ব প্রজ্বলিত রাখিবার প্রয়াস পাইতেছে বলিয়াই জাতীয় মুসলমান দল প্রস্তাবটির তৃতীয় দফা সর্ত্ত করিতে বাধ্য হইলেন। যুক্ত-নির্ব্বাচন এবং সাবালক মাত্রের ভোটাধিকার—এই দুইটিকে ভিত্তি করিয়া তাঁহারা ভারতবর্ষের যে-কোন দল বা সম্প্রদায়ের সঙ্গেই রফা করিতে রাজি আছেন।

জার্ম্মানীতে ডাক্তারি শিক্ষা—

জার্ম্মানীর ডয়চ্‌শে একাডেমির গবেষণা-বৃত্তি প্রাপ্ত ডাঃ শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র চৌধুরী জার্ম্মানীতে ডাক্তারি শিক্ষা সম্বন্ধে একটি বিবৃতি সংবাদ-পত্রের মারফত সম্প্রতি প্রকাশ করিয়াছেন। জার্ম্মানীতে ডাক্তারি পাঠেচ্ছু প্রত্যেক ভারতবাসীর এ বিষয়ে অবহিত হওয়া উচিত। আমরা বিবৃতির চুম্বক নিম্নে দিলাম।

ভারতবর্ষের প্রবেশিকা পরীক্ষা পাশ করিলেই যে-কেহ জার্ম্মানীর ডাক্তারি কলেজে ভর্ত্তি হইবার উপযুক্ত বিবেচিত হইয়া থাকে। তবে আই-এস-সি পাশ ছাত্রের পক্ষে পাঠ্য বিষয় অনুধাবন করা অপেক্ষাকৃত সহজ। যাঁহারা ডাক্তারির রসায়নের দিকটা অধ্যয়ন করিতে চান তাঁহাদিগকে লাটিন শিখিতে হইবে। প্রত্যেক বিদেশী ছাত্রের জার্ম্মান জানা অত্যাবশ্যক, কারণ জার্ম্মান ভাষাতেই সকল বিষয় শিক্ষা দেওয়া হয়। শিক্ষার্থীকে এগার 'সেমেষ্টার' কাল অধ্যয়ন করিতে হইবে। বৎসরে দুই সেমেষ্টার—গ্রীষ্ম ও শীত। গ্রীষ্মকালে তিন মাস এবং শীতকালে পাঁচ মাস ছাত্রগণ কলেজে পড়িয়া থাকে। প্রথম সেমেষ্টার এপ্রিল মাসে এবং দ্বিতীয় সেমেষ্টার অক্টোবর মাসে আরম্ভ হয়। যে কোন সেমেষ্টারেই ভর্ত্তি হওয়া চলে, তবে দ্বিতীয় সেমেষ্টার অর্থাৎ শীতকালে ভর্ত্তি হওয়াই সুবিধা। এগার সেমেষ্টারকে মোটামুটি দুই ভাগে ভাগ করা হয়। প্রথম পাঁচ সেমেষ্টারে ডাক্তারির পূর্ব্ব ক্লিনিক্যাল (Pre-clinical) এবং অপর ছয় সেমেষ্টারে ক্লিনিক্যাল অংশ শিখিতে হয়। পূর্ব্ব-ক্লিনিক্যাল অংশে আছে—ব্যবচ্ছেদ বিদ্যা, শারীরতত্ত্ব, জীবতত্ত্ব, উদ্ভিদ বিদ্যা, পদার্থ বিদ্যা, রসায়ন। নিদান, শল্য শাস্ত্র, ধাত্রী বিদ্যা, স্ত্রীরোগ, স্বাস্থ্যতত্ত্ব, ডাক্তারি ব্যবহার-শাস্ত্র, রোগ নির্ণয় তত্ত্ব (Pathology) ক্লিনিক্যাল অংশের অন্তর্ভুক্ত। পূর্ব্ব-ক্লিনিক্যাল বিভাগের পরীক্ষা ভারতবর্ষীয় বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের ফার্ষ্ট এম্-বির সমান। এই পরীক্ষা পাশ করিলে তবে ছাত্রগণকে ক্লিনিক্যাল অংশ শিখানো হয়। জার্ম্মানীতে এম-বি উপাধি নাই। ক্লিনিক্যাল বিভাগে পাস করিলে প্রত্যেক ছাত্রকেই এম্-ডি উপাধি দেওয়া হয়। ভারতবর্ষে এম্-বি পাশ করিয়া গেলে মাত্র এক বৎসরেই জার্ম্মানীর বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এম্-ডি উপাধি লাভ করা যাইবে। বার্লিন, বোন, ব্রেসলাউ, এরলাংগেন, হামবুর্গ, হাইডেলবের্গ, য়েনা, কোলন, কীল, কনিগ্‌স্‌বের্গ, লাইপৎসিগ, মারবুর্গ, মুানিক, মুন্‌ষ্টার, রোষ্টক, তুবিংগেন, ভুর্ত্সবুর্গ, ডুসেলডর্ফ—জার্ম্মানীর এই বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে ডাক্তারি পড়ানো হয়।

—

বাংলা

ডাঃ শ্রীসুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—

শ্রীযুত সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮৮৮ সালে ফরিদপুর জেলার নড়িয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯০৪ সনে চাঁদপুর হইতে প্রবেশিকা



রোগশয্যায় শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কুচবিহার কলেজে ভর্ত্তি হন। কুচবিহারে অধ্যয়নকালে বঙ্গ-ভঙ্গের প্রতিবাদস্বরূপ স্বদেশী আন্দোলন সুরু হয়। ছাত্রাবস্থায় সুরেশচন্দ্র আন্দোলনে যোগদান করিয়াছিলেন। যথাসময়ে বি-এ পাশ করিয়া তিনি কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজে প্রবেশ করেন এবং ১৯১৩ সনে সম্মানের সহিত এম্‌-বি পাশ করেন। এই সময়ে হিন্দুশাস্ত্র অধ্যয়ন করিবার জন্য সুরেশচন্দ্র কাশী, হরিদ্বার প্রভৃতি স্থানে গমন করিয়াছিলেন। পরে ফিরিয়া আসিয়া ফরিদপুরে ডাক্তারি ব্যবসা আরম্ভ করেন। দেড় বৎসর পরে সুরেশবাবু ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল সার্ভিসে যোগদান করিয়া বিশিষ্ট বীজাণুতত্ত্ববিদের পদ লাভ করেন। এই কার্য্য করিতে করিতে ক্যাপটেন-আই-এম-এস উপাধি প্রাপ্ত হন।

১৯২০ সনে কলিকাতায় কংগ্রেসে অসহযোগ প্রস্তাব গৃহীত হইলে সুরেশচন্দ্র সরকারি চাকুরিতে ইস্তফা দিয়া স্বদেশ সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। কংগ্রেসের গঠনমূলক কার্য্যে সুরেশ-বাবুর কৃতিত্ব অনেক। ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ প্রমুখ কয়েকজন কর্ম্মীকে লইয়া সুরেশচন্দ্র কুমিল্লা শহরের অনতিদূরে 'অভয়-আশ্রম' প্রতিষ্ঠা করেন। সঙ্ঘবদ্ধভাবে চরকায় সূতা কাটা ও খদ্দর বয়ন, দুঃস্থদের চিকিৎসার জন্য হাসপাতাল স্থাপন এবং ইতরভদ্রনির্ব্বিশেষে সকলকে বিনা মূল্যে ঔষধ দান, পংক্তি ভোজনাদিতে উৎসাহ দিয়া অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ এবং তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর মধ্যে শিক্ষা-বিস্তারকল্পে নৈশবিদ্যালয়াদি পরিচালনা আশ্রমের কর্ম্মিগণের কার্য্য।

গত বৎসরের আইন অমান্য আন্দোলনেও সুরেশবাবু কায়মনে যোগদান করিয়াছিলেন। সুরেশচন্দ্র কংগ্রেসের নির্দ্দেশে লবণ-আইন ভঙ্গ করিবার জন্য স্বেচ্ছাসেবকদল লইয়া বাঁকুড়া হইতে পদব্রজে কাঁথি গমন করেন। বাংলায় তিনিই সর্ব্বপ্রথম লবণ-আইন ভঙ্গ করিয়া কারাবরণ করিয়াছেন। তাঁহার আড়াই বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ড হইয়াছিল। কিন্তু দুরারোগ্য অস্থি-ক্ষয়রোগে আক্রান্ত হইয়া কারাবাসের কাল পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই তিনি বিনা সর্ত্তে মুক্তিলাভ করেন। সুরেশ বাবু এখনও এই ব্যাধিতে কষ্ট পাইতেছেন।

সুরেশচন্দ্র 'চিরকুমার থাকিয়া দেশ-সেবায় কায়মন সমর্পণ করিয়াছেন। তাঁহার আদর্শে অনুপ্রাণিত হইলে শিক্ষিত জনেরা দেশের প্রভূত কল্যাণ সাধন করিতে পারিবেন।

সলিলা শক্তিমন্দির—

নারীর দায়িত্ব অনেক। দায়িত্ব যথাযথ পালন করিতে হইলে তাঁহার শিক্ষার বিশেষ প্রয়োজন। শরীরচর্চ্চা, বিদ্যা-অর্জ্জন, ঘরকন্নার কাজ, শিশু-পালন, গৃহ শিল্পাদি শিক্ষা নারীর অবশ্য কর্ত্তব্য।

কেন-না তিনি সন্তানের জননী ও পালনকারিণী, সহধর্ম্মিণী, গৃহলক্ষ্মী এবং সমাজের সেবিকা। নারী যাহাতে আত্মমর্য্যাদা রক্ষা করিয়া জীবনের বিচিত্র কর্ম্ম পরিপাটিরূপে করিয়া যাইতে পারেন তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই সলিলা শক্তিমন্দিরে শিক্ষা দেওয়া হয়। ১৩৩৪ সালে ৪৫০ কালীঘাট রোডে প্রতিষ্ঠা অবধি শক্তিমন্দির উপযুক্ত শিক্ষক ও শিক্ষয়িত্রীর দ্বারা পরিচালিত হইয়া আসিতেছে। চরকায় সুতা-কাটা ও অন্যান্য গৃহশিল্প. সঙ্গীত, স্তোত্র ও সাধারণ শিক্ষা, যুযুৎসু ও অন্যবিধ ব্যায়াম নিয়মিত ভাবে শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। শক্তি-মন্দিরের পরিচালনার জন্য দুইটি কমিটি আছে—(১) পৃষ্ঠপোষক ও উপদেশক কমিটি, (২) মহিলা কার্য্যকরী কমিটি। স্যর নীলরতন সরকার ক্যাপ্টেন জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ ব্যক্তিগণ প্রথম কমিটিতে আছেন। দ্বিতীয় কমিটি শ্রীযুক্তা উষা মুখোপাধ্যায়. উর্ম্মিলা বসু, শ্রীমতী লীলা দেবী প্রভৃতি মহিলাগণ দ্বারা পরিচালিত। মহিলাগণের অক্লান্ত পরিশ্রমে প্রতিষ্ঠানটিব উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে। এখানকার অধিকাংশ ছাত্রীই অবৈতনিক। এরূপ প্রতিষ্ঠান চালাইতে হইলে অর্থের প্রয়োজন। যাঁহারা শক্তিমন্দিরে অর্থদান করিতে ইচ্ছুক তাঁহারা সাধারণ সম্পাদিকা শ্রীমতী লীলা দেবীর নামে মন্দিরের ঠিকানায় ইহা পাঠাইতে পারেন। এরূপ প্রতিষ্ঠান যত হয় ততই ভাল।

বয়েজ নার্সারি হোম—

শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমের ভূতপূর্ব্ব ছাত্র শ্রীযুক্ত অশোককুমার গুপ্ত কলিকাতায় একটি শিক্ষালয় স্থাপিত করিয়াছেন। শিক্ষকগণের তত্ত্বাবধানে সকাল বিকাল ছাত্রগণ অধ্যয়ন করিয়া থাকে। এখানে সঙ্গীত-চর্চ্চারও ব্যবস্থা আছে। ছাত্রগণের শারীরচর্চ্চার দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখা হয়। মেস্তর পি, কে, গুপ্ত ছাত্রগণকে সপ্তাহে একদিন ব্যায়াম শিক্ষা দিয়া থাকেন। অন্যবিধ খেলাধুলারও আয়োজন আছে। মাঝে মাঝে ছাত্রগণকে চিড়িয়াখানা, যাদুঘর, এমন কি কলিকাতার বাহিরেও লইয়া যাওয়া হয়। বিদ্যালয়ের সংলগ্ন ছাত্রাবাসে অশোকবাবুর তত্ত্বাবধানে কয়েক-জন ছাত্র বাস করে। শিশুগণকেও এই ছাত্রাবাসে রাখা হয়। পরলোকগত স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, স্যর মাইকেল স্যাড্‌লার প্রমুখ শিক্ষাবিদ্‌গণ বিদ্যালয়ের শিক্ষাপদ্ধতির ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছিলেন। ১৯১৭, ৮ই মার্চ্চ মাত্র তিনটি ছাত্র লইয়া অশোকবাবু বিদ্যালয় আরম্ভ করেন। তাঁহার অদম্য অধ্যবসায়ে প্রতিষ্ঠানটির দিন দিন উন্নতি হইতেছে। বর্ত্তমান স্কুলগৃহটি কলিকাতার ৬নং নলিন সরকার ষ্ট্রীটে অবস্থিত।

ডাঃ শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত—

ডাঃ শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত বাকরগঞ্জের অন্তর্গত গৈলাগ্রামের অধিবাসী। সুরেন্দ্রনাথ প্রথমতঃ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে দর্শন শাস্ত্রে ডাক্তার উপাধি প্রাপ্ত হন। পরে কেম্ব্রিজের ট্রিনিটি কলেজে গবেষণা-ছাত্ররূপে দর্শনের চর্চ্চা করেন এবং ডাক্তার উপাধি লাভ করেন। কেম্ব্রিজের প্রতিনিধি স্বরূপ ১৯২১ সনে প্যারিসের আন্তর্জাতিক দর্শন কংগ্রেসে গমন করেন। ১৯২৪ সনে নেপ্‌লসে পঞ্চম আন্তর্জাতিক কংগ্রেসে, ১৯২৫ সনে রুমিয়ার বিজ্ঞান একাডেমিতে, ১৯২৬ সনে হার্ভার্ডে ষষ্ঠ আন্তর্জাতিক কংগ্রেসে যোগদান করেন। সুরেন্দ্রনাথের বয়স এখন ৪৪ বৎসর। তিনি ইতিমধ্যেই ইংরেজীতে 'হিন্দুরহস্যবাদ', 'যোগদর্শন', 'ভারতীয় আদর্শের উন্নতি' সম্বন্ধে পুস্তক লিখিয়াছেন। 'ভারতীয় দর্শনের ইতিহাস' নামে তাঁহার একখানি পুস্তক কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস হইতে প্রকাশিত হইয়াছে।

সাত বৎসর পূর্ব্বে সুরেন্দ্রনাথ প্রেসিডেন্সী কলেজের দর্শন বিভাগে কার্য্য আরম্ভ করেন। সম্প্রতি ইনি সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হইয়াছেন। ব্রাহ্মণসভার বিরুদ্ধ-আন্দোলন সত্ত্বেও অ-ব্রাহ্মণই এবার অধ্যক্ষ হইলেন।

শিক্ষার জন্য দান—

টাঙ্গাইল, লাউহাটি নিবাসী শ্রীযুত আরকান খাঁ স্বগ্রামে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য পাঁচ হাজার টাকা দান করিয়াছেন। সম্প্রতি তিনি দরিদ্র হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে প্রায় দুই হাজার টাকার বস্ত্র বিতরণ করিয়াছেন। টাঙ্গাইলের কবরখোলা মেরামতের জন্যও তিনি পাঁচ শত টাকা দিয়াছেন। এ-পি

যাদবপুরে প্রাথমিক শিক্ষা—

কলিকাতার সন্নিকট যাদবপুরের জমীদার মুন্সী মহম্মদ ইস্‌মাইল হিন্দু-মুসলমান বালকগণের শিক্ষার জন্য একটি অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন। তিনি এই নিমিত্ত একটি বাড়িও প্রস্তুত করাইয়াছেন। তাহাতে এককালে ১০০টি ছাত্র বসিয়া পড়িতে পারিবে। বালকগণের খেলাধুলার জন্য স্কুলের সংলগ্ন দুই বিঘা জমিও দান করিয়াছেন। গরীব ছাত্রগণকে পুস্তক ছাড়া খাইতে পরিতেও দেওয়া হয়। হিন্দু ও মুসলমান ছাত্রদের মধ্যে কোন পার্থক্য করা হয় না।

অস্পৃশ্যতা-বর্জ্জন—

সম্প্রতি যশোহর জেলার অন্তর্গত কালিয়ার নিকটবর্ত্তী মজাপুর গ্রামে সার্ব্বজনীন শিবপূজা ও মহোৎসব উপলক্ষে বিভিন্ন স্থান হইতে নমঃশূদ্র প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর প্রায় পনর হাজার হিন্দু মিলিত হইয়াছিল। নড়াইলের উকিল শ্রীযুক্ত আশুতোষ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের সভাপতিত্বে এক বিরাট সভার অধিবেশন হয়। উক্ত সভায় সর্ব্ব-সম্মতিক্রমে নিম্নলিখিত মন্তব্য গৃহীত ও সর্ব্বতোভাবে কার্য্যে পরিণত হয়:—

"জাতির এই জীবন-মরণের সন্ধিক্ষণে হিন্দু-সমাজের বর্ত্তমান সমস্যাপূর্ণ অবস্থা বিশেষরূপে বিবেচনা করত দেশ ও সমাজের কল্যাণকল্পে এই সভা মন্তব্য করিতেছে যে, হিন্দুসমাজের প্রচলিত অস্পৃশ্যতা দোষ শাস্ত্র, নীতি ও মনুষ্যত্ব-বিরুদ্ধ বিধায় সর্ব্বতোভাবে পরিত্যজ্য এবং তদনুসারে বিভিন্ন শ্রেণীর হিন্দুদিগের মধ্যে মন্দির-প্রবেশ, পূজা ও পানীয় বিষয়ের চির-আচরিত বাধা ও ব্যবধান অদ্য হইতেই দূরীভূত হউক।"

বিধবাবিবাহ সম্মিলনী—

সম্প্রতি কলিকাতার আর্য্যসমাজ হলে শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্রের নেতৃত্বে বঙ্গীয় বিধবাবিবাহ সম্মিলনীর এক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। বিধবাগণের সামাজিক, আর্থিক, নৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা ও বক্তৃতাদির পর এই প্রস্তাবগুলি সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইয়াছে.—

(১) এই সম্মিলনী যুবকগণকে, বিশেষত মৃতদারগণকে, সানুনয় অনুরোধ করিতেছে যে, বর্ত্তমান সমাজ-সমস্যা দূর করিবার জন্য তাঁহারা যেন বিধবা বিবাহই করেন।

(২) এই সম্মিলনী বিশেষভাবে জ্ঞাত হইয়াছে যে, নবদ্বীপে বঙ্গীয় বিধবাদিগের অবস্থা অতীব শোচনীয় এবং তথা হইতে তাহাদের আরও কদর্য্য স্থানে লইয়া যায়। এই সম্মিলনী উক্ত কদর্য্য বিষয়ে হিন্দুসমাজের নেতাদিগের মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছে এবং তাঁহাদিগের নিকট সানুনয় অনুরোধ করিতেছে যে, তাঁহারা যেন এইরূপ বিধবাদের উদ্ধারকল্পে বা রক্ষণে কোন উপযুক্ত পন্থা অবলম্বন করেন।

—

বিদেশ

স্পেনে গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা—

স্পেনের ভূতপূর্ব্ব রাজা য়্যালফোন্সো স্বদেশ ত্যাগের প্রাক্কালে এক বিবৃতিতে স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন যে, স্পেনবাসীরাই স্পেনের ভাগ্য-বিধাতা। স্বদেশ প্রেমে উদ্বুদ্ধ হইয়াই তিনি বিনা রক্তপাতে সিংহাসন ত্যাগ করিয়া দেশত্যাগী হইলেন। স্পেনের দুর্দ্ধর্ষ নৃপতি, যিনি এক মাস পূর্ব্বেও স্পেনের ভাগ্যনিয়ন্তা ছিলেন, তিনি হঠাৎ জনমতের অঙ্গুলি হেলনে বিনা বাক্যব্যয়ে কেন তখ্‌ত ছাড়িয়া দিলেন তাহা ভাবিবার বিষয়। স্পেন এক রাষ্ট্রের অধীন থাকিলেও কখনও এক 'নেশ্যন' হয় নাই। বিভিন্ন জাতি, ভাষা, কৃষ্টি স্পেনকে চিরতরে বিভক্ত করিয়া রাখিয়াছে। রাজতন্ত্র যুগে যুগে সকল ক্ষমতা প্রয়োগ করিয়া ইহার একতাপাদন করিতে প্রয়াস পাইয়াছে সত্য, কিন্তু তাহাতে ইহা স্পেনের বিভিন্ন অংশের বিষ নজরেই পড়িয়াছিল। স্পেন রোম্যান্ ক্যাথলিক, তাহার প্রধান অবলম্বন 'চার্চ্চ' এবং অভিজাত সম্প্রদায়। ১৮৭৬ সনে একবার স্পেনে গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হয়। পরে স্পেনের রাজতন্ত্রীদের চক্রান্তে দ্বাদশ য়্যালফোন্সো সিংহাসন লাভ করেন। জনগণ তাঁহাকে মানিয়া লইতে রাজি হইল না, 'বে-আইনী রাজা' বলিয়া তিনি আখ্যাত হইলেন। স্পেনের ভূতপূর্ব্ব রাজা ত্রয়োদশ য়্যালফোন্সো এই 'বে-আইনী রাজা'র পুত্র, কাজেই তিনিও বে-আইনী, সাধারণের অবজ্ঞেয়। য়্যালফোন্সো ১৯২৩ সনে প্রিমো ডি রিভেরাকে সর্ব্বাধ্যক্ষ (dictator) নিযুক্ত করিলেন। রিভেরা নিমকহারাম নহেন, সর্ব্বাধ্যক্ষ হইয়াই স্পেনের পার্লেমেন্ট কোর্তেজ (Cortes) বন্ধ করিয়া দিলেন। চারিদিকে বিদ্রোহবহ্নি ছড়াইয়া পড়িল। গণতন্ত্রী য্যাকলো জামোরা ঘোষণা করিলেন, "the Spanish crown is the most illegitimate thing in Spain, because it is unconstitutional"—অর্থাৎ স্পেনের রাজতন্ত্র আদৌ নিয়মানুগ নহে, এই জন্য এখানে ইহার মত বে-আইনী প্রতিষ্ঠান আর দুইটি নাই। বিদেশী দ্রব্যের উপর অতিরিক্ত শুল্ক স্থাপন, অনার্জ্জিত আয়ের উপর কর নির্দ্ধারণ, স্পেনের বিদেশী ব্যবসায়ের মূলধনের ছয় দশমাংশ স্পেনীয়-করণ, বড় বড় রাস্তা ও গৃহ নির্ম্মাণ, তৈলের খনি ও অন্যান্য গভব খনি স্পেন-সরকারের এক চেটিয়া করা—রিভেরা দেশের হিতকল্পে এই সকল উপায় অবলম্বন করিলেও জনগণের দৈন্য ঘুচিল না। কারণ সরকারের উপর জনসাধারণের আস্থা নাই, তাহারা সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করিতে নারাজ। স্পেনের মুদ্রা 'পেসেটা'র (১ পেসেটা=১০ পেন্স) বিনিময়ের হার প্রতি পাউণ্ডে আটাশ হইতে পঁয়ত্রিশে নামিয়া গেল। সাধারণের দুর্দ্দশার আর অন্ত রহিল না। দিন দিন কর বৃদ্ধি হইতে লাগিল এবং তাহা তাহাদের পক্ষে বোঝার উপরে শাকের আটি হইল। স্পেনের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিও রিভেরার দৃষ্টি এড়াইতে পারিল না। ছাত্র ও শিক্ষকগণই সর্ব্বত্র আন্দোলন জীয়াইয়া রাখে। তাঁহাদিগকে সমূলে নিপাত করিবার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলিই তুলিয়া দেওয়া হইল। ছাত্রেরা দেশময় ছড়াইয়া পড়িল এবং দেশময় রাজতন্ত্রের দৌরাত্ম্যের বিরুদ্ধে অসন্তোষ প্রচার করিতে লাগিল। নেতারা দলে দলে কারারুদ্ধ হইলেন। বিদ্রোহদমনে বিফলমনোরথ হইয়া ১৯২৯ সনে রিভেরা পদত্যাগ করিলেন। বেরেঙ্গুয়ের সর্ব্বাধ্যক্ষ নিযুক্ত হইলেন, কিন্তু তিনিও বৎসরাধিক চেষ্টা করিয়াও বিদ্রোহ প্রশমিত করিতে পারিলেন না। অতঃপর গত ফেব্রুয়ারী মাসে তিনিও পদত্যাগ করিলেন। রাজতন্ত্রী জুয়ান আজনায়ের নেতৃত্বে মন্ত্রীসভা গঠিত হইল। গণতন্ত্রের সঙ্গে দীর্ঘ আট বৎসরব্যাপী লড়াইয়ে রাজতন্ত্র বেশ ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। রাজতন্ত্রের বিরোধী দলসমূহের নেতাদের সঙ্গে রাজা কথাবার্ত্তা সুরু করিলেন। সাধারণের মনোভাব বুঝিয়া য়্যালফোন্সো নূতন মুনিসিপাল নির্ব্বাচনের আদেশ দিলেন এবং বলিলেন যে, নির্ব্বাচনে গণতন্ত্রের জয় হইলে তিনি সিংহাসন ত্যাগ করিতে রাজি আছেন।



বন্দুক চালনায় কৃতী বাঙালী বালক শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ভাদুড়ী

অবশেষে, গণতন্ত্রেরই জয় হইল। রাজা পুত্রের স্বপক্ষে সিংহাসন ত্যাগ করিলেন। কিন্তু গণতন্ত্রীরা সকল অশান্তির আকর রাজতন্ত্রকেই উচ্ছেদ করিতে চান। রাজা য়্যালফোন্সো অগত্যা স্ত্রী-পুত্র সমভিব্যাহারে দেশ ছাড়িয়া প্যারিসে উপনীত হইলেন।

স্পেনে বিনা রক্তপাতে গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। সামরিক আইনে দণ্ডিত জ্যামেরা কারামুক্ত হইয়াই সামরিকভাব রিপব্লিকের সভাপতি মনোনীত হইয়াছেন। স্পেনের পার্লামেন্ট কোর্তেজের প্রতিনিধি নির্ব্বাচন এখনও হয় নাই। ইতিমধ্যেই পোর্তুগাল, বেলজিয়াম, আর্জেন্টাইন রিপাব্লিক, ফ্রান্স ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্য স্পেনের গণতন্ত্র স্বীকার করিয়া লইয়াছেন।

বন্দুক চালনায় বাঙালী বালকের কৃতিত্ব--

শ্রীমান দেবেন্দ্রনাথ ভাদুড়ী ইংলণ্ডের সামারসেটের অন্তর্গত টণ্টন্ স্কুলে পড়ে। বিলাতে স্কুল ও কলেজে সামরিক শিক্ষার ব্যবস্থা আছে এবং ছাত্রদের জন্য একটি স্বতন্ত্র সৈন্যদল আছে। এই ছাত্র সৈন্যদলের নাম O.T.C. অর্থাৎ অফিসার্স্ ট্রেনিং কোর। স্কুল ও কলেজের ছাত্রেরা ইচ্ছা করিলে এই O.T.C.তে যোগ দিয়া বন্দুক ছোঁড়া, ড্রিল ইত্যাদি শিখিতে পারে। শ্রীমান দেবেন্দ্রনাথও ইহাতে যোগ দিয়াছে। গত মার্চ্চমাসে ইংলণ্ডে সমগ্র ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বন্দুক ছোঁড়ার প্রতিযোগিতা হয়। তাহাতে ছাত্রদের মধ্যে এই বালকটি প্রথম হইয়াছে। দেবেন্দ্রনাথের বয়স চৌদ্দবৎসর মাত্র। এত অল্প বয়সে বিলাতের ছেলেরাও 'ব্রিটিশ এম্পায়ার শুটিং টেষ্ট'এ যোগ দিতে ভরসা পায় না। যাহারা যোগ দিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে দেবেন্দ্রনাথ বয়ঃকনিষ্ঠ ছিল। বিলাতে এই বাঙালী বালকের খুব প্রশংসা হইয়াছে।

মীরা বাঈ

শ্রীকালিকারঞ্জন কানুনগো, পি-এইচ. ডি

আমি সাধক ভক্ত কিংবা কবি নই; ইতিহাসের মরুপ্রান্তরে আমি অতীতের স্মৃতি খুঁজিয়া বেড়াই। সুতরাং ভক্তিবিলাসিনী কৃষ্ণপ্রেমোন্মাদিনী মীরার করুণ কাহিনী ভাবুক রসগ্রাহী বাঙালীর কাছে নূতন করিয়া বলিবার ক্ষমতা আমার আছে বলিয়া মনে হয় না।

মীরা বাঈ রাণা কুম্ভের স্ত্রী ছিলেন; তিনি বৈষ্ণব ভক্তদের সঙ্গে নিঃসঙ্কোচে মিশিতেন বলিয়া পতি কর্ত্তৃক অশেষ প্রকারে নির্যাতিত হন—এ সমস্ত কথা এখনও অনেকে অবিসংবাদী সত্য বলিয়া মনে করেন। অথচ উহা সর্ব্বৈব অসম্ভব ও মিথ্যা। মীরার পতি ও পিতৃকুলের সঠিক পরিচয় নিম্নলিখিত কুলপঞ্জী হইতে জানা যায়।

(মীরার পিতৃকুল)

- রাও চুণ্ডা রাঠোর
  - রিড়মল (রায়মল)
    - রাও যোধা
      - রাও সুজা (যোধপুর রাজ)
        - কুমার বাঘাজী
          - রাও গাঁগা
            - রাও মালদেব
      - দুদা (মেড়তা-সামন্ত)
        - বীরমদেব (১ম পুত্র)
          - জয়মল রাঠোর (চিতোর-দুর্গরক্ষক)
        - রাও রতনসিংহ
          - মীরা বাঈ

(মীরার পতিকুল)

- মহারাণা কুম্ভ
  - উদা (পিতৃহন্তা)
  - মহারাণা রায়মল
    - মহারাণা সংগ্রাম সিংহ
      - কুমার ভোজরাজ (মীরার স্বামী)
      - রতনসিংহ
      - বিক্রমজিৎ
        - মহারাণা উদয় সিংহ

রাণা কুম্ভ মীরার স্বামী নহেন—স্বামীর প্রপিতামহ! গান, দোহা এবং জনশ্রুতিতে মীরা বাঈকে "মেড়্তনী," অর্থাৎ মেড়্তা-বংশীয়া বলা হইয়াছে। যোধপুর-রাজ রাও যোধার পুত্র দুদা ১৫১৮ বিঃ সম্বত অর্থাৎ ১৪৬১ খৃষ্টাব্দে মেড়্তার সামন্ত-রাজ হইয়াছিলেন। দুদার জ্যেষ্ঠপুত্র বীরমদেবের জন্ম ১৪৭৭ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ মহারাণা কুম্ভের মৃত্যুর নয় বৎসর পরে। টড সাহেবই প্রথমে এই ভুল লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। মহারাণা কুম্ভ বিদ্যানুরাগী পরমবৈষ্ণব ছিলেন। তিনি 'গীত গোবিন্দ' কাব্যের 'রসিক-প্রিয়া' নামক টীকা লিখিয়া গিয়াছেন। মীরা বাঈ 'রাগ-গোবিন্দ' নামক কাব্য লিখিয়াছিলেন। সুতরাং "যোগ্যং যোগ্যেন যোজয়েৎ" এই নীতির অনুসরণ করিয়া জনশ্রুতি কুম্ভ ও মীরার মধ্যে দাম্পত্য সম্বন্ধ

স্থাপন করিয়াছে। চিতোর-দুর্গে মহারাণা কুম্ভ কর্তৃক প্রস্তুত "কুম্ভশ্যামজী"র এক মন্দির আছে; উহারই পাশে একটি বিষ্ণুমন্দির দেখা যায়—যাহাকে লোকে মীরা বাঈয়ের তৈয়ারী বলিয়া থাকে। হয়ত এই মন্দির দুইটির সান্নিধ্য দেখিয়াই ঐতিহাসিকের অঘটন-ঘটন-পটীয়সী বুদ্ধি নির্ম্মাতৃ-দ্বয়ের পতি-পত্নী সম্বন্ধ অনুমান করিয়া লইয়াছে, এ অনুমান অসম্ভব নহে।

আজমীঢ় হইতে যোধপুরের পথে, যোধপুর হইতে বিশ ক্রোশ উত্তর-পূর্ব্বে অসংখ্য বীরের রক্তসিঞ্চিত বীরপ্রসূ মেড়্‌তা ভূমি। মেড়্‌তা অতি প্রাচীন স্থান—লোকে ইহাকে মান্ধাতার আমলের শহর বলিয়া থাকে। যোধপুর-রাজ যোধার কনিষ্ঠ পুত্র দুদা ১৪৬১ খৃষ্টাব্দে মেড়্‌তা জনপদ "জাগীর" পাইয়াছিলেন। দুদাজী বীর ও পরম ভাগবত ছিলেন; তিনিই মেড়তার সুপ্রসিদ্ধ চতুর্ভুজদেবের মন্দির স্থাপনা করেন। চতুর্ভুজদেব মেড়তিয়া রাঠোরদের কুলদেবতা; এখনও তাহারা চতুর্ভুজজীর নামযুক্ত "পবিত্রা" শির-পেঁচের ন্যায় পাগড়ীর উপর বাঁধিয়া থাকে। দুদাজী জ্যেষ্ঠপুত্র বীরমদেবকে মেড়্‌তা এবং চতুর্থ পুত্র রতন সিংহকে মেড়্‌তার অধীনস্থ কুড়্‌কী, বাজোলী ইত্যাদি বারখানি গ্রাম দিয়াছিলেন। কুড়্‌কী গ্রাম রতন সিংহের একমাত্র কন্যা মীরার জন্মস্থান। মীরার জন্মের তারিখ সঠিক জানা যায় না; অনুমান তিনি ১৪৯৮ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি কোনো সময়ে ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন। (হরবিলাস সারদা বা সর্দ্দা-কৃত মহারাণা সাঁগা, ১ম ভাগ, পৃঃ ৯৯)।

অতি শৈশবাবস্থায় মাতৃবিয়োগ হওয়াতে মীরার মাতামহী তাঁহাকে প্রতিপালন করেন। মাতৃহীনা মীরার হৃদয়মরু বাল্যেই অপার্থিব প্রেমের পিপাসায় আকুল হইয়া গিরিধরলালজীকে আশ্রয় করিয়াছিল। গিরিধর-লালজীর মূর্ত্তি ত্রিভঙ্গ সুঠাম; বামহাতে গোবর্দ্ধন ধারণ করিয়া আছেন; ডানহাতে অধর-সংলগ্ন মুরলী। বালিকা আপনাহারা হইয়া গিরিধরলালজীর মন্দিরে খেলাধুলা করিত; তাহার মান-অভিমান অচেতন বিগ্রহকে জাগ্রত করিয়া তুলিয়াছিল। বয়ঃসন্ধিকালে মীরা গিরিধরলালকে আত্মসমর্পণ করিলেন। যাঁহার একহাতে গোবর্দ্ধন অন্যহাতে বাঁশরী, যিনি পূর্ণ ব্রহ্ম সনাতন, যাঁহার মধ্যে শৌর্য্য ও প্রেমের, প্রাবৃটের তড়িচ্ছটা ও শারদ জ্যোৎস্নার অপূর্ব্ব সমন্বয়, তিনি ছাড়া কে মীরার স্বামী হইবেন?

রাও দুদার মৃত্যুর পর বীরমদেব মেড়্‌তার গদীতে বসিলেন (১৫১৫ খৃঃ)। ১৫১৬ খৃষ্টাব্দে তিনি মহারাণা সংগ্রাম সিংহের জ্যেষ্ঠপুত্র কুমার ভোজদেবের সহিত মীরার বিবাহ দিলেন। বিবাহের উৎসবে মীরা গিরিধরলালজীকে ভোলেন নাই; তিনি বিগ্রহটি স্বামী-গৃহে লইয়া গেলেন। মীরার পার্থিব প্রেমের স্বপ্ন কালের কটাক্ষে সহসা টুটিয়া গেল; সম্ভবতঃ ১৫১৮ ও ১৫২৩ খৃষ্টাব্দের মধ্যে তাঁহার পতি-বিয়োগ ঘটে। ১৫২৭ খৃষ্টাব্দে মহারাণা খানোয়ার যুদ্ধে বাবরের হাতে পরাজিত হইলেন। মীরার পিতা রতন সিংহ ও কাকা রায়মল যোধপুর রাজ রাও গাঁগার পক্ষ হইতে রাঠোর-সৈন্যের অধিনায়ক হইয়া মহারাণার সাহায্যার্থ আসিয়াছিলেন—তাঁহারা এই যুদ্ধে নিহত হন। মহারাণা সাঁগার মৃত্যুর পর রতন সিংহ (৫ই ফেব্রুয়ারি ১৫২৮—১৫৩১), এবং রতন সিংহের মৃত্যুর পর অকর্ম্মণ্য বিক্রমজিৎ মিবারের রাজা হইলেন। মীরা এতদিন শ্বশুরগৃহেই ছিলেন। তাঁহার অপূর্ব্ব ভক্তি ও ভাবোন্মাদনায় আকৃষ্ট হইয়া অনেক ভগবৎপ্রেমিক সাধু তাঁহার দর্শনার্থ চিতোরে আসিতেন। মীরা লোকলজ্জা উপেক্ষা করিয়া তাঁহাদের সঙ্গে হরিগুণ গান করিতেন। রাণা বিক্রমজিৎ এইজন্য মীরাকে নানা-রকম যন্ত্রণা দিয়াছিলেন। কথিত আছে, বিক্রমজিৎ বীজাবর্গী-জাতীয় এক বৈশ্য মহাজনের হাতে বিষের পেয়ালা মীরার কাছে পাঠাইয়াছিলেন। সে রাণীর দেউড়ীর কাছে গিয়া বলিল, রাণা আপনার জন্য চরণামৃত পাঠাইয়াছেন। মীরা চরণামৃত জ্ঞান করিয়া উহা পান করিলেন। লোকে বলে, মীরার শাপে বীজাবর্গীরা ছারখার হইয়া গিয়াছে--তাহাদের বংশ ও সম্পত্তির কখনও বৃদ্ধি হয় না। এখনও যোধপুর-সরকারে কোন বীজাবর্গী বানিয়া চাকরি পায় না। প্রবাদ আছে, মীরা বাঈয়ের উপর এই বিষের কোনো প্রতিক্রিয়া হয় নাই; দ্বারকাতীর্থে রণছোড়জীর মুখ হইতে উহা আবিরের ন্যায় বাহির হইয়া গিয়াছিল! মহারাণা বিক্রমজিতের ব্যবহারে ক্রুদ্ধ হইয়া বীরমদেব

অনাথা মীরাকে মেড়্তায় লইয়া আসিলেন। চিতোরলক্ষ্মী চিরতরে চিতোর ত্যাগ করিলেন। ১৫৩৫ খৃষ্টাব্দে গুজরাট-পতি বাহাদুর শাহ বিপুল সৈন্য লইয়া চিতোর অধিকার করিয়া প্রতিহিংসা চরিতার্থ করিল।

বীরমদেবের যত্ন ও ভালবাসায় মীরা কয়েক বৎসর মেড়্তায় শান্তিতে কাটাইলেন। এখানে তাঁহার এক শিষ্য জুটিল—ইনি বীরমদেবের বালকপুত্র জয়মল। মীরা গিরিধরলালজীর মূর্ত্তিটি সাজাইয়া প্রতিরাত্রে গীত বাদ্য ও নৃত্য করিয়া প্রেমাবিষ্ট হইতেন। মীরার গিরিধরলাল বহু শতাব্দীর স্মৃতি বুকে লইয়া আজও চতুর্ভুজ-জীর মন্দিরে বিরাজ করিতেছেন ; ভক্ত নাই, ভগবান আছেন। সর্ব্বপ্রকার বন্ধনমুক্ত ও অনন্যনির্ভর না হইলে ভগবৎ-প্রেমের চরমোৎকর্ষ ও লীলার পূর্ণ পরিণতি হয় না। এজন্য লোকে বলে,ভগবানের ভালবাসা সর্ব্বনেশে। গিরিধরলালজী মীরার পতিকুলের সর্ব্বনাশ করিয়া ক্ষান্ত হইলেন না। তাই তিনি নির্ম্মমভাবে মীরার শেষ আশ্রয় মেড়্তাকে ছারখার করিলেন। বন্ধুপ্রীতিই হউক, নারীপ্রেমই হউক, ভালবাসার রাজ্যে মানুষ ও দেবতা কেহই শরিক পছন্দ করে না। যতদিন বীরমদেব জয়মল আছেন, মেড়্তার রাজ-ঐশ্বর্য্য আছে, যতদিন মীরার ব্যথার ব্যথী কেহ থাকিবে, দরদ করিয়া "মীরা" বলিয়া ডাকিবার কেহ থাকিবে, ততদিন মীরা গিরিধরলালজীকে একান্ত আপনার বলিয়া পাইতে পারিবেন না। তাই তাঁহার ইচ্ছায় সংসারে মীরার শেষ আশ্রয় সাধের মেড়্তাও ধ্বংস হইল।

মেড়্তার রাজশ্রী ও ক্ষমতাদৃপ্ত দুর্দান্ত রাঠোর-গণের স্বাধীন ভাব যোধপুর-রাজ মালদেবের চক্ষুশূল ছিল। স্বাভাবিক জ্ঞাতি-শত্রুতা অন্য একটি কারণে আরও গুরুতর হইয়া উঠিল। বি. স. ১৫৮৬ (১৫২৯ খৃঃ) মালদেবের পিতা রাও গাঁগা আজমীঢ়ের সুবাদার দৌলৎ খাঁকে নাগোর-সীমান্তে এক যুদ্ধে পরাজিত করেন। দৌলৎ খাঁর হাতী পলাইয়া মেড়্তায় পৌঁছিলে বীরমজী উহা ধরিয়া ফেলিলেন। মালদেব ১৫৩১ খৃষ্টাব্দে (১৫৮৮ বিঃ সম্বত) যোধপুরের গদীতে বসিয়াই মেড়্তা ইত্যাদি স্ব-স্ব-প্রধান সামন্ত রাজ্যগুলির উচ্ছেদ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। ১৫৩৮ খৃষ্টাব্দে মালদেব দৌলৎ খাঁর সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া বীরমদেবকে মেড়্তার অধিকারচ্যুত করিলেন। পর বৎসর তিনি আজমীঢ় অধিকার করিয়া বীরমজীকে রাজপুতানা হইতে বাহির করিয়া দিবার জন্য সুপ্রসিদ্ধ সর্দ্দার জৈতা ও কুম্পাকে প্রেরণ করিলেন। বীরমজী কচ্ছবাহদিগের আশ্রয়গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহারা মালদেবের সহিত বিরোধ করিতে সাহস না করায় বীরমদেব রণ্থামভোরে এবং ঐ স্থান হইতে মণ্ডুর শাসনকর্ত্তা মল্লু খাঁর আশ্রয়গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলেন।

গিরিধরলালজীর ইচ্ছা পূর্ণ হইল। মীরা সংসারাশ্রম ত্যাগ করিয়া তীর্থভ্রমণে বাহির হইলেন। কথিত আছে, যাইবার সময় তিনি জয়মলকে আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন :—

> "বহুত বধে তেরো পরিবার।
> নহী হোয় কজিয়া মে হার॥"

মীরার বর সফল হইয়াছে। এখনও জয়মলের বংশজ মেড়্তিয়া রাঠোর সংখ্যায় সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, এবং ঝগড়া, বিবাদ ও যুদ্ধে সকলের অগ্রণী। মারবাড়ে প্রসিদ্ধি আছে—

> জান রাউদনৈ মরননে ঊদা।

অর্থাৎ উদাবতগণকে বরযাত্রায় এবং দুদাবতগণকে লড়ন-মরণের ব্যাপারে চটপটে দেখায়।

মীরার জীবনের অবশিষ্টাংশ আমরা আলোচনা করিব না। ভক্তি ও আধ্যাত্মিকতার রাজ্যে ঐতি-হাসিকের বিচার-বিভ্রমের আশঙ্কা অধিক। যাঁহারা ভক্ত ও বিশ্বাসপ্রবণ তাঁহারা সমসাময়িক গ্রন্থকার নাভাজী-রচিত "ভক্তমাল" গ্রন্থে মীরার জীবনী পাঠ করিবেন। মীরার সঙ্গে আকবরের সাক্ষাৎ ও রাজনীতি-শিক্ষা, তান শাহ্র (অপভ্রংশ তানসেন) সঙ্গীত-শিক্ষা, তুলসীদাসের সহিত পত্র-ব্যবহার ইত্যাদি যে-সমস্ত কাহিনী ভক্তদের কাছে শুনা যায় উহা সম্পূর্ণ কাল্পনিক ; ইঁহারা কেহই মীরার সমকালীন নহেন। মীরার সরল সরস, ভক্তিবিষয়ক হিন্দী ও গুজরাতী ভাষায় গান ও দোঁহা ভারতবর্ষের

সর্ব্বত্র সমানভাবে সমাদৃত। তাঁহার মল্লার রাগ পশ্চিম-ভারতে বিশেষ প্রসিদ্ধ।

ভক্তেরা বলেন, মীরা দ্বারকায় "রণ্‌ছোড়জী"র মন্দির-দর্শনে গিয়াছিলেন। রাণা উদয় সিংহ মীরাকে ফিরাইয়া আনিবার জন্য দ্বারকায় কয়েকজন ব্রাহ্মণ পাঠাইয়াছিলেন। তিনি কিছুতেই গৃহমুখী হইতে সম্মত না হওয়ায় ব্রাহ্মণেরা ধন্না দিয়া মন্দিরে পড়িয়া রহিল। গিরিধরলালজীর কাছে শেষ প্রার্থনা জানাইয়া মীরা গাহিলেন—

মীরাকে প্রভু গিরিধর নাগর
মিল বিছুড়রণ নহী কীজে।

ইহার পর মীরাকে আর কেহ মরজগতে দেখিতে পায় নাই। যাঁহারা একান্ত ভক্ত তাঁহারা এখনও দেখিতে পান—রণছোড়জীর কুক্ষি হইতে মীরার বস্ত্রাঞ্চলের কিয়দংশ বাহির হইয়া আছে!*

* "হিন্দী মীরাবাঈকা জীবনচরিত্র" প্রণেতা ঐতিহাসিক মুন্‌শী দেবীপ্রসাদ মারবাড়ের জুঁনবে গ্রামের ভূরদান নামক এক ভাটের কাছে শুনিয়াছিলেন বি. সম্বত ১৬০৩ সালে মীরার মৃত্যু হয়, কিন্তু কোথায় হয় জানা নাই। মহামহোপাধ্যায় গৌরীশঙ্কর ওঝা ইহাই মীরার মৃত্যুর তারিখ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। এই প্রবন্ধ মুন্‌শী দেবীপ্রসাদজীর দুষ্প্রাপ্য 'মীরাবাঈকা জীবনচরিত্র' এবং গৌরীশঙ্করজীর 'রাজপুতানেকা ইতিহাস' (২য় খণ্ড অবলম্বনে লিখিত)।

বোম্বাই-প্রবাসী বাঙালী

শ্রীইন্দুভূষণ সেন

বঙ্গের বাহিরে বাঙালীদের কথা "প্রবাসী"তে মাঝে মাঝে বাহির হইয়া থাকে। কিন্তু বোম্বাই-এর বাঙালীদের কোনও কথা গত আটদশ বৎসরের ভিতরে বাংলার কোনও কাগজে চোখে পড়ে নাই। অথচ বোম্বাই শহরে বাঙালী যথেষ্ট আছেন এবং অনেকেই নিজ নিজ কর্ম্মজীবনে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন। প্রবাসীতে আজ তাঁহাদের একটু পরিচয় দিতেছি।

বোম্বাই ব্যবসায়-প্রধান শহর। ইহার বড় বড় কল কারখানা, আপিস, ব্যাঙ্ক, প্রভৃতি বোম্বাই-এর গুজরাটি, পার্শী,ও মুসলমান বণিকদের সমৃদ্ধির পরিচয় দিতেছে। এই ব্যবসায়-প্রধান শহরে যে কয়জন বাঙালী ব্যবসায়ে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের কথাই প্রথমে বলিতে চাই।

এখানকার ব্যবসায়ী বাঙালীদের মধ্যে প্রথমেই নাম করিতে হয় শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের। হুগলী জেলার বাগাটী গ্রামে তাঁহার নিবাস। বর্দ্ধমান ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুলের শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া প্রায় পনের বৎসর পূর্ব্বে তিনি মাত্র ৭৫৲ টাকা মাসিক মাহিনায় বোম্বাই-এর ফটক বালচাঁদ অ্যাণ্ড কোম্পানী নামক একটি ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানীর সামান্য চাকুরী লইয়া বোম্বাই প্রদেশে আসেন। একমাত্র নিজের পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের ফলে আজ তিনি প্রসিদ্ধ টাটা কনষ্ট্রাক্‌শন কোম্পানীর জেনারেল ম্যানেজারের পদে উন্নীত হইয়াছেন। ইঞ্জিনিয়ারিং এষ্টিমেটে শ্রীযুক্ত বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় একজন বিশেষজ্ঞ বলিয়া এখানে পরিচিত। সম্প্রতি বোম্বাই শহর হইতে পুনা যাওয়ার পথে পাহাড় কাটিয়া কয়েকটা সুড়ঙ্গ তৈয়ারী করিয়া জি. আই. পি. রেলওয়ের লাইন বসাইয়া তাঁহার কোম্পানী যথেষ্ট সুনাম অর্জ্জন করিয়াছে। শ্রীযুক্ত বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এখানকার বাঙালীদের সমস্ত অনুষ্ঠানের সহিত জড়িত। তিনি দুইবার স্থানীয় বেঙ্গল ক্লাবের সভাপতি ছিলেন। বোম্বাই-এর যে কত দুঃস্থ বাঙালীকে তিনি নানা রকমে সাহায্য করিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই।

শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র মৈত্র মহাশয় প্রায় ২০ বৎসর যাবৎ

বোম্বাই শহরে আছেন। নদীয়া শান্তিপুরে তাঁহার নিবাস। তিনি একজন বীমার দালাল। মৈত্র মহাশয় কেবলমাত্র ব্যবসায় ক্ষেত্রেই নিজেকে আবদ্ধ করিয়া রাখেন নাই।



শ্রীশিবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়



শ্রীজগদীশচন্দ্র মৈত্র
(× চিহ্নিত ব্যক্তি)

তিনি নানাবিধ খেলাধূলায় খুব উৎসাহী। তিনি 'দি স্পোর্টস্‌ম্যান' নামক একখানা ইংরেজী পাক্ষিক পত্রিকা সম্পাদন করিতেছেন। ওয়েষ্টার্ণ-ইণ্ডিয়া ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের তিনি একমাত্র ভারতীয় সভ্য। তাঁহার নিকট বাংলা দেশ বিশেষ ভাবে ঋণী। তিনি গত খুলনা দুর্ভিক্ষ ও উত্তর বঙ্গ বন্যাপ্রপীড়িতদের জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম ও চেষ্টার ফলে বোম্বাই হইতে প্রায় তিন লক্ষ টাকা তুলিয়া সাহায্যার্থ পাঠাইয়াছিলেন। মৈত্র মহাশয় একবার স্থানীয় বেঙ্গল ক্লাবের প্রেসিডেণ্ট ছিলেন।



শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র সেন, এম-এ, আই-সি-এস

শ্রীযুক্ত কালীচরণ দাশ মহাশয় প্রায় ৪৫ বৎসর যাবৎ বোম্বাই শহরে ব্যবসায়ে নিযুক্ত আছেন। তাঁহার নিবাস হুগলী জেলায়। তিনি এখানকার একজন প্রসিদ্ধ স্বর্ণকার। সোনার গহনাতে মণিমুক্তা প্রভৃতি বসানোর কার্য্যে তিনি যথেষ্ট নাম করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে বলিতে চাই যে, পূর্ব্ব ও পশ্চিম বঙ্গের প্রায় তিন শত বাঙালী এখানে স্বর্ণকারের ব্যবসায়ে নিযুক্ত আছেন। তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই হীরা বসানোর কার্য্যে যথেষ্ট নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়াছেন।



শ্রীপ্রফুল্ল চৌধুরী, এম-এ, বি-এল



শ্রীসুধাংশুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, এম-এ, পি-এইচ-ডি

এতদ্ব্যতীত আরও কতিপয় বাঙালী কলের কাপড়-চোপড়, ঢাকাই কাপড় ও বোতাম, যশোহরের চিরুণী ইত্যাদি নানা প্রকার জিনিষের এজেন্সী লইয়া ছোটখাট ব্যবসায় করিতেছেন।

যাঁহারা উচ্চ সরকারী পদে প্রতিষ্ঠিত আছেন এবার তাঁহাদের একটু পরিচয় দিতেছি। শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র সেন, এম-এ, আই-সি-এস, মহাশয় প্রায় পনের বৎসর যাবৎ বোম্বাই প্রদেশে আছেন। তিনি সোলাপুর, নাসিক, থানা প্রভৃতি বিভিন্ন জেলায় উচ্চ সরকারী পদে নিযুক্ত ছিলেন। বর্ত্তমানে তিনি বোম্বাই হাইকোর্টের রেজিষ্ট্রার। শ্রীযুক্ত সেন মহাশয়ের নাম সাহিত্য-জগতে সুপরিচিত। ইংরেজী কবিতা রচনায় তিনি সিদ্ধহস্ত। তিনি রবীন্দ্রনাথের অনেক কবিতা ও 'রাজা' নামক কথানাট্যখানি ইংরেজীতে অনুবাদ করিয়াছেন। খুলনা জেলার কালিয়া গ্রামে তাঁহার নিবাস।

শ্রীযুক্ত প্রফুল্ল চৌধুরী, এম-এ-বি-এল, মহাশয় প্রায় এক বৎসর যাবৎ এখানে আছেন। শ্রীহট্ট জেলায় তাঁহার নিবাস। তিনি ১৯১৫ সালে ভারত সরকারের রাজস্ব বিভাগের নিখিল ভারত প্রতিযোগিতা পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। বর্ত্তমানে তিনি বোম্বাই গভর্ণমেণ্টের ডেপুটি ফাইনানশ্যিয়াল অ্যাড্‌ভাইসরের কার্য্য করিতেছেন। রাজস্ব-বিভাগের কার্য্যে শ্রীযুক্ত চৌধুরী মহাশয় অত্যন্ত দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র ডাঃ শ্রীযুক্ত সুধাংশুকুমার বন্দ্যোপাধায় এম-এ, পি-আর-এস, পি-এইচ-ডি, মহাশয় প্রায় আট বৎসর যাবৎ বোম্বাই শহরে আছেন। তিনি কোলাবা মানমন্দিরের ডাইরেক্টরের কার্য্য করিতেছেন। তিনি এবার নাগপুরে প্রবাসী বাঙালীদের সাহিত্য-সম্মিলনে বিজ্ঞান-শাখার সভাপতি হইয়াছিলেন। ঢাকা, বিক্রমপুরে তাঁহার নিবাস।

শ্রীযুক্ত ঈড়েশচন্দ্র গুপ্ত এম্-এস্-সি মহাশয় প্রায় ছয় বৎসর যাবৎ বোম্বাইএ আছেন। তিনি বোম্বাই ট্যাকশাল-এর ডেপুটি অ্যাসে-মাষ্টার। তিনি একবার স্থানীয় বেঙ্গল ক্লাবের প্রেসিডেণ্ট ছিলেন। ঢাকা, মহেশ্বরদি পরগণায় তাঁহার নিবাস।



শ্রীঈড়েশচন্দ্র গুপ্ত, এম-এস-সি

শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি-এস্-সি, বি-ই মহাশয় প্রায় দেড় বৎসর যাবৎ ইণ্ডিয়ান ষ্টোরস্ ডিপার্টমেন্টের বোম্বাই শাখাতে কণ্ট্রোলার অব ষ্টোরস্এর কার্য্য করিতেন। চন্দননগরে তাঁহার নিবাস।

শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ সেন, বি-এ মহাশয় প্রায় সাত বৎসর যাবৎ বোম্বাইএর নিকটে এলিফেণ্টা দ্বীপের এলিফেণ্টা-গুহার রক্ষকের কার্য্য করিতেছেন। উক্ত গুহায় পাহাড়ের গায়ে খোদাই কতকগুলি বহু পুরাতন হিন্দু দেবদেবীর মূর্ত্তি আছে। শ্রীযুক্ত সেন মহাশয়ের চেষ্টার ফলে বর্ত্তমানে ঐ মূর্ত্তিগুলি অত্যন্ত যত্নের সহিত রক্ষিত হইতেছে এবং ভারতের অতীত যুগের শিল্পসমৃদ্ধির পরিচয় দিতেছে।

কিছুদিন পূর্ব্বে আরও কতিপয় বাঙালী এখানে উচ্চ সরকারী পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন কেহ-বা স্থানান্তরিত হইয়াছেন। ৺পি, এন, বসু, এম-এ, পোষ্টমাষ্টার জেনারেল, শ্রীযুক্ত ডি, ডি, ব্যানার্জি, এম-এ, এম-আই ই-ই, পোষ্টমাষ্টার জেনারেল, শ্রীযুক্ত জে, ঘোষাল, আই-সি-এস, কমিশনার অব্ একসাইজ, মহাশয়ের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।



শ্রীদেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, বি এস-সি, বি-ই

লাহোরের ট্রিবিউন পত্রের ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক প্রবীণ সাহিত্যিক, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয় প্রায় দশ বৎসরেরও অধিক কাল বোম্বাইয়ে বাস করিতেছেন। শ্রীযুক্ত গুপ্ত মহাশয়ের নাম সাহিত্য-সমাজে সুপরিচিত। প্রবাসীর পাঠক পাঠিকাদের নিকট তাঁহার পরিচয় দেওয়া নিষ্প্রয়োজন।

ভারতবর্ষের হাই কমিশনার শ্রীযুক্ত স্যর অতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের কনিষ্ঠ সহোদর শ্রীযুক্ত অমূল্যচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় অনেকদিন এসোসিয়েটেড প্রেস্ অব্ ইণ্ডিয়ার বোম্বাই বিভাগে উচ্চ পদে নিযুক্ত ছিলেন। সম্প্রতি তিন লিগ্ অফ্ নেশনস্-এর ভারত-সংক্রান্ত প্রচার বিভাগে নিযুক্ত হইয়া জেনেভাতে গিয়াছেন। শ্রীযুক্ত চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সামাজিক ব্যাপারে অত্যন্ত উদার-মতাবলম্বী ছিলেন।

তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী সুশীলা চট্টোপাধ্যায়ের সহিত বোম্বাই হাইকোর্টের ব্যারিষ্টার মিঃ সি, দপ্তরীর বিবাহ হইয়াছে। মিঃ দপ্তরী একজন সম্ভ্রান্ত বংশীয় গুজরাটী। জি-আই-পি, রেলওয়ের এ্যাসিষ্ট্যাণ্ট ট্রান্সপোর্ট সুপারিন্টেন্ডেণ্ট শ্রীযুক্ত নলিনীশঙ্কর সেন,



শ্রীনীরেন্দ্রনাথ ঘোষ

এম-এ মহাশয় তাঁহার কনিষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী প্রমীলা চট্টোপাধ্যায়কে বিবাহ করিয়াছেন।

ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে শ্রীযুক্ত নীরেন্দ্রনাথ ঘোষ, এ-এম-আই-ই-ই মহাশয়ের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। যশোহর জেলার বিদ্যানাথকাঠী গ্রামে তাঁহার নিবাস। শ্রীযুক্ত ঘোষ মহাশয় লণ্ডনের ফ্যারাডে



শ্রীনরেন্দ্রনাথ দত্ত, বি-এ

হাউসে শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া সেখানকার ডি-এফ-এইচ ডিপ্লোমা লাভ করিয়াছেন। বর্ত্তমানে তিনি হিট্‌লী অ্যাণ্ড গ্রেশাম অ্যাণ্ড কোম্পানী নামক একটী বিলাতী ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানায় বৈদ্যুতিক বিভাগের প্রধান কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইয়াছেন। তিনি প্রায় পঞ্চাশ বৎসর যাবৎ বোম্বাইয়ে আছেন। তিনি ৺মাইকেল মধুসূদন দত্ত মহাশয়ের আত্মীয়; ঘোষ মহাশয়ের মাতা কবিবরের ভ্রাতুষ্পুত্রী।

শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ দত্ত, বি-এ মহাশয় হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ বীমা কোম্পানীর বোম্বাই বিভাগের ম্যানেজারের পদে নিযুক্ত আছেন এবং অতীব দক্ষতার সহিত কার্য্য করিতেছেন। বরিশাল জেলায় তাঁহার নিবাস। প্রায় সাত বৎসর যাবৎ তিনি বোম্বাইয়ে আছেন। স্থানীয় বেঙ্গল ক্লাবের তিনি বর্ত্তমান প্রেসিডেণ্ট।

শিক্ষা-বিভাগে যে সব বাঙালী আছেন, তাঁহাদের মধ্যে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রেণুপদ কর, এম-এ, আই-ই-এস্ মহাশয়ের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। শ্রীযুক্ত কর



শ্রীপুলিনবিহারী দত্ত

মহাশয় প্রায় ছয় সাত বৎসর যাবৎ বোম্বাই শহরে আছেন এবং বর্ত্তমানে সেকেণ্ডারি ট্রেনিং কলেজের অধ্যক্ষের কার্য্য করিতেছেন। বোম্বাই-এর 'প্রার্থনা সমাজে'র নানাবিধ আন্দোলনের সহিত তিনি সংশ্লিষ্ট। বর্দ্ধমান জেলায় তাঁহার নিবাস।

বাঙালীর গৌরব দক্ষিণ হায়দ্রাবাদ প্রবাসী ডাঃ ৺অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় ডি, এস্-সি মহাশয়ের কন্যা শ্রীযুক্তা মৃণালিনী চট্টোপাধ্যায় বি-এ, মহাশয়া বোম্বাই-এর 'নিউ হাই স্কুল ফর গার্লস্' নামক একটি বালিকা বিদ্যালয়ের প্রিন্সিপাল। তিনি মান্দ্রাজ হইতে প্রকাশিত "শ্যামা" পত্রিকার সম্পাদিকা। তিনি এখানে ভারতীয় নারীদের মধ্যে, সাহিত্য নৃত্যগীত প্রভৃতি চারুশিল্পের চর্চ্চা প্রবর্ত্তিত করিবার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহার অনুপ্রেরণায় কিছুদিন পূর্ব্বে স্থানীয় বাঙালী, গুজরাটী ও পার্শী মহিলাদের দ্বারা রবীন্দ্রনাথের 'নটীর পূজা' ও 'রক্তকরবী' নাটক দুইখানি ইংরেজীতে অভিনীত হইয়াছিল।

শিল্পী শ্রীযুক্ত পুলিন বিহারী দত্ত মহাশয় প্রায় তিন বৎসর যাবৎ বোম্বাই-এর ফেলোশিপ স্কুলে আর্ট শিক্ষকের কার্য্য করিতেছেন। হুগলী জেলায় তাঁহার নিবাস। পশ্চিম ভারতে ভারতীয় শিল্পকলার আদর্শ প্রচার করিবার জন্য পুলিনবাবু যথেষ্ট চেষ্টা করিতেছেন এবং সেই উদ্দেশ্যে কতিপয় স্থানীয় শিল্পোৎসাহী বন্ধুর সহিত মিলিত হইয়া "রসমণ্ডল" নামক একটি সঙ্ঘ স্থাপন করিয়াছেন। ভারতীয় শিল্প-কলার উন্নতির জন্য এই রসমণ্ডল যথেষ্ট প্রচার-কার্য্য করিতেছেন।



ডাঃ শ্রীঅবিনাশচন্দ্র দাস, এম-ডি (হোমিওপ্যাথ, ও তাঁহার পত্নী

ডাঃ শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রপ্রসাদ নিয়োগী, এম-এস্-সি, এম-বি, মহাশয় প্রায় চারি বৎসর যাবৎ বোম্বাইএর

গোবর্দ্ধনদাস সুন্দরদাস মেডিকেল কলেজের ফিজিওলজির অধ্যাপকের কার্য্য করিতেছেন।

ডাঃ শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র দাস এম-ডি, মহাশয় আট বৎসর যাবৎ বোম্বাই শহরে চিকিৎসা ব্যবসায় করিতেছেন এবং গুজরাটী সম্প্রদায়ের ভিতরে যথেষ্ট পশার করিয়াছেন। ফরিদপুর জেলার মাদারীপুরে তাঁহার নিবাস।

বাঙালীর অসাম্প্রদায়িক অনুষ্ঠানগুলির ভিতরে রামকৃষ্ণ মিশন এখানে নানাবিধ প্রচারকার্য্য করিতেছে। বোম্বাই শহরের প্রায় সাত মাইল উত্তরে বি-বি অ্যাণ্ড সি-আই লাইনের উপরে 'খার' নামক উপনগরে কিছুদিন হইল মিশনের নিজ গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছে এবং স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ ও স্বামী বিশ্বানন্দ মহারাজ এই মিশনের নানাবিধ জনহিতকর কার্য্যের পরিচালনা করিতেছেন। স্থানীয় বাঙালীদের সহিত এই মিশনের ঘনিষ্ঠ যোগ আছে।

১৯২২ সালে জি-আই-পি রেলওয়ে লেবরেটরীর কেমিষ্ট শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ সেন, বি-এস্-সি প্রমুখ কতিপয় বাঙালী মহোদয়ের চেষ্টায় 'প্যাড়েলে' বাঙালীদের জন্য একটি ক্লাব স্থাপিত হইয়াছে। একটি ছোট লাইব্রেরী এই ক্লাবের সঙ্গে সংযুক্ত আছে। সম্প্রতি ক্লাবের চেষ্টায় বাঙালীদের জন্য ফুটবল্, ব্যাডমিণ্টন্ প্রভৃতি খেলার বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। সমস্ত বাঙালীদের মধ্যে ভাবের আদান প্রদানের জন্য এই ক্লাব হইতে মাঝে মাঝে নানা-প্রকার সম্মিলনীর বন্দোবস্ত করা হয়।

রবীন্দ্রনাথ

শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত

১

কবি রবীন্দ্রনাথ নয়, মানুষ রবীন্দ্রনাথকে আজ আমরা একটু দেখিতে চাই। কবির ইহাতে কিছু আপত্তি হইতে পারে—তিনি হয়ত বলিবেন, তাঁহাকে সত্যভাবে দেখিতে হইলে কবি হিসাবেই দেখিতে হইবে, মানুষ-হিসাবে তিনি কি করিয়াছেন বা না করিয়াছেন সেটা তাঁহার জীবনে অবান্তর কথা; তাঁহার যে সত্য যে স্বরূপ, তাঁহার মধ্যে যতটুকু শাশ্বত ও সনাতনের মত তাহা তিনি ধরিয়া দিয়াছেন। তাঁহার কাব্যে বাকীগুলির কোন বিশেষ অর্থ নাই মর্য্যাদাও নাই—অন্যান্য অনেকের সহিত সেদিক দিয়া তাঁহার খুব বেশী পার্থক্য বা বিশেষত্ব না থাকিলেও থাকিতে পারে। কবির শ্রেষ্ঠ পরিচয় তাঁহার কাব্যে, অন্য পরিচয়ে তাঁহাকে ভুল বুঝা হয়, তাঁহাকে খাটো করা হয়।

কিন্তু মানুষ রবীন্দ্রনাথ বলিতে আমরা একান্ত বাহিরের বৈষয়িক বা সাংসারিক রবীন্দ্রনাথকে বুঝিতেছি না, আমরা তাঁহার ভিতরের সেই সত্যকার মানুষটিরই কথা বলিতেছি, যাহার একটা প্রকাশ হইতেছে—কবি। রবীন্দ্রনাথ কাব্যেই হয়ত সেই মানুষটির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অথবা সর্ব্বাপেক্ষা পরিস্ফুট প্রকাশ হইয়াছে, তবুও তাহা একটা বিশেষ ধারায় বা অঙ্গের প্রকাশ মাত্র। সেই প্রকাশ যে-সত্যকে যে-উপলব্ধিকে, অন্তরাত্মার যে-সিদ্ধিকে ব্যক্ত করিতে, আকার দিতে চাহিতেছে তাহাই আমাদের লক্ষ্য।

রবীন্দ্রনাথের কাব্যসৃষ্টির মূল কথা এবং সকলের চেয়ে বড় কথা হইতেছে "সৌন্দর্য্য"-- তিনি দেখিতেছেন সুন্দরকে এবং দেখাইতেছেন সেই সুন্দরকে সুন্দরভাবে। যেখানে যাহা-কিছু সুন্দর—প্রকৃতির রাজ্যে হউক আর অন্তরের রাজ্যে হউক, কায়ে হউক মনে হউক বাক্যে হউক তিল তিল করিয়া সকল স্থান হইতে সকল সৌন্দর্য্য কুড়াইয়া লইয়া তিনি কাব্যের গড়িয়াছেন তিলোত্তমা মূর্ত্তি। তাঁহার ভাষা সুন্দর, শব্দের লালিত্য, ছন্দের লাস্য তাঁহাতে পাইয়াছে বোধ হয় পরাকাষ্ঠা। তাঁহার ভাব সুন্দর—চিন্তার বৈদগ্ধ্য, অনুভবের সৌকুমার্য্য অতি বিচিত্র ও

মনোহর। তাঁহার আখ্যানের বিষয় ও বস্তু নিজে নিজেই সুন্দর—শব্দের অলঙ্কার, অর্থের অলঙ্কারে—মণ্ডনের উপর মণ্ডন দিয়া—তাহাকে আবার অধিকতর অঙ্গলত সুন্দর করিয়া তিনি ধরিয়াছেন। তাঁহার

ঝরিছে মুকুল, কূজিছে কোকিল
যামিনী জোছনা মত্তা।
"কে এসেছ তুমি ওগো দয়াময়"—
শুধাইল নারী, সন্ন্যাসী কয়—
"আজি রজনীতে হয়েছে সময়,—
এসেছি বাসবদত্তা।"

অথবা

তব স্তনহার হ'তে নভস্তলে খসি পড়ে তারা,
অকস্মাৎ পুরুষের বক্ষোমাঝে চিত্ত আত্মহারা,
নাচে রক্তধারা!
দিগন্তে মেখলা তব টুটে আচম্বিতে
অয়ি অসম্বৃতে!

কি একটা অপরূপ অনুপম সৌন্দর্য্যের কল্পলোকই না উন্মুক্ত করিয়া ধরিতেছে।

রবীন্দ্রনাথের ভিতরের আসল মানুষটি হইতেছে এই ঐন্দ্রজালিক রূপকার। সর্ব্বতোভাবে সুরূপের সৃষ্টি—ইহাই তাঁহার অন্তর পুরুষের ধর্ম্ম, তাঁহার স্বভাবের নিত্যসিদ্ধি। জ্ঞানের দিক দিয়া, শক্তির দিক দিয়া তিনি যত উপরে না উঠিয়াছেন, তাহাও ছাড়াইয়া গিয়াছেন তিনি সৌন্দর্য্যের দিক দিয়া। জ্ঞান বা শক্তি তাঁহার চেতনার মধ্যে নিম্নতর স্থান পাইয়াছে, উহারা হইয়া আছে সৌন্দর্য্যের অনুগত সেবক।

রবীন্দ্রনাথের অন্তরপুরুষটি আসিয়াছে যেন এক গন্ধর্ব্ব লোক হইতে। এই গন্ধর্ব্ব পৃথিবীতে অবতীর্ণ পার্থিব জীবনে প্রকৃত সুন্দরের কিছু প্রসার করিয়া দিতে। সৌন্দর্য্যকে সকল রকমে ব্যক্ত করাই তাঁহার ব্রত ও ধর্ম্ম। সুন্দর কাব্য অনেকে রচনা করিয়াছে—সুন্দরের উপরও অনেকে কাব্য রচিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ এই কবি-শ্রেণীর মধ্যে একজন শ্রেষ্ঠ পুরুষ সন্দেহ নাই। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের বৈশিষ্ট্য এইখানে যে, তাঁহার অন্তরস্থ কবি-পুরুষ তাঁহার সমগ্র সত্তা ছাইয়া রহিয়াছে। তিনি কাব্য যদি কিছু নাও লিখিতেন, তবুও তাঁহার জীবনটিই একখানি সুন্দরের জীবন্ত কাব্য হইয়া থাকিত। নিজে তিনি সুদর্শন—তাঁহার বাক্য সুন্দর, তাঁহার ব্যবহার সুন্দর,—তাঁহার কর্ম্ম সুন্দর, তাঁহার ধর্ম্ম সুন্দর।* নিজে চারিদিকে সৌন্দর্য্যকে সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছেন—সৌন্দর্য্য হইতে সৌন্দর্য্যের মধ্য দিয়া সৌন্দর্য্যের অভিমুখে চলিয়াছেন।

বলিয়াছি রবীন্দ্রনাথের অন্তর পুরুষ হইতেছে রূপকার। কিন্তু এই রূপ তিনি আকারের সৌষ্ঠব অপেক্ষা বিশেষ ভাবে ধরিয়াছেন ছন্দের স্পন্দনে। সৌন্দর্য্যের গঠন অপেক্ষা গতি, বলন অপেক্ষা চলনের উপরেই দেখি তাঁহার কার্য্যে বেশী জোর পড়িয়াছে। তাঁহার কাব্য সৃষ্টিতে তাই স্থাপত্য বা ভাস্কর্য্য রীতির অপেক্ষা বেশী পাই সঙ্গীতের নৃত্যের রীতির প্রভাব। সুন্দরকে তিনি লাভ করিয়াছেন—স্থিতি নয়, গতির ভিতর দিয়া—দর্শন নয়, শ্রবণের ভিতর দিয়া। যে প্রাণের স্পন্দনে এই সৃষ্টি বিকশিত মুঞ্জরিত হইয়া উঠিতেছে, বাহ্য আকারের বা কাঠামোর পিছনে যে নিভৃত আবেগ উদ্বেলিত, কবি কান পাতিয়া তাহারই ছন্দ, তাহারই সুর শুনিতে ধরিতে চাহিতেছেন। কবি চাহিতেছেন অর্থের অন্তরালে রহিয়াছে যে-ব্যঞ্জনা—তাহাকে, মূল বাক্যের অন্তরে রহিয়াছে যে, অশরীরী ভাব—তাহাকে। কবি তাই বলিতেছেন—

আমি দেখি নাই তার মুখ, আমি
শুনি নাই তার বাণী,
কেবল শুনি ক্ষণে ক্ষণে তাহার
পায়ের ধ্বনিখানি।

আরও

মন দিয়ে যার নাগাল নাহি পাই
গান দিয়ে সেই চরণ ছুঁয়ে যাই
সুরের ঘোরে আপনাকে যাই ভুলে—

তাই দেখি রূপের আকার যেখানে রবীন্দ্রনাথ আঁকিয়াছেন, সেখানেও রূপকে স্থির করিয়া, সমাধির বিষয় করিয়া তিনি ধরেন নাই। তিনি দিয়াছেন রূপের চলমূর্ত্তি,—এই যেমন,

ধেয়ে চ'লে আসে বাদলের ধারা,
নবীন ধান্য দুলে দুলে সারা—

* এখানে মনে পড়িতেছে রবীন্দ্রনাথ নিজেই একবার রামেন্দ্র-সুন্দরকে যে কথায় অভিনন্দিত করিয়াছিলেন—"তোমার, হৃদয় সুন্দর, তোমার বাক্য সুন্দর, তোমার হাস্য সুন্দর, হে রামেন্দ্র সুন্দর—"।

নৃত্য ; ছন্দায়িত গতির মূর্চ্ছনাই দিয়াছে তাঁহার সৌন্দর্য্যের রূপায়ন। কালিদাসের কাব্যসুন্দরী সম্বন্ধে আমরা মোটের উপর বলিতে পারি—'চিত্রার্পিতারম্ভ ইবাবতস্থে।' কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিতে

শব্দময়ী অপ্সর রমণী
গেল চলি, স্তব্ধতার তপোভঙ্গ করি।

তবে রহস্যের কথা এই যে, কবির শব্দময়ী অনুপ্রেরণা স্তব্ধতাকে ভাঙিয়াও বেশী দূর যাইতে পারে নাই। সৌন্দর্য্যের এই যত নৃত্য, এই যত ঝঙ্কার, ইহাদের বাঁকে বাঁকে কি একটা ভাবের ঘোর, সুরের লয়, এমন মীড় টানিয়া চলিয়াছে যে, মনে হয় যেন তাহারা সব ফিরিয়া একটা শান্তির ও স্তব্ধতারই তটে গিয়া মিলিয়া যাইতেছে। কবির মুখরতা যেন মৌনতারই সহিত কোলাকুলি করিয়া আছে। এক দিকে দেখি তাঁহার রসলিপ্সু প্রাণ প্রকৃতির বর্ণে গন্ধে হাস্যে লাস্যে পুঞ্জীভূত ঐশ্বর্য্যে মাতোয়ারা হইয়া গিয়াছে; তাঁহার সৌন্দর্য্য-পিপাসু ইন্দ্রিয়গ্রাম বাহিরের বস্তুসম্ভারের বৈভবের দিকে পরম আগ্রহে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। আত্মাকে ভগবানকেও তাই তিনি ধরিতে চাহিতেছেন—যাবতীয় ইন্দ্রিয়ের পঞ্চপ্রাণের আলিঙ্গনে। তবুও অন্য দিকে দেখি এই সকলেরই মধ্যে তাঁহার লক্ষ্য চলিয়া গিয়াছে—

অশান্তির অন্তরে যথা শান্তি সুমহান।

স্থূল শব্দের, রূঢ় গতায়াতের, স্থূলস্থূলের জগৎ লইয়া খেলিতে খেলিতেই তিনি ভাবে ও ভঙ্গীতে তাহাকে ছাড়িয়া উঠিয়া গিয়াছেন একটা সূক্ষ্মতর লোকে, যেখানে সুর ছন্দ যেন সবে জন্মগ্রহণ করিতেছে—সুর ছন্দ সেখানে কথার রূপের ভারে জড়ের অতি-স্পষ্টতা পায় নাই, তাহাতে মাখা আছে একটা শুচিতা, স্বচ্ছতা, লঘুতা, লালিত্য, লাবণ্য—সেখানে

কত যে অশ্রুত বাণী
শূন্যে শূন্যে করে কানাকানি ;
* * *
তাদের নীরব কোলাহলে
অস্ফুট ভাবনা যত দলে দলে ছুটে চলে—

কবির আকাঙ্ক্ষা তাই হইতেছে—

যে গান কানে যায় না শোনা*
সে গান যেথায় নিত্য বাজে
প্রাণের বীণা নিয়ে যাব
সেই অতলের সভামাঝে।

এ যেন প্রাচীন গ্রীকেরা যাহাকে বলিতেন music of the spheres, সেই জিনিষের মত কিছু ; এখানে পাই সৌন্দর্য্যের আদি আবেগ, মূল ছন্দ। মনে হয়, প্রাণের প্রথম স্পন্দনে সৃষ্টি যখন রূপ গ্রহণ করিতে সুরু করিল—সর্ব্বং প্রাণ এজতি নিঃসৃতং—উপনিষদের এই বাক্যটি রবীন্দ্রনাথের অত্যন্ত প্রিয় এবং প্রায়ই তিনি এটি উল্লেখ করিয়া থাকেন। তখনকার সেই প্রথম দোলন, সেই প্রথম তান, সেই নাদব্রহ্মই যেন রবীন্দ্রনাথের ইষ্ট, এবং এই ইষ্টের সাধনায় অপরূপ সাফল্যই তাঁহার কবিত্বের বৈশিষ্ট্য ও মহিমা—এই ইষ্টের ধ্যান-মূর্ত্তি রবীন্দ্রনাথ দিতেছেন এই মন্ত্রে—

সুর গিয়েছে থেমে, তবু
থামতে যেন চায় না কভু
নীরবতায় বাজ্‌ছে বীণা
বিনা প্রয়োজনে।

২

সত্যের সাধনা আছে, মঙ্গলের সাধনা আছে। রবীন্দ্রনাথের কাছে সত্য ও মঙ্গল সাধনার বস্তু, তাহাদের প্রেয়ের, সৌন্দর্য্যের দিক দিয়া। সত্যের সত্যতার জন্য তিনি সত্যের ততখানি উপাসক নহেন ; মঙ্গলের মাঙ্গল্যের জন্যও তিনি মঙ্গলের পূজারী নহেন। কিন্তু সত্যকার সত্য আবার সত্যসত্যই সুন্দর ; পরম মঙ্গল আবার পরম সুন্দর। সুন্দর বলিয়াই সত্য ও মঙ্গল তাঁহাকে আকৃষ্ট করিয়াছে।

---

* এখানে স্মরণ করা যাইতে পারে কীট্‌স'-এর "heard melodies are sweet, but those unheard are sweeter."—
ফলতঃ রবীন্দ্রনাথের মত কীট্‌সও ছিলেন একান্ত সৌন্দর্য্যেরই পূজারী, তবে ইংরেজ-কবি সৌন্দর্য্যকে কান দিয়া শুনা অপেক্ষা চক্ষু দিয়া দেখিয়াছেন বেশী—তাঁহার melodies গতির স্পন্দন অপেক্ষা ফুটাইয়া ধরিতেছে স্থির রূপ ; সঙ্গীত বা নাট্য অপেক্ষা তাঁহার কবিত্বে পাই বিশেষ ভাবে চিত্রের রীতি। গতি সুর ছন্দের সূক্ষ্ম সুনিপুণ লাস্য রবীন্দ্রনাথের মত প্রাধান্য পাইয়াছে শেলীর কাব্য-প্রতিভায়।

রবীন্দ্রনাথ প্রেমের কবি, প্রেমের মানুষ—বৈষ্ণব সাধকেরা যাহাকে বলেন "সুপুরুষ"। কিন্তু তাঁহার প্রেমও হইতেছে সৌন্দর্য্যেরই সার। কবির প্রেম তাই কবিকে বলিতেছে—

হাত ধরে মোরে তুমি
লয়ে গেছ সৌন্দর্য্যের সে নন্দন ভূমি
অমৃত-আলয়ে। সেথা আমি জ্যোতিষ্মান,
অক্ষয় যৌবনময় দেবতা সমান;
সেথা মোর লাবণ্যের নাহি পরিসীমা—

প্রেমকে কেবল প্রেম-হিসাবে তিনি ততখানি উপভোগ করেন নাই বড়ু চণ্ডীদাস যেমন করিয়াছিলেন; প্রেমের মধ্যে সৌন্দর্য্য আসিয়া পাইয়াছে চরম অভিব্যক্তি, পরাকাষ্ঠা, তাই তিনি প্রেমিক হইয়া গিয়াছেন। অতি-আধুনিক অনুভূতি প্রেমকে সৌন্দর্য্য হইতে সম্পূর্ণ বিশ্লিষ্ট করিয়া ধরিয়াছে, বরং অসুন্দরেরই সহিত তাহার একটা মিলন ঘটাইতে চাহিতেছে, রবীন্দ্রনাথ এই হিসাবে পরম প্রাচীন, সনাতনপন্থী।

রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্য্য হইতেছে সামঞ্জস্য, সমন্বয় সুসঙ্গতি, প্রসন্নতা, নির্ম্মলতা, প্রশান্তি। বিরোধ যেখানে, রুক্ষতা রূঢ়তা যেখানে, সেইখানেই সৌন্দর্য্যের অভাব—সেখানে ছন্দের পতন হইয়াছে, তাল কাটিয়া গিয়াছে, সুর ভাঙিয়াছে, চলনের বলনের দোষ ঘটিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের ভগবান তাই হইতেছেন

সুন্দর বল্লভ, কান্ত

এবং

তাঁরি মুখের প্রসন্নতায়
সমস্ত ঘর ভরে।

এই বল্লভের কাছে কবির নিত্যকার আকিঞ্চনও তাই

নির্ম্মল কর উজ্জ্বল কর
সুন্দর কর হে

এবং

এ জীবনে যা কিছু সুন্দর
সকলি আজ বেজে উঠুক সুরে।

ভগবান ভগবান, কারণ, তিনি নিখিল বিশ্বের মিলনের সূত্র—রবীন্দ্রনাথের বিশ্বপ্রীতি আসিয়াছে এই মিলনের বা মিলের যে সৌন্দর্য্য তাহার কল্যাণে। সমস্ত সৃষ্টি "আকাশ আলোক তনু মন প্রাণ" বরণীয় লোভনীয়; কারণ তাহার ভিতর দিয়া এক পরম মধুর ঐক্যতান ঝরিয়া পড়িতেছে। রবীন্দ্রনাথের মহামানবের আদর্শও আসিয়াছে এই ঐক্যতানের অনুপ্রেরণায়। পৃথিবীর সকল দেশ জাতি তাহাদের বিভিন্নতা, বৈশিষ্ট্য লইয়া পরস্পরের সহিত সম্মিলিত হইয়া দাঁড়াইবে—মানব-সমাজ এই ভাবে পাইবে একটা সুঠাম সৌন্দর্য্য। মানুষের মধ্যে সমানে সমান দেখি যে রেষারেষি, নীচের প্রতি উপরের সে অত্যাচার আর উপরের প্রতি নীচের যে দাসভাব—সাধারণ ভাবে, মানুষের এই ধরণের যাবতীয় হীনবৃত্তিই পরিত্যজ্য; কারণ, তাহা কর্কশ, অসুন্দর, কুৎসিত। শান্তি, প্রীতি, ঔদার্য্য, সৌহার্দ্দ্যই—মানুষকে, ব্যক্তি-হিসাবে ও গোষ্ঠী-হিসাবে, সুন্দর করিয়া গড়িয়া তুলিতে পারে।

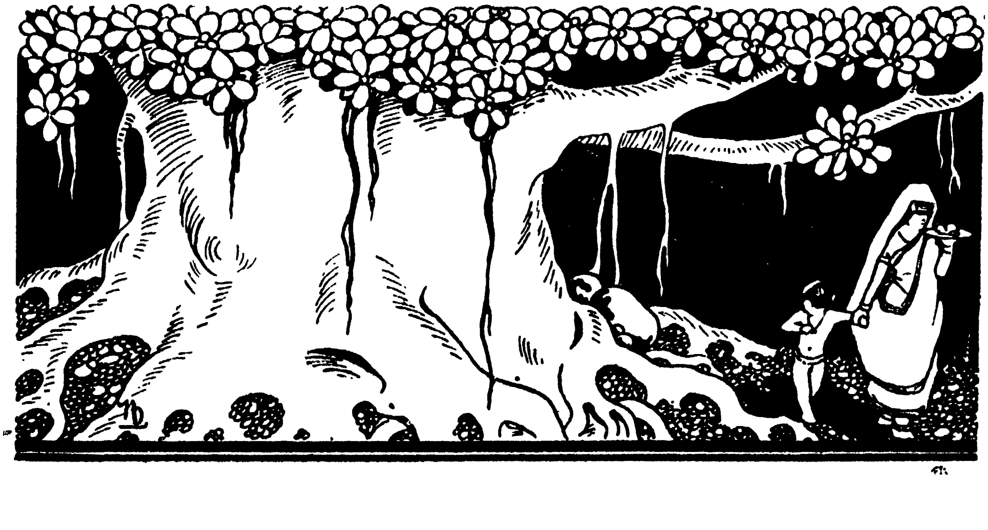
রবীন্দ্রনাথের স্বাদেশিকতারও মূলে রহিয়াছে এই সৌন্দর্য্যপ্রিয়তা। দাসত্বের মধ্যে রহিয়াছে শ্রীহীনতা, তাহাই তাঁহাকে বেশি পীড়া দেয়। দারিদ্র্যের স্থূল অভাবটি অপেক্ষা তাঁহার কাছে অধিক অসহ্য দারিদ্র্যেরও শ্রীহীনতা। মহাত্মা গান্ধীর মত তিনি যদি অভাবকে অভাব-হিসাবেই একান্ত করিয়া দেখিতে পারিতেন, তবে হয়ত না-হউক একটি বারের জন্যও চরকায় হাত দিলেও দিতেন। কিন্তু তাঁহার কাছে স্বচ্ছলতা নিজে নিজেই কিছু সার্থক নয়; স্বচ্ছলতা সার্থক, যদি তা হয় সুছন্দ। রবীন্দ্রনাথের স্বাদেশিকতা তাই ভাঙন অপেক্ষা গড়নের উপর বেশী জোর দিয়াছে, বিদেশীর সহিত কলহ-কোলাহল অপেক্ষা নিজেদের মধ্যে বুঝাপড়া করা, শত্রুকে গিয়া আক্রমণ অপেক্ষা নিজের ঘর সামলান, সারান ও সাজানকেই তিনি আসল কাজ বলিয়া বিবেচনা করেন—গড়ন অর্থ সৃষ্টি করা, তাহার অর্থ সুন্দর করিয়া রচনা করা। জাতির সমবেত জীবনের সকল অঙ্গকে পরিপুষ্ট করিয়া, ঐক্যবদ্ধ করিয়া, রূপগত সৌষ্ঠব ও কর্ম্মগত ছন্দ দেওয়াই হইল তাঁহার স্বদেশী-সমাজের আদর্শ।

তাই বলিয়াছি, রবীন্দ্রনাথ সুন্দর কাব্য ও সুন্দরের কাব্য যে রচনা করিয়াছেন তাহা অপেক্ষাও রবীন্দ্রনাথের বিশিষ্ট সৃষ্টি হইতেছে তিনি বাস্তবে, আমাদের জীবনে প্রকৃত সৌন্দর্য্যের প্রভাব কিছু নামাইয়া আনিয়াছেন বিশেষত আমাদের বাঙালীর জীবনে, আমাদের বাংলা দেশে। নিজের কাব্য-সৃষ্টির মধ্যেই রবীন্দ্রনাথের সমস্ত অস্তিত্ব শেষ হইয়া যায় নাই। প্রথমত, তাঁহার অনুপ্রেরণায় তাঁহাকে কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে কাব্য, চিত্র, সঙ্গীত, নৃত্য, অভিনয় প্রভৃতি চারু-শিল্পের একটা জগৎ, নূতন একটা ধারা; দ্বিতীয়ত, তাঁহার প্রাণের স্পন্দনে আমাদের সারা দেশে একটা সুকুমার রুচি ও অনুভূতি—একটা সৌন্দর্য্যমুখী চেতনা জাগিয়া উঠিয়াছে; তৃতীয়ত, যে জিনিষটি এক হিসাবে আরও অর্থ-পূর্ণ, আমাদের সাধারণ ব্যবহারিক জীবনে, আমাদের বসনে ভূষণে, আলাপে ব্যবহারে, গৃহে মজলিসে, বাস্তবের উপকরণে ও প্রয়োগে একটা নূতন সৌষ্ঠব ও পারিপাট্য যদি ক্রমশ দেখা দিয়া থাকে, তবে তাহার মূলে—সাক্ষাতে হউক আর অসাক্ষাতে হউক—রবীন্দ্রনাথের প্রভাব অনেকখানিই রহিয়াছে বলিয়া আমার বিশ্বাস।

ভারতবাসীর মধ্যে বাঙালীই যা হউক একটু সৌন্দর্য্যরসিক বলিয়া খ্যাতি পাইয়াছে। এই খ্যাতি ঠাকুর বাড়ীর কল্যাণে যে অনেকখানি সম্ভব হইয়াছে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। এক কালে আমরা কি ছিলাম, জানি না; হয়ত আমাদের সৌন্দর্য্য-বোধ বিশেষভাবে ছিল ভাবের অন্তরের, বড় জোর শিল্পের জিনিষ; বাহিরের জীবনে পর্য্যন্ত—জাপানীদের মত—সৌন্দর্য্যকুশলী জাত আমরা কখনও ছিলাম কি না সন্দেহ। তবুও ভিতরে বা বাহিরে যতটুকু সম্পদ বা সিদ্ধি ঐ বিষয়ে আমাদের ছিল, তাহা নানা কারণে একেবারেই নষ্ট হইয়া গিয়াছিল।

প্রাণশক্তির অভাব, বৈরাগ্য, দৈন্য, নৈরাশ্য, তামসিকতা একটা বিপুল হেলাফেলা, ঘোর বিশৃঙ্খলতা আমাদের জীবনের রূপায়নকে কুৎসিত করিয়া তুলিয়াছিল। শেষে যে প্রভাব রবীন্দ্রনাথে কেন্দ্রীভূত হইয়াছে, বিশেষ মূর্ত্তি পাইয়াছে, তাহাই আসিয়া আমাদিগকে রক্ষা করিল, খুলিয়া দিল নূতন সৌন্দর্য্য সৃষ্টির ধারা।

কেবল আমাদের দেশেরই কথা বলি কেন, কেবল বাংলায় বা ভারতবর্ষের মধ্যেই এই প্রভাবকে আবদ্ধ রাখিতে চাই কেন? আমার বিশ্বাস, ইউরোপে—পাশ্চাত্যে—রবীন্দ্রনাথ যে এতখানি আদর পাইয়াছেন, তাহা তাঁহার কবিত্বের জন্য প্রধানত নয়। কল-কারখানার, যান্ত্রিকতার, রূঢ় প্রয়োজনের শ্রীহীন জীবন হইতে মুক্তি পাইয়া আধুনিক জগৎ রবীন্দ্রনাথকে অনুসরণ করিয়া প্রবেশ করিতেছে কোন একটা শান্তির ও শ্রীর নিকেতনে।



বর্গীর হাঙ্গামা

শ্রীযদুনাথ সরকার

(১)

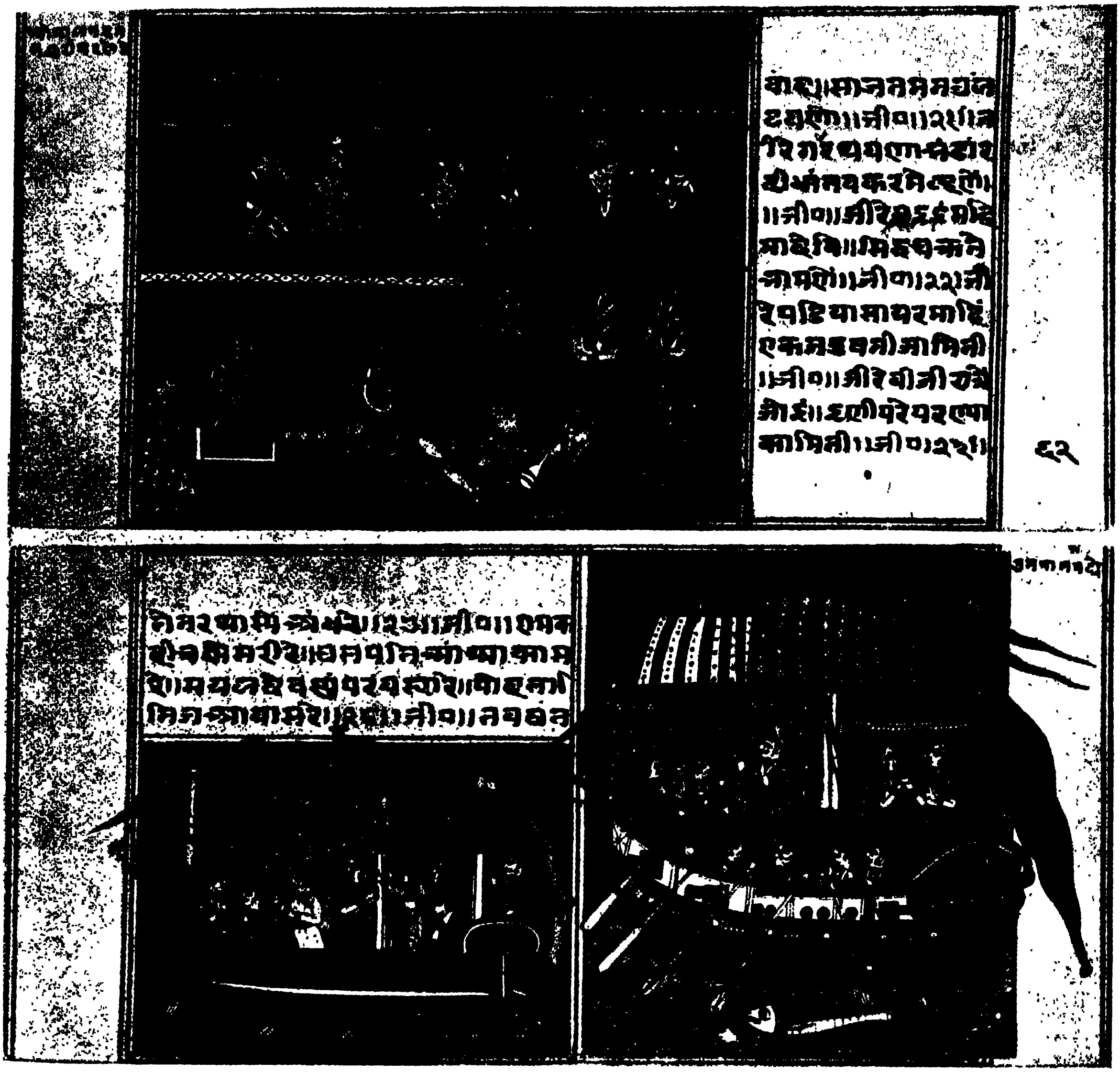
১৭৪২ সালে এবং তাহার পর বৎসরও নবাব আলীবর্দ্দী খাঁ মারাঠাদের বাংলা দেশ হইতে তাড়াইয়া দিতে পারিলেন বটে, কিন্তু এই অবিরাম পরিশ্রম ও দ্রুত কুচ করার এবং সর্ব্বদা সজাগ থাকার ফলে তাঁহাকে এবং তাঁহার সেনানীদের মহা ক্লান্ত হইয়া পড়িতে হইল। নবাবের বয়স প্রায় সত্তর বৎসর হইয়াছে, অথচ এখনও তাঁহার মনের তেজ এবং অদম্য শ্রমশক্তির কাছে যুবকেরা হার মানে। কিন্তু ভবিষ্যতে দেশে শান্তির ও দেশ-শাসকের বিশ্রামলাভের আশা দেখা গেল না। প্রকৃতিদেবী সুবা বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যাকে এমনি করিয়া গঠন করিয়াছেন যে, মারাঠা আক্রমণ হইতে এই দেশ রক্ষা করিতে গিয়া বঙ্গেশ্বরকে একটি অতি ভীষণ স্বাভাবিক বাধা ও অসুবিধার বিরুদ্ধে যুঝিতে হইত। মারাঠাদের পক্ষে নাগপুর অতি সুন্দর কেন্দ্রস্থল হইয়াছিল; সেখান হইতে তাহাদের অভিযান ইচ্ছামত হয় উত্তর-পূর্ব্বে গিয়া বিহার প্রদেশে, না-হয় সোজাসুজি পূর্ব্বদিক দিয়া উড়িষ্যায় অতি সহজে ও অল্প সময়ে প্রবেশ করিতে পারিত, কারণ এই দুইটি প্রদেশই তাহাদের দেশের গায়ে লাগাও। এই আক্রমণকারীরা সম্মুখযুদ্ধে পরাস্ত হইলে তৎক্ষণাৎ পিছনের ঘন বনময় দেশে ঢুকিয়া বঙ্গীয় সেনার পশ্চাদ্ধাবন হইতে বাঁচিত, এবং অল্প একটু ঘুরিয়া গিয়া মেদিনীপুর জেলায় দেখা দিত। [মুঘল-যুগে মেদিনীপুর সুবা-উড়িষ্যার অন্তর্গত ছিল।]

আর, বাংলার নবাবের পক্ষে নিজ সৈন্যদল ও কামান গোলাবারুদ লইয়া ভাল রাস্তা দিয়া রাজধানী মুর্শীদাবাদ হইতে পাটনা পৌঁছিতে অতি দীর্ঘপথ অতিক্রম করিতে হইত, এবং অনেক বেশী সময় লাগিত। ততদিনে মারাঠারা সেই প্রদেশ লুটিয়া শেষ করিয়া ফেলিত। আর যদি বা নবাব দলবলে পাটনা পৌঁছিলেন, মারাঠারা অমনি পলাইয়া জঙ্গলের পথ দিয়া সুদূর দক্ষিণে উড়িষ্যায় গিয়া আবার মাথা খাড়া করিত। সেখানে তাহাদের রুখিবার কেহই নাই। নবাব যথেষ্ট সৈন্য ও সাজসরঞ্জাম সঙ্গে লইয়া পাটনা হইতে উড়িষ্যা যাইতে তাঁহার তিন চারিগুণ অধিক সময় লাগিত, আর তাহার পূর্ব্বেই অবাধ লুটের চোটে উড়িষ্যা উজাড় হইয়া পড়িত। বঙ্গীয় রাজশক্তি এই বহু শত মাইল ব্যাপিয়া বিক্ষিপ্ত থাকার ফলে সদাই দুর্ব্বল ছিল। ফলতঃ, মারাঠা-শক্তির কেন্দ্রস্থল নাগপুর ধ্বংস করিতে না পারিলে বাংলাকে স্থায়িভাবে নিরাপদ করা অসম্ভব ছিল।

যদি পাটনায় এবং কটকে আলীবর্দ্দীর মত দক্ষ দ্রুতকর্ম্মা তেজী এবং তাঁহার সম্পূর্ণ অনুগত ও বিশ্বাসী কোন প্রতিনিধি নায়েব-নাজিম্ (ডাকনাম "পাটনার বা কটকের ছোট নবাব") রাখা যাইত, এবং তাহার অধীনে প্রবল সৈন্যদল সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিত, তবে এই দুই প্রদেশেই মারাঠা-অভিযান পৌঁছা মাত্র তাহাকে বাধা ও শাস্তি দেওয়া সম্ভব হইত। কিন্তু দেশের ও জাতির পরম দুর্ভাগ্যবশতঃ—

পুত্রাদপি ধনভাজাং ভীতি—

এবং সে-যুগে আমাদের মধ্যে স্বদেশপ্রেম কল্পনারও অতীত ছিল। প্রথমতঃ, আলীবর্দ্দীর সমান হওয়া দূরে থাকুক, তাঁহার অর্দ্ধেক দক্ষ, তেজী ও সর্ব্বজনমান্য নেতা বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যায় একটিও ছিল না। তাহার পর, নবাব যে-সব আত্মীয়-স্বজনকে পূর্ণিয়া, কটক ও পাটনায় প্রতিনিধিরূপে রাখিতেন, তাহারা তাঁহাকে, পরে তাঁহার উত্তরাধিকারীকে, ডিঙাইয়া স্বাধীন হইবার—এমন কি বঙ্গসিংহাসন অধিকার করিবার—স্বপ্ন দিন-রাত দেখিত, সে-বিষয়ে জল্পনা-কল্পনা করিত। দেশ-



একটি প্রাচীন পুস্তকের পৃষ্ঠা।

প্রাচীন চিত্র হইতে

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা।

নায়কদের এই অন্ধ স্বার্থপরতা এবং গৃহবিবাদ বাংলার ধ্বংসের কারণ হইল।

(১০)

১৭৪২ সালে বর্গীরা ভাস্কর পণ্ডিতের অধীনে বাংলা আক্রমণ করে, ১৭৪৩ সালের প্রথমে স্বয়ং নাগপুরের রাজা রঘুজী ভোঁসলের অধীনে। ১৭৪৩ সালের হেমন্ত ও শীতকাল বাংলার পক্ষে নিরাপদে কাটিয়া গেল। কিন্তু ১৭৪৪ সালে মার্চ্চ মাসের গোড়ায় আবার ভাস্কর পণ্ডিত মারাঠাদের নেতা হইয়া উড়িষ্যার পথ দিয়া বঙ্গদেশে প্রবেশ করিল। প্রথম বৎসর লুণ্ঠিত দ্রব্য ও শিবিরের মালপত্র কাটোয়ায় ফেলিয়া পলাইতে বাধ্য হওয়ায়, এবং দ্বিতীয় বৎসরে বালাজীর দ্বারা বাংলা দেশ হইতে তাড়িত হওয়ায়, বিশেষতঃ বাংলার নবাবের নিকট বাইশ লাখ টাকা পেশোয়া আদায় করিলেন অথচ রঘুজী এক পয়সাও পাইলেন না, এই সব কারণে এবার বর্গীদের নেতা ক্ষেপিয়া উঠিয়াছিল। ভুক্তভোগী বাঙালী কবি গঙ্গারাম তাহাদের অত্যাচারের জীবন্ত চিত্র দিয়াছেন :—

যেই মাত্র পুনরপি ভাস্কর আইল।
তবে সরদার সকলে ডাকিয়া কহিল—
"স্ত্রীপুরুষ আদি করি যতেক দেখিবা।
তলয়ার খুলিয়া সব তাদের কাটিবা॥"
এতেক বচন যদি বলিল সরদার।
চতুর্দ্দিকে লুটে কাটে বোলে "মার মার"॥
ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব যত সন্ন্যাসী ছিল।
গোহত্যা স্ত্রীহত্যা শত শত কৈল॥

[মহারাষ্ট্র-পুরাণ]

বর্গী-সৈন্যদলে মহারাষ্ট্রীয় হিন্দু ভিন্ন অসংখ্য মুসলমান, পিণ্ডারী, নীচ-জাতীয় অথবা জাতিহীন ধর্ম্মহীন অসভ্য লুঠেরা ছিল। বাংলার নিরীহ নর-নারীদের উপর বর্গীদের অকথ্য অত্যাচার হইতে লাগিল।

মাঠে ঘেরিয়া বরগী দেয় তবে সাড়া।
সোণা রূপা লুঠে নেয়, আর সব ছাড়া॥
কারু হাত কাটে, কারু নাক কান।
একি চোটে কারু বধয়ে পরাণ॥
ভাল ভাল স্ত্রীলোক যত ধরিয়া লইয়া যায়।
আঙ্গুষ্ঠে দড়ি বাঁধি দেয় তার গলায়॥
এক জনে ছাড়ে তবে আর জনা ধরে।
*   *   *   তারা ত্রাহি শব্দ করে॥
এই মত বরগী কত পাপ কর্ম্ম করিয়া।
সেই সব স্ত্রীলোকে যত দেয় সব ছাড়িয়া॥
তবে মাঠে লুটিয়া বরগী গ্রামে সাধায়।
বড় বড় ঘরে আসিয়া আগুন লাগায়॥
কাহুকে বাঁধে বরগী দিয়া পিঠমোড়া।
চিত করি মারে লাথি পায়ে জুতা চড়া॥
"রূপী দেহ, রূপী দেহ" বোলে বারে বারে।
রূপী না পাইয়া তবে নাকে জল ভরে॥
কাহুকে ধরিয়া বরগী পুখরে ডুবায়।
ফাফর হইয়া তবে কারু প্রাণ যায়॥

[মহারাষ্ট্র-পুরাণ]

বর্গীরা সাত-আট জন জুটিয়া যে এক এক স্ত্রীলোকের ধর্ম্মনাশ করিত ইহা অবিশ্বাস করা যায় না, কারণ রাজা শম্ভুজীর অধীনে নিজ মহারাষ্ট্রের সৈন্যগণ যখন ১৬৮৩ খৃষ্টাব্দে পোর্তুগীজ-রাজ্যে গোয়ার নিকট ষষ্ঠি ও বার্দ্দেশ প্রদেশ আক্রমণ করে, তখন তাহারা যে এইরূপ দলবদ্ধ-ভাবে স্থানীয় স্ত্রীলোকদের উপর অত্যাচার (gang rape) করিত, তাহার সাক্ষ্য তৎকালীন পোর্তুগীজ কাহিনীতে * স্পষ্টই পাওয়া যায়। আর, টাকা-আদায়ের জন্য পুরুষদের যে শ্বাস রোধ করিয়া এবং অন্যান্য নানা প্রকারে যন্ত্রণা দেওয়া হইত, তাহার বিস্তৃত বিবরণ সলিমুল্লা প্রভৃতি পারসিক ঐতিহাসিক দিয়াছেন।'

কবি বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার তাঁহার সংস্কৃত কাব্য "চিত্রচম্পূ"তে এই ১৭৪৪ সালে মারাঠাদের ভয়ে পলাতক বাঙালী নরনারীর দুর্দ্দশা স্বচক্ষে দেখিয়া লিখিয়াছেন :—

* এই বিবরণের ইংরেজী অনুবাদ ইণ্ডিয়া আফিস হইতে নকল করিয়া আনিয়া *Journal of the Hyderabad Archaeological Society*-তে ১৯১৮ সালে ছাপিয়াছি।

"মারাঠারা কৃপায় কৃপণ, গর্ভবতী এবং শিশু ব্রাহ্মণ ও দরিদ্রদের তলোয়ার দিয়া কাটিয়া ফেলে, সমস্ত নিষিদ্ধ আচরণে নিপুণ, তাহারা বাংলার জনপদে যেন ছোট প্রলয় ঘটাইল; সমস্ত ধন এবং সাধ্বী স্ত্রীলোক হরণ করিল।" মারাঠারা আসিতেছে এই সংবাদ পাইয়া তৎকালীন বর্দ্ধমানের মহারাজা চিত্রসেন, তাঁহার কর্ম্মচারীদের হাতে বর্দ্ধমান শহর ছাড়িয়া দিয়া, নিজে পলাতক নর-নারী, ব্রাহ্মণ-শূদ্র, ধনী-নির্ধন, পণ্ডিত-মূর্খ সকল প্রজাকে সঙ্গে লইয়া নিজ সৈন্য দিয়া রক্ষা করিতে করিতে, তাহারা সারাদিন হাঁটিয়া গরমে ও পিপাসায় অসহ্য কষ্ট ভোগ করিবার পর, দুই বড় নদীর মধ্যে এক নিরাপদ স্থানে আনিয়া পৌছাইয়া দিলেন। এই স্থানটিকে কবি নাম দিয়াছেন "দক্ষিণ প্রয়াগ ও গঙ্গা-সাগরের মধ্যস্থিত বিশালা নগরী"। সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার লেখক অনুমান করেন যে 'উহা সপ্তগ্রামান্তর্গত ত্রিবেণী শহর। 'বড় নগর' ওরফে বরাহনগর, হওয়া সম্ভব নহে।

এবার ভাস্কর পণ্ডিতের অধীনে বিশ হাজার অশ্বারোহী আসিয়াছিল। তাহার সঙ্গে আলী ভাই করাওওল্ নামে এক অতি বিখ্যাত দক্ষিণী মুসলমান সেনাপতি ছিল। মারাঠা-সর্দ্দার বিশ জনের নাম পাওয়া যায়, যথা,—

যশোবন্ত রাও গুজর,	নীলকণ্ঠ রাও মোহিতে,
দাজীবা ভোঁসলে,	বাবুজী মহাডীক,
মনাজী ভোঁসলে,	নারায়ণ ভোঁসলে,
সন্তাজী ভোঁসলে,	কৃষ্ণরাও নিম্বালকর,
বাপুজী কদম,	শ্রীপৎরাও মেহেকর,
ব্যাংকটরাও ভাউ,	দাজীবা পাঠণকর,
বলবন্ত রাও শির্কে,	গোবিন্দ রাও শেলুকর,
সঠবাজী যাদব,	শিবাজী জামাদার,
সুভানজী রাও,	নানা বখশী,
জোতিবা কারভারী,	রঘুজী গাইকোয়াড়,—

এবং অপর একজন মুসলমান সর্দ্দার শাহ্ আহমদ খাঁ (অথবা শহামৎ খাঁ)। *

(১১)

মারাঠাদের পুনরায় আগমন ও অত্যাচারের সংবাদ পাইয়া নবাব আলীবর্দ্দী অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। তাঁহার নিজের শরীর অসুস্থ, আর সৈন্যগণও গত কয়েক বৎসর ধরিয়া প্রতিবৎসর কঠিন যুদ্ধ ও দীর্ঘ কুচ করিতে বাধ্য হওয়ায় অতিশয় ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল, তাহাদের বিশ্রাম দেওয়া আবশ্যক। এই অবস্থায় তাহারা সম্মুখের ভীষণ গ্রীষ্মে কয়েক মাস ধরিয়া যুদ্ধযাত্রা করিতে অনিচ্ছুক। এখন কি করা যায়?

নবাব তাঁহার প্রধান সেনাপতি মুস্তাফা খাঁ আফঘানের সহিত পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন যে, মারাঠা সর্দ্দারদের খুন করা ভিন্ন উপায় নাই। তিনি মুস্তাফা খাঁর নিকট প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, যদি সে তাঁহাকে এই বিপদ হইতে উদ্ধার করিতে পারে, তবে তিনি পুরস্কার-স্বরূপ তাহাকে বিহারের নায়েব-সুবাদার (অর্থাৎ ছোট নবাব) করিয়া দিবেন।

তাহার পর নবাবের পক্ষ হইতে দূত পাঠাইয়া ভাস্করকে বলা হইল যে, যুদ্ধ করিয়া উভয়পক্ষে ক্ষতি করা কেন, টাকা লইয়া সন্ধি কর, আমরা চৌথ দিব। ভাস্কর এই সন্ধির কথাবার্ত্তা কহিবার জন্য আলী ভাইকে পাঠাইয়া দিল। নবাব তাহাকে নানা মিষ্ট আলাপে এবং সম্মান ও উপহার দিয়া মুগ্ধ করিলেন এবং সন্ধির সব শর্ত্ত স্থির করিবার জন্য মারাঠা-সেনাপতিদের সঙ্গে একদিন দেখা করিতে চাহিলেন। আলী ভাই নবাবকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিল, আর যখন যুদ্ধের ইচ্ছা ত্যাগ করা হইয়াছে তখন সন্ধি পাকা করিবার জন্য উভয়পক্ষীয় প্রধানের মিলন অতি স্বাভাবিক এবং চিরপরিচিত প্রণালী। সে গিয়া ভাস্করকে দেখা করিতে বলিল। ভাস্কর নিঃসন্দেহ হইবার জন্য রীতিমত আশ্বাসবাণী চাহিল। তখন নবাবের পক্ষে মুস্তাফা খাঁ এবং রাজা জানকীরাম (দেওয়ান) বর্গীদের শিবিরে গিয়া কোরাণ, গঙ্গাজল ও তুলসী ছুঁইয়া শপথ করিল যে সাক্ষাতের সময় মারাঠাদের প্রতি কোনো বিশ্বাসঘাতকতা করা হইবে না। [সলিমুল্লা বলেন যে মুস্তাফা খাঁ কোরাণ-পুস্তকের বদলে একখানা ইট কাপড়ে জড়াইয়া লইয়া গিয়া তাহার

* কাশী রাও রাজেশ্বর গুপ্তে কৃত নাগপুর কর ভোঁসল্যাচী বখর, ৪৩ পৃঃ পাদটীকায় উদ্ধৃত। সলিমুল্লা বলেন [I. O. L. MS. *f.* 123*b*] যে আলী ভাই জাতিতে মারাঠা কিন্তু ইসলাম-ধর্ম্মে দীক্ষিত হয়।

উপর হাত রাখিয়া শপথ করে। কিন্তু এ গল্পটা অন্য এক ঘটনা হইতে লইয়া এখানে আরোপ করা হইয়াছে]

এ সময় নবাব আমানিগঞ্জে এবং ভাস্কর কাটোয়া অঞ্চলের "দিগনগরে" * শিবির খাটাইয়াছিলেন; স্থির হইল যে, উভয় পক্ষই অগ্রসর হইয়া গঙ্গার পূর্ব্বতীরে মানকরায় (বহরমপুর ক্যান্টনমেণ্ট হইতে চার মাইল দক্ষিণে) আসিয়া সাক্ষাৎ করিবেন। এই স্থানে আলীবর্দ্দী বড় বড় তাঁবু খাড়া করিয়া নানা আড়ম্বরে সাজাইলেন। সন্ধি হইয়াছে এই কথা তিনি চারিদিকে প্রচার করিয়া দিলেন, এবং প্রকাশ্যে যুদ্ধের সব উদ্যোগ ও সতর্কতা ছাড়িয়া দিয়া মারাঠা সর্দ্দারদের উপহার দিবার জন্য হাতী ঘোড়া এবং নানাপ্রকার বহুমূল্য দ্রব্য রত্ন ও খেলাৎ একত্র জুটাইলেন। এইরূপে ভাস্করের সব সন্দেহ দূর হইল, সে নিজ কর্ম্মচারী রঘুজী গাইকোয়াড়ের নিষেধ মানিল না।

(১২)

ভাস্কর কাটোয়া ছাড়িয়া গঙ্গা পার হইয়া ৩০এ মার্চ্চ ১৭৪৪ (১লা বৈশাখ) সৈন্যসহ পলাশীতে আসিয়া তাঁবু খাটাইয়া রহিল। এখান হইতে মানকরা ১৮ মাইল উত্তরে। পরদিন (৩১এ মার্চ্চ) বাইশ জন সর্দ্দার এবং দশ হাজার অশ্বারোহী মাত্র সঙ্গে লইয়া ভাস্কর মানকরায় পৌঁছিল। সৈন্যগণ বাহিরের মাঠে কিছু দূরে থাকিল; ভাস্কর একুশজন সর্দ্দার † এবং বিশ পঁচিশজন নিম্নকর্ম্মচারীর সহিত দরবারের তাঁবুতে প্রবেশ করিল। তাঁবুর চারিপাশে কাপড়ের ডবল দেওয়াল (কানাৎ) ছিল, এবং সেই দুই সার কানাতের ফাঁকে নবাবের অনেকগুলি বাছা বাছা বলিষ্ঠ ক্ষিপ্রহস্ত যুবক সৈন্য লুকাইয়া ছিল। বাহিরে আরও অনেক তাঁবু খাড়া করা ছিল, তাহার আড়ালে নবাবের অসংখ্য অশ্বারোহী সৈন্য হাতী প্রভৃতি যুদ্ধের সাজে প্রস্তুত হইয়া নীরবে অপেক্ষা করিতেছিল; মারাঠারা তাহাদের দেখিতে পাইল না।

ভাস্কর সেই চল্লিশ-পঞ্চাশজন লোক লইয়া দরবারের তাঁবুতে প্রবেশ করিল এবং দূরে অপর প্রান্তে যেখানে নবাব গদীতে বসিয়া ছিলেন সেদিকে ধীরে ধীরে ফরাশের উপর দিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল। অমনি তাহার প্রবেশের দরজা নবাবের চাকরেরা বাহির হইতে পর্দ্দা ফেলিয়া দড়ি দিয়া শক্ত করিয়া বাঁধিয়া দিল; মারাঠাদের পলাইবার অথবা সাহায্যার্থ সেনাসামন্ত আনিবার পথ বন্ধ হইল। তখন আলীবর্দ্দী হুকুম দিলেন—"মার এই জঘণ্য কাফিরদের"। অমনি নবাবের সম্মুখ হইতে অনুচরগণ এবং দু-পাশে কানাতে লুকান সৈন্যগণ ছুটিয়া আসিয়া ভাস্করের দলকে আক্রমণ করিল। মারাঠারাও তলোয়ার খুলিয়া আত্মরক্ষার চেষ্টা করিল, কিন্তু তাহাদের শত্রুগণ সংখ্যায় অনেক বেশী, আক্রমণ আকস্মিক, এবং স্থানও অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ বলিয়া সকলেই মারা পড়িল। * বাহিরে নবাবের সহস্র সহস্র সৈন্য হুঙ্কার করিয়া মারাঠা-সৈন্যদলকে আক্রমণ করিল। [এই হত্যার বিবরণ চন্দননগর হইতে পণ্ডিচেরীতে ১২ মে লিখিত পত্রেও আছে।]

খুনের হুকুম দিয়াই নবাব তাঁবুর পিছনের দরজা দিয়া সরিয়া পড়েন, এবং আশ্চর্য্য ধীরতার সহিত একপাটি হারানো জুতা খুঁজিয়া বাহির করিবার জন্য বিলম্ব করিয়া তবে হাতীর পিঠে উঠিয়া বসেন। তাহার পর সব মারাঠা-সর্দ্দারদের নিঃশেষ করিয়া মারা হইয়াছে শুনিয়া এবং "ভাস্করের মাথা কাটিয়া আনিয়া আমাকে দেখাও" এরূপ বার-বার বলিয়া যখন নিঃসন্দেহ হইলেন, তখন পলায়মান মারাঠা-সৈন্যের পশ্চাদ্ধাবন করিবার জন্য

* Dignagur—কাটোয়া হইতে ৩২ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিম এবং বর্দ্ধমান শহর হইতে ১৮ মাইল উত্তর-পশ্চিম (রেনেলের ৭নং ম্যাপ)।

† অর্থাৎ রঘুজী গাইকোয়াড় ভিন্ন অপর ১৯ জন মারাঠা সেনাপতি এবং আলী ভাই ও শাহ জামাল।

* সলিমুল্লা অবলম্বনে লিখিত। সিয়র-রচয়িতা বলেন যে নবাবের চাকরেরা দড়ি কাটিয়া তাঁবুটা মারাঠা-সর্দ্দারদের উপর ফেলিয়া দিয়া তাহাদের মারে। এটা সম্ভব বোধ হয় না, কারণ নবাবী যোদ্ধারা মারাঠাদের সঙ্গে যুদ্ধে মিশিয়া গিয়াছিল। অপর এক কাহিনী, যে নবাব কিছুক্ষণ কথাবার্ত্তা বলিবার পর ভাস্করের নিকট মিথ্যা এক ওজর করিয়া তাঁবু হইতে সরিয়া পড়েন এবং তাহার পর মারাঠাদের [illegible]

রওনা হইলেন। কাটোয়া পৌছানো পর্য্যন্ত তিনি থামিলেন না। কিন্তু মারাঠা-সৈন্যগণের কোথাও চিহ্ন দেখা গেল না।

রঘুজী গাইকোয়াড় ভাস্করকে নবাবের সহিত ওরূপভাবে দেখা করিতে অনেকবার নিষেধ করিয়াছিল, অন্ততঃ সন্দিগ্ধ হইতে এবং সব সর্দ্দারকে একসঙ্গে লইয়া না গিয়া অর্দ্ধেককে সতর্কভাবে সৈন্যসহ কিছুদূরে প্রস্তুত থাকিতে উপদেশ দেয়। কিন্তু ভাস্কর যখন তাহার কোনো কথাই শুনিল না, তখন গাইকোয়াড় না-জানি কি হয় ভাবিয়া অপর একুশজন সর্দ্দারের সঙ্গে নবাবের দরবারে যায় নাই, নিজের তাঁবুতে বসিয়া ছিল। নবাব-সৈন্যের আক্রমণ আরম্ভ হওয়া মাত্র সে নিজ দল লইয়া দ্রুতবেগে পলাইয়া পলাশী ও কাটোয়ায় মারাঠা-শিবিরে পৌছিয়া নিজের ও ভাস্করের সব সম্পত্তি বোঝাই করিয়া অবশিষ্ট দশ হাজার সৈন্যসহ নিরাপদে স্বদেশে পৌছিল। নেতাদের সংহারের সংবাদ পাইয়া অপরাপর মারাঠা দল, বাংলা ও উড়িষ্যার নানাস্থানে যে যেখানে ছিল, এদেশ ছাড়িয়া নাগপুর চলিয়া গেল। বিজয়ী আলীবর্দ্দী নিজ সৈন্যদের মধ্যে দশ লক্ষ টাকা পুরস্কার বিতরণ করিলেন। তাঁহার অনুরোধে বাদশাহ নবাবের সব সেনাধ্যক্ষদের মন্‌সব্ বাড়াইলেন এবং উচ্চ উপাধি দিলেন।

(১৩)

ভাস্কর মরিল। তাহার পর এক বৎসর তিন মাস কাল বাংলা দেশ মহা শান্তি ও সুখ ভোগ করিল। ক্রমাগত তিন বৎসর ধরিয়া ছোটাছুটি, যুদ্ধ এবং দুশ্চিন্তার পর নবাব এখন নিঃশ্বাস ফেলিবার অবকাশ পাইলেন বটে, কিন্তু ভীষণ অর্থকষ্টে পড়িয়া গেলেন।

একে ত উড়িষ্যা-জয়ের জন্য দুইবার সদলবলে গিয়া যুদ্ধ করিতে বাধ্য হওয়ায় ১৭৪১ সালে বঙ্গেশ্বরের অনেক টাকা খরচ হইয়াছিল। আবার, ঠিক তাহার পরই বর্গীর আগমনে বাংলায় গঙ্গার পশ্চিমের সব জেলা-গুলিতে এবং পূর্ব্বপারেও অনেক স্থলে গ্রাম-পোড়ানো, লুট, লোক-পলায়ন, চাষবাস শিল্প-ব্যবসা বন্ধ হওয়া, বাণিজ্যের অভাবে রাজকীয় প্রাপ্য মাশুলের লোপ পাওয়া, প্রভৃতি ভীষণ ফল ফলিল; প্রজার ধনক্ষয়ের সঙ্গে সঙ্গে রাজার আয়ও কমিয়া গেল। অপর দিকে, দেশরক্ষার জন্য এই নূতন শত্রুর বিরুদ্ধে অনেক নূতন সৈন্য রাখিতে, সদা সজাগ সশস্ত্র থাকিতে এবং নানাস্থানে দ্রুত কুচ করিতে বাধ্য হওয়ায়, বিশেষতঃ পেশোয়াকে বাইশ লক্ষ টাকা দেওয়ার জন্য, নবাব-সরকারের খরচ অত্যন্ত বাড়িয়া গেল। ভাস্করকে মারিয়া বর্গীদের দেশ হইতে তাড়াইয়া দিবার পর (এপ্রিল ১৭৪৪র প্রথমে) নবাব টাকার অভাবে চারিদিকে অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন। তাহার পূর্ব্ব বৎসরই নবাব ইংরেজ ফরাসী ও ডচ বণিকদের নিকট হইতে বর্গীর হাঙ্গামার ফল বলিয়া দুই দুই হাজার টাকা আদায় করেন। কিন্তু এই টাকা তাঁহার অভাবের মরুভূমিতে এক ফোঁটা জল মাত্র হইল; কারণ শুধু তাঁহার সৈন্যদের বেতনেই মাস মাস পনের লাখ টাকা লাগিতেছিল।

১৭৪৪ সালের জুলাই মাস পড়িতেই আলীবর্দ্দী কাসিমবাজার-কুঠীর ইংরেজদের ডাকিয়া বলিলেন:—"তোমরা সমস্ত জগতের পণ্যদ্রব্যের কেনা বেচা করিতেছ। আগে তোমরা [বৎসর বৎসর] চার পাঁচখানা জাহাজ খাটাইতে, আর এখন চল্লিশ পঞ্চাশখানা জাহাজ আন, তাহার আবার সবগুলি কোম্পানীর নিজের জন্য নহে। গত পাঁচ বৎসর ধরিয়া আমি তোমাদের নিত্য উপকার করিয়াছি, কিন্তু তোমরা আমাকে স্মরণ কর নাই। আর এখন আমি দেশরক্ষার জন্য মারাঠাদের সহিত প্রাণপণ যুদ্ধে ব্যস্ত, এই সময় কিনা তোমরা আমাকে সাহায্য করা দূরে থাকুক, মারাঠাদের গোলা-বারুদ যোগাইয়া দিয়াছ! অতএব আজ হইতে আমার রাজ্যের কোনো স্থানে তোমরা ব্যবসা করিতে পারিবে না, যতক্ষণ না তোমরা আমার সৈন্যদের দু-মাসের বেতন, ত্রিশ লক্ষ টাকা, দাও।" ইহার দুই-তিন দিন পরে নবাবের পিয়নগণ আসিয়া কাসিমবাজারে সাহেব বণিকদের ঘিরিয়া রাখিল এবং বাংলার সর্ব্বত্র সাহেবদের বাণিজ্য বন্ধ করিয়া দিবার হুকুম গেল।

শুজা-উদ্দীনের নবাবীর সময়ও তাঁহার শত্রুপক্ষকে

যুদ্ধের সরঞ্জাম বিক্রয় করিবার দোষ দিয়া ইংরেজদের নিকট হইতে ১,৮৪,৫০০ টাকা আদায় করা হয় (১৭৩১)। এখন ইংরেজরা এই অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা বলিয়া নবাবকে দরখাস্ত করিল, কিন্তু ব্যবসা-নিষেধের হুকুম উঠাইয়া লইবার জন্য নবাবকে এক লক্ষ টাকা দিতে চাহিল। নবাব তাহাতে সম্মত হইলেন না। তাঁহার পেয়াদা ও সওয়ার গিয়া সব গড়া-কাপড়ের আড়ঙ্গে কাজ বন্ধ করিয়া দিল। নবাব টাকা-আদায়ের জন্য নানা ধনী লোককে ধরিয়া চাবুক মারিতে লাগিলেন। খ্রীত কোৎমাকে একজন কর্ম্মচারী পিটিয়া এক লক্ষ পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা দিতে রাজী করাইল, কিন্তু তাহার পর তাহাকে অপর এক জল্লাদের হাতে সঁপিয়া দেওয়া হইল যে যন্ত্রণা দিয়া তিন লক্ষ টাকা আদায় করুক। এইরূপ টাকা-আদায়ের জন্য ইংরেজ কোম্পানীর উকীলদিগকে দুই দিন অনাহারে নবাব দরবারে আটক করিয়া রাখা হইল। নবাব এই দাবি নিষ্পত্তি করিবার ভার চয়ন রায় এবং ফতেচাঁদ (জগৎ শেঠ)এর উপর দিলেন; তাহারা বলিল, "নবাব কোম্পানীর নিকট হইতে এই টাকা (অর্থাৎ ত্রিশ লাখ) চান না; তাঁহার অভিপ্রায় এই যে সাহেবেরা, তাহাদের আশ্রয়ে যে-সব বণিক ব্যবসা চালাইতেছে এবং যে-সব ধনী লোক বর্গীর হাঙ্গামার সময় পরিবার ও ধন লইয়া কলিকাতায় পলাইয়াছে তাহাদের মধ্য হইতে ঐ টাকা তুলিয়া নবাবের হাতে দিবে। নবাব নিজ সৈন্যদের বেতন দিতে দিতে সমস্ত সুবার রাজস্ব ও নিজের সঞ্চিত ধন নিঃশেষ করিয়া, আত্মীয়-স্বজন এমন কি অনুচরদের নিকট টাকা লইতে বাধ্য হইয়াছেন। সুতরাং এটা খুব যুক্তিসঙ্গত কথা যে কলিকাতার অধিবাসীরাও তাহাদের অংশ দিবে।···নবাবের সৈন্যাধ্যক্ষগণ [বাকী বেতনের জন্য] অধীর হইয়া উঠিয়াছে, এবং প্রত্যহ নবাবকে জেদ করিতেছে যে ইংরেজদের বাড়ি ও আড়ঙ্গগুলি লুঠ করিতে অনুমতি দিন।"

ইংরেজরা মহা বিপদে পড়িয়া অবশেষে অনেক চেষ্টা ও সুপারিশের পর নবাবকে সাড়ে তিন লক্ষ টাকা দিয়া মিটমাট করিল। তাহা ছাড়া নবাবের প্রধান সেনাপতি এবং অন্যান্য উচ্চ কর্ম্মচারীদের ৩০,৫০০ টাকা, পাটনার নবাবকে আট হাজার, ঢাকায় পাঁচ হাজার উপহার-স্বরূপ দিতে বাধ্য হইল। অক্টোবর মাসে ইংরেজদের বাণিজ্য এইরূপে আবার বাধামুক্ত হইল। চন্দননগর হইতে এক লক্ষ টাকা চাওয়া হইল, ফরাসীরা ৩০,০০০৲ টাকাতে রফা করিবার চেষ্টা করিলেন।

(১৪)

১৭৪৪ সালের শেষ নয় মাস এবং ১৭৪৫ সালের প্রথম অর্দ্ধেক শান্তিতে কাটিল।

কিন্তু ইতিমধ্যে নবাবের ঘরে এক মহা বিবাদ উপস্থিত হইয়া সমস্ত রাজনৈতিক গগন এক নূতন ঝড়ে ভরিয়া দিল, বাংলার সুখশান্তির আশা নষ্ট করিল; এবং বর্গীর হাঙ্গামার সহিত আফঘান সৈন্যদের বিদ্রোহ জড়াইয়া পড়িয়া এ দেশের অবস্থা অতি জটিল করিয়া তুলিল। আলীবর্দ্দী ভাস্কর-হত্যার পুরস্কারস্বরূপ তাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সেনাপতি ও সব যুদ্ধে প্রধান সহায়ক মুস্তাফা খাঁকে বিহারের শাসনকর্ত্তার পদ দিতে প্রতিজ্ঞা করেন, কিন্তু কার্য্যসিদ্ধি হইবার পর তিনি নিজ জামাতার খাতিরে এই প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিলেন না। আর, মুস্তাফা খাঁর কুটুম্ব আবদুল রসুল খাঁকে উড়িষ্যার নায়েব-সুবাদারের পদ হইতে সরাইয়া সেখানে রাজা জানকী-রামের পুত্র দুর্লভরামকে বসাইলেন। এই সব কারণে আলীবর্দ্দী ও মুস্তাফা খাঁর মধ্যে ঝগড়া বাধিয়া গেল, তর্ক-বিতর্ক শেষে বিদ্রোহ ও যুদ্ধে দাঁড়াইল (ফেব্রুয়ারি ১৭৪৫)। আফঘান সৈন্যগণ আলীবর্দ্দীর প্রধান সহায় এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যোদ্ধা ছিল। তাহাদের এক বড় দল এখন নবাবের চাকরি ছাড়িয়া দিয়া মুস্তাফা খাঁর অধীনে মুর্শীদাবাদ হইতে পাটনা আসিয়া পাটনার ছোট নবাব জৈন-উদ্দীন আহমদকে আক্রমণ করিল। ছয় দিন যুদ্ধের পর মুস্তাফা খাঁ পরাজিত হইয়া (২১এ মার্চ্চ) পলায়ন করিল এবং বিহারের নানা স্থানে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। অবশেষে ২০এ জুন (?) জৈন-উদ্দীন আহমদের সঙ্গে এক যুদ্ধে গুলির আঘাতে মুস্তাফার প্রাণ গেল, এবং

তাহার দলের আফঘানেরা ছত্রভঙ্গ হইয়া টিকারী ও সাসেরাম অঞ্চলে আশ্রয় লইল।

মুস্তাফা খাঁ মুর্শীদাবাদ হইতে চলিয়া যাইবার কিছু পরেই আলীবর্দ্দী তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ পাটনায় উপস্থিত হন, এবং মার্চ্চ মাসের শেষে তাহাকে জমানিয়া-ঘাজীপুর পর্য্যন্ত তাড়া করিয়া গিয়া, পরে মুর্শীদাবাদে ফিরিয়া আসেন। ইতিমধ্যে মুস্তাফার আহ্বানে এবং সাহায্যের প্রতিশ্রুতিতে রঘুজী ভোঁসলে ভাস্করের খুনের প্রতিশোধ লইবার জন্য চৌদ্দ পনের হাজার সৈন্যসহ কটক আক্রমণ করিলেন; নবাব তখন বিহারে আফঘান-বিদ্রোহ থামাইতে ব্যস্ত। রাজা দুর্ল্লভরাম (কটকের নায়েব-সুবাদার) জনকতক প্রধান সঙ্গীসহ নিজের বুদ্ধিদোষে ও রঘুজীর বিশ্বাসঘাতকতায় মারাঠাদের হাতে বন্দী হইল, কটক শহর মারাঠাদের অধিকারে আসিল, কিন্তু আবদুল আজিজ বারাবাটী-দুর্গের মধ্যে থাকিয়া যুদ্ধ করিতে লাগিল, শত্রুকে দুর্গ ছাড়িয়া দিতে সম্মত হইল না; মারাঠারা উহা অবরোধ করিয়া রহিল। এই বিপদের সময় আলীবর্দ্দী মারাঠা ও মুস্তাফা খাঁর মিলন বন্ধ করিবার জন্য টাকা দিয়া সন্ধির প্রস্তাব করিয়া পাটনা হইতে রঘুজীর নিকট দূত পাঠাইলেন। রঘুজী সুবিধা বুঝিয়া তিন কোটি টাকা চাহিলেন। নবাব সন্ধির কথা-বার্ত্তায় দু-মাস কাটাইলেন, তাহার পর জুনের শেষে যেই শুনিলেন যে মুস্তাফা মারা গিয়াছে ও তাহার আফঘান-সৈন্যগণ ছত্রভঙ্গ হইয়াছে, অমনি তিনি সন্ধির প্রস্তাব ভাঙিয়া দিলেন। কিন্তু সমস্ত উড়িষ্যা, কটক হইতে মেদিনীপুর ও হিজলী পর্য্যন্ত, রঘুজীর হাতে আসিল। অবশেষে আবদুল আজিজও সাহায্যের আশা হারাইয়া নিজের বাকী বেতন পাইবার শর্ত্তে বারাবাটী-দুর্গ মারাঠাদের হাতে ছাড়িয়া দিল। এক বৎসর পরে জানকীরাম তিন লক্ষ টাকা দিয়া পুত্রকে মারাঠাদের কয়েদ হইতে খালাস করিল।

উড়িষ্যা গ্রাস করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া রঘুজী জুন মাসে বর্দ্ধমান জেলায় প্রবেশ করেন; অমনি দেশে মহা গণ্ডগোল উপস্থিত হইল এবং কাপড়ের আড়ঙ্গে কাজকর্ম্ম থামিয়া গেল। কিন্তু একমাস পরেই (২০এ জুলাই) তিনি ঐ জেলা ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন। ইহার কারণ আলী-বর্দ্দীর সসৈন্যে মুর্শীদাবাদে প্রত্যাগমন এবং মুস্তাফা খাঁর মৃত্যু। জুলাই মাসে রঘুজী বীরভূম জেলায় গিয়া ছাউনী করিয়া রহিলেন।

(১৫)

বর্ষা শেষ হইলে (অক্টোবর ১৭৪৫) রঘুজী বিহার প্রদেশে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার উদ্দেশ্য মৃত মুস্তাফা খাঁর পুত্র মুর্ত্তাজা খাঁ এবং অপর আফঘানদের মক্‌রীখুই নামক গ্রামে স্থানীয় জমিদারদের অবরোধ হইতে উদ্ধার করিয়া তাহাদের দ্বারা নিজ সৈন্যদল পুষ্ট করা।

বীরভূমের জঙ্গল এবং মুঙ্গেরের নিকট খড়্গপুরের পাহাড় দিয়া অগ্রসর হইয়া পথে ফতুয়া, শেখপুরা এবং টিকারীর অধীন অনেক গ্রাম লুট করিয়া, শোণ নদী পার হইয়া, রঘুজী ভোঁসলে দক্ষিণ-বিহারে পৌঁছিয়া আফঘানদিগকে খালাস করিলেন। উহারা যোগ দেওয়াতে তাঁহার সৈন্য-সংখ্যা এখন বিশ হাজার হইল। টিকারীর জমিদারীতে আর্‌ওয়াল গ্রামে দুইদল একত্র হইল।

ইতিমধ্যে বীরভূম হইতে রঘুজীর বিহার-যাত্রার সংবাদ পাইবামাত্র আলীবর্দ্দী অক্টোবর মাসের প্রথমে মুর্শীদাবাদ হইতে পাটনার দিকে কুচ করিলেন। বাঁকিপুরে পৌঁছিয়া কিছুদিন থামিয়া রহিলেন, কারণ পাটনা শহরের আর কোনো বিপদ-সম্ভাবনা নাই, অথচ আফঘানেরা যোগ দেওয়াতে রঘুজী এত প্রবল হইয়াছেন যে, তাঁহাকে পরাস্ত করা সহজ নহে। আলীবর্দ্দী পাটনায় সৈন্যদল বৃদ্ধি করিয়া, কামান ও সাজসরঞ্জাম লইয়া, যুদ্ধের জন্য সতর্ক শ্রেণিবদ্ধভাবে সেনা চালাইয়া মারাঠাদের দিকে অগ্রসর হইলেন। মারাঠারা তাঁহার আগে আগে চলিতে লাগিল; ঠিক নবাবের তোপের গোলা পৌঁছানোর অপেক্ষা একটু বেশী দূরে থাকে এবং পথের দুধারে গ্রাম লুট করে। রঘুজী স্বয়ং রাণীর তলাও (=পুকুর)এ, [মুহীব আলীপুর নামক গ্রামের নিকট] অবশিষ্ট সৈন্য লইয়া তাঁবু খাটাইয়া ছিলেন। নবাবী সৈন্য সেখানে পৌঁছিবা মাত্র তাহাদের অগ্রগামী ভাগ, মীরজাফরের অধীনে, হঠাৎ আক্রমণ

করিয়া রঘুজীকে ঘিরিয়া ফেলিল। অপর বর্গীরা চারিদিকে জমা হইয়া রঘুজীকে উদ্ধার করিবার চেষ্টা করিল। অনেকক্ষণ যুদ্ধের পর শেষে শমশের খাঁ নামক নবাবের আফঘান সেনাপতির শিথিলতায় রঘুজী এই বিপদ হইতে বাঁচিলেন। যুদ্ধের শেষে নবাব স্বয়ং আসিয়া পৌছিলেন, কিন্তু বর্গীদের পশ্চাদ্ধাবন করিয়া কোনোই ফল হয় না। দ্রুত কুচ করায় তাঁহার তাঁবু ও মালপত্র পিছনে পড়িয়া ছিল, এজন্য নবাব ঐ স্থানে অপেক্ষা করিতে বাধ্য হইলেন।

তখন নবাব-মহিষী আলীবর্দ্দীর শ্রম লাঘব করিবার ইচ্ছায়, নিজের দূত রঘুজীর নিকট পাঠাইয়া সন্ধির প্রস্তাব করিলেন। রঘুজী সন্ধি করিতে উৎসুক ছিলেন, কিন্তু মীর হবিব তাহাকে নিষেধ করিল এবং বলিল যে, মুর্শীদাবাদ শহরে সৈন্য নাই, এই সময় দ্রুতবেগে সেখানে গেলে অবাধে লুট করিয়া অগণিত ধন পাওয়া যাইবে। অমনি বর্গীরা সেইদিকে ছুটিল, আর আলীবর্দ্দীও তাহাদের পিছু পিছু যথাসাধ্য বেগে কুচ করিতে লাগিলেন। শোণ নদীর তীর বাহিয়া উত্তর দিকে আসিয়া বঙ্গীয় সৈন্য পাটনার নিকট পৌছিয়া, অমনি পূর্ব্বদিকে দেশের মুখে রওনা হইল। পথে তাহাদের মুনের পর্য্যন্ত কোনমতে আহার জুটিয়াছিল, তাহার পর প্রায় উপবাস এবং প্রত্যহ দ্রুত কুচ করা।

ভাগলপুর পৌছিলে চম্পানগরের নদীর ধারে আলীবর্দ্দীকে নিজ সৈন্য হইতে পৃথক পাইয়া রঘুজী তাঁহাকে হঠাৎ আক্রমণ করিয়া ঘিরিয়া ফেলিলেন। ছয় শত সৈন্য লইয়া দশগুণ বর্গীর সঙ্গে লড়িয়া নবাব তাহাদের অবশেষে হটাইয়া দিলেন, কারণ এইরূপে সময় পাইয়া তাঁহার দলবল ক্রমে আসিয়া জুটিয়াছিল।

(১৬)

সেখান হইতে রণে ভঙ্গ দিয়া রঘুজী দ্রুতবেগে বন-জঙ্গলের পথে মুর্শীদাবাদের নিকট আসিয়া পৌছিলেন (২১ ডিসেম্বর, ১৭৪৫); তাহার পরদিন নবাবও শহর-হইতে তিন ক্রোশ দূরে আসিয়া পড়িলেন। কিন্তু সেই একদিনের সুযোগেই বর্গীরা মুর্শীদাবাদের ওপারের শহরতলি * এবং অনেক গ্রাম লুট করিয়া জ্বালাইয়া দিয়াছিল। নবাবের আগমন-সংবাদে রঘুজী মুর্শীদাবাদের দক্ষিণ ও পশ্চিম দিকে সরিয়া পড়িলেন। নবাব তিন চার দিন থামিয়া দম লইয়া ঝপাইদহ হইতে আমানিগঞ্জে গেলেন। তাহার পর কাটোয়ার পশ্চিমে রাণীর পুকুরের পাড়ে দুই পক্ষে ভীষণ যুদ্ধ হইল; অনেক লোক মারা যাওয়ায় রঘুজী রণক্ষেত্র হইতে পলাইলেন। মীর হবিব দুই তিন হাজার মারাঠা এবং ছয় সাত হাজার পাঠান (মুর্ত্তাজা খাঁ, বুলন্দ খাঁ প্রভৃতির অধীনে) সঙ্গে লইয়া বেরারে ফিরিয়া গেল।

কিন্তু কতকগুলি ছোট ছোট বর্গীর দল বঙ্গের নানা স্থানে ঘুরিতে লাগিল। † ১৭৪৬ সালের ৩রা জানুয়ারি তাহারা আবার কাসিমবাজারের তিন ক্রোশ পশ্চিমে দেখা দিল। কাটোয়ায় তাহাদের প্রধান আড্ডা রহিল, কাজেই ১৭৪৬ সালের প্রথম দু-তিন মাস দেশে অশান্তি থাকিলই, যদিও বড় কোন যুদ্ধ বা সৈন্যদলের চলাফেরা হইল না। মীর হবিব বেরার হইতে মেদিনীপুর আসিয়া সেই স্থান ও বাঁলেশ্বর দখল করিয়া সেখানে প্রায় বৎসরটা কাটাইল।

নবাবের সৈন্যগণ রণশ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে, তিনি নিজেও ক্লান্ত এবং অগাধ টাকা খরচ করিয়া ফেলিয়াছেন। সুতরাং ১৭৪৬ সালের প্রথমভাগে তিনি মুর্শীদাবাদে বসিয়া থাকিয়া দুই দৌহিত্র সিরাজউদ্দৌলা ও আক্রমুদ্দৌলার মহাসমারোহে বিবাহ দিলেন।

ভ্রম-সংশোধন

বৈশাখ মাসের 'প্রবাসী'তে "বর্গীর হাঙ্গামা" প্রবন্ধে কয়েকটা ভুল হইয়াছে।

পৃষ্ঠা	স্তম্ভ	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১২৩	২য়	১৩	আলীবর্দ্দী	জৈনউদ্দীন আহমদ
		১৬	ফেব্রুয়ারী	১২ মার্চ্চ

* যথা, ঝপাইদহ, মীরজাফরের বাগান প্রভৃতি [সিয়র, ১৫৩]।

† A boody of Marathas fired on a party of [English] soldiers sent to Hijli. The tents put out to air at Nichepur were carried away by the Marathas, who not regarding the English colours seized some boats of private trade. [Bengal letter d, 31 Jan., 1746]. A body of Marathas have continued at Midnapur the whole season under the command of Mir Habib. [*Ibid.*, 30 Nov. 1746]

ডাক্তার কুমারী মন্তেসরি

শ্রীযোগেশচন্দ্র পাল

আজ যদি ইউরোপ আমেরিকা প্রভৃতি মহাদেশের শিশু-শিক্ষাপদ্ধতির প্রতি দৃষ্টিপাত করা যায়, তাহা হইলে দেখা যাইবে যে, সে-সকল দেশের শিশুশিক্ষায় বিপ্লব চলিতেছে। আজ সেখানকার মেয়ে-পুরুষ সকলে দেশের ভবিষ্যৎ বংশধরগণকে মানুষ করিয়া তুলিবার জন্য মনে-প্রাণে লাগিয়া গিয়াছে। পুরুষদের চেয়ে মেয়েরাই ইহার দিকে বেশী ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। মেয়েরা মাতার জাতি কি না, তাই তাহারা সন্তানকে মানুষ করিবার ভার লইয়াছে। দেখিতে পাই, সে দেশের শিশুশিক্ষার ভার যাহাদের হাতে, তাহাদের শতকরা পঁচাত্তর জনই নারী।

ইউরোপ আমেরিকার শিশুশিক্ষায় বিপ্লব আসিল কেমন করিয়া, তাহা বলিতে হইলে শিশুশিক্ষার ইতিহাসের গোড়া হইতে দেখা আবশ্যক। শিক্ষা সম্বন্ধে অনেকেই বহু প্রাচীন কাল হইতে অনেক কথা বলিয়াছেন। কিন্তু প্রাচীন কালের মনীষীরা শিক্ষা সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, সে-শিক্ষা শিশুদের জন্য নয়। তবে তাহার ভিতরও শিশুশিক্ষার অনেকটা আভাস পাওয়া যায়। কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে কেহ শিশুশিক্ষার রূপ দেন নাই। ফরাসী বিপ্লবের পূর্ব্বে রুশোর মনে এই কথাটা বিশেষ করিয়া ধরা পড়ে এবং তিনি শিশুশিক্ষা সম্বন্ধে অনেকগুলি খাঁটি কথা বলিয়া যান। সেগুলি আজও ভাবিয়া দেখিবার মত। অনেকেই তাঁহার লেখা লইয়া গবেষণা করিতেছেন। রুশোর মত হেগেলও শিশুশিক্ষা সম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়া যান। তাঁহার সবচেয়ে বড় কথা শিশুদের পূর্ণ স্বাধীনতা দিতে হইবে—শিক্ষার সময়ে শিশুরা পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করিবে। এই স্বাধীনতার ভিতর দিয়াই তাহারা তাহাদের দৈনন্দিন জীবন সুশৃঙ্খলিত করিয়া তুলিবে। ইঁহারা যাহা বলিয়া গিয়াছেন তাহা লইয়া কেহ বড় ভাবে নাই। তাঁহাদের লেখা বা মতামত লইয়া কেহ আলোচনাও করেন নাই; রূপ দিবার চেষ্টা ত কেহ করেনই নাই।

ইহাদের আসিলেন জার্ম্মাণ দার্শনিক ফ্রোবেল। তিনি পূর্ব্বোক্ত লেখক ও মনীষিগণের লেখার আলোচনা এবং নিজের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতে সিদ্ধান্ত করিলেন যে, শিশুরা শিক্ষালাভ করিবে খেলাধূলা, স্বাধীনতা ও প্রেমের ভিতর দিয়া। এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া তিনি তাহাকে বাস্তব রূপ দিতে চেষ্টা করিলেন। তাহারই ফলে আজ আমরা কিন্ডারগার্টেন শিক্ষাপদ্ধতি দেখিতে পাইয়াছি। কিন্ডারগার্টেন শিক্ষাপদ্ধতি আবিষ্কৃত হইলেও সেই যুগে কেহ তাহা গ্রহণ করিল না। ফ্রোবেলের চেষ্টা ও গবেষণাকে জার্ম্মাণ সরকার সাহায্য ত করিলেনই না, বরং তাঁহার মতবাদকে পিষিয়া মারিবার চেষ্টা করিলেন। ইহাতে ফ্রোবেল দমিলেন না। তাঁহার জীবদ্দশায় তিনি ভাল করিয়া কোনো স্কুল চালাইয়া যাইতে পারেন নাই। মানুষ তাহার ভুল বুঝিতে পারে, তাই জার্ম্মানরা, এবং ক্রমে ক্রমে সমগ্র ইউরোপের লোক নিজেদের ভুল বুঝিতে পারিয়া ফ্রোবেলের শিক্ষাপদ্ধতিকে বরণ করিয়া লইল। আস্তে আস্তে সমস্ত ইউরোপ আমেরিকা, এমন কি সমস্ত পৃথিবীতে, কিন্ডারগার্টেন শিশুশিক্ষা পদ্ধতি ছড়াইয়া পড়িল। ১৯১০ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে কিনডারগার্টেন ভিন্ন শিশুশিক্ষার অন্য কোন ভাল পদ্ধতি ছিল না।

কুমারী মন্তেসরি তাঁহার নূতন শিশুশিক্ষাপদ্ধতি প্রবর্ত্তন না করা পর্য্যন্ত কিন্ডারগার্টেন শিক্ষাপদ্ধতিতে যে সকল দোষ আছে, তাহা আমাদের কাছে ধরা পড়ে নাই। স্বাধীনতাকে শিশুশিক্ষার প্রধান বিষয় বলিয়া ধরিয়া লইলেও ফ্রোবেলের কিন্ডারগার্টেন শিক্ষাপদ্ধতির মধ্যে জোরজবরদস্তির (dogmatism) ও পরাধীনতার ভাব রহিয়া গিয়াছে। কিনডার-গার্টেন পদ্ধতিতে অনেক দোষ আছে, কিন্তু সমস্ত দোষ এখানে দেখান সম্ভবপর নয়। তাই তাহার প্রধান উদ্দেশ্য যে স্বাধীনতা—সে সম্বন্ধে মাত্র

দু-একটি কথা বলিব। "A child learns from within"—শিশু নিজের ভিতর হইতেই সব শিখে এবং যাহা কিছু শিক্ষার আবশ্যক, তাহার বীজ শিশুর মনের মধ্যেই আছে। কেবল সেই বীজকে ফুটাইয়া তুলিয়া বৃক্ষে পরিণত করা শিক্ষার কাজ। এইজন্য চাই স্বাধীনতা, এইজন্য চাই চারি পার্শ্বের স্ফূর্ত্তিজনক আবহাওয়া, প্রকৃতির সৌন্দর্য্য, শিশুর অবাধ গতি, ও সর্ব্বোপরি, শৃঙ্খলা। এইজন্য চাই আদর্শ শিক্ষক।

শিশুর স্বভাবকে ফুটাইয়া তুলিবার জন্য যে স্বাধীনতার আবশ্যক তাহা ফ্রোব্রেল দিতে চাহিয়াও দিতে পারেন নাই। কিন্ডারগার্টেন ক্লাসের ছেলেদের স্বাধীনতা থাকিয়া স্বাধীনতা নাই। তাহারা নিজেদের ইচ্ছামত কাজ করিতে পারে না। তাহাদিগকে নিয়মমত ঘণ্টার পর ঘণ্টা ক্লাসে থাকিতেই হইবে; ইচ্ছা না থাকিলেও ক্লাসে গিয়া বসিতে হইবে; পড়ায় মন না লাগিলেও থাকিতে হইবে; যখন যাহা ইচ্ছা, তখন তাহা করিতে পারিবে না। তারপর সামাজিকতা শিক্ষা দেওয়া শিশুশিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য। কিন্ডারগার্টেন শিক্ষার ভিতর তাহার অভাবও দেখা যায়।

ফ্রোবেলের পর যিনি শিশুশিক্ষার নূতন রূপ দিয়াছেন, তিনি ডাক্তার কুমারী মেরিয়া মন্তেসরি। আজ যাঁহারা শিশুশিক্ষা সম্বন্ধে একটু ভাবেন তাঁহারা সকলেই কুমারী মন্তেসরির কথা শুনিয়াছেন। মন্তেসরি শিক্ষা আজিকার দিনের সব চেয়ে ভাল শিশুশিক্ষা পদ্ধতি। ইউরোপ আমেরিকার ত কথাই নাই, ভারতবর্ষেও অনেকগুলি মন্তেসরি স্কুল স্থাপিত হইয়াছে—বিশেষ করিয়া গুজরাটে। বাংলাদেশে কিন্তু মন্তেসরি স্কুল একটিও নাই। ইউরোপ আমেরিকায় মন্তেসরি শিক্ষক শিক্ষয়িত্রী তৈয়ার করিবার জন্য কলেজ পর্য্যন্ত খোলা হইয়া গিয়াছে। মন্তেসরি শিক্ষার প্রধান বিষয় ১। স্বাধীনতা, ২। শৃঙ্খলা, ৩। ব্যক্তিগত শিক্ষা, ৪। সামাজিকতা শিক্ষা, ৫। খেলনার (apparatus) সাহায্যে মন ও শরীরের বিকাশ সাধন। এক কথায় বলা যাইতে পারে যে, মন্তেসরি শিক্ষার লক্ষ্য—"শৃঙ্খলা, স্বাধীনতা, খেলাধূলা ও ভালবাসার ভিতর দিয়া খেলনার সাহায্যে শিশুদিগের মন, বুদ্ধি ও শরীরের বিকাশ সাধন করা এবং মনে প্রেম ও ভালবাসার সঞ্চার করিয়া সামাজিকতা শিক্ষাদান, যাহাতে ভবিষ্যৎ



ডাঃ কুমারী মন্তেসরি

জীবনে তাহারা আদর্শ নাগরিক হইয়া মানব-সমাজের সেবা করিতে পারে।"

যিনি শিশুশিক্ষার এই লক্ষ্যে পৌঁছিবার জন্য, ভোগ-বিলাস,সংসার, নাম, খ্যাতি, অর্থ, বাড়িঘর পরিত্যাগ করিয়া তপস্যা করিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন, তিনি ধন্য হইয়াছেন এবং জগৎকে এক নূতন জিনিষ দান করিয়াছেন। আজ আমরা সেই গরীয়সী নারী মেরিয়া মন্তেসরির জীবনের সাধনার কথা বলিব।

বাল্যজীবন ও শিক্ষা

যাহারা পৃথিবীতে কিছু দিবার জন্য আসে, তাহারা তাহাদের জন্মের সঙ্গে সঙ্গে লইয়া আসে

বিরোধকে। অন্যান্য মহাত্মা, ঋষি প্রভৃতির মত কুমারী মন্তেসরিও জন্মের সঙ্গে সঙ্গে বিরোধকে সহযোগী হিসাবে লইয়া আসিয়াছিলেন। তাঁহার মধ্যজীবন পর্য্যন্ত তিনি বিরোধকে বাদ দিয়া চলিতে পারেন নাই। কিন্তু বিরোধকে তিনি কখনও ভয় করেন নাই।

ইউরোপকে আমরা আজ সভ্যতার জন্য বড় বলিয়া মানিলেও এই ইউরোপের মধ্যে এমন সব দেশ আছে, যেখানকার অবস্থা—সামাজিক ও পারিবারিক ব্যাপারে, আমাদের অপেক্ষা ভাল নয়, অন্ততঃ মহাযুদ্ধের পূর্ব্বে ইটালীর পারিবারিক অবস্থা, সমাজিক অবস্থা, শিক্ষা-দীক্ষা কোন ক্রমেই ভারতবর্ষের চেয়ে ভাল ছিল না। ভারতবর্ষে আজকাল সাধারণ মেয়েদের যেমন অবস্থা, লেখাপড়ার নামে যেমন তাহাদের হৃদ্‌কম্প হয়, কলেজে পড়া মেয়েকে খৃষ্টান ম্লেচ্ছ বলিয়া গালি দেয়, তারপর নিজেদের পরিবারের মেয়েরা স্কুল কলেজে পড়িতে চাহিলে জাতি যাইবে, মানসম্মানের হানি হইবে, ধর্ম্ম নষ্ট হইবে বলিয়া ভীত হয়, মন্তেসরি যখন ইটালীর মধ্যবিত্ত ঘরে জন্মগ্রহণ করিলেন, তখন ইটালীর সামাজিক অবস্থাও ছিল ঠিক সেইরূপ। তাই তাঁহাকে লেখাপড়া শিখিতে কত বেগ পাইতে হইয়াছে তাহা সহজেই অনুমান করা যায়।

তখনকার দিনে লেখাপড়ার তেমন চর্চ্চা না থাকিলেও কুমারী মন্তেসরি লেখাপড়া করিতে লাগিলেন। একটু বড় হইলে এই লেখাপড়ার প্রতি তাঁহার বিশেষ ঝোঁক আসিয়া পড়িল। তারপর দেশের অবস্থা, দেশের মেয়েদের অবস্থা, সমাজে কুসংস্কারের ভীষণ বন্ধন তাঁহার মনকে দোলা দিতে লাগিল। সমাজের কুৎসা, নিন্দা, অপবিত্র ইঙ্গিত কিছুই তিনি লক্ষ্য করিলেন না। সমস্ত অবহেলা করিয়া তিনি উচ্চ শিক্ষার জন্য কলেজে ভর্ত্তি হইলেন। সমাজের এই অবস্থা দেখিয়া শুনিয়া যেমন সমাজের প্রতি তাঁহার একটা ঘৃণা জন্মিল, তেমনি সমাজকে মরণের পথ হইতে বাঁচাইবার জন্য, সমাজকে উন্নত করিবার জন্য, প্রবল ইচ্ছা হইল। তিনি বহু চিন্তা করিয়া ঠিক করিলেন যে, চিকিৎসক হইয়া সমাজ-সেবায় আত্মনিয়োগ করিবেন। ইহার জন্য তিনি ডাক্তারী পরীক্ষা দিবার ইচ্ছায় রোম ইউনিভার্সিটিতে ভর্ত্তি হইলেন।

ডাক্তারীতে ভর্ত্তি হওয়াতে চারিদিক হইতে লোকের কুদৃষ্টি আবার তাঁহার উপর নূতন করিয়া আসিয়া পড়িল। তখন ডাক্তারী লাইনে অন্য কোন ছাত্রী ছিল না। ইটালীতে তিনিই সর্ব্বপ্রথম মহিলা ডাক্তারী পরীক্ষার জন্য রোমের ইউনিভার্সিটিতে ভর্ত্তি হইলেন। সমাজের কুদৃষ্টি, নিন্দা ত আছেই, তার উপর লোকের কুদৃষ্টিও তাঁহার উপর আসিয়া পড়িল। পড়াশুনা করা তাঁহার পক্ষে কঠিন হইয়া উঠিল।

কিন্তু তিনি তাঁর লক্ষ্যকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া চলিলেন। তিনি ছিলেন সাধক, বিশ্বের হিতসাধন করা তাঁহার অন্তরের কামনা, দেশের ভবিষ্যৎ গড়িয়া তুলিবার ইচ্ছা ছিল তাঁর প্রবল, তাই তিনি সমস্ত বাধাবিঘ্নকে পরাজিত করিয়া রোম ইউনিভার্সিটির চিকিৎসাবিদ্যার সর্ব্বোচ্চ পরীক্ষা কৃতিত্বের সহিত পাশ করিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তিনি চিকিৎসার জন্য ডাক্তার উপাধি প্রাপ্ত হইলেন।

ডাক্তারী

কুমারী মন্তেসরি ডাক্তার হইলেও সাধারণ ডাক্তারের মত ছিলেন না। তিনি আসিয়াছিলেন মাতৃরূপে। তিনি ছিলেন রোগীর মা।

ইটালী তখন কি অবস্থায় ছিল, তাহা বুঝিতে পারি ইটালীর সরকারের দেশের প্রতি কর্ত্তব্যহীনতা দেখিয়া। তখন অর্থাৎ পঁচিশ ত্রিশ বৎসর আগে সমস্ত ইটালীতে এমন একটিও প্রতিষ্ঠান ছিল না, যেখানে দেশের কালা, বোবা, পাগল, বিকৃতমস্তিষ্ক লোকের চিকিৎসা হইতে পারে। ডাক্তার মন্তেসরি যখন পাশ করিয়া বাহির হইলেন, তখন রোমে মাত্র একটি প্রতিষ্ঠান কাজ আরম্ভ করিয়াছে। তিনি পাশ করিয়াই এই প্রতিষ্ঠানের সহকারী ডাক্তার হইয়া কাজ করিতে লাগিলেন।

তিনি তাঁহার আপিসের কর্ত্তব্য হিসাবে যাহা করা আবশ্যক, তাহা করিতে এতটুকুও ত্রুটি করিতেন না। তারপর যাহাদের জীবনমরণের ভার হাসপাতালের

উপর ছিল, কর্ত্তব্য না হইলেও তিনি অবসর সময়ে গিয়া তাহাদের দেখাশুনা করিতেন। রাত্রি জাগিয়া রোগীর কাছে নার্সের মত বসিয়া থাকিতেন। তাঁহার অবসর সময়েও তিনি ইচ্ছা করিয়া নানাপ্রকার সংক্রামক রোগের রোগীকে দেখিতেন। যে-কোন সাংঘাতিক রোগের রোগীই হউক না কেন, তাঁহার কর্ত্তব্য হউক আর নাই হউক, তিনি কোন দিনও তাহাকে অবহেলা করেন নাই। রোম নগরীতে তখন বেশী ডাক্তার ছিল না। যাহারা ছিল, তাহারা সুযোগ বুঝিয়া গরীবের উপর অন্যায় জুলুম করিয়া অনেক সময় বেশী পয়সা লইত। তাই গরীবেরা তাঁহাদিগকে না ডাকিয়া কুমারী মন্তেসরির কাছে ছুটিয়া আসিত। রোমের যে-কোন স্থান হইতেই কেহ আসুক না কেন, তিনি রাত্রিদিন সময় অসময় বিচার না করিয়া তাহাদের গৃহে রোগীর কাছে গিয়া বসিতেন। কোন রোগীর কথা শুনিলে যতক্ষণ তিনি তাহাকে দেখিতে না পারিতেন, ততক্ষণ শান্তি পাইতেন না। এইজন্য কত রাত্রি যে তিনি পাহারাওয়ালার মত জাগিয়া কাটাইয়াছেন তাহার ঠিক নাই।

কুমারী মন্তেসরি শিশুরোগ সম্বন্ধে বিশেষ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। তাই তাঁহার উপর শিশুদের দেখিবার শুনিবার ভার ছিল। হাসপাতালে যে-সব শিশু ছিল, তাহাদের অধিকাংশই বিকৃতমস্তিষ্ক এবং নির্ব্বোধ ছিল। তাই যখনই এই সব শিশুদের কাছে তিনি যাইতেন, তখনই তাঁহার মনের কোণে একটা আঘাত লাগিত। তাঁহার প্রাণ সমবেদনায় ভরিয়া উঠিত। তিনি ভাবিতেন, ইহাদিগকে কি মানুষ করিয়া তোলা যায় না; ইহাদের কি বুদ্ধি জ্ঞান বিকশিত করা যায় না? এই কথাই তিনি কেবল ভাবিতেন।

শিশু-অনাথ-আশ্রমে

শুধু ডাক্তারী করিবার জন্য, শুধু ঔষধ দিবার জন্য তিনি জন্ম গ্রহণ করেন নাই, তিনি জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন মানুষকে মানুষ করিয়া তুলিতে। তাই ডাক্তারী তাঁহার ভাল লাগিল না।

ডাক্তারী পরিত্যাগ করিয়া কুমারী মন্তেসরি সরকারী শিশু অনাথালয়ের ডিরেক্টর নিযুক্ত হইলেন। তিনি এইখানে ছেলেমেয়ে পাইয়া তাঁহার নূতন সাধনায় সিদ্ধি লাভ করিবার জন্য লাগিয়া গেলেন। ভোর হইতে না হইতেই উঠিয়া ছেলেমেয়েদের কাজে লাগিয়া যাইতেন। এইরূপ সর্ব্বক্ষণ ছেলেমেয়েদের সহিত থাকিতে পারায় তিনি তাহাদিগকে পর্য্যবেক্ষণ করিবার যথেষ্ট সুযোগ পাইলেন।

কুমারী মন্তেসরি বহু সাধনার পর এক দিন হঠাৎ আশার আলো সম্মুখে দেখিতে পাইয়া আনন্দিত হইলেন। সেই দিন শিশুদের মন্দিরের ভিত্তি স্থাপিত হইল। মন্তেসরি মনে করিলেন, তিনি সিদ্ধির পথে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন।

তাঁহার অধীনে যে-সব দুর্ব্বলমস্তিষ্ক ছেলে ছিল, তাহাদের মধ্যে একটি ছেলে একদিন সাধারণ বালকদের সহিত পরীক্ষা দিয়া ভালভাবে পাশ করিল। কেবল তাহাই নহে, সে মন্তেসরির নিকট যে প্রণালীতে শিক্ষা-প্রাপ্ত হইয়াছিল, তাহার ফলে অন্যান্য ছেলেদের চেয়ে বেশী নম্বর পাইল।

একটি ছেলে এরূপ হইল বলিয়া মন্তেসরি তেমন আনন্দ পাইলেন না, তবে তিনি যে সাফল্যের পথে প্রায় আসিয়া পৌঁছিয়াছেন, তাহা বুঝিতে তাঁহার বাকি রহিল না। তিনি অধিক মনোযোগের সহিত, আরও উৎসাহের সহিত, এই সব দুর্ব্বলমস্তিষ্ক বালক-বালিকা-দিগকে শিক্ষা দিতে লাগিলেন। ফলে যে সমস্ত ছেলে তাঁহার কাছে শিক্ষা পাইয়া পরীক্ষা দেয়, তাহারাই সাধারণ ছেলের চেয়ে বেশী নম্বর পায়। বার বার যখন এইরূপ ঘটিতে লাগিল, তখন তিনি স্থিরনিশ্চয় হইলেন যে তিনি কৃতকার্য্য হইয়াছেন। তখন তিনি জিনিষটাকে সাধারণের উপযোগী করিয়া গড়িয়া তুলিতে স্থির করিলেন।

পুনরায় অধ্যয়ন আরম্ভ

সে ১৯০০ সনের কথা। কুমারী মন্তেসরি অনাথ-আশ্রম পরিত্যাগ করিয়া বিষয়টা ভালরূপে গুছাইয়া

তুলিবার জন্য, সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিবার জন্য, আবার অধ্যয়নে রত হইলেন। তিনি রোম বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শনের ছাত্রী হিসাবে ভর্ত্তি হইলেন, সঙ্গে সঙ্গে মনস্তত্ত্ব-বিজ্ঞান পড়িতে লাগিলেন। বিশেষ করিয়া তিনি শিশু-মনস্তত্ত্বের উপর জোর দিলেন। তিনি যে কর্ত্তব্যকে মাথা পাতিয়া লইয়া বাহির হইয়াছেন, পড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাহা সাধন করিতে অপরিসীম চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তিনি কেবল দর্শন ও মনস্তত্ত্ব পড়িয়াই ক্ষান্ত হন নাই, নাচ, গান, ব্যায়াম প্রভৃতি বিষয়ে বিশেষ মন দিতে লাগিলেন। তিনি জানিতেন শিশুর মন গঠন করিবার জন্য এই সকলের আবশ্যকতা আছে। ইহার উপর তিনি নিজে ডাক্তার ছিলেন, শরীরতত্ত্ব ত তিনি জানিতেনই এবং স্বাস্থ্য বিদ্যায়ও পারদর্শী ছিলেন।

কিছু দিন অধ্যয়ন করিয়া তিনি গবেষণার কার্য্যে লাগিয়া গেলেন। ইতিমধ্যেই তিনি শিশুবিজ্ঞান সম্বন্ধে যত বই পড়িয়াছিলেন, তাহার অনেকগুলির নাম আমরা শুনি নাই। কিন্তু তাহাতেও তাঁহার জ্ঞানপিপাসা মিটিল না। তাহার পূর্ব্বে যাঁহারা শিশুবিজ্ঞান সম্বন্ধে অল্পবিস্তর লিখিয়া গিয়াছেন, তাহার সমস্তই তিনি পড়িয়াছেন। তাহা ছাড়া তাঁহার গবেষণা হইতে আমরা এমন সব ব্যক্তির নাম জানিতে পারি, যাহাদিগকে শিক্ষা-বিশারদ বলিয়া ভ্রম করাও সম্ভব নয়।

তিনি নানা বই পড়িয়া যেমন গবেষণা করিতে লাগিলেন, তেমনি বাস্তব গবেষণার জন্য নানা প্রকার প্রাইমারী স্কুল পরিদর্শন করিতে লাগিলেন।

টলেমো

মন্তেসরি যখন গবেষণায় নিযুক্ত, তখন টলেমো রোমের সাধারণ লোকদের স্বাস্থ্য লইয়া গভীরভাবে আলোচনা করিতেছিলেন। সেই সময়ে রোমে সাধারণ গৃহস্থেরা (গরীবের ত কথাই নাই) অতি জঘন্য পল্লীতে বাস করিত। ময়লা গন্ধ আবর্জ্জনার মধ্যে বাস করার জন্য সেই সব লোকের স্বাস্থ্য ভয়ানক খারাপ ছিল এবং এইজন্য তাহাদের দৈনন্দিন জীবনে সুখ ছিল না, তাহারা যেন বিধাতার অভিশাপ লইয়া রোমে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল।

এই সব পূতিগন্ধময় বাস্তব নরক দেখিয়া, তাহাদের বিষময় দৈনন্দিন জীবনের নরকযন্ত্রণা দেখিয়া, আর শিশু-দের দুঃখকষ্ট দেখিয়া টলেমোর প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। তিনি ইহাদের জীবনযাত্রা ভাল করিবার জন্য, ইহাদের নরক-যন্ত্রণা হইতে মুক্ত করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন। তিনি জানিতেন, এই প্রাচীন কুসংস্কারের আমূল পরিবর্ত্তন আবশ্যক। কেমন করিয়া রাতারাতি ইহার পরিবর্ত্তন করা যায় তাহা লইয়া টলেমো মাথা ঘামাইতে লাগিলেন। সহজে এই সকল লোক তাহাদের কু-অভ্যাস পরিত্যাগ করিবে না। তাহাদিগকে শিক্ষা-দীক্ষা দিয়া জাগাইয়া তুলিতে হইলেও সময়ের আবশ্যক। অনেক চিন্তার পর এই সব পল্লীতে তিনি বড় বড় আদর্শ-গৃহ তৈয়ার করিয়া দিলেন।

তখন গরীব লোকেরা স্বামী-স্ত্রীতে মিলিয়া সংসার চালাইবার জন্য মজুরি করিত। দিনের বেলা এই সব আদর্শগৃহে শিশুরা কেবল বাস করিত। ইহারা মাতাপিতা ছাড়া হইয়া নিজেদের ইচ্ছামত এই আদর্শগৃহের নানাস্থান আবর্জ্জনায় ভরিয়া দিত, নানা প্রকার ক্ষতি করিত। সিঁড়ি ভাঙিয়া ফেলিত, দেওয়ালে কালি লাগাইত। ইহা ছাড়া জিনিষপত্র ভাঙিয়া চুরিয়া একাকার করিত। এই সব ক্ষতি পূরণ করিতে অনেক অর্থব্যয় হইত। তাই টলেমো ভাবিলেন, যে টাকা এই সব মেরামত করিতে ব্যয় হয়, তাহা দ্বারা যাহাতে ইহারা কোন অনিষ্ট করিতে না পারে তার ব্যবস্থা করা ভাল। এজন্য চাই এই সব বালকবালিকাদিগকে রক্ষণাবেক্ষণ করা, এবং রক্ষণা বেক্ষণের জন্য উপযুক্ত লোক।

কাসা-ডি-বাম্বিনী

মানুষ যার জন্য সাধনা করে, সেই সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিতে তাহাকে কোন বেগ পাইতে হয় না। ভগবান অলক্ষ্যে তাহার হাতে সাধনার ফল আনিয়া দেন। মন্তেসরি চেষ্টাকরিতে ছিলেন যাহাতে তিনি ছোট ছোট অর্থাৎ তিন হইতে ছয় বৎসরের শিশুদের জন্য

একটি আদর্শ শিশু-মন্দির স্থাপন করিতে পারেন। এদিকে টলেমো মন্তেসরির সম্বন্ধে সকল সংবাদই রাখিতেন। ইহাদের দুইজনের উদ্যম অনেকটা মিলিয়া গেল। তাই আদর্শগৃহের শিশুদিগকে দেখাশুনার জন্য এবং তাহার কাজে সহায়তা করিবার জন্য টলেমো মন্তেসরিকে আহ্বান করিলেন।

মন্তেসরি দেখিলেন, তিনি যাহা চাহিয়াছিলেন তাহা অলক্ষ্যে তাঁহার হাতে আসিয়া পড়িল। তিনি যে-বয়সের শিশুকে চাহিতেছিলেন, তাহাদেরও পাইলেন। কয় বৎসরের আলোচনা ও গবেষণার পর তিনি বুঝিয়াছিলেন যে মানব-জীবনের তিন হইতে ছয় বৎসরের ভিতরকার অবস্থাই সব চেয়ে সাংঘাতিক। এই তিন বৎসরের মধ্যে মানবজীবনের ভবিষ্যৎ মূর্ত্তি বা বিকাশের সূচনা আরম্ভ হয়। কাজেই জাতির, সমাজের, রাষ্ট্রের কল্যাণের জন্য এই বয়সের শিশুদিগকে মানুষ করা সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য। তিনি পাইলেনও তাহাদেরই। টলেমোর প্রদত্ত কাজ তিনি সানন্দে গ্রহণ করিলেন। এইরূপে ১৯০৭ খৃষ্টাব্দের ৬ই জানুয়ারী কাসা-ডি-বাম্বিনী স্থাপিত হইল ও তাহার সঙ্গে সঙ্গে বর্ত্তমান মন্তেসরি পদ্ধতির যুগ আরম্ভ হইল।

প্রচার

অন্ধকার আলোককে ঘিরিয়া রাখিতে পারে না, অন্ধকার ভেদ করিয়াই সে চলিয়া যায়। হাজার হাজার মাইল দূরের নক্ষত্রের আলো আমরা রাত্রির ঘোর অন্ধকারের মধ্যেও দেখিতে পাই। মন্তেসরির নূতন দান ইতালীর এক ক্ষুদ্র পল্লীর ভিতর থাকিলেও সুদূর আমেরিকা হইতে লোকে তাহা দেখিতে পাইয়াছিল।

মন্তেসরি পদ্ধতি প্রথম আরম্ভ হয় রোমের এক সামান্য পল্লীর একটি আদর্শ গৃহে। তখন ইহাকে কেহই দেখে নাই, ইহার সম্বন্ধে কোন কথা কেহই শুনে নাই, আর ইহা স্থাপন করিতেও কোন প্রকার জাঁকজমক করা হয় নাই। মন্তেসরি বাহিরের লোককে ইহার সম্বন্ধে কোন কথা বলেন নাই এবং প্রচার ত মোটেই করেনই নাই।

কিন্তু পাঁচ বৎসরের মধ্যে রোমের এক অনাদৃত পল্লীতে তিনি যে সিদ্ধিলাভ করিলেন, পৃথিবীর কাছে আর তাহা চাপা রহিল না। পৃথিবীকে তাহা বলিতে হইল না, পৃথিবীই তাহা খুঁজিয়া বাহির করিয়া লইল। পাঁচ বৎসর ধরিয়া শিশুদিগকে শিক্ষা দিয়া তিনি খেলনাগুলি বিজ্ঞান-সঙ্গত করিয়া তুলিলেন। এই খেলনার প্রধান কাজ বুদ্ধির বিকাশ সাধন করা। তারপর খেলাধূলা ও শৃঙ্খলতার ভিতর দিয়া শিশুদিগকে এমন করিয়া তুলিলেন, যে মন্তেসরি নিজেই তাহা দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। তাঁহার এই নূতন আবিষ্কার লইয়া ফ্রান্স, জাপান, ইংলণ্ড, আমেরিকা প্রভৃতি দেশের দৈনিক মাসিক, সাপ্তাহিক পত্রিকাগুলিতে বিরাট আন্দোলন সুরু হইল। তাহার ফলে সমস্ত পৃথিবীর লোকের দৃষ্টি রোমের ঐ ক্ষুদ্র আবর্জ্জনাময় পল্লীতে গিয়া পড়িল।

মন্তেসরি নূতন শিক্ষা প্রণালীর কথা প্রচার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সমস্ত দেশের শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীরা এই শিক্ষা-পদ্ধতি হইতে যাহাতে তাহারা বঞ্চিত না হয় তাহার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিল। যাহারা মাতা তাহারা শিশুর ভবিষ্যৎ ভাবিয়া রোমে যাইবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিল - রোমের এই নূতন শিক্ষা-পদ্ধতি জানিতে না পারিলে বুঝি তাহাদের শিশুদের শিক্ষা অসমাপ্ত রহিয়া যায়। তাই যে একবার ইউরোপে বেড়াইতে যায় ও রোমের এই কাসা-ডি-বাম্বিনী না দেখিয়া ফিরিয়া আসে, সে মনে করে তাহার ইউরোপ দেখা হয় নাই, তাহার ভ্রমণ অসমাপ্ত রহিয়া গিয়াছে।

তাঁহার এই ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠান দেখিবার জন্য ও তাঁহার পদ্ধতি অবলোকন করিবার জন্য বিদেশ হইতে অনেক লোক আসিত, কিন্তু তিনি তাহাদিগকে অভ্যর্থনা করিতে পারিতেন না। কত লোক কত বিষয় জানিবার জন্য তাঁহাকে চিঠি লিখিত, সব চিঠির জবাব দিতেন না, দিবার অবসর পাইতেন না, বা যে চিঠি আসিত তিনি তাহা বুঝিতেন না। তিনি দিবারাত্রি কাজ করিয়া চলিয়াছেন, অন্য কোন কিছুর প্রতি একেবারেই লক্ষ্য নাই, কেবল চিন্তা কেমন করিয়া তাঁহার কঠোর তপস্যায় কৃতকার্য্য হইবেন। আহারনিদ্রা তিনি প্রায় ত্যাগ করিয়া-

ছিলেন। তাঁহাকে যদি কেহ ধরিয়া লইয়া গিয়া খাওয়াইত, তবেই তিনি খাইতেন। শরীর রক্ষার জন্য যে ব্যায়ামের আবশ্যক, তাহা তিনি ভুলিয়া গিয়াছিলেন। দিনদিন তাঁহার শরীর দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছিল, তবু শরীরের প্রতি কোন লক্ষ্য নাই। তাঁহার দেহ, মন, জীবন, ভোগ, বাসনা, অর্থ সব এই শিক্ষাপদ্ধতির জন্য বিলাইয়া দিয়াছেন, তবু যদি কৃতকার্য্য হইতে পারেন। অবশেষে তিনি রোম ইউনিভারসিটির অ্যানথ্রপলজির চেয়ারও পরিত্যাগ করিলেন।

তিনি যখন এই কাজে এমন করিয়া লাগিয়া গিয়াছিলেন, তখন পাঁচজন ইটালীয়ান মহিলা তাঁহাকে সাহায্য করিতে আসিলেন। তাঁহারা ছিলেন মন্তেসরির দক্ষিণ হস্ত। তাঁহারাও মন্তেসরির মত নিজেদের জীবন শিশুশিক্ষার জন্য উৎসর্গ করিয়াছিলেন। মন্তেসরির পরবর্ত্তী গবেষণা অনেকখানি এই পাঁচ জন শিষ্যার সাহায্যের উপর নির্ভর করিয়াছিল। তাঁহারা মন্তেসরিকে ভাল করিয়া বুঝিয়াছিলেন এবং তাঁহার কর্ম্মপদ্ধতিকে বাস্তব জীবনে ফুটাইয়া তুলিবার ব্রত তাঁহারাই গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা মন্তেসরিকে "মা" বলিয়া ডাকিতেন।

রোমবাসীদের বিরুদ্ধতা

কুমারী মন্তেসরির সাধনায় শিক্ষা জগতে তখন একটা নূতন যুগ আরম্ভ হইল। তাঁহার লিখিত বই নানা ভাষায় অনুবাদিত হইতে লাগিল। ইংলণ্ড, আমেরিকা হইতে লোক আসিয়া মন্তেসরি পদ্ধতি শিক্ষা করিয়া গিয়া নিজ দেশে শিশুমন্দির স্থাপন করিতে লাগিল। বিদেশীরা মন্তেসরিকে বুঝিতে পারিল, আদর করিল, কিন্তু যে রোমের জন্য তিনি প্রাণপণ খাটিলেন, সেই রোম তাঁহাকে চিনিল না—বরং তাঁহাকে পদে পদে বাধা দিতে লাগিল।

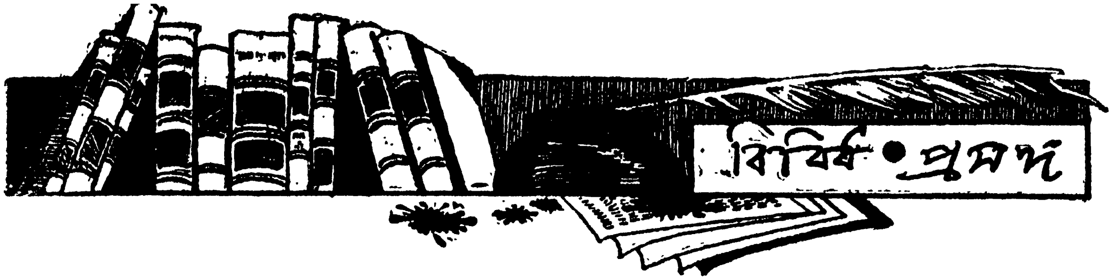
ইটালী সরকার মন্তেসরি শিক্ষাপদ্ধতিকে গ্রহণ না করিয়া চিরদিনের জোর-জবরদস্তির শিক্ষাকে চালাইতে লাগিল। তাহারা বলিতে লাগিল, মন্তেসরি শিক্ষা দেশের লোককে ভাল না করিয়া মন্দই করিবে। মানুষ যদি প্রথম অবস্থা হইতেই স্বাধীনতাকে জীবনের ব্রত করিয়া লয়, তবে সে পরে এনার্কিষ্ট হইবে এবং তাহার দ্বারা দেশে বিপ্লব সৃষ্টি হইবার খুব সম্ভাবনা।

বর্ত্তমান অবস্থা

রোম আজ মন্তেসরির মূল্য বুঝিতে পারিয়াছে। সারা রোম আজ মন্তেসরি শিশুমন্দিরে ভরিয়া গিয়াছে। কেবল তাই নয়, ইতালীয় সরকার মন্তেসরি শিক্ষাকে দেশের সকল স্কুলে চালাইবার চেষ্টা করিতেছে এবং ইহার প্রচারের জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিতেছে। যাহাতে বাহিরে মন্তেসরি শিক্ষা প্রচার হয়, তাহার জন্যও প্রচার কার্য্য চালাইতেছে। প্রাইমারী স্কুলেও আজ মন্তেসরি শিক্ষাপদ্ধতি একটু পরিবর্ত্তন করিয়া চালান সম্ভবপর হইয়াছে। ইতালীয় সরকার মন্তেসরি শিক্ষার শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রী তৈয়ার করিবার জন্য একটি ট্রেনিং কলেজ খুলিয়াছে। এই কলেজে মন্তেসরি বক্তৃতা করেন এবং আদর্শ শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রী তৈয়ার করেন—বাস্তব ও সাহিত্যিক শিক্ষার ভিতর দিয়া।

এখন পৃথিবীময় মন্তেসরি শিক্ষার বহুল প্রচার হইয়াছে এবং হইতেছে। ইংলণ্ডেও মন্তেসরি শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রী তৈয়ার করিবার জন্য একটি ট্রেনিং কলেজ খোলা হইয়াছে। কুমারী মন্তেসরি সেখানে বৎসরে চার মাস শিক্ষা দেন।

এতদিন তিনি তাঁহার গবেষণা কার্য্যেই নিযুক্ত ছিলেন, বাহিরের সহিত সমস্ত সম্বন্ধ ছিন্ন করিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু এখন এই বৃদ্ধ বয়সে তিনি নানা দেশে ঘুরিয়া বেড়াইয়া নূতন শিক্ষার জন্য লোককে উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিতেছেন।



রবীন্দ্র-জয়ন্তী

গত ২৫শে বৈশাখ শ্রীমৎ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বয়ঃক্রম সপ্ততি বৎসর পূর্ণ হইয়াছে। তাঁহার জীবন নানা সাধনায় ও কর্ম্মে পরিপূর্ণ। শ্রেষ্ঠ মানবদিগের মধ্যে এই অক্লান্তকর্ম্মীর স্থান কোথায়, তাহা নিরূপণ করিবার চেষ্টা স্বদেশে ও বিদেশে অনেকে করিয়াছেন। আমরা তাহা করা অনাবশ্যক মনে করি। অন্যেরা আবশ্যক মনে করিলেও, তাহা করিবার মত জ্ঞান ও শক্তি আমাদের নাই।

তাঁহার প্রতিভা কোন্ বিষয়ে কত উচ্চ শ্রেণীর, তাহা নিরূপণ করিবার ক্ষমতা আমাদের নাই। কিন্তু ইহা বলিতে পারি যে, মানবচরিত্রের জ্ঞানে ও বিশ্লেষণে, সাহিত্যের নানা বিভাগে সৃষ্টির কার্য্যে, গান রচনায় সুরের সৃষ্টিতে ও কণ্ঠসঙ্গীতে, চিত্রাঙ্কণে ও স্থাপত্যে, অভিনয়ে ও নৃত্যকলায়, রাজনীতির সার অংশের জ্ঞানে, শিক্ষার মূলনীতি সম্বন্ধীয় জ্ঞানে ও তাহার প্রয়োগে, ইতিহাসের মর্ম্মস্থলে প্রবেশের শক্তিতে, দেশহিতের সত্য পথ নির্দ্দেশে ও তাহার অনুসরণে, দার্শনিক তত্ত্বের মর্ম্মোদ্ভেদে, আধ্যাত্মিক সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে, জীবনকে বিশ্বনিয়মের ও বিশ্ববৈচিত্র্যের সহিত সকল দিক্ দিয়া সমঞ্জসীভূত করিবার সাধনায়, তাঁহার যে অসামান্য ও বহুমুখী শক্তির পরিচয় পাওয়া গিয়াছে, অতীত ও বর্ত্তমান কালের অন্য কোন মানুষে একাধারে তাহা দেখা গিয়াছে বলিয়া আমরা অবগত নহি। ইহার দ্বারা আমরা তাঁহাকে জগতের শ্রেষ্ঠ মানুষ বলিতেছি না; তাঁহার কোন অসম্পূর্ণতা নাই, তাহাও বলিতেছি না। এক একটি বিষয়ে তাঁহা অপেক্ষা প্রতিভাশালী ও শক্তিমান্ অন্য অনেকে ছিলেন ও আছেন। আমরা কেবল এই বলিতেছি, যে, তাঁহার মত বিচিত্রশক্তিমান্ পুরুষ বিরল।

কালে আমরা তাঁহার সমসাময়িক। অন্যরূপ নৈকট্যও তাঁহার সহিত আমাদের কাহারও কাহারও আছে। এই জন্য আমরা কেহ-বা তাঁহাকে অযথা বড় করিয়া দেখিতে পারি, কেহ-বা অযথা ছোট মনে করিতে পারি। তাঁহার প্রকৃত পরিচয় ভবিষ্যতের মানুষেরা লাভ করিতে ও দিতে পারিবে। তাঁহার চরিত ও ব্যক্তিত্ব ভারতবর্ষের ও ভারতের বাহিরের পৃথিবীর কতখানি কল্যাণ ও আনন্দের কারণীভূত, তাহাও এখনও সংক্ষেপে বলিবার নহে। উপযুক্ত সময়ে, উপযুক্ত ব্যক্তির দ্বারা তাহা বিবৃত হইবে।

নানা দেশ হইতে প্রাপ্ত অভিনন্দনের টেলিগ্রাম হইতে বুঝা যায় বিদেশে তাঁহার কিরূপ প্রতিষ্ঠা।

গান্ধী-আরুইন চুক্তি

গান্ধী-আরুইন চুক্তির পর ভারতবর্ষের সহিত ব্রিটিশ বাণিজ্যের উন্নতি হইবে, ব্রিটিশ বণিকরা এই আশা করিয়াছিল। কেন করিয়াছিল জানি না। চুক্তিতে কেবল এই সর্ত্ত ছিল, যে, রাজনৈতিক হিসাবে কেবল ব্রিটিশ পণ্য বর্জ্জনের প্রবলতম চেষ্টা আর করা হইবে না; কিন্তু স্বদেশী শিল্প ও পণ্যের উন্নতির জন্য সকল বিদেশী বস্ত্রাদি বর্জ্জনের আন্দোলন ও তজ্জন্য পিকেটিং চলিতে পারিবে। গান্ধীজী ও অন্যান্য নেতারা ঠিক চুক্তি অনুসারে চলিতেছেন, এবং যেখানে কোন ব্যতিক্রমের কথা শুনিতেছেন, অমনি সেখানে তাহার প্রতিকার করিতেছেন। তথাপি, ব্রিটিশ বণিকরা খবরের কাগজে, সভায় বক্তৃতায় ও পার্লেমেণ্টে কংগ্রেস চুক্তিভঙ্গ করিয়াছে, এই কোলাহল তুলিয়াছে। ভারতসচিব ওয়েজউড বেন তাহাদিগকে এই সত্য কথা বলিয়া ন্যায়নিষ্ঠা ও সাহসের পরিচয় দিয়াছেন যে, কংগ্রেস কোন চুক্তি ভঙ্গ করে নাই।

কবির সপ্ততি বৎসর পূর্ত্তির উৎসব

সবিনয় নিবেদন—

অদ্য ২৫শে বৈশাখ, ১৩৩৮ (শুক্রবার, ৮ই মে, ১৯৩১) কবিবর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের বয়ঃক্রম সপ্ততি বৎসর পূর্ণ হইল। আমরা মনে করি যে, এই শুভঘটনা উপলক্ষ্য করিয়া, সমগ্র দেশবাসীর পক্ষ হইতে, কলিকাতা নগরীতে, তাঁহার যথোচিত সংবর্দ্ধনা এবং একটি আনন্দোৎসবের অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য।

ঐ সংবর্দ্ধনা ও তাহার আনুষঙ্গিক উৎসব-অনুষ্ঠানাদির ব্যবস্থা করিবার জন্য আগামী ২রা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৮ (শনিবার, ১৬ই মে, ১৯৩১) সন্ধ্যা ছয় ঘটিকার সময়, কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইন্‌ষ্টিটিউট্ গৃহে একটি পরামর্শ-সভার অধিবেশন হইবে।

এই সভায় আপনার উপস্থিতি ও যোগদান প্রার্থনীয়।

ইতি কলিকাতা, ২৫শে বৈশাখ, ১৩৩৮।

শ্রীজগদীশচন্দ্র বসু
শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়
শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ শীল
শ্রীরাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
শ্রীকামিনী রায়
শ্রীযতীন্দ্রমোহন সেন-গুপ্ত
বাসন্তী দেবী
শ্রীঅবলা বসু
শ্রীসরলা রায়
শ্রীনীলরতন সরকার
শ্রীপ্রমথনাথ রায়-চৌধুরী
আবুল কালাম্ আজাদ্
ঘনশ্যামদাস বিরলা
ডেভিড এজ্‌রা
শ্রীকৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য
সুচারু দেবী
(ময়ূরভঞ্জ)
শ্রীমন্মথনাথ রায়-চৌধুরী (সন্তোষ)
শ্রীচারুচন্দ্র ঘোষ
শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ সরকার
শ্রীশরৎচন্দ্র বসু
শ্রীবিজয়প্রসাদ সিংহ-রায়
খাজা নাজিমউদ্দিন
শ্রীযদুনাথ সরকার
গগনবিহারী এল্ মেহতা
শিবানন্দ (বেলুড়)
শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

ফস, কলিকাতার লর্ড বিশপ
আর্থার মুর
শ্রীদেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী
শ্রীহৃষীকেশ লাহা
শ্রীশ্রীশচন্দ্র নন্দী
(কাশিমবাজার)
ডব্‌লু এস্ আরকুহার্ট
শ্রীজ্ঞানরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীহেরম্বচন্দ্র মৈত্রেয়
এ কে ফজলুল হক্
এইচ্ এ গিড্‌নী
শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু
(প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব)
শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন
শ্রীজলধর সেন
মুজীবর রহমান্
শ্রীনরেশচন্দ্র সেন-গুপ্ত
আনন্দ্‌জী হরিদাস
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাশ-গুপ্ত
এস্ খোদাবক্স্
শ্রীপ্রমথনাথ তর্কভূষণ
শ্রীযোগীন্দ্রনাথ রায় (নাটোর)
সরলা দেবী
মালুক্ সিং বেদী
হরিরাম গোয়েঙ্কা
পদম্‌রাজ জৈন
শ্রীকৃষ্ণকুমার মিত্র

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী
চন্দ্রশেখর ভেঙ্কট্ রামন
হাসান সুরাবর্দ্দী
শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু
শ্রীবিধানচন্দ্র রায়
শ্রীপ্রফুল্লনাথ ঠাকুর
মোহাম্মদ আকরম খাঁ
শ্রীপ্রমথ চৌধুরী
শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত
সর্ব্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন্
শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মল্লিক
শ্রীযতীন্দ্রনাথ বসু
শ্রীদুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থ
শ্রীঅর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়
ই সি বেন্‌থল্
শ্রীপ্রসন্নকুমার রায়
শ্রীশরৎকুমার রায়
(দিঘাপতিয়া)
শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার
নন্দলাল পুরী
ওঙ্কার মল জাতিয়া
জাহাঙ্গীর কয়াজী
শ্রীসরোজিনী দে
গুরুদিৎ সিং
এ এফ্ এম্ আবদুল আলি

লক্ষ্ণৌতে মুসলমানদের কন্‌ফারেন্স

করাচী কংগ্রেসের কাছাকাছি সময়ে দিল্লীতে মুসলমানদের একটি কনফারেন্স হয়। যাঁহারা তাহার উদ্যোগ করিয়াছিলেন এবং যাঁহারা তাহাতে উপস্থিত হইয়াছিলেন, তাঁহারা তাহাকে সকল দলের মুসলমানদের কন্‌ফারেন্স বলিয়াছিলেন। তাহাকে এই নামে অভিহিত করা ঠিক হয় নাই। কারণ, যাঁহারা কংগ্রেসের দলভুক্ত তাঁহারা ঐ কন্‌ফারেন্সে যোগ দেন নাই, যাঁহারা জামিয়ৎ-উল-উলেমার অনুসরণ করেন তাঁহারাও তাহাতে যোগ দেন নাই। অন্য কোন কোন দলের মুসলমানও তাহাতে যোগ দেন নাই। দিল্লীর কন্‌ফারেন্স প্রধানতঃ মুসলমানদের সেই দলের কন্‌ফারেন্স যাহা ভারতীয় ব্রিটিশ আমলাদের এবং সর্ ফজলী হুসেনের অঙ্গুলী-নির্দ্দেশে চলেন।

লক্ষ্ণৌতে যে-সকল মুসলমান ভারতীয়ের কন্‌ফারেন্স হইয়া গিয়াছে, তাঁহারা আপনাদিগকে ন্যাশ্যান্যালিষ্ট অর্থাৎ স্বাজাতিক নামে অভিহিত করিয়াছেন। এই নাম কিয়ৎ পরিমাণে উপযোগী, কিন্তু সম্পূর্ণ উপযোগী নহে। লক্ষ্ণৌ কন্‌ফারেন্সে গৃহীত প্রধান প্রস্তাবটি বিবেচনা করিলে ইহা বুঝা যায়।

লক্ষ্ণৌ কন্‌ফারেন্সের সভাপতি সর্ আলী ইমামের বক্তৃতাটি ঠিক স্বাজাতিকের বক্তৃতা। তিনি নিজ ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের জন্য কোন বিশেষ প্রকারের ব্যবস্থা চান নাই। শুধু তাই নয়। মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র নির্ব্বাচনের তিনি দোষ প্রদর্শন করেন। ১৯০৫ সালে লর্ড মিণ্টোর আমলে যে কয় জন মুসলমান তাঁহার কাছে গিয়া ব্যবস্থাপক সভায় মুসলমানদের জন্য কয়েকটি সভ্যের পদ আলাদা করিয়া রাখিয়া কেবল মুসলমান নির্ব্বাচকদের দ্বারা তাঁহাদের নির্ব্বাচন প্রার্থনা করিয়াছিলেন, সর্ আলী ইমাম তাঁহাদের মধ্যে এক জন ছিলেন। কয়েক বৎসরের পর্য্যবেক্ষণ, অভিজ্ঞতা ও চিন্তার ফলে তিনি ১৯০৯ সালেই আলাদা নির্ব্বাচনের কুফল বুঝিতে পারিয়াছিলেন; এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন, উহা স্বাজাতিকতার ঠিক্ বিপরীত ত বটেই, অধিকন্তু উহা মুসলমানদের পক্ষে অনিষ্টকর। সেইজন্য তিনি ১৯০৯ সালে উহার প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। তখন কিন্তু মুসলমানেরা প্রায় সকলেই খবরের কাগজে ও বক্তৃতা-মঞ্চে তাঁহার মতের নিন্দা করিয়াছিলেন।

বাইশ বৎসর পরে লক্ষ্ণৌ কনফারেন্সে ভারতবর্ষের সকল প্রদেশ হইতে মুসলমানেরা একত্র সমবেত হইয়া সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়ের সম্মিলিত নির্ব্বাচন প্রথার সমর্থন করিয়াছেন। সর্ আলী ইমামের মতে এই কনফারেন্স প্রায় সমগ্র শিক্ষিত মুসমানদের প্রতিনিধিস্বরূপ।

সর্ আলী ইমাম তাঁহার বক্তৃতায় বলেন, যে, মুসলমানদের মধ্যে কতকগুলি লোক সম্মিলিত নির্ব্বাচন চান বটে; কিন্তু তাহার সঙ্গে সঙ্গে ইহাও চান, যে, সমগ্র ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় এবং প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভাগুলিতে মুসলমানদের জন্য কতকগুলি সভ্যপদ যেন আলাদা করিয়া রক্ষিত থাকে। তাঁহারা আরও চান যে, মুসলমানেরা সমগ্রভারতে এবং যে সব প্রদেশে তাঁহারা সংখ্যান্যূন, সেই সব প্রদেশে তাঁহাদের সংখ্যার অনুপাতে যতগুলি সভ্যপদ পাইতে পারেন তাহা অপেক্ষা কিছু বেশী পদ তাঁহাদের জন্য যেন রক্ষিত হয়। সর্ আলী ইমাম্ উভয় প্রকার দাবিরই বিরুদ্ধে। তিনি মুসলমানদের জন্য কোন প্রকার স্বতন্ত্র ব্যবস্থা চান না।

—

লক্ষ্ণৌ কন্‌ফারেন্সের প্রধান প্রস্তাব

সর্ আলী ইমাম খাঁটি স্বাজাতিকতার (ন্যাশন্যালিজ্‌মের) পক্ষপাতী হইলেও লক্ষ্ণৌ কন্‌ফারেন্সে প্রধান যে প্রস্তাবটি অধিকাংশের মতে গৃহীত হয়, তাহাতে কিঞ্চিৎ অসাম্প্রদায়িকতার সঙ্গে অনেকটা সাম্প্রদায়িক দাবি মিশ্রিত আছে। এরূপ ভেজালের বিরুদ্ধে কন্‌ফারেন্সে সংশোধক প্রস্তাব উপস্থিত হইয়াছিল। কিন্তু তাহা অধিকাংশের মতে নামঞ্জুর হইয়া যায়।

প্রস্তাবটিতে অসাম্প্রদায়িক ভাব যেটুকু আছে, তাহা নির্দ্দেশ করিতেছি।

প্রথমতঃ, উহার দ্বারা সম্মিলিত নির্ব্বাচন চাওয়া হইয়াছে। অর্থাৎ সমগ্রভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার এবং প্রাদেশিক

সমুদয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্যেরা সকল সম্প্রদায়ের নির্ব্বাচকদিগের দ্বারা নির্ব্বাচিত হইবেন—হিন্দু সভ্যদিগের নির্ব্বাচনে হিন্দু অহিন্দু সকল প্রকার নির্ব্বাচক ভোট দিতে পারিবেন, মুসলমান সভ্যদিগের নির্ব্বাচনে মুসলমান অমুসলমান সব শ্রেণীর নির্ব্বাচক ভোট দিতে পারিবেন, ইত্যাদি।

দ্বিতীয়তঃ, সমগ্রভারতে এবং যে-যে প্রদেশে মুসলমানেরা সংখ্যান্যূন এবং শতকরা ত্রিশ জনের কম, তথায় ব্যবস্থাপক সভাসকলে তাঁহাদের জন্য নির্দ্দিষ্ট-সংখ্যক মুসলমান সভ্য থাকিবে, এইরূপ ব্যবস্থা প্রস্তাবটিতে চাওয়া হইয়াছে বটে, কিন্তু স্বাতন্ত্র্যলিপ্স মুসলমানেরা যেমন তাঁহাদের লোকসংখ্যার অনুপাতের চেয়ে বেশীসংখ্যক সভ্য চান, এই প্রস্তাবে তাহা চাওয়া হয় নাই। অর্থাৎ কোথাও মুসলমানেরা যদি মোট লোকসংখ্যার শতকরা ১৫ জন হন, তাহা হইলে তথাকার ব্যবস্থাপক সভায় মুসলমান সভ্য শতকরা ১৫ জনই চাওয়া হইয়াছে, তার চেয়ে কিছু বেশী হইতেই হইবে, এরূপ বলা হয় নাই।

তৃতীয়তঃ, স্বাতন্ত্র্যলিপ্স মুসলমানেরা, যে-যে প্রদেশে মুসলমানরাই সংখ্যায় অধিকতম, সেখানেও তাঁহাদের সংখ্যার অনুপাতে ব্যবস্থাপক সভায় অধিকতম সভ্যপদ তাঁহাদের জন্য রক্ষিত হউক, এইরূপ দাবি করিয়া আসিতেছেন। বঙ্গে ও পঞ্জাবে তাঁহাদের সংখ্যা অন্য সব ধর্ম্মাবলম্বীর চেয়ে বেশী। তথাপি, এই স্বাতন্ত্র্যপ্রয়াসী মুসলমানেরা চাহিয়া আসিতেছেন যে, এই দুই প্রদেশেও তাঁহাদের জন্য সংখ্যার অনুপাতে প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভায় অধিকতম সভ্যপদ রক্ষিত হউক। কোন ধর্ম্ম-সম্প্রদায় সংখ্যান্যূন হইলে সম্মিলিত নির্ব্বাচনে তাঁহাদের সম্প্রদায়ের কোন সভ্য বা যথেষ্টসংখ্যক সভ্য পাছে নির্ব্বাচিত না হন, সেই জন্য সংখ্যান্যূনদের স্বার্থরক্ষার অজুহাতে তাঁহাদের জন্য নির্দ্দিষ্টসংখ্যক সভ্যপদ আলাদা করিয়া রাখিবার ব্যবস্থা চাওয়া হয়। কিন্তু মুসলমানেরা যে-যে প্রদেশে সংখ্যায় অধিকতম, সেখানেও অধিকতম সভ্যপদ আইন দ্বারা তাঁহাদের জন্য রাখিতে বলিলে, ইহাই বলা হয়, যে, তাঁহারা সংখ্যায় অধিকতম হইলেও এত দুর্ব্বল বা অযোগ্য যে, ভোটে হারিয়া যাইবেন, অথচ এইরূপ অযোগ্যতা সত্ত্বেও তাঁহারা কার্য্যতঃ সেই সেই প্রদেশে **আইন দ্বারা** স্থায়ী শাসক-সম্প্রদায় হইতে চান। স্বাতন্ত্র্যপ্রয়াসী মুসলমানদের এই দাবির অযৌক্তিকতা, অসঙ্গতি ও দুর্ব্বলতা বুঝিতে পারিয়া লক্ষ্ণৌ কন্‌ফারেন্স কোন প্রদেশের সংখ্যাভূয়িষ্ঠ মুসলমানদের জন্য তথাকার ব্যবস্থাপক সভায় অধিকতম সভ্যপদ রক্ষার দাবি করেন নাই।

এই তিনটি বিষয়ে ছাড়া আর সব বিষয়ে লক্ষ্ণৌ কন্‌ফারেন্স মিঃ জিন্নার ১৪ দফা দাবির সমর্থক স্বাতন্ত্র্য-প্রয়াসী দলের সহিত একমত। তাহা দেখাইতেছি।

প্রস্তাবটির তৃতীয় দফায় বলা হইয়াছে, যে, ভবিষ্যতে ফেডার‍্যাল রাষ্ট্রবিধি অনুসারে সমগ্র ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় কার্য্য নির্ব্বাহিত হইবে, কিন্তু রেসিডুয়ারী অর্থাৎ অবশিষ্ট ক্ষমতাগুলি ফেডারেশ্যনের অঙ্গসমূহকে (যেমন প্রদেশগুলিকে) অর্শিবে। ইহার একটু ব্যাখ্যা করা দরকার।

বহু পূর্ব্ব হইতে ভারতীয়েরা বলিয়া আসিতেছেন, যে, তাঁহারা প্রাদেশিক আত্মকর্তৃত্ব চান। প্রাদেশিক আত্মকর্তৃত্বের মানে, প্রত্যেক প্রদেশের আভ্যন্তরীণ বিষয়ে সেই সেই প্রদেশের সম্পূর্ণ ক্ষমতা থাকিবে। সমগ্রভারতীয় বিষয়গুলিতে প্রাদেশিক গবর্ন্মেণ্টের ক্ষমতা থাকিবে না। দেশ রক্ষা ও তাহার জন্য জলস্থল-আকাশে সেনাদল রক্ষা, অস্ত্রশস্ত্রসংগ্রহ, যুদ্ধ ও সন্ধি করা একটি সমগ্রভারতীয় বিষয়। ইহার উপর প্রদেশগুলির কর্তৃত্ব থাকিতে পারে না। বিদেশের সহিত, পররাষ্ট্রের সহিত, সম্পৃক্ত বিষয়সকলও সমগ্রভারতীয় গবর্ন্মেণ্টের এলাকাভুক্ত থাকা চাই। ডাক ও টেলিগ্রাফ বিভাগ এবং রেলওয়ে সমগ্রভারতীয় গবর্ন্মেণ্টের অধীন থাকা প্রয়োজন। এইরূপ আরও অনেক বিষয় আছে। স্বরাজ-অনুযায়ী নূতন শাসনবিধি প্রবর্ত্তিত হইবার পূর্ব্বে কোন্ কোন্ বিষয় ভারতীয় এবং কোন্‌গুলি বা প্রাদেশিক তাহা নির্দ্দিষ্ট হইবে। কিন্তু নিঃশেষে বর্ত্তমান সময়ে জ্ঞাত সব বিষয়গুলি ভাগ করা সম্ভবপর হইবে না। তদ্ভিন্ন ভবিষ্যতে নূতন অবস্থার আবির্ভাবে নূতন নূতন বিষয়েরও উদ্ভব

হইতে পারে। ভাগ করিবার পর, ঐ প্রকার যে-সব বর্ত্তমানে জ্ঞাত ও ভবিষ্যতে সম্ভাব্য বিষয় বাকী ও অবিভক্ত থাকিবে, সেইগুলিকে অবশিষ্ট বিষয় ও তৎ-সম্বন্ধীয় ক্ষমতা বলা যাইতে পারে। এতদ্ভিন্ন ভবিষ্যতে মধ্যে মধ্যে প্রদেশে প্রদেশে মতভেদ হইবে। তাহার মীমাংসক ও মীমাংসা আবশ্যক। মীমাংসিতব্য বিষয়গুলিও অবশিষ্ট বিষয়সমূহের অন্তর্গত হইবে। এরূপ মতভেদ স্থলে সমগ্রভারতীয় গবর্ন্মেণ্টই মীমাংসক হইতে পারেন।

নেহরু কমিটির এবং অধিকাংশ স্বাজাতিকের মতে অবশিষ্ট বিষয় সম্পর্কীয় ক্ষমতা ভারতীয় গবর্ন্মেণ্টেরই হওয়া উচিত। তাহা ব্যতিরেকে ভারতবর্ষ একটি সংহত প্রবল আত্মরক্ষাসমর্থ রাষ্ট্র থাকিতে পারিবে না, এবং প্রদেশে প্রদেশে সামঞ্জস্য বিধানের সহজ উপায় থাকিবে না। অন্যান্য কারণেও অবশিষ্ট বিষয় সম্পৃক্ত ক্ষমতা ভারতীয় গবর্ন্মেণ্টেরই করায়ত্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। মুসলমানেরা হয়ত কয়েকটি মুসলমানপ্রধান প্রদেশে নিজ সম্প্রদায়কে যথাসম্ভব শক্তিশালী করিবার নিমিত্ত ভিন্নমতাবলম্বী হইয়াছেন। কিন্তু সমগ্রভারতকে সংহত অখণ্ড ও প্রবল রাখিতে না পারিলে ভারতীয় স্বাধীনতা রক্ষা করা কঠিন হইবে, সুতরাং প্রদেশবিশেষকে যত ক্ষমতাই দেওয়া হউক, তাহা ব্যর্থ হইবে। এই জন্য প্রত্যেক প্রদেশেরই ক্ষমতা আবশ্যকমত কিছু কিছু কমাইয়া ভারতীয় গবর্ন্মেণ্টকে প্রবল করা দরকার।

প্রস্তাবটির ৪র্থ উপধারায় পাব্লিক সার্ভিস কমিশন দ্বারা সব সরকারী চাকরিতে নিয়োগের প্রস্তাব ভাল। কিন্তু উমেদারদের মধ্য হইতে লোক বাছিবার সময় যোগ্যতমকে না-বাছিয়া ন্যূনতম কার্য্যকারিতার মাপকাঠি (minimum standard of efficiency) অনুসারে লোক বাছিয়া সকল সম্প্রদায়কে চাকরির ন্যায্য ভাগ দিবার প্রস্তাবে আমাদের আপত্তি আছে। সরকারী চাকরিতে যোগ্যতম লোককেই লইলে আপাততঃ মুসলমানেরা তাঁহাদের লোকসংখ্যার অনুপাতে চাকরি না পাইতে পারেন। কিন্তু খুব যোগ্য অমুসলমান থাকিতে চলনসই রকমের মুসলমান লইলে রাষ্ট্রীয় কাজ যতটা ভাল চলা উচিত, তাহা চলিবে না। তাহাতে মুসলমান ও অমুসলমান সব সম্প্রদায়েরই ক্ষতি। তদ্ভিন্ন, "প্রতিযোগিতায় যোগ্যতম না হইলেও, মুসলমান বলিয়াই চলনসই যোগ্যতার জোরে চাকরি পাইব," এই বিশ্বাস মুসলমানদের থাকিলে তাঁহাদের মধ্যে উন্নতির ইচ্ছা খুব প্রবল হইবে না এবং তাঁহাদের উন্নতিতে বাধা পড়িবে।

সৈনিকের কাজে ও তদ্বিধ কোন কোন কাজে সব প্রদেশের বা জাতির বা শ্রেণীর লোককে লওয়া হয় না। এই জন্য তাহা বাদ দিয়া অন্য সব গবর্ন্মেণ্ট চাকরির সংখ্যা ধরিলে দেখা যায় ব্রিটিশ ভারতে মোট ৩,৫৮,৯১৭ জন গবর্ন্মেণ্ট-ভৃত্য আছেন। ইঁহারা সকলে বা অধিকাংশ উচ্চতম যোগ্যতা অনুসারে নিযুক্ত হইলে দেশের কাজ ভাল চলিবে। কিন্তু এই সাড়ে তিন লাখ লোকের মধ্যে চলনসই ন্যূনতম যোগ্যতা অনুসারে যত বেশী লোক চাকরি পাইবে দেশের কাজ তত খারাপ ভাবে নির্ব্বাহিত হইবে এবং তাহাতে দেশের সব লোকের ক্ষতি। ব্রিটিশ ভারতের লোকসংখ্যা ২৪,৭০,০৩,২৯৩। সাড়ে তিন লাখ বা তার চেয়ে কম-সংখ্যক চলনসই যোগ্যতা বিশিষ্ট লোকের সুবিধার জন্য প্রায় পঁচিশ কোটি লোকের ক্ষতি ও অসুবিধা করা কি উচিত? মুসলমানদের মধ্যে অনেকে প্রতিযোগিতা দ্বারা নির্দ্ধারিত উচ্চতম যোগ্যতা অনুসারে কাজ পাইয়াছেন। সুতরাং ইহার দ্বারা প্রমাণ হইতেছে, যে, মুসলমানদের কোন স্বাভাবিক নিকৃষ্টতা নাই;—কেবল যোগ্যতমেরাই চাকরি পাইবে এই নিয়ম প্রবর্ত্তিত হইলে দু-দশ বৎসরেই বিস্তর মুসলমান আশানুরূপ যোগ্যতা লাভ করিতে পারিবেন। কিন্তু মনে করা যাক, ন্যূনতম চলনসই যোগ্যতার জোরে মুসলমানরাই সমস্ত সাড়ে তিন লাখ চাকরি পাইলেন। তাহাতে এই সাড়ে তিন লাখ লোকের যেমন কিছু রোজগার হইবে, অন্য দিকে তাঁহাদের যোগ্যতা ন্যূনতম ও চলনসই বলিয়া দেশের কাজ ভাল চলিবে না। তাহাতে অ-চাকুরে ছয় কোটি মুসলমানের লাভ না লোকসান কোন্‌টা বেশী?

অতএব, আমাদের বিবেচনায় ন্যূনতম চলনসই কার্য্যক্ষমতা অনুসারে গবর্ন্মেণ্ট-চাকরির ভাগ-

বাঁটোয়ারা সমগ্র দেশের পক্ষে ক্ষতিকর এবং সমগ্র মুসলমান সমাজের পক্ষেও অনিষ্টকর। চাকরিপ্রার্থী কতকগুলি মুসলমানের সুবিধার জন্য এই প্রকার সাম্প্রদায়িক দাবির সমর্থন করিয়া সমগ্র ভারতীয়দের এবং মুসলমান সমাজের ক্ষতি করা উচিত নয়।

পঞ্চম ও ষষ্ঠ দফাতে সিন্ধুদেশ, বালুচীস্তান এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশকে তিনটি আলাদা আলাদা গবর্ণর-শাসিত ব্যবস্থাপকসভাবিশিষ্ট প্রদেশে পরিণত করিবার দাবি করা হইয়াছে। ঐ অঞ্চলগুলিতে মুসলমানরা সংখ্যাভূয়িষ্ঠ বলিয়া এই দাবি করা হইয়াছে। বালুচীস্তানের লোকসংখ্যা কেবল ৪,২০,৬৪৮, বাংলার ছোট ছোট জেলাগুলির চেয়েও কম। তাহার রাজস্বের ও শিক্ষার অবস্থা খারাপ। সিন্ধুর লোকসংখ্যা ৩২,৭৯,৩৭৭, ময়মনসিংহ ও ঢাকা জেলার চেয়ে কম। উহার রাজস্বের অবস্থা ভাল নয়। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের লোকসংখ্যা ২২,৫১,৩৪০। তাহার রাজস্ব অপেক্ষা ব্যয় প্রতি বৎসর দুই কোটি টাকার উপর হয়। এই অঞ্চলগুলিকে গবর্ণর-শাসিত প্রদেশে পরিণত করিলে খরচ আরও বাড়িবে। এখন অন্য জায়গা হইতে টাকা আনিয়া ইহাদের শাসনকার্য্য চালাইতে হয়। ভবিষ্যতে আরও বেশী টাকা বাহির হইতে আনিতে হইবে।

হিন্দুমহাসভা এই প্রকার বিষয়ে এরূপ কোন প্রস্তাবই করেন নাই, যে, হিন্দুপ্রধান কতকগুলি আত্মব্যয়-নির্ব্বাহে অসমর্থ প্রদেশ গড়িয়া ফেলিতে হইবে। মহাসভার প্রস্তাব এই, যে, প্রদেশগুলিকে ভাঙিয়া-চূরিয়া কিছু করিতে হইলে, নূতন প্রদেশ গড়িতে হইলে, তদর্থে বিশেষভাবে নিযুক্ত সীমা-কমিশন দ্বারা ভাষা, আর্থিক অবস্থা প্রভৃতি সমুদয় বিষয় বিবেচিত হইবার পর কর্ত্তব্যনির্ণয় করিতে হইবে। সর্ব্বত্র-প্রযোজ্য সাধারণ নিয়ম অনুসারে কাজ হয়, হিন্দুমহাসভা ইহাই চান। কেবল হিন্দুদের সুবিধার জন্য কিছু করা হউক, এরূপ কোন প্রস্তাব হিন্দুমহাসভা কখনও করেন নাই।

সপ্তম দফায় স্বাজাতিক ও গণতন্ত্রবাদীদের সমর্থন-যোগ্য কয়েকটি স্পষ্টভাবে ব্যক্ত বা উহ্য প্রস্তাব আছে। যথা—(১) জাতিধর্ম্মবর্ণনির্বিশেষে সমুদয় সাবালক পুরুষ ও নারী ব্যবস্থাপক সভার সভ্য-নির্ব্বাচনে ভোট দিতে পারিবে, (২) নির্ব্বাচন সকল সম্প্রদায়ের নির্ব্বাচকেরা একত্র করিবে; (৩) সংখ্যান্যূন সম্প্রদায়ের লোকদের জন্য ব্যবস্থাপক সভায় তাহাদের সংখ্যার অনুপাতের অধিকসংখ্যক কতকগুলি সভ্যপদ রক্ষিত থাকিবে না, যদিও তাহারা অতিরিক্ত সভ্যপদ দখল করিবার জন্য প্রতিযোগিতা করিতে পারিবে; (৪) সংখ্যাভূয়িষ্ঠ কোন সম্প্রদায়ের জন্য ব্যবস্থাপক সভার সভ্যপদ কোথাও একটিও রক্ষিত থাকিবে না।

৭ম দফায় যাহা যাহা স্বাজাতিকেরা অনুমোদন করিতে পারেন, তাহা বলিলাম। যাহা তাঁহাদের অনুমোদনের অযোগ্য তাহাও বলি। সংখ্যালঘিষ্ঠ বা সংখ্যান্যূন কোন সম্প্রদায় বা শ্রেণীর জন্য তাহাদের সংখ্যার অনুপাতেও ব্যবস্থাপক পদ রক্ষিত হওয়া অকর্ত্তব্য। এ বিষয়ে লক্ষ্ণৌ কন্‌ফারেন্সের প্রস্তাব সাম্প্রদায়িকতা-দুষ্ট হইয়াছে। প্রস্তাবটির আর একটি গুরুতর দোষ এই হইয়াছে, যে, তাঁহারা যে-যে প্রদেশে সংখ্যান্যূন তথায় তাঁহাদের জন্য কতকগুলি সভ্যপদ রক্ষিত থাকিবে, কিন্তু বঙ্গে ও পঞ্জাবে সংখ্যান্যূন হিন্দুদের জন্য একটি সভ্যপদও রক্ষিত থাকিবে না। কতকগুলি সভ্যপদ রক্ষিত থাকা যদি সংখ্যান্যূনদের পক্ষে সুবিধাজনক হয়, তাহা হইলে মুসলমানরা হিন্দুদিগকে সেই "সুবিধা" হইতে কেন বঞ্চিত করিতে চান? কিন্তু তাঁহারা তাহাই করিয়াছেন। তাঁহারা বলিয়াছেন, সংখ্যান্যূনেরা যে-যে প্রদেশে মোট লোকসংখ্যার শতকরা ত্রিশ জনের কম, কেবল সেখানেই এই সুবিধা পাইবেন। সংখ্যাটি ত্রিশ করা হইয়াছে এইজন্য যে, পঞ্জাবে ও বঙ্গে হিন্দুরা সংখ্যান্যূন হইলেও শতকরা ত্রিশজনের চেয়ে বেশী। অতএব সংখ্যাটি ত্রিশ করিবার উদ্দেশ্য স্পষ্ট।

—

বঙ্গের হিন্দুদের কর্ত্তব্য

হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে ব্যবস্থাপক সভা-আদির সভ্য নির্ব্বাচন প্রভৃতি সম্বন্ধে যে মতভেদ আছে, তাহার

মীমাংসা একসঙ্গে ভারতবর্ষের সকল প্রদেশের কথা বিবেচনা করিয়া করিলেই ভাল হয়। এখন যতগুলি গবর্ণর-শাসিত প্রদেশ আছে, তাহার মধ্যে কেবল পঞ্জাব ও বাংলা ছাড়া আর সব প্রদেশে হিন্দুর সংখ্যা মুসলমানের চেয়ে এত বেশী, যে, তথায় মুসলমানরা তাহাদের সংখ্যার অনুপাতের চেয়ে অনেক বেশী সভ্যপদ পাইলেও ব্যবস্থাপক সভায় হিন্দুদের প্রাধান্য থাকিয়া যাইবে। সেই কারণে, এবং বঙ্গে হিন্দুরা নিজেদের সম্বন্ধে সম্প্রদায় হিসাবে চীৎকারপরায়ণ না-হওয়ায়, বাংলা দেশে হিন্দুমুসলমান সমস্যা কি প্রকারের, সে বিষয়ে অন্যান্য প্রদেশের লোকদের জ্ঞান যথেষ্ট নহে। এই হেতু সারা ভারতবর্ষ সম্বন্ধে হিন্দুমুসলমান সমস্যার যে সমাধান হইবে, তাহাতে বঙ্গীয় হিন্দুদের সুবিধা না হইতেও পারে। কিন্তু ভবিষ্যতে সমাধান যে কিরূপ হইবে, তাহা জানা নাই এবং অনুমানও করা যায় না। সেইজন্য আপাততঃ হিন্দু ও মুসলমান পক্ষের সর্ব্বাপেক্ষা আধুনিক যে প্রস্তাব প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে উভয় সম্প্রদায়ের সুবিধা অসুবিধার প্রভেদ কিরূপ দেখা আবশ্যক।

হিন্দুমহাসভা গত মার্চ্চ মাসের শেষের দিকে দিল্লী হইতে ভাবী শাসনবিধি সম্বন্ধে যে মন্তব্য প্রকাশ করেন, তাহাতে কথিত হইয়াছে, ভারতীয় এবং প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভাসমূহের সভ্যনির্ব্বাচন একটি সাধারণ নির্ব্বাচক-তালিকা (common electoral roll) অনুসারে সম্মিলিত (joint) ভাবে হইবে, এবং সংখ্যান্যূন বা সংখ্যাভূয়িষ্ঠ কোন সম্প্রদায়ের জন্যই কোন ব্যবস্থাপক সভায় নির্দ্দিষ্টসংখ্যক সভ্যপদ রক্ষিত থাকিবে না। লক্ষ্ণৌয়ের মুসলমান কন্‌ফারেন্সে গৃহীত প্রধান প্রস্তাব অনুসারে অন্যান্য প্রদেশে যাহাই ঘটুক, বাংলা দেশে হিন্দু-মুসলমানদের তদনুযায়ী অবস্থা হিন্দুমহাসভার মন্তব্যের অনুযায়ীই হইবে। অর্থাৎ হিন্দুমহাসভার মন্তব্য অনুসারে কাজ হইলে বঙ্গে হিন্দু ও মুসলমান কাহারও জন্য যেমন কোন সভ্যপদ আলাদা করিয়া রক্ষিত থাকিবে না, লক্ষ্ণৌয়ের প্রস্তাব অনুসারে কাজ হইলেও তেমনই বঙ্গে হিন্দু মুসলমান কাহারও জন্য কোন সভ্যপদ আলাদা করিয়া রক্ষিত থাকিবে না। উভয় সম্প্রদায়ের লোকেরাই যতগুলি ইচ্ছা সভ্যপদের জন্য প্রতিযোগিতা করিতে পারিবেন।

বঙ্গে হিন্দুরা মুসলমানদের চেয়ে সংখ্যায় কম। সেই জন্য সম্মিলিত নির্ব্বাচনে ব্যবস্থাপক সভায় মুসলমান অপেক্ষা হিন্দু সভ্যের সংখ্যা কম হইবার সম্ভাবনা আছে। কিন্তু এই সম্ভাবনা আছে বলিয়াই, হিন্দুরা যদি কতকগুলি সভ্যপদ তাঁহাদের জন্য রাখিবার দাবি করেন, তাহা হইলে যে-যে প্রদেশে মুসলমানেরা সংখ্যায় কম তথায় তাঁহাদের তদ্রূপ দাবিতে হিন্দুদের আপত্তি করাটা অসঙ্গত, অর্থহীন ও অযৌক্তিক হইবে। লক্ষ্ণৌয়ের প্রস্তাবের আমরা যে সমালোচনা করিয়াছি, তাহা সমস্ত ভারতবর্ষের দিক দিয়া সম্পূর্ণ যুক্তিসঙ্গত, যদিও বাংলা দেশকে আলাদা করিয়া ধরিলে হিন্দুমহাসভার মন্তব্য এবং লক্ষ্ণৌয়ের মুসলমান কন্‌ফারেন্সের প্রস্তাব, উভয়ের ফল বঙ্গের হিন্দুদের পক্ষে কার্য্যতঃ এক দাঁড়ায়।

আমাদের মত এই যে, কোন ধর্ম্মাবলম্বী লোকই সেই ধর্ম্মাবলম্বী বলিয়াই ব্যবস্থাপক সভায় যাইবার বেশী সুবিধার দাবি যেন না করেন। ব্যবস্থাপকপদপ্রার্থী হিন্দু নিজের কার্য্য দ্বারা প্রমাণ করুন, যে, তিনি জাতিধর্ম্মনির্বিশেষে দেশের সব নরনারীর হিতৈষী ও হিতসাধক; ব্যবস্থাপকপদপ্রার্থী মুসলমান খ্রীষ্টিয়ান প্রভৃতিও নিজেদের সম্বন্ধে ঐরূপ প্রমাণ দিয়া ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশ করুন। তাহা হইলেই দেশের মঙ্গল হইবে। হিন্দুর পক্ষে হিন্দু সমাজকে, মুসলমানের পক্ষে মুসলমান সমাজকে শ্রেষ্ঠ মনে করা স্বাভাবিক। কিন্তু বাস্তবিক সেই সমাজই শ্রেষ্ঠ, যাহার সভ্যেরা সকল সমাজের লোকদের হিতসাধন করে।

—

স্বতন্ত্র ও মিশ্র নির্ব্বাচনে সংখ্যান্যূনদের লাভ ক্ষতি

প্রত্যেক সম্প্রদায়ের আলাদা আলাদা নির্ব্বাচনে দেশে একজাতিত্বের (common nationalityর) ভাব প্রবল

ও দৃঢ় হয় না, বরং তাহা দুর্ব্বল হয়। পৃথক নির্ব্বাচনের বিরুদ্ধে ইহা একটি প্রধান আপত্তি। কিন্তু সংখ্যান্যূনরা বলিতে পারেন, "জাতির (নেশ্যনের) দশা যাহাই হউক, আমাদের ত কতকগুলি সভ্য ব্যবস্থাপক সভায় থাকিবে; তাহারা আমাদের স্বার্থ..ক্ষা করিবে।" এই যুক্তির মূল্য বেশী নয়। সংখ্যান্যূনদের জন্য যতগুলি সভ্যপদই রাখা যাক, অধিকাংশ সভ্যপদ তাহাদের জন্য রাখা যাইবে না। সুতরাং তাহাদের হিতের জন্য সংখ্যাভূয়িষ্ঠ দলের সভ্যদের সহানুভূতি ও সাহায্য চাই। কিন্তু স্বতন্ত্র নির্ব্বাচন প্রথা বজায় থাকিলে সংখ্যাভূয়িষ্ঠ দলের সভ্যেরা বলিতে অধিকারী থাকিবেন, "আপনাদের নিজের প্রতিনিধি আছেন, তাঁহারাই আপনাদের হিতাকাঙ্ক্ষী ও নিজের লোক; আপনাদের অভাব অভিযোগ দুঃখ তাঁহাদিগকেই বলুন। আমরা আপনাদের পর, আমাদিগকে কিছু বলা অযৌক্তিক।" পক্ষান্তরে সম্মিলিত নির্ব্বাচনপ্রথা প্রচলিত থাকিলে দেশের ক্ষুদ্রতম সম্প্রদায় ও শ্রেণীর লোকেরাও প্রত্যেক সভ্যের সহানুভূতি ও সাহায্য পাইতে অধিকারী থাকিবেন। নির্ব্বাচনের প্রতিযোগিতা জিনিষটি এরূপ যে, নির্ব্বাচনে জয়ী হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত একজন মানুষের ভোটও অবহেলা করা চলে না। নির্ব্বাচন হইয়া গেলে নির্ব্বাচিত ব্যক্তিরা অনেকে নিজেদের প্রতিশ্রুতি ভুলিয়া যান বটে; কিন্তু সবাই তাহা ভুলেন না, এবং যিনি বা যে-দলের সভ্যেরা প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেন না, তাঁহার বা তাঁহাদের পুনর্নির্ব্বাচনে ব্যাঘাত ঘটিবার সম্ভাবনা আছে।

অতএব, সম্মিলিত বা মিশ্র নির্ব্বাচন জাতীয় একতা বর্দ্ধনের অনুকূল ও প্রত্যেক সম্প্রদায়ের পক্ষে হিতকর, এবং ইহাতে জাতিধর্ম্মনিবিশেষে প্রত্যেক নির্ব্বাচকের মতের মূল্য বাড়ে।

—

সাবালক সকল নরনারীর নির্ব্বাচনাধিকার

কংগ্রেস করাচীতে ঘোষণা করিয়াছেন, স্বরাজের আমলে প্রত্যেক সাবালক নরনারীর ব্যবস্থাপক সভার সভ্য নির্ব্বাচনে ভোট দিবার অধিকার থাকিবে। লক্ষ্ণৌয়ের মুসলমান কন্‌ফারেন্সেও এইরূপ দাবি করা হইয়াছে। এবিষয়ে আমরা এখন "কিন্তু" করিলে আমাদের উপর দুরভিসন্ধি আরোপিত হইবে। বিশেষতঃ, দরিদ্র ও নিরক্ষরদের পক্ষ হইতে আমাদের উপর আক্রমণ আসিবে। তথাপি এ বিষয়ে আমরা আমাদের মত জ্ঞাপন করিবার অনুমতি লইতেছি। আমাদের বিবেচনায় এইরূপ নিয়ম করিলে ভাল হয় যে,- স্বরাজের প্রথম পাঁচ বা দশ বৎসর প্রত্যেক বালক-বালিকার ও প্রত্যেক নিরক্ষর প্রাপ্তবয়স্ক নরনারীর শিক্ষার বন্দোবস্ত করিয়া দেশ হইতে নিরক্ষরতা দূর করিতে হইবে, এবং এই পাঁচ বা দশ বৎসর পরে প্রত্যেক সাবালক ব্যক্তির ভোটদানে অধিকার জন্মিবে। আজকালকার দিনে এরূপ বিলম্বজনক প্রস্তাবে কেহ মন না দিতে পারেন। কিন্তু সকল সাবালক ব্যক্তিকে ভোটের অধিকার দিবার সঙ্গে সঙ্গে যদি অন্ততঃ সাবালক নিরক্ষরদের এবং নাবালকদিগের সকলের শিক্ষার বন্দোবস্ত হয়, তাহাও সন্তোষের বিষয় হইবে।

—

নিখিলবঙ্গ নারী-মহাসম্মেলন

কলিকাতায় নিখিলবঙ্গ নারী-মহাসম্মেলনের প্রথম অধিবেশন একটি স্মরণীয় ঘটনা। ইংরেজীতে ইহাকে বঙ্গনারীদের কংগ্রেস নাম দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু ভারতীয় জাতীয় মহাসভার সহিত ইহার একটি প্রভেদ এই, যে, ইহাতে সামাজিক বিষয়েরও আলোচনা হইয়াছিল। তাহা স্বাভাবিকও বটে। কারণ, রাষ্ট্রীয় পরাধীনতার কুফল পুরুষ ও নারী উভয়কেই ভোগ করিতে হয় বটে, কিন্তু সামাজিক কুপ্রথার কুফল ভোগ নারীদিগকেই বেশী করিতে হয়। কলিকাতায় হিন্দুস্থানী, গুজরাটী প্রভৃতি যে-সব মহিলা বাস করেন তাঁহাদের অনেকে এবং অনেক মুসলমান বাঙালী মহিলা এই সম্মেলনে যোগ দিয়াছিলেন। ইহা সুখের বিষয়।

—

নারী-মহাসম্মেলনের শিল্প প্রদর্শনী

কলিকাতার টাউনহলে নারী-মহাসম্মেলনের শিল্প-

প্রদর্শনী বেশ হইয়াছিল। শ্রীযুক্তা লেডী নির্ম্মলা সরকার একটি তথ্যপূর্ণ সারবান বক্তৃতা পাঠ করিয়া ইহার উদ্বোধন করেন।

—

শ্রীযুক্তা নির্ম্মলা সরকারের অভিভাষণ

শ্রীযুক্তা নির্ম্মলা সরকার তাঁহার অভিভাষণে প্রথমে বঙ্গে স্বদেশী আন্দোলনের ইতিহাস বলিয়া তাহার দ্বারা বাংলায় যে নানাবিধ শিল্পের উন্নতি হইয়াছিল তাহার বর্ণনা করেন। "কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্যবশতঃ ঐ বেগ ক্রমে মন্দীভূত হইয়া আসিল। স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহারের চেষ্টায় শৈথিল্য দেখা দিল।"

"১৯২০ সনে মহাত্মা গান্ধী যখন অহিংস অসহযোগ, মাদকতা নিবারণ ও বিদেশী পণ্য বর্জ্জন ভারতের স্বরাজলাভের প্রথম সোপান বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন, তখন এই আন্দোলন সমস্ত ভারতে ব্যাপ্ত হইয়া নূতন জীবন, নূতন প্রতাপ ও নূতন শ্রী ধারণ করিল। খদ্দরের আবির্ভাবে কার্পাস সূত্র—যাহা বহুকাল বিদেশীয় শাসক জাতির হস্তে আমাদের বন্ধনরজ্জু হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, তাহা পুনরায় আমাদের মাতা, পত্নী, ভগিনী ও পুত্রকন্যাগণের সৌকুমার্য্যময় অঙ্গের শোভা ও গৌরব বর্দ্ধন করিতে আরম্ভ করিল।"

মহাত্মা গান্ধীর প্রবর্ত্তিত অসহযোগ আন্দোলনে দেশী সব রকম শিল্প অল্পাধিক পরিমাণে উৎসাহ পাইয়াছে সন্দেহ নাই। কিন্তু খদ্দরের উৎপাদন ও উন্নতির দিকেই প্রধানতঃ মন দেওয়ায় তাহা যতটা হইয়াছে, অন্য স্বদেশী কুটীরশিল্পের উন্নতি স্বদেশী আন্দোলনের দ্বারা যত হইয়াছিল, অসহযোগ আন্দোলন দ্বারা তত হয় নাই, আমাদের ধারণা এইরূপ। ইহা সমালোচনার ভাবে বলিতেছি না, কেবল তথ্য হিসাবে বলিতেছি।

স্বদেশী শিল্পের পুনরুদ্ধার দ্বারা দেশের যে মহৎ উপকার হইতে পারে, সে বিষয়ে উদ্বোধিকা মহাশয়া যথার্থ কথা বলিয়াছেন :—

"বহুকাল পূর্ব্বে আমাদের দেশ বস্ত্রশিল্প ও কারুকার্য্যের জন্য সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছিল। বিদেশী পণ্য বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দেশীয় শিল্প লুপ্তপ্রায় হইয়া গিয়াছে। হতভাগ্য দেশের লোক নিষ্পেষিত হইয়া অনাহারে ও অর্দ্ধাহারে স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়া পড়িতেছে এবং ম্যালেরিয়া ইত্যাদি নানাপ্রকার দুরারোগ্য বিভীষিকাপূর্ণ রোগের সহিত সংগ্রাম করিতে না পারিয়া অকালে কত লক্ষ লক্ষ মানুষ মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে তাহা অবর্ণনীয়। দেশ দারিদ্র্যের পীড়নে ও মৃত্যুর ছায়ায় মনুষ্যত্ব হারাইয়াছে। ইহার একমাত্র উপায়—শিল্পের পুনরুদ্ধার করা।"

আমাদের দেশে কুটীরশিল্প প্রবর্ত্তনের চেষ্টা এবং পাশ্চাত্য বড় বড় কারখানার মালিকদের লুণ্ঠন-নীতির প্রভেদ সম্বন্ধে অভিভাষণে সত্য কথা বলা হইয়াছে :—

পাশ্চাত্য অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান-সমূহের আদর্শ ও কার্য্য-প্রণালীর সহিত আমাদের দেশের বর্ত্তমান আর্থিক জাগরণের একটি বিশেষ পার্থক্য লক্ষিত হয়। এই পার্থক্যটুকুই আমাদের বিশেষত্ব এবং ব্যবসা ও শিল্পের ক্ষেত্রে ইহা আমরা যেন না ভুলি। পাশ্চাত্যের ঐশ্বর্য্যের মূলে রহিয়াছে বিরাট বিরাট কারখানা ও তাহার সাহায্যে প্রথমতঃ স্বদেশের কর্ম্মীদিগের বিত্তশোষণ ও তৎসঙ্গে দুনিয়ার অপরাপর সকল দেশের বাজারে গায়ের জোরে প্রভুত্ব বিস্তার করিয়া উচ্চমূল্যে মাল বিক্রয় করিয়া অল্পমূল্যে তত্রস্থ কাঁচা মাল খরিদ করিয়া লইয়া আসা। এই আর্থিক লুণ্ঠন-নীতি বর্ত্তমান ইউরোপের সর্ব্বনাশ করিয়াছে। ইহার ফলে আন্তর্জ্জাতিক যুদ্ধবিগ্রহ অহরহ ঘটিয়া থাকে এবং দেশের ভিতরে ধনিকে শ্রমিকে বিবাদ ঘটিয়া অশান্তির সৃষ্টি হয়। তদ্ব্যতীত অপর দেশের জন্য পণ্য উৎপাদন করিয়া শ্রমিকগণও শিল্পের যে প্রাণ-বস্তু তাহার সৌন্দর্য্য বা শ্রী, তাহা হারাইয়া শিল্পীকে সম্পূর্ণরূপে যন্ত্রগত করিয়া ফেলে।

কুটীরশিল্পে এই সকল দোষ লক্ষিত হয় না, ইহাতে তাহারা পুরা পাওনা পায়। অপর দেশের বাজার-লুণ্ঠন করিবার প্রবৃত্তি ইহাতে পোষিত হয় না। কুটীরশিল্পে শ্রমিকের অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য্য আরাধনা করিবার স্পৃহাও পূর্ণবিকাশ লাভ করে। এই সকল কারণে কুটীর-শিল্পের উন্নতি স্বজাতির ঐশ্বর্য্য, নীতি, প্রাণ, মন সকল দিক্ দিয়াই বিশেষ প্রয়োজনীয়। এই কার্য্যে যাঁহারা ব্রতী তাঁহারা মাতৃভূমির উপযুক্ত সেবক।"

—

শ্রীযুক্তা মোহিনী দেবীর অভিভাষণ

নারী-মহাসম্মেলনের অভ্যর্থনাসমিতির নেত্রী শ্রীযুক্তা মোহিনী দেবী তাঁহার অভিভাষণে অন্যান্য কথার মধ্যে, ইংলণ্ডের মেয়েদের ভোটের অধিকার লাভের চেষ্টার সহিত ভারতীয় ও বঙ্গীয় নারীপ্রচেষ্টার পার্থক্য দেখাইয়া বলেন :—

(ইংলণ্ডের মেয়েদের) সে অভিযান ছিল নিজেদের পিতা ভ্রাতা স্বামীপুত্রদের বিরুদ্ধে। আমাদের অভিযান তো তাহা নহে। আমরা এই অভিযানে আমাদের স্বামী পুত্র ভ্রাতার পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইয়াছি। আমাদের এ যুদ্ধ কোন সামাজিক বিধানের বিরুদ্ধে নয়, ইহার মূল আরও অনেক গভীর; ইহার স্মরণ পীড়াদায়ক, জ্বালাময় ও মনুষ্যত্ববিকাশের পরিপন্থী।

নারী-মহাসম্মেলনের সভানেত্রী শ্রীযুক্তা সরলা দেবী চৌধুরাণীর অভিভাষণ পড়িলে কিন্তু মনে হয়, যে, তিনি প্রধানতঃ পুরুষজাতির বিরুদ্ধে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

মেয়েদের এ সজ্ঘর্ষের মধ্যে আনিবার কোন প্রয়োজন নাই। থাকুক তাহারা গৃহ-কোণের সামান্য সুখ দুঃখ, আশা আকাঙ্ক্ষা লইয়া —শিশুকে তাহারা স্তন্য দিক, সন্তানকে পালন করিয়া তুলুক, রন্ধন-শালায় সুখাদ্য প্রস্তুত করুক।

এইরূপ আপত্তির উত্তরে মোহিনী দেবী যাহা বলেন তাহার কিয়দংশ এইরূপ—

যে সনাতন সভ্যতার মধ্যে আমার জন্ম তাহারই প্রাক্কালে যুধ্যমান-স্বামীর রথাশ্ব চালনা করিয়াছিলাম, আমি তাহারই মধ্যভাগে কেশ কাটিয়া ধনুকের ছিলা প্রস্তুত করিতে দিয়াছিলাম, আমি "মেরী ঝান্সী নেহি দেংগী" বলিয়া অগণিত শত্রুর পথরোধ করিয়া দাঁড়াইয়াছিলাম ; সেই আমাকে আজ তোমরা কি নিষেধ-বাক্যে, কি অনুশাসনের জোরে গৃহকক্ষে আবদ্ধ করিয়া রাখিবে ? পিতা পতি পুত্রের মঙ্গলকামনায় আমি উপবাস করিয়াছি, তাঁহাদের শুভকামনা করিয়া বুক চিরিয়া রক্ত দিয়াছি, ইষ্ট কামনায় দেবদ্বারে মানত করিয়াছি, আজ সেই পিতা পুত্র স্বামীর সর্ব্বাপেক্ষা দুর্দ্দিনে কিছুতেই ঘরে বসিয়া থাকিতে পারিব না।

বঙ্গের রাজনৈতিক দলাদলি সম্বন্ধে তিনি বলেন :—

এই যে বাঙ্গালা দলাদলির আগুনে ভস্মীভূত হইতেছে, যাহার জন্য আমরা অন্য অন্য প্রদেশের নিকট অবনতশির, সেই কালাগ্নিতে যেন ইন্ধন আর না জোগাই, নিজের মধ্যে সংঘবদ্ধ হইয়া সমস্ত ভেদ ভুলিয়া গিয়া সিদ্ধির পথ সুগম করি।

নারীদের আকাঙ্ক্ষা ও প্রতিজ্ঞা তিনি নীচের বাক্যগুলিতে প্রকাশ করেন।

আমি আমার দেশের মুক্তি চাই,—রাষ্ট্রে, সমাজে, ধর্ম্মে, সাহিত্যে চিত্রকলায় আজ ভারতবাসীর জীবনকে বাহিরের শক্তি পঙ্গু করিয়া রাখিয়াছে, তাহার সহিত মরণপণ করিয়া আজ আমার সে-সব পঙ্গুত্ব নাশ করিতে চাই—আজ চাই আমরা দেশের মুক্তি। নর-নারীর অখণ্ড ও অক্ষুণ্ণ স্বাধীনতার যে দাবি, যে অধিকার—তাহার জন্যই আমরা মৃত্যুপণ করিয়া যাত্রা সুরু করিলাম। কণ্টকে ক্ষতবিক্ষত হইতে সর্পদংশনের জ্বালা সহ্য করিতে পারিবে না ? তরল অগ্নিস্রোতে দগ্ধ হইতে ভয় পাইতেছ ? না, এ সবই মায়া মাত্র, অপদেবতার মায়া, মতিভ্রম হইতে নিজেকে রক্ষা করিয়া চল। স্বাধীনতার দাবি, মুক্ত জীবনের অধিকারের জন্য সর্ব্বপ্রযত্নে তোমার নারীত্বকে জাগাইয়া তোল, যে স্বাধীনতা আমরা চাই, বিদেশী পণ্যবর্জ্জনে তাহা আমার করায়ত্ত হয় হউক, চরকায় সূতা কাটিয়া খদ্দর প্রচলনে তাহা আসে আসুক, আইন অমান্য করিয়া তাহা যদি আমার প্রাপ্য হয়—হউক, স্বাধীনতা আমি চাই-ই।

"ভারতবাসীর জীবনকে বাহিরের শক্তি পঙ্গু করিয়া রাখিয়াছে" ইহা সত্য কথা, কিন্তু আংশিক সত্য। আমরা নিজেও যে নিজেদের শত্রু তাহা ভুলিলে চলিবে না।

—

শ্রীযুক্তা সরলা দেবী চৌধুরাণীর বক্তৃতা

পুরুষ ও নারীদের মধ্যে প্রতিযোগিতা ও রেষারেষি পাশ্চাত্য নানা দেশে যে-সব কারণে যতটা জন্মিয়াছে, ভারতবর্ষে সে-সব কারণের আবির্ভাব এখনও পাশ্চাত্য দেশ-সকলের মত হয় নাই। যদি সে সব কারণের পূর্ণ বিকাশ এখানে হয়, তাহা হইলে পুরুষ ও নারীর পরস্পরের প্রতি মনোভাব ঠিক পাশ্চাত্য কোন কোন শ্রেণীর পুরুষ ও নারীদের মত হইবে কি-না বলিতে পারি না। আমরা যতটা জানি ও অনুমান করিতে পারি, বর্ত্তমানে পুরুষদের প্রতি বঙ্গনারীদের মনের ভাব সাধারণতঃ পাশ্চাত্য দেশসকলে পুরুষদের প্রতি নারীর অধিকারপ্রতিষ্ঠাপ্রয়াসিনীদের (ফেমিনিষ্টদের) মনের ভাবের মত নহে। কিন্তু আমরা পুরুষ মাত্র। এ বিষয়ে শ্রীযুক্তা সরলা দেবী চৌধুরাণীর মত সাক্ষাৎ জ্ঞান আমাদের থাকিবার কথা নহে।

পূর্ব্বেই আভাস দিয়াছি, তাঁহার বক্তৃতাটিতে পুরুষদের প্রতি যথেষ্ট অনুগ্রহের অভাব লক্ষিত হয়। কিন্তু সেজন্য নিকৃষ্টজাতীয় মনুষ্য আমরা তাঁহার সহিত তর্ক করিবার সাহস রাখি না। কেবল আমাদের মন্তব্যের কয়েকটি প্রমাণ তাঁহার বক্তৃতা হইতে নীচে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। একথা আগেই বলিয়া রাখি, তিনি পুরুষ জাতির যে-সব দোষ উদ্ঘাটন করিয়াছেন, তাহা অংশতঃ নিশ্চয়ই সত্য, সর্ব্বৈব সত্য কি না সে-বিষয়ে আমাদের সন্দেহ আছে।

"এই কংগ্রেস বঙ্গনারীর আত্মচেতনার মূর্ত্ত বিকাশ, বাংলার পুরুষের আত্মচেতনার সহিত তাহার সম্পর্ক নাই।"

ইহা কি সত্য ?

"বাংলার নারী তাহার জীবনের বিভিন্ন বিভাগে যে বৈষম্যমূলক ব্যবহার পাইয়া আসিয়াছে তাহার ফলেই এই আত্মচেতনার উদ্ভব।"

"পুরুষ তাহার নিজ স্বার্থোদ্দেশেই নারীকে ব্যবহার করিয়াছে—নারীর নিজ প্রয়োজন পূরণ করিতে বিশেষ কোন সাহায্যই সে করে নাই।"

বঙ্গনারীর জাগৃতি বিষয়ে পুরুষেরা "বিশেষ কোন সাহায্যই" করে নাই, ইহা কি ঐতিহাসিক তথ্য ?

"নারীর মনের ভাব পুরুষ কোন দিন অনুভব করে নাই।"

ইহা সত্য হইলে পৃথিবীর (ও বাংলা দেশের) পুরুষলিখিত সকল কাব্যের নারী-চরিত্র-বর্ণনা সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক।

"ক্রমশঃ অধিকার প্রতিষ্ঠা" শীর্ষক অনুচ্ছেদে সভানেত্রী মহাশয়া বলিতেছেন :—

"পাশ্চাত্যের নারীগণ দীর্ঘ-দিনের মোহনিদ্রা ভঙ্গ করিয়া শতাব্দীব্যাপী সংগ্রামের পর তাঁহাদের অবস্থার বিশেষ পরিবর্ত্তন সাধন

করিয়াছেন। সহস্র অত্যাচার, অনাচার ও বঞ্চনার সহিত সংগ্রাম করিয়া আজ তাঁহারা জয়লাভ করিয়াছেন। তাহার ফলে আমাদের, অর্থাৎ ভারতীয় নারীদের পক্ষে প্রত্যেক বার নূতন শাসনসংস্কারে কোন-না-কোন প্রদেশের মিউনিসিপালিটী, সিনেট, আইন-সভা ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে প্রবেশ করা অপেক্ষাকৃত সহজ হইয়াছে।"

এই কথাগুলির মধ্যে সত্য আছে স্বীকার্য্য। কিন্তু ভ্রমও আছে। ইংলণ্ডে নারীর অধিকারলাভপ্রচেষ্টা বর্ত্তমান শতাব্দীতে কতকটা জয়যুক্ত হইবার বহুপূর্ব্বে আমাদের মহিলারা গত শতাব্দীতে বিশ্ববিদ্যালয়ে যে যে অধিকার পাইয়াছিলেন, কেম্ব্রিজ অক্সফোর্ডে এখনও তাহার কোন কোনটি ইংরেজ মহিলাদের করায়ত্ত হয় নাই। সামাজিক কোন কোন বিষয়ে ভারতীয় নারীদের স্থান পাশ্চাত্য নারীদের চেয়ে উচ্চে আগে হইতেই ছিল। পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা এখানে হইতে পারে না। দু-একটা কথা বলি।

পরমাত্মায় মাতৃত্ব আরোপ পাশ্চাত্য দেশে বা প্রাচ্যে প্রচলিত সেমিটিক কোন শাস্ত্রে আছে কি? ঐরূপ কোন শাস্ত্রে ঈশ্বরের বাণী নারীর নিকট প্রকাশিত হইয়াছিল বলিয়া উল্লেখ আছে কি? ভারতীয় শাস্ত্রে আছে।

সভানেত্রী মহাশয়া বলিতেছেন, "জাতীয় মহাসভা অদ্যাবধি নিজেদের কর্ম্মসমিতি প্রভৃতি শুধু পুরুষের দ্বারাই গঠিত করিয়া চলিয়াছেন, যদিও বহুক্ষেত্রে এই সকল পুরুষ অনেক নারী অপেক্ষা কার্য্যক্ষমতায় ও বুদ্ধিতে হীন।" জাতীয় মহাসভার কর্ম্মসমিতির অতীত বা বর্ত্তমান কোন মহিলা সভ্যের অস্তিত্ব শ্রীযুক্তা সরলা দেবী চৌধুরাণী কি অবগত নহেন? কার্য্যক্ষমতা ও বুদ্ধিতে শ্রেষ্ঠ অনেক পুরুষ কংগ্রেসওয়ালাও কংগ্রেসের কর্ম্মসমিতিতে স্থান পান না। কিন্তু তাহার জন্য কংগ্রেস কর্ত্তৃপক্ষের কোন দুরভিসন্ধি বা পক্ষপাতিত্ব নিশ্চয়ই আছে বলিতে পারি না। তা ছাড়া আরও একটা কথা বিবেচনা করা চাই। আজকাল শুধু কার্য্যক্ষমতা ও বুদ্ধিই কংগ্রেসের কর্ম্মসমিতির সভ্য হওয়ার পক্ষে যথেষ্ট নহে। স্বার্থত্যাগ, কার্য্যে-প্রমাণিত সাহস এবং যখন-তখন অম্লানবদনে জেলে যাইবার জন্য প্রস্তুতিরও প্রয়োজন আছে। "চাচা আপন বাঁচা" নীতির অনুসরণকারী পুরুষ ও নারীরা কার্য্যক্ষমতা ও বুদ্ধিতে খুব শ্রেষ্ঠ হইলেও কংগ্রেসের কর্ম্মসমিতিতে তাঁহাদের স্থান নাই।

শ্রীযুক্তা সরলা দেবী যে বলিয়াছেন, "জাতির মঙ্গলের জন্য যদি বিশেষ কাহারও অর্থনৈতিক স্বাধীনতার প্রয়োজন হয় তবে সে নারীর," ইহা অতি সত্য কথা। "পুরুষের বেকার সমস্যা অপেক্ষা নারীর বেকার সমস্যা আরও গুরুতর," ইহাও ঠিক কথা। "স্ত্রীলোকের নীতি-বিগর্হিত বৃত্তি গ্রহণ অথবা দুর্নীতিপরায়ণ জীবনযাপনে"র "মূল কারণ" সব স্থলে "আর্থিক দুর্দ্দশা" যদি না-ও হয়, তাহা হইলেও অনেক স্থলে উহাই যে প্রধান কারণ তাহাতে সন্দেহ নাই।

আর্থিক স্বাধীনতা হইতে বঞ্চিত স্ত্রীলোক অনেক সময়ই পুরুষের লালসা-বহ্নিতে পতিত হয়—ইহার ফল ব্যভিচার, ইহার ফল বেশ্যালয়। সুতরাং কোন আদর্শ রাষ্ট্রে একজন বেকার কিম্বা জীবিকাহীন স্ত্রীলোক থাকিবে না; আদর্শ সমাজে পুরুষ যদি কোন নারীকে প্রলুব্ধ করিয়া লইয়া যায় তবে আইনানুসারে তাহার কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা থাকিবে; প্রলুব্ধকারী পুরুষের গায়ে কুশের আঁচড়টি লাগিবে না, আর প্রলুব্ধ নারীই শুধু সমাজের শাসনদণ্ড ভোগ করিবে, আর এরূপ হইতে পারিবে না। প্রলুব্ধ নারীর এই শাসন তাহার নিজ মঙ্গলের জন্যও নহে—পুরুষেরই স্বার্থরক্ষার জন্য। কেন-না, পূর্ব্বে সে পুরুষেরই সম্পত্তি-বিশেষ ছিল। নারীর দেহ এবং মনের উপর পুরুষের যে অধিকার সৃষ্ট হইয়াছে তাহা তখনই গুরুতর আঘাত পায় যখন নারীর মুক্তির জন্য এবং সমাজকে নিষ্কলুষ করিবার জন্য কোন কঠোর আইন প্রস্তাবিত হয়। পুরুষ নারী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর—এই মনোবৃত্তিই নারীকে কাম ও লালসার পসারিণীতে পরিণত করিয়াছে। স্বর্গেও পুরুষের জন্য উর্ব্বশী ও রম্ভার সৃষ্টি হইয়াছে। যত প্রকারে পুরুষ নারীকে আপন প্রয়োজনে ব্যবহারের বস্তু বলিয়া ঠিক দিয়া রাখিয়াছে তন্মধ্যে ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট ও ঘৃণিত। আইনের অস্ত্রে সজ্জিত ও কবির কল্পনায় সমর্থিত সমাজ পুরুষকে এই অধিকার দিয়াছে।

এগুলি খাঁটি সত্য কথা এবং পুরুষসমাজের পক্ষে দারুণ লজ্জার কথা।

নিম্নমুদ্রিত কথাগুলিতে সভানেত্রী কংগ্রেসের যে খুঁত ধরিয়াছেন, তাহা অমূলক নহে।

শৌণ্ডিকালয়গুলি পুরুষের পক্ষে অনিষ্টকর, কিন্তু বেশ্যালয়গুলি নারী-জাতির পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা অপমানজনক। বিগত শীতকালে লাহোরে নিখিল-ভারত এবং নিখিল-এশিয়া নারীসম্মিলনী নামক দুইটি মহিলা সভার প্রত্যেকটিতেই মদ্য নিবারণের দাবি উপেক্ষা না করিয়াও বেশ্যালয় ধ্বংসের প্রচেষ্টাকেই কার্য্যসূচীর একটি প্রধান বিষয় বলিয়া গণ্য করা হয়। কিন্তু কংগ্রেস মদ্য নিবারণের প্রয়োজনীয়তা পূর্ণভাবে হৃদয়ঙ্গম করিলেও বেশ্যালয়গুলি রাখার কুফল সম্বন্ধে এতটুকুও দৃষ্টি দেয় নাই। পুরুষচালিত গবর্ণমেণ্ট যখন বেশ্যালয়ের লাইসেন্স দিয়া নিজ তহবিল পূর্ণ করে, আর পুরুষদের পরিচালিত ভারতের জাতীয় মহাসভা যখন তাহাদের বিরুদ্ধে একটি প্রতিবাদ-

বাণীও উচ্চারণ করে না, তখন ভারতের নারীদের উচিত অবিলম্বে উদ্বুদ্ধ হইয়া মিলিত চেষ্টায় চৈনিক কবি ডাঃ লীউয়ের প্রস্তাবিত একটি নিখিল-বিশ্ব গণতন্ত্রসভা গঠন করা। পৃথিবীর পবিত্রতা এবং শান্তি রক্ষার জন্য এই গণতন্ত্রের পরিষদসমূহে নারীরই থাকিবে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ক্ষমতা।

অভিভাষণে নারীর মূল অধিকার সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে, মোটের উপর তাহা সমর্থনযোগ্য। স্ত্রীলোকদের উত্তরাধিকার সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে, তাহাতে কার্য্যতঃ এরূপ দাঁড়াইতে পারে, যে, সধবা বা বিধবা বধূ পিতৃকুল ও শ্বশুরকুল উভয় বংশ হইতেই সম্পত্তি পাইবেন। তাহা অসাম্যমূলক হইবে না, যদি পুরুষরাও ঠিক্ সমভাবে পিতৃকুল ও শ্বশুরকুলের সম্পত্তির অধিকারী হন। স্বামীর আয়ে সধবা অবস্থায় স্ত্রীর সমান অধিকার থাকিলে, স্ত্রীর জীবিত অবস্থায় তাঁহার আয়ে ও স্ত্রীধনে স্বামীর সমান অধিকার থাকা সাম্যমূলক ব্যবস্থা হইবে।

আজকাল রাজনৈতিক মুক্তিসাধনেই পুরুষদের—এবং সঙ্গে সঙ্গে অনেক নারীরও—ব্যগ্রতা দেখা যায়। সেইজন্য শ্রীমতী সরলা দেবী আত্মার মুক্তি আনয়নের প্রতি শ্রোত্রীদিগকে অবহিত হইতে বলিয়া যথার্থ নেত্রীর কাজ করিয়াছেন।

—

নারী-মহাসম্মেলনের প্রস্তাবাবলী

নিখিল-বঙ্গ নারী-মহাসম্মেলনে যে-যে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে, তাহা মোটের উপর সমর্থনযোগ্য। বিবাহবিচ্ছেদের প্রস্তাবটি পরিত্যক্ত হইয়াছে। বিবাহ-বিচ্ছেদ জিনিষটার প্রতি আমাদের মনেরও বিরুদ্ধতা আছে। কিন্তু স্থলবিশেষে ও অবস্থাবিশেষে বিবাহ-বিচ্ছেদের ব্যবস্থা না থাকায় স্ত্রীলোকদের উপর অত্যন্ত অবিচার ও অত্যাচার হয়। পুরুষরা ত অনেকে স্ত্রী পরিত্যাগ করেই, সুতরাং তাহাদের কথা বলা অনাবশ্যক। অনেকে মনে করেন, হিন্দু সমাজে বা হিন্দুশাস্ত্রে বিবাহ-বিচ্ছেদের ব্যবস্থা নাই। কিন্তু নানাজাতির হিন্দুর মধ্যে বিবাহবিচ্ছেদ আছে। তাহারা নিম্নশ্রেণীর বলিয়াই অহিন্দু নহে। এবং "নষ্টেমৃতে" ইত্যাদি যে শ্লোকের দ্বারা বিধবাবিবাহ শাস্ত্রীয় বলিয়া প্রমাণ করা হয়, তাহাতেই ত অবস্থাবিশেষে সধবা স্ত্রীলোকের পত্যন্তর গ্রহণের ব্যবস্থা রহিয়াছে।

বিপরীত ধর্ম্মাবলম্বীদের মধ্যে বিবাহ আমরা অনুমোদন করি না। যাহাদের পারিবারিক প্রথা ও রীতিনীতি, সামাজিক প্রথা ও রীতিনীতি, ধর্ম্মমত ও ধর্ম্মানুষ্ঠান, এবং কৃষ্টি (কালচার) পৃথক, তাহাদের মধ্যে বিবাহ বাঞ্ছনীয় নহে। ইহাতে সন্তানদেরও অনিষ্ট হয় তবে যদি হিন্দুবংশজ খ্রীষ্টিয়ানবংশজ মুসলমানবংশজ প্রভৃতি ব্যক্তিরা ঔদ্বাহিক আদান-প্রদান করিতে চায়, তাহারা ১৮৭২ সালের তিন আইন অনুসারে তাহা করিতে পারে।

বাংলা দেশে নারীহরণের বাহুল্যের দিকে নারী-মহাসম্মেলন কেন মন দিলেন না, তাহা বন্ধ করিতে কেন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন না, এবং পাপকার্য্যের জন্য বালিকা-দিগকে পণ্যদ্রব্যে পরিণত করিবার ব্যবসা বন্ধ করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ কেন হইলেন না, জানি না। বালিকা ও প্রাপ্তবয়স্কা নারীদের সকলকে শিক্ষিত করিয়া তুলিবার জন্য দেশের লোকদের ও গবর্ন্মেণ্টের একান্ত চেষ্টা করা আবশ্যক। এবিষয়ে একটি আলাদা প্রস্তাব সম্মেলনে উপস্থাপিত ও গৃহীত হইলে ঠিক হইত।

—

"বর্ষপঞ্জী"

রবীন্দ্র-জয়ন্তী উপলক্ষ্যে শান্তিনিকেতনে ও অন্য কোথাও কোথাও উৎসব হইয়াছে। এখন কবির জীবনের প্রধান প্রধান ঘটনার ও কাজের তারিখ এবং তাঁহার কোন্ বহি কখন প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা জানিবার কৌতূহল অনেকেরই হইবে। বিশ্বভারতীর গ্রন্থাগারিক শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় যে "বর্ষপঞ্জী" প্রস্তুত করিয়াছেন, তাহাতে এই সব তথ্য লিখিত আছে। উহা প্রবাসী কার্য্যালয়ে পাওয়া যায়। মূল্য ডাকমাশুল-সমেত সাড়ে চারি আনা।

—

"কবি-পরিচিতি"

সম্প্রতি আর একটি সময়োপযোগী বহি প্রকাশিত

হইয়াছে। ইহা প্রেসিডেন্সী কলেজের রবীন্দ্র-পরিষৎ কর্ত্তৃক প্রকাশিত "কবি-পরিচিতি।" নামটি কবি নিজে দিয়াছেন। পুস্তকখানিতে তাঁহার একটি কবিতা, একটি অভিভাষণের অনুলিখন, এবং প্রমথ চৌধুরী, সুরেন্দ্রনাথ দাস-গুপ্ত, শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, সোমনাথ মৈত্র, রাধারাণী দত্ত, নীহাররঞ্জন রায় এবং গিরিজা মুখোপাধ্যায়ের সাতটি প্রবন্ধ আছে।

—

"রাশিয়ার চিঠি"

আর একটি অন্য রকমের সময়োপযোগী পুস্তক রবীন্দ্রনাথের জন্মোৎসব দিবসে প্রকাশিত হইয়াছে। প্রবাসীতে কবির রুশিয়া সম্বন্ধে যতগুলি চিঠি প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার সহিত প্রবাসীতে প্রকাশিত তাঁহার অপর কয়েকটি লেখা একত্র সন্নিবদ্ধ করিয়া সবগুলি বিশ্বভারতী গ্রন্থালয় পুস্তকাকারে মুদ্রিত করিয়াছেন। রুশিয়া সম্বন্ধে নানা কথা জানিবার কৌতূহল অনেকেরই আছে। যাঁহারা প্রবাসী পড়েন না, তাঁহারা এই পুস্তকে প্রত্যক্ষদর্শী কবির ঐ চিঠিগুলি পড়িয়া উপকৃত হইবেন। আর যাঁহারা প্রবাসী পড়েন, তাঁহাদেরও চিঠিগুলি আবার এক জায়গায় পড়িবার ও রাখিবার সুবিধা হইল।

—

মহাত্মা গান্ধী ও মাতৃভাষা

গত ১৮ই এপ্রিল বোম্বাই মিউনিসিপালিটি মহাত্মা গান্ধীকে সম্মান-পত্র উপহার দেয়। তিনি এই অভিনন্দনের উত্তর এই বলিয়া গুজরাটিতে দেন, যে, "মাতৃভাষা ভিন্ন অন্য ভাষায় আলোচনা মন্ত্রণাদি চালান উচিত নহে।" ইহা অযৌক্তিক কথা নহে। কিন্তু যেখানে এমন সব লোক একত্র হইয়া মন্ত্রণা ও আলোচনা করে, যাহাদের মাতৃভাষা এক নয়, সেখানে কোন্ ভাষায় কাজ চালান হইবে? সমবেত অধিকাংশ লোক যে ভাষা বুঝে ও বলিতে পারে, তাহাতেই চালান উচিত।

বোম্বাইয়ে মহাত্মা গান্ধী তাঁহার মাতৃভাষা গুজরাটিতে অভিনন্দনের উত্তর দেন। কিন্তু উহা বোম্বাই শহরে প্রচলিত একমাত্র বা প্রধান দেশভাষা নহে। ১৯২১ সালের সেন্সস্ অনুসারে বোম্বাই শহরে যতগুলি ভাষা প্রচলিত ছিল, তাহার মধ্যে প্রধান পাঁচটি যত লোকের মাতৃভাষা ছিল তাহা নীচের তালিকায় দেখান হইল।

ভাষা	কত জনের মাতৃভাষা।
মরাঠী	৬,০৪,৪৪৯
গুজরাটী	২,৩৬,০৪৭
হিন্দী	১,৭৩,৬৪১
কচ্ছী	৩৯,৫২১
কোঙ্কনী	৩২,৫৯৮

১৯২১ সালে বোম্বাই শহরের লোকদের শতকরা ৫১.৪ জনের মাতৃভাষা ছিল মরাঠী, ২০.১ জনের গুজরাটী। সুতরাং ঐ নগরের প্রধান মাতৃভাষা মরাঠী।

মহাত্মা গান্ধী সাধারণতঃ হিন্দীতে কথাবার্ত্তা চালান ও বক্তৃতা করেন। বোম্বাইয়ে ইহার ব্যতিক্রম করিবার কারণ বোধ হয় এই, যে, তিনি প্রাদেশিক ও স্থানীয় ব্যাপারের আলোচনায় তত্রত্য মাতৃভাষা ব্যবহারের পক্ষপাতী। তাহা হইলে বোম্বাই শহরে মরাঠীর ব্যবহারই প্রশস্ত, যদিও সর্ব্বত্রই নিজের মাতৃভাষা ব্যবহার করিবার অধিকার সকলের থাকা উচিত। কংগ্রেসে হিন্দুস্থানী, ইংরেজী, এবং, বক্তার মাতৃভাষা হিন্দুস্থানী না হইলে, তাঁহার মাতৃভাষা অন্য কোন দেশীভাষা ব্যবহারের অধিকার থাকা উচিত।

—

রাষ্ট্রনীতি ও মিঃ ভিলিয়ার্স

কলিকাতা ইউরোপীয় সভার বর্ত্তমান সভাপতি মিঃ ভিলিয়ার্স ইংলণ্ডের "ডেলী এক্সপ্রেস" কাগজে এদেশের ভবিষ্যৎ রাষ্ট্রনীতি এবং ইউরোপীয় বণিক-সম্প্রদায়ের ঐ সম্পর্কে কার্য্যপন্থার সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করিয়াছেন। ঐ মতামত প্রকাশের ফলে এদেশের রাজনৈতিক মহলে ছোটখাট একটি ঝড় বহিয়া গিয়াছে। এখন প্রকাশ এই যে, ডেলী এক্সপ্রেসে তাঁহার মন্তব্য ঠিক ভাবে প্রকাশিত হয় নাই। এখানের ইউরোপীয় সভা ঐ মন্তব্য সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে, উহা যদি সত্য হয়—এবং সভার বিশ্বাস যে উহা নির্ভুল নয়—তবে উহা

ভিলিয়ার্সের নিজস্ব (কেন-না, উহা সভার অনুমোদন বিনাই কাগজে দেওয়া হইয়াছে)। ইংলিশম্যান কাগজ উহা এদেশে প্রথম প্রচার করেন। এখন তাঁহারা বলিতেছেন যে, মিঃ ভিলিয়ার্স জানাইয়াছেন যে, ঐ মন্তব্যে অনেক কাটছাঁট করায় উহার মতের ধারা ভুল ভাবে দেখান হইয়াছে। যাহা হউক, ইংলিশম্যানের মতে ঐ মন্তব্যের নির্ভুল সারাংশ এই যে, এ দেশের ভবিষ্যৎ রাষ্ট্রনীতির মধ্যে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের জন্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা থাকা উচিত; ব্রিটিশ বণিকসম্প্রদায় তাহাদের সম্পর্কে ভেদবিচার কিছুতেই মানিয়া লইবে না; ব্রিটিশ সাম্রাজ্য হইতে ভারতের বিচ্ছিন্ন হইবার অধিকার সম্বন্ধে মহাত্মা গান্ধীর যে মত তাহাও তাহারা মানিবে না এবং যদি পুনর্ব্বার আইন অমান্য এবং বিদেশী পণ্যদ্রব্য বহিষ্কার আন্দোলন আরম্ভ হয় তবে ভারত গভর্ন্মেণ্টের উচিত তাহা ক্ষিপ্র ও দৃঢ়ভাবে দমন করা।

এই ব্যাপারে প্রথমে যাহা প্রকাশিত হয় তাহার সারাংশ এই যে, হিন্দু যদি ভাল চায় তবে বিদেশী বণিক ও বিদেশীয় সাধারণের বিরুদ্ধাচরণ বন্ধ করুক, নহিলে উক্ত মহাশয়গণ ভেদনীতির সমর্থন, মুসলমান-দিগের সহিত একত্র হইয়া হিন্দুর শত্রুতাচরণ ইত্যাদি, এমন কি, দৈহিক বলপ্রয়োগ পর্য্যন্ত সবকিছু করিয়া হিন্দুকে দমন করিবেন।

এই সকল মন্তব্য এবং কূটনীতি চালনের ও "ভয় দেখানর" ফলে দেশী নানা সংবাদপত্রে নানাপ্রকার তীব্র সমালোচনা প্রকাশিত হইয়াছে। কেহ বলিয়াছেন যে মিঃ ভিলিয়ার্স "এতদিনে অসার নীতিকথা, ছলনা ও শঠতার ধূম্রজাল উড়াইয়া স্বরূপ প্রকাশ করিয়াছেন।" কেহ-বা ইউরোপীয় সম্প্রদায়কে এরূপ নির্ব্বোধের মত 'যা খুশী তাই" বলার ফল সম্বন্ধে সতর্ক করিয়াছেন। আমাদের মতে এ বিষয়ের বিশেষ আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। কেন-না, ভিলিয়ার্স যাহা বলিয়াছেন তাহার মধ্যে নূতন কিছুই নাই। এমন কি ইউরোপীয়গণের ভবিষ্যৎ কার্য্যপন্থা সম্বন্ধে তাঁহার যে নির্দ্দেশ (ভুল বা নির্ভুল ভাবে) প্রথমে প্রকাশিত হইয়াছিল, তদনুসারে কাজও তাঁহারা এ পর্য্যন্ত কিছু কম করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। ভবিষ্যতেও যদি তাঁহারা ঐরূপ করেন, তবে অল্প কিছুকালের জন্য হিন্দুরা কতকটা ক্ষতিগ্রস্ত হইবে সন্দেহ নাই। কিন্তু উহার পরিণামে তাঁহাদের উচ্ছেদ অবশ্যম্ভাবী। মুসলমান সম্প্রদায় সম্বন্ধে যে ইঙ্গিত আছে তাহা উন্নতিশীল মুসলমানগণ এখনই হেয়জ্ঞান করেন এবং যাঁহারা সংরক্ষণের পক্ষপাতী তাঁহারাও এইরূপ বিরোধ ও ভেদনীতির প্রশ্রয় কতটা দিবেন সে-বিষয়ে সন্দেহ আছে। ইতিহাস আজকাল সকল শিক্ষিত লোকেই পড়ে এবং বিদেশীর এই কূটনীতির ফলে অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীতে হিন্দু মুসলমান উভয়েরই যে কি দুর্গতি হইয়াছিল তাহা শিক্ষিত লোক মাত্রেই জানে।

এই মিঃ ভিলিয়ার্স ইউরোপীয় সভার সভাপতি এইমাত্র আমরা জানি। ইহা ভিন্ন তিনি কে বা কি তাহা আমরা বিশেষ কিছু জানি না। সুতরাং তাঁহার সভার বিনা অনুমোদনে কিছু বলিবার যোগ্যতা আছে কি-না এবং তাঁহার সেইরূপ স্বতন্ত্র নিজস্ব মতের গুরুত্ব সম্বন্ধেও বিচার করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। আমরা যে কয়জন ভিলিয়ার্সের কথা জানি বা শুনিয়াছি তাহাদের কয়েকজনের বিষয় কিছু বলা যাইতে পারে।

প্রথম ভিলিয়ার্স ইংলণ্ডের রাজা প্রথম চার্লসের চাটুকারবৃত্তি করিয়া প্রভূত অর্থশালী এবং প্রবল ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তি হইয়াছিলেন। সেই ক্ষমতার অশেষ অপব্যবহার এবং নিজের স্বার্থ অন্বেষণের জন্য নানাপ্রকার বিশ্বাস-ঘাতকতা ও অসৎ কার্য্য করিয়া তিনি নিজ দেশের ও রাজার অশেষ দুর্গতি করেন। তিনি গুপ্তঘাতকের হাতে নিহত হন, এবং তাঁহার কার্য্যের ফলে ইংলণ্ডে বিদ্রোহ ও রাজা প্রথম চার্লসের শিরশ্ছেদ হয়। ইনি প্রথম ডিউক অব বাকিংহাম।

দ্বিতীয় ভিলিয়ার্স উপরোক্ত জনের উপযুক্ত পুত্র। ইনিও প্রবলপরাক্রান্ত ব্যক্তি ছিলেন এবং পিতার ন্যায় শক্তির অপব্যবহার কুটচক্রান্ত এবং অসৎ ব্যবহার সমানেই করিয়াছিলেন। কিন্তু বার-বার বিশ্বাস-

ঘাতকতা করায় রাজা প্রজা সকলে বিরক্ত হওয়ায় শেষে ইহার অবস্থা শোচনীয় হয়।

তৃতীয় ভিলিয়ার্স আধুনিক লোক বলিয়া শুনিয়াছি। বিগত মহাযুদ্ধের শেষে ইনি এদেশে মস্ত ব্যবসায় ফাঁদিয়া বসেন। শোনা যায় যে ব্যবসা চালনা এবং স্থাপন সম্বন্ধে ইহার প্রধান গুণ ছিল কোনও অতি উচ্চ রাজপ্রতিনিধি বা রাজকর্ম্মচারীর সঙ্গে তাঁহার পারিবারিক সম্বন্ধ এবং সম্ভ্রান্ত পরিবারসুলভ আদব-কায়দা। ইনি আসামে তেলের খনি, উড়িষ্যায় কয়লার খনি ইত্যাদির লিমিটেড কোম্পানী করিয়া বহু বহু লক্ষ টাকার শেয়ার বিক্রয় করেন। শোনা যায় যে, ঐ টাকার অধিকাংশই ভারতীয় হিন্দুদিগের দ্বারা প্রদত্ত এবং ইহাও শোনা যায়, ঐ সকল কোম্পানীর মধ্যে অনেকগুলিই গত আইন অমান্য আন্দোলনের পূর্ব্বেই প্রায় নিশ্চল হইয়া পড়ে

আমরা জানি না, সভাপতি মিঃ ভিলিয়ার্সের সহিত ঐ প্রথম ও দ্বিতীয় ভিলিয়ার্সের কোনও বংশগত সম্পর্ক আছে কিনা। থাকিলেও, সব দিক দিয়া বংশানুক্রমের দাবি তাঁহার পক্ষে না-করাই সুবুদ্ধির কাজ হইবে। আমরা ইহাও ঠিক বলিতে পারি না যে, তৃতীয় ভিলিয়ার্স ও সভাপতি ভিলিয়ার্স একই ব্যক্তি কিনা। যদি আমরা যাহা শুনিয়াছি তাহা সত্য হয় এবং ইনিই সেই ভিলিয়ার্স হন তবে ইঁহার বলা উচিত যে, হিন্দুর উঁহার সহিত পূর্ব্বোক্ত রূপ সাক্ষাৎ আর্থিক সহযোগিতা করার ফলে হিন্দুদিগের কি উপকার হইয়াছে।

—

মুসলমানদের সাহায্য লইবার আর এক প্রস্তাব

ভারতবর্ষে বিলাতী কাপড়ের আমদানি ব্রিটিশ বণিকদের আশার অনুরূপ হইতেছে না বলিয়া তাঁহারা ভারতীয়দিগকে ভয় দেখাইতেছেন এবং নানা প্রকার ফন্দী আঁটিতেছেন। একটা ফন্দী ম্যাঞ্চেষ্টার গার্ডিয়্যানের এক লেখক ঐ কাগজে লিখিয়া ফেলিয়াছেন। ব্যাপারটা এই। বিলাতী কাপড় আমদানি প্রধানতঃ হিন্দু ব্যবসাদাররা করে—যেমন কলিকাতায় মাড়োয়ারীরা। কিন্তু বিক্রী না হওয়ায় তাহারা আর উহা নূতন করিয়া আমদানি করিতেছে না। সেইজন্য এখন বিলাতী বস্ত্রনির্ম্মাতাদিগকে পরামর্শ দেওয়া হইতেছে, "তোমরা এখন মুসলমানদের দ্বারা বিলাতী কাপড় আমদানি করাও; যদি তাহাদের টাকা না থাকে, টাকাও তাহাদিগকে ধার দাও।" দেশদ্রোহিতা করিবার লোক সব সমাজেই আছে, মুসলমানদের মধ্যেও আছে। সুতরাং ল্যাঙ্কেশায়ারের বণিকদের টাকা খাইয়া বিলাতী কাপড় আমদানি করিবার লোক মুসলমানদের মধ্যে পাওয়া কঠিন হইবে না। কিন্তু তাহাতে ত ল্যাঙ্কেশায়ারের তাঁতিদের দুঃখ ঘুচিবে না। যদি এরূপ হইত, যে, বিলাতী কাপড় ভারতে আসিলেই বিক্রী হইবে, তাহা হইলে আমদানি করিবার লোক ঠিক করিতে পারিলেই বিলাতের কাপড়ের কলওয়ালাদের দুঃখ ঘুচিত। কিন্তু আমদানি করিবার লোক খুঁজিয়া বাহির করা আসল সমস্যা নয়—আসল সমস্যা ক্রেতা পাওয়া। ভারতবর্ষে এখনও বিলাতী কাপড় গুদামে অনেক মজুত আছে। কিন্তু ক্রেতা নাই। অল্পসংখ্যক ক্রেতা হয়ত তাহা কিনিতে ইচ্ছা করিতে পারে, কিন্তু পিকেটারদের পরামর্শ ও অনুরোধে তাহারাও নিবৃত্ত থাকে। পিকেটারদিগকে পুলিসে ঠেঙাইলে বা গ্রেপ্তার করিলে তাহাদের জায়গায় আরও পিকেটার উপস্থিত হয়।

ল্যাঙ্কেশায়ারের কলওয়ালারা যদি সেই সব দেশে তাঁহাদের কাপড় পাঠান যেখানে তাহার চাহিদা আছে, তাহা হইলে ভাল হয়। তাঁহাদের কাপড়ে আমাদের প্রয়োজন নাই।

ভারতবর্ষের স্বরাজের বিরোধী ইংরেজরা যে-কোন উপায়ে স্বরাজ-লাভের চেষ্টা ব্যর্থ করিতে চায়, তাহাতেই মুসলমানদিগকে সহায়রূপে পাইবার আশা করে, ইহা স্বাজাতিক মুসলমানেরা নিশ্চয়ই মুসলমান-সমাজের পক্ষে লজ্জার বিষয় মনে করিবেন।

—

উত্তর ও পূর্ব্ব বঙ্গে অন্নকষ্ট

উত্তর ও পূর্ব্ব বঙ্গের কোন কোন স্থানে অন্নকষ্ট

হইয়াছে। এই অন্নকষ্টকে দুর্ভিক্ষ বলিলে অন্যায় হয় না। পাটের দর অত্যন্ত কমিয়া যাওয়া ইহার একটি কারণ। পঞ্জাবের গমের চাষীদের দুর্দ্দশা মোচনের অজুহাতে ভারত গবন্মেণ্ট বিদেশ হইতে আমদানি গমের উপর শুল্ক বসাইলেন। তাহাতে গমের চাষীদের কোন সুবিধা হউক বা না-হউক, কলিকাতার আটা-ময়দার কলওয়ালার এবং তাহাদের ক্রেতাদের অসুবিধা হইল। কিন্তু বঙ্গের পাটচাষীদের দুর্দ্দশায় ভারত গবন্মেণ্টের হৃদয় দ্রবীভূত হইল না কেন? পাটের সস্তা দরে ভারত-প্রবাসী ও স্কটল্যাণ্ডবাসী বিদেশী পাটের কলওয়ালাদের সুবিধা হইয়াছে বলিয়া?

আমাদের দেশের দুঃখী লোকদের দুরবস্থা সম্বন্ধে বিদেশীদের মনের ভাব যাহাই হউক, আমাদের কর্ত্তব্য আমাদিগকে করিতে হইবে। দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট সব জায়গার লোকেরা বিশ্বাসযোগ্য তথ্য সংগ্রহ ও প্রকাশ করুন, নিরন্ন লোকদের ফোটোগ্রাফ তুলুন ও প্রকাশ করুন, সং লোকদিগকে লইয়া সাহায্য-দান-কমিটি গঠন করুন এবং এই প্রকারে অর্থ সংগ্রহ করিয়া বিপন্ন লোকদিগকে সাহায্য দিতে থাকুন।

—

বঙ্গে রাজনৈতিক দলাদলি

বঙ্গের রাজনৈতিক দলাদলির উচ্ছেদ সাধন করিবার জন্য আমরা কিছুই করিতে পারি না বলিয়া দুঃখ হয়। ময়মনসিংহে শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সেন-গুপ্তের উপর আক্রমণ এবং তাঁহার ও কলিকাতা মিউনিসিপালিটীর প্রধান কর্ম্মকর্ত্তার উপর দোষারোপপূর্ণ একখানা চিঠির প্রচার বাংলার কংগ্রেসওয়ালাদের লজ্জার কারণ হইয়াছে।

এখন আবার শুনা যাইতেছে, কংগ্রেসের সভ্য সংগ্রহ করিবার জন্য রসীদ বহি সর্ব্বত্র নিরপেক্ষভাবে দেওয়া হইতেছে না। এখন যে-দলের হাতে ক্ষমতা আছে, আগামী নির্ব্বাচনের পূর্ব্বে অন্য দল যাহাতে বেশী সভ্য সংগ্রহ করিয়া তাহাদিগকে পরাস্ত করিতে না পারে, সেই উদ্দেশ্যে কি রসীদ বহি দিতে পক্ষপাত ও কৃপণতা করা হইতেছে?

কোন কোন ধর্ম্মের লোকেরা মনে করে, যে, একমাত্র তাহারাই মানুষকে স্বর্গের পথ দেখাইয়া দিতে পারে। এই জন্য স্বর্গের পথ প্রদর্শনের ব্যবসাতে তাহারা কোন প্রতিদ্বন্দ্বী সহ্য করিতে পারে না। ফলে অনেক ঝগড়া-বিবাদ, এমন কি রক্তপাত পর্য্যন্ত হয়।

দেশ উদ্ধারের কাজেও যখন ক্ষমতালোলুপতা বা পেশাদারী আসে, কিংবা যখন কলিকাতা মিউনিসিপালিটীর বহু চাকরিতে নিয়োগে বহু জিনিষপত্র ক্রয়ে ও বহু কণ্ট্রাক্ট দানে মুরুব্বিয়ানাটা অন্যতম লক্ষ্য হয়, তখন ভিতরে জিনিষটা যাহাই হউক, বাহিরে তাহা এইরূপ আকার ধারণ করে, যেন এক দল অন্য দলকে বলিতেছে,"আমরাই প্রকৃত দেশোদ্ধারক, তোমরা মেকি; অতএব তোমাদের প্রতিযোগিতা বিনষ্ট করিব।"

এই দলাদলির জন্য, যাঁহারা বঙ্গের কর্ম্মিষ্ঠ কংগ্রেস-ওয়ালা নহেন তাঁহারা সাক্ষাৎভাবে দায়ী না হইতে পারেন। কিন্তু পরোক্ষ দায়িত্ব তাঁহাদেরও আছে। দলাদলিতে যখন দেশের কলঙ্ক ও ক্ষতি হয়, তখন আমাদের মত নিলিপ্ত, উদাসীন, 'নির্বিরোধ' দর্শকদের কি কোন কর্ত্তব্য ও দায়িত্ব থাকে না? অন্ততঃ আমাদের কর্ত্তব্য আছে আমরা অনুভব করিতেছি, কিন্তু তাহা পালন করিবার পথ দেখিতে পাইতেছি না।

—

সীমা-কমিশন নিয়োগ

যে ভারত-গবন্মেণ্ট-আইন অনুসারে ভারতের বর্ত্তমান শাসনপদ্ধতি প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহার ৫২-এ ধারায় গবন্মেণ্টকে আবশ্যকমত প্রদেশগুলির সীমা পরিবর্ত্তনাদি উপায়ে প্রদেশসমূহের পুনর্গঠনের ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু ঐ শাসনপদ্ধতি শেষ হইতে চলিল, অথচ এ পর্য্যন্ত ঐ ধারাটির কোন ব্যবহার করা হইল না।

গোলটেবিল বৈঠকের অতঃপর যে অধিবেশন হইবে, তাহাতে গবর্ণর-শাসিত একটি অখণ্ড উৎকল প্রদেশ এবং গবর্ণর-শাসিত একটি সিন্ধু প্রদেশ গঠনের প্রস্তাব উঠিবার সম্ভাবনা আছে। ভারতভৃত্য সমিতির কটকস্থিত সভ্য শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীনারায়ণ সাহু পাটনার ইণ্ডিয়ান নেশুন কাগজে লিখিয়াছেন, যে,

ভারত-গবর্ন্মেণ্ট উৎকল প্রদেশ গঠনার্থ একটি সীমা-কমিশন নিয়োগ করিতে যাইতেছেন। উহা কেবল উৎকল প্রদেশের জন্যই, তাঁহার চিঠি পড়িয়া এইরূপ মনে হয়। তাহা ঠিক্ কিনা বলা যায় না। যাহা হউক, সাহু মহাশয়ের চিঠিতে মনে হইতেছে, গবর্ন্মেণ্ট প্রাদেশিক সীমা সম্বন্ধে কিছু করিতে ইচ্ছুক হইয়াছেন। অন্ধ্রদেশীয়েরা (তেলুগুভাষীরা) একটি স্বতন্ত্র অন্ধ্র প্রদেশ গঠন করাইতে উদ্যোগী হইয়াছেন। তাহা ৯ই মে তারিখের "জাষ্টিস্" কাগজে প্রকাশিত শ্রীযুক্ত ভী রামদাস পাণ্টলুর চিঠি হইতে বুঝা যায়।

ভারত-গবর্ন্মেণ্ট সাইমন কমিশনের কাছে যে মেমোর‍্যাণ্ডাম্ পেশ করেন, তাহাতে প্রদেশ পুনর্গঠনের পক্ষে যে-সব যুক্তি দেখাইয়াছিলেন, তাহার মধ্যে একটির সম্বন্ধে বলা হইয়াছিল যে, উহার ভিত্তি স্থাপিত "upon the improvement of the administration by the removal of disabilities to which isolated groups of peoples are exposed, if separated from the bulk of the peoples with whom by race or by language they should naturally be united।" যে-সব বঙ্গভাষী লোকদের আবাসস্থান বিহার-উড়িষ্যা প্রদেশের মধ্যে ফেলা হইয়াছে, তাহারা অধিকাংশ বাঙালীদের সাহচর্য্য হইতে বঞ্চিত হওয়ায় শিক্ষা প্রভৃতি নানা বিষয়ে তাহাদের অসুবিধা হইয়াছে। যে-সব বঙ্গভাষীদের পিতৃভূমি আসাম প্রদেশের অন্তর্গত করা হইয়াছে, তাহাদেরও অসুবিধা আছে। অতএব, বিহার-উড়িষ্যা ও আসাম প্রদেশদ্বয় হইতে বঙ্গের টুকরাগুলি বিযুক্ত করিয়া তাহা বঙ্গের সহিত পুনঃসংযোজিত করা উচিত। এ বিষয়ে এখনই বঙ্গের সব রাজনৈতিক দলের সম্মিলিত চেষ্টা করা আবশ্যক। কংগ্রেস ভাষা অনুসারে প্রদেশ গঠনের পক্ষপাতী। অতএব বাঙালী কংগ্রেসওয়ালারা এ বিষয়ে বঙ্গের অন্যান্য রাজনৈতিক দলের সহিত সহযোগিতা করিতে পারেন।

ইহা নিশ্চিত, স্বরাজের আমলে প্রত্যেক প্রদেশের ব্যবস্থাপক সভায় ও রাষ্ট্রীয় কার্য্যে দেশভাষা ব্যবহৃত হইবে। বঙ্গে যে পরিমাণে বাংলা ভাষা এবং লিপি ব্যবহৃত, ভারতবর্ষের অন্য কোন প্রদেশে সেই পরিমাণে এক ভাষা ও এক লিপি প্রচলিত নাই। কিন্তু ভৌগোলিক বঙ্গদেশের কোন কোন অংশকে অন্য দুই প্রদেশের সহিত যুক্ত করিয়া দেওয়ায় বঙ্গের এই বিশেষত্বের সুবিধা সকল বঙ্গভাষী ভূখণ্ড পাইতেছে না।

উৎকল একটি আলাদা প্রদেশ হইয়া গেলে বিহারে স্বরাজের আমলে হিন্দী রাষ্ট্রীয় ভাষা হইবে। বিহারের সহিত সংযুক্ত বঙ্গের অংশের বাঙালীদের তাহাতে অসুবিধা হইবে। অতএব মানভূম প্রভৃতি বঙ্গভাষী অঞ্চল বঙ্গের সহিত পুনর্যুক্ত করা উচিত। এই প্রকার কারণে আসামের অন্তর্ভূত বঙ্গভাষী অঞ্চলগুলিকেও বঙ্গের সহিত পুনর্যুক্ত করা কর্ত্তব্য।

—

টাটা লৌহ ও ইস্পাত কোম্পানী ও সর্ পদমজি জিনওয়ালা

সর্ পদমজি জিনওয়ালা সম্প্রতি টাটা লৌহ ও ইস্পাত কারখানার ডেপুটি চেয়ারম্যান নিযুক্ত হইয়াছেন। ইনি অল্পদিন আগে পর্য্যন্ত ভারতীয় শুল্কনির্দ্ধারণ বোর্ডের সভাপতি ছিলেন। ইনি সম্প্রতি টাটা কোম্পানির ডিরেক্টরবর্গের তরফে উহার কার্য্যচালনা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতে নিযুক্ত হন, এবং ঐ কার্য্য সমাপ্তির পর উক্ত কোম্পানি সম্বন্ধে তিনি বোম্বায়ে তাঁহার অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন।

তাঁহার মতে কোম্পানীর অবস্থা অত্যন্ত আশাপ্রদ। কেন না, গত বৎসরে পূর্ব্বের অন্য কোন বৎসর অপেক্ষা অধিক পরিমাণ ইস্পাত প্রস্তুত হইয়াছে, এবং প্রস্তুতির খরচাও অন্য বৎসর অপেক্ষা কিছু কম।

কোম্পানীতে ভারতীয় লোক নিয়োগ সম্বন্ধে তাঁহার মত বিদেশীরই মতন। তিনি বলেন যে, যদিও ইহা ঠিক যে, কোম্পানীকে আরও দ্রুতভাবে ভারতীয়ভাবাপন্ন (অর্থাৎ উহার কাজে অধিক ভারতীয় নিয়োগ) করা উচিত, কিন্তু তাহা কোম্পানীর কার্য্যশৃঙ্খলা ও কার্য্যকারিত্বের বিনিময়ে করা উচিত নয়। তাঁহার মতে "ভারতীয়তাপাদনের" উপর অতিরিক্ত জোর দেওয়ার ফলে কোম্পানীর ভারতীয় কর্ম্মচারিগণের নিয়মানুবর্ত্তিতা ও শাসনাধীনতা কমিতেছে। কেন-না, তাহারা নিজেদের বিদেশীয় কর্ম্মচারিগণের সমকক্ষ বলিয়া জ্ঞান করিতে অসময়েই আরম্ভ করিয়াছে। তিনি আরও বলিয়াছেন যে, কোম্পানীর অংশীদারদিগের স্বার্থ ভাল ভাবে বজায় থাকে, যদি স্থানীয় কার্য্যচালকগণের সম্বন্ধে সমালোচনা কম হয়। বিশেষতঃ, যেহেতু এই সমালোচনা অযথেষ্ট, অশুদ্ধ এবং পক্ষপাতিত্বপূর্ণ সংবাদের ও তথ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত।

কোম্পানীর অবস্থা আশাপ্রদ, ইহা সুখবর। কেন-না, যত শীঘ্র এই শ্বেত হস্তীটি ভারতীয় করদাতার স্কন্ধ হইতে নামে ততই ভাল। যে ৫০ বা ৬০ লক্ষ টাকা বাৎসরিক

এই কোম্পানীর উদরপূর্ত্তিতে যাইতেছে তাহা সৎকার্য্যে নিয়োগ করিলে এ দরিদ্র দেশের অনেক উপকার হয়।

কোম্পানীতে ভারতীয় নিয়োগ সম্বন্ধে তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহা আমরা বহুবার বহু বিদেশীর কপট সহানুভূতিরূপে শুনিয়াছি। "ভারতীয় নিয়োগ করা উচিত, আহা, নিশ্চয়, তবে কি-না বেশী দ্রুত ঐ কাজ করিলে কোম্পানীর কার্য্যকারিতার হানি হইবে!" টাটা কোম্পানীর আবার কার্য্যকারিতার কি হানি হইবে?

ইংরেজী এফ্‌ফিসিয়েন্সী কথাটা বেশ রসাল এবং সুশ্রাব্য। কিন্তু টাটা কোম্পানীর সম্বন্ধে ঐ শব্দ ব্যবহার স্পর্দ্ধা ও বাচালতা ভিন্ন আর কিছুই নয়। জিনওয়ালা মহাশয় বলিয়াছেন, স্থানীয় কার্য্যচালকদের কার্য্যের সমালোচনা না করিলে অংশীদারদিগের ভাল হয়। সে বিষয়ে সন্দেহ কি? আরও ভাল হয় যদি দেশের লোক নির্ব্বিবাদে আরও শুল্ক এবং অর্থসাহায্য বৃদ্ধি করাইয়া কষ্টার্জ্জিত অর্থ আরও বেশী পরিমাণে টাটার অংশীদারদিগের কুক্ষিতে দান করে। জিনওয়ালা বলিয়াছেন, অধিকাংশ সমালোচনা ভুল বা ভ্রান্ত ধারণা হইতে উৎপন্ন। স্বীকার করিলাম তাহাই ঠিক, কিন্তু সঠিক খবর কোথায় পাওয়া যায়? টাটা কোম্পানী কি কোনও খবর দিতে প্রস্তুত? তবে জিনওয়ালা মহাশয় দেশের লোককে যতটা অজ্ঞ ভাবেন ততটা নয়, অন্তত পক্ষে টাটা কোম্পানী সম্বন্ধে। এবং টাটা কোম্পানী ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির নহে, যে, উহার তরফে যে যা বলিবে তাহাই সত্য বলিয়া মানিয়া লইতে হইবে। টাটা কোম্পানীর হোম-অগ্নিতে আহুতি দিবার পূর্ব্বে যজ্ঞের ফল সম্বন্ধে প্রশ্ন হইতে পারে।

—

টাটা কোম্পানী দেশী না বিদেশী?

অনেকে হয়ত বলিবেন, দেশী কোম্পানী সম্বন্ধে এত তীব্র সমালোচনা করা উচিত নয়। সেই জন্য আমরা বিচার করিতে চাই যে, এই প্রতিষ্ঠান দেশী না বিদেশী। ইহাকে দেশী বলা হয়, যেহেতু:—

(১) ইহা একজন মহানুভব এদেশীয় দ্বারা স্থাপিত।

(২) ইহার (অধিকাংশ) অংশীদার ও ডিরেক্টরগণ এদেশীয়।

(৩) ইহা এই দেশের মালমসলায় ও এই দেশের জমীর উপর চলে।

(৪) ইহার কুলিমজুর এদেশী।

কিন্তু ইহাকে বিদেশী বা বিজাতীয় বলাও সমীচীন, কেন-না:—

(১) ইহার পরিচালক (ডিরেক্টর) বর্গের স্বজাতি-বা স্বদেশ-প্রেমের কোনও চিহ্ন নাই। বিদেশীর প্রতি ভক্তির চূড়ান্ত তাঁহারা অনেকরূপেই দেখাইয়াছেন ও দেখাইতেছেন।

(২) ইহার কার্য্যচালনা সম্পূর্ণভাবে বিদেশীর হাতে এবং প্রকৃত পক্ষে তাহারাই ইহার স্বত্বাধিকারী।

(৩) এই প্রতিষ্ঠান স্থাপনের ফলে এদেশের লোকের অপেক্ষা বিদেশীর বহু বেশী লাভ হইতেছে। বিদেশী নিকৃষ্ট কর্ম্মচারীও এখানে টাকায় আঠার আনা পায়। এদেশীয়েরা অনেক ক্ষেত্রে অত্যন্ত অবিচার পাইয়া থাকে।

(৪) এদেশীয় অন্য কারখানা, যাহারা এই প্রতিষ্ঠানের সাহায্য পাইলে উন্নতি করিতে পারিত, তাহাদের প্রতি এই প্রতিষ্ঠানের বিদেশী কর্ম্মকর্ত্তারা এবং তাঁহাদের দাসরূপী দেশী পরিচালকবর্গ কোনরূপ সহানুভূতি দেখান না। যথা, ইঁহারা পিগু লৌহ (pig iron) এদেশে বিক্রয় করেন টন-প্রতি ৬৫৲ টাকায় এবং সেই লৌহই বিদেশে চালান দেন ৩০৲ টাকা টন দরে!

(৫) এই প্রতিষ্ঠান কয়েকটি ইউরোপীয় কারখানাকে অল্পদরে ইস্পাত বিক্রয় করেন, দেশী কারখানাকে অধিক মূল্যে ক্রয় করিতে হয়।

(৬) এই প্রতিষ্ঠানের উৎপন্ন দ্রব্যাদি বিক্রয় করিয়া যা লাভ বা কমিশন হয় (এবং তাহা পরিমাণেও প্রচুর), তাহা ভোগদখল করে একদল ইউরোপীয়।

(৭) সর্ব্বশেষে, "ভারতীয়করণ" সম্বন্ধে পরিচালকদিগের মনোবৃত্তি যে কি, তাহা জিনওয়ালা মহাশয়ের কথাতেই প্রকাশ।

এই 'ভারতীয়করণ" সম্পর্কে জিনওয়ালা বলিয়াছেন যে, উহা "আরও" দ্রুত করা উচিত। যেন উঁহারা "ভারতীয়করণের" অনেক চেষ্টাই করিয়াছেন! ভারতীয়করণের কি যথার্থ চেষ্টা উঁহারা করিয়াছেন তাহা বলুন। কোনও ভারতীয় যোগ্যতার সহিত ঐ কোম্পানীতে কাজ করিলে তাহার ভবিষ্যতে কি আশা আছে? এবং তাহার যোগ্যতার সম্বন্ধে সুবিচারের কি লেশমাত্র ব্যবস্থা ওখানে আছে? সুযোগ্য ভারতীয় কর্ম্মচারীকে লঙ্ঘন করিয়া অল্প-যোগ্যতাযুক্ত ইউরোপীয়ের নিয়োগ ইঁহারা কখনও কি করেন নাই? যদি করিয়া থাকেন ত কতবার করিয়াছেন এবং তাহার প্রায়শ্চিত্তের কি ব্যবস্থা ইঁহারা করিয়াছেন? যদি বলেন, যে, ঐরূপ অবিচার উঁহারা করেন নাই, তবে আমরা বলিতে বাধ্য যে, পরিচালকবর্গ সে-বিষয়ে অজ্ঞ কিংবা সত্যপ্রকাশে ভীত। কেন-না, আমরা এইরূপ বহু অবিচারের কথা

শুনিয়াছি যেখানে ভারতীয়েরা কোনরূপ বিচারই পায় নাই।

—

টাটা কোম্পানী এবং কার্য্যকারিতা

তাহার পর কার্য্যকারিতার ছলে "ভারতীয়করণে" জিনওয়ালা মহাশয়ের অনিচ্ছা প্রকাশ। এ বিষয়ে আমাদের বক্তব্য এই মাত্র যে, আমরা আশ্চর্য্য হই যে, কোন্ লজ্জায় টাটা কোম্পানীর ধুরন্ধর পরিচালক-বর্গ বা তাঁহাদের সুযোগ্য কর্ম্মচারীরূপী মনিববৃন্দ কার্য্যকারিতা শব্দ মুখে আনেন!

যেদিন তাঁহারা "একহাতে ভিক্ষার ঝুলি ও অন্য হাতে পিস্তল লইয়া" শুল্কবৃদ্ধি ও অর্থ-সাহায্যের জন্য দরিদ্র ভারতবাসীর হর্ত্তাকর্ত্তাদিগের দ্বারস্থ হইয়াছিলেন, সেই দিনই তাঁহাদের কার্য্যকারিত্ব ও কার্য্যকৌশলের যথার্থ পরিচয় আমরা পাইয়াছি। হইতে পারে যে, লৌহ ও ইস্পাত উৎপাদন সম্বন্ধে আমাদের "পুথিগত বিদ্যা' ভিন্ন আর কিছুই নাই, কিন্তু ইহা কি সত্য নয় যে, টাটা কোম্পানী বিদেশী কারখানার তুলনায়—

(১) লৌহখনিজ ম্যাঙ্গানিজ, ডলমাইট প্রস্তর, ও চূর্ণ প্রস্তর ইত্যাদি বহু বহু সুলভে পায়।

(২) কয়লা বিদেশীর অপেক্ষা সুলভে (অন্ততঃ পক্ষে সমান দামে) পায়।

(৩) জমীর খাজনা প্রায় বিদেশীর তুলনায় নাম-মাত্র দেয়।

(৪) অশিক্ষিত কুলি-মজুর বহু সুলভে পায়।

(৫) প্রস্তুত মাল বহনের রেল বা জাহাজ ভাড়া (বিদেশী চালান অপেক্ষা) অনেক কম দেয়।

পরিশেষে বিদেশী মালের উপর শুল্ক থাকায় সেখানেও যথেষ্ট লাভের স্থান আছে। তথাপি এই ধুরন্ধর বিশ্বকর্ম্মা কার্য্যচালকগণ লাভ দেখাইতে পারেন না। এই ত তাঁহাদের যোগ্যতা!

অর্থ ও জিনিষপত্রের অপব্যবহারের কথা না বলাই ভাল। তাহা হইলে পরিচালকবর্গের যোগ্যতাও প্রকাশিত হইয়া যাইবে। দুঃখের বিষয়, তাঁহারা এদেশীয়। কেবলমাত্র ভারতীয় কর্ম্মচারীর বেলাই "যত দোষ নন্দঘোষ।"

—

কারমাইকেল মেডিক্যাল কলেজ

বেলগাছিয়ার কারমাইকেল মেডিক্যাল কলেজ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত সংযুক্ত একমাত্র বেসরকারী মেডিক্যাল কলেজ। ইহার জন্য প্রসূতি-হাঁসপাতাল নির্ম্মাণ করিবার নিমিত্ত চারি লক্ষ টাকার উপর প্রয়োজন। গবর্ন্মেণ্ট এই সর্ত্তে দেড় লাখ টাকা দিতে চাহিয়াছেন, যে কলিকাতা মিউনিসিপালিটী একটা থোক্ টাকা দিবেন এবং বাকী সর্ব্বসাধারণ দিবে। মিউনিসিপালিটী ৫০,০০০ দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় স্মৃতিরক্ষা ফণ্ড হইতে প্রাপ্ত ৩৫,০০০ সমেত ৮০,০০০ টাকা সাধারণের নিকট হইতে পাওয়া গিয়াছে। আরও দেড় লক্ষ টাকা চাই। প্রিন্সিপ্যাল ডাক্তার কেদারনাথ দাস ইহার জন্য সকলের নিকট আবেদন করিয়াছেন। এই টাকাটি তাঁহার পাওয়া উচিত। হাঁসপাতালটির জন্য ১,৪০,০০০ টাকা মূল্যে প্রায় তিন বিঘা জমী কেনা হইয়াছে।

—

আত্মসমর্পণ নীতি

ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ শাসনবিধিতে সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান কিরূপ হওয়া উচিত বা হইবে, সে-বিষয়ে মতভেদ আছে। তজ্জন্য বিবাদ-বিসংবাদ তর্ক-বিতর্ক এবং দরকষাকষি হইয়া আসিতেছে। কংগ্রেস-নেতারা সমাধানের একটা সোজা উপায় স্থির করিয়াছেন। পণ্ডিত জবাহরলাল, সর্দার পটেল এবং মহাত্মা গান্ধী এ বিষয়ে একমত। তাঁহারা বলেন, "সংখ্যান্যূনেরা (এই শব্দ দ্বারা তাঁহারা কেবল মুসলমানদিগকেই কার্য্যতঃ অভিহিত করেন) যাহা চান, তাহাই দিয়া ফেলা উচিত; অবশিষ্ট যাহা থাকিবে, তাহাই হিন্দুরা লইবেন।" মহাত্মাজী সম্প্রতি "ইয়ং ইণ্ডিয়ায়" এ বিষয়ে লিখিয়াছেন :—

"As a Satyagrahi I believe in the full absolute efficacy of full surrender. Numerically, the Hindus happen to be a majority. Without reference therefore to what the Egyptian majority did, they may give the minorities what they want. But even if the Hindus were a minority, as a Satyagrahi and a Hindu I say, the Hindus would lose nothing in the long run by full surrender.

"The surrender advised by me is not of honour, but of earthly goods. There is no loss of honour in surrendering seats, position or emoluments."

মুসলমানেরা যে কোন কোন প্রদেশে সংখ্যায় অধিকতম এবং হিন্দুরা যে তথায় তাহাদের চেয়ে সংখ্যায় কম, মহাত্মাজীর ইহা বিবেচনা করিবার প্রয়োজন হয় নাই। কারণ, তাঁহার মতে হিন্দুরা সংখ্যায় অধিকতম হউক বা কমই হউক, আত্মসমর্পণ করা একমাত্র তাহাদেরই কর্ত্তব্য। মুসলমানেরা যেখানে যেখানে সংখ্যায় অধিকতম, সেখানেও তিনি তাহাদিগকে আত্মসমর্পণ করিবার পরামর্শ দেন নাই। তাহার কারণ বোধ হয় এই

যে, তিনি নিজে হিন্দু, সুতরাং হিন্দুদিগকে অনুরোধ করিবার অধিকার তাঁহার বেশী আছে। তাঁহার এই "সাম্প্রদায়িকতা" (কংগ্রেসওয়ালারা মাফ করিবেন) বোধগম্য। ইহাও হইতে পারে, যে, তিনি মুসলমানদিগকে হিন্দুদের মতে "নমনীয়", 'সাত্ত্বিক", ও "উদার" মনে করেন না। অবশ্য এ সবই আমাদের অনুমান।

গান্ধীজী বলিয়াছেন, আত্মসমর্পণ নীতির অনুসরণ দ্বারা শেষ পর্য্যন্ত হিন্দুরা ক্ষতিগ্রস্ত হইবেন না। হিন্দুরা ক্ষতিগ্রস্ত হইবেন কি-না, তাহার আলোচনা আমরা আবশ্যক মনে করি না। সমগ্র জাতির ও দেশের হিতাহিতই বিবেচ্য। জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে দেশী লোকদের মধ্যে যোগ্যতম লোকদের উপর সব রকম সরকারী কাজের ভার পড়িলে তবে দেশের কাজ ভাল চলিতে পারে। কিন্তু এক ধর্ম্মসম্প্রদায় অন্য সম্প্রদায়ের নিকট আত্মসমর্পণ করিলে মোটের উপর যোগ্যতম লোকদের হাতে কার্য্যভার পড়িবে না, এবং দেশহিতও যথাসম্ভব হইবে না।

মহাত্মাজী কেবল পদমর্য্যাদা ও আর্থিক লাভের দিক্‌টাই ভাবিতেছেন। পদের সম্মান ও আর্থিক পাওনা ছাড়িয়া দিতে পারা যায়। কিন্তু তাহাই প্রধান বা একমাত্র বিবেচ্য বিষয় নহে। ব্যবস্থাপক সভার সভ্যপদ, মিউনিসিপালিটীর সভ্যত্ব, পেয়াদাগিরি, চৌকিদারী, সমুদয়ই দেশের হিতের জন্য। কোন কোন রকম কাজের জন্য কোন কোন ব্যক্তির বেশী শক্তি প্রবৃত্তি যোগ্যতা থাকে। তদনুসারে প্রত্যেকের কোন-না-কোন কাজ করিয়া দেশের সেবা করা কর্ত্তব্য। এই কর্ত্তব্য না-করা, এই কর্ত্তব্য করিবার অধিকার ও সুযোগ ত্যাগ করা, কাহারও উচিত নহে। কোন ব্যক্তি যদি ব্যবস্থাপক হইবার জন্য যোগ্যতম হন, তিনি বলিতে পারেন না, "আমি আত্মসমর্পণ করিলাম—অনধিকারী আমি এখন আমার অনভ্যস্ত ও অজ্ঞাত কৃষিকর্ম্ম, ডাক্তারী, এঞ্জিনিয়ারি, মোটরগাড়ী চালন, সারেঙের কাজ, বা পৌরোহিত্য করিব"; এবং অন্য কাহারও তাঁহাকে আত্মসমর্পণ করিবার পরামর্শ দেওয়াও উচিত হইবে না। "স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মোভয়াবহঃ," উক্তিটির এরূপ অর্থ করা অসঙ্গত নহে, যে, যিনি তাঁহার প্রবৃত্তি শক্তি ও শিক্ষার দ্বারা যে কাজের উপযুক্ত, তাহা করাই তাঁহার ধর্ম্ম, অন্য কাজ করিতে যাওয়া "পরধর্ম্ম" এবং তাহা ভয়াবহ বলিয়া বর্জ্জনীয়।

মৌলানা শৌকৎআলী যদি মহাত্মাজীকে বলেন, "গান্ধীজী, আপনি আমার নিকট আত্মসমর্পণ করুন। আমি এখন দেশের লোকদিগকে অহিংসা, আত্মসমর্পণ, দীনতা, নম্রতা, সাত্ত্বিকতা, ব্রহ্মচর্য্য প্রভৃতি বিষয়ে উপদেশ দিব এবং কংগ্রেসের নেতৃত্ব করিব; এবং আপনি দিল্লীতে এরোপ্লেন বিভাগের কর্ত্তৃত্ব করুন কিংবা কোন্ কোন্ পশু কোরবানি করা উচিত তদ্বিষয়ে উপদেশ প্রদান করুন," তাহা হইলে কি মহাত্মাজী রাজী হইবেন, না রাজী হওয়া তাঁহার পক্ষে বিন্দুমাত্রও কর্ত্তব্য হইবে?

ভয়ে কিছু ছাড়িয়া দেওয়া উচিত নয়; শক্তিমান্ ও সাহসী ব্যক্তিই ত্যাগ করিতে অধিকারী। মহাত্মাজী ইহা বলিয়াছেন, এবং ইহা সত্য কথা। তিনি ইহা বলিয়া হিন্দুদিগকে প্রকারান্তরে সাহসী ও শক্তিমান্ বলিয়াছেন।

টাকাকড়ি পদমর্য্যাদা ত্যাগ করা চলে, কিন্তু মানুষের ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগত জীবনের নিয়ামক নীতি (প্রিন্সিপল্) আত্মসমর্পণের ও ত্যাগের জিনিষ নয়। নিজ নিজ যোগ্যতা অনুযায়ী কাজ করা মানুষের ব্যক্তিগত জীবন যাপনের একটি নীতি। যোগ্যতম লোকদের দ্বারা দেশের ও জাতির কাজ নির্ব্বাহিত হওয়া উচিত, ইহা মানুষের সমষ্টিগত জীবনের নিয়ামক অপর একটি নীতি। এই উভয় নীতির ক্ষেত্রে আত্মসমর্পণের কথা উঠিতে পারে না। তাহা তুলিলে অন্যায় হয়।

যাহা অন্যায় ও অনিষ্টকর তাহাতে রাজী হইয়া রফা করিলে স্থায়ী শান্তির আশা কম। ব্যক্তিগত বা সাম্প্রদায়িক অন্যায় দাবি ও অযথা সুবিধাভোগ মা'নিয়া লওয়া ভ্রান্ত নীতি। ইহাতে কেবল খাঁই বাড়িতে থাকে। রবীন্দ্রনাথ এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন। লক্ষ্ণৌ চুক্তির সহিত মিঃ জিন্নার চৌদ্দ দফা দাবি ও সর্ মুহম্মদ ইক্‌বালের বক্তৃতা প্রভৃতির তুলনা করিলে দেখা যাইবে, সাম্প্রদায়িকতাগ্রস্ত মুসলমানদের খাঁই বাড়িয়াই চলিয়াছে। স্বাজাতিক মুসলমানদের কথা স্বতন্ত্র; তাঁহাদের মত মহাত্মাজীর আত্মসমর্পণ নীতি বিবৃত হইবার পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছিল।

মহাত্মাজীর যে ইংরেজী বাক্যগুলি উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহাতে তিনি মাইনরিটিদের অর্থাৎ সংখ্যান্যূন লোক-সমষ্টিসমূহের নিকট আত্মসমর্পণ করিতে বলিয়াছেন। বহুবচন প্রয়োগ করিয়া থাকিলেও কার্য্যতঃ তিনি অবশ্য মুসলমানদের উদ্দেশেই এই কথাটি ব্যবহার করিয়াছেন। কিন্তু মুসলমানরা ছাড়া অন্যান্য মাইনরিটিও আছে। সকল মাইনরিটির নিকট আত্মসমর্পণ কিরূপে সুসাধ্য? হিন্দু নামক একটি মুরগী কত জনের সেবায় লাগিতে পারে? ধরুন, আমরা না হয় সব মাইনরিটির নিকটেই আত্মবলি দিলাম। কিন্তু যজ্ঞের ভাগ লইয়া ভিন্ন ভিন্ন মাইনরিটি-দেবতাদের মধ্যে ঝগড়া বাধিতে পারে না কি? অবশ্য, সব মাইনরিটি মুসলমানদের মত

প্রবল বা মুসলমান ও শিখদের মত উচ্চকণ্ঠ, ন্যায়শাস্ত্রের সহিত যুধ্যমান এবং আত্মপ্রতিষ্ঠাপরায়ণ নহে, এই যা রক্ষা। কিন্তু মুসলমান ও শিখদের অবলম্বিত পন্থা লাভজনক দেখিলে অন্যান্য লোকসমষ্টি যে সেই পথের পথিক হইবে না, তাহা কে বলিতে পারে?

এ বিষয়ে সাধারণভাবে আমাদের বক্তব্য সংক্ষেপে কিঞ্চিৎ বলিলাম।-এখন বাংলা দেশে আত্মসমর্পণ নীতির প্রয়োগ হইতে পারে কি-না, বিবেচ্য।

এখানে মুসলমানরা সংখ্যায় অধিকতম। সুতরাং গান্ধীজীর উপদেশ হিতকর হইলে মুসলমান বাঙালীদিগকে তাহার অনুসরণ করিতে বলা উচিত ছিল। যাহা হউক, সে কথা ছাড়িয়া দিলাম।

বঙ্গের সমষ্টিগত জীবনের সকল বিভাগে অল্প যাহা কিছু উন্নতি হইয়াছে, তাহার অধিকাংশ হিন্দুদের চেষ্টায় হইয়াছে। সরকারী বেতনভোগী কর্ম্মচারীদের মধ্যে হিন্দুদের শতকরা যত জন খুব দক্ষ বিবেচিত হইয়াছেন, মুসলমানদের শতকরা তত জন খুব দক্ষ বিবেচিত হন নাই, আমাদের ধারণা এইরূপ। ইহার উত্তরে মুসলমানেরা বলিবেন, তাঁহারা যথেষ্ট-সংখ্যক চাকরি ও যথেষ্ট সুযোগ না পাওয়ায় এরূপ হইয়াছে। প্রত্যুত্তরে অবশ্য বলা যায়, যে, তাহার জন্যও তাঁহারাই দায়ী, কারণ তাঁহারা শিক্ষার সুযোগ যথোচিত গ্রহণ করেন নাই। কিন্তু বৈতনিক কাজের কথা ছাড়িয়াই দিলাম। দেশের হিতের জন্য নিজের শক্তি সামর্থ্য, সময় ও অর্থ ব্যয় করিয়া অবৈতনিক কাজ হিন্দুরা যত করিয়াছেন ও করিতে অভ্যস্ত, মুসলমানেরা তত নহেন। এরূপ কাজ হইতে উপকার মুসলমানরাও পাইয়াছেন।

এ অবস্থায়, "দেশহিতকর্ম্মের ক্ষেত্র মুসলমানরা যতটা ইচ্ছা অধিকার করুন, বাকী হিন্দুরা করিবে," বলিলে কেহ কি মনে করেন দেশহিত অন্ততঃ অতীত ও বর্ত্তমানের সমানও হইবে? আমরা তাহা মনে করি না।

বঙ্গে শিক্ষায় মুসলমানেরা হিন্দুদের চেয়ে অনগ্রসর। সুতরাং অনেক রকম কাজের জন্য হিন্দুর চেয়ে মুসলমানের যোগ্যতা কম। কোন কোন রকম কাজের জন্য যথেষ্টসংখ্যক যোগ্য মুসলমান আপাততঃ পাওয়াই যাইবে না। অবশ্য কোন কোন বিষয়ে যোগ্যতম মুসলমানও আছেন। কিন্তু সমষ্টিগতভাবে মোটের উপর একথা বলা সত্য, যে, বঙ্গে মহাত্মাজীর আত্মসমর্পণ নীতির মানে হইবে, অপেক্ষাকৃত অযোগ্যতরকে অপেক্ষাকৃত যোগ্যতরের কর্ম্মভার অর্পণ। তাহা সুফলপ্রদ হইতে পারে না।

বড়াই করিবার জন্য কিংবা মুসলমানদিগকে কষ্ট দিবার জন্য এসব কথা বলিতেছি না; হিন্দু বাঙালীদের কৃতিত্বও তাঁহাদের সংখ্যার তুলনায় বিশেষ কিছু নয়। আমরা কেবল ইহাই বলিতে চাই, যে, কেবলমাত্র বা প্রধানতঃ মুসলমানদের দ্বারা এখন দেশের বৈতনিক ও অবৈতনিক নানাবিধ কাজ যথাযোগ্যরূপে সম্পাদিত হইবে না।

—

কুণ্ডা শিল্পবিদ্যালয়

এই বিদ্যালয়টি ১৯১৯ সালে ত্রিপুরা জেলার কুণ্ডা-গ্রামে পরলোকগত ডাঃ শশীভূষণ দত্ত কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়। উহা তাঁহার সুযোগ্য পুত্র শ্রীযুক্ত সত্যভূষণ দত্তের তত্ত্বাবধানে বিশিষ্ট কমিটি দ্বারা পরিচালিত হইতেছে। ইহাতে বাঁশের নানা রকম জিনিষ তৈরি হয় এবং প্রস্তুত করিতে শিখান হয়। ইহার পাটের কাজের বিভাগে পাটের সুতাকাটা, বয়ন করা ও রং করা শিক্ষার্থী-দের কাছে বেতন না লইয়া শিখান হয়। পাটের গালিচা, আসন, সতরঞ্চী, বিছানা-ঢাকা, বৈঠকখানার উপযুক্ত ফরাস ইত্যাদি তৈরি হয়। এই বিদ্যালয়ের অনেক জিনিষ আমরা দেখিয়াছি ও ব্যবহার করিয়াছি। জিনিষগুলি সস্তা অথচ ব্যবহারযোগ্য। কলিকাতায় এগুলির বিক্রীর ভার কোন দোকান লইলে ভাল হয়।

শতাধিক কপালী নারী বিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধানে পাটের সুতা কাটিয়া থাকেন।

—

কলিকাতার ক্লেদ-নিষ্কাশন সমস্যা

প্রত্যেক শহরেরই জল-সরবরাহ ও ক্লেদ-নিষ্কাশন দুটি প্রধান সমস্যা। কলিকাতার পক্ষে দ্বিতীয়টি ক্রমেই বিষম হইয়া উঠিতেছে। নগরবাসিগণ সকলেই জানেন যে, এই নগরীর ক্লেদ অর্থাৎ নর্দ্দমার ও পায়খানার ময়লা নিষ্কাশনের জন্য নগরের ক্লেদ-নালীর (ড্রেনের) যে ব্যবস্থা আছে, তাহা যথেষ্ট নহে। আয়তন ও লোক-সংখ্যা বৃদ্ধি এবং প্রাচীন ক্লেদ-নালীর ক্ষয়প্রাপ্তি, এই তিন প্রধান কারণে এই ব্যাপারের নূতন ব্যবস্থা অতি সত্বর প্রয়োজনীয়।

আবার ক্লেদনালীর বিস্তার ও সুবিন্যাসও যথেষ্ট নহে। এই বিরাট নগরীর ক্লেদ শহর হইতে দূরে কোন নদীতে ফেলিতে হয়, যাহাতে ইহা নগরীর নিকটে সঞ্চিত হইয়া স্বাস্থ্যহানির কারণ হইয়া না দাঁড়ায়। কলিকাতার ক্লেদের পরিমাণ দৈনিক প্রায় আড়াই কোটি ঘনফুট। সুতরাং অল্প কিছুদিন ইহা জমিয়া যাইলে কলিকাতার দুই পাশে মহা নরককুণ্ড উৎপন্ন হইতে পারে।

এখন যে ব্যবস্থা চলিতেছে, তাহাতে এই ক্লেদরাশি

নালী হইতে খালে পড়ে এবং খাল হইতে বিদ্যাধরী নদীতে পড়িয়া প্রবাহের সহিত সমুদ্রে চলিয়া যায়। কিন্তু এই ব্যবস্থা আর বেশী দিন চলিতে পারে না; কেন-না বিদ্যাধরী মজিয়া যাইতেছে এবং সেই কারণে ইহার প্রবাহ ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইতেছে। অতি শীঘ্রই প্রবাহ বন্ধ হইয়া নগরীর ক্লেদ-নিষ্কাশনের পথ বন্ধ হইয়া যাইতে পারে। ফলে কলিকাতার দক্ষিণ-পশ্চিম সীমানায় ক্লেদের প্রকাণ্ড একটি হ্রদের সৃষ্টি এবং সঙ্গে সঙ্গে বিষম মহামারীর প্রকোপের আশঙ্কা আছে।

১৯০৪ সালে বাংলা প্রাদেশিক গবর্মেণ্ট প্রথম এই বিষয়ে আশঙ্কা প্রকাশ করেন। ১৯১৩ সালে আরও বিশেষ ভাবে এই ভয়ের কথা গবর্মেণ্ট জানান, এবং ইহার প্রতিকারের জন্য ঐ বৎসরই প্রথম "বিদ্যাধরী কমিটি" বসে। তাহার পর ১৯১৬।১৯১৯ পর্য্যন্ত বিদ্যাধরীতে নানাস্থানের সঞ্চিত জল আনিয়া ফেলিয়া তাহার প্রবাহ বৃদ্ধি এবং পলিমাটি ধুইয়া ফেলার নিষ্ফল চেষ্টা হয়। ১৯২২ সালে অবস্থা সঙ্গীন বুঝিয়া কৃত্রিম উপায়ে বিদ্যাধরীর নদীগর্ভ ধুইবার জন্য জলসঞ্চয়ের ব্যবস্থা এবং "ড্রেজার" দ্বারা নদীগর্ভ কাটিয়া গভীর করার প্রস্তাব হয়। ১৯২৩-২৪ সালে নদীগর্ভ সাড়ে দশ লক্ষ টাকা খরচে কাটান হয় কিন্তু পলিমাটি পুনর্ব্বার জমিতে থাকে, অর্থাৎ প্রবাহের জোর বাড়ে নাই।

এদিকে নগরীর ভিতরেও ক্লেদ-নিষ্কাশনের অবস্থা খারাপ হয়, সুতরাং ১৯২৫-২৬ সালে ভিতরের ব্যবস্থার জন্য ১ কোটি ৭১ লক্ষ টাকা ব্যয়ের একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। পরের বৎসর বিদ্যাধরী হঠাৎ দ্রুত পলিমাটি জমিয়া মজিয়া যাইবার উপক্রম দেখায়। কলিকাতা করপোরেশন ইহার প্রতিকার করিবার চেষ্টায় গবর্মেণ্টকে প্রশ্ন করেন যে, তাঁহারা এ বিষয়ে কি করিতে চাহেন। ১৯২৮ সালে গবর্মেণ্ট জানান যে তাঁহাদের পক্ষে বিদ্যাধরী সংস্কার নিষ্প্রয়োজন, কিন্তু কলিকাতা করপোরেশন যদি তাহা করিতে চাহেন, তবে গবর্মেণ্ট কিছু সুবিধা করিয়া দিতে পারেন।

১৯২৯ সালে গবর্মেণ্ট করপোরেশনকে এক চিঠিতে জানান যে, কলিকাতার ক্লেদ-নিষ্কাশন সমস্যার বিশেষ সমাধানের উপর এই রাজধানীর স্বাস্থ্যরক্ষা সম্পূর্ণ নির্ভর করে; সেই কারণে গবর্মেণ্ট অত্যন্ত ব্যস্ত। ইহার পর ব্যবস্থা সম্বন্ধে গবর্মেণ্ট ও করপোরেশনে মতদ্বৈধ হওয়ায় শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ দে-কে এই বিশেষ কার্য্যে অনুসন্ধাণ ও ব্যবস্থা করার জন্য করপোরেশন নিযুক্ত করেন।

তাহার পর ১৯৩০ সালের মে মাসে শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ দে এই বিষয়ে—অর্থাৎ আভ্যন্তরীণ ক্লেদ-নিষ্কাশন ও তাহার দূর প্রক্ষেপ সম্বন্ধে—একটি সম্পূর্ণ প্রস্তাব দেন যাহা ঐ বৎসর জুলাই মাসে করপোরেশন গ্রহণ করেন। তাহার পর বাংলার স্বাস্থ্য-বিভাগের মন্ত্রীর সহিত পরামর্শ এবং উক্ত প্রস্তাবদ্বয় গবর্মেণ্টের অনুমোদনের জন্য পেশ করা গত সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যেই হইয়া যায়।

তাহার পর ব্যাপার ক্রমেই গুরু হইতে গুরুতর হইয়া দাঁড়াইতেছে। বিদ্যাধরীর প্রবাহ প্রায় লোপ পাইয়াছে, কিন্তু এখনও গবর্মেণ্ট উক্ত প্রস্তাবদ্বয় বিশেষজ্ঞ দ্বারা পরীক্ষা পর্য্যন্ত করান নাই।

আমরা জানি না. ডক্টর দে'র প্রস্তাব এই বিষম সমস্যার যথার্থ সমাধান করিবে কি না। কিন্তু আমরা বুঝি যে, ইহার অতি সত্বর পরীক্ষা কলিকাতা নগরীর প্রাণরক্ষার জন্য প্রয়োজন। যদি ইহা উপযুক্ত হয়, তবে গবর্মেণ্টের উচিত উহার অনুমোদন করিয়া দ্রুত কাজ করিবার পথ ছাড়িয়া দেওয়া; যদি না হয়, অন্য বিধান করিতে করপোরেশনকে বলা বা পরামর্শ দেওয়া। স্বাস্থ্য-বিভাগের মন্ত্রী মহাশয় এ বিষয়ে কি করিতেছেন?

—

প্রবেশিকায় সংস্কৃত ইচ্ছাধীন

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষার জন্য সংস্কৃত শেখা ছাত্রছাত্রীদের ইচ্ছাধীন করিবার চেষ্টা হইতেছে। আমরা ইহার সম্পূর্ণ বিরোধী। আষাঢ়ের প্রবাসীতে এই বিষয়ের আলোচনা করা হইবে।

বিজ্ঞপ্তি

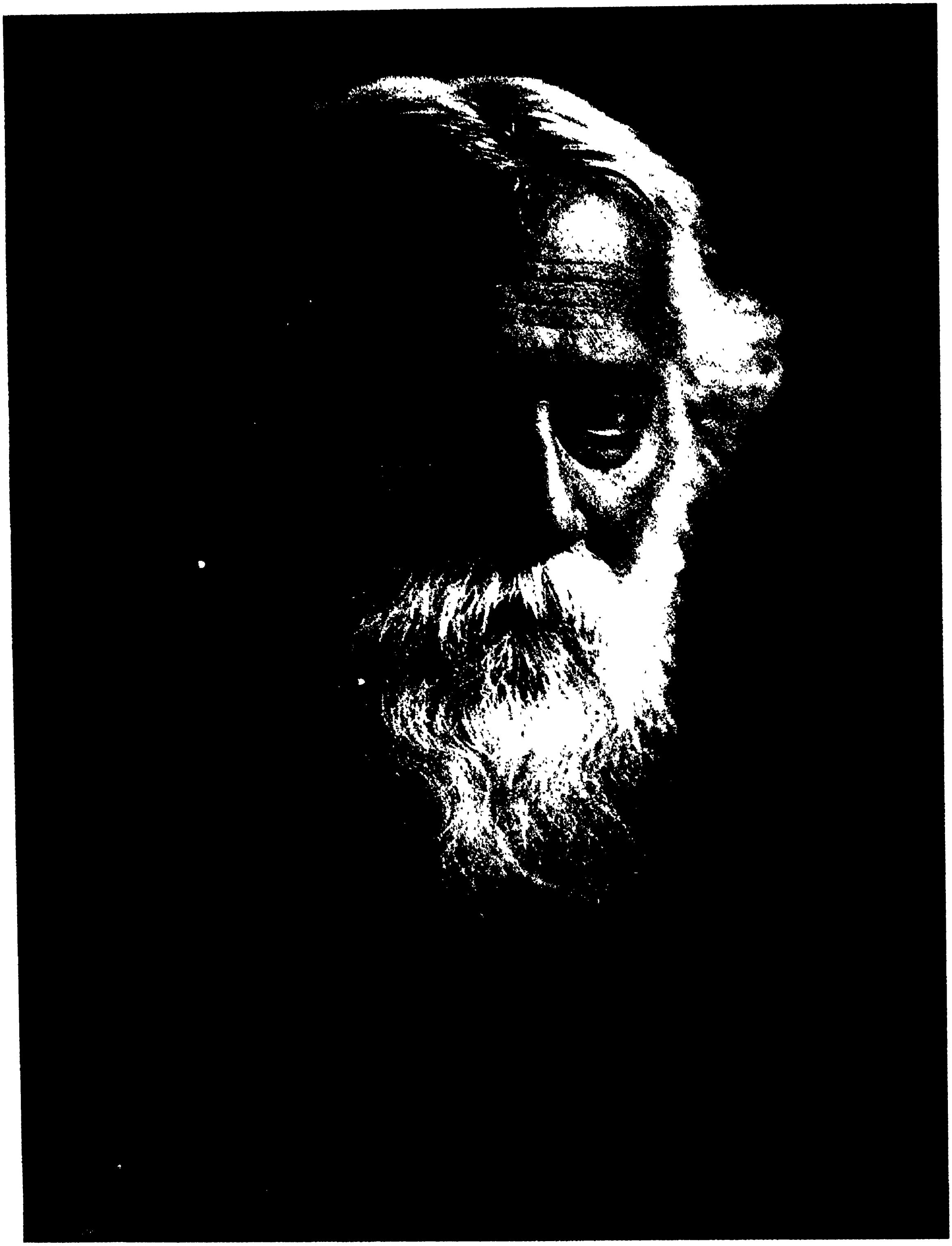
প্রবাসীতে সুদীর্ঘ গল্প প্রকাশ করার পক্ষে বাধা আছে। প্রত্যেক গল্পে চারি হাজারের বেশী শব্দ না থাকা বাঞ্ছনীয়। তাহা অপেক্ষা কম হইলেও ক্ষতি নাই, বরং ভালই।

অতঃপর প্রবাসীতে প্রকাশিত মৌলিক ছোটগল্পের লেখকগণ পাঁচ অথবা তদপেক্ষা কম পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ গল্পের জন্য পৃষ্ঠা-প্রতি তিন টাকা হিসাবে, এবং দীর্ঘতর গল্পের জন্য পৃষ্ঠা-প্রতি দুই টাকা হিসাবে ষোল টাকা পর্য্যন্ত দক্ষিণা পাইবেন।

আষাঢ়ে

পরশুরামের গল্প

মহেশের মহাযাত্রা



ইয়েঘি আর্ট ষ্টুডিও (টোকিও)
কর্তৃক গৃহীত আলোকচিত্র

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শ্রীরবীন্দ্র-জয়ন্তী

(কবিবরের ৭০ বৎসর পূর্ণ-হওয়া উপলক্ষে)

এই উৎসব ২৫শে বৈশাখ প্রাতঃকালে শান্তিনিকেতনের আম্রকুঞ্জে অনুষ্ঠিত হয়। সকলে সমবেত হইলে রবীন্দ্রনাথ নির্দ্দিষ্ট আসনে উপবিষ্ট হইবার পর শ্রীযুক্ত পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রী স্বরচিত নিম্নমুদ্রিত কবিতা পাঠ করেন।

জ্যোতির্জিত্বরমুৎস্বজ্জগদিদং কর্ম্মণ্যভিপ্রেরয়ঞ্চ
জাড্যং জর্জ্জরয়ংস্তমাংসি তিরয়ন্ সর্ব্বং সমুদ্ভাসয়ন্।
পাপ্মানং বিনিপাতয়ন্ প্রতিপদং ভদ্রং সমুদ্ভাবয়ন্
ভূয়াদভ্যুদয়ো রবেরবিরতং বিশ্বস্য ভব্যং বহন্॥
ভেদো যস্য ন বস্তুতোঽস্তি ভুবনে প্রাচী প্রতীচীতি বা
মিত্রত্বং প্রকটীকৃতং চ সততং যেনাত্মনঃ কর্ম্মণা।
বিশ্বং যস্য পদং প্রসিদ্ধমনিশং সত্যে চ যস্য স্থিতি—
র্ভূয়াৎ তস্য জয়ো রবেরবিরতং তেনাস্তু তৃপ্তং জগৎ॥

অতঃপর কবির রচিত 'তুমি আমাদের পিতা" গানটি গীত হয়। তাহার পর কবি-আবাহন প্রভৃতি পরে পরে মুদ্রিত অনুষ্ঠানগুলি হয়। গানগুলি সমস্তই কবির রচিত। মন্ত্রগুলি শ্রীযুক্ত পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রী কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত ও অনুবাদিত। সেগুলির সানুবাদ আবৃত্তি তিনিই করেন। কতকগুলি মন্ত্রের উচ্চারণ আশ্রমের হিন্দীশিক্ষক এবং কয়েকটি ছাত্রছাত্রীও করিয়াছিলেন।

চীনদেশের চারিজন ভদ্রলোক ও একটি মহিলা তাঁহার জন্য উপহার আনিয়াছিলেন। তন্মধ্যে কবি যিনি তিনি স্বরচিত চৈনিক কবিতা সুর করিয়া পড়িয়া রবীন্দ্রনাথকে উপহার দেন। যিনি চিত্রকর তিনি একটি উৎকৃষ্ট চিত্র উপহার দেন।

বৃক্ষরোপণ ও প্রপা উৎসর্গের পর কবি যাহা বলেন, তাহা মুদ্রিত হইল। বক্তৃতান্তে তিনি তাহারই প্রপূর্ত্তি-স্বরূপ তাঁহার তিনটি কবিতা পড়েন। প্রথমটি "কবি-পরিচিতি" নামক সদ্যপ্রকাশিত পুস্তকে ছাপা হইয়াছে। অন্য দুটি হস্তলিখিত খাতা হইতে পঠিত হয়। সর্ব্বশেষে শ্রীযুক্ত পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রী এই আশীর্ব্বাদ পাঠ করেন:—

এষ ত্বাং সবিতা ধিনোতু ভগবান্ যজ্জ্যোতিরাদীপ্যতে
ত্বাং পাত্বাশ্রমদেবতা ভগবতী নিত্যং প্রসন্নাশয়া।
জীব ত্বং শরদাং শতং স্ফুটতরং বিশ্বস্য পশ্যন্নিবং
তৃপ্যত্বেতদনারতং চ ভুবনং শান্তিং পরামাগতম্॥

মন্ত্র-সংগ্রহ *

তুমি আমাদের পিতা
তোমায় পিতা ব'লে যেন জানি,
তোমায় নত হ'য়ে যেন মানি,
তুমি কোরো না কোরো না রোষ।
হে পিতা হে দেব দূর ক'রে দাও
যত পাপ যত দোষ—
যাহা ভালো তাই দাও আমাদের
যাহাতে তোমার তোষ॥
তোমা হ'তে সব সুখ হে পিতা
তোমা হ'তে সব ভালো
তোমাতেই সব সুখ হে পিতা
তোমাতেই সব ভালো।
তুমিই ভালো হে তুমিই ভালো
সকল ভালোর সার—
তোমারে নমস্কার হে পিতা
তোমারে নমস্কার॥

কবি-আবাহন

পুনরেহি বাচস্পতে দেবেন মনসা সহ
দীপ্যমান দিব্য মন লইয়া, হে বাণীর অধিপতি,
আবার আমাদের মধ্যে এসো।

* মন্ত্রগুলি সবই অথর্ব-বেদ হইতে সংগৃহীত।

বিশ্বা রূপাণি জনয়ন্ যুবা কবিঃ

হে নিত্য নবীন কবি, বিশ্বরূপ রচনা করিতে করিতে তুমি এসো।

সীদতা বহিরুরু বঃ সদস্কৃতম্

তোমার জন্য প্রশস্ত উপবেশন-স্থান রচিত হইয়াছে, এই আসনে উপবেশন কর।

ইমা ব্রহ্ম ব্রহ্মবাহঃ ক্রিয়ন্ত আ বর্হিঃ সীদ

হে মন্ত্রবাহ, এই সব স্তবমন্ত্র এখন উচ্চারিত হইবে, আসনে উপবেশন কর।

স্যোনং মে সীদ

আমাদের জন্য সুখে আসীন হও।

আ নো যজ্ঞং ভারতী তূয়মেতু

এই উৎসব ভূমিতে ভারতী ত্বরায় আগমন করুন।

আ চ বহ মিত্রমহশ্‌ চিকিত্বান

ত্বং দূতঃ কবিরসি প্রচেতাঃ

সকল মিত্রের অপেক্ষা তুমি মিত্র, তুমি কবি, তুমি প্রচেতা, তুমি বিশ্বচিত্তের দূত। সকলকে এখানে আবহন কর।

পশ্যদ্ অক্ষণ্বান্ ন বিচেতদ্ অন্ধঃ

যাহার চক্ষু আছে সে-ই এই সত্য দেখিতে পায়। যে অন্ধ সে ইহা চিনিতেই পারে না।

অচিকিত্বাং শ্চিকিতুষশ্চিদ্ অত্র

কবীন্ পৃচ্ছামি বিদ্বনো ন বিদ্বান

বুঝি না বলিয়াই, যাঁহারা বোঝেন সেই কবিদের করি এখানে জিজ্ঞাসা; জানি না বলিয়াই, জানেন যে সব কবি তাঁহাদের করি জিজ্ঞাসা।

বাচস্পতে ঋতবঃ পঞ্চ যে নৌ

বৈশ্বকর্ম্মণাঃ পরি যে সংবভূবুঃ

যস্তে অপ্‌সু মহিমা যো বনেষু

য ওষধীষু পশুষপ্‌স্বন্তঃ

তাভির্নো এহি দ্রবিণোদা অজস্রঃ-

যতো ভয়ম্ অভয়ং তন্নো অস্ত

হে বাণীর পতি, আমাদের জন্য যে পঞ্চ ঋতু বিশ্বকর্ম্মা হইতে ঘিরিয়া ঘিরিয়া আসিতেছে—যে মহিমা তোমার জলে, যে মহিমা তোমার অরণ্যে, যে মহিমা ওষধীতে পশুতে ও জলের গভীর অন্তরে, হে অজস্র-ঐশ্বর্য্যদাতা, সকল ঋতুর সেই সব ঐশ্বর্য্য ও চরাচরের সেই মহিমা লইয়া এসো, যেখান হইতে ভয় সেখানেই আমাদের অভয় হউক।

বাচস্পতে পৃথিবী নঃ স্যোনা

ইহৈব প্রাণঃ সখ্যে নো অস্ত

হে বাণীর পতি, পৃথিবী আমাদের আনন্দময় হউক, এই পৃথিবীতেই নিখিল প্রাণ আমাদের সঙ্গে প্রেমে যোগযুক্ত হউক।

হে চির নূতন আজি এ দিনের
প্রথম গানে
জীবন আমার উঠুক বিকাশি'
তোমার পানে।
তোমার বাণীতে সীমাহীন আশা
চির দিবসের প্রাণময়ী ভাষা
ক্ষয়হীন ধন ভরি দেয় মন
তোমার হাতের দানে!
এ শুভ লগনে জাগুক গগনে
অমৃত বায়ু
আনুক জীবনে নব জনমের
অমল আয়ু।
জীর্ণ যা-কিছু যাহা-কিছু ক্ষীণ
নবীনের মাঝে হোক্ তা বিলীন,
ধুয়ে যাক্ যত পুরাণো মলিন
নব আলোকের স্নানে।

অর্ঘ্যদান

নবো নবো ভবসি জায়মানো-

হ্নাংকেতুরুষসামেষ্যগ্রম্

নব নব দিনে জন্মিয়া তুমি নিত্য নবীন, দিনের পর দিনের তুমিই প্রকাশক, উষার অগ্রে অগ্রে তুমি কর যাত্রা।

যৎ প্রাঙ্ প্রত্যঙ্ স্বধয়া যাসি শীভম্
যদেকো বিশ্বং পরি ভূম জায়সে

সহজ আনন্দে আপন ছন্দে কি পূর্ব্বে কি পশ্চিমে চলিয়াছে তোমার যাত্রা; একাই তুমি সকল বিশ্ব ব্যাপিয়া কর জন্মলাভ।

শিবাস্ত একা অশিবাস্ত একাঃ
সর্ব্বা বিভর্ষি সুমনস্যমানঃ

কত কত লোক, কত বা তাহাদের বাণী তোমার অনুকূল, কত কত তোমার প্রতিকূল; সবই তুমি আনন্দে কল্যাণ-মনে কর বহন।

অমুত্র সন্নিহ বেত্থেতঃ সংস্তানি পশ্যসি

এখানে থাকিয়া তুমি ওখানকার জান মরম, ওখানে থাকিয়া তুমি এখানকার রহস্য পাও দেখিতে।

ন ত্বদন্যঃ কবিতরো ন মেধয়া ধীরতরো স্বধাবন্
ত্বং তা বিশ্বা ভুবনানি বেত্থ
সখা নো অসি পরমং চ বন্ধুঃ

ধ্যানবলে তোমা অপেক্ষা অধিক কবি কেহ নাই, হে আত্ম-লীলাময়, জ্ঞানেও তোমা অপেক্ষা জ্ঞানী কেহ নাই। বিশ্ব ভুবন সবই তুমি জান। তুমি আমাদের সখা, তুমি আমাদের পরম বন্ধু।

কবীয়মানঃ ক ইহ প্র বোচদ্
দেবং মনঃ কুতো অধি প্রজাতম্

'কবিয়ানা'-মাত্র করেন যাঁহারা কেমন করিয়া তাঁহারা এই সব রহস্য প্রকাশ করিবেন? কোথা হইতে সেই দিব্য মানস জন্ম-লাভ করে?

ত্রীণি ছন্দাংসি কবয়ো বি যেতিরে
পুরুরূপং দর্শতং বিশ্বচক্ষণম্
আপো বাতা ওষধয়স্
তান্যেকস্মিন্ ভুবন আর্পিতানি

কবিগণ তিনটি ছন্দের সাধনা করিয়া গিয়াছেন; বিচিত্র-রূপ, দর্শনীয় রূপ ও বিশ্বলোচন (বিশ্ব-দ্রষ্টা) সেই ছন্দ, তাহাই জল বায়ু ও ওষধি, এক ভুবনেই ছন্দের এই ত্রিবেণী স্থাপিত।

কালো অশ্বো বহতি সপ্তরশ্মিঃ
সহস্রাক্ষো অজরো ভূরিরেতাঃ
তমা রোহন্তি কবয়ো বিপশ্চিতস্
তস্য চক্রা ভুবনানি বিশ্বা॥

সহস্রাক্ষ জরারহিত, বহু-প্রাণ-বীজ-যুক্ত সপ্তরশ্মি কাল-অশ্ব সদাই বহিয়া চলিয়াছে; মনীষী কবিরাই তাহাতে আরোহণ করেন; বিশ্ব ভুবন তাঁহার চক্র।

অর্ঘ্য-উপায়ন

আমার মুক্তি আলোয় আলোয়
এই আকাশে
আমার মুক্তি ধূলায় ধূলায়
ঘাসে ঘাসে।
দেহমনের সুদূর পারে
হারিয়ে ফেলি আপনারে
গানের সুরে আমার মুক্তি
ঊর্দ্ধে ভাসে।
আমার মুক্তি সর্ব্বজনের মনের মাঝে
দুঃখ বিপদ তুচ্ছ-করা কঠিন কাজে
বিশ্বধাতার যজ্ঞশালা
আত্মহোমের বহ্নিজ্বালা
জীবন যেন দিই আহুতি
মুক্তি আশে।

কবি-বাচন

সমবেত জনগণের প্রতি—
ইদং জনাসো বিদথ মহদ্ব্রহ্ম বদিষ্যতি
ন তৎ পৃথিব্যাং নো দিবি যেন প্রাণন্তি বীরুধঃ

হে জনগণ শ্রবণ কর, এই কবি গভীর মন্ত্র প্রকাশ করিয়া কহিবেন। না এই বাহ্য পৃথিবীতে না দ্যুলোকে আছে সেই প্রাণ-রস, যাহার বলে তরুলতা সব নিত্য নব প্রাণে প্রাণবান।

তস্যা রূপেণেমে বৃক্ষা হরিতা হরিতস্রজঃ

তাঁহার নিত্য নিত্য নবীন জীবন্ত রূপেই এই সকল বৃক্ষ সদাই জীবন্ত হরিৎ শোভায় শোভিত ও হরিৎ-পল্লবমালায় ভূষিত।

অপূর্বেণেষিতা বাচস্তা বদন্তি যথাযথম্

অপূর্ব্বের দ্বারা প্রেরিত যে সকল বাক্য তাহারাই এই রহস্যকে যথাযথ ব্যক্ত করে।

দেবস্য পশ্য কাব্যং ন মমার ন জীর্য্যতি

চাহিয়া দেখ সেই দিব্য কাব্য; না আছে তাহাতে জরা, না আছে তাহার মৃত্যু।

সনাতনমেনম্ আহুরুতাদ্য স্যাৎ পুনর্ণবঃ

ইহাকেই বলা হয় সনাতন, অথচ ইহাই নিত্য নবীন; অদ্য ইহাই নব জীবনে হউক জীবন্ত।

কবির প্রতি—

উত্থাপয় সীদতো বুধ্ন এনান্

অদ্ভিরাত্মানম্ অভি সং স্পৃশন্তাম্

এই সকল জন যাহারা তলায় পড়িয়া আছে তাহাদিগকে তোমার সেই প্রাণমন্ত্রে উঠাইয়া তোল। ইহারা প্রাণরসে আপনাদিগকে অভিষিক্ত করুক।

অচ্যুতচ্যুৎ সমদো গমিষ্ঠো

ভূম্যাঃ পৃষ্ঠে বদ রোচমানঃ

নিশ্চলকে তুমি সচল কর, বিপ্লবের মধ্যে তুমি সদাই ঝাঁপাইয়া পড়। দীপ্যমান হইয়া এই ভূমির পৃষ্ঠে বল তোমার বাণী।

সকলকে তোমার এই বাণী শোনাও—

জ্যায়স্বন্তশ্চিত্তিনো মা বি যৌষ্ঠ

সংরাধয়ন্তঃ সধুরাশ্চরন্তঃ

পরস্পরে শ্রদ্ধাবান্ হও, চিত্তবান্ হও, চলিতে চলিতে পরস্পরে বিযুক্ত হইও না, পরস্পরে সমান সিদ্ধিযুক্ত হও, সাধনার ভার যুক্তভাবে সবাই বহন কর।

সকলকে শুনাইয়া বল তোমার মহামন্ত্র—

সমানী প্রপা সহ বোঽন্নভাগঃ

সায়ংপ্রাতঃ সৌমনসো বো অস্তু

একই প্রপায় সমানভাবে তোমাদের তৃষ্ণা পরিতৃপ্ত হউক, সবার সঙ্গে সবার সমান অন্নভাগ হউক। সকাল সন্ধ্যা সকল সময় তোমাদের সৌহৃদ্য ও প্রীতির যোগ হউক।

সংজ্ঞানং নঃ স্বেভিঃ সংজ্ঞানম্ অরণেভিঃ

এই প্রীতিযোগ সকল আপন জনের সঙ্গে হউক; সকল পরজনেরও সঙ্গে হউক।

সংজ্ঞানামহৈ মনসা সং চিকিত্বা

মা যুষ্মহি মনসা দৈব্যেন

সবার সঙ্গে যেন মনে মনে যুক্ত হই, জ্ঞানে জ্ঞানে যুক্ত হই, দৈব্য মনের সহিত যেন বিযুক্ত না হই।

সং শ্রুতেন গমেমহি মা শ্রুতেন বি রাধিষি

শ্রুত এই গভীর মন্ত্রে যেন আমরা যোগযুক্ত সঙ্গত হই; ইহার দ্বারা যেন বিযুক্ত, পরস্পরের বিরুদ্ধ না হই।

পশ্চাৎপুরস্তাদধরাদ উতোত্তরাৎ

কবিঃ কাব্যেন পরিপাহি

সখা সখায়ম্ অজরো জরিম্ণে

মর্ত্তাঁ অমর্ত্যাস্ত্বং নঃ

পশ্চাতে সম্মুখে, নীচে উপরে, হে কবি তোমার কাব্যের দ্বারা আমাদিগকে রক্ষা কর। বন্ধু যেমন বন্ধুকে রক্ষা করে তেমনই হে জরারহিত, জরাজীর্ণ-আমাদিগকে —হে অমৃত, ম্রিয়মাণ-আমাদিগকে রক্ষা কর।

উদাতে নম উদায়তে নম উদিতায় নমঃ

বিরাজে নমঃ স্বরাজে নমঃ সম্রাজে নমঃ

উদিত-হইবে-যে-তুমি তোমাকে নমস্কার, উদিত-হইতেছ-যে-তুমি তোমাকে নমস্কার, উদিত-হইয়াছ-যে-তুমি তোমাকে নমস্কার।

বিবিধরূপে বিরাজিত তোমাকে নমস্কার, স্বাধীন-প্রকাশ স্বরাট তোমাকে নমস্কার, সম্যক স্বপ্রকাশে বিরাজিত সম্রাট তোমাকে নমস্কার।

যা পেয়েছি প্রথম দিনে
সেই যেন পাই শেষে।
দু'হাত দিয়ে বিশ্বেরে ছুঁই
শিশুর মতন হেসে।
যাবার বেলা সহজেরে
যাই যেন মোর প্রণাম সেরে
সকল পন্থা যেথায় মেলে
সেথায় দাঁড়াই এসে।

খুঁজতে যারে হয় না কোথাও
চোখ যেন তায় দেখে,
সদাই যে রয় কাছে তারি
পরশ যেন ঠেকে।
নিত্য যাহার থাকি কোলে,
তা'রেই যেন যাই গো বলে
এই জীবনে ধন্য হ'লেম
তোমায় ভালবেসে।

বৃক্ষরোপণ ও প্রপ্রাউৎসর্গ।
কবির অভিভাষণ ও তিনটি কবিতাপাঠ।
'আমাদের শান্তিনিকেতন' গান।

অতঃপর সকলে জলযোগ করিবার পর অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়।

(রবীন্দ্রনাথের অভিভাষণ)

নিজের সত্য পরিচয় পাওয়া সহজ নয়। জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতার ভিতরকার মূল ঐক্যসূত্রটি ধরা পড়তে চায় না। বিধাতা যদি আমার আয়ু দীর্ঘ না করতেন, সত্তর বৎসরে পৌঁছবার অবকাশ না দিতেন, তাহলে নিজের সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা করবার অবকাশ পেতাম না। নানাখানা ক'রে নিজেকে দেখেছি, নানা কাজে প্রবর্ত্তিত করেছি, ক্ষণে ক্ষণে তাতে আপনার অভিজ্ঞান আপনার কাছে বিক্ষিপ্ত হয়েছে। জীবনের এই দীর্ঘ চক্রপথ প্রদক্ষিণ করতে করতে বিদায়কালে আজ সেই চক্রকে সমগ্ররূপে যখন দেখতে পেলাম, তখন একটা কথা বুঝতে পেরেছি যে, একটিমাত্র পরিচয় আমার আছে, সে আর কিছুই নয়, আমি কবি মাত্র। আমার চিত্ত নানাকর্ম্মের উপলক্ষ্যে ক্ষণে ক্ষণে নানাজনের গোচর হয়েচে। তাতে আমার পরিচয়ের সমগ্রতা নেই। আমি তত্ত্বজ্ঞানী শাস্ত্রজ্ঞানী গুরু বা নেতা নই—একদিন আমি বলেছিলাম, 'আমি চাইনে হ'তে নববঙ্গে নবযুগের চালক'। সে কথা সত্য বলেছিলাম। শুভ্র নিরঞ্জনের যাঁরা দূত তাঁরা পৃথিবীর পাপক্ষালন করেন, মানবকে নির্ম্মল নিরাময় কল্যাণব্রতে প্রবর্ত্তিত করেন, তাঁরা আমার পূজ্য, তাঁদের আসনের কাছে আমার আসন পড়েনি। কিন্তু সেই এক শুভ্র জ্যোতি যখন বহুবিচিত্র হন, তখন তিনি নানাবর্ণের আলোকরশ্মিতে আপনাকে বিচ্ছুরিত করেন, বিশ্বকে রঞ্জিত করেন; আমি সেই বিচিত্রের দূত। আমরা নাচি, নাচাই, হাসি, হাসাই, গান করি, ছবি আঁকি, যে আবিঃ বিশ্বপ্রকাশের অহৈতুক আনন্দে অধীর, আমরা তাঁরি দূত। বিচিত্রের লীলাকে অন্তরে গ্রহণ করে' তাকে বাইরে লীলায়িত করা—এই আমার কাজ। মানবকে গম্যস্থানে চালাবার দাবী রাখিনে, পথিকদের চলার সঙ্গে চলার কাজ আমার। পথের দুইধারে যে ছায়া, যে সবুজের ঐশ্বর্য্য, যে ফুল পাতা, যে পাখীর গান, সেই রসের রসদে জোগান দিতেই আমরা আছি। যে-বিচিত্র বহু হয়ে খেলে বেড়ান দিকে দিকে স্বরে গানে নৃত্যে চিত্রে, বর্ণে বর্ণে, রূপে রূপে, সুখদুঃখের আঘাতে-সংঘাতে, ভালোমন্দের দ্বন্দ্বে—তাঁর বিচিত্র রসের বাহনের কাজ আমি গ্রহণ করেছি, তাঁর রঙ্গশালার বিচিত্র রূপকগুলিকে সাজিয়ে তোলবার ভার পড়েছে আমার উপর, এইই আমার একমাত্র পরিচয়। অন্য বিশেষণও লোকে আমাকে দিয়েছেন; কেউ বলেছেন, তত্ত্বজ্ঞানী, কেউ আমাকে ইস্কুল-মাষ্টারের পদে বসিয়েছেন। কিন্তু বাল্যকাল থেকেই কেবল মাত্র খেলার ঝোঁকেই ইস্কুলমাষ্টারকে এড়িয়ে এসেছি—মাষ্টারী পদটাও আমার নয়। বাল্যে নানা সুরের ছিদ্রকরা বাঁশি হাতে যখন পথে বেরলুম তখন ভোরবেলায় অস্পষ্টের মধ্যে স্পষ্ট ফুটে উঠতে চাচ্ছিল, সেইদিনের কথা মনে পড়ে। সেই অন্ধকারের সঙ্গে আলোর প্রথম শুভদৃষ্টি; প্রভাতের বাণীবন্যা সেদিন আমার মনে তার প্রথম বাঁধ ভেঙেছিল। দোল লেগেছিল চিত্তসরোবরে, ভালো করে বুঝি বা না বুঝি, বলতে পারি বা না পারি, সেই বাণীর আঘাতে বাণীই জেগেছে। বিশ্বে বিচিত্রের লীলায় নানা সুরে চঞ্চল হয়ে উঠচে নিখিলের চিত্ত, তারি তরঙ্গে বালকের চিত্ত চঞ্চল হয়েছিল, আজো তার বিরাম নেই। সত্তর বৎসর পূর্ণ হ'ল, আজো এ চপলতার জন্য

বন্ধুরা অনুযোগ করেন, গাম্ভীর্য্যের ত্রুটি ঘটে। কিন্তু বিশ্বকর্ম্মার ফরমাসের যে অন্ত নেই। তিনি যে চপল, তিনি যে বসন্তের অশান্ত সমীরণে অরণ্যে অরণ্যে চির-চঞ্চল। গাম্ভীর্য্যে নিজেকে গড়খাই করে আমি তো দিন খোয়াতে পারিনে। এই সত্তর বৎসর নানা পথ আমি পরীক্ষা করে দেখেছি, আজ আমার আর সংশয় নেই, আমি চঞ্চলের লীলা-সহচর। আমি কি করেছি, কি রেখে যেতে পারব, সেকথা জানিনে। স্থায়িত্বের আবদার করব না; খেলেন তিনি, কিন্তু আসক্তি রাখেন না; যে খেলাঘর নিজে গড়েন, তা আবার নিজেই ঘুচিয়ে দেন। কাল সন্ধ্যাবেলায় এই আম্রকাননে যে আল্পনা দেওয়া হয়েছিল, চঞ্চল তা এক রাত্রের ঝড়ে ধুয়ে মুছে দিয়েছেন, আবার তা নতুন করে আঁকতে হ'ল। তাঁর খেলা-ঘরের যদি কিছু খেলনা জুগিয়ে দিয়ে থাকি, তা মহাকাল সংগ্রহ করে রাখবেন এমন আশা করিনে। ভাঙা খেলনা আবর্জ্জনার স্তূপে যাবে। যতদিন বেঁচে আছি সেই সময়টুকুর মতোই মাটির ভাঁড়ে যদি কিছু আনন্দরস জুগিয়ে থাকি সেই যথেষ্ট। তার পরের দিন রসও ফুরোবে, ভাঁড়ও ভাঙবে, কিন্তু তাই বলে ভোজ ত দেউলে হবে না। সত্তর বৎসর পূর্ণ হবার দিন আজ আমি রসময়ের দোহাই দিয়ে সবাইকে বলি যে, আমি কারু চেয়ে বড় কি ছোট সেই ব্যর্থ বিচারে খেলার রস নষ্ট হয়; পরিমাপকের দল মাপকাঠি নিয়ে কলরব করচে, তাদেরকে ভোলা চাই। লোকালয়ে খ্যাতির যে হরির লুঠ ধূলোয় ধূলোয় লোটায়, তা নিয়ে কাড়াকাড়ি করতে চাইনে। মজুরীর হিসেব নিয়ে চড়া গলায় তর্ক করবার বুদ্ধি যেন আমার না ঘটে।

এই আশ্রমের কর্ম্মের মধ্যেও যেটুকু প্রকাশের দিক্ তাই আমার; এর যে যন্ত্রের দিক যন্ত্রীরা তা চালনা করছেন। মানুষের আত্মপ্রকাশের ইচ্ছাকে আমি রূপ দিতে চেয়েছিলাম। সেই জন্যেই তার রূপ-ভূমিকার উদ্দেশে একটি তপোবন খুঁজেছি। নগরের ইট কাঠের মধ্যে নয়, এই নীলাকাশ উদয়াস্তের প্রাঙ্গণে এই সুকুমার বালক বালিকাদের লীলাসহচর হ'তে চেয়েছিলাম। এই আশ্রমে প্রাণসম্মিলনের যে কল্যাণময় সুন্দর রূপ জেগে উঠছে, সেটিকে প্রকাশ করাই আমার কাজ। এর বাইরের কাজও কিছু প্রবর্ত্তন করেছি, কিন্তু সেখানে আমার চরম স্থান নয়, এর যেখানটিতে রূপ সেখানটিতে আমি। গ্রামের অব্যক্ত বেদনা যেখানে প্রকাশ খুঁজে ব্যাকুল, আমি তার মধ্যে। এখানে আমি শিশুদের যে ক্লাস করেছি সেটা গৌণ—প্রকৃতির লীলাক্ষেত্রে শিশুদের সুকুমার জীবনের এই যে প্রথম আরম্ভরূপ, এদের জ্ঞানের অধ্যবসায়ের আদি সূচনায় যে ঊষারুণদীপ্তি, যে নবোদ্গত উদ্যমের অঙ্কুর, তাকেই অবারিত করবার জন্য আমার প্রয়াস, না হলে আইনকানুন সিলেবাসের জঞ্জাল নিয়ে মরতে হ'ত। এই সব বাইরের কাজ গৌণ, সেজন্য আমার বন্ধুরা আছেন। কিন্তু লীলাময়ের লীলার ছন্দ মিলিয়ে এই শিশুদের নাচিয়ে গাইয়ে, কখনো ছুটি দিয়ে এদের চিত্তকে আনন্দে উদ্বোধিত করার চেষ্টাতেই আমার আনন্দ, আমার সার্থকতা। এর চেয়ে গম্ভীর আমি হ'তে পারব না; শঙ্খঘণ্টা বাজিয়ে যাঁরা আমাকে উচ্চ মঞ্চে বসাতে চান, তাঁদের আমি বলি, আমি নীচেকার স্থান নিয়েই জন্মেছি, প্রবীণের প্রধানের আসন থেকে খেলার ওস্তাদ আমাকে ছুটি দিয়েচেন। এই ধূলোমাটি ঘাসের মধ্যে আমি হৃদয় ঢেলে দিয়ে গেলাম, বনস্পতি ওষধির মধ্যে। যারা মাটির কোলের কাছে আছে, যারা মাটির হাতে মানুষ, যারা মাটিতেই হাঁটতে আরম্ভ ক'রে শেষকালে মাটিতেই বিশ্রাম করে, আমি তাদের সকলের বন্ধু, আমি কবি।

২৫এ বৈশাখ, ১৩৩৮।

শান্তিনিকেতন

[শ্রীপুলিনবিহারী সেন কর্ত্তৃক অনুলিখিত ও কবি কর্ত্তৃক সংশোধিত]

("কবি-পরিচিতি" হইতে)

অর্থ কিছু বুঝি নাই, কুড়ায়ে পেয়েছি কবে জানি
নানা বর্ণে চিত্রকরা বিচিত্রের নর্ম্ম বাঁশিখানি
যাত্রাপথে। সে-প্রত্যুষে প্রদোষের আলো অন্ধকার
প্রথম মিলন সনে লভিল পুলক দোঁহাকার
রক্ত-অবগুণ্ঠনচ্ছায়ায়। মহামৌন পারাবারে
প্রভাতের বাণীবন্যা চঞ্চলি মিলিল শতধারে

তুলিল হিল্লোল দোল। কত যাত্রী গেল কত পথে
দুর্লভ ধনের লাগি অভ্রভেদী দুর্গম পর্ব্বতে
দুস্তর সাগর উত্তরিয়া। শুধু মোর রাত্রি দিন,
শুধু মোর আনমনে পথ-চলা হোল অর্থহীন
গভীরের স্পর্শ চেয়ে ফিরিয়াছি, তার বেশি
হয়নি সঞ্চয় করা, অধরার গেছি পিছু পিছু।
আমি শুধু বাঁশরীতে ভরিয়াছি প্রাণের নিঃশ্বাস,
বিচিত্রের সুরগুলি গ্রন্থিবারে করেছি প্রয়াস
আপন বীণার তন্তুজালে। ফুল ফোটাবার আগে
ফাল্গুনে তরুর মর্ম্মে, বেদনার যে স্পন্দন জাগে
আমন্ত্রণ করেছিনু তা'রে মোর মুগ্ধ রাগিণীতে
উৎকণ্ঠা-কম্পিত মূর্চ্ছনায়। ছিন্নপত্র মোর গীতে
ফেলে গেছে শেষ দীর্ঘশ্বাস। ধরণীর অন্তঃপুরে
রবি রশ্মি নামে যবে, তৃণে তৃণে অঙ্কুরে অঙ্কুরে
যে নিঃশব্দ হুলুধ্বনি দূরে দূরে যায় বিস্তারিয়া
ধূসর যবনি-অন্তরালে, তারে দিনু উৎসারিয়া
এ বাঁশির রন্ধ্রে রন্ধ্রে; যে বিরাট গূঢ় অনুভবে
রজনীর অঙ্গুলিতে অক্ষমালা ফিরিছে নীরবে
আলোকবন্দনা মন্ত্রজপে—আমার বাঁশিরে রাখি
আপন বক্ষের 'পরে, তারে আমি পেয়েছি একাকী
হৃদয় কম্পনে মম; যে বন্দী গোপন গন্ধখানি
কিশোর কোরক মাঝে স্বপ্নস্বর্গে ফিরিছে সন্ধানি
পূজার নৈবেদ্য ডালি, সংশয়িত তাহার বেদনা
সংগ্রহ করেছে গানে আমার বাঁশরী কলস্বনা।

চেতনা-সিন্ধুর ক্ষুব্ধ তরঙ্গের মৃদঙ্গ-গর্জ্জনে
নটরাজ করে নৃত্য, উন্মুখর অট্টহাস্য সনে
অতল অশ্রুর লীলা মিলে গিয়ে কল রল-রোলে
উঠিতেছে রণি রণি, ছায়া রৌদ্র সে দোলায় দোলে
অশ্রান্ত উল্লোলে। আমি তীরে বসি তারি রুদ্রতালে
গান বেঁধে লভিয়াছি আপন ছন্দের অন্তরালে
অনন্তের আনন্দ বেদনা। নিখিলের অনুভূতি
সঙ্গীত সাধনা মাঝে রচিয়াছে অসংখ্য আকুতি।

এই গীতি-পথপ্রান্তে, হে মানব, তোমার মন্দিরে
দিনান্তে এসেছি আমি নিশীথের নৈঃশব্দ্যের তীরে
আরতির সান্ধ্যক্ষণে—একের চরণে রাখিলাম
বিচিত্রের নর্ম্ম বাঁশি,—এই মোর রহিল প্রণাম ॥

রবি-প্রদক্ষিণ পথে জন্মদিবসের আবর্ত্তন
হ'য়ে আসে সমাপন।
আমার রুদ্রের
মালা রুদ্রাক্ষের
অন্তিম গ্রন্থিতে এসে ঠেকে
রৌদ্রদগ্ধ দিনগুলি গেঁথে একে একে।
হে তপস্বী, প্রসারিত করো তব পাণি
লহ মালাখানি।

উগ্র তব তপের আসন,
সেথায় তোমারে সম্ভাষণ
ক'রেছিনু দিনে দিনে কঠিন স্তবনে
কখনো মধ্যাহ্নরৌদ্রে কখনো বা ঝঞ্ঝার পবনে।
এবার তপস্যা হ'তে নেমে এসো তুমি
দেখতে দাও যেথা তব বনভূমি
ছায়াঘন, যেথা তব আকাশ অরুণ
আষাঢ়ের আভাসে করুণ।
অপরাহ্ন যেথা তার ক্লান্ত অবকাশে
মেলে শূন্য আকাশে আকাশে
বিচিত্র বর্ণের মায়া; যেথা সন্ধ্যাতারা
বাক্যহারা
বাণীবহ্নি তারায় তারায় জ্বালি'
নিভৃতে সাজায় ব'সে অনন্তের আরতির ডালি
শ্যামল দাক্ষিণ্যে ভরা
সহজ আতিথ্যে বসুন্ধরা
যেথা স্নিগ্ধ শান্তিময়;
যেথা তার অফুরাণ মাধুর্য্য সঞ্চয়
প্রাণে প্রাণে
বিচিত্র বিলাস আনে রূপে রসে গানে।

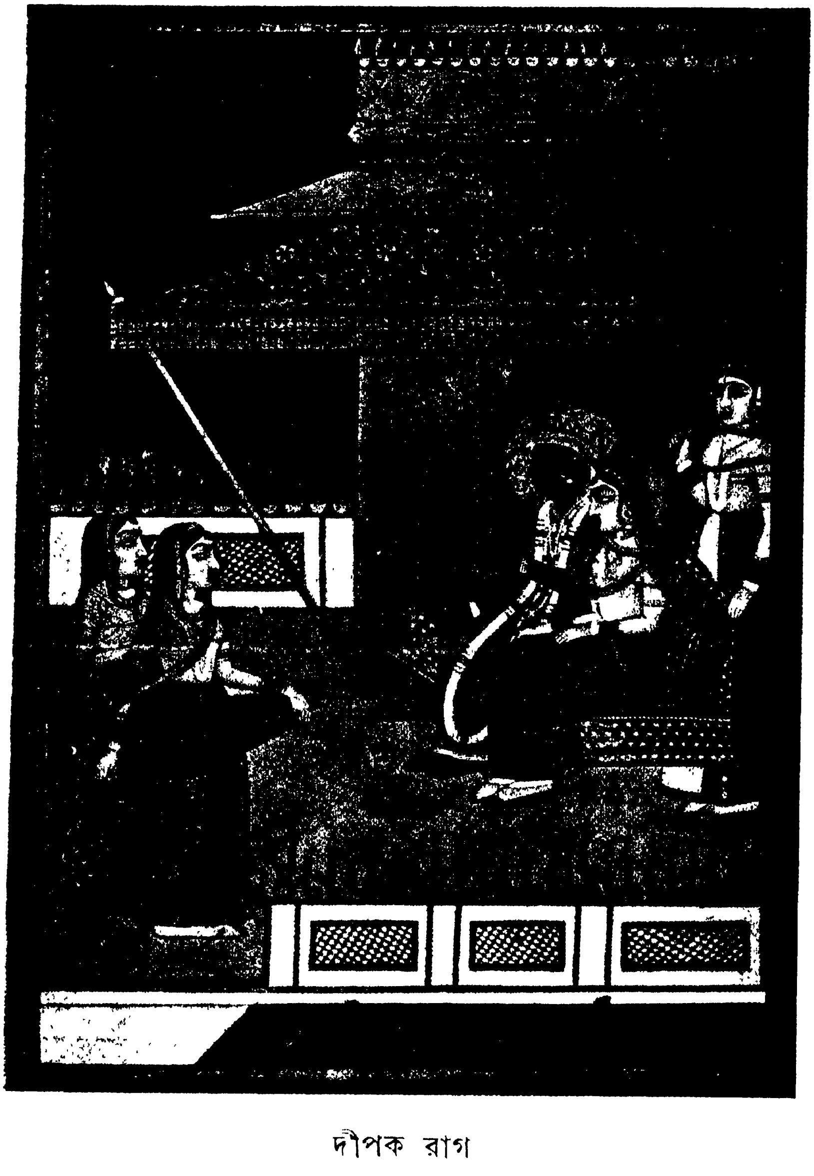
বিশ্বের প্রাঙ্গণে আজি ছুটি হোক্ মোর,
ছিন্ন ক'রে দাও কর্ম্মডোর।

আমি আজ ফিরিব কুড়ায়ে
উচ্ছৃঙ্খল সমীরণ যে কুসুম এনেছে উড়ায়ে
সহজে ধূলায়,
পাখীর কুলায়
দিনে দিনে ভরি' উঠে যে সহজ গানে,
আলোকের ছোঁওয়া লেগে, সবুজের তম্বুরার তানে।
এই বিশ্ব-সত্তার পরশ,
স্থলে জলে তলে তলে এই গূঢ় প্রাণের হরষ
তুলি' লব অন্তরে অন্তরে,
সর্ব্বদেহে, রক্তস্রোতে, চোখের দৃষ্টিতে, কণ্ঠস্বরে,
জাগরণে, ধেয়ানে তন্দ্রায়,
বিরাম সমুদ্রতটে জীবনের পরমসন্ধ্যায়।
এ জন্মের গোধূলির ধূসর প্রহরে
বিশ্বরস-সরোবরে
শেষবার ভরিব হৃদয় মন দেহ
দূর করি' সব কর্ম্ম, সব তর্ক, সকল সন্দেহ,
সব খ্যাতি, সকল দুরাশা,
বলে যাব,"আমি যাই, রেখে যাই, মোর ভালোবাসা॥"

২৩-এ বৈশাখ,
১৩৩৮

শুধায়ো না মোরে তুমি মুক্তি কোথা, মুক্তি কারে কই,
আমি তো সাধক নই, আমি গুরু নই।
আমি কবি সদা আছি
ধরণীর অতি কাছাকাছি,
এ পারের খেয়ার ঘাটায়,
সম্মুখে প্রাণের নদী জোয়ার ভাঁটায়
নিত্য বহে নিয়ে ছায়া আলো,
মন্দ ভালো,
ভেসে-যাওয়া কত কি যে, ভুলে যাওয়া কত রাশি রাশি
লাভ ক্ষতি কান্না হাসি,—
এক তীর গড়ি' তোলে অন্য তীরে ভাঙিয়া ভাঙিয়া;
সেই প্রবাহের 'পরে উষা ওঠে রাঙিয়া রাঙিয়া,
পড়ে চন্দ্রালোকরেখা জননীর অঙ্গুলির মতো;
কৃষ্ণরাতে তারা যত
জপ করে ধ্যানমন্ত্র; অস্তসূর্য্য রক্তিম উত্তরী
বুলাইয়া চ'লে যায়; সে-তরঙ্গে মাধবীমঞ্জরী
ভাসায় মাধুরীডালি,
পাখী তার গান দেয় ঢালি'।
সে তরঙ্গ-নৃত্যছন্দে বিচিত্র ভঙ্গীতে
চিত্ত যবে নৃত্য করে আপন সঙ্গীতে
এ বিশ্বপ্রবাহে,
সে ছন্দে বন্ধন মোর মুক্তি মোর তাহে।
রাখিতে চাহি না কিছু, আঁকড়িয়া চাহি না রহিতে,
ভাসিয়া চলিতে চাই সবার সহিতে
বিরহ মিলন গ্রন্থি খুলিয়া খুলিয়া,
তরণীর পালখানি পলাতকা বাতাসে তুলিয়া।
হে মহাপথিক,
অবারিত তব দশদিক।
তোমার মন্দির নাই, নাই স্বর্গধাম,
নাইকো চরম পরিণাম;
তীর্থ তব পদে পদে;
চলিয়া তোমার সাথে মুক্তি পাই চলার সম্পদে,
চঞ্চলের নৃত্যে আর চঞ্চলের গানে,
চঞ্চলের সর্ব্বভোলা দানে—
আঁধারে আলোকে,
সৃজনের পর্ব্বে পর্ব্বে, প্রলয়ের পলকে পলকে।

২৪-এ বৈশাখ
১৩৩৮



দীপক রাগ

প্রাচীন চিত্র

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

প্রবাসী

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"

"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৩১শ ভাগ ১ম খণ্ড | আষাঢ়, ১৩৩৮ | ৩য় সংখ্যা

"বৈশাখেতে তপ্ত বাতাস মাতে"

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বৈশাখেতে তপ্ত বাতাস মাতে
কুয়োর ধারে কলাগাছের দীর্ণ পাতে পাতে ;
গ্রামের পথে ক্ষণে ক্ষণে ধূলা উড়ায়,
ডাক দিয়ে যায় পথের ধারে কৃষ্ণচূড়ায় ;
আশু ক্লান্ত বেলগুলি সব শীর্ণ হয়ে আসে,
ম্লান গন্ধ কুড়িয়ে তারি ছড়িয়ে বেড়ায় সুদীর্ঘ নিঃশ্বাসে ;
শুক্‌নো টগর উড়িয়ে ফেলে,
চিকণ কচি অশথ পাতায় যা-খুশি-তাই খেলে ;
বাঁশের গাছে কী নিয়ে তার কাড়াকাড়ি,
খেজুর গাছের শাখায় শাখায় নাড়ানাড়ি ;
বটের শাখে ঘন সবুজ ছায়া-নিবিড় পাখীর পাড়ায়
হুহু ক'রে ধেয়ে এসে ঘুঘু দুটির নিদ্রা ছাড়ায় ;
রুক্ষ কঠিন রক্ত মাটি ঢেউ খেলিয়ে মিলিয়ে গেছে দূরে
তার মাঝে ওর থেকে থেকে নাচন ঘুরে ঘুরে ;
ক্ষেপে উঠে হঠাৎ ছোটে তালের বনে উত্তরে দিক্‌সীমায়
অস্ফুট ঐ বাষ্প-নীলিমায় ;

টেলিগ্রাফের তারে তারে
সুর সেধে নেয় পরিহাসের ঝঙ্কারে ঝঙ্কারে ;
এম্‌নি ক'রে বেলা বহে যায়,
এই হাওয়াতে চুপ ক'রে রই একলা জানালায় ।
ঐ যে ছাতিম গাছের মতোই আছি
সহজ প্রাণের আবেগ নিয়ে মাটির কাছাকাছি,
ওর যেমন এই পাতার কাঁপন, যেমন শ্যামলতা,
তেমনি জাগে ছন্দে আমার আজকে দিনের সামান্য এই কথা ।
না থাক্ খ্যাতি, না থাক্ কীর্ত্তিভার,
পুঞ্জীভূত অনেক বোঝা অনেক দুরাশার,—
আজ আমি যে বেঁচেছিলেম সবার মাঝে মিলে সবার প্রাণে
সেই বারতা রইল আমার গানে ॥

১৯ বৈশাখ
১৩৩৮

"বালক বয়স ছিল যখন"

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বালক বয়স ছিল যখন, ছাদের কোণের ঘরে
নিঝুম দুই পহরে
দ্বারের 'পরে হেলিয়ে মাথা,
মেঝে মাদুর পাতা,
একা একা কাটত রোদের বেলা,—
না মেনেছি পড়ার শাসন, না ক'রেছি খেলা ।
দূর আকাশে ডেকে যেত চিল,
সিসু গাছের ডালপালা সব বাতাসে ঝিল্‌মিল্‌ ।
তপ্ত তৃষায় চঞ্চু করি ফাঁক
প্রাচীর 'পরে ক্ষণে ক্ষণে ব'স্‌ত এসে কাক ।
চড়ুই পাখীর আনাগোনা মুখর কলভাষা,
ঘরের মধ্যে কড়ির কোণে ছিল তাদের বাসা ।
ফেরিওয়ালার ডাক শোনা যায় গলির ওপার থেকে—
দূরের ছাদে ঘুড়ি ওড়ায় সে কে !
কখন মাঝে মাঝে
ঘড়িওয়ালা কোন্ বাড়িতে ঘণ্টাধ্বনি বাজে ।

সাম্‌নে বিরাট অজানিত, সাম্‌নে দৃষ্টি-পেরিয়ে যাওয়া দূর
বাজাত কোন্ ঘর-ভোলানো সুর।
কিসের পরিচয়ের লাগি
আকাশ-পাওয়া উদাসী মন সদাই ছিল জাগি।
অকারণের ভালো লাগা
অকারণের ব্যথায় মিলে গাঁথত স্বপন নাইকো গোড়া আগা।
সাথীহীনের সাথী
মনে হ'ত দেখ্‌তে পেতেম দিগন্তে নীল আসন ছিল পাতি।
সত্তরে আজ পা দিয়েচি আয়ুশেষের কূলে
অন্তরে আজ জান্‌লা দিলেম খুলে।
তেমনি আবার বালকদিনের মত
চোখ মেলে মোর সুদূর পানে বিনাকাজে প্রহর হ'ল গত।
প্রখর তাপের কাল,
ঝর্‌ঝরিয়ে কেঁপে ওঠে শিরীষগাছের ডাল;
কুয়োর ধারে তেঁতুলতলায় ঢুকে
পাড়ার কুকুর ঘুমিয়ে পড়ে ভিজে মাটির স্নিগ্ধ পরশ সুখে;
গাড়ির গরু ক্ষণকালের মুক্তি পেয়ে ক্লান্ত আছে শুয়ে
জামের ছায়ায় তৃণবিহীন ভুঁয়ে।
কাঁকর পথের পারে
শুক্‌নো পাতার দৈন্য জমে গন্ধরাজের সারে।
চেয়ে আছি দু চোখ দিয়ে সব কিছুরে ছুঁয়ে,
ভাবনা আমার সবার মাঝে থুয়ে।
বালক যেমন নগ্ন আবরণ,
তেমনি আমার মন
ঐ কাননের সবুজ ছায়ায় এই আকাশের নীলে
বিনা বাধায় এক হয়ে যায় মিলে।
সকল জানার মাঝে
চিরকালের না-জানা কার শঙ্খধ্বনি বাজে।
এই ধরণীর সকল সীমায় সীমাহারার গোপন আনাগোনা
সেই আমারে ক'রেছে আন্‌-মনা॥

২১ বৈশাখ
১৩৩৮

মহেশের মহাযাত্রা

পরশুরাম

কেদার চাটুয্যে মহাশয় বলিলেন—আজকাল তোমরা সামান্য একটু বিদ্যে শিখে নাস্তিক হয়েচ, কিছুই মানতে চাও না। যখন আরও একটু শিখবে তখন বুঝবে যে আত্মা আছেন। ভূত, পেত্নী—এঁরাও আছেন। বেম্মদত্যি, কন্ধকাটা — এঁয়ারাও আছেন।

বংশলোচনবাবুর বৈঠকখানায় গল্প চলিতেছিল। তাঁর শালা নগেন বলিল—আচ্ছা বিনোদ-দা, আপনি ভূত বিশ্বাস করেন?

বিনোদবাবু বলিলেন—যখন প্রত্যক্ষ দেখব তখন বিশ্বাস ক'রব। তার আগে হাঁ-না কিছুই বল্‌তে পারি না।

চাটুয্যে বলিলেন—এই বুদ্ধি নিয়ে তুমি ওকালতি কর! বলি, তোমার ঠাকুদ্দাকে প্রত্যক্ষ করেচ? ম্যাক্‌ডোনাল্ড্‌, চার্চিল আর বাল্‌ডুইনকে দেখেচ? তবে তাদের কথা নিয়ে অত মাতামাতি কর কেন?

—আচ্ছা আচ্ছা, হার মানচি চাটুয্যে মশায়।

—প্রত্যক্ষ করা যার-তার কম্ম নয়। শ্রীভগবান্ কখনও কখনও তাঁর ভক্তদের বলেন—দিব্যং দদামি তে চক্ষুঃ। সেই দিব্যদৃষ্টি পেলে তবে সব দেখতে পাওয়া যায়।

নগেন জিজ্ঞাসা করিল—আপনি পেয়েচেন চাটুয্যে মশায়?

—জ্যাঠামি করিস নি। এই কলকাতা শহরের রাস্তায় যারা চলা-ফেরা করে—কেউ কেরানী, কেউ দোকানী, কেউ মজুর, কেউ আর কিছু—তোমরা ভাবো সবাই বুঝি মানুষ। তা মোটেই নয়। ওদের ভেতর সর্ব্বদাই দু-দশটা ভূত পাওয়া যায়। তবে চিনতে পারা দুষ্কর। এই রকম ভূতের পাল্লায় পড়েছিলেন মহেশ মিত্তির।

—কে তিনি?

—জানো না? আমাদের মজিলপুরের চরণ ঘোষের পিসে। এককালে তিনি কিছুই মানতেন না, কিন্তু শেষ দশায় তাঁকেও স্বীকার ক'রতে হয়েছিল।

সকলে একবাক্যে কহিলেন—কি হয়েছিল বলুন-না চাটুয্যে মশায়!

চাটুয্যে মশায় হুঁকাটি হাতে তুলিয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন।—

প্রায় ত্রিশ বৎসর আগেকার কথা। মহেশ মিত্তির তখন শ্যামবাজারের শিবচন্দ্র কলেজে প্রফেসারি করতেন। অঙ্কের প্রফেসার, অসাধারণ বিদ্যে, কিন্তু প্রচণ্ড নাস্তিক। ভগবান, আত্মা, পরলোক, কিছুই মানতেন না। এমন কি, স্ত্রী মারা গেলে আর বিবাহ পর্য্যন্ত করেন নি। খাদ্যাখাদ্যের বিচার ছিল না, বলতেন—শুয়োর না খেলে হিঁদুর উন্নতির আশা নেই, ওটা বাদ দিয়ে কোনও জাতি বড় হ'তে পারে নি। মহেশের চাল-চলনের জন্যে আত্মীয়-স্বজন তাঁকে একঘরে করেছিল। কিন্তু যতই অনাচার করুন, তাঁর স্বভাবটা ছিল অকপট, পারতপক্ষে মিথ্যে কথা কইতেন না। নিজের কোনো ভুল বুঝতে পারলে তখনই স্বীকার করতেন। তাঁর পরমবন্ধু ছিলেন সাতকড়ি কুণ্ডু, তিনিও ঐ কলেজের প্রফেসার, ফিলসফি পড়াতেন। কিন্তু বন্ধু হ'লে কি হয়, দুজনে হরদম ঝগড়া হ'ত, কারণ, সাতকড়ি আর কিছু মানুন বা না-মানুন, ভূত মানতেন। তা ছাড়া, মহেশবাবু অত্যন্ত গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ—কেউ তাঁকে হাসতে দেখে নি, আর সাতকড়ি ছিলেন আমুদে লোক, কথায় কথায় ঠাট্টা ক'রে বন্ধুকে উদ্‌ব্যস্ত করতেন। তবু মোটের ওপর তাঁদের পরস্পরের প্রতি খুব একটা টান ছিল।

তখন রাজনীতিচর্চ্চার এত রেওয়াজ ছিল না, আর ভদ্রলোকের ছেলের অন্নচিন্তাও এমন চমৎকারা হয় নি, দু-একটা পাস ক'রতে পারলে যেমন-তেমন চাকরি জুটে যেত। লোকের তাই উঁচুদরের বিষয় আলোচনা করবার সময় ছিল। ছোকরারা চিন্তা ক'রত—বউ ভাল

বাসে কি বাসে না। যাদের সে-সন্দেহ মিটে গেছে, তারা মাথা ঘামাত—ভগবান্ আছেন কি নেই। একদিন কলেজে কাজ ছিল না, অধ্যাপকরা সকলে মিলে গল্প করছিলেন। গল্পের আরম্ভ যা নিয়েই হোক, মহেশ আর সাতকড়ি কথাটা টেনে নিয়ে ভূতে আর ভগবানে হাজির করতেন, কারণ, এই নিয়ে তর্ক করাই তাঁদের অভ্যাস। এদিনও তাই হয়েছিল।

আলোচনা স্বরু হয় ঝি-চাকরের মাইনে নিয়ে। কলেজের পণ্ডিত দীনবন্ধু বাচস্পতি মশায় দুঃখু করছিলেন—ছোটলোকের লোভ এত বেড়ে গেছে যে আর পেরে ওঠা যায় না। মহেশবাবু বল্লেন—লোভ সকলেরই বেড়েচে, আর বাড়াই উচিত, নইলে মনুষ্যত্বের বিকাশ হবে কিসে। পণ্ডিত মশায় উত্তর দিলেন—লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু। মহেশবাবু প্রত্যুত্তর দিলেন—লোভ ত্যাগ করলেও মৃত্যুকে ঠেকানো যায় না।

তর্কটা তেমন জুতসই হচ্চে না দেখে সাতকড়িবাবু একটু উসকে দেবার জন্যে বল্লেন—আমাদের মতন লোকের লোভ হওয়া উচিত মৃত্যুর পর। মাইনে ত পাই মোটে পৌনে দু-শ, তাতে ইহলোকে ক-টা সখ-ই বা মিটবে। তাই ত পরকালের আশায় ব'সে আছি, আত্মাটা যদি স্বর্গে গিয়ে একটু ফুর্ত্তি করতে পারে।

দীনবন্ধু পণ্ডিত বল্লেন—কে বল্লে তুমি স্বর্গে যাবে? আর, স্বর্গের তুমি জানই বা কি?

—সমস্তই জানি পণ্ডিত মশায়। খাসা জায়গা, না গরম না ঠাণ্ডা। মন্দাকিনী কুলুকুলু বইচে, তার ধারে ধারে পারিজাতের ঝোপ। সবুজ মাঠের মধ্যিখানে কল্পতরু গাছে আঙুর বেদানা আম রসগোল্লা কাট্‌লেট ফ'লে আছে, ছেঁড় আর খাও। জন-কতক ছোকরা-দেবদূত গোলাপী উড়ুনি গায়ে দিয়ে সুধার বোতল সাজিয়ে ব'সে রয়েচে, চাইলেই ফটাফট্ খুলে দেবে। ঐ হোথা কুঞ্জবনে ঝাঁকে ঝাঁকে অপ্সরা ঘুরে বেড়াচ্চে, দু-দণ্ড রসালাপ কর, কেউ কিচ্ছু বলবে না। যত খুশী নাচ দেখ, গান শোনো। আর, কালোয়াতি চাও ত নারদ মুনির আস্তানায় যাও।

মহেশবাবু বল্লেন—সমস্ত গাঁজা। পরলোক, আত্মা, ভূত, ভগবান্, কিছুই নেই। ক্ষমতা থাকে প্রমাণ কর।

তর্ক জ'মে উঠ্‌ল। প্রফেসাররা কেউ এক পক্ষে কেউ অপর পক্ষে দাঁড়ালেন। পণ্ডিত মশায় দারুণ অবজ্ঞায় ঠোঁট উল্‌টে ব'সে রইলেন। বৃদ্ধ প্রিন্‌সিপাল রফা ক'রে বল্লেন—ভূতের তেমন দরকার দেখি না, কিন্তু আত্মা আর ভগবান্ বাদ দিলে চলে না। মহেশ মিত্তির আস্তিন গুটিয়ে বল্লেন—কেউ-ই নেই, আমি দশ মিনিটের মধ্যে প্রমাণ ক'রে দিচ্চি। সাতকড়ি কুণ্ডু মহা উৎসাহে বন্ধুর পিঠ চাপ্‌ড়ে বল্লেন--লেগে যাও!

তারপর মহেশবাবু ফুলস্কাপ কাগজ আর পেনসিল নিয়ে একটি বিরাট্ অঙ্ক ক'ষতে লেগে গেলেন। ঈশ্বর, আত্মা আর ভূত—এই তিন রাশি নিয়ে অতি জটিল অঙ্ক, তার গতি বোঝে কার সাধ্য! বিস্তর যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ ক'রে হাতীর শুঁড়ের মতন বড় বড় চিহ্ন টেনে অবশেষে সমাধান করলেন— ঈশ্বর $=0$, আত্মা $=$ ভূত $=\sqrt{0}$।

বাচস্পতি মশায় বল্লেন—বদ্ধ উন্মাদ!

মহেশবাবু বল্লেন—উন্মাদ বল্লেই হয় না। সাধ্য থাকে ত আমার অঙ্কের ভুল বার করুন।

সাতকড়ি বল্লেন—অঙ্ক-টঙ্ক আমার আসে না। বাচস্পতি মশায় যদি ভগবান্ দেখাবার ভার নেন ত আমি মহেশকে ভূত দেখাতে পারি।

বাচস্পতি বল্লেন—আমার ব'য়ে গেছে।

মহেশবাবু বল্লেন—বেশ ত, সাতকড়ি তুমি ভূতই দেখাও না। একটার প্রমাণ পেলে আর সমস্তই মেনে নিতে রাজী আছি।

সাতকড়িবাবু বল্লেন—এই কথা? আচ্ছা, আসচে হপ্তায় শিবচতুর্দ্দশী পড়চে। সেদিন তুমি আমার সঙ্গে রাত বারোটায় মানিকতলায় নতুন খালের ধারে চল, পষ্টাপষ্টি ভূত দেখিয়ে দেব। কিন্তু যদি কোনো বিপদ ঘটে ত আমাকে দুষতে পাবে না।

—যদি দেখাতে না পার?

—আমার নাক কেটে দিও। আর যদি দেখাতে পারি, ত তোমার নাক কাট্‌ব।

প্রিন্‌সিপাল বল্‌লেন—কাটাকাটির দরকার কি, সত্যের নির্ণয় হ'লেই হ'ল।

শিবচতুর্দ্দশীর রাত্রে মহেশ মিত্তির আর সাতকড়ি কুণ্ডু মানিকতলায় গেলেন। জায়গাটা তখন বড়ই ভীষণ ছিল, রাস্তায় আলো নেই, দু-ধারে বাব্‌লা গাছে আরও অন্ধকার করেচে। সমস্ত নিস্তব্ধ, কেবল মাঝে মাঝে প্যাঁচার ডাক শোনা যাচ্ছে। হোঁচট খেতে খেতে দুজনে নতুন খালের ধারে পৌঁছলেন। বছর-দুই আগে ওখানে প্লেগের হাসপাতাল ছিল, এখনও তার গোটাকতক খুঁটি দাঁড়িয়ে আছে।

মহেশ মিত্তির সাহসী লোক, কিন্তু তাঁরও গা ছম্‌ছম্ ক'রতে লাগ্‌ল। সাতকড়ি সারা রাস্তা কেবল ভূতের কথাই কয়েচেন—তারা দেখতে কেমন, মেজাজ কেমন, কি খায়, কি পরে। দেবতারা হচ্চেন উদারপ্রকৃতি দিলদরিয়া, কেউ তাঁদের না মানলেও বড়-একটা কেয়ার করেন না। কিন্তু অপদেবতারা পদবীতে খাটো ব'লে তাঁদের আত্মসম্মানবোধ বড়ই উগ্র, না মানলে ঘাড় ধ'রে তাঁদের প্রাপ্য মর্য্যাদা আদায় করেন।—এই সব কথা।

হঠাৎ একটা বিকট আওয়াজ শোনা গেল, যেন কোনো অশরীরী বেরাল তার পলাতকা প্রণয়িনীকে আকুল আহ্বান করচে। একটু পরেই মহেশবাবু রোমাঞ্চিত হয়ে দেখলেন—একটা লম্বা রোগা কুচ্‌কুচে কালো মূর্ত্তি দু-হাত তুলে সাম্‌নে দাঁড়িয়ে আছে। তার পিছনে একটু দূরে ঐ রকম আরও দুটো।

সাতকড়িবাবু থরথর ক'রে কাঁপতে কাঁপতে বল্‌লেন—রাম রাম সীতারাম! ও মহেশ, দেখচ কি, তুমিও বল না।

আর একটু হ'লেই মহেশবাবু রাম-নাম উচ্চারণ ক'রে ফেলতেন, কিন্তু তাঁর কনশেন্স্ বাধা দিয়ে বল্‌লে—উঁহু, একটু সবুর কর, যদি ঘাড় মট্‌কাবার লক্ষণ দেখ তখন না-হয় রাম-নাম কোরো।

এঁরা একটা পাকুড় গাছের নীচে ছিলেন। হঠাৎ ওপর থেকে খানিকটা কাদা-গোলা জল মহেশের মাথায় এসে প'ড়ল।

তখন সাম্‌নের সেই কালো মূর্ত্তিটা নাকী সুরে বল্‌লে—মহেশ বাবু, আপনি নাকি ভূত মানেন না?

এ অবস্থায় বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি মাত্রেই ব'লে থাকেন—আজ্ঞে হাঁ, মানি বই কি। কিন্তু মহেশ মিত্তির বেয়াড়া লোক, হঠাৎ তাঁর কেমন একটা খেয়াল হ'ল, ধাঁ ক'রে এগিয়ে গিয়ে ভূতের কাঁধ খাম্‌চে ধ'রে জিজ্ঞাসা করলেন—কোন্ ক্লাস?

ভূত থতমত খেয়ে জবাব দিলে—সেকেণ্ড ইয়ার সার্!

—রোল নম্বর কত?

ভূত করুণ নয়নে সাতকড়ির দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা ক'রলে—বল্‌নি সার্?

সাতকড়ির মুখে রাম রাম ভিন্ন কথা নেই। পিছনের দুটো ভূত অদৃশ্য হয়ে গেল। পাকুড় গাছে যে ছিল, সে টুপ্ ক'রে নেমে এসে পালিয়ে গেল। তখন বেগতিক দেখে সাম্‌নের ভূতটি ঝাঁকুনি দিয়ে মহেশের হাত ছাড়িয়ে চোঁচা দৌড় মারলে।

মহেশ মিত্তির সাতকড়ির পিঠে একটা প্রচণ্ড কিল মেরে বললেন—জোচ্চোর!

সাতকড়িও পাল্টা কিল মেরে বল্‌লেন—আহাম্মক!

নিজের নিজের পিঠে হাত বুলুতে বুলুতে দুই বন্ধু বাড়ি-মুখো হলেন। আসল ভূত যারা আশেপাশে লুকিয়ে ছিল, তারা মনে মনে বল্‌লে—আজি রজনীতে হয় নি সময়।

পরদিন কলেজে হুলস্থূল বেধে গেল। সমস্ত ব্যাপার শুনে প্রিন্‌সিপাল ভয়ঙ্কর রাগ ক'রে বললেন—অত্যন্ত শেমফুল ব্যাপার। দুজন নামজাদা অধ্যাপক একটা তুচ্ছ বিষয় নিয়ে হাতাহাতি! সাতকড়ি তোমার লজ্জা নেই?

সাতকড়িবাবু ঘাড় চুলকে বল্‌লেন—আজ্ঞে আমার উদ্দেশ্যটা ভালই ছিল। মহেশকে রিফর্ম্ করবার জন্যে যদি একটু ইয়ে ক'রেই থাকি, তাতে আর দোষটা কি—হাজার হোক আমার বন্ধু ত?

মহেশবাবু গর্জ্জন ক'রে বললেন— কে তোমার বন্ধু?

প্রিন্‌সিপাল বল্‌লেন—মহেশ তুমি চুপ কর। উদ্দেশ্য যাই হোক, কলেজের ছেলেদের এর ভেতর জড়ানো একবারে অমার্জ্জনীয় অপরাধ। সাতকড়ি তুমি বাড়ি যাও, তোমায় সস্‌পেণ্ড্ করলুম। আর মহেশ, তোমাকেও সাবধান ক'রে দিচ্চি—আমার কলেজে আর ভুতুড়ে তর্ক তুলতে পারবে না।

মহেশবাবু উত্তর দিলেন—সে প্রতিশ্রুতি দেওয়া শক্ত। সকল রকম কুসংস্কার দূর করাই আমার জীবনের ব্রত।

—তবে তোমাকেও সস্‌পেণ্ড্ করলুম।

অন্যান্য অধ্যাপকরা চুপ ক'রে সমস্ত শুনছিলেন। তাঁরা প্রিন্‌সিপালের হুকুম শুনে কোনো প্রতিবাদ করলেন না, কারণ, সকলেই জানতেন যে তাঁদের কর্ত্তার রাগ বেশী দিন থাকে না।

মহেশবাবু তাঁর বাসায় ফিরে এলেন। সাতকড়ির ওপর প্রচণ্ড রাগ—হতভাগা একটা গভীর তত্ত্বের মীমাংসা করতে চায় জুয়োচুরির দ্বারা! সে আবার ফিলসফি পড়ায়! এমন অপ্রত্যাশিত আঘাত মহেশবাবু কখনও পান নি।

মানুষের মন যখন নিদারুণ ধাক্কা খায় তখন সে তার ভাব ব্যক্ত করবার জন্যে উপায় খোঁজে। কেউ কাঁদে, কেউ তর্জ্জন-গর্জ্জন করে, কেউ কবিতা লেখে। একটা কোঁচ-বকের হত্যাকাণ্ড দেখে মহর্ষি বাল্মীকির মনে যে ঘা লেগেছিল, তাই প্রকাশ করবার জন্যে তিনি হঠাৎ দু-লাইন শ্লোক রচনা ক'রে ফেলেন—মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বম্ ইত্যাদি। তারপর সাতকাণ্ড রামায়ণ লিখে তাঁর ভাবের বোঝা নামাতে পেরেছিলেন। আমাদের মহেশ মিত্তির চিরকাল নীরস অঙ্কশাস্ত্রের চর্চ্চা ক'রে এসেচেন, কাব্যের কিছুই জানতেন না। কিন্তু আজ তাঁরও মনে হঠাৎ একটা কবিতার অঙ্কুর গজ্‌গজ্ ক'রতে লাগ্‌ল। তিনি আর বেগ সাম্‌লাতে পারলেন না, কলেজের পোষাক না ছেড়েই বড় একখানা এল্‌জেব্‌রা খুলে তার প্রথম পাতায় লিখে ফেল্‌লেন—

সাতকড়ি কুণ্ডু,
খাই তার মুণ্ডু।

কবিতাটি লিখে বার-বার ডাইনে বাঁয়ে ঘাড় বেঁকিয়ে দেখলেন — হাঁ, উত্তম হয়েচে।

কিন্তু একটা খট্‌কা বাধ্‌ল। কুণ্ডুর সঙ্গে মুণ্ডুর মিল আবহমান কাল থেকে চ'লে আসচে, এতে মহেশের কৃতিত্ব কোথায়? কালিদাসই হোন আর রবি-ঠাকুরই হোন, কুণ্ডুর সঙ্গে মুণ্ডু মেলাতেই হবে—এ হ'ল প্রকৃতির অলঙ্ঘনীয় নিয়ম। মহেশ একটু ভেবে ফের লিখলেন—

কণ্ডু সাতকড়ি,
মুণ্ডু পাত করি।

হাঁ, এইবারে মৌলিক রচনা বলা যেতে পারে। মহেশের মনটা একটু শান্ত হ'ল। কিন্তু কাব্যসরস্বতী যদি একবার কাঁধে ভর করেন তবে সহজে নামতে চান না। মহেশবাবু লিখতে লাগলেন—

ওরে সাতকড়ে,
হবি তুই ম'রে
নরকের পোকা
অতিশয় বোকা।

উঁহু, নরকই নেই তার আবার পোকা। মহেশবাবু স্থির করলেন—কাব্যে কুসংস্কার নাম দিয়ে তিনি শীঘ্রই একটা প্রবন্ধ রচনা করবেন। তারপর তাঁর কবিতার শেষের চার লাইন কেটে দিয়ে ফের লিখলেন—

সাতকড়ি ওরে,
কাত করি' তোরে
পিঠে মারি চড়—

এমন সময় মহেশের চাকরটা এসে বল্‌লে—বাবু, চা হবে কি দিয়ে? দুধ ত ছিঁড়ে গেছে।

মহেশবাবু অন্যমনস্ক হয়ে বল্‌লেন—সেলাই ক'রে নে।

পিটে মারি চড়,
মুখে গুঁজি খড়।
জ্বেলে দেশালাই
আগুন লাগাই।

কিন্তু সাতকড়িকে পুড়িয়ে ফেল্‌লে জগতের কোনো

লাভ হবে না, অনর্থক খানিকটা জান্তব পদার্থ বরবাদ হবে। বরং তার চাইতে—

সাতকড়ি ওরে,
পোড়াব না তোরে।
নিয়ে যাব ধাপা,
দেব মাটি-চাপা।
সারা হয়ে যাবি,
ট্যাঁড়স ফলাবি।

মহেশবাবু আরও অনেক লাইন রচনা করেছিলেন, তা আমার মনে নেই। কবিতা লিখে খানিকটা উচ্ছ্বাস বেরিয়ে যাওয়ায় তাঁর হৃদয়টা বেশ হাল্কা হ'ল, তিনি কাপড়-চোপড় ছেড়ে ইজিচেয়ারে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন।

তিন দিন যেতে না যেতে প্রিন্সিপাল মহেশ আর সাতকড়িকে ডেকে পাঠালেন। তাঁরা আবার নিজের নিজের কাজে বাহাল হলেন, কিন্তু তাঁদের বন্ধুত্ব ভেঙে গেল। সহকর্ম্মীরা মিলনের অনেক চেষ্টা করলেন, কিন্তু কোনো ফল হ'ল না। সাতকড়ি বরং একটু সন্ধির আগ্রহ দেখিয়েছিলেন, কিন্তু মহেশ একেবারে পাথরের মতন শক্ত হয়ে রইলেন।

কিছুদিন পরে মহেশবাবুর খেয়াল হ'ল—প্রেততত্ত্ব সম্বন্ধে একতরফা বিচার করাটা ন্যায়সঙ্গত নয়, এর অনুকূল প্রমাণ কে কি দিয়েচেন তাও জানা উচিত। তিনি দিশী বিলিতী বিস্তর বই সংগ্রহ ক'রে পড়তে লাগলেন, কিন্তু তাতে তাঁর অবিশ্বাস আরও প্রবল হ'ল। প্রত্যক্ষ প্রমাণ কিছুই নেই, কেবল আছে—অমুক ব্যক্তি কি বলেচেন আর কি দেখেচেন। বাঘের অস্তিত্বে মহেশের সন্দেহ নেই, কারণ, জন্তুর বাগানে গেলেই দেখা যায়। ভূত যদি থাকেই, তবে খাঁচায় পুরে দেখা না বাপু। তা নয়, শুধু ধাপ্পাবাজি। প্রেততত্ত্ব চর্চ্চা ক'রে মহেশবাবু বেজায় চ'টে উঠলেন। শেষটায় এমন হ'ল যে, ভূতের গুষ্টিকে গালাগাল না দিয়ে তিনি জলগ্রহণ করতেন না।

প'ড়ে প'ড়ে মহেশের মাথা গরম হয়ে উঠ্‌ল। রাত্রে ঘুম হয় না, কেবল স্বপ্ন দেখেন ভূতে তাঁকে ভেংচাচ্চে। এমন স্বপ্ন দেখেন ব'লে নিজের ওপরেও তাঁর রাগ হ'তে লাগ্‌ল। ডাক্তার বল্‌লে—পড়াশুনো বন্ধ করুন, বিশেষ ক'রে ঐ ভুতুড়ে বইগুলো—যা মানেন না তার চর্চ্চা করেন কেন? কিন্তু ঐ সব বই পড়া মহেশের এখন একটা নেশা হয়ে দাঁড়িয়েচে। পড়লেই রাগ হয়, আর সেই রাগেতেই তাঁর সুখ।

অবশেষে মহেশ মিত্তির কঠিন রোগে শয্যাশায়ী হয়ে পড়লেন। দিন দিন শরীর ক্ষ'য়ে যেতে লাগ্‌ল, কিন্তু রোগটা ঠিক নির্ণয় হ'ল না। সহকর্ম্মীরা প্রায়ই এসে তাঁর খবর নিয়ে যেতেন। সাতকড়িও একদিন এসেছিলেন, কিন্তু মহেশ তাঁর মুখদর্শন করলেন না।

সাত আট মাস কেটে গেল। শীতকাল, রাত দশটা। সাতকড়িবাবু শোবার উদ্যোগ করচেন, এমন সময় মহেশের চাকর এসে খবর দিলে যে তার বাবু ডেকে পাঠিয়েচেন, অবস্থা বড় খারাপ। সাতকড়ি তখনই হাতীবাগানে মহেশের বাসায় ছুটলেন।

মহেশের আর দেরি নেই। বল্‌লেন—সাতকড়ি, তোমায় ক্ষমা করলুম। কিন্তু ভেবো না যে আমার মত কিছুমাত্র বদ্‌লেচে। এই রইল আমার উইল, তোমাকেই অছি নিযুক্ত করেচি। আমার পৈত্রিক দশ হাজার টাকার কাগজ ইউনিভার্সিটিকে দান করেচি, তার সুদ থেকে প্রতিবৎসর একটা পুরস্কার দেওয়া হবে। যে-ছাত্র ভূতের অনস্তিত্ব সম্বন্ধে শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ লিখবে, সে ঐ পুরস্কার পাবে। আর দেখ—খবরদার, শ্রাদ্ধ-টাদ্ধ কোরো না। ফুলের মালা, চন্দন-কাঠ, ঘি, এসব দিও না, একদম বাজে খরচ। তবে হাঁ, দু চার বোতল কেরাসিন ঢালতে পার। দেড় সের গন্ধক আর পাঁচ সের সোরা আনানো আছে, তাও দিতে পার, চটপট্‌ কাজ শেষ হয়ে যাবে। আচ্ছা, চল্‌লুম তাহ'লে।…

রাত প্রায় সাড়ে এগারো। মহেশের আত্মীয়-স্বজন কেউ কলকাতায় নেই, থাকলেও তারা আস্‌ত না। বড়-দিনের বন্ধ, কলেজের সহকর্ম্মীরা প্রায় সকলেই অন্যত্র গেছেন। সাতকড়ি মহা বিপদে পড়লেন। মহেশবাবুর চাকরকে বল্‌লেন পাড়ার দু-চারজনকে ডেকে আনতে।

অনেকক্ষণ পরে দুজন মাতব্বর প্রতিবেশী এলেন। ঘরে ঢুকলেন না, দরজার সামনে দাঁড়িয়ে বল্লেন—চুপ ক'রে ব'সে আছেন যে বড়? সংকারের ব্যবস্থা কি করলেন?

সাতকড়ি বল্লেন—আমি একলা মানুষ, আপনাদের ওপরেই ভরসা।

—ওই বেলেল্লা হতভাগার লাশ আমরা বইব? ইয়াকি পেয়েচেন?—এই কথা ব'লেই তাঁরা স'রে পড়লেন।

সাতকড়ির তখন মনে প'ড়ল, বড় রাস্তার মোড়ে একটা মাটকোঠায় সাইনবোর্ড দেখেচেন—বৈতরণী-সমিতি, ভদ্রমহোদয়গণের দিবারাত্র সস্তায় সংকার। চাকরকে বসিয়ে রেখে তখনই সেই সমিতির খোঁজে গেলেন।

অনেক চেষ্টায় সমিতি থেকে তিন জন লোক যোগাড় হ'ল। পনর টাকা পারিশ্রমিক, আর শীতের ওষুধ বাবদ ন-শিকে। সমস্ত আয়োজন শেষ হ'লে সাতকড়ি আর তাঁর তিন সঙ্গী খাট কাঁধে ক'রে রাত আড়াইটার সময় নিমতলায় রওনা হ'লেন।

অমাবস্যার রাত্রি, তার ওপর আবার কুয়াশা। সাতকড়ির দল কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট দিয়ে চল্লেন। গ্যাসের আলো মিটমিট করচে, পথে জনমানব নেই। কাঁধের বোঝা ক্রমেই ভারী বোধ হ'তে লাগল, সাতকড়ি হাঁপিয়ে পড়লেন। বৈতরণী-সমিতির সর্দ্দার ত্রিলোচন পাকড়াশী বুঝিয়ে দিলেন—এমন হয়েই থাকে, মানুষ ম'রে গেলে তার ওপর জননী বসুন্ধরার টান বাড়ে।

সাতকড়ি একলা নয়, তাঁর সঙ্গীরা সকলেই সেই শীতে গলদ্ঘর্ম্ম হয়ে উঠ্ল। খাট নামিয়ে খানিক জিরিয়ে আবার যাত্রা।

কিন্তু মহেশ মিত্তিরের ভার ক্রমশই বাড়চে, পা আর এগোয় না। পাকড়াশী বল্লেন—ঢের ঢের বয়েচি মশায়, কিন্তু এমন জগদ্দল লাশ কখনও কাঁধে করি নি। দেহটা ত শুকনো, লোহা খেতেন বুঝি? পনর টাকায় হবে না মশায়, আরও গোটা-দশ চাই।

সাতকড়ি তাতেই রাজী, কিন্তু সকলেই এমন কাবু হয়ে পড়েচে যে দু-পা গিয়ে আবার খাট নামাতে হ'ল। সাতকড়ি ফুটপাথে এলিয়ে পড়লেন, বৈতরণীর তিন জন হাঁপাতে হাঁপাতে তামাক টানতে লাগ্ল।

ওঠবার উপক্রম করচেন এমন সময় সাতকড়ির নজরে প'ড়ল—কুয়াশার ভেতর দিয়ে একটা আবছায়া তাঁদের দিকে এগিয়ে আসচে। কাছে এলে দেখলেন—কালো র‍্যাপার মুড়ি দেওয়া একটা লোক। লোকটি বল্লে—এঃ, আপনারা হাঁপিয়ে পড়েচেন দেখচি! বলেন ত আমি কাঁধ দি।

সাতকড়ি ভদ্রতার খাতিরে দু-একবার আপত্তি জানালেন, কিন্তু শেষটায় রাজী হলেন। লোকটি কোন্ জাত তা আর জিজ্ঞাসা করলেন না, কারণ, মহেশ মিত্তির ও-বিষয়ে চিরকাল সমদর্শী—এখন ত কথাই নেই। তা ছাড়া, যে-লোক উপযাচক হয়ে শ্মশানযাত্রার সঙ্গী হয়, সে ত বান্ধব বটেই।

ত্রিলোচন পাকড়াশী বল্লেন—কাঁধ দিতে চাও দাও, কিন্তু বখ্‌রা পাবে না, তা ব'লে রাখচি।

আগন্তুক বল্লে — বখরা চাই না।

এবার সাতকড়িকে কাঁধ দিতে হ'ল না, তাঁর জায়গায় নতুন লোকটি দাঁড়াল। আগের চেয়ে যাত্রাটা একটু দ্রুত হ'ল, কিন্তু কিছুক্ষণ পরে আর পা চলে না, ফের খাট নামিয়ে বিশ্রাম।

পাকড়াশী বল্লেন—বিশ টাকার কাজ নয় বাবু, এ হ'ল মোষের গাড়ির বোঝা। আরও দশ টাকা চাই।

এমন সময় আবার একজন পথিক এসে উপস্থিত—ঠিক প্রথম লোকটির মতন কালো র‍্যাপার গায়ে। এ-ও খাট বইতে প্রস্তুত। সাতকড়ি দ্বিরুক্তি না ক'রে তার সাহায্য নিলেন। এবার পাকড়াশী মশায় রেহাই পেলেন।

খাট চলেচে, আর একটু জোরে। কিন্তু কিছুক্ষণ পরে আবার ক্লান্তি। মহেশের ভার অসহ্য হয়ে উঠচে, তার দেহে কিছু ঢোকে নি ত? খাট নামিয়ে আবার সবাই দম নিতে লাগলেন।

কে বলে শহুরে লোক স্বার্থপর? আবার একজন সহায় এসে হাজির—সেই কালো র‍্যাপার গায়ে। সাতকড়ির ভাববার অবসর নেই, বল্লেন—চল, চল।

আবার যাত্রা, আরও একটু জোরে। তারপর ফের খাট নামাতে হ'ল। এই যে, চতুর্থ বাহক এসে হাজির—সেই কালো র্যাপার। এরা কি মহেশকে বইবার জন্যেই এই তিন পহর রাতে পথে বেরিয়েচে? সাতকড়ির আশ্চর্য্য হবার শক্তি নেই, বল্লেন—ওঠাও খাট, চল জল্‌দি।

চার জন অচেনা বাহকের কাঁধে মহেশের খাট চলেচে, পিছনে সাতকড়ি আর বৈতরণী-সমিতির তিন জন। এইবার গতি বাড়চে, খাট হন্ হন্ ক'রে চলেচে। সাতকড়ি আর তাঁর সঙ্গীদের ছুটতে হ'ল।

আরে অত তাড়াতাড়ি কেন, একটু আস্তে চল। কে-ই বা কথা শোনে! ছুট—ছুট। আরে কোথায় নিয়ে যাচ্ছ, থামো থামো, বীড্‌ন্ ষ্ট্রীট ছাড়িয়ে গেলে যে! লোক-গুলো কি শুনতে পায় না? ওহে পাকড়াশী, থামাও না ওদের—

কোথায় পাকড়াশী? তিনি বিচক্ষণ লোক, ব্যাপারটা বুঝে টাকার মায়া ত্যাগ ক'রে সদলে পালিয়েচেন।

মহেশের খাট তখন তীরবেগে ছুটেচে—সাতকড়ি পাগলের মতন পিছু পিছু দৌড়চ্ছেন। কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, গোলদীঘি, বউবাজারের মোড়—সব পার হ'য়ে গেল। কুয়াশা ভেদ ক'রে সাম্‌নের সমস্ত পথ ফুটে উঠেচে—এ পথের কি শেষ নেই? রাস্তা কি ওপরে উঠেচে না নীচে নেমেচে? এ কি আলো, না অন্ধকার? দূরে ও কি দেখা যাচ্ছে? সমুদ্রের ঢেউ, না চোখের ভুল?

সাতকড়ি ছুটতে ছুটতে নিরন্তর চীৎকার করচেন—থামো থামো। ওকি, খাটের ওপর উঠে বসেচে কে? মহেশ? মহেশই ত। কি ভয়ানক! দাঁড়িয়েচে—ছুটন্ত খাটের ওপর খাড়া হয়ে দাঁড়িয়েচে! পিছনে ফিরে হাত নেড়ে কি বল্‌চে?

দূর দূরান্তর থেকে মহেশের গলার আওয়াজ এল—সাতকড়ি—ও সাতকড়ি—

—কি, কি? এই যে আমি।

—ও সাতকড়ি—আছে, আছে, সব আছে, সব সত্যি—

মহেশের খাট অগোচর হয়ে এল, তখনও তাঁর ক্ষীণ কণ্ঠস্বর শোনা যাচ্ছে—আছে, আছে···

সাতকড়ি মূর্চ্ছিত হয়ে পড়লেন। পরদিন সকালে ওয়েলেস্‌লি ষ্ট্রীটের পুলিস তাঁকে দেখতে পেয়ে মাতাল ব'লে চালান দিলে। তাঁর স্ত্রী খবর পেয়ে বহু কষ্টে তাঁকে উদ্ধার করেন।

বংশলোচনবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন—গয়ায় পিণ্ডি দেওয়া হয়েছিল কি?

—শুধু গয়ায়? পিণ্ডিদাদনখাঁয়ে পর্য্যন্ত দেওয়া হয়েচে, কিন্তু কোনো ফল হয় নি, পিণ্ডি ছিটকে ফিরে এল।

—মহেশ মিত্তিরের টাকাটা?

—সেটা ইউনিভার্সিটিতে গচ্ছিত আছে। কিন্তু কাজ কিছুই হয় নি, ভূতের বিরুদ্ধে প্রবন্ধ লিখতে কোনো ছাত্রের সাহস নেই। এখন সেই টাকা সুদে-আসলে প্রায় ত্রিশ হাজার হয়েচে। একবার সেনেটে প্রস্তাব ওঠে টাকাটা আর কিছুতে খরচ করা হোক। কিন্তু ছাদের ওপর এমন দুপ্-দাপ্ শব্দ সুরু হ'ল যে সব্বাই ভয়ে পালালেন। সেই থেকে মহেশ-ফণ্ডের নাম কেউ করে না।

কালীপ্রসন্ন সিংহ ও তাঁহার নাট্যগ্রন্থাবলী

শ্রীসুশীলকুমার দে

বাংলা নাটক ও নাট্যশালার ইতিহাসে, পাইকপাড়ার রাজা ঈশ্বরচন্দ্র ও প্রতাপচন্দ্র সিংহের উদ্যোগে তাঁহাদের বেলগেছিয়া উদ্যানবাটীতে প্রতিষ্ঠিত নাট্যশালা যেরূপ সুপরিচিত, তৎকালীন অন্যান্য রঙ্গমঞ্চ সেরূপ প্রসিদ্ধি লাভ করে নাই ইংরেজী ৩১শে জুলাই, শনিবার, ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে, রামনারায়ণ তর্করত্নের 'রত্নাবলী'র অভিনয়ের দ্বারা বেলগেছিয়া নাট্যশালার প্রথম সূত্রপাত হইয়াছিল, এবং ২৯শে মার্চ্চ ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে রাজা ঈশ্বরচন্দ্রের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে এই রঙ্গমঞ্চ অন্তর্হিত হইয়াছিল। কিন্তু ইহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে কালীপ্রসন্ন সিংহের জোড়াসাঁকোস্থ বাটীতে তৎপ্রতিষ্ঠিত বিদ্যোৎসাহিনী সভার অধীনে একটি রঙ্গমঞ্চ স্থাপিত হইয়াছিল; এবং এই স্থলে, ৯ই এপ্রিল ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে রামনারায়ণ তর্করত্নের 'বেণীসংহার' প্রথম অভিনীত হয়। ইহার প্রতিষ্ঠাতা কালীপ্রসন্ন সিংহ স্বয়ং এই নাট্যমঞ্চের জন্য তিনখানি অধুনা-বিস্মৃত নাটক রচনা করেন। বেলগেছিয়া নাট্যশালার মত এই রঙ্গমঞ্চও এককালে যথেষ্ট প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল, এবং বাংলা নাট্যাভিনয়ে নবযুগ প্রবর্ত্তনে ইহার প্রভাব কোন অংশে ন্যূন ছিল না। প্রকৃতপক্ষে, ইহারই দৃষ্টান্তে এক বৎসর পরে বেলগেছিয়া নাট্যশালা স্থাপিত হইয়াছিল। যদিও এই দুইটি অনুষ্ঠানের কোনটিও স্থায়ী বা সাধারণ রঙ্গমঞ্চে পরিণত হয় নাই, তথাপি যাঁহারা প্রথম বাংলা নাটক রচনা করিবার উদ্যোগ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের রচনাগুলি এই সকল রঙ্গমঞ্চে প্রথম অভিনীত হইয়াছিল। পরলোকগত যোগীন্দ্রনাথ বসু তদ্রচিত মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিতে বেলগেছিয়া নাট্যশালার বিবরণ দিয়াছেন। বর্ত্তমান প্রবন্ধে বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চ ও সেই রঙ্গমঞ্চে অভিনীত কালীপ্রসন্ন সিংহের নাটকগুলির কিঞ্চিৎ পরিচয় লিপিবদ্ধ হইল।

পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সাহিত্যের প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজী নাট্যাভিনয়ের অনুকরণে, নূতন ধরণের নাটক রচনা ও অভিনয়ের বাসনা তৎকালীন শিক্ষিত সমাজকে অনুপ্রাণিত করিয়াছিল। তখনও বাংলায় সাধারণ বা স্থায়ী নাট্যশালা প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, এবং নাট্যশালার সাহায্যে নাট্য-সাহিত্য গঠিত হইবার সময়ও আসে নাই। পূর্ব্বোক্ত রঙ্গমঞ্চ দুইটি স্থাপিত হইবার পূর্ব্বে, কোন কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির গৃহে নাটকাভিনয় হইয়াছিল, কিন্তু তাহা স্বল্পকাল-মাত্র-স্থায়ী আমোদে পর্য্যবসিত হওয়াতে বিশেষ ফলপ্রদ হয় নাই। ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে নবীনচন্দ্র বসুর শ্যামবাজারের বাটীতে মহাসমারোহে ও বহুল অর্থব্যয়ে কোন অজ্ঞাতনামা লেখক রচিত 'বিদ্যাসুন্দর' নাটকের অভিনয় হইয়াছিল। সমসাময়িক সংবাদপত্রে এই প্রথম বাংলা নাটকাভিনয়ের প্রশংসা দেখিতে পাওয়া যায়। মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি তাঁহার 'সন্দর্ভসংগ্রহে' (১৮৯৭, পৃঃ ৬-১০) তৎকালীন 'হিন্দু পাওনিয়র' নামক ইংরেজী মাসিকপত্র হইতে (অক্টোবর, ১৮৩৫) এই নাটকের দ্বিতীয় অভিনয়ের যে বিস্তৃত বিবরণ দিয়াছেন, তাহা হইতে এখানে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিয়া দিলে এই অভিনয়ের কিরূপ আয়োজন হইয়াছিল তাহা পাঠক বুঝিতে পারিবেন:

The private theatre got up about two years ago* is still supported by Babu Nobin Chunder Bose. It is situated in the residence of the proprietor at Shambazar where four or five plays† were acted during the year. These are native performances by people entirely Hindus, after the English fashion in the vernacular language of their country; and, what elates us with joy, as it should do all the friends of Indian improvement, is that the fair

* মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি অনুমান করেন যে, এই তারিখে ভুল আছে; তাঁহার মতে 'বিদ্যাসুন্দরে'র প্রথম অভিনয় ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে (১২৩৮ বঙ্গাব্দে) হইয়াছিল।

† অপর কি কি নাটক অভিনীত হইয়াছিল, তাহার বিবরণ পাওয়া যায় না।

sex of Bengal are always seen on the stage, as the female parts are almost exclusively performed by Hindu women. We had the pleasure of attending at a play during the last full moon : and we must acknowledge that we were highly delighted. That house was crowded by upwards of a thousand visitors of all sorts ...... The play commenced a little before 12 o'clock and continued the next day till half past six in the morning.... The subject of the performance was Bidya-sunder.... It commenced with the music of the orchestra which was very pleasing. The native musical instrument, such as the *sitar*, the *saranghi*, the *pakhowaj* and others, were played....Before the curtain was drawn a prayer was sung to the Almighty....The scenery was generally imperfect ; the perspective of the pictures, the clouds, the water were all failures....The part of Sunder the hero of the poem, was played by a young lad, Shamachurn Bannerji of Burranagore, who in spite of his praiseworthy efforts did not do entire justice to his performance...Young Shamachurn tried occasionally to vary the expression of his feelings, but his gestures seemed to be studied, and his motions stiff. The parts of the Raja and others were performed to the satisfaction of the whole audience. The female characters in particular were excellent. The part of Bidya... played by Radhamoni (genernally called Moni), a girl of nearly sixteen years of age, 'was ably sustained ; her graceful motions, her sweet voice and her love-tricks with Sunder filled the minds of the audience with rapture and delight. She never failed as long as she was on the stage...The other female characters were equally well performed, and amongst the rest, we must not omit to mention that the part of Rani, the wife of Raja Bira Singha, and that of Malini... were acted by an elderly woman Joy Durga, who did justice to both characters in the twofold capacity... and another woman Raj Cumari, usually called Raju, played the part of a maid-servant to Bidya, if not in a superior manner, yet as ably as Joy Durga.

এই বর্ণনা হইতে বুঝা যাইবে যে, নবীনচন্দ্র বসুর স্বভবনস্থিত রঙ্গমঞ্চ প্রায় দুই বৎসর স্থায়ী হইয়াছিল, কিন্তু এক বিদ্যাসুন্দর ছাড়া আর কোনও নাটকের অভিনয় বোধ হয় তেমন সফল হয় নাই। এই অভিনয়ের একটি উল্লেখযোগ্য বিশেষত্ব এই যে, ইহাতে স্ত্রীলোকের ভূমিকা পুরুষের দ্বারা অভিনীত হয় নাই। কিন্তু যাত্রার প্রভাব বোধ হয় একেবারে যায় নাই, এবং আধুনিক রীতি ও রুচি অনুসারে বিচার করিলে ইহার যাহা ত্রুটি ছিল, তাহা নব্যশিক্ষিত সমাজের সম্পূর্ণ মনঃপূত হয় নাই।*

এ সময়ে সুরচিত বাংলা নাটকেরও যথেষ্ট অভাব ছিল। ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে তারাচরণ শিকদারের 'ভদ্রার্জ্জুন'* ও ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে হরচন্দ্র ঘোষের 'ভানুমতী-চিত্তবিলাস' † প্রকাশিত হইলেও, এই দুইটির একটিও অভিনয়োপযোগী নাটক হয় নাই। 'ভদ্রার্জ্জুন' কোথাও অভিনীত হইয়াছিল বলিয়া জানা যায় না, এবং হরচন্দ্র ঘোষের দ্বিতীয় নাটক 'কৌরব-বিয়োগ' (১৮৫৮)এর ভূমিকা হইতে স্পষ্ট জানা যায় যে, 'ভানুমতী-চিত্তবিলাস' কোনও রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয় নাই।

'বিদ্যাসুন্দর' অভিনয়ের পর, ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে রামনারায়ণ তর্করত্নের 'কুলীনকুলসর্ব্বস্বে'র অভিনয়ের উল্লেখ পাওয়া যায়। এই নাটক ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে (১২৬১ বঙ্গাব্দে) রচিত, এবং ইহার প্রকাশকাল ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দ (১৯১১ সংবৎ); কিন্তু প্রথম কোথায় ও কবে ইহার অভিনয় হইয়াছিল তৎসম্বন্ধে যথেষ্ট মতভেদ রহিয়াছে। বোধ হয়, প্রথম ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা নূতন বাজারে জয়রাম বসাকের বাটীতে ও পরে ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা বাঁশতলার গলিতে ও চুঁচুড়ায় এই নাটক অভিনীত হয়; কিন্তু ইহার কোন বিশেষ বিবরণ পাওয়া যায় না। সেই বৎসর (১৮৫৭) ফেব্রুয়ারি মাসে আশুতোষ দেবের (ছাতুবাবুর) সিমুলিয়া বাসভবনে নন্দকুমার রায় প্রণীত 'শকুন্তলা' নাটকের অভিনয় হইয়াছিল। কথিত আছে যে, আশুতোষ দেবের দৌহিত্র শরৎকুমার ঘোষ শকুন্তলার ভূমিকা, এবং প্রিয়মাধব মল্লিক ও আনন্দচন্দ্র মুখোপাধ্যায় যথাক্রমে দুষ্মন্ত ও দুর্ব্বাসার ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন। ব্রিটিশ মিউজিয়ম গ্রন্থাগারে এই নাটকের যে মুদ্রিত সংস্করণ রহিয়াছে, তাহার তারিখ ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দ। গ্রন্থ-হিসাবে ইহার রচনা অত্যন্ত অপরিপুষ্ট, এবং ইহার অভিনয় সম্বন্ধে কিশোরীচাঁদ মিত্র লিখিয়াছেন: "it was a failure."‡ ইহার পর, বিদ্যোৎসাহিনী সভার রঙ্গমঞ্চে সেই বৎসর (১৮৫৭) এপ্রিল মাসের ৯ই তারিখে রামনারায়ণের 'বেণীসংহার' ও নভেম্বর মাসে কালীপ্রসন্নের 'বিক্রমোর্ব্বশী' অভিনয়ের

* হেরাসিম লেবেডেফের থিয়েটার (১৭৯৫ খৃষ্টাব্দ) ও তাঁহার ইংরেজী হইতে অনূদিত দুইখানি বাংলা নাটকের এখানে উল্লেখের প্রয়োজন নাই, কারণ ইহা দেশীয় রঙ্গমঞ্চ ছিল না। এতৎসম্বন্ধে বিবরণ *Calcutta Review*,1923, p. 84 এবং *Indian Historical Quarterly*, 1925এ পাওয়া যাইবে।

* বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা, ১৩২৪, পৃঃ ৪২

† বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা, ১৩৩৩, পৃঃ ১৪১

‡ *Calcutta Review*, 1873, p. 275.

সহিত নিয়মিত নাট্যাভিনয় ও নাটক রচনার সূত্রপাত হইল।

কালীপ্রসন্ন সিংহের নাম বাংলা সাহিত্যে সুপরিচিত। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে মাত্র ২৯ বৎসর বয়সে তাঁহার অকালমৃত্যু হয়, কিন্তু একদিকে মহাভারতের অনুবাদ ও অন্যদিকে 'হুতোম প্যাঁচার নক্সা' তাঁহাকে বাংলা সাহিত্যে অমর করিয়া রাখিবে।* বিদ্যাসাগরের সমাজ-সংস্কার কার্য্যে সাহায্য, মাইকেলের সংবর্দ্ধনা, হরিশ্চন্দ্রের মৃত্যুর পর 'হিন্দু পেট্রিয়টে'র পরিচালনা, 'নীলদর্পণে'র অনুবাদের জন্য আদালতে লং সাহেবের অর্থদণ্ড দাখিল করা, প্রভৃতি তাঁহার সময়ের সকল সৎকার্য্যে তিনি অগ্রণী ছিলেন। নিজ যত্ন ও উৎসাহে ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে স্বগৃহে প্রতিষ্ঠিত বিদ্যোৎসাহিনী সভার অধীনস্থ রঙ্গমঞ্চের জন্যও তিনি তিনখানি নাটক লিখিয়াছিলেন। এই রঙ্গমঞ্চ ৯ই এপ্রিল, ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে, রামনারায়ণ তর্করত্নের 'বেণী-সংহার' নাটকের প্রথম অভিনয়ের সহিত কালীপ্রসন্নের জোড়াসাঁকোস্থ ভবনে প্রতিষ্ঠিত হয়। কালীপ্রসন্নের স্বলিখিত যে তিনখানি নাটক এই রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয়, তাহাদের নাম যথাক্রমে (১) বিক্রমোর্ব্বশী—১৮৫৭, (২) সাবিত্রী-সত্যবান্—১৮৫৮ এবং (৩) মালতী-মাধব—১৮৫৯। ইহার মধ্যে প্রথম ও শেষ গ্রন্থ স্বনামপ্রসিদ্ধ সংস্কৃত নাটকের অনুবাদ; কিন্তু দ্বিতীয়খানি তাঁহার নিজস্ব রচনা।

বিক্রমোর্ব্বশী নাটক, বাংলা সাহিত্যের উৎসাহদাতা বর্দ্ধমানের মহারাজা মহতাপচাঁদকে উৎসর্গ করা হইয়াছে; এই ইংরেজী উৎসর্গ-পত্রের তারিখ—২০শে সেপ্টেম্বর, ১৮৫৭।† এই নাটকের নাম ও বর্ণনা ইহার ইংরেজী ও বাংলা টাইট্‌ল-পেজ বা আখ্যা-পত্রে এইরূপ দেওয়া আছে :

Vikramorvasi of Kalidasa. Translated into Bengali by Kali Prosonno Sing. Calcutta: Printed by Anund Chunder Vedantuvagees at the Tuttobodhinee Press, for Vidyot Sahinee Shova. 1857.

বিক্রমোর্ব্বশী নাটক। মহাকবি কালীদাস (*sic*) বিরচিত। শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন সিংহ কর্ত্তৃক মূল সংস্কৃত গ্রন্থ হইতে বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদিত। কলিকাতা বিদ্যোৎসাহিনী সভার কারণ। তত্ত্ববোধিনী সভার যন্ত্রে শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ দ্বারা মুদ্রিত। ১৭৭৯ শক।

নাটকখানি পঞ্চাঙ্কে সমাপ্ত এবং ইহার পত্র-সংখ্যা ৵০ + ৴০ + ৮৫। ইহার নাতিদীর্ঘ "বিজ্ঞাপনে" অনুবাদক বিদ্যোৎসাহিনী সভার অধীনস্থ রঙ্গমঞ্চের উল্লেখ করিয়া স্বীয় নাটক-রচনার উদ্দেশ্য এইরূপ বিবৃত করিয়াছেন :

"বাঙ্গালা নাটকের অনুরূপ বহুকালাবধি বঙ্গবাসিগণ দর্শন করেন নাই, কারণ অতিপূর্ব্বকালে মহাকবি কালিদাসাদির দ্বারা যে সমস্ত সংস্কৃত নাটক রচিত হয়, তাহারই অনুরূপ হইত, পরে প্রায় দুই তিন শত বৎসর অতীত হইল সংস্কৃত ভাষায় নাটক ও অনুরূপাদি এক-কালেই রহিত হইয়াছে, সেই অবধি আর কোন ধনবান্ ভবনে নাটকাদির অভিনয় হয় নাই। পরে সেক্‌সপিয়র ও অন্যান্য ইংরাজি নাটকাদি বঙ্গদেশে অভিনয় হইলে হিন্দুগণ সংস্কৃত ও বাঙ্গালা নাটকের অনুরূপ করিতে ইচ্ছা করেন। উইলসন্ সাহেব লেখেন প্রায় অশীতিবর্ষ হইল কৃষ্ণনগরাধিপতি ৺প্রাপ্ত শ্রীযুক্ত রাজা ঈশ্বরচন্দ্র রায় বাহাদুরের ভবনে চিত্রযজ্ঞ নামক এক সংস্কৃত নাটকের অনুরূপ হয়, কিন্তু রঙ্গভূমির নিয়মাদির অনুবর্ত্তী হইয়া অভিনয় করেন নাই, ও সংস্কৃত ভাষায় লিখিত হইবার কারণ অনেকের মনোরঞ্জন হয় নাই। এক্ষণে এই বিদ্যোৎসাহিনী সভার অধীনস্থ রঙ্গভূমিতে বঙ্গবাসীগণ পুনরায় বাঙ্গালা নাটকের অনুরূপ দর্শনে পারগ হইলেন। প্রথমতঃ বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গভূমিতে ভট্টনারায়ণ প্রণীত বেণীসংহার নাটকের শ্রীযুক্ত রামনারায়ণ ভট্টাচার্য্য কৃত বাঙ্গালা অনুবাদের অভিনয় হয়, যে মহাত্মারা উক্ত অভিনয় সময়ে রঙ্গভূমিতে উপনীত ছিলেন, তাঁহারাই তাহার উত্তমতা বিবেচনা করিবেন। ফলে মান্যবর নটগণ যথাবিহিত নিয়মক্রমে অনুরূপ করায় দর্শকমহাশয়দিগের প্রীতিভাজন ও শত শত ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছিলেন।

পরে উপস্থিত দর্শক মহোদয়গণের নিতান্ত আগ্রহাতিশয়ে এবং তাহাদিগের অনুরোধ বশতঃ পুনরায় বিদ্যোৎসাহিনী সভার অধীনস্থ রঙ্গভূমিতে অনুরূপ কারণেই বিক্রমোর্ব্বশী অনুবাদিত ও প্রকাশিত হইল, এক্ষণে বিদ্যোৎসাহী মহোদয়গণের পাঠযোগ্য এবং নাগরীয় অন্যান্য রঙ্গভূমিতে অনুরূপ যোগ্য হইলে আমার শ্রম সফল হইবে।"

'বিক্রমোর্ব্বশী'র অভিনয় তৎকালে যথেষ্ট সমাদৃত হইয়াছিল। কালীপ্রসন্ন সিংহ স্বয়ং রঙ্গমঞ্চে পুরূরবার ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়াছিলেন,* এবং দর্শকবৃন্দের মধ্যে কলিকাতার প্রায় সকল গণ্য ও মান্য ব্যক্তি উপস্থিত

---

* কালীপ্রসন্ন সিংহের স্বল্পায়ু জীবনের বৃত্তান্ত ইতিপূর্ব্বে শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ ঘোষ ইংরেজীতে ও বাংলায় বিবৃত করিয়াছেন। কালীপ্রসন্নের অধুনা-দুষ্প্রাপ্য নাটকগুলি আমরা তাঁহার নিকটই পাইয়াছি।

† এই উৎসর্গ-পত্রটি শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ ঘোষ তাঁহার 'কালীপ্রসন্ন সিংহ' (কলিকাতা, বঙ্গাব্দ ১৩২২) গ্রন্থে (পৃঃ ২০) সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছেন। 'বিবিধার্থ-সংগ্রহ' (৪র্থ পর্ব্ব, ৪২ সংখ্যা) হইতে জানা যায় যে, কালীপ্রসন্নের 'বিক্রমোর্ব্বশী'র কিয়দংশ প্রথমে 'পূর্ণচন্দ্রোদয়' পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল; পরে উক্ত রঙ্গমঞ্চে অভিনয়ের জন্য সমুদয় গ্রন্থাকারে প্রকাশিত করা হইয়াছিল।

* তাঁহার অভিনয় হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত 'হিন্দু পেট্রিয়টে' প্রশংসালাভ করিয়াছিল।

ছিলেন। ইহার অভিনয় সম্বন্ধে প্রত্যক্ষদর্শী কিশোরীচাঁদ মিত্র লিখিয়াছেন :

There was a large gathering of native and European gentlemen who were unanimous in praising the performance. Among the latter, Mr., afterwards Sir, Cecil Beadon, the Secretary to the Government of India, expressed to us his unfeigned pleasure at the admirable way in which the principal characters sustained their parts.

কিন্তু অভিনয় সমাদৃত হইলেও রচনা-হিসাবে কালীপ্রসন্নের এই প্রথম উদ্যমের প্রশংসা করিতে পারা যায় না। মনে রাখিতে হইবে যে, এই সময় অনুবাদকের বয়স মাত্র ষোড়শ বৎসর, এবং এই নাটক তাঁহার প্রথম সাহিত্যিক রচনা। গ্রন্থকার মূলের অবিকল অনুবাদ করিতে গিয়া নাটকের ভাষা ও ভঙ্গীকে সরস করিতে পারেন নাই এবং পয়ারাদি ছন্দে মূলের বিচিত্র ও দীর্ঘচ্ছন্দী শ্লোকগুলির মর্য্যাদা রক্ষা হয় নাই। 'বিবিধার্থ-সংগ্রহে'র সমালোচক 'বিক্রমোর্ব্বশী' সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, "ইহাতে নস্তের গন্ধমাত্র বোধ হয় না"; পণ্ডিতী ভাষা না হইলেও, ইহার ভাষা সংস্কৃতগন্ধী ও কৃত্রিম। চতুর্থ অঙ্কে পুরূরবার উন্মাদ-দৃশ্যের নিম্নোদ্ধৃত অংশ হইতে ইহার রচনার নমুনা পাওয়া যাইবে :

রাজা (ঊর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করিয়া) কে আমাকে অনুশাসন করেন, (দেখিয়া) এ কি পিতামহ শশলাঞ্ছন, ভগবান্ তারাপতি, এই অনুশাসনে আমাকে নিতান্ত অনুগ্রহ করিলেন। (মণি লইয়া) অহে সঙ্গমমণে!

যদি আমি তব বলে প্রিয়তমা পাই।
শিরোধার্য্য হবে তুমি বলিলাম তাই॥
অতএব কর যত্ন শীঘ্র সঙ্গমনে।
কৃতার্থ হইব আমি তবে এ ভুবনে॥

(পরিক্রমণ ও অবলোকন করিয়া) কেন হে এই লতা, কুসুমবিহীনা হইলেও ইহার দর্শনে আমার অনুরাগ জন্মিতেছে। তথা হি।

তনুতরা মেঘজলে আর্দ্র কিশলয়া।
ধৌতাধরা যেন অশ্রুবেগে অল্পরয়া॥
স্বকালবিগমে তথা পুষ্পোদ্গমহীনা।
আভরণশূন্যা যথা মানিনী অঙ্গনা॥
মধুকর শব্দ বিনা রহিয়াছে স্থিরা।
চিন্তামৌন ধরিয়াছে যেন নারী ধীরা॥
বোধ হয় প্রিয়তমা ত্যজি পদানত।
দাসজন লতাভাবে আছে প্রকুপিত॥

যা হউক, এই প্রিয়ানুকারিণী লতাকে একবার আলিঙ্গন করি। (নিকটে গিয়া লতালিঙ্গন) (অনন্তর সেই স্থান হইতে উর্ব্বশীর প্রবেশ) (নিমীলিত নয়নে স্পর্শ নাটন করিয়া) অয়ে! উর্ব্বশীগাত্র স্পর্শ বশতই যেন আমার অন্তরিন্দ্রিয় পুলকিত হইতেছে, কিন্তু বিশ্বাস হয় না, যেহেতু প্রথমতঃ

এই প্রিয়া এই প্রিয়া হইতেছে বোধ।
ক্ষণমাত্রে পরিবর্ত্তে হয় জ্ঞানরোধ॥
অতএব বিলোচন বিনিদ্র করণ।
অতি ভয়ঙ্কর হয় যেন হে মরণ॥

(চক্ষু উন্মীলন করিয়া সহর্ষে) এই সত্যই উর্ব্বশী যে। (মোহপ্রাপ্তি) (কিঞ্চিৎ পরে চেতনা প্রাপ্ত হইয়া) প্রিয়ে অদ্য জীবন পাইলাম,

ত্বদীয় বিরহসিন্ধু পরপারে গত।
অদ্য সংজ্ঞা পাইলাম প্রাণ যথামৃত॥

উর্ব্বশী। মহারাজ! ক্ষমা করুন, আমি কোপবশা হইয়া আপনাকে নিরতিশয় ক্লেশ প্রদান করিয়াছি।

রাজা। প্রিয়ে! আমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতে হইবে না, তোমার দর্শনেই আমার অন্তরাত্মা সুতরাং প্রসন্ন হইয়াছে, এক্ষণে বল, এতকাল কি প্রকারে বিরহিতা হইয়াছিলে, তোমার অন্বেষণার্থে আমি ময়ূর পরভৃৎ হংস রথাঙ্গ গজ পর্ব্বত সরিৎ কুরঙ্গ প্রভৃতি সকলকেই রোদন করিতে করিতে জিজ্ঞাসা করিয়াছি। (পৃঃ ৬৬-৬৮)।

কালীপ্রসন্ন সিংহের দ্বিতীয় অনূদিত নাটক 'মালতী-মাধবে'র প্রথমেই ইংরেজী আখ্যা-পত্র বা টাইটল-পেজ এইরূপ :

Malatee Mudhaba A Comedy of Bhubabhootee. Translated into Bengalee from the original Sanscrit, by Kali Prusno Sing, M. A. S. Calcutta: Printed for the Beedut Shaheence Shova, by G. P. Roy & Co., No. 67, Emaumbrry Lane, Cossitollah. 1859.

এই পৃষ্ঠার উল্টা দিকে উৎসর্গ-পত্র: This Translation is most respectfully Dedicated to all Lovers of the Hindu Theater, by the Translater (*sic*).

পর পৃষ্ঠায় বাংলা টাইট্ল-পেজ এইরূপ :

মালতীমাধব নাটক। মহাকবি ভবভূতি বিরচিত। শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন সিংহ কর্ত্তৃক মূল সংস্কৃত হইতে বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদিত। কলিকাতা। জি, পি, রায় এণ্ড কোং দ্বারা বিদ্যোৎসাহিনী সভার কারণ মুদ্রিত। শকাব্দা ১৭৮০। বিনা মূল্যেন বিতরিতব্যং।

নাটকটি চার কাণ্ড ও বারটি অঙ্কে সম্পূর্ণ। এই কাণ্ড ও অঙ্ক বিভাগ ইংরেজী নাটকের Act ও Scene বিভাগের অনুযায়ী। পত্রসংখ্যা ।৵০ + ৯১।

'বিক্রমোর্ব্বশী' নাটকে মূলের অবিকল অনুবাদ করিতে গিয়া ভাষার যে কৃত্রিমতা ও লালিত্য-হানি হইয়াছে, কালীপ্রসন্ন তাঁহার দ্বিতীয় অনুবাদে এই দোষ পরিহার করিবার উদ্দেশ্যে তাঁহার 'মালতী-মাধবে'র বিজ্ঞাপনে লিখিয়াছেন :

বাঙ্গালা ভাষায় সংস্কৃতের অবিকল লালিত্য রক্ষা করিতে চেষ্টা করা নিরর্থক, কারণ অবিকল অনুবাদিত গ্রন্থ সহজেই পাঠ করিতে ঘৃণা বোধ হয়, বিশেষতঃ প্রত্যেক পদের বাঙ্গালা অর্থ ও শব্দানুকরণে যথার্থ ভাব সংরক্ষণ করা কাহারও সাধ্য নহে। ইহার প্রথম

উদ্যম স্বরূপে মহাকবি কালিদাস প্রণীত বিক্রমোর্ব্বশী নাটকেই সম্পূর্ণ পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়াছি, তন্নিমিত্ত এবার তাহা হইতে সতন্ত্রিত (*sic*) হইতে হইয়াছে।...মৎরচিত, মৎপ্রণীত ও মদনুবাদিত অন্য অন্য নাটক হইতে মালতীমাধবের ভাষারও প্রভেদ হইয়াছে, কারণ অভিনয়ার্হ নাটক সকল ইদানিন্তন (*sic*) যে ভাষায় লিখিত হইতেছে আমিও সে অবলম্বন করিয়া ঈপ্সিত বিষয় সুসিদ্ধ করণ মানসে সচেষ্ট ছিলাম।

'মালতী-মাধবে'র ভাষা ও রচনা অনেক পরিমাণে প্রাঞ্জল হইয়াছে সত্য, কিন্তু ইহা যে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক হইয়াছে তাহা বলা যায় না। মূলের শ্লোকগুলি ছন্দে অনুবাদ না করিয়া তাহার ভাবার্থ গদ্যে প্রকাশ করা হইয়াছে। এই প্রণালী রামনারায়ণ তর্করত্নও অবলম্বন করিয়াছেন, কিন্তু ইহা বিশেষ ফলপ্রদ হইয়াছে বোধ হয় না; কারণ, সংস্কৃত নাটকের শ্লোকগুলিই ও তাহার ধ্বনিবৈচিত্র্য, তাহার নাট্য-সৌন্দর্য্যের আধারস্বরূপ। মালতীকে দেখিয়া মাধবের পূর্ব্বরাগ ও বিরহাবস্থা তাহার সখা মকরন্দের নিকট এইরূপ বিবৃত করা হইয়াছে (তৃতীয় অঙ্ক, পৃঃ ১৩):

মকরন্দ। বয়স্য! এ তুমি কেমন বল্লে, একবার দর্শন কল্লেই কি এতাদৃশ প্রণয় হয়. না না তোমাদিগের আন্তরিক কোন কথা আছে, প্রকাশ কচ্চো না, পদ্মফুল কি চন্দ্রকিরণে বিকশিত হয়।

মাধব। বয়স্য! আমি তোমার নিকটে কিছুই গোপন করি নাই, তবে শোনো সবিশেষ বর্ণনা করি, যখন সুন্দরী সখীগণে বেষ্টিত হইয়া আমাকে দর্শন কল্লেন, তখন পরস্পরের মুখাবলোকন করে, সকলে হাস্য কত্তে লাগ্‌লেন। সখে! এই সকল দর্শন করে আমার অনুভব হলো যে আমি ঐ কামিনীগণের নিকট পরিচিত আছি।

মকরন্দ (স্বগত) সখার হৃদয়াকাশে প্রেমেন্দু উদয় হয়েছে।

কলহংস (স্বগত) কোন রমণীর বিষয় লয়ে কথোপকথন হচ্চে।

মকরন্দ। সখে! এক্ষণে চল আবাসে গমন করি।

মাধব। না প্রিয়তম! আমি এক্ষণে কোনক্রমেই উদ্যান পরিত্যাগ কত্তে পারব না, চন্দ্রবদনীর রূপলাবণ্য দর্শনে আমি জ্ঞানশূন্যচিত্ত হয়েছি, কি প্রকারে তা বলো গমন করি। কোন ক্রমেই যে মন প্রবোধ মানবে না, আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবার কোন সম্ভাবনা নাই, কারণ ভাবিনীর ভাবদর্শনে স্পষ্ট প্রতীতি হলো, তাঁহার অন্তরে কামদেবের আবির্ভাব হয়েছে, কিন্তু আমি কিছুমাত্র শঙ্কেত (*sic*) করি নাই, কেবল চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় চেয়েছিলাম, মধ্যে মধ্যে সাত্বিক ভাবের আবির্ভাব হয়ে হৃৎকম্প হয়েছিল, আমি এই অবস্থায় অবস্থান কচ্চি,এমত সময়ে কতকগুলি অস্ত্রধারি দ্বারপাল এবং এক বৃদ্ধা, কামিনীগণকে হস্তির উপর বসাইয়া নগরাভিমুখে গমন করিল। আহা প্রিয়তম! চন্দ্রবদনী গমনকালে পুনঃ পুনঃ মদনোদ্যানের প্রতি সতৃষ্ণ নয়নে দৃষ্টিনিক্ষেপ কত্তে লাগ্‌লেন, দুর হতে বোধ হলো, যেন প্রস্ফুটিত পদ্মফুল সমীরণে সঞ্চালিত হচ্চে, সখে! মৃগনয়নার অদর্শনে আমি যে যন্ত্রণা সহ্য করেছি তা বর্ণনা করা যায় না, কারণ সংসারে তাহার দৃষ্টান্ত বিরহ (বিরল?), কখন বা কামাগ্নি প্রজ্বলিত হয়ে অন্তর্দাহ কত্তে লাগলো, মধ্যে মধ্যে অচৈতন্যও হয়েছিলাম, যখন চৈতন্য প্রাপ্ত হই তখন কি প্রকার চিত্ত সুস্থির কর্ব্বো কিছুই স্থির কত্তে পারি নাই।*

কালীপ্রসন্নের অনুবাদ আক্ষরিক না হইলেও

---

* এই স্থলে তুলনার জন্য রামনারায়ণ তর্করত্নের 'মালতী-মাধব' হইতে অনুরূপ অংশ এখানে উদ্ধৃত হইল; কিন্তু রামনারায়ণের অনুবাদ নয় বৎসর পরে ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত।—

মকরন্দ। সখা তুমি দেখ্‌চি দর্শন করেই তাঁর আশাপথের পথিক হয়েছ, কিন্তু তাঁর মনের ভাব কিছু জান্তে পেরেছ? তোমার প্রতি তাঁর ভাবভঙ্গি কিছু হয়েছিল?......

মাধব। সখা, সে কথাও তোমাকে আনুপূর্ব্বিক বলি শোন। ওদিগে লোকের অত্যন্ত জনতা, ভারি কোলাহল, আমি এই স্থানটিতে বসে উৎসব দেখ্‌চি, আর এই বকুল গাছ থেকে ফুল পড়ুচে, তাই নিয়ে যদৃচ্ছাক্রমে এক ছড়া মালা গাঁথ্‌চি, এমন সময় উৎসব সমাজের মধ্যে হতে সেই নবীনা সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী কএক জন সখী সঙ্গে (অঙ্গুলি দ্বারা নির্দ্দেশ) এই দিগের পুষ্প চয়ন করতে এসে এই বৃক্ষতলে দাঁড়ালো; দাঁড়ালে একটি সখী অমনি বলে উঠলো "সেই তিনি লো তিনি" এই কথা শুনে তারা সকলেই আমার প্রতি চেয়ে দেখ্‌লে।

মকরন্দ। তবে বোধ হয় পূর্ব্বে তারা তোমাকে কোথাও দেখে থাক্‌বে, এ নূতন দেখা নয়।

মাধব। হ্যাঁ ভাই, সেইরূপ বোধ হলো, কিন্তু আমি ভাই তাদের কখন দেখি নাই।

মকরন্দ। তা হবে, তার পর।

মাধব। তারপর আর একটি সখী আমা প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করে সেই নবীনাকে বল্যে "কেমন প্রিয়সখি, বলি চিন্তে পার" এই কথা বলে সে হাসতে লাগলো, তাতে সেই নবীনা যেন লজ্জা পেয়ে অধোবদন হলেন। অধোবদন হলেন সত্য, কিন্তু তাও বলি, আমার প্রতি তার দৃষ্টির বিরতি হলো না, কখন সেই মোহন নয়ন-যুগল বিকশিত ইন্দীবরের ন্যায় প্রকটিত মাধুর্য্য-লাবণ্য প্রকাশ কত্তো লাগলো, কখন ভ্রূরূপ লতাকৃত মুকুলিত কুসুমের ন্যায় বক্রভাবে মুগ্ধ কত্তো লাগলো। আর কখনো বা আমার নয়নগোচর হলে, তড়িতের ন্যায় চমকিত হয়ে নেত্রাচ্ছদের আশ্রয় অবলম্বন কত্তো লাগলো। সখা, সে মনোহর ভাবটি এখনো আমার অন্তঃকরণে জাগরিত রয়েছে, সে স্নিগ্ধ দৃষ্টি, মধুর মূর্ত্তি আমি কখনই বিস্মৃত হতে পারবো না। সে যা হোক্‌, আমাকে দেখেই তাঁদের পুষ্পচয়ন গেলো, অন্য আলাপ গেলো, নূপুরধ্বনি বিরত হলো, সকলে অমনি স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে কানাকানি করতে লাগলো, তাই ভাই আমার যেন কিছু লজ্জা হলো, আমি যেন কত অন্যমনে আছি, মালা গাঁথা যেন আমার বড়ই প্রয়োজন, না হলেই যেন নয়, আমি এমনি ভাবটি প্রকাশ করবার চেষ্টা কত্তো লাগ্‌লাম, কি তা কল্যে কি হবে? মন কি আমার আছে যে আমি তাকে বশীভূত করে রাখবো? আর মনই যখন পরবশ হলো তখন নয়ন আর আমার অনুগত থাকবে কেন? নয়নও মনের সঙ্গে সেই সুরূপার রূপামৃত-সাগরে সন্তরণ দিতে লাগলো, ফলতঃ ইন্দ্রিয়গণকে আর আমি আয়ত্ত কত্তো পারলেম না, অমনি হতচৈতন্য হয়ে চিত্রার্পিতের ন্যায় রৈলেম।...

মকরন্দ। কন্যাটি কতক্ষণ সেখানে ছিল?

মাধব। তা বড় অধিক ক্ষণ নয়। কিঞ্চিৎ পরে পরিজনের অনুরোধে একটি সুসজ্জিত গজপৃষ্ঠে আরোহণ করে সেই গজেন্দ্রগামিনী কিঙ্করী সহচরীগণ লয়ে গমন করলেন। গমনকালে সেই সুলোচনা, যেমন মৃণালের উপর প্রফুল্লপদ্ম পবনহিল্লোলে এক একবার বিবর্ত্তিত ভাবে দোলায়মান হয় সেইরূপ, আমার প্রতি মুখকমল ফিরিয়ে সুধাধিক স্নিগ্ধ কটাক্ষ নিক্ষেপ করতে করতে জনতামধ্যে প্রবিষ্ট হলেন আর আমি দেখ্‌তে পেলেম না। (দীর্ঘনিশ্বাস)।

আনুপূর্ব্বিক।+ অনুবাদে রামনারায়ণ তর্করত্ন আরও অধিক পরিমাণে স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করিয়াছেন, এবং মূলের ভাবমাত্র গ্রহণ করিয়া পরিবর্জ্জন, পরিবর্ত্তন ও নূতন বাক্যের বিস্তার করিয়াছেন; কিন্তু কালীপ্রসন্ন যথাসম্ভব মূলের অবিকল অনুসরণ করিয়াছেন। কিন্তু ভাষা এখনও সজীব ও স্বাভাবিক হয় নাই। ভাষার কথা ছাড়িয়া দিলেও, যাত্রার ধরণটি এখনও একেবারে দূর হয় নাই। যথা, ভাবগদ্‌গদ মালতীর সহিত লবঙ্গিকার কথোপকথন (চতুর্থ অঙ্ক, পৃঃ ২২-২৩) :

মালতী। হাঁ তারপর ?

লবঙ্গিকা। তারপর আমি এই মালাটি চাইলে তিনি অম্‌নি গলা থেকে খুলে আমাকে দিলেন।

মালতী (পুষ্পমালা নিরীক্ষণ করিয়া) সখি! এ মালা ছড়াটির অন্যদিকের মত এ দিকটা ভাল করে গাঁথা হয়নি।

লবঙ্গিকা। প্রিয়সখি! এ বিষয়ে তোমারই সম্পূর্ণ দোষ।

মালতী। কেন সখি আমি কিসে অপরাধি হলেম।

লবঙ্গিকা। সখি! তোমার নিরুপম সৌন্দর্য্য ও অপাঙ্গ ভঙ্গিতে তিনি এমন মোহিত হয়েছিলেন যে মালার শেষভাগটা ভাল করে গাঁত্তেও পাল্লেন না।

মালতী। প্রিয়সখি! তুমি এরূপ প্রিয়বাক্যে কেবল আমাকে মিথ্যা প্রবোধ দিচ্চো।

লবঙ্গিকা। না সখি! আমি তোমাকে প্রবঞ্চনা কচ্চি নে।

মালতী। (লবঙ্গিকা আলিঙ্গন করিয়া) সখি সেই চিত্তচোরের ইহা স্বাভাবিক বিলাষ (*sic*) তাই আমাকে দেখে অমন করে রৈলেন্।

লবঙ্গিকা (ঈষৎ কোপ প্রকাশ করিয়া) তবে তুমিও তাঁকে দেখে স্বাভাবিক ভাব প্রকাশ করেছিলে।

এই নাটকের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য এই যে, কৃত্রিম সাধুভাষা পরিত্যাগ করিয়া অনুবাদক চলিত ভাষার আশ্রয় লইয়াছেন। নবম অঙ্কে (পৃঃ ৫৭) বিবাহ-রাত্রের হাস্যোদ্দীপক প্রসঙ্গে বুদ্ধরক্ষিতার স্বগতোক্তি ইহার একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ :

বুদ্ধরক্ষিতা। (সহাস্যে) ও মা! কোথা যাবো কি লজ্জার কথা, আ মলো তাই নয় একটু স্যায়না হ, ওমা তাও নয়, পোড়ারমুখো বুড়ো যেন মুখ্যে ছিল, মকরন্দ মালতীর বেশে তার ঘরে গিয়েছিল, মিন্সে তার কিছুই জান্তে পাল্লে না গা, মিন্সে কি কানা গোঁপ-জোড়াও কি দেখতে পেলে না (উচ্চহাস্যে) খুব করেছে, লবঙ্গিকা বল্‌ছিলো যে ফুলশয্যার রাত্তিরে বুড়ো যেমন আলিঙ্গন কত্তে যাবে অম্‌নি মকরন্দ নাকি গোব্যাড়ান পিটোবে, তা যা হোক এই ব্যালা মকরন্দের সঙ্গে মদয়ন্তিকার বে দিতে হবে, তা যাই, দেখিগে কোথাকার জল কোথায় যায়।

এখানে চলিত ভাষা উপযোগী হইলেও, এই ধরণের ভাষায় সর্ব্বত্র যে মূলের গাম্ভীর্য্য রক্ষিত হইয়াছে, তাহা বলা যায় না। ইহার উপর, অনেক স্থলে কৃত্রিম ভাষায় ও ভঙ্গীতে, দীর্ঘ বর্ণনা বা বক্তৃতা বা স্বগতোক্তি আধুনিক অভিনয়ের উপযোগী হয় নাই। মূল অনুসরণ করিয়া সপ্তম অঙ্কে মাধবের মুখে শ্মশানের এইরূপ একটি বর্ণনা আছে :

মাধব। কি ভয়ানক রাত্রি, উঃ কিছুই দেখ্‌তে পাওয়া যায় না শ্মশান স্থান কি ভয়ঙ্কর, চারিদিকে শিবাগণের শব্দে, পেচককুলের অমঙ্গল দূষিত ধ্বনিতে, অদূরে জ্বলন্ত চিতার মধ্যস্থ দগ্ধ কাষ্ঠফলকের শব্দে, বৈষয়িক ব্যক্তিরও বৈরাগ্যোদয় হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা, এক্ষণে মন! কেন আর অন্যবিষয় দর্শনে প্রতিজ্ঞাপালনে বিরত হও? হে নেত্রযুগল! আর কি প্রিয়ার দর্শন পেয়ে চরিতার্থ হতে পার্ব্বে? হে কর্ণদ্বয়! তোমরা আর কি সেই সুকোমল কথা শুনে জুড়াতে পাবে? হে হস্তদ্বয়! কেন আর বিলম্ব কর, তোমরা মনেও ভেবো না যে আর সেই সৌন্দর্য্যশালিনীকে আলিঙ্গন কত্তে পাবে। হে চরণদ্বয়, তোমরা কেন গমনে ক্ষান্ত হয়েছ?

এইরূপ তিন পৃষ্ঠাব্যাপী স্বগতোক্তি, একটি গান বা স্তব দিয়া শেষ করা হইয়াছে।

এই নাটকের প্রারম্ভে অনুবাদকের স্বরচিত একটি প্রস্তাবনা আছে, এবং তাহাতে দুইটি গান দেওয়া হইয়াছে। মূলের শ্লোকগুলির ছন্দানুবাদ বর্জ্জন করিয়া তৎপরিবর্ত্তে এই নাটকে বারটি গান সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।* এই গানগুলি প্রধানতঃ বৈতালিক, মালতী বা মাধবের দ্বারা গেয়। গানগুলির ধরণ অনেকটা নিধুবাবুর টপ্পার মত, যথা—

রাগিণী বাঁরোয়া—তাল ঠুংরি।

তাহে মজো না রে মন।
যাতে হবে পরে জ্বালাতন ॥

+ এই স্থলে অনুবাদের দুইটি ভুল উল্লেখযোগ্য। প্রথম অঙ্কে (পৃঃ ৮) বলা হইয়াছে যে, মাধবের চিত্রপট মন্দারিকার অঙ্কিত কিন্তু পরে তৃতীয় অঙ্কে (পৃঃ ১৭) মালতী স্বয়ং এই চিত্র অঙ্কিত করিয়াছে এইরূপ বলা হইয়াছে। রামনারায়ণের অনুবাদে এ ভুল নাই। পুনরায় ষষ্ঠ অঙ্কে—

দূত। আজ্ঞা রাজমহিষী আপনাকে মালতীকে লয়ে যেতে বল্লেন।

কামন্দকী। বাছা চল তোমার মা ডাকচেন।

* বাংলা নাটকে গান-সংযোগের রীতি এই প্রথম নয়। রামনারায়ণের 'রত্নাবলী'তে (১৮৫৮) দশটি গান আছে। সেগুলি ঈশ্বর গুপ্তের শিষ্য ও সে-সময়ের উৎকৃষ্ট সঙ্গীত-রচয়িতা বলিয়া খ্যাত গুরুদয়াল চৌধুরী রচনা করিয়া দিয়াছিলেন। রামনারায়ণের 'মালতী-মাধবে'ও (১৮৬৭) এইরূপ কতকগুলি গান দেওয়া হইয়াছে। সেগুলি বনয়ারীলাল রায় নামক কোন ব্যক্তি রচনা করিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু কালীপ্রসন্ন স্বয়ং সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন। কালীপ্রসন্নের সঙ্গীতানুরাগের পরিচয়, দ্বিতীয় বর্ষের 'পুণ্য' পত্রিকায় হিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

দুর্লভ বস্তুর তরে, মন কি যতন করে,
পরে অনুরাগ করে, হবে পর কি আপন।
পরের প্রণয় তরে, লাজ ভয় ত্যাগ করে,
কুলে জলাঞ্জলি করে, কর কুপথে গমন॥
পরে প্রেমবশ হয়ে, পরেরে আপন কয়ে,
বিরহ যাতনা সয়ে, কর পরেরে যতন॥

'সাবিত্রী-সত্যবান্' কালীপ্রসন্ন সিংহের একমাত্র নিজস্ব রচনা। নাটকের নামেই ইহার কথাবস্তুর পরিচয়। ইহার আখ্যান-ভাগ প্রধানতঃ মহাভারত হইতে গৃহীত হইয়াছে। এই নাটকের যে কাপিখানি আমরা দেখিয়াছি, দুর্ভাগ্যক্রমে তাহা খণ্ডিত (পত্রসংখ্যা ৯৮)। ইহার বাংলা টাইটল্-পেজ বা 'বিজ্ঞাপন' নাই, কিন্তু ইংরেজী টাইটল্-পেজ এইরূপ :

Shabitree Shotyoban A Comedy by Kali Prosono Sing Member of the Asiatic and Agricultural and Horticultural Societies of India, and of the British Indian Association and President of the Bidyotte Shahinee Shobha of Calcutta etc. etc. Calcutta: Printed by G. P. Roy & Co., for Bidyotte Shahinee Shoba, No. 7 Emaumbarry Lane, Cossitollah 1858.

নাটকখানি পাঁচ কাণ্ডে বিভক্ত, এবং প্রত্যেক কাণ্ডে অঙ্ক-বিভাগ এইরূপ : প্রথম কাণ্ড—তিন অঙ্ক ; দ্বিতীয়—তিন ; তৃতীয়—তিন, চতুর্থ—এক (অসম্পূর্ণ)। ইংরেজী নাটকের প্রণালীতে এইরূপ কাণ্ড ও অঙ্ক বিভাগ হইলেও, সংস্কৃত নাটকের অনুকরণে রঙ্গমঞ্চে নট ও নটীর কথোপকথন দ্বারা নাট্যবস্তুর অবতারণা করা হইয়াছে, এবং ইংরেজী ও সংস্কৃত নাটকের প্রণালী মিশ্রিত করিয়া নাট্যসঙ্কেত বা stage directionগুলি দেওয়া হইয়াছে : যথা, পটোত্তোলনান্তর প্রবেশ, পটক্ষেপেণ নিষ্ক্রান্তাঃ সর্ব্বে (omnes exeunt)।*

কথাবস্তু চিত্তাকর্ষকভাবে গ্রথিত হইলেও, নাটকখানি খুব উঁচুদরের নহে। দৃশ্যগুলি স্বল্পায়তন, ক্ষিপ্রগতি, ও অবান্তর বিষয়ের বাহুল্য-বর্জ্জিত ; কিন্তু চরিত্রাঙ্কন বেশ স্পষ্ট বা পরিস্ফুট হয় নাই। গ্রন্থকার পুস্তকগত নায়ক-নায়িকার আদর্শের আশ্রয় লইয়াছেন, জীবন্ত চিত্র আঁকিতে পারেন নাই। স্থানে স্থানে হাস্যরসের অবতারণা করা হইয়াছে, কিন্তু সে চেষ্টা খুব সফল হয় নাই। এই নাটকের বিদূষক, সংস্কৃত নাটকের মামুলীপ্রথাগত, উদরপরায়ণ ও বৈশিষ্ট্যবর্জ্জিত বিদূষকের ছায়ামাত্র। ভবভূতির অনুকরণে, প্রথম কাণ্ড, তৃতীয় অঙ্কে যে দুই শিষ্যের প্রসঙ্গ আছে, তাহাতে হাস্যোদ্দীপনের চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে। সংস্কৃত নাটকের প্রভাব গ্রন্থকার বর্জ্জন করিতে পারেন নাই। সেইজন্য বর্ণনা বা ভাবপ্রবণতার আতিশয্য নাট্যবস্তুর অবাধ গতিকে অনেকস্থলে ব্যাহত করিয়াছে। 'মালতী-মাধবে' মকরন্দের গলা জড়াইয়া মাধবের আট-দশ পৃষ্ঠাব্যাপী মামুলী ধরণের হাহুতাশ ও বিলাপোক্তি যেরূপ ক্লান্তিজনক হইয়াছে, সেরূপ সত্যবানের পূর্ব্বরাগ ও বিরহাবস্থা, তদুপলক্ষ্যে তাহার বন্ধু শ্বেতগর্ভের সহিত কথোপকথন, সংস্কৃত-নাটকের অনুকরণে কৃত্রিম, ভাবগদ্গদ ও বাগাড়ম্বর-বহুল হইয়াছে। চতুর্থ অঙ্কে সত্যবান্ ও সাবিত্রীর সাক্ষাৎ শকুন্তলা ও দুষ্মন্তের কথা মনে করাইয়া দেয়। শ্বশুরগৃহ গমনের সময় সাবিত্রীর প্রতি তৎসখী সাগরিকার উপদেশ, মহর্ষি কণ্বের উপদেশের স্পষ্ট অনুকরণ।

একটি দোষ কালীপ্রসন্ন সিংহের সমস্ত নাটকে দেখা যায় ; সেটি এই যে, গুরুগম্ভীর সাধু ভাষা ও অত্যন্ত লঘু চলিত ভাষা পাশাপাশি থাকিয়া অনেকস্থলে হাস্যাস্পদ হইয়াছে। 'সাবিত্রী-সত্যবানে'ও এই দোষ অল্প পরিমাণে রহিয়াছে। যথা, একদিকে

সাবিত্রী। এই জগন্মণ্ডলে মানবগণ লোভপরবশ হইয়া বিবিধ দুষ্কর্ম্মে অবিরত অভিরত থাকে, শাস্ত্রেও কথিত আছে লোভ হইতে ক্রোধ উৎপন্ন হয়, লোভ হইতে অভিলাষ জন্মে, লোভ হইতে মোহ জন্মে, সেই হেতু লোভই সকল পাপের মূল কারণ।

অথবা—

সত্যবান। সখে! ক্রমশঃ আমার শারীরিক ও মানসিক শক্তি হ্রাস হইতেছে, মন কি দিবা কি রজনী সকল সময়ই চঞ্চল, গুরুজন-সেবা এবং সাবকাশ সময়ে বন্ধুগণ সঙ্গে স্বচ্ছন্দে কালযাপনও প্রিয়কর হইতেছে না, বোধ করি অনতিকাল মধ্যেই কামাশার কাল করে পতিত হইতে হইবে।

অন্যদিকে,

তরলিকা। এখন বের কথায় পোড়াস্ নে পোড়াস্ নে, এর পর ভাতার ভাতার করে আমাদের পোড়াবি।......ইত্যাদি

'মালতী-মাধবে'র মত এই নাটকেও কতকগুলি রাগ-তাল-যুক্ত গান সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, কিন্তু সঙ্গীতগুলি প্রায়ই ধর্ম্মবিষয়ক।

* এইরূপ হরচন্দ্র ঘোষের 'চারুমুখ-চিত্তহরা'য় (১৮৬৪) 'সর্ব্বেষাং প্রস্থানম্' ইত্যাদি নাট্যসঙ্কেত রহিয়াছে। রামনারায়ণ তর্করত্নের 'চক্ষুদান' প্রহসনে, প্রত্যেক অঙ্কের শেষে "পটপ্রক্ষেপণং। সমবেতবাদনম্" ও আছে।

সমসাময়িক সংবাদপত্রে রামমোহন রায়ের কথা

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

১

শ্রীরামপুরের ব্যাপটিষ্ট মিশন কর্ত্তৃক প্রচারিত 'সমাচার দর্পণ' বাংলা ভাষায় দ্বিতীয় সংবাদপত্র। ১৮১৮ সালের ২৩এ মে তারিখে ইহার প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়। জে. সি. মার্শমান্ বিশেষ দক্ষতার সহিত বহুদিন যাবৎ কাগজখানির সম্পাদকতা করিয়াছিলেন। 'সমাচার দর্পণ' মিশনরী-পরিচালিত হইলেও ইহাতে পরধর্ম্মের কুৎসা অথবা খ্রীষ্টধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব বিষয়ে আলোচনা স্থান পাইত না বলিলেও অন্যায় হয় না।

এই সুপ্রাচীন সংবাদপত্রখানির ১৮২১ হইতে ১৮৪০ সাল পর্য্যন্ত ফাইল সম্প্রতি আমার হস্তগত হইয়াছে। এই দুষ্প্রাপ্য ফাইলগুলি হইতে সে-যুগের একটা স্পষ্ট চিত্র পাওয়া যায়। বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমি রাজা রামমোহন রায়ের বিলাত-প্রবাসের কথা এই সমকালিক সংবাদপত্র হইতে সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করিলাম। ইহা হইতে অনেক নূতন কথা জানা যাইবে।

রামমোহন রায়ের বিলাত-যাত্রা

(৯ মে ১৮২৯। ২৮ বৈশাখ ১২৩৬)

"দিল্লীর বাদশাহ।—আমরা শুনিয়াছি কিন্তু তাহার তথ্যাতথ্যতার বিষয়ে আমরা শপথ করিতে পারি না যে দিল্লীর বাদশাহকে কেহ ইহা শিক্ষা করাইয়াছে কোম্পানির উপরে তাঁহার কোন এক বাবতে চারি কোটি টাকার দাওয়া ছিল এবং সেই দাওয়ার শেষকরণার্থে তিনি এক জন অতিশয় প্রসিদ্ধ হিন্দু ব্যক্তিকে ইংগ্লণ্ডদেশে প্রেরণ করিতেছেন…।"

(২০ নভেম্বর ১৮৩০। ৬ অগ্রহায়ণ ১২৩৭)

"শ্রীযুত বাবু রামমোহন রায়ের যাত্রা।—শ্রীযুত বাবু রামমোহন রায় স্বীয় পুত্র ও চারি জন পরিচারক সমভিব্যাহৃত হইয়া আলবিয়ননামক জাহাজে আরোহণপূর্ব্বক বিলায়তে গমন করিয়াছেন। কলিকাতার ইঙ্গরেজী সম্বাদপত্রেতে বাবুর এই কর্ম্মেতে অতিশয় প্রশংসা প্রকাশিত হইয়াছে এবং ইংগ্লণ্ডদেশে এমত নানা সুদৃশ্য বস্তু আছে যে তাহাতে ঐ বাবুর যাদৃশ অনুরাগ ও বিদ্যা তদ্দ্বারা বোধ হয় যে তাঁহার তাহাতে অত্যন্ত সন্তোষ জন্মিবে ইহা অবগত হইয়া আমরাও ইত্যবসরে তাঁহার এই কীর্ত্তির অত্যন্ত প্রশংসা করি। গবর্ণমেণ্ট গেজেটে লেখেন যে ঐ বাবু আপন পরিচারকদ্বারা যাত্রা কালে এবং ইংগ্লণ্ডদেশে বাসকরণ সময়েতেও স্বীয় জাতীয় রীত্যনুসারেতে ব্যবহার করিতে পারিবেন।

অপর পত্রে লেখেন যে বাবু রামমোহন রায় যে ব্রাহ্মণ হইয়া প্রথমতঃ ইংগ্লণ্ডদেশে যাত্রা করিতেছেন এমত নহে যেহেতুক ইহার চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে দুই জন ব্রাহ্মণ শ্রীশ্রীযুত বাদশাহের হজুর কৌন্সেলে এক দরখাস্ত দেওনের নিমিত্ত বোম্বেহইতে বিলায়তে গমন করিয়াছিলেন অনন্তর তাঁহারা এতদ্দেশে প্রত্যাগত হইলে তাঁহারদের প্রতি কোন দোষ অর্পিত হয় নাই।"

(১৫ জানুয়ারি ১৮৩১। ৩ মাঘ ১২৩৭)

"১৮৩০, ২২ নভেম্বর।—আলবিয়ননামক জাহাজ গঙ্গাসাগরহইতে সমুদ্রপথে যায় সেই জাহাজে শ্রীযুত বাবু রামমোহন রায় ইংগ্লণ্ডদেশে গমন করেন এবং তাঁহার কএক জন মিত্র তাঁহার সহিত গঙ্গাসাগর পর্য্যন্ত যান।"

(১২ ফেব্রুয়ারি ১৮৩১। ২ ফাল্গুন ১২৩৭)

"শ্রীযুত বাবু রামমোহন রায়।—শ্রীযুত বাবু রামমোহন রায়ের সঙ্গে যে২ চাকর গিয়াছে চন্দ্রিকা-সম্পাদক তাহারদের নাম ধাম আমারদের স্থানে জিজ্ঞাসা করেন তাহাতে আমরা স্পষ্ট উত্তর দি যে তদ্বিষয় আমরা কিছুই জানি না তাহারদের জন্ম কি পিতামাতার নাম কি বিদ্যাভ্যাস বিষয়ে আমরা কিঞ্চিন্মাত্র অবগত নহি বাবুর বিলায়তে গমনের সম্বাদ আমরা কলিকাতার ইঙ্গরেজী সম্বাদপত্রে পাইলাম এবং তাহা আমরা দর্পণের দ্বারা প্রকাশ করিলাম। পরে চাকরের বিষয়ের অনুসন্ধান করা শিষ্টবিশিষ্ট লোকের কর্ম্ম নয় অতএব তৎপত্র সম্পাদক মহাশয়কে আমরা পরামর্শ দি যে তিনি সে বিষয়ের সুরথালকরা মৌকুপ করেন।

গত এক সপ্তাহের প্রকাশিত চন্দ্রিকাপত্রে সম্পাদক মহাশয় ব্যঙ্গোক্তি করিয়া কহেন যে শ্রীযুত রামমোহন রায় জাহাজারোহণ করিয়া সমুদ্রপথে বিলায়ত গমনে জাতিভ্রষ্ট হইয়াছেন। জাতির বিষয়ে যাঁহারা অতিবিজ্ঞ তাঁহারা এ বিষয়ের বিবেচনা করিবেন কিন্তু যে যাত্রায় গমন করিয়াছেন তৎপ্রযুক্ত যে তাঁহার পৈতৃকাধিকার যাইবে না ইহা আমরা স্পষ্ট জানি। কোন গ্রামের প্রধান লোক কোন এক ব্যক্তির জাতি নষ্ট করিতে পারেন অথবা জাতির সমন্বয় করিতে পারেন কিন্তু ভারতবর্ষে আদালতের ডিক্রীবিনা কোন ব্যক্তি আপনার সম্পত্তির অনধিকারী হইতে পারে না এবং অনুমান হয় যে শ্রীযুত রামমোহন রায়কে বিলায়ত দর্শনের বিষয়ে যে পৈতৃকাধিকারে অনংশীকরণ স্বরূপ দণ্ড দিবেন এমত কোন জজসাহেব নাহি।"

(২৭ নভেম্বর ১৮৩০। ১৩ অগ্রহায়ণ ১২৩৭)

"বাবু রামমোহন রায়।—ইণ্ডিয়া গেজেটে লেখে যে বাবু রামমোহন রায় সতীবিষয়ক এক দরখাস্ত পার্লিমেণ্টে দেওনার্থ সমভিব্যাহারে লইয়া বিলায়তে গিয়াছেন। উক্ত বাবু যে জাহাজে গমন করিয়াছেন তাহা এইক্ষণে গঙ্গাসাগর ছাড়িয়া সমুদ্রগত হইয়াছে।"

(৭ জানুয়ারি ১৮৩২। ২৪ পৌষ ১২৩৮)

"১৮৩১, ১৮ জানুয়ারি।—আলবিয়ননামক জাহাজে আরোহণপূর্ব্বক শ্রীযুত বাবু রামমোহন রায় কেপে পঁহুছেন।"

(১৮ জুন ১৮৩১। ৫ আষাঢ় ১২৩৮)

"শ্রীযুত বাবু রামমোহন রায়।—কিয়ৎকাল হইল কেপহইতে এই সম্বাদ আগত হয় যে বাবু রামমোহন রায় নিরুদ্বেগে কেপে পঁহুছিয়া তথাহইতে ইঙ্গলণ্ডদেশে যাত্রা করিয়াছেন যাত্রাকালে তিনি উত্তমরূপে শারীরিক সুস্থ ছিলেন এবং অন্য২ জাহাজারোহিরদের ন্যায় তিনি কাপ্তানসাহেবের মেজের উপর ভোজন করেন না কিন্তু নিয়মমত আপনার কুঠরীতে বসিয়া এবং তিনি যে সকল ভক্ষণীয় দ্রব্য সমভিব্যাহারে লইয়া যান তাহা লইয়া তাঁহার ভৃত্যেরা অহরহর্ভক্ষণীয় প্রস্তুত করে। এইক্ষণে যে তিনি নির্ব্বিঘ্নে ইঙ্গলণ্ডের তটে উত্তীর্ণ হইয়া থাকিবেন এমত আমরা প্রত্যাশা করি এবং হৌস অফ কমন্সের কমিটীর সাহেবেরদের সমক্ষে ভারতবর্ষীয় অবস্থার বিষয়ে সুতরাং তিনি সাক্ষ্য দিবেন অপর ভারতবর্ষের হিতার্থে যে নানা যত্ন করিবেন তৎপ্রযুক্ত ভারতবর্ষের যে শুভফল জন্মিবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

অপর হরকরাপত্রের সুধারাবিশিষ্ট এক জন হিন্দু ইতিস্বাক্ষরিত এক পত্রে প্রেরক লেখেন যে রামমোহন রায়ের বিরুদ্ধাচারিরা এতদ্দেশে এতদ্রূপ প্রবোধ জন্মাইতে চেষ্টান্বিত আছে যে রামমোহন রায় ইঙ্গলণ্ডদেশে গমনকরাতে জাতিভ্রষ্ট হইয়াছেন…।"

রামমোহনের বিলাত-যাত্রায় আন্দোলন

(২৪ সেপ্টেম্বর ১৮৩১। ৯ আশ্বিন ১২৩৮)

"বাবু রামমোহন রায়।—সংপ্রতি প্রকাশিত কস্যচিদ্বিশ্বাসস্য ইতি স্বাক্ষরিত পত্রে লেখক জিজ্ঞাসা করেন যে শ্রীযুত বাবু রামমোহন রায়ের বিলায়ত গমনে ভারতবর্ষের মঙ্গল কি অমঙ্গল হইবে এই প্রশ্নে উত্তরঘটিত অতিদীর্ঘ এক পত্র আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি তাহাতে লেখক লেখেন যে এই পত্র অবিকল আমরা প্রকাশ করি। তাহা করিতে আমরা ক্ষম নহি যেহেতুক তাহাতে রামমোহন রায়ের ঘরের কথাসম্বলিত অনেক গ্লানি আছে অতএব ঐ পত্র প্রকাশ করা আমারদের উপযুক্ত বোধ হয় না। ইহার পূর্ব্বে আমরা অনেকবার চন্দ্রিকাপ্রকাশক মহাশয়ের গৃহকথাঘটিত পত্র প্রাপ্ত হইয়াছিলাম কিন্তু তাহা নিত্যই প্রকাশ করিতে স্বীকৃত হই নাই সংপ্রতিকার পত্র লেখককে আমরা সুজ্ঞাত হইয়া তদ্রূপ নিয়মও এইস্থলে আমারদিগের কর্ত্তব্য হয়। অতএব ঐ পত্রে রামমোহন রায়ের গৃহকথাঘটিতাংশ ত্যাগ করিয়া যদি কেবল তাঁহার সাধারণ কর্ম্মঘটিতাংশ প্রকাশ করিতে অনুমতি দেন তবে প্রস্তুত আছি।"

(১৫ অক্টোবর ১৮৩১। ৩০ আশ্বিন ১২৩৮)

"শ্রীযুত দর্পণপ্রকাশক মহাশয় সমীপেষু।

গত ১৭ সেপ্টেম্বর ২ আশ্বিনের সমাচার দর্পণে (শ্রীপ্রশ্নকার বিশ্বাসস্য) ইতিস্বাক্ষরিত এক পত্র প্রকাশ

হইয়াছে তাহার তাৎপর্য্য শ্রীযুত রামমোহন রায় বিলাত যাওয়াতে অস্মদ্দেশীয়দিগের পক্ষে মঙ্গল হইবেক কি অনিষ্ট দর্শিবেক এই প্রশ্ন করিয়া তাবৎ সম্বাদ প্রকাশকাদি অনেকের স্থানে উত্তর প্রার্থনা করিয়াছেন ইহাতে আপন২ বিবেচনানুসারে উত্তর প্রদান করা উচিত অতএব কিঞ্চিল্লিখি।

রামমোহন রায় বিলাত যাওয়াতে আমারদের দেশের উপকারমাত্র নাই যেহেতু তিনি এতদ্দেশের সর্ব্বসাধারণের উপকারক নহেন বিশেষতঃ হিন্দুবর্গের বিশেষানিষ্টকারী ইহা এদেশে রাষ্ট্র আছে। কিন্তু তাঁহার মতাবলম্বি দশ পাঁচ জনের এবং তাঁহার পুত্রাদির আছে কি না তাহা আমরা বলিতে পারি না অপর তাঁহা হইতে এদেশের সাধারণ উপকার হইবে ইহা কদাচ নহে। কেননা তিনি এদেশীয় লোকের মহান্ ইষ্ট যে ধর্ম্ম কর্ম্ম তাহা নষ্ট করিবার অনেক চেষ্টা করিবায় তাবতেই উত্ত্যক্ত বিরক্ত হইয়াছেন। তৎপ্রমাণ রামমোহন রায়ের বিদ্যা প্রকাশের পূর্ব্বে এতন্নগরে লোক সকলে সুখে বাস করিতেছিলেন অর্থাৎ দৈবকর্ম্ম ও পিতৃকর্ম্মাদিকরণে আচণ্ডালপ্রভৃতির বিশেষ যত্ন ছিল এবং তিনিও স্বয়ং স্বদেশীয়েরদের আচার ব্যবহারাদি বর্ত্মে চলিতেন। হিন্দুর আচার ব্যবহারে থাকিয়া কোন২ ইঙ্গলণ্ডীয় মহাশয়ের অধীনতায় বিশেষতঃ এক শিবিল সরবেণ্ট ডিগ্বি সাহেবের অনুগ্রহেতে অনেক কালাবধি কোম্পানির কাযকর্ম্ম করিয়া কতক গুলিন ধনসঞ্চয় করিয়াছিলেন তৎপরে নগরে আসিয়া কএক জন ভাগ্যবদ্ব্যক্তির নিকটে যাতায়াতকরত এবং বাক্কৌশলাদির দ্বারা আত্মীয়তা প্রকাশ করিলে তাঁহারদের মধ্যে কেহ২ বাধ্য হইয়াছিলেন এই সাহসে কিছু কাল পরেই আত্মীয় সভানামক এক সভা সংস্থাপন করেন কিঞ্চিৎকাল ঐ সভায় কএক জন লোক যাতায়াত করিয়াছিলেন যেহেতুক তাঁহারদের অনুমান হইয়াছিল যে এই সমাজ-দ্বারা বুঝি এদেশের কিছু উপকার জন্মিতে পারে অবশেষে জানিলেন যে সর্ব্বনাশের বীজরোপণ করিতে চাহেন অর্থাৎ ঐ সভায় কেবল দেবদ্বিজাদির দ্বেষমাত্র প্রকাশ হয় তখন সকলে সতর্ক হইলেন ফলতো ভদ্রলোকসকল ঐ সভায় পুনর্গমনাগমন করিলেন না তাহাতেই সে সমাজ ছিন্নভিন্ন হইল। এবং তাঁহার আহার আচার ব্যবহার হিন্দুর ধারামত নহে ইহাও ব্যক্ত হইল। তৎকালাবধি রামমোহন রায় হিন্দুরদের ত্যজ্য হইলেন ইহারো এক প্রমাণ লিখি।

অনেকের স্মরণে থাকিবেক যে পূর্ব্বের চিফজুষ্টিস সর এড্বার্ড হাইডইষ্ট সাহেব যখন হিন্দু কালেজ স্থাপন করেন তখন নগরস্থ প্রায় সমস্ত ভাগ্যবন্ত লোক উক্ত সাহেবের অনুরোধে এবং দেশের মঙ্গল বোধে অনেক২ টাকা চাঁন্দা দিলেন ইহাতে হাইডইষ্ট সাহেব তুষ্ট হইয়া কালেজের নিয়ম করিয়াছিলেন তাহাতে এতদ্দেশীয় মহাশয়েরদের মধ্যে উপযুক্ত পাত্র বিবেচনা করিয়া ঐ পাঠশালায় কর্ম্মাধ্যক্ষ নিযুক্ত করিলেন তন্মধ্যে রামমোহন রায় গ্রাহ্য হইলেন না যেহেতু তাবৎ হিন্দুর মত নহে।

দ্বিতীয় প্রমাণ। রামমোহন রায় হিন্দুরদের সমাজে গ্রাহ্য হওয়া দূরে থাকুক তাঁহার সহিত সহবাস ছিল এই অপরাধে এক জন অতিমান্য লোকের সন্তান বিদ্বান এবং অনেক ধনদানে বিলক্ষণ সক্ষম তিনিও তৎপদে নিযুক্ত হইতে পারিলেন না তাঁহাকে তৎপদাভিষিক্তকরণাশয়ে সদর দেওয়ানীর জজ মেং হেরিংটন সাহেব বিশেষ অনুরোধ করিয়াছিলেন তাহাও রক্ষা হইল না। রামমোহন রায়ের সহবাসে এতাদৃশী দুরবস্থা লোকের ঘটিয়াছে আহার ব্যবহার করিলে কি হইত বলা যায় না এ কথা বিলাতে ইষ্টো সাহেবকে জিজ্ঞাসা করিলে সপ্রমাণ হইবেক।

রামমোহন রায় অনেককালাবধি অনেক প্রকার ভাষা গ্রন্থ ছাপা করিয়া লোককে প্রদান করিয়াছেন তাহা প্রাপ্তিমাত্র সাধুসকল তুষ্ট না হইয়া মহাকষ্টপূর্ব্বক মিসনরি সাহেবেরদের রচিত গ্রন্থের ন্যায় অগ্রাহ্য করিয়াছেন যেহেতু তাহাতে যাহা লেখেন তাহার তাৎপর্য্য স্বেচ্ছাচারি হওয়া উত্তম দেবদেবীপূজা অপকৃষ্ট কর্ম্ম এবং পিতৃমাতৃশ্রাদ্ধতর্পণাদি ত্যাগ করিলে ক্ষতি নাই। ইহা এ প্রদেশের ইতর লোকের বালকেও বিশ্বাস করে না।

রামমোহন রায় আপন গ্রন্থে ঐ বিষয় বারম্বার

প্রকাশ করাতে কএক জন অবোধ এবং কএক জন ধনহীন কেহ বা তাঁহার অধীন ঐ মতাবলম্বী হইল।

অপরঞ্চ রামমোহন রায় হিন্দু কালেজের অধ্যক্ষতায় নিযুক্ত হইতে পারিলেন না একারণ মনোভীষ্ট সিদ্ধির ব্যাঘাতে ব্যাকুল হইয়া অপমান বোধে তদ্দুঃখ মোচনার্থ ইংরেজী বিদ্যাভ্যাসের এক পাঠশালা স্থাপিতা করিলেন তাহার তাৎপর্য্য এই যে অধিকবয়স্ক ব্যক্তি সকল তাঁহার বাক্য অগ্রাহ্য করেন অতএব বালককে উপদেশ করিলে অবশ্য বশ্য হইবে। ক্রমে২ ঐ পাঠশালায় শিক্ষিত ক্ষুদ্রজাতীয় বালক সকল তন্মতাবলম্বী হইল ভদ্র লোকের সন্তান যে কএক জন তন্মতাবলম্বী হইয়াছে সুতরাং তাঁহারদের ধর্ম্মের সংসারে অধর্ম্ম স্পর্শ-হওয়াতে ধর্ম্ম ধন মানহীন হইতেছে ইহা কেহ২ এইক্ষণে বুঝিয়াছেন কেহ বা একেবারে সর্ব্বনাশ না হইলে বুঝিতে পারিবেন না এ কথা (সুপরিষ্টেসিয়ান) বলিয়া যদি কেহ মান্য না করেন তাহাতে হানিবিরহ।

অপর রামমোহন রায় কলোনিজেসিয়ানের পক্ষ ইহাও এদেশ সেদেশ বিখ্যাত আছে তাঁহার বাঞ্ছা কোন প্রকারে এ প্রদেশ কলনাইজ হয় তন্নিমিত্ত তন্মতাবলম্বি শ্রীকালীনাথ রায়প্রভৃতি সতীদ্বেষি কএক জনকে প্রবৃত্তি লওয়াইয়া কলনিজেসিয়ানের পক্ষ আরজীতে স্বাক্ষর করাইয়াছিলেন কিন্তু হিন্দুমাত্রের অভিলাষ নহে যে এদেশে ইঙ্গরেজ লোক আসিয়া চাসবাস করে এবং তালুকদার হয়। তাহাতে যে দোষ তাহা কলনিজেসিয়ানের বিপক্ষ আরজীতে বিশেষরূপে বর্ণনা করিয়া বিলাত পাঠান গিয়াছে। অতএব তিনি কোন প্রকারেই এতদ্দেশীয় সাধারণের উপকারক নন্।

কস্যচিৎ নগরবাসি দর্পণ পাঠকস্য।"

"রামমোহন রায়ের বিষয়ে আমরা যে পত্র দর্পণোপরি প্রকাশ করিলাম তদ্বিষয়ক আমারদিগের কিঞ্চিৎ স্পষ্ট লেখা উচিত। ঐ পত্র ডাকের দ্বারা আমারদের নিকটে পঁহুছে তাহার খামের উপরি ভবানীচরণ এই নাম লিখিত ছিল কেবল এই কারণে এমত নহে কিন্তু ঐ পত্রের অক্ষরচ্ছন্দ এবং উত্তম বিন্যাসদ্বারা বোধ হইয়াছিল যে তাহা শ্রীযুত চন্দ্রিকাসম্পাদক বিজ্ঞ মহাশয়কর্তৃক রচিত হইয়াছে কিন্তু শেষে ঐ পত্র তিমিরনাশক পত্রে অর্পিত হইয়াছে দৃষ্টহওয়াতে তদ্বিষয়ে আমরা কিছু অনুভব করিতে পারিলাম না।"

(২২ অক্টোবর ১৮৩১। ৭ কার্ত্তিক ১২৩৮)

"...ইঙ্গরেজী বিদ্যা ভালরূপে শিক্ষা করিলেই দৈবকর্ম্ম পিতৃকর্ম্ম ত্যাগ করিতে হয় এমত নহে। যদি বল শ্রীযুত রামমোহন রায়ের সহিত যাঁহারদিগের বিশেষ আত্মীয়তা আছে তাঁহারা তদুপদেশে উক্ত কর্ম্মে ক্ষান্ত হইয়াছেন। ইহাও সত্য নহে কেননা শ্রীযুত কালীনাথ মুন্সী তাঁহার পরমাত্মীয় এবং তাঁহার স্থাপিত ব্রহ্মসভায় ইঁহার সর্ব্বদা গমনাগমন আছে তথায় যেপ্রকার জ্ঞানোপদেশ হয় তাহা কি তিনি শ্রবণ করেন না ফলতঃ তাঁহাতে বিচক্ষণ মনোযোগ আছে। অথচ তাঁহার বাটীতে শ্রীশ্রী৺দুর্গোৎসবাদি তাবৎ কর্ম্ম হইয়া থাকে এবং শ্রীযুত বাবু রাজকৃষ্ণ সিংহ ও শ্রীযুত বাবু নবকৃষ্ণ সিংহ ও শ্রীযুত বাবু শ্রীকৃষ্ণ সিংহদিগের সহিত কি রায়জীর আত্মীয়তা নাই। অপরঞ্চ শ্রীযুত বাবু দ্বারিকানাথ ঠাকুরের সহিত রামমোহন রায়ের বিশেষ আত্মীয়তা আছে কিন্তু রায়জী তাঁহার নিত্যকর্ম্ম বা কাম্য-কর্ম্ম কিছুই রহিত করাইতে পারিয়াছেন তাহা কখনই পারিবেন না ঐ বাবুর বাটীতে ৺দুর্গোৎসব ও ৺শ্যামাপূজা ও ৺জগদ্ধাত্রী পূজা ইত্যাদি তাবৎ কর্ম্ম হইয়া থাকে। অতএব এমত কোন হিন্দু আছে যে দৈব ও পিতৃ কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া আপনাকে হিন্দু বলাইতে চাহে। কিন্তু বাবুদিগের বাটীতে এই মহোৎসবে তাঁহারদিগের আত্মীয় তাবৎ লোক নিমন্ত্রিত হইয়া আগমন করিবেন অনুমান করি কেবল শ্রীযুত রাধাপ্রসাদ রায় ইহাতে বঞ্চিত হইবেন যেহেতু তিনি পিতার নিয়মের অন্যথা করিতে পারিবেন না কেননা আমরা অনেক দিবসাবধি শুনি নাই যে রামমোহন রায় কোন স্থানে প্রতিমা দর্শন করিতে গিয়াছিলেন কিন্তু প্রায় বিশ বৎসরের পূর্ব্বে দেবপূজা করিতেন এবং অনেক স্থানে দর্শনার্থ গমন করিয়াছিলেন তাহা এতন্নগরেই দেখা শুনা গিয়াছে।—চন্দ্রিকা।"

বিদেশে রামমোহনের সম্মান

(২০ আগষ্ট ১৮৩১ । ৫ ভাদ্র ১২৩৮)

"শ্রীযুত বাবু রামমোহন রায়।— ১৮৩১ সালের ১২ আপ্রিলের লিবরপুলনগরের পত্রে লেখে যে শ্রীযুত বাবু রামমোহন রায় ৮ আপ্রিলে নির্ব্বিঘ্নে ঐ নগরে পঁহুছেন এবং উপনীত হইয়া অবধি নগরস্থ প্রধান২ ব্যক্তিরদের সঙ্গে বাবুর আলাপকরণে প্রায় প্রত্যেক ঘণ্টাক্ষেপ হয়। পরে ১২ তারিখে নগরস্থ ইষ্টইণ্ডিয়া কমিটীর কএক জন সাহেব বাবু রামমোহন রায়ের আগমনজন্য সন্তোষ জ্ঞাপনার্থ তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া কহিলেন যে কোম্পানির বিরুদ্ধে আপনি আমারদিগের যে অনেক প্রকার সাহায্য করিবেন এমত আমারদের ভরসা। তাহাতে বাবু উত্তর করিলেন যে আমার যেং অভিপ্রেত তাহা বিরোধের দ্বারা নিষ্পত্তি না হইয়া সদাদ্বারা যে নিষ্পত্তি হয় এমত বাঞ্ছা। আদালতসম্পর্কীয় কোন২ সুনিয়ম করিতে এবং স্বীয় বাণিজ্য রহিত করিতে এবং দেশমধ্যে লবণাদির এক চেটিয়ারূপে ব্যবসায় ত্যাগ করিতে এবং ইউরোপীয়েরদিগকে স্বচ্ছন্দে ভারতবর্ষে আগমন ও বসবাসার্থ অনুমতি দিতে এবং মোকদ্দমাব্যতিরেকে তাঁহারদিগকে তদ্দেশবহির্ভূত করিতে যে ক্ষমতা আছে তাহা রহিত করিতে ইত্যাদি বিষয়ে যদ্যপি কোম্পানি বাহাদুর স্বীকৃত হন তবে তাঁহারা যে পুনর্ব্বার চার্টর পান ইহাতে আমি বিপক্ষতাচরণ না করিয়া বরং সপক্ষ হইব।"

(৩ সেপ্টেম্বর ১৮৩১ । ১৯ ভাদ্র ১২৩৮)

"শ্রীযুত বাবু রামমোহন রায়।—ইঙ্গলণ্ডহইতে শেষাগত সম্বাদের দ্বারা অবগত হওয়া গেল যে শ্রীযুত বাবু রামমোহন রায় লিবরপুল নগরহইতে লণ্ডন নগরে গমন করিয়া এক শরাইতে বাস করিতেছেন। তিনি অতিসমাদরপুরঃসর তত্রত্যকর্তৃক গৃহীত হন এবং রাজধানীর অতিমান্য অনেক শিষ্টবিশিষ্ট মহাশয়েরা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন।"

(১৭ সেপ্টেম্বর ১৮৩১ । ২ আশ্বিন ১২৩৮)

"শ্রীযুত বাবু রামমোহন রায়।— বাবু রামমোহন রায় যে সময়ে লিবরপুলনগরে অবস্থিত তৎসময়ে তন্নগরস্থ তাবন্মান্য লোক তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাদর্থ আগত হন। পরে ঐ নগর ও তৎসন্নিহিত যে সকল সুদৃশ্য বিষয় ছিল তাহা তিনি দর্শন করিলেন কিন্তু মাঞ্চিষ্টর নগরের লৌহঘটিত রাস্তা দৃষ্টি করিয়া তাঁহার বিশেষ চমৎকার হয়। তিনি পরীক্ষার দ্বারা ঐ অদ্ভুত ব্যাপারের প্রকারসকলের বিষয় বিবেচনা করিতে ক্ষম হন এতদর্থ তৎকর্ম্মাধ্যক্ষেরা রাস্তার উপরি তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতে প্রস্তাব করিলেন অতএব তাঁহারা পূর্ব্বাহ্নে সাত ঘণ্টার সময়ে যাত্রা করিয়া বাষ্পের গাড়িতে এক ঘণ্টা বিংশতি মিনিটে পনর ক্রোশ গমন করিয়া মাঞ্চিষ্টরনগরে পঁহুছিলেন। যাত্রাকালীন গাড়ি কোন২ সময়ে ঘণ্টায় পনর ক্রোশের হিসাবে চলিল তাহাতে রামমোহন রায় যেপর্য্যন্ত চমৎকৃত হইলেন তাহা তিনি কহিতে অসমর্থ। পরে মাঞ্চিষ্টরনগরে পঁহুছিলে তিনি নানা শিল্পের কারখানা দেখিতে গেলেন। যখন তাঁহার পদব্রজে গমন করিতে হইল তখন নগরস্থ প্রত্যেক নিষ্কর্ম্ম ব্যক্তিরা আবাল বৃদ্ধ বনিতা এবং কর্ম্মি অনেক ব্যক্তিও স্ব২ কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া দর্শনার্থ তাঁহাকে আসিয়া ঘেরিল। পরিশেষে তিনি তথাহইতে সরাইতে ফিরিয়া আসিয়া লিবরপুলে প্রস্থান করিলেন এবং ঐ নগরে তিনি আরো নয় দিন অবস্থিতি করেন।

অনন্তর রামমোহন রায় লণ্ডন নগরে গমন করিলেন কিন্তু পথিমধ্যে যেং স্থানে গাড়ি দুই মিনিট স্থগিত থাকে সেইস্থানেই চতুর্দ্দিগে ইঙ্গলণ্ডদেশ দর্শনার্থ আগত বিদেশি ব্যক্তিকে দিদৃক্ষু মহাজনতা উপস্থিত হইল। তিনি যেমন দেশদিয়া শকটারোহণে চলিতে লাগিলেন তেমনি কোনস্থানে পর্ব্বত কোনস্থানে উপত্যকা ভূমি ও উৎকৃষ্ট কৃষ্ট ক্ষেত্র ও খাল ও নদী ও সাঁকো ও জমীদারেরদের বসতবাটী ইত্যাদি মহাধনি ব্যক্তিরদের চিহ্ন দেখিয়া মহাহৃষ্টচিত্ত হইলেন। মধ্যে২ তিনি ব্রাহ্মণপরায়ণ ভারতবর্ষাপেক্ষা ইঙ্গলণ্ডদেশের এতাবদৌৎকর্ষের চিহ্নসকল তৎসহচর যুব রাজচন্দ্রকে [রাজারামকে] দর্শাইতে লাগিলেন। পরে রামমোহন রায় লণ্ডননগরে পঁহুছিলে দুই শত অতিশিষ্ট মান্য জন তাঁহার নিকটাগত হইয়া তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাত করিলেন কিন্তু কেপে তাঁহার পদদেশে যে আঘাত হইয়াছিল তাহার বেদনাতে তাঁহারদের প্রতিসাক্ষাদর্থ গমন করিতে তিনি ক্ষম

হইলেন না। সর এড্‌ওয়ার্ড হৈড ইষ্ট সাহেব কোন এক দিবস তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলে ঐ সাহেব যে পার্লিমেণ্টের সুধারার বিপক্ষ তদ্বিষয়ে রামমোহন রায় তাঁহাকে কিঞ্চিৎ উপহাস করিলেন। ঐ সাহেব তাঁহার যুক্তিসিদ্ধ কথাসকল খণ্ডন করণার্থ যত্ন করিলেন। পরিশেষে তাঁহার গৃহে যে মহোৎসব হইবে তাহাতে বাবু রামমোহন রায়কে আহ্বান করিলেন।

অপর রামমোহন রায়ের সহচর যুব রাজচন্দ্র এক দিবস নগরোদ্যানে ভ্রমণকরতঃ শ্রীমতী রাণীকে দেখিলেন তাহাতে শ্রীমতী তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে ডাকিয়া অনেক কথোপকথনানন্তর রামমোহন রায় ও ভারতবর্ষপ্রভৃতি-বিষয়ে অনেক প্রশ্ন করিলেন।···

অকিঞ্চনের বোধে এই হয় যে তাঁহার বিলায়ত গমনে ভারতবর্ষের অত্যন্ত হিতের সম্ভাবনা তাহার কারণ এই২ প্রথমতঃ যে সময়ে ভারতবর্ষের উত্তরকালীন বন্দোবস্তের আন্দোলন হইতেছে এবং যে সময়ে রাজমন্ত্রী ও পার্লিমেণ্ট এতদ্দেশের তাবদ্বিষয়ক সম্বাদের অনুসন্ধান করিতেছেন এমত সময়ে তিনি তথায় উপস্থিত হইয়াছেন। দ্বিতীয়তঃ রামমোহন রায় এতদ্দেশের তাবদ্বিষয় সুজ্ঞাত এতদ্দেশে যাহার২ আবশ্যক তাহা ও তৎপ্রাপণের উপায় তিনি অভিজ্ঞ গবর্ণমেণ্টের কিরূপ চাইল্‌ তাহা অবগত আছেন। এবং সংপ্রতিকার রাজকর্ম্ম নির্ব্বাহকরণেতে যে কলঙ্ক থাকে তাহাতেও তাঁহার বিজ্ঞতা আছে এবং যেং রূপ মতান্তর করিলে ভারতবর্ষের উন্নতি হইবে তাহাও তিনি জ্ঞাপন করিতে ক্ষম বটেন। তৃতীয়তঃ রামমোহন রায় স্বদেশীয় লোকেরদের সর্ব্বপ্রকারে হিতৈষী এবং যাহাতে তাঁহার বোধে ভারতবর্ষের অমঙ্গল হয় এমত তিনি কোন পরামর্শ দিবেন না এমত কোন প্রস্তাব করিবেন না এইপ্রযুক্ত তাঁহার পরামর্শ অনেকেরি অতিগ্রাহ্য হইবে। এবং বিশেষতঃ তিনি যে এতৎসময়ে ইঙ্গলণ্ডদেশে গমন করিয়াছেন ইহা ভারতবর্ষের অতিশুভসূচক অনুমান করিলাম।

সতীর বিষয় রামমোহন রায়ের কোন উক্তিদ্বারা যে নিষ্পন্ন হইবে এমত আমারদের বোধ নয় তদ্বিষয় শ্রীযুত রাজমন্ত্রিরা আপনারদের ভদ্রাভদ্র জ্ঞানানুসারেই সম্পন্ন করিবেন··· ।”

(১২ নভেম্বর ১৮৩১। ২৮ কার্ত্তিক ১২৩৮)

“বাবু রামমোহন রায়।—অত্যন্তাহ্লাদপূর্ব্বক জ্ঞাপন করিতেছি যে শ্রীযুক্ত আনরবিল কোর্ট অফ ডৈরেক্তর্স সাহেবেরদের কর্ত্তৃক শ্রীযুত বাবু রামমোহন রায়ের নিমিত্ত সম্ভ্রমসূচক এক মহা ভোজ প্রস্তুত হইয়া তাহাতে আশী জন সাহেব নিমন্ত্রিত হন। অপর কোম্পানি বাহাদুরের সভাপতি ঐ ভোজে অধ্যক্ষস্বরূপ উপবেশন করেন এবং শ্রীযুত বাবু রামমোহন রায় তাঁহার বামপার্শ্বে উপবেশিত হন। অপর যথারীতি রাজাপ্রভৃতিরদের মদ্যপানাদি হইলে ঐ সভাপতি গাত্রোত্থানপূর্ব্বক রামমোহন রায়ের সম্মানার্থ পান করিতে সকলকে আহূত করিলেন পরে তিনি ঐ অতিশিষ্টবিশিষ্ট বিজ্ঞ ব্রাহ্মণের নানা গুণোৎকীর্ত্তনানন্তর ভারতবর্ষের হিতার্থে তাঁহার যে সকল উদ্যোগ তৎপ্রস্তাব করিলেন। তৎপরে কহিলেন যে রামমোহন রায়কে আদর্শক জ্ঞান করিয়া অন্য২ অতিশিষ্টবিশিষ্ট জ্ঞানি মানি মহাশয়েরা যে ইঙ্গলণ্ড দেশে আগমন করিবেন এমত আমারদের দৃঢ় প্রত্যয় জন্মিয়াছে।

অতএব রামমোহন রায় ইঙ্গলণ্ড দেশে কিপর্য্যন্ত মান্য হইয়াছেন তাহা এতদ্দেশীয় পাঠক মহাশয়েরদের এতদ্দ্বারা সুগোচর হইবে · ।”

(২৯ অক্টোবর ১৮৩১। ১৪ কার্ত্তিক ১২৩৮)

‘বাবু রামমোহন রায়। সংপ্রতি ইঙ্গলণ্ড দেশ-হইতে আগত সম্বাদপত্রের দ্বারা অবগত হওয়া গেল যে শ্রীযুত বাবু রামমোহন রায় শ্রীযুত কোর্ট অফ ডৈরেক্তর্স সাহেবেরদের কর্ত্তৃক অতি সমাদরপূর্ব্বক গৃহীত হইয়াছেন এবং সংপ্রতি আডিসকোম স্থানে যুদ্ধ শিক্ষকেরদের পরীক্ষা দর্শনার্থ তাঁহারদের সঙ্গে তথায় গমন করিয়াছেন।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের বিষয়ে বাবুর অভিপ্রায়-বিষয়ক অমূলক কতক প্রস্তাব ইঙ্গলণ্ডীয় সম্বাদপত্রে প্রকাশিত হওয়াতে বাবু টাইম্‌সনামক সম্বাদপত্রসম্পাদকের নিকটে এক পত্র প্রেরণ করিয়া এই নিবেদন করিয়াছেন যে এতদ্বিষয়ে আপনারা কিঞ্চিৎকাল ক্ষান্ত থাকুন

ভারতবর্ষে স্থাপিত গবর্ণমেণ্টের বিষয়ে আমার যাহা বক্তব্য তাহা অল্পকালের মধ্যে এক ক্ষুদ্র পুস্তক প্রকাশ করিয়া ব্যক্ত করিতেছি।"

(১০ ডিসেম্বর ১৮৩১। ২৬ অগ্রহায়ণ ১২৩৮)

"বাবু রামমোহন রায়।—বাবু রামমোহন রায়ের নিত্যালাপি এমত এক জন সাহেবের ১৮ জুলাই তারিখের পত্রে অবগত হওয়া গেল যে বাবু এইক্ষণে বিলক্ষণ স্বস্থ হইয়াছেন। উক্ত বাবু শ্রীযুত বাদশাহের ভ্রাতা শ্রীযুত ড্যুক অফ সসেক্সের সহিত প্রায় এক দিবস ব্যাপিয়া আলাপ করেন তাহাতে ঐ ড্যুক অত্যন্তানুরক্ত বোধ হয় বাদশাহের পুত্র শ্রীযুত অর্ল মনিষ্টরের সঙ্গে পূর্ব্বে তাঁহার পরিচয়াদি ছিল। ইত্যাদি যে সকল মহাশয়েরদের সঙ্গে তাঁহার সম্পর্ক হইয়াছে তদ্দ্বারা বাবু রাজদরবারে ও রাজমন্ত্রির চক্রের মধ্যে এইক্ষণে গৃহীত হইয়াছেন। কথিত আছে যে উক্ত বাবু যেরূপ লোকেরদিগকে বাধ্য করিতেছেন তদ্দৃষ্টে কোর্ট অফ ডৈরেক্তর্স সাহেবেরদের উদ্বেগ জন্মিয়াছে এবং দিল্লীর বাদশাহ যে এমত উত্তম ব্যক্তিকে উকীলস্বরূপ নিযুক্ত করিয়াছেন ইহাতে ঐ বাদশাহের সৌভাগ্য সকলেই জ্ঞান করিতেছেন। অতএব কলিকাতাস্থ কতক এতদ্দেশীয় লোকেরদের আশা মিথ্যা জ্ঞান করিবা আমরা সংপ্রতি লিখিয়াছিলাম যে রামমোহন রায় ইঙ্গলণ্ড-দেশে পরমসমাদরে গৃহীত হইয়াছেন তাহা এইক্ষণে প্রমাণ হইল।"

(১৪ জানুয়ারি ১৮৩২। ২ মাঘ ১২৩৮)

"১৮৩১ সালের বর্ষফল।—

জুলাই, ৬। কোম্পানি বাহাদুরের কোর্ট অফ ডৈরেক্তর্স সাহেবেরা বাবু রামমোহন রায়কে সম্ভ্রমার্থে এক দিন ভোজন করান।

সেপ্তেম্বর, ৭। বোর্ড কন্ট্রোলের সভাপতি শ্রীযুত রাইট আনরবিল চার্লস গ্রাণ্ট সাহেব শ্রীযুত বাবু রামমোহন রায়কে দরবারের সময়ে বাদশাহের সঙ্গে সাক্ষাৎ করান এবং শ্রীযুত তাঁহাকে অতিসমাদরপূর্ব্বক গ্রহণ করেন।

(২২ ফেব্রুয়ারি ১৮৩২। ১১ ফাল্গুন ১২৩৮)

"...ইঙ্গলণ্ড দেশের বাদশাহের দরবারের আকবারে রামমোহন রায়ের বাদশাহের সঙ্গে সাক্ষাৎকরণবিষয়ে এই লেখে যে তিনি তৎসময়ে ব্রাহ্মণের বেশ অর্থাৎ উষ্ণীষ ও কাবা পরিধান করিয়া আগত হইলেন ঐ কাবা নীলবর্ণ মকমল অথচ স্বুবর্ণমণ্ডিত।"

ভারতের মঙ্গলার্থে রামমোহনের প্রচেষ্টা

(১৪ মার্চ্চ ১৮৩২। ৩ চৈত্র ১২৩৮)

"বাবু রামমোহন রায়।—হরকরা সম্বাদপত্রের দ্বারা শ্রুত হওয়া গেল যে শ্রীশ্রীযুত ইঙ্গলণ্ড দেশের রাজার ভ্রাতা শ্রীযুত ড্যুক অফ কম্বর্লেণ্ট শ্রীযুত বাবু রামমোহন রায়কে সঙ্গে লইয়া কুলীনেরদের সভায় সভ্যেরদের সহিত সাক্ষাৎ করাইলেন। ভারতবর্ষের ব্যাপারের বিষয়ে তাঁহার যে বিবেচনা তাহা তিনি মৌখিকে জ্ঞাপন করিতে স্বীকৃত না হইয়া লিখিতে প্রস্তুত আছেন তাহা আমারদের নিকটে পঁহুছিবামাত্র অগৌণে পাঠক মহাশয়েরদিগকে জ্ঞাপন করিব।"

(২৪ মার্চ ১৮৩২। ১৩ চৈত্র ১২৩৮)

"রাজা রামমোহন রায়।—ইণ্ডিয়া গেজেট পত্রের দ্বারা অবগত হওয়া গেল যে ভারতবর্ষের রাজস্ব ও আদালত-সম্বলিত ও বাণিজ্যবিষয়ক নিয়মসম্পর্কীয় কতক প্রশ্ন লিখিয়া রায়জীকে দেওয়া যায় ইহার উত্তর প্রত্যুত্তর সকল তিনি প্রস্তুত করিতেছেন। রাজস্বের নিয়মবিষয়ক উত্তর তিনি দাখিল করিয়াছেন কথিত আছে যে সকলেই তাহাতে পরম সন্তুষ্ট হইয়াছেন ভারতবর্ষের আদালতসম্পর্কীয় নিয়মের যে প্রশ্ন হয় তাহার উত্তর সেপ্তেম্বর মাসের প্রথমেই প্রায় সম্পন্ন হইয়াছিল এবং তিনি যখন এই সকল বিষয়ের উত্তর বিস্তারিতরূপে প্রস্তুত করিবেন তখন দেওয়ানী ও ফৌজদারী জমীদারপ্রভৃতির তাবন্নিয়ম তন্মধ্যে সুপ্রকাশিত হইবে। উক্ত আছে যে জুরীর দ্বারা মোকদ্দমা নিষ্পন্নকরা ও আদালতসম্পর্কীয় এতদ্দেশীয় ব্যক্তির-দিগকে নিযুক্তকরা ও ইউরোপীয় সাহেবেরদের সহকারি এতদ্দেশীয় জজ নিযুক্তকরা ও তাবদ্বিষয়ের প্রকৃত রেজিষ্টরী রাখা ও তাবৎ দেওয়ানী ও ফৌজদারী আইনের সংহিতাকরা ও পারস্যের পরিবর্ত্তে ইঙ্গরেজী ভাষা ব্যবহার হওনপ্রভৃতি এতদ্দেশের নানা সৌষ্ঠবসূচক প্রস্তাব তিনি করিয়াছেন।

শ্রীযুত দিল্লীর বাদশাহের স্থানে শ্রীযুত রামমোহন রায় যে রাজা খ্যাতি প্রাপ্ত হন তাহাতে শ্রীযুত ইঙ্গলণ্ডের বাদশাহের মন্ত্রিগণ স্বীকৃত হইয়াছেন এবং তৈমুরবংশের বংশধরের উকীলস্বরূপে তিনি শ্রীযুত ইঙ্গলণ্ডাধিপকর্তৃক সংগৃহীত হইয়াছেন অতএব শ্রীযুত বাদশাহের মুকুট ধারণ মহোৎসবসময়ে ইউরোপের নানা রাজার প্রতিনিধিরদের নিমিত্ত যে আসন নির্দিষ্ট হইয়াছিল তাহাতে শ্রীযুত রাজা রামমোহন রায়কে স্থান দেওয়া গেল।

অতএব উক্ত রাজাজীউর বিলায়ত গমনেতে ভারতবর্ষের মঙ্গল সম্ভাবনা যে পূর্ব্বে আমরা লিখিয়াছিলাম এইক্ষণে তাহার সুফলের লক্ষণ হইতেছে পাঠক মহাশয়েরদের ইহাতে স্পষ্ট বোধ হইবে। এবং রামমোহন রায়ের ধর্ম্মাবলম্বনবিষয়ে যদ্যপি এতদ্দেশীয় লোকেরদের সম্মতির অনৈক্য থাকে তথাপি রায়জী যে এতদ্দেশীয় অতিবিজ্ঞ ব্যক্তিরদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং ভারতবর্ষের হিতার্থ যে উত্তম পরামর্শ দিতে ক্ষমতাপন্ন ইহাতে কাহারো বিপ্রতিপত্তি নাই।...”

(১২ জানুয়ারি, ১৮৩৩ । ১ মাঘ ১২৩৯)

“১৮৩২, জুন।—ভারতবর্ষীয় বিষয়সম্পর্কীয় হৌস অফ কমন্সের প্রতি শ্রীযুত রামমোহন রায় যে প্রশ্নোত্তর লিখিয়াছেন তাহা কলিকাতার সম্বাদপত্র ও দর্পণে প্রকাশহওয়াতে এতদ্দেশীয় অনেক সম্বাদপত্রমধ্যে অবিকল অর্পণ হইয়া তাঁহার উক্তিবিষয়ক অনেক বাদানুবাদ হয়।”

(২ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৩ । ২২ মাঘ ১২৩৯)

“রাজা রামমোহন রায়।—ভারতবর্ষীয় লোককর্তৃক খ্রীষ্টীয়ান লোকের মোকদ্দমার বিচারকরা এবং তিন রাজধানীতে জুষ্টিস অফ পীসের কর্ম্ম করা এবং গ্রান্দজুরীতে নিযুক্তহওনের ক্ষমতা অর্পণার্থ অল্প দিন হইল ইঙ্গলণ্ড দেশে যে ব্যবস্থা নির্দ্ধার্য্য হয় তদ্বিষয়ক রাজা রামমোহন রায়ের এক পত্র গত রবিবারের রিফার্মরপত্রে [২৭ জানুয়ারি] প্রকাশিত হয়। ঐ পত্রের উপকারকতা এই যে রাজা রামমোহন রায়ের বিলায়তে গমনেতে ভারতবর্ষের কিপর্য্যন্ত মঙ্গল। ঐপত্র অতিবাহুল্যপ্রযুক্ত দর্পণে অর্পণ সম্ভবে না। এবং ঐ ব্যবস্থা নির্দ্ধার্য্য হইয়াছে-প্রযুক্ত রাজা রামমোহন রায়ের পত্রের উক্তি প্রকাশকরণের তাদৃশ আবশ্যকতা নাই।”

বর্দ্ধমান-রাজের সহিত মোকদ্দমায় রামমোহনের জয়লাভ

(১৫ ডিসেম্বর ১৮৩২ । ২ পৌষ ১২৩৯)

“রাজা রামমোহন রায়ের নামে বর্দ্ধমানের মহারাজের মোকদ্দমা।—রাজা রামমোহন রায়ের পক্ষে সদর দেওয়ানী আদালতে যে ডিক্রী হইয়াছে তাহার অনুবাদ দর্পণের এক স্থানে অর্পণ করিলাম তাহা পাঠ করিতে পাঠক মহাশয়েরদের স্পৃহা হইতে পারে।—

সদর দেওয়ানী আদালত।
কলিকাতার প্রবিন্স্যল আপীল আদালত।
শ্রীযুত রাটরি সাহেবের সমক্ষে।
১৮৩১ সাল ১০ নবেম্বর।

মহারাজ তেজশ্চন্দ্র আপেলাণ্ট ফরিয়াদী রামমোহন রায় ও গোবিন্দপ্রসাদ রায় রিস্পণ্ডেণ্ট আসামী।

দাওয়া। মহালের রাজস্বের বাকি বলিয়া কিস্তিবন্দি খত সুদসমেত ১৫০০২ টাকা।

রামকান্ত রায়ের উত্তরাধিকারী আসামীরদের নামে ফরিয়াদী উক্ত দাওয়ার বিষয়ে ১৮২৩ সালের ১৬ জুন তারিখে কলিকাতার প্রবিন্স্যল আপীল আদালতে নালিশ করেন। নালিশের কারণ এই।

আসামীরদের পিতা ও পিতামহ রাধানগরের রামকান্ত রায় ফরিয়াদীর স্থানে এক জমীদারীর ইজারা লন পরে বলিয়া ও বাগদী প্রভৃতি পরগণার জমা বাকি পড়াতে তাঁহার ৭৫০১ টাকা দেনা হইল ঐ টাকা বাঙ্গালা ১২০৪ সালের ১৫ আশ্বিনে কিস্তিবন্দি করিয়া দিতে অঙ্গীকার করিয়া এক কিস্তিবন্দি খত লিখিয়া দেন এবং তাহাতে জিলা বর্দ্ধমানের জজ ও রেজিষ্টর সাহেব এবং হুগলির শ্রীযুত সি বুরুস সাহেব স্বাক্ষর করেন কিন্তু রামকান্ত রায় ঐ টাকা না দিয়া বাঙ্গালা ১২১০ সালে পরলোকগত হন এইক্ষণে ঐ দেনা আসল ও সুদসমেত ১৫০০২ টাকা হইয়াছে। আসামীরা মৃত ব্যক্তির সম্পত্তির উত্তরাধিকারী

কিন্তু ঐ টাকা শোধকরণের কিছু বন্দোবস্ত করিবেন না এইপ্রযুক্ত ফরিয়াদী তাঁহারদের নামে নালিশ করেন।

তাহাতে রামমোহন রায় এই উত্তর করেন যে কোন্ সময়ে ও কিনিমিত্তে কিস্তিবন্দির খতে সহী হয় ইহার কিছুমাত্র আমি জানি না। আমার ৺পিতাঠাকুর রামকান্ত রায় সম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন যদ্যপি রাজস্বের বাকীবিষয়ে ফরিয়াদীর কোন দাওয়া থাকিত তবে আমার স্থানে না করিয়া তিনি বর্ত্তমানেই তাঁহার স্থানে ঐ দাওয়া করিতেন। আমার ৺পিতাঠাকুরের উত্তরাধিকারিত্বরূপে আমি কিছু সম্পত্তি পাই নাই বরং আমার আচার ব্যবহার ও ধর্ম্ম-বিষয়ক বিবেচনাপ্রযুক্ত আমি স্বীয় বংশ্যহইতে নির্লিপ্ত হই এবং আমার পিতাঠাকুর থাকিতেও তাঁহার সঙ্গে ও স্বীয় পরিজনের সঙ্গে আমি পৃথক্ অতএব আমাকে উত্তরাধিকারী বলিয়া ফরিয়াদী আমার নামে উক্ত বিষয়ে কোন নালিশ করিতে পারেন না। ফরিয়াদী কিস্তিবন্দির খতের বিষয় কহিয়াছেন বাঙ্গালা ১২০৪ সালে তাহা দেওনের করার ছিল ঐ তারিখের পর সাত বৎসরপর্য্যন্ত আমার পিতা বর্ত্তমান থাকেন তাঁহার পরলোক ১২১০ সালে হয় কিনিমিত্তে এ পর্য্যন্ত তাঁহার স্থানে দাওয়া করেন নাই অতএব এই দাওয়া কখন প্রকৃত নহে যদ্যপি যথার্থের ন্যায় স্বীকার করা যায় তথাপি দেনাদারব্যক্তি জীবৎ থাকিতে কিনিমিত্ত সাত বৎসরপর্য্যন্ত ঐ টাকার দাওয়া করেন নাই ইহার কারণ অবশ্য ফরিয়াদীর দর্শাইতে হইবে। এইক্ষণে ছাব্বিশ বৎসর পরে তিনি আমারদের নামে এতদ্বিষয়ে নালিশ করেন ইহা ১৭৯৩ সালের ৩ আইনের ৪ ধারার বিধির বিপরীত। এই সুস্পষ্ট ত্রুটির বিষয়ে ফরিয়াদী যে ওজোর করিয়াছেন তাহা কোনপ্রকারে গ্রাহ্য হইতে পারে না। তাঁহার প্রথম ওজোর এই কেবল মৈত্রতাপ্রযুক্ত এত কালপর্য্যন্ত তদ্বিষয়ে ক্ষান্ত ছিলেন। দ্বিতীয় ওজোর এই যে আসামীর ভ্রাতা জগমোহন রায় তাঁহার নিকটে উমেদোয়ার ছিলেন তৃতীয়তঃ আসামী স্বয়ংকে জিলার মধ্যে দেখা পাওয়া যায় নাই। যে মৈত্রতাপ্রযুক্ত ফরিয়াদী কহিতেছেন যে তিনি আপনার দাওয়ার টাকা চাহেন নাই তদ্বিষয়ে উত্তর দেওনের আবশ্যকই নাই। দ্বিতীয় ওজোরের বিষয়ে একমাত্র উত্তর দেওয়া আবশ্যক যে জগমোহন রায় বাঙ্গালা ১২১৮ সালে লোকান্তরগত হন তাহাও তের বৎসর হইল যদ্যপিও তিনি ফরিয়াদীর নিকটে উমেদোয়ার থাকিতেন তথাপি তাহাতে এই ন্যায্য দাওয়াকরণের কিছু আপত্তি ছিল না। পরিশেষে কহেন যে আসামী অর্থাৎ আমার অবস্থিতি-স্থানের কিছু ঠিকানা পান নাই ইহার বিচারকরণেরও কিছু অপেক্ষা করে না যেহেতুক আসামী কখন কোম্পানি বাহাদুরের এলাকার বাহিরে ছিলেন না তিনি অনেককাল রামগড় ও ভাগলপুর ও রঙ্গপুরে বাস করিয়াছিলেন এবং গত নয় বৎসরাবধি কলিকাতা মহানগরে বাস করিতেছেন হুগলিতেও তাঁহার বাটী আছে এবং বর্দ্ধমানের কালেক্টরী এলাকার মধ্যেও তাঁহার অনেক বিষয় আছে অধিকন্তু ফরিয়াদীর নিজ জমীদারীর মধ্যেই তাঁহার ভারি জমার অনেক পত্তনিতালুক আছে এবং কলিকাতার মধ্যেও আছে তাঁহার এই সকল বিষয় সম্পত্তি সুজ্ঞাত হইয়াও ফরিয়াদী একবারো কখন উক্ত দাওয়াবিষয়ক প্রস্তাবও করেন নাই। এমত অন্যায় দাওয়াকরাতে কেবল আসামীর ক্লেশ দুঃখ দেওয়াব্যতিরেকে আর কিছুমাত্র অভিপ্রায় দৃষ্ট হইতেছে না। এই অনুভব আরো ইহাতে স্পষ্ট বোধ হইতেছে যে আসামীর ভাগিনেয়* গুরুদাস মুখোপাধ্যায় ফরিয়াদীর পুত্র মহারাজ প্রতাপচন্দ্রের বাটীর দেওয়ান ছিলেন এবং যুব মহারাজের পরলোকগমনোত্তর রাণীরদের স্বত্ব স্থিররাখনার্থ আদালতে তিনি ঐ রাণীরদের উকীল হইয়া ফরিয়াদীর বিরুদ্ধপক্ষে ছিলেন। আসামীর সঙ্গে ঐ উকীলের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কথাকাতে ফরিয়াদী বোধ করিলেন যে ঐ উকীল আসামীর পরামর্শ সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করিয়াই আদালতে সওয়াল জওয়াব করিয়া থাকেন এইপ্রযুক্ত আসামী একেবারে তাঁহার ক্রোধপাত্র হইলেন অতএব ফরিয়াদী আসামীর প্রতি জাতক্রোধ হইয়াই আসামীকে এককালে বিনষ্টকরণার্থ এই নালিশ করিয়াছেন এবং ফরিয়াদী ভরসা করেন যে তাঁহার সম্ভ্রম ও প্রতাপপ্রযুক্ত তাঁহার পক্ষেই জয় হইবে এবং তাঁহার এমত অসংখ্যক ধন আছে যে ঐ ক্রোধানুরূপ

* 'দৌহিত্র' হইবে, কারণ ইংরেজী রায়ে 'daughter's son' আছে।

ইষ্টসিদ্ধ হওয়াতে আসামীকে যদি একেবারে বিনষ্ট করিতে পারেন তবে নালিশের ভূরি২ ব্যয়ের নিমিত্ত তাঁহার ভ্রূক্ষেপও হইতে পারে না।

জওয়াব ফরিয়াদী আপন নালিশের হেতুবাদ সকল যে স্প্রেকারে স্থির রাখিয়া অধিক কথার মধ্যে এই লিখিলেন যে আসামীর পিতা তাঁহার অতিসম্ভ্রান্ত মোস্তাজের মধ্যে গণ্য ছিলেন এবং তাঁহার সঙ্গে অত্যন্ত আত্মীয়তা ছিল। যখন২ তাঁহার স্থানে কিস্তিবন্দির টাকা কহিতেন তখনি তিনি এই ওজোর করিতেন যে এইক্ষণে আমার দেওনের কিছু সঙ্গতি নাই তাঁহার মরণোত্তর ঐ টাকার দাওয়া তাঁহার উত্তরাধিকারী জগমোহন রায়ের নিকটে করা যায় এবং তাঁহার মরণোত্তর তাঁহার পুত্র গোবিন্দপ্রসাদ রায়ের স্থানে করা গেল কিন্তু তাঁহারা উভয়েই নানা ওজোর ও টালমাটাল করিয়া টাকা দিলেন না ফরিয়াদী আসামীর যে নানা মহোপকার করিয়াছেন সেসকল বিস্মৃত হইয়া এইক্ষণে ফরিয়াদীর দাওয়া লোপ করণার্থ আগামী ১৭৯৩ সালের ৩ আইন দেখাইতেছেন কিন্তু ১৮০৫ সালের ২ আইনে পাওন-বিষয়ের দাওয়াকরণার্থ ষাইট বৎসরপযন্ত মিয়াদ নির্দ্দিষ্ট আছে অতএব ঐ আইন দর্শায়নে কি হইতে পারে।

জওয়াবলজওয়াব। আসামী আপন জওয়াবে যাহা লিখিয়াছেন তাহাই জওয়াবলজওয়াবে পুনর্ব্বার লিখিতেছেন অধিকন্তু এই লেখেন যে কোন পুত্র যদি পিতার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হন তবে পিতার কর্জের দায়ী বটেন কিন্তু পিতা জীবৎ থাকিতে যদি পুত্র পিতার সঙ্গে পৃথক্ হন এবং পিতার সঙ্গে সম্পর্ক না রাখিয়া কেবল স্বীয় উদ্যোগেই টাকা উপাজন করেন এবং যদি পিতার মরণোত্তর পিতার সম্পত্তির কিয়দংশও উত্তরাধিকারিস্বরূপে প্রাপ্ত না হন তবে শাস্ত্র ও ব্যবহারানুসারে কোন প্রকারেই এমত পিতার কর্জের দায়ী পুত্র হইতে পারেন না বটে।

আসামী গোবিন্দপ্রসাদ রায়কে হাজিরকরণার্থ যদ্যপি ইয়ালামনামা তাঁহার নামে বাহির হয় তথাপি তিনি স্বয়ং বা উকীলের দ্বারা হাজির হন নাই।

প্রবিন্স্যল আদালতের জজ শ্রীযুত ব্রাডন সাহেব অতিমনোযোগপূর্ব্বক তাবৎ কাগজপত্র দৃষ্টি করিয়া এই স্থির করিলেন যে খত সহীকরণের পর রামকান্ত রায় ছয় বৎসরপর্যন্ত জীবদ্দশায় থাকিতে ফরিয়াদী তাঁহার উপর যে কখন দাওয়া করিয়াছিলেন এমত প্রমাণ দর্শাইতে পারিলেন না। জগমোহন রায় ও গোবিন্দপ্রসাদ রায়ের উপর ফরিয়াদী যে দাওয়া করিয়াছিলেন তাহা সপ্রমাণার্থ যে দুই সাক্ষিকে উপস্থিত করিয়াছেন তাহারদের সাক্ষ্য বিশ্বাসের যোগ্য নহে তিনি কহেন যে সাতাইশ বৎসরাবধি রামমোহন রায় পিতার সম্পত্তিতে অধিকারী হইয়াছেন তথাপি তাঁহার উপর কখন কোন দাওয়া হয় নাই। কিস্তিবন্দী খতে সুদের প্রসঙ্গও নাই অতএব সুদ দেওয়া কখন হইতে পারে না। দুই জন সাক্ষী এমন সাক্ষ্য দিয়াছে যে বাঙ্গালা ১২১১ ও ১২১৬ সালের মধ্যে ঐ টাকার দাওয়া হইয়াছিল বটে কিন্তু ১২১৬ অবধি যে ১২৩০ সালে এই মোকদ্দমা প্রথম উপস্থিত হয় তৎপর্য্যন্ত চৌদ্দ বৎসর গত হয়। আইনঅনুসারে বার বৎসর অতীত হইলেই কোন মোকদ্দমা গ্রাহ্য হইতে পারে না এইপ্রযুক্ত ফরিয়াদীর মোকদ্দমা খরচাসমেত ডিসমিস হইল।

তাহাতে ফরিয়াদী সদর দেওয়ানী আদালতে তাহার আপীল করেন।

ঐ আদালত এই মোকদ্দমার তাবদ্বিবরণ অতিসূক্ষ্মরূপ বিবেচনাপূর্ব্বক এই হুকুম করিলেন। অদ্যকার তারিখের রুবকারীতে নং ৩০০৪ মোকদ্দমায় প্রবিন্স্যল আদালতের ডিক্রী মঞ্জুরকরণের যে কারণ দর্শান গিয়াছে সেই কারণ সকল এই মোকদ্দমার উপরেও খাটে অতএব ঐ২ হেতুতে প্রবিন্স্যল আদালতের ডিক্রী মঞ্জুর হইল এবং উভয় আদালতের খরচাসমেত আপেলাণ্টের মোকদ্দমা ডিসমিস হইল।"

ফ্রান্সে গমন

(৯ মার্চ ১৮৩৩। ২৭ ফাল্গুন ১২৩৯)

"রাজা রামমোহন রায়।—ইঙ্গলণ্ড দেশহইতে শেষাগত সম্বাদপত্রের দ্বারা অবগত হওয়া গেল যে উক্ত রাজা এইক্ষণে ফ্রান্স দেশে গমন করিয়াছেন পরে ইউরোপের অন্যান্য দেশ পরিভ্রমণ করিবেন।

সতীধর্ম্ম-নিবারণে রামমোহন

(১০ নভেম্বর ১৮৩২। ২৬ কার্ত্তিক ১২৩৯)

"সতীবিষয়ক।—১৮২৯ সালের ৪ দিসেম্বরে সতীধর্ম্ম অশাস্ত্র ও ফৌজদারী আদালতে দণ্ডার্হ বলিয়া শ্রীযুত লার্ড উলিয়ম বেণ্টীঙ্ক গবর্নর্ জেনরল যে আইন নির্দ্ধারিত করেন তদ্বিরুদ্ধে সুবে বাঙ্গালা বেহার ও উড়িষ্যার হিন্দু লোকেরা শ্রীশ্রীযুত বাদশাহের নিকট যে আপীল করেন তাহা শনিবারে শ্রীশ্রীযুতের প্রিবি কৌন্সেলে উত্থান হয় অর্থাৎ তদ্দেশীয় গবর্ণমেণ্ট হিন্দুদিগের সতীধর্ম্ম নিবারণ করিতে ক্ষমতাবান্ হন কি না এই গুরুতর ও বহুলোকের অনুশীলিত প্রশ্ন বিচারার্থ বিতণ্ডিত হইল।

* * *

আপেলাণ্ট অর্থাৎ হিন্দুরদের সপক্ষে ডাক্তর লসিণ্টন মেং ড্রিঙ্কওয়াটর ও মেং মাক্‌ডোগলসাহেবেরা বিতণ্ডাকারী হইয়া প্রথমে লসিণ্টন সাহেব কহিলেন যে সতীরীতি যথাশাস্ত্র ধর্ম্ম ইহার ভূরি২ প্রমাণ হিন্দুরদের বহুশাস্ত্রে লিখিত আছে…।

আগামি শনিবারে ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানির যওয়াব শ্রীযুত সলিসিটর জেনরল সর চার্ল্‌স উইদেরল সর এডওয়ার্ড সগ্‌ডন ও সরজেণ্ট স্পেঙ্কিপ্রভৃতি দ্বারা শুনানী হইবেক।

অপর শ্রীযুত রামমোহন রায় ও ভারতবর্ষ সম্বন্ধীয় অনেক মহাশয় ঐ কালীন উপস্থিত ছিলেন। ২৫ জুন।

২ জুলাই।

কৌন্সেল আফিসে শনিবারে প্রাতঃকালে শ্রীশ্রীযুতের হিন্দু প্রজারদিগের আপীল শুনিবার কারণ শ্রীযুত বাদশাহের প্রিবি কৌন্সেল অর্থাৎ উক্ত কৌন্সেলের সভাপতি শ্রীযুত লার্ড চেন্সেলর মেং আফ দি রোল্‌স বোর্ড অফ কান্ট্রোলের সভাপতি ফার্ষ্ট লার্ড আফ দি এডমাএরেল্‌টি পেমেষ্টর আফ দি ফোরসেস দি মারকুইস ওএলেস্‌লি সর এল সেডওএল সর এইচ ইষ্ট কৌন্সেলে বসিলেন। আনরবিল উলিয়ম বেথরষ্ট প্রিবি কৌন্সেলের ক্লার্ক হইলেন এবং শ্রীযুত রাজা রামমোহন রায় পূর্ব্বের ন্যায় লার্ডদিগের নিকট বসিলেন…।

৯ জুলাই।

সতী নিবারণের বিপরীতে ভারতবর্ষস্থ হিন্দুপ্রজাদিগের আপীল শুনিবার কারণ শনিবারে এগার ঘণ্টার সময় হোয়াইট হালে কৌন্সেল চেম্বরে শ্রীশ্রীযুত বাদশাহের প্রিবি কৌন্সেলের বৈঠক হইল…। রাজা রামমোহন রায়ও উপস্থিত ছিলেন।…—চন্দ্রিকা।"

(১২ জানুয়ারি ১৮৩৩। ১ মাঘ ১২৩৯)

"১৮৩২—জুলাই, ১১।—শ্রীলশ্রীযুত বাদশাহ হুজুর কৌন্সেলে এই হুকুমক্রমে সতীধর্ম্মপক্ষীয় আবেদনপত্রের ডিসমিস হয়।"

(১৭ নভেম্বর ১৮৩২। ৩ অগ্রহায়ণ ১২৩৯)

"স্ত্রীদাহ নিবারণে হর্ষসূচক সভা।— গত শনিবার [১০ নভেম্বর] সন্ধ্যাকালে ব্রাহ্ম্য সমাজের সাধারণ গৃহে স্ত্রীদাহ নিবারণে আনন্দিত মহোদয়েরা এক মনোরম কমিটি করিয়াছিলেন তাহার প্রধানাধ্যক্ষ শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর ঐ সভোপবিষ্ট ইউরোপীয় ও এতদ্দেশীয় মহাত্মাবর্গের সমক্ষে প্রথম এই প্রশ্ন হইয়াছিল যে অত্যধিক ঘৃণ্য স্ত্রীহত্যারূপ দুষ্কর্ম্ম নিবারণপ্রযুক্ত আমারদের যে পরমানন্দের মঙ্গল সমাচার সংপ্রতি ইঙ্গলণ্ড হইতে আসিয়া কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইবামাত্র আহ্লাদিত করিয়াছে ইহার সম্পূর্ণ ক্ষমতাবিশিষ্ট শ্রীশ্রীযুত ইঙ্গলণ্ডাধিপতি ও প্রবিকৌন্সেলকে ধন্যবাদ দেওনের বিষয়ে আপনারদের কি অভিপ্রায় তাহাতে পরস্পর সভ্যগণেরা পরমোল্লাষিত হইয়া অত্যাবশ্যকরূপে সম্মতি প্রদান করিলেন অপর কোর্ট আব্ ডিরেকটর্সকে ধন্যবাদ দেওনের প্রস্তাবেও সভ্যগণের অভিমত সম্পূর্ণ হইল তৃতীয় প্রশ্ন এই যে আমারদের এই মহোল্লাষের আদি কারণ পরম দয়ালু শ্রীশ্রীযুত লার্ড উলিএম বেণ্টীঙ্ক গবর্নর্ বাহাদুর অতএব তাঁহাকে এক ধন্যবাদ দেওয়া আমারদের উচিত কি না ইহাতে সভগণেরা সম্পূর্ণ সম্মতি দিলেন যে তাঁহার ধন্যবাদ দেওয়া অতিকর্ত্তব্য চতুর্থ প্রশ্ন এই যে শ্রীযুত রাজা রামমোহন রায় মহাশয়ের দ্বারা ঐ ধন্যবাদ পত্র বিলাতে পূর্ব্বোক্ত উভয় বিচার স্থানে অর্পিত-হওনের বিষয়ে আপনারা কি অনুমতি করেন তাহাতেও সভ্যগণেরা আনন্দিতরূপে সম্মত হইলেন বিশেষতঃ

সভ্যগণেরা এই অভিপ্রায় প্রকাশ করেন যে স্ত্রীহত্যা নিবারণার্থে শ্রীযুত রাজা রামমোহন রায়ের যে পর্য্যন্ত পরিশ্রম ও নির্দয় স্ত্রীবধিরদের কটূক্তির ভাগী তিনি হইয়াছেন বাঙ্গালির মধ্যে অন্য কাহারও এরূপ হয় নাই অতএব এতদ্বিষয়ে তাঁহাকে এক ধন্যবাদ দেওয়া অত্যাবশ্যক ···।—জ্ঞানান্বেষণ।"

রামমোহনের ভ্রাতা দেওয়ান রামতনু রায়

(২২ ডিসেম্বর ১৮৩২ । ৯ পৌষ ১২৩৯)

"ধর্ম্মসভার দলে ভঙ্গদশা।—শ্রবণে অনুমান হয় যে এইক্ষণে ধর্ম্মসভার দল ভঙ্গদশা প্রাপ্ত হইতেছে কেননা শ্রীযুত বাবু ভগবতীচরণ মিত্রজ যিনি সহমরণ সংস্থাপনার্থ অশেষ যত্ন করিয়াছেন অদ্যাপি সহদাহ বারণের কথা শুনিলে তিনি মহাখেদিত হন কিন্তু এইক্ষণে শুনিতেছি আঁদুল নিবাসি শ্রীযুত বাবু মথুরানাথ মল্লিকের ভাগিনেয় শ্রীযুত বাবু গোবিন্দচন্দ্র রায়ের সহিত পূর্ব্বোক্ত মিত্র বাবুর কন্যার বিবাহ হইয়াছে শ্রীযুত মল্লিক বাবু যে সহদাহকে অতিঘৃণিত কহেন ইহা অবিদিত নাই এবং সহমরণ বারণের প্রধানাগ্রগণ্য শ্রীযুত রাজা রামমোহন রায় যে জন্যে স্ত্রীদাহিরা তাঁহাকে সতী দ্বেষী কহিয়া থাকেন তাঁহার ভ্রাতা শ্রীযুত দেওয়ান রামতনু রায় বরযাত্র হইয়া ঐ বিবাহের সভায় উপস্থিত ছিলেন ঐ সকল সতীদ্বেষী ও ব্রহ্মসভার দলস্থ লোকের সহিত আমোদ প্রমোদ করিয়া মিত্র বাবু সতীদ্বেষিদলস্থ বরেতে কন্যার্পণ করিয়াছেন শ্রীযুত বাবু হরচন্দ্র লাহিড়ি ব্রহ্মসভায় আসিয়াছিলেন এজন্যে খেদিত হইয়া চন্দ্রিকাকার ঐ বাবুর নামাঙ্কিত এক খানি পত্র আপনি প্রকাশ করিয়া পাঠকবর্গকে ভরসা দিয়াছেন যে বাবু সে সভায় আসেন নাই শ্রীযুত বাবু ভগবতীচরণ মিত্রের নামাঙ্কিত পত্র চন্দ্রিকায় ছাপিয়াত জানাইতে পারিবেন না যে গোবিন্দচন্দ্র রায়ের সহিত মিত্র বাবুর কন্যার বিবাহ হয় নাই যেহেতুক ইহা ঢাক ঢোল বাজাইয়া হইয়াছে এবং মিত্র বাবু রাগ করিলে সম্পাদকস্য পদেরও পেঁচ পাঁচ ঘটিতে পারে লাহিড়ি বাবুই যেন যাতায়াতের বিষয় বলিয়া তুচ্ছ করিয়া রহিয়াছেন কিন্তু বিবাহের বিষয় মিথ্যা কহিলে পরে মিত্র বাবু কদাপি চুপ করিয়া থাকিবেন না··· ।—জ্ঞানান্বেষণ।"

(২৯ ডিসেম্বর ১৮৩২ । ১৬ পৌষ ১২৩৯)

"* * * শ্রীযুত বাবু ভগবতীচরণ মিত্রজ শ্রীযুত বাবু মথুরানাথ মল্লিকের ভাগিনেয়ের সহিত কন্যার বিবাহ দিয়াছেন। ঐ বিবাহে তাঁহার বাটীতে রামমোহন রায়ের কনিষ্ঠ শ্রীযুত রামতনু রায় * ও বাবু কালীনাথ রায়ের কনিষ্ঠ শ্রীযুত বৈকুণ্ঠ নাথ রায় এবং মথুর বাবুর কনিষ্ঠ শ্রীযুত শ্রীনাথ মল্লিক বরযাত্র আসিয়াছিলেন তাঁহারা সভাস্থ হইয়া কর্ম্ম সমাপনানন্তর যথা কর্ত্তব্য আহার ব্যবহার করিয়াছেন।···—চন্দ্রিকা।"

---

* কেহ কেহ বলেন, ইনি রামমোহনের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা এবং সচরাচর 'রামলোচন রায়' নামে পরিচিত ছিলেন। ১৮০৩ সালে লেখা বর্দ্ধমানের কালেক্টরের একখানি পত্রে রামমোহন রায়ের ভ্রাতা রূপে রামলোচন রায়ের উল্লেখ দেখিয়াছি।



প্রেতিনী

শ্রীমনোজ বসু

চণ্ডীদহের মুখে পড়িয়া ডিঙি টলমল করিতে লাগিল। একে ত গাঙে ভয়ানক টান, তাহার উপর উল্টা বাতাস। মাঝির কলিকায় আগুন কেবলমাত্র ধরিয়া উঠিয়াছে। হরিচরণ বলিল—না, না মাঝি, তামাক খাওয়া রেখে দুই হাতে বোঠে চালাও দিকি—এবং মাঝির সেই কলিকা নিজের দুই হাতে চেটোর মধ্যে রাখিয়া অভিনিবেশ সহকারে টানিতে আরম্ভ করিল। হইলে কি হয়, শান্তিতে তামাক খাওয়া তাহারও কপালে নাই। ছইয়ের ভিতরে চুড়ির আওয়াজ। চুড়ি অবশ্য নানা কারণে বাজিতে পারে—নীচু ছই, উঠিতে বসিতে হাত লাগিয়া যাওয়া বিচিত্র নয়। কিন্তু একবার—দুইবার—তিনবার, কলিকা রাখিয়া উঠিতে হইল।

ভিতরে ঢুকিয়া দেখে একটা টিনের ট্রাঙ্ক, সেইটা দুই হাতে জোর করিয়া ধরিয়া তাহার উপর মাথা রাখিয়া প্রভা বসিয়া আছে। হরিচরণকে দেখিয়া একটু হাসিবার মত ভাব করিল। কহিল—নৌকো কি রকম টলমল করছে, দেখ না—আর তুমি বসে বসে বেশ তামাক খাচ্ছিলে—

হরিচরণ বলিল—ভয় হচ্ছে না-কি তোমার?

প্রভা বলিল—কিসের ভয়? না, আমার ভয়-টয় নেই মশায়। ওঃ সর্ব্বনাশ! তুমি যে অত কাছে এসে বসলে—মাঝে মোটে পাচ সাত হাত জায়গা। আর একটুখানি দূরে গিয়ে বসতে হয়। মাঝিরা দেখলে ভাববে কি?

এটা প্রভার মিথ্যা কথা। দুইজনের মাঝে যে ফাঁক-টুকু ছিল তাহা পাচ সাত হাত ত নয়, হাত দুয়েকও হইবে না। কিন্তু প্রভার কাঁচা বয়স, বিয়ে মোটে বছর দুই আগে হইয়াছে, যা বলে তাহাতে তর্ক করিতে নাই। হরিচরণ সরিয়া একেবারে পাশে আসিল। অমনি প্রভা তাহার কোলের উপর চোখ বুজিয়া শুইয়া পড়িল।

একটু পরে মাথা তুলিয়া বলিল—আচ্ছা, আজকে যদি এখানে নৌকো ডুবে যায়—

হরিচরণ রাগ করিয়া উঠিল—ও সব কি কথা? গাঙের উপর ভর-সন্ধ্যেকালে অমন বলতে নেই—

প্রভা নিষেধ মানিল না—ধর যদি ডুবেই যায়, আমি ত মোটেই সাঁতার জানিনে—তুমি কি কর তাহ'লে?

—কি করি? দিব্যি হাসতে হাসতে গাঙ পাড়ি মেরে একলা ঘরে ফিরে যাই। তুমি কি ভাব বল দেখি?

প্রভা বলিল,—না, তা কক্ষনো যাও না। সত্যি তুমি কি কর আমার শুনতে ইচ্ছা হচ্ছে, বল না।

—তোমাকে জড়িয়ে ধরে সাঁতার কাটি।

প্রভা তবু ছাড়ে না। আর কোনোগতিকে যদি তোমার হাত ফসকে যায়? আমি ত অমনি চণ্ডীদ'র অথই জলে তলিয়ে যাব, তা হ'লে কি করবে?

হরিচরণ বলিল—তোমার আর কথা নেই আজ?

প্রভা জেদ করিয়া বলিল—না বল কি কর তাহ'লে? বলবে না? আচ্ছা, থাকগে। মুখ ভার হইয়া উঠিল।

—তাহ'লে হাত পা ছেড়ে দিয়ে আমিও অমনি ডুবে মরব। ঐ গাঙের তলায় ফের যুগল-মিলন হবে।

প্রভা ঘাড় নাড়িয়া কহিল—ইঃ, তা আর হ'তে হয় না। সাঁতার-জানা মানুষ সাঁতার না দিয়ে ইচ্ছে ক'রে ডুবে মরতে পারে কখনও?

—বিশ্বাস কর না?

প্রভা বলিল—না।

—তোমায় ছেড়ে আমি সত্যি সত্যি বেঁচে থাকব, এই তুমি ভাব?

প্রভা মুখ টিপিয়া হাসিয়া বলিল—ভাবি না ত কি? বেঁচে থাকবে এবং পছন্দমত তিন নম্বরের জন্য তক্ষুনি ঘটক লাগাবে। পুরুষ মানুষের আবার ভালবাসা!

হরিচরণ বলিল—বেশ তবে তাই! তোমায় আমি

ভালবাসিনে, আদর করিনে, জ্বালাতন করি, এই ত? ভাল ভাল কাপড় গয়না দিতে পারিনে, আমি গরীব মানুষ—আমার আবার ভালবাসা। বেশ—বেশ—বলিয়া সে অপর দিকে মুখ ফিরাইয়া মনোযোগের সহিত স্বভাবের শোভা দেখিতে লাগিল।

কিছুক্ষণ চুপচাপ। শেষে প্রভাই কথা কহিল—ও-দিকে এক নজরে চেয়ে কি দেখছ? ওগো, কি দেখছ বল না? গরু? মাছরাঙা? জেলেদের বউ? কই, জবাব দিলে না যে!

হরিচরণ নিরুত্তর।

প্রভা উঠিয়া বসিল। তারপর খিল খিল করিয়া হাসিয়া কহিল—রাগের পুরুষ, অত রেগো না—তুমি ভালবাস ভালবাস—একঝুড়ি, দশঝুড়ি, দশ হাজার ঝুড়ি ভালবাস। হল ত! সহসা জোর করিয়া দুইহাতে হরিচরণের মুখ নিজের দিকে ফিরাইয়া বলিতে লাগিল,—তুমি ওদিকে তাকাতে পাবে না, কক্ষনো না—এই ব'লে দিলাম। মাঝ গাঙে আমার একা একা ভয় করে না বুঝি? কই তাকাও আমার দিকে—কথা কও—

কাজেই কথা কহিতে হইল। বলিল—কি কথা কব?

প্রভা কহিল—আমি শিখিয়ে দেব না-কি? আচ্ছা, বল—আর কোনো দিন আমি তামাক খাব না, কারণ মুখ দিয়ে ভারী বিচ্ছিরি গন্ধ বেরোয়, শ্রীমতী প্রভাবতী দেবী পছন্দ করেন না—বল বল—

হরিচরণ বলিল—মুখের কথা ফস্ করে ত বলে ফেললে! প্রথম যখন তামাক খাওয়া প্র্যাক্‌টিশ্ করি সে কৃচ্ছ্রসাধনের ইতিহাস ত শোন নি। নিমু দাসকে দেখেছ—কৈবর্ত্তপাড়ার নিমাই?

প্রভা গল্প শুনিতে ভারী ভালবাসে। গল্পের গন্ধ পাইয়া তৎক্ষণাৎ পরম উৎসাহে সায় দিল—হুঁ।

—ঐ নিমুর সাথে খুব ভাব করেছিলাম। রোজ দুপুরে স্কুল পালিয়ে তার বাড়ি যেতাম। আমাকে দেখে খুব খাতির করে ছাঁচতলায় কোদালখানা নামিয়ে দিত—দিয়ে নিমু নিজেই যেত তামাক সেজে আনতে। ফিরে আসতে একঘণ্টা দেড় ঘণ্টা দেরি হত,—যত্ন করে তামাক সাজত কি-না! ততক্ষণ হলুদের ভুঁই তৈরী করবার ব্যবস্থা। ঠিক দুপুরে রোদ্দুরে ঘণ্টাদেড়েক ধরে জমি কোপানো—একবার ভাব ত ব্যাপারখানা!

প্রভা কহিল—ওমা আমার কি হবে! এতখানি কষ্ট করতে তামাক খাওয়ার জন্যে?

হরিচরণ কহিল—এই শেষ না-কি? একদিন কথাটা কেমন করে বাবার কানে উঠল। একটা আস্ত কঞ্চি ভাঙলেন পিঠের উপর। সংসারে একেবারে ঘেন্না ধরে গেল। বললে বিশ্বাস করবে না, তখন ত মোটে বার তের বছর বয়স—শেষ রাতে 'জয়গুরু' বলে বৈরাগী হয়ে বেরিয়ে পড়লাম। সঙ্গের সম্বল একটা দেশলাই, এক কৌটো তামাক এবং বাবার নক্‌সী-কাটা সখের কল্‌কেটা—

প্রভা জিজ্ঞাসা করিল—কোথায় গেলে?

হরিচরণ বলিল—কিছু ত ঠিক করে বেরুই নি। যাচ্ছি ত যাচ্ছি। মাঝে মাঝে গাছতলায় বসে তামাক সেজে নিচ্ছিলাম। গোড়ায় স্ফূর্ত্তিও ঠেক্‌ছিল খুব—একেবারে মাঠের মধ্যে প্রকাশ্যভাবে সকলের সামনে দিয়ে ইঞ্জিনের মত ধোঁয়া উড়িয়ে চলে যাওয়া! কিন্তু সারাদিন ঐ ধোঁয়াছাড়া পেটে আর কিছু পড়ল না। সন্ধ্যেবেলায় মহাবিপদ, তামাক গেল ফুরিয়ে—

প্রভা কহিল—তারপর?

—তারপর বোধগম্য হ'ল যে সন্ন্যাসে মজা নেই। কিন্তু আপাততঃ এক ছিলিম তামাক এবং রাত কাটাবার একটুখানি জায়গার ত দরকার, শেষে ভাতটাত জোটে ত ভালই। একজন চাষা শুকনো খেজুর পাতার আটি নিয়ে যাচ্ছিল, ডাক দিলাম—ও মিয়া সাহেব, তোমার হাতের কল্‌কেয় কিছু আছে না-কি? সাফ জবাব দিল, না। ফের জিজ্ঞাসা কর্‌লাম—এ গাঁয়ের নাম কি? বল্‌লে—কমলডাঙা।

প্রভা বাধা দিয়া বলিয়া উঠিল—কমলডাঙা? ঐখানেই ত দিদির বাপের বাড়ি—না?

হরিচরণ প্রশ্ন করিল—দিদি? তোমার আবার দিদি কে? চিন্‌লাম না ত?

প্রভা বলিল—আমার দিদি? সরযূ—সরযূ আমার আগে যিনি ছিলেন গো। তুমি প্রথমে কমলডাঙায় বিয়ে করনি?

হরিচরণ বলিল—উঁহু, কল্মীডাঙায়। কমলডাঙ্গা সেই কোথায়—সাত সমুদ্দুর পার। আর কল্মীডাঙা ঐ সামনে—খান পাঁচ সাত বাঁকের পর গিয়ে পড়্‌ব।

প্রভা জিজ্ঞাসা করিল—তাই না-কি? আমাদের এই নৌকো দিদির বাপের বাড়ির গাঁ দিয়ে যাবে?

হরিচরণ বলিল—হুঁ, তা ছাড়া আর পথ কই? ও মাঝি, নৌকো কল্মীডাঙার খাল দিয়ে উঠ্‌বে ত?

কিন্তু মাঝি কি বলে শুনিবার মোটেই অপেক্ষা না করিয়া প্রভা বলিল—আমি নাম্‌ব কিন্তু, নেমে এক দৌড়ে দিদির বাপের বাড়ি গিয়ে সব দেখে শুনে আস্‌ব। হাস্‌ছ যে—হাস্‌লে শুন্‌ব না। যাব আর আস্‌ব, একমিনিটও সেখানে থাক্‌ব না—কেমন?

হরিচরণ বলিল—যাঃ, তা কি হয়?

—কেন হবে না? দিদির বাবা মা বুঝি আমার পর। আমি যাব—কিচ্ছু দোষ হবে না—

হরিচরণ বলিল—দোষের কথা কে বল্‌ছে? ঘাট থেকে সে বাড়ি অনেক দূর—

প্রভা কহিল—অনেক দূর? দু-কোশ, দশ্‌কোশ? যাও—ও তোমার যেতে না দেবার কথা—

ইহারও উত্তরে হরিচরণ একটা কিছু বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু প্রভা শুনিলই না। সজোরে ঘাড় নাড়িয়া বলিল—ও শুনেছি, যখন সেই ঘাটে যাব আমায় ব'লো। হাঁ—তুমি যা বল্‌বে তা আমি জানি। ও মাঝি, কল্মীডাঙায় নৌকা গেলে আমায় ব'লো, একটু নাম্‌ব।—

বুড়া মাঝি স্বীকার করিল।

প্রভা পুনরায় আরম্ভ করিল—দিদি মারা যান তো এই কল্মীডাঙায়—না?

হরিচরণ বলিল—হাঁ, বাপের ভিটে যেন ওকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে এল। এসে দশটা দিনও কাটল না। সে ত তুমি সব শুনেছ।

সে গল্প প্রভা আগেই শুনিয়াছে। হরিচরণ অবশ্য সর্ব্বদা চাপা দিতে যায়, কিন্তু প্রভাকে পারিবার জো আছে? একটা একটা করিয়া সব শুনিয়া তবে ছাড়িয়াছে।

বছর চার আগের কথা, তখন হরিচরণ চৌধুরী-সেরেস্তায় নায়েবী করিত। আষাঢ় কিস্তির টাকা আদায় হইয়াছে, সেই টাকা লইয়া কলিকাতায় জমিদার বাড়ি যাইবে। পানসীও ঠিক হইয়া গিয়াছে। ক'দিন পরে রথ, মতলব আছে কলিকাতা হইতে অমনি রথের বাজার সারিয়া আসিবে—গোটা পাঁচ সাত কলমের আমের চারা, এক সেট ছিপ সুতা বঁড়শী, সরযূর জন্য একখানা হাতীপাড় মটকার সাড়ী—পাড়টা একটু পছন্দ করিয়া কিনিতে হইবে, অমন গায়ের রঙের সাথে যাহাতে মিল হয়। এই সমস্ত ঠিক হইয়া আছে, কিন্তু হঠাৎ সরযূ বাধাইল মুস্কিল।

সন্ধ্যার সময় কেহ কোথাও নাই, হরিচরণ নিজের মনে টাকার চালান ঠিক করিতেছিল—হঠাৎ সরযূ আসিয়া সাম্‌নে বসিল। হরিচরণ একবার চাহিয়া দেখিতেই বিনা ভূমিকায় বলিল—আমি তোমার নৌকোয় কল্মীডাঙায় যাব। চালানের যোগটা যাহাতে নির্ভুল হয়, হরিচরণের মন ছিল সেই দিকে, শুধু বলিল—হু। সরযূ অমনি তড়াক করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, বলিল—তা'হলে জিনিষপত্তর গুছিয়ে নি গে?—হরিচরণ প্রশ্ন করিল—কি—কি বল্‌ছ? কিন্তু সরযূ অনাবশ্যক উত্তর দিবার জন্য একমুহূর্ত্তও দাঁড়াইল না। পরে চালান লেখা শেষ করিয়া ভিতরে ঢুকিয়া যখন সরযূর দেখা মিলিল, তখন তাহার বাক্স গোছানো প্রায় সারা। কল্মীডাঙায় রথের সময় বড় ধূমধাম হয়। হরিচরণের এই পানসীতে চড়িয়া সরযূ সেখানে যাইবে, চাঁপাতলার ঘাট পথেই পড়ে—সেইখানে তাহাকে নামাইয়া দিতে হইবে, তারপর শুধু রথের মেলার কয়টা দিন বাপের বাড়ি থাকিয়া আবার হরিচরণের ফিরতি বেলায় সেই নৌকাতেই ফিরিয়া আসিবে—এই ব্যবস্থা ইতিমধ্যেই পাকা হইয়া গিয়াছে, আর তাহার নড় চড় হইবার উপায় নাই। হরিচরণ একটু প্রতিবাদ করিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু সরযূ বলিল—বাঃ রে, তুমি যে 'হুঁ' বল্‌লে, আগে রাজী হয়ে শেষকালে—মুখের উপর মেঘ ঘনাইয়া আসিল। কাজেই বরকন্দাজকে একটু বড় দেখিয়া পানসী আনিতে বলিয়া দেওয়া হইল। শ্বশুর-মহাশয়কেও চিঠি লেখা হইল,

বুধবারে দিনের ভাঁটায় খালের ঘাটে যেন পাল্কীবেয়ারা উপস্থিত থাকে।

এই যে এত জেদ করিয়া বাপের বাড়ি আসা, কিন্তু চাঁপাতলার ঘাটে যখন নৌকা লাগিল সরযূ কেমন হইয়া গেল—যেন নামিবার উৎসাহ পায় না। নামিতে গিয়া ফিরিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইল। তারপর হরিচরণের কাছে আসিয়া বলিল—আমি যাব না, তুমি এস, না হ'লে একা-একা আমি কক্ষনো যাচ্ছিনে। কিন্তু হরিচরণের ত নামিবার উপায় নাই। সঙ্গে বিস্তর কাঁচা টাকা—লাটের কিস্তি আসিয়া পড়িয়াছে, টাকাটা ঠিক সময়ে পৌঁছাইয়া দেওয়া দরকার, পথে একটুও দেরি করিবার জো নাই। মেয়েমানুষে এ সব বোঝে না। সরযূর ধারণা, হরিচরণ ঠিক রাগ করিয়াছে। রাগ যে করে নাই, তাহা যতই বলা যায় কিছুতে বিশ্বাস করিবে না। কেবলই বলে—জেদ ক'রে এসেছি ব'লে তুমি ঠিক রাগ করেছ, ঠিক—ঠিক—তোমার মুখ দেখে বুঝেছি—আমাকে ঠকাতে পারবে না—হাস্‌লে কি শুনি? বিপুল বেগে হাস্য করিলেও ভুলিবে না, এমনি মুস্কিল! ওদিকে ঘাটের উপর শ্বশুরমহাশয় স্বয়ং পাল্কী বেয়ারা সহ উপস্থিত। হরিচরণ একবার নামিয়া প্রণাম করিয়া এবং সবিশেষ নিবেদন করিয়া বিদায় লইয়া আসিয়াছে। এখন তিনি ঠায় রৌদ্রে দাঁড়াইয়া, অথচ মেয়ে জামাইয়ের বিদায়ের পালা আর সাঙ্গ হয় না। হরিচরণ ব্যস্ত হইয়া উঠিল। বলিল, যাও, যাও, শ্বশুরমশায় কি ভাবছেন বল ত? সরযূর সেই আগের কথা—রাগ কর নি? আচ্ছা, গা ছুঁয়ে ব'ল। হ্যাঁ, বল যে ফিরৃতি-বেলা সাথে ক'রে নিয়ে যাবে—

সরযূর গা ছুঁইয়া হরিচরণ বলিল—নিয়ে যাব।

সে শপথ রক্ষা হয় নাই।

এ সব পুরনো কথা। ডিঙি চড়িয়া আজ রাত্রে দুজনে সরযূর বাপের বাড়ির ঘাট দিয়া চলিয়া যাইবে ইহা শুনিয়া অবধি প্রভার কেবলই নানারূপ মনে উঠিতে লাগিল। নৌকায় উঠিয়াই ছইএর একদিকের অনেকখানি খড় ছিঁড়িয়া সে মস্ত বড় ফাঁক করিয়া লইয়াছে, সেখান হইতে উত্তরের পাড় বেশ দেখা যায়। সেই ফাঁক দিয়া বাহিরের দিকে তাকাইয়া তাকাইয়া যে-সতীনকে জীবনে কোনোদিন দেখে নাই তাহার কথাই ভাবিতেছিল। হরিচরণও চুপ করিয়া বসিয়া। ছপ্-ছপ্ করিয়া দাঁড়ের আওয়াজ, এক একবার ধনুকের তীরের মত পাশ কাটাইয়া জেলে-ডিঙী আগাইয়া যাইতেছে। হঠাৎ মাঝি চেঁচাইয়া উঠিল—বাঁয় দাঁড় মারো; ডাইনে দ'—গাজী বদর বদর—অন্ধকার হইয়া আসিয়াছে। একটা পাখী জলের ধারে কোথায় বসিয়াছিল, মাঝির চীৎকারে ফর্‌ফর্ করিয়া ডিঙির উপর দিয়া ওপারে উড়িয়া গেল।

প্রভা মুখ ফিরাইয়া জিজ্ঞাসা করিল—আজকে অমাবস্যে?

হরিচরণ বলিল—উঁহু। অমাবস্যে কাল, নিশিপালন উপোষ দুই-ই। অমাবস্যের খোঁজ কেন?

প্রভা কহিল—দিদি যেদিন মারা যান সেদিনও ঘোর অমাবস্যে শুনেছি—না?

হরিচরণ প্রভার মুখের দিকে চাহিল। বলিল—এখনও ঐ কথা ভাবছ? যা চুকে বুকে গেছে, সে-সব আবার কেন?

প্রভা কাতর-কণ্ঠে কহিয়া উঠিল—ওগো, আজ যদি অমনি চুকে যায়, আমার কথাও আর তুমি ভাববে না তা হলে?

হরিচরণ বলিতে লাগিল—শোন কথা। তুমি আজ হলে কি? যখন তখন যা তা বলা ভারী আদিখ্যেতা। না অমন বলে না, কি কথা কেমন-ক্ষণে পড়ে যায় কিছু বলা যায় কি?

প্রভা একটু হাসিল।

হরিচরণ বলিল—হাসছ! আমি ঐ রকম কালাকাল মানতাম্ না—পাঁজি-টাঁজি ডোণ্টকেয়ার করতাম। শোন তবে সরযূকে নামিয়ে দিয়ে ত কল্‌কাতায় গেলাম, কাছারী থেকে খবর গেল বিপিন সা জোর ক'রে মহালের বাঁধ কেটে দিয়েছে। সেদিন অমাবস্যে, তার উপর সূর্য্যি-গেরোন। খাজাঞ্চী মশায় বল্লেন—এমন দিনে কখনও বেরুবেন না, শাস্ত্রে পই-পই ক'রে বারণ আছে। না শুনে রওনা হলাম। মনে মনে ঠিক করলাম, চাঁপাতলার ঘাটে নৌকো বেঁধে নিজে গিয়ে সরযূকে তুলে আনব—এত করে বলে দিয়েছিল। যাত্রার ফল অমনি সাথে সাথে।

ঘাটে পৌঁছে দেখি, আমাকে আর যেতে হ'ল না—সে-ই এসেছে। এ-কথা ত প্রভা শোনে নাই। জিজ্ঞাসা করিল—এসেছিলেন? আমরা শুনেছি যে আর দেখা হয় নি। হরিচরণ বলিল—হাঁ প্রভা, এসেছিল, দেখাও হয়েছিল। চাঁপাতলায় নয়, তার রশিটাক পশ্চিমে বটতলার শ্মশানঘাটে। বলিতে বলিতে সে চুপ করিয়া গেল।

তখন উত্তর বিলে ঝোড়োকোণায় একসারি তালগাছের মাথায় ক্রমে আঁধার করিয়া আসিতেছে, একটা একটা করিয়া তারা ঢাকিয়া যাইতেছে। প্রভা হঠাৎ কহিল—একটা কথা বলব?

—কি?

—আজকে নৌকো এখানে বেঁধে রাখ, কালকের জোয়ারে ফের যাব—

হরিচরণ বলিল—তাতে লাভ কি?

প্রভা বলিতে লাগিল—তুমি অমত করো না। এই রাত্তিরে কল্মীডাঙায় গেলে তুমি কক্ষনো আমায় নামতে দেবে না, তা জানি। কালকে সেই অমাবস্যে, কাল দিন-মানে ঘাটে নৌকো বেঁধে আমি দিদির বাবার ওখানে ছুটে যাব। গিয়ে বলব, আমি এসেছি, এক অমাবস্যেয় তিনি গিয়েছিলেন আর এক অমাবস্যেয় আমি এসেছি, ঘরে নাও। ওগো, তোমার পায়ে পড়ি অমত কোরো না—আমার বাবা নেই, কাল দিনমানে আমি বাবার কাছে যাব। বলিতে বলিতে হরিচরণের পায়ের কাছে পড়িয়া সে কাঁদিয়া ফেলিল! এমনি ছেলেমানুষ! কিন্তু সত্যসত্যই তো মরা-সম্পর্কের কুটুম্ববাড়ি বিনা খবরে অমন করিয়া নতুন বউকে তোলা যায় না। লোকে বলিবে কি? হরিচরণ প্রভাকে শান্ত করিতে লাগিল—ছিঃ, কাঁদে না, আচ্ছা পাগল তুমি! একবার ঠাণ্ডা মাথায় ভেবে দেখ তো, তা কখনও হয়?

প্রভা মাথা তুলিয়া বলিল—কি হয় না?

বল্ছি, তুমি ওঠো! দেখ, ভগবান যাকে নিয়ে গেলেন তার জন্যে হা-হুতাশ করে ফল কি? ও ভুলে থাকাই ভাল।

প্রভা আগুন হইয়া উঠিল। জানি, জানি, তোমরা তা খুব পার। তোমরা ভালবাস না ছাই! সব মুখস্থ করা কথা। আজ যদি ঝড় ওঠে, নৌকো ডুবে যায়, আমি মরি—কালকেই আর একজনের সাথে কত সোহাগ হবে! তখন আমার কথা কেউ বলতে গেলে অমনি মুখ চেপে ধরবে—

হরিচরণ হো-হো করিয়া হাসিতে লাগিল। বলিল—রাগ ক'রে চোখ বুজে আছ না-কি! গাঙ ছাড়িয়ে নৌকো যে খালে ঢুকেছে। এখানে মোটে হাঁটুজল। নৌকো ডুবলেও আমরা ডুবব না, দেখ না তাকিয়ে।

প্রভা রাগ করিয়া জবাব দিল না, তাকাইয়াও দেখিল না।

নৌকা তখন খালে ঢুকিয়া তরতর বেগে যাইতেছিল। প্রভা বাহিরের দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল। আকাশে তারা নাই, চারিদিক আঁধার—ভাল করিয়া ঠাহর করিলে ঝাপসা দেখা যায়। খালের ধারে কাহাদের লাউমাচা, জোয়ারের জল তাহাদের নীচে অবধি তলাইয়া দিয়াছে। প্রভার নড়াচড়া নাই। চরের ধারে সারি সারি কয়খানা ঘর ও খড়ের গাদা দিগন্ত-বিসারী ধানক্ষেত পাহারা দিতেছে। হঠাৎ তাহারই মধ্যে কোন্ দাওয়া হইতে খঞ্জনী বাজিয়া উঠিল। আকাশভরা মেঘ, কোনো পারে একটা লোকের ছায়া দেখা যায় না। প্রভা বসিয়াই আছে—যেন একখানি ছবি, ছইয়ের ভিতরে অন্ধকার পটের উপর পাকা ধানের রঙ দিয়া ছবি আঁকানো। হরিচরণও চুপ করিয়া ছিল। কিন্তু কতক্ষণ পরে নিস্তব্ধতা বড় অসহ্য ঠেকিল। প্রভার হাত ধরিয়া নাড়িয়া বলিল—শুনছ? শুনছ?

—কি?

শোঁ শোঁ করিয়া অনেকদূর হইতে শব্দ আসিতে লাগিল, দূরের কোনো গাঁয়ে বাদল নামিয়াছে। হরিচরণ বলিল—অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে কি দেখ্ছ? এদিকে ফের না। এখনও রাগ আছে নাকি?

প্রভা কহিল—রাগ কিসের?

—রাগ নয় ত কি? কেবল ঐ রাগটাই যা তোমার দোষ, নইলে তোমায় আমার এমন ভাল লাগে—

এবার প্রভা মুখ ফিরাইল, একটুখানি হাসি ঠোঁটে ফুটিল। বলিল—সত্যি না-কি?

হরিচরণ উচ্ছ্বসিত হইয়া বলিল—নিশ্চয়ই, বুক চিরে দেখাতে পারি—

প্রভা কহিল—দেখাও না একটু। তারপর হাসিতে হাসিতে অতি তরলস্বরে প্রশ্ন করিল—আচ্ছা, ঐ কথাটা—ঠিক ঐ কথাটা কতবার তুমি দিদিকে বলেছ, আমায় বলতে পার?

হরিচরণ মুষড়াইয়া গেল। সরযূর ভূত তবে তাহাকে এখনও ছাড়ে নাই! হয়ত রাতে দুপুরে মাঝে মাঝে যখন মাথার ঠিক থাকে না, সরযূকে এইরূপ কোনো কোনো কথা বলিয়া থাকিবে, কে তাহা মনে করিয়া রাখিয়াছে? সকলেই এমন বলিয়া থাকে, কিন্তু সে-সব স্বীকার করিবার জায়গা ইহা নয়। তৎক্ষণাৎ ঘাড় নাড়িয়া প্রতিবাদ করিল—কক্ষনো না, একদিনও না—

প্রভা কহিল—কি সাধুপুরুষ! একদিনও না? হাত পা ছেড়ে দিয়ে গাঙের তলায় যুগল-মিলন হবার কথা-টথা তা দিদিকে কোনোদিন বল নি—যেমন আজকে আমায় বলছিলে?

প্রভা খুশী হইতেছে বুঝিয়া হরিচরণ আরও উৎসাহে প্রতিবাদ করিতে লাগিল—যাকে-তাকে একথা বলা যায় না-কি? ও তোমাকেই শুধু বললাম—বুঝলে প্রভা, সে শুধু নামেই তোমার সতীন, ভালবাসার ভাগ পায় নি—কথা কটা বলিতে কিন্তু হরিচণের বুকের ভিতর কাঁপিয়া উঠিল।

এমনি সময়ে মাঝি বলিয়া উঠিল—কলমীডাঙায় এলাম মা-ঠাকরুণ—কষাড় হোগলা বনের মধ্যে ঢুকিয়া হোগলার আগা কাঁপাইতে কাঁপাইতে নৌকা ডাঙায় আসিয়া লাগিল। হরিচরণের মুখের হাসি নিবিয়া গেল। তাহার কেমন মনে হইল, যাহাকে কোনোদিন ভালবাসে নাই বলিতেছিল, সে যেন কথাটা আশপাশ কোনখান হইতে শুনিয়া ফেলিয়া ডুকরাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। এ ত সরযূরই কান্না, কেবল স্বরের তীব্রতায় যেন সহস্রগুণ জোরে আসিয়া বুকে লাগিতেছে। বাতাস উঠিয়াছে, ঘাটের উপরে বাঁশঝাড় নিরন্ধ্র অন্ধকার—সেখানে কটর্-কটর্-কট্ সে যে কি শব্দ উঠিতেছে যেন, কে সমস্ত চিবাইয়া ভাঙিয়া-চুরিয়া একাকার করিয়া ফেলে আর কি! সেই অন্ধকারে কিছু দূরে বাঁওড়ের কিনারায় হরিচরণ অকস্মাৎ সরযূকে দেখিতে পাইল। সরযূকে সে কতকাল চোখে দেখে নাই, মন হইতে সে যেন মুছিয়া গিয়াছিল, কিন্তু আজ দেখিল তেমনি খুব ফরসা এবং কপালে বড় সিঁদুরের ফোঁটা টক্‌টক্ করিতেছে, পরণে লালপাড় শাড়ী, রং কাঁচা হলুদের ন্যায়—সে যে তাহাতে কোনো ভুল নাই। সরযূই ত অন্ধকারের মধ্যে আশশ্যাওড়া ও ভাঁটের জঙ্গল ভাঙিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে ছুটিয়া আসিতেছে। বাঁওড়ের বাঁশের সাঁকো পার হইতে পারিল না, সেখান হইতে হাত নাড়িয়া নাড়িয়া ডাকিতেছে—আমায় ফেলে যেও না, নিয়ে যাও—নিয়ে যাও। হরিচরণ চোখ বুজিল, হাত দিয়া কান ঢাকিল, তবু কানে ঢুকিতে লাগিল—ঝড়ের একটানা শব্দ উ উ উ উ—ভাষাহীন একটানা কান্না। মনে হইল—ঐ শব্দ আসিতেছে সাঁকোর ওপার হইতে, সেখানে মুখ থুবড়াইয়া বিনাইয়া বিনাইয়া সরযূ কাঁদিতেছে। সে উহাদের কথাবার্তা শুনিতে পাইয়াছে—শুনিয়া বুক চাপড়াইয়া বিজন শ্মশান-ঘাটায় একলা প্রেতিনী মানুষের ভালবাসার জন্য মাথা খুঁড়িয়া মরিতেছে। মড় মড় করিয়া একটা গাছ ভাঙিয়া পড়িল। যেন সাঁকো পার হইয়া আসিল! চেঁচাইয়া বলার দরকার—মাঝি, মাঝি, বোঠে ধর, দাঁড় লাগাও, পালাও, পালাও—

দরকার ত বটে, কিন্তু মুখ দিয়া কথা বাহির হইল না। প্রভা চাহিয়া দেখিল হরিচরণের মুখ একেবারে বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে। প্রভা ভয় পাইল, হঠাৎ বলিয়া বসিল,—দিদিকে আজও দেখলে না-কি? কে যেন কাঁদছে—তুমি গলার স্বর চিন্‌তে পার?

হরিচরণ চমকাইয়া বলিল—কেন, কেন, ও-কথা বলছ কেন?

প্রভা বলিল—তুমি তাকে ভাল না বাসলেও সে ত আর স্বামীকে ভোলেনি। কাছ দিয়ে গেলে দেখতে আসবে না?

হরিচরণ বলিল,—প্রভা, আর ও-কথা তুলো না, আমার আর মিথ্যা বলার অপরাধ বাড়িও না।



শূজা খাঁর মুবারক-মঞ্জিল

বৈশাখের 'প্রবাসী'তে শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার মহাশয়ের লিখিত 'বর্গীর হাঙ্গামা' শীর্ষক প্রবন্ধের পাদটীকায় মুবারক-মঞ্জিলের অবস্থিতি যেস্থানে অনুমিত হইয়াছে তাহা ভ্রান্তিমূলক। মুবারক-মঞ্জিলের অবস্থান নিরূপিত হইবার পূর্ব্বে সংক্ষেপে ইহার জন্ম-কথার আলোচনা হওয়া আবশ্যক। মুর্শীদ কুলী খাঁ যখন হায়দ্রাবাদের দেওয়ান সেই সময় তাঁহার একমাত্র কন্যা জিনেতুন্নেসা বেগমের সহিত শূজা খাঁর বিবাহ হয়। এই স্ত্রীর গর্ভে শূজা খাঁর একটি পুত্র জন্মে; তাঁহার নাম মির্জ্জা আসাদউদ্দৌলা, এবং ইনিই পরে সরফরাজ খাঁ নামে পরিচিত। মুর্শীদকুলী বাংলার নবাব হইলে জামাতা শূজাউদ্দিনকে উড়িষ্যায় তাঁহার প্রতিনিধি নিযুক্ত করিলেন। স্বামীর সহিত মনোমালিন্য ঘটায় জিনেতুন্নেসা পুত্রের সহিত মুর্শীদাবাদে পিতার নিকট বাস করিতে লাগিলেন।

মৃত্যুকালে মুর্শীদকুলী দৌহিত্র সরফরাজ খাঁকে বাংলার মসনদের উত্তরাধিকারী নিযুক্ত করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিলেন। শূজাউদ্দিনেরও দিল্লী দরবারে প্রতিপত্তি কম ছিল না। তখন 'খাঁন দওরান' উপাধিধারী খাজা হাসান নামক এক ব্যক্তি মহম্মদ শাহের 'আমিরুল ওমরাহ্' অর্থাৎ 'প্রাইম মিনিষ্টার' ছিলেন। শূজাউদ্দিন এই খাঁন-দওরানের সাহায্য লাভ করিলেন। স্থির হইল যে, মুর্শীদকুলীর মৃত্যুর পর খাঁন-দওরান স্বয়ং বঙ্গ ও উড়িষ্যার শাসনকর্ত্তা পদ গ্রহণ করিয়া শূজাউদ্দিনকে তাঁহার প্রতিনিধি নিযুক্ত করিবেন।

মুর্শীদকুলীর মৃত্যুর অল্পদিন পূর্ব্বে শূজা খাঁ তদীয় অন্য এক স্ত্রীর গর্ভজাত পুত্র মহম্মদ তকি খাঁকে উড়িষ্যায় শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিয়া কয়েক শত সুশিক্ষিত সৈন্য ও বিশ্বস্ত কর্ম্মচারি সহ কটক পরিত্যাগ করিয়া মুর্শীদাবাদ অভিমুখে যাত্রা করিলেন। কটক হইতে মুর্শীদাবাদ হইয়া গৌড় পর্য্যন্ত বাদশাহী আমলের একটি রাস্তা অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। বলা বাহুলা, শূজা খাঁ এই পথ বাহিয়া অগ্রসর হইতেছিলেন। পথিপার্শ্বে শাহ ইসমাইল গাজীর সমাধিস্থান গড়মান্দারণের (১) প্রায় তিন মাইল পূর্ব্বে 'দীননাথ' নামক স্থানে তিনি অবস্থান করিতেছিলেন, এমন সময় সংবাদ আসিল, মুর্শীদকুলীর মৃত্যু ঘটিয়াছে। এই 'দীননাথ' নামক স্থানেই শূজাউদ্দিন দিল্লীর বাদশাহের নিকট হইতে সুবে বাংলার শাসনকার্য্য পরিচালনার 'ফারমান' পাইলেন। পরদিন দুই দিনের পথ অতিক্রম করিয়া মুর্শীদাবাদ প্রবেশ করিলেন, এবং নিজেকে নবাব বলিয়া ঘোষণা করিলেন। গ্লাড্উইনের ঐতিহাসিক অনুবাদে বিবৃত হইয়াছে, সরফরাজ খাঁ মাতা এবং মাতামহীর যুক্তি অনুসারে পিতাকে বাধা দেওয়া উচিত মনে করিলেন না; তিনি রাজপ্রাসাদ পরিত্যাগ করিয়া মুক্তাখালীতে স্বীয় ভবনে বাস করিতে লাগিলেন।

(১) মৌলভী আব্দুল ওয়ালী সাহেব দ্বারা এশিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় লিখিত The Tomb of Ismail Ghazi শীর্ষক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

শূজা খাঁ নবাব হইয়াই চল্লিশ লক্ষ মুদ্রা এবং তৎসহ হস্তী ইত্যাদি বহু মূল্যবান উপঢৌকনাদি মহম্মদ শাহের দরবারে পাঠাইয়া দিলেন; পরিবর্ত্তে, বাদশাহ কর্ত্তৃক বঙ্গ ও উড়িষ্যার নবাব বলিয়া অভিনন্দিত হইলেন, উপরন্তু, মু'তমন-আল-মুল্ক, শূজাউদ্দৌল্লা, আসদজঙ্গ বাহাদুর উপাধি লাভ করিলেন।*

এই 'দীননাথ' নামক স্থানে শূজাউদ্দিনের সৌভাগ্যলাভ হইল বলিয়া ইহার স্মৃতি-রক্ষার্থ এইস্থানে একটি সরাই নির্ম্মিত হইল এবং তাহার নামকরণ করা হইল—'মুবারক-মঞ্জিল' বা 'সৌভাগ্য-মন্দির'।

'দীননাথ' হুগলী জেলার আরামবাগ মহকুমার গোঘাট থানার অন্তর্গত; বর্দ্ধমান হইতে ন্যূনাধিক ৩০ মাইল দক্ষিণে সম্পূর্ণ "একদিনের পথ।" অধুনা ইহা 'শাহানবান্দি' নামে অভিহিত। ইহার অধিকাংশ অধিবাসী মুসলমান। 'মুবারক-মঞ্জিলে'র ধ্বংসাবশেষ অতীতের সাক্ষ্যস্বরূপ আজিও 'শাহানবান্দি'তে বিরাজ করিতেছে। ইহার আকাশচুম্বী ভগ্নসৌধরাজি এবং সর্ব্বোপরি প্রবেশ-পথের বিরাট স্তম্ভদ্বয় আজিও দর্শকের যুগপৎ বিস্ময় ও আনন্দ উৎপাদন করে; চারুকারুকার্য্যময় প্রাচীর গাত্র অতীত যুগের শিল্পচাতুর্য্যের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। অদূরে একটি মসজিদের ভগ্নাবশেষ পরিলক্ষিত হয়।

'মুবারক-মঞ্জিলে'র দ্বারদেশে একটি শিলালিপিতে 'ফারসী' ভাষায় কয়েক ছত্র কবিতা খোদিত রহিয়াছে। কবিতাটি বেশ সুখপাঠ্য; মধ্যে মধ্যে দুই একটি শব্দ ও অক্ষর কালের কবলে লয়প্রাপ্ত হইলেও অর্থ নিরূপণ করিতে বেগ পাইতে হয় না। কবিতাটিতে সংক্ষেপে মুবারক-মঞ্জিলের ইতিবৃত্ত বর্ণনা করা হইয়াছে। উহা এইরূপ:—

ব-আহ্দে বাদ্শাহে খল্ক্ পরূওর্
মোহাম্মদ শাহ্ শাহান শাহে আজম্
চু নও-ওয়াবে আসদ্জঙ্গ আজ উড়েষা—
নমূদা আড়াম্ ব-বঙ্গালা মোসল্মা
হামিঁ জা কে 'দীননাথ' নাম আস্ত্
শোদা বা নস্রৎ ও ইক্বালে মুখীম্
বরায়ে ইন্ত্জামে সুবয়ে বঙ্গ্
রসিদ্ আজ পেষে খাকান্ হুকুমে মহ্কম্
মুবারক্-মঞ্জিল আজিঁরা নাম করূদন্দ্
কে শোদ্ হাসেল্ মুরাদে খাস্ ও আম
চু শোদ্ আবাদ্ ইঁজায়ে দিল্ আফ্রোজ্
যে বহরশ্ মিস্রয়ে তারিখ জোস্তাম্
ব-গোশম্ হাজক ঘয়েব্ ইঁ নেদা দাদ্
মুবারক্-মঞ্জিলে দোসারাহম্
হমিঁ জা বহ্রে তা'মিরে সরাহম্
ব-করমুদা খোদাওন্দে মোকর্‌রম্
ব-আম্রে আলি নওয়াব ফয়েজ বকেস জাহাঁ
চুইঁ মকাঁ আমাঁ শোদ্ মোরওব ও মহ্কম

* Stewarts' *History of Bengal.*

যে সালে ফাররোখে ইত্‌মাম্‌ গফ্‌ত্‌ হাজফ যয়েব
সরায়ে মু'তমন-আল-মুল্ক, মুলজায়ে আলম্‌।

তাৎপর্য্য :—"সম্রাটশিরোমণি নরপালক বাদশাহ মহম্মদ শাহের আমলে নবাব আসদ্‌জঙ্গ (শুজা খাঁ।) যখন উড়িষ্যা হইতে বঙ্গদেশ আক্রমণ করেন, সেই সময় এই দীননাথ নামক স্থানে তাঁহার ভাগ্যোন্নতি ঘটিল। মাননীয় অধিনায়ক (দিল্লীশ্বর)-এর নিকট হইতে সুবে বাংলার শাসনকার্য্য পরিচালনার আদেশ উপস্থিত হইল। আত্মপরনির্ব্বিশেষে সকলের মনোরথ পূর্ণ হওয়ায় এই স্থানের আখ্যা দেওয়া হইল, মুবারক-মঞ্জিল (সৌভাগ্য-মন্দির)। এই মনোরম স্থানের সংস্কার-কার্য্য সমাপ্ত হইলে সংস্কারের কাল-নির্দ্দেশক একছত্র কবিতা অন্বেষণ করিতেছিলাম। দৈববাণী আমার (অর্থাৎ কবির) কর্ণ-কুহরে কহিয়া দিল, ইহাই আমার ইহকাল এবং পরকালের মুবারক-মঞ্জিল, দয়ালু ঈশ্বর এইস্থানে এক সরাইখানা নির্ম্মাণ করিতে আদেশ করিলেন। শান্তিবিতরণকারী মহান নবাবের শাসনকালে এই আলয় সুপ্রতিষ্ঠিত হইল। ইহার সমাপ্তির শুভবর্ষ নির্ণয় করিবার জন্য দৈববাণী হইল—মু'তমন-আল-মুল্ক (শুজা খাঁর বাদশাহ দত্ত উপাধি)-এর সরাইখানা জগতের আশ্রয়স্থল।"

আরবী অক্ষরসমূহের একপ্রকার সাংখ্যিক অর্থ আছে। কবিতাটির শেষ লাইনের সংখ্যানুপাত করিলে মুবারক-মঞ্জিল কোন্‌ সনে স্থাপিত তাহা বুঝিতে পারা যায়। হিজরী ১১৩৫ অর্থাৎ ১৭৩১ খৃষ্টাব্দে ইহা স্থাপিত হয়।

মুর্শিদকুলী খাঁর মৃত্যু হয় ১৭২৭ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে। শুজা খাঁ জুলাই, ১৭২৭ হইতে মার্চ্চ, ১৭৩৯ পর্য্যন্ত দ্বাদশ বর্ষকাল বাংলার নবাব ছিলেন। সুতরাং শুজা খাঁর শাসনের চতুর্থ বৎসরে মুবারক-মঞ্জিলের নির্ম্মাণকার্য্য পরিসমাপ্ত হয়।

শিলালিপির বর্ণনানুসারে শুজা খাঁ 'আজম্‌ নমুদা' অর্থাৎ বঙ্গদেশ আক্রমণ করিতে আসিতেছিলেন। ইতিহাসে উক্ত হইয়াছে, মুর্শিদকুলী বাদশাহের সম্মতি না পাইলেও মৃত্যুকালে সরফরাজ খাঁকেই উত্তরাধিকারী নিযুক্ত করিয়া রাজ্যের যাহা কিছু তাহারই হস্তে অর্পণ করিয়া যান। নবাবের মৃত্যুর পর সরফরাজ খাঁ মাতামহের অন্তিম কামনা বাদশাহ দরবারে জ্ঞাপন করিলেন এবং পিতাকেও সমস্ত ঘটনা অকপটে লিখিয়া পাঠাইলেন। এত অল্পে সরফরাজ মসনদের লোভ সংবরণ করিতে পারিবেন, ইহা বোধ হয় শুজা খাঁ অনুমান করিতে পারেন নাই এবং সেইজন্যই বোধ হয় তিনি বঙ্গদেশ 'আক্রমণ' পর্য্যন্ত করিতে কৃতসঙ্কল্প ছিলেন। তিনি যে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইয়াই আসিতেছিলেন, সে-বিষয়ে অন্যমত হইবার কোনও হেতু নাই। সরফরাজ খাঁর সুবুদ্ধির জন্যই যে পিতা-পুত্রের যুদ্ধে ধরাবক্ষ—তথা ইতিহাসের পৃষ্ঠা কলঙ্কিত হইল না, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। সত্য বটে তাঁহার এ সুবুদ্ধি হওয়ার যথেষ্ট কারণও ছিল। বাংলার মসনদ যে ভবিষ্যতে তাঁহারই, একথা তিনি মনে-প্রাণে বিশ্বাস করিতেন। এতদ্ভিন্ন বর্ত্তমানও তাঁহার বিশেষ ক্ষতিকর ছিল না; মুর্শিদকুলীর ব্যক্তিগত সমস্ত সম্পত্তির ওয়ারিশ ত তিনি হইলেনই, অধিকন্তু পুত্রের ব্যবহারে সন্তুষ্ট হইয়া শুজা খাঁ তাঁহাকে বাংলার দেওয়ান নিযুক্ত করিলেন।*

মোহাম্মদ আনজুম্‌

শান্তিনিকেতন

মহামহোপাধ্যায় শ্রীপ্রমথনাথ তর্কভূষণ

আমার যাহা কিছু যৎসামান্য লেখাপড়া, তাহা সকলই সেকালের 'চতুষ্পাঠী'র গণ্ডীর ভিতরের, বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নত তোরণ পার হইয়া প্রতীচ্য সভ্যতার আলোক-লাভে মনের অন্ধকার দূর করিবার সৌভাগ্য হইতে আমি চিরবঞ্চিত। সুতরাং অতি শৈশবকাল হইতেই আমি টোলের পণ্ডিতগণের জ্ঞানময় রাজ্যের একজন নিতান্ত অকিঞ্চন প্রজামাত্র। আমার পক্ষে সেকালে বাঙ্গলা কবিতার, বিশেষতঃ পাশ্চাত্য ভাবজড়িত নবরচিত বাঙ্গলা কবিতার রসাস্বাদন, অনুশীলন, বা প্রশংসন প্রাচীনপন্থী শিষ্টগণের অনুমোদিত ত ছিলই না,—প্রত্যুত নিষিদ্ধই ছিল,—অভাগ্যবশতঃ বা সৌভাগ্যবশতঃ ঠিক্‌ বুঝিতে পারি না। আমি কিন্তু বাল্যকাল হইতেই এইরূপ অহেতুক বিধিব্যবস্থার বশবর্ত্তী থাকিতে পারি নাই—বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস ও রবীন্দ্রনাথের কবিতা আমার বড় ভাল লাগিত এবং ঐ সকল রচনার প্রশংসা করিতেও কোন প্রকার সঙ্কোচ বোধ করিতাম না এবং অনেক সময়েই টোলের পাঠ্যপুস্তকনিবহের অনুশীলনকালেও অন্যমনা হইয়া রবীন্দ্রনাথের অমর কবিতার কথাই ভাবিতাম।

রবীন্দ্রনাথের কবিতায় প্রথম যে বংশীধ্বনি শুনিয়া-ছিলাম, তাহার ভিতরে যে কেবল শারদ পূর্ণচন্দ্র চন্দ্রিকা-ধবলিত কুসুমিত বৃন্দাবনের যমুনাসৈকতে নিভৃত নিকুঞ্জে ব্রজবাসিনী গোপিকাগণের আহ্বান-গীতি, তাহা আমার মনে হইত না। আমার মনে এই বংশীধ্বনিতে

বিশ্বমানবের নিজ মহিমার উপর পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত হইবার জন্য ব্যষ্টি মানবাত্মাকে আত্মসাৎ করিবার প্রাণস্পর্শিনী আকুল গীতির করুণ ক্রন্দন পদে পদে অভিব্যক্ত হইতেছে। এই আকুলতা-ভরা করুণ গীতি—বৃন্দাবন ছাড়িয়া শ্যামা বঙ্গভূমির দিকে যখন ঝুঁকিয়া পড়িল তখন কবীন্দ্রের সেই বংশীধ্বনি অন্য আকার ধারণ করিল—

"সোনার বাংলা—আমি তোমায় ভালবাসি,—
তোমার আকাশ, তোমার বাতাস আমার প্রাণে বাজায় বাঁশী।—"

তারপর—

"স্থলে জলে আর গগনে গগনে
বাঁশী বাজে যেন মধুর লগনে।
আসে দলে দলে তব দ্বারতলে
দিশি দিশি হতে তরণী।"

এই ক্রমশঃ উপচীয়মান কবির প্রাণস্পর্শী বংশীধ্বনি বাঙ্গালীর প্রাণে যে অমর মানবতার তীব্র বিশ্বপ্রীতিকে পূর্ণচন্দ্রোদয়ে বিক্ষুব্ধ মহাসাগরের ন্যায় উদ্বেল করিয়া তুলিয়া থাকে, তাহার গভীরতা ও মধুরতার অপার্থিব অনুভূতি আমার মনে হয় বাঙ্গালী জাতির পক্ষে বিধাতার অতুলনীয় শ্রেষ্ঠ দান। প্রায় চারি শত বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালীর প্রাণে এই বাঁশীর স্বর নূতন ভাবের স্পন্দন আনিয়াছিল—সেই স্বরে বাঙ্গালী নবজীবন লাভ করিয়া বিশ্বজনীন প্রেমের বন্যায় ভাসিয়াছিল—তাহার পরিচয় পাইয়া থাকি গৌরাঙ্গ দেবের পার্ষদ শ্রীরূপ গোস্বামীর কবিতায়। সেই কবিতাটি এই—

রুন্ধন্নম্বুভৃতশ্চমৎকৃতি পদং কুর্ব্বন্ মুহুস্তুম্বুরুং
ধ্যানাদন্তরয়ন্ সনন্দনমুখান্ সংগুম্ভয়ন্ বেধসম্।
ঔৎসুক্যাবলিভির্বলিং বিবলয়নভোগীন্দ্র মা কম্পয়ন্
ভিন্দন্নণ্ড কটাহ ভিত্তিমভিতো বভ্রামবংশীধ্বনিঃ।

শারদ পূর্ণিমার বিমল চন্দ্রিকা ধৌত যমুনা পুলিনে শ্যামের মধুর মুরলী বাজিতে আরম্ভ করিল। সে মুরলীমোহনের মুরলীধ্বনি শুধুই যে ব্রজ গোপীগণকে সংসারের সকল বন্ধন ছাড়াইয়া বিশ্বাত্মা শ্রীহরির পাদমূলে আকর্ষণ করিয়াছিল তাহা নহে, কিন্তু তাহা নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের উপর কি প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল শ্রীরূপ গোস্বামী এই শ্লোকে তাহাই বর্ণন করিয়াছেন। ইহার সংক্ষিপ্ত তাৎপর্য্য এই—

"বিশ্বপ্রাণীর আকর্ষণকারী শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি বৃন্দাবনের যমুনা পুলিন হইতে উত্থিত হইয়া ক্রমে উর্দ্ধে উঠিতে লাগিল ও উত্তরোত্তর পুষ্ট হইতে লাগিল। প্রথমেই অন্তরীক্ষে প্রসারিত হইয়া তাহা সঞ্চরণশীল মেঘের গতি রুদ্ধ করিয়া দিল। তাহার পর আরও উর্দ্ধে উঠিতে লাগিল—দ্যুলোকে—ইন্দ্রভবনে—দেব সভায় সমবেত দেবনিকায়গণের সঙ্গীতগোষ্ঠীতে প্রবিষ্ট হইয়া তাহা সুরসঙ্গীতাচার্য্য তুম্বুরুকে বিস্ময়াবিষ্ট করিয়া বেসুরা ও বেতালা করিয়া তুলিল, দ্যুলোক ছাড়িয়া ক্রমে তাহা সত্যলোকে পৌঁছিল, সেখানে সমাধিমগ্ন সনাতন সনন্দন ও নারদ প্রভৃতির নির্বিকল্প ভাঙ্গিয়া দিল, শ্রুতিগান-মুখর চতুরাননের রসনাতে স্তব্ধভাব আনিয়া দিল—শুধু কি উর্দ্ধে ছুটিল তাহাই নহে, পৃথিবীর নিম্ন-নিম্ন স্তর ভেদ করিয়া রসাতলে বলিরাজের হৃদয়ে অননুভূতপূর্ব্ব উৎকণ্ঠার সমুদ্রকে উদ্বেল করিতে আরম্ভ করিল, তাহার পর আরও নীচে নামিয়া গেল, যাঁহার ফণাতে ত্রিভুবন প্রতিষ্ঠিত, সেই স্থির ধীর অনন্ত দেবকে কে চঞ্চল করিয়া তুলিল, তাঁহার চঞ্চলতায় নিখিল লোক কম্পিত হইয়া উঠিল, এইরূপে বংশীধ্বনি ত্রিলোক পরিপূরিত করিয়া বিশ্রাম পাইল না, আরও পুষ্ট হইতে লাগিল। এত পুষ্ট হইল—এত বাড়িল যে, শেষে ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে তাহা আর অবকাশ না পাইয়া—ব্রহ্মকটাহ বিদীর্ণ করিয়া অনন্ত হইয়া অনন্তে মিশিবার জন্য ঘুরিয়া বেড়াইতে আরম্ভ করিল।"

প্রকৃত প্রপঞ্চের প্রত্যেক স্তরে অপ্রাকৃত বিশ্বজনীন প্রেমসুধাপ্রবাহের বিরাট বন্যা বহাইয়া বিশ্বমানবের দর্শনলাভে চরিতার্থ হইবার জন্য বাঙ্গালী জাতির এই বংশীধ্বনিরূপে পরিণত তীব্র আকাঙ্ক্ষা আজ চারি শত বৎসরের পরে মহাকবি রবীন্দ্রনাথের অনন্য-সাধারণ কবিতায় ও গদ্যে যেমন করিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে, তেমন করিয়া আর কখনও ফুটিয়াছিল বলিয়া আমার মনে হয় না, রবীন্দ্রনাথের স্বজাতির প্রতি এই অমর দুর্লভ দান এ সংসারে তুলনাহীন।

ব্যষ্টির ব্যষ্টিত্ব বজায় রাখিয়া সমষ্টিতে আত্মহারা ভাবে মিশিয়া যাওয়া-রূপ যে মহাসমন্বয়, তাহারই

জীবিত আদর্শ হাতে-কলমে গড়িয়া দেখাইয়া সমগ্র মানবজাতির অন্তরাত্মাতে প্রবেশ করাইবার জন্যই শান্তিনিকেতনে বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠা হইয়াছে, ইহাই আমার বিশ্বাস। এখানে আসিয়া আমি যাহা কিছু দেখিলাম, যাহা কিছু শুনিলাম, তাহাতে আমার এই বিশ্বাস আরও দৃঢ় হইয়াছে।

নূতনের সহিত পুরাতনের বিবাদ চিরদিন চলিয়া আসিতেছে, ইহা থাকিবেও চিরদিন। ইহা যেমন ধ্রুব সত্য, তেমনিই আবার নূতনের সহিত পুরাতনের অবিশ্রান্ত বিরোধসমন্বয়ও ধ্রুবতর সত্য। যাহা অতীত তাহা আর কখনও ফিরিবে ইহা সম্ভবপর নহে, যাহা ফিরিবার নহে তাহাকে ফিরাইবার চেষ্টা মস্তিষ্কের উষ্ণতার পরিচয় দেয়, কিন্তু তাহা তাহার প্রকৃতিস্থতার পরিচায়ক যে একেবারেই নহে ইহা আমি নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারি। কথাটা এই হইতেছে যে, যাহা পুরাতন হইয়াও চিরনূতন, যাহার চিরনবীনতা পুরাতনের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত, সেই চিরপুরাতন অথচ চিরনূতন সনাতন চিরসুন্দরকে ছাটিয়া দূরে ফেলিয়া পুরাতন-মাত্রকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া রাখিবার জন্য বা পুরাতনকে বিস্মৃতিসাগরে ডুবাইয়া তাহার দিকে পিঠ করিয়া নূতন মাত্রকে আদর করিয়া কাঁধে তুলিয়া আনন্দে নৃত্য করিবার জন্য যে অত্যধিক ব্যাকুলতা, তাহাই সংসারে সর্ব্বতোমুখী অশান্তিকে সৃষ্টি করিয়া থাকে, এই অশান্তির সর্ব্বতঃপ্রসারী অনলকে নির্ব্বাপিত করিতে না পারিলে বাঙ্গালার জাতীয় নবজীবন-তরু অকালে শুকাইয়া যাইবে, সকল প্রকার জাতীয় হিতকর আন্দোলন অনুষ্ঠান অরণ্যরোদনে পর্য্যবসিত হইবে, এই দ্বেষ ঈর্ষা কলহ ও কালুষ্যময় অশান্তি-বহ্নিকে চিরদিনের জন্য বঙ্গদেশ হইতে নির্ব্বাপিত করিয়া নির্ব্বাসিত করিবার জন্য রবীন্দ্রনাথের স্বজাতিপ্রেম, স্বদেশপ্রীতি ও বিশ্বমানব সেবা প্রভৃতি সম্মিলিত হইয়া এই শান্তিনিকেতনে বিশ্বভারতী মূর্ত্তিতে উদিত হইয়াছে— শান্তিনিকেতন দেখিয়া আমার ইহাই মনে হইতেছে। তাই অচিন্ত্যানন্তশক্তি করুণাময় শ্রীভগবানের নিকট প্রার্থনা করি যে, রবীন্দ্রনাথ সুদীর্ঘজীবী ও স্থিরারোগ্য-যুক্ত হইয়া এই অচিরাঙ্কুরিত বাঙ্গালীর আশাকল্পতরু-রূপ শান্তিনিকেতনকে দেশ কাল ও পারিপার্শ্বিক অবস্থাসমূহের অনুকূল ভাবে রসসেক দ্বারা দিগ্‌দিগন্ত বিস্তারশীল শাখা-পত্র-পল্লব-কুসুম ও ফল সম্পদের অক্ষয় বট করিতে সমর্থ হউন।

পুরাতনের জীর্ণ গলিতপ্রায় অকর্ম্মণ্য অঙ্গগুলিকে ছাটিয়া ফেলিয়া বর্দ্ধনশীল হিতকর বিশুদ্ধ অঙ্গনিবহের যথাস্থানে সন্নিবেশ হিন্দুসমাজে কেবল আজই হইতে আরম্ভ করিয়াছে তাহা আমি স্বীকার করি না, যাহা সত্য ও সুন্দর তাহা ভিন্ন দেশে বা ভিন্ন জাতির মধ্যে অভিব্যক্ত হইলেও দেশান্তরে বা জাত্যন্তরে তাহার গ্রহণ ও আদর সকল মনুষ্য সমাজেই ঐহিক ও পারত্রিক অভ্যুদয়ের হেতু হইয়া থাকে, ইহা অগুনীয় সিদ্ধান্ত। হিন্দুসমাজ নিজ গৌরবের সমুন্নত শীর্ষে যখন সমারূঢ় ছিল, তখন এই সিদ্ধান্তানুসারেই তাহা চলিত। প্রাচীন হিন্দুর জাতীয় সাহিত্য ও ইতিহাস ইহার জাজ্জল্যমান প্রমাণ, তাই মহাকবি কালিদাসও বলিয়াছেন—

পুরাণমিত্যেব ন সাধুসর্ব্বম্
নচাপি সর্ব্বং নবমিত্যাছ্যম্।
সন্তঃ পরীক্ষ্যান্যতরদ্ভজন্তে
মূঢ়ঃ পরপ্রত্যয়নেয় বুদ্ধিঃ॥

পুরাতন বলিয়াই যে সকল বস্তু সাধু হইবে তাহা নহে; অন্যদিকে নূতন বলিয়াই যে সকল বস্তু দুষ্ট হইবে তাহাও নহে, সৎপুরুষগণ পরীক্ষাপূর্ব্বক পুরাতন ও নূতনের মধ্য হইতে যাহা সাধু তাহাই গ্রহণ করিয়া থাকেন; যাহার বিবেক নাই সেই ব্যক্তিই পরের প্রতীতি দ্বারা পরিচালিত হইয়া থাকে।

"যাবার বেলায় পিছু ডাকে"

শ্রীঅমিয়জীবন মুখোপাধ্যায়

ওই সন্ধ্যা আসে নেমে। শ্রান্ত দেহটিরে
ধরণীর ক্রোড় পরে এলাইয়া ধীরে
দিবস হ'য়েছে মৌন। যে প্রচণ্ড তেজে
বিশ্বেরে মুখর করি উঠিয়াছে বেজে
তা'র রথচক্রধ্বনি ; যে দৃপ্ত মহিমা
ওই দূর এক সীমা হ'তে আর সীমা
পূর্ণ করি ক্ষণে ক্ষণে জীবনের গানে
দর্প ভরে চলিয়াছে সম্মুখের পানে
দিকে দিকে কর্ম্মস্রোত মুক্ত করি দিয়া
সবারে বিচিত্র করি অঙ্গে ঝলকিয়া
আপনার জ্যোতির্ম্ময় রূপ ; ওই তা'র
অবসন্ন দুটি আঁখি 'পরে আপনার
মুখখানি নত করি রহিয়াছে চাহি
ধরণী নীরবে। শান্ত গণ্ড দুটি বাহি
এক বিন্দু অশ্রু নাই। ললাটের 'পরে
কোনোখানে ওঠে নাই ফুটি অগোচরে
একটি বিষণ্ণ-রেখা এলায়িত কেশে
সর্ব্ব আভরণ হারা বিবাগিনী বেশে
কি যেন ভাবিছে মনে। মাঝে মাঝে তা'র
দুঃসহ বেদনা যেন শুধু একবার
অন্তরের সুগভীর শুব্ধ তল হ'তে
উচ্ছ্বসিয়া বাহিরের শূন্যতার স্রোতে
মিশায়ে দিতেছে ধীরে অতি সুগোপনে
একটি করুণ দীর্ঘনিশ্বাসের সনে
রুদ্ধ মৌন হাহাকার! অন্তিমের হাসি
শোণিত রক্তিম হয়ে ফুটিয়াছে আসি
পরিশ্রান্ত দিবসের যাতনাপাণ্ডুর
কম্প্র ওষ্ঠাধর পরে। হয়ে গেছে দূর
সব অহঙ্কারটুকু চেতনার লাজে,
কোন্ অজানার ডাক ল'য়ে আসিয়াছে
বিদায়ের লগ্ন তা'র! অসীম নির্ভরে
চাহিয়া সে ধরণীর শান্ত আঁখি 'পরে
সমস্ত নয়ন দিয়ে লইতেছে মাগি
যাত্রার পাথেয় যেন করিবার লাগি
ক্লিষ্ট কপোলের 'পরে সব তৃষ্ণাহরা
অচঞ্চল স্নেহ-স্নিগ্ধ-উন্মাদনা-ভরা
একটি চুম্বন-রেখা।

ওগো জানি আমি
একদিন ওই মত চুপে চুপে নামি
আসিবে সহসা মম কুটিরের দ্বারে
অলক্ষিতে ধীরে ধীরে স্বপ্ন-অন্ধকারে
আমারও জীবন-সন্ধ্যা। নিখিলের গান
প্রবাহি চলিয়া যাবে ; অসংখ্য পরাণ
উৎসবে রহিবে মাতি তারি তালে তালে
বিক্ষুব্ধ পুলক বেদনার অন্তরালে
বিকশিয়া ক্ষণে ক্ষণে! তুলি মুক্ত রোল
দিকে দিকে এ বিশ্বের জীবন-কল্লোল
আবর্ত্তিয়া চলি যাবে ফেনিল উচ্ছ্বাসে
দণ্ডে দণ্ডে আপনার সৃজন-উল্লাসে
অনন্ত সৌন্দর্য্যধারা! তারি এক ধারে
মোর ক্ষীণ আয়ু-দীপ-শিখা বারে বারে
শুধু শেষবার লাগি গভীর প্রয়াসে
কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠি উদ্বেলিত-শ্বাসে
পশ্চাৎ মায়ার পানে রাখি দুটি আঁখি
চকিতে নিভিয়া যাবে!

আজি থাকি থাকি
একটি জিজ্ঞাসা মোর জাগি ওঠে বুকে
সেদিন বিদায় লব যে করুণ-মুখে
কোনোদিন—কোনো ক্ষণে—কভু কোনো ছলে
উঠিবে কি ফুটি কভু কারও অশ্রুজলে

সে বিষণ্ণ মুখখানি ? কারও কোনো ক্ষণে
সহস্র কর্ম্মের মাঝে পড়িবে কি মনে
সহসা আমারে ? সে কি হবে আন্‌মনা
কখনো গোপনে স্মরি আমার বেদনা
লুকায়ে যা' ছিল শুধু মোর মর্ম্ম মাঝে
সন্ধান ছিল না যার কভু কা'রও কাছে
কোথায় নীরবে ঢাকা ! কভু কোনো ক্ষণে
নিস্তব্ধ নিশীথে কারও রঙীন্‌-স্বপনে
সকলের একপাশে ম্লান-ছায়া মোর
দাঁড়াবে আসিয়া তার সুষুপ্তি-বিভোর
মুদিত-নয়ন 'পরে ? ধীরে জাগি উঠি
স্পন্দিত বক্ষের 'পরে রাখি বাহু দুটি
আকুলিত মুখখানি ঢাকি উপাধানে
এলাইয়া দিবে দেহ ? আকাশের পানে
হয়ত চাহিয়া রবে কভু একাকিনী
আমারে নিবিড় করি লইবারে চিনি
একটি তারার মাঝে, উদ্ঘাটিয়া তা'র
যুগযুগান্তের গুপ্তরহস্যের দ্বার
নির্নিমেষ দু-নয়ানে ! বরষার মায়া
প্রসারিয়া দিবে যবে আপনার ছায়া
মন্ত্রমুগ্ধা ধরণীর প্রতি অঙ্গ ঘেরি
চঞ্চল চমকে ; সেই সমারোহ হেরি
কারও কি অন্তরখানি শূন্য-হাহারবে
উচ্ছ্বসি উঠিবে কাঁদি ? অন্ধরাতে যবে
গুরু গুরু তালে তালে বর্ষণ-সঙ্গীতে
ধরণীর বক্ষখানি অপূর্ব্ব-ভঙ্গীতে
অঙ্গে অঙ্গে মিলনের রোমাঞ্চ আবেশে
উঠিবে ভরিয়া ; মৃদুল চরণে এসে
কেহ কি দাড়ায়ে গৃহ বাতায়ন তলে
আমারে স্মরিয়া ধীরে কোমল-অঞ্চলে
মুছি লয়ে সদ্যসিক্ত নয়নের পাশ
চাপি যাবে বিরহের করুণ-নিঃশ্বাস
অসহ্য ব্যথায় ? যবে বসন্তের সুরে
মঞ্জুগানে ভরি কুঞ্জ শিঞ্জিত নূপুরে
বাজাইয়া কল কল কাকলীর বীণ্‌
বিশ্বের অঙ্গন-দ্বারে ফাল্গুন নবীন
বর্ণে গন্ধে পূর্ণ করি পুষ্প-রথ 'পরে
দিকে দিকে, কণ্ঠে কণ্ঠে, আনন্দ-শিহরে
বিকচ যৌবন প্রভা দীপ্ত স্মিত মুখে
উঠিবে গুঞ্জরি ; কেহ অনন্ত উৎসুকে
উদ্বেগ-আকুল-বুকে পল গণি গণি
তারি আসা সাথে-সাথে মোরও পদধ্বনি
শুনিবারে পাতি রবে কান ? মৃদু-বায়
মর্ম্মরিয়া দিকে দিকে শুভ্র পূর্ণিমায়
মুঞ্জরি তুলিবে যবে কাননে কাননে
বল্লরীর সুপ্ত সুখ ; সেকি একমনে
বহি বুকে আপনার শঙ্কাপূর্ণ আশা
তারি মাঝে খুঁজি নিতে চাবে মোর ভাষা
উন্মুখ-আকাঙ্ক্ষা-ভরে ? কখনও নিভৃতে
সুন্দরের ধ্যান-মগ্না সমাহিত-চিতে
চন্দন-চর্চ্চিত-পুষ্প সে কি পূজা-থালে
অন্তরের দেবতারে নিবেদন-কালে
জন্ম জন্ম মোরে চাহি প্রার্থনার বাণী
জানাইবে যুক্ত-করে ?
আজি নাহি জানি
কভু আমি লীলায়িত কাহারে স্বপনে
কাহারও স্মরণ পথে কখনও গোপনে
অর্থহীন দাবি নিয়ে এই জীবনের
কেমনে উঠিব ফুটি ? অযোগ্য-প্রেমের
দণ্ডে দণ্ডে টুটি পড়া শিথিল-বন্ধনে
কাহারে রাখিব বাঁধি ? তবু ক্ষণে ক্ষণে
ওগো আজি এ কি মোর তৃষ্ণা উঠে জাগি
মোর জীবনের শেষ স্মৃতিটুকু লাগি
সকলের অন্তরালে একটি অন্তরে
ছেড়ে-যাওয়া এই মোর ধরণীর পরে !

উড়িষ্যার মন্দির

শ্রীনির্ম্মলকুমার বসু

আর্য্যাবর্ত্ত হইতে দাক্ষিণাত্যের অভিমুখে যে-কয়টি পথে লোকে পূর্ব্বে যাতায়াত করিত, তাহার মধ্যে যে-পথটি পূর্ব্বসমুদ্রের উপকূলে উড়িষ্যার ভিতর দিয়া গিয়াছে, তাহা প্রধান না হইলেও হীন নহে। যে-সকল পথে আর্য্যাবর্ত্ত ও দাক্ষিণাত্যের মধ্যে প্রধানতঃ ব্যবসা-বাণিজ্য চলিত, যেদিক দিয়া নানাবিধ লোকের যাতায়াত ছিল, সেগুলি আরও পশ্চিমে বিন্ধ্যগিরি ও নর্ম্মদা নদীকে স্থানে স্থানে অতিক্রম করিয়া গিয়াছে। তাহাদের তুলনায় উড়িষ্যার পথটি অপেক্ষাকৃত দুর্গম। উড়িষ্যার পশ্চিমে যে-পার্ব্বত্য প্রদেশ আছে তাহা হইতে অনেকগুলি নদী পূর্ব্বদিকে প্রবাহিত হইয়াছে। তাহাদের অধিকাংশ প্রস্থে অর্দ্ধ মাইলেরও বেশী। দাক্ষিণাত্য যাইতে হইলে এগুলিকে অতিক্রম করিতে হয়, কিন্তু বাণিজ্যের জন্য অধিক মাল লইয়া বার-বার এরূপ নদী অতিক্রম করাও দুরূহ ব্যাপার। এই কারণে উড়িষ্যার ভিতর দিয়া উত্তর ও দক্ষিণ দেশের মধ্যে বাণিজ্যের তত যোগাযোগ ছিল না। কিন্তু এইরূপ দুরধিগম্য দেশ বলিয়া এবং একপার্শ্বে সমুদ্র ও অপর পার্শ্বে পর্ব্বতের দ্বারা সুরক্ষিত হওয়ার ফলে উড়িষ্যা বহুকাল অবধি ক্ষাত্রশক্তির একটি প্রধান কেন্দ্র ছিল। গঙ্গা হইতে গোদাবরী পর্য্যন্ত দেশ উড়িষ্যার গঙ্গবংশের করায়ত্ত ছিল, এবং তাঁহাদেরই লুণ্ঠিত ধনসম্পদের ফলে বহুকাল ধরিয়া উড়িষ্যাদেশ শিল্পকলার একটা শ্রেষ্ঠ কেন্দ্রস্বরূপ বিরাজ করিয়াছিল। সমস্ত আর্য্যাবর্ত্ত যখন মুসলমান সভ্যতার প্রভাবে আচ্ছন্ন হইয়া আসিতেছে, যখন তাহার শিল্প কলা ও বিদ্যা প্রায় লুপ্ত হইতে বসিয়াছে, তখন উত্তর-ভারতের শেষ সীমান্তে উড়িষ্যা প্রাচীন হিন্দু আচার-ব্যবহার প্রভৃতির আশ্রয়স্থল-স্বরূপ বর্ত্তমান ছিল।

উড়িষ্যায় শুধু যে উত্তর-ভারতের অধুনালুপ্ত প্রথাগুলি বা জীবনযাত্রার পদ্ধতি সংরক্ষিত ছিল, তাহা নহে। আর্য্যাবর্ত্ত ও দাক্ষিণাত্যের মধ্যপথে অবস্থিত হওয়ার জন্য উড়িষ্যায় উভয় দেশেরই প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল। ফলে এখানকার আচার-ব্যবহার বা সভ্যতার বিভিন্ন উপাদানগুলিকে বিশ্লেষণ করিলে কখনও আর্য্যাবর্ত্ত, কখনও-বা দাক্ষিণাত্যের সহিত যোগাযোগের প্রমাণ পাওয়া যায়। কয়েকটি উদাহরণের সাহায্যে এই বিষয়টি উপলব্ধি করা যাইবে। উড়িয়া ভাষা হিন্দী, বাংলা ও গুজরাটীর মত আর্য্যশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। অক্ষরগুলি দেবনাগরী হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। কিন্তু লিপির শৈলী দক্ষিণদেশের মত। অক্ষরের উপর মাত্রা সরল রেখা না হইয়া গোলাকার থাকে। উত্তর-ভারতে 'ঋ'কে 'র' বলে, দক্ষিণে উহার উচ্চারণ 'রু', উড়িষ্যাতেও তাই। দাক্ষিণাত্যে জলাশয়ের মধ্যস্থলে পাথরে নির্ম্মিত একটি ক্ষুদ্র মন্দির থাকে, উড়িষ্যায় তাহাকে দীপদণ্ড বলে। উত্তর-ভারতে জলাশয়ে এরূপ মন্দির স্থাপনার রীতি প্রচলিত নাই। দক্ষিণের সঙ্গীতে মীড়ের ব্যবহার নাই, কিন্তু উড়িষ্যার সঙ্গীতে উত্তর-ভারতের মত মীড়ের ব্যবহার আছে। উড়িষ্যায় পট আঁকিবার যে প্রথা আছে, তাহা মেদিনীপুরের পুরাতন প্রথা হইতে অভিন্ন। এমনিভাবে আমরা উড়িষ্যার সহিত কখনও আর্য্যাবর্ত্তের কখনও-বা দাক্ষিণাত্যের যোগ দেখি। ভাসা-ভাসা পরীক্ষায় যে তত্ত্বের সন্ধান পাওয়া যায়, কোনো একটি বিশেষ পথ ধরিয়া গভীর অনুসন্ধান করিলে তদপেক্ষা অনেক নূতন বিষয়ের সন্ধান পাওয়ার সম্ভাবনা আছে। বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা সেই উদ্দেশ্যে উড়িষ্যার স্থাপত্য-শিল্পের ইতিহাসের পর্য্যালোচনা করিব। হয়ত তাহা হইতে উড়িষ্যার ইতিহাসের সম্বন্ধে আরও কিছু জ্ঞান লাভ করা যাইবে।

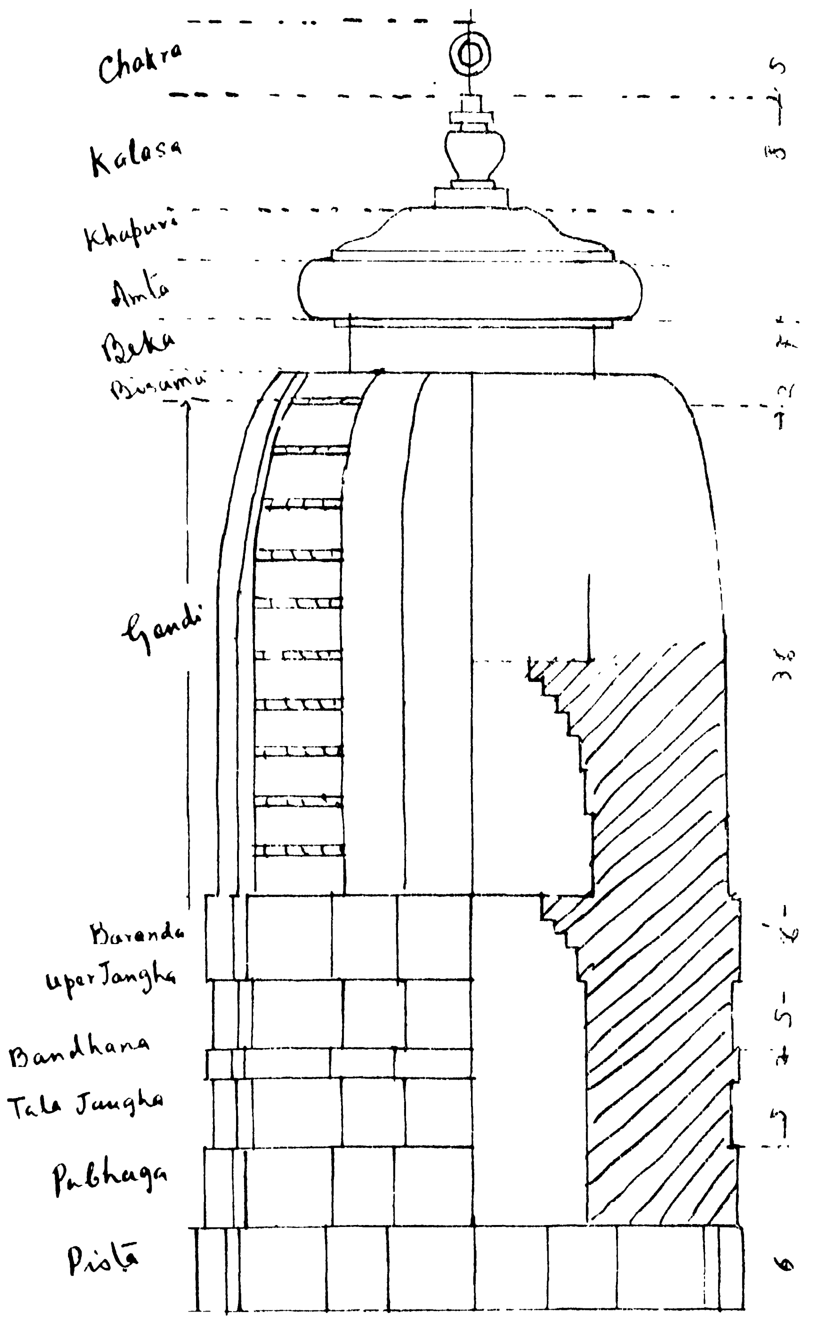
উড়িষ্যার মন্দির ও শিল্পিগণ বিখ্যাত। সেই সকল শিল্পীদের বংশধরগণের নিকট পুরাতন স্থাপত্য বিদ্যার বিষয়ে অনেক তালপাতার উপর হাতে লেখা পুথি



ভুবনেশ্বরে একটি ক্ষুদ্র রেথ দেউল

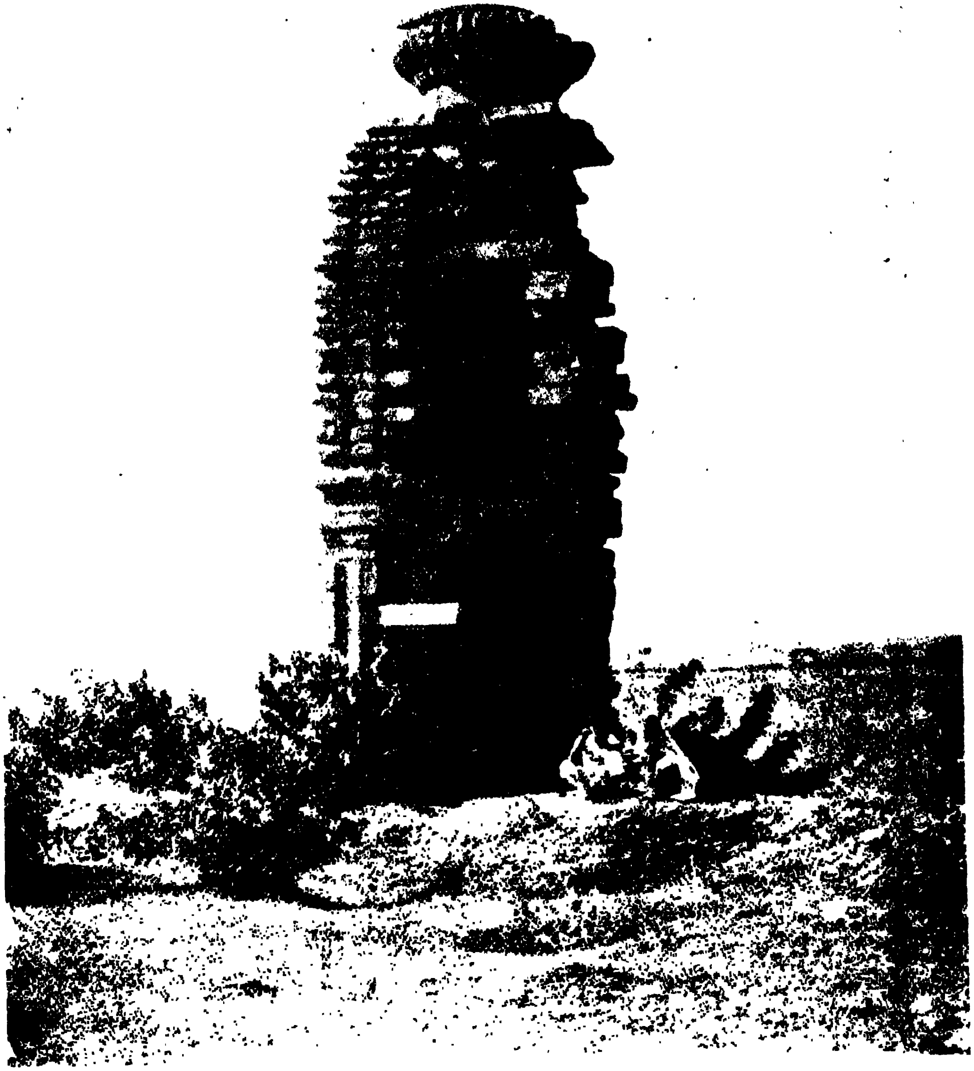
পাওয়া যায়। শিল্পিগণ সহজে জাতিগত বিদ্যা বাহিরের কাহাকেও জানিতে দেন না। সেইজন্য শিল্পবিদ্যার কৌশলের বিষয়গুলি, যথা—কেমন করিয়া পাথর বাছাই করিতে হয়, তাহাদের উচ্চে তুলিতে হয় বা জোড়া দিতে হয়, তাহা পুঁথিতে না লিখিয়া সন্তান বা শিষ্যদের কার্য্যক্ষেত্রে হাতে-কলমে শিক্ষা দিতেন। কেবল যাহা ভুলিবার মত বিষয়, যেমন বিভিন্ন জাতীয় মন্দিরের মধ্যে প্রভেদ, তাহাদের প্রত্যেকের বিশিষ্ট লক্ষণ প্রভৃতি,

পুথিতে লিখিয়া রাখিয়া তাহা সযত্নে লুকাইয়া রাখিতেন। সেইজন্য বহু চেষ্টায় পুথি সংগ্রহ করিতে পারিলেও তাহা হইতে আমরা শিল্পের ব্যাবহারিক অঙ্গগুলির বিষয়ে কিছুই জানিতে পারি না। অবশিষ্ট যা হা থা কে তা হা ও সূত্রাকারে লিখিত বলিয়া পারদর্শী শিল্পীর সাহায্য ব্যতিরেকে বোঝা দুরূহ। এইরূপ প্র থা য় সুবিধাও যেমন, অসুবিধাও তেমনই। সুবিধা এই যে, বেশী লিখিতে হয় না বলিয়া শাস্ত্র লোপ পাইবার সম্ভাবনা কম। আগে যখন মুদ্রাযন্ত্র ছিল না, হাতে বই লেখা হইত, তখন বই যত ব ড় হ ই বে, তা হা কে শুদ্ধভাবে লেখাও তত কঠিন হইত। অসুবিধার মধ্যে বহুদিনের অব্যবহারে শিল্পী যদি শিল্পসূত্রের অর্থ ভুলিয়া যান, তাহা হইলে সেই শব্দের অর্থ পুনরুদ্ধার করা প্রায় অসম্ভব হইয়া পড়ে। যাহাই হউক, এমনই কতকগুলি পুরাতন, ছিন্নভিন্ন শিল্পশাস্ত্র লইয়া জীবিত শিল্পিগণের সাহায্যে উড়িষ্যার স্থাপত্য-শিল্পের প্রায় বার আনা অংশ উদ্ধার করা হইয়াছে।



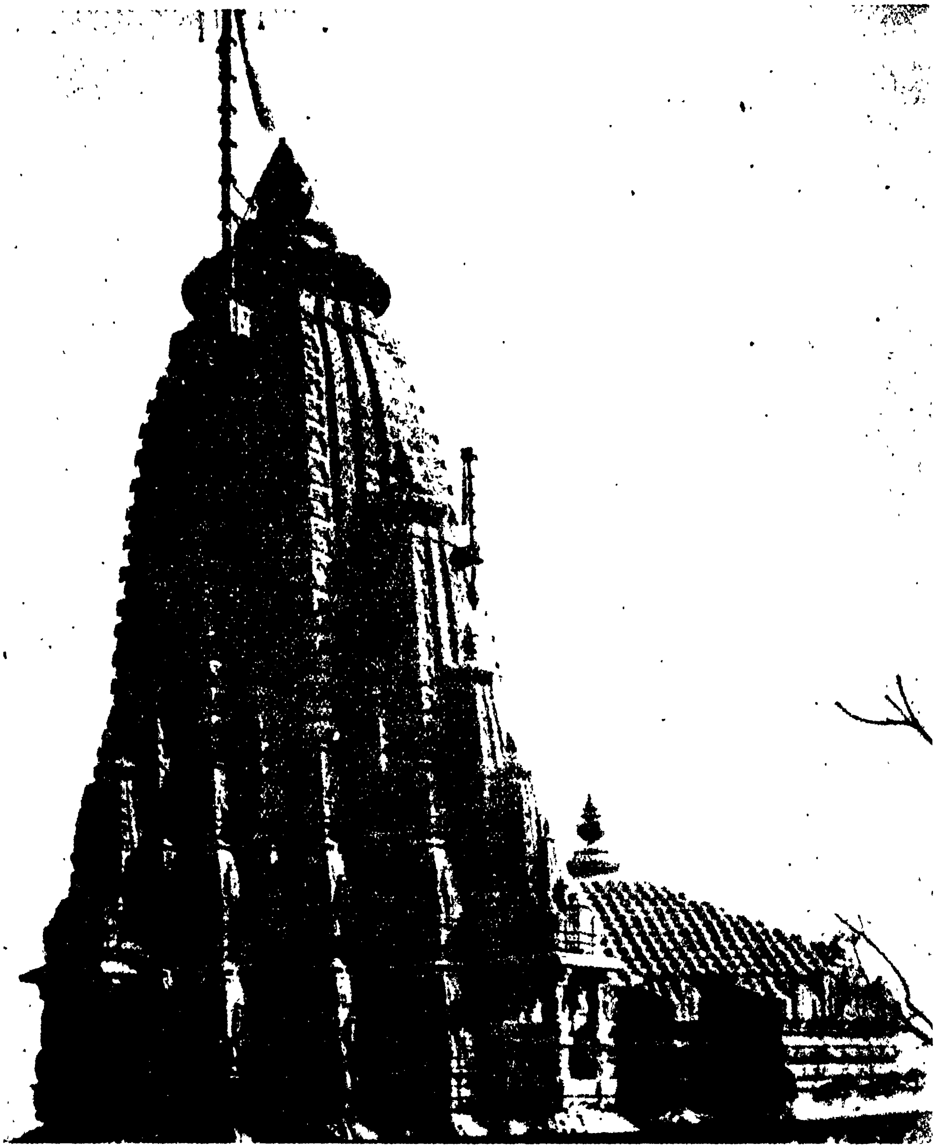
রেখ দেউলের বিশ্লেষণ

তাহাতে দেখা যায় যে, উড়িষ্যায় প্রধানতঃ চারি প্রকার মন্দিরের প্রচলন ছিল। প্রথম রেখ দেউল দ্বিতীয় ভদ্র দেউল, তৃতীয় খাখরা দেউল ও চতুর্থ গৌড়ীয় দেউল। এগুলির মধ্যে রেখ দেউলের লক্ষণ হইল যে, তাহার আসন (ground plan) চতুরস্র অর্থাৎ দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে সমান। এইরূপ আসনের উপর



মানভূম জেলায় তেলকুপি গ্রামে একটি ভগ্ন রেখ দেউল

কিছুদূর খাড়া দেওয়াল উঠিয়া যায়, তাহার পর দেওয়াল ক্রমশঃ ভিতরের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িবে। অনেকখানি উঠিলে পর চারিদিকের দেওয়ালের মধ্যে ব্যবধানটিকে আড়াআড়ি কয়েকটি চওড়া পাথরের পাট বসাইয়া বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। তাহার উপরে মানুষের গলার মত মন্দিরের গলা থাকে। গলার উপরে একটি প্রকাণ্ড গোলাকার এবং চেপ্টা বস্তু থাকে, তাহাকে আঁলা বলে। আঁলার উপরে খর্পরী ও তাহার উপরে একটি কলস ও তদুপরি দেবতার আয়ুধ বসান হয়। ইহাই হইল রেখ দেউলের সাধারণ রূপ।



উদয়পুরের জগদীশ মন্দির

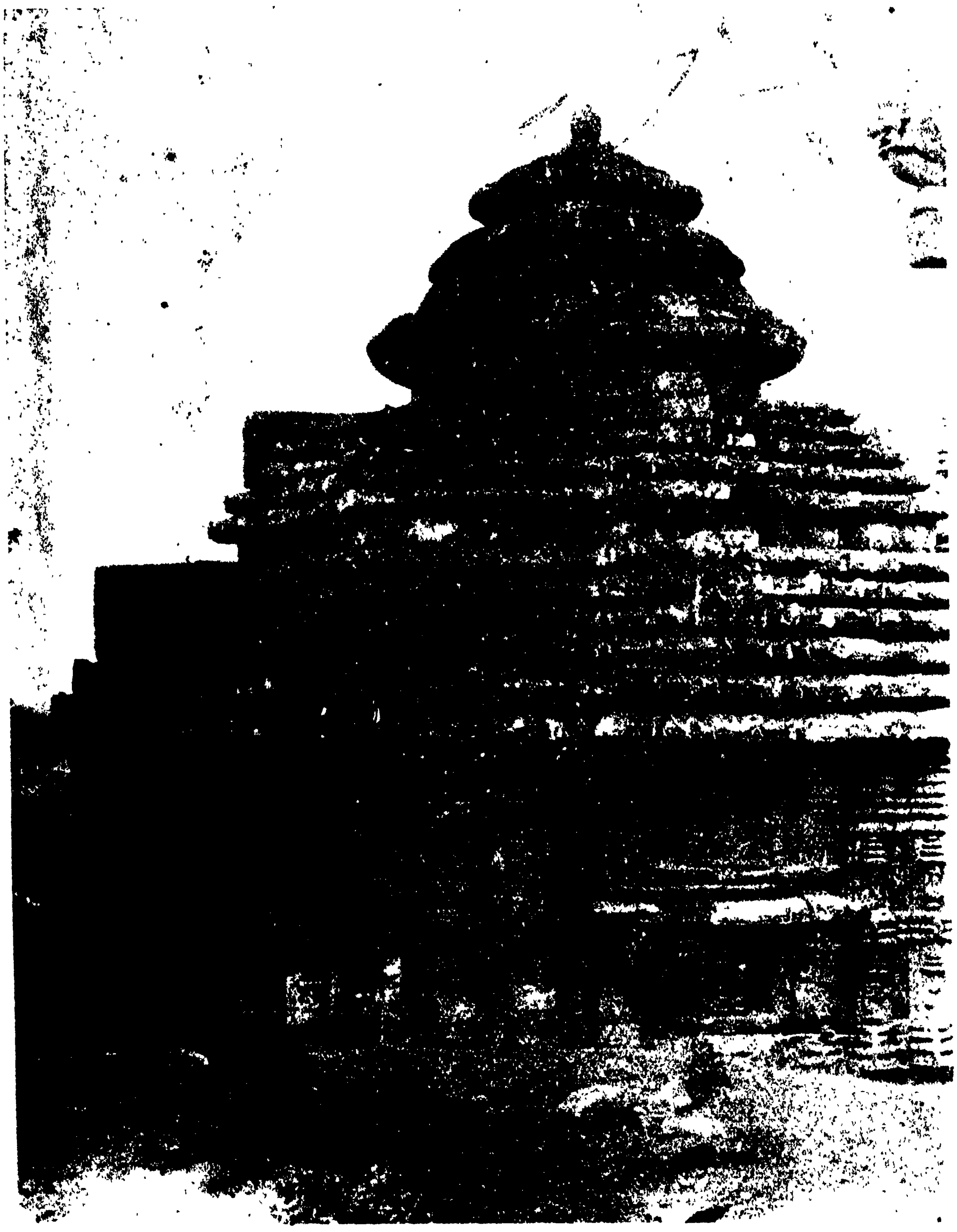
রেখ দেউল যে উড়িষ্যাতেই আবদ্ধ তাহা ভাবিবার কোনও কারণ নাই। বাংলা দেশের মধ্যে বীরভূম ও বৰ্দ্ধমানে, অর্থাৎ রাঢ়দেশে, বিহারে মানভূম, গয়া প্রভৃতি জেলাতেও রেখ দেউল দেখিতে পাওয়া যায়। অবশ্য সে-সকল প্রদেশে মন্দিরগুলি যে ঠিক উড়িষ্যারই অনুরূপ, তাহা নহে। দেশ ও কালের ভেদ অনুসারে তাহাদের রূপেরও তারতম্য হয়, কিন্তু তাহাদের মধ্যে প্রভেদ অপেক্ষা ঐক্যই বেশী। বিহার ও বাংলা ভিন্ন মধ্য-ভারতে বুন্দেলখণ্ড বাঘেলখণ্ডে, ভূপাল রাজ্যের মধ্যে, যুক্তপ্রদেশে বিন্ধ্যাচলে, উত্তরাপথে কাংড়া উপত্যকায়, বদরীনারায়ণের পথেও স্থানে স্থানে রেখ মন্দির দৃষ্টিগোচর হয়। আরও পশ্চিমে, রাজপুতানার মরুভূমির মধ্যে



রাজারাণী মন্দির, ভুবনেশ্বর

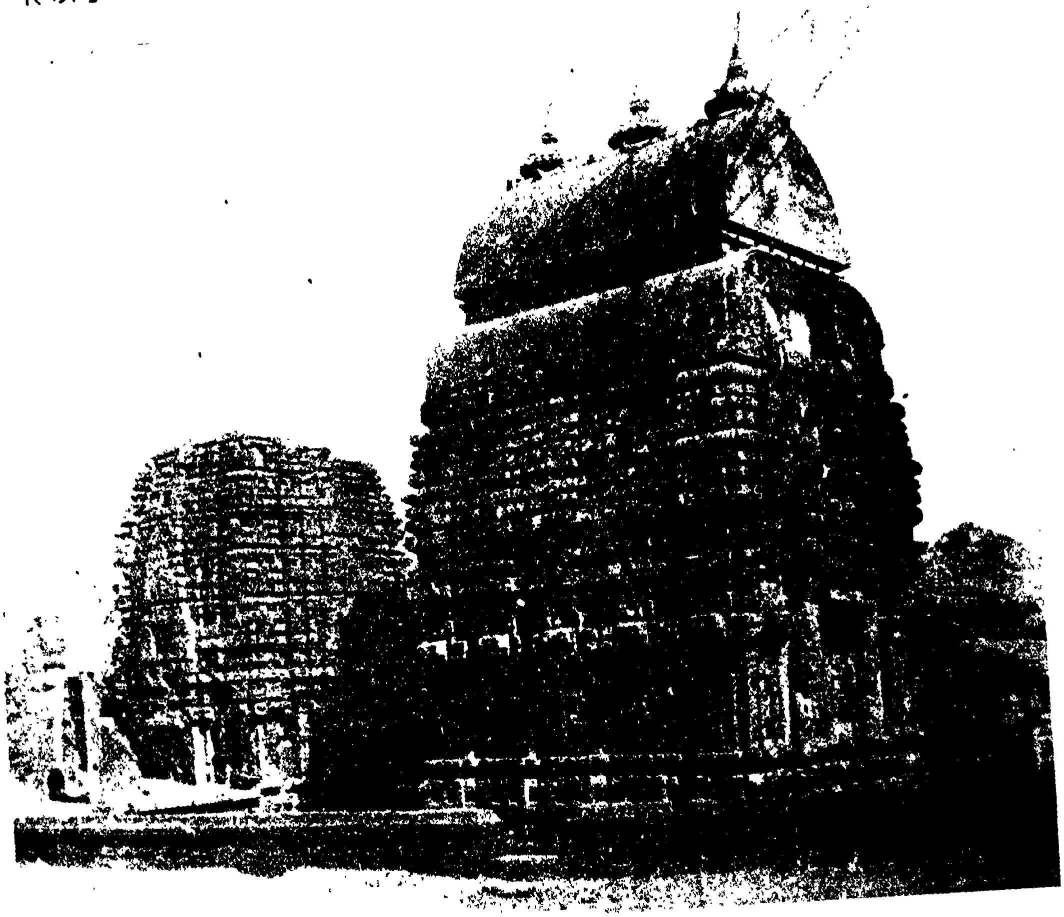
যোধপুরের নিকট ওসিয়া গ্রামে অনেকগুলি রেখ মন্দির একত্র পাওয়া যায়। এইভাবে সমস্ত আর্য্যাবর্ত্ত জুড়িয়া যে এক সময়ে রেখ মন্দির নির্ম্মাণের রীতি ছড়াইয়া পড়িয়াছিল, তাহার প্রভূত প্রমাণ পাওয়া যায়। সকল দেশের রেখ দেউল মোটামুটি উড়িষ্যার মত আকৃতিবিশিষ্ট হইলেও তাহাদের গঠনে, অন্তরের ভাবে ও সজ্জায় স্থানীয় বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করিয়াছে। যাহাই হউক, রেখ দেউলের ইতিহাসের সূত্রে আমরা উড়িষ্যাকে আর্য্যাবর্ত্তের সহিত সংযুক্ত দেখিতে পাই।

উড়িষ্যায় রেখ দেউলকে অবলম্বন করিয়া শিল্পিগণ অনেক ভাব ফুটাইয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের পরিকল্পনায় রেখ দেউল একটি দণ্ডায়মান পুরুষস্বরূপ। মন্দিরের বিভিন্ন



ভুবনেশ্বরে সারি দেউলের সহিত সংযুক্ত ভদ্র দেউল

অংশের নামকরণও সেই অনুসারে হইয়া থাকে। সর্ব্ব নিম্নে পাদ, তাহার উপরে জঙ্ঘা। মধ্যে গণ্ডী (দেহের মধ্যভাগ), তাহার উপরে গলা, খর্পরী প্রভৃতি শব্দের ব্যবহারে পরিকল্পনার অন্তর্নিহিত তত্ত্বটি সহজে ধরা পড়ে। এইরূপ পুরুষমন্দিরের অন্তরে ভগবান মূর্ত্তি ধারণ করিয়া বিরাজ করিতেছেন। রেখ দেউলের সম্মুখে যাত্রিগণের বসিবার জন্য যে দেউল থাকে তাহার গঠন কিন্তু রেখ দেউলের গঠন হইতে স্বতন্ত্র। শিল্পিগণ এইরূপ



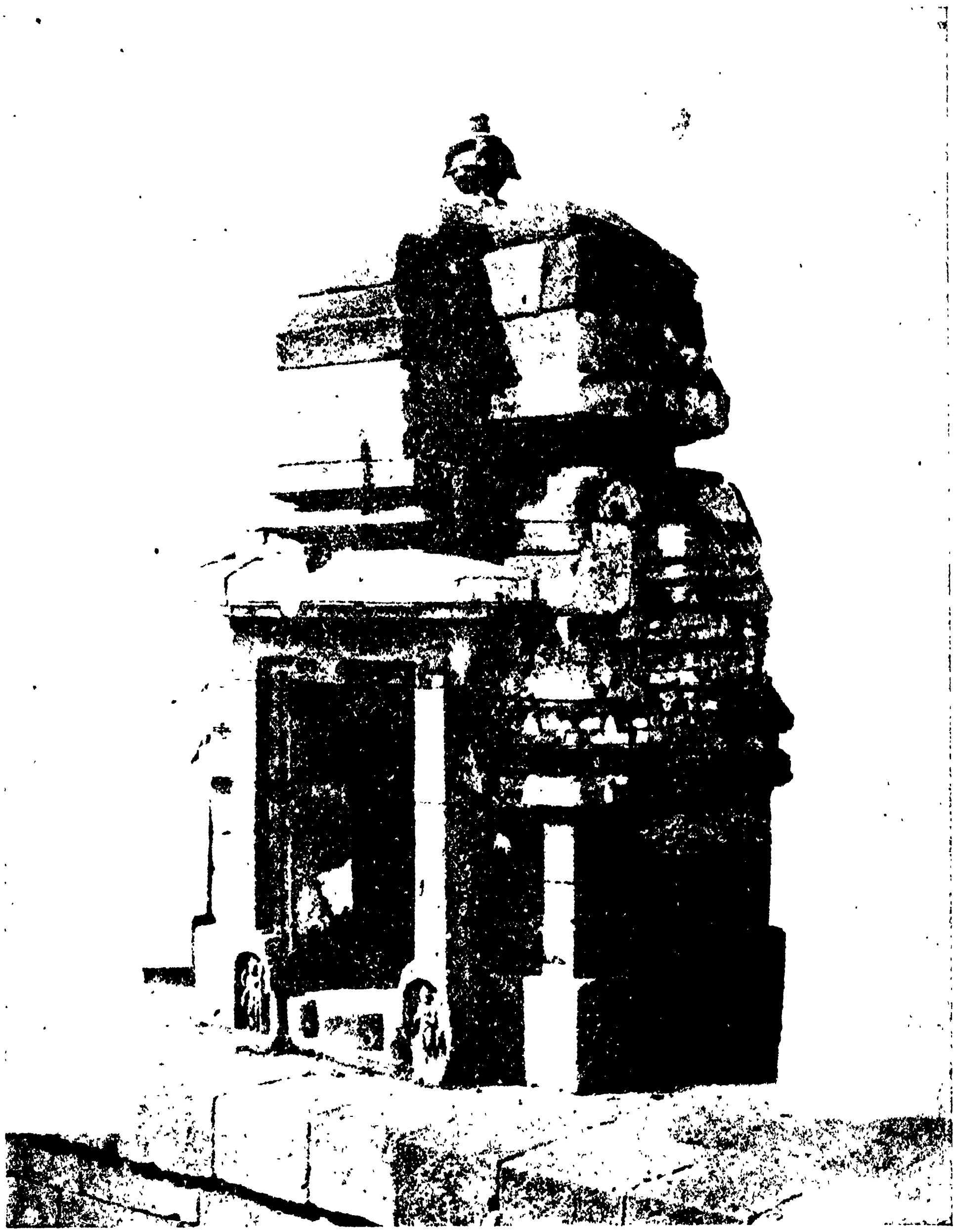
বৈতাল দেউল (খাখরা জাতীয়), ভুবনেশ্বর

পিরামিডের মত ত্রিকোণ ছাদ বিশিষ্ট মন্দিরকে রেখ দেউলের সহিত তুলনায় স্ত্রীজাতীয় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন।

ভদ্র দেউলের নীচের অংশ রেখ দেউলেরই মত। কিন্তু দেওয়াল অর্থাৎ সরলভাবে দণ্ডায়মান অংশ শেষ হইলে মন্দিরটি সু-উচ্চ বংশদণ্ডের মত ঈষৎ বক্রভাবে না হেলিয়া পিরামিডের আকৃতি ধারণ করিয়া থাকে। ইহাকে ভদ্র দেউলের গণ্ডী অথবা ভদ্রগণ্ডী বলে। ভদ্রগণ্ডী অনেকগুলি থাক অথবা পিঢ়ার সমাবেশে রচিত হয়। শাস্ত্রীয় বিধি অনুসারে সর্ব্বোচ্চ পিঢ়াটি দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে সর্ব্বনিম্ন পিঢ়ার অর্দ্ধেক হইয়া থাকে। ইহার উপরে ভদ্রগণ্ডীর মস্তক স্থাপিত হয়।

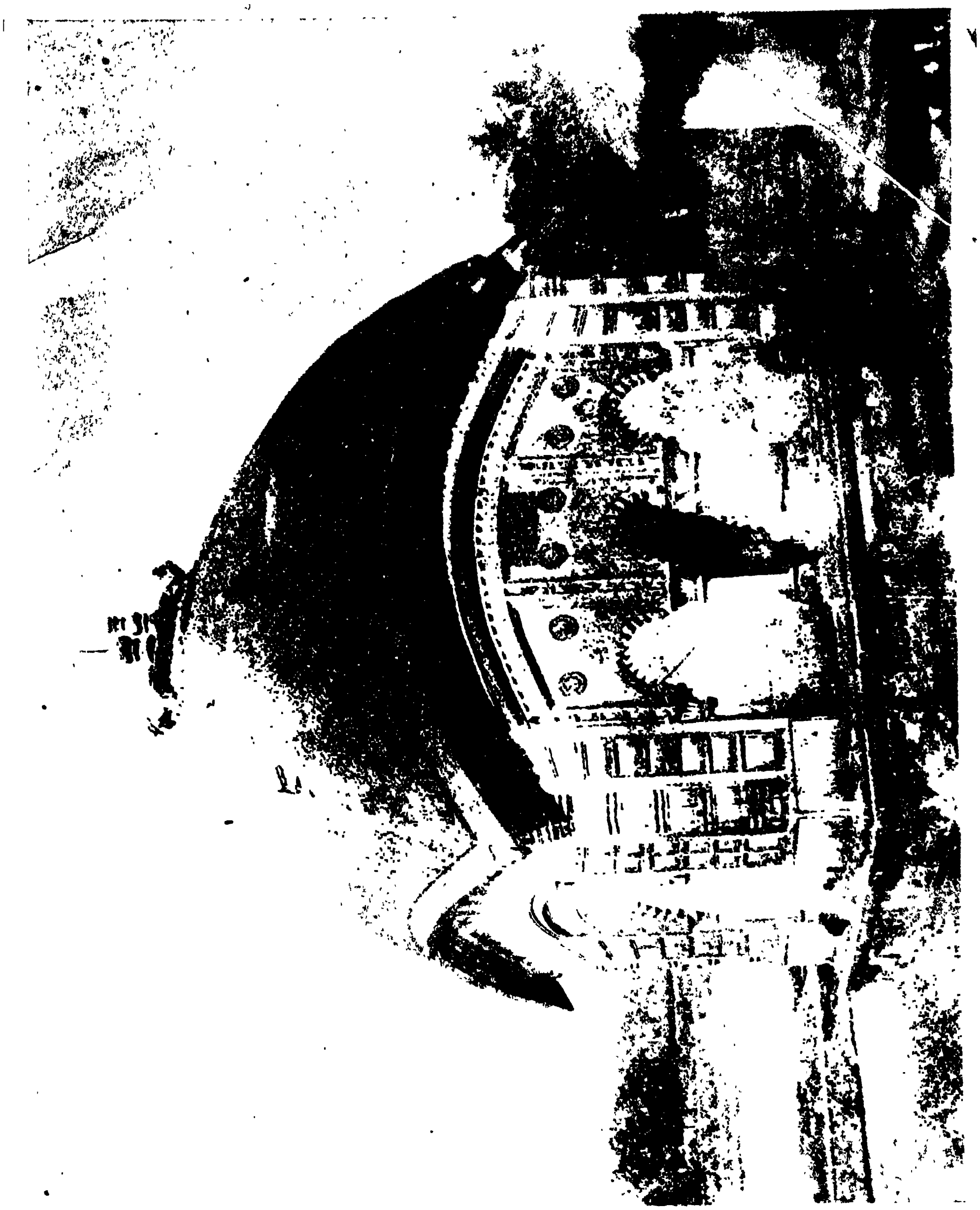
উড়িষ্যায় যত পুরাতন রেখ দেউল আছে, তত পুরাতন ভদ্র দেউল নাই। প্রথমে রেখদেউল শুধুই করা হইত, সম্মুখে খোলা দরজা থাকিত। রেখ দেউলের গভ বড় নহে বলিয়া প্রথম প্রথম যাত্রিগণ বোধ হয় বাহির হইতে বিগ্রহ দর্শন করিতেন। পরে তাঁহাদের ক্লেশ নিবারণের জন্য লম্বা আটচালার মত পাথরের একটি আয়ত মন্দির নির্ম্মাণ করা হইত। তাহার কিছুকাল পরে চতুরস্র ও ভদ্র-গণ্ডীবিশিষ্ট ভদ্র দেউল রচিত হইতে লাগিল। ক্রমে রেখার সহিত এক বা দুইটি ভদ্র দেউল করিবার বিধিই দাঁড়াইয়া গেল।

উড়িষ্যা ভিন্ন মানভূমে একটি ও রাজপুতানায় ওসিয়াঁ গ্রামে একটি ভদ্র দেউল দেখা যায়। মানভূমের পাড়াগ্রামে



ভুবনেশ্বরে একটি ক্ষুদ্র খাখরা দেউল

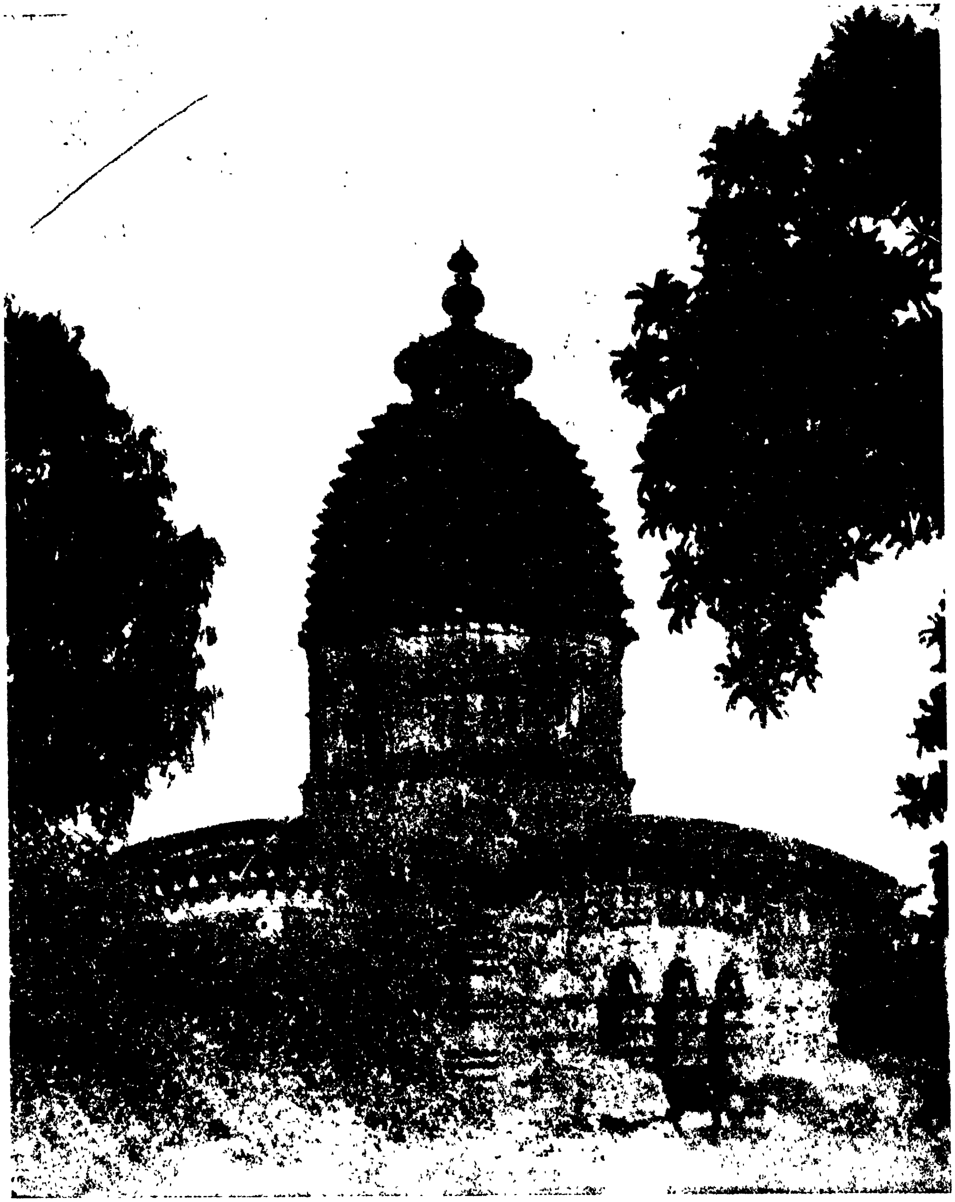
যে ভদ্র দেউল আছে, তাহার গণ্ডী পিরামিড সদৃশ হইলেও উড়িষ্যা বা ওসিয়াঁর ভদ্র দেউলের মত পিঢ়ার সমাবেশে রচিত নহে। ইহা হইতে অনুমান হয় যে, পিরামিড আকারের ছাদ এবং পিঢ়ার ব্যবহার বিভিন্ন কালে বা বিভিন্ন দেশে উৎপন্ন হইয়াছিল। বাংলা দেশে রেখ সদৃশ মন্দিরের গণ্ডী সচরাচর পিঢ়ার সমাবেশে নির্ম্মিত হয়। ইহাও উল্লিখিত অনুমানকে সমর্থন করে। কিন্তু পিরামিড আকৃতিটি কোন্ দেশে আবিষ্কৃত হইয়া কেমন করিয়া উড়িষ্যায় এত প্রসারলাভ করিল, তাহা এখনও স্পষ্টরূপে জানা যায় নাই।



পুরীতে মার্কণ্ডেশ্বর সরোবরতীরে গৌড়ীয় দেউল

ভদ্রের পরে আমরা শিল্পশাস্ত্রে খাখরা দেউলের উল্লেখ পাই। খাখরা দেউলের আসন আয়ত। দেওয়াল রেখের মত; গণ্ডী পিঢ়ার সমাবেশে রচিত। ইহা কিছু দূর পর্য্যন্ত রেখ-গণ্ডীর মত, কিছু দূর আবার ভদ্র-গণ্ডীর মতও রচিত হইতে পারে। গণ্ডীর উপরে খাখরা নামে একটি বিশিষ্ট আকৃতির বস্তু থাকে।

খাখরা দেউল উড়িষ্যায় খুবই কম। কেবল ভুবনেশ্বরে চার পাঁচটি উদাহরণ ভিন্ন ইহার আর কোথাও সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না। তবে অলঙ্কার-হিসাবে খাখরার প্রতিকৃতির ব্যবহার উড়িষ্যায় বহু স্থানে দেখা যায়। শিল্পশাস্ত্রে খাখরা-জাতীয় দেউলের মধ্যে দ্রবিড়া, বিরাটি প্রভৃতি কয়েকটি বিশিষ্ট রূপের উল্লেখ আছে। দ্রাবিড়



বিষ্ণুপুরে রেখ ও গৌড়ীয়ের সংমিশ্রণে রচিত মন্দির

দেশের মন্দিরও আয়ত আসনযুক্ত এবং তাহার উপরে খাখরার অনুরূপ, কিন্তু তাহা অপেক্ষা উচ্চতায় অনেক ছোট, একটি অংশ থাকে। এই সকল কারণে মনে হয় খাখরা দেউল দ্রাবিড় মন্দিরের উড়িয়া সংস্করণ। অতএব এই জাতীয় মন্দিরের সূত্রে আমরা উড়িষ্যার সহিত দক্ষিণ দেশের একটি যোগসূত্র পাই।

খাখরার পরে শিল্পশাস্ত্রে যে গৌড়ীয় মন্দিরের উল্লেখ আছে তাহার নামেই তাহার উৎপত্তির ইতিহাস পাওয়া যায়। উড়িষ্যায় গৌড়ীয় মন্দির নাই বলিলেই হয়। কেবল পুরীতে উত্তর পার্শ্ব মঠের দ্বারে এবং মার্কণ্ডেয় সরোবরের তীরে বর্দ্ধমানের মহারাজা কীর্ত্তিচন্দ্রের জননীর চেষ্টায় নির্ম্মিত একটি মন্দিরে গৌড়ীয় শৈলীর ব্যবহার

দেখা যায়। উড়িষ্যায় গৌড়ীয় স্থাপত্যরীতি কোনও প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। তাহার কারণ উড়িষ্যায় তৎপূর্ব্বে হইতেই বিশাল প্রস্তরখণ্ডের সমাবেশে রচিত সু-উচ্চ মন্দিরের ব্যবহার প্রচলিত ছিল। সেইজন্য গৌড়ীয় স্থাপত্যরীতি উড়িষ্যাকে এ-বিষয়ে কিছু দিতে পারে নাই এবং দিবার মত তাহার কিছু ছিলও না।

মোটের উপর স্থাপত্যের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে আমরা উড়িষ্যাকে প্রধানতঃ আর্য্যাবর্ত্তের সহিত সম্বন্ধবদ্ধ দেখি। দাক্ষিণাত্যের সহিত এ-বিষয়ে তাহার সংযোগ অপেক্ষাকৃত ক্ষীণ। এমনিভাবে গৃহনির্ম্মাণের পদ্ধতি, পোষাক-পরিচ্ছদ, আহার ও রন্ধন বিধি, সামাজিক গঠন অথবা ধর্ম্মমতের পর্য্যালোচনা করিলে আরও হয়ত কত নূতন সূত্রের সন্ধান পাওয়া যাইবে। বহুজনের সম্মিলিত চেষ্টার দ্বারা যখন ধীরে ধীরে ইতিহাস গঠনের মালমশলা প্রভূত পরিমাণে সঞ্চিত হইবে তখনই আমরা উড়িষ্যার প্রকৃত ইতিহাসের রচনাকার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে পারিব।

পোর্ট আর্থারের ক্ষুধা

শ্রীসুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

৭

প্রথম বন্দী

একদিন লেফটেন্যান্ট তোকি জন কয় সৈনিক লইয়া Luanni-Chiao-র আশপাশে শত্রুসন্ধানে বাহির হইলেন। শত্রুর দেখা মিলিল না, তাই পশ্চাতে প্রহরী দাঁড় করাইয়া ফিরিতে সুরু করিলেন। এ হেন সময়ে তাঁর দল ও পশ্চাদ্বর্ত্তী প্রহরীদলের মধ্যে দুইজন রুশচরের অপ্রত্যাশিত আবির্ভাব। জাপানী সৈনিকের বেড়াজালের মধ্যে পড়িয়াও তারা বশ্যতা স্বীকার করিল না—কীরিচ লইয়া রীতিমত লড়াই সুরু করিয়া দিল। অবশেষে গুলির ঘায়ে আহত হইয়া তারা যখন ধরাশায়ী হইল, তখন দেখা গেল, আঘাত গুরুতর হইলেও তখনও প্রাণ বাহির হয় নাই।

এই আমাদের প্রথম বন্দী। তাদের প্রশ্ন করিবার জন্য সকলে অধীর হইয়া উঠিল। অবিলম্বে খড়ের মাদুর তৈরি হইয়া গেল, তার উপর দুজনকে শোয়াইয়া একটি জলধারার পাশে আনা হইল। সেখান থেকে আমাদের ছাউনি বেশী দূর নয়।

বন্দী শত্রু দেখিবার আগ্রহে সৈনিকেরা চারিধারে ভিড় করিয়া দাঁড়াইল। দোভাষী সঙ্গে লইয়া অবিলম্বে একজন কর্ম্মচারী আসিয়া পৌঁছিলেন, দুই বন্দীকে দুই জায়গায় রাখিয়া পরীক্ষা সুরু হইল।

সাধামত শুশ্রূষান্তে ডাক্তারেরা প্রবোধ দিয়া বলিল, চিন্তা নেই, আমরা তোমাদের দেখাশুনো করব! এখন বেশ নিশ্চিন্ত হয়ে সব প্রশ্নের ঠিক ঠিক উত্তর দাও দেখি!

ডাক্তারেরা আমাদের জানাইল, গুলি দুজনেরই বুক ভেদ করিয়াছে। বড় জোর ঘণ্টাখানেক বাঁচিতে পারে! জ্ঞান থাকিতে থাকিতে দরকারী কথা জিজ্ঞাসা করা ভাল!

প্রশ্ন হইল—তোমার কোন্ রেজিমেণ্ট আর কোন্ দল?

বন্দী বেচারা হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল, Infantry Sharpshooters ২৬ নম্বর রেজিমেণ্ট।

"বেশ। তোমাদের দলের নায়ক কে?"

"জানি না।"

দোভাষী তাহাকে বুঝাইতে লাগিল,—জানি না বল কেন? নিজের নায়কের নাম তোমার জানা উচিত!

বন্দীর মুখ দেখিয়া মনে হইল না সে মিথ্যা কহিতেছে। তার মুখ দিয়া রক্ত পড়িতেছিল, শ্বাস-প্রশ্বাসেও কষ্ট হইতে লাগিল।

সে জল চাহিল।

আমি তার পাশেই ছিলাম। ঝর্ণা থেকে এক গ্লাস জল ধরিয়া তাহাকে দিতে গেলাম। নেওয়া দূরের কথা, সে ফিরিয়াও তাকাইল না।

"আমার বোতলে ফোটানো জল আছে, আমাকে তাই দিন!"

তাই করিলাম। জানি না, সেই রুশ সৈনিক আসন্ন মৃত্যুকালেও শত্রুর-দেওয়া জল-পান করিতে ঘৃণা বোধ করিল কি না! তবে, কাঁচা জল পান না করিয়া স্বাস্থ্যবিধি পালনের যে-আগ্রহ সে দেখাইল, তাহাতে বিস্মিত হইলাম। চরিত্রের এই দৃঢ়তার জন্যই আহত না হওয়া পর্য্যন্ত সে জাপানীদের সঙ্গে নির্ভয়ে যুঝিতে পারিয়াছিল।

এই রুশ সৈনিকটিই যে কেবল তার নায়কের নাম জানিত না, তা নয়। পরে অনেক বন্দীকেই প্রশ্ন করিয়া বুঝিয়াছি অধিকাংশই সমান অজ্ঞ। কিসের জন্য বা কার জন্য যে তারা লড়িতেছে, তা-ও তারা জানিত না। দশজনের মধ্যে ন-জন বলিত, তাড়ার চোটে যুদ্ধক্ষেত্রে আসিয়াছে—কেন, কি বৃত্তান্ত, অতশত বোঝে না!

বন্দীকে রেহাই দেওয়া হইল। ক্রমেই সে সাদা হইতেছে, শ্বাস-প্রশ্বাসের কষ্ট বাড়িয়া চলিয়াছে, মৃত্যুর আর বিলম্ব নাই।

ডাক্তার জিজ্ঞাসা করিল, "কষ্ট হচ্ছে কি? কিছু বলতে চাও?"

সহানুভূতির কথায় বন্দীর চোখে জল আসিল। মাথাটা একটু তুলিয়া সে কহিল, দেশে স্ত্রী-পুত্র রেখে এসেছি। তাদের জানাবেন, কেমন ক'রে আমার মৃত্যু হ'ল।

অপর বন্দীটি ভিন্ন প্রকারের। দোভাষী যখন জিজ্ঞাসা করিল, তোমার রেজিমেণ্ট এখন কোথায়?

সে কতকটা এইরূপ উত্তর দিল—

"চোপ রও! জানি না আমি! জাপানীরা ভারি নিষ্ঠুর! যারা আত্মসমর্পণ করে তাদের প্রতি লেশমাত্র দয়া নেই! আমাকে 'সুপ' দাও, চুরট দাও!"

নান্‌শানে বিশেষভাবে পরাজিত হইয়াও রুশেরা বুঝে নাই জাপানীদের যথার্থ কৃতিত্ব কোথায়? পোর্ট-আর্থারের তথাকথিত অজেয় শক্তির উপর নির্ভর করিয়া তারা খর্ব্বকায় শত্রুকে হেয়জ্ঞান করিয়াছিল। কূপ-মণ্ডুকের মত তাদের অবস্থা। Chiulien-cheng-এ আমাদের বিজয়বার্ত্তা তারা শোনে নাই, রুশেরা কোরিয়া হইতে নিঃশেষে বিতাড়িত হইয়াছে তাও জানে না। এসব কথা শুনিয়াও তারা বিশ্বাস করে নাই।

শত্রুর আড্ডা আবিষ্কারের চেষ্টা দিনরাত চলিতেছে। একবার একটা বড় দল শত্রুসন্ধানে বার হইয়া একদল অশ্বারোহী রুশসৈন্যের মুখোমুখি পড়িয়া যায়। শত্রুপক্ষের অনেকে নিহত হইল। জাপানীরা তাদের ঘোড়াগুলি ধরিয়া লইয়া আসিল।

রুশেরাও আমাদের উপর অবিরাম লক্ষ্য রাখিয়াছিল। দূরে Waitou-shan গিরিশিরে দূরবিন্ হাতে লইয়া কালো পতাকা নাড়িয়া শাস্ত্রীরা সর্ব্বদাই ইসারা করিতেছে দেখিতে পাইতাম। কখনও কখনও তারা আমাদের অগ্রবর্ত্তী শ্রেণীর উপর নজর রাখিবার জন্য চীনাসাজে গুপ্তচর পাঠাইত। প্রথম প্রথম তাদের ছদ্মবেশ ধরা পড়ে নাই—অসতর্কতার ফলে কয়েকজন জাপানী প্রহরী নিহত হয়। পরে আমরাও সাবধান হইলাম—এমন কি আসল চীনাদেরও আমাদের এলাকায় আসিতে দিতাম না। একবার সমুখের গ্রামের চীনা 'মেয়র' জাপানী এলাকায় প্রবেশের অনুমতি চাহিলেন। এই নিয়মে তাঁদের অত্যন্ত অসুবিধা হইতেছে জানাইলেন। তখন জাপানী কর্ত্তৃপক্ষ একটি বিশিষ্ট কমিটির হাতে এরূপ ব্যক্তিগত ব্যাপারের তদন্তের ভার অর্পণ করেন। ফলে, যাদের পরিবার বা আত্মীয়-স্বজন এলাকার মধ্যে বাস করে, কেবল তারাই প্রবেশের অনুমতি পাইল।

এইরূপে আসল যুদ্ধের আয়োজনে নিরত থাকিয়া সুযোগের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। সামরিক কারণে কিছুকাল গায়ে পড়িয়া আক্রমণ না করিয়া, সে কাজ

শত্রুকে করিতে দেওয়া হইল। যাহাতে তারা অতর্কিত আক্রমণ করিতে না পারে, কেবল ততটুকু সাবধানতা আমরা অবলম্বন করিলাম। ইত্যবসরে শত্রুর রণপোত Hsiaoping-tao এবং Heishi-chiao-র নিকটে আবির্ভূত হইয়া এলোপাথাড়ি গোলা ছুঁড়িয়া আমাদের আড্ডা আবিষ্কারের চেষ্টা করিতে লাগিল।

৮

ওয়াইতুশানের যুদ্ধ

মাসাবধি কাল আটঘাট বাঁধিয়া সুযোগের প্রতীক্ষায় আছি। শত্রুর সহিত অবিরাম খণ্ডযুদ্ধ চলিতেছে। শত্রু আছে অনেকগুলি উঁচু পাহাড়ে, আমরা আছি নীচে। সুতরাং আমাদের গতিবিধি লক্ষ্য করা তাদের পক্ষে সহজ। শত্রুকে এই সুবিধা দেওয়া আর উচিত নয়।

পাহাড়গুলির নাম Waitou-shan (উচ্চতা ৩৭২ 'মিটার') Shungting shan (দুই চূড়াবিশিষ্ট, উচ্চতা ৩৫২ 'মিটার') আর একটি অনামা পাহাড়। আমরা তার নাম দিয়াছিলাম Kenzan বা 'খড়্গগিরি' সেটি প্রথম দুইটির চেয়ে উঁচু এবং দুরারোহ। এই-সব পাহাড় আমাদের আক্রমণ থেকে নিরাপদ। সেখানে ভালো ভালো দূরবিন্ বসাইয়া শত্রুপক্ষ আমাদের ছাউনি, তালিয়েন্ উপসাগর ও Dalnyতে কি ঘটিতেছে সমস্তই দেখিতে পায়। ইহা আমাদের একটা মস্ত অসুবিধা। ঐ সব জায়গা যতদিন শত্রুর হাতে থাকিবে, ততদিন আমাদের পিছনে যুদ্ধের আয়োজন হইবার জো নাই, হয়ত অগ্রসর হইয়া আক্রমণ করিবার সুযোগও হারাইতে হইবে! অতএব স্থানগুলি অবিলম্বে দখল করা দরকার। তা ছাড়া Hsiaoping-tao লইতে হইবে, যাহাতে শত্রুর জাহাজ Talien উপসাগরে হানা দিতে না পারে। Waitou-shanএ আমাদের প্রথম যুদ্ধের ইহাই কারণ।

এ যুদ্ধ কিছু মারাত্মক নয়—ঐ সব পাহাড় থেকে শত্রুকে বিতাড়িত করাই ইহার উদ্দেশ্য। সুদৃঢ় স্থান—তাই রুশেরা উহা রক্ষার বিশেষ কোনো বন্দোবস্ত করে নাই। সে-স্থান আক্রমণ করা তাই তেমন কঠিন ছিল না। আমাদের কিন্তু ইহাই প্রথম যুদ্ধ, তাই প্রচুর উৎসাহ ও জেদের সহিত লড়িয়াছিলাম।

একদিন গোপন আদেশ পৌঁছিল—অবিলম্বে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও! তখন রাত অনেক, শিবিররক্ষীদের আগুন নিবিয়া আসিয়াছে। মাঝে মাঝে গাধার ডাক রাত্রির নির্জ্জনতা আরও বাড়াইয়া তুলিতেছিল। মাঝরাতে এ আদেশ আসিল কেন?—চীনাদের ভয়ে। স্থির ছিল পূর্ব্বদিন আক্রমণ হইবে, কিন্তু যাত্রার আয়োজন সুরু হইবার পর সন্দেহ হইল যে, চীনারা শত্রুপক্ষের কাছে আমাদের অভিসন্ধি ফাঁস করিয়া দিয়াছে। অগত্যা সেদিন আক্রমণ স্থগিত রাখিয়া পরদিন প্রত্যুষে করাই স্থির হইল। চীনারা টের পাইবার আগেই যাত্রা সুরু করিতে হইবে!

সে-রাত্রে উত্তেজনায় ঘুম আসিল না। বিছানায় এপাশ-ওপাশ করিতে করিতে আসন্ন যুদ্ধের কল্পনায় মন ভরিয়া উঠিল। মাঝে মাঝে পাশের শয্যায় শায়িত সৈনিকের সঙ্গে যা তা আবোল-তাবোল বকিতে লাগিলাম। অন্ধকারে ইতস্তত ছোট ছোট আগুনের ঝিলিক চোখে পড়িতেছে। বুঝিলাম অনেকেই জাগিয়া আছে এবং সিগারেট টানিতে টানিতে আমারই মত হয়ত কত কি ভাবিতেছে!

অচিরে শিবিরের সর্ব্বত্র একটি নীরব চঞ্চলতার সৃষ্টি হইল। সৈনিক ও নায়কেরা দ্রুতগতি শয্যাত্যাগ করিয়া যথাসম্ভব নিঃশব্দে তাঁবু ও ওভারকোট পাট করিতে সুরু করিল। অতি সাবধানে ক্যাঁচকেঁচে চামড়ার বোঁচকা (knapsack) আঁটিয়া পা টিপিয়া টিপিয়া ঘাসের উপর দিয়া এক জায়গায় গিয়া জড়ো হইলাম। বন্দুকগুলি গাদা দিয়া দাঁড় করাইয়া রাখা হইল। মেঘাচ্ছন্ন আকাশ কালির মত কালো—অন্ধকারে কেবল কিরীচ ও টুপির উপরকার ধাতুময় তারাগুলি চকচক করিতেছে। নয়ন নিদ্রালস ও নিষ্প্রভ হইলেও সৈনিকদের চিত্তে দৃঢ়তা ও অধীরতার অভাব নাই। চাপাস্বরে কথা চলিতেছে—"কিছু ফেলিয়া আস নাই ত?" "সব আগুন নিবিয়াছে?"

সহসা সকলে নির্ব্বাক হইল। "নিঃশব্দে চল"—এই আদেশ পাইয়া তারা চলিতে সুরু করিল। গ্রামসীমা না ছাড়ানো পর্য্যন্ত সন্তর্পণে চলিতে হইল—যাহাতে চীনারা

না জানিতে পারে, প্রভাতে উঠিয়া আমাদের না দেখিয়া যেন অবাক হইয়া যায়! একমাস গ্রামে ছিলাম, ইহারই মধ্যে সেখানকার নদী গিরি প্রান্তর পরিচিত হইয়া উঠিয়াছে, তাদের উপর মায়া পড়িয়া গেছে, গ্রামখানি গৃহের মত হইয়া উঠিয়াছে। এতদিন যে তরু আশ্রয় দিল, যে জলধারা তৃষ্ণা মিটাইল, তাদের প্রতি উদাসীন হই কিরূপে?

পল্লীবাসীদের মধ্যে এক বুড়া ছিল—তার নাম চ্যাং তিন্‌শিন্। লোকটি আমাদের অনেক সেবা করিয়াছে, সকালে জল তুলিয়াছে, সন্ধ্যায় আগুন জ্বালিয়াছে। কেমন করিয়া টের পাইয়াছিল আমরা যাইতেছি—সারা রাত সে আমাদের কাজ করিল, তারপর গ্রাম অন্তে আসিয়া আমাদের বিদায় দিয়া গেল। বেচারা! তাহাকে আজও ভুলিতে পারি নাই।

ভোরের কুয়াশায় আকাশ আচ্ছন্ন—সূর্য্যোদয় এখনও হয় নাই। সুদীর্ঘ সৈন্যশ্রেণীশীর্ষে সূর্য্য-পতাকা* উড়িতেছে। দক্ষিণে বহু দূরে কয়েকটা আওয়াজ হইল—যুদ্ধ সুরু হইল না কি?

ঠিক সেই সময় আমাদের দলের দক্ষিণ ও বাম বাহু (column) যুদ্ধ আরম্ভ করিল। দক্ষিণ বাহু পান্‌টুগ্রামের দক্ষিণ পশ্চিমের পাহাড় আক্রমণ করিবে, আর বাম বাহু আক্রমণ করিবে Luanni-chiao পাহাড়ের পূর্ব্বদিকের গিরিশীর্ষে শত্রুর ঘাঁটি।

আমরা বাম বাহুর মাঝের অংশ—আমরা আক্রমণ করিব Waitou-shan। ঘোড়ার জিভ বাঁধিয়া, পতাকা মুড়িয়া, অস্ত্রাদি নীচু করিয়া নিঃশব্দে চলিতে লাগিলাম। কাছাকাছি পৌঁছিলে শত্রুপক্ষ উপর হইতে খুব এক চোট গুলিবর্ষণ করিল। প্রবল বাধার মুখে আমরাও তাদের দিকে গুলি চালাইতে লাগিলাম। তারা উপরে, আমরা নীচে, তাদের গোলাগুলি আমাদের মাথায় বৃষ্টিধারার মত পড়িতে লাগিল—আমাদের পায়ের কাছে ধূলা উড়াইল। এত দিনে আমাদের প্রথম অঙ্কের যবনিকা উঠিল!

সময় যতই যাইতেছে, গোলাগুলির আনাগোনা ততই বাড়িতেছে—ব্যাপার গুরুতর হইয়া উঠিল। নির্ধূম বারুদের বিস্ফোরক গ্যাসের দুর্গন্ধে যুদ্ধক্ষেত্র ভরিয়া গেল। বন্দুকের টোটার কামরা খোলা ও বন্ধ হওয়ার এবং খালি টোটা ছিটকাইয়া পড়ার শব্দ, গুলির গুমরানি, গোলার চাপা গর্জ্জন এবং আঘাতের পর ফাটিয়া পড়া—অতি অপূর্ব্ব, রক্ত চঞ্চল হইয়া ওঠে। দিকে দিকে 'আগে চল, আগে চল' ধ্বনি। খাড়া পাহাড়, খড়্গের মত পাথর সমস্ত উপেক্ষা করিয়া সৈন্যদল দ্রুতপদে অধীর আগ্রহে উঠিতেছে। বন্ধনীর মধ্যে টোটাগুলা খড় খড় করিতেছে, চলার ছন্দে তলোয়ার খাপ হইতে লাফাইয়া লাফাইয়া উঠিতেছে, চিত্ত যেন নাচিতেছে! চল আর গুলি চালাও, গুলি চালাও আর চল! শত্রুর গুলি বৃষ্টিধারার মত নীচে নামিতেছে আর আমাদের গুলি হাউইয়ের মত শূন্য ভেদিয়া উপরে উঠিতেছে। যুদ্ধ ভীষণ হইয়া উঠিল।

শত্রুশ্রেণীকে যতক্ষণ না গোলাগুলি দিয়া বিদীর্ণ করা যায় ততক্ষণ গুলি চালাইয়া তাদের ব্যতিব্যস্ত করা দরকার। যুদ্ধে কামানের কাজও যথেষ্ট, যদিও যুদ্ধ শেষ করিতে হয় কিরীচ দিয়া। গুলি চালাইতে হয় খুব সাবধানে। যুদ্ধ একবার সুরু হইলে উত্তেজনায় পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত কাঁপিতে থাকে, কাণ্ডজ্ঞান হারাইবার অবস্থা হয়, কিন্তু তা হইলে চলে না। ঠাণ্ডা মাথায় কাজ করা খুব কঠিন, তবুও ধীরেসুস্থে টিপ করিয়া বন্দুকের ঘোড়া টানিতে হয়। যতই সোরগোল হোক, রক্তস্রোত যতই কেন বহিতে থাকুক, তবুও বিচলিত হইবার জো নাই!

"শীতের রাতে যেমন করিয়া হিম পড়ে তেমনি সন্তর্পণে ধীরে ধীরে বন্দুকের ঘোড়া টানিও"—কবিতায় এই শিক্ষা পাই! এমনি করিয়া সজ্ঞানে অবিচলিত হাতে গুলি চালাইলে লক্ষ্যভেদ হইবেই।

যোদ্ধাদের উদ্যম ও আগ্রহ ক্রমে বাড়িয়া চলিল—যুদ্ধও জমিয়া উঠিল। আহতের সংখ্যা প্রতি মুহূর্ত্তেই বাড়িতেছে। 'আ!' বলিয়া আর্ত্তনাদ, তারপরই গুরুভার পতন শব্দ—সঙ্গে সঙ্গে মানুষটি একেবারে অজ্ঞান।

শেষ সুযোগ দ্রুতগতি আসিতেছে, শত্রু টলিতে সুরু করিয়াছে। এক পা আগে, এক পা পিছনে,—তাদের মন-

* জাপানের জাতীয় পতাকা

মরা অবস্থা। হুঙ্কার দিয়া শত্রুর প্রতি ধাওয়া করার এই অবসর। সহসা যেন শত বজ্র হাঁকিয়া উঠিল, পাহাড় ও উপত্যকা, আকাশ ও পৃথিবী কাঁপিতে লাগিল, আমাদের নায়ক কাপ্তেন মুরাকামি সুদীর্ঘ অসি আস্ফালন করিয়া চীৎকার করিয়া সম্মুখে ধাবিত হইলেন। তাঁর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া সৈনিকেরা চকিতে শত্রুশ্রেণী বিদীর্ণ করিল—লম্ফঝম্ফ করিয়া হৈ-হৈ রৈ-রৈ শব্দে। প্রাণের দায়ে শত্রু পিছন ফিরিয়া ছত্রভঙ্গ হইয়া দৌড় দিল—অস্ত্রশস্ত্র, টুপি টোটা প্রভৃতি পশ্চাতে ফেলিয়া।

ওয়াইতুশান দখল হইল। আটটার সময় 'বানজাই' ধ্বনিতে সকালের আকাশ কাঁপিতে লাগিল।

৯

কেন্‌জান্

ওয়াইতুশান্ স্বচ্ছন্দে দখল করিয়া জাপানীদের সাহস বাড়িয়া গেল। দীর্ঘ অপ্রশস্ত পার্ব্বত্য পথ ধরিয়া পলায়নপর শত্রুকে তারা তাড়া করিল। কেন্‌জান্ বা "৩৬৮ মিটার পাহাড়" আক্রমণ করাই উদ্দেশ্য। তাদের উৎসাহ অসীম—এক চালেই বাজি মাত্ করিবার আশা।

কেন্‌জান্ শিলাময় অতি বন্ধুর দুরারোহ গিরিচূড়া। সেখানে উঠিবার একটিমাত্র পথ আমাদের দিকে ছিল। সে-পথ এমন যে একটি মানুষ তার মাঝে দাঁড়াইয়া হাজার হাজার লোকের ওঠা নামায় বাধা দিতে পারে। গোড়ায় এ পাহাড়ের কোনো নাম ছিল না আগেই বলিয়াছি। রুশেরা নাম দেয় "Quin Hill"। স্থানটি আমাদের দখলে আসার পর জেনারেল নোগি উহার নাম রাখিয়াছিলেন "কেন্‌জান্" বা "খড়্গগিরি"। প্রথমে জানিতাম না কত শত্রুসৈন্য সেখানে আছে—শুনিয়াছিলাম কিছু পদাতিক ও দশটি কামান মাত্র তাদের সম্বল।

আমাদের রেজিমেণ্টই ওয়াইতুশানের পাদদেশ প্রদক্ষিণ করিয়া সাগরতীরাভিমুখে শস্যক্ষেত্রের মাঝে গিয়া থামিল। Liaotung-এ তখন দারুণ গ্রীষ্ম—নিকটে মুখ ভিজাইবার মতও একটি জলধারা নাই। গ্রামের অন্তে গাছপালা, ঝোপঝাড়ের অভাবে একটু ছায়াও মেলে না। পদতলে একগাছা ঘাস পর্য্যন্ত নাই—সূর্য্যরশ্মি যেন জলন্ত লৌহ-শলাকা—টুপি ফুঁড়িয়া আমাদের মাথা গলাইয়া দিবার উপক্রম করিল। মনকে বুঝাইলাম, এ নিদারুণ দাহ-যন্ত্রণা বেশীক্ষণ থাকিবে না—অচিরেই যুদ্ধে মাতিবার সুযোগ মিলিবে! কিন্তু বৃথা বৃথা! সকাল ন'টা হইতে বেলা তিনটা পর্য্যন্ত সমভাবেই কাটিয়া গেল। বামে বহুদূরে পূর্ব্ব-সাগরের বীচিবিক্ষুব্ধ বারিরাশি দেখা যাইতেছে। মনে হইতে লাগিল—আহা! যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়া মরিবার আগে যদি একবার ঐ শীতল জলে ডুব দিতে পারিতাম!

কিছুক্ষণ পরে আমাদের বামদিকে Hsiaoping-tao দ্বীপের নিকটে এক রুশ মানোয়ারি জাহাজ আসিয়া অচিরে আমাদের উপর গোলাবর্ষণ সুরু করিল। ঊর্দ্ধ আকাশে ইতস্তত ধোঁয়ার কুণ্ডলী রচিত হইতে লাগিল, বাতাসে একটা হুরর্ ধ্বনি উঠিল, প্রচণ্ড শব্দে গোলা আমাদের নিকটে পড়িতে লাগিল—গোলার পর গোলা, শব্দের পর শব্দ। গোলা পাথরের উপর পড়িয়া স্ফুলিঙ্গ বর্ষণ করিতেছে, চারিদিকে ধোঁয়া ছড়াইতেছে, টুকরা পাথর এদিক-ওদিক ছুটিতেছে। নিরাপদে দূরে দাঁড়াইয়া দেখিলে মনে উত্তেজনার সঞ্চার হয় বটে, কিন্তু গোলার ঘায়ে ঘায়েল হইবার সাধ হয় না। অধিকাংশ গোলাই খুব কাছে পড়িলেও ভাগ্যক্রমে কেহই আহত হইল না। শীঘ্রই কেন্‌জানের দিক থেকে বন্দুক ও কামানের শব্দ আসিতে সুরু করিল। আক্রমণ তবে আরম্ভ হইয়াছে। যুদ্ধে যোগ দিবার জন্য মন অস্থির হইয়া উঠিল।

যাত্রার আদেশ আসিয়াছে। ভারি চামড়ার বোঁচকা (knapsack) চটপট চলাফেরার বাধা। সকলে তাড়াতাড়ি এক একটা লম্বা থলির মধ্যে একদিনের আন্দাজ রসদ ভরিয়া পিঠে বাঁধিল, তারপর ওভারকোট কাঁধে ফেলিল। গোটা দুই তিন সিগারেট সংগ্রহ করিয়া তখনই রওনা হইলাম। দ্রুতগতি চলিবার বিশেষ কোনো আদেশ দিল না, তবুও আমাদের চলার বেগ দেখিতে দেখিতে বাড়িয়া গেল। যেদিক থেকে বন্দুকের আওয়াজ ও কামানের গর্জ্জন আসিতেছিল সেইদিকে একটানা সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করিয়া চলিলাম, যুদ্ধক্ষেত্র ক্রমে নিকটে আসিতে লাগিল।

পৌঁছিয়া দেখি শত্রু-অধিকৃত পাহাড়টা আমাদের সমুখে প্রায় খাড়া হইয়া উঠিয়াছে। রুশেদের সহিত আমাদের প্রথম সৈন্যশ্রেণীর অবিরাম গোলাগুলি বিনিময় চলিতেছে। যুদ্ধের তেজ বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আহতের সংখ্যাও বাড়িয়া চলিয়াছে—আমাদের পিছনপানে তারা ঘনঘন বাহিত হইতেছে।

জাপানী গোলন্দাজেরা শত্রুর কামান থামাইবার খুব চেষ্টা করিতে লাগিল। পদাতিকেরা একজনের পিছনে আর এক জন খাড়া পাহাড়ে কোনগতিকে উঠিতে সুরু করিল। মাঝে মাঝে থামিয়া গুলি চালায়, তারপর আবার একটু ওঠে, আবার থামে। আকাশ ব্যাপিয়া পাণ্ডুর মেঘ, সাদা ও কালো ধোঁয়া গাদাগাদা উঠিতেছে, মাটির উপর চড়বড় করিয়া গোলাবৃষ্টি হইতেছে। গোলন্দাজের হাত ভাল, অচিরে মধ্যে শত্রুর তিন চারিটি কামান নীরব হইয়া গেল।

আমাদের পদাতিকেরা শত্রুর খুব নিকটে পৌঁছিয়াছে এমন সময় দুইটা 'মাইন' তাদের সামনে ফাটিয়া গেল। কালো ধোঁয়া আর ধূলার মেঘের মধ্যে আমাদের লোকেরা অদৃশ্য হইলে ভয় হইল বুঝি-বা সর্ব্বনাশ ঘটিয়াছে। কিন্তু আশ্চর্য্য, ধোঁয়া মিলাইলে দেখিলাম আমাদের একটি লোকও মরে নাই! তবে কি রুশেরা এত বহুমূল্য বারুদ নষ্ট করিল শুধু ধূলা উড়াইবার জন্য?

কেবল বিস্ফোরক 'মাইন' দিয়া নয়, বারবার একযোগে গুলিবর্ষণ করিয়া শত্রু আমাদের বাধা দিতে লাগিল। তাদের পানে মুখ ফিরানো দায়, আরামে মাথা তোলারও উপায় নাই। তবুও নির্ভয়ে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। ছোট একটি দল মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইয়া হাতে পায়ে ভর দিয়া পাহাড়ের উপর উঠিয়া পড়িল। অমনি সেই দৃষ্টান্তে উৎসাহিত হইয়া বড় বড় দল বন্যার মত শত্রুর মধ্যে গিয়া পড়িতে লাগিল। 'মাইন' এর মুখ মাড়াইয়া, সমুখ ও পাশের গোলাগুলি উপেক্ষা করিয়া এই আক্রমণ—তাহাতে কত যে বিপদ বুঝাইয়া বলা কঠিন।

কেন্‌জান-গিরি দৈববলে বলীয়ান, তাহাকে কি ছাড়া যায়? শত্রু প্রাণপণে বাধা দিতে লাগিল। যুদ্ধ ত নয় যেন সাক্ষাৎ নরক। বর্শার সঙ্গে বর্শা, তলোয়ারের সঙ্গে তলোয়ার মিলিল, ভীষণ কামানগর্জ্জনে ডুবিল যোদ্ধদলের হুঙ্কার ও আস্ফালন এবং আহতের সকরুণ বিলাপ। আকাশ ধূমাবরণে অদৃশ্য হইল। শত্রুর সকল চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া বিজয়লক্ষ্মী আমাদের আশ্রয় করিলেন। নানা পরাজয়-চিহ্ন পশ্চাতে ফেলিয়া শত্রু পালাইল।

শৈলশিরে নবসূর্য্য-পতাকা সগর্ব্বে উড়িতেছে। কেল্লা হাতে আসিয়াছে—শত্রুকে আর কি উহা ফিরাইয়া দিব?

ক্রমশঃ



দ্বীপময় ভারত

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

[১৫] যবদ্বীপের রাজবাটীতে নৃত্যদর্শন : শূরকর্ত্তর রাজা দশম পাকু-ভুবন (Pakoeboewono X) রবীন্দ্রনাথকে তাঁর প্রাসাদে আমন্ত্রণ করেন, প্রাসাদের অন্তঃপুরিকাদের নাচ দেখাবার জন্য। এই নাচ যবদ্বীপের কৃষ্টির একটী অপূর্ব্ব বিকাশ। এর বর্ণনা অনেকে উচ্ছ্বসিত প্রশংসার সঙ্গে ক'রে গিয়েছেন; এই নাচের অনেক ছবিও নিয়েছে, অনেক শ্রেষ্ঠ রূপকার এর ছবিও এঁকেছেন; আর ঐতিহাসিক আর নৃত্যকলা-রসিক এই নাচের কথা অনেক বইয়ে লিখে গিয়েছেন।

মঙ্কুনগরোর বাড়ীথেকে রওনা হ'য়ে রাত্রি আটটা পঞ্চাশে আমরা Kraton অর্থাৎ রাজপ্রাসাদে পঁউছুলুম। প্রথা-মতন ভিতরের বিরাট মণ্ডপ যেখানে নাচ হবে, সেখানে গিয়ে উঠবার আগে, বাইরের আর ভিতরের মহলের মাঝেকার একটী ফটকের সাম্‌নে আমাদের মোটর থাম্‌ল, কবি নাম্‌লেন, আমরাও নাম্‌লুম। ফটক মানে একটী বিরাট দেউড়ী, তার সামনেটা ছাতে ঢাকা, দরজার আশে পাশে ঘর। এই দেউড়ীতে রাজার কতক-গুলি নিকট আত্মীয়—ছেলে ভাই, ভাইপো—অতিথিদের স্বাগতের জন্য ছিলেন। ইউরোপীয় ফৌজী পোষাক পরা দু-চারটী প্রৌঢ় আর ছেলেদের দেখলুম। অন্য অতিথিদের মধ্যে কতকগুলি ডচ্ মহিলা, একটী প্রাচীন ইংরেজ দম্পতী, আর একজন ডচ পুরুষও ছিলেন। ডচ রেসিডেণ্ট তখনও আসেনি—তাঁর আগমনের অপেক্ষায় আমাদের মিনিট দু-চার দাঁড়িয়ে থাকতে হ'ল। তাঁর মোটর এল, তিনি নেমেই একজন আর্দ্দালীর হাতে নিজের টুপী দিয়ে, সাম্‌নে একটী ইউরোপীয় মহিলা দাঁড়িয়েছিলেন তাঁর সঙ্গে করমর্দ্দন ক'রে, আর কোনও দিকে না চেয়ে সাঁ ক'রে এগিয়ে চ'লে গেলেন, দরজা পার হ'য়ে গেলেন। ডচ জাতির আর ডচ রাণীর প্রতিনিধি হিসাবে তিনি উপস্থিত, দেউড়ীতে দাঁড়িয়ে কারো সঙ্গে আলাপ করাটা বোধ হয় কায়দা-বিরুদ্ধ। যবদ্বীপীয় রাজপুত্রদের দ্বারা পরিবৃত হ'য়ে কবির অনুগমন ক'রে যে পথ দিয়ে রেসিডেণ্ট সাহেব গেলেন সেই পথ দিয়ে আমরাও চ'ললুম। অষ্টাদশ শতকের সেকেলে যবদ্বীপীয় পোষাক প'রে, মস্ত চওড়া খোলা তলওয়ার হাতে দু-চার জন সেপাই আশে পাশে দাঁড়িয়ে র'য়েছে, আমাদের সঙ্গেও চ'লেছে। একটা দু-দিকের দেওয়ালের মাঝেকার পথ দিয়ে আবার একটা দেউড়ীতে এলুম। এই দেউড়ী পেরিয়েই দেখি, সাম্‌নে এক অতি প্রশস্ত আঙিনায় বিজলীর আলোয় উদ্ভাসিত বহুস্তম্ভবিশিষ্ট একটি বিরাট পেণ্ডপো বা মণ্ডপ। যবদ্বীপীয় রাজবাটীর এক ঐশ্বর্য্যময় দৃশ্য আমাদের চোখের সামনে তখন এসে দাঁড়াল। প্রথমেই নজর প'ড়্‌ল, মণ্ডপের ধারে কতকগুলি রাজানুচর নিশ্চল ধাতু মূর্ত্তির মতো দাঁড়িয়ে—বোধ হয় হিন্দু-আমলের পোষাক প'রে; এদের গা খালি, সুদৃঢ় পেশী আর চওড়া বুকের পাটা, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ গায়ের রঙ বিজলীর আলোতে চক্‌চক্ ক'রছে; এদের মাথায় গোল আর উঁচু সাদা রঙের টুপী—খুব উঁচু তুর্কী ফেজ টুপীর ভাব, তবে তার মাথায় কালা রেশমের গোছা নেই; সোনালী রঙের একটা ক'রে ফিতের অলঙ্কার গলা থেকে বুকের উপর ঝুলছে; পরণে রঙীন সারঙ—আর হাতে খোলা তলওয়ার, উঁচু ক'রে ধ'রে দাঁড়িয়ে আছে। এদের বেশ বীরত্ব-ব্যঞ্জক চেহারা—আর একেবারে সেকেলে ধরণের; যেন যবদ্বীপের হিন্দু আমলের লড়াইয়ের কাব্য বা ইতিহাসের পাতা থেকে নেমে এসেছে। আশে পাশে যবদ্বীপীয় দরবারী পোষাক প'রে নানা লোক মণ্ডপের সামনা-সামনি দাঁড়িয়ে আছে, দেখলুম। বাঁ দিকে পড়ে গামেলানের দল; নানা রকমের যন্ত্র-পাতি নিয়ে সব ব'সে র'য়েছে। মস্ত বড়ো মণ্ডপটা মানুষে যেন গিশ্-গিশ্ ক'রছে।



রেসিডেণ্ট্-সহ শূবকর্ত্তর সুসুহুনান—পশ্চাতে রাজবাটীর দাসী ও অনুচরগণ

একদিকে লাল কালো আর সোনালি রঙের সাজ পরানো একটা কালো ঘোড়ার মূর্ত্তি—প্রথম হঠাৎ দেখে মনে হ'য়েছিল—বুঝি বা জীয়ন্ত ঘোড়াকে দাঁড় করিয়ে রেখেছে। মণ্ডপটী দুটী চাতালে; উপরে রাজার রেসিডেণ্টের আর অভ্যাগতদের বস্‌বার জন্য; আর তা থেকে এক ধাপ নীচে তার চার দিকে বারান্দার মতন আর একটী চাতাল। আমরা মণ্ডপের আঙিনায় পৌছে দেখলুম, সুসুহুনান স্বয়ং রেসিডেণ্ট সাহেবের অপেক্ষায় মণ্ডপে ওঠবার সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে। রেসিডেণ্ট আমাদের আগে আগে যাচ্ছিলেন, দু-জনে সামনা-সামনি হ'তেই ঝুঁকে পরস্পরকে অভিবাদন ক'রলেন, তারপরে দুজনে পাশাপাশি চ'ললেন, মণ্ডপের উপরে এঁদের দুজনের জন্য দুখানি উঁচু চেয়ার ছিল তাতে গিয়ে ব'সলেন। রেসিডেণ্ট সুসুহুনানের বাঁ দিকে ছিলেন, দুজনে হাত গলাগলি ক'রে চ'লছিলেন। রেসিডেণ্টের আসন সুসুহুনানের আসনের চেয়ে একটু উঁচু, আর এটি ছিল সুসুহুনানের সিংহাসনের ডান দিকে। এই বিরাট মণ্ডপটির নাম Bengsal Kentjana 'বেঙসাল কন্‌চানা' বা 'কাঞ্চন-মণ্ডপ'। বেশ উঁচু থামগুলি, ছাতের নীচে চমৎকার কাঠের কাজ। মেঝে সাদা মারবল পাথরের। রাজার নিশানের রঙ হ'চ্ছে লাল আর সোনালি হ'লদে, এই দুই রঙ চারিদিকে লাগানো। চার-কোণা মণ্ডপ, তার উঁচু চাতালের একদিকে সুসুহুনান আর রেসিডেণ্ট ব'সলেন, আর খুব উঁচু পদবীর কতকগুলি যবদ্বীপীয় আর ডচ ব্যক্তি। কবিকে সুসুহুনানের বাঁ পাশে বসালে। মণ্ডপের আর তিন দিকে সারি সারি —এক সারি বা দু'সারি ক'রে—চেয়ার। দু-তিনটে চেয়ারের সামনে একটি ক'রে ছোট টেবিল বা তেপায়া। মণ্ডপের মাঝখানটা খালি; এই খানটাতে নাচ হবে। সুসুহুনান মুসলমান হ'লেও, অন্য যবদ্বীপীয়দের মতন এঁদের মধ্যে পর্দ্দা নেই; রাজার আত্মীয়ারাও এই নাচের সভায় প্রকাশ্যে ইউরোপীয় মহিলাদের মতনই ব'সেছিলেন। প্রত্যেক চেয়ারে নাম-লেখা কার্ড দড়ি দিয়ে বাঁধা—আমাদের জন্য নির্দ্দিষ্ট বস্‌বার জায়গা দেখিয়ে দিলে। বসবার আগে কিন্তু অভ্যাগত আর ডচ অফিসারদের লাইন বেঁধে সুসুহুনান আর রেসিডেণ্ট সাহেবের সামনে গিয়ে একে একে এঁদের সঙ্গে কর-মর্দ্দন ক'রে আস্‌তে হ'ল। তারপরে আমরা



যবদ্বীপ-শূরকর্ত্ত নগরে রাজবাটীতে ‘সেরিম্পি’ নৃত্য

(‘হেন্‌ডেও্‌’ বা প্রণামান্তে উত্থানের ভঙ্গী)

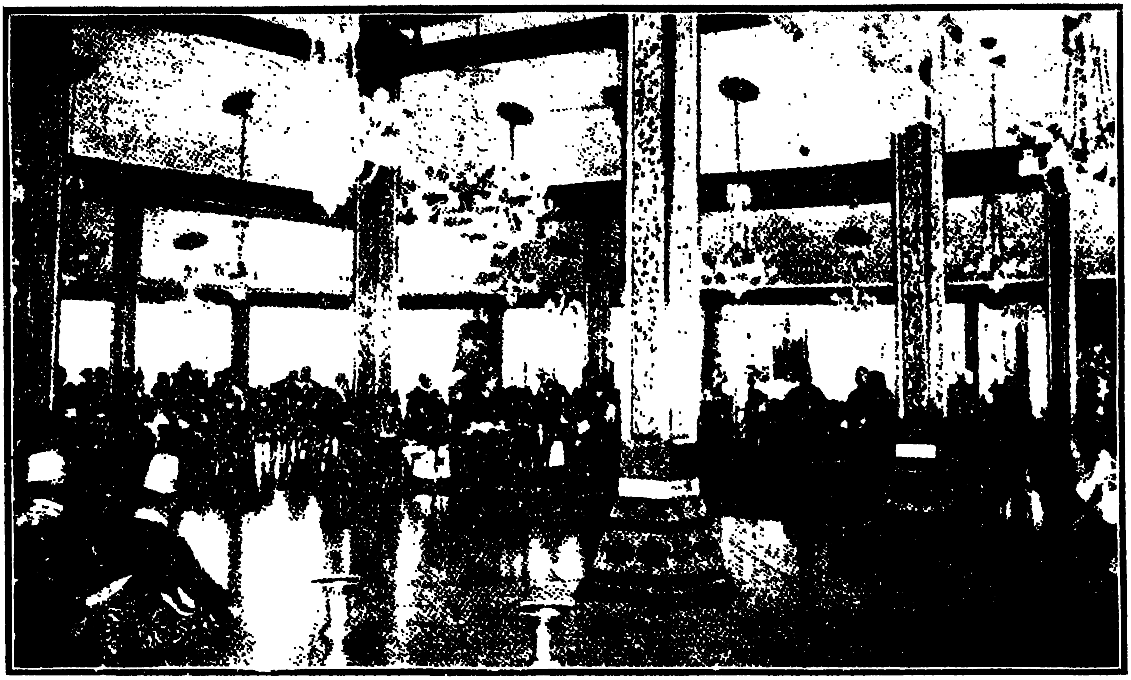
প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা



যবদ্বীপ-শূরকর্ত্ত নগরে রাজবাটীতে 'বেডয়ো' নৃত্য

('তান্‌জাক্‌' বা ছুরিকা লইয়া নৃত্যে যুদ্ধাভিনয়—দক্ষিণহস্তে আক্রমণের ও বাম হস্তে আক্রমণ-নিবারণের চেষ্টা

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা



সুরকর্ত্তর রাজবাটীর মণ্ডপ—সভার জন্য প্রস্তুত ; ডানদিকে থামের পাশে সুসুহুনান ও রেসিডেণ্ট আসীন,
বামে ভূমিতে উপবিষ্ট যবদ্বীপীয় রাজানুচরগণ

ব'সলুম। সুরেন বাবু, ধীরেন বাবু, আমি—আমরা কালো রেশমের আচকান আর পাজামা আর মাথায় কালো টুপী প'রে গিয়েছিলুম। আমার বাঁ পাশে ছিলেন ডচ অফিসার, আর ডান পাশে একটি প্রৌঢ়া যবদ্বীপীয় মহিলা, পরে শুনলুম তিনি সুসুহুনানের এক বোন। জড়োয়া গয়না—হীরের কানের দুল-টুল অল্প দু-চার খানা প'রেছিলেন। একটু দূরে কবি, সুসুহুনান এঁরা ব'সে। আমরা ব'সতেই, প্রথমবার ইউরোপীয় ব্যাণ্ড এক পাশে কোথায় ছিল তাই বেজে উঠ্‌ল। ইতিমধ্যে একদল চাকরে এসে অভ্যাগতদের সামনেকার টেবিলে গেলাসে ক'রে পানীয় দিয়ে যেতে লাগ্‌ল—ঠাণ্ডা লেমনেড। সাদা জামা আর রঙীন সারং পরা রাজবাড়ীর চাকরের দল। যখন এরা সুসুহুনান কিংবা রেসিডেণ্টের সামনে যায়, বা এঁদের কিছু জিনিস দেয়, তখন হাঁটু গেড়ে ব'সে দু হাত জুড়ে প্রণাম করে, তারপরে পানীয় প্রভৃতি দেয়। কবি আর সুসুহুনানের মধ্যে দোভাষীর কাজ করবার জন্য ছিলেন সুসুহুনানের এক যুবা পুত্র। (রাজার নাকি গুটি তিরিশেক সন্তান।) এই রাজকুমারটি খুব গৌরবর্ণ, বেশ সুপুরুষ দেখতে,—তবে একটু খর্ব্বকার। তিনি ইউরোপে ছিলেন বছর দুতিন, কতকগুলি ইউরোপীয় ভাষা জানেন, ইংরেজি তার মধ্যে একটা। হলাণ্ডে একটি অশ্বারোহী সৈন্যদলের সেনানী ছিলেন—বেশ জনপ্রিয় লোক, ডচেরাও এঁর খুব পক্ষপাতী। রাজা নিজের ভাষায় কবিকে যা জিজ্ঞাসা করেন, রাজপুত্র ইংরিজিতে সেটার অনুবাদ ক'রে কবিকে বলেন, আর কবির কথা রাজাকে দেশভাষায় জ্ঞাপন করেন। রাজার সঙ্গে কথা কওয়ার মধ্যে একটা জিনিস দেখলুম—দুই হাত জোড় ক'রে মাথায় ঠেকিয়ে প্রণামের ঘটা। রাজা যাই কিছু রাজকুমারকে বলেন, শুনেই রাজকুমার দুইহাত জোড় করে মাথায় ঠেকান, যেন মহারাজের কথা মাথায় ক'রে নিলুম। তারপর রাজাকে কিছু বলবার আগে ফের ঐ রকম করেন। এই হ'চ্ছে যবদ্বীপের প্রাচীন রীতি ; মুসলমান অর্থাৎ আরব বা পারস্যের আদব-কায়দা এই রীতিকে তাড়াতে পারে নি। কবির সঙ্গে সুসুহুনানের

এমন কোনও গভীর বিষয়ে আলাপ হয় নি; বেশীর ভাগই ভদ্রতার বাজে কথা, তার মধ্যে কবির বয়স কত, আর তাঁর সন্তানাদি কি, এ-সম্বন্ধে রাজা খুব কৌতূহল দেখিতেছিলেন। আমার কিন্তু রাজকুমারটীর দোভাষীগিরি দূর থেকে দেখ্‌তে বেশ লাগ্‌ছিল; কবির-ও এঁকে বেশ ভালো লেগেছিল।

এই রাজকুমারটির নাম Koesoemajoedo 'কুসুমায়ুধ'। যবদ্বীপের শ্রেষ্ঠ সামন্ত নৃপতি ধর্ম্মে মুসলমান হ'লেও এ রকম নাম রাখতে লজ্জিত হন না। আমাদের দেশের নিজাম বা অন্য কোন বড়ো মুসলমান রাজার বাড়ীতে এটা কি এখন সম্ভব? এরা মুসলমান ধর্ম্ম নিয়েছে, কিন্তু জা'ত দেয় নি। মঙ্কুনগরোর দুই ছোটো ছেলে—তাদের নাম হচ্ছে Sarosa 'সরোষ' আর Santosa 'সন্তোষ' (যবদ্বীপে 'রোষ' অর্থে বীরত্ব—'স-রোষ' কিনা বীরত্ব-যুক্ত), আর তার ছোটো একটি মেয়ের নাম Koesoemawardani 'কুসুমবর্দ্ধনী'। সুন্দা, মাদুরী, যবদ্বীপীয়,—এই তিনটি জাতির মধ্যে এখনও যে সব বড়ো-বড়ো সংস্কৃত নাম প্রচলিত আছে তা দেখ্‌লে আশ্চর্য্য হ'তে হয়। বাতাবিয়ার Balai Poestaka 'বালাই পুস্তক' অর্থাৎ 'পুস্তকালয়' বা সরকারী লোক-সাহিত্য প্রচার বিভাগের প্রকাশিত পুস্তকের তালিকা থেকে কতকগুলি লেখকের নাম তুলে' দিচ্ছি; তা থেকে এদেশে মুসলমানদের ভদ্র সমাজের মধ্যে ব্যবহৃত সংস্কৃত নামের কিছু কিছু ধারণা করা যাবে।—

যথা,—Harja Hadiwidjaja (আর্য্য আদি-বিজয়—যবদ্বীপীয় লিপিতে অনেক সময়ে আদ্য স্বরবর্ণের আগে একটী অনুচ্চারিত হ-কার বসিয়ে দেয়), Wirapoestaka বীরপুস্তক, Soeradipoera সুরাধিপুর, Soerjapranata সূর্য্য-প্রণত, Mangkoeatmadja মঙ্কু-আত্মজ ('মঙ্কু' যবদ্বীপীয় শব্দ—অর্থ 'ক্রোড়-দেশ'), Sastrowirja শাস্ত্রবীর্য্য, Sastratama শাস্ত্রতম (বা 'শাস্ত্রাত্ম'), Poedjaardja পূজা-আর্য্য, Wirawangsa বীরবংশ, Poerwasoewignja পূর্ব্ব-সুবিজ্ঞ, Wirjasoesastra বীর্য্য-সুশাস্ত্র, Sasraprawira সহস্র-প্রবীর, Sasrasoetiksna সহস্র সুতীক্ষ্ণ, Dirdjasoebrata ধৈর্য্য-সুব্রত, Ardjasoewita আর্য্য-সুবীত, Rangga-warista রঙ্গ-বর্ষিত, Wirjadiardja বীর্য্যাধি-আর্য্য, Jasawidagda যশোবিদগ্ধ, Sasrakoesoema সহস্র-কুসুম, Sindoepranata সিন্ধু-প্রণত, Daramaprawira ধর্ম্ম-প্রবীর, Poerwaadiwinita পূর্ব্ব-অধিবিনীত, Marta-ardjana মর্ত্ত-অর্জ্জন, Djajamargasa জয়মার্গস ('স' যবদ্বীপীয় প্রত্যয়), Reksakoesoema রক্ষা-কুসুম, Boedidarma বুদ্ধি-ধর্ম্ম, Adisoesastra আদি-সুশাস্ত্র, Dwidjaatmadja দ্বিজ-আত্মজ, Prawira-soedirdja প্রবীর-সুধৈর্য্য, Soerjadikoeoema সূর্য্যাধিকুসুম, Reksasoesila রক্ষা-সুশীল, Sasra-harsana সহস্র-হর্ষণ, Karta-asmara কৃত-স্মর, Sasrasoeganda সহস্র-সুগন্ধ, Djajapoespita জয়-পুষ্পিত, Tjitrasentana চিত্র-সন্তান, Arijasoetirta আর্য্য-সুতীর্থ, Kartawibawa কৃত-বিভব,—ইত্যাদি ইত্যাদি। শূরকর্ত্তয় একটী কাপড়ের দোকানে সুরেনবাবু কিছু বাতিক কাপড় কিন্‌লেন, দোকানের অধিকারীর নাম-Hardjosoepradjnjo, অর্থাৎ 'আর্য্য-সুপ্রাজ্ঞ'। বহুস্থানে আবার যবদ্বীপীয় শব্দের সঙ্গে সংস্কৃত শব্দ জুড়ে এদের নাম করণ হয়। পশ্চিম যবদ্বীপের সুন্দাজাতির মধ্যেও এই রকম সংস্কৃত নামের ঘটা দেখা যায়- যেমন,—সৌম্যাত্মজ, প্রবীরকুসুম, অদ্দি (?)-বিনত, গুণবান, গন্ধ-আদিনগর, ধীরাধিনত, কান্তপ্রবীর, সুরবিনত, সূর্য্যাধিরাজ, ধর্ম্ম-বিজয়, শাস্ত্রাধিরাজ, সত্যবিজয়, চক্রাধিরাজ, ইত্যাদি।

এতগুলি সংস্কৃত নাম শোনাবার উদ্দেশ্য—এদেশের ভদ্র সমাজের সংস্কৃতির একটা পট-ভূমিকা দেওয়া। প্রাচীন কালে হিন্দু যুগে অবশ্য আরও বেশী ক'রে সংস্কৃতের ব্যবহার হ'ত। কিন্তু বহু শব্দ এরা এমন হজম ক'রে নিয়েছে যে সেগুলি যবদ্বীপীয় ভাষার সঙ্গে মিশে গিয়েছে। এদের ভাষায় বিস্তর সংস্কৃত শব্দ এখনও আছে—ক্বচিৎ সে সব শব্দের অর্থ ব'দলে গিয়েছে, কিন্তু শব্দগুলি র'য়েছে। প্রাচীন যবদ্বীপীয় গদ্যে আর কাব্যে সংস্কৃত শব্দের ছড়াছড়ি;—প্রাচীন যবদ্বীপের বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ 'অর্জ্জুন-বিবাহ' থেকে দুটী শ্লোক উদাহরণ স্বরূপ তুলে' দিচ্ছি—

বসন্ততিলক ছন্দ (একবিংশ সর্গ)—

যন্ ক্বাং নিবাতকবচাগুলাগুল্ প্রগল্‌ভ
ক্রোধে রিকাঙ মঙিকু নীতি মমেং উপায়।
তন্ সাম ভেদ ধন কেবল দণ্ডকর্ম্ম,
গোঙ নিঙ্ পরাক্রম জুগেনদু ক-প্রবীরন্॥ ১॥
মন্ত্রিন্য পাদ্-উভয় শুদ্ধকুল প্রশান্তা
ক্রোধাক্ষ ভ্রুকুত বিরক্ত করালবক্ত্র।
রেৎবেং হিরণ্যকশিপুঃ কুল কালকেয়
মঙ্গেঃ কৃতার্থ গিন্নলঙ্ হলুরিঙ্ রণাঙ্গ॥ ২॥

এদের ভাষায় সংস্কৃত শব্দের এই বাহুল্যের কথা রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'যবদ্বীপের প্রতি' কবিতায় উল্লেখ ক'রেছেন :—

এই যে পথে হ'য়েছিল মোদের যাওয়া আসা,
আজো সেথায় ছড়িয়ে আছে আমার ছিন্ন ভাষা।

যবদ্বীপের রাজবাড়ীর কায়দার মধ্যে, আমাদের দেশের সভ্যতার আর রীতি-নীতির সঙ্গে খাপ খায় না এমন কিছুই দেখলুম না। যাক্,—আমরা বসবার পরে ইউরোপীয় ব্যাণ্ড তো অল্প খানিকক্ষণ বাজ্‌ল। তারপরে নানা তালে গামেলান বাদ্য বেজে উঠ্‌ল। খালি গায়ে গামেলানের দল ভুঁয়ে ব'সে ; তাদের মধ্যে গাইয়ে র'য়েছে জন-কতক, মেয়ে আর পুরুষ। এদের গলার আওয়াজ চমৎকার। পুরুষ গাইয়েরাই বেশী গাইলে—ধীর-গম্ভীর একটী স্বরে একজন গায়ক গান ধ'রলে—সমস্ত গামেলানের সমধুর টুংটাং ধ্বনির উর্দ্ধে, আমাদের ধ্রুপদ গানের ধরণে এর স্নিগ্ধ-গভীর কণ্ঠস্বর শোনাতে লাগ্‌ল। আমাদের স্থির হ'য়ে ব'সতে এইরূপে খানিকক্ষণ কেটে গেল। মণ্ডপটীর চার ধারে চেয়ারে যবদ্বীপীয় আর ডচ নর-নারীরা উপবিষ্ট—গামেলানের আর গানের আওয়াজে মণ্ডপটা গম্-গম্ ক'রছে। আমার ডান পাশে যে রাজ-বংশীয়া মহিলাটি ব'সেছিলেন, তিনি দু একটি কথা আমায় জিজ্ঞাসা ক'রলেন—মালাই ভাষায়। যথাশক্তি আমি তাঁর সঙ্গে মালাই বল্‌বার চেষ্টা ক'রতে লাগলুম। কবির সম্বন্ধে প্রশ্ন, ভারতবর্ষের রাজাদের সম্বন্ধে প্রশ্ন, আর মেয়েদের সম্বন্ধে প্রশ্ন। আমরা মুসলমান নই শুনে কোনও ভাববৈলক্ষণ্য নেই। বাঁ পাশের ডচ ভদ্রলোকটীর হিন্দু দর্শন সম্বন্ধে জানবার বড়ো ইচ্ছা দেখলুম—ইনি বোধ হয় কোনও আসিস্‌টাণ্ট্-রেসিডেণ্ট হবেন। কবিকে আর সকলের মতন—তবে একটু বেশী কাজ করা—একখানা চেয়ার দিয়েছিল, পরে তাঁর জন্য একখানা আরাম-কেদারা এনে দিলে। নাচ কখন কেমন ভাবে আরম্ভ হবে জানি না. আমরা ব'সে ব'সে গল্প-গুজব ক'রছি, গামেলান শুন্‌ছি, আর মাঝে-মাঝে বরফ-লিমনেড খাচ্ছি।



যবদ্বীপীয় নর্ত্তকী

আমার পাশের ডচ্ ভদ্রলোকটী আমার গায়ে হাত দিয়ে, মণ্ডপের বাইরে আর একটী মহলে যাবার একটা ঢাকা পথের দিকে দেখালেন। সকলের দৃষ্টিও সেই দিকে প'ড়্‌ল। অতি মনোহর ধীর পদবিক্ষেপে কতকগুলি তরুণী আস্‌ছে। লোকজনের গুঞ্জন যেন সহসা থেমে গেল, গামেলানের বাজনা তখন যেন আরও উৎসাহের সঙ্গে বেজে উঠ্‌ল, গায়কের কণ্ঠস্বর যেন বিজয়োৎসবের উল্লাসে পূর্ণতর উচ্চতর হ'য়ে উঠ্‌ল। 'বেডয়ো' নাচের পাত্রীরা সভা-মণ্ডপে প্রবেশ দিচ্ছেন। এরা সংখ্যায় ন জন। সৌষ্ঠব আর সুষমায় পূর্ণ দেহশ্রী। পরিধানে একখানি ক'রে খেজুরছড়ির মতন ঢেউ-খেলানো সাদার উপর খয়রা রঙের নক্সাদার সারং, তার খানিকটা মাটিতে লুটিয়ে আস্‌ছে। গায়ে বুক-আঁটা উজ্জ্বল নীল বা লাল বা হলদে রঙের মখমল বা কিঙ্‌খাপের আঙিয়া পরা, দুই কাঁধ অনাবৃত।

কোমরে নানা রঙের নক্সায় বোনা রেশমের পটোল। কাপড়ের উত্তরীয় জড়িয়ে কোমর-বন্ধ, তার দুটো লম্বা খুঁট দু-দিকে ঝুল্‌ছে। মাথায় খোপায় জুঁইফুলের মালা—আর সোনার প্রজাপতি বা অন্য কোনও ভাবের অলঙ্কার, প্রতি নড়া-চড়ায় সব মাথার গয়না কেঁপে কেঁপে উঠ্‌ছে। গায়ে অলঙ্কার খুব কম; জড়োয়া কানফুল বা দুল, হাতে সরু চুড়ী বা বালা একগাছা ক'রে, কনুইয়ের উপরে একটী ক'রে খুব কাজ



'স্রিম্পি'-নৃত্য-নিরতা রাজকন্যা
(ডচ চিত্রকার লেলিভেল্ট অঙ্কিত চিত্র হইতে)

করা তাড়ের মতন গহনা, মাথায় ছোটো একটী ক'রে সোনার মুকুট, আর গলায় একগাছি ক'রে ছোটো হার। গায়ে অনাবৃত গ্রীবাদেশে কাঁধে, দুই বাহুতে, মুখে একটা হলদে রঙের গুঁড়ো মাখা, তাতে দূর থেকে এদের ঠিক যেন দেবী-প্রতিমার মতন বোধ হ'চ্ছিল। এদের দৃষ্টি ভূমিতলে নিবদ্ধ, একটা তন্ময় ভাবের সঙ্গে আস্‌ছে, অন্য কোনও দিকে এরা তাকাচ্ছে না; মাথা যেন ঈষৎ সঙ্কোচের সঙ্গে নত হ'য়ে গিয়েছে। পা ফেলছে, এক পায়ের ঠিক সামনে আর এক পা, যেন পা দিয়ে জমি মেপে মেপে চ'লছে; দুপা পাশাপাশি রেখে সাধারণ ভাবে আমরা যেমন চ'লে থাকি সে রকমটা মোটেই নয়। এরা রাজ-অন্তঃপুরিকা, তাই এদের সম্মাননার জন্য সাম্‌নে আর পিছনে কতকগুলি ক'রে দাসী আস্‌ছিল; রাজার সাম্‌নে যেমন কেউ দাড়ায় না, হাঁটু গেড়ে বা উবু হ'য়ে বসে, তেমনি এই দাসীরা উবু হ'য়ে বসা অবস্থায় পা ঘ'ষ্‌টে ঘ'ষ্‌টে চ'লে আস্‌ছিল। মণ্ডপের মধ্যখান অবধি এই দাসীরা ওই রকম ভাবে নর্ত্তকী কন্যাদের সঙ্গে এল'—এক জন আগে আগে, আর ক'জন পিছনে; তার পরে তারা চ'লে গেল। নয়জন কন্যা তখন এসে রাজার সামনে দাঁড়াল,—তাদের দৃষ্টি তখনও সেই ভাবে নিজনিজ পদতলে নিবদ্ধ।

প্রাচীন ভারতে নৃত্য-কলার খুবই উৎকর্ষ হ'য়েছিল, এ কথা আমরা সকলেই জানি। গান আর বাজনার মতন নাচও দেবার্চ্চনায় ব্যবহার হ'ত। নাচকে বাঙ্‌লাদেশের বাউলেরা 'দেহের গান' ব'লে বর্ণনা ক'রেছেন। নাচের উন্নতি এদেশে কতখানি হ'য়েছিল, ভাবের প্রকাশ বিষয়ে নাচকে কতটা সহায়ক ব'লে লোকে মনে ক'রত, তা দক্ষিণে তামিল দেশে চিদম্বরম-এর মন্দিরের গোপুরম্ বা তোরণ-দেহলীর গাত্রে উৎকীর্ণ শত শত নৃত্য-ভঙ্গীর প্রস্তর-চিত্র থেকে বোঝা যায়। আগে ভারতবর্ষে ভদ্রঘরেও নাচ প্রচলিত ছিল, যেমন গুজরাটে এখনও আছে– গুজরাটের অতিমনোহর গর্‌বা নাচ। রাজার মেয়েরাও নগরের দেবালয়-প্রাঙ্গণে নৃত্যভঙ্গে কন্দুক-ক্রীড়া ক'রতেন। দশকুমার-চরিতের মতন বই থেকে এ সব কথা জান্‌তে পারি। এখন সে-সব কথা অতীতের স্বপ্ন হ'য়ে দাঁড়িয়েছে—সে দিন আর ফিরবে না। রাজার ঘরের মেয়েদের নাচের প্রথা ভারতবর্ষ থেকে যবদ্বীপেও যায়। ওখানে মন্দির-প্রাঙ্গণে দেববিগ্রহের সাম্‌নে সাধারণ নর্ত্তকীর বা রাজঅন্তঃপুরিকার বা অভিজাত বংশের মেয়েদের নাচের ব্যবস্থা হ'ত—এই নাচ দেবপূজার একটী মনোহর অঙ্গ ব'লে বিবেচিত হ'ত। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধ'রে এইরীতি

চ'লে আসে—যবদ্বীপে ভারতীয় নৃত্যকলা একটী বিশিষ্ট রূপ পেয়ে দাঁড়ায়, যেন একেবারে পূর্ণতায় এসে পৌঁছয়। ইন্দোনেসীয় বা মালাই জাতির মধ্যে নৃত্যই ভাবের এক চরম অভিব্যক্তি হ'য়ে দাঁড়ায়। কিন্তু নৃত্যের মূলসূত্রগুলি ভারতেরই; কারণ, হাতের অনেক ভঙ্গীকে এখনও এদেশে 'মুদ্রা' বলে। প্রাচীন ভাস্কর্য্যে—যেমন বর-বুদুরের গায়ে—উৎকীর্ণ খোদিত-চিত্রে নাচের অতি সুন্দর কতকগুলি ছবি পাওয়া যায়। যবদ্বীপীয় কৃষ্টির উদ্যানে এই নাচ একটী অনিন্দ্য-সুন্দর পুষ্প—দেবতার অর্চ্চনাতেই মুখ্যতঃ এটী নিবেদিত হ'ত। পরে কালধর্ম্মে যবদ্বীপে সব ব'দলে গেল—মুসলমান ধর্ম্ম এল, কাব্য-সঙ্গীত সৌন্দর্য্য-কলা প্রভৃতির সাহায্যে যে ভাবে আগে দেব-সেবা হ'ত তা একেবারে বন্ধ হ'য়ে গেল। মন্দিরগুলি আর পূজাস্থান রইল না, পরিত্যক্ত হ'ল, দেববিগ্রহ দূরীভূত হ'ল। কিন্তু যবদ্বীপের রাজারা ধর্ম্মান্তর গ্রহণ ক'রেও নিজেদের জাতীয় কৃষ্টির এই জিনিষটী আর ছাড়্‌তে পারলেন না। তাঁরা নিজেদের রাজসভার শোভার নিমিত্ত আর নিজেদের আনন্দের নিমিত্ত এই নাচ বজায় রাখলেন—এর tradition বা ঠাট বা পুরুষানুক্রমে প্রাপ্ত রীতিকে বর্জ্জন ক'রলেন না। আগেকার মতই রাজাবরোধের রমণীগণ বা রাজকন্যাগণ নাচের চর্চ্চা ক'রতে লাগলেন, আর রাজার সাম্‌নে বা কখনও কখনও রাজাদেশে রাজার অভ্যাগতদের সামনে নিজেদের এই অপূর্ব্ব শিল্প-কলা দেখাতে থাক্‌লেন।

যবদ্বীপের শূরকর্ত্ত আর যোগ্যকর্ত্ত এই দুই নগরেই এখন এই রকমের রাজঘরানা নাচ প্রচলিত আছে। রাজবাটীর দুই রকম শ্রেণীর মেয়েরা এই নাচ নাচে। এক রকম নাচ ক'রে থাকে রাজার মেয়েরা। চার জন মাত্র একসঙ্গে এই নাচে নামে। এই নাচের নাম হ'চ্ছে Serimpi 'সেরিম্পি' বা Srimpi 'স্রিম্পি'। সাত আট বছর থেকে রাজবাড়ীর মেয়েদের শেখাতে আরম্ভ করে। এই সব নাচ শেখা খুব কষ্টসাধ্য ব্যাপার। সাধারণতঃ বিয়ে হ'য়ে যাওয়ার পরে এরা আর নাচতে পায় না। সতেরো আঠারো কি কুড়ি বছর বয়সের মধ্যেই এদের বিয়ে হ'য়ে যায়। দ্বিতীয় রকমের নাচের নাম হ'চ্ছে Bedaja বা Bedojo 'বেডয়ো'। আগে রাজ-অন্তঃপুরের জন্য সুন্দরী কন্যা গ্রাম থেকে আনা হ'ত—পিতামাতা অনেক সময়ে রাজাকে কন্যা দান করা গৌরবের কথা ব'লে মনে ক'রত, তা সে যত, বড়ো ঘরের বা যত গরীব ঘরেরই বাপ-মা হোক না কেন। এই সব মেয়েদের এনে অতি যত্নে শিক্ষা দেওয়া হ'ত, আর এরা মন্দিরেও নৃত্য ক'রত, রাজার স্ত্রী ব'লে গণ্য হ'ত। এখনও এই রকম প্রথা যবদ্বীপে অল্প-স্বল্প আছে। এই সব রাজস্ত্রী যে নাচ নাচে, তার নাম 'বেডয়ো'। এদেরও খুব ছেলেবেলা থেকে শিক্ষা দেওয়া হয়, আর একটু বয়স হ'য়ে গেলে আর নাচে না। অষ্টাদশ শতকে 'বেডয়ো' নাচে তখনকার দিনের একজন রাজা কতকগুলি নোতুন বিষয়ের যোজনা করেন, যেমন নর্ত্তকী মেয়েদের সে-কেলে পিস্তল নিয়ে আওয়াজ করা। আর কতকগুলি ডচ রুচিবাগীশের হাতে প'ড়ে বিগত শতকের মাঝামাঝি এদের পোষাকের একটু পরিবর্ত্তন করা হয়—আঙিয়ার বদলে কাঁধ-ঢাকা জামা দেওয়া হয়; কখনও কখনও এই কাঁধ-ঢাকা জামা প'রেই নাচে।

আমরা শূরকর্ত্তয় 'বেডয়ো'র নাচ দেখলুম, পরে যোগ্য-কর্ত্তয় 'স্রিম্পি' দেখি। দুইয়ের পার্থক্য আমরা কিছু ধ'রতে পারলুম না—দুই একই শ্রেণীর নাচ। এই নাচ যবদ্বীপের রাজবাটীর বাইরে কারো দেখবার সুযোগ সাধারণতঃ হয় না। বছরে নাকি চার দিন এই নাচে বাইরের লোকের নিমন্ত্রণ হ'য়ে থাকে—তাও ডচ রেসিডেণ্ট সাহেবের মারফতে হয়, তাঁর হাত দিয়ে নাচের নিমন্ত্রণের কার্ড বিলি হয়। এই চারটী দিন হ'চ্ছে—(১) হলাণ্ডের মহারাণীর জন্মদিন, (২) রাজার জন্মদিন, (৩) ডচ সরকারের সম্মাননার জন্য এক দিন, আর (৪) মুসলমানদের পয়গম্বর মোহম্মদের জন্মদিন। শুনলুম, রবীন্দ্রনাথ আস্‌ছেন ব'লে বিশেষভাবে তাঁকে দেখাবে ব'লে আর একদিনের জন্য সুসুহুনান্ এই নাচের ব্যবস্থা করেন।

নাচ আরম্ভ হ'ল। এর বর্ণনা কি দেবো? আমার মনে তার একটা উজ্জ্বল বর্ণময় ছাপ মাত্র আছে—তার খুঁটি-নাটি কিছু মনে আসে না। বিশেষতঃ যখন নৃত্যকলার

কিছুই আমি জানি না। এই সম্বন্ধে যে ধারণাটি আমার মনে বিদ্যমান, সেটি হ'চ্ছে এর একটি অতি শুদ্ধ-সংযত শালীনতা। প্রত্যেক ভঙ্গীটি এমন একটি শুচিতাপূর্ণ গাম্ভীর্য্যের সঙ্গে প্রকাশিত হ'চ্ছিল, যে তা দেখে মনও যেন দেবার্চ্চনা-স্থলের উচিত একটা পবিত্রতায় ভ'রে উঠ্‌ছিল। নর্ত্তকীরা যখন রাজার সামনে আনতনেত্রে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে, ধীরে ধীরে চতুর্দ্দিকে পরিধেয়ের বিন্যাস ক'রে দিয়ে, মাটিতে হাঁটু পেতে ব'সে, দুই হাত জোড় ক'রে রাজাকে 'সেম্বাঃ' বা প্রণাম ক'রলে,—তারপরে আবার আস্তে আস্তে উঠে' ললিত গতিতে নাচ আরম্ভ ক'রলে—এর প্রত্যেক হাত বা কোমর বাঁকানোর ঢংটা আমাদের কাছে অপূর্ব্ব লাগ্‌ছিল। নাচের ভঙ্গীর কতকগুলি ছবি এঁকেছিলেন একটি সুইডেন দেশীয় মহিলা; এঁর নাম Tyra de Kleen; শূরকর্ত্তায় ইনি এবিষয়ের জন্য অনুমতি পেয়েছিলেন। তাঁর আঁকা রঙীন ছবিগুলি ডচ সরকারের সাহায্যে বাতাবিয়ার Balai Poestaka-র মারফৎ প্রকাশিত হ'য়েছে। ছবিগুলি এমন খুব যে ভালো তা নয়, তবে 'স্রিম্পি' আর 'বেডয়ো' নাচের কতকগুলি ভঙ্গী এ'র তুলিতে ধরা প'ড়েছে। (এই বইয়ের দুখানি রঙীন ছবি এবারকার 'প্রবাসী'তে দেওয়া হ'ল।) 'স্রিম্পি' নাচকে যবদ্বীপের রোমান্স ছেনে তৈরী বলা যায়। নাচের মধ্যে সব চেয়ে বেশি আমাকে মুগ্ধ ক'রেছিল—এই সব মেয়ের আনত দৃষ্টি, আর ধীর-ললিত ছন্দোময় গতি। কিন্তু মোটের উপরে, মঙ্কুনগরোর গৃহে এ কয় দিন যে-সব নাচ দেখি, সে-সবের সঙ্গে তুলনা ক'রলে, সুসুহুনানের রাজবাটীর নাচে যেন একটু শ্রান্তি একটু ennui-এর ভাব আছে ব'লে বোধ হ'চ্ছিল। কিন্তু এইটুকুনই এই প্রচ্ছন্ন বেদনার ভাবটা যেন এর একটা বিশেষ অপার্থিব গুণ ব'লেও লাগ্‌ছিল।

পর পর তিনটী নাচ হ'ল, সবকটিতেই এই নয় জন মেয়ে ছিল। এদের নাচ যখন শেষ হ'ল, তখন আবার যে ভাবে এরা এসেছিল সেই ভাবেই ফিরে' গেল। বাজনা যেন দ্বিগুণ জোরে বেজে উঠ্‌ল, গায়কের কণ্ঠে আবার



শূরকর্ত্তর রাজবাটীর দাসী ও ভৃত্যবৃন্দ

উচ্চ তান এল। আমরা এতক্ষণ ধ'রে যা দেখছিলুম, তা এরা চ'লে যেতে স্বপ্ন ব'লে এখন মনে হ'তে লাগ্‌ল।

নাচ শেষ হবার পরে, অন্য অভ্যাগতদের সঙ্গে রাজ-প্রাসাদ আর রাজার নানা তৈজস-পত্র দেখ্‌তে গেলুম। লাল আর সোনালী রঙে রঙানো পর পর বিস্তর মহল, সবগুলি প্রায় একতালা ক'রে। একটী মণ্ডপে শ্রীদেবীর বিছানা বা গদী আছে। টেবিলের উপরে কোথাও বা তৈজস-পত্র সাজানো। খাস অন্তঃপুরিকারা এখানটায় ছিলেন, এইটেই হচ্ছে প্রাসাদের প্রাচীন পদ্ধতিতে তৈরী অংশ। একটী কক্ষে রাজার পাটরাণী Ratoe Emas 'রাতু 'মাস' অর্থাৎ 'স্বর্ণ রাজ্ঞী' সোনার বাক্স থেকে অভ্যাগতদের চুরুট বিতরণ ক'রলেন। গায়ে মালাই কোর্ত্তা, দামী সারং পরা, পায়ে সোনার জরী-কাজ জুতো, রাজার যত আত্মীয়ারা বেড়াচ্ছেন। রাজবাড়ীর দাসীর সংখ্যাও প্রচুর; যেখানে সেখানে কালো কিংবা অন্য রঙের সারং পরা, কাঁধ খোলা রেখে কোমরে আর বুকে উত্তরীয় জড়ানো, আর গলায় ভাঁজ ক'রে দু কাঁধের উপর দিয়ে রেখে ছোটো ছোটো সোনালী রঙের চাদর,—এহেন পোষাক-পরা কম-বয়সী আধা-বয়সী বৃদ্ধা বহু দাসী। চৌকো পানের বাটা নিয়ে তাম্বুল-করঙ্ক-বাহিনীরা কোথাও হাঁটু পেতে ব'সে। দু-চারটি বামন দাসীও দেখলুম—রাজবাড়ীতে অন্ধ আর বামন রাখা এদেশের রীতি; বামন রাখার রীতি প্রাচীন ভারতের রাজবাড়ীতেও ছিল, অজন্টার ছবিতে দেখা যায়। সোনালী জরির কাপড়-চোপড়ে, সোনা রূপার বাসন-কোসন খেলনা আর অন্য জিনিসে সবটাকে যেন কল্পলোকের ব্যাপার ব'লে মনে হ'চ্ছিল।

এই মহলে আর সব অভ্যাগতদের সঙ্গে খানিকক্ষণ কাটিয়ে আমরা গেলুম, রাজবাড়ীর অন্যান্য অংশ দেখ্‌তে। একটি সাজানো-গোছানো ছোটো বাগান, আর তার সংযুক্ত একটী বাড়ী; একটি চীনে ধাঁজের প্যাভিলিয়ন; ইউরোপীয় কেতায় সাজানো পুরো একটা মহল; জাপানী মূর্ত্তি, চীনা মাটিতে তৈরী নানা চীনা মূর্ত্তি; চীনা ছবি; এই রকম সব অনেক কৌতুককর জিনিস আমাদের দেখালে। এক জায়গায় এক Visitors' Book-এ আমাদের নাম সই করালে। তারপর আমাদের আবার বড়ো মণ্ডপে আস্‌তে হ'ল। সেখানে যে যার চেয়ারে ব'সলুম—আমাদের তখন কুলফী-বরফ খাওয়ালে। তার পরে আসবার সময়ের মতন ঘটা ক'রে রেসিডেণ্ট সাহেব বিদায় নিলেন। সুসুহুনানের কাছ থেকে আমরা বিদায় নেবার জন্য তখন সমবেত হ'লুম। তিনি আমাদের প্রত্যেককে একখানি ক'রে তাঁর নিজের আর তাঁর পাটরাণীর মিলিত বেশ বড়ো আকারের



শুরকর্ত্তর সুসুহুনান্ ও তাঁহার পাটরাণী 'রাতু 'মাস্'

ফোটোগ্রাফ উপহার দিলেন, আর কবিকে দিলেন, একটি সোনা-বাঁধানো লাঠি, তাঁর স্মারক হিসাবে। আমরা রাত সাড়ে-এগারোটায় বাসায় ফিরলুম।

[১৬] শূরকর্ত্তয় শেষ তিন দিন।

১৫ই সেপ্টেম্বর, বৃহস্পতিবার।—

শ্রীযুক্ত পিঝো (Dr. Theodor Gautier Thomas Pigeaud) যবদ্বীপের প্রাচীন ধর্ম্ম ও ভাষা নিয়ে আলোচনা ক'রছেন। এঁর বয়স অল্প, কিন্তু এঁর মধ্যে আলোচ্য বিদ্যায় বেশ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। হিন্দু ধর্ম্মের আর হিন্দু পুরাণ-কাহিনীর উৎপত্তি-বিষয়ে এঁর সঙ্গে কিছু কিছু আলোচনা করি, আর সেই আলোচনায় আমি বেশ প্রীত হই। ভারতের হিন্দুধর্ম্ম আর সভ্যতা এ সব দেশে এসে সহজেই এতটা বিস্তার লাভ ক'রলে, তার কারণ হ'চ্ছে কতকটা এই যে, হিন্দু ধর্ম্মের আর সভ্যতার নিজেরই মূলে অনেক বিষয়ে অস্ট্রিক্ জাতির আহৃত উপাদান আছে। ডাক্তার পিঝো মনে করেন যে রামায়ণের গল্প আর্য্য-পূর্ব্ব যুগের, খুব সম্ভব মূল আখ্যানটীর উদ্ভব হ'য়েছিল এই আস্ট্রিক জাতির মধ্যে; পরে এটীকে সংস্কৃত ক'রে বাল্মীকি প্রভৃতি কবিদের সহায়তায় ব্রাহ্মণগণ কর্তৃক গৃহীত হয়, হিন্দু বা ব্রাহ্মণ্য সভ্যতার অঙ্গ হিসাবে দাঁড়িয়ে যায়। রামায়ণ আর মহাভারতের মূল কথা আর্য্য-পূর্ব্ব যুগের ভারতের সুসভ্য অনার্য্য জাতির মধ্যে উদ্ভূত হওয়া অসম্ভব নয়। তবে রামায়ণের আখ্যানবস্তুতে একাধিক বিভিন্ন কথা মিলিত হ'য়ে গিয়েছে, এইটাই বেশী সম্ভব। এ বিষয় নিয়ে—রামায়ণ মহাভারত আর পুরাণ কাহিনীগুলিতে, অনার্য্য-উপাদান কতটা আছে, তাই নিয়ে আলোচনা কিছু কিছু হ'চ্ছে, আরও বেশী ক'রে হবে। হিন্দু সভ্যতার মূলে যদি অনার্য্য প্রভাব এতটা বেশী থাকে, তা হ'লে রামায়ণ-মহাভারত-পুরাণেও যে থাকবে তার আর আশ্চর্য্য কি। ডাক্তার পিঝো আমাদের আলাপের স্মারক স্বরূপে একটী মূল্যবান উপহার আমায় দিলেন—Tantu Panggelaran ব'লে প্রাচীন যবদ্বীপীয় পুরাণ-কথার গ্রন্থ। বইখানি গদ্যে লেখা, হিন্দু সৃষ্টিকথা, দেবদেবীদের কাহিনী আর যবদ্বীপের প্রাচীন হিন্দুধর্ম্ম আর অনুষ্ঠান সম্বন্ধে নানা কথায় ভরা; এটী মূল পুথি থেকে, ভূমিকা ডচ অনুবাদ আর টীকাটিপ্পনী সমেত রোমান অক্ষরে ছাপিয়ে তার লাইডেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টরেট-থীসিস্ হিসাবে ডক্টর পিঝো প্রকাশিত ক'রেছেন; সঙ্গে সঙ্গে ডচ ভাষায় খান তেরো প্রাচীন যবদ্বীপীয় পুরাণ-গ্রন্থের পরিচয়ও দিয়েছেন—যথা—দেবশাসন, রাজপতিগুণ্ডল (?), প্রতস্তি ভুবন (?), ব্রতিশাসন, ঋষিশাসন, শিবশাসন, শীলক্রম, সারসমুচ্চয়, আদিপুরাণ, ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ, অগস্ত্যপর্ব্ব, চতুঃপক্ষোপদেশ, কোরবাশ্রম। অনুরূপ বা সমনামের সংস্কৃতি বইয়ের সঙ্গে এগুলি মিলিয়ে দেখা উচিত। এই রূপ তুলনা-মূলক আলোচনায় আমাদের অতীতের কোনও না কোনো অজ্ঞাত রহস্য বেরিয়ে প'ড়বে নিশ্চয়ই।

সকালে মঙ্কুনগরো কবিকে পাহাড়ের উপরে তার এক বাগান-বাড়ীতে নিয়ে গেলেন। সঙ্গে আমরা সকলেই ছিলুম, ত্রেউএস্, কোপ্যারব্যাগ, ধীরেন বাবু, পিঝো আর আমি।

খালি সুরেন বাবু যান নি, তিনি ডচ বাস্তশিল্পী Karsten কার্স্‌টেন-এর সঙ্গে মোটরে ক'রে উত্তরে সেমারাঙ্ শহরে সারাদিনের মতন গেলেন, সেখানে এই শিল্পী যবদ্বীপীয় বাস্তু-রীতির আধারের উপর নোতুন অনেকগুলি বাড়ী ক'রেছেন, তাই দেখতে গেলেন। সুরেনবাবু চিত্রকর তো বটেন, তিনি সৌষ্ঠবময় গৃহরচনায়ও সিদ্ধহস্ত; শান্তিনিকেতনে আর শ্রীনিকেতনে অতি মনোহর যে একটী বাস্তু-রীতি গ'ড়ে উঠ্‌ছে, যাতে ভারতীয় ভাব পুরো বজায় আছে অথচ ভারতীয় বাস্তশিল্পের একটা নবীন অভিব্যক্তি ফুটে উঠ্‌ছে, সেই বাস্তু-রীতির উদ্ভবে সুরেনবাবুর অনেক খানি কৃতিত্ব আছে।

এ জায়গাটায় লোকের বসতি কম। চমৎকার দৃশ্য এখানকার, কেবলি বালিদ্বীপের কথা মনে হ'চ্ছিল। কতকগুলি সহজ চড়াই পথ বেয়ে' আমাদের গাড়ী গেল। মাঝে Karang Pandan 'কারাঙ পান্দান' ব'লে একটি গ্রাম পড়ে; এখানকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য খুবই উপভোগ্য। ইউরোপীয়দের জন্য এখানে একটি হোটেল আছে। আমরা মঙ্কুনগরোর পাহাড়ের উপরকার বাড়ীতে গিয়ে সেখানে খানিকক্ষণ কাটিয়ে' আবার কারাঙ-পান্দান-এ এলুম। সেইখানেই আমাদের



যবদ্বীপ—সম্ভ্রান্ত গৃহে 'বাতিক্' কাপড় প্রস্তুত করণ

মাধ্যাহ্নিক আহার হ'ল। মঙ্কুনগরোর সঙ্গে কবির নানা বিষয়ে আলাপ হ'ল। পাহাড়ের ঢালু গায়ে তৈরী 'কারাঙ-পান্দান' হোটেলের একটি পোস্তায় ব'সে সামনে প্রসারিত দিগন্ত-বিস্তৃত সমতল ভূমির দৃশ্য চমৎকার লাগ্‌ল।

ফিরতি পথে শুনলুম, এই কারাঙ-পান্দান-এর পার্ব্বত্য-অঞ্চল বহুস্থলে দুর্গম—আর সেখানে এখনও হিন্দু যবদ্বীপীয় লোকেরা বাস করে,—মুসলমান ধর্ম্ম আর ডচ শাসন এখনও সেখানে পৌঁছায়নি। যবদ্বীপীয়দের মধ্যে মুসলমান ধর্ম্ম প্রচার লাভ ক'রতে থাক্‌লে, অনেক হিন্দু এই পাহাড়ে' অঞ্চলে আর পূর্ব্ব যবদ্বীপে তোসারি অঞ্চলে আর বলিদ্বীপে গিয়ে আশ্রয় নেয়। কারাঙ-পান্দান-এ এরা বাইরের কারুকে বড়ো যেতে দেয় না, নিজেরাও বড়ো একটা বাইরে আসে না, তাই এদের সম্বন্ধে সঠিক খবর কেউ দিতে পারে না। তবে এরা এখনও বলিদ্বীপের আর তোসারির হিন্দুদের-মতন শ্রাদ্ধাদি অনুষ্ঠান করে, আর এদের একটি প্রধান পর্ব্ব বা পূজানুষ্ঠান আছে, এদের ভাষায় তার নাম হ'চ্ছে Asaminda বা Asaminta 'আসামিন্দা' বা 'আসামিন্তা'। মঙ্কুনগরো ব'ললেন, কেউ কেউ মনে করেন যে এটি সংস্কৃত 'অশ্বমেধ' শব্দের অপভ্রংশ; তবে এই অনুষ্ঠানের স্বরূপ কি তা বাইরের কেউ ভালো ক'রে ব'ল্‌তে পারে না।

বিকালে সন্ধ্যার দিকে আমার একটি বক্তৃতা ছিল, স্থানীয় ডচ প্রটেষ্টাণ্ট মাষ্টারদের শেখাবার ইস্কুলে। শান্তিনিকেতন বিদ্যালয় আর শিক্ষার বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের অভিমত, আদর্শ আর প্রয়োগ –এই ছিল বক্তৃতার বিষয়। দ্রেউএস দোভাষীর কাজ ক'রলেন। জন আশী লোক নিয়ে শ্রোতৃদল; এর মধ্যে বেশীর ভাগই ডচ মেয়ে আর পুরুষ,—এই ইস্কুলের ছাত্র-ছাত্রী, আর পিছনের বেঞ্চিগুলিতে জন-কতক যবদ্বীপীয় ছোকরা।

আজ রাত্রি নটা থেকে পৌনে এগারোটা পর্য্যন্ত কবিকে নিয়ে স্থানীয় Kunstkring-এ সভা হ'ল। কবি বক্তৃতা দিলেন, বাকে তার তর্জ্জমা ক'রলেন। বিষয় ছিল—জাতিতে জাতিতে সংঘাত রূপ সমস্যার সমাধান ভারতবর্ষ কি ভাবে ক'রেছিল। আজ সকালের ঘোরাঘুরির দরুন কবির শরীর মোটেই ভালো ছিল না, কিন্তু তিনি নিজের স্বাভাবিক অন্তর্মুখিতার সঙ্গে বিষয়টীর আলোচনা করেন। ইন্দোনেসীয় জাতির স্বাতন্ত্র্য লাভের চেষ্টার বিরোধী কতকগুলি ডচ ব্যক্তি আছে—কবির আলোচ্য বিষয় আর তাঁর আলোচনা-রীতি বোধ হয় তাদের ভালো লাগে নি।

১৬ই সেপ্টেম্বর, শুক্রবার।—

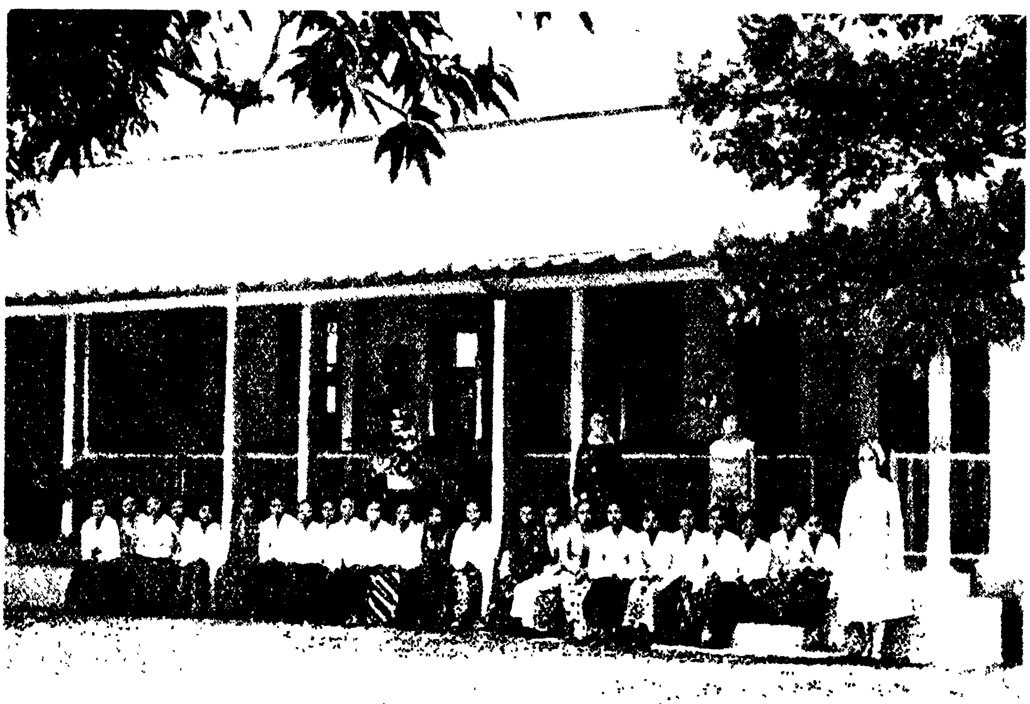
সকালে প্রাতরাশের সময়ে মঙ্কুনগরোর বাড়ীতে আবার নাচের আসর ব'স্‌ল। যে দুটী মেয়েকে এই দু তিন দিন নাচতে দেখেছি, তারা আজ পুরুষের পোষাক প'রে Wireng নাচ দেখালে। মেয়েদের দ্বারা যুদ্ধ-বিগ্রহ সংক্রান্ত নাচ, এটা একটু অদ্ভুত ধরণের লাগ্‌ল। তার পর মঙ্কুনগরোর ভাই ঘটোৎকচের ভূমিকায় তাঁর নৃত্যাভিনয় দেখালেন।

ডাক্তার Stutterheim ষ্টুটারহাইম ব'লে একটী ডচ্ পণ্ডিতের সঙ্গে আজ আলাপ হ'ল। যবদ্বীপীয়দের জন্য এখানকার একটী সরকারী ইস্কুলের অধ্যক্ষ ইনি। এই ইস্কুলে ভাষা, সাহিত্য, ইতিহাস, কলা ইত্যাদি বিশেষ ক'রে শিক্ষা দেওয়া হয়। যবদ্বীপে এখনও বিশ্ববিদ্যালয় হয় নি; উচ্চ শিক্ষা, বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উপাধি এই সব পেতে হ'লে যবদ্বীপীয় আর অন্য ইন্দোনেসীয় ছাত্রদের এখন হলাণ্ডে বা ইউরোপের উপাধি দেশে যেতে হয়। তবে ডচ সরকার শীঘ্রই একটী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনা ক'রবেন। বাতাবিয়ার আইন পড়বার জন্য এক সরকারী বিদ্যালয় আছে, সেটীকে নিয়ে এই নব-প্রস্তাবিত বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন-বিভাগ গঠিত হবে। বাতাবিয়ায় একটী মেডিক্যাল ইস্কুল হ'ল, তার থেকে চিকিৎসা-বিদ্যার বিভাগ হবে। বাণ্ডুং-এ একটী সায়েন্স-কলেজ বা ইস্কুল আছে, সেইটিকে নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান-বিভাগ হবে। আর শুকর্ত্তয় ডাক্তার ষ্টুটারহাইমের এই ইস্কুলটীকে অবলম্বন ক'রে সমগ্র ইন্দোনেসিয়ার জন্য একটী আর্টস্-কলেজ হবে। ষ্টুটারহাইম যুবক, নিজে সংস্কৃত জানেন, দ্বীপময় ভারতের ইতিহাস আর প্রত্নতত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁর লেখা প্রধান প্রমাণের

মধ্যেই গণ্য হয়। তাঁর ইচ্ছা, প্রস্তাবিত বিশ্ববিদ্যালয়ের এই আর্ট্‌স্‌ বিভাগে Kawi কবি বা প্রাচীন যবদ্বীপীয় ভাষা পাঠের সঙ্গে-সঙ্গে যাতে সংস্কৃতও শেখানো হয়। পরে আমি এঁর ইস্কুল দেখে আসি, আর দেখে ভারী চমৎকার লাগে। ডাক্তার ষ্টুটারহাইম এখন বলিদ্বীপীয় প্রত্নতত্ত্ব নিয়ে কাজ ক'রছেন। বলিদ্বীপে কতকগুলি পুরাতন সংস্কৃত অনুশাসন পাওয়া গিয়েছে, সেগুলির সম্পাদন-কার্য্যে তিনি এখন নিযুক্ত। ভালো সংস্কৃত জানেন এমন ভারতীয় পণ্ডিতের সাহায্য পেলে এই কার্য্য সহজ আর সুন্দর ভাবে হয়, এই কথা তিনি আমাকে ব'ল্‌লেন। অল্পক্ষণের মধ্যে সমধর্ম্মিত্ব-হেতু আমাদের আলাপ বেশ জ'মল।

কালকে স্থানীয় বিশিষ্ট যবদ্বীপীয়দের আহৃত একটা সভায় কবির কতকগুলি কবিতা পড়া হবে—বাকের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে আমি 'কথা ও কাহিনী'র এই কবিতাগুলর ইংরেজি অনুবাদ ক'রে দিলুম—'অভিসার, মূল্য-প্রাপ্তি, স্পর্শমণি, বিচার, বাকে এগুলির ডচ ক'রলেন, তার পরে যবদ্বীপীয় ভাষায় অনুবাদ ক'রে সভায় পড়া হবে।

সদ্বংশীয় যবদ্বীপীয়দের মেয়েদের জন্য এই শহরে Van Deventer School নামে একটা বিদ্যালয় ক'রেছে, মঙ্কুনগরো এই বিদ্যালয়ের একজন পৃষ্ঠপোষক। কোপ্যারব্যার্গ বিকালে কবিকে সেখানে নিয়ে গেলেন, সঙ্গে আমরাও গেলুম। ছোটো ইস্কুলটা; সম্ভ্রান্ত ঘরের ২৫।৩০টা মেয়ে পড়ে, বচর বারো থেকে ষোলো পর্য্যন্ত বয়সের; বোর্ডিং স্কুল, একটা মাত্র ক্লাস, মাসে ২৫ গিলডার ক'রে বেতন। প্রধান শিক্ষয়িত্রী একজন বয়িয়সী ডচ মহিলা—ভারী অমায়িক মিষ্টি ব্যবহার এঁর। আর একজন ডচ শিক্ষয়িত্রী আছেন আর যবদ্বীপীয় শিক্ষায়ত্রী একজন আছেন। যবদ্বীপীয় ভাষা, ডচ ভাষা, ইতিহাস, ভূগোল, ছবি-আঁকা, বাতিক কাপড় তৈরী করা, সেলাই, রান্না, এই সব শেখানো হয়। যবদ্বীপীয় ভাষা পড়াবার জন্য একজন পণ্ডিত আছেন। মালাই ভাষা



শূরকর্ত্ত—ফান্‌-ডেফেণ্টার কন্যাবিদ্যালয়

এদের আলাদা ক'রে শেখানো হয় না। মেয়েকয়টীকে দেখে আমাদের দেশের মেয়েদের মতন লাজুক, শান্ত, নম্র আর ভব্য ব'লে মনে হ'ল। বড়ো ঘরের মেয়ে অনেকেই, তবুও দাসদাসীর পাট এখানে বেশী নেই, গৃহকর্ম্ম কাপড় কাচা ইত্যাদি নিজেরাই করে। ইস্কুল বাড়ীটী খুব বড়ো নয়, তবে গাছপালা চারদিকে বেশ আছে। মাঝেকার একটা বড়ো ঘর নিয়ে এদের ডর্ম্মিটরী বা শোবার ঘর। শিক্ষয়িত্রী আমাদের সব দেখালেন—বিলাসিতা কিছুই নেই, তক্তাপোষের উপরে সাদা মাদুরই হ'চ্ছে এদের বিছানা, কিন্তু সব পরিষ্কার ঝক্-ঝক্ তক্-তক্ ক'র্‌ছে। একটা বেশ শুচিতার আব-হাওয়ার মধ্যে যেন ইস্কুলটী। কবির চমৎকার লাগ্‌ল—মঙ্কুনগরো আর তাঁর বন্ধুদের এই রকম ভাবে দেশের প্রাচীন সাহিত্য আর শিল্পের সঙ্গে জড়িত, বিলাসিতা-বর্জ্জিত উচ্চশিক্ষা দেবার চেষ্টাকে খুবই সাধুবাদ দিলেন।

আজ বিকালে জুইফুলের গন্ধযুক্ত চা পান করা গেল—এই চা নাকি খালি যবদ্বীপেই হয়। চায়ের সঙ্গে অন্যতম উপকরণ বা অনুপান ছিল—সকরকন্দ আলু সিদ্ধ, নারকম দুধ আর সাগুদানার সঙ্গে এদেশের এক রকম গুড় দিয়ে তৈরী পায়স—এটী এদেশের একটী সুখাদ্য।

প্রথম রাত্রে মঙ্কুনগরোর প্রাসাদের ছোটো মণ্ডপে ছায়াচিত্র-সহযোগে আমার বক্তৃতা হ'ল, ভারতের চিত্র-শিল্পের ইতিহাস বিষয়ে। কবি ছিলেন মঙ্কুনগরো নিজেও ছিলেন। ডাক্তার ষ্টারহাইম লণ্ঠন আনেন আর ছবিগুলি দেখান, আর আমার ইংরেজী বক্তৃতার ডচ অনুবাদ করেন দ্রেউএস। মঙ্কুনগরো নিজের জন পঞ্চাশেক আত্মীয় আর বন্ধুকে নিমন্ত্রণ করেছিলেন।

আহারাদির পরে রাজকুমার কুসুমায়ুধ-র বাড়ীতে যবদ্বীপের বৈশিষ্ট্য ছায়াচিত্রাভিনয় দেখ্‌তে গেলুম। এই জিনিস হ'চ্ছে বিখ্যাত Wajang Poerwa 'ওয়াইয়াং পূর্ব্ব'—প্রাচীন ইতিহাসের কাহিনী নিয়ে ছায়াভিনয়। এই জিনিসটীর সম্বন্ধে কিছু বলা দরকার।

(ক্রমশঃ)

ট্রাজেডি

শ্রীহেমচন্দ্র বাগচী

মহাকাশে রাত্রি এল ; এল যেন তিমির-জোয়ার
লঙ্ঘিয়া কালের বাধা ধরিত্রীর দীর্ঘ উপকূলে !
এস আরও কাছে সরে—মোর হাতে হাত দাও আজ—
শুনিছ না, দুয়ারে তোমার লাগিছে নিশার স্রোত ?
শব্দহীন সেই বেগ—থরথর আঘাতে তাহার
কাঁপিছে তোমার ঘর—তরী, যেন উঠিয়াছে দুলে—
এ আদিম অন্ধকারে দুটি প্রাণী করিছে বিরাজ—
'নোয়া' বুঝি ভাসায়েছে বর্ম্মসম অর্ণবের পোত !

এস শুনি দুইজনে ধরণীর হিন্দোলার গান,
আঁচল ছড়ায়ে রাতি বসিয়াছে শিয়রে তাহার—
সে ভাষা বুঝি না মোরা—শুধু সেই গাঢ়তম সুর
মর্ম্মের অন্তরে পশি তুলি ধরে কাহার গুণ্ঠন !
তোমারও শিহর জাগে ?—যেন তীব্র বিদ্যুতের বাণ
চকিতে ছিঁড়িয়া দিল অতীতের মহা পারাবার !—
দেখ কি বিষণ্ণ আলো !—ভেসে যায় দূর হ'তে দূর—
'আদম' 'ইভা'র জ্যোতি কা'রা যেন করিছে লুণ্ঠন !

মনে হয় আজ রাতে ওই মাঠে কে যেন কাঁদিছে—
কায়াহীন যত ছায়া একসাথে করিয়াছে ভিড়,
চেনে না প্রিয়ারে যেই, প্রিয়ারে যে দেয় বিসর্জ্জন,
প্রিয়ারে যে বধ করে রুধি তার সুরভি-নিঃশ্বাস,
সব যেন আসিয়াছে—হিমরাতে শিশিরে ভাসিছে
তাদের বাঞ্ছিত আশা ; শোন ধ্বনি গভীর ঝিল্লীর
নিয়তির পরিহাসে ক্ষীণ হ'ল যাদের জীবন,—
তাদের ছায়ায় দেখ ভরে গেল রাত্রির আকাশ !

বর্গীর হাঙ্গামা

শ্রীযদুনাথ সরকার

(১৭)

গত বৎসরের অর্থাৎ ১৭৪৫ সালের প্রথমে বর্গীর হাঙ্গামার জন্য নবাব চন্দননগরের ফরাসী কোম্পানীর নিকট হইতে ৪৫ হাজার টাকা আগাম বলিয়া লইলেন। তাহার পর যখন তিনি মুস্তাফা খাঁর সহিত যুদ্ধে ব্যস্ত, তখন ঐ কুঠীর বড়সাহেব তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে যায়, তাহার ফলে তাহাদের আরও আট হাজার টাকা খরচ হয়। এই-সব কারণে ফরাশডাঙ্গার অধীন গ্রামগুলি হইতে নূতন কর আদায় করিবার জন্য পণ্ডিচেরীর অধ্যক্ষ হুকুম দিলেন। এই "মারাঠা দণ্ডের" পরিমাণ পঁচিশ হাজার টাকা ধার্য্য করা হইল। ১৭৪৫ সালের শেষভাগে মারাঠাদের আগমনের ফলে পথের দুই ধারে গ্রাম ও ক্ষেত উজাড় হইয়া গেল। বর্গীদের এত সাহস বাড়িয়াছিল যে, তাহাদের একদল ফরাসী এলাকার গ্রামে ঢুকিয়া লুঠপাঠ আরম্ভ করিয়া জনকতক প্রজাকে খুন করিল। কিন্তু মুস্য রুসেল ৫০ জন সৈন্য লইয়া গিয়া তাহাদের আক্রমণ করিলেন; ১৫ জন মারাঠা হত, জনকতক বন্দী এবং অনেকগুলি আহত হইলে পর উহারা পলাইয়া গেল। এই হাঙ্গামার ফলে ঐ অঞ্চলে ভয়ানক অন্নকষ্ট উপস্থিত হইল, টাকায় পাঁচ সের মাত্র চাউল বিকাইতে লাগিল। দুর্ভিক্ষের সহচর মহামারী দেখা দিল এবং তাহাতে অসংখ্য কারিগর (তাঁতী?) মারা গেল। [ফরাসী কুঠীর পত্র]

১৭৪৬ সালের ৩রা জানুয়ারি একদল বর্গী কাসিমবাজারের তিন ক্রোশ দূরে উপস্থিত হইল; কিন্তু তাহাদের প্রধান আড্ডা কাটোয়ায় রহিল। ঐ দুই অঞ্চলে গড়া-কাপড়ের আড়ঙ ছিল; বর্গীর ভয়ে সব তাঁতী পলাইল, সাহেবেরা রপ্তানী করিবার জন্য আর কাপড় পান না। "কাসিমবাজারের আশপাশে বর্গী-দলগুলি দীর্ঘকাল ধরিয়া ক্রমাগত থাকায়, লুঠ ও দুর্ভিক্ষ চলিতেছে, এবং শিল্প-বাণিজ্য বন্ধ হইয়াছে। শুনা যায় যে [রাজধানীর] শহরতলীগুলি একেবারে ধ্বংস হইয়া গিয়াছে।...এক ছোট দল পথে যে-সব বাঙালীকে পাইল তাহাদের স্ত্রী পুরুষ বালক বৃদ্ধ বিচার না করিয়া হত্যা করিয়া ধন লুটিয়া ফরাশডাঙ্গার কাছে আসিয়া পৌঁছিল।" [ফরাসী কুঠীর পত্র, ১৬ই ফেব্রুয়ারি]

রঘুজী নিজে কাসিমবাজার দ্বীপ ছাড়িয়া কামটপুরে চলিয়া গেলেন, মীর হবিব এবং মুস্তাফা খাঁর পুত্র মুর্তাজা খাঁ বিষ্ণুপুরের দিকে গেল, কিন্তু বর্গীদের প্রধান দল বর্দ্ধমান জেলায় রহিল। মার্চের প্রথমে নবাব এক প্রবল সৈন্যদল সহিত আতাউল্লা খাঁকে বর্দ্ধমান জেলায় পাঠাইয়া দিলেন। তাহার ফলে বর্গীরা সে জেলা হইতে তাড়িত হইল। নবাবও নিজে সেখানে গেলেন, কিন্তু শত্রু দূর হওয়ায় এপ্রিল মাসে রাজধানীতে ফিরিয়া আসিলেন।

বঙ্গদেশ কিছু দিনের জন্য শান্তি পাইল। কিন্তু উড়িষ্যা মারাঠাদেরই হাতে রহিল। মে জুন মাসে মীর হবিব হিজলীর আশপাশে লুঠ করিতে লাগিল। জুন মাসে তাহার সৈন্য ফলতার কাছে আড্ডা করিয়া রহিল। "আলীবর্দ্দীর ভাব দেখিয়া বোধ হয় যেন তিনি তাহাকে কটকের নবাবী শান্তভাবে ভোগ করিবার জন্য ছাড়িয়া দিয়াছেন।" [ফরাসী কুঠীর পত্র।] রাজধানীতে ফিরিয়া নবাব টাকা সংগ্রহের জন্য নিষ্ঠুর উৎপীড়ন আরম্ভ করিলেন। বর্ষার পর (শীতকালে) উড়িষ্যা উদ্ধারের চেষ্টা হইবে এই সঙ্কল্প রহিল।

ভাস্কর-হত্যার প্রতিশোধ লইবার জন্য মারাঠারা যে পুনরায় বাংলায় আসিবে ইহা নিশ্চিত জানিয়া আলীবর্দ্দী পদ্মার তীরে গোদাগাড়ীতে একটি মাটির দুর্গ গড়িলেন; অভিপ্রায় যে ঐখানে অস্ত্র কামান বারুদ

ও খাদ্য জমা থাকিবে এবং বিপদে পড়িলে নবাব সপরিবারে রাজধানী ত্যাগ করিয়া ওখানে আশ্রয় লইবেন। [ফরাসী দপ্তর]

(১৮)

গ্রীষ্মকালে মুর্শীদাবাদে থাকিবার সময় নবাব স্থির করিলেন যে মীরজাফর সেনাপতি হইয়া উড়িষ্যায় গিয়া মারাঠাদের তাড়াইয়া দিবেন। কিন্তু তাঁহার রওনা হইতে অনেক মাস বিলম্ব হইল। মীরজাফর মুর্শীদাবাদের বাহিরে শিবির স্থাপন করিয়া নবাবের আদেশ-মত নূতন সৈন্য সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। কারণ, জুলাই মাসে বাংলার পাঠান-সৈন্যদের সহিত নবাবের আবার ঝগড়া বাধায় তিনি হীনবল হইয়া পড়িয়াছিলেন। গত বৎসর রঘুজীর সহিত যুদ্ধের সময় নবাবের সর্ব্বপ্রধান পাঠান-সেনাপতি শমশের খাঁ ও সরদার খাঁর বিশ্বাসঘাতকতা অথবা তাচ্ছিল্যের ফলে নবাব-সৈন্য রঘুজীকে ঘিরিয়া ফেলিয়াও ধরিতে পারিল না। এজন্য আলীবর্দ্দীর মনে পাঠানদের প্রতি সন্দেহ ও বিদ্বেষভাব প্রথম জাগিয়া উঠে। তাহার পর, ভগবানগোলা হইতে মুর্শীদাবাদে স্থলপথে চাউল আসিবার সময় ঐ রাস্তার প্রহরী শমশের খাঁর শিথিলতায় অথবা বর্গীদের সঙ্গে গোপনে যোগাযোগের ফলে অনেক বলদ ও চাউল বর্গীরা লুটিয়া লইল, রাজধানীতে খাদ্য দুর্ম্মূল্য হইল। এইজন্য আলীবর্দ্দী ছয় সাত হাজার পাঠান-সৈন্যকে চাকরি ছাড়াইয়া দিয়া তাহাদিগকে তাহাদের বাড়ি, দ্বারভাঙা জেলায়, চলিয়া যাইতে হুকুম দিলেন। তাহারা বাকী বেতন না পাইলে যাইবে না বলিয়া বসিয়া রহিল। নবাব একজন চোব্‌দার্ পাঠাইয়া তাহাদের জানাইলেন যে, বেতন দিতে কিছু বিলম্ব হইবে। তাহারা সেই চোব্‌দারকে ধরিয়া অপমান ও লাঞ্ছনা করিল এবং পাঠান-দল ও নবাবের অপর সৈন্যদের মধ্যে ছোটখাট মারামারি হইল। অবশেষে পাঠানের দল সিরাজের বিবাহের পরেই মুর্শীদাবাদ ছাড়িয়া কুচ করিয়া বঙ্গ ও বিহারের সীমানার ঘাটীস্থল সিকরিগলিতে গিয়া বসিয়া রহিল, এবং বেতন পাইবার পর মুঙ্গেরে গঙ্গা পার হইয়া দ্বারভাঙ্গা জেলায় চলিয়া গেল। [ফরাসী কুঠীর পত্র; সিয়র ১৫৪-১৫৬]

নবেম্বরের প্রথমে আলীবর্দ্দী দিল্লী হইতে মুহম্মদ শাহের এক পত্র পাইলেন। তাহার মর্ম্ম এই যে, বাদশাহ মহারাষ্ট্র-রাজ শাহুকে চৌথ দিবার শর্ত্তে তাঁহার সহিত সন্ধি প্রায় স্থির করিয়াছেন এবং বঙ্গের খাজনা হইতে পঁচিশ লাখ এবং বিহারের খাজনা হইতে দশ লাখ টাকা এই বাবতে বৎসর বৎসর দিল্লীতে পাঠাইতে হইবে, সেখান হইতে উহা শাহুর প্রতিনিধিকে দেওয়া হইবে। সকলে আশা করিতে লাগিল যে, এইরূপে বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যা বিপদ হইতে মুক্ত হইবে, দেশে আবার শান্তি ও বাণিজ্য আসিবে। [চন্দননগরের পত্র, ২৪ নবেম্বর, ১৭৪৬; কলিকাতার পত্র, ৩০ নবেম্বর]

(১৯)

নূতন সৈন্যদল ও রণসজ্জা সম্পূর্ণ করিয়া নবেম্বরে মুর্শীদাবাদ ছাড়িয়া মীরজাফর মেদিনীপুরের নিকট পৌঁছিলেন। সেখানে ১২ই ডিসেম্বর যুদ্ধে বর্গীদের পরাস্ত করিলেন। তাহাদের প্রধান সেনাপতি সৈয়দ নূর* এবং অপর দুইজন বড় সর্দ্দার মারা পড়িল, সৈন্যগণ বালেশ্বরের মধ্য দিয়া কটকের দিকে পলাইয়া গেল। ইতিমধ্যে মীর হবিব কণিকা জয় করিয়া, সেখানকার রাজা ও রাজপরিবারকে বন্দী করিয়া, এইরূপে অবসর পাইয়া মীরজাফরকে বাধা দিবার জন্য অগ্রসর হইতেছিল।

১৭৪৭ সালের জানুয়ারির মাঝামাঝি মীর হবিব বালেশ্বরের দুই মাইল দূরে পৌঁছিয়া ছাউনী করিল; তাহার সঙ্গে আট হাজার অশ্বারোহী ও বিশ হাজার পদাতিক। সে বুড়াবালং নদীর পাড়ে কামান পাতিয়া দেয়াল তুলিয়া বাংলার সৈন্যের পথ বন্ধ করিয়া বসিয়া রহিল। আর, কটক হইতে রঘুজীর পুত্র জানোজী নিজ দল-বল লইয়া হবিবকে সাহায্য করিতে অগ্রসর হইলেন। মীরজাফর দেখিলেন যে, শত্রুশক্তি তাঁহার অপেক্ষা অনেক

* ইংরেজদের বালেশ্বর কুঠীর ১৬ ডিসেম্বরের পত্র। কিন্তু সিয়রে আছে যে, সৈয়দ নূর আরও দুই বৎসর পরে জীবিত ছিল; সম্ভবতঃ এটা ভুল।

প্রবল; তখন তিনি মেদিনীপুর হইতে ভয়ে অতি দ্রুত-বেগে পিছাইয়া বর্দ্ধমানে আশ্রয় লইতে গেলেন। মারাঠাদের অগ্রগামী দল দু-এক হাজার মাত্র, মীরজাফরের অধীনে ষোল হাজার সোয়ার। অথচ সমস্ত মারাঠা-সৈন্য রাজার পুত্রের ও মীর হবিবের নেতৃত্বে আসিয়া পড়িয়াছে, এই ভাবিয়া মীরজাফর পথে কোথাও থামিয়া আত্মরক্ষার চেষ্টা করিলেন না। তাঁহার ভয় ও চঞ্চলতা দেখিয়া ঐ ছোট মারাঠা দল তাঁহাকে আক্রমণ করিয়া কয়েকটা হাতী ও কিছু মালপত্র অবাধে কাড়িয়া লইল।

এদিকে, হঠাৎ এই ভাগ্যপরিবর্ত্তনের সংবাদ পাইয়া আলীবর্দ্দী মীরজাফরকে বকিয়া দৃঢ় হইয়া থাকিতে লিখিয়া আরও সৈন্য বর্দ্ধমানে পাঠাইয়া তাঁহার দল পুষ্ট করিলেন। ক্রমে সমস্ত মারাঠা সৈন্যও সেখানে আসিয়া পৌঁছিল এবং সামান্য যুদ্ধ হইতে লাগিল। এই সময় মীরজাফর এবং আতাউল্লা (রাজমহলের ফৌজদার) ষড়যন্ত্র করিল যে আলীবর্দ্দীকে একদিন সাক্ষাতের সময় হত্যা করিয়া দু-জনে পাটনা ও বাংলার সিংহাসন ভাগ করিয়া লইবে! কিন্তু এই ষড়যন্ত্র কার্য্যে পরিণত করিবার মত সাহসে কুলাইল না। গোপন কথা নবাবের নিকট প্রকাশ হইয়া পড়িল। তিনি নিজে বর্দ্ধমানে আসিয়া মীরজাফরকে পদচ্যুত করিলেন।

আলীবর্দ্দী এখন একেবারে একাকী, অসহায়। তাঁহার সব পাঠান সৈন্য ও সেনাধ্যক্ষ চলিয়া গিয়াছে, তাহার উপর বর্ত্তমান প্রধান সেনাপতি মীরজাফরকে ছাড়াইয়া দিয়াছেন, আতাউল্লাও অবিশ্বাসের পাত্র। কিন্তু মরা হাতী লাখ টাকা। এই অদ্ভুত কর্ম্মবীর অতি বৃদ্ধ বয়সে এবং একাকী হইয়াও অজেয়। তিনি স্বয়ং সামনে আসিয়া দাঁড়াইলে বঙ্গীয় সৈন্যগণের সাহস বাড়িল, সব কাজে সুবন্দোবস্ত হইতে লাগিল। তাহারা শিবির ছাড়িয়া অগ্রসর হইয়া জানোজী ও সমস্ত মারাঠা-সৈন্যকে আক্রমণ করিয়া হটাইয়া দিল (ফেব্রুয়ারি-মার্চ্চ ১৭৪৭)। বর্গীরা আর আর বারের মত এই সম্মুখযুদ্ধ হইতে পলাইয়া পাশ ঘুরিয়া মুর্শীদাবাদ লুট করিতে ছুটিল। কিন্তু আলীবর্দ্দী তাহাদের পিছু পিছু আসিয়া এ কাজে বাধা দিলেন। অবশেষে বর্ষার আগমন দেখিয়া জানোজী বিফলমনোরথ হইয়া মেদিনীপুরে ফিরিয়া গেলেন, নবাব মুর্শীদাবাদে রহিলেন।

(২০)

সারা বৎসর (১৭৪৭) ধরিয়া বর্গীরা অবাধে উড়িষ্যা দখল করিয়া রহিল, তাহার ফলে "বাণিজ্য প্রায় বন্ধ হইল, সব রকমের খাদ্যদ্রব্য দুর্ম্মূল্য হইল, আবার মারাঠারা আসিতেছে এইরূপ যে-কোন মিথ্যা গুজব শুনিবামাত্র বাংলার লোক বাড়ি ঘর ছাড়িয়া পলাইতে লাগিল। বালেশ্বর হইতে চাউলের নৌকা বর্গীরা পথে আটক করিয়া ইংরেজ কুঠীতে ও গ্রামে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত করিল" (সেপ্টেম্বর-অক্টোবর)। [ইংরেজ কুঠীর পত্র]

"নানা বাধাবিঘ্ন পাইবার ফলে নবাব এ বৎসর মারাঠাদের সেই প্রদেশের বাহির করিয়া দেওয়া নিজ ক্ষমতার অতীত দেখিলেন। [সুতরাং] তাহারা হিজলী হইতে তাম্বুলী (=তামলুক) পর্য্যন্ত গঙ্গার ধারে অনেক গ্রাম দখল করিয়াছে, কিন্তু তাহারা আর দেশবাসীদের খুন বা লুট করে না; শুধু যে-সব নৌকা নদী উজাইয়া আসে তাহাদের নিকট হইতে পথ-কর আদায় করে।" [ফরাসী কুঠীর পত্র, ১১ অক্টোবর, ১৭৩৭]

অক্টোবর মাসে নবাব রাজধানীর বাহিরে আমানিগঞ্জে আসিয়া ছাউনি করিয়া রহিলেন এবং মেদিনীপুর হইতে মারাঠা তাড়াইবার জন্য সমরসজ্জা করিতে লাগিলেন। কিন্তু আবার এক গৃহবিবাদ আবার সেনানেতা ও দেশশাসকদের অন্ধ স্বার্থপরতা, বাংলা দেশের দুঃখ অপমান ও ধনজন-নাশকে যেন চিরস্থায়ী করিয়া রাখিল।

(২১)

পাটনার শাসনকর্ত্তা (নায়েব্-নাজিম্ বা "ছোট নবাব") জৈনউদ্দীন আহমদ খাঁ আলীবর্দ্দীর ভ্রাতুষ্পুত্র ও জামাতা। তিনি পথ চাহিয়া বসিয়া ছিলেন যে, কখন বৃদ্ধ নবাব চোখ বুজিবেন আর সেই সুযোগে তিনি নিজে বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার সিংহাসন দখল করিবেন। এই

কাজের জন্য লোকবল চাই। সুতরাং সদ্যঃপদচ্যুত এবং দ্বারভাঙ্গার গ্রামে প্রত্যাগত সেই যুদ্ধে পরিপক্ক পাঠান-সৈন্যদের নিজের দিকে আনিতে পারিলে তাঁহার খুব দল-পুষ্টি হইবে। তিনি আলীবর্দ্দীকে লিখিলেন যে, এই সব তেজী সৈনিক-ব্যবসায়ী লোক বেশী দিন ঘরে বেকার হইয়া বসিয়া থাকিতে পারিবে না, তাহারা শীঘ্রই পেটের দায়ে ডাকাতি বা বিদ্রোহ আরম্ভ করিয়া দিবে, অতএব দেশের শান্তির জন্য উহাদের বিহারের সরকারী ফৌজে চাকরি দিয়া কাজে লিপ্ত এবং চোখের সামনে সুসংযত করিয়া রাখা উচিত। আলীবর্দ্দী সম্মত হইলেন। জৈনউদ্দীন চাকরি দিবার প্রস্তাব করিয়া উহাদের সঙ্গে চিঠিপত্র চালাইতে লাগিলেন। তাঁহার আহ্বানে ঐ তিন হাজার * পাঠান-সৈনিক শমশের খাঁ, সর্দ্দার খাঁ, মুরাদ শের খাঁ প্রভৃতি নেতার অধীনে দ্বারভাঙ্গা হইতে (১০ ডিসেম্বর) রওনা হইয়া পাটনার অপর পারে হাজী-পুরে আসিয়া দশ বার দিন (১৬-২৫ ডিসেম্বর) বসিয়া রহিল, আর পাটনার ছোট নবাবের সহিত কথাবার্ত্তা পাকা করিতে লাগিল।

সব স্থির হইলে পাঠানেরা আসিয়া চেহেলসতুন অর্থাৎ ৪০ স্তম্ভের ঘর নামক পাটনা শহরের রাজ-প্রাসাদে জৈনউদ্দীন আহমদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিল। তাহাদের নেতাদের পান দিয়া বিদায় দিবার সময় তাহারা নবাবকে হঠাৎ আক্রমণ করিয়া কাটিয়া ফেলিল (১২ জানুয়ারি ১৭৪৮) এবং শহর দখল করিয়া লুঠ, অত্যাচার ও অপমান করিয়া সকলেরই প্রাণান্ত করিয়া দিল। আলীবর্দ্দীর বড় ভাই বৃদ্ধ হাজী আহমদকে কয়েদ করিয়া টাকা আদায়ের জন্য সতের দিন ধরিয়া অশেষ যন্ত্রণা দিয়া প্রাণে মারিল (৩০এ জানুয়ারি)। নবাবের স্ত্রীদের বন্দী করিয়া রাখিল। আহমদ শাহ্ আবদালী কাবুল হইতে দিল্লী আক্রমণ করিতে আসিয়াছেন এই সংবাদ পাইয়া বিহারের এই পাঠানদের সাহস বাড়িয়াছিল। তাহারা ভাবিল আবার বুঝি শের শাহের দিন ফিরিয়াছে, মুঘল-রাজ উঠিয়া গিয়া পাঠান-রাজ আরম্ভ হইয়াছে।

তিন মাস (১২ জানুয়ারি—১৬ এপ্রিল ১৭৪৮) ধরিয়া বিহারে পাঠান রাজত্ব থাকায় ঘোর অত্যাচার ও অরাজকতায় লোককে ভুগিতে হইল। হাজী আহমদের ঘরে ৭০ লক্ষ টাকা এবং অনেক মণিমুক্তা ও অলঙ্কার পাওয়া গেল। জৈনউদ্দীনের নিজ সম্পত্তি এবং রাজকোষের সরকারী রাজস্ব সব পাঠানদের হাতে পড়িল। পাটনা শহরের ব্যাঙ্কার (শর্‌রাফ)দের নিকট হইতে ছয় লক্ষ টাকা আদায় করা হইল। ঐ শহরের ঘরে ঘরে পাঠানেরা জোর করিয়া টাকা অথবা জিনিষ লইতে লাগিল। ফতুয়ার ডাচ্ কুঠী আক্রমণ করিয়া (২০ ফেব্রুয়ারি) সেখান হইতে ৭৫ হাজার টাকার সাদা কাপড় লুঠিয়া আনিল।

(২২)

এই ভীষণ ব্যাপারের সংবাদ পাইয়া আলীবর্দ্দী তাড়াতাড়ি মুর্শীদাবাদ হইতে রওনা হইতে পারিলেন না, কারণ, তখন তাঁহার কাছে সৈন্য নাই, টাকা নাই। বর্গীরা মুর্শীদাবাদের ওপারে বর্দ্ধমান জেলায় জাঁকিয়া বসিয়া আছে, তাহাদের কয়েকটি দল রাজধানীর বাহিরে দূরে দূরে ঘুরিতেছে; নবাব সব সৈন্য লইয়া মুর্শীদাবাদ ছাড়িয়া সুদূর পাটনায় গিয়াছেন, এই সংবাদ পাইলেই তাহারা অমনি অরক্ষিত বঙ্গ-রাজধানীর উপর ছোঁ মারিয়া পড়িবে এবং তাহার চারিদিকের সব দেশ উৎসন্ন করিয়া দিবে। সুতরাং একদিকে বাংলায় বর্গীদের ঠেকাইয়া রাখিতে এবং অপর দিকে প্রবল জয়-উল্লসিত দুর্দ্ধর্ষ পাঠানদের হাত হইতে পাটনা উদ্ধার করিতে হইলে সাধারণ সৈন্য ও অর্থ বলে সফল হওয়া অসম্ভব। এতদিন বাংলার যে-অঞ্চলে বর্গীরা আসিত শুধু সেইখানেই লুঠপাঠ ও খুন হইত। কিন্তু বঙ্গেশ্বরের দুর্ব্বলতা এবং পাটনায় পাঠান-বিদ্রোহের পর এই ঘরোয়া বিপ্লব দেখিয়া দেশময় অরাজকতা ছড়াইয়া পড়িল; এবং যেখানে বর্গী নাই, শুধু নবাবের শাসনাধীন, সেখানেও শান্তি লোপ পাইল, তাঁহার সৈন্যেরাই প্রজাদের লুঠ করিতে লাগিল। "অনেক ছোট ছোট ফৌজ এখানে-ওখানে দেশময় ছড়াইয়া পড়িয়াছে; তাহাদের উপর কোন প্রকার শাসন

* সিয়র, ১৮৯ পৃঃ। কিন্তু ইংরাজ কুঠীর পত্রে আছে বার হাজার; বোধ হয় পাটনা দখলের পর এতগুলি পাঠান আসিয়া জুটে।

নাই। নিত্য লুঠ হইতেছে।" [কাসিমবাজার ইংরেজ কুঠীর পত্র, ৩১ জানুয়ারি ১৭৪৮।] এই সুযোগে মারাঠারা সমস্ত পশ্চিম-বঙ্গ অধিকার করিল, তাহারা মুর্শীদাবাদ হইতে বর্দ্ধমান পর্য্যন্ত নানা জায়গায় থানা বসাইয়া বড় বড় দলে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল।

এদিকে কাসিমবাজারের ইংরেজ বণিকেরা কয়েকখানি নৌকায় মাল বোঝাই করিয়া এন্‌সাইন ইংলিশ নামক সেনানীকে কিছু সৈন্য সহ তাহার রক্ষার ভার দিয়া কলিকাতার দিকে পাঠাইয়াছিলেন। তাহাদের পথেই কাটোয়ায় বর্গীদের প্রধান আড্ডা এবং স্বয়ং জানোজী সেখানে উপস্থিত। এইরূপ অবস্থায় এন্‌সাইনের পলাশীতে অপেক্ষা করা উচিত ছিল, কারণ নবাব এক প্রবল ফৌজ সহিত ফতে আলী খাঁকে কাটোয়ার দিকে পাঠাইতেছিলেন, তাহার আগমনে মারাঠারা নিশ্চয়ই কাটোয়া ছাড়িয়া বীরভূমে সরিয়া পড়িত। কিন্তু এন্‌সাইন ফতে আলীর সঙ্গ ধরিবার জন্য একদিনও পলাশীতে না থামিয়া সোজাসুজি কাটোয়ায় পৌছিল এবং মারাঠাদের বন্ধুত্বের আশ্বাসবাণীর উপর নির্ভর করিয়া গভীর নদীগর্ভ ছাড়িয়া নৌকাগুলি পশ্চিম তীরের নিকট কম জলে লইয়া গিয়া স্থলযুদ্ধে নিপুণ শত্রুর হাতে অসহায় শিকার স্বরূপ হইয়া পড়িল। তাহার পর এন্‌সাইন নিজ সৈন্য ও বজরা ছাড়িয়া মিটমাট করিবার চেষ্টায় একাকী মারাঠা-সর্দ্দারের নিকট গেল। এবং সেই অবসরে মারাঠাগণ নৌকাগুলিতে ঢুকিয়া সব মালপত্র লুঠিয়া লইয়া গেল (১৭ ফেব্রুয়ারি)। ইহাতে কোম্পানীর প্রায় চার লক্ষ টাকা এবং বেসরকারী বণিকদের ৩৫ হাজার টাকা লোকসান হইল। কলিকাতার কাউন্সিল এন্‌সাইন ইংলিশকে কয়েদ করিয়া সব সৈন্যের সামনে প্রকাশ্য অপমানের সহিত বরখাস্ত করিলেন (Broke him at the head of the military.)

ফতে আলীর আগমন মাত্র বর্গীরা সব জিনিষপত্র লইয়া কাটোয়া ছাড়িয়া চলিয়া গেল। তাহাদের প্রধান দলটি বর্দ্ধমান জেলায় রহিল, আর কতকগুলি বর্গী চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়া লুঠ করিতে লাগিল। জানোজী ভাগলপুরের দিকে রওনা হইলেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল যে বিদ্রোহী পাঠানদলের সহিত যোগ দিয়া, বালাজী পেশোয়া যে পশ্চিম দিক হইতে পাটনায় আসিবেন বলিতেছিলেন, তাঁহাকে যুদ্ধ করিয়া ঠেকান।

(২৩)

আলীবর্দ্দী মুর্শীদাবাদ শহরের বাহিরে (আমানিগঞ্জে ?) ছাউনী করিয়া কয়েক সপ্তাহ থাকিয়া সৈন্য জুটাইয়া দেশরক্ষার ভাল বন্দোবস্ত করিয়া [তজ্জন্য ষ্টুয়ার্টের বাংলার ইতিহাস দ্রষ্টব্য], যখন শুনিলেন যে, তাঁহার মিত্র বালাজী রাও সসৈন্যে পাটনায় আসিতেছেন, তখন সাহস পাইয়া সেইদিকে রওনা হইলেন। ২৯এ ফেব্রুয়ারি ছাউনী ছাড়িয়া কুচ আরম্ভ হইল। মুর্শীদাবাদ হইতে বার ক্রোশ দূরে কোমরা* নামক স্থানে গিয়া তাঁহাকে অনেক দিন থামিতে হইল, কারণ তাঁহার সৈন্যগণ আরও বেশী টাকা না পাইলে অগ্রসর হইবে না বলিয়া বসিয়া রহিল। ইতিমধ্যে মারাঠারা নবাবের পশ্চাৎ দিকে বাংলায় প্রবেশ করিল। মীর হবিব কাটোয়ায় আসিল, তাহার অগ্রগামী দল কাটোয়া হইতে পাঁচ ক্রোশ দূরে কাট্‌লিয়াতে (১৪ মার্চ) পৌছিল এবং অপর একদল কলিকাতার নিকট থানা দুর্গ অধিকার করিল।

কিন্তু আলীবর্দ্দী নিজ সৈন্যদের ঠাণ্ডা করিয়া সিকরিগলি (১৭ মার্চ্চ) পার হইয়া পাটনার দিকে দ্রুত অগ্রসর হইলেন। তিনি ভাগলপুরে পৌছিলে মীর হবিব জঙ্গল হইতে বাহির হইয়া চম্পানগরের নালার পারে নবাবী ফৌজের পশ্চাদ্‌ভাগ আক্রমণ করিল, এবং চাকর ও মালবাহকদের কিছু ক্ষতি করিয়া অল্প যুদ্ধের পর পলাইয়া গেল। নবাব চলিতে থাকিলেন। মুঙ্গের পৌছিয়া সৈন্যদের কয়েকদিন বিশ্রাম দিয়া আন্দাজ ১২ই এপ্রিল বাঢ় শহরের নিকট পৌছিলেন। এখান হইতে পাটনা শহর ৩৪ মাইল পশ্চিমে।

ইতিমধ্যে জানোজী ও মীর হবিব অন্য পথে দ্রুত পাটনা আসিয়া পাঠানদের সহিত যোগ দিয়াছিলেন।

* *Comia* [*Beng. Consult.*, 19 Mar. 1748.] সুতী হইতে ৭ মাইল দক্ষিণে *Comrah* গ্রাম, জঙ্গীপুরের এক ক্রোশ পূর্ব্বে [রেনেলের ৯ নং ম্যাপ]।

পাঠানেরা মীর হবিব ও মোহন সিংহ নামক দুইজন বর্গী-নেতাকে সাক্ষাৎ করিবার জন্য ডাকিয়া আনিয়া তাহাদের কয়েদ করিয়া রাখিল এবং পূর্ব্ব-প্রতিশ্রুত বেতন ও বখ্শিশ বাবদ ৩৫ লক্ষ টাকা দাবি করিল। অবশেষে মীর হবিব দুই লাখের জন্য ব্যাঙ্কারের জামিন দিয়া খালাস হইল।

(২৪)

শমশের খাঁ পাটনায় হামিদ খাঁ করাচিয়া (কুরেশী ?)কে নিজের নায়েব অর্থাৎ প্রতিনিধি করিয়া দুই তিন হাজার সৈন্য সহ রাখিয়া, বঙ্গেশ্বরকে ঠেকাইবার জন্য বাঘ-এ-জাফর খাঁ হইতে পূর্ব্বদিকে রওনা হইল। সঙ্গে প্রায় পঞ্চাশ হাজার সৈন্য (সোয়ার ও পদাতিক লইয়া) এবং বার হাজার মারাঠা। বাঢ়ের নিকট কালোডী * নামক গ্রামে মহা-যুদ্ধ হইল (১৬ই এপ্রিল)। এখানে গঙ্গার পুরাতন পরিত্যক্ত খালের মধ্যে একটা চড়া ছিল, দক্ষিণের রাস্তা হইতে একটা ছোট নালা দিয়া পৃথক করা। ইহার উপর পাঠানেরা দাঁড়াইয়া ছিল। আলীবর্দ্দী নিজেই অগ্রসর হইয়া, বর্গীদের দিকে দৃকপাত না করিয়া প্রথমে আফঘানদের আক্রমণ করিলেন। যুদ্ধে তাঁহারই জয় হইল। শমশের খাঁ আহত হইয়া হাতীর পিঠ হইতে পড়িয়া গেল, তাহার মাথা কাটিয়া নবাবকে দেখান হইল। মুরাদ শের খাঁ (জৈনউদ্দীনের হন্তা) এবং আর একজন বড় পাঠান সেনাপতি মারা গেল। সর্দ্দার খাঁ ও বখ্শী বেলী [? Buseey Bailee in *Bengal Consultations* of 26 April] ইহা দেখিয়া পলায়ন করিল। পাঠানদের সমস্ত শিবির ও সম্পত্তি নবাবের হাতে পড়িল। মারাঠারা এতক্ষণ বামপাশে চুপ করিয়া থাকিয়া উভয় পক্ষের মালপত্র লুটিবার সুযোগের অপেক্ষায় যুদ্ধের ফল দেখিতেছিল, তাহারাও পলায়নের পথ ধরিল।

এই যুদ্ধের পর বিজয়ী আলীবর্দ্দী বৈকুণ্ঠপুর হইয়া পাটনায় আসিলেন। সেখানে মৃত ভ্রাতা ও জামাতার পরিবারবর্গকে সান্ত্বনা দিয়া ঐ প্রদেশে পুনরায় শান্তি স্থাপন ও সুশাসনের বন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন। পরাজিত আফঘানদের সব স্ত্রী-পুত্র পাটনায় ছিল। মহাপ্রাণ নবাব তাহাদের উপর কোন প্রকার প্রতিশোধ না লইয়া তাহাদের সসম্মানে নিজ নিজ ধনসম্পত্তি সহিত দেশে পাঠাইয়া দিলেন। মীর হবিবের স্ত্রী-পুত্র এতদিন মুর্শীদাবাদে আটক ছিল, এখন তাহাদেরও মীর হবিবের নিকট যাইবার বন্দোবস্ত করিলেন।

জানোজী পলাইতে পলাইতে পথে মাতার মৃত্যু-সংবাদ পাইয়া নাগপুরে চলিয়া গেলেন। মীর হবিব অল্প সৈন্য লইয়া মেদিনীপুরে আশ্রয় লইল। জানোজী নাগপুর পৌঁছিবার পর সেখান হইতে তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা মানাজী সৈন্যসহ আসিয়া মীর হবিবের বলবৃদ্ধি করিলেন।

ইতিমধ্যে কালোডীর যুদ্ধের এক দিন পূর্ব্বে দিল্লীতে বাদশাহ মুহম্মদ শাহ্ মারা গিয়াছিলেন। তাঁহার সিংহাসনে কে বসে, বাংলার প্রতি নূতন বাদশাহ্ কি নীতি ধরিবেন, উজীরের পদ লইয়া দরবারে ইরাণী ও তুরাণী এই দুই দলের উমরাদের মধ্যে মারামারি কতদূর গড়ায়, কাবুল হইতে আবদালী এই সুযোগে ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন কিনা,—এই সব দেখিবার জন্য আলীবর্দ্দী সমস্ত গ্রীষ্ম বর্ষা ও শরৎকাল * পাটনায় বসিয়া থাকিয়া পশ্চিম দিকে উৎকণ্ঠায় তাকাইয়া কাটাইলেন। পরে শীতকালে বাংলায় ফিরিলেন।

(২৫)

কিন্তু বঙ্গেশ্বরের ভাগ্যে শান্তি নাই, আরাম নাই। উড়িষ্যা হইতে বর্গী দূর করিবার জন্য তাঁহাকে আবার সমর-যাত্রা করিতে হইল। ১৭৪৯ সালের মার্চ মাসের

* *Cullodee* (*Beng. Consult*, 26 Apr. 1748.) বাঢ় হইতে ৭ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে গঙ্গার সেই দক্ষিণ তীরে *Colladerrah* নামক গ্রাম আছে [রেনেলের ১৫ নং ম্যাপ] প্রকৃত নাম বোধ হয় 'কালা দিয়াড়া' হইবে। এখান হইতে বৈকুণ্ঠপুর ১৫ মাইল পশ্চিমে, এবং তথা হইতে ফতুয়া ৪ মাইল পশ্চিমে।

*ফরাসী কুঠীর ১০ সেপ্টেম্বর ১৭৪৮র চিঠিতে জানা যায় যে, তিনি তখনও পাটনায় ছিলেন। অতএব সিয়র ১৭৫ পৃষ্ঠার সংবাদ ভুল।

মাঝামাঝি মুর্শীদাবাদ হইতে কাটোয়া গিয়া সৈন্য জড় করিতে লাগিলেন। ইহার কয়েক মাস পূর্ব্বেই সাত আট হাজার সোয়ার ও বর্কআন্দাজ বর্দ্ধমানে পাঠাইয়া বর্গীদের আসিবার পথে ঘাটী বসাইয়া রাখিয়াছিলেন। তিনি নিজে যখন বর্দ্ধমানে আসিলেন, তখন তাঁহার ছোট কামান (field artillery, movable light artillery)-বিভাগের সৈন্যগণ তাহাদের বাকী বেতনের জন্য গণ্ডগোল বাধাইয়া দিল, বিদ্রোহ করিয়া বসিল। নবাব রাগিয়া তাহাদের সকলকে ছাড়াইয়া দিয়া বিনা তোপে শত্রুর বিরুদ্ধে যাত্রা করিলেন। তাঁহার কয়েকজন সেনাপতিও এই সময় পলায়ন করিল। কিন্তু তিনি তাহাতে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া মেদিনীপুরে অগ্রসর হইলেন। তাঁহার আগমন-সংবাদে মীর হবিব সেখানকার নিজ ছাউনীতে আগুন দিয়া পলাইয়া গেল। নবাব মেদিনীপুর শহরে না ঢুকিয়া বাহির বাহির দিয়া গিয়া কাঁশাই নদী পার হইলেন এবং নিজ সৈন্য হইতে একদল পৃথক করিয়া (detachment) জঙ্গলের মধ্যে পাঠাইয়া দিয়া সেখানে এক মারাঠা-ফৌজকে রাত্রে আক্রমণ করিয়া কটকের দিকে তাড়াইয়া দিলেন। পরে বালেশ্বর ভদ্রক ও যাজপুর পার হইয়া আলীবর্দ্দী বারা নামক স্থানে (কটকের ১৮ ক্রোশ উত্তরে) উপস্থিত হইলেন। এখানে জঙ্গলে খোঁজ করিয়া মীর হবিব বা বর্গীদের কোনো চিহ্ন দেখিতে পাওয়া গেল না। তখন আলীবর্দ্দী অবশিষ্ট সৈন্যদের সেই জঙ্গল হইতে বাহির হইবার পথের মুখ বন্ধ করিয়া পাহারা দিবার জন্য রাখিয়া, নিজে দুই হাজার অশ্বারোহী লইয়া বারা হইতে সন্ধ্যার সময় রওনা হইলেন এবং পরদিন দুপুর বেলা পর্য্যন্ত আঠার ঘণ্টা অনবরত কুচ করিয়া মহানদী পার হইয়া কটকের দুর্গ বারাবাটীর সামনে আসিয়া পৌছিলেন; তিন শত সোয়ার মাত্র তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে আসিতে পারিয়াছিল; পথে তাহাদের অসহ্য গরম, গাছের ছায়া নাই, সঙ্গে তাঁবু নাই, আহার জোটে নাই।

পরদিন বারাবাটী-দুর্গরক্ষকেরা আত্মসমর্পণের প্রস্তাব করিল। কিন্তু তাহাদের পাঁচজন নেতা * ধরা দিতে আসিলে পর আলীবর্দ্দী তাহাদের মাথা কাটিয়া ফেলায়, দুর্গের লোকজন আবার যুদ্ধ আরম্ভ করিয়া দিল। নবাব তখন (১৮ মে ১৭৪৯) কটক শহরে ঢুকিলেন। কয়েক দিন পরে বারাবাটী-দুর্গও তাঁহার হাতে আসিল।

কটক পুনরুদ্ধার হইল বটে, কিন্তু মীরজাফর ও দুর্লভরাম কেহই ঐ প্রদেশের শাসনভার লইতে সম্মত হইল না, কারণ তাহারা জানিত যে, নবাব চলিয়া গেলেই মারাঠারা উড়িষ্যায় ফিরিবে এবং তাহাদের পরাস্ত করার মত লোকবল নায়েব-নাজিমের ছিল না। শেখ আবদুস্ সোভান নামে একজন হতদরিদ্র সামান্য কর্ম্মচারী "ছোট নবাব" হইবার লোভে ঐ পদ গ্রহণ করিল। অগত্যা তাহাকে নায়েব-সুবাদার করিয়া বসাইয়া আলীবর্দ্দী তাড়াতাড়ি বাংলাদেশে ফিরিলেন। পথে তাঁহার ও সৈন্যদের ভীষণ কষ্ট পাইতে হইল। মাথার উপর সূর্য্যতাপ অসহ্য। আর আষাঢ় মাস পড়িয়াছে, বর্ষা আরম্ভ হওয়ায় রাস্তা কাদায় ঢাকা, নদীগুলি খরস্রোতে ছুটিতেছে, নালাগুলি অগাধ জলে ভরা। এই কষ্টের মধ্য দিয়া তিনি ৬ই জুন বালেশ্বরে পৌছিলেন। সেখানে শুনিলেন যে এর মধ্যে মীর হবিব কটকে ফিরিয়া শেখ আবদুস্ সোভানকে পরাস্ত ও আহত করিয়া কটক দখল করিয়াছে। আলীবর্দ্দীর এত পরিশ্রম এক সপ্তাহের মধ্যে পণ্ড হইয়া গেল। এখন কটক পুনরুদ্ধার করা অথবা স্থায়িভাবে দখলে রাখা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব। তিনি ওদিকে না তাকাইয়া দ্রুত মুর্শীদাবাদের দিকে চলিলেন এবং জুলাই মাসের প্রথমে মোতীঝিল প্রাসাদে প্রবেশ করিলেন।

---

*"The Nabab has entered Katak. On his approach Mir Habib with the Marathas fled; five of his head zamindars [এস্থলে আমি মনে করি জামাদার অর্থাৎ সেনানী, হইবে] stayed behind and surrendered themselves to the Nabab, who immediately cut off their heads." [Balasore letter, 21st May, 1749.] কিন্তু সিয়র ১৭৭ পৃষ্ঠায় আছে যে প্রাতে যখন সৈয়দ নূর, ধরমদাস হাজারী এবং সর্আন্দাজ খাঁ নবাবের সঙ্গে দেখা করিয়া আত্মসমর্পণ করিতে আসিল, তাঁহার আজ্ঞায় প্রথম দুই জনকে বন্দী ও তৃতীয় জনকে কাটিয়া ফেলা হইল; একথা ঠিক নহে। নূর ইহার দুই বৎসর আগে যুদ্ধে মরে।

(২৬)

এই ৭৫ বৎসর বয়সের শরীরে আর কত সহে? মুর্শীদাবাদে পৌছিবার পর সেই বৎসর সেপ্টেম্বর মাসে নবাব অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িলেন। অক্টোবরের প্রথমে অগ্রগামী মারাঠা-সৈন্য আসিয়া বালেশ্বর দখল করিয়া বসিল। তাহার কয়েক দিন পরে মীর হবিব, মোহনসিংহ এবং মুর্ত্তাজা খাঁ আসিয়া জোটায় বালেশ্বরে প্রায় ৪০ হাজার ফৌজ একত্র হইল (১৭ অক্টোবর ১৭৪৯)।

তবুও আলীবর্দ্দী স্বয়ং মেদিনীপুরে গেলেন এবং সিরাজউদ্দৌলাকে অগ্রগামী সৈন্যসহ বালেশ্বরে পাঠাইলেন। এই সংবাদে বর্গীরা সেখান হইতে সরিয়া পড়িল, কিন্তু তাহাদের স্থায়ী পরাজয় বা শক্তিনাশ হইল না। সিরাজ ফিরিয়া নারায়ণগড়ে নবাবের দেখা পাইলেন।

এদিকে বঙ্গীয় সেনা-বিভাগে অনেক জুয়াচুরি ও দোষ চলিতেছিল। প্রতি পল্টনে অনেকগুলি সিপাহী না রাখিয়া মিথ্যা হিসাব (dead muster) দিয়া তাহাদের বেতন লওয়া হইত এবং এই টাকা সেনাধ্যক্ষ, জামাদার ও হিসাবের কেরাণীরা বাঁটিয়া খাইত। দেখা গেল যে এক পল্টনে ১৭০০ সিপাহীর বেতন সরকার হইতে দেওয়া হইত, অথচ প্রকৃতই ৮০ জন মাত্র সৈন্য কাজ করিত। নবাব এই জুয়াচুরি বন্ধ করিবার চেষ্টা করায় সেনা-বিভাগে ভীষণ অসন্তোষের সৃষ্টি হইল।

এমন সময় খবর আসিল যে একদল বর্গী জঙ্গলের পথে দ্রুতবেগে মুর্শীদাবাদ লুঠিতে যাইতেছে। অমনি নবাব মেদিনীপুর হইতে বর্দ্ধমানে ফিরিলেন এবং বর্দ্ধমান-রাজার দেওয়ান মাণিকচাঁদের বাগানে বাস করিতে লাগিলেন। তাঁহার তথায় পৌছানর সংবাদ পাইয়া মারাঠারাও মুর্শীদাবাদের পথ ছাড়িয়া দিয়া মেদিনীপুরে গিয়া মাথা খাড়া করিল। নবাব আর কি করেন? তিনি পুনরায় মেদিনীপুরে গেলেন, কিন্তু তাহার পূর্ব্বেই বর্গীরা সে স্থান ছাড়িয়া অদৃশ্য হইয়াছে।

তখন দেশকে রক্ষা করিবার জন্য মেদিনীপুরে বড় স্থায়ী সেনা-নিবাস স্থাপন করিতে সঙ্কল্প করিয়া আলীবর্দ্দী সেখানে অনেক বাড়িঘর,আফিস ও গুদাম তৈয়ারি আরম্ভ করিয়া দিলেন (১৭৫০এর মার্চ্চ মাস)।

কিছুদিন পরে সংবাদ পাইলেন যে, তাঁহার প্রাণের অপেক্ষাও প্রিয় দৌহিত্র এবং নির্ব্বাচিত উত্তরাধিকারী সিরাজউদ্দৌলা তাঁহাকে লঙ্ঘন করিয়া স্বাধীন নবাব হইবার জন্য বিদ্রোহ করিয়াছে এবং পাটনা অধিকার করিতে গিয়াছে। অমনি সেই ভরা বর্ষার মধ্যে আলীবর্দ্দী মেদিনীপুর হইতে পাটনার অভিমুখে রওনা হইলেন, পথে মুর্শীদাবাদে একদিন মাত্র থামিলেন। মীর-জাফর এবং অপর কয়জন সেনানীকে প্রবল ফৌজ সহিত মেদিনীপুরে রাখা হইল বটে, কিন্তু নবাব এখন অতি বৃদ্ধ, আবার তাঁহার অসুখের সংবাদে সকলেই হতাশ হইয়া পড়িল, পরে আরোগ্য সংবাদ আসিলে কেহই তাহা বিশ্বাস করিল না।

এই অবস্থা দেখিয়া বর্গীদের সাহস বাড়িয়া গেল, মীর হবিব আসিয়া মেদিনীপুরে দেখা দিল এবং নবাবী ফৌজকে প্রায় ঘেরাও করিয়া ফেলিল। ইতিমধ্যে আলীবর্দ্দী অসীম স্নেহে সিরাজের বিদ্রোহ মিটাইয়া ফেলিয়াছিলেন। তিনি সেই দুর্ব্বল কাতর শরীর লইয়া আবার মেদিনীপুর গিয়া যুদ্ধে মীর হবিবকে পরাস্ত করিলেন বটে (১৭৫০ ডিসেম্বর হইতে ১৭৫১ ফেব্রুয়ারি), কিন্তু বর্গীরা হটিয়া গেল মাত্র, স্থায়িভাবে সেখান হইতে দূর হইল না, এবং সেই জঙ্গলের মধ্যে তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন করা বৃথা শ্রম ও লোকক্ষয় মাত্র।

(২৭)

ভগ্নহৃদয়, ভগ্নস্বাস্থ্য, মৃত্যুপ্রতীক্ষাকারী, অবসন্ন শূন্য-কোষ বঙ্গেশ্বর কাটোয়ায় ফিরিলেন। এই অক্লান্তকর্ম্মী বীরকে অবশেষে এতদিনে হার মানিতে হইল, তাঁহার জীবনের অবিরাম চেষ্টা যে পণ্ড হইল তাহা স্বীকার করিতে হইল। তিনি পুরুষকারের শেষ আশাও ছাড়িয়া দিলেন।

ভবিষ্যতে বর্গীর হাঙ্গামা হইতে বঙ্গদেশকে বাঁচাইবার একমাত্র উপায় যে রঘুজীকে চৌথ দিতে স্বীকৃত হওয়া এ কথা নবাব এখন বুঝিলেন। সেই প্রস্তাব করিয়া নাগপুরে দূত পাঠাইলেন (মার্চ্চ অথবা এপ্রিলের প্রথম, ১৭৫১) তাহার উত্তরে মারাঠা-পক্ষ হইতে দূত আসিল। কিছুদিন তর্কবিতর্কের পর এই-সব শর্ত্তে সন্ধি হইল :—

(১) মীর হবিব এখন হইতে বাংলার নবাবের চাকরি স্বীকার করিয়া তাঁহার প্রতিনিধি-স্বরূপ উড়িষ্যার নায়েব-নাজিম হইয়া ঐ প্রদেশ শাসন করিবে এবং ঐ প্রদেশের রাজস্ব রঘুজীর সৈন্যদের তন্‌খা (নগদ বেতন) নামে তাহাদের দিবে।

(২) তাহার উপর, বাংলার নবাব প্রতি বৎসর রঘুজীকে বার লক্ষ টাকা চৌথ দিবেন; কিন্তু মারাঠারাও প্রতিজ্ঞা করিবে যে, ভবিষ্যতে কখনও আলীবর্দ্দীর রাজ্যের সীমানার ভিতর এক পাও প্রবেশ করিবে না।

(৩) জালেশ্বরের ধারে সুবর্ণরেখা নদীকে মারাঠা-রাজ্যের উত্তর সীমানা ধার্য্য করা হইল; তাহারা কখনও ইহা লঙ্ঘন করিবে না। মেদিনীপুর জেলা সুবা কটক হইতে পৃথক করিয়া সুবা বাংলার সহিত যুক্ত করিয়া দেওয়া হইল।*

সন্ধি হইল বটে, কিন্তু শীঘ্র বাংলার দুঃখের অবসান হইল না। এই বৎসর (১৭৫১) অত্যন্ত অনাবৃষ্টির ফলে একেবারে চাউল জন্মিল না, দেশময় দুর্ভিক্ষ। চন্দননগরের ফরাসী কুঠীর সাহেবেরা তাঁহাদের জাহাজ বোম্বাই-এর জন্য চাউল সংগ্রহ করিতে মহাকষ্টে পড়িলেন। [*Ibid.* p. 425.]

(২৮)

সন্ধি হইবার এক বৎসর ও দুই তিন মাস পরে জানোজী পিতার প্রতিনিধি হইয়া কটকে পৌঁছিলেন। তখন স্থানীয় মারাঠা ব্রাহ্মণেরা আর মীর হবিবের শাসন বহন করিতে অথবা তাহার আজ্ঞা পালন করিতে অসম্মত হইল, কারণ হবিব এখন আলীবর্দ্দীর প্রতিনিধি, প্রজার মঙ্গল দেখে, মারাঠাদের টাকা দেয়, কিন্তু দেশ শোষণ করিতে দেয় না। তাহারা জানোজীকে বার-বার বলিতে লাগিল যে, মীর হবিবের নিকট গত চৌদ্দ পনের মাসের রাজস্বের হিসাব লওয়া হউক, তাহা হইলে দেখা যাইবে যে, ঐ প্রদেশের রাজস্ব এবং বাংলা হইতে আগত চৌথ বার লাখ টাকা কিরূপে মারাঠা ও আফঘান সেনাদের মধ্যে বাঁটিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং মীর হবিব নিজে কত টাকা খাইয়াছে। জানোজী ষড়যন্ত্র স্থির করিয়া মীর হবিব ও তাহার অনুচরদের নিজের কাছে ডাকিয়া আনিয়া সমস্ত দিন মিষ্ট আলাপ করিয়া তাহাদের ধরিয়া রাখিয়া, সন্ধ্যার সময় পূজা করিবার নামে সেখান হইতে চলিয়া গেলেন। অমনি মারাঠা সেনানীরা সেই তাঁবুর মধ্যে ভিড় করিয়া ঢুকিয়া মীর হবিবকে বলিল যে, যতক্ষণ সে হিসাব না দিবে এবং নিজে যে রাজস্ব খাইয়াছে তাহা ফেরৎ দিবার জন্য খৎ সহি না করিবে, ততক্ষণ তাহাকে তাঁবু হইতে বাহিরে যাইতে দেওয়া হইবে না। হবিব কিছুক্ষণ তর্ক করিল, পরে বুঝিল তাহার প্রাণ সংশয়। তখন মধ্যরাত্রে সে তাহার চল্লিশ পঞ্চাশ জন অনুচর সহিত তলোয়ার খুলিয়া মারাঠাদের কাটিতে কাটিতে বাহির হইবার চেষ্টা করিল, কিন্তু সকলেই হত হইল। সিয়র-রচয়িতা ঘুলাম হুসেন এই স্থলে মন্তব্য করিয়াছেন যে, মীর হবিব অযুত অযুত নিরপরাধী দরিদ্র লোকের যে সর্ব্বনাশের কারণ হইয়াছিল আজ তাহার উপযুক্ত প্রতিফল পাইল! [সিয়র, ১৯০পৃঃ]

মীর হবিবের পর মুসলাহ্-উদ্দীন মুহম্মদ খাঁ উড়িষ্যার নায়েব-নাজিম্ হইল। নামে আলীবর্দ্দীর প্রতিনিধি হইলেও, সে কার্য্যতঃ নিজকে মারাঠা-রাজার চাকর মাত্র বলিয়া গণ্য করিয়া কাজ করিতে লাগিল। উড়িষ্যা সম্পূর্ণরূপে বাংলা হইতে পৃথক এবং পররাষ্ট্র হইয়া গেল। বর্গীর হাঙ্গামার ইহাই স্থায়ী ফল। অপর একটি ফল, বর্গীরা হেষ্টিংসের যুগের সন্ন্যাসী ও ফকির নামক পশ্চিমে ডাকাতদের বাংলা লুটিবার জন্য দৃষ্টান্ত দেখাইয়া ও পথ চিনাইয়া দিয়া গেল।

সমাপ্ত

* সিয়র ১৮৮ পৃষ্ঠায় আছে যে, এই সন্ধি হিজরী ১১৬৫ সালের প্রথমে (=নবেম্বর ১৭৫১ খৃষ্টাব্দে) সহি করা হয়। কিন্তু তাহা ভুল। কারণ সিয়রে উহার পরপৃষ্ঠায় বলা হইতেছে যে, এই সন্ধি করিবার এক বৎসর ও কয়েক মাস পরে জানোজী কটকে আসিয়া মীর হবিবকে খুন করেন। চন্দননগর হইতে মসুলিপটনের ফরাসী কুঠীতে (১১ অক্টোবর ১৭৫২) লিখিত চিঠিতে বলা হইতেছে "মীর হবিব, যে এক বৎসর হইল নবাবের সঙ্গে মিটমাট করিয়াছিল এবং কটক প্রদেশ ও মারাঠাদের শাসন করিতেছিল, গত মাসের ৪ঠা তাহাদের নেতা জানোজীর দ্বারা খুন হইয়াছে।" [*Correspondance du Conseil de Chandernagor*, ii. 435] সুতরাং এই সন্ধি যে ১৭৫১ সালের মে মাসের মধ্যে দুই পক্ষ সহি করেন ইহাই সত্য তারিখ বলিয়া মানিতে হয়। 4th September, New Style (of France) = 24 August, Old Style (of England.)

অপরাজিত

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

২৭

সারাদিনের পরিশ্রমের পর সে বাংলোয় ফিরিয়া পাতকুয়ার ঠাণ্ডা জলে স্নান করিয়া এক প্রকার বন্য লেবুর রস মিশানো চিনির সরবত খায়—গরমের দিনে শরীর যেন জুড়াইয়া যায়—তার পরেই রামচরিত মিশ্র আসিয়া রাত্রের খাবার দিয়া যায়—আটার রুটী, কুম্ড়া বা ঢ্যাঁড়সের তরকারী ও অড়হরের ডাল। বারো তেরো মাইল দূরের এক বস্তী হইতে জিনিষপত্র সপ্তাহ অন্তর কুলীরা লইয়া আসে—মাছ একেবারেই মেলে না, মাঝে মাঝে অপু পাখী শিকার করিয়া আনে। একদিন সে বনের মধ্যে এক হরিণকে বন্দুকের পাল্লার মধ্যে পাইয়া অবাক হইয়া গেল—বড়শিঙ্গা কিংবা সম্বর হরিণ ভারী সতর্ক, মানুষের গন্ধ পাইলে তার ত্রিসীমানায় থাকে না—কিন্তু তাহার ঘোড়ার বারো গজের মধ্যে এ হরিণটা আসিল কিরূপে? খুসী ও আগ্রহের সহিত বন্দুক উঠাইয়া লক্ষ্য করিতে গিয়া সে দেখিল লতাপাতার আড়াল হইতে শুধু মুখটি বাহির করিয়া হরিণটিও অবাক চোখে তাহার দিকে চাহিয়া আছে—ঘোড়ায়-চড়া মানুষ দেখিয়া ভাবিতেছে হয়ত এ আবার কোন জীব!...হঠাৎ অপুর বুকের মধ্যেটা ছাঁৎ করিয়া উঠিল—হরিণের চোখ দুটি যেন তাহার খোকার চোখের মত!—অমন ডাগর ডাগর অমনি অবোধ নিষ্পাপ। সে উদ্যত বন্দুক নামাইয়া তখনি টোটাগুলি খুলিয়া লইল। এখানে যতদিন ছিল, আর কখনও হরিণ শিকারের চেষ্টা করে নাই।

খাওয়া দাওয়া শেষ হয় সন্ধ্যার পরেই, তার পরে সে নিজের খড়ের বাংলোর কম্পাউণ্ডে চেয়ার পাতিয়া বসে।...অপূর্ব্ব নিস্তব্ধতা। অস্পষ্ট জ্যোৎস্না ও আঁধারে পিছনকার পাহাড়ের গম্ভীর দর্শন অনাবৃত গ্রানাইট প্রাচীরটা কি অদ্ভুত দেখায়! শালকুসুমের সুবাস ভরা অন্ধকার, মাথার উপরকার আকাশে অগণিত নৈশ নক্ষত্র। এখানে অন্য কোনো সাথী নাই, তাহার মন ও চিন্তার উপর অন্য কাহারও দাবী দাওয়া নাই, উত্তেজনা নাই, উৎকণ্ঠা নাই,—আছে শুধু সে, আর এই বিশাল আরণ্য প্রকৃতির কর্কশ, বন্ধুর, বিরাট সৌন্দর্য্য—আর আছে এই নক্ষত্রভরা নৈশ আকাশটা।

বাল্যকাল হইতেই সে আকাশ ও গ্রহ-নক্ষত্রের প্রতি আকৃষ্ট। কিন্তু এখানে তাদের এ কি রূপ! কুলীরা সকাল সকাল খাওয়া সারিয়া ঘুমাইয়া পড়ে—রামচরিত মিশ্র মাঝে মাঝে অপুকে সাবধান করিয়া দেয়; তাম্বুকা বাহার মৎ বৈঠিয়ে বাবুজী—শেরকা বড় ডর হ্যায়—পরে সে কাঠকুটা জ্বালিয়া প্রকাণ্ড অগ্নিকুণ্ড করিয়া গ্রীষ্মের রাত্রেও বসিয়া আগুন পোহায়—অবশেষে সেও যাইয়া শুইয়া পড়ে, তাহার অগ্নিকুণ্ড নিবিয়া যায়—শুব্ধ রাত্রি, আকাশ অন্ধকার...পৃথিবী অন্ধকার, আকাশে বাতাসে অদ্ভুত নীরবতা, আবলুসের ডালপাতার ফাঁকে দু একটা তারা যেন অসীম রহস্যভরা মহাব্যোমের বুকের স্পন্দনের মত দিপ্ দিপ্ করে, বৃহস্পতি স্পষ্টতর হয়, উত্তর-পূর্ব্ব কোণের পর্ব্বত-সানুর বনের উপরের কালপুরুষ ওঠে, এখানে ওখানে অন্ধকারের বুকে আগুনের আঁচড় কাটিয়া উল্কাপিণ্ড খসিয়া পড়ে।

দুই ঘণ্টা বসিবার পরে নক্ষত্রগুলা কি অদ্ভুত ভাবে স্থান পরিবর্ত্তন করে!...আবলুস ডালের ফাঁকের তারাগুলা ক্রমশঃ নীচে নামে, কালপুরুষ ক্রমে পর্ব্বতসানুর দিক হইতে মাথার উপরকার আকাশে সরিয়া আসে, বিশাল-কায় ছায়াপথটা টের্চ্চা হইয়া ঘুরিয়া যায়, বৃহস্পতি পশ্চিম আকাশে ঢলিয়া পড়ে—রাত্রির পর রাত্রি এই গতির অপূর্ব্ব লীলা দেখিতে দেখিতে এই শান্ত, সনাতন জগৎটা যে কি ভয়ানক রুদ্রগতিবেগ প্রচ্ছন্ন রা।খয়াছে তাহার স্নিগ্ধতা ও সনাতনত্বের আড়ালে, সে সম্বন্ধে অপুর মন সচেতন হইয়া

উঠিল—অদ্ভুত ভাবে সচেতন হইয়া উঠিল!···সে মুগ্ধ হইয়া যায় পুলকিত হইয়া ওঠে। জীবনে কখনও তাহার এত ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয় নাই বিশাল নক্ষত্র জগৎটার সঙ্গে, এ-ভাবে হইবার আশাও কখনও ছিল না।

অপুর বাংলোঘরের পিছনে ও দক্ষিণে পাহাড়, পিছনকার পাহাড়তলী আধমাইলেরও কম, দক্ষিণের পাহাড় মাইল দুই দূরে। সাম্‌নের বহুদূর বিস্তৃত উঁচুনীচু জমিটা শাল ও পপ্‌রেল চারা ও একপ্রকার অর্দ্ধশুষ্ক তৃণে ভরা—অনেক দূর পর্য্যন্ত খোলা। সারা পশ্চিমদিকচক্রবাল জুড়িয়া বহুদূরে, বিন্ধ্যপর্ব্বতের নীল অস্পষ্ট সীমারেখা, ছিন্দ্‌ওয়ারা ও মহাদেও শৈলশ্রেণী—পশ্চিমা বাতাসের ধূলা-বালি যেদিন আকাশকে আবৃত না করে সেদিন বড় সুন্দর দেখায়। মাইল এগারো দূরে নর্ম্মদা বিজন বনপ্রান্তরের মধ্য দিয়া বাহিয়া চলিয়াছে, খুব সকালে ঘোড়ায় উঠিয়া স্নান করিতে গেলে বেলা নয়টার মধ্যে ফিরিয়া আসা যায়।

পিছনের পর্ব্বতসানুর ঘন বন নিবিড়, জনমানবহীন, রুক্ষ ও গম্ভীর। দিনের শেষে পশ্চিম গগন হইতে অস্ত সূর্য্যের আলো পড়িয়া পিছনের পাহাড়ের যে অংশটা খাড়া ও অনাবৃত, তার গ্রানাইট্ দেওয়ালটা প্রথমে হয় হল্‌দে, পরে হয় মেটে সিঁদুরের রং, পরে জরদা রংএর হইতে হইতে হঠাৎ ধূসর ও তারপরেই কালো হইয়া যায়, ওদিকে দিগন্তলক্ষ্মীর ললাটে আলোর টিপের মত সন্ধ্যাতারা ফুটিয়া ওঠে, অরণ্যানী ঘন অন্ধকারে ভরিয়া যায়, শাল ও পাহাড়ী বাঁশের ডালপালায় বাতাস লাগিয়া একপ্রকার শব্দ হয়, রামচরিত ও জহুরী সিং নেকড়ে বাঘের ভয়ে আগুন জ্বালে চারিধারে, শিয়াল ডাকিতে সুরু করে, বন মোরগ ডাকে, অন্ধকার আকাশে দেখিতে দেখিতে গ্রহ, তারা, জ্যোতিষ্ক, ছায়াপথ একে একে দেখা দেয়, গভীর রাত্রে কৃষ্ণপক্ষের ভাঙা চাঁদ পাহাড়ের পিছন হইতে ধীরে ধীরে উঠিতে থাকে, এ যেন সত্যই গল্পের বইয়ে পড়া জীবন।

এক এক দিন সে বৈকালে ঘোড়ায় করিয়া বেড়াইতে যায়। শুধুই উঁচু-নীচু অর্দ্ধশুষ্ক তৃণভূমি ছোট বড় শিলাখণ্ড ছড়ানো মাঝে মাঝে শাল ও বাদাম গাছ। আর এক জাতীয় বড় বন্য গাছের কি অপূর্ব্ব আঁকাবাঁকা ডাল পালা, চৈত্রের রৌদ্রে পাতা ঝরিয়া গিয়াছে, নীল আকাশের পটভূমিতে পত্রশূন্য ডালপালা যেন ছবির মত দেখা যায়। অপুর তাঁবু হইতে মাইল তিনেক দূরে একটা ছোট পাহাড়ী নদী আঁকিয়া বাঁকিয়া গিয়াছে, অপু তাহার নাম রাখিয়াছে বক্রতোয়া। গ্রীষ্মকালে জল আদৌ থাকে না, তাহারই ধারে একটা শাল ঝাড়ের নীচে একখানা বড় পাহাড়ের উপর সে এক একদিন গিয়া বসে, ঘোড়াটা গাছের ডালে বাঁধিয়া রাখে—স্থানটা ঠিক ছবির মত।

স্বর্ণাভ বালুর উপর অন্তর্হিত বন্যনদীর উপল ঢাকা চরণ-চিহ্ন—হাত কয়েক মাত্র প্রশস্ত নদীখাত, উভয় তীরই পাষাণময়, ওপারে কঠিন ও দানাদার কোয়ার্ট্‌জাইট্ ও ফিকে হল্‌দে রংএর বড় বড় পাথরের চাঁইএ ভরা, অপু ভাবে, অতীত কোন্ হিম-যুগের তুষার নদীর শেষ প্রবাহে ভাসিয়া আসিয়া এখানে হয়ত আটকাইয়া গিয়াছে, সোনালী রংএর নদী-বালু হয়ত স্বর্ণরেণু মিশানো, অস্তসূর্য্যের রাঙা আলোয় অত চক্ চক্ করে কেন নতুবা? নিকটে সুগন্ধ লতা কস্তুরীর জঙ্গল, খর বৈশাখী রৌদ্রে শুষ্ক খুঁটিগুলা ফাটিয়া মৃগনাভির গন্ধে অপরাহ্নের বাতাস ভারাক্রান্ত করিয়া তুলিয়াছে··· এত দূরবিসর্পিত দিগ্‌বলয় কখনও সে দেখে নাই, এত নির্জ্জনতার কখনও ধারণা ছিল না তাহার—বহুদূরে পশ্চিম আকাশের অনতিস্পষ্ট সুদীর্ঘ নীল শৈলরেখার উপরকার আকাশটাতে সে কি অপরূপ বর্ণসমুদ্র! না দেখিলে কখনও সে ভাবিতে পারিত না যে, পৃথিবীতে এত সুন্দর স্থান আছে···

কি অপূর্ব্ব দৃশ্য চোখের সম্মুখে যে খুলিয়া যায়! এমন সে কখনও দেখে নাই—জীবনে কখনও দেখে নাই।

এ বিপুল আনন্দ তার প্রাণে কোথা হইতে আসে!

এই সন্ধ্যা, এই শ্যামলতা, এই মুক্ত প্রসারের দর্শনে যে অমৃত মাখানো আছে, সে মুখে তা কাহাকে বলিবে?···কে তাহার এ চোখ ফুটাইল, কে সাঁঝ সকালের, সূর্য্যাস্তের, নীল বনানীর শ্যামলতার মায়া-কাজল তাহার চোখে মাখাইয়া দিল?

দূর বিসর্পিত চক্রবালরেখা দিগন্তের যতটুকু ঘেরিয়াছে, তারই কোনো কোনো অংশে, বহুদূরে, নেমির শ্যামলতা অনতিস্পষ্ট সান্ধ্য-দিগন্তে নিলীন, কোনো কোনো অংশে ধোঁয়া ধোঁয়া দেখা-যাওয়া বনরেখায় পরিস্ফুট, কোনো দিকে শাদা শাদা বকের দল আকাশের নীলপটে ডানা মেলিয়া দূর হইতে দূরে চলিয়াছে…মন কোথাও বাধে না, অবাধ, উদার দৃষ্টি, পরিচয়ের গণ্ডী পার যাইয়া অদৃশ্য অজানার উদ্দেশে ভাসিয়া চল…

একদিন অমরকণ্টক দেখিতে যাইবার জন্য অপু মিঃ রায়-চৌধুরীর নিকট ছুটি চাহিল।

মনটা ইহার আগে অত্যন্ত উতলা হইয়াছিল, কেন যে এত উতলা হইল, কারণটা কিছুতেই ভাল ধরিতে পারিল না। হইতেই অমরকণ্টক যাইবার ইচ্ছা ছিল, ভাবিল এই সময় একবার ঘুরিয়া আসিবে।

মিঃ রায়-চৌধুরী শুনিয়া বলিলেন—যাবেন কিসে? পথ কিন্তু অত্যন্ত খারাপ, এখান থেকে প্রায় আশী মাইল দূর হবে, এর মধ্যে ষাট মাইল ডেন্স ভার্জিন ফরেষ্ট্—বাঘ, ভালুক, নেক্ড়ের দল সব আছে। বিনা বন্দুকে যাবেন না, ঘোড়া সহিস নিয়ে যান—রাত হবার আগে আশ্রয় নেবেন কোথাও - সেণ্ট্রাল ইণ্ডিয়ার বাঘ, রসগোল্লাটির মত লুফে নেবে নইলে। ঐ জন্যে কতদিন আপনাকে বারণ করেছি এখানেও সন্ধ্যের পর তাঁবুর বাইরে বসবেন না—বা অন্ধকারে বনের পথে একা ঘোড়া চালাবেন না—তা আপনি বড্ড রেক্‌লেস।

তখন সে উৎসাহে পড়িয়া বিনা ঘোড়াতেই বাহির হইল বটে, কিন্তু দ্বিতীয় দিন সন্ধ্যার সময় সে নিজের ভুল বুঝিতে পারিল—ধারাল পাথরের নুড়িতে জুতার তলা কাটিয়া চিরিয়া গেল, অতদূর পথ হাঁটিবার অভ্যাস নাই, পায়ে এক বিরাট ফোস্কা উঠিয়াছে। পিছনে রামচরিত বোঁচকা লইয়া আসিতেছিল, সে সমানে পথ হাঁটিয়া চলিয়াছে, মুখে কথাটি নাই। বহু দূরের একটা পাহাড় দেখাইয়া বলিল, ওর পাশ দিয়া পথ। পাহাড়টা ধোঁয়া ধোঁয়া দেখা যায়, বোঝা যায় না মেঘ না পাহাড়—এত দূরে। অপু ভাবিল পায়ে হাঁটিয়া অতদূর সে যাইবে ক'দিনে?

এ ধরণের ভীষণ আরণ্যভূমি অপুর মনে হইল এ-অঞ্চলে এতদিন আসিয়াও সে দেখে নাই সে যেখানে থাকে, সেখানকার বন ইহার তুলনায় শিশু, নিতান্ত অবোধ শিশু। দুপুরের পর যে বন সুরু হইয়াছে তাহা এখনও শেষ হয় নাই, অথচ সন্ধ্যা হইয়া আসিল!

অন্ধকার নামিবার আগে একটা উঁচু পাহাড়ের উপরকার চড়াই পথে উঠিতে হইল—উঠিয়াই দেখা গেল—সর্ব্বনাশ, সাম্‌নে আবার ঠিক এমনি আর একটা পাহাড়। অপুর পায়ের ব্যথাটা খুব বাড়িয়াছিল, তৃষ্ণাও পাইয়াছিল বেজায়—অনেকক্ষণ হইতে জলের সন্ধান মেলে নাই, আবলুস গাছের তলা বিছাইয়া অম্লমধুর কেঁদফল পড়িয়াছিল—সারা দুপুর তাহাই চুষিতে চুষিতে কাটিয়াছিল—কিন্তু জল অভাবে আর চলে না। দূরে দূরে, উত্তরে ও পশ্চিমে নীল পর্ব্বতমালা নিম্নের উপত্যকার ঘন বনানী সন্ধ্যার ছায়ায় ধূসর হইয়া আসিতেছে, সরু পথটা বনের মধ্যে দিয়া আঁকিয়া-বাঁকিয়া নামিয়া গিয়াছে।

সৌভাগ্যের বিষয়, সম্মুখের পাহাড়টার ওপারে এক মাইলের মধ্যে বন-বিভাগের একটা ডাকবাংলো পাওয়া গেল। চারিধারে নিবিড় শাল বন, মধ্যে ছোট্ট খড়ের ঘর। খাল ও বন-বিভাগের লোকেরা মাঝে মাঝে রাত্রি কাটায়।

এ রাত্রির অভিজ্ঞতা ভারী অদ্ভুত ও বিচিত্র। বাংলোতে অপুরা একটি প্রৌঢ় লোককে পাইল, সে ইহারই মধ্যে ঘরে খিল দিয়া বসিয়া কি পড়িতেছিল, ডাকাডাকিতে উঠিয়া দরজা খুলিয়া দিল। জিজ্ঞাসা করিয়া জানা গেল, লোকটা মৈথিল ব্রাহ্মণ, নাম আজবলাল ঝা। বয়স ষাট বা সত্তর হইবে। সে সেই রাত্রে নিজের ভাণ্ডার হইতে আটা ও ঘৃত বাহির করিয়া আনিয়া অপুর নিষেধ সত্ত্বেও উৎকৃষ্ট পুরী ভাজিয়া আনিল—পরে অতিথি-সৎকার সারিয়া সে ঘরের মধ্যে বসিয়া সুস্বরে সংস্কৃত রামায়ণ পড়িতে আরম্ভ করিল। কিছু পরেই অপু বুঝিল লোকটা সংস্কৃত ভাল জানে—নানা কাব্য উত্তমরূপে পড়িয়াছে। নানা স্থান হইতে শ্লোক মুখস্থ বলিতে লাগিল—কাব্য-

চর্চ্চায় অসাধারণ উৎসাহ, পাশাপাশি তুলসীদাসী রামায়ণ ও প্রেমসাগর হইতে অনর্গল দোঁহা আবৃত্তি করিয়া যাইতে লাগিল।

ক্রমে ওঝাজী নিজের কাহিনী বলিল। দেশ ছিল দ্বারভাঙা জেলায়। সেখানেই শৈশব কাটে, তের বৎসর বয়সে উপনয়নের পরে এক বেনিয়ার কাছে চাকুরি লইয়া কাশী আসে। পড়াশুনা সেখানেই—তার পরে কয়েক জায়গায় টোল খুলিয়া ছাত্র পড়াইবার চেষ্টা করিয়াছিল—কোথাও সুবিধা হয় না। পেটের ভাত জুটে না, নানা স্থানে বৃথা ঘুরিবার পরে এই ডাকবাংলোয় আজ সাত আট বছর বনবাস করিতেছে। লোকজন বড় এখানে কেহ আসে না, কালেভদ্রে এক আধ জন, সে-ই একা থাকে, মাঝে মাঝে তের মাইল দূরের বস্তি হইতে খাবার জিনিষ ভিক্ষা করিয়া আনে, বেশ চলিয়া যায়। সে আছে আর আছে তাহার সব কাব্যগ্রন্থগুলি—তার মধ্যে দুখানা হাতের লেখা পুঁথি, মেঘদূত ও কয়েক সর্গ ভট্টি।

অপুর এত সুন্দর লাগিল এই নিরীহ, অদ্ভুত প্রকৃতির লোকটির কথাবার্ত্তা ও তাহার আগ্রহ-ভরা কাব্যপ্রীতি—এই নির্জ্জন বনবাসেও একটা শান্ত সন্তোষ। তবে লোকটি যেন একটু বেশী বকে, বিদ্যাটা যেন বেশী জাহির করিতে চায়—কিন্তু এত সরলভাবে করে যে, দোষ ধরাও যায় না। অপু বলিল—পণ্ডিতজী, আপনাকে এখানে থাক্‌তে দেয় কেউ কিছু বলে না?

—না বাবুজী, নাগেশ্বর প্রসাদ ব'লে একজন এঞ্জিনীয়ার আছেন, তিনি আমাকে খুব মানেন, সেই জন্যে কেউ কিছু বলে না।

কথায় কথায় সে বলিল—আচ্ছা পণ্ডিতজী, এ বন কি অমরকণ্টক পর্য্যন্ত এমনি ঘন?

—বাবুজী এই হচ্চে প্রসিদ্ধ বিন্ধ্যারণ্য। অমরকণ্টক ছাড়িয়ে বহুদূর পর্য্যন্ত বন, এমনি ঘন—চিত্রকূট ও দণ্ডকারণ্য এই বনের পশ্চিমদিকে। এর বর্ণনা শুনুন তবে নৈষধচরিতে—দময়ন্তী রাজ্যভ্রষ্ট নলের সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হবার পরে এই বনে পথ হারিয়ে ঘুরছিলেন—ঋক্ষবান্ পর্ব্বতের পাশের পথ দিয়ে তিনি বিদর্ভ দেশে যান। রামায়ণেও এই বনের বর্ণনা শুনবেন আরণ্য কাণ্ডে? শুনুন্ তবে।

অপু ভাবিল, লোকটা বর্ত্তমানের কোনো ধার ধারে না, প্রাচীন শিক্ষা-দীক্ষায় একেবারে ডুবিয়া আছে—সব কথায় পুরাণের কথা আনিয়া ফেলে। লোকটিকে ভারী অদ্ভুত লাগিতেছিল—সারাজীবন এখানে-ওখানে ঘুরিয়া কিছুই করিতে পারে নাই—এই বনবাসে নিজের প্রিয় পুঁথিগুলা লইয়া বৎসরের পর বৎসর কাটাইয়া চলিয়াছে, কোনো দুঃখ নাই, কষ্ট নাই। এ ধরণের লোকের দেখা মেলে না বেশী।

ওঝাজী সুস্বরে রামায়ণের বনবর্ণনা পড়িতেছিল। কি অদ্ভুতভাবে যে চারিপাশের দৃশ্যের সঙ্গে খাপ খায়! নির্জ্জন শালবনে অস্পষ্ট জ্যোৎস্না উঠিয়াছে, কেন্দু ও চিরঞ্জী গাছের পাতাগুলা এক এক জায়গায় ঘন কালো দেখাইতেছে ও বনের মধ্যে শিয়ালের দল ডাকিয়া উঠিয়া প্রহর ঘোষণা করিল।

কোথায় রেল, মোটর, এরোপ্লেন, ট্রেড্-ইউনিয়ন? ওঝাজীর মুখে আরণ্য কাণ্ডের শ্লোক শুনিতে শুনিতে সে যেন অনেক দূরের এক সুপ্রাচীন জাতির অতীত সভ্যতা ও সংস্কৃতির মধ্যে গিয়া পড়িল একেবারে। অতীতের গিরিতরঙ্গিণী তীরবর্ত্তী তপোবন, হোম-ধূমপবিত্র গোধূলির আকাশতলে বিস্তৃত অগ্নিশালা, শ্রুগ্‌ভাণ্ড, অজিন, কুশ, সমিধ, জলকলস, চীর ও কৃষ্ণাজিন পরিহিত সজপা মুনিগণের বেদপাঠধ্বনি—শান্ত গিরিসানু ...বনজ কুসুমের সুগন্ধ...গোদাবরীতটে পুন্নাগ নাগকেশরের বনে পুষ্প আহরণরতা সুমুখী আশ্রমবালা-গণ...কৃশাঙ্গী রাজবধূগণ...ক্ষীণজ্যোৎস্নায় নদীজল আলো হইয়া উঠিয়াছে, তীরে স্থলবেতসের বনে ময়ূর ডাকিতেছে।

সে যেন স্পষ্ট দেখিল এই নিবিড় অজানা অরণ্যানীর মধ্য দিয়া নির্ভীক, কবাটবক্ষ প্রাচীন রাজপুত্রগণ সকল বিপদকে অতিক্রম করিয়া চলিয়াছেন। দূরে নীল মেঘের মত পরিদৃশ্যমান ময়ূর-নিনাদিত ঘন বন, দুর্গম পথের নানা স্থানে রাক্ষসে পূর্ণ কন্দ, প্রস্থ, গুহা, গহ্বর—অজানা ও মৃত্যুসঙ্কুল—চারিধারে পর্ব্বতরাজির ধাতুরঞ্জিত শৃঙ্গ সকল

আকাশে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া আছে·· কুন্দগুল্ম,সিন্দুবার, শিরীষ, অর্জ্জুন, শাল, নীপ, বেতস, তিনিশ ও তমাল তরুতে শ্যামায়মান গিরিসানু···শরদ্বারা বিদ্ধ রুরু ও পৃষত মৃগ আগুনে ঝল্‌সাইয়া খাওয়া···বিশাল ইঙ্গুদী তরুমূলে সতর্ক রাত্রি যাপন।

পরবর্ত্তী যুগের সাম্রাজ্যলোভীদের রক্তলোলুপতাও যেন স্পষ্ট হইয়া উঠিল—কুতুবশাহী, আদিলশাহী ও নিজামশাহী সুলতানদের অত্যাচার···মোগল সেনাপতি নজর মহম্মদ খাঁ ও তাঁর বক্সারী গোলন্দাজ সৈন্য··· দেওগড় ও গোয়ালিগড়ের গিরিদুর্গের সে শোচনীয় শ্মশানদৃশ্য।

ওঝাজী উৎসাহ পাইয়া অপুকে একটা পুঁটুলি খুলিয়া একরাশ সংস্কৃত কবিতা দেখাইলেন, গর্ব্বের সহিত বলিলেন, বাবুজী, ছেলেবেলা থেকেই সংস্কৃত কবিতায় আমার হাত আছে, একবার কাশী-নরেশের সভায় আমার গুরুদেব ঈশ্বরশরণ আমায় নিয়ে যান। একজোড়া দোশালা বিদায় পেয়েছিলাম, এখনও আছে। ত্রিশ পঁয়ত্রিশ বছর আগেকার কথা। তারপর তিনি অনেকগুলি কবিতা শুনাইলেন, বিভিন্ন ছন্দের সৌন্দর্য্য ও তাহাতে তাঁর রচিত শ্লোকের কৃতিত্ব সরল উৎসাহে বর্ণনা করিলেন। এই ত্রিশ বৎসর ধরিয়া ওঝাজী বহু কবিতা লিখিয়াছেন ও এখনও লেখেন, সবগুলি সযত্নে সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াও দিয়াছেন, একটিও নষ্ট হইতে দেন নাই, তাহাও জানাইলেন।

একটি অদ্ভুত ধরণের দুঃখ ও বিষাদ অপুর হৃদয় অধিকার করিল। কত কথা মনে আসিল, তাহার বাবা এই রকম গান ও পাঁচালী লিখিত তাহার ছেলেবেলায়। কোথায় গেল সে সব? যুগ যে বদল হইয়া যাইতেছে, ইহারা তাহা ধরিতে পারে না। ওঝাজীর এত আগ্রহের সহিত লেখা কবিতা কে পড়িবে? কে আজকাল ইহার আদর করিবে? কোন্ আশা ইহাতে পূরিবে ওঝাজীর? অথচ কত ঐকান্তিক আগ্রহ ও আনন্দ ইহাদের পিছনে আছে। চাঁপদানীর পোষ্টাপিসে কুড়াইয়া পাওয়া সেই ছোট মেয়েটির নাম ঠিকানা ভুল পত্রখানার মতই তাহা ব্যর্থ ও নিরর্থক হইয়া যাইবে! কেন এমন হয়?

সকালে উঠিয়া সে ওঝাজীকে একখানা দশ টাকার নোট দিয়া প্রণাম করিল। নিজের একখানা ভাল বাঁধানো খাতা লিখিবার জন্য দিল—কাছে আর টাকা বেশী ছিল না, থাকিলে হয়ত আরও দিত। তার একটা দুর্ব্বলতা এই যে, যে একবার তাহার হৃদয় স্পর্শ করিতে পারিয়াছে তাহাকে দিবার বেলায় সে মুক্তহস্ত, নিজের সুবিধা অসুবিধা তখন সে দেখে না।

ডাকবাংলো হইতে মাইল খানেক পরে পথ ক্রমে উপরের দিকে উঠিতে লাগিল, ক্রমে আরও উপরে উচ্চ মালভূমির উপর দিয়া পথ—শাল, বাঁশ, খয়ের ও আবলুসের ঘন অরণ্য—ডাইনে বামে উঁচুনীচু ছোট বড় পাহাড় ও টিলা—শালপুষ্পসু রভি সকালের হাওয়া যেন মনের আয়ু বাড়াইয়া দেয়। চতুর্থ দিন বৈকালে অমরকণ্টক হইতে কিছুদূরে অপরূপ সৌন্দর্য্যভূমির সঙ্গে পরিচয় হইল— দুই দিকের পাহাড়ের মধ্যে সিকিমাইল চওড়া উপত্যকা, দুধারের সানুদেশের বন অজস্র ফুলে ভরা,—বন্য শেফালি বন, পলাশের গাছ যেন জ্বলিতেছে। হাত দুই উঁচু পাথরের পাড়, মধ্যে গৈরিক বালু ও উপল শয্যায় শিশু শোণ নির্ম্মল জলের ধারা হাসিয়া খুসিয়া বিলাইতে বিলাইতে ছুটিয়া চলিয়াছে—একটা ময়ূর শিলাখণ্ডের আড়াল হইতে নিকটের গাছের ডালে উঠিয়া বসিল। অপুর পা আর নড়িতে চায় না—তার মুগ্ধ ও বিস্মিত চোখের সম্মুখে শৈশব কল্পনায় স্বর্গকে কে আবার এ ভাবে বাস্তবে পরিণত করিয়া খুলিয়া বিছাইয়া দিল!

অপুর মনে হইল সত্য, সত্য সত্য—এই শান্ত নির্জ্জন আরণ্য ভূমিতে বনের ডালপালার আলোছায়ার মধ্যে পুষ্পিত কোবিদারের সুগন্ধে দিনের পর দিন ধরিয়া একটি নব জগতের জন্ম হয়—ঐ দূর ছায়াপথের মত তা দূরবিসর্পিত,.এটুকু শেষ নয়, এখানে আরম্ভও নয়—তাকে ধরা যায় না অথচ এই সব নীরব জীবনমুহূর্ত্তে অনন্ত দিগন্তের দিকে বিস্তৃত তার রহস্যময় প্রসার মনে মনে বেশ অনুভব করা যায়। এই এক বৎসরের মধ্যে মাঝে মাঝে সে তাহা অনুভব করিয়াছেও—এই অদৃশ্য জগৎটার মোহস্পর্শ মাঝে মাঝে বৈশাখী শালমঞ্জরীর উন্মাদ সুবাসে সন্ধ্যাধূসর অনতিস্পষ্ট গিরিমালার সীমারেখায়, নেকড়ে

বাঘের ডাকেভরা জ্যোৎস্নাস্নাত শুভ্র জনহীন আরণ্যভূমির গাম্ভীর্য্যে অগণিত তারাখচিত নিঃসীম শূন্যের ছবিতে বৈকালে ঘোড়াটি বাঁধিয়া যখনই বক্রতোয়ার ধারে বসিয়াছে, যখনই অপর্ণার মুখ মনে পড়িয়াছে, কতকাল ভুলিয়া যাওয়া দিদির মুখখানা মনে পড়িয়াছে, একদিন শৈশব-মধ্যাহ্নে মায়ের মুখে শোনা মহাভারতের দিনগুলার কথা মনে পড়িয়াছে, তখনই সঙ্গে সঙ্গে তার ইহাও মনে হইয়াছে যে, যে-জীবন যে-জগতকে আমরা প্রতিদিনের কাজকর্ম্মে হাটে ঘাটে হাতের কাছে পাইতেছি জীবন তাহা নয়, এই কর্ম্মব্যস্ত অগভীর একঘেয়ে জীবনের পিছনে একটি সুন্দর পরিপূর্ণ, আনন্দ-ভরা সৌম্য জীবন লুকানো আছে—সে এক শাশ্বত রহস্যভরা গহন গভীর জীবন-মন্দাকিনী, যার গতি কল্প থেকে কল্পান্তরে ; দুঃখকে তা করিয়াছে অমৃতত্বের পাথেয়, অশ্রুকে করিয়াছে অনন্ত জীবনের উৎসধারা।

আজ তার বসিয়া বসিয়া মনে হয় শীলেদের বাড়ি চাকুরি তাহার দৃষ্টিকে আরও শক্তি দিয়াছিল, অন্ধকার আপিস ঘরে একটুখানি জায়গায় দশটা থেকে সাতটা পর্য্যন্ত আবদ্ধ থাকিয়া একটুখানি খোলা জায়গার জন্য সে কি তীব্র লোলুপতা, বুভুক্ষা—দুই টুইশনির ফাঁকে গড়ের মাঠের দিকের বড় গির্জ্জাটার চূড়ার পিছনকার আকাশের দিকে তৃষিত চোখে চাহিয়া থাকার সে কি হ্যাংলামি! কিন্তু সেই বদ্ধ জীবনই পিপাসাকে আরও বাড়াইয়া দিয়াছিল, শক্তির অপচয় হইতে দেয় নাই, ধরিয়া বাঁধিয়া সংহত করিয়া রাখিয়াছিল। আজ মনে হয় চাপদানীর হেড মাষ্টার যতীশ বাবুও তার বন্ধু—জীবনের পরম বন্ধু—সেই নিষ্পাপ দরিদ্র ঘরের উৎপীড়িতা মেয়ে পটেশ্বরীও। ভগবান তাহাকে নিমিত্ত স্বরূপ করিয়াছিলেন—তাহারা সকলে মিলিয়া চাপদানীর সেই কুশীবস্তীর জীবন হইতে তাহাকে জোর করিয়া দূর করিয়া না দিলে আজও সে সেখানেই থাকিয়া যাইত। এমন সব অপরাহ্নে সেখানে বিশু সেক্‌রার দোকানের সান্ধ্য আড্ডায় মহা খুশীতে আজও বসিয়া তাস খেলিত।

একথাও প্রায়ই মনে হয় জীবনকে খুব কম মানুষেই চেনে। জন্মগত ভুল সংস্কারের চোখে সবাই জীবনকে বুঝিবার চেষ্টা করে, দেখিবার চেষ্টা করে, দেখাও হয় না, বোঝাও হয় না। তা ছাড়া সে চেষ্টাই বা ক'জন করে?

অমরকণ্টক তখনও কিছু দূর। অপু বলিল, রামচরিত কিছু শুক্‌নো ডাল আর শালপাতা কুড়িয়ে আন, চা করি। রামচরিতের ঘোর আপত্তি তাহাতে। সে বলিল, হুজুর এ সব বনে বড় ভালুকের ভয়। অন্ধকার হবার আগে অমরকণ্টকের ডাকবাংলোয় যেতে হবে। অপু বলিল, তাড়াতাড়ি চা হয়ে যাবে, যাও না তুমি। পরে সে বড় লোটাটায় শোণের জল আনিয়া তিন টুক্‌রা পাথরের উপর চাপাইয়া আগুন জ্বালিল। হাসিয়া বলিল, একটা ভজন গাও রামচরিত, যে আগুন জ্বলচে, এর কাছে তোমার ভালুক এগোবে না, নির্ভয়ে গাও।

জ্যোৎস্না উঠিল। চারিধারের অদ্ভুত, গম্ভীর শোভা। কল্যকার কাব্য পুরাণের রেশ তাহার মন হইতে এখনও যায় নাই। বসিয়া বসিয়া মনে হইল সত্যই যেন কোন্ সুন্দরী, চারুনেত্রা রাজবধূ—নবপুষ্পিতা মল্লীলতার মত তন্বী, লীলাময়ী—এই জনহীন, নিষ্ঠুর আরণ্যভূমিতে পথ হারাইয়া বিপন্নার মত ঘুরিতেছেন। দূরে ঋক্ষবান পর্ব্বতের পার্শ্ব দিয়া বিদর্ভ যাইবার পথটি কে তাঁহাকে বলিয়া দিবে?

২৮

নন-কো-অপারেশনের উত্তেজনাপূর্ণ দিনগুলি তখন বছর তিনেক পিছাইয়া পড়িয়াছে, এমন সময়ে একদিন প্রণব রাজসাহী জেল হইতে খালাস পাইল।

জেলে তার স্বাস্থ্যহানি হয় নাই, কেবল চোখের কেমন একটা অসুখ হইয়াছে, কেবল চোখ কর্‌কর্ করে, জল পড়ে। জেলের ডাক্তার মিঃ সেন চশমা লইতে বলিয়াছেন এবং কলিকাতার এক চক্ষুরোগ বিশেষজ্ঞের নামে এক পত্রও দিয়াছেন।

জেল হইতে বাহির হইয়া সে ঢাকা রওনা হইল এবং সেখান হইতে গেল স্বগ্রামে। এক প্রৌঢ়া খুড়ীমা ছাড়া তাহার আর কেহ নাই, বাপ মা শৈশবেই মারা গিয়াছেন, এক বোন্ ছিল সেও বিবাহের পর মারা যায়।

সন্ধ্যার কিছু আগে সে বাড়ি পৌঁছিল। খুড়ীমা ভাঙা

রোয়াকের ধারে কম্বলের আসন পাতিয়া বসিয়া মালা জপ করিতেছিলেন, তাহাকে দেখিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন। খুড়ীমার নিজের ছেলেটি মানুষ নয়, গাঁজা খাইয়া বেড়ায়, প্রণবকে ছেলে বেলা হইতে মানুষ করিয়াছেন, ভালও বাসেন, কিন্তু লেখাপড়া জানিলে কি হইবে, তাহার পুনঃ পুনঃ সদুপদেশ সত্ত্বেও সে কেবলই পুলিশের হাঙ্গামায় পড়িতেছে, ইচ্ছা করিয়া পড়িতেছে, জেল ও হাজতবাস অঙ্গের আভরণ করিয়া তুলিয়াছে। এ বৃদ্ধবয়সে শুধু তাঁহারই মরণ নাই, ইত্যাদি নানা কথা ও তিরস্কার প্রণবকে রোয়াকের ধারে দাঁড়াইয়া শুনিতে হইল। বাগানের বড় কাঁঠাল গাছের একটা ডাল কে কাটিয়া লইয়া গিয়াছে, খুড়ীমা চৌকী দিয়া বেড়ান কখন, তিনি ও-সব পারিবেন না, তাঁহাকে যেন কাশী পাঠাইয়া দেওয়া হয়, কারণ কর্ত্তাদের অত কষ্টের বিষয়-সম্পত্তি চোখের উপর নষ্ট হইয়া যাইতেছে, এ দৃশ্য দেখাও তাঁর পক্ষে অসম্ভব।

দিন চারেক বাড়ি থাকিয়া খুড়ীমাকে একটু শান্ত করিয়া চশমার ব্যবস্থার দোহাই দিয়া সে কলিকাতা রওনা হইল। সোদপুরে খুড়ীমার একজন ছেলেবেলার পাতানো গোলাপফুল আছে, তারা প্রণবকে দেখিতে চায় একবার, সেখানে যেন সে অবশ্য অবশ্য যায়, খুড়ীমার মাথার দিব্য। প্রণব মনে মনে হাসিল। বৎসর চার পূর্ব্বে গোলাপফুলের বড় মেয়েটির যখন বিবাহের বয়স হইয়াছি খুড়ীমা এই কথাই বলিয়াছিলেন, কিন্তু প্রণব যাওয়ায় সময় করিয়া উঠিতে পারে নাই। তারপরই আসিল নন-কো-অপারেশনের ঢেউ, এবং আনুসঙ্গিক নানা দুঃখ-দুর্ভোগ। সেটির বিবাহ হইয়া গিয়াছে, এবার বোধ হয় ছোটটির পালা।

কলিকাতায় আসিয়া সে প্রথমে অপুর খোঁজ করিল, পরিচিত স্থানগুলিতে গিয়া দেখিল, দু-একদিন ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী খুঁজিল, কারণ যদি অপু কলিকাতায় থাকে তবে ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীতে না আসিয়া পারিবে না। কোথাও তাহার সন্ধান মিলিল না। চাঁপদানীতে যে অপু নাই, তাহা সে তিন বৎসর আগে জেলে ঢুকিবার সময় জানিত, কারণ তাহারও প্রায় এক বৎসর আগে অপু সেখান হইতে চলিয়া গিয়াছে।

একদিন সে মন্মথদের বাড়ি গেল। তখন রাত্ত প্রায় আটটা, বাহিরের ঘরে মন্মথ বসিয়া কাগজপত্র দেখিতেছে, সে আজকাল এটর্ণি, খুড় শ্বশুরের বড় নামডাক ও পশারের সাহায্যে নতুন বসিলেও দু পয়সা উপার্জ্জন করে। মন্মথ যে ব্যবসায়ে উন্নতি করিবে, তাহার প্রমাণ প্রণব সেদিনই পাইল।

ঘণ্টাখানেক কথাবার্ত্তার পরে রাত সাড়ে সাতটার কাছাকাছি মন্মথ যেন-একটু উস্‌খুস করিতে লাগিল—যেন কাহার প্রতীক্ষা করিতেছে। একটু পরেই একখানা বড় মোটরগাড়ী আসিয়া দরজায় লাগিল, একটি পঁয়ত্রিশ ছত্রিশ বছরের যুবকের হাত ধরিয়া দুজন লোক ঘরে প্রবেশ করিল। প্রণব দেখিয়াই বুঝিল যুবকটি মাতাল অবস্থায় আসিয়াছে। সঙ্গের লোক দুটির মধ্যে একজনের একটা চোখ খারাপ, ঘোলাটে ধরণের—বোধ হয় সে চোখে সে দেখিতে পায় না, অপর লোকটি বেশ সুপুরুষ। মন্মথ হাসিমুখে অভ্যর্থনা করিয়া বলিল, এই যে মল্লিক মশায়, আসুন, ইনিই মিঃ সেন-শর্ম্মা?···বসুন, নমস্কার। গোপাল বাবু বসুন এইখানে। আর ওঁকে আমাদের কন্‌ডিশন্‌স্‌ সব বলেছেন তো?

ধরণে প্রণব বুঝিল মল্লিক মশায় বড় পাকা লোক। উত্তর দিবার পূর্ব্বে তিনি একবার প্রণবের দিকে চাহিলেন। প্রণব উঠিতে যাইতেছিল, মন্মথ বলিল—না, না, বস হে। ও আমার ক্লাসফ্রেণ্ড, একসঙ্গে কলেজে পড়তুম—ও ঘরের লোক, বলুন আপনি। মল্লিক মহাশয় একটা পুঁটুলি খুলিয়া কি সব কাগজ বাহির করিলেন, তাঁহাদের মধ্যে নিম্নস্বরে খানিকক্ষণ কি কথাবার্ত্তা হইল। সঙ্গের অন্য লোকটি দু-বার যুবকটির কানে কানে ফিস্‌ ফিস্‌ করিয়া কি কি বলিল, পরে যুবক একটা কাগজে নাম সই করিল। মন্মথ দুবার সইটা পরীক্ষা করিয়া কাগজখানাকে একটা খামের মধ্যে পুরিয়া টেবিলে রাখিয়া দিল ও একরাশ নোটের তাড়া মল্লিক মশায়কে গুনিয়া দিল। পরে দলটি গিয়া মোটরে উঠিল।

প্রণব নির্ব্বোধ নয়, সে ব্যাপারটি বুঝিল। যুবকটির নাম অজিতলাল সেন-শর্ম্মা, কোনো জমিদারের ছেলে। যে-জন্যেই হউক সে দুইহাজার টাকার হ্যাণ্ডনোট কাটিয়া দেড়হাজার

টাকা লইয়া গেল এবং মল্লিক মশায় তার দালাল, কারণ, সকলকে মোটরে উঠাইয়া দিয়াই তিনি আবার ফিরিয়া আসিলেন ও পুনরায় প্রণবের দিকে বিরক্তির দৃষ্টিতে চাহিয়া মন্মথের সঙ্গে নিম্নস্বরে কিসের তর্ক উঠাইলেন—সাড়ে সাত পার্সেণ্টের জন্য তিনি যে এতটা কষ্ট স্বীকার করেন নাই একথা কয়েকবার শুনাইলেন। ঠিক সেই সময়েই প্রণব বিদায় লইল।

পরদিন মন্মথের সঙ্গে আবার দেখা। মন্মথ হাসিয়া বলিল—কালকের সেই কাপ্তেন বাবুটি হে—আবার শেষ-রাত্রে তিনটের সময় মোটরে এসে হাজির। আবার চাই হাজার টাকা,—থোকে থার্টি-ফাইভ্ পার্সেণ্ট লাভ মেরে দিলুম। মল্লিক লোকটা ঘুঘু দালাল। বড়লোকের কাপ্তেন ছেলে যখন শেষরাতে হ্যাণ্ডনোট কাটচেন, তখন আমরা যা পারি করে নিতে—আমার কি, লোকে যদি দেড় হাজার টাকার হ্যাণ্ডনোট কেটে এক হাজার নেয় আমার তাতে দোষ কি? এই-সব চরিয়েই তো আমাদের খেতে হবে? কত রাত এমন আসে দ্যাখো না, টাকার যা বাজার কলকাতায়, কে দেবে?

প্রণব খুব আশ্চর্য্য হইল না। ইহাদের কার্য্যকলাপ সে কিছু কিছু জানে, সে নানা ধরণের লোকের সঙ্গে মিশিয়াছে, কিন্তু এক অপ্রকৃতিস্থ মাতাল যুবকের নিকট হইতে ইহারা এক রাত্রিতে হাজার টাকা অসৎ উপায়ে উপার্জ্জন করিয়া বড় গলায় সেইটাই আবার বাহাদুরি করিয়া জাহির করিতেছে, ইহাতে বন্ধুর প্রতি একটা বিরক্তি ও অশ্রদ্ধায় তার মন ভরিয়া উঠিল। হতভাগ্য যুবকটির জন্য প্রণবের কষ্ট হইল—মত্ত অবস্থায় সে যে কি সই করিল, কত টাকা তাহার বদলে পাইল, হয়ত বা তাহা সে বুঝিতেই পারিল না।

কলিকাতা হইতে সে মামার বাড়ি আসিল। মাতৃসমা বড় মামীমা আর ইহজগতে নাই। গত বৎসর পূজার সময় তিনি মারা গিয়াছেন। প্রণব তখন জেলে। সেখানেই সে সংবাদটা পায়। গঙ্গানন্দকাটির ঘাটে নৌকা ভিড়িতে তাহার চোখ ছলছল করিয়া উঠিল। কাল ট্রেনে সারা রাত ঘুম হয় নাই আদৌ, তাড়াতাড়ি স্নানাহার সারিয়া দোতলার কোণের ঘরে বিশ্রামের জন্য যাইয়া দেখিল বিছানার উপর একটি পাঁচ ছয় বৎসরের ছেলে চুপ করিয়া শুইয়া। দেখিয়া মনে হইল একরাশ বাসি গোলাপফুল কে যেন বিছানার উপর উপুড় করিয়া ঢালিয়া রাখিয়াছে—হাঁ, সে যাহা ভাবিয়াছে তাই—জ্বরে ছেলেটির গা যেন পুড়িয়া যাইতেছে মুখ জ্বরের ধমকে লাল, ঠোঁট কাঁপিতেছে, কেমন যেন দিশেহারা ভাব। মাথার দিকে একখানা রেকাবিতে দুখানা আধ খাওয়া ময়দার রুটী ও খানিকটা চিনি। প্রণব জিজ্ঞাসা করিল—তুমি কাজল, না?

খোকা যেন হঠাৎ চমক ভাঙিয়া কতকটা ভয় ও কতকটা বিস্ময়ের দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল, কোনো কথা বলিল না।

প্রণবের মনে বড় কষ্ট হইল—ইহাকে ইহারা এ-ভাবে একা উপরের ঘরে ফেলিয়া রাখিয়াছে। অসহায় বালক একলাটি শুইয়া মুখ বুজিয়া জ্বরের সঙ্গে যুঝিতেছে, পথ্য দিয়াছে কি—না, দুখানা ময়দার হাত-গড়া-রুটি ও খানিকটা লাল চিনি। আর কিছু জোটেনি এদের? জ্বরের ঘোরে তাহাই বালক যাহা পারিয়াছে খাইয়াছে। প্রণব জিজ্ঞাসা করিল—খোকা রুটি কেন, সাবু দেয়নি তোমায়?

খোকা বলিল—ছাবু নেই।

—নেই কে বললে?

—মা মাসীমা বললে ছাবু নেই।

সে জ্বরে হাঁপাইতেছে দেখিয়া প্রণব ঠাণ্ডা জল আনিয়া তার মাথাটা বেশ করিয়া ধুইয়া দিয়া পাখার বাতাস করিতে লাগিল। কিছুক্ষণ এরূপ করিতেই জ্বরটা একটু কমিয়া আসিল, বালক একটু সুস্থ হইল। দিশেহারা ও হাঁসফাঁস ভাবটা কাটিয়া গেল। প্রণব বলিল—বল তো আমি কে? খোকা বলিল—জা-জা-জা-জানিনে তো?

প্রণব বলিল, আমি তোমার মামা হই খোকা। তোমার বাবা বুঝি আসেনি এর মধ্যে?

কাজল ঘাড় নাড়িয়া বলিল ন্-ন্-না তো, বাবা কতদিন আসেনি।

প্রণব কৌতূহলের সুরে বলিল—তুমি এত তোৎলা হলে কি করে, কাজল?

সে অপুর ছেলেকে খুব ছোটবেলায় দেখিয়াছিল। আজ দেখিয়া মনে হইল অপুর ঠোঁটের সুকুমার রেখাটুকু ও গায়ের সুন্দর রংটি বাদে এর মুখের বাকী সবটুকু মায়ের মত।

কাজল ভাবিয়া ভাবিয়া বলিল—আমার বাবা আসবে না?

আসবে না কেন? বাঃ!

—ক-ক-কবে আসবে?

—এই এল বলে। বাবার জন্যে মন কেমন করে বুঝি?

কাজল কিছু বলিল না।

অপুর উপরে প্রণবের খুব রাগ হইল। ভাবিল—আচ্ছা পাষণ্ড তো? মা-মরা কচি ছেলেটাকে বেঘোরে ফেলে রেখে কোথায় নিরুদ্দেশ হয়ে বসে আছে। ওকে এখানে কে দেখে তার নেই ঠিক—দয়া-মায়া নেই শরীরে?

ক্রমশঃ

পাশ্চাত্য প্রভাব ও বঙ্গসাহিত্য

শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন

বর্ত্তমান ভারতের প্রগতি পর্য্যালোচনা করিতে গিয়া প্রথমেই প্রশ্ন উঠে, আমরা কোন্ লক্ষ্যের, কোন্ আদর্শের অনুসরণ করিতেছি। আমরা প্রাচ্যদেশীয়; আমাদের স্বধর্ম্মে, মহাজন-অনুসৃত পথে, ঠিক চলিতেছি কি? ইউরোপীয়, বিশেষতঃ ইংলণ্ডের, ভাব ও ভঙ্গীর একান্ত নিকটে আসিয়া ভারতীয় চিন্তাধারার বিচিত্র পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, একথা সকলেই স্বীকার করেন; কিন্তু বিপথে আসিয়া পড়িয়াছি কি? এই পরিবর্ত্তন ভারতের পক্ষে শুভদায়ক কি-না সে বিষয়ে বিচার-বিতর্ক পণ্ডিতেরা করিয়াছেন ও করিতেছেন। কেহ কেহ বলেন এ পরিবর্ত্তন অতি সামান্য; আমাদের জাতীয়-জীবন-সমুদ্রে দুই-একটা তরঙ্গের সৃষ্টি হইয়াছে, কিন্তু অন্তস্তল আলোড়িত করা দূরে থাক্, তাহা স্পর্শও করে নাই। আবার অনেকের মতে সে পরিবর্ত্তন অত্যন্ত স্পষ্ট, গভীর ও স্থায়ী। আমাদের জীবনযাত্রার রীতি, সাহিত্য, শিল্প, বৃত্তি, বৈদেশিক ভাবাবর্ত্তে পড়িয়া সকলই রূপান্তর গ্রহণ করিতেছে। তবে ভালই হউক আর মন্দই হউক, এ পরিবর্ত্তনের হাত হইতে কেহ রক্ষা পান নাই,—সকলকেই ইহা অল্পবিস্তর স্বীকার করিতে হইয়াছে। কেহ কেহ এই প্রবল বন্যার বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে সাহস করিয়াছেন। আমাদের দেশের চিন্তা-নায়কগণ বহুপূর্ব্বে স্বদেশী ভাবধারা অব্যাহত রাখিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহারা কতটা কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন বর্ত্তমান প্রবন্ধে সে-বিষয়ে কিছু আলোচনা করিব।

ইংরাজী ১৮৬০ হইতে ১৯৩০ সাল, মোটামুটি এই সত্তর বৎসরে আমরা পূর্ব্ব যুগের অনুবাদের মোহ ও অভ্যাস কাটাইয়া সাহিত্য সৃষ্টি করিতে শিখিয়াছি। প্রথমে বঙ্কিমচন্দ্র, পরে রবীন্দ্রনাথ আমাদের সাহিত্য-জীবনকে, সাহিত্যধারাকে পুষ্ট ও নিয়ন্ত্রিত করিয়াছিলেন। উভয়েই সাহিত্যের একচ্ছত্র সম্রাট, রসস্রষ্টা, রূপস্রষ্টা, সাহিত্য-বিচারের নব নব পন্থা প্রবর্ত্তন করিয়া তাহাকে নবীনতর আস্বাদ দিয়া সঞ্জীবিত, মুকুলিত, প্রফুল্লিত করেন।

প্রতিভাবান্ এই দুই সাহিত্যিক চেষ্টা করিলেও পাশ্চাত্য প্রভাবের হাত হইতে একবারে মুক্তি পাইতে পারিতেন কি-না সন্দেহ। পারিপার্শ্বিক হইতে রস আকর্ষণ করিয়া পরিপুষ্ট হওয়া মানুষের ধর্ম্ম। যে স্থবির, যে প্রাণহীন, তাহার দ্বারা বাহিরের গুণ আয়ত্ত হয় না, কিন্তু যাহার প্রাণশক্তি আছে, সে বাহিরের রস গ্রহণ করিয়া থাকে,

গ্রহণ করিয়া বল অর্জ্জন করে। বাহিরের স্রোত আসিয়া, ঝড় আসিয়া একবার যাহার ভিত্তিভূমি টলাইয়া দিয়াছে, তাহার উন্নতির বিশেষ সম্ভাবনা নাই, কারণ সে বড় দুর্ব্বল, কিন্তু "ভিন্ন ধর্ম্মীর প্রভাব সহিতে পারি না, তাহার সংস্পর্শে আমার প্রকৃতি নষ্ট হইবে," এরূপ মনোবৃত্তিও দুর্ব্বলতার পরিচায়ক। চেতনধর্ম্মী জীবের অন্য জাতির সংস্পর্শে যে পরিবর্ত্তন ঘটে তাহা স্বাভাবিক, তাহাতে গ্লানিকর কিছু নাই।

বাণিজ্যব্যপদেশে আগত পাশ্চাত্য শক্তির রাজনৈতিক অধীনতার ফলে পাশ্চাত্য জীবনযাত্রার অপরূপ চাকচিক্যে ভারতের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। ইংলণ্ড তথা ইউরোপ কোনও কোনও বিষয়ে ভারত অপেক্ষা অগ্রসর; তাই নব-পরিচয় লাভের পর ভারত ভাবিল,—শিক্ষা দীক্ষা সবই পরিবর্ত্তন করিয়া নূতন করিয়া গড়িতে হইবে, হৃতগৌরব পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। পুরাতন ও নবীন কর্ম্মপদ্ধতি ও চিন্তাধারার মধ্যে এইরূপে সামঞ্জস্য স্থাপনের চেষ্টার ফলে আদর্শ সাঙ্কর্য্যের সৃষ্টি হইল। এই আদর্শ সাঙ্কর্য্যের ছায়া ভারতের অনেক প্রাদেশিক সাহিত্যে অল্পবিস্তর পড়িয়াছে; কারণ সাহিত্য যে মানবজীবনের চিন্তার দর্পণ, মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার, স্বপ্নের ভাণ্ডার। বাংলা সাহিত্যে এই ছায়া বিশেষভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে; কারণ ক্লাইভের ও ওয়ারেণ হেষ্টিংসের চেষ্টায় ও পরিশ্রমে বঙ্গদেশেই সর্ব্বপ্রথম ইংরেজ রাজ্যের বনিয়াদ পাকা হয়।

তারপর এই দেড়শত বৎসরের অধিক হইল বাংলায় আসিয়াছে স্রোতের পর স্রোতে, বিদেশী ভাবের বন্যা। সে বন্যা সমস্ত দেশকে প্লাবিত করিয়াছে, তাই উহার প্রভাব এখানে আরও বেশী স্পষ্ট, উহার চিহ্ন আরও বেশী সুনির্দ্দিষ্ট। এই প্রভাবের রাজনৈতিক ভিত্তি সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে ত্রিশ চল্লিশ বৎসর লাগিল; তারপর উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙালী যখন সাগরপারে নূতন রূপের, নূতন শক্তির সন্ধান পাইল, তখন সাহিত্যক্ষেত্রেও আদর্শ-সঙ্কট হইল; প্রাচীন রূপ, প্রাচীন ভাব অক্ষুণ্ণ রাখিব, না নূতনের পানে ছুটিব; ছন্দ, মিল, যতি, অলঙ্কারশাস্ত্রের বিভিন্ন ও বহুল প্রয়োগ; নাটক, গদ্য, চম্পূ, জীবনী—কোন্‌টি কি ভাবে লেখা হইবে তাহা লইয়া পরীক্ষা চলিতে লাগিল। বঙ্গসাহিত্যের সেই সন্ধিক্ষণে বঙ্কিমচন্দ্র জাতির অধিনায়ক হইয়া আসিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্র ঈশ্বর গুপ্তের শিক্ষানবিশী করিয়াছিলেন; আর গুপ্ত মহাশয় ছিলেন বাংলার 'খাঁটী কবি।' তাই হুগলী ও হিন্দু কলেজের শিক্ষার আওতায় বাড়িয়াও বঙ্কিমচন্দ্র দেশী সাহিত্যকে উপেক্ষা করিতে পারিলেন না, 'বিদেশের কুকুরের জন্য দেশের ঠাকুর ফেলা' তাঁহার ধাতে সহিল না। ইংরেজী সাহিত্যে তাঁহার যথেষ্ট পটুত্ব ছিল, ইংরেজী ভাষার উপর তাঁহার বেশ অধিকার ছিল, তথাপি প্রাণ উৎসর্গ করিয়া, এবং সমস্ত হৃদয় উজাড় করিয়া, তিনি বঙ্গভাষার সেবা করিয়াছিলেন। ইংরেজী সাহিত্য হইতে তিনি বহু উপাদান আহরণ করিয়া ভাষা-মাতৃকার পূজার অর্ঘ্যরূপে সাজাইয়া দেন, অথচ তিনি এ-বিষয়ে সঙ্কীর্ণচিত্ত ছিলেন না; বৈদেশিক ভাবের সহিত পরিচয়ের ফলে যে নূতন ধরণের উপন্যাস, প্রবল সাময়িক সাহিত্যের সৃষ্টি হয়, তাহা অনেকটা বঙ্কিমচন্দ্রের চেষ্টার ও প্রতিভা-বিনিয়োগের ফল। তাঁহার চারিদিকে তাঁহাকে কেন্দ্র করিয়া যে সাহিত্যিক মণ্ডলী গড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহাও তাঁহার নিকট হইতে খাঁটি দেশীয় রচনা-রীতি শিক্ষা করিয়াছিল। অন্তরঙ্গ কোন খ্যাতনামা লেখকের রচনা সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছিলেন, "একেবারে বাংলা অক্ষরে ইংরেজী লিখেছিল।" সে-সব রচনা তিনি নিজে সংশোধন করিয়া দিতেন। গুপ্ত মহাশয়ের শিক্ষা দীক্ষা তাঁহাকে অযথা ও অন্ধ পরানুকরণ হইতে নিবৃত্ত রাখিয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের সহজ দেশপ্রীতি এই শিক্ষার গুণে কতদূর বলবতী হইয়াছিল তাহা বিচার্য্য। বিদেশের সদ্‌গুণ তাঁহার দৃষ্টি এড়ায় নাই। ফরাসী দার্শনিক কোমৎ যে নূতন মত "পজিটিভিজ্‌ম্" প্রচার করিয়াছিলেন, তাহার প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ছিল। সমাজতন্ত্র পরীক্ষা করার প্রয়োজনীয়তা, সামাজিক উন্নতির জন্য ভিন্ন ভিন্ন বিদ্যার একমুখীকরণ, পরার্থে আত্মত্যাগ—এ-সকলের প্রতি তাঁহার বিশেষ আকর্ষণ ছিল; কিন্তু এই অভিনব মতবাদকে তিনি গীতার শিক্ষার সহিত, হিন্দুর সাধনার সহিত,

মিলাইয়া লইয়াছিলেন, শুধুই ইহার নিরীশ্বরতা তাঁহার ভাল লাগে নাই, মহামানবের পূজা ভগবদ্ভক্তির স্থান অধিকার করিতে পারে নাই। সংস্কৃত কাব্যদর্শনাদি শাস্ত্রের আলোচনায় নিপুণ বঙ্কিমচন্দ্র, পাশ্চাত্য বিদ্যায় সুপণ্ডিত হইয়াও, ইউরোপীয় সাহিত্য হইতে বস্তু ও ভাবের নানা উপাদান সংগ্রহ করিয়াও, পাশ্চাত্য ভাব-স্রোতে গা ভাসাইয়া দেন নাই। তিনি যুগ-প্রবর্ত্তক ছিলেন বলিয়া, ভাব ও কর্ম্মের কেন্দ্রস্বরূপ ছিলেন বলিয়া, সমসাময়িক বহু মনীষীর মধ্যে ইহার সুফল দেখা গিয়াছিল। ইংরেজী ভাব ও ভাষার অবাধ অনুকরণের দিনে অমিতবিক্রমের সহিত বঙ্কিমচন্দ্র পাশ্চাত্য ভাব নিয়ন্ত্রণের কথা বলেন, স্বধর্ম্মের পতাকা উত্তোলন করেন, তাঁহার নিকট বাঙালী জাতি যে অশেষ ঋণজালে আবদ্ধ রহিয়াছে, ইহা তাহার অন্যতম কারণ।

বঙ্কিমের কথা বলিতে গিয়া আর একজনের কথা মনে পড়ে। পাশ্চাত্য ভাবের আন্দোলনে বাঙালীর চিত্ত যখন আলোড়িত হইতেছিল, তখন মনস্বী ভূদেব তাহাকে প্রকৃতিস্থ করিবার জন্য সর্ব্বপ্রকার জীবনযাত্রার প্রণালী লিপিবদ্ধ করিয়া যান। ব্যক্তিগত জীবনের নানাবিধ সমস্যায় "আচার প্রবন্ধ" দিগ্‌দর্শন ;—"পারিবারিক প্রবন্ধে" সাময়িক পারিবারিক সমস্যার উল্লেখ ও সমাধান এবং "সামাজিক প্রবন্ধে" সামাজিক সম্পর্ক ও নানারূপ সমস্যার কথা বলা হইয়াছে। বাঙালী আদর্শসঙ্কট হইতে ত্রাণ পাইবে, অন্ততঃ সে-বিষয়ে তাহার অনেকটা সাহায্য হইবে—এই উদ্দেশ্যে ভূদেব নিজে পাশ্চাত্য প্রভাবের হাত হইতে একেবারে পরিত্রাণ না পাইয়াও বাঙালীর জন্য এই পুস্তক তিনখানি লিখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার গম্ভীর বাণী বাঙালীর মনে পাশ্চাত্য ভাবের প্রতিক্রিয়ার মত খানিকটা কাজ করিয়াছিল, এবং মহাকালের ইঙ্গিতে আমরা আজ সে-যুগের রচনাকে অবহেলা করিতে আরম্ভ করিলেও তাঁহার ভাবপ্রবাহের তরঙ্গ আজও আমাদের চিত্ততটে আঘাত করিতেছে।

বঙ্কিমচন্দ্রের পরে রবীন্দ্রনাথের হস্তে বঙ্গসাহিত্য পরিচালনের ভার পড়িয়াছে। কোনও বিদ্বৎসভা বা রাজবিধি তাঁহাকে এ-ভার অর্পণ করে নাই, এ অধিকার প্রাকৃতিক প্রতিভার দান। নানারূপ প্রতিকূল মন্তব্যে তাঁহার এই সহজ সাহিত্যনেতৃত্ব খর্ব্ব হয় নাই, প্রায় চল্লিশ বৎসরকাল রবীন্দ্রনাথ সর্ব্বব্যাপী প্রতিভার দ্বারা সমসাময়িক বঙ্গসাহিত্যকে পরিচালিত করিয়া আসিতেছেন। বৈদেশিক চিন্তাপ্রবাহের প্রতি তাঁহার মনোভাব কিরূপ, তাহা আলোচনা করা যাক্।

রবীন্দ্রনাথ মূলতঃ কবি। নানাপ্রকার আবেগ উদ্বেগ অকারণ পুলকে নিত্য তাঁহার হৃদয় স্পন্দিত; পাশ্চাত্য প্রভাবের প্রতি তাঁহার হৃদয়-কপাট রুদ্ধ থাকিবে, ইহা সম্ভব নহে। নবীন চিন্তা, নূতন ছবি, দূরাগত বাণী—কবির চিরদিনই ইহাদের জন্য একটা আকর্ষণ থাকিবার কথা, তাহাতে আবার রবীন্দ্রনাথের মত কবি! তরুণ জীবনে নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গে কবি যে উদ্দাম হৃদয়-প্রবাহের কথা ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহা আজ কবির পরিণত বয়সেও জীবন্ত, বেগবান; পাশ্চাত্য ভাবসংঘাতে তাঁহার মত আর কাহার হৃদয় ধ্বনিত, স্পন্দিত হইবে? কোন্ প্রকৃতি চঞ্চল হইয়া উঠিবে?

কিন্তু এই অসীম আকুলতা কবির জীবনে অন্যদিকে বিপুল সংযমের সহিত মিশিয়াছে। আশৈশব চিরকালই তিনি শান্ত সংহত লিপিনৈপুণ্যের পরিচয় দিয়াছেন; উদ্দাম আবেগে মৃত্যুর ফেনিল বিভীষিকা পান করিবার দুরন্ত আহ্বান কবির কর্ণে প্রবেশ করিলেও তিনি আদর্শচ্যুত হন নাই, 'সত্যং শিবং সুন্দরম্'—এর ধ্যান তাঁহার নষ্ট হয় নাই। উপনিষদ্ যে তাঁহার সাহিত্য সৃষ্টির ও সাহিত্য দৃষ্টির মূল ভিত্তি, স্বদেশপ্রীতি যে তাঁহাকে দেশীয় সুরে বদ্ধশ্বাস রাখিয়াছে; তাঁহার সূক্ষ্মদৃষ্টি সাহিত্যকে অদ্ভুত ও অসঙ্গত মিশ্রণ হইতে রক্ষা করিতে চাহিয়াছে।

অথচ এমন কথা বলা চলে না যে রবীন্দ্রনাথ পাশ্চাত্য সাহিত্যে যথেষ্ট প্রাধান্য অর্জ্জন করেন নাই। কোনও কোনও পণ্ডিত এতাদৃশ অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন যে, রবীন্দ্রনাথের পশ্চিমের সাহিত্য রীতিমত পড়া ছিল না। কিন্তু জীবনের কৈশোর-বয়সে বিলাতযাত্রার প্রাক্কালে, সবরমতী নদীতীরে সত্যেন্দ্রনাথের নির্জ্জন গৃহে তাঁহার কবিহৃদয় ইংরেজী কাব্যের আবহাওয়ায় পরিপুষ্টি লাভ

করে। প্রথমবার ইংলণ্ড প্রবাসেও তিনি ইংরাজের কাব্যজীবন হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ছিলেন না,—তাঁহারই আত্মকাহিনী হইতে তাহা বুঝিতে পারা যায়।

তাঁহার ইংরেজী কবিতার অনুবাদ, ইংরেজী কাব্যের সমালোচনা ও কাব্যসমালোচনা-রীতির সহিত পরিচয় ও প্রবন্ধে তাহাদের উল্লেখ, মনের ভাব ইংরেজীতে এবং ইংরেজী কবিতায় প্রকাশ করার অদ্ভুত ক্ষমতা, পাশ্চাত্য সাহিত্যে তাঁহার গভীর অনুরাগ ও ব্যাপক জ্ঞানের সাক্ষী। আবার তাঁহার ছোটগল্প ও উপন্যাসে, কবিতায় ও অন্য রচনায় পাশ্চাত্য সাহিত্যের সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের প্রমাণ বহুস্থলে পাওয়া যায়। সে-বিষয়ে তিনি কোনও প্রকার কার্পণ্য দেখান নাই। তাই একসময়ে লোকে বাংলার শেলী বলিয়া তাঁহার পরিচয় দিত। পশ্চিমের ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ে নিজের জ্ঞান সম্বন্ধে কবি অবশ্য বার-বার সন্দেহ ও সঙ্কোচ প্রকাশ করিয়াছেন, কিন্তু তাহা বিনয়বাণী ভিন্ন আর কিছু নহে, এবং সে-সব উক্তি বেদবাক্য বলিয়া যিনি গ্রহণ করেন তাঁহার বুদ্ধির গভীরতার প্রশংসা করা যায় না।

পাশ্চাত্য সাহিত্যের সহিত নিবিড় পরিচয় সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথ প্রাচ্য আদর্শ হইতে বিচ্যুত হন নাই, ইহা সামান্য কথা নহে। একদিকে তিনি যেমন বিশ্বভারতীর, বিশ্বদেবতার উপাসক, অন্যদিকে আবার মানসিক অধীনতারও পক্ষপাতী নহেন। তাই তিনি ভারতীয় অন্যান্য সাধকের মত বলেন,—বর্ত্তমান যুগে ইউরোপের নিকট জগতের ঋণ অস্বীকার করা অসম্ভব; বুদ্ধিবৃত্তিমূলক যে শিক্ষা তাহা ইউরোপের নিকট পাইতে হইবে, কিন্তু হৃদয়ের শিক্ষার জন্য ভারতের প্রাচীন ঋষিদিগের নিকট যাওয়া চাই। যৌবনে তিনি ফরাসী উৎকৃষ্ট উপন্যাস বিশেষের বাংলা অনুবাদের বিরুদ্ধে আপত্তি তুলেন। কারণ তাহা উৎকৃষ্ট হইলেও আমাদের আবহাওয়ার অনুপযোগী। অল্পদিন পূর্ব্বে তিনি অতি-আধুনিক বাংলা সাহিত্যের মূলগত একটি সুরের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেন, 'পশ্চিমের হাওয়া' সম্বন্ধে সকলকে সতর্ক হইতে বলেন। দেশকাল সম্বন্ধে সর্ব্বপ্রকার সঙ্কীর্ণতার যিনি চিরদিন বিরোধী, তাঁহার এই উক্তি আপাততঃ সঙ্কীর্ণ মনে হইলেও তাঁহার অভিপ্রায় বোধ হয় যে,—সাহিত্য, সমাজের ছবি; সমাজের কৃত্রিম ছবি সাহিত্যে মিথ্যাচার মাত্র। আমরা প্রাচ্য; প্রাচ্য আদর্শের অনুসরণ ভিন্ন আমাদের গতি নাই। সুতরাং পাশ্চাত্য ভাব, পাশ্চাত্য আদর্শ যাহা আমাদের সমাজের সহিত সুসমঞ্জস নহে, তাহা সাহিত্যে আমাদের বলিয়া পরিচয় দিবার যোগ্য নহে। যে ঘটনার, যে ভাবের সহিত আমাদের অন্তরের যোগ নাই, আমরা তাহা আমাদের একান্ত নিজস্ব বলিয়া মনে করিতে পারি না; অনুবাদে শুধু তাহার বহিরাবরণটুকু আমরা পাই।

সাহিত্যসেবী সমাজের কল্যাণ করেন সাহিত্যের মধ্য দিয়া,—পরোক্ষভাবে; সমাজের কল্যাণ করিব এই সঙ্কল্প করিয়া এবং এই কথা স্থূলভাবে প্রকাশ করিয়া নয়। বঙ্গসাহিত্যের বর্ত্তমান যুগকে নিয়ন্ত্রিত করিতে চেষ্টা করিয়া, পাশ্চাত্য সাহিত্যের অযথা এবং অন্ধ অনুকরণ হইতে কথঞ্চিত রক্ষা করিয়া, রবীন্দ্রনাথ তাঁহার দীর্ঘকালব্যাপিনী সাহিত্যসেবা শুভাবহ করিয়াছেন। তাঁহার লেখনী জয়যুক্ত হইয়াছে, বঙ্গসাহিত্যের, তথা ভারতীয় সাহিত্যের, শ্রীবৃদ্ধির দিক দিয়া আরও জয়যুক্ত হউক, আমাদের আত্মপ্রতিষ্ঠার ভাব বাড়াইয়া দিক।

টেলিগ্রামের দৌত্য

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

সংসার-কলেজ

সর্ব্বাণীকুমার একদমে এন্ট্রান্স, আই-এ, বি-এ, বি-কম্, এম-এ, বি-এল এবং পি-এচ্-ডি পাস দিয়া যখন পাণ্ডিত্যের একটি জটিল প্রহেলিকা হইয়া বাহির হইয়া আসিল, সংসারের তরফ হইতে প্রথম তাহাকে অভিনন্দিত করিলেন একটি বয়ঃপ্রাপ্তা কন্যার পিতা। এটিকে শেষ অভিনন্দনও বলা চলে, কারণ ইহার পরে সংসার উদাসীন হইয়াই রহিল এবং বিশেষ করিয়া চাকরির বাজারে সর্ব্বাণী হাজার হাজার রকমে নিজের পরিচয় দিয়াও সে ঔদাসীন্য ঘুচাইতে পারিল না। তখন শ্বশুর বলিলেন—"এ কাজের কথা নয় বাবাজী, তোমার ও প্রেষ্টিজ্ ফ্রেষ্টিজে পেট ভরবে না, ঢুকে পড় আমার আপিসে, যা থাকে কূল কপালে..."

আজ এক বৎসর সর্ব্বাণী এই মার্চ্চেণ্ট আপিসে কাজ করিতেছে, উন্নতিও করিতেছে—একে বড়বাবুর জামাই, তায় পেটে বিদ্যাও আছে। তবে শ্বশুরের বড় কড়া নজর, বলেন—"না, কাজ শেখবার বয়স এটা, ফুর্ত্তির ঢের সময় আছে।" কাজে ঢুকিবার পর মাত্র একবার শ্বশুরবাড়ি যাওয়া ঘটিয়াছিল; শ্বশুর বলেন—"এখন ঐতেই সন্তুষ্ট থাক। আর শ্বশুরবাড়ির খোদ শ্বশুরটিকে ত অষ্টপ্রহর দেখতেই পাচ্ছ, যা হোক্ একটা সান্ত্বনা ত?"

মাস-দশেক হইল একটি কন্যা হইয়াছে—অনেক দিন হইতে একবার যাওয়ার জন্য সর্ব্বাণী উস্‌খুস্ করিতেছে। আপিসের প্রবীণদের তাগাদায় বড়বাবু রাজী হইয়াছেন—চার দিনের মেয়াদে। সাহেব কি একটা ব্যারাম সারিবার জন্য বিলাতের বিখ্যাত স্বাস্থ্যনিবাস বাথ্ নামক শহরে গিয়াছে, শীঘ্রই আসিবে। সে আসিয়া পৌঁছিবার পূর্ব্বেই সর্ব্বাণীর হাজির হওয়া চাই।

সর্ব্বাণীর গাড়ী দুটো-ছাপ্পান্নয়। ঠিক হইয়াছে আড়াইটে পর্য্যন্ত আপিসে থাকিবে, তাহার পর ট্যাক্সিতে করিয়া ছুট দিয়া শিয়ালদহে গাড়ী ধরিবে। যাহারা ঠিক বড়বাবুর মত অবস্থা প্রাপ্ত হন নাই, এমন ব্যক্তি মাত্রেই জানেন এমন দিনে, বিশেষ করিয়া এমন অবস্থায়, কাজ করা কিরূপ অসম্ভব। সর্ব্বাণী এ-বহি সে-বহি উল্টাইয়া খানিকটা কাটাইল, একটা মোটা লেজারে ক্রমাগতই ভুল লিখিয়া খানিকটা কাটছাঁট করিল এবং ক্রমাগত বাম হাতের রিষ্টওয়াচটির দিকে এবং ডান দিকে দেওয়াল-ঘড়িটার দিকে চাহিয়া সময়ের ষ্টীমরোলারের মত গতিটার জন্য বিরক্ত হইয়া উঠিতে লাগিল। দেওয়াল-ঘড়িটায় ক্যালকাটা টাইম—এদিকে রিষ্টওয়াচে রেলওয়ের টাইমও আজ মিলাইয়া রাখিয়াছে। কিন্তু মনে হইতেছে যেন দুইটাই ষড়যন্ত্র করিয়া আজ হাত পা মুড়িয়া বসিয়াছে।

টেবিলের দুই পাশের দুইটি ড্রয়ার টানিয়া দিয়া আড়াল করিয়া, পকেট হইতে একটি সুগন্ধ লিপি সন্তর্পণে বাহির করিয়া কোলে মেলিয়া ধরিল এবং ঘাড় সোজা করিয়া ও চোখ নীচু করিয়া পড়িতে লাগিয়া গেল। আপিসের ঠাকুর্দ্দা অভয় চৌধুরী তাহার পিছনেই পিছন ফিরিয়া বসেন, না ঘুরিয়াই প্রশ্ন করিলেন—"মুখস্থ হ'ল ভায়া?"

সর্ব্বাণী হাসিয়া জবাব দিতে যাইতেছিল, মুখ তুলিতেই বড়বাবুর পেয়াদা একটি সেলাম ঠুকিয়া একটি স্লিপ দিল। লেখা আছে—"Dr. Sarbani Bose, Ph.D. to see me at once"—বড়বাবু জামাইয়ের শ্রেষ্ঠ খেতাবটি নামের দুই দিকে জুড়িয়া দিতে কখনও ভুলেন না।

সর্ব্বাণী শ্বশুরের কামরার মধ্যে গিয়া উপস্থিত হইলে তিনি একখানা চেয়ার দেখাইয়া বসিতে বলিয়া কলম ঘষিতে লাগিলেন। বেয়ারা বাহিরে গিয়া পর্দ্দাটা টানিয়া দিল।

বড়বাবুর লিখিতে খানিকটা সময় গেল; শেষ হইলে বইটা সশব্দে বন্ধ করিয়া মলাটের উপর কর্ম্মসমাপ্তি-

সূচক একটা কিল বসাইয়া দিয়া বলিলেন—"ব্যস্।" এ তাহার একটা পেটেণ্ট বদ অভ্যাস, সাহেবও শোধরাইতে না পারিয়া হাল ছাড়িয়া বসিয়াছে। বলিলেন—"আগে কাজ তারপর সংসারের কথা, এটুকু মনে রেখ বাবাজী।··· হ্যাঁ, তাহ'লে আজ নেহাৎ সিঁদুরালিতে যাবেই?"

সিঁদুরালি শ্বশুরবাড়ি। যুবক লজ্জিতভাবে মাথাটি একটু নীচু করিয়া লইল। বড়বাবু কহিতে লাগিলেন—"তা যাও, আর যাবে বৈকি, সেকি কথা! তুমিও এক বছর যাওনি আর তাঁরাও এক বছর তোমায় দেখেন নি। তোমার শাশুড়ীর খুবই ইচ্ছে। আমার ওপর চোখ রাঙিয়ে ইয়াব্বড়া এক চিঠি লিখেচেন—সে যদি দেখ! আরে আমারই কি অনিচ্ছা? তবে কি জান বাবাজী? চাকরি আগে, ফুর্ত্তি পরে। এই তোমাদের উঠ্‌তি বয়স, এখন সব ভুলে উন্নতির দিকে নজর রাখবে—বকোধ্যানম্ হয়ে চিন্তা করবে কিসে দু-পয়সা আসে। এটিই মূল রে বাবা। আর মানুষ কটা বছরই বা রোজগার করতে পারে? পঞ্চাশ—পঞ্চান্ন—ধর ষাট্? তারপর কর না কত ফুর্ত্তি করবে।···বেয়ারা!···ডাকলে আবার সায়েব বেটা রাগ করে। তা কি করব? ও ছেলেদের খেলনার মত কলিং বেল আমার হাতে টেঁকে না। চারটে ত বেকল হয়ে প'ড়ে আছে। অত যদি অফিস্যাল কায়দা চাই ত দেনা একটা ঘোড়ার গাড়ীর ঘণ্টা কিনে—এন্তার পা দিয়ে ঘটাং ঘটাং করতে থাকব'খন।"

সর্ব্বাণী হাস্যসংবরণ করিতে পারিল না। বেয়ারা আসিয়া দাঁড়াইল। বড়বাবু পকেট হইতে দস্তার মোটা চেন আঁটা একটা জামবাটির মত ঘড়ি বাহির করিয়া তাহার হাতে দিলেন, বলিলেন—"দুটো পনর হয়েচে, ঠিক আড়াইটের সময় যে ট্যাক্সিটা দেখবি, ডাকবি। আমি ও হল্টেজ্ ফল্টেজ্ দিতে রাজী নই, বুঝলি? না দেবায়, না ধর্ম্মায়।···যা ফুটপাথের উপর দাঁড়িয়ে থাকগে।···কি বুঝলি?··হয়েচে, হয়েচে, আর মেলা বক্তিমে দিতে হবে না,—তুমি খুব বুদ্ধিমান, এখন যাও দয়া ক'রে ফুটপাথে গিয়ে দাঁড়াও গে। বাবাজী বোধ হয় ভাবচ শ্বশুর ব্যাটা আচ্ছা কৃপণ ত···"

সর্ব্বাণী অপ্রতিভভাবে অর্দ্ধস্ফুট ভাবে বলিল—"না···"

বড়বাবু সেটুকুর দিকে কর্ণপাত না করিয়া বলিলেন—"দু-এক মিনিট হল্টেজ্ নিয়ে মারামারি করে। তা করি; কেন যে করি, পয়সাটা যে কি জিনিষ ক্রমে টের পাবে। এই ত কুলো একটি মেয়ে হয়েচে; সংসারটি জাঁকাল হয়ে ঘাড়ে চেপে বসুক্, তখন বুঝবে—হ্যাঁ, বুড়ো একদিন বলেছিল বটে।"

সর্ব্বাণী লজ্জায় মাথা নত করিল।

"হ্যাঁ, তোমায় যার জন্যে ডাকা। কথাটা বলতে কেমন শোনায় বটে। কিন্তু তা ভাবলে সংসার চলে না। কথাটা এই যে—দিলাম বটে চার দিনের ছুটি—তোমারও দেখচি মেয়েটির দিকে মন প'ড়ে রয়েচে, গিন্নীরও আগ্রহাতিশয্য; কিন্তু পার ত এ-থেকেও একদিন বাঁচিয়ে নিয়ে এস। সায়েব এই সময় সেরে সুরে ভাল মন নিয়ে আসবে, একটা মস্ত বড় সুযোগ। কি জান বাবাজী? শ্বশুর-বাড়িটা একটা বদ জায়গা, সব মেয়েদের কাণ্ড কি-না? ঠিক যে-সময়টি পয়সা কামাবার বয়স, সেই সময়টি ও উপসর্গটি জোটে এসে। এই ক'রেই বাঙালী জাতটা ত গেল। সায়েবদের মধ্যে ও বালাই-ই নেই—তোমাদের ওপর শাসনও করচে দিব্যি। পি-এচ-ডি পাস ক'রে তো ডাক্তার হয়েচ—ওদের বই-টইয়ের মধ্যে 'শ্বশুরবাড়ি' ব'লে কোন কথা পেয়েচ?—আমরা টেনে father in-law's house করেচি, আমাদের নিজেদের কাজ চালাবার জন্যে। এইগুলি লক্ষ্য করবার বিষয়।"

লজ্জায় সর্ব্বাণীর আর ঘাড় তুলিবার অবস্থা ছিল না।

"রাগ করো না বাবাজী, শ্বশুর তোমার একটু স্পষ্ট বক্তা লোক। পাস করেচ অনেক—লেকচারও শুনেচ অনেক। কিন্তু সংসার-কলেজের প্রিন্সিপালের লেকচার একটু শুনতে হবে বই কি। আরে তিন দিনে না আসতে পার চারটে দিনই পুষিয়ে নেবে, কিন্তু তার বেশী নয়।···হ্যাঁ, এইগুলো ধর—নাও, হাত তোল। এই কুড়ি টাকা—সেকেণ্ড ক্লাস ভাড়া, ওদিকে যদি গাড়ী-টাড়ী নাই এসে পৌঁছুল কি কিছু হ'ল—একটা তখন ভাড়া ক'রতে হবে ত? এই দশটা টাকা ধর। এই ট্যাক্সি

আট টাকা...হ্যাঁ হ্যাঁ অতই লাগবে,—শ্বশুরের কাছ থেকে টানতে হয় রে বাবা, নাও, হাত গুটিও না। আমরাও ত এক সময় জামাই ছিলাম—শ্বশুর-ব্যাটাকে কামধেনু ব'লেই ধরতাম।...ভাড়ার ওপর ড্রাইভার ব্যাটা কাকুতি-মিনুতি ক'রে এক আধ টাকা চায় দিও। কিন্তু খবরদার—হন্টেজ ব'লে নয়—ও আমার প্রিন্সিপালের বাইরে। রাস্তায় চা জলখাবার আছে এই পাঁচটা টাকা ধর।...সিগারেট খাওয়াটা ছেড়েছে ত?—হ্যাঁ, ওটা প্রথমতঃ বড় অপকারী, আর দ্বিতীয়তঃ সেরেফ বাজে খরচ—না দেবায় না ধর্ম্মায়।...প্রথম মেয়ে, মুখ দেখবার জন্যে ধরবে সব, একটু নেবে ঘোষ এণ্ড সন্সের ওখান থেকে একটা কিছু যাহোক সোনাদানা নিয়ে যেও। এই নাও পঞ্চাশটি টাকা...দেখেচ? ব্যাটা লবাবপুত্তুর, আবার হাত গুটোয়। এদিকে বেয়ারা বেটাও হ্যাঁ করে রয়েচে—এই ধর একটা টাকা। সেখানে মেয়েরা খাওয়াবার জন্যে ধরবে—কেন বোকার মত নিজের গাঁট থেকে পয়সা খরচ ক'রবে? রাখ এই কুড়িটা টাকা।—আমাদের ঠাকুর্দ্দার সেই—'জুতাকা বদৌলৎ' খাওয়াবার গল্পটা জান?—এক মৌলবী ছিল—বে করলে, ছেলে হ'ল—বন্ধুরা বললে খাওয়াও; কিন্তু সে বেচারা পেরে ওঠে না। শেষকালে তাগাদার চোটে ব্যতিব্যস্ত হয়ে দিলে একদিন সবাইকে ঢালোয়া নেমন্তন্ন ক'রে। সবাই জুতো ছেড়ে ঘরে গিয়ে ব'সে হাসিতামাসা গল্পগুজব করতে লাগল। যখন আর কেউ বাকী নেই মৌলবী সায়েব সবার বাছাবাছা জুতোগুলি বাজারে নিয়ে গিয়ে..."

বেয়ারা আসিয়া বলিল—ট্যাক্সি হাজির।"

বড়বাবু বলিলেন—"তাহ'লে ওঠ বাবাজী, আর দেরি করা নয়। থাক্, থাক্ আর প্রণাম ক'রতে হবে না। আমার মাথায় যত চুল তত বছর পরমায়ু হোক—তোমার গিয়ে, টাক্ পড়বার আগে যত চুল ছিল। এস বাবা, ষ্টেশন থেকে একটা টেলিগ্রাম করে দিও।"

কলেজের দৃশ্যান্তর

সিমুরালি গ্রামটা কলিকাতা হইতে এক শত ক্রোশের মাথায়, রেল ষ্টেশন হইতে দশ ক্রোশ, পোষ্ট আপিস হইতে চার ক্রোশ। রেল, নৌকা আর গরুর গাড়ীযোগে পৌছিতে হয়, গোটা-চব্বিশ ঘণ্টা লাগিয়া যায়। সেবারে ফিরিয়া আসিয়া সর্ব্বাণী নাক কান মলিয়াছিল—আর ও মুখো নয়।

ভোরে রেলগাড়ী হইতে নামিয়া শ্বশুর-মহাশয়ের আদেশ-মত একখানি টেলিগ্রাম করিয়া দিল। ষ্টেশনে লোক, গাড়ী মজুত ছিল—সে-কথাও জানাইয়া দিল। তাহার পর দীর্ঘ আট ঘণ্টা রাস্তার ঝাঁকানি, দোলানি, ধূলা, তৃষ্ণা, রোদ—সমস্ত অত্যাচার একখানি মিলনোৎসুক মুখের চিন্তায় কাটাইয়া যখন গন্তব্য স্থানে পৌছিল, তখন বেলা একটা হইয়া গিয়াছে।

পাড়াগাঁয়ে গ্রাম-সম্পর্কেই অনেক আত্মীয়-কুটুম্ব হইয়া পড়ে, বিশেষ করিয়া মেয়েমহলে। সকলের প্রাপ্য প্রণামাদি চুকাইয়া দিয়া স্নানাহার করিতে সর্ব্বাণীর প্রায় একটা হইয়া গেল। তাহার পর পান চিবাইতে চিবাইতে বিশ্রামের জন্য ঘরে প্রবেশ করিল। বড়শালাজ গল্প করিতে করিতে দুয়ার পর্য্যন্ত আসিল। সেইখানেই দাঁড়াইয়া হাসিয়া বলিল—"এখন একটু ঘুমোও ভাই, কেউ যদি জ্বালাতন ক'রতে আসে ধমকে দিও। তোমার ঘুমের শত্রুটি ওৎ পেতে আছে কি-না, তাই সাবধান ক'রে দিলাম।"

সর্ব্বাণী জুতা ছাড়িয়া পালঙ্কের উপর বসিয়া পাখার হাওয়া খাইতে লাগিল। একটু পরে মাখনের মত কোমল, ঢল ঢলে একটি কচি মেয়েকে কোলে লইয়া তাহার স্ত্রী সুহাস ব্রীড়াজড়িত পদে ঘরে প্রবেশ করিল।

দুজনেই পরস্পরের মুখের পানে চাহিয়া হাসিয়া ফেলিল। সুহাস হাসিমুখখানি লজ্জায় বাঁকাইয়া নীচু করিল। অনেক দিন পরে দেখা, তাহার উপর কোলের মধ্যে নব-পরিণয়ের অনেক মধুস্মৃতির সাক্ষ্য এই নবীন সম্পদটি—তাহার বড়ই জড়িমা বোধ হইতেছিল। দৃশ্যটা সর্ব্বাণী খানিকটা উপভোগ করিল, তাহার পর বধূকে কাছে টানিয়া লইয়া বাঁ-হাতটা তাহার কাঁধের উপর রাখিল, দক্ষিণ হস্তে কন্যার চিবুক স্পর্শ করিয়া তাহার নধর ঠোঁটে পিতৃত্বের একটি স্নেহনিদর্শন দিল, তাহার পর বলিল—"বড় চমৎকার হয়েচে, না?"

সম্মুখ হইতে স্বামীর পাশে আসিয়া সুহাসের লজ্জাটা অনেকটা কাটিয়া গিয়াছিল ; খুকীর মুখের পানে চাহিয়াই বলিল—"তোমার মতন মুখ হয়েচে, চমৎকার ত হবেই।"

"কি জানি, নিজের মুখটা তেমন মনে পড়চে না ; তবে সেটা যে চমৎকার, সে খবর আজ টের পেলাম, কিন্তু চোখ দুটো ঠিক তোমার মতন।"

"না মশায়, সবই তোমার মতন ; সবাই ব'লচে বাপ-মুখো মেয়ে, খুব ভাগ্যবতী মেয়ে। ঠিক তোমার মতন আদল হয়েচে।"

"হ'লে অন্ততঃ বেচারার একটা দুর্ভাগ্য এই হ'ত যে, মার অমন চাঁদপানা মুখ না পেয়ে এই কাটখোট্টার মত মুখ পেত। কিন্তু আমার মেয়ের সম্বন্ধে আমারই বেশী জানা উচিত,—তোমার মুখ একেবারে বসান, আর তাই এত চমৎকার"—তাহার পর বধূকে আরও কাছে টানিয়া, তাহার নয়নকোণ অধরে স্পর্শ করিয়া বলিল—"সত্যি ব'লচি, চোখ দুটি অবিকল তোমার মত।"

শিশুটি এই সুযোগে বাপের পকেটস্থ মনিব্যাগটি নিজের অল্পায়ত আঙুলের দ্বারা যতটা সম্ভব বাগাইয়া ধরিয়াছিল, একটা টান দিয়া সেটাকে মুখে পুরিবার চেষ্টা করিল। সুহাস হাসিয়া বলিল, "বাপের ওপর ডাকাতি হচ্চে ?" বলিয়া কন্যাকে স্বামীর বক্ষে তুলিয়া দিয়া বলিল—"এই নাও, বমালসুদ্ধ ডাকাত ধরে দিলাম—বকশিস।"

সর্ব্বাণী কন্যাকে বুকে চাপিয়া চুম্বন করিল, সুহাসের অধরেও বকশিসের গোটাকতক নগদ মোহর দিল, তাহার পর কন্যার কোমলগণ্ডে নিজের মুখটা চাপিয়া বলিল—"আমার বুকের ওপর ডাকাতি বুঝি এই দুষ্টুর কাছে শিখেচিস ?"—বলিয়া সুহাসিনীর পানে একটা বক্রদৃষ্টি হানিল।

সুহাসও কি একটা জবাব দিতে যাইতেছিল, এমন সময় ভেজান দরজার বাহির হইতে কাংস-নিন্দিত স্বর উঠিল—"তা বলি জামাইবাবু এখন মা-ষষ্ঠীর কিরপেয় সুভালাভালি একটি ভেঙে দুটি হ'ল, আমাদের বকশিস..."

"তোর যে আর তর্ সয় না ঝি—কদ্দিন পরে দুটিতে এক জায়গায় হ'ল..."

কিন্তু ঝিয়ের কথায় যে বাধা দিল তাহারও বিশেষ যে তর সহিতেছিল এরূপ মনে হয় না, কারণ সে দুয়ার পর্য্যন্তও খুলিয়া হাসিতে হাসিতে ঘরে ঢুকিল এবং বলিল,—"আমাদের সব্বার বকশিস বাকী—মেয়ের বাপ হওয়া চাড্ডিখানি কথা নাকি ?..."

ঝি-ও হাসিতে হাসিতে তাহার অনুসরণ করিল। ঝি আসিতে সুহাস ঘোমটাটা কপালের নীচে নামাইয়া দিল।

সর্ব্বাণী একটু অপ্রস্তুত হইয়া পড়িল, তাড়াতাড়ি কন্যাকে বধূর কোলে তুলিয়া দিল। সুহাস একটু সরিয়া দাঁড়াইল।

সর্ব্বাণী কিশোরী শালীর পানে চাহিয়া বলিল—"ঠিক সময়েই এসেচ সুভাষ, আমি নগদ নগদই বকশিস দিতে সুরু ক'রে দিয়েচি,—তোমার দিদি ওর ভাগটা পেয়ে গেছে"—বলিয়া লজ্জিতা স্ত্রীর পানে চাহিল।

সুভাষ তাহার ভগ্নীকে ধরিয়া বসিল—"হ্যাঁ দিদি, কি পেয়েচ বল না—সত্যি বল না..."

সুহাস স্বামীর পানে একবার রাগিয়া চাহিল, চাপা গলায় ভগ্নীকে বলিল—"তোরও যেমন, কার সঙ্গে মুখ লাগিয়েচিস্—লোক চিনিস্ না ?"

সর্ব্বাণী স্ত্রীর মতের পোষকতা করিয়া বলিল—"খুব ঠিক কথা, সুভাষ, মুখটা চেনা লোকের সঙ্গেই লাগান ভাল। তবে কথা হচ্চে—আমিও অচেনা নয়, আর সে-রকম চেনা লোক তোমার হয়ও নি—"

সুভাষ বলিল—"আঃ, এসে পর্য্যন্ত খালি ইয়ারকি হচ্চে, খালি..."

সর্ব্বাণী ব্যস্তসমস্ত হইয়া বলিল—"দেখেচ, ভাগ্যিস্ মনে করিয়ে দিলে ! এখানে কোথায় একটু ধর্ম্মচর্চ্চা ক'রব, না...তা পূজোর জোগাড়-টোগাড় হয়েচে ?"

শালী সুযোগটুকু ছাড়িল না। বলিল—"ঠাকুর ত সামনেই রয়েচেন, নাও, গলবস্ত্র হয়ে প্রণাম কর, আমি মন্তর পড়াচ্চি..."

সুহাস রোষকষায়িত লোচনে বলিল—"মর্ পোড়ার-মুখী, তুইও এদিকেই যোগ দিলি ? কলিকালে কাউকেও

বিশ্বাস নেই। আমি কোথায় ইয়ারকি বন্ধ ক'রতে গেলাম…"

ঝি কালা; সে সকলের মুখপানে চাহিয়া মাঝে মাঝে আন্দাজে হাসিয়া যাইতেছিল, নেহাৎ স্ত্রীজাতি বলিয়া মাঝে মাঝে দু-একটা কথা বুঝিতে পারিলেও এসব রহস্যের কথায় যোগ দিতে পারিতেছিল না। "কলিকাল" কথাটি একটু কানে যাইতে তাহার একটা সুযোগ মিলিয়া গেল, বলিল—"কলিকাল ব'লে কলিকাল? ঘোরকলি? বলি হঁ্যাগা, সব পেরথোমে আমি কথা তুললুম, আর আমার বকশিসের কথাটাই চাপা পড়ে গেল? দুই বোনে সমস্ত বকশিস লুট করে নেবে ভেবেচ?—তা হবেনি বাছা।…এস ত খুকুমণি আমরাও দুজনে বাপের ওপর জুলুম করি।"

সুভাষ হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল, বলিল—"ঠিক হয়েচে, না দেন ত জোর করে কেড়ে নে ঝি, হক্ পাওনা ছাড়িস্ নি…"

সুহাসও ঘাড় বাঁকাইয়া মুখে আঁচল গুঁজিল। সর্ব্বাণী অপ্রতিভভাবে মুখ নীচু করিয়া মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল।

খুকী ঝাঁপাইয়া মার কোল হইতে ঝিয়ের কোলে আসিয়া বাপের দিকে চাহিয়া বলিল—"ডু ডু"—সকলে আবার হাসিয়া উঠিল।

খুকীর কথার পুঁজি অল্প হওয়ায় ঝি সবগুলাই ঠোঁট-নাড়ার ভঙ্গিমাতেই বুঝিয়া লইতে পারিত। হাসিতে যোগদান করিয়া বলিল—"না রে খেপী, জুজু নয়, বাবা, এই ত কোলে উঠেছিলি; বাবা চুমো খায়, গয়না দেয়… ওমা, সত্যিই ত! কই পেরথোম মেয়ে মুখদেখানি সোনাদানা কই? আর তোমরাও ত আচ্ছা মা-মাসী বাপু, তেহনথে নিজের কথাই পাঁচকাহন করচ, মেয়েটা কথা কইতে জানেনি ব'লে আর সে নিজের নেয্য পাওনা পাবে নি গা!…

সুভাষও যোগ দিল—"তাই ত! আমি ভেবেচি দিদি প্রথমে এসেচে, নিশ্চয় আদায় ক'রে রেখেচে।… তুই যে ভাই বরের সুন্দর মুখ দেখে মেয়ের কথাও ভুলে ব'সে থাকবি এ কেমন ক'রে জানব?"

সুহাসের দেওয়ার মতন কোনো জবাবদিহি ছিল না। আসল কথাই হইতেছে—শেখান থাকিলেও সে অনেক দিনের পর স্বামীকে দেখিয়া আদায়ের কথা ভুলিয়া গিয়াছিল। সর্ব্বাণীর ইঙ্গিতমত পকেট হইতে চামড়া দিয়া মোড়া একটা কৌটা আনিয়া তাহার হাতে দিল। সর্ব্বাণী বোতাম টিপিয়া কৌটাটা খুলিয়া একটু লজ্জিত-ভাবে সুভাষের হাতে দিল। মাঝখানে একটি পাথর-বসান লকেটযুক্ত একগাছি সোনার হার।

সুভাষ উৎফুল্লভাবে খুকীর গলায় পরাইয়া একটু দূরে সরিয়া হাততালি দিয়া উঠিল, বলিল—"কি চমৎকার মানিয়েচে দেখ দিদি। বোসজা-মশাই, তোমার পছন্দ আছে, আমি পরোয়ানা দিলাম।…বল, তা'ত আছেই, তা না হ'লে কি সুন্দর মুখ দেখে মেয়ের জন্যে যত্ন ক'রে আনা গয়নার কথাটা এমন বেমালুম ভুলে যেতে পারি? —হি-হি-হি…"

ঝিও আহ্লাদের চোটে খুকীকে বুকে চাপিয়া একমুখ হাসিয়া হারটা পরীক্ষা করিতে লাগিল। সর্ব্বাণী আর সুহাস, দুজনেই লজ্জায় ঘাড়টা নীচু করিয়া আড়চোখে সন্তানের বর্দ্ধিত শ্রী নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। সুভাষ খুকীকে কোলে লইয়া সংবাদটি বাড়িতে রাষ্ট্র করিতে ছুটিল। ঝিও অনুসরণ করিল।

খানিকক্ষণ ঘরটি নিস্তব্ধ হইয়া রহিল, শেষে সুহাসই কথা কহিল,—অনুযোগের স্বরে ঘাড় বাঁকাইয়া বলিল— "দেখ ত, মিছে আমায় অপ্রস্তুত করালে।"

সর্ব্বাণী তাহার কাঁধে হাত দিয়া বলিল—"সরে এস, কেন বল ত?"

"এনেছিলে ত আগে হারটা বের ক'রে দিলেই হ'ত। ঠাট্টার চোটে আমায় কি আর কেউ টেঁকতে দেবে? ঐ শুনলে ত সুভাষীর কথা? ঠোঁটে ক্ষুরের মতন ধার, তোমায়ও ত বাদ দিলে না।"

"কই আর বাদ দিলে? তবে ক্ষুর জিনিষটা আমার মুখে লাগান অভ্যেস আছে, আর যত ধার হয় ততই যেন মোলায়েম।"

সুহাস রাগিয়া বলিল—"ইয়ারকি নয়, মিথ্যে কথা ক'রে এখন তোমার সম্বন্ধে [illegible] করে।"

"মিথ্যে কথাটা বুঝি ইয়ারকির বাইরে হ'ল?…তা কি বলতে হুকুম হয়?"

"বলবে আমি তোমায় বলতে ভুলিনি। তুমি নিজেই —নিজেই…"

"—শুনতে ভুলে গিয়েছিলাম? বেশ তাই বলব।"

সুহাস জ্বালাতন হইয়া বলিল—"আঃ তা কেন। বলবে—বলবে—আঃ বল না, কি বললে ভাল হবে; আমার মাথায় আসচে না…"

সর্ব্বাণী বিপর্য্যস্ত ক্ষুদ্র মাথাটি বুকের কাছে টানিয়া লইল। মুখ নত করিয়া বলিল—"আমায় বললে তার উত্তর দেব'খন; তোমায় জিজ্ঞাসা ক'রলে ব'লো…"

সুহাস উৎগ্রীব হইয়া কহিল—"হ্যাঁ…"

"ব'লো এর পরেরটির বেলায় আর ভুল হবে না—" বলিয়া আদরে মুখটি চাপিয়া ধরিল।

"ধ্যাৎ!" বলিয়া সুহাস লজ্জায় তাহার বুকে আরও এলাইয়া পড়িল। এমন সময় ভেজান দরজায় আঘাত করিয়া তাহার বোন প্রশ্ন করিল—"আসতে পারি?"

দূতের যাত্রা

দু'টা দিন এই রকমে হাসি-তামাসা, মিলন-সোহাগের মধ্যে লঘুভাবে কাটিয়া গেল। সকলে ধরিয়া বসিয়াছে—খাওয়াইতে হইবে। তাহারই আয়োজন চলিয়াছে। কর্ম্মকর্ত্তা সুভাষ, তাহারই হাতে টাকা। সর্ব্বাণী প্রীতিভোজে প্রথমে একটু মৌখিক আপত্তি জানায়; পরে, টাকা দেওয়ার সময়, যাহাতে অনুষ্ঠান আয়োজনে কোনো ত্রুটি না হয় সেজন্য শ্যালিকাকে মিনতি জানাইয়া বলে—ধনমান তোমারই হাতে সমর্পণ করলাম, সুভাষ, দেখো।

এদিকে আপিসে শ্বশুর-মহাশয় বিষম উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িয়াছেন। আজকালকার ছেলে নিজের স্বার্থ বোঝে না, কেবল ফুর্ত্তির দিকেই নজর। তাহাতে আবার বাড়ির মেয়েছেলেরাও হইয়াছে অবুঝ, কোথায় বুঝাইয়া সুঝাইয়া জামাইকে একদিন পূর্ব্বেই কার্য্যক্ষেত্রে পাঠাইয়া দিবেন না, সব জামাইয়ের [illegible] দল পাকাইতে ব্যস্ত। ওদের আস্কারা পাইয়া ত সেবার তিন দিন ছুটির ওপর সাত দিন এক্‌স্‌টেন্‌সন্ লইল।

এদিকে সাহেবের চিঠি আসিয়াছে, সে ১৬ তারিখে পৌঁছিবে। আর দিন-আষ্টেক বাকি। বড়বাবু একটা টেলিগ্রামের ফরম উঠাইয়া লইলেন, ঠিকানার জায়গায় লিখিলেন—Dr. Sarbani Bose Ph.D. Sadardihi Sadwali. তার পর অনেকক্ষণ ভাবিয়া নীচে আরম্ভ করিলেন—Burra Saheb এই পর্য্যন্ত লিখিয়াই কলম তুলিয়া আবার ভাবিতে লাগিলেন। একটু পরে নিজের মনেই বলিলেন—না, বাবাজী ভাববেন শ্বশুর ব্যাটা আচ্ছা চামার ত—না-পৌঁছিতেই তাগাদা লাগিয়েচে।…ডাকিলেন—"বেয়ারা!"

বেয়ারা আসিয়া হাজির হইল।

"টাইপিষ্ট বাবুকে ডাক্ একবার। আছে, না সিগারেট টানতে বেরিয়েচে?"

বেয়ারা টাইপিষ্ট বাবুকে সঙ্গে করিয়া দিয়া গেল। সর্ব্বাণীর সমবয়সী এবং বন্ধুও। একটু অন্যমনস্ক হইলেই দুই হাতের আঙুলগুলা টাইপ করার ভঙ্গীতে নাচিতে আরম্ভ করিয়া দেয়।

বড়বাবু বলিলেন—"তুমি বাবু টেবিল থেকে একটু সরে দাঁড়াও, তোমার আঙুলগুলো যেন স্বপ্ন দেখে—সেদিন অত বড় চেয়ারটা উল্টেই দিলে। সায়েব আসচে সে খবর রাখ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, শুনেচি আট দিন …"

"হয়েচে, এই রকম হিসেব নিয়েই চাকরি করেচ। আট দিন নয়, ঠিক আটটি ঘণ্টা ধরে রাখবে, বুঝলে?—সেই যে ঝুনো ব্রাহ্মণ চাণক্য ব'লে গেছে—গৃহীত ইব কেশেষু মৃত্যুনা ধর্ম্মমাচরেৎ—সেটি কক্‌খনো ভুলো না। চাকরিই হ'ল ধর্ম্ম রে বাবা। সর্ব্বদা গেলুম গেলুম, ভাবটি মনে বজায় রেখে যাওয়া চাই।…ওদিকে বন্ধুটি ত শ্বশুরবাড়ি গিয়ে তোফা ফুর্ত্তি মারচেন, তাঁর হিসেবে বোধ হয় আট মাস হবে। কবে আসবে চিঠি পেয়েচ? এবারে কতদিন এক্‌স্‌টেন্‌সন্ নেবেন? যাবার সময় তোমায় ব'লে গেছেন?"

"আজ্ঞে না।"

"বলেচে, তুমি ঢুকুচ্ছ।·· টেলিগ্রামের ফর্মটা তুলে নাও দিকিন। তোমাদের দু-জনকে বাঁচাতে বাঁচাতে আমি এদিকে ঘোর মিথ্যেবাদী হয়ে উঠলাম।···লেখ Burra-Saheb returned from Bath—angry—wants you at once (বড় সাহেব বাথ হইতে ফিরিয়াছেন—ক্রুদ্ধ—শীঘ্র এস) হয়েছে? নীচে তোমার নাম দিয়ে দাও—এইজন্যে তোমায় ডাকা। আমার জবানি দেওয়াটা ভালও দেখায় না, আর বাবাজী গা-ও করবেন না, ভাববেন শ্বশুর-বেটা ভাঁওতা দিচ্চে। হ্যাঁ, ওটা much angry (অতিশয় ক্রুদ্ধ) করে দাও বরং।"

টাইপিষ্ট আমতা আমতা করিয়া বলিল, "much কথাটা ঠিক বসে না; very লিখে দোব?"

"বসে না মানে?"

টাইপিষ্ট সেই রকম ভাবে বলিল—"আজ্ঞে, বোধ হয় গ্রামারে আটকায়··"

"আটকাগ্, কথাটায় জোর আছে—বেশ আঁটো-শাঁটো কথা—very ও-রকম তাগাদা দিতে পারবে না। ভ অক্ষরটাই কি রকম ঢিলেঢালা দেখ্‌চ না?—যেন শুকনো ছাতুর মত।··· কই, আমাদের সময়ে ত গ্রামারের এরকম উপদ্রব ছিল না!···নাও, লিখে দাও। আগে বাপধন আমার ছটফটিয়ে ফুর্ত্তি ছেড়ে আসুন ত, পরে সামলে নেওয়া যাবে'খন।···আর মেয়ের মুখ দেখা তো হ'ল রে বাপু,—যার জন্যে এত ধড়ফড়ানি, কি বল?···বেয়ারা!

এই টেলিগ্রামটা দিয়ে আয়। সমস্ত দিনটা কাটিয়ে আসতে পারবি ত?"

পথের মাঝে

সিহুঁরালির পোষ্ট এবং টেলিগ্রাফ আপিস সদর-ডিহিতে—চার ক্রোশের ধাক্কা!

পোষ্টমাষ্টার ভবানীশঙ্করবাবু নির্ঝঞ্ঝাট প্রকৃতির লোক। বরাবর লেখালেখি করিয়া ভিড় হইতে সরিতে সরিতে শেষ বয়সে এই নিরিবিলি জায়গাটিতে আসিয়া বসিয়াছেন। সকালে খান-চল্লিশেক চিঠি আমদানি আর দুপুরের ঝোঁকে খান-চল্লিশেক পাঠানো—কাজ মোটামুটি এই। ইহার উপর কোনদিন যদি একটা মনিঅর্ডার এল, কি গেল, কি একখানা টেলিগ্রামের হাঙ্গাম পড়িল ত ভবানীশঙ্কর গর গর করিতে থাকেন—"পরের হ্যাপা সামলাতে সামলাতেই জীবনটা গেল।: শেষ বয়সটাতেও নিরিবিলিতে একটু আফিম সেবা করে কাটাব তা আর হ'তে দিলে না ব্যাটারা; সমস্ত জীবনটা ত নাকে দড়ি দিয়ে খাটিয়ে নিলি রে বাপু, আর কেন?···"

আজ খানিকটা পাটনেয়ে আফিম সওগাত পাওয়া গিয়াছিল। কিন্তু এমনি অদৃষ্ট যে, তোয়াজ করিয়া আর খাওয়া হইল না। সমস্ত ভূ-ভারতের কাজ আজ সদরডিহিতে আসিয়া জড় হইয়াছে যেন। সকালের ঝোঁকে তিনখানা রেজেষ্টারি, একখানা টেলিগ্রাম পাঠানো—তখনকার জমাট নেশা ঐতেই উবিয়া গেল। দুপুরে একখানা মনিঅর্ডার! ঠিক যখন মৌতাতটি জমিয়া আসিতেছে।·· কেন আর মনিঅর্ডার করবার দিন ছিল না, না সময় ছিল না? সাত ব্যাটার সাধ্যসাধনা করিয়া একটু ভাল জিনিষ যদি যোগাড় করা গেল ত কেবলই ঝগড়া, একটু নিশ্চিন্ত হইয়া যে তার লইবে মানুষে, তাহার উপায়টি নাই···

ভবানীশঙ্কর ঈষৎ জড়িতকণ্ঠে হাঁক দিলেন—"গুপী-কেষ্ট, বলি, আছিস না গেছিস রে?"

"এই যে ঠাকুরমশায়" বলিয়া গুপীকেষ্ট সামনেই টেবিলের আড়াল হইতে সট্ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। সে একাধারে পিয়ন, ষ্ট্যাম্প ভেণ্ডর, সর্টার, পোষ্টমাষ্টার বাবুর 'বামন', আর অনেক কিছু। ভবানীশঙ্কর একটু চমকিয়া উঠিয়া বলিলেন—"হঠাৎ এমনি করে দাঁড়িয়ে ওঠে লোকে!···কোথায় যে থাকিস, তখন থেকে ডেকে ডেকে হয়রান হলাম ···"

গুপীকেষ্টর অভ্যাস হইয়া গিয়াছে, এসব কথার আর জবাব দেয় না।

"—একটু দেখিস বাবা, আর যেন কোনো ব্যাটা এসে না জ্বালাতন করে। বলিস "মাষ্টার-মশায়ের শরীরটা খারাপ

খারাপ, কাল তখন এসে কাজ ক'রে নিয়ে যাবেন। আমি একটু চেখে দেখি জিনিষটা কেমন দিলে; কেনই যে আমায় দেয় সব খাতির করে; বলে মরবার ফুরসৎ নেই। একটু মিষ্টি কথায়ই বলিস্, না হ'লে আবার বিনি খরচার নালিশ ক'রে দেবে…"

কুয়াশার ওপর কুয়াশার মত নেশাটি বেশ গাঢ় হইয়া আসিয়াছে। গুপীকেষ্ট একটি লোককে খানিকটা বচসা করিয়া সরাইল। ভবানীশঙ্করের অভিভূত ইন্দ্রিয়ের কাছে বোধ হইল গুপী যেন একটা ফৌজকে কথার তোড়ে হটাইয়া দিল। মুখে একটু হাসি ফুটিল, মনে মনে বলিলেন—"সাবাস ব্যাটা!" এমন সময় টেলিগ্রাফের যন্ত্রে শব্দ হইল, টকাটক-টেরে-টকটক'। ছয় দিন পরে দিন বুঝিয়া ঠিক আজই!

"বলে—'কপালে নাইক ঘি, ভাঁড় চাঁচলে হবে কি?' দেখলি গুপী, ব্যাটাদের আক্কেলখানা?…হ্যাঁ, হাঁা, যাচ্ছি, আর সবুর সয় না" বলিয়া ভবানীশঙ্কর অর্দ্ধনিমীলিত নেত্রে মন্থর গতিতে গিয়া যন্ত্রে বামহস্তের আঙুল দিয়া বসিলেন ও দক্ষিণ হস্তে লিখিতে লাগিলেন—Doctor Sarbani Bose PHD—শেষের অক্ষর তিনটের দিকে চাহিয়া বলিলেন—"কি রকম হ'ল?—ফ্যড্!…তারে আর একবার জিজ্ঞাসা করিলেন, একই উত্তর পাইয়া বিরক্ত-ভাবে বলিলেন—"মরুক গে; ফ্যড তো ফড্ই, বলে যদ্দৃষ্টং তল্লিখিতম্—আমার কিসের মাথাব্যথা?…

লিখিয়া চলিলেন—Sadardihi Suidurali—Burra-Saheb returned from Bath muc—hangry—ভবানীবাবু ওদিকে থামিতে সঙ্কেত করিয়া মনে মনে বলিলেন— 'মাক্ মাক্ এ কি রকম হ'ল! আবার হ্যাংরি কিরে বাবা! রিপিট করিতে বলিলেন—বিরক্ত ভাবে ফাঁক ফাঁক হইয়া অক্ষরগুলা বাজিতে লাগিল m-u-c-h-a-n-g-r-y—

ভবানীশঙ্করের নেশায় আচ্ছন্ন মগজে একবার হঠাৎ যা বসিয়া গিয়াছিল, এই নিঃসম্পর্ক আলাদা আলাদা অক্ষরে সেটা আরও বদ্ধমূল হইয়া গেল। "দুত্তোর, যত গরজ যেন আমারই" বলিয়া লিখিলেন, wants you at once—Binode—শেষ হইল।

সমস্তটা ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া দুই তিনবার পড়িলেন। শেষে নেশার ধোঁয়া ভেদ করিয়া মুখে যেন একটু জ্ঞানের দীপ্তি ফুটিয়া উঠিল। hangry কথাটা নিজের বুদ্ধিমত একটু বদলাইয়া দিয়া বলিলেন—তাই ত বলি টেলিগ্রাম নিয়ে মাথার চুল পাকালাম, আর আজ এই একটি সামান্য লাইনের মানে বুদ্ধি এড়িয়ে যাবে—Burra Saheb returned from Bath muc hungry wants you atonce —Binode

"বুঝলে গুপী? বড়সাহেব নেয়ে এসে ক্ষিধেয় চোখে কানে দেখতে পাচ্ছেন না, তাই ডাক্তারকে তার করা হচ্ছে, শীগ্‌গির চলে এস।…একে বলে তড়িবৎ। সাধ ক'রে কি বলে সাহেবের কুকুর হওয়াও ভাল?…আর আমি অভাগা একটু তোওয়াজ করে একরত্তি আফিম সেবা করব সমস্ত দিনে তার ফুরসৎ হয়ে উঠল না"

তারপর নিজের মনে বলিতে লাগিলেন—"এটা কি? এম. ইউ. সি—মাক্—মাক্—কই 'মাক্,' ব'লে কোনো কথা কখনও শুনিনি ত! তবে কথাটা বেশ যেন জোরালো গোছের—মাক্ হাঙ্গরি! যেন খাই খাই করচে! মরুক গে, মানে ত দিব্যি বেরিয়ে এসেচে, কথায় বলে 'ভাষাসমুদ্র'—কটা কথাই বা জানি আমি? বিদ্যে ত ফোর্থ ক্লাস পর্য্যন্ত।

গুপীকেষ্টকে বলিলেন—"সিঁদুরালির বিট্ কাল না? যাস্, আনা দুয়েক ট্যাকে আসবে। আমার মাঝে পড়ে ভরিখানেক মাল স্রেফ নষ্ট সকাল থেকে—আর মালের সেরা মাল গো!…

একটুর মধ্যে আবার নিঝুম হইয়া পড়িলেন।

ভগ্নদূত

বাড়িটি আনন্দের কলরবে মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে—আজ প্রীতিভোজ। সুভাষ আর সর্ব্বাণীর শালাজের সকাল থেকে আর ফুরসৎ নাই,—মাঝে মাঝে সর্ব্বাণীকে ঠাট্টা বিদ্রূপে জর্জ্জরিত করিয়া যাওয়ার অবসরটুকু ছাড়া। সুহাস লজ্জায় গরবে অলসগতি হইয়া এখানে-ওখানে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, কখনও সখীদের সহিত খানিকটা গল্প করিল,

কখনও ছেলেমেয়েদের সাজগোজে মন দিল। একবার গিয়া রান্নাঘরে উঁকি মারিল। বৌদিদি লুচি ভাজিতেছিল, ব্যালনটা থামাইয়া বলিল—"ও মা, তুমিও চলে এলে ঠাকুরঝি? ঠাকুরজামাইকে দেখবে কে? আমরা সব এদিকে ব্যস্ত, তোমার ভরসাতেই চলে এসেচি···"

সুহাস আব্দার অভিমানের সুরে বলিল—দেখ্‌চ মা, তোমার বৌকে?"

তিনি কড়ায় খস্তি নাড়িতে নাড়িতে বলিলেন—তোমরা কেন বাপু ওর পেছনে লেগেছ?"

ঝিয়ের আজ সবচেয়ে পায়া ভারী। সে গয়না গোট পরা খুকীকে কোলে লইয়া সকলেরই কৌতূহলের কেন্দ্র হইয়া উঠিয়াছে এবং খুকীর বাপ এবং বাপের বাড়ি কলিকাতা নগরী সম্বন্ধে বিস্ময়কর কাহিনী সব বিবৃত করিয়া সকলের কৌতূহল দশগুণ বাড়াইয়া তুলিতেছে। তাহার উপর আবার কেহ তাহার কথা শুনিতে পাইতেছে না, এই ধারণার বশে দশগুণ চীৎকার করায় সে একাই বাড়িটা দশগুণ গুলজার করিয়া তুলিয়াছে।

এর ওপর আছে ছেলেমেয়েদের হট্টগোল, বাড়িটিতে আনন্দ যেন উছলিয়া উঠিতেছে।

এমন সময় সুখের এই ঐকতানের মধ্যে একটা বেসুরা আঘাত দিয়া বাড়ির সরকার মহাশয় রান্নাঘরের সামনে আসিয়া ডাকিলেন—"মা আছেন?"

তাঁহার মুখের ভাব দেখিয়াই যে যেমনভাবে কাজ করিতেছিল, সে সেইভাবেই নিশ্চল হইয়া গেল। গৃহিণী বিবর্ণমুখে প্রশ্ন করিলেন—"কি সরকার-মশায়, খবর ভাল'ত?"

"হ্যাঁ।···আপনি একটু বাইরে আসুন, সদরের পানে।···তোমরা কাজ কর মা, কোনো ভাবনার কথা নয়।"

গৃহিণী হাত ধুইয়া কাপড়ে হাত মুছিতে মুছিতে বাহিরের দিকে চলিলেন। যাহাদের সান্ত্বনার কথা বলা হইল তাহারা বিহ্বলভাবে পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করিতে লাগিল। একটা নিরিবিলি-গোছের জায়গায় আসিয়া সরকার মহাশয় উদ্বেগকম্পিত হস্তে ফতুয়ার পকেট হইতে একটা টেলিগ্রামের বন্ধ খাম বাহির করিয়া শুষ্কমুখে বলিলেন—"হঠাৎ এই এক টেলিগ্রাম এল মা।"

কথাটা শেষ না হইতেই—"ওমা সে কি গো!" বলিয়া গৃহিণী ব্যাকুলভাবে সরকার মহাশয়ের মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন। "কার নামে সরকার-মশাই? আমার যে ভয়ে পেটের ভেতর হাত পা সেঁদিয়ে যাচ্চে!"

সরকার-মহাশয় তেমনিভাবে বলিলেন—"জামাইয়ের নামে মা,—এই আনন্দের দিনে বিনা মেঘে এই বজ্রাঘাত—কি যে শুনতে হবে কিছুই আন্দাজ করতে পারচি না; আমার ত বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পেয়েচে। ভট্টচায্যি মহাশয়ের কাছে লোক দৌড় ক'রে দিয়েচি, এসে একটা লগ্ন দেখে বলুন। সে ওদিক থেকে ঈশেন-মাষ্টারকেও ডেকে আনবে। একটা ভাল সময় দেখে খুলে পড়ুক্, তার পরে যেমন্ হয় করা যাবে। জামাইকে আর এখন দেখান উচিত নয়। কি অক্ষণে কুক্ষণে যাত্রা করেচেন যে···আজকালকার ছেলে···"

"যা ক'রে ফেলেচেন তার ত চারা নেই, সরকার-মশাই; এখন মা মঙ্গলচণ্ডী রক্ষে করেন ত রক্ষে। দোহাই মা, ষোল আনার পূজো দোব, দেখো যেন···"

এমন সময়, যে ভট্টাচার্য্য এবং ঈশান-মাষ্টারের খোঁজে গিয়াছিল সে আসিয়া খবর দিল—ভট্টাচার্য্য ভিন্ গাঁয়ে গিয়াছেন, ঈশান-মাষ্টার একটু পরে আসিতেছে।

গৃহিণীর চক্ষু ছল ছল করিয়া উঠিল। ভট্টাচার্য্যের অনুপস্থিতি যে ভয়ানক একটা দুর্লক্ষণ তাহাতে সরকার-মহাশয়েরও কোনো সংশয় রহিল না। খানিকক্ষণ কোনো সান্ত্বনাই দিতে পারিলেন না। তাহার পর বলিলেন—"কাজটুকু আজ হয়ে যাক মা, কাল খোলাই ভাল হবে। আপনি বুক বেঁধে থাকুন একটু—না হ'লে সব পণ্ড হবে। আমি গোবিন্দজীউর পায়ে ঠেকিয়ে খামটা বাক্সয় তুলে রাখচি আজ।"

নিরুপায়, তাহাই স্থির হইল। ভাল করিয়া চক্ষু মুছিয়া গৃহিণী একেবারে রান্নাঘরে গিয়া প্রবেশ করিলেন। খালি বৌ আর সুভাষই ছিল, আসন্ন বিপদের কথা তাহারা শুনিল।

ভয়ের ছোঁয়াচ তাহাদের মনেও সংক্রামিত হইয়া

গেল। সুভাষ একটু পরে কিন্তু বলিল—"আচ্ছা, ভাল খবরও ত থাকতে পারে।"

মা বিরক্ত হইয়া বলিলেন—"ছেলেমানষী রাখ সুভাষী, তারে না-কি আবার ভাল খবর আসে। শুনলে গা জ্বলে যায়। অমুঙ্গুলে খবর দেবার জন্যেই কোম্পানী ওটা ক'রেচে—আকাশের বাজ টেনে!"

সুভাষ একটু ভয় কাটাইয়া উঠিয়াছে, বলিল—"কেন, সেবারে দত্তদের মেজ ছেলের পাশের খবর ত টেলিগ্রামেই এসেছিল…"

মা ধমক দিয়া উঠিলেন—"ছেলেটা শেষ পর্য্যন্ত বাঁচল? আর জ্বালাসনি বাপু, আজকাল মেয়ে সব যেন ধিঙ্গি হয়েচিস। তুমি গিয়ে যেন আজ কথাটা জামাই-বাবুর সামনে পেড় না।…গা-জুরি কথা শুনচ বৌমা?"

তিনিও ছুই তিনটি সন্তানের মা, মানৎ করিতে করিতে বুকের সাহস অনেকটা কমিয়া আসিয়াছে। বলিলেন—"কে জানে, মা। আমার ত সব গুলিয়ে যাচ্ছে; তবে সুহাস ঠাকুরঝিকেও শুনিয়ে কাজ নেই বাপু, আজকের দিনটা যাক্।"

সেদিনটা গেল। উৎসবের উপর ছুইখানি বিষণ্ণ মুখের ছায়া পড়িয়া রহিল। সর্ব্বাণী, সুহাস কাহারও মনে কিন্তু কোনো সন্দেহ জাগিবার অবসর হইল না। সুভাষ, তাহার বয়সের গুণেই বোধ হয়, কাল্পনিক ভয়কে অতটা আমল না দিয়া আমোদটা সাধ্যমত সজীব রাখিল।

তাহার পরদিন ভট্টাচার্য্য আসিয়া পাজি দেখিল এবং তিনচারখানি ভয়ত্রস্ত মুখের অনবরত দেব-দেবীদের নামোচ্চারণের মধ্যে ঈশান-মাষ্টার তিনবার কপালে ঠেকাইয়া খামটা খুলিয়া টেলিগ্রামখানি পড়িল। প্রথমে মনে মনে পড়িয়া গম্ভীরভাবে বলিল—"আমরা রাক্কস নাকি!" বলিয়া আবার পড়িতে লাগিল।

গৃহিণী আধ ঘোমটার আড়াল হইতে অর্দ্ধস্ফুটভাবে বলিলেন—"সরকার-মশাই, শীগ্‌গির ব'লতে বলুন না—আমার যে হাত-পা কাঁপচে—ও-কথা কেন বললেন উনি।"

ঈশান-মাষ্টার বলিল—"নতুন বৌ, মানে করলে ত এই হয় যে—বড় সায়েব নেয়ে এসে বেজায় ক্ষুধিত হয়ে প'ড়েচেন, তোমায় এক্ষুনি চান—তারের একটা কথার শেষের অক্ষরটা ওঠেনি—ও-রকম হয়ে থাকে—টেলিগ্রাফ আপিসের বিদ্যে কি-না…তার ক'রচে কে একজন বিনোদ। কিন্তু এ-রকম লেখার উদ্দেশ্য ত বুঝতে পারচি নি বাছা—ভূত নয়, রাক্কস নয়…"

কথাটা শেষ না হইতেই গৃহিণী শিহরিয়া উঠিলেন—আতঙ্কে চোখ ছুটা বড় বড় করিয়া বলিলেন—"ও মা, সেকি গো, কি অলক্ষুণে কথা! নেয়ে এসে ক্ষিদে পেয়েচে, তোমায় এক্ষুনি চান? শুনলে যে গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে মা, কি হবে? রাক্কসের হাত, ক্ষিদে পেয়েচে শোর গরু গেলো না বাপু বাকড় ভরে। ও সরকার-মশাই, একি অনর্থ? আর কারোর বিষয় কিছু লেখেনি?"

ঈশান-মাষ্টার লেখার পানে চাহিয়া খুব বুঝিবার চেষ্টা করিতেছিল, বলিল—"না, কই কর্ত্তার বিষয় ত কিছুই লিখচে না।"

গৃহিণীর চক্ষু ছুইটি জলে ভরিয়া আসিল। মুখ ফিরাইয়া আঁচলে মুছিয়া বলিলেন—"একি এক সর্ব্বনেশে তার এল মা?" শাশুড়ীর অবস্থা দেখিয়া পুত্রবধূও অশ্রুসংবরণ করিতে পারিল না। সুভাষ শুধু চিন্তিতভাবে বলিল—"কি রকম যেন খাপছাড়া কথাগুলো। তার আসতে কিছু ভুল হয়নি ত?"

মা ধমক দিয়া উঠিলেন—"তুই ক্ষেমা দে দিকিন, বাছা। তোর নিজের কথাগুলোই শুধু বাঁধনসই, আর সবই খাপছাড়া। বলে তারে কোম্পানীর রাজত্বটা চ'লচে।…আমার একটা কথা মনে নিচ্ছে সরকার-মশাই—সায়েব পাগল হয়ে দৌরাত্ম্যি ক'রচে না ত? উনি প্রায়ই বলেন—ঠাণ্ডা দেশের লোক, একটুতেই মাথা গরম হয়ে ওঠে, হিতাহিত জ্ঞান থাকে না। তাই বাড়াবাড়ি হয়নি ত?"

ভট্টাচার্য্য, ঈশান-মাষ্টার, সরকার-মশায়, সবাই একসঙ্গে বলিল—"সম্ভব।"

ভট্টাচার্য্য বলিল—"আমার প্রথম থেকেই যেন ঐ রকম সন্দেহ হচ্ছিল মা।"

গৃহিণী বলিলেন—"সন্দেহ নয়, ভট্‌চায্যি মশাই, ঐ

ঠিক। দেখচ না নেয়ে এসেও কি রকম আবল-তাবল লাগিয়েচে ? জামাইয়ের ওপর ঝোঁকটা বেশী। এখন ক'দিন আর গিয়ে কাজ নেই, কি জানি সামনে পেলেই কি একটা অনর্থ ঘটিয়ে ব'সবে। তুমি আপনি ওঁকে এক্ষুণি তার ক'রে দাও সরকার-মশাই, পত্রপাঠ চ'লে আসুন। না হয় নিকে দাও—আমি মরমর—এমন কিছু মিথ্যে কথাও নেকা হবে না। তারপর ঠাণ্ডা হ'লে শ্বশুর-জামাইয়ে আবার চলে যাবেন'খন। তদ্দিন ভাল ক'রে শান্তিসস্তেন ক'রে বাবা বুড়োশিবের পূজোটুজো দি।··· এক্ষুণি ঈশেন-মাষ্টার নিকে দিন। ··আমার যেন গেরোর ওপর গেরো আসচে—ভালয় ভালয় সবগুলিকে রেখে যেতে পারলে বাঁচি···"(চক্ষে অঞ্চল-প্রদান)।

ভট্টাচার্য্য কহিল—"হ্যাঁ, শান্তি-স্বস্ত্যয়ন একটা হওয়া দরকার।"

বধূ ফিস্ ফিস্ করিয়া শাশুড়ীর কানে কি বলিল। তিনি শঙ্কাকুল মুখে সরকার-মশাইকে বলিলেন—"বউ মা বলচেন, জামাই নাকি কালই যেতে চান। ছুটি ফুরিয়েচে। ব'লচেন নাকি এবারে কাজের বড্ড ভিড়। একদিনও বেশী থাকতে পারবেন না।—উপায় ?"

সকলে চিন্তিতভাবে চুপ করিয়া রহিল। একটু পরে সরকার-মশায় বলিলেন—"একটা উপায় আছে, মা। কিছু খরচ পড়ে যাবে কিন্তু।"

গৃহিণী বিরক্তভাবে বলিলেন—"প্রাণ নিয়ে টানাটানি, আর তুমি খরচের কথা ভাবচ সরকার-মশাই ? শ-দুশো যা লাগে—বল উপায় কি ?"

"শ-দুশোর কথা নয়, কিছু লাগবে। পোষ্ট আপিসের ছাপ দেওয়া একটা নকল তার জোগাড় ক'রতে হবে। যেন কর্ত্তা জামাইকে তার ক'রচেন—'তোমার এখন কয়েকদিন এসে কাজ নেই। আমি আসচি।'···ক'দিনের কথা লিখব ?"

গৃহিণী একটু আশ্বস্ত হইয়া বলিলেন—"মন্দ নয়। ভাগ্যিস তোমরা দু-তিন জন পুরুষমানুষ একত্তর হ'লে ! কথায় বলে—'পুরুষের বুদ্ধি'; আমি একা নারী যে কি করতুম।···একেবারে দশ দিনের কথা নিকে দাও—'দশ দিনে এসে কাজ নেই—আমি নিজেই আসচি।'

তুমি নিজের হাতে সব ঠিকঠাক ক'রে নিয়ে এসো। ওঁরা দু-জন কি বলেন ?"

ভট্টাচার্য্য এবং ঈশান-মাষ্টারও সম্মতি দিল।

সুভাষের লজ্জা নাই বলিতে হয়, কহিল—"তারটা জামাইবাবুকে একবার দেখিয়ে নিলে হয় না ?"

গৃহিণী জ্বলিয়া উঠিলেন, বলিলেন—"তোর ফোড়ন দেওয়ার জ্বালায় আমার মাথা মুড় খুঁড়ে মরতে ইচ্ছে হয় সুভাষী, কবে তোর বুদ্ধিসুদ্ধি হবে বল্ দিকিন ?··· খবরদার, জামাইয়ের কানে কি সুহাসের কানে যদি এর একবর্ণও ওঠে ত তোর আর কিছু বাকী রাখব না। এতগুলো লোক হ'ল মুখ্যু, আর উনি হাইকোর্টের জজ এসেচেন।···বড় সুখের খবর, না ?···উনি না আসা পর্য্যন্ত তোমরাও সব খবরটা চেপে রাখ বাপু।"





মুসলমান আমলে বঙ্গবাসিগণের বসন-ভূষণ ও প্রসাধন

মুসলমান বিজয়কাল হইতে তাহাদের রাজ্যশেষ পর্য্যন্ত বঙ্গবাসিগণের পরিচ্ছদাদি জানিবার পক্ষে বঙ্গসাহিত্যই প্রধান উপাদান। এইজন্য তাৎকালিক বঙ্গসাহিত্য হইতে পরিচ্ছদ ও প্রসাধন সম্বন্ধে যতদূর অবগত হওয়া যায় তাহাই লিপিবদ্ধ করিলাম—

১। নারীগণ—

(ক) ত্রয়োদশ শতাব্দী—

ধনবানের গৃহিণীরা হার, কেয়ুর, কঙ্কণ, নাকে বেসর ও পায়ে নূপুর পরিতেন এবং সধবা স্ত্রীলোকগণ মাথায় সিন্দুর দিতেন—

খসাইয়া ফেলে হার কেয়ুর কঙ্কণ।
অভিমানে দূর করে যত আভরণ॥
নাকের বেসর ফেলে পায়ের নূপুর।
পুছিয়া ফেলিল সবে সিথার সিন্দুর॥
(গোপীচাঁদের গীত)

(খ) চতুর্দ্দশ ও পঞ্চদশ শতাব্দী—

সধবাগণ সিঁথিতে সিন্দুর, বাহুতে বলয় ও শঙ্খ ও পায়ে নূপুর পরিত—

চঞ্চল নয়ন তোর সিসতে সিন্দুর,
বাহুতে বলয়া শোভে পাএতে নূপুর।
(শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন)

অঙ্গে কাঁচুলী ধারণ করিত, সাতেসরী নামক হার ও কেয়ুর ব্যবহার করিত—

কাঞ্চুলী ভাঙ্গিআঁ, তন বিগুতিল,
ছিঁড়ি সাতেসরী হারা (শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন ৩৮)

লোটন খোঁপা বাঁধিত ও তাহা পুষ্পমালা দ্বারা শোভিত করিত—

ললিত খোঁপাত শোভে চম্পকের মালা (শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন পৃঃ ২৭১)
কুসুম সুষম মুকুতা মাল
লোটন ঘোটন বাঁধিয়া—
(চণ্ডীদাসের পদাবলী।)

তাহারা রেশমের কাপড় পরিত ও কাঁখে কলসী করিয়া জল আনিতে যাইত।

কাখে ত কলসী করি বড়ায়ি তুলে
(শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন ২৫৯ পৃঃ)
নেত ধড়ি পরিধানে (ঐ পৃঃ ২৫৯)

তাহারা ললাটে তিলক, কানে কুণ্ডল, পায়ে মগর খাড়ু, কানে হীরকখচিত "খড়ি" বা কুণ্ডল ধারণ করিত, বাহুতে বাউটি, পদাঙ্গুলীতে পাসলী ব্যবহার করিত এবং আঙ্গুলে আংটি, হাতে সোনার বালা ব্যবহার করিত—

ললাটে তিলক যেহ্ন নব শশিকলা — শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন ৬৮
সবসলি লাগে মোর কানের কুণ্ডল ,, ৭৮
পাএর মগর খাড়ু মাথে ঘোড়া চুলে ,, ৭৯
কানের হীরা ধর কড়া ,, ১১২
হাথের বলয় নিলেঁ আঅর বাহুঠী ,, ১৩৪
কনক কঙ্কণ নিলেঁ আঅর আঙ্গুঠি। ,, ,,
বড় দুঃখ পাইল আহ্মে কাড়িতেঁ পাসলি ,, ,,

কন্যার গাত্রে পিঠালী লিপ্ত করিত এবং তোলা জলে স্নান করাইত—

হরিদ্রা মাথায় চারি বরে কুতুহলে।
অঙ্গেতে পিঠালী দিল সখীরা সকলে॥
কৃত্তিবাসী রামায়ণ

কন্যার মস্তকে আমলকী দেওয়া হইত ও কেশে চিরুণী দেওয়া হইত—

সখী দেয় সীতার মস্তকে আমলকী (কৃত্তিবাসী রামায়ণ)
চিরুণীতে কেশ আঁচড়াইয়া সখীগণ (ঐ)

সধবাগণ কপালে তিলক ও সিন্দুর পরিত, নাকে বেসর, গলায় হার, উপর হাতে তাড়, কর্ণে কর্ণফুল, বাহুতে শঙ্খ ও শঙ্খের উপর কঙ্কণ, পায়ে নূপুর, বুকে কাঁচলী এবং পরিধানে পাটের পাছড়া ব্যবহার করিত—

কপালে তিলক আর নির্ম্মল সিন্দুর—কৃত্তিবাস
নাকেতে বেসর দিল মুক্তা সহকারে।
পাটের পাছড়া দিল সকল শরীরে॥
গলায় তাহার দিল হার ঝিলমিলি।
বুকে পরাইয়া দিল সোণার কাঁচলি॥
উপর হাতেতে দিল তাড় স্বর্ণময়।
সুবর্ণের কর্ণফুলে শোভে কর্ণদ্বয়॥
দুই বাহু শঙ্খেতে শোভিল বিলক্ষণ।
শঙ্খের উপরে সাজে সোণার কঙ্কণ॥
দুই পায়ে দিল তার বাজন নূপুর।
(কৃত্তিবাসী রামায়ণ)

এয়োরা মঙ্গল গাইতে আসিয়া পান, গুয়া, তৈল, সিন্দুর পাইত ও সধবাগণ পায়ে আলতা পরিত—

এয়ো এসে মঙ্গল গাইতে তারা সবে পান খাইতে
আর চাইবে তৈল সিন্দুরে। (বিজয়গুপ্ত)
পায়ের আলতা তোর না পড়িল ধূলি (ক্ষেমানন্দ)

খনি, পাটের শাড়ী, শঙ্খ, সোণার চুড়ি ও সিঁথিতে সিন্দুরের বদলে কাগের গুঁড়া মুসলমানেরা ব্যবহার করিত—

খনি বদলে দিব কাঁচা পাটের শাড়ী।
শঙ্খ বদলে দিব সুবর্ণের চুড়ী।
সিন্দুর বদলে দিব কাউগের গুড়ী॥ (বিজয় গুপ্ত)

তাহারা গায়ে চন্দন মাখিত, নয়নে কাজল দিত, কেশপাশে ফুল জড়াইত—

আগর চন্দন আঙ্গে মাখী।
কাজলে রঞ্জিল দুই আখী॥
ফুলে জড়ি বান্ধি কেশপাশে।
পরিধান কর নেত বাসে॥ (শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন)

(গ) ষোড়শ শতাব্দী—

স্ত্রীলোকেরা দোছুটি করিয়া বারো হাত শাড়ী পরিত—

দোছুটি করিয়া পরে বার হাত শাড়ী (কবিকঙ্কণ চণ্ডী)

তাহারা "গুয়ামুটি" নামক একপ্রকার খোঁপা বাঁধিত—

কবরী বাঁধিল রামা নাম গুয়ামুটি। (কবিকঙ্কণ চণ্ডী)

ধনী স্ত্রীলোকগণ মেঘডুম্বুর শাড়ী ও কাঁচুলী পরিত—

বাছিয়া পরয়ে মেঘডুম্বুর কাপড়।
কাঁচুলী পরিয়া মাতা বসিল দুয়ারে॥ (কবিকঙ্কণ চণ্ডী)

তাহারা কজ্জল পরিত, পিঠালী ও হলুদ মাখিয়া গায়ের ময়লা পরিষ্কার করিত, কুলুপিয়া ও শ্রীরামলক্ষ্মণ নামক শঙ্খধারণ করিত—

কজ্জল গরল নিশীথ প্রবল ধরসি কিবা কারণে॥
পিঠালী হরিয়া লয়্যা, খুল্লনারে বুলি চায়্যা,
করিতে অঙ্গের মলা দূর॥
দুইকরে কুলুপিয়া শঙ্খ।
কেমতে পুড়িল শঙ্খ শ্রীরাম লক্ষ্মণ॥ (কবিকঙ্কণ চণ্ডী)

স্ত্রীলোকেরা রক্তবস্ত্র পরিয়া, মাথার চুল এলাইয়া মঙ্গলবারে অষ্টমী, নবমী ও চতুর্দ্দশী তিথিতে মঙ্গলচণ্ডীর পূজা করিত—

পরিয়া লোহিতবাস, আকুল কুন্তলপাশ,
বেড়ি ফিরে দিয়া হুলাহুলি।
দেখিছি আপন চক্ষে কাগুরী কামাখ্যা মুখে
দেয় ওড়ফুলের অঞ্জলি॥

হীরা, নীলা, মতি, প্রবাল, কলধৌতসংযুক্ত অলঙ্কার, কণ্ঠমালা, কুণ্ডল, স্বর্ণচুড়ি, মুক্তার বেড়ী, সুবর্ণকাঁঠি, কনকশিকলি, নূপুর কিঙ্কিণী, মল ও বাঁকি, অঙ্গুরী, পাশলি, বালা, শাঁখা, অঙ্গদ প্রভৃতি অলঙ্কারের প্রচলন ছিল—

হীরা, নীলা, মতি, পলা, কলধৌত কণ্ঠমালা
কুণ্ডল কিনিল স্বর্ণচুড়ি।
পুবাতে জায়ার সাধ কিনিল পাটের জাদ
মণিময় মুকুতার বেড়ী॥
(কবিকঙ্কণ চণ্ডী)

বিচিত্র কপালতটি গলায় সুবর্ণ কাঁঠি
কটিতটে শোভে আর কনকশিকলি (ঐ)
পদযুগে মলবাঁকি করে ঝলমলি॥ ঐ
সুবর্ণ কিঙ্কিণী সাজে ঐ
রজত পাশলি ছটি ঐ
সর্ব্বাঙ্গে চন্দন পঙ্ক, অঙ্গদ বলয়াশঙ্খ ঐ
মাণিকের অঙ্গুরী। ঐ
মণিময় কাঞ্চন নূপুর॥ ঐ

নারীগণ শিরে তৈল দিয়া কবরী বাঁধিত, কপালে সিন্দুর দিত ও পরস্পরের মাথায় উকুন তুলিত।—

শিরে তৈল দিয়া তার বাঁধিল কবরী।
সরস সিন্দুর ভালে দিল সহচরী (কবিকঙ্কণ চণ্ডী)
মোর মাথায় গোটাচারি দেখহ উকুন। (ঐ)

তাহারা কুঙ্কুম, কস্তুরী, চুয়া মাখিত ও সুগন্ধি কুসুম ভালবাসিত। তাহারা কুঙ্কুমে মুখ মার্জ্জনা করিত—

কুঙ্কুম কস্তুরী চুয়া সুগন্ধী প্রসূন। ঐ
করতলে কুঙ্কুমে ও মুখ মাজই (গোবিন্দ দাস)

রমণীগণের আটটি প্রধান আভরণ ছিল। তাহারা নীলাম্বর পরিধান করিত—

…নীলাম্বর পরিল নূতন মেঘ ছটা॥
বিচিত্র টোপর শিরে সুবর্ণ নিশান।
পাশে পাশে মরকত মুকুতা প্রধান॥
সুরঙ্গ সিন্দুর ভালে শোভা সমুচ্চয়।
তরুণ তিমিরে যেন তারার উদয়॥
চারিপাশে গোরোচনা চন্দনের বিন্দু।
রবিকে বেড়িয়া যেন রহিলেক ইন্দু॥
কজ্জলে কুরঙ্গ আঁখি করিল শোভন।
অষ্ট অঙ্গে অষ্ট শোভা অষ্ট আভরণ॥
কটিতটে সুকিঙ্কিনি কনক বিশাল।
রুণঝু ঝুনুঝু বাজে শুনিতে রসাল॥
বিনোদ কাঁচলি বুকে বিচিত্র অভেদ।
রাধাকৃষ্ণ লেখা তায় রাস পরিচ্ছেদ॥
(মাণিক গাঙ্গুলীর ধর্ম্মমঙ্গল)

পরিয়া পাটের জোড় বান্ধিয়া চিকুর ওর
তাহে নানা ফুলের সাজনি।
পরিসর হিয়া ঘন লেপিয়াছে চন্দন
দেখিয়া জীউ করিনু নিছনি॥
মৃগমদ চন্দন কুঙ্কুম চতুঃসম
সাজিয়া কে দিল ভালে ফোঁটা।
(গোবিন্দ দাস)

তাহারা কপালে চন্দনবিন্দু, গলায় স্বর্ণের মালা পরিতেন, পীতবস্ত্র পরিধান করিতেন।

ভাল উপরে চন্দন বিন্দু—জ্ঞানদাস
কম্বুকণ্ঠে কনকমান
গজ মোতিম গাঁথি প্রবাল, বিবিধ
রতন সাজনি (জ্ঞানদাস)
কটি পীতপট কাছনি (জ্ঞানদাস)

(ঘ) সপ্তদশ শতাব্দী—

দুর্গার বর্ণনাপ্রসঙ্গে তাৎকালিক ধনশালিনী নারীগণের অলঙ্কারাদির পরিচয় পাওয়া যায়—

মৃগমদ চর্চ্চিত তিলক বিন্দু বিন্দু।
হেরিয়া লজ্জিত তাহে শরতের ইন্দু॥
খগচঞ্চু নাসাতে বেসর মুক্তাফল।
রতন নূপুর পদে করে ঝল
শ্রুতিমূলে কর্ণফুলে তপ্ত হেমচাকি।
নীলপদ্মে স্বর্ণভৃঙ্গ করে ঝিকিমিকি॥
চাচর কেশের বেণী পবনে দোলায়।
নবীন মেঘেতে যেন বিদ্যুৎ খেলায়॥
* * *
চিবুকে ত মৃগমদ রেণুবিন্দু তার।
নক্রানে অঞ্জন যেন বিদ্যুৎ খেলায়॥
* * *
গলাতে রতন হার ইন্দ্রনীলমণি।
বাহুতে বিচিত্র শঙ্খ ইন্দু বিন্দু জিনি॥

স্বর্ণ চুড়ি জড়াও করি দিল পরাইয়া।
লক্ষে লক্ষে ইন্দু দিল বিদ্যুতে মিশাইয়া॥
তাড় কঙ্কণ বাজুবন্দ শোভে দশভুজে।
দশদিক্ প্রকাশিত কঙ্কণের তেজে॥
তড়িতজড়িত যেন অঙ্গুলে অঙ্গুরি।
* * *
গজমতি হার গলে অতি মনোহর॥
* * *
বিচিত্র কাঁচুলি নির্ম্মাইল বক্ষোদেশে।
হীরার জড়িত পাটা স্তনের সমপাশে॥
করিশুণ্ড জিনিয়া জানু মনোহর।
কাঞ্চনে জড়িত পরিধান পাটাম্বর॥
* * *
ক্ষীণ কটিতটে হেমকিঙ্কিণী প্রকাশে।
স্থলপদ্মে জিনি পাদপদ্ম সুকোমল॥
বাঁকমল ঘুঙ্গুর শোভিত পাতামল।
* * *
রুনু ঝুনু বাজে পদে সোণার নূপুর॥
(অন্ধ কবি ভবানীপ্রসাদের দুর্গামঙ্গল)

(ঙ) অষ্টাদশ শতাব্দী—

সধবাগণ আয়তির চিহ্নস্বরূপ হাতে একগাছি লোহা বা শঙ্খ ধারণ করিত। তাহারা গায়ে ও চুলে তৈল দিত—

"আয়তের চিহ্ন হাতে লোহা একগাছি" (অন্নদামঙ্গল)
"তৈল বিনা চুলে জটা খড়ি উড়ে গায়" ঐ
"দুই গাছি শঙ্খ হস্তে ভগ্ন বস্ত্র পরি"
(মুক্তারাম সেনের সারদামঙ্গল)

তাহারা চিরুণী দ্বারা চুল আঁচড়াইত ও ললাটে সিন্দুর পরিত এবং বক্ষে কাঁচুলী ধারণ করিত—

"আঁচড়ে চিরুণে চারু চাঁচর চিকুর।
ললাটে সিন্দুর শোভা তম করে দূর" ॥ (অন্নদামঙ্গল)
"হেমময় কুচ করি, রাখিছ কাঞ্চুলী বেড়ি"
(মুক্তারাম সেনের সারদামঙ্গল)

নারীগণ গাত্রে নানা অলঙ্কার ধারণ করিতেন—

কনক মকর খাড় সহিতে জে ঘুঙ্গুর
নূপুর বাজ্যাছে পদারবিন্দে॥
কটিতে কিঙ্কিণী সাজে রুনু রুনু ঝুনু বাজে
বাজু মল তার বাহোপরি।
এক করে শঙ্খ ধরে কঙ্কণ শোভে আর করে
করাঙ্গুলে শোভে রত্ন অঙ্গুরি॥
শ্রবণে ত কর্ণফুল করিয়াছে ঝলমল
গলে দোলে গজমতি হারে।
সুন্দর জে নাসিকাএ বেশর শোভ্যাছে তাহে
মুকুতা সহিত দোলে অধরে॥
(ভবানী শঙ্কর দাসের মঙ্গলচণ্ডী
পাঞ্চালিকা ৪২ পৃঃ ; ৭১ পৃঃ)

কাঁচুলী নানা বর্ণের হইত এবং তাহাতে নানাপ্রকার চিত্র অঙ্কিত করা হইত—

শ্বেত নেত পীতবর্ণ লইয়া অম্বর।
কাঞ্চুলিতে চিত্র করে অতি মনোহর॥
(মঙ্গলচণ্ডী পাঞ্চালিকা)

"তিন ছেলেরমা"র কাঁচুলী পরিধান নিন্দনীয় ছিল।
"তিন ছেলের মা মাসী কাঁচুলী বাঁন্ধে তুলে"। (ঘনরাম)
কর্ণাট দেশে প্রস্তুত কাঁচুলি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত হইত।—
কুচযুগে কর্ণাটি কাঁচলি কৈল বন্ধ—শিবায়ন।

বাগ্‌দিনীর বর্ণনাতে তাহাদের বসনভূষণের পরিচয় পাওয়া যায়—

দু হাতে দুগাছি মেঠে কাপড় পরেছে এঁটে
খাট করি হাঁটুর উপর।
গলায় রসের কাটি হিঙ্গুলের পলা দুটি
পুঁতি বেড়ে সেজেছে সুন্দর॥
অঞ্জন রঞ্জন আঁখি গঞ্জন খঞ্জন পাখী
সুললিত নাকে নাকচোনা।
নবীন নীরদ তনু তরুণ তিমির ভানু
রূপে আলো কৈল কালসোণা॥
ভুবনমোহন খোপা সন্ধী সালুকের ঝাঁপা
পেট্যা পাড়ি পরেছে সিন্দুর।
কমল কলিকা কুচ বুকেতে হয়েছে উঁচ
কদম্ব কুসুম কর্ণপুর।
পিত্তলের ঝুট্যা পায় যাবক রঞ্জিত তায়
করাঙ্গুলে পিত্তল অঙ্গুরী॥
(শিবায়ন ১১০)

নারীগণ স্নান সময়ে হরিদ্রা তৈল ও আমলকী ব্যবহার করিত—

হরিষে হরিদ্রা তৈল আমলকী লয়ে।
সখী সঙ্গে স্নান যায় হর্ষচিত্ত হয়ে॥
(ঘনরামের ধর্ম্মমঙ্গল)

সম্ভ্রান্ত নারীগণ তৎকালে এইরূপ প্রসাধন করিতেন :—

রতনমুকুরে রাণী দেখে মুখছবি।
কপালে সিন্দুর শোভা প্রভাতের রবি॥
চন্দন চন্দ্রমা কোলে কজ্জলের বিন্দু।
ভুরুযুগ উপরে উদয় অর্দ্ধ ইন্দু॥
বিন্দু বিন্দু গোরোচনা শোভে তায় অতি।
অলকামণ্ডিত মণি মুকুতার পাঁতি॥
নানা পরিবন্দ করে বেঁধেছে কবরী।
* * *
বুকে বাঁধা কাঁচলি সঙ্কেত অভিলাষে।
* * *
চরণে ভূষণ পরে পায়ে গোটা মল।
গরব গমনে কত পুরুষ পাগল॥
বিচিত্র বসন পরে কমলা বিলাস।
সুন্দরী সহজরূপে তিমির বিনাশ॥
অঙ্গে শোভে অপূর্ব্ব অনেক অলঙ্কার।
বিরচিতে বাহুল্য তুলনা নাহি তার॥
(ঘনরামের ধর্ম্মমঙ্গল)

মাধবী—পৌষ, ১৩৩৭ শ্রীমনীষিনাথ বসু সরস্বতী

সমাজের অসাম্য

শ্রীরাধাকমল মুখোপাধ্যায়, পি-এইচ-ডি

ফরাস রাষ্ট্রের এলাকায় কোনো সভায় কিছু মন্তব্য প্রকাশ করিতে গেলে ফরাসী রিপাব্‌লিক যে সাম্য মৈত্রী ও স্বাধীনতার জয় ঘোষণা করিয়াছিল, যাহার ফলে সমগ্র জগতে ভাবে ও সমাজ-গঠনে যে একটা যুগান্তর আসিয়াছিল, তাহার কথা স্বতঃই মনে হয়। আমাদের দেশও এই বিশ্ব-আন্দোলনের ফল হইতে বঞ্চিত হয় নাই। আমরা এখন পূর্ণ রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার দাবি করিতেছি। জাতিভেদ বর্জ্জনের কথা উঠিয়াছে। ভারতের নারী পুরুষের সহিত সমান অধিকার চাহিতেছে। শ্রমিকও তাহার অধিকার ঘোষণা করিয়াছে। দেশের উৎপন্ন ধন-সম্পদের ন্যায়ানুমোদিত বণ্টনের দাবিও শুনা গিয়াছে। সামাজিক আদর্শের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে আমরা কি পরিমাণে এ দেশে আর্থিক ও সামাজিক সাম্য আনিতে পারিয়াছি, তাহা চিন্তা করিবার বিষয়। কারণ ফ্রান্সেই হউক, রুশিয়ায় হউক বা ভারতবর্ষেই হউক, অর্থ ও অধিকারের অনৈক্য সব অসাম্য, সব অশান্তির মূলে।

একটা কথা আমরা বড় বেশী ভাবিতেছি না; সেটা এই, যে-দেশে সমাজ ও সভ্যতার প্রধান অবলম্বন কৃষি, সেখানে ভূমির অধিকারের অনৈক্য সব অনিষ্টের কারণ। এ দেশ চিরকাল ভূম্যধিকারী কৃষকের দেশ ছিল। দুই দিক হইতে পল্লীসমাজে ঘোর অসাম্য গত দেড় শত বৎসরে দেখা গিয়াছে। একদিকে, নূতন জমিদার শ্রেণীর আবির্ভাব। লর্ড কর্ণওয়ালিসের ভুলে যাঁহারা কেবলমাত্র জমির ইজারা লইয়াছিলেন, তাঁহারা হইয়া গেলেন জমির সম্পূর্ণ স্বত্বাধিকারী। যে-জমিতে কৃষকেরও সম্পূর্ণ ভোগদখলের দাবি গ্রাম্য সমাজের কল্যাণে চিরকাল নিয়ন্ত্রিত হইয়া আসিতেছিল, সে জমির উপর সম্পূর্ণ অধিকার বর্ত্তাইল ইজারাদারের। ইংরেজ আমলে সেট্‌লমেন্টের ফলে কি গ্রাম্য সমাজ, কি কৃষক, কাহারও প্রাচীন স্বত্বের চিহ্নমাত্র রহিল না। কর্ণওয়ালিসের ইচ্ছা ছিল, বাংলা দেশের কৃষকের কায়েমী অধিকার সম্বন্ধে জেলায় জেলায় কানুনগোর দ্বারা একটা বিশেষ অনুসন্ধান করা। কিন্তু এই অনুসন্ধান-কার্য্য এত বিরাট, কানুনগোগণের সংখ্যা এত কম এবং কলেক্টারগণের এত ঔদাসীন্য ছিল, যে, অনুসন্ধান-কার্য্য আরম্ভই হইল না। কাজেই বাংলার কৃষক নীরবে নির্ব্বিবাদে আপনার অধিকার-লোপ মানিয়া লইল। পঞ্জাবের কৃষক কিন্তু তাহা মানে নাই। ওখানে পূর্ব্বে সব কৃষকের সমান অধিকার ছিল, কিন্তু যাই লম্বরদারকে ইংরেজ তাহার খাজনা আদায়ের প্রয়োজন অনুসারে বেশী অধিকার দিল, সমস্ত কৃষকশ্রেণীর মধ্যে একটা চাঞ্চল্য উপস্থিত হইল—সে চাঞ্চল্য এখনও যায় নাই। সারসা জেলার গ্রামে গ্রামে একটি গাথা এখনও লোকমুখে চলিতেছে,—

রালকে আয়ি সবে ভাই
শুনি উনহান বাড় বসাই
এক দে শির তে পাগ বানাই
উস্নো বান গিয়া লম্বরদার
হাকিম উসনু হুকুম শুনায়া
লাম্বারদার ইমান খরায়া॥

সব ভূঁই-ভাইদিগের সমান স্বত্ব ছিল, একজন তাহাদেরই মধ্যে খাজনা আদায় করিয়া সরকারী তহবিলে জমা দিত। ইংরেজ আমলে হাকিম উহাকে নূতন অধিকার ও স্বত্ব দিল, সে প্রভু হইয়া অসত্য আচরণ করিতে লাগিল। ভাইয়াচারা গ্রাম্য সমাজে সাম্যবাদের কেমন সরল উদাহরণ।

জমিদার এবং লম্বরদারদিগের আবির্ভাব ও গ্রাম্য-সমাজের বিলোপসাধনের সঙ্গে সঙ্গে যেমন ভূমির অধিকারে অনৈক্য দেখা দিয়াছে, সেরূপ জমির অবাধ লেন-দেন অথবা অপরকে ভোগদখল করিতে দেওয়ার

অধিকার—যাহা এদেশের ভূম্যধিকারীর কখনও ছিল না,— তাহাও ধনী ও দরিদ্র কৃষকের মধ্যে ব্যবধান সৃষ্টি করিয়াছে। জমিদার, পত্তনিদার, ইজারাদারের মত জোৎদারও হইলেন শ্রমবিমুখ। তাহার নীচে আসিল চুকানিদার, তাহার নীচে দর-চুকানিদার। তাহার নীচে দর-দর-চুকানিদার। তাহারও নিম্নস্তরে তস্য চুকানিদার এবং তেলে-তস্য-চুকানিদার। ইহাদের অধিকাংশেরই জোৎ স্বত্ব নাই। ইহার উপর আবার জমির ভাগবিলি আছে। ভাগচাষী, ভাগকর, বর্গাদারের কোন স্বত্বই নাই। মধ্যবিত্ত বাঙালীর ভাগচাষীই অবলম্বন।

বাংলা দেশ এবং বাংলা দেশের বাহিরে জমিদারী ও জমিবিলি ও হস্তান্তর সম্বন্ধে এবং গ্রাম্য সমাজের গোচারণ-ভূমি খাল পুষ্করিণী ইত্যাদির অধিকার সম্বন্ধে পুনর্ব্বিচার অবশ্যম্ভাবী। দেশে এখন চাষী যে ফসল উৎপন্ন করে তাহাতে রাষ্ট্র ছাড়া ভাগ বসাইতেছে শ্রম-বিমুখ খাজানা আদায়ীর দল। জমিজীবীদের সংখ্যা ও জমি হইতে বিতাড়িত নিরাশ্রয় মজুর দলের সংখ্যা দিন দিন বাড়িয়াই চলিতেছে। ভূমিহীন মজুরের সংখ্যা দশ বৎসর অন্তর প্রায় ১,০০,০০,০০০—এক কোটি বাড়িতেছে। এত অনৈক্যে কোন কৃষক-সভ্যতা টিকিতেই পারে না।

যে-কোন বিধি-ব্যবস্থায় হউক না কেন, জমিদারী স্বত্বের সংক্ষেপ করিয়া, জমির হস্তান্তর প্রতিরোধ করিয়া মজুর, বর্গাদার, আধিয়ার প্রভৃতিকে কায়েমী স্বত্ব দিয়া পল্লীসমাজের অনৈক্য দূর করিতেই হইবে। ধনী ও মধ্যবিত্ত শ্রেণী রাষ্ট্রিক স্বাধীনতা লাভ করিয়া তাহা দেশের ও দশের অকল্যাণে নিয়োজিত করিবে, যদি এই অনৈক্যের একটা সমাধান না হয়।

আরও এক কারণে দেশের পল্লীসমাজে অনৈক্য বাড়িতেছে। লোকসংখ্যাবৃদ্ধি হেতু জমি ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতম হইয়া চলিয়াছে। ফলে অনেক প্রদেশে শতকরা ৪০ হইতে ৬০ জন কৃষকের জমির পরিমাণ এত ক্ষুদ্র যে, তাহাতে কৃষক-পরিবারের সঙ্কুলান হয় না। গ্রামে গ্রামে নিরবলম্বন শ্রমিকদলের সংখ্যা এই কারণেও বৃদ্ধি পাইতেছে। যদি দেশের অর্দ্ধেক পরিমাণ ক্ষেতে কেবলমাত্র কৃষি হইতে জীবিকানির্ব্বাহ অসম্ভব হইয়া পড়ে, তবে সমাজে ঘোর অশান্তি, এমন কি বিপ্লবও ঘটিবার সম্ভাবনা।

ইহার নিরাকরণের তিনটি প্রধান উপায় আছে। এক হইতেছে, ইউরোপের অনেক দেশের মতন আইন করা যে কৃষকের মৃত্যুর পর হয় জ্যেষ্ঠ না হয় কনিষ্ঠ পুত্র উত্তরাধিকারিসূত্রে জমি পাইবে। অপর পুত্রগণ তাহার নিকট কিছু অর্থ এবং অস্থাবর সম্পত্তি ক্ষতিপূরণ হিসাবে পাইবে। উত্তরাধিকার-বিধির সংস্কার কঠিন, কিন্তু এদিকে আমাদের মন দেওয়া বিশেষ প্রয়োজনীয়, নিঃসন্দেহ। দ্বিতীয়, যাহাদের জমির পরিমাণ এত কম যে, পরিবার সঙ্কুলান হওয়া অসম্ভব, তাহাদিগকে জমির খাজনা হইতে নিষ্কৃতি দেওয়া। রুশিয়ায় এইরূপে শতকরা ৩৫ জন কৃষক ট্যাক্স হইতে সম্পূর্ণ নিষ্কৃতিলাভ করিয়াছে। তৃতীয়, অবাধ লোকোৎপাদন হইতে বিরত হওয়া। জাপানের মত এদেশেও কৃষকশ্রেণীর মধ্যে জন্ম-প্রতিরোধের আন্দোলন জাগাইতে হইবে। দুর্নীতির ভয় করিয়া বসিয়া থাকিলে আর চলিবে না, কারণ লোকসংখ্যাবৃদ্ধি, দুর্ভিক্ষ ও মহামারীকে আজ আমাদের নিত্য সঙ্গী করিয়া রাখিয়াছে।

ভূমির অধিকার ও অর্থের তারতম্য একদিকে যেমন সমাজে ঘোর অসাম্য আনিয়া দিয়াছে, অপরদিকে ইউরোপ হইতে গৃহীত আমাদিগের নব-নাগরিক রাষ্ট্রবিন্যাস এই অনৈক্যের প্রতিরোধ করে নাই, বরং তাহার প্রশ্রয়ই দিয়াছে। ইহা ভুলিলে চলিবে না যে, পার্লামেণ্ট শাসন, ইউরোপীয় অত্যাধুনিক ধনীর প্রভুত্বমূলক শিল্প-পদ্ধতির (Capitalism) সহিত অচ্ছেদ্য বন্ধনে জড়িত। দুইয়েরই প্রথা, কেন্দ্রীকরণের দ্বারা আপনার কলেবরবৃদ্ধি, দুই-ই নাগরিক ও সর্ব্বভুক্। প্রদেশ, জনপদ, গ্রামের রাষ্ট্রিক শক্তি গ্রাস করিয়া পার্লামেণ্ট শাসন সুদৃঢ় হইয়াছে। গ্রামের সাধারণ জীবনযাত্রাও আজ রাজধানী হইতে পরিচালিত, ক্রমবর্দ্ধমান আমলাশ্রেণীর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

দরিদ্র কৃষকপ্রধান দেশ রক্তবীজ আমলাদলকে চিরকাল পোষণ করিতে পারে না। এ কথা সেদিন মহাত্মা গান্ধী স্পষ্ট বলিয়াছেন। তাহা ছাড়া যে-দেশে

কৃষক এবং মধ্যবিত্ত ও ধনীর শিক্ষার তারতম্য এত অধিক, সে দেশে পার্লামেন্ট-শাসন ধনী ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রভুত্বে পর্য্যবসিত হইবার বিশেষ ভয় আছে। কারণ অশিক্ষিত কৃষক-সমাজ দল গড়ে না, দলপতিরই আশ্রয় গ্রহণ করে।

রাষ্ট্রশাসনের গুরু ব্যয়ভার কমাইতে গেলে, রাষ্ট্রকে শ্রেণী-সংঘর্ষ হইতে বাঁচাইতে হইলে গ্রামে, জনপদে, প্রদেশে, রাষ্ট্রিক জীবনের উদ্বোধন চাই। গ্রাম-পঞ্চায়েত, জনপদ-পঞ্চায়েত ও প্রদেশ-পঞ্চায়েত শাসনের দ্বারা তাহা একমাত্র সম্ভব। শাসনের আসল ভার গ্রাম-পঞ্চায়েতকে না দিলে একটা স্বাধীন কর্ম্মঠ গ্রাম্য সমাজ গড়িয়া উঠিবে না, মধ্যবিত্ত আমলা শ্রেণীরই জয়-জয়কার হইবে। পঞ্চায়েত-শাসন একাধারে সহজ জাতীয় ও অবৈতনিক শাসন।

ভারতবর্ষের নানা গ্রামে প্রদেশে পঞ্চায়েত, পঞ্চগ্রাম, দশগ্রাম, শতগ্রাম শাসনের অনুষ্ঠান এখনও জীবিত আছে। তাহাদিগের পুনরুদ্ধার ও সমবায় হইতেছে আমাদের আসল federalism, ফরাসীরা যাহাকে এখন বলিতেছে regionalism। মহাত্মা গান্ধী বলিয়াছেন যে, তিনি দেশে poor man's democracy আনিবেন। তাহার একমাত্র উপায় গ্রাম-পঞ্চায়েতকে পুনর্জ্জীবিত করা, এবং তাহার উপর রাষ্ট্রকার্য্যের অধিকাংশ ভার ন্যস্ত করা। রুশিয়ার সোভিয়েট কিংবা জার্ম্মানীর কমিউন অপেক্ষা আমাদের গ্রাম-পঞ্চায়েত যে অধিকতর শাসনকুশল হইবে, এ আশাও করা যায়। গ্রাম ও জনপদ পঞ্চায়েতের সমবায়ে প্রাদেশিক পঞ্চায়েত গঠিত হইবে। তাহাদিগেরই প্রতিনিধি নিখিল ভারত সভার সভ্য হইবে। নেহরু রিপোর্টের লেখকগণ কিংবা কংগ্রেস পাশ্চাত্যের অনুকরণে রাষ্ট্রের সংস্কার ও বিন্যাস চাহিয়াছে। রাষ্ট্রগঠনে দেশের যুগ-পরম্পরার্জ্জিত শক্তি ও অনুষ্ঠানের প্রতি তাহারা নিতান্ত উদাসীন। যে-রাষ্ট্রবিন্যাসে অশিক্ষিত কৃষক নিজেও দলবলে আপনার রাষ্ট্রীক দায়িত্ব গ্রহণ করিতে পারিবে না, তাহা অচিরেই তাহাকে স্বাধিকার হইতে বঞ্চিত করিবে। ইতিহাস দেশে দেশে বার-বার ইহার সাক্ষ্য দেয়। ইহা কি খুব আশ্চর্য্যের বিষয় নহে, যে, এবারকার কংগ্রেস শ্রমিকের অধিকারের তালিকা লিপিবদ্ধ করিল, কিন্তু কৃষকের অধিকার সম্বন্ধে সে একবারে মৌন। ইহা ত সকলেই জানেন যে, লেনিন ও ট্রট্স্কির বিরোধ, অথবা ষ্টালিন ও তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বিগণের সংঘর্ষ যাহা সমগ্র সোভিয়েট রিপাব্লিককে তোলপাড় করিয়াছে, তাহা ধনী, মধ্যবিত্ত ও গরীব কৃষকের অধিকার লইয়া মতভেদ। এদেশে মতভেদ ত দূরের কথা, কংগ্রেস কৃষকের নামও একবার করিল না। ভূমির স্বাধিকারের মত ভারতের কৃষককে রাষ্ট্রিক স্বাধিকারও দিতে হইবে, তাহার শতযুগাভ্যস্ত পঞ্চায়েত শাসনে, কংগ্রেস-অনুমোদিত পার্লামেণ্ট শাসনে নহে। তবেই দেশের ভবিষ্যৎ সমাজ সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার নীতিতে সুগ্রথিত হইবে। জননায়কগণ সেই সাম্যমূলক ভবিষ্যৎ সমাজের প্রতীক্ষা করুন, দিনে দিনে তাহাকে ভাবে ও কর্ম্মে গড়িয়া তুলুন। অধ্যাত্মজীবনে ভারতবর্ষ যে সর্ব্বাত্মক সাম্যকে প্রতিষ্ঠা করিয়াছে, ভারতবর্ষের সমাজ-বিন্যাস তাহারই সুন্দর চিরচঞ্চল প্রতিবিম্বরূপে তখন সৃষ্টি-সরোবরে ভাসিবে।*

* শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে চন্দননগর পুস্তকাগারের সাম্বৎসরিক অধিবেশনে কথিত।

চিরন্তনী*

শ্রীস্বর্ণলতা চৌধুরী

১

গিদোকে খুব সুখী বোধ হইতেছিল। জগতে তাঁহার যে কোনো ভাবনা-চিন্তা আছে দেখিলে তাহা বোধ হইত না। একটি রাজনৈতিক ভোজে নিমন্ত্রণ খাইয়া এবং বক্তৃতা করিয়া তিনি বাড়ি ফিরিতেছিলেন। রন্ধন অতি উৎকৃষ্ট হইয়াছিল এবং নিজের বক্তৃতার প্রশংসাও তিনি শুনিয়াছিলেন প্রচুর। সুতরাং মেজাজটা তাঁহার খুবই ভাল ছিল। আগামী প্রতিনিধি নির্ব্বাচনে তিনিই যে জয়লাভ করিবেন, সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহও তাঁহার ছিল না। সন্ধ্যাবেলা একটি নৃত্যোৎসবে তাঁহার নিমন্ত্রণ ছিল। ব্যারোনেস্ ষ্টিফানিয়ার সঙ্গে রসালাপ হওয়ার সম্ভাবনা খুবই। তিনি বাড়ি ফিরিয়া আসিতেছিলেন, ঘণ্টাখানেক বিশ্রাম করিবার জন্য।

গাড়ী হইতে নামিয়া খাইবার ঘরের ভিতর দিয়া নিজের ঘরের দিকে চলিয়াছেন, এমন সময় তাঁহার পুরাতন ভৃত্য জুসেপ্পে আসিয়া সসম্ভ্রমে অভিবাদন করিয়া দাঁড়াইল। সে কথা বলিতে চায় বুঝিয়া গিদো জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি খবর জুসেপ্পে?"

জুসেপ্পে বলিল, "যদি অনুগ্রহ করে শোনেন, আমার একটা কথা বলবার আছে।"

প্রভু বলিলেন, "তাড়াতাড়ি ব'লে ফেল, আমার সময় বেশী নেই।"

ভৃত্য বলিল, "আজকে কোন্ দিন তা আপনার মনে নেই?"

গিদো বলিলেন, "না, আজ বিশেষ কোনো দিন না কি?"

"আজ আপনার জন্মদিন।"

গিদোর মুখ বিষাদগম্ভীর হইয়া আসিল, তিনি বলিলেন, "তাই ত বটে, আমার মনে ছিল না।"

জুসেপ্পে বলিল, "অন্যান্য বারে সারাবাড়ি ফুল দিয়ে সাজান হ'ত—"

তাহার প্রভু বাধা দিয়া বলিলেন, "সে পুরাকালে যা হ'ত তা হ'ত। এখন আর জগতে ফুল নেই।"

জুসেপ্পে বলিল, "আজ্ঞে না, তা হয় না। সে টেবিলের উপর রক্ষিত প্রকাণ্ড একটি ফুলের তোড়ার আবরণ উন্মোচন করিয়া দেখাইল।

গিদো বলিলেন, "ধন্যবাদ, তোমার এই উপহারটি পেয়ে বড় খুশী হলাম।"

খুশী হইয়াছেন এ কথা গিদো শুধু মুখে বলিলেন বটে, কিন্তু মনটা তাঁহার আরও বিষণ্ণ হইয়া উঠিল। এই দিনটাতে আগে আগে কি আনন্দোৎসবই না হইত, আর এখন পুরাতন ভৃত্য ভিন্ন আর কেহ এ দিনটাকে স্মরণও করিল না! কিন্তু মনে মনে যাহাই ভাবুন, মুখের ভাবে তিনি কোনো দুঃখের চিহ্ন প্রকাশ করিলেন না। নিজের ঘরের দিকে অগ্রসর হইতে হইতে বলিলেন, "আমাকে সন্ধ্যা আটটায় উঠিয়ে দিও, আমি একটু ঘুমিয়ে নিতে যাচ্ছি।"

জুসেপ্পে একটু যেন ব্যস্তভাবে বলিল, "এখন না ঘুমলেই ভাল, দেখুন।"

তাহার প্রভু বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "কেন ব'ল দেখি?" জুসেপ্পে বলিল, "বিকেলে আমরা কেউ বাড়ি ছিলাম না, জিরোলামো একলা ছিল। তখন নাকি একজন ভদ্রমহিলা আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। আপনি বাড়ি নেই শুনে তিনি ব'লে গিয়েছেন যে, সাতটার সময় তিনি আবার আসবেন, আপনি নিশ্চয় যেন তাঁর জন্যে অপেক্ষা করেন, কারণ তাঁর খুব জরুরী কাজ আছে।"

---

* Matilde Serao হইতে।

গিদো জিজ্ঞাসা করিলেন, "তাঁর নাম কি?"

"তিনি নাম বলেন নি।"

গিদো বলিলেন, "ভারি রহস্যময় ব্যাপার ত? তিনি কি রকম দেখতে তা জিরোলামো কিছু বলেছে?"

"হ্যাঁ, সে বলেছে তিনি বেশ লম্বা, তাঁর চুল আর চোখ কালো, পোষাক-পরিচ্ছদ অতি সুন্দর।"

গিদো বলিলেন, "রহস্যটা ক্রমেই ঘনীভূত হয়ে উঠ্‌ছে, আমার কৌতূহলও জেগে উঠ্‌ছে। তোমার কি মনে হয় এই ভদ্রমহিলার খাতিরে এখনকার মত ঘুমটা বাদ দেওয়াই ভাল?"

জুসেপ্পে বলিল, "আজ্ঞে হ্যাঁ, না ঘুমলেই ভাল। সাতটা ত বাজতে যাচ্ছে, তিনি যদি কথামত ঠিক সময়ে আসেন, তাহ'লে আপনাকে শুতে-না-শুতে আবার উঠে বসতে হবে।"

গিদো বলিলেন, "ভাল, তাই করা যাবে। খবরের কাগজটা নিয়ে এস, মহিলাটি না-আসা পর্য্যন্ত কাগজ পড়েই কাটিয়ে দেওয়া যাবে।" ভৃত্য বাহির হইয়া যাইবামাত্র তিনি যেন আপন মনেই বলিয়া উঠিলেন, "কালো চুল আর চোখ? ষ্টিফানিয়ার ত সোনার মত চুল, নীল চোখ। যাক, একটু রকমারি হওয়া ভাল।"

গিদোর মন্তব্য শুনিয়া পাঠক মনে করিতে পারেন যে, তিনি প্রণয়লীলার ওস্তাদ, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নয়। জীবনে তাঁহাকে গভীর দুঃখ এবং নিরাশা সহ্য করিতে হইয়াছিল। একটি মাত্র নারীকে তিনি সমগ্র হৃদয় ঢালিয়া ভালবাসিয়াছিলেন, কিন্তু বড় আকস্মিকভাবে এই ভালবাসার পাত্রীটিকে তিনি হারাইয়াছিলেন। তাহাকে তিনি মোটেই ভুলিতে পারেন নাই। ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির ন্যায় এই প্রেম এখনও তাঁহার হৃদয়কে নিরন্তর দগ্ধ করিতেছিল। গত দুই বৎসর গিদো ক্রমাগত ভুলিবার চেষ্টা করিতেছেন, নানা প্রকার বিলাস-বিভ্রমে তিনি গা ঢালিয়া দিয়াছেন।

তিনি কাগজ লইয়া পড়িতে বসিয়া গেলেন। কিছুক্ষণ পরেই জুসেপ্পে ঘরে ঢুকিয়া খবর দিল, "তিনি এসেছেন, বসবার ঘরে বসে আছেন।"

গিদো মুখ তুলিয়া চাহিয়া বলিলেন, "তুমি কি তাঁকে চেন?"

ভৃত্য একটু যেন থতমত খাইয়া বলিল, "আজ্ঞে না।" গিদো দ্রুতপদে বসিবার ঘরে গিয়া প্রবেশ করিলেন। ভদ্রমহিলা পিছন ফিরিয়া দাঁড়াইয়া একটি ছবির অ্যালবামের পাতা উল্টাইতেছিলেন। গিদো তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে একবার তাঁহার দিকে চাহিয়া দেখিলেন, পিছন হইতেই বুঝিলেন রমণী দীর্ঘাকৃতি এবং অপূর্ব্ব অঙ্গসৌষ্ঠবশালিনী। তাঁহার পরিচ্ছদও অতি শোভন ও সুন্দর।"

তাঁহার দিকে অগ্রসর হইতে হইতে গিদো বলিলেন, "নমস্কার।"

মহিলা বিদ্যুৎবেগে ফিরিয়া দাঁড়াইলেন। গিদো বজ্রাহতের মত তাঁহার দিকে তাকাইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। ভদ্রমহিলা প্রতিনমস্কার করিয়া একটা চেয়ার টানিয়া বসিয়া বলিলেন, "সন্ধ্যাবেলা এসে পড়ে তোমার কিছু অসুবিধা করিনি ত?"

গিদো বলিলেন, "কিছুমাত্র না। তোমার জন্যে কি করতে পারি বল?"

মহিলা বলিলেন, "তুমি হয়ত কথাটা ভদ্রতা ক'রে বলছ, কিন্তু সত্যিই আমার জন্যে অনেকখানি কাজ তোমায় করতে হবে। সুতরাং কথাটা আমি সত্যসত্যই তোমার মনের কথা ব'লে ধরে নিলাম।"

গিদো হাসিয়া বলিলেন, "তা কর আপত্তি নেই। তুমি কি করাতে চাও আমাকে দিয়ে, জান্‌লে সুখী হব।"

রমণী ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন, যেন কি ভাবে কথাটা পাড়িবেন তাহা বুঝিতে পারিতেছিলেন না। গিদো এই অবসরে তাঁহাকে ভাল করিয়া দেখিয়া লইলেন। হাঁ, তিনি আগেরই মত রূপবতী আছেন, হয়ত-বা তাঁহার সৌন্দর্য্য আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। গিদো প্রথম যখন তাঁহাকে দেখেন তখন কি মনোহারিণী মূর্ত্তিই এমার ছিল! কিন্তু এখন এমার চোখের দৃষ্টিতে বোঝা যায় যে, দুঃখকষ্ট কি জিনিষ তাহা তিনি বুঝিতে পারিয়াছেন, ইহাতে তাঁহার রূপ আরও মহিমামণ্ডিত বোধ হইতেছে।

খানিকপরে এমা জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কখনও অভিনয় করেছ ?"

গিদো বলিলেন, "নিশ্চয়, আমার সমস্ত জীবনটাই ত অভিনয় !"

এমা বলিলেন, "তাই নাকি ? তাহ'লে তোমার বেশী অসুবিধা হবে না, যেমন অভিনয় করছ ক'রে যেও। তবে একটু শক্ত ভূমিকা নিতে হবে, সফল হবে কি না জানি না।"

গিদো বলিলেন, "সঙ্গে কে অভিনয় করবেন এবং দর্শক কে হবেন, তার উপর অনেকটা নির্ভর করছে।"

এমা বলিলেন, "আমি সঙ্গে থাকব।"

গিদো বলিলেন, "ভাল, তুমি যে খুব উৎকৃষ্ট অভিনেত্রী, তা আমার জানা আছে।"

এমা কথা ঘুরাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি এখনও আমার বাবার কাছে নিয়মিত চিঠি লেখ ?"

"হ্যাঁ, কিন্তু গত তিন সপ্তাহ তিনি আমার চিঠির কোনো উত্তর দেননি।"

এমা বলিলেন, "আমি কাল তাঁর কাছ থেকে একখানা চিঠি পেয়েছি। আগামী কাল সকালে তিনি মিলানে এসে পৌছচ্ছেন।"

গিদো বিস্মিতভাবে এমার দিকে চাহিয়া রহিলেন, তাহার পর বলিলেন, "কিন্তু তোমার বাবা ত সাতজন্মেও বাড়ি ছেড়ে নড়েন না ?"

"তাঁকে এক জায়গায় বাধ্য হয়ে যেতে হয়েছিল, এখন নেপল্‌সে ফিরে যাচ্ছেন। এই পথ দিয়ে যাচ্ছেন, আমাদের দেখে যাবার জন্যে।"

গিদো বলিলেন, "তাহ'লে ?"

এমা একটা মখমলের টুলের উপর পা রাখিয়া বলিলেন, "অবস্থাটা আমাদের পক্ষে খুবই চমৎকার।"

গিদো জিজ্ঞাসা করিলেন, "অবস্থাটা তোমার চমৎকার লাগ্‌ছে ?"

এমা বলিলেন, "এ বিষয়ে আলোচনা ক'রে ত কোনো লাভ নেই ? এখন যাতে বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়া যায়, তার একটা উপায় ঠিক কর।"

"আমি ত কোনও উপায় খুঁজে পাচ্ছি না।"

এমা বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "এইটুকুই যদি না পারবে, তাহ'লে এত বিদ্যেবুদ্ধি নিয়ে কি করবে ? এত রাজনীতির চাল চালতে পার, এতরকম কথা বলতে পার, আর সামান্য একটা ফন্দি ঠিক করতে পারছ না ?"

গিদো বলিলেন, "এই ভাবে যদি বকৃতে আরম্ভ কর তাহ'লে যেটুকু বুদ্ধি আছে, তাও লোপ পেয়ে যাবে।"

এমা বলিলেন, "আমি একটা উপায় ঠিক করেছি।"

গিদো বলিলেন, "সেটা আমি অনুমানই করেছিলাম।"

এমা একটু খোঁচা দিয়া বলিলেন, "তোমার বুদ্ধির দৌড় প্রশংসনীয়। যাক্ সে কথা। আমি বাবাকে সত্য কথাটা কিছুতেই জান্‌তে দিতে চাই না।"

গিদো বলিলেন, "সত্যটা বড়ই শোচনীয়।"

এমা বলিলেন, "বিশেষণ যোগ ক'রে কোনও লাভ নেই। আমার বাবা সত্যটা জানতে পারলে অত্যন্ত মর্ম্মাহত হবেন, আমারও বড় খারাপ লাগবে। সন্তানদের অপরাধে পিতামাতার শাস্তি হওয়া উচিত নয়। এতদিন পর্য্যন্ত তাঁকে আমরা দুঃখ থেকে বাঁচিয়ে রাখতে পেরেছি, কারণ তিনি অনেক দূরে থাকতেন এবং তুমিও আমার সাহায্য করেছ। কিন্তু কাল ত আমাদের সব মিথ্যাচরণ প্রকাশ হয়ে পড়বে, তখন উপায় কি হবে ? যেমন ক'রে হোক, তাঁর কাছ থেকে সত্য গোপন করতে হবে। আমি তোমার সাহায্য চাই। তিনি এসে আমাদের যেন একত্রই দেখেন। কথায় বা ব্যবহারে আসল অবস্থা কি, তা যেন কিছুতেই না প্রকাশ পায়। এটা আমাদের করতেই হবে।"

গিদো নীরবে এমার কথা শুনিতেছিলেন। এমা থামিবার পরও তিনি কিছু বলিলেন না দেখিয়া তাঁহার পত্নী একটু অসহিষ্ণুভাবে বলিলেন, "জিনিষটা একটা অভিনয় মাত্র, তাও অল্পক্ষণের জন্য। এতে এত ভাববার কি আছে ?

গিদো বলিলেন, আমি ত রাজীই আছি। কিন্তু পাছে কোথাও গোলমাল হয়ে সব ফাঁস হয়ে যায়, এই আমার ভয়।

এমা বলিলেন, "কি ক'রে গোলমাল হবে ?"

গিদো বলিলেন, "চাকর-বাকরগুলো ত রয়েছে ?"

এমা বলিলেন, "তোমার নূতন চাকরটাকে কাল ছুটি দিয়ে দিও, আমি জুসেপ্পের সঙ্গে কথা ব'লে সব ঠিক ক'রে নেব।"

"যদি হঠাৎ বন্ধুবান্ধব কেউ এসে হাজির হয় ?"

এমা বলিলেন, "জুসেপ্পেকে ব'লে দিও সকলকে বলতে যে আমরা বাড়ি নেই।"

গিদো বলিলেন, "ষ্টেশনে তাঁকে আনতে আমাদের যেতে হবে ত ? আমাদের একসঙ্গে দেখলে লোকে কি বল্‌বে ?"

এমা বলিলেন, "কেউ আমাদের দেখলে ত ? একটা বন্ধ গাড়ীতে গেলেই হবে।"

গিদো দেখিলেন এমা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। তবুও তিনি বলিলেন, "সারাদিন তিনি থাকবেন, বাড়িটা যে নিতান্তই লক্ষ্মীছাড়া আইবুড়োর বাড়ির মত হয়ে আছে, তা কি বুঝবেন না ?"

এমা হাসিয়া বলিলেন, "আহা, অভিনয় করতে গেলে তার সাজসরঞ্জাম সব চাই ত ? আমার বাজনা, শেলাইয়ের তোড়জোড়, দু-চারটে পোষাক, এ সব নিয়ে আস্‌ব। ঘরগুলির কিছু পরিবর্ত্তন হয়েছে কি ?

গিদো বিষণ্ণভাবে বলিলেন, "কিছুই বদলান হয়নি, তুমি যেমন রেখে গিয়েছিলে, সেই রকমই সব আছে।"

এমা বলিলেন, "ধন্যবাদ, তোমার আর কোনও আপত্তি নেই ত ?"

গিদো বলিলেন, "আমার আর কি আপত্তি ? তবে তোমার বাবার চোখে শেষ অবধি ধুলো দিতে পারব কিনা, সেইটাই আমার সন্দেহ।"

এমা বিদ্রূপের সুরে বলিলেন, "কেন, প্রেমিক-যুগলের অভিনয় আমরা করতে পারব না, ভাল ক'রে ? আমাদের নববিবাহিত জীবনের দিনগুলি মনে ক'রে সেই মত চললেই হবে ?"

গিদো চট করিয়া জবাব দিলেন, "সে সব প্রায় ভুলেই গিয়েছি।" দুজনে দুজনের দিকে তীব্রভাবে একবার চাহিয়া দেখিলেন, যেন পরস্পরের শক্তি পরীক্ষা করিতে চান।

এমা বলিলেন, "আজকে তোমার কোথাও যাবার কথা নেই ত ? আমার এরকম ক'রে তোমার সময় নষ্ট করা বড় স্বার্থপরের মত কাজ হচ্ছে।"

গিদো বলিলেন, "কোথাও আমার যাবার কথা নেই, আর থাকলেও আমি যেতাম না।"

এমা বলিলেন, "আবার তোমায় ধন্যবাদ জানাচ্ছি। যাক, সন্ধ্যাবেলাটা তাহ'লে কাজে লাগান যেতে পারে।"

গিদো বলিলেন, "কি কাজ ?"

এমা বলিলেন, "জিনিষপত্র নিয়ে এসে, ঘরদোর সব ঠিক করে রাখতে হবে ত ? তোমার এখানে বসে থাকবার কিছুই দরকার নেই। কাল দশটার আগে তোমায় কিছুই করতে হবে না। সুতরাং কোথাও যাবার থাকলে স্বচ্ছন্দে যেতে পার।"

গিদো বলিলেন, "একটা নৃত্যোৎসবে আমার যাবার কথা ছিল, কিন্তু তোমার দরকার থাকলে আমি যাব না।"

এমা ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, "না, না, আমার কিছু দরকার নেই। এখানে থাকলেই আমাদের কথা বলতে হবে, কিন্তু আমাদের পরস্পরকে বলবার মত আর কোনও কথা নেই।"

গিদো বলিলেন, "কোন কথা নেই, না অত্যন্ত বেশী কথা আছে ? কিন্তু যাক সে কথা। আমাকে দরকার নেই ত ? আমি তাহ'লে গিয়ে কাপড় পরি।"

এমা সম্মতিসূচক মাথা নাড়িলেন, গিদো বাহির হইয়া গেলেন। মুখে তাঁহার মানসিক সংগ্রামের কোনো চিহ্ন ছিল না, কিন্তু ভিতরে ভিতরে তাঁহার অত্যন্ত অশান্তি বোধ হইতেছিল।

নৃত্যোৎসবে গিয়াও তিনি অতিশয় অন্যমনস্ক হইয়া রহিলেন। ব্যারোনেস ষ্টিফানিয়া ভাবিয়াই পাইলেন না যে তাঁহার হইয়াছে কি। অল্পক্ষণ পরেই গিদো অন্য সকলের অজ্ঞাতে উৎসবক্ষেত্র হইতে বাহির হইয়া পড়িলেন এবং সোজা বাড়ি ফিরিয়া আসিলেন। আশ্চর্য্য হইয়া দেখিলেন, সমস্ত বাড়ির চেহারা বদলাইয়া গিয়াছে। বড় বসিবার ঘরটি এতকাল বন্ধই থাকিত,

আজ তাহা খোলা হইয়াছে এবং সবগুলি আলো জ্বলিতেছে। কাপড় রাখিবার আলমারি, খাদ্যদ্রব্যের আল্‌মারি সব ক'টা খোলা হইয়াছে এবং ফুলের সুগন্ধে বাড়ি ভরিয়া উঠিয়াছে। এমার বাজনা আসিয়াছে, তাহার উপর স্বরলিপি সাজান। আস্‌বাবগুলি নাড়িয়া চাড়িয়া অন্য রকম করিয়া রাখা হইয়াছে, ফুলদানীগুলিতে ফুলের তোড়া দেওয়া হইয়াছে, এমা নিজে একটি সুন্দর পোষাক পরিয়া ঘরের ভিতর ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন।

গিদোর বোধ হইল তিনি যেন স্বপ্ন দেখিতেছেন। এমা কি ফিরিয়া আসিয়াছেন? দুই বৎসর ব্যাপী ভীষণ বিচ্ছেদ, স্বামী-স্ত্রীর কলহ, এ সব কি তিনি কল্পনা করিয়াছিলেন?

গিদো ঘরের ভিতর দিয়া যাইতে যাইতে বলিলেন, "শুভরাত্রি।"

এমা মুখ না ফিরাইয়াই উত্তর দিলেন, "শুভরাত্রি।"

২

বিবাহের আগে এই দুইটি মানুষ কিন্তু পরস্পরকে পাগলের মত ভালবাসিত। গিদো এমার অনুসরণ করিয়া ইটালি ঘুরিয়া বেড়াইয়াছিলেন। কতরাত যে বিনিদ্রভাবে এমার জানলার নীচে দাঁড়াইয়া কাটাইয়াছিলেন, তাহার ঠিক-ঠিকানা নাই। এমারও অলিন্দে দাঁড়াইয়া থাকিতে ক্লান্তি দেখা যাইত না এবং আট দশ পৃষ্ঠার চিঠিলেখা তাঁহার নিত্যকর্ম্ম হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। বিবাহের পরও তিনটি বৎসর তাঁহারা অত্যন্ত সুখে ছিলেন। মধ্যে মধ্যে অবশ্য একটু-আধটু খুঁটিনাটি বাধিয়া যাইত, কারণ এমা অত্যন্ত আদুরে মেয়ে ছিলেন, এবং স্বামী সম্বন্ধে একটু ঈর্ষা-পরায়ণাও ছিলেন। গিদো ছিলেন অতি ধীর প্রকৃতিস্থ স্বভাবের মানুষ, স্ত্রী রাগারাগি করিলে তিনি বড়-জোর মৃদু একটু হাসিতেন। ইহাতে অবশ্য উল্টা ফল হইত, এমার ক্রোধের আগুনে ঘৃতাহুতি পড়িত। কিন্তু মিটমাট হইতে বিলম্ব হইত না।

বিবাহের বহুদিন পূর্ব্বে গিদো একটি মেয়েকে ভাল-বাসিতেন, ইহার সহিত হঠাৎ তাঁহার একদিন সাক্ষাৎ হইল। এমা এই কথা জানিতে পারিয়া অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন, এবং সত্য গোপন করিয়াছেন বলিয়া গিদোকে তিরস্কার করিতে লাগিলেন। স্ত্রীর বিশ্বাসের অভাব দেখিয়া গিদো ক্রুদ্ধ হইলেন এবং ব্যাপারটাকে সামান্য বলিয়া যেন উড়াইয়াই দিলেন।

ইহার ফল হইল বিষময়। এমার সমস্ত ভালবাসা যেন ঘৃণা ও বিদ্বেষে পরিণত হইল। তিনি অতি গর্ব্বিত স্বভাবের ছিলেন এবং স্বামী আর একটি মহিলাকে ভালবাসে মনে করিয়া তাঁহার আত্মাভিমান অত্যন্ত আহত হইল। তিনি ধরিয়াই লইলেন যে গিদো এখনও সেই মহিলাটিকে ভালবাসেন।

তিনি স্বামীর কাছে গিয়া বলিলেন তাঁহাদের আর একসঙ্গে থাকা অসম্ভব। কোনো গোলমাল না করিয়া সোজাসুজি পৃথক হইয়া গেলেই ভাল।

গিদো একেবারে বজ্রাহত হইয়া গেলেন। প্রথমে তিনি আপত্তি করিলেন, ব্যাপারটাকে ঠাট্টা করিয়া উড়াইয়া দিতে চাহিলেন, এবং স্ত্রীকে বুঝাইবার চেষ্টাও করিলেন। কিন্তু এমা এমন কঠিন ও উদ্ধতভাবে উত্তর দিলেন যে গিদোর চুপ করিয়া যাওয়া ভিন্ন আর কোনো উপায় রহিল না। স্ত্রীকে আর কিছু বলা তিনি আত্মসম্মানের পক্ষে হানিকর বিবেচনা করিলেন, এবং গম্ভীরভাবে এমার সব সর্ত্তে রাজী হইয়া তাঁহাকে যাইতে দিলেন। তাঁহার দৃঢ়বিশ্বাস হইল এমা হৃদয়হীনা এবং অত্যন্ত গর্ব্বিতা। ইহার পর তিনি রাজনৈতিক আন্দোলনে ঝাঁপ দিয়া পড়িলেন, সামাজিক আমোদ-প্রমোদেও খুব বেশী করিয়া যোগ দিতে লাগিলেন। তিনি এমন ভাব ধারণ করিয়া থাকিতেন যেন এই দ্বিতীয় কৌমার্য্যের দশায় তিনি অতি সুখে আছেন। কিন্তু যখন তিনি একাকী থাকিতেন, তখন নিজের কাছে নিজে স্বীকার না করিয়া পারিতেন না যে তাঁহার জীবনের সুখশান্তি চিরদিনের জন্য নষ্ট হইয়া গিয়াছে। সামাজিক উৎসবক্ষেত্রে মধ্যে মধ্যে এমার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইত। তাঁহারা নীরবে পরস্পরকে অভিবাদন করিয়া সরিয়া যাইতেন। এমা কদাচিৎ বাহির হইতেন, কারণ গিদোর সঙ্গে বেশী দেখা হয়, তাহা তিনি চাহিতেন না।

পৃথক হইবার পূর্ব্বে তাঁহারা কিন্তু একটি সর্ত্ত করিয়াছিলেন। এমার বৃদ্ধ পিতাকে কিছু জানান হইবে না। দুই জনেই পূর্ব্বের মত তাঁহার নিকট চিঠিপত্র লিখিবেন।

এমার পিতা শ্রীযুক্ত জর্জ্জো নেকে কিছু বলা হইল না। তিনি নিজের মিথ্যা সুখস্বর্গে বাস করিতে লাগিলেন। কিন্তু তিনি মিলানে আসিবার প্রস্তাব করাতে বিপদ বাধিল।

গর্ব্বিত স্বভাবের বাধা কাটাইয়া এমাকে আবার স্বামীর অনুগ্রহপ্রার্থিনী হইয়া আসিতে হইল। যে-গৃহ তিনি উন্নতমস্তকে ত্যাগ করিয়া গিয়াছিলেন, সেখানে আবার প্রবেশ করিতে তাঁহার বাধিতেছিল। তিনি ক্রমাগত মনে মনে জপ করিতে লাগিলেন, "আমি এটা বাবার খাতিরে করছি।"

গিদোর কঠোর ভদ্রতা তাঁহাকে শক্তি দিল। তাঁহাদের কথাবার্ত্তা মোটের উপর সন্তোষজনকই হইল। যাহা ঘটিয়া গিয়াছে, কেহই তাহার উল্লেখ করিলেন না, ভবিষ্যতের কথাও কিছু হইল না! উভয়েই ধীরস্থির বিজ্ঞ ব্যক্তির মত ব্যবহার করিলেন। কিন্তু পরের দিনটা কি ভাবে কাটিবে? বৃদ্ধকে ষ্টেশন হইতে গৃহে আনিয়া, না জানি কত মিথ্যা কথা তাঁহাদের বলিতে হইবে, কত মিথ্যাচারই করিতে হইবে। তাহার পর? তাহার পর আবার অভিনেতা দুটি পরস্পরকে অত্যন্ত দূর হইতে অভিবাদন করিবে এবং যে যাহার পথে চলিয়া যাইবে। নিজেদের কলহের একটা নিষ্পত্তি করিবার একজনেরও ইচ্ছা ছিল না। গিদো কখনও প্রথমে অগ্রসর হইবেন না এবং এমাও কখনও ক্ষমা করিবেন না। স্বামী-স্ত্রী দুজনেই মনে মনে ভাবিলেন, বর্ত্তমান ব্যবস্থায়ই তাঁহারা বেশ সুখে আছেন, পরিবর্ত্তনের কোনো প্রয়োজন নাই।

সান্ধ্য আহারটা সবেমাত্র শেষ হইয়াছে। এমার পিতা চেয়ারে হেলান দিয়া আনন্দের হাসি হাসিতে-ছিলেন। তাঁহার মন তখন সুখে ভরপুর। মেয়ে-জামাই তাঁহাকে অতিশয় আগ্রহের সহিত অভ্যর্থনা করিয়াছেন, কোনও কিছুতে খুঁৎ ধরিবার জো ছিল না।

অভিনেতা দুইজনও তাঁহার হাসিতে যোগ দিয়া হাসিতেছিলেন, কিন্তু মনে মনে তাঁহারা বড়ই বিপন্ন বোধ করিতেছিলেন। কাল রাত্রে যাহা অত্যন্ত সহজ বোধ হইয়াছিল, আজ আর তাহা তত সহজ মনে হইতেছিল না। ষ্টেশন হইতেই বিপদ সুরু হইয়াছিল। এমার পিতা ট্রেন হইতে নামিয়াই এক হাতে কন্যাকে, অন্য হাতে জামাতাকে জড়াইয়া ধরিয়া চুম্বন করিলেন। গিদো এবং এমাকে বাধ্য হইয়া পরস্পরকে নাম ধরিয়া ডাকিতে হইল এবং অতিশয় প্রণয়াসক্ত পতি-পত্নীর মত ব্যবহার করিতে হইল। গিদোর মুখ থাকিয়া থাকিয়া হৃদয়াবেগের আতিশয্যে বিবর্ণ হইয়া উঠিতেছিল, এমার মুখেও রক্তোচ্ছ্বাস ঘনাইয়া উঠিতেছিল। অভিনয় করিতেছিলেন বটে, কিন্তু নিজেদের বিগত সুখের দিনগুলি বড় বেশী করিয়া তাঁহাদের মনে পড়িতেছিল। তখনকার দিনে দুজনার পরস্পরের প্রতি যে মনোভাব ছিল, তাহা বার-বার মনে জাগিয়া উঠিতেছিল। ইহার উপর তাঁহাদের সর্ব্বদাই সশঙ্কিত হইয়া থাকিতে হইতেছিল, পাছে কোনো অসাবধানতায় বৃদ্ধের নিকট তাঁহারা ধরা পড়িয়া যান। তাঁহারা দুজনেই বড় বেশী বিচলিত হইয়া উঠিয়াছিলেন, কেন জানি না তাঁহাদের কেবলই মনে হইতেছিল, এই অভিনয় হইতে তাঁহাদের জীবনে বিপুল একটা পরিবর্ত্তন আসিয়া পড়িবে।

আহারের পর বৃদ্ধ উপরে চলিলেন। এমা এবং গিদো তাঁহার পশ্চাতে আসিতেছিলেন। এমা অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে গিদোর দিকে চাহিলেন। গিদো তাঁহার মনের কথা বুঝিলেন, এমা ভাবিতেছেন "কেমন করে আমরা সারাটা দিন এই অভিনয় চালাব?"

গিদোও অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে উত্তর দিলেন, তাহার মনের ভাব, "আমরা যথাসাধ্য করে যাই, তারপর যা করেন ভাগ্যবিধাতা।"

ইহার পর অভিনয় চালাইয়া যাওয়া আরও শক্ত হইল, কারণ এমার পিতা বসিবার ঘরে আসিয়া আরাম-চেয়ারে বসিলেন এবং নানাপ্রকার প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, সেগুলির উত্তর দিতে স্বামী-স্ত্রী দুজনকেই বড় বিপন্ন হইতে হইল।

বৃদ্ধ কফি পান করিতে করিতে বলিলেন, "আজ তোমাদের সঙ্গে একটা দিন কাটিয়ে আমি যে কি পর্য্যন্ত সুখী হলাম, তা বলতে পারি না। মা লক্ষ্মী, তোমাদের চিঠিপত্র আমি সর্ব্বদাই পাই, কিন্তু চোখে দেখে যে আনন্দ হয়, তার তুলনা নেই। তুমি আগের চেয়েও দেখতে আরও সুন্দর হয়েছ, তাই না গিদো?"

গিদো হাসিয়া বলিলেন, "হ্যাঁ আমিও ওকে সেই কথা বলছিলাম।"

বৃদ্ধ বলিলেন, "ঠিক কথা। এমা, তুমি আদর্শ স্বামী পেয়েছ। চিঠিতেও গিদো তোমার কথা ছাড়া আর কিছু লেখেন না। তুমি একেবারে তাঁকে যাদু করে ফেলেছ।"

এমা শান্তস্বরে বলিলেন, "হ্যাঁ, বাস্তবিকই তিনি আদর্শ স্বামী।"

এই কথার পর তিনজনেই খানিকক্ষণ নীরব হইয়া রহিলেন। গিদো নতমস্তকে কি যেন চিন্তা করিতে লাগিলেন। তাহার পর বৃদ্ধ বলিলেন, "তোমার মাসতুতো বোন রোজালিয়া তোমায় ভালবাসা জানিয়েছে। বেচারীর অনেক দুঃখকষ্ট গেল।"

এমা একটু যেন বিদ্রূপের স্বরে বলিলেন, "সে না তার পিয়েরোকে বিয়ে করেছিল?"

এমার পিতা বলিলেন, 'হ্যাঁ, বিয়ে করেছিল বটে, এবং পরস্পরের প্রতি তাদেব ভালবাসাও ছিল, কিন্তু কেমন যেন বনিবনাও হল না। ঝগড়াঝাঁটি করে রোজালিয়া শেষে আবার বাড়ি ফিরে এল।"

এমা বলিয়া উঠিলেন, "ঠিক করেছিল।"

বৃদ্ধ বলিলেন, "ছি মা, এরকম কথা বোলো না। স্ত্রীর কখনও উচিত নয় স্বামীকে ছেড়ে যাওয়া। যাক আমি অনেক করে বুঝিয়ে বলাতে এখন সব মিটমাট হয়ে গেছে, রোজেলিয়া আবার স্বামীর কাছে ফিরে গেছে।"

এমা বলিলেন, "তুমি শেষে মিটমাট করে দিলে বাবা?"

বৃদ্ধ বলিলেন, "হ্যাঁ মা, এজন্যে আমি খুব গর্ব্ব অনুভব করি। তোমার স্বর্গগতা মাতারও এই মত ছিল, তিনি অতি ক্ষমাশীলা ছিলেন। তিনি সর্ব্বদাই বলতেন —যারা ভালবাসে বেশী, তারা ক্ষমাও করে বেশী।"

সকলে আবার কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন, তাহার পর বৃদ্ধ বলিলেন, "চল মা, তোমাদের বাড়িঘর সব ঘুরে দেখে আসি। চারিদিকেই খুব মখমল আর রেশমের ছড়াছড়ি দেখছি, একটু ভাল করে দেখা যাক্।"

গিদো বলিলেন, "চলুন বড় বসবার ঘরটা দিয়ে সুরু করা যাক।"

বৃদ্ধ সেই ঘরে ঢুকিয়া বলিলেন "চমৎকার ঘরখানি। বড় নিমন্ত্রণের পক্ষে ঠিক উপযোগী। তোমরা কিন্তু খুব বেশী ভোজটোজ দেও?"

গিদো তাড়াতাড়ি বলিলেন, "আগে এখনকার চেয়ে ঢের বেশী দিতাম।"

তাঁহার শ্বশুর বলিলেন, "তা ত হবেই, এখন রাজনৈতিক কাজে অনেক সময় যায়। আর এইটি বুঝি মেয়ের বসবার ঘর? কি সুন্দর! আসবাবগুলি কি এমা নিজে পছন্দ করে এনেছ?"

এমা বলিলেন, "না, গিদোই ও-গুলি এনেছেন।" বৃদ্ধ হাসিয়া বলিলেন, "তোমার পছন্দের তারিফ করতে হয়। এমা সারাক্ষণই এখানটায় কাটাও বুঝি?"

তাহার পর শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া বলিলেন, "এই ঘরের রংগুলি ভারি সুন্দর। কিন্তু এমা, একটা জিনিষ দেখতে পাচ্ছি না যে?"

এমা ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, "কি বাবা?"

"তোমার মায়ের ছবিখানি কি হ'ল? সেটা ত এই ঘরে থাকা উচিত।"

এমা একান্ত বিপন্ন বোধ করিতেছেন দেখিয়া গিদো তাড়াতাড়ি বলিলেন, "আমরা মাঝে অনেক দিন বাইরে ছিলাম কিনা? আমাদের সব জিনিষপত্র এখনও এসে পৌছয়নি।"

বৃদ্ধ বলিলেন, "সে ছবিখানা ফেলে আসা ঠিক হয়নি। তা যাক, এমা কখনও তার মাকে ভুলবে না। গিদো তুমি তাঁকে জান্‌লে না এই আমার মস্ত দুঃখ। তিনি মরবার সময় আমাকে প্রতিজ্ঞা করিয়ে যান যে এমার সুখের জন্য আমি যেন সব কিছু করতে রাজী হই। সুতরাং এমা যখন তোমায় ভালবাস্‌ল, তখন আমি তাঁর কথা স্মরণ করে কোনো বাধা দিলাম না। এমা, সেই



চড়াই উৎরাই

শ্রীবিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

ইংলিশ কন্‌সালের বাড়ির নৃত্যোৎসব তোমার মনে আছে? যেখানে আমরা গিদোর সঙ্গে গিয়েছিলাম?"

এমা যন্ত্রচালিতের মত বলিলেন, "হ্যাঁ বাবা।"

বৃদ্ধ হাসিয়া বলিলেন. "তোমরা যে বাগদত্ত হয়েছ তা আর সেখানে কাউকে বলে দিতে হয়নি, তোমাদের চেহারা দেখেই সবাই বুঝেছিল।"

গিদো হাসিয়া বলিলেন, "তা বোঝা গিয়েছিল বটে।"

এমার পিতা বলিলেন, "তোমাদের পরস্পরের প্রতি এই রকম প্রগাঢ় প্রেম যেন চিরদিন থাকে, এই প্রার্থনা করি।"

গিদো বলিলেন, "সেই আশাই করি।" বৃদ্ধ চলিতে চলিতে একটা ঘরের সামনে দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ-ঘরে কি হয়? এটা বন্ধ যে?"

এই ঘরটিতে গিদো আজকাল শয়ন করিতেন, এমা ইহাতে প্রবেশ করেন নাই। তাঁহার পিতা যে প্রত্যেকটি ঘর দেখিতে চাহিবেন, তাহা তাঁহারা মনে করেন নাই।

গিদো কি বলিবেন ভাবিয়া পাইতেছেন না দেখিয়া এমা তাড়াতাড়ি বলিলেন, "এটা বাড়তি শোবার ঘর বাবা।"

বৃদ্ধ বলিলেন, "ও, আমি রাত্রে থাকতে পারলে তাহ'লে আমাকে এই ঘরটা দিতে? দুঃখের বিষয় আমি কিছুতেই থাকতে পারব না।"

গিদো বলিলেন, "আপনি একদিনও থাকতে পারলেন না, এতে আমরা বাস্তবিকই বড় দুঃখিত হয়েছি।"

"আচ্ছা, আর এক সময় এসে থাকা যাবে। এবার ঘরটাই দেখে মনের খেদ মিটাই। দরজাটা খুলে দাও ত।"

এমা বলিলেন, "কিন্তু বাবা—"

তাঁহার পিতা বলিলেন, "ঘরখানা গুছনো নেই, এই ত বল্‌তে চাও? তাতে কিছু এসে যায় না।"

গিদো দেখিলেন বৃদ্ধকে বাধা দেওয়া বৃথা, তিনি সাহসে ভর করিয়া দরজটা খুলিয়া দিলেন।

বৃদ্ধ ঘরে ঢুকিয়া বলিলেন, "ভারি সুন্দর ঘর। কেন, বেশ ত গুছানো রয়েছে? এই যে এমার ছবি! গিদো নিশ্চয় এটি এখানে রেখেছে, আমাকে খুশি করবার জন্যে। ধন্যবাদ। তুমি যে মনে করে এটি করেছ, এতে আমি ভারি খুশি হয়েছি।"

তাঁহারা আবার ফিরিয়া গিয়া বসিবার ঘরে বসিলেন। স্বামী-স্ত্রী দুজনকেই অত্যন্ত অন্যমনস্ক দেখাইতেছিল। এমার পিতা যদি অত্যন্ত সরলপ্রকৃতি না হইতেন, তাহা হইলে তিনি নিশ্চয়ই কিছু সন্দেহ করিতেন। কিন্তু তাঁহার সেদিকে দৃষ্টিই ছিল না। বসিয়া তিনি বলিলেন, "এমন সুন্দর বাড়ি ছেড়ে বার-বার তোমাদের চলে যেতে হবে, বড় দুঃখের বিষয়।"

এমা বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "সে কি বাবা?"

তাঁহার পিতা বলিলেন, "গিদো যদি প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হন, তাহ'লে তাঁকে বছরের ভিতর ছয় মাস রোমে গিয়ে থাকতে হবে। তখন তোমাকেও ত আর তিনি একলা মিলানে রেখে যাবেন না? তোমাদের দুজায়গায় দুটো বাড়ি করতে হবে আর কি? তোমাদের খুবই জ্বালাতন হ'তে হবে, কিন্তু আমার একটু সুবিধে হবে। তোমরা যতদিন রোমে থাকবে, আমি তোমাদের খুব ঘন ঘন দেখতে পাব, কারণ রোম থেকে নেপ্‌ল্‌স্ খুব কাছেই।"

৪

এমার পিতাকে ষ্টেশনে গিয়া ট্রেনে তুলিয়া দিয়া স্বামী-স্ত্রী আবার গাড়ীতে চড়িয়া বসিলেন। দুইজনেই যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলেন।

অভিনয় শেষ হইয়া গিয়াছে, এখন তাঁহারা যে যাহার সাধারণ জীবনযাত্রার ভিতর ফিরিয়া যাইতে পারিবেন। এমা জানালা দিয়া বাহিরে চাহিয়া রহিলেন, এবং গিদো নীরবে বসিয়া রহিলেন। হঠাৎ গিদোর হাত তাহার পত্নীর অঙ্গে ঠেকিয়া গেল।

গিদো বলিলেন, "কিছু মনে করো না।" এমা গম্ভীরভাবে বলিলেন, "না মনে আর কি করব?"

তাঁহারা যেন অতি দূরের মানুষ! অথচ দুজনেরই মনের ভিতর সারাদিনের ঘটনাবলী ক্রমাগত ঘুরিতেছিল। পরস্পরকে কি তাঁহারা বলিয়াছিলেন, কখন্ কোন্ ভাব তাঁহাদের মনে আসিয়াছিল।

রাস্তার মোড়ের কাছে গাড়ী আসিবামাত্র গিদো জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি সোজা তোমার বাড়ি চলে যেতে চাও?"

এমা বলিলেন, "না, আমায় একবার তোমার ওখানে গিয়ে জিনিসপত্রগুলো গুছিয়ে নিতে হবে ত? ঝি-টা একলা পারবে না। গোছান হলেই আমি চলে যাব।"

গিদো বলিলেন, "তা বেশ।"

বাড়ি পৌছিবামাত্র এমা তাড়াতাড়ি তাঁহার ছোট বসিবার ঘরটিতে গিয়া প্রবেশ করিলেন। গিদো বসিবার ঘরে গিয়া একখানা খবরের কাগজ টানিয়া লইয়া পড়িতে বসিয়া গেলেন। পড়িবার ভাণ তিনি করিতেছিলেন বটে, কিন্তু আসলে তাঁহার কান ছিল পাশের ঘরে। এমার পদধ্বনি শুনিতেই তিনি ব্যস্ত ছিলেন। এমা মধ্যে মধ্যে দরজার সামনে দিয়া আসা-যাওয়া করিতেছিলেন, গিদো তাহাই দেখিতেছিলেন।

একবার তিনি ডাকিয়া বলিলেন, "তোমার কি ক্লান্তি বোধ হচ্ছে না?"

এমা বলিলেন, "না, আমার কাজ প্রায় শেষ হয়ে এল।"

অল্পক্ষণ পরেই এমা আসিয়া বসিবার ঘরে প্রবেশ করিলেন। একখানা চেয়ার টানিয়া বসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখনও বৃষ্টি হচ্ছে নাকি?" তাঁহাকে অত্যন্ত অবসন্ন দেখাইতেছিল।

গিদো কাগজখানা নামাইয়া রাখিয়া বলিলেন, "হ্যা, এখনও হচ্ছে বটে।"

এমা জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমার গাড়ীটা কি এখনও আসেনি?"

গিদো বলিলেন, "জানি না ত, আচ্ছা গিয়ে দেখে আস্‌ছি।"

এমা বলিলেন, "থাক, অত কষ্ট করতে হবে না। এখনি আসবে এখন।"

গিদো জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমাকে বাড়ি পৌছে দিয়ে আসব?"

"তার দরকার নেই।"

সময় যেন কাটিতে চাহিতেছিল না। ভৃত্য আসিয়া যখন খবর দিল যে গাড়ী আসিয়াছে, এমা তখন তাড়াতাড়ি উঠিয়া টুপী পরিতে লাগিলেন। টুপীতে পিন্ গুঁজিতে তাঁহার আঙুলগুলি ক্রমাগত কাঁপিতেছিল।

টুপী পরা শেষ হইলে তিনি দস্তানা পরিয়া প্রস্তুত হইলেন। আয়নার সামনে দাঁড়াইয়া পোষাক-পরিচ্ছদ একটু আধটু ঠিকঠাক করিয়া লইলেন। তাহার পর বিদায় গ্রহণ করিবার জন্য গিদোর দিকে ফিরিয়া দাঁড়াইলেন। গিদোও অত্যন্ত বিবর্ণমুখে উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

এমা মৃদুস্বরে বলিলেন—"বিদায়।"

গিদো উত্তর দিলেন না। এমা বাহির হইয়া চলিলেন। তাঁহার পদক্ষেপ দৃঢ়তাব্যঞ্জক, তিনি যে একটুও কাতর হন নাই, তাহাই যেন জোর করিয়া বুঝাইতে চাহিতেছিলেন। তিনি পিছন ফিরিয়া একবারও তাকাইলেন না, কিন্তু গিদো যে তাঁহার পশ্চাতে আসিতেছেন, তাহা তিনি ভাল করিয়াই বুঝিতে পারিতেছিলেন।

দরজার সামনে একটি ভারি মখমলের পরদা ঝুলিতেছে। সেটিকে তুলিয়া ধরিবার জন্য এমা হাত বাড়াইতেই গিদো ক্ষিপ্রহস্তে পরদাটি টানিয়া ধরিলেন। তাঁহার হাত এমার হাতে ঠেকিয়া গেল।

গিদো বলিলেন, "এমা, তুমি যে আমাকে ক্ষমা করেছ, তা বলতে ভুলে গিয়েছ।" তাঁহার কণ্ঠস্বর গভীর এবং বেদনাপূর্ণ।

এমা চকিতে তাঁহার দিকে তাকাইয়া তাঁহার বক্ষে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। পুরাতন প্রেমের স্রোত আবার নূতন হইয়া তাঁহাকে ভাসাইয়া লইয়া গেল।

গিদো পত্নীকে প্রগাঢ় আলিঙ্গনে বাঁধিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি আর কখনও আমাকে ছেড়ে যাবে না ত?"

এমা তাঁহার স্কন্ধে মুখ লুকাইয়া বলিলেন, "না গিদো। আমার মায়ের ছবিখানা এইখানেই নিয়ে আসব।"

পুস্তক পরিচয়

মুক্তিপথে—শ্রীপ্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত ও গ্রন্থকার কর্ত্তৃক মহিষবাথান হইতে প্রকাশিত। মূল্য এক টাকা।

বইখানি কবিতার বই বলিয়াই আজিকার পাঠক সমাজে ইহাকে বিশেষ করিয়া পরিচিত করার প্রয়োজন আছে। প্রভাতমোহন ইতিপূর্ব্বে চিত্রশিল্পী রূপে খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন। বর্ত্তমানে তিনি দেশহিতব্রতী সন্ন্যাসী— মহাত্মা গান্ধীর প্রাণদ মন্ত্রের উপাসক। এই কাব্যে তিনি সেই মন্ত্রেরই উদ্গাতা। কবিতাগুলি পড়িবার সময়ে মন ও প্রাণ দুই-ই উন্মুখ হইয়া উঠে; সেই সঙ্গে কাব্যের কারুকলাও মুগ্ধ করে। লেখকের রচনা প্রথম হইতে পাঠকের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে, এবং বইখানির ভিতর দিয়া অগ্রসর হইবার কালে ফাঁকি দিবার অবসর দেয় না; তার কারণ, একটি লেখাতেও লেখক নিজেকে ফাঁকি দেন নাই; কাব্য রচনাতেও এমন সত্যাগ্রহ আমাদের সাহিত্যে বিরল। কবিতাগুলির বিষয়বস্তু বা উপলক্ষ্য—বর্ত্তমান সত্যাগ্রহ সংগ্রাম ও তাহারই প্রত্যক্ষ বাস্তব-ক্ষেত্রে লেখকের নিজস্ব বাহিরের অভিজ্ঞতা ও অন্তরের অনুভূতি। এজন্য লেখকের এই আন্তরিকতা আদৌ বিস্ময়কর নয়। বিস্ময়কর হইয়াছে ইহাই যে, এই সকল কবিতার একটি অপূর্ব্ব ভাবকল্পনা অতি গভীর অনুভূতি বঞ্চিত হইয়া কবি-ভাষা লাভ করিয়াছে। কবি যে তরুণ তাহার প্রমাণও যেমন ইহাতে সর্ব্বত্র আছে, তেমনি, তিনি যে সত্যকার কবি-প্রতিভার অধিকারী তাহা ইহার সাবলীল ছন্দে ও সুনিপুণ বাণী-মুখরতায় ধরা পড়িয়াছে। এই কাব্যে আমরা একটি কঠোর সত্যপরায়ণ দেশ-হিতব্রতী মনুষ্যপেশিকের হৃদয়ে সরস্বতীর অধিষ্ঠান-কামনা দেখিয়া আশান্বিত হইয়াছি। যে বিস্ময়রসকে উৎকৃষ্ট কাব্যের মূল উপাদান বলিয়া অনেকে মনে করেন, এ কবির কাব্য-প্রেরণায় জীবনকে এক নূতন দিক দিয়া দেখার সেই বিস্ময় সর্ব্বত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে; অতিশয় কঠোর কঠিন বাস্তবের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতম পরিচয়ের ফলে মানুষ আত্মভ্রষ্ট না হইয়া বরং যখন সেই আত্মাকেই লাভ করে, তখন তাহার বেদনা-সিন্ধুর উপরে যে চিন্ময় জ্যোতির প্রকাশ দেখিয়া সে নিজেই আনন্দ-প্রত্যয়ে আত্মহারা হয়—এই কাব্যের অধিকাংশ স্থলে সেই সাত্ত্বিক জয়োল্লাসের অকৃত্রিম বাণী-ঘোষণা আছে। সকল কবিতাগুলিই যে বিশুদ্ধ কবিতা হইয়াছে একথা বলি না; কিন্তু কতকগুলি যে হইয়াছে তাহা কাব্যরসিক মাত্রেই স্বীকার করিবেন। বাকীগুলিতে ভাবের গভীরতা, আবেগ ও আন্তরিকতা যথেষ্ট পরিমাণে থাকিলেও তাহাতে কবির চিন্তাকুল অনুভূতি রসাবস্থাকে বিঘ্নিত করিয়াছে। কিন্তু এ গুলিতেও বাণীর দৈন্য নাই; বরং মনে হয়, যাঁহারা ভাব অপেক্ষা ভাবনার পক্ষপাতী তাঁহারা এইগুলিকেই বেশী পছন্দ করিবেন। মোটের উপর প্রায় কোনো রচনাই ব্যর্থ নয়; চিন্তার যে মৌলিকতা অতি গভীর আন্তরিক অনুভূতিতেই সম্ভব, তাহা এই কবিতাগুলির মধ্যে যথেষ্ট আছে। ছন্দ, ও বিশেষতঃ মিলের উপরে, কবির যে স্বচ্ছন্দ আধিপত্য লক্ষ্য করা যায় তাহাতেও তিনি যে কাব্য-রচনাকালে শিল্পীর আনন্দে মাতিয়া উঠেন, সে পরিচয় পাই। কাব্য-পরিচয়-প্রসঙ্গে কবিতা উদ্ধৃত করাই সঙ্গত; এই স্বল্প পরিসরে তাহা সম্ভব নয়। আমি কতকগুলি কবিতার নাম উল্লেখ করিব মাত্র। কতক-গুলি কবিতা কাব্য হিসাবে সার্থক হইয়াছে, যথা,—দেশের ডাক, বন্দী, জন্মাষ্টমী, প্রেতপুরী, প্রিয়জন, মৃত্যুভীত, কারায় শরৎ, দেশমাতৃকা, ভাইফোঁটা, প্রত্যাশা, কবি, দিন-লিপি, যুদ্ধবিরতি। প্রেতপুরী, মৃত্যুভীত, ও দিন-লিপি, এবং 'ফাঁসি'র শেষ কয় ছত্র আমাদের বড় ভাল লাগিয়াছে। যে কয়টি কবিতা ভাব-চিন্তার গৌরবে অথবা শাণিত বচন-বিন্যাসের কৌশলে কবির শক্তিমত্তার পরিচয় দেয় তাহাদের মধ্যে এই কয়টি উল্লেখযোগ্য: দুরাগ্রহ, যোগসূত্র, ফাঁসি, সাক্ষাৎ, চাবুক, দেশের যুবা, মা বিদ্যা যা বিমুক্তয়ে, মুক্তি।

এই অসম্পূর্ণ কাব্য-পরিচয়ের শেষে যে দু-একটি কথা বলা আবশ্যক মনে করি তাহা এই। যে দেশ- ও জাতি- প্রেমই আধুনিক ভারতকে উচ্চতর আত্মিক সাধনার ব্রতী করিতেছে বলিয়া মনে হয়, এই তরুণ কবির কণ্ঠে তাহার যে ভারতী শুনিলাম, তাহাতে বাংলা কাব্য সম্বন্ধে আশ্বস্ত হইবার কারণ আছে। এতদিন জাতীয়তার নামে কাব্যে যে বাগাড়ম্বর ও ছন্দের হুঙ্কার শোনা যাইতেছিল, মনে হয়, অতঃপর তাহা কান ছাড়িয়া প্রাণের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হইবে; এবং জাতি-প্রেমের ভিতর দিয়াই যে মনুষ্যত্বের উদ্বোধন হইবে, তাহা আমাদের কাব্যকেও বিপুল, গভীর ও বিচিত্র করিয়া তুলিবে। তরুণ-কবি তাঁহার নিজেরই কবিপ্রাণকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন—

> কবি—সে কি শুধু কথা কবে?...
> সেকি শুধু এ সংসারে উৎসবের উপচারে—
> দুর্দ্দিনের হাহাকারে নহে?
> বন্দিদাহে গৃহজন যবে করে প্রাণপণ,
> সে তখনো শুধু কথা কহে?
> তরণী ডুবিছে ঝড়ে, যাত্রীদল সমস্বরে
> জুড়িয়াছে ব্যাকুল ক্রন্দন—
> তীরে সমাহিত-চিতে দেবগৃহ-দেহলীতে
> তখনো সে দিবে আলিম্পন?
> ধরণীর মর্ম্মতলে যেথা চলে বেদনজলে
> মানুষের অভিষেক-স্নান—
> বন্ধুর বাস্তব-লোক, চারিদিকে দুঃখশোক
> সেথা কি কবির নাহি স্থান?
> আঘাত লাঞ্ছনা ব্যথা মানুষে শিখায় যথা
> মহত্ত্বের উত্তরাধিকার,
> সেথা নাহি পশে সে কি? শুধু দূর হতে দেখি
> নিজমনে স্বপ্ন রচে তার?

কবির পক্ষে এ প্রশ্নের জবাব হয়ত আছে—কিন্তু আমরা সাধারণতঃ যে ধরণের কাব্য-নির্ম্মাণ করি তাহার পক্ষ হইতে ইহার জবাব দেওয়া দুরূহ। তাই মনে সংশয় জাগে।—

মনুষ্যত্ব দাঁড়ায়েছে দ্বারে,
পূজা-অর্ঘ্য দিতে হবে তারে;
মহিমায় সমুন্নত এসেছে রাজার মত—
আসে নাই ভিক্ষা চাহিবারে।
রে কৃপণ, ভয়ে ভয়ে—কি পূজা আনিলি লয়ে?
ছন্দে গাঁথা কবিতার হার?
ভাঙা-চোরা জোড়াতালি কথার গাঁথুনি খালি।
ওর কাছে কি দাম উহার?
বুঝিলি না মূঢ় ওরে! ও চায় সম্পূর্ণ তোরে,
একেবারে লুটে নিতে চায়—
তোর সর্ব্ব দেহমন, সর্ব্বজ্ঞান সর্ব্বপণ,
জীবনের সর্ব্ব কবিতায়।

ইহার উত্তরে আজ আমাদের কবিকুলের কি বলিবার আছে? কাব্যের আদর্শে যাহারা কাব্যরচনা করিতে পারে নাই, তাহারা এই জীবনের আদর্শকে তুচ্ছ করিবে কোন্ মুখে?

কিন্তু তরুণ কবিকে এ কথাও মনে রাখিতে হইবে যে, উৎকৃষ্ট কবি-কল্পনা বাস্তব জীবনযাত্রার আদর্শেই একান্ত নিয়মিত নয়; কবি-বৃত্তি মুখ্যতঃ লোক-চারণ-বৃত্তি নহে। তাঁহার কাব্যে এই বাস্তব জীবনাবেগকে আশ্রয় করিয়া কবিপ্রাণের যে এক নূতন অনুভূতিমার্গ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাই কবিকর্ম্ম-হিসাবে সার্থক; যেখানে বাস্তবের বাস্তবতাই তাহাকে অতিমাত্রায় বিচলিত করিয়াছে, সেখানে তাঁহার প্রাণধর্ম্ম কবিধর্ম্মকে ক্ষুণ্ণ করিয়াছে। বাস্তবের দ্বারা দেহ-চেতনার মন্থনে তাঁহার মুক্তিকামী আত্মা যেখানে জাগিয়াছে, সেইখানেই তাঁহার কবিকল্পনা স্ফূর্ত্তি পাইয়াছে। তাঁহার সেই কবিশক্তির অধিকতর স্ফুরণে বাংলা কাব্য লাভবান হউক, ইহাই আমার কামনা।

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

স্বাধীনতার দাবী—শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার কর্ত্তৃক প্রণীত এবং ৭১।১ নং মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট 'আনন্দ বাজার পত্রিকা' কার্যালয় হইতে গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ২৬৯ পৃষ্ঠা, দাম দুই টাকা।

ব্রিটিশসাম্রাজ্যভুক্ত অন্যান্য উপনিবেশগুলির স্বাধীনতা আন্দোলনের বিবরণ দিয়া গ্রন্থকার ভারতবর্ষের স্বাধীনতা-আন্দোলনের ইতিহাস রচনা করিয়াছেন। গ্রন্থখানি সাতটি অধ্যায়ে বিভক্ত, যথা (১) পূর্ণ স্বরাজ্য সঙ্কল্প, (২) ব্রিটিশ সাম্রাজ্য নীতি (৩) আমেরিকায় ব্রিটিশ অধিকারের পরিণাম, (৪) ইউরোপে নবযুগের সূচনা, (৫) কানাডা ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্য নীতি, (৬) আয়র্লণ্ডে ব্রিটিশ প্রভুত্ব, ও (৭) ভারত ও ব্রিটিশ শাসনতন্ত্র।

শেষোক্ত অধ্যায়টি সর্ব্বাপেক্ষা দীর্ঘ এবং মূল্যবান্। এই অধ্যায়ে ভারতবর্ষে ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রতিষ্ঠার সূত্রপাত হইতে আরম্ভ করিয়া গান্ধী-আরুইন চুক্তিকাল পর্য্যন্ত সুদীর্ঘ সময়ের যাবতীয় রাজনৈতিক ঘটনা গ্রন্থকার নিপুণতার সহিত আলোচনা করিয়াছেন। লেখক শুধু ঘটনাবলী সন্নিবেশ করিয়া কর্ত্তব্য সমাপ্ত করেন নাই; দেশের সমাজের উপর প্রত্যেকটি রাজনৈতিক ব্যাপারের ক্রিয়া সম্বন্ধে নিজের স্বাধীন মত প্রকাশ করিয়াছেন। রাজনৈতিক তথ্যানুসন্ধিৎসু-গণের পক্ষে এইজন্য গ্রন্থখানি উপাদেয় হইয়াছে। বহিখানির প্রকাশ কালোপযোগী হইয়াছে। তীব্র অথচ যুক্তিপূর্ণ ও সংযত ভাষায় গ্রন্থকার ভারতবর্ষের স্বাধীনতার দাবি উপস্থিত করিয়াছেন। বহিখানা পড়িয়া সকলেই উপকৃত হইবেন।

ছাপা ও বাঁধা ভাল।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ মৈত্র

বৈশাখী-বাঙ্লা—শ্রীবলাই দেবশর্ম্মা। প্রকাশক সারস্বত সাহিত্য মন্দির, বর্দ্ধমান। এক টাকা।

প্রবন্ধ-পুস্তক। এই লেখক চিন্তাপূর্ণ রচনার জন্য বিশেষ প্রসিদ্ধ। তাঁহার প্রবন্ধগুলিতে অতীত বঙ্গদেশ এবং অতীত ভারতবর্ষের সুন্দর চিত্র পাওয়া যায়। এই চিত্রের সঙ্গে সঙ্গে লেখকের স্বদেশ-প্রেমের আবেগ পাঠকের চিত্ত উতলা করে। আলোচ্য পুস্তকে বিশেষ করিয়া বঙ্গদেশের অতীত গৌরবের প্রকৃষ্ট উপলব্ধি পাওয়া যায়। বাঙালীর ও বাংলার বৈশিষ্ট্য বুঝিতে যাঁহারা উৎসুক, এই পুস্তক তাঁহাদিগকে বিশেষ তৃপ্তিদান করিবে।

অগ্নিমন্ত্রে নারী—শ্রীসান্ত্বনা গুহ। যুগবাণী সাহিত্যচক্র, ১৪ কৈলাস বোস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। পাঁচ সিকা।

বর্ত্তমানকালে ভারতবর্ষে যে-আন্দোলন চলিতেছে, তাহাতে ভারতের নারীগণ অপূর্ব্ব উৎসাহে যোগদান করিয়াছেন। তাঁহাদের কর্ম্মশক্তিতে দেশ আজ কেবল উদ্বুদ্ধ নহে, বলবান্ হইয়া উঠিয়াছে। এই সময়ে দেশ-বিদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের নেত্রীগণের কথা দেশবাসীকে জানানোর বিশেষ প্রয়োজন আছে।

আলোচ্য পুস্তকখানিতে এইরূপ ছয়টি নারীর কর্ম্ম-পরিচয় আছে। তাঁহারা—রুশিয়ার সোফিয়া বার্ডিনা; রুমানিয়ার হাজা লিপ্সিজ্; চীনের সোমি চেঙ্; রুশিয়ার ভেরা ফিগ্নার; আয়র্লাণ্ডের মার্কিয়েভিক্স্; এবং তুরস্কের হালিদে হানুম। আমাদের দেশে এইরূপ নারী-চরিত্রের যত আলোচনা হয় ততই মঙ্গল। এই হিসাবে পুস্তকটির প্রচার হওয়া বাঞ্ছনীয়।

লেখকের বর্ণনা মন্দ নহে; কিন্তু ভাষা সর্ব্বত্র বেশ ভাল হয় নাই।

শ্রীপ্যারীমোহন সেন-গুপ্ত

কাব্যে রবীন্দ্রনাথ—শ্রীবিশ্বপতি চৌধুরী, এম-এ প্রণীত ও ২১ নন্দকুমার চৌধুরী লেন, কলিকাতা হইতে শরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী এণ্ড সন্স্ কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ডবল ক্রাউন ষোড়ষাংশিত ২১৮ পৃষ্ঠা, কাপড়ের বাঁধাই, মূল্য দুই টাকা।

রবীন্দ্র-কাব্যের কাঁচা, পাকা, মাঝারি আলোচনা বাংলা ভাষায় বড় কম হয় নাই—তার মধ্যে অধিকাংশই কাব্যের এক একটা বিশিষ্ট দিকের আলোচনা: অর্থাৎ কোনটি তার ভাবের আলোচনা, কোনটি তত্ত্বের, কোনটি বা ছন্দলালিত্যের। কাব্যরস বিচার অতি বিরল, এমন কি অজিতকুমারও 'কাব্য-পরিক্রমা'য় তত্ত্বালোচনাই করিয়াছেন। সে-কথা স্বীকার করিতে তিনি কুণ্ঠিত হন নাই। উক্ত গ্রন্থের 'জীবন-দেবতা' শীর্ষক অধ্যায়ে তিনি লিখিয়াছেন—"জীবন-দেবতা লইয়া এত বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক প্রমাণপত্র সংগ্রহের চেষ্টা করিলাম, তাহা দেখিয়া অনেক কাব্যরসজ্ঞ ব্যক্তি ক্ষুব্ধ হইতে পারেন।" কেবল ওই একটি অধ্যায়ে নয়, বইখানির আগাগোড়াই তত্ত্বালোচনা। তাই হয়ত লেখক ভূমিকাতেও বলিয়াছেন—"রসাত্মক কাব্যের রসপ্রসঙ্গে এরূপ জটিল তত্ত্বের 'কচকচি' অনেকের নিকটে

অপ্রীতিকর হইতে পারে।" অজিতবাবুর সুলিখিত পাণ্ডিত্যপূর্ণ রচনা 'রবীন্দ্রনাথেও' দার্শনিক আলোচনা বড় কম নাই। তার মধ্যে কেবল কবি ও কাব্যের কথা নয়, পরন্তু কবির ব্যক্তিগত জীবনের আলোচনাও আছে। সমগ্রভাবে রবীন্দ্র-কাব্যের রসালোচনা করিয়া বিশ্বপতিবাবু বাংলা সাহিত্যের একটি মস্ত অভাব দূর করিলেন।

আলোচ্য বইখানিতে (১) রূপ-জগৎ—(ক) নিসর্গ (খ) নারী, (২) অরূপের পথে ও (৩) অরূপ—এই কয়টি অধ্যায় আছে। ইহাতে তিনি রবীন্দ্র-কাব্যের আদি অর্থাৎ 'সন্ধ্যাসঙ্গীত' হইতে 'পূরবী' পর্য্যন্ত কবিমানসের বিচিত্র যাত্রা-কথা—তার আশা নৈরাশ্য আনন্দ অন্বেষণ ও আবিষ্কার আলোচনা করিয়াছেন; কবিসৃষ্টির গতি, ভঙ্গী এবং ক্রমপরিণতি অভ্রান্তভাবে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। "কাব্যে রবীন্দ্রনাথ" মুখ্যত কাব্যরসালোচনা—সহজ সরল সুন্দর ভাষায় ব্যক্ত, প্রচুর ও যথাযোগ্য উদাহরণ-সমন্বিত। রচনার মধ্যে কোথাও পাণ্ডিত্য-প্রকাশের চেষ্টা নাই, অথচ তাহাতে পাণ্ডিত্যের পরিচয় আছে যথেষ্ট। বইখানি পড়িয়া সর্ব্বাগ্রে মনে হয়, লেখক কতটা দরদ দিয়া তাহা রচনা করিয়াছেন। বুঝিতে পারি তিনি রবীন্দ্র-কাব্যে একেবারে অবগাহন করিয়াছেন—উপরে উপরে ভাসিয়া বেড়ান নাই।

রবীন্দ্র-কাব্যের সঙ্গীত (music) অনবদ্য, তার চিত্রসৃষ্টি অতুল্য। লেখক যে-ভাবে তাহা দেখাইয়াছেন, সঙ্গীত ও চিত্রবিদ্যায় অধিকার না থাকিলে তাহা সম্ভব হইত না—তাঁহার অকৃত্রিম রসবোধেরও তাহা পরিচায়ক। কাব্যসৌন্দর্য্য-বিশ্লেষণ এমন স্পষ্ট ও চিত্তাকর্ষক হইয়াছে যে, সাধারণ পাঠকও তাহা পড়িয়া কবির রচনা পড়িতে উৎসুক হইবেন। খুব সংক্ষেপে লেখকের বক্তব্য এই—

"যে ভাষায় অর্থ আছে, কিন্তু সঙ্গীত নাই, তাহা উচ্চাঙ্গের কবিতার ভাষা হইতে পারে না। চিত্রবর্জ্জিত এবং সঙ্গীতবর্জ্জিত ভাব তত্ত্ব মাত্র—তাহা কাব্য নয়।

"রবীন্দ্রনাথ শান্ত রসের উপাসক।

"তাঁর নিসর্গ-কবিতার মধ্যে দুইটি ধারা দেখা যায়। একটি বর্ত্তমান জীবনকে অনন্ত সৃষ্টিলীলা হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া স্বতন্ত্রভাবে ভোগ করিবার ধারা, আর একটি বর্ত্তমান জীবনকে অনন্ত সৃষ্টিলীলার সহিত সংযুক্ত করিয়া ভোগ করিবার ধারা।

"রবীন্দ্রনাথের প্রেমের কবিতার মধ্যে লালসার দিকটি কম। প্রেমের কবি হিসাবে রবীন্দ্রনাথকে দুঃখের কবি বলা যাইতে পারে। তাঁহার প্রেমের কবিতা অধিকাংশই বিরহ গাথা। আসল কথা, রবীন্দ্রনাথ স্থূলের উপাসক ন'ন।

"রবীন্দ্রনাথের কাব্যজীবন ক্রমপরিণতিশীল। বাঁধাধরা কোন দার্শনিক মত গোড়া হইতে তাঁহাকে পাইয়া বসিতে পারে নাই।

"সোনার তরী, চিত্রা, চৈতালি, কাহিনী, কল্পনা, কথা এবং ক্ষণিকা—এই কয়টি কাব্যগ্রন্থকে লইয়া যে যুগটি গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহাকে রবীন্দ্রনাথের রস-জীবনের শ্রেষ্ঠতম যুগ বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

"রবীন্দ্রনাথের মধ্যে সৌন্দর্য্য উপভোগের যত বিভিন্ন দিকের সন্ধান পাই, এতটা বোধ হয় পৃথিবীর আর কোন কবির মধ্যে পাওয়া যায় না।

"শিল্পজগতে রূপবস্তু বলিয়া স্বতন্ত্র কোন জিনিষ নাই;—ভাব-বস্তুকে ফুটাইয়া তুলিবার পক্ষে যাহা সহায়তা করে তাহাই রূপ। সুতরাং ভাববস্তুর অনুযায়ী রূপ আপনাকে রূপান্তরিত করিয়া ফেলিতে বাধ্য। তাই এক শ্রেণীর কবিতায় যাহা রূপ অপর শ্রেণীর কবিতায় তাহা রূপই নয়।"

বইখানির ছাপা, কাগজ, মলাট শোভন ও সুন্দর হইয়াছে। অন্তরে-বাহিরে এমন সৌন্দর্য্যের সমাবেশ প্রায়ই চোখে পড়ে না। কাব্যরসপিপাসু ও বাংলা সাহিত্যের অনুরাগী পাঠকের কাছে ইহার নিশ্চয়ই আদর হইবে। এই উৎকৃষ্ট কাব্যালোচনার বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়।

শ্রীসুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

মুস্কিল আসান—শ্রীহীরেন্দ্রনাথ বসু প্রণীত। ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন্ প্রকাশিত, কলিকাতা; মূল্য ৷৷০।

ছেলেমেয়েদের গল্পের বই। হাসির গল্পগুলি, যেমন "গদাধরের বীরত্ব," "দুটো পয়সা" বেশ মজার। আর কয়েকটি গল্পে বেশ করুণ ভাব আছে যা পড়িয়া ছেলেমেয়েরা মুগ্ধ হইবে। বইখানি পাঠ করিয়া শিশুরা যে আমোদ পাইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

টুনটুনির গান—শ্রীসুনির্ম্মল বসু প্রণীত। বাগচী এণ্ড সন্স কর্ত্তৃক প্রকাশিত, ২০৩ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা; মূল্য এক টাকা।

সুনির্ম্মল বাবুর কবিতা শিশুসমাজে বেশ আদর লাভ করিয়াছে। তাঁহার কবিতার সুর ও ভাব খুব সহজেই শিশুচিত্তকে মুগ্ধ করে। টুনটুনির গান পড়িয়া ছেলেমেয়েরা তাঁর লেখার আরও ভক্ত হইয়া পড়িবে। তাঁহার কবিতার ভিতর দিয়া বাদলা দিনের মাদলের আওয়াজ, মেঘলা দিনের গান, জংলা সুর, হলুদ রঙের চাঁদ, চৈতের হাওয়া ইত্যাদি সবই ধরা পড়ে। ছন্দে এমন স্বচ্ছন্দগতি আছে, শব্দ-চয়ন এত সরল, ভাব এমন সুন্দর যে, ছেলেমেয়েরা কেন সকলেই বইখানি পড়িয়া মুগ্ধ হইবে।

শ্রীসুধীরচন্দ্র সরকার

জীবনদোলা—শ্রীমতী শান্তা দেবী প্রণীত।

পরভৃতিকা—শ্রীমতী সীতা দেবী প্রণীত।

ভগিনীদ্বয়ের উপন্যাসগুলি বাংলা সাহিত্যে সুপরিচিত। কোন কোন উপন্যাস বিদেশী ভাষায় অনূদিত হইয়াছে। দু-খানাই বৃহৎ উপন্যাস; কমবেশী ৪০০ পৃষ্ঠা পরিমিত। এম, সি, সরকার এণ্ড সন্স, ১৫ কলেজ স্কোয়ার, হইতে প্রকাশিত। মূল্য প্রত্যেকখানির আড়াই টাকা।

জীবনদোলা—এই বৃহৎ উপন্যাসখানি লিখনভঙ্গীতে, প্লটে, ও বাঙালী মধ্যবিত্ত শিক্ষিত ভদ্রপরিবারের চিরপরিচিত কাহিনীর মধুর বর্ণনায় সকলের মন মোহিত করিবে। এরূপ চিত্তাকর্ষক উপন্যাস বাংলায় খুব কমই আছে। সামাজিক প্রথা সম্বন্ধে রক্ষণশীল পরিবার এবং উদারমতাবলম্বী পরিবার, গৃহ ছাড়িয়া আতুর আশ্রম, সবই আছে। নানা দিগ্‌দেশ হইতে নরনারী একত্র হইয়া চরিত্র-গৌরবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। ইহার মধ্যে বিশেষ স্থান গাঙ্গুলী-গৃহিণীর। তাঁহার চরিত্র উপন্যাস-জগতের সেই মহামহিমময় নারীচরিত্র "গোরা"র মাকেই মনে করাইয়া দেয়। কিন্তু আমাদের যেটি নাই সেইটি আমাদের দিয়াছেন বলিয়া গ্রন্থকর্ত্রীকে হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে ধন্যবাদ দিয়াছি। সেটি ভাইবোনের সম্বন্ধের আদর্শ চিত্র।

আমাদের সামাজিক কুব্যবস্থা গৌরীদানের চাপে এই সম্বন্ধের মাধুর্য্যটি জীবনে ফুটে নাই, সাহিত্যেও আসে নাই। বিধবা হইয়া বোন্ বাড়িতে আসেন বটে, কিন্তু যাহার ছায়াও শুভকর্ম্মে অশুচি, তাহাকে দিয়া উন্নত কোন পারিবারিক আদর্শের বিকাশ আকাশকুসুমবৎ অলীক, মানুষের সাংসারিক জীবনের অতীত জায়গায় তাহাকে লইয়া যতই লোফালুফি করি না কেন। লেখিকা কি সকল সঙ্কট অতিক্রম করিয়া কেমন নিপুণতার সঙ্গে ভাইবোনের এই অকৃত্রিম ভালবাসার চিত্র ফুটাইয়া তুলিয়াছেন, তাহা উপন্যাসখানি সহানুভূতির সঙ্গে পাঠ করিতে না পারিলে বুঝাইয়া দেওয়া অসম্ভব। আর না বুঝিলে বঙ্গসাহিত্যের একটি নূতন রসাস্বাদন হইতে বঞ্চিত হইলাম বলিয়া মনে করিব। গৌরী ও শঙ্কর, চঞ্চলা ও সঞ্জয়, ইঁহাদের পরস্পরের ভাবের বিনিময়ের মধ্যে লেখিকা যথেষ্ট মনস্তত্ত্ব-বিশ্লেষণের ক্ষমতা প্রদর্শন করিয়াছেন। অন্য কোথায়ও মনস্তত্ত্ব-বিশ্লেষণ নাই, তাহা বলিতেছি না। একটা ঘটনা ত মনে পড়ে। সেই নৌকাবিহারের দিনে সঞ্জয়ের হাত ধরিয়া গৌরীর গঙ্গার ঘাটে অবতরণ। উহা পরমাত্মার জন্য জীবাত্মার অভিসার মনে করাইয়া দেয়। চারিদিকের সমস্ত বিশ্বকোলাহলের মধ্যে গৌরীর প্রাণে জাগিতেছে "শুধু সঞ্জয়ের হাতের স্পর্শটুকু"। উপন্যাসখানির নাম "গৌরী" রাখিলে বিশেষ কিছু অত্যুক্তি হইত না। তবে "জীবন দোলা" নামে আখ্যানবস্তু স্পষ্টীকৃত হইয়াছে।

বলা বাহুল্য, ছাপা কাগজ বাঁধাই সুন্দর। তবে ছাপার ভুল সম্বন্ধে প্রকাশক যাহা বলিয়াছেন, তদতিরিক্ত বলিবার কিছু নাই।

পরভৃতিকা—বর্ণনা-চাতুর্য্যে ও বস্তু-সন্নিবেশকৌশলে এই বৃহৎ উপন্যাস লেখিকার শ্রেষ্ঠ উপন্যাসের মধ্যে গণ্য হইবে। এই সরস উপন্যাসখানি উপন্যাসই, আর কিছু নহে। ইহাতে উপদেশের আড়ম্বর নাই, যাহাতে উপন্যাসকে উপন্যাস নামের অযোগ্য করে, কোন তত্ত্বের মীমাংসার গরজ নাই, যাহাতে লেখাটা বক্তৃতা হয়। ইহা খাঁটি উপন্যাস, প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত পাঠকের ঔৎসুক্যকে জাগ্রত করিয়া রাখে। মনের উপর এমন একটা দাগ ফেলে যাহাতে পুস্তক সমাপ্ত করিয়া কিছুক্ষণ পশ্চাতের দিকে তাকাইয়া ভাবিতে হয়। কৃষ্ণা যে সেই জন্মদিনে ঘরের বাহির হইল, তাহার পর নানা ঘটনা-বিপর্য্যয়ের মধ্য দিয়া আবার তাহাকে ঘরে কন্যা ও বধূরূপে না আনা পর্য্যন্ত লেখিকা পাঠককে নিশ্বাস ফেলিবার অবসর দেন নাই। ঘটনা যাহা দাঁড়াইল, তাহাতে যে পাঠকই কেবল স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিলেন তা নয়, ভানুমতীও বাঁচিলেন। আর কোন মীমাংসাই পাঠককে তৃপ্তি দিতে পারিত না। এত টাকাকড়ির ছড়াছড়ি, কিন্তু অর্থের প্রশ্ন কোনও চরিত্রকে আক্রমণ করে নাই, যদি আদির সেই নাসর্কে না ধরা যায়। নৈতিক চরিত্রের আদর্শ গ্রন্থকর্ত্রীর কোন ধর্ম্মাচার্য্যের অপেক্ষা ছোট নয়। সকল চরিত্রই উত্তম ফুটিয়াছে। "মহাধনবান্ ভূস্বামী হইতে একেবারে নামবংশ পরিচয়হীন দরিদ্রের অবস্থায় দাঁড়াইতে" সুবীরের মনে আঘাত লাগিয়াছিল, কিন্তু অর্থলোভ তাহার হৃদয়ে চুলমাত্রও রেখাপাত করিল না। কৃষ্ণাও সুবীরের জন্য ধনসম্পত্তি সবই ছাড়িতে প্রস্তুত ছিল। একটি একটি করিয়া বহিখানির সব সুন্দর জায়গাগুলি উল্লেখ করিলে সমগ্র গ্রন্থখানির অখণ্ড সৌন্দর্য্য দেখান হইবে না। "বাবা, তুই আমার ছেলে ন'স" ভানুমতীর এই হৃদয়ভেদী আর্ত্তনাদ মর্ম্মস্পর্শী। এই কয়টি কথার মধ্যেই আখ্যানবস্তু সব পুরা। ইহা মাতৃহৃদয়ের রক্ত দিয়া গড়া একটি আর্ত্তনাদ, যাহা ভুলা যায় না, যাহা সুনিপুণ শিল্পীর হাতে মূর্ত্তিলাভ করিয়াছে। ভবানী ভুলিবার মত পরভৃতিকা নয়। ধাত্রী পান্নাকে কেহ ভুলে নাই। ভবানী গর্হিত কাজ করিয়াছে, তাহা সে জানিত। কিন্তু সে কাজ করিতে তাহাকেও যে হৃদয়তন্ত্রী ছিন্ন করিতে হইয়াছিল তাহা স্বীকার না করিলে তার প্রতি অবিচার করা হয়।

গ্রন্থকর্ত্রী ব্রহ্মদেশ প্রবাসিনী ছিলেন। তিনি তাঁহার প্রায় কোন নায়িকা-নায়িকাকেই ব্রহ্মদেশের জল না খাওয়াইয়া ছাড়েন না। আমরা সেজন্য তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। তাঁহার বর্ণনা-পটুতায় তিনি উপন্যাস ও ছোট ছোট গল্পে আমাদের কাছে এই মগের মুলুকটাকে একটা "জলজীয়ন্ত" দেশে পরিণত করিয়াছেন। আমরা ব্রহ্মদেশে যাই নাই, কিন্তু তাহা হইলেও বর্ম্মা আর নিতান্ত 'না-দেখা' জিনিষ নাই। ইহাই ধন্যবাদের কারণ।

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ বেদান্তবাগীশ

সাগরদোলা—শ্রীকাত্যায়নী দেবী প্রণীত। প্রকাশক "যুগবাণী সাহিত্যচক্র," ১৪ কৈলাস বোস ষ্ট্রীট্, কলিকাতা। মূল্য এক টাকা।

এই বহিখানিতে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের জন্য পাঁচটি গল্প আছে। তাহা পড়িয়া তাহারা তৃপ্তিলাভ করিবে। ইহার ছবিগুলিও ভাল। ছাপা ও কাগজ উৎকৃষ্ট।

র. চ.



ভারতবর্ষ

মহীশূর রাজ্যে নারীগণের দায়াধিকার লাভ—

ভারতবর্ষের হিন্দু আইনে নারীগণ দায়াধিকার হইতে বঞ্চিত। আইনের এই ত্রুটি দূর করিবার জন্য ইদানীং ভারতবর্ষে প্রবল আন্দোলন চলিয়াছে। দেশীয় রাজ্যসমূহের মধ্যে অত্যগ্রসর মহীশূর-রাজ্য সর্ব্বপ্রথম জনমতের স্বপক্ষে সাড়া দিয়াছেন। মহীশূর সরকার সম্প্রতি নারীগণের দায়াধিকার সম্পর্কীয় আইন ব্যবস্থাপক সভায় পেশ করিয়া অধিকাংশ সভ্যের মতে পাশ করিয়া লইয়াছেন। এই প্রস্তাবের স্বপক্ষে ভোট দিয়াছিলেন ২৫৭ জন এবং বিপক্ষে মাত্র ৩ জন সভ্য। হিন্দুর যুক্তপরিবারের দায়াধিকার সম্পর্কে যে-সব নিয়ম বহাল আছে—এই আইন অনুসারে নারীদের বেলায়ও ঠিক্ ঠিক্ তাহাই খাটিবে।

শিক্ষা কার্য্যে দান—

ত্রিবাঙ্কুরের মহারাজা বাহাদুর কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে ১,২৫,০০০ টাকা দান করিয়াছেন। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ ব্যয় নির্ব্বাহার্থ বার্ষিক ১০,০০০ টাকা করিয়া দিতেও প্রতিশ্রুত হইয়াছেন।

বালিকার কৃতিত্ব—

বিহারের অন্তর্গত দিনাপুরের ব্যবসায়ী শেঠ রামকৃষ্ণ ডালমিয়ার (যিনি গত বৎসর কংগ্রেসে এক লক্ষ টাকা দান করিয়াছিলেন) কন্যা কুমারী রমাবাঈর বয়ঃক্রম মাত্র চতুর্দ্দশ বৎসর। বালিকাটি এই অল্প বয়সেই নানা বিষয়ে কৃতিত্ব অর্জ্জন করিয়াছেন। রমাবাঈ পাঁচ বৎসর বয়সে সমগ্র ভগবদ্গীতাখানা মুখস্থ করেন এবং ১৯২৯ সালে এলাহাবাদ বিদ্যাপীঠ হইতে 'বিদ্যাবিনোদিনী' উপাধি লাভ করেন। তিনি এগার বৎসর বয়সে ইংরেজী শিখিতে আরম্ভ করেন এবং গত তিন বৎসরের মধ্যেই এই ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। গুজরাটী এবং বাংলা ভাষায়ও তাঁহার বেশ দখল হইয়াছে। শ্রীমতী রমাবাঈ বিদ্যাচর্চ্চায় যেমন তৎপর ক্রীড়াকৌতুকেও তাঁহার তেমনি অধ্যবসায়। ইতিমধ্যেই তিনি অশ্বারোহণ, মোটরাদি পরিচালন সাইকেল-চড়া এবং সাঁতার কাটায় ওস্তাদ হইয়াছেন। অগ্রবাল সম্প্রদায়ে এরূপ গুণবতী বালিকা বিরল। ১৯২৮ সনে নিখিল-ভারতীয় অগ্রবাল সম্প্রদায়ের বার্ষিক সম্মেলনে রমাবাঈ স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। তাঁহার বক্তৃতায় পরিতুষ্ট হইয়া সম্মেলনের কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাকে একটি স্বর্ণপদক উপহার দেন। বালিকা রমাবাঈ উচ্চ শিক্ষার দিকে না যাইয়া এখন হইতেই দেশ-সেবায় আত্মনিয়োগ করিতে মনস্থ করিয়াছেন।

নিখিল-ভারত হিন্দী সাহিত্য সম্মেলন—

ভারতবর্ষের হিন্দীভাষীরা হিন্দী ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতি ও প্রচারকল্পে প্রতি বৎসর সভা-সমিতি করিয়া থাকেন। এ বৎসর কাশীর পণ্ডিত জগন্নাথ দাস রত্নাকর মহাশয়ের নেতৃত্বে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট হলে হিন্দী সাহিত্য সম্মেলনের বিংশতিতম অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। হিন্দীর রাষ্ট্র ভাষা হইবার দাবি, সন্তান-সন্ততিগণকে হিন্দী ভাষা শিখাইবার জন্য বাঙালী পিতামাতাকে অনুরোধ, হিন্দীকে বিশ্ববিদ্যালয়ে আবশ্যিক দ্বিতীয় ভাষা করিবার প্রস্তাব, বঙ্গদেশে হিন্দীর বহুল প্রচারের জন্য ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ সুধীগণকে লইয়া এক কমিটি স্থাপন, সাহিত্যের উন্নতিকল্পে হিন্দী অভিধান সঙ্কলন, হিন্দী নাট্য-সাহিত্যের উন্নতির জন্য যোগ্য লেখক নিয়োগ প্রভৃতি বিবিধ বিষয় সম্মেলনে আলোচিত হইয়াছে।

সম্মেলনের এই অধিবেশনে কাশীর সাহিত্যানুরাগী শ্রীযুক্ত গোকুল-চাঁদ গুপ্ত মৃত ভ্রাতার স্মৃতিকল্পে হিন্দী পুস্তক প্রকাশার্থে সম্মেলনকে এক কালীন দশ হাজার টাকা দান করিয়াছেন। তিনি হিন্দী পুস্তক লেখকগণকে উৎসাহিত করিবার জন্য ইতিপূর্ব্বে সম্মেলনে ৪০,০০০ টাকা দান করিয়া একটি স্থায়ী বৃত্তির ব্যবস্থা করিয়াছেন। প্রতি বৎসর হিন্দীর শ্রেষ্ঠ লেখককে এই টাকার সুদ ১,২০০ টাকা বৃত্তি দেওয়া হয়। এবার এলাহাবাদের পণ্ডিত গঙ্গাদাস উপাধ্যায়, এম্-এ মহাশয় এই পুরস্কার লাভ করিয়াছেন।

সম্মেলন বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ মন্দিরের অনুরূপ একটি গ্রন্থাগার স্থাপন করিতেও সঙ্কল্প করিয়াছেন। এই উদ্দেশ্যে শ্রীযুক্ত বাহাদুর সিং সিংঘি ১২,৫০০ টাকা এবং শ্রীযুক্ত সীতারাম সাকেসারিয়া ২,০০০ টাকা দান করিয়াছেন। বৎসরের শ্রেষ্ঠ মহিলা-লেখিকাকে বৃত্তি দিয়া উৎসাহিত করিবার জন্য সাকেসরিয়া মহাশয় সম্মেলনকে আরও ৫০০ টাকা দিয়াছেন।

সম্মেলনের সঙ্গে হিন্দী সাহিত্য প্রদর্শনীও অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

ভারতে বিলাতী কাপড়ের আমদানী—

গত ১৯৩০ সালে জানুয়ারী হইতে এপ্রিল এই চারিমাসে ভারতে ন্যূনাধিক ৪৭ কোটী বর্গ গজ বিলাতী কাপড় আমদানী হইয়াছিল কিন্তু বর্ত্তমান ১৯৩১ সালের জানুয়ারী হইতে এপ্রিল এই চারি মাসে মাত্র ১৩ কোটি বর্গ গজ বিলাতি কাপড় ভারতে আমদানী হইয়াছে।

খদ্দরের কথা—

বোম্বাই শহরের 'খাদি পত্রিকার' জুন সংখ্যায় নিখিল-ভারত কাটুনি সমিতির (All-India Spinners' Association) বাৎসরিক রিপোর্ট বাহির হইয়াছে। তাহাতে প্রকাশ, ১৯২৯ সালের ৩০এ সেপ্টেম্বরে যে বৎসর শেষ হইয়াছে সে বৎসর খাদি উৎপন্ন

হইয়াছে ৩১,৫৫,৪৮৭ টাকার, ১৯৩০ সনের ৩০এ সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত হইয়াছে ৫৩,০০,৮১৬ টাকার। অতএব শতকরা ৬৮ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই দুই বৎসরে খদ্দর বিক্রী হইয়াছে যথাক্রমে ৩৯,৪৩,০৭৭ টাকার এবং ৬৩,৪৪,৫৫৩ টাকার। বৃদ্ধি হইয়াছে শতকরা ৬১ ভাগ।

উক্ত দুই বৎসরের খদ্দর-কেন্দ্রসমূহের বিবরণও পাওয়া যায়। ১৯২৯ সালে খদ্দর-কেন্দ্র ছিল মোট ৩৮৪টি এবং পর বৎসর তাহা দাঁড়ায় ৬০০টি। ইহার মধ্যে পূর্ব্ব বৎসরের উৎপাদন ও বিক্রীর কেন্দ্র ছিল যথাক্রমে ১৭৯ ও ২০৫ এবং পর বৎসর অর্থাৎ ১৯৩০ সনে তাহা দাঁড়ায় যথাক্রমে ২৪১টি এবং ৩৫৯টি। এই সকল উৎপাদন ও বিক্রী কেন্দ্রের কতকগুলি সাক্ষাৎভাবে কাটুনি সমিতির অধীন, কতকগুলি সাহায্যপ্রাপ্ত। এ বৎসর ২৯৮টি স্বাধীন কেন্দ্রেও কাজ হইয়াছে। এগুলিও মোট সংখ্যার মধ্যে ধরা হইয়াছে।

এ বৎসর ছয় হাজার গ্রামে খাদির কার্য্য চলিয়াছে। গত দুই বৎসর সমগ্র ভারতে খদ্দর উৎপাদন কর্ম্মে কত লোক নিযুক্ত ছিল তাহার সঠিক হিসাব কাটুনি সমিতি দিতে পারেন নাই। তবে যে দু'চারটি প্রদেশ এ পর্য্যন্ত হিসাব পাঠাইয়াছে, তাহাতে দেখা যায়—১৯২৯ সনে এ কার্য্যে নিযুক্ত ছিল ১১,৪২৬ জন এবং ১৯৩০ সালে নিযুক্ত হইয়াছিল ১৯,৯৬৯ জন।

১৯৩০ সনের সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত খদ্দর উৎপাদন কার্য্যে মূলধন খাটিয়াছিল ২৭,২৫,৮৬১—২—০ টাকা।

—

বাংলা

নিখিল-ভারত নারী সম্মেলনের কলিকাতা শাখা—

নিখিল-ভারত নারী সম্মেলন ভারতব্যাপী নারী-জাগরণের অন্যতম ফল। প্রতিবৎসর বিভিন্ন প্রদেশের নারীগণ মিলিত হইয়া দেশের ও দশের হিতসাধন কল্পে নানা বিষয় আলাপ-আলোচনা করিয়া থাকেন। বিগত চারি বৎসরে দিল্লী, পাটনা, বোম্বাই ও পুনায় পর পর অধিবেশন হইয়া গত ডিসেম্বরে লাহোরে ডাঃ মুথুলক্ষ্মী রেড্ডির নেতৃত্বে সম্মেলনের পঞ্চম অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। সম্মেলনের সিদ্ধান্তগুলি অনুসারে কার্য্য করিবার নিমিত্ত প্রত্যেক প্রদেশে একটি করিয়া শাখা সমিতি প্রতিবৎসর গঠিত হয়। এবারেও এ উদ্দেশ্যে কলিকাতা শাখা-সমিতি গঠিত হইয়াছে—শ্রীযুক্তা সরলা দেবী চৌধুরাণী সমিতির অধ্যক্ষ এবং শ্রীযুক্তা এস্-সি রায় সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ। সম্মেলনের প্রস্তাবগুলি সাধারণ্যে প্রচার করা ছাড়া স্থানীয় বিশেষ বিশেষ সমস্যার আলোচনা এবং যথাবিহিত কর্ত্তব্য নিরূপণও শাখা সমিতিগুলির কাজ। কলিকাতা শাখাসমিতি অন্যান্য কার্য্যের সঙ্গে বয়স্থা স্ত্রীলোকদের মধ্যে শিক্ষাপ্রচার এবং পতিতা বালিকাদের আশ্রম সংক্রান্ত ব্যাপারেও হস্তক্ষেপ করিবেন বলিয়া কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন। অনুসন্ধিৎসুজনেরা শ্রীযুক্তা এস্-সি-রায়ের সঙ্গে পত্র ব্যবহার করিলে নারীসম্মেলন এবং শাখা সমিতির সাধু প্রচেষ্টাগুলির সম্বন্ধে সম্যক অবগত হইতে পারিবেন।

বহিভ্রমণ সমিতি—

পাশ্চাত্য দেশসমূহে ছাত্র-ছাত্রীগণকে লইয়া ইতিহাসপ্রসিদ্ধ স্থানে, পাহাড়ে, জঙ্গলে, হ্রদের পার্শ্বে, সমুদ্রের ধারে ভ্রমণ করিতে যাইবার রীতি প্রচলিত আছে। ঐ সকল দেশের সরকার এবং জনসাধারণ এ বিষয় সর্ব্বপ্রকারে সাহায্য করিয়া থাকেন। কারণ তাঁহারা জানেন, বহিভ্রমণ, ভিন্‌দেশ, দৃশ্য ও লোকদের দর্শন, তাহাদের সঙ্গে আলাপ ইত্যাদি ব্যতিরেকে শিক্ষা অসমাপ্ত থাকিয়া যায়। শহরের একঘেয়ে জীবনযাত্রা, একটানা অধ্যয়নাদি দেহ-মন পঙ্গু করিয়া তোলে। বহিভ্রমণ শুধু মনের খোরাক জোগায় না, দেহও সুস্থ এবং সবল রাখে। কলিকাতার ডাঃ মৃগেন্দ্রলাল মিত্রের সহধর্ম্মিণী শ্রীযুক্তা হেমলতা মিত্রের চেষ্টা-যত্নে বালক-বালিকাগণের বহিভ্রমণের সুবন্দোবস্ত করিবার জন্য গেল বৎসর একটি সমিতি (Children's Fresh Air and Excursion Society) স্থাপিত হইয়াছে। গত পূজায় এবং বর্ত্তমান গ্রীষ্মের ছুটিতে সমিতি ছাত্র-ছাত্রীগণকে ভ্রমণে পাঠাইতে সমর্থ হইয়াছেন। উপযুক্ত শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীগণের তত্ত্বাবধানে প্রথমবার পঞ্চাশটি বালক এবং দশটি বালিকা যথাক্রমে ঝরিয়া ও গিরিডিতে পাঠান হইয়াছিল; এবারেও আশীটি বালক এবং পনরটি বালিকা বালেশ্বর জিলার চণ্ডীপুরে এবং পুরীতে গিয়াছে। চণ্ডীপুর বঙ্গোপসাগর হইতে ছয়-সাত মাইল মাত্র দূরে। এখানে থাকিয়া সমুদ্রস্নানে যাওয়া খুব সুবিধা। ব্রাহ্ম বালক বিদ্যালয়ের শিক্ষক শ্রীযুক্ত করুণাবন্ধু মুখোপাধ্যায় এবং অন্যান্য বিদ্যাপীঠের কয়েকজন শিক্ষক ও শিক্ষয়িত্রী দুই বারই বহিভ্রমণকালে বালকবালিকাগণের অধিনায়ক হইয়া বিশেষ ত্যাগস্বীকার করিয়াছেন। সমিতি রেল কোম্পানী, ম্যাডান থিয়েটার, বটকৃষ্ণ পাল কোম্পানী প্রভৃতির নিকট হইতেও সাহায্য পাইয়াছেন। সমিতি এই অল্পকালের মধ্যেই সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। এবার বহিভ্রমণে যাইবার জন্য ছাত্রদের পক্ষ হইতে তিন শতখানা আবেদন পড়িয়াছিল, কিন্তু কর্তৃপক্ষ অর্থাভাবহেতু নিতান্ত ইচ্ছাসত্ত্বেও এক শতখানার বেশী গ্রহণ করিতে পারেন নাই। এই হিতকর প্রতিষ্ঠানে প্রত্যেক ব্যক্তিরই সাহায্য করা উচিত।

পদব্রজে ৫,৮০০ মাইল ভ্রমণ—

শ্রীযুক্ত ললিতমোহন গাঙ্গুলী এ পর্য্যন্ত পদব্রজে ৫৮০০ মাইল পরিভ্রমণ করিয়া গত ১৪ই মে বোম্বাই-এ পৌঁছিয়াছেন। নেপাল, ভুটান, বিহার, কাশ্মীর, যুক্তপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ এবং আজমীর ভ্রমণ শেষ করিয়াছেন। সম্প্রতি হায়দ্রাবাদ হইয়া তাঁহার করাচী যাইবার কথা। ভাগোহাট, খান্না, করাচী এবং সিন্ধুদেশ সাইকেল যোগে ভ্রমণ করিয়া শ্রীযুক্ত জে-সি মিত্র নামে আর একজন বাঙালীও বোম্বাই-এ পৌঁছিয়াছেন। তিনি পদব্রজে রাজপুতনার মরুভূমি অতিক্রম করিয়াছেন। তিনি শীঘ্রই সাইকেলযোগে আজমীর ও চিতোর যাইবেন।

ডাঃ শ্রীরুদ্রেন্দ্রকুমার পাল—

শ্রীরুদ্রেন্দ্রকুমার পাল শ্রীহট্টের প্রবীণ উকিল শ্রীযুক্ত রাধিকারঞ্জন পাল বি-এল মহাশয়ের জ্যেষ্ঠপুত্র। ম্যাট্রিকুলেশন হইতে আরম্ভ করিয়া আই-এস্-সি, বি-এস্-সি ও মেডিক্যাল কলেজের প্রত্যেক পরীক্ষায়ই ইনি বৃত্তি লাভ করেন ও ১৯২৭ সনের জুন মাসে, এম্ বি এবং আগষ্ট মাসে এস্. এস্-সি পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদক ও পুরস্কার প্রাপ্ত হন। তাহার অব্যবহিত পরে, মধ্যভারতের ইন্দোর মেডিক্যাল স্কুলে শারীর বিদ্যার অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ১৯২৯ সালের অক্টোবর মাসে, শারীরতত্ত্বে গবেষণার জন্য এদেশে আসিয়া বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানবিৎ স্যর এডওয়ার্ড সার্পি শেফারের নিকট কাজ আরম্ভ করেন। ঐ সঙ্গে সঙ্গেই এপ্রিল মাসে,ট্রাইপস্ কোয়ালিফিকেশন ও অক্টোবর মাসে এম-আর-সি-পি পাশ

করেন। গত জানুয়ারী মাসে "গলগ্রন্থি ও কটিগ্রন্থির উপর খাদ্যপ্রাণের প্রভাব" শীর্ষক গবেষণা পেশ করেন। উক্ত থিসিস্ পরীক্ষকগণ কর্ত্তৃক খুব উচ্চপ্রশংসা লাভ করিয়াছে এবং ডাঃ পাল এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপাধি,—ডি-এস্-সি লাভ



ডাঃ শ্রীরুদ্রেন্দ্রকুমার পাল

করিয়াছেন। গত জুন মাসে, এডিনবরায়, ইউনাইটেড কিংডমের ফিজিওলজিকেল সোসাইটির যে সভা হয়, সেই সভায়ও ডাঃ পাল গবেষণার জন্য বিদ্বজ্জনসমাজে খুবই সুখ্যাতি লাভ করেন।

ডাঃ পাল্ একজন সাহিত্যিকও বটেন। কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজে যখন প্রথম ম্যাগাজিন প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন তিনিই ইহার প্রথম সম্পাদক মনোনীত হন। ইংরেজী পত্রিকায় শরীরতত্ত্বসম্বন্ধে নানা প্রবন্ধ ছাড়া অধুনালুপ্ত ভারতী, ভারতবর্ষ, স্বাস্থ্য সমাচার, মাতৃমন্দির প্রভৃতি বাংলা পত্রিকায়ও ইঁহার চিকিৎসা ও ভ্রমণ বিষয়ক নানা প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে।

কুলী মহিলার মহদ্দৃষ্টান্ত—

শ্রীহট্ট জেলার অন্তর্গত কাইরান্দারা গ্রামের একটি কুলী রমণী সেণ্ট আনী স্কুলের পক্ষ হইতে ১২,০০০৲ টাকা মূল্যের একটি লটারী প্রাইজ প্রাপ্ত হইয়াছেন। এই দরিদ্রা কুলী রমণী অযাচিত লাভের অর্থ নিজ ব্যবহারের জন্য আত্মসাৎ না করিয়া ইহা সর্ব্বসাধারণের উপকারের জন্য একটি দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন এবং অন্যান্য জনহিতকর অনুষ্ঠানে ব্যয় করিতে মনস্থ করিয়াছেন। সমাজের নিম্নতম স্তরে অবস্থিত দুঃস্থ কুলী রমণী তাঁহার এই অসামান্য ত্যাগ দ্বারা যে সদাশয়তার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, তাহা প্রচুর বিত্ত-বিভবশালী অভিজাত-সম্প্রদায়ের মধ্যেও একান্ত বিরল।

চরখা ও তকলি প্রতিযোগিতায় সত্তর বৎসরের বৃদ্ধার পুরস্কার লাভ—

মহাত্মা গান্ধীর ঢাকার অন্তর্গত বাহেরক সত্যাশ্রম পরিদর্শনের স্মৃতি উৎসব উপলক্ষে যে চরখা প্রতিযোগিতা হইয়াছিল তাহাতে বাহেরকের শ্রীমতী জ্যোতির্ম্ময়ী দাশগুপ্তা প্রথম পুরস্কারস্বরূপ স্বর্ণপদক লাভ করিয়াছেন। বাবু বনবিহারী কুণ্ডু তাঁহার স্বর্গগতা পত্নীর স্মৃতির উদ্দেশ্যে এই পদক উপহার দিয়াছেন। শ্রীমান পরেশচন্দ্র দে দ্বিতীয় পুরস্কার স্বরূপ এবং শ্রীযুক্তা সরোজিনী দেবী তৃতীয় পুরস্কার স্বরূপ



দেড় বৎসর বয়স্ক একটি বালক চরখায় সুতা কাটিতেছে

এই বালকটি এলাহাবাদের শ্রীযুক্ত মাণিকলাল চট্টোপাধ্যায়ের পৌত্র

একটি করিয়া চরখা পাইয়াছেন। শ্রীমতী অরুণবালা মুখোপাধ্যায় তকলি প্রতিযোগিতায় প্রথম পুরস্কার স্বরূপ একটি রৌপ্য নির্ম্মিত তকলি ও ৭০ বৎসরের বৃদ্ধা শ্রীযুক্তা নবলক্ষ্মী দেবী দ্বিতীয় পুরস্কার লাভ করিয়াছেন।

বিধবা-বিবাহ—

সম্প্রতি লিলুয়ার "দেবালয়" গৃহে সুপরিচিত কবি বালবিধবা শ্রীমতী রাধারাণীর সহিত সুসাহিত্যিক শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র দেবের শুভ বিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে। বিবাহের সকল কার্য্য হিন্দু শাস্ত্র মতে নারায়ণ শিলা সাক্ষ্য করিয়া খ্যাতনামা পণ্ডিতগণ দ্বারা পরিচালিত হইয়াছে। এই বিবাহের প্রধান বিশেষত্ব কন্যা সম্প্রদানকার্য্য স্বয়ং সম্পাদন করিয়াছে—শাস্ত্রমতে প্রাপ্ত-বয়স্কা কন্যা নিজেই সম্প্রদান করিতে পারেন বলিয়া ইহা সম্ভব হইয়াছে। পাত্র ও পাত্রী উভয়েই কলিকাতার খ্যাতনামা বনিয়াদী কায়স্থ বংশ-সম্ভূত। তাঁহারা স্বেচ্ছায় সৎসাহসের বশবর্ত্তী হইয়া সম্পূর্ণ বৈদিক শাস্ত্রমতে বিবাহ সম্পাদন করিয়াছেন।

দানবীর ৺মনোমোহন ঘোষ—

খুলনার সন্নিকট নওয়াপাড়ার জমিদার মনোমোহন ঘোষ মহাশয় গত ২৮এ মে বৃহস্পতিবার রাত্রিতে খুলনার বাড়ীতে পরলোক গমন করিয়াছেন। দানে তিনি মুক্তহস্ত ছিলেন। তিনি তাঁহার গ্রামের হাসপাতালে ২৫ হাজার টাকা, বাগেরহাট কলেজে ১০ হাজার টাকা, গ্রামের উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়ে ৫ হাজার টাকা এবং খুলনা দুর্ভিক্ষ সাহায্যভাণ্ডারে এক হাজার টাকা দান করিয়া গিয়াছেন।

পরলোকে অধ্যাপক সতীশচন্দ্র মিত্র—

যশোহর খুলনার ইতিহাস লেখক দৌলতপুর হিন্দু একাডেমির অধ্যাপক সতীশচন্দ্র মিত্র মহাশয় আর ইহজগতে নাই। সতীশবাবু দৌলতপুর হিন্দু একাডেমির প্রাণস্বরূপ ছিলেন। বিদ্যায়তনের পরিকল্পনা হইতেই তিনি ইহার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলেন। যশোহর খুলনার ইতিহাস সতীশচন্দ্রের ঐতিহাসিক জিজ্ঞাসা ও তথ্যানুসন্ধিৎসার ফল ও নিদর্শন। প্রতাপ সিংহ প্রভৃতি আরও কয়েকখানা পুস্তক তিনি রচনা করিয়াছিলেন। কলেজ-গ্রন্থাগারের ইতিহাস-বিভাগ সতীশচন্দ্রের চেষ্টায় ও পরিশ্রমে অমূল্য ও দুষ্প্রাপ্য পুস্তকাদি দ্বারা এবং তাঁহার সংগৃহীত প্রাচীন মূর্ত্তি, ফলক, অস্ত্র-শস্ত্র ও মুদ্রাদি দ্বারা সমৃদ্ধ হইয়াছে। তাঁহার মৃত্যুতে বঙ্গমাতা একজন কৃতী সন্তান হারাইলেন।

পরলোকে সতীশচন্দ্র রায়—

পদাবলী সাহিত্যে সুপণ্ডিত ঢাকা-নিবাসী সতীশচন্দ্র রায় সম্প্রতি ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। তিনি আমরণ পদাবলী সাহিত্য চর্চ্চা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার অদম্য অধ্যবসায়ের ফলে বহু লুপ্ত প্রাচীন পুথি আবিষ্কার ও তাহার পাঠ উদ্ধার সম্ভব হইয়াছে। তাঁহার মৃত্যুতে বঙ্গভাষা একজন একনিষ্ঠ সেবক হারাইল।

—

বিদেশ

জার্ম্মানী অষ্ট্রিয়ার বাণিজ্যিক সন্ধি এবং ফ্রান্স প্রমুখ দেশসমূহের উষ্মা —

বিগত মহাযুদ্ধের পর মধ্য ও পূর্ব্ব ইউরোপে কয়েকটি খণ্ড রাজ্যের উদ্ভব হইয়াছে। প্রত্যেক রাজ্য আর্থিক তথা রাষ্ট্রিক হিসাবে সুপ্রতিষ্ঠিত হইবার উপায় স্বরূপ শুল্ক-প্রাচীর (Tariff walls) উঁচাইয়া রাখিয়াছে। ফলে ইউরোপের দেশগুলির মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্য একেবারে কমিয়া গিয়াছে, এবং নানা স্থানে ভীষণ আর্থিক অনটন দেখা দিয়াছে। নানা কারণে তথাকার বিভিন্ন রাষ্ট্রগুলির মধ্যে রেষারেষিও লাগিয়াই আছে। ইহার প্রতিকার মানসে ফরাসী রাজনীতিবিশারদ মসিয় ব্রিয়াঁ ইউরোপীয় খণ্ডরাজ্যগুলিকে সংহত করিয়া লীগ্ অব্ নেশ্যনস্-এর অন্তর্গত একটি সম্মিলিত রাষ্ট্র গঠন করিতে গত তিন-চার বৎসর ধরিয়া উঠিয়া-পড়িয়া লাগিয়াছেন। কিন্তু ইউরোপীয় রাজনীতির জটিলতা, রাষ্ট্রসমূহের পরস্পরের প্রতি অবিশ্বাস এবং অধিকাংশ রাষ্ট্রেরই পরের মাথায় কাঁঠাল ভাঙিয়া খাইবার লোভ হেতু ব্রিয়াঁর এই প্রচেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত হইতে পারে নাই। অন্যদের অপেক্ষা না রাখিয়া সমূহ বিপদ হইতে ত্রাণ পাইবার নিমিত্ত জার্ম্মাণী ও অষ্ট্রিয়া পরস্পরের শুল্ক-প্রাচীর ভাঙিয়া দিয়া ব্যবসা-বাণিজ্যে অবাধ নীতি চালাইতে প্রয়াসী হইয়াছেন। প্রথমেই খুঁটিনাটির মধ্যে না গিয়া উভয় রাষ্ট্র সন্ধির মূলসূত্রগুলিমাত্র সম্প্রতি (১৯এ মার্চ্চ, ১৯৩১) প্রকাশিত করিয়াছেন। ফ্রান্স, পোলাণ্ড, চেকোশ্লোভাকিয়া এই সূত্রগুলি পাঠ করিয়াই আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিয়াছেন। তাঁহাদের মতে টিউটন জাতি অধ্যুষিত রাষ্ট্র দুইটির বাণিজ্যিক সন্ধি সমগ্র লাটিন জাতির বিরুদ্ধে শক্তি সঞ্চয় করিবার একটা প্রবল প্রয়াস। ইঁহাদের জোর আন্দোলনের ফলে লীগ্ অব্ নেশ্যনস্-এর কৌন্সিলেও এ-বিষয় উত্থাপিত হইয়া সম্যক আলোচিত হইয়া গিয়াছে। কৌন্সিলে এই সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে, জার্ম্মাণী, অষ্ট্রিয়া ও অন্যান্য দেশসমূহের মধ্যে ইতিপূর্ব্বে যে সব সন্ধি হইয়া গিয়াছে, এই সন্ধিতে তাহার কোনরূপ ব্যাঘাত হয় কি-না তাহাই মাত্র বিচার্য্য। বিষয়টি আশু মীমাংসার জন্য আন্তর্জ্জাতিক বিচারালয়ে পেশ করা হইয়াছে।

জার্ম্মাণী-অষ্ট্রিয়ার সন্ধি মসিয় ব্রিয়াঁ কর্ত্তৃক উদ্ভাবিত সমগ্র ইউরোপে যুক্তরাষ্ট্র স্থাপন প্রচেষ্টার একটি আংশিক ক্ষীণ সংস্করণ মাত্র। এই সন্ধিতে পরস্পরের স্বাধীনতা সম্পূর্ণ বজায় রহিয়াছে, এবং একই উদ্দেশ্যে তৃতীয় কোন রাষ্ট্রের সঙ্গে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইবার ক্ষমতা পরস্পরকে প্রদান করা হইয়াছে। সন্ধির সর্ত্তগুলি যথাযথ প্রতিপালিত না হইলে উপযুক্ত সময়ে অপরকে জানাইয়া তাঁহারা সন্ধি প্রত্যাহারও করিতে পারিবেন। উভয় দেশ হইতে নির্দ্দিষ্টসংখ্যক প্রতিনিধি লইয়া একটি কমিটি গঠিত হইবে। পরস্পরের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হইলে তাহার বিচার করা ইহার কার্য্য এবং বিচারের ফলাফল সর্ব্বথা মান্য। ফ্রান্স প্রমুখ লাটিন জাতীয় দেশগুলি চিরকাল টিউটন জাতির সম্মিলনকে (জার্ম্মান ভাষায় ইহাকে "Anschluss" বলে) সন্দেহের চক্ষে দেখিয়া আসিতেছেন। তাঁহারা এই মিলন সংঘটিত হইতে দিবার পক্ষে ঘোরতর বিরোধী। কারণ তাঁহাদের বিশ্বাস, জার্ম্মাণী ও অষ্ট্রিয়া এই বাণিজ্যিক মিলনের সূত্র লইয়া মধ্য ইউরোপের খণ্ড রাজ্যসমূহে প্রভাব বিস্তার করিবে এবং সমগ্র ভূখণ্ডকে একদা গ্রাস করিয়া ফেলিবে। পক্ষান্তরে, জার্ম্মানী বলিতেছেন যে, অর্থকষ্ট দূর করিবার জন্যই তাঁহারা এইরূপ সন্ধিবদ্ধ হইতে বাধ্য হইয়াছেন। তাঁহারা আরও বলেন যে, মহাযুদ্ধের পূর্ব্বের রাজতন্ত্র জার্ম্মানী এবং পরের গণতন্ত্র জার্ম্মানীর অবস্থা এবং মনোভাবে আকাশপাতাল প্রভেদ, সুতরাং তাঁহাকে ভয় করিবার কোন সঙ্গত কারণ নাই।

বক্সা-দুর্গে রবীন্দ্র-জয়ন্তী

নির্ব্বাসনের বন্দীদের কবি-বন্দনা।

[বক্সা-দুর্গে রবীন্দ্র-জয়ন্তী সুষ্ঠুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে। নানা অসুবিধা ও বিঘ্নের ভিতর দিয়া উৎসবকে মনের মত সুন্দর করিতে পারা না গেলেও যতটা সম্ভব ভালই হইয়াছিল।

উৎসবক্ষেত্রে মঞ্চটি ভারতীয় রীতিতে সুন্দররূপে সাজান হয়। মঞ্চের সম্মুখে দুইধারে কদলী বৃক্ষ ও মঙ্গলঘট স্থাপন করিয়া আলপনা দেওয়া হয় এবং সামনের দিকে একসারি প্রদীপ দেওয়া হয়। সর্ব্বপ্রথমে ঐকতানবাদনের পর কবির উদ্দেশ্যে অভিনন্দন-পত্র পাঠ করা হয়। মঞ্চের উপর রবীন্দ্রনাথের এই উপলক্ষে অঙ্কিত ছবি অতি সুন্দর করিয়া সাজান হয়, এবং অভিনন্দন পাঠান্তে উক্ত চিত্রের কাছে উহা উপস্থাপিত করা হয়। অতঃপর "জন-গণ-মন অধিনায়ক" গানটি মিলিতকণ্ঠে গীত হয়। সর্ব্বশেষে "শেষবর্ষণ" অভিনীত হয়।]

অভিনন্দন-পত্র

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের শ্রীচরণকমলে—

ওগো কবি,

"আমরা তোমায় করি গো নমস্কার।"

সুদূর অতীতের যে পুণ্যপ্রভাতক্ষণে তোমার আবির্ভাব, আজ বাংলার সীমান্তে, নির্ব্বাসনে বসিয়া, আমরা বন্দীদল তোমার সেই জন্মক্ষণটিকে বন্দনা করি। আর স্মরণ করি, বিরাট মহাকালকে যিনি সেই ক্ষণটির দ্বারপথ উন্মুক্ত করিয়া এই দেশের মাটির পানে তোমাকে অঙ্গুলি ইঙ্গিতে পথ দেখাইয়াছেন।

যেদিন জ্যোতির্ম্ময় আলোক-দেবতা তমসাতীরে প্রথম চোখ মেলিয়া চাহিলেন, আলোকবহ্নির আত্ম-প্রকাশই ত সেদিনকার একমাত্র সত্য নয়। সেই একের প্রকাশে সুপ্তির অন্ধকার তটে তটে বিচিত্র বহুও যে আপনাকে জানিয়া, জানাইয়া উঠিয়াছে। হে মর্ত্তের রবি, তোমার আকাশবিহারী বন্ধুর সঙ্গে তোমার যে পরম সাদৃশ্য আমরা দেখিতে পাইয়াছি। তুমি নিজকে প্রকাশ করিয়াছ;—তাই ত বিস্মৃতির অখ্যাত প্রদেশে আমাদের মাঝে আলো জ্বলিয়া উঠিয়াছে।

হে ঐশ্বর্য্যবান্, তোমার মাঝে জাতি আপন ঐশ্বর্য্যের সন্ধান পাইয়াছে।

হে ধ্যানী, তোমার চোখে জাতি মহান্ বিশ্বমানবের স্বপ্ন দেখিয়াছে।

হে সাধক, তোমার হাতে জাতি আপনার সাধনার ধন গ্রহণ করিয়াছে।

তাই কি তুমি প্রত্যেকের পরমাত্মীয়?

হে ঋষি, তোমার জন্মক্ষণে এই বাংলার জন্ম-গেহে সমগ্র জাতির জন্ম-জয়ধ্বনি বাজিয়া উঠিয়াছিল। অজ্ঞাত আমরা সেদিন অজানা নীহারিকাপুঞ্জের মাঝে না জানিয়াও শিহরিয়া উঠিয়াছিলাম। আজ জাগ্রত জীবনের যাত্রা-পথে দাঁড়াইয়া, হে অগ্রজ, তার ঋণ শোধ করি। আমরা না আসিতে তুমি আমাদের জীবনের জয়গান গাহিয়াছ; আমরা সে দান প্রণামের বিনিময়ে আজ অঞ্জলি পাতিয়া লইতেছি।

তোমার জন্মক্ষণটি পিছনের অতীতে হয়ত হারাইয়া গিয়াছে—কিন্তু আজিকার এই স্মরণ-দিনে আমাদের কণ্ঠের জয়ধ্বনি সম্মুখের অগণিত মুহূর্ত্ত-শ্রেণীতে প্রতিধ্বনিত হইয়া অনন্তের শেষ-সীমান্ত পারে গিয়া পৌছুক।

হে কবি-গুরু! আমরা "তোমায় করি গো নমস্কার"; অবরুদ্ধের অভিনন্দন গ্রহণ কর। ইতি

বক্সা-দুর্গ
ভুটান-সীমান্ত
রবীন্দ্র-জয়ন্তী বাসর

গুণমুগ্ধ
সমবেত রাজবন্দী

প্রত্যভিনন্দন

বক্সা-দুর্গস্থিত রাজবন্দীদের প্রতি

নিশীথেরে লজ্জা দিল অন্ধকারে রবির বন্দন।
পিঞ্জরে বিহঙ্গ বাঁধা, সঙ্গীত না মানিল বন্ধন।
ফোয়ারার রন্ধ্র হ'তে
উন্মুখর উর্দ্ধ স্রোতে
বন্দি বারি উচ্চারিল আলোকের কি অভিনন্দন॥

মৃত্তিকার ভিত্তি ভেদি অঙ্কুর আকাশে দিল আনি
স্বসমুত্থ শক্তিবলে গভীর মুক্তির মন্ত্রবাণী।
মহাক্ষণে রুদ্রাণীর
কি বর লভিল বীর,
মৃত্যু দিয়ে বিরচিল অমর্ত্ত্য নরের রাজধানী॥

"অমৃতের পুত্র মোরা" কাহারা শুনাল বিশ্বময়!
আত্মবিসর্জন করি আত্মারে কে জানিল অক্ষয়!
ভৈরবের আনন্দেরে
দুঃখেতে জিনিল কে রে
বন্দীর শৃঙ্খলচ্ছন্দে মুক্তের কে দিল পরিচয়॥

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

দার্জ্জিলিং
১৯ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৮



মিঃ চার্চ্চিল—আমি বোধ করি অনধিকার-প্রবেশ করচি?



জন বুল—মহাত্মা গান্ধী এই বাঘটাকে সামলাতে পারবেন কি না সে-বিষয়ে আমার সন্দেহ হচ্চে।

ভিয়েনার শিশুমঙ্গল প্রতিষ্ঠান

শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র চৌধুরী

বছর দুই আগে যখন ভিয়েনায় আসি, তখন আমার জানা ছিল না যে, ভিয়েনার শিশুমঙ্গল প্রতিষ্ঠান পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শিশুমঙ্গল-প্রতিষ্ঠানগুলির অন্যতম। ভিয়েনা মিউনিসিপালিটির সোশিয়ালিষ্ট কর্ম্মকর্ত্তারা যুদ্ধের পর



"মাতৃস্নেহ"
আণ্টন হানক কর্ত্তৃক পরিকল্পিত এই মূর্ত্তিটি
ভিয়েনার সকল শিশুমঙ্গল প্রতিষ্ঠানেই স্থাপিত হইয়াছে

ইহার প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। যে-সময়ে ইহা গড়িয়া উঠে তখন ভিয়েনার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা অতি শোচনীয়। সুতরাং আমাদের ভারতবাসীদের কাছে এই আদর্শের মূল্য অতি বেশী, কেন-না এ-রকম কোন কাজে নামিতে হইলে আমাদেরও বহু রাজনৈতিক এবং আর্থিক বাধা অতিক্রম করিতে হইবে।

ভিয়েনার যে শিশুমঙ্গল কাজ, তাহার মূলে রহিয়াছে একটা সমগ্র জাতির ভবিষ্যৎ উন্নতি এবং মঙ্গলের আকাঙ্ক্ষা। ভিয়েনা মিউনিসিপালিটির সোশিয়ালিষ্ট কর্ত্তারাই এই কথাটা প্রথম উপলব্ধি করেন যে, একটি শিশুর হিতাহিত কেবল একটা ব্যক্তিগত জীবনের জীবন-মরণের কথামাত্রই নয়—একটা সমগ্র জাতির ভবিষ্যৎ তাহাতে নিহিত রহিয়াছে, এবং এই কারণেই শিশুদের প্রাণধারণ এবং সুস্থ রাখিবার ব্যবস্থা করিতে হইলে একটা জাতির সম্মিলিত রাষ্ট্রীয় এবং সামাজিক শক্তিপ্রয়োগের প্রয়োজন হয়। এই কথা জানিয়াই ভিয়েনা মিউনিসিপালিটি শিশুমঙ্গল কাজকে নিজের বলিয়া গ্রহণ করিয়া তাহার ব্যয়ের ভার শহরের বাজেটের উপর আরোপ করেন।

শিশুর জন্মের পূর্ব্বেকার কাজ

ভিয়েনার শিশুমঙ্গল কার্য্যপদ্ধতিতে শিশুর ভূমিষ্ঠ হওয়ার পূর্ব্ব হইতে আরম্ভ করিয়া শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া তাহার সাংসারিক জীবনে প্রবেশ করা পর্য্যন্ত যাহা যাহা প্রয়োজন, তাহার সমস্তেরই ব্যবস্থা আছে। কার্য্য-বিধিটি এইরূপ—

১। কাহারা সন্তানোৎপাদনের যোগ্য এ বিষয়ে শিক্ষা বিস্তার।

২। শহরের প্রতিটি ভাবী জননীর খবর রাখা।

৩। তাহাদের তত্ত্বাবধান এবং প্রয়োজন হইলে চিকিৎসার ব্যবস্থা।

নবজাত শিশুর পরিচর্য্যা

১। নবজাত শিশুদের স্বাস্থ্য পর্য্যবেক্ষণ করা এবং মাতা কিংবা পালক-মাতাদের শিশুর লালনপালন সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়া ;

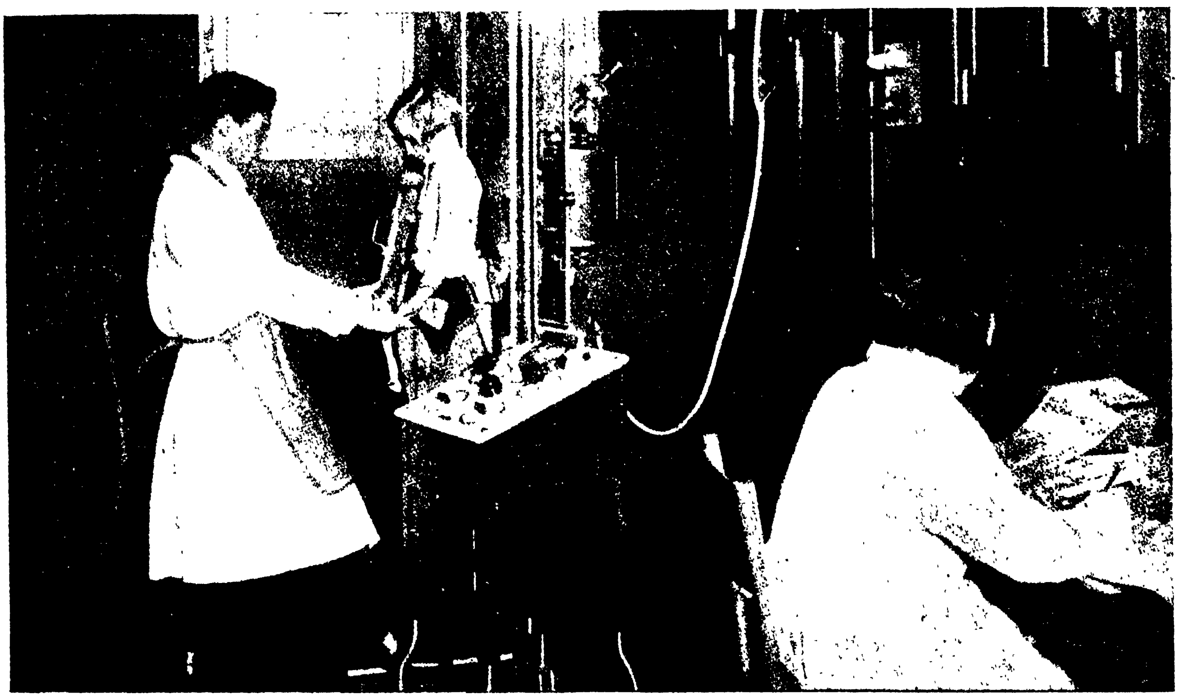
২। ক্রেশ (অর্থাৎ দুগ্ধপোষ্য শিশুদিগকে রাখিবার জায়গা) হাসপাতাল কিংবা আশ্রম খোলা।

পরের ব্যবস্থা

১। স্কুলে যাইবার বয়সের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত কিণ্ডারগার্টেন, দিনে থাকিবার আশ্রম প্রভৃতিতে শিশুদের যত্ন নেওয়া।



ভিয়েনার একটি শিশুমঙ্গল কেন্দ্র
দ্বারদেশে এই কেন্দ্রের স্থাপয়িত্রী ফ্রাউ হাইণ্ডল্ দাঁড়াইয়া আছেন



ভিয়েনার একটি শিশুমঙ্গল কেন্দ্রে একটি শিশুকে এক্স-রের দ্বারা পরীক্ষা করা হইতেছে

২। স্কুলে যাইবার উপযুক্ত বয়সের শিশুদের শারীরিক এবং মানসিক স্বাস্থ্যের প্রতি নজর দেওয়া।

৩। শিশুদের জন্য খেলার জায়গা, স্নানের জায়গা, আমোদের ঘর প্রভৃতির ব্যবস্থা করা।



শিশুরা রৌদ্র পোহাইতেছে

৩। পীড়িত শিশুদের চিকিৎসা করা।

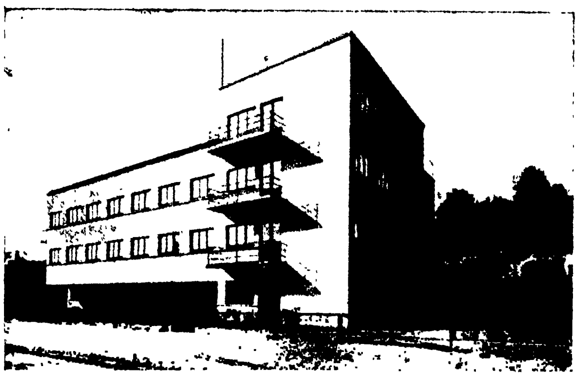
সুস্থ মায়ের সুস্থ সন্তান, এই কথাই শিশুমঙ্গল কাজের মূলমন্ত্র। সুতরাং শিশুর জন্মের পর হইতে শিশুর যত্ন নেওয়াই শিশুর পক্ষে যথেষ্ট নয়। যে রোগ জন্মগত তাহার চিকিৎসা ব্যয়সাপেক্ষ। সেজন্য সেরূপ শিশু যাহাতে না জন্মে, তাহারই ব্যবস্থা করিতে হয়। সন্তানোৎপাদনের অনুপযোগী লোককে sterilize করা যায় এ-রকম কোন আইনের ব্যবস্থা ভিয়েনায় নাই, তবে Municipal Marriage Advice Bureau নামে একটা সমিতি এ-সম্বন্ধে শিক্ষা দান করে।

ভাবী জননীদের তত্ত্বাবধান করিবার জন্য ভিয়েনাতে চৌত্রিশটি মাতৃমঙ্গল আশ্রম আছে। সে-সব জায়গায় ডাক্তারী পরীক্ষার উপযুক্ত সাজসরঞ্জাম আছে। যে-কোন স্ত্রীলোক এই সব আশ্রমে উপস্থিত হইয়া নিজের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করাইয়া যাইতে পারে। যাহাদের পক্ষে এই সকল স্থানে আসা সম্ভব নয়, স্বাস্থ্য-বিভাগের কর্ম্মচারীদিগকে তাহাদের কাছে উপস্থিত হইয়া তাহাদের পরীক্ষাদি করিতে হয়। জন্ম-রেজেষ্টরি বিভাগের কর্ত্তা প্রতিটি শিশুর জন্মের খবর বিভিন্ন শিশুমঙ্গল সমিতিগুলিকে জানাইয়া দেন এবং তাহারা এই শিশুদের পরিদর্শন করিয়া বেড়ায়।

এই স্বাস্থ্য পরিদর্শকদের কি পরিমাণ কাজ করিতে তাহা একটি অঙ্ক হইতেই বুঝা যায়। ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে ইহাদের ২,৩০,০০০ বার পরিদর্শনে যাইতে হইয়াছিল।

মিউনিসিপালিটি আসন্নপ্রসবা স্ত্রীলোকদের জন্য কতকগুলি হাসপাতাল খুলিয়াছে। ভিয়েনার অর্দ্ধেকের বেশী শিশুদের জন্ম হয় এই হাসপাতালগুলিতে। মিউনিসিপালিটি কেবল হাসপাতাল খুলিয়াই ক্ষান্ত নয়। যাহারা গবর্ণমেণ্টের কাছ হইতে সন্তান-প্রসবের সময় কোন অর্থ সাহায্য না পায়, মিউনিসিপালিটি তাহাদিগকে সন্তান-প্রসবের পর চার সপ্তাহ পর্য্যন্ত সপ্তাহে ১০ শিলিং (অষ্ট্রিয়ান্) করিয়া দেয়।

নবজাত শিশুদের উপযুক্ত লালন-পালনের জন্য মাতাপিতাদের নিয়মিতভাবে নানা কেন্দ্রে শিক্ষা দেওয়া হয়। তাহা ছাড়া City Health Department প্রতিটি নবপ্রসূতিকে বিনামূল্যে এক প্রস্থ শিশুর পোষাক ইত্যাদি দিয়া থাকে। ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে এ-রকম এগার হাজার প্যাকেট পাঠান হইয়াছিল।



শিশুদের আশ্রম

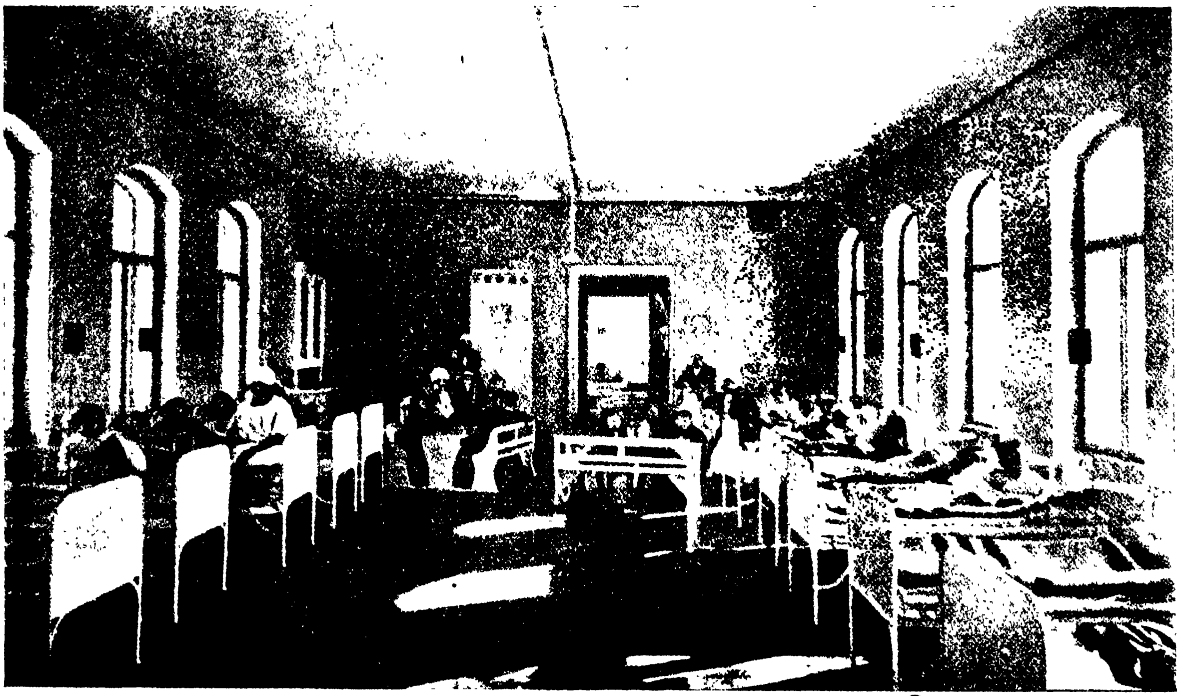
নবজাত শিশুদের রক্ষার জন্য মিউনিসিপালিটির দুইটি ক্রেশ্ আছে। তাহা ছাড়া ব্যক্তিবিশেষের পরিচালিত বহু ক্রেশও আছে। মিউনিসিপালিটি তাহাদের অর্থ সাহায্য করে।

বড় শিশুদের ভার গ্রহণ করিবার জন্য ভিয়েনাতে একশত দুইটি কিণ্ডারগার্টেন আছে। শহরের বিভিন্ন স্থানে সে-গুলি অবস্থিত। সকাল সাতটা হইতে সন্ধ্যা ছয়টা পর্য্যন্ত সেগুলি খোলা থাকে, বাপমায়েরা সকালে ছেলেদেব এখানে রাখিয়া কাজে যায়, আবার সন্ধ্যার সময় ঘরে লইয়া যায়। তিন হইতে ছয় বছর পর্য্যন্ত শিশুদের এখানে রাখিবার নিয়ম। ছয় বছরের উপর ছেলেদের জন্য চৌত্রিশটি "ডে হোম" আছে।



একটি কিণ্ডারগার্টেন স্কুল

স্কুলের ছেলেদের স্বাস্থ্য প্রতি-সপ্তাহে পরীক্ষা করা হয়।



যক্ষ্মাগ্রস্ত শিশুদের জন্য একটি হাসপাতাল

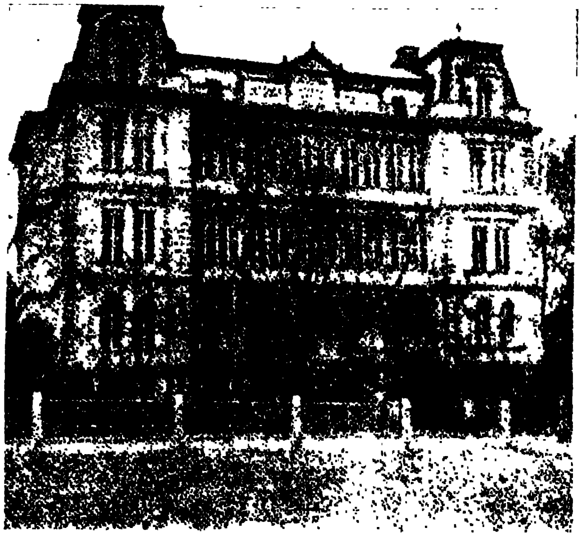
প্রথম বছর যক্ষ্মার জন্য প্রতি ছেলে-মেয়েকে বিশেষ করিয়া পরীক্ষা করা হয়। দাঁত ও চোখ পরীক্ষা করিবার জন্যও রীতিমত ব্যবস্থা আছে। মিউনিসিপালিটি শিশুদের জন্য একত্রিশটি খেলার জায়গা,

তেরটি স্কেটিং-এর রিঙ্ক এবং বারোটি স্নানঘর করিয়া দিয়াছে। ইহা ভিন্ন ছুটির দিনে শিশুদের শহরের বাহিরে লইয়া যাইবার জন্যও মিউনিসিপালিটির ব্যবস্থা আছে।



শিশুদিগকে কৃত্রিম রৌদ্রে রাখা হইয়াছে

চিকিৎসার মধ্যে যক্ষ্মাচিকিৎসার প্রতি ভিয়েনাতে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হইয়াছে। কারণ যক্ষ্মারোগ ভিয়েনাতে অতি প্রবল। মিউনিসিপালিটির কতকগুলি



একটি শিশু হাসপাতাল

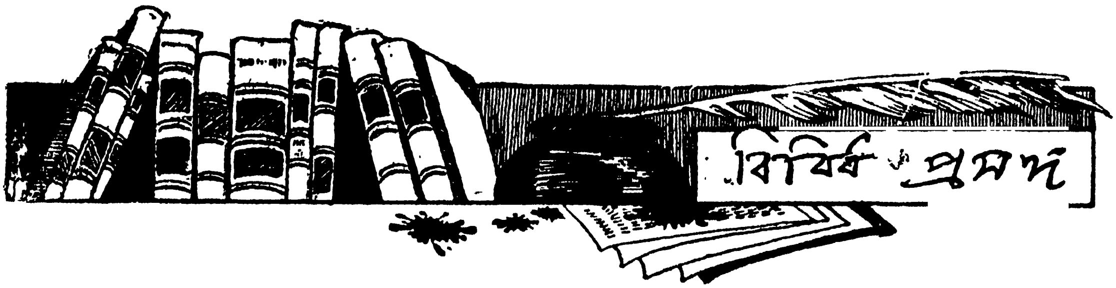
যক্ষ্মাচিকিৎসালয় এবং যক্ষ্মারোগীর আবাস আছে। যে যে পরিবারে যক্ষ্মারোগ আছে সেখান হইতে শিশুদের অন্যত্র সরাইয়া লওয়া হয়—যাহাতে রোগ শিশুদের মধ্যে সংক্রামিত হইতে না পারে।

এই সব শিশুদের খরচ মিউনিসিপালিটিই বহন করে। কেবল মাত্র চিকিৎসালয়ই রোগ নিবারণের পক্ষে যথেষ্ট নয় বলিয়া মিউনিসিপালিটি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ঘরবাড়ী নিম্মাণ, স্বাস্থ্যকর আহারের ব্যবস্থা, ছুটিতে শহরের বাহিরে বেড়াইতে লইয়া যাওয়া প্রভৃতি লোকহিতকর কাজের ভার গ্রহণ করিয়াছে, ফলে শহরের মৃত্যুসংখ্যা অনেক কমিয়া গিয়াছে।*



একটি মন্তেসরী স্কুল

* লেখকের নিজের গৃহীত তিনটি ফটোগ্রাফ ব্যতীত এই প্রবন্ধের চিত্রগুলি ভিয়েনা মিউনিসিপালিটি ও ফ্রাউ ডিরেক্টরিন হাইণ্ডলের অনুমতি ও সৌজন্যে প্রকাশিত হইল।



চার্চিলের চালাকী

মিস্‌টার চাচিল একজন ইংরেজ রাজনৈতিক। কয়েকদিন পূর্ব্বে তিনি বিলাতে যে বক্তৃতা করিয়াছেন, তাহার কয়েকটা কথা সংক্ষেপে রয়টারের তারের খবরে এদেশে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। নীচে ইংরেজীতে সেগুলা উদ্ধৃত করিতেছি।

He asked why should the safe-guards be only in the interests of India? Had the British, who had lifted the population of India several hundred years above their level in peace, justice and sanitation, no right to have their interests considered? He urged the Conservatives to make it clear that they were determined to discharge their duty to the vast masses of people and would not hand them over to greedy and fanatical politicians who would immediately reduce the country to chaos and carnage, if they gained control.

He described the Cawnpore riots as the direct outcome of the Irwin-Gandhi Pact with its ambiguous and equivocal formulas and said that worse would speedily follow unless the British dealt with the problem in terms of manly truth.

চাচিলের এবং আরও অনেক ইংরেজ রাজনৈতিকের ভণ্ডামি ধরিবার জন্য শ্রমসাধ্য গবেষণার দরকার নাই। উপরে উদ্ধৃত সামান্য কয়েকটা কথার মধ্যেই পরস্পর-বিরোধী মত রহিয়াছে। প্রথমতঃ বক্তা জিজ্ঞাসা করিতেছেন, ভারতবর্ষে যে নূতন শাসনবিধি প্রবর্ত্তিত হইবে, তাহাতে কেবল ভারতবর্ষেরই স্বার্থরক্ষার ব্যবস্থা কেন করা হইবে? যে ইংরেজরা শান্তি, ন্যায় এবং স্বাস্থ্যবিষয়ক ব্যবস্থাতে ভারতবর্ষকে কয়েক শত বৎসর অগ্রসর করিয়া দিয়াছে, তাহাদের স্বার্থ বিবেচিত হইবার কোন অধিকার কি তাহাদের নাই? তিনি তাঁহার নিজ রাজনৈতিক দল কনজার্ভেটিভ-দিগকে সনির্ব্বন্ধ এই অনুরোধ করেন, যে, তাঁহারা ইহা সুস্পষ্ট করিয়া দিউন, যে, তাঁহারা ভারতের বিশাল জনরাশির প্রতি তাঁহাদের কর্ত্তব্য পালন করিতে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ, এবং তাঁহারা ধর্ম্মান্ধ বা রাজনৈতিকমতান্ধ ও লোভী ভারতীয় লোকদের হাতে ভারতীয় জনগণের ভার ছাড়িয়া দিবেন না; কারণ তাহারা দেশে প্রভুত্ব পাইলে তৎক্ষণাৎ দেশটাতে মহা বিশৃঙ্খলতা ও রক্তারক্তি উপস্থিত করিবে।

চাচিলকে জিজ্ঞাসা করা বৃথা, যে, তাহার কোন্ বিষয়ে আগ্রহটা সত্য? ইংলণ্ডের স্বার্থরক্ষা, না, ভারতীয় জনগণের মঙ্গলসাধন? কারণ, এই সব ধূর্ত্ত ভণ্ডের মতে ইংরেজদের উদরপূর্ত্তি করিবার জন্যই ভারতীয়দের জন্ম এবং ভারতীয়েরা ইংরেজদিগকে ধনশালী ও শক্তিশালী রাখিতে পারিলেই তাহাদের জন্ম সার্থক হয়।

শেষে চাচিল বলে, কানপুরের দাঙ্গাটা আরুইন-গান্ধী চুক্তির সাক্ষাৎ ফল, এবং ব্রিটিশরা পৌরুষ-সহকৃত সত্যানুসরণ দ্বারা ভারতীয় সমস্যাটার সম্বন্ধে ব্যবস্থা না করিলে শীঘ্রই কানপুর দাঙ্গার চেয়েও ভীষণতর অবস্থা ঘটিবে। ব্রিটিশ রাজত্বে ব্রিটিশ প্রভুত্বের সময়ে সংখ্যায় ও ভীষণতায় যত ক্রমবর্দ্ধমান দাঙ্গা রক্তারক্তি ঘটিতেছে, তাহার জন্য ব্রিটিশ রাজত্বকে দায়ী না করিয়া ভারতীয়দের স্বরাজলাভেচ্ছাকে দায়ী করা ব্রিটিশ ন্যায়-শাস্ত্রের এক অতি চমৎকার যুক্তি। চাচিলের মত লোকগুলা সম্পূর্ণ নির্লজ্জ।

—

বঙ্গের দলাদলির নিষ্পত্তির চেষ্টা

বোম্বাইয়ে সম্প্রতি কংগ্রেসের কার্য্য-নির্ব্বাহক কমিটির যে অধিবেশন হইয়া গিয়াছে, তাহাতে বঙ্গের কংগ্রেস-ঘটিত দলাদলির নিষ্পত্তির ভার বেরারের শ্রীযুক্ত আনে মহাশয়ের উপর অর্পিত হইয়াছে। তাঁহার নিষ্পত্তি

উভয় পক্ষ মানিয়া লইয়া অতঃপর বিবাদ হইতে নিবৃত্ত হইলে বঙ্গের কতকটা অকল্যাণ নিবারিত হইবে। কল্যাণ হইবে কি না, তাহা দুই দলের অকপট দেশ-হিতৈষিতা, হিত করিবার পথনির্দ্ধারণের বুদ্ধি, এবং হিত করিবার মত কর্ম্মশক্তির উপর নির্ভর করিবে।

বাংলা দেশে শ্রীযুক্ত আনের মত পক্ষপাতশূন্য, বিচক্ষণ লোক এক জনকেও কংগ্রেস খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিলে বাংলা দেশের সম্মান রক্ষিত হইত। কিন্তু কংগ্রেস বাংলা দেশের সম্মান রক্ষার জন্য ব্যগ্র হইবেন, এরূপ আশা করা ঠিক নয়। আমরা যদি নিজেই নিজের মান রাখিতে না পারি, তাহা হইলে অন্যেরা তাহা রাখিবে, এমন আশা করা উচিত নয়।

—

বোম্বাইয়ে দেশীরাজ্য-পরিষদের অধিবেশন

ভারতবর্ষের দেশী রাজ্যগুলি সাক্ষাৎভাবে ব্রিটিশ গবন্মেণ্টের শাসনের অধীন নয়, যদিও তাহাদের নৃপতিরা ইংলণ্ডের রাজা পঞ্চম জর্জকে অধিরাজ বলিয়া মানিতে বাধ্য। এই রাজ্যগুলি ১৯২১ সালের সেন্সস অনুসারে সাত কোটি কুড়ি লক্ষ লোকের বাসভূমি। এগুলির প্রায় সর্ব্বত্রই আইনের শাসন নাই—রাজা মহারাজা নবাবদের ইচ্ছাই আইন। সুতরাং তাহার ফলে অন্যায় অত্যাচার কুশাসন যে খুব হয়, তাহা বলা বাহুল্য। রাজ্যগুলির আয়ের খুব বড় একটা অংশ নৃপতিদের সাংসারিক ব্যয় এবং বিলাসলালসাদির ব্যয়ে নিযুক্ত হয়। ব্রিটিশ সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জ তাঁহার পারিবারিক ব্যয়ের জন্য ব্রিটেনের রাজস্বের অযুতকরা আট টাকা পাইয়া থাকেন। ভারতবর্ষে ত্রিবাঙ্কুড়ের মত উন্নতিশীল রাজ্যেও প্রাসাদের ব্যয় রাজস্বের শতকরা ছয় টাকা অর্থাৎ অযুতকরা ছয় শত টাকার অধিক। বড়োদার মত উন্নতিশীল রাজ্যে প্রাসাদের ব্যয় রাজস্বের শতকরা বার টাকা অর্থাৎ অযুত-করা বার শত টাকা।

দেশী রাজ্যসকলের শাসন প্রজাতন্ত্র হইলে প্রজাদের উন্নতি হইবে, এবং অত্যাচারও নিবারিত হইবে। রাজ্যসমূহে যে-সব অত্যাচার অবিচার হয়, তাহা লোকসমক্ষে উপস্থিত করিয়া তাহার প্রতিকার লাভের জন্য চেষ্টা করা দেশীরাজ্য-পরিষদের অন্যতম উদ্দেশ্য। রাজ্যসকলে প্রজাদের নিকট দায়ী শাসনপ্রণালী প্রবর্ত্তন অন্যতম উদ্দেশ্য।

গত জ্যৈষ্ঠ মাসে বোম্বাই শহরে সমগ্র ভারতবর্ষের দেশী রাজ্যসমূহের এই পরিষদের তৃতীয় অধিবেশন হয়। প্রবাসীর সম্পাদককে এই অধিবেশনের সভাপতি নির্ব্বাচন করা হয়। গত দুই অধিবেশনে যত লোক অভ্যর্থনা-সমিতির সভ্য হইয়াছিলেন, তাঁহাদের সমষ্টি অপেক্ষা তৃতীয় অধিবেশনের অভ্যর্থনা সমিতির সভ্যদের সংখ্যা অনেক বেশী (প্রায় উহার দেড়গুণ) হইয়াছিল। ভারতবর্ষের সকল দিক ও অঞ্চল হইতে প্রতিনিধিবর্গের সমাগম হইয়াছিল। অধিবেশনের জন্য রয়্যাল অপেরা হাউস নামক থিয়েটার ভাড়া লওয়া হইয়াছিল। উহাতে তিন হাজার লোক ধরে। যাহাতে তাহারা সকলে শুনিতে পায় তাহার জন্য রেডিওর বন্দোবস্ত হইয়াছিল। ভিতরে জায়গা না কুলানতে বাহিরেও বিস্তর লোক জমা হইয়াছিল। তাহাদের জন্যও রেডিওর বন্দোবস্ত ছিল।

—

দেশীরাজ্য-পরিষদে ব্যবহৃত ভাষা

দেশীরাজ্য-পরিষদে আমার বক্তৃতাটি হিন্দী ও ইংরেজী ইহার যে-কোন ভাষায় পড়িবার জন্য আমি প্রস্তুত হইয়া গিয়াছিলাম। উদ্দেশ্য—চাহিদা অনুসারে সরবরাহ করিব। দেখিবার জন্য অপেক্ষা করিয়া ছিলাম, অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীদাস রাওজী তৈয়সী কোন্ ভাষায় বক্তৃতা করেন। বোম্বাইয়ে গান্ধীজীর প্রভূত প্রভাব। সেই জন্য ভাবিয়াছিলাম, হিন্দীতেই বোধ করি বক্তৃতা হইবে। কিন্তু তৈয়সী মহাশয় একটি ইংরেজী বক্তৃতা পড়িলেন। তিনি জাতিতে কচ্ছী। কচ্ছ দেশের ভাষা ঠিক্ গুজরাটী নয়, গুজরাটীর মত বটে। পরিষদে সমবেত লোকদের সঙ্গে তিনি হয় গুজরাটী নতুবা ইংরেজীতে কথাবার্ত্তা চালাইতেছিলেন। তাঁহার বক্তৃতার পর আসিল আমার পালা। অনুরুদ্ধ

না হইয়াও আমি আপনা হইতেই আমার হিন্দী অভিভাষণটি পড়িতে আরম্ভ করিলাম। যখন উহার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ পড়া হইয়াছে, এমন সময় ক্ষমতাপ্রাপ্ত অভ্যর্থনা-সমিতির একজন সভ্য আমার নিকটস্থ হইয়া কানে কানে বলিলেন, "লোকেরা উঠিয়া যাইতেছে; আপনি ইংরেজীতে আপনার বক্তৃতা না পড়িলে ঘর খালি হইয়া যাইবে।" তখন আমি ইংরেজী ধরিলাম। পরে অবগত হইয়াছিলাম, আমি কখন্ ইংরেজীতে বক্তৃতা করিব তাহার অপেক্ষায় বাহিরে অনেক লোক জমা হইয়াছিলেন; আমি ইংরেজী অভিভাষণ পড়িতে আরম্ভ করিবার পর তাঁহারা ঘরের ভিতর আসিলেন।

এই অধিবেশনে অনেকগুলি প্রস্তাব ধার্য্য হয়। বক্তার সংখ্যাও সত্তর আশী জনের কম হইবে না। আমি হিসাব রাখি নাই, কিন্তু আমার ধারণা এইরূপ যে, অধিকাংশ লোক গুজরাটী ভাষায় বক্তৃতা করিয়াছিলেন, অনেকে ইংরেজীতেও বক্তৃতা করেন। হিন্দীতেও কতকগুলি লোক বক্তৃতা করেন। কয়েকজন মরাঠীতে বক্তৃতা করেন। একজন শিখ পঞ্জাবীতে বক্তৃতা করেন। বিষয়নির্ব্বাচক সমিতির কাজও এইরূপ নানা ভাষায় নির্ব্বাহিত হয়।

অভ্যর্থনা-সমিতি কংগ্রেস দলের মহাত্মা গান্ধী প্রমুখ অনেক ব্যক্তিকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। তাহার মধ্যে শ্রীযুক্ত পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয়, শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু, শ্রীমতী কমলা নেহরু, শ্রীমতী কমলা দেবী চট্টোপাধ্যায় এবং খান্ আবদুল গফ্‌ফার খান্ আসিয়াছিলেন। ইহাদের মধ্যে শ্রীমতী কমলা দেবী চট্টোপাধ্যায় অল্পক্ষণ থাকিয়াই চলিয়া যাওয়ায় তাঁহাকে বক্তৃতা করিতে বলিবার সুযোগ হয় নাই। পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয় হিন্দীতে, শ্রীমতী কমলা নেহরু ও খান্ আবদুল গফ্‌ফার খান্ উর্দ্দুতে এবং শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু ইংরেজীতে বক্তৃতা করেন। তিনি বক্তৃতা করিতে উঠিলে, "হিন্দী" "হিন্দী" রব উঠে। তাহাতে তিনি বলেন, "হিন্দীতে বক্তৃতা করিতে বলিলে আমাকে বসিতেই বলা হইবে।" আমি শ্রোতাদিগকে বলিলাম, "তাঁহার সুবিধা-মত ভাষাতেই তাঁহাকে বক্তৃতা করিতে দেওয়া উচিত।" তখন তিনি ইংরেজীতেই বলিলেন।

স্বর্গীয় গোপালকৃষ্ণ গোখলে কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ভারত-ভৃত্য সমিতির সভ্য পণ্ডিত হৃদয়নাথ কুঞ্জরু মহাশয়কেও বক্তৃতা করিতে বলা হয়। তিনি দাঁড়াইবা মাত্র "হিন্দী" "হিন্দী" রব উঠে। উত্তরে তিনি বলেন, "উর্দ্দু আমার মাতৃভাষা, উর্দ্দুতে বক্তৃতা করিতে আমি পারি। কিন্তু আমার উর্দ্দু অপেক্ষা ইংরেজীই আপনারা ভাল বুঝিবেন।" এই বলিয়া তিনি ইংরেজীতেই বক্তৃতা করেন।

যে-যে প্রদেশের মাতৃভাষা হিন্দী, সেখানে ছাড়া অন্যান্য প্রদেশে শিক্ষিত লোকেরা কোন সভায় সমবেত হইলে তাঁহাদের অধিকাংশ যেমন ইংরেজী বুঝেন ও বলিতে পারেন, হিন্দী তেমন বলিতে বুঝিতে পারেন না, ভারতবর্ষের বর্ত্তমান অবস্থা সম্ভবতঃ এইরূপ, ইহা বুঝাইবার জন্য এই কথাগুলি লিখিলাম। ভবিষ্যতে অবশ্য অবস্থা অন্য প্রকার হইতে পারে।

—

দেশীরাজ্য-পরিষদে সভাপতির বক্তৃতা

দেশীরাজ্য-পরিষদে আমি যে বক্তৃতা করিয়াছিলাম, তাহার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল দুটি। রাজ্যগুলিতে নিয়মতন্ত্র ও প্রজাতন্ত্র শাসনপ্রণালী প্রবর্ত্তিত হইলে প্রজা ও রাজা উভয়েরই হিত হইবে, এবং তাহা প্রবর্ত্তন করা উচিত ও সুসাধ্য, ইহা প্রদর্শন করা আমার প্রথম উদ্দেশ্য ছিল। ভারতবর্ষ এখন ফেডারেটেড্ অর্থাৎ সংঘবদ্ধ হইতে যাইতেছে। ব্রিটিশ-শাসিত প্রদেশগুলি এবং দেশী রাজ্যগুলি এই ফেডারেশ্যন বা সংঘের অঙ্গীভূত হইবে। এই অঙ্গগুলির আভ্যন্তরীণ শাসনপ্রণালী মোটের উপর একই রকমের হওয়া চাই, ইহা দেখান আমার দ্বিতীয় উদ্দেশ্য ছিল।

ফেডারেশ্যন বা সংঘের অঙ্গীভূত কতকগুলি অংশে চলিবে নৃপতিদের স্বেচ্ছাচার এবং অন্যগুলিতে (অর্থাৎ বর্ত্তমানে ব্রিটিশ-শাসিত প্রদেশগুলিতে) চলিবে প্রজাতন্ত্র শাসনপ্রণালী, এরূপ ব্যবস্থায় কাজ চলিতে পারে না, চলা

উচিত নয়। সমস্ত ফেডারেশ্যন বা সংঘের যে ব্যবস্থাপক সভা হইবে তাহাতে কাহারও নিকট দায়িত্বশূন্য স্বেচ্ছাকারী রাজাদের মনোনীত সদস্য বসিবে এবং প্রদেশগুলির লোকদের দ্বারা নির্ব্বাচিত তাহাদের প্রতিনিধিরাও বসিবে, এমন বিসদৃশ ব্যবস্থায় আমরা রাজী হইতে পারি না। পৃথিবীতে যত ফেডারেশ্যন বা সংঘবদ্ধ রাষ্ট্র আছে, তাহার প্রত্যেকটির অঙ্গীভূত অংশগুলির শাসনপ্রণালী এক প্রকারের। অতএব, ভারতবর্ষের প্রদেশগুলিতে ও দেশী রাজ্যগুলিতে প্রজাতন্ত্র-শাসনপ্রণালী প্রচলিত হওয়া উচিত।

প্রজাতন্ত্র-শাসনপ্রণালী যে ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী লোকদের অজ্ঞাত নহে, তাহা আমি বক্তৃতায় প্রদর্শন করি। হিন্দু বৌদ্ধ ও জৈনদের মধ্যে প্রাচীন ভারতে দীর্ঘকাল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সাধারণতন্ত্র ছিল। তদ্ভিন্ন নিয়মতন্ত্র ও প্রজাতন্ত্র রাজার অধীন রাজ্যও ছিল। প্রজারঞ্জন করেন বলিয়াই রাজার নাম রাজা। অতীত কালে সব রাজাই প্রজারঞ্জক ও নিয়মাধীন ছিলেন বলিলে সত্য কথা বলা হইবে না। অত্যাচারী ও নিষ্ঠুর রাজাও ছিল অনেক। কিন্তু রাজার আদর্শ উচ্চ ছিল এবং আদর্শ নৃপতিও অনেক ছিলেন। রঘুবংশের নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকটিতে এই উচ্চ আদর্শের আভাস পাওয়া যায়।

"প্রজানামেবভূত্যর্থং স তাভ্যো বলিমগ্রহীৎ।
সহস্রগুণমুৎস্রষ্টু.মাদত্তে হি রসং রবিঃ॥"

"তিনি কেবল প্রজাদের হিতের জন্যই তাহাদের নিকট হইতে কর লইতেন। (যেমন) সূর্য্য সহস্রগুণ বর্ষণ করিবার নিমিত্ত পৃথিবী হইতে রস আকর্ষণ করেন।"

শুক্রনীতিসারের নিম্নোদ্ধৃত বাক্যের মত আরও অনেক বাক্য উদ্ধৃত করিয়া দেখান যাইতে পারে, যে, প্রাচীন ভারতের রাজনীতিতে রাজাকে প্রজাদের ভৃত্য মনে করা হইত।

"স্বভাগভৃত্যা দাস্যত্বে প্রজানাং চ নৃপঃ কৃতঃ।
ব্রহ্মণা স্বামিরূপস্তু পালনার্থং হি সর্ব্বদা॥" ১। ১৮৮।

"ব্রহ্ম রাজাকে স্বামী রূপে প্রজাদের দাস্যত্বে নিযুক্ত করিয়াছেন। রাজা প্রজাদের সর্ব্বদা পালনার্থ কর রূপে নিজের বেতন পাইয়া থাকেন।"

কিরূপ শাসনপ্রণালী মুসলমানদের অনুমোদিত, তাহা জানিবার জন্য অতীত কালে যাইবার প্রয়োজন নাই। বর্ত্তমান সময়ে যতগুলি স্বাধীন মুসলমান রাষ্ট্র আছে, তাহার প্রায় সবগুলিই হয় সাধারণতন্ত্র, কিংবা প্রজাতন্ত্র রাজ্য। তাহাদের নাম ও শাসনপ্রণালীর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা আমি বক্তৃতাতে দিয়াছি।

শিখদের সমুদয় ঐহিক আধ্যাত্মিক ব্যাপার সম্বন্ধীয় ব্যবস্থা তাহাদের চারিটি "তখ্‌ত্‌"-এর অধিবেশনে হইত। তাহাতে ছোট-বড় প্রত্যেক শিখের মত-প্রকাশের অধিকার ছিল।

ব্রিটিশ-শাসিত ভারতবর্ষের প্রদেশগুলির প্রতি বর্গ-মাইলে যত লোকের বসতি, দেশী রাজ্যগুলির প্রতি বর্গ-মাইলে তাহা অপেক্ষা অনেক কম লোকের বসতি। দেশী রাজ্যের কুব্যবস্থা এবং তথায় প্রজাদের রাজনৈতিক অধিকারশূন্যতা যে এই পার্থক্যের একটি প্রধান কারণ তাহা অভিভাষণে প্রদর্শিত হইয়াছে।

রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রভেদে দেশ কিরূপ অবনত বা উন্নত হয়, তাহা দেখাইবার জন্য আমি কাশ্মীরের সহিত সুইটজার্ল্যাণ্ডের এবং হায়দরাবাদের সহিত চেকো-স্লোভাকিয়ার বিস্তৃতি, লোকসংখ্যা, স্বাভাবিক সম্পদ, শিক্ষার অবস্থা প্রভৃতির তুলনা করিয়া ভারতীয় রাজ্য-গুলির হীনতা প্রদর্শন করিয়াছি।

অভিভাষণে আরও অনেক বিষয়ের আলোচনা আছে।

—

দেশীরাজ্য-পরিষদে গৃহীত প্রস্তাবাবলী

একটি প্রস্তাবে বলা হয়, দেশী রাজ্যের নৃপতিরা প্রজাদের প্রতিনিধি নহেন। অপর একটি প্রস্তাবে যে-সব রাজা বিদেশে দীর্ঘ কাল থাকিয়া সময়ের ও প্রজাদের অর্থের অপব্যয় করেন, তাঁহাদের নিন্দা করা হয়। আর একটি প্রস্তাব অনুসারে কার্য্য-নির্ব্বাহক কমিটিকে দেশী রাজ্যগুলি হইতে অভাব-অভিযোগাদির বৃত্তান্ত সংগ্রহ করিয়া প্রতিকারের চেষ্টা করিতে বলা হয়। বঙ্গে দুটি

দেশী রাজ্য আছে। তাহার একটি হইতেও কোন প্রতিনিধি পরিষদের অধিবেশনে যোগ দেন নাই। পাটিয়ালার মহারাজার বিরুদ্ধে যে-সব প্রকাশ্য অভিযোগ করা হইয়াছিল, তাহার প্রকাশ্য কোন বিচার হয় নাই। ঐ মহারাজারই মনোনীত এক জন ইংরেজের দ্বারা যে তদন্ত হইয়াছিল, তাহা প্রকাশ্য বিচার নহে। প্রকাশ্য বিচারের দাবি করিয়া একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। অন্য একটি প্রস্তাব দ্বারা গোল টেবিল বৈঠকে দেশী রাজ্যের প্রজাদের প্রতিনিধি পাঠাইবার অধিকার দাবি করা হয়। প্রত্যেক রাজ্যে প্রজাদের নিকট দায়ী প্রজাতন্ত্র-শাসনপ্রণালীও চাওয়া হয়।

—

হজরৎ মোহম্মদের ছবি-প্রকাশ

দুজন পঞ্জাবী মুসলমান যুবক কলিকাতার তিন জন পুস্তক-বিক্রেতাকে হত্যা করার অভিযোগে পুলিস কর্ত্তৃক অভিযুক্ত হয়। তাহারা দায়রা সোপর্দ্দ হইয়াছে। তাহাদের বিরুদ্ধে পুলিসের পক্ষ হইতে বলা হইয়াছে, যে, "প্রাচীন কাহিনী" নামক বাংলা বহিতে হজরৎ মোহম্মদের ছবি প্রকাশ করায় তাহারা ঐ বহির প্রকাশক ও তাঁহার দুজন সহকারীকে খুন করিয়াছে। এই অভিযোগ সত্য কি-না, তাহা হাইকোর্টের বিচারে পরীক্ষিত হইবে।

বিচারাধীন বিষয় সম্বন্ধে কিছু বলা উচিত নহে। কিন্তু মুসলমানদের শাস্ত্রে অভিজ্ঞ কোন মুসলমান যদি অমুসলমানদিগকে জানান যে, মুসলমান ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তকের কোন ছবি ছাপিলে বা তাঁহার কোন বিরুদ্ধ সমালোচনা করিলে কোরানে বা হাদিসে এইরূপ কাজের জন্য কি প্রকার শাস্তি বিহিত আছে, তাহা হইলে ভাল হয়। আমরা 'মডার্ণ রিভিউ' কাগজে এই প্রশ্ন করিয়াছিলাম, কিন্তু এ পর্য্যন্ত কোন উত্তর পাই নাই। এইরূপ প্রশ্ন করিবার দুটি কারণ আছে। মুসলমান শাস্ত্রের এতদ্বিষয়ক বিধান জানিতে পারিলে অমুসলমানগণ যথোচিত আচরণ করিতে পারিবে। দ্বিতীয়তঃ পূর্ব্বোক্ত আসামীদের করোনারের আদালতে এবং প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে বিচারের সময় অনেক পশ্চিমা মুসলমান জনতা করিয়া "আল্লা হো আকবর" ধ্বনি উত্থাপিত করে। এরূপ ব্যাপারের সহিত ঈশ্বরের মহিমার কি সম্পর্ক আছে, তাহাও অমুসলমানরা জানিতে পারিলে মুসলমানদের সহিত যথোপযুক্ত ব্যবহার করিতে পারিবে।

—

ব্রহ্মে ভারতীয় সৈন্য প্রেরণ

ব্রহ্মদেশে ভারতীয়দের প্রতি বিদ্বেষের কতকগুলি কারণ আছে। তা ছাড়া, এই বিদ্বেষ বাড়াইবার চেষ্টাও ভিতরে ভিতরে চলিতেছে। বিদ্বেষের একটি কারণ, ব্রহ্মে বিদ্রোহ দমন করিবার জন্য ভারতবর্ষীয় সৈন্য প্রেরণ করা হইতেছে। বর্ম্মীদিগের সহিত ভারতীয়দের কোন ঝগড়া নাই। বর্ম্মীদের অনেকে স্বাধীন হইবার জন্য বিদ্রোহ করিয়াছে। এই বিদ্রোহ স্বাধীনতালাভের সদুপায় কি-না, আমাদের তাহা বিবেচনা করিবার আবশ্যক নাই। ইংরেজরা তাহাদিগকে অধীন রাখিয়াছে ও রাখিতে চায়। তাহাদিগকে অধীন রাখায় ইংরেজদেরই লাভ প্রধান। এই লাভটা পুরামাত্রায় নিজেদের হাতে রাখিবার জন্য তাহারা ব্রহ্মদেশকে ভারতবর্ষ হইতে আলাদা করিতেও চায়। এ অবস্থায় ব্রহ্মে ভারতীয় সৈন্য পাঠাইয়া, ভারতীয়রা ব্রহ্মের স্বাধীনতার শত্রু, বর্ম্মীদের মনে এই বিশ্বাস জন্মান অনুচিত। একথা 'মডার্ণ রিভিউ'এর গত সংখ্যায় লিখিয়াছি। তাহার পর দেখিলাম, ভিক্ষু উত্তম এই রূপ কথা অসুস্থ অবস্থায় কারমাইকেল হাসপাতাল হইতে লিখিয়াছেন। তিনি ভারতের জাতীয় নেতৃবৃন্দ এবং ব্যবস্থাপক সভাসমূহের সভ্যগণের উদ্দেশে নিম্নলিখিত মর্ম্মে এক অনুরোধ-পত্র প্রচার করিয়াছেন:—"দেশের মঙ্গলকামনায় ভারতীয় সৈন্যদিগকে যাহাতে ব্রহ্মদেশে প্রেরণ করা না হয়, অবিলম্বে সেরূপ ব্যবস্থা অবলম্বনের নিমিত্ত আমি আপনাদিগকে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ জানাইতেছি; যেহেতু উহা দ্বারা ব্রহ্মে ভারতীয়দের বিরুদ্ধে বিদ্বেষের সূচনা হইবে। এই সঙ্গে আমি ইহাও উল্লেখ করিতে পারি যে,

চীনে ভারতীয় সৈন্য প্রেরণের কথা উঠিলে পর অনুরূপ প্রতিবাদ সফল হইয়াছিল।"

—

লাঙ্কেশায়ারে বেকার সমস্যা ও মিঃ এণ্ড্রুস্

একটি বিলাতী তারের খবর দৈনিক কাগজে বাহির হইয়াছে, যে, ভারতবর্ষে লাঙ্কেশায়ারের কাপড় আমদানী কমিয়া যাওয়ায় সেখানকার মিলের বিস্তর মজুর বেকার বসিয়া আছে এবং তাহাদের কষ্ট হইয়াছে; মিস্টার এণ্ড্রুস্ বেকার লোকদের দুঃখ দুর্দ্দশা মহাত্মা গান্ধীকে জানাইবার নিমিত্ত অনুসন্ধান ও পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন। মহাত্মা গান্ধীকে জানাইবার উদ্দেশ্য বোধ করি এই, যে, তিনি দয়ার্দ্র হইয়া যদি বিলাতী কাপড়ের বয়কট তুলিয়া লন। এই অনুমান সত্য মনে করিয়া আমরা দু-একটা কথা বলিতে চাই।

লাঙ্কেশায়ারের মজুরদের উপর আমাদের কোন রাগ নাই। তাহাদের প্রতি প্রতিহিংসার ভাব না থাকায় তাহাদের দুঃখে আমাদের কোন সুখ হইতেছে না। কাহারও অনিষ্ট না করিয়া তাহাদের দুঃখের প্রতিকার করিতে পারিলে আমরা সুখী হইতাম। কিন্তু তাহাদের কিংবা মিঃ এড্রুসের বাঞ্ছিত প্রতিকার আমরা অন্যায় মনে করি। ভারতবর্ষের বহুকোটি লোক বিদেশী বস্ত্রের ব্যবহারে নিরন্ন হইয়াছে। রোগে ও অনাহারে বহু লক্ষ লোকের প্রাণ গিয়াছে। অজ্ঞানতার অন্ধকারে দেশ মজ্জিত হইয়াছে। এই অবস্থা শতাধিক বৎসর ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে। ইহার একটি প্রতিকার বিদেশী বস্ত্রের আমদানী কমাইয়া ভারতবর্ষে বস্ত্র-উৎপাদন। তাহা আমাদিগকে করিতে হইবে। ইহার মধ্যে কোন অধর্ম্ম নাই, বরং ইহা না করাই অধর্ম্ম। অন্য দিকে, লাঙ্কেশায়ারের বর্ত্তমানে বেকার মজুরেরা ব্যক্তিগত ভাবে ইংলণ্ডের পণ্যোৎপাদন ও বাণিজ্য নীতির জন্য দায়ী হউক বা না হউক, অন্য দেশের অনিষ্ট করিয়া তাহার ধন শোষণের উপর ঐ নীতি প্রতিষ্ঠিত। তাহাতে কোন শ্রেণীর ইংরেজের ক্ষতি বা দুঃখ হইলে তাহার জন্য দায়ী ইংরেজ জাতি ও গবন্মেণ্ট, আমরা নহি। লাঙ্কেশায়ারের কয়েক মাস বা সামান্য কয়েক বৎসর ব্যাপী দুঃখ দূর করিবার মত টাকা ইংলণ্ডের আছে। ইংলণ্ড তাহা করুন। বেকার লোক-দিগকে এমন নূতন কোন কোন কারখানায় ও বাণিজ্যে নিযুক্ত করুন, যাহা অধর্ম্মের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে।

ইংরেজ মজুরদের জন্য মহাত্মা গান্ধীর হৃদয় গলাইবার চেষ্টা অনুচিত ত বটেই, তাহা নিষ্ফলও বটে। কারণ, যাহা ন্যায়সঙ্গত, তাহার বিপরীত দিকে দেশের লোক-দিগকে চালাইবার ক্ষমতা গান্ধীজীরও নাই। তা ছাড়া, বিদেশী বয়কট অস্ত্র তিনি আবিষ্কার করেন নাই। ভারতবর্ষে ইহা বহু পূর্ব্বে প্রথম বাংলা দেশেই ব্যবহৃত হইয়াছিল। যে উপায় অন্যেরা অবলম্বন করিয়া ফল পাইয়াছে, তাহা তাহারা গান্ধীজীর উপদেশ নিষেধ নির্বিশেষে ব্যবহার করিতে থাকিবে।

—

মহাত্মা গান্ধীর ভাষাব্যবহার নীতি

আমরা যখন গত সপ্তাহে বোম্বাইয়ে ছিলাম, তখন একদিন প্রাতে অগণিত "প্রভাত ফেরীর" অর্থাৎ বৈতালিকের দল তাঁহার বাসার সম্মুখ দিয়া গান করিতে করিতে গেল, কতক লোক দীর্ঘ কাল বাটীর সম্মুখে অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল। তিনি তাহাদিগকে গুজরাতীতে কিছু বলিলেন। তাহার পর কংগ্রেস-ভবনে সর্দ্দার পটেল জাতীয় পতাকা উত্তোলন করিলেন। সেখানেও হাজার হাজার লোক উপস্থিত ছিল। পটেল মহাশয় তাহাদিগকে গুজরাতীতে কিছু বলিলেন। বোম্বাই শহরের অর্দ্ধেকের উপর লোকে মরাঠী বলে; গুজরাতী বলে শতকরা কুড়ি জন। তা ছাড়া অন্যান্য ভাষাও বোম্বাইয়ে চলিত আছে। এরূপ শহরে যদি গান্ধীজী ও পটেলজী নানাভাষাভাষী লোকের জনতাকে গুজরাতীতে উপদেশ দিতে পারেন, তাহা হইলে কংগ্রেসের অধিবেশন উপলক্ষ্যে সমাগত নানাভাষাভাষী লোককে কিছু বলিবার জন্য কেবল হিন্দীই বলিতে হইবে, এ নিয়মের সঙ্গতি বোধগম্য হইতেছে না।

—

সংস্কৃত ও সংস্কৃত কলেজ

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রবেশিকা পরীক্ষার্থীদের সংস্কৃতশিক্ষা তাহাদের স্বেচ্ছাধীন করিতে চাহিতেছেন। কি কারণে জানি না, এমনই সংস্কৃত শিখিবার ইচ্ছা ছাত্রদের কমিয়াছে বোধ হয়। তাহার উপর ঐরূপ নিয়ম করিলে সংস্কৃত শিখিবার ছাত্র আরও কমিবে। সংস্কৃতের প্রতি বিরাগের জন্য বা অন্য কি কারণে জানি না, সংস্কৃত কলেজে ছাত্র কমিয়াছে। উহার ইংরেজী-বিভাগে ১৯২৮-২৯ সালে ১২৩ জন ছাত্র ছিল, ১৯২৯-৩০ সালে কমিয়া ১০০ হয়। ১৯৩০-৩১এ শুনিয়াছি ৭৮ জন হইয়াছে। সংস্কৃত-বিভগে ১৯২৯-৩০ সালে ৮৭ জন ছাত্র ছিল, এখন কত জানি না। এই কলেজের ইংরেজী-বিভাগে ছাত্রবেতন মাসিক ৬ টাকা মাত্র। তাহাও সকলকে দিতে হয় না। "ব্রাহ্মণপণ্ডিত"দিগের পুত্রেরা মাত্র দুটাকা বেতন দিলেই পড়িতে পান। ষাটজনের জন্য এইরূপ কম বেতনের ব্যবস্থা আছে। তদ্ভিন্ন মাসিক ১০, ১৬, ২০, ও ৩০ টাকার কয়েকটি বৃত্তি আছে। কলেজের প্রিন্সিপ্যাল ও অধ্যাপকেরা যোগ্য লোক। দর্শন ও ইতিহাসের "অনার্স" ছাত্রেরা অতিরিক্ত বেতন না দিয়া প্রেসিডেন্সী কলেজে ঐ দুই বিষয়ে ব্যাখ্যান শুনিতে পারে। অনেক ছাত্রকে কোন-না-কোন কলেজে ভর্ত্তি হইতে ক্লেশ পাইতে হয়। তাহারা অন্যান্য "সস্তা" কলেজের সঙ্গে সঙ্গে এই কলেজটিতেও সন্ধান লইলে ভাল হয়।

—

"নিবেদিতা"

বোম্বাইয়ে একটি বাঙালী যুবক "নিবেদিতা" নামক প্রবাসী বাঙালীদের একটি ত্রৈমাসিক কাগজ আমাদের হাতে দেন। এটি ইহার প্রথম সংখ্যা। বার্ষিক মূল্য ১৷৽ টাকা। এই কাগজেই দেখিলাম, বোম্বাইয়ে তিন হাজারের উপর বাঙালী আছেন। সম্ভবতঃ তাঁহারা সকলে সপরিবারে থাকেন না। স্থতরাং উপার্জ্জক বাঙালী হাজারখানেক নিশ্চয়ই বোম্বাইয়ে আছেন। তাঁহারা অনায়াসে এই কাগজটিকে বাঁচাইয়া রাখিতে পারিবেন। আশা করি ইহাতে বোম্বাই শহরের ও প্রেসিডেন্সীর বাঙালীদের খবর বেশী করিয়া থাকিবে।

—

প্রবেশিকা পরীক্ষায় সংস্কৃত

বর্ত্তমানে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা পাস করিবার জন্য সকল ছাত্র-ছাত্রীকেই সংস্কৃত, ফার্সী, আর্বী বা এইরূপ কোন ভাষা শিখিতে হয়। সম্প্রতি ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার পাঠ্য বিষয়ে যে পুনর্বিচার চলিতেছে, তাহাতে প্রস্তাব করা হইয়াছে, যে, ভবিষ্যতে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা পাস করিতে হইলে সংস্কৃত বা অন্য কোন 'ক্লাসিকাল' ভাষা শিখিবার কোনও বাধ্যবাধকতা থাকিবে না। ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় পাস করিবার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ যে-যে বিষয়গুলি সকল ছাত্রকেই গ্রহণ করিতে হইবে বলিয়া প্রস্তাব করিয়াছেন, সেগুলি নিম্নলিখিত রূপ :—

বিষয়			নম্বর
ভার্ণাকুলার	২	প্রশ্নপত্র	২০০
ইংরেজী	২	"	৩০০
গণিত	১	"	১০০
ইতিহাস (ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষের)	১	"	১০০
ভূগোল	১		১০০

স্থতরাং দেখা যাইতেছে, যে, প্রস্তাবিত ব্যবস্থা অনুমোদিত হইলে ছাত্রদিগকে আর বাধ্য হইয়া সংস্কৃত বা ঐরূপ কোন প্রাচীন ভাষা শিখিতে হইবে না। আমরা ইহা সমীচীন মনে করি না। কেন করি না, তাহা আপাততঃ অন্য কোন ভাষার প্রসঙ্গ না তুলিয়া কেবল মাত্র সংস্কৃতের ক্ষেত্রেই আলোচনা করিব।

বিশ্ববিদ্যালয় কি ধারণার বশে সংস্কৃতকে আবশ্যিক না রাখিয়া স্বেচ্ছাধীন করিতে চাহিতেছেন তাহা আমরা জানি না। কিন্তু আমরা কিছুতেই উহার অনুমোদন করিতে পারি না। আমাদের মনে হয়, প্রত্যেক বাঙালী বালক-বালিকারই সংস্কৃত শিক্ষা করা উচিত। যদি বাংলার মুসলমানদের সংস্কৃত শিখিতে কোন আপত্তি থাকে, তাহা হইলে বাংলার সমস্ত হিন্দু বালক-বালিকার সংস্কৃত শেখা উচিত। কিন্তু আমাদের বিশ্বাস, মুসলমানদের

পক্ষেও সংস্কৃত জানার প্রয়োজন আছে। সংস্কৃতের সহিত ভারতবর্ষের অন্য কোন আধুনিক ভাষা অপেক্ষা বাংলা ভাষার সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর এবং বাংলা ভাষা সংস্কৃতের উপর বেশী নির্ভরশীল। ইহা বাংলা ভাষার দৈন্য বা দুর্ব্বলতা বলিয়া মনে হইতে পারে। কিন্তু দৈন্যই হউক বা দুর্ব্বলতাই হউক, উহা যে সত্য সে বিষয়ে সন্দেহ নাই, এবং সত্য বলিয়াই অন্ততঃ কিছু পরিমাণ সংস্কৃত না জানিলে শুদ্ধ ভাবে বাংলা লেখা সম্ভবপর নয়। গত এক শত]বৎসরের সাহিত্যচর্চ্চার ফলে বাংলা ভাষা নানা দিকে সমৃদ্ধ হইয়াছে সত্য, কিন্তু এখনও তাহার কতকগুলি বিষয়ে একটু দৈন্য আছে। এই দৈন্য দূর করিতে নূতন শব্দের সৃষ্টি ও চয়ন আবশ্যক। বর্ত্তমানে এই সকল শব্দই সংস্কৃত হইতে গৃহীত হয়। বাংলা দেশে সংস্কৃতের চর্চ্চা ও জ্ঞান লোপ হইলে বাংলা ভাষার পুষ্টিসাধনের ও বিকাশের প্রধান উৎসটিই শুকাইয়া যাইবে।

ইহা ছাড়া বাংলা দেশের কাল্চার বা সংস্কৃতির দিক হইতেও সংস্কৃত জানা ও শিক্ষার প্রয়োজন আছে। একমাত্র অসভ্য বর্ব্বর জাতিদেরই সভ্যতার কোন অতীত নাই। ভারতবর্ষের বর্ত্তমান সভ্যতা প্রাচীন ভারতের সংস্কৃতি ও আধ্যাত্মিক সাধনার উপর প্রতিষ্ঠিত। এই প্রাচীন সভ্যতার পরিচয় আমরা আংশিকভাবে পাই পালি সাহিত্যে, কিন্তু প্রধানতঃ সংস্কৃত সাহিত্যে। বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত শিক্ষার বাধ্যবাধকতা না থাকিলে এই সভ্যতার সহিত বর্ত্তমান যুগের যোগমূল বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। এই দিক হইতে সংস্কৃত ভাষার কি মূল্য তাহা বিচার করা কোন চৌদ্দ পনর বৎসর বয়স্ক বালকের পক্ষে সম্ভব নয়। সুতরাং একটা নূতন ভাষা শিক্ষা করা পরিশ্রমসাধ্য ব্যাপার বলিয়া যদি সে বাল্যকালে সংস্কৃত না শেখে তাহা হইলে বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া সে যখন বুঝিতে পারিবে ইহাতে তাহার কি ক্ষতি হইল,তখন আর তাহার পক্ষে সেই ক্ষতির প্রতিকার করা সম্ভব হইবে না। সেই জন্য আমাদের মনে হয়, শিখিবার বয়সের সকল ছাত্রকে মোটামুটি সংস্কৃত ভাষা শেখানো উচিত যাহাতে সে ভবিষ্যৎ জীবনে ইচ্ছা করিলে সংস্কৃতের গভীরতর চর্চ্চা করিতে পারে এবং যাহাতে সেই সংস্কৃত-চর্চ্চার পথ আগে হইতেই বন্ধ হইয়া না যায়।

কেহ কেহ হয়ত বলিবেন যে, ব্যাবহারিক জীবনের দিক হইতে সংস্কৃতের কোন মূল্য নাই। কিন্তু স্কুলে যে-সকল জিনিষ শিক্ষা দেওয়া হয় তাহার কতগুলিরই বা ব্যাবহারিক মূল্য আছে? বীজগণিত সকল স্কুলের ছাত্রকেই পড়িতে হয়। ব্যাবহারিক জীবনে উহারই বা কি মূল্য আছে? কিন্তু শিক্ষাসমস্যার মধ্যে শুধু জীবিকা-অর্জ্জনের আদর্শকেই বড় করিয়া ধরিলে চলিবে না। বুদ্ধি মার্জ্জিত করা, মনের প্রসারসাধন করা, নিষ্কাম জ্ঞানের প্রতি শ্রদ্ধা জন্মানোও শিক্ষার কাজ। এই কথাটা ভুলিয়া গেলে শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হইবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য বিষয় সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন যে, বাংলা ভাষার চর্চ্চা যাঁহারা করেন তাঁহাদের পক্ষে সংস্কৃত জানা নিতান্তই প্রয়োজন। বাংলা যাহাদের মাতৃভাষা তাহাদিগকে যদি সংস্কৃত শিখিতে না দেওয়া হয় তাহা হইলে উহার ফল অত্যন্ত বিষম হইবে।

আমরা এই মতের সম্পূর্ণ সমর্থন করি, এবং বিজ্ঞান শিক্ষা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ যাহা বলিয়াছেন তাহারও অনুমোদন করি। আমাদেরও এই মত, যে, ম্যাট্রিকুলেশনের পাঠ্যতালিকার মধ্যে সংস্কৃত ও প্রাথমিক বিজ্ঞান আবশ্যিক হওয়া উচিত। তাহা হইলে অতীত ও ভবিষ্যৎ, কাহারও সহিতই আমাদের কোন বিরোধ হইবে না।

—

বাংলায় শারীর সাধন

বাঙালীর চিরকালের দুর্নাম যে তাহাকে আত্মরক্ষার জন্য ছোট বিষয়ে পশ্চিমা দারোয়ানের ও বৃহৎ ব্যাপারে গোরা পল্টনের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। ইহা অবশ্য ইংরেজী যুগের সম্বন্ধেই সত্য। কারণ যদিও বর্ত্তমানে আমাদের ঘরের দারোয়ান, পথের পুলিস, ও সীমান্তের সৈনিক সকলেই অবাঙালী, তথাপি ইংরেজী যুগের পূর্ব্বে বাংলা দেশের যোদ্ধা ও বীরপুরুষ বাংলা দেশেরই লোক ছিল। সাহস, শারীরসাধন বা যুদ্ধবিদ্যা বিষয়ে পারগ

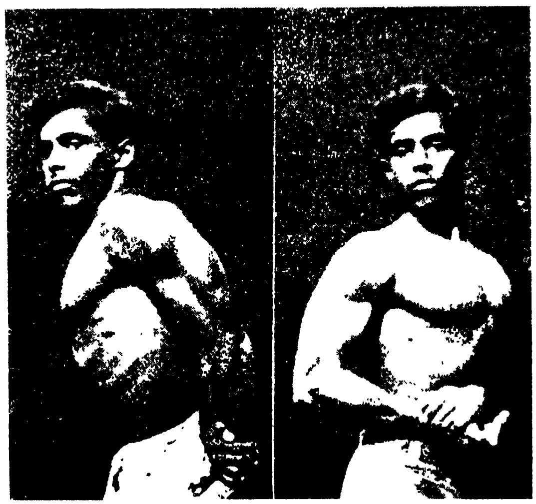
হওয়া কোন জাতি-বিশেষের নিজস্ব নহে। চেষ্টা করিলে ও শিক্ষা পাইলে সকল জাতির লোকই উৎকৃষ্ট যোদ্ধা বা সাহসী শক্তিমান হইতে পারে। প্রমাণ-স্বরূপ বলা



শ্রীকানাইলাল মুখোপাধ্যায়—বাঙালী ব্যায়াম-সাধক

যাইতে পারে যে, ভারতেই ইংরেজরা এদেশীয় বহুজাতিকে কখন যোদ্ধা জাতি বলিয়া প্রমাণ করিয়াছে এবং কখন-বা নিজ স্বার্থানুসারে আবার তাহাদের যুদ্ধে অপারগ বলিয়া অপর কাহাকেও সৈন্যদলে গ্রহণ করিয়াছে। ভারতের বাহিরে বহু জাতি ইতিহাসের এক যুগে যুদ্ধে অকর্ম্মা বলিয়া খ্যাত হইয়া পরবর্ত্তী যুগে উৎকৃষ্ট যোদ্ধা রূপে দেখা দিয়াছে। যথা প্রাচীন রোমানরা প্রথমে যুদ্ধে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, পরে বহু জাতির পদদলিত হইয়া বর্ত্তমানে আবার মুসোলিনির নেতৃত্বে ইউরোপের ভয়ের কারণ হইয়া দাঁড়াইতেছে। চেক, স্লোভাক, ক্রোট, পোল প্রভৃতি বহু জাতি কয়েক বৎসর পূর্ব্বেও পরদাসত্বে আবদ্ধ ছিল, কিন্তু এখন তাহারা বড় বড় যোদ্ধা জাতি বলিয়া পরিচিত। প্রাচীন পারস্য ও গ্রীসের লোকেরা এককালে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা ছিল; বর্ত্তমানে তাহারা যুদ্ধ-বিদ্যার জন্য বিখ্যাত নহেন।

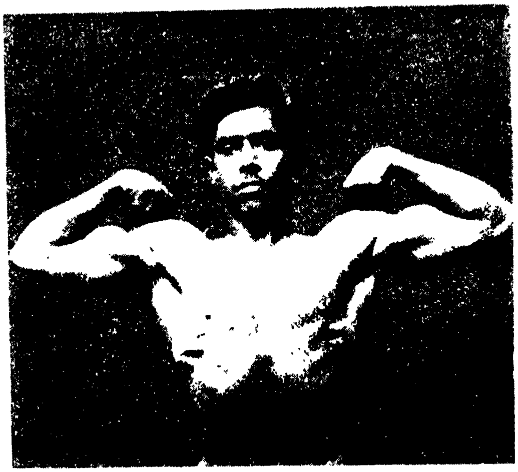
ভারতবর্ষে ইংরেজ সরকার যদিও সামরিক কারণে বহু কোটি টাকা ব্যয় করেন তথাপি এই টাকাটা ব্যয় সম্বন্ধে তাঁহাদের ব্যবস্থা একটু খামখেয়ালি ধরণের। যে-ক্ষেত্রে সমগ্র দেশ রাজস্ব-হিসাবে এই টাকাটা দিতে বাধ্য হইতেছে, সে ক্ষেত্রে ইহার ব্যয় এরূপ ভাবে হওয়া উচিত যাহাতে সব প্রদেশেরই ইহাতে কিছু কিছু উপকার হয়। অর্থাৎ সৈনিক সমগ্র ভারত হইতেই লওয়া উচিত এবং সামরিক-বিভাগের রসদ প্রভৃতিও সমগ্র দেশ হইতে (ও শুধু ভারত হইতেই) ক্রয় করা উচিত। কোন জাতি-বিশেষ শুধু সৈনিক হইতে পারে, এ কথাটা যে মিথ্যা, তাহা ইংরেজ রাজত্বের ইতিহাস হইতেই প্রমাণ করা যায়। এ বিষয়ের আলোচনা এখানে নিষ্প্রয়োজন। মোটকথা যে বাংলার প্রজা বহু কোটি টাকা রাজস্ব দিয়া থাকে। এই টাকার অধিকাংশ সামরিক হিসাবে খরচ হয়। সুতরাং বাংলার প্রজার



শ্রীকানাইলাল মুখোপাধ্যায়—বাঙালী ব্যায়াম-সাধক

দেশরক্ষার কাজে নিযুক্ত হইবার অধিকার আছে। যে-দেশে সহস্র সহস্র যুবক বেকার, সে দেশে এ কথার মূল্য বুঝাইতে বেগ পাইতে হইবে না। বাংলার বেকার যুবকমণ্ডলী যদি আকাশে, জলে ও স্থলে সৈনিক রূপে স্থান পান, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে আর রাস্তায় রাস্তায় নিষ্কর্ম্মা হইয়া

ঘুরিতে হইবে না। নিজদেশ রক্ষার কার্য্য সম্মানের কার্য্য। বাংলার যুবক এ কার্য্য সাগ্রহে ও সানন্দেই করিবেন। সৈনিকের সহিত পুলিস সার্জ্জেণ্ট প্রভৃতির কাজও তাঁহাদের করিবার অধিকার চাই। এখন বক্তব্য যে সৈনিক প্রভৃতি হইতে হইলে যে-পরিমাণ শারীরিক সামর্থ্য ও সাহস প্রয়োজন তাহা বাঙালীর আছে কি না।



শ্রীকানাইলাল মুখোপাধ্যায় - বাঙালী ব্যায়াম-সাধক

না থাকিলে তাহা আহরণ করা বাঙালীর পক্ষে অসম্ভব কি না। আজকাল বাঙলার সর্ব্বত্র শারীরসাধন লইয়া খুব একটা উৎসাহের সূত্রপাত হইয়াছে। শত শত যুবক বাংলার শহরে শহরে ও গ্রামে গ্রামে শারীরসাধনায় ব্রতী হইয়াছেন। তাঁহারা যে এই কার্য্য ভাল করিয়াই করিতেছেন তাহার প্রমাণের অভাব নাই। বাংলায় বহু সহস্র শক্তিমান যুবক আছেন ও প্রত্যহ আরও শত শত যুবক শক্তির পথে আগুয়ান হইতেছেন। একথা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না যে বাংলা এখন ভারতের সেনাবাহিনীর জন্য যথেষ্ট লোক দিতে পারে। আমাদের চেষ্টা করা উচিত, যাহাতে বাঙালী পল্টন পুনর্গঠিত হয় এবং সম্ভব হইলে একাধিক পল্টন গঠিত হয়। ইহা আমাদের দাবি, ভিক্ষা নহে।

—

কলিকাতায় সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কের নূতন শাখা

সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া ভারতবর্ষে একটি বৃহত্তম ব্যাঙ্ক। ইহার বহু শাখা বহু শহরে আছে এবং ইহার দ্বারা প্রতি বৎসর শত শত কোটি টাকার কারবার হইয়া থাকে। ব্যবস্থারও সুনামে সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক কোন বিদেশী ব্যাঙ্ক অপেক্ষা হীন নহে।

সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কের অদ্যাবধি কলিকাতায় দুইটি শাখা ছিল। সম্প্রতি ইহার আর একটি শাখা কলিকাতার হগ সাহেবের বাজারের নিকট খোলা হইয়াছে। ইহাতে উক্ত বাজারের ব্যবসায়ীদিগের বিশেষ সুবিধা হইবে। এই শাখা ব্যাঙ্ক অন্যান্য ব্যাঙ্ক অপেক্ষা দৈনিক ১॥০ ঘণ্টা অধিক সময়, অর্থাৎ বেলা ৪॥০টা অবধি খোলা থাকে। ইহাতে কাজের খুবই সুবিধা হইবে। ইউরোপেও অনেক ব্যাঙ্ক স্থানীয় প্রয়োজন অনুসারে অধিক সময় খোলা থাকে।

সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কের মালিকরা বোম্বাইবাসী এবং বোম্বাই-বাসী দ্বারাই তাঁহাদের বাংলার সকল শাখা চালিত হয়। ইহাতে বাঙালীর আপত্তি করিবার কিছু আছে কি না তাহা বলিতে চাহি না। কিন্তু এই নূতন শাখার এজেণ্ট যিনি নিযুক্ত হইয়াছেন তিনি বাঙালী। ইঁহার নাম শ্রীসুরেশচন্দ্র মজুমদার। ইনি বোম্বাইএর সিডেনহ্যাম



শ্রীসুরেশচন্দ্র মজুমদার

কলেজে ব্যবসা বাণিজ্য শিক্ষা করিয়া যশ অর্জ্জন করিয়াছেন। আমরা আশা করি সুরেশবাবু তাঁহার নব-লব্ধ পদে ক্রমশঃ উন্নতি লাভ করিবেন।

—

খানাতল্লাস

বিগত ৩রা জুন যখন ভারত-সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জের জন্মদিন উপলক্ষ্যে সমগ্র কলিকাতা নগরী ছুটি উপভোগ করিতেছিল, তখন প্রবাসী আপিসে পুলিসের আবির্ভাব হয়। ইহা পুলিসের অক্লান্ত পরিশ্রমের নিদর্শন রূপে হইল বা আপিসে কেহ থাকিবে না এবং হঠাৎ আসিয়া অনেক কিছু আবিষ্কার করিয়া ফেলা যাইবে এই আশায় হইল, তাহা বলা যায় না। ইহা

দ্বারা সম্রাটের অপমান করা হইল কিনা তাহাও বলিতে পারি না।

ইতিপূর্ব্বে আমাদের আপিসে অনেকবার পুলিসের আগমন ঘটিয়াছে। কখন কারণ থাকাতে কখনও বা বিনা কারণে। তবে এতবার খানাতল্লাস করা হইয়াছে যাহাতে প্রবাসী আপিসের কর্ম্মচারীরা নির্দ্দোষ হইলেও পুলিসের পুনঃ পুনঃ আবির্ভাবে নিজেদের "প্রায় অপরাধী" মনে করিতে আরম্ভ করিয়াছে। মনোবিজ্ঞানবিৎ পাঠকগণ suggestion অথবা ভাবারোপের শক্তির কথা অবশ্যই অবগত আছেন। এবার আমাদের অপরাধ কি তাহা প্রথমে বলা হয় নাই। পুলিস আসিয়া জানাইলেন যে তাঁহারা আপিসে রাজদ্রোহ-সূচক চিত্র, ব্লক, চিঠিপত্র, পুস্তক প্রভৃতি আছে বলিয়া সন্দেহ করেন ও এই জাতীয় দ্রব্যের জন্য খানাতল্লাস করিবেন।

খানাতল্লাস বহুবার দেখিয়াছি কিন্তু এবার কিছু কিছু নূতন জ্ঞান লাভ করিলাম। প্রথমতঃ স্থূলকায় পুলিসনায়ক মহাশয় নিজের পকেট প্রভৃতি দেখাইয়া প্রমাণ করিলেন যে তিনি আপত্তিজনক কিছু সঙ্গে লইয়া আসেন নাই। এমন কি নাতিসূক্ষ্ম কটিদেশে বেল্ট-সংলগ্ন রিভলবার অস্ত্রটিও দেখাইলেন। বলা বাহুল্য, আমরা দেখিয়া আশ্বস্ত হইলাম যে পুলিসও অপরাপর সাধারণ মানুষের মতই রুমাল, নস্যের ডিবা, মনিব্যাগ প্রভৃতিই লইয়া বিচরণ করেন।

অতঃপর খানাতল্লাস আরম্ভ হইল। আমাদের সকল ফাইল, দেরাজ, আলমারি, র‍্যাক, হাত ব্যাগ, চিঠিপত্র তন্ন তন্ন করিয়া দেখা হইল। প্রবাসী প্রেসের ম্যানেজার শ্রীসজনীকান্ত দাসের ব্যক্তিগত চিঠিপত্রাদিও অতি মনোযোগ সহকারে পঠিত হইল। নানাপ্রকার প্রশ্ন করা হইল। ইহার নিকট এই টাকা কেন লইয়াছেন, উহাকে আট আনা কেন দিয়াছেন, ইহার সহিত প্রবাসী আপিসের কি সম্বন্ধ, উহার সহিতই বা কি প্রকার যোগাযোগ, ইত্যাদি। পুলিস শুধু যে অকারণে উকিল ব্যারিষ্টারের সহিত কারবার করেন না তাহা বুঝিলাম।

আমাদের ছবি ছাপিবার ব্লকগুলি তাঁহাদের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করিল; কিন্তু ব্লক দেখিয়া যে ছবিটি কি তাহা বুঝা যায় না ইহাতে পুলিস ঈষৎ মনঃক্ষুণ্ণ হইলেন দেখিলাম। অবশ্য আমরা প্রস্তাব করিলাম, যে, আমাদের যে কয় সহস্র ব্লক আছে তাহা উঠাইয়া গবর্ন্মেণ্টের ছাপাখানায় লইয়া গিয়া প্রুফ তুলিতে তিন-চার বৎসরের অধিক সময় লাগিবে না। এ প্রস্তাব তাঁহাদের মনঃপুত হইল না।

বেলা ২টা হইতে রাত প্রায় ৭ ঘটিকা অবধি আমরা পুলিসের সৎসঙ্গে ছিলাম। দেখিলাম ভারতবাসী শুধু অকারণে পুলিসের জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করেন না। এরূপ মনোযোগের সহিত আর কেহ অপরের চিঠি পড়ে না যেমন পুলিসে পড়িতে পারে—এমন কি লোকের স্ত্রীর চিঠিও বাদ যায় না। এমন করিয়া অনর্থক অর্থহীন প্রশ্ন করিতেও আর কেহ পারে না। এমন করিয়া যাহা নাই তাহার অনুসন্ধান করিতে পারিয়াছিল শুধু রবীন্দ্র-কল্পনার সেই ক্ষ্যাপা যাহার সম্বন্ধে কবি গাহিয়াছেন

"ক্ষ্যাপা খুঁজে খুঁজে ফিরে পরশ পাথর।"

ধর্ম্মের নামে নরহত্যা

বিগত ৭ই মে তারিখে দ্বিপ্রহরে কলিকাতার কলেজ ষ্ট্রীটস্থ সেন ব্রাদার্সের পুস্তকের দোকানে, দোকানের মালিক শ্রীযুক্ত ভোলানাথ সেন এবং তাঁহার দুইজন কর্ম্ম-চারীকে দুই ব্যক্তি ছুরিকাঘাতে হত্যা করিয়াছে। এই সূত্রে দুইজন পশ্চিমা মুসলমান গ্রেপ্তার হইয়াছে ও তাহাদের এখন বিচার চলিতেছে। তাহারাই হত্যার জন্য দোষী কিনা তাহা এখনও সাব্যস্ত হয় নাই।

ভোলানাথ বাবু ও তাঁহার দুইজন কর্ম্মচারীকে যে এরূপ করিয়া হত্যা করা হইল তাহার কারণ অনুসন্ধান করিয়া শেষ অবধি এই অনুমানই যথার্থ বলিয়া পুলিস দ্বারা গ্রাহ্য হইয়াছে যে, তিনি কিছুকাল পূর্ব্বে "প্রাচীন কাহিনী" নাম দিয়া একটি পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করেন ও তাহাতে মুসলমানদিগের আপত্তিজনক কয়েকটি কথা ও মোহম্মদ ও গ্যাব্রিয়েলের একটি চিত্র ছিল, তজ্জন্যই মুসলমান ধর্ম্মের সম্মানরক্ষার্থ তাঁহাকে হত্যা করা হইয়াছে। মুসলমান ধর্ম্মে মোহম্মদের কোন চিত্র আঁকিলে বা ছাপিলে চিত্রকর বা মুদ্রাকরকে হত্যা করিবার জন্য নির্দ্দেশ আছে কিনা তাহা আমাদের জানা নাই। থাকিলেও সে নির্দ্দেশ সর্ব্বক্ষেত্রে মুসলমানরা যে মানিয়া চলে না তাহার ঐতিহাসিক প্রমাণ আছে। যথা ভোলানাথ বাবুর পুস্তকের চিত্রটিই জনৈক মুসলমান কর্ত্তৃক তৈমুরের পৌত্র জাহির-উল্লা বেগের আদেশে ১৪৩৭ খৃষ্টাব্দে অঙ্কিত হয় এবং উক্ত চিত্রকরকে হত্যা করা হইয়াছিল বলিয়া জানা যায় নাই। ইহা ছাড়া শুনিয়াছি ইউরোপের কয়েকটি চিত্রশালায় মোহম্মদের তথাকথিত চিত্র আরও আছে এবং তাহা মুদ্রিতও হইয়াছে। এজন্য কোন তুর্কী বা আরব বা আলব্যানীয় মুসলমান কাহাকেও কখন হত্যা করিয়াছেন বলিয়া শুনি নাই।

মুসলমানদিগের যে এ জাতীয় চিত্র দেখিলে প্রাণে আঘাত লাগে তাহাতে সন্দেহ নাই। নয়ত প্রাণের মায়া ছাড়িয়া এই কারণে মানুষ মানুষকে হত্যা করিতে প্রবৃত্ত হইবে কেন? সেইজন্য এরূপ চিত্র কাহারও আঁকা বা ছাপা উচিত নহে। কিন্তু মনুষ্যসভ্যতার বর্ত্তমান অবস্থায় এই জাতীয় কারণে কাহারও নরহত্যা করা উচিত নহে। এরূপ নরহত্যা যাহাতে না হয় তাহার জন্য শিক্ষিত মুসলমানদিগের বিশেষ চেষ্টা করা উচিত। কারণ ইহাতে তাঁহারা এবং তাঁহাদের সহিত সকল ভারতবাসীই জগতের চক্ষে হেয় হইবেন।

মুসলমানদিগের সু বা কুসংস্কার সম্বন্ধে অপর ধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তির জ্ঞান থাকা স্বাভাবিক নহে। যথা অপরাপর ধর্ম্মের লোকেরা নিজ নিজ ধর্ম্মগুরুদিগের চিত্র দেখিলে রুষ্ট হন না। কেহ কেহ খুশীই হন। ৺ভোলানাথ সেন মহাশয় নিজের "প্রাচীন কাহিনী" লিখিবার সময় মুসলমানদিগের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করিবার জন্য উক্ত চিত্রখানি পুস্তকে সংলগ্ন করেন নাই। তাঁহার আশা ছিল, যে, বাংলার সকল ধর্ম্মাবলম্বী লোকেদের খুশী করিতে পারিলে পুস্তকখানি পাঠ্য বলিয়া নির্দ্ধারিত হইবে। ফলেও তাহাই হইয়াছিল। টেক্‌স্‌টবুক কমিটি এই পুস্তকটি পাঠ্য বলিয়া ধার্য্য করেন। এই কমিটির মধ্যে মুসলমান সভ্যও ছিলেন বলিয়া শুনিয়াছি।

গত বৎসর ডিসেম্বর মাসে কলিকাতার "ছোলতান" পত্রিকায় এই পুস্তকের একটি তীব্র সমালোচনা বাহির হয়; তৎপরে "মুসলমান" ও "হানাফি" পত্রিকাতেও ঐরূপ সমালোচনা বাহির হয়। অন্যান্য পত্রিকাতেও এই বিষয় আলোচনা হয়। ৺ভোলানাথবাবু এই বিষয় অবগত হইয়া নিজে যে ইসলামের প্রতি কোন প্রকার অবজ্ঞা প্রকাশ করিয়া ঐ চিত্রটি ছাপান নাই এবং শিক্ষা-বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষের আদেশ পাইলে চিত্রটি পুস্তক হইতে অপসারিত করিতে রাজী আছেন তাহা "দৈনিক ছোলতানে" লেখেন। কিন্তু সম্ভবতঃ ইতিমধ্যে বাংলার গণ্ডী ছাড়াইয়া ভোলানাথ সেনের অপরাধের সংবাদ ভারতের বিভিন্ন দেশে ছড়াইয়া পড়ে।

হত্যার পক্ষাধিক কাল পূর্ব্বে শিক্ষা-বিভাগ হইতে পুস্তকটির বিক্রয় বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়; এবং পুস্তকের আপত্তিজনক চিত্রটি ও কয়েকটি কথা অপসারিত ও পরিবর্ত্তিত করা হয়। তথাপি নির্দ্দোষ ভোলানাথ সেন ও তাঁহার দুইজন কর্ম্মচারীকে অজ্ঞাত ঘাতকের হস্তে প্রাণ হারাইতে হইল।

এখন কথা হইতেছে এই যে, হত্যার জন্য সাক্ষাৎ-ভাবে যে-ই দায়ী হোক না কেন, ইহার মূলে আরও ব্যাপার আছে। কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তি-সংঘ এই হত্যা-কার্য্যে প্ররোচিত করিয়াছে কি-না, এই বিষয় অনুসন্ধান হওয়া প্রয়োজন। কারণ যদি কাহারও প্ররোচনায় কোন নির্ব্বোধ ব্যক্তি এরূপ হত্যাকার্য্য করে তাহা হইলে হত্যাকারী অপেক্ষা প্ররোচকদিগের শাস্তি অধিক হওয়া উচিত। গবর্ন্মেণ্ট হইতে সর্ব্বাগ্রে এই বিষয়ে অনুসন্ধান হওয়া উচিত এবং এই জাতীয় কোন তথ্য আবিষ্কৃত হইলে অপরাধীদিগের কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা করিতে হইবে।

—

চট্টগ্রামে সান্ধ্য অবরোধ

কিছু দিন যাবৎ চট্টগ্রাম শহরের হিন্দু ভদ্রলোক শ্রেণীর যুবকদিগের উপর হুকুম জারি হইয়াছে যে, তাহারা সন্ধ্যার পর গৃহের বাহিরে যাইতে পারিবে না।

দাঙ্গা হাঙ্গামা, সামরিক আইন জারি, বিশেষ বিপ্লব আশঙ্কা—এই সকল কারণে সাধারণতঃ এইরূপ হুকুম জারি হইয়া থাকে—যদিও তাহা কোনও সভ্যদেশের শাসনতন্ত্রে বিশেষ স্থান পায় না এবং তাহাও সাধারণতঃ বেশীদিন স্থায়িভাবে জারি হয় না। কিন্তু যে-সকল স্থলে এইরূপ হুকুম জারি হয়, তাহা কোনও ধর্ম্ম-বিশেষের লোকদের বিরুদ্ধে সচরাচর ঘোষিত হয় না। আমরা "সচরাচর" শব্দটি ব্যবহার করিতেছি, কেন-না "কখনই হয় নাই" আমরা নিশ্চিত ভাবে বলিতে পারি না।

উপস্থিত ক্ষেত্রে চট্টগ্রামের হিন্দু ভদ্র যুবক-দিগের উপর এইরূপ বিশেষ ভাবে ভেদাত্মক আদেশ দেওয়ার কারণ কি তাহা আমরা জানি না। ঐ স্থলের শাসনকর্ত্তার এইরূপ হুকুমজারি করার আইনতঃ ক্ষমতা আছে এবং তিনি তাহা ব্যবহার করিয়াছেন ইহাই আমরা জানি। তিনি স্পষ্ট কারণ কিছুই নির্দ্দেশ করেন নাই এবং এইরূপ আদেশের মূলে যে কোন বিশেষ কারণ আছে তাহার কোনরূপ প্রত্যক্ষ বা গৌণ প্রমাণ এ পর্য্যন্ত আমরা খুঁজিয়া পাই নাই। এইরূপ ভাবে সমস্ত চট্টগ্রামবাসী হিন্দু ভদ্র যুবকবৃন্দকে পরোক্ষভাবে দুষ্ক্রিয়াসক্ত জাতির সামিল করায় দেশ কি বিপদ হইতে উদ্ধার পাইল তাহা যদি কখনও প্রকাশিত হয় তবেই আমরা এইরূপ আদেশের যথাযথ বিচার করিতে পারিব। যে কারণটি এখন অস্পষ্টভাবে দেখান হইতেছে তাহা এই যে, চট্টগ্রামে হিন্দু যুবকদিগের মধ্যে বিপ্লববাদীর সংখ্যা কিছু অধিক আছে বা তাহাদের মধ্যে বিপ্লববাদ সংক্রান্ত কোনও চক্রান্ত চলিয়াছে। কিন্তু ইহাও সন্দেহমাত্র বলিয়া বোধ হয়। কেন-না, স্পষ্ট প্রমাণ থাকিলে পুলিস ও

গোয়েন্দা বিভাগের অপরিমিত ক্ষমতার প্রয়োগে ঐ সকল যুবক বন্দী হইয়া যাইত। তবে যদি পুলিস অপারগ হইয়া এইরূপ হুকুমজারি চাহিয়া থাকে তাহা হইলে ভিন্ন কথা।

শাসনবিধির মধ্যে শাস্তি-প্রকরণটা "দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন" জন্য, ইহাই সভ্যজগতের নিয়ম। তবে বিশেষ বিপদের সময় ব্যবহারের জন্য কতকগুলি আইন আছে যাহার প্রয়োগে দুষ্ট ও শিষ্ট সকলেই কষ্ট পায় ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কিন্তু তাহার প্রয়োগ অযথা অথবা দীর্ঘকাল স্থায়ী হইলে শাসনকারী ও শাসিত উভয়েরই ক্ষতি হয়, ইহাই ইতিহাসের লিখন। এবং যে-কোন আইনের প্রয়োগ জাতিধর্ম্ম-ভেদাত্মক হইলে তাহার কুফল আরও বেশী।

এখন সমস্ত ব্যাপারটি বিচারাধীন, সুতরাং যে সকল নির্দ্দোষী লোক ইহাদ্বারা কষ্ট পাইতেছেন তাঁহাদের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন ভিন্ন আমাদের উপায় নাই, কিন্তু আমরা বলিতে বাধ্য যে, এইরূপ আদেশের ফলে দেশে শান্তি অপেক্ষা অশান্তি বৃদ্ধিরই সম্ভাবনা বেশী, এবং হিন্দুজাতির প্রতি সমুচিত কারণ বিনা এরূপ ভেদাত্মক বিচার বিশেষভাবে নিন্দনীয়। মুষ্টিমেয় বিপ্লববাদীর অস্তিত্ব যদি কারণরূপে প্রদর্শিত হয় তাহা হইলে আমরা তাহা যথেষ্ট বলিয়া স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহি। অবশ্য ইহা সত্য যে যদি সমস্ত দেশের সকল কার্য্যক্ষম ব্যক্তিমাত্রেই কারারুদ্ধ বা অবরুদ্ধ থাকে তবে পুলিস ও হাকিমের কাজের অনেক সুবিধা হয় এবং তাঁহারা ভয় ও উদ্বেগ হইতে একেবারেই নিস্তার পান, কিন্তু ঐরূপ শাসনপন্থাকে আদর্শ বলিয়া স্বীকার করা দুরূহ।

সময়ে অসময়ে নানা রাজকর্ম্মচারীর মুখে আমরা পুলিসের কার্য্যক্ষমতার উচ্চকণ্ঠে প্রশংসা শুনিতে পাই। যদি পুলিস ও গোয়েন্দা বিভাগ এতই কার্য্যক্ষম হয়, তবে তাহারা প্রকৃত দোষীকে ধরিয়া নির্দ্দোষীকে এইরূপ স্বাধীনতা-লোপের যন্ত্রণা হইতে মুক্তি দিতে পারে না কেন?

—

কলিকাতার ক্লেদ নিষ্কাশন

এতদিন পরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক গবর্ন্মেণ্ট ডাঃ দে'র প্রস্তাবের প্রথম অংশের অনুমোদন করিয়াছেন। ইহা নগরীর অভ্যন্তরের ক্লেদনালী ইত্যাদির বিস্তারের প্রস্তাব। দ্বিতীয় অংশে নিষ্কাশিত ক্লেদ দূরে সাগরগামী নদীতে নিক্ষেপের জন্য ব্যবস্থা আছে।

প্রথম অংশটির জন্য খরচ পড়িবে ৬৫ লক্ষ টাকা। শুনা যাইতেছে এই টাকার মধ্যে ৪২ লক্ষ টাকার কার্য্য অত্যন্ত জরুরী বলিয়া ডাঃ দে এই বৎসরই কাজ আরম্ভ করিতে চাহেন, কিন্তু করপোরেশনের অর্থসচিব ও আর্থিক ব্যবস্থা-সভা অত টাকা নাই বলিয়া ধীরে ধীরে বহু বৎসর ধরিয়া এই কার্য্যটি উদ্ধার করিতে চাহেন।

আমরা শুনিয়াছিলাম যে, এই ক্লেদসমস্যা চরমে উঠিতে আর কয়েক বৎসর মাত্র আছে, এবং অবস্থা এখনই প্রায় সঙ্গীন হইয়া উঠিয়াছে। ইহা কি তবে সত্য নহে? যদি ইহা সত্য হয়, তবে করপোরেশনের উচিত যে, যে-কোন উপায়ে এই কার্য্য শীঘ্র সমাধান করা।

গত বৎসর যখন করপোরেশন এই প্রস্তাবগুলি নিজেরা অনুমোদন করিয়া গবর্ন্মেণ্টের নিকট প্রেরণ করেন, তখন এই খরচের কি কোনই ব্যবস্থা ভাবা হয় নাই?

—

কানপুর

কানপুরের দাঙ্গা সম্বন্ধে যে সরকারী কমিশন বসিয়াছিল তাহার রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা মূল রিপোর্ট এখনও দেখিবার সুযোগ পাই নাই, সুতরাং সাময়িক পত্রে উক্ত কমিশন এবং তাহার সম্মুখে সাক্ষ্য দানের যে-সকল বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে তাহার উপর নির্ভর করিয়াই কিছু লিখিতেছি।

দাঙ্গার উৎপত্তি সম্বন্ধে এই একটা মত বা অনুমান কয়েক জন সাক্ষী কমিশনের সম্মুখে উপস্থিত করেন, যে, উহা প্ররোচক-চরের (agent provocateur-এর) দ্বারা সংঘটিত হয়। এই মত কমিশন একটুও দ্বিধা না করিয়া অগ্রাহ্য করিয়াছেন। কারণ তাঁহারা বলেন, ইহার সমর্থক সাক্ষ্য অস্পষ্ট ও অপ্রচুর। বাস্তবিকই ইহার সমর্থক সাক্ষ্য এই প্রকারের কি-না, বলিতে পারিলাম না; কারণ সাক্ষ্য আমাদের সম্মুখে নাই। কমিশন দাঙ্গার অন্য যে-সব পরোক্ষ ও সাক্ষাৎ কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহার প্রমাণ তাঁহাদের দ্বারা অস্বীকৃত অনুমানটির চেয়ে বেশী স্পষ্ট এবং প্রচুর কি-না, তাহাও সাক্ষ্য সম্মুখে না থাকায় ঠিক করিয়া বলিতে পারিলাম না। রিপোর্টের যে-যে অংশ বাহির হইয়াছে, তাহাতে ত মনে হয়, কমিশনের দ্বারা সমর্থিত মতের পক্ষেও যথেষ্ট প্রমাণ নাই।

পুলিস-বিভাগের প্ররোচক চরের দ্বারা এই ভয়ঙ্কর কাণ্ড সংঘটিত হইয়াছিল, এই অনুমান মানিয়া লইলে পরবর্ত্তী ঘটনার সহিত দাঙ্গার এই প্রকার উদ্ভবের সামঞ্জস্য দেখা যায়। কোন উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য মানুষ যে কাণ্ড ঘটায়, সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ না হওয়া পর্য্যন্ত সেই কাণ্ডের পরিসমাপ্তি করিতে তাহাকে ত্বরান্বিত ও ব্যগ্র হইতে দেখা যায় না। কাজের ফলের দ্বারা উদ্দেশ্যের অনুমান

সাধারণতঃ করা হইয়া থাকে। কানপুরের দাঙ্গার ফলে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে পরস্পরের প্রতি অবিশ্বাস ও বিদ্বেষ খুব বাড়িয়াছিল। হিন্দু-মুসলমানের রক্তারক্তি থামাইবার জন্য ইংরেজদের এদেশে প্রভু থাকা দরকার, ইহা প্রমাণ করিবার জন্যও এই দাঙ্গাটা ব্যবহৃত হইতেছে। দাঙ্গা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হইলে হিন্দু-মুসলমানের অবিশ্বাস ও বিদ্বেষ এতটা বাড়িত না এবং ইংরেজ-প্রভুত্বের আবশ্যকতার প্রমাণরূপেও দাঙ্গাটা উত্তমরূপে ব্যবহার করা চলিত না। বস্তুতঃও দেখা যায়, যথেষ্ট সুযোগ, সময় ও সামর্থ্য থাকিলেও পুলিস ও ম্যাজিষ্ট্রেট দাঙ্গা নিবারণের চেষ্টা প্রথম কয়েক দিন করেন নাই, ইহা কমিশন এবং গবর্মেণ্ট স্বীকার করিয়াছেন। সুতরাং কেহ যদি অনুমান করে যে, সরকারী গুপ্ত প্ররোচকেরা যাহা ঘটাইয়াছিল, তাহার পর্য্যাপ্ত ফল না-ফলা পর্য্যন্ত তাহা থামাইয়া দিবার স্বাভাবিক অনিচ্ছাই সরকারী ম্যাজিষ্ট্রেট ও পুলিসের অমার্জ্জনীয় নিষ্ক্রিয়তার কারণ, তাহা হইলে অনুমানকারীকে খুব বেশী দোষ দেওয়া যায় না।

দাঙ্গাটা গুপ্ত প্ররোচকের দ্বারা সংঘটিত হইয়াছিল, ইহা অবশ্য অনুমান মাত্র। এই থিওরির সহিত পরবর্ত্তী ঘটনাসমূহের সামঞ্জস্য আছে, আমরা কেবল তাহাই দেখাইলাম। থিওরি বা মতটা সত্য কি-না, সমুদয় সাক্ষ্য পড়িতে না পাইলে সে-বিষয়ে আলোচনা করা চলে না। তবে, কমিশন যে বলিতেছেন, এই অনুমানের স্পষ্ট ও প্রচুর প্রমাণ নাই, তাহা প্রবল যুক্তি নহে। গুপ্ত প্ররোচকেরা তাহাদের কাজের প্রচুর প্রকাশ্য ও স্পষ্ট প্রমাণ রাখিয়া দিবে, এরূপ আশা করা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। তাহার পর গুপ্ত প্ররোচকের বিষয় অন্ততপক্ষে একজন সাক্ষী আছেন যাঁহার সাক্ষ্য একেবারে অগ্রাহ্য করা যায় না। রায় সাহেব রূপচাঁদ জৈন, অনারারি ম্যাজিষ্ট্রেট, ব্যাঙ্কার এবং ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের ভূতপূর্ব্ব সভাপতি, স্পষ্টভাবে বলিয়াছেন যে, তিনি একজন লোককে এই দাঙ্গার সূত্রপাত করিতে দেখিয়াছিলেন যাহাকে অনেকেই ছদ্মবেশী গোয়েন্দা হেড় কনষ্টেবল বলিয়া বলিয়াছিল। এই লোকটাকে তিনি স্বচক্ষে দেখিয়াছিলেন এবং তাহার দাঙ্গা বাধাইবার চেষ্টাও তিনি দেখিয়াছিলেন।

কমিশন হরতালকেই দাঙ্গার উৎপত্তির কারণ বলিয়াছেন। কিন্তু তাহার সপক্ষে কোনও প্রমাণ উপস্থিত করিতে পারেন নাই। বরঞ্চ কানপুরের ট্রাম কোম্পানির সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট জেমস্ সাহেব স্পষ্টই সাক্ষ্য দিয়াছেন যে, হরতালে দোকান-পাট বন্ধ করার জন্য কোন জোর-জবরদস্তি হয় নাই। এবং জোর-জবরদস্তি করার ফলে দাঙ্গার সৃষ্টি সম্বন্ধে কমিশনের যে সিদ্ধান্ত তাহার সপক্ষে কোনই প্রমাণ নাই। বরঞ্চ কমিশন ইহা স্বীকার করিয়াছেন, যে, দাঙ্গা ঘটান হরতালকারীদিগের (কংগ্রেসের) সম্পূর্ণ উদ্দেশ্যবিরুদ্ধ ব্যাপার।

যুক্ত-প্রদেশের সকৌন্সিল গবর্ণর মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, বিগত আইন-অমান্য-আন্দোলনের-সময় কানপুরের আন্দোলনকারীদিগের উপর যথেষ্ট বলপ্রয়োগ না করায় ঐ স্থানের লোকে শাসন-বিভাগের উপর শ্রদ্ধাভক্তি হারায় এবং এই অশ্রদ্ধার ফলে আইন শাসন অগ্রাহ্য করার প্রবৃত্তি জন্মায়, যাহার ফলে এই দাঙ্গার উৎপত্তি ঘটে। এই মতপ্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে ঐরূপে দয়া-দাক্ষিণ্য দেখাইয়া অর্থাৎ কংগ্রেসের আন্দোলনকারিগণের যথেচ্ছাচারের সমুচিত শাস্তি-না-দিয়া—এই দাঙ্গার বীজ রোপণের জন্য গবর্ণর বাহাদুর ঋষির মত নিজ দোষ স্বীকার করিয়াছেন। আমরা কিন্তু তাঁহার দোষ হইয়াছিল এ কথা মানিতে পারিলাম না। কেন-না, প্রথমতঃ কংগ্রেসের যথেচ্ছাচারের শাস্তির অভাব কানপুরে কি হইয়াছিল তাহা বলা হয় নাই, এবং আমরাও কোথায়ও শুনি নাই। দ্বিতীয়তঃ ইহাই যদি যথার্থ কারণ হইত, তাহা হইলে দাঙ্গাকারীদের সঙ্গে কংগ্রেসের দলের কিছু-না-কিছু সংস্রব থাকিত; কেন-না, আইনের প্রতি অশ্রদ্ধা যথেচ্ছাচারীরই বেশী হওয়া উচিত, কিন্তু কমিশন সে-বিষয়ে স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, দাঙ্গার উৎপত্তির সহিত কংগ্রেসকে জড়ান যায় না।

তৃতীয়তঃ গবর্ণরের বাক্যেই আমরা পাইতেছি যে

মার্চ্চ মাসের অব্যবহিত পূর্ব্বেই শাসনদণ্ড সবলভাবে পরিচালনা করার ফলে কানপুরে আইন ও শাসনের উপর শ্রদ্ধাভক্তি পুনঃস্থাপিত হয়। যদি তাহাই হয় তবে মার্চ্চ মাসের শেষের দিকে যে দাঙ্গা হয় তাহার কারণ আইন ও শাসনের উপর অশ্রদ্ধা, ইহা কিরূপে যুক্তিসঙ্গত বলা যাইতে পারে? কমিশনও, আইন-অমান্য-আন্দোলনকে এই দাঙ্গার সঙ্গে কোনরূপে সংশ্লিষ্ট করা যায় না, একথা বলিয়াছেন। দাঙ্গার পূর্ব্বাভাসের মধ্যে হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ সম্পর্কে কংগ্রেসের জুলুম বিষয়ে অনেক কথাই বলা হইয়াছে কিন্তু প্রমাণ কিছুই দেওয়া হয় নাই। অন্যপক্ষে ঐ সম্পর্কে মুসলমানদিগের তাঞ্জীম সম্বন্ধে অনেক সাক্ষ্য ছিল, কিন্তু কমিশন এইমাত্র বলিয়াছেন যে, "আশ্চর্য্যের বিষয় কোনও সম্ভ্রান্ত মুসলমান ইহার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন না, কিন্তু কমিশনের মতে তাঞ্জীমের দরুণ মুসলমানদিগের সঙ্কল্প দৃঢ় হয় এবং (সেইজন্য) ইহার গুরুত্ব উপেক্ষা করা উচিত নহে।"

তাঞ্জীম কংগ্রেস-বিরোধী দল। ইহার দলভুক্ত লোকেরা অস্ত্রশস্ত্র লইয়া কুচকাওয়াজ করিয়া বেড়াইত। এই দলের কার্য্যগতিক একাধারে উগ্র ও অপমানসূচক ছিল। গবর্ন্মেণ্ট হিন্দুদিগের রাজনৈতিক আন্দোলন দমনের জন্য যথেষ্ট বলপ্রয়োগ করিয়াছিলেন, কিন্তু ইহাদের নির্ব্বিবাদে যথেচ্ছাচার করিতে দিয়াছিলেন। কানপুরের এবং কানপুরের বাহিরের অনেক মুসলমান ইহাকে প্রচ্ছন্নভাবে সমর্থন করিতেছিলেন (মৌলানা শওকত আলির নামও কয়েকজন সাক্ষী বলিয়াছেন)। পরে ইহার স্বরূপ প্রকাশ পাওয়ায় ঐ সকল সমর্থনকারীরা সরিয়া পড়িয়াছেন, এই সকল কথা বহু হিন্দু ও অহিন্দু সম্ভ্রান্ত সাক্ষী বলিয়াছেন।

অথচ কমিশন তাঞ্জীমের কথা দু'কথাতেই সারিয়াছেন এবং গবর্ণর বাহাদুর কোন উচ্চবাচ্যই করেন নাই! কেন? তাহার পর দাঙ্গার কথা। ২৪শে মার্চ্চ অপরাহ্নে দাঙ্গা আরম্ভ হয়। প্রথমে মুসলমানগণ আক্রমণ করে এবং প্রথমে হিন্দুরই মন্দির দগ্ধ ও হিন্দুর সম্পত্তি নষ্ট ও লুটতরাজ হয়। পরে হিন্দুরা প্রতিশোধ ও প্রতিহিংসা লইতে থাকে। ইহা কায়ার ব্রিগেডের অধ্যক্ষের সাক্ষ্যে পাওয়া যায়। তাহার পর চৌক-বাজার মসজিদ দগ্ধ হয়।

এই মন্দির ও মসজিদ দগ্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ-বহ্নি ভীষণভাবে প্রজ্জ্বলিত হয় এবং দাঙ্গা ভয়াবহ রূপ ধারণ করে। ঐরূপে তিন দিন প্রবলবেগে দাঙ্গা চলিতে থাকে। ফলে বহু শত লোক হতাহত, অনেকগুলি মন্দির ও মসজিদ এবং অসংখ্য দোকানপাট ঘরবাড়ি ধ্বংস দগ্ধ ও লুণ্ঠিত হয়। সমস্ত দাঙ্গায় কমিশনের মতে পাঁচ শত এবং অন্যমতে সহস্রাধিক লোক হত হয়। কানপুর শহর যুদ্ধক্ষেত্রের মত বিধ্বস্ত হইবার উপক্রম হয়।

কমিশনের মত এই, প্রথম দিকে কানপুরের কর্ত্তৃপক্ষ যদি যথাযথ ও কর্ত্তব্যপরায়ণ ভাবে কাজ চালাইতেন তবে দাঙ্গা শীঘ্রই থামিয়া যাইত এবং এই ভীষণ ব্যাপারটি এইরূপ সংহারমূর্ত্তি ধারণ করিতে পারিত না। এখন দেখা যাউক কে কি ভাবে কার্য্য করিয়াছিলেন।

কমিশনার বলিয়াছেন ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ সেল ভগৎ-সিংহের ফাঁসীর দরুণ গোলমাল হইতে পারে এইরূপ সতর্কীকরণ সংবাদ গবর্ন্মেণ্টের কাছে আগেই পাইয়াছিলেন। ঐ কারণে পুলিস ও সৈন্য বিভাগের সহিত তিনি ব্যবস্থাও করিয়াছিলেন। কিন্তু যখন বিপদ আসন্ন হয় তখন তিনি অকুস্থল ত্যাগ করিয়া, গলিঘুঁজি দিয়া (কেন-না বড়রাস্তায় তখন ইটপাটকেল চলিতেছিল) চলিয়া যান। চলিয়া যাইবার উদ্দেশ্য ছিল সান্ধ্য অবরোধের (curfew order) পরোয়ানা লিখিয়া জারি করিবার জন্য। এই সময়ে চলিয়া না যাইয়া যদি তিনি দ্রুত ও দৃঢ়ভাবে দাঙ্গা দমন করিবার চেষ্টা করিতেন তাহা হইলে মেষ্টন রোডের মন্দির ও মছলিবাজারের মসজিদ দুইটিই রক্ষা পাইত এবং দাঙ্গা সূত্রপাতের সঙ্গে সঙ্গেই শেষ হইয়া যাইত। ম্যাজিষ্ট্রেট জানিতেন যে, উক্ত মন্দির ও মসজিদ সামনা-সামনি স্থিত এবং ১৯১৩ সালে ঐখানে বিষম দাঙ্গা হয়। এইবার দাঙ্গার সময় তিনি কাছেই ছিলেন এবং তাঁহার কাছেই পুলিস ফৌজ ছিল।

কমিশন উপরোক্ত কথাগুলি বলিয়া মন্তব্য প্রকাশ

করিয়াছেন যে, ম্যাজিষ্ট্রেটের চলিয়া যাওয়া উচিত হয় নাই এবং এই দাঙ্গার ব্যাপারের গুরুত্ব অনুভব করিতে তাঁহার সাংঘাতিক দেরি হইয়াছিল। দাঙ্গা যখন ভীষণ ভাবে আরম্ভ হইল তখনও প্রথম তিন দিন তিনি তাহার দমনের জন্য সাক্ষাৎভাবে কি করিয়াছিলেন সে-সম্বন্ধে কমিশনের রিপোর্টে আমরা বিশেষ কিছু পাই নাই।

সকৌন্সিল যুক্তপ্রদেশের গবর্ণর তাঁহার পূর্ব্বকীর্ত্তির প্রশংসা ও এই ব্যাপারে তাঁহার কার্য্যমন্থরতার জন্য মৃদু তিরস্কার করিয়াছেন এবং তিনি থাকিতে কানপুর অঞ্চলের লোকের মধ্যে নিশ্চিন্ত ভাব আসিতে পারে না, এই বলিয়া তাঁহাকে স্থানান্তরিত করিয়াছেন!

পুলিসের সম্বন্ধে কমিশন বলিয়াছেন—"সকল শ্রেণীর সাক্ষী অন্য সকল বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশ করা সত্ত্বেও **এক বিষয়ে একমত ছিলেন,** তাহা এই যে দাঙ্গার ব্যাপারে পুলিস **নিশ্চেষ্ট ও উদাসীন** ভাব দেখাইয়াছিল। এই সাক্ষীদিগের মধ্যে ইউরোপীয় ব্যবসায়ী, সকল শ্রেণীর হিন্দু-মুসলমান, সৈনিক কর্ম্মচারী, আপার ইণ্ডিয়া চেম্বার অফ কমার্সের সেক্রেটারী, ভারতীয় খ্রীষ্টিয়ানদিগের প্রতিনিধিবর্গ এবং **এমন কি দেশীয় রাজকর্ম্মচারীও** ছিলেন।" এরূপ একমত ও স্পষ্ট সাক্ষ্য সত্ত্বেও কমিশন পুলিসের দোষ ক্ষালনের কিছু চেষ্টা করিয়া শেষে "ঢোক গিলিয়া" বলিয়াছেন, "আমাদের মনে সন্দেহ নাই যে প্রথম তিন দিন পুলিসের যতটা কার্য্যতৎপরতা দেখান উচিত ছিল তাহা তাহারা দেখায় নাই।" প্রথম তিন দিন সর্ব্বাপেক্ষা সাংঘাতিক দাঙ্গা চলিয়াছিল তাহা আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি, সুতরাং সেই তিন দিন পুলিস নিশ্চেষ্ট থাকায় কি হইয়াছিল সহজেই বুঝা যায়। এবং "যতটা কার্য্যতৎপরতা উচিত" ইহা দূরের কথা, কিছুমাত্র দেখাইয়াছিল কিনা তাহার সম্বন্ধে কমিশন নির্ব্বাক এবং সকল সাক্ষী বিপরীত মত প্রকাশ করিয়াছেন। যাহা হউক পুলিসকে এইটুকু দোষ দেওয়ারও কৈফিয়ৎ হিসাবে কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন, যথা :—

সারমত মহল্লায় ২৫শে বিকালে হাঙ্গামা আরম্ভ হয়। সেখানে পুলিস চৌকি আছে। উপরন্তু বিকাল পাঁচটায় সেখানে সশস্ত্র পাহারা বসান হয়। ২৫শের রাত্রে সেখানেই খুন, লুট, অগ্নিকাণ্ড আরম্ভ হয়। পরদিন দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত সেখানে উনিশটি খুন, অনেকগুলি বাড়ি লুট ও অগ্নিতে দগ্ধ হয়। **পুলিসের দল কাছেই ছিল, তাহারা ওদিকে ভ্রূক্ষেপও করে নাই।**

গোয়ালটোলিতে ২৬শের সকালে সমস্ত বাজারটিতে আগুন লাগান হয়। মিঃ রায়ান (ইউরোপীয়) সাক্ষী দিয়াছেন যে তিনি গিয়া দেখেন যে বাজারে আগুন লাগিয়াছে এবং বিস্তর লোক সশস্ত্র হইয়া দাঙ্গার উপক্রম করিতেছে। সশস্ত্র পুলিস ফৌজ সেখানেই উপস্থিত ছিল, কিন্তু কিছুই করিতেছিল না। মিঃ রায়ান নিজে দাঙ্গা থামাইয়া পুলিসকে প্রশ্ন করেন যে তাহারা ওখানে কিসের জন্য আছে। উত্তরে তাহারা বলে যে তাহারা লক্ষ্ণৌ হইতে আসিয়াছে এবং **কোন হুকুম পায় নাই।**

সদর বাজারে ২৬শে তারিখে কয়েকটি গুণ্ডার দল 'ধীরে সুস্থে' (কমিশনের ভাষায়) আটটি খুন, একটি বাড়ি লুট ও অগ্নিতে দগ্ধ করে। দুই দল সশস্ত্র পুলিস সেখানে ছিল। এক দল বেশ কাছেই ছিল, কিন্তু গুণ্ডারা "ধীরে-সুস্থে" কাজ শেষ করে, পুলিস কিছুই করে নাই।

সব্জীমণ্ডিতে ২৬শে তারিখে অনেকগুলি খুন হয়, ১০০ পদ দূরে সশস্ত্র পুলিস ছিল। কিছু করে নাই। পটবলপুরে পুলিস ফাঁড়ি এবং আর একদল পুলিশ পিকেট ছিল, আর সেখানে জুমা মসজিদ এবং অন্নপূর্ণার মন্দির আক্রান্ত ও দগ্ধ হয়।

ইহা ভিন্ন আরও অনেক সাক্ষী পুলিসের সম্মুখেই অজস্র দুষ্কার্য্য ঘটিবার কথা বলিয়াছেন, পুলিসের ঔদাসীন্য সকল ক্ষেত্রেই সমান!

কমিশন বলিয়াছেন যে পুলিস পাহারা-দেওয়ায় সম্পূর্ণভাবে গাফিলী করিয়াছিল, উপরন্তু মিথ্যা রিপোর্ট দিয়াছিল। ২৫শে তারিখের সকালে বাঙালী মহলে ভীষণ অত্যাচার ও হাঙ্গামা হয়। পুলিসের সদর থানা কাছেই ছিল, সেখানে পাহাড়াওয়ালারা কোনই খবর দেয় নাই, যদিও শ্রীযুক্ত বিদ্যার্থী খবর পাইয়া অনেকগুলি মুসলমানকে উদ্ধার করেন।

এইরূপ পুলিসের অপরূপ কীর্ত্তির উপর কমিশন মৃদু মন্তব্য করিয়া ক্ষান্ত হইয়াছেন। সকৌন্সিল গবর্ণর প্রথমেই পুলিসের উর্দ্ধতন দুইজন (বিলাতী) কর্ম্মচারীকে দোষ হইতে রেহাই দিয়াছেন, কেন না তাঁহারা কানপুরে নূতন গিয়াছিলেন! নূতন বলিয়া তাঁহারা পথ হারাইয়া শহরের বাহিরে চলিয়া গিয়াছিলেন কিনা তাহা আমরা জানি না, কিন্তু চারিদিকে খুন জখম দাঙ্গা হইতেছে ইহা তাঁহারা চক্ষে দেখিয়াছিলেন নিশ্চয় এবং তাহা দমন করিতে সক্ষম হওয়া দূরের কথা পুলিসের জড়তাও দূর করিতে বিশেষ সক্ষম হন নাই। তাঁহারা কি কাজ করিয়াছিলেন তাহার বিশেষ কোনও পরিচয় পাওয়া যায় না, যাহা করেন নাই তাহাতে মহাভারত লেখা চলে।

ইঁহারা কর্ম্মক্ষম হইলে কি হইতে পারিত তাহা কমিশনের রিপোর্টে ডেপুটি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ওঙ্কার সিংহের কার্য্যে দেখা যায়। এই একমাত্র পুলিস কর্ম্মচারী যিনি এই দাঙ্গায় কার্য্যকুশলতা দেখাইয়াছেন। ইঁহাকে সিসামৌ মহল্লায় দাঙ্গা দমন করিতে পাঠানো হয়। তিনি ক্ষিপ্রতার সহিত সেখানে এক বেলায় ৫০টি গ্রেপ্তার করেন ও সবল ও দৃঢ়ভাবে পুলিস চালনা করেন, ফলে সঙ্গে সঙ্গে দাঙ্গা থামিয়া যায়। কানপুরের অন্য সকল জায়গায় প্রথম তিন দিনে মাত্র আটটি গ্রেপ্তার হয়।

যুক্তপ্রদেশের গবর্ণর বাহাদুর উর্দ্ধতন সাহেব কর্ম্মচারীগুলিকে দায়মুক্ত, খেতাবধারী কোতোয়াল খাঁ-বাহাদুর সৈয়দ ঘুলাম হাসাইনকে মৃদু তিরস্কার, এবং পুলিসের morale ভাল আছে বলিয়া (অর্থাৎ তাহারা দমিয়া যায় নাই বলিয়া) উচ্চ প্রশংসা করিয়াছেন, তবে কয়েক জন কনেষ্টবল ইত্যাদির কাজের গাফিলীর দরুণ তদারক করিবেন বলিয়াছেন। সে বেচারাদের কপালে দুঃখ থাকিলেও থাকিতে পারে।

কংগ্রেস পক্ষ হইতে কমিশনে সাক্ষ্য দেওয়া হয় নাই, কেন-না কংগ্রেসের তদন্তে রাজকর্ম্মচারীরা সাক্ষ্য দেন নাই। সুতরাং যাঁহারা এই দাঙ্গা সম্বন্ধে সঠিক খবর দিতে পারিতেন তাঁহাদেরই সাক্ষ্য কমিশনের রিপোর্টে নাই। আমরা জানি কানপুর কংগ্রেস কমিটি দাঙ্গা থামাইবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছিলেন। কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাদের প্রবল ক্ষমতা লইয়া যদি কংগ্রেসের এক-দশমাংশ মাত্র চেষ্টা করিতেন তাহা হইলে দাঙ্গা শীঘ্রই থামিয়া যাইত। কমিশন কংগ্রেসকে দোষীও করেন নাই, তাহার দাঙ্গা থামাইবার চেষ্টারও উল্লেখ করেন নাই! কিন্তু রিপোর্টেই আমরা দেখিতেছি স্থানীয় কমিটির প্রেসিডেণ্ট শ্রীযুক্ত জোগ দাঙ্গার প্রথম মুখেই বিশেষ আহত হন এবং অন্যতম সদস্য স্বর্গীয় বিদ্যার্থী মহাশয়কে ত সকৌন্সিল গবর্ণর পর্য্যন্ত সাধুবাদ করিয়াছেন। এই সূত্রে বলা উচিত যে, কয়েক জন দেশীয় কর্ম্মচারী দাঙ্গা থামাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু পুলিস সাহায্য না করায় সফল-কাম হইতে পারেন নাই।

মোটের উপর কমিশনের রিপোর্ট ও সকৌন্সিল যুক্তপ্রদেশের গবর্ণরের মন্তব্য সম্বন্ধে বলা যায় যে, দাঙ্গার কারণ ঠিকভাবে দেখান হয় নাই—গবর্ণর বাহাদুরের সিদ্ধান্ত কমিশনেরই মতবিরোধী। কানপুরে কর্ত্তৃপক্ষ ও পুলিসের "অকর্ম্মণ্যতা" অনেক চাপা দেওয়া সত্ত্বেও জাজ্বল্যমানভাবে প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে—দণ্ডদান যাহা হইয়াছে তাহার সম্বন্ধে মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। তবে কমিশন সম্বন্ধে এইটুকু বলা যাইতে পারে যে উহা নিরবচ্ছিন্ন "চুনকামের ঠিকাদারের" কার্য্য করে নাই।

কানপুরের খেতাবধারী ব্যক্তিগণ ও অনরারী ম্যাজিষ্ট্রেটগণ দাঙ্গা থামাইবার জন্য বিশেষ কিছু না করাতে কমিশন আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছেন। আমরা ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার বিশেষ কিছু দেখি না। স্বর্গীয় শ্রীযুক্ত বিদ্যার্থীকে কমিশন তাঁহার স্বার্থত্যাগ ও নির্ভীক ভাবে বিপন্নের সাহায্যে মৃত্যু বরণের জন্য মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করিয়াছেন এবং যুক্তপ্রদেশের কিরণ সেবাসমিতি ও তাহার সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত ভামিলকেও প্রশংসা করিয়াছেন।

এই শোচনীয় ব্যাপারে পরলোকগত গণেশ শঙ্কর বিদ্যার্থীর উজ্জ্বল দৃষ্টান্তই আমাদের একমাত্র আশার কথা। এই ত্যাগী নির্ভীক ও মহাপ্রাণ কর্ম্মীর পুরুষকারে পিতৃভূমির মুখ উজ্জ্বল হইয়াছে। তিনি বহু বিপন্ন মুসলমানকে উদ্ধার করিয়া তাহাদিগকে মুসলমান পল্লীতে বা অন্য নিরাপদ স্থানে পৌঁছাইয়া দিয়াছিলেন।

ইহাতে তাঁহার প্রাণনাশের কতটা আশঙ্কা, তাহা তাঁহার বন্ধুরা তাঁহাকে বার-বার বলিয়াছিলেন। তিনি সে কথায় ভ্রূক্ষেপ না করিয়া কর্ত্তব্যকার্য্য-জ্ঞানে উহা করিতেছিলেন। শেষে মুসলমানকে রক্ষা করিতে গিয়া তিনি অন্য মুসলমান দ্বারা নিহত হন।

অহিংস যোদ্ধ পুরুষের বীরোচিত মৃত্যু তাঁহার হইয়াছে, ইহাই তাঁহার উপযুক্ত মহাপ্রয়াণ।

—

শিক্ষার জন্য দান

অন্ধ্র দেশের জয়পুরের মহারাজা নিজ অভিষেক উপলক্ষ্যে অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয়ে বার্ষিক এক লক্ষ টাকা দান করিতে অঙ্গীকার করিয়াছেন। এই টাকা ব্যাবহারিক বিজ্ঞান শিখাইবার জন্য ব্যয়িত হইবে।

এইরূপ প্রশংসনীয় দান করিবার মত ধনী বাংলা দেশে একেবারেই নাই বলা যায় না।

—

বোম্বাই শহরের লোকসংখ্যা হ্রাস

১৯২১ সালের সেন্সসে বোম্বাইয়ের লোকসংখ্যা ১১,৭৫,৯১৪ ছিল, বর্ত্তমান সালে উহা কমিয়া ১১,৫৭,৮৫১ হইয়াছে। বোম্বাইয়ে শুনিলাম, পিকেটিঙের জন্য বিদেশী মালের কাট্‌তি কমিয়া যাওয়ায় তাহার ব্যবসাদারেরা শহর ছাড়িয়া গিয়াছে। সেই জন্য লোক কমিয়াছে। কলিকাতায় এরূপ কারণে লোক কমে নাই, বিদেশী জিনিষের কাট্‌তিও খুব কমে নাই। বিদেশী কাপড়ের কাট্‌তি কতক কমিয়াছে বটে।

—

শিক্ষিত জুতাবুরুষওয়ালা

একটি দৈনিকের জনৈক পত্রপ্রেরক লিখিয়াছেন, কলুটোলা ষ্ট্রীটে একটি ভদ্র শ্রেণীর যুবককে তিনি জুতার কালির কোটা ও জুতার বুরুষ হাতে বলিতে শুনিয়াছেন, "আপনারা একটি পয়সা দিয়া জুতাবুরুস করাইয়া লউন।" ইহাকে পত্রপ্রেরক শোচনীয় বেকার সমস্যা বলিয়াছেন। এক অর্থে ইহা শোচনীয় বটে। কিন্তু যুবকটি যে ভিক্ষা না করিয়া জুতাবুরুষ করিতে রাজী হইয়াছেন, তাহা প্রশংসার বিষয়।

—

লক্ষপতি মেথর

কলিকাতার বাবুরাম ঝাড়ুদার ১৮ খানা বাড়ি ও নগদ ১ লক্ষ ১৪ হাজার টাকা রাখিয়া যায়। এই সংবাদটির সহিত আগেকার সংবাদটি তুলনীয়।

—

পেশাওয়ার ও ক্ষীরাই

পেশাওয়ারে যেমন অনেকে বন্দুকের গুলিতে বুক পাতিয়া দিয়াছিল, মেদিনীপুরের ক্ষীরাই গ্রামের ১২ জন যুবক সেইরূপ নির্ভয়ে পুলিসের গুলিতে প্রাণ দিয়াছিল। কিন্তু তাহাদের বীরত্ব-কাহিনী পেশাওয়ারের বীরদের কীর্ত্তির মত প্রশংসালাভ করে নাই। না করুক—অপ্রসিদ্ধ বীরেরাও বীর। গ্রামবাসী এই বারটি মানুষের প্রতি গত ১৭ই জ্যৈষ্ঠ সম্মান প্রদর্শিত হইয়াছে।

—

ফিলিপাইনে বাঙালী অধ্যাপক

বরিশাল উজীরপুরের শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ রায়, এম্ এ, পি এইচ ডি, ফিলিপাইন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপকের কাজ করেন। তিনিই সেখানে একমাত্র বাঙালী। কিছু-দিনের জন্য দেশে আসিয়াছিলেন। আবার মানিলা গিয়াছেন। তাঁহার "ভারতবর্ষ ও ফিলিপাইন" নামক ভাল ইংরেজী বহিখানি সমালোচনার জন্য পাইয়াছি।

—

বোম্বাইয়ের কাপড় ও বাংলার কয়লা

দেশী জিনিষ বলিয়া বাঙালীরা বিলাতীর চেয়ে মহার্ঘ বোম্বাইয়ের কাপড় কেনে, কিন্তু বোম্বাইয়ের মিলওয়ালারা সস্তা বলিয়া দক্ষিণ-আফ্রিকার কয়লা কেনে, কিছু বেশী দাম দিয়া বঙ্গের কয়লা কেনে না! বাঙালীরা নিজেদের মিলের এবং নিজেদের চরখা ও তাঁতের কাপড় কিনিতে থাকুন।

—

ভারতীয় সেনাদলে ভারতীয় 'অফিসার' নিয়োগ

১৮৬৮ সনে স্যর জর্জ্জ চেস্‌নী লিখিয়াছিলেন যে, ভারতীয়দিগকে উচ্চ সামরিক পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে,

জাতিধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে সকলকেই সরকারী চাকুরিতে উন্নতি করিবার সমান অধিকার ও সুযোগ দেওয়া হইবে—মহারাণী ভিক্টোরিয়ার এই ঘোষণা-পত্র পালিত হয় নাই। তাহার পর আজ ষাট বৎসরেরও অধিক কাল ধরিয়া ভারতবর্ষের শিক্ষিত ভদ্রসন্তানকে সেনানায়ক হিসাবে নিযুক্ত করিবার জল্পনাকল্পনা চলিয়াছে, প্রায় পনর বৎসর পূর্ব্বে এই বিষয়ে একটা প্রতিশ্রুতিও দেওয়া হইয়াছিল, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও ভারতবর্ষের সেনাবাহিনীতে ভারতীয় অফিসারের সংখ্যা এখনও মুষ্টিমেয়। এই বৎসরের ৩১শে মার্চ্চ তারিখে এ দেশের দেশী ও বিলাতী সৈন্যের সাত হাজার সাতানব্বই জন 'কিংস কমিশন' ধারী অর্থাৎ লেফ্‌টেনান্ট, ক্যাপ্টেন, মেজর, কর্ণেল প্রভৃতি পদে নিযুক্ত অফিসারের মধ্যে মাত্র একশত সাত জন ভারতীয় ছিল। ইহাদের মধ্যে ছাব্বিশ জন ভারতীয় অশ্বারোহী সৈন্যদলে, সাত জন পাইওনিয়ার্স রেজিমেণ্ট, ষাট জন পদাতিক সৈন্যদলে নিযুক্ত ও চৌদ্দ জন এখনও অনিযুক্ত অবস্থায় আছেন। ভারতীয় সেনাবাহিনীতে উনিশটি মাউন্টেন ব্যাটারী বা পার্ব্বত্য তোপখানা আছে। কিন্তু ইহার মধ্যে কোন ভারতীয় অফিসার নাই। স্যাপার্‌স্ ও মাইনার্স অথবা ইঞ্জিনিয়র সৈন্যদের উপরেও কোন ভারতীয় অফিসার নাই।

এই অবস্থায় আমাদের দেশের রাজনৈতিক নেতারা আজ দশ বৎসরেরও অধিককাল ধরিয়া সৈন্যদলে আরও বেশী ভারতীয় অফিসার নিয়োগ করিবার জন্য আন্দোলন করিয়া আসিতেছেন। কিন্তু তাঁহাদের আন্দোলনে এ-পর্য্যন্ত খুব বেশী ফল হয় নাই। বিলাতের 'ওয়র অফিস' ও এখানকার ইংরেজ সেনানায়কদের আপত্তি ও বাধা অতিক্রম করিয়া ভারত গবর্ন্মেণ্টের পক্ষে এই বিষয়ে সামান্য কিছু করাও সম্ভব হয় নাই, ভারতীয় সৈন্যদলকে সম্পূর্ণরূপে 'ইণ্ডিয়ানাইজেশ্যন' বা স্বদেশীকরণ ত দূরের কথা।

সুতরাং কথাটা গোলটেবিল বৈঠকে উঠে। অনেক আলোচনার পর গোলটেবিল বৈঠকের ৭নং সাব-কমিটি দুইটি সিদ্ধান্তে পৌঁছেন—(১) ভবিষ্যতে ভারতীয় সৈন্যদলে প্রতিবৎসর আরও অধিকসংখ্যক ভারতীয় অফিসার নিযুক্ত করা হইবে; এবং (২) ভারতবর্ষে অফিসার তৈরি করিবার জন্য যথাশীঘ্র একটি সামরিক কলেজ স্থাপিত হইবে। কিন্তু কত সংখ্যক ভারতীয় নিযুক্ত করা হইবে বা কতদিনের মধ্যে ভারতীয় সেনাবাহিনীকে সম্পূর্ণরূপে স্বদেশী করা হইবে, এ-সম্বন্ধে সাব-কমিটির মধ্যে মতভেদ ঘটে। এক দল বলেন, যে, এ-বিষয়ে কোন প্রতিশ্রুতি দেওয়া সম্ভব নয়, কারণ কি ভাবে এবং কত ভারতীয় নিযুক্ত করিলে সৈন্যদলের কোনও ক্ষতি হইবে না, তাহা একমাত্র প্রধান সেনাপতি এবং সেনানায়কেরাই বলিতে পারেন; সুতরাং এ-বিষয়ে কি করা হইবে বা হইবে না তাহার ভার সম্পূর্ণরূপে সামরিক কর্ম্মচারীদের হাতেই ছাড়িয়া দেওয়া উচিত। অপর দল বলেন, যে, এ-বিষয়ে একটা স্থিরসিদ্ধান্তে পৌঁছিতে না পারিবার কোন কারণ নাই; কারণ যদি অফিসার হইবার যোগ্যতাযুক্ত ভারতীয় উপযুক্ত সংখ্যায় পাওয়া যায় এবং তাহাদিগকে যদি রীতিমত শিক্ষা দেওয়া যায়, তাহা হইলে কেন যে কয়েক বৎসরের মধ্যেই ভারতীয় সৈন্যদলের সমস্ত অফিসারের পদে ভারতীয়দের নিযুক্ত করা যাইবে না, তাহার কোন সঙ্গত হেতু নাই। বলা বাহুল্য, সাব-কমিটিতে এই মতভেদের কোন মীমাংসা হয় নাই। একটা নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ভারতবর্ষের সেনা-বাহিনীকে সম্পূর্ণরূপে ভারতীয় করা হইবে, মিঃ জিন্না শেষপর্য্যন্ত এইরূপ একটা অঙ্গীকারের জন্য দাবি করেন। কিন্তু তিনি সরকারী পক্ষ হইতে এরূপ কোন প্রতিশ্রুতি আদায় করিতে পারেন নাই। সাত নম্বর সাব-কমিটির অন্য ভারতীয় সদস্যেরা তাঁহার মত দৃঢ়তা দেখাইলে, সে প্রতিশ্রুতি লওয়া যাইত কি না সে বিষয়ে এখন আর আলোচনা করিয়া লাভ নাই; কারণ অন্য ভারতীয় সদস্যেরা তাহা করেন নাই। তাঁহারা মুখে না হইলেও কাজে গবর্ন্মেণ্টের কথাই মানিয়া লইয়াছেন। ইহাতে ভারতবর্ষের সৈন্যদলকে কি ভাবে এবং কতটুকু স্বদেশী করা হইবে, তাহা সম্পূর্ণরূপে সামরিক কর্ম্মচারীদের ইচ্ছাধীন হইয়া পড়িয়াছে। ইহার ফল কি হইতে চলিয়াছে তাহা ইণ্ডিয়ান স্যাণ্ডহার্ষ্ট কমিটির দ্বারা সামরিক কর্ম্মচারীরা কি করাইয়া লইবার চেষ্টা করিতেছেন তাহা দেখিয়াই স্পষ্ট বোঝা যাইতেছে।

—

ভ্রম-সংশোধন

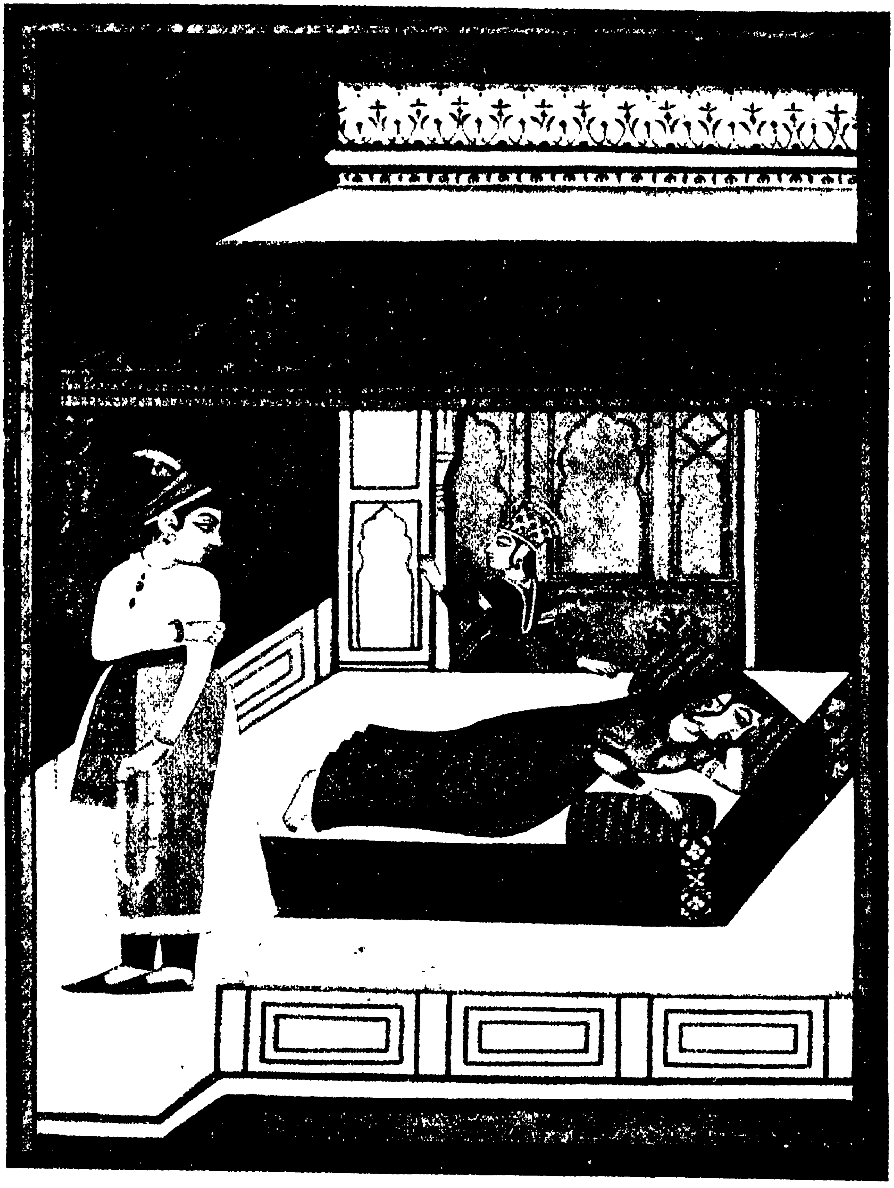
গত জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রবাসীতে প্রকাশিত 'বোম্বাই-প্রবাসী বাঙালী' প্রবন্ধের পাণ্ডুলিপিতে ভুল থাকায় উহার কয়েকটি স্থলে সংশোধন আবশ্যক। সেইগুলি নিম্নে দেওয়া হইল :—

২৫০ পৃষ্ঠার দ্বিতীয় স্তম্ভে ছবির নীচে "শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র সেন. এম-এ, আই-সি-এস" স্থলে "শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র সেন, বি-এ, আই-সি-এস"

২৫২ পৃষ্ঠার দ্বিতীয় স্তম্ভে ছবির নীচে "শ্রীদেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, বি-এস্‌সি, বি-ই" স্থলে "শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন, বি-এস্‌সি, বি-ই"

২৫৩ পৃষ্ঠার দ্বিতীয় স্তম্ভে অষ্টম পংক্তিতে "প্রায় পঞ্চাশ বৎসর" স্থলে "প্রায় পাঁচ বৎসর" হইবে।

১২০।২ নং আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা প্রবাসী প্রেস হইতে শ্রীসজনীকান্ত দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।



রাগিণী ললিত

একটি প্রাচীন চিত্র হইতে

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

প্রবাসী

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"

"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৩১শ ভাগ
১ম খণ্ড

শ্রাবণ, ১৩৩৮

৪র্থ সংখ্যা

হিন্দু মুসলমান

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ভারতবর্ষের সকল প্রদেশের সকল সমাজের ঐক্যে প্রতিষ্ঠিত এক মহাজাতিকে জাগিয়ে তুলে তার একচ্ছত্র আসন রচনা করব বলে দেশ-নেতারা পণ করেছেন।

ঐ আসন জিনিষটা, অর্থাৎ যাকে বলে কন্‌ষ্টিট্যুশান্‌, ওটা বাইরের, রাষ্ট্রশাসনব্যবস্থায় আমাদের পরস্পরের অধিকার নির্ণয় দিয়ে সেটা গড়েপিটে তুলতে হবে। তার নানারকমের নমুনা নানা দেশের ইতিহাসে দেখেচি, তারি থেকে যাচাই বাছাই করে প্ল্যান ঠিক করা চলচে। এই ধারণা ছিল ওটাকে পাকা করে খাড়া করবার বাধা বাইরে, অর্থাৎ বর্ত্তমান কর্ত্তৃপক্ষদের ইচ্ছার মধ্যে। তারি সঙ্গে রফা করবার তক্‌রার করবার কাজে কিছুকাল থেকে আমরা উঠে পড়ে লেগেছি।

যখন মনে হ'ল কাজ এগিয়েছে হঠাৎ ধাক্কা খেয়ে দেখি, মস্ত বাধা নিজেদের মধ্যেই। গাড়িটাকে তীর্থে পৌঁছে দেবার প্রস্তাবে সারথী যদিবা আধরাজি হ'ল, ওটাকে আস্তাবল থেকে ঠেলে বের করবার সময় হুঁস হ'ল একা গাড়িটার দুই চাকায় বিপরীত রকমের অমিল, চালাতে গেলেই উল্টে পড়বার জো হয়।

যে বিরুদ্ধ মানুষটার সঙ্গে আমাদের বাইরের সম্বন্ধ, বিবাদ করে একদিন তাকে হটিয়ে বাহির করে দেওয়া দুঃসাধ্য হ'লেও নিতান্ত অসাধ্য নয়, সেখানে আমাদের হারজিতের মামলা। কিন্তু ভিতরের লোকের বিবাদে কোনো একপক্ষ জিৎলেও মোটের উপর সেটা হার, আর হারলেও শান্তি নেই। কোনো পক্ষকে বাদ দেবারও জো নেই, আবার দাবিয়ে রাখতে গেলেও উৎপাতকে চিরকাল উত্তেজিত করে রাখাই হবে। ডান পাশের দাঁত বাঁ পাশের দাঁতকে নড়িয়ে দিয়ে যদি বড়াই করতে চায় তবে অবশেষে নিজে অনড় থাকবে না।

এত দিন রাষ্ট্রসভায় বরসজ্জাটার পরেই একান্ত মন দিয়েছিলুম, আসনটা কেমন হবে এই কথা ভেবেই মুগ্ধ। ওটা মহামূল্য ও লোভনীয়। প্রতিবেশীরা যারা কিংখাবের আসন বানিয়েছে তাদের আসরের ঘটা দেখে ঈর্ষা হয়। কিন্তু হায়রে, স্বয়ং বরকে বরণ করবার আন্তরিক আয়োজন বহুকাল থেকে ভুলেই আছি। আজ তাই পণ নিয়ে বরযাত্রীদের লড়াই বাধে। শুভকর্ম্মে অশুভ-গ্রহের শান্তির কথাটায় প্রথম থেকেই মন দিই নি,

কেবল আসনটার মালমসলার ফর্দ্দ নিয়ে বেলা বইয়ে দিয়েচি।

রাষ্ট্রিক মহাসন 'নর্ম্মাণের চেয়ে রাষ্ট্রিক মহাজাতি সৃষ্টির প্রয়োজন আমাদের দেশে অনেক বড় একথা বলা বাহুল্য। সমাজে ধর্ম্মে ভাষায় আচারে আমাদের বিভাগের অন্ত নেই। এই বিদীর্ণতা আমাদের রাষ্ট্রিক সম্পূর্ণতার বিরোধী, কিন্তু তার চেয়ে অশুভের কারণ এই যে, এই বিচ্ছেদে আমাদের মনুষ্যত্ব-সাধনার ব্যাঘাত ঘটিয়েচে। মানুষে মানুষে কাছাকাছি বাস করে তবু কিছুতে মনের মিল হয় না, কাজের যোগ থাকে না, প্রত্যেক পদে মারামারি কাটাকাটি বেধে যায়, এটা বর্ব্বরতার লক্ষণ। অথচ আমরা যে-আত্মশাসনের দাবী করচি সেটা তো বর্ব্বরের প্রাপ্য নয়। যাদের ধর্ম্মে সমাজে প্রথায় যাদের চিত্তবৃত্তির মধ্যে এমন একটা মজ্জাগত জোড়-ভাঙানো দুর্য্যোগ আছে যে, তারা কথায় কথায় এক-খানাকে সাতখানা করে ফেলে, সেই ছত্রভঙ্গের দল ঐক-রাষ্ট্রিক সত্তাকে উদ্ভাবিত করবে কোন্ যন্ত্রের সাহায্যে?

যে-দেশে প্রধানত ধর্ম্মের মিলেই মানুষকে মেলায়, অন্য কোনো বাঁধনে তাকে বাঁধতে পারে না, সে-দেশ হতভাগ্য। সে-দেশ স্বয়ং ধর্ম্মকে দিয়ে যে-বিভেদ সৃষ্টি করে সেইটে সকলের চেয়ে সর্ব্বনেশে বিভেদ। মানুষ বলেই মানুষের যে মূল্য সেইটেকেই সহজ প্রীতির সঙ্গে স্বীকার করাই প্রকৃত ধর্ম্মবুদ্ধি। যে-দেশে ধর্ম্মই সেই বুদ্ধিকে পীড়িত করে রাষ্ট্রিক স্বার্থবুদ্ধি কি সে দেশকে বাঁচাতে পারে?

ইতিহাসে বারে বারে দেখা গেছে যখন কোনো মহাজাতি নবজীবনের প্রেরণায় রাষ্ট্রবিপ্লব প্রবর্ত্তন করেছে, তার সঙ্গে সঙ্গে প্রবলভাবে প্রকাশ পেয়েছে তার ধর্ম্মবিদ্বেষ। দেড়শত বৎসর পূর্ব্বকার ফরাসী-বিপ্লবে তার দৃষ্টান্ত দেখা গেছে। সোভিয়েট রাশিয়া প্রচলিত ধর্ম্মতন্ত্রের বিরুদ্ধে বদ্ধ-পরিকর। সম্প্রতি স্পেনেও এই ধর্ম্মহননের আগুন উদ্দীপ্ত। মেক্সিকোয় বিদ্রোহ বারে বারে রোমক চার্চ্চকে আঘাত করতে উদ্যত।

নব্য তুর্কী যদিও প্রচলিত ধর্ম্মকে উন্মূলিত করেনি কিন্তু বলপূর্ব্বক তার শক্তি হ্রাস করেছে। এর ভিতরকার কথাটা এই যে, বিশেষ ধর্ম্মের আদিপ্রবর্ত্তক-গণ দেবতার নামে মানুষকে মেলাবার জন্যে, তাকে লোভ দ্বেষ অহঙ্কার থেকে মুক্তি দেবার জন্যে উপদেশ দিয়ে-ছিলেন। তারপরে সম্প্রদায়ের লোক মহাপুরুষদের বাণীকে সঙ্ঘবদ্ধ করে বিকৃত করেছে, সঙ্কীর্ণ করেছে,—সেই ধর্ম্ম দিয়ে মানুষকে তারা যেমন ভীষণ মার মেরেছে এমন বিষয়বুদ্ধি দিয়েও নয়,—মেরেছে প্রাণে মানে বুদ্ধিতে শক্তিতে,—মানুষের মহোৎকৃষ্ট ঐশ্বর্য্যকে ছারখার করেচে,—ধর্ম্মের নামে পুরাতন মেক্সিকোয় স্পেনীয় খৃষ্টানদের অকথ্য নিষ্ঠুরতার তুলনা নেই। পৃথিবীতে অপ্রতিহত প্রভুত্ব নিয়ে রাজা যেমন কতবার দুর্দ্দান্ত অরাজকতায় মত্ত হয়েচে, প্রজার রক্ষাকর্ত্তা নাম নিয়ে প্রজার সর্ব্বনাশ করতে কুণ্ঠিত হয়নি, এবং অবশেষে সেই কারণেই আজকের ইতিহাসে রাজ্য থেকে রাজার কেবলই বিলুপ্তি ঘটচে, ধর্ম্ম সম্বন্ধেও অনেক স্থলে সেই একই কারণে ধর্ম্মতন্ত্রের নিদারুণ অধার্ম্মিকতা দমন করবার জন্যে, মানুষকে ধর্ম্মপীড়া থেকে বাঁচাবার জন্যে অনেক-বার চেষ্টা দেখা গেল। আজ সেই সেই দেশেই প্রজা যথার্থ স্বাধীনতা পেয়েছে, যে দেশে ধর্ম্মমোহ মানুষের চিত্তকে অভিভূত করে এক দেশবাসীর মধ্যে পরস্পরের প্রতি ঔদাসীন্য বা বিরোধকে নানা আকারে ব্যাপ্ত করে না রেখেচে।

হিন্দু সমাজে আচার নিয়েচে ধর্ম্মের নাম। এই কারণে আচারের পার্থক্যে পরস্পরের মধ্যে কঠিন বিচ্ছেদ ঘটায়। মৎস্যাশী বাঙালীকে নিরামিষ প্রদেশের প্রতিবেশী আপন বলে মনে করতে কঠিন বাধা পায়। সাধারণত বাঙালী অন্য প্রদেশে গিয়ে অভ্যস্ত আচারের ব্যতিক্রম উপলক্ষ্যে অবজ্ঞা মনের মধ্যে পোষণ করে। যে-চিত্তবৃত্তি বাহ্য আচারকে অত্যন্ত বড় মূল্য দিয়ে থাকে তার মমত্ববোধ সঙ্কীর্ণ হতে বাধ্য। রাষ্ট্র-সম্মিলনীতেও এই অভাব কথায় কথায় ধরা পড়ে এবং দেখা যায়, আমরা যে অলক্ষ্য ব্যবধান সঙ্গে করে নিয়ে বেড়াই তা সংস্কারগত অতি সূক্ষ্ম এবং সেইজন্য অতি দুর্লঙ্ঘ্য। আমরা যখন মুখে তাকে অস্বীকার করি তখনও নিজের

অগোচরেও সেটা অন্তঃকরণের মধ্যে থেকে যায়। ধর্ম্ম আমাদের মেলাতে পারে নি, বরঞ্চ হাজারখানা বেড়া গড়ে তুলে সেই বাধাগুলোকে ইতিহাসের অতীত শাশ্বত বলে পাকা করে দিয়েচে। ইংরেজ নিজের জাতকে ইংরেজ বলেই পরিচয় দেয়। যদি বল্‌ত খৃষ্টান, তাহলে যে ইংরেজ বৌদ্ধ বা মুসলমান বা নাস্তিক তাকে নিয়ে রাষ্ট্রগঠনে মাথা-ঠোকাঠুকি বেধে যেত। আমাদের প্রধান পরিচয় হিন্দু বা মুসলমান। একদলকে বিশেষ পরিচয়কালে বলি বটে হিন্দুস্থানী, কিন্তু তাদের হিন্দুস্থান বাংলার বাইরে।

কয়েক বছর পূর্ব্বে আমার ইংরেজ বন্ধু এণ্ড্রুজকে নিয়ে মালাবারে ভ্রমণ করছিলুম। ব্রাহ্মণ-পল্লীর সীমানায় পা বাড়াতেই টিয়া-সমাজভুক্ত একজন শিক্ষিত ভদ্রলোক আমাদের সঙ্গ ত্যাগ করে দৌড় দিলেন। এণ্ড্রুজ বিস্মিত হয়ে তাঁকে গিয়ে ধরলেন, এবং প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করাতে জান্‌লেন, এ পাড়ায় তাঁদের জাতের প্রবেশ নিষেধ। বলা বাহুল্য, হিন্দুসমাজ বিধি অনুসারে এণ্ড্রুজের আচারবিচার টিয়া ভদ্রলোকের চেয়ে অনেক গুণে অশাস্ত্রীয়। শাসনকর্ত্তার জাত বলে তাঁর জোর আছে, কিন্তু হিন্দু বলে হিন্দুর কাছে আত্মীয়তার জোর নেই। তার সম্বন্ধে হিন্দুর দেবতা পর্য্যন্ত জাত বাঁচিয়ে চলেন, স্বয়ং জগন্নাথ পর্য্যন্ত প্রত্যক্ষ দর্শনীয় নন। বৈমাত্র্য সন্তানও মাতার কোলের অংশ দাবী করতে পারে,—ভারতে বিশ্বমাতার কোলে এত ভাগ কেন? অনাত্মীয়তাকে অস্থিমজ্জায় আমরা সংস্কারগত করে রেখেছি অথচ রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে তাদের আত্মীয়তা না পেলে আমরা বিস্মিত হই। শোনা গিয়েছে, এবার পূর্ব্ববঙ্গে কোথাও কোথাও হিন্দুর প্রতি উৎপাতে নমশূদ্ররা নির্দ্দয়ভাবে মুসলমানদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিল। ভাবতে হবে না কি, ওদের দরদ হ'ল না কেন, আত্মীয়তার দায়িত্বে বাধা পড়ল কোথায়?

এই অনাত্মীয়তার অসংখ্য অন্তরাল বহু যুগ ধরে প্রকাশ্যে আমাদের রাষ্ট্রভাগ্যকে ব্যর্থ করেছে এবং আজও ভিতরে ভিতরে আমাদের দুঃখ ঘটাচ্চে। জোর গলায় যেখানে বলচি, আমরা এক, সূক্ষ্ম সুরে সেখানে অন্তর্য্যামী আমাদের মর্ম্মস্থানে বসে বলচেন, ধর্ম্মেকর্ম্মে আচারে বিচারে এক হবার মত ঔদার্য্য তোমাদের নেই। এর ফল ফলচে; আর রাগ করচি ফলের উপরে, বীজ বপনের উপরে নয়।

যখন বঙ্গবিভাগের সাংঘাতিক প্রস্তাব নিয়ে বাঙালীর চিত্ত বিক্ষুব্ধ তখন বাঙালী অগত্যা বয়কট্‌-নীতি অবলম্বন করতে চেষ্টা করেছিল। বাংলার সেই দুর্দ্দিনের সুযোগে বম্বাই মিলওয়ালা নির্ম্মমভাবে তাঁদের মুনফার অঙ্ক বাড়িয়ে তুলে আমাদের প্রাণপণ চেষ্টাকে প্রতিহত করতে কুণ্ঠিত হননি। সেই সঙ্গে দেখা গেল বাঙালী মুসলমান সেদিন আমাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়ালেন। সেই যুগেই বাংলা দেশে হিন্দু মুসলমানে লজ্জাজনক কুৎসিত কাণ্ডের সূত্রপাত হ'ল। অপরাধটা প্রধানত কোন্ পক্ষের এবং এই উপদ্রব অকস্মাৎ কোথা থেকে উৎসাহ পেলে সে তর্কে প্রয়োজন নেই। আমাদের চিন্তা করবার বিষয়টা হচ্ছে এই যে, বাংলা দ্বিখণ্ডিত হ'লে বাঙালী জাতের মধ্যে যে পঙ্গুতার সৃষ্টি হ'ত, সেটা বাংলা দেশের সকল সম্প্রদায়ের এবং বস্তুত সমস্ত ভারতবর্ষেরই পক্ষে অকল্যাণকর, এটা যথার্থ দরদ দিয়ে বোঝবার মত একাত্মকতা আমাদের নেই বলে সেদিন বাঙালী হিন্দুর বিরুদ্ধে অনাত্মীয় অসহ-যোগিতা সম্ভব হয়েছিল। রাষ্ট্রপ্রতিমার কাঠামো গড়বার সময় এ কথাটা মনে রাখা দরকার। নিজেকে ভোলানোর ছলে বিধাতাকে ভোলাতে পারব না।

এই ব্যাপারে সেদিন অনেকেই রাগারাগি করেছিলেন। কিন্তু ফুটো কলসীতে জল তুলতে গেলে জল যে পড়ে যায় তা নিয়ে জলের উপরে বা কলসীর উপরে চোখ রাঙিয়ে লাভ কি? গবজ আমাদের যতই থাক্ ছিদ্রটা স্বভাবত ছিদ্রের মতই ব্যবহার করবে। কলঙ্ক আমাদেরই, আর সে কলঙ্ক যথাসময়ে ধরা পড়বেই, দৈবের কৃপায় লজ্জা নিবারণ হবে না।

কথা হয়েচে ভারতবর্ষে একরাষ্ট্রশাসন না হয়ে যুক্ত রাষ্ট্রশাসননীতির প্রবর্ত্তন হওয়া চাই। অর্থাৎ একেবারে জোড়ের চিহ্ন থাকবে না এতটা দূর মিলে যাবার মত ঐক্য আমাদের দেশে নেই এ কথাটা মেনে নিতে হয়েচে। আমাদের রাষ্ট্রসমস্যার এ একটা

কেজো রকমের নিষ্পত্তি বলে ধরে নেওয়া যাক। কিন্তু তবু একটা কঠিন গ্রন্থি রয়ে গেল, হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে ভেদ ও বিরোধ। এই বিচ্ছেদটা নানা কারণে আন্তরিক হয়ে দাঁড়িয়েছে। বাইরে থেকে রাষ্ট্রনৈতিক প্রলেপ দিয়ে এর ফাটল নিবারণ করা চলবে না, কোনো কারণে একটু তাপ বেড়ে উঠলেই আবার ফাটল ধরবে।

যেখানে নিজেদের মধ্যে সত্যকার ভেদ সেখানেই রাষ্ট্রিক ক্ষমতার হিস্যা নিয়ে স্বতন্ত্র কোঠায় স্বতন্ত্র হিসাব চল্‌তে থাকে। সেখানে রাষ্ট্রিক সম্পদে সকলেরই অখণ্ড স্বার্থের কথাটা স্বভাবতই মনে থাকে না। এমন দুর্গ্রহে একই গাড়িকে দুটো ঘোড়া দুদিকে টানবার মুস্কিল বাধায়। এখন থেকেই অধিকারের ভাগ-বখরা নিয়ে হট্টগোল জেগেচে। রাষ্ট্রনৈতিক বিষয়বুদ্ধির যোগে গোলটেবিল পেরিয়েও এই গোল উত্তরোত্তর বাড়বে বই কমবে এমন আশা আছে কি? বিষয়বুদ্ধির আমলে সহোদর ভাইদের মধ্যেও বচসা বেধে যায়। শেষকালে গুণ্ডাদের হাতেই লাঠিসড়কির যোগে যমের দ্বারে চরম নিষ্পত্তির ভার পড়ে।

একদল মুসলমান সম্মিলিত নির্ব্বাচনের বিরুদ্ধে, তাঁরা স্বতন্ত্র নির্ব্বাচনরীতি দাবী করেন এবং তাঁদের পক্ষের ওজন ভারী করবার জন্যে নানা বিশেষ সুযোগের বাটখারা বাড়িয়ে নিতে চান। যদি মুসলমানদের সবাই বা অধিকাংশ একমত হয়ে স্বতন্ত্র নির্ব্বাচনরীতির দাবী করেন, এবং নিজেদের পক্ষের ওজন বাড়িয়ে নিতে চান, তা হলে এমনতরো দাবী মেনে নিয়েও আপোষ করতে মহাত্মাজী রাজি আছেন বলে বোধ হ'ল। তা যদি হয়, তাঁর প্রস্তাব মাথা পেতে নেওয়াই ভাল। কেন-না, ভারতবর্ষের তরফে রাষ্ট্রিক যে অধিকার আমাদের জয় করে নিতে হবে, তার সুস্পষ্ট মূর্ত্তি এবং সাধনার প্রণালী সমগ্রভাবে তাঁরই মনে আছে। এ পর্য্যন্ত একমাত্র তিনিই সমস্ত ব্যাপারটাকে অসামান্য দক্ষতার সঙ্গে প্রবল বাধার বিরুদ্ধে অগ্রসর করে এনেছেন। কাজ উদ্ধারের দিকে দৃষ্টি রাখলে শেষ পর্য্যন্ত তাঁরই হাতে সারথ্য-ভার দেওয়া সঙ্গত। তবু একজনের বা একদলের ব্যক্তিগত সহিষ্ণুতার প্রতি নির্ভর করে একথা ভুললে চলবে না, যে, অধিকার পরিবেষণে কোনো একপক্ষের প্রতি যদি পক্ষপাত করা হয় তবে সাধারণ মানব-প্রকৃতিতে সেই অবিচার সইবে না, এই নিয়ে একটা অশান্তি নিয়তই মার-মুখো হয়ে থেকে যাবে। বস্তুত এটা পরস্পরের বিবাদ মেটাবার পন্থা নয়। সকলেই যদি একজোট হয়ে প্রসন্ন মনে এক-ঝোঁকা আপোষ করতে রাজি হয় তাহলে ভাবনা নেই; কিন্তু মানুষের মন! তার কোনো একটা তারে যদি অত্যন্ত বেশী টান পড়ে তবে সুর যায় বিগড়ে, তখন সঙ্গীতের দোহাই পাড়লেও সঙ্গৎ মাটি হয়। ঠিক জানি না কি ভাবে মহাত্মাজী এ সম্বন্ধে চিন্তা করচেন। হয়ত গোলটেবিল বৈঠকে আমাদের সম্মিলিত দাবীর জোর অক্ষুণ্ণ রাখাই আপাতত সব চেয়ে গুরুতর প্রয়োজন বলে তাঁর মনে হতে পারে। দুই পক্ষই আপন আপন জিদে সমান অটল হয়ে বস্‌লে কাজ এগোবে না। এ কথা সত্য। এ ক্ষেত্রে এক পক্ষে ত্যাগ স্বীকার করে মিটমাট হয়ে গেলে উপস্থিত রক্ষা হয়। একেই বলে ডিপ্লোম্যাসি। পলিটিক্‌সে প্রথম থেকেই ষোল আনা প্রাপ্যের উপর চেপে বসলে ষোল আনাই খোয়াতে হয়। যারা অদূরদর্শী কৃপণের মত অত্যন্ত বেশী টানাটানি না করে' আপোষ করতে জানে তারাই জেতে। ইংরেজের এই গুণ আছে, নৌকোডুবি বাঁচাতে গিয়ে অনেকটা মাল ইংরেজ জলে ফেলে দিতে পারে। আমার নিজের বিশ্বাস বর্ত্তমান আপোষের প্রস্তাবে ইংরেজের কাছে আমরা যে প্রকাণ্ড ক্ষতিস্বীকার দাবী করচি সেটা য়ুরোপের আর কোন জাতির কাছে একেবারেই খাটতো না, তারা আগাগোড়াই ঘুষি উঁচিয়ে কথাটা সম্পূর্ণ চাপা দেবার চেষ্টা করত। রাষ্ট্রনৈতিক ব্যাপারে ইংরেজের সুবুদ্ধি বিখ্যাত; ইংরেজ সবখানির দিকে তাকিয়ে অনেকখানি সহ্য করতে পারে। এই বুদ্ধির প্রয়োজন যে আমাদের নেই এ কথা গোঁয়ারের কথা; আখেরে গোঁয়ারের হার হয়ে থাকে। রাষ্ট্রিক অধিকার সম্বন্ধে একগুঁয়েভাবে দর-কষাকষি নিয়ে হিন্দু মুসলমানে মনকষাকষিকে অত্যন্ত বেশী দূর এগোতে দেওয়া শত্রু-পক্ষের আনন্দবর্দ্ধনের প্রধান উপায়।

আমার বক্তব্য এই যে, উপস্থিত কাজ উদ্ধারের খাতিরে আপাতত নিজের দাবী খাটো করেও একটা মিটমাট করা সম্ভব হয় তো হোক—কিন্তু তবু আসল কথাটাই বাকি রইল। পলিটিক্সের ক্ষেত্রে বাইরে থেকে যেটুকু তালি-দেওয়া মিল হতে পারে সে মিলে আমাদের চিরকালের প্রয়োজন টিঁকবে না। এমন কি পলিটিক্সেও এ তালিটুকু বরাবর অটুট থাকবে এমন আশা নেই, ঐ ফাঁকির জোড়টার কাছে বারে বারেই টান পড়বে। যেখানে গোড়ায় বিচ্ছেদ, সেখানে আগায় জল ঢেলে গাছকে চিরদিন তাজা রাখা অসম্ভব। আমাদের মিল্‌তে হবে সেই গোড়ায়, নইলে কিছুতে কল্যাণ নেই।

এতদিন সেই গোড়ার দিকে এক রকমের মিল ছিল। পরস্পরের তফাৎ মেনেও আমরা পরস্পর কাছাকাছি ছিলুম। সম্প্রদায়ের গণ্ডীর উপর ঠোকর খেয়ে পড়তে হ'ত না, সেটা পেরিয়েও মানুষে মানুষে মিলের যথেষ্ট জায়গা ছিল। হঠাৎ এক সময়ে দেখা গেল দুই পক্ষই আপন ধর্ম্মের অভিমানকে উঁচিয়ে তুলতে লেগেছে। যতদিন আমাদের মধ্যে ধর্ম্মবোধ সহজ ছিল ততদিন গোঁড়ামি থাকা সত্ত্বেও কোনও হাঙ্গাম বাধেনি, কিন্তু এক সময়ে যে কারণেই হোক, ধর্ম্মের অভিমান যখন উগ্র হয়ে উঠল তখন থেকে সম্প্রদায়ের কাঁটার বেড়া পরস্পরকে ঠেকাতে ও খোঁচাতে সুরু করলে। আমরাও মসজিদের সামনে দিয়ে প্রতিমা নিয়ে যাবার সময় কিছু অতিরিক্ত জিদের সঙ্গে ঢাকে কাঠি দিলুম, অপর পক্ষেও কোরবানির উৎসাহ পূর্ব্বের চেয়ে কোমর বেঁধে বাড়িয়ে তুললে, সেটা আপন আপন ধর্ম্মের দাবী মেটাবার খাতির নিয়ে নয়, পরস্পরের ধর্ম্মের অভিমানকে আঘাত দেবার স্পর্দ্ধা নিয়ে। এই সমস্ত উৎপাতের সুরু হয়েচে শহরে, যেখানে মানুষে মানুষে প্রকৃত মেলামেশা নেই বলেই পরস্পরের প্রতি দরদ থাকে না।

ধর্ম্মমত ও সমাজরীতি সম্বন্ধে হিন্দু মুসলমানে শুধু প্রভেদ নয়, বিরুদ্ধতা আছে একথা মানতেই হবে। অতএব আমাদের সাধনার বিষয় হচ্চে তৎসত্ত্বেও ভাল রকম করে মেলা চাই। এই সাধনায় সিদ্ধিলাভ আমাদের না হ'লে নয়। কিন্তু এর একান্ত আবশ্যকতার কথা আমাদের সমস্ত হৃদয়মন দিয়ে আজও ভাবতে আরম্ভ করিনি। একদা খিলাফতের সমর্থন করে মহাত্মাজী মিলনের সেতু নির্ম্মাণ করতে পারবেন মনে করেছিলেন। কিন্তু এহ বাহ্য। এটা গোড়াকার কথা নয়, এই খেলাফৎ সম্বন্ধে মতভেদ থাকা অন্যায় মনে করিনে, এমন কি, মুসলমানদের মধ্যেই যে থাক্‌তে পারে তার প্রমাণ হয়েচে।

নানা উপলক্ষ্যে এবং বিনা উপলক্ষ্যে সর্ব্বদা আমাদের পরস্পরের সঙ্গ ও সাক্ষাৎ-আলাপ চাই। যদি আমরা পাশাপাশি চলি, কাছাকাছি আসি, তাহলেই দেখতে পাব, মানুষ বলেই মানুষকে আপন বলে মনে করা সহজ। যাদের সঙ্গে মেলামেশা নেই, তাদের সম্বন্ধেই মত প্রভৃতির অনৈক্য অত্যন্ত কড়া হয়ে ওঠে, বড় হয়ে দেখা দেয়। যখনি পরস্পর কাছাকাছি আনাগোনার চর্চ্চা হতে থাকে তখনই মত পিছিয়ে পড়ে, মানুষ সামনে এগিয়ে আসে। শান্তিনিকেতনে মাঝে মাঝে মুসলমান ছাত্র ও শিক্ষক এসেছেন, তাঁদের সঙ্গে আমাদের কোন প্রভেদ অনুভব করিনি, এবং সখ্য ও স্নেহ সম্বন্ধ স্থাপনে লেশমাত্র বাধা ঘটেনি। যে-সকল গ্রামের সঙ্গে শান্তিনিকেতনের সম্বন্ধ তার মধ্যে মুসলমান গ্রাম আছে। যখন কল্‌কাতায় হিন্দু মুসলমানের দাঙ্গা দ্রুত সহযোগে কল্‌কাতার বাইরে ছড়িয়ে চলেচে তখন বোলপুর অঞ্চলে মিথ্যা জনরব রাষ্ট্র করা হয়েছিল যে, হিন্দুরা মসজিদ ভেঙে দেবার সঙ্কল্প করচে, এই সঙ্গে কল্‌কাতা থেকে গুণ্ডার আমদানিও হয়েছিল। কিন্তু স্থানীয় মুসলমানদের শান্ত রাখতে আমাদের কোনো কষ্ট পেতে হয়নি, কেন না, তারা নিশ্চিত জানত আমরা তাদের অকৃত্রিম বন্ধু।

আমার অধিকাংশ প্রজাই মুসলমান। কোরবানি নিয়ে দেশে যখন একটা উত্তেজনা প্রবল, তখন হিন্দু-প্রজারা আমাদের এলাকায় সেটা সম্পূর্ণ রহিত করবার জন্য আমার কাছে নালিশ করেছিল। সে নালিশ আমি সঙ্গত বলে মনে করিনি, কিন্তু মুসলমান প্রজাদের ডেকে যখন বলে দিলুম কাজটা যেন এমন ভাবে সম্পন্ন করা হয় যাতে হিন্দুদের মনে অকারণে আঘাত না লাগে, তারা তখনি তা মেনে নিলে। আমাদের সেখানে এ পর্য্যন্ত

কোনো উপদ্রব ঘটেনি। আমার বিশ্বাস তার প্রধান কারণ আমার সঙ্গে আমার মুসলমান প্রজার সম্বন্ধ সহজ ও বাধাহীন।

এ কথা আশা করাই চলে না যে, আমাদের দেশের ভিন্ন ভিন্ন সমাজের মধ্যে ধর্ম্মকর্ম্মের মতবিশ্বাসের ভেদ একেবারেই ঘুচতে পারে। তবুও মনুষ্যত্বের খাতিরে আশা করতেই হবে আমাদের মধ্যে মিল হবে। পরস্পরকে দূরে না রাখলেই সে মিল আপনিই সহজ হতে পারবে। সঙ্গের দিক থেকে আজকাল হিন্দু-মুসলমান পৃথক্ হয়ে গিয়ে সাম্প্রদায়িক অনৈক্যকে বাড়িয়ে তুলেছে, মনুষ্যত্বের মিলটাকে দিয়েছে চাপা। আমি হিন্দুর তরফ থেকেই বলছি, মুসলমানের ত্রুটি বিচারটা থাক্—আমরা মুসলমানকে কাছে টান্‌তে যদি না পেরে থাকি তবে সে জন্যে যেন লজ্জা স্বীকার করি। অল্পবয়সে যখন প্রথম জমিদারী সেরেস্তা দেখতে গিয়েছিলুম, তখন দেখলুম আমাদের ব্রাহ্মণ ম্যানেজার যে তক্তপোষে গদিতে বসে দরবার করেন সেখানে একধারে জাজিম তোলা, সেই জায়গাটা মুসলমান প্রজাদের বসবার জন্যে, আর জাজিমের উপর বসে হিন্দু প্রজারা। এইটে দেখে আমার ধিক্কার জন্মেছিল। অথচ এই ম্যানেজার আধুনিক দেশাত্মবোধী দলের। ইংরেজরাজের দরবারে ভারতীয়ের অসম্মান নিয়ে কটুভাষা ব্যবহার তিনি উপভোগ করে থাকেন, তবু স্বদেশীয়কে ভদ্রোচিত সম্মান দেবার বেলা এত কৃপণ। এই কৃপণতা সমাজে ও কর্ম্মক্ষেত্রে অনেক দূর পর্য্যন্ত প্রবেশ করেছে, অবশেষে এমন হয়েছে যেখানে হিন্দু, সেখানে মুসলমানের দ্বার সঙ্কীর্ণ, যেখানে মুসলমান সেখানে হিন্দুর বাধা বিস্তর। এই আন্তরিক বিচ্ছেদ যতদিন থাকবে ততদিন স্বার্থের ভেদ ঘুচবে না এবং রাষ্ট্র-ব্যবস্থায় এক পক্ষের কল্যাণ-ভার অপর পক্ষের হাতে দিতে সঙ্কোচ অনিবার্য্য হয়ে উঠ্‌বে। আজ সম্মিলিত নির্ব্বাচন নিয়ে যে দ্বন্দ্ব বেধে গেছে তার মূল তো এইখানেই। এই দ্বন্দ্ব নিয়ে যখন আমরা অসহিষ্ণু হয়ে উঠি তখন এর স্বাভাবিক কারণটার কথা ভেবে দেখি না কেন?

ইতিমধ্যে বাংলা দেশে অকথ্য বর্ব্বরতা বারে বারে আমাদের সহ্য করতে হয়েছে। জার-শাসনের আমলে এই রকম অত্যাচার রাশিয়ায় প্রায় ঘটত। বর্ত্তমান বিপ্লবপ্রবণ পলিটিক্যাল যুগের পূর্ব্বে আমাদের দেশে এ রকম দানবিক কাণ্ড কখনো শোনা যায়নি। ব্রিটিশ-শাসিত ভারতে বহু গৌরবের law and order পদার্থটা বড় বড় শহরে পুলিস পাহারার জাগ্রত দৃষ্টির সামনে স্পর্দ্ধা সহকারে উপরি উপরি অবমানিত হতে লাগল ঠিক এই বিশেষ সময়টাতেই। মারের দুঃখ কেবল আমাদের পিঠের উপর দিয়েই গেল না, ওটা প্রবেশ করেচে বুকের ভিতরে। এটা এমন সময়ে ঘটল ঠিক যখন হিন্দু মুসলমানে কণ্ঠ মিলিয়ে দাঁড়াতে পারলে আমাদের ভাগ্য সুপ্রসন্ন হ'ত, বিশ্বসভার কাছে আমাদের মাথা হেঁট হ'ত না। এই রকমের অমানুষিক ঘটনায় লোক-স্মৃতিকে চিরদিনের মত বিষাক্ত করে তোলে, দেশের ডান হাতে বাঁ হাতে মিল করিয়ে ইতিহাস গড়ে তোলা দুঃসাধ্য হয়। কিন্তু তাই বলেই তো হাল ছেড়ে দেওয়া চলে না, গ্রন্থি জটিল হয়ে পাকিয়ে উঠেছে বলে ক্রোধের বেগে সেটাকে টানাটানি করে আরও আঁট করে তোলা মূঢ়তা। বর্ত্তমানের ঝাঁজে ভবিষ্যতের বীজটাকে পর্য্যন্ত অফলা করে ফেলা স্বাজাতিক আত্মহত্যার প্রণালী। নানা আশু ও সুদূর কারণে, অনেক দিনের পুঞ্জিত অপরাধে হিন্দু মুসলমানের মিলন-সমস্যা কঠিন হয়েছে, সেইজন্যেই অবিলম্বে এবং দৃঢ় সঙ্কল্পের সঙ্গে তার সমাধানে প্রবৃত্ত হতে হবে। অপ্রসন্ন ভাগ্যের উপর রাগ করে তাকে দ্বিগুণ হন্যে করে তোলা চোরের উপর রাগ করে মাটিতে ভাত খাওয়ার মত।

বর্ত্তমান রাষ্ট্রিক উদ্যোগে বম্বাই প্রদেশে আন্দোলনের কাজটা সবচেয়ে সবেগে চলতে পেরেছিল তার অন্যতম কারণ সেখানে হিন্দু মুসলমানের বিরোধ বাধিয়ে দেবার উপকরণ যথেষ্ট ছিল না। পার্সিতে হিন্দুতে দুই পক্ষ খাড়া করে তোলা সহজ হয়নি। কারণ পার্সি-সমাজ সাধারণত শিক্ষিত সমাজ, স্বদেশের কল্যাণ সম্বন্ধে পার্সিরা বুদ্ধিপূর্ব্বক চিন্তা করতে জানে, তা ছাড়া তাদের মধ্যে ধর্ম্মোন্মত্ততা নেই। বাংলা দেশে আমরা আছি জতুগৃহে, আগুন লাগাতে বেশীক্ষণ লাগে না। বাংলা

দেশে পরের সঙ্গে বোঝাপড়া করতে যখনই নামি, ঠিক সেই সময়টাতেই নিজের ঘর সাম্লানো অসাধ্য হয়ে ওঠে। এই দুর্য্যোগের কারণটা আমাদের এখানে গভীর করে শিকড় গেড়েচে, এ কথাটা মেনে নিতেই হবে। এ অবস্থায় শান্তমনে বুদ্ধিপূর্ব্বক পরস্পরের মধ্যে সন্ধিস্থাপনের উপায় উদ্ভাবনে যদি আমরা অক্ষম হই, বাঙালী-প্রকৃতিসুলভ হৃদয়াবেগের ঝোঁকে যদি কেবলই জেদ জাগিয়ে স্পর্দ্ধা পাকিয়ে তুলি, তাহলে আমাদের দুঃখের অন্ত থাকবে না এবং স্বাজাতিক কল্যাণের পথ একান্ত দুর্গম হয়ে উঠবে।

আমাদের মধ্যে কেউ কেউ চোখ বুজে বলেন সবই সহজ হয়ে যাবে যখন দেশটাকে নিজের হাতে পাব। অর্থাৎ নিজের বোঝাকে অবস্থা পরিবর্ত্তনের কাঁধে চাপাতে পারব এই ভরসায় নিশ্চেষ্ট থাকবার এই ছুতো। কথাটা একটু বিচার করে দেখা যাক্।

ধরে নেওয়া গেল গোলবৈঠকের পরে দেশের শাসন-ভার আমরাই পাব। কিন্তু দেশটাকে হাত-ফেরাফেরি করবার মাঝখানে একটা সুদীর্ঘ সন্ধিক্ষণ আছে। সিভিল সার্ভিসের মেয়াদ কিছুকাল টিঁকে থাকতে বাধ্য। কিন্তু সেইদিনকার সিভিল সার্ভিস হবে ঘা-খাওয়া নেকড়ে বাঘের মত। মন তার গরম হয়ে থাকবার কথা। সেই সময়টুকুর মধ্যে দেশের লোক এবং বিদেশের লোকের কাছে কথাটা দেগে দেগে দেওয়া তার পক্ষে দরকার হবে যে, ব্রিটিশরাজের পাহারা আলগা হবা-মাত্রই অরাজকতার কালসাপ নানা গর্ত্ত থেকে বেরিয়ে চারিদিকেই ফণা তুলে আছে, তাই আমরা স্বদেশের দায়িত্বভার নিতে সম্পূর্ণ অক্ষম। আমাদের আপন লোকদেরকে দিয়েও একথা কবুল করিয়ে নেবার ইচ্ছা তার স্বভাবতই হবে যে, আগেকার আমলে অবস্থা ছিল ভাল। সেই যুগান্তরের সময়ে যে যে গুহায় আমাদের আত্মীয়বিদ্বেষের মারগুলো লুকিয়ে আছে সেই-সেইখানে খুব করেই খোঁচা খাবে। সেইটি আমাদের বিষম পরীক্ষার সময়। সে পরীক্ষা সমস্ত পৃথিবীর কাছে। এখন থেকে সর্ব্বপ্রকারে প্রস্তুত থাকতে হবে যেন বিশ্বজগতের দৃষ্টির সামনে মূঢ়তায় বর্ব্বরতায় আমাদের নূতন ইতিহাসের মুখে কালি না পড়ে।

গাথা সায়ন্তনী

(রবীন্দ্রনাথের বয়ঃক্রম সপ্ততি বর্ষ পূর্ণ হওয়া উপলক্ষ্যে)

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

১

সারাটি গগন ঘুরি', পূর্ব্ব হ'তে পশ্চিম-অচলে
পহুঁছিলে হে রবীন্দ্র !—পলাতকা সে উষা প্রেয়সী
এবার ফিরাবে মুখ, চিরতরে উঠিবে বিকশি'
ক্ষণিকের দেখা সেই আভা তার কপোল-যুগলে !
তারি লাগি' নিশান্তের তারাময় তিমির-তোরণ
খুলিয়া বাহিরি' এলে ; তব নেত্রে নিমেষ হরণ
করেছিল সে উর্ব্বশী—আলোকের প্রথম প্রতিমা !
তোমার উদয়-ছন্দে জাগিল সে-রূপের হিন্দোল,
মেঘে মেঘে মুহুর্মুহু কি বিচিত্র বরণ-হিল্লোল !
ধরণী ফিরিয়া পে'ল অসিত নিচোলে তার
হরিত-নীলিমা ;
অম্বুনিধি আরম্ভিল মৃদু কলরোল।

২

বীণার সে সপ্ততন্ত্রী মুরছিল এক শুভ্র রাগে !—
দিকে দিকে বিরচিলে মায়া-পুরী ছায়া-মনোহর ;
মধ্যাহ্ন অতীত যবে, স্মৃতি-শেষ প্রভাত-প্রহর—
হেরিলে কি পুনঃ সেই পদচিহ্ন রথ-পুরোভাগে ?
বীণায় বাজিল তাই বৈকালী সে রাখালিয়া সুর,
শোনা যায় তারি মাঝে বাজে কার বিধুর নূপুর
দূর হ'তে ! নভো-নাভি হ'তে তাই নিম্ন-মুখে হেলি'
রশ্মি তব প্রসারিলে দীর্ঘতর পশ্চিম-অয়নে—
যেথায় সাগর-তীরে নিশীথের কজ্জল-নয়নে
ঘুমায় সাঁজের তারা ; সোনার
সিকতা 'পরে ক্লান্ত তনু মেলি'
রবি-বিরহিণী রত স্বপন-বয়নে।

৩

ধায় রথ এখনো যে, রশ্মি-রজ্জঃ বিলায়ে বিমানে—
দিগঙ্গনা তাই হ'তে ভরি' লয় করঙ্কে কুঙ্কুম,
জল-জাল হ'তে উঠে বারুণীর কেশধূপ-ধূম,
ছুটে চলে তুরগেরা গোধূলির শিশির-নিপানে।
তব বীণাযন্ত্রে বাজে পূরবীর রাগিণী উদাস—
বৈশাখী নিদাঘ-দিবা মানে না সে বিদায়-হুতাশ ;
যত শেষ হয় আয়ু, তত তার রূপ রমণীয় !—
সে তব চরণে বসি' জানু ধরি' চেয়ে আছে মুখে ;
যৌবন যাপিল যেই তোমা সাথে অসীম কৌতুকে,
সে জানে কাহার লাগি' ছানিয়াছ নীলাকাশে
আলোর অমিয়,
—কার পাণি ভরিবে ও গানের যৌতুকে !

৪

সে দিবারে হেরিয়াছি—কলাবতী কবি-প্রতিভার
চির-স্ফূর্ত্তি ! হেরিয়াছি কেমনে সে জ্যোতির কমল
মুদিত মুকুল হ'তে মেলিয়াছে লাবণ্যের দল
বৃন্ত-বন্ধে, রূপ-অন্ধ-আঁখি হ'তে হরি' অন্ধকার !
অর্দ্ধপথে কে তোমারে ডাক দিল অস্ত-সিন্ধু পারে—
রূপের সোনার-তরী ডুবাইলে সঙ্গীত-পাথারে
কার লাগি' হে বিবাগী ?—সেই দিবা পদতললীনা
চায় কভু নিজপানে, কভু তব নয়ন-মুকুরে,—
হেরে তার সে মূরতি আজও সেথা রহি'
রহি' ফুরে !
তবু কার অনুরাগে উদাসিনী বাণী তব রূপমোহহীনা
পরায় সুরের মালা নিশার চিকুরে ?

৫

তুমি শুধু জানো তারে—ভালে যার বিবাহ-চন্দন
পরাবে তাপসী সন্ধ্যা,—উষা হ'বে রবি-স্বয়ম্বরা !
ছিল যে অসূর্য্যম্পশ্যা, আলো-ভীরু, কুহেলি-অম্বরা—
পূর্ণ আঁখি মেলিবে সে অপসারি' মুখাবগুণ্ঠন !
রূপার কাজল-লতা—আধ'-চাঁদ—কবরীর পাশে,
একটি তারার টিপ হেরিবে সে ভুরুর সকাশে ;
বিলোল অপাঙ্গে তার রবে না সে কটাক্ষ অথির,
তুমি যবে পরাইবে সাবধানে সীমন্ত-সীমায়
তব শেষ-কিরণের রেণুটুকু সিন্দুরের প্রায় ;—
সেই লগ্নে দিবা নিশা দোঁহে মিলি' এক আরতির
দীপাবলী সাজাইবে সোনার থালায় !

৬

রথ হ'তে নামি' এবে কোন্ মহা দিক-চক্রবালে
উতরি' যাপিবে, রবি, অন্ত-হীন আলোক-বাসর ?
হেথায় নিশীথ-রাতে নিদ্‌হারা পিপাসা-কাতর
তারারা রহিবে চেয়ে প্রাচীপানে ;—সে নিশি
পোহালে
ভাতিবে কি আর বার এ গগনে আদিম প্রভাত—
কালের তিমির-গর্ভে পশিবে কি আলোর প্রপাত ?
নিবারি' দুরন্ত দাহ দিবা-দেহে ধ্যানমন্ত্র-বলে—
অন্তরালে হেরিল যে বেদমাতা উষার মূরতি,
স্ফটিকাক্ষমালা হাতে নিবসিল নিখিল-ভারতী
সবিতৃমণ্ডলে যার, পুনঃ এই বর্ষ-মাস—রাশিচক্রতলে
অবতরি' উদিবে সে রবিকুলপতি ?

৭

মন্দ করি' গতিবেগ নিরন্তর-অগ্রসর-পথে,
সাঙ্গ কর সুবিলম্বে সায়াহ্নের স্নিগ্ধ অবকাশ
নেহারিব বহুক্ষণ সেই জবাকুসুমসঙ্কাশ
তরুণার্ক-রূপে তোমা—যেন নব উদয়-পর্ব্বতে !
সহসা বিটপী-শিরে, পৃথিবীর প্রদোষ-প্রাঙ্গণে,
ঝরিবে আশিস-ধারা তরলিত আবীরে-কাঞ্চনে !
হরজটাজালে যথা উর্ম্মিমালা চন্দ্রকরোজ্জ্বল—
দিবার অলক-মেঘে উছলিবে গীত-তরঙ্গিনী
অনুরাগে ; তার পর এক হাতে সে বরবর্ণিনী
ছড়া'বে কুসুম্ভ-ফুল, আর হাতে আলুলিবে
ধূসর কুন্তল,—
তখনও অ-শেষ তব কিরণ-কাহিনী !

মহারাণা কুম্ভকর্ণ

(১৪৩৩—৬৮ খৃঃ)

শ্রীকালিকারঞ্জন কানুনগো, পি-এইচ-ডি

রাজপুতানার ইতিহাসে মহারাণা কুম্ভকর্ণ বা কুম্ভের ব্যক্তিত্ব চিতোরের ধ্বংসস্তূপের মধ্যে তাঁহার বিশাল অক্ষয়কীর্ত্তিস্তম্ভের ন্যায় অনুপম ও অলৌকিক। বস্তুতঃ মধ্যযুগে তিনিই প্রাচীন ভারতের আদর্শানুযায়ী 'সকল-কলা-পারঙ্গম' শেষ হিন্দুরাজা—যাঁহার মধ্যে শৌর্য্য ও শাস্ত্রজ্ঞান, নীতি ও সুকুমার কলার একত্র সমাবেশ দেখা যায়। শুধু জনশ্রুতি কিংবা ভাটের কবিতাই তাঁহার জীবনবৃত্তান্তের একমাত্র উপকরণ নহে। এ-পর্য্যন্ত তাঁহার রাজত্বের যতগুলি শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, সেগুলি একত্র করিলে একখানা দুই শত পৃষ্ঠার পুস্তক হইতে পারে। ইহার মধ্যে নিম্নলিখিত শিলালিপিগুলি তাঁহার চরিতকথার জন্য বিশেষ প্রয়োজনীয়।—

১। বি. সম্বত ১৪৯৬ (১৪৪০ খৃঃ) অব্দের রাণপুরের (যোধপুর রাজ্যে) জৈন-মন্দিরস্থ শিলালিপি।—এই শিলালিপিতে কুম্ভের রাজত্বকালের প্রথম সাত বৎসরের ইতিহাস পাওয়া যায়। ইহাতে লিখিত আছে :— রাণা কুম্ভকর্ণ সারঙ্গপুর (মালবান্তর্গত) নাগোর, জয়পুর রাজ্যস্থিত নরানা, আজমীঢ়, মাণ্ডোর, মাণ্ডলগড়, বুঁদী, খাটু (জয়পুর রাজ্যে), চাটসু ইত্যাদি বিষম দুর্গ-সমূহ অনায়াসে জয় করিয়াছিলেন।···ম্লেচ্ছ-মহীপাল-(সুলতান-)রূপী সর্পকে পক্ষীরাজ গরুড়ের মত অবমর্দ্দিত···এবং দিল্লী ও গুজরাত-রাজকে পরাজিত করিয়া···"হিন্দু-সুরত্রাণ" (হিন্দু-সুলতান) আখ্যা লাভ করিয়াছিলেন।

২। দৈলবাড়া গ্রামস্থিত (আবু পর্ব্বতে) বিমলশাহ এবং তেজপালের মন্দিরের মধ্যস্থ "চকের" বেদীতে খোদিত শিলালিপি (আষাঢ় শুক্লা দ্বিতীয়া, ১৫০৬ বি. সম্বত)। ইহাতে লেখা আছে রাণা কুম্ভ আবু-যাত্রীদের কাছে তৎকালে "দান" ('জকাৎ'=পুণ্যের উপর শুল্ক ?), "মুণ্ডিক" (প্রতি যাত্রীর উপর মুণ্ডকর), বলাবী (রাস্তা-রক্ষার কর), ঘোড়া বলদের উপর কর ইত্যাদি যাহা আদায় করা হইত সমস্তই মাফ্ করিয়া দিয়াছিলেন।

৩। কীর্ত্তি-স্তম্ভ প্রশস্তি।—মহারাণা কুম্ভের চিতোর-দুর্গস্থ কীর্ত্তিস্তম্ভের নির্ম্মাণ-কার্য্য শেষ হইয়াছিল বি. সম্বত ১৫০৫ অব্দের মাঘ মাসের শুক্লাদশমী তিথিতে। ইহার পর স্তম্ভগাত্রে বিজয়প্রশস্তি খোদাই করা আরম্ভ হয়। এই প্রশস্তি-যোজনা বি.স.১৫১৭ অব্দের অগ্রহায়ণ মাসের কৃষ্ণা-পঞ্চমী সোমবারে সমাপ্ত হইয়াছিল। মূল প্রশস্তির শিলা-লিপি অধিকাংশ নষ্ট হইয়া গিয়াছে। বি. স. ১৭৩৫ অব্দে কোনো পণ্ডিত ঐ প্রশস্তির নকল পুস্তকাকারে সংগ্রহ করিয়াছিলেন। মহামহোপাধ্যায় গৌরীশঙ্কর ওঝা ইহার পাণ্ডুলিপি আবিষ্কার না করিলে ইতিহাসের এই মূল্যবান উপাদান অজ্ঞাত থাকিত।

৪। কুম্ভল-গঢ়-প্রশস্তি (১৫১৭ বি. সম্বত)।—ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে—মহারাণা কুম্ভ "নারদীয়নগর" জয় করিয়া রাণীদের দাস্যকর্ম্মে নিযুক্ত করিয়াছিলেন···হম্মীরপুরের যুদ্ধে বনবীর বিক্রমকে বন্দী···মলরাণাকে অগ্নিসাৎ··· রণস্তম্ভপুর বিজয়···এবং "আম্রদাদ্রি" (আঁবের ; বর্ত্তমান জয়পুর) দেশকে নিষ্পেষিত করিয়া দিলেন।

রাণা কুম্ভের রাজত্বকালের আলোচনায় ঐতিহাসিকেরা বুঝিতে পারেন মুসলমান-ঐতিহাসিক ফিরিশ্‌তা,'মিরাৎ-ই-সিকন্দরী'র গ্রন্থকার ইত্যাদি কিরূপ বেপরোয়াভাবে মহারাণা কুম্ভের সমসাময়িক মালব ও গুজরাতের সুলতান-দিগের পরাজয়ের কথা যথাসম্ভব গোপন করিয়াছেন। রাণা কুম্ভের প্রতাপে সিরোহী,মারবাড়, বুন্দী প্রভৃতি রাজ্য বিশেষভাবে উত্ত্যক্ত হইয়াছিল। এই কারণে ঐ সমস্ত রাজ্যের "খ্যাত" বা ঐতিহাসিক কাহিনীগুলি রাণা কুম্ভের ইতিহাস বিকৃত করিয়াছে। সুচতুর ঐতিহাসিক

গৌরীশঙ্করজী তুলনামূলক আলোচনা দ্বারা এইগুলির অসত্যতা প্রমাণ করিয়া ঘোর অন্ধকারে আলোকপাত করিয়াছেন। মহাত্মা টড লিখিত রাণা কুম্ভের রাজত্ব-বিবরণ এখন কেহই ইতিহাস বলিয়া গ্রহণ করিতে পারে না, সুতরাং ইহার ভুল-নির্দ্দেশ অনাবশ্যক। সম্প্রতি আমরা মহারাণা কুম্ভের ইতিহাস আনুপূর্ব্বিক আলোচনা করিব।

বৃদ্ধ রাণা লাখার অপ্রাসঙ্গিক রসিকতায় চিতোরে মহা অনর্থ ঘটিয়াছিল। ভীষ্মপ্রতিম কুমার চূঁডা পিতার শেষ বয়সে বিবাহের ইচ্ছা পূর্ণ করিবার জন্য শপথ করিয়া বংশানুক্রমে চিরদিনের জন্য মিবার সিংহাসনের দাবি পরিত্যাগ করিলেন। ইহাতেও রাণার নব-পরিণীতা রাঠোর-কুমারী হংস বাঈর আশঙ্কা দূর হইল না। তাঁহার পুত্র বালক মুকুলের রাজ্যাভিষেকের পর (১৪১৯ খৃঃ) বীরবর চূঁডা বিমাতার মনস্তুষ্টির জন্য স্বেচ্ছায় মিবার-রাজ্য ছাড়িয়া মালবের সুলতান হোশঙ্গ ঘোরীর চাকরি গ্রহণ করিলেন। স্ত্রী-বুদ্ধি বাস্তবিকই প্রলয়ঙ্করী হইয়া উঠিল। হংস বাঈর বড়ভাই রণমল মিবারে সর্ব্বেসর্ব্বা হইলেন; ভাগ্যান্বেষী রাঠোরেরা মিবার-রাজ্য ছাইয়া ফেলিল। শিশোদিয়াগণ স্বদেশে পরদেশীর মত ম্রিয়মাণ হইয়া রহিলেন।

মহারাণা মোকল প্রাপ্তবয়স্ক হইয়াও রণমল ও হংস বাঈর ক্ষমতাপাশ ছিন্ন করিতে পারেন নাই। ১৪৩৩ খৃষ্টাব্দে মহারাণা কয়েকজন সর্দ্দারের চক্রান্তে রাণা লাখার সূত্রধার স্ত্রীর গর্ভজাত চাচা ও মেরার হস্তে নিহত হইলেন। রণমল শিশু কুম্ভকর্ণকে মিবার-সিংহাসনে বসাইয়া পূর্ব্ববৎ রাজকার্য্য চালাইতে লাগিলেন। রাঠোরদিগের চক্রান্তে সন্দিহান হইয়া রাও চূঁডা নিজের ছোট ভাই রাঘবদেবকে দরবারে রাখিয়া গিয়াছিলেন। রণমল রাঘবদেবকে নিতান্ত ঘৃণিত চক্রান্তে প্রকাশ্য দরবারে হত্যা করিয়া নিষ্কণ্টক হইলেন। মহারাণা কুম্ভ রণমলের উপর পূর্ব্ব হইতেই অসন্তুষ্ট ছিলেন; এখন তিনি নিজকে আরও বিপন্ন মনে করিলেন। সৈন্যদলকে হাত করিবার জন্য মহারাণা বহিঃশত্রু দমনে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। প্রথমে তিনি সিরোহী-রাজ্য আক্রমণ করিবার জন্য ডোডিয়া নরসিংহের অধিনায়কত্বে সৈন্য প্রেরণ করিলেন; কেন-না মহারাণা মোকলের মৃত্যুর পর সিরোহী-রাজ সৈসমল মিবার-সীমান্তে কয়েকটি গ্রাম অধিকার করিয়াছিলেন। অল্পদিনের মধ্যে মিবার-সৈন্য আবু পর্ব্বত এবং সিরোহী-রাজ্যের পূর্ব্বাংশ জয় করিয়া ফেলিল। রাণা কুম্ভ আবুশিখরে অচলগড় নামক দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া বিজিত রাজ্য স্ববশে আনিলেন।*

১৪৩৭ খৃষ্টাব্দে মহারাণা স্বয়ং এক বৃহৎ বাহিনী লইয়া মামুদ খিলজীর রাজ্য আক্রমণ করেন। সারঙ্গপুরের নিকট উভয় সৈন্যের যুদ্ধ হয়। মামুদ পলাইয়া মাণ্ডুনগরে আশ্রয় গ্রহণ করেন। মাণ্ডু অধিকার করিয়া সদাশয় বীর কুম্ভ বিনা নিষ্ক্রয়ে বন্দী খিলজী সুলতানকে মুক্তি দিলেন। কুম্ভলগড় প্রশস্তিতে এই বিজয়ের এক অতিশয়োক্তিপূর্ণ বর্ণনায় লিখিত আছে মহারাণা কুম্ভ সারঙ্গপুরে অসংখ্য মুসলমান-প্রধানগণের স্ত্রীলোকদিগকে বন্দী করিয়াছিলেন। মামুদের মহাগর্ব্ব খণ্ডন করিয়া সারঙ্গপুর বিধ্বস্ত করেন, এবং অগস্ত্য ঋষির ন্যায় নিজের অসি-রূপ চুল্লু দ্বারা দহ্যমান নগর-রূপ বাড়াবাগ্নি-যুক্ত মালব-সমুদ্র পান করিয়াছিলেন।† এই মালব-বিজয়ের স্মৃতিচিহ্ন-স্বরূপ মহারাণা নিজের উপাস্য দেবতা বিষ্ণুর প্রতি উৎসর্গীকৃত কীর্ত্তিস্তম্ভ নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করিলেন। মহারাণা মোকলের হত্যাকারী চাচার পুত্র 'একা' এবং উহার সহযোগী মহপা পঁবার—যাহারা মালবে পলাতক ছিল—পায়ে পড়িয়া ক্ষমা প্রার্থনা করায় মহারাণা কুম্ভ ইহাদিগকে

* "সমগৃহীদর্বুদ শৈলরাজং
ব্যাধুয় যুদ্ধোদ্ধর-ধীর-ধুষ্যান্।
... ...
নির্ম্মায়াচলদুর্গমস্য শিখরে তত্রাকরোদালয়ং
(কীর্ত্তিস্তম্ভ প্রশস্তি)।

† দীনা বদ্ধা যেন সারঙ্গ-পুষ্যাং।
ঘোষাঃ প্রৌঢ়াঃ পারসীকাধিপানাং
তাঃ সংখ্যাতুম্ নৈব শক্নোতি কোঽপি॥
... ...
ইতীব সারঙ্গপুরং বিলোড্য
মহংমদ ত্যাজিতবান্ মহংমদ (?)॥
এতদ্দগ্ধ-পুরাগ্নি-বাড়বমসৌ যন্মালবাম্ভোনিধিং
ক্ষৌণীশঃ পিবতি স্ম খড়গ-চুলুকৈস্তন্মাদগস্ত্যাস্ফুটম্॥"
—ওঝা, পৃঃ ৫৯৮ পাদটীকা

নিজের কাছে রাখিলেন; রাঠোর রণমলের আপত্তি অগ্রাহ্য হইল। ইহারা রণমলের বিরুদ্ধে নানা কথা বলিয়া মহারাণার সন্দেহ আরও বদ্ধমূল করিয়া দিল।

মহারাণা কুম্ভের মাতা সৌভাগ্য দেবীর ভারমলী নামে এক দাসী ছিল; বৃদ্ধ রণমল উহার সহিত প্রণয়াসক্ত ছিলেন। রণমল একদিন মদের নেশায় কোন কথার উপর প্রেয়সীকে বলিয়া ফেলিলেন, "চিতোরে যদি কেহ থাকিতে চায় [অর্থাৎ সৌভাগ্য দেবী] তোর দাসী হইয়া থাকিতে হইবে।" রাঠোরেরা তাঁহাকে হত্যা করিবার জন্য ষড়যন্ত্র করিতেছে ভাবিয়া রাণা কুম্ভ রাও চূঁডাকে শীঘ্র চিতোরে আনিবার জন্য দূত পাঠাইলেন। এক দিন রাত্রে সঙ্কেত অনুসারে ভারমলী বৃদ্ধ প্রেমিককে খুব মদ খাওয়াইয়া পাগড়ীর দ্বারা খাটের সহিত শক্ত করিয়া বাঁধিয়া রাখিল। মহপা পঁবার কয়েকজন গুপ্তঘাতকের সহিত প্রবেশ করিয়া কার্য্য শেষ করিল। কথিত আছে, তলবারের প্রথম চোট লাগিতেই রণমল খাটসুদ্ধ খাড়া হইয়া নিজের 'কাটার' দ্বারা দু-তিন জনকে বধ করিয়াছিলেন। ১৪৩৮ খৃষ্টাব্দে, অর্থাৎ মালব-বিজয়ের একটু পরে, এই ঘটনা সংঘটিত হয়।

অনুমান ১৪৪০ খৃষ্টাব্দে মহারাণা হাড়াবতী অর্থাৎ বর্ত্তমান কোটা ও বুন্দী রাজ্য আক্রমণ করেন। হাড়াবতী বহু দুর্গে সুরক্ষিত এবং হাড়াবংশী রাজপুতেরা অসাধারণ বীর; এই জন্য মহারাণা দীর্ঘকাল যুদ্ধের পর তাহাদিগকে 'করদ'* করিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয়। তিনি যে "হেলায়" বুন্দী ও মাণ্ডলগড় জয় করিতে পারেন নাই ইহা বলা বাহুল্য। হাড়া-সামন্তগণ মহারাণা মোকলের মৃত্যুর পর স্বাধীন হইয়াছিলেন; তাঁহাদিগকে পুনরায় স্ববশে আনিবার জন্য কুম্ভ এ অভিযান করিয়াছিলেন।

মালব-রাজ মাহমুদ শাহ রাজপুতের উদারতা ও সদাশয়তা ভুলিয়া ১৪৪৩ খৃষ্টাব্দে মহারাণার রাজ্য আক্রমণ করেন।

এই যুদ্ধের বিবরণ কোনো সমসাময়িক মুসলমান ঐতিহাসিক লিখিয়া যান নাই। একশত ষাট বৎসর পরে রচিত ফিরিশ্‌তার ইতিহাসই আমাদের প্রধান অবলম্বন। ফিরিশ্‌তা-কথিত উত্তর-ভারতের যে-কোন রাজ্যের বিবরণের সত্যতা যাচাই করিলেই দেখা যায় যে, তিনি অনেক স্থলেই মন-গড়া কথা লিখিয়াছেন। এই ক্ষেত্রেও সেই অবস্থা। ফিরশ্‌তার বর্ণনানুসারে তিনি কুম্ভলগড়ের পাদদেশে অবস্থিত কৈলবাড়া গ্রামের বাণ-মাতার মন্দির পোড়াইয়া মূর্ত্তিগুলির উপর ঠাণ্ডা জল ঢালিয়াছিলেন এবং খণ্ডিত মূর্ত্তিগুলি কসাইদিগকে মাংস ওজন করিবার জন্য দিয়াছিলেন। তৎপর তিনি চিতোরে হানা দিলেন; রাজপুতগণ তাঁহার হস্তে কয়েকবার পরাজিত হইয়া দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিল। তিনি বহু লুটের মাল লইয়া রাজধানী মাণ্ডুতে আসিলেন এবং সুলতান হোশঙ্গের মসজিদের নিকট স্থাপিত স্বীয় মাদ্রাসার সম্মুখে সাত মঞ্জিল উচ্চ মানার তৈয়ার করিয়া বিজয় চিরস্মরণীয় করিলেন। মালব-সীমান্তে এত স্থান থাকিতে মাহমুদ এক লাফে সিরোহী-সীমান্তে গিয়া কৈলবাড়া আক্রমণ করিলেন এবং যে-স্থানে যাইতে আওরংজেবের মত বীরেরও হৃৎকম্প হইত সে স্থান হইতে মামুদ খিল্‌জী লুটের মাল লইয়া ফিরিলেন, এ কথা স্বয়ং ফিরিশ্‌তা স্বর্গ হইতে নামিয়া আসিয়া বলিলেও কেহ বিশ্বাস করিতে পারিবে না। প্রকৃত-পক্ষে, মালব-রাজ শুধু হাতে ব্যর্থ মনোরথ হইয়া ফিরিয়াছিলেন। তিন বৎসর পরে ১৪৪৬ খৃষ্টাব্দের কার্ত্তিক মাসে সুলতান মামুদ খিল্‌জী আবার মহারাণার রাজ্য আক্রমণ করেন। ফিরিশ্‌তার মতে এবারও মামুদ জয়লাভ করেন এবং মাণ্ডলগড়ের অবরোধ উঠাইবার জন্য রাণা বহু ধনরত্ন দিয়া সন্ধি প্রার্থনা করেন। তাহার মতে মোটের উপর মামুদ পাঁচবার মহারাণাকে পরাজিত করেন! ইহার পর তিনি তাজ খাঁকে গুজরাত-রাজ সুলতান কুত্‌বুদ্দীনের কাছে প্রেরণ করেন। এই সময় নাগোর জিলার অধিকার লইয়া গুজরাত-সুলতানের সঙ্গে মহারাণার বিবাদের সূত্রপাত হয়।

* জিত্বা দেশমনেক দুর্গ বিষমং হাড়াবটীং হেলয়া
তন্নাথান্ করদাম্বিধায় চ জয়স্তম্ভানুদস্তম্ভয়ৎ।
দুর্গং গোপুরমত্র ষট্‌পুরমপি প্রোচ্চাং চ বৃন্দাবতীং
শ্রীমন্মণ্ডল দুর্গমুচ্চ বিলসচ্ছালাং বিশালাং পুরীং।
...কুম্ভলগড় প্রশস্তি

বীরবিনোদ-রচয়িতা শ্যামলদাসজী বলেন, নাগোরের মুসলমানগণ হিন্দুদিগকে নির্যাতিত করিবার জন্য অকারণ গো-হত্যা আরম্ভ করাতে মহারাণা ১৪৫৮ খৃষ্টাব্দে পঞ্চাশ হাজার সৈন্যসহ নাগোর আক্রমণ করেন। নাগোরে মহারাণা যে ভীষণ অত্যাচার করিয়াছিলেন তাহার কথা তাঁহার কীর্ত্তিস্তম্ভের গাত্রে খোদিত হইয়াছিল। যথা :—

প্রজ্বাল্য পেরোজ-মশীতিমুচ্চাং নিপাত্য তন্নাগপুরং প্রবীরঃ॥
নিপাত্য দুর্গং পরিখাং প্রপূর্য্য গজান্ গৃহীত্বা যবনীশ্চ বদ্ধা।
অদণ্ডয়দ্যো যবনাননন্তান্ বিড়ম্বয়ন্ গুর্জ্জর-ভূমি-ভর্ত্তুঃ॥
লক্ষাণি চ দ্বাদশগোমতল্লীরমোচয়দ দুর্যবনানলেভ্যঃ।
তং গোচরং নাগপুরং বিধায় চিরায় যো ব্রাহ্মণাসাদকার্ষীৎ॥
মূলং নাগপুরং মহচ্ছক-তরোন্মূল্য শুনং মহী-
নাথো যং পুনরচ্ছিদৎ সমদহৎ পশ্চাম্মশীত্যা সহ।
—কীর্ত্তিস্তম্ভ প্রশস্তি, (MS.)

অর্থাৎ, মহারাণা কুম্ভ গুজরাত-সুলতানকে বিড়ম্বনা (উপহাস) করিয়া নাগপুর (নাগোর) অধিকার করিলেন, এবং ফিরোজ-নির্ম্মিত উচ্চ মশীত (মস্‌জিদ) ধ্বংস, দুর্গ-পরিখা পরিপূর্ণ, হস্তিসমূহ গ্রহণ ও যবন-স্ত্রী-গণকে বন্দী করিয়া অসংখ্য ম্লেচ্ছকে দণ্ডিত করিলেন। তিনি যবনদের হস্ত হইতে গো-গণকে উদ্ধার করিলেন। নাগোরকে "গোচরে" পরিণত করিয়া ব্রাহ্মণদিগকে দান করিলেন এবং শক-তরুর মূলস্বরূপ নাগোরকে মশীত-সহ ভস্মীভূত করিলেন।

নাগোরের দুর্দ্দশা শুনিয়া সুলতান কুত্‌বুদ্দীন মিবার-আক্রমণে অগ্রসর হইলেন। সিরোহীর বিতাড়িত রাজা মহারাণার হাত হইতে নিজ রাজ্য উদ্ধারের আশায় সুলতানের শরণাপন্ন হওয়ায় সুলতান নিজ সেনাপতি ইমাদ্-উল-মুল্ককে রাজার সহিত আবু পর্ব্বতের দিকে পাঠাইয়া স্বয়ং কুম্ভলগড় (কমলমীর ?) অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। আবু পর্ব্বতের যুদ্ধে ইমাদ-উল-মুল্ক সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইয়া পলায়ন করিলেন; তাঁহার বহু সৈন্য এই যুদ্ধে ধ্বংস হয়। গুজরাত-সুলতান মহারাণার সঙ্গে সন্ধি করিয়া নিষ্কৃতি পাইলেন। কিন্তু ফিরিশ্‌তার সেই একই সুর—রাজপুতগণের বার-বার পরাজয় ও বহু ধনরত্ন দান করিয়া সন্ধি-প্রার্থনা!

যখন গুজরাত-সুলতান কুম্ভলগড় হইতে আহমদাবাদে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিলেন তখন মালব-রাজ সুলতান মামুদ খিলজীর দূত তাজ খাঁ তাঁহার কাছে পৌঁছিলেন। ফিরিশ্‌তায় দেখা যায়, চম্পানের দুর্গে উভয়পক্ষ "কালনেমীর লঙ্কাভাগ" করিতে বসিয়াছিলেন। মহারাণার রাজ্যের দক্ষিণ ভাগ কুত্‌বুদ্দীন ও উত্তর ভাগ মামুদ খিল্‌জী পাইবেন ইহা লেখাপড়া (অহদ্‌নামা) হইয়া গেল। পর বৎসর যুগপৎ মালব ও গুজরাত সৈন্য পূর্ব্ব ও পশ্চিম হইতে মহারাণার রাজ্য আক্রমণ করিল। সিরোহীর নিকটে মহারাণা দুইবার কুতব শাহর হস্তে পরাজিত হইয়া পার্ব্বত্য প্রদেশে পলায়ন করিলেন। মামুদ খিল্‌জী কি করিলেন ফিরিশ্‌তা তাহা লেখেন নাই। তবে সন্ধি হওয়ার পর কুতব শাহ চৌদ্দ মণ সোনা এবং মামুদও একটা মোটা রকমের কিছু পাইয়া নিজ নিজ রাজ্যে প্রস্থান করিলেন। যাহা হউক, পরবর্ত্তী মহারাণা সংগ্রাম সিংহের হস্তে মালব ও গুর্জ্জরেশ্বরের যে দুর্গতি হইয়াছিল এবারও বস্তুতঃ সেরকম শিক্ষাই তাঁহারা পাইয়াছিলেন। মিবারভূমি স্বর্ণপ্রসবিনী নয়, বীরপ্রসবিনী বটে। এই অভিযানে মহারাণা মুসলমান-শক্তিদ্বয়ের সমবেত বলকে বিমর্দ্দিত করিয়াছিলেন—

স্ফূর্জ্জদ্ গুর্জ্জর-মালবেশ্বর-সুর ত্রাণোরু সৈন্যার্ণব—
ব্যস্তাব্যস্ত-সমস্ত বারণ-বন প্রাগ্‌ভার-কুম্ভোদ্ভবঃ।
—কীর্ত্তিস্তম্ভ প্রশস্তি

মহারাণা কুম্ভের অপরাজেয় শৌর্য্যে তাঁহার "তোডর-মল্ল" * ও "হিন্দু-সুরত্রাণ" উপাধি সার্থক হইয়াছিল। তিনি শুধু বীর ছিলেন না। সুদীর্ঘ রাজত্বের সঞ্চিত অর্থরাশি তিনি দুর্গাদি নির্ম্মাণে ও লোকহিতকর কার্য্যে ব্যয় করিতেন। লোকে বলে মিবারের ছোট বড় চৌরাশীটি দুর্গের মধ্যে বত্রিশটি দুর্গই রাণা কুম্ভের তৈয়ারী। বি. সম্বত ১৫১৫ (১৪৫৯ খৃঃ) অব্দের চৈত্র কৃষ্ণাত্রয়োদশী তিথিতে তাঁহার অন্যতম অক্ষয়কীর্ত্তি কুম্ভলগড় দুর্গের প্রতিষ্ঠা হয়। যদি রাণা কুম্ভ কোনো যুদ্ধ না করিয়া কেবলমাত্র এই দুর্গটির স্থান-

* হয়েশ-হস্তীশ-নরেশ-রাজত্রয়োল্লসৎ-তোডরমল্ল-মুখ্যং
বিজিত্য তানাজিষু কুম্ভকর্ণ মহীমহেন্দ্রো বিরুদং বিভর্ত্তি—
—কীর্ত্তিস্তম্ভ প্রশস্তি (MS.)

অর্থাৎ, যে-সমস্ত রাজা "অশ্বপতি," "গজপতি" ও 'নরপতি'—এই তিন উপাধি একত্র ধারণ করিবার উপযুক্ত, তাঁহাদের বল-মর্দ্দনে (তোড়র=তোড়ণ) মল্লের সমান—এজন্য মহী-মহেন্দ্র কুম্ভকর্ণ তোডর মল্ল বলিয়া কথিত হন।

নির্দ্দেশ করিয়া যাইতেন, তাহা হইলেও তাঁহার সামরিক প্রতিভার প্রশংসা কম হইত না। এই অগম্য দুর্গই রাণা প্রতাপ ও রাজসিংহের সময়ে মিবার-স্বাধীনতার শেষ আশ্রয়স্থল হইয়াছিল। তিনি জলযন্ত্র (Persian wheel) যুক্ত এবং সিঁড়িবিশিষ্ট বহু ("বাওলী") কূপ এবং বড় বড় "তালাব" (পুষ্করিণী) খনন করাইয়া প্রজার জলকষ্ট নিবারণ করিয়াছিলেন।

মহারাণা কুম্ভ বিদ্যানুরাগী ছিলেন; তাঁহার দরবারে বিদ্বানের বিশেষ আদর ছিল। নাট্য ও সঙ্গীতে পারদর্শী ছিলেন বলিয়া তাঁহাকে সে যুগের "অভিনব ভরতাচার্য্য" বলা হইয়াছে। 'সংগীতরাজ', 'সংগীত মীমাংসা', এবং 'সুড় [র ?] প্রবন্ধ' নামক পুস্তকগুলি তাঁহার নিজের রচনা। ইহা ছাড়া ইনি "চণ্ডী শতকের" ব্যাখ্যা, "গীত গোবিন্দম্" কাব্যের "রসিকপ্রিয়া" নামক টীকা, এবং চারিটি নাটক লিখিয়া গিয়াছেন। এ সমস্ত নাটকে মারাঠী, কর্ণাটী এবং কথিত মেবারী ভাষার প্রয়োগ আছে। তিনি নিজে সুকবি, এবং নিপুণ বীণাবাদক ছিলেন। মহারাণা "সংগীত রত্নাকর" নামক গ্রন্থের টীকা করিয়া বিভিন্ন তাল রাগ-যুক্ত অনেক দেবতা স্তুতি রচনা করিয়াছিলেন; উহা একলিঙ্গ মাহাত্ম্যের রাগবর্ণন অধ্যায়ে সংগৃহীত আছে। তিনি শিল্পকলার বিশেষ উৎসাহদাতা ছিলেন। তাঁহার দরবারে অনেক শিল্প-সম্বন্ধীয় পুস্তক রচিত হইয়াছিল। সূত্রধর মণ্ডন, "দেবতামূর্ত্তি প্রকরণ," "প্রাসাদমণ্ডন", "রাজবল্লভ", "রূপমণ্ডন", "বাস্তমণ্ডন", "বাস্তশাস্ত্র" "বাস্তসার"; মণ্ডনের ভাই নাথা "বাস্তমঞ্জুরী" এবং মণ্ডনের পুত্র গোবিন্দ "উদ্ধার-ধোরণী", "কলা-নিধি" ও "দ্বারদীপিকা" শিল্প-গ্রন্থ লিখিয়াছিল। মহারাণা কুম্ভ স্বয়ং "জয়" এবং "অপরাজিতের" মতানুসারে কীর্ত্তিস্তম্ভ নির্ম্মাণ-প্রণালী সংগ্রহ করিয়া এক পুস্তক লিখিয়াছিলেন—ইহা তাঁহার কীর্ত্তিস্তম্ভের নিম্নাংশে পাথরে খোদিত হইয়াছিল। তাঁহার কীর্ত্তিস্তম্ভ প্রশস্তির শেষ শ্লোকে লিখিত আছে—প্রশস্তির পূর্ব্বার্দ্ধ রচনা করিয়া কবি "অত্রি" পরলোকগমন করেন। তাঁহার পুত্র মহেশ কবি শেষার্দ্ধ রচনা করেন। পুরস্কার-স্বরূপ মহারাণা কবিকে একটি হস্তী, সুবর্ণমণ্ডিত চামর ও শ্বেত ছত্র প্রদান করেন। বস্তুতঃ মহারাণা কুম্ভকে রাজপুতানার সমুদ্রগুপ্ত বলা যাইতে পারে; রাজপুতানায় মিবারের সার্ব্বভৌমত্বের ভিত্তি কুম্ভই স্থাপন করিয়া গিয়াছিলেন।

মহারাণা কুম্ভের চরিত্র সমালোচনা করিতে হইলে খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর নৈতিক আদর্শ দ্বারা বিচার করা আবশ্যক। অগ্নি ও অসিতে শত্রুরাজ্য নির্ম্মম-ভাবে ধ্বংস, নিরপরাধ অসহায়া পুরনারীগণকে বন্দী করা ইত্যাদি নিন্দনীয় বটে, কিন্তু সম্রাট অশোকের কলিঙ্গ-বিজয় হইতে গত মহাযুদ্ধ পর্য্যন্ত আমরা এই পশুবলের একই তাণ্ডবলীলা দেখিয়া আসিতেছি। তবে দুঃখের বিষয়, সেকালে রাজারা ইহা ঘৃণ্য বলিয়া মনে করিতেন না, কুকীর্ত্তিকে কীর্ত্তিজ্ঞান করিয়া শিলালিপি দ্বারা অক্ষয় করিয়া যাইতেন, এ কালের সভ্য জগৎ দুষ্কার্য্যগুলি মিথ্যার আড়ালে ঢাকিয়া রাখে—এই আন্তর্জাতিক নৈতিক দৃষ্টি ও ভাবের পরিবর্ত্তনটুকুই উন্নতি। মহারাণা কুম্ভের ইষ্টদেবতা একলিঙ্গদেব হইলেও তিনি ভর্ত্তৃহরির দশরথের মত "ন ত্র্যম্বকাদন্যমুপাস্থিতা-সৌ" ছিলেন না। তিনি পরম বিষ্ণুভক্তও ছিলেন এবং মূর্ত্তিতত্ত্ব অনুসারে বিভিন্নপ্রকার অসংখ্য বিষ্ণুমূর্ত্তি প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। জৈনধর্ম্মকেও তিনি শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন, এবং তাঁহাদের মন্দির ইত্যাদি নির্ম্মাণের জন্য বহু অর্থ দান করিতেন। নিঃসন্দেহ তিনি ইস্‌লামের মহাশত্রু ছিলেন—মুসলমানকে নির্যাতিত ও মস্‌জিদ ইত্যাদি ভঙ্গ করিতে দ্বিধা করিতেন না। মুসলমান-বিজয়ের পূর্ব্বে দাক্ষিণাত্য ও গুজরাতের হিন্দু রাজারা ইস্‌লাম ধর্ম্মের প্রতি যে উদারতা দেখাইয়াছিলেন, মুসলমান অধিকারের পর সে উদারতা সঙ্কুচিত হইয়া আসিল।

প্রাচীন যুগে হিন্দুরা যে পরধর্ম্ম নির্যাতন করিতেন না এমন নহে, নালন্দা মিউজিয়মে রক্ষিত বুদ্ধের "ত্রৈলোক্য-বিজয়-মূর্ত্তি" [শিব ও পার্ব্বতীর বুকের উপর দণ্ডায়মান বুদ্ধ], মহারাজ হর্ষবর্দ্ধনকে হত্যা করিবার জন্য ব্রাহ্মণদিগের ষড়যন্ত্র, দাক্ষিণাত্যে শৈব ও বৈষ্ণবের সংঘর্ষ একই মনোবৃত্তির অভিব্যঞ্জনা। তবে

যে কু-বৃত্তিটুকু হিন্দুসমাজে কয়েক শতাব্দী পর্য্যন্ত সুপ্ত ছিল, মুসলমান-বিজেতৃগণের মন্দির ও দেবমূর্ত্তি ভঙ্গ এবং ধর্ম্মপীড়নে তাহা আবার জাগিয়া উঠিল; মহারাণা কুম্ভের নিন্দিত আচরণ এই স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়ার ফল।

মহারাণা কুম্ভ শেষ-বয়সে উন্মাদরোগগ্রস্ত হইয়াছিলেন। লোকে বলে, একদিন মহারাণা একলিঙ্গজীর মন্দিরের প্রাঙ্গণে একটি গাভীকে হাই তুলিতে দেখিয়া উন্মাদের ন্যায় "কামধেনু তণ্ডব [তাণ্ডব] করিয়" এই পদ বার-বার আওড়াইতে লাগিলেন। তাঁহার এই "শশেমিরা" অবস্থা কিছুদিন চলিল। একদিন সর্দ্দারেরা এক ছদ্মবেশী চারণকে লইয়া রাজসভায় উপস্থিত হইলেন। রাণা পূর্ব্ববৎ "কামধেনু তণ্ডব করিয়" পদ আবৃত্তি করিবামাত্র চারণ মারবাড়ী ভাষায় নিম্নলিখিত কবিতা পাঠ করিল—

"জদ ঘর পর জোবতী দীঠ নাগোর ধরতী
গায়ত্রী সংগ্রহণ দেখ মন মাঁহি ডরতী।
সুরকোটী তেতীস আণ নীরন্তা চারো
নহি চরত পিবঁত করতী হুঙ্কারো॥
কুম্ভেন রাণ হণিয়া কলম আজস উর ডর উতরিয়।
তিণ দীহ শঙ্কর তণৈ কামধেনু তণ্ডব করিয়॥"

অর্থাৎ, নাগোর নগরে গো-হত্যা হইতেছে দেখিয়া গায়ত্রী [কামধেনু] অত্যন্ত ভয়ভীতা হইয়াছিলেন। তেত্রিশ কোটী দেবতা উঁহার জন্য তৃণজল আনিলেও কামধেনু আহার ও জলগ্রহণ করিলেন না। যেদিন হইতে রাণা কুম্ভ "কলম"গণকে [কল্‌মা-পাঠকারী মুসলমান] বধ করিয়া গাভীসমূহ রক্ষা করিলেন, সেদিন হইতে কামধেনু হর্ষিত হইয়া শঙ্করের দ্বারে "তাণ্ডব" করিতেছেন। ইহার পর হইতে মহারাণার ঐ পদ আবৃত্তি করার বাতিক দূর হইল বটে, কিন্তু তিনি পূর্ব্ববৎ বিকৃতমস্তিষ্ক রহিলেন।

একদিন মহারাণা কুম্ভলগড়-দুর্গে কুম্ভস্বামীর [মামাদেব] মন্দিরের নিকটবর্ত্তী জলাশয়ের ধারে বসিয়া আছেন এমন সময় হঠাৎ তাঁহার রাজ্যলোভী জ্যেষ্ঠপুত্র* উদা বা উদয়সিংহ তরবারির আঘাতে তাঁহার জীবনলীলার অবসান করিল (১৪৬৮ খৃঃ)।

* এই প্রবন্ধের অধিকাংশ উপকরণই খ্যাতনামা ঐতিহাসিক মহামহোপাধ্যায় গৌরীশঙ্কর ওঝা-কৃত হিন্দী "রাজপুতানেকা ইতিহাস" দ্বিতীয় ভাগে (পৃঃ ৫৯১-৬৩৬) মহারাণা কুম্ভের জীবন-চরিত হইতে গৃহীত। "অবতরণ" (quotation) ইত্যাদিও উক্ত পুস্তক হইতে গৃহীত। চরিত্র-বিশ্লেষণে মতপ্রকাশের জন্য প্রবন্ধ-লেখক দায়ী।

প্রভাতী

শ্রীসুবলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

১

অপার অম্বরে বুঝি ছায়াপথ-পালঙ্কের 'পরে,
কপালে প্রত্যূষ-তারা,—দিগ্বধূ সে নিদ্রা-নিমগনা!
ঊর্ম্মি-উন্মুখর তানে ঊর্দ্ধায়িত আলোর প্রার্থনা—
বন্দী সাগরের বীণা বেজে ওঠে কানন-মর্ম্মরে!
সিন্ধুগামী বিহঙ্গেরা অর্দ্ধস্ফুট জাগর-স্বপনে,
রমণীয় রোমাঞ্চনে শোনে বুঝি সূর্য্যের বাঁশরী,
কাঁপিছে মন্দার-গন্ধ মরালের শুভ্র তনু ভরি—
রক্তিম আভাস আসে নিশান্তের পান্থ-সমীরণে।

দূরবনে অকস্মাৎ শোনা গেল, বিহগ কাকলী,
পূরব-তোরণে এল জ্যোতিষ্মান, অপরূপ তনু—
আকাশের মর্ম্মে হানি দীপ্যমান্ ঝঙ্কৃত আবেশ!
একটি শিশির-রেখা শেষ-তারা রেখে গেছে চলি
কপালে অঙ্কিত করি;—কাঁপে তার বঙ্কিম ভ্রূধনু—
পৃথিবীর শ্যামদেহে অনিন্দিতা উষার উন্মেষ।

২

সপ্তসমুদ্রের তীরে দাঁড়ায়েছে সে কন্যা-কুমারী,
হিমাদ্রির শুভ্রশিরে তুষারের বাজে একতারা—
মহেশের ধ্যানলোকে উমার তপস্যা বুঝি সারা—
চম্পার সুরভি-শ্বাস, বাতায়নে ফিরিছে সঞ্চারি
নিশ্বাসের দ্রুততালে আন্দোলিত করি বনভূমি,
মল্লার রাগিণী গানে করিয়াছে ছায়ারে কোমল—
প্রাতঃসূর্য্যে ঝলকিছে শিশিরাশ্রু-সজল কমল;
অর্দ্ধ-স্ফুট তৃণাঙ্কুর দলে দলে উঠিছে কুসুমি।

নিমীল নয়ন মেলি উষা কহে—'তুমি! নমস্কার—
অঞ্জলি ভরিয়া লহ, লহ মোরে হে প্রভাত-ভানু!
এখনও উড়িছে দেখ দূর মাঠে কুয়াশা-কবরী
শুভ্র সে পালক দোলে আকাশের নীলে,—চমৎকার!
কালের সে অক্ষমালা গণিতেছ তুমি ত কৃশানু—
জানি আমি ক্ষণকাল,—একবার ডাক নাম ধরি!

পোর্ট-আর্থারের ক্ষুধা

শ্রীসুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

১০

পালটা আক্রমণ

কেন্‌জান্ হস্তগত হইবার পর শীঘ্রই Shuangting-shan ও আশপাশের স্থানগুলি আমাদের দখলে আসিল। ধোঁয়ার মাঝ দিয়া দেখিলাম বিজয়ী সেনাদলের উপর জাপানী পতাকা উড়িতেছে। তাদের জয়ধ্বনি বায়ু ভেদিয়া আকাশে বজ্রনিনাদের মত উঠিতে লাগিল। Shuangting-shan কেন্‌জানের মতই প্রয়োজনীয় অথচ সুরক্ষিত নয়, তাই বেশীক্ষণ যুঝিতে পারিল না। প্রাচীন প্রবাদ আছে—দলের একটি বুনো হাঁস ভয় পাইলে সমস্ত দলটাই বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়ে! তেমনি একটি সৈন্যদল পিছু হটিলে সমগ্র বাহিনী পরাজিত হয়। কেন্‌জানের উপর রুশেদের খুব আস্থা ছিল। যেমনি তার পতন হইল অমনি Shuangting-shan ও Hsiaoping-tao শুকনো পাতার মত ঝরিয়া পড়িল।

যে-উচ্চতা হইতে শত্রু এতদিন আমাদের গতিবিধি লক্ষ্য করিত, এখন সেখানে আমরাই দর্শকের স্থান অধিকার করিয়া বসিলাম। এমন জায়গা যে রুশেরা আবার দখল করিবার চেষ্টা করিবে তাহাতে বিস্ময়ের হেতু নাই। শোনা যায়, রুশ জেনারেল ষ্টেসেল* তাঁর সমগ্র সৈন্যবাহিনীকে, যেমন করিয়া হোক কেন্‌জান্ পুনরধিকার করিবার আদেশ দিয়াছিলেন। কারণ পোর্ট-আর্থার রক্ষায় কেন্‌জান্ অপরিহার্য্য। আমরাও পণ করিয়াছিলাম, শত্রুকে কিছুতেই সে-স্থান ছাড়িয়া দিব না। তাদের মত আমরাও চরম ত্যাগ করিতে প্রস্তুত!

গ্রীষ্মের দীর্ঘ দিন শেষ হইল—সূর্য্য অস্ত গেল। যুদ্ধশেষে নিরানন্দ ধূসর আলোয় আকাশ ও ধরণী ঢাকা পড়িল। শোণিতাক্ত তৃণপুঞ্জের উপর দিয়া অস্বস্তিকর তপ্ত হাওয়া বহিতে লাগিল। ক্ষণেক পূর্ব্বের রণতাণ্ডবের পর আসিল ভয়াবহ গভীর স্তব্ধতা, মাঝে মাঝে কেবল দু-চারিটা বন্দুকের শব্দ—ছাড়াছাড়া, নিস্তেজ, পরিশ্রান্ত। মনে হইল, এমনি করিয়া এলোমেলো গুলি চালাইয়া পরাজিত শত্রু তার দুঃখ ও ক্রোধের ভার লাঘবের চেষ্টা করিতেছে! সহসা গিরিশিখর কালো মেঘপুঞ্জ উদ্গার করিতে লাগিল, নিমেষে সারা আকাশ কালির মত হইয়া গেল—বিদ্যুৎ ও বজ্রের পর ক্ষিপ্রবেগে বৃষ্টি নামিল বন্দুকের গুলির মত! কিছু পূর্ব্বে মানুষ যে মারাত্মক দৃশ্যের অবতারণা করিয়াছিল, প্রকৃতি যেন তাহারই পুনরাবৃত্তি সুরু করিয়া দিল। বিরূপ প্রকৃতির এই যুদ্ধ সৈনিকদের কষ্ট আরও বাড়াইয়া তুলিল—একটা গাছও নাই, যার তলে আশ্রয় মিলিতে পারে! দেখিতে দেখিতে সকলের মূর্ত্তি হইল যেন জলে-ডোবা ইঁদুর! বৃষ্টির মধ্যে পাহাড়ের উপর রাত কাটিল—শুনিতে লাগিলাম তলায় ঘোড়াগুলা হাঁকডাক করিতেছে।

ভয়ানক যুদ্ধের পর সাধারণত একটা খুব ঝড় বা বৃষ্টি হয়। যুদ্ধ খুব জমিলে আকাশ বারুদের ধোঁয়ায় অন্ধকার হইয়া ওঠে—চারিদিক ভারি নিরানন্দ ফাঁকা ফাঁকা ঠেকে। অচিরে কানে তালা দিয়া বজ্র হাঁকিয়া ওঠে এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সজোরে বৃষ্টি নামিয়া যুদ্ধক্ষেত্রের সমস্ত মলিনতা ধুইয়া দেয়। এমনি বর্ষণকে বলে—"বিজেতার জন্য আনন্দাশ্রু আর পরাজিতের জন্য শোকাশ্রু।" এমনি দুর্য্যোগের রাত বেহাত জায়গা পুনরধিকারের চেষ্টার উপযুক্ত সময়। আমরা কিন্তু যুদ্ধজয়ের পরও অসতর্ক হই নাই—বজ্রগর্জ্জনে বা বারি-বর্ষণে ঢিলা দিবার পাত্র আমরা নয়। সূচনামাত্রেই শত্রুর অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা পণ্ড করিতে লাগিলাম।

Kenzan ও Shuangting-shan অধিকারের

* পোর্ট-আর্থারে রুশেদের প্রধান সেনাপতি।

সাত দিন পরে একদা মধ্যাহ্নে শত্রু পাল্‌টা আক্রমণ স্বরু করিল। আট নয় শত পদাতিক Wangchia-tun হইতে সিধা অগ্রসর হইতে লাগিল, আর Tashi-tung-এর আশপাশ হইতে গোলা বর্ষণ আরম্ভ হইল। ব্যাপার অপ্রত্যাশিত নয়—আমরা বিস্মিত হইলাম না। তাদের পানে আমাদের সমস্ত বন্দুক ও কামান দাগা সত্ত্বেও তারা নির্ভয়ে দ্রুতগতি সম্মুখে ধাবিত হইল—কিন্তু অধিকক্ষণের জন্য নয়। আমাদের প্রত্যেক "ভলি"র পর শত্রু দলে দলে ধরাশায়ী হইতে লাগিল। তাদের নায়ক দীর্ঘ তরবারি শূন্যে ঘুরাইয়া ছুটিয়া আসিতেছিল—সে-ও পড়িয়া গেল। দেখিয়া অবশিষ্ট সৈনিকেরা রণে ভঙ্গ দিয়া উপত্যকার মধ্যে এলোমেলো ছুটিয়া পালাইল।

গোলন্দাজেরা কিন্তু অত সহজে নিরস্ত হইল না। আরও কিছুকাল তারা আমাদের পানে গোলা চালাইতে লাগিল। শেষে, বোধ করি পলায়নপর পদাতিক দলকে দেখিয়া নিরাশ হইয়া হাল ছাড়িয়া দিল। চারিদিক আবার নীরব—কেন্‌জান্‌ পুনরধিকারের প্রথম চেষ্টা সফল হইল না!

ইহার কিছুকাল পরে রুশেরা Taipo-shan-এর উপরে দেখা দিল। প্রথম আক্রমণে যত ছিল, এবারও প্রায় তত পদাতিক সানন্দে 'ব্যাণ্ড' বাজাইয়া আমাদের প্রথম 'লাইনের" পানে অগ্রসর হইল। দুই দলের মধ্যেকার ব্যবধান যখন ৭০০.৮০০ 'মিটার' * মাত্র তখন তারা "উরা" গর্জ্জন করিয়া ছুটিয়া আসিল। অমনি আমরা ঘন ঘন গুলিবর্ষণ স্বরু করিয়া দিলাম। ফলে, অগ্রগামীরা ত মরিলই, যারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিল, তারাও মরিল। অবশেষে শত্রু Taipo-shan-এর দিকে ফিরিয়া গেল।

পরদিন রাত একটায় অন্ধকারে কেন্‌জান্‌ আবার আক্রান্ত হইল। আক্রমণ যেমন্‌ দ্রুত তেমনি সুচিন্তিত—রুশেরা মৃত্যু পণ করিয়া আসিয়াছিল। তারা এমন নিঃশব্দে খাড়া পাহাড়ে হামা দিয়া উঠিয়াছে যে, একখানা পাথর বা নুড়িও স্থানচ্যুত হয় নাই। অতর্কিতে জাপানী শান্ত্রীকে বধ করিয়া সদলবলে তারা আমাদের শিবিরের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল। গভীর অন্ধকার—শত্রু-মিত্র চিনিবার যো নাই, তার মাঝে ভীষণ যুদ্ধ। কে যে কাহাকে মারিতেছে জানে না, তবুও সকলে তলোয়ার চালাইতেছে। কিছুই দেখা যায় না, শুধু আততায়ীর পতন শব্দ কানে পৌছিতেছে। রুশেরা এবারেও আমাদের বাধা ভেদ করিতে পারিল না—হতাশ হইয়া বেশ শৃঙ্খলার সহিত পাহাড় হইতে নামিয়া গেল। আহত অবস্থায় যারা পড়িয়া রহিল, তারা কিন্তু যথাসম্ভব বন্দুক ও তলোয়ারের সাহায্যে আমাদের বাধা দিতে লাগিল। বিশেষ করিয়া এক জনের কথা মনে পড়ে। তার আঘাত সাংঘাতিক, মৃত্যু আসন্ন। এমন সময় সে তার অবনত মাথা কষ্টে তুলিয়া একটু হাসিল। পরলোকের যে পথিক—তার অধরে সেই অগ্রাহ্যের ও কঠিন সঙ্কল্পের হাসি অতি ভয়ঙ্কর।

ভাবিয়াছিলাম শত্রু এইবার নিরস্ত হইল, কিন্তু আমাদের অনুমান মিথ্যা প্রতিপন্ন করিয়া বহু শত্রু-সৈন্য প্রত্যুষে আবার আক্রমণ করিল। অবিরাম গোলা বর্ষণের আড়ালে পদাতিকেরা অগ্রসর হইতে লাগিল। সম্মুখের সারিতে শত্রুসেনার সংখ্যা কেবলই বাড়িতেছে—মনে হইল যেমন করিয়া হউক কেন্‌জান্‌ দখল করিবার পণ তারা করিয়াছে! বারবার শত্রু-আক্রমণ ব্যর্থ করিয়া আমাদের নানা অভিজ্ঞতা লাভ হইয়াছিল, ইহা একটা মস্ত সুবিধা। তবুও এবার বিশেষ বেগ পাইতে হইল। শত্রু অনেক, তবে আমাদেরও সৈন্যসংখ্যা বাড়িয়াছে—আক্রমণ প্রতিরোধের ব্যবস্থারও উন্নতি হইয়াছে। ফলে, এই যুদ্ধ আমাদের কেন্‌জান্‌-আক্রমণের তুল্যই ভীষণ হইয়া উঠিল।

ঘণ্টার পর ঘণ্টা শত্রুর কামানের সংখ্যা বাড়িয়া চলিয়াছে। একাধিক গিরিশিখর হইতে কেন্‌জান্‌ ও আমাদের পদাতিক শিবিরের উপর গোলা নিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। গোলন্দাজের অপূর্ব্ব তৎপরতা, লক্ষ্যও প্রায় অভ্রান্ত। এক মিনিট ত দূরের কথা, এক সেকেণ্ডেরও বিরাম নাই—গোলাগুলি অবিরাম পড়িতেছে। প্রত্যুষ হইতেই আমাদের গোলন্দাজ ও পদাতিকেরাও কামান ও বন্দুক চালনা করিয়া শত্রুকে অগ্রসর হইতে দেয় নাই।

* এক 'মিটার' এক গজ অপেক্ষা তিন ইঞ্চের কিছু বেশী।

ক্রমে দুই পক্ষের গোলাগুলিতে আকাশ ভরিয়া উঠিল—পাখীর আর উড়িবার ঠাঁই নাই, জীব-জন্তুর লুকাইবার স্থান নাই। শূন্য যেন গুরুভার—দিগ্বিদিকে অবিচ্ছিন্ন গভীর নিনাদ—সারা আকাশ ও ধরণী যেন অগণ্য উন্মত্ত অসুরের ক্রোধকবলিত। শত্রুর বিস্ফোরক গোলা দলে দলে ছুটিয়া আসিয়া মাথার উপর ফাটিতেছে—নির্দ্দয়ভাবে আঘাত হানিতেছে, হত্যা করিতেছে! তাহা প্রতিরোধ করিবার জন্য আমাদের গোলন্দাজেরা প্রাণপণে যুঝিতেছে—কখনও বা দায়ে পড়িয়া স্থান পরিবর্ত্তন করিতেছে। যুদ্ধের ফল অনিশ্চিত। মাঝে মাঝে শত্রুর দল বৃদ্ধি হইতেছে—অমনি নূতন বিক্রমে তারা আক্রমণ সুরু করিতেছে। আমরাও 'রিজার্ভ' দলের কতক অংশ যুদ্ধে নামাইয়াছি—কয়েক দল গোলন্দাজও বড় বড় কামান লইয়া আশপাশে আড্ডা গাড়িয়াছে। দক্ষিণে শাকুহো নামক স্থানে নৌ-গোলন্দাজেরা স্থাপিত। এইরূপে উভয় পক্ষের শক্তি বৃদ্ধির ফলে প্রত্যেকেই অপরের উচ্ছেদের চেষ্টা করিতে লাগিল। দিন শেষ হইয়া গেল, রাত্রি আসিল, সংগ্রামের তবুও বিরাম নাই।

নিরানন্দ যুদ্ধক্ষেত্রের উপর সূর্য্যাস্তের ম্লান আলো আসিয়া পড়িয়াছে। পশ্চাতে ঘনপাণ্ডুরতা—সমস্তই কেমন বিষাদময় হইয়া উঠিল। আজিকার যুদ্ধ কি নিষ্ফল হইল? মন বলিতেছে, নিশাগমে শত্রু নিরস্ত হইবে না—আমাদিগকে শ্রান্ত অবসন্ন করিয়া আমাদের গোলাগুলির অভাব ঘটাইবার উদ্দেশ্যেই তারা সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত গোলা চালাইয়াছে! তাই রাত্রে সজাগ সতর্ক হইয়া তাদের প্রতীক্ষায় রহিলাম।

গভীর রাতে প্রচণ্ড আক্রোশে শত্রু একযোগে আক্রমণ করিল। মনে হইল, তাদের 'উলা'-ধ্বনি যেন শত শত বন্যজন্তুর গর্জ্জন! অন্ধকারে তাদের কিরীচ জ্বলিতেছে তুষারের উপর সূর্য্যরশ্মির মত। ভাবিলাম, এবার শত্রুকে দেখাইব, আমরা কেমন পদার্থ! সকলে লক্ষ্য স্থির করিয়া গুলি বর্ষণ করিতে লাগিলাম—সে অব্যর্থ সন্ধানের মুখে শত্রুর পরাজয় নিশ্চিত। 'উলা'-ধ্বনি ক্রমেই নিস্তেজ হইতে লাগিল—অসির জৌলুসও অন্ধকারে অন্তর্হিত হইল। আবার চারিদিক নীরব। সেই নীরবতায় তৃণভূমি হইতে পতঙ্গের করুণ গুঞ্জন এবং যুদ্ধক্ষেত্রে পরিত্যক্ত আহত রুশেদের কাতরানি স্পষ্ট হইয়া উঠিল। উপরে, আকাশে ঘনমেঘ ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে—বর্ষণ আসন্ন, সন্দেহ নাই। সে-বর্ষণের পূর্ব্বে আমাদের নয়ন দু-ফোঁটা অশ্রুবর্ষণ করিল—এ যুদ্ধে যারা প্রাণ দিল, তাদের জন্য!

১১

প্রতিরোধ

প্রতিরোধের কাজ বিষম বিড়ম্বনা! ভিতরে বাহিরে হয়ত যুদ্ধের জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত, তবু সুযোগের অপেক্ষায় বসিয়া থাকিতে হয়। কাজের অভাবে কটিবন্ধ হইতে বিলম্বিত অসি গুমরাইতেছে, হাতের পেশিগুলা দীর্ঘশ্বাস ছাড়িতেছে, তথাপি নিরুপায়! আক্রমণের গোড়ার কথা প্রতিরোধ—এ কথা কিন্তু ভুলিলে চলে না। যুদ্ধপ্রণালী স্থির করিয়া আক্রমণে অগ্রসর হইবার পূর্ব্বে সতর্ক প্রতি-রোধের সব রকম উপায় অবলম্বন করিতে হয়, শত্রুর অবস্থা পুঙ্খানুপুঙ্খ ও নির্ভুলভাবে নির্দ্ধারণ করিতে হয়, তাদের সৈন্যসংস্থান আবিষ্কার করিতে হয়। কাজেই আমাদের বর্ত্তমান অবস্থা যেন সরোবরের মধ্যে "ড্রাগন"-এর ক্ষণস্থায়ী আত্মগোপন, আর আমাদের যুদ্ধযাত্রা যেন মেঘ ও কুয়াশায় ঢাকা "ড্রাগন"এর স্বর্গারোহণ!

শত্রু কেন্‌জান্ লইতে না পারিয়া Schuangtai-kou ও Antzu-ling এবং দক্ষিণে Taipo-shan ও Laotso-shan-এর দিকে অনেকটা পিছু হটিয়া গেল। সেখানে বরাবর পাহাড়ের উপর সুদৃঢ় বাধা তুলিয়া জাপানী আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য প্রস্তুত হইল। আমরা যেখানে ছিলাম ঠিক সেখানেই রহিলাম, শত্রুকে কণা পরিমাণ ভূমিও ফিরাইয়া দিলাম না। Huangni-chuan-Tashang tun-এর উত্তর পূর্ব্বের পাহাড়গুলির উপর লক্ষ্য রাখা আমাদের দলের কাজ। প্রথম দিনই কোদাল ও শাবল লইয়া মাটি-খুঁড়িতে সুরু করিলাম। Changchia-tun-এর তুলনায় এবার আমরা শত্রুর আরও নিকটে আছি। শত্রু মাঝে মাঝে হানা দিবে ইহা নিশ্চিত, তাই

প্রতিরোধের রীতিমত ব্যবস্থার প্রয়োজন। অবিরাম কঠিন যুদ্ধের পরও সৈনিকের বিশ্রামের অবসর নাই, সে-চিন্তা তাদের মনেও ওঠে না। দিন রাত তারা বালির বস্তা ও তারের বেড়া পিঠে লইয়া খাড়া পাথুরে পথ দিয়া ঘাসের চাবড়া বা ছুঁচলো পাথর ধরিয়া ধরিয়া উঠিতেছে।

কঙ্কালের মত এক পাষাণময় তুঙ্গশৈলের উপর আমাদের আস্তানা—পাহাড়ের ধার নীচে উপত্যকায় প্রায় সোজা নামিয়াছে। জলশূন্য বৃক্ষবিরল পাহাড়। একমাত্র সুখ—কুয়াশার ভিতর দিয়া দূরে Laotie shan এর দুর্গ-শ্রেণী চোখে পড়ে, নিকটের পাহাড়েও গড়-ঘেরা মাটির ঢিপি দেখিতে পাই। দেখিয়া কল্পনা করি, অচিরে ওই রঙ্গমঞ্চে আবার যবনিকা উঠিবে—আবার ওখানে এক জীবন্ত নাট্যাভিনয় দেখিতে পাইব। দুর্ব্বার সংগ্রামের আমেজ পাইতেছি—এবার যেন এমন করিয়া নিঃশেষে আত্মাহুতি দিতে পারি, যাহাতে দেহের কণা পরিমাণ অস্থি-মাংসও অবশিষ্ট না থাকে!

কঠিন পরিশ্রম আর ব্যর্থ কল্পনায় দিন কাটিয়া যায়। রাত্রির নিকষ কালো পর্দা ঠেলিয়া একদল কালো মূর্ত্তি পাহাড়ে উঠিয়া আসে। উহারা কে? সারাদিনের শ্রমে কাতর সৈনিককে অব্যাহতি দিবার জন্য নূতন লোক আসিতেছে। তবে কি রাতেও কাজ চলে? চলে বই কি—আক্রমণ-প্রতিরোধ ব্যবস্থার এই রাতের কাজই আসল। দিনের বেলা, কোথায় কাজ চলিতেছে নির্ণয়ের জন্য শত্রু গোলা চালায়—তখন একটানা কাজ অসম্ভব। তাই রাতে খাটিয়া সময়ের ক্ষতিপূরণ করিয়া লইতে হয়। দূরে শত্রু-শিবির হইতে উত্থিত ধোঁয়ার পানে চাহিয়া আমাদের সৈনিকেরা পাথরের গাদা দেয়, বালি বহিয়া আনিয়া থলি ভর্ত্তি করে এবং তারের বেড়া দিবার খোঁটা পোঁতে। যথাসম্ভব নিঃশব্দে কাজ করিতে হয়—ধূমপানের উপায় নাই, বলাই বাহুল্য। একটি সিগারেট ধরাইলে শত্রু গুলি চালাইতে পারে!

রাত দুটা তিনটা পর্য্যন্ত দারুণ ঝড় জলের মধ্যেও কাজ চলিতে থাকে। প্রত্যূষে কেবল ক্ষণকালের বিশ্রাম। কেহ কেহ তখনও বন্দুক-কাঁধে মূর্ত্তির মত খাড়া দাঁড়াইয়া শত্রু-শিবির পানে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখে। শাস্ত্রীদের কাজ মোটেই সহজ নয়। অনাবৃত আকাশতলে শীতল নিশীথ বাতাসে দাঁড়াইয়া মৃদু হাসিয়া তারা বলাবলি করে—বেজায় শীত হে! আজ আবার ওঁরা (শত্রু) আসছেন না কি?

রুশ গোলন্দাজেরা ঠিক কোথায় কেহ জানে না। উপত্যকায় আমাদের কর্ম্মচারীদের শিবির—সেখানে তারা গোলা ফেলিত। একদিন একটা প্রকাণ্ড গোলা উড়িয়া আসিয়া দারুণ শব্দে ফাটিয়া গেল। পাহাড়ের খানিকটা চূর্ণ হইল, পাথর ছিটকাইল, পীতাভ ঘন ধোঁয়ায় চারিদিক ভরিয়া গেল, মাটি কাঁপিয়া উঠিল। যুদ্ধে ব্যবহৃত সাধারণ কামানের গোলার অভিজ্ঞতা ছিল—এতবড় গোলা এই প্রথম দেখিলাম। ভারি বিস্ময় বোধ হইল—তবে কি শত্রু Lungwang-tang-এ নৌ-কামান টানিয়া তুলিয়া গোলা দাগিতেছে?

আর একটা ব্যাপারেও মনে খটকা লাগিল। প্রত্যহ প্রায় একই সময়ে শত্রু আমাদের পানে সবিক্রমে গোলা চালাইত, সর্ব্বদাই সেনাধ্যক্ষের আড্ডা লক্ষ্য করিয়া কামান ছুড়িত—তার ফলে আমাদের অপ্রত্যাশিত ক্ষতি হইতে লাগিল। মনে হইত, শত্রুর এই আচরণের মধ্যে কোথায় যেন কি একটা রহস্য আছে, কিন্তু তা ভেদ করা মোটেই সহজ নয়। অবশেষে দীর্ঘকাল সতর্ক সন্ধানের ফলে জানা গেল যে, আমাদের শাস্ত্রীশ্রেণীর পিছনে চীনারা গরু বা ভেড়ার পাল লইয়া পাহাড়ে উঠিত—জন্তুগুলি চরানোই যেন তাদের উদ্দেশ্য! তথা হইতে দূরবর্ত্তী রুশ-দলকে সঙ্কেত করিত। যেদিকে বা যে-গ্রামে গোলা ফেলা দরকার, একটা কালো গরু বা একপাল ভেড়া ধীরে ধীরে সেদিকে চালিত করিয়া ইঙ্গিতে ব্যাপারটি বুঝাইয়া দিত!

মাসের শেষের দিকে আমাদের সন্ধানী কর্ম্মচারীরা শত্রুর প্রহরীশ্রেণী ভেদ করিয়া তাদের কয়েকজন কর্ম্মচারীকে অতর্কিতে ঘেরিয়া ফেলিল। কাজ হাসিল করিয়া ফিরিবার পথে তিন চার জন রুশ সন্ধানী দূতের সঙ্গে সাক্ষাৎ। এদিক ওদিক তাড়া খাইয়া বন্দী হইবার ভয়ে তারা মরিয়া হইয়া গুলি চালাইয়া পলায়নের চেষ্টা করিতে লাগিল। শেষ পর্য্যন্ত কেবল একজনকে

বন্দী করিয়া জাপানী কর্ম্মচারীরা সগৌরবে ফিরিয়া আসিল।

বন্দীকে যথাবিধি প্রশ্ন করা সুরু হইল। সে একজন পদাতিক কর্ম্মচারী। ঘন ঘন মাথা নোয়াইয়া সে প্রাণ-ভিক্ষা করিতে লাগিল। যাহা জানে সমস্তই প্রকাশ করিবে বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিল। যেখান থেকে শত্রুর গতিবিধি নজরে পড়ে সেখানে লইয়া গেলে সে রুশ-সৈন্যের সংস্থান-ব্যবস্থা অসঙ্কোচে দেখাইয়া বুঝাইয়া দিল। তার উত্তরের সঙ্গে আমাদের লোকের সংগৃহীত বিবরণ মিলাইয়া দেখা গেল, সে মিথ্যা কহে নাই। সে যাহা জানিত সমস্তই অকপটে প্রকাশ করিল—আমরা যথেষ্ট উপকৃত হইলাম। তবুও তার প্রতি কৃতজ্ঞতার বদলে ঘৃণারই উদ্রেক হইল—সে কাপুরুষ বলিয়া!

আর একজন রুশ সৈনিকের পরীক্ষার কথা বলি। আমাদের কেন্‌জান্‌ আক্রমণের পরের রাত্রে একটা প্রকাণ্ড পাথরের তলায় সে ধরা পড়ে। সেখানেই সে লুকাইয়া ছিল। আমাদের কথাবার্ত্তা হইল কতকটা এইরূপ—

"আমাদের আক্রমণ সম্বন্ধে তোমাদের ধারণা কি?"

"আমরা ভয় পাইয়াছিলাম। প্রতি মুহূর্ত্তেই ভাবিতেছিলাম জাপানীদের ভীষণ আক্রমণ সুরু হইবে।"

"নায়কেরা তোমাদের যত্ন আত্তি করে ত?"

"প্রথম যখন পোর্ট-আর্থারে আসি, তখন বেশ সদয় ব্যবহার পাইয়াছি, কিন্তু ইদানী আর তেমন নাই। মাস-তিনেক হইতে বেতনের মাত্র এক-তৃতীয়াংশ পাইতেছি। রসদের পরিমাণও সম্প্রতি প্রায় অর্দ্ধেকে দাঁড়াইয়াছে—বাকি যায় ওদের পকেটে!"

"নান্‌শানে পরাজিত রুশেরা কি পোর্ট-আর্থারে ফিরিয়াছে?"

"আসল দুর্গের মধ্যে তারা প্রবেশ করিতে পায় নাই—প্রথম 'লাইনে' কাজ করিবার আদেশ পাইয়াছিল। খাদ্য অবশ্য পায় নাই, কারণ তার না-কি অভাব! অগত্যা সেটা সংগ্রহের ভার তাদেরই!"

"তোমার দেশের লোক অনেকে বন্দী হইয়া জাপানে গেছে খবর রাখ কি?"

"হাঁ, জানি! এই সেদিন আমারই এক বন্ধু সেখানে গেল!"

১২

শিবির-জীবন

ভাবিতাম, তাঁবুগুলো অন্তত বৃষ্টি ও হিম আটকাইবার পক্ষে যথেষ্ট—কিন্তু বাতাস ও বৃষ্টির উপদ্রবে অধুনা তাহাদের অবস্থা শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছে। ষাট দিন হইল জাহাজ হইতে নামিয়াছি, ষাট দিনই তাঁবুর মধ্যে বাস। তাঁবুই আমাদের সাধারণ বাসস্থান—সেই একখান ক্যাম্বিসই আমাদের সম্বল। রোদ আটকানো ছাড়া, আপাতত আর কোনো কাজে উহা লাগে না। দেহ নম্র প্রকৃতির অত্যাচার সহ্য করিল, কিন্তু রসদ আর অস্ত্রশস্ত্র গোলাগুলি রক্ষা পায় কিরূপে? অথচ এ সব পদার্থ আমাদের জীবনের মতই মূল্যবান! নিরুপায় অবস্থায় বৃষ্টির মধ্যেও সুনিদ্রার ব্যাঘাত হয় না—সুখস্বপ্ন আমাদের দিনের শ্রান্তি দূর করে। তখন আমাদের সুপ্ত মুখের পানে চাহিলে দেখিতে পাইবে, সাজ-পোষাক আঁটিয়া আমরা ঘুমাইয়া আছি। মাথার লম্বা চুল এলোমেলো বিপর্য্যস্ত, মুখে খোঁচা খোঁচা গোঁফদাড়ি, রোদে-পোড়া গায়ের চামড়ায় ধূলামাটির প্রলেপ—যেন ভিখারী বা ডাকাতের পাল!

সকলেই কৃশকায় হইয়া পড়িয়াছে। আহারেই আমাদের একমাত্র আনন্দ। একটু অবসর পাইলেই মনে হয়—কি খাওয়া যায়?

"ভাল খাবার কিছু আছে?"

"না, তোমার কাছে নিশ্চয়ই আছে। দাও না ভাই একটু।"

দুজনে দেখা হইলেই এমনিধারা আলাপ হয়। মুখ বদলাইবার ইচ্ছা অদম্য হইলে, ছোলা মটর বা গম ভাজিয়া ইঁদুরের মত কুড়মুড় শব্দে চিবাইতে থাকি!

Dalny দখলে আসার পর জিনিষপত্র আনার সুবিধা বাড়িল। ঠিক যুদ্ধে ব্যাপৃত থাকার সময় ছাড়া আর বিশেষ কষ্ট রহিল না। সৈনিকেরা নিয়মিত রসদ পাইতে লাগিল—নিজেরা রাঁধিয়া খায়। পাহাড়ের

ছায়ায় বা পাথরের ঢিপির আড়ালে শুকনো ভুট্টাগাছ জ্বালাইয়া রান্না হইতেছে, নিবস্ত আগুনের ধোঁয়ায় অধীরভাবে ভাত সিদ্ধ হইবার আশায় তারা বসিয়া আছে, দেখিতে পাইতাম। তাদের দেখিয়া মনে হইত যেন একপাল ফুর্ত্তিবাজ ছেলে! শশা, শুকনো মূলা, শাক-সবজি, শুকনো রাঙা আলু বা টিনেভরা খাদ্যেই তাদের সমধিক রুচি। বিনা জলে শুকনো বিস্কুট গেলা সাধারণত যাদের অভ্যাস, আধসিদ্ধ ভাতের সঙ্গে দু-একটা নুনে-জরানো কুল পাইলে যারা রীতিমত ভোজ বলিয়া মনে করে, উপরোক্ত আহার্য্য পাইয়া তারা যে বর্ত্তিয়া যাইবে, সে কথা বলাই বাহুল্য।

বর্ত্তমানে Changchia-tun অপেক্ষা প্রীতিপ্রদ স্থানে আছি। এখানে কিছু কিছু শ্যামল তৃণ আছে, দু-চারিটি সুন্দর ফুলও হাসিতেছে। ঝিনুকের খোলের মধ্যে ফুলগুলি সাজাইয়া রাখি, কখনও বা কোটের বোতামে আটকাইয়া তাদের সৌরভ আঘ্রাণ করি। ক্ষুদে ক্ষুদে নীল "Forget-me-not"-এর পানে চাহিয়া কল্পনায় ভর করিয়া গৃহে প্রিয়জনের কাছে উড়িয়া যাই!

রুশ ছাড়া জাপানী যোদ্ধার অপর এক শত্রু ছিল—আব্‌হাওয়া নামক বিষম দানব। মানুষ যতই কেন সাহসী হোক, হঠাৎ পীড়িত হইয়া রণক্ষেত্র ত্যাগে বাধ্য হইতে পারে। ইহাকেই বলে—'আবহাওয়া' নামক শত্রুর হাতে ঘায়েল হওয়া। কখনো কখনো আর এক শত্রুর হাতে তারা ঘায়েল হয়—তার নাম 'খাদ্য'। মুক্ত আকাশতলে বৃষ্টি বাতাসের মাঝে থাকার দরুন কখনো কখনো সংক্রামক রোগের আবির্ভাব হয়। কাছাকাছি গাছ-জাতীয় কিছু ছিল না বটে, তবে ঘাস ছিল যথেষ্ট। তার দ্বারা কাজ চালানো গোছ ঘরের ছাউনি হইতেও পারে। সেই ঘাসের চালা রৌদ্র নিবারণে যথেষ্ট হইলে ঝড়বৃষ্টিতে একেবারে অচল, বর্ষাকালে আমাদের ছেঁড়া তাঁবুর চেয়েও অধম। শত্রুর গোলার ঝড় তবুও সহ্য হয়, কিন্তু প্রাকৃতিক ঝড় একেবারে কাবু করিয়া ফেলে। দিনরাত অতি পরিশ্রম, নিদ্রাভাব, অতি কদর্য্য জলপান, তার উপর বৃষ্টিতে ভিজিয়া ভিজিয়া হাড়-ইস্তক ঠাণ্ডা হইয়া যায়! এ সবের ফলে সৈন্যশ্রেণীতে আমাশয় দেখা দিয়া অনেককেই অকেজো করিয়া ছাড়িল। আমি বেশ বলিষ্ঠ ও হৃষ্টপুষ্ট ছিলাম—উক্ত রোগের কবলে পড়িয়া অতি দ্রুত দেহের শক্তি ও স্বাস্থ্য হারাইতে বসিলাম। ভয় হইল শেষ পর্য্যন্ত বা সেই শত্রুর হাতেই পরাজয় ঘটে! ভাবনায় বড়ই বিমর্ষ হইয়া পড়িলাম।

প্রতিদিনই যুদ্ধযাত্রার আদেশ পাইব আশা করিতেছিলাম। সুস্থ হওয়ার পূর্ব্বে আদেশ আসিলে আমরা পড়িয়া থাকিব—আর যুদ্ধের গৌরবের ভাগ পাইব না! একে অসুস্থতা, তার উপর ভাবনাচিন্তায় অধীরতা ও দুঃখের ভারও বাড়িয়া গেল। তখন যে তিন ব্যক্তি আমার উপকার করিয়াছিলেন তাঁদের সহৃদয়তা কখনও ভোলা সম্ভব নয়—দু-জন অস্ত্রচিকিৎসক, মাসাইচি-য়্যাসুই ও হাজিমে-আন্দো; আর আমার সৈনিক-ভৃত্য বুন্‌কিচি-তাকাও।

আমার রোগ ছোঁয়াচে, তবুও তাঁরা নিয়ত আমার কাছে কাছে থাকিয়া সযত্নে ঔষধ পথ্য ও সেবার ব্যবস্থা করিতেন। আনন্দ ও সান্ত্বনা দিবার জন্য কত মজার মজার গল্প বলিতেন। তাঁদেরই চেষ্টায় সুস্থ হইয়া আবার যুদ্ধে যোগ দিয়া কর্ত্তব্য সম্পন্ন করা সম্ভব হইয়াছিল। এইরূপে তাঁদের প্রতি সবিশেষ অনুরক্ত হইয়া, যতদিন সেখানে ছিলাম, তাঁদের দুঃখের ও শ্রমের ভাগ লইয়া তৃপ্ত হইতাম।

সুদৃঢ় দুর্গের ভীষণ অবরোধ যখন চলে, তখন যারা সম্মুখে থাকে, আঘাত ও মৃত্যু কেবল তাদেরই মধ্যে নিবদ্ধ থাকে না—পশ্চাতে অস্ত্র-চিকিৎসক ও অন্যান্য অ-যোদ্ধার মধ্যেও উহা আবির্ভূত হয়। শুধু তাই নয়, অনেক সময়ে আহতকে তুলিয়া আনার জন্য, নিজ জীবন বিপন্ন করিয়া গোলাগুলির মুখেও ডাক্তারকে আগুসার হইতে হয়। এমন অবস্থায় কে যে আগে মরিবে কেহ তাহা জানে না।

যুদ্ধক্ষেত্রের গোলমালে কার বিশেষ বন্ধু কোথায় মরিল সাধারণত জানা অসম্ভব, তার দেহও খুঁজিয়া পাওয়া দায়। মৃত বা জীবিত অবস্থায় তার সাক্ষাৎ লাভ এত অনিশ্চিত যে, তেমন দুরাশা কেহই করে না। তাই পোর্ট-আর্থার দুর্গের প্রথম আক্রমণ ঘোষিত হইলে

ডাক্তার দু-জনের হাত ধরিয়া শেষ বিদায় লইলাম। আবার তাদের দেখিবার আশা ছিল না।

সৈন্যাবাসে যে-সৈন্যদল আমার শিক্ষাধীন ছিল, তার মধ্যে আমার সৈনিক ভৃত্য বুন্‌কিচি-তাকাও অন্যতম। তার অনুরাগ, আগ্রহ ও অকপট ব্যবহার আমাকে মুগ্ধ করিয়াছিল। সদরে বদলি হইবার পর অনেক পীড়াপীড়ি করিয়া তার নায়কের অনুমতি আদায় করিয়া তাহাকে ভৃত্যের কাজে বাহাল করি। শান্তির সময়, কর্ম্মচারী ও তার ভৃত্যের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কই থাকে, কিন্তু একত্রে যুদ্ধ-ক্ষেত্রে থাকার সময় সে-সম্পর্ক আরও নিবিড় হয়, তখন আর প্রভুভৃত্যের সম্বন্ধ নয়, বড় ও ছোট ভাইয়ের সম্বন্ধ। সকল বিষয়েই আমি তাকাও'র উপর নির্ভর করিতাম—সেও আমার অত্যন্ত অনুগত হইয়া পড়িয়াছিল। রাঁধা-বাড়া করিয়া সে আহার পরিবেষণ করিত—কোথা হইতে একটা প্রকাণ্ড জলাধার সংগ্রহ করিয়াছিল—দূর থেকে জল আনিয়া তাহা ভরিয়া দিত—তার কল্যাণে গরম জলে স্নানের আরাম উপভোগ করিতাম।

রোগের সময় শ্রান্তি ভুলিয়া সে সারারাত আমার পাশে বসিয়া থাকিত, গা-হাত-পা টিপিয়া আমাকে আরাম দিবার চেষ্টা করিত। ক্ষুধায় কাতর হইয়া খাইতে চাহিলে সে আমাকে ভর্ৎসনা করিত—শিশুকে ভুলাইবার মতই বলিত, এখন আপনার অসুখ, এখন কি খেতে আছে? শীগ্‌গির শীগ্‌গির সেরে উঠুন, তখন যা চাইবেন তাই খেতে দেব!

প্রত্যেক খুঁটিনাটির প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া সে সেবা করিত, এতটুকু নড়চড় হইত না, না চাহিতেই সব কিছু পাইতাম!

আমার সেই সহৃদয় ভৃত্যের কথা কখনও ভুলিব না।

১৩

স্মৃতি-তর্পণ

পোর্ট-আর্থারে রুশের অধিকার ক্রমেই খর্ব্ব হইয়া আসিতেছিল, সেই জন্যই আমাদের সৈন্যশ্রেণী বিদীর্ণ করিয়া হাত পা মেলিবার তাদের প্রাণপণ চেষ্টা। আমাদের সামনে এক খাড়া পাহাড়, তার নাম দিয়াছিলাম ইওয়া-য়্যামা। সেখানে শত্রুর চর প্রায়ই আমাদের সন্ধান লইতে আসিত। অগত্যা সেই জায়গায় আমাদের এক ঘাঁটি বসানো স্থির হইল।

১৬ জুলাই তারিখে, তখনও গভীর অন্ধকার, লেফ্‌টেন্যাণ্ট সুগিমুরা কয়েকজন সৈনিক লইয়া সেখানে যাইবার আদেশ পাইল। গ্রীষ্মকালেও রাতের হাওয়া ঠাণ্ডা—সেই ঠাণ্ডা হাওয়া তাদের মুখে ঝাপটা দিয়া তৃণগুল্মের মাঝে সর্‌সর্ ধ্বনি তুলিল। রাতের পর রাত সুনিদ্রার অভাবে তাদের অবস্থা শোচনীয়—স্নায়ু দুর্ব্বল, দেহে মাংস নাই, সকলেই অস্থিসার। অন্ধকার ভেদ করিয়া তারা দেখিবার চেষ্টা করিতেছে, শত্রুর পদশব্দের জন্য মাঝে মাঝে মাটিতে কান পাতিয়া শুনিতেছে, কারণ এমন রাতে শত্রু নিশ্চয়ই আসিবে। সহসা শাস্ত্রী হাঁকিল—শত্রু! অমনি লেফ্‌টেন্যাণ্ট হুকুম দিল—ছড়িয়ে পড়, ছড়িয়ে পড়! অবিচলিত সাহসে শত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধ করিয়া জায়গাটি রক্ষা করিবার জন্য সুগিমুরা বদ্ধপরিকর হইল। শত্রু তিনদিক ঘিরিয়াছে, সংখ্যায় তারা অনেক বেশী, যদিও ঠিক কত অন্ধকারে বুঝিবার যো নাই। উপরন্তু তারা 'মেশিন্‌-গান্' সঙ্গে আনিয়াছে। আত্মরক্ষার জন্য এই ভীষণ মারণাস্ত্র রুশেরা ব্যবহার করিয়া থাকে। নান্‌শানে ইহারই মুখে শত সহস্র জাপানী চূর্ণ হইয়াছে। মাত্র জন কয় সৈনিক লইয়া তিন দিকে শত্রু-পরিবৃত হইয়া সুগিমুরা লড়িতে লাগিল। তার নিজের এবং দলবলের শৌর্য্যবীর্য্য এমন যে দুই ঘণ্টা লড়াইয়ের পরও শত্রু এতটুকু ভূমি অধিকার করিতে পারিল না। ফলে হঠাৎ রণে ভঙ্গ দিয়া তারা অন্ধকারে অদৃশ্য হইল। কিন্তু সাহসী সুগিমুরা মারাত্মক ভাবে আহত হইল—'মেশিন-গানের' গুলি তার মাথা ভেদ করিয়াছে। যে কয় মিনিট সে বাঁচিয়া ছিল চীৎকার করিয়া সকলকে উৎসাহ দিয়াছে, হু হু করিয়া চোখের মধ্যে রক্ত ঝরিয়া পড়িয়াছে, তবু নিরস্ত হয় নাই।

রুশপক্ষ দশজনের বেশী মৃত সৈনিক ফেলিয়া গিয়াছিল। পরদিন প্রত্যুষে 'রেড-ক্রশ' নিশান ও 'ষ্ট্রেচার' লইয়া রুশেরা আসিল। জাপানী শাস্ত্রীদের দিকে গম্ভীর-ভাবে অগ্রসর হইয়া মৃত দেহ কুড়াইবার ছলে আমাদের

শিবিরে উঁকি দিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। এ ত গেল, এ ছাড়া তারা অন্যায়ভাবে শ্বেত পতাকা ও জাপানী সূর্য্য-পতাকার সাহায্যে ইতিপূর্ব্বে আমাদের ঠকাইবার ঘৃণ্য চেষ্টা করিয়াছে। একবার নয়, দুইবার নয়, এ চালাকি প্রায়ই তারা করিয়া থাকে। একবার আর এক রকমে তাদের নীচতা প্রকাশ পায়।

একদিন রাতে আমাদের শান্ত্রী দেখিতে পাইল একটা অন্ধকার ছায়া তার পানে আগাইয়া আসিতেছে। দস্তুরমত সে হাঁকিল, "কে যায় ? দাঁড়াও !"

ছায়ামূর্ত্তি উত্তর দিল, "জাপানী সামরিক কর্ম্মচারী···" শান্ত্রী ভাবিল হয়ত কোনো কর্ম্মচারী শত্রুর খোঁজে গিয়াছিল, এখন ফিরিয়া আসিল। তাই সে বলিল, "যাও !" হঠাৎ সেই মূর্ত্তি কিরীচ লইয়া তাহাকে আক্রমণ করিল। নিমেষে শান্ত্রীর ভুল ভাঙিয়া গেল, সে কহিল, "ওরে পাজি, তুই শত্রু ! তবে এই দ্যাখ !" বলিয়া বন্দুকের বাঁট দিয়া এক ঘায়ে তাহাকে ধরাশায়ী করিয়া ফেলিল।

শত্রু কয়েকটা জাপানী কথা শিখিয়া তাহারই সাহায্যে আমাদের ঠকাইবার চেষ্টা করিত।

বাহকেরা সুগিমুরাকে তুলিয়া এক গোলাঘরে লইয়া গেল। সেখানে তার সৈনিক ভৃত্য ইতো মায়ের মত যত্নে তার সেবায় নিরত হইল। বিশ্বাসী ইতোর চোখে জল, ভাবনা ও শ্রান্তিভারে মুখ মলিন, তবুও সে আহত প্রভুকে কত মত সান্ত্বনা দিতে লাগিল। সুগিমুরাকে হাসপাতালে পাঠানোর পরও সে সময় পাইলেই অনেকখানি দুর্গম পথ পায়ে হাঁটিয়া তাহাকে দেখিতে যাইত। একদিন সদর থেকে ফিরিবার পথে দেখি কাঁধে ভারি বোঝার ভারে হাঁপাইতে হাঁপাইতে এক সৈনিক পাহাড়ে উঠিয়া আসিতেছে। কাছে পৌঁছিয়া দেখি সে ইতো। জিজ্ঞাসা করিলাম, সুগিমুরার অবস্থা কেমন ?

"ভারি খারাপ। আজ আর তিনি কোনো কথা বুঝতে পারছেন না।"

"তাই ত ! তোমার সেবা যত্নে নিশ্চয়ই তিনি তুষ্ট হয়েছেন !"

কথাটা শুনিয়া ইতো কাঁদিয়া ফেলিল, কহিল, "তাঁর সঙ্গে আমিও কেন আহত হইনি, এই আমার দুঃখ ! কত দয়া তিনি করেছেন, তার কোনো প্রতিদান দিতে পারিনি, আর এখন তিনি ছেড়ে চল্লেন জন্মের মত ! দুজনে একসঙ্গে মরতে পারলে কত আনন্দ হ'ত ! এই ত কাল রাতে তিনি আমার হাতখানা চেপে ধরে বল্লেন, তোমার স্নেহ ভুলতে পারব না ! শুনে আমার কেবলই মনে হতে লাগল, কেন তাঁর সঙ্গে আমারও মরণ হ'ল না !"

তার পর সে বলিল, "তবে আসি, আর দাঁড়াবার সময় নেই। দেরী হলে হয়ত তাঁকে দেখতে পাব না।"

ইতো চলিতে লাগিল। তার কাঁধের উপর যে ভারি বোঝা, তাহাতে সুগিমুরারই জিনিষপত্র ছিল।

আর একজনের কথা বলি। সৈনিকটির নাম হেইগো য়্যামাশিতা। লোকটি ভারি বাধ্য ও কর্ত্তব্যপরায়ণ, পরিশ্রম যতই হোক তার আপত্তি নাই। সঙ্গীরা তাহাকে শ্রদ্ধা করিত, ভালো বাসিত, তাদের ধারণায় সে ছিল সৈনিকের আদর্শস্থানীয়। একদিন যুদ্ধক্ষেত্রে সে তার প্রিয়তম বন্ধুর পানে ফিরিয়া গম্ভীরভাবে বলিল, "প্রাণ নিয়ে ফিরে যাবার আশা আমার নেই। দশবছর আগে যে-সব সঙ্গীরা মারা গেছে তাদের সঙ্গে দেখা ক'রে বলব তাদের মৃত্যুর পূর্ণ প্রতিশোধ নেওয়া হয়েছে—এ ছাড়া আমার অন্য কামনা নেই। কিন্তু আমার এক দাদা আছেন তিনি ভারি গরীব। আমি মরলে, তাঁকে জানিয়ো আমার মরণের ফুল কেমন করে' কি অপরূপ রূপে ফুটেছিল !"

অনতিকাল পরে এক জরুরি চিঠি বিলি করিবার আদেশ সে পাইল। কাজ শেষ করিয়া ফিরিবার পথে তার পেটে গুলি লাগিল। কিন্তু তার ভ্রূক্ষেপ নাই। বলিল, "এ আর এমন কি ? বিশেষ কিছুই নয় !"

লোকজন আসিয়া তাহাকে তুলিয়া লইয়া গেল, কারণ তার দাঁড়াইবার শক্তি ছিল না। ডাক্তার পরীক্ষা করিয়া মাথা নাড়িলেন। দলের নায়ক কর্নেল তাহাকে দেখিতে

আসিলেন, সান্ত্বনা দিয়া কহিলেন, "ভয় নেই। নিরাশ হয়ো না! নিশ্চয়ই খুব কষ্ট পাচ্ছ, কিন্তু সাহস হারালে চলবে না!"

মৃত্যু আসন্ন হইল। ঝাপসা চোখে কর্নেল বলিলেন, "এ আঘাত সম্মানের! তোমার কর্ত্তব্য তুমি পালন করেছ ..."

হেইগোর চোখ একটুখানি খুলিল, মুখে যন্ত্রণা-কাতর মিনতি—কর্নেল ক্ষমা...আমার মৃত্যুর প্রতিশোধ...

তার হাত কাঁপিতে লাগিল, ঠোঁট নড়িয়া উঠিল, যেন সে আরও কিছু বলিতে চায়, কিন্তু তা আর হইল না। দেখিতে দেখিতে সে পরপারে যাত্রা করিল, যেখান থেকে কাহারও ফিরিবার উপায় নাই।

কেন্‌জান্ আক্রমণ থেকে এ পর্য্যন্ত বড় কম লোক মরে নাই। সেই সব বীরাত্মাকে স্মরণ করিবার জন্য একটি দিন ধার্য্য হইল। নির্দ্দিষ্ট দিনে মেঘলা সন্ধ্যার দিকে Lingshuiho-tzu-র কাছে এক গোলাবাড়িতে একটি বেদী স্থাপনা করা হইল। নামেই বেদী, কিন্তু আসলে এক কৃষকের উঠান থেকে আহরিত একটি ডেস্ক। সাদা কাপড়ে সেটি ঢাকিয়া তার উপরে টাঙানো হইল 'অমিদা' বুদ্ধের এক ছবি। ধর্ম্মযাজক তোয়ামার কাছে ছবিখানি পাওয়া গেল। বেদীর সামনে মৃতের ভস্মাবশেষ-ভরা বাক্সগুলি থাক দিয়া সাজানো হইল—চারি কোণা বাক্স, দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে পাচ ইঞ্চি। ধূপ জ্বালানো হইল, বেদীর মুখ রহিল পোর্ট-আর্থারের দিকে। মোমবাতির ম্লান আলোয় নিরানন্দ শোকের ভাব মূর্ত্ত হইয়া উঠিল, নিকটে ও দূরে পতঙ্গদল সুর করিয়া যেন জীবনের নশ্বরতার কথা প্রচার করিতে লাগিল। বাতাস সিরসির করিয়া উইলোর শাখা চিরুণীর মত আঁচড়াইতে লাগিল, আর তারই মাঝ দিয়া বৃষ্টি ঝরিতে লাগিল যেন আকাশের কান্না। বেদীর সম্মুখে দাঁড়াইল নায়কেরা অর্দ্ধচন্দ্রাকারে, তাদের পিছনে দাঁড়াইল সেনাদল। ধর্ম্মযাজক শাস্ত্রগ্রন্থ থেকে পাঠ করিতে লাগিলেন। পাঠ-শেষে প্রধান নায়ক অগ্রসর হইয়া ধূপ জ্বালাইলেন, তারপর মাথা নত করিয়া দাঁড়াইলেন। অন্যান্য নায়কেরাও একে একে তাঁর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিল। স্তব্ধ নির্ব্বাক সভা, কেহ কোনো কথা বলিল না। অগোচরে নায়ক ও সৈনিকের জামার আস্তিন ভিজিয়া উঠিল—সে কি কেবল বৃষ্টির জলে?

ক্রমশঃ



রবীন্দ্র-আরতি

শ্রীকরুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়

জয়ন্তী প্রতিভাচ্ছটা বিচ্ছুরিয়া বিশ্ব চমকিয়া
ভো রবীন্দ্র! বাগীশ্বর, বাণী তব অবিস্মরণীয়া।
সপ্তাশ্বের রশ্মিকরে এই পূর্ব্ব-আশার সৈকতে
কি অপূর্ব্ব আবির্ভাব দীপ্যমান হিরণ্ময় রথে।
যশের দুন্দুভি তূর্য্যে দিঙমণ্ডলে আরতি তোমার—
নমস্তে বিরাট-কণ্ঠ, চিরঞ্জীব কবি-অবতার।
লহ অকিঞ্চন অর্ঘ্য, মানসের পদ্ম-নিবেদন,
অনুপ অমৃতগন্ধী শ্রদ্ধাঘন অগুরু চন্দন।
যেমতি পঙ্কিল নীর মিশি পুণ্য জাহ্নবী-লহরে
হারায়ে মালিন্য তার দেবতার পূজাঘট ভরে—
তেমতি তোমার রস-নিষ্যন্দিনী ধারার বর্ষণে
নন্দিত নির্ম্মল হয়ে বন্দি তোমা এ পরমক্ষণে।

এ গৌরব-নিকেতনে পূজা দিতে আসিয়াছি আজ,
নির্ব্বাক করেছে চিত্ত উৎসবের ভেরীর আওয়াজ।
শঙ্খ সে দক্ষিণাবর্ত্ত মুখর মঙ্গল-সমীরণে,—
ক্ষম দোষ, ঘটে যদি ভকতের মন্ত্র-উচ্চারণে।
মনে পড়ে একদিন পদপ্রান্তে বসিয়া তোমার
শুনেছি তন্ময় হয়ে তব দৈবী বীণার ঝঙ্কার;
সুন্দরের মন্ত্র দিলে, তরুণের স্মৃতি-রন্ধ্র-পথে,
ধ্বনিল উদাত্ত গ্রামে মরমের পরতে পরতে।
দিয়াছিলে পরসাদ, পেয়েছিনু চরণের ধূলি
আজও সেই গর্ব্ব জাগে, ভুলি নাই স্নেহস্পর্শগুলি।
প্রসীদ হে দীক্ষাগুরু! তব তপো-নিরুদ্ধ নিঃশ্বাস
হোম-বৈশ্বানর যেন অপ্রকাশে করিল প্রকাশ।
অচিহ্নিত অনুদ্দেশে চিনিয়াছ আলোর স্বাক্ষর,
সার্ব্বভৌম প্রতিষ্ঠায়, বিদ্যোতিত উষ্ণীষ-ভাস্বর।
সীমা হ'তে যাত্রা তব অসীমের অদৃশ্য-উরসে,
ভাবের প্রশান্ত মহাসমুদ্রের অতল পরশে।
মৃত্যুঞ্জয় শৌর্য্য তব, বরপুত্র বিশ্বভারতীর,
আপনা হইতে অই পদযুগে নত হয় শির।
ইন্দ্রচাপ নিন্দি তব কল্পনার কার্ম্মুক টঙ্কারি
উদ্ধারিলে মহানিধি রত্নাকরে দূরে অপসারি।
বিশ্বজিৎ যজ্ঞভাগে লভিয়াছ ন্যায্য অধিকার,
অক্ষয় তোমার কীর্ত্তি; উপমা, উৎপ্রেক্ষা নাহি তার।

যে বিচিত্র অমরীরে যৌবনের রাখী-পূর্ণিমায়
পরাইলে রাঙা রাখী, সে অনিন্দ্যা বরিল তোমায়
স্বয়ম্বর-সভাতলে, প্রাণ লক্ষ্মী চিরন্তনী বধূ
যুগে যুগে নিবেদিল উন্মাদন মহুয়ার মধু।
অদ্বিতীয়া যাদুকরী, কবরীর এক বেণী তার
মুক্ত করি হে সুন্দর! জড়াইলে মুকুতার হার
আলাপিলে সাথে তার পূরবিয়া নারাঙ্গীর বনে
আধ-পরিচয়-ভরা-আধভোলা-জাগর-স্বপনে।

জীবনের অপরাহ্নে, কবিতার দিবাস্বপ্ন-পারে
তারি সে গোলাপ-কলি কবে ঢলি পড়িল পাথারে!
তোমার ব্যথার পূজা আজও কবি হয়নি নিঃশেষ,
প্রদীপ-শিখার রূপে দুঃখ-মূর্ত্তি জাগে অনিমেষ।
প্রকাম-উন্মুক্ত তব দেউলের দ্বার-বাতায়ন,
তার মাঝে শান্ত তুমি মননের গহনে মগন।
দুঃসহ-সুন্দর দুঃখ সুখ হয় যে-সাধন-ফলে,
বিকাশে তৃতীয় নেত্র, অন্তরেতে স্যমন্তক জ্বলে,—
রূপের সে অরবিন্দে অরূপের মধু করি পান
"দুঃখের বক্ষের মাঝে আনন্দের পেয়েছ সন্ধান,"
গানে গানে, সুরে সুরে, রূপে রূপে, ছন্দের ক্রন্দনে
অনন্তেরে আলিঙ্গিতে চাহিয়াছ বাহুর বন্ধনে।

হে প্রসন্ন-উদাসীন, কি দেখিছ সন্ধ্যার বাউল?
দীপ্ত জ্যোতি-উপবীতে আবর্ত্তিছে গ্রহের বর্ত্তুল
সুদূর নক্ষত্রলোকে,—দেশকাল ঋতু সম্বৎসর
মন্থন করিছে কোন্ অনাহত সপ্তকের স্বর!
হিমাদ্রির মেরুদণ্ডে বিসর্পিত প্রতিধ্বনি তার,
স্তব্ধ ব্যোম স্পন্দমান, গায়ত্রীর আদিম-ওঙ্কার।

সমসাময়িক সংবাদপত্রে রামমোহন রায়ের কথা

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

২

রামমোহনের বিলাত-যাত্রার সঙ্গী রামরত্ন মুখোপাধ্যায়

(২৮ সেপ্টেম্বর ১৮৩৩। ১৩ আশ্বিন ১২৪০)

"ইঙ্গলণ্ডদেশে মুক্তিয়ার প্রেরণ।—আমরা কেবল অল্প দিন শুনিয়াছি যে ১৮২৮ সালে কলিকাতার গবর্ণমেণ্ট লাখেরাজ ভূমি বিষয়ে যে আইন করিয়াছিলেন তাহাতে বঙ্গদেশীয় নিষ্কর ভূমির ভোগ দখলকারি ব্যক্তিরা আপনারদের স্বত্বহানি হয় বোধ করিয়া শ্রীযুত কোর্ট অফ ডৈরেক্তর্স সাহেবেরদের নিকটে ঐ আইনের আপীল করিতে ইঙ্গলণ্ডদেশে বাবু রামরত্ন মুখোপাধ্যায়কে আপনারদের মোখ্তার স্বরূপ প্রেরণ করিয়াছেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে আমরা ইহার সম্বাদ প্রথমতঃ ইঙ্গলণ্ডদেশে প্রকাশিত এক সম্বাদ পত্রের দ্বারা অবগত হইলাম। বিশেষতঃ গত ৬ আপ্রিল তারিখে লণ্ডননগরে প্রকাশিত টাইম্‌সনামক সম্বাদ পত্রের দ্বারা জ্ঞাত হওয়া গেল যে ১৭৯৩ সালে অতি সাধু গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর লার্ড কর্ণওয়ালিস ভারতবর্ষে নিষ্করভূমির ভোগবান ব্যক্তিরদের প্রতি এই অঙ্গীকার করিয়াছিলেন যে আদালতে তোমারদের নিষ্কর ভূমির সনন্দ অসিদ্ধ সপ্রমাণ না হইলে কদাচ বেদখল হইবা না কিন্তু এই প্রতিজ্ঞা স্পষ্টত হেয় করিয়া ১৮২৮ সালে কলিকাতার গবর্ণমেণ্ট রাজস্বের কর্ম্মকারক সাহেবেরদিগকে আদালতের ডিক্রী বিনা আপনারদেরই বিবেচনা মতে ঐ ভূমিভোগি ব্যক্তিরদিগকে বেদখল করিতে হুকুম দিলেন। তাহাতে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিরা ইহা না হয় এমত কলিকাতার গবর্ণমেণ্টে আবেদন করিলেন কিন্তু তাহাতে কেবল এইমাত্র ফলোদয় হইল যে শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে তাঁহারদিগকে এতাবন্মাত্র কহিলেন যে ১৮২৮ সালের আইন রদ বা মতান্তরকরণের আমি কোন উপযুক্ত হেতু দেখি না অতএব ভারতবর্ষে তাহার প্রতিকারহওনে হতাশ হইয়া ঐ ভূমিভোগি-ব্যক্তিরা বাবু রামরত্ন মুখোপাধ্যায়কে আপনারদের মোখ্তারের ন্যায় কোর্ট অফ ডৈরেক্তর্স সাহেবেরদের হজুরে প্রেরণ করেন এবং মুখোপাধ্যায় লণ্ডননগরে পঁহুছিয়া তাঁহারদের দরখাস্ত সবিনয়ে উক্ত কোর্টে নিবেদন করিলেন কিন্তু কোর্টের সাহেবেরা তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র বিবেচনা না করিয়া এবং তাঁহারদের নিকটে যে নালিসের প্রস্তাবকরণার্থ তাঁহারদের এক জন ভারতবর্ষীয় প্রজা স্বদেশীয় লোকেরদের হিতার্থ স্বীয় বাটী পরিজনাদি ত্যাগ করিয়া সাত হাজার ক্রোশ বিদেশ গত হইয়াছিলেন তাঁহার প্রস্তাবিত বিষয় সমূলক কি অমূলক ইহার কিছু তত্ত্বাবধারণ না করিয়া এইমাত্র উত্তর দিলেন যে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের কৃত কার্য্যের বিষয়ে ভিন্ন২ লোকেরদের দরখাস্ত যদ্যপি ঐ গবর্ণমেণ্টের দ্বারা কোর্ট অফ ডৈরেক্তর্স সাহেবেরদের নিকটে প্রেরিত না হয় তবে কোর্টের সাহেবেরদের তাহা গ্রাহ্যকরণের রীতি নাই।... —বোম্বাই দর্পণ।"

(৯ অক্টোবর ১৮৩৩। ২৪ আশ্বিন ১২৪০)

"ইঙ্গলণ্ডদেশে রামরত্ন মুখোপাধ্যায়ের প্রেরণ করণ।—.. গত সোমবারের হরকরা পত্রে ঐ আইন রদহওনের প্রার্থনা করণার্থ শ্রীলশ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলে বেহার ও উড়িষ্যা বঙ্গদেশ নিবাসিরা যে দরখাস্ত দিয়াছিলেন সেই দরখাস্ত এবং কোর্ট অফ ডৈরেক্তার্স সাহেবেরদের নিকটে বাবু রামরত্ন মুখোপাধ্যায় যে লিখন পঠন করেন তাহা প্রকাশিত হইয়াছে কিন্তু মুখোপাধ্যায় বাবু যে কোন্ সময়ে এতদ্দেশহইতে যাত্রা করেন তাহা প্রকাশিত নাই অতএব তাহা অদ্যপর্য্যন্তও আমরা জ্ঞাত হইতে পারি নাই।"

(১৯ অক্টোবর ১৮৩৩। ৪ কার্ত্তিক ১২৪০)

"বিলাতগামি শ্রীরামরত্ন মুখোপাধ্যায়ের বিষয়।— এপ্রদেশহইতে রামরত্ন মুখোপাধ্যায় যে বিলাত গমন করিয়াছেন এমত কথা আমরা শুনি নাই রামরত্ন মুখোপাধ্যায় এই নাম বাঙ্গালিভিন্ন অন্য দেশীয়ের নহে ইহা নিশ্চয় বটে কিন্তু বাঙ্গালি ব্রাহ্মণের মধ্যে এমত কুল প্রদীপ কেহ জন্মেন নাই যে বিলাত গমন করেন কেবল রামমোহন রায় ভিন্ন দ্বিতীয় ব্যক্তি অদ্যাপি দৃষ্টি বা শ্রবণগোচর হয় নাই অপর আমরা কএক সপ্তাহঅবধি

বিশেষ অনুসন্ধান করিলাম কেহই কহিতে পারিলেন না তৎপরে নানা স্থানের জমীদারপ্রভৃতিকে আমরা পত্র লিখিয়াছিলাম যদ্যপি এতাদৃশ আরজীতে কেহ স্বাক্ষর করিয়া থাকেন তাহাও কেহই স্বীকার করিলেন না এবং সকলেই কহেন যে বিলাত প্রেরণার্থ সভীর পক্ষ আরজী আর কলনিজেসিয়ানের বিরুদ্ধে এক আরজীতে আমরা স্বাক্ষর করিয়াছিলামমাত্র আর কিছুই স্মরণ হয় না অতএব এই প্রকার অনুসন্ধান দ্বারা বোধ হইল হিন্দু ধার্ম্মিকগণের মধ্যে এমত আরজী প্রস্তুত হয় নাই এবং রামরত্ন মুখোপাধ্যায়নামক কোন ব্যক্তি বিলাত গমন করেন নাই।

তবে যে বিলাতের সম্বাদ পত্রে এবং বোম্বে দর্পণে রামরত্ন মুখোপাধ্যায়ের নাম এবং তাহার আরজীর বিবরণ এবং বিচারপতিদিগের তদ্বিষয়ে হুকুম প্রকাশ হইয়াছে ইহা কি তাবৎ অলীক। উত্তর, আমরা তাহা তাবৎ অলীক বলি না তদ্বিষয়ে এই ঠিকানা করা গিয়াছে রামমোহন রায়ের সমভিব্যাহারে এতদ্দেশীয় এক জন দীন ব্রাহ্মণের সন্তান এখানে তাহার পাচক ছিল সেই গিয়াছে তাঁহার পরিচর্য্যা কর্ম্ম করিবেক কিঞ্চিৎ বেতন পাইবেক সেই ব্যক্তির নাম রামরত্ন মুখোপাধ্যায় হইবেক রায়জী চতুরতা করিয়া ঐ আরজীতে তাহারি নাম দিয়া তথায় দরপেশ করাইয়াছিলেন* যদি তাহাতে মঙ্গল হইত তবে আপন নাম ব্যক্ত করিতেন সেখানে আরজী অগ্রাহ্য হইল সুতরাং ঐ দীনহীনের নাম প্রকাশ হইল এবং ইহাও সর্ব্বত্র রাষ্ট্র করাইলেন যে আমি কেবল বিলাতে আগমন করিয়াছি এমত নহে আমার আগমনের পরেই আর এক জন ব্রাহ্মণ বিলাতে আসিয়াছে এবং আরো অভিপ্রায় আছে লাখরাজ বিষয়ে আরজী যদি রায়জী আপনি দরপেশ করেন তবে কোর্ট অফ ডৈরেক্তর্স সাহেবেরা তাঁহার প্রতি বিরক্ত হইতে পারেন। যদি বল এতাদৃশ আশঙ্কা তাঁহার থাকিলে কি জন্য এমত আরজী প্রস্তুত করাইবেন। উত্তর, যদি লাখরাজ বিষয়ক মোকদ্দমায় মঙ্গল হয় তবে তাবৎ বৃত্তিভোগি ব্রাহ্মণ তাঁহার পক্ষ হইতে পারেন তাহা হইলে বিলাত গমন জন্য দোষে দেশে এসে দোষী হইয়া পতিত থাকিবেন না এই বিবেচনা করিয়াছিলেন তাহা হইল না কিন্তু যদ্যপিও লাখরাজবিষয়ে কিছু মঙ্গল হইত তথাপি এপ্রদেশের কি ব্রাহ্মণ কি অন্যান্যবর্ণ অর্থাৎ কর্ণবেধী মাত্র তাঁহাকে হিন্দু জ্ঞান করিবেন না রাজ্যাস্পদ দিলেও ধার্ম্মিক হিন্দুরা জাত্যন্তরীয় ব্যক্তির সহিত ব্যবহার করেন না।... —চন্দ্রিকা।"

* এ কথা সত্য বলিয়া মনে হয়।

(২ নভেম্বর ১৮৩৩। ১৮ কার্ত্তিক ১২৪০)

"শ্রীযুত দর্পণপ্রকাশক মহাশয় সমীপেষু

...চন্দ্রিকাকার লেখেন যে অনুসন্ধান করিয়া জানিয়াছি উক্ত আবেদনপত্রে এতদ্দেশের কোন জমীদার স্বাক্ষর করেন নাই চন্দ্রিকাকার কি সত্যবাদী কিরূপ বা তথ্য তদন্ত করিয়াছেন কেহ স্বাক্ষর করে নাই এ কথা লিখিতে লজ্জার লেশমাত্র হইল না তবে যদি এমত বিবেচনা করিয়া থাকেন স্বয়ং ধনোপার্জ্জনে অক্ষম পিতার উপার্জ্জিত ধন হইতে ইদানীং বলে ছলে বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া যে জমীদারী করিতেছে কিম্বা দুই চারি বৎসরহইতে করিয়াছে সেই নব্য জমীদার মান্য তদ্ভিন্ন অন্য গণ্য নহে ইহা হইলে চন্দ্রিকাকারের সত্যবাদিত্বের কোন ব্যাঘাত জন্মে না কিম্বা স্বয়ং চন্দ্রিকাকার ভূমিশূন্য জমীদার আপনাকে স্বীকার করিয়া স্বাক্ষর না করিয়া থাকেন ইহাতেও সত্যবাদিত্বের হানি নাই তবে যে শ্রীযুত রাজা শিবকৃষ্ণ বাহাদুর ও শ্রীযুত বাবু রাধাকান্ত দেব ও শ্রীযুত রাজবল্লভ রায় চৌধুরী ও শ্রীযুত রাজকৃষ্ণ চৌধুরী ও সাবর্ণ চৌধুরী ও শ্রীযুত বাবু মধুসূদন সান্যাল এবং শ্রীযুত রামকমল সেনপ্রভৃতি যে তদাবেদনপত্রে স্বাক্ষর করিয়াছেন চন্দ্রিকাকারের বিবেচনায় বুঝি ইঁহারা জমীদার ও মান্যের মধ্যে গণ্য না হইবেন।...কস্যচিৎ তালুকদারস্য।"

(২৬ ডিসেম্বর ১৮৩৫। ১২ পৌষ ১২৪২)

"রাজকর্ম্মে নিয়োগ।—... ...

১৫ দিসেম্বর।

শ্রীযুত রামরতন মুখোপাধ্যায় মুরশিদাবাদের ডেপুটি কালেক্টর হইয়াছেন।"

রামরত্ন মুখোপাধ্যায় (ডাক নাম শম্ভুচন্দ্র) রাজা রামমোহন রায়ের পাচকরূপে বিলাত গিয়াছিলেন বলিয়া আমরা জানি। কিন্তু তিনি একখানি চিঠিতে নিজকে "রাজা রামমোহন রায়ের ইণ্ডিয়ান প্রাইভেট সেক্রেটারী" বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। তিনি পরে "রায় বাহাদুর" হইয়াছিলেন। বড়লাট লর্ড উইলিয়াম বেণ্টিঙ্ক তাঁহাকে কৃপার চক্ষে দেখিতেন। এদেশে ফিরিবার পর তিনি গভর্ন্মেণ্ট হাউসে যাইবার জন্য একবার লেডি বেণ্টিঙ্কের আমন্ত্রণ-পত্র পাইয়াছিলেন। তাঁহাকে একটি চাকরি দিবার জন্য ২৪-পরগণার জজ—মুর সাহেব বড়লাটের নির্দ্দেশে লিখিত একখানি সুপারিশ-পত্র পাইয়াছিলেন।

রামরত্ন ১৮৩৫ সালের ২৯এ ডিসেম্বর তারিখে মুর্শিদাবাদে ডেপুটি কালেক্টরের পদ পাইয়াছিলেন। হুদা ঈশানপুর খাসমহল তাঁহার তত্ত্বাবধানে ছিল। ১৮৪৪ সালের আগষ্ট মাস পর্য্যন্ত তিনি এই কর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন। শেষে আলস্যপরায়ণ ও কর্ত্তব্যকর্ম্মে অজ্ঞ—এই অপরাধে তাঁহার চাকরি যায়। (*Board of Revenue Cons. 20 Feby. 1838*, Nos. 160-62 ; *25 Aug. 1841*, No. 33. *13 Dec. 1844*, No. 30.)

অমূলক জনরব

(৩ নভেম্বর ১৮৩২ । ১৯ কার্ত্তিক ১২৩৯)

"শ্রীযুত রামমোহন রায়।—আমারদের দৃষ্ট হইতেছে যে অনেকেই উন্মত্ততাপূর্ব্বক লিখিয়াছেন যে শ্রীযুত রামমোহন রায় ইঙ্গলণ্ডীয় এক বিবিসাহেবকে বিবাহকরণার্থ উদ্যত হইয়াছেন। কলিকাতায় রায়জীর এক স্ত্রী আছে এবং তিনি প্রকাশরূপে হিন্দুশাস্ত্রের কোন বিধি উল্লঙ্ঘনকরাতে জাতিভ্রংশবিষয়ে নিত্য অতিসাবধান হইয়া আছেন অতএব আমরা বোধ করি যে এই জনরব সমুদায়ই অমূলক ও অগ্রাহ্য। তিনি ঈদৃশাবস্থা অর্থাৎ স্ত্রী থাকিতে যদি কোন বিবি সাহেবকে বিবাহ করিতে চেষ্টিত থাকেন তবে আমরা বোধ করি যে তাঁহার দৃঢ়তর বিপক্ষেরা রাগপূর্ব্বক তাঁহার প্রতি যত গ্লানি তিরস্কারাদি করিয়াছেন সে সকলেরই তিনি উপযুক্তপাত্র বটেন।"

(১০ নভেম্বর ১৮৩২ । ২৬ কার্ত্তিক ১২৩৯)

"শ্রীযুত রামমোহন রায়।—ইঙ্গলণ্ডদেশীয় সম্বাদপত্রের দ্বারা অবগত হওয়া গেল যে ইঙ্গলণ্ডীয় এক বিবি সাহেবকে বিবাহকরণবিষয়ক যে জনরব উত্থিত হইয়াছিল তাহা মিথ্যা জ্ঞাপন করিতে শ্রীযুত রামমোহন রায় ভদ্রবোধ করিয়াছেন।"

রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটিতে রামমোহন

(১১ ডিসেম্বর ১৮৩৩ । ২৭ অগ্রহায়ণ ১২৪০)

"রাজা রামমোহন রায়।—রাজা রামমোহন রায়ের তাবদ্বার্ত্তাবিষয়ক তাঁহার স্বদেশীয় লোকেরদের শুশ্রূষা বোধে লণ্ডননগরস্থ রাজকীয় আসিয়াটিক সোসৈটির বৈঠকে শ্রীযুত কোলব্রুক সাহেবের প্রতি সোসৈটির বাধ্যতা স্বীকারকরণ বিষয়ে তিনি যে প্রস্তাব করিলেন তাহা আমরা অত্যাহ্লাদপূর্ব্বক জ্ঞাপন করিতেছি। লণ্ডননগরস্থ ভারতবর্ষীয় বিদ্যাবিষয়ে সর্ব্বাপেক্ষা যাঁহারা বিজ্ঞবর এবং যাঁহারা ভারতবর্ষে বহুকাল বাস করিয়া এতদ্দেশীয় ভাষায় দৃঢ়তর সংস্কারাপন্ন হইয়াছেন তাঁহারা সকলই ঐ সোসৈটির অন্তঃপাতী।

শ্রীযুত রাজা রামমোহন রায় উক্ত সোসৈটির অধ্যক্ষ শ্রীযুত হেনরি তামস কোলব্রুক সাহেবকে সোসৈটির কৃতজ্ঞতা স্বীকার করত কহিলেন* যে শ্রীযুত কোলব্রুক সাহেবের স্বাভাবিক গুণ ও আচার ব্যবহারবিষয়ে আমার যেমন ভদ্রত্ব জ্ঞান আছে তাহা এইক্ষণে অবশ্য প্রস্তাব্য হইয়াছে ফলতঃ আমি কহিতে পারি যে ঐ পরম মান্য শ্রীযুত সাহেব তাবল্লোককর্তৃক যেমন আদৃত তাদৃশ অন্য কোন ব্যক্তিকে জানা যায় নাই। রাজা আরো কহিলেন যে বিজ্ঞতম হিন্দুরদের বহুকালাবধি এমত বোধ ছিল যে ইউরোপীয়েরা কখন সংস্কৃত বিদ্যাবিষয়ে গাঢ় সংস্কারাপন্ন হইতে পারেন না কিন্তু হিন্দুরদের উত্তরাধিকারিত্ব নির্ণায়ক সর্ব্বাপেক্ষা যে দুই গ্রন্থ প্রামাণিক দায়ভাগ ও মিতাক্ষরা তাহা শ্রীযুত সাহেব অনুবাদ করাতে প্রথমতঃ বোধ হইল যে হিন্দুরদের ঐ জ্ঞান মিথ্যা এবং ভারতবর্ষীয় লোক যেমন সংস্কৃত বিদ্যায় সংস্কারাপন্ন হন ইউরোপীয়েরাও তেমনি হইতে পারেন। অপর শ্রীযুত রাজা শ্রীযুত কোলব্রুক সাহেবের অস্বাস্থ্যের বিষয়ে অনেক বিলাপোক্তি প্রকাশ করিয়া কহিলেন যে আমি ইঙ্গলণ্ড দেশে পঁহুছিয়া দেখিলাম যে সাহেব অত্যন্ত অসুস্থ ও ক্ষীণ তথাপি ভরসা ছিল যে মুক্ত হইতে পারিবেন কিন্তু তাহা না হইয়া এইক্ষণে পূর্ব্বাপেক্ষা অস্বাস্থ্য বৃদ্ধি হইতেছে। পরে শ্রীযুত রাজা কহিলেন যে যদ্যপিও কোলব্রুক সাহেব অজরামর নহেন এবং তিনি যে চিরকাল বাঁচিবেন এমন ভরসা নাই তথাপি তিনি অবর্ত্তমান হইলেও তাঁহার গ্রন্থ জীবিত থাকিবে এবং তাঁহার কীর্ত্তি ও সম্ভ্রম শত২ বর্ষ বিরাজমান থাকিবে। তথাপি ভরসা হয় যে এই যাত্রা তিনি রক্ষা পাইবেন এবং পূর্ব্বে যেমন লোকের উপকার করিয়াছেন পুনর্ব্বার তদ্রূপ উপকার করিবেন।

পরিশেষে রাজাজী এই প্রস্তাব করিলেন যে এই সোসৈটির অধ্যক্ষ শ্রীযুত হেনরি তামস কোলব্রুক সাহেবের নিকটে সোসৈটি স্বীয় বাধ্যতা স্বীকার করিতেছেন এবং তাঁহার নিয়ত আত্যন্তিক পীড়ার নিমিত্ত অত্যন্ত খেদিত আছেন।

অনন্তর শ্রীযুত বেলি সাহেব এই প্রস্তাবের প্রতিপোষকতাসূচক কহিলেন যে উক্ত শ্রীযুত সাহেবের বিষয়ে রাজা রামমোহন রায় যাহা কহিয়াছেন তাহাতে আমার সম্মতি আছে তিনি যেমন সকল লোকের সমাদৃত তদপেক্ষা অধিক সমাদৃত কোন ব্যক্তিকে আমি জ্ঞাত নহি।

পরে সকলেই ঐ প্রস্তাবে সুসম্মত হইলেন।"

বিলাতে গ্রন্থপ্রকাশ

(১৬ মার্চ্চ ১৮৩৩ । ৪ চৈত্র ১২৩৯)

"রাজা রামমোহন রায়ের নূতন গ্রন্থ।—রাজাজী ইঙ্গলণ্ড দেশে অবস্থিতকরণসময়ে বেদের প্রধান পুস্তকাদির এক তর্জ্জমা পুনর্ব্বার মুদ্রাঙ্কিত করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন।"

* যাঁহারা রামমোহনের সমগ্র বক্তৃতাটি পাঠ করিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদিগকে *Asiatic Journal*, May-August 1833, p. 224 পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

দিল্লীশ্বরের দৌত্যকার্য্য

(১১ জানুয়ারি ১৮৩২। ২৮ পৌষ ১২৩৮)

"শ্রীযুত লার্ড উইলিয়ম বেণ্টীঙ্ক ও দিল্লীর বাদশাহ।—শ্রীযুত বড় সাহেব শ্রীযুত দ্বিতীয় আকবর সাহের সহিত সাক্ষাৎ না করিয়া দিল্লী অতিক্রম করেন। ইঙ্গরেজী সম্বাদ পত্রে ইহার নানা কারণ দর্শান গিয়াছে কিন্তু তাহার কোন কারণ বিশ্বসনীয় বোধ হয় না। কিন্তু ঐ সকল কারণের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা যাহা অতিঅবিশ্বসনীয় তাহা এই যে শ্রীযুত বাবু রামমোহন রায় এক্ষণে ইঙ্গলণ্ড দেশে শ্রীযুত বাদশাহের পক্ষে গবর্ণমেণ্টের এক ডিক্রীর আপীলের উদ্যোগ করিতেছেন। এই বিষয়ে আমারদিগের যেপর্য্যন্ত বোধ তাহাতে দৃষ্ট হয় যে দিল্লীর চতুর্দিগে বার্ষিক বার লক্ষ টাকা উৎপাদক জায়গীর দিল্লীর রাজ-পরিজনেরদের ভরণপোষণার্থ নিযুক্ত হইয়াছিল। পরে গবর্ণমেণ্ট ঐ জায়গীরের সববরাহ কর্ম্ম আপন হস্তে গ্রহণ করিয়া রাজবংশ্যেরদিগকে বার্ষিক নগদ বার লক্ষ টাকা করিয়া দিলেন। এইক্ষণে ঐ ভূমিতে অধিক টাকা উৎপন্ন হয় এবং তাহা ব্রিটিস গবর্ণমেণ্ট স্বহস্তে রাখিয়াছেন। বোধ হয় যে এই নিয়মের বিষয়ে শ্রীযুত বাদশাহ ইঙ্গলণ্ড দেশের রাজমন্ত্রিরদের প্রতি অভিযোগ করিয়াছেন।"

(৫ জুন ১৮৩৩। ২৪ জ্যৈষ্ঠ ১২৪০)

"দিল্লীর বাদশাহের দরবার। রাজা রামমোহন রায়।—কিঞ্চিৎকাল হইল শ্রীযুত বাদশাহের মন্ত্রী রাজা সোহন লাল এবং ঐ দরবারের এক ব্যক্তি খোজা জাকুত আলী খাঁর পরস্পর অত্যন্ত দ্বেষ পৈশুন্য আছে সংপ্রতি এক দিবস তাঁহারা বাদশাহের সমক্ষেই পরস্পর অনেক কটুকাটুব্য করিলেন। ঐ বিবাদে কিছু ক্ষতিবৃদ্ধি হইতে পারে না যেহেতুক বাদশাহ এক্ষণে ছায়ামাত্রপ্রায় কিন্তু রাজা রামমোহন রায় বাদশাহের উকীল স্বরূপ ইঙ্গলণ্ড দেশে গমন সময়ে ৭০০০০ টাকা প্রাপ্ত হন এই কথা ঐ বিবাদকালেই প্রকাশ পায় অতএব কেবল এতদর্থই আমরা ঐ বিবাদের প্রসঙ্গ করিলাম। ঐ উভয় ভদ্র ব্যক্তির দ্বারা যে কথা প্রকাশ হয় তাহা নীচে লেখা যাইতেছে। রাজা সোহন লাল অত্যন্ত তুচ্ছ তাচ্ছল্যরূপেই ঐ খোজাকে কহিলেন আমি তোমাকে সামান্য এক জন চোপদারের ন্যায় জ্ঞান করি তুমি কেবল আপনার কার্য্য দেখ অন্য বিষয়ে হাত দিও না ইহাতে খোজা অত্যন্ত রাগজ্বালিত হইয়া মন্ত্রিকে কহিলেন যে আমিও তোমাকে অতিক্ষুদ্র জ্ঞান করি বাদশাহের তাবৎ হুকুম আমার প্রতি হয় পশ্চাৎ সেই হুকুম আমি তোমার প্রতি করি। তুমি কে তুমি কেবল কালিকার এক ব্যক্তি আধুনিক তুমি নবাব নওয়াযিস খাঁর এক জন চাকর ছিলা পরে ঐ মুনীবকে অপদস্থ করিয়া তাঁহার কর্ম্ম পাইয়াছ তুমি বাদশাহের কি উপকার করিয়াছ তুমি ৭০,০০০ টাকা ব্যয় করিয়া রামমোহন রায়কে বিলায়তে পাঠাইয়াছ বটে কিন্তু তাহাতে কি ফলোদয় হইয়াছে।"

(১২ জুন ১৮৩৩। ৩১ জ্যৈষ্ঠ ১২৪০)

"শ্রীযুত রাজা রামমোহন রায়।—গত সপ্তাহের দর্পণে রাজা রামমোহন রায়ের বিষয়ে আমরা যাহা লিখিয়াছিলাম তদ্বিষয়ে আমারদের পরমমিত্র সহযোগি চন্দ্রিকাসম্পাদক মহাশয়ের ভ্রমাত্মক বোধ হইয়াছে আমরা কোন সময়ে রামমোহন রায়ের নামাদিতে কেবল শ্রীযুত প্রয়োগ করাতে তিনি বোধ করিয়াছেন যে রাজা রামমোহন রায়ের প্রতি আমারদের বিরাগ জন্মিয়াছে। কিন্তু আমরা তাঁহাকে নিতান্ত কহিতেছি যে তন্নামাদ্যে রাজা পদ না লেখা কেবল অনবধানতা-প্রযুক্তই হইয়াছে। আমরা তাঁহাকে রাজা বলিয়া যে লিখিয়া থাকি তাহার কারণ এই যে দিল্লীর শ্রীযুত বাদশাহ রামমোহন রায়কে রাজোপাধি প্রদান করিয়াছেন এবং ইঙ্গলণ্ড দেশের রাজদরবারেও তিনি তদুপাধিক নামে গৃহীত হন।

রাজা রামমোহন রায় উকীলস্বরূপে বাদশাহের দরবার হইতে যে ৭০,০০০ টাকা প্রাপ্ত হইয়াছেন এই সম্বাদ আমরা আগরা আকবর হইতে গ্রহণ করিয়াছিলাম। যদ্যপি চন্দ্রিকাসম্পাদক মহাশয় ঐ প্রকরণ মনোযোগ-পূর্ব্বক পাঠ করিতেন তবে দৃষ্ট হইত যে দিল্লীর দরবারের খোজা ঐ দরবারের মন্ত্রির প্রতি অভিযোগ করিয়া কহিলেন যে তুমি রাজা রামমোহন রায়কে উক্ত সংখ্যক টাকা দিয়াছ। যদ্যপি ঐ টাকা রাজাজী লইয়াও থাকেন তথাপি ইঙ্গলণ্ড দেশে যাত্রা করাতে তাঁহার যে পরিশ্রম ও ব্যয় হইয়াছে কেবল তদুপযুক্ত মাত্রই পাইয়াছেন অতএব এতদ্বিষয়ে রাজাজীকর্তৃক যে কিছু ফলোদয় হয় নাই আমারদের এই উক্তিতে চন্দ্রিকাসম্পাদক মহাশয় উল্লসিত আছেন কিন্তু তাঁহার ইহাও স্মর্ত্তব্য যে ঐ উক্তিও খোজার। অস্মদাদির বোধ হয় যে রায়জী ইঙ্গলণ্ডদেশগত হইয়া উক্ত বাদশাহের ও স্বদেশীয়েরদের অনেক মঙ্গল করিয়াছেন।"

(২১ ডিসেম্বর ১৮৩৩। ৮ পৌষ ১২৪০)

"রাজা রামমোহন রায়।—ইঙ্গলণ্ড দেশে রাজা রামমোহন রায়ের গমন বিষয়ে এবং দিল্লীর রাজবাটীর ব্যাপার বিষয়ে দিল্লী গেজেটে কএক প্রস্তাব উল্লিখিত হইয়াছে তাহাতে অবশ্য পাঠকমহাশয়েরদের শুশ্রূষা হইবে। তাহাতে

বোধ হইল যে দিল্লীর দরবার নানা দলাদলিতে বিভক্ত আছে এবং বাদশাহের অতিপ্রিয় তৃতীয় পুত্র যুবরাজ শ্রীযুত সিলিম ও শ্রীমতী রাণীর প্রিয়তম পুত্র যুবরাজ শ্রীযুত বাবর ইঁহারাই মোঙ্গলের সাম্রাজ্যে এইক্ষণে যাহা আছে তাহার কার্য্য চালাইতেছেন কথিত আছে যে তাঁহারা আপনারদের নিজ ব্যয়ার্থ প্রতি মাসে ১০০০০ টাকা করিয়া লইতেছেন অথচ সিংহাসনের প্রকৃতোত্তরাধিকারী আলি আহেদ ঐ বংশের সর্ব্বাপেক্ষা মান্য অথচ সুশিক্ষিত ব্যক্তি বহুকালাবধি পিতার নিকটে অত্যপমানিত হইয়া আছেন তিনি উক্ত সংখ্যক টাকার অর্দ্ধেকও পান না যাহা পান তাহাও কোম্পানিবাহাদুর তাঁহার প্রতি নিযুক্ত করিয়া দিয়াছেন। ঐ পত্রের লেখক আরো লেখেন যে বর্ত্তমান বাদশাহের পৌত্রেরদের মধ্যে কেহ২ মাসিক এক শত টাকার অধিক প্রাপ্ত হন না এবং বাদশাহের ভ্রাতৃপুত্র এবং মাতৃস্বস্রীয় ও পিতৃস্বস্রীয় ও অন্যান্য বহিরঙ্গ কুটুম্বেরা তৈমুর বংশ্য হইয়াও এক জন মসালচির মাহিয়ানার তুল্য বেতন এবং বাদশাহের বাবুর্চিখানা হইতে কিঞ্চিৎ২ পোলাও পাইয়া কোনরূপে কালযাপন করিতেছেন। আরো কথিত আছে যে রাজা রামমোহন রায়কে ইঙ্গলণ্ড দেশে ওকালতী খরচা দেওনার্থ ঈদৃশ দুর্বিধ ব্যক্তিরদের উপরেও দাওয়া হইতেছে। এবং কথিত আছে যে রাজা রামমোহন রায়ের ওকালতী খরচা বাদশাহের মাসে অন্যূন ২০০০ টাকা লাগিতেছে। রাজাজীর ইঙ্গলণ্ড দেশে গমনের অভিপ্রায় এই ঐ বাদশাহের সঙ্গে যে প্রাচীন সন্ধিপত্র আছে তন্নিয়ম প্রতিপালন করা যায়। ঐ সন্ধিপত্রে লিখিত ছিল যে দিল্লী প্রদেশে যে রাজস্ব উৎপন্ন হইবে তাহা শ্রীযুত বাদশাহেরই থাকিবে। তথাপি অনেকে বোধ করেন যে রাজাজীর বহুকালাবধি ইঙ্গলণ্ড দেশে থাকনের তাৎপর্য্য এই যে বাদশাহের রাজ সিংহাসনের উত্তরাধিকারিত্বের পরিবর্ত্তন হইয়া ঐ উত্তরাধিকারী তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র না হইয়া তৃতীয় পুত্র হন কিন্তু শুনিয়া অত্যন্ত আপ্যায়িত হইলাম যে হরকরা সম্পাদক অতিপ্রামাণিক ব্যক্তির দ্বারা নিশ্চয় করিয়াছেন যে রাজা রামমোহন রায় বাদশাহের সিংহাসনের উত্তরাধিকারিত্বের পরিবর্ত্তক ব্যাপার বিষয়ে কোন প্রকারেই প্রবর্ত্ত নহেন তদ্বিষয় তাঁহার স্বপ্নেও চিন্তিত হয় নাই।”

(২৫ মে ১৮৩৩। ১৩ জ্যৈষ্ঠ ১২৪০)

“শ্রীযুত দিল্লীর বাদশাহকর্ত্তৃক উপাধি প্রদান।—কএক সপ্তাহ হইল সম্বাদপত্র পাঠ করিয়া অবগত হইলাম যে ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের অনুমতিব্যতিরেকে শ্রীযুত দিল্লীশ্বর উপাধি প্রদান করাতে গবর্ণমেণ্ট কিঞ্চিদ্বিরক্ত হইয়াছেন। এইক্ষণে মফঃসল আকবর পত্রে তাহার সবিশেষ কিঞ্চিৎ জ্ঞাত হওয়া গেল।...

অপর ঐ পত্রে যে কথোপকথন প্রস্তাব লিখিত আছে তদ্দারা বোধ হয় যে শ্রীযুত রামমোহন রায়ের ইঙ্গলণ্ড দেশে গমনের উপরে শ্রীযুত দিল্লীর বাদশাহের অনেক নির্ভর আছে। তদ্বিষয় ঐ পত্রে লেখে যে ঐ রাজার প্রতিনিধিস্বরূপ এইক্ষণে লণ্ডন নগরে বর্ত্তমান বাবু রামমোহন রায়ের বিষয়ে রাজদরবারে অনেক কথোপকথন উত্থাপিত হইল তাহাতে শ্রীযুত বাদশাহ কহিলেন যে রাজকর বৃদ্ধিবিষয়ক আজ্ঞা প্রকাশ হইলেই তাহাতে আমার দৃঢ় প্রত্যয় হইতে পারে পূর্ব্বে হইবে না। অতএব ইহাতে বোধ হইতেছে যে ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টকর্ত্তৃক বাদশাহ যে বৃত্তি ভোগ করিতেছেন এইক্ষণে বাবু রামমোহন রায়ের দ্বারা তাহার বৃদ্ধির প্রতীক্ষায় আছেন।”

(১০ আগষ্ট ১৮৩৩। ২৭ শ্রাবণ ১২৪০)

“শ্রীযুত দিল্লীর বাদশাহ।—মফঃসল আকবরের দ্বারা অবগত হওয়া গেল যে দিল্লীর শ্রীযুত রেসিডেণ্টসাহেব শ্রীযুত রাজা সোহনলালের সমভিব্যাহারে সংপ্রতি দিল্লীর শ্রীযুত বাদশাহের নিকটে উপস্থানপূর্ব্বক কহিলেন যে ব্রিটিস গবর্ণমেণ্ট আপনকার বৃত্তি বার্ষিক ৩ লক্ষ টাকাপর্য্যন্ত বর্দ্ধিত করিতে নিশ্চয় করিয়াছেন পরে ঐ সম্বাদসূচক যে পত্র প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তাহা অনুবাদ করিয়া বাদশাহকে জ্ঞাপন করিলেন।

অতএব শ্রীযুত বাদশাহের উকীলস্বরূপ শ্রীযুত রাজা রামমোহন রায় যে বিলায়তে গমন করিয়াছেন তাঁহার যাত্রা নিষ্ফল কহা যাইতে পারে না বরং তাহাতে বাদশাহবংশ্যের উপকার দর্শিয়াছে।”

(১ জানুয়ারি ১৮৩৪। ১৯ পৌষ ১২৪০)

“রাজা রামমোহন রায়।—২০ আগষ্ট তারিখের রাজা রামমোহন রায়ের এক পত্রে লেখে যে দিল্লীর শ্রীযুত বাদশাহের দরবারের খরচের নিমিত্ত এইক্ষণে বৎসরে যে ১২ লক্ষ টাকা দিতেছেন তদতিরিক্ত আর ৩ লক্ষ টাকা শ্রীযুত আনরবল কোর্ট অফ ডৈরেক্তর্স সাহেবেরা দিতে স্বীকৃত হইয়াছেন এইক্ষণেও রাজা রামমোহন রায়ের এই দাওয়া আছে যে তাঁহার বিলাতে গমনের খরচা কোম্পানি দেন।”

(৫ মার্চ ১৮৩৪। ২৩ ফাল্গুন ১২৪০)

“দিল্লী।—অবগত হওয়া গেল যে রাজা রামমোহন রায়ের মৃত্যু সম্বাদ যখন দিল্লীর বাদশাহের দরবারে পঁহুছিল তখন দরবারস্থ তাবল্লোক একেবারে হতাশ হইলেন বিশেষতঃ শ্রীযুত যুবরাজ মির্জা সিলিং ও তাঁহার

পক্ষীয় লোকেরা কহিলেন যে ইঁহার উদ্যোগক্রমে আমারদের বার্ষিক যে তিন লক্ষ টাকা বৃদ্ধি সম্ভাবনা ছিল এইক্ষণে সে ভরসা গেল। কিন্তু তদ্বিষয়ে কিঞ্চিন্মাত্রও ভয় নাই যদ্যপি ব্রিটিস গবর্ণমেণ্ট উক্ত সংখ্যক টাকা দিতে অঙ্গীকার করিয়া থাকেন তবে যে ব্যক্তির উদ্যোগে অঙ্গীকৃত হইয়াছিলেন এইক্ষণে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে বলিয়া কখন অপহ্নব করিবেন না।"

(২৫ জুন ১৮৩৪। ১২ আষাঢ় ১২৪১)

"দিল্লীর বাদশাহের বৃত্তি।—··· আমরা কোন ইউরোপীয় সম্বাদপত্রের দ্বারা অবগত হইলাম যে রাজা রামমোহন রায় দিল্লীর বাদশাহের যে ৩ লক্ষ টাকা-পর্য্যন্ত বর্ত্তন বর্দ্ধন করিয়াছিলেন তাহাতে কোন ব্যক্তি বাদশাহকে ঐ টাকা হেয় জ্ঞান করিতে এমত কুপরামর্শ দিয়াছেন যে তিনি তাহা কদাচ লইবেন না।"

(২২ জানুয়ারি ১৮৩৩। ১০ মাঘ ১২৪০)

"রাজা রামমোহন রায়।—বোম্বাই দর্পণসম্পাদক লেখেন যে তিনি এই জনশ্রুতি শ্রুত হইয়াছেন যে সংপ্রত্যাগত ইঙ্গলণ্ডহইতে এক লিপির দ্বারা বোধ হইতেছে যে রামমোহন রায়ের এতদ্দেশের গবর্নর জেনরলের ব্যবস্থাকারি কৌন্সেলের কার্য্যার্থ নিযুক্ত হওনের সম্ভাবনা আছে। পাঠক মহাশয়েরদের স্মরণ থাকিবে যে চার্টরের নিয়মক্রমে ঐ কৌন্সেলের কার্য্য নির্ব্বাহার্থ পাচ জন নিযুক্ত হইবেন তন্মধ্যে চারি জন কোম্পানি বাহাদুরের চাকর তদ্ভিন্ন সাধারণ এক জন।"

বিলাতে রামমোহনের মৃত্যু

(১২ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৪। ২ ফাল্গুন ১২৪০)

"রাজা রামমোহন রায়ের মৃত্যু।—আমরা অত্যন্ত খেদপূর্ব্বক জ্ঞাপন করিতেছি যে গত শনিবারে রাজা রামমোহন রায়ের মৃত্যুসম্বাদ কলিকাতায় পঁহুছে। তিনি কিয়ৎকালাবধি পীড়িত হইয়া ইঙ্গলণ্ড দেশের বৃশ্চলনগরের নিকটে অবস্থিতি করিতেছিলেন সেইস্থানে অতিবিজ্ঞ চিকিৎসক সাহেবেরা চিকিৎসাতে বিলক্ষণ মনোযোগ করিলেও গত ২৭ সেপ্তেম্বর তারিখে তাঁহার লোকান্তর হয়।"

(১ মার্চ ১৮৩৪। ১৯ ফাল্গুন ১২৪০)

"রাজা রামমোহন রায়ের মৃত্যু সম্বাদ।

কুমারিকা খণ্ডমধ্যে বিদ্যাসিন্ধু ছিল।
কালরূপ ভাস্করের করে সুখাইল॥
বেদান্ত শাস্ত্রের অন্ত নিতান্ত এবার।
শুদ্ধ হইয়া শব্দ শাস্ত্র করে হাহাকার॥
অলঙ্কার হইলেন আকার রহিত।
দর্শন দর্শিত হীন হইল নিশ্চিত॥
বেদ উপনিষদের ঘুচিল সূচনা।
যন্ত্রণাযন্ত্রিত অন্য অন্য শাস্ত্র নানা॥
ইঙ্গলণ্ডীয় শাস্ত্রে আর আরবি পারসি।
না রহিল পারদর্শি অন্য এতাদৃশি॥
ব্রহ্ম উপাসকগণ আচার্য্যবিহীন।
হায় হিন্দুস্থান দেশ হইল নেত্র হীন॥
পাণ্ডিত্য দেখিয়ে যারে সর্ব্বশাস্ত্রে অতি।
রাজা রামমোহন বলি বাখানে ভূপতি॥
যা হতে প্রকাশ দেশে নানা বেদ বিধি।
হরিলেক কালচোর হেন গুণনিধি॥
বার শত চল্লিশ সনে ইঙ্গলণ্ডীয় দেশে।
রবিবার আশ্বিনের দ্বাদশ দিবসে।
মান্দ্রাজের যন্ত্রে করে এই মুদ্রাঙ্কিত।
তদ্দৃষ্টে প্রকাশ করি হইয়া খেদিত॥"

রামমোহনের সমাধি

(২৬ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৪। ১৬ ফাল্গুন ১২৪০)

"রাজা রামমোহন রায়ের ষ্টেপণ্টনস্থানে এক উদ্যানের মধ্যে কবর হইয়াছে তাঁহার পোষ্যপুত্র ও ভৃত্যবর্গ ও ইঙ্গলণ্ডীয় কএক জন সাহেব তৎসময়ে উপস্থিত ছিলেন।

রামমোহনের শ্রাদ্ধ

(৫ এপ্রিল ১৮৩৪। ২৪ চৈত্র ১২৪০)

"বাবু রাধাপ্রসাদ রায়।—কএক দিবস হইল চন্দ্রিকাসম্পাদক লিখিয়াছিলেন মৃত রামমোহন রায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুত রাধাপ্রসাদ রায় হিন্দুরদিগের শাস্ত্রানুসারে তাঁহার শ্রাদ্ধাদি করিয়াছেন ইহাতে হরকরা হেরেল্ড ফিলাম্থপিষ্ট সম্পাদক মহাশয়েরা তাহা অমূলক বলিয়াছেন কিন্তু আমারদিগের বোধ হয় ঐ সকল ইঙ্গরেজি পত্র সম্পাদক মহাশয়েরা যাহার নিকট শুনিয়াছেন সে ব্যক্তি মিথ্যা কথা বলিয়াছে চন্দ্রিকাসম্পাদকের অভিপ্রায় যাহাই থাকুক কিন্তু তাঁহার লিখিত বিষয় অমূলক নহে অতএব আমরা উচিত বোধ করিয়া এ বিষয়ে প্রকাশ করিলাম,··· —জ্ঞানান্বেষণ।"

(১২ এপ্রিল ১৮৩৪। ১ বৈশাখ ১২৪১)

"রামমোহন রায়ের শ্রাদ্ধবিষয়ক।—রাধাপ্রসাদ রায় প্রায়শ্চিত্ত করিয়া পর্ণ নর দাহ করিয়া ত্রিরাত্র অশৌচ ব্যবহারপূর্ব্বক অর্থাৎ যথাকর্ত্তব্য হবিষ্যান্ন ভোজন উত্তরীয় বসন ধারণ কুশাসনে শয়ন আমিষ বর্জন দ্বারে২ ভ্রমণ হিন্দুর ন্যায় তাবৎ আচরণ করিয়াছেন ইহা

সপ্রমাণ কারণ শ্রীযুত দেওয়ান দ্বারকানাথ ঠাকুর ও শ্রীযুত বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর ও শ্রীযুত বাবু মথুরানাথ মল্লিক ও শ্রীযুত বাবু কালীনাথ মুন্সীপ্রভৃতি রায় সাহেবের দলভুক্ত ভক্ত প্রধান শিষ্য বিশেষ বিখ্যাত সাহেবলোকের নিকট সম্মানিত ব্যক্তিদিগকেই সাক্ষি মানিলাম যদি হরকরাসম্পাদক অনুগ্রহ করিয়া উক্ত বাবু তাবৎকে কিম্বা তাঁহারদিগের মধ্যে দুই এক জনকে পত্র লেখেন তাঁহারা যে উত্তর প্রদান করিবেন তাহাতে আমারদিগের কথা সপ্রমাণ হইবেক ··এইক্ষণে গবর্ণমেণ্টের সংস্কৃত কালেজের এক জন অধ্যাপক শ্রীযুত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ ভট্টাচার্য্য এখানে বর্ত্তমান আছেন তিনি ঐ শ্রাদ্ধের প্রায়শ্চিত্ত এবং যথাকর্ত্তব্য তাবৎ কর্ম্মের ব্যবস্থাপক বিশেষ রায়জীর প্রিয় শিষ্য অবশ্য পোষ্য বশ্য এবং ব্রহ্মসভার বেদপাঠক তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেও জানিতে পারিবেন।···রাধাপ্রসাদ রায় এইক্ষণে শ্রাদ্ধ করিয়া বাটীহইতে কলিকাতার বাসায় আসিয়াছেন তাঁহাকে হরকরাসম্পাদক মহাশয় এক চিঠি লিখুন যে তুমি হিন্দুর মতে তোমার পিতার শ্রাদ্ধ করিয়াছ কিনা তিনি এই পত্রের যে উত্তর লিখিবেন হরকরা মহাশয় আপন পত্রে তাহাই অবিকল প্রকাশ করিলে সর্ব্বসাধারণের নিকট কে মিথ্যাবাদী তাহা সপ্রমাণ হইবেক।··· —চন্দ্রিকা।"

রাধাপ্রসাদ রায়ের দিল্লীতে অবস্থান

(৪ জুন ১৮৩৬। ২৩ জ্যৈষ্ঠ ১২৪৩)

"রাধাপ্রসাদ রায়।—রাজা রামমোহন রায়ের পোষ্য-পুত্র যে কোম্পানি বাহাদুরের কেরাণী হইয়াছেন ইহাতে ঐ বাবুর ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি হইবে এই কথা বলিয়া ফ্রেণ্ড অফ ইণ্ডিয়া সম্পাদক মহাশয় কহেন পোষ্যপুত্রের ঐশ্বর্য্যবৃদ্ধি ও শ্রীযুত রাধাপ্রসাদ রায়ের দিল্লীতে নৈরাশ এই দুই বিষয় বিবেচনা করিতে অত্যন্ত অসদৃশ জ্ঞান হয় দিল্লীর শ্রীযুত বাদশাহ অলঙ্ঘ্য প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিয়াছিলেন তাঁহার পেনসিয়নেতে যাহা বৃদ্ধি হইবে রাজা রামমোহন রায় পুত্র পৌত্রাদিক্রমে তাহার দশাংশের একাংশ পাইবেন এবং শ্রীযুত বাবু রাধাপ্রসাদ রায়ও তদর্থে অনেক দিবসপর্য্যন্ত দিল্লীতে উপাসনা করিতেছেন কিন্তু পরিশেষে যে সম্বাদ আসিয়াছে তাহাতে বোধ হয় তাঁহার আশা সফল হইবেক না ঐ বাদশাহ ব্যবস্থার বাহিরেই আছেন এবং বোধ হয় এইক্ষণে সম্ভ্রমের বাহিরেও থাকিতে চাহেন রাজা রামমোহন রায়ের পরিবারেরা কেবল বাদশাহের সম্ভ্রমের প্রতি নির্ভর করিয়াই টাকা প্রাপ্তির প্রত্যাশা করেন কিন্তু বাদশাহ জ্ঞান করেন রাজা রামমোহন রায়ের মরণেতেই তিনি খালাস পাইয়াছেন * শ্রীযুত রাধাপ্রসাদ রায় প্রতি মাসেতেই দিল্লীর দরবারে উপস্থিত থাকেন কিন্তু এপর্য্যন্ত তাঁহার প্রার্থনা সিদ্ধির কোন চিহ্নই দেখেন নাই এইক্ষণে বাদশাহের মরণাবস্থা হইয়াছে তিনি মরিলে রাজা রামমোহন রায়ের পরিবারেরা একেবারেই নিরকাঙ্ক্ষ হইবেন। —জ্ঞানান্বেষণ।"

কলিকাতায় রামমোহনের স্মৃতিসভা

(২৬ মার্চ ১৮৩৪। ১৪ চৈত্র ১২৪০)

"রাজা রামমোহন রায়।—৺ প্রাপ্ত রাজা রামমোহন রায় মহাশয়ের নীচেলিখিত বিষয় পাঠ করিতে পাঠক মহাশয়েরা অনেকেই উৎসুক হইবেন।

পশ্চাৎ স্বাক্ষরিত আমরা ৺ প্রাপ্ত রাজা রামমোহন রায়ের অশেষ গুণ যাহাতে চিরস্মরণীয় হয় এমত উপায় বিবেচনাকরণার্থ আগামী ৫ আপ্রিল শনিবার বেলা তিন ঘণ্টাসময়ে টৌনহালে ৺ প্রাপ্ত রাজার মিত্রগণের সমাগমার্থ সমাবেদন করিতেছি।

জেম্স পাটল। দ্বারকানাথ ঠাকুর। জান পামর। টি প্লোডন। রসময় দত্ত। ডবলিউ এস ফার্বস। ডবলিউ আদম। জে কলেন। জে ইয়ং। কালীনাথ রায়। প্রসন্নকুমার ঠাকুর। শ্রীকৃষ্ণ সিংহ। হরচন্দ্র লাহিড়ি। লক্ষ্মীনারায়ণ মুখো। লঙ্গইবিল ক্লার্ক। রষ্টমজি কওয়াসজি। আর সি জিনকিন্স। ডি মাকফার্লন। এ ত্রয়র। এচ এম পার্কর। ডবলিউ আর ইয়ং। তামস ই এম টর্টন। উইলিয়ম কব হরি। ডবলিউ কার সি ই ত্রিবিলয়ন। ডেবিড হার। মথুরানাথ মল্লিক। রমানাথ ঠাকুর। রাজচন্দ্র দাস। জি জে গার্ডন। জেম্স সদর্লণ্ড। সি কে রাবিসন। ডি মাকিণ্টায়র। ডবলিউ এচ স্মোণ্ট সাহেব।"

(৯ এপ্রিল ১৮৩৪। ২৮ চৈত্র ১২৪০)

"রাজা রামমোহন রায়।—৺ প্রাপ্ত রাজা রামমোহন রায়ের স্বজন পরজনগণ গুণকারি গুণগণ যাহাতে উপযুক্তমতে চিরস্মরণীয় হইতে পারে তদ্বিবেচনাকরণার্থ গত শনিবারে তাঁহার বন্ধুগণ টৌনহালে এক সভা করিলেন।

তাহাতে শ্রীযুত সার জন গ্রাণ্ট সাহেব সভাপতি হইয়া

* একথা সত্য নহে। এ-সম্বন্ধে ১৯৩০ সালের জানুয়ারি মাসের 'মডার্ণ রিভিউ' পত্রে প্রকাশিত আমার "Rammohun Roy's Engagements with the Emperor of Delhi" নামক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

অত্যন্ত বাক্‌পটুতাপূর্ব্বক কার্য্যারম্ভ করিলেন। আমারদের খেদ হয় যে তদ্বিবরণসকল স্থানাভাবপ্রযুক্ত দর্পণে অর্পণ করিতে পারিলাম না। তিনি স্বীয়োক্তির শেষে কহিলেন এইক্ষণে আমি যৎকার্য্যে নিযুক্ত আছি ইহাঅপেক্ষা অধিক অনুরাগ বা সন্ত্রমের কার্য্যে কখন নিযুক্ত হই নাই।

তৎপরে শ্রীযুত পাটল সাহেব এই প্রস্তাব করিলেন রামমোহন রায়ের পাণ্ডিত্য ও পরহিতৈষিতা গুণের বিষয়ে এবং নীতি ও বিদ্যাবিষয়ে স্বদেশীয় লোকেরদের অবস্থার সৌষ্ঠবকরণার্থ এবং সামান্যতঃ স্বদেশীয় লোকের মঙ্গল বৃদ্ধিকরণার্থ যে বহুতর উদ্যোগ করিয়াছিলেন তদ্বিষয়ে এই সভাগত মহাশয়েরা যে মহানুভব করেন সেই অনুভব যে উপায়েতে উত্তমরূপে প্রকাশ পায় এমত উপায়ের দ্বারা রাজা রামমোহন রায়কে চিরস্মরণীয় করা উচিত এমত আমারদের বোধ হয়।

এই প্রস্তাবে শ্রীযুত বাবু রসিকলাল মল্লিক অত্যুত্তম বক্তৃতাপূর্ব্বক * পৌষ্টিকতা করিলেন এবং সকলই তাহাতে সম্মত হইলেন।

পরে শ্রীযুত পার্কর সাহেব যে প্রস্তাব করিলেন তাহাতে শ্রীযুত টর্টন সাহেব সর্ব্বসম্মত পোষকতা করিলেন তাহা এই যে।

এই বৈঠকের অভিপ্রেত সিদ্ধকরণার্থ এক চাঁদা করা যায় এবং উত্তরকালে ধনদাতৃবর্গের নিকটে যে নিয়মের প্রস্তাব হইবে তাহার ছয় সপ্তাহের পরে তাঁহারা স্বয়ং বা অন্যের দ্বারা যেমত জ্ঞাপন করিবেন তদনুসারে কার্য্য হইবে।

তৎপরে শ্রীযুত সদর্লণ্ড সাহেব যে প্রস্তাব করিলেন তাহাতে শ্রীযুত ব্রামলি সাহেব সর্ব্বসম্মত পোষকতা করিলেন।

তাহা এই যে নীচে লিখিতব্য সাহেবলোকেরা কমিটিস্বরূপ নিযুক্ত হইয়া টাকা সংগ্রহ করিবেন এবং তাবৎ ভারতবর্ষহইতে চাঁদার টাকা সংগ্রহের উপযুক্ত সময় গত হইলে তাঁহারা স্বাক্ষরকারিরদের এক বৈঠক করিয়া তাহার শেষ করিবেন।

সার জন গ্রাণ্ট। জন পামর। জেম্‌স পাটল। টি প্লৌডন। এচ এম পার্কর। ডি মাকফার্লন। টি ই এম টর্টন। রষ্টমজি কওয়াসজি। মথুরানাথ মল্লিক। জেম্‌স সদর্লণ্ড। কর্ণল ইয়ং। জি জে গর্ডন। এ রাজর্স। জেম্‌স কিড। ডবলিউ এচ স্মোল্ট। ডি হের। কর্ণল বিচর। দ্বারকানাথ ঠাকুর। রসিকলাল মল্লিক। বিশ্বনাথ মতিলাল।

শুনিয়া অত্যন্তাপ্যায়িত হইলাম ঐ বৈঠকের সময়েই পাঁচ ছয় হাজার টাকা পর্য্যন্ত চাঁদায় স্বাক্ষর হইয়াছিল।

* *Asiatic Journal*, Nov. 1834 (Asiatic Intelligence —Calcutta, pp. 148-49) দ্রষ্টব্য।

(২৩ এপ্রিল ১৮৩৪। ১২ বৈশাখ ১২৪১)

"ইঙ্গলিশমেন সম্বাদপত্রের দ্বারা অবগত হওয়া গেল যে রাজা রামমোহন রায়ের চিরস্মরণার্থ চাঁদার যে টাকা সংগ্রহ হইয়াছে তাহার সংখ্যা ৮০০০।"*

(৩০ এপ্রিল ১৮৩৪। ১৯ বৈশাখ ১২৪১)

"রাজা রামমোহন রায়।—৵ প্রাপ্ত রাজা রামমোহন রায়ের চিরস্মরণার্থ এতদ্দেশীয় যে মহাশয়েরা চাঁদায় স্বাক্ষর করিয়াছেন তাঁহারদের নাম পশ্চাল্লিখিত হইল।

দ্বারকানাথ ঠাকুর	১০০০
মথুরানাথ মল্লিক	১০০০
রষ্টমজি কওয়াসজি	২৫০
প্রসন্নকুমার ঠাকুর	১০০০
রায় কালীনাথ চৌধুরী	১০০০
রামলোচন ঘোষ	১০০
রমানাথ ঠাকুর	২০০
উপেন্দ্রমোহন ঠাকুর	১০০
চন্দ্রমোহন চাটুয্যে	৫০
মথুরানাথ ঠাকুর	৫০
দক্ষিণানন্দ মুখুয্যে	৫০
গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ	২
অখিলচন্দ্র মুস্তোফী	৫
চন্দ্রশেখর দে	১৬
ক্ষেত্রমোহন মুখুয্যে	৮
ভৈরবচন্দ্র দত্ত	৮
রাধানাথ মিত্র	৩০
প্রাণকৃষ্ণ কুণ্ড	৪
রামগোপাল ঘোষ	১৬
ভোলানাথ সেন	১০
বেণীমাধব ঘোষ	৫
পূর্ণানন্দ চৌধুরী	৫
কৃষ্ণানন্দ বসু	৫
মধুসূদন রায়	৫
গোরাচাঁদ চক্রবর্ত্তী	২
প্রতাপচন্দ্র ঘোষ	৫
বলরাম সমাদ্দার	১০
আনন্দচন্দ্র বসু	৫
গোমানসিংহ রায়	৫
কালীপ্রসাদ চাটুয্যে	৫
নন্দকুমার ঘোষ	২

* এই প্রসঙ্গে *Calcutta Municipal Gazette* (20 Dec. 1930) পত্রে প্রকাশিত শ্রীযুত মন্মথনাথ ঘোষ লিখিত "The First Memorial Meeting in Calcutta" প্রবন্ধটি দ্রষ্টব্য।

দুর্গাপ্রসাদ মিত্র	...	...	২
বাবু কৃষ্ণচন্দ্র লালা	...	...	৫
রামকৃষ্ণ সমাদ্দার	...	...	৫
নিমাইচরণ দত্ত	...	...	২
দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর	...	...	৫০০
পূর্ণানন্দ সেন	...	...	৫০
মদনমোহন চাটুর্য্যে	...	...	২৫
রামপ্রসাদ মিত্র	...	...	৫
রামচন্দ্র গাঙ্গুলি	...	...	২৫
কালীপ্রসাদ রায়	...	...	৫
কমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী	...	...	৫
অক্ষয়চাঁদ বসু	...	...	১০
রামরতন হালদার	...	...	৫
বংশীধর মজুমদার	...	...	৫
অভয়াচরণ চাটুর্য্যে	...	...	২
কৃষ্ণমোহন মিত্র	...	...	৫
বলরাম হড়	...	...	১৬
রামকুমার ঘোষ	...	...	৪
গোকুলচাঁদ বসু	...	...	৪
নবীনচাঁদ কুণ্ড	...	...	১০
গঙ্গানারায়ণ দাস	...	...	৫
ব্রজমোহন খাঁ	...	...	২৫
গঙ্গাচরণ সেন	...	...	৫
নবকুমার চক্রবর্ত্তী	...	...	৩
ঈশ্বরচন্দ্র শাহা	...	...	২
রামচন্দ্র মিত্র	...	...	২
রামতনু লাহুং	...	...	২
তারাকান্ত দাস	...	...	২
বিশ্বনাথ মতিলাল	...	...	১০০

(২১ জুন ১৮৩৪। ৮ আষাঢ় ১২৪১)

"রাজা রামমোহন রায়।—অবগত হওয়া গেল যে ৺প্রাপ্ত রাজা রামমোহন রায়ের চিরস্মরণীয় কোন চিহ্ন নিষ্পাদ্যকরণার্থ যে চাঁদা হয় তাহাতে শ্রীলশ্রীযুত লার্ড উইলিয়ম বেন্টীঙ্ক সাহেব ৫০০ টাকা সহী করিয়াছে এবং কথিত হইয়াছে যে ঐ প্রসিদ্ধ ব্যক্তির চিরস্মরণার্থ যদ্যপি বিদ্যালয়ে কোন অধ্যাপকতা পদ নিষ্পাদ্যহওনের যে কল্প হইয়াছে তাহা সফল হইলে তাঁহার চাঁদায় শ্রীলশ্রীযুত ইহা অপেক্ষাও অধিক টাকা প্রদান করিবেন।—কুরিয়র।"*

(৮ অক্টোবর ১৮৩৪। ২৩ আশ্বিন ১২৪১)

"শ্রীযুত দিল্লীর বাদশাহ।—ইঙ্গলিসমেন পত্রের দ্বারা অবগত হওয়া গেল যে শ্রীযুত দিল্লীর বাদশাহ অনেককালের পর যে নিয়মে গবর্ণমেণ্ট ইহার পূর্ব্বে তাঁহার জীবিকা বার্ষিক ৩ লক্ষ টাকা পর্য্যন্ত বৃদ্ধি করিতে প্রস্তাব করিয়াছিলেন এইক্ষণে তাহা লইতে এবং অতিরিক্ত দাওয়া ত্যাগ করিতে স্বীকার করিয়াছেন। ন্যূনাধিক বার মাস হইল তিনি ঐ টাকা গ্রহণ করিতে অস্বীকৃত ছিলেন সংপ্রতি কহিতেছেন যে এইক্ষণে রামমোহন রায়ের লোকান্তরহওয়াতে আর অধিক প্রাপণের ভরসা নাই সুতরাং ঐ টাকাই লইতে হইল।"

রাজারাম রায়

(১২ মার্চ ১৮৩৬। ১ চৈত্র ১২৪২)

"রামমোহন রায়ের পুত্র।—শুনিয়া পরমাপ্যায়িত হওয়া গেল যে বোর্ডকন্ট্রোলের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত সর জন হব হৌস সাহেব ৺ রামমোহন রায়ের পুত্রকে ঐ আপীসে ক্লার্ক পদে নিযুক্ত করিয়াছেন।

(২১ মে ১৮৩৬। ৯ জ্যৈষ্ঠ ১২৪৩)

"৺রামমোহন রায়ের পুত্রের উচ্চপদ।—কিয়ৎকাল

* ১৮৩৪ সালের শেষাশেষি রামমোহন রায় স্মৃতিরক্ষা কমিটির কার্য্য কতটা অগ্রসর হইয়াছিল, নিম্নোদ্ধৃত অংশ হইতে তাহার আভাস পাওয়া যাইবে :—

"*Rammohun Roy.* At a meeting of subscribers to the Rammohun Roy testimonial, it appeared that there was already a sufficient sum contributed for the mere purpose of erecting a statue; but it was the unanimous opinion of those present, that, instead of so appropriating the fund, efforts should be made so to augment it as to admit of the establishment of some institution devoted to education, bearing the name of the deceased. With this view circulars will be addressed to the principal persons at every station in India, and also to Europe and America."—*Asiatic Journal*, January 1835, (Asiatic Intelligence—Calcutta, p. 14.)

হইল ৺রামমোহন রায়ের যে পুত্র বোর্ড কন্ট্রোলে মুহুরীর পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন তিনি এইক্ষণে শ্রীযুত সর জন হবহৌস সাহেবকর্ত্তৃক কোম্পানির কেরাণিপদে নিযুক্ত হইয়াছেন। যে পদের দ্বারা ক্রমশঃ ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের উচ্চ২ পদ প্রাপ্তি এবং একেবারে ব্রিটিস ভূম্যধিকারি প্রধান ব্যক্তিরদের তুল্যরূপে গণ্যতা হয় এমত যে মহাপদ তাহা এতদ্দেশীয় লোককে এই প্রথম প্রদত্ত হইল। এই যুব ব্যক্তি যখন বোর্ড কন্ট্রোলে কর্ম্ম করিতেছিলেন তখন তীক্ষ্ণ বুদ্ধিপ্রকাশ ও স্বাভাবিক গুণ ও উদ্যোগের দ্বারা স্বীয় কার্য্য এমত নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন যে তত্রস্থ প্রধান ব্যক্তিকর্ত্তৃক অতিপ্রশংস্য হইয়াছেন। দি ওয়াচম্যান, জানুয়ারি, ১৪।"

(২ জুলাই ১৮৩৬। ২০ আষাঢ় ১২৪৩)

"রামমোহন রায়ের পুত্র।—শ্রীযুত সর জন হবহৌস সাহেবকর্ত্তৃক সংপ্রতি যে হিন্দু যুব ব্যক্তি ইঙ্গলণ্ডদেশে সিবিলসম্পর্কীয় কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছেন তাঁহার নাম রাজা তিনি ৺রামমোহন রায়ের পোষ্যপুত্র এইক্ষণে তাঁহার বয়ঃক্রম বিংশবর্ষ হইতে পারে যেহেতুক তিনি ঐ পালক পিতার সমভিব্যাহারে ৬ বৎসর হইল বিলাতে গমন করিয়াছেন গমনসময়ে তাঁহার চতুর্দশবর্ষ বয়ঃক্রম ছিল। প্রথমে ঐ বেচারা পিতৃমাতৃ বিহীনহওয়াতে সিবিলসম্পর্কীয় শ্রীযুত ডিক সাহেবকর্ত্তৃক প্রতিপালিত হইয়াছিলেন ঐ সাহেবের সহিত রামমোহন রায়ের অতিপ্রণয়প্রযুক্ত সাহেবের লোকান্তর পরে তাঁহাকে রায়জী পোষ্যপুত্র স্বীকার করিয়াছিলেন।—আগ্রা আকবর।"

(১৭ ডিসেম্বর ১৮৩৬। ৪ পৌষ ১২৪৩)

"৺রামমোহন রায়ের পুত্র।—গত ১০ আগস্ত তারিখের ইঙ্গলণ্ডীয় এক সম্বাদপত্রে লেখে রামমোহন রায়ের যে পুত্র এতদ্দেশে সিবিলসম্পর্কীয় কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছেন তিনি এইক্ষণে স্কটলণ্ডে পরিভ্রমণ করিতেছেন এবং ১ আগস্ত তারিখে শ্রীযুত লার্ড লিনডাক [Lord Lyndock] সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎকরাতে শ্রীযুত সাহেব তাঁহাকে অতিসমাদরপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া স্বীয় বাটীর নিকটবর্ত্তি আশ্চর্য্য বিষয়সকল দেখাইলেন। ঐ সম্বাদপত্রে লেখে রায়জীর পুত্রের বয়ঃক্রম অষ্টাদশ বা বিংশ বর্ষ হইবেক এবং বিলক্ষণ বুদ্ধিমান্ কএক বৎসরাবধি ইঙ্গলণ্ডে বিদ্যোপার্জন করিয়াছেন।"

(২৬ মে ১৮৩৮। ১৪ জ্যৈষ্ঠ ১২৪৫)

"শেষাগত ইউরোপীয় সম্বাদ।—৺প্রাপ্ত রামমোহন রায়ের পুত্র ভারতবর্ষে প্রত্যাগমন করিবেন এমত কল্প আছে। পূর্ব্বে একবার তাঁহাকে ভারতবর্ষের মধ্যে সিবিল সম্পর্কীয় কর্ম্ম দেওনার্থ অঙ্গীকার হইয়াছিল কিন্তু নিযুক্ত করা যায় নাই পরে শ্রীযুত সর জন হবহৌস সাহেবের অর্থাৎ বোর্ড কান্ট্রোলের আফীসে তাঁহাকে কেরাণিগিরি কর্ম্ম দেওনার্থ প্রস্তাব হইয়াছিল ফলে তাহাও বিফল হইয়াছে।"

(১৮ আগষ্ট ১৮৩৮। ৩ ভাদ্র ১২৪৫)

"রাজা রামমোহন রায়ের পুত্র।—এই সপ্তাহে জাবানামক জাহাজ ইঙ্গলণ্ড দেশ হইতে পঁহুছিয়াছে রাজা রামমোহন রায়ের যে পুত্র পিতার সঙ্গে বিলাতে গমন করিয়াছিলেন তিনি এই জাবা জাহাজে এতদ্দেশে প্রত্যাগত হইয়াছেন। এই যুব ব্যক্তিকে শ্রীযুত সর জন হব হৌস সাহেব এতদ্দেশীয় সিবিল সম্পর্কীয় কর্ম্মে নিযুক্ত করিতে ইচ্ছুক হইয়াছিলেন কিন্তু তদ্বিষয়ে শ্রীযুক্ত কোর্ট অফ ডৈরেক্তর্স সাহেবেরা নিতান্ত অসম্মত হইলেন।"

সাধ

শ্রীতারাদাস মুখোপাধ্যায়

লোক যাতায়াত করায় উঠানের উপর একটা রাস্তা তৈরি হইয়া গিয়াছে। এই দিক দিয়া তাড়াতাড়ি নদীর ঘাটে পৌছান যায়। উঠানের একপাশে ছোট্ট একটুখানি মাটির ঘর। সাম্‌নে একটা চালা নামান। তারই এক কোণে রান্নাঘর। সামনের মস্ত উঠানটার বেড়া নাই। তাই পাড়ার যত লোক এই দিকেই ঘাটে যায়। কেহ বারণও করে না। যার বাড়ি সে সারাদিন থাকে বাহিরে। সন্ধ্যায় যখন ফিরিয়া আসে, তখন আর লোকও কেউ আসে না, আসিলেই বরং ভাল হইত। এই একান্ত নিঃসঙ্গ লোকটির একটু সঙ্গও জুটিতে পারিত। কিন্তু আসে না।

সেদিন কিন্তু জ্যোৎস্নাটা বেশ উঠিয়াছিল। গদাধর ভাতের হাঁড়িটা উনানে চড়াইয়া দিয়া কলিকায় এক টুকরা জ্বলন্ত অঙ্গার চড়াইয়া হুঁকা হাতে বাহিরে আসিল; সারা উঠানটাই সবুজ ঘাসে মোড়া। শুধু মাঝখান দিয়া একটি সরু সাদা পথ উঠানকে দুই ভাগে ভাগ করিয়া দিয়াছে। গদাধর এই পথটার পানেই চাহিয়া রহিল; চাঁদের আলোতে পথটুকু চমৎকার দেখাইতেছিল। দিনের বেলা কত লোক এই পথ দিয়া যায়। পাড়ার বধূরা এই পথেই নদী হইতে জল আনে। এই ত এখনও তাহাদের কলসীচ্যুত জলধারা পথের উপর আলপনার মত আঁকা রহিয়াছে। খুঁজিলে হয়ত পায়ের অলক্তক রেখাও মিলিতে পারে! ওই যে চারিদিকে প্রতিবেশিগণের গৃহ—ওইখানেই ত তাহারা রহিয়াছে, যাহার উঠান দিয়া তাহারা যাতায়াত করে তাহাকে কি একবারও মনে করে না? গদাধর ভাবিতে লাগিল, এই উঠানের একদিন কত সৌন্দর্য্যই না ছিল। চারিদিকে সুন্দর বেড়া দেওয়া ঝক্‌ঝকে নিকানো উঠানখানির একপাশে তুলসী মঞ্চ। মা প্রতিসন্ধ্যায় সেখানে প্রদীপ জ্বালিয়া শঙ্খ বাজাইতেন। দক্ষিণের ঐ কোণটায় তিনটা বেল ফুলের ঝাড় ও একটা হেনা গাছ ছিল। বর্ষায় কত ফুলই না ফুটিত। পাড়ার মেয়েরা আঁচল ভরিয়া বেলফুল লইয়া যাইত রোজ সকালে। গদাধরের সহিত সেই ছোট মেয়েদের কতই ভাব ছিল। আজ হয়ত তাহাদের চেনাই যায় না। একবার একটি মেয়ে—নবীন বোসের নাত্‌নী—না? হাঁ, হাঁ, সেই ত—হেনার একটা ডাল ভাঙিয়াছিল বলিয়া গদাধর তাহাকে কি মারটাই মারিয়াছিল। মেয়েটা কিন্তু বেজায় ফুল ভালবাসিত; তাহার পরদিনই আবার বেলফুল তুলিতে আসিয়াছিল।

আচ্ছা, সে মেয়েটি এখন কোথায়? একদিন যেন শুনিয়াছে, সে বিধবা হইয়া এই গ্রামেই ফিরিয়া আসিয়াছে। সত্য না কি? তবে হয়ত সেও এই পথে জল লইয়া যায়। কিন্তু ঐটুকু মেয়ে বিধবা। আহা কি কষ্ট!

কলিকার আগুনটা নিবিয়া গিয়াছিল। টানিতে গিয়া গদাধর ধূম পাইল না। আর একটু আগুন লইবার জন্য উনানের কাছে আসিয়া দেখিল, ভাত ফুটিয়া ফেন উথলিয়া পড়িতেছে, অগ্নি নির্ব্বাপিতপ্রায়। আরও দু'খান কাঠ দিয়া আগুনটি বেশ করিয়া ধরাইয়া দিয়া গদাধর এক কলিকা জ্বলন্ত কয়লা ভরিয়া লইল। চালার নীচে একটি বড় মসৃণ পাথর সিঁড়ির কাজ করিতেছে। পাথরটি যে কত দিন হইতে এখানে আছে গদাধর তাহা জানে না। মার কাছে শুনিয়াছে, তাহার ঠাকুরদা না কি ইহাকে আনিয়াছিলেন। এই পাথরের উপর গদাধর কত খেলা খেলিয়াছে। হয়ত ইহাকে ধরিয়াই সে প্রথম হাঁটিতে শিক্ষা করে। পাথরটার উপরেই গদাধর বসিয়া পাড়ল।

নিস্তব্ধ জ্যোৎস্না উঠানের উপর লুটাইতেছিল। তামাক টানিতে টানিতে কত পুরাতন কথাই যে গদাধরের মনে আসিতেছিল তাহার হিসাব হয় না

অতীতের সমস্ত জীবনটাই তাহার স্মৃতির মধ্যে ঘুরিতে লাগিল।

লেখাপড়া সে সামান্যই শিখিয়াছিল। পাঠশালে সে কিছুতেই যাইতে চাহিত না। বাবা কত বকাবকি করিতেন, মা কত মিষ্টি কথায় ভুলাইয়া. সন্দেশের লোভ দেখাইয়া তাহাকে পড়িতে পাঠাইতেন। সামান্য একটু অসুখ হইলে সেবাশুশ্রূষার সে কি ধুম। পাঠশাল যাওয়ার বালাই নাই, মা সর্ব্বদা কাছে বসিয়া মাথায় হাত বুলাইতেন। ঔষধ খাইয়া তিক্ত মুখ শোধনের জন্য বাবা কত ফলফুলারি আনিয়া দিতেন। চার পাঁচ দিন অসুখের পর যেদিন পথ্য করিবে সেদিন সকাল হইতেই গদাধর মার রান্নাশালে বসিয়া থাকিত। মা তাহার জন্য কত যত্ন করিয়া মাছের ঝোল রান্না করিতেন। গদাই বসিয়া বসিয়া দেখিত আর ভাবিত, খুব খাইবে। কিন্তু অসুখের পর প্রথম দিন বেশী খাইতে পারিত না। মা দুঃখ করিতেন।

সুন্দর মেয়ে দেখিলেই মা বলিতেন, আমার, গদাইয়ের জন্যে এমনি একটি রাঙা টুকটুকে বউ ক'রব। মার সে ইচ্ছাটা আর পূরণ হইল না। শূন্য গৃহে কোনো সুন্দরীর পা পড়িল না।

মার জন্যে গদাইয়ের মনখানি অনেকদিন পরে আজ আবার কাঁদিয়া উঠিল।

সে অনেকক্ষণ ধরিয়া মা'র মূর্ত্তিখানি মনে করিবার চেষ্টা করিল। মা অনেক দিন গিয়াছেন। গদাই তাঁহাকে ভালরূপে মনের মধ্যে আনিতে পারিল না। শুধু তাঁর স্নেহের প্রত্যেক খুঁটিনাটিগুলি মনে হইতে লাগিল। ভবিষ্যতে কাহারও জন্য কাঁদিবার নাই। কিন্তু অতীতের স্মৃতির কাঁদন ত শেষ হয় না। শেষ হইলে মানুষ বাঁচিবে কি লইয়া? গদাই ভাবিতে লাগিল।

একদিন বুধপুরে মা না-কি তাহার সম্বন্ধ পাকা করিয়াছিলেন। কিন্তু দেনাপাওনার গোলযোগে বিবাহ হয় নাই। কে জানে সে মেয়েটি এখন কাহার ঘর করিতেছে? এই একান্ত অপরিচিতার জন্যও আজ গদাধরের মন ব্যাকুল হইয়া উঠিল। মনে হইল, হয়ত সেও আজ বিধবা হইয়া কষ্ট পাইতেছে। গদাধরের সহিত বিবাহ হইলে ত তাহা হইত না। আজ হয়ত সে থাকিলে এই উঠানের শ্রী অন্যরূপে ফিরাইয়া দিত। হয়ত দুটি ফুট্‌ফুটে ছেলেমেয়ে এই চালায় মাদুরের উপর ঘুমাইত। জ্যোৎস্না লাগিয়া গালগুলি তাহাদের চক্‌চক্ করিত। তাহাদের মা রান্না করিতে করিতে একবার করিয়া আসিয়া গালে চুমা খাইয়া যাইত। ক্লান্ত গদাধর হয়ত ঐ ছেলে দুটির পাশেই শুইয়া পড়িত। বধূ আসিয়া ডাকিয়া ঘুম ভাঙাইত।

ধরা-ভাতের উগ্রগন্ধ গদাধরের ধ্যান ভাঙাইয়া দিল; উঠিয়া গিয়া দেখিল ভাত পুড়িয়া গিয়াছে। যাক্। মধুর দোকানে দুই পয়সার মুড়ি আনিয়া খাইলেই চলিবে। রাত্রি ত বেশী হয় নাই। এখনই কি মধু দোকান বন্ধ করে! না, তার দোকানে পাড়ার লোকের তাসের আড্ডা রাত বারটা অবধি চলে যে। মুড়ি পরে আনিলেই হইবে। গদাধর ভাবিয়াই চলিল।

নদীর কিনারায় ঐ যে বড় অশথ গাছটা, কত বয়সই না উহার হইয়াছে। মনে পড়িল একদিন পাখীর বাচ্চা পাড়িতে গিয়া ঐ গাছ হইতে পড়িয়া গদাইয়ের পা মচকাইয়া যায়। সে ত বেশী দিনের কথা নয়। মা তখনই খানিক চুন-হলুদ গরম করিয়া পায়ে লাগাইয়া দিলেন। যন্ত্রণায় গদাধর কাঁদিতেছিল। ও-বাড়ীর বামুনপিসী,—মার আগেই তিনি গিয়াছেন—বেড়াইতে আসিয়া গদাইয়ের মাথায় কতক্ষণ ধরিয়া হাত বুলাইয়াছিলেন; কত অদ্ভুত গল্প বলিয়া তাহাকে ভুলাইয়াছিলেন। বামুনপিসী বেশ লোক ছিলেন। আহা!

পাখী পুষিবার ঝোঁক কি গদাইয়ের কম ছিল? একদিন ঐ পাখী ধরিবার জন্যই ত পাঠশালে বেত খাইয়া পড়া ছাড়িয়া দেয়।

সে-বছর গ্রামে সখের যাত্রাপার্টি হয়। নীলু ময়রা ছিল ম্যানেজার। গদাইকে রাধিকার পার্ট দেয়। সে কি মজা—পাঠশাল ছাড়িয়া দিনরাত যাত্রার দলেই পড়িয়া থাকিত। অসময়ে খাওয়ার জন্য মা কত বকিতেন। কেই-বা শোনে!

রাধিকার পাঠ গদাই বেশ ভালই করিয়াছিল। সবাই

খুব সুখ্যাতি করিয়াছিল তখন। নীলু ময়রা বাঁচিয়া থাকিলে দলটা ভালই হইত।

কিন্তু বিদূষক সাজিত নলিনী চাটুজ্যে। ছোকরা কি ভয়ানক রকম হাসাইতে পারিত! সে না-কি এখন কোন্ বড় কোম্পানীতে কাজ করে। কতদিন দেখা নাই, কেমন আছে কে জানে!

রাত্রি অনেক হইয়াছে, নয়? মা থাকিতে এতখানি রাত কিছুতেই জাগিতে দিতেন না। অসুখ করিতে পারে। গদাইয়ের অসুখ হইলে মা যে কি ভীষণ চিন্তিত হইতেন!

আচ্ছা, আজ এই রাত জাগিয়া, না খাইয়া কাল যদি তার অসুখ করে। কে তাহাকে দেখিবে? কে আর— ভগবান।

মার মৃত্যুর পর ত গদাইয়ের বড়-রকম অসুখ হয় নাই। একবার হোক না। এই সরু পথ দিয়া যাহারা জল আনিতে যায় তাহারা কি একবার করিয়া সকাল-বিকাল গদাইকে দেখিয়া যাইবে না? কি জানি? কেউ হয়ত দেখিতেও পারে। মেয়ের জাত ত! কোলের কলসী হইতে একটু জলও হয়ত মুখে ঢালিয়া দিতে পারে। তা দিবে বই কি, তাহারাই ত মানুষ। দয়ামায়ায় গড়া শরীর! নাঃ, রাত হইয়া গিয়াছে। মুড়ি আনিতে হইবে। মা থাকিলে ঘরেই মুড়ি ভাজিয়া রাখিতেন। গদাই ভালবাসিত বলিয়া মা কুসুমবীচি দিয়া হলুদরাঙা মুড়ি ভাজিতেন। কি সে সুন্দর মুড়ি! যেন একরাশ সরিষা ফুল! কাঁচা লঙ্কা ত উঠানটাতেই কত ফলিত। কিন্তু না, রাত হইতেছে।

মধু কি এখনও জাগিয়া আছে? নাই-বা থাকিল। একরাত না খাইলে কি মরিয়া যাইবে! মা'র মৃত্যুর পর কতদিনই ত এমন উপবাস গিয়াছে। আজও যাক না!

একদিন রাত্রে গদাই রাগ করিয়া না খাইয়াই ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। মা কিন্তু দুপুর রাত্রে তাহাকে জাগাইয়া দুধমুড়ি খাওয়াইয়া তবে ঘুমাইতে দিয়াছিলেন। ওঃ, গদাইয়ের সে কি দারুণ অভিমান! মাকে নাস্তা-নাবুদ করিয়া তুলিয়াছিল।

আজ কিন্তু না খাইলে কেহ কিছুই বলিবে না। মানুষের জীবনে কত দুঃখই না আসে।

সারাটি উঠানে চাঁদের কিরণ গলিয়া গলিয়া পড়িতেছে। মাদুরখানা টানিয়া আনিয়া গদাধর চালার যেখানে জ্যোৎস্না পড়িয়াছিল সেইখানটিতে পাতিল। মাথার বালিশটা তেলে কালো হইয়া উঠিয়াছে। এই জ্যোৎস্নালোকে উহাকে একেবারেই মানায় না। হাতের উপর মাথা রাখিয়াই গদাই শুইয়া পড়িল। চোখের উপর ভাসিতে লাগিল ঘাস-ঢাকা উঠানটির মাঝখান দিয়া সরু পথখানি। কত রাঙা চরণের চিহ্ন সে পথে সারাদিন পড়িয়াছে।

আজ কেন এত একলা মনে হয়? গদাই ত কোনোদিন এত বেশী ভাবে নাই। না, ভাবে বই কি! তবে আজ যেন একটু বেশী বেশী। কি জানি, মানুষের মন মাঝে মাঝে কেন এমন ভাবুক হইয়া পড়ে।

ভালবাসা দিবার ত কেহ নাই-ই। ভালবাসা লইবারও ত কেহ রহিল না। আজ যদি একটা পোষা কুকুর থাকিত, গদাই হয়ত তাহাকেই একচোট আদর করিয়া লইত। নাঃ, এমন একলা আর থাকা যায় না। কাল একটা কুকুরও অন্তত সে লইয়া আসিবে।

বাবাঃ, কুকুরের উপর মা কি বিরক্তই না ছিল! বিশ্রী জানোয়ার! ভাতের হাঁড়িতে মুখ দিতে আসে! মা মোটেই কুকুর দেখিতে পারিতেন না। একবার গদাই একটা আধবিলাতী কুকুর লইয়া আসিয়াছিল। গায়ে তার লম্বা লম্বা চুল! কুকুরটা দেখিতে কি সুন্দর ছিল! মা কিন্তু তাহাকে উঠানের ঐ কোণটায় দুটি ভাত ফেলিয়া দিতেন। ঘরে উঠিতে আসিলে ঝাঁটা লইয়া তাড়া করিতেন। কিন্তু কি মজা, কুকুটা মারা গেলে মা-ই বেশী দুঃখ পাইয়াছিলেন, বলিয়াছিলেন—আমার গদাইয়ের কুকুর, আমার একটা ছেলে মরে যাওয়ার মত দুঃখ হয়েছে!

আজ কিন্তু আর না ঘুমাইলে কাল সকালে উঠিতে পারা যাইবে না। উঃ, মাথাটা ভীষণ ধরিয়াছে। যদি জ্বর হয়! হয় ত, হোক্ না। ঐ যারা যায় ঐ সরু পথ দিয়া তাহাদের কেহ যদি একটিবার তাহাকে দেখিয়া যায়! একবারও কেহ যদি তাহার তপ্ত ললাটে শীতল হাতখানির স্পর্শ বুলাইয়া যায়…আঃ…

সাহিত্য

শ্রীসুবিমল সরকার, এম-এ, ডি-ফিল (অক্সন)

'সাহিত্যের' আসল অর্থ—"যা কিছু 'সাহিত্যে' অর্থাৎ কোনও সভা, সমিতি, পরিষদ্ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানে, সহযোগী সভ্যগণের মধ্যে, আলোচিত, ব্যাখ্যাত, পঠিত বা গীত হ'তে পারে।" 'সাহিত্য' পূর্ব্বে বল্‌ত 'অ্যাসোসিয়েশ্যন' বা পরিষদ্‌কে,—তার থেকে পরিষদের উপযুক্ত কার্য্যকলাপেরও 'সাহিত্য' নাম হ'ল ; যেমন আমরা আজকাল বলি 'সোসাইটি করা',—মানে নানাপ্রকার সামাজিক কাজে (ও অকাজে) তৎপর হওয়া। বৈদিক যুগে এই রকম বিবিধ সামাজিক কার্য্যকলাপকে ব'ল্‌ত 'সভা-সমিতি' করা, প্রথম বৌদ্ধ যুগে ব'ল্‌ত 'সমাজ' করা, মৌর্য্যকাল থেকে গুপ্তকাল অবধি বল্‌ত 'গোষ্ঠী' করা (যার অবনতির ক্যারিকেচার হ'ল 'কুষ্ঠী কাটা')। 'সাহিত্যচর্চ্চা' কথাটা বোধ হয় গুপ্তযুগের পর থেকে প্রচলন হয়েছে ; তার পর ক্রমশঃ 'সাহিত্য' অর্থাৎ অ্যাসোসিয়েশ্যনগুলি বহু শতাব্দীর বিজাতীয় আক্রমণ, অন্তর্বিপ্লব ইত্যাদির প্রকোপে লুপ্ত হ'লে (যেমন ভোজের ধারাবতীস্থ সাহিত্য-কলা-ভবন প্রনষ্ট হয়েছিল), তাদের চর্চ্চাটুকুই বিক্ষিপ্ত দু-চারজনের মধ্যে রয়ে গেল। আর সেইটুকুর চর্ব্বিতচর্ব্বণই হয়ে পড়ল দেশের 'সাহিত্য'। প্রথমে 'সাহিত্য-দর্পন'গুলি ছিল 'সাহিত্যের' বা অ্যাসোসিয়েশ্যনের সমালোচকদের জন্য, পরে রয়ে গেল ভাঙা-সভার কবিদের নিজেদের মুখ দেখবার জন্য। আজকাল এই দেশে আবার আমরা সেই 'সাহিত্য' ও 'চর্চ্চা'র বিচ্ছেদ-সন্ধি করেছি, 'সাহিত্য-পরিষদ্', 'সাহিত্য-সভা' ইত্যাদি সংগঠন ক'রে। কিন্তু এই সব নাম-করণে কিছু পুনরুক্তি দোষ ঘটেছে,—'সাহিত্য' মানেই সভা বা পরিষদ্, এবং তার আলোচ্য বিষয়গুলিও।

অতি প্রাচীন বৈদিক যুগ থেকেই সমবেত মণ্ডলীতে সাহিত্যিক প্রচেষ্টা ও চর্চ্চা এদেশে চলে এসেছে। বৈদিক সভা-সমিতিতে দেখি, নানারকম খেলা ও আমোদ-প্রমোদের সঙ্গে, তর্কবিচার, গবেষণা, বক্তৃতা, কাব্যাবৃত্তি প্রভৃতিও চলত ; যেমন অথর্ব্ব-সংহিতায় দেখি যে, ওষধিবিজ্ঞান সম্বন্ধে একটি বিশেষজ্ঞ বক্তৃতা দিচ্ছেন সভাস্থ নারীবৃন্দকে আহ্বান ক'রে। এইরূপ বৈদিক সংহিতাগুলির বহুস্থলে কথিত আছে যে, কোনও সভ্য সভাতে ভাল একটি বক্তৃতা দিতে বা তর্কবিচারে স্বমত সিদ্ধ করতে বা স্বরচিত গাথা-সূক্তাদি পাঠ করতে, সাগ্রহে প্রস্তুত হচ্ছেন,—যাতে অন্য কোন সভ্যের তুলনায় তাঁর চেষ্টাটি খাটো না নয়। এই বৈদিক কালের সভাগুলি কোন একটি বিশেষ বিষয়ে সীমাবদ্ধ থাকত না ; শ্রুতির উল্লেখ থেকে বেশ বোঝা যায় যে, বার্ত্তা, নীতি, অর্থ,—ছন্দ, গাথা, আখ্যান,—মন্ত্র, ব্রাহ্মণ, উপনিষৎ,—(যাকে আমরা আজকাল ইংরেজীতে বলি socio-political-historico-literary-religio-philosophical topics)—এই সর্ব্বপ্রকার জ্ঞানবিষয়েই সভা ও সভা-জাতীয় অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলির বলবার কিছু ছিল। সংহিতাগুলির অনেক সূক্তই সম্ভবতঃ প্রথমে সমসাময়িক 'সভা' বা 'সমনে' মৌলিক রচনা হিসাবে আবৃত্তি করা হয়েছিল। অনেকটা এই ভাবেই,—পাঠে, ব্যাখ্যানে, প্রশ্নোত্তরে, আলোচনায়—অনুবৈদিক সাহিত্য, বিশেষতঃ ঔপনিষদিক সাহিত্য গড়ে উঠেছিল। মহাকাব্য ও পুরাণগুলিতেও দেখি যে ঐ বৈদিক যুগেই সভাগুলিতে যজ্ঞক্রিয়া, মন্ত্রপাঠ, ধর্ম্মালোচনাও হচ্ছে, রাজনৈতিক সমস্যাও মীমাংসিত হচ্ছে, কিংবা ঋষি বা সূত মহাকবিরা পুরাণকথার অথবা সমসাময়িক ইতিহাসের ভিত্তিতে গাথা, কাব্য প্রভৃতি রচনা ক'রে, স্বয়ং বা সশিষ্য আবৃত্তি করছেন,—যার সভাস্থ বিদ্বৎজন ও সাধারণ সভ্যকর্ত্তৃক সমালোচনা, সমাদর ও পুরস্কারও হচ্ছে। এইভাবে আমাদের বেশীর

ভাগ মহাকাব্য ও পুরাণ গড়ে উঠেছে। সভার এই প্রকার কাজের জন্য তখনকার বৈদিক 'চরণ' বা আশ্রমগুলিতে গুরু-শিষ্যতে মিলে বৎসরের পর বৎসর কতটা পরিশ্রমে প্রস্তুত হ'তে হ'ত, তা রামায়ণে বাল্মীকির আশ্রমে ও নৈমিষ-সভায় রামরচিত প্রণয়ন, অভিনয় ও পাঠের যে সবিশেষ বর্ণনা আছে তার থেকেই বেশ বোঝা যায়। এর পরবর্ত্তী যুগের 'সমাজ' বা 'গোষ্ঠী' হ'ল (গণতন্ত্রের বদলে রাজতন্ত্রের প্রাদুর্ভাবের ফলে) বৈদিক 'সভা' ইত্যাদির 'পলিটিকাল' ও 'সিভিক' দিকটা অনেকটা বাদ দিয়ে যা রইল তাই,—বেশীর ভাগই সোসাইটি, আমোদপ্রমোদ খেলা ও শিল্পকলা নিয়েই তার কারবার। এই সময়ে বলা যেতে পারে যে, Literary Societies, Art Societies, ও Club-life এদেশে পূর্ণ বিকশিত হয়ে উঠেছে। বাৎস্যায়নের সূত্রগুলিতে গোষ্ঠীতে যে-ধরণের সাহিত্য-চর্চ্চা ও সুকুমার কলাভ্যাসের ছবিটি পাওয়া যায়, এই পাটলি-পুত্রেরই সেই উৎকর্ষে আমাদের পৌছতে এখনও ঢের দেরি, কারণ আমাদের ব্যক্তিগত ও সামাজিক শিক্ষা, সংস্কার ও আদর্শ এখনও তার নীচে। তখনকার গোষ্ঠীর সভ্যদের যত বিষয়ে অধিকার বা সমাদর থাকৃত, নিজেদের দৈনিক জীবনে যতগুলি ললিতকলার অভ্যাস ও উপলব্ধি করতে হ'ত, যত বিষয়ে আলোচনা করবার ক্ষমতা অর্জ্জন করতে হ'ত, যতটা স্ত্রীশিক্ষা, স্ত্রীসাম্য ও স্ত্রীস্বাধীনতা স্বীকার করতে হ'ত, কিংবা যতটা লোক-শিক্ষার ভার নিতে হ'ত,—আমাদের এই সাহিত্য-সভার সভ্যদের যদি তার সামান্য অংশও করতে হয়, তাহ'লে অনেকেই অ-সভ্য হ'তে রাজি হবেন।

আমাদের দেশে সাহিত্য ও সাহিত্য-সেবার প্রাচীন ইতিহাসের এই যে অত্যল্প প্রাসঙ্গিক অবতারণা ক'রে নিলাম, তার উদ্দেশ্য এই কয়েকটি কথা আপনাদের বিশেষ ক'রে স্মরণ করিয়ে দেবার জন্য :—প্রথমতঃ—পরিষদ্ ছাড়া সাহিত্য বর্দ্ধিত হ'তে এবং প্রসার লাভ করতে পারে না,—আমাদের এই দেশেই দেখা যাচ্ছে যে সেটা কখনও হয় নি।

দ্বিতীয়তঃ—'সভা', 'সমিতি', 'সমজ', 'পরিষদ্', 'সমাজ', 'গোষ্ঠী', 'সাহিত্য', ইত্যাদি যে-নামই যখন চলন হয়ে থাকুক না কেন, আমাদের দেশের সনাতন ধরণ হচ্ছে এই, যে, এই সব প্রতিষ্ঠানে সর্ব্বপ্রকার cultural বা (বৈদিক ভাষায় বলতে গেলে) "সভেয়" প্রসঙ্গই সুসঙ্গত ব'লে গণ্য হ'ত :—পুরাণেতিহাস, কাব্য-গাথা, ললিতকলা, নাট্য-গীতি, দর্শন-বিজ্ঞান, বার্ত্তানীতি,—সবই পর্য্যায়ক্রমে, যথাকালে, যথাস্থানে ;—যেমন রাজসূয়োপলক্ষে সভায় নারাশংসী বীণানুগতা গাথা, অশ্বমেধোপলক্ষে সভায় রাজবংশ চরিতাখ্যান, মহাব্রতকালে সমনে নৃত্য-গীত-বাদ্য,—অথবা পৌর্ণমাসীতে প্রেক্ষণক অর্থাৎ নাট্যাভিনয়, শুক্লাপঞ্চমীতে বাণীভবনে কাব্যসমস্যা, নগরান্তরের বিদ্বৎ-সমাগমে পাঠ বা তর্কবিচার, ইত্যাদি।

তৃতীয়তঃ—আমাদের প্রাচীন সভ্যতার সামাজিক প্রথা ও ধারণানুসারে, সমাজের সব 'সিটিজেন'-দেরই, বর্ণ বা পদনির্ব্বিশেষে স্ত্রীপুরুষ সমভাবে,—সভ্যতাভিমানী সকল নাগরিক-নাগরিকারই কোন-না-কোন গোষ্ঠী বা পরিষদের অন্তর্ভুক্ত হ'তে হয়,—যার উদ্দেশ্য ক্রীড়ায় কলায় সভাটিকে 'নরিষ্ঠা,' কাব্যে বিজ্ঞানে 'গরিষ্ঠা' ক'রে তোলা। আনন্দ-সম্ভোগ, ঘরে-বাইরে সৌন্দর্য্যের বোধ ও অভিব্যক্তি, উচ্চস্তরের সুকুমার চিত্তবৃত্তিগুলির সমুৎকর্ষ,—এসব আমাদের আধুনিক জাতীয় জীবনে বড়ই কম :—অন্নচিন্তা, মান-অপমানের বোঝা, স্বাধিকারের উদ্বেগ, স্বদেশীয়ের মধ্যে বিরোধ, বিদেশীয়ের হিংসা, ইত্যাদি নানা দুর্ভাবনা ও দুর্বিধানের মধ্যে এটা মনে করতেও সুখ যে অন্য ধরণের জীবনযাত্রাও এদেশে অপরিচিত ছিল না, এখনও বোধ হয় অসম্ভব নয়।

চতুর্থতঃ—ভারতীয় সাহিত্য বেশীর ভাগই ভারতীয় পুরাণ-ইতিহাসের উপকরণে গঠিত। ইতিহাস ও সাহিত্যের এই ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আমাদের মধ্যে যতটা, ততটা আর কোথাও নয়। তার প্রধান কারণ, আমরা অতি পুরানো মানুষ, সুদীর্ঘ বিচিত্র অতীত আমাদের অস্থিমজ্জাগত ; তাই আমাদের সকল ধ্যান-ধারণা-কল্পনার মধ্যেই এক একটা মহা-ইতিহাস ছায়া ফেলে ;

তা ছাড়া আমাদের ভাব-প্রবণতা ও বাস্তবকে মানসলোকে পুনর্নির্ম্মাণ করার অভ্যাস ইতিহাসকে কাব্য করেছে ও কাব্যকেও ইতিহাস মেনেছে; যদিও এখন আমরা ইতিহাস ও সাহিত্যের স্বরূপ আগের চেয়ে ভাল ক'রে জেনেছি, তবুও এই দুটির সম্বন্ধ এদেশে আল্‌গা হ'তে এখনও দেরি আছে; কারণ আমাদের জাগরিত সাহিত্যকে উন্নতিশীল করতে হ'লে, ঐতিহাসিক প্রণালীতে তার বিশ্লেষণ ও আলোচনা করতে হবে,—সাহিত্যকে খাড়া ক'রে দেবে, জোর দেবে, ব্যক্তিত্ব দেবে, ঐতিহাসিকরা; তারপর আমাদের দৃষ্টি ও চিন্তা ভবিষ্যের দিকে, কিংবা ত্রিকাল ছাড়িয়ে, এখনও যাচ্ছে না। এতদিন ত আমরা খালি অতীতের ওপর চল্‌তাম, এখন বর্ত্তমান নিয়ে ব্যস্ত; এখনও সব সাহিত্যের বিষয়-বস্তু হয় অতীতের কল্পনা ও প্রতিধ্বনি, নয় বর্ত্তমানের নানাপ্রকার সংঘর্ষের দুঃস্বপ্ন; কাজেই ইতিহাস ছাড়া সাহিত্য চলে কি ক'রে? প্রথম সাহিত্যের উদ্ভব হ'ল এইদেশে এই বিহার ও বঙ্গের সন্ধিস্থলে, অঙ্গ বা সূত-বিষয়ে,—যখন পৃথুর রাজবংশের ইতিহাস নিয়ে সূতরা পুরাণ-গাথা রচনা করলেন, যখন মাগধরা স্বদেশের ব্রাত্য রাজাদের কীর্ত্তিগান করলেন। পুরাণে বলে সে বেদ-সংহিতারও আগে। এই সূতমাগধ সাহিত্য থেকেই গড়ে উঠল সমস্ত পুরাণ, সমস্ত মহাকাব্য, রামায়ণ, মহাভারত, হরিবংশ। ঋক্-যজুস-অথর্ব্বণে দেখি সমস্ত সূক্তমন্ত্রগুলির তলায় তলায় ইতিহাসের ফল্গুনদী,—দিবোদাস-সুদাস, বশিষ্ঠ-বিশ্বামিত্র, কুরু-পাঞ্চাল, ভৃগু-হৈহয় প্রভৃতির পুরাণকথা ছেড়ে দিলে অর্থহীন হয়ে যায়; যেমন বেদের সমর-গাথা সুদাস রাজার, বেদের যজ্ঞমন্ত্রে রাণী সুভদ্রা কম্পিলবাসিনীর নাম, এমন কি মধুরতম প্রেমের নাটিকাটিও পুরূরবসের গান্ধারী প্রেয়সীর বিষয়ে; তাই পুরাণকার পুরাণের প্রথমেই বলেছেন "পুরাণেতিহাস না জেনে যে বৈদিক সাহিত্য চর্চ্চা করে সে বেদকে হত্যা করে।" কুরুপাঞ্চাল কাশীকোশল মদ্রবিদেহের স্বনামধন্য জ্ঞানপিপাসু ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়দের বাদ দিলে উপনিষদের আর থাকে কি? বৌদ্ধ ও জৈন সাহিত্যও যা, ইতিহাসও তা। বুদ্ধ ও নন্দের ইতিহাসে অশ্বঘোষের প্রতিভা খেলবার স্থান পেল; ভরত-দৌষ্যন্তির পুরাণগাথা, রঘুবংশচরিত ও শুঙ্গবংশের ইতিহাসের ওপর কালিদাসের খ্যাতির অর্দ্ধেক আশ্রয় ক'রে আছে; চন্দ্রগুপ্ত ছাড়া বিশাখদত্তই বা কি, হর্ষ ছাড়া বাণভট্টই বা কি। কহ্লনবিহ্লনকে কি কবি বলব, না ঐতিহাসিক? প্রাচীন সাহিত্য ছেড়ে, পরেও দেখি চৌহান ইতিহাসের সাহিত্যিক হলেন চাঁদ বরদাই, রামপালের হলেন সন্ধ্যাকর নন্দী। তুলসীদাস যে অমর হলেন সে ত রামের পুরানো ইতিহাস দিয়ে; কাশীরামের লেখায় ইতিহাস অন্য আকারে বেরিয়ে এল। আজকালকার দিনে রাজস্থান, মহারাষ্ট্রের ইতিহাস, মোগল-পাঠানের "তারিখ", দেশের অনাদৃত জনশ্রুতি ও পল্লীস্মৃতি, এই সব অবলম্বন করেই ত বঙ্গীয় বা অন্যান্য প্রাদেশিক ভাষার সাহিত্য উঠে দাঁড়িয়েছে। ইতিহাস-মকরন্দে কত অলি রস নিয়ে গান করেছে,—বঙ্কিম, রমেশ, দ্বিজেন্দ্র, রবীন্দ্র—সবাই; ইতিহাস-মন্থনেই বঙ্গসাহিত্য-সুধার উদয় হয়েছে। আবার অন্যদিকে বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের ঐতিহাসিক সমালোচকরা ইতিহাসের নূতন একটা ধারা খুলে দিয়েছেন।



কালীপ্রসন্ন সিংহ ও তাঁহার নাট্যগ্রন্থাবলী

গত আষাঢ় মাসের 'প্রবাসী'তে ডক্টর শ্রীযুত সুশীলকুমার দে মহাশয় কালীপ্রসন্ন সিংহের নাট্যগ্রন্থাবলী সম্বন্ধে একটি উপাদেয় প্রবন্ধ প্রকাশিত করিয়াছেন ও সেই সঙ্গে বাঙালী-প্রতিষ্ঠিত নাট্যশালার আদি ইতিহাসেরও একটু পরিচয় দিয়াছেন। সুশীলবাবু এই বিষয়ে অনেক দিন ধরিয়া গবেষণা করিতেছেন। বাংলা দেশের নাট্যশালা ও নাটক সম্বন্ধে তাঁহার লিখিত প্রবন্ধাবলী ইতিপূর্ব্বে অন্যত্রও প্রকাশিত হইয়াছে।* ভবিষ্যতে উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা নাট্যসাহিত্য সম্বন্ধে যে-কেহ আলোচনা বা গবেষণা করিবেন তাঁহাকেই সুশীলবাবুর প্রবন্ধগুলি পড়িতে হইবে। সেজন্য সুশীলবাবুর তথ্যসংগ্রহের মধ্যে যে দু-একটি সামান্য ভ্রমপ্রমাদ ও অসম্পূর্ণতা আছে সেগুলিকে দূর করিয়া প্রবন্ধটিকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিতে পারিলে সাহিত্যসেবীমাত্রেরই অতিশয় আহ্লাদের বিষয় হইত। উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে আলোচনা করিবার যোগ্যতা আমার নাই। তবে এই যুগের অন্য কতকগুলি বিষয়ে অনুসন্ধান করিতে গিয়া আমাকে অনেকগুলি সমসাময়িক সংবাদপত্র ঘাঁটিতে হইয়াছে। এই সকল সংবাদপত্রের মধ্যে পুরাতন বাংলা নাট্যশালা ও নাট্যসাহিত্য সম্বন্ধে অনেক তথ্য ছড়াইয়া আছে। হয়ত সেগুলি সুশীলবাবুর চোখ এড়াইয়া গিয়াছে। আমি তাঁহারই প্রবন্ধের পরিশিষ্ট হিসাবে সেই সকল তথ্যের যেগুলি আমার সংগ্রহ করা ছিল তাহা অতি সংক্ষেপে 'প্রবাসী'র পাঠকদের সম্মুখে উপস্থাপিত করিতেছি।

বিদ্যোৎসাহিনী সভার প্রতিষ্ঠাকাল

সুশীলবাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ প্রতিষ্ঠিত বিদ্যোৎসাহিনী সভার প্রতিষ্ঠাকাল ১৮৫৫ সাল বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন (পৃ. ৩০৯)। কিন্তু সমসাময়িক একখানি সংবাদপত্রের বিবরণ হইতে মনে হয় ইহার অনেক আগেই বিদ্যোৎসাহিনী সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ১ মাঘ ১২৬৩ (১৩ জানুয়ারি ১৮৫৭) তারিখের 'সংবাদ প্রভাকরে' দেখিতেছি,—

> "বিজ্ঞাপন।—২ মাঘ বুধবার রাত্রি ৮ ঘণ্টার সময়ে বিদ্যোৎসাহিনা সভার তৃতীয় সাম্বৎসরিক সভা হইবে, দর্শক মহাশয়গণ সভারোহণ করত বাধিত করিবেন।
>
> শ্রীকালীপ্রসন্ন সিংহ
> বিদ্যোৎসাহিনী সভা সম্পাদক।"

বিদ্যোৎসাহিনী সভার তৃতীয় সাম্বৎসরিক সভা ১৮৫৭ সালের ১৪ই জানুয়ারি অনুষ্ঠিত হইলে, ১৮৫৫ সালে ঐ সভার প্রতিষ্ঠা হওয়া সম্ভব নয়। তবে কি 'সংবাদ প্রভাকরে'র এই বিজ্ঞাপনে কোনো ভুল আছে? তাহা মনে হয় না, কারণ মাঘ, ১৭৭৮ শকের 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র ১৪৪ পৃষ্ঠাতেও বিজ্ঞাপনটি ঠিক ঐ ভাষায় মুদ্রিত হইয়াছে।

প্রকৃত ব্যাপার এই যে বিদ্যোৎসাহিনী সভার সাম্বৎসরিক সভাগুলি যথাসময়ে না হইয়া বিলম্বে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। 'সংবাদ প্রভাকরে' দেখিতেছি প্রথম সাম্বৎসরিক সভার তারিখ—১৯ জানুয়ারি ১৮৫৬। ইহা হইতেই সুশীলবাবু এবং কালীপ্রসন্ন সিংহের চরিতকার শ্রীযুত মন্মথনাথ ঘোষ বিদ্যোৎসাহিনী সভার প্রতিষ্ঠাকাল ১৮৫৫ সাল বলিয়া ধরিয়াছেন। পক্ষান্তরে বিদ্যোৎসাহিনী সভার ১৮৫৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার একটি পরোক্ষ প্রমাণ আছে। ১৮৫৩, ১৪ই জুন (১২৬০, ১ আষাঢ়) তারিখের 'সংবাদ প্রভাকরে' দেখিতেছি,—

> "১২৬০, জ্যৈষ্ঠ মাসের বিবরণ।— ... ৺নন্দলাল সিংহ মহাশয়ের পুত্র শ্রীমান্ বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ বঙ্গভাষার অনুশীলন জন্য এক সভা করিয়াছেন।"

এই সভাই যে বিদ্যোৎসাহিনী সভা তাহা সন্দেহ করিবার কোনো কারণ আছে বলিয়া আমার মনে হয় না।

কালীপ্রসন্ন সিংহের নাট্যগ্রন্থাবলী

বিদ্যোৎসাহিনী সভা হইতে প্রকাশিত, কালীপ্রসন্ন সিংহের তিনখানি নাটকের পরিচয় সুশীলবাবু তাঁহার প্রবন্ধে দিয়াছেন। 'বিক্রমোর্ব্বশী নাটক'কে সুশীলবাবু কালীপ্রসন্নের "প্রথম উদ্যম" "প্রথম সাহিত্যিক রচনা" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন (পৃ. ৩১০)। কিন্তু ১৮৫৭ সালে প্রকাশিত বিক্রমোর্ব্বশী নাটক কালীপ্রসন্নের প্রথম উদ্যম নহে। 'বিক্রমোর্ব্বশী' প্রকাশের চারি বৎসর পূর্ব্বে, ১৮৫৩ সালে, তিনি 'বাবু নাটক' প্রকাশ করিয়াছিলেন। ১৮৫৫ সালের ১৪ ডিসেম্বর তারিখের 'সংবাদ প্রভাকরে' প্রকাশিত নিম্নলিখিত বিজ্ঞাপনটি হইতে তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইবে:—

> "বিজ্ঞাপন।—পূর্ব্বে প্রায় দুই বৎসর গত হইল আমি একবার বাবু নাটক্ নামক গ্রন্থ রচিয়া প্রকাশ করি, কিন্তু তাহা এক্ষণে এমত দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে যে কত লোক চারিমুদ্রা স্বীকার করিয়াও পান নাই,. অতএব আমি পুনরায় মুদ্রিত করিবার অভিলাষি, যদ্যপি কেহ গ্রাহক শ্রেণীতে ভুক্ত হইতে ইচ্ছা করেন তিনি বিদ্যোৎসাহিনী সভায় নাম ধাম লিখিয়া পাঠাইলে তাঁহাকে গ্রাহকগণ মধ্যে গণ্য করা যাইবেক মূল্য।০, বিনা স্বাক্ষরকারী ৸০ মাত্র।
>
> শ্রীকালীপ্রসন্ন সিংহ।
> সম্পাদক।"

'বাবু নাটক'-এর অস্তিত্ব জানা না থাকায় সুশীলবাবু ভ্রমক্রমে ১৮৫৮ সালে প্রকাশিত 'সাবিত্রী সত্যবান নাটক'কে "কালীপ্রসন্ন সিংহের একমাত্র নিজস্ব রচনা" বলিয়াছেন (পৃ. ৩১১)।

* "প্রাচীন বাঙ্গালা নাটক ও তাহার অভিনয়"—শ্রীসুশীলকুমার দে।—প্রগতি, ১৩৩৪—আশ্বিন (পৃ. ২২৮-৪০), কার্ত্তিক (পৃ. ২৯৭-৩০৩), অগ্রহায়ণ (পৃ. ৩৪৫-৫৩); ইত্যাদি।

১৮৫৫ সালের ১৬ই আগষ্ট (১ ভাদ্র ১২৬২) তারিখের 'সংবাদ প্রভাকরে' নিম্নলিখিত "বিজ্ঞাপন"টি মুদ্রিত হইয়াছে :—

" 'বিধবোদ্বাহ' নাটক যাহা আমরা সাতিশয় পরিশ্রমে প্রস্তুত করিয়া প্রকাশ করিতেছি, তাহা যে কোন মহাশয়ের প্রয়োজন হয় তিনি বিদ্যোৎসাহিনী সভায় অথবা ঐ সভার সহকারি সম্পাদক শ্রীযুত বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহের নিকটে পত্র লিখিলে তাঁহাকে গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত করা যাইবেক, ঐ নাটকের মূল্য ১ এক তঙ্কা মাত্র।

শ্রীউমেশচন্দ্র মল্লিক।
বিদ্যোৎসাহিনী সভা সম্পাদক।"

'বিধবোদ্বাহ নাটক' কাহার রচিত তাহা জানিতে পারি নাই, কিন্তু বিজ্ঞাপনটির ধরণ হইতে মনে হয় ইহা কালীপ্রসন্নের রচনা।

১৮৫৮ সালে কালীপ্রসন্নের 'সাবিত্রী সত্যবান নাটক' প্রকাশিত হয় সুশীলবাবু লিখিয়াছেন, তাঁহার নিকট এই নাটকের যে কাপিখানি আছে তাহা খণ্ডিত, তাহাতে বাংলা টাইটল-পেজ বা 'বিজ্ঞাপন' নাই। আমি রাজা রাধাকান্ত দেবের লাইব্রেরীতে ও উত্তরপাড়া পাবলিক লাইব্রেরীতে সাবিত্রী সত্যবান নাটকের একাধিক খণ্ড দেখিয়াছি। ইহার পত্র-সংখ্যা ।৵০+৯৮। বাংলা টাইটল-পেজ এইরূপ :—

"সাবিত্রী সত্যবান নাটক। শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন সিংহ প্রণীত। কলিকাতা। জি, পি, রায় এণ্ড কোং দ্বারা বিদ্যোৎসাহিনী সভার কারণ মুদ্রিত, কসাইটোলা এমামবাড়ী লেন নং ৬৭। শকাব্দা ১৭৮০। বিনা মূল্যেন বিতরিতব্যং।"

এই পৃষ্ঠার উল্টা দিকে "বিজ্ঞাপন" ; তাহা এইরূপ :—

"বিজ্ঞাপন

সাবিত্রী সত্যবান নাটক, মুদ্রিত ও প্রচারিত হইল। মহাভারতীয় বন পর্ব্বান্তর্গত পতিব্রতোপাখ্যানে সাবিত্রী সত্যবান বিষয়ক আখ্যায়িকা বিশেষ রূপে লিখিত থাকায় এস্থলে সে বিষয় উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন। মহাভারতীয় বনপর্ব্বান্তর্গত পতিব্রতোপাখ্যানের সাবিত্রী চরিত হইতে কেবল মর্ম্ম মাত্র পরিগৃহীত হইয়াছে, নতুবা কোন কোন স্থান অসংলগ্নবোধে পরিত্যক্ত স্থান বিশেষে নূতন ঘটনায় অলঙ্কৃত করা গিয়াছে, যাঁহারা সংস্কৃত জানেন তাঁহারা অবশ্যই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিবেন, যে মহাভারতীয় সাবিত্রী সত্যবানের উপাখ্যান অতীব সুন্দর, ইহার রমণীয়ভাব ও কমনীয় প্রতিভার দ্বারা পাঠকগণ সময়ে সুন্দর রসে সম্মোহিত হয়েন তাহার সন্দেহ নাই, বিশেষতঃ বঙ্গীয় স্ত্রীলোকের সাবিত্রী সত্যবান উপাখ্যান বিশেষ রূপে জানা আবশ্যক, যদ্দারা পাতিব্রত্য ধর্ম্মের উদাহরণ স্বরূপে ও ধর্ম্মজ্ঞান শিক্ষায় তদনুসরণে সমর্থা হইবে। এক্ষণে সাবিত্রী সত্যবান উপাখ্যান নাটকাকারে পরিণত করিয়া সহৃদয় পাঠকগণ সমীপে সমর্পণ করিলাম, বিদ্যোৎসাহী মহোদয় গণের পাঠ যোগ্য এবং নগরীয় অন্যান্য রঙ্গভূমির অভিনয়ার্হ হইলেই পরিশ্রম ও ধন ব্যয় সার্থক বিবেচনা করিব।

কলিকাতা
বিদ্যোৎসাহিনী সভা
১৭৮০ শকাব্দা

শ্রীকালীপ্রসন্ন সিংহ।"

'কুলীনকুলসর্ব্বস্ব' নাটকের অভিনয়

'কুলীনকুলসর্ব্বস্ব' নাটকের অভিনয় সম্বন্ধে সুশীলবাবু লিখিয়াছেন :—
"১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে রামনারায়ণ তর্করত্নের 'কুলীনকুলসর্ব্বস্বে'র অভিনয়ের উল্লেখ পাওয়া যায়।...প্রথম কোথায় ও কবে ইহার অভিনয় হইয়াছিল তৎসম্বন্ধে যথেষ্ট মতভেদ রহিয়াছে। বোধ হয় প্রথম ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা নূতন বাজারে জয়রাম বসাকের বাটীতে ও পরে ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা বাঁশতলার গলিতে ও চুঁচুড়ায় এই নাটক অভিনীত হয়। কিন্তু ইহার কোন বিশেষ বিবরণ পাওয়া যায় না।"

১৮৫৬ সালে 'কুলীনকুলসর্ব্বস্ব' নাটকের প্রথম অভিনয় হইয়াছিল, এ কথা কোথায় আছে জানি না। তবে সমসাময়িক একজনের—গোরদাস বসাকের—মাইকেল মধুসূদন দত্ত সম্বন্ধে স্মৃতিকথায় দেখিতেছি ১৮৫৭ সালের মার্চ মাসে এই নাটকখানি জয়রাম বসাকের বাটীতে প্রথম অভিনীত হয়।—

"The credit of organizing the first Bengali Theatre belongs to the late Babu Jayram Bysack of Churruckdanga Street, Calcutta, who formed and drilled a Bengali dramatic corps and set up a stage in his house, on which was performed, in March 1857, the sensational Bengali play of *Kulin Kula Sarvasra* by Pandit Ramnarayana. The success and popularity that attended the first experiment led the late Babu Gopal Das Sett to form a similar corps and set up a stage in his house in Rutton Sircar's Garden Street, on which the same play was repeated, before an enthusiastic audience. The unprecedented sensation into which the whole native community was thrown, after the celebration of the first widow marriage [1856, 7 Decr.] under the aegis of that redoubtable apostle of social reform, Isvara Chandra Vidyasagara, accounted for the interest and excitement which these performances of a play representing a most important social reform, created at the time. As naturally expected, Vidyasagara and Babu Kali Prasanna Singha, always on the van of national progress, encouraged the actors in Babu Gadadhar Sett's house, by their presence and personal interest."*

কুলীনকুলসর্ব্বস্বের প্রথম অভিনয়ের তারিখ ও স্থান সম্বন্ধে গৌরদাস বসাক মহাশয়ের উক্তি যে অভ্রান্ত, ১৮৫৭ সালের ১৯ মার্চ্চ তারিখের 'হিন্দু পেট্রিয়ট' হইতে উদ্ধৃত নিম্নলিখিত অংশে তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইবে :—

"WEEKLY REGISTER OF INTELLIGENCE.
Friday, the 13th March.

THE EDUCATIONAL GAZETTE states that the well-known farce of Koolino-Kooloshorbushya was acted in the private residence of a Baboo in Calcutta with great success..."

'কুলীনকুলসর্ব্বস্বের' তৃতীয় অভিনয়ের কথাও তৎকালীন সংবাদপত্রে পাওয়া যায়। ১২৬৪ সালের ১৩ই চৈত্র তারিখের 'সংবাদ প্রভাকরে' দেখিতেছি :—

"১০ই চৈত্র [২২ মার্চ্চ ১৮৫৮] গদাধর শেঠের ভবনে 'কুলীনকুল-সর্ব্বস্ব' নাটকের তৃতীয় বার অভিনয় হয়। রঙ্গভূমি সাত শত লোকে পূর্ণ হইয়াছিল। বিদ্যাসাগর প্রভৃতি গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ দর্শক ছিলেন।"†

এই বিবরণের সহিত গৌরদাস বসাকের উক্তির সম্পূর্ণ মিল আছে।

---

* যোগীন্দ্রনাথ বসুর "মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবন-চরিত" (৩য় সং.), পৃ. ৬৪৭-৪৮।

† "ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ও সংবাদ প্রভাকর"—হরিহর শাস্ত্রী।—বঙ্গসাহিত্য, মাঘ-চৈত্র ১৩২৯।

১৮৫৮ সালের জুলাই মাসের প্রথম ভাগে—১৮৫৭ সালে নহে—চুঁচুড়ায় 'কুলীনকুলসর্ব্বস্ব' পুনরায় অভিনীত হয়। ১৮৫৮, ১৫ জুলাই তারিখের 'হিন্দু পেট্রিয়টে' দেখিতেছি :—

"*Tuesday, the 13 July*.. THE ACTING of the Koolin-o-Kooloshurboshwo Natuck at Chinsurah has, it appears, given great offence to the Koolins of the locality...The acting took place in the house of a gentleman of the Banya caste,..."

ছাতুবাবুর বাটীতে 'শকুন্তলা' নাটকের অভিনয়

সুশীলবাবু লিখিয়াছেন :—"১৮৫৭, ফেব্রুয়ারি মাসে আশুতোষ দেবের (ছাতুবাবুর) সিমুলিয়া বাসভবনে নন্দকুমার রায় প্রণীত 'শকুন্তলা' নাটকের অভিনয় হইয়াছিল।"

ছাতুবাবুর বাড়িতে 'শকুন্তলার' * প্রথম অভিনয় হয় ১৮৫৭ সালের ৩০ জানুয়ারি তারিখে—ফেব্রুয়ারি মাসে নহে। এই অভিনয় সম্বন্ধে ৫ই ফেব্রুয়ারি তারিখে হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় তাঁহার 'হিন্দু পেট্রিয়টে' এক দীর্ঘ বিবরণ লিখিয়াছিলেন ; স্থানাভাবে তাহার অংশ-বিশেষ মাত্র উদ্ধৃত করিতেছি :—

"We are...delighted to learn that the theatre had been got up by the grandsons of the late Babu Ashootosh Dey, the stage having been erected at the family residence of the deceased millionaire, and partaking of the character of a private theatrical . . . The play is admirably fitted for the stage. We had abundant evidence of the fact from the performance which came off on the night of the 30th instant [*ultimo*]. The young gentleman who personated Sacoontolah looked really grand and queenly in his gestures and address, and did great justice to the part he was enacting. The other amateurs also succeeded in creating an effect. We are told that the performers have not had the benefit of any lessons from practised actors, and this circumstance enables us to accord great credit to exertions undoubtedly very well directed...."

এই অভিনয়ের তিন সপ্তাহ পরে (২২ ফেব্রুয়ারি) ছাতুবাবুর বাড়িতে 'শকুন্তলা' দ্বিতীয়বার অভিনীত হয়। ১৮৫৭, ২৬ ফেব্রুয়ারি (১২৬৩, ১৬ ফাল্গুন) তারিখে 'সংবাদ প্রভাকর' লিখিয়াছিলেন :—

"গত ১২ ফাল্গুন [২২ ফেব্রুয়ারি ১৮৫৭] রবিবার যামিনী যোগে ৺বাবু আশুতোষ দেব [মৃত্যু ১৮৫৬, ২৯ জানুয়ারি] মহাশয়ের ভবনে শকুন্তলা নাটকের অনুরূপ পুনঃ প্রদর্শিত হয়, নাট্যশালার শোভা অতি রমণীয় হইয়াছিল, বিশেষতঃ প্রায় ৪০০ শত ভদ্রলোক বিবিধ প্রকার বিচিত্র পরিচ্ছদে পরিবৃত্ত হইয়া সভার শোভা অতিশয় বৃদ্ধি করিয়াছিলেন, সম্ভ্রান্ত ভদ্র কুলোদ্ভব বালকগণ নট-নটীরূপ ধারণ পূর্ব্বক নাটকের বিচিত্র রচনানুক্রমে রঙ্গভূমিতে উপস্থিত হইয়া আপনাপন বক্তৃতা ও শরীরের ভঙ্গি অতি উত্তমরূপে প্রকাশ করাতে দর্শক মাত্রেই পরম পুলকিত হইয়া সাধুবাদ করিয়াছেন, বিশেষতঃ শকুন্তলার লাবণ্য-জ্যোঃতি শরচ্চন্দ্রের দ্যোতির প্রায় প্রকাশ হইবার রঙ্গস্থল উজ্জল হইয়াছিল এবং তাঁহার সুমিষ্ট স্বরে মধুবর্ষণ হইয়াছে, তিনি সভাস্থ সকলেরই চিত্ত আকর্ষণ করিয়াছেন তাঁহার আনন্দে সকলে আনন্দিত ও বিমোহিত, তাঁহার ম্লানবদন সন্দর্শনে সকলেরই ম্লানমুখ এবং তাঁহার কাতরোক্তি শ্রবণে অনেকের অশ্রুপাত হইয়াছে, আহা, তরুণবয়স্ক ছাত্রগণ মহাকবি কালীদাস প্রণীত শকুন্তলা নাটকের অনুরূপ প্রদর্শন সময়ে কবিবরের মনোগত ভাব প্রকাশ করাতে আমরা পরম পুলকিত হইয়াছি, অধুনা অন্যান্য ভদ্রকুল প্রসূত বিদ্যানুরাগি ছাত্রগণ এই মহদ্দৃষ্টান্তের অনুগামি হইয়া যদ্যপি সংস্কৃত কবিগণ কৃত নাটকের পুনরুদ্ধার করেন তবে পরমোপকার হয়।"

* এই পুস্তকখানি ১৮৫৫ সালের শেষার্দ্ধে প্রকাশিত হয়। ১৮৫৬, ১২ই এপ্রিল (১২৬৩, ১ বৈশাখ) তারিখের 'সংবাদ প্রভাকরে' দেখিতেছি :—

"ভাদ্র, ১২৬২।—...শ্রীযুত নন্দকুমার রায় কর্ত্তৃক 'অভিজ্ঞান শকুন্তলা' নামক নাটক পুস্তক গদ্য পদ্যে অনুবাদিত হইয়া প্রকাশ হয়।"

'শকুন্তলা নাটকের অভিনয় সম্বন্ধে কিশোরীচাঁদ মিত্র ১৮৭৩ সালে 'কলিকাতা রিভিউ' পত্রে একটি প্রবন্ধে লিখিয়াছিলেন :—"It was a failure." সুশীলবাবুর প্রবন্ধেও একথা উদ্ধৃত হইয়াছে। কিন্তু কিশোরীচাঁদ স্বয়ং শকুন্তলা-নাটকের অভিনয় দেখিয়া এরূপ মন্তব্য করিয়াছেন কি না জানি না, তবে 'হিন্দু পেট্রিয়ট' ও 'সংবাদ প্রভাকরে'র বিবরণ হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে অভিনয় সাফল্য-মণ্ডিত হইয়াছিল এবং দর্শকগণ যথেষ্ট সাধুবাদ করিয়াছিলেন।

'শকুন্তলা'-অভিনয়ের মাস-ছয় পরে ছাতুবাবুর বাড়িতে সমারোহে আর একখানি নাটকের অভিনয় হইয়াছিল। তাহার উল্লেখ সুশীলবাবু করেন নাই। 'সংবাদ প্রভাকর' পাঠে জানা যায় :—

"১২৬৪, ভাদ্র।...স্বর্গগত বাবু আশুতোষ দেবের ভবনে 'মহাশ্বেতা' নামে নাটকের থিয়েটর হয়।"*

নবীন বসুর বাটীতে 'বিদ্যাসুন্দর' নাটকের অভিনয়

১৮৩৫ সালের শেষদিকে কলিকাতা শ্যামবাজার-নিবাসী নবীনচন্দ্র বসুর স্বভবনস্থিত রঙ্গমঞ্চে মহাসমারোহে 'বিদ্যাসুন্দর' নাটকের অভিনয় হয়। এই প্রসঙ্গে সুশীলবাবু তাঁহার প্রবন্ধে "মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি তাঁহার 'সন্দর্ভ-সংগ্রহে' (১৮৯৭, পৃ. ৬-১০) তৎকালীন 'হিন্দু পাওনিয়র' নামক ইংরেজী মাসিকপত্র হইতে (অক্টোবর, ১৮৩৫) এই নাটকের দ্বিতীয় অভিনয়ের যে বিস্তৃত বিবরণ দিয়াছেন, তাহা হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত" করিয়াছেন।

'হিন্দু পাওনিয়রে'র বিবরণের প্রায় সমগ্র অংশ বিলাত হইতে প্রকাশিত তৎকালীন *Asiatic Journal* (April 1836, Asiatic Intelligence—Calcutta, pp 252-53, পত্রেও মুদ্রিত হইয়াছিল। মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধির পুস্তকের উপর নির্ভর না করিয়া, এশিয়াটিক জর্নালের সাহায্য লইলে সুশীলবাবু এ-বিষয়ে আরও সঠিক সংবাদ পাইতেন। মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধির 'সন্দর্ভ-সংগ্রহ' হাতের কাছে নাই ; না থাকিলেও বুঝিতেছি তিনিই 'হিন্দু পাওনিয়র'কে "মাসিকপত্র" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, কারণ বিবরণটি 'সন্দর্ভ-সংগ্রহে' প্রকাশিত হইবার তিন বৎসর পূর্ব্বে বিদ্যানিধি-সম্পাদিত 'অনুশীলন' নামক মাসিক পত্রে (১৩০১, মাঘ) উদ্ধৃত হইয়াছিল। তাহাতে তিনি লিখিয়াছেন, -"১৮৩৫ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে 'হিন্দু পায়োনিয়ার' নামে এক মাসিক পত্র প্রকাশিত হয়।" সুশীলবাবু বিদ্যানিধির উক্তিকেই সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু 'হিন্দু পাওনিয়র' মাসিকপত্র

* সংবাদ প্রভাকর—১৬ সেপ্টেম্বর ১৮৫৭ (১ আশ্বিন ১২৬৪)

হওয়া সম্ভব নয়।* কারণ এশিয়াটিক জর্নালে উদ্ধৃত বিবরণটির শেষে লেখা দেওয়া আছে :—"*Hindu Pioneer, Oct. 22.*" এই তারিখ হইতেই সূচিত হইতেছে যে 'হিন্দু পাওনিয়র' সাপ্তাহিক পত্র ছিল,—মাসিকপত্র নহে।

আর একটি কথা। সুশীলবাবু 'হিন্দু পাওনিয়রে'র বিবরণটি উদ্ধৃত করিবার সময় কয়েকটি ভুল করিয়াছেন,—তন্মধ্যে একটি গুরুতর। তাহার ফলে একটি বাক্যের অর্থ অন্যরূপ দাঁড়াইয়াছে। উদ্ধৃত অংশের প্রথমেই আছে—"The private theatre... is situated in the residence of the proprietor at Shambazar where four or five plays WERE acted during the year." এখানে "were" কথাটি ARE হইবে।

১৮৩৫, ২২ অক্টোবর তারিখের 'হিন্দু পাওনিয়রে' বিদ্যাসুন্দর অভিনয়ের বিবরণটি প্রকাশিত হইলে পরদিন *Calcutta Courier* নামক দৈনিক সংবাদপত্রে তাহা সমগ্রভাবে উদ্ধৃত হইয়াছিল। *The Englishman and Military Chronicle* পত্রেও বিবরণটি প্রকাশিত হয়। এই প্রসঙ্গে 'ইংলিশম্যানে' একজন সংবাদদাতার একখানি পত্রও মুদ্রিত হইয়াছিল। সেই পত্রের উপর মন্তব্য করিয়া ইংলিশম্যান-সম্পাদক লিখিয়াছিলেন :—

"HINDOO THEATRICALS.—We insert a letter respecting the account of certain Hindu Theatricals which we copied from the *Pioneer*. Our correspondent, who is we know well informed, has sufficiently shewn that so far from such Theatricals being attended with any advantage, moral or intellectual to the Hindus, it behoves every friend to the people to discourage such exhibitions, which are equally devoid of novelty, utility and even decency. Our correspondent has lifted the veil with which the writer of the sketch sought to screen the real character of these exhibitions, and we hope we shall hear no more of them in the *Hindu Pioneer* unless it be to denounce them.—*Englisman.*" †

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

* "THE HINDOO PIONEER. In the *Reformer* of yesterday we observe a letter on the subject of the new publication got up by the Alumni of the Hindu College,...It appears that the youths who have got up the *Pioneer*, have made some sort of pledge to the managers not to make it a vehicle of political or religious controversy, or of attacks upon the College..."—*Harkaru* (Cited in The *Calcutta Courier*, Oct. 5, 1835). ইহা হইতে মনে হয়, ১৮৩৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসের মাঝামাঝি অথবা অক্টোবরের গোড়া হইতে 'হিন্দু পাওনিয়র' প্রকাশিত হয়। See also *Asiatic Journal*, March 1836 (Asiatic Intelligence—Calcutta, p. 179.)

† Cited in The *Calcutta Courier*, dated Oct. 28, 1835.

হজরত মহাম্মদের ছবি

'হজরত মহাম্মদের ছবি প্রকাশ' শীর্ষক প্রবন্ধে প্রবাসী পত্রিকা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন যে হজরতের ছবি আঁকার জন্য ইশলাম-শাস্ত্রে কোন প্রকার দণ্ডের ব্যবস্থা আছে কি না? ইহার উত্তরে আমি জানাইতেছি যে ইশলাম ধর্ম্মে ছবি-আঁকা অবশ্য নিষিদ্ধ। ইশলাম শাস্ত্রবেত্তাগণ ইহার কারণ নির্দ্দেশ করিতে যাইয়া বলিতেছেন যে, যদি কোন মহাপুরুষের ছবি অঙ্কিত করিয়া রাখা হয় তবে তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার শিষ্যগণ হয়ত উক্ত ছবিকে নিরাকার খোদাতালার ছবি কল্পনা করিয়া পূজা করিতে পারে। এই দুষ্কৃতি নিবারণের জন্যই ইশলামে ছবি-আঁকা নিষিদ্ধ। কিন্তু ইশলাম শাস্ত্রে এমন কোন বিধান বা হাদিস নাই যে ভিন্ন ধর্ম্মী কেহ কোন মুসলমান মহাপুরুষের ছবি আঁকিলেই তাঁহার মুণ্ডপাতের ব্যবস্থা করিতে হইবে কিংবা জোরজবরদস্তি করিয়া সেই কাজ হইতে তাঁহাকে নিবৃত্ত করিতে হইবে। বরং পরমতসহিষ্ণু হওয়ার জন্য ইশলাম ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক হজরত মহাম্মদ তাঁহার শিষ্যবর্গকে বার-বার উপদেশ দিয়াছেন বলিয়া হাদিস শাস্ত্রে ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়। সুতরাং ইহা বলাই বাহুল্য যে, যে-মহাপুরুষ পর-মত সহ্য করার জন্য বার-বার আদেশ করিয়াছেন, সেই মহাত্মাই পুনরায় ছবি আঁকার মত তুচ্ছ কাজের জন্য গুরুদণ্ডের ব্যবস্থা করিয়া তাঁহার মাহাত্ম্য নষ্ট করিয়া ফেলিবেন; ইহা কস্মিনকালেও হইতে পারে না। তবে ইহা সত্য যে কতকগুলা নিরক্ষর ধর্ম্মান্ধ এবং স্বার্থান্ধ ব্যক্তি অনেক স্থলে ইশলাম-শাস্ত্রের ভুল ব্যাখ্যা করিয়া নানারূপ অপকার্য্য করিয়া বসে, এবং এইরূপ অন্যায় অনুষ্ঠান দ্বারা ইশলামের বৈশিষ্ট্য ও মাহাত্ম্য নষ্ট করিয়া দেয়। ফলে সভ্যসমাজে ইশলাম-ধর্ম্মকে হেয় করিয়া ফেলে।

(খান-বাহাদুর) দেওয়ান একলিমুররাজা চৌধুরী
প্রেসিডেণ্ট—আঞ্জুমন ইশলামিয়া, শ্রীহট্ট

কুমারী সফিয়া খাতুন লিখিয়াছেন—"বাল্যকাল থেকে পবিত্র কোরাণ আমি পিতার কাছে সহস্রবার পাঠ করেছি। তারপর ভারতবর্ষে কয়েকটি গুপ্ত সাম্প্রদায়িক হত্যার পর কোরাণে এই গুপ্তহত্যা সম্বন্ধে মত কি, সেটা জানবার জন্যেও বটে, 'প্রবাসী'তে আপনাদের জিজ্ঞাসা পাঠ ক'রে পুনরায় বিশেষভাবে অনুসন্ধানের পর পবিত্র কোরাণের কোথাও কোন অংশে এই প্রকার গুপ্তহত্যা-সমর্থক বাণী দেখতে পাইনি। পবিত্র কোরাণে "বিচারের দিনে বিশেষ শাস্তির" ব্যবস্থা আছে, কিন্তু তাহা ইহজীবনেই গুপ্তহত্যার বিধান নহে।

বিধর্ম্মী হত্যা করে মৃত্যুমুখে পতিত হ'লে "শহিদ" ও বেঁচে থাকলে "গাজী" এই অদ্ভুত কথা পবিত্র কোরাণের কোথাও লেখা নাই।"



মুসলমানযুগে বঙ্গবাসীর ভূষণ ও পরিচ্ছদ

(ক) ত্রয়োদশ শতাব্দী।

এই সময়ে পুরুষেরা মাথায় পাগড়ী ধারণ করিত।

কার জন্য পাকড়ী রাখিছ মস্তক উপরে
(মাণিকচাঁদের গীত)

অনেকে পাটের পাছড়া পরিধান করিত—

বিনে বান্দি নাহি পিন্দে পাটের পাছড়া (ঐ)

গৃহস্থেরা গায়ে তৈল ব্যবহার করিত এবং কাঁথা ব্যবহৃত হইত—

তৈল বিনে শুষথ তনু বস্ত্র বিনে কাঁথা
(গোপীচন্দ্রের গীত)

যুগীরা ক্ষুরে মস্তক মুণ্ডিত করিয়া কর্ণে কুণ্ডল ধারণ করিয়া গায়ে ভূতি মাখিয়া কটিতে কৌপীন বাঁধিয়া কাঁধে কাঁথা ঝুলি করিয়া ণ করিত—

সুবর্ণের খুরেতে মুড়ায় মাথা কেষ।
কর্ণেতে কুণ্ডল দিয়া হইল জুগী বেষ॥
বিভূতি মাখিল গায় কটিতে কৌপীন।
কাথা ঝুলি কান্দে করি হইল উদাসিন॥
(গোপীচন্দ্রের গীত)

ধনীলোকেরা "বাঙ্গলা ঘরে" বাস করিয়া শীতল মন্দিরে পালঙ্ক বহার করিত, গ্রীষ্মকালে শীতল-পাটিতে শয়ন করিত, বালিশে লান দিয়া দণ্ডপাথার বা শ্বেতচামরের বাতাস উপভোগ করিত, াহারা অগোর (অগুরু) চন্দনের প্রলেপ ও কর্পূরের সহিত তাম্বুল পভোগ করিত—

"বান্দিলাম বাঙ্গলা ঘর নাই পড়ে কালী"
(মাণিকচাঁদের গীত)

পালঙ্কে ফেলাইব হস্ত নাই প্রাণের ধন॥
শীতলপাটি বিছাইয়া দিমু বালিসে হেলান পাও।
গ্রীসকালে বদনত দিমু দণ্ডপাথার বাও॥
(মাণিকচাঁদের গীত)

সেত চামরে কেহ করিছে বাতাস।
অগোর চন্দন কেহ লেপে সর্ব্বগায়॥
কর্পূর সহিত কেহ তাম্বুল যোগায়॥
(গোপীচন্দ্রের গীত)

ধর্ম্মের উপাসকগণ চিটাফোটা কাটিত, গলায় তুলসী ও তাম্র ধারণ করিত—

চিট্যাফটা দেখ দুত গলাঅ তুলসী
(শূণ্যপুরাণ)

রক্ত বন্নের তাম্র করেতে চড়ায় (ঐ)

মুসলমান বিজেতৃগণ মাথায় কালো টুপি ও ইজার পরিধান করিত এবং ঘোড়ায় চড়িত ও হাতে "ত্রিরুচ কামান" ধরিয়া ব্যবহার করিত—

ধর্ম্ম হৈল্যা জবনরূপি মাথাএত কাল টুপি
হাতে সোভে ত্রিরুচ কামান।

(খ) চতুর্দ্দশ ও পঞ্চদশ শতাব্দী

পুরুষ ও নারীগণ ছাতি মাথায় দিয়া আতপতাপ ও বর্ষার ধারা হইতে মস্তক রক্ষা করিত—

ঝাট করি রাধার মাথাত ধর ছাতী (শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন)

পুরুষগণ মাথায় "ঘোড়া চুল" (স্কন্ধদেশ পর্য্যন্ত লম্বিত কেশগুচ্ছ) রাখিত, ও সুগন্ধি চন্দন মাখিত—

কাল কাহ্নাঞিঁ মাথাতে ঘোড়া চুল (শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন)
সুগন্ধ চন্দনে বড়ায়ি লেপিআঁ গাএ (ঐ)

বরকে ছায়ামণ্ডপের নীচে বসাইয়া বসন ও চন্দন দিয়া বরণ করা হইত। স্ত্রীগণ বরকে বরণ করিত ও বাসর-ঘরে ঠাট্টা-তামাসা করিত; পরে দধি ও মাথায় দূর্ব্বা ধান দিয়া বরণ করিত। 'গঙ্গাজলি' চামর দ্বারা ব্যজন করা হইত—

চারি ভাই বৈসে ছায়ামণ্ডপের তলে—
কৃত্তিবাসী রামায়ণ

বরণ করিল রামে বসন চন্দনে— (ঐ)
পায়ে দধি দিলেন মাথায় দূর্ব্বাধান।
বরণ করিয়া গেল যত সখীগণ (কৃত্তিবাস)
গঙ্গাজলি চামর দিলেক ঠাঁই ঠাঁই (ঐ)

ধনীগণ স্নানের সময়ে সুগন্ধি তৈল মাখিত ও সর্ব্বাঙ্গে সুগন্ধি চন্দনের প্রলেপ দিত—

মাখিয়া সুগন্ধি তৈল স্নান করিবারে (ঐ)
সর্ব্বাঙ্গে লেপিয়া দিল সুগন্ধি চন্দন (ঐ)

বিদ্বান্ কবিকে পাটের পাছড়া, পুষ্প মালা ও চন্দনের ছড়া দিয়া সম্মান করা হইত—

খুসি হইয়া মহারাজ দিল পুষ্পমালা—
কেদার খাঁ শিরে ঢালে চন্দনের ছড়া।
রাজা গৌড়েশ্বর দিল পাটের পাছড়া॥ (কীর্ত্তিবাস)

পুরুষেরা একখানা কাপড় কাছা দিয়া পরিত, একখানি মাথায় বাঁধিত ও একখানা গায়ে দিত—

একখান কাচিয়া পিন্ধে, আর একখান
মাথায় বাঁধে, আর একখান দিল সর্ব্বগায়
(বিজয়গুপ্ত—পদ্মপুরাণ)

(গ) ষোড়শ শতাব্দী

বালকগণ সুবর্ণের কৌড়ি, বৌলি, রজতমুদ্রা, পাশুলী, অঙ্গদ, কঙ্কণ, শঙ্খ, রূপার মল, বাঁক, নানাপ্রকার হার, সুবর্ণজড়িত বাঘনখ, কটিদেশে ডোরি, প্রভৃতি পরিধান করিত—

অদ্বৈত আচার্য্য ভার্য্যা জগৎ পূজিতা আর্য্যা
নাম তাঁর সীতাঠাকুরাণী।
আচার্য্যের আজ্ঞা পাঞা গেলা উপহার লৈঞা
দেখিতে বালক শিরোমণি॥

সুবর্ণের কৌড়ি বৌলি রজতমুদ্রা পাশুলি
সুবর্ণের অঙ্গদ কঙ্কণ।
দুবাহুতে দিব্যশঙ্খ রজতের মল বঙ্ক
স্বর্ণ মুদ্রা নানা হারগণ॥
ব্যাঘ্র নখ হেমজড়ি কটিপট্টসূত্র ডোরি
হস্তপদের যত আভরণ।
চিত্রবর্ণ পট্টশাড়ী ভুণীপোতা পট্ট পাড়ি
স্বর্ণ রৌপ্য মুদ্রা বহু ধন॥

চৈতন্য চরিতামৃত, আদিলীলা

বিশ্বম্ভরের সুবেশ হইতে তাৎকালিক বেশভূষার পরিচয় পাওয়া যায়—

এথা বিশ্বম্ভর হরি, অঙ্গের সুবেশ করি
কটিতে টানিঞা পিন্ধে ধড়া।
শিরে শোভে তিন ঝুটি, গলায়ে সে রস কাঠি
কণ্ঠলগ্ন মুকুতা দুবেড়া॥
নয়ানে কাজর রেখা, পাঁচথুপী বান্ধে শিখা
ঝলমল হেম অলঙ্কার।
চরণে মগরা খাড়ু হাতে করি ক্ষীর লাড়ু
চলিলা ঠাকুর বিশ্বম্ভর॥

(লোচনদাসের চৈতন্যমঙ্গল, আদিখণ্ড)

পুরুষগণ গায়ে চন্দন মাখিতেন, কোঁচা দিয়া কাপড় পরিতেন। সন্ন্যাসী ও কপালী গায়ে নানা তীর্থের চিহ্ন অঙ্কিত করিয়া ভিক্ষা করিয়া বেড়াইত।

বৈষ্ণবেরা কাঁথা কম্বল ও লাঠি লইয়া গলায় তুলসী কাঠি পরিয়া নৃত্য গীতে কালযাপন করিত—

কাঁথা কম্বল লাঠি গলায় তুলসী কাঠী
সদাই গোঙ্গায় গীত নাটে॥

(কবিকঙ্কণ চণ্ডী)

বৈদ্যগণ প্রভাতে উঠিয়া উর্দ্ধ ফোঁটা কাটিয়া মাথায় বস্ত্র বাঁধিয়া জর্জ্জর ধুতি পরিধান করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইত—

উঠিয়া প্রভাত কালে উর্দ্ধ ফোঁটা করে ভালে
বসন মণ্ডিত করি শিরে।
পরিয়া জর্জ্জর ধুতি কাঁখে করি নানা পুঁথি
গুজরাটে বৈদ্যগণ ফিরে॥

(কবিকঙ্কণ চণ্ডী)

হিন্দু ভদ্রলোকেরা লম্বা কোঁচা দিয়া কাপড় পরিত এবং কেহ কেহ মাথায় পাগ বাঁধিত। তাহারা শীতকালে তুলিপাড়ী, তসর বস্ত্র, পাছুড়ী ও নেহালী নামক শীত বস্ত্র ব্যবহার করিত—

তুলিপাড়ি পাছুড়ী শীতের নিবারণ। (কবিকঙ্কণ চণ্ডী)
শীত নিবারণ দিব তসর বসনে॥ (ঐ)
নেয়াল বুনিয়া নাম বোলায় বেনটা (ঐ)

গরীবেরা খোসলা নামক শীতবস্ত্রের দ্বারা শীত নিবারণ করিত—

হরিণ বদলে পাইনু পুরাণ খোসলা

শাওলী গামছা নামক গামছার প্রচলন ছিল—

শাওলী গামছা দিব ভূষিত কস্তুরী। (ঐ)

বিলাসীরা কানে স্বর্ণালঙ্কার পরিধান করিত, গায়ে চন্দন মাখিত, মুখে গুয়া ও হাতে পান লইয়া তসরের কাপড় পরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইত ও তাহারা জুতা পরিত। লোকেরা মস্তকে পাগড়ী, পরিধানে ধুতী, গায়ে পাছড়া, খাসাজোড়া, ধোকড়ী, খুঞা, খোসলা প্রভৃতি ব্যবহার করিত—

খট্টায় তুলিপাড়িয়া মশারি টাঙ্গান হইত—

খট্টায় পাড়িয়া তুলা টাঙ্গায় মশারি জানি (কবিকঙ্কণ চণ্ডী

(মাণিক গাঙ্গুলীর ধর্ম্মমঙ্গল)

রাজারা মাথায় রণটোপ, গায়ে ভাল কাপড় ও পায়ে মখমলের জুতা পরিতেন—

শিরে রণটোপ শুচেন গায়।
খাসা মেকমলি পাদুকা পায়॥

(মাণিক গাঙ্গুলীর ধর্ম্মমঙ্গল জাগরণ পালা)

(ঘ) সপ্তদশ শতাব্দী—

পুরুষগণ মাথায় ফুল ও মুকুট, কর্ণে কুণ্ডল, গলায় হার ও কদম্ব মালা পরিধান করিত—

শিরে চারু চাচর চিকণ কেশজাল।
মণিময় মুকুটবেষ্টিত পুষ্পমাল॥ * * *
কর্ণে এক কুণ্ডল করএ ঝলমল। * * *
অঙ্গদ বলয় নানা ভূষণে ভূষিত॥ * * *
বৈজয়ন্তী মালা গলে দোলে অনিবার।

(নরহরি চক্রবর্ত্তীর ব্রজপরিক্রমা)

বৈষ্ণব সন্ন্যাসীর সজ্জা এইরূপ—

বর্ষশীতাদিতে এই বৃক্ষতলে বাস।
সঙ্গে জীর্ণ কাঁথা অতি জীর্ণ বহির্বাস॥
আপনি হইয়া সিক্ত অতি বৃষ্টি নীরে।
ঠাকুরে রাখিত এই বৃক্ষের কোটরে॥

(ঐ—ঐ)

শিশুগণ হাতে বলয়, পায়ে মগরা খাড়ু, গলায় বাঘনখ, মাথায় সোনার শিকলী ও পাটের থোপনা পরিত—

অঙ্গদ বলয় সাজে সুবাহু যুগলে।
চরণে মগরা খাড়ু বাঘনখ গলে॥
সোণার শিকলি শিরে পাটের থোপনা।

(নরহরি চক্রবর্ত্তীর নবদ্বীপ-পরিক্রমা)

পুরুষগণ কিরীট, কুণ্ডল, নূপুর, কঙ্কণ আদি অলঙ্কার পরিধান করিত এবং কস্তুরী, কুসুম ও অগুরু চন্দন ধারণ করিত—

সর্ব্বাঙ্গ শোভিত রত্ন নানান আভরণ।
কিরীট কুণ্ডল হার নেপুর কঙ্কণ॥
কস্তুরী কুসুম আর অগুরু চন্দন।
পরিলেক নানান মতে দিব্য আভরণ॥

(রামরাজা বিরচিত মৃগলুব্ধ সংবাদ)

(ঙ) অষ্টাদশ শতাব্দী—

পুরুষগণ শুভ্র ও পীতবর্ণ বস্ত্র পরিধান করিত, এবং মাথায় পাগ বাঁধিত—

শ্বেত নেত পীতাম্বর—
দিব্য পাক বাঁধিলেক নিজ উত্তমাঙ্গে।
কনকজড়িতাম্বর করি পরিধান।

(ভবানীদাস বিরচিত মঙ্গলচণ্ডী পাঞ্চালিকা

চুরির দায়*

শ্রীস্বর্ণলতা চৌধুরী

রের উৎসব তিন দিন হইল হইয়া গিয়াছে। মোনিকা-পরিবারে এই উৎসবটি চিরকালই খুব ঘটা রিয়া হয়। মস্তবড় ভোজ হয়, তাহাতে বহু লোক মন্ত্রিত হয়, ঘটার কোনো ত্রুটি হয় না। আজ শ্রীমতী ষ্টিনা লামোনিকা রূপার বাসন-কোসন এবং খাবার র যে সকল কাপড়-চোপড় ব্যবহৃত হয়, সেগুলি সব নিয়া গাঁথিয়া তুলিয়া রাখিতেছিলেন। পরের মহোৎসবে বার এগুলি বাহির করা হইবে।

দুইটি স্ত্রীলোক তাঁহাকে কাজে সাহায্য করিতেছিল। কজন বাড়ীর ঝি মারিয়া, আর একজন ধোপানী যাণ্ডিয়া। চাদর, ঝাড়ন, টেবিলের ঢাকনী প্রভৃতি যত াপড়, সব ধোপদস্ত হইয়া, বড় বড় থলের ভিতর রক্ষিত ইয়াছিল। থলেগুলি সার দিয়া গৃহিণীর সামনে সাজান ছল। দেওয়াল, আল্‌মারী ও বাসনের তাক হইতে রূপার বাসনগুলি ঝক্ ঝক্ করিয়া জ্যোতি ছড়াইতে-ছল। জিনিষগুলি ওজনে রীতিমত ভারি, তবে একটু মোটাভাবে তৈয়ারী, তাহাদের গায়ের কারুকার্য্যও খুব সূক্ষ্ম নয়, দেখিলে বোঝা যায় বহুদিন আগেকার জিনিষ, এবং স্থানীয় শিল্পীর হাতেরই কাজ। ঘরটি সাবান-জলের গন্ধে ভরপূর।

ক্যাণ্ডিয়া থলের ভিতর হইতে চাদর, ঝাড়ন, তোয়ালে প্রভৃতি বাহির করিয়া করিয়া গৃহিণীকে দেখাইতেছিল যে, কোনোটি কোথায়ও ছিঁড়িয়া বা দাগ পড়িয়া যায় নাই। তিনি দেখিয়া উহা ঝি মারিয়াকে দিতেছিলেন, সে সযত্নে কাপড়গুলি আলমারী ও দেরাজে উঠাইয়া রাখিতেছিল। গৃহিণী কাপড়ের ভাঁজে ভাঁজে ল্যাভেণ্ডার ছড়াইয়া দিতেছিলেন এবং কাপড়গুলির নম্বর একটি ছোট খাতায় টুকিয়া রাখিতেছিলেন। ক্যাণ্ডিয়া ধোপানীর বয়স বছর পঞ্চাশ হইবে। সে দেখিতে লম্বা রোগা, তাহার গায়ের সমস্ত হাড় যেন খোঁচার মত বাহির হইয়া আছে। সে একটু কুঁজো, হয়ত ক্রমাগত হেঁট হইয়া কাপড় আছ্‌ড়ানোর দরুণ এইরূপ হইয়াছে, হাত দু'খানা শরীরের অনুপাতে অত্যন্ত লম্বা, মাথাটা শিকারী পাখীর মাথার মত। ঝি মারিয়া অর্টোনার অধিবাসিনী, মোটা-সোটা, ফরসা চেহারা। তাহার চোখ-গুলি ভারি সরলতাব্যঞ্জক, কথাবার্ত্তা কোমল ধরণের, হাতগুলিও নরম। সারাক্ষণ কেক্, মিঠাই, জ্যাম্, জেলী প্রভৃতি নাড়িতে হইলে এই প্রকার হাতই থাকা প্রয়োজন। গৃহিণী ডনা ক্রিষ্টিনাও অর্টোনার অধিবাসিনী। তিনি একটি বেনেডিক্টাইন্ মঠে শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। তিনি খাট, তবে গড়নটি একটু অধিক পুরস্ত, মুখে তিলের বাহুল্য আছে। নাসিকাটি তাহার অতিরিক্ত লম্বা; দাঁতগুলি দেখিতে ভাল নয়, চোখ বেশ সুন্দর। তবে চোখ তিনি প্রায় সর্ব্বদাই নত করিয়া থাকাতে বোধ হইত যেন তিনি নারীবেশধারী ধর্ম্মযাজক।

সারাটি দুপুর ধরিয়া, এই তিনজন স্ত্রীলোক অতি সাবধানতাসহকারে নিজেদের কাজ করিতেছিলেন। কাজ সারিয়া খালি থলেগুলি লইয়া ক্যাণ্ডিয়া চলিয়া যাইবার উপক্রম করিতেছে, এমন সময়, রূপার ছোট জিনিষগুলি গুণিতে গুণিতে ডনা ক্রিষ্টিনা দেখিলেন যে, একটি রূপার চামচ কম পড়িতেছে।

তিনি অত্যন্ত ব্যস্তভাবে বলিয়া উঠিলেন, "মারিয়া, ও মারিয়া, একটা চামচ যে কম পড়ছে, তুমি নিজে গুণে দেখ।"

মারিয়া বলিল, "তা কি করে হবে ঠাক্‌রুণ, আপনি যে অসম্ভব কথা বলছেন। কই দেখি আমি?" সে তাড়াতাড়ি ছুটিয়া গিয়া রূপার জিনিষগুলি একটি একটি

---

*Gabriele D'Annunzio-র Italian হইতে।

করিয়া গুণিয়া দেখিতে লাগিল। গৃহিণী একদৃষ্টে তাহার দিকে তাকাইয়া রহিলেন। রূপার বাসনগুলি টুং টাং শব্দ করিতে লাগিল।

মারিয়া গণনা শেষ করিয়া হতাশার স্বরে বলিয়া উঠিল, "সত্যিই ত একটা কম দেখছি। তাহলে এখন কি করা যাবে ?"

তাহার উপর সন্দেহ করা অসম্ভব ছিল। পনেরো বৎসর সে এই পরিবারে কাজ করিতেছে। বিশ্বস্ততা, প্রভুভক্তি ও সততার পরিচয় সে নিয়তই দিয়াছে। ডনা ক্রিষ্টিনার বিবাহের সময় সে তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে অর্টোনা হইতে আসিয়াছিল, সে যেন তাঁহার যৌতুকেরই একটা অংশ। প্রথম হইতেই গৃহিণীর করুণায় সে বাড়ীতে বেশ একটা প্রভুত্ব লাভ করিয়াছিল। কুসংস্কারে তাহার মন পরিপূর্ণ ছিল এবং নিজের গ্রামের সেণ্ট এবং গির্জ্জার প্রতি ভক্তি ছিল অসীম। সাংসারিক বুদ্ধিতে তাহার জুড়ী মেলা ভার ছিল। মারিয়া এবং গৃহিণী মিলিয়া তাহাদের বর্ত্তমান বাসস্থান পেস্কারার বিপক্ষে একটি দল গঠন করিয়াছিল। এখানকার কোনো জিনিষই তাঁহারা ভাল চক্ষে দেখিত না। মারিয়া সুবিধা পাইলেই নিজের জন্মভূমির হাজার ঐশ্বর্য্যের গল্প ফাঁদিয়া বসিত। সেখানকার জাঁকজমকের কোথাও তুলনা মেলে না। আর এই পোড়া দেশে আছে কি ? সামান্য একটা ছোট রূপার ক্রুশ ত এখানকার গির্জ্জার সম্পত্তি।

ডনা ক্রিষ্টিনা মারিয়াকে বলিলেন, "ভিতরে গিয়ে একবার ভাল করে খুঁজে আয়।"

মারিয়া চামচ খুঁজিতে ভিতরে চলিল। সে রান্নাঘর ও বারান্দা তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়া আসিল, কিন্তু চামচের কোনো চিহ্ন দেখিতে পাইল না। সে খালি হাতে ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "সেখানে ত কিছু নেই।"

দু'জনে মিলিয়া তখন নানাপ্রকার কল্পনাজল্পনা, আন্দাজ চলিতে লাগিল। দু'জনে উঠানের উপরে যে গাড়ী-বারান্দা, সেখানে গিয়া উপস্থিত হইলেন। ইহার সম্মুখেই কাপড়-কাচা ঘর, সেখানেও অনুসন্ধান চলিতে লাগিল। গৃহিণী এবং পরিচারিকার কথার শব্দে আশেপাশের বাড়ীর জান্‌লা খুলিতে আরম্ভ করিল, এবং মাথা বাড়াইয়া নানাজনে নানাপ্রকার প্রশ্ন করিতে লাগিল।

"ডনা ক্রিষ্টিনা, ব্যাপারখানা কি ? খুলেই বলুন।"

ডনা ক্রিষ্টিনা এবং মারিয়া হাতমুখ নাড়িয়া ব্যাপারটার বিশদ বর্ণনা করিলেন। প্রতিবেশিনীরা মন্তব্য করিলেন, "তা হলে বাড়ীতে চোর ঢুকেছে বলুন!"

দেখিতে দেখিতে পাড়াময় চামচ চুরির কথা প্রচার হইয়া গেল এবং সারা শহরময় ছড়াইতেও দেরি হইল না। সকলে মিলিয়া এই বিষয়েই কল্পনা, আলোচনা করিতে লাগিল। কথাটা যত দূরে ছড়াইতে লাগিল, ততই তাহার রূপান্তর ঘটিতে লাগিল। স্যান্ আগোষ্টিনোতে যখন খবর পৌঁছিল, তখন সকলে শুনিল লামোনিকা পরিবারের সব রূপার বাসনই চুরি হইয়া গিয়াছে।

বসন্তকালের দিন, গোলাপগাছগুলি ফুলে ফুলে ভরিয়া উঠিয়াছে, পাখীর গানের বিরাম নাই। কাজেই জানলার ধারে দাঁড়াইয়া মেয়েদের গল্প করিবার উৎসাহেরও অন্ত ছিল না। প্রত্যেক বাড়ির জানালাতেই এক এক জন নারীর দর্শন পাওয়া গেল এবং কে চোর, সে বিষয়ে ক্রমাগত আলোচনা চলিতে লাগিল।

ডনা ক্রিষ্টিনা হাত কচলাইতে কচলাইতে বলিলেন, "কে যে আমার জিনিষটা নিয়ে গেল, তার ঠিক নেই।"

প্রতিবেশিনী ডনা ইসাবেলা মোটা গলায় বলিলেন, "আপনার কাছে তখন কে কে ছিল বলুন দেখি ? আমার মনে হচ্ছে যেন ক্যাণ্ডিয়াকে আমি আজ আপনাদের বাড়ী আসতে দেখলাম।"

ডনা কেলিসিটা বলিলেন, "ওমা, তবেই হয়েছে।" সঙ্গে সঙ্গে আর সকলেই বলিয়া উঠিলেন, "সত্যি ত, আপনার একবারও একথা মনে হয় নি ? ক্যাণ্ডিয়ার গুণকীর্ত্তি আপনি জানেন না বুঝি ? তার ঢের কাহিনী আপনাকে শোনাতে পারি। ক্যাণ্ডিয়া কাপড় ভাল কাচে তা ঠিক। পেস্কারাতে তার মত ভাল ধোপানী আর একটিও মিল্‌বে না। কিন্তু হলে কি হয় ?



ইস্পাহান

আর ভূর্ত্ কর্ত্তৃক অঙ্কিত

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

এমন ছিঁচকে মেয়েমানুষও কোথাও নেই। খালি এ বাড়ি থেকে জিনিষ সরাচ্ছে, আর ও বাড়ি থেকে জিনিষ সরাচ্ছে। আপনি এ কথা শোনেন নি বুঝি ?"

একজন বলিলেন, "সে একবার আমার এক জোড়া তোয়ালে সরিয়েছে, একেবারে জোড়াকে জোড়া।"

আর একজন বলিলেন, "আমার ঝাড়ন একটা নিয়েছে, নতুন আস্ত ঝাড়ন।"

তৃতীয়া বলিলেন, "আর আমার যে অত বড় রাত-কামিজটাই দিলে না, তার খোঁজ রাখ ?"

জানা গেল ক্যাণ্ডিয়া সব বাড়ি হইতেই কিছু-না-কিছু জিনিষ চুরি করিয়াছে। ডনা ক্রিষ্টিনা বিষণ্ণভাবে বলিলেন, "তাকে না হয় দিলাম ছাড়িয়ে, কিন্তু ধোপানী পাব কোথায় ? সিল্‌ভেষ্ট্রাকে রাখব ?"

"ও মা গো, সে কি কথা !"

"তবে সেই কানী আঞ্জিলাটোনিয়াকে রাখব ?"

"বাপ রে, সে যে সবার ওঁচা !"

একজন মহিলা বলিলেন, "কি আর করবে, ছোট-লোকের এ সব উৎপাত না সয়ে উপায় নেই।"

আর একজন বলিলেন, "তাই বলে এত আস্কারা দেওয়া কিছু নয়, রূপোর চামচই একটা নিয়ে গেল !"

তৃতীয়া বলিলেন, "না ডনা ক্রিষ্টিনা, এটা হেসে উড়িয়ে দিলে কিছুতেই চল্‌বে না।"

মারিয়াও এইবার তর্কে সমানে সমানে যোগ দিল। তাহাকে দেখিলে যদিও অত্যন্ত শান্তশিষ্ট আর দয়ালু মনে হইত, তবু সে যে সামান্য ঝি মাত্র নয়, সেটা সুবিধা পাইলেই সে সকলকে জানাইয়া দিত। কোমরে হাত দিয়া এবার সে বলিল, "সে বিচার আমাদের হাতে, ডনা ইসাবেলা, উড়িয়ে দেব কি রাখব, তা আমরা বুঝব।"

চুরির গল্প ঘরে বাহিরে পুরাদমে চলিতে লাগিল। শেষে শহর ছাড়াইয়া অন্যত্র পর্য্যন্ত এ খবর গিয়া পৌছিল।

(২)

সকাল বেলা ক্যাণ্ডিয়া সবে টবের ভিতর কনুই পর্য্যন্ত ডুবাইয়া কাপড় কাচা আরম্ভ করিয়াছে, এমন সময় পুলিসের কনষ্টেবল বিয়াজিয়ো পেস আসিয়া তাহার দরজার কাছে হাজির হইল। গম্ভীরভাবে বলিল, "মহামহিম মেয়র তোমাকে এখনি তাঁর আপিসে যেতে বলেছেন।"

ক্যাণ্ডিয়া কাপড় কাচা না থামাইয়াই ভ্রুকুটি করিয়া বলিল, "কি বল্‌লে ?"

"তিনি তোমাকে এখনি তাঁর আপিসে যেতে বলেছেন।"

ক্যাণ্ডিয়া একগুঁয়ে ঘোড়ার মত ঘাড় বাঁকাইয়া বলিল, "যেতে বলেছেন কেন শুনি ?" মেয়র যে কেন তাহাকে ডাকিতে পারেন, তাহা সে ভাবিয়াই পাইল না।

বিয়াজিয়ো বলিল, "কেন টেন আমি সে সব জানি না। আমাকে যা বল্‌তে বলা হয়েছে, তা আমি বল্‌লাম।"

ক্যাণ্ডিয়ার একগুঁয়েমি আরও বাড়িয়া গেল, সে ক্রমাগত বাজে প্রশ্ন করিয়া চলিল, "আমাকে ডেকেছেন ? কেন ডেকেছেন ? তোমাকে কি বলে দেওয়া হয়েছে আমাকে বলবার জন্যে ? আমি কি করেছি জান্‌তে পারি ? শুধু শুধু অমনি ডেকে পাঠালেই হ'ল ? আমি যাব না ত।"

বিয়াজিয়োর শেষে ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিল, সে বলিল, "ও, তুমি যাবে না ? আচ্ছা, দেখা যাবে কেমন না যাও।" সে নিজের পুরণো তলোয়ারের হাতলে হাত দিয়া বিড় বিড় করিয়া বকিতে বকিতে চলিয়া গেল।

তাহাকে আসিতে অনেকেই দেখিয়াছিল, এবং তাহার সঙ্গে ক্যাণ্ডিয়ার কি কথাবার্ত্তা হইল তাহাও অনেকেই শুনিল। ক্রমে ক্রমে দরজার গোড়ায় লোক জমা হইতে লাগিল। ক্যাণ্ডিয়া তখনও ধপাধপ্ শব্দে কাপড় কাচিতেছে। রূপার চামচ চুরির কথা সকলেই শুনিয়াছিল, তাহারা এখন মুখ চাওয়াচাওয়ি করিয়া হাসিতে লাগিল এবং নানা রকম ইঙ্গিতে ইসারায় কথা বলিতে লাগিল। ক্যাণ্ডিয়া এ সব কথার মানে ঠিক বুঝিতে পারিল না, কিন্তু একটা অশুভ আশঙ্কায় তাহার মনটা কাল হইয়া উঠিল। তাহার আশঙ্কা আরও বাড়িয়া গেল, যখন দেখা গেল যে, বিয়াজিয়ো সঙ্গে আর একজন কর্ম্মচারীকে লইয়া আবার তাহার বাড়ীর দিকে আসিতেছে।

"এইবার এস দেখি," বলিয়া সে ক্যাণ্ডিয়ার দিকে চাহিয়া একটা হাঁক দিল।

ক্যাণ্ডিয়া এবারে আর দ্বিরুক্তি না করিয়া, সাবান-জলের হাত মুছিয়া ফেলিয়া তাহাদের সঙ্গে চলিল। রাস্তায় ঘাটে লোকে তাহার দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া দেখিতে লাগিল। তাহার মহাশত্রু রোসা প্যান্নুরা তাহাকে পথের মাঝে দেখিয়া চীৎকার করিয়া বলিল, "চুরি করা হার ফেলে দিলেই ভাল।"

এই অকারণ উৎপীড়নে ক্যাণ্ডিয়া এমনই হতবুদ্ধি হইয়া গিয়াছিল যে সে কোনো উত্তরও দিতে পারিল না।

মেয়রের আপিসের সামনে একদল অকর্ম্মা লোক ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। তাহারা তাহার দিকে হাঁ করিয়া চাহিয়া আছে দেখিয়া, রাগের চোটে ক্যাণ্ডিয়ার ভয়ভাবনা সব দূর হইয়া গেল। ঝড়ের বেগে ছুটিয়া সে মেয়রের ঘরে ঢুকিয়া পড়িল এবং চীৎকার করিয়া বলিল, "আমাকে কিসের জন্যে ডেকেছেন শুনি?"

মেয়র ডন সিল্লা শান্তিপ্রিয় মানুষ, ধোপানীর মোটা গলার হাঁকে তিনি একেবারে চমকিত হইয়া উঠিলেন। তাহার পর নিজেকে সাম্‌লাইয়া, এক টিপ্‌ নস্য লইয়া বলিলেন, "বোস বাছা, বোস।"

ক্যাণ্ডিয়া বসিল না। তাহার শিকারী পাখীর ঠোঁটের মত নাকটা রাগে ফুলিতেছিল, তাহার গাল চিবুক সব কাঁপিতেছিল, সে আবার বলিল, "কেন ডেকেছেন, বলুন না?"

মেয়র বলিলেন, "তুমি কাল ডনা ক্রিষ্টিনা লামোনিকার বাড়ীতে কাপড় দিতে গিয়েছিলে, না?"

"হ্যাঁ, গিয়েছিলাম। তাতে হয়েছে কি? কোনো জিনিষ কি খোয়া গেছে? সব আমি এক একটি করে গুনে মিলিয়ে দিয়ে এসেছি। কাপড় খোয়াবার মেয়ে আমি নই।"

"থাম বাছা, আমায় কথা বলতে দাও। সেই ঘরে সব রূপোর বাসনগুলো ছিল না?"

ক্যাণ্ডিয়া এতক্ষণে ব্যাপার খানিকটা বুঝিতে পারিল। ক্রুদ্ধ বাজপাখীর মত তাহার মুখ ভীষণ হইয়া উঠিল, এখনই যেন ছোঁ মারিবে। তাহার ঠোঁট কাঁপিতে লাগিল।

মেয়র বলিয়া চলিলেন, "রূপোর বাসনগুলোর মধ্যে থেকে একটা চামচ চুরি গিয়েছে। তোমার সঙ্গে ভুলক্রমে সেটা চলে যায়নি ত?"

ক্যাণ্ডিয়া একেবারে লাফাইয়া উঠিল। সত্যই সে কিছুই লইয়া যায় নাই।

"আমি চোর? তাই না কি? কে বলেছে শুনি? আমাকে চামচ নিতে কেউ দেখেছে? আপনি যে অবাক করলেন মশায়। আমার নামে শেষে চুরির অপবাদ!"

রাগের চোটে সে আর কিছু বলিতেই পারিল না। চুরির অপবাদ দেওয়াতে তাহার আরও বেশী রাগ হইতেছিল, এইজন্য যে, মনে মনে সে জানিত, চুরি করা তাহার পক্ষে কিছু অসম্ভব নয়।

মেয়র নিজের চেয়ারটিতে ভাল করিয়া হেলান দিয়া বসিয়া বলিলেন, "তুমিই তাহলে চামচটা নিয়েছ ত?"

ক্যাণ্ডিয়া শুক্‌নো কাঠের মত হাত দুইখানা নাড়িয়া বলিয়া উঠিল, "আপনি অবাক করলেন, মশায়!"

মেয়র বলিলেন, "আচ্ছা, এখন বাড়ী যাও, পরে দেখা যাবে।"

ক্যাণ্ডিয়া তাহাকে অভিবাদন না করিয়াই বাহির হইয়া গেল, দরজায় তাহার মাথাটা একবার ঠুকিয়া গেল। রাগে তাহার বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পাইয়াছিল। রাস্তায় পা দিয়া লোকের ভিড় দেখিয়া সে বুঝিল সকলেই তাহাকে চোর মনে করিতেছে, তাহার নির্দ্দোষিতায় কেহ বিশ্বাস করে না। তবুও সে উচ্চকণ্ঠে নিজের সাফাই গাহিতে গাহিতে চলিল। রাস্তার লোকগুলা তাহার কথা শুনিয়া হাসাহাসি করিতে করিতে যে যাহার পথে চলিয়া গেল। ক্যাণ্ডিয়া রাগে পাগলের মত হইয়া বাড়ী ফিরিয়া আসিল এবং দরজার গোড়ায় বসিয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিল।

পাশের বাড়ীতে ডন্ ডোনাটো ব্রাণ্ডিমার্ট বলিয়া এক ভদ্রলোক বাস করিতেন, তিনি মাথা বাহির করিয়া বলিলেন, "আর একটু জোরে চীৎকার কর, রাস্তার লোকে ভাল করে শুনতে পাচ্ছে না।"

তখনও কাপড়ের রাশ পড়িয়া আছে, কাজেই খানিক পরে কান্না থামাইয়া ক্যাণ্ডিয়া আবার আস্তিন গুটাইয়া কাপড় কাচিতে বসিয়া গেল। কাজ করিতে করিতে সে মনে মনে নিজের স্বপক্ষে কি কি বলা যায় সব ভাবিয়া ঠিক করিতে লাগিল। কেমন ভাবে, কি ভাষায় সে সাফাই গাহিবে, তাহা সাজাইয়া গুছাইয়া স্থির করিতে লাগিল। এ ধরণের কথা শুনিলে নিতান্ত অবিশ্বাসী মানুষও তাহাকে বিশ্বাস করিবে।

যখন তাহার কাজ শেষ হইয়া গেল, তখন ডনা ক্রিষ্টিনার সঙ্গে একবার দেখা করিবার জন্য সে বাহির হইয়া পড়িল।

কিন্তু ডনা ক্রিষ্টিনার সঙ্গে দেখা হইল না, তিনি বাড়ী ছিলেন না। মারিয়ার সঙ্গে তাহার দেখা হইল, সে ক্যাণ্ডিয়ার সব কথা গম্ভীর ভাবে শুনিয়া মাথা নাড়িতে নাড়িতে ভিতরে চলিয়া গেল, কোনো কথার উত্তর দিল না।

ক্যাণ্ডিয়া যত বাড়ীতে কাপড় কাচিত, সব জায়গায় এক একবার ঘুরিয়া আসিল। প্রত্যেক বাড়ীতে সে চুরির ঘটনা বলিতে লাগিল এবং নিজের সাফাই গাহিতে লাগিল। লোকে তাহাকে বিশ্বাস করিতেছে না, যত দেখিতে লাগিল, ততই তাহার যুক্তিতর্ক বাড়িয়া যাইতে লাগিল, উত্তেজনাও বাড়িতে লাগিল। কিন্তু কোনো ফল হইল না, সে মনে মনে বুঝিতে পারিল যে, কোনো উপায়ে আর সে নিজেকে নির্দ্দোষী প্রমাণ করিতে পারিবে না। নিরাশায় তাহার মন ভরিয়া উঠিল। আর তাহার করিবার রহিল কি?

(৩)

ডনা ক্রিষ্টিনা নিশ্চেষ্ট ছিলেন না। তিনি সিনিগিয়া নাম্নী একটি নীচজাতীয়া স্ত্রীলোককে ডাকিয়া পাঠাইলেন। সে যাদুবিদ্যা মন্ত্রতন্ত্র প্রভৃতি ভাল জানে বলিয়া বিখ্যাত ছিল। চোরাই মাল বাহির করিতে সে অদ্বিতীয় ছিল। সকলে বলিত, চোরদের সঙ্গে তাহার একটা বাঁধা ব্যবস্থা আছে।

সিনিগিয়া আসিবামাত্র ডনা ক্রিষ্টিনা তাহাকে বলিলেন, "চামচটা যদি খুঁজে বার করে দিতে পার, তাহলে তোমায় খুব ভাল করে বখ্‌শিস দেব।"

সিনিগিয়া বলিল, "ভাল কথা, চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই আমি মাল ঠিক বার করে দেব।"

চব্বিশ ঘণ্টা পরে সে নিজের জবাব লইয়া আসিল। চামচটা না কি উঠানের মধ্যে কূয়ার ধারে একটা গর্ত্তের ভিতর পাওয়া যাইবে। ডনা ক্রিষ্টিনা এবং মারিয়া তৎক্ষণাৎ উঠানে নামিয়া পড়িলেন এবং অল্প একটু খোঁজাখুঁজি করিতেই চামচটা বাহির হইয়া পড়িল।

চামচ পাওয়ার খবর দেখিতে দেখিতে সারা শহরময় ছড়াইয়া পড়িল।

ক্যাণ্ডিয়া তখন বিজয়িনীর মত মুখ করিয়া রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিতে লাগিল। সে যেন লম্বায় আরও বাড়িয়া গিয়াছে, চলিয়াছে একেবারে মাথা খাড়া করিয়া, যাহার সহিত দেখা হয়, তাহার দিকেই এমন ভাবে হাসিয়া তাকায় যেন সে বলিতে চায়, "কেমন, আমি বলেছিলাম না?"

রাস্তার ধারের দোকানদাররা ক্যাণ্ডিয়ার বিজয়যাত্রা দেখিয়া ফিস্‌ফিস্‌ করিয়া কি সব বলাবলি করিতে লাগিল, তাহার পর অর্থপূর্ণ হাসি হাসিতে লাগিল। একটা মদের দোকানে ফিলিপো লা সেল্‌ভি নামক এক ভদ্রলোক বসিয়া পান করিতেছিলেন, দোকানদারকে ডাকিয়া বলিলেন, "ক্যাণ্ডিয়ার জন্যে ঠিক এই রকম এক গেলাস মদ নিয়ে এস।"

ক্যাণ্ডিয়া মদের খুব ভক্ত ছিল, এ রকম নিমন্ত্রণ পাইয়া সে মহানন্দে দোকানের ভিতর ঢুকিয়া পড়িল।

ফিলিপো লা সেল্‌ভি বলিলেন, "তোমার বাহাদুরি আছে তা বলতে হবে।"

দোকানের সামনে একদল অকর্ম্মা লোক দাঁড়াইয়া তামাসা দেখিতেছিল। সকলেরই যেন দুষ্টামীর মতলব। ক্যাণ্ডিয়া গেলাসটি মুখের কাছে তুলিয়াছে, এমন সময় ফিলিপো সকলকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "ক্যাণ্ডিয়া আমাদের খুব চালাক, না? কেমন গুছিয়ে কাজ ফতে করেছে।"

লোকগুলি হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। একটা

বেঁটে কুঁজো লোক, নানারকম অদ্ভুত অঙ্গভঙ্গী করিয়া ক্যাণ্ডিয়া এবং সিনিগিয়ার নাম মিলাইয়া ছড়া বাঁধিয়া নাচিতে আরম্ভ করিল। দর্শকের দল ত হাসিয়াই খুন।

ক্যাণ্ডিয়া কয়েক মুহূর্ত্ত গেলাস হাতে করিয়া হতবুদ্ধির মত বসিয়া রহিল, হঠাৎ সে বুঝিতে পারিল, কি ব্যাপার ঘটিয়াছে। লোকগুলি কেহই তাহাকে নির্দ্দোষী বলিয়া বিশ্বাস করিতেছে না। নিজের সুনাম রক্ষা করিবার জন্য সে সিনিগিয়ার সঙ্গে ষড়যন্ত্র করিয়া চামচটা ফিরাইয়া দিয়াছে, ইহাই সকলের ধারণা।

তাহার মাথায় যেন খুন চাপিয়া গেল। সে ব্যাঘ্রীর মত সেই কুঁজো বুড়ার উপর লাফাইয়া পড়িয়া তাহাকে বেদম প্রহার করিতে আরম্ভ করিল। দর্শকরা চারিদিকে ঘিরিয়া দাড়াইয়া জোর গলায় বাহবা দিতে লাগিল, ঠিক যেন মেড়ার লড়াই, না মোরগের লড়াই হইতেছে।

ধোপানীর ভীষণ কবলে পড়িয়া কুঁজো বুড়ো লাটিমের মত ঘুরপাক খাইতে লাগিল। পলাইবার বহু চেষ্টা করিয়াও সে ক্যাণ্ডিয়ার হাত ছাড়াইতে পারিল না, শেষে মারের চোটে মুখ থুবড়াইয়া মাটিতে পড়িয়া গেল।

কয়েকজন লোক ছুটিয়া গিয়া তাহাকে তুলিয়া ফেলিল। সকলে সমস্বরে ক্যাণ্ডিয়াকে গাল দিতে আরম্ভ করায় সে তখন ছুটিয়া নিজের বাড়ী চলিয়া আসিল। দরজা বন্ধ করিয়া, সে বিছানায় শুইয়া, রাগে হাত কামড়াইতে লাগিল। এই নূতন অপবাদটা চুরির অপবাদের চেয়েও তাহার মনে হইতে লাগিল বেশী, কারণ সে মনে মনে জানিত যে এই প্রকার কাজ করা তাহার পক্ষে কিছুই অসম্ভব নয়। কি করিয়া যে সে নিজেকে নির্দ্দোষী প্রতিপন্ন করিবে, কিছুই ভাবিয়া পাইল না। অবস্থাটা এমন হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে, স্বচ্ছন্দেই লোকে তাহাকে অপবাদ দিতে পারে। এমন কোনো ওজর সে তুলিতে পারিবে না, যাহাতে প্রমাণ হইতে পারে যে, সে এমন কাজ করিতে পারে না। লামোনিকাদের বাড়ীর উঠানে ঢোকা কিছুই কষ্টসাধ্য ব্যাপার নয়, সদর দরজা সারাক্ষণই খোলা থাকে। লোকজন চাকরবাকর সারাক্ষণই যাওয়া আসা করে। সুতরাং ক্যাণ্ডিয়া বলিতে পারিবে না যে, উঠানে যাওয়া তাহার পক্ষে সম্ভব নয়। সিনিগিয়ার সঙ্গে যুক্তি করিয়া চামচটা গর্ত্তে রাখিয়া আসার পথে বাস্তবিকই কোনো বাধা ছিল না।

লোককে বুঝাইবার জন্য ক্যাণ্ডিয়া নূতন নূতন যুক্তি-তর্কের অবতারণা করিতে লাগিল। সারাক্ষণ সে নিজের বুদ্ধিতে শান দিতে লাগিল, নানাপ্রকার চুলচেরা বিচারের চোটে সে মানুষকে অস্থির করিয়া তুলিল। দোকানে দোকানে, বাড়ীতে বাড়ীতে ঘুরিয়া সে মানুষের অবিশ্বাস দূর করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। সকলেই তাহার কথা শুনিত, তাহাতে বেশ আমোদ পাইত, তবে বিশ্বাস করিত কি না সন্দেহ। 'আচ্ছা, আচ্ছা, তাই না হয় হল'', বলিয়া তাহারা ক্যাণ্ডিয়াকে বিদায় করিয়া দিত।

কিন্তু তাহাদের কথার সুরেই ক্যাণ্ডিয়ার বুক দমিয়া যাইত। সে বুঝিত যে, সে বৃথাই এত পরিশ্রম করিতেছে। কেহই তাহার কথা বিশ্বাস করে না। তবুও সে হাল ছাড়িত না, সারারাত জাগিয়া নূতন নূতন যুক্তি আবিষ্কার করিত, সকালে সেগুলি উঁচু গলায় জাহির করিতে লাগিয়া যাইত। ক্রমে ক্রমে তাহার বুদ্ধিভ্রংশ হইতে আরম্ভ করিল, রূপার চামচের কথা ভিন্ন আর কোনো কথা সে আর ভাবিতেও পারিত না।

কাজকর্ম্ম ক্রমে সে ছাড়িয়া দিতে লাগিল, সুতরাং সংসারে অভাব দেখা দিল। নদীতে কাপড় কাচিতে গিয়া, মধ্যে মধ্যে সে হাতের কাপড়ের কথা ভুলিয়া গিয়া, চুরির ব্যাপার ভাবিতে আরম্ভ করিত, কাপড় হাত হইতে পড়িয়া জলে ভাসিয়া যাইত। ক্যাণ্ডিয়ার সেদিকে খেয়ালই থাকিত না, সে বক্ বক্ করিয়া বকিয়া চলিত। তাহার কথা চাপা দিবার জন্য শেষে অন্য ধোপানীরা নানারকম তামাসার গান বাঁধিয়া গাহিতে সুরু করিত। ক্যাণ্ডিয়া তখন পাগলের মত হাত পা নাড়িয়া ঝগড়া জুড়িয়া দিত।

কেহ আর তাহাকে কাজ দিতে চাহিত না। তাহার আগের প্রভুরা মাঝে মাঝে দয়া করিয়া খাবার কিছু কিছু পাঠাইয়া দিত। ক্যাণ্ডিয়ার অবশেষে এমন দুরবস্থা হইল যে, সে ছেঁড়া কাপড় পরিয়া, মাথা হেঁট করিয়া রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিতে লাগিল। দুষ্ট ছেলের দল তাহাকে দেখিলেই পিছনে লাগিত এবং চীৎকার

করিত, "ক্যাণ্ডিয়া পিসি, রূপোর চামচের গল্পটা বল না, সেটা আমরা ভাল করে শুনিনি।

অপরিচিত লোককেও ক্যাণ্ডিয়া এখন মাঝে মাঝে ডাকিয়া দাঁড় করাইত, জোর করিয়া তাহাকে চুরির কাহিনী এবং নিজের নির্দোষিতার প্রমাণ শুনাইয়া দিত। পাড়ার ছোক্‌রার দল মধ্যে মধ্যে তাহাকে ডাকিয়া পাঠাইত, এবং তাহার হাতে একটা বা দুইটা পয়সা গুঁজিয়া দিয়া, তাহাকে বক্তৃতা করাইতে লাগাইয়া দিত। কেহ বা দুষ্টামি করিয়া তাহার সঙ্গে তর্ক করিত এবং বিরুদ্ধ যুক্তি দিত। ক্যাণ্ডিয়া ক্ষেপিয়া উঠিয়া অনর্গল বকিয়া যাইত। ছোক্‌রারা শেষে তাহাকে নিষ্ঠুর কোনো একটা কথা বলিয়া বিদায় করিয়া দিত। ক্যাণ্ডিয়া মাথা নাড়িয়া চলিয়া যাইত, তাহার পর রাস্তার যত ভিখারী ধরিয়া নিজের স্বপক্ষের যুক্তি শুনাইতে বসিত। একজন বধির ভিখারিণীর সঙ্গে সে বন্ধুত্ব করিয়াছিল, তাহার আবার এক পা খোঁড়া।

শেষে ক্যাণ্ডিয়া সাংঘাতিক অসুখে শয্যাশায়ী হইয়া পড়িল। তাহার ভিখারিণী বন্ধুই তাহার তত্ত্বাবধান করিতে লাগিল। ডনা ক্রিষ্টিনা লামোনিকা তাহাকে খানিকটা ঔষধ, এক ঝুড়ি কয়লা পাঠাইয়া দিলেন।

রোগিণী ঘরের বিছানায় শুইয়া কেবলই রূপোর চামচের বিষয় প্রলাপ বকিতে লাগিল। মাঝে মাঝে এক হাতের উপর ভর করিয়া উঁচু হইয়া উঠিয়া আর এক হাত সবেগে শূন্যে নাড়িয়া সে নিজের যুক্তিতে জোর দিতে লাগিল।

তাহার আয়ু শেষ হইয়া আসিয়াছিল। তাহার দৃষ্টি যখন ছায়ায় ঢাকিয়া আসিতেছে, তখনও সে হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিতে লাগিল, "ঠাকরুণ, আমি ওটা নিইনি, কারণ চামচটা—" কথা শেষ হইবার আগেই তাহার প্রাণবিয়োগ হইল। শেষ যুক্তিটা আর তাহার বলা হইল না।

কুহুধ্বনি

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী

মুকুলিত আম্রকুঞ্জে ডাকে পিক সারা দ্বিপ্রহর
না মানি' সূর্য্যের রুদ্র দীপ্তিমান ভ্রূকুটিবিক্রমে ;
দশদিশি ঘেরি' সেই একাক্ষর শব্দভেদি স্বর
অমৃতের পিচিকারী হানিতেছে সৃষ্টির মরমে !

ক্ষুধা নহে, তৃষ্ণা নহে, অক্ষত রয়েছে চূতাঙ্কুর,
অদূরে সরসীবক্ষে শুষ্ক চঞ্চু যাচে না সন্ধান ;
অজ্ঞাত বেদনা বহি' নাহি ক্ষুব্ধ অভিযোগ-সুর,
সুদূর সঙ্গীরে ডাকি' নহে তাহা প্রণয়-আহ্বান।

অনাবিল আনন্দের মধুস্রাবী মোহন পঞ্চম
শূন্যপথে গেঁথে চলে সূত্রহীন স্বরের মালিকা—
প্রহর-প্রহরীদলে ক্ষণে ক্ষণে লাগায়ে বিভ্রম ;
প্রতিধ্বনি করি' চলে গিরিপথে বনের বালিকা !

তারি নীচে যন্ত্রকণ্ঠে অবিশ্রান্ত উঠে গরজনি
ছাপিয়া সহস্রমুখী জনতার মিশ্র কোলাহল ;
পীড়িত মর্দ্দিত পৃথ্বী কাতরে জানায় আর্ত্তধ্বনি,—
তারো ঊর্দ্ধে সেই কণ্ঠ বিস্ময়েরে করিছে বিহ্বল !

গৃহে গৃহে জ্বলে অগ্নি—চালে চালে নাচে উচ্চ শিখা,
কুহুকুহু মুহুর্মুহু ঢালে তাহে স্বরধুনিধারা ;
ধূসর মরুর বক্ষে মিলে পথ তৃণাঙ্কুরে লিখা,
বন্ধ্যার বুভুক্ষু বক্ষে নবাগত সন্তানের সাড়া !

স্মৃতির কুহকমন্ত্রে প্রিয়স্পর্শ যথা মনোরথে,
দুর্বৎসরে দুর্গোৎসব ভরি' তোলে ব্যথার আরতি ;
কণ্টকে আকীর্ণ এই শুষ্ক রুক্ষ সংসারের পথে
তেমনি সে কুহুধ্বনি আকস্মিক স্বরসরস্বতী।

দণ্ডক অরণ্যতলে কবে শুনেছিনু ঐ স্বর,
চমকিয়া মৃগশিশু চেয়েছিল বৈদেহীর পানে ;
কত যুগ বয়ে গেছে, আজো তার অতৃপ্ত অন্তর—
স্বর্গসুধা পিয়াইয়া কালের নয়নে স্বপ্ন আনে !

সহজ উপায়ে ফটোগ্রাফি

শ্রীহরিহর শেঠ

প্রথমেই বলা দরকার আমি আলোকচিত্র-শিল্পে একজন বিশেষজ্ঞ ত নই-ই, খুব ভালরূপ যে ছবি তুলিতে পারি তাহাও বলিতে পারি না।

যাঁহাদের ফটো তোলার সামান্যও অভিজ্ঞতা আছে তাঁহারাই জানেন, যে-বস্তু বা বিষয়ের ফটোগ্রাফ তুলিতে হইবে ক্যামেরার লেন্স-এর মধ্য দিয়া তাহার ছায়া আসিয়া প্রথম একখানি কাচ-বিশেষের উপর পতিত হয়। তৎপরে উহাকে কতিপয় রাসায়নিক দ্রব্য মিশ্রিত বিভিন্ন আরক বা 'সলিউশনে' ধৌত করিলে তাহাতে ছবি বাহির হয়। এই প্রক্রিয়াকে 'ডেভেলপ্' করা বলে। আর যে কাচ-বিশেষের কথা বলিলাম, উহা জেলেটিন্ ও কতিপয় রাসায়নিক দ্রব্যলিপ্ত কাচখণ্ড; উহাকে 'ড্রাই প্লেট্' বলে। ড্রাই প্লেট অর্থে শুষ্ক প্লেট। আলোকচিত্র আবিষ্কারের প্রাথমিক যুগে কাচে সদ্য কতকগুলি রাসায়নিক দ্রব্য মাখাইয়া তাহাতে ফটো তোলা হইত, তাহাকে 'ওয়েট প্লেট' বলিত। প্লেট ডেভেলপের পর আবশ্যক ধৌতাদি হইলে উহা নেগেটিভ নাম প্রাপ্ত হয়। এই কাচ-খণ্ডের উপর যে ছবি হয় উহা উল্টা এবং আলোকময়, অর্থাৎ সাদা অংশ কাল ও ছায়াময় ও কাল অংশ সাদা হয়। এই কারণে ইহাকে নেগেটিভ বলে।

ফটো তোলার জন্য যে-সমস্ত দ্রব্য আবশ্যক হয় ড্রাই প্লেট বা ফিল্ম তাহার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান্। ইহা ব্যতিরেকে ফটোগ্রাফ তোলা যাইতে পারে না বলিয়াই সাধারণতঃ জানা আছে। এক কথায় যাহা প্রথম এবং প্রধান আবশ্যক সেই ড্রাই প্লেট অথবা ফিল্ম না লইয়া এবং তৎপরিবর্ত্তে ব্যয়াধিক্য বা সামান্য মাত্রায় অসুবিধার সৃষ্টি না করিয়াও সুন্দর ফটো তোলা যায়। আর একটি কথা, ফটোগ্রাফ বা অন্য কোন ছাপা বা হস্তাঙ্কিত চিত্রলিপি বা নক্সাদি—যদি উহা কার্ডে আঁটা বা উভয় পৃষ্ঠে না থাকে, তাহা হইলে ক্যামেরার সাহায্য না লইয়াও সহজে অতি সামান্য ব্যয়ে অবিকল প্রতিলিপি লওয়া যায়। বলা বাহুল্য, বিনা ড্রাই প্লেটে বিনা ক্যামেরার সাহায্যে যে ছবি হইবে, তাহার স্থায়িত্ব সাধারণ ফটোগ্রাফ অপেক্ষা কোন অংশে হীন নহে।

এক সময়ে আমার অনেকগুলি ফটোগ্রাফের আবশ্যক হয়, তখন কি উপায়ে অল্পব্যয়ে ফটো তোলা যাইতে যাইতে পারে, এ-বিষয় লইয়া বন্ধুবর শ্রীযুক্ত গুরুদাস ভড়ের সহিত আমার আলোচনা হইতেছিল। সেই সময় প্লেটের পরিবর্ত্তে ব্রোমাইড বা গ্যাসলাইট কাগজে চেষ্টা করিয়া দেখিবার কথা হয়। প্রায় ত্রিশ-পয়ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে ক্যামরার মধ্যে p. o. p. কাগজ দিয়া দীর্ঘক্ষণ এক্সপোজার দিয়া একবার পরীক্ষা করিয়াছিলাম। মনে হইতেছে তাহাতে কাগজের উপর আলো ও ছায়ার খুব অস্পষ্ট রেখাপাত হইয়াছিল। তখন ব্রোমাইড কাগজের ব্যবহারে আমি অভ্যস্ত ছিলাম না আর এখনকার মত এত বেশী উহার প্রচলনও ছিল না, এবং সে সময় ভাল করিয়া পরীক্ষা করিয়া তাহাতে সাফল্য লাভের জন্য আর চেষ্টাও করি নাই।

সম্প্রতি ড্রাই প্লেটের পরিবর্ত্তে ব্রোমাইড কাগজে নেগেটিভ প্রস্তুত করিয়া তাহা হইতে যেরূপ সুফল পাইয়াছি তাহার কথা যাঁহারা এ-বিষয়ে অনুরাগী বা ব্যাপৃত তাঁহাদের না জানাইয়া থাকিতে পারিতেছি না।

বিনা প্লেটে ফটো তুলিতে নূতন কোন জিনিষের আবশ্যক হয় না, সকল ক্যামেরাতেই একার্য্য হইতে পারে। ফোকাস্ করার পর 'ডার্ক স্লাইড্'এর ভিতর যেখানে প্লেট দিতে হয়, তথায় তৎপরিবর্ত্তে একখানি সেন্সিটিভ্ কাগজ পুরাইয়া যথানিয়মে এক্সপোজার দিয়া



৩ নং কাগজের নেগেটিভ্। ছাপা ছবি হইতে কণ্টাক্ট প্রিণ্ট দ্বারা ইহা প্রস্তুত হইয়াছে। ক্যামেরা ব্যবহৃত হয় নাই। (ব্রোমাইড্ কাগজ)



৩ নং কাগজের নেগেটিভ্ হইতে কণ্টাক্ট প্রিণ্ট দ্বারা ইহা প্রস্তুত হইয়াছে। (ব্রোমাইড্ কাগজ)

পদ্ধতিমত ডেভেলপ 'ফিক্স' ও ধৌতাদি করিলেই ছবি হইল। বলা বাহুল্য এ ছবিতে সমস্তই উল্টা হইবে, অর্থাৎ দক্ষিণ দিক বামে এবং বামদিক দক্ষিণে, আর কাল অংশ সাদা এবং সাদা অংশ কাল হইবে। তৎপরে উহা হইতে পুনরায় ফটোগ্রাফ লইলেই সেই ছবিতে উক্ত দোষগুলি সংশোধিত হইয়া আবশ্যক ছবি পাওয়া যাইবে। এই নেগেটিভ হইতে কাচের নেগেটিভের ন্যায় যথানিয়মে 'কনট্যাক্ট প্রিণ্ট' করাও চলিতে পারে। তাহা করিতে হইলে নেগেটিভখানিতে আলোছায়ার একটু বেশী বৈষম্য থাকিলে ভাল হয় এবং কাচের নেগেটিভে ছবি ছাপিতে যে সময় লাগে ইহাতে তদপেক্ষা বেশী সময় বা অধিকতর আলোক আবশ্যক হয়। দিনের আলোকেও ছাপা চলিতে পারে, কিন্তু উহার জন্য সময় স্থির করা একটু কঠিন হয়, তদপেক্ষা গ্যাস, ইলেকট্রীক্ বা কেরোসিন ল্যাম্পের আলোকই সুবিধাজনক। কাগজের নেগেটিভে কনট্রাষ্ট না থাকিলে এবং উহা ফ্ল্যাট্ হইলে সময় সময় ছবির সাদা অংশগুলি ঈষৎ কৃষ্ণাভ দেখায়।

এক্সপোজারের বা ছাপার সময় ডায়াফ্রাম্ কত কম বা বেশী করিতে হইবে তাহা বই পড়িয়া বুঝিবার চেষ্টা করা অপেক্ষা নিজে নিজে পরীক্ষা দ্বারা অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করাই শ্রেয় মনে করি। মোটামুটি বলা যাইতে পারে, নেগেটিভ হইতে কনট্যাক্ট প্রিণ্ট দ্বারা ছবি তুলিতে সময় একটু বেশী লাগে, কিন্তু আর সকল বিষয় ড্রাই প্লেট ব্যবহারের নিয়মের অনুরূপ। আর ডেভেলপ করা বা ডেভেলপার প্রস্তুত সম্বন্ধে যে কাগজে যেরূপ ব্যবস্থা, তাহা ছাড়া বিশেষ কোন ব্যবস্থার আবশ্যক হয় না।

কোন ফটো, ছাপা ছবি বা হস্তাঙ্কিত ছবি অথবা



১ নং নেগেটিভ্। (কাগজের)
ছবি হইতে প্রস্তুত। (ব্রোমাইড্ কাগজ)



১ নং কাগজের নেগেটিভ হইতে কণ্টাক্ট প্রিণ্ট (ব্রোমাইড কাগজ)



২ নং কাগজের নেগেটিভ্।
বালকের ফটোগ্রাফ্ (ব্রোমাইড্ কাগজ)



২ নং কাগজের নেগেটিভ্ হইতে পুনরায়
ফটো লওয়া। (ব্রোমাইড্ কাগজ)

হস্তলিপি প্রভৃতির কপি করিবার জন্য যদি আবশ্যক হয়, তাহা হইলে যাহা হইতে কপি করিতে হইবে তাহার পর-পৃষ্ঠায় লেখা বা ছবি না থাকিলে ক্যামেরার সাহায্য না লইয়া কনট্যাক্ট প্রিণ্ট দ্বারা প্রথম নেগেটিভ, তৎপরে তাহা হইতে পুনরায় প্রিণ্ট দ্বারা অবিকল ছবি বা লেখার প্রতিলিপি পাওয়া যায়। অবশ্য ছবি বা লেখাদি কার্ডে আঁটা বা খুব মোটা কাগজে হইলে পূর্ব্বের লিখিত উপায়ে উহার ফটো গ্রহণ ভিন্ন এ উপায়ে হয় না।

এই স্থানে একটা কথা বলিয়া দেওয়া ভাল। অনেক সময়ই কাগজ কাচের মত বেশ সমান, অর্থাৎ চৌরস থাকে না, একটু বক্র হইয়া থাকে। এরূপ থাকিলে ছবি বাঁকা এবং অসমান-হেতু দূরত্বের সামান্য কম-বেশী বশতঃ এক্সপোজার কোন অংশে কম কোন অংশে অধিক হইয়া নেগেটিভ খারাপ হইতে পারে। এজন্য স্লাইডের মাপমত কাগজখণ্ড মাত্র স্লাইডের ভিতর না দিয়া একখানি কাচকে পশ্চাতে রাখিয়া ব্রোমাইড বা যে-কাগজ দিতে চান তাহা দেওয়া আবশ্যক। এরূপ করিলে স্লাইডের ভিতরস্থিত স্প্রীং কাচখণ্ডকে সম্মুখ দিকে ঠেলিয়া কাগজখানিকে সমানভাবে রাখিতে পারিবে। এই কাচখণ্ড একখানি ব্যবহৃত প্লেটের কাচ হইলেই চলিতে পারে। অবশ্য সম-মাপের লোহার পাত বা মজবুত পেষ্টবোর্ড হইলেও এ কাজ হইতে পারে। নেগেটিভ্ প্রস্তুত করিবার জন্য যে-শ্রেণীর কাগজই ব্যবহার করা হউক তাহা মসৃণ এবং প্রিণ্ট প্রস্তুতের জন্য কাগজ র‍্যাপিড হওয়াই সুবিধাজনক। সুতরাং মসৃণ ব্রোমাইড কাগজই ভাল।

যাঁহাদের ফটোগ্রাফিতে সখ আছে এবং বেশী ছবি তোলা দরকার, তাঁহাদের একবার আমি পরীক্ষা করিয়া দেখিতে বলি। এই প্রক্রিয়ার কতকগুলি সুবিধা আছে—

(১) অনেক কম খরচে হয়।

(২) অল্প স্থানে এবং সামান্য খামের মধ্যে রাখা যায়।

(৩) অতি অল্পব্যয়ে কোনরূপ নষ্ট না হইয়া চিঠির খামের মধ্যে স্থানান্তরে পাঠান যায়।

(৪) গরমের সময় গলিয়া যাইবার ভয় কম থাকে।

(৫) সময় কম লাগে।

(৬) নেগেটিভ্ রক্ষা করা অপেক্ষাকৃত সহজ।

(৭) ভাঙিবার ভয় থাকে না।

(৮) নেগেটিভ্ ও প্রিণ্টের জন্য স্বতন্ত্র রাসায়নিক সলিউশন্ আবশ্যক হয় না।

(৯) ছবি কপি করিবার জন্য সময়বিশেষে ক্যামেরা না থাকিলেও চলে।

এই প্রথার উন্নতি সাধন জন্য এক্ষণে আবশ্যক কাগজের নেগেটিভখানিকে কোন উপায়ে স্বচ্ছ করা। কাগজের নেগেটিভখানিকে কোন রাসায়নিক আরকে নিমজ্জিত করিয়া বা অন্য কোন প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছ করিয়া লইতে পারিলে আর কাচের ড্রাই প্লেটের আবশ্যকতাই থাকিবে না। শুনিয়াছি এক ভাগ ক্যানাডা বালসাম্ এবং চারিভাগ টারপিন্ মিশ্রিত করিয়া উষ্ণ নেগেটিভের পশ্চাৎ দিকে মাখাইয়া শুখাইয়া লইলে তাহা কতকাংশে স্বচ্ছ হইয়া থাকে। ইহাতেও কাজের পক্ষে কিছু সুবিধা হইতে পারে। আর ল্যাণ্টার্ণের জন্য যেরূপ পেপার স্লাইড্ পাওয়া যায়, সেই মত কোন স্বচ্ছ কাগজ যদি প্রস্তুত হইয়া আসে তাহা হইলেও সুবিধা হয়। অদূর ভবিষ্যতে এ ব্যবস্থা হইবেই এবং কারখানাওয়ালাদের এ বিষয়ে দৃষ্টি থাকিলে বিশেষ বিশেষ কার্য্যের জন্য ভিন্ন ড্রাই প্লেট ক্রমে নির্ব্বাসনের পথে যাইবে এবং সুবিধাজনক ভাবে প্রস্তুত কাগজই তাহার স্থান অধিকার করিবে।*

বুঝিবার সুবিধার জন্য এই প্রবন্ধের সহিত কয়েক প্রকার কাগজের নেগেটিভ ও তাহা হইতে প্রস্তুত ছবির প্রতিলপি দিলাম। মানুষের ফটো, ছবি হইতে গৃহীত ফটো এবং ক্যামেরা-সাহায্য-ব্যতিরেকে প্রস্তুত কপি,

* কোড্যাক্ কোম্পানির "Kodesko" নামক এক প্রকার সেন্সিটিভ কাগজ আছে। উহা খুব পাতলা, আংশিক স্বচ্ছ বলা যাইতে পারে। আমি উহা ব্যবহার করি নাই, বোধ হয় তাহাতে একটু সুবিধা হইতে পারে।

সকল প্রকারের নমুনাই ইহাতে আছে। আমার বিশ্বাস যে-সকল ফটোগ্রাফার এ-বিষয়টির কথা কখন শ্রবণ করেন নাই, তাঁহারা এই ছবিগুলি দেখিয়া আমার কথায় আস্থাবান হইবেন। এই ছবিগুলি আমার নিজের গৃহীত নহে, আমার পুত্র শ্রীমান মনোরঞ্জন শেঠ এগুলি তুলিয়া দিয়াছে।+

+ এই প্রবন্ধ রচনায় শ্রীযুক্ত গুরুদাস ভড়ের নিকট হইতে কোন কোন বিষয়ে সাহায্য পাইয়াছি সে জন্য অনেক সুবিধা হইয়াছে।

দেড় টাকা

শ্রীসত্যভূষণ সেন

সুবল ছিল মহা সামাজিক লোক। আত্মীয় বন্ধুদের বাড়ী যাতায়াত, সকলের সহিত লৌকিকতা, আদর-আপ্যায়ন, এ-সকল বিষয়ে তাহার উৎসাহ ছিল অক্লান্ত। ইহাতে তাহার সময়ের অপব্যয় হইত যথেষ্ট, সঙ্গে সঙ্গে অর্থব্যয়ও হইত অল্পস্বল্প। এইখানেই পত্নীর সহিত তাহার বিরোধ। সুপর্ণাও লোক মন্দ ছিল না। সকলের সহিত মেলামেশা করিবার অভ্যাস তাহারও ছিল, কিন্তু অযথা অর্থব্যয়ে তাহার আপত্তিও ছিল স্পষ্ট। সুবলের স্বাভাবিক মতিগতি সুপর্ণার সংসর্গ ও চেষ্টা সত্ত্বেও বিশেষ পরিবর্ত্তিত হয় নাই। সুতরাং মাসের মধ্যে দুই-এক দিন পতি-পত্নীতে একটু মতান্তর, মনান্তরও প্রায় স্বাভাবিকই হইয়া উঠিয়াছিল।

সেদিন এক বন্ধুর বাড়ীতে সস্ত্রীক সুবলের নিমন্ত্রণ ছিল। নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করিবার কোন উপায় ছিল না, কাজেই অন্ততঃ গাড়ীভাড়া বাবদে কিছু অর্থব্যয় অবশ্যম্ভাবী। পরামর্শে স্থির হইল যে, সুবলের নাটকের বই কেনা বাবদে মাসিক বরাদ্দ টাকা হইতে এই খরচটা সঙ্কুলান করিতে হইবে। সুবলের মনে মনে হাসি পাইল বটে, কিন্তু সে পত্নীর সম্মুখে একটু বিষণ্ণ ও বিরক্ত মুখ করিতে বাধ্য হইল।

সুপর্ণা শহরে গাড়ীর বদলে ট্রামগাড়ীতে যাতায়াত অভ্যাস করিয়া লইয়াছে। প্রথম প্রথম সুবল একটু ক্ষীণ আপত্তি উত্থাপন করিয়াছিল, কিন্তু সুপর্ণার নিকট তাহা আমল পায় নাই। সুপর্ণার এরূপ বেপরোয়াভাবে ট্রামগাড়ীতে যাতায়াতে তাহার বন্ধু-মহিলারা মনে মনে সকলেই তাহাকে বাহাদুর বলিয়া স্বীকার করিত বটে, কিন্তু সকলে মিলিয়া আলোচনা করিবার সময় মুখে তাহাকে নিন্দা করিতে অবশ্য কিছু মাত্র ত্রুটি করিত না।

বন্ধুর বাড়ীতে সেদিন একটু বিলম্ব হইয়া পড়িল, ফলে ট্রামগাড়ীর সময়ও উত্তীর্ণ হইয়া গেল। অগত্যা বাড়ী ফিরিবার জন্য গাড়ী ডাকিতে হইল। সুবলের দুর্ভাগ্যক্রমে তখন আবার একখানা প্রথম শ্রেণীর গাড়ী ছাড়া আর কোন গাড়ী পাওয়া গেল না। যথাকালে আরোহী দুইটিকে লইয়া গাড়ী রওনা হইল। অন্ধকার রাত্রি, বাহিরে টিপ টিপ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে, শহর অনেকটা নিস্তব্ধ হইয়া আসিতেছে। গাড়ীর ভিতরে নিস্তব্ধতা আরও গভীর। সে নিস্তব্ধতার অর্থ বুঝিতে সুবলের একটুও বিলম্ব হইল না। বেচারী নিরুপায়। নিরুপায় হইলেও একটু চেষ্টা করিয়া দেখিবার মত সাহস সুবলের ছিল। সে গাড়ীর অন্ধকারের মধ্যে আস্তে আস্তে সুপর্ণার হাতখানা কাছে টানিয়া লইল, তারপরে জিজ্ঞাসা করিল—'আজকার দিনটা কেমন কাটল?' অন্ধকারের মধ্যেই জবাব আসিল—'দিন তো কোন্ কালেই কেটে গেছে। রাতটাও তো কাটতে চলল।' সুবল বুদ্ধি করিয়া হাতখানা ছাড়িয়া দিল। একটু পরে প্রশ্ন হইল—'ফার্ষ্ট ক্লাস গাড়ী ছাড়া কি শহরে আর গাড়ী ছিল না?'

—সময় মত হ'লে পাওয়া যেত বই কি।

—বন্ধুর বাড়ীতে গিয়ে বসলে আর সময়-অসময় জ্ঞান থাকে না বুঝি ?

—কি করা যায় ? তাদের সুবিধা-অসুবিধাও একটু দেখতে হবে তো।

—তা তো বটেই। তারপরে আবার গাড়ী ভাড়া দেবার সময় গাড়োয়ানের সুবিধা-অসুবিধাও দেখতে হবে হয় ত ?

—তার মানে ?

—মানে তো একেবারে জলের মত স্পষ্ট। তোমার তো গাড়োয়ানদের সঙ্গেও পর্য্যন্ত লৌকিকতা করবার অভ্যাস আছে!

—ওঃ, বক্‌শিসের কথা বলছ ? তা বক্‌শিস ত ওরা পেয়েই থাকে।

—তা না পাবে কেন ? দেবার লোক থাকলেই পায়। কিন্তু কেন ? যা ওদের ন্যায্য পাওনা তার উপরে বক্‌শিসের জন্য ওদের দাবি কিসে আমি তো বুঝতে পারি না।

—তা বুঝতে না পারলে চল্‌বে কেন ? ন্যায্য পাওনার চেয়েও উপরি পাওনার ওপরে লোভ সকলেরই আছে দেখা যায়। ইউরোপে কি হয় জান ?

—'না, জানি না।'

—সে দেশে এসব শ্রেণীর লোকরা ন্যায্য পাওনা বরং ছাড়তে রাজী, কিন্তু বকশিস—

সুপর্ণা ঝঙ্কার দিয়া উঠিল—'থাক্, ইউরোপের স্বপ্ন দেখবার সময় এখন নয়।'

—স্বপ্ন দেখবার এই তো সময়—রাত এগারটা প্রায় হ'ল।

সুপর্ণার অধরে ক্ষীণ হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিল। কিন্তু সে গম্ভীর হইয়া বলিল—'মোট কথা তোমাদের এসব বিষয়ে সৎসাহস নেই, কাজেই ওরা বক্‌শিসের লোভে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে।'

—সাহসের অভাব! তুমি কি মনে কর আমরা গাড়োয়ানদের ভয় করি ? কক্ষণো না। আজকেই দেখে নিও।

সুপর্ণার অধরে আবার একটু ক্ষীণ হাসির রেখা। তবু গম্ভীর মুখেই জিজ্ঞাসা করিল—'আজকে গাড়ী ভাড়া কত দিতে হবে ?'

—দেড় টাকা হার ঠিক হয়েছে—দেড় টাকাই দেব।

—আজ বরং আট আনা পয়সা আরও বেশী দিতে পার—সেটা অযথা হবে না। অনেকটা রাত হয়ে গেছে, তার উপরে বৃষ্টি।

—না, এক পয়সাও না। কেন দিতে যাব বেশী ? পুলিস তো ঠিক ক'রে দেয় নি যে, বৃষ্টি হলে বা বেশী রাত হলে ভাড়াও বেশী দিতে হবে।

হয়ত এবার সুবলের অধরেও একটু ক্ষীণ হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিয়া অন্ধকারেই বিলীন হইয়া গেল।

গাড়ী চলিতে লাগিল। সুবল অতি সতর্কভাবে পকেটে হাত দিয়া টাকা-পয়সার হিসাব করিতে লাগিল—তিনটি টাকা, দুইটি আধুলি, দুইটি পয়সা অথবা একটি আধুলি, তিনটি পয়সা, দুইটা নিকেলের চার-আনি, একটি সিকি ইত্যাদি। তার পরে ভাবনা হইল গাড়ী ভাড়া কত দেওয়া যায়। বিষম সমস্যা—হয় গাড়োয়ানের নিকট মানসম্ভ্রম বিসর্জ্জন, অথবা পত্নীর নিকট ভ্রূকুটি লাভ।

গাড়ী আসিয়া বাড়ীর দরজায় দাঁড়াইল। সুপর্ণা গাড়ী হইতে নামিয়া বাড়ীর দরজায় গিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। সুবল গাড়োয়ানকে বিদায় করিবার জন্য রাস্তার বাতির নীচে গেল। সুপর্ণা যেন দেখিতে না পায় এমনভাবে দাঁড়াইয়া পকেট হইতে টাকাপয়সা বাহির করিয়া দুইটি টাকা বাছিয়া লইয়া গাড়োয়ানকে দিল এবং চোখের ইঙ্গিতে তাহাকে একটু ইসারা করিয়া বলিল—'এই নাও, দেড় টাকা দিলাম—দেড় টাকাই তো তোমাদের নিয়ম।"

সুবল যে টাকা দিতে গিয়া কত কৌশল করিল এবং সুপর্ণার দিকে একবার তাকাইয়াও লইল, তাহা গাড়োয়ানের চোখ এড়ায় নাই। গাড়োয়ান সুবলের দুর্ব্বলতা কোথায় স্পষ্টই বুঝিতে পারিল। সুবলের দুর্ব্বলতায় গাড়োয়ানের বুদ্ধির সবলতা যেন হঠাৎ বাড়িয়া গেল। সে বলিল—'দেড় টাকায় হবে না বাবু, কিছু বকশিস দিতে হবে।"

সুবল যেন আকাশ হইতে পড়িল—'আবার বকশিস কিসের? এই তো এক ঘণ্টার পথ, দেড় টাকা দিয়েছি। আবার কি চাই?'

সুপর্ণা ডাকিয়া বলিল, 'আঃ দিয়ে দাও আট আনা পয়সা—রাত হয়ে গেছে অনেকটা, বৃষ্টিও আছে।'

সুবল দেখিল যে, গাড়োয়ান তাহার চোখের ইঙ্গিত স্বীকার না করিয়া বরং তাহার অপব্যবহার করিতেছে। তখন সে নিজ মর্য্যাদা রক্ষার জন্য বলিয়া উঠিল—'না কেন মিছামিছি আট আনা পয়সা দেব?—যা ওদের ন্যায্য পাওনা'—গাড়োয়ান সুপর্ণার উপদেশে অনেকটা উৎসাহ পাইয়াছিল,—সে বকশিস না লইয়া কিছুতেই নড়িতে চায় না।

সুপর্ণা অধৈর্য্য হইয়া উঠিল, বলিল—'কি যন্ত্রণা, বিদায় করে দাও না ওকে! রাত দুপুরে একটা গাড়োয়ানের সঙ্গে হল্লা আরম্ভ করেছ—তোমার কি বুদ্ধি-শুদ্ধি লোপ পেয়ে গেল? অন্য সময় এত বুদ্ধি কোথায় থাকে?'

বাস্তবিকই সুবলের বুদ্ধি-শুদ্ধি লোপ পাইবারই কথা সে যে গাড়োয়ানকে আগেই আট আনা পয়সা বেশী দিয়াছে, তাহা তো বলিবার উপায় নাই। সুপর্ণার আদেশে অগত্যা নীরবে আরও আট আনা পয়সা দিয়া গাড়োয়ানকে বিদায় করিতে হইল।

এবার হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিল গাড়োয়ানের অধরে।

গাড়োয়ান মনে মনে ভাবিতেছিল যে, বাবুদের ঘরে ঘরে এমন স্ত্রী হইলে গাড়োয়ানদের পক্ষে লাভের কথা বটে—তবে নিজের স্ত্রীটি যেন তাহার এমন না হয়।

বঙ্গের পুস্তকালয় ও বঙ্গভাষা

[নৃত্যগোপাল স্মৃতি-মন্দিরে চন্দননগর পুস্তকাগারের অষ্টপঞ্চাশত্তম বাৎসরিক উৎসব উপলক্ষে সভাপতি শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বক্তৃতার মর্ম্ম।]

এই পুস্তকালয়, বিশেষতঃ এই হল দেখে বিশেষ তৃপ্তি বোধ হয়েছে। চন্দননগরের বাইরে এরকম ছোট শহরে এরূপ সুন্দর হল দেখি নি। বর্দ্ধমানে একটি হল আছে, সেখানে ধনীলোকেরও অভাব নেই। কিন্তু সে হল এর চেয়ে ছোট এবং এরূপ সুন্দরও নয়। বড়োদায় আধুনিক নিয়মে পরিচালিত একটি ভাল লাইব্রেরী আছে। তার মধ্যে সর্ব্বসাধারণের পড়বার জন্যে পাঠাগার ছাড়া মহিলা ও শিশুদের পড়বার স্বতন্ত্র ঘর আছে। ছেলেদের, মেয়েদের, সাধারণ পাঠকদের আলাদা আলাদা বিভাগ আছে। প্রত্যেক বিভাগেরই সুন্দর বন্দোবস্ত। তা ছাড়া আর এক রকম বন্দোবস্ত আছে, যাকে চলন্ত লাইব্রেরী (Travelling Library) বলা চলে। এটা হচ্ছে গ্রামে গ্রামে বই বিতরণ করা। আমি এর বিবরণ কাগজে পড়েছি, কিন্তু তা'র কার্য্য চোখে দেখবার সুযোগ পাই নি। লাহোরে গিয়েছিলাম সেখানেও বড়োদার মত বন্দোবস্তের লাইব্রেরী তখন তৈরি হচ্ছিল। মহিলাদের আলাদা ঘর, ছোট ছেলেদেরও আলাদা ঘর তৈরি হচ্ছিল। এই সব লাইব্রেরীর ব্যবস্থা দেখে হরিহরবাবুর কাছে আমরা অনুরোধ করতে পারি, একদিন তিনিও যেন চন্দননগরের লাইব্রেরীকে সকল দিক দিয়ে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ক'রে তুলতে পারেন। নারীদের শিক্ষার প্রতি তাঁর অনুরাগ আছে, সুতরাং তাঁদের পড়বার সুবন্দোবস্ত বিষয়ে তাঁর নিশ্চয়ই দৃষ্টি আছে। আমাদের আর বেশী কিছু বলতে হবে না। আপনাদের লাইব্রেরীর রিপোর্টে দেখলাম এখানেও চলন্ত লাইব্রেরীর মত কতকটা কাজ হচ্ছে।

"চন্দননগরের অন্যান্য পুস্তকাগার ও পাঠাগারগুলি অর্থাভাব বশতঃ সকল প্রকার পুস্তক তাঁহাদের সভ্যদের পড়িতে দিতে পারেন না। সেই অভাব যাহাতে আংশিকভাবে পূরণ করিয়া পাঠাগারগুলি নিজেদের কার্য্যপ্রসার বাড়াইতে পারেন, সেই বিষয়ে চন্দননগর পুস্তকাগার সাহায্য করিতে প্রস্তুত। শিবশঙ্কর পাঠাগার এইরূপ সাহায্য পাইতেছেন। হুগলী জেলা লাইব্রেরী সম্মিলনীর পক্ষ হইতে গ্রামে গ্রামে লোক পাঠাইয়া যে সকল পুস্তক পড়াইবার ব্যবস্থা হইয়াছিল, সে পুস্তকগুলি চন্দননগর পুস্তকাগার হইতেই লওয়া হইয়াছিল।" (রিপোর্ট, পৃষ্ঠা ৪)

আপনারা এইরকম বই ধার দিয়ে দিয়ে কাজটার প্রসার আরও বাড়াতে পারবেন। রিপোর্ট থেকে আর একটা কথা ব'লে আমি বাংলাভাষা সম্বন্ধে কিছু বলবো। এখানে পুস্তকের যে তালিকা দেওয়া হয়েছে, তাতে দেখলাম, "India in Bondage" বইয়ের উল্লেখ আছে; এখানি গবর্ন্মেণ্ট বাজেয়াপ্ত করেছেন। আমিই বই ছাপিয়েছিলাম। ৪০০০ কপি ছাপা হয়। তার মধ্যে ৩৫০০ কপি বিক্রী হয়। বাকি ৫০০ কপি পুলিস নিয়ে যায়। শুনতে পাই, বইখানা গোপনে গোপনে, চারিগুণ তিনগুণ দ্বিগুণ মূল্যে, এখনও বিক্রী হয়—কেমন ক'রে হয়, সে সম্বন্ধে আমার কোন সাক্ষাৎ জ্ঞান নাই।



সভাপতি ও অন্যান্য সভ্য

বইখানা দেখছি আপনাদের আছে—এখানে থাকবেও। বইখানা অন্যত্রও অন্য ক্রেতাদের নিকট আছে। কিন্তু তাঁদের নাম কেউ জানে না, কোথাও লেখা নাই। আপনারা দেখছি, একেবারে ছেপে দিয়েছেন, যে, বইখানা এখানে আছে! এই সম্পর্কে আর একটা কথা মনে পড়লো। "The Case for India" নামে আমেরিকা থেকে একখানা বই বেরিয়েছে। এর লেখক ডাঃ উইল ডুরাণ্ট রবীন্দ্রনাথকে বইখানা উৎসর্গ করেন। তাতে তিনি স্বহস্তে রবীন্দ্রনাথের সম্বন্ধে লিখেছেন, "আপনি একাই ভারতের স্বাধীনতা পাওয়ার পক্ষে যথেষ্ট কারণ ("You alone are sufficient reason why India should be free")। আমি গ্রন্থকারকে চিনি না এবং আমেরিকাতেও যাইনি। রবিবাবুর কাছ থেকে বইখানা চেয়ে নিয়ে "Modern Review' কাগজে তার এক সমালোচনা বা'র করি। লেখক আমাকেও একখানি বই পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু সে বই আমি পাই নি। গ্রন্থকার বইখানা আমি পেলাম কি না জানতে চেয়েছিলেন। আমি লিখলাম পাই নি। আমাদের কাগজে সমালোচনা বা'র হওয়ার পূর্ব্বে কোন বিখ্যাত পুস্তকের দোকান এই বইয়ের ৫০ কপি ফরমাস দিয়েছিলেন। আমেরিকা থেকে বই পাঠানও হয়েছিল। কিন্তু তাঁরা বই পেলেন না। ডাঃ উইল ডুরাণ্টের ইংলণ্ডের এজেণ্ট আমাকে আর একখানা বই পাঠিয়ে লেখেন, "আমরা গ্রন্থকারের ইচ্ছানুসারে আপনাকে এক কপি বই পাঠাচ্ছি। আপনি বইখানা ভারতবর্ষে ইংরেজীতে বা দেশভাষায় ছাপাতে পারেন।" আমি তাঁদের লিখে দিয়েছি, সে বইও পাই নি, আর ভবিষ্যতে আবার পাঠালেও পাব না। [এই বইখানি সরকারী নিষিদ্ধ বহির তালিকাভুক্ত নয়, বাজেয়াপ্তও নয়। বোম্বাইয়ে দেখে এসেছি, এ বই প্রকাশ্যভাবে দোকানে বিক্রী হচ্ছে।]

এইবার আমি বাংলা ভাষা সম্বন্ধে দুই একটা কথা বলবো। আমাদের দেশে স্বরাজ হ'লে, বর্ত্তমানে ইংরেজীর মত, আমাদের একটা রাষ্ট্রভাষা হবে। সে ভাষা হয়ত হিন্দুস্থানীই হবে। হিন্দুস্থানী ভাষায় সকলের চেয়ে বেশী লোক কথা বলে। বাংলা তার পরেই। হিন্দুস্থানীর সঙ্গে যেমন বেহারী ধরা হয়, তেমনি বাংলার সহিত আসামী উড়িয়া প্রভৃতি ধরিলে বাংলাভাষীর সংখ্যা বাড়তে পারে। আমার উদ্দেশ্য বাংলা সাহিত্যের বেশ সমৃদ্ধি কেমন ক'রে হয় তারই আলোচনা করা। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠতা আছে। এ পর্য্যন্ত কোন প্রচলিত ভারতীয় ভাষার কোন বই পৃথিবীর প্রায় সব সভ্য ভাষায় অনুবাদিত হয় নি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কোন-না-কোন বই পৃথিবীর প্রায় সকল সভ্য ভাষায় অনুবাদিত হয়েছে। শান্তিনিকেতনে সেই সমস্ত বইয়ের এক এক কপি রক্ষিত আছে। এটা বাংলা ভাষার পক্ষে কম গৌরবের কথা নয়। আমাদের অন্য মনীষীরা যদি তাঁদের অন্ততঃ কোন কোন বই বাংলাভাষায় লেখেন তা হলে বাংলার অনেক উন্নতি হয়। বাঙালীর মাথা থেকে যে চিন্তা বেরিয়েছে তার প্রভাব পৃথিবীর অনেক জায়গায় অনুভূত হচ্ছে, ইহা ভেবে সুখ হয়। আমার অনুরোধ, যে রকমই লেখক হোন না কেন, তাঁরা যেন তাঁদের, অন্ততঃ কতক বক্তব্য বাংলাভাষায় লেখেন। আমরা বাংলা লিখবো বাংলা বলব—এ ভাব সকল বাঙালীরই থাকা উচিত। বাংলা ভাষা যা'তে ভাল হয় তার চেষ্টা করা আমাদের আবশ্যক। অবশ্য বাংলা ভাষায় যা কিছু লেখা হয় তার সবই ভাল, বা সব লেখারই সদ্য সদ্য আদর হবে, তা নয়। এখন যার আদর নাই, ভবিষ্যতে এমন অনেক লেখার আদর হ'তে পারে। ভাল চিন্তা, ভাল ভাব, কাজের কথা—যার যা মনে আসে আমরা তা বলে যাই—ফল বিধাতার হাতে। ভাষার ব্যবহার করতে করতেই তার সমৃদ্ধি আসে।

কোন ভাষায় অল্প লোকে কথা বলে ব'লেই তার যে স্থায়িত্ব হয় না, তা নয়। ওয়েলস্ খুব ছোট দেশ। ইংরেজদের মধ্যে থেকেও ওয়েলসের লোকরা নিজেদের ভাষাকে আঁকড়ে আছে। এদের সভ্যতা ইংরেজদের চেয়ে পুরাতন। ভূতপূর্ব্ব প্রধান মন্ত্রী লয়েড্ জর্জ্জ এই ওয়েলসেরই লোক। খুব কম করেও এদের ভাষায় পাঁচ লাখ বই ছাপা হয়েছে। আমাদের বাংলা ভাষায় পাঁচ লাখ বই আছে কিনা জানি না। সমস্ত বাংলা বই কোথাও সংগৃহীত হয়েছে কিনা তাও জানি না।

আমাদের সকলেরই বাংলা ভাষার প্রতি একটা কর্ত্তব্য আছে। কথা ত বাংলায় বলবই, লিখবও কিছু। বাংলা ভাষাতে সকল প্রকার তথ্য সংগ্রহ করা উচিত। তা ছাড়া বই পড়ার অভ্যাস থাকা যেমন দরকার, বইয়ের অধিকারী হওয়াও তেমনি চাই। এই সম্পর্কে চার্ল্‌স্ ল্যাম্বের একটি গল্প মনে পড়ে গেল। একজন তাঁর এক বন্ধুর বাড়ী গিয়ে দেখেন যে বন্ধুর লাইব্রেরীতে অনেক সুন্দর সুন্দর বই রয়েছে। বন্ধুটি দুই একখানা বই পড়বার জন্য বাড়ী নিয়ে যেতে চাইলে তিনি বললেন, "আলমারী খুলে বইগুলো দেখ।" খুলে দেখেন, কোন বইয়ে তাঁর নিজের নাম নেই, সকল বইতে অপরের নাম লেখা। অতঃপর লাইব্রেরীর মালিক বললেন, "আমি যে বিদ্যায় এই লাইব্রেরী করেছি, তুমি যে সেই বিদ্যে আমার উপর চালাবে, তা হ'তে দেব না।" অর্থাৎ তিনি অনেকের কাছ থেকে পড়বার জন্য বই চেয়ে নিয়ে এসে আর ফেরৎ দেন নি। আমাদের দেশেও অনেকের এ অভ্যাস আছে। চাতুরী হিসাবে এ বিদ্যা মন্দ নয়। তবে এ বুদ্ধি সকলের হলে গ্রন্থকারদের দশা কি হবে? সবাই বুদ্ধিমান হ'লে কি হয় তার একটা গল্প আছে। এক রাজা রাজ্যে একটা দুধের পুকুর তৈরি করবার জন্যে প্রধান মন্ত্রীকে দিয়ে রাজ্যে হুকুম দেওয়ালেন যে, প্রত্যেক প্রজা বিশেষস্থানে অবস্থিত এক নূতন পুকুরে রাত্রে এক ঘটি দুধ ঢেলে দিয়ে যাবে। পরদিন সকালে রাজা ও মন্ত্রী গিয়ে দেখলেন, পুকুর শুধু জলেই ভর্ত্তি, এক বিন্দুও দুধ নেই। প্রজারা সবাই ভেবেছিল, অন্য সকলে ত দুধ দেবে, আমি যদি এক ঘটি জল দিই, তা আর কে টের পাবে? সকল বুদ্ধিমান্ই একভাবে ভাবে। কাজেই দুধ আর কেউ ঢালে নি, সকলেই জল ঢেলে গেছে। সকলেই যদি বুদ্ধিমান হন, তা হ'লে লাইব্রেরীর মত প্রতিষ্ঠান চলবে না। ধার করবার লোকও পাবেন না, আর গ্রন্থকাররাও প্রায় সবাই আর বই লিখবেন না।

প্রতিভাশালী ব্যক্তিরা প্রত্যেকেই যদি আপনার মৌলিক চিন্তা বাংলা ভাষায় ব্যক্ত করেন, তা হ'লে অন্য জাতির লোকেরাও বাংলা শিখবেন। রবীন্দ্রনাথের বই পড়বার জন্য ইউরোপে কোন কোন উচ্চ-শিক্ষিত ব্যক্তি আগ্রহের সহিত বাংলা ভাষা শিখেছেন। রবীন্দ্রনাথ যখন ইউরোপে ছিলেন তখন ভ্রমণ করতে করতে আমরা চেকো-স্লোভাকিয়ার রাজধানী প্রাগ্ শহরে যাই। সেখানকার মেয়র রবীন্দ্রনাথের সম্বর্দ্ধনার্থে এক ভোজ দিয়েছিলেন। সেখানে অধ্যাপক লেজ্‌নী রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশে বাংলায় এক অভিনন্দন পাঠ করেন। সভার শেষে তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "আমার বক্তৃতা কেমন হ'ল? অনেক ভুল করি নি ত?" আমি বললাম, "ব্যাকরণে কোন দোষ হয় নি, তবে উচ্চারণ ঠিক্ হয় নি।" তিনি বললেন, "উচ্চারণ ঠিক্ হবে এ আশা আমি করি নি।" আমাদের ভাষার যত উন্নতি হবে জগতের কাছে আমরাও তত উন্নত বলে পরিচিত হব।

বাংলা ভাষার নানাদিক দিয়ে উন্নতি করা চাই। এখনও অনেক বিষয়ে লেখবার বাকী আছে। এতদিন পর্য্যন্ত আমাদের বাংলা ভাষায় প্রধানতঃ কেবল কাব্য উপন্যাসেরই উন্নতি হয়েছে। কতকগুলি ভাল কাব্য ও ভাল উপন্যাস লেখা হয়েছে। অন্য ভাষায় লিখিত ঐ জাতীয় পুস্তকের চেয়ে তারা নিকৃষ্ট নয়, বরং কতকগুলি তাদের চেয়ে উৎকৃষ্ট। এখন অন্যদিকেও উন্নতির প্রয়োজন আছে। বাংলা ভাষায় এমন সব বই থাকা দরকার যা'তে কেবল বাংলা পড়েই, যাকে কালচার বা কৃষ্টি বলে, তা আমরা পেতে পারি। মাতৃভাষায় লিপিবদ্ধ কোন বিষয় পাঠ করলে তা আমাদের যেমন অস্থিমজ্জাগত হয় অন্য ভাষার ভিতর দিয়ে সেরূপ হয় না। যে সমস্ত বিষয়ে নূতন পারিভাষিক শব্দ চাই, সংস্কৃতের সাহায্যে আমাদের সেই সমস্ত নূতন শব্দ সৃষ্টি করতে হবে। এই সম্পর্কে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সংস্কৃত সম্বন্ধে যা স্থির করেছেন তার সম্বন্ধে দুই এক কথা বলবো। এঁরা স্থির করেছেন, সংস্কৃত এখন থেকে প্রবেশিকায় স্বেচ্ছাশিক্ষণীয় বিষয়ের মধ্যে পরিগণিত হবে। তার ফল এই হবে, এর পরে অল্প ছাত্রই সংস্কৃত পড়বে। আমি এরূপ ব্যাপারের বিরোধী। এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আমার কথা হয়েছিল। তাঁরও মত, সংস্কৃতকে স্বেচ্ছাশিক্ষণীয় করলে ক্ষতি হবে। বিজ্ঞান, ডাক্তারী প্রভৃতি বিষয়ে বই লিখতে গেলেও নূতন কথা সৃষ্টি করতে হবে। অবশ্য যেগুলা চলে গেছে, তাকে আর নূতন করে তৈরি করবার দরকার নেই। নূতন কথা তৈরি করতে গেলে সংস্কৃত জানতে হবে। এটা ঠিক কথা, আজ পর্য্যন্ত বাংলার সম্পূর্ণ কোনো ব্যাকরণ প্রকাশিত হয় নি। রাজা রামমোহন রায় নিজের লেখা "গৌড়ীয় ব্যাকরণ" প্রকাশ করেছিলেন। আধুনিক কালে রাজশেখরবাবুর "চলন্তিকা" একখানি ভাল বাংলা অভিধান। তিনি অভিধানের সঙ্গে একটু একটু ব্যাকরণও জুড়ে দিয়েছেন। কিন্তু খাঁটি বাংলার ব্যাকরণ লিখতে গেলেও তার কতকটা সংস্কৃতের ব্যাকরণও হবে; কারণ, বাংলার সঙ্গে সংস্কৃতের খুব ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। বাংলা ভাষাকে ভাল ক'রে জানতে ও গড়তে গেলে সংস্কৃত শিখতে হবে।

মূল থেকে রস সংগ্রহ ক'রে গাছ সতেজ হয়। তেমনি অতীত থেকে আমাদিগকে পরিপুষ্টির উপায় খুঁজতে হবে। কোন জাতির সভ্যতা জানতে হ'লে, তার অতীতের সঙ্গে পরিচয় থাকা উচিত। সেই জন্যে সংস্কৃত পড়া উঠালে চলবে না। যখন শিশুর হাতেখড়ি হয়, তখন তাকে কি আমরা জিজ্ঞাসা করি, "তুমি এ-কোর্স্ নেবে, না বি-কোর্স্ নেবে?" বড় না হ'লে পাঠ্যবিষয় নির্ব্বাচন করবার শক্তি কার হয় না। ম্যাট্রিকুলেশন পর্য্যন্ত যে অল্প সংস্কৃত ছেলেদের শিখান হয় তা হোক্, পরে বাদ দিতে হয় তারাই দেবে। সংস্কৃত ভাষাকে গোড়া থেকেই বাদ দেওয়া উচিত নয়।

[অনুলেখক শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়]

অপরাজিত

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

২৯

শশীনারায়ণ বাঁড়ুয্যে প্রণবের নিকট জামাই-এর যথেষ্ট নিন্দা করিলেন—বন্ধুর সঙ্গে বিয়ের যোগাযোগটি তো ঘটিয়েছিলে, ভেবে ভ্যাখো তো সে আজ পাঁচ বচ্ছরের মধ্যে নিজের ছেলেকে একবার চোখের দেখা দেখতে এল না, ত্রিশ চল্লিশ টাকা মাইনের চাকুরি করচেন আর ঘুরে বেড়াচ্চেন ভবঘুরের মত, চাল নেই চুলো নেই, কোনো জন্মে যে করবেন সে আশাও নেই—বলো না, হাড়ে চটেচি আমি—এদিকে ছেলেটিও কি অবিকল তাই!...এই বয়েস থেকেই তেম্‌নি নির্ব্বোধ, অথচ যেম্‌নি চঞ্চল, তেম্‌নি একগুয়ে। চঞ্চল কি একটু আধটু। ঐটুকু তো ছেলে, একদিন করেচে কি, একদল গরুর গাড়ীর গাড়োয়ানের সঙ্গে চলে গিয়েচে সেই পীরপুরের বাজারে—এদিকে আমরা খুঁজে পাইনে, চারিদিকে লোক পাঠাই—শেষে মাখন মুহুরীর সঙ্গে দেখা, সে ধরে নিয়ে আসে। খাওয়াও, দাওয়াও, মেয়ের ছেলে কখনও আপনার হয় না, যে পর সে-ই পর।

খোকা বাপের মত লাজুক ও মুখচোরা—কিন্তু প্রণবের মনে হইল এমন সুন্দর ছেলে সে খুব কম দেখিয়াছে। সারা গা বহিয়া যেন লাবণ্য ঝরিতেছে, সদাসর্ব্বদা মুখ টিপিয়া কেমন এক করুণ, অপ্রতিভ ধরণের হাসি হাসে—মুখখানা এত লাজুক ও অবোধ দেখায় সে সময়।... কেমন যে একটা করুণা হয়। এখানে কয়েক দিন থাকিয়া প্রণব বুঝিয়াছে দিদিমা মারা যাওয়ার পরে এ বাড়িতে বালককে যত্ন করিবার আর কেহ নাই—সে কখন খায়, কখন শোয়, কি পরে এ সব বিষয়ে বাড়ির কাহারও দৃষ্টি নাই। শশীনারায়ণ বাঁড়ুয্যে তো নাতিকে দুচক্ষে দেখিতে পারেন না, সর্ব্বদা কড়া শাসনে রাখেন। তাঁহার বিশ্বাস এখন হইতে শাসন না করিলে এ-ও বাপের মত ভবঘুরে হইয়া যাইবে, অথচ বালক বুঝিয়া উঠিতে পারে না, দাদামশায় কেন তাহাকে অমন উঠিতে তাড়া, বসিতে তাড়া দেন—ফলে সে দাদামশায়কে যমের মত ভয় করে, তাঁর ত্রিসীমানা দিয়া হাঁটিতে চায় না।

*　　*　　*

কাজলের মুস্কিল বাধে রোজ সন্ধ্যার সময়। খাওয়া-দাওয়া হইয়া গেলে তাহার মামীমা বলে, ওপরে চলে যাও, শুয়ে পড় গিয়ে। কাজল বিপন্নমুখে রোয়াকের কোণে দাঁড়াইয়া শীতে ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতে থাকে। ওপরে কেউ নাই, মধ্যে একটা অন্ধকার সিঁড়ি, তাহার উপর দোতলার পাশের ঘরটাতে আল্‌নায় একরাশ লেপকাঁথা বাঁধা আছে। আধ-অন্ধকারে সেগুলা এমন দেখায়।

আগে আগে দিদিমা সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়া ঘুম পাড়াইয়া রাখিয়া আসিত। দিদিমা আর নাই, মামীমারা খাওয়াইয়া দিয়াই খালাস। সেদিন সে সেজ দিদিমাকে বলিয়াছিল। তিনি ঝঙ্কার দিয়া বলিয়া উঠিলেন, আমার তো আর খেয়ে দেয়ে কাজ নেই, এখন তোমায় যাই শোওয়াতে। একা একটু আর যেতে পারেন না, সেদিন তো পীরপুরের হাটে একা পালিয়ে যেতে পেরেছিলে? ছেলের ন্যাকরা দেখে বাঁচিনে।

নিরুপায় হইয়া ভয়ে ভয়ে সিঁড়ি বাহিয়া উপরে ওঠে। কিন্তু ঘরে ঢুকিতে আর সাহস না করিয়া প্রথমটা দোরের কাছে দাঁড়াইয়া থাকে। কোণে কড়ির আল্‌নার নীচে দাদামশায়ের একরাশ পুরানো হুঁকার খোল ও হুঁকা-দান। এককোণে মিট্‌মিটে তেলের প্রদীপ, তাতে সামান্য একটুখানি আলো হয় মাত্র, কোণের অন্ধকার তাতে আরও যেন সন্দেহজনক দেখায়। এখানে একবার আসিলে আর কেহ কোথাও নাই, ছোট মামীমা নাই, ছোটদিদিমা নেই, দলু নাই, টাটি নাই—শুধু সে আর চারিপাশের এই-সব অজানা বিভীষিকা। কিন্তু এখানে

সে কতকক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিবে? ছোট মাসীমা ও বিন্দু ঝি এ-ঘরে শোয়, তাহাদের আসিতে এখনও বহু দেরী, শীতের হাওয়ায় হাড় কাঁপুনি ধরিয়া যায় যে! অগত্যা সে অন্যান্য দিনের মত চোখ বুজিয়া ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া নিজের বিছানার উপর উঠিয়াই ছোট লেপ্‌টা টানিয়া একেবারে মুড়ি দিয়া ফেলে। কিন্তু বেশীক্ষণ লেপ মুড়ি দিয়া থাকিতে পারে না—ঘরের মধ্যে কোনো কিছু নাই তো? মুখ খুলিয়া একবার ভীতচোখে চারিধারে চাহিয়া দেখিয়া আবার লেপ মুড়ি দেয়। আর যত রাজ্যের ভূতের গল্প কি ঠিক ছাই এই সময়টাতেই মনে আসে?

দিদিমা থাকিতে এ-সব কষ্ট ছিল না। দিদিমা তাহাকে ঘুম না পাড়াইয়া নামিত না। কাজল উপরে দিদিমার গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিত, এইবার এক্‌তা গ-গ-অ প্প-। কথার শেষের দিকে পাৎলা রাঙা ঠোঁট দুটি ফুলের কুঁড়ির মত এক জায়গায় জড় করিয়া না আনিলে কথা মুখ দিয়া বাহির হইত না। তাহার দিদিমা হাসিয়া বলিত—যে গুড় খাস্, গুড় খেয়ে খেয়ে এম্‌নি তোৎলা। গল্প বল্‌ব, কিন্তু তুমি পাশ ফিরে চুপটি করে শোবে, নড়্‌বেও না, চড়্‌বেও না। কাজল ভ্রূ কুঁচ্‌কাইয়া ঘাড় সামনের দিকে নামাইয়া থুৎনী প্রায় বুকের উপর লইয়া আসিত পরে চোখের ভুরু উপরের দিকে উঠাইয়া হাসি-ভরা চোখে চুপ করিয়া দিদিমার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিত। দিদিমা বলিত, দুষ্টুমি করো না দাদাভাই, আমার এখন অনেক কাজ, তোমার দাদু আবার এখুনি পাশার আড্ডা থেকে আস্‌বেন, তাঁকে খেতে দেব। ঘুমোও তো লক্ষ্মী ভাইটি?

কাজল বলিত, ইল্লি!··· দা-দা দাদুকে খাবার দেবে তো ছোট মাসীমা তু-তুমি এখন যাবে বৈ কি?··· এক্‌তা গ গ-অ-প্প কর, হ্যাঁ দিদিমা—

এ ধরণের কথা সে শিখিয়াছে বড় মাস্‌তুতো ভায়েদের কাছে। তাহার বড় মাসীমার ছেলে দলু কথায় কথায় বলে ইল্লি! কাজলও শুনিয়া শুনিয়া তাহাই ধরিয়াছে।

তাহার পর দিদিমা গল্প করিত, কাজল জানালার বাহিরে তারাভরা, স্তব্ধ, নৈশ আকাশের দিকে চাহিয়া একবার মুখ ফুলাইত, আবার হাঁ করিত, আবার ফুলাইত আবার হাঁ করিত। দিদিমা বলিত, আঃ ছিঃ দাদু। ও-রকম দুষ্টুমি করলে ঘুমুবে কখন? এখুনি তোমার দাদু ডাক্‌বেন আমায়, তখন তো আমায় যেতে হবে। চুপ্‌টি করে শোও। নইলে ডাক্‌ব তোমার দাদুকে?

দাদামশায়কে কাজল বড় ভয় করে, এই বার সে চুপ হইয়া যাইত।

কোথায় গেল সেই দিদিমা। আজকাল আর কেহ কাছে বসিয়া খাওয়ায় না, সঙ্গে করিয়া উপরে লইয়া আসে না, গল্পও করে না। একলাটি এই অন্ধকারের মধ্যে দিয়া আসিয়া উপরের ঘরে শুইতে হয়। সকলের চেয়ে মুস্কিল হইয়াছে এটাই বেশী কি-না?

(৩০)

আরও একবৎসর কাটিয়া গিয়াছে। চৈত্র মাস যায় যায়।

অপু অনেকদিন পরে দেশে ফিরিতেছিল। গাড়ীর মধ্যে একজন মুসলমান ভদ্রলোক লক্ষ্ণৌএর খরমুজার গুণবর্ণনা করিতেছিল, অনেকে মন দিয়া শুনিতেছিল—অপু অন্যমনস্কভাবে জানালার বাহিরে চাহিয়াছিল। কতক্ষণে গাড়ী বাংলা দেশে আসিবে? সাতসমুদ্র তেরোনদী পারের রূপকথার রাজ্য বাংলা! আজ দীর্ঘ সাড়ে পাঁচ বৎসর সে বাংলার শান্ত, কমনীয় রূপ দেখে নাই, এই বৈশাখে বাঁশের বনে বনে শুক্‌নো বাঁশখোলার তলা-বিছাইয়া পড়িয়া-থাকা, কাঞ্চনফুলে ভরা সান-বাঁধান পুকুরের ঘাটে সদ্যস্নাত নতমুখী তরুণীর মূর্ত্তি—কলিকাতার মেস্-বাটী, দালানের রেলিংএ কাপড় মেলিয়া দেওয়া, বাবুরা সব আপিসে, নীচের বাল্‌তিতে বৈকাল তিনটার সময় কলের মুখ হইতে জল পড়িতেছে—এ সব সুপরিচিত প্রিয় দৃশ্যগুলি আর একবার দেখিবার জন্য—উঃ মন কি ছটফটই না করিয়াছে গত ছ'বছর! বাংলা ছাড়িয়া সে ভাল করিয়া বাংলাকে চিনিয়াছে, বুঝিয়াছে। কতক্ষণে বাংলাকে দেখা যাইবে আজ? সন্ধ্যা ঠিক সাতটার সময়?

রাণীগঞ্জ ছাড়িয়া অনেক দূর আসিবার পরে বালুম

মাঠের মধ্যে সিঙ্গারণ নদীর গ্রীষ্মের খররৌদ্রে জল শুকাইয়া গিয়াছে—দূর গ্রামের মেয়েরা আসিয়া নদীখাতের বালু খুঁড়িয়া সেই জলে কলসী ভর্ত্তি করিয়া লইতেছে—একটি কৃষক-বধূ জল-ভরা কলসী কাঁখে রেলের ফটকের কাছে দাঁড়াইয়া গাড়ী দেখিতেছে—অপু দৃশ্যটা দেখিয়া পুলকিত হইয়া উঠিল—সারা শরীরে একটা অপূর্ব্ব আনন্দ-শিহরণ! কতদিন বাংলার মেয়ের এ পরিচিত ভঙ্গিটি সে দেখে নাই! চোখ, মন জুড়াইয়া গেল।

বর্দ্ধমান ছাড়াইয়া নিদাঘ অপরাহ্নের ঘন ছায়ায় একটা অদ্ভুত দৃশ্য চোখে পড়িল। একটা ছোট পুকুর ফুটন্ত পদ্মফুলে একেবারে ভরা, ফুলে পাতায় জল দেখা যায় না—ওপারে বিচালী-ছাওয়া গৃহস্থের বাটী, একটা প্রাচীন সজিনা গাছ জলের ধারে ভাঙিয়া পড়িয়া গলিয়া খসিয়া যাইতেছে, একটা গোবরগাদা—আজ সারাদিনের আগুন-বৃষ্টির পরে, বিহার ও সাঁওতাল পরগণার বন্ধুর, আগুন রাঙা ভূমিশ্রীর পরে ছায়া-ভরা পদ্মপুকুরটা যেন সারা বাংলার কমনীয় রূপের প্রতীক হইয়া তাহার চোখে দেখা দিল।

হাওড়া ষ্টেশনে ট্রেনটা আসিয়া দাঁড়াইতেই সে যেন খানিকটা অবাক্ হইয়া চারিদিকে চাহিয়া দেখিল—এত আলো, এত লোকজন, এত ব্যস্ততা, এত গাড়ী-ঘোড়া জীবনে যেন সে এই প্রথম দেখিতেছে। হাওড়া পুল পার হইবার সময় ওপারের আলোকোজ্জ্বল মহানগরীর দৃশ্যে সে যেন মুগ্ধ হইয়া গেল—ও-গুলা কি? মোটর বাস? কই আগে তো ছিল না কখনও? কি বড় বড় বাড়ী কলিকাতায়, ফুটপাথে কি লোকজনের ভিড়! বাড়ীর মাথায় একটা কিসের বিজ্ঞাপনের বিজলি আলোর রঙীন্ হরপ একবার জ্বলিতেছে, আবার নিবিতেছে—উঃ, কী কাণ্ড!

হ্যারিসন্ রোডের একটা বোর্ডিংএ উঠিয়া একা একটা ঘর লইল—স্নানের ঘর হইতে সাবান মাখিয়া স্নান সারিয়া সারাদিনের ধূমধূলি ও গরমের পর ভারী আরাম পাইল। ঘরের আলোর সুইচ টিপিয়া ছেলেমানুষের মত আনন্দে আলোটাকে একবার জ্বালাইতে একবার নিবাইতে লাগিল—সবই নতুন মনে হয়। সবই অদ্ভুত লাগে।

পরদিন সে কলিকাতার সর্ব্বত্র ঘুরিল—কোনো পরিচিত বন্ধুবান্ধবের সহিত দেখা হইল না। বৌবাজারের সেই কবিরাজ বন্ধুটি বাসা উঠাইয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে, পূর্ব্বপরিচিত মেসগুলিতে নতুন লোকেরা আসিয়াছে, কলেজ স্কোয়ারের সেই পুরাতন চায়ের দোকানটি উঠিয়া গিয়াছে।

সন্ধ্যার সময় সে একটা নতুন বাংলা থিয়েটারে গেল শুধু বাংলা গান শোনার লোভে। বেশী দামের টিকিট কিনিয়া রঙ্গমঞ্চের ঠিক সম্মুখের সারির আসনে বসিয়া পুলকিত ও উৎসুক চোখে সে চারিধারের দর্শকের ভিড়টা দেখিতেছিল। একটা অঙ্কের শেষে সে বাহিরে আসিল, ফুটপাথে একজন বুড়ী পান বিক্রী করিতেছে, অপুকে বলিল, বাবু, পান নেবেন্ না, নেন না। অপু ভাবিল সবাই মিঠে পান কিন্‌চে বড় আয়নাওয়ালার দোকান থেকে। এ বুড়ীর পান বোধ হয় কেউ কেনে না—আহা, নিই এর কাছ থেকে।

সকলেরই উপর কেমন একটা করুণার ভাব, সবারই উপর কেমন একটা ভালবাসা, সহানুভূতির ভাব—অপুর মনের বর্ত্তমান অবস্থায় বুড়ী পানওয়ালী হাত পাতিয়া দশটা টাকা চাহিয়া বসিলেও সে তৎক্ষণাৎ তাহা দিতে পারিত।

দ্বিতীয় অঙ্কের শেষে সে আবার বাহির হইয়া বুড়ীটার কাছে পান কিনিতে যাইতেছে, এমন সময় পিছনের আসনের দিকে তাহার নজর পড়িল।

সে একটু আগাইয়া গিয়া কাঁধে হাত দিয়া বলিল, সুরেশ্বর-দা, চিন্‌তে পারেন?

কলিকাতায় প্রথম ছাত্র-জীবনের সেই উপকারী বন্ধু সুরেশ্বর, সঙ্গে একটি তরুণী মহিলা। সুরেশ্বর মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—গুডনেস্ গ্রেশাস! আমাদের সেই অপূর্ব্ব না?

অপূর্ব্ব হাসিয়া বলিল—কেন সন্দেহ হচ্ছে না কি? ওঃ, কতদিন পরে আপনার সঙ্গে, ওঃ?

—দেখে সন্দেহ হবার কথা বটে, মুখের চেহারা বদ্‌লেচে, রংটা একটু তামাটে—যদিও you are as handsome as ever—ও তোমার সঙ্গে আলাপ করে দিই নি—ইনি

আমার বেটার হাফ—আর ইনি আমার বন্ধু অপূর্ব্ব বাবু—কবি, ভাবুক, লেখক, ভবঘুরে এ্যাণ্ড হোয়াট নট—আমি তোমার অনেক খবরই রাখি হে—জানকী লেখে তোমার কথা, তারপর কোথায় ছিলে এতদিন ?

—কোথায় ছিলুম না তাই বরং জিজ্ঞেস করুন—In all sorts of places—তবে সভ্য জগতে থেকে দূরে। ছ' বছর পরে কাল কলকাতায় এসেচি। ও ড্রপ উঠল বুঝি, এখন থাক, বলব এখন।

—মোষ্ট বাজে প্লে। তার চেয়ে চল, তোমার সঙ্গে বাইরে যাই,অপু বন্ধুকে সিগারেট দিয়া নিজে সিগারেট ধরাইতে ধরাইতে বলিল—আপনার এ-সব দেখে এক-ঘেয়ে হয়ে গিয়েছে, তাই ভাল লাগচে না বোধ হয়। আমার চোখ নিয়ে যদি দেখতেন, তবে ছ'বছর বনবাসের পরে উড়েদের রামযাত্রাও ভাল লাগত। জানেন সুরেশ্বর-দা, সেখানে আমার ঘর থেকে কিছু দূরে এক জায়গায় একটা গিরগিটি থাকতো—সেটা এবেলা ওবেলা রং বদ্‌লাত, ছুটি বেলা তাই সখ করে দেখতে যেতুম—তাই ছিল একমাত্র তামাসা, তাই দেখে আনন্দও পেতুম।

তারপর সে থিয়েটার-ঘর হইতে নিঃসৃত সুবেশ নরনারীর স্রোতের দিকে চাহিয়া রহিল—এই আলো, লোকজন, সাজানো দোকানপসার—এসব সে ছেলে-মানুষের মত আনন্দে চাহিয়া চাহিয়া দেখিতেছিল।

স্ত্রীকে মাণিকতলায় শ্বশুরবাটীতে নামাইয়া দিয়া সুরেশ্বর অপুর সহিত ধর্ম্মতলার এক রেষ্টরেন্টে গিয়া উঠিল। অপুর কথা সব শুনিয়া বলিল—এই পাঁচ বছর ও-খানে ছিলে ? মন কেমন করত না দেশের জন্যে ?

—Oh, at times I felt so terribly homesick—homesick for Bengal—শেষ দু-বছর দেশ দেখতে ইচ্ছে হত—

সুরেশ্বরও নিজের কথা বলিল। চট্টগ্রাম অঞ্চলে কোনো কলেজের অধ্যাপক, বিবাহ করিয়াছে কলিকাতায়। সম্প্রতি শালীর বিবাহ উপলক্ষে আসিয়াছে। বলিল—দ্যাখো ভাই, তোমার ও জীবন একবার আস্বাদ করতে ইচ্ছে হয়—কিন্তু তখন কি জানতুম বিয়ে এমন জিনিষ হয়ে দাঁড়াবে ?

অপু হাসিয়া বলিল—ওঃ, আমি ভাবচি আপনার এ লেক্‌চার যদি বৌদি শুনতেন !···

—না না, শোনো। সত্যি বলৃচি, সে উনিশ-শো পনেরো সালের সুরেশ্বর আর নই আমি। সংসারের হাড়ি-কাঠে যৌবন গিয়েচে, শক্তি গিয়েচে, স্বপ্ন গিয়েচে, জীবনটা বৃথা খুইয়েচি—কত কি করবার ইচ্ছে ছিল—ওঃ, যেদিন এম্-এ ডিপ্লোমাটা নিয়ে গাউন সমেত এক দোকানে গিয়ে ফটো ওঠালুম, কি খুসা ! মনে হ'ল, সারা পৃথিবীটা আমার পায়ের তলায় ! ফটোখানা আজও আছে—চেয়ে দেখে ভাবি, কি হয়ে দাঁড়িয়েচি ! পাড়া-গাঁয়ের কলেজে তিন-শো চব্বিশদিন একই কথা আওড়াই, দলাদলি করি, প্রিন্সিপ্যালের মন যোগাই, স্ত্রীর সঙ্গে ঝগড়া করি, ছেলেদের ডাক্তার দেখাই, এর মধ্যে মেয়ের বিয়ের ভাবনাও ভাবি—না না, তুমি হেসো না, এসব ঠাট্টা নয় অপু বলিল—এত সেন্টিমেণ্টাল হয়ে পড়লেন কেন হঠাৎ সুরেশ্বর-দা—এক পেয়ালা কাফি—

—না না, তোমাকে পেয়ে সব বললুম, কারুর কাছে বলিনে, কে বুঝবে ? তারা সবাই দেখচে দিব্যি চাকরী করচি, মাইনে বাড়চে। তবে ত বেশই আছি।

—এ নিয়ে কথা এখন মিটবে না। আমি আপনার সঙ্গে একমত হতে পারচি নে। কেন, তা এখন গুছিয়ে বলতে পারব না সুরেশ্বর-দা।

রেষ্টরেণ্ট হইতে বাহির হইয়া পরপর বিদায় লইল। অপু বলিল—জীবনটা অদ্ভুত জিনিষ সুরেশ্বর-দা—অত সহজে তাকে উড়িয়ে দেওয়া চলে না। আপনি কি দিয়ে বিচার করবেন তার values ? আচ্ছা, আসি, বড় আনন্দ পেলুম আজ। যখন প্রথম কলিকাতায় পড়তে আসি, জায়গা ছিল না, তখন আপনারা জায়গা দিয়েছিলেন, সে কথা ভুলিনি এখনও।

পরদিন দুপুর পর্য্যন্ত ঘুমাইয়া কাটাইল। বৈকালের দিকে ভবানীপুরে লীলার মামার বাড়ী গেল। অনেক দিন সে লীলার কোনো সংবাদ জানে না—দূর হইতে লাল ইটের বাড়ীটা চোখে পড়িতেই একটা আশা ও উদ্বেগে বুক ঢিপ ঢিপ করিয়া উঠিল। লীলা এখানে আছে, না নাই, যদি গিয়া দেখে সে আছে। সেই একদিন দেখা

হইয়াছিল অপর্ণার মৃত্যুর পূর্ব্বে। আজ আট বৎসর হইতে চলিল—এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে আর কোনো দিন দেখা হয় নাই।

প্রথমেই দেখা হইল লীলার ভাই বিমলেন্দুর সঙ্গে। সে আর বালক নাই, খুব লম্বা হইয়া পড়িয়াছে, মুখের চেহারা অন্য রকম দাড়াইয়াছে। বিমলেন্দু প্রথমটা যেন অপুকে চিনিতে পারিল না, পরে চিনিয়া বৈঠকখানার পাশের ঘরে লইয়া গিয়া বসাইল। দু-পাচ মিনিট এ কথা ও কথার পরে অপু যতদূর সম্ভব সহজস্বরে বলিল—তারপর তোমার দিদির খবর কি—এখানে, না শ্বশুর-বাড়ী?

বিমলেন্দু কেমন একটা আশ্চর্য্য সুরে বলিল—ও, ইয়ে আসুন আমার সঙ্গে—চলুন।

কেমন একটা অজানা আশঙ্কায় অপুর মন ভরিয়া উঠিল, ব্যাপার কি? একটু পরে গিয়া বিমলেন্দু রাস্তার মোড়ে দাড়াইয়া নীচু স্বরে বলিল—দিদির কথা কিছু শোনেননি আপনি? অপু উদ্বিগ্নমুখে বলিল—না—কি? লীলা আছে তো?

—আছেও বটে, নেইও বটে। সে সব অনেক কথা, আপনি ফ্যামিলির ফ্রেণ্ড বলে বল্‌চি। দিদি ঘর ছেড়েচে। স্বামী গোড়া থেকেই ঘোর মাতাল—অতি কুচরিত্র। বেণ্টিঙ্ক ষ্ট্রীটের এক ইহুদী মেয়েকে নিয়ে বাড়াবাড়ি আরম্ভ করে দিলে—তাকে নিজের বাসাতে রাত্রে নিয়ে যেতে সুরু করে দিলে। দিদিকে জানেন তো? তেজী মেয়ে, এ সব সহ্য করার পাত্র নয়—সেই রাত্রেই ট্যাক্সি ডাকিয়ে পদ্মপুকুরে চলে আসে নিজের ছোট মেয়েটাকে নিয়ে। মাস দুই পরে এক দিন দাদাবাবু এল, মেয়েকে সিনেমা দেখাবার ছুতো করে নিয়ে গেল জব্বলপুরে—আর দিদির কাছে পাঠায় না। তারপর দিদি যা করেচে সে যে আবার দিদি করতে পারত তা কখনো কেউ ভাবে নি। হীরক সেনকে মনে আছে? সেই যে ব্যারিষ্টার হীরক সেন, আমাদের এখানে পার্টিতে দেখেচেন অনেকবার। সেই হীরক সেনের সঙ্গে দিদি এক দিন নিরুদ্দেশ হয়ে গেল। এক বৎসর কোথায় রইল—আজকাল ফিরে এসেচে, কিন্তু হীরক সেনকে ছেড়েচে। একা বালিগঞ্জে বাড়ী ভাড়া নিয়ে থাকে। এ বাড়ীতে তার নাম আর করবার উপায় নেই। মা কাশীবাসিনী হয়েচেন, আর আস্‌বেন না।

কথা শেষ করিয়া বিমলেন্দু নিজেকে একটু সংযত করার জন্যেই বোধ হয় একটু চুপ করিয়া রহিল। পরে বলিল, হীরক সেন কিছু না—এ শুধু তার একটা শোধ তোলা মাত্র, সেন তো শুধু উপলক্ষ্য। আচ্ছা, তবে আসি অপূর্ব্ব বাবু, এখন কিছু দিন থাক্‌বেন তো এখানে? বিমলেন্দু চলিয়া যায় দেখিয়া অপু কথা খুঁজিয়া পাইল, তাড়াতাড়ি তাহার হাতখানা ধরিয়া অকারণে বলিল, শোনো, শোনো, হ্যা, লীলা বালিগঞ্জে আছে তা হ'লে?

এ প্রশ্ন সে করিতে চাহে নাই, সে জানে এ প্রশ্নের কোনো অর্থ নাই। কিন্তু এক সঙ্গে এত কথা জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হইতেছিল—কোন্‌টা সে জিজ্ঞাসা করিবে?

বিমলেন্দু বলিল, এতে আমাদের যে কি মর্ম্মান্তিক—বর্দ্ধমানে আমাদের বাড়ীর সেই নিস্তারিণী ঝিকে মনে আছে? সে দিদিকে ছেলেবেলায় মানুষ করেচে, পূজোর সময় বাড়ী গেছলুম, সে ভেউ ভেউ করে কাঁদতে লাগল। সে বাড়ীতে দিদির নাম পর্য্যন্ত করবার জো নেই। রমেন দা আজকাল বাড়ীর মালিক, বুঝলেন না? দিদিও সুখে নেই, বলবেন না কাউকে, আমি লুকিয়ে যাই, এত কাঁদে মেয়ের জন্যে! হীরক সেন দিদির টাকাগুলো দুই হাতে উড়িয়েচে, আবার বলেছিল বিলেত বেড়াতে নিয়ে যাবে। সেই লোভ দেখিয়েই নাকি নাকি টানে—দিদি আবার তাই বিশ্বাস করত! জানেন তো দিদির ঝোঁক আছে, চিরকাল ইউরোপের বড় আর্ট গ্যালারী-গুলো দেখবার।

বিমলেন্দু চলিয়া যাইতে উদ্যত হইলে অপু আবার গিয়া তার হাত ধরিয়া বলিল—তুমি মাঝে মাঝে কোন্ সময়ে যাও? বিমলেন্দু বলিল রোজ যে যাই তা নয়। বিকেলে দিদি মোটরে বেড়াতে আসে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের সামনের মাঠে, ঐখানে দেখা করি।

বিমলেন্দু চলিয়া গেলে অপু অন্যমনস্কভাবে হাঁটিতে হাঁটিতে রসারোডে আসিয়া পড়িল—কি ভাবিতে ভাবিতে সে শুধুই হাঁটিতে লাগিল। পথের ধারে একটা পার্ক,

ছেলেমেয়েরা খেলা করিতেছে, দড়ি ঘুরাইয়া ছোট মেয়েরা লাফাইতেছে, সে পার্কটায় ঢুকিয়া একটা বেঞ্চের উপর বসিল। লীলার উপর রাগ বা অভিমান কোনোটাই হইল না, সে অনুভব করিল এত ভালবাসে নাই সে কোনোদিনই লীলাকে, এই আট বৎসরে লীলা তো তাহার কাছে অবাস্তব হইয়া পড়িয়াছে, তাহার মুখ পর্য্যন্ত ভাল মনে হয় না, অথচ মনের কোন্ গোপন অন্ধকার কোণে এত ভালবাসা সঞ্চিত হইয়া ছিল তাহার জন্য। সে ভাবিল ওর দাদামশায়ের যত দোষ, কে এ বিয়ে দিতে মাথার দিব্যি দিয়েছিল তাঁকে? বেচারী লীলা! সবাই মিলে ওর জীবনটা নষ্ট করে দিলে।

কিছু দিন কলিকাতায় থাকিবার পরে সে বাসা বদলাইয়া অন্য এক বোর্ডিংএ গিয়া উঠিল। পুরাণো দিনের কষ্টগুলা আবার সবই আসিয়া জুটিয়াছে—একা এক ঘরে থাকিবার মত পয়সা হাতে নাই, অথচ দুই তিনটি কেরানীবাবুর সঙ্গে এক ঘরে থাকা আজকাল তাহার পক্ষে একেবারেই অসম্ভব মনে হয়। লোক তাঁহারা ভালই, অপুর চেয়ে বয়স অনেক বেশী, সংসারী, ছেলেমেয়ের বাপ। ব্যবহারও তাহাদের ভাল। কিন্তু হইলে কি হয় তাঁহাদের মনের ধারা যে পথ অবলম্বনে গড়িয়া উঠিয়াছে অপু তাহার সহিত আদৌ পরিচিত নয়। সে নির্জ্জনতাপ্রিয়, একা চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে চায়, সেইটাই এখানে হইবার জো নাই। হয়ত সে বৈকালের দিকে বারান্দাটাতে সবে আসিয়া বসিয়াছে—কেশববাবু হুঁকা হাতে পিছন হইতে বলিয়া উঠিলেন—এই যে অপূর্ব্ব বাবু, একাটি বসে আছেন? চৌধুরী ব্রাদার্স বুঝি এখনও আপিস থেকে ফেরেন নি? আজ শোনেননি বুঝি মোহনবাগানের কাণ্ডটা? আরে রামোঃ—শুনুন তবে।

কলিকাতা তাহার পুরাতন রূপে আবার ফিরিয়া আসিয়াছে, সেই ধূলা, ধোঁয়া, গোলমাল, একঘেয়েমি, সঙ্কীর্ণতা, সব দিনগুলা এক রকমের হওয়া—সেই সব।

সে চলিয়া আসিত না, কিংবা হয়ত আবার এতদিনে চলিয়া যাইত, মুস্কিল এই যে মিঃ রায়-চৌধুরীও ওখানকার কাজ শেষ করিয়া কলিকাতায় ফিরিয়া একটি জয়েন্ট-ষ্টক কোম্পানী গড়িবার চেষ্টায় আছেন, অপুকে তাঁহার আপিসে কাজ দিতে রাজী হইয়াছেন। কিন্তু অপু বসিয়া বসিয়া ভাবিতেছিল গত ছ' বছরের জীবনের পরে আবার কি সে আপিসের ডেস্কে বসিয়া কেরানীগিরি করিতে পারিবে? এদিকে পয়সা ফুরাইয়া আসিল যে! না করিলেই বা চলে কিসে?

সেখানে থাকিতে এই ছয় বৎসরে যাহা হইয়াছিল, অপু বোঝে এখানে তা চব্বিশ বৎসরেও হইত না। আর্টের নতুন স্বপ্ন সেখানে সে দেখিয়াছে। ওখানকার সূর্য্যাস্তের শেষ আলোয় জনহীন প্রান্তরে জীবনের গভীর রহস্যময় সৌন্দর্য্যকে জানিয়াছে, সম্পূর্ণ নতুন ভাবে সে চিনিয়াছে জগতকে।

সে ভাবিয়াছিল এই সৌন্দর্য্যকে, জীবনের এই অপূর্ব্ব রূপকে যতদিন কালিকলমে বন্দী করিয়া দশজনের চোখের সাম্‌নে না ফুটাইতে পারিবে, তত দিন সে কিছুতেই ক্ষান্ত হইবে না। কত নিস্তব্ধ, তারাভরা রাত্রে গভীর বিস্ময়ের দৃষ্টিতে তাঁবুর বাহিরের ঘন, নৈশ অন্ধকারের দিকে চাহিয়া চাহিয়া এই প্রশ্নটাই মনে জাগিত—কি দিবে সে জগতকে? তার জীবনের কি কোনো উদ্দেশ্যই নাই? এই স্বপ্নকে হাতের নাগালে আঁকড়াইয়া পাওয়া যায় না?

দুঃখের নিশীথে তার প্রাণের আকাশে সত্যের যে নক্ষত্ররাজি উজ্জ্বল হইয়া ফুটিয়াছে, তাহা সে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়া যাইবে, জীবনকে সে কি ভাবে দেখিল তাহা লিখিয়া রাখিয়া যাইবে।

বহু দূর ভবিষ্যতের কত শত অনাগত বংশধরদের নরম ও কচিমুখের কথা মনে পড়িত, খোকার মুখের স্মৃতিটা কি অপূর্ব্ব প্রেরণাই দিত সে সময়। ওদেরও জীবনে কত দুঃখরাত্রের বিপদ আসিবে, কত সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইবে, তখন যুগান্তের এ-পার হইতে দৃঢ়হস্ত বাড়াইয়া দিতে হইবে, তাহাতে কতশত বিনিদ্র রজনীর মৌন জনসেবা একদিন সার্থক হইবে অপরের জীবনে।

ভবিষ্যৎ সম্বন্ধ কত আশঙ্কাও জাগে। যদি কেউ না পড়ে? আবার ভাবে পৃথিবীর কোন্ অতীতে আদিম যুগের শিল্পীদল দুর্গম গিরিগুহার অন্ধকারে

বৃষ, বাইসন, ম্যামথ আঁকিয়া গিয়াছিল—প্রাচীন দিনের বিস্মৃত প্রতিভা এত কাল পরে তার দাবি আদায় করিতেছে—নতুবা ক্যাণ্টাব্রিয়া, দর্দ্দঞ্র ও পিরেনিজের পর্ব্বতগুহাগুলায় দেশবিদেশের মনীষী ও ভ্রমণকারীদের এত ভিড় কিসের ?

নিজের প্রথম বইখানি—মনে কত চিন্তাই আসে। অনভিজ্ঞ মন সব তাতেই অবাক্ হইয়া যায়, সব তাতেই গাঢ় পুলক অনুভব করে।

* * * *

এই তাহার বই লেখার ইতিহাস।

* * * *

কিন্তু প্রথম ধাক্কা খাইল বইখানার পাণ্ডুলিপি হাতে দোকানে দোকানে ঘুরিয়া। অজ্ঞাতনামা লেখকের বই কেহ লওয়া দূরে থাকুক, ভাল করিয়া কথাও বলে না। একটা দোকান খাতা রাখিয়া যাইতে বলিল। দিন-পাঁচেক পরে তাহাদের একখানা পোষ্টকার্ড পাইয়া অপু ভাল কাপড় পরিয়া, জুতা বুরুশ করিয়া বন্ধুর চশমা ধার করিয়া দুরু দুরু বক্ষে সেখানে গিয়া হাজির হইল। অত ভাল বই তাহার—পড়িয়া হয়ত উহারা অবাক হইয়া গিয়াছে!

দোকানের মালিক প্রথমে তাহাকে চিনিতে পারিল না, পরে চিনিয়া বলিল—ও! ওহে সতীশ, এঁর সেই খাতাখানা এঁকে দিয়ে দাও তো—বড় আলমারীর দেরাজে দেখ।

অপুর কপাল ঘামিয়া উঠিল। খাতা ফেরৎ দিতে চায় কেন? সে বিবর্ণমুখে বলিল—আমার বইখানা কি—

না, নতুন লেখকের বই নিজের খরচে তাহারা ছাপাইবে না। তবে যদি সে পাঁচ শত টাকা খরচ দেয়, তবে সে অন্য কথা। অপু অত টাকা কখনও এক জায়গায় দেখে নাই।

পরদিন সকালে বিমলেন্দু অপুর বাসায় আসিয়া হাজির। বৈকালে পাঁচটার সময় ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের সাম্‌নের মাঠে লীলা আসিবে, বিশেষ করিয়া বলিয়া দিয়াছে তাহাকে লইয়া যাইতে।

বৈকালে বিমলেন্দু আবার আসিল। দুজনে মাঠে গিয়া ঘণ্টা খানেক অপেক্ষা করবার পরে বিমলেন্দু একটা হল্‌দে রঙের মোটর দেখাইয়া বলিল, ঐ দিদি আস্‌চে—আসুন গাছতলায়, গাড়ী পার্ক করবে, এখানে ট্রাফিক পুলিসে আজকাল বড় উৎপাত করে।

অপুর বুক ঢিপ্ ঢিপ্ করিতেছিল। কি বলিবে, কি বলিবে সে লীলাকে?

বিমলেন্দু আগে আগে, অপু পিছনে পিছনে। লীলা গাড়ী থেকে নামে নাই, বিমলেন্দু জানালার কাছে গিয়া বলিল—দিদি, অপূর্ব্ববাবু এসেচেন, এই যে। পরক্ষণেই অপু গাড়ীর পাশে দাঁড়াইয়া হাসিমুখে বলিল—এই যে, কেমন আছ লীলা?

সত্যই অপূর্ব্ব সুন্দরী! অপুর মনে হইল, যে-কবি বলিয়াছেন সৌন্দর্য্যই একটা মহৎ গুণ, যে সুন্দর তার আর কোনো গুণের দরকার করে না, তিনি সত্যদর্শী, অক্ষরে অক্ষরে তাঁর উক্তি সত্য।

তবুও আগের লীলা নাই, একটু মোটা হইয়া পড়িয়াছে, মুখের সে তরুণ লাবণ্য আর কই? মুখের পরিণত সৌন্দর্য্য ঠিক তাহার মা মেজবৌ-রাণীর এ বয়সে যাহা ছিল তাই, সেই ছেলেবেলায় বর্দ্ধমানের বাটীতে দেখা মেজবৌ-রাণীর মুখের মত। উদ্দাম, লালসামাখা সৌন্দর্য্য নয়—শান্ত, বরং যেন কিছু বিষণ্ণ।

বাড়ীর বাহির হইয়া গিয়াছে যে-মেয়ে, তার ছবির সঙ্গে অপু কিছুতেই এই বিষণ্ণনয়না দেবীমূর্ত্তিকে খাপ খাওয়াইতে পারিল না। লীলা ব্যস্ত হইয়া হাসিমুখে বলিল—এস, অপূর্ব্ব এস। তুমি তো আমাদের ভুলেই গিয়েচ একেবারে, উঠে এসে বসো। চল, তোমাকে একটু বেরিয়ে নিয়ে আসি। শোভা সিং, লেক্—

লীলা মধ্যে বসিল, ও-পাশে বিমলেন্দু, এ-পাশে অপু। অপুর মনে পড়িল বাল্যকালে ছাড়া লীলার এত কাছে সে আর কখনও বসে নাই। লীলা অনর্গল বকিতেছিল, নানা রকম মোটরগাড়ীর তুলনামূলক সমালোচনা করিতেছিল, মাঝে মাঝে অপুর সম্বন্ধে এটা-ওটা প্রশ্ন করিতেছিল। লেক দেখিয়া অপু নিরাশ হইল।

সে মনে মনে ভাবিল—এই লেক্! এরই এত নাম! এ কল্‌কাতার বাবুদের ভাল লাগ্‌তে পারে—ভারী তো! লীলা আবার এরই এত সুখ্যাতি করছিল—আহা, বেচারি কল্‌কাতা ছেড়ে কখনও কোথাও তো যায় নি! লীলা পাছে অপ্রতিভ হয় এই ভয়ে সে নিজের মতটা আর ব্যক্ত করিল না।

হঠাৎ লীলা বলিল—হ্যা ভালো কথা, তুমি নাকি কি বই লিখেচ? একদিন আমাকে দেখাবে না কি লিখলে? আমি জানি তুমি একদিন বড় লেখক হবে, তোমার সেই ছেলেবেলার গল্প লেখার কথা মনে আছে? তখন থেকেই জানি।

পরে সে একটা প্রস্তাব করিল। বিমলেন্দুর মুখে সে সব শুনিয়াছে, বইওয়ালারা বই লইতে চায় না—ছাপাইতে কত খরচ পড়ে? এ বই ছাপাইয়া বাহির করিবার সমুদয় খরচ সে দিতে রাজী।

অপ্রত্যাশিত আনন্দে অপুর সারা শরীরে যেন একটা বিদ্যুতের ঢেউ খেলিয়া গেল। সব খরচ! যত লাগে! তবুও আজ সে মুখে কিছু বলিল না।

অপুর মনে লীলার জন্য একটা করুণা অনুকম্পা জাগিয়া উঠিল ঠিক—পুরাতন দিনের মত। লীলারও কত আশা ছিল আর্টিষ্ট হইবে, ছবি আঁকিবে, অনভিজ্ঞ তরুণ বয়সে তাহারই মত কত কি স্বপ্নের জাল বুনিত। এখন শুধু নতুন নতুন মোটর গাড়ী কিনিতেছে, সাহেবী দোকানে লেস্ কিনিয়া বেড়াইতেছে—পুরাতন দিনের যজ্ঞবেদীতে আগুন কই, নিবিয়া গিয়াছে। যজ্ঞ কিন্তু অসমাপ্ত। রূপার পাত্র লীলা! অভাগিনী লীলা!

ঠিক সেই পুরাতন দিনের মত মনটি আছে কিন্তু। তাহাকে সাহায্য করিতে মায়ের পেটের মমতাময়ী বোনের মতই হাত বাড়াইয়া দিয়াছে অমনি আশৈশব তাহার বন্ধু…তাহার সম্বন্ধে অন্তত ওর মনের তারটি খাঁটি সুরেই বাজিল চিরদিন। এখানেও হয়ত করুণা, মমতা, অনুকম্পা—ওদেরই বাড়ীতে না তার মা ছিল রাঁধুনী, কে জানে হয়ত কোন্ শুভ মুহূর্ত্তে তার হীনতা, দৈন্য, অসহায় বাল্যজীবন বড়লোকের মেয়ে লীলার কোমল বাল্য মনে ঘা দিয়াছিল, সহানুভূতি, করুণা, মমতা জাগাইয়াছিল! সকল সত্যিকার ভালবাসার মশলা এরাই—এরা যেখানে নাই, ভালবাসা সেখানে মাদকতা আনিতে পারে, কিন্তু নিবিড় হইয়া উঠে না, মোহ আনিতে পারে, কিন্তু চিরস্থায়িত্বের স্নিগ্ধতা আনে না।

সে ভাবিল লীলার মনটা ভাল বলে সেই সুযোগে সবাই ওর টাকা নিচ্চে। ও বেচারী এখনও মনে সেই ছেলেমানুষটি আছে—আমি ওকে exploit করতে পারব না। দরকার নেই আমার বই ছাপানোয়।

এদিকে মুস্কিল। হাতের টাকা ফুরাইল। চাকুরিও জোটে না।

মিঃ রায়-চৌধুরী অনবরত ঘুরাইতে ও হাঁটাইতে লাগিলেন। অপু যেখানে ছিল সেখানে আবার এঁরা ম্যাঙ্গানিজের কাজ আরম্ভ করিয়াছেন, অপু ধরিয়া পড়িল তাহাকে আবার সেখানে পাঠানো হৌক্। অনেকদিন ঘোরানোর পরে মিঃ রায়-চৌধুরী একদিন প্রস্তাব করিলেন, সে আরও কম টাকা বেতনে ওখানে যাইতে রাজী আছে কিনা? অপমানে অপুর চোখে জল আসিল, মুখ রাঙা হইয়া উঠিল। এ কথা বলিতে উঁহারা আজ সাহস করিল শুধু এইজন্য যে, উঁহারা জানে যতই কমে হোক না কেন, সে সেখানে ফিরিয়া যাইতে রাজী হইবে, অর্থের জন্য নয়—অর্থের জন্য এ অপমান সে সহ্য করিবে না নিশ্চয়।

কিন্তু…

শরতের প্রথম—নীচের অধিত্যকায় প্রথম আবলুস ফল পাকিতে সুরু করিয়াছে বটে, কিন্তু মাথার উপরে পর্ব্বত সানুর উচ্চস্থানে এখনও বর্ষা শেষ হয় নাই। টেঁপারী বনে এখনও ফল পাকিয়া হলুদে হইয়া আছে, ভালুকদল এখনও সন্ধ্যার পরে টেঁপারী খাইতে নামে, টিয়াপাখীর ঝাঁক সারাদিন কলরব করে, আরও ওপরে সেখান হইতে বাদাম ও সেগুন বনের সুরু, সেখানে অজস্র সাদা মাজুফল, আরও উপরে রিঠাগাছের থোলো-থোলো ফল ধরিয়াছে, এমন কি ভাল করিয়া খুঁজিয়া দেখিলে দু-একটা রিঠাগাছে এখনও দু-এক ঝাড় দেরিতে-ফোটা রিঠা ফুলও পাওয়া যাইতে পারে।

সেখানকার সেই বিরাট, রুক্ষ আরণ্যভূমি, নক্ষত্রালোকিত, আধ-আঁধার উদার, জনহীন, বিশাল তৃণভূমি, সেই টানা, একঘেয়ে পশ্চিমে হাওয়া, সেই অবাধ জ্যোৎস্না স্বাধীনতা, প্রসারতা, সেই বিরাট নির্জ্জনতা তাহাকে আবার ডাকিতেছে।

এক এক সময় তাহার মনে হয় কানাডায়, অষ্ট্রেলিয়ায়, নিউজিল্যাণ্ডে, আফ্রিকায় মানুষ প্রকৃতির এই মুক্ত সৌন্দর্য্যকে ধ্বংস করিতেছে সত্য, গাছপালাকে দূর করিয়া দিতেছে বটে, কিন্তু প্রকৃতি একদিন প্রতিশোধ লইবে। ট্রপিকস্-এর অরণ্য আবার জাগিবে, মানুষকে তাহারা তাড়াইবে, আদিম অরণ্যানী আবার ফিরিবে। ধরা-বিদারণকারী সভ্যতাদর্পী মানুষ যে স্থানে সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছে, পর্ব্বতমালার নাম দিয়াছে নিজের দেশের রাজার নামে, হ্রদের নাম দিয়াছে রাজমন্ত্রীর নামে, ওর শুক পাখী, শিল, বল্গা হরিণ ভালুককে খুন করিয়াছে তেল রস চামড়ার লোভে, ওর মহিমাময় পাইন অরণ্য ধূলিসাৎ করিয়া কাঠের কারখানা খুলিয়াছে, এ সবের প্রতিশোধ একদিন আসিবে।

এ যেন এমন একটা শক্তি যা বিপুল, বিশাল, বিরাট অসীম ধৈর্য্যের ও গাম্ভীর্য্যের সহিত সে সংহত শক্তিতে চুপ করিয়া অপেক্ষা করিতেছে কারণ সে জানে তার নিজ শক্তির বিপুলতা। অপু একবার ছিন্দওয়ারার জঙ্গলে একটা খনির সাইডিং লাইন তৈরি হওয়ার সময়ে আরণ্যভূমির তপস্যাস্তব্ধ, দূরদর্শী, রুদ্রদেবের মত এই মৌন, গম্ভীর ভাব লক্ষ্য করিয়াছিল। ওই শক্তিটা ধীর ভাবে শুধু সুযোগ প্রতীক্ষা করিতেছে মাত্র।

*　　*　　*

অপুর কিন্তু চাকরি হইল না। এবার একা মিঃ রায়-চৌধুরীর হাত নয়। জয়েণ্ট-ষ্টক্ কোম্পানীর অন্যান্য ডাইরেক্টররা নাকি রাজী হইল না। হয়ত বা তারা ভাবিল এ লোকটার সেখানে ফিরিবার এত আগ্রহ কেন? পুরানো লোক, চরির মুলুক, সন্ধান জানে, সেই লোভেই যাইতেছে। তা ছাড়া ডাইরেক্টররাও মানুষ, তাদেরও প্রত্যেকেরই বেকার ভাগ্নে, ভাইপো, শালীর ছেলে আছে।

সে ভাবিল, চাকুরি না হয়, বইখানা বাহির করিয়া দেখিবে চলে কিনা। মাসিক পত্রিকায় দু-একটা গল্পও দিল, একটা গল্পের বেশ নাম হইল, কিন্তু টাকা কেহ একদিন দিল না। হঠাৎ তাহার মনে হইল অপর্ণার গহনাগুলা শ্বশুরবাড়ীতে আছে, সেগুলা সেখান হইতে এই সাত আট বৎসর সে আনে নাই, সেগুলি বেচিয়া তো বই বাহির করার খরচ জোগাড় হইতে পারে! এই সহজ উপায়টা কেন এতদিন মাথায় আসে নাই?

সে লীলার কাছে আরও কয়েকবার গেল, কিন্তু কথাটা প্রকাশ করিল না। উপন্যাসের খাতাখানা লইয়া গিয়া পড়াইয়া শোনাইল, লীলা খুব উৎসাহ দেয়। একদিন লীলা হিসাব করিতে বসিল বই ছাপাইতে কত লাগিবে। খুব উৎসাহ পাইয়া অপু মেসে ফিরিল। পথে আসিতে আসিতেই ভাবিল—অন্য কেউ যদি দিত হয়ত নিতুম, কিন্তু লীলা বেচারীর টাকা নেব না।

একদিন সে হঠাৎ খবরের কাগজে তাহার সেই কবিরাজ বন্ধুটির ঔষধের দোকানের বিজ্ঞাপন পাইল। সেদিনই সন্ধ্যার পরে সে ঠিকানা খুঁজিয়া সেখানে গেল। সুকিয়া ষ্ট্রীটের একটা গলিতে দোকান। বন্ধুটি বাহিরেই বসিয়াছিল, দেখিয়া বলিয়া উঠিল—বাঃ—তুমি! তুমি বেঁচে আছ দাদা?

অপু হাসিয়া বলিল—উঃ, কম খুঁজিনি তোমায়। ভাগিস্ আজ তোমার শিল্পাশ্রমের বিজ্ঞাপনটা চোখে পড়্‌ল, তাই তো এলুম। তার পর কি খবর বল? দোকানের আসবাবপত্র দেখে মনে হচ্চে অবস্থা ফিরিয়ে ফেলেচ।

বন্ধু খানিকটা চুপ করিয়া রহিল। খানিকটা এ গল্প ও গল্প করিল। পরে বলিল—এস বাসায় এস।

সত্যই অবস্থা ফিরিয়াছে বটে। বাসাটা দেখিয়াই অপু সেটা বুঝিল। ছোট সাদা রঙের দোতলা বাড়ী, নীচের উঠানে একটা টীনের শেডের তলায় আট দশটি লোক কি সব জিনিস প্যাক্ করিতেছে, লেবেল আঁটিতেছে, অন্যদিকে একটা কল ও চৌবাচ্চা, আর একটা টীনের শেডে গুদাম। উপরে উঠিয়াই একটা মাঝারি হলঘর,

দুপাশে দুটা ছোট ছোট ঘর, বেশ সাজানো। একটা সেট্ টমাসের বড় ক্লক ঘড়ি দালানে ঢক্ ঢক্ করিতেছে। বন্ধু ডাকিয়া বলিল—ওরে বিন্দু, শোন্ তোর মাকে বল্, এক্ষুনি দুপেয়ালা চা দিতে।

অপু উৎসুকভাবে বলিল—তার আগে একবার বৌঠাকরুণের সঙ্গে দেখাই করি—বিন্দুকে বল তাঁকে এদিকে একবার আস্‌তে বল্‌তে? না কি এখন অবস্থা ফিরেচে বলে তিনি আর আমার সঙ্গে দেখা করবেন—

কবিরাজ বন্ধু ম্লানমুখে চুপ করিয়া রহিল—পরে নিম্নস্বরে অনেকটা যেন আপন মনেই বলিল—সে আর তোমার সঙ্গে দেখা করবে না ভাই। তাকে আর কোথায় পাবে? রমলা আর সে দুজনেই ফাঁকি দিয়েছে! অপু অবাক্ মুখে তাহার দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল।

—এ মাঘে রমলা গেল পরের শ্রাবণে সে গেল। ওঃ, সে কি সোজা কষ্ট দিয়েচে ভাই? তখন ওদিকে কাবুলীর দেনা, এদিকে মহাজনের দেনা—বাড়ীতে যমেমানুষে টানাটানি চল্‌চে। তোমার কথা কত বল্‌ত। এই শ্রাবণে পাঁচ বচ্ছর হয়ে গিয়েচে। তার পরে বিয়ে করব না, করবো না আজ বছর তিনেক হোল বদ্যিবাটীতে—

তার পর বন্ধুর কথায় নতুন-বৌ চা ও খাবার লইয়া অপুর সাম্‌নেই আসিল। শ্যামবর্ণ, স্বাস্থ্যবতী, কিশোরী মেয়েটি, চোখ মুখ দেখিয়া মনে হয় খুব চটপটে, চতুর। খাবার খাইতে গিয়া খাবারের দলা যেন অপুর গলায় আটকাইয়া যায়। বন্ধুটি নিজের কোন্ কালির বড়ী ও পাতা চায়ের প্যাকেটের খুব বিক্রী ও ব্যবসায়ের দিক হইতে এ-দুটি দ্রব্যের সাফল্যের গল্প করিতেছিল।

উঠিবার সময় বাহিরে আসিয়া অপু জিজ্ঞাসা করিল—নতুন বৌটি দেখতে তো বেশ, এদিকেও বেশ গুণবতী না?

—মন্দ না। কিন্তু বড় মুখরা, ভাই। আগের তাকে তো জানতে? সে ছিল ভাল মানুষ। এর পান থেকে চুণ খস্‌লেই—কি করি ভাই আমার ইচ্ছে ছিল না যে আবার—

ফুটপথে একা পড়িয়াই অপুর মনে পড়িল পটুয়াটোলার সেই খোলার বাড়ীর দরজায় প্রদীপহাতে হাস্যমুখী, নিরাভরণা, দরিদ্র গৃহলক্ষ্মীর ছবিটি—আজ ছ'বছর কাটিয়া গেলেও মনে হয় যেন কালকার কথা—ছবিটি হঠাৎ এত স্পষ্ট হইয়া ফুটিয়া উঠিল তাহার চোখের সম্মুখে। খানিকদূর গিয়া আর একটি ছবি মনে পড়িল—সেই বিজয়া দশমীর বৈকালে দাঁতের মাজন শিলে গুঁড়া করিতেছে মেয়েটি, সর্ব্বাঙ্গ মাজনে ধূসর, কপালে স্বেদজল, মুখ শ্রমে রাঙা, চুল অবিন্যস্ত, চোখে চকিত অপ্রতিভের দৃষ্টি।

(৩১)

কাজল বড় হইয়া উঠিয়াছে, আজকাল গ্রামের সীতানাথ পণ্ডিত সকালে একবেলা করিয়া পড়াইয়া যান, কিন্তু একটু ঘুমকাতুরে বলিয়া সন্ধ্যার পরে দাদামশায়ের অনেক বকুনি সত্ত্বেও সে পড়িতে পারে না, চোখের পাতা যেন জড়াইয়া আসে, অনেক সময় যেখানে সেখানে ঘুমাইয়া পড়ে—রাত্রে কেহ যদি ডাকিয়া খাওয়ায়, তবেই খাওয়া হয়।

তবে পড়াশুনার আগ্রহ তার বেশী ছাড়া কম নয়। বিশ্বেশ্বর মুহুরীর হাত-বাক্সে কেশরঞ্জনের উপহারের দরুণ গল্পের বই আছে অনেকগুলি। খুনী আসামী কেমন করিয়া ধরা পড়িল, সেই সব গল্প। আর পড়িতে ইচ্ছা করে আরব্য উপন্যাস, কি ছবি! কি গল্প! দাদামশায়ের বিছানার উপর একদিন পড়িয়া ছিল—টের পাইয়া বিশ্বেশ্বর মুহুরী কাড়িয়া লইয়া বলিল, এঃ, আট বচ্ছরের ছেলের আবার নবেল পড়া? এইবার একদিন তোমার দাদামশায় শুনতে পেলে দেখো কি করবে।

কিন্তু বইখানা কোথায় আছে সে জানে—দোতলার শোবার ঘরের সেই কাঁঠাল কাঠের সিন্দুকটার মধ্যে—একবার যদি চাবিটা পাওয়া যাইত! সারারাত জাগিয়া পড়িয়া ভোরের আগেই তাহা হইলে তুলিয়া রাখে।

এ কয়েকদিন বৈকালে দাদামশায় বসিয়া বসিয়া তামাক খান, আর সে পণ্ডিতমশায়ের কাছে বসিয়া বসিয়া পড়ে। সেই সময় পণ্ডিত-মশায়ের পেছনকার অর্থাৎ চণ্ডীমণ্ডপের উত্তর ধারের সমস্ত ফাঁকা জায়গাটা একটা অদ্ভুত ঘটনার রঙ্গভূমিতে পরিণত হয়, ঘটনাটাও হয়ত

খুব স্পষ্ট নয়, সে ঠিক বুঝাইয়া বলিতে তো পারে না? কিন্তু দিদিমার মুখে শোনা নানা গল্পের রাজপুত্র ও পাত্রের পুত্রেরা নাম না-জানা নদীর ধারে ঠিক এ সন্ধ্যা-বেলাটাতেই পৌঁছায়—কোন্ রাজপুরীকে কাঁপাইয়া রাজ-কন্যাদের সোনার রথ বৈকালের আকাশপানে উঠিয়া অদৃশ্য হইয়া যায়—সে অন্যমনস্ক হইয়া দেওয়ালের পাশে ঝুঁকিয়া আকাশটার দিকে চাহিয়া থাকে, কেমন যেন দুঃখ হয়—ঠিক সেই সময় সীতানাথ পণ্ডিত বলেন—দেখুন, দেখুন, বাঁড়ুয্যে-মশায় আপনার নাতির কাণ্ডটা দেখুন, শ্লেটে বুড়্‌কে লিখ্‌তে দিলাম, তা গেল চুলোয়—হাঁ করে তাকিয়ে কি দেখচে দেখুন—অমন অমনোযোগী ছেলে যদি—

দাদামশায় বলেন—দিন না ধাঁ করে এক থাপ্পড় বসিয়ে গালে—হতভাগা ছেলে কোথাকার—হাড় জালিয়েচে, বাবা করবে না খোঁজ, আমার ঘাড়ে এ বয়সে যত ঝুঁকি।

তবে কাজল যে দুষ্ট হইয়া উঠিয়াছে, এ কথা সবাই বলে। একদণ্ড সুস্থির নয়, সর্ব্বদা চঞ্চল, একদণ্ড চুপ করিয়া থাকে না, সর্ব্বদা বকিতেছে। পণ্ডিতমশায় বলেন—দেখ্‌তো দলু কেমন অঙ্ক কসে? ওর মধ্যে অনেক জিনিষ আছে—আর তুই অঙ্কে একেবারে গাধা। পণ্ডিত পিছন ফিরিলেই কাজল মামাতো ভাই দলুকে আঙুল দিয়া ঠেলিয়া চুপিচুপি বলে, তো-তোর মধ্যে অনেক জিনিষ আছে? কি জিনিষ আছে রে? ভাত ডাল খি-খিচুড়ী...খিচুড়ী? হি-হি ইল্লি! খিচুড়ী খাবি, সতীশ?

দাদামশায়ের কাছে আবার নালিশ হয়।

তখনই দাদামশায় ডাকিয়া শাস্তিস্বরূপ বানান জিজ্ঞাসা করিতে আরম্ভ করেন। বানান কর—সূর্য্য। কাজল বানানটা জানে, কিন্তু ভয়জনিত উত্তেজনার দরুণ হঠাৎ তাহার তোৎলামিটা বেশী করিয়া দেখা দেয়—দু-একবার চেষ্টা করিয়াও 'দন্ত্য স' কথাটা কিছুতেই উচ্চারণ করিতে পারিবে না বুঝিয়া অবশেষে বিষণ্ণমুখে বলে—তা—তালব্য শয়ে দিঘ্য উকার—

ঠাস্ করিয়া এক চড় গালে, ফরসা গাল, তখনই দাড়িমের মত রাঙা হইয়া উঠে, কান পর্য্যন্ত রাঙা হইয়া যায়। কাজলের ভয় হয় না, একটা নিষ্ফল অভিমান হয়—বাঃ রে বানানটা তো সে জানে, কিন্তু মুখে যে আটকাইয়া যায় তো তার দোষ কিসের? কিন্তু মুখে এত কথা বলিয়া বুঝাইয়া প্রতিবাদ বা আত্মপক্ষ সমর্থন করিবার মত এতটা জ্ঞান তাহার হয় নাই—সবটা মিলিয়া অভিমানের মাত্রাটাই বাড়াইয়া তোলে। কিন্তু অভিমানটা কাহার উপর সে নিজেও ভাল বোঝে না।

বর্ষাকালের শেষের দিকে সে দু-একবার জ্বরে পড়ে। জ্বর আসিলে উপরের ঘরে একলাটি একটা কিছু টানিয়া গায়ে দিয়া চুপ করিয়া শুইয়া থাকে। কাহার পায়ের শব্দে মুখ তুলিয়া বলে—ও মামীমা, জ্বর এসেচে আমার—একটা লে-এ-এ-প বে-বের করে দাও না? ইচ্ছা করে কেহ কাছে বসে, কিন্তু বাড়ীর এত লোক সবাই নিজের নিজের কাজে ব্যস্ত। জ্বরের প্রথম দিকে কিন্তু চমৎকার লাগে, কেমন যেন একটা নেশা, সব কেমন অদ্ভুত লাগে। ঐ জানালার গরাদেতে একটা ডেও পিঁপড়ে বেড়াইতেছে, গায়ে চুনে কালীতে মিশাইয়া একটা দাড়িওয়ালা মজার মুখ। জানালার বাহিরের নারিকেল গাছেই নারিকেল-সুদ্ধ একটা কাঁদি ভাঙিয়া ঝুলিয়া পড়িয়াছে। নীচে তাহার ছোট মামাতো বোন অরু, 'ভাত ভাত' করিয়া চীৎকার সুরু করিয়াছে—বেশ লাগে। কিন্তু শেষের দিকে বড় কষ্ট, গা জ্বালা করে হাত পা ব্যথা করে, সারা শরীর ঝিম্ ঝিম্ করে, মাথা যেন ভার বোঝা, এ সময়টা কেহ কাছে আসিয়া যদি বসে!

কাছারীর উত্তর গায়ে পথের ধারে এক বুড়ীর খাবারের দোকান, বারো মাস খুব সকালে উঠিয়া সে তেলে ভাজা বেগুনি ফুলুরী ভাজে। কাজল তার বাঁধা খরিদ-দার। অনেকবার বকুনি খাইয়াও সে এ লোভ সাম্‌লাইতে সমর্থ হয় নাই। সারিবার দিনদুই পরেই কাজল সেখানে গিয়া হাজির। অনেকক্ষণ সে বসিয়া বসিয়া ফুলুরিভাজা দেখিল, পুঁইপাতার বেগুনি, জবা পাতার তিল পিটুলি। অবশেষে সে অপ্রতিভ মুখে বলে—আমায় পুঁইপাতার বেগুনি দাও না দিদিমা? দেবে? এই নাও

পয়সাটা। বুড়ী দিতে চায় না, বলে—না খোকা দাদা, সেদিন জ্বর থেকে উঠেছ, তোমার বাড়ীর লোকে শুন্‌লে আমায় বকবে। কিন্তু কাজলের নির্ব্বন্ধাতিশয্যে অবশেষে দিতে হয়।

একদিন বিশ্বেশ্বর মুহুরীর কাছে ধরা পড়িয়া যায়। বুড়ীর দোকান হইতে বাহির হইয়া জবাপাতার তেলপিটুলির ঠোঙা হাতে খাইতে খাইতে পুকুর পাড় পর্য্যন্ত গিয়াছে—বিশ্বেশ্বর আসিয়া ঠোঙাটি কাড়িয়া লইয়া ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া বলিল—আচ্ছা পাজি ছেলে তো? আবার ওই তেলেভাজা খাবারগুলো রোজ রোজ খাওয়া?

কাজল বলিল—আমি খা-খা-খাচ্ছি তা তো-তোমার কি?

বিশ্বেশ্বর মুহুরী হঠাৎ আসিয়া তাহার কান ধরিয়া একটা ঝাকুনি দিয়া বলিল—আমার কি, বটে? রাগে অপমানে কাজলের মুখ রাঙা হইয়া গেল। ইহাদের হাতে মার খাওয়ার অভিজ্ঞতা তার এই প্রথম। সে ছেলেমানুষি সুরে চীৎকার করিয়া বলিল—মুখপুড়ি, হতচ্ছাড়া তু—তুমি মার্লে কেন? বিশ্বেশ্বর তাহার গালে জোরে একচড় বসাইয়া দিয়া বলিল—আমি কেন, এস তো কর্ত্তার কাছে একবার—এস।

কাজল পাগলের মত যা-তা বলিয়া গালি দিতে লাগিল। চড়ের চোটে তখন তাহার মাথার মধ্যে ঝাঁ ঝাঁ করিতেছে এবং বোধ হয় এ অপমানের কোনো প্রতীকার এখানকার কাহারও নিকট হইতে হইবার আশা নাই। মুহূর্ত্ত মধ্যে ঠাওরাইয়া বুঝিয়া চীৎকার করিয়া বলিল—আমার বা—বাবা আসুক, বলে দোবো, দেখো—দেখো তখন—

বিশ্বেশ্বর হাসিয়া বলিল—আচ্ছা যাও, তোমার বাবার ভয়ে আমি একেবারে গর্ত্তের মধ্যে যাব আর কি? আজ পাঁচ বছরের মধ্যে খোঁজ নিলে না, ভারী তো—

হয়ত একথা বলিতে বিশ্বেশ্বর সাহস করিত না, যদি সে না জানিত তাঁহার এ জামাইটির প্রতি কর্ত্তার মনোভাব কিরূপ।

কাজল রাগের মাথায় ও কতকটা পাছে বিশ্বেশ্বর দাদামশায়ের কাছে ধরিয়া লইয়া যায় সেই ভয়ে পুকুরের দক্ষিণ-পাড়ের নারিকেল বাগানের দিকে ছুটিয়া যাইতে যাইতে বলিতে লাগিল—দেখো না, দেখো তুমি, আসুক না—পরে পিছন দিকে চাহিয়া খুব কড়া কথা শুনানো হইতেছে, এমন সুরে বলিল—তোমার পেটে খিচুড়ী আছে, খিচুড়ী খাবে?

নদীর বাঁধাঘাটে সেদিন সন্ধ্যাবেলা বসিয়া বসিয়া সে অনেকক্ষণ দিদিমার কথা ভাবিল। দিদিমা থাকিলে বিশ্বেশ্বর মুহুরী গায়ে হাত তুলিতে পারিত? সে জবা-পাতার বেগুনি খায় তো ওর কি? ঐ একটা নক্ষত্র খসিয়া পড়িল। দিদিমা বলিত নক্ষত্র খসিয়া পড়িলে সেই সময় পৃথিবীতে কেউ না কেউ জন্মায়। মরিয়া কি মানুষ নক্ষত্র হয়।

ক্রমশঃ



মুখ্‌তার ও মিশরের নবজাগরণ

মোহম্মদ এনামুল হক্, এম-এ

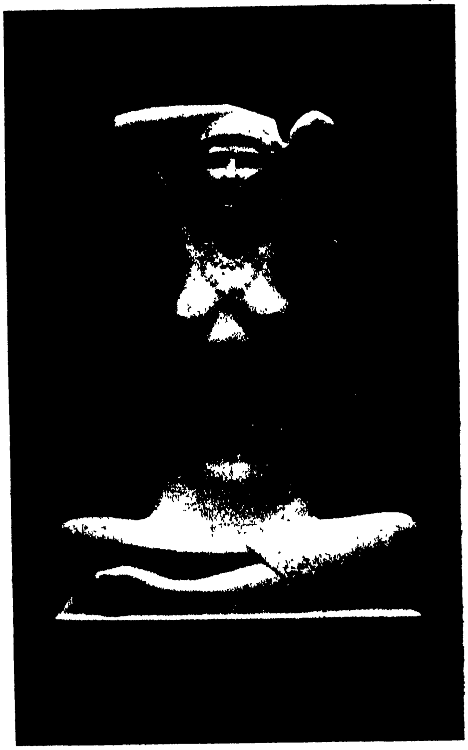
ব্যাবিলন্, ফিনীশিয়া ও গ্রীস্ প্রভৃতি দেশের প্রাচীন সভ্যতার মধ্যে প্রাচীন মিশরের সভ্যতাও একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। আজ মিশর পৃথিবীর নিকট শুধু মৃতের দেশ বলিয়া পরিচিত, কিন্তু প্রাচীন কালে সে তাহা ছিল না। একদিন তাহার স্থাপত্য-শিল্প, ভাস্কর্য্য চিত্রকলা প্রভৃতি প্রাচীন জগতকে স্তম্ভিত করিয়া দিয়াছিল; আজও জগত মিশরের সেই প্রাচীন নিদর্শনমালা দেখিয়া বিস্ময়াবিষ্ট না হইয়া পারিতেছে না।

ক্লিওপেট্রার যুগ পর্য্যন্ত মিশরীয় সভ্যতার এই দিক জীবন্ত ও জাগ্রত ছিল। তাঁহার মৃত্যুর পর হইতে মিশর যেন ম্রিয়মাণ, অসাড় ও নিস্পন্দ হইয়া পড়ে। মিশরীয় জীবনের সকল বিভাগে এই সময় যে ঘোর অবসাদ দেখা দিয়াছিল, দেশের বুকে দিগ্বিজয়ীদের তুমুল সংগ্রামেও তাহা কাটিয়া যায় নাই। এই সময় হইতে মিশরের উপর দিয়া নানা রাষ্ট্র-বিপ্লবের ঝড় বহিয়া গিয়াছে সত্য, নানাভাবে তাহার ভাগ্য পরিবর্ত্তন ও বিবর্ত্তন ঘটিয়াছে তাহাও মিথ্যা নয়, কিন্তু তাহা সত্বেও, মিশরের প্রাচীন শিল্প ও কলা-শক্তি বিলুপ্ত হয় নাই;—তাহা শুধু কিছুদিনের জন্য ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল মাত্র।

পঁচিশ বৎসরের কিছু পূর্ব্বে মিশরের শক্তি নিদ্রা হইতে জাগ্রত হইয়া স্বপ্নাবিষ্ট নয়নে আধুনিক জগতের প্রতি নিরীক্ষণ করিল; তাহার অবসাদ ও জড়তাগ্রস্ত বাহুতে পূর্ব্ব শক্তি ফিরিয়া আসিল; বহির্জ্জগতের অগোচরে সে প্রাচীন শিল্পীর যন্ত্রপাতি টানিয়া লইয়া অনন্যমনে আপন কাজে প্রবৃত্ত হইল এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন মিশর, তাহার লুপ্ত শিল্পকলা, মৃত বীর, পৌরাণিক দেবদেবী, ও সম্রাটদের মামীর কথা চিন্তা করিতে লাগিল।

এই নবজাগরণের ফলে, মিশরে আজ আমরা একটি জীবন্ত কলাচক্রের মনোরম দৃশ্য দেখিতে পাইতেছি। এতদিন কেরো নগরীর যাদুঘর ও পুস্তকাগারগুলি কেবল অলঙ্কার ও স্থাপত্যশিল্পমূলক সৃষ্টির নিদর্শন লইয়া গৌরব করিতে পারিত; আজ তাহা অতি আধুনিক শিল্পকলাসামগ্রীতেও পরিপূর্ণ হইয়া উঠিতেছে। শিল্পকলার ক্ষেত্রে আধুনিকতার স্রোত প্রবাহিত হইয়া আজ কেরো নগরীকে পরিপ্লাবিত করিয়া তুলিয়াছে, তাহার প্রাণবন্ত নীল নদের তীরেই জন্মলাভ করিয়াছে। শিল্পকলার ক্ষেত্রে মিশরের এই তরুণ আন্দোলন নিতান্তই অপ্রত্যাশিতভাবে দেখা দিয়াছে। এতদিন জগৎ মনে করিত, এ ক্ষেত্রে মিশরের নবজীবনলাভ অসম্ভব; জগতের কাছে যেন একটি কিংবদন্তী দাঁড়াইয়া গিয়াছিল,—মিশর কোন্ মন্ত্রশক্তি-বলে প্রাচীন শক্তি হারাইয়াছে, আর সে তাহার হৃতশক্তি ফিরিয়া পাইবে না! তাই যখন তাহার নবজাগরণের সূত্রপাত হয়, তখন কেহ তাহার প্রতি লক্ষ্য করে নাই। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যে মিশর যখন স্বীয় অনন্যসাধারণ প্রতিভাবলে পাশ্চাত্য জগতের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইল, তখন আমেরিকাবাসীরাও হঠাৎ পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিতে পাইল,—মিশরে একটি নূতন বস্তর উদ্ভব ঘটিয়াছে। মিশরের কতিপয় প্রধান কলাবিদের শিল্পকার্য্য প্যারিসে প্রদর্শিত হইবার পর হইতেই আমেরিকাবাসীরাও বাধ্য হইয়া স্বীকার করিয়াছে,—মিশরীয় শিল্পকলা এখনও যথেষ্ট জীবন্ত ও জাগ্রত।

শিল্পকলার ক্ষেত্রে মিশরের নবজীবন প্রাপ্তির কথা, জনৈক মিশরীয় লেখকের নিম্নলিখিত কথাগুলিতে বেশ সুন্দরভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে,—"বৈদেশিক রাজদূতগণকর্ত্তৃক শতমুখে প্রশংসিত মিশরের সুন্দর



আইসিস



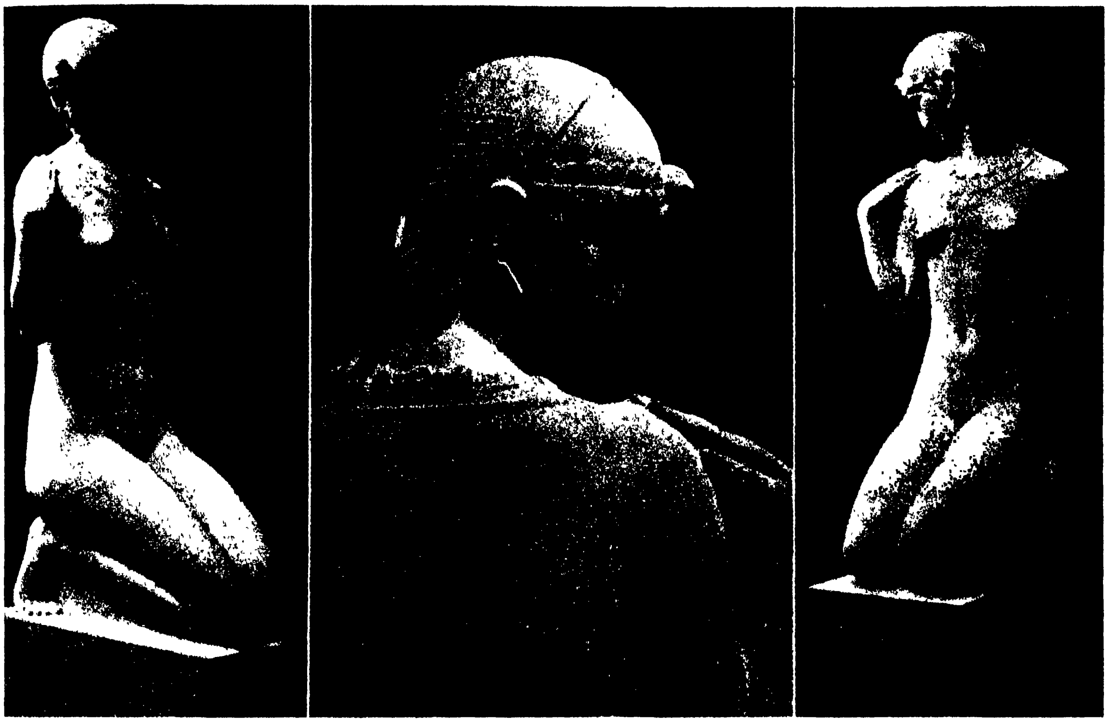
ঘাটে

স্তম্ভরাজি, চমৎকার প্রতিমা-নির্ম্মাণকৌশল, ভাস্কর্য্য ও প্রাচীরগাত্রে খোদিত চিত্র প্রভৃতি এতদিন বিষণ্ণ মনে মিশরের লুপ্ত শিল্পকলার সাক্ষ্যদান করিলেও, তাহার প্রাচীন শিল্পকলা বিলুপ্ত হয় নাই। ইহা এখন জীবিত,—পুনর্জ্জীবন প্রাপ্ত। যে সকল আবর্জ্জনা তাহাকে ঢাকিয়া রাখিয়াছিল তাহাকে সরাইয়া দিয়া মিশর এখন মাথা তুলিয়াছে, চক্ষুরুন্মীলন করিয়াছে এবং নবীন জীবনে উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে।"

পাশ্চাত্য জগতে কলাবিদ্যা কালক্রমে এক এক ধাপ করিয়া উন্নতিলাভ করিতে করিতে আধুনিকতা লাভ করিয়াছে। কিন্তু মিশরে তাহা হয় নাই। প্রাচীনতার সীমা উল্লঙ্ঘন করিয়া ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যমূলক আধুনিকতায় আসিয়া দাঁড়াইতে গিয়া মিশরকে মধ্যবর্ত্তী কোন ধাপ অতিক্রম করিতে হয় নাই। প্রাচীনতা ও আধুনিকতার মধ্যবর্ত্তী ক্রমগুলি মিশর যেন সুষুপ্তির ঘোরেই অতিক্রম করিয়া গিয়াছে।

মিশরের এই নবজীবনপ্রাপ্তি ও কলাসম্পদবৃদ্ধি একটি চমৎকার বস্তু। সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্যের বিষয়,—মিশর তাহার শিল্পকলার প্রাচীন ও আধুনিক, এই দুই দিক্‌কে আবিষ্কার করিতে গিয়া, উভয়ের মাঝখানে কোন পাশ্চাত্য প্রভাবের আমদানী করে নাই; অথচ তাহার মৌলিকতা, ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য ও আধুনিকতা সর্ব্বত্রই ফুটিয়া উঠিয়াছে। তাহার কলাবিৎ যুগধর্ম্মকে নিখুঁতভাবে অঙ্কিত করিয়াছেন; তাহার শিল্পী প্রাচীন গ্রীক্-মিশরীয় যুগের শিল্পের সহিত সমন্বয় স্থাপন করিয়াছেন।

মিশরের ঘুমন্ত কলা-শক্তির বিষয় বলিতে গিয়া একটি কথা পরিষ্কার করিয়া বলিয়া দেওয়া উচিত। গ্রীক-মিশরীয় যুগ হইতে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত মিশরে কোন শিল্পকলার সৃষ্টি হয় নাই, এ-কথা বলা আমাদের উদ্দেশ্য নহে। এই সময়ে, স্থাপত্যশিল্প ও ভূষণমূলক (decorative) কলাবিদ্যার যথেষ্ট উন্নতি



"নীলনদ-বধূ"

সাধিত হয়। কিন্তু মিশরে আরব অভিযানের পর হইতে বর্ত্তমানকাল অবধি, জীবন্ত বস্তু কি প্রাণীর চিত্রাঙ্কণ, কি তাহাদের মূর্ত্তিনির্ম্মাণ, একেবারে লোপ পাইয়া গিয়াছিল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

সে যাহা হউক, মিশরের তরুণ ভাস্কর মুখ্‌তারের শিল্পে আধুনিক ও প্রাচীন কলাকৌশল যেমন চমৎকারভাবে মিশিয়া গিয়াছে, তেমনটি আর কোথাও দেখা যায় না। চিত্রকর নঘীর শিল্পকলাতেও এই দুইটি বিষয়ের যুগলমিলন বেশ ফুটিয়া উঠিয়াছে। ইনি ইটালী ও ফরাসী দেশে শিক্ষালাভ করেন। যতদিন পর্য্যন্ত তিনি একটি নিজস্ব শিল্পরীতি (Individual style) খাড়া করিতে পারেন নাই, ততদিন ফরাসী ইম্প্রেশ্যনিষ্ট্‌ বেসনার (Besnard)এর প্রভাবেই বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন। এই দুই শিল্পীর সমসাময়িক আরও অনেক শিল্পীর কার্য্যে নবীন ও প্রাচীনের এই মিলন ও সামঞ্জস্যটি দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাদের মধ্যে মহ্‌মুদ্‌ সাঈদ ও হেদায়েতের নাম উল্লেখযোগ্য। হেদায়েৎ একজন চিত্রকর। কলাকৌশল ফলান ব্যাপারে তিনি সিদ্ধহস্ত। তাঁহার তুলিকার স্পর্শে মিশরের প্রাকৃতিক দৃশ্যগুলি সুন্দর ও মোহময় হইয়া ফুটিয়া উঠিতেছে।

মিশরের এই কলানেতৃগণের মধ্যে মুখ্‌তারের স্থান অতি উচ্চে। তাঁহার জীবনেতিহাস অতি চমৎকার। সম্প্রতি প্যারিসে শিল্পকলার ক্ষেত্রে তিনি বিশেষ কৃতকার্য্যতা লাভ করায়, তাঁহার খ্যাতি ইউরোপময় ছড়াইয়া পড়িয়াছে।

বর্ত্তমান শতাব্দীর প্রারম্ভে, উত্তর-মিশরের তুম্বরা নামক ক্ষুদ্র গ্রামে, ফেল্লা বা কৃষাণ বংশে মুখ্‌তারের জন্ম হয়। এই মিশরীয় কৃষাণ বালকটি অপরাপর গ্রাম্য বালকদের সহিত নীল নদের তীরে যদৃচ্ছা খেলিয়া বেড়াইয়া নিশ্চিন্তভাবে শৈশবের দিনগুলি কাটাইয়া দিতেছিল। এই বিশ্ববিশ্রুত

নদের সহিত যে শত শত কিংবদন্তী ও প্রাচীন কাহিনী জড়িত রহিয়াছে, তাহা ভাবিয়া দেখিবার অবসরও তাঁহার ছিল না। তথাপি নীল নদের এই প্রাচীন সম্পদ মন্ত্রশক্তির ন্যায় অলক্ষিতে ধীরে ধীরে বালকের সুকুমার



বাজার হইতে প্রত্যাবর্ত্তন

মনে ক্রিয়া করিতেছিল। অবশেষে এমন একদিন আসিল,—বালক আর বাজে খেলায় সময় কাটাইয়া সুখী হইতে পারিল না; এখন হইতে নানা গভীর ভাব তাহার হৃদয়ে সাড়া দিয়া উঠিতে লাগিল। নীল নদ-তীরবর্ত্তী কর্দ্দম যেন তাহাকে নীরব ভাষায় ইঙ্গিতে বলিতে লাগিল, "বালক, তোমার খেলার সাথীদের ন্যায় আর মাটির পুতুল গড়িয়া সময় কাটাইও না, এইবার তোমার গ্রাম্য লোকদের মূর্ত্তি গড়িতে থাক।" বালকের ভাবপ্রবণ হৃদয়ে এই বাণীর প্রতিধ্বনি জাগিয়া উঠিল, তিনি আপন মনে গ্রাম্য লোকদের প্রতিমূর্ত্তি গড়িতে লাগিলেন। এই সময়েই বালকের অজ্ঞাতসারে তাহার ঘুমন্ত প্রতিভা সজাগ হইয়া উঠিতে লাগিল।

বালক এই সময়ে গ্রাম্য লোকের মূর্ত্তি নির্ম্মাণের ভিতর দিয়া যে সূক্ষ্ম প্রতিভার পরিচয় দিতে লাগিল, তাহা শিক্ষালব্ধ ও সুরুচি সম্পন্ন না হইলেও অনেক শিক্ষিত ও মার্জ্জিত রুচির শিল্পীর মধ্যে দুর্লভ।

একদা কোন শুভদিবসে বালক আপন মনে পুতুল-নির্ম্মাণ ক্রীড়ায় মগ্ন ছিল; তাহার নয়নদ্বয় সৃষ্টির স্বপ্নে বিভোর; হস্তদ্বয় শিল্পচর্চ্চায় চঞ্চল;—এমন সময়ে জনৈক ধনাঢ্য ভদ্রলোক গ্রাম পরিভ্রমণে বাহির হইয়া বালককে দেখিতে পাইলেন। মিশরীয় দেবী আইসিসের কৃপা শতধারায় বালকের উপর পতিত হইল। ভদ্রলোকটি এই অশিক্ষিত বালকের মধ্যে বিকাশোন্মুখ প্রতিভার পরিচয় লাভ করেন; মুখ্‌তার মুহূর্ত্তের মধ্যে তাঁহার হৃদয় জয় করিয়া লইতে সমর্থ হইলেন

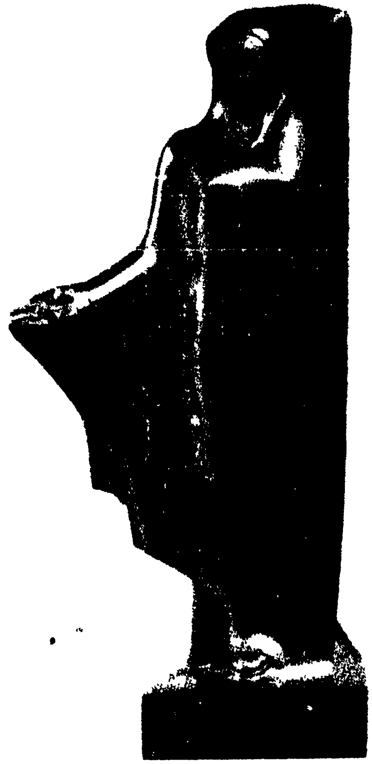
বালক মুখ্‌তারের জীবনে এই যে এতগুলি বিস্ময়কর ব্যাপার সংঘটিত হইতে লাগিল, তাহার গুরুত্ব পূর্ণভাবে হৃদয়ঙ্গম করিয়া উঠিবার পূর্ব্বেই, তিনি প্রাথমিক শিক্ষা আরম্ভ করেন। প্রাথমিক শিক্ষার পর, তাঁহার সাহায্য-দাতা তাঁহাকে কেরোর সুকুমারকলা-বিদ্যালয়ে (Ecole des Beaux-Arts) প্রেরণ করেন, এবং তৎপর তিনি প্যারিসের বিখ্যাত শিল্পবিদ্যালয়ে প্রেরিত হইয়াছিলেন। প্যারিসে অধ্যয়নকালে, তথাকার সাল (Salon) প্রদর্শনীতে, তাঁহার প্রতিভা জনসাধারণ কর্ত্তৃক স্বীকৃত হয় এবং তজ্জন্য তিনি পুরস্কারও প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এ পর্য্যন্ত তরুণ শিল্পী মুখ্‌তার শিল্পের ক্ষেত্রে কোন বিশিষ্ট নিজস্ব রীতির উদ্ভাবন করিতে পারেন নাই। তখনও তাঁহার শিল্পকলা সবেমাত্র গড়িয়া উঠিতেছিল। এই সময়, তিনি বিশেষ কৃতিত্ব লাভ করিলে, হয়ত তাঁহার ভবিষ্যৎ উন্নতির পথে বাধা পড়িত।

এইরূপ যৎসামান্য কৃতিত্ব লাভ করিয়া মুখ্‌তার সন্তুষ্ট থাকিতে পারিলেন না। চিরদিন শিষ্যত্ব করাও তাঁহার অভিপ্রায় ছিল না। লা-প্লাঞ (La Plagne) প্যারিসের একজন প্রধান ভাস্কর ও একটি যাদুঘরের কন্‌জারভেটর। মুখ্‌তার তাঁহার একজন ভক্ত শিষ্য

ছিলেন। বিগত মহাযুদ্ধের সময় লা-প্লাঞ-এর অবর্তমানে মুখ্‌তার ঐ যাদুঘরে গুরুর পদ গ্রহণ করিলেও তিনি আপন বিশিষ্ট ভঙ্গীতে স্বদেশের জীবনকে ভাস্কর্য্যে ফুটাইয়া তুলিবার স্বপ্ন কখনও ভুলিতে পারেন নাই। পরিশেষে তিনি আত্মবৈশিষ্ট্য-মূলক মিশরীয় রীতির উদ্ভাবন করেন ও তাহার উৎকর্ষ সাধন করিতে থাকেন। অধুনা স্বদেশে বিদেশে তাঁহার শিল্পকার্য্যগুলি মৌলিকতার জন্য, বিশেষতঃ জাগ্রত মিশরীয় শিল্পকলার মূর্ত্ত বিকাশরূপে, সমাদর লাভ করিতেছে।

সম্প্রতি মুখতারের 'প্রাপ্তি' বা 'লা-ক্রভাই' (La Trouvaille) নামক একটি মূর্ত্তি ফরাসী গভর্ণমেণ্ট ক্রয় করিয়াছেন। ইহা আধুনিক সভ্যতা হইতে বহু দূরে একেবারেই প্রকৃতির ক্রোড়ে লালিতপালিত একটি যুবতী রমণীর প্রতিমূর্ত্তি। এই মেয়েটি বর্ত্তমান সভ্যতার কোন উপকরণ কোনদিন লাভ ত করেই নাই, এমন কি তাহার কোন নামগন্ধও জানিত না; সে একদা পথি-পার্শ্বে কোন সভ্য রমণীর অলঙ্কার লাভ করে, এবং তাহা কি বস্তু বুঝিতে না পারিয়া ভয় ও বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া ঐ অলঙ্কারের প্রতি তাকাইতে থাকে। এই মূর্ত্তিটির বিষয়বস্তু এই। মুখতারের "Bride of the Nile" বা "নীলনদ-বধূ" নামক আর একখানি অতি চমৎকার প্রস্তরমূর্ত্তিও ফরাসী গভর্ণমেণ্টের অধিকারে আছে। এই মূর্ত্তিতে মিশরের কল্পনাপ্রবণ প্রেমময় হৃদয়ের বাণী রূপ ও রস লইয়া চমৎকার হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। এই মূর্ত্তিটির মধ্যে গ্রীক্‌-মিশরীয় প্রভাব পরিস্ফুট।

চিরাচরিত প্রথানুসরণ পন্থীদের প্রাচীন পথ পরিত্যাগ করিয়া মুখ্‌তার শিল্পের ক্ষেত্রে যে মহৎ দুঃসাহসিকতার পরিচয় দিয়াছেন, তাহাই তাঁহাকে বিদেশে যথেষ্ট সমাদর দান করিয়াছে। প্যারিসের ব্যার্ণহাইম গ্যালারীতে গত বৎসর তাঁহার শিল্পপ্রদর্শনী হইয়া গেলে, কোন সমালোচক বলিয়াছিলেন, "মুখ্‌তারের শিল্পকার্য্য প্রমাণ করিয়াছে যে, গ্রীকো-রোমান আইন-কানুনকে আবশ্যকমত অনুকরণ না করিলেও শিল্পী মৌলিকতা ও সামঞ্জস্য ফুটাইয়া তুলিতে পারে।" প্রকৃত পক্ষে বলিতে গেলে, মিশরের প্রাচীন শিল্পীরাই মুখ্‌তারের শিক্ষক। তিনি তাঁহাদিগকে মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করেন। কিন্তু প্রাচীন শিল্পীরা তাঁহার আদর্শ হইলেও তিনি নিতান্ত ভুলবশেও অক্ষমতার সহিত তাঁহাদিগকে

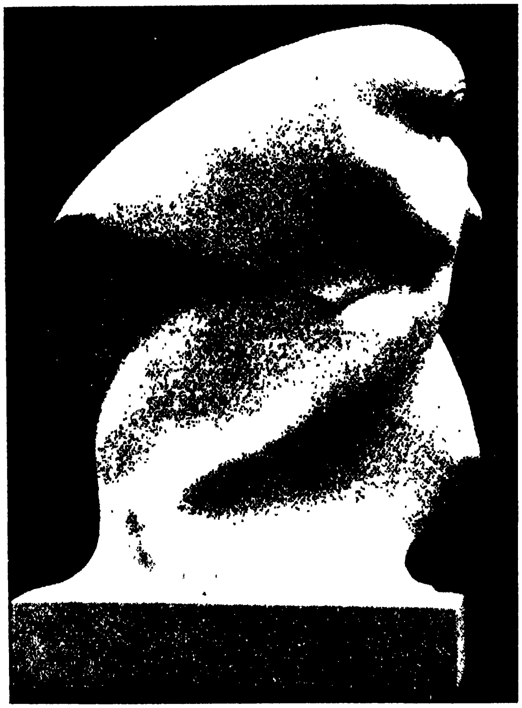


সেখ-অল-বেলেদের পত্নী

অনুকরণ করিতে যান না। তাঁহার শিল্পরীতিতে ব্যক্তিত্বের ছাপ যেমন পরিস্ফুট, উহা আবার তেমনি আধুনিক। ইহার সহিত প্রাচীন শিল্পরীতির চমৎকার সাদৃশ্য আছে বলিয়াই ইহা আমাদিগকে প্রাচীন সারল্যের যুগে লইয়া যায়; আমরা যেন নবীন সৌন্দর্য্য দেখিয়া সৌন্দর্য্য-চর্চ্চায় আত্মহারা হইয়া পড়ি।

ভাস্কর মুখ্‌তার স্বদেশে বিদেশে সর্ব্বত্র সমান সমাদর লাভ করিয়া আসিতেছেন। কিঞ্চিদধিক এক বৎসর অতীত হইল, কেরোর কোন প্রসিদ্ধ চত্বরে, "মিশরের জাগরণ" বা "The Awakening of Egypt," নামক

তাঁহার কতকগুলি ভাস্করকার্য্যের আবরণ উন্মোচন করা হয়। মিঃ গ্র্যাপ (Mr. Grappe) এই সময় তথায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি এই মূর্ত্তিগুলিকে কেরো



ঝড়ো হাওয়া

যাদুঘরের প্রাচীন মূর্ত্তির সহিত তুলনা করিয়া বিস্তর প্রশংসা করিয়াছেন।

ভাস্করকার্য্যে মুখ্তার যাহা করিতেছেন, হেদায়েৎ, নঘী, মহমুদ্ সাঈদ ও অপরাপর মিশরীয় চিত্রকরেরা রং ও তুলির সাহায্যে তাহা চিত্রে প্রকাশ করিতেছেন। ইঁহাদের সকলের কার্য্যে একই প্রেরণা ও সৃষ্টির ধারা ক্রিয়া করিতেছে। মিশরের নিজস্ব সত্তার প্রকাশ ও নীলনদের কাব্যসৌন্দর্য্য প্রকাশ করাই তাঁহাদের সকলের উদ্দেশ্য।

হেদায়েৎ স্বীয় গ্রাম্য নদীতীরের সান্ধ্য দৃশ্যগুলি অঙ্কিত করিতে গিয়া যেরূপ প্রতিভার পরিচয় দিতেছেন, তাহা আর কেহ দেখাইতে পারে নাই। এই দৃশ্যগুলির মধ্যে কুহেলিকাবৃত প্রাকৃতিক দৃশ্যের ভাবসৃষ্টিই তাঁহার বৈশিষ্ট্য। এ বিষয়ে তাঁহার সমকক্ষ দক্ষ শিল্পী মিশরে আর নাই।

মাত্র কয়েক বৎসর পূর্ব্বে তরুণ চিত্রশিল্পী মহ্মুদ সাঈদের 'ক্লাসিক' অর্থাৎ ইউরোপীয় সর্ব্বজনগৃহীত শিল্পরীতি হইতে আধুনিক রীতিতে প্রত্যাবর্ত্তন একটি বিস্ময়কর ব্যাপার বটে। তিনি শৈশবে মিশরেই ইটালীয় শিক্ষকের নিকট চিত্রাঙ্কন-বিদ্যা শিক্ষা করেন। শিক্ষা-কালে তাঁহার নিজস্ব কোন বিশিষ্ট শিল্পরীতি প্রকাশ পায় নাই। তখন আধুনিক মিশরীয় চিত্রকরদের চিত্র হইতে তাঁহার চিত্র এক স্বতন্ত্র বস্তু ছিল। তিনি প্রাচীন চিরা-চরিত প্রথা অবলম্বন করিয়াই চিত্রাঙ্কন করিয়া যাইতে-ছিলেন। এই সময়ে, ঘটনাক্রমে তিনি রুশীয় আধুনিকতা-পন্থী শিল্পীদের সংস্রবে আসেন। ইহার পর হইতে তিনি সম্পূর্ণই আধুনিকতা-পন্থী হইয়া পড়িয়াছেন। তাঁহার এই আধুনিকতা অবলম্বনে ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যও নষ্ট হয় নাই।

মহমুদ সাঈদের মত নঘী সম্পূর্ণরূপে প্রাচীন প্রভাব ছাড়াইয়া উঠিতে না পারিলেও, একটি নিজস্ব শিল্প-রীতি খাড়া করিয়াছেন। ইতিমধ্যে তিনি অনেকগুলি বিখ্যাত ছবি অঙ্কন করিয়াছেন। তন্মধ্যে বিরাট প্যানেলের (panel) গাত্রে অঙ্কিত The Triumph of Egypt বা 'মিসর জয়ন্তী' নামক ছবিখানিই প্রধান। ইহা সম্প্রতি মিশর গভর্ণমেণ্ট ক্রয় করিয়া কোন রাজপ্রাসাদের বৈঠক-খানার শোভাবর্দ্ধন করিয়াছেন। এই ছবিখানিতে রাজবর্ম্ম দিয়া কোন মিশরীয় রাণীর বিজয়োৎসবের শোভাযাত্রা চিত্রিত হইয়াছে ;—কলাবিৎ, ভাস্কর, শিল্পী, ফলের চাষী, শ্রমিক প্রভৃতি সমাজের সকল স্তরের লোক এই শোভাযাত্রায় যোগদান করিয়াছে। ইহার প্রতি ছবিটি নিখুঁত ও সুস্পষ্টরূপে অঙ্কিত করা হইয়াছে। নঘীর আর একটা ছবিতে খর্জ্জুরকুঞ্জ চিত্রিত করা হইয়াছে। খর্জ্জুরকুঞ্জকে সম্মুখে রাখিয়া তাহার তলদেশে দাঁড়াইলে যে হ্রস্ব বা দীর্ঘ ভাব দেখা যায়, তদনুসারে পারিপার্শ্বিক স্থির করিয়া তাহাকে এমন অসাধারণ শিল্পচাতুর্য্যসহকারে অঙ্কিত করা হইয়াছে যে, মনে হয় যেন আমরা প্রকৃতই খর্জ্জুরবৃক্ষতলে দণ্ডায়মান

আছি, এবং চিত্রে অঙ্কিত ব্যক্তিকে তাহার ফলভারাবনত অগ্রভাগে আরোহণ করিতে দেখা যাইতেছে।

মুখ্‌তার্‌ ও তাঁহার মত তরুণ শিল্পীদের আবির্ভাবে ও জগতের ঘটনাপরম্পরার প্রভাবে, আধুনিক মিশরীয় শিল্পকলা এক গৌরবময় নবীন যুগে প্রবেশ করিয়াছে এবং ধীরে ধীরে উহা বিশ্বজগতের সম্পদে পরিণত হইয়া উঠিতেছে।

মামার মোটর

শ্রীসুবোধ বসু

তর্ক হইতেছিল একটা গভীর বিষয় লইয়া। বাঙালী-মেয়েরা বব্‌ করিলে ভাল দেখায় কি-না। শুধু মাত্র আলোচনা হইতে ধাপে ধাপে আর্টের মাপকাঠির কথা উঠিল। তারপর পাশ্চাত্য সৌন্দর্য্য-তত্ত্ববিদ্‌দের পত্রিকা হইতে উদ্ধৃত-করা মত। তারপর উদাহরণ দিবার প্রয়াস।

বিনোদ দারুণ মাতিয়া উঠিয়াছে। যেন এ বিষয়টার বিচারের উপরেই জগতের সমস্ত ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছে, এবং বাঙালী মেয়েরা চুল না ছাঁটিলে স্বরাজের আর আশা নাই। সে কহিল, "সমস্ত ওয়ার্ল্ড্‌ কন্‌ভারটেড্‌—এমন কি, মেরী পিক্‌ফোর্ডও রাজী হয়েছে।"

সনাতন জবাব দিল,—"আরে রেখে দাও তোমার মেরী পিক্‌ফোর্ড; একটা এক্‌ট্রেস কোথায় কি করলে না করলে তার জন্য দুনিয়া নাচতে সুরু করুক আর কি।"

বিনোদের পৃষ্ঠপোষক অতীন কহিল, "এই সব ওল্ড স্কুল কুসংস্কারের জন্যই দেশটা গেল। চুলের জট্‌ কাটলে যেন রামায়ণ অশুদ্ধ হয়ে যাবে?"

সনাতনের হইয়া অবিনাশ কহিল, "আহা রোগা গিরগিটির মত চেহারায় ঝুঁটি বাঁধলে কি রূপই বঙ্গবালাদের খোলে,—যেন লেজ-খসা ব্যাঙাচী।"

বিনোদ রাগিয়া গেল। রাগিবারই কথা। সে নতুন-নতুন কবিতা লিখিতেছে, বাঙালী মেয়েদের এমন ক্যারিকেচার সে সহ্য করিতে পারে না। গরম হইয়া সে কহিল, "জানিস্‌ সব ফ্যাস্‌নেবল্‌ সোসাইটির মেয়েরাই আজকাল বব্‌ করছে? এই তো সেদিন গিয়ে—"

থিওরি পর্য্যন্ত বেশ চলিতেছিল। কিন্তু এইবার উদাহরণ দিতে আসিয়াই মুস্কিল। মফঃস্বল হইতে কলিকাতায় পড়িতে আসিয়া মেসে বাস করিতেছে। বালিগঞ্জ কমিউনিটির সঙ্গে আর কতটুকুই বা পরিচয়? সিনেমা-থিয়েটার, লেক আর ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে যতটা অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করা যায় তাহাই মাত্র সম্বল।

সনাতন কহিল, "কড়ে আঙুলে গোণা যায় ক'টা ছাঁটা-মাথা সারা শহরে আছে।" একেবারে যুদ্ধং দেহি ভাব। এর পরে আর তর্ক চলে না। হয় কোলাহল, নয় ত বাহুবল। প্রথমটা চলিতেছে। পরেরটাও সুরু হওয়া বিচিত্র নয়। কিন্তু অতদূর আর যাইতে হইল না। সিঁড়ি বাহিয়া সিগারেট ফুঁকিতে-ফুঁকিতে যে-ছেলেটি উঠিয়া আসিল তাহাকে দেখিয়া সকলেই কহিয়া উঠিল, "এই তো!"

ছেলেটির রঙ্‌ আর যাই বলা যাক্‌, ফর্সা বলা যায় না। গায়ে চীনাসিল্কের শার্ট। কলারটা ঘাড়ের উপর উঠাইয়া দেওয়া। উপরের পকেটের মুখ হইতে একটি সিল্কের রুমাল উঁকি দিতেছে। টেরী পিছন দিকে ঘুরাইয়া দিবার একটা প্রয়াসও লক্ষ্য করা যায়। সে হেলিয়া দাঁড়াইয়া মিহি গলায় কহিল, "কি?"

এ সব ফ্যাসন-ট্যাসন ব্যাপার সম্বন্ধে মেসে সে অথরিটি। কত বড়-বড় বাড়িতে তার যাতায়াত!

আর তার মামাও কি যে-সে লোক না কি? মণিলাল বলে ব্যারিষ্টারিতে কম করিয়া বলিলেও মাসে তাঁর হাজার পঁচিশ টাকা আয়। না, নাম তাঁর বাহিরে বিশেষ নাই বটে। মণিলালের মামা পাব্‌লিসিটি পছন্দ করেন না। পত্রিকাওয়ালারা যখন বড়-বড় কেস্‌-এর রিপোর্ট লেখে তখন তাহার মামার নামটা বাধ্য হইয়া অনিচ্ছাসত্ত্বে বাদ দিতে হয়। নহিলে ভয় আছে তো,—মামা অমনি ছাড়িবেন না। অতএব মামার ভাগ্নে মণিলাল একজন অ্যারিষ্টোক্রাট। এই পচা মেসে থাকে শুধু খেয়াল করিয়া। নহিলে এমন নোঙ্‌রা জায়গায় তার চৌদ্দপুরুষও থাকে নাই। মামা একশ'বার বাড়িতে যাইয়া থাকিতে বলিয়া হার মানিয়া গিয়াছে।

অতএব বিনোদ তাহাকেই বিষয়টির সুমীমাংসা করিয়া দিতে বলিল। মণিলাল কথাটা শুনিয়া একেবারে কৃপা-ভরা হাসি হাসিয়া উঠিল। ষ্ট্রেঞ্জ্‌! এ নিয়ে আবার তর্ক ওঠে? বিনুনী ডিস্‌কার্ডেড্‌ প্র্যাকটিস্‌—এন্টিকোয়েটেড্‌ বল্‌লেই হয়। কোনো রেস্‌পেক্‌টবল্‌ ফ্যামিলিতেই মেয়েদের আর ঐ জঞ্জাল বয়ে বেড়াতে দেখি না। বেণী দেখলেই ত চাইনিজদের কথা মনে পড়ে।"

সনাতনের দলের লোকরা দমিয়া পড়িল। কিন্তু সনাতন আরও শক্ত। বিশেষত মণিলালকে সে অতটা গৌরব দিতে চায় না। বন্ধুরা সবাই সেটা লক্ষ্য করিয়াছে। বিনোদ বলে, "নিছক ঈর্ষা! বাপের পাটের দালালি করে, কিছু টাকা আছে বটে, কিন্তু মণিদের মত কাল্‌চার পেতে আরও একশো বছর।"

সনাতন কহিল, "কেন সেদিন সিনেমায় দেখ্‌লাম রায়-ফ্যামিলির একজন মেয়ে—" বাধা দিয়া করুণা-বিমিশ্রিত অবজ্ঞার সুরে মণিলাল কহিল, "রাখো, তর্ক ক'রো না। ক'টা বড় ফ্যামিলিতে গিয়েছ শুনি? ক'জন আপ্‌-টু-ডেট্‌ মেয়েকে দেখেছ? রায়-ফ্যামিলির সুজাতাকে চেন,—যে গান গায়? আর মিটারদের নেলীকে,—নিউ-এম্পায়ারে নেচে সবাইকে তাক লাগিয়ে দিয়েছিল? করুণা বোসের এই একগোছ চুল, যতটা হয়ত তুমি দেখোও নি কোনো দিন,—কেটে খালাস হ'ল। রমা দত্ত, রেডিওর এমেচার গায়িকা, ছবি চন্দ, বালিগঞ্জ এসোসিয়েসনের নতুন প্রেসেট, "রামধনু"র রাণী হাসি চ্যাটার্জ্জী,—আর কত বল্‌ব? সেদিন গিয়ে দেখি মামাতো-বোন ডলী বব্‌ ক'রে বসে আছে। বল্‌লুম,—এদ্দিন পরে শেষে। হেসে বল্‌লে,—"নইলে আর সোসাইটিতে মেশা যায় না।"

বিনোদ উচ্ছ্বসিত। মণিলালকে ত সে আইডিয়াল ঠিক করিয়াছে। বিজয়ীর মত সনাতনের দিকে চাহিয়া সে কহিল, "আস্‌বে আর?"

সনাতন কিছু জবাব দিতে পারে না। এতগুলি পার্স'ন্যাল্‌ এক্‌সপিরিয়ান্সের উপর কিছু বলাও চলে না। নিষ্ফল ক্ষোভে শুধু সে গজ্‌গজ্‌ করিতে লাগিল।

মণিলাল কহিল, "যাই, কাপড়-জামাটা বদ্‌লে ফেলা যাক্‌। মাইল-পঞ্চাশেক মোটরিং করা গেছে। ভাগ্যিস্‌ মামার মিনার্ভা গাড়ীটা নিয়ে গিছলাম, নইলে বুইক-ফুইক হ'লে গা-ব্যথায় আর টেঁকা যেত না।"

বিনোদ শ্রদ্ধায় একেবারে ভাঙিয়া পড়িবার জোগাড়। কহিল, "আচ্ছা ভাই, একটা মিনার্ভা গাড়ীর দাম কত?"

"কেন, কিনবি নাকি রে" বলিয়া কৃপাভরা হাসি হাসিয়া মণিলাল শিস দিতে দিতে নিজের ঘরে চলিয়া গেল।

ভোরবেলায় নতুন উত্তেজনা। শনিবার দিন সন্ধ্যাবেলা একটু সঙ্গতের আয়োজন করিতে হইবে। তার সঙ্গে কিছু জলযোগ না হইলেও চলে না। অতএব চাঁদা তোলা প্রয়োজন। আর খুঁটিনাটি লইয়াও ফ্যাক্‌ড়া বাধে।

সনাতন কহিল, "রসগোল্লা, কচুরী আর ডালমুট। ঘোলের সরবতও হ'তে পারে।" বিনোদ ও সতীন নাক সিঁট্‌কাইল। হালখাতার নিমন্ত্রণ না কি? নহিলে এমন জলযোগ কোনো ফ্যাশনেবল্‌ জায়গায় কোনো দিন হয় না। না না, ও-সব চলবে না। চা, কেক, কাটলেট এই সব।

সনাতন ভেংচাইল, কহিল, "তবেই পেলিটীর বাড়ি হয়ে গেল আর কি?"

বিনোদও ছাড়িবার পাত্র নহে। সেও তেমনি খিঁচিয়া উঠিয়া জবাব দিল, "না, তাঁর জন্য বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণের হষ্টেল করতে হবে!"

মিটিঙে উপস্থিত সকলের ভোটই লওয়া হইল। কিন্তু ফল দেখিয়া মনে হইল স্বরাজের অবস্থা আশাপ্রদ নয়,—বেশীর ভাগই বিলাতী গ্রহণের সপক্ষে। চা, কেক্, কাটলেট্। হিন্দুর দোকানে হওয়া চাই কিন্তু, নহিলে আবার ক'জনের আপত্তি। পেঁয়াজ-না-দেওয়া নিরামিষ মাংসের মত হিন্দুর দোকানের জিনিষে এ মেসের কাহারও আপত্তি নাই।

এইবার চাঁদাটা উঠিলেই সব ঠিক হইয়া যায়। কিন্তু বেশীর ভাগ লোকই চার আনার বেশী দিতে চায় না। কিন্তু চার আনা করিয়া উঠাইলে, ইংরেজীতে যাকে বলে দুদিক মেলে না। টাকা-দুয়েক কম্‌তি পড়িয়া যায়। অনেক রকম বিয়োগ ও ভাগ করিয়া অঙ্কটাকে যখন আর কমান গেল না তখন বিষয়টা ভাবিবার মত হইয়া উঠিল।

সনাতন খোঁচা দিয়া কহিল, "নাও, এবার সাহেবী করো!"

বিনোদ কহিল, "করবই তো। চল্, মণিলালের কাছে। দু'টাকা একলাই দিয়ে দেবে সে।"

অবিনাশ অবজ্ঞাব হাসি হাসিয়া উঠিল। অবিনাশ কহিল, "তা হলেই খাওয়া হয়েছে। তোমাদের ঐ এরিষ্টোক্রাটটি আর যাই করুন এদিকে বেশ হুঁশিয়ার। কথার চাল দিতে ত আর ট্যাক্সো দিতে হয় না? কিন্তু পকেটে হাত পড়লেই লোক বোঝা যায়। মনে আছে সরস্বতী পূজোর তিন দিন আগে সেবার কে চাঁদা না দিয়ে পালিয়েছিল? যাবার আগের দিন পর্য্যন্ত,—হাঁ, নিশ্চয় দেব, দশ টাকা দেব। ক'টাকা পেয়েছিলে শুনি?

ব্যাপারটা এতই জানা যে, বিনোদও একটু ঘাবড়াইয়া গেল। কিন্তু মামার যার মিনার্ভা গাড়ী ও পঁচিশ হাজার টাকা মাসিক আয়, তার আবার এ সব ফাঁকি দিবার প্রবৃত্তি থাকিতে পারে না কি? কহিল, "আজ্ঞে, ফাঁকি দিয়ে যে পালিয়েছিল সে কথাটাই বা তোমাকে কে বলল্? ওর এক ভাগ্নের তখন অন্নপ্রাশন, তারের পরে তার, না যেয়ে করে কি? এই ভগ্নীপতিরই ত মাইকার মাইন্।" অবিনাশ কহিল, "জানা আছে সবই। বেশ, চলো ব্যারিষ্টার মামার ভাগ্নের কন্‌টি বিউশানটাই আগে আনা যাক্ গিয়ে।"

দলবল তখন মণিলালের ঘরের দিকে চলিল।

মণিলাল তখন তার নিজের ঘরের একটা বেতের টেবিলে উদ্গত-বাষ্প চায়ের পেয়ালার সম্মুখে ছুরি দিয়া প্লাম কেক্ কাটিতেছিল। বড়লোকের বড় কথা,—তার চায়ের সেট্, চামচ, ছুরি সব অভিজাত দামের। বিছানায় একটা বেড্-কভার। চেয়ারের উপর একটা কুশান্,—চাঁদ্‌নীর দোকানগুলিতে যেমন ঝুলানো থাকে। দেওয়ালে গোটা-দুয়েক জাপানী পাটী-ছবি। এক কথায় ঘর-খানা মন্দ নয়। দেওয়ালে ময়লা, তবে সেটা মেসের দোষ।

"এসো এসো। কি মনে ক'রে? চাঁদা? কিসের চাঁদা?"

সনাতন ব্যাপারটা বুঝাইয়া বলিল। তার দু'টাকা না হইলে বাজেট মিলিবে না। অবিনাশ বিনোদের দিকে চোখ টিপিল। অর্থটা এই যে এবার তোমার প্রিন্সের কাণ্ডটা দেখো।

"দু'টাকা? দু'টাকায় কি হবে?" মণিলাল মনি-ব্যাগ্ খুলিয়া একটা পাঁচ টাকার নোট ছুঁড়িয়া দিল। সঙ্গে সঙ্গে বিনোদের চোখ গর্ব্বে একেবারে উজ্জ্বল। মণিলাল একটু হাসিয়া কহিল, "আমি কিন্তু টাকা দিয়েই খালাস। প্রেজেন্ট থাক্‌তে কিন্তু পার্‌ব না, সেটা আগে থাক্‌তেই বলে দিচ্ছি।"

সনাতন অকৃতজ্ঞ নয়। পাঁচ টাকা দেওয়ার পর আর চটিয়া থাকা চলে না। সে কহিল, "কেন?"

"শনিবার দিন আমার একটা এন্‌গেজমেণ্ট আছে জাষ্টিস্ চ্যাটার্জ্জীর বাড়ি। ওঁর ছোট মেয়ে লুসীর জন্মদিন কিনা। না না, দিন বদ্‌লিয়ে আর দরকার নেই। সারা সপ্তাহটা হেভিলি বুক্‌ড্। আমার কি আর অবসর আছে? ওকে নিয়ে আজ মার্কেটে যেতে হবে,—নয়ত সিনেমাতে, নয়ত বোট্যানিকলে। কাল যেতে হবে মোটর ড্রাইভে। এরিষ্টোক্রাসির সঙ্গে

চেনা ক'রে ঝকমারি হয়েছে। মামা টেনে নিয়ে সবার সঙ্গে ইন্‌ট্রোডিউস্ করে দেয়, অভদ্রতা করতে পারিনে।"

সনাতন অতীনের কানে কানে কহিল, "এই চাল দিচ্ছে।"

অতীন কহিল, "যে-বিষয়ে কোনো জ্ঞান নেই সে বিষয়ে কোনো মতামত প্রকাশ ক'রো না।"

যাক্. খুশী হইয়া সবাই মণিলালের ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল, গেল না শুধু বিনোদ, অতীন এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষী আর দু-একজন। তারা সেখানেই তক্তপোষে বসিয়া পড়িল। সোসাইটিতে মেশে,—কত কথাই না জানে। কোন্ মেয়ের কার সঙ্গে বিয়ে ঠিক,—কোন্ ছেলেটা কার জন্য ব্যর্থপ্রেমে ঘুরিয়া মরিল, কোন্ তরুণ ব্যারিষ্টার কিসের জন্য টু-সিটার মোটর কিনিয়াছে, এই সব। মিসেস্ অমুকের বাড়ি চ্যারিটী পারফর্ম্মেন্সের রিহার্সেল হইতেছে,—সেদিন নৃত্য-নিপুণা মিস্ নেলীর সঙ্গে টেনিস খেলিয়া মণিলাল স্বেচ্ছায় হারিয়াছে,—বালিগঞ্জে ওদের ক্লাবের হাফ্ মুন্ কার্নিভালে অঞ্জলি মিত্র কি গান গাহিয়াছিল, রেণু হালদার ওর হাসিটাকে ভারী প্লেজেণ্ট বলিয়াছিল,—শুনিতে শুনিতে মণিলালের গুণগ্রাহীদের বিস্ময় ও শ্রদ্ধার আর অন্ত থাকে না।

মণিলাল পেয়ালাতে এক চুমুক দিয়া কহিল, "একটু ক'রে কেক খাও না। না না, আমার কি কম পড়বে? কাল ফিরপোর দোকান থেকে এক পাউণ্ড আনা হ'ল। ওঃ এই কাগজের ব্যাগটা,—না রে ওটা ফিরপোর দোকানের সাধারণ ব্যাগ নয়। ওদের নাম লেখা বাক্স আর ব্যাগ ফুরিয়ে গেছে, তাই শপ-এসিস্‌ট্যাণ্টটা বার-বার ক্ষমা চেয়ে দুঃখ জানিয়ে ওটাতেই পূরে দিয়েছিল। তা দিলই বা, ব্যাগ তো আর খাব না।"

মণিলাল হাসিয়া উঠিল। অন্য সবাইও।

মণিলাল চায়ের কাপটা সরাইয়া রাখিয়া ঘড়ির দিকে একবার চাহিয়া কহিল, "এখন আবার মামার ওখানে একবার যেতে হবে। একটা মোটর পাঠিয়ে দেবার কথা ছিল। কে জানে, যেখানে বাস করি, ড্রাইভার হয়ত এসে খুঁজে-টুজে ফিরেই গেছে!"

বিনোদ কহিল, "এও হ'তে পারে যে মামার কোনো দরকার পড়েছে,—গাড়ী নিয়ে বেরিয়ে গেছেন।"

মণিলাল হাসিয়া উঠিল। "মামার কি আর একটা মোটর না কি? নগদ পাঁচখানা। সবগুলিই দামী। মামাকে বলি, বৃষ্টির দিনের জন্য একটা শস্তা দামের কিন্‌লে হয় না। মামা হেসেই উড়িয়ে দেন, বলেন, "সস্তা জিনিষ আর কিন্‌তে পারব না।"

শ্রোতারা শ্রদ্ধায় একেবারে ভাঙিয়া পড়িবার জোগাড়। কম বড়লোকের ভাগ্নের সঙ্গে কথা বলিতেছে তাহারা?

স্যাক্‌রার বিলে ভারী টাকাটা দেখিলে লক্ষপতি প্রেয়সীর নিকট যেমন সোহাগ-পরিস্ফুট আতঙ্কের ভাণ করে তেমনি করিয়া মণিলাল কহিল, "আবার শ-পাঁচেক টাকা খরচের দায়ে পড়া গেল।"

বিস্ময়ে বিনোদ কহিল, "পাঁচ-শ টাকা?"

ঔদাস্য-ভরা কণ্ঠে মণিলাল কহিল, "লুসীকে জন্মদিনে একটা প্রেজেণ্ট দিতে হবে তো। ভাবছি ব্রোচই একটা দেওয়া যাক্। মামাতো-বোন ডলীকে নিয়ে বেরুব বাছতে।" বিস্ময়ে এ ওর মুখের পানে তাকাইতে লাগিল। পাচ-শ টাকার প্রেজেণ্ট—ইহা তাদের কল্পনাকেও ছাড়াইয়া যায়।

"লুসীকে দেখলে তবে বুঝতে পারতিস্ বাঙালীর মেয়ে কতটা সুন্দরী হ'তে পারে। জাত এরিষ্টোক্রাট ফ্যামিলি,—হবে না কেন? বব্ করেছে। কানে মুক্তার দুল। চমৎকার গলা। গান শুনিয়েই ত আমাকে মুগ্ধ করেছে। হ্যাঁ, বন্ধু তোদের কাছে আর গোপন ক'রে কি হবে, আমরা প্রেমে পড়েছি। না না, দোষ এতে কিছু নেই, সে আমাকে ভালবাসে, আর আমি তাকে। বাকি ব্যবস্থাটা মামীমা করছেন। বিনোদ প্রায় নিঃশ্বাস ফেলিতে পারে না। কহিল, "কন্—কুন্‌গ্রাটুলেশন্‌স্।"

মণিলাল সলজ্জ একটু হাসিল।

"লটি ব্যানার্জ্জীকে অনেক কষ্টে এড়ান গেছে। বাপের এক ঝুড়ি টাকা আছে সত্যি, কিন্তু তার জন্য আর তাকে বিয়ে করতে পারি না। শাড়ীর সঙ্গে জুতো

ম্যাচ ক'রে পরতে শিখলে না এখনও। বিশ হাজারের তলায় গাড়ীর নম্বর,—কোন্ মান্ধাতার আমলে কিনেছিল এখন পর্য্যন্ত কিপ্টে আর বদ্‌লালেই না। যাক্ ওঠা যাক্। হ্যামিল্‌টনের ওখানে ছাড়া ভাল ব্রোচ বোধ হয় আর কোথাও পাওয়া যাবে না। এ সব ইণ্ডিয়ান দোকানে পছন্দ-মাফিক যদি কোনো জিনিষও পাওয়া যায়? ভাল জিনিষ না হ'লে লুসীকে ত প্রেজেণ্ট দেওয়া যায় না? ভাবছিলাম আর কিছু বেশী টাকা খরচ করে—কিন্তু লুসী অত টাকা খরচ করতে দেবে না। বলে, তোমার বাবার জমিদারীর আয় দুই লাখ টাকা বলেই শুধু শুধু টাকা নষ্ট করবে না কি? লুসীটা বড় দুষ্টুর মত হাসে। বলে, কদ্দিন পরে না-হয় অনেক দিও। কি আর বল্‌ব বল, জোরে মোটর হাঁকিয়ে দিলাম। সেদিন রাজ্যি ঘুরে বেড়িয়েছিলাম। হাঁ, লুসীও চমৎকার ড্রাইভ করে।"

বিনোদ ও অতীন প্রভৃতির চোকে পলক পড়িতেছে না। এরিষ্টোক্রাটিক ফ্যামিলির ফ্যাস্‌নেবল রীতি, মেয়েরা পুরুষ-বন্ধুর সঙ্গে মোটরে ঘুরিয়া বেড়ায়, তাহাতে কিছুই আটকায় না। এই রকম হওয়াই ত উচিত।

শনিবার সন্ধ্যাবেলা উৎসবের জোগাড় হইতেছিল। ফুল-পাতা দিয়া একটা ঘর সাজান হইয়াছে। হারমোনিয়াম্, তবলা, এসরাজ। বেশ একটু উৎসাহের ভাব। বিনোদ কহিল,—"মণিলালটা থাক্‌লে এখন জম্‌তো ভাল। হাজার হোক্, বড় ফ্যামিলির ছেলে। অবিনাশ সতরঞ্চিটা পাতিয়া এখন হাঁপাইতেছিল। কহিয়া উঠিল, "বাবুর কোন্ দরকারটা আজ পড়ল শুনি? দেমাক্, পেট-ভরা দেমাক্।"

অতীন পাশে ছিল; সে প্রায় রাগিয়া গেল। "হ্যাঁ, তোমার এই ছাইয়ের জন্য সে অত বড় একটা অকেস্যনে না যাক্।"

অবিনাশ জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায় গেছে শুনি?"

এই সুযোগ বিনোদ হারাইতে পারে না। এই আন্‌কালচার্ডগুলিকে একটু শুনাইয়া দেওয়া যাক্ মণিলাল কোন্ সোসাইটীতে মেলামেশা করে। সে কণ্ঠস্বরে যতটা সম্ভব সম্ভ্রান্ততা আনিয়া কহিল, "জাষ্টিস্ চ্যাটার্জ্জীর মেয়ের জন্ম-উৎসবে। মিস্ লুসী চ্যাটার্জ্জী ওর একজন পার্স'ন্যাল ফ্রেণ্ড।"

একটি গোবেচারী গোছের ছেলে হাঁ করিয়া কথা গিলিতেছিল। সে কহিয়া উঠিল, "আমি মণিবাবুকে একটু আগে মিষ্টান্ন-ভাণ্ডারে খাচ্ছে দেখে এলাম, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটে,—ন'-মাসিমার বাড়ির কাছে।"

মিষ্টান্ন-ভাণ্ডারে মণিলাল? বেশীর ভাগ ছেলেই হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। সবাই জানে হোটেলে খাইতে হইলে সাধারণ ফিরপোতেই সে খায়,—নীচে নামিলে বড়-জোর চাইনিজ। সে খাইবে দেশী খাবারের কোন্ এক মিষ্টান্ন-ভাণ্ডারে? আবার কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটে। বালিগঞ্জ এভেনিউতে হইলে না হয় সখ করিয়া একদিন খাইতেও পারিত।

বিনোদ কহিল. "তোমার মাথা খারাপ হয়েছে। চোখের ওষুধও দিও।"

সনাতন আসিয়া এইটা লইয়া একটু হৈ চৈ সুরু করিল, "তোমাদের মণিলালের মুখখানা আছে বলেই টিঁকে আছে।" কিন্তু বিনোদ তাহাকে শীগগিরই চুপ করাইয়া দিল গোবেচারীকে জেরা করিয়া।

"বড় যে মণিলালকে খাবারের দোকানে তুমি দেখেচ, বল তো তার গায়ে কি জামা ছিল?"

ছোকরা থতমত খাইয়া গেল। সাধারণত সিল্কের জামাই মণিলাল পরে। সে কহিল. "সিল্কের জামা।"

বিনোদ ও অতীন অবজ্ঞায় হাসিয়া উঠিল। "তবেই খুব দেখেচ। আগাগোড়া খদ্দর পরে গেছে। সেটাই আজকাল ফ্যাশন কি না।"

ছোকরা চুপ করিয়া গেল।

যাক্, উৎসব বেশ জমিয়াছে, চা, কেক, কাটলেট। সনাতন এ বিষয়ে আপত্তি করিয়াছিল, কিন্তু এখন দেখা গেল লোলুপতা তাহার অন্য কাহারও অপেক্ষা কম ত নহেই বরঞ্চ অবশিষ্ট তিনটা কাটলেট অবিনাশকে বঞ্চিত করিয়া সে-ই মুখে ফেলিয়া দিল।

গোটা-নয়েকের সময় সঙ্গত যখন বেশ জমিয়া উঠিয়াছে তখন অকস্মাৎ খদ্দর-পরা মণিলাল সহাস্য মুখে আসিয়া

উপস্থিত। তার হাতে মস্ত বড় শ্বেতপদ্মের এক তোড়া, তাহার তলায় একটা গোড়ে মালাও ঝুলিতেছে। গা হইতে বাহির হইয়া আসিতেছে গোলাপ জলের গন্ধ।

সবাই তাহাকে অভ্যর্থনা করিয়া উঠিল। মণিলাল খুশীমুখে তখন আসরে আসিয়া বসিয়া পড়িল।

"তোমাদের জন্যই ওখান থেকে তাড়াতাড়ি ছুটে এলাম। মিসেস চ্যাটার্জ্জী নাছোড়বান্দা। বলতে হ'ল, আমার বন্ধুদের উৎসবে না গিয়ে পারি না। তারপর অনেক ব'লে কয়ে, এক পেট খাবার খেয়ে তবে ছুটি পেয়েছি। আবার তোমাদের এখানেও খেতে হবে? ওরে বাবা, সেটি পারব না, পেটে যদি একটু জায়গা থাকে। আচ্ছা, আনো এক কাপ চা আর এক স্লাইস্ কেক,—ওন্‌লি টুপিস্—"

কেকে এক কামড় দিয়া পেয়ালা হইতে এক চুমুক চা পান করিয়া মৃদুস্বরে বিনোদকে মণিলাল কহিল, "ব্রোচটা চমৎকার মানিয়েছে লুসীকে। সেটা প'রে তাকে কি চমৎকারই দেখাচ্ছিল তুই যদি দেখতিস্। লুসী বললে, কি ডিসেণ্ট তোমার পছন্দ--lovely. তা দামটা একটু বেশী হয়েছে বৈকি,—ভাল জিনিষ হ'লে হতেই হবে। পাঁচ-শো টাকায় কিছুতেই হ'ল না,—ছ'শো পঁচিশ টাকা পনেরো আনা।

শ্রদ্ধাপ্লুত বিনোদের মুখ দিয়া শুধু বাহির হইল, "ঈস্।"

"আর এই সাদা পদ্মের এই তোড়াটা নিজের হাতে লুসী আজ আমাকে উপহার দিয়েছে। ফুলের তাড়া থেকে আমার জন্য বেছে রেখেছিল। বল্‌লুম, তোমাকে দেখাচ্চে যেন বিয়ে করতে যাচ্ছ। ন-টী গার্ল, কিল দেখালে।"

কয়দিন কাটিয়া গিয়াছে। সেদিন মণিলাল নিজের ঘরে বসিয়া একটা ট্র্যাশ্ ইংরেজী নভেল পড়িতেছিল। ট্র্যাশ্ নভেল পড়ার মধ্যে এরিষ্টোক্রাসি আছে। মুগ্ধ হইয়া মণিলাল পড়িতেছে। তিন পাতা যাইতে-না-যাইতেই পাঁচটা গুম্ খুন। এর পর আরও না জানি কি আছে? স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড আসিল বলিয়া। এমন সময় ঘরে ইন্‌স্পেক্টর অমুকের প্রবেশ করা উচিত ছিল, কিন্তু আসিল বিনোদবিহারী।

"কি খবর?"

বিনোদের মুখ লাল হইয়া উঠিয়াছে। তার ঠোঁটটা কাঁপিল, কিন্তু কথা বাহির হইল না। ধীরে আসিয়া তক্তপোষে সে বসিয়া পড়িল।

মণিলাল কহিল, "আরে ঘামাচ্ছিস্ কেন? ব্যাপার কি? কানটা তো দারুণ লাল, কেউ মলে দেয়নি তো?"

অনেক কষ্টে সঙ্কোচ এড়াইয়া বিনোদ কহিল, "ভাই, একটা উপকার করতে হবে—তুমি না হ'লে আর কেউ পারবে না।"

মণিলাল কহিল, "লুসীর ব্রোচ কিনতেই সব টাকা ফুরিয়ে গেছে। আরও টাকার জন্য লিখে দিয়েচি, তার আগে তো আর—"

বাধা দিয়া বিনোদ কহিল,"না টাকার জন্য আসিনি।"

"তবে? আমাদের গানের ক্লাবের মজলিশের টিকেটের—"

"না না, সে-সব কিছু নয়।"

বিনোদের মুখখানা আরও লাল হইয়া উঠিল। গেঁয়ো-মেয়ের-মত সঙ্কোচ কাটাইয়া ফেলিয়া সে সহসা কহিয়া ফেলিল, "আমার জন্য মেয়ে দেখতে যেতে হবে।"

"মেয়ে দেখতে?" বিস্ময়ে মণিলালের চোখ দুটি বড় হইয়া উঠিল। "তোর জন্য মেয়ে দেখতে? বিয়ের মেয়ে?"

ঘাড় নাড়িয়া বিনোদ কহিল, "হুঁ।"

"না বাপু, ও-সব সেকেলে ব্যাপারের মধ্যে আমি নেই। হরিবল্—কাপড়ের পুঁটলীর মত একটা মেয়েকে যাচাই করা। জংলী প্রথা। লজ্জাবতী-লতার গা থেকে মাথা পর্য্যন্ত থর থর করে কাঁপন দেখলেই হাসি পায়। পুতুলের পেট টিপলে যেমন আওয়াজ বেরোয় তেমনি-তর—কথাবার্ত্তা,—হা হা। আমাদের সোসাইটিতে বাপু ও-সব মান্ধাতার আমলের প্রথা প্রচলিত নেই। ছেলেরা আর মেয়েরা নিজ নিজ কম্পেনিয়ান্ পছন্দ ক'রে নেবে। কোনো হাঙ্গামা নেই।"

বিনোদ একেবারে দমিয়া গেল। একেই তো সে দারুণ ভয়ে ভয়ে আসিয়াছিল, তারপর মণির এই সহানুভূতির অভাব। মণিলাল তো জানেও না বিয়ের আগে

মেয়ে দেখিয়া পছন্দ করার অধিকার মাকে কত রাগত চিঠি লেখালেখি করিয়া সে আদায় করিয়াছে। আজই ও-বাড়ি হইতে লোক তাকে লইতে আসিবে। ইচ্ছা ছিল মণিলালকে লইয়া যায়,—তার মতটার কত দাম, আর পছন্দও কত আর্টিষ্টিক। মণিলালের কি আর এদের বিশেষ পছন্দ হইবে,—বড় বড় সোসাইটির কত সুন্দরী মেয়ের সঙ্গে মেশে,—তবু সে যদি মেয়ের মুখের 'কাট্'-টাকে একেবারে আন্-বেয়ারেবল্ বলে তবে আর তাকে বিয়ে করা চলে না।

মণিলাল কহিল, "আর তা ছাড়া আজ একটা এন্-গেজমেণ্টও আছে। ছাড়াতে পারলেই বাঁচতাম, ডাঃ নাগের ফ্লাট মেয়েটাকে যতই অ্যাভয়েড করি ততই এসে আমার উপর ভর করে। আজ সিনেমায় যেতে হবে তাদের নিয়ে।"

"তবে থাক্,"—বলিয়া ক্ষুণ্ণমনে বিনোদ বাহির হইয়া যাইতেছিল, সহসা মণিলাল ডাকিয়া কহিল, "না না, তোকে আমি ডিস্‌য়্যাপয়েণ্ট করতে চাই না,—যাবো তোরই সঙ্গে মেয়ে দেখতে। লিলি নাগকে একটা না হয় ফোন করে দেওয়া যাবে।"

খুশী হইয়া বিনোদ ফিরিয়া আসিল। নানা আলোচনা। "তারা মধ্যবিত্ত লোক, তাদের বাড়ি নিয়ে কিন্তু নাক সিঁটকাতে পারবে না। আচ্ছা মণি, তোর মামার একটা মোটর আনা যায় না,—পাঁচটা তো আছে, তাতে চড়েই যাওয়া যেত।"

মণিলাল হতাশায় করতল-দুটি চিৎ করিয়া কহিল, "আর দিন পেলিনে, বললি যেদিন তিনটার ভেতর দুটো সোফারেরই জ্বর। আর একটা তো সারাক্ষণ মামার সঙ্গেই ঘোরে।"

বিনোদের ইচ্ছা হইতেছিল, বলে, "কেন তুমিও তো চালাতে জানো,"—কিন্তু লজ্জায় আর বলা হইল না। অতএব মোটর করিয়া যাইবার ইচ্ছা বিসর্জন দিতে হইল। ট্যাক্‌সি করিয়াও যাওয়া চলে, কিন্তু সেটা তো আর তেমন রেস্‌পেকটেবল্ নয়।

যাক্, দু-বন্ধু যথাসময়ে যথাস্থানে উপস্থিত হইল। আদর-আপ্যায়ন, মেয়ে সেলাইয়ের জন্য একজিবিশানে সোনার মেডেল পাইয়াছে। ম্যাট্রিক ক্লাসে পড়ে। "হ্যাঁ, সেতারটা তনুরই। আহা সবই তো ফেলে গেলে—খাবারগুলি তনুর নিজ হাতে তৈরি।"

সবটাই মণিলাল কৃপা-মিশ্রিত অবজ্ঞার চোখে দেখিতে লাগিল।

"কোন্ স্কুলে পড়ে মেয়ে? লরেটোতে?"

"না, গার্লস্ এইচ-ই?"

মণিলালের ইহাতে করুণা হইল। কহিল, "কেন যে টাকা খরচ করে যা তা ইস্কুলে পড়ান? মেয়েদের পড়াতে হ'লে কলকাতায় ঐ আপনার একটি মাত্র স্কুল—লরেটো।"

মেয়ের ভাই অলক্ষ্যে শুধু কটমট করিল।

মণিলাল একটা নাতিদীর্ঘ হাই তুলিবার পর কহিল, "এই তো আমার মামাতো-বোন ডলীকে নিয়ে মামা মহামুস্কিলে পড়েছিলেন। কলকাতায় একটা রেস্‌পেক্‌টেবল্ স্কুলই নেই। শেষে সিম্‌লেতে কনভেণ্টে রেখে পড়ালেন। তা অবশ্য মামার কথা আলাদা, টাকার তো আর অভাব নেই। ঠিক কথা, পিয়ানো বাজাতে জানে তো?"

বাড়ির লোকেরা বিস্মিত চোখে মণিলালের দিকে তাকাইয়া রহিল। ছেলেটা কে রে বাবা! মধ্যবিত্ত বাঙালী গৃহস্থের ঘরে মেয়েরা যেন সচরাচরই পিয়ানো বাজায়। মেয়ের কাকা বলিল, "না ও-সব বাজনা কি আর আমাদের গৃহস্থের ঘরে থাকে। সেতার বাজায় বেশ।"

"ও আই সী, সে-কথা আমি প্রায় ভুলেই গিছলাম। আমাদের মধ্যে ওটা একটা নেসেসিটির মধ্যে কি না। হ্যাঁ, আমাদের পুওর কান্‌ট্রিতে সবাই কি আর একটা পিয়ানো প্রভাইড করতে পারে। তবে সেতারটা বড় এন্টীকোয়েটেড—ভায়োলিন্ হ'লে না হয়—"

মেয়ের ভাই একেবারে জ্বলিয়া উঠিবার জোগাড়; বড়রা চোখ টিপিয়া তাহাকে শান্ত করিবার চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু মণিলালের সেদিকে খেয়ালই নাই। বড় ফ্যামিলির ছেলে, বড় দৃষ্টি। এ-সব সাধারণ কথা জিজ্ঞাসা করিলে কাহারও আবার রাগ হইতে পারে নাকি! সিল্কের রুমাল বাহির করিয়া মুখ মুছিতে মুছিতে মেয়ের কাকাকে সে কহিল, "বাড়ির কত রেণ্ট দেন্?"

পঁচাশি টাকা। পাঁচটা রুম।"

মণিলাল অসীম বিস্ময়ে প্রায় চীৎকার করিয়া উঠিল। "মাত্র পঁচাশি টাকা? ড্যাম্ চীপ! তা এসব কোয়াটারে বাড়ি চীপ্ হয় বলেই শুনেছি।"

তারপর বিনোদের দিকে ফিরিয়া যেন কানে কানেই বলিতেছে এমনি করিয়া কহিল, "ক্যামাক্ ষ্ট্রীটে মামার বাড়িটার ভাড়া দেয় আটশো পঁচাশি টাকা। রুম্‌ও গোটা-দশেকের বেশী হবে না। কেবল মাত্র ফ্যাসানেবল্ পাড়ায় বলেই অত রেণ্ট।"

"আজ্ঞে আপনার মামার নামটা,"—মেয়ের ভাই অর্দ্ধেক উচ্চারণ করিতেই বৃদ্ধেরা তাহার মুখ চাপিয়া ধরিয়া অন্যত্র লইয়া গেল। মণিলাল শুধু স্নিগ্ধ হাসিয়া কহিল, "আহা, উনি অন্যায় কি বলেছেন। মামার নামটা বল্‌তে আমার লজ্জা কি,—তিনি অর্থে, সামর্থ্যে, বিদ্যায় গর্ব্ব করবারই মতন লোক।"

এমন সময় পাশের ঘরে মহিলাদের সমাগমের সূচনা হইল। চাপা গলায় উপদেশ, ফিস্‌ফিসানি, চুড়িবালার নিক্কণ। পরক্ষণেই ছোট্ট একটি মেয়ের সঙ্গে পরীক্ষার্থী মেয়েটির প্রবেশ।

মণিলাল এটিকেট দুরস্ত। দাড়াইয়া উঠিয়া অভ্যর্থনা করিল। বসুন চেয়ারটাতে। মেয়েদের সঙ্গে কথাবার্ত্তায় মণিলাল বেশ স্মার্ট,—কত ফ্যাস্‌নেব্‌ল্ মেয়েদের সঙ্গে মেশে, হইবে না বা কেন? প্রশ্ন চালাইতে তার একটু বাধিল না। নানা কথাবার্ত্তা।

তারপর,—"সেদিন না আপনাদের স্কুলে মেয়েদের একটা পারফর্ম্মেন্স হয়ে গেল? আপনি কি সেজেছিলেন? কিছু সাজেন নি, ষ্ট্রেঞ্জ্! আচ্ছা, আপনি ডান্সিং—"

মেয়ের কাকার চোখ এবার ভ্রূকুটিয়া উঠিল। বিনোদ কানের কাছে ফিসফিস্ করিয়া বলে, "না না, ভাই, তুমি ও-সব প্রশ্ন ক'রো না। ওরা কি আর তোমাদের সোসাইটির মত, বুঝবে না, শুধু রাগ করবে।"

ছেলের ভাই এতক্ষণ ফিরিয়া আসিয়াছে। সে মুখ হাঁ করিতেই বড়রা তাহাকে চুপ করাইয়া দিল।

মণিলাল এতক্ষণে ব্যাপারটা যেন বুঝিয়া লইয়াছে। কহিল, "দেখুন, আমি সরি যে এ প্রশ্ন করাতে আপনারা একটু অফেন্স্ নিয়েচেন। আমাদের সোসাইটিতে এটা এত স্বাভাবিক যে,—যাক্।"

একটুক্ষণ নিঃশব্দে কাটিয়া গেল। অন্তঃপুরের মেয়েরা ফিস্‌ফিস্ করে। আর বিনোদ সুযোগ পাইলেই মণিলালকে ইসারা করিয়া বলিতেছে, "ভাই, আর কিছু বলিস্-টলিস্ না। কিন্তু মেয়ের কাল্‌চার কতটুকু মণিলাল তাহা ভাল করিয়া দেখিয়া লইতে চায়। তার চোটে বিনোদের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া উঠিল। মনে মনে সে ভাবিল, এ-সব এরিষ্টোক্রাটিক ফ্যামিলির ছেলে-টেলেকে আনাই এখানে ঠিক হয় নাই।"

মণিলাল মেয়ের কাকাকে কহিল, "এর দু-হাতেই চুড়ি দেখ্‌তে পাচ্ছি।"

মেয়ের কাকা কহিল, "হাঁ, পাঁচ গাছ ক'রে।"

বাধা দিয়া মণিলাল কহিল, "না, তা বলচি না। চুড়ি-পরা আর আজকাল ফ্যাসান নয়। কোনো ফ্যাস্‌নেবল্ জায়গায়ই ও আর চলে না। পনেরো বছর আগে ছিল।"

মেয়ের কাকার ধৈর্য্য প্রায় শেষ-সীমানায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে। সে বেশ একটু কড়া স্বরে কহিল, "চুড়ি ফ্যাসান নয়, তবে কি ফ্যাসান্ শুনি?"

মণিলাল অবজ্ঞায় প্রায় ভ্রূকুটি করিল। কি ফ্যাসান্ তাই জানে না,—পুওর ক্রিচার! কহিল, "রুলী তবু পরে এক হাতে। দু হাতে গয়না পরার দিন উঠে গেছে। তবে আজকাল ফ্যাসান্ হয়েচে শুধু ডান হাতে একটা করে,—এই তো জাষ্টিস্ চ্যাটার্জ্জীর মেয়েকে সেদিন একটা প্রেজেণ্ট করেছি,—ডান হাতে শুধু একটা ক'রে ব্রোচ্।"

হাতে—ব্রোচ্? অন্তঃপুরের কলগুঞ্জন অকস্মাৎ একেবারে বন্ধ। এক মুহূর্ত্তে সকলের চোখ দীর্ঘ,—এমন কি বিনোদেরও। এক মিনিট চোখ চাওয়া-চাওয়ি, তারপর তীরের মত এক ঝলক খিল্‌খিল্ হাসি শোঁ করিয়া আসিয়া ঘরে প্রবেশ করিল। এদিকে চেয়ারে তনুর বোধ হয় ফিক্ ব্যথা উঠিয়াছে, নহিলে প্রাণপণে মুখখানা সে বিকৃত করিবে কেন? তনুর পাশে যে ছোট্ট মেয়েটি দাঁড়াইয়াছিল সেও ফিক্ করিয়া হাসিয়া কহিয়া উঠিল, "ওমা কি বলে! হিঃ হিঃ।"

সম্মুখে পিছনে ডাহিনে বামে কেবল হিঃ হিঃ। এ কি এপিডেমিক লাগিল না কি? মণিলাল তো কিছুই বুঝিতে পারিতেছে না। এমন সময় মেয়ের ভাই হিঃ-হিঃ-কারের উপরে শ্লেষের কণ্ঠ উঠাইয়া কহিল, "মশায়, কোন্ হাতে ব্রোচ্‌টা বাঁধে জাষ্টিস্ চ্যাটার্জ্জীর মেয়ে? বাঁ-হাতে না ডানহাতে? গলায় বাঁধে না, ঠিক জানেন তো।"

অঁ্যা! অঁ্যা!

মণিলালের বোধ হয় দারুণ জলতেষ্টা পাইয়াছে। নহিলে আর সে ঢোকের পর ঢোক গিলিবে কেন? সে তো আর বিষম খায় নাই।

অতিকষ্টে এ-ঢোকটা লইয়া সে কহিল, 'অঁ্যা অঁ্যা, ইয়ে—'

হাঃ হাঃ হোঃ হিঃ—

মণিলালের কণ্ঠ অকস্মাৎ জড়াইয়া আসিল। সে যেন তোতলাইয়া উঠিতেছে,—"দেখুন আ—আমি গিয়ে বল্‌তে যাচ্ছিলাম আপনার গিয়ে—"

চারদিকে তখন হাসির তুফান। বাঃ বেশ তো ব্রোচ্‌টা,—কিসের? হাঃ হাঃ হোঃ হোঃ।

বিনোদ প্রমাদ গণিল। মণিলালের দিকে তাকাইয়া দেখে,—এ কি, তার ঠোঁটটা হিঃ হিঃ করিয়া কাঁপিতেছে। কান? হ্যাঁ কানের বর্ণও স্বাভাবিক রক্ত। এখন,—এখন কি?

এমন সময় রাস্তায় একটা মোটরের হর্ণ। তাড়াতাড়ি জান্‌লা দিয়া বাহিরের দিকে দেখিয়াই মণিলাল অকস্মাৎ একেবারে দাঁড়াইয়া পড়িল। "আরেরে, ভুলেই গিছলাম বালিগঞ্জ যেতে হবে। ভাগ্যিস্ মামার মোটরটাকে পাওয়া গেছে। এই এই—"

পরক্ষণে খসিয়া-পড়া চাদরটা সাম্‌লাইয়া লইয়া মণিলাল সড়াক্ করিয়া ঘরের বাহির হইয়া পড়িল।

দ্বীপময় ভারত

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

[১৭] শূরকর্ত্তে ছায়া-নাটক দর্শন

যবদ্বীপের সংস্কৃতির উদ্যানে একটী সুন্দর পুষ্প হ'চ্ছে Wajang Koelit 'ওআইয়াং কুলিৎ' বা পুতুলের ছায়া-নাটক। সংক্ষেপে জিনিসটী এইঃ নাটকের পাত্র-পাত্রীদের চামড়ায় কাটা মূর্ত্তি বা ছবি নিয়ে প্রদর্শক একটা সাদা পরদার সামনে বসেন, প্রদর্শকের সামনে মাথার উপরে একটা আলো থাকে, এই আলোর রশ্মি পরদার সামনে ধরা পুতুলের উপরে প'ড়ে সাদা পরদার উপরে ছায়ার সৃষ্টি করে, পরদার ও-ধারেও ছায়া দেখা যায়। পুতুলগুলির হাত নড়াতে পারা যায়। আর প্রদর্শক মুখে মুখে ঘটনাবলীর বর্ণনা পাঠ করেন, বা পাত্র-পাত্রীদের কথা অভিনয়ের ধরণে নিজেই ব'লে যান। এই রকম পুতুল নিয়ে ছায়াবাজীর নাটক অত্যন্ত সরল আর ছেলে-মানষী ব্যাপার ব'লে মনে হবে, কিন্তু একে অবলম্বন ক'রে যবদ্বীপে একটী বেশ বড়ো আর বৈশিষ্ট্যময় শিল্প-কলা গ'ড়ে উঠেছে।

যবদ্বীপে এই রকম ছায়া-নাটকের উৎপত্তি কি কি ক'রে হ'ল? এরা যে চামড়ায়-কাটা পুতুল বা ছবি-গুলি ব্যবহার ক'রে সেগুলি অত্যন্ত অদ্ভুত; ওআইয়াং-এর পুতুলের চেহারায় যবদ্বীপে মানবদেহ-চিত্রণে অত্যন্ত grotesque বা বিসদৃশ ঢঙ এসে গিয়েছে, ছবিগুলির হাত-পা সব লিকলিকে সরু ক'রে তৈরী করা হয়, মাথাটীর সমাবেশও অদ্ভুত; আর পোষাক-পরিচ্ছদ পরণের ধরণও অদ্ভুত। প্রথম দর্শনে এ জিনিসের সঙ্গে পরিচয় নেই এমন লোকের চোখে সবটা জড়িয়ে দেবতা বা মানবের

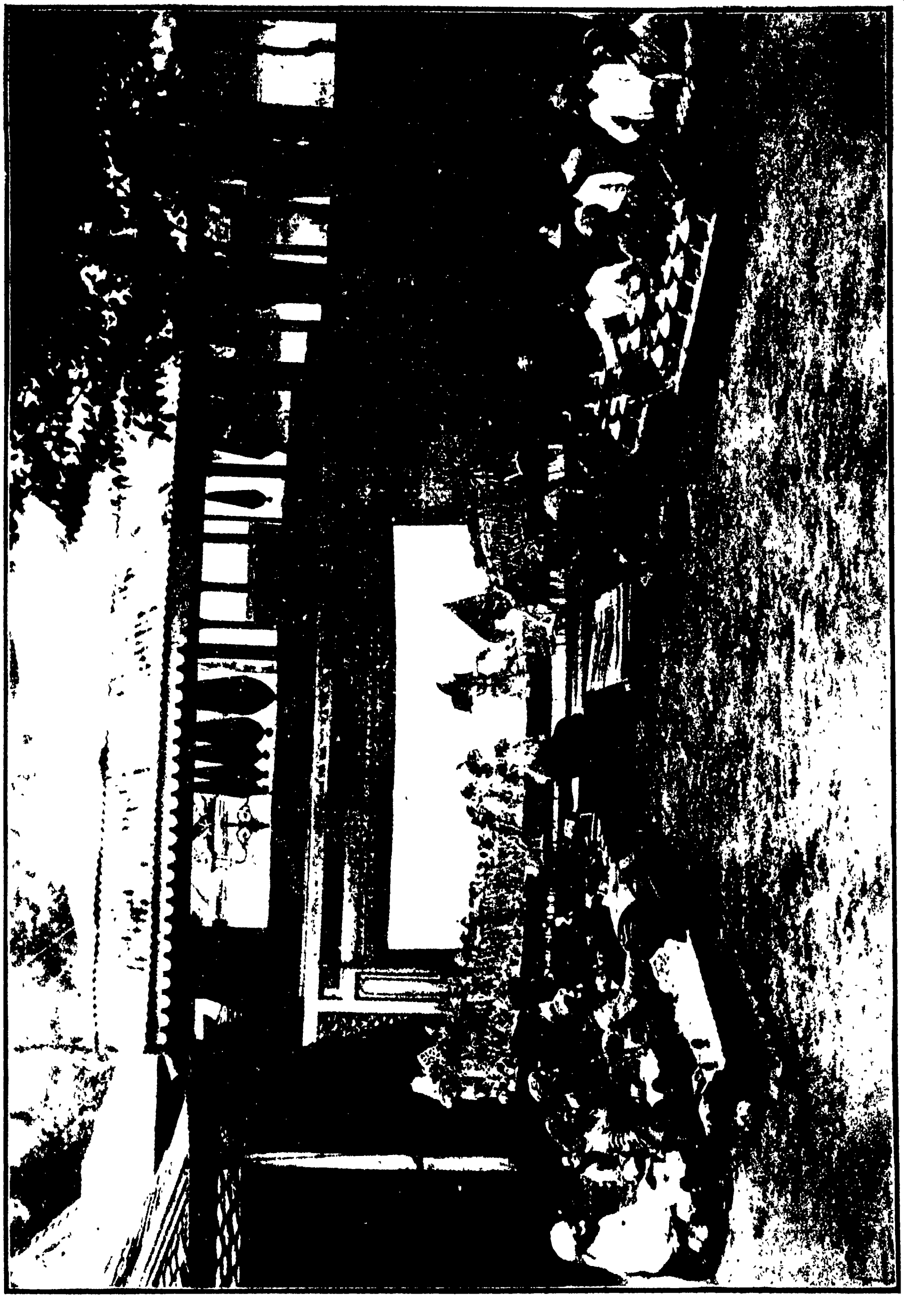
মূর্ত্তিগুলিকে ভূতের বা ব্যঙ্গচিত্রের মূর্ত্তি ব'লেই মনে হবে। কেমন করে এই বিসদৃশ ঢঙের মূর্ত্তির উদ্ভব হ'ল তার ক্রম-বিকাশ বোঝা কিছু কঠিন নয়, Kats রচিত এই ছায়া-নাটক বিষয়ক বৃহৎ সচিত্র পুস্তকে ছবি দিয়ে বেশ দেখানো হ'য়েছে, কেমন ক'রে খ্রীষ্টীয় নবম শতকের প্রাম্বানান-এর ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিবের মন্দিরের বাস্তবানুসারী শিল্পের দেবমূর্ত্তি আস্তে আস্তে ত্রয়োদশ শতকের পানাতারান্-এর শিল্পে বিশিষ্ট ভঙ্গী পেয়ে অনেকটা অন্য ধরণের হ'য়ে দাঁড়াল, আর তারপরে ধীরে ধীরে এই শিল্প আজকালকার ওআইয়াং-এর সজ্ঞানকৃত কিম্ভূত মূর্ত্তি পেয়ে ব'সল। মূর্ত্তিগুলি অদ্ভুত হ'লেও, তাদের মধ্যে একটা কলা-রীতি আছে, তাদের উদ্দেশ্য আছে, আর দস্তুর-মতন তাদের iconography বা মূর্ত্তি-নির্ণয়-বিদ্যাও আছে। চামড়া থেকে কেটে লাল নীল আর সোনালী ইত্যাদি নানা উজ্জ্বল রঙ লাগিয়ে এগুলিকে দেখ্‌তে খুবই জমকালো করা হয়; দুদিকেই রঙ লাগানো হয়—প্রত্যেক রঙের, দেহের প্রত্যেক ভঙ্গীটার একটা বিশেষ অর্থ থাকে। ম'সের সিঙের বা বাঁশের কাঠির মতন সরু হাতলে মূর্ত্তিগুলি আটকানো থাকে, আর পৃথক আর দুটা সরু কাঠি দুটা হাতের সঙ্গে লটকানো থাকে, তার দ্বারা হাত নড়াতে পারা যায়।

কি রকম ভাবে এই আদিম অবস্থার নাটক যবদ্বীপে এতটা প্রচার লাভ করে তা বলা যায় না। পুতুল-নাচ—দড়ি টেনে পুতুলের হাত পা নাড়িয়ে নাটকের খেলা দেখানো যবদ্বীপে এখনও প্রচলিত আছে, আর মানুষের দ্বারায় স্বাভাবিক মুখে বা মুখস-পরা মুখে অভিনীত নাটক-ও খুব হয়, কিন্তু এই ওআইয়াং কুলিৎ-এর লোকপ্রিয়তা কিছু কমে নি।

এ জিনিস ভারত থেকেই যবদ্বীপে গিয়েছিল ব'লে অনুমান হয়। সংস্কৃত নাটকের উৎপত্তি সম্বন্ধে কতকগুলি ইউরোপীয় পণ্ডিতের মত এই যে ভারতের আদি নাটক হ'ত পুতুল-নাচ আর ছায়া-নাট্যকে অবলম্বন ক'রে। পুতুল-নাচের সঙ্গে যে মানুষের দ্বারা অভিনীত নাটকের একটা যোগ ছিল তা সংস্কৃত নাটকের 'সূত্রধার' শব্দই যেন ইঙ্গিত ক'রছে—'সূত্রধার' অর্থে যে পুতুল নাচাবার সুতো বা দড়ি ধ'রে থাকে, তার পরে অর্থ দাঁড়াল যে নিজেই অভিনয় করে। তবে 'ছায়া-নাটক' এই শব্দটা সংস্কৃতে আছে, আর সম্ভবতঃ এর দ্বারা পুতুল বা ছবির ছায়ার সাহায্যে অভিনয় সূচিত হয়। কিন্তু সংস্কৃতে যে দুই চারখানি 'ছায়া-নাটক' আছে, সেগুলি ঢের পরের—খ্রীষ্টীয় ১০০০এর ও পরেকার। যে সকল পণ্ডিত মনে করেন যে-সংস্কৃত নাটকের মূল এই ছায়া-নাটক, তাঁরা পতঞ্জলির মহাভাষ্যের একটা উক্তি নিয়ে নিজেদের মত স্থাপন করবার চেষ্টা করেন; তবে তাঁরা এই উক্তিটাকে যেভাবে গ্রহণ করেন, অন্য পণ্ডিতে তার আপত্তি ক'রেছেন। আমার মনে হয়, প্রাচীন ভারতে নাটকের উদ্ভব পুতুল-নাচের সঙ্গে কিছু পরিমাণে জড়িত থাকা সম্ভব, কিন্তু যবদ্বীপীয় ওআইয়াং-এর মত পুতুলের ছায়া দ্বারা অভিনয় প্রাচীন ব্যাপার নয়, অর্ব্বাচীন যুগেরই ব্যাপার; খ্রীষ্টীয় প্রথম সহস্রকের শেষের দিকে সম্ভবতঃ ভারতবর্ষে এর উদ্ভব হয়, তারপর ভারত থেকে ইন্দোচীনে (শ্যামে আর কম্বোজে) যায়, যবদ্বীপে যায়, ওদিকে আরবদের দেশ ইরাক আর মিসরেও যায়, আর তুর্কীরাও এই জিনিস পরে নেয়; যবদ্বীপীয়দের ওআইয়াং-এর মত শ্যামদেশেও ছায়াভিনয়ের জন্য চামড়ায়-কাটা ছবি ব্যবহারের রেওয়াজ আছে; আর ইরাক মিসর আর তুর্কদেশেও খ্রীষ্টীয় চতুর্দ্দশ আর পঞ্চদশ শতকের চামড়ায় কাটা মূর্ত্তি আর অন্য চিত্র পাওয়া গিয়েছে। ভারতবর্ষে বোধ হয় এ জিনিসটা ততটা লোকপ্রিয় হ'তে পারে নি।

বেশীর ভাগ রামায়ণ মহাভারত আর প্রাচীন যবদ্বীপীয় রাজকাহিনী (বা 'পাঞ্জি') অবলম্বন ক'রে এই ওআইয়াং নাটক; মহাভারত রামায়ণ অবলম্বন ক'রে যে ছায়া-নাটক হয় তার নাম Wajang Poerwa 'ওআইয়াং পূর্ব্ব'। যবদ্বীপে রামায়ণ মহাভারতের এতটা লোক-প্রিয়তা অনেকটা এই ওআইয়াং পূর্ব্বের লোক-প্রিয়তার সঙ্গে জড়িত।

(ওআইয়াং-কুলিৎ-এর উপর ১৩৩৬ সালের আশ্বিন মাসের প্রবাসীতে বন্ধুবর শ্রীযুক্ত কালিদাস নাগ একটী তথ্যপূর্ণ সচিত্র প্রবন্ধ প্রকাশ করেন, তাতে



'ওআইয়াং-কুলিৎ' বা ছায়ানাটকের আসর—প্রাঙ্গনে সজ্জিত

ওআইয়াং-এর মূর্ত্তির একটী তে-রঙা ছবি আর অন্য ছবিও আছে।)

১৬ই সেপ্টেম্বর রাত্রি সওয়া নটায় কবির সঙ্গে আমরা রাজকুমার কুসুমায়ুধ'র বাড়ীতে গেলুম। বাড়ীটী খুব বড়ো ব'লে মনে হ'ল না। ছোটো খাটো একটী 'পেণ্ডপো' বা মণ্ডপ, সেখানে ওআইয়াং-এর সরঞ্জাম সাজানো রয়েছে। মাননীয় অভ্যাগতদের জন্য চেয়ার পাতা, আর সাধারণ লোকেরা মাটীতে গাল্‌চের উপরে

ব'সেছে। আমাদের স্বাগত ক'রে বসালে। গৃহকর্ত্তা রাজকুমার কুসুমায়ুধ সহাস্য বদনে উপস্থিত। এঁর এক ভাইয়ের সঙ্গে পরিচয় হ'ল, ভদ্রলোক পনেরো বছর হলাণ্ডের লাইডেন নগরে ছিলেন, ডচ আর ফরাসী বলেন। Djatikoesoemo 'জাতিকুসুম' নামে আর একজন রাজকুমার ছিলেন। রাজকুমার কুসুমায়ুধ'র আর একটা নাম শুনলুম Ardjoeno 'অর্জ্জুন'। শ্রীযুক্ত ডাক্তার রাজিমান—এঁর কথা আগে ব'লেছি, ইনি দেখতে এসেছিলেন; আর মঙ্কনগরোও এসেছিলেন।

পেণ্ডপোটি জুড়ে ওআইয়াং-এর আসর। বাড়ীর অন্দরের একটা হল ঘর আর পেণ্ডপোর মাঝামাঝি, সুন্দরভাবে খোদাই-করা কাঠের ফ্রেমে বড়ো সাদা চাদর একখানা আঁটা র'য়েছে। ভিতরের দিকে ভিতর বাড়ীর হল-ঘরে ব'সে মেয়েরা, আর বাইরের দিকে পেণ্ডপো-তে ব'সে পুরুষেরা—দু-দিকে ব'সে লোকে চাদরের উপর ছায়াচিত্রের অভিনয় দেখ্‌তে পায়। বাইরের দিকে পরদার সামনে মাঝামাঝি জায়গায় Dalang 'দালাং' বা কথকের আসন; দালাং-এর মাথার উপরে ঈষৎ সামনে, উপর থেকে শিকলে ঝোলানো খুব কাজ করা পিতলের একটা বড় প্রদীপ। দালাং-এর ডাইনে বাঁয়ে দুই পাশে পরদার সঙ্গে লম্বালম্বি ক'রে রাখা দুটো কলা গাছের গুড়ি; তাতে প্রায় শ' দেড়েক ওআইয়াং-এর মূর্ত্তি রাখা—মূর্ত্তিগুলির শিঙের বা বাঁশের কাঠির হাতল কলাগাছের গায়ে বিঁধিয়ে সেগুলিকে খাড়া ক'রে রাখা হ'য়েছে। দালাং-এর পিছনে তাঁর দোহার গাইয়েদের আর বাদকদের দল; গামেলান্ বাজনা, ঢোল, সারেঙ্গী এই সব বাজনা।

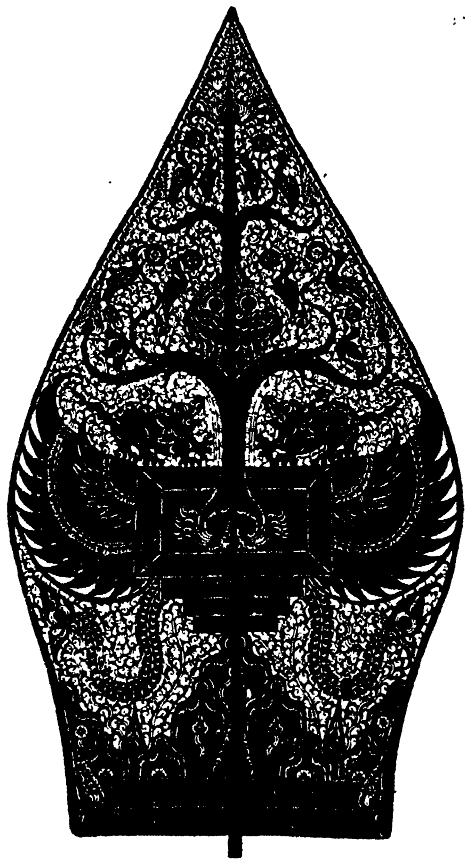
স্বাগত-শিষ্টাচারের পরে আমরা ব'সলুম। শ্রীযুক্ত রাজিমান আর মঙ্কনগরো এঁরা ওআইয়াং-এর পুতুলের সব ব্যাপার আমাদের বুঝিয়ে দিতে লাগলেন। মূর্ত্তি গুলি দুই ভাবের ক'রে কাটা হয়, দৈব প্রকৃতিক পাত্রের আর আসুর-প্রকৃতিক পাত্রের। দেব-প্রকৃতির পাত্রের নাক সরল ভাবে আঁকা হয়, অসুর-প্রকৃতির পাত্রের নাক উঁচু দিকে। মূর্ত্তিতে ঘাড় কতটা বাঁকা তার উপর পাত্রের মনোভাব নির্ভর করে; সাধারণতঃ যে ভাবে ঘাড় বাঁকানো হয় তাতে নির্ব্বিকার-ভাব দেখানো হয়, একটু বেশী ঝুঁকানো থাকার অর্থ বৈরাগ্য-ভাব, একটু উঁচু থাকার অর্থ বীরত্ব-ভাব। যখন পাত্র ক্রোধাবিষ্ট হন তখন কালো রঙে রঙানো পুতুল বা'র করা হয়, অন্য ভাব-বিশিষ্ট হ'লে লাল রঙে বা সাধারণ গায়ের সোনালী রঙে। এইরূপে একই পাত্র বা পাত্রীর জন্য নানা রকম মূর্ত্তি থাকে; ঠিক ভাবোপযোগী মূর্ত্তি ব'ার ক'রে ছায়াভিনয় করে। এক অর্জ্জুনের চিত্র-বিচিত্র রঙের পাঁচ রকম মূর্ত্তি আছে। অবশ্য ছায়া নাট্যে এত রঙের সমাবেশের কোনও সার্থকতা থাকে না, কিন্তু তবুও এই সব খুঁটি-নাটী ওআইয়াং-মূর্ত্তির অপরিহার্য্য অঙ্গ হ'য়ে দাঁড়িয়ে গিয়েছে, দালাং-এর দিকে



তিনটী-'ওআইয়াং' মূর্ত্তি

যে দর্শকরা থাকে সেগুলি তাদের দর্শন ও আলোচনার বিষয়ে হ'য়ে ওঠে। ডাক্তার রাজিমান আমায় জিজ্ঞাসা ক'রলেন, ভারতবর্ষে নাটকে বা ছবিতে ভীমের পরিধানের কাপড় কি রঙের করা হয়? আমি অবশ্য একথা জানতুম না, ভীমের কাপড়ের কোনও বিশেষ রঙের ব্যবস্থা আছে কি না; এখন অন্ততো আমাদের বেশকারীরা কি যাত্রায় কি থিয়েটারে এ বিষয়ে নিরঙ্কুশ। ডাক্তার রাজিমান ভীমের ওআইয়াং মূর্ত্তিটী দালাং-এর কাছ থেকে নিয়ে আমায় দেখালেন—ভীমের পরিধেয়ের রঙ দেখলুম, লাল আর সবুজ চৌকা ছক-কাটা। এই লাল আর সবুজের check বা ছক হ'চ্ছে যবদ্বীপে বায়ুর রঙ, ভীম আর হনুমান হ'চ্ছেন পবন-তনয়, বায়ুর পুত্র, তাই এঁদের কাপড়ে ঐ ছকের ব্যবস্থা করা হয়। অন্য অন্য দেবতা আর পাত্র-পাত্রী সম্বন্ধেও এই রকম বিশেষ বর্ণ আর চিহ্নের নির্দ্দেশ ওআইয়াং-মূর্ত্তিগুলিতে করা হয়। দেবতারা আর ঋষিরা মাটীতে পা দেন না, তাঁরা শূন্যে বিচরণ ক'রতে পারেন, তাঁদের এই বিভূতি দেখাবার জন্য ওআইয়াং-মূর্ত্তিগুলিতে দেবতা-প্রকৃতির চিত্র হ'লে পায়ে জুতো এঁকে দেওয়ার রীতি আছে। বটার' উইস্নু, বটার' গুরু, বটার' ব্রম', অর্থাৎ ভট্টারক বিষ্ণু, গুরু (শিব) আর ব্রহ্মা, এঁরা দেবতা ব'লে জুতো প'রে আসেন। শিবের মূর্ত্তি দেখলুম—উপবিষ্ট বৃষের উপরে মহাদেব আসীন, চতুর্ভুজ, কিন্তু পায়ে কালো রঙের নাগরা জুতো। মূর্ত্তি অনেকগুলি ক'রে থাকে, রামায়ণ মহাভারত এই দুইটী পালায় জড়িয়ে প্রায় আড়াই শ' মূর্ত্তি থাকে। খালি পাত্র-পাত্রীর মূর্ত্তি ছাড়া আখ্যায়িকায় বর্ণিত পশুপক্ষীর ও ছবি থাকে, যেমন রামায়ণের স্বর্ণমৃগের—কিন্তু এগুলি সংখ্যায় কম। বড়ো গল্পের এক একটী পালা বা অধ্যায় শেষ হ'লে, পাখার মতন করে কাটা একটী ছবির ছায়া ফেলা হয়, তাতে মেরুপর্ব্বত, বৃক্ষশ্রেণী নদী ইত্যাদি আঁকা থাকে, এটীকে Goenoeng 'গুনুং' বা পর্ব্বত বলে।

কবিকে গৃহস্বামী কতকগুলি বাতিক কাপড় উপহার দিলেন। ছায়া-নাটক আরম্ভ হ'ল। অন্য সব আলো নিবিয়ে দেওয়া হ'ল, খালি পর্দ্দার সামনেকার প্রদীপটী জ্ব'লতে লাগ্‌ল। দালাং ব'সে ব'সে গুরু-গম্ভীর স্বরে তাঁর কথা ব'লে যেতে লাগলেন, আর পুতুল তুলে নিয়ে নিয়ে তাদের ছায়া পরদার ফেলে অভিনয়ের মতন তাদের পরিচালনা ক'রতে লাগলেন। আজকের



'গুনুং'-এর প্রতিকৃতি

পালা ছিল 'কীচক বধ'। দালাং-এর বলবার ভঙ্গীটুকু বেশ সুন্দর লাগছিল। মনে হ'চ্ছিল, তাঁর ভাষায় প্রচুর সংস্কৃত শব্দ আছে। একাধারে কথা, কথোপকথন আর গান ছিল। সব সময়টা দালাং-এর কথার পিছনে মৃদু ভাবে গামেলানের টুং-টাং ধ্বনি একটা পটভূমিকার সৃষ্টি ক'রে চ'লছিল। মাঝে মাঝে দালাং-এর গানে যোগ দিয়ে যখন তাঁর দোহাররা গেয়ে উঠ্‌ছিল, তখন বাজনার মাত্রাও উচ্চ হ'য়ে উঠছিল।



ছায়ানাট্যে যবনিকার সম্মুখে 'দালাং' বা কথক-সূত্রধারের স্থান

আমরা দালাং-এর দিকে ব'সে দেখ্‌ছিলুম। তাতে ক'রে আমরা গায়ক বাদকের দল, রঙীন ওআইয়াং মূর্ত্তি, পরদায় মূর্ত্তির ছায়া,—পরদার সামনেকার প্রদীপের আলোয় সব কিছুই দেখতে পাচ্ছিলুম। খানিকক্ষণ পরে আমাদের পরদার ওদিকে নিয়ে গেল। সেদিকটা অন্ধকার,—প্রদীপের আলোটাও নেই, কিন্তু এই অন্ধকারে সাদা পরদার উপরে পতিত ছায়ামূর্ত্তিগুলি চমৎকার ফুটে' উঠেছিল। এই দিক থেকে দেখেই এই ছায়া-নাট্যের সার্থকতা বোঝা গেল। বাস্তবিক, এদিকে খালি ছায়ায় হওয়ায় মূর্ত্তিগুলির বিসদৃশ ভাবটা যেন বেশ মানিয়ে যাচ্ছিল। আমাদের যবদ্বীপীয় বন্ধুরা ব'ললেন যে পরদার ওদিকে, দালাং যেদিকে ব'সে পাঠ ক'রে ক'রে মূর্ত্তির ছায়া ফেলে যায় তার উল্‌টো দিকেই প্রাচীন কালে লোকে ব'সত; তার পরে ক্রমে দালাং-এর দক্ষতা আর তার মূর্ত্তিগুলির সৌন্দর্য্য ভালো করে দেখবার জন্য পুরুষেরা দালাং-এর দিকেই ব'সতে আরম্ভ ক'রলেন, মেয়েরা কিন্তু ঠিক দিকেই র'য়ে গেলেন। এখনও যারা ওআইয়াং-এর প্রকৃত সৌন্দর্য্য উপভোগ ক'রতে চান তাঁরা ওদিকে গিয়েই দেখেন।

রাত্রি বারোটা পর্য্যন্ত এই ছায়া-নাট্যের ব্যাখ্যা আর তাৎপর্য্য শুনতে শুনতে আর গামেলানের তালে গান আর পাঠের মধ্যে ছায়াচিত্রগুলি দেখতে দেখতে বেশ কেটে গেল। এদের দেশে প্রচলিত মহাভারত কাহিনী আর রামায়ণ কাহিনীও মূল সংস্কৃত কাহিনী থেকে বহু স্থলে ব'দলে গিয়েছে, তবে খুব বেশী রকমের ওলট-পালট কিছু হয় নি। সে সব বিষয়েও দু চারটে খবর পাওয়া গেল—আর সে সব বিষয়ে ডচ সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতেরা ইতিপূর্ব্বে অনেক কথা লিখেও গিয়েছেন।

এই ওআইয়াং-কুলিৎ নাট্যের মজলিসে Dr Baudisch ডাক্তার বাউদিশ্‌ ব'লে একজন অষ্ট্রীয়ান ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হ'ল। ইনি এখানকার কারাগারের অধ্যক্ষ। ভদ্রলোকটী হিন্দু ধর্ম্ম আর দর্শন সম্বন্ধে বেশ শ্রদ্ধা আর আগ্রহ পোষণ করেন দেখলুম। ইনি নিজে কিন্তু রোমান কাথলিক। আমাদের রামকৃষ্ণ

মিশন সম্বন্ধে খবর রাখেন। বৌদ্ধ বিহারের ব্যবস্থাও এঁর ভালো লাগে। Faith আর Emotion, ভক্তি আর ভাবুকতা—এই বিষয় নিয়ে আলাপ হ'ল।

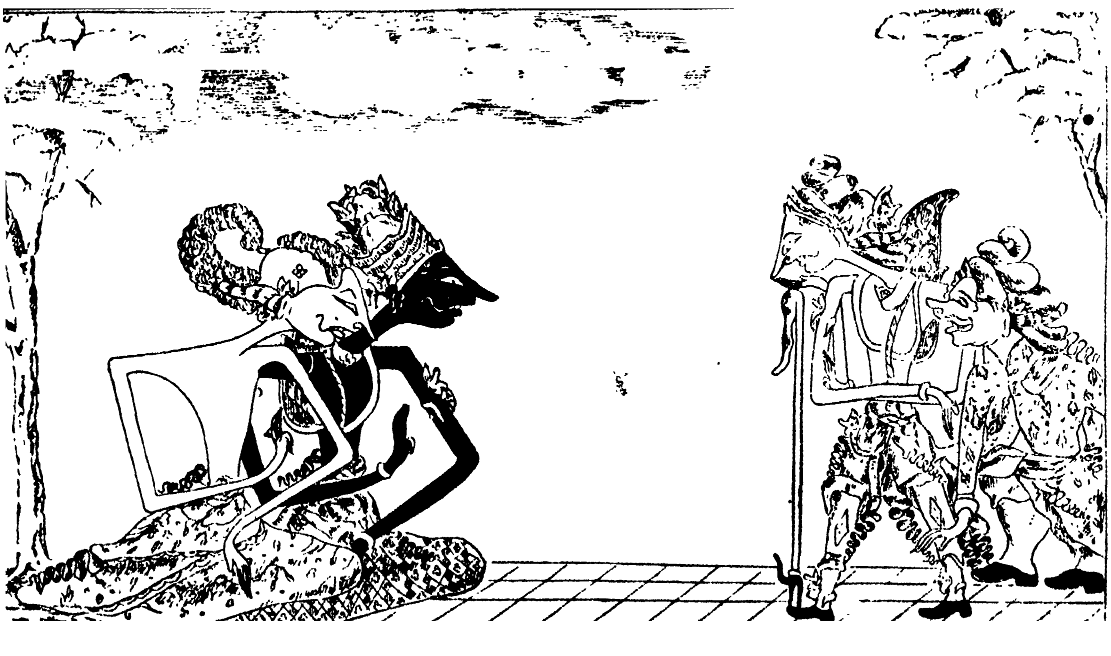
শনিবার, সেপ্টেম্বর ১৭ই—

আজ সকালে Dr. van Stein Callenfels ডাক্তার ফান্ ষ্টাইন কালেনফেল্‌স্ ব'লে একটী ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হ'ল. ইনি সরকারী প্রত্ন-বিভাগের একজন কর্ম্মচারী—একাধারে ইঞ্জিনিয়ার, প্রাচীন শিল্পবিৎ, নৃতত্ত্ববিৎ। এঁর কথা ভুলবার নয়। এত বড় বিরাট বপুর মানুষ আমি আর দেখি নি—যেমন ঢাঙা তেমনি মোটা-সোটা—দেহের দৈর্ঘ্য রবীন্দ্রনাথের মত সুদীর্ঘদেহ ব্যক্তিকেও অতিক্রম ক'রে, বিশালত্বে তো বটেই। এঁর সঙ্গে প্রাম্বানান্ আর বর-বুদুরের মন্দিরে আর যোগ্যকর্ত্ততে পরে আরও ঘনিষ্ঠ ভাবে মেশা হ'য়েছিল; যেমন বিপুল-কলেবর, তেমনি উদার খোলা প্রকৃতির লোক ইনি। আমাকে ডাক্তার ষ্টুটারহাইমের ইস্কুল দেখাতে নিয়ে গেলেন—যে ইস্কুলের কথা আগে ব'লেছি। ইস্কুলটীর ব্যবস্থা চমৎকার। ডাক্তার ষ্টুটারহাইম আমাকে নিয়ে সব ক্লাসগুলি দেখালেন—তখন সকাল সাড়ে আটটা ন'টা হবে, সব ক্লাস হ'চ্ছিল। একটী ক্লাসে যবদ্বীপীয় কৃষ্টি নিয়ে আলোচনা হ'চ্ছে, শিক্ষকের নির্দ্দেশ-মতন ক্লাসের অন্য ছেলেমেয়েদের সামনে দাঁড়িয়ে একটী যবদ্বীপীয় ছেলে দেশী নৃত্যের ব্যাখ্যা ক'রছে। এর হাতের ভাবগুলি দেখে একে বেশ পাকা নাচিয়ে' ব'লে মনে হ'ল। ডচ ভাষা পড়ানো হ'চ্ছে আর একটি ক্লাসে। ছবি-আঁকাও শেখানো হয় দেখলুম। ছেলে-মেয়েরা এক সঙ্গে পড়ে। আমাদের হাই ইস্কুলের উঁচু ক্লাসের মত বয়সের ছাত্র ছাত্রীরা। ইস্কুলের বাড়ীটা বেশ বড়ো, একজন চীনার তৈরী চীনা-ধরণের বাড়ী, বাড়ীর ভিতরে চমৎকার একটী বাগান আছে, বাগানে আম-গাছে আম হ'য়েছে, আমগুলি পাকাবার জন্য বেতের ছোট্ট ছোট্ট ঝুড়ী ক'রে বেঁধে দেওয়া হ'য়েছে, সেই অবস্থায় গাছে ঝুল্‌ছে। শ্রীযুক্ত ষ্টুটারহাইম ছেলেমেয়েদের এক জায়গায় জড়ো ক'রলেন, ডচ ভাষায় রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে আর আমাদের আগমন সম্বন্ধে তাদের কিছু ব'ললেন, তারপরে আমায় ছেলেদের কিছু ব'লতে অনুরোধ ক'রলেন। আমি ইংরেজীতে ব'ললে তারা আমার কথা বুঝবে একথা তিনি আমায় জানালেন, ব'ল্‌লেন যে ছাত্রেরা অনেকেই ইংরেজী পড়ে। এরা মাটিতে বসে বা দাঁড়িয়ে রইল—কিশোর বয়সের কৌতূহল আর চঞ্চলতা পূর্ণ বুদ্ধিশ্রী-মণ্ডিত সব মুখ। আমি আস্তে আস্তে সহজ ইংরেজীতে প্রায় বিশ পঁচিশ মিনিট ধ'রে এদের ব'ল্‌লুম—ভারতবর্ষের ছেলেদের আর ইস্কুলের সম্বন্ধে, শান্তিনিকেতনের সম্বন্ধে। শান্তিনিকেতনের ছেলেদের মধ্যে প্রচলিত দুই একটা হাসির গল্পও ব'ল্‌লুম, দেখলুম তা বুঝতে ও পারলে, তাতে বোঝা গেল যে এরা আমার কথা সব ধ'রতে পারছে। শান্তিনিকেতনে উই পোকার বড্ড উৎপাত, গাছতলায় মাটিতে আসন পেতে ব'সে এক উপাসনা-সভায় কোনও আচার্য্য বড্ড বেশীক্ষণ ধ'রে উপাসনা ক'রছিলেন, তাঁর শ্রোতারা অধৈর্য্য হ'য়ে প'ড়ছিল, শেষে তিনি যখন দেড় ঘণ্টা-ব্যাপী সুদীর্ঘ উপাসনা সাঙ্গ ক'রে উঠলেন তখন দেখা গেল যে তাঁর কামিজের পিছন দিকটা যেটা বসবার আসনের বাইরে মাটিতে লুটিয়েছিল সেটা উই-পোকায় এই সময়ের মধ্যে খেয়ে ফেলেছে—এই রকম দুই একটা গল্পে এদের মধ্যে হাসাহাসি প'ড়ে গেল। মোটের উপর এই ইস্কুলের শিক্ষার ব্যবস্থা দেখে সাধুবাদ দিতে হয়—১৫,১৬ বছরের ছেলেরা নিজেদের ভাষা আর সাহিত্যের সঙ্গে সঙ্গে দু-দুটো ইউরোপীয় ভাষা বেশ ক'রে আয়ত্ত করে, এ বিশেষ বাহাদুরীর কথা।

Java Institute-এও গিয়ে সেখানে খানিকক্ষণ আমাদের কোপ্যার্‌ব্যার্গের সঙ্গে কথাবার্ত্তা করা গেল। আমাদের এই কোপ্যারব্যার্গটী অতি চমৎকার লোক। এঁর নামের মানে হ'চ্ছে 'তামার পাহাড়।' 'তাম্রকূট' বা 'তাম্রচূড়'—এই দুটী সংস্কৃত শব্দে এর নামের একটা চলন-সই তর্জ্জমা করা যায়। আমি ব'ল্‌লুম—আপনার নামের একটা সংস্কৃত সংস্করণ ক'রে আপনাকে সেই নামে ডাকবো; এখন 'তাম্রকূট' কি 'তাম্রচূড়,' এ দুটোর কোনটা ব্যবহার ক'রবো তা ঠিক ক'রতে পারছি না—আপনি এ বিষয়ে আমাদের সাহায্য

করুন; এখন আপনি তাম্রকূট বা তামাক ভালো বাসেন, না 'তাম্বাচূড়া' অর্থাৎ রামপাখীর মাংস ভালো বাসেন? তদনুসারে আপনার Koperberg নামের সংস্কৃত অনুবাদ হবে। ভদ্রলোকের রুচি-অনুসারে আমরা তাঁর নামকরণ ক'রলুম 'তাম্রচূড়'—ডচ বানানে Tamra-tjoeda; এঁর নানা সদগুণে আকৃষ্ট হ'য়ে—কবি ব'লতেন, দেখ হে, লোকটা 'তাম্রচূড়' নয়, একেবারে 'স্বর্ণচূড়'। যাই হোক্, 'তাম্রচূড়' নামেই ইনি খুব খুশী। ইনি জাতে ডচ্, ধর্ম্মে আর সমাজে ইহুদী। দেশী লোকেদের প্রতি অত্যন্ত দরদ, সেইহেতু সরকারী চাকরী ছেড়ে দিয়ে এদের সংস্কৃতি রক্ষার জন্য সৃষ্ট Java Institute নিয়েই আছেন। সব কাজে পিছনে থেকে পরিশ্রম ক'রে যাবার দিকে এঁর আগ্রহ বেশী, নিজেকে জাহির ক'রতে চান না। কবি এঁর খুব প্রশংসা ক'রতেন। একটা জিনিস দেখতুম, যবদ্বীপীয়েরা এঁর সঙ্গে ঘরের লোকের মতন ব্যবহার ক'রতেন। শিশুদের সঙ্গে ইনি খুব সহজেই জমিয়ে নিতেন। মঙ্কুনগরোর বাড়ীতে দেখি, রাজবাড়ীর যত ছোটো ছোটো ছেলেদের নিয়ে মাতামাতি ক'রছেন, ভাঙা ভাঙা মালাইয়ে তাদের সঙ্গে আলাপ ক'রছেন, কি কথা হ'ত জানি না, তবে হাত পা নেড়ে মাটিতে গড়াগড়ি দিয়ে তাদের সঙ্গে বেশ ভাব ক'রে নিতেন; একদিনের কথা মনে আছে, মঙ্কুনগরোর বাড়ীর একটি আঙিনায় একটি ছোটো অর্দ্ধ-উলঙ্গ যবদ্বীপীয় ছেলে কি দুষ্টুমি ক'রে ঊর্দ্ধশ্বাসে পালাচ্ছে, তার পিছনে বাঁশের তৈরী লড়াইয়ে-মোরগ ঢেকে রাখবার বিরাট এক খাঁচা নিয়ে তাকে তাড়া ক'রছেন আমাদের তাম্রচূড়, খাঁচা দিয়ে তাকে চাপা দেবার মতলবে; আর মহা উৎসাহে কোলাহল ক'রতে ক'রতে এক পাল ছেলে সঙ্গে সঙ্গে ছুটছে—সাহেব ছেলেটিকে লক্ষ্য ক'রে খাচাটি ফেলেছেন, আধ ইঞ্চি হ'লেই শিকার কবলস্থ হয় আর কি—কিন্তু তড়াক্ ক'রে এক লাফ দিয়ে ক্ষিপ্রগতি যবদ্বীপীয় শিশু এক ঘরের চৌকাট ডিঙিয়ে ঘরের ভিতর দিয়ে অন্দর মহলে অদৃশ্য হ'য়ে গেল। এঁর সাহচর্য্যে আর চেষ্টায় আমাদের বলি আর যবদ্বীপ দর্শন পূর্ণাঙ্গ হ'য়েছিল।

দুপুরে জিনিসপত্র গুছিয়ে নিলুম—কাল আমরা



ওআইয়াং-কুলিৎ-এর মূর্ত্তির রীতিতে আঁকা ছবি—জনক, শ্রীকৃষ্ণ ও জুতা-পায়ে চতুর্ভুজ শিব ও নারদ



দোকান

শ্রীরমেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

যোগ্যাকর্ত্ত যাত্রা ক'রবো। শূরকর্ত্ত যবদ্বীপের আধুনিক হিন্দু সভ্যতার কেন্দ্র, অন্য দুই একটী জিনিসের সঙ্গে এখান থেকে আমার একটী সীল-মোহর করিয়ে নিলুম—তাতে যবদ্বীপীয় অক্ষরে লেখা 'কাশ্যপ সুনীতিকুমার'। বেলা দুটোয় কবির সঙ্গে দেখা ক'রতে এল' কতকগুলি স্থানীয় ভারতীয়,—এদের মধ্যে বেশীর ভাগ পাঞ্জাবী মুসলমান, এরা পূর্ব্ব-পাঞ্জাবের জালন্ধর আর হোশিয়ারপুর জেলার লোক, এখানে বাজারে এদের মণিহারী জিনিসের দোকান আছে,—আর এদের সঙ্গে ছিলেন বিরাট দাড়ীওয়ালা পাঞ্জাবী মুসলমান হকীম একজন, ইনি তিব্বী বা ইউনানী দাওয়াই যবদ্বীপীয়দের মধ্যে ফিরি ক'রে বিক্রী ক'রে বেড়ান, আর ছিল জন কতক স্থানীয় সিন্ধী ব্যাপারী।

ওআইয়াং-এর মূর্ত্তি কাটা এখানকার একটী সাধারণ লোক-শিল্প। ওআইয়াং-এর ধাঁজে ছবিও রঙ-চঙ দিয়ে কাগজে আঁকা হয়, আর এমন কি এই ঢঙের ছবি দিয়ে রামায়ণ মহাভারত আর প্রাচীন যবদ্বীপের কাহিনীর বইও চিত্রিত করা হয়। রাস্তার ধারে বাড়ীর দেয়ালে ছোটো ছেলেকে এই ওআইয়াং-এর অনুকৃতি ক'রে বেশ পাকা হাতে কয়লা দিয়ে ছবি আঁকতে দেখেছি। রাজকুমার কুসুমায়ুধ'র বাড়ীতে ওআইয়াং কাটবার কারিগর আছে, চামড়ায় কি ক'রে এই সব ছবি কাটা হয় তা ধীরেনবাবু আর সুরেন বাবু আজ বিকালে গিয়ে দেখে এলেন।

সন্ধ্যের দিকে সুরেন বাবু আর ধীরেন বাবুর সঙ্গে বাজারে বাজারে খুব ঘোরা গেল—বাতিক কাপড়, পুরাতন গুজরাটী পাটোলা কাপড, আর অন্য শিল্পদ্রব্যের সন্ধানে। Pasar Besar বা বড়ো-বাজারে পাঞ্জাবী মুসলমানদের খান দুই দোকান দেখলুম। এরা বড়ই সামান্যভাবে ছোটো-খাটো ব্যবসা চালাচ্ছে। এদের পাশেই এক চীনে দোকান—সেখানে কিছু পুরাতন জিনিস সংগ্রহ হ'ল—বাঘ হাতী আর হাঁসের নকশা-কাটা পাটোলা কাপড়ের তৈরী কোমরবন্দ, আর বাতিক কাপড়, আর অন্য জিনিস। আর একটী রাস্তায় পাশাপাশি সিন্ধীদের দুটো রেশমের কাপড়ের দোকান,—এদের খ'দ্দের বেশীর ভাগ যবদ্বীপীয় ভদ্র-গৃহস্থের লোকেরা। এদের মধ্যে জোগুমল ও তৎপুত্রগণের দোকানে ব'সে নানা আলাপ হ'ল। গোপাল ব'লে একটী সিন্ধী যুবক আমাদের সঙ্গে গল্প ক'রতে লাগ্‌ল। পাটোলা বা পাটোরি কাপড়ের কাজ শূরকর্ত্ত'র রাজঘরানাদের কল্যাণে এখনও টি'কে আছে, এরা সাবেক চালের জিনিস ব'লে এখনও ব্যবহার করে. এদের জন্যই সিন্ধী ব্যাপারী কয়ঘর, সুরাট থেকে তৈরী ক'রে আনিয়ে এই কাপড় যবদ্বীপে আমদানী ক'রে থাকে, এই কাপড় কেটে পাজামা আর কোমরবন্দ তৈরী হয়, এই কাপড় নাচুনী মেয়েরা উত্তরীয়ের মতন ব্যবহার করে, ইত্যাদি। গোপাল আমাদের সঙ্গে গল্প ক'রতে ক'রতে আমাদের মঙ্কু-নগরোর বাড়ী পর্য্যন্ত পৌঁছে দিয়ে গেল। সে যবদ্বীপে কয়েক বছর আছে, এর বিস্তর যবদ্বীপীয় বন্ধু হ'য়েছে, মালাই তো জানেই, ডচ কিছু কিছু জানে, যবদ্বীপীয়ও বেশ জানে, যবদ্বীপীয় বন্ধুরা বাড়ীতে উৎসবাদিতে একে নিমন্ত্রণ করে,—যবদ্বীপীয়েরা তো হিন্দুই, মুসলমান ব'ল্‌লে আমরা যা বুঝি এরা মোটেই তা নয়, বাবু সাব, এরা রামায়ণ মহাভারত আমাদের চেয়ে ও ভালো জানে,—আর রামায়ণের বেশ কবিত্ব-পূর্ণ অনুবাদ এদের ভাষায় আছে—এই শুনুন না, যেখানে ভিখারী-বেশী রাবণের সঙ্গে সীতা ঘৃণা-ভরে কথা কইছেন সেই জায়গাটা—এই ব'লে সে খানিকটা ক'রে যবদ্বীপীয় রামায়ণের শ্লোক আউড়ে যায় আর হিন্দী আর ইংরেজীতে অনুবাদ ক'রে আমাদের শোনায়। এত দূর দেশে এসেও সে যবদ্বীপে নিজেকে ততটা প্রবাসী ব'লে মনে করে না, কারণ এদেশের সঙ্গে তার মাতৃভূমির একটা সংস্কৃতি-মূলক যোগ সে ধ'রতে পেরেছে,—এ কথাটা বোঝা গেল।

আজকে সওয়া সাতটা থেকে সাড়ে আটটা পর্য্যন্ত আলোক-চিত্রের সাহায্যে কালকের দেওয়া বক্তৃতাটার পুনরাবৃত্তি আমায় ক'রতে হ'ল। আমার ইংরেজী থেকে বাকে ডচ অনুবাদ ক'রলেন, তারপর তা থেকে একজন যবদ্বীপীয় যুবক নিজ মাতৃভাষায় অনুবাদ ক'রে যেতে লাগলেন। মঙ্কুনগরো আজও উপস্থিত ছিলেন।

আর রাজবাড়ীর মেয়েরাও ছিলেন অনেকগুলি। কাল্লকের মতন ডাক্তার ষ্টটারহাইম লণ্ঠন নিয়ে এসেছিলেন, তাঁর ছাত্রও অনেকগুলি এসেছিল। মঙ্কু-নগরো ভারতীয় চিত্রকলার অনুরাগী, রাজপুত চিত্রের উপর কুমারস্বামীর বড়ো বই আর বস্‌টন্ মিউজিয়মের রাজপুত চিত্রাবলীর তালিকা তাঁর খাস পাঠাগারেই র'য়েছে,—আর তা ছাড়া আমাদের ক'লকেতার Indian Society of Oriental Art-এর প্রকাশিত আধুনিক ভারতীয় শিল্পীদের ছবিও তিনি আনিয়াছেন।

রাত সওয়া নটায় স্থানীয় যবদ্বীপীয়দের দ্বারা কবির সংবর্দ্ধনা হ'ল এখানকার Contact Club-এর হলে; এখানকার যবদ্বীপীয় সমাজের তাবৎ শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন, ডচ ভদ্রলোকও অনেকগুলি ছিলেন। গান কবিতা আর বক্তৃতার সভা। কবিকে সম্মানের আসনে বসালে। রাজকুমার কুসুমায়ুধ ইংরেজীতে কবিকে স্বাগত ক'রে ছোটো একটা বক্তৃতা দিলেন। ডাক্তার রাজিমানও বক্তৃতা ক'রলেন। কথা ও কাহিনীর যে পাঁচটা কবিতা আগেই বাঙলা থেকে আমি ইংরেজী ক'রে দিই, আর বাকে তা থেকে ডচ ক'রে দেন, তার যবদ্বীপীয় অনুবাদ ডাক্তার রাজিমান প'ড়লেন— মূল বাঙ্‌লা কবি শুনিয়ে দেবার পরে, সহজ সরল ভাষায় বর্ণিত গাথা কয়টার গভীরতা ডাক্তার রাজিমানের মর্ম্ম স্পর্শ ক'রেছিল, তিনি প'ড়তে প'ড়তে যেন একটু অভিভূত হ'য়ে যাচ্ছিলেন; যবদ্বীপীয়দের মধ্যে যে এতটা ভাব-প্রবণতা, আছে এ আমার অপ্রত্যাশিত ছিল। প্রাচীন যবদ্বীপীয় কাব্য অর্জ্জুন-বিবাহ থেকে পাঠ হ'ল, আধুনিক যবদ্বীপীয় প্রেমের গান গাওয়া হ'ল। কবি 'যবদ্বীপের প্রতি' বলে যে কবিতা লিখেছিলেন, যেটার ইংরেজী আর ডচ অনুবাদ মঙ্কনগরোর বাড়ীতে বিতরিত হ'য়েছিল, তার প্রত্যুত্তরে রচিত যবদ্বীপের তরফ থেকে ভারতবর্ষের প্রতি আর বিশেষ ক'রে কবির প্রতি একটা যবদ্বীপীয় কবিতা গান ক'রে শোনানো হল। (এই কবিতার মূল যবদ্বীপীয় কথাগুলি আর তার ডচ অনুবাদ Java Institute-এর মুখপত্র Djawa ব'লে পত্রিকায় প্রকাশিত হ'য়েছিল, আর পরে Visvabharati Quarterlyতে তার ইংরেজী অনুবাদও প্রকাশিত হ'য়েছিল।) কবিকেও কিছু ব'ল্‌তে হ'ল। এখানে যবদ্বীপীয়েদের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের মধ্যে চমৎকার হৃদ্যতার পরিচয় পেলুম। সভার কাজ চুক্‌ল রাত্রি প্রায় পৌনে বারোটায়।

কবি বাসায় ফিরলেন। মঙ্কনগরো আমাদের নিয়ে গেলেন তাঁর প্রতিষ্ঠিত এক নাট্যশালায়। বহুদূরে শহরের একপ্রান্তে মঙ্কনগরোর একটা বাগিচা আছে, সাধারণের ব্যবহারের জন্য সেটা তিনি দান ক'রেছেন। আর সাধারণের চিত্তবিনোদনের জন্য, আর নাট্যাভিনয়ের মধ্য দিয়ে দেশের প্রাচীন সংস্কৃতির সঙ্গে সাধারণে যাতে যোগ রাখতে পারে সেই উদ্দেশ্যে নিজের পয়সায় একটা নাট্যসম্প্রদায় তিনি চালাচ্ছেন। এখানে নটেরা মুখ্যতঃ রামায়ণ মহাভারত আর প্রাচীন যবদ্বীপীয় রাজকাহিনী আর উপন্যাস অবলম্বন ক'রে নাটক ক'রে থাকে,— সম্প্রদায়ে নটী নেই। দু এক আনা মাত্র দর্শনী দিয়ে সাধারণ লোকে দেখতে আসে। সপ্তাহে দুদিন না তিন দিন ক'রে প্রায় বিনামূল্যের এই নাট্যাভিনয় হয়। মঙ্কনগরো প্রাচীন পদ্ধতির সঙ্গে সঙ্গে অভিনয় আর নৃত্য গীতাদির উৎকর্ষ বজায় রাখ্‌তে বিশেষ যত্নশীল। আমরা গিয়ে দেখলুম, অভিনয় চ'লছে,—প্রেক্ষাগৃহ লোকে লোকারণ্য—এক পাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখবারও ব্যবস্থা আছে। মেয়ে-পুরুষ, ছেলে-বুড়ো, সব শ্রেণীর সব বয়সের লোক। মহাভারতের একটা কোনও পর্ব্ব নিয়ে অভিনয় হ'চ্ছিল। মাঝারী আকারের রঙ্গমঞ্চ, নটদের পোষাক পরিচ্ছেদ অভিনয় ভঙ্গী সব সাবেক চালের—বুঝলুম, এখানে সংরক্ষণ-রীতিই প্রধানতঃ অবলম্বিত হ'চ্ছে। বোধ হয়, তে-টানায় প'ড়ে যবদ্বীপের কৃষ্টিকে vulgarised বা নীচ হ'য়ে পড়া থেকে কোনও রকমে বাঁচিয়ে রাখতে হ'লে এই সংরক্ষণ-নীতিরই বিশেষ আবশ্যকতা আছে। নটেদের অভিনয় যা দেখলুম, বেশ প্রশংসনীয় ব'লেই মনে হ'ল। অর্জ্জুন তাঁর তিন অনুচর 'সেমার'-দের নিয়ে এলেন, বনে এক সিংহের সঙ্গে সেমারদের দেখা, বিদূষক-প্রকৃতির এই তিন সেমার আর সিংহকে নিয়ে খানিক হাস্য-রসের অবতারণা—

এসব ধ'রে প্রাচীন রীতির অনুকূল অথচ বেশ সহজভাবে অভিনয় হল। নাটকে রাক্ষস-রাজার সভা, ঋষির আশ্রম, রাক্ষস-রাজের নৃত্য, একজন রাজকুমারের নৃত্য, এই সব বিষয় ছিল। নাচ এদের শিল্প-চেষ্টার প্রধান বিকাশ—সব জিনিসের সঙ্গে নাচকে ঢুকিয়ে এরা কেমন সুন্দর ক'রে তোলে, যে সে ব্যাপারের তুলনা হয় না, চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। মঙ্কুনগরো এই রূপে নানা দিক দিয়ে তাঁর স্বদেশীয়দের মধ্যে জাতীয় কৃষ্টির অমৃতবারি সিঞ্চিত ক'রে জাতের রস-বোধ আর শিল্প-প্রাণকে কোনও রকমে এই দুর্দ্দিনে জীইয়ে রাখ্‌তে চাচ্ছেন—ভবিষ্যতে যাতে এই জাতীয় কৃষ্টি দুর্দ্দিনে কোনও উপায়ে বেঁচে থাকার ফলে আরও নূতন রসসৃষ্টি যবদ্বীপীয় জা'তের দ্বারা হ'তে পারে এই আশায়, তাঁর এই সাধু উদ্যম সব জা'তের লোকেদেরই সাধুবাদ পাবার যোগ্য, আর অবস্থা অনুকূল হ'লে অনুকরণ করার যোগ্য।

রাত একটায় বাসায় ফিরলুম—নাটক তখনও শেষ হয় নি। ডাক্তার ষ্টুটারহাইম সঙ্গে ছিলেন, তাঁর কাছথেকে বিদায় নিলুম। আজকের দিনটায় যবদ্বীপের মধ্যযুগের কৃষ্টির বিশেষ কতকগুলি বস্তু দেখা গেল। কাল সকালে যোগ্যকর্ত্ত যাত্রা ক'রতে হবে—প্রাম্বানান-এর বিশ্ববিশ্রুত হিন্দু মন্দির পথে প'ড়বে—যবদ্বীপের কৃষ্টির একটী উৎসমুখে সেই মন্দিরের প্রতিষ্ঠা, আমাদের ভারতের সঙ্গে যবদ্বীপের নাড়ীর যোগ এই সব মন্দিরের মধ্যদিয়ে। জিনিস-পত্র গুছিয়ে রোজনামচা লিখে যখন শয্যার আশ্রয় গ্রহণ ক'রলুম তখন রাত দুটো।

ইস্‌লামের প্রথম যুগে চিত্রকলা

শ্রীনীরদচন্দ্র চৌধুরী

১

মুসলমান চিত্রকলা মানবসভ্যতার একটি বিশিষ্ট সম্পদ, অথচ চিত্রাঙ্কন পূর্ণবিকশিত ইস্‌লামের অনুশাসন-বিরুদ্ধ; 'উমায়্যহ্‌-বংশীয় খলিফাদের রাজত্বকাল হইতে আরম্ভ করিয়া গত শতাব্দী পর্য্যন্ত এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকার প্রত্যেকটি মুসলমান-শাসিত রাজ্যে এমন মুসলমান নৃপতি কমই জন্মিয়াছেন যিনি চিত্রকলা বা চিত্রকরকে উৎসাহ দেন নাই, অথচ হদিসের মত প্রাচীন মুসলমান ধর্ম্মশাস্ত্রে চিত্রকর ঈশ্বরের শত্রু বলিয়া আখ্যাত—এ ব্যাপারটা যেমনই সর্ব্বজনবিদিত তেমনই বিস্ময়কর।

ছবি আঁকিবার ইচ্ছা মানুষের একটি অতি গভীর ও আদিম বৃত্তি। মানুষ বলিতে আজকাল আমরা যে জীবকে বুঝি, সে পৃথিবীতে আসিয়াছে যতদিন, চিত্রকলাও প্রায় ততই প্রাচীন। অন্ততঃ ইউরোপে ক্রোমানিয়ো জাতি ও চিত্রকলা সমসাময়িক। আবার, মানবজাতির সেই বহুবিস্মৃত শৈশব হইতেই ধর্ম্মের সহিত চিত্রকলার অতি নিবিড় সম্বন্ধ। ধর্ম্মানুষ্ঠান ও জাদুর প্রয়োজন মিটাইবার জন্যই চিত্রকলার উদ্ভব, মসিয় সালোমঁ রেনাকের এ-সিদ্ধান্ত সকল বৈজ্ঞানিক ও নৃতত্ত্ববিৎ মানিয়া লন নাই বটে, তবু যখনই আমরা প্রাচীন প্রস্তরযুগের চিত্রগুলির কথা ভাবি—আল্‌তামিরা, ফঁ দ্য গোম বা নিয়োর সেই দুর্গম বিসর্পিত গুহা, তাহার গভীর, অন্ধকার, মনুষ্যবাসের চিহ্নবর্জ্জিত অন্তস্তল, সেইখানে পাথরের গায়ে খোদাই করা বা লাল কালো ও শাদা রঙে আঁকা তীরবিদ্ধ একটি বাইসন—তখনই আমরা এই ছবির সহিত মারণ, উচাটন ও বশীকরণ অথবা কোন বলি ও পূজার যে একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে, তাহা স্বীকার না করিয়া পারি না। পরবর্ত্তী যুগের মানুষ চিত্রকলাকে ধর্ম্ম ও জাদুর নিগড় হইতে মুক্ত করিয়া অনেকটা নিছক আমোদের উপকরণ করিয়া তুলিয়াছিল। তবু ধর্ম্মের সহিত চিত্রকলার যোগাযোগ কোনদিনই ঘুচিয়া যায় নাই। মানব-মনের উপর চিত্রকলার প্রভাব এত গভীর যে, মারণ উচাটনের উপায় বলিয়া না হউক, প্রচারের সহায়ক হিসাবে সকল ধর্ম্মই উহাকে অতি আদরের সহিত গ্রহণ করিয়াছে। তাই দেখিতে পাই, প্রাচীন মিশরের মন্দির হইতে আরম্ভ করিয়া অতি-আধুনিক গির্জ্জা পর্য্যন্ত এমন কোন উপাসনা বা পূজার জায়গা অল্পই আছে যেখানে ভাস্কর্য্য বা চিত্রকলা স্থান পায় নাই। এ-কথাটা গ্রীক বা হিন্দুর পৌত্তলিক ধর্ম্ম সম্বন্ধে যেমন সত্য, খৃষ্টধর্ম্মের প্রটেষ্টাণ্ট শাখার মত পৌত্তলিকতাদ্বেষী ধর্ম্ম সম্বন্ধেও তেমনই সত্য।

মানব-সমাজে যুগযুগব্যাপী চিত্রকলার প্রতিষ্ঠা, এবং

ধর্ম্মের সহিত চিত্রকলার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের কথা আলোচনা করিয়া যখনই আমরা মুসলমান সমাজে ধর্ম্ম ও চিত্রকলার বিরোধের কথা স্মরণ করি, তখনই মনে অনেকগুলি প্রশ্ন জাগে—এ দ্বন্দ্বের উৎপত্তি কবে, কি করিয়া হইল? সত্যই কি ইস্লামধর্ম্মের প্রবর্ত্তক চিত্রকলার বিদ্বেষী ছিলেন? চিত্রকলা সম্বন্ধে তাঁহার সঙ্গী ও অনুবর্ত্তীগণের কি ধারণা ছিল? ইস্লাম ধর্ম্মে চিত্রাঙ্কন দোষাবহ হইলে সে-অনুশাসন অগ্রাহ্য করিয়া একটা মুসলমান চিত্রকলার উদ্ভব হইল কি করিয়া? মুসলমান রাজারা কি বলিয়া চিত্রকলাকে উৎসাহ দিলেন, মুসলমান চিত্রকরই বা কি করিয়া পাওয়া সম্ভব হইল? তবে কি ইসলামের সর্ব্বত্র ও সর্ব্বকালে চিত্রকলাবিদ্বেষ সমানভাবে ছিল না? চিত্রকলা সম্বন্ধে নিষেধ কখন, কাহার দ্বারা, কাহার প্রভাবে প্রবর্ত্তিত হইল?

বলা বাহুল্য এ-সকল অতি জটিল ঐতিহাসিক প্রশ্ন, ধর্ম্মবিশ্বাসের সহিত ইহাদের কোন সম্বন্ধ নাই। ইস্লামের আদি যুগ হইতে আজ পর্য্যন্ত বহু মুসলমান ধর্ম্মবিৎ চিত্রকলা দূষণীয় কিনা এবং কেন দূষণীয়, এ বিষয়ের বিচার করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদের সে বিচার শাস্ত্রীয়, ঐতিহাসিক নহে। চিত্রকলা সম্বন্ধে মুসলমান সমাজের মনোভাব যুগে যুগে কি রূপ গ্রহণ করিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছিল, তাহার বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা মাত্র সেদিন ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা আরম্ভ করিয়াছেন। এই সকল পণ্ডিতদের মধ্যে সর্ব্বাগ্রে নাম করিতে হয় স্যর টমাস্ আর্ণল্ডের। মুসলমান ধর্ম্ম ও সংস্কৃতিতে চিত্র-কলার স্থান সম্বন্ধে, তিন বৎসর পূর্ব্বে প্রকাশিত তাঁহার রচিত "পেন্টিং ইন্ ইস্লাম" (Painting in Islam) নামক পুস্তক অপেক্ষা বিশদতর আলোচনা আমার চোখে পড়ে নাই। এ প্রবন্ধে স্যর টমাস্ আর্ণল্ড ও তাঁহার সহকর্ম্মীদিগের গবেষণার সারমর্ম্ম দেওয়া হইবে মাত্র। আমি আরবী জানি না, মুসলমান চিত্রকলার সহিত সামান্য পরিচয় ও তাহার উপর গভীর শ্রদ্ধা থাকা সত্ত্বেও মূল পুস্তক পড়া আমার সাধ্যায়ত্ত নয়, তাই বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমার নিজস্ব বক্তব্য যে কিছুই নাই, তাহা বলা একান্তই নিষ্প্রয়োজন।

২

কোরান মুসলমানদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্মগ্রন্থ। সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালে মুসলমানগণ কোরানের উক্তিকে স্বয়ং ভগবানের বাণী বলিয়া মান্য করিয়া আসিয়াছেন। প্রথম যুগের ইস্লাম সম্বন্ধে ঐতিহাসিকের নিকট ইহা অপেক্ষা প্রামাণিক কোন গ্রন্থ নাই। এই কোরানে চিত্রাঙ্কন সম্বন্ধে কোন নিষেধাজ্ঞা নাই। এমন কি উহার কোথাও স্পষ্টতঃ চিত্র বা চিত্রাঙ্কনের উল্লেখ পর্য্যন্ত নাই। কোরানের তিনটি জায়গায় 'স্বূর' শব্দটি পাওয়া যায়—(৪০।৬৬, ৬৪।৩, ৮২।৮)—কিন্তু সে যুগে এ কথাটির অর্থ একটু অন্য রকম ছিল। পরবর্ত্তী যুগে 'স্বূর' বলিতে ছবি বুঝাইত, সেই অর্থই আজ পর্য্যন্তও চলিয়া আসিয়াছে; কিন্তু কোরানের ভাষায় এই শব্দটি 'দেহের বাহ্যিক আকৃতি বা মাপ' এই অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে।*

কোরানে চিত্র বা চিত্রকরের কোন উল্লেখ নাই ইহা যত-না আশ্চর্য্যের বিষয়, তাহা অপেক্ষাও আশ্চর্য্যজনক কথা এই যে, উহার কোথাও মূর্ত্তি বা মূর্ত্তিপূজা সম্বন্ধেও সুস্পষ্ট কোন নিষেধ নাই। একেশ্বরবাদ কোরানের মূলমন্ত্র। ঈশ্বরের সমকক্ষ ও দোসর কল্পনা বা 'শির্ক' অপেক্ষা গুরুতর পাপ ইস্লামের চক্ষে আর কিছু নাই। অথচ বহু চেষ্টা করিয়াও মুসলমান ধর্ম্মবিদ্‌গণ কোরান হইতে মূর্ত্তিবিরোধী একটি ভিন্ন দুইটি নির্দ্দেশ বাহির করিতে পারেন নাই। এই নির্দ্দেশটিরও প্রকৃত অর্থ সম্বন্ধে সন্দেহ আছে। সমগ্র কোরানে বারদশেক মাত্র মূর্ত্তির উল্লেখ আছে (৬।৭৪ ; ৭।১৩৪ ; ১৪।৩৮ ; ২১।৫৩, ৫৮ ; ২২।৩১ ; ২৬।৭১ ; ২৯।১৬, ২৩)। ইহার মধ্যে আবার পাঁচ ছয় জায়গায় 'মূর্ত্তি' অর্থে ব্যবহৃত শব্দগুলি (স্বনম্, বত্থন্, তিমথাল্) বাইবেলোক্ত আব্রাহামের গল্পের প্রসঙ্গে ব্যবহৃত হইয়াছে। সুতরাং সংখ্যার দিক হইতে দেখিলে খৃষ্টান বা ইহুদী ধর্ম্মশাস্ত্রের তুলনায় কোরানে মূর্ত্তির উল্লেখ নাই বলিলেই চলে। এই সকল উল্লেখেও আবার মূর্ত্তি সম্বন্ধে সুস্পষ্ট কোন নির্দ্দেশ নাই। এই অবস্থায়,পরবর্ত্তী যুগের মুসলমান ধর্ম্মবিদ্‌গণ কোরানের একটি বাক্য হইতে চিত্রাঙ্কন ও মূর্ত্তিনির্ম্মাণ সম্বন্ধে একটা নিষেধ বাহির করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। সে বাক্যটিতে আছে, "হে বিশ্বাসিগণ, মদ্য ও জুয়াখেলা, মূর্ত্তি (অন্স্বাব্ অথবা নুস্বব্) ও [গণৎকারদিগের] তীর [বা পাশা?] সয়তানের কৃত অপবিত্র কর্ম্ম—তাহা বর্জ্জন করিবে।" (কুর্'আন্, ৫।৯২)। পূর্ব্বেই বলিয়াছি এ বাক্যটির অর্থ সম্বন্ধে একটু সন্দেহ আছে। মসিয় লাম্মাঁর মতে

---

* "...dans la langue qoranique il désigne non—comme plus tard—les images, mais les formes extérieures, les dimensions géométriques des corps. Ce sens serait donc antérieur au mouvement des études philosophiques, sous les 'Abbāsides, à l'encontre de l'opinion de Fraenkel, *Aram. Fremdworter*, p. 272." (Lammens, "L'Attitude" etc., p. 243). পুস্তকের নামের জন্য প্রবন্ধের শেষে প্রমাণপঞ্জী দ্রষ্টব্য। আমি আরবী না জানিলেও যাঁহারা আরবী জানেন তাঁহাদের সুবিধার জন্য সর্ব্বত্রই মূলগ্রন্থের পৃষ্ঠাঙ্ক সঙ্কলন করিয়া দিলাম।

'অন্‌স্বাব' পাথর বা থাম মাত্র ; এই প্রকার পাথর ও থাম ইস্‌লাম ধর্ম্ম প্রবর্ত্তনের পূর্ব্বে বেদুয়িন আরবদের দ্বারা দেবতা বলিয়া পূজিত ও বেদীর মত ব্যবহৃত হইত ; এগুলি আরব 'ফেটিশিজম' বা পাথর-পূজার সহিত সংশ্লিষ্ট ; উহাদের সহিত প্রতিমার বা মূর্ত্তির কোন সম্বন্ধ নাই।* মসিয় লাম্ম্যাঁর এই ব্যাখ্যা ঠিক হউক আর না-ই হউক, কোরানের এই বচনটি যে কেবলমাত্র পৌত্তলিকতা সম্বন্ধে নিষেধ তাহা সুস্পষ্ট, উহাকে চিত্রাঙ্কন সম্বন্ধে নিষেধ বলিয়া মনে করা যাইতে পারে না।

কিন্তু কোরানে চিত্রকলার উল্লেখ না থাকিলেও হদিস এ সম্বন্ধে নীরব নহে। প্রামাণিক ধর্ম্মশাস্ত্র হিসাবে মুসলমানদিগের নিকট কোরানের পরই হদিসের স্থান। হদিসের সর্ব্বত্র উচ্চকণ্ঠে চিত্রকলা পাপ বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে। অবশ্য চিত্রকলা সম্বন্ধে হদিসে যে-সকল উক্তি আছে, তাহাদের মধ্যেও যে কিছু কিছু অসঙ্গতি ও অসামঞ্জস্য না আছে এমন নয়। এ সকল আপাতঃ অসঙ্গতির অর্থ কি তাহা পরে আলোচনা করা যাইবে। কিন্তু এ সকল অসঙ্গতি সত্ত্বেও মোটের উপর হদিসের অনুশাসন যে চিত্রকলার সম্পূর্ণ বিরোধী, সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। চিত্রকলা ও চিত্রকরদের সম্বন্ধে হদিসে যে-সকল উক্তি আছে, তাহার দুয়েকটি উদ্ধৃত করিলেই উহা প্রমাণ হইবে।

প্রথমেই দেখিতে পাই একস্থলে বলা হইয়াছে—'রোজ কেয়ামতের দিনে সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন শাস্তি হইবে তাহাদের, যাহারা চিত্রাঙ্কন করিয়া থাকে।" (বোখারী)।† "যে গৃহে কুকুর অথবা ছবি থাকে, ফেরেস্তারা (দেবদূতরা) সে গৃহে প্রবেশ করেন না।" (বোখারী)।‡ বোখারী ভিন্ন অন্যের ধৃত হদিসেও চিত্রকলা সম্বন্ধে এইরূপ নিষেধ অনেক আছে। কন্‌য্ অল্ 'উম্মাল-এ আছে, "রোজ কেয়ামতের দিনে সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন শাস্তি হইবে তাহাদের, যাহারা কোন নবীকে হত্যা করিয়াছে, যাহারা কোন নবীর দ্বারা নিহত হইয়াছে, যাহারা মানুষকে অজ্ঞানে বিপথে লইয়া গিয়াছে, এবং যাহারা মূর্ত্তি অথবা চিত্র নির্ম্মাণ করিয়াছে।" "অগ্নি হইতে একটি মাথা বাহির হইয়া আসিবে এবং জিজ্ঞাসা করিবে, 'ঈশ্বরের বিরুদ্ধে যাহারা মিথ্যার সৃষ্টি করিয়াছিল, ঈশ্বরের যাহারা শত্রু হইয়াছিল, ও ঈশ্বরকে যাহারা অবহেলা করিয়াছিল, তাহারা কোথায়?' তখন মনুষ্যেরা জিজ্ঞাসা করিবে, 'কাহারা এই তিন শ্রেণীর লোক?' সেই মাথা উত্তর দিবে, 'ঈশ্বরের বিরুদ্ধে মিথ্যার সৃষ্টি করিয়াছিল যে সে জাদুকর, মূর্ত্তি বা চিত্রের নির্ম্মাণকারী ঈশ্বরের শত্রু, এবং যে ব্যক্তি মনুষ্যের দ্বারা দৃষ্ট হইবে বলিয়া কার্য্য করে সে ঈশ্বরকে হেলা করিয়াছে।"*

হদিসে চিত্রকলা ও চিত্রকর কেন নিন্দিত হইয়াছে, সে-সম্বন্ধে নানারূপ ভ্রান্ত ধারণা আছে। সাধারণ লোকের বিশ্বাস এই যে, চিত্রকলা পৌত্তলিকতার সহায়ক বলিয়া মুসলমান ধর্ম্মে নিষিদ্ধ। কিন্তু হদিসে এইরূপ কোন উক্তি নাই। কয়েকটি হদিসে এইটুকুমাত্র বলা হইয়াছে যে, নমাজের সময়ে চিত্ত বিক্ষিপ্ত করে বলিয়া হজরৎ মোহম্মদ তাঁহার পত্নী আয়েষাকে ছবিযুক্ত একটি পর্দ্দা সরাইয়া রাখিতে বলিয়াছিলেন।† পক্ষান্তরে চিত্রাঙ্কন কিজন্য পাপ, নানা হদিসে স্পষ্টাক্ষরে তাহার ব্যাখ্যা আছে। এই ধর্ম্মশাস্ত্রের মতে ঈশ্বরের সৃষ্টির অনুকরণ করিয়া ঈশ্বরকে স্পর্দ্ধা করে বলিয়া চিত্রকর মহাপাপী। স্যর টমাস আর্ণল্ড বলিতেছেন,—

"The reason for his [the painter's] damnation is this : in fashioning the form of a being that has life, the painter is usurping the creative function of the Creator, and thus is attempting to assimilate himself to God ; and the futility of the painter's claim will be brought home to him, when he will be made to recognize the ineffectual character of his creative activity, through his inability to complete the work of creation by breathing into the objects of his art, which look so much like living beings, the breath of life." ‡

এই উক্তি যে সম্পূর্ণ সত্য তাহা দুইটি হদিস হইতেই প্রমাণিত হয়।—"হজরৎ বলিয়াছেন, আল্লাহ্ বলেন, আমার সৃষ্টির মত সৃজন করিতে যায় যে ব্যক্তি, তাহার অপেক্ষা অধিক জালেম আর কে হইতে পারে?" (বোখারী)।§ "ছবি নির্ম্মাণ করে যাহারা, কেয়ামতের দিনে তাহারা দণ্ডপ্রাপ্ত হইবে। তাহাদিগকে বলা হইবে, 'তোমরা যাহা সৃষ্টি করিয়াছ, তাহাকে জীবনদান কর'।" (বোখারী)।** কিন্তু তাহারা তাহা পারিবে না ও উদ্ধত স্পর্দ্ধার জন্য দণ্ডিত হইবে।

চিত্রকর যে ঈশ্বরের শক্তি অধিকার করিতে চায়

---

* "Les *ansab* n'offraient rien de commun avec les sculptures : c'étaient des pierres ou des stèles à la fois divinité et autel, mais dont la présence se trouve intimement liée à l'exercice du fétichisme arabe." (Lammens, *op. cit.*, p., 248). এই প্রসঙ্গে আরব 'ফেটিশিজম্' সম্বন্ধে মসিয় লাম্ম্যাঁ-র আলোচনা বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য।

† Bukhari (edition Juynboll), Vol. IV, 104 (no. 89).

‡ Bukhari (edition Krehl), Vol. II, p. 311.

* 'Alī al-Muttaqī, Kanz al-'Ummal, Vol. II. p. 200.

† Bukhari (ed Juynboll) Vol. IV, pp. 76-77 (no. 91).

‡ Arnold—*Painting in Islam*, pp. 5-6.

§ Bukhari, Vol IV, p. 104 (No. 90).

** Bukhari, Vol IV, p. 106 (No. 97).

বলিয়াই দণ্ডার্হ তাহা আর একটি বিষয় হইতেও প্রতিপন্ন হয়। আরবী ভাষায় চিত্রকরের প্রতিশব্দ "মুস্বব্‌বির্"— অর্থাৎ 'যে গঠন করে, গড়ে, বা আকৃতি দেয়।' এই শব্দটি কোরানে স্বয়ং ভগবানের সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইয়াছে। "তিনি ঈশ্বর, সৃষ্টিকর্ত্তা, নির্ম্মাণকর্ত্তা, গঠনকারী (মুস্বব্‌বির্)।" ক়ুর'আন্ ৫৯।২৪)। চিত্রকর সম্বন্ধেও এই কথাটি ব্যবহৃত হওয়াতে সে যে কিরূপ উদ্ধত ও স্পর্দ্ধাবান্ তাহাই সূচিত হইতেছে। মুসলমান মনের এই বিশ্বাসের উল্লেখ করিয়া স্যর টমাস আর্ণল্ড বলিতেছেন,—

"Thus the highest term of praise which in the Christian world can be bestowed upon the artist, in calling him a creator, in the Muslim world serves to emphasize the most damning evidence of his guilt."*

৩

'ইস্‌নাদ্' বা সাক্ষ্যপরম্পরা সম্বন্ধে সন্দেহের কোন কারণ না থাকিলে মুসলমান জগতে হদিস্‌গুলিও মোহম্মদ ও তাঁহার সঙ্গীগণের কার্য্যকলাপ ও উক্তির প্রামাণিক বিবরণ বলিয়াই মান্য হইয়া থাকে। এই কারণে চিত্রকলা সম্বন্ধে হদিসে যে-সকল উক্তি আছে, তাহাদিগকেও বিশ্বাসী মুসলমানগণ ইসলাম ধর্ম্মের প্রকৃত অনুশাসন বলিয়াই মানেন। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও হদিসের বিবরণকে চিত্রকলা সম্বন্ধে মোহম্মদ ও তাঁহার সঙ্গীগণের প্রকৃতপ্রস্তাবে কি ধারণা ও মনোভাব ছিল, তাহার ঐতিহাসিক প্রমাণ হিসাবে গ্রাহ্য করা যাইতে পারে কিনা সে-বিষয়ে সন্দেহ করিবার হেতু আছে। প্রথমেই মনে রাখিতে হইবে, মোহম্মদের মৃত্যুর একশত বৎসরেরও অধিককাল পরে হদিস সংগ্রহ আরম্ভ হয়। "অল্-কুতুব-অল্-সিত্‌তা" নামে সুপরিচিত হদিসের যে ছয়টি বিখ্যাত সংগ্রহ বা 'স্বহ্বিহ্বিন্' আছে, তাহার কোনটিই এই সময়েরও আরও একশত বৎসরের পূর্ব্বে রচিত নয়। অল্-বুখারীর মৃত্যু হয় ৮৭০ খৃষ্টাব্দে, মুস্‌লিমের ৮৭৫ খৃষ্টাব্দে, অবূ দাব়ূদের ৮৮৮ অব্দে, অল-তিরামধীর ৮৯২ অব্দে, অল্ নমা'ঈর ৯১৫ অব্দে ও ইব্‌ন্ মাজার ৮৮৬ অব্দে। 'মুসনদ' রচয়িতা সুবিখ্যাত অহ্‌মদ্-ইব্‌ন্-হ্বন্‌বল-এর মৃত্যু হইয়াছিল ৮৮৫ খৃঃ অব্দে। অন্যান্য হদিস্ সংগ্রহকর্ত্তাদের কথা বলা নিষ্প্রয়োজন। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে হদিসের যতগুলি বিখ্যাত ও প্রামাণিক সংগ্রহ আছে, তাহার সবগুলিই হিজিরার তৃতীয় শতকে রচিত।

কিন্তু এক রচনাকালই নয়, ঐতিহাসিক প্রমাণ হিসাবে হদিসকে অভ্রান্ত বলিয়া মনে না করিবার অন্য গুরুতর কারণও আছে। স্মরণ রাখা উচিত, হদিস মোহম্মদ ও তাহার সঙ্গীগণের উক্তি ও কার্য্যকলাপের **ঐতিহাসিক** বিবরণ নয়, উহা বিশ্বাসী মুসলমানের কি করা উচিত এবং কি করা অনুচিত, তাহার নজীর মাত্র। হদিসে আইনকানুন সম্বন্ধীয় ব্যবস্থা; আচার-অনুষ্ঠানের নির্দ্দেশ; নিষিদ্ধ ও অনিষিদ্ধ খাদ্য সম্বন্ধে বিচার; হালাল কি, হারাম কি, তাহার ব্যাখ্যা; স্বর্গনরকের বর্ণনা; সৃষ্টির বর্ণনা; এমন কি আদব-কায়দা সম্বন্ধীয় উপদেশও আছে। কোরানে যে-সকল কর্ত্তব্য-অকর্ত্তব্যের উল্লেখ নাই, সে-সম্বন্ধে একটা ব্যবস্থা দেওয়াই হদিসের মূল উদ্দেশ্য। মসিয় লাম্মাঁর কথায় বলা যাইতে পারে— হদিসের অনুপ্রেরণা ঐতিহাসিক নয়, শাস্ত্রীয়। (*Son inspiration est non pas historique mais doctrinale :* il ne faut jamais perdre de vue ce principe). হদিস্‌কারের মুখ্য উদ্দেশ্য ধর্ম্মের অনুশাসন লিপিবদ্ধ করা, ঐতিহাসিক তথ্য তাঁহার নিকট গৌণ ব্যাপার মাত্র।

কোরান মুসলমান ধর্ম্মের সর্ব্বাপেক্ষা প্রামাণিক গ্রন্থ হইলেও ইহাতে অনেক প্রশ্নের বিস্তৃত বিচার নাই, এবং ইহা মুসলমান ধর্ম্ম প্রচারের প্রথম যুগে রচিত। মোহম্মদের মৃত্যুর পর ইস্‌লামের শক্তি যখন এশিয়া ও আফ্রিকাময় ছড়াইয়া পড়িল, যখন মুসলমানগণ নূতন নূতন ধর্ম্ম, নূতন নূতন আচার-ব্যবহার, নূতন নূতন জাতির সংস্পর্শে আসিতে লাগিলেন, যখন তাঁহারা দেখিলেন নূতন যুগে যে-সকল নূতন অবস্থার সম্মুখীন তাঁহারা হইতেছেন, যে-সকল নূতন প্রশ্ন তাঁহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইতেছে, সে-সম্বন্ধে কোরানে কোন নির্দ্দেশ নাই, তখন তাঁহারা নূতন যুগের জন্য নূতন ব্যবস্থার সৃষ্টি না করিয়া মোহম্মদের কার্য্যকলাপ ও উক্তির মধ্যেই এ-সকল সমস্যার মীমাংসা খুঁজিতে লাগিলেন। পূর্ব্বপুরুষের আচার-ব্যবহার অনুসারে চলিবার ইচ্ছা আরব-মনের একটা খুব প্রাচীন ধর্ম্ম। ইস্‌লাম প্রচারের পূর্ব্বেও আরবরা তাহাদের পূর্ব্বপুরুষদের 'সুন্না' অনুযায়ী চলিত। ইস্‌লামের পর সে 'সুন্না'র প্রভাব আর রহিল না, হজরত মোহম্মদের একটা নূতন 'সুন্না'র সৃষ্টি হইল। কিন্তু মোহম্মদ যে-দেশে যে-কালে জন্মিয়াছিলেন, ইস্‌লামের পরবর্ত্তী যুগ তাহার অপেক্ষা এত বিভিন্ন যে, সকল সময়ে সেই অবস্থায় প্রযোজ্য হইতে পারে এইরূপ নজীর মোহম্মদের সুপরিজ্ঞাত কার্য্যকলাপের মধ্যে পাওয়া গেল না। অথচ বিশ্বাসী মুসলমানের নিকট হজরত মোহম্মদের 'সুন্না' ভিন্ন অর্ব্বাচীন বিধিব্যবস্থার কোন মূল্য নাই। তাই বিভিন্ন দেশ ও বিভিন্ন কালের উপযুক্ত নূতন ব্যবস্থা হইল, কিন্তু তাহা, ইংরেজীতে যাহাকে

* Arnold, *op. cit.*, p. 6.

'লিগেল ফিক্‌শ্যন্' বলা হয় তাহার বলে, স্বয়ং মোহম্মদের সুন্না বলিয়াই চলিতে লাগিল। কোরানের অনুশাসনকে সম্পূর্ণ কারবার জন্য এইরূপে যে বিরাট হদিস্-শাস্ত্রের সৃষ্টি হইল, তাহার সবগুলি ব্যবস্থা যে মোহম্মদের প্রকৃত সুন্না নয়, তাহা সর্ব্বজনবিদিত।*

সব হদিস্ই যে সমান বিশ্বাসযোগ্য নয়, এ-কথা অতি প্রাচীন কাল হইতেই মুসলমান শাস্ত্রকারগণও মানিয়া আসিয়াছেন। হিজিরার তৃতীয় শতকের একজন মুসলমান পণ্ডিত বলিয়াছেন, "যাঁহারা অন্য কোন বিষয়ে মিথ্যা কথা বলেন না, এরূপ ধার্ম্মিক লোকও হদিস্ সম্বন্ধে মিথ্যা কথা বলিয়াছেন।" ("লম্ নর স্ব-স্বালিহ্বীন ফী শয়্যিন্ অক্‌ধব মিন্-হুম্ ফী-ল-হদীথ্")। কথাটি যে সম্পূর্ণ সত্য, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। একই বিষয়ে বিভিন্ন হদিসের মধ্যে অসামঞ্জস্য এত বেশী, যে, তাহাতে স্পষ্টই মনে হয় বিভিন্ন মতাবলম্বী শাস্ত্রকারগণ নিজেদের মতকে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য স্বকপোলকল্পিত অথবা বিকৃত হদিসের সৃষ্টি করিয়াছেন। এইজন্য হদিসের প্রামাণিকত্ব বিচার করিবার জন্য একটি বিজ্ঞানেরই সৃষ্টি হইয়াছিল। উহাকে "অল্-জরহ্ব্ ব-'ল ত'দীল্" বলা হইত। ইহার সাহায্যে ব্যক্তিবিশেষের বিশ্বাসযোগ্যতা প্রভৃতি বিচার করিয়া হদিস্‌গুলিকে তিন ভাগে বিভক্ত করা হইত—প্রথম, সহিহ্ব্ (দোষহীন); দ্বিতীয়, হসন্ (সুন্দর); তৃতীয়, দ'ঈফ (দুর্ব্বল)। কিন্তু এই সকল বিচারপদ্ধতি থাকা সত্ত্বেও মুসলমান শাস্ত্রকারগণ হদিসের প্রামাণিকত্ব বিচার করিবার সময়ে নিরপেক্ষ থাকিতে পারেন নাই, নিজেদের মতামত, ঝোঁক ও সহানুভূতির দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়াছেন। ইস্‌লামের প্রথম যুগে যখন সকল প্রশ্নের চূড়ান্ত মীমাংসা হইয়া যায় নাই, ব্যক্তিগত বা দলগত রেষারেষিও একটু প্রবল ছিল, তখন মোহম্মদের বহু সঙ্গীর সাক্ষ্যও অকাট্য সত্য বলিয়া গ্রহণ করা হইত না। দৃষ্টান্তস্বরূপ অবু হুরয়্‌রহ্-র নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। তাঁহার উক্তি অনেকেই প্রামাণিক বলিয়া গ্রহণ করিতে চাহিতেন না। এ-সম্বন্ধে বোখারীতে একটি চমৎকার গল্প আছে। এই গল্পে আছে, ইব্‌ন্ 'উমর একদা বলেন যে মোহম্মদ মেষরক্ষক কুকুর ও শিকারী কুকুর ভিন্ন আর সকল কুকুর মারিয়া ফেলিতে আদেশ দেন। অবু হুরয়্-রহ্ এই বচনের শেষে "অউ যার'ইন্" এই কথাটি জুড়িয়া দেন। ইহাতে ইব্‌ন্ 'উমর মন্তব্য করেন "অবু হুরয়্‌রহ্-র কৃষিক্ষেত্র ছিল।" স্বার্থের জন্য হদিসের বিকৃতির ইহা একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ। কিন্তু ক্রমে ক্রমে ইস্‌লামের ধর্ম্মমতও যেমন সুস্থির হইয়া আসিতে লাগিল, প্রথম যুগের ঈর্ষ্যাবিদ্বেষ এবং মতবিভেদও লোকে ভুলিয়া যাইতে লাগিল; তখন পূর্ব্ববর্ত্তী যুগে যে-সকল হদিস প্রামাণিক বলিয়া গণ্য হইত না, তাহাও সত্য বলিয়া স্বীকৃত হইতে লাগিল, বহু নূতন হদিসেরও প্রবর্ত্তন হইল। এইরূপে কালক্রমে হদিস প্রায় কোরানের মতই প্রামাণিক বলিয়াই গণ্য হইতে লাগিল।

বর্ত্তমান কালে আবার গোল্‌ত্‌সিহের প্রমুখ ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ ঐতিহাসিক গবেষণা করিয়া দেখাইয়াছেন যে, সকল হদিস্ সমান বিশ্বাসযোগ্য নহে, এমন কি একই সময়ে রচিতও নয়; উহাতে সপ্তম শতাব্দী হইতে নবম শতাব্দী পর্য্যন্ত ইস্‌লামের ইতিহাসে যে-সকল ঘটনা ঘটিয়াছে ও যে-সকল মতপরিবর্ত্তন হইয়াছে, সে-সকলেরই ছায়া পড়িয়াছে; মোহম্মদ ও তাঁহার সঙ্গীগণের কার্য্যকলাপের ঐতিহাসিক প্রমাণহিসাবে উহাদিগকে নির্ব্বিচারে গ্রহণ করা যাইতে পারে না।

৪

হদিসকে বিনা বিচারে গ্রহণ করিবার বিরুদ্ধে সাধারণভাবে যে কয়েকটি কথা বলা হইল, চিত্রকলা ও ভাস্কর্য্য সম্বন্ধে সেগুলি আরও ভাল করিয়া খাটে। হদিস্ চিত্রকলার সম্পূর্ণ বিরোধী সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই; হদিসে চিত্রকলা সম্বন্ধে যে-সকল নিষেধ আছে, সেগুলিও মোহম্মদেরই উক্তি বলিয়াই বর্ণিত হইয়াছে, তাহাও সত্য। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও স্যর টমাস্ আর্ণল্ড্ ও অন্যান্য পণ্ডিতরা মনে করেন, হদিসের উক্তিগুলিকে চিত্রকলা সম্বন্ধে মোহম্মদ ও তাঁহার সঙ্গীগণের প্রকৃত মনোভাবের প্রমাণ বলিয়া গ্রাহ্য করা যাইতে পারে না। তাঁহাদের মতে, হদিসে যতটা বলা হইয়াছে, প্রকৃতপক্ষে মোহম্মদ ও তাঁহার সমসাময়িক আরবরা ততটা চিত্রবিরোধী ছিলেন না।*

এই মতের সপক্ষে অনেকগুলি সমীচীন যুক্তি আছে। প্রথমেই দেখিতে পাই, হদিস ভাস্কর্য্য ও চিত্রকলার অত্যন্ত বিরোধী হইলেও উহাতে মোহম্মদের নিজের এবং তাঁহার সঙ্গীগণের গৃহে চিত্র বা মূর্ত্তির

* "This of necessity soon led to deliberate forgery of Tradition. The transmitters brought the words and the actions of the Prophet into agreement with the view of the later period.···The majority of the Traditions then cannot be regarded as really reliable historical accounts of the *Sunna* of the Prophet." (Juynboll, Encyclopaedia of Islam, Vol II.)

* "There is little doubt that these utterances, placed in the mouth of the Prophet by later writers, give expression to an intolerant attitude towards figured art which Muhammad himself did not feel" Arnold, *op. cit.*, p. 6.

অস্তিত্বের বহু উল্লেখ রহিয়াছে। একটি হদিসে আছে যে, দেবদূত জিব্রাইল একদিন হজরৎ মোহম্মদের গৃহে প্রবেশ করিয়া একটি মনুষ্যমূর্ত্তি বা "তিম্‌ছাল ইন্‌ষান্‌" দেখিতে পান। (তিরমিধী)। হজরৎ মোহম্মদের মজলিশের, বা লোকের সহিত সাক্ষাৎ করিবার কক্ষের, শয্যার ঢাকনা, গালিচা প্রভৃতিতে পশুপক্ষী ও জীবজন্তুর ছবি অঙ্কিত ছিল, এইরূপ বর্ণনা অন্য একটি হদিসে পাওয়া যায়। (অবূ দাবূদ)। বিবি আয়েষার গৃহেও জীবজন্তুর প্রতিকৃতিযুক্ত পর্দ্দা ছিল, হদিসে এইরূপ উল্লেখ আছে। নমাজের বিঘ্ন করে বলিয়া হজরৎ মোহম্মদ সেগুলিকে সরাইয়া ফেলিতে আদেশ দিয়াছিলেন, হদিসে এইরূপ কথা আছে বটে, কিন্তু সেই একই হদিসে ইহাও আছে যে, আয়েষা সেগুলিকে কাটিয়া গদী ও বালিশ তৈরি করিয়া দিবার পর হজরৎ রসুল সেগুলি ব্যবহার করিতে আপত্তি করেন নাই। (বুখারী*)। তাহা ছাড়া হজরৎ মোহম্মদ বিবি আয়েষার খেলা করিবার পুতুল সম্বন্ধেও আপত্তি করেন নাই। এ-সম্বন্ধে অহ্‌মদ-ইব্‌ন্‌-হম্বলের সংগ্রহে নিম্নোদ্ধৃত হদিসটি আছে।—

"বিবি আয়েষা বলিতেছেন, হজরৎ রসুলে করিম তাবুক অথবা খায়বর হইতে ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহার ছোট কামরার উপর একটি পর্দ্দা ছিল। এই সময় বাতাসে পর্দ্দার একপাশ উড়িয়া যাওয়ায়, তাঁহার খেলনাগুলি হজরতের নজরে পড়িল। তাহাতে হজরৎ জিজ্ঞাসা করিলেন, "আয়েষা, এগুলি কি? আয়েষা উত্তর করিলেন—আমার খেলনা। খেলনাগুলির মধ্যে একটা ডানাওয়ালা ঘোড়ার উপর হজরতের নজর পড়িল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—মাঝখানে ওটা কি? আয়েষা বলিলেন, ঘোড়া। হজরৎ বলিলেন—ওর উপর ওগুলি আবার কি দেখা যাইতেছে? আয়েষা বলিলেন—ও-দুটি ডানা। হজরৎ বলিলেন—ঘোড়ার আবার ডানা! আয়েষা বলিলেন—আপনি শুনেন নাই? সোলেমানের ঘোড়ার দুইখানি ডানা ছিল। বিবি আয়েষা বলিতেছেন,—আমার কথা শুনিয়া হজরৎ এত হাসিলেন যে, আমি তাঁহার মাড়ির দাঁত দেখিতে পাইলাম।"

এই হদিসটি উদ্ধৃত করিয়া মৌলানা মোহাম্মদ আক্‌রম খাঁ বলিতেছেন,—"এই হাদিছ হইতে নিম্নলিখিত বিষয়-গুলি অতিশয় স্পষ্টভাবে সপ্রমাণ হইয়া যাইতেছে—(১) হজরতের গৃহে জীবজন্তুর পুতুল রক্ষিত হইত; (২) তাঁহার সহধর্ম্মিণী বিবি আএশা তাহা ব্যবহার করিতেন; (৩) হজরতের তাহা জানা ছিল, তত্রাচ তিনি নিষেধ করেন নাই, বরং খেলাধূলার উপকরণ বলিয়া বিবি আএশার কথায় আনন্দপ্রকাশ করিয়াছিলেন; (৪) হজরত মৌন থাকিয়া এই কার্য্যে সম্মতিই দিয়াছেন—মোহাদ্দেছগণের পরিভাষায় ইহা তক্‌রিরী হাদিছ; (৫) এই ঘরে প্রবেশ করিতে কোন ফেরেস্তাকে কখনও কোন আপত্তি করিতে শুনা যায় নাই, অথচ ছবির তুলনায় পুতুল অধিক আপত্তি-জনক।" *

হজরৎ মোহম্মদের মত তাঁহার সঙ্গীগণের গৃহেও মূর্ত্তি অথবা চিত্রের অস্তিত্বের উল্লেখ হদিসে আছে। এ-প্রসঙ্গে দুই তিনটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিলেই বোধ করি যথেষ্ট হইবে। অহ্‌মদ্‌ ইব্‌ন্‌-হম্বলের সংগৃহীত একটি হদিসে মিস্‌বর্‌-ইব্‌ন-মখ্‌রমহ্‌ নামক এক ব্যক্তির পোষাকে ও ইব্‌ন্‌-'অব্বাসের গৃহের একটি আসবাবে জীবজন্তুর প্রতিকৃতির উল্লেখ আছে।† অহ্‌মদ ইব্‌ন্‌ হম্বল ধৃত আর একটি হদিসে মরবান্‌ ইব্‌ন্‌-অল্‌-হকমের গৃহে মূর্ত্তি ছিল, ইহা বলা হইয়াছে। ইনি এক সময়ে মদিনার শাসনকর্ত্তা ছিলেন।‡ বোখারীর হদিস-সংগ্রহে বলা হইয়াছে যে, একদিন অবূ হুরয়্‌রহ্‌ মদিনার একটি বাড়িতে এক চিত্রকরকে দেয়ালে ছবি আঁকিতে দেখেন।§ অহ্‌মদ্‌ ইব্‌ন্‌ হম্বল ও মুস্‌লিম কর্ত্তৃক লিপিবদ্ধ আর একটি হদিসে আছে যে, ইব্‌ন্‌ 'অব্বাসের নিকট একদিন এক চিত্রকর আসিয়া ছবি আঁকা পাপ কি না এই কথা জিজ্ঞাসা করে। ইব্‌ন্‌ 'অব্বাস তাহাকে তুলি পরিত্যাগ করিতে না বলিয়া শুধু প্রাণহীন বস্তু আঁকিতে উপদেশ দেন।**

হদিসের এই সকল উক্তি প্রকৃত কি অপ্রকৃত সে বিচারের এখানে প্রয়োজন নাই, তবে এ-কথাটা ঠিক যে, ইস্‌লামের প্রথম যুগে চিত্রকলা একেবারে ধর্ম্মবিরুদ্ধ হইলে হদিসে চিত্র ও ভাস্কর্য্যের এত উল্লেখ থাকিত না। হদিস্‌ ব্যতীত অন্য ঐতিহাসিক বিবরণের দ্বারাও ঠিক এই কথাই প্রমাণিত হয়। ইস্‌লাম ধর্ম্ম প্রবর্ত্তনের পূর্ব্বেকার যুগের আরবী কাব্যে দেখা যায়, সে-যুগের আরবদিগের নিকট মূর্ত্তি প্রভৃতির অতিশয় আদর ছিল। তাহারা সুন্দরী স্ত্রীর বর্ণনা করিতে গিয়া প্রায়ই চিত্রের মত রূপসী, মর্ম্মর মূর্ত্তির মত শুভ্রকান্তি, বাইজেনটাইন প্রতিমার মত উজ্জ্বল—এইরূপ সব উপমা ব্যবহার করিত। সম্রাট হেরাক্লাইয়াসের মোহর ও যীশুর মূর্ত্তি ও ক্রুশ-যুক্ত স্বর্ণ মুদ্রাও সেই যুগের আরব বণিকেরা অতি যত্নের সহিত সংগ্রহ করিত। আরব দেশে

* Bukhari, Vol IV, pp. 76-77.

* "সমস্যা ও সমাধান—মৌলানা মোহাম্মদ আক্‌রম খাঁ প্রণীত—১২৭-১২৮ পৃঃ। মৌলানা সাহেবের পুস্তকে এই বিষয়ে আরও অনেকগুলি হদিস উদ্ধৃত হইয়াছে।

† Ibn Hanbal, *Musnad*, Vol. I. p. 320.

‡ *Ibid*, Vol. II, p. 232.

§ Bukhari, Vol. IV, p. 104 (no. 90)

** Hanbal, *Musnad*, i, 360; Musilm, *Sahih* II. 16

বিদেশ হইতে যে সকল পণ্যদ্রব্য আসিত তাহাতেও মানুষ ও বহু জীবজন্তুর ছবি অঙ্কিত থাকিত।

এই ধারা শুধু মোহম্মদের জীবিতকালেই নয় তাঁহার পরবর্ত্তী যুগেও একেবারে বদ্‌লাইয়া যায় নাই। চিত্র সম্বন্ধে সর্ব্বত্র ও সকল সময়ে মোহম্মদ প্রবল আপত্তি করেন নাই, এরূপ কাহিনী সে-যুগের ইতিহাসে বিরল নহে। অয্‌রকী কর্তৃক লিখিত ইতিহাসে একটি গল্প আছে যে, মোহম্মদ যখন মক্কা জয়ের পর কাবার অভ্যন্তরের চিত্রগুলি নষ্ট করিয়া ফেলিতে আদেশ দেন, তখন তিনি একটি থামের উপর অঙ্কিত যীশু ও মাতা মেরীর ছবির উপর হাত রাখিয়া বলেন, এই ছবি ব্যতীত আর সবগুলিই মুছিয়া ফেল। এই চিত্রটি অনেক দিন পর্য্যন্ত কাবার মধ্যে ছিল। অবশেষে, ৬৮৩ খৃঃ অব্দে উমায়দ সৈন্যদের মক্কা অবরোধের সময়ে উহা বিনষ্ট হইয়া যায়। হজরৎ মোহম্মদ চিত্রকলাকে গুরুতর পাপ বলিয়া মনে করিলে, তিনি মৃত্যুশয্যায় পত্নীদের সহিত খৃষ্টান গির্জ্জার চিত্র সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছেন, এরূপ উল্লেখও তাঁহার জীবনীতে থাকিত না। অবশ্য এই প্রসঙ্গে জীবনীকার মোহম্মদের দ্বারা চিত্রকলার নিন্দাই করাইয়াছেন। তবু, পরবর্ত্তী যুগে চিত্রকলা মুসলমান সমাজে যেরূপ গর্হিত কাজ বলিয়া বিবেচিত হইত, মোহম্মদের সময়েও তাহার সম্বন্ধে সেইরূপ ধারণা থাকিলে কোন জীবনীকার স্বয়ং হজরৎ রসুলের দ্বারা শেষমুহূর্ত্তে চিত্রকলার আলোচনাও করাইতে সাহস পাইতেন না।

মোহম্মদের পরবর্ত্তী যুগেও আমরা চিত্রকলাবিদ্বেষের বড় একটা প্রমাণ পাই না। 'ত্বরি'তে আছে যে, মোহম্মদের বিশ্বস্ত সহচর স'দ ইব্‌ন্ অবী বক্ক্কাস যখন টিসাইফান জয় করিয়া সাসানীয় রাজাদের প্রাসাদে নমাজ করেন, তখন তিনি সেই রাজপুরীর দেওয়ালে অঙ্কিত মনুষ্য ও জীবজন্তুর মূর্ত্তি সম্বন্ধে কোন আপত্তি করেন নাই, সেগুলি নষ্ট করিয়া ফেলিতেও আদেশ দেন নাই। ইহার পর খলিফা 'উমর-এর-মত ধর্ম্মপ্রাণ মুসলমানকেও যখন আমরা মদিনার মসজিদে ধূপ দিবার জন্য সিরিয়া হইতে আনীত একটি মূর্ত্তি-অঙ্কিত ধূপদানী দিতে সঙ্কোচ করিতে দেখি না (ইব্‌ন্-রুস্তহ্‌), তখন স্বতঃই মনে হয়, পরবিকশিত ইসলামে আমরা যে ভাস্কর্য্য ও মূর্ত্তিবিদ্বেষ দেখিতে পাই, প্রথম যুগের ইসলামে তাহা মোটেই ছিল না।*

৫

তবে কখন, কাহার প্রভাবে চিত্রকলা ও ভাস্কর্য্য সম্বন্ধে নিষেধ ইস্‌লামের অঙ্গীভূত হইল? প্রথমে সময়ের কথাই ধরা যাক। কোরানে চিত্রকলার প্রতি বিদ্বেষের কোন পরিচয় পাওয়া যায় না, অথচ হদিসে এই বিদ্বেষ সুস্পষ্ট। ইহা হইতে মনে হয়, হদিস সঙ্কলিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে চিত্রকলা সম্বন্ধে আপত্তিও প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। হদিস-সঙ্কলনের ইতিহাস একটু অস্পষ্ট বলিয়া এই কাল যে ঠিক কোন্ কাল, তাহা নিশ্চিত বলিবার উপায় নাই। তবে মোটামুটি ভাবে এ-কথাটা বলিলে ভুল করা হইবে না যে, হিজিরার দ্বিতীয় শতকে প্রথম হদিসগুলি সংগৃহীত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই মুসলমান সমাজে চিত্রকলা-বিদ্বেষ প্রথম আত্মপ্রকাশ করে, এবং হিজিরার তৃতীয় শতকে বোখারী, মুসলিম প্রভৃতির বিরাট হদিস-সংগ্রহ সঙ্কলিত হইবার পর সেই আপত্তি পূর্ণতা লাভ করে।

এই অনুমান যে সত্য, তাহার অন্য প্রমাণও আছে। হিজিরার দ্বিতীয় শতকের শেষের দিকে মুসলমান একেশ্বর-বাদের মধ্যে একটা পরিবর্ত্তন দেখা দেয় এবং তাহার ফলে ইসলামধর্ম্মিগণ মূর্ত্তি ও চিত্র সম্বন্ধে আরও অসহিষ্ণু হইয়া পড়েন। খলিফা 'উমরের যে খোদিত ধূপদানীটির কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, তাহার কারুকার্য্যগুলি ৭৮৩ খৃষ্টাব্দে মদিনার একজন শাসনকর্ত্তার আদেশে নষ্ট করিয়া ফেলা হয়। তৎকালীন মুসলমান আচার-ব্যবহার ও ধর্ম্ম সম্বন্ধে বিখ্যাত খৃষ্টান সাধক দামাস্কাস-নিবাসী সেণ্ট জনের প্রগাঢ় জ্ঞান ছিল। তাঁহার আত্মীয়েরা পঞ্চাশ বৎসর ধরিয়া উময়্যহ্‌-বংশীয় খলিফাদিগের রাজস্ব-সচিব ছিলেন। এই সেণ্ট জনের লেখায় মূর্ত্তি ও চিত্রদ্বেষীদের সম্বন্ধে অনেক কথা আছে। কিন্তু কোথাও তিনি তাহাদের মধ্যে মুসলমানদের নাম করেন নাই। অথচ তাঁহার পঞ্চাশ বৎসর পরেই হারুন-অল-রসিদ ও মাইমুনের সমসাময়িক, খৃষ্টান ধর্ম্মবেত্তা থিওডোর অবুকরা তাহাদিগকে মূর্ত্তি ও চিত্রদ্বেষী বলিয়াই উল্লেখ করিয়াছেন। ইহা হইতে মনে হয়, উময়্যহ্‌-বংশীয় খলিফাদের রাজত্বের শেষের দিকে ও 'অব্বাস-বংশীয়দের শাসনের প্রারম্ভকালে চিত্রকলাবিদ্বেষ ইসলামের মধ্যে প্রথমে উগ্রভাবে দেখা দেয়। এই যুগে বাইজেণ্টাইন সাম্রাজ্যেও একটা অতি প্রচণ্ড মূর্ত্তিবিদ্বেষ দেখা দিয়াছিল,—তাহা অবশ্য খৃষ্টান পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে।

চিত্র সম্বন্ধে ইসলামের এই মতবিবর্ত্তন কেন এবং কাহাদের প্রভাবে ঘটে, ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা অনেক গবেষণার পর তাহার দুই তিনটি কারণ স্থির করিয়াছেন। ইহার মধ্যে ইহুদীদের ও ইহুদী ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রভাবই প্রধান বলিয়া মনে হয়। কিন্তু এই কারণটি সম্বন্ধে

* ইস্‌লামের প্রথম যুগের শিল্পচর্চ্চা সম্বন্ধে যাঁহারা আরও তথ্য জানিতে চান, তাঁহারা মসিয় লাম্মার প্রবন্ধের ২৪৮ হইতে ২৬৮ পৃষ্ঠায় অনেক দৃষ্টান্ত পাইবেন।

আলোচনা করিবার পূর্ব্বে আর একটি কারণের উল্লেখ করাও প্রয়োজন।

ইসলামের আবির্ভাবের অব্যবহিত পূর্ব্বে সমগ্র পশ্চিম এশিয়া জুড়িয়া কি ধর্ম্মে, কি রাজনৈতিক ব্যাপারে, কি আর্টে, গ্রীকো-রোমান বা হেলেনিষ্টিক প্রভাবের বিরুদ্ধে একটা আন্দোলন দেখা দিয়াছিল। আর্টে এই আন্দোলন হেলেনিজ্‌মের বাস্তবতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের রূপ ধারণ করিয়া প্রকাশ পায়। বাস্তবতার পূর্ণবিকাশ হইতে পারে একমাত্র মূর্ত্তিগঠনে, সেইজন্য পশ্চিম-এশিয়ার 'ন্যাচরেলিজ্‌ম্'-বিরোধী শিল্পীরা মূর্ত্তিগঠনের প্রতি একেবারে উদাসীন হইয়া পড়িল। যাহা কিছু স্বভাবানুকারী, মনুষ্য বা জীবদেহের অবিকল প্রতিচ্ছবি, তাহা তাহাদের নিকট নিন্দনীয় বলিয়া মনে হইতে লাগিল। ইহার ফলে পঞ্চম হইতে দশম শতাব্দী পর্য্যন্ত পশ্চিম-এশিয়ার শিল্পে সুগঠিত মনুষ্য বা জীবমূর্ত্তি অতি কমই দেখিতে পাওয়া যায়। ইসলামের আপত্তিও প্রধানতঃ স্বভাবানুকারী মূর্ত্তি বা চিত্র গঠন সম্বন্ধেই। এই বিদ্বেষের আবির্ভাবও পশ্চিম-এশিয়ার এই শিল্প-বিপ্লবের পূর্ণপরিণতির যুগে। এই সকল ব্যাপারের পর্য্যালোচনা করিয়া মসিয় ব্রেহিয়ে বলেন, "Islam marks the definite triumph of that secular evolution which took the Orientals farther and farther away from Naturalism."

ভাস্কর্য্য ও চিত্রকলা সম্বন্ধে ইসলামের বিদ্বেষ ও 'মাইনর ডেকোরেটিভ আর্টস্' সম্বন্ধে তাহার অনুরাগের কথা স্মরণ করিলে এ যুক্তিতে যে অনেকটা সত্য আছে, তাহা স্পষ্টই মনে হয়। অন্ততঃ এ কথাটা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, স্বয়ং মোহম্মদের আর্ট সম্বন্ধে যে ধরণের আপত্তি, তাহার সহিত এই বাস্তবতা-বিরোধী, অ্যান্টি-ন্যাচরালিষ্টিক আন্দোলনের সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য আছে। কিন্তু পূর্ণবিকশিত ইসলামের চিত্রকলা ও ভাস্কর্য্য বিরোধের বেলায় এ থিওরী খাটে না। পশ্চিম-এশিয়ার অ্যান্টিহেলেনিক বিপ্লব আর্টে বাস্তবতার বিরোধী হইলেও জীবমূর্ত্তি গঠনের একেবারে বিরোধী নয়। এই যুগের শিল্পীরা শুধু তাহাদের গঠিত মূর্ত্তিকে ঠিক জীবন্ত প্রাণীর মত না করিয়া 'ষ্টাইল-ইজ্‌ড্' করিয়াই সন্তুষ্ট। ইস্‌লাম যে-কোন প্রকার জীবমূর্ত্তি সৃষ্টির একেবারে বিরোধী। সেইজন্য মনে হয়, ইসলামের দ্বিতীয় যুগে তাহার উপর এমন কোন একটা প্রভাব আসিয়া পড়িয়াছিল যাহার ফলে ইসলামের বিধিব্যবস্থা ভাস্কর্য্য ও চিত্রকলার একেবারে বিরোধী হইয়া দাঁড়ায়। ইউরোপীয় পণ্ডিতদের মতে এই প্রভাব আর কাহারও নয় — ইহুদীদের।

ইহুদীদের মত মূর্ত্তি ও চিত্রদ্বেষী জাতি অতি অল্পই দেখা যায়। ডিউট্রোনোমিতে মূর্ত্তি গঠন সম্বন্ধে সুস্পষ্ট নিষেধ আছে। তালমুদে এই নিষেধের বিস্তৃত ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। ইহুদীদের এই মূর্ত্তিবিদ্বেষ ইসলামে যে সংক্রামিত হইয়াছিল সে-বিষয়ে সন্দেহ করা চলে না। হিজিরার পূর্ব্বে মদিনাতে বহু ইহুদী ছিল। তাহাদের অনেকেই মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করে। ইসলাম ধর্ম্মের আচার-অনুষ্ঠান ও বিধিনিষেধের উপর ইহাদের ও ইহুদী ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রভাব সম্বন্ধে গত কয়েক বৎসরের মধ্যে অনেক গবেষণা হইয়াছে। প্রফেসার মিটভখ (Mittwoch) বলেন, ইসলামের আচার অনুষ্ঠান বা 'স্বলাত্'-এর সহিত ইহুদী আচার-অনুষ্ঠানের সম্বন্ধ খুব ঘনিষ্ঠ। অন্ততঃ হদিসের উপর ইহুদীদের প্রভাব যে অত্যন্ত বেশী তাহা সুনিশ্চিত। অনেকগুলি হদিসের সহিত তালমুদের ব্যবস্থার একেবারে ভাষাগত সাদৃশ্য রহিয়াছে।* সেজন্য মনে হয়, ইহুদীদের যুগব্যাপী চিত্রকলা ও ভাস্কর্য্য বিদ্বেষ মুসলমান ইহুদীদের দ্বারাই ইসলামে প্রথম সংক্রামিত হয়। পূর্ণ-বিকশিত ইসলামে চিত্রকলার মত কুকুর এবং শূকর সম্বন্ধে আপত্তিও ইহুদী প্রভাবেরই সূচনা করে। কুকুর ও শূকরকে অত্যন্ত অপবিত্র জ্ঞান করা ইহুদীদের একটা দৃঢ়বদ্ধ সংস্কার। কোরানে কুকুরকে গর্দ্দভ অপেক্ষা অধিক নিন্দনীয় জীব বলিয়া কোথাও বলা হয় নাই।† অথচ হদিসে আছে—"যে-গৃহে কুকুর অথবা চিত্র থাকে, সে গৃহে ফেরেস্তারা প্রবেশ করেন না।"

৬

এত সব শাস্ত্রীয় বিধিনিষেধও যে মুসলমান সমাজে চিত্রকলাকে ঠেকাইয়া রাখিতে পারে নাই, মুসলমান চিত্রকলার অপূর্ব্ব সম্পদই তাহার প্রমাণ। তবে এই সকল বাধার ফলে সাধারণ মুসলমানের মধ্যে চিত্রকলা কখনও প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে নাই। প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত উহা কেবলমাত্র ধর্ম্মবিৎ ও শাস্ত্রকারদের বিরুদ্ধাচরণকে অবহেলা করিবার মত শক্তি যাঁহাদের ছিল,

* "In regard to Jewish influence upon many of the Hadith there can be no doubt whatsoever. A large number of these Traditions reproduce almost verbally the precepts enunciated in the Talmud. [A. Guillaume, "The Influence of Judaism on Islam (*The Legacy of Israel.* Oxford 1927) pp., 153 *ff.* A. J. Wensinck—*The Second Commandment*, p. 162] "The Jewish origin of the unkindly judgment of painting and the painter seems distinctly to be indicated by his being associated with the pig and the Christian bell in several of the Traditions." Arnold, *op. cit.*, pp. 10-11.

† কুর'আন ৭।১৭৫ ; ১৮।১৭, ২১ ; ও ২।২৬১ ; ১৬।৮ ; ৭৪।৫১।

তাঁহাদের গৃহেই আবদ্ধ ছিল। তাই মুসলমান চিত্রকলা রাজসভা ও অভিজাতদিগের আর্ট। উহার বিকাশে মুসলমান জনসাধারণের সাহায্য বা সাহচর্য্যের বড়-একটা পরিচয় পাওয়া যায় না।

মোহম্মদের জীবিতকালে ও তাঁহার মৃত্যুর অব্যবহিত পরে আরব সমাজে চিত্রকলার চর্চ্চা কতটুকু ছিল, তাহার সংক্ষিপ্ত আলোচনা উপরে করা হইয়াছে। এইবার আমাদিগকে খৃষ্টীয় দশম শতাব্দী পর্য্যন্ত, অর্থাৎ যে যুগে চিত্রাঙ্কন সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় নিষেধ ক্রমেই প্রবল হইয়া উঠিতেছিল, সেই যুগে মুসলমান সমাজে চিত্রকলার কিরূপ চর্চ্চা হইতেছিল, তাহার একটু পরিচয় লইতে হইবে। এই প্রসঙ্গে দুইটি কথা বিশেষভাবে স্মরণ রাখা আবশ্যক। উহার প্রথমটি এই যে, কয়েকটি বিনষ্টপ্রায় চিত্র ও দুই চারিটি মুদ্রা ভিন্ন সে-যুগের চিত্রকলার নিদর্শন একেবারে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। কুস্‌য়র্‌ 'অম্‌রহ্‌ ও সামর্‌রার ফ্রেস্কো, মিশর হইতে সংগৃহীত কয়েকটি প্যাপিরাসের টুকরা, খলিফা মুতবক্‌কিল ও অল্‌-মুকতাদির-এর মুদ্রা—এইরূপ কয়েকটিমাত্র জিনিষ হইতে আমাদিগকে সে যুগের চিত্রকলা কিরূপ ছিল তাহা অনুমান করিয়া লইতে হইবে। দ্বিতীয় কথা এই যে, মুসলমান সমাজে ইতিহাসের সহিত ধর্ম্মশাস্ত্রের অতিশয় ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকায়, মুসলমান ঐতিহাসিকগণ পারতপক্ষে চিত্রাঙ্কনের মত পাপকার্য্যের উল্লেখ করেন নাই। সুতরাং সে-যুগের চিত্রকলা সম্বন্ধে ইতিহাস একেবারে নীরব, এ-কথা বলিলে অত্যুক্তি হয় না। তবু, এ-সকল কারণ সত্ত্বেও, ইসলামের প্রথম যুগের চিত্রকলা ও ভাস্কর্য্যের যে প্রমাণ পাওয়া যায়, তাহা নিতান্ত অবহেলা করিবার মত নয়।

উময়্যহ্‌-বংশীয় খলিফাগণ অতিশয় বিলাসী ও আমোদ-প্রিয় ছিলেন। সুতরাং ইঁহাদের সময়েই যে চিত্রকলার প্রকাশ্য চর্চ্চা ও বিস্তারের বহু প্রমাণ পাওয়া যাইবে, তাহা কিছুমাত্র আশ্চর্য্যের বিষয় নয়। এই বংশের খলিফা য়যীদ (৬৮০-৬৮৩ খৃঃ অব্দ) কর্ত্তৃক নিযুক্ত কুফাহ্‌-র শাসনকর্ত্তা, 'উবয়্‌দ অল্লাহ্‌ ইব্‌ন্‌-যিয়াদ্‌-এর প্রাসাদে সিংহ, কুকুর, ভেড়া প্রভৃতির প্রতিকৃতি ছিল। * এই প্রতিকৃতিগুলি মূর্ত্তি কিংবা ছবি তাহার কোন স্পষ্ট উল্লেখ নাই। কিন্তু এইগুলির জন্য বিশ্বাসীদের মনে অত্যন্ত ক্ষোভ উপস্থিত হইয়াছিল। এই বংশের রাজত্বকালেই কবি 'উমর ইব্‌ন্‌-অবী রবী'অহ্‌ মক্কায় তীর্থ করিতে গিয়া এক রাজকন্যার তাঁবুতে জীবজন্তুর ছবিযুক্ত একটি লাল কিংখাবের পরদা দেখিয়াছিলেন।* মক্কায় স্বয়ং হজরৎ রসুলের গৃহ দেখিতে গিয়া এইরূপ কোন জিনিষ সঙ্গে রাখা পরবর্ত্তী যুগের কোন বিশ্বাসী মুসলমানের পক্ষে অসম্ভব ছিল।

উময়্যহ্‌-বংশীয়দের রাজত্বকালের চিত্রকলার প্রধান নিদর্শন কুস্‌য়র্‌ 'অম্‌রহ্‌-র প্রাসাদের বিখ্যাত ফ্রেস্কোগুলি। ১৮৯৮ খৃঃ অব্দে আলোয়া মুজিল এই চিত্রগুলি আবিষ্কার করেন।† এই প্রাসাদের একটি ভিন্ন প্রত্যেকটি কক্ষের সিলিং ও দেয়াল চিত্রাঙ্কিত। একটি ঘরে ছয়টি রাজার ছবি আছে। ইহারা উময়্যহ্‌-বংশীয় খলিফাদের দ্বারা পরাজিত ছয় জন ইসলামের শত্রু। আর একটি ঘরে মানুষের বিভিন্ন বয়স, জয়, দর্শনবিদ্যা, ইতিহাস, কাব্য প্রভৃতির রূপক চিত্র আছে। অন্য ঘরে নগ্ন পুরুষ ও স্ত্রীমূর্ত্তি, নর্ত্তক-নর্ত্তকী, বংশীবাদক, গায়ক, শিকার, নানা জীবজন্তু—বিশেষতঃ হরিণের ছবি প্রভৃতি আছে। প্রাসাদে ঢুকিয়াই সিংহাসনারূঢ় একটি রাজার প্রতিকৃতি দেখিতে পাওয়া যায়। এই প্রতিকৃতির চারিদিকে ভগবানের আশীর্ব্বাদ-যাচ্ঞাসূচক আরবী লেখমালা রহিয়াছে। কিন্তু এই প্রতিকৃতিটি যে কাহার সেই নামটি পড়া যায় না। প্রফেসর হার্টসফেল্ট অনুমান করেন, ইনিই খলিফা প্রথম বলিদ্‌ (৭০৫-৭১৫ খৃঃ-অব্দ)—যাঁহার আদেশে ৭১২ খৃঃ-অব্দ হইতে ৭১৫ খৃঃ-অব্দের মধ্যে এই প্রাসাদ নির্ম্মিত হইয়াছিল।

উময়্যহ্‌-বংশীয়দের পর ধর্ম্মনিষ্ঠ 'অব্বাস্‌-বংশীয় খলিফাগণও চিত্রকলা ও ভাস্কর্য্যের চর্চ্চা করিতেন। খলিফা মন্‌সুর (৭৫৪-৭৭৫ অব্দ) তাঁহার প্রাসাদের গম্বুজের উপর একটি অশ্বারোহী যোদ্ধৃমূর্ত্তি স্থাপিত করিয়াছিলেন। খলিফা আমিন (৮০৯-৮১৩) নানা জীবজন্তুর আকৃতিতে বড় বড় নৌকা তৈয়ার করাইয়াছিলেন। 'অব্বাস-বংশীয়দের সময়ের চিত্রকলার প্রধান নিদর্শন সামর্‌রার প্রাসাদের ফ্রেস্কো। এই প্রাসাদ খলিফা মু'তসিম্‌ কর্ত্তৃক ৮৩৮ খৃঃ অব্দের কাছাকাছি নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই প্রাসাদে কুস্‌য়র্‌-'অমরহ্‌-র প্রাসাদের মত নগ্ন স্ত্রীমূর্ত্তি, নর্ত্তকী, শিকার, পশুপক্ষী প্রভৃতির ছবি আছে।‡ এই ছবিগুলি যে-সকল চিত্রকর আঁকিয়াছে, তাহাদের নাম পর্য্যন্ত আছে। ইহাদের কেহ কেহ খৃষ্টান, আবার অনেকেই মুসলমান। সামর্‌রাতেই খলিফা মুতবক্‌কিল (৮৪৭-৮৬১ অব্দ) কর্ত্তৃক নির্ম্মিত অল্‌-মুখ্‌তার নামে একটি

* Yāqūt, Mu'jum al-buldan, Vol. 1, pp. 792-3.

* Jāhiz, Kitāb al-Mahāsin, Vol. I, p. 342 (l. 15).

† A. Musil—Cusejr 'Amra (Wien, 1907).

‡ Herzfeld, Die Malereien von Samarra (Berlin, 1927)

প্রাসাদ আছে। উহাতেও গ্রীক চিত্রকরদের অঙ্কিত অনেক চিত্র আছে। এই মুতবক্কিলই আবার নিজের প্রতিকৃতি-সমন্বিত মুদ্রাও অঙ্কিত করাইয়াছিলেন। এইরূপ একটি অতি সুন্দর মুদ্রার প্রতিলিপি আর্ণল্ড ও গ্রোমানের পুস্তকে আছে।* খলিফা অল্-মুহ্‌তদী-র (৮৬৯-৮৭০) প্রাসাদের দেওয়ালেও চিত্র অঙ্কিত ছিল, তাহার উল্লেখ মুসলমান ঐতিহাসিকদের পুস্তকে পাওয়া যায়।† দশম শতাব্দীর প্রথমভাগে খলিফা মুক্‌তাদির (৯০৮-৯৩২) একটি সোনার গাছ ও পক্ষী প্রভৃতি নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। ইঁহারও প্রতিকৃতি-সমন্বিত বহু মুদ্রা পাওয়া যায়।‡

দ্বাদশ শতাব্দীর পূর্ব্বে কাগজের উপরে অঙ্কিত চিত্র পাওয়া যায় না, এমন কি এমন কোন চিত্রের উল্লেখও বড় একটা পাওয়া যায় না। কেবলমাত্র অল্-মস্‌'উদী বলিয়া গিয়াছেন যে, হিজিরার ৩০৩ অব্দে (৯১৫-১৬ খৃঃ অব্দে) তিনি ইস্‌তখ্‌র্‌এ একটি হস্তলিখিত পুঁথি দেখেন; তাহাতে সাতাশ জন সাসানীয়-বংশের রাজার প্রতিকৃতি অঙ্কিত ছিল। বলা বাহুল্য, সে-যুগে এই ধরণের চিত্র যাহা ছিল, সবই বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। শুধু মিশরের ফাইউম্ ও অল্-উষ্‌মুনয়ন হইতে আনীত কয়েকটি প্যাপিরাসের টুকরা সে-যুগের চিত্রকলা কিরূপ ছিল তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। এই প্যাপিরাসগুলি ১৮৮৫ সনে আবিষ্কৃত হয়। এখন সেগুলি ভিয়েনার মিউজিয়মে আর্চ্চ-ডিউক রাইনের° সংগ্রহে রক্ষিত আছে। এই প্যাপিরাসগুলির মধ্যে মানুষ, গাছ-পালা, জীবজন্তু, আদিরসাত্মক চিত্র প্রভৃতি আছে। এই সকল চিত্রের মধ্যে একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সেটি একটি অশ্বারোহী আরব যোদ্ধার মূর্ত্তি।§ এই ছবিটির নীচে কোরানের একটি বচন উদ্ধৃত আছে। কুর-'আন্, ২১৯০) ও তাহার নীচেই "অল্-হম্‌দু লি-ল্লাহি শুকরন্" ইত্যাদির পর চিত্রকরের নাম লিখিত আছে— অবূ তমীম্ হয়্‌দর।

দশম শতাব্দী পর্য্যন্ত মুসলমান চিত্রকলার এই হইল অতিসংক্ষিপ্ত ইতিহাস। তাহার পর এই ইতিহাস এত সুপরিচিত যে তাহার আর পুনরাবৃত্তির আবশ্যক করে না।

* Arnold and Grohmann—*The Islamic Book*, 1929, p. 11, fig. 8.

† Mas'ūdi, Murūj adh-Dhahab, Vol. VIII, p. 19.

‡ Arnold & Grohmann, *op. cit.* p. 10, fig. 6; Mann—*Der Islam*, p. 37, fig. 12.

§ Vienna, Erzherzog Rainer collection of Papyri. Exhibition no. 954. Arnold and Grohmann, *op. cit.* p. 7, fig. 4.

এই প্রবন্ধ-রচনার জন্য আমি নিম্নলিখিত পুস্তকগুলির সাহায্য লইয়াছি:

১। Sir Thomas W. Arnold—Painting in Islam. Oxford, 1928.
২। H. Lammens—"L'attitude de l'Islam primitif en face des arts figurés. Journal Asiatique (11-ème série, tome VI, pp., 239-79; September-October, 1915.
৩। মৌলানা মোহাম্মদ আক্‌রম খাঁ—"সমস্যা ও সমাধান"। কলিকাতা।
৪। Sir Thomas W. Arnold and Adolf Grohmann—The Islamic Book. London & Paris, 1929.
৫। I. Goldziher—Le Dogme et la Loi de l'Islam. (Traduction de Felix Arin). Paris, 1920.
৬। Alfred Guillaume—The Traditions of Islam—an Introduction to the Study of Hadith Literature. Oxford, 1924.
৭। H. Lammens—L'Islam—Croyance et Institutions. Beyrouth, 1926.
৮। Th. W. Juynboll—Article "Hadith" in "The Encyclopaedia of Islam (1927), Vol. II, pp. 189 *ff*.
৯। E. Blochet—Musalman Painting (translated from the French by Cicely M. Binyon). London, 1929.
১০। „ —Les Enluminures des Manuscrits Orientaux—turcs, arabes, persans—de la Bibliothèque Nationale, Paris, 1926.
১১। Martin—The Miniature Paintings and Painters of Persia, India and Turkey from the 8th to the 18th Century. 2 vols. London. 1912.



রাশিয়ার চিঠি—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ২১০নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য, কাগজের মলাট ১৸০ এবং কাপড়ে বাঁধান ২।০। প্রবাসীর অর্দ্ধেক আকারের পৃষ্ঠার ২২১ পৃষ্ঠা। কাগজ ভাল, ছাপা পরিষ্কার।

রবীন্দ্রনাথ রাশিয়ায় গিয়া যাহা দেখিয়াছেন ও জানিতে পারিয়াছেন, তাহার মধ্যে যাহা শিক্ষাসম্বন্ধীয় ও কৃষিবিষয়ক প্রধানতঃ তাহাই এই চিঠিগুলিতে লিখিয়াছেন। কিন্তু প্রসঙ্গতঃ অন্য কথাও যাহা আসিয়া পড়িয়াছে, তাহারও গুরুত্ব কম নয়। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হইতে লিখিত এই চিঠিগুলি হইতে আমাদের অনেক শিখিবার আছে, ভাবিবার বিষয়ও অনেক আছে। কবি একখানা পোষ্টকার্ড লিখিলেও তাহাতেও সাহিত্যরস থাকে। সুতরাং বলা বাহুল্য, এই চিঠিগুলি সাহিত্য হিসাবে উৎকৃষ্ট।

সমুদয় চিঠি ও পরিশিষ্ট তিনটি প্রবাসীতে বাহির হইয়াছিল। কিন্তু পুরাতন মাসিক পত্রের পাতা উল্টাইয়া কোন বহি পড়িবার সুবিধা হয় না, মাসিক পত্র সকলে বাঁধাইয়াও রাখেন না। এইজন্য পুস্তক ক্রয় করা আবশ্যক।

এই পুস্তকের ছবিগুলি প্রবাসীতে প্রকাশিত হয় নাই। সেগুলি সুমুদ্রিত। গোড়াতেই রাশিয়ায় তোলা রবীন্দ্রনাথের একটি ছবি আছে। অন্যগুলির নাম পায়োনিয়র্স কম্যুনে দু'জন পায়োনিয়র ছাত্র ও রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথের চিত্রপ্রদর্শনীতে রবীন্দ্রনাথ, মস্কৌ কৃষিভবনে রবীন্দ্রনাথ, ভক্সের প্রেসিডেণ্ট অধ্যাপক পেট্রভ ও রবীন্দ্রনাথ, সাহিত্যসভায় রবীন্দ্রনাথের অভ্যর্থনা, চিত্রপ্রদর্শনী গৃহে রবীন্দ্রনাথের আগমন, পায়োনিয়র্স কম্যুনে রবীন্দ্রনাথ, সোভিয়েট ছাত্রদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথের কবিসম্বর্দ্ধনা সভা, মস্কৌ কলাভবনে রবীন্দ্রনাথের অভ্যর্থনা, এবং পায়োনিয়র ছাত্রদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ।

মেবার মহিমা—শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্-এ। কলিকাতা, ভবানীপুর, ১৪৬ নং হরিশ মুখার্জি রোডস্থিত লেখা প্রেস হইতে শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বেরা কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। মূল্যের উল্লেখ নাই। ডবল ক্রাউন ১৬ পেজী ১৬০ পৃষ্ঠা।

গ্রন্থকার চিতোর দেখিতে গিয়াছিলেন। "সেই স্বদেশপ্রেমের মহাতীর্থে দাঁড়াইয়া" তাঁহার হৃদয় এক অপূর্ব্বভাবে উচ্ছ্বসিত হয়। তাহার প্রভাবাধীন হইয়া, টডের রাজস্থান গ্রন্থ অবলম্বন পূর্ব্বক, তিনি এই কবিতাপুস্তক লিখিয়াছেন। যাঁহারা কবিতায় মেবারের কাহিনী পড়িতে চান, তাঁহারা এই বহিখানি পড়িয়া প্রীত হইবেন।

র. চ.

মৃচ্ছকটিক—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দেবশর্ম্মা বিরচিত। প্রকাশক শ্রীঅমিয় চৌধুরী, বি-এ। ১২৭ হরিশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা।

নানাকারণে পাঠক ও লেখকগণের মধ্যে প্রতীচ্য সাহিত্যের ছায়াটা যেন আপাততঃ ঘনিষ্ঠ বলিয়া বোধ হয়। এরূপ সময়ে পুরাতন সংস্কৃত সাহিত্যের আলোটুকু সাধারণ্যে প্রকট করা বিশেষ সময়োপযোগী। এইজন্য 'কবি প্রবর রাজা শূদ্রকের পদাঙ্ক অনুসরণে শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দেবশর্ম্মা বিরচিত "মৃচ্ছকটিক" পুস্তকখানি পড়িয়া বিশেষ তৃপ্তি লাভ করিয়াছি।

সংস্কৃত মৃচ্ছকটিক রচনার কাল লইয়া বিচার অনেক হইয়াছে ও হইতেছে। ভাসের চারুদত্ত শূদ্রকের ভিত্তিস্বরূপ অথবা শূদ্রক ভাসের পূর্ব্ববর্ত্তী ইত্যাদি গবেষণা, এবং বসন্তসেনা, শকুন্তলা ও সীতার আদর্শে হিন্দু নারী ভোগ্যা বা পূজ্যা ইহার বিচারই যদি উদ্দেশ্য হইত, তাহা হইলে তাহা ভারতীয়ের এবং হিন্দুর সাহিত্য হিসাবে উপভোগ্য হইত সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহার প্রভাব কিছু সঙ্কীর্ণ হইত। এক-হিসাবে মৃচ্ছকটিকের প্রভাব শকুন্তলা ও উত্তরচরিত অপেক্ষা অনেক বেশী। ইহার কারণ মৃচ্ছকটিকের চরিত্রাবলী ও ঘটনাবিন্যাস সার্ব্বজনীন ও সার্ব্বকালীক—অনেক সময়ে মনে হয় কালিদাস ও ভবভূতির ভাবুকতার পর শূদ্রকের বস্তুগতিকতা যেন অপরিহার্য্য হইয়া উঠিয়াছিল। নিরবচ্ছিন্ন উচ্চ ভাব ও আদর্শ প্রচারের মধ্যে একটা স্থবিরতা জমিয়া উঠিতে থাকে, তখন বাস্তবের বিবৃতি অতীতের তপস্যা ছাড়িয়া ভবিষ্যতের সাধনার ইঙ্গিত করে।

মৃচ্ছকটিকের যুগস্থায়ী প্রভাবের একটি প্রমাণ ইহার বিভিন্ন যুগোপযোগী নানা সংস্করণ। খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীতে ভাসের চারুদত্ত, সপ্তম শতাব্দীতে শূদ্রকের মৃচ্ছকটিক, দশম শতাব্দীতে নীলকণ্ঠের মৃচ্ছকটিকের দশমসর্গে ধূতার সহিত বাসবদত্তার মিলন, এবং আলোচ্য গ্রন্থে সুরেন্দ্রনাথের বিংশশতাব্দীর রচনা। সপ্তম ও বিংশ শতাব্দীর সামাজিক অনুরাগ ও অনুযোগ আচার ও ব্যবহারের পার্থক্য বজায় রাখিতে দশ অঙ্ক পাঁচটি অঙ্কে পর্য্যবসিত হইয়াছে। পতিব্রতা স্ত্রীর স্কন্ধে চাপিয়া কুষ্ঠরোগীর বেশ্যাভিসারের দিন এক এবং সারদা বিবাহ-বিধির দিন অন্য সুতরাং নিজ স্ত্রী ধূতার অলঙ্কার বারস্ত্রী বসন্তসেনাকে দান প্রভৃতি মূলের কয়েকটি ভিন্নরুচি ঘটনাবিন্যাস বর্জন করিয়া আধুনিক রচয়িতা স্বচ্ছদৃষ্টির পরিচয় দিয়াছেন।

বসন্তসেনার মূল আখ্যানটি কিন্তু এক চিরন্তনকাহিনী—'নিতুই নব চিরপুরাতন'। রিক্তসর্ব্বস্ব উদারচেতা ব্রাহ্মণ চারুদত্তের প্রতি বারবণিতা বসন্তসেনার উৎসৃষ্টসর্ব্বস্ব আসক্তি এবং রাজশ্যালক সংস্থানকের অর্থবলে বসন্তসেনার বশীকরণে বৃথা চেষ্টা ও নীচ জিঘাংসা। তিনটি চরিত্রই আলেখ্যের ন্যায় পরিস্ফুট। বুঝি বা চারুদত্ত, বসন্তসেনা এবং শকার লইয়াই সংসার। আপনভোলা চারুদত্ত মুক্তহস্তে আপনাকে বিলাইয়াছেন; ধন, আশ্রয়, পরিশেষে শকারকে ক্ষমা এসবও তুচ্ছ, কিন্তু বসন্তসেনাকে আত্মদান, তাহার প্রেমস্বীকার—দারিদ্র্যের তিক্তগর্ব্বে গর্ব্বিত ব্রাহ্মণ চারুদত্তের শ্রেষ্ঠদান। আর বসন্তসেনা! প্রাচীন গ্রীসের 'হিটায়ের' অথবা অষ্টাদশ শতাব্দীর ফরাসী 'গ্রাঁদ দামের'-এর আদর্শে গঠিত বসন্তসেনার প্রতি সমসাময়িক হিন্দুসমাজের অনপনেয় সংস্কার রোহসেনের মুখে বাহির হইয়াছে—"দূর দূর, ইনি কেন আমার মা হতে যাবেন? আমার মা হ'লে, এ রকম কেন? এত অলঙ্কার কেন?" (৭৭ পৃঃ)।

একদিকে স্থিরচপলার ন্যায়, নিবাতনিষ্কম্পদীপশিখার ন্যায়, স্থির তড়াগবক্ষে প্রতিবিম্বিত বালারুণের ন্যায় উদাসীন চারুদত্তের মমত্ব-বিধুরতা, সংস্কাররাশির হিমগিরির আশ্রয়ে শ্রান্ত ও শান্ত। অপরদিকে বসন্তসেনার সাধ ও সাধনা :—

"বাজে তোমার বীণা আমার প্রাণে
কতই ঝঙ্কার কতই তানে
কতই রাগে উঠে জেগে
ভুলে যেতেও চাইনে ॥" (পৃঃ ৬৪)

এই অনির্দিষ্ট আলোড়নের কয়েকটা বুদ্‌বুদ মাত্র কবিকল্পিত হিন্দু-সমাজ-সাগরে ফুটিয়া উঠিয়াছে। তাহারা ত সাগরবক্ষে ভাসিতেছে; নিম্নে যে অগাধ ও অজ্ঞেয় সলিলরাশি বহিয়াছে, তাহা ত অনড় ও অচল। যতদিন এই উপেক্ষিতার আমূল আলোড়ন না হইবে, ততদিন কোন সংস্কারই সার্থকই হইবে না। ততদিন শকার সাকার হইয়া থাকিবে। লম্পট পণ্ডিত কাসানোভাও শূদ্রকের শকারের শিষ্যত্ব স্বীকার করিতে পারিতেন। যতদিন সমাজ তাহার বসন্তসেনাকে কেতকীকুসুম করিয়া রাখিবে, ততদিন তাহার গন্ধে ও পরাগে মধু ও বস আসিবে না, বরং উহার তলে কামের করাল ব্যাল শকার হইয়া বাস করিবে।

কালিদাস ও ভবভূতির নাটকে সমাজসংরক্ষণের চেষ্টা যথেষ্ট। সে সমাজ আবার উচ্চস্তরের, ধন, প্রভাব-প্রতিপত্তি সমস্তই শ্রেণীবিশেষের করায়ত্ত। ১৯১৪-১৮ সালের ইউরোপীয় মহাসমরের পূর্ব্বেকার (এবং অনেক বিষয়ে পরবর্ত্তী) ইউরোপীয় ও আমেরিকার প্রপাগাণ্ডা ফিল্ম্‌-এর যথারীতি 'শুভসমাপ্তি'র উদ্দেশ্য ছিল দর্শকের মনে এক মোহময় বিশ্বাসের জাল বিস্তার করা যে—"God's in His heaven, all's right with the world as long as society is what it is."সংস্কৃত নাটকের ভরতবাক্য ও ভারতের ব্রাহ্মণশাসিত সমাজের প্রশস্তিস্বরূপ—দেশের পার্থিব ও অপার্থিব নায়কদের স্তায়ঘোষণা। রাজতন্ত্র ও কুলীনতন্ত্রের আশ্রয়ে পুষ্ট সাহিত্য স্বতঃই জ্ঞাত বা অজ্ঞাতভাবে তন্ত্রান্তরের বিরোধী হইয়া উঠিয়াছিল। সে সমাজে প্রাকৃতভাষী ইতরজনের ভাব ও ভাষা, ভয় ও ভরসা, উদাসীন কৌতূহল বা অবজ্ঞার বিষয় ছিল। শূদ্রকের মৃচ্ছকটিক এ-হিসাবে প্রথম প্রাকৃত বা প্রোলেটারিয়ান্ পুস্তক। ভরতের নাট্যশাস্ত্র (১৮শ অধি.) দশরূপক (৩য় পরি.) এবং সাহিত্যদর্পণে (৬ষ্ঠ পরি.) ইহার নাম দেওয়া হইয়াছে 'প্রকরণ' এবং ইহার বৈশিষ্ট্য বর্ণনায় 'লোকসংশ্রয়' কথার ব্যবহার হইয়াছে। মার্কস্-এর "প্রোলেটারিয়ান্" শব্দের 'লোকসংশ্রয়' অপেক্ষা ভাল অনুবাদ মনে পড়ে না। তবে দুইটি শব্দের ভিতর সমগ্র ইউরোপ ও প্রায় পঞ্চদশ শতাব্দীর ব্যবধান। মৃচ্ছকটিকের মূল চরিত্রের অধিকাংশই প্রাকৃত ও প্রাকৃতভাষী; একজন প্রাকৃত গোপালকের রাজপদে অভিষেচন এবং প্রকৃতিপুঞ্জের প্রভাবঘোষণা এবং সেই প্রকৃতির অঙ্গভূতা একজন বারবনিতার ব্রাহ্মণপত্নীত্বে বরণ—প্রত্যেকটি ঘটনা প্রতিষ্ঠিত সমাজ এবং সেই সমাজের অবিচার ও গ্লানির নিরপেক্ষ বিশ্লেষণ এবং স্বপক্ষীয় প্রতিকার প্রচার। সুরেন্দ্রনাথের মৃচ্ছকটিকে সুপ্রযুক্ত গ্রাম্যভাষা প্রয়োগে, বিশেষতঃ শর্ব্বিলক ও মদনিকার কথোপকথনে এই প্রাকৃতভাবটি সুন্দররূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে (পৃঃ ৫৪-৫৬)। কয়েকটি বানানের ভুল পর্য্যন্ত (পৃঃ ১২৪ রাজকর্ম্মচারী ইত্যাদি) ছাড়িয়া দিতে দ্বিধা হয়। এইখানে একটি কথা মনে পড়ে; সাহিত্য স্বভাবতঃই *altiora petit*. শূদ্রকের প্রতিকার সম্বন্ধে অপরপক্ষের কি বক্তব্য জানিতে ইচ্ছা হয়। ভাসের 'বাসবদত্তা'র ক্রমবিকাশ শূদ্রকের 'মৃচ্ছকটি'কে; আশা করি সুরেন্দ্রনাথ একখানি মৌলিক নাটকে ইহার বিবর্ত্তন ও পরিণতি দেখাইবার চেষ্টা করিবেন।

গতবৎসর বিলাতে মৃচ্ছকটিকের অভিনয় হইয়াছিল—ইংরেজীতে। ইউরোপে প্রতিষ্ঠিত ও প্রতিষ্ঠাপ্রয়াসী, অভিজাত ও উদ্ভিজ্জ, উভয়বিধ মতেরই আন্দোলনের অবকাশ আছে। এইরূপ মতের সংঘর্ষ ও তাহার ফলের উপর সমাজের ভবিষ্যৎ নির্ভর করে। কলিকাতায় আমাদের রঙ্গমঞ্চে লোকে 'সীতা'র অভিনয় দেখিতেছে, 'মৃচ্ছকটিকে'র অভিনয় কি সম্ভব নয়? সুরেন্দ্রনাথের 'মৃচ্ছকটিক'-খানি আধুনিক রঙ্গমঞ্চের উপযোগী বলিয়া মনে হয়।

শ্রীঅনন্তপ্রসাদ শাস্ত্রী

শেলী—শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। গুপ্ত ফ্রেণ্ডস এণ্ড কোং। কলিকাতা। মূল্য দেড় টাকা।

এই পুস্তকখানার সার্থকতা বিচার করা কিছু কঠিন। ইহাকে শেলীর জীবনী বলিয়া গণ্য করিলে শেলীর প্রতি অবিচার করা হইবে। মসিয় মোরোয়ার 'আরিয়েল'-এর অনুবাদ বলিয়া ধরিলে মসিয় মোরোয়ার প্রতি অবিচার করা হইবে। সুতরাং ইহাকে নৃপেন্দ্রবাবু রচিত শেলীর জীবন সম্বন্ধে একখানি মৌলিক উপন্যাস বলিয়া গণ্য করাই বোধ করি যুক্তিসঙ্গত। তবু নৃপেন্দ্রবাবুর বইখানার সহিত মসিয় মোরোয়ার বই-এর সাদৃশ্য এত বেশী যে, এ-দুয়ের মধ্যে একটু তুলনা করিবার ইচ্ছা পাঠকমাত্রেরই মনে জাগিতে পারে। আমি একটি জায়গায় মাত্র এইরূপ একটু তুলনা করিব। সেটি শেলীর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার বর্ণনা। মসিয় মোরোয়া লিখিয়াছেন,—

"Le temps était admirable. Sous la lumière cruc le sable jaune vif et la mer violette formaient l plus beau des contrastes. Au-dessus des arbres, le blancs sommets des Apennins dessinaient un d ces fonds à la fois nuageux et marmoréens qu Shelley avait tant admirés.

"Beaucoup d'enfants du village étaient venu voir ce spectacle rare, mais un silence respectueu fut observé. Byron lui-même était pensif et abattu "Ah! volonté de fer, pensait il, voilà donc ce qu reste de tant de courage…Tu as défié Jupiter Prométhée…Et te voici…"

নৃপেন্দ্রবাবু লিখিতেছেন—

"স্বচ্ছ আকাশ হইতে সুন্দর আলো আসিয়া সমুদ্রের কালো আবরণকে স্বচ্ছ নীল করিয়া তুলিল। তীরের বালুগুলি হীরকচূর্ণের মত জ্বলিতে লাগিল। তীরে তীরে শান্ত সমুদ্র মৃদু মর্ম্মরধ্বনি তুলিতেছিল। দূরে পাইন-বনের পারে পাহাড়ের চূড়ায় বরফ গলিয়া পড়িতেছিল। পাইন বন শান্ত, নিস্তব্ধ, মধুর।

"শেলীর দেহাবশেষের দিকে চাহিয়া বায়রণের বুক ভাঙিয়া যাইতেছিল। বায়রণের সমস্ত অন্তর মথিত করিয়া দীর্ঘশ্বাস বাহির হইয়া আসিল, "হায়, প্রমিথিয়ুস্!"

মসিয় মরোয়ার সহিত তুলনা করিয়া বা বর্ণনায় ভুল ধরিয়া নৃপেনবাবুর প্রতিও আমি অবিচার করিতে চাই না

কিন্তু শুধু আর্টের দিক হইতে দেখিলেও এ দুইটি বর্ণনার মধ্যে যে তফাৎ তাহা খাঁটি ও মেকীর তফাৎ, 'আরিয়েল' পড়িবার পর নৃপেনবাবুর শেলী পড়িয়া পাঠকমাত্রেরই মনে কি এ-কথাটা জাগিবে না ?

পুস্তকখানার বিষয়বস্তুর সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া মলাটটিও অনুকরণেই পরিকল্পিত হইয়াছে। কিন্তু তাহাতেও মূলের সেই 'ফিনিশ' নাই।

শ্রীনীরদচন্দ্র চৌধুরী

হারামণি—মৌলবী মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন, এম-এ কর্তৃক সংগৃহীত ও সম্পাদিত। প্রাপ্তিস্থান—প্রবাসী কার্য্যালয়, ১২০।২ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা। মূল্য পাঁচ সিকা।

কালের প্রচণ্ড প্রবাহে মানব-সভ্যতার বহু মণিরত্নই বিলুপ্ত হইয়াছে—হয়ত ইহাতে মানবের কল্যাণই হইয়াছে, যুগ যুগ সঞ্চিত মণিরত্নের চাপে মানুষের হয়ত নিঃশ্বাস ফেলিবার অবকাশ থাকিত না। যে রত্ন কালের করালগ্রাসে লুপ্ত হইয়াছে, যাহা অতীতের অর্জ্জন এবং অতীতের গর্ভেই বিনষ্ট, তাহার খোঁজে মানুষের মহামূল্য বর্ত্তমান ব্যয়িত করা সমীচীন কি না তাহাতে সংশয় আছে। মানব-সভ্যতার প্রাচীন ইতিহাস রচনায়, হয়ত ইহার সার্থকতা আছে কিন্তু নিছক্ পুরাতন মণিরত্নের খোঁজেই এই কার্য্য অনেকটা রবীন্দ্রনাথের 'পরশমণি'র ক্ষ্যাপার পরশপাথর খোঁজার মতই। যুগে যুগে প্রয়োজন মত মানুষের ভাণ্ডারে কতকগুলি বস্তু মণিরত্নের কোঠায় স্থান পায়, কাজ ফুরাইয়া গেলেই কাচখণ্ডের মতই সেগুলি মূল্যহীন হইয়া পড়ে।

মৌলবী মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন সাহেব যে 'হারামণি'গুলি প্রভূত অনুসন্ধান এবং কায়িক ও মানসিক পরিশ্রমের দ্বারা খুঁজিয়া বাহির করিয়াছেন, সেগুলি নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিলাম। এই মণিগুলি হারাইয়া গেলেও ইহাদের মূল্য হ্রাস হয় নাই অর্থাৎ মানবের যে প্রয়োজন সাধনে ইহারা মণিরত্নের কোঠায় স্থান পাইয়াছিল সে প্রয়োজন আজিও তাহার আছে। প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও এগুলি লুপ্ত হইয়াছে কেন, এই প্রশ্ন মনে জাগা স্বাভাবিক। ইহার উত্তর এই যে, তথাকথিত ইংরেজী শিক্ষিত পাশ্চাত্য ভাবাপন্ন ব্যক্তিদের নিকটই এগুলি হারামণি ; দেশের বিপুল জনসাধারণের মনে প্রাণে মুখে এখনও এই মণিগুলি জাজ্বল্যমান হইয়া আছে ; সুখের দিনে এইগুলিই তাহাদের আত্মজ্ঞান অক্ষুণ্ণ রাখে, দুঃখের দিনে এই-গুলিই তাহাদের প্রাণে বল দেয়। সুতরাং 'হারামণি' নামটি আমাদের দেশে নিজেদের যাঁহারা শিক্ষিত বলেন তাঁহাদের তরফ হইতেই সার্থক।

এই 'হারামণি' অনুসন্ধানের কাজে যে গভীর অন্তর্দৃষ্টি ও রসবোধ থাকা প্রয়োজন মৌলবী মনসুরউদ্দীন সাহেবের তাহা আছে, এই কারণেই তাঁহার এই 'হারামণি' সংগ্রহ রসের দিক দিয়া নিখুঁত হইয়াছে। কোথায়ও এই সংগ্রহের সমগ্রতার হানি হয় নাই। রবীন্দ্রনাথের কথায়, এগুলিতে "যেমন জ্ঞানের তত্ত্ব তেমনি কাব্য-রচনা, তেমনি ভক্তির রস মিশেচে। লোক-সাহিত্যে এমন অপূর্ব্বতা আর কোথাও পাওয়া যায় বলে বিশ্বাস করিনে।"

এই প্রাচীন গানগুলির বর্ত্তমান প্রয়োজন সম্পর্কে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ এই পুস্তকে যাহা বলিয়াছেন তাহাই এ বিষয়ে শেষ কথা।

সৃষ্টির আদিকাল হইতে দেখা যায় রসপিপাসু মানব-মন শুধু তত্ত্বকথা নিছক তত্ত্বের আকারে কখনও গ্রহণ করে নাই, গাথা, কাহিনী বা সঙ্গীতের সাহায্যে সে সেগুলি আত্মসাৎ করিয়াছে। 'হারামণি'র গানগুলি আমাদের অতিপরিচিত নশ্বর দেহ অথবা দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় ব্যবহৃত নিত্যপ্রয়োজনীয় তৈজসপত্রের উপমায় পরিপূর্ণ ; বাড়ীর পাশের কামারশাল, খেয়াঘাটের নৌকা, রেলগাড়ী, হাসপাতাল প্রভৃতিও অনেকগুলি গানে কাঠামো স্বরূপ ব্যবহার করা হইয়াছে। এইগুলির সাহায্যে আসল তত্ত্বকথা আত্মসাৎ করিতে মানুষের বাধে না। অবশ্য ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, অনেক ক্ষেত্রে উপমাগুলি মাত্রা ছাড়াইয়া গিয়াছে। যথারীতি গানের সাহায্যে এই 'হারামণি' যাহাতে পুনরায় প্রবর্ত্তিত হয় তাহার চেষ্টা আবশ্যক। অশিক্ষিত জনসাধারণের মনের প্রসারের জন্য ইহা ছাড়া পথ নাই।

ভূমিকায় মৌলবী মনসুরউদ্দীন সাহেব এই সকল গানের শ্রেণী-বিভাগ করিয়া দিয়াছেন। দেহতত্ত্ব বা শব্দগান, মারফোতগান, ধুয়া, বারোমাসী, জারী, শারী, ভাসান, বিয়া, কবিগান, গাজীর গান, ঘাটুগান প্রভৃতি সম্বন্ধে ইহা হইতে একটা সুস্পষ্ট ধারণা জন্মে।

শুধু তত্ত্বের দিক দিয়া নহে, কয়েকটি গান কাব্যসম্পদেও অতুলনীয়। মুর্শিদাবাদ জেলার মেয়েলী গানের মধ্যে যে অপরূপ মাধুর্য্য, 'হারামণি'তে উদ্ধৃত 'দ্বিতীয় গানখানি না দেখিলে তাহা কি বিশ্বাস করিতাম! ভাই ভগিনীকে সম্ভবতঃ তাহার শ্বশুরবাড়ী লইয়া যাইতেছে, তাহার জন্য ডোলা আসিয়াছে ; কি কি কারণে সে যাইবে না, গানটি তাহারই একটি ফিরিস্তি মাত্র। কিন্তু এই ফিরিস্তিও কি মনোহর কাব্য হইয়া উঠিয়াছে! এরূপ আরও অনেক অপূর্ব্ব রত্ন এই বইখানিতে মৌলবী সাহেব পরিবেশন করিয়াছেন। আমরা জানি এই কার্য্যের, এই পরিশ্রমের যে মূল্য তাহা সমালোচকের প্রশংসাবাণীর মধ্যে নাই ; তিনি যে আবেগের বশবর্ত্তী হইয়া এই সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইয়া-ছিলেন সেই আবেগই তাঁহার পুরস্কার তাঁহাকে আনিয়া দিয়াছে। বাংলাভাষাভাষিগণের তরফ হইতে আমরা তাঁহাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

শ্রীসজনীকান্ত দাস

শ্রীশ্রীযোগব্রহ্মবিদ্যা—(উপনিষদ্) তত্ত্বদ্রষ্টা শ্রীমন্মহর্ষি যোগানন্দ হংস, বি-এ, বি-এল্ ও বেদান্ততীর্থ যত্নে পরিকীর্ত্তিত।

ইহা এক বিপুল গ্রন্থ, বিংশ খণ্ডে প্রকাশিত এবং নানা প্রেসে মুদ্রিত। খণ্ডের প্রকাশকও ভিন্ন ভিন্ন। গ্রন্থে এত বিষয়ের অবতারণা আছে, যাহাতে গ্রন্থকারের ধারণা-শক্তির প্রশংসা না করিয়া পারা যায় না। এত বড় গ্রন্থে, বহুবিষয়ের অবতারণা আছে, সুতরাং সকলে গ্রন্থ-কারের সঙ্গে এক মত হইবেন ইহা আশা করা যায় না। তবে আমরা সাধারণভাবে এই কথা বলিতে সমর্থ যে, তিনি সব সময়ে প্রচলিত মতামতের শৃঙ্খল হইতে মুক্ত হইতে না পারিলেও বিষয়সমূহের বিচারে নিরপেক্ষ হইতে চেষ্টা করিয়াছেন। গ্রন্থের যাহা প্রধান দোষ আমাদের মনে হয় তাহা এই, গ্রন্থকার কোন বিষয়ের আলোচনা একস্থানে ধারাবাহিকরূপে না করিয়া নানা খণ্ডে অল্প অল্প করিয়া

বিচার করিয়াছেন। ইহাতে পাঠকের পাঠের পক্ষেও যেমন ব্যাঘাত হয়, তেমনই পুনরাবৃত্তিদোষও ঘটে। পাঠকের সুবিধার জন্য শ্রীযুক্ত মাধবগোবিন্দ রায়, বি-এ, বি-এল্, এডভোকেট্ হাইকোর্ট, শ্রীযুক্ত মনোমোহন চৌধুরী বি-এ বি-এল্ প্রভৃতি প্রকাশকগণ নিবেদন করিয়াছেন—"যোগ-ব্রহ্মবিদ্যার কোন একটিমাত্র পরিচ্ছেদ পাঠ করিলেই সেই পরিচ্ছেদোক্ত বিষয়ের সম্পূর্ণ জ্ঞানলাভ হইবে না। এজন্য এই গ্রন্থের বিংশতি সর্গের অন্তর্গত নির্ঘণ্টপত্রের নির্দ্দেশিত (নির্দ্দেশ?) মত কথিত বিষয় সম্বন্ধীয় অপরাপর পরিচ্ছেদ-সমূহও পাঠ করা সঙ্গত হইবে।" মুখ্যতঃ ব্রহ্মতত্ত্ব, জগৎ-তত্ত্ব ও জীবতত্ত্ব লইয়াই গ্রন্থের বিচার, সুতরাং নামনির্ব্বাচনে গ্রন্থকার বিষয়বুদ্ধির পরিচয় দেন নাই। বিষয়বুদ্ধিসম্পন্ন প্রকাশকগণ উপদেশ দিতে পারিতেন। গ্রন্থের নাম ও গ্রন্থকর্ত্তার নাম উভয়ই গ্রন্থপ্রচারের ব্যাঘাত উৎপন্ন করিবে। আমি পাঠকমণ্ডলীকে এই ত্রুটি পরিহার করিয়া গ্রন্থখানি পাঠ করিতে অনুরোধ করি আনন্দ ও উপকার দুই-ই লাভ হইবে।

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ বেদান্তবাগীশ

রূপতৃষ্ণা—সামাজিক উপন্যাস। প্রণেতা ও প্রকাশক শ্রীক্ষিতিনাথ দাস। প্রাপ্তিস্থান গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্, কলিকাতা। ৩২৮ পৃষ্ঠা, দাম দুই টাকা।

গ্রন্থকার ভূমিকায় জানাইয়াছেন যে, "দেশবাসী সাধারণের, বিশেষতঃ স্কুলকলেজের ছাত্র ও ছাত্রীগণের নৈতিক চরিত্রগঠনই এ গ্রন্থের মুখ্য লক্ষ্য।"

গ্রন্থের নামেই বর্ণিত বিষয়ের পরিচয় পাওয়া যায়। রূপতৃষ্ণায় অন্ধ হইলে মানুষের কতদূর অধঃপতন হইতে পারে গ্রন্থকার তাহাই দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার চেষ্টা সফল হইয়াছে। গ্রন্থবর্ণিত চরিত্রগুলি সজীব, তাহাদের ক্রমপরিণতিও স্বাভাবিক হইয়াছে।

গ্রন্থের ভাষা মার্জ্জিত। প্রাকৃতিক ঘটনার বর্ণনায় গ্রন্থকার যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। গ্রন্থে নাটকীয় উপাদান প্রচুর পাওয়া যায়। ছাপা ও বাঁধাই বেশ ভাল।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ মৈত্র

হাসিমুখ—শ্রীঅক্রুরচন্দ্র ধর প্রণীত। দি ঢাকা লাইব্রেরী, ঢাকা। মূল্য ছয় আনা।

ইহা ছোট ছেলেমেয়েদের জন্য লেখা কবিতার বই। কবিতাগুলি পাঠ করিয়া তাহারা আনন্দ পাইবে।

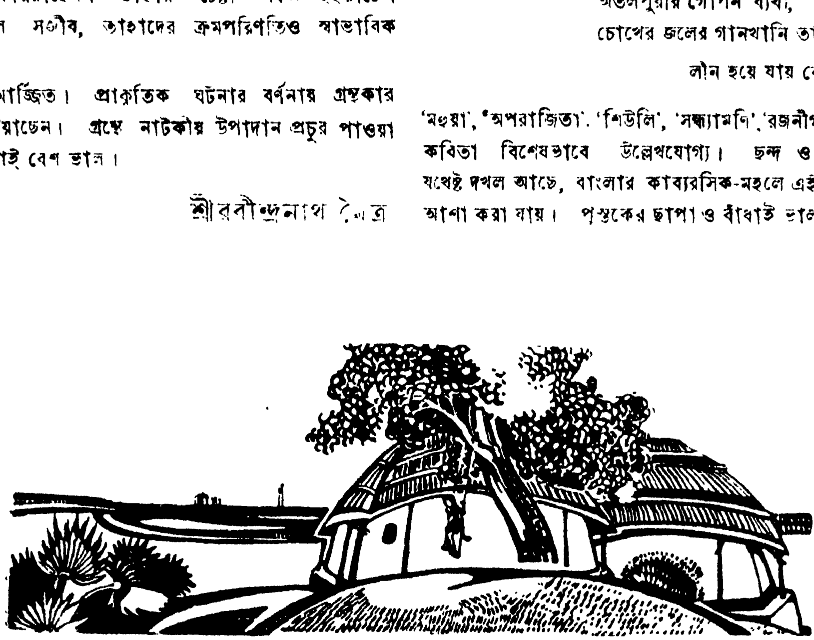
ব্যথার পরাগ—কবিতার বই, শ্রীকৃষ্ণধন দে প্রণীত। প্রবাসী কার্য্যালয়, ১২০।২ আপার সার্কুলার রোড হইতে শ্রীঅশোক চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত, মূল্য দেড় টাকা।

বাংলার আধুনিক কাব্যসাহিত্য লইয়া যাঁহারা আলোচনা করেন কবি কৃষ্ণধন দে তাঁহাদের অপরিচিত নহেন। বিভিন্ন সাময়িক পত্রিকায় তাঁহার কতকগুলি উৎকৃষ্ট কবিতা পাঠ করিয়া তাঁহার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমরা আশান্বিত হইয়াছিলাম। 'ব্যথার পরাগ' তাঁহারই প্রথম প্রকাশিত কবিতা গ্রন্থ হইলেও বাংলাদেশের কবিসমাজে কৃষ্ণধনবাবুকে প্রতিষ্ঠা দান করিবে।

এই গ্রন্থে পঁয়ত্রিশটি পরিচিত ফুলের অন্তর্নিহিত বেদনার কথা কবি বিভিন্ন সুললিত ছন্দে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। আমাদের কাব্যসাহিত্যে ফুল ও কবিতার সম্পর্ক খুব গাঢ় হইলেও কবিরা প্রায় সকলেই ফুলকে মানবসমাজ হইতে বিচ্ছিন্নভাবেই দেখিয়াছেন। মানুষের সমগ্র অনুভূতি দিয়া পুষ্পপুরীর গোপন ব্যথার সন্ধান এমনভাবে আর কেহ করেন নাই। বঙ্গ সাহিত্যে এই কবিতাগুলি একদিক দিয়া সম্পূর্ণ নূতন। এই গ্রন্থের 'উন্মীলনীতে' কবি বলিতেছেন—

"তৃষার ব্যথায় আকুল যে ফুল
নিদ্‌পুরীতে একলা ঘুমায়,
তুমি কি তার মুছিয়ে আঁখি
জাগিয়ে দেবে চুমায় চুমায়?
শুনবে কি তার সকল কথা
অতলপুরীর গোপন ব্যথা,
চোখের জলের গানখানি তার
লীন হয়ে যায় কোন্ নীলিমায়?"

'মহুয়া', 'অপরাজিতা', 'শিউলি', 'সন্ধ্যামণি', 'রজনীগন্ধা', 'কামিনী' প্রভৃতি কবিতা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ছন্দ ও ভাষার উপর কবির যথেষ্ট দখল আছে, বাংলার কাব্যরসিক-মহলে এই গ্রন্থের আদর হইবে আশা করা যায়। পুস্তকের ছাপা ও বাঁধাই ভাল।





দেশ-বিদেশের কথা

বিদেশ

ইউরোপের অর্থসঙ্কট এবং মার্কিন রাষ্ট্রপতির সাধু প্রস্তাব—

ইউরোপের অর্থসঙ্কটের মূল কারণ তিনটি—(১) বিগত মহাসমর, (২) ভের্সাই সন্ধি এবং (৩) যুদ্ধসরঞ্জাম নির্ম্মাণে প্রত্যেক রাষ্ট্রের অত্যধিক তৎপরতা। বিগত মহাসমরে জিত-বিজেতা সকল জাতিই ধনে-প্রাণে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল। ক্ষতিপূরণের জন্য যুদ্ধাবসানে যে সন্ধি হয় তাহার ফলে ইউরোপের আর্থিক ও রাষ্ট্রিক সমস্যা আরও জটিল হইয়া পড়িয়াছে। জার্ম্মানী যুদ্ধের ক্ষতিপূরণস্বরূপ প্রতি বৎসর বিজেতা রাষ্ট্রসমূহকে কোটি কোটি টাকা দিতে বাধ্য। জার্ম্মানীর উপনিবেশগুলি নির্ম্মমভাবে ছাঁটিয়া দেওয়া হইয়াছে। তাহার ব্যবসাবাণিজ্যের দ্বারও প্রায় সর্ব্বত্র রুদ্ধ। পূর্ব্ব ও মধ্য ইউরোপের রাষ্ট্রগুলি ভাঙিয়া-চুরিয়া এমন কতকগুলি রাজ্যের সৃষ্টি করা হইয়াছে যাহারা জাতি ভাষা, কৃষ্টিতে বিভিন্ন, যাহাদের স্বার্থ বিভিন্ন, সুতরাং যাহাদের মধ্যে দ্বন্দ্ব চিরকাল লাগিয়াই থাকিবে। এই রাষ্ট্রগুলি স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিবার জন্য নানা উপায় অবলম্বন করিয়াছে। কতকগুলি কৃত্রিম বাধা সৃষ্টি করিয়া পরস্পরের মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্যের মূলেও কুঠারাঘাত করিতেছে। ফলে, ইউরোপখণ্ডের অন্তর্বাণিজ্য ও বহির্বাণিজ্য আজ মাটি হইতে বসিয়াছে। ইউরোপের রাষ্ট্রগুলির এই দুর্দ্দিনে দুর্ম্মতিও উপস্থিত হইয়াছে ভীষণ। পরস্পরের মধ্যে রেষারেষি, অবিশ্বাস ও স্বার্থান্বেষণের দরুন আত্মরক্ষার অছিলায় প্রত্যেক রাষ্ট্র যুদ্ধ-সরঞ্জাম অতিদ্রুত বাড়াইয়া চলিয়াছে। প্রতি বৎসর স্থল ও নৌ-সেনা পোষণে, বিভিন্ন শ্রেণীর যুদ্ধ জাহাজ ও এরোপ্লেন নির্ম্মাণে ও রক্ষণে কোটি কোটি টাকা ব্যয় হইয়া থাকে। এই জাহাজগুলি আবার দশ পনর বিশ বৎসর অন্তর একেবারে অকেজো হইয়া যায়। ইহার ফলে, জগতের অর্থ অনর্থক শোষিত হইয়া অকাজে নষ্ট হইয়া যাইতেছে, প্রত্যেক রাষ্ট্র ঋণজালে আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে, বেকার সমস্যা মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে। আজ বিশ্বব্যাপী হাহাকার।

ইউরোপের এই নিদারুণ অবস্থার প্রতিকারকল্পে নৌ-সম্মেলন, নিরস্ত্রীকরণ-সম্মেলন, কেলগপ্যাক্ট (উদ্দেশ্য যুদ্ধ রহিত করা) অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, মসিয় ব্রিয়াঁ প্রমুখ চিন্তাবীরগণ ইউরোপে একটি যুক্তরাষ্ট্র স্থাপনেরও মানস করিয়াছিলেন, কিন্তু বস্তুতঃ তাহাতে ইউরোপের অর্থসঙ্কট আদৌ ঘুচে নাই। অর্থসঙ্কট ইউরোপের সর্ব্বত্র দেখা দিলেও জার্ম্মানীতেই উহা ভীষণ আকার ধারণ করিয়াছে। এই বৎসরে জার্ম্মান সরকারের বজেটে ঘাটতি হইয়াছে দশ কোটি পাউণ্ড। ইহার উপরে, ইয়ং প্ল্যান অনুসারে বিজেতা জাতিবৃন্দকে যুদ্ধের ক্ষতিপূরণের বার্ষিক কিস্তি বাবদ দশ কোটি পাউণ্ড করিয়া দিবার বরাদ্দ আছে। ইয়ং প্ল্যান অনুসারে যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ বাবদ জার্ম্মানীকে প্রথম সাইত্রিশ বৎসরে দশ কোটি পাউণ্ড এবং পরবর্ত্তী একুশ বৎসরে আট কোটি পাউণ্ড করিয়া বার্ষিক কিস্তি বিজেতাদের দিবার কথা। সমূহ বিপদ হইতে আত্মরক্ষার জন্য জার্ম্মানী নানা উপায় খুঁজিতেছে। জার্ম্মানী-অষ্ট্রিয়ার বাণিজ্যিক সন্ধি এইরূপ একটি প্রচেষ্টা। কিন্তু কয়েকটি বিজেতা রাষ্ট্রের প্রবল প্রতিবাদ ও বিরোধিতায় এইরূপ সন্ধি একেবারে ব্যাহত না হইলেও আপাততঃ দুঃসাধ্য হইয়াছে। জার্ম্মানীর রাজস্ব ও পররাষ্ট্র সচিবের সম্প্রতি বিলাত-গমন, ইংরেজ মন্ত্রীমণ্ডলের সঙ্গে সাক্ষাৎ এবং যুদ্ধক্ষতিপূরণ সমস্যা সম্বন্ধে আলাপ-আলোচনাও জার্ম্মানীর ভীষণ আর্থিক দৈন্যের প্রমাণ। সমগ্র ইউরোপের এবং বিশেষ করিয়া জার্ম্মানীর যখন এই অবস্থা, তখন এরূপ কোন চরম পন্থা অবলম্বন করা দরকার যাহাতে জিত-বিজেতা সকল রাষ্ট্রের সুবিধা হইতে পারে, এবং এরূপ নীতি অবলম্বন করা উত্তমর্ণ মার্কিনের পক্ষেই সম্ভব। তাই যখন রাষ্ট্র-পতি হুভার ঘোষণা করিলেন যে, মার্কিন যুক্ত-রাষ্ট্র ঋণী-জাতিবৃন্দের নিকট হইতে এ বৎসর আর টাকা লইবেন না, তখন সকলেই যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল। ইংলণ্ড এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত উপনিবেশগুলি ও ভারতবর্ষ, জার্ম্মানী, ইতালী, অষ্ট্রিয়া, বুলগেরিয়া আমেরিকাকে ধন্য ধন্য করিতে লাগিল। রাষ্ট্রপতি হুভার এই প্রস্তাব করিতে গিয়া বলিয়াছেন, "The American people will be wise creditors in their own interest and good neighbours"—অর্থাৎ মার্কিন জাতি বৎসরেক কাল ঋণ আদায় স্থগিদ রাখিয়া বুদ্ধিমান উত্তমর্ণ বলিয়াই পরিচিত হইবে। কারণ, এই পন্থা অবলম্বন করিলে টাকা আদায় তাহার পক্ষে সহজসাধ্য হইবে। উপরন্তু, এইরূপে অপরাপর জাতির প্রতি তাহার সৌভ্রাত্রধর্ম্মও বিলক্ষণ প্রকটিত হইবে। হুভার তাঁহার প্রস্তাবের একটিমাত্র সর্ত্ত রাখিয়াছেন,—মার্কিন জাতির ন্যায় অন্যান্য জাতিকেও পরস্পরের ঋণ, এবং বিগত মহাসমরের ক্ষতিপূরণ বাবদ পাওনা বাৎসরিক কিস্তি আদায় স্থগিত রাখিতে হইবে। এই প্রস্তাব মানিয়া লইলে ফ্রান্সের সমূহ ক্ষতি হয়। কারণ, ফ্রান্সকে প্রতিবৎসর ঋণ পরিশোধ করিতে হয় দুই কোটি পাউণ্ড, কিন্তু জার্ম্মানীর নিকট হইতে যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ বাবদ তাহার বাৎসরিক প্রাপ্য চারি কোটি পাউণ্ড। এই বিষমতা দূরীকরণের জন্য মার্কিন পররাষ্ট্র সচিব এবং ফরাসী মন্ত্রীমণ্ডলের মধ্যে পরামর্শ হইয়া গিয়াছে। ফ্রান্সও অন্যান্য জাতির ন্যায় যুক্তরাষ্ট্র-পতির প্রস্তাবের মূলনীতি মানিয়া লইয়াছে। তবে ফ্রান্সের যে দুই কোটি পাউণ্ড এ বৎসর ক্ষতি হইবে তাহা পূরণ করিবার জন্য আন্তর্জ্জাতিক ব্যাঙ্ককে টাকা ধার দিতে অনুরোধ করা হইয়াছে। ইহাও ধার্য্য হইয়াছে যে, আন্তর্জ্জাতিক ব্যাঙ্ক দশ কিস্তিতে এই টাকা জার্ম্মানীর নিকট হইতে আদায় করিবে এবং জার্ম্মানীকে রেলপথগুলি ব্যাঙ্কের কাছে পণ রাখিতে

হইবে। এরূপ ব্যবস্থা কার্য্যে পরিণত হইতে হইলে ইয়ংপ্ল্যানে স্বাক্ষরকারী জাতিবৃন্দের মতামত প্রয়োজন, এইজন্য তাহাদের একটি সভা বিলাতে আহূত হইয়াছে। আশা করা যায়, ঋণ ও ক্ষতিপূরণ আদায় সম্পর্কিত খুঁটিনাটি বিষয়গুলির শীঘ্রই সুমীমাংসা হইয়া যাইবে এবং রাষ্ট্রপতি হুভারের সাধু প্রস্তাব অন্ততঃ এক বৎসরের জন্য প্রত্যেকের আর্থিক দুশ্চিন্তা দূর করিবার পথে সহায় হইবে। আর্থিক রাষ্ট্রিক নানা সমস্যার সুমীমাংসা হইয়া জগতে শান্তি পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সূচনা বলিয়াও কেহ কেহ এই প্রস্তাবকে অভিনন্দিত করিয়াছেন। কারণ, তাঁহাদের মতে ক্ষতিপূরণের দায় হইতে জার্ম্মানীকে মুক্তি না দিলে এবং ঋণী জাতিসমূহকেও ঋণমুক্ত না করিলে জগতের শান্তি ফিরিয়া আসিবার কোনই সম্ভাবনা নাই।

বাংলা

রবীন্দ্র জয়ন্তী—

গত ২রা জ্যৈষ্ঠ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের সপ্ততিতম জন্মোৎসব অনুষ্ঠান কল্পে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের সভাপতিত্বে কলিকাতায় যে প্রারম্ভিক সভার অধিবেশন হয়, তাহাতে অন্যান্য কার্য্যের মধ্যে প্রস্তাবিত সংবর্দ্ধনা ও তাহার আনুষঙ্গিক উৎসবাদির আয়োজন ও অনুষ্ঠানের জন্য একটি কমিটি গঠিত হয়। স্যর জগদীশচন্দ্র বসু এই কমিটির সভাপতি, মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, শ্রীযুক্তা কামিনী রায়, স্যর প্রফুল্লচন্দ্র রায়, শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত বিধানচন্দ্র রায়, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, স্যর চন্দ্রশেখর ভেঙ্কট রামন্, স্যর রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, রেভারেণ্ড ডক্টর ডবলু এস্ আরকুহার্ট, স্যর নীলরতন সরকার, শ্রীযুক্ত ঘনশ্যামদাস বিড়লা, স্যর দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী, শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু, লেফটেনাণ্ট কর্ণেল হাসান সুরাবর্দ্দী, স্যর চারুচন্দ্র ঘোষ, স্যর নৃপেন্দ্রনাথ সরকার, শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সেন-গুপ্ত, শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় ও মহারাজা শ্রীশচন্দ্র নন্দী সহকারী সভাপতি, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত কোষাধ্যক্ষ, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু সম্পাদক, এবং শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত অমলচন্দ্র হোম যুগ্ম সহযোগী সম্পাদক মনোনীত হন। এতদ্ভিন্ন ইউরোপীয় এবং ভারতবর্ষের নানা প্রদেশের ও ধর্ম্মের অনেক ভদ্রমহিলা ও ভদ্রলোক সদস্য মনোনীত হন। সংবর্দ্ধনা ও আনুষঙ্গিক উৎসবাদি আগামী অগ্রহায়ণ মাসের শেষার্দ্ধে কিংবা পৌষের প্রথমার্দ্ধে হইবে। ঠিক পরে বিজ্ঞাপিত হইবে।

দানশীলা স্বর্গীয়া হরিমতি দত্ত—

বিগত ১৩ই জ্যৈষ্ঠ বাংলা দেশের একটি মহীয়সী নারী মহাপ্রয়াণ করিয়াছেন। ইনি ডাঃ বীরেশ্বর মিত্রের ভগিনী ও ৺পরাণচাঁদ দত্তের বিধবা পত্নী দানশীলা শ্রীযুক্তা হরিমতি দত্ত। মানবজাতির অসংখ্য বেদনা তাঁহাকে পীড়া দিত, তাই মানুষের যে দুঃখ যখন তাঁহার প্রাণকে স্পর্শ করিত তাহাই মোচন করিতে তিনি মুক্তহস্তে দান করিতেন। তিনি হিন্দু গৃহের সন্তানহীনা বিধবা; তাই বৈধব্যের বেদনা ও সংগ্রাম তাঁহাকে বিশেষ করিয়া বিচলিত করিয়াছিল। তিনি নারীশিক্ষা সমিতির বাণীভবন বিধবাশ্রম স্থাপনের জন্য ১০,০০০৲ টাকা দান করিয়াছিলেন, পরে এই আশ্রমের গৃহ নির্ম্মাণের জন্য আরও ২৫,০০০৲ টাকা দান করিয়াছিলেন। তিনি কারমাইকেল মেডিক্যাল কলেজের ধাত্রীমঙ্গল ওয়ার্ডে ১০,০০০৲, রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম হাসপাতালে ৫,০০০৲, উত্তরবঙ্গ বন্যায় ১,০০০৲ ও চিত্তরঞ্জন সেবাসদনে ৫০০৲ দান করেন। ইহা ছাড়া বহু দরিদ্র ও অসহায় ছাত্রের সকল অভাব ইনি মোচন করিতেন।



স্বর্গীয়া হরিমতি দত্ত

আমরা ইঁহাকে ব্যক্তিগত ভাবে জানিতাম। বয়সে আমাদের মাতৃস্থানীয়া ও নানাগুণে অলঙ্কৃতা হইলেও ইনি আমাদের সঙ্গে যেরূপ ভদ্রতা ও বিনয়ের সহিত ব্যবহার করিতেন, দেখিয়া বিস্মিত হইতাম। পুরাকালীন হিন্দু বিধবার মত ত্যাগে, নিষ্ঠায়, বৈরাগ্যে, পবিত্রতায়, ব্রহ্মচর্য্যে ও দীনতায় তিনি বিশ্বাস করিতেন এবং নিজ জীবনে সাধ্যমত তাহা পালন করিয়া গিয়াছেন।

কিন্তু পুরাতন পন্থী হইলেও পুরাতনের যাহা ভুল বলিয়া বুঝিতেন তাহাকে ত্যাগ করিতে তাঁহার বিন্দুমাত্র দ্বিধা হইত না। স্বামী তাঁহাকে পোষ্যপুত্র গ্রহণের অনুমতি দিয়া গিয়াছিলেন, কিন্তু পোষ্যপুত্র গ্রহণের চেয়ে মানব-সেবায় অর্থকে সার্থক করিলে স্বামীর কল্যাণ অধিক হইবে বলিয়া তিনি দানের পন্থাই গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহা ছাড়া শ্বশুরকুলের অন্যান্য উত্তরাধিকারীকে বঞ্চিত করিয়া বাহিরের একজনকে সে স্থানে প্রতিষ্ঠিত করিতেও তিনি চাহিতেন না।

মেয়েদের সমবায় ভাণ্ডার, দোকান পাট প্রভৃতি ছোটখাট স্বাধীন ব্যবসায় ইত্যাদির প্রতিও ইঁহার টান ছিল। এই সব বিষয়ে ইঁহার সহিত অনেক কথা হইয়াছে। কলিকাতার দক্ষিণ অঞ্চলে এইরূপ একটি ব্যবসায়ের পৃষ্ঠপোষকতা করিবার ইচ্ছা তিনি আমাদের নিকট প্রকাশ করিয়াছিলেন।

ইঁহার মত উন্নতমনা নারীর তিরোভাবে দেশের যে ক্ষতি হইল তাহা পূর্ণ হওয়া শক্ত। মৃত্যুকালে ইঁহার বয়স ৬১ বৎসর হইয়াছিল। গত ২০শে জুন রামমোহন লাইব্রেরী হলে শ্রীযুক্তা অনুরূপা দেবীর নেতৃত্বে ইঁহার স্মৃতির উদ্দেশে একটি বিরাট সভা হয়।

স্মৃতিসভায় শ্রীযুক্ত কিরণ চন্দ্র দত্ত বলেন যে, শ্রীযুক্তা হরিমতির স্মৃতিকে সম্মান প্রদর্শন করিবার একমাত্র উপায় তাঁহার আরব্ধ কার্য্যকে সম্পূর্ণ করা—তাঁহার কার্য্য সম্পূর্ণ হইলে বাণীভবন সংশ্লিষ্ট ৺ পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নামই উজ্জ্বলতর হইবে।

আমরাও মনে করি দেশের লোকের এই দানশীলা মহিলার দান সার্থক করিবার জন্য এই বিধবাশ্রমটিকে সকল দিক্ দিয়া একটি সুপ্রতিষ্ঠিত মঙ্গলকর প্রতিষ্ঠান করিয়া তোলা উচিত। ইহাকে নূতন নূতন দিকে বিস্তৃতি দিয়াও বর্ত্তমান অবস্থাকে আদর্শের আরও নিকটতর করিয়া তুলিয়া আমাদের দেশের গৌরব বৃদ্ধি করার প্রয়োজন আছে।

শ

দেবানন্দপুরের যুবকগণের সাধু প্রচেষ্টা—

ম্যালেরিয়ার প্রকোপে কত জনাকীর্ণ গ্রাম উজাড় হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। ম্যালেরিয়া নিবারণী সমবায় সমিতির চেষ্টায় ম্যালেরিয়া-পীড়িত স্থানসমূহে বহু সমিতি স্থাপিত হইয়াছে। এই সমিতিগুলি পচা ডোবা বুজাইয়া, নূতন পুষ্করিণী খনন করাইয়া, বনজঙ্গল পরিষ্কার করাইয়া ম্যালেরিয়া রাক্ষসীকে বিতাড়িত করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছে এবং তাহারা অনেক স্থলে সফলকামও হইয়াছে।

হুগলী জেলার দেবানন্দপুর মুসলমান আমলে আরবি ফার্সি শিক্ষার কেন্দ্র ছিল। রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র রায় বাল্যকালে কিছুকাল এখানে থাকিয়া ফার্সি অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। এই প্রসিদ্ধ পুরাতন জনাকীর্ণ গ্রামখানিতে ইতিপূর্ব্বে ম্যালেরিয়ার এত প্রকোপ দেখা দিয়াছিল যে, ১৯২১ সনের সেন্সসে ইহার লোক সংখ্যা মাত্র ৪৮০ জনে গিয়া নামিয়াছিল। ইহা গ্রামের যুবকসম্প্রদায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। যুবকগণের উদ্যোগে দেবানন্দপুরে একটি সমিতি গঠন করা হয় এবং কলিকাতার ম্যালেরিয়া নিবারণী সমিতির সহিত সংযুক্ত করা হয়। এই প্রতিষ্ঠানটি গ্রাম হইতে শুধু ম্যালেরিয়া বিতাড়িত করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই, গ্রামে শিক্ষাপ্রচার, পাঠাগারস্থাপন, পল্লীসংরক্ষণ, সামাজিক সংগঠন, সেবা ও শুশ্রূষা প্রভৃতি বিষয়েও বিশেষ তৎপর হইয়াছেন। সমিতি বালক ও বালিকাদের জন্য দুইটি স্বতন্ত্র বিদ্যালয় স্থাপিত করিয়াছেন। সমাজের সকল স্তরের ছেলেমেয়েরাই এখানে অধ্যয়ন করিয়া থাকে। দেবানন্দপুরের যুবকগণের এই সাধু প্রচেষ্টা অতীব প্রশংসনীয়। ঔপন্যাসিক শ্রীযুক্ত শরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং প্রত্নতাত্ত্বিক শ্রীযুক্ত বিমলাচরণ লাহা প্রমুখ কয়েক জন গণ্যমান্য ব্যক্তি এই প্রতিষ্ঠানটির পৃষ্ঠপোষক হইয়া সাধারণের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।

শিক্ষা-প্রচারে মুসলমান নারী—

বাংলার মুসলমান নারী-সমাজে শিক্ষা প্রচার ও প্রসার মোটেই আশানুরূপ হইতেছে না। যিনিই এ বিষয়ে তৎপর হইবেন তিনিই দেশের প্রভূত কল্যাণ সাধন করিতে পারিবেন। শিক্ষা-প্রচারে সমষ্টিগত বা সম্প্রদায়গত যে-কোন প্রচেষ্টাই প্রশংসনীয়, এবং দেশের ও জাতির পক্ষে মঙ্গলকর। শ্রীযুক্তা এইচ-এ-হাকাম (হুসেন-আরা বেগম) সাহেবা গত আট বৎসর ধরিয়া মুসলমান নারী-সমাজে শিক্ষাপ্রচারের জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া আসিতেছেন। তাঁহার পরিশ্রমের ফলে চারি বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতায় মোসলেম য়্যাংলো অরিয়েন্ট্যাল বালিকাবিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। বিদ্যালয়টি ক্রমশঃ উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে। গত বৎসর এই বিদ্যালয়ে ১১৪ জনছাত্রী অধ্যয়ন করিয়াছে। হাকাম-মহোদয়া এই স্কুলটিকে উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে পরিণত করিতে ইচ্ছুক। বালিকাগণের উপযোগী একটি পুস্তকাগার স্থাপনেও তাঁহার সঙ্কল্প আছে। তিনি মুসলমান মহিলাগণের আর্থিক উন্নতিকল্পে একটি মহিলা শিল্প-বিভাগ এবং অসহায় বিধবাগণের জন্য একটি আশ্রম স্থাপন করিতেও প্রয়াসী হইয়াছেন। এ-সকল বিষয় কার্য্যে পরিণত করিতে হইলে অর্থের প্রয়োজন। বাংলার প্রত্যেক সহৃদয় ব্যক্তিরই জাতিধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে এই প্রতিষ্ঠানটিকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিয়া তুলিতে সাহায্য করা উচিত।

শ্রীযুক্তা হাকাম-মহোদয়া জন্ম দক্ষিণ আমেরিকার ব্রিটিশ গায়নায়। তিনি দক্ষিণ আমেরিকায়ই শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়াছেন। তাঁহার শক্তিসামর্থ্য, শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা শিক্ষাদান কার্য্যে ও শিক্ষাপ্রচারে নিয়োজিত হইলে মুসলমান নারী সমাজের তথা সমগ্র জাতির প্রভূত উপকার হইবে। আমরা তাঁহার বিদ্যায়তনটির উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি।

বাঙালী মুসলমান মহিলার বিদেশ-যাত্রা—

কেপ টাউনের কুমারী সফিয়া খাতুন উচ্চশিক্ষার জন্য বিলাতে গমন করিতেছেন। তিনি অক্সফোর্ডের বি-এ পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইবার আগে লোথাম কলেজে ভর্ত্তি হইবেন। আমরা এই বাঙালী মহিলার সাফল্য কামনা করি।

মস্কো শহরে বাঙালী ছাত্র—

ময়মনসিংহের সুসঙ্গ পরগণার অন্তর্গত নয়াপাড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার সাহা ১৯১৫ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বি-এস্-সি



শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার সাহা

পাশ করিয়া কলিকাতায় বিজ্ঞানকলেজে প্রবেশ করেন। তথায় অধ্যয়ন কালে অধ্যাপক সি-ভি-রমণের নিকট রুষিয়ায় দরিদ্র ছাত্রদের অধ্যয়নের সুবিধার কথা শ্রবণ করিয়া কপর্দ্দকহীন অবস্থায় তথায় গমন করেন। অধ্যাপক রমণের পরিচয়লিপি দেখাইয়া অক্ষয়কুমার একাডেমি লাজারেফের ফিজিকেল ইন্‌ষ্টিটিউটে সাদরে গৃহীত হন। তিনি সেখানে মাসিক দেড়শত টাকা বৃত্তি লাভ করিয়া চারি বৎসর পদার্থবিদ্যা অধ্যয়ন ও গবেষণা করিয়া বিশেষ কৃতিত্ব অর্জ্জন করিয়াছেন। অক্ষয়-বাবু সেণ্ট্রাল কমিটি অব সায়েন্সের সভ্য মনোনীত হইয়াছেন, এবং বর্ত্তমানে ফিজিক্যাল ইন্‌ষ্টিটিউটে সহকারীর পদে নিযুক্ত আছেন। তাঁহার পদার্থবিদ্যার গবেষণামূলক প্রবন্ধ ইংরেজী ও রুষীয় ভাষায় মুদ্রিত হইয়াছে। ইহা ছাড়া তিনি বাংলা সাহিত্য রুষীয় ভাষায় তর্জ্জমা করিয়া তাহার প্রচারেও সাহায্য করিতেছেন।

কবিতা দেবী স্মৃতি পুরস্কার—

শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদিগকে জানাইয়াছেন যে, ১৩৩৭ সালের সর্ব্বোৎকৃষ্ট 'লিরিক্' কবিতার জন্য ঐ বৎসরের প্রবাসীর অগ্রহায়ণ সংখ্যায় প্রকাশিত 'কারায় শরৎ' শীর্ষক কবিতার লেখক শ্রীপ্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়কে উক্ত পুরস্কার নগদ ৫০৲ টাকা প্রদত্ত হইল। পুরস্কারের যোগ্য কোন গাথা-কবিতা না পাওয়ায় পুরস্কার (নগদ ৫০৲ টাকা) আগামী বারের জন্য মজুত রহিল।

রুষিয়ায় কৃতী বাঙালী—

শ্রীযুক্ত অবনীনাথ মুখোপাধ্যায় খুলনা জিলার সাতক্ষীরা মহকুমার অন্তর্গত কাবুলিয়া গ্রামের অধিবাসী। সাধারণ শিক্ষার দিকে না ঝুঁকিয়া বিগত ১৯০৭ সনে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে বস্ত্রবয়ন শিক্ষার্থ আহ্‌মেদাবাদের একটি মিলে সামান্য মজুরের কাজে প্রবৃত্ত হন। পরে নিজের চেষ্টায় জাপান ও জার্ম্মেনীতে যাইয়া বয়ন-বিজ্ঞান কলেজে অধ্যয়ন করিয়া এ-বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হইয়াছিলেন। জার্ম্মানীতে অবস্থান কালে লাইপত্‌সিক বিশ্ববিদ্যালয়েও তিনি কিছুকাল অধ্যয়ন করেন।

অবনীনাথ সাম্যবাদী। ১৯২৫ সালে মস্কো শহরে যাইয়া সব দেখিয়া শুনিয়া তিনি বুঝিতে পারেন যে, সাম্যবাদমূলক জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চ্চা না করিলে দেশের স্বাধীনতা অর্জ্জন সম্ভব হইবে না। তিনি মস্কোস্থিত ইন্‌ষ্টিটিউট অব কম্যুনিষ্টে চারি বৎসর গবেষণা কার্য্যে রত থাকিয়া ইতিহাসে 'ডাক্তার' উপাধি লাভ করেন। তিনি ইতিমধ্যেই ভারতবর্ষ সম্বন্ধে কয়েকখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন —১। Agrarian India, ২। ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষ, ৩। ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহ, ৪। ভারতে কৃষক আন্দোলন। প্রথমোক্ত গ্রন্থখানি রুষীয় ভাষায় মুদ্রিত হইয়া ইতিমধ্যেই দ্বিতীয় সংস্করণ হইয়া গিয়াছে। লেনিনগ্রাডের প্রদর্শনীতে তাঁহার গ্রন্থাবলীর খুব প্রশংসা হইয়াছে।

অবনী-বাবু ১৯২৫ সালে রুষ-সরকার কর্ত্তৃক সমরখন্দ্ সোভিয়েটে অবৈতনিক সভ্য মনোনীত হন। প্রাচ্য জাতিসমূহের মধ্যে আর কেহ ইতিপূর্ব্বে এই পদ ও সম্মান লাভ করেন নাই। ১৯২৯ সনে প্রাচ্য বৈজ্ঞানিক গবেষণা-সমিতির (Scientific Association of Oriental Research) সভ্য এবং কম্যুনিষ্ট একাডেমিতে বিজ্ঞান সভ্য (scientific staff-member) নিযুক্ত হইয়াছেন। এইখানেই অবনী-বাবু প্রাচ্যবিদ্যা পরিষদে (Institute of Orientology) অধ্যাপকের পদ প্রাপ্ত হন। গত বৎসর তিনি বিজ্ঞান-মন্দিরের প্রাচ্যশাখায় শিক্ষা-সচিব (Education Secretary of the Oriental Institute of the Academy of Science) নিযুক্ত হইয়াছেন। এই কাজ অতি সম্মানসূচক ও দায়িত্বপূর্ণ। এই কাজে প্রাচ্যবিদ্যায় সর্ব্বপ্রধান ছয় জন রুষীয় পণ্ডিত তাঁহার সহকারী। ইহা ছাড়া তিনি মস্কোর আন্তর্জাতিক কৃষি-সমিতিরও কর্ম্মী-সভ্য (staff member of the International Agrarian Institute of science)।

পঞ্চশস্য

পৃথিবীর সর্ব্বাপেক্ষা উঁচু বাড়ী—

নিউ-ইয়র্কের 'এম্পায়ার ষ্টেট বিল্ডিং' নির্ম্মাণ শেষ হইলে, উহা পৃথিবীর সর্ব্বাপেক্ষা উঁচু বাড়ী হইবে। এতদিন পর্য্যন্ত নিউইয়র্কের সর্ব্বোচ্চ বাড়ী ছিল 'ক্রাইস্‌লার বিল্ডিং',—উহার উচ্চতা ১,০৪৬ ফুট। এই নূতন বাড়ীটির উচ্চতা ১,২৫২ ফুট, অথবা কলিকাতার অক্টারলোনী মনুমেণ্টের সাতগুণের অপেক্ষাও বেশী। এই বাড়ীটিতে ৮৫টি তালা আছে। তাহা ছাড়া ১৪ তালাযুক্ত একটি চূড়াও আছে। পরপৃষ্ঠায় এই বাড়ীটি তৈরী হইবার সময়ের ছবি দেওয়া হইয়াছে।

আধুনিক গির্জ্জায় আইনষ্টাইনের মূর্ত্তি—

মধ্যযুগে গির্জ্জার দেয়ালে নানা সাধুসন্ন্যাসীর মূর্ত্তি খোদিত থাকিত। বর্ত্তমান যুগের গির্জ্জায় একটু নূতন ধরণের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। নিউইয়র্কের রকফেলার 'স্কাই স্ক্রেপার' গির্জ্জায় বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক আইনষ্টাইনের একটি মূর্ত্তি উৎকীর্ণ আছে। মূর্ত্তিটির গঠন ও পোষাকপরিচ্ছদ অবশ্য প্রাচীন ধরণেরই।

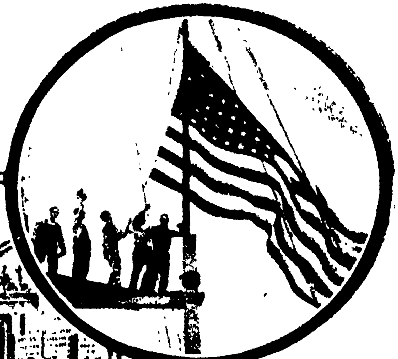


রকফেলার 'স্কাই-স্ক্রেপার' গির্জ্জার দ্বারদেশে আইনষ্টাইনের মূর্ত্তি। উপরের সারিতে বামদিক হইতে গুণিলে তৃতীয় মূর্ত্তিটি আইনষ্টাইনের।

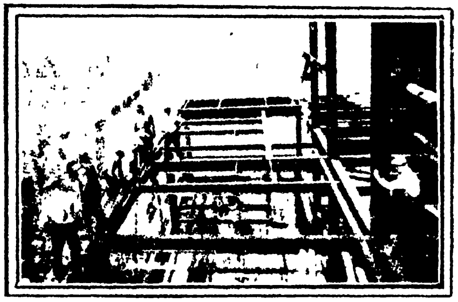


একটি মজুর ক্রেনে চড়িয়া উপরে উঠিতেছে।

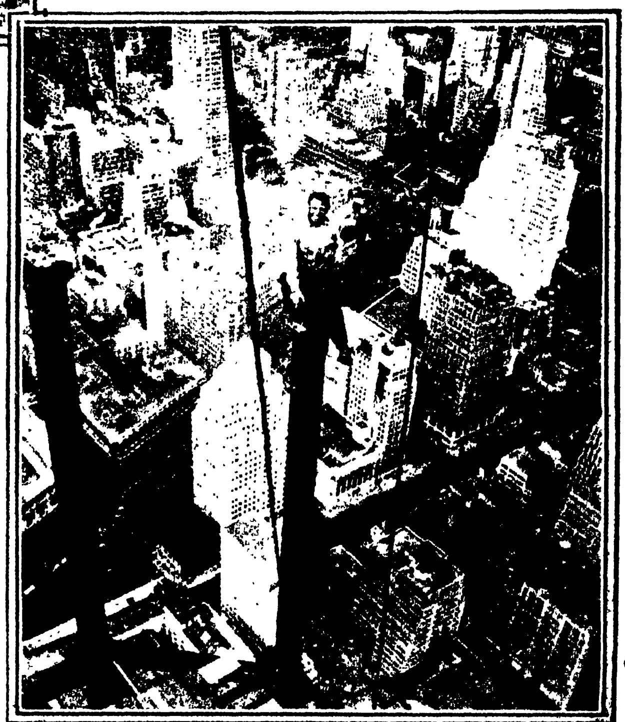




উপরে—ষ্টীলের কাঠামো নির্ম্মাণ শেষ হইবার পর চূড়ায় পতাকা উত্তোলন।
বামদিকে—মজুররা যাহাতে পা ফসকাইলেও একেবারে নীচে পড়িয়া না যায়, সেজন্য ব্যবহৃত জাল।



ফ্রেমের উপর দিয়া মজুররা যাতায়াত করিতেছে।



রাস্তা হইতে হাজার ফুটেরও বেশী উপরে একটি কড়ির উপর দাঁড়াইয়া এই মজুরটি হাত তুলিয়া অভিবাদন করিতেছে।



বাড়ীর উপর হইতে নীচের দিকে চাহিলে যেরূপ দেখায়।

'এক্সচেঞ্জ' বা মুদ্রা-বিনিময়

শ্রীযোগেশচন্দ্র সেন, এম-এ(হারভার্ড)

সরকারি এবং বে-সরকারি মহলে গত কয়েক বৎসর যাবৎ এক্সচেঞ্জ সম্বন্ধে তুমুল বাদানুবাদ চলিতেছে। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, এই বিষয়টি এত জটিল যে ইহা সর্ব্বসাধারণের বোধগম্য হইবে না, সুতরাং যাঁহারা পারদর্শী তাঁহারাই শুধু আলোচনা করুন অন্যদের ইহা লইয়া মাথা ঘামাইবার প্রয়োজন নাই। বর্ত্তমান যুগে অর্থনীতি-সমস্যাই প্রধান সমস্যা, লোকমত গঠন করিতে হইলে যাহাতে সর্ব্বসাধারণের বোধগম্য হয়, এইরূপে এই বিষয়গুলি আলোচনা করিতে হইবে। বোম্বাই অঞ্চলের গুজরাটী খবরের কাগজ যাঁহারা পড়েন তাঁহারা জানেন, ব্যবসা ও শিল্প সম্বন্ধে সে দেশে কত বিশদ-ভাবে আলোচনা করা হয়। এই জন্যই সেই অঞ্চলের লোকেরা বর্ত্তমানে অর্থনীতির মূলতত্ত্ব অন্য প্রদেশের লোক অপেক্ষা ভাল বোঝেন। বাংলা ভাষায় এই সব বিষয় আলোচনা করা কষ্টসাধ্য হইতে পারে; কিন্তু সেই জন্য কোন প্রচেষ্টা না করাও বাঞ্ছনীয় নয়। দেশী ভাষার সাহায্যে কোনও বিষয় যে ভাবে বুঝাইতে পারা যায় বিদেশী ভাষার সাহায্যে কোনও রকমে সেইরূপ পারা যায় না। ব্যবসা সম্বন্ধে বাঙালীর বিমুখতা এবং ঔদাসীন্য দূর করিতে হইলে অর্থনীতির অধিকতর আলোচনার প্রয়োজন। অদূর ভবিষ্যতে যখন শাসনভার আমাদের হাতে আসিবে, তখন এই বিষয়ের গুরুত্ব আমরা আরও উপলব্ধি করিব। সেই জন্য এখন হইতে নিয়মিতরূপে এই সব বিষয় আলোচনা করা প্রয়োজন। এক্সচেঞ্জের শব্দের অর্থ কি? এক দেশের মুদ্রা অন্য দেশের মুদ্রার সহিত বিনিময়কেই 'এক্সচেঞ্জ' বলে। প্রকৃতপক্ষে এক্সচেঞ্জের হার নির্দ্ধারিত হয়,—এক দেশের মাল অন্যান্য দেশের মালের বিনিময় হইতে। আমরা মালের মূল্য অর্থ দ্বারা নিরূপণ করি সত্য, কিন্তু প্রকৃতপ্রস্তাবে 'এক্সচেঞ্জ' যে মালেরই বিনিময় সে কথা ভুলিলে চলিবে না। সেই জন্যই যখন আমদানি মালের মূল্য রপ্তানি মালের মূল্য অপেক্ষা অধিক হয়, তখন ব্যাঙ্কিং মহল ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়ে। কারণ, যখন রপ্তানি অপেক্ষা আমদানি বেশী হয় তখন রপ্তানি মালের মূল্য দিয়া আমদানি মালের মূল্য মিটান যায় না। বিদেশী মুদ্রার চাহিদা বেশী হইয়া পড়ে। ফল এই দাঁড়ায় যে, নির্দ্ধারিত হার অপেক্ষা অন্য দেশের মুদ্রার জন্য আমাদিগকে অধিক মূল্য দিতে হয়। যদি এই ব্যাপারটা আরও অধিক গড়ায়, তাহা হইলে আমাদিগকে সেই দেশে স্বর্ণ পাঠাইতে হয়। এক্সচেঞ্জের হার নিয়মিত করা প্রত্যেক দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কাজ। ইংলণ্ডে ব্যাঙ্ক অফ্ ইংলণ্ড, ফ্রান্সে ব্যাঙ্ক অফ্ ফ্রান্স, জার্ম্মেনিতে রাইস্ ব্যাঙ্ক, আমেরিকার যুক্ত-রাজ্যে ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাঙ্ক, জাপানে ব্যাঙ্ক অফ জাপান, ইহা নিয়মিতভাবে করে। আমাদের দেশে কোন কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক নাই বলিয়া ভারত সরকারই ইহা করেন। বিদেশী কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কগুলি এক্সচেঞ্জের হার ঠিক রাখার জন্য নিম্নলিখিত পদ্ধতি অবলম্বন করেন। যখন তাঁহারা দেখেন যে, নিজ দেশের মুদ্রা অন্য দেশের মুদ্রার তুলনায় নির্দ্ধারিত হারের নীচে যাইতেছে, তখন তাহারা সুদের হার বাড়াইয়া দেন। যে-সকল বিদেশী বণিকদের তাঁহাদের দেশে টাকা পাওনা আছে, তাহারা টাকা না তুলিয়া বেশী সুদের জন্য সেখানেই খাটায়। অধিকন্তু যদি অন্যান্য দেশে সুদের হার কম থাকে, তাহা হইলে সেই সকল দেশ হইতেও টাকা আসিতে থাকে। অধুনা ভারত সরকার শতকরা ৬৲টাকা সুদে ট্রেজারি বিল মারফতে তিন মাসের জন্য টাকা ধার করিতেছেন, বিলাতে তিন মাসের ব্যাঙ্ক বিলের সুদ সেই স্থলে ২॥ হইতে ২৸৹, কাজেই বিলাত হইতে অনেক টাকা এই উচ্চ সুদে খাটাইবার জন্য এদেশে পাঠান হইতেছে। মোট কথা এই, যে-দেশে সুদের হার বেশী সেই দেশেই সকলে অর্থ পাঠাইতে চায়।

অধুনা পৃথিবীর সব দেশের সঙ্গে অর্থের আদান-প্রদান এত সহজ হইয়াছে, যে, কোথাও স্বদের হার বেশী হইলে, অন্য দেশ হইতে সেখানে টাকা আসিতে আরম্ভ করে। ইহার ফল এই দাঁড়ায় যে, ঐ দেশের মুদ্রার চাহিদা অন্য দেশে বাড়িয়া যায়, এদেশের মুদ্রার মূল্য অন্যদেশের মুদ্রার তুলনায় পূর্ব্বাপেক্ষা বাড়িয়া যায়, অর্থাৎ কি-না এক্সচেঞ্জের হার বাড়িয়া যায়। স্বদের হার বাড়াইয়া কমাইয়া এইরূপে এক্সচেঞ্জ নিয়মিত করা হয়। ইহা সত্ত্বেও যদি এক্সচেঞ্জের হার কমিতে থাকে, তাহা হইলে অন্য দেশে সোনা চালান দেওয়া হয় এবং কোন কোন সময়ে বিদেশে ধার করাও হয়, যাহাতে দেয় টাকা সম্প্রতি না দিতে হয়। আজকাল প্রত্যেক সভ্যজাতির মুদ্রাই স্বর্ণের উপর প্রতিষ্ঠিত। কেবল সেই স্বর্ণমুদ্রাগুলির নাম এবং তাহাতে স্বর্ণের পরিমাণ বিভিন্ন হওয়ায় সেইগুলির মূল্য স্বদেশের মুদ্রার দ্বারা নিরুপণ করা হয়। যেমন, ইংলণ্ডের মুদ্রার নাম পাউণ্ড ষ্টার্লিং এবং আমেরিকার যুক্তরাজ্যের মুদ্রার নাম ডলার; উভয় মুদ্রা যদিও স্বর্ণের উপর প্রতিষ্ঠিত, তথাপি তাহাদের স্বর্ণের পরিমাণের ব্যতিক্রমের জন্য যুক্তরাজ্যের চার ডলার ছিয়াশী সেণ্ট ইংলণ্ডের এক পাউণ্ডের সমান। ভারতবর্ষের মুদ্রা, টাকা রৌপ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত; বিদেশের সঙ্গে বাণিজ্য করিতে হইলে আমাদের রৌপ্য-মুদ্রা অন্য দেশের স্বর্ণমুদ্রার সহিত কি হারে বিনিময় হইবে? সোনার সঙ্গে স্বর্ণমুদ্রার দামের অতি সামান্য ব্যবধান আছে, কিন্তু রৌপ্যের দামের তুলনায় আমাদের টাকার মূল্য অনেক বেশী, অর্থাৎ টাকাতে যতটুকু রূপা আছে, তাহার মূল্য ছয় আনার বেশী হইবে না। অধুনা রূপার দাম উত্তরোত্তর হ্রাস হওয়াতে ঐ মূল্য আরও কমিয়াছে। কাজেই অন্যান্য দেশে, যাহাদের মুদ্রা স্বর্ণের উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহাদের সঙ্গে ব্যবসা করিতে হইলে আমাদের টাকার মূল্য কি প্রকারে নিরূপিত হইবে? ১৮৯৩ সন পর্য্যন্ত আমেরিকার যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, ইটালি, বেলজিয়াম, সুইজারল্যাণ্ড দেশে স্বর্ণ এবং রৌপ্য উভয় প্রকার মুদ্রারই এক সঙ্গে প্রচলন ছিল। তখন এক আউন্স স্বর্ণ পনর আউন্স রূপার সমান ছিল এবং দেনাদারেরা নিজের ইচ্ছামত স্বর্ণ কিম্বা রৌপ্য মুদ্রায় দেনা শোধ করিতে পারিত। সেই সময়ে আমাদের দেশেও টাকশালে রূপা লইয়া গেলে এবং প্রস্তুত করিবার খরচা দিলে টাকা তৈয়ারী করিয়া দেওয়া হইত। কিন্তু দেখা গেল যে, আন্তর্জ্জাতিক সহকারিতা ছাড়া রৌপ্য এবং স্বর্ণ দুইটিই "প্রধান মুদ্রা" রূপে এক দেশে চলিতে পারে না। এই জন্যই অনেকগুলি আন্তর্জ্জাতিক বৈঠক বসে। কিন্তু ফলে কিছুই হয় না। তখন প্রত্যেক দেশ নিজ স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য স্বর্ণকেই তাহাদের মুখ্য মুদ্রা বলিয়া ঘোষণা করে। সেই সময়ে ভারতবর্ষেও সর্ব্বসাধারণের রৌপ্যের পরিবর্ত্তে টাকশাল হইতে টাকা পাইবার অধিকার বন্ধ করা হয়, এবং সরকার এরূপ প্রতিশ্রুতি দেন যে, আন্তর্জ্জাতিক ব্যবসায়ের আদান-প্রদানের জন্য টাকার মূল্য এক শিলিং চার পেনি হিসাবে তাঁহারা যোগাইবেন, অর্থাৎ এক পাউণ্ডের মূল্য ধার্য্য হইল পনর টাকা। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, স্বর্ণমুদ্রা এবং স্বর্ণের (অর্থাৎ ঐ মুদ্রাতে যতখানি স্বর্ণ আছে তাহার) মূল্য প্রায় সমান, কিন্তু রৌপ্যমুদ্রা এবং রূপার মূল্যে অনেক তফাৎ। ইহার কারণ এই যে, মুদ্রা প্রস্তুত করিবার অধিকার শুধু সরকারের একচেটিয়া, সেইজন্যই তাঁহারা ইহার যে কোন কৃত্রিম মূল্য নির্দ্ধারণ করিতে পারেন। দেশের ভিতর ইহাতে ক্রয়-বিক্রয়ের কোন অসুবিধা হয় না। মালের বিনিময়ের জন্য যত টাকার প্রয়োজন, সেই হিসাবে যদি টাকার সংখ্যা অধিক না হয়, তাহা হইলে সাধারণতঃ মালের মূল্যের হ্রাসবৃদ্ধি হয় না। কিন্তু বিদেশের সঙ্গে যখন আমাদের দেনা-পাওনা মিটাইতে হয় তখন কি হিসাবে তাহা করা যাইতে পারে? যে-দিন হইতে রৌপ্যকে মুদ্রার উচ্চ আসন হইতে নামাইয়া দেওয়া হইয়াছে, সেই দিন হইতে, অন্যান্য জিনিষের মূল্য যেমন চাহিদার উপর নির্ভর করে, ইহার মূল্যও সেইরূপই নির্ভর করে। পূর্ব্বে এক তোলা সোনা পনর তোলা রূপার সমান ছিল, এখন সেই স্থলে হইয়াছে এক তোলা সোনা প্রায় পঞ্চাশ তোলা রূপার সমান। যদি রূপার "ঘটা বাড়ার" উপর আমাদের টাকার মূল্যের হ্রাস-বৃদ্ধি হয়, তাহা হইলে অন্য দেশের সঙ্গে ব্যবসা করা মুস্কিল হইয়া পড়ে। কেন-না,

যদি আজ আমি প্রতি পাউণ্ডে পনর টাকা হিসাবে ইংলণ্ড হইতে কোন মাল ক্রয় করি এবং যখন একমাস পরে মাল আসিয়া পৌছিবে, তখন যদি আমাকে পনর টাকার স্থলে বিশ টাকা দিতে হয় তাহা হইলে আমাকে ভয়ানক ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে। এইরূপ অনিশ্চয়ের মধ্যে ব্যবসা ভালরূপে চলিতে পারে না বলিয়াই একটা নির্দ্দিষ্ট হারে এক্সচেঞ্জ বাঁধা হয়। ১৮৯৩ সন হইতে ১৯১৬ সন পর্য্যন্ত প্রতি টাকার এক্সচেঞ্জের হার ছিল এক শিলিং চার পেন্স। বিগত মহাযুদ্ধের সময় প্রত্যেক দেশই নিজেদের আর্থিক অবস্থা সুরক্ষিত রাখিবার জন্য স্বর্ণের রপ্তানি বন্ধ করিয়া দেয়। সেই সময় ইংলণ্ড, ফ্রান্স এবং আমেরিকার যুক্তরাজ্যে ভারতবর্ষ হইতে অধিক পরিমাণ মাল রপ্তানি হইতে থাকে, অথচ তাহারা যুদ্ধে ব্যাপৃত থাকায় আমাদের দেশে উপযুক্ত মাল পাঠাইতে পারে নাই। স্বর্ণের রপ্তানি বন্ধ করায় আমাদের প্রাপ্য টাকা রৌপ্য দ্বারা মিটাইতে তাহারা বাধ্য হয়। এই কারণেই রৌপ্যের মূল্য অসম্ভব বাড়িতে থাকে। ১৯১৫ সনে লণ্ডনে রৌপ্যের দর ছিল প্রতি আউন্সে ২৭$\frac{1}{8}$ পেনি, ১৯১৬ সনের এপ্রিল মাসে দাম বাড়ে ৩৫$\frac{1}{2}$ পেনি, ডিসেম্বর মাসে হয় ৩৭ পেনি। ১৯১৭ সনের আগষ্ট মার্সে ইহার মূল্য ৪৩ পেনির উর্দ্ধে উঠে। যদি প্রতি আউন্স রূপার মূল্য ৪৩ পেনি হয়, তাহা হইলে এক শিলিং চার পেনি হিসাবে উহাতে যতটুকু রূপা আছে তাহার মূল্য যোল আনা হয়। ইহার উর্দ্ধে উঠিলে টাকার মূল্য যোল আনার অধিক হয়। ১৯১৭ সনের সেপ্টেম্বর মাসে রূপার দাম হয় পঞ্চান্ন পেনি। রূপার দামের বৃদ্ধির সঙ্গে গভর্ণমেণ্টও নিম্নলিখিত হারে এক্সচেঞ্জের হার বাড়াইতে থাকেন।

তারিখ	এক্সচেঞ্জের হার
৩রা জানুয়ারি, ১৯১৭	১—৪$\frac{1}{4}$ পেনি
২৮শে আগষ্ট, ১৯১৭	১—৫ ,,
১২ই এপ্রিল, ১৯১৮	১—৬ ,,
১৩ই মে, ১৯১৯	১—৮ ,,
১২ই আগষ্ট, ১৯১৯	১—১০ ,,
১৯ই সেপ্টেম্বর, ১৯১৯	২—০ ,,
২২শে নভেম্বর, ১৯১৯	২—২ ,,
১২ই ডিসেম্বর, ১৯১৯	**২—৪** ,,

তিন বৎসরের মধ্যে সরকার এক্সচেঞ্জের হার আট বার পরিবর্ত্তন করেন। ১৯১৯ সনে সরকার একটি কারেন্সি কমিটি নিযুক্ত করেন। এই কমিটি ১৯২০ সনে এক্সচেঞ্জের হার দুই শিলিং নির্দ্ধারণ করেন। বোম্বাইর শ্রীযুক্ত দাদিবা মেরোয়ানজি দালাল এই কমিটির একমাত্র ভারতীয় সদস্য ছিলেন। তিনি ইহার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করেন এবং পৃথক রিপোর্টে অতি সুন্দর যুক্তিপূর্ণ মত ব্যক্ত করেন। তাঁহার প্রতিবাদ অগ্রাহ্য করিয়া যদিও দুই শিলিং হার স্থির করা হয়, তথাপি কিছুদিন পরে আসল রূপার দাম হ্রাস হইতে লাগিল। তখন দেখা গেল, উপরোক্ত হার বহাল রাখা সম্ভবপর নয়। স্যর ম্যাল্‌কম হেলী, যিনি অধুনা যুক্তপ্রদেশের লাট, তিনি তখন ভারত সরকারের রাজস্ব সচিব ছিলেন। এক্সচেঞ্জে নির্দ্দিষ্ট হার দুই শিলিং বজায় রাখিবার জন্য এখান হইতে কোটি কোটি টাকার 'রিভার্স বিল্' বিক্রয় করা হয় এবং তাহা মিটাইবার জন্য বিলাতে আমাদের 'কারেন্সি রিজার্ভে'র তহবিল হইতে যে সব 'সিকিউরিটি' কেনা ছিল, সেগুলি বাধ্য হইয়া যা তা মূল্যে বিক্রয় করিতে হয়। ফলে ভারতের অনেক কোটি টাকার লোকসান হয়। ইহা সত্ত্বেও যখন এক্সচেঞ্জকে বাগ মানান গেল না, তখন ১৯২৬ সনে আবার একটি কারেন্সি কমিশনের নিয়োগ করা হয়। ভারতীয় বণিকসম্প্রদায়ের পক্ষ হইতে একমাত্র স্যর পুরুষোত্তমদাস ঠাকুরদাস ইহার সদস্য ছিলেন। এই কমিশন দুই শিলিংএর পরিবর্ত্তে এক শিলিং ছয় পেনি হার নির্দ্ধারণ করেন এবং এখনও ইহাই বজায় আছে। স্যর পুরুষোত্তমদাস ইহার তীব্র প্রতিবাদ করেন এবং এক শিলিং চার পেনি, যাহা ১৮৯৩ সন হইতে ১৯১৬ সন পর্য্যন্ত বহাল ছিল, তাহার পক্ষে নিজের যুক্তিপূর্ণ সুচিন্তিত মত জানান। এবারেও একমাত্র ভারতীয় বণিক-সম্প্রদায়ের সদস্যের প্রতিবাদ অগ্রাহ্য করিয়া ব্রিটিশ সদস্যদের মত বজায় রহিল। তখন হইতে আজ পর্য্যন্ত এই বিষয়টি লইয়া আমাদের সহিত সরকারের বাদানুবাদ চলিতেছে, আমরা বলি যে, উক্ত হারের **ফলে দেশের অনেক প্রকার আর্থিক দুরবস্থা ঘটিয়াছে।**

কি করিয়া এরূপ হইল, তাহা বিচার করিয়া দেখা যাক।

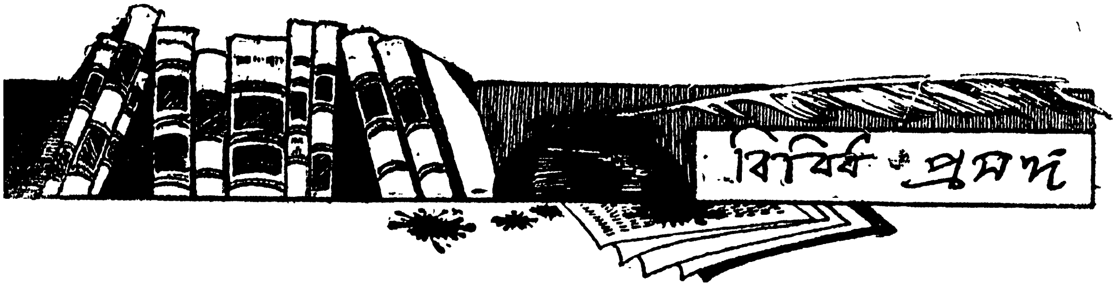
বিলাতের ব্যবসায়ীগণ যখন আমাদের দেশে মাল বিক্রয় করে, তখন তাহারা টাকা আনার হিসাবে বিক্রয় করে না, পাউণ্ডের হিসাবে করে। তাহারা যে হুণ্ডি লেখে, তাহা পাউণ্ড, শিলিং, পেন্সে লিখিত হয়। পূর্ব্বে যখন এক টাকার বিনিময়ে হার ছিল এক শিলিং চার পেনি, তখন ব্রিটিশ ব্যবসায়ী এক পাউণ্ডের মাল বিক্রয় করিলে তাহার পড়্তা আমাদের দেশে অন্য খরচা বাদ দিলে হইত পনর টাকা। বিলাতের সহিত আমাদের কাপড়ের প্রতিযোগিতাই বেশী। মনে করুন, পূর্ব্বে যদি আমাদের মিলওয়ালাদের পড়্তা পড়িত চৌদ্দ টাকা, তাহা হইলে তাহারা বিলাতের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিতে পারিত। এখন এক্সচেঞ্জের হার এক শিলিং ছয় পেনি হওয়াতে ফল হইল বিপরীত। বিলাতে ব্যবসায়ীরা পূর্ব্বের মতই পাউণ্ড হিসাবে তাহাদের প্রাপ্য মূল্য পাইবেন, কিন্তু এক শিলিং চার পেনি হিসাবে যে মালের পড়্তা পড়িত পনর টাকা এখন এক শিলিং ছয় পেনি হওয়াতে তাহার পড়্তা হইল তের টাকা পাঁচ আনা চার পাই। কাজেই আমাদের চৌদ্দ টাকার পড়্তায় আমরা তাহাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় দাঁড়াইতে পারি না। অবশ্য আমদানি শুল্ক বৃদ্ধি হওয়াতে প্রতিযোগিতা অনেকটা কমিয়াছে, তথাপি বিনিময়ের হার উচ্চ হওয়াতে বিদেশীদের সুবিধা হইল শতকরা সাড়ে বার টাকা অর্থাৎ যে স্থলে শুল্ক চড়ান হইল শতকরা পনর টাকা, সে স্থলে আমাদের সুবিধা হইল মাত্র আড়াই টাকা। এখন বলা যাইতে পারে যে, বিদেশের আমদানিতে যদি আমাদের অসুবিধা হইয়া থাকে, তবু রপ্তানিতে তো আমাদের সুবিধা হইয়াছে। কেন-না, মাল বিক্রয় করিয়া যে স্থলে আমরা এক শিলিং চার পেনি পাইতাম সেস্থলে এখন আমরা এক শিলিং ছয় পেনি পাইতেছি। অর্থাৎ টাকা-প্রতি দুই পেনি বেশী পাইতেছি। এই যুক্তি কতটা সত্য, তাহা সামান্য বিবেচনা করিলেই বোঝা যাইবে। আমাদের দেশের মালের মূল্য যদি অন্য দেশ অপেক্ষা উচ্চ হয়, তাহা হইলে ক্রেতারা সেই মূল্য দিতে বাধ্য নয়। পাট ছাড়া আমাদের দেশে এমন কিছু জন্মায় না, যাহা অন্যত্র জন্মে না। ধরুন তুলা, গম, চামড়া, চা, কয়লা, তিসি, চাল ইত্যাদি। তুলা আমেরিকার যুক্তরাজ্য, মিশর ও কেনিয়াতে প্রচুর জন্মে। এক্সচেঞ্জের হার বেশী বলিয়া কি ক্রেতারা অধিক মূল্য দিয়া আমাদের তুলা কিনিবে? তেমনি অষ্ট্রেলিয়া, কানাডা, উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা এবং ইউরোপের সব জায়গায়ই গম জন্মে, যদি আমাদের গমের দাম বেশী হয়, তাহা হইলে অন্য দেশ হইতে কিনিবে। এবার আমাদের দেশে প্রচুর গম জন্মিয়াছে এবং ইহার দামও খুব কম, তথাপি অষ্ট্রেলিয়া হইতে গম আমদানি হইতেছিল। ইহা নিবারণ করিবার জন্য সরকার সেদিন গম আমদানির উপর শুল্ক চড়াইয়াছেন। মোট কথা, কোনও মালের দাম নিরূপণ হয়, তাহার পরিমাণ এবং সেই সঙ্গে তাহার চাহিদার উপর। যদি এমন হইত যে, এ-সব মাল অন্য দেশে জন্মায় না, তাহা হইলে হয়ত বেশী মূল্যেও তাহারা কিনিতে বাধ্য হইত। এক পাটের বিষয়ে কতক পরিমাণে সে কথা খাটে। কিন্তু এখানেও দেখা গিয়াছে যে, চাহিদা না থাকিলে বাধ্য হইয়া আমাদিগকে দাম কমাইতে হয়। সুতরাং উচ্চ হারে এক্সচেঞ্জ নির্দ্ধারিত হওয়াতে আমাদের দেশীয় শিল্পের এবং রপ্তানির উভয় দিকেই ক্ষতি হইয়াছে। এক্সচেঞ্জের অস্বাভাবিক হার বজায় রাখিতে গিয়া সরকার পক্ষ হইতে যে সকল উপায় অবলম্বন করা হইয়াছে, তাহাও ভাবিয়া দেখিবার বিষয়। পূর্ব্বে দেখান গিয়াছে যে, যখনই টাকার বাজার নরম, অর্থাৎ সুদের হার কম হয়, তখনই এক্সচেঞ্জ নীচে নামিতে থাকে। ইহা বন্ধ করিবার জন্য টাকার বাজার যাহাতে নরম না হয়, সেজন্য সরকার প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছেন। প্রতি সপ্তাহে আজ প্রায় দুই বৎসর যাবৎ দুই কোটি টাকার ট্রেজারি বিল বিক্রয় করা হইতেছে, বাধ্য হইয়া সরকারকে ইহার জন্য উচ্চ হারে সুদ দিতে হইতেছে। ১৯২৯ সনের এপ্রিল মাস হইতে ১৯৩০ সনের মার্চ্চ

পর্য্যন্ত চৌষট্টি কোটি তিয়াত্তর লক্ষ পঁচাত্তর হাজার টাকার ট্রেজারি বিল বিক্রয় করা হইয়াছিল এবং সরকারি বর্ষশেষে অর্থাৎ ৩১শে মার্চ্চ তারিখে সরকারের দেনা ছিল ছত্রিশ কোটি টাকা। ইহার পূর্ব্ব বৎসর বাকী দেনা ছিল মাত্র চার কোটি টাকা। কাজেই এক বৎসরে দেনা বাড়িয়াছে বত্রিশ কোটি টাকা। ইহা ছাড়া চল্‌তি নোটের প্রচলন কম করা হইয়াছিল বত্রিশ কোটি একচল্লিশ লক্ষ টাকা। অন্যান্য দেশে ব্যাঙ্ক রেট শতকরা দুই হইতে তিন টাকা পর্য্যন্ত আর আমাদের দেশে ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের রেট রাখা হইয়াছে ছয় হইতে সাত টাকা পর্য্যন্ত। চারিদিক হইতে যে-কোন প্রকারে টাকার বাজার গরম রাখিবার চেষ্টা সরকার করিতেছেন, কেন-না, তাহা না করিলে এক্সচেঞ্জের হার টিকে না। তিন মাসের ট্রেজারি বিলে সরকার দেন শতকরা ছয় টাকারও অধিক এবং তাহাতে ইন্‌কম্ টেক্সও লাগে না। এত উচ্চ হারে সুদ দেওয়ার জন্য কোম্পানির কাগজের দর মাটি হইয়া গিয়াছে। ১৯১৪-১৫ সনের সাড়ে-তিন টাকার কোম্পানির কাগজের দর ছিল ৯৬/০ ; ১৯২৬-২৭ সনে ছিল ৭৯/০ ; ১৯২৭-২৮ সনে ছিল ৭৯/০ ; ১৯২৮-২৯ সনে ছিল ৭৫৷৵ ; ১৯২৯-৩০ সনে ছিল ৭২/০ ; এখন ইহার মূল্য হইয়াছে তেষট্টি। ব্যাঙ্ক, ইন্‌সিওরেন্স এবং বড় বড় অনুষ্ঠান, যাহারা মোটারকম কোম্পানির কাগজ কিনিয়াছিল, তাহাদের লক্ষ লক্ষ টাকা লোকসান হইয়াছে। এমন অবস্থা দাঁড়াইয়াছে যে, এখন তাহারা কোম্পানির কাগজ কেনা যুক্তিযুক্ত মনে করিতেছে না। আর করিবেই বা কেন? ট্রেজারি বিল কিনিলেই যখন শত করা ছয় টাকা সুদ পাওয়া যায় এবং ইহার মূল্য হ্রাস হইবার কোন সম্ভাবনা নাই, তখন কোম্পানীর কাগজ কিনিয়া লাভ কি? ব্যাঙ্ক এবং ইনসিওরেন্স কোম্পানিগুলির উদ্বৃত্ত পত্র হইতে দেখা যায় যে, তাঁহারা বহু বৎসর পরে দেয় (long-dated) কোম্পানির কাগজ বিক্রয় করিয়া ফেলিয়াছেন এবং তৎপরিবর্ত্তে ট্রেজারি বিল কিনিয়াছেন। তাঁহারা কোম্পানির কাগজ বিক্রয় করাতে ইহার মূল্য আরও কমিয়াছে এবং কমিতেছে। এখানে ব্যাঙ্কগুলি তিন মাসের আমানতের জন্য শতকরা পাঁচ হইতে সাড়ে পাঁচ টাকার অধিক সুদ দেয় না। সরকারের প্রতিযোগিতায় তাহারা উপযুক্ত আমানত পাইতেছে না এবং যাহা পাইতেছে তজ্জন্য তাহাদিগকেও উচ্চ সুদ দিতে হইতেছে। ইহাতে যাঁহারা ব্যবসা করিতেছেন, তাঁহাদিগকে বেশী হারে সুদ দিতে হইতেছে। আজকাল ব্যবসায়ের অবস্থা পৃথিবীব্যাপী মন্দা চলিতেছে, অন্যান্য দেশে যথাসম্ভব টাকার বাজার নরম রাখা হইতেছে, তাহা সত্ত্বেও ব্যবসা ভাল রকম চলিতেছে না,—সেই স্থলে এত উচ্চ সুদ দিয়া আমাদের ব্যবসা কি রূপে চলিবে? ট্রেজারি বিলের জন্য উচ্চ হারে সুদ দিতে হইতেছে বলিয়া সরকারের ক্রেডিট খারাপ হইয়া গিয়াছে। তিন বৎসর পূর্ব্বে সরকার শতকরা চার টাকা সুদে এদেশে টাকা ধার করিয়াছেন, এখন সেইস্থলে শতকরা ছয় টাকা সুদেও টাকা পাওয়া মুস্কিল। বিলাতে সেক্রেটারি অফ্ ষ্টেটের খরচার জন্য প্রতিবৎসর আমাদের যে ত্রিশ কোটি টাকার অধিক পাঠাইতে হয়, তাহা পাঠাইতে না পারায় সরকারকে উচ্চ হারে সেখানে টাকা ধার করিতে হইতেছে। বিলাতের সরকার টাকা ধার পান শতকরা চার টাকায়, সেখানকার কোম্পানিগুলি পায় শতকরা পাঁচ টাকায়, আর আমাদের সরকারের ক্রেডিট এত কম যে, তাঁহারা শতকরা ছয় টাকার কমে টাকা ধার পান না।

সম্প্রতি দিল্লীতে ফেডারেশ্যান অফ ইণ্ডিয়ান চেম্বার্স অফ কমার্সের এক অধিবেশনে, রাজস্ব-সচিব স্যর জর্জ্জ সুষ্টার সরকারের পক্ষ হইতে যে সাফাই গাহিয়াছেন, তাহা নিতান্তই অবান্তর ও ভিত্তিহীন। তিনি বলেন, এক্সচেঞ্জ এক শিলং ছয় পেনি ধার্য্য করায় ভারতের কোনও ক্ষতি হয় নাই। তিনি স্বীকার করেন না যে, ইহাতে আমাদের কিনিবার শক্তি কমিয়াছে এবং বর্ত্তমান হারনির্দ্ধারণ করিবার পর হইতে এদেশের আমদানি এবং রপ্তানি অনেক বাড়িয়াছে। এক্সচেঞ্জের হ্রাসবৃদ্ধির সঙ্গে আমাদের ক্রয় করিবার শক্তির হ্রাস-বৃদ্ধি হয় না। তিনি আরও বলেন যে, আমাদের মুদ্রার ভিত্তি যাহাই হউক না কেন, তাহাতে কিছুই আসিয়া যায় না, ইহা মূল্য-

নির্দ্ধারণের উপায় মাত্র। আমাদের ক্রয় করিবার শক্তি আমাদের মালের মূল্যের উপর নির্ভর করে। এই ত গেল সরাসরি স্তোকবাক্য। বাস্তবিকই কি ইহা ঠিক? ১৯৩০ সনের কমার্সিয়াল ইন্‌টেলিজেন্স ডিপার্টমেন্টের রিপোর্ট হইতে দেখা যায় যে, গত বৎসর ১৯২৯ সনের সঙ্গে তুলনায় আমাদের আমদানি কমিয়াছে চৌষট্টি কোটি টাকা এবং রপ্তানি কমিয়াছে সত্তর কোটি টাকা। আর যদি এক্সচেঞ্জের হ্রাস-বৃদ্ধির সঙ্গে আমাদের ব্যবসায়ের কোন যোগাযোগ না থাকিত, তাহা হইলে সরকার পক্ষ হইতে উচ্চ হার বজায় রাখিবার জন্য এত জেদই বা কেন? আবার ইহাও বলা হয় যে, বর্ত্তমান এক্সচেঞ্জ এমন একটি পবিত্র জিনিস যে, ইহা কোনও মতে বদলান যাইতে পারে না। এটি বোধ হয় নূতন আবিষ্কার। কেন-না, আমরা দেখাইয়াছি যে ১৯১৭ হইতে ১৯১৯ পর্য্যন্ত উহা আট বার পরিবর্ত্তন করা হইয়াছে। তাহার পরেও আরও দুইবার পরিবর্ত্তন হইয়াছে। যদি দশবার পরিবর্ত্তন করিয়াও ইহার পবিত্রতা বজায় থাকে, তবে আর একবার পরিবর্ত্তন করিলেই বেদ অশুদ্ধ হইবে কেন? স্যর জর্জ্জ সুষ্টার যে বলিয়াছেন আমাদের ক্রয় করিবার শক্তি আমাদের মালের মূল্যের উপর নির্ভর করে, তাহা ঠিক। কিন্তু আমাদের মালের মূল্য কি অন্যান্য দেশের মালের মূল্যের উপর নির্ভর করে না? এক্সচেঞ্জের হার বেশী হইলে বিদেশীদের এদেশে প্রতিযোগিতা করিবার সুবিধা হয়, তদুপরি আমাদের মালের মূল্য বিদেশী মালের তুলনায় বেশী হইলে বিক্রয় করিবার অসুবিধা ঘটে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি পরিমাণ এবং চাহিদার উপরেই মালের মূল্য নির্ভর করে। এই অবস্থায় সরকারি পক্ষের এই যে উক্তি—এক্সচেঞ্জের ঘটা বাড়ানোতে আমাদের কোন লাভলোকসান নাই,—তাহা মোটেই ঠিক নয়। আমরা মনে করি, ইংলণ্ডের ব্যবসায়ীদের সুবিধার জন্যই এক্সচেঞ্জের উচ্চ হার নির্দ্ধারণ করা হইয়াছে। যদি তাহা না হইত, তাহা হইলে সমগ্র ভারতবর্ষের তীব্র প্রতিবাদ সত্ত্বেও কেন ইহা কমান হইতেছে না? এই উচ্চ হার বজায় রাখিতে গিয়া কৃত্রিম উপায়ে টাকার বাজার গরম রাখা হইয়াছে, কোম্পানীর কাগজের দাম অসম্ভব কমিয়াছে, সরকারি ঋণের সুদ বাড়িয়াছে, ব্যাঙ্ক রেট অন্য দেশের তুলনায় উচ্চ রাখা হইয়াছে, চল্‌তি টাকার সংখ্যা কমান হইয়াছে, কারেন্সি রিজার্ভ নষ্ট করা হইয়াছে এবং আমাদের শিল্প-বাণিজ্যের অশেষ ক্ষতি করা হইয়াছে।





বাঙালী জাতির সমুদ্রযাত্রার স্মৃতি

অনেক দেশে এমন অনেক আচার অনুষ্ঠান আছে, যাহার উৎপত্তি তথাকার লোকেরা হয়ত ভুলিয়া গিয়াছে কিন্তু যাহা জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান্ বিদেশীরা অনুমান করিতে পারেন।

পৌষ মাসের শেষদিনে প্রত্যূষে বঙ্গের কত গ্রামে ও নগরে নদী ও পুষ্করিণীতে কলার খোলের তরী ফুলের মালায় ও প্রদীপে সাজাইয়া যে ভাসান হয়, তাহার অর্থ ও উৎপত্তির সম্বন্ধে স্বর্গীয়া ভগিনী নিবেদিতা এইরূপ একটি অনুমান করিয়াছেন। তাঁহার মতে বাঙালীরা সমুদ্রচারী জাতি ছিল। প্রধানতঃ পৌষে বাণিজ্যের নিমিত্ত ও অন্য উদ্দেশ্যে তাহাদের সমুদ্রযাত্রা আরম্ভ হইত। যাহারা সমুদ্রে গিয়াছে, ভগবানের নিকট তাহাদের কল্যাণ-কামনা করিয়া কলার খোলার তরীগুলি ভাসান হইত। যে-কারণে ও উদ্দেশ্যে এগুলি ভাসান হইত, তাহা লোকে ভুলিয়া গিয়াছে; কিন্তু অনুষ্ঠানটি রহিয়া গিয়াছে।

দি শিপ্ অব্ ফ্লাউয়ার্স্ অর্থাৎ পুষ্পের তরী নামে ভগিনী নিবেদিতার এ বিষয়ে জুলাই মাসের মডার্ণ রিভিয়ু পত্রিকায় একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। পৌষের শেষদিন সম্বন্ধে এই প্রবন্ধ হইতে দুটি বাক্য উদ্ধৃত করিতেছি। তাহা হইতে তাঁহার অনুমান বুঝা যাইবে।

"...it is the day of prayers for all travellers, all wanderers from their homes, for all whose footsteps at nightfall shall not lead to their own door."

"...ইহা সকল পর্য্যটকের জন্য প্রার্থনা করিবার দিন; নিজ নিজ নিকেতন হইতে দূরে পরিব্রাজকদের নিমিত্ত, সন্ধ্যাগমে যাহাদের পদবিক্ষেপ তাহাদিগকে স্বগৃহের দ্বারের দিকে লইয়া যাইবে না, তাহাদের নিমিত্ত প্রার্থনার দিন।"

"Here, too, in Bengal, we have a maritime people, once great amongst the world's sea-farers, and here, on the last day of *Paus*, we celebrate the opening of the annual commercial season, the old-time going-forth of merchant-enterprise and exploration."

"বাংলা দেশেও একটি সমুদ্রচারী জাতি দেখিতে পাই, যাহারা এক সময়ে পৃথিবীর সাগরগামী জাতিদের মধ্যে বড় ছিল, এবং এই বঙ্গে আমরা পৌষ সংক্রান্তিতে বাণিজ্য-মরস্থমের প্রারম্ভিক অনুষ্ঠান করি—যে ঋতুতে লোকে পুরাকালে প্রবাসযাত্রা করিয়া বাণিজ্যিক উদ্যমে ও অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইত।"

ভগিনী নিবেদিতার প্রবন্ধে তাঁহার অনুমানের সমর্থক অন্য কথাও আছে। বাঙালীদের সামুদ্রিক উদ্যমের প্রমাণ নানা দিক্ হইতে সংগৃহীত হইতে পারে। যেমন, রাজশাহী জেলার পাহাড়পুরে যে প্রাচীন স্তূপ খনন করিয়া আবিষ্কার করা হইয়াছে, তাহার শিল্পের সহিত সরকারী প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুক্ত কাশীনাথ দীক্ষিত জাভার প্রাচীন শিল্পের সাদৃশ্যের উল্লেখ করিয়াছেন। বাংলার সমুদ্রতট বিস্তৃত, এবং এখনও তাহাতে বন্দর আছে। বাংলার কোন কোন প্রাচীন কাব্যে সওদাগরদের সমুদ্রযাত্রার পরিচয় পাওয়া যায়। এই সব কারণে, ভগিনী নিবেদিতার অনুমান সত্য বলিয়া মনে হয়।

বাঙালীদের অহঙ্কার বাড়াইবার জন্য এই প্রসঙ্গের উত্থাপন করি নাই। পূর্ব্বে কোন জাতি কোন বিষয়ে বড় থাকিয়া পরে তাহার পতন হইলে, তাহা তাহার গৌরবের বিষয় না হইয়া বরং লজ্জার বিষয়ই হওয়া উচিত। কিন্তু কেবল লজ্জিত হইবার ও লজ্জা দিবার নিমিত্তও এই প্রসঙ্গের উত্থাপন করি নাই। আমাদের উদ্দেশ্য অন্য প্রকার।

এই বাংলার মাটি, বাংলার জল, ও বাংলার বাতাস হইতে শক্তি সঞ্চয় করিয়া বাঙালী আগে যাহা করিতে পারিয়াছিল, এখনও তাহা করিতে পারে, ইহা স্মরণ করিবার ও করাইবার জন্য আমরা ভগিনী নিবেদিতার প্রবন্ধটির উল্লেখ করিলাম। অবশ্য, কোন জাতি আগে যদি কোন বড় কাজ না করিয়া থাকে, তাহা হইলে বর্ত্তমানে বা ভবিষ্যতেও যে তাহারা তাহা করিতে পারিবে না, ইহা স্বতঃসিদ্ধ নহে। ইউরোপ ও আমেরিকার যে-সব জাতির লোক এখন নানাবিধ আকাশযান দ্বারা আকাশপথে বিচরণ করে, প্রাচীন কালে তাহারা তাহা করিত না। আমরা প্রাচীন কালে সমুদ্রচারী না থাকিলেও, বর্ত্তমানে হইতে পারি। তাহার জন্য স্বদেশে ও বিদেশে শিক্ষা আবশ্যক। কিন্তু বাঙালী ছেলেরা যেন মনে না করেন, যে, তাঁহারা শীঘ্র ও সহজেই জাহাজের মালিক বা ক্যাপ্টেন, এডমির্‌্যাল, ইত্যাদি হইয়া উঠিবেন। অন্য কাজের মত, এই সব কাজও আরম্ভ করিতে হইবে সামান্য ভাবে।

—

অধ্যাপক চন্দ্রশেখর বেঙ্কট রামনের সংবর্দ্ধনা

গত ১১ই আষাঢ় কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটী অধ্যাপক স্যার চন্দ্রশেখর বেঙ্কট রামন্‌কে পদার্থবিদ্যা-বিষয়ে বৈজ্ঞানিক গবেষণায় তাঁহার অসাধারণ কৃতিত্বের জন্য অভিনন্দিত করেন। কলিকাতার মেয়র শ্রীযুক্ত ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় অভিনন্দনপত্র পাঠ করেন। বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য এশিয়ায় অধ্যাপক রামন্‌ই প্রথমে নোবেল পুরস্কার পাইয়াছেন। ইহা একটি স্মরণীয় ঘটনা, এবং ইহার দ্বারা তিনি স্বয়ং প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াইছেন, অধিকন্তু ইহার দ্বারা ভারতবর্ষের ও এশিয়ার গৌরব বৃদ্ধি হইয়াছে। অতএব তাঁহার সংবর্দ্ধনা খুব ঠিক্‌ই হইয়াছে।

অধ্যাপক রামন্ বিশেষ করিয়া যে আবিষ্ক্রিয়াটির জন্য নোবেল পুরস্কার পাইয়াছেন, তাহার পর তিনি আরও গবেষণা করিয়াছেন। তাহার মধ্যে আলোকের স্বরূপ সম্বন্ধে তিনি যাহা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাহার যাথার্থ্য আরও পরীক্ষা দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হইলে, তাহা তাঁহার অন্যান্য আবিষ্ক্রিয়া অপেক্ষা গরীয়ান্ বলিয়া গৃহীত হইবার সম্ভাবনা আছে।

মিউনিসিপ্যালিটীর অভিনন্দনের উত্তরে তিনি যে-সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা যথার্থ। বৈজ্ঞানিক জ্ঞানবিস্তারের নিমিত্ত এবং গবেষণার দ্বারা নূতন বৈজ্ঞানিক জ্ঞান আহরণের জন্য ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার "ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশ্যন ফর দি কাল্টিভেশ্যন অব সায়েন্স" স্থাপন করেন। এই বিজ্ঞানসভার পরীক্ষাগারেই যুবা বেঙ্কট রামন্ অধ্যাপক হইবার পূর্ব্বে গবেষণা করিতেন। তখন তিনি বিখ্যাত হন নাই। স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সেই অবস্থায় তাঁহাকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিদ্যার প্রধান অধ্যাপক নিযুক্ত করেন। এই উভয় ঘটনার উল্লেখ করিয়া অধ্যাপক রামন্ ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার এবং স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

তিনি বলেন, গত পনর বৎসর তিনি অনেক মনস্বী সহকর্ম্মী পাইয়াছেন, ইহা তাঁহার সৌভাগ্য। তাঁহার মতে গবেষণায় তাঁহার অনেক কৃতিত্ব তাঁহাদের সাহায্যের ফলে সম্ভব হইয়াছে। "সাধারণতঃ ইহাই মনে করা হয়, যে, অধ্যাপকের চালনা অনুসারে কাজ করিয়া ছাত্রেরাই উপকৃত হয়। বস্তুতঃ, অধ্যাপকও, তাঁহার অধীনে যে-সব প্রতিভাশালী ছাত্রেরা কাজ করে, তাহাদের সাহচর্য্যে সমান উপকৃত হন।"

কলিকাতা সম্বন্ধে ডাঃ রামন্ বলেন:—

"For a hundred years, Calcutta has been the intellectual metropolis not only of Bengal, or of India, but of the whole of Asia. From Calcutta has gone forth a living stream of knowledge in many branches of study. It is inspiring to think of the long succession of scholars, both Indian and European, who have lived in this city, made it their own, and given it of their best. It must be a profound privilege to be able to work and live in such an environment."

"গত এক শত বৎসর কলিকাতা বিদ্যাবুদ্ধিবিষয়ে, শুধু বাংলা বা ভারতবর্ষের নহে, সমগ্র এশিয়ার প্রধান নগর হইয়া আছে। বিদ্যানুশীলনের বহু শাখায় কলিকাতা হইতে জ্ঞানের প্রাণবান্ স্রোত নানাদিকে প্রবাহিত হইয়াছে। যে-সকল ভারতীয় ও ইউরোপীয় পণ্ডিত-

পরম্পরা এই শহরে বাস করিয়াছেন, ইহাকে নিজের করিয়াছেন, এবং ইহাকে তাঁহাদের মনীষার শ্রেষ্ঠ সম্পদ দান করিয়াছেন, তাঁহাদের কথা ভাবিলে মন অনুপ্রাণিত হয়। এরূপ স্থানে বাস করা ও কাজ করা একটি বিশেষ অধিকার।"

আমরা বাংলার ও কলিকাতার মানুষ। আমাদের মন সহজেই কলিকাতার এই প্রশংসা সত্য বলিয়া গ্রহণ করিবার তৃপ্তি পাইতে চায়। সেই জন্য, কলিকাতার সহিত যাঁহাদেব কোনই সম্পর্ক নাই, এই প্রশংসা কি পরিমাণে ন্যায়তঃ কলিকাতার প্রাপ্য, তাঁহারাই তাহাব যথার্থ বিচারক।

আমরা যাহা লিখিলাম, তাঁহার সংবাদ-অংশের উপকরণ কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল গেজেটের শোভন ও বৈচিত্র্যপূর্ণ বিশেষ "রামন্ সংখ্যা" হইতে গৃহীত।

—

বাঙালীর বুদ্ধিবিদ্যার হ্রাস বৃদ্ধি

কয়েক বৎসর হইতে দেখা যাইতেছে, যে, সিবিল সার্বিস, রাজস্ব-বিভাগের চাকরী, প্রভৃতির জন্য যে-সব পরীক্ষায় সমস্ত ভারতবর্ষের যুবকদের মধ্যে প্রতিযোগিতা হয়, তাহাতে বাঙালী যুবকেরা আগেকার মত কৃতিত্ব দেখাইতে পারিতেছে না। ইহা হইতে অনেকে মনে করেন, যে, বাঙালী ছাত্রদের বুদ্ধিবিদ্যা, বিদ্যানুরাগ ও শ্রমশীলতা হ্রাস পাইয়াছে। অনেক বৎসর হইতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া অপেক্ষাকৃত সহজ হইয়া পড়ায় ঐরূপ কুফলের উৎপত্তি অসম্ভব নহে। আমাদের মনে হয়, কিয়ৎ পরিমাণে ঐ প্রকার কুফল সত্য সত্যই ফলিয়াছে। অতিরিক্ত হুজুক-প্রিয়তা ইহার অন্যতম কারণ। তাহার জন্য "নেতাদের" দায়িত্ব আছে।

কিন্তু প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় বাঙালী ছাত্রদের অপেক্ষাকৃত অকৃতিত্বের অন্য কোন কোন কারণও থাকিতে পারে।

ইংরেজী শিক্ষা অন্য অনেক প্রদেশের চেয়ে অনেক আগে বাংলা দেশে প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। সেই জন্য বাঙালীদিগকে বুদ্ধিবিদ্যায় শ্রেষ্ঠ মনে করা হইত। পরে অন্যান্য প্রদেশ ক্রমশঃ বঙ্গের সমকক্ষ হইয়া উঠিতেছে। ইহা সম্ভবতঃ একটি কারণ।

নানা কারণে বঙ্গে চাকরীর, বিশেষতঃ সরকারী চাকরীর, প্রতি বিরাগ ক্রমে ক্রমে ছাত্রদের মধ্যে বিস্তার লাভ করিতেছে। অল্প বেতনের চাকরীর জন্যও শত শত দরখাস্ত পড়ে দেখিয়া চাকরীর প্রতি বিরাগের সত্যতা অনেকে অস্বীকার করিতে পারেন। কিন্তু কথাটা সত্য। বেশী দরখাস্ত পড়িবার একটা কারণ, আজকাল আগেকার চেয়ে অনেক বেশী ছেলে পাস হয়। সরকারী চাকরীর প্রতি বিরাগবশতঃ অনেক বিশেষ বুদ্ধিমান্ ছাত্র পূর্ব্বোল্লিখিত পরীক্ষাগুলি দেয় না। ইহা সম্ভবতঃ আর একটি কারণ।

শুধু ক্লাসের নির্দ্দিষ্ট বহি পড়িলে জ্ঞানের প্রসার বাড়ে না, বুদ্ধি যথেষ্ট মার্জ্জিত হয় না। অন্যান্য বহি এবং উৎকৃষ্ট সাময়িক পত্র পড়া দরকার। বাংলা দেশে ছেলেমেয়েরা "পাঠ্যপুস্তক" ছাড়া যাহা পড়ে, তাহা প্রায়ই বাংলা উপন্যাস, বাংলা মাসিকপত্র, এবং অবশ্য দৈনিক কাগজ। এ সবই পড়া দরকার। কিন্তু কেবল উপন্যাস ও গল্পপূর্ণ বাংলা ও ইংরেজী মাসিক পড়িলে জ্ঞান বৃদ্ধি হয় না। অন্য রকমের ভাল বহি এবং সারবান্ দেশী ও বিদেশী মাসিক ও ত্রৈমাসিক কাগজ পড়া উচিত। যাহা পড়িলে জ্ঞান বাড়ে, এরূপ বহি ইংরেজীতে যত আছে, বাংলায় তত নাই। বাংলা নানারকম ভাল বই ছেলেরা অবশ্যই পড়িবেন। কিন্তু ইংরেজীও বেশী পড়া দরকার। অন্যান্য প্রদেশের যে-সব ছেলে ক্লাসের বই ছাড়া অন্য বই পড়ে, তাহারা ইংরেজীই বেশী পড়ে তাহারা দেশী ও বিদেশী ইংরেজী ভাল ভাল প্রবন্ধপূর্ণ মাসিক কাগজও বাঙালী ছেলেদের চেয়ে বেশী পড়ে। এই কারণে তাহাদের নানাবিষয়ক জ্ঞান বেশী হইবার অধিকতর সম্ভাবনা ঘটে।

ভারতবর্ষের সকল প্রদেশের ছাত্রদের মধ্যে বাঙালী ছাত্রদিগকে না-পছন্দ করিবার কারণ থাকায় পরীক্ষায় তাহাদিগকে নীচে ফেলিবার চেষ্টা জ্ঞাতসারে বা

অজ্ঞাতসারে হইতে পারে। ইহা অসম্ভব নহে, কিংবা হইলে তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় মনে করা উচিত নয়।

যাহা হউক, এ সমস্তই অনুমান। বিঘ্নবাধা যতই থাকুক, সমস্ত ভারতবাসীকে যেমন জগতের মধ্যে আত্মরক্ষা করিতে হইবে, তেমনই বাঙালীকেও ভারতবর্ষের মধ্যে আত্মরক্ষা করিতে হইবে। আমরা ইহা বলি না, যে, বাঙালীরা চিরকাল ভারতবর্ষের সব জাতির মধ্যে সব বিষয়ে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়া থাকুক। এরূপ অসাম্য কখনও জাতীয় একতার পরিপোষক হইতে পারে না। মোটের উপর সব প্রদেশের মধ্যে একটা সাম্য উৎপন্ন হওয়া উচিত; কেহ কোন বিষয়ে শ্রেষ্ঠ, অপরে অন্য বিষয়ে শ্রেষ্ঠ হইবেন।

বর্ত্তমান ১৯৩১ সালের লোকসংখ্যা-গণনায় দেখা গিয়াছে, ভারতবর্ষে ৩৫ কোটি লোক বাস করে। তাহার মধ্যে বাংলায় পাঁচ কোটি লোকের বসতি। অতএব আমরা সমগ্র ভারতবর্ষের জনমণ্ডলীর এক-সপ্তমাংশ। সুতরাং আমাদিগকে দেখিতে হইবে, যেন কোন বিষয়ে আমাদের কৃতিত্ব ন্যূনকল্পে সমগ্র ভারতীয়দের কৃতিত্বের এক-সপ্তমাংশ অপেক্ষা কম না হয়।

প্রভু ইংরেজদের দ্বারা ব। তাহাদের ব্যবস্থা অনুসারে যে-সব পরীক্ষা গৃহীত হয় কিংবা যে-সব বিদ্যাবিষয়ক সম্মান বা পুরস্কার দেওয়া হয়, তাহাতে নানা কারণে বাঙালীর প্রতি অবিচার হইতে পারে—যদিও আপনাদের অকৃতিত্বের সমস্ত দোষ এরূপ আনুমানিক অবিচারের ঘাড়ে চাপান নির্ব্বুদ্ধিতার কাজ হইবে। যে-সব বৃত্তি, পুরস্কার, সম্মান বা নিয়োগ সম্পূর্ণ রূপে সম্পূর্ণ স্বাধীন কোন ইউরোপীয় জাতির হাতে আছে, তাহাতে বাঙালীর প্রতি বাঙালী বলিয়া অবিচার যেমন হইতে পারে না, বাঙালীর প্রতি পক্ষপাতিত্বও তেমনই অসম্ভব। কারণ, এই সব স্বাধীন জাতির নিকট বাঙালী-অবাঙালীর মধ্যে কোন প্রভেদ নাই; সব ভারতীয়ই সমান। এই জন্য জার্ম্মেনীতে দুই বার যাহা ঘটিয়াছে, তাহা বিবেচনার যোগ্য মনে করি।

কিছু কাল পূর্ব্বে জার্ম্মেনীর বিদ্বৎ-পরিষদের ভারতীয় প্রতিষ্ঠান (India Institute of Die Deutsche Akademie), যে-সব ভারতীয় বিদ্যার্থী জার্ম্মেনীতে বিজ্ঞানাদির অনুশীলন করিতে চান, তাঁহাদিগকে সাতটি বৃত্তি দেন। এইগুলির জন্য ভারতবর্ষের সকল প্রদেশ ও বিশ্ববিদ্যালয় হইতে আবেদন গিয়াছিল। অধিকাংশ বৃত্তি বাঙালী বিদ্যার্থীরা পাইয়াছিলেন। বর্ত্তমান বৎসরে জার্ম্মেনীর ঐ ভারতবর্ষ-সম্বন্ধীয় প্রতিষ্ঠান আবার কুড়িটি বৃত্তি দিবার অঙ্গীকার করেন। ভারতবর্ষের প্রায় সব বিশ্ববিদ্যালয় এবং বড় বড় কলেজ হইতে প্রায় তিন শত আবেদন জার্ম্মেনীতে পৌঁছে। কুড়িটির মধ্যে এগারটি বৃত্তি বাঙালী বিদ্যার্থীরা পাইয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে একজন বাঙালী মহিলাও আছেন। তিনি ডাক্তার কুমারী মৈত্রেয়ী বসু, এম্‌-বি। ইনি ম্যুনিক বিশ্ববিদ্যালয়ে চিকিৎসা-বিদ্যার উচ্চ উচ্চ অঙ্গে গবেষণা করিবেন ও শিক্ষালাভ করিবেন।

এই প্রতিষ্ঠানের অবৈতনিক সেক্রেটরী অধ্যাপক ডক্টর টিয়েরফেল্ডার পদার্থবিদ্যার (Physics-এর) বৃত্তিটির জন্য খুব বেশী প্রতিযোগিতা হইয়াছিল, লিখিয়াছেন। ইহার জন্য ভাল ভাল গ্রাডুয়েটদের নিকট হইতে সতেরটি আবেদন যায়; আবেদকেরা প্রায় সবাই এম্‌-এস্‌সি। তাঁহাদের মধ্যে শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বৃত্তিটির জন্য মনোনীত হইয়াছেন।

জার্ম্মেন বৃত্তিগুলির জন্য মনোনয়ন হইতে মনে হইতেছে, যে, বাঙালী বিদ্যার্থীদের মধ্যে বুদ্ধিমান্‌, জ্ঞানানুরাগী ও শ্রমশীল লোক এখনও আছেন। বাঙালী ছাত্রদের বুদ্ধিশক্তি এখনও আছে। সকলে তাহার, অপপ্রয়োগ ও অপচয় না করিয়া, সুপ্রয়োগ করিলে বর্ত্তমানে ও ভবিষ্যতে বাঙালী জাতির খ্যাতি হ্রাস পাইবে না।

—

কলিকাতায় বাঙালী পদার্থ-বৈজ্ঞানিকদের গবেষণার সুযোগ

কলিকাতা মিউনিসিপালিটী কর্ত্তৃক অধ্যাপক রামনের সংবর্দ্ধনা উপলক্ষ্যে কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল গেজেটের যে একটি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে,

তাহাতে, অধ্যাপক রামন্ যে পদার্থবিদ্যা-বিষয়ে একটি গবেষক-সম্প্রদায় ("School of Physics") প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন বলেন, তৎসম্বন্ধে একটি অস্বাক্ষরিত প্রবন্ধ আছে। এই প্রবন্ধ হইতে জানিতে পারা যায়, যে,

"Prof. Raman's position in the world of science to-day depends on the fact that he has not only himself been an investigator of the first rank, but has also inspired a whole group of men whose work has firmly established the reputation of Calcutta as a centre of research." "The call to the Calcutta University in July, 1917, freed him from the bondage of official work and enabled him to devote attention to the training of a long succession of students in the laboratories of the University College of Science and of the Indian Association for the Cultivation of Science. An idea of the influence Prof Raman has exerted in building up an Indian School of Physics may be obtained by mentioning some of the physicists who, at one time or another, worked in Calcutta in these two institutions and now occupy independent scientific positions."

তাৎপর্য্য। "আজ বৈজ্ঞানিক জগতে অধ্যাপক রামনের স্থান কেবল ইহার উপরই নির্ভর করে না, যে, তিনি নিজে একজন প্রথম শ্রেণীর গবেষক, কিন্তু ইহার উপরও নির্ভর করে, যে, তিনি এমন এক দল লোককে অনুপ্রাণিত করিয়াছেন যাঁহাদের কাজ গবেষণার কেন্দ্ররূপে কলিকাতার খ্যাতি দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে।" "১৯১৭ সালের জুলাই মাসে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁহাকে আহ্বান তাঁহাকে সরকারী কাজের দাসত্ব হইতে মুক্ত করে, এবং কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বিজ্ঞান-কলেজের এবং ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারের বিজ্ঞান-সভার পরীক্ষণাগার দুটিতে দীর্ঘ ছাত্রপরম্পরাকে শিক্ষিত করিবার কাজে মনোযোগ দিতে সমর্থ করে। যে-সব পদার্থ-বৈজ্ঞানিক কোন-না-কোন সময়ে এই দুটি প্রতিষ্ঠানে কাজ করিয়াছিলেন এবং এক্ষণে স্বতন্ত্র বৈজ্ঞানিক পদে আসীন আছেন, তাঁহাদের কয়েক জনের নাম করিলে, অধ্যাপক রামন্ একটি ভারতীয় পদার্থ-বৈজ্ঞানিক সম্প্রদায় গঠনে কিরূপ প্রভাব প্রয়োগ করিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে ধারণা জন্মিবে।"

ইহার পরে, সরকারী আবহবিদ্যা-বিভাগে, সরকারী প্যাটেন্ট আপিসে এবং ভারতবর্ষের বহু বিশ্ববিদ্যালয়ে বৈজ্ঞানিক পদে অধিষ্ঠিত আটত্রিশ জন ভদ্রলোকের নাম আছে। প্রবন্ধটি হইতে উদ্ধৃত বাক্যগুলি হইতে বুঝা যায়, যে, ইঁহারা হয় অধ্যাপক রামনের শিষ্যরূপে কিংবা তাঁহার প্রভাব ও অনুপ্রাণনার বশে কলিকাতার দুটি পূর্ব্বোল্লিখিত প্রতিষ্ঠানে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে অধ্যাপক মেঘনাদ সাহা, ঢাকার অধ্যাপক আইন্সটাইনের একটি মতের সংশোধক সত্যেন্দ্রনাথ বসু প্রভৃতিরও নাম আছে। ইঁহারা অধ্যাপক রামনের শিষ্য ছিলেন কিংবা অন্য প্রকারে তাঁহার দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন, তাহা তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলে জানা যাইবে।

দেখা যাইতেছে, বাঙালীর দ্বারা প্রতিষ্ঠিত এবং প্রধানতঃ বাঙালীদের অর্থে পরিচালিত বঙ্গের রাজধানী কলিকাতায় অবস্থিত দুটি বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠানে ৩৮ জন নাম-করা বৈজ্ঞানিক কাজ করিয়াছেন। এই ৩৮ জনের মধ্যে ১৫ (পনের) জন বাঙালী, ২৩ (তেইশ) জন বাঙালী নহেন। বাঙালীর সংখ্যা কম হইবার কারণ অনেক প্রকার হইতে পারে। ১ম—বাঙালী বিদ্যার্থীদের মধ্যে বিজ্ঞানে অনুরাগ ও শ্রমশীলতা এত কম, যে, তাঁহারা যত জন নিজেদের প্রদেশে স্থিত কলিকাতায় বৈজ্ঞানিক কার্য্য করিয়াছেন, দূর প্রদেশ হইতে আগত তাহা অপেক্ষা বেশী জন কলিকাতায় ঐরূপ কাজ করিয়াছেন। ২য়—হয়ত আরও অধিকসংখ্যক বাঙালী বিদ্যার্থী কাজ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের বৈজ্ঞানিক প্রতিভা না-থাকায় তাঁহারা নাম করিতে পারেন নাই। ৩য়—হয়ত আরও অধিকসংখ্যক বাঙালী কাজ করিতে পারিতেন ও ইচ্ছুক ছিলেন, কিন্তু তাঁহাদিগকে অন্যদের সমান সুযোগ ও উৎসাহ দেওয়া হয় নাই। ৪র্থ—যত বাঙালী এখানে বৈজ্ঞানিক কাজ করিয়াছেন, তাঁহারা হয়ত অন্যদের সমকক্ষ হইলেও তালিকায় তাঁহাদের নাম উঠে নাই। (দেখা যাইতেছে, যে, লাহোরের দয়ানন্দ এংলো-বেদিক কলেজের শ্রীযুক্ত গোবর্দ্ধনলাল দত্ত ছাড়া, পাটনা, কাশী, আগ্রা, পঞ্জাব, নাগপুর, চিদাম্বরম্, বোম্বাই,

রেঙ্গুন, এবং মান্দ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে এবং সরকারী প্যাণ্টেণ্ট আফিসে নিযুক্ত যে-সব বৈজ্ঞানিক কলিকাতার প্রতিষ্ঠান দুটিতে কাজ করিয়াছেন, তাঁহাদের সংখ্যা ১৮, কিন্তু ১৮ জনই অবাঙালী। ইহা হইতে অনুমান হইতে পারে, যে, (সম্ভবতঃ) ৫ম—বঙ্গের বাহিরের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের লোকদিগকে কলিকাতার প্রতিষ্ঠান দুটিতে গবেষণা করিবার সুযোগ যেরূপ দেওয়া হয়, বাঙালী বৈজ্ঞানিক কর্ম্মীরা ঐ সব বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরীর সুযোগ সেরূপ পান না। কিংবা, ৬ষ্ঠ—কলিকাতায় বৈজ্ঞানিক কর্ম্ম করিবার সুযোগপ্রাপ্ত অবাঙালীরা অন্যত্র কাজের জন্য দরখাস্ত করিলে যেরূপ সুপারিশ পান, কলিকাতায় বৈজ্ঞানিক কর্ম্ম করিবার সুযোগপ্রাপ্ত বাঙালীরা অন্যত্র কাজের জন্য দরখাস্ত করিলে তদ্রূপ সুপারিশ পান না।

এই অনুমানগুলির মধ্যে কোন্‌টি বা কোন্ কোন্‌টি সত্য, কিংবা একটিও সত্য কিনা, তাহা আমরা বলিতে অসমর্থ। কিন্তু আমাদের এই দৃঢ় বিশ্বাস আছে, যে, বাঙালী যুবকেরা অটলপ্রতিজ্ঞ হইলে সকল প্রকারের অসুবিধা ও বাধা অতিক্রম করিয়া কৃতী হইতে এবং বঙ্গের নাম উজ্জ্বল করিতে পারেন।

—

ফরিদপুরে মুসলমানদের কন্‌ফারেন্স

বাংলা দেশের ন্যাশন্যালিষ্ট অর্থাৎ স্বাজাতিক মুসলমানদিগের সম্প্রতি একটি কন্‌ফারেন্স হইয়া গিয়াছে। তাহাতে, তাঁহারা কি চান, তাহা সভাপতি ডাক্তার আন্সারী মহাশয়ের বক্তৃতায় উক্ত হইয়াছে। এই বক্তৃতা পড়িলে বুঝা যায়, মুসলমানদের মধ্যে যাঁহারা স্বতন্ত্র সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচন চান এবং যাঁহারা অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বীদের সহিত একত্র সম্মিলিত নির্ব্বাচন চান, এই উভয় দলের মধ্যে প্রভেদ এই নির্ব্বাচনরীতি লইয়াই; অন্যান্য বিষয়ে তাঁহাদের দাবী সারতঃ একই।

সম্মিলিত নির্ব্বাচন এবং সাম্প্রদায়িক স্বতন্ত্র নির্ব্বাচন প্রভৃতি বিষয়ে আমাদের মত আমরা, কারণ ও যুক্তি প্রদর্শন করিয়া, অনেক বার লিখিয়াছি। বার-বার একই কথা লিখিতে ইচ্ছা হয় না।

রফা সম্বন্ধে আমাদের মত এই, যে, যে কোন প্রকারের রফাই হউক না কেন, তাহা নির্দ্দিষ্ট কয়েক বৎসরের জন্য হওয়া উচিত, এবং ঐ মিয়াদ শেষ হইয়া গেলে ঠিক অসাম্প্রদায়িক ও গণতান্ত্রিক রীতি যাহা তাহাই পুনর্ব্বার তর্কবিতর্ক বাগ্‌বিতণ্ডা ব্যতিরেকে প্রবর্ত্তিত হওয়া উচিত। কাগজে পড়িয়াছি, মৌলানা শৌকৎ আলি স্বতন্ত্র নির্ব্বাচন রীতি সম্বন্ধে এই প্রকার বন্দোবস্তে রাজী ছিলেন, যে, আপাততঃ দশ বৎসরের জন্য এই রীতি চলুক, তাহার পর নির্ব্বাচিত মুসলমান প্রতিনিধিদের দুই-তৃতীয়াংশ যদি সম্মিলিত নির্ব্বাচনে সম্মত হন তাহা হইলে তাহাই প্রবর্ত্তিত হইবে, নতুবা স্বতন্ত্রনির্ব্বাচন রীতিই বাহাল থাকিবে। এইরূপ ব্যবস্থার দোষ সহজেই ধরা যায়। স্বতন্ত্র নির্ব্বাচন রীতি অনুসারে যে-সকল মুসলমান প্রতিনিধি ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশ করিবেন, সম্ভবতঃ তাঁহাদের অনেকে সম্মিলিত নির্ব্বাচন রীতি প্রবর্ত্তিত থাকিলে বা হইলে নির্ব্বাচিত হইতেন না বা হইবেন না। এ অবস্থায় তাঁহাদের অধিকাংশ যে কোনকালে স্বতন্ত্র নির্ব্বাচন রীতির বিরুদ্ধে এবং সম্মিলিত নির্ব্বাচন রীতির পক্ষে মত দিবেন, এমন আশা করা যায় না। সুতরাং মৌলানা শৌকৎ আলি প্রকারান্তরে ইহাই চাহিতেছেন, যে, স্বতন্ত্র নির্ব্বাচনরীতি চিরস্থায়ী হউক, অন্ততঃ অনির্দ্দিষ্ট ও খুব দীর্ঘ কালের জন্য স্থায়ী হউক।

রফা যাহা হইবে, তাহা মহাত্মা গান্ধী ও কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি করিবেন। মহাত্মা গান্ধী এবং ওয়ার্কিং কমিটির অন্যান্য সভ্যদের মধ্যে হিন্দুই বেশী। কিন্তু তাঁহারা হিন্দুর দিকে না ঝুঁকিয়া মুসলমানের দিকেই ঝুঁকিয়া কাজ করেন। সেই জন্য বলিয়াছেন যে, তাঁহারা মুসলমানদের সম্মিলিত দাবী নির্ব্বিচারে গ্রহণ করিবেন। তাঁহারা যে হিন্দুর দিকে ঝুঁকিয়া কাজ করেন না, ইহা ভাল। কারণ, সমগ্র ভারতে হিন্দুদের সংখ্যাই বেশী; সুতরাং মুসলমানদের মধ্যে অন্ততঃ অনেক লোকের বিশ্বাসভাজন হইতে হইলে হিন্দুদের বক্তব্যে বেশী মন না-দেওয়া দরকার।

হিন্দু মহাসভার মতবিজ্ঞপ্তি পত্র

রফা যাহাই হউক, প্রকৃত অসাম্প্রদায়িক ও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা কিরূপ হওয়া উচিত, দেশে তাহা বলিবার লোক থাকা দরকার। আমাদের বিশ্বাস, গত মার্চ্চ মাসের শেষে দিল্লী হইতে হিন্দু মহাসভা যেরূপ ব্যবস্থার বর্ণনা প্রকাশ করেন, তাহাই এই প্রকার ব্যবস্থা। ইহা গত বৈশাখ মাসের প্রবাসীর বিবিধ প্রসঙ্গে মুদ্রিত হইয়াছে। হিন্দু মহাসভা হিন্দুদের সমিতি, এবং হিন্দুসম্প্রদায়ের প্রতি অবিচার নিবারণ চেষ্টা ইহার অন্যতম উদ্দেশ্য। কিন্তু ইহাকে মুসলমানদের সাম্প্রদায়িক সমিতির সদৃশ মনে করিলে ভুল হইবে। মুসলমান সমিতি সকল, এমন কি ন্যাশন্যালিষ্ঠ মুস্লিম কনফারেন্সগুলি পর্য্যন্ত, যে-যে প্রদেশে মুসলমানরা সংখ্যাভূয়িষ্ঠ ও যথায় তাহারা সংখ্যালঘিষ্ঠ উভয়ত্রই মুসলমানদের জন্য বিশেষ কিছু চাহিয়াছে। এ প্রকার দাবীর উত্থাপন মুসলমানরাই আগে করিয়াছেন। হিন্দুরা কখনও কোথাও আগে হইতেই এরূপ দাবী করেন নাই, যে, "যেহেতু অমুক অমুক প্রদেশে আমরা সংখ্যায় অন্য সবদের চেয়ে বেশী অতএব আমাদের প্রতিনিধির সংখ্যা আইন অনুসারে অধিকতম হইবেই বলিয়া বাঁধা থাক্," কিংবা "যেহেতু আমরা অমুক অমুক প্রদেশে মুসলমানদের চেয়ে সংখ্যায় কম, অতএব সেই সেই প্রদেশে আমাদের লোকসংখ্যার অনুপাতে প্রতিনিধির সংখ্যা যত হইতে পারে, তাহা অপেক্ষা বেশীসংখ্যক প্রতিনিধি আইন দ্বারা আমাদিগকে দেওয়া হউক।"

মুসলমানেরা এই উভয় রকম দাবী করা সত্ত্বেও হিন্দু মহাসভা দিল্লী হইতে মার্চ্চ মাসে প্রকাশিত মতবিজ্ঞপ্তি পত্রে সমগ্র ভারতের হিন্দুদের বা কোন প্রদেশের সংখ্যাভূয়িষ্ঠ বা সংখ্যালঘিষ্ঠ হিন্দুদের জন্য কোন দাবীই করেন নাই; কেবল স্বাজাতিক, অসাম্প্রদায়িক, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা কি হওয়া উচিত, তাহাই বলিয়াছেন। অতএব হিন্দু মহাসভা সাম্প্রদায়িক সমিতি হইলেও, যাহা অসাম্প্রদায়িক তাহাই বলিয়াছেন।

এখানে ইহা বলা আবশ্যক, যে, পঞ্জাবের শিখরা ও হিন্দুরা, তথায় অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক রীতি প্রবর্ত্তিত না হইলে তাঁহাদের কি কি বিশেষ দাবী শুনিতে হইবে তাহা বলিয়াছেন; কিন্তু তাঁহারা আগেই সে কথা বলেন নাই, তথাকার মুসলমানদের অসঙ্গত দাবীর উত্তরেই নিজেদের দাবী জানাইয়াছেন।

—

পঞ্জাব ও বঙ্গের হিন্দুদিগকে বঞ্চিত করিবার চেষ্টা?

ন্যাশন্যালিষ্ট মুসলমানদের অনেকের মনোভাব কিরূপ, তাহার দৃষ্টান্ত স্বরূপ একটি বিষয়ের এখানে উল্লেখ করিতেছি। লক্ষ্ণৌতে যখন তাঁহাদের কন্ফারেন্স হয়, তখন তাঁহারা বলেন, কোনও প্রদেশে কোন সম্প্রদায় মোট লোকসংখ্যার শতকরা ত্রিশ জনের কম হইলে তাহারা সংখ্যার অনুপাতে প্রতিনিধি ত পাইবেই, অধিকন্তু ব্যবস্থাপক সভার আরও অধিক সভ্যপদ পাইবার চেষ্টা করিতে পারিবে। শতকরা ত্রিশ বলিবার কারণ এইরূপ অনুমিত হইয়াছে, যে, যাহাতে পঞ্জাবের ও বঙ্গের হিন্দুরা এই সুবিধা না পায়। সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়মাত্রেই এই সুবিধা পাইবে বলিলে এই দুই প্রদেশের হিন্দুরা তাহা পাইত। কিন্তু শতকরা ত্রিশের কম হওয়া চাই, এই সর্ত্ত দ্বারা তাহাদিগকে বাদ দেওয়া হইল; কেন-না ১৯২১ সালের সেন্সস অনুসারে পঞ্জাব বা বাংলা উভয় প্রদেশেই তাহারা শতকরা ত্রিশের বেশী। লক্ষ্ণৌ কন্ফারেন্সের পর একটা গুজব রটিয়াছে, যে, বর্ত্তমান ১৯৩১ সালের সেন্সসে পঞ্জাবে হিন্দুদের অনুপাত শতকরা ত্রিশেরও কম হইয়া গিয়াছে। এই কারণে, ফরিদপুরে মুসলমানদের কন্ফারেন্সে শতকরা ত্রিশের পরিবর্ত্তে শতকরা পঁচিশ বলা হইয়াছে। অর্থাৎ যেমন করিয়াই হউক, যে যে প্রদেশের মুসলমানরা সংখ্যায় কম সুবিধাটা তাহাদের পাওয়া চাই, কিন্তু বঙ্গের ও পঞ্জাবের হিন্দুরা যেন তাহা না পায়! মুসলমানরা যেখানে যেখানে সংখ্যায় কম, সর্ব্বত্রই শতকরা পঁচিশের চেয়ে কম; সুতরাং কোথাও উল্লিখিত সুবিধা হইতে বঞ্চিত হইবে না। নিজেদের জন্য বিশেষ কোন সুবিধা চাওয়া স্বার্থপরতা; কিন্তু যাহাতে নিজেদের সদৃশ অবস্থার কোন কোন প্রদেশের অন্য লোকেরা সে সুবিধা হইতে বঞ্চিত হয়, সর্ব্বপ্রযত্নে তাহার চেষ্টা করা স্বার্থপরতা হইতে নিকৃষ্ট আরও কিছু।

প্রতিহিংসার সম্ভাবনা রক্ষাকবচ !

একটা কথা কোন কোন মুসলমান নেতা অনেকবার বলিয়াছেন ; ডাক্তারী আন্সারীও আগে বলিয়াছিলেন, ফরিদপুরেও আবার বলিয়াছেন। তাহার উল্লেখ করিতে হইতেছে। কথাটা দুঃখকর। তাহার মর্ম্ম এই। তিনি মুসলমানদিগকে এই বিশ্বাসে বুক বাঁধিতে বলিয়াছেন, যে, হিন্দুপ্রধান প্রদেশসকলে মুসলমানদের প্রতি হিন্দুদের ব্যবহার মুসলমানপ্রধান প্রদেশসকলে হিন্দুদের প্রতি মুসলমানদের ব্যবহারের চেয়ে নিকৃষ্ট হইতে পারিবে না। ইহার সোজা মানে এই, যে, যদি আগ্রা-অযোধ্যা বিহার বোম্বাই মান্দ্রাজ প্রভৃতি হিন্দু-প্রধান প্রদেশসকলে মুসলমানদের প্রতি কোন অবিচার অত্যাচার হিন্দুরা করে, তাহা হইলে বাংলা পঞ্জাব সিন্ধু উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত ও বালুচিস্তান প্রদেশসকলে মুসলমানরা হিন্দুদের উপর অন্ততঃ তাহা অপেক্ষা কম অবিচার অত্যাচার করিবে না। এই প্রকার ব্যবস্থার প্রয়োজন আছে কিনা, ইহা ন্যায়সঙ্গত ও ধর্ম্মসঙ্গত কিনা, এবং ইহা মুসলমানদের পক্ষে রক্ষাকবচের কাজ করিবে কিনা, এই তিনটি বিষয় বিবেচ্য। বিস্তারিত আলোচনা করিতে ইচ্ছা হয় না ; তথাপি কিছু বলিতে হইবে।

প্রথমটি সম্বন্ধে বক্তব্য এই, যে, হিন্দুরা যে অত্যাচারী অপেক্ষা অত্যাচরিত হইবার জন্যই অধিকতর বিখ্যাত, তাহা ভারতবর্ষের অতীত ও বর্ত্তমান ইতিহাস হইতে বহু বহু ঘটনার উল্লেখ করিয়া প্রমাণ করা যায়। অতএব, হিন্দুদিগকে যে-প্রকার ভয় দেখান হইতেছে, তাহা অনাবশ্যক।

দ্বিতীয় প্রশ্নটি সম্বন্ধে বক্তব্য এই, যে, পশ্চিমা ও দক্ষিণা হিন্দুরা পশ্চিমা বা দক্ষিণা মুসলমানদিগকে ঠ্যাঙাইলে খুন করিলে তাহাদের ঘরবাড়ি লুট করিলে বা জালাইয়া দিলে (এরূপ কর্ম্ম হিন্দুরা কোথাও বহু বহু পরিমাণে করে বা মুসলমানদের চেয়ে কোথাও বেশী করে তাহার প্রমাণ নাই), বাঙালী পঞ্জাবী ও সিন্ধী হিন্দুদের প্রতি বাঙালী পঞ্জাবী ও সিন্ধী মুসলমানদের ঐরূপ ব্যবহার যে ন্যায়শাস্ত্র বা ধর্ম্মশাস্ত্র অনুসারে সঙ্গত হইতে পারে, তাহাদের অস্তিত্ব আমরা অবগত নহি। এরূপ কোন কোন শাস্ত্রের কথা জানি বটে, যাহাতে অনিষ্টের বিনিময়ে হিত করিবার উপদেশ আছে। হিতের পরিবর্ত্তে হিত করা ত উচিতই ; এবং তদনুসারে দুর্ভিক্ষাদি বিপদে কোথাও হিন্দু মুসলমানকে মুসলমান হিন্দুকে সাহায্য করিলে অন্যত্রও তাহাদের পরস্পরের হিত করা কর্ত্তব্য।

তৃতীয়তঃ, যদি উল্লিখিত ব্যবস্থার প্রয়োজন বা ঔচিত্যের কথা ছাড়িয়া দিয়া, উহা মুসলমানদের রক্ষা-কবচের কাজ করিবে কি না কেবল তাহারই বিচার করা যায়, তাহা হইলে আমাদের বিবেচনায় উহা ঐ প্রকারে ফলপ্রদ হইবে না। ভারতবর্ষ একটি ছোট গ্রাম নগর বা জেলা নহে, বিস্তৃত দেশ। ইহার কোন্ দূর কোণে কোন্ সম্প্রদায়ের লোক অন্য কাহার উপর অত্যাচার অবিচার করিতেছে, তাহার খবর রাখিয়া অন্য দূর কোণের ঐ অত্যাচরিতদের সধর্ম্মীরা অত্যাচারীদের সধর্ম্মীদের উপর শোধ তুলিবে, এই ভয়ে উভয় পক্ষ পরস্পরের প্রতি অত্যাচার হইতে বিরত থাকিবে, আমাদের এমন মনে হয় না। অবশ্য এ কথা আমরা হিন্দুর মনোভাব হইতে বলিতেছি। কারণ, পাবনা জেলার, কিশোরগঞ্জ মহকুমার, বা রোহিতপুর গ্রামের হিন্দুদের উপর অত্যাচারের বৃত্তান্ত পড়িয়া বঙ্গের বাহিরের কোন প্রদেশের হিন্দুদের দুঃখ বা ক্রোধ হইয়াছিল বলিয়া অবগত নহি। মুসলমানদের প্রতি ঠিক্ এই প্রকার ভীষণ ব্যাপক অত্যাচারের দৃষ্টান্ত জানি না বলিয়া, বলিতে পারিলাম না এক প্রদেশের মুসলমানেরা অত্যাচরিত হইলে অন্যান্য প্রদেশের মুসলমানেরা কি ভাবেন করেন বা ভাবিতে করিতে পারেন।

—

ন্যূনতম যোগ্যতা অনুসারে চাকরী ভাগ

ন্যাশন্যালিষ্ট মুসলমানদের আর একটি দাবী এই, যে, সর্ব্বত্র লোকসংখ্যার অনুপাতে ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়কে সরকারী চাকুরী দিতে হইবে, এবং তাহা ন্যূনতম যোগ্যতা অনুসারে দিতে হইবে। অবশ্য তাঁহারা ইহা নিজেদের

স্বার্থরক্ষার জন্য বলিয়াছেন। ইহাতে, ন্যূনতম-যোগ্যতা-বিশিষ্ট মুসলমান চাকরোদের অর্থপ্রাপ্তি ঘটিবে বটে, কিন্তু অপেক্ষাকৃত অল্পসংখ্যক চাকরো ও চাকরোদের পরিবারবর্গ ছাড়া খুব বেশীসংখ্যক অন্য মুসলমানদের মঙ্গল হইবে কি? মুসলমান অমুসলমানকে লইয়া যে সমগ্র জাতি, তাহার মঙ্গল হইবে কি? যোগ্যতম লোকদিগকে কাজ দিলেই দেশ সুশাসিত এবং ক্রমশঃ উন্নত ও সমৃদ্ধ হইতে পারে। বর্ত্তমান সময়েই দেখা যায়, নির্দ্দিষ্ট অনুপাত অনুসারে মুসলমান-দিগকে চাকরী দিবার নিয়ম থাকা প্রযুক্ত মুসলমানরা সামান্য শিক্ষা পাইয়া চাকরী পাওয়ায় তাহাদের মধ্যে শিক্ষার উন্নতি ও বিস্তৃতি হইতেছে না। ন্যূনতম যোগ্যতা অনুসারে শতকরা ৫৫টি চাকরী বাঙালী মুসলমানেরা পাইলে মুসলমান সমাজে শিক্ষার দুর্দশা বাড়িবে বই কমিবে না।

অযোগ্যতর মুসলমানের পরিবর্ত্তে যোগ্যতর অমুসলমান কেন চাকরী পাইবে না, তাহার উত্তর কোন ন্যায়শাস্ত্রে ধর্ম্মশাস্ত্রে পাওয়া যাইবে না। সকল রাষ্ট্রেই ধর্ম্মবিষয়ক নিরপেক্ষতা থাকা উচিত। কিন্তু যোগ্যতর অমুসলমানকে বাদ দিয়া অযোগ্যতর মুসলমানকে কাজ দিলে তাহার মানে এই হইবে, যে, রাষ্ট্র মুসলমানকে বেশী পছন্দ করে, অতএব যে সহজে চাকরী পাইতে চায় তাহার মুসলমান হওয়া উচিত।

—

বাংলা সরকারের রিপোর্ট

বাংলা সরকারের ১৯২৯-৩০ সালের রিপোর্ট বাহির হইয়াছে। ইহাতে খবরের কাগজ ও খবরের কাগজ-ওয়ালাদের প্রতি এবং সত্যাগ্রহী প্রভৃতি রাজনৈতিক আন্দোলকদের প্রতি অনেক বাক্যবাণ বর্ষিত হইয়াছে। তাহাদের প্রতি কথাগুলা সব সত্য কিনা, তাহার বিচার করিতে হইলে সেগুলা উদ্ধৃত করিতে হয়। কিন্তু কথাগুলা এমন মূল্যবান ও দেশহিতকর নয়, যে, বিনা-মূল্যে সেগুলার প্রচার করা আমাদের কর্ত্তব্য। সম্পাদকেরা দেশহিতকর অনেক কথা বিনি পয়সায় ছাপেন। কিন্তু সরকার পক্ষের গালাগালি বিনি পয়সায় ত ছাপিতে পারিই না, মূল্য দিলে বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ছাপিতাম কিনা তাহাও বলা দরকার মনে করি না।

আমরা বেসরকারী লোকেরা যদি এমন কিছু বলি লিখি করি যাহাতে সরকারের অসন্তোষ ক্রোধ ক্ষতিবোধ হয়, তাহা হইলে সরকার পক্ষের লোক আমাদিগকে ঠেঙান, জরিমানা করেন, জেলে পাঠান, ইত্যাদি। সুতরাং ঐ প্রকারেই ত শোধবোধ হইয়া যাওয়া উচিত। তাহার উপর আমাদিগকে গালাগালি দেওয়াটা কি আতিশয্য নয়? যদি আইনে নির্দ্দিষ্ট বিশেষ বিশেষ স্থলে সরকারী লোকদের প্রতি বেসরকারী লোকদের উল্লিখিত নানাবিধ ব্যবহার করিবার আইনসঙ্গত অধিকার থাকিত, তাহা হইলে এরূপ প্রশ্ন উঠিত না।

—

ভাষা অনুযায়ী প্রদেশ গঠন

কাটা বাংলাকে জোড়া দিবার ওজুহাতে যখন আবার নূতন রকমে বাংলাদেশের কয়েকটি টুকরা বিহারের সঙ্গে জুড়িয়া দেওয়া হয়, তখন সরকার পক্ষ হইতে একটা প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়, যে, ভবিষ্যতে ভাষা অনুসারে বাংলাদেশের সব অংশকে একত্র করিবার চেষ্টা করা হইবে। সাইমন কমিশনের রিপোর্টেও ভাষা অনুসারে প্রদেশ গঠন করিবার অনুরোধ আছে। সুতরাং বাঙালীরা এবং অন্যান্যভাষাভাষীরা ভাষা অনুসারে প্রদেশ গঠনের দাবী করিতে পারেন। সরকারী প্রতিশ্রুতি না থাকিলেও পারিতেন। সরকারী প্রতিশ্রুতি যে সব সময় রক্ষিত হয়, তাহা নহে। অনেক সময় দায় এড়াইবার জন্য কিংবা কোন আবেদন বা দাবী আপাততঃ চাপা দিবার নিমিত্ত ভবিষ্যতে কিছু করিবার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়; তাহা নিশ্চয়ই রক্ষিত হইবে, এরূপ ইচ্ছা হয়ত থাকে না। এসব কথা মনে রাখা দরকার। জানা দরকার, যে, গবর্ন্মেণ্টের নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য যাহা আবশ্যক নহে, তাহা তাহার দ্বারা করাইয়া লইতে হইলে তাহাকে অতিষ্ঠ করিয়া তোলা চাই।

আদর্শ হিসাবে এক একটি ভাষা লইয়া এক একটি প্রদেশ গঠন ভাল হইলেও কার্য্যতঃ তাহা সুসাধ্য বা বাঞ্ছনীয় না হইতে পারে। হিন্দী আগ্রা-অযোধ্যা প্রদেশ, বিহার, মধ্যপ্রদেশের কয়েকটি জেলা এবং কোন কোন দেশী রাজ্যের ভাষা। কিন্তু সবগুলিকে একত্র করিয়া একটি সুবৃহৎ প্রদেশে পরিণত করা চলে না। মধ্যপ্রদেশের অনেক জেলায়, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর অনেক জেলায়, দেশী রাজ্য হায়দরাবাদের অংশ-বিশেষে ও বেরারে মরাঠী ভাষা প্রচলিত। সবগুলিকে একটি প্রদেশ করা চলে না।

কিন্তু কোন কোন স্থলে ভাষা অনুসারে প্রদেশ গঠন একান্ত কর্ত্তব্য, এবং কোন কোন স্থলে তাহা সুসাধ্যও বটে। উৎকলের কোন-না-কোন টুকরা কোন না-কোন অন্য প্রদেশের সঙ্গে সংযুক্ত করা হইয়াছে। তদ্ভিন্ন উৎকলের এক বৃহৎ অংশ নানা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেশী রাজ্যে বিভক্ত। এই সব কারণে, কোন প্রাদেশিক গবন্মেণ্টই একমাত্র বা প্রধানতঃ ওড়িয়াদিগের মঙ্গলসাধনে মনোনিবেশ করে না, করিতে পারে না। সেইজন্য উৎকল জ্ঞানে অপেক্ষাকৃত অনগ্রসর এবং দরিদ্র হইয়া আছে। অথচ উৎকলের ইতিহাস হইতে এবং তাহার এখনও বিদ্যমান মন্দিরাদি হইতে বুঝা যায়, যে, আগে এই দেশ সমৃদ্ধ, প্রতাপশালী ও সভ্যতায় অগ্রসর ছিল।

তেলুগুভাষী অন্ধ্র দেশের, কন্নাড়ভাষী কর্ণাটের, এবং আরও কোন কোন অঞ্চলের, একভাষাভাষী বলিয়া, এক একটি প্রদেশে পরিণত হইবার দাবী আছে। গবন্মেণ্টের স্বার্থসিদ্ধির জন্য কেবল দুই-একটিতে মন দিয়া অন্যগুলি অবহেলা করা অনুচিত। সবগুলিরই মীমাংসা হওয়া উচিত। আপাততঃ, আমরা বাঙালী বলিয়া বাংলাদেশের, এবং উৎকল বঙ্গের সন্নিহিত এবং বাংলার সহিত তাহার সভ্যতার ঐতিহাসিক যোগ আছে বলিয়া, আমরা বঙ্গের ও উৎকলের সম্বন্ধে সামান্য কিছু বলিব।

কোন্ কোন্ জেলা বা জেলার অংশ বাংলায় আসা উচিত, কোন্গুলি উৎকলে যাওয়া উচিত, কোন্গুলি বা আসামের সহিত যুক্ত থাকা ভাল, তাহা বিচার করিবার সময় কেহ কেহ আচার-ব্যবহার, ঔদ্বাহিক আদান-প্রদান, প্রভৃতির ঐক্য ও বৈষম্যের কথা তুলিতেছেন। এসব জিনিষ অবশ্য তুচ্ছ করিবার বিষয় নহে। কিন্তু এক্ষেত্রে তাহাদের কথা না তোলাই ভাল। কারণ, একই প্রদেশবাসী, একই ধর্ম্মের ও বর্ণের লোকদের মধ্যে ঔদ্বাহিক আদান-প্রদান না চলিবার এবং আচার-ব্যবহারের পার্থক্যের দৃষ্টান্ত রহিয়াছে। বাংলা দেশে রাঢ়ী, বারেন্দ্র, বৈদিক ও কনৌজিয়া শ্রেণীর ব্রাহ্মণদের মধ্যে আদান-প্রদান নাই, আচার-ব্যবহারেরও কিছু পার্থক্য আছে। অথচ তাহারা সকলেই বাংলা বলে ও বাঙালী। ভাষা অনুসারে প্রদেশ গঠনের কথা উঠিয়াছে; সুতরাং কেবল ভাষা অনুসারে বিচার হওয়াই ভাল।

আর একটি কথা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। বিচার হইতেছে বর্ত্তমান সময়ের, অতীত কালের নহে। এখন যেখানে অন্য ভাষা চলিত আছে, অতীত কালে হয়ত সেখানে ও বাংলা দেশে একই ভাষা প্রচলিত ছিল। মিথিলার অক্ষর এবং বাংলার অক্ষর এক; বিদ্যাপতিকে বাংলার ও মিথিলার লোকেরা নিজেদের কবি বলিয়া দাবী করে। কিন্তু তা বলিয়া বাঙালীদের ইহা বলিলে চলিবে না, যে, মিথিলা বঙ্গের অন্তর্ভূ'ত হউক। এখন দেখিতে হইবে, আগে যেখানে যে-ভাষাই প্রচলিত থাকুক, এখন কি ভাষা প্রচলিত।

ভাষা এক বলিয়াই, বিশেষ কোন অসুবিধা না থাকিলেও এক বা একাধিক জেলাকে বাংলার সামিল করিবার চেষ্টা না করিলেও চলে। আমাদের এই বক্তব্য বুঝাইবার জন্য, আমাদের কোন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত প্রকাশ না করিয়া, আমরা আসামপ্রদেশভুক্ত বাংলাভাষী স্থানগুলির উল্লেখ করিতে চাই। সমুদয় বাংলাভাষী স্থান বঙ্গের অন্তর্গত হওয়া চাই, এই নিয়ম অনুসারে আসামপ্রদেশভুক্ত এই জায়গাগুলির বঙ্গে আসা উচিত সন্দেহ নাই। কিন্তু এখানে বিবেচনা করিতে হইবে, আমরা কেন একভাষাভাষী লোকদিগকে একপ্রদেশভুক্ত করিতে চাই। কোন একভাষাভাষী বহুসংখ্যক লোকদের সঙ্গে অন্যভাষাভাষী অল্পসংখ্যক লোককে এক প্রদেশভুক্ত করিলে শেষোক্ত লোকদের নানা অসুবিধা

ঘটিতে পারে। তাহাদের ভাষা ও সাহিত্য, তাহাদের শিক্ষা, তাহাদের সংস্কৃতি (culture) প্রভৃতি যথেষ্ট উৎসাহ পায় না, তাহাদের সরকারী কাজকর্ম্ম, ঠিকা (contract), ফরমাইস পাইবার অসুবিধা হয়, ব্যবস্থাপক সভায় তাহাদের মতের জোর হয় না, ইত্যাদি। এখন বিবেচনা করিতে হইবে, আসামপ্রদেশভুক্ত বঙ্গভাষীদের এই সকল বিষয়ে অসুবিধা আছে কিনা, এবং থাকিলে তাহা এত বেশী কিনা যাহার জন্য তাহাদের বঙ্গের অন্তর্ভূত হওয়া একান্ত আবশ্যক। আমরা এই বিষয়ে বিশেষজ্ঞ নহি, সুতরাং এবিষয়ে আমাদের কোন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নাই। কিন্তু আমরা জানি, আসাম প্রদেশে যত ভাষা-ভাষী লোকসমষ্টি আছে, তাহাদের মধ্যে বঙ্গভাষাভাষীর সমষ্টিই সব চেয়ে বড়। সুতরাং বাঙালীদের ভাষা, শিক্ষা, সংস্কৃতি, সরকারী কাজ আদি পাইবার এবং ব্যবস্থাপক সভায় প্রতিনিধিত্বের দাবী আসামে অবহেলিত হইবার কথা নহে। কিন্তু বাস্তবিক হয় কিনা বলিতে পারি না। অন্য দিকে, দেখিতে হইবে, আসামে বিস্তর জমী ও অরণ্য পড়িয়া আছে; এখনও তথায় বহু লক্ষ লোক বসিতে ও সমৃদ্ধ হইতে পারে। আসামের খনিজ ও অরণ্যজ সম্পত্তি এখনও অল্পই মানুষের ব্যবহারে লাগান হইয়াছে—সমস্ত এখনও সুপরিজ্ঞাতই নহে। আসামপ্রদেশভুক্ত থাকিতে তথাকার বাঙালীদের এই সমস্ত প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য্যের সুবিধা পাইবার যতটা সুযোগ আছে, তাঁহাদের বাসভূমি বঙ্গের অন্তর্গত হইলে ততটা সুযোগ থাকিবে না, ইহা নিশ্চিত। এই বিষয়টি বিশেষ অনুধাবনযোগ্য।

বঙ্গের যে-সব টুকরা বিহারের অন্তর্গত হইয়াছে, সেগুলির কথা স্বতন্ত্র। এই টুকরাগুলির অধিবাসীদের শিক্ষা আদির অসুবিধা আছে। সরকারী চাকরী প্রভৃতি পাওয়াতেও বাধা হয়। তাহারা বিহার-প্রদেশভুক্ত হইলেও প্রায়শই, "বিহারীর জন্য বিহার" নীতির অনুসরণে বাঙালী বলিয়া উপেক্ষিত হয়। বিহারের ব্যবস্থাপক সভায় তাহাদের মতের জোর হইতেই পারে না। অন্য সব অসুবিধার কথা বলিবার প্রয়োজন নাই। অবশ্য কোন্ কোন্ জেলা বা জেলাংশ বঙ্গভাষী, তাহা লইয়া তর্ক উঠিতে পারে। ঝগড়া ভাব হইতে তর্ক না করিয়া ধীর স্থির ভাবে, তথ্যের উপর নির্ভর করিয়া, আলোচনা করা উচিত। কিন্তু অবিকৃত তথ্য সব স্থলে পাওয়া যায় না, ইহাও স্বীকার্য্য। পূর্ণিয়া জেলার একটি বৃহৎ অংশ গ্রিয়ার্স'ন সাহেব পর্য্যন্ত বঙ্গভাষী বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন। তাহার পর, ঐ জেলা বিহারের অন্তর্গত হওয়ায়, ভাষা বিষয়ে তাঁহা অপেক্ষা অপণ্ডিত লোকদের দ্বারা ঠিক হইয়া গেল, যে, ঐ অংশের লোক হিন্দীই বলে!

যাহা হউক, কতকগুলি স্থান সম্বন্ধে কোন সন্দেহ হওয়া উচিত নয়। যেমন, মানভূম জেলা। ইহার অধিকাংশ লোক বাঙালী; বহু পুরুষ ধরিয়া বাঙালী, ও বাংলা বলে। ধানবা'দ অঞ্চল সম্বন্ধে তর্ক উঠিয়াছে বটে। খনিতে কাজ করিবার জন্য অনেক অবাঙালী এই অঞ্চলে আসায় এখানে তাহাদের সংখ্যাধিক্য ঘটিয়া থাকিবে—ঐ অঞ্চলে বাঙালী ও অবাঙালীদের ঠিক্ সংখ্যা কত জানি না। যদি অবাঙালীদের সংখ্যা বেশী হয়, তাহা হইলেও বিবেচনা করিতে হইবে, যে, তাহারা পরিবারী হইয়া তথাকার স্থায়ী বাসিন্দা হইয়াছে কিনা, যেমন আগ্রা-অযোধ্যা প্রদেশের কোন কোন শহরে কোন কোন বাঙালী পরিবার চা'র পাচ পুরুষ ধরিয়া স্থায়ী বাসিন্দা হইয়াছে। কোন বিশেষ একটি গ্রাম বা নগর বা অঞ্চল কোন্ প্রদেশের অন্তর্গত, তাহা কেবল অস্থায়ী আগন্তুক লোকদের সংখ্যা দ্বারা নির্দ্ধারণ করা যায় না। কলিকাতার সন্নিকটে গঙ্গার উভয় তীরে অনেক কলকারখানাবহুল স্থান আছে, যেখানে বঙ্গের বাহির হইতে বিস্তর শ্রমজীবীর আমদানী হওয়ায়, স্থায়ী বাসিন্দা বাঙালীরা হয়ত কোথাও কোথাও সংখ্যায় কম হইয়া গিয়াছে। কিন্তু ঐ স্থানগুলি তাহা হইলেও বঙ্গেরই অংশ। ধানবা'দের এবং এই জায়গাগুলির প্রভেদ এই, যে, কলিকাতার সন্নিহিত এই জায়গাগুলি বঙ্গের মাঝখানে অবস্থিত, ধানবা'দ সীমার সন্নিকট একটি জেলার অন্তর্গত; কিন্তু এই প্রভেদের জন্য ধানবা'দের স্থায়ী বাসিন্দা বাঙালী-দিগকে ভিন্নপ্রদেশভুক্ত করা উচিত হইবে না।

সাঁওতাল পরগণার যে-যে অংশে স্থায়ী বাসিন্দা হিন্দীভাষীর সংখ্যা স্থায়ী বাসিন্দা বাঙালীর চেয়ে বেশী, সেগুলি বিহারে থাকিবে; যেখানে স্থায়ী বাসিন্দা বাঙালী বেশী, সেগুলির বঙ্গের অন্তর্ভূত হওয়া উচিত। সাঁওতাল-দের পক্ষে বাংলা ও বিহার মোটের উপর সমান কিনা বলিতে পারি না। বাংলার চেয়ে বিহারকে তাহাদের বেশী পছন্দ করিবার কারণ নাই।

সিংহভূম ও ধলভূম লইয়া উৎকলীয় নেতারা নানা তর্কের অবতারণা করিয়াছেন। আমরা আলোচনাটি কেবল বর্ত্তমান সময়ে প্রচলিত ভাষার সীমার মধ্যে আবদ্ধ রাখার পক্ষপাতী। মেদিনীপুরের দক্ষিণ অংশ লইয়াও উৎকলীয় নেতারা তর্ক তুলিয়াছেন। এখানেও বিচার প্রচলিত ভাষা অনুসারে করা উচিত। আলোচনা খুব সহজ নহে। কারণ, বাংলা ও ওড়িয়ার মধ্যে খুব সাদৃশ্য আছে, এবং সকল ওড়িয়া না হইলেও, অন্ততঃ শিক্ষিত ওড়িয়ারা বাংলা বলিতে পারেন। যে-সকল স্থান সম্বন্ধে বিবেচনা করিতে হইবে, তথাকার লোকেরা কি ভাষা বলে বলিয়া তাহাদের বিশ্বাস এবং তাহারা কোন্ প্রদেশভুক্ত থাকিতে বা হইতে চায়, তাহা নির্দ্ধারণ করিবার চেষ্টা করিয়া নির্দ্ধারণ অনুসারে চলা যাইতে পারে। কিন্তু শুনিয়াছি, যে, অনেক লোক এত অজ্ঞ এবং ক্ষুদ্র সরকারী লোকদের ভয়ে এত ত্রস্ত, যে, তাহাদিগকে শুধাইয়া প্রকৃত তথ্য নির্দ্ধারণ অসাধ্য বা দুঃসাধ্য। সেন্সস রিপোর্টের উপর কিংবা তদ্রূপ অন্য কোন কোন সরকারী রিপোর্টের উপর নির্ভর করা আর এক উপায়। এই রিপোর্টগুলিও সব সময় অভ্রান্ত নহে। পূর্ণিয়া জেলার অংশ-বিশেষের ভাষা সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছি, তাহা তাহার একটি প্রমাণ। আমাদিগকে একজন শ্রদ্ধেয় উৎকলীয় নেতা বলিয়াছেন, তিনি এরূপ চিঠি দেখিয়াছেন, যাহাতে ঊর্দ্ধতন সেন্সস কর্ম্মচারী অধস্তন কর্ম্মচারীদিগকে বলিতেছেন, মেদিনীপুরের কোন কোন অঞ্চলের লোকদের ভাষা তাহারা যাহাই বলুক তাহা বাংলা বলিয়া লিখিয়া লইতে হইবে। ইনি যে চিঠি দেখিয়াছেন, তাহা খাঁটি হইলে, সেন্সসে ভ্রম ঢুকিবার ইহা একটি কারণ হইয়াছে।

মেদিনীপুর সম্বন্ধে, অন্ততঃ ইহার একটি বৃহৎ অংশ সম্বন্ধে, ইহা ঐতিহাসিক সত্য, যে, উহা এক সময়ে উৎকলের অংশ ছিল। কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি, অতীত ইতিহাসের দ্বারা বিচার করিলে চলিবে না। পৃথিবীর নানা দেশে ভাষা ও সাহিত্যের সংস্পর্শে ও সংঘর্ষে মানুষ এক ভাষার পরিবর্ত্তে অন্য ভাষা গ্রহণ করিতেছে। ইংলণ্ড, স্কটল্যাণ্ড এবং ওয়েলসের সমষ্টি গ্রেট ব্রিটেনের সব অংশের লোকেরা শিক্ষিত, তাহাদের মধ্যে নিরক্ষরের সংখ্যা খুব কম। অথচ গ্রেট ব্রিটেনেও কোন কোন অংশের অধিকাংশ লোক নিজেদের ভাষা ছাড়িয়া দিয়া ইংরেজী বলিতেছে। ১৯১১ সালে ওয়েলসের লোকসংখ্যা ছিল ১৭ লক্ষের উপর। মন্‌মাথশায়ারেও ওয়েল্‌শ ভাষা চলিত ছিল। ১৯১১ সালে এই উভয় অঞ্চলের ১৯০,২৯২ জন (অর্থাৎ শতকরা ৭.৯ জন) লোক ওয়েল্‌শ ভাষা, এবং ৭৮৭,০৭৪ জন (অর্থাৎ শতকরা ৩২.৫ জন) লোক ইংরেজী ও ওয়েল্‌শ্ বলিতে পারিত। বাকী, অধিকাংশ, লোক কেবল ইংরেজী বলিত। ১৯১১ সালের পরের সংখ্যা পাই নাই। ১৯২১ সালে স্কটল্যাণ্ডের লোকসংখ্যা ছিল ৪৮,৮২,৫৯৭। তাহাদের মধ্যে ৯,৮২৯ জন কেবল গেলিক, এবং ১৪৮,৯৫০ জন গেলিক ও ইংরেজী বলিত। বাকী সবাই শুধু ইংরেজী বলিত। বিদেশের এই প্রকার দৃষ্টান্ত হইতে বুঝা যায়, যে, মেদিনীপুরের, সিংহভূমের ও ধলভূমের অনেক ওড়িয়ার ভাষা এখন কেবলমাত্র বাংলা হওয়াটা অসম্ভব নহে। এবং পূর্ব্বেই বলিয়াছি, যে, ইহাও অসম্ভব নহে, যে অনেক প্রকৃত ওড়িয়াভাষীকে সেন্সসে বা অন্য রিপোর্টে বঙ্গভাষী বলিয়া গণনা করা হইয়াছে। সত্য-নির্দ্ধারণ সহজ নহে। কিন্তু মোটামুটি সত্য-নির্দ্ধারণ অসাধ্যও নহে। কিন্তু যাঁহাদের উপর ইহার ভার পড়িবে, তাঁহাদিগকে ধৈর্য্য ও নিরপেক্ষতার সহিত কেবল সত্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া চলিতে হইবে।

যিনি যাহা সত্য মনে করেন, শেষ সিদ্ধান্ত তদনুযায়ী না হইলে উত্তেজিত না হওয়া প্রার্থনীয়। ভারতবর্ষে ধর্ম্মভেদ বশতঃ এবং ধর্ম্মভেদের ছিদ্র অবলম্বন দ্বারা

অনেক কলহ, মনোমালিন্য, রক্তারক্তি পর্য্যন্ত ঘটিয়াছে ও ঘটান হইয়াছে। ভাষা লইয়া আর একটা ঝগড়ার পত্তন ও বিস্তার সর্ব্বথা অবাঞ্ছনীয়।

যে-যে বিষয়ে সতর্ক হইতে হইবে, তাহা মনে রাখিয়া যে-সকল স্থান বাংলাপ্রদেশের অন্তর্ভূত হওয়া বা থাকা উচিত, তথাকার লোকেরা দৈনিক কাগজে তথ্য প্রকাশ ও আলোচনা করিলে সুফল ফলিতে পারে।

—

দীনেশ গুপ্ত

জেলসমূহের ইন্‌স্পেক্টর জেনারেল সিমসন সাহেবকে হত্যা করার অভিযোগে শ্রীমান্ দীনেশ গুপ্তের প্রাণদণ্ড হয়। প্রাণদণ্ড রহিত করিবার নিমিত্ত সকল প্রকার চেষ্টা করা হইয়াছিল। কিন্তু তাহা ব্যর্থ হইয়াছে, এবং তাঁহার ফাঁসী হইয়া গিয়াছে। ইহাতে দেশের মধ্যে বিশেষ বিক্ষোভ উপস্থিত হইয়াছে। তাহার কারণও আছে। এই যুবকের অনেক সদ্‌গুণ ছিল।

সিমসন সাহেবকে হত্যা করা ঠিক হইয়াছিল, একথা আমরা মনে করি না, সুতরাং বলিতেও পারি না; কারণ রাজকর্ম্মচারী হিসাবে কিংবা সাধারণ মানুষ হিসাবে তাঁহার এমন কোন দোষের বিষয় আমরা জানি না, যাহার জন্য তাঁহার প্রাণবধ করা বা তাঁহাকে কোন লঘুতর শাস্তি দেওয়া ন্যায়সঙ্গত বিবেচিত হইতে পারে। বর্ত্তমান ব্রিটিশ গবর্ন্মেণ্টের অনেক দোষ আছে। সেই জন্য এবং, বিদেশী শাসনের দোষ না থাকিলেও, প্রত্যেক জাতির স্বশাসক হওয়া উচিত বলিয়া, কংগ্রেস হইতে আরম্ভ করিয়া আমরা অনেকেই পূর্ণস্বরাজ চাই। কিন্তু বর্ত্তমান গবর্ন্মেণ্টের উচ্ছেদ এবং বর্ত্তমান গবর্ন্মেণ্টের অনত্যাচারী বা অত্যাচারী ভৃত্যদের ব্যক্তিগতভাবে উচ্ছেদ এক নহে।

অন্যদিকে, শ্রীমান্ দীনেশ গুপ্তের কার্য্য সম্বন্ধে বিচারপতি বাক্‌ল্যাণ্ড সাহেব যাহা তাঁহার রায়ে লিখিয়াছেন, তাহাও বিবেচনা করিবার বিষয়। তিনি যাহা লিখিয়াছেন তাহার মর্ম্ম এই, যে, কোন ব্যক্তিগত লাভের জন্য কিংবা ব্যক্তিগত প্রতিহিংসার মত কোন কারণ বশতঃ দীনেশ এই কাজ করে নাই। তাঁহার রায় পড়িয়া মনে হয়, আইনে কোন পরিষ্কার ব্যবস্থা থাকিলে তিনি দীনেশকে মৃত্যুদণ্ডের পরিবর্ত্তে অন্য কোন দণ্ড দিতেন। এই কারণে, দেশের অনেক লোক যখন দীনেশের প্রাণভিক্ষা চাহিয়াছিল, তখন প্রাণদণ্ডের পরিবর্ত্তে "যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরে"র ব্যবস্থা করিলে ভাল হইত। তাহা করিলে ভবিষ্যতে রাজকর্ম্মচারীর হত্যা বাড়িত বলিয়া মনে হয় না। অন্য দিকে হত্যাকারীদের প্রাণদণ্ড হইলেই যে হত্যাপরাধ কমে, ঐরূপ অপরাধের ইতিহাস হইতে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় না। যাহা হউক, ভিক্ষা ভিক্ষাই। ভিক্ষা দিতে সমর্থ কেহ যদি ভিক্ষা না দেন, তাঁহাকে কটু কথা বলা, ভিক্ষুকোচিত হইলেও, আত্মসম্মানবিশিষ্ট লোকের অকর্ত্তব্য।

দীনেশের কাজ হইতে এবং তাঁহার ফাঁসীর পূর্ব্ব মুহূর্ত্তের আচরণ হইতে তাঁহার নির্ভীকতা এবং নিঃস্বার্থতা সম্বন্ধে কোন সন্দেহ থাকে না। এরূপ একটি যুবকের জীবনের অকালে অবসান নিতান্ত শোকের বিষয়।

—

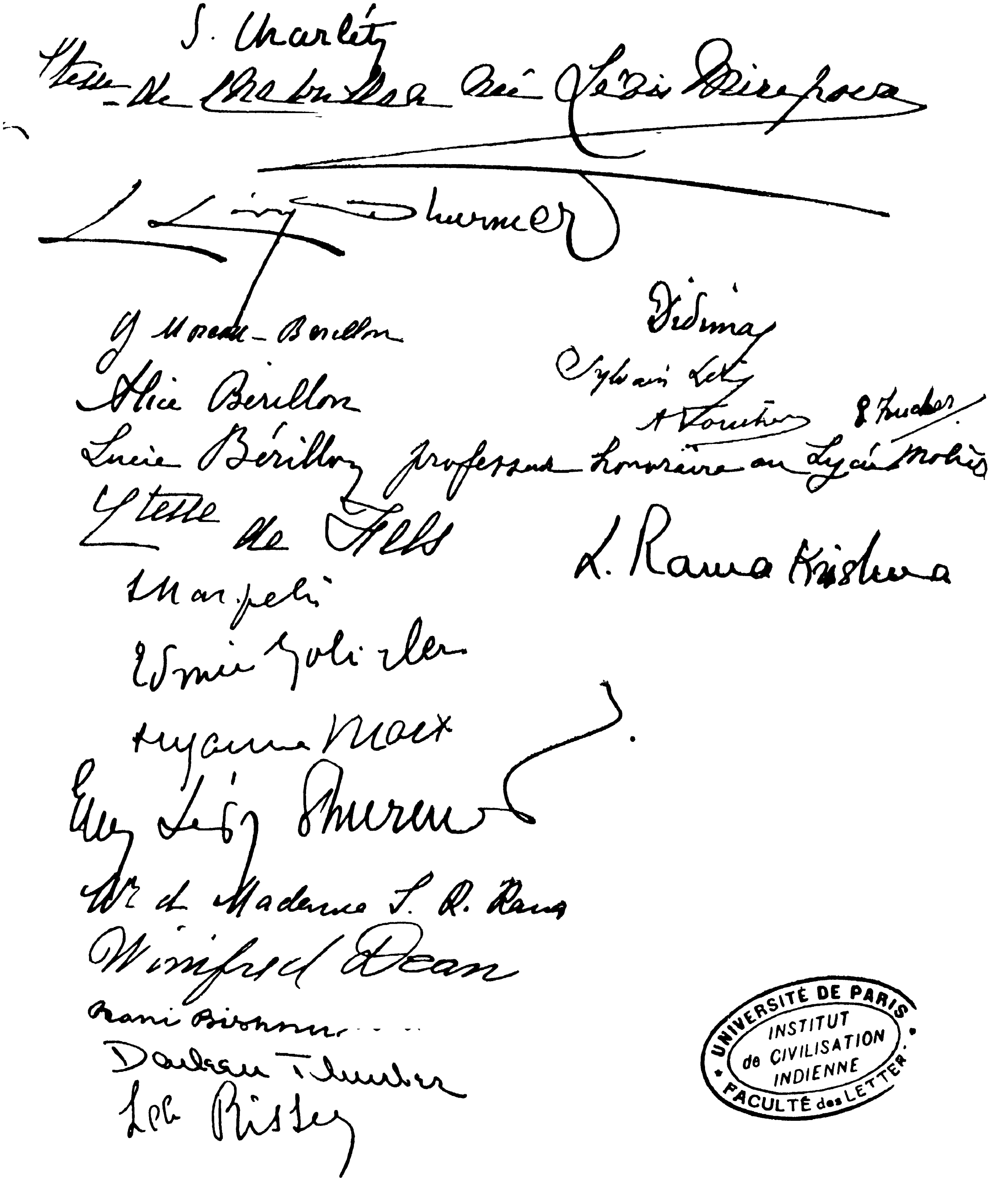
প্যারিসে রবীন্দ্রনাথের জন্মবাসরীয় সংবর্দ্ধনা

ফ্রান্সে ভারতীয় সভ্যতা সম্বন্ধে আলোচনার জন্য একটি সমিতি আছে। তাহার নাম অ্যাঁস্তিত্যু দ্য সিভিলিজাসিয়োঁ অ্যাঁদিয়েন্ (Insitut de Civilisation Indienne)। এই সমিতির উদ্যোগে রবীন্দ্রনাথের সপ্ততিতম জন্মদিবস উপলক্ষ্যে ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসে একটি সভার অধিবেশন হয়। তাহাতে ফরাসী এবং ভারতীয় অনেক ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলা উপস্থিত ছিলেন। তাঁহাদের একত্র-গৃহীত ফোটোগ্রাফের প্রতিলিপি দিলাম। উভয় দেশের দুই এক জনকে মাত্র চিনিতে পারা যাইতেছে। বিখ্যাত প্রাচ্যবিদ্যাবিশারদ সিল্‌ভেঁ লেভিকে চেনা যাইতেছে। কাঠিয়াবাড়ের সর্দার সিংজী রাণা এবং স্বর্গীয় মহেশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের ভাগিনেয় বাঙালী যুবক ডাক্তার বিমলকুমার সিদ্ধান্তকেও চেনা যাইতেছে।

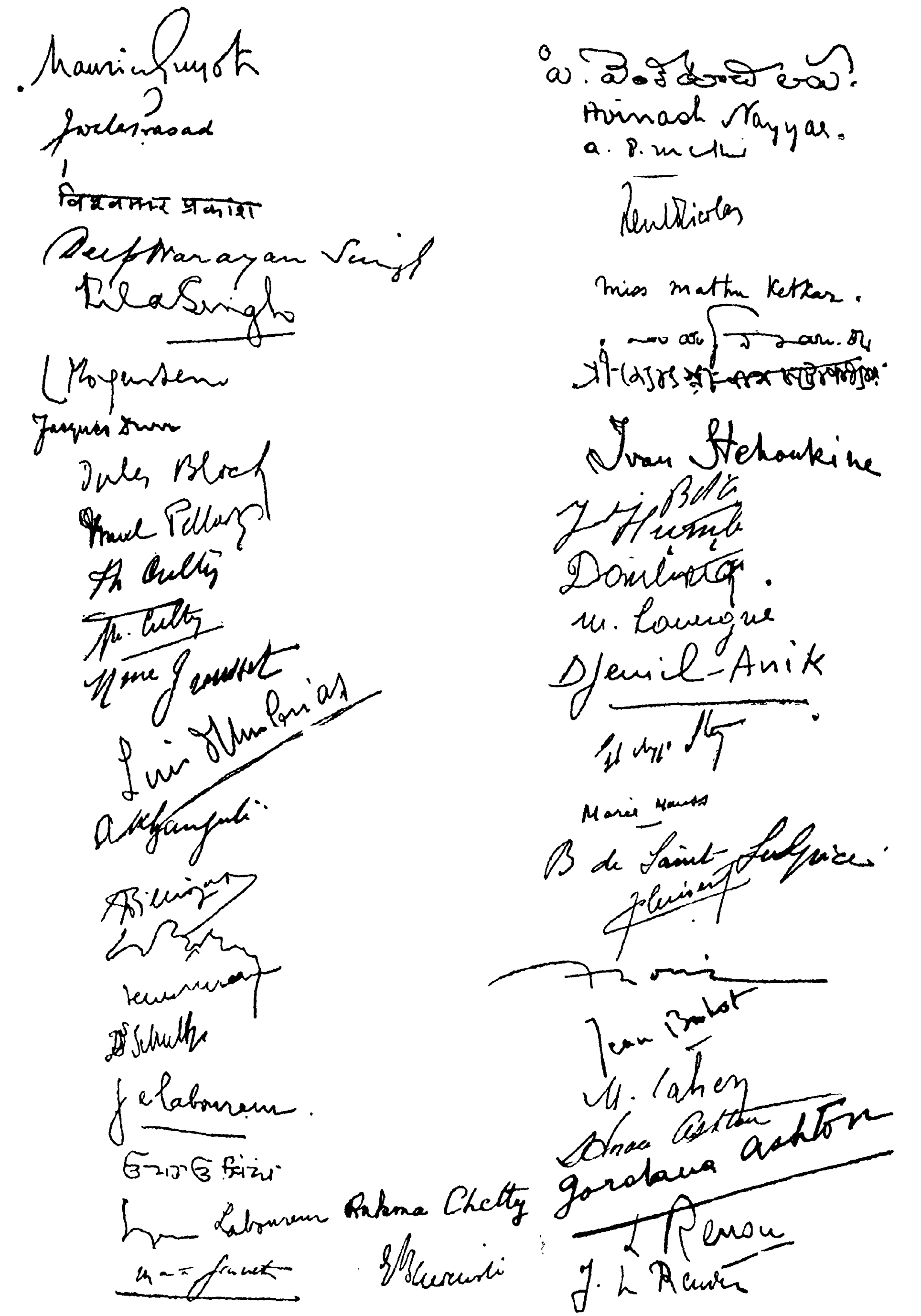
সভাস্থলে সমবেত অনেকে একটি কাগজে তাঁহাদের নাম রোমান, বাংলা ও নাগরী অক্ষরে স্বাক্ষর করিয়



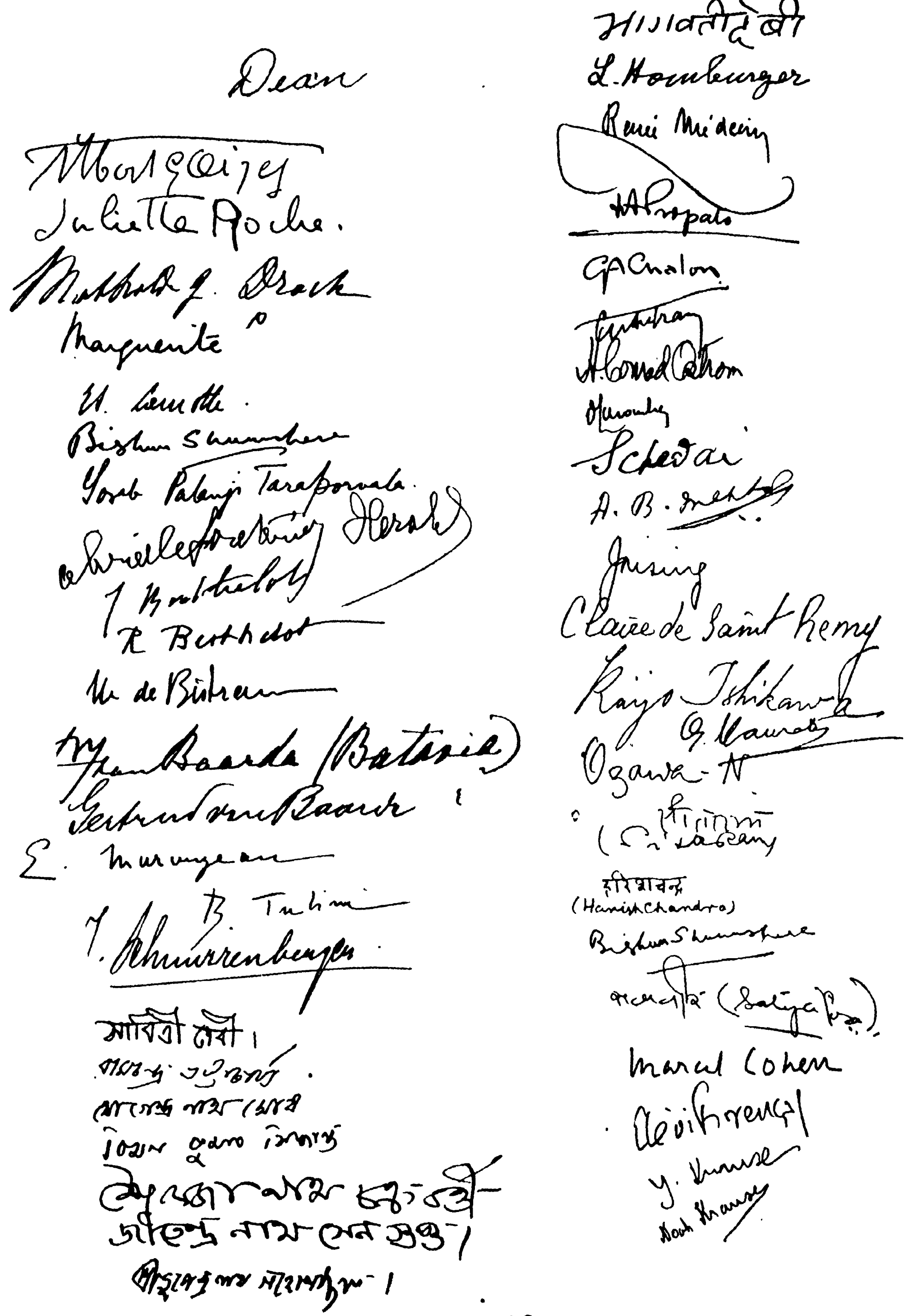
প্যারিসে রবীন্দ্রনাথের জন্মবাসরীয় সংবর্দ্ধনা সভা



স্বাক্ষরের প্রতিলিপি



স্বাক্ষরের প্রতিলিপি



স্বাক্ষরের প্রতিলিপি

কবির প্রতি আপনাদের শ্রদ্ধা প্রীতি ও শুভ ইচ্ছা জ্ঞাপন করিয়াছেন। তাঁহাদের সকলের স্বাক্ষরগুলির প্রতিলিপি দিলাম। এই স্বাক্ষরগুলির প্রথমটি প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ের রেক্টর শ্রীযুক্ত শার্লেতির ও দ্বিতীয়টি বিখ্যাত ফরাসী লেখিকা কম্‌তেস্ দ্য নোয়াইয়ের। অন্য স্বাক্ষরকারীদের মধ্যেও অনেক বিখ্যাত লেখক-লেখিকা আছেন। স্থানাভাবে তাঁহাদের নাম দেওয়া গেল না। বাঙালী পাঠক-পাঠিকাদের মধ্যে কেহ কেহ বাংলা দস্তখতগুলিতে নিজেদের আত্মীয়-আত্মীয়ার হস্তাক্ষর দেখিতে পাইবেন।

—

পুরাতন বাংলা সংবাদপত্রের ফাইল

প্রবাসীর সহকারী-সম্পাদক শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এখন বাংলা সংবাদপত্রের ইতিহাস সঙ্কলনে নিযুক্ত আছেন। তিনি অনেক চেষ্টা করিয়াও কতকগুলি পুরাতন বাংলা সংবাদপত্রের ফাইল আবিষ্কার করিতে পারেন নাই। প্রবাসীর কোনও পাঠকের সন্ধানে যদি সেই পত্রিকাগুলির সম্পূর্ণ বা অসম্পূর্ণ ফাইল থাকে, তবে তিনি অনুগ্রহ করিয়া প্রবাসী আপিসের ঠিকানায় ব্রজেন্দ্রবাবুকে সেই সংবাদ এবং সেই ফাইলগুলি দেখিবার অনুমতি দিলে তিনি বিশেষ উপকৃত হইবেন। তাঁহার নিম্নলিখিত পত্রিকাগুলির প্রয়োজন :—

(১) সমাচার দর্পণ (১৮৪০-৪১ ; ১৮৫১-৫২)
(২) সোমপ্রকাশ (প্রথম তিন বৎসরের—১৮৫৮-৬১)
(৩) সংবাদ প্রভাকর
(৪) জ্ঞানান্বেষণ
(৫) সমাচার চন্দ্রিকা
(৬) সম্বাদ ভাস্কর
(৭) এডুকেশন গেজেট (১৮৫৬-৬০)

—

ছাত্র-নির্য্যাতন

বঙ্গের ও আসামের কোন কোন স্কুলে ও কলেজে সেই সব ছাত্রকে ভর্ত্তি করা হইতেছে না যাহারা গাঁজা আফিং মদের দোকানে ও বিদেশী কাপড়ের দোকানে পিকেটিং করিয়াছিল, কিংবা অন্য ভাবে সত্যাগ্রহে যোগ দিয়াছিল। কোন কোন শিক্ষালয়ে ছাত্রদের কাছে এইরূপ প্রতিশ্রুতি চাওয়া হইতেছে, যে, তাহারা ভবিষ্যতে কোন রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগ দিবে না। আমরা ঐ সব স্কুল কলেজের হেডমাষ্টার এবং প্রিন্সিপ্যালদের এইরূপ কাজ গর্হিত মনে করি। গান্ধী-আরুইন চুক্তিতে স্পষ্ট করিয়া ছাত্রদের কথার উল্লেখ না থাকিলেও উহার মর্ম্মগত নীতিই এই, যে, যে-সব সত্যাগ্রহী বলপ্রয়োগসাপেক্ষ কোন অপরাধ করে নাই, তাহাদের অতীত আচরণের জন্য কোন শাস্তি হইবে না। ছাত্রদের পিকেটিং সাধারণতঃ ঐ-জাতীয়। তদ্ভিন্ন গান্ধী-আরুইন চুক্তি অনুসারে অহিংস নিরুপদ্রব পিকেটিং নিষিদ্ধ নহে। সেইজন্য পিকেটিঙের নিমিত্ত ছাত্রদিগকে শাস্তি দেওয়া অনুচিত। রাজনৈতিক আন্দোলন বলিতে কর্ত্তৃপক্ষ যাহা বুঝেন, শিক্ষালয়ের অধ্যক্ষেরা তাহা ত জানেন। এদেশে কাহাকেও গাঁজার দোকানে গিয়া গাঁজা কিনিতে নিষেধ করিলে, বিদেশী কাপড় না কিনিয়া দেশী কাপড় কিনিতে বলিলে, তাহাও হয় রাজনৈতিক আন্দোলন। অথচ বালকেরাও বুঝে, নেশা করা ভাল নয়, দেশী জিনিষ থাকিতে বিদেশী কেনা ভাল নয় ; সুতরাং সে-কথা বেশ বুঝিয়া-সুঝিয়া এবং নিজেদের পড়াশুনা ও অন্য কর্ত্তব্যের ক্ষতি না করিয়া তাহারাও বলিতে পারে। এ অবস্থায় বালক-বালিকাদের নিকট হইতে রাজনৈতিক আন্দোলনে বিরত থাকিবার প্রতিজ্ঞা লিখাইয়া লইলে, তাহাদিগকে জানিয়া-শুনিয়া ভবিষ্যতে মিথ্যাবাদী হইতে বলা হয়। কারণ, রাজনৈতিক আন্দোলনের সহিত এক আধটু যোগ ছেলেমেয়েদের থাকিবেই ; দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় যাহাদের বিন্দুমাত্রও যোগ থাকিবে না, তাহারা অমানুষ। আমরা শিক্ষক হইলে এরূপ অমানুষদের শিক্ষক হইতে চাহিতাম না। কোন স্বাধীন দেশেই ছাত্রদিগকে রাজনীতির সহিত লেশমাত্র-সম্পর্কবিহীন থাকিতে বলা হয় না। স্বাধীন দেশ অপেক্ষা ভারতবর্ষে রাজনীতিচর্চ্চার বেশী দরকার আছে। সুতরাং এদেশে ছাত্রদিগকে খাঁটি অরাজনৈতিক

জীব বানাইবার চেষ্টা অত্যন্ত নিন্দনীয়। ভারতপ্রবাসী ইংরেজরা ইহা করিতে পারে; কিন্তু দেশী শিক্ষকদের ইহা করা অনুচিত।

আমরা অনেক বৎসর ধরিয়া বলিয়া লিখিয়া আসিতেছি, যতক্ষণ কেহ ছাত্র-নামধারী থাকিবে, ততক্ষণ তাহাকে ছাত্রের কাজ করিতে হইবে। শিক্ষায় অবহেলা করিয়া তাহার অন্য কাজ করা উচিত নহে। কিন্তু মনোযোগী অমনোযোগী দু'রকম ছাত্রই আছে। কতক ছেলে বায়োস্কোপ দেখায়, কতক ফুটবল ও অন্য খেলাধূলায় খুব বেশী সময় নষ্ট করে। কিন্তু তাহা অনেকে করে বা করিতে পারে বলিয়া কোন শিক্ষালয়ের কর্তৃপক্ষ ত ভর্তি হইবার সময় এরূপ প্রতিজ্ঞা করাইয়া লন না, যে, তাহারা খেলাধূলায় ও বায়োস্কোপে মত্ত থাকিয়া সময় নষ্ট করিবে না ও পড়াশুনায় অবহেলা করিবে না? সুতরাং রাজনৈতিক আন্দোলনে ব্যাপৃত থাকিলে তাহাদের পড়াশুনার ব্যাঘাত হইবে ভাবিয়াই বা তাহাদের কাছে কেন মুচলেকা লওয়া হইবে?

আসল কথা এই, যে, যাহারা এরূপ মুচলেকা চায়, তাহারা ছাত্রদের শিক্ষার ব্যাঘাতের জন্য ততটা চিন্তিত নয়, যতটা চিন্তিত ইংরেজ প্রভুদের সন্তোষ অসন্তোষের জন্য এবং সরকারী সাহায্য পাওয়া না-পাওয়ার জন্য। যাহারা দেশের স্বাধীনতা চায় না, তাহারা ছাত্রদিগকে অভিনয়াদিতে খুব মাতিয়া থাকিতে ত বাধা দেয় না; যত কুদৃষ্টি রাজনীতির উপর।

বস্তুতঃ কোন প্রকার সাধু প্রতিজ্ঞাও করাইয়া লওয়া খারাপ এবং মানবপ্রকৃতি সম্বন্ধে অজ্ঞতার ফল। প্রতিজ্ঞা করাইলেই মানুষের কতকটা স্বাধীনতা হরণ করা হয়, এবং তাহাতে মানুষের মন বিদ্রোহী হয়। যাহাকে নিষিদ্ধ বলা হয়, তাহার প্রতি মানুষের মনের একটা আকর্ষণ আছে এই জন্য, যে, জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে তাহার মনের মধ্যে এইরূপ একটা যুক্তি কাজ করে, "আমাকে এই কাজটা না-করিতে হুকুম করা হইতেছে; আমি কি ভীরু, না গোলাম, যে হুকুম মানিব? আমি কাজটা করিবই করিব?"

ছাত্রদের যাঁহারা প্রকৃত হিতৈষী, তাঁহাদের একটু মনস্তত্ত্বজ্ঞান থাকা দরকার, এবং তাহাদিগকে হুকুম ও মুচলেকার দ্বারা চালাইবার চেষ্টা না করিয়া অন্য উপায়ে চালাইবার চেষ্টা করা আবশ্যক।

—

সতীশচন্দ্র রায়

শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায়ের মৃত্যুতে বাংলা সাহিত্যের বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে। তিনি বঙ্গীয় বৈষ্ণব সাহিত্যের—বিশেষ করিয়া পদাবলীর—বিশেষ চর্চ্চা করিয়াছিলেন।



সতীশচন্দ্র রায়

তাহার সংগ্রহও প্রকাশ করিয়াছিলেন। তিনি অনেক প্রাচীন পুঁথি আবিষ্কার করিয়াছিলেন এবং পাঠের উদ্ধারও করিয়াছিলেন।

—

কংগ্রেস দলাদলির সালিসী

বাংলাদেশের কংগ্রেসের দুই দলের বিবাদ নিষ্পত্তি

করিবার নিমিত্ত শ্রীযুক্ত আনে বেরার হইতে আসিয়াছেন। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে তাঁহার কার্য্যের সাফল্য কামনা করিতেছি।

—

দুর্ভিক্ষ

উত্তর ও পূর্ব্ব বঙ্গের নানাস্থানে অন্নাভাবের অতি দুঃখকর নানা সংবাদ খবরের কাগজে বাহির হইতেছে। আগে আগে দুর্ভিক্ষের সময় বিপন্ন লোকদের সাহায্যার্থ যেরূপ চেষ্টা হইত, এবার সেরূপ চেষ্টা হইতেছে কি? মনে হইতেছে, যেন লোকে অন্যবিধ চিন্তায় বিক্ষিপ্তচিত্ত হইয়া রহিয়াছে। কলিকাতা শহরে সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়ের লোকদের নেতৃবর্গকে লইয়া একটি কমিটি করিয়া অর্থসংগ্রহের চেষ্টা করা সমীচীন কি না, নেতৃবর্গ বিবেচনা করুন।

—

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির কার্য্য

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি গত অধিবেশনে অনেক গুরুতর বিষয়ের আলোচনা করিয়া কতকগুলি সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। তাঁহারা খুব পরিশ্রম করিতেছেন। কিন্তু ভারতবর্ষ অতি বৃহৎ দেশ ও ইহার লোকসংখ্যা ৩৫ কোটি বলিয়া, ইহার অভাব অভিযোগ দুর্দ্দশা ও সমস্যার অন্ত নাই। সম্ভবতঃ সময়ের অভাবে এবং স্থলবিশেষে সংবাদের অভাবেও তাঁহারা কোন কোন প্রয়োজনীয় বিষয়ের আলোচনা করিতে পারেন না। তাহার মধ্যে দুটি বিষয়ের এখানে উল্লেখ করিতেছি। প্রত্যেকটি বিষয় মহাত্মা গান্ধীকে বা কংগ্রেসের কোন সেক্রেটরীকে চিঠি লিখিয়া বা টেলিগ্রাফ করিয়া জানাইবার পর তাঁহারা কিছু করিবেন বা না-করিবেন, কংগ্রেসের কার্য্যপ্রণালী সম্ভবতঃ এরূপ নয়। ভারতবর্ষের বিদেশী গবর্ন্মেণ্ট কিছু করুন বা না-করুন, দেশের লোকেরা দরখাস্ত না করিলেও অনেক খবর রাখেন। কংগ্রেসের সব খবর রাখিবার বন্দোবস্ত থাকা দরকার। ওয়ার্কিং কমিটির প্রাদেশিক সভ্য সব প্রদেশে নাই। যেখানে যাঁহারা আছেন, তাঁহারা কার্য্যভারপ্রপীড়িত। এই জন্য সব প্রদেশে সংবাদপ্রেরক সেক্রেটরী রাখিলে ভাল হয়। কেন-না, ওয়ার্কিং কমিটি সব প্রদেশের খবরের কাগজ পড়েন না।

এখন বিষয় দুটির উল্লেখ করি।

স্বদেশী ও বিদেশী কয়লা

বেহারে ও বঙ্গে খনি হইতে যত কয়লা তোলা হয় বা হইতে পারে, আমাদের দেশের প্রয়োজন এখনও দীর্ঘকাল তাহাতেই সিদ্ধ হইতে পারে। প্রথম শ্রেণীর কয়লা যে যথেষ্ট পাওয়া যায় না, তাহাও নহে। যে-খনি দেশী মালিকের থাকিবার সময় তাহার কয়লা নিকৃষ্ট বিবেচিত হইত, সেই খনি ইংরেজ কিনিবার পর তাহার কয়লা প্রথম শ্রেণীর বলিয়া গণিত হইয়া থাকে, স্বর্গীয় সাতকড়ি ঘোষ তাঁহার সাক্ষ্যে এ কথা বলিয়া গিয়াছেন।

নানা কারণে আজকাল কয়লার ব্যবসাতে বড় মন্দা পড়িয়াছে এবং তজ্জন্য অনেক লোক বেকার হইয়াছে। একটা কারণ, দক্ষিণ-আফ্রিকার কয়লার প্রতিদ্বন্দ্বিতা। তথাকার গবর্ন্মেণ্টের ও জাহাজওয়ালাদের সহযোগিতায় ঐ কয়লা বোম্বাইয়ে আনীত হইয়া যে-দরে বিক্রী হয়, সে-দরে বেহার ও বঙ্গের কয়লা বোম্বাই প্রদেশে বিক্রী করা যায় না। শুনা যায়, এই জন্য বোম্বাইয়ের দেশী কাপড়ের কলওয়ালারা বিদেশী কয়লা ব্যবহার করেন। দেশী কয়লা ব্যবহার করিলে তাঁহাদের কোন লাভই থাকিবে না, বোধ করি এমন নয়; লাভ সামান্য কমিবে মাত্র। দেশের যে-সব লোক দেশী কলের কাপড় ও খদ্দর ব্যবহার করেন, তাঁহারা সস্তা বিদেশী কাপড় না কেনায় কিছু ক্ষতি স্বীকার করেন। মিলওয়ালাদেরও কি সামান্য কম লাভে রাজী হওয়া উচিত নয়? ইহা একটি কংগ্রেসের বিবেচনার যোগ্য বিষয়।

বঙ্গে গান্ধী-আরুইন চুক্তি ভঙ্গ

পুলিসের বিরুদ্ধে অত্যাচারের অভিযোগ সম্বন্ধে কোন তদন্ত হইবে না, যথেষ্ট বা অযথেষ্ট কারণে, গান্ধী-আরুইন চুক্তিতে এইরূপ স্থির হয়। সেইজন্য, চুক্তির পরে

গান্ধীজী যে মেদিনীপুর প্রভৃতি বঙ্গের কোন কোন জেলায় কোন কোন স্থানে পুলিসের কার্য্যের সম্বন্ধে ঘটনাস্থলে লোকদের মুখে তাহাদের দুঃখের কাহিনী শুনিতে যান নাই, সে সম্বন্ধে কিছু বলিতে চাই না। কিন্তু তিনি কারা-মুক্ত হইবার পর একবারও যদি তমলুক কাঁথি প্রভৃতি অঞ্চলে যাইতেন, তাহা হইলে লোকেরা খুব আশ্বস্ত হইত। সে কথাও ছাড়িয়া দিলাম।

আজকাল কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির আলোচনায় এবং অনেক দেশী দৈনিকে বোরসাদ বারদোলি তালুকার এবং আগ্রা-অযোধ্যার নানাস্থানে চুক্তিভঙ্গের খবর দেখিতে পাই। কিন্তু আমাদের এই বাংলাদেশে তমলুক ও অন্য কোন কোন অঞ্চলে যে সরকারী লোকদের দ্বারা চুক্তিভঙ্গ হইতেছে শুনিতে পাই, তাহার সত্যাসত্যতা নির্দ্ধারণের চেষ্টা হয় না কেন, এবং বঙ্গে যে সকলের চেয়ে রাজনৈতিক বন্দী বেশী আছে তাহাদের সকলেই বল-প্রয়োগসাপেক্ষ (violent) অপরাধে অপরাধী কি না, তাহা নির্দ্ধারণের চেষ্টা হয় না কেন, তাহার কারণ অবগত নহি। ইহাও একটি কংগ্রেসের বিবেচনার যোগ্য বিষয়।

—

বর্দ্ধমানে প্রাদেশিক হিন্দু কন্‌ফারেন্স

আগামী ২রা ও ৩রা শ্রাবণ বর্দ্ধমানে বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দু কন্‌ফারেন্সের অধিবেশন হইবে। কাশিমবাজারের মহারাজা শ্রীশচন্দ্র নন্দী মহাশয় সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। বাংলাদেশে হিন্দু মহাসভার কাজের বিশেষ আবশ্যক আছে,—সংকীর্ণতা ও গোঁড়ামি রক্ষা করিবার জন্য নহে, কিন্তু সেই সকল বাধা দূর করিবার জন্য যাহা হিন্দুসমাজকে আভ্যন্তরীণ সংহতিহীন ও দুর্ব্বল করিয়া রাখিয়াছে। এই জন্য হিন্দুসভার কার্য্যে সকল হিন্দুরই যোগ দেওয়া উচিত।

হিন্দু মহাসভার কাজের একটা রাজনৈতিক দিক্ আছে। কিন্তু তাহা গৌণ। রাজনৈতিক সাম্প্রদায়িক সমস্যার, সন্তোষজনক বা অসন্তোষজনক, একটা সমাধান হইয়া গেলেও মহাসভার বিস্তর কাজ করিবার থাকিবে। সকল হিন্দু তাহার খবরটা অন্ততঃ যদি রাখেন, তাহা হইলে তাঁহাদের মঙ্গল হইবে। এ বিষয়ে চিঠিপত্র কলিকাতায় বঙ্গীয় হিন্দুসভার আপিসে ১৬০ নং হ্যারিসন রোড ঠিকানায় লিখিতে হইবে।

রবীন্দ্রনাথ কোন রাজনৈতিক দলভুক্ত নহেন। হিন্দু মুসলমানের দলাদলিতেও তিনি নাই। তাহার বেশী প্রমাণ না দিয়া ভূপালের নবাবের তাঁহাকে নিমন্ত্রণের উল্লেখ করা যাইতে পারে। শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি বসু তাঁহাকে অনেক দিন হইল এক বার ইণ্টারভিউ করেন। সেই কথাবার্ত্তা "বিজলী" কাগজে বাহির হইয়াছিল। তাহাতে কবি এই মর্ম্মের মত প্রকাশ করিয়াছিলেন, যে, বঙ্গে হিন্দু মহাসভার করণীয় কাজ অনেক আছে। আশা করি, আমাদের স্মৃতিবিভ্রম হইতেছে না। তাহা যদি না হয়, তাহা হইলে রবীন্দ্রনাথ হিন্দু মহাসভার সামাজিক এবং শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক কর্ত্তব্য সম্বন্ধেই এরূপ মত প্রকাশ করিয়া থাকিবেন। কোন দলের রাজনৈতিক মত সম্বন্ধে তিনি স্বেচ্ছায় কিছু বলিতে চান না। যে-সব হিন্দু হিন্দুমহাসভার রাজনৈতিক মত প্রকাশ করেন না, তাঁহারা ইহার অন্যান্য কার্য্যে যোগ দিতে বা আনুকূল্য করিতে পারেন।

—

আমেরিকায় গান্ধী ভোজ

পাশ্চাত্য দেশসকলে রাজনৈতিক বক্তৃতাদির জন্য অনেক সময় ভোজের আয়োজন হয়। আমেরিকার নিউ ইয়র্ক শহরে সম্প্রতি এইরূপ একটি ভোজ হইয়া গিয়াছে। তাহার উদ্দেশ্য, মহাত্মা গান্ধী ভারতবর্ষের স্বাধীনতা লাভার্থ যে প্রচেষ্টার প্রবর্ত্তন করিয়াছেন, আমেরিকার পক্ষ হইতে তাহার সাফল্য কামনা করা। তাহাতে অনেক বিখ্যাত লোক বক্তৃতা করিয়াছিলেন। তাহার কোন কোনটি ভারতীয়দের পরিচালিত কোন কোন ইংরেজী দৈনিকে বাহির হইয়াছে। সমুদয় বক্তৃতা আমেরিকা হইতে আমাদের নিকট আসিয়াছে। ডাঃ সাণ্ডারল্যাণ্ড প্রভৃতি ভারতবন্ধু সভায় উপস্থিত হইতে না পারিয়া যে-সব চিঠি লিখিয়াছিলেন, তাহাও পাইয়াছি। সুবিধা

হইলে এইগুলির কোন কোন অংশ ইংরেজী মডার্ণ রিভিউ কাগজে প্রকাশ করিব।

সুভাষবাবুকে প্রহার সম্বন্ধে তদন্ত

গত "স্বাধীনতা দিবসে" কলিকাতায় মিছিল ও সভা উপলক্ষ্যে শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসুকে ও অন্য কোন কোন নেতা ও নেত্রীকে পুলিস যে প্রহার করিয়াছিল, সে-বিষয়ে তদন্ত করিবার জন্য একটি কমিটি নিযুক্ত হয়। মিঃ হাসান ইমাম, স্যার নীলরতন সরকার প্রভৃতি তাহার সভ্য ছিলেন। তাঁহারা তদন্তের রিপোর্ট প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে পুলিসের ব্যবহার অত্যন্ত গর্হিত ও নিন্দনীয় হইয়াছিল, এবং তাহার কোন ন্যায্য কারণ ছিল না। তাঁহারা আরও বলিয়াছেন, যে, পুলিস কমিশনারের সহিত সুভাষবাবুর কোন গোপনীয় বুঝা-পড়া থাকার কথা মিথ্যা।

পাটের চাষ হ্রাস

গত বৎসর বঙ্গে মোট যত বিঘা জমীতে পাটের চাষ হইয়াছিল, এ বৎসর তাহার প্রায় অর্দ্ধেক জমীতে চাষ হইয়াছে। সুতরাং উৎপন্নও গত বৎসরের অর্দ্ধেক হইবার কথা। তাহা হইলে, পাটের চাহিদা পূর্ব্ববৎ থাকিলে দাম বাড়িবার কথা। এ বিষয়ে আমরা বিশেষজ্ঞ নহি। যাঁহারা বিশেষজ্ঞ এবং পাটচাষীদের হিতৈষী, তাঁহারা দেখিবেন যেন কোন কৌশলে ও কৃত্রিম উপায়ে পাট-কলের লোকেরা ও দালালরা চাষীদিগকে সস্তায় মাল ছাড়িয়া দিতে বাধ্য না করে।

ছাত্রীছাত্রদের রবীন্দ্রজয়ন্তী

আমরা দেখিয়া প্রীত ও উৎসাহিত হইলাম, যে, বঙ্গের ছাত্রী ও ছাত্রেরা রবীন্দ্রনাথের জীবনের সপ্ততিবর্ষ পূর্ণ হওয়া উপলক্ষ্যে বিশেষ উৎসবের আয়োজন, কবির বাণী সর্ব্বত্র প্রচারের আয়োজন, এবং বিশ্বভারতীর প্রতি কার্য্যতঃ দেশব্যাপী মৈত্রী প্রদর্শনের উপায় অবলম্বন করিতে সঙ্কল্প করিয়াছেন। এই সঙ্কল্প কেবল হিন্দুমুসলমান বাঙালী ছাত্রীছাত্রেরা করেন নাই, অন্য কোন কোন ছাত্রও ইহাতে যোগ দিয়াছেন।

সর্ব্বসাধারণের রবীন্দ্রজয়ন্তী

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ইন্‌ষ্টিটিউটের গত ২রা জ্যৈষ্ঠের সভায় রবীন্দ্রজয়ন্তীর আয়োজন করিবার নিমিত্ত যে কমিটি গঠিত হয়, সেই কমিটির এক অধিবেশনে উহার বিবেচনার জন্য উৎসব সম্বন্ধে একটি প্রস্তাব উপস্থিত করা হইবে। উৎসবটি সপ্তাহব্যাপী করিবার অভিপ্রায় আছে। কোন্ দিন কি করা যাইতে পারে, তাহার একটু আভাস প্রস্তাবে আছে। প্রথম দিনে উদ্বোধনের অনুষ্ঠান এবং কবির রচনাবলী সম্বন্ধে বাংলায় লিখিত প্রবন্ধাদি পাঠ ও কবিতা পাঠ; দ্বিতীয় দিনে কবির ইংরেজী গ্রন্থাবলী সম্বন্ধে এবং তাঁহার দার্শনিক ও ধর্ম্ম-বিষয়ক মত, শিক্ষাকার্য্য, রাজনৈতিক মত, গ্রামসংগঠন প্রভৃতি বিষয়ক কার্য্য সম্বন্ধে ইংরেজীতে প্রবন্ধাদি পাঠ। এই দিনের কাজে যোগ দিবার জন্য ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ হইতে ভারতীয় ও ইউরোপীয় মনীষীদিগকে নিমন্ত্রণ করা হইবে। ৩য় ও ৪র্থ দিবসে সঙ্গীতে রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার সৃষ্টি সম্বন্ধে বাংলায় ও ইংরেজীতে প্রবন্ধ, এবং তাঁহার রচিত নানা প্রকারের গান গাইবার ব্যবস্থা হইবে। পঞ্চম দিনে তাঁহার কোন নাটকের অভিনয়। ষষ্ঠ দিবসে তাঁহাকে বিভিন্ন সভাসমিতি কর্ত্তৃক অভিনন্দন-পত্র দ্বারা সম্বর্দ্ধনা এবং অর্থ উপহার। সপ্তম দিবসে কবির দর্শন-লাভার্থ উদ্যান-সম্মিলনের আয়োজন। প্রস্তাবে এই সঙ্গে সঙ্গে একটি মেলারও আয়োজন করিবার কথা আছে। মেলার অঙ্গ হইবে (১) প্রদর্শনী, (২) আমোদ-প্রমোদ, (৩) খেলা কুস্তী ইত্যাদি, এবং সর্ব্বসাধারণের বোধগম্য ও মনোরঞ্জক বক্তৃতাবলী। প্রদর্শনীতে রাখা হইবে, রবীন্দ্রনাথের আঁকা ছবি; তাঁহার রচিত গ্রন্থাবলীর যে-সব হস্তলিপি পাওয়া যায়; তাঁহার গ্রন্থাবলীর ভিন্ন ভিন্ন সংস্করণ; ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় তাঁহার

গ্রন্থসমূহের অনুবাদ; বাংলা, ইংরেজী, ফরাসী, জার্ম্মান প্রভৃতি ভাষায় তাঁহার সম্বন্ধে বহি; তাঁহার ভিন্ন ভিন্ন বয়সের ফটোগ্রাফ, তাঁহার নানা রকমের ছবি, ও নানা দেশে তাঁহার নানা বক্তৃতা ও অন্য কাজের সভাদির ছবি; নানা দেশে তাঁহাকে প্রদত্ত উপহারাবলী; কলাভবনের ছাত্রীছাত্রদের, শ্রীভবনের ছাত্রীদের এবং শ্রীনিকেতনের ছাত্রীছাত্রদের নানা শিল্পকার্য্যের নমুনা; সমগ্র বঙ্গদেশ হইতে সংগৃহীত নানাবিধ শিল্পজাত দ্রব্য, ও প্রাচীন ও নবীন কুটীরশিল্পের নমুনা; এবং আধুনিক বঙ্গীয় চিত্রকরসম্প্রদায়ের অঙ্কিত ছবি। আমোদ-প্রমোদের মধ্যে কথকতা, যাত্রা, কীর্ত্তন, বাউলের গান, গম্ভীরার গান প্রভৃতি, এবং রায়বেঁশের নাচ প্রভৃতি থাকিবে। খেলার মধ্যে দেশী খেলা, জিউজিৎসু, এবং ব্রতী বালক ও ব্রতী বালিকাদের নানা কাজ প্রদর্শন থাকিবে। বক্তৃতাগুলির মধ্যে বিশ্বভারতীর নানা বিভাগের কাজের বর্ণনা করা হইবে, এবং ম্যাজিক লণ্ঠন ও সিনেমার সাহায্য লওয়া হইবে। উৎসব ডিসেম্বর মাসে বড়দিনের ছুটিতে কলিকাতার ওয়েলিংটন স্কোয়ারে মণ্ডপ নির্ম্মাণ করিয়া করিবার কথা হইয়াছে।

বাংলা ও ইংরেজীতে লিখিত নানা প্রবন্ধাদি সম্বলিত একাধিক গ্রন্থ প্রকাশ করিবার সঙ্কল্প আছে।

সাহিত্য, দর্শন ও ধর্ম্ম, সঙ্গীত, চিত্রকলা, অভিনয়, নানা ঋতু-উৎসব, নৃত্য, গৃহধর্ম্মে গৃহস্থালীতে বাস-ভবনাদি নির্ম্মাণে শিল্প ও কলার প্রতি অভিনিবেশ, শিক্ষানীতি, রাষ্ট্রনীতি ও জাতিগঠন, গ্রামসংগঠন, প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মিলন, জগতে শান্তির ও মৈত্রীর বার্ত্তা প্রচার, প্রভৃতি নানা বিষয়ে ও দিকে রবীন্দ্রনাথ যে অসাধারণ কাজ করিয়াছেন, উৎসব উপলক্ষ্যে সকলকে তাহার কিছু আভাস দিবার প্রস্তাব হইয়াছে।

আমাদের বিবেচনায় প্রস্তাবটি সুচিন্তিত। ইহার কোন কোন অঙ্গে পরিবর্ত্তন পরিবর্দ্ধনাদি হইতে পারে ও হইবে বটে। কিন্তু রবীন্দ্রজয়ন্তী মোটের উপর এই প্রকারে সপ্তাহ ব্যাপিয়া হইলে তাহা কবির সর্ব্বতোমুখী প্রতিভার এবং মানুষকে আনন্দ দিবার ও মানুষের কল্যাণসাধনের বহুবিধ চেষ্টায় বিকশিত তাঁহার মানব-প্রীতির অনুরূপ হইবে।

—

বিদেশী পণ্য বর্জ্জন

বিদেশী কাপড় ও বিদেশী অন্য অনাবশ্যক জিনিষের বিক্রী বন্ধ করিবার জন্য পিকেটিং প্রভৃতি চেষ্টা মন্দীভূত হইয়াছে। ইহা দেশী শিল্প-বাণিজ্যের পক্ষে শুভলক্ষণ নহে।

—

কংগ্রেসের সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান

কংগ্রেস কার্য্যনির্ব্বাহক কমিটি সাম্প্রদায়িক সমস্যা সম্বন্ধে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, তাহা যে অবিমিশ্র স্বাজাতিকতা ও গণতান্ত্রিকতা হইতে উদ্ভূত নহে, তাহা তাঁহারা নিজেই বলিয়াছেন। ইহাও বলিয়াছেন, যে, উহা খাঁটি সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্তও নহে। উভয়ই সত্য কথা। ইহা রফা, এবং তাঁহাদের মতে ইহা বর্ত্তমান অবস্থার পক্ষে স্বাজাতিকতা ও গণতান্ত্রিকতার যথাসম্ভব কাছ-ঘেঁসা রফা। কংগ্রেস সিদ্ধান্তটি স্বাজাতিক মুসলমানদের প্রায় সব দাবী গ্রহণ করিয়াছেন। তথাপি ইহা কিয়ৎপরিমাণে স্বাজাতিক মুসলমানদের প্রস্তাব অপেক্ষা অধিক গণতান্ত্রিক।

ইহার প্রথম ধারা জনগণের ভিত্তিগত অধিকার, ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীর ব্যক্তিগত আইন (পার্স’ন্যাল ল) প্রভৃতি সম্বন্ধীয়। এবিষয়ে বিশেষ কিছু বলিবার নাই। এরূপ ব্যবস্থা থাকা উচিত।

দ্বিতীয় ধারায় বলা হইতেছে, সকল প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ ও নারী ভোট দিবার অধিকার পাইবে। সকল সাবালক পুরুষ ও স্ত্রীলোক ভোট পাইলে তাহার ফলে মুসলমানদের মধ্যেও পর্দ্দার উচ্ছেদ অনিবার্য্য। মুসলমান নারীরা স্বাধীনতা পাইলে বহুবিবাহও লুপ্ত হইবে।

তৃতীয় ধারায় উক্ত হইয়াছে, যে, সম্মিলিত নির্ব্বাচন-রীতি অনুসৃত হইবে। সিন্ধুদেশের হিন্দুদের, আসামের মুসলমানদের, পঞ্জাবের ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের শিখদের এবং যে-কোন প্রদেশে হিন্দু ও মুসলমানেরা মোট অধিবাসীসমষ্টির শতকরা পঁচিশ জনের কম, তথায় তাহাদের

জন্য কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভায় তাহাদের সংখ্যার অনুপাতে প্রতিনিধির সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট থাকিবে, অধিকন্তু তাহারা তাহার অতিরিক্ত সভ্যপদ পাইবার নিমিত্ত প্রতিযোগিতা করিতে পারিবে। এই ব্যবস্থার দোষ এই, যে, পঞ্জাবে ও বঙ্গে হিন্দুরা সংখ্যায় মুসলমানদের চেয়ে কম হইলেও, তাহারা এই ব্যবস্থার সুবিধা পাইবে না; যেহেতু, তাহাদের সংখ্যা শতকরা পঁচিশের চেয়ে কম নয়, বেশী। এই পঁচিশ সংখ্যাটিতে কি জাদু থাকিতে পারে, তৎসম্বন্ধে একটি অনুমানের উল্লেখ পূর্ব্বে করিয়াছি। ব্যবস্থাটির আর একটি ত্রুটি এই, যে, হিন্দু মুসলমান ও শিখ ছাড়া অন্য কোন ধর্ম্মাবলম্বীরা কোথাও সংখ্যালঘিষ্ঠ থাকিলে তাহাদের জন্য কোনই ব্যবস্থা ইহাতে করা হয় নাই। মুসলমানেরা যে-যে প্রদেশে সংখ্যায় অধিকতম, সেখানেও তাহাদের সংখ্যার অনুপাতে অধিকতম সভ্যপদ তাহাদের জন্য নির্দ্দিষ্ট রাখিবার ব্যবস্থা যে নাই, ইহা ভাল।

সরকারী চাকরীর ন্যূনতম যোগ্যতা নির্দ্দেশ প্রভৃতি সম্বন্ধে যে ধারাটির মুসাবিদা কংগ্রেস কার্য্যনির্ব্বাহক কমিটি করিয়াছেন, তাহা ফরিদপুরে ডাক্তার আন্সারীর ঐরূপ ধারাটি অপেক্ষা ভাল। কারণ, কংগ্রেস মুসাবিদাটিতে যদিও ন্যূনতম যোগ্যতা নির্দ্দেশের ব্যবস্থা আছে, তথাপি ইহা বলা হয় নাই, যে, তদনুসারেই নিয়োগ করিতেই হইবে (ডাক্তার আন্সারীর ধারাটিতে আছে "all appointments *shall* be made…according to a minimum standard of efficiency"); বলা হইয়াছে, যে, পাব্লিক সার্ভিস কমিশনকে সরকারী সব কার্য্য-বিভাগের এফিসিয়েন্সী বা কার্য্যকারিতা ও কার্য্য-পটুতার উপর যথোচিত দৃষ্টি ("due regard") রাখিতে হইবে।

একটি ধারায়, মন্ত্রীমণ্ডল গঠনকালে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়সকলের স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি রাখিতে বলা হইয়াছে। ইহা কেমন করিয়া করা হইবে, বলা হয় নাই। সংখ্যালঘু কোন সম্প্রদায়ের লোক বলিয়াই কোন একজন ব্যবস্থাপক সভার সভ্যকে মন্ত্রী করিতে হইলে, তিনি যে যোগ্য লোক হইবেন, যোগ্যতমদের একজন হইবেন, এবং অধিকাংশ সভ্যের বিশ্বাসভাজন হইবেন, সকল সময়ে তাহা না হইতে পারে। দায়িত্বপূর্ণ শাসনপ্রণালীর নীতি (principle of responsible government) এরূপ বন্দোবস্তের বিরোধী।

বালুচিস্তান ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশকে গবর্ণর-শাসিত ব্যবস্থাপকসভাবিশিষ্ট অন্যান্য প্রদেশের মত প্রদেশ করার আমরা বিরোধী, এই একটি প্রধান কারণে, যে, ঐ দুটি অঞ্চল বর্ত্তমান অবস্থাতেই নিজের রাজস্ব হইতে নিজের ব্যয়নির্ব্বাহে অসমর্থ। তাহাদিগের ঘাট্‌তি মিটাইবার জন্য ভারত-গবর্ন্মেণ্ট বিস্তর টাকা দিতে বাধ্য হইবেন, এবং ঐ টাকা অর্থাভাবপীড়িত অন্য সব প্রদেশ হইতে তাহাদিগকে বঞ্চিত করিয়া লওয়া হইবে। ঐ দুই অঞ্চলের লোকসংখ্যা বাংলার এবং অন্য কোন কোন প্রদেশের অনেক জেলার চেয়েও কম। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের লোকসংখ্যা ২২,৫১,৩৪০ এবং বালুচিস্তানের ৪,২০,৬৪৮। এই দুটি অঞ্চল মুসলমানপ্রধান. এই জন্য মুসলমানরা বরাবর এই দুটিকে বড় বড় প্রদেশের সমান করিতে চাহিয়া আসিতেছেন। তাহা হইলে তথাকার মুসলমানেরা অন্যান্য প্রদেশের টাকায় সমৃদ্ধ হইতে পারিবেন, এবং সংখ্যায় খুব কম হইলেও অন্যান্য প্রদেশের মত কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভায় সভ্য পাঠাইতে পারিবেন এবং এই সভ্যেরা প্রায় সবই মুসলমান হইবেন।

সিন্ধুদেশকেও একটি স্বতন্ত্র প্রদেশে পরিণত করিতে বলা হইয়াছে। কিন্তু তাহাতে এই সর্ত্ত জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে, যে, সিন্ধুদেশের লোকদিগকে স্বতন্ত্র প্রদেশের রাষ্ট্রীয় কার্য্য চালাইবার অতিরিক্ত ব্যয়ভার নির্ব্বাহ করিতে হইবে। বালুচিস্তান ও উ-প সীমান্ত প্রদেশের বেলায় এরূপ সর্ত্ত না করিয়া সিন্ধুর বেলাই কেন করা হইল, তাহার রহস্য আমরা জানি না। তবে, সিন্ধু সম্বন্ধে একথা জানি, যে, তথাকার রাজস্ব প্রধানতঃ হিন্দুদের প্রদত্ত ট্যাক্স হইতে উঠে—যদিও তাহারা সংখ্যায় প্রায় সিকি অংশ। সিন্ধু দেশের ব্যয়ভার আরও বেশী করিয়া সিন্ধীদিগকেই নির্ব্বাহ করিতে বলার মানে, ট্যাক্সের বোঝা আরও বেশী করিয়া তথাকার

হিন্দুদের উপর চাপান। ন্যায়সঙ্গত সর্ত্ত এই হইত, যে, যাঁহারা (অর্থাৎ সংখ্যাভূয়িষ্ঠ তথাকার মুসলমানেরা) সিন্ধুকে স্বতন্ত্র প্রদেশ করিতে বলিতেছেন, তাঁহারা অতিরিক্ত ব্যয়ভারের অংশ তাঁহাদের সংখ্যার অনুপাতে বহন করিবেন।

উ-প সীমান্ত প্রদেশ ও বালুচিস্তান সম্বন্ধে উক্ত প্রকার সর্ত্ত না করিবার দুটি কারণ অনুমিত হইতে পারে। প্রথম, ঐ দুই অঞ্চলে সংখ্যায় ও ধনশালিতায় সিন্ধী হিন্দুদের সমান এমন হিন্দু নাই যাহাদের নিকট হইতে যথেষ্ট ধন শোষণ করা যাইতে পারে ; দ্বিতীয়, সিন্ধু নদীতে বাঁধ দিয়া লক্ষ লক্ষ বিঘা জমীতে জলসেচন দ্বারা ধনবৃদ্ধির যে উপায় সিন্ধু দেশে হইবে, বালুচিস্তান ও উপ-সীমান্ত প্রদেশে সেরূপ কোন পূর্ত্ত কার্য্য হইতেছে না।

রেসিডুয়ারী অর্থাৎ "অবশিষ্ট" ক্ষমতা কেন্দ্রীয় গবর্ন্মেণ্টের হাতে অর্পণ না করিয়া প্রদেশ ও দেশী রাজ্যগুলিকে দেওয়া অত্যন্ত আপত্তিজনক ও আজগুবি ব্যবস্থা। তবু রক্ষা এই, যে, কার্য্যনির্ব্বাহক কমিটি বলিতেছেন, যে, ভারতবর্ষের কল্যাণার্থ প্রয়োজন হইলে এই ব্যবস্থা নাকচ হইতে পারিবে। ভারতবর্ষের কল্যাণ ত দূরের কথা, স্বাধীন শক্তিশালী ও অখণ্ড রাষ্ট্ররূপে ভারতবর্ষের অস্তিত্বই নির্ভর করে "অবশিষ্ট" ক্ষমতা কেন্দ্রীয় গবর্ন্মেণ্টের হাতে থাকার উপর। অবশিষ্ট ক্ষমতার মানে কি এবং তাহা কেন কেন্দ্রীয় গবর্ন্মেণ্টের হাতে থাকা উচিত, তাহার ব্যাখ্যা আমরা গত জ্যৈষ্ঠের প্রবাসীর ২৭৮ ও ২৭৯ পৃষ্ঠায় করিয়াছি। এই জন্য এখানে বেশী কিছু লিখিতেছি না। স্বাজাতিক মুসলমানদের অন্য যে-সব দাবী কংগ্রেস কার্য্যনির্ব্বাহক কমিটি গ্রহণ করিয়াছেন, তাহার আলোচনাও জ্যৈষ্ঠের বিবিধ প্রসঙ্গে আছে।

কমিটির সিদ্ধান্তের আলোচনা আমরা সংক্ষেপে করিলাম। ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট রফা উদ্ভাবন করিবার চেষ্টা করা বৃথা ; কেন-না, রফা যেমনই হউক, সেই রফাই ভাল, যাহাতে উভয় পক্ষ সম্মত হইবে। কোন রফাতেই আমরা সব দলকে সম্মত করাইতে পারিব, এমন সামর্থ্য আমাদেরত নাই-ই, এমন কি কংগ্রেসও পার্থক্যবাদী মুসলমানদিগকে রাজী করিতে পারেন নাই, সম্ভবতঃ হিন্দু মহাসভাকেও রাজী করিতে পারিবেন না।

—

মৌলানা আক্রম খাঁর অভিভাষণ

যশোহর জেলা রাজনৈতিক সম্মেলনের সভাপতিরূপে মৌলানা আক্রম খাঁ যে বক্তৃতা করিয়াছেন, তাহা আমরা স্বতন্ত্র মুদ্রিত আকারে দেখি নাই ; দৈনিক কাগজে যতটুকু দেখিয়াছি, আমাদের বিবেচনায় তাহা সত্য ও সমর্থন-যোগ্য কথায় পূর্ণ। তাহার কিয়দংশ আমরা উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

আমাদের দেশে আজকাল দেশ-সেবার উদ্দেশ্যে নানাবিধ জাতীয় উৎসব ও অনুষ্ঠানের আয়োজন সর্ব্বদা ও সর্ব্বত্রই হইয়া থাকে। ইহার প্রত্যেকটিতে সকলের মুখে সোৎসাহে "বন্দে মাতরম্" ধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায়। কিন্তু আমার মনে হয়, এই সেবা ও বন্দনার দাবীর মূলে যে দেশ, তার সত্যকার স্বরূপটাকে সম্যক্‌ভাবে উপলব্ধি করার চেষ্টা সকল সময়ে আমরা আবশ্যক বলিয়া মনে করি না। আমার মতে "বন্দে মাতরম্" মন্ত্রের বাস্তব সার্থকতা হইতেছে "বন্দে ভ্রাতরমের" সত্যকার দীক্ষায়। ভ্রাতৃপ্রেমের এই পুণ্য অনুভূতিকে পরিপূর্ণভাবে ধারণ এবং বাস্তবরূপে প্রকাশ করার সুবিধার জন্যই, একটা কল্পকেন্দ্রের হিসাবে জন্মভূমিকে আমরা জননীরূপে ধারণা করিয়া থাকি। আমি জননী বলিতে এখানে বুঝি, তাঁর সন্তানগণের সমষ্টিগত স্বরূপকে, আর দেশ বলিতে মনে করি, তাঁর সমগ্র মানবের সমবায়ে রচিত জাতিকে। বস্তুতঃ দেশ অর্থে কতকগুলি মাটির স্তূপ, নদ-নদী বা পাহাড়-পর্ব্বতের সমষ্টি নহে।

বাঙালী হিসাবে—হিন্দু-মুসলমান নির্ব্বিশেষে—আমাদের একটা বৈশিষ্ট্য আছে। শত চেষ্টা করিয়াও আমরা এই বৈশিষ্ট্যকে বর্জ্জন করিতে পারি না, অন্য দেশের বৈশিষ্ট্যকে অর্জ্জন করিতেও পারি না। পেশাওয়ারের আঙ্গুর-বেদানা অতি উপাদেয় হইলেও বাংলার মাটি তার চাষের উপযুক্ত নহে। বাংলার নারিকেল ও মর্ত্তমান কাবুল-কান্দাহারের উর্ব্বরতর ভূভাগেও জীবনধারণ বা সুফলদান করিতে পারে না। পারে না বলিয়াই এগুলিকে আমরা বৈশিষ্ট্য বলিয়া উল্লেখ করিতে পারি।

বাংলার প্রকৃতি এই অভিন্নতার দ্বারাই অ-বাংলা হইতে নিজকে সকল দিক দিয়া পৃথক করিয়া রাখিয়াছে এবং সংক্ষেপে ইহাই হইতেছে বাংলার বৈশিষ্ট্য। এই বৈশিষ্ট্যের আচ্ছাদনে অবস্থিত এই যে পাঁচ কোটি মানুষ, ইহাদেরই সমষ্টির নাম বাঙালী জাতি। ধর্ম্মে তুমি হিন্দু আমি মুসলমান, কিন্তু জাতিতে আমরা উভয়েই বাঙালী—এই সত্যটা আজ আমাদিগকে শতকণ্ঠে সহস্রভাবে ঘোষণা করিতে হইবে এবং মুসলমানকে সমস্ত শক্তি লইয়া এই ঘোষণায় যোগদান করিতে হইবে। বংশ বা ধর্ম্ম বিভিন্ন হইলে জাতিও পৃথক হইয়া যায়, এ ধারণাটি সম্পূর্ণভাবে ভুল এবং সমস্ত অনর্থের মূল। এছলাম এ ধারণার সমর্থন করে না। বরং সত্য কথা এই যে, এই অন্যায় ধারণাকে দুনিয়ার পৃষ্ঠ হইতে সমূলে উৎপাটন করাই হইতেছে এছলামের একটা অন্যতম আদর্শ। বড় দুঃখের বিষয়,

অন্যের কথা দূরে থাক, মুসলমান সমাজের অনেকেই আজি এই অনুপম আদর্শগুলিকে বিস্মৃত হইয়া বসিয়াছেন।

পূর্ব্বে বলিয়াছি,—দেশের সেবা অর্থে দেশবাসীদের সেবা ব্যতীত আর কিছুই নহে। এই দেশবাসী প্রধানতঃ কাহারা, দেশসেবার অনুষ্ঠানের প্রারম্ভে সর্ব্বপ্রথমে আমাদিগকে তাহার একটা হিসাব বুঝিয়া দেখিতে হইবে।

অতঃপর মৌলানা সাহেব সেন্সাসের সংখ্যা হইতে দেখান, যে,

ফলতঃ পল্লীর কথা ও পল্লীর ব্যথাই হইতেছে বাঙালী জাতির কথা ও তাহাদের সত্যকার ব্যথা, এবং কৃষক-সমাজের স্বার্থই হইতেছে বাঙালী জাতির সর্ব্বপ্রধান ও সর্ব্বপ্রথম স্বার্থ।

কিন্তু স্বতন্ত্র-নির্ব্বাচন বিদ্যমান থাকিতে হিন্দু ও মুসলমান কৃষক-সমাজের সংহত ও সঙ্ঘবদ্ধ হওয়ার কোন উপায় নাই। অথচ সংহতিশক্তিসম্পন্ন না-হওয়া পর্য্যন্ত ইহাদের শোচনীয় অবস্থার প্রতিকার হওয়াও সম্পূর্ণ অসম্ভব। তত্রাচ মুসলমানের স্বার্থরক্ষার দোহাই দিয়া স্বতন্ত্রনির্ব্বাচনের সমর্থন করা হইতেছে!

—

ভারতের "জাতীয়" ঋণ সম্বন্ধে বৃটেনের দায়িত্ব

বর্ত্তমান জগতে প্রায় সকল জাতিরই কিছু কিছু "জাতীয় ঋণ" আছে। ইহার কারণ দুই প্রকার। প্রথমতঃ, সকল জাতিই বর্ত্তমান কালে দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য বহু অর্থ ব্যয় করিয়া রেল লাইন, খাল, জলসরবরাহের ব্যবস্থা, বন্দরনির্ম্মাণ, স্কুল-কলেজ প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি কার্য্য করিয়া থাকেন। এই কার্য্যের জন্য যত অর্থ প্রয়োজন হয়, তাহা কোন জাতিই বার্ষিক রাজস্ব হইতে দিতে পারেন না। এই সকল অর্থপ্রসূ (productive) কার্য্যের জন্য সকল জাতিই নিজের দেশে অথবা অপর দেশে ঋণ করিয়া থাকে। এই জাতীয় ঋণ করাতে জাতির আর্থিক উন্নতি হয় এবং তাহাতে রাজস্ব বৃদ্ধি পায়। সুতরাং এইরূপ ঋণের সুদের ব্যবস্থা করিতে কোন জাতিরই বেগ পাইতে হয় না। দ্বিতীয় প্রকার ঋণের কারণ আকস্মিক ব্যয়। হঠাৎ কোন প্রকার যুদ্ধবিগ্রহ, নৈসর্গিক দুর্ঘটনা অথবা দুর্ভিক্ষ ঘটিলে বাৎসরিক রাজস্বের সাহায্যে তাহার ব্যবস্থা করা সম্ভব হয় না। তখন রাজসরকার হইতে ঋণ গ্রহণ করা ব্যতীত অপর উপায় থাকে না। এই জাতীয় ঋণ নিছক্ খরচ (অর্থাৎ অর্থপ্রসূ নহে)। ইহার সুদ গুণিতে জাতিকে বিশেষ বেগ পাইতে হয়। বিগত মহাযুদ্ধের ফলে জগতের বহু জাতিকে শত শত কোটি টাকা ব্যয় করিতে হইয়াছিল। এই ব্যয় যে-ভাবে করা হয় তাহাতে কোন জাতিরই কোন প্রকার আর্থিক উন্নতি হয় নাই। বরং বহু কামান দাগিয়া পরস্পরের বহু ধনসম্পত্তি ধ্বংস করা হয় এবং তজ্জন্য সকল যুদ্ধলিপ্ত জাতিরই ভবিষ্যতে আয় বাড়া দূরের কথা, কমিয়া যায়। জাপানের মহাভূমিকম্পে যা লোকসান হয়, তাহার জন্য জাপানকে যা ঋণ করিতে হয় তাহাও এইরূপ অফলপ্রসূ (unproductive)।

ভারতবর্ষের যে জাতীয় ঋণের ভার আছে তাহাও এইরূপ দুই ভাগে বিভাগ করা যায়। যে ঋণের টাকা যথার্থ লাভজনক ভাবে ব্যয় করা হইয়াছে (লাভজনক—রেল লাইন, খাল প্রভৃতি নির্ম্মাণ করিয়া) তাহা একদিকে এবং যে টাকা কামান দাগিয়া, অল্পমূল্যের মাল জাতির নামে অধিক দামে ক্রয় করিয়া, বিদেশী পল্টনের বেতন বা পেন্সন জোগাইয়া অথবা অপর কোন উপায়ে অপব্যয় করা হইয়াছে তাহা আর এক দিকে। এই অপব্যয়ের টাকার মধ্যে আবার বহু অর্থ সম্পূর্ণরূপে বিদেশের লোকের খেয়াল বা সুবিধার জন্য ব্যয় করা হইয়াছে। ভারতের ঘাড়ে সে ঋণের বোঝা চাপাইয়া দিলেও ভারতের সহিত তাহার কোনই সম্বন্ধ নাই বলা চলে।

ভারতের ঘাড়ে যে বিরাট ঋণের বোঝা ইংরেজ এতকাল চাপাইয়া রাখিয়াছে, তাহার মধ্যে কতটা সত্যসত্যই আমাদের জাতীয় ঋণ এবং কতটা ইংরেজের অপব্যয় বা নিজের সুবিধার জন্য ব্যয়িত, অর্থাৎ কতটার জন্য আমরা জাতীয়ভাবে সত্যসত্যই ঋণী এবং কতটার জন্য ইংরেজই আসলে দায়ী, এই বিষয়ের মীমাংসার জন্য বিগত করাচী কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটির দ্বারা একটি বিশেষ কমিটি নিযুক্ত হয়। এই কমিটি তাঁহাদের রিপোর্ট সম্প্রতি প্রকাশ করিয়াছেন। কমিটি যে সকল কথা রিপোর্টে প্রকাশ করিয়াছেন সে সকল কথা ভারতীয় ইতিহাস ও অর্থনীতির সম্পর্কে বহুকাল হইতেই আলোচিত হইয়া আসিয়াছে; কিন্তু রাষ্ট্রনীতির দিক হইতে সমগ্র জাতির

মতহিসাবে এই সকল কথা এত কাল ভাল করিয়া ব্যক্ত করা হয় নাই। এই কারণে রিপোর্টে লিখিত তথ্যের একটা জোরাল রকম নূতনত্ব আছে। সকল ভারতবাসীর এই রিপোর্ট পাঠ করা উচিত। রিপোর্টের লেখকগণের মতে ভারতে "জাতীয় ঋণ" জাতির বিনা অনুমতিতে গৃহীত ও ব্যয়িত হইয়াছে বলিয়া তাহা জাতীয় ঋণ বলিয়া গ্রাহ্য নহে। উপরন্তু ঋণজাত অর্থ বহুক্ষেত্রে ভারতের কোন প্রকার সুখসুবিধার জন্যই ব্যয়িত হয় নাই। কোন কোন ক্ষেত্রে আমাদের তথাকথিত জাতীয় ঋণের টাকা আমাদেরই অপকারার্থে ব্যয় করা হইয়াছে। সুতরাং এ "জাতীয় ঋণ" ধর্ম্মনীতি, অর্থনীতি বা রাষ্ট্রনীতি কোন দিক দিয়াই যথার্থরূপে জাতীয় ঋণ নহে। তথাপি ইহার সপক্ষে বলা যায়, এই টাকার অন্তত কিয়দংশ ভারতের আর্থিক উন্নতি এবং সুবিধার জন্য ব্যয় করা হইয়াছে। সুতরাং ইহার কিয়দংশকে জাতীয় ঋণ বলিয়া আমাদের স্বীকার করা উচিত।

আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলে ভারত সরকার যত টাকা জাতির নামে ঋণ করেন, তাহার সমস্তটিই যুদ্ধ করিয়া ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ জয় করিবার জন্য অথবা ইংরেজের বহিঃশত্রুর সহিত লড়িবার জন্য ব্যয় করা হয়। যথা, ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী কর্ত্তৃক গৃহীত ভারতীয় ঋণের হিসাবে দেখা যায় যে :—

প্রথম আফগান যুদ্ধে	১৫,০০০,০০০ পাউণ্ড খরচ করা হয়।
দুই বর্ম্মা যুদ্ধে	১৪,০০০,০০০ পাউণ্ড খরচ করা হয়।
চীন, পারস্য ও নেপাল অভিযানে	৬,০০০,০০০ পাউণ্ড খরচ করা হয়।
	মোট ৩৫,০০০,০০০ পাউণ্ড

এই সকল ব্যয়ের বিষয়ে স্বনামধন্য ইংরেজ নেতাদের মতামত কি তাহা দেখা যাউক। সার জর্জ্জ উইনগেট প্রায় ৭০ বৎসর পূর্ব্বে বলেন,—

"এসিয়াতে আমরা আমাদের সাম্রাজ্যের বাহিরে যত যুদ্ধ করিয়াছি তাহার অধিকাংশই ভারত সরকারের লোক ও অর্থবলের জোরে করা হইয়াছে। এই সকল যুদ্ধের উদ্দেশ্য বহুক্ষেত্রেই সম্পূর্ণরূপে বৃটেনের স্বার্থসিদ্ধি মাত্র এবং কোন কোন ক্ষেত্রে পরোক্ষভাবে ভারতের সহিত সম্পর্কিত ছিল।...আফগান যুদ্ধ এইরূপ বৃটিশ স্বার্থ-ঘটিত যুদ্ধের একটি উৎকৃষ্ট নিদর্শন। এই যুদ্ধ ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর মত না লইয়া এমন কি তাহাদের মতের বিরুদ্ধেই করা হয়। ইহার উদ্দেশ্য সম্পূর্ণরূপে বৃটিশস্বার্থঘটিত ছিল; কিন্তু তথাপি 'কোর্ট অফ ডাইরেক্টর'দিগের আপত্তি অগ্রাহ্য করিয়া ইহার খরচ ভারতের ঘাড়ে চাপাইয়া দেওয়া হয়......পারস্যের যুদ্ধও এইরূপ। ইহার সহিত ভারতের কোন সম্বন্ধ ছিল না; কিন্তু ইহাও ভারতের জনবল ও অর্থের সাহায্যে সম্পন্ন হয়।...সত্য কথা বলিতে, ভারতের জনবল ও অর্থের সাহায্যে আমরা আমাদের এসিয়ার সকল যুদ্ধই চালাইয়াছি... ইহা আমাদের ভারত সম্পর্কিত ব্যবহারের চূড়ান্ত স্বার্থপরতার প্রমাণ।"

জন ব্রাইটও আফগান যুদ্ধের বিষয়ে পার্লামেণ্টে বলেন,—

"গত বৎসর আমি বলিয়াছিলাম যে, আফগান যুদ্ধের বিরাট খরচের বোঝাটি ইংলণ্ডের জনসাধারণেরই বহন করা উচিত, কারণ, এই যুদ্ধটি ইংলণ্ডের মন্ত্রিবৃন্দ ইংলণ্ডের স্বার্থের জন্যই করিয়াছিলেন।"

কিন্তু এই সকল ব্যক্তির কথাগুলি সম্পূর্ণ বৃথাই যায়। এই ত গেল ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রথম যুগে ভারতের নামে ঋণ করিয়া অর্থব্যয়ের ইতিহাস। অতঃপর সিপাহী-বিদ্রোহের যুগে কোম্পানীর হাত হইতে গভর্ণমেণ্ট ইংলণ্ড-রাজের হস্তে গেল। এই হাতবদল বাবদ্ ইংলণ্ড-রাজের মন্ত্রিবর্গ নিজেদের স্বজাতি ও বন্ধুবান্ধব স্থানীয় ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে যথাসাধ্য উচ্চমূল্যে ভারতরাষ্ট্র পরিচালনার অধিকার বিক্রয় করিতে দেন। দামটা অবশ্য ইংলণ্ড দিল না; দিল যাহাদের বিক্রয় করা হইল তাহারাই, অর্থাৎ ভারতবর্ষের জনসাধারণ। কোম্পানী নিজ অধিকার হস্তান্তরকালীন পাইলেন,—

১৮৩৩—৫৭ অবধি নিজ মূলধনের সুদ হিসাবে	১৫,১২০,০০০	পাউণ্ড
১৮৫৪—৭৪ " " " " "	১০,০৮০,০০০	"
মূলধনের বাজার দরে মূল্য হিসাবে (মূলধন আসলে মাত্র ৬,০০০,০০০ পাউণ্ড ছিল)	১২,০০০,০০০	"
মোট	৩৭,২০০,০০০	পাউণ্ড

অতঃপর বা এই সঙ্গেই সিপাহী-বিদ্রোহের খরচ বাবদ ৪০,০০০,০০০ পাউণ্ড ঋণ করিয়া ভারতের স্কন্ধে চাপান হইল। সিপাহী-বিদ্রোহ ভারতীয় ইংরেজ সরকারের অত্যাচার অবিচার ও বিশৃঙ্খল কার্য্যকলাপের জন্যই হয়। এই বিদ্রোহ ভারত সরকারের নিমকভোগী সৈনিকরাই নিজ প্রভুদের বিরুদ্ধে করে, জনসাধারণ ইহাতে যোগ দেয় নাই, বরং বহুক্ষেত্রে ইংরেজের সমর্থনই করে। জনসাধারণ বিদ্রোহীদের সাহায্য করিলে হয়ত বা ভারতের ইতিহাস অন্য প্রকার হইয়া যাইত। ইংরেজ কিন্তু ভারতীয় জনসাধারণের প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়া দূরে থাকুক, নিজ পাপের বোঝা ভারতীয় জনসাধারণের

ঘাড়েই চাপাইল। বিদ্রোহদমনের খরচের জন্য আমরাই দায়ী হইলাম। ১৮৭২ খৃঃ অব্দে ইংলণ্ডবাসী ভারতসচিব একখানা পত্রে লিখিলেন :

…এই যুদ্ধ সাম্রাজ্যের তরফ হইতে ইংলণ্ড করিতে বাধ্য হন ; কারণ অন্যথা করিলে প্রাচ্যে বৃটিশ সাম্রাজ্য লোপ পাইতে পারিত…একথা স্বীকার্য্য যে, এইরূপ যুদ্ধ সাম্রাজ্যের অপর কোন স্থানে হইলে তাহার খরচের অধিকাংশ অন্ততঃ ইংরেজরাই বহন করিত, কিন্তু ভারতীয় সিপাহী-বিদ্রোহের দমন কার্য্যে যাহা ব্যয় হইল, তাহা সম্পূর্ণরূপে ভারতীয় প্রজার স্কন্ধে ন্যস্ত হইল।

বুয়র মহাযুদ্ধের খরচ বুয়রদিগের স্কন্ধে চাপান ত হয়ই নাই, বরং ইংলণ্ড বুয়রদিগের বিধ্বস্ত ক্ষেত-খামার পুনঃনির্ম্মাণ করিবার জন্য তাহাদের ৩,০০০,০০০ পাউণ্ড সাহায্য করেন। ইহাকেই বলে বৃটিশের উচ্চ আদর্শ ও সুবিচার! সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, বাহিরের যুদ্ধের খরচ, কোম্পানীকে ভারত বিক্রয়ের মূল্য এবং সিপাহী-বিদ্রোহের খরচ একত্র করিলে ভারতের মোট ঋণের ভার ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলের শেষ অবধি ১১২,২০০,০০০ পাউণ্ড হইল।

ভারত গভর্ণমেণ্ট ইংলণ্ড-রাজের হাতে আসিবার পরে যত ঋণ গ্রহণ করা হইয়াছে, তাহা দুই ভাগে ভাগ করিয়া আলোচনা করা হইয়াছে। (১) যে অর্থব্যয় করিয়া ভারতের কোন লাভ হয় নাই ; যথা, নানা যুদ্ধের খরচ, ইংলণ্ডে ব্যয়িত অর্থ, দুর্ভিক্ষের খরচ, টাকা ও পাউণ্ডের বিনিময়ের হার সংক্রান্ত লোকসান ইত্যাদি ও (২) লাভজনক ব্যয় অর্থাৎ জলসরবরাহের, ডাক ও টেলিগ্রাফের ও আংশিকভাবে রেলরাস্তা গঠনের খরচ ইত্যাদি।

এই সকল অপব্যয়ের তালিকার মধ্যে হাবসী যুদ্ধ, দ্বিতীয় আফগান যুদ্ধ, মিশরের যুদ্ধবিবাদ, সীমান্তের যুদ্ধ, বর্ম্মা যুদ্ধ প্রভৃতির জন্য ৩৭,০০০,০০০ পাউণ্ড খরচ করা হয়। বিগত ১৯১৪—১৮খৃঃ অব্দের মহাযুদ্ধের জন্য একদফা ভারতের তরফ হইতে নিছক্ উপহার হিসাবে বহুকোটি টাকা বৃটেনকে দেওয়া হয় এবং দ্বিতীয় দফা যুদ্ধের অনেক খরচ ভারতসরকারের পক্ষ হইতে করা হয়। এই দুই প্রকার ব্যয়ের জন্য রিপোর্টের লেখকগণ ৩৬০,০০,০০,০০০ কোটি টাকা আমাদের দিক হইতে দাবী করিতেছেন।

ভারত গভর্ণমেণ্ট ভারতবাসীর খরচে বহুকাল হইতে বহুপ্রকার অপব্যয় করিয়া আসিতেছেন। রাজস্বে এই অপব্যয়ের সঙ্কুলান না হইলে ঋণ করিয়া এই সকল খরচ জোগান হইয়াছে। রিপোর্টের লেখকগণ এই সকল খরচের মধ্যে ইংলণ্ডে ইণ্ডিয়া অফিসের খরচ, এডেনের, পারস্যের ও চীনের বাণিজ্য-রাজপ্রতিনিধি মোতায়েন রাখার খরচ, রাজধর্ম্মরক্ষার খরচ প্রভৃতি যোগ করিয়া ২০,০০০,০০০ পাউণ্ড দাবী করিতেছেন।

বিগত ৪৫ বৎসর যাবৎ ব্রহ্মের সাধারণ আয়ব্যয়ের খাঁকতি হইয়াছে ১৫ কোটি টাকা, ব্রহ্মের রেল লাইন রক্ষার লোকসান ২২ কোটি টাকা ও ভারতীয় সমর-বিভাগের ব্যয়ে ব্রহ্মের অংশ বৎসরে ১ কোটি হিসাবে ৪৫ কোটি টাকা—মোট ৮২ কোটি টাকা ব্রহ্মদেশ হইতে ভারতবর্ষ পাইবে। রিপোর্টের লেখকদিগের মধ্যে এক-জনের মতে এই টাকা ব্রহ্মকে ভারত হইতে বিচ্ছিন্ন করিলে তবেই দাবী করা উচিত। আমাদেরও মত তাহাই, কেন-না, বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে দাবীদাওয়ার হিসাব করিলে বাংলা ভারতের অপর বহু প্রদেশের নিকট হইতে বহু কোটি টাকা পাইবে বলিয়া প্রমাণ করা যায়, কারণ বাংলা হইতে লব্ধ বহু রাজস্ব ভারতের সাধারণ রাজকার্য্যের জন্য কেন্দ্রীয় তহবিলে জমা করা হয়।

দুর্ভিক্ষবিভাগের সকল খরচই ভারতবাসীর মঙ্গলের জন্য করা হইয়াছে বলিয়া রিপোর্টের লেখকগণ মানিয়া লইতেছেন। এই বিভাগে যে অপব্যয় করা হয় নাই তাহা নহে, কিন্তু তাহা হইলেও খরচটা জাতির তরফ হইতে মানিয়া লওয়া উচিত।

ভারতের মুদ্রাবিনিময়ের ব্যবস্থা করিতে গিয়া ভারত সরকার বহুবার বহু নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচয় দিয়াছেন। কখনও টাকার সহিত পাউণ্ডের সম্বন্ধ ১ টাকায় ১ শিলিং ৪ পেনি, কখনও ২ শিলিং, কখন ১½ শিলিং, কখনও বা অনির্দ্দিষ্ট। এই ভাবে "এক্সচেঞ্জ" বা আন্তর্জাতিক মুদ্রাবিনিময়ের হার লইয়া যথেচ্ছাচার করিয়া ভারতীয় ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদির অপরিমেয় ক্ষতি করা হইয়াছে। ইহার পরিমাণ নির্দ্দেশ করা সম্ভব নহে বলিয়া রিপোর্টের লেখকগণ এই লোকসান আমাদের পরাধীনতা-পাপের শাস্তিস্বরূপ

স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। এ-কথাও স্বীকার্য্য যে, জাতীয় ঋণের কোন অংশ সাক্ষাৎভাবে এই কার্য্যে ব্যয়িত হয় নাই। কিন্তু মধ্যে মধ্যে জোর করিয়া বাজার দরের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রীয় খরচে অল্পমূল্যে পাউণ্ড ও টাকা সরবরাহ করিবার জন্য যে টাকা অপব্যয় করিয়া ভারত সরকার ইংলণ্ডীয় বণিকমণ্ডলীর কৃতজ্ঞতা আহরণ করিয়াছেন,তাহার এক-প্রকার পরিমাপ সহজেই করা যায়। এই বাবদে রিপোর্টের লেখকগণ ভারতবাসীর তরফ হইতে ইংরেজের নিকট ৩৫ কোটি টাকা দাবী করিতেছেন।

রেলরাস্তা নির্ম্মাণ,রেল কোম্পানীগুলিকে লাভ গ্যারাণ্টি করা প্রভৃতিতে ভারতের অজস্র অর্থ নষ্ট করা হইয়াছে। প্রথমতঃ যে খরচে রেলরাস্তা নির্ম্মাণ করা উচিত ছিল, বহুক্ষেত্রে তাহার দ্বিগুণ দামে পথনির্ম্মাণ করা হইয়াছে এবং এই মিথ্যা নির্ম্মাণ ব্যয়কে মূলধন বলিয়া মানিয়া লইয়া বৎসরের পর বৎসর তাহার উপর জাতীয় অর্থে গ্যারাণ্টি করা সুদ দেওয়া হইয়াছে। অর্থাৎ ইংরেজ কোম্পানী ৫০ টাকা খরচ করিয়া তাহাকে ১০০ টাকা বলিয়া প্রমাণ করিয়া বরাবর ডবল সুদ খাইয়া আসিতেছে, এবং যখন কোন রেলরাস্তা রাষ্ট্রীয় তরফ হইতে ক্রয় করিয়া লওয়া হয়, তখন তাহার জন্য এই মিথ্যা মূল্যই দেওয়া হইয়াছে। ইংরেজ অর্থনীতিজ্ঞরা সর্ব্বদা এই জুয়াচুরীটি অস্বীকার করিয়া চলেন। যথা Findlay Shirras তাঁহার *Indian Finance and Banking* নামক পুস্তকে (তৃতীয় সংস্করণ, ১৯২০। ২৩৫ পৃঃ) লিখিয়াছেন,—

"It is interesting to note that while the total debt, productive and unproductive, on March 31, 1918, amounts to £ 336·5 millions, the value of the State Railways and Irrigation Works alone (Capitalized at 25 years' purchase) is estimated at £ 584,000,000.

অর্থাৎ "১৯১৮ খৃঃ অব্দের ৩১শে মার্চ্চ তারিখে ভারতের সমগ্র জাতীয় ঋণ ৩৩৬,৫০০,০০০ পাউণ্ড মাত্র ছিল; কিন্তু ইহা অত্যন্তই প্রণিধানযোগ্য যে, ঐ দিনে শুধু রেলরাস্তা ও জলসরবরাহের খাল প্রভৃতির মূল্যই (২৫ বৎসরের আয় যোগ করিয়া মূল্য ঠিক করা হইয়াছে) ছিল ৫৮৪,০০০,০০০ পাউণ্ড।"

এই জাতীয় হিসাব দেখাইয়া ইংরেজরা আত্মদোষ ক্ষালনের চেষ্টা প্রায়ই করিয়া থাকেন। এই জন্য আলোচ্য রিপোর্টটি বাহির হওয়ায় বিশেষ লাভ হইয়াছে। রিপোর্টের লেখকগণ রেল সংক্রান্ত লোকসান ৮৩ কোটি টাকা ধার্য্য করিয়াছেন। আমাদের মতে ইহা কম ধরা হইয়াছে।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, রিপোর্টের হিসাবে ভারতের সমগ্র জাতীয় ঋণের হিসাব খতাইয়া আমাদের ইংরেজের নিকট নিম্নলিখিতরূপ দাবী রহিয়াছে,—

কোম্পানির আমল

বাহিরে যুদ্ধের খরচ	৩৫ কোটি টাকা
কোম্পানীর মূলধন ও সুদ	৩৭ কোটি টাকা
সিপাহী বিদ্রোহের খরচ	৪০ কোটি টাকা
মোট	১১২ কোটি

সম্রাটের আমল

বাহিরের যুদ্ধের খরচ	৩৭ কোটি টাকা
ইয়োরোপীয় মহাযুদ্ধে "উপহার"	১৮৯ কোটি টাকা
ভারতদত্ত খরচ	১৭১ কোটি টাকা
মোট	৩৭৭ কোটি টাকা

বিবিধ খরচ	২০ কোটি টাকা
ব্রহ্মদেশ বাবদ	৮২ কোটি টাকা
মুদ্রাবিনিময়ের জের	৩৫ কোটি টাকা
রেলরাস্তা বাবদ	৮৩ কোটি টাকা
মোট	৭২৯ কোটি টাকা

সকল হিসাব খতাইয়া রিপোর্টের লেখকগণ নিম্নলিখিতরূপ মন্তব্য করিয়াছেন,—

"বর্ত্তমানে ভারতের জাতীয় ঋণের পরিমাণ ১,১০০ কোটি টাকারও অধিক। ভারতবর্ষ দখল করিয়া ইংলণ্ডের প্রভূত ঐশ্বর্য্য লাভ হইয়াছে এবং ভারতীয়দের এই কারণে বস্ত্রব্যবসা বাণিজ্য নষ্ট হইয়াছে, এমন কি ধনৈশ্বর্য্য উৎপাদনের ক্ষমতাই প্রায় লোপ পাইয়াছে। সুতরাং বৃটেনের উচিত ভারতের প্রতিও আয়র্লণ্ডের মত ব্যবহার করা; অর্থাৎ আয়র্লণ্ডকে যেমন বৃটেন স্বাধীনতা দিবার সময়ে সমগ্র জাতীয় ঋণভার হইতে মুক্তি দিয়াছিলেন, ভারতবর্ষকেও সেই মুক্তি দেওয়া তাঁহাদের কর্ত্তব্য। জাতীয় মুক্তি ও স্বাধীনতার পথে ভারতবর্ষকে অগ্রসর করিয়া দিতে হইলে তাহার স্কন্ধ হইতে বৃটেনের এই বিরাট বোঝা অপসারিত করিয়া দেওয়া উচিত। ভারতবর্ষের আর অধিক রাজস্ব দিবার ক্ষমতা নাই। সুতরাং বর্ত্তমান রাজস্ব যদি সম্পূর্ণরূপে ভারতবর্ষের উন্নতির জন্যই ব্যবহৃত হয়, তাহা হইলেই ভারতবর্ষ আগাইয়া চলিতে পারিবে। এই কার্য্য সম্পন্ন করিতে হইলে তথাকথিত জাতীয় ঋণের ভার ও সামরিক ব্যয় প্রভৃতি কমাইয়া জাতির ক্ষমতানুরূপ করিতে হইবে। এইরূপ ব্যয় লাঘব করিতে পারিলে উদ্বৃত্ত অর্থ শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও অপরাপর জাতিগঠন সংক্রান্ত কার্য্যে ব্যয়িত হইতে পারিবে।"

শ্রীযুক্ত জে, সি, কুমারাপ্পার মতে অদ্যাবধি সামরিক ব্যয় যত করা হইয়াছে, তাহার যে অংশ সাম্রাজ্য রক্ষার্থে ব্যয়িত হইয়াছে, অর্থাৎ নিছক ভারতের

রক্ষা কার্য্যে ব্যয় করা হয় নাই, তাহা ভারতবর্ষের বৃটেনের নিকট প্রাপ্য। সমগ্র সামরিক ব্যয় অদ্যাবধি ২১,১২৮ কোটি টাকা হইয়াছে। শ্রীযুক্ত কুমারাপ্পার মতে ইহার মধ্যে ৫৪০ কোটি টাকা আমাদের ফেরৎ পাওয়া উচিত।

দ্বিতীয়তঃ, আমাদের "জাতীয়" ঋণের যে অংশ সত্যই আমাদের নহে, তাহার সুদও এতাবৎ আমরা দিয়া থাকিলেও আমাদের দেয় নহে। সুতরাং এই সুদের টাকাটাও আমাদের ফেরত পাওয়া উচিত। শ্রীযুক্ত কুমারাপ্পা আমাদের প্রাপ্য এই সুদের হিসাব ৫৩৬ কোটি টাকা ধার্য্য করিয়াছেন। সুতরাং এই দুই দফার হিসাবেই আমাদের সমগ্র "জাতীয়" ঋণ খারিজ হইয়া যাওয়া উচিত।

রিপোর্টের লেখকগণ বৃটেনের নিকট আমাদের দাবীর যাহা হিসাব করিয়াছেন, তাহাতে আমাদের মতে যদি ভুল হইয়া থাকে তবে সে ভুলে বৃটেনেরই সুবিধা হইয়াছে। এই হিসাবে বহু জিনিস বাদ পড়িয়া গিয়াছে। প্রথম, ভারতবিজয় সংক্রান্ত লুঠের একটা হিসাব করা উচিত ছিল। এখনও যদি কোন আন্তর্জাতিক পুলিসের দ্বারা বৃটেনের সকল মিউজিয়াম, অট্টালিকা ও ব্যাঙ্কের খাতা খানাতল্লাস করিয়া দেখা যায়, তাহা হইলে ভারতের বহুশত কোটি টাকার সম্পত্তি ধরা পড়িবে। কত রাজার মণিমুক্তা, কত ধনসম্পত্তি যে পলাশীর পর হইতে এ দেশ হইতে লুণ্ঠিত হইয়াছে, তাহার হিসাব কে করিবে? তাহা হইলেও এই বিষয়ের হিসাব অনেকটা করা যায় এবং করা উচিত।

শুধু বিগত মহাযুদ্ধেই আমাদের লক্ষাধিক লোক হত হয়। অপর বহু যুদ্ধেও বহু সহস্র ভারতবাসী "সাম্রাজ্যের" জন্য হতাহত হইয়াছে। এতগুলি প্রাণের ও মানুষের একটা দাম আছে। বিগত মহাযুদ্ধে ইউরোপ ও আমেরিকার ১৩০,০০,০০০ লোক মারা যায়। আমেরিকার অধ্যাপক বোগার্ট* এই লোক সংখ্যার মূল্য নির্দ্ধারণ করেন ৩৩, ৫৫১, ২৭৬,২৮০ ডলার। এই হিসাবে আমাদের মহাযুদ্ধে হত লোকের মূল্য ৭৫ কোটি টাকার অধিক হয়। অপরাপর যুদ্ধের হতাহতের মূল্যও কম হইবে না।

অধ্যাপক কে টি শা ও অধ্যাপক কে জি খাম্বাটার হিসাব মতে† বিগত মহাযুদ্ধে আমাদের ব্যবসার ক্ষতি ১০০ কোটি টাকারও অধিক হইয়াছে। ইহার জন্যও বৃটিশ "সাম্রাজ্য" দায়ী।

ভারতবিজয়ের প্রথমযুগে যে সকল মহারথী ভারতে আসিয়া ভারতের উন্নতিসাধনের জন্য জীবন যাপন করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের পুরস্কারের হিসাবও মন্দ নহে। এই হিসাব রিপোর্টে দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু ইহার জন্য কোন দাবী করা হয় নাই। হিসাব নিম্নলিখিতরূপ,—

রবার্ট ক্লাইব—জাগীরের আয়
কর্ণওয়ালিস—বৎসরে ৫,০০০ পাউণ্ড
হেষ্টিংস—বৎসরে ৪,০০০ পাউণ্ড ও এককালীন ৭১,০৮০ এবং ৫০,০০০ পাউণ্ড

ওয়েলেস্‌লি	বাৎসরিক	৫,০০০	পাউণ্ড
স্যার জন ম্যাকফারসন	,,	১,০০০	,,
সার জর্জ্জ বার্লো	,,	১,৫০০	,,
মারকুইস হেষ্টিংস্‌	এককালীন	৬০,০০০	,,
হার্ডিং	বাৎসরিক	৫,০০০	,,
ডালহউসী	,,	৫,০০০	,,

ভারতবর্ষের পূর্ণ দাবী নির্দ্ধারণ করিতে হইলে বহু দিন খাটিয়া বহুখণ্ড গ্রন্থ প্রণয়ন করিতে হয়। তাহা ভবিষ্যতে কেহ করিবে আশা করি। উপস্থিত রিপোর্ট অনুযায়ী আমাদের অখণ্ডনীয় দাবীটুকু কি বৃটেনে গ্রাহ্য হইবে? লীগ অফ-নেশন্‌স এ-বিষয়ে কি বলেন তাহার অপেক্ষায় রহিলাম।

* Earnest L. Bogart, *Direct and Indirect Costs of the Great World War*, p.267.

† Shah and Khambata, *Wealth and Taxable Capacity of India*. (1st. Ed.) p. 276.

১২০।২ নং আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা প্রবাসী প্রেস হইতে শ্রীসজনীকান্ত দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত



সাঁওতাল নৃত্য

[illegible]

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

প্রবাসী

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"

"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৩১শ ভাগ, ১ম খণ্ড | ভাদ্র, ১৩৩৮ | ৫ম সংখ্যা

সাধনার রূপ

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়েষু

— তোমার সম্বন্ধে আমার কাছে আভাসমাত্র দিয়েছিলেন। আরও স্পষ্টতর করে জানলে তোমার সঙ্গে আলাপ করবার চেষ্টা করতুম। আমার আশঙ্কা হয় পাছে আমাকে কেউ ভ্রমক্রমে গুরু ব'লে গ্রহণ করেন—আমার সে পদ নয়। —র কাছে আমি যে সঙ্কোচ জানিয়েছিলুম তার কারণই এই। তুমি যে সাধনার কথা লিখেচ আমি তাকে শ্রদ্ধা করি। সেই সঙ্গে আমার একটি কথা বলবার আছে এই যে, অন্তরের সাধনার পরিণতি বাইরে—সঞ্চয়ের সার্থকতা দানে। একদিন আমি নিজের আত্মিক নির্জ্জনতার মধ্যে আধ্যাত্মিক উপলব্ধির আনন্দকে সংহতভাবে লাভ করবার জন্যে সাধনায় প্রবৃত্ত ছিলুম। যে কারণেই হোক সেই নিঃসঙ্গতা থেকে আমি বেরিয়ে এসেছি। অতিশয় একান্তভাবে নিজের সত্তার নিগূঢ় মূলে নিবিষ্ট হয়ে যাওয়া আমার চল্‌ল না, যে বিচিত্র সংসারে আমি এসেচি আপনাকে ভুলে সহজভাবে সেখানে আপনাকে লাভ করতে হবে এই দিকেই আমাকে ভিতর দিক থেকে ঠেলে পাঠালে। আমি স্বভাবতই সর্ব্বাস্তিবাদী—অর্থাৎ আমাকে ডাকে সকলে মিলে—আমি সমগ্রকেই মানি। গাছ যেমন আকাশের আলো থেকে আরম্ভ ক'রে মাটির তলা পর্য্যন্ত সমস্ত কিছু থেকে ঋতু-পর্য্যায়ের বিচিত্র প্রেরণা দ্বারা রস ও তেজ গ্রহণ ক'রে তবেই সফল হয়ে ওঠে—আমি মনে করি আমারও ধর্ম্ম তেমনি—সমস্তের মধ্যে সহজে সঞ্চরণ ক'রে সমস্তের ভিতর থেকে আমার আত্মা সত্যের স্পর্শ লাভ ক'রে সার্থক হ'তে পারবে। এই যে বিচিত্ররূপী সমগ্র, এর সঙ্গে ব্যবহার রক্ষা করতে হ'লে একটি ছন্দ রেখে চল্‌তে হয়, একটি সুষমা,—যদি তাল কেটে যায় তবেই সমগ্রকে আঘাত করি এবং তার থেকে দুঃখ পাই। বস্তুত যখনই কিছুতে উত্তেজনার উগ্রতা

আনে তার থেকে এই বুঝি, ছন্দ রাখতে পারলুম না,—তাই সমগ্রর সঙ্গে সহজ যোগসূত্রে জট পড়ে গেল। তখন নিজেকে স্তব্ধ ক'রে জট খোলবার সময় আসে। এমন প্রায়ই ঘট্‌তে থাকে সন্দেহ নেই কিন্তু তাই ব'লে জীবনের সহজ সাধনার প্রশস্ত ক্ষেত্রকে সঙ্কীর্ণ ক'রে নিজেকে নিরাপদ করা আমার দ্বারা ঘটল না। বিশ্বে সত্যের যে বিরাট বৈচিত্র্যের মধ্যে আমরা স্থান পেয়েছি তাকে কোনো আড়াল তুলে খণ্ডিত করলে আত্মাকে বঞ্চিত করা হবে এই আমার বিশ্বাস। যদি এই বিরাট সমগ্রের মধ্যে সহজ বিহার রক্ষা ক'রে চল্‌তে পারি তবে নিজের অগোচরে স্বতই পরিণতির পথে এগোতে পারব—ফল যেমন রৌদ্রে বৃষ্টিতে হাওয়ায় আপনিই তার বীজকে পরিণত ক'রে তোলে। আমি তাই নানা কিছুকেই নিয়ে আছি—নানা ভাবেই নানা দিকেই নিজেকে প্রকাশ করতে আমার ঔৎসুক্য। বাইরে থেকে লোকে মনে ভাবে তাদের মধ্যে অসঙ্গতি আছে, আমি তা অনুভব করি নে। আমি নাকি গাই, লিখি, আঁকি, ছেলে পড়াই—গাছপালা আকাশ আলোক জলস্থল থেকে আনন্দ কুড়িয়ে বেড়াই। কঠিন বাধা আসে লোকালয় থেকে—এত জটিলতা এত বিরোধ বিশ্বে আর কোথাও নেই। সেই বিরোধ কাটিয়ে উঠতে হবে, জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত আমার এই চেষ্টার অবসান হবে না। আমার নিজের ভিতর থেকে আশ্রমে যদি কোন আদর্শ কিছুমাত্র জেগে থাকে তবে সে আদর্শ বিশ্বসত্যের অবারিত বৈচিত্র্য নিয়ে। এই কারণেই কোনো একটা সঙ্কীর্ণ ফল হাতে হাতে দেখিয়ে লোকের মন ভোলাতে পারব না—এই কারণেই লোকের আনুকূল্য এতই দুর্লভ হয়েচে এবং এই কারণেই আমার পথ এত বাধাসঙ্কুল। একদিকে পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রী থেকে আরম্ভ ক'রে স্কুলের দরিদ্র চাষী পর্য্যন্ত সকলেরই জন্যে আমাদের সাধনক্ষেত্রে স্থান ক'রে দিতে হয়েছে—সকলেই যদি আপনাকে প্রকাশ করতে পায় তবেই এই আশ্রমের প্রকাশ সম্পূর্ণ হ'তে পারবে—তিব্বতী লামা এবং নাচের শিক্ষক, কাউকে বাদ দিতে পারলুম না।

মনে কোরো না যে, তোমার সাধনপ্রণালী ও সাধন ফলের প্রতি আমার কিছুমাত্র সংশয় আছে। তোমার প্রকৃতি নিজের পথ যদি খুঁজে পেয়ে থাকে তবে আমার পন্থা তার প্রতিবাদ করবে এমন স্পর্দ্ধা তার নেই। সত্যকে তুমি যে-ভাবে যে-রসে পাচ্চ আমার প্রকৃতিতে যদি তা সম্ভব না হয় তবে সেজন্য পরিতাপ করা মূঢ়তা। ফলের গাছ তার রসের সার্থকতা প্রকাশ করে আপন ফলে, ইক্ষু করে আপন দণ্ডের মধ্যে, কেউ কারও প্রতিযোগী নয়,—বৃহৎ ক্ষেত্রে এক জায়গায় উভয়েই মিলে যায়। ইতি—

১১ মার্চ্চ ১৯৩১

শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ ঘোষকে লিখিত]

প্রেমসম্পুট

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র, এম-এ

আঁধারের নিতল নীল বুকের মাঝে তারাগুলি নিমিখশূন্য দৃষ্টিতে জাগিয়া থাকে, রহস্যাচ্ছন্ন কালের বক্ষেও তেমনি কতকগুলি উজ্জ্বল চরিত্র অম্লান জ্যোতিতে দেদীপ্যমান থাকে। শ্রীরাধা সেইরূপ একটি চরিত্র। শ্রীরাধা বিশুদ্ধ প্রেমের আদর্শ। তিনি কৃষ্ণময়ী। কৃষ্ণ-প্রেম বলিতে যাহা বুঝায় তিনি তাহার মূর্ত্তিমতী প্রতিমা। তিনি সর্ব্বাংশে কৃষ্ণস্বরূপিণী।

সর্ব্বাংশৈঃ কৃষ্ণসদৃশী তেন কৃষ্ণ-স্বরূপিণী—ব্রহ্মবৈবর্ত্তে।

প্রেমের স্বভাব এই যে উহা দুইটি হৃদয়কে গলাইয়া এক করিয়া দেয়। যতক্ষণ এই একত্ব সাধিত না হয়, ততক্ষণ প্রেম হইল না। শ্রীরাধা

কৃষ্ণপ্রাণাধিকা কৃষ্ণপ্রিয়া কৃষ্ণস্বরূপিণী।—ঐ

কৃষ্ণ হইতে অতিরিক্ত কোনও সত্তা তাঁহার নাই। তাই তাঁহাকে পণ্ডিতেরা বলেন 'প্রেমশিরোমণি', 'মহাভাব-স্বরূপিণী', 'প্রেমরসের সীমা'। কল্পনা প্রেমের এতদপেক্ষা কোনও উজ্জ্বলতর চিত্র অঙ্কিত করিতে পারে নাই। সাংসারিক প্রেমের কলঙ্ক-কালিমময় নিকষে সোনার রেখাটির মত এই প্রেমের চিত্র। এই প্রেমচিত্রের সম্মুখে স্বকীয়া পরকীয়া প্রভৃতি প্রশ্ন উঠিতে পারে বলিয়া আমি মনে করি না। প্রেম যেখানে পাগলা ঝোরার মত শত শত ধারায় ছুটিয়া সব ভাসাইয়া লইয়া যায়, সেখানে নীতিবাদীদের সমস্ত সংশয় বিতর্ক স্তব্ধ হইয়া যায় না কি? গোষ্পদ বা পুষ্করিণীর গভীরতা ও দৈর্ঘ্য সমালোচনার বিষয় হয় বটে, কিন্তু মহাসমুদ্রের কূলে দাঁড়াইয়া কেহ কি সে-সকল কথা একবারও ভাবে? রাধা-প্রেম ঐ পাগলা ঝোরার ন্যায় সকল বাধাকে উপেক্ষা করে, গভীরতায় সমুদ্রকেও নিন্দা করে, নিঃস্বার্থতায় সমস্ত উপমাকে হার মানায়।

এই প্রেমের ছবি ফুটিয়া উঠিয়াছিল পদাবলী-সাহিত্যে। পদাবলী সত্যই প্রেমসম্পুট বা প্রেমের রত্নকৌটা। জয়দেব, চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি প্রেমের যে ছবি আঁকিয়াছেন, তাহা বর্ণে ও বৈচিত্র্যে অতুলনীয়। চৈতন্যদেব এই প্রেমের পরিমলে পাগল। বৈষ্ণবেরা বলেন তিনি ভগবানের অবতার। কিন্তু এ এক নূতন অবতার এ—প্রেমের অবতার! তিনি প্রেমের ঠাকুর। এমন অবতারের কথা পূর্ব্বে কেহ কখনও শুনে নাই। মহাপ্রভু সন্ন্যাসী, কিন্তু প্রেমিক। প্রেমিক কখনও সন্ন্যাসী হইতে দেখা যায় না, সন্ন্যাসী কখনও প্রেমিক হয় না। কিন্তু গোরা কখনও প্রেমে অজ্ঞান, কখনও বিরহে ব্যাকুল।

কি ভাব উঠিল মনে কান্দিয়া আকুল কেনে
সোণার অঙ্গ ধূলায় লুটায়।

এই যে চিত্র, ইহার সহিত শ্রীরাধার চিত্রের সাদৃশ্য বড় সুস্পষ্ট। সেই জন্য শ্রীগৌরাঙ্গকে বলে 'রসরাজ মহাভাব।' তিনি প্রেমিক, রসিকশেখর, এই জন্য রসরাজ। তিনি প্রেমের চরম অভিব্যক্তি, এই জন্য মহাভাব।

এই যে প্রেম ও রসে মাখামাখি, ইহাই বৈষ্ণবধর্ম্মের সর্ব্বাপেক্ষা নিগূঢ় ও পরমাস্বাদ্য রহস্য। ইহা হইতে মধুর ও উপভোগ্য আর কিছুই নাই। অন্য সমস্তই বাহ্য। প্রেম-যমুনার মূলপ্রপাত খুঁজিতে গিয়া মহাপ্রভু যখন উর্দ্ধ হইতে উর্দ্ধতর শিখর অতিক্রম করিয়া রাধা-প্রেমরূপ যমুনোত্রীর স্বচ্ছ ধারায় অবগাহন করিলেন, তখন আর কোনও রূপ বিচার রহিল না। এইখানে সমস্ত জিজ্ঞাসা, সমস্ত কৌতূহল মুহূর্ত্তে নিরস্ত হইয়া গেল।

শ্রীচৈতন্যের পরে এই রাধাপ্রেমের মাধুর্য্য কাব্যে ও ছন্দে আরও বিকসিত হইয়া উঠিল। গোবিন্দ দাস, জ্ঞান দাস, নরোত্তম দাস প্রভৃতির কাব্যে এই প্রেমের মাহাত্ম্য নানা ছন্দে, নানা ভাবে বর্ণিত হইল। নরোত্তম দাস ঠাকুর তাঁহার একটি প্রসিদ্ধ 'প্রার্থনা'র পদে বলিলেন :—

হরি হরি আর কবে হেন দশা হব।
কবে বৃষভানুপুরে আহিরী গোপের ঘরে
তনয়া হইয়া জনমিব ॥

ইহারও পরে, পণ্ডিতপ্রবর শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী তাঁহার 'প্রেম-সম্পুট' নামক গ্রন্থে এই রাধাপ্রেমের একটি সুন্দর বিশ্লেষণ দিয়াছেন। তাঁহার বর্ণনা-ভঙ্গীটি এরূপ চিত্তাকর্ষক যে উহা একটু বিস্তৃত ভাবে উল্লেখ করিলে বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না।

শ্রীরাধার মন পরীক্ষা করিবার জন্য একদিন শ্রীকৃষ্ণ মোহিনী-বেশ ধারণ করিয়া বৃষভানু-রাজের অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। রাধিকা সেই অবগুণ্ঠনবতী যুবতীকে দেখিয়া তাঁহার সখীদিগকে বলিলেন:—জানিয়া আইস, ঐ রমণী কি প্রয়োজনে আসিয়াছেন। সখীগণ যুবতীকে ঐরূপ প্রশ্ন করিলে তিনি মৌন রহিলেন, কোনও উত্তর দিলেন না। তখন রাধিকা তাঁহার সমীপবর্ত্তিনী হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন:—

'অয়ি শুভে! আপনি কে? এবং কি প্রয়োজনে এখানে আসিয়াছেন? আপনার রূপ দেখিয়া মনে হইতেছে আপনি কোন সম্ভ্রান্ত ঘরের কুলবধূ। আপনার আগমনের উদ্দেশ্য জ্ঞাপন করিয়া আমাকে কৃতার্থ করুন।'

এইরূপ ভাবে পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসিত হইয়া রমণীবেশ-ধারী শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন:—'আমি দেবী, স্বর্গে আমার নিবাস। আমি যে-নিমিত্ত ব্যাকুল হইয়া তোমার নিকট আসিয়াছি তাহা শ্রবণ কর।

'তোমাদের এই বৃন্দাবনে যে বেণুধ্বনি হয়, তাহার বিক্রম স্বর্গপুরে প্রবেশ করিয়া চিরযৌবনা দেবাঙ্গনাগণকেও বিভ্রান্ত করিয়াছে। আমি সেই বংশীধ্বনির অনুসরণ করিয়া এখানে আসিয়াছি। কয়েকদিন বংশীবটে অবস্থান করিয়া তোমাদের অনুপম বিবিধ বিলাসও দর্শন করিলাম। অবশ্য কোনও পরপুরুষ আমাকে দর্শন করিতে সমর্থ হয় না।'

ইহা শুনিয়া শ্রীরাধা পরিহাস করিয়া সেই নবীনা যুবতীকে বলিলেন, "গোপনে আপনি যখন শ্রীহরির লীলা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তখন আপনার আর পরপুরুষের প্রয়োজন কি?"

দেবাঙ্গনাবেশী শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, 'সখি, তোমার সঙ্গে পরিহাসে কে পারিবে? তুমি সর্ব্বগুণযুক্তা। তুমি মানবী হইলেও, সুরাঙ্গনাগণ তোমার গুণকথা নতমস্তকে শ্রবণ করেন। বৈকুণ্ঠেও তোমার ন্যায় প্রেমবতী কেহ নাই। আমি কৈলাসে হৈমবতীর সভায় তোমার অনেক গুণবর্ণনা শ্রবণ করিয়াছি।

'কিন্তু আমি আসিয়া যাহা প্রত্যক্ষ করিলাম, তাহাতে আমার দুঃখের অবধি নাই। আমি দেখিলাম সুচতুর-শিরোমণি শ্রীকৃষ্ণ তোমাকে বঞ্চনা করিয়া অন্য রমণীর প্রেমে মুগ্ধ হইয়াছেন। তোমাকে সঙ্কেত-স্থানে আগমন করিতে বলিয়া তিনি নিতান্ত নিষ্ঠুর ভাবে তোমাকে উপেক্ষা করিয়া অন্য নায়িকার কুঞ্জে নিশিযাপন করিলেন। এরূপ কপটাচারী শঠের প্রতি তোমার এত অনুরাগ দেখিয়া আমি আশ্চর্য্যান্বিতা হইয়া গিয়াছি।'

শ্রীমতী ধীর ভাবে সমস্ত কথা শুনিয়া কুমারসম্ভবের পার্ব্বতীর ন্যায় ক্রোধে স্ফুরিতাধর হইলেন না। ছদ্মবেশী শিবের মুখে শিবনিন্দা শুনিয়া পার্ব্বতী ধৈর্য্য ধারণ করিতে পারেন নাই। একবার তিনি যে কারণে দেহত্যাগ করিয়া কর্ণযুগলকে শাস্তি দিয়াছিলেন, আবারও প্রায় তেমনই দশা ঘটিবার উপক্রম হইয়াছিল। কিন্তু শ্রীরাধিকা জানিতেন যে, তাঁহার প্রেমের মর্ম্ম বুঝিতে পারা সকলের পক্ষে সম্ভব নহে। তাই তিনি প্রতিবাদ-রূপে কেবল বলিলেন, 'সখি, শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় তোমারও এই একটি গুণ দেখিতেছি যে, তুমি আমার সমক্ষে আমার প্রিয়তমের এত নিন্দা করিলেও আমি তোমার প্রতি ক্রমশঃ অনুরক্ত হইয়া পড়িতেছি। তোমার উপর আমার ক্রোধ হইতেছে না, ইহাই আশ্চর্য্য।

'তবে তুমি যখন জিজ্ঞাসা করিলে, তখন শোনো। আমার প্রিয়তম যে সঙ্কেতকুঞ্জে আমাকে আহ্বান করিয়া নিজে আগমন করিতে পারিলেন না, ইহাতে তাঁহার দোষ কিছুমাত্র নাই। অন্য কর্ত্তৃক নিবারিত হইয়াই তিনি ঐরূপ করিয়াছিলেন। তিনি কিন্তু তাহাতে সুখী হইতে পারেন নাই। আমি যে সজল নয়নে নিশি-জাগরণে তাঁহার প্রতীক্ষা করিতেছি, এই চিন্তা সর্ব্বদা মনে হওয়াতে তিনিও সেই রজনী অতি কষ্টে অতিবাহিত

করিয়াছিলেন। পরদিন প্রভাতে তিনি আমার নিকট আসিলে আমি যে অভিমান করিয়াছিলাম, তাহা কেবল প্রিয়তমের দুঃখ স্মরণ করিয়া, আমার সেই সকোপ তিরস্কার তিনি অত্যন্ত উপভোগ করিয়াছিলেন।

'আর যে রাসমণ্ডল হইতে আমাকে বনান্তরে লইয়া গিয়া হঠাৎ পরিত্যাগ করিয়া যাওয়ার কথা বলিলে, সখি, তাহাতেও প্রাণাধিকের কিছুমাত্র দোষ নাই। কেন, তাহা বলিতেছি।

'তিনি আমাকে লইয়া যখন অন্যত্র চলিয়া গেলেন,তখন আমার অন্য সখীরা আমার প্রতি স্বভাবতঃই ঈর্ষাপরায়ণা হইয়াছিল। সেইজন্য প্রিয়তম আমাকে নানাপ্রকারে আনন্দ প্রদান করিয়া অন্তর্হিত হইলেন। অভিপ্রায় এই যে, অন্য গোপীরা আমাকে তদবস্থায় দেখিলে তাহাদের ঈর্ষা ত দূর হইবেই, অধিকন্তু কৃষ্ণবিরহে আমার কি দশা হয় তাহা দেখিয়া তাহারা আমার প্রেমের শ্রেষ্ঠতা অনুভব করিবে। সুতরাং হে সুন্দরি! আমার প্রাণ-বল্লভের কোনও অপরাধ নাই। তিনি 'প্রেমাম্বুধি গুণমণিখনিঃ'। তাঁহার তুলনা নাই।'

শ্রীমতীর এই সকল যুক্তি শুনিয়া সেই যুবতী বলিলেন,

দোষা অপি প্রিয়তমস্য গুণা যতঃ স্যুঃ
তদ্দত্ত কষ্টশতমপ্যমৃতায়তে যৎ।
তদ্দুঃখলেশকণিকাপি যতো ন সহ্যা
তৎকৃত্যাত্মদেহমপি যং ন বিহাতুমীষ্টে।
যোহ সন্তমপ্যনুপমং মহিমানমুচ্চৈঃ
প্রত্যায়য়ত্যনুপদং সহসা প্রিয়স্য॥
প্রেমা স এব...

যাহাতে প্রিয়তমের দোষগুলিও গুণের ন্যায় প্রতীত হয়, যাহাতে তাঁহার প্রদত্ত শত শত কষ্টকেও অমৃত বলিয়া মনে হয়, যাহাতে প্রিয়তমের দুঃখলেশকণিকাও সহ্য করিতে পারা যায় না, যাহার নিমিত্ত নিজের দেহপাত হইলেও প্রিয়তমকে ত্যাগ করিতে ইচ্ছা হয় না, যাহা প্রিয়তমের মহিমা না থাকিলেও পদে পদে অনুপম মহিমা অনুভব করাইয়া থাকে, তাহারই নাম প্রেম।

'রাধে, বুঝিলাম ইহাই তোমার প্রেমের রহস্য। সত্যই তুমি প্রেমবতী। হৈমবতীর সভায় যাহা শুনিয়াছিলাম যে, তোমার ন্যায় প্রেমিকা জগতে নাই, আজ তাহার সত্যতা প্রত্যক্ষ করিলাম। কিন্তু একটি বিষয়ে আমার সন্দেহ যাইতেছে না; কৃষ্ণের মনের অভিপ্রায় তুমি কেমন করিয়া বুঝিলে? তিনি যে-কারণে তোমার নিকট আসিতে পারেন নাই অথবা যে-অভিপ্রায়ে তোমাকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, তাহা তুমি কি করিয়া জানিলে? তোমার কি অচ্যুত-যোগ-সিদ্ধি আছে, যাহার দ্বারা অপরের মনের কথা জানিতে পারা যায়?'

তখন রাধিকা বলিলেন 'হে সুন্দরি, তোমরা দেবাঙ্গনা, অচ্যুত-যোগ-সিদ্ধিতে তোমাদের প্রয়োজন থাকিতে পারে, আমি মানবী, আমরা উহা কোথায় পাইব? প্রিয়তমের মনের ভাব জানিতে আমার কি কোনও যোগের প্রয়োজন হয়? আমরা যে পরস্পরের মনোভাব জানিতে পারিব, ইহা আর বেশী কথা কি?

একাত্মনীহ রসপূর্ণতমেহত্যগাধে
একাসুসংগ্রথিতমেব তনুদ্বয়ং নৌ।
কস্মিংশ্চিদেক সরসীব চকাসদেক
নালোত্থমব্জ যুগলং খলুনীলপীতম্।

'সখি, একটি সরোবরে নীলপীত দুইটি পদ্ম একনাল হইতে উত্থিত হইলে যেমন হয়, তেমনি অতি অগাধ রসপূর্ণতম একটি আত্মা হইতে আমাদের দুই তনু আবির্ভূত হইয়া একই প্রাণসূত্রে তাহা সংগ্রথিত আছে।' এইজন্যই একের মনের ভাব অপরের মনে তৎক্ষণাৎ প্রতিফলিত হয়।'

তখন সেই মোহিনী বলিলেন, 'প্রিয়সখি, তুমি যাহা বলিলে তাহা যুক্তিসঙ্গত সন্দেহ নাই। কিন্তু আমি ইহার প্রত্যক্ষ কোনও প্রমাণ না পাইলে নিঃসন্দেহ হইতে পারিতেছি না।'

রাধিকা জিজ্ঞাসিলেন, 'কি প্রত্যক্ষ প্রমাণ তোমার চাই? বল।'

তখন সেই সুন্দরী কৌতুকসহকারে বলিলেন, 'আচ্ছা, কৃষ্ণ নিকটেই থাকুন, বা দূরেই থাকুন, তুমি তাঁহাকে একটি বার স্মরণ কর। তিনি যদি তোমার আহ্বান শুনিয়া তোমার নিকটে এই মুহূর্তে আগমন করেন, তাহা হইলে আমার সংশয় দূরীভূত হইবে। হে কৃষ্ণপ্রিয়ে, এ সময়ে গুরুজনের এখানে আগমনের সময় নহে

অতএব তুমি নিঃসঙ্কুচিত চিত্তে, তাঁহাকে একটি বার স্মরণ কর. কৃষ্ণ এখানে আসুন, আমরা দেখিয়া আনন্দলাভ করি।'

এইরূপভাবে অনুরুদ্ধ হইয়া বৃষভানু-নন্দিনী নেত্রযুগল নিমীলিত করিয়া নিজ কান্তের ধ্যান করিতে লাগিলেন এবং সমস্ত ইন্দ্রিয়বৃত্তি নিরোধ করিয়া যোগিনীর মত মৌনাবলম্বন করিলেন।

যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ তৎক্ষণাৎ নারীবেশ পরিত্যাগ করিয়া ধ্যানস্তিমিতনয়না গলদশ্রুবয়না শ্রীরাধিকাকে মুহুর্মুহু চুম্বন করিলেন।

মহামহোপাধ্যায় বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ১৬০৬ শকে এই প্রেমসম্পুট কাব্য প্রণয়ন করেন। এই কাব্যে কবি যে প্রেমের বিশ্লেষণ দিয়াছেন, তাহা অত্যন্ত উপভোগ্য।

অন্যান্য বৈষ্ণব মহাজনগণও শ্রীরাধা-প্রেমের চিত্রাঙ্কনে যথেষ্ট নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াছেন। যশোদা যেরূপ বাৎসল্যের প্রতিমূর্ত্তি, রাধিকা তেমনই প্রেমের প্রতিমূর্ত্তি। বৈষ্ণব কবিরা যেন হৃদয়ের শোণিতবিন্দু দিয়া এই প্রেমের ছবি আঁকিয়াছিলেন। জ্ঞান দাস ও গোবিন্দ দাসের পদাবলী হইতে এই প্রেম-পরিকল্পনার নমুনা দিতেছি।

কিশোরী কৃষ্ণপ্রেমের আস্বাদ পাইয়াছেন। কিন্তু লজ্জাবিজড়িত নবোঢ়ার ন্যায় সখীগণকে কিছু বলিতে পারিতেছেন না। সখীরা একদিন অনুযোগ করিয়া বলিতেছেন :—

লহু লহু মূচকি হাসি চলি আওলি
পুন পুন হেরসি ফেরি।
জনু রতি পতি সঞে মীলল রঙ্গভূমে
ঐছন কয়ল পুছেরি॥
ধনি হে বুঝলুঁ এ সব বাত।
এত দিনে তুহুঁক মনোরথ পুরল
ভেটলি কানুক সাথ॥

তুমি মৃদু মৃদু মুচকি হাসিয়া চলিয়া আসিতেছ এবং পুনঃ পুনঃ পিছনে ফিরিয়া চাহিতেছ। তোমার রঙ্গ দেখিয়া মনে হইতেছে যেন রঙ্গমঞ্চে রতি মদনের সহিত মিলিত হইয়াছেন। মদন অনঙ্গ বলিয়া তাঁহাকে দেখা যায় না, কিন্তু রতির অভিনয় দেখিয়া যেমন অনঙ্গের অস্তিত্ব অনুমান করিতে হয়, তোমার হাসি-হাসি ভাব ও পুনঃ পুনঃ ফিরিয়া চাওয়া দেখিয়া তোমার প্রেমাস্পদের সহিত মিলনের কথাও বুঝিতে পারা যাইতেছে। রাধে, এতদিনে আমরা এ সকল কথা বুঝিতে পারিলাম। বুঝিলাম যে, এতদিনে তোমার মনোরথ পূর্ণ হইয়াছে এবং নাগরেন্দ্র চূড়ামণি শ্রীকৃষ্ণের সহিত তোমার দেখা হইয়াছে।

হাম সব নিজ জন কহসি রাতিদিন
সো সব বুঝলুঁ আজে।
জ্ঞান দাস কহ সখি তুহুঁ বিরমহ
রাই পায়ল বহু লাজে॥

সখীগণ বলিতেছেন—আমরা যে তোমার একান্ত আপনার জন, একথা রাত্রি দিন বলিয়া থাক। কিন্তু আজ সে-সকল বুঝা গেল! অর্থাৎ তোমার প্রেমের কথা আমাদের নিকট গোপন করিতেই তুমি ব্যস্ত। ইহাকে কি আপনার জন বলে? জ্ঞান দাস বলিতেছেন, সখি তুমি আর বলিও না, রাধিকা অত্যন্ত লজ্জা পাইয়াছেন।

সখীগণ শ্রীরাধা-কৃষ্ণের প্রেমলীলার সঙ্গিনী মাত্র নহেন, তাঁহারা এই প্রেমের কারিকর। এই পিরীতি-রত্ন ভাঙিলে তাহা জোড়া লাগাইতে ইঁহারা পটু। বস্তুতঃ সখী নহিলে এই প্রেমলীলা অসম্পূর্ণ থাকিত। রবীন্দ্রনাথ যেমন শকুন্তলার সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে, শকুন্তলা-চিত্র অনসূয়া ও প্রিয়ম্বদার দ্বারা সম্পূর্ণ হইয়াছে, তেমনি আমরা বলিতে পারি, সখী ব্যতীত শ্রীরাধার চিত্র কখনও পূর্ণ, সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইতে পারিত না। সখীগণ শ্রীরাধার অনেকখানি। সখীগণের অনুযোগের উত্তরে রাধিকা বলিতেছেন :—

দরশনে লোর নয়ন যুগ ঝাঁপ।
করইতে কোর তুহু ভুজ কাঁপ॥
দূর কর এ সখি সো পরসঙ্গ।
নামহি যাক অবশ কর অঙ্গ॥
চেতন না রহ চুম্বন বেরি।
কো জানে কৈছে রভস-রস-কেলি॥

সখি, তোমরা আমাকে মিছাই দোষ দিতেছ। আমি ইচ্ছা করিয়া তোমাদের নিকট কিছুই গোপন করি নাই। শ্রীকৃষ্ণের সহিত আমার প্রণয়ের কথা তোমরা জানিতে চাহিতেছ, কিন্তু আমি কি বলিব? যাঁহাকে দেখিলে

নয়নযুগল অশ্রুতে ভরিয়া যায় (ভাল করিয়া দেখিবার পক্ষে বাধা জন্মায়), যাঁহাকে আলিঙ্গন করিতে গেলে ভুজদ্বয় কম্পিত হয়, তাঁহার সহিত প্রেম-ক্রীড়ার কথা কি বলিব ? সখী সে-সকল প্রসঙ্গ আর তুলিও না। যাঁহার নাম মনে হইতেই অঙ্গ অবসন্ন হইয়া আসে, যিনি চুম্বন করিলে আমার চেতনা লুপ্ত হয়, তাঁহার সহিত রভস-কেলি কেমন তাহা কি আমি জানি ? আমি নিজেই জানি না, তা তোমাদিগকে বলিব কি প্রকারে ?

কানুক পরশে যতহুঁ অনুভাব।
অনুভবি আপ পরহুঁ সমুঝাব॥

কৃষ্ণের স্পর্শে যে-সকল বিচিত্র অনুভাব উদিত হয়, তাহা আমি নিজে বুঝিলে ত পরকে বুঝাইব ?

তবহু জগত ভরি আকিরিতি এহ।
রাধা-মাধব অবিচল লেহ॥

আমার ত ব্যাপার এই, অথচ এর মধ্যে জগতে এই কলঙ্ক রটিয়াছে যে রাধা ও কৃষ্ণের মধ্যে অত্যন্ত প্রণয় !

এ কিয়ে সুদঢ় কিয়ে পরিবাদ।
গোবিন্দ দাস কহ না ভাঙ্গে বিবাদ॥

এই যে লোকে বলে ইহা কি সুনিশ্চিত অর্থাৎ সত্য কথা, অথবা মিছাই কলঙ্ক ? গোবিন্দ দাস বলিতেছেন যে, এ সন্দেহ কোন দিন ঘুচিবে না।

পোর্ট-আর্থারের ক্ষুধা

শ্রীসুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

১৪

তাইপোশানের যুদ্ধ

আমরা যেখানে আছি প্রতিদিন সেখানকার শক্তি বৃদ্ধি হইতেছে। এবার আগে চলার আয়োজন সুরু হইল। নান্‌শানে শত্রুর বারোটি কামান দখলে আসে, Luanni-chiaoর কাছে উচ্চভূমিতে সেগুলি বসানো হইল ; তা ছাড়া Chuchuan-tzur পশ্চিমে উচ্চভূমিতে রাখা হইল ছয়টি অতিকায় নৌ-কামান। শত্রুর অগ্রবর্ত্তী ঘাঁটির খবর আনিবার জন্য সন্ধানী দল ঘন ঘন যাইতে লাগিল। ধনুকের জ্যা একমাস ধরিয়া টানিয়া আছি, এবার তীর ছাড়িবার জন্য আমরা প্রস্তুত—কেবল প্রস্তুত নয়, উৎসুক। সৈনিকদের উৎসাহে বান ডাকিয়াছে—আক্রমণের এই সুযোগ। আটাশে জুলাই আমাদের বিভিন্ন দল যাত্রা করিল দাক্ষিণে রুশের আড্ডার উপর নামিবার জন্য।

আমার দলের উদ্দেশ্য সুরক্ষিত তাইপোশান দখল করা। যুদ্ধের পূর্ব্ব রাতে ব্রিগেডিয়ার-জেনারেল যুদ্ধের প্রণালী পরিষ্কার বুঝাইয়া দিলেন। নায়ক ও সৈনিককে প্রাণপণে লড়িতে বলিলেন, জায়গাটি দখল করা চাই-ই, কারণ এই যুদ্ধে জিতিলে তবেই পোর্ট-আর্থারের আসল অবরোধ সুরু হইতে পারে। আমাদের কর্নেলও বলিলেন এই প্রথম আমাদের সমগ্র রেজিমেণ্ট যুদ্ধে যোগ দিবে। যুদ্ধে জয়-পরাজয় আসলে যুদ্ধের সুরুতেই সূচিত হয়। তিনি আমাদের নায়ক, আমাদের প্রাণের মালিক এখন তিনিই, তাহা বলি দিতে তিনি দ্বিধা করিবেন না—লড়াইয়ের সময় যে-কোনো উপায় সমাচীন বোধ হইবে তাহাই তিনি অবলম্বন করিবেন। তিনি আরও বলিলেন, 'বুশিদো' বা জাপানী ক্ষাত্রধর্ম্মের শক্তি পরীক্ষার এই সময়। মহামাহিম সম্রাট কৃপা করিয়া আমাদের উপর যে-বিশ্বাস ন্যস্ত করিয়াছেন, প্রমাণ করিতে হইবে আমরা তার অনুপযুক্ত নই, প্রয়োজন হইলে পতাকাতলে সকলেরই প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে হইবে !

যাত্রার আগের রাতে শিবিরের দৃশ্য অ-সাধারণ। হেথা-হোথা সৈনিকেরা ফিসফিস করিয়া কথা কহিতেছে, কেহ বা একা দাঁড়াইয়া আনমনাভাবে বন্দুক ধরিয়া

আপন মনে ঈষৎ হাসিতেছে—কেন, তা সে-ই জানে। অনেকে অন্তর্বাস (underwear) বদলাইয়া তাদের সবসেরা ধোপদস্ত পরিষ্কার অন্তর্বাস পরিতেছে—ময়লা কাপড়ে মরিয়া তারা শত্রুর অবজ্ঞাভাজন হইতে চায় না! আবার কেহ কেহ উদাসভাবে আকাশপানে চাহিয়া গুনগুন করিয়া গাহিতেছে।

পরদিন শেষরাত্রে চারিদিকে নিবিড় কুয়াশা—একফুট সামনেও দৃষ্টি চলে না; পূর্ব্বদিন সন্ধ্যায় বৃষ্টির পর থেকে হু হু করিয়া ঠাণ্ডা বাতাস বহিতেছে। এমন সময় হাজার হাজার সৈনিক অন্ধকার ঠেলিয়া চলিতে সুরু করিল সুদীর্ঘ অজগরের মত! রাত তিনটায় ইওয়ায়্যামা পাহাড়ের পাদমূলে পৌছিলাম। আমাদের রেজিমেণ্টের 'রিসার্ভ' দল এখানে থাকিবে, পাহাড়ের মাথায় থাকিবে 'স্কার্‌মিশারস্‌' ডানদিকে অপর একটি পাহাড়ে থাকিবে গোলন্দাজ। যুদ্ধ সুরু করিবার সঙ্কেত না পাওয়া পর্য্যন্ত সৈন্যশ্রেণী থেকে কাহারও মাথা বাড়াইবার অবধি হুকুম নাই। সকলে বন্দুকে গুলি ভরিয়া কার্ত্তুজের বাক্স খুলিয়া রাখিল, নিশ্বাস রুধিয়া সকলেই কর্নেলের 'ফায়ার' আদেশের অপেক্ষা করিতেছে। ইওয়ায়্যামার মাথায় দূরবীন্‌ হাতে কর্নেল দাঁড়াইয়া আছেন, তাঁর সামনে খোলা ম্যাপ হাতে দাড়াইয়া অ্যাড্‌জুট্যাণ্ট; মাঝে মাঝে সে ম্যাপের বাক্স হাতড়াইতেছে। গোলাগুলি-বাহী ঘোড়াগুলো পাহাড়ের তলায় জড়ো হইয়াছে, মালবাহী সৈনিকেরাও কাজ সুরু করিবার জন্য অধীর। সঙ্কেত হইবে একটি কামানের শব্দ। নিজ নিজ ঘড়ির কাঁটার পানে তাকাইয়া আছি, এক এক মিনিট যায় আর বুক ঢিপঢিপ করিতে থাকে।

অবশেষে এগারোটা উনপঞ্চাশ মিনিটে বাঁ দিকে তোপের আওয়াজ পাওয়া গেল। লাওৎসো-শান্‌ থেকে তাইপোশান্‌ পর্য্যন্ত শত্রুকে আক্রমণ করার এই সঙ্কেত। গত ত্রিশ দিনের মধ্যে একটি গোলাও ছাড়া হয় নাই—ইহার জন্য শত্রু আদৌ প্রস্তুত ছিল না। তাড়াতাড়ি তারা যে উত্তর দিল তা ভারি অলস ও নিস্তেজ শুনাইল—আমাদের মাথার অনেক উপর দিয়া তাহাদের গোলা চলিয়া গেল! স্থির ছিল আমাদের বাঁ দিকের সৈন্যদল প্রথমে লাওৎসো-শানের উপর শত্রুকে আক্রমণ করিয়া পরাভূত করিবে, পরে আমাদের দল গিয়া তাহাদের সঙ্গে যোগ দিবে। তাই কিছুক্ষণ স্থির হইয়া সেই আক্রমণের গতি লক্ষ্য করিতে লাগিলাম। একটু পরে আমাদের নৌ-কামানগুলো এমন সোরগোল তুলিল যে মনে হইল শত্রুপক্ষ অচিরে ভয়ে তটস্থ হইয়া ঘাটি ছাড়িয়া পালাইবে, কিন্তু দেখা গেল তারা ততটা দুর্ব্বল নয়।

যুদ্ধের তেজ ক্রমেই বাড়িতেছে। আমাদের সমস্ত কামান লাওৎসো-শানের উত্তরের ঢালুতে শত্রুর বড় কামানগুলোকে থামাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে শত্রুর গোলাবর্ষণ একটু কমিয়া আসিল, সুযোগ বুঝিয়া আমাদের বাঁ দিকের পদাতিক দল জাপানী তোপের আশ্রয়ে অগ্রসর হইতে সুরু করিল। অবিলম্বে তারা আন্দাজ দু'হাজার গজ সামনে একটি অর্দ্ধচন্দ্রাকার উচ্চভূমি দখল করিল, তারপরেই বামে ঘুরিয়া বেলা দশটার সময় লাওৎসো-শানের উত্তর মুখের বাঁধটা দখল করিল। মনে হইল রুশেরা এই সব জায়গা সুরক্ষিত করিবার তেমন বন্দোবস্ত করে নাই, কারণ খানিক বাধা দেওয়ার পর তারা এখানকার বড় কেল্লা ছাড়িয়া দিল। আমাদের পতাতিকেরা পাহাড়ের মাথা দখল করার পরও কতক শত্রু নিভয়ে দক্ষিণের ঢালুর উপর দাঁড়াইয়া মরিয়া হইয়া আমাদের নিম্নগামী একাগ্র গুলিবর্ষণের সম্মুখীন হইল—আক্রমণ এতক্ষণ চলার তাহাই কারণ। শেষ পর্য্যন্ত আমাদের বাঁ দিকের দল তাহাদিগকে সেখান থেকে ছত্রভঙ্গ অবস্থায় তাড়াইয়া দিল। কিন্তু তাদের পিছনে ছিল Lungwangtang খাঁড়ি, তাই সেদিকে পলায়ন অসম্ভব। ফলে বহু হতাহতকে ফেলিয়া বাদবাকি নৌকার মধ্যে লাফাইয়া পড়িয়া খাঁড়ির ওপারে গিয়া লুকাইল।

বাঁ দিকের দলের (left wing) কর্ত্তব্য এইভাবে সম্পন্ন হইল। এবার আমাদের পালা। কর্নেল আওকি কাপ্তেনদের হুকুম করিলেন, ডানদিকের দল, গুলি চালাতে সুরু কর! অমনি সমস্ত শ্রেণী মাথা বাড়াইয়া দিল, চড়বড় করিয়া তাদের বন্দুকের শব্দ হইল মুড়িভাজার মত। সঙ্গে সঙ্গে রুশেদের গুলি

বড় বড় ফোঁটায় আমাদের চারিদিকে পড়িতে লাগিল—বালি উড়াইয়া, পাথর ছিটকাইয়া, মানুষকে ধরাশায়ী করিয়া। কানের কাছ দিয়া যেগুলো যায় তারা শিস দেওয়ার মত শব্দ করে, শূন্যে উঁচু দিয়া যেগুলো যায় কম্পমান গম্ভীর তাদের শব্দ। দীর্ঘ সৈন্যশ্রেণী শিকলের মত বিলম্বিত, তাদের মাঝে মাঝে জোড় ভঙ্গ হইতে লাগিল। 'ষ্ট্রেচার' লইয়া বাহকেরা আহতকে তুলিবার জন্য ছুটিয়া বেড়াইতেছে। শিলা-বৃষ্টির মত কেবল বন্দুকের গুলি নয়, বড় বড় কামানের গোলা আমাদের মাথার উপর ফাটিয়া সাদা ধোঁয়া ছড়াইতে লাগিল। গোলার টুকরা ধপাধপ করিয়া পড়িয়া মাটিতে গর্ত্ত করিতেছে কিম্বা আক্রমণকারীর মাথার উপরে বিঁধিয়া বসিতেছে। কখনো কখনো গোলার শূন্য খোলটা পাহাড় ডিঙাইয়া আমাদের 'রিসার্ভ' দলের মধ্যে গিয়া পড়ে। আমি যখন 'রিসার্ভে' ছিলাম তখন এমনি একটা শূন্য গোলার খোল এক সৈনিকের গায়ে লাগিতে দেখি—তার ফলে তার ডান হাত উড়িয়া গিয়া সেখানেই সে মারা পড়ে। পরে সেই খোলটা পরীক্ষা করিয়া দেখা গেল, তার মধ্যে প্রথমে এক টুকরা ওভারকোট, তারপর এক টুকরা কোট, তারপর এক টুকরা গেঞ্জি, তারপর মাংস ও হাড়, তারপর আবার গেঞ্জি কোট ও ওভারকোট, সঙ্গে রক্তমাখা ঘাস ও নুড়ি—সে এক অভিনব ও ভয়ঙ্কর canned goods (টিনে ভরা মাল)!

এই যুদ্ধ কয়েক ঘণ্টা ধরিয়া চলিল। শত্রুর প্রবল গোলাবর্ষণের মুখে অগ্রসর হওয়ার সুযোগ হইল না। আমাদের হতাহতের সংখ্যা এত দ্রুত বাড়িতে লাগিল যে 'ষ্ট্রেচার' তৈরি করিয়া কুলানো দায়। আমাদের অনেক পিছনে প্রাথমিক শুশ্রূষা-শিবিরেও গোলা পড়িতে লাগিল। সেখানে জনকয় আহত সৈনিক দ্বিতীয় দফা আঘাত পাইল বা মারা পড়িল। এ এক সাংঘাতিক যুদ্ধ। গোলন্দাজদের বামে 'রিসার্ভ' দল রওনা হইল, সুযোগ উপস্থিত হইলে মুহূর্ত্তের মধ্যে তারা ছুটিয়া গিয়া শত্রুর উপর ঝাঁপাইয়া পড়িতে পারিবে। এ সময়ে আমি 'রিসার্ভ' দলের পতাকাবাহী ছিলাম। গোলন্দাজদের সঙ্গে আছি এবং পতাকাটা বেশ স্পষ্ট, তার ফলে Wangchia-tun এর রুশেরা আমাদের উপর ভীষণভাবে গোলা দাগিতে লাগিল। শত্রুর লক্ষ্য ভাল, গোলাগুলো বাতাসে বৃষ্টিধারার মত কাত হইয়া আসিতে লাগিল। মিনিট খানেকের জন্য ধোঁয়া সরিয়া গেলে দেখিলাম, একজন লেফটেন্যাণ্ট—সে সেইমাত্র সাহসের সঙ্গে সৈনিকদের চালনা করিতেছিল—রক্ত-মাখা দেহে মরিয়া পড়িয়া আছে। গোলন্দাজ-নায়ক ও তার সহকারীরা টুকরা টুকরা হইয়া গেছে, তাদের মাথার ঘি ফিন্‌কি দিয়া বাহির হইতেছে, নাড়িভুঁড়ি কাদায় ও রক্তে মাথামাখি। 'রিসার্ভ' গোলান্দাজেরা তাদের স্থান লইতে গেল এবং তারাও মারা পড়িল।

অবস্থা এমন দাঁড়াইল, সেখানে থাকিলে প্রতি মুহূর্ত্তে লোক ক্ষয় হওয়ার সম্ভাবনা। কিছুক্ষণ থেকে আকাশে মেঘ জমা হইতেছিল, এখন চারিদিক অন্ধকার নিরানন্দ হইয়া উঠিল। দেখিতে দেখিতে প্রবল বাতাস বারুদ ও ধোঁয়ার পাশাপাশি পাল্লা দিয়া ছুটিতে লাগিল, কাদাগোলা বৃষ্টি গুলিগোলার সঙ্গে তেরছাভাবে পড়িতে লাগিল। ঠিক সেই সময় আমাদের 'রিসার্ভ' দল কর্নেলের সঙ্গে মিলিবার হুকুম পাইল। গোলন্দাজদের সান্নিধ্য ছাড়িয়া বাঁ দিকে 'মার্চ' করিতে সুরু করিলাম। পাথরের উপর দিয়া অতি কষ্টে চলিতেছি, তীব্র বাতাসে পতাকা এমন পতপত করিতে লাগিল যে ভয় হইল পাছে ছিঁড়িয়া টুকরা টুকরা হইয়া যায়। এমন সময় মাথার উপর একটা গোলা ফাটিল, তার টুকরাগুলা শূন্যে ছড়াইয়া গেল। পতাকার খানিকটা উড়িয়া গেল, একটি লোক মারা পড়িল এবং গোলার এক টুকরা আমাদের অনেক পিছনে এক উপত্যকার মাঝে গিয়া পড়িল।

কর্নেল ছিলেন ইওয়ায়্যামা পাহাড়ের মাথায়, সে-কথা আগেই বলিয়াছি। তাঁহাকে সেখানে দেখিয়া শত্রু নিঃসন্দেহ বুঝিল সেখানেই আমাদের সমস্ত শক্তি সংহত, তাই বুঝিয়া তারা পাহাড়ের উপর শিলাবৃষ্টির মত গোলা ফেলিতে লাগিল। কর্নেল আওকি শত্রুর পানে একদৃষ্টে চাহিয়া অচল অটল ভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। তাঁর

কাছে গিয়া পতাকা ছিঁড়িয়া যাওয়ার খবর দিলাম, তিনি কেবল বলিলেন, বটে! ক্ষণকাল পরে বলিলেন, ঠিক ম্যাস্থভারের মত, কি বল?

বেলা দুইটা। এখনও লড়াইয়ের মীমাংসা হয় নাই। ঘণ্টায় ঘণ্টায় আমাদের হতাহতের সংখ্যা বাড়িতেছে। এই সময়ে আমাদের বাঁ দিকের এক অংশ আগাইতে সুরু করিল। আমাদের দলও আগে যাইবার আদেশ পাইল। অমনি সমস্ত লোক উঠিল একটা কালো দেওয়ালের মত এবং হু হু করিয়া শত্রুর কামানের মুখের কাছে গিয়া পড়িল। সুযোগ বুঝিয়া রুশেরা তোপের বহর আরও বাড়াইয়া দিল। আমাদের মধ্যে যারা অগ্রবর্ত্তী হইয়াছিল তারা ছিন্নভিন্ন হইল, যারা যায় নাই তারা আগেই মরিয়াছে। সাব্‌-লেফটেন্যাণ্ট হাচিদার বুকে গুলি লাগিয়াছে, তবুও সে সামনে চল, সামনে চল, বলিয়া হাঁকিতেছে; ঝলকে ঝলকে রক্ত পড়িতেছে, তবুও ভ্রূক্ষেপ নাই। তার আঘাতের কথা সৈনিকেরা জানেও না। শত্রুর পানে খানিকটা পথ দ্রুতবেগে ছুটিয়া গিয়া মৃদুকণ্ঠে 'বান্‌জাই' বলিয়া সে মরিয়া গেল।

হাচিদা আহত হওয়ার আগে তার এক সৈনিকের ডান হাত চূর্ণ হইয়া যায়, তবুও সে রণে ক্ষান্ত দেয় নাই। লেফটেন্যাণ্ট তাহাকে শুশ্রূষা-শিবিরে পাঠাইতে চাহিলে সে বলিল, আজ্ঞে এ অতি তুচ্ছ আঘাত! আমি এখনও বেশ লড়তে পারি! এই বলিয়া বোতলের জলে ক্ষত স্থান ধুইয়া তার উপর তোয়ালে জড়াইয়া সে ছুটিয়া চলিল বাঁ হাতে বন্দুক ধরিয়া। শত্রুর কাছাকাছি পৌঁছিয়া নায়ক হাচিদার পাশেই সে নিহত হইল।

শেষ পর্য্যন্ত কর্নেল আওকির 'রিসার্ভ' দুই দল পদাতিক ও এক দল ইঞ্জিনীয়ারে আসিয়া ঠেকিল। সকাল থেকে আমাদের গোলন্দাজেরা শত্রুর কামান থামাইবার যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও সফল হয় নাই। শত্রু-অধিকৃত আসল জায়গা এখনও অক্ষত আছে।

দিন শেষ হইল। যুদ্ধের দৃশ্য মলিন অন্ধকারের পর্দ্দায় ঢাকা পড়িল। কিছুক্ষণের জন্য বৃষ্টি ধরিয়াছে, রাত্রির বিষাদ দিকে দিকে ব্যাপ্ত হইল। পাহাড়ে ও উপত্যকায় শত শত মৃতদেহ ছড়াইয়া আছে, অন্ধকারের গায়ে শত্রু কেল্লাগুলো মাথা তুলিয়া যেন নিষ্ফল আক্রমণে আমাদিগকে আহ্বান করিতেছে। রাত্রে কামান বন্দুক অবিরাম চলিতে লাগিল, 'ষ্ট্রেচারের' অভাবে তাই হতাহতকে তাঁবুর উপর ফেলিয়া বহন করা হইতেছে। অক্ষত আমরা মূকমৌন মৃত্যুকবলিতদের পাশে বসিয়া নিদ্রাহীন চোখে দিবাগমের অধীর প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম।

১৫

তাইপোশান্‌ অধিকার

পরদিন প্রত্যুষে পদাতিকদলের পথ খোলসা করিবার জন্য সমস্ত জাপানী কামান তোপ দাগিতে সুরু করিল। গোলা বর্ষণ আগের দিনের চেয়ে প্রবল, অনুপাতে শত্রুর জবাবও তেমনি। রুশের কেল্লার এই অদ্ভুত দুর্ভেদ্যতার কারণ কি? তাদের খাতের সামনে পাহাড়, উপরে তক্তার ছাউনি—নিরাপদে লুকাইয়া ঘুলঘুলির ভিতর দিয়া তারা গুলি চালায়। আমাদের বিস্ফোরক গোলায় তাদের ক্ষতি হয় না। ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় তাদের দ্রুতবর্ষী কামান ও 'মেশিন্‌-গান' সাজানো আছে—তার দ্বারা সব দিক থেকেই আমাদের উপর গোলা ফেলা যায়; আর সেই ভয়ানক কামানগুলো কঠিন পদার্থে তৈরি, কঠিন আবরণে সুরক্ষিত। তার উপর, আমাদের পাহাড়ের পাশ ও তাদের পাহাড়ের উল্টা পাশে মিলিয়া একটা শিলাময় উপত্যকা সৃষ্ট হইয়াছে—তার দেওয়ালগুলো প্রায় খাড়া হইয়া ওঠা; অমানুষিক চেষ্টা ছাড়া সেখানে নামা ওঠা সম্ভব নয়।

কামানের কাজ যতক্ষণ ঠিকমত না হয় ততক্ষণ বন্দুক চালাইয়া ফল নাই। যেমন করিয়া হোক শত্রুর 'মেশিন্‌-গান' অকেজো করা চাই। বন্দুক কাজে লাগাইতে না পারিলে মানুষকে গুলির মত ব্যবহার করা ছাড়া উপায় নাই—অর্থাৎ গুলি যেখানে গিয়া আঘাত হানিতে অক্ষম মানুষ সেখানে গিয়া আঘাত করিবে! অচিরে সেই আদেশ আসিল। আমাদের রেজিমেণ্টের পঞ্চম, সপ্তম ও দশম দল হুড় হুড় করিয়া

পত্যকার মধ্যে নামিয়া পড়িয়া শত্রুকে ভীষণ আক্রমণ রিল। রুশ গোলন্দাজেরা এতক্ষণ আমাদের কামান ক্ষ্য করিয়া গোলা ছাড়িতেছিল, এবার তারা এই অসম্ভব-প্রত্যাশী ধাবমান সৈন্যশ্রেণীর উপর কামানের খ ঘুরাইয়া দিল। সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত 'মেশিন্-গান' ও কল্লার পদাতিক একযোগে সেই দুঃসাহসী দলের উপর গুলি বর্ষণ সুরু করিল। কিন্তু সেনাদল ভ্রূক্ষেপ করিল া, হুহুঙ্কারে ঝড়ের মত তারা ছুটিয়া চলিল—কামান র্জনের সঙ্গে তাদের সেই হুঙ্কার মিশিয়া শত বজ্র নির্ঘোষের মত শুনাইতে লাগিল। দানবের মত তারা ড়িতে লাগিল—আহত নায়কের খোঁজ লইল না, ত সঙ্গীর পানে তাকাইল না। মৃত ও মরণাপন্নের উপর দিয়া ছুটিয়া বা লাফাইয়া জীবিতেরা অবশেষে ক্রব নিকটে গিয়া পৌঁছিল। সমুখে প্রকৃতির অচল দে—খাড়া পাহাড়ের আড়াল পিছনে সাথীদের অনেক গতপ্রাণ—পাহাড়ের ধারে ছড়াইয়া পড়িয়া আছে; একদৃষ্টে শত্রুর পানে চাহিয়া সেখানে তারা দাঁড়াইয়া রহিল—আর কিছুই করিতে পারিল না।

গোলাগুলির ধারাবর্ষণের মাঝ দিয়া যখন তারা ছুটিতেছিল তখন মনে হইতেছিল যেন ফিকা পাণ্ডুর একদল গাঢ় ধোঁয়ার মাঝ দিয়া চলিয়াছে। দেখা গেল তাদের মধ্যে কেহ কেহ অতিকায় গোলার ঘায়ে শূন্যে উড়িতেছে। তাদের দেহ তুলিয়া লওয়ার পর দেখা গেল কোনো কোনো সৈনিকের গায়ে আঘাতের চিহ্নমাত্র নাই, কিন্তু গায়ের চামড়া আগাগোড়া বেগুনে হয়ে গেছে। দেহ ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত হইয়া সজোরে ভূমির উপর পড়ায় এমন হইয়াছে।

প্রকাণ্ড মন্দিরের ঘণ্টাকে একটা আলপিন দিয়া দিবার চেষ্টা যেমন ব্যর্থ হয়, শত্রুর প্রবল বাধার মুখে আমাদের গোলাবর্ষণের ফলও তেমনি হইল। এমনিভাবে চলিলে হয়ত আমরা কিছুই করিতে পারিতাম না। তাই নিঃশেষে ধ্বংস হওয়ার সম্ভাবনা সত্ত্বেও আমাদের শেষ চেষ্টা করিতে হইল। ব্রিগেডিয়ার-জেনারেল শীঘ্রই আদেশ দিলেন—

এই যুদ্ধের সূচনা হইতে নায়ক ও সৈনিকদের বিক্রম উচ্চ প্রশংসার যোগ্য। আজ অপরাহ্ণ পাঁচটায় তাইপোশানের পূর্ব্ব দিকে আমাদের 'ব্রিগেড' শত্রুকে আক্রমণ করিবে। সমগ্র গোলন্দাজবাহিনী তোপ দাগিবে, তার ফলে সুযোগ উপস্থিত হইলেই বাঁ দিকের দল দ্রুতগতি আক্রমণ করিয়া শত্রুকে অভিভূত করিয়া পরাস্ত করিবে। তখন তোমার রেজিমেণ্ট তোমাদের সমুখের শত্রুর ঘাটি অধিকারের প্রাণপণ চেষ্টা অবশ্য করিবে আশা করি!

কিছুক্ষণ পরেই এক তরুণ সেনানায়কের আবির্ভাব—তার হাতে এক বোতল বীয়ার। আগের দিন থেকে পানাহার জোটে নাই বলিলেও চলে, যুদ্ধক্ষেত্রে সেই বীয়ারের বোতল এক অপূর্ব্ব দৃশ্য। ভাবিতে লাগিলাম, এ ব্যক্তি কে হইতে পারে? নিকটে আসিলে তাহাকে চিনিলাম—দ্বিতীয় ব্যাটালিয়নের লেফটেন্যাণ্ট কান।

"কেমন, আজব চীজ নয় কি এই বীয়ার? কাল থেকে বেল্টে এই বোতল বয়ে বেড়াচ্ছি শত্রুর এলাকায় 'বান্‌জাই' পান করার জন্যে! এস ভাই সব, এক সঙ্গে পান করি—বিদায়ের পাত্র! তোমাদের কাছে থেকে অনেক স্নেহ পেয়েছি—ঠিক করেছি আজ সুন্দরভাবে মরব...

এমনি সব কথা তরুণ নায়ক খুব ফুর্ত্তির সঙ্গে বলিতে লাগিল, কিন্তু সে যে রহস্য করিতেছে না তাহা কারও বুঝিতে বাকি রহিল না। অ্যালুমিনিয়াম পাত্র সোনালী সুরায় পূর্ণ করা হইল, তারপর সেই পাত্র সকলের হাতে হাতে ঘুরিয়া আসিল। পান করার সময় সকলের মুখে একটু ম্লান হাসি খেলিয়া গেল। তারপর লেফটেন্যাণ্ট কান খালি বোতলটা তুলিয়া ধরিয়া হাঁকিল, সকলের কুশল প্রার্থনা করি! তারপর মৃত সৈনিকদের কবর দিবার জন্য ছুটিয়া চলিয়া গেল। কেমন করিয়া বুঝিব সেই তার শেষ বিদায়? শত্রুর এলাকায় 'বান্‌জাই' হাঁকিবার আনন্দ লাভ করার আগেই সে মৃত্যুর গহনে প্রবেশ করিল। পরে শুনিয়াছিলাম, মৃতের কবর দেওয়ার কাজ তদারক করার সময় সে বলিয়াছিল, "ওদের ওপর ভালো করে' মাটি চাপাও, কারণ আমার পালাও এল বলে'!"

মৃত্যুর পদধ্বনি সে কি শুনিতে পাইয়াছিল ?

বেলা পাঁচটা। আমাদের সমস্ত গোলন্দাজবাহিনী একযোগে অগ্নি বর্ষণ সুরু করিল এবং সমস্ত পদাতিক তার সঙ্গে যোগ দিল। ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় স্বর্গ মর্ত্ত্য অন্ধকার হইয়া উঠিল, গোলা ফাটিতে লাগিল, গুলি ছুটিতে লাগিল, মনে হইল গিরিদরি ছিন্ন হইল বা। পদাতিকেরা গুলি চালায় আর ছুটিয়া যায়, আবার থামিয়া গুলি চালায়, তারপর সামনে লাফাইয়া পড়ে। শত্রুর গোলার মুখে তারা সিধা যাইতে পারিতেছে না। কখনো মরণাহত সৈনিক ক্ষীণকণ্ঠে কেবল 'লেফটেন্যাণ্ট' বলিয়া কৃতজ্ঞতা জানাইতে চাহিতেছে, কখনো বা কেবল 'আ' বলিয়া মরিতেছে।

অবশেষে আমাদের প্রথম ব্যাট্যালিয়ন শত্রুর থেকে কুড়ি গজ আন্দাজ তফাতে আসিয়া পৌছিল, কিন্তু সামনে দেওয়ালের মত খাড়া পাহাড়, তাহাতে পা রাখিবার ঠাঁই পর্য্যন্ত নাই। পাহাড়ে ওঠার জন্য অধীর অথচ উঠিতে একেবারে অক্ষম, এমন অবস্থায় পাশ থেকে শত্রুর গুলি অবিরাম ঝরিতে লাগিল। শত্রুর মুখোমুখি দাঁড়াইয়া আমাদের দ্বিতীয় দল রুশেদের 'মেশিন্-গানের' মুখে দেখিতে দেখিতে শেষ হইয়া গেল। একটা গুলি কাপ্তেন মাৎসুমারুর অসিফলক ভেদ করিয়া তার বাঁ গাল ছুঁইয়া ছুটিয়া গেল। আমাদের কামানের গোলা শূন্যে রোসনাই সৃষ্টি করিল বটে, কিন্তু শত্রুর কেল্লার প্রায় কোনো ক্ষতিই করিতে পারিল না। 'শ্রাপ্‌নেলের' (গুলিভরা চোঙের মত ধাতুময় আধার) কর্ম্ম নয়, শত্রুর খাতের (trench) ছাউনি চূর্ণ করার জন্য গোলাকার 'শেল্' ফাটানো দরকার। গোলন্দাজের কাছে দূতের পর দূত যাইতে লাগিল আদেশ লইয়া—আমাদের পদাতিক-দের প্রাণ বিপন্ন হয় হোক, তবুও গোলাকার 'শেল' যত ঘন ঘন সম্ভব ছাড়িতে থাক! কিন্তু দূতেরা যথাস্থানে আদেশ বিলি করার আগেই প্রত্যেকে মারা পড়িল—একজনও প্রাণ লইয়া ফিরিল না।

সাতটা বাজিল, আটটা বাজিল, শেষে ন'টা বাজিল, তবুও আমাদের অবস্থার কোনো উন্নতি নাই। প্রথম ব্যাট্যালিয়ন কিছুক্ষণের জন্য দাঁড়াইতে বাধ্য হইল। দ্বিতীয় ব্যাট্যালিয়নের নায়ক মেজর তামাই সাংঘাতিক-ভাবে আহত; তাঁর সহকারী লেফটেন্যাণ্ট ক্যান্ আক্রমণের পথের খোঁজ করিতেছিল, এমন সময় তার মাথার মধ্যে গুলি লাগিল—ফিরিয়া সংবাদবাহককে ডাকার সঙ্গে সঙ্গেই মৃত্যু। তৃতীয় ব্যাট্যালিয়ন শত্রুর কাছে পৌছিল বটে, কিন্তু ঐ পর্য্যন্ত, আর কিছু করিতে পারিল না। প্রতিমুহূর্ত্তে সে-দলের হতাহতের সংখ্যা বাড়িয়া চলিল। আমাদের অবস্থা ক্ষুদে মাছের মত—অতিকায় তিমি যাহাকে অচিরে গিলিয়া ফেলিবে। কিন্তু আমাদের সৈন্যশ্রেণীর প্রতিজ্ঞা যেমন দুর্জ্জয় সাহসও তেমনি অদম্য—শত্রুকে আয়ত্ত করা যতই কঠিন হইতে লাগিল ততই তাদের রোখ বাড়িয়া চলিল, ততই নূতন নূতন উপায় তারা আবিষ্কার করিতে লাগিল। সকল ব্যাটালিয়ন, বিশেষ করিয়া প্রথমটি, কুড়ুল দিয়া পাথর ভাঙিয়া, সেগুলি উপর উপর থাক দিয়া পা রাখিবার ব্যবস্থা করিতে লাগিল। কিন্তু কাজ সোজা নয়, শত্রুর এত কাছে যে দুই পক্ষই যেন দুই বাঘ, দাঁত বার করিয়া পরস্পরকে ছিঁড়িয়া ফেলার ভয় দেখাইতেছে। রুশেরা আমাদের কাজে বাধা দিবার খুব চেষ্টা করিতে লাগিল—কুড়ুলের একটু আওয়াজ হয় আর আগুনের জিভ বার হইয়া আমাদের আশপাশের জায়গাটা বুভুক্ষুর মত চাটিয়া লয়। তবুও তারই মধ্যে একরকম দাঁড়াইবার ঠাঁই তৈরি হইয়া গেল, আমরা এবার একযোগে আক্রমণের জন্য প্রস্তুত।

রাত বাড়িয়া চলিয়াছে, যুদ্ধক্ষেত্রের উপর অস্তগামী চাঁদের বিষণ্ণ ম্লান আলো। আমাদের শিবিরের আধখানা সেই আলোয় একখানি black and white ছবির একাংশের মত দেখাইতেছে। দ্বিতীয় ব্যাট্যালিয়নের নায়ক মেজর উচিনো আমাদের কর্নেলের কাছে এই লিপি পাঠাইলেন—

"আমাদের ব্যাট্যালিয়ন আক্রমণ করতে চলেছে—আশা করছি আমরা নিঃশেষে ধ্বংস হব। আপনারাও আক্রমণ করুন। আমার বিশ্বাস আমাদের প্রিয় ও পরম শ্রদ্ধেয় কর্নেল এ আক্রমণের বিজয়ী নায়ক হতে

পারবেন এবং সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে আমাদের যুদ্ধপতাকা শত্রুর দুর্গপ্রাচীরে স্থাপিত হবে। আমার বিদায়-নমস্কার গ্রহণ করুন !"

তারপর বামদিকে বহুদূরে শুনিতে পাইলাম তুরীতে 'কিমিগায়ো'র গম্ভীর স্বর বাজিয়া উঠিল। আমাদের উপত্যকার আকাশে চাঁদ ভাসিতেছে, জাতীয় সঙ্গীতের বিলম্বিত ক্ষীণ প্রতিধ্বনি যেন অন্তরে গিয়া প্রবেশ করিল। স্বরটি শুনিয়া মনে হইল যেন স্বয়ং সম্রাট অগ্রসর হওয়ার আদেশ দিতেছেন! নায়ক ও সৈনিকেরা সিধা হইয়া দাঁড়াইল, তারপর অসীম সাহসে হুঙ্কার দিয়া হাতে পায়ে পাথর ও নুড়ির উপর দিয়া গিয়া শত্রুর বক্ষঃপ্রমাণ প্রাকারের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল। একেবারে সামনের দলে মেজর মাৎসুমুরা দীপ্তচোখে বজ্রকণ্ঠে হুকুম করছেন--ছুটে চল, সামনে! আবার তুরীতে 'কিমিগায়ো' বাজিয়া উঠিল, দলের পর দল 'বান্জাই' হাঁকিতে লাগিল, ভৈরব নাদে পাহাড় কম্পমান। পাহাড়ের মাথায় কিরীচে কিরীচে সংঘর্ষ আগুনের ফুলকি ছড়াইতেছে। দলের পর দল ছুটিয়া আসিতেছে অতিকায় ঢেউয়ের মত। রুশেরা টলিতেছে —মুখোমুখি হাতাহাতি লড়াই আর কতক্ষণ চলে ?

অবশেষে, বেলা আটটায়, পূবের আকাশ যখন লালে লাল, তখন তাইপোশান্ আমাদের সম্পূর্ণ দখলে আসিয়া গেল।

আমাদের নূতন শিবিরের অনেক উঁচুতে জাপানী পতাকা উড়িতেছে। দিকে দিকে 'বান্জাই' ধ্বনি শুনিতে পাইতেছি।

১৬

যুদ্ধশেষে

তাইপোশান্ সম্পূর্ণ দখল হওয়ার আগে আমরা একটানা আটান্ন ঘণ্টা লড়াই করিয়াছিলাম। সে সময়ের মধ্যে অবশ্য পানাহার ও নিদ্রা হয় নাই। শত্রু সহজে পরাজয় স্বীকার করে নাই, অসীম বিক্রমে লড়িয়াছিল। আমাদের এই জয়ে যুদ্ধের পরবর্ত্তী ধারা নিয়ন্ত্রণে যথেষ্ট সাহায্য হইল।

নান্শানের যুদ্ধে আমাদের পক্ষে হতাহতের সংখ্যা হয় চার হাজার। এ পর্য্যন্ত উহাই সর্ব্বাপেক্ষা মারাত্মক যুদ্ধ বলিয়া গণ্য হইতেছিল, কিন্তু তাইপোশানের তুলনায় নান্শান্ সস্তাদরে পাওয়া গিয়াছিল, সন্দেহ নাই। নান্শানে শত্রুর সমুখে ছিল বিস্তীর্ণ ঢালু জমি; আমাদের সৈন্যদল সেখানে থাকায় নিরাপদ স্থান থেকে শত্রু তাদের উড়াইয়া দিয়াছিল। তাইপোশানের আশপাশের প্রকৃতি সম্পূর্ণ আলাদা—কেবল খাড়া পাহাড় আর গভীর উপত্যকা। সেখানে সহজেই আত্মরক্ষা করা বা লুকাইয়া থাকা সম্ভব। তবুও সেখানে আমাদের পক্ষে হতাহতের সংখ্যা নান্শানের সমান হইয়াছিল। তাইপোশান যুদ্ধের ভীষণতা ইহা হইতে অনুমান করা যায়।

একটুখানি জায়গার জন্য তিন দিন ধরিয়া লড়াই চলে। পিছন থেকে কোনো খাদ্যই আনানো যায় নাই—কেবল শুকনো বিস্কুট চিবাইয়াছি। এক ফোঁটা জল পাই নাই, এক মুহূর্ত্ত ঘুমাই নাই। উদ্বেগ ও উত্তেজনার আতিশয্যে আহার নিদ্রার কথা মনেই ছিল না। এক খাওয়ার কষ্ট ছাড়া রুশেদের অবস্থাও তেমনি। তাদের পরিত্যক্ত কালো রুটি আর জমাট চিনি পাইয়া আমাদের লোকেরা আহ্লাদে আটখানা।

যুদ্ধশেষে আমাদের প্রথম অনুভূতি—নিদ্রাবেশ। তখন মনে হয় আর কিছুরই দরকার নাই, কেবল ঘুমাইতে চাই। মৃত সঙ্গীদের কথা বলিতে বলিতে, যুদ্ধের অভিজ্ঞতা আলোচনা করিতে করিতে জনে জনে ঢুলিতে সুরু করিল, তারপর শত্রুর খাতের ছাউনির তলায় শুইয়া নিরীহ শিশুর মত ঘুমাইয়া পড়িল। রক্তে মাখামাখি হইয়া নিহত রুশ সৈনিকেরা চারিদিকে পড়িয়া আছে, তাহাতে তাদের গভীর ঘুমের ব্যাঘাত নাই। পানাহারের চিন্তাও লোপ পাইয়াছে—তাদের নাক ডাকিতেছে সুদূর বজ্রধ্বনির মত। মাঝে মাঝে শত্রুর গুলি ছুটিতেছে—মশা ভন ভন করিলে যেটুকু ঘুমের অসুবিধা, তাহাতে সেটুকুও হইতেছে না।

যুদ্ধের মহিমা প্রকাশ পায় কেবল গোলাগুলি বর্ষণের মাঝে, কিন্তু তার বীভৎসতা সব চেয়ে ভাল দেখা

যায় যুদ্ধ থামিবার পর। মৃত্যুর পক্ষপাত নাই—শত্রু-মিত্র নির্ব্বিচারে তার ছায়া বিস্তারিত। ভয়ঙ্কর হত্যাকাণ্ডের শেষে রক্তমাখা অগণ্য মৃতদেহ ঘাসের উপর আর পাথরের মাঝে দীর্ঘকাল পড়িয়া থাকে। নান্‌শানে নিহত সৈন্য দেখিয়া আতঙ্কে ও বিতৃষ্ণায় চোখ না ঢাকিয়া পারি নাই। এখানকার দৃশ্যও তেমনি বীভৎস, তবুও সেবারের মত আঁতকাইয়া উঠিলাম না। কোনো কোনো সৈনিকের মুখ ও মাথা চূর্ণ হইয়া গেছে, মস্তিষ্কের সঙ্গে ধূলামাটির মাখামাখি। কাহারও বা নাড়ি ভুঁড়ি ছিঁড়িয়া বার হইয়াছে, তা থেকে রক্ত ঝরিতেছে।

নান্‌শানে শত্রুর মৃতদেহ দেখিয়া তাদের জন্য মায়া হইয়াছিল, তাদের প্রতি সহানুভূতি জাগিয়াছিল, কিন্তু এখানে তাদের ঘৃণা করিতে লাগিলাম। কেন, তাদের কি দোষ? তারাও কি যোদ্ধা নয়, তারাও কি কর্ত্তব্য করিতে গিয়া মরে নাই? তাদের সঙ্গে কঠিন যুদ্ধের ফলে আমাদের এতগুলি সৈনিকের প্রাণ নষ্ট হওয়ায় আমাদের মনে শত্রুর প্রতি এই ঘৃণার সঞ্চার। কেন তারা প্রাণপণে বাধা দিল, কেন সহজে হার মানিল না? কেন তারা খাতের মধ্যে নিরাপদে দাঁড়াইয়া গর্ত্তের ভিতর দিয়া বন্দুকের নল বাহির করিয়া আমাদের সৈনিকদিগকে হত্যা করিল? যুদ্ধের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা যাহাদের আছে, তাহারা সাহসী ও দুর্জ্জয় শত্রুর মৃতদেহ দর্শনে এই ঘৃণা ও ক্রোধের উৎপত্তি অক্লেশে বুঝিতে পারিবে, যদিও এ মনোভাবের মূলে কোনো যুক্তি নাই।

একটি খাতের মধ্যে দেখা গেল এক রুশ সৈনিক মরিয়া পড়িয়া আছে। তার মাথায় ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। সম্ভবত প্রথম আঘাতের পরও সে সাহসের সঙ্গে লড়িয়াছিল, শেষে আমাদের দ্বিতীয় গুলি তার প্রাণ সংহার করিয়াছে। যে সব সাহসী রুশ যোদ্ধা খাতের ভিতর থেকে ছুটিয়া বার হইয়াছিল, নিশ্চয় তাদেরই মৃতদেহ ওই বক্ষঃপ্রমাণ প্রাকারের পাশে ছড়াইয়া পড়িয়া আছে। আমরা হুড়মুড় করিয়া গিয়া পড়াতে ইহারাই খাতের বাহিরে আসিয়া আমাদের সঙ্গে কিরীচ ও ঘুসি দিয়া লড়িয়াছিল। ইহাদের কারও কারও বুকের মধ্যে স্ত্রী পুত্রের রক্তমাখা ছবি পাওয়া যায়।

যুদ্ধ শেষ হইবার পরই আমার ভৃত্য রুশেদের একটি ঝুলি (haversack) লইয়া উপস্থিত। তার ভিতর থেকে রকমারি জিনিষ বার হইল—মায় এক স্যুট চীনা পোষাক! সেটি যেমন আমাদের বিস্ময় উদ্রেক করিল তেমনি তার সাহায্যে একটা হদিসও মিলিল। রুশের সন্ধানী দূতেরা চীনা সাজিয়া আমাদের খোঁজখবর করিতে আসিত!

এই যুদ্ধে আমরা কতকগুলি অকেজো 'মেশিন্-গান্' দখল করি। এই যন্ত্রকে আমরা সব চেয়ে বেশি ভয় করিতাম। মস্ত একখানা লোহার পাত ঢালের কাজ করে, তার মাঝ দিয়া লক্ষ্য স্থির করা হয়। উঁচু দিকে, নীচু দিকে, ডাইনে বাঁয়ে অস্ত্র চলাফেরা করিবার সময়ও ঘোড়া টানা চলে। মিনিটে ছ'শ'র বেশি 'বুলেট' স্বতশ্চালিতভাবে নিঃসারিত হয়, যেন একটা দীর্ঘ অখণ্ড 'বুলেটের' শিক কামানের মুখ নিক্ষেপ করিতে থাকে। 'হোস্' বা ক্যাম্বিসের নল দিয়া যেমন করিয়া রাস্তায় জল ছিটানো হয়, ইহা দ্বারা তেমনি করিয়া 'বুলেট' ছিটানো চলিতে পারে। চালকের ইচ্ছামত ইহা অল্প বা বেশি জায়গা ব্যাপিয়া নিকটে বা দূরে গুলি চালাইতে সক্ষম। কেহ এই ভীষণ মারণাস্ত্রের লক্ষ্যস্থল হইলে বিদ্যুদ্বেগে তিন চারিটি গুলি তার দেহের একই জায়গা ভেদ করিয়া মস্ত আঘাতের সৃষ্টি করিতে পারে। বন্দুকে যেমন 'বুলেট' ব্যবহৃত হয় এ গুলিও তত বড়। একটি লম্বা ক্যাম্বিসের 'বেল্টে' এমনি অনেক গুলি পরানো থাকে, সেই 'বেল্ট' 'মেশন্ গানের' কামরায় (chamber) ভরা হয়—বায়স্কোপের ফিল্মের মত ঐ 'বেল্ট' চালিত হয়। কাছ থেকে শব্দটা হয় অতি দ্রুত ট্যাপ, ট্যাপ, ট্যাপ, কিন্তু দূর থেকে শুনলে মনে হয় যেন স্তব্ধ নিঝুম নিশীথ রাতে কলের তাঁত চলিতেছে। শব্দটা ভয়ানক—শুনলে গায়ে কাঁটা দেয়।

রুশেরা এই যন্ত্র চালনায় বিশেষ পটু। যতক্ষণ না আমাদের সৈনিকেরা খুব কাছে আসে ততক্ষণ তারা চুপ করিয়া থাকে, তারপর যেই আমরা সোল্লাসে

'বান্‌জাই' হাঁকিতে উদ্যত হই, অমনি এই মারাত্মক অস্ত্রের সংহারের ঝাঁটা দিয়া আমাদিগকে ঝাঁটাইতে সুরু করে; তার ফলে দেখিতে দেখিতে মড়ার ঢিপি ও পাহাড় রচনা হইয়া যায়। তাইপোশানের যুদ্ধের পর শত্রুর এলাকায় আমাদের এক সৈনিকের দেহ পাওয়া যায়, তার নাম হোদো, সে দ্বিতীয় দলের একজন "ক্ষীণ-আশা" সম্প্রদায়ের চর। তার দেহে সাতচল্লিশটা গুলি, কেবল ডান হাতেই পঁচিশটা! অপর এক রেজিমেণ্টের সৈনিকের গায়ে সত্তরটার বেশি গুলি লাগিয়াছিল!

এখানে শত্রুর চার পাঁচটি যুদ্ধের কুকুর নিহত দেখিতে পাই। বলিষ্ঠ, গায়ে ছোট ছোট বাদামী রেঁায়া, মুখের চেহারা চালাক চতুর। আমাদের গুলিতে তারা মরিয়াছে—ইতর প্রাণী হইলেও যুদ্ধক্ষেত্রে মৃত্যুর সম্মানের ভাগ লইয়াছে।

যুদ্ধে ব্যবহার করিবার জন্যই রুশেরা এই কুকুরগুলিকে তালিম দেয়, নানা কাজে এদের নিযুক্ত করে। শুনিতে পাই কখনও কখনও ইহারা চরের কাজও করিয়া থাকে।

এই যুদ্ধের পর আমাদের দলের লোক একখানি পত্র কুড়াইয়া পায়। সেখানি রুশ-নায়ক জেনারেল ফকের লেখা। তাহাতে লেখা ছিল—

"জাপানী সৈন্যদল 'মার্চ' করিতে জানে কিন্তু পিছু হটিতে জানে না। কোনো জায়গা একবার আক্রমণ সুরু করিলে তারপর একরোখা ভাবে লড়িতে থাকে। এটা নয় অনুমোদন করিলাম, কিন্তু যখন অবস্থাগতিকে অগ্রসর হওয়া অসম্ভব হয়, তখন কখনও কখনও পিছু হটিলেও লাভ হইতে পারে। কিন্তু বিপদ যতই থাক জাপানীরা আক্রমণ চালাইবেই, কিছুতেই ক্ষান্ত হইবে না। হয়ত জাপানী লড়াইয়ের কায়দা যাঁরা রচনা করিয়াছেন তাঁরা পিছু হটার' কায়দা সম্বন্ধে চিন্তাই করেন নাই!"

১৭

প্রাথমিক শুশ্রূষা-শিবির

যুদ্ধের উত্তেজনায় আর কিছু ভাবিবার সময় পাই নাই, এখন বন্ধু ডাক্তার য্যাসুইয়ের কথা মনে পড়িল। তিনি নিরাপদে আছেন ত? সেদিন সন্ধ্যার আকাশে ঘনঘটা, আমি তাইপোশানের তলায় ছোট একটি স্রোতস্বতীর ধারে ধারে 'উইলো' গাছের তলায় একলা বেড়াইতেছি। ভাবিতেছিলাম, আহতের শুশ্রূষায় ডাক্তার নিশ্চয়ই খুব ব্যস্ত। এমন সময় হঠাৎ সেনানায়কের জুতার শব্দ কানে পৌঁছিল, ফিরিয়া দেখি, তিনি পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন।

"ডাক্তার য্যাসুই!"

"লেফটেন্যাণ্ট সাকুরাই!"

"বেশ ভালো আছেন?"

পরস্পরে সানন্দে করমর্দ্দন করিলাম। উভয়ের কুশলতার উল্লেখের পর সম্প্রতিকার যুদ্ধের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম। কাপ্তেন মাৎসুমারু আহত হইয়াছিলেন, তিনিও আসিলেন। তাঁর কাঁধে সেই গুলির ঘায়ে-বাঁকা, ফলকে-গোল-জানালা-ফুটানো তলোয়ার। তিনিও সাগ্রহে আমাদের কথাবার্ত্তায় যোগ দিলেন। ডাক্তার য্যাসুই প্রাথমিক শুশ্রূষা-শিবিরের (first aid station) নিখুঁত বর্ণনা করিতে লাগিলেন—

যুদ্ধের সময় প্রায়ই শত্রুর গোলা চীনাদের বাড়ির কাছে পড়িত। আমাদের সাময়িক শুশ্রূষা-শিবিরের সঙ্গীন অবস্থা। একবার একটা মস্ত 'শেল্' ছাত ফুঁড়িয়া উঠানে ফাটিয়া যাওয়ার ফলে অনেক আহত সৈনিক টুকরা টুকরা হইয়া গেল। বাড়ির দেওয়ালে ও থামে তাদের রক্ত মাংসের ছাপ পড়িল। আর একবার বাহকেরা বহুকষ্টে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে একটি আহত সৈনিককে আনিয়া সবে উঠানে নামাইয়াছে, এমন সময় শত্রুর একটা গুলি ছিটকাইয়া আসিয়া বেচারাকে শেষ করিয়া দিল। শুশ্রূষা-শিবিরের সে-সব হৃদয়-বিদারক দৃশ্য বর্ণনা করা যায় না। নরকের বিভীষিকার সঙ্গে তার তুলনা করিতে ইচ্ছা করে।

একজন আহত লোককে আনিলেই, তা সে কর্ম্মচারীই হোক আর সাধারণ সেনাই হোক, ডাক্তার ও হাসপাতালের লোকেরা তার প্রাথমিক শুশ্রূষার ব্যবস্থা করে। যুদ্ধক্ষেত্রে গোলাগুলির প্রকোপ বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আহতের সংখ্যাও দ্রুত থেকে দ্রুততর

বাড়িতে থাকে, তখন ডাক্তার ও তার সহকারীদের ক্ষমতায় কুলায় না। একজনের ব্যবস্থা করিতে করিতে হয়ত দেখিতে পায় অপর একজন হাপাইতে সুরু করিয়াছে, গায়ের রং ও ফ্যাকাশে হইয়া উঠিতেছে। এই দ্বিতীয় ব্যক্তির মুখে যখন কয়েক ফোঁটা ব্রাণ্ডি দিতেছে তখন হয় ত তৃতীয় ব্যক্তি বিনা চিকিৎসায় মারা যাইবার উপক্রম। একজনের ক্ষতে যথারীতি ঔষধ দিয়া ব্যাণ্ডেজ করার আগেই দশ পনেরো জন নূতন আহত আসিয়া হাজির।

ডাক্তারদের চারিদিকে মারাত্মক-রকম আহত সৈনিক। তারা শার্টের আস্তীন গুটাইয়া সারা পোষাকে রক্ত মাখিয়া প্রাণপণে খাটিতেছে। কারও ব্যাণ্ডেজ বাঁধা হইতেছে, যাদের হাড় ভাঙিয়াছে তাদের splint বাঁধার ব্যবস্থা। অবশ্য তাড়াহুড়ার ব্যাপার--সাময়িক সাহায্য মাত্র; তবুও ডাক্তারদের নিশ্বাস ফেলার সময় নাই। করিবার এত আছে অথচ কতটুকুই বা করা সম্ভব ভাবিতে ভাবিতে আর চারিদিকের সেই যন্ত্রণার দৃশ্য দেখিতে দেখিতে মাথা খারাপ হইবার যোগাড় হয়।

কিন্তু এই বাড়িতে বা ওই উঠানে যারা শায়িত তারা সকলেই সাহসী সৈনিক। শুশ্রূষার বিলম্ব হইলে বা তা যথেষ্ট না হইলেও তাদের নালিশ নাই। বিশেষ কোনো অভিলাষ বা অসন্তোষ তারা প্রকাশ করে না। যুদ্ধের উন্মায় ও উত্তেজনায় এখনও তারা আচ্ছন্ন, তাই সৈনিকের হুঙ্কার বা কামানের আওয়াজ শুনিতে পাইলেই তারা ছুটিয়া যুদ্ধে যাইতে চায়। তাদের শান্ত করিয়া স্থির করিয়া রাখিতে ডাক্তারদের রীতিমত বেগ পাইতে হয়। মাথায় চোট লাগার ফলে যারা পাগল হইয়াছে, তারা মৃদু কণ্ঠে 'তেন্নো হেইকা বান্‌জাই' (সম্রাট দীর্ঘজীবন লাভ করুন) বা 'রুশকি' (রুশ) বলিয়া টলিয়া টলিয়া বেড়ায়, ডাক্তার চাপিয়া ধরিয়া থাকিলে তারা রাগে জলিয়া ওঠে, বলে—তুই 'রুশকি'! এমনি ধ্বস্তাধ্বস্তির ফলে অতিমাত্রায় রক্তস্রাব হইয়া শীঘ্রই তারা মারা পড়ে।

সাতাশ তারিখে আহতের সংখ্যা খুব বেশি ছিল। শুশ্রূষা-শিবিরের সম্মুখের গোলাবাড়ির উঠান একেবারে ভর্ত্তি হইয়া গেল। ডাক্তার যখন একজনকে দেখিতেছে তখন পিছন থেকে তার ইজেরে টান পড়িল। ফিরিয়া দেখে এক ব্যক্তি তার পায়ে ঠেস দিয়া নিরীহ শিশুর মত চিরনিদ্রায় ঢলিয়া পড়িতেছে। আমার প্রাণ রক্ষা হবার নয়, আমাকে এখনি মেরে ফেলুন—ডাক্তারকে দুই হাতে চাপিয়া একজন যন্ত্রণায় চেঁচাইতেছে। একজন সার্জেণ্ট হাতের উপর ভর দিয়া পা দুখানা টানিতে টানিতে ডাক্তারের কাছে আসিয়া উপস্থিত। সজলচোখে সে মিনতি করিতেছে—দেখুন, ওই যে লোকটি, ও আমারই দলের; ও যে-ভাবে হাপাচ্ছে হয় ত কোনো ফল হবে না, তবুও দয়া করে আর একবার ওকে দেখবেন কি? সেই সার্জেণ্ট নিজেই খুব আহত, তবুও তাঁবেদারের কষ্ট সহিতে পারিতেছে না!

সেদিন সকাল বেলায় শুশ্রূষা-শিবিরে বিবর্ণ পাংশুমুখে এক সৈনিক আসিয়া উপস্থিত। ডাক্তার তাহাকে দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি হয়েছে তোমার? আহত?" কোনো জবাব নাই, বৃথাই তার ঠোঁট নড়িতে লাগিল। আবার ডাক্তার প্রশ্ন করিল, "ব্যাপার কি? না বল্‌লে আমি বুঝব কি করে'?" তবুও সে নিরুত্তর। ডাক্তারের ভারি অদ্ভুত ঠেকিল। লোকটির মুখের পানে লক্ষ্য করিতে সে তার উপর একটু রক্ত দেখিতে পাইল। ভাল করিয়া পরীক্ষার পর দেখা গেল ডান দিক থেকে বাঁ দিকের রগ এফোঁড় ওফোঁড় করিয়া গুলি চলিয়া গেছে। তার ফলে তার দর্শন ও শ্রবণ শক্তি দু-ই লোপ পাইয়াছে। বুঝিতে পারিয়া ডাক্তার তখনি শুশ্রূষা সুরু করিয়া দিল। বেচারার হাতখানা সযত্নে তুলিয়া লইতেই সে দাঁত কিড়মিড় করিয়া বলিল—প্রতিহিংসা! দেখিতে দেখিতে তার দেহ কঠিন হইয়া গেল, তার যন্ত্রণারও অবসান হইল—লড়াইয়ের সাধ আর মিটিল না।

একদিন এক আহত সৈনিক দুই হাত দুলাইতে দুলাইতে ছুটিয়া আসিল, যেন বিশেষ তাড়া।

"জোর লড়াই চলেছে! ভারি মজা! জায়গাটা দখল হ'ল বলে!"

ডাক্তার জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কি আহত ?

"কোমরের কাছে একটু—"

ডাক্তার যুদ্ধের ফল জানিতে উৎসুক। বলিলেন, "তুমি অনেক শত্রু মেরেছ নিশ্চয় ? জখম হ'ল কাদের দিকে বেশি ?"

লোকটি চাপা গলায় বলিল, "এবারও জাপানের দিকেই বেশি।"

তারপর ডাক্তার তার কোমরের কাছে 'সামান্য আঘাত' পরীক্ষা করিতে গিয়া চমকিয়া উঠিল। ডান দিকের উরুদেশের মাংস গোলার ঘায়ে বেমালুম অদৃশ্য হইয়াছে। যুদ্ধে বীরত্ব দেখাইয়াছে, কর্ত্তব্যে ত্রুটি হয় নাই—ইহারই গৌরবে সে অস্থির। জানেই না যে ফোঁটা ফোঁটা করিয়া তার প্রাণের স্রোতেই ভাঁটা পড়িয়া আসিতেছে। মহা উৎসাহে আনন্দে সে যুদ্ধের গল্প করিয়া চলিল।

"বেশ। এবার যেতে পার। ব্যাণ্ডেজ করা হয়ে গেছে !"

ডাক্তারের কথায় লোকটি দাঁড়াইয়া উঠিল, কিন্তু এক পা-ও চলিতে পারিল না। লড়াইয়ের উত্তেজনায় এমন অবস্থায়ও লোকে হাঁটিতে বা দৌড়িতে পারে, কিন্তু তার পর স্নায়ুগুলা একবার ঢিলা হইয়া গেলে হঠাৎ যন্ত্রণায় একেবারে কাবু হইয়া পড়ে।

যুদ্ধ যখন চলিতে থাকে তখন ইতস্তত 'রেডক্রশ' নিশান যুদ্ধক্ষেত্রের আহতদিগকে আহ্বান করে। যে সব বীর যুদ্ধে মরিয়াছে, তারা এই সেবাসঙ্ঘের কোনো সাহায্য পায় না, সমস্ত সুবিধাই ভোগ করে আহতেরা, তাই কখনও কখনও তাদের মনে হয়, নিহতের কাছ থেকে যেন কিছু চুরি করিতেছে ! যুদ্ধ সুরু হইবার সঙ্গে সঙ্গেই ডুলি বাহকেরা ডুলি কাঁধে লইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে বাহির হইয়া পড়ে, ঘুরিয়া ঘুরিয়া আহতকে তুলিয়া তারা প্রাথমিক শুশ্রূষা-শিবিরে লইয়া যায়। এই সব বাহকদেরও আসল যোদ্ধার মত নির্ভীক হওয়া চাই। গোলাগুলি তলোয়ার উপেক্ষা করিয়া আহতকে খুঁজিয়া বার করিয়া তাহাকে নিরাপদ স্থানে লইয়া যাইতে হয়। এই বিপদ-সঙ্কুল সেবার ভার তাদেরই উপর ন্যস্ত আছে। শুধু তাই নয়, আপনাপন পরিমিত খাদ্যেরও মহামূল্য জলের ভাগও আহতকে দিতে হয়, যথাসাধ্য সাবধানে তাদের বহন করিতে হয় এবং স্নেহে তাদের সান্ত্বনা দিতে হয়।

দেশের হাসপাতালে যে সব পীড়িত ও আহত সেনাকে ফেরত পাঠানো হয়, তাদের পোষাক সাদা, তারা ডাক্তার ও সেবিকাদের সস্নেহ সেবা শুশ্রূষা পাইয়া থাকে। কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রের হাসপাতালে ব্যাপার অন্যরকম। সেখানে গ্রীষ্মকালে হতভাগ্য আহত সেনাকে ঝাঁক ঝাঁক মাছি আসিয়া আক্রমণ করে, তাদের নাকে মুখে পোকা পড়ে, কারও কারও হাত অকেজো হইয়া পড়ায় সেগুলোকে তাড়াইতেও পারে না। ইচ্ছা থাকিলেও হাসপাতালের আরদালি আর কতটুকু সাহায্য করিতে পারে ?—একশো আহতের পিছনে একজনমাত্র আরদালি। দিনের বেলা প্রখর রৌদ্রে, রাত্রে বৃষ্টিতে বা হিমে তারা খোলা পড়িয়া থাকে। কখনও কখনও দীর্ঘকাল এমনিভাবে পড়িয়া থাকিয়া তাদের অবস্থা অকথ্য নোংরা হইয়া ওঠে, তখন ক্ষতের পরিচর্য্যা করিবার আগে ঝরণার জলে ডুবাইয়া বুরুশ দিয়া ঘসিয়া ঘসিয়া তাদের দেহ সাফ করিতে হয়।

১৮

অবিরাম চলা

প্রকৃতি তাইপোশানের কেল্লাগুলোকে প্রায় অজেয় করিয়া রাখিয়াছিল, তা-ও যখন জাপানীর দখলে আসিল তখনো রুশেরা দমিয়া গেল না। কারণ তাইপোশানকে ঘিরিয়া তাদের আসল আত্মরক্ষার আয়োজন এখনও অব্যাহত আছে। দুই তিনটা পরাজয়ে এমন কি আসে যায় ? এবার তারা কান্তাশান্ পাহাড়ে হটিয়া গিয়া সেখানে আক্রমণ প্রতিরোধের নূতন ব্যবস্থায় মন দিল—সেখানে তৃতীয়বার দাঁড়াইবার চেষ্টা হইবে। আমাদের একদিনের বিলম্বে উহাদের একদিনের সুবিধা। তাই দীর্ঘকাল যুদ্ধের পর শ্রান্ত দেহের বিশ্রামের অবসর হইল না ; আমরা শত্রুর পিছু পিছু অবিরাম ধাওয়া করিয়া চলিলাম বন্যাস্রোতের মত। উদ্দেশ্য, তাদের আত্মরক্ষার আয়োজন সম্পূর্ণ হওয়ার আগেই তাহাদিগকে তাড়াইয়া প্রধান কেল্লায় ঠেলিয়া তোলা।

প্রথমেই গুলিবারুদের অভাব পূরণ করা হইল, তার পর দলের পুনর্গঠন এবং শত্রুর অশ্বারোহী দলের সন্ধান। স্থির হইল পরদিন আমাদের সমগ্র সেনাবাহিনী একযোগে যাত্রা সুরু করিবে। ২৭ তারিখে হুচিয়াতুনের কাছে উপত্যকায় আমাদের রেজিমেণ্ট একটা অস্থায়ী আড্ডা গাড়িল। রাত তিনটায় ব্রিগেড্-সদর থেকে কর্নেলের কাছে আদেশ আসিল—এখনি লোক পাঠাইয়া কর্ত্তব্য বুঝিয়া লও।

আমাকে সেই কাজে পাঠানো হইল। একজন আরদালি সঙ্গে নিয়া নদীর ধার দিয়া দেড় 'রি' * ছুটিয়া চারটের কিছু আগে সদরে পৌঁছিলাম। কাজ শেষ হইলে মনে হইল, যদি আরও তাড়াতাড়ি ছুটিয়া শিবিরে ফিরিতে না পারি, তবে আমাদের রেজিমেণ্ট যথাসময়ে যুদ্ধে যোগ দিতে পারিবে না। সুতরাং হালকা হওয়া দরকার। অগত্যা সমস্ত পোষাক খুলিয়া ফেলিয়া আরদালির হাতে দিলাম, তারপর একহাতে পিস্তল আর অন্য হাতে তলোয়ার ধরিয়া একেবারে দিগম্বরবেশে উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিলাম। তখনও অন্ধকার, ভুল পথে না যাই সে সম্বন্ধে খুব সতর্ক আছি। নদীর ধার দিয়া অবিরাম ছুটিতেছি, দম বন্ধ হইয়া আসিতেছে। হঠাৎ এক জায়গায় পে-মাষ্টার' মিশিমার গলার আওয়াজ পাইলাম—তিনি আহার্য্য পাঠাইবার ব্যবস্থা করিতেছিলেন। দৌড়িতে দৌড়িতেই চীৎকার করিয়া বলিলাম—খাবারের আর দরকার নেই, এখনি আমরা যাত্রা করব। আমার কথা শেষ হইলে পিছনে অনেক দূরে মিশিমার গলার আওয়াজ পাইলাম।

ভাগ্যক্রমে ভুল করিয়া পথ হারাই নাই, পাঁচটার দশমিনিট আগেই আমাদের অস্থায়ী আড্ডায় পৌঁছিলাম। সৈন্যদল তখনি জড় হইয়া শত্রুকে আক্রমণ করার আদেশ পাইল। যে আরদালির হাতে আমার পোষাক দিয়াছিলাম সে এখনো ফেরে নাই। অবশ্য গ্রীষ্মকালের প্রত্যূষে এমনি বিবস্ত্র অবস্থায় থাকায় দিব্য আরাম, কিন্তু এ ভাবে ত আর 'মার্চ' করা যায় না। প্রথম কর্ত্তব্য বিনা পোষাকে সুসম্পন্ন হইয়াছে, কিন্তু এখনকার কর্ত্তব্যে যে পোষাক দরকার। প্রথম আরদালির সন্ধানে দ্বিতীয় আরদালি ছুটিল, কিন্তু তবুও তার দেখা নাই। শেষে যাত্রাকাল উপস্থিত, আমার অবস্থা শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইল। হাল ছাড়িয়া দিয়াছি, এমন সময় ভাগ্যক্রমে শেষ মুহূর্ত্তে পোষাক আসিয়া পৌঁছিল উলঙ্গ অবস্থায় লড়াই করার গৌরব অর্জ্জন করা গেল না! এখন সেটা হাসির কথা, কিন্তু তখন রীতিমত ভাবাইয়া তুলিয়াছিল।

বোঝা গেল এবার লড়াই হইবে খোলা মাঠে। তার মানে প্রথম শ্রেণীতে চলিল skirmishers, তার পিছনে 'রিজার্ভ' দল—সমস্তই দস্তরমাফিক সাজানো, যেন শান্তির সময়ে সখের লড়াই হইবে। কেল্লা আক্রমণের সময় এভাবে সৈন্যচালনা প্রায় অসম্ভব—তখন রণভূমির অবস্থা অনুযায়ী 'রিজার্ভের' সংখ্যা ক্রমশ বাড়াইতে হয়। এ পর্য্যন্ত শিলাময় পার্ব্বত্য ভূমিই আক্রমণ করা হইয়াছে; তাই যতদূর সম্ভব শত্রুর কাছাকাছি হওয়ার চেষ্টা, যাহাতে সুযোগ পাইলেই একযোগে তাদের উপর ঝাঁপাইয়া পড়া যায়। এই ধরণের আক্রমণে ড্রিলের কেতাবে লেখা সেনা-সংস্থান সম্ভব নয়।

সে যাই হোক, এবার তাইপোশান পার হইলেই সেখান থেকে সমুচ্চ তাকুশান্ পর্য্যন্ত বিস্তৃত সমতল, তাই এবার প্রথম খোলা মাঠে লড়াইয়ের সম্ভাবনায় আমাদের বেজায় স্ফূর্ত্তি। শত্রু অপ্রস্তুত অবস্থায় ছিল, সুযোগ বুঝিয়া আমরা হঠাৎ আক্রমণ করিলাম। তারা কতকটা বাধা দিলেও পায়ে-পায়ে হটিতে বাধ্য হইল। আমাদের রেজিমেণ্টের কেবল দুটি দল হাতে রহিল, বাকি সকলেই যুদ্ধে নামিয়া গেল। ক্রমে তারা শত্রুকে ঘেরিয়া ফেলিল; দুই দিকেই আক্রমণ করার ফলে মাঝখানের দলের হার হইতেই তারা দুই ভাগে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল, তখন আর পিছু না হটিয়া উপায় রহিল না।

শেষ লক্ষ্যস্থলে তখনও পৌঁছি নাই, ভুট্টাক্ষেতের উপর দিয়া পতাকা হাতে ছুটিয়া চলিয়াছি, এমন সময় মেজর উচিনোর সঙ্গে দেখা। তাঁর তীক্ষ্ণ চোখ বাজ পাখীর চোখের মত জ্বলিতেছে, তলোয়ারে ভর দিয়া একখানা পাথরের উপর তিনি দাঁড়াইয়া। দেশে থাকিতে

* এক 'রি'—ইংরেজী ২॥ মাইল আন্দাজ

আমাদের রেজিমেণ্টের সদরে একত্রে ছিলাম, তাঁর চরিত্রের প্রভাব যাদের উপর খুব বেশি পড়িয়াছিল আমি ছিলাম তাদেরই একজন। লড়াইয়ের কায়দা সম্বন্ধে তাঁর সুস্পষ্ট ধারণা, অদম্য সাহস, সরল সংযত ব্যবহার আমার শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিত। ইনিই তাইপোশান্ আক্রমণের মাঝে কর্নেলকে সেই বিদায়-লিপি পাঠাইয়াছিলেন। ইনিই তাঁর বাছা বাছা দুই দল লোক লইয়া পাহাড়ের উত্তর-পূর্ব্ব কোণে ছুটিয়া উঠিয়া পশ্চাদ্বর্ত্তী দলের আক্রমণের পথ খোলসা করিয়াছিলেন। তারপর আর সেই নির্ভীক নায়কের সঙ্গে দেখা হয় নাই। ভুট্টাক্ষেতে তাঁহাকে দেখিয়া মনে হইল আবার যেন তাঁহাকে অসীম বিক্রমে লড়িতে দেখিতেছি। তাঁহাকে না ডাকিয়া পারিলাম না। ডাক শুনিয়া তিনি ফিরিয়া চাহিলেন, উৎসাহ দিয়া বলিলেন, পতাকার গৌরব আরও বাড়িয়ে তোলো!

সেদিন মধ্যাহ্নে ঈপ্সিত স্থান আমাদের সম্পূর্ণ দখলে আসিয়া গেল। এখন আমাদের সৈন্যশ্রেণীর বিস্তার হইল উত্তরে তুচেংতুন পাহাড় থেকে দক্ষিণে তাকুশানের পূর্ব্ব দিকের পাহাড় পর্য্যন্ত। সেই নবলব্ধ ভূমির উপর দাঁড়াইয়া দূরবীনের সাহায্যে এক অদ্ভুত দৃশ্য চোখে পড়িল।

এখান থেকে সর্ব্বপ্রথম পোর্ট-আর্থারের দুর্ভেদ্য দুর্গের আসল আক্রমণ-প্রতিরোধ ব্যবস্থা চোখে পড়িল। দক্ষিণে চিকুয়ান্‌শান্ থেকে সুরু করিয়া উত্তরে যতদূর দৃষ্টি চলে, চারিদিকে কেবল কেল্লা আর 'ট্রেঞ্চ'। তার মাঝ থেকে ভীষণ দর্শন কতকগুলো পদার্থ মাথা তুলিয়া আছে যেন বাঘ ও চিতার দল লাফ দিবার জন্য উদ্যত—সেগুলো অতিকায় কামান। এখানে ওখানে সর্ব্বত্র কুয়াশার মাঝ দিয়া অস্পষ্ট দেখা যাইতেছে আট দশ থাক করিয়া তার—সেগুলি তারের বেড়া। মাঝে মাঝে শত্রুর সন্ধানী চরের থানা। বিশ ত্রিশ জনের এক একটি দল তারের বেড়া বসাইতেছে! এই রঙ্গমঞ্চের উপরই যুদ্ধের ভাগ্য নির্ণয় হইবে—এখানেই জগতের দৃষ্টি পড়িয়া আছে। আমরা যাহারা এই রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করিত, আমরা ত ইহার কথা ঘুমের মাঝেও ভুলিয়া থাকিতে পারি না।

সেদিন থেকে আমরা লাংতুর কাছে থাকিয়া কান্তাশান্ গিরিশিরে সুদৃঢ় বাধা তুলিতে লাগিলাম। আমাদের উদ্দেশ্য, শত্রুর ডান দিকের মুখোমুখি তাকুশান্ ও সিয়াওকুশান্ পাহাড় হঠাৎ আক্রমণ করিয়া দখল করা; তারপর উক্ত পাহাড় দুটিকে আমাদের আক্রমণের বুনিয়াদ করিয়া শত্রুর আসল আত্মরক্ষার বেড়ার (main line of defence) উপর আক্রমণ সুরু করা।

—ক্রমশ



উদান*

শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য্য

আমাদের দেশে এখন একমাত্র চট্টগ্রামে বৌদ্ধধর্ম্মের কিছু প্রচার আছে। এখানকার বৌদ্ধগণের মধ্যে পালি ভাষায় লিখিত বৌদ্ধ সাহিত্যের আলোচনা ক্রমশ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে, ইহা আনন্দের বিষয়। বিশেষ আনন্দের বিষয় এই যে, এখানকার ভিক্ষুগণ নিজেদের ভাষায়, অর্থাৎ বাঙ্‌লায়, ক্রমে-ক্রমে কিছু-কিছু করিয়া পালি-সাহিত্যের প্রচারে মনোযোগী হইয়াছেন। উপযুক্তভাবে পরিচালিত হইলে তাঁহাদের এই চেষ্টায় যে প্রভূত কল্যাণ হইবে তাহাতে কোনো সন্দেহ নাই। ইঁহাদের চেষ্টায়, বিশেষত শ্রীপ্রজ্ঞালোক মহাস্থবির মহাশয়ের উদ্যোগে রেঙ্গুন নগরে 'বৌদ্ধ মিশন প্রেস' নামে একটি ছাপাখানা স্থাপিত হইয়াছে। ইহা হইতে 'বৌদ্ধ ত্রিপিটক গ্রন্থমালা' নামে একটি গ্রন্থাবলী প্রকাশ করিবার উদ্যোগ হইয়াছে। যদিও ইহার বিশেষ বিবরণ জানিবার সুবিধা আমাদের হয় নাই তথাপি আলোচ্য গ্রন্থখানি এই গ্রন্থমালার প্রথম গ্রন্থ বলিয়া বুঝা যায় যে, এই গ্রন্থমালায় পালি ত্রিপিটকের অন্তর্গত পুস্তকগুলিকে বঙ্গাক্ষরে মূল পালি ও তাহার বঙ্গানুবাদের সহিত প্রকাশ করা হইবে। বলা বাহুল্য, বৌদ্ধ মিশনের পরিচালকগণের এই সঙ্কল্প অতিসাধু। ইহার দ্বারা তাঁহারা এক দিকে বঙ্গের বৌদ্ধগণকে ও অপর দিকে তাহার জনসাধারণকে বৌদ্ধধর্ম্ম ও পালি-সাহিত্যের সহিত পরিচিত হইবার সুযোগ প্রদান করিবেন।

সূত্র, বিনয় ও অভিধর্ম্ম এই তিন পিটকের মধ্যে সূত্র পিটকে প্রধানত পাঁচখানি 'নিকায়' (=নিচয়, সমূহ) গ্রন্থ আছে, দীর্ঘ (দীঘ) নিকায়, মধ্যম (মজ্‌ঝিম) নিকায়, সংযুক্ত (সংযুত্ত) নিকায়, অঙ্গোত্তর (অঙ্গুত্তর) নিকায়, ও ক্ষুদ্রক (খুদ্দক) নিকায়। এই ক্ষুদ্রক নিকায়ের মধ্যে পনেরখানি পুস্তক আছে, যথা,—ধর্ম্ম (ধম্ম) পদ, সূত্র (সুত্ত) নিপাত, জাতক, ইত্যাদি। আমাদের আলোচ্য উ দা ন -নামক পুস্তকখানিও এই ক্ষুদ্রক নিকায়ের অন্তর্গত।

উ দা ন শব্দের অর্থ লিখিতে গিয়া গ্রন্থকার লিখিয়াছেন (পৃ. ২২৯) "প্রীতিবেগ হইতে উত্থিত গদ্য বা পদ্যময়ী (!) ভাববিকাশ।" একটু পরিষ্কার করিয়া দেখা যাউক। আমাদের শরীরের অন্তর্গত যে বায়ুর গতি ঊর্দ্ধদিকে তাহাকে উ দা ন বলা হয়। প্রশ্বাস বায়ু উদান। আমাদের আলোচ্য উ দা নে র ইহার সহিত কিছু সম্বন্ধ বা সাদৃশ্য আছে। অত্যন্ত প্রীতির (অথবা অন্য কোনো মানসিক বৃত্তির) বেগে যে বাক্য উচ্চারিত হয় ("পীতিবেগসমুট্‌ঠাপিতো উদাহারো"), তাহাকেই এখানে উ দা ন বলা হইতেছে। তেল, বা ঘি, অথবা ঐরূপ অন্য কোনো তরল দ্রব্যকে মাপিতে হইলে যে পাত্র দ্বারা মাপ করা যায় তাহাতে তাহা না কুলাইলে, অর্থাৎ বেশী হইলে ঐ বেশী অংশ ঐ মাপ-পাত্র হইতে গলিয়া পড়িয়া যায়। তেল প্রভৃতির এই অতিরিক্ত অংশকে অ ব শে ষ অর্থাৎ অবশিষ্ট অংশ বলা হয়। সময়বিশেষে কোনো তড়াগে জল ঢুকিতে থাকে, যতটা কুলায় তড়াগ ঐ জল ধারণ করে, কিন্তু তাহার বেশী হইলে জল বাহির হইয়া বহিয়া চলিয়া যায়, এই বহির্গত অতিরিক্ত জলকে বলা হয় প্র বা হ। এইরূপে প্রীতির (অর্থাৎ অন্য কোনো মানসিক বৃত্তির) বেগে হৃদয়ের মধ্যে যে বিতর্ক-বিচার উপস্থিত হয়, হৃদয় তাহা নিজের মধ্যে ধারণ করিয়া রাখিতে পারে না, তাহা বাক্‌পথের দ্বারা বহির্গত হইয়া উক্তিবিশেষের আকারে পরিণত হয়। এই উক্তিবিশেষই উ দা ন। আমরা ইহাকে উচ্ছ্বাস বলিতে পারি।

এক-একটি বর্গ বা পরিচ্ছেদের মধ্যে অবস্থিত সূত্রগুলির নাম একত্র সংগ্রহ করিলে ঐ সংগ্রহের নাম উ দ্দা ন (উদ্ + √ দা 'বন্ধন' + অন)। কখনো কখনো এই অর্থেও উ দা ন শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়, যেমন, জাতকে, (৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৩৩-৩৪)। বস্তুত এখানে উ দ্দা ন পাঠও পাওয়া যায়।

উ দা ন কে ইংরেজী ভাষায় কখনো কখনো solemn utterance শব্দে অনুবাদ করা হয় ; কিন্তু পূর্ব্বে আমরা যেমন দেখিতে পাইলাম তাহাতে solemn এই বিশেষণটির এখানে কোনো সার্থকতা দেখা যায় না। উহার স্থানে বরং inspired শব্দটি চলিতে পারে। কেহ বা solemn inspiration বলিতে চাহেন, যেমন আমাদের গ্রন্থকার মহাশয়। এখানেও solemn চলিতে পারে না। বরং কেবল inspiration ভাল।

এই উদান সাধারণত পদ্যের আকারে হইয়া থাকে, কখনো-কখনো বা গদ্যেরও আকারে পাওয়া যায়, যেমন আলোচ্য পুস্তকের ১ম, ৩য় ও ৪র্থ নির্ব্বাণ সূত্র (পৃ. ২০১-২০৩)। পদ্যাত্মক উদানে এক বা একাধিক পদ্য বা গাথা থাকিতে পারে।

সমগ্র উদান-গ্রন্থে মোট আশীটি উদান আছে। এইগুলিকে আটটি বর্গে বা গণে সমান-সমান ভাগ করা হইয়াছে। প্রত্যেক বর্গে দশটি করিয়া উদান। আলোচ্য গ্রন্থখানিতে উদানগুলিকে সংগ্রহ করা হইয়াছে বলিয়া ইহারও নাম উ দা ন হইয়াছে।

ইহাতে এক-একটি উদান বুদ্ধদেব কোথায় কাহার নিকটে, ও কি প্রসঙ্গে প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহার বিবরণ দিয়া শেষে উদানটি বলা হইয়াছে। এই বিবরণ ও ইহার সহিত এক-একটি উদানকে একত্র করিয়া তাহাকে সূত্র (সুত্ত) বলা হয়।

একটা (৮, ৮) উদাহরণ দেওয়া যাউক। পূর্ব্বে যিনি এই আলোচ্য উদানটিকে প্রকাশ করিয়াছিলেন, তিনি বলিতেছেন—

আমি এইরূপ শুনিয়াছি যে, এক সময়ে ভগবান্ শ্রাবস্তীতে পূর্ব্বারাম-নামক স্থানে মিগারের মাতা বিশাখার প্রাসাদে বাস করিতেছিলেন। সেই সময়ে বিশাখার একটি অতিপ্রিয় নাতনীর মৃত্যু হয়। বিশাখা ভিজা কাপড়ে ও ভিজা চুলেই দুপুর বেলা ভগবানের নিকট উপস্থিত হন। তাঁহাকে অসময়ে ঐরূপে উপস্থিত দেখিয়া তিনি তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। বিশাখা বলিলেন—

'ভগবন্, আমার নাতনীর মৃত্যু হইয়াছে।'

---

* শ্রীমৎ জ্যোতিপাল ভিক্ষু কর্ত্তৃক অনূদিত, বৌদ্ধ মিশন প্রেস, রেঙ্গুন।

'বিশাখা, এই শ্রাবস্তীতে যতগুলি মানুষ আছে, তুমি কি ততগুলি ছেলে ও নাতি ইচ্ছা করিবে?'

'হাঁ, ভগবন্; আমি ততগুলিই ছেলে ও নাতি ইচ্ছা করিব।'

'ভাল, বিশাখা, শ্রাবস্তীতে কতগুলি লোক প্রত্যহ মারা যায়?'

'ভগবন্ দশ জনও মরে, নয় জনও মরে, আট, সাত, ছয়, পাঁচ, চার, তিন, দুই জনও মরে, অন্তত একজনও মরে। শ্রাবস্তীতে কোনো দিন মৃত্যু হয় না, এমন হয় না।'

'আচ্ছা, তাহা হইলে, বিশাখা, এমন কি কোনো দিন হইবে যে দিন তোমার কাপড় ও চুল ভিজিবে না?'

'না, ভগবন্; ভগবন্, এত বেশী ছেলে ও নাতিতে আমার কাজ নাই।'

'বিশাখা, যাহাদের এক শ প্রিয়, তাহাদের দুঃখও এক শ। যাহাদের প্রিয় নব্বুই, তাহাদের দুঃখও নব্বুই।...যাহাদের প্রিয় একটিমাত্র তাহাদের দুঃখও একটিমাত্র। যাহাদের মোটেই প্রিয় নাই, তাহাদের দুঃখ নাই, শোক নাই, ব্যথা নাই; তাহারা নির্ম্মল। আমি তো ইহাই বলি।'

অনন্তর ভগবান্ এই বিষয়টি জানিয়া সেই সময়ে এই উদানটি প্রকাশ করিয়াছিলেন—

'সংসারে যত কিছু শোক, পরিদেবনা, ও নানারকমের দুঃখ আছে তৎসমুদয় প্রিয়কে অবলম্বন করিয়া উৎপন্ন হয়, প্রিয় না থাকিলে হয় না। অতএব লোকে যাহাদের কোথাও কিছু প্রিয় থাকে না, তাহাদের শোক থাকে না, তাহারা সুখী। অতএব যে ব্যক্তি শোক ও তৃষ্ণার অতীত নির্ম্মল অবস্থাকে (নির্ব্বাণকে) প্রার্থনা করে, সে যেন লোকে কোথাও কিছুকে প্রিয় না করে।'

উল্লিখিত উদানটির মূল এই:—

যে কেচি সোকা পরিদেবিতা বা
দুক্খা চ লোকস্মিং অনেকরূপা।
পিয়ং পটিচ্চেব[১] ভবন্তি এতে
পিয়ে অসন্তে ন ভবন্তি এতে॥
তস্মা হি তে সুখিনো বীত সোকা
যেসং পিয়ং নত্থি কুহিঞ্চি লোকে।
তস্মা অসোকং বিরজং পত্থয়ানো
পিয়ং ন কযিরাথ কুহিঞ্চি লোকে॥

আলোচ্য পুস্তকে ইহার অনুবাদ করা হইয়াছে এইরূপ—

যাহা কিছু শোক বিলাপ দুঃখ অনেক প্রকার অবনীতে
প্রিয় হেতু হয় সবি উদয় প্রিয়হীনে নারে জনমিতে।
তারা বীতশোক তাহারা সুখী যারা প্রিয়হীন ত্রিভুবনে
তাই যদি চাও নির্ম্মল নির্ব্বাণ করিও না প্রেম কারো সনে[২]

সর্ব্বশেষের উদানটিতে (৮.১০) বলা হইয়াছে যে, কোনো ভিক্ষু পরিনির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইবার পর অগ্নি দ্বারা তাঁহার দেহের সৎকার করা হইলে শেষে কিছুই অবশিষ্ট থাকে নাই। ইহাই উপলক্ষ্য করিয়া বুদ্ধদেব এই উদানটি প্রকাশ করেন—

অয়োঘনহতসসেব জলতো জাতবেদসো[৩]।
অনুপুব্বূপসন্তস্স যথা ন ঞায়তে গতি॥
এবং সম্মা বিমুত্তানং কামবন্ধোঘতারিনং
পঞ্ঞাপেতুং গতী[৪] নত্থি পত্তানং অচলং সুখং॥

ইহার সরল অর্থ এইরূপ—

জ্বলন্ত অগ্নিকে লোহার মুগুর দিয়া আঘাত করিতে থাকিলে যেমন তাহা ক্রমে ক্রমে উপশান্ত হইয়া আসে, নিবিয়া যায়, কোথায় তাহা গেল জানা যায় না, এইরূপ যাঁহারা সম্যক্ প্রকারে বিমুক্ত হইয়া গিয়াছেন, কামের বন্ধন রূপ প্রবাহকে উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছেন, অচল সুখকে লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা যে কোথায় গমন করেন তাহা জানাইতে পারা যায় না।

আলোচ্য পুস্তকের অনুবাদটি নিম্নে অবিকল উদ্ধৃত হইল, পাঠকগণ সমস্ত লক্ষ্য করিয়া পড়িয়া দেখিবেন:—

"তপ্ত অয়শাগ্নি যথা নিভে যায় মুদ্গরপ্রহারে
ক্রমে ক্রমে, গেল কোথা নারে কেহ জানিতে উহারে;
সম্যক্ বিমুক্ত হেন তীর্ণ যাঁরা কাম বন্যা জল
নির্দ্দেশিতে নাই গতি, লাভীদের সুখ অচঞ্চল।

এইরূপ নির্ব্বাণ-প্রভৃতি বহু উপাদেয় কথায় উদান-গ্রন্থখানি পরিপূর্ণ। ইহা আলোচনা করিলে পাঠকেরা বৌদ্ধ ধর্ম্ম সম্বন্ধে বহু কথা জানিতে পারিবেন।

এই গ্রন্থের অনেক কথা ও গাথা বিনয়ের মহাবগ্গ, চুল্লবগ্গ, সংযুত্তনিকায়, ও ধম্মপদ-প্রভৃতিতে পাওয়া যায়।

শ্রীযুক্ত জ্যোতিপাল ভিক্ষু মহাশয় আলোচ্য পুস্তকে প্রথমে মূল পালি ও তাহার নীচে বঙ্গানুবাদ দিয়া শেষে একটি পরিশিষ্টে উদানের অর্থকথা (ধর্ম্মপাল-রচিত পরমার্থদীপনী) অবলম্বন করিয়া কতকগুলি দুরূহ শব্দের বা বিষয়ের ব্যাখ্যা দিয়াছেন। তিনি মূলের গদ্য অংশের অনুবাদ গদ্যে এবং পদ্য অংশের অনুবাদ পদ্যে করিয়াছেন। কিন্তু মূলে কোনো স্থানে উদানটি গদ্যে থাকিলেও তাহার অনুবাদ পদ্যে করা হইয়াছে, যেমন প্রথম নির্ব্বাণ সূত্রে (৮.১)। ইহা করিতে গিয়া ফল ভাল হয় নাই, কেননা দেখা যাইতেছে ইহাতে মূলের অনেক কথা বাদ পড়িয়াছে।

উদানের এই সংস্করণের দ্বারা বঙ্গীয় পাঠকগণ অনেক উপকার পাইবেন, ইহাতে সন্দেহ নাই। এ জন্য ভদন্ত জ্যোতিপাল আমাদের ধন্যবাদের পাত্র। তবে সংস্করণখানি যেমন হইলে খুব ভাল হইত তাহা হয় নাই। ইহাতে বিবিধ ত্রুটি থাকিয়া গিয়াছে। বিস্তৃতভাবে বলিবার সময়ও নাই, স্থানও নাই, প্রয়োজনও নাই; সংক্ষেপে বলি।

গ্রন্থকার স্পষ্টত কিছু না বলিলেও তাহার "ব্যবহৃত সাঙ্কেতিক অক্ষর"গুলি দেখিয়া মনে হয় তিনি 'ইংরেজী পুস্তক' (বোধ হয় PTS সংস্করণ), 'ব্রহ্মদেশীয় পুস্তক' (পুঁথি বা কোথায় ছাপান বলা হয় নাই), 'বিনয় মহাবর্গ' ও 'লঙ্কা বা সিলোনে মুদ্রিত পুস্তক'; আলোচনা করিয়া আলোচ্য সংস্করণটি প্রস্তুত করিয়াছেন। তা ছাড়া 'হস্তলিখিত

১। এখানে ছন্দের অনুরোধে 'পটিচ্চ' না পড়িয়া 'পটিচ্চেব' পাঠই গ্রহণ করা উচিত।

২। এখানে শেষের পঙক্তিতে মূলের 'পিয়ং কযিরাথ' ইহার অনুবাদে 'করিও না প্রেম' না লিখিয়া 'করিবে না প্রেম' লিখিলে মূলকে অনুসরণ করা হইত। 'কযিরাথ' হইতেছে 'কুর্য্যাৎ', 'কুরু' নহে। ৫২শ উদানের (পৃ. ১৭১) শেষের 'চরেতি' শব্দের অর্থেও এইরূপ গোলমাল হইয়াছে। অনুবাদ দেখিয়া মনে হয় অনুবাদক মহাশয় 'চরেতি'-কে 'চর+ইতি' ধরিয়াছেন, কিন্তু বস্তুত তাহা 'চরে (=চরেৎ)+ইতি।'

৩। এখানে PTS সংস্করণের 'জাতবেদস্স' পাঠ ঠিক নহে।

৪। PTS ও আলোচ্য সংস্করণে এখানে 'গতি' পাঠ আছে, কিন্তু ছন্দের অনুরোধে এখানে 'গতী' হওয়া উচিত। যেমন, "এবং গামে মুনী চরে।"

পুস্তকও' এই কাজে লাগান হইয়াছে। কিন্তু এই 'হস্তলিখিত পুস্তকের' কোনো বিবরণ দেওয়া হয় নাই, ইহা কোন্ দেশের বা কোন্ অক্ষরে তাহারও উল্লেখ নাই। যাহাই হউক, আমাদের গ্রন্থকার যে, এই সমস্ত উপকরণ যথাযথরূপে কাজে লাগাইতে পারেন নাই তাহা তাঁহার সংস্করণখানি দেখিলে স্পষ্টই বুঝা যায়। স্থানে-স্থানে কোনো বিচার না করিয়াই ভুল পাঠ ধরা হইয়াছে, বা যাহা ভুল ছিল না তাহাকে ভুল করিয়া তাহাকে গ্রহণ করা হইয়াছে, অথবা যাহা বস্তুত মূলে ছিল তাহা ভুলে পরিত্যক্ত হইয়াছে। অন্তত 'ইংরেজী পুস্তকের' পাঠটা একটু মনোযোগের সহিত মিলাইয়া দেখিলে অনেক ভাল হইত। তিনি যে অর্থকথা আলোচনা করিয়া অনুবাদ করিয়াছেন ইহা স্পষ্ট বুঝা যায়, কিন্তু মূল পাঠ গ্রহণ করিবার সময় তিনি অর্থকথায় গৃহীত পাঠের দিকে অনেক স্থানে লক্ষ্য রাখেন নাই, রাখিলে ভাল করিতেন। দুই-একটি উদাহরণ দেওয়া যাউক—

১৭শ পৃষ্ঠায় ৩য় ও ৭ম পঙ্‌ক্তিতে মুদ্রিত দেখা যায় 'জুহস্তে', কিন্তু বস্তুত হইবে 'জুহন্তি'। ঐ পৃষ্ঠায় উদানটি এইরূপ দেখা যায়—

> ন উদকেন সুচী হোতি বব্‌হেথ নহায়তি জনো।
> যম্হি সচ্চঞ্চ ধম্মো চ সো সুচী সো চ ব্রাহ্মণো॥

এখানে প্রথম চরণে 'ন উদকেন' না লিখিয়া ছন্দের অনুরোধে 'নোদকেন' পাঠ করিলেই ভাল হইত। কিন্তু ইহা ছাড়িয়া দেওয়া যাউক। দ্বিতীয় চরণে 'নহায়তি' পাঠটি ঠিক নহে। যদিও পালি ব্যাকরণ-অনুসারে ইহা অশুদ্ধ নহে, তথাপি ছন্দের অনুরোধে একটি অক্ষর (syllable) কমাইয়া, ও শেষের ইকারকে ঈকার করিয়া 'নহায়তী' পাঠ করা উচিত। অর্থকথায় (Simon Hewavitarane Bequest, vol. VI, Paramatthadipani or the Commentary to Udana) 'নহায়তী' পাঠই আছে, এবং PTS সংস্করণেও ইহাই দেখা যাইবে। [শেষোক্ত সংস্করণে প্রথম চরণে 'সুচী' স্থানে ভুল করিয়া 'সুচি' পাঠ ধরা হইয়াছে। এখানেও ছন্দের অনুরোধে ঈকারান্ত পাঠ করা উচিত, এবং অর্থকথায় বস্তুত এই পাঠই আছে।]

১৪শ ও ১৫শ পৃষ্ঠায় সর্ব্বত্রই 'সঙ্গামজি' (=সংগ্রামজিৎ) হইবে, 'সঙ্গামজী', (ঈকারান্ত) নহে। পৃ. ২০, 'পক্কমি' নহে, 'পক্কামি'; ২৩ পৃ. 'অধিপতিত্বা' নহে 'অধিপাতেত্বা'; পৃ. ২৪, 'পচ্চপাদী' নহে, 'পচ্চপাদি'; পৃ. ২৯, 'তণ্হাকখয়' নহে, 'তণ্হক্‌খয়'।

পৃ ১৮৩, এখানকার উদানটির শেষ চরণে পাঠ ধরা হইয়াছে 'ন জাতুমেতি'। এখানে এই পাঠটি যে, হইতেই পারে না, তাহা নহে। যদি এই পাঠ রাখিতে হয়, তাহা হইলে, জাতু-ম্-এতি এখানকার মকারটিকে (লঘু এস্‌সতি=লঘুমেস্‌সতি ইত্যাদি স্থানের ন্যায়) মকার আগম করিয়া ব্যাখ্যা করিতে হইবে, এবং ইহার আক্ষরিক অর্থ হইবে 'কখনো আগমন করে না।' কিন্তু আলোচ্য অনুবাদে লিখিত হইয়াছে 'নাহি সে আসে জন্ম নিতে।' ভাবার্থ ধরিলে এ অনুবাদও চলিতে পারে, এবং অর্থকথায় ইহা বলাও হইয়াছে। বস্তুত এখানে 'ন জাতিমেতি' এই পাঠও পাওয়া যায়, এবং অর্থ-কথায় ইহার উল্লেখও করা হইয়াছে। কিন্তু আলোচ্য সংস্করণে এ সম্বন্ধে কিছুই বলা হয় নাই, যদিও বহু উপকরণ লইয়া ইহা করা হইয়াছে। কেবল এই স্থানেই যে, এইরূপ হইয়াছে তাহা নহে, বহু-বহু স্থলে পাঠভেদ দেখান হয় নাই।

অনেক স্থানে মূলে যাহা নাই অর্থকথা হইতে তাহা গ্রহণ করিয়া অনুবাদের মধ্যে দেওয়া হইয়াছে। ইহাতে ক্ষতি হইত না যদি এই অতিরিক্ত কথাগুলি বন্ধনী বা অন্য কোনো উপায়ে একটু পৃথক্ করিয়া দেখান হইত। অন্যথা কেবল অনুবাদ-পাঠক মনে করিতে পারেন যে, ঐ স্থানের সমস্ত কথাই মূলে আছে। পূর্ব্বোল্লিখিত ১৭শ পৃষ্ঠায় মূলে আছে—

> 'সম্বহুলা জটিলা গয়ায়ং উম্মুজ্জন্তি পি
> নিমুজ্জন্তি পি।'

ইহার অনুবাদে লিখিত হইয়াছে—

'অনেকজন জটাধারী তাপস (এখানে মূলের 'হিমপাতসময়ে' শব্দটির অনুবাদ একেবারে বাদ গিয়াছে) গয়ানদীতে ও গয়াপুকুরে একবার ডুবে আবার উঠে।'

এখানে মূলে কেবল 'গয়ায়ং' আছে, ইহার অনুবাদ 'গয়ায়' কিন্তু অনুবাদক লিখিয়াছেন 'গয়ানদীতে ও গয়াপুকুরে'। অর্থকথার স্থানান্তরে দেখিলে জানা যায় যে, গয়া-নামে একটি গ্রাম ছিল, আর তাহার নিকটে গয়াতীর্থ অর্থাৎ গয়া-নামে একটি নদী ও একটি পুষ্করিণী ছিল। মনে হয়, অনুবাদক ইহাই মনে করিয়া আলোচ্য স্থলে ঐরূপ লিখিয়া থাকিবেন।

> "সুপ্পবুদ্ধকুট্ঠিং গাবী তরুণবচ্ছা অধিপাতেত্বা
> জীবিতা বোরোপেসি।" পৃ ১২৫।

অনুবাদ—

'এক নবপ্রসূতি গাভী সুপ্রবুদ্ধ কুষ্ঠীকে শৃঙ্গাঘাতে মারিয়া ফেলিল।'

এখানে 'তরুণবচ্ছা' ও 'অধিপাতেত্বা' শব্দের অনুবাদ মোটেই করা হয় নাই। অথচ মূলে 'শৃঙ্গাঘাতে'র কিছু না থাকিলেও অনুবাদে তাহা দেওয়া হইয়াছে। দ্রষ্টব্য পৃ ২৩।

'সূচিঘতিকা' স্থলে (পৃ. ১৩২), 'সূচিঘটিকা' হইবে। ইহার অর্থ 'তালা' নহে, 'ছোট খিল'। 'উপট্ঠানসালা' (উপস্থানশালা) শব্দের (পৃ. ২৭) অর্থ 'অতিথিশালা' নহে, ইহাকে 'বৈঠকখানা' বলা যাইতে পারে।

'অধিবাসেতু মে ভন্তে ভগবা স্বাতনায় ভত্তং' (পৃ. ২০৫), ইহার অনুবাদ করা হইয়াছে 'আমার পুণ্যার্থ নিমন্ত্রণ গ্রহণ করুন।' 'স্বাতন' শব্দের অর্থ কি 'পুণ্য'? অন্যত্রও (পৃ. ৯৭) এই বাক্যটি আছে, কিন্তু সেখানে ভুলে 'স্বায়তনায়' ছাপা হইয়াছে। এখানে কিন্তু অনুবাদের মধ্যে 'পুণ্যার্থ' লিখিত হয় নাই। বলা হইয়া থাকে যে, 'স্বাতন' হইয়াছে সংস্কৃত 'শ্বস্তন' হইতে এবং ইহার অর্থ করা হয় 'কল্যকার জন্য'।

'সরীরস্‌স ঝায়মানস্‌স নেব' ইত্যাদি (পৃ. ২২৭), এখানে 'ঝায়মানস্‌স' শব্দের পর 'ডয্হমানস্‌স' শব্দ ভুলে বাদ পড়িয়াছে। উল্লিখিত বাক্যাংশের অনুবাদ করা হইয়াছে 'শবদেহ ধ্যানাগ্নিতে দগ্ধ হইতেছিল।' এখানে মূলে 'ধ্যানাগ্নির' কোনো কথা নাই। 'ঝায়মান' ইহার সহিত 'ধ্যানের' কোনো যোগ নাই। অর্থকথায় উহার অর্থ পরিষ্কার করিয়া দেওয়া হইয়াছে 'জালিয়মান', অর্থাৎ 'যাহা জ্বালান হইতেছে।'

এখানকার উদানটি এই (পৃ. ২২৭)—

> অভেদি কায়ো নিরোধি সঞ্‌ঞা
> বেদনা বীতিরহিংসু৫ সব্বা।
> বূপসমিংসু সঙ্খারা
> বিঞ্‌ঞাণং অত্থমাগমা॥

৫। এখানে বহু পাঠভেদ আছে, কিন্তু আলোচ্য সংস্করণে তাহার কোনো উল্লেখ করা হয় নাই।

ইহার অনুবাদটি ভাল হইয়াছে—

ভাঙিল শরীর, নিবিল সংজ্ঞা, বেদনা অস্তঙ্গত (অন্তর্হিত)
সকলি, প্রশান্ত হল সংস্কার, বিজ্ঞান অস্তমিত।

অনুবাদে মূলের অনেক কথার অর্থ স্পষ্ট হয় নাই। পরিশিষ্টে প্রকাশ করিবার কতক চেষ্টা করিলেও তাহা পর্য্যাপ্ত হয় নাই। অনুবাদের ভাবাটি আরও মার্জ্জিত ও শোধিত হওয়া আবশ্যক ছিল।

সাধারণ পাঠকেরা এই আলোচ্য পুস্তকখানি হইতে যে অনেক উপকার পাইবেন তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। কতকগুলি ত্রুটি দেখাইবার ইহাই একমাত্র উদ্দেশ্য যে, যদি সেইগুলি অপনয়ন করিতে পারা যায় তো বইখানি বিশেষ উপাদেয় হইবে। তা ছাড়া, ত্রিপিটক-গ্রন্থমালায় ক্রমশ অনেক পালি পুস্তক ও তাহাদের বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করিবার কথা। ইঁহাদের সংস্কারক ও বন্ধয়িতারা যদি এই জাতীয় ত্রুটিগুলি যাহাতে না হয় তাহা লক্ষ্য রাখিয়া কাজ করেন তো তাঁহাদের সেই কাজ খুব ভাল হইবে।

সংসার স্রোতে

শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

বাদলের মেঘে আকাশ কখন ছাইয়া গিয়াছে বীরেন তাহা ঠিক করিতে পারে নাই। তাহার মনের আকাশে তখন চন্দ্র বা সূর্য্যের লীলা চলিতেছিল না; সেখানেও তখন নিকষ কালো মেঘের কোলে বিদ্যুদ্বিকাশ আরম্ভ হইয়াছিল। সৃষ্টির আদিম যুগ হইতে আজ পর্য্যন্ত দরিদ্রের দুঃখের দিনলিপি ও নারীর অসহায়তার কথা তাহার হৃদয়পটে স্তরে স্তরে অঙ্কিত হইয়াছিল। দারিদ্র্য ও নারী—দুই ভীষণ সমস্যার মধ্যে সে যেন পাক খাইয়া ফিরিতেছিল। হঠাৎ নরেশের আহ্বানে তাহার চমক ভাঙিল—বাড়ি ফিরবি নে?

বীরেন একবার বিদ্যুদালোকোদ্ভাসিত ইনষ্টিটিউটের লাইব্রেরী-কক্ষের দিকে চাহিয়া নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল—"বাড়ি? হাঁ, বাড়ি যাব বই কি?

বাড়ির কথা মনে করিতেই তাহার অসহ্য বোধ হইতে লাগিল; কলিকাতার হর্ম্ম্যরাজির দিকে চাহিয়া সে যেন অস্থির হইয়া উঠিল। এত বড় বড় বাড়ি—এমন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন; ইহার একটি তাহাদের হইলে কি ক্ষতি ছিল?

নরেশ পুনরায় তাগিদ দিল—শীগগির ওঠ; মেঘ করেছে দেখছিস নে।

—দেখেছি চল্। বলিয়া বীরেন নরেশের আপাদ-মস্তক একবার চোখ বুলাইয়া লইল। আজ কি জানি কেন তাহার মনে হইল—আজিকার নরেশ যেন তাহার সতীর্থ নরেশ নয়। তাহার বুকের মাঝে যে বাসা বাঁধিয়াছিল সে যেন আজ কলিকাতার জনারণ্যে মটরগাড়ী, হীরার আংটি, সোনার রিষ্টওয়াচ ও ত্রিতল বাটীর মধ্যে হারাইয়া গিয়াছে। সে কহিল—তুই নয় যা, আমি একটু পরে যাব'খন।

নরেশ প্রতিবাদ করিয়া জানাইল যে, তাহাকে মোটরে করিয়া তাহার বাড়ির কাছে বড় রাস্তায় না রাখিয়া সে যাইবে না। আকাশে মেঘের জোয়ার তাহার মত পাদচারীকে ভাসাইয়া লইতে তাহার একটুও আপত্তি হইবে না।

অগত্যা বীরেন বই ছাড়িয়া নরেশের মোটরে উঠিয়া বসিল। পথে সে অভ্যাসমত আজ একটি কথাও কহিল না দেখিয়া নরেশ বিস্মিত হইয়া অনেক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। শেষে বীরেনের বাড়ীর কাছে আসিলেও যখন সে নামিবার উদ্যোগ করিল না, তখন মোটর থামাইয়া বলিল—তোর আজ কি হ'ল, বল্ ত! এটা আষাঢ়ের প্রথম দিন নয়, অলকাপুরীতে তোর জন্যে কোন বিরহিণী—

কথাটা শেষ হইল না। রাগিয়া বীরেন কহিল—মেঘদূত বা তার কবির কথা আমি ভাবছিনে। এখনকার দিনে বিক্রমাদিত্য বেঁচে নেই জানি।

—তবে কি ভাবছিস?

—ভাবছি Hunger বুভুক্ষা; great hunger নয়,

শুধু Hunger (হঙ্গার) ন্যুট হামসুনের। তবে নোবেল প্রাইজের অত টাকা—

সে হঠাৎ মোটর হইতে নামিয়া বিদায়-সম্ভাষণ না জানাইয়াই বাড়ির পথ ধরিল।

২

বাড়ি—কয়েকখানি খোলার ঘর—অপরিষ্কার, সঙ্কীর্ণ, দুর্গন্ধ। অনশন বা অর্দ্ধাশনক্লিষ্ট ছোট ছোট ভাই-বোনেদের করুণ আর্ত্তনাদে ভরা। অভাব-অভিযোগের অন্ত নাই—যেন দারিদ্র্যের একটা বড় পীঠস্থান।

বীরেন ধীরে ধীরে আসিয়া এই বাড়িতে তাহার পড়ার ঘরে প্রবেশ করিল। মা দেখিয়া বলিলেন—আজ দাওয়ার ঐ পাশটায় বসে পড়াশুনা কর বাবা। ওঁর আর ছোটখুকীর জ্বর এসেছে; ঐ ঘরটায় খুকীকে শুইয়ে দিয়েছি।

—আজ আর পড়ব না—বলিয়া সে তাহার পড়ার ঘরে ঢুকিয়া পড়িল; চাহিয়া দেখিল—স্যাঁতসেঁতে মেজের উপর ছেঁড়া একটি মাদুরে খুকী শুইয়া আছে। অপরিষ্কার চিমনীর অন্ধকার ভেদ করিয়া হ্যারিকেনের আলো কোনরূপে তাহার মুখে আসিয়া পড়িয়াছে। ছোট ঘরটি ধোঁয়া ও কেরোসিনের দুর্গন্ধে ভরা। সে একবার ছোট বোনটির কপালে হাত বুলাইয়া দিল। এই স্নেহের স্পর্শে সে শিশু একবার চোখ মেলিয়া পরক্ষণেই চোখ বুজিয়া পড়িয়া রহিল।

মেজ ভাই ও সেজবোন আসিয়া আব্দার জুড়িল—দাদা, আজ আমাদের 'লেবেঞ্চুস' আনোনি!

বীরেন যত-না অপ্রস্তত হইল, দুঃখিত হইল তাহার চেয়েও বেশী। এই দরিদ্র সংসারে সামান্য চিনির ডেলা খাওয়াকেই যাহারা বিলাসিতার চরম বুঝিতে শিখিয়াছে তাহাদের নিত্যকার এই পাওনা হইতে সে শুধু অমনোযোগিতার জন্যই তাহাদিগকে বঞ্চিত করিয়াছে বলিয়া ক্ষুণ্ণ হইল। কোনও মতে সে উত্তর দিল—আজ ভুল হয়ে গেছে রে! কাল ডবল করে পাবি।

ন বোন আসিয়া বলিল—মা জিজ্ঞাসা করলে—ছোট খোকার কানে পুঁজের ওষুধ এনেছ?

আজ তাও তাহার ভুল হইয়া গিয়াছিল। সে উত্তর না দিয়া অত্যন্ত ক্লান্তভাবে ছোট খুকীর মাদুরের নিকট শুইয়া পড়িল। আর পারা যায় না। ভাইবোনের সংখ্যা কিছু কম হইলে কি চলিত না? ত্রিশ টাকার কেরানীর ঘরে—

সে চোখ বুজিয়া পড়িয়া রহিল।

৩

গোলদীঘির এক কোণে দুপুর বেলায় অনেকদিন পরে বীরেনকে ধরিতে পাইয়া নরেশ বলিল—তোর কি হয়েছে বল ত? চুলের টিকিটাও দেখার জো নেই।

কি যে হইয়াছে তাহা বীরেন কেমন করিয়া বুঝাইবে? তিলে-তিলে না খাইতে পাইয়া মরণের পথে অগ্রসর হওয়ার ইতিহাস বলার মত নয়। বই-কেনা বন্ধ রাখিয়া স্কলারশিপের টাকা সংসারে খরচ করিয়াও ত সে ভাই ভগিনীর নিত্যকার দুঃখ এতটুকুও কমাইতে পারে নাই।

তাহাকে নীরব দেখিয়া নরেশ পুনরায় বলিল—আমরা নয় কোন দোষই করলাম। কিন্তু কলেজ? সেখানেও ত আসিস্ নে।

রুক্ষ মুখ বিকৃত করিয়া বীরেন উত্তর দিল—সেখানে সম্ভবতঃ আর যাব না।

—কেন?

—পড়া হয়ত ছাড়তে হবে।

- স্কলারশিপ পেয়েও।

ব্যথিত বিস্ময়ে নরেশ মুখ তুলিয়া তাহার পানে চাহিল। বীরেনের চোখ দুইটি নরেশের পরিপাটি পরিচ্ছদের ও বাঁধান নোট বইগুলির দিকে চাহিয়া একবার জ্বলিয়া উঠিল, পরমুহূর্ত্তেই জলে ভরিয়া আসিল। সে সামলাইয়া কহিল—তা ছাড়া আর কিছুই করবার নেই। মা বাপের পাপের প্রায়শ্চিত্ত ছেলেকে করতে হয়।

বলিতে বলিতে তাহার চোখ দুইটি আবার ছলছল করিয়া উঠিল। দৃষ্টি ফিরিয়া গেল, তাহার সেই ছোট পড়ার ঘরটিতে। রুগ্ন শিশু আজ আর সে ঘরে নাই। তাহার স্থান সে চিরকালের মত খালি করিয়া দিয়া গিয়াছে। বিনা চিকিৎসায় বিনাপথ্যে তাহার ছোট ভাইটিও তাহার অনুগমন করিয়াছে।

সে হঠাৎ কহিল—আমায় একটা কড়া বর্ম্মা চুরুট কিনে দিবি ভাই! পকেটে পয়সা নেই আজ।

এবার নরেশ বিস্ময়ে দস্তুরমত হতবুদ্ধি হইয়া গেল। সে কহিল—সেকি? এ ত তুই কোনদিনই খাস্‌নে।

—এখন খাই। আগে লজেন্স কিনতাম, এখন কড়া চুরুট কিনি—দু-চার টানে বেশ মাথাটা ঘুরে ওঠে।

নরেশ কাছে আসিয়া তাহার হাত ধরিয়া বলিল—চল আজ তোকে আমার বাড়িতে যেতে হবে, আজ তোকে আর ছাড়ব না।

অনেক ধস্তাধস্তির পর বীরেন নরেশের বাড়ী যাইতে বাধ্য হইল। নরেশের মা তাহাকে নাওয়াইয়া খাওয়াইয়া ধরিয়া রাখিলেন। খানিক পরে নরেশ তাহার ছোট বোনকে লইয়া আসিয়া বীরেনকে বলিল—এটা বড্ড দুষ্ট হয়েছে ভাই। কিচ্ছু পড়া-শোনা করে না। তুই যদি একটু দেখে শুনে দিস্।

নরেশের মা-ও কহিলেন—'ঐ একটি ত মেয়ে, ছেলেও আর নেই। দাদার কাজটা তুই কর বাবা। নরেশের এসব দিকে আদৌ খেয়াল নেই।

এক ভাই এক বোন। বীরেন একটি নিঃশ্বাস চাপিয়া গেল। অনেকক্ষণ সে কোন কথা কহিল না; শেষে হঠাৎ রুক্ষভাবে বলিল—গরীবের প্রতি এ সাহায্যের কথা মনে থাকবে। তবে আমি এ ভার বইতে অক্ষম। আমার ভাই-বোনেদেরও দেখবার লোক নেই।

নরেশ বা তাহার মাতা এ কথার কোন জবাব দিতে পারিলেন না। বীরেন এবার একটু অনুতপ্ত স্বরে কহিল—আপনাদের দয়া আমি ভুলব না, কিন্তু—

সে নরেশের দিকে চাহিয়া বলিল—'আমি আজকাল শাস্ত্রবিশ্বাসী খাঁটি হিন্দু হয়েছি নরেশ—বুঝলি?

সঙ্গে সঙ্গেই সে অস্বাভাবিক জোরে হাসিয়া উঠিল। কিন্তু কেহই কিছু উত্তর দিল না, দেখিয়া সে পুনরায় কহিল—বাবা বলেন, মৃত্যু রোগের ওষুধ নেই; ডাক্তার ডাকা ভুল। অদৃষ্ট ছাড়া পথ নেই। স্রোতের টানে ভেসে যেতে হবেই। আর—

সে হঠাৎ মাঝ পথে থামিয়া নরেশের মাকে প্রণাম করিল ও কাহাকেও কিছু বলিবার অবসর না দিয়াই বাহিরে আসিয়া দুপুরের রোদে কলিকাতার পাথুরে পথ বাহিয়া চলিল।

(৪)

সারাদিন পরে সে যখন বাড়ি পৌঁছিল তখন সেখানে দস্তুরমত বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইয়াছে। সদ্য আগত শিশুর চীৎকারে ঘরে রুদ্ধ বাতাস ভারী উঠিয়াছিল। তাহার বাবা অপটুহস্তে আহায্য প্রস্তুত করিতেছেন, আর ছোট ছোট ভাই বোনগুলি ক্ষুধার তাড়নায় রোগযন্ত্রণায় নবাগতের সহিত পাল্লা দিয়াই বুঝি চীৎকার জুড়িয়া দিয়াছে।

সে নিকটে তিষ্ঠিতে না পারিয়া তাহার পড়ার ঘরটিতে গিয়া উপস্থিত হইল। বইয়ের আলমারিতে মাকড়সার জাল; তেলাপোকা ও ইঁদুরের নাদিতে আলমারি ভরিয়া গিয়াছে। বইগুলির কোন কোনখানি কুমীরে-পোকা বা বোলতার বাসার আটা লাগিয়া পাতায় পাতায় জুড়িয়া গিয়াছে। সে স্তব্ধ হইয়া অনেকক্ষণ আলমারির দিকে চাহিয়া রহিল। দুই-একবার দুই-একখানি বই খুলিল ও শেষে সব এলোমেলো করিয়া রাখিয়া দিল।

পিতা আসিয়া কহিলেন—'তোর জন্যে একটা চাকরি জোগাড় হয়েছে। আপাততঃ পঁচিশ টাকা। ভাল কাজ দেখাতে পারলে চল্লিশ-পঞ্চাশ টাকা শেষ পর্য্যন্ত উঠ্‌তে পারে।

—পঁচিশ টাকা?

—হ্যাঁ।

—যাক স্কলারশিপের টাকার চেয়ে বেশী।

পিতার ক্লিষ্ট মুখের দিকে চাহিয়া সে আর কথা বলিল না; শেষে বলিল—কবে থেকে বেরুতে হবে?

—পরশু।

—আচ্ছা।

মাহিনা যাহাই হউক তবুও চাকরি; জড়জগতে দেহ ও মন একত্র রাখিবার পক্ষে অপরিহার্য্য। মায়ের মুখে হাসি ফুটিয়াছে, পিতার কপালের রেখার কুঞ্চনও যেন কমিয়া গিয়াছে। হায় ভবিষ্যতের আশা! সে নহিলে আর বর্ত্তমানকে সুসহ করিতে পারিত কে? আশ্রয়হীন দীন ভিখারীর তিক্ত জীবনের দিনগুলি ত সে-ই সহনীয় করিয়া রাখিয়াছে।

পোষাক পরিয়া সে মাকে গিয়া প্রণাম করিয়া দাঁড়াইল। মা আনন্দ প্রকাশ করিলেন; ছেলেও একটু হাসিয়া বলিল—আজ আমাদের সংসারের স্মরণীয় দিন, মা।

মা সায় দিলেন; ছেলে ভাবিল—আরম্ভ পঁচিশ টাকায়, আর শেষ ?

সামান্য টাকাটার কথা আর ভাবিতে ইচ্ছা করিল না।

৫

চাকরির সঙ্গেই বিবাহ দেশের সনাতন রীতি। মা বলিলেন—বাবা, বিয়ে একটা কর, নইলে সংসার যে আর চলে না! ছেলেপুলে নিয়ে আমি আর পেরে উঠিনে।'

অতি দুঃখে বীরেন হাসিয়া ফেলিল, কহিল—সংসার সচল কবে ছিল তা ত জানিনে মা। আমাদের বিয়ে করা মানেই দরিদ্রের সংখ্যা বাড়ান। নিজেরা ত কম ভোগনি, এখনও ভুগছ।

—এ আর না ভোগে কে ? তাই বলে সাধ-আহ্লাদ আমাদের একেবারেই থাকবে না ?

সাধ-আহ্লাদের কথায় তাহার অনেক দিনের পুরাতন ক্ষতে আঘাত বাজিল। কি অভ্রভেদী বিরাট আকাঙ্ক্ষাই না তাহার ছিল! নরেশকে সে কত ছোট মনে করিয়া আসিয়াছে। ছাত্র-হিসাবে, কীর্ত্তি-উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ হিসাবে তাহাদের ব্যবধানকে কত বেশী বড় করিয়াই না সে দেখিয়াছিল! অদৃষ্টের বিরুদ্ধে অভিযান করিয়া, বিজয়-লাভের ক্ষীণ আশা এখনও হয়ত একেবারে যায় নাই।

সে কহিল—এখন থাক্, মা। একটু গুছিয়ে নাও, পরে হবে। নতুন যে লোক আন্‌তে চাচ্ছ, তারও ত খরচ আছে, তারও ত কাচ্চা, বাচ্চা হ'তে পারে।

—সে আর না হয় কবে ? তাই ব'লে ছেলের বিয়ে দেব না ?—তিনি একটু চুপ করিয়া বলিলেন—সংসারে আর একটা লোক না হলে সত্যিই আমি আর সামলাতে পারছি নে।'

বীরেন মায়ের দিকে ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিল। এই শীর্ণ দেহের প্রতি অস্থিতে, প্রতি শিরা-উপশিরায় কি অসীম সহিষ্ণুতার কাহিনীই না লেখা আছে। এই মায়ের সাধ অথবা সাহায্যের প্রার্থনা যাহাই হোক ন কেন সে মিটাইতে বাধ্য।

সে পাঁজরভাঙা নিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিল—যা ভাল বোঝ কর। আমি ছেলে—তুমি মা—বার-বার বলছ।

সে মায়ের সম্মুখে আর দাঁড়াইল না; চুপি চুপি তাহার পড়ার ঘরে গিয়া উপস্থিত হইল। দুইবার ইতস্ততঃ করিল, দুইবার কাপড়ের খুঁটে চোখ মুছিল, শেষে বইগুলি আলমারি হইতে বাহির করিয়া রাতের অন্ধকারে পুরাতন পুস্তকের দোকানে বিক্রয় করিয়া আসিল। এইরূপে তাহার সব আশার সোনা গলাইয়া অনেকক্ষণ উদ্দেশ্যহীন ভাবে পথে পথে ঘুরিয়া শেষে স্যাকরার দোকান হইতে সে একটি আংটি কিনিল—নববধূকে উপহার দিবে। তাহার সকল আক্রোশ সে ভাবী বধূর জন্য জড়ো করিয়া রাখিল।

বিবাহ নির্ব্বিঘ্নে শেষ করিয়া বউ লইয়া বীরেন বাড়ি আসিল। মায়ের আনন্দের অবধি নাই। তিনি আচারাদি শেষ করিয়া কহিলেন—বীরু, বউ কেমন হ'ল রে ?

—যেমন দেখছ।

মেজ বোন বলিল—তা নয় দাদা, পছন্দ হয়েছে ত ?

—তা ত জানিনে।

বিস্মিত হইয়া মা প্রশ্ন করিলেন—সে কি ?

—হাঁ, ঠিক তাই। বউ ত চাওনি, লোক চেয়েছিলে।— বলিয়াই সে লজ্জিত হইয়া মুখ ফিরাইল। মায়ের ব্যথিত দৃষ্টি তাহাকে অস্থির করিয়া তুলিল। আর কেন অনাবশ্যক এ আঘাত! আংটি প্রস্তুত সে ত প্রস্তুত হইয়াই করিয়াছিল। তবে কেন আর শুধু গুরুজনকে তৃপ্তি হইতে বঞ্চিত করা।

সে মাথা নীচু করিয়া মুখখানি যথাসাধ্য প্রফুল্ল করিয়া কহিল—তোমরা মা বড় লজ্জা দাও, বউ পছন্দ অপছন্দের কথা তোমাদের সঙ্গে বলা যায় ?

মায়ের মুখে হাসি দেখিয়া সে ঈষৎ তৃপ্তি অনুভব করিল। ক্ষণিকের সুখস্বপ্ন—সেও ত সুলভ নয়।

৬

ফুলশয্যার খাট! সরমজড়িত নববধূ কম্পিত বক্ষে স্বামীর সহিত প্রথম বোঝাপড়া করিবে! ফুলে ফুলে খাটখানি ভরিয়া গিয়াছে! আবেশময় মধুর মুহূর্ত্ত, জীবনে নূতন সঞ্চয়ের প্রথম দিন!

বীরেন তখন বাহিরে একা বসিয়া খুব কড়া চুরুট টানিতেছিল। একটা, দুইটা, তিনটা চুরুট সে শেষ করিয়া ফেলিল। এমন সময়ে ছোট বোন আসিয়া বলিল—দাদা, ঘরে চল, আজ যে ফুলশয্যা!

বীরেনের কঠিন মুখে ঈষৎ কোমলতার আভাস ফুটিয়া উঠিল। সে কহিল—তাতে তোর কি পোড়ামুখি?

—ওমা, অবাক করলে যে? বাবারে বাবা, এখন থেকেই বউয়ের ওপর টান দেখ না।—বকিতে বকিতে সে উচ্ছ্বসিত আনন্দে ছুটিয়া অগ্রসর হইল।

ভগ্নীর গমনশীল রুগ্ন বিশীর্ণ মূর্ত্তির দিকে চাহিতেই আবার তাহার মুখ ভারী হইয়া উঠিল। নরেশের বোন, সে কেন—কিসে—এর চেয়ে—

তৎক্ষণাৎ সে ভাবনার কণ্ঠ রোধ করিতে চাহিল। নরেশের বোনের সঙ্গে নরেশের কথাও যে মনে পড়িতে চায়। সে অতি দ্রুতপদে কোনও দিকে না চাহিয়াই সটান তাহার শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিল। রসিকা স্ত্রীলোক দুই-একজন গা টেপাটিপি করিল—বাবা, ছেলের আর তর সয়না।

বীরেন সোজা গিয়া খাটে শুইয়া পড়িল—বধূর দিকে একবার চাহিয়াও দেখিল না। শুইয়া শুইয়া সে আকাশ পাতাল ভাবিতে লাগিল। এ বধূকে সে কেমন করিয়া গ্রহণ করিবে। জীবনের পথে কতটুকু সাহায্য ইহার দ্বারা সম্ভব! তাহার আদর্শের নিকট এ যে একেবারে ছোট! আবার ভাবিল—বধূর কি দোষ? তাহাকে সে ভালভাবে গ্রহণ করিতে বাধ্য। তাহার উপর যে চিরদিনের নির্ভর স্থাপন করিল তাহাকে উপেক্ষা করিবে, সে কি এতই ছোট হইয়া গিয়াছে?

কিন্তু তবুও যেন ভাল লাগে না। ভাল লাগা-না-লাগা ত শুধু কর্ত্তব্যজ্ঞানের উপর নির্ভর করে না। যে রুদ্ধ অভিমানের বোঝা সে গোপনে এতকাল বহিয়া আসিতেছে, তাহা এখন কাহারও উপর চাপাইতে না পারিলে সে স্থির থাকিতে পারে কই? যে বিষ এত-দিন ধরিয়া তিলে তিলে সঞ্চিত হইয়াছে তাহাকে কোনও পথ দিয়া বাহির করিয়া না দিয়া নীলকণ্ঠ হইতে গেলে সে ত বাঁচিবে না।

সে তৎক্ষণাৎ সরিয়া ধাক্কা দিয়া রূঢ়ভাবে বধূকে কহিল—'শোন, ও সব লজ্জা ভাঙানোর ধৈর্য্য আমার নেই। ধর এই আংটিটা তোমায় দিলাম, তোমারই জন্যে আগে থেকে তৈরি করিয়েছি। এর দাম কত জান?

নব বধূ কথা কহিল না। সে স্বামীর এই অকস্মাৎ উগ্রতায় স্তব্ধ হইয়া গিয়াছিল। বীরেন আবার বলিল—এর দাম কত বেশী তোমায় আজ বোঝাতে পারব না। এর দাম—

সে হঠাৎ চুপ করিল। মনে মনে ভাবিল—না থাক, আজিকার দিনে আর ইহাকে কাঁদাইব না। সে আংটিটি জানালা দিয়া ছুঁড়িয়া বাহিরে ফেলিয়া দিল।

বালিকা বধূ তখন চোখের জলে ভিজিয়া কি ভাবিতেছিল সেই জানে।

সারারাত চুপ করিয়া পড়িয়া থাকিয়া প্রভাতে সে বাড়ি ছাড়িয়া বাহির হইয়া পড়িল। সব উচ্চাশার সমাধি দিয়া সে এখন ভবিষ্যতের দিকে চাহিতেও সাহস পাইতেছিল না। আনমনে পথ চলিতে চলিতে নরেশের সহিত হঠাৎ তাহার দেখা হইয়া গেল। সে তাহাকে দেখিয়া সজাগ হইয়া পাশ কাটাইবার চেষ্টা করিতেছিল, কিন্তু নরেশ তাহাকে ধরিয়া ফেলিয়া বলিল—আমি তোকেই খুঁজছিলাম রে।

—কেন?

—বি-এ পাশ করেছি; তাই আজ মা বাড়িতে একটা ভোজের আয়োজন করেছেন। আর—

বীরেনের মুখ পাংশু হইয়া উঠিল। সে যেন একটি ধাক্কা সামলাইয়া লইয়া নিজেকে দাঁড় করাইল কিন্তু তাহার কোনও কথাই আর তাহার কাণে প্রবেশ করিল না। সমগ্র কলিকাতা শহর যেন তখন তাহার পায়ের নীচে হইতে সরিয়া যাইতেছিল।

খানিক পরে সে যেন ঘুম ভাঙিয়া উঠিল ও নরেশকে

সজোরে একটি ধাক্কা মারিয়া একরূপ ছুটিয়াই তাহার সম্মুখ হইতে বাহির হইয়া গেল।

নরেশ কারণ বুঝিতে না পারিয়া খানিকক্ষণ তাহার দিকে চাহিয়া রহিল ও শেষে অন্যান্য বন্ধু-বান্ধবগণকে নিমন্ত্রণ করিতে চলিল।

৭

ইহার পরে আট বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। সংসারের কত স্থানে কত ভাবের চিহ্নই না তাহারা আঁকিয়া দিয়াছে। কত ছোট বড় হইয়াছে, কত বড় ছোট হইয়াছে।

নামজাদা প্রফেসর নরেশ তাহার ঘরে বসিয়া একখানি বইয়ের পাতা উল্টাইতেছিল ও কালের প্রগতির কথা ভাবিতেছিল, এমন সময়ে বীরেন তাহার ঘরে আসিয়া প্রবেশ করিল। তাহাকে চিনিতে নরেশের বেশ একটু সময় লাগিল; অকালবৃদ্ধ, কালিমাগ্রস্ত ন্যুব্জ দেহ বীরেনকে একেবারে না চিনিলেও নরেশকে খুব দোষ দেওয়া যাইত না। নরেশ তাহার যথোচিত অভ্যর্থনা করিয়া প্রশ্ন করিল—কেমন আছিস?

—চলে যাচ্ছে এক রকম। তোর প্রফেসরিতে মাইনে কত হ'ল এখন?

—ছ'শ টাকা।

—বেশ বেশ। আমি একটু দরকারে এদিকে এসেছিলাম। ভাবলাম একবার দেখা করে যাই। হাঁ আর দেখ এই কাগজটায় একজন প্রাইভেট টিউটরের বিজ্ঞাপন দিয়েছেন—

নরেশ বলিল—ও আমার বোন দিয়েছে। তার ছেলের জন্যে একটি ভাল মাষ্টার চাই।

—তবে ত ভালই হ'ল। এসে দেখছি ভাল করেছি। ভগবান তোদের ভালই করুন। তা আমাকে ঐ মাষ্টারিটা দেনা কেন?

—তুই করবি?—নরেশ করুণ বিস্ময়ে প্রশ্ন করিল।

হাসিয়া বীরেন বলিল—'আমি করব না ত আর কে করবে? সে ত আমারও এক রকম ভাগনে হয়।

নরেশের বেদনা-বোধ বাড়িয়া চলিল। মনে পড়িল দশ বৎসর আগেকার এক বীরেনের কথা। এ যেন সে নয়।

সে ক্ষুব্ধ কণ্ঠে কহিল—ওটার মাইনে বড় কম। তা আমি নয় তাকে বলে ওর উপর আর টাকা-দশেক বাড়িয়ে দেব।

—তাহ'লে ত ভালই হয়। হ্যাঁ—তা—তাহলে ঐ ঠিক রইল।—বলিয়া বীরেন মহা খুশী হইয়া বাড়ি ফিরিল, স্ত্রীকে কহিল—বুঝলি পাগলি, ভারী দাঁও মেরে দিয়েছি। করকরে পাঁচশটে টাকা আরও মাস মাস ঘরে আস্‌বে। এককালের বন্ধু ছিল, বড় লোক, একটু খোসামোদ করতেই গলে জল হয়ে গেল।

বউ শুনিয়া মহানন্দে রুগ্ন ছেলেটার জন্য একটি বেদানা কিনিতে ছ-আনার পয়সা হাতে দিয়া স্বামীকে বাজারে পাঠাইয়া দিল।

বৌদ্ধসাহিত্যে শিল্প ও ভৌগোলিক তথ্য

শ্রীবিমলাচরণ লাহা, এম-এ, বি-এল, পি-এইচ ডি,

মহাবংশ নামক বৌদ্ধগ্রন্থে স্তূপ (থূপ), বিহার এবং বাপীর প্রচুর উল্লেখ আছে; তাহা হইতে প্রাচীন সিংহলে স্থাপত্য ও ভাস্করশিল্পের বিকাশের পরিচয় পাওয়া যায়।

স্তূপগুলি অর্দ্ধমণ্ডলাকৃতি মাটির ঢিপির মত; খণ্ড খণ্ড ইট, মাটি ইত্যাদি ভিতরে চাপা দিয়া উপরে ইট অথবা পাথর স্তরে স্তরে গাঁথিয়া এই স্তূপগুলি নির্ম্মিত হইয়াছিল। স্তূপের উপরিভাগে ক্ষুদ্র বেষ্টনী দেওয়া একটি স্থান আছে, সেটিকে 'হার্ম্মিক' বলা হয়; পুণ্য তিথি অথবা উৎসব দিনে যখন ভক্তগণের সমাগম হয় তখন সেই স্তূপের রক্ষিত বুদ্ধদেবের দেহাস্থি বা ভস্ম অথবা অন্য কোন পবিত্র দ্রব্য পাত্রাধারে স্থাপন করিয়া ঐ 'হার্ম্মিকের' মধ্যে রাখা হয়। সেই পাত্রাধারটিকে আতপ তাপ হইতে রক্ষা করিবার জন্য হার্ম্মিকের উপরিভাগে এক হইতে আরম্ভ করিয়া এগারটি পর্য্যন্ত ছত্র স্তরে স্তরে সাজান হইয়া থাকে। স্তূপের পূর্ব্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণে মাঝে মাঝে চারিটি তোরণ থাকিতে দেখা যায় এবং প্রাচীরবেষ্টনীর ভিতরে স্তূপের চারিদিকে পরিক্রম করিয়া পূজা করিবার ব্যবস্থা আছে। যে পবিত্র পাত্রাধার মাঝে মাঝে হার্ম্মিকের মধ্যে স্থাপন করিয়া প্রদর্শন করা হয়, সেই পাত্রাধারটি প্রথমাবস্থায় স্তূপের ভিতরেই রাখা হইত; কিন্তু পরে এই রীতি পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। পণ্ডিত কুমারস্বামী বলেন, ভারতবর্ষের সর্ব্বপ্রাচীন স্তূপগুলির মধ্যে অর্দ্ধমণ্ডলাকৃতি স্তূপ ও বেষ্টনীগুলিই প্রথম এবং তোরণগুলি পরে নির্ম্মিত হইয়াছিল। সাঁচী স্তূপের চারিদিকে এই তোরণের চারিটি সুন্দর নমুনা আছে। সিংহলে এই জাতীয় তোরণ নাই; কিন্তু অনেকগুলি স্তূপের চারিদিকে সুপ্রশস্ত বেদী এবং সারি সারি উঁচু পাথরের স্তম্ভ আছে; স্তম্ভগুলিতে মাঝে মাঝে মণ্ডনশিল্পেরও পরিচয় পাওয়া যায়।

সিংহলে স্তূপের সংখ্যা অনেক। দেবপ্রিয় তিস্সের রাজত্বকালে প্রথম স্তূপ নির্ম্মাণের ঐতিহাসিক উল্লেখ মহাবংশ হইতে আমরা জানিতে পারি। তিনি 'থূপারাম' স্তূপ এবং 'পঠম' চৈত্য (মহাবংশ গ্রন্থে দাগোবা ও চেতিয় (চৈত্য) একই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে) নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। রাজা দুট্ঠগামনীর রাজত্বে অনুরাধপুর নগরে সোন্নমলী অথবা মহাথূপ এবং মরীচ-বট্টিথূপ নামক দুইটি সুবৃহৎ স্তূপ নির্ম্মিত হইয়াছিল। মহাথূপ স্তূপের প্রাচীর বিচিত্র চিত্রে অলঙ্কৃত ছিল বলিয়া মহাবংশে উল্লেখ আছে।

স্তূপের ন্যায় 'বিহারে'ও স্থাপত্যশিল্পের নিদর্শন পাওয়া যায়। অনুরাধপুরে এক সময়ে অনেকগুলি বিহার ছিল; এখন তাহার ধ্বংসাবশেষের মধ্য হইতে উহাদের ভিত্তি মাত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে। সিংহলে পুলস্তপুর নগরে পরবর্ত্তীকালে নির্ম্মিত সত্ত-থূমক-পাসাদ নামক একটি সুবৃহৎ প্রাসাদ এখনও বর্ত্তমান আছে। মহাবংশে সিংহলের অনেকগুলি বিহারের উল্লেখ আছে— মহাবিহার, অভয়গিরি বিহার এবং দক্খিন গিরিবিহার তাহার মধ্যে প্রসিদ্ধ।

খৃষ্ট-পূর্ব্ব দ্বিতীয় শতকে অনুরাধপুরে এক হাজার স্তম্ভের উপর নির্ম্মিত একটি সুবৃহৎ বিহারের উল্লেখও মহাবংশে আছে।

বাপী এবং সরণীনির্ম্মাণের প্রথাও প্রাচীন সিংহলে খুব প্রসার লাভ করিয়াছিল। পণ্ডুবাপী গামনীবাপী এবং দীঘবাপী প্রভৃতি বাপীর উল্লেখ আমরা মহাবংশে পাই। পণ্ডিত পার্কার তাঁহার 'প্রাচীন সিংহল' নামক গ্রন্থে বাপী-নির্ম্মাণের আলোচনা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, প্রাচীন সিংহলবাসীরা এই বাপী-নির্ম্মাণব্যাপারে যে পূর্ত্তবিদ্যার পরিচয় দিয়াছে, তাহা সত্যই বিস্ময়কর। বর্ত্তমান কালের পূর্ত্তকার্য্যের তাহারাই প্রথম পথপ্রদর্শক।

অনুরাধপুরে এক সময়ে স্নানের জন্য একটি অনাবৃত সরণী ছিল, এবং জলে নামিবার জন্য ভিতরের দিকে সিঁড়ি ছিল।

সিংহলের ভাস্করশিল্পের পরিচয় প্রথম আমরা পাই বলি-উৎসবের মৃত্তিকানির্ম্মিত মূর্ত্তিগুলির মধ্যে। প্রকৃতপক্ষে রাজা দুটুগামনীর রাজত্বকালেই ভাস্কর-শিল্পের প্রথম বিকাশ হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। লোহ পাসাদের রত্নখচিত স্তম্ভগুলিতে সিংহ, ব্যাঘ্র ও অন্যান্য প্রাণী ও দেবদেবীর অনেক মূর্ত্তিকে রূপদান করা হইয়াছিল বলিয়া মহাবংশে উল্লেখ আছে [পৃ. ২১৬] মহাথূপের পবিত্র পাত্রাধারের উপর যে সূর্য্য, চন্দ্র, তারা, রত্ন এবং পদ্মের সুন্দর প্রস্তর-চিত্রের নিদর্শন আছে, তাহা হইতেও ঐ সময়ের ভাস্কর-শিল্পের বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। বুদ্ধদেবের সম্বোধিলাভের পর হইতে পূর্ণ সাত সপ্তাহের সমগ্র কাহিনী এবং তাহার সঙ্গে ব্রহ্মার প্রার্থনা, ধর্ম্মচক্র-প্রবর্ত্তন, বিম্বিসারের আগমন এবং রাজগৃহ-প্রবেশ, বেলুবন এবং জেতবন দান ও গ্রহণ, বুদ্ধদেবের মহাপরি-নির্ব্বাণ, অগ্নিসংকার ও দেহাংশ বণ্টন এবং বেস্সন্তর জাতক—সমস্তই অতি সুন্দর ভাবে এই প্রস্তর-নির্ম্মিত পবিত্র পাত্রাধারের উপর উৎকীর্ণ হইয়াছে [মহাবংশ, পৃঃ ২৪১-৪২]

দেবপ্রিয় তিস্সের পূর্ব্বে সিংহলের স্থাপত্য ও ভাস্কর-শিল্পের বিশেষ পরিচয় মহাবংশে পাওয়া যায় না। কেবল মাত্র উল্লেখ আছে যে মধুরার [মাদুরা] পাণ্ডু-বংশীয় রাজা সিংহলের রাজা বিজয়সিংহের নিকট একবার তাঁহার নিজের শিল্পীকুল এবং অষ্টাদশ শিল্প-গোষ্ঠীর এক হাজার শিল্পী-পরিবার পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। ইহা হইতেই অনুমিত হয় যে, দক্ষিণ-ভারতের শিল্প প্রভাবের ফলেই সিংহলে ভারতীয় স্থাপত্য ও ভাস্কর-শিল্পের সূচনা দেখা গিয়াছিল।

অশোকের ধর্ম্মবিজয়ের ফলে সিংহল বিজিত হইয়াছিল; এবং তাহার পর হইতেই ভারত ও সিংহলের মধ্যে দৃঢ়তর বন্ধনের সূত্রপাত হয়। অশোকের সমসাময়িক সিংহলের রাজা ছিলেন দেব-প্রিয় তিস্য; তাঁহার রাজত্বকালেই সিংহলে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রচার হয় এবং সেই সঙ্গে ভারতীয় স্থাপত্য ও ভাস্কর-শিল্পের প্রসার ও বৃদ্ধি হয়। পার্কার বলেন, খৃষ্ট পূর্ব্ব তৃতীয় শতকে প্রথম ভারতবর্ষ হইতেই দাগোবার (স্তূপের) স্থাপত্যরীতি সিংহলে প্রবর্ত্তিত হয়, এবং সর্ব্বপ্রাচীন দাগোবাগুলি ভারত-সম্রাট অশোকের রাজত্বকালেই নির্ম্মিত হয়।

প্রাচীনকালে উত্তর-ভারতে অনেকগুলি বড় বড় নগর ছিল; প্রত্যেক নগরের চারিদিকে সুদৃঢ় প্রাচীর-বেষ্টনী ছিল, এবং বেষ্টনীর উপর সুবৃহৎ সময়-নিরূপক-যন্ত্র-গৃহ (clock-tower) শোভা পাইত। নগরের চারিদিকের প্রাচীর-বেষ্টনীর চারিটি সুবৃহৎ তোরণ ছিল, এবং ঠিক বেষ্টনীর ভিতরই সমগ্র নগরী পরিক্রম করিয়া একটি সুপ্রশস্ত পথ থাকিত। প্রাচীরের বাহিরে চারি-দিকে পরিখা খনন করিবার রীতি ছিল; ভিতরে রাজ-প্রাসাদ ও অন্যান্য রাজন্য ও মন্ত্রীবর্গের গৃহাদি শোভা পাইত। নগরের সর্ব্বত্র সমান্তরাল রাস্তার দুই পাশে শ্রেণিবদ্ধ আপণ শ্রেণী, পত্রপুষ্পশোভিত উদ্যান, হ্রদ, পদ্মশোভিত সরণী ইত্যাদি নগরের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিত। দেব-দেবীর মন্দিরেরও অভাব ছিল না (মিলিন্দ প্রশ্ন, ১ ভাগ, পৃঃ ৩৩০-৩৩১)।

বাড়িগুলি ছিল সাধারণ কাঠের তৈরি। ধর্ম্মপদটঠ কথায় (vol. 4, p. 211) উল্লেখ আছে যে, রাজা বিম্বিসার একটি কাঠের বাড়িতে বাস করিতেন। ডক্টর স্পুনারের কুম্রাহারে খননাবিষ্কারের ফলে জানা গিয়াছে যে, বাড়ির ভিত্তিগুলি নির্ম্মাণে পাথর ব্যবহৃত হইত।

বিনয়পিটকে জন্তাঘরের উল্লেখ আছে; ঐ ঘরে লোকেরা গরম জলের বাষ্পে স্নান করিত। পণ্ডিত রীজ-ডেভিড্‌স (*Buddhist India*, p. 74) অনুমান করেন যে, ঘরগুলি ইট অথবা পাথরের তৈরি উঁচু ভিত্তির উপর নির্ম্মিত হইত, ভিত্তিতে উঠিবার সিঁড়ি ছিল, এবং বারান্দার চারিদিকে বেষ্টনী ছিল। ছাদ ও দেয়াল সাধারণতঃ কাঠেরই তৈরি হইত, কিন্তু তাহার উপর প্রথমতঃ চামড়া এবং তাহার উপর চুন ও বালির আস্তরণ দেওয়া হইত। দেওয়ালের নীচের দিক অবশ্য ইষ্টক-

নির্ম্মিত হইত। এই স্নানাঘরের সঙ্গে একটি ভিতরের ঘর এবং একটি গরম ঘর সংলগ্ন থাকিত; তাহা ছাড়া স্নানের জন্য একটি গরম জলের আধারও রাখা হইত।

ব্রাহ্মণ ও উপনিষদের যুগে ভারতবর্ষের পাঁচটি বিভাগের কথা আমরা জানি—মধ্যদেশ, প্রাচ্য, প্রতীচ্য, উদীচ্য এবং দক্ষিণ দেশ। বৌদ্ধগ্রন্থকারেরা, এমন কি ফাহিয়ান, হিউয়েন সাঙ্ প্রভৃতি চীন-পরিব্রাজকেরাও এই পাঁচটি বিভাগের কথা জানিতেন। বিনয়গ্রন্থসমূহে মধ্যদেশকে বলা হইয়াছে মঝ্‌ঝিম দেশ; মনুর ধর্ম্মশাস্ত্রে মধ্যদেশেরই উল্লেখ আছে; পাতঞ্জল গ্রন্থে বলা হইয়াছে 'আর্য্যাবর্ত্ত'; এবং বৌধায়ন বলিয়াছেন 'শিষ্টদেশ'। কিন্তু মধ্যদেশের পূর্ব্বসীমানা লইয়া ইহাদের মধ্যে মতভেদ আছে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে মধ্যদেশ বলিতে সরস্বতী ও দৃশদ্বতী নদী দুইটির মধ্যবর্ত্তী দেশকেই বুঝায়। প্রাচীন কুরুরাজ্য পাঞ্চাল-রাজ্য এবং উশীনর ও বৎস রাজ্য এই মধ্যদেশেই অবস্থিত ছিল। মনুর সময়ে মধ্যদেশের পূর্ব্ব সীমানা এলাহাবাদ বা প্রয়াগ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল; উত্তর সীমানায় ছিল হিমালয়, এবং দক্ষিণ সীমানায় ছিল বিনশন (সরস্বতী নদীর বিলয়-স্থান)। কবি রাজশেখরের সময়ে পূর্ব্ব সীমানা আরও পূর্ব্বদিকে বারাণসী পর্য্যন্ত বিস্তার লাভ করিয়াছিল। বৌদ্ধ-গ্রন্থকারদের মতে মধ্যদেশের পূর্ব্ব সীমানা ছিল, কজঙ্গল বা রাজমহলের পূর্ব্বদিকে মহাসাল; কিন্তু দিব্যাবদানের মতে মধ্যদেশ বিস্তৃত ছিল পুণ্ড্রবড্ঢন বা পৌণ্ড্রবর্দ্ধন পর্য্যন্ত। মনোরথপূরনী নামক বৌদ্ধ-গ্রন্থে (পৃঃ ৯৭-৯৮) মধ্যদেশের সুবিস্তৃত সীমানার উল্লেখ আছে। এই গ্রন্থের মতে মধ্যদেশের উত্তরে উশীরগিরি বা উশীরধ্বজ, পশ্চিমে থূন নামক ব্রাহ্মণ গ্রাম (সরস্বতী নদীর তীরে থানেশ্বর), দক্ষিণে সেতকন্নিক (নিগম), দক্ষিণ-পূর্ব্ব দিকে সল্লবতী (অথবা সলিলবতী) নদী, পূর্ব্ব দিকে কজঙ্গল-নিগম এবং তাহারও পূর্ব্ব দিকে মহাসাল। এই পুস্তকে আরও উল্লেখ আছে যে, মঝ্‌ঝিম দেশ দৈর্ঘ্যে ছিল তিন শত যোজন, প্রস্থে আড়াই শত যোজন, এবং তাহার পরিধি নয় শত যোজন।

মহাগোবিন্দ সুত্তন্তে (*Digha Nikaya*, vol.II.) ভারতবর্ষের সাতটি বিভাগের উল্লেখ আছে। রাজা রেণুর রাজ্যের সাতটি বিভাগ ছিল; (১) কলিঙ্গদের দন্তপুর, (২) অস্সকদের পোতন, (৩) অবন্তীদের মাহিস্সতী, (৪) সোবীরদের রোরুক, (৫) বিদেহদের মিথিলা (৬) অঙ্গদের চম্পা এবং (৭) কাশীদের বারাণসী রাজ্য। অঙ্গুত্তর নিকায়ে (vol. I, p. 213) ষোলটি মহাজনপদের উল্লেখ আছে; অঙ্গ, মগধ, কাশী, কোশল, বজ্জি, মল্ল, বংস, কুরু, পাঞ্চাল, মচ্ছ, সুরসেন, অস্সক, অবন্তী, গান্ধার এবং কম্বোজ। জনবসভ সুত্তন্তেও (*Digha Nikaya*, vol.II.) কাশী-কোশল, বজ্জি-মল্ল, চেতি-বংস, কুরু-পাঞ্চাল, এবং মচ্ছ-সুরসেন জনপদের উল্লেখ আছে। ইন্দ্রিয় জাতকেও (Fausböll, *Jataka*, vol. III) আরও কয়েকটি জনপদের নাম আছে: সুরথ (সুরাট), লম্বচুলক, অটবী, অবন্তী, দক্ষিণাপথ, দণ্ডকারণ্য, কুম্ভবতীনগর, মঝ্‌ঝিমপদেশের অরঞ্জর পার্ব্বত্য জনপদ। মোগ্‌গলিপুত্ত-তিস্‌স (তিষ্য)থের যে-যে দেশে বৌদ্ধ-প্রচারক পাঠাইয়াছিলেন, মহাবংশে (পৃ. ৯৪) তাহার উল্লেখ আছে —যথা, কাশ্মীর, গান্ধার, মহিষমণ্ডল, বনবাস, অপরান্তক, মহারট্‌ঠ, যবন দেশ, হিমালয় দেশ, সুবর্ণভূমি, এবং লঙ্কা। মহাবংশে (পৃ. ৯৬) বঙ্গ, কলিঙ্গ, ও লাট দেশেরও উল্লেখ আছে। মিলিন্দ-পঞ্‌ঞ নামক গ্রন্থে শক ও যবন দেশ, চীন বা বিলাত (Tartary) দেশ, অলসন্দ (Alexandria) নিকুম্ব, বারাণসী, কোশল, কাশ্মীর ও গান্ধার দেশের উল্লেখ আছে।

দীপবংশ নামক গ্রন্থে (পৃঃ ২৬-২৮) উত্তর-ভারতের কয়েকটি প্রধান নগরের নাম আছে; যথা, কুশবতী রাজগহ (রাজগৃহ), মিথিলা, পকুল, অযুঝ্‌ঝনগর, বারাণসী, কপিলনগর, হত্থীপুর, একচক্‌খু, বজির, মধুরা, অরিট্‌ঠপুর ইন্দপত্ত, কোশম্বী, কন্নগোছ, রাজনগর, চম্পকনগর, তক্‌খসীলা, কুশীনারা, এবং মলিত্থির (তম্বলিত্থি)। পরমত্থজোতিকা নামক গ্রন্থে (vol. 1, p. 69) মদ্রদেশে এক সাগল নগরের উল্লেখ আছে; আবার থেরীগাথা টীকায় (পৃঃ ১২৭) মগধে আর এক সাগল নগরের নামও জানা যায়। মিলিন্দ-পঞ্‌ঞে (পৃঃ ১) উত্তর-পশ্চিম-সীমান্তে আর এক তৃতীয় সাগল নগরের উল্লেখ আছে।

দীঘনিকায়ের মহাপরিনিব্বাণ সুত্তে (*Digha*, vol. II.) চম্পা, রাজগহ, সাবত্থী, সাকেত, কোশম্বী, ও বারাণসী প্রভৃতি নগরের উল্লেখ আছে। চেতিয় জাতকে (*Jataka*, vol. III) উত্তর-ভারতে হত্থিপুর, অস্সপুর, সীহপুর উত্তর পাঞ্চাল এবং ব্দ্দরপুর নগর প্রতিষ্ঠার উল্লেখ আছে।

মজ্ঝিম নিকায়ে (vol. I, p. 39) বাহুকা, সুন্দরিকা, সরস্বতী এবং বাহুমতী নদীর উল্লেখ আছে; অঙ্গুত্তর নিকায়ে (vol. II) গঙ্গা, যমুনা, অচিরবতী, সরভূ, মহী, অনোতত্ত, সীহপপাত, রথকার, কন্নমুণ্ড, কুনাল, ছদ্দন্ত মন্দাকিনী নদীর নাম পাওয়া যায়। মিলিন্দ-পঞ্হে সিন্ধু, সরস্বতী, বেত্রবতী, বিতংসা এবং চন্দভাগা নদীর উল্লেখ আছে।*

* এই সকল স্থান নদী প্রভৃতির বর্ত্তমান নাম ও অবস্থিতি সম্বন্ধে কানিংহাম্ সাহেবের *Ancient Geography of India* (ed. by S. N. Majumdar) এবং শ্রীযুক্ত নন্দলাল দে মহাশয়ের *Geographical Dictionary of Ancient and Mediaeval India* (2nd ed. 1927) দ্রষ্টব্য।

যতদিন যতক্ষণ যয় দণ্ড থাকি

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী

যতদিন যতক্ষণ, যয় দণ্ড থাকি,
মুহূর্ত্তের তরে আমি নই ত একাকী,
বিশ্বব্যাপী দেবতার প্রাণের পরশ,
আমার অন্তর তলে সঞ্চারে হরষ,
আলো মোরে স্পর্শ দেয়, বায়ু কথা বলে;
নিশার তিমির পটে যে তারকা জ্বলে
বাণী তার অনির্ব্বাণ, আরও আছে কত,
সুদূর শৈশব হ'তে, নিত্য ও নিয়ত
যত কথা, যত ছবি, যে স্মৃতি-সম্ভার
রচি দিল চৈত্য মঠ অন্তরে আমার;
আকাশে হারায়ে গেল যত স্বপ্ন মম,
দেবতার অনবদ্য পুষ্পবৃষ্টি সম,
অসীম ব্যাপিয়া আজও গন্ধ তার ভাসে,
বসন্ত রচনা করে, পুষ্প হয়ে হাসে,
মর্ম্মে মর্ম্মরিয়া যায় গানের আভাস,
কোকিলের কল-কণ্ঠে মিলন আশ্বাস।
তাই থেকে থেকে মোর আনমনা মনে,
তোমরা ঘরের সাথী ছায়া-ছবি সনে
অভিন্ন হইয়া যাও, স্বপ্ন সত্য হয়,
বাস্তব অস্তিত্ব হীন যেন কিছু নয়!

মনের ভ্রমণ

শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন, এম-এ

বেহার অঞ্চলে অনেকগুলি দ্রষ্টব্য স্থানই সাধারণ বাঙালীর জানা আছে; প্রত্যক্ষভাবে না হউক, পরোক্ষভাবে আমরা দেশের সৌন্দর্য্য উপভোগ করি। কিন্তু পাটনার অতি নিকটে থাকিয়াও মনেরের নাম বড়-একটা শোনা যায় না। ইহার কারুকার্য্য কিন্তু জনসমাজে আরও আদর পাইবার উপযুক্ত, শিল্পকৌশলের সুন্দর নিদর্শন। পাটনার অতি নিকটে বলিয়া পাটনা-প্রবাসী বাঙালী সম্ভবতঃ মনেরে গিয়া থাকিবেন। বিজ্ঞানের যুগে যান-বাহনের সুব্যবস্থায় মনের ঘুরিয়া আসা আদৌ কঠিন নয়; যাঁহারা কষ্ট করিয়া একবার দেখিতে যাইবেন, তাঁহাদের কষ্টস্বীকার সার্থক হইবে, এইটুকু আশ্বাস দেওয়া যাইতে পারে।

আমরা যেদিন দেখিতে যাই সেদিন ছিল এই ইংরেজী বৎসরের প্রথম দিন। ছুটি থাকাতে সেদিন অনেকেই আমাদের সহযাত্রী হইয়া পড়িয়াছিল। মুসলমানদেরও সেদিন ছিল পুণ্যদিন, দলে দলে যাত্রী নানা দিক হইতে মনের অভিমুখে আসিতেছিল। গঙ্গার ধার দিয়া বাঁধা রাস্তা; সেই প্রশস্ত রাজপথে অনেকটা দূর আমরা সেই পথ দিয়াই অতিক্রম করিলাম। পাটনা শহর, সুতরাং শীতকালে ভিন্ন অন্য সময় দিবা দ্বিপ্রহরে বাহির হইলে তাহা নিশ্চয়ই বিশেষ সুখদায়ক হইত না। শীতের মধ্যাহ্নে যতটা রৌদ্রতাপ সহ্য করিতে হইত, শীকরকণাপৃক্ত বায়ু তাহাও দূর করিয়া দিল।



ছোটা দরগা

পথে পড়িল দানাপুর সেনানিবাস। এখান হইতে মনের দশ মাইল মাত্র। নূতন বৎসরের প্রথম দিন,—দলে দলে সৈনিকদিগকে পথে বেড়াইতে দেখিলাম। সকলেরই যেন আজ অখণ্ড অবসর, কাহারও কোনও ব্যস্ততা নাই। মনেরে পৌছিতে প্রায় তিনটা বাজিল; একটি বেশ ভাল ডাকবাংলা আছে, মোটর ও সাজ-সরঞ্জাম সেখানে রাখিয়া সদলবলে দেখিতে বাহির হইলাম। শতাধিক বৎসর পূর্ব্বে জনৈক ইউরোপীয় ভ্রমণকারী,* পরবর্ত্তী বিদেশী পর্য্যটকদের সাহায্যের জন্য লিখিয়া গিয়াছেন, পাটনা হইতে দানাপুর নৌকাযোগে যাইতে আট ঘণ্টা সময় লাগে! তাহার স্থানে আজ এক ঘণ্টারও কম সময় প্রয়োজন।

ডাকবাংলা হইতে বাহির হইয়া প্রথমেই এক দীঘি; ইহার সঙ্গে শোণ-নদের যোগ আছে, চার শত ফিট দীর্ঘ

* *Bengal, Past & Present*, 1926.

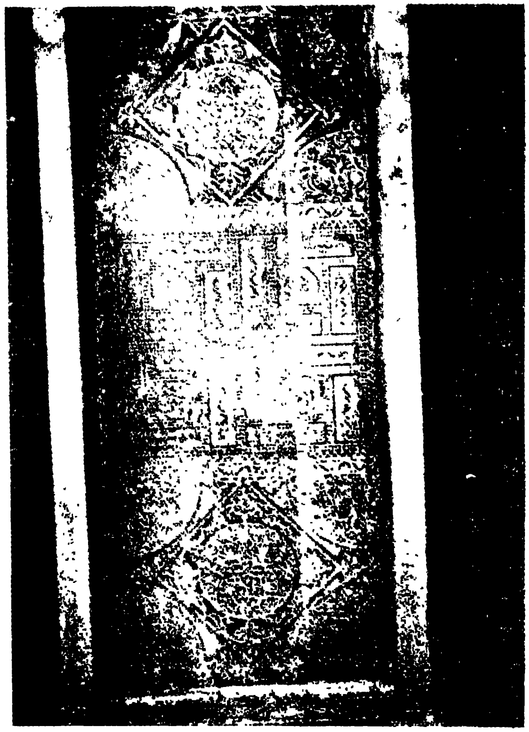
এক টানেল ইহাকে শোণের সহিত যুক্ত রাখিয়াছে। দক্ষিণ দিকে একজন প্রসিদ্ধ মুসলমান সাধকের সমাধিস্থান—"বড়া দর্‌গা।" শেখ্ ইয়াহিয়া মনের-ই বা মখ্‌দুম ইয়াহিয়া এখানে দেহ রক্ষা করিয়াছেন। মনেরেই ইহার জন্মস্থান ছিল, ১২৯০-৯১ খ্রীষ্টাব্দে দেহান্ত হয়। আজ



ছোটী দর্‌গার এক কোণের দৃশ্য

তাঁহার মৃত্যুদিন বলিয়া এখানে বিস্তর লোকসমাগম হইয়াছে। দর্‌গায় প্রবেশ করিয়া দেখিলাম তিনটি সমাধিস্থান রহিয়াছে; তাহার মধ্যে একটি পূর্ব্বোক্ত মখ্‌দুম ইয়াহিয়া মনের-ই-র, অন্য একটিতে তাঁহার কাকা ও অপরটিতে তাঁহার স্ত্রীর সমাধি।

তারপর ছোটী দর্‌গায় গেলাম। ইহা দেখিতে বড়, কিন্তু নামে ছোট, তাই বোধ হয় ইহার নাম "ছোটী দর্‌গা।" এখানে মখ্‌দুম দৌলত শাহের সমাধিস্থান আছে। মখ্‌দুম দৌলত শাহ পূর্ব্বোক্ত সাধকের (ইয়াহিয়া মনের-ই-র) ভাগিনেয়, তখনকার বেহারের সুবাদার ইব্রাহিম খাঁর গুরু। ১৩০৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি মারা যান, আর ১৩১৬ খ্রীষ্টাব্দে ইব্রাহিম খাঁ সমাধিস্থান নির্ম্মাণ শেষ করেন। ছোটী দর্‌গার চার কোণে চারিটি সুন্দর স্তম্ভ আছে; ইহা দক্ষিণমুখী; পূর্ব্বোক্ত দীঘির উপরেই। দর্‌গার মধ্যভাগে ছাদের পূর্ব্বদিকে আরবী অক্ষরে লেখা আছে—"আতাল কুর্সী, বিসমোল্লা।" পাটনা



ছোটী দর্‌গার ছাদের ভিতরকার দৃশ্য—এক দিক

গেজেটিয়ারে ইহার নির্ম্মাণকাল ১৬১৬ খ্রীষ্টাব্দ দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু এরূপভাবে সময়-নিরূপণ করা অতি দুর্ঘট ব্যাপার। ওল্ডহ্যাম সাহেব বলিয়াছেন, ইহা নাকি গুজরাত হইতে কারিগর আসিয়া তৈয়ারী করিয়াছে, এবং মন্দির নির্ম্মাণপদ্ধতিতে তাহার আভাস পাওয়া যায়। অভিজ্ঞ দর্শক হয়ত এ বিষয়ের মীমাংসা করিতে পারিবেন। কিন্তু ইহা যে "বঙ্গদেশে মোগলদের সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর কীর্ত্তি" একথা বুকানান হ্যামিল্টনের মত লোকও বলিয়া গিয়াছেন। সে সূক্ষ্ম কারুকার্য্যের কথা আর কি বলিব! কি করিয়া তাহার যথেষ্ট প্রশংসা করি! ছোটী দর্‌গার ভিতরকার ছাদে যে সংযত সৌন্দর্য্যরুচির

পরিচয় পাওয়া যায়, যে কল্পনা-সংস্থানের নিদর্শন মিলে, এক কথায় বলিতে গেলে তাহা অপূর্ব্ব, অথচ অপূর্ব্ব বলিলে তাহার কিছুই বলা হইল না। আধুনিক যুগেও তাহা বিগতশ্রী হয় নাই, কালের অত্যাচারে তাহা অপরিম্লান হইয়া রহিয়াছে।

মনেরকে কেন্দ্র করিয়া এক প্রশস্ত ভূখণ্ড মুসলমান সাধকের সাধনার পবিত্র চিহ্ন ধারণ করিতেছে। বড়ী দর্‌গায় যে শেখ ইয়াহিয়া মনের-ই বিশ্রামলাভ করিয়াছেন তাঁহার পুত্র মখ্‌দুম শরিফুদ্দীনের স্মৃতিতে বিহার মহকুমা শরিফ্ অর্থাৎ পূত হইয়া আছে। যাঁহারা রাজগিরে গিয়াছেন তাঁহারা মখ্‌দুম কুণ্ডের কথা স্মরণ করিবেন; মখ্‌দুম শাহ্ শেখ শরিফুদ্দীন সেখানে এক গুহামধ্যে চল্লিশ দিন উপবাসে ও আরাধনায় কাটান। আবার অতি নিকটে গয়াতে ইঁহার অতি নিকট আত্মীয়া বিবি কামালোর সমাধি। বিবি কামালো সম্বন্ধে অনেক অদ্ভুত কাহিনী সমাজে প্রচারিত আছে। সেকেন্দর লোদী ও বাবর এখানে আসিয়াছিলেন। বাবরের আত্মচরিত হইতে জানা যায় প্রায় চারি শত বৎসর পূর্ব্বে (১৫২৮ খ্রীষ্টাব্দের ২৭এ এপ্রিল তারিখে) বাবর দেশজয় উপলক্ষে শোণ-নদের অপর পারে আসিয়া পৌঁছান; সেখানে মনেরের কথা শুনিতে পাইয়া শোণ পার হইয়া চিস্তি সম্প্রদায়ের শীর্ষস্থানীয় শেখ ইয়াহিয়ার কবর দেখিতে আসিলেন। তিনি সমাধিস্থানের চারিদিকে প্রদক্ষিণ করিয়া নিকটে যে-সব ফলের বাগান ছিল তাহা বেড়াইয়া দেখিলেন এবং নমাজ সারিয়া শিবিরে ফিরিলেন। তখনকার দিনে মনের হইতে গঙ্গা আরও বেশী দূরে ছিল।

বড়ী দর্‌গার উত্তর-পূর্ব্বে এক অর্দ্ধভগ্ন গজারূঢ় শার্দ্দূল মূর্ত্তি চোখে পড়িল। শুধু সিংহ বা ব্যাঘ্র দেখিলে তাহার শক্তির দিকটা দর্শকের কাছে তেমন স্পষ্ট হয় না বলিয়া গজদলনকারী মূর্ত্তি শিল্পীর অধিক প্রিয়। উড়িষ্যায় এই ধরণের বহু মূর্ত্তি আছে,—বিপুল বিক্রমে সিংহ হস্তীকে পায়ে চাপিয়া রাখিয়াছে,—"ছিঁড়া-উঁড়া-গজ-সিংহ। এই গজ-বিমর্দ্দনকারী জন্তুটি কিন্তু সিংহ নয়, "শার্দ্দূল"। এইরূপ শক্তিধর মূর্ত্তি হিন্দু রাজাদের, হিন্দু শিল্পীদের অতি প্রিয় বস্তু ছিল; তাই এখানে অতীত হিন্দুগৌরবের এক মাত্র নিদর্শন হইয়া আজিও লুপ্তপ্রায় হিন্দুপ্রতিষ্ঠার সাক্ষী হইয়া উহা দাঁড়াইয়া আছে।

শুনিতে পাই, মনের এক সময়ে বেহারের কেন্দ্রস্থল



বড়ী দর্‌গার নিকটে 'শার্দ্দূল'

ছিল। মনের ও তাহার চারি পাশের বহু পরগণার রাজা ছিলেন মণিরাম—তাঁহার নাম হইতেই নাকি 'মনের' এই নামকরণ হইয়াছে।

বহুদিন হইতেই তাঁহার রাজ্যের উপর মুসলমানদের লোভ ছিল; কিন্তু কিছুতেই তাঁহাকে আঁটিয়া উঠিতে পারিতেছিল না। তখন তাহারা আরব দেশ হইতে ইমাম তেগ ফতে সাহেবকে আনাইল। ইমাম সাহেবের ধর্ম্মানুরাগে ও অলৌকিক ক্ষমতায় রাজা খুশী হইয়া অনেক জায়গীর দিলেন; ক্রমে নানাস্থান হইতে মুসলমানেরা আসিয়া সেই সব স্থানে বসবাস করিতে আরম্ভ করিল।

একদিন অল্প কয়েকজন সঙ্গী লইয়া রাজা শিকারে বাহির হইয়াছেন, এমন সময় পূর্ব্বপরামর্শ ও ব্যবস্থা অনুসারে শত্রুদের অতর্কিত আক্রমণে তিনি নিহত হইলেন, রাজপ্রাসাদ ভস্মীভূত হইল।

সে রাজবাড়ির আর কিছুই অবশিষ্ট নাই, শুধু ঐ পূর্ব্বকথিত গজোপরি আরূঢ় শার্দ্দূল মূর্ত্তি আর ঐ দীঘিকা। ইমাম তেগ ফতে সাহেব ছিলেন শেখ ইয়াহিয়ার পিতামহ।

যাহা কিছু দ্রষ্টব্য ছিল তাহা দর্শন করিয়া দিঘীর পার দিয়া ফিরিলাম। ডাকবাংলায় সেদিন অন্ততঃ জন-কুড়ি সাহেব মেমসাহেব আসিয়া ভিড় করিয়াছিলেন। একটু নিভৃতে বৈকালিক জলযোগের ব্যাপার শেষ করিয়া ডাক্তার-বন্ধুর গাড়ীতে ফিরিয়া রওনা হইলাম।

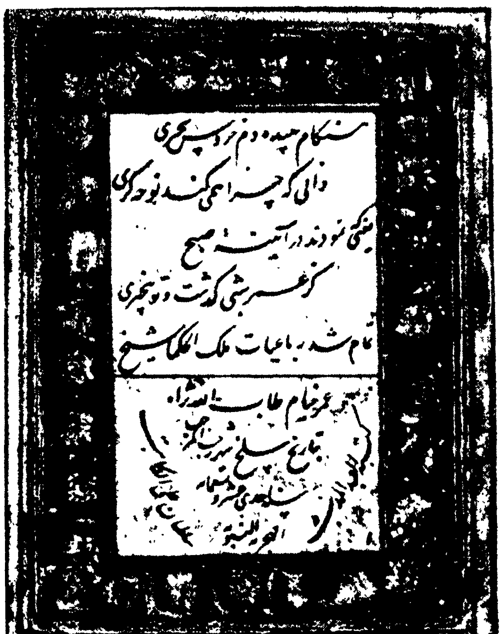
আজকাল মনের কিন্তু এই বড়-ছোট কোনও দরগার জন্য তেমন প্রসিদ্ধ নয়—যেমন এখানকার একপ্রকার লাড্ডুর জন্য। ইহা বাংলার মতিচূরের মত, শুধু গন্ধে প্রভেদ আছে। মনেরের সেই সুমিষ্ট লাড্ডুর কথা মনে করিয়া ও তাহার স্বাদ উপহার দিতে পারিব না বলিয়া (বিশেষ, পরের মুখে ঝাল বা মিষ্ট কিছুই খাইতে নাই) এখানেই নির্ব্বাক হইলাম।*

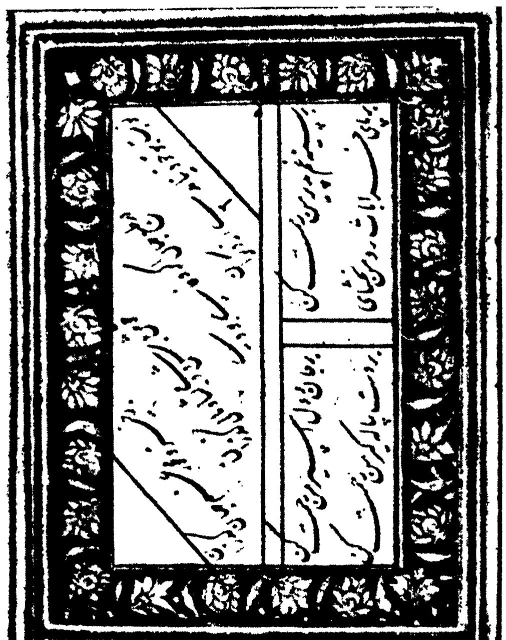
* প্রবন্ধের সহিত প্রকাশিত চিত্রগুলি শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ ঘোষ দস্তিদারের সৌজন্যে প্রাপ্ত।

ওমর খায়ামের একখানি প্রাচীন পুঁথি

শ্রীহরিহর শেঠ

ওমর খয়ামের যে-সকল প্রাচীন পুঁথি এ পর্য্যন্ত পাওয়া গিয়াছে তন্মধ্যে বিলাতের বড্‌লিয়েন নামক সুবিখ্যাত গ্রন্থাগারে যাহা রক্ষিত আছে তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। উহার তারিখ ৮৬৫ হিজরা (১৪৬০





লিপিকরের প্রতিলিপিকরণের স্থানকালাদির বিবরণ

খৃষ্টাব্দ)। পারস্যের কবি ওমর খায়ামের মৃত্যুকাল জানা গিয়াছে ১১২৩ খৃষ্টাব্দ, সুতরাং তাঁহার রচিত রুবাই-গুলির প্রাচীনত্ব আট শত বৎসর। এই সুদীর্ঘকালের মধ্যে মুদ্রাযন্ত্র প্রচলনের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত কত গুণগ্রাহী রসজ্ঞ সুলতান বাদশাহ ইহার কত পুঁথি যত্নের সহিত প্রস্তুত করাইয়াছেন তাহার ইয়ত্তা নাই। সে-সকলের মধ্যে কত লোপ পাইয়াছে আর এখনও কত আছে তাহাও কিছু স্থির নাই।

কিছু দিন পূর্ব্বে কলিকাতার একটি ক্ষুদ্র গলির মধ্যে একটি সামান্য বইয়ের দোকানে ওমর খায়ামের একখানি অতি সুন্দর সচিত্র পুঁথি পাওয়া গিয়াছিল। "দি ইলাস্‌ট্রেটেড লণ্ডন নিউজ" পত্রিকায় প্রকাশিত তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ হইতে এখানে দুই এক কথা বলিব। এই পুঁথি দীর্ঘকাল অজ্ঞাত ভাবে উল্লিখিত দোকানে পড়িয়াছিল, তৎপরে অকস্মাৎ উহা অধ্যাপক নাজির আসরফের দৃষ্টিতে পতিত হওয়ায় তিনি তাঁহার পারিবারিক পুস্তকাগারের জন্য তাহা ক্রয় করেন। পরিশেষে তিনি উহা পাটনা জেলায় তাহার স্বগ্রামের লাইব্রেরীতে প্রদান করেন।

এই পুঁথিতে লিখিত প্রতিলিপিকারের নাম ও লিখনের সময় যাহা লেখা আছে তাহা হইতে জানা যায় যে,১৫০৫ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে উহার লিখন সমাপ্ত হইয়াছে। পাণ্ডুলিপির ভূমিকার পৃষ্ঠাখানি না থাকায় ইহার সম্বন্ধে এই পাঁচ শতাব্দীর কোন ইতিহাসই জানিবার বা পারস্য হইতে ভারতবর্ষের এই মহানগরীতে ইহা কিরূপে আসিল তাহা বুঝিবারও উপায় নাই। একটু লেখা হইতে এই মাত্র জানা যায়, যে, পঞ্জাবের শিয়ালকোট জেলায় পাসরার গ্রামের দেবীদাস নামক একজন হিন্দু বিদ্যার্থী ইহার স্বত্বাধিকারী ছিলেন। আর জানা যায় বেনারসের শামিন্ আহম্মদ্ নামক কোন দপ্তরি ১৮৯১ অব্দে পুঁথিখানি মেরামত করিয়াছিল। একটু হিন্দুস্থানী লেখা হইতে আরও জানা যায়, যে, পূর্ব্বে এই পাণ্ডুলিপিখানির হাঁসিয়া আরও প্রশস্ত ছিল, উহা খারাপ হইয়া যাওয়ায় ১৮৯১ সালে বাঁধাইবার সময় ছোট করা হইয়াছে। ইহার



পুঁথির একখান চিত্র

প্রথমকার প্রায় কুড়িখানি পৃষ্ঠা এরূপ ভঙ্গপ্রবণ ও বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে যে, তাহা দেখিলেই বুঝা যায় দেবীদাসের বংশধরদের অযত্নেই উহার এই দশা প্রাপ্তি হইয়াছে।

এই ক্ষুদ্র পুঁথিখানির আকার ৬×৪॥; ৪॥×৩, চতুশ্চত্বারিংশৎ পৃষ্ঠা। ইহাতে মোট ২০৬-টি চতুষ্পদী শ্লোক আছে। ইহার চিত্রসম্পদ, সাজসজ্জার মনোহারিত্ব, অত্যুৎকৃষ্ট লিপিচাতুর্য্য অতুলনীয়। ইতি-পূর্ব্বে ওমর খায়ামের এত সুন্দর পুথি কোথাও আবিষ্কৃত হয় নাই। ইহা উজ্জ্বল কৃষ্ণবর্ণের কালির

দ্বারা লিখিত। প্রতি পৃষ্ঠার চারিদিকে সোনালি ও অন্যান্য বিবিধ বর্ণের পুষ্পলতা চিত্রিত। ইহার পার্শ্বে যে আর এক দফা চিত্র ছিল তাহা নষ্ট না হইলে উহা যে কত মনোরম দেখাইত তাহা এক্ষণে অনুমান



পুঁথির অন্য একখানি চিত্র

করা ভিন্ন উপায় নাই। এই বিচিত্র গ্রন্থের প্রতিলিপি-কারের নাম সুলতান আলি। তিনি সে-সময়ের পারস্যের একজন জগৎপ্রসিদ্ধ লিপিকার বলিয়া খ্যাত ছিলেন। চিত্রগুলি কাহার দ্বারা অঙ্কিত তাহার কোন উল্লেখ নাই। খুব সম্ভব সমসাময়িক কোন প্রসিদ্ধ চিত্রকরের দ্বারা উহা চিত্রিত। স্বর্ণ ও অন্যান্য যে-সকল উপাদানে উহা রঞ্জিত করা হইয়াছে তাহা যেরূপ মূল্যবান তাহাতে উহা কোন নরপতির জন্য প্রস্তুত হইয়াছিল বলিয়াই অনুমিত হয়। খুব সম্ভব পারস্যের সুপ্রসিদ্ধ শিল্পরসজ্ঞ সুলতান হোসেন বাইকুরার জন্য উহা প্রস্তুত হইয়াছিল। তিনি ১৪৫৭ হইতে ১৫০৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। এই সুলতান হোসেন তৎকালে পারস্যে নবধারায় গ্রন্থলিখন,চিত্রণ ও বাঁধাই প্রভৃতির উৎকর্ষের প্রবর্ত্তক বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার সময়ের বাঁধাই প্রভৃতির মনোহারিত্ব আজিও অতুলনীয়। এক কথায় বইখানি তৎকালীন পারস্যের গ্রন্থ পারিপাট্যের একটি উজ্জ্বল নমুনা।

পুঁথিখানিতে পাঁচখানি চিত্র আছে। এই চিত্রগুলি যদিও সুপ্রসিদ্ধ চিত্রকর বিজাদ্ বা তাঁহার খ্যাতনামা শিষ্য শেক্‌জাদা মহম্মদের চিত্রের তুলনা হীন, তাহা হইলেও ইহা এরূপ কোন চিত্রকরের দ্বারা অঙ্কিত যাহার শিক্ষা বিজাদের চিত্রশালায়। পুঁথিখানির শিল্পচাতুর্য্যের কথা ছাড়িয়া দিলেও ইহার মূলান্তর্গত আবশ্যকতাও কম নহে। ওমার খায়াম সম্বন্ধীয় যে-সকল গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে তন্মধ্যে অধ্যাপক আর্থার ক্রুষ্টেন্‌সনের সম্পাদিত গ্রন্থখানি প্রামাণ্য। তিনি কবির ১২১৩-টি রুবাই সম্বলিত একটি সংস্করণ প্রকাশিত করিয়াছেন, তন্মধ্যে যে ১২১টিকে সম্ভবতঃ আসল বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, এই পুঁথিতে লিখিত ২০৬-টির মধ্যে ৭৪টি উক্ত গ্রন্থের নির্দ্দিষ্ট তালিকান্তর্গত। সুতরাং সকল দিক দিয়াই দেখা যাইতেছে ওমর খায়েমের রুবায়েতের এই পুঁথিখানি অতি মূল্যবান।

রাজা

শ্রীমনোজ বসু

উড়ো খবর নয়—পোষ্টকার্ডের চিঠি, সুধীর নিজ হাতে লিখিয়াছে।

"বাবা, বহু দিন আপনাদের কুশল-সংবাদ না পাইয়া চিন্তিত আছি। শনিবার বারোটার গাড়ীতে বাড়ি পৌঁছিয়া শ্রীচরণ দর্শন করিব এবং বিস্তারিত সাক্ষাৎ মতে নিবেদন করিব।"

শনিবার অর্থাৎ আগামী কাল। নিবারণ তাড়াতাড়ি বাড়ির মধ্যে খবর জানাইলেন। পুরা দুইটি বছর অন্তে ছেলে বাড়ী আসিতেছে। ছুটি পায় নাই বলিয়া নহে, বরঞ্চ এতদিন ছুটি ছিল দিবা-রাত্রি চব্বিশ ঘণ্টাই। চাকরির উমেদারীতে এ-যাবৎ যত হাঁটাহাঁটি করিয়াছে তাহার সমষ্টিতে বোধ করি পদব্রজে ভারতবর্ষ হইতে ল্যাপল্যাণ্ড অবধি পরিভ্রমণ সারা হইয়া যায়। যাহা হউক চাকরি জুটিয়াছে, ভাল চাকরি এবং এই প্রথম ছুটি।

পাঁজি খুলিয়া নিবারণ মনোযোগ সহকারে শনিবার তারিখটার গোড়া হইতে আগা অবধি পড়িয়া ফেলিলেন, একটা কিছু পূজাপার্ব্বণ চোখে পড়িল না। ছুটিটা কিসের সাব্যস্ত হইল না। বুধবারে ইদের বন্ধ আছে বটে, চিঠির তারিখটা শনিবার কি বুধবার লিখিয়াছে—দৃষ্টি-বিভ্রম হইতে পারে, ভাল করিয়া আর একবার মিলাইয়া দেখিতে বালিশের নীচে হাত দিলেন, তারপর বিছানা উল্টাইয়া ফেলিলেন, তবু চিঠি পাওয়া গেল না। যতদূর মনে পড়ে, বালিশের তলায় রাখা ছিল, তবে যায় কোথায়?

চিঠি তখন চলিয়া গিয়াছে উত্তরের ঘরে বাদাম-তলার দিককার জানালার কাছে। চোরে চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছে—চোর কিরণমালা। চার পাঁচ লাইনের চিঠি, কিন্তু খুকীর জালায় কথা কয়টা স্থির হইয়া পড়িবার জো আছে? থাবা দিয়া ধরিতে যায়। অবশেষে ছোট ননদ পটলীকে অনেক খোসামোদ করিয়া তাহার কোলে খুকীকে পাড়ায় পাঠাইয়া দিল। তারপর কিরণ এদিক ওদিক তাকাইয়া আর একবার সবেমাত্র কাপড়ের ভিতর হইতে বাহির করিয়াছে, আবার বিপদ! শাশুড়ী আসিয়া ঢুকিলেন। কিরণ চিঠি ঢাকিয়া ফেলিল। শাশুড়ী সেকেলে মানুষ, অতশত দেখেন না; আসিয়াই বলিলেন—বৌমা, বিছানার চাদর ওয়াড়-টোয়াড়গুলো খুলে দাও ত শীগ্‌গীর—এখন ক্ষারে সেদ্ধ ক'রে রাখি, ভোর থাক্‌তে থাক্‌তে কেচে দেব—কেমন?

বধূ সায় দিয়া বলিল,—হ্যাঁ মা, কি রকম বিচ্ছিরি ময়লা হয়ে গেছে, দেখ না—

শাশুড়ী বলিলেন—খোকা বারোটার গাড়ীতে যদি আসে তার আগেই সব কেচে দেব। নোংরামি মোটে সে দুচক্ষে দেখতে পারে না। আর তোমাকেও বলে দিচ্ছি মা, এরকম পাগলীর মেয়ের মত বেড়াতে পারবে না—কালকে সকাল-সকাল নেয়ে ফিটফাট থেকো। যে যেমন চায় তেমনি থাক্‌তে হয় শহরে বাজারে থাকে, বোঝ না?

আনন্দে কিরণের বুকের ভিতরে কেমন করিতে লাগিল, হাসিও পাইল। খোকা—বুড়ো খোকা—অতবড় গোঁফওয়ালা ছেলে, এখনও মা কিনা খোকা বলিয়া ডাকেন!

এদিকে বাহিরে নিবারণের গলা উচ্চ হইয়া উঠিয়াছে। ঘটনাটা এই—নটবর কামার বছর পাঁচ সাত আগে একখানা বঁটি গড়িয়া দিয়াছিল, তাহার দরুণ এখনও তিন আনার পয়সা বাকী। উক্ত পয়সার তাগাদা করিতে আসিয়া এমন ভাবে চাপিয়া ধরিয়াছে যে, তৃতীয় ব্যক্তি কেহ উপস্থিত থাকিলে নিশ্চয় মনে ভাবিত, ঐ তিন আনার পয়সা এখনই হাতে না পাইলে বেচারা সবংশে নির্ঘাত মারা যাইবে। কিন্তু

নিবারণ বহুদর্শী ব্যক্তি, অপরে যে প্রকার ভাবুক, নটবরের জন্য তাঁহার দুশ্চিন্তা হইল না। বলিলেন—রোসো, এইবারে ঠিক—আর একটা দিন মোটে—কাল সুধীর বাড়ি আসবে, কাল আর নয়, পরশু সকালের দিকে এসো একবার—পাই পয়সাটি অবধি হিসেব করে নিয়ে যেও, নাও—কল্‌কেটা ধর—বলিয়া হুঁকা হইতে নটবরের হাতে কলিকা নামাইয়া দিয়া আবার সুরু করিলেন—শোনো নি নটবর, বল কি—শোনো নি, কানে তুলো দিয়ে থাক না কি? আমার সুধীরের মস্ত বড় চাকরী হয়েছে, দেড় শো টাকা মাইনে—

কিঞ্চিৎ বাড়াইয়া বলা নিবারণের অভ্যাস, এ গ্রামে সকলেই ইহা জানে। পাওনাদার এবং আত্মীয়স্বজনে বহুবার নিবারণের মুখে শুনিয়াছে—চাকরি ঠিক হয়ে গেছে, এখন সাহেব বিলেত থেকে পৌছতে যা দেরি। এবারে আর ভুয়ো নয়, আসছে মাসের পয়লা থেকে নিশ্চয়—। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত সাহেব কখনও বিলাত হইতে আসিয়া পৌছে নাই এবং মাসের পর মাস অনেক পহেলাই কালসমুদ্রে তলাইয়া গিয়াছে। সুধীরের চাকরির কথা তাই লোকে বড় বিশ্বাস করে না। তবে এবারের কথা স্বতন্ত্র। দোকানে বসিয়া হাপর টানিতে টানিতে নটবরও যেন কাহার মুখে শুনিয়াছে, সুধীরের ভারী কপাল-জোর, ভাল চাকরি পাইয়াছে। এখন ঐ দেড় শো টাকার কথা যদি বাদ-সাদ দিয়া অন্ততঃ সত্যকার পঁচিশ টাকাতেও আসিয়া দাঁড়ায়, তবু নটবরের তিন আনা আদায় হইবার উপায় হইয়াছে। সে পুলকিত হইল।

নিবারণ পুত্রগর্ব্বে স্ফীত হইয়া বলিতে লাগিলেন—সেদিন দাকোপার পাঁচু ঘোষের সঙ্গে দেখা—পিসি আর বৌকে নিয়ে কালীঘাট গিয়েছিল। সুধীর দেখতে পেয়ে এই টানাটানি—বাসায় না নিয়ে ছাড়লই না। পাঁচু বলে, দাদা, কর কি—মস্ত তিনমহল বাড়ি ভাড়া করেছে, ঝি-চাকর যে কতগুলো গুণে ঠিক করতে পারলাম না। মাইনে দেড় শো, আর উপরি—সকালে আপিসে যায় খালি পকেটে, সন্ধ্যেবেলা দু'পকেট যেন ছিঁড়ে পড়ে। টাকার বোঝা নিয়ে হেঁটে আস্‌তে পারবে কেন, গাড়ী করে ফির্‌তে হয়। দেখা হ'লে একবার পাঁচু ঘোষকে জিজ্ঞাসা করে দেখো।

নটবরের গা শির্ শির করিয়া উঠিল—এই সেদিনের সুধীর! তাহার দোকানের সামনে দিয়া খালি গায়ে খালি পায়ে জেলেপাড়া হইতে মাছ লইয়া আসিত। বলিল—তা বেশ—বড্ড ভাল কথা, আর আপনার দুঃখ কি, চৌধুরী মশাই, রাজ্যেশ্বর ছেলে—

নিবারণ বিনয় প্রকাশ করিয়া বলিলেন—তোমরা পাঁচ জনে ভাল বল্‌লেই ভাল। পাঁচু যা বল্‌লে—বুঝলে—শুনে তাক্ লেগে যায়—পেত্যয় হয় না। রাজরাজড়ার কাণ্ডই বটে। শুনেছ বোধ হয় এবার আমরা বাড়িসুদ্ধ কলকেতায় চলে যাচ্ছি, সুধীর এসে সেই সব ঠিক করবে—

নিবারণ চুপিচুপি কথা বলিবার লোক নহেন, বিশেষতঃ ছেলের এই সৌভাগ্যের কথা। ঘরের ভিতর হইতে কিরণ শুনিতে পাইল, সুধীর দেড় শো টাকার চাকরি পাইয়া রাজা-রাজড়ার কাণ্ড আরম্ভ করিয়াছে। কিরণ একবারও কলিকাতায় যায় নাই এবং সত্যকার রাজারা যে কি প্রকার কাণ্ড করিয়া থাকে তাহাও সঠিক আন্দাজ করিতে পারে না। এ গ্রামে সখের থিয়েটার আছে, অতএব রাজা সে অনেকবার দেখিয়াছে—গায়ে জরির ঝক্‌মকে পোষাক, মাথায় মুকুট। সুধীরের মাথার উপর মুকুট বসাইয়া দিলে কি রকম দেখায় তাহাই সে সকৌতুকে কল্পনা করিতে লাগিল। নিবারণ সত্যবাদী যুধিষ্ঠির নয়, তাহা কিরণ জানে। তবু আজিকার কথাগুলি মিথ্যা বলিয়া ভাবিতে কিছুতেই প্রাণ চাহে না। অনেকবার অনেক আশা করিয়া শেষে সমস্ত মিথ্যা হইয়া গিয়াছে, এবারে মিথ্যা হইলে সে মরিয়া যাইবে। এইটুকু জীবনে যে অনেক দুঃখ পাইয়াছে, সে এক সাতকাণ্ড রামায়ণ। ছেলেবেলায় কিরণের মা মরিয়া গেলে বাবা আবার বিবাহ করেন। নূতন মা কিরণকে মোটে দেখিতে পারিত না, এখন আর তাহাকে বাপের বাড়ি লইয়া যাইবার নামও কেহ করে না।...সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিয়াছে, বাদাম গাছের ফাঁকে চাঁদ উঠিল। কিরণের মনে

হইল যেন কোন্ অনির্দ্দেশ্য স্থানে বসিয়া তাহার অনেক দিনের হারানো মা তাকাইয়া দেখিতেছেন এবং বড় খুশী হইয়াছেন যে সুধীর রাজা হইয়াছে, আর সে—তাঁহার সেই জন্মদুঃখিনী মেয়ে, এতকালের পর হইয়াছে রাজার পাটরাণী! আয়না ও চুলের দড়ি পাড়িল, তারপর ভাবিল—দূর হোক্ গে, চুল বাঁধব না আর আজ, বেলা একেবারে গেছে। রান্নাঘরে আসিয়া উনান ধরাইতে গিয়া ভাবিল—এত সকাল সকাল কিসের রান্না! ছেলেমানুষের মত খিল্ খিল্ করিয়া হাসিতে ইচ্ছা করে, তাহার যেন কি হইয়াছে, তাহাকে ঠিক ভূতে ধরিয়াছে।

পটলী পাড়া বেড়াইয়া আসিয়া খুকীকে কিরণের কোলে ঝপ্ করিয়া ফেলিয়া দিল। তখনই ছুটিয়া বাহির হইয়া যায়। কিরণ ডাকিল—ও পটলী, যাচ্ছিস্ কোথা? শোন্—সুশীলাদের বাড়ি গেছলি? তার বর নাকি এসেছে—কলকেতায় বাসা করেছে, তাকে নিয়ে যাবে, সত্যি? পটলী দৃকপাত না করিয়া কোমরে আঁচল জড়াইয়া উঠানে কুমীর-কুমীর খেলিতে গেল। উঠানে যেন ডাকাত পড়িয়াছে, পাড়ার ছেলেমেয়েদের কোলাহলে কান পাতা যায় না, পটলী হইয়াছে কুমীর আর উত্তর ও পূব ঘরের দাওয়া হইয়াছে ডাঙা। সেই ডাঙার উপর হইতে উঠানরূপ নদীতে সকলে যেই নাহিতে নামে, পট্লী দৌড়াইয়া তাহাদের ধরিতে যায়। রান্নাঘর হইতে মেয়ে কোলে কিরণ দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিল। খুকীর মোটে চারিটা দাঁত উঠিয়াছে, কিরণ খুকীর গালের মধ্যে একবার একটা আঙুল দিয়াছে আর অমনি সে কামড়াইয়া ধরিল। ওরে রাক্কুসী ছাড়-ছাড়—মরে গেলাম, ভারী যে দাঁতের দেমাক হয়েছে তোমার! কিরণ হাত ছাড়াইয়া লইল। খুকী হাসিতে লাগিল। কিরণ খুকীর দিকে তাকাইয়া মুখ নাড়াইয়া নাড়াইয়া বলে—অত হেসো না, খুকী, অত হেসো না, সব মানিক পড়ে গেল, সব মুক্তো ঝরে গেল। মেয়ে মোটে এইটুকু, বুদ্ধি কত—সব বোঝে, চৌকাঠ ধরিয়া উঠিয়া দাঁড়ায়, আবার হাত তালি দিয়া বলে—তা—তা—তা—। কিরণ বলিল,—হাঁ করে হাবলার মত দেখছো কি? ড্যাবডেবে চোখ মেলে এক নজরে কি দেখছ আমার মানিক? খেলা দেখছ, তুমিও দেখো, বড় হও আগে। ঠাণ্ডা হয়ে বাবু হয়ে বোসো তো—এই যে দোলে—দোলে—

দোলন দোলন দুলুনী
রাঙা মাথার চিরুণী
বর আসবে যখনি
নিয়ে যাবে তখনি—

খুকী তালে তালে কেমন দোলে! কিরণ মেয়েকে মুখের উপর তুলিয়া কচি কচি নরম হাত বুক গাল চাপিয়া ধরিতে লাগিল। খুকীর খুব আনন্দ হইয়াছে, মাথা নাড়ায় আর টানিয়া টানিয়া বলে—বা-আ-আ—বা—বা। মেয়ে বাবাকে দেখে নাই, সুধীর বাড়ি হইতে যাইবার সময় কেবল মধুর সম্ভাবনার কথাটি জানিয়া গিয়াছিল। কিরণ ফিস্-ফিস্ করিয়া বলিল—খুকী, দেখিস্—দেখিস্, কালকে বাবা আসবে—তোর খোকা বাবা—মার যেমন কাণ্ড, অত বড় ছেলে এখনও খোকা—হিহি। ছেলেমানুষের মত হাসিতে লাগিল। তারপর চারিদিকে তাকাইয়া দেখিল, কেহ কোনখান হইতে শুনিতে পায় নাই ত? এমন সোনার চাঁদ তাহার কোলে আসিয়াছে—সুধীর তা জানে না, চোখে দেখে নাই, সুধীরের জন্য মনে করুণা হইল। আবার রাগ হইল—এই ত চিঠিপত্রে খবর পাইয়াছে, একবার কি এতদিনের মধ্যে মেয়েকে দেখিতেও ইচ্ছা করে না?

সেইদিন গভীর রাত্রে কিরণ বিছানায় শুইয়া আছে, ঘুম আর আসে না। মাথা গরম হইয়া উঠিয়াছে, দু-তিনবার উঠিয়া মাটির কলসী হইতে জল বাড়াইয়া মুখে চোখে দিল। এইবার ঠিক ঘুম আসিবে, চোখ বুজিয়া শুইল। বেড়ার ফাঁকে জ্যোৎস্না আসিয়া অনেকদিন আগেকার স্নেহস্পর্শের মত সর্ব্বাঙ্গ জড়াইয়া ধরিল। দুই বছর কম সময় নয়। সুধীরকে গ্রামসুদ্ধ সকলে অকর্ম্মণ্য ঠাওরাইয়াছিল, সেই সঙ্গে কিরণেরও দোষ পড়িয়াছিল। সে নাকি বরকে আঁচল-ছাড়া হইতে দেয় না। শাশুড়ী-স্পষ্ট কিছু বলিতেন না, কিন্তু

ওর চেয়ে মুখোমুখী হইলেই যে ভাল হইত। শেষাশেষি এমন হইয়াছিল, সুধীর বাড়ি হইতে বাহির হইলে সে বাঁচে! মুখ ফুটিয়া একথা বলিতে সাহস হইত না, কাহাকেও দোষ দিবার উপায় ছিল না, এক এক সময়ে কিরণের মনে হইত ডাক ছাড়িয়া কাঁদিয়া ওঠে! যেদিন সুধীর রওনা হইল সেদিন সে খুশী হইয়াছিল, এখন সে-সব কথা ভাবিলে বড় কষ্ট হয়। আর লোকটিরও এমন ধনুক-ভাঙা পণ—চাকরি নাই বা হইল, এতদিনের মধ্যে একবার বাড়ি আসিয়া গেলে মহাভারত অশুদ্ধ হইয়া যাইত নাকি? কিন্তু সে দুঃখের দিন কাটিয়াছে, সুধীর হইয়াছে রাজা, কাজেই কিরণ রাজরাণী—কাল সে বাড়ি আসিবে। কাল এতক্ষণ—

আগামী কাল এতক্ষণ যে কি হইতেছে চক্ষু বুজিয়া সে সেই মনোরম ভাবনা ভাবিতে লাগিল।

ঘরে ঢুকিয়া হয়ত দেখিবে ক্লান্ত সুধীর ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, জলের গ্লাসটা খুঁজিতে খুঁজিতে হেরিকেন তুলিয়া কিরণ দেখিয়া লইবে। আলোটা মুখের কাছ দিয়া বার বার ঘুরাইবে, তবু চক্ষু খুলিবে না। পা ধুইয়া জলের ঘটি ঠনাৎ করিয়া তক্তপোষের নীচে রাখিবে, সজোরে দোরে খিল দিবে, তারপর খুকীর মাথাটা বালিশের উপর সাবধানে তুলিয়া দিয়া মশারি গুঁজিতেছে—

সুধীর আলগোছে একখানা হাত বাড়াইয়া খপ্ করিয়া তাহাকে ধরিয়া ফেলিবে।

আসলে সুধীর ঘুমায় নাই ঘুমের ভাণ করিয়া পড়িয়া ছিল, কিংবা ঘুমাইলেও ইতিমধ্যে কখন জাগিয়াছে, আগে সাড়া দেয় নাই—

কিরণ বলিবে—"বড্ড গরম, চল—দাওয়ায় বসিগে—কেমন ফুটফুটে জ্যোৎস্না, দেখেছ?"

সুধীর হাসিয়া বলিবে—"ভয় করবে না? বাদাম গাছে এক পা আর তালগাছে এক পা—ঐ যে মস্ত একটা কি দাঁড়িয়ে আছে, দেখতে পাচ্ছ?"

কিরণ বড় ভীতু। বিয়ের কিছুদিন পরে একদিন রাত্রিতে সে রাগ করিয়াছিল, তারপরে সুধীর ভূতের ভয় দেখাইয়া তাহাকে এমন বিপদে ফেলিয়াছিল—সে কথা ভাবিলে হাসি পায়। সে সময়ে কি বোকাই না ছিল!

কিরণ বলিবে—ভয় দেখাচ্ছ, আমায় কচিখুকী পেয়েছ নাকি?

তৎক্ষণাৎ প্রতিবাদ আসিবে—কক্ষণো না, কচি খুকী ভাবব—সর্ব্বনাশ! কুড়ি পেরুল, বুড়ী হতে আর বাকী কি?

—এখন আমার মোটেই ভয় করে না—কি দেবে বল, একলা-একলা এখনি খালের ঘাটে চলে যাচ্ছি—তারপর কিরণ হঠাৎ আর এক কথা জিজ্ঞাসা করিবে—কলকেতায় যে বাসা করছে সে নাকি তিনতলা? ছাত থেকে কেল্লা দেখা যায়? গড়ের মাঠ কতদূর? সুশীলার বর যেখানে বাসা করেছে সে বাড়ি চেন? তুমি আপিসে গেলে আমি দুপুরবেলা খুকীকে নিয়ে সুশীলাদের বাসায় বেড়াতে যাব কিন্তু—অথবা এরূপও হইতে পারে।

হয়ত কাজকর্ম্ম সারিয়া মেয়েকোলে কিরণ যখন আসিয়া ঢুকিবে, তখন সুধীর শিয়রে আলো রাখিয়া নভেল পড়িতেছে। নভেল পড়া ত ছাই—কিরণকে দেখিয়া মৃদু হাসিয়া বই রাখিয়া দিবে, তারপর হাত ধরিয়া বসাইবে। বলিবে—এত দেরি হ'ল? ভাল আছ ত? কই, মেয়ে দেখাও—দেখি—দেখি—

দেখাইবে না ত, মেয়ের মুখ কিরণ কিছুতে দেখাইবে না। কেন, এই যে এত চিঠিপত্র দাও—মেয়ের কথা ভুলিয়াও একবার লিখিয়া থাক? মেয়ে কি গাঙের জলে ভাসিয়া আসিয়াছে—মেয়ের বুঝি মান নাই!

কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত দেখাইতে হইবে। সুধীর পকেট হাতড়াইবে। ওমা, একছড়া খাসা হার চিক্ চিক্ করিতেছে, অতবড় হার ঐটুকু মেয়ের জন্যে! মজা দেখো না, চারটে দাঁত উঠেছে—তিন দিনের ভেতর দস্যিমেয়ে চিবিয়ে চিবিয়ে চেপ্‌টা করে দেবে।—বাপ নিজের হাতে মেয়ের গলায় হার পরাইয়া দিবে। কিরণ বলিবে—রাত্তিরটা গলায় থাকুক, কাল সকালে কিন্তু মনে ক'রে হার খুলে নিও—ফের নীল কাগজে মুড়ে ভাল মানুষের মত মা'র হাতে নিয়ে দিও। হ্যাঁগা তাই করতে হয়—মাকে বলো, মা এই তোমার নাতনীর

হার নেও—মা খুশী হয়ে খুকীর গলায় পরিয়ে দেবেন, সে কেমন হবে বল ত ?

ঘুমন্ত মেয়ে ন্যাকড়ার মত বাপের বুকে লাগিয়া থাকিবে। সুধীর বলিবে—ইঃ একেবারে যে তোমার মত হয়েছে—চোখদুটো, গায়ের রং, পায়ের গড়ন, একচুল তফাৎ নেই—

সুখের হাসি হাসিয়া কিরণ বলিবে—কিন্তু নাকটা যে বাপের। বিয়ের সময় ঐ বোঁচা নাকের দাম ধরে দিতে হাজার টাকা।

নাকের উচ্চতা কি পরিমাণ হইলে ঠিক মানানসই হয়, তাহার তর্ক উঠিবে—সেই তাহাদের পুরাতন তর্ক।

জোৎস্নামগ্ন চৈত্র-রাত্রির স্নিগ্ধ বাতাসে ঘরকানাচে বাদামগাছের পত্রমর্ম্মর···ঘুমের ঘোরে খুকীর ছোট্ট বুকখানা কাঁপিয়া কাপিয়া উঠিতেছে···বাহির-বাড়ির ভাঙা চণ্ডীমণ্ডপের ফাটলে তক্ষক ডাকে, চারি দিকের অতল নিসুপ্তির মধ্যে কিছু সময় অন্তর তাহার রব শোনা যায়—কটর্‌র্‌র্‌ তক্ষ তক্ষ!···বিবাহের পরবর্ত্তী স্বপ্নস্মৃতির টুকরা টুকরা আগামী দিনের মধুর কল্পনার সহিত মিলিয়া সেই রাত্রে একটি নিদ্রাহারা বিমুগ্ধ গ্রামবধূর মনের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল।

সকালে রোদ না উঠিতেই ননদ-ভাজে খালের ঘাটে গিয়া বাসনের বোঝা নামাইল। বাসন-মাজা ত উপলক্ষ্য, কেবল গল্প আর গল্প—এমনি করিয়া উহারা রোজ এক প্রহর বেলা কাটাইয়া আসে। ষ্টেশন হইতে সাঁকো পার হইয়া গ্রামে আসিতে হয়। কিরণ সাঁকো পিছনে করিয়া বাসন মাজিতেছিল, হঠাৎ পটলী চেঁচাইয়া উঠিল—ওমা, এত সকালে এসে পড়্‌ল? তাড়াতাড়ি এঁটো হাতেই কিরণ ঘোমটা টানিল। পটলী খিল্‌খিল্‌ করিয়া হাসিতে লাগিল।—ও বৌদি, কলাবৌ সাজ্‌লি কেন? আমি কার কথা বল্‌লাম? আসছে আমাদের মুংলী গাইটা। মুংলী গরু আসিতেছিল ঠিক, কিন্তু পটলী যে ভঙ্গী করিয়া বলিয়াছিল, সেটা মুংলীর সম্পর্কে নিশ্চয় নয়। পোড়ারমুখী মেয়ে, এই বয়সে এমন পাকা হইয়াছে। কিরণ বলিল—তাই বই কি! তুমি বড্ড ইয়ে হয়েছ, গুরুজনের সাথে ঠাট্টা—তোমায় দেখাচ্ছি—বলিয়া বড় রাগিয়া শাসন করিতে গিয়া পারিল না, শাসন করিবে, না হাসি চাপিবে?

এদিকে নিবারণ ভারী ব্যস্ত। উঠিয়া আগে বেড়ার গায়ে ছাতিম গাছের কয়েকটা ডাল ছাঁটিয়া দিলেন, পথটা যেন আঁধার করিয়া ফেলিয়াছিল। তারপর নিশি গাঙ্গুলীর বাড়ি গিয়া বলিলেন—একটা টাকা হাওলাত দিতে পার, গাঙ্গুলী? কালকে নিও—গাঙ্গুলী নিরাপত্তিতে টাকা বাহির করিয়া দিলেন। বলিলেন—সুধীর বাবাজী আজ আস্‌ছেন বুঝি, বাজারে যাচ্ছ? সাজা তামাকটা খেয়ে যাও, বেলা হয়নি। আর আমার কথাটা মনে আছে ত? নিশি গাঙ্গুলীর কথাটা হইতেছে, সুধীরকে বলিয়া তাহার আপিসে বা অন্য কোথাও মেজ ছেলে হেমন্তর একটা চাকরি করিয়া দিতে হইবে। তামাক খাইয়া এবং গাঙ্গুলীকে বিশেষ প্রকারে আশ্বাস দিয়া নিবারণ উঠিলেন।

বাজারে মাছ কিনিতে গিয়া বিষম বিভ্রাট। চারিটা সরপুঁটি আসিয়াছে, তাহার ন্যায্য দর চার আনার বেশী এক আধলাও নয়। নিতান্ত গরজ বলিয়া পাঁচ আনা অবধি দর দিয়া নিবারণ ঘণ্টাখানেক ধন্না দিয়া বসিয়া আছেন। মাঝে মাঝে খোসামোদ চলিতেছে—ও পাঁড়ুয়ের পো, তুলে দে—অলেজ্য দর হয় নি। ছেলে বাড়ি আসবে, বড় চাকুরে—আমাদের মত কচুঘেঁচু দিয়ে খাওয়া ত অভ্যেস নেই। দে বাবা, তুলে দে—কিন্তু পাঁড়ুয়ের পুত্র কিছুতেই ভিজিতেছিল না। এমন সময়ে অক্রূর মোড়ল আট আনা বলিয়া ধাঁ করিয়া মাছ ক'টা তুলিয়া লইল। নিবারণ একেবারে মারমুখী। অক্রূরও ছাড়িবে কেন—গত কল্য মণ-দশেক গুড় বেচিয়াছে, গুড়ের দর যাহাই হউক, একসঙ্গে অতগুলি গাঁটে থাকায় তাহার মেজাজ ভিন্নপ্রকার। গ্রামের জন-কয়েক নিবারণকে বুঝাইয়া সুঝাইয়া হাত ধরিয়া ভিড়ের ভিতর হইতে সরাইয়া লইয়া গেল। কিন্তু নিবারণের রাগ মিটে নাই—ছোটলোকের এত আস্পর্দ্ধা—আসুক সুধীর, দেখা যাইবে কত ধানে কত চাল!—

সুধীর যখন পৌছিল তখন বিকাল হইয়া গিয়াছে। আজ আর আসিল না সাব্যস্ত করিয়া বাড়িসুদ্ধ সকলের খাওয়া-দাওয়া সারা হইয়াছে, কিরণ এইবার চারিটা মুখে দিবে। কি মনে করিয়া ও-ঘরে যাইতেছিল, এমন সময়ে দেখিল সাঁকোর উপর একটা ছাতি, শেষে আরও ভাল করিয়া দেখিল। তারপর রান্নাঘরের ভিতর ঢুকিয়া পড়িল। সুধীর আসিয়া ডাকিল—মা, ওমা, কোথায় সব? সর্ব্বাঙ্গে ঘাম ঝরিতেছে, টিনের একটি সুটকেস্ ষ্টেশন হইতে নিজেই বহিয়া আনিয়াছে, কলিকাতার বাসায় যে অগুস্তি চাকরবাকর তাহার একটাও সঙ্গে আনে নাই। মা আসিয়া পাখা করিতে লাগিলেন। পটলী খুকীকে কোলে লইয়া সামনে দাঁড়াইল। সুধীর এক নজর চাহিয়া দেখিল, চেহারা মলিন রুক্ষ—সে শ্রী নাই, হয় ত চাকরির খাটুনীতে, তাহার উপর পথের কষ্ট!

খাওয়া-দাওয়া সারিয়া একটু জিরাইবারও অবকাশ হইল না, ইতিমধ্যে গ্রামের হিতাকাঙ্ক্ষীরা আসিয়াছেন। শ্রীদাম মল্লিক সকলের চেয়ে প্রবীণ, সুধীর সর্ব্বাগ্রে তাঁহার পায়ের ধূলা লইল। মল্লিক মহাশয় বলিলেন—শুনলাম সব কথা নিবারণের কাছে, শুনে যে কি আনন্দ হ'ল! এখন বেঁচেবর্ত্তে থাক, অখণ্ড পরমাই হোক। বুড়ো বাপমাকে এইবারই নিয়ে যাচ্ছ ত? নিয়ে যাবে বই কি? গঙ্গার চান করবে, হরিনাম করবে, এর চেয়ে আর ভাগ্যির কথা কি? আমাদের পোড়া কপাল—আমরাই পড়ে রইলাম পচা ডোবায়—বলিয়া একটা নিঃশ্বাস ফেলিলেন।

ভগবতী আচার্য্য কিঞ্চিৎ হস্তরেখাদি বিচার ও ফলিত জ্যোতিষের চর্চ্চা করিয়া থাকেন। বলিলেন—বলেছিলাম কিনা নিবারণ-দা, বৃহস্পতি তুঙ্গী—তোমার সুধীর রাজা হবে। ঊর্দ্ধরেখা আঙুলের গোড়া অবধি চলে এসেছে—বলিনি? নিবারণের সে কথা মনে পড়ে না, কিন্তু ঘাড় নাড়িলেন।

নিশি গাঙ্গুলীও আসিয়াছিলেন। বলিলেন—বাবাজী, আমাদের বাড়িতে সন্ধ্যের পর একবার অবিশ্যি করে যেও—তোমার খুড়ীমা ডেকেছেন—

অমনি ড্রামাটিক ক্লাবের ছেলেরা সমস্বরে কোলাহল করিয়া উঠিল—সে কি ক'রে হবে? সন্ধ্যের পর সুধীরবাবু আমাদের রিহার্শাল দেখতে যাবেন যে। ওঁকেই এবার ক্লাবের সেক্রেটারী করা হবে—কালকে আমরা মিটিং করব।

সুধীর সন্ত্রস্ত হইয়া বলিয়া উঠিল—সেক্রেটারী আমাকে কেন? আমাকে বাদ দাও, আমি থিয়েটারের কিচ্ছু বুঝিনে।

দলের একজন বলিল—তাতে কি হয়েছে, আমরাই সব বুঝিয়ে-টুঝিয়ে দেব। এই ধরুন আপাততঃ উদ্যান, দুর্গ আর অন্তঃপুর-সংলগ্ন প্রাসাদ এই তিনটে সিন, গোটা-পাঁচেক চুল দাড়ি, দুটো রয়াল ড্রেস আর একটা হার-মোনিয়ম কিনে দেবেন—ব্যস্। আমাদের নারদ যে কি চমৎকার গান গায় শুনলে অবাক হয়ে যাবেন—কিন্তু দুঃখের কথা কি বলব, জুৎসই একটা দাড়ির অভাবে অমন প্লে-টা নামাতে পারছি নে।

গাঙ্গুলী পুনশ্চ বলিলেন—যেমন ক'রে হোক একবার যেতেই হবে বাবাজী, নইলে তোমার খুড়ীমা ভারী কষ্ট পাবেন। সারাদিন বসে বসে চন্দোরপুলি বানিয়েছে। আমি হেমন্তকে পাঠিয়ে দেব, সাথে করে নিয়ে যাবে।

অনেকের অনেকপ্রকার আবেদন, সুধীর উঠিল। জামা গায়ে দিবার জন্য ঘরে ঢুকিয়া দেখে সেখানে মাত্র একটি প্রাণী—একলা কিরণ চুল বাঁধিতেছে। কিরণের বুকের ভিতর ঢিপ ঢিপ করিতে লাগিল, যে দুষ্ট এই সুধীর! কিন্তু তাহার সে দুষ্টামী আর নাই ত। শান্তভাবে জামাটা পাড়িয়া গায়ে দিল, একটা মুখের কথাও জিজ্ঞাসা করিল না। ভাবখানা এমন, যেন তাহারা দুটিতে বরাবর বারোমাস একসঙ্গে ঘরগৃহস্থালী করিয়া আসিতেছে। পটলী খুকীকে আনিয়া বলিল,—দাদা, একবার কোলে নাও না—দ্যাখ, তোমায় দেখে কেমন করছে। সুধীর দাঁড়াইল, একবার হাসিয়া মেয়ের দিকে তাকাইল, তারপর কহিল—এখন বড় ব্যস্ত রে। সব দাঁড়িয়ে রয়েছেন—থাক্‌গে এখন।

ড্রামাটিক ক্লাবের যতগুলি লোক কেহই কলিকাতা-বাসী ভাবী-সেক্রেটারীর সম্মুখে গুণপনার পরিচয় দিতে ত্রুটি করিল না। ফলে রিহার্শাল যখন থামিল, তখন চাঁদ

মাথার উপরে। নারদ যাবার মুখেও একবার দাড়ির তাগাদা দিলেন। সুধীর বলিল—ব্যস্ত হবেন না, কালকের মিটিঙে সব এষ্টিমেট ঠিক হবে। দু-তিনজন আসিয়া সুধীরকে বাড়ি অবধি পৌঁছাইয়া দিয়া গেল।

দোরে খিল আঁটা, একটা জানলা খোলা ছিল। সুধীর দেখিল—মিট মিট করিয়া হেরিকেন জ্বলিতেছে, থালায় ও বাটিতে ভাত ব্যঞ্জন ঢাকা দেওয়া এবং ঠিক তাহার পাশেই মাটির মেঝেতে কিরণ ঘুমাইয়া আছে। অনেকক্ষণ বসিয়া বসিয়া অবশেষে বেচারী ওখানেই শুইয়া পড়িয়াছে। মনটা কেমন করিয়া উঠিল, ডাকিল—কিরণ, ও কিরণ—দু-বছর আগেকার সেই ডাক একেবারে ভুলিয়া যায় নাই ত। কিরণ ধড়মড় করিয়া উঠিয়া দোর খুলিয়া দিল। সুধীর বলিল—তাড়াতাড়ি করছ কেন, বোসোই না। ভাতের দরকার নেই, গাঙ্গুলী গিন্নীর যা কাণ্ড—তিন দিন না খেলেও ক্ষতি হবে না—

কিরণ মৃদু হাসিয়া বলিল—তিন দিন থাকছ ত? বাবাকে আজ আসবার জন্যে লিখে দিলাম, পত্তোর পেয়ে মঙ্গলবার নাগাদ ঠিক এসে পড়বেন—এ তিনটে দিন থাকতে হবে কিন্তু।

সুধীর বলিল—মোটে তিন দিন? এরি মধ্যে তাড়াতে চাও, ভারী নিষ্ঠুর ত তুমি! তিন মাসের কম নড়ছিনে—দেখে নিও—।

আচ্ছা, আচ্ছা,—দেখব—কিরণ মুখ টিপিয়া হাসিতে লাগিল। আর বড়াই করো না, মায়া-দয়া সব বোঝা গেছে। আমরা না-হয় পর, নিজের মেয়েকেও কি একটিবার চোখের দেখা দেখতে ইচ্ছে করে না?

সুধীর বলিল—সে কথা ত বলবেই কিরণ, তার সাক্ষী ভগবান। তারপর মুখখানা অতিশয় ম্লান করিয়া কহিতে লাগিল,—শরীরের কি হাল হয়েছে, দেখতে পাচ্ছ ত? দু-বছর যা কেটেছে, অতিবড় শত্তুরের তেমন না হয়। জায়গা না পেয়ে একরকম রাস্তার ফুটপাথে শুয়ে কাটিয়েছি—এক পয়সার মুড়ি খেয়ে দিন কেটেছে, কদিন তাও জোটেনি। ভাগ্যিস্ রাস্তার কলের জলে পয়সা লাগে না—

কিরণের চোখ ছল ছল করিয়া উঠিল, তাড়াতাড়ি বলিল—থাক্‌গে, তুমি থাম। একটু চুপ করিয়া থাকিয়া নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল—যে দুঃখ কপালে লেখা ছিল তা যাবে কোথায়? সে ছাইভস্ম ভেবে আর কি হবে বল।

দুজনে স্তব্ধ হইয়া রহিল। ঘুমন্ত মেয়ের দিকে তাকাইয়া আবার কিরণের হাসি ফুটিল। ওগো তুমি খুকীকে দেখলে না? এমন দুষ্ট হয়েছে—ঐটুকু মেয়ে, হাড়ে হাড়ে বজ্জাতি—

সুধীর কহিল,—দেখব না কেন? দেখছি ত।

কিরণ যেন কত বড় গিন্নী। তেমনি সুরে কহিল—ও আমার কপাল, ঐ রকম দেখলে হয় নাকি? মেয়ে আমার সাথে কত দুঃখ করছিল—বাবা আমায় কোলে নিলে না, আদর করলে না। তুমি খুকীকে একটা সরু হার গড়িয়ে দিও—নির্ম্মলা দিদির মেয়েকে দিয়েছে, খাসা দেখায়—

সুধীর জিজ্ঞাসা করিল—মেয়ে কথা বলতে শিখেছে নাকি?

—বলে না? সব কথা বলে, সে কি আর তোমরা বুঝতে পার? বলিয়া হাসিতে লাগিল। তারপর আবার সুরু করিল—সেদিন বলছিল, বাবাকে একখানা ঠেলা গাড়ী কিনে দিতে বোলো—তাই চড়ে গড়ের মাঠে হাওয়া খাব—

সুধীরও হাসিল। বলিল—বটে, আবার গড়ের মাঠের সখ হয়েছে?

—কেন অন্যায়টা কিসের? খালি খালি চুপটি ক'রে বাসায় বসে থাকবে বুঝি—তুমি ভাব আমরা কিছু জানিনে। আমাকে না লিখলে কি হয়, শ্বশুরঠাকুর সব রাষ্ট্র করে দিয়েছেন।

—কি শুনেছ বল ত?

—মস্তবড় বাড়ি ভাড়া করেছ, আমাদের সবাইকে নিয়ে যাচ্ছো—কোন্‌টা শুনিনি! তাই তাড়াতাড়ি বাবাকে আসবার জন্য চিঠি দিলাম, যাবার আগে একটিবার দেখা করে যাই—কতদিন দেখা হবে না।

সুধীরের মুখ অত্যন্ত বিবর্ণ হইয়া গেল। বলিল—এ সব মিছে কথা কিরণ—

—কি মিছে কথা?

—এই বাসা করার কথা-টতা। মতলব করেছিলাম বটে, কিন্তু সে সব আর হবে না।

কিরণ বলিল—কেন হবে না—আলবৎ হবে। মাইনে খাওয়া লোকে কখনও যত্ন করে? তোমার শরীরের দশা দেখে যে কান্না পায়! আমি তোমাকে কখনও একলা ছেড়ে দেব না।

—কিন্তু খরচ চালাব কোত্থেকে?

—ওঃ! বলিয়া কিরণ গম্ভীর হইল।

—কথা বল না যে।

কিরণ কহিল—আমার খরচ বড্ড বেশী, আমায় নিয়ে কাজ নেই। বেশ ত মাকে নিয়ে যাও। আমি যাব না, কক্ষণো তোমার বাসায় যাব না এই বলে দিলাম—বলিয়া জানালা দিয়া বাহিরের দিকে তাকাইল।

সুধীর বলিল—রাগ হ'ল? কতদিন বাদে এসেছি আর এই রকম কষ্ট দিচ্ছ?

—আমি কষ্ট দিই, আর ত কেউ দেয় না, সেই ভাল—বলিয়া মুখ ফিরাইয়া কহিতে লাগিল—দু-বছরের মধ্যে ক'খানা চিঠি দিয়েছ? দশখানা কি এগারো খানা। সব বেঁধে ঐ বাক্সের মধ্যে রেখে দিইছি। বিকেল বেলা এসেছ, তখন থেকেই ভাব দেখছি। বুঝি—বুঝি—সব বুঝি। কিরণ চোখ মুছিল।

সুধীর বলিল—বল্‌লে ত বিশ্বেস করবে না, আমি কি করব?

—কি আর করবে—তিনমহল বাড়ির ভাড়া জোটে, চাকর-বাকরের মাইনে জোটে, সব জোটে, কেবল—থাকগে। বলিতে বলিতে কিরণ চুপ করিল।

—তিনমহল বাড়ি ভাড়া করেছি আমি?

কিরণ বলিল—হ্যাঁগো আমি সব জানি। তিন মহল বাড়ি ভাড়া করেছ, দেড়শো টাকা মাইনে পাচ্ছ—লুকুচ্ছ কেন?

সুধীর বলিল—না, লুকুব না—আর কি জানো বল ত—

—মাইনে ছাড়া উপরি পাও, রোজ টাকায় আর নোটে পকেট ভর্ত্তি হয়ে যায়—বল ঠিক কি-না?

সুধীর বলিল—ঠিক!

—ঢাক্‌ছিলে যে বড়—

সুধীর হাসিল। বলিল—দেখছিলাম, তোমরা কে কি রকম দরদী—অভাবের কথা শুনে কে কি বল। বাসা ভাড়া হয়ে গেছে কিরণ, নিয়ে যাব না ত কি? তোমাদের সব্বাইকে নিয়ে যাব।

কিরণ রুখিয়া বলিল—আমি যাব না, কক্ষণো যাব না—বলেছি ত। খুকীকে কোলে নিলে না, বিকেল থেকে একটিবার হাসছ না, দুঃখটা কিসের শুনি? টাকাকড়ি হয়েছে—ছাই টাকা, আমরা তোমার টাকা চাইনে।

তখনও ম্লান হাসি ঠোঁটের উপর ছিল। সুধীর বলিল—এই যে কত হাসছি, দেখছ না? এত ঝগড়াও করতে পার তুমি, তোমার ও-স্বভাবটা আর বদ্‌লাল না—

—তোমার স্বভাব বদ্‌লেছে, সেই ভাল।

বধূর হাত ধরিয়া টানিয়া সুধীর বলিল—সত্যি আর রাগারাগি নয়—আজকে সারাদিন বড় কষ্ট গিয়েছে—

কিরণ বলিল—তবু ত এক দণ্ড জিরোন নেই, এই এতখানি রাত অবধি—

—কি করব বল? গাঙ্গুলীমশায় নাছোড়-বান্দা—ছেলের চাকরি করে দিতে হবে। বলে এলাম হেমন্তকে সঙ্গে নিয়ে কলকাতায় যাব। কেশব ঘোষ, রাম মিত্তির, তারক চকোত্তি, সকলের চার সনের খাজনা বাকী—তার কড়াক্রান্তি হিসেব হয়ে গেল—কাল সকালে সব আসবেন—মিটিয়ে দিতে হবে। শ্রীদাম মল্লিক মশাই আপ্যায়ন ক'রে বসিয়ে ঠিকানা টুকে নিলেন, গঙ্গাস্নানের যোগে সপরিবারে আমার বাসায় পায়ের ধুলো দেবেন। ক্লাবের ছেলেরা কাল মিটিং করবে, তাদের সিন ড্রেসের এষ্টিমেট হবে। বড়লোকের হাঙ্গামা কত? সবারই গরজ বেশী, কেউ ছাড়েন না, অব্যাহতি কোথায়?

এই সব বাজে কথা শুনিতে কিরণের মন চাহিতেছিল না। বেশ করেছ—বড় কাজ করেছ—বলিয়া হঠাৎ ঘুমন্ত মেয়েকে বিছানা হইতে টানিয়া তুলিয়া হাসিতে

হাসিতে হুকুমের স্বরে বলিল—মেয়ে কোলে নাও—তোমার মত মোটেই নয়, দেখ তো কেমন—নাও।

সুধীর কিন্তু উৎসাহ প্রকাশ করিল না, বলিল—আবার জেগে উঠে এক্ষুণি কান্নাকাটি সুরু করবে—এসব কাল হবে। ভারী ঘুম পাচ্ছে, আমি এখন শুই।

ঠিক তাহার ঘণ্টা-দুই পরে সুধীর খাট হইতে নামিয়া দাঁড়াইল। হেরিকেনের জোর কমানো ছিল, উস্কাইয়া দিয়া দেখিল—মেয়ের পাশে কিরণ বিভোর হইয়া ঘুমাইতেছে। একখানা চিঠি লিখিল—

"কিরণ, আমার সম্বন্ধে কিছু ভুল শুনিয়াছিলে। চাকরি পাইয়াছিলাম, তবে মাহিনা দেড়শো নয়, চল্লিশ টাকা। বাসা ভাড়া করিয়াছিলাম—উহা তিনতলা নয়, পাকা মেঝে, চাঁচের বেড়া, টিনের ঘর। কিন্তু বাজার মন্দা বলিয়া আজ সাত দিন চাকরির জবাব হইয়াছে। তোমাদিগকে লইয়া একসঙ্গে থাকিব এই আশায় বাসা ভাড়া করিয়াছিলাম, কিন্তু যে অর্দ্ধেক ভাড়া অগ্রিম দিতে হইয়াছিল সেইটাই লোকসান। দু-বছর যে কষ্টে গিয়াছে তাহা ভগবান জানেন—শহরে বসিয়া আর উঞ্ছবৃত্তি করিতে পারি না, তাই দু-দিন জিরাইতে আসিয়াছিলাম। কিন্তু তোমরা এবং গ্রামসুদ্ধ সকল ইতর ভদ্রে চক্রান্ত করিয়া আমাকে তাড়াইয়া দিলে। আজ দিনরাত্রির মধ্যে আমার অবস্থা মুখ ফুটিয়া কাহারও কাছে বলিতে পারিলাম না, তাই চিঠি রাখিয়া পলাইলাম।

"এক মাসের মাহিনার মধ্যে হোটেল খরচ, বাসা ভাড়া, আপিস-দরোয়ানের দেনা এবং বাড়ি আসিবার ট্রেন ভাড়া বাদে সম্প্রতি হাতে এগার টাকা বারো আনা আছে। চিঠির সঙ্গে একখানা দশ টাকার নোট গাঁথিয়া রাখিয়া যাইতেছি। উহা হইতে খুকীর জন্য গিনি সোনার হার, কেশব ঘোষ প্রভৃতির খাজনা শোধ, ড্রামাটিক ক্লাবের সিন ড্রেস, গাঙ্গুলী-পুত্রের কলিকাতার রাহা খরচ এবং মা-বাবা ও তোমার যদি অপর কোন সাধ বাসনা থাকে সমাধা করিও। আমার জন্য চিন্তা নাই—নগদ সাত সিকা লইয়া রওনা হইলাম।"

পরদিন নিবারণ বলিতে লাগিলেন—আপিসের কাজে ঐ ত মুস্কিল—দুপুর রাত্রে টেলিগ্রাম এসে হাজির, ভোর বেলা ইষ্টিশানে পৌছে দিয়ে এলাম। ওকে ছাড়া আর কাউকে দিয়ে সাহেবের বিশ্বাস নেই—আপিসের হেড কিনা—

জাতিভেদ-রহস্য

শ্রীঅনিলবরণ রায়

বর্ত্তমানে হিন্দুসমাজ যে-সব গ্লানিতে জর্জ্জরিত তাহাদের অনেকেরই মূল প্রচলিত জাতিভেদ। অস্পৃশ্যতার অভিশাপ এই জাতিভেদেরই একটি চরম পরিণাম। ভারতের নানা স্থানে আজ যে অ-ব্রাহ্মণ আন্দোলন অতি বড় হইয়া জাগিয়া উঠিতেছে, ইহাও যুগযুগান্তব্যাপী জাতিভেদ অত্যাচারের বিরুদ্ধে অবশ্যম্ভাবী প্রতিক্রিয়া। পুরাকালে এক একটি জাতি নিবিড় ঐক্যে বদ্ধ ছিল, কারণ এক জাতির মধ্যে সমস্ত লোকের ছিল একই রকম শিক্ষাদীক্ষা, একই রকম আচার-ব্যবহার, ব্যবসায় স্বার্থ। আজ আর সে ঐক্য বজায় নাই, এখন আর কেহ জাতির অনুযায়ী ব্যবসায় বা জীবনপ্রণালী অবলম্বন করিতে নিজেকে বাধ্য মনে করে না। এক ব্রাহ্মণ জাতির মধ্যেই আমরা দেখিতে পাই উত্তম হইতে অধম নানাস্তরের লোক। কাহারও শিক্ষাদীক্ষা, কাল্‌চার অতি উচ্চ, আবার কেহ-বা মনুষ্যত্বের নিম্নতম স্তরে পড়িয়া রহিয়াছে। মানুষের পক্ষে যত রকম পেশা বা বৃত্তি খোলা আছে ব্রাহ্মণেরা নির্ব্বিচারে

সে-সবই অবলম্বন করিতেছে। সিন্ধুদেশে অস্পৃশ্য ব্রাহ্মণ আছে। উড়িষ্যা হইতে অনেক ব্রাহ্মণ আসিয়া কলিকাতার রাস্তায় ঝাড়ুদারের কাজ করে। দক্ষিণদেশের ব্রাহ্মণেরা কৃষক, শিল্পী, শ্রমজীবী। ভারতের সর্ব্বত্রই মোটামুটি এইরূপ অবস্থা। অন্য পক্ষে ব্রাহ্মণেতর জাতি, এমন কি অস্পৃশ্যেরাও অনেক স্থানে শিক্ষাদীক্ষার উচ্চস্তরে উঠিয়াছে, অনেকক্ষেত্রে তাহারা শ্রেষ্ঠ বৃত্তিসমূহ অবলম্বন করে। জাতির মধ্যে গভীর ঐক্যবোধ ও সহানুভূতি এবং সামাজিক কার্য্যপরম্পরার একটা সুশৃঙ্খল অর্থনৈতিক বিভাগ, ইহাই ছিল প্রাচীন জাতিভেদের প্রকৃত শক্তি। এখন ইহা চিরকালের মত অন্তর্হিত হইয়াছে, অথচ জাতির অভিমান এখনও প্রবল আছে এবং তাহা এক জাতিকে তীব্রভাবে অন্য জাতি হইতে পৃথক করিয়া রাখিতেছে। ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত সম্বন্ধে একটি গল্প প্রচলিত আছে:—একটি হিন্দু বালিকাকে পাঠানেরা অপহরণ করিতেছিল; কিন্তু স্থানীয় ব্রাহ্মণেরা তাহা দেখিয়াও বালিকাকে সাহায্য করিতে বা রক্ষা করিতে বিন্দুমাত্রও চেষ্টা করে নাই, কারণ মেয়েটি ছিল বেনের মেয়ে, বেনিয়া-কী লেড়কী! বর্ত্তমান হিন্দুরা কি জাতির মধ্যে, কি বাহিরে, কোথাও ঐক্য ও সহানুভূতির বন্ধন উপলব্ধি করে না; যে হিন্দু শিক্ষাদীক্ষা প্রাচীন কালে সমস্ত ভারতের বিভিন্ন জাতি, বিভিন্ন সম্প্রদায়কে এক বিরাট জীবন্ত ঐক্যে, বৈচিত্র্যপূর্ণ সাম্যে গড়িয়া তুলিয়াছিল, সে শিক্ষাদীক্ষা আজ নিষ্প্রাণহীন হইয়া পড়িয়াছে। ইহার অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ হিন্দুসমাজ শতধা বিভিন্ন হইয়া ভাঙিয়া পড়িতেছে।

প্রাচীনকালে জাতিভেদের যে উপযোগিতা বা সার্থকতাই থাকুক্ না কেন, এখন ইহা তাহার প্রাচীন সত্তার প্রেতে পরিণত হইয়াছে এবং সমাজের যে কত অনিষ্ট সাধন করিতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই। বিদেশী সমালোচকেরা মূল সত্যের সন্ধান করিতে পারে না বা চাহে না। তাহারা বর্ত্তমানে প্রচলিত অর্থহীন, অনিষ্টকর অত্যাচারী এই জাতিভেদকে দেখাইয়া দিয়াই প্রমাণ করিতে চায় যে, ভারতের শিক্ষাদীক্ষা, ভারতের কাল্‌চার ও সভ্যতা অতি হীন। কেহ কেহ আবার বিদেশী শাসনকে সমর্থন করিতেও জাতিভেদের দোহাই দিয়া থাকে। ভারতে যেরূপ জাতিবিদ্বেষ তাহাতে যদি একটি শক্ত বিদেশী গবর্ণমেণ্ট বিভিন্ন জাতির মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করিতে এখানে চিরবিরাজমান না থাকে, তাহা হইলে মানবতার প্রতি অবিচার, অত্যাচার করা হয়! কিন্তু ভারতের শত্রুরা আমাদের সমাজের এই গ্লানিকে কেমন নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য ব্যবহার করিতেছে, সে কথা না হয় ছাড়িয়া দিলাম। তবু জানি জাতিভেদ ভিতর হইতে আমাদের সমগ্র সমাজ-প্রতিষ্ঠানকে বিষাক্ত করিয়া তুলিয়াছে। এই জাতিভেদের জন্যই হিন্দুসমাজে যথাযোগ্য বিবাহ এত বিরল। জাতির মধ্যেই কন্যার বিবাহের ব্যবস্থা করিতে হয় বলিয়া নিষ্ঠুর বরপণ এমন অতিমাত্রায় বাড়িয়া উঠিয়া লোককে সর্ব্বস্বান্ত করিয়া দিতেছে। বংশানুক্রমে সঙ্কীর্ণ জাতির গণ্ডীর মধ্যে বিবাহ করিয়া হিন্দুর রক্ত নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছে, হিন্দুর স্বাস্থ্য ও প্রাণশক্তি হীন হইয়া পড়িয়াছে, ইতিমধ্যেই বৈজ্ঞানিকেরা হিন্দুজাতিকে ধ্বংসোন্মুখ জাতি, "the dying race", বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন। এই মারাত্মক দোষের প্রতিকার করিতে বিভিন্ন জাতির মধ্যে অবধি বিবাহের প্রচলন যদি অবিলম্বেই করিতে পারা না যায়, তাহা হইলে জগতের অন্যান্য অনেক প্রাচীন সভ্য জাতির ন্যায় হিন্দুও শীঘ্র ধরাপৃষ্ঠ হইতে লুপ্ত হইবে।

অতএব জাতিভেদকে ঝাড়ে-মূলে ঘুচাইয়া দেওয়া হিন্দুর পক্ষে মরণ-বাঁচনের প্রশ্ন। কিন্তু এ-পর্য্যন্ত এই আন্দোলন বিশেষ অগ্রসর হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না; আমাদের সংস্কারকেরা কেবল জোড়াতালি দিতে চাহিতেছেন; তাঁহারা বিভিন্ন জাতির মধ্যে আহারের, (interdining) প্রচলন করিতেছেন, অস্পৃশ্যদের জন্য বিদ্যালয়, দেবমন্দির খুলিয়া দিতেছেন, একই জাতির বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে বিবাহের প্রচলন করিবার চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু যতক্ষণ না ভিন্ন জাতির সহিত বিবাহ প্রচলিত হইতেছে, ততক্ষণ জাতিভেদের লোপ হইয়াছে বলিতে পারা যায় না। বিবাহ ব্যতীত অন্য সকল ব্যাপারেই আজকাল জাতিভেদ



ভোজ

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

কার্য্যতঃ বর্জ্জিত হইয়াছে। লোকে বিবাহের সময় ব্যতীত জাতির কোনও হিসাব লয় না। কিন্তু বিবাহ ব্যাপারে কিছুতেই জাতির গণ্ডী অতিক্রম করিতে চায় না। তাহারা জাতিভেদকে অগ্রাহ্য করিতে পারে না, কারণ তাহাদের মনে কেমন একটা খট্‌কা লাগে। তাহারা মনে করে এই জাতিভেদ তাহাদের ধর্ম্মের সহিত অচ্ছেদ্যভাবেই জড়িত। তাহাদের একটা অস্পষ্ট ধারণা আছে যে, জাতি হারান মানেই ধর্ম্ম হারান। প্রাচীন ভারতীয়গণের জীবনে জাতিভেদ যে বিশেষ প্রয়োজনীয় স্থান অধিকার করিয়াছিল তাহা হইতেই এই আসক্তির সৃষ্টি হইয়াছে এবং যদিও জাতিভেদের সেই মূল প্রয়োজনীয়তা ও উপযোগিতা সম্পূর্ণভাবে লুপ্ত হইয়াছে, তথাপি লোকে অন্ধ সংস্কারের বশেই ইহাকে ধরিয়া থাকিতে চাহিতেছে। শুধু জাতিভেদ বলিয়া নহে, হিন্দুদের অন্যান্য অনেক সামাজিক ও সংস্কৃতিগত প্রথা ও অনুষ্ঠান সম্বন্ধেই ইহা বলা যায়। তাহাদের অন্তর্নিহিত সত্য ও সার্থকতা লোকে হারাইয়া ফেলিয়াছে, কেবল বাহ্যিক আকারটিকেই সংস্কারের বশে অন্ধভাবে ধরিয়া রাখিয়াছে। হিন্দুগণকে তাহাদের ধর্ম্মের, তাহাদের শিক্ষাদীক্ষা সংস্কৃতির প্রকৃত সত্য সম্বন্ধে উদ্বুদ্ধ হইতে হইবে, তাহাদিগকে আত্ম-চেতন হইতে হইবে। কেবল তাহা হইলেই হিন্দুসমাজ মিথ্যা আচার-ব্যবহার ও অন্ধ সংস্কারের মারাত্মক চাপ হইতে মুক্ত হইতে পারিবে। হিন্দুগণকে সচেতন, আত্ম-চেতন করা, ইহাই হিন্দুসংগঠনের মূলকথা।

হিন্দুর মনের উপর বর্ণাশ্রম আদর্শের প্রভাব খুব বেশী, কিন্তু তাহারা ঐ আদর্শের প্রকৃত মর্ম্ম উপলব্ধি করে না, অজ্ঞানতার বশে উহাকে জাতিভেদের সহিত গোলমাল করে। কিন্তু, জাতিভেদ বিকাশের ইতিহাস ভাল করিয়া আলোচনা করিলে তাহাদের আর এই ভুল করা উচিত হইবে না। বস্তুতঃ, জাতিভেদ প্রাচীন চাতুর্ব্বর্ণ্য প্রথার উল্টা, বিরোধী,—একথা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। সমাজকে সুনির্দ্দিষ্ট শ্রেণীতে বিভক্ত করা কিছুই অসাধারণ ব্যাপার নহে এবং ইহা আদৌ ভারতীয় জীবনেরই বৈশিষ্ট্য ছিল না। কিন্তু, এই সব সামাজিক বিভাগের যে আধ্যাত্মিক অর্থ ও উপযোগিতা ভারতীয়গণ নির্দ্ধারণ করিয়াছিলেন তাহাই ছিল ভারতীয় প্রতিভার বৈশিষ্ট্য এবং তাহার জন্যই জাতিভেদ ভারতবাসীর জীবনের উপর এইরূপ গভীর ও স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করিতে পারিয়াছিল। প্রাচীন সমাজের মোটামুটি চারি বিভাগ—চিন্তাশীল ও পুরোহিত শ্রেণী, শাসক ও যোদ্ধাশ্রেণী, উৎপাদনকারী ও ব্যবসায়ী শ্রেণী, শ্রমজীবী ও দাসশ্রেণী,—সমাজ-জীবনও কর্ম্মের স্বাভাবিক বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে আপনা হইতেই হয়ত আভির্ভূত হইয়াছিল। কিন্তু ভারতের তত্ত্বদর্শী ঋষিগণ এই সামাজিক শ্রেণী-বিভাগের মধ্যেই এক গভীরতর সত্যের সন্ধান পাইয়াছিলেন। তাঁহারা দেখিয়াছিলেন যে, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এই চারিশ্রেণীর ভিতর দিয়া মানবসমাজে ভগবানের চারি গুণ প্রকটিত হইতে চাহিতেছে—জ্ঞান (knowledge), শক্তি (power), সামঞ্জস্য ও শৃঙ্খলা (harmony), কর্ম্ম (work)। তাই দেখা যায় যে, বেদের পুরুষসূক্তে চারি বর্ণকে যথাক্রমে ব্রহ্মার মুখ, বাহু, উরু ও পদ হইতে উদ্ভূত বলিয়া রূপকস্থলে বর্ণনা করা হইয়াছে,—

> ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীদ্ বাহুরাজন্যঃ কৃতঃ।
> উরু তদস্য যদ্ বৈশ্যঃ পদ্ভ্যা শূদ্রো অজায়ত॥

তাঁহারা দেখিয়াছিলেন যে, ভগবান্ বীজরূপে প্রত্যেক মনুষ্যের মধ্যেই নিহিত রহিয়াছেন। কিন্তু সর্ব্বত্র তাঁহার প্রকাশ সমান নহে। তাঁহারা আরও দেখিয়াছিলেন যে, প্রত্যেক মানুষকে তাহার স্বভাব, প্রকৃতি ও শক্তি অনুযায়ী কর্ম্ম ও সাধনার দ্বারা আত্মবিকাশ করিবার সুযোগ দিতে হইবে। কারণ কেবল এইভাবেই মানুষ তাহার অন্তর্নিহিত ভাগবৎ সত্তাকে পূর্ণভাবে বিকশিত করিবার দিকে অগ্রসর হইতে পারে এবং ইহাই পুরুষার্থ। ইহাই ছিল প্রাচীন ভারতীয় চাতুর্ব্বর্ণ্য প্রথার মূল সত্য। চাতুর্ব্বর্ণ্য মানবসমাজে ভগবানের চতুর্থ প্রকাশের রূপক বলিয়া গণ্য হইত। ক্রমশঃ এই প্রকাশকেই সত্য ও সিদ্ধ করিয়া তুলিতে হইবে। আবার কার্য্যতঃ এই বিভাগের দ্বারা মানুষ আপন আপন আত্মবিকাশের ধারার সন্ধান পাইত, সেই ধারায় অনুসরণ করিলেই ব্যষ্টিগত

ও সমষ্টিগত মানবের মধ্যে ভগবানের প্রকাশ পূর্ণ হইয়া উঠিবে। কিন্তু মূলনীতি বা আদর্শ যাহাই থাকুক না কেন, বাস্তব জীবনের ক্ষেত্রে অন্ততঃ বেশী দিন মানুষের স্বভাব, শক্তি ও গুণের হিসাব করিয়া তাহাদের শ্রেণীনির্দ্দেশ করিয়া দেওয়া এবং তাহাদের অন্তরপ্রকৃতির বিকাশের অনুকূল কর্ম্ম দেখাইয়া দেওয়া কার্য্যতঃ সম্ভব হয় নাই। প্রকৃতি ও শক্তি অনুযায়ী শ্রেণীবিভাগের পরিবর্ত্তে জন্ম অনুযায়ী শ্রেণীবিভাগ প্রবর্ত্তিত হয় এবং ভারতীয় মনের উপর বংশানুক্রম নীতির প্রভাব সমধিক থাকায় প্রাচীন চাতুর্ব্বর্ণ্য শীঘ্রই সুনির্দ্দিষ্ট জন্মগত ভেদে পরিণত হয়। ইহাই জাতিভেদের প্রকৃত উৎপত্তি। কিন্তু বর্ত্তমানে জাতিভেদ যেমন কেবল আচারগত (conventional) হইয়া পড়িয়াছে, প্রাচীনকালে উহা এরূপ ছিল না। তখন ইহার দ্বারা এক সুস্পষ্ট উদ্দেশ্য সিদ্ধ করা হইত। সুনির্দ্দিষ্ট জাতিরূপ বা আদর্শের (types) বিকাশই ছিল লক্ষ্য এবং এই জন্যই একজাতির মধ্যে বিবাহ দেওয়া হইত। ব্রাহ্মণেরা এমন মানসিক শক্তির বিকাশ করিতে চাহিতেন যাহাতে মনবুদ্ধি উচ্চ বিষয়ের সূক্ষ্ম আলোচনা করিতে সমর্থ হয়। ক্ষত্রিয়েরা এমন চরিত্রের বিকাশ করিতে চাহিতেন যাহাতে তাঁহাদের শ্রেণীর নির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম ও কর্ত্তব্য সম্পাদনে তাঁহারা দক্ষ ও তৎপর হন। বৈশ্যেরা বিশেষ শিক্ষার দ্বারা মনবুদ্ধিকে এমনভাবে গঠিত করিতেন যেন ব্যবসা-বাণিজ্যে সাহায্য হয়। শূদ্রগণকেও এমন শিক্ষা দেওয়া হইত যেন তাহারা নিরহঙ্কারভাবে শ্রদ্ধার সহিত সেবাকার্য্য সম্পাদন করিতে পারে এবং উচ্চবর্ণের সেবা করাকেই সম্মানের বিষয় মনে করে কারণ এই ভাবেই তাহারা ক্রমশঃ বিকাশের উচ্চতর স্তরে উঠিতে পারিবে। এই ভাবে ব্রাহ্মণের আদর্শ, ক্ষত্রিয়ের আদর্শ, বৈশ্যের আদর্শ, শূদ্রের আদর্শ সুনির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল এবং প্রত্যেক শ্রেণীর আদর্শ ও ধর্ম্মকে সকলেই শ্রদ্ধা ও সম্মানের চক্ষে দেখিত। সেই আদর্শতন্ত্রের যুগ অনেক দিন শেষ হইয়া গিয়াছে, কিন্তু তখন যে-সব মহান্ আদর্শের সৃষ্টি হইয়াছিল হিন্দুর মনে এখনও তাহা অঙ্কিত হইয়া রহিয়াছে।

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় প্রভৃতির ধর্ম্ম ও আদর্শের এই যে চারি জাতিরূপ, পরবর্ত্তীকালে বিভিন্ন জাতির মিশ্রণের ফলে সেই চারি রূপ বজায় রাখা আর সম্ভব হয় নাই, লোকের মনে সেগুলি কেবল আদর্শ ভাবেই রহিল, কিন্তু বাস্তব জীবনে তাহাদের আর অস্তিত্ব রহিল না। তখন আর নৈতিক আদর্শ অনুযায়ী মানবশ্রেণী সৃষ্টি করা জাতিভেদের লক্ষ্য রহিল না। সমাজের অর্থনৈতিক কর্ম্মবিভাগই হইল জাতিভেদের প্রধান লক্ষ্য। আবার লোকের অর্থনৈতিক জীবন যেমন ক্রমশঃ জটিল হইয়া পড়িল, তেমনি পেশা ও বৃত্তি অনুযায়ী বহু জাতি ও উপজাতির সৃষ্টি হইল। কালক্রমে এই অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যও লুপ্ত হইল এবং সমাজের অর্থনৈতিক কর্ম্ম-বিভাগ এমন ভাবে গোলমাল হইয়া গেল যে আর তাহার পুনরুদ্ধার করা অসম্ভব। এখন সমস্ত জিনিষটাই সম্পূর্ণ মিথ্যা ও অর্থহীন হইয়া পড়িয়াছে। প্রাচীন চাতুর্ব্বর্ণ্যের উচ্চ আধ্যাত্মিক ও নৈতিক উদ্দেশ্যের কথা দূরে থাকুক, পরবর্ত্তীকালে জাতিভেদের দ্বারা সমাজে অর্থনৈতিক সুবিভাগের যে উদ্দেশ্য সাধিত হইত এখন আর তাহাও হয় না।

শ্রীঅরবিন্দ তাঁহার The Psychology of Social Development নামক গ্রন্থে বলিয়াছেন—"আদর্শ তন্ত্রের (the typal stage) অবস্থা হইতে সমাজ স্বভাবতঃই আচারতন্ত্রের (the conventional) মধ্যে আসিয়া পড়ে। সমাজে আচারতন্ত্রের যুগ তখনই আরম্ভ হয় যখন মূল সত্য বা আদর্শের বাহ্যিক প্রকাশ ও আনুসঙ্গিক অনুষ্ঠানগুলিই আদর্শটি অপেক্ষাও অধিক মূল্যবান হইয়া পড়ে। এইরূপেই জাতিভেদের বিকাশ, নৈতিক চারি বর্ণ বিভাগের যেগুলি ছিল বহিরঙ্গ অনুষ্ঠান,—জন্ম, অর্থনৈতিক বৃত্তি, ধর্ম্মসম্বন্ধীয় বিশিষ্ট আচার-অনুষ্ঠান, বংশগত প্রথা—এইগুলিই মূল উদ্দেশ্যকে ছাড়াইয়া অতিমাত্রায় বড় হইয়া উঠিল। প্রথমে সমাজব্যবস্থার জন্মকে গুরুত্ব দেওয়া হইত না, গুণ ও শক্তিরই হিসাব লওয়া হইত। কিন্তু ক্রমশঃ যখন ব্রাহ্মণাদির আদর্শ সুনির্দ্দিষ্ট হইয়া পড়িল তখন শিক্ষা ও ঐতিহ্যের (tradition) দ্বারা সেই সব আদর্শকে বজায়

রাখার প্রয়োজন অনুভূত হইল এবং শিক্ষা ও ঐতিহ্য স্বভাবতঃই বংশপরম্পরার ধারা অনুসরণ ক'রল। এইরূপে ব্রাহ্মণের ছেলেকে ব্রাহ্মণ বলাই রীতি হইয়া দাঁড়াইল। সে ছেলে আবার বংশপরম্পরাগত শিক্ষা ও ঐতিহ্যের অনুসরণ করিলে তাহাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া গ্রহণ করিতে কোনই আপত্তি হইত না। এই ভাবে বংশ-পরম্পরাক্রম যেমন দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইতে লাগিল, তেমনি ক্রমশঃ নৈতিক আদর্শ অনুযায়ী চরিত্র ও শক্তির বিকাশের দিকে আর তেমন দৃষ্টি রহিল না। যাহা এককালে ছিল জাতিভেদ প্রথার ভিত্তিস্বরূপ তাহাই শেষ পর্য্যন্ত কেবলমাত্র অলঙ্কার হইয়া দাঁড়াইল,—না হইলেও চলে! অবশ্য চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ ও আদর্শ শাস্ত্রকারেরা নৈতিক আদর্শ বজায়ের প্রয়োজনীয়তা খুবই জোরের সহিত প্রচার করিতেন, কিন্তু সমাজের বাস্তবজীবনে তাহা আর সত্য রহিল না। একবার যখন ধরিয়া লওয়া হইল যে, ঐটি না হইলেও চলে, তখন ক্রমশঃ সেটিকে বাদ দেওয়াই অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়িল। শেষ পর্য্যন্ত জাতিভেদের অর্থনীতিক ভিত্তিও বিনষ্ট হইতে আরম্ভ হইল এবং জন্ম ও বংশপ্রথা, নানারূপ অর্থহীন ধার্ম্মিক অনুষ্ঠান ও চিহ্ন এই সবই জাতিভেদকে ধরিয়া রাখিল। জাতিভেদের যখন পূর্ণ অর্থনীতিক যুগ, তখন পণ্ডিত ও পুরোহিতগণই ব্রাহ্মণ বলিয়া নিজদিগকে চালাইয়া দিত। অভিজাত সম্প্রদায় ও সামন্ত-গণ ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচিত হইত, ব্যবসায়ী ও মহাজনগণ বৈশ্য বলিয়া এবং অর্দ্ধানশনগ্রস্ত বিত্তহীন শ্রমিকেরাই শূদ্র বলিয়া পরিচিত হইত। যখন অর্থনীতিক ভিত্তিও ভাঙিয়া পড়ে, তখন পুরাতন প্রথার জরারুগ্ন অবস্থা আরম্ভ হইয়াছে। তখন ইহা শুধু নামে, খোলায়, মিথ্যায় পর্য্যবসিত হইয়াছে। তখন হয় ইহাকে সমাজের ব্যক্তি-তন্ত্রযুগের উত্তাপে গলাইয়া ধ্বংস করিয়া দিতে হইবে, নতুবা যে জাতি অন্ধভাবে ইহাকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকিবে, তাহাকে ইহা মারাত্মক দুর্ব্বলতা ও মিথ্যার পূর্ণ করিয়া তুলিবে।"

আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি যে, বর্ত্তমান জাতিভেদের এই মারাত্মক মিথ্যা প্রহসন উঠাইয়া দিবার বিরুদ্ধে রহিয়াছে হিন্দুদের অন্ধ ধর্ম্মসংস্কার। আমাদের শ্রেষ্ঠ সমাজমতধারকেরাও জাতিভেদকে সামনা-সাম্‌নিভাবে আক্রমণ করিতে সাহস পান না। পুণ্যস্মৃতি স্বামী শ্রদ্ধানন্দ অপেক্ষা নির্ভীক ও সাহসী সংস্কারক হিন্দুদের মধ্যে বর্ত্তমানে দেখা যায় নাই। তাঁহাকেও বলিতে হইয়াছিল "হিন্দুসমাজকে প্রাচীন বর্ণধর্ম্মের আদর্শে পুনর্গঠিত করা যে কত কঠিন তাহা আমি উপলব্ধি করি। কিন্তু, বিভিন্ন উপজাতি সমূহকে, এমন কি পঞ্চম ও অস্পৃশ্যগণকেও চারিটি প্রধান জাতির অন্তর্গত করিয়া লওয়া কঠিন হইবে বলিয়া মনে হয় না।" কিন্তু হিন্দু-সমাজকে যে আবার সেই প্রাচীন বর্ণাশ্রমের আদর্শে কখনও গঠন করা সম্ভব তাহা আমরা বিশ্বাস করি না; বস্তুতঃ ঐ আদর্শ কখনও বাস্তবে পরিণত হইয়াছিল, না কেবল আদর্শমাত্রই ছিল, ইহা লইয়াই কিছু মতভেদ আছে। আর শত শত বৎসরের মিশ্রণ ও গোলমালের দ্বারা প্রাচীন জাতিভেদ যে ছত্রিছন্ন হইয়া পড়িয়াছে, সে-সবের সংস্কারসাধনপূর্ব্বক আবার সেই প্রধান চারি জাতিতে ফিরিয়া যাওয়াও কখনই সম্ভব হইবে না। এই জরাজীর্ণ জাতিভেদ প্রথাকে আর কোনরূপে জীয়াইয়া রাখিয়া সমাজের কোনও কল্যাণই সাধিত হইবে না। যেমন ভাবেই ইহার সংস্কার বা উন্নতি সাধন করা হউক না কেন, লোকের যুগযুগান্তরের অভ্যাস শীঘ্রই পুনরায় বর্ত্তমান অশুভসমূহের সৃষ্টি করিবে। প্রকৃত প্রতিকার হইতেছে, জাতিভেদকে একেবারে ঘুচাইয়া দেওয়া এবং মানব-চরিত্রের যে চিরন্তন সত্য প্রাচীন চাতুর্ব্বর্ণ্যের মধ্যে তৎকালোচিতভাবে গৃহীত ও অনুসৃত হইয়াছিল, সেই সত্যের ভিত্তির উপর বর্ত্তমান দেশকালের উপযোগী নূতন সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করা। সেই সত্য এই যে, প্রত্যেক মানুষকে আপন আপন স্বভাব ও শক্তি অনুযায়ী আত্মবিকাশ করিবার পূর্ণ স্বাধীনতা ও সুযোগ দিতে হইবে, এবং এইরূপ বিকাশের অনুকূল কর্ম্ম করিবার সুযোগ ও সুবিধা করিয়া দিতে হইবে। ইহা সহজেই বুঝা যায় যে, জাতিভেদ মানবচরিত্রের এই মূলনীতির, এই সনাতন ধর্ম্মের বিরোধী, কারণ জাতিভেদ মানুষের স্বভাব ও গুণের কোনও হিসাব না

লইয়া জন্ম অনুসারেই সমাজে তাহার স্থান ও কর্ম্ম নির্দ্দেশ করিয়া দেয়। আমাদের মহান্ অধ্যাত্মশাস্ত্র গীতা প্রাচীন চাতুর্ব্বর্ণ্যের অন্তর্নিহিত এই সত্যটিকে স্পষ্টভাবে দেখাইয়া দিয়াছে এবং গীতার "স্বভাব" ও "স্বধর্ম্মে"র নীতিতে সেই সত্যকেই নূতন ভাবে বিবৃত করা হইয়াছে। গীতার সেই নীতি হইতেছে এই,—"সকল কর্ম্মের নির্দ্দেশ ভিতর হইতেই আসা চাই, কারণ প্রত্যেক মানুষেরই একটা নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে, তাহার প্রকৃতির একটা বিশিষ্ট নীতি, একটা সহজাত শক্তি আছে। সেইটি তাহার অধ্যাত্ম সত্তার মূল কার্য্যকরী শক্তি, সেইটিই প্রকৃতির মধ্যে তাহার আত্মাকে জীবন্তরূপ দিয়াছে, সেইটিকে কর্ম্মের দ্বারা প্রকাশ করা ও পূর্ণভাবে গড়িয়া তোলা, জীবনের মধ্যে তাহাকে কার্য্যকরী করিয়া তোলা, ইহাই তাহার প্রকৃত ধর্ম্ম। সেইটি তাহার আভ্যন্তরীণ ও বাহ্য জীবনের প্রকৃত সত্য পন্থা দেখাইয়া দেয় এবং সেইটি হইতে আরম্ভ করিয়াই সে উত্তরোত্তর আত্ম-বিকাশের পথে অগ্রসর হইতে পারে।" (শ্রীঅরবিন্দের Essays on the Gita, Second series)।

অবশ্য জাতিভেদের উচ্ছেদ হইলে হিন্দুর সামাজিক ও নৈতিক জীবনে যে সর্ব্বতোমুখী বিপ্লব উপস্থিত হইবে সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। কিন্তু আজ যে-সব দোষ ও গ্লানি ভিতর হইতে হিন্দুসমাজকে বিষাক্ত ও ধ্বংস করিতেছে সে-সব হইতে পূর্ণভাবে মুক্ত হইতে হইলে এইরূপ একটা বিপ্লবেরই প্রয়োজন। বন্ধনরজ্জুগুলি জীর্ণ হইয়া পড়িলে সমস্ত জিনিষটা একেবারে ভূমিসাৎ হয়। এইরূপ পরিবর্ত্তন সাধনের সময়ে কিছু গোলমাল ও বিশৃঙ্খলা হওয়া অসম্ভব নহে। কিন্তু এই সব পরিবর্ত্তনের পশ্চাতে একটা মহান্ আদর্শ ও নিশ্চিত লক্ষ্য থাকা প্রয়োজন। ভারতকে তাহার অতীত হইতে সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন করিয়া পাশ্চাত্য আদর্শ অনুযায়ী আধুনিক ভাবে গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা ভারতের স্বধর্ম্মের বিরোধী হইবে এবং তাহার দ্বারা কোনও কল্যাণ সাধিত হইতে পারে না। আবার যে-সব ধার্ম্মিক ও সামাজিক সংস্কার ও প্রথা হিন্দুদের মধ্যে গভীরভাবে শিকড় গাড়িয়া বসিয়াছে, কেবল মনবুদ্ধির যুক্তিতর্কের দ্বারা সমাজের বর্ত্তমান ভালমন্দ বিচার করিয়া সে-সবকে দূর করিতে পারা যাইবে না। যদিও মন বুঝিতে পারে, তথাপি হৃদয় তাহা গ্রহণ করিবে না এবং যে প্রাণশক্তি ও ইচ্ছাশক্তি না হইলে কোনও রূপ ব্যাপক বৈপ্লবিক পরিবর্ত্তন সাধিত হইতে পারে না, সে শক্তিও উদ্বুদ্ধ হইবে না। ভারতের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, কেবল অধ্যাত্ম আন্দোলনই ভারতবাসীর মর্ম্মকে সহজে স্পর্শ করিতে পারে এবং তাহাদের মধ্যে প্রকৃত জাগরণ ও নূতন জীবন আনয়ন করিতে পারে। ইহা ভারতের সুদীর্ঘ অধ্যাত্ম সাধনার, অধ্যাত্ম শিক্ষাদীক্ষা সভ্যতার ফল। এই শিক্ষাদীক্ষা ভারতবাসীর মনকে এমনভাবে গড়িয়া দিয়াছে, যে, সে-মন সহজেই আধ্যাত্মিকতার দিকে আকৃষ্ট হয়। বুদ্ধদেব ভারতে যে মহান্ অধ্যাত্ম আন্দোলনের সূত্রপাত করিয়াছিলেন, তাহা জাতিভেদকে প্রায় নির্ম্মূল করিয়া দিয়াছিল এবং হিন্দুসমাজে বহুদিনের সঞ্চিত দোষ ও গ্লানিসমূহের মূলে কুঠারাঘাত করিয়াছিল। কিন্তু তখনও ব্রহ্মণ্য ধর্ম্মের প্রভাব খর্ব্ব হয় নাই এবং বৌদ্ধগণ যে একান্ত ত্যাগ, সন্ন্যাস ও নির্ব্বাণের আদর্শ প্রচার করিয়াছিলেন তাহা ভারতবাসীর মনের উপরে স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। বৈদিক যুগ হইতেই ভারতবাসী পাইয়াছে একটা সমগ্র দৃষ্টি, সমগ্রভাব, তাহাতে আছে ত্যাগের সহিত ভোগের সমন্বয়, আধ্যাত্মিকতার সহিত পার্থিব জীবনের সমন্বয়। এই জন্যই শেষ পর্য্যন্ত বৌদ্ধ ধর্ম্ম ভারতবর্ষ হইতে বহিষ্কৃত হইয়াছিল এবং হিন্দুধর্ম্মের পুনঃ-প্রতিষ্ঠার সহিত প্রাচীন জাতিভেদ আবার ফিরিয়া আসিয়াছিল। তবে তাহা অনেকাংশে পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। বাংলা দেশে আমরা দেখিতে পাই বৌদ্ধযুগের একাকারের পর যখন আবার জাতিভেদ স্থাপিত হইল, তখন কেবল দুইটি জাতি গঠন করা সম্ভব হইল, ব্রাহ্মণ ও শূদ্র, যেমন দক্ষিণ দেশে আছে ব্রাহ্মণ ও অব্রাহ্মণ। তাহার পর হইতে জাতিভেদ ও অন্যান্য অনিষ্টকর প্রথা ও আচারকে দূর করিবার জন্য পুনঃ পুনঃ চেষ্টা ও আন্দোলন হইয়াছে। কিন্তু যুক্তিতর্কের দ্বারা ধ্বংসমূলক সমালোচনা কখনও যথেষ্টভাবে অগ্রসর হয় নাই এবং

গঠনশক্তিও নূতন সৃষ্টির যথোচিত প্রশস্ত ভিত্তি স্থাপন করিতে পারে নাই। সেইজন্য ঐ সব আন্দোলন নানা ফলপ্রসূ হইলেও জাতিভেদ প্রভৃতি প্রথাকে দূর করিতে সক্ষম হয় নাই। অনেক ক্ষেত্রে তাহারা নূতন নূতন ভেদবৈষম্যের কঠিন প্রাচীর গড়িয়া তুলিয়াছে, নূতন নূতন সম্প্রদায় ও জাতির সৃষ্টি করিয়াছে।

ভিতর হইতে হিন্দুসমাজ যে কখনও জাতিভেদের উচ্ছেদ করিতে পারিবে তাহা এক রকম অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছিল, বাহির হইতে একটা প্রবল আক্রমণ প্রয়োজন হইয়াছিল। পাশ্চাত্য সংঘর্ষ ও প্রভাবের দ্বারা সেই প্রয়োজন সিদ্ধ হইয়াছে। পাশ্চাত্য সংঘর্ষের ফলে জাতিভেদ ও অন্যান্য বহু মিথ্যা আচার ও সংস্কার দুর্ব্বল ও ক্ষীণ হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু, শুধু যুক্তিতর্কের উপর নির্ভর করিয়া অথবা পাশ্চাত্য সভ্যতাকেই আদর্শরূপে সম্মুখে ধরিয়া হিন্দুসমাজকে সংস্কৃত করিবার আন্দোলন করিলে তাহা সাধারণতঃ হিন্দুদের জীবনে বিশেষ কোনও গভীর পরিবর্ত্তন আনয়ন করিতে পারিবে না। হিন্দু সমাজকে জাতিভেদের অত্যাচার ও অন্যান্য অনিষ্টকর প্রথা হইতে পূর্ণভাবে মুক্ত করিতে হইলে চাই এমন এক পূর্ণ ও ব্যাপক অধ্যাত্ম আন্দোলন, যাহা বৌদ্ধ আন্দোলনের ন্যায় শুধু ত্যাগ ও সন্ন্যাসের দিকেই অতিমাত্রায় ঝুঁকিবে না, অথবা সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মসমূহের গোঁড়ামি ও সঙ্কীর্ণতার দ্বারা দুষ্ট হইবে না। তাহা ভারতের সেই পূর্ণ বৈদিক আদর্শের দ্বারাই অনুপ্রাণিত হইবে, যে আদর্শে সমস্ত জীবনই হইতেছে অধ্যাত্ম সত্য ও শক্তিলাভের সাধনা, আবার আধ্যাত্মিকতা হইতেছে পার্থিব জীবনকে অস্বীকার বা ত্যাগ করা নহে, পরন্তু তাহাকে উন্নত ও রূপান্তরিত করিবার দিব্য শক্তি। সে আন্দোলন প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষাদীক্ষা ও ধর্ম্মের মূল শাশ্বত সত্যগুলি আবিষ্কার ও গ্রহণ করিবে, বাহির হইতে যুগে যুগে যে-সব ধর্ম্ম, সভ্যতা, শিক্ষা-দীক্ষার স্রোত ভারতে প্রবেশ করিয়াছে সে-সব হইতেও মূল গ্রহণীয় বস্তু ও সত্য সকল আয়ত্ত করিয়া লইবে। শুধু তাহাই নহে, মানবজীবন মানবসমাজকে উন্নত ও সুগঠিত করিবার জন্য নূতন নূতন সত্য, নূতন নূতন শক্তির অনুসন্ধান ও প্রয়োগ করিবে। ভারতমাতা আজ এই রকমই এক বিরাট মহান অধ্যাত্ম আন্দোলনের অপেক্ষা করিতেছেন। কেবলমাত্র এইরূপ এক আন্দোলনের দ্বারাই ভারতবাসী সত্যসত্যই নবজীবনে জাগ্রত হইয়া উঠিবে, ঋষিপূজ্য এই ভারতভূমি এক অভূতপূর্ব্ব মহিমা ও মহত্ত্বের দিকে সুনিশ্চিতভাবে অগ্রসর হইতে পারিবে।

ইকনমিক্‌স প্রাক্‌টিক্যাল

শ্রীঅমূল্যকুমার দাশগুপ্ত

স্ত্রী ও আমি দুইজনেই ইকনমিক্‌সের চরম ভক্ত। কয়লার কারবার হইতে আখের চাষ পর্য্যন্ত যত কিছু সম্ভব ও অসম্ভব কাজ, হাতেকলমে করিয়া দেখিবার জন্য আমাদের উৎসাহের অবধি ছিল না।

তখন ইউরোপে যুদ্ধ বাধিয়াছে। জিনিবপত্র সবই প্রতিদিন ভয়ানক দুর্ম্মূল্য হইয়া উঠিতেছে। আর এ যুদ্ধ যে কবে থামিবে, কে জানে? খরচ কমানো বা আয় বাড়ানোর কোন সহজ অথচ প্রকৃষ্ট পন্থা আবিষ্কার করিবার জন্য অস্থির হইয়া উঠিয়াছিলাম। পন্থাও শীঘ্রই মিলিল।

একদিন সকাল বেলায় স্ত্রীকে মাসিকপত্র পড়িয়া শুনাইতেছি। বিষয়, ছাগল-পোষা। লেখক অতি জোর ভাষায় বলিতেছেন, "বাড়িতে কয়েকটা ছাগল থাকিলে, বাড়ির আশেপাশের জঙ্গল সাফ করা, বাগানের ঘাস ছাঁটা প্রভৃতি খরচ অতি সহজেই বাঁচিয়া যায়। অথচ এজন্য প্রতি বৎসর আমাদের বড় কম ব্যয় হয়

না। মালী বা মজুরকে দিয়া ঠিক-মত কাজ পাওয়া যে কি কষ্টকর, তাহা ভুক্তভোগী মাত্রই জানেন।...একটা মালীর মাহিনা ও খাওয়া-পরাতে মাসে অন্তত ২৫৲ পড়ে। সে তুলনায় দুই-তিনটা ছাগল-পোষার খরচ কিছুই নয়।"

"সত্যি লিখেচে এই সব? কই, দেখি?" স্ত্রী ষ্টোভের উপরে দুধের কড়া ফেলিয়াই উঠিয়া বইটা দেখিতে আসিলেন। কারণও ছিল। ঠিক আগের দিনেই উড়ে মালীটা তাঁহার একজোড়া ব্রেস্‌লেট লইয়া বিনা নোটিসে চাকুরি ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে।

আমি পড়িতে লাগিলাম, "বর্ত্তমানে বাজারে মাংসের দর ক্রমেই চড়িতেছে।...ছাগলের দুধ, যেমন স্বাদু তেমনি পুষ্টিকর। শিশু রোগী ও বৃদ্ধের পক্ষে অতি উপকারী। আজকাল খাঁটি দুধ ত কিনিতে পাওয়াই যায় না। একটা ছাগল বৎসরে......"

কড়ার দুধ উথলিয়া পড়িয়া ষ্টোভ সশব্দে নিবিয়া গেল। স্ত্রী তাহা লক্ষ্যও করিলেন না,—"আচ্ছা, আমাদের ক'টা কেনা হবে? আমার ত মনে হচ্ছে ছটা হ'লেই আপাততঃ—কি বল?"

আমারও ঝোঁক চাপিয়াছিল, বলিলাম, "বেশ ত, তার আর কি? কেনা যাবে।"

যথাসময়ে ছাগল আসিয়া পৌছিল। ছটা নয়, দুইটা। তা হোক, ছাগল বটে! যেমন প্রকাণ্ড দেখিতে, তেমনি লম্বা শিঙ। স্ত্রী দেখিয়া আনন্দে মাতিয়া উঠিলেন। ছেলেরা চেঁচামেচি করিয়া হাট বসাইয়া দিল। স্ত্রীও কম যান্ না—"আহা, ওদের বেঁধে রেখো না। ছেড়ে দাও, গেট ত বন্ধই রইল। দেখো এখন কেমন আপনি চরে খাবে।"

উত্তরে আমি শুধু খোঁটাটার মাথায় হাতুড়ীর আরও কয়েকটা ঘা বসাইলাম। বলিলাম, "বেঁধে ত রাখতেই হবে। নইলে পরে যদি পালিয়ে যায়, তখন? আর ফুলের গাছগুলো......"

তিনি একটু বিষণ্ণমুখে, করুণ নেত্রে তাহাদের খাওয়া দেখিতে লাগিলেন। আহা বেচারীরা! একটু স্বাধীন-ভাবে চরিয়া খাইবার ক্ষমতাটুকু পর্য্যন্ত নাই!

পরদিন সকালে দেখা গেল, দড়ি ও খোঁটা সমেত ছাগল অন্তর্হিত হইয়াছে। বহু চেষ্টাতেও কোনো খোঁজ মিলিল না। ভোর হইতে সারাটা সকাল ছাগলের সন্ধানে রৌদ্রে ঘুরিয়া ঘুরিয়া, শেষে শ্রান্তদেহে বাড়িতে আসিয়া বসিয়া পড়িলাম। স্ত্রী ব্যাকুল হইয়া আমার প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। একা ফিরিয়া আসিতে দেখিয়া ছুটিয়া আসিয়া প্রশ্ন করিলেন, "কি হ'ল? পেলে না?"

বলিলাম, "নাঃ। সমস্ত পাড়াটা খুঁজে এলুম, কেউ বল্‌লে না তাদের দেখেচে। ও গেছে, আর পাওয়া যাবে না।"

তাঁহার চক্ষে নিরাশায় জল আসিল। ভগ্নকণ্ঠে বলিলেন, "পাওয়া যাবে না? না না, তুমি হয়ত ভাল করে খুঁজে দেখনি। ধর যদি কেউ—" কথা শেষ হইল না। তাঁহার দৃষ্টি অনুসরণ করিয়া চাহিয়া দেখিলাম, হারানিধি আপনি ফিরিয়া আসিতেছে।

বাগানের গেট খুলিয়া একজন খুব মোটা লোক প্রবেশ করিল, দুই হাতে দুইটা ছাগলকে দড়ি ধরিয়া সে প্রাণপণে টানিয়া আনিতেছে। চিনিলাম সে বাজারের সব্জীওয়ালা।

কাছে আসিয়া একহাতে কপালের ঘাম মুছিতে মুছিতে সে জিজ্ঞাসা করিল, "দেখুন ত, এ ছাগল আপনাদের?"

স্ত্রী চক্ষু মুছিতেও ভুলিয়া গেলেন। হাসিমুখে ছুটিয়া আসিয়া বলিলেন, "আঃ বাঁচালে! কোথায় পেলে এদের?"

অথচ দুইদিন আগেও এই লোকটি সব্জী বেচিতে আসিলে তিনি ইহার সম্মুখে বাহির হন নাই। দরদস্তর করিবার জন্য আমাকে পাড়া হইতে ডাকাইয়া আনাইয়াছিলেন।

লোকটা ততক্ষণ একপাশে একটা খোঁটার সঙ্গে দড়ি দুইটা বাঁধিয়া রাখিতেছিল। আমার দিকে চাহিয়া বলিল, "আজ্ঞে পেয়েছি আমার কপি ক্ষেতে। ভোর-বেলায় কপি তুল্‌তে গিয়েছি, না দেখি, এঁরা আরামে ফলার কর্‌ছেন। দু'দু কুড়ি কপি খেয়ে ফেলেছে, বাবু!

আর মাড়িয়ে ছিঁড়ে কত যে নষ্ট করেছে তার ঠিকানা নেই। বিশ্বেস না হয় চলুন বাবু, নিজের চোখে দেখে আস্‌বেন। আপনারা ভদ্দরলোক বলেই…"

বাধা দিয়া বলিলাম, "তোমার কত টাকার জিনিষ নষ্ট হয়েছে?"

"দু-কুড়ি কপি। পাটনেয়ে রাক্কুসে ফুলকপি বাবু, এক-একটা তিন সের করে ওজনে হ'ত। মেহনতটাই কি কম করেছি তার পেছনে? বাজারে গিয়ে দেখবেন বাবু, অমন কপি আর কারু বাগানে নেই এ তল্লাটে। তুলিনি, বলি, বড়দিনের বাজারে চড়া দামে বেচ্‌ব। তা খুব—"

বিরক্তি ধরিতেছিল। মনিব্যাগ বাহির করিয়া বলিলাম, "এই নাও, তোমার কপির দাম, দশ টাকা দিচ্ছি। হ'ল ত?"

সে বলিল,—"মারা যাব বাবু। আজকের বাজারটা মাটি হ'ল। তার ওপরে এদের ধরতে গিয়ে—"

এতক্ষণ নজরে পড়ে নাই। তাহার কথায় চক্ষু পড়িল, তাহার পায়ের দুইটা আঙুল ছিঁড়িয়া তখনও রক্ত ঝরিতেছে। বুঝিলাম, ছাগলরা নিতান্ত নিরীহ-ভাবে ধরা দেন নাই। লজ্জা পাইয়া আর একখানা নোট বাহির করিয়া দিলাম।

টাকা লইয়া সেলাম করিয়া সে চলিয়া গেল। যাইতে যাইতে মুখ ফিরাইয়া বলিয়া গেল, "এগুলোকে একটু সাম্‌লে রাখ্‌বেন বাবু, নইলে আবার…"

কিছুক্ষণ নীরবে যে গেট দিয়া সে বাহির হইয়া গেল সেইটার দিকে চাহিয়া রহিলাম। স্ত্রী সজল-স্নেহদৃষ্টিতে ছাগল দুটিকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। দেখিয়া দেখিয়া যেন তাঁহার আশ মিটিতেছিল না। তাহারা ততক্ষণ ঘুরিয়া ঘুরিয়া সমস্তটা দড়ি খোঁটার গায়ে জড়াইয়া, শেষে শুকনো সুন্দরীকাঠের খোঁটাটাকে খাওয়া যায় কিনা তাহাই পরীক্ষা করিয়া দেখিতেছিল।

দেওয়ালের বড় ঘড়িটায় টং টং করিয়া বারটা বাজিল। ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম্‌। স্ত্রী চমকিয়া চাহিয়া ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন,—"নাও, আর ব'সে থেকো না। চান করতে যাও এবারে!"

একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলাম, "সে ত যাচ্ছি। কিন্তু এদের নিয়ে কি করা যায় বল ত? রোজ যদি এমনিধারা হয় তবেই ত…"

তিনি বলিলেন, "যা হয়ে গেছে তার ত আর চারা নেই। এবার থেকে আরও ভাল ক'রে বেঁধে রাখতে হবে।"

"হ্যাঁ, সে ত নিশ্চয়ই। আজ বিকেলেই তার ব্যবস্থা কর্‌ছি। এখনকার মত বরং এদের ওধারের ঘরটাতে আট্‌কে রাখা যাক্‌।"

সে ঘরে কেহ থাকিত না। শুধু কতকগুলি জিনিষ স্তূপাকার করিয়া রাখা হইয়াছিল। তাহারই মধ্যে ছাগল পুরিয়া, দরজায় শিকল লাগাইলাম। তবু কিছুক্ষণের জন্য নিশ্চিন্ত!

বিকালে এক মুটের মাথায় চাপিয়া দুইটা লোহার খোঁটা ও দুই গাছা মজবুত শিকল আসিল। মুটের সাহায্যে খোঁটা দুইটাকে শক্ত করিয়া পুঁতিয়া তাহাতে শিকল জড়াইয়া বাঁধিলাম। সকল আয়োজন সমাপ্ত হইলে ছাগল আনিতে চলিলাম। একবার কোনো রকমে শিকল গলায় পরাইতে পারিলে হয়! তখন দেখা যাইবে কত জোর ধরেন তাঁহারা!

অতি সাবধানে ভয়ে ভয়ে দরজা খুলিতেই, প্রকাণ্ড কি একটা বস্তু অতর্কিতে কামানের গোলার মত বেগে আসিয়া গায়ের উপরে পড়িল। বিশেষ কিছু ভাবিবার অবসর নাই, সটান ভূমিসাৎ হইলাম। পরক্ষণেই সর্ব্বাঙ্গের উপর দিয়া যেন একটা প্রবল ঝড় বহিয়া গেল। শুধু ভুঁড়ির উপরে দুখানি চরণ চকিতে মালিকের পরিচয়টা জানাইয়া দিয়া গেল। চারিদিকে অন্ধকার। কুলগাছে অসংখ্য জোনাকি উড়িতেছে!

প্রায় দশ মিনিট পরে। চক্ষের অন্ধকার কাটিয়া গেলে ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিলাম তখনও মাথার মধ্যে একটা গুব্‌রে পোকা উড়িতেছে। শান-বাঁধানো রোয়াকের উপরে পড়িয়া মাথাটা বেশ খানিক ফুলিয়া উঠিয়াছে। পেটের উপরে জামাটা ক্রমে আরও লাল হইয়া যাইতেছে!

অতিকষ্টে উঠিয়া দরজা দিয়া ঘরের মধ্যে মুখ বাড়াইতেই—ভয়ে শিহরিয়া উঠিলাম।

ছাগলে সব খায় শুনিয়াছি। কিন্তু ঈশ্বরের সৃষ্টিতে যে এতবড় রাক্ষস আছে, কোনোদিন ধারণাও করিতে পারিতাম না। সের-দশেক ঘাস ও ছোলা খাইয়াও তাহাদের তৃপ্তি হয় নাই। এককোণে দু'খানা ডেক্‌চেয়ার ছিল। তাহার ক্যাম্বিস্ দুইটা, খান-তিনেক মাদুর, বারান্দার চাল ছাইবার জন্য আনা একগাদা খড়,—বেমালুম চলিয়া গিয়াছে। চেয়ারের পায়া ক'খানা পর্য্যন্ত অক্ষত থাকে নাই। মেঝের অবস্থা দেখিয়া বুঝিলাম, মাটি খুঁড়িয়াও সম্ভবতঃ খাবারেরই সন্ধান চলিয়াছিল। ইটের দেওয়াল, নেহাৎ খাওয়া যায় না, তাই রক্ষা পাইয়াছে।

নিজে সশরীরে আস্ত আছি কি-না ঠাহর করিয়া দেখিতেছি, একটা আর্ত্ত চীৎকার শুনিয়া চমকিয়া ছুটিলাম। এদিকে আসিয়া দেখি, স্ত্রী ছোট ছেলেটিকে সবলে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া রহিয়াছেন। তাঁহার কপাল কাটিয়া রক্তে সমস্ত কাপড় ভিজিয়া যাইতেছে। কাজেই বড় ছেলেটি নিশ্চল অবস্থায় মাটির উপরে পড়িয়া।

আমাকে দেখিয়া স্ত্রী কাঁদিয়া উঠিলেন, "খোকাকে মেরে ফেলেছে।"

খোকাকে তুলিয়া লইয়া বলিলাম, "ভয় পেয়ো না। মরেনি, অজ্ঞান হয়ে গেছে। কি ক'রে এমন হ'ল?"

বলিতেই অদূরে ছাগলদের দিকে দৃষ্টি পড়িল। তাহারা তখন পরম নিরীহ মুখে আমার অতি আদরের একটি টগর ফুলের ঝাড়কে নিঃশেষ করিতেছে।

স্ত্রী পাংশুমুখে কহিলেন, "এক্ষুণি ডাক্তারকে খবর দাও। এক মিনিট দেরি করো না।"

ডাক্তার আসিয়া ঔষধ দিয়া অনেক কষ্টে জ্ঞান করাইলেন। বলিলেন, "বেশী চোট লাগে নি, ভয়ে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল। একটু সাবধানে রাখবেন। ভয় পাওয়ার ফলে হয়ত জ্বর হ'তে পারে।"

স্ত্রী ভয়ে কাঁদিয়া ফেলিলেন। "জ্বর? ভয় পেয়ে জ্বর হ'লে ত শুনেছি নাকি··"

ডাক্তার একটু হাসিয়া বলিলেন, "অত ব্যস্ত হচ্ছেন কেন? সত্যি আর কোন ভয় নেই, তবে একটু হয়ত ভোগাবে, এই যা। মেণ্টাল শক্ পেয়েছে কি-না। তা, কেমন থাকে খবর দেবেন। কাল একবার এসে দেখে যাব বরং।"

সমস্ত রাত্রিটা ছেলেদের লইয়া দুইজনে বসিয়া কাটাইলাম। মনের মধ্যে যা হইতেছিল, লিখিয়া বুঝানো যায় না। অদৃষ্ট ভাল ছিল, আর কোনো উপসর্গ হইল না। পরদিন ডাক্তার আসিয়া দেখিয়া বলিলেন, "আর কোনো ভয় নাই।"

তার পর দিন-তিনেক নির্ব্বিঘ্নে কাটিল। এক্ষয়টা দিন ছেলেদের লইয়াই ব্যস্ত ছিলাম, ছাগলদের খবর লইবার সময় বা ইচ্ছা হয় নাই। তাহারাও আর কোনো উপদ্রব করিল না। মনে করিলাম, ছাগলেরও তাহা হইলে চক্ষুলজ্জা আছে!

ছেলেরা সারিয়া উঠার সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রীর ছাগলের উপরে লুপ্তস্নেহ আবার ফিরিয়া আসিয়াছিল। চতুর্থ দিনে আসিয়া বিমর্ষমুখে কহিলেন, "দেখ, ছাগল দুটোর কি যেন অসুখ করেছে। মাটিতে শুয়ে পড়ে কেবলি কাৎরাচ্চে, আর কি রকম সব শব্দ করছে। দেখ্‌বে এসো!"

কি হইল আবার? ছাগলের দাম যে আমার কাছে ক্রমেই বাড়িতেছে! উঠিতে হইল।

দেখিয়া বুঝিলাম, অসুখ যাই হউক, বেশীই বটে। পশুচিকিৎসক ডাকা হইল। তিনি আসিয়া বলিলেন, "ঠাণ্ডা লেগেছে। এমনি করে বাইরে ফেলে রেখেছেন! এরা হ'ল সৌখীন জানোয়ার,···"

সত্যই ত! একটু অনুতাপও হইল। বলিলাম, "তা, এখন,···"

"আর দেরি করবেন না, ঘরে নিয়ে যান। খুব গরমে রাখবেন। গরম সেঁক দিতে পারলে ভাল হয়। ঘাস খেতে দেবেন না, শুধু শুক্‌নো ছোলা। আর আমার সঙ্গে কাউকে দিন, ওষুধ পাঠিয়ে দিচ্চি। হ্যাঁ, আট টাকা। থ্যাঙ্কস্।"

ধরাধরি করিয়া ছাগলকে ঘরে লইয়া গিয়া তাহাদের

শুশ্রূষায় লাগিয়া গেলাম। স্ত্রীর পালিত-বাৎসল্য আছে! ছেলেরা রাত দশটা পর্য্যন্ত মায়ের অপেক্ষায় জাগিয়া থাকিয়া, শেষে নিজেরাই ঘুমাইয়া পড়িল।

ক্রমেই অসহ্য হইয়া উঠিতেছে। অথচ ইহাদিগকে বিদায় করিবার কথা তুলিলে স্ত্রী হয়ত মহামারী কাণ্ড বাধাইয়া দিবেন। সমস্ত রাত্রি জাগিয়া ছাগলের পরিচর্য্যা করিতে করিতে স্থির করিলাম,রাত্রি প্রভাত হইলেই ইহাদিগকে দূর করিব, তাহাতে যাহা হয় হউক। ক্রেতা খুঁজিবার মত ধৈর্য্য ছিল না। যাক্, বিলাইয়া দিব, না-হয় কিছু টাকা লইবে। কিন্তু কাহাকেই বা দিই? ঠিক্ হইয়াছে। আমার বাড়িব কাছেই এক মিস্ত্রী থাকে। লোকটি ভাল, আমার ব অনুগত। তাহাকেই দিয়া দিব। তাহার হাতে অন্ততপক্ষে অযত্ন হইবে না। হাজার হউক, জানিয়া শুনিয়া ত আর·····"

ভোর হইতেই বাহির হইয়া পড়িলাম। মিস্ত্রীর বাড়িতে গিয়া ডাকিতে, সে বাহিরে আসিল। আমাকে দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, "বাবু আপনি! এমন অসময়ে?"

আমি অধীর হইয়াছিলাম। কোনো ভূমিকা না করিয়া একেবারেই বলিলাম, "দুটো ছাগল বিলেয়ে দিচ্ছি। নেবে?"

সে শিহরিয়া চক্ষু বুজিয়া, দুইহাত জোড় করিয়া কপালে ঠেকাইল। কহিল, "আজ্ঞে, আর যা বল্‌বেন, কিন্তু ওটি নয়। ঢের শিক্ষে হয়ে গেছে।"

সভয়ে বলিলাম, "কি হয়েছিল? ছাগল পুষেছিলে নার কখনও?"

সে বলিল, "সে অনেক দিন আগে। আমার ভায়রাভাই এক ছাগল দিয়েছিল। ভাবলুম, বেশ ত, অমনি পাওয়া যাচ্ছে, কি ই বা আর এমন ক্ষেতি করবে? তা, চার দিনেতেই এমন হাল করে তুল্‌লে, শেষটা প্রাণের দায়ে ঘরের কড়ি দিয়ে তাকে বিদেয় করতে হল। সে ত তবু ছিল বাচ্চা। আর আপনার ছাগল যত, ঘোড়া! বাপ রে!"

হতাশ হইয়া বাড়ি ফিরিলাম। তাহাকে বার-বার সাবধান করিয়া দিয়া আসিলাম, যেন কাহারও কাছে একথা প্রকাশ না করে। স্ত্রীর কানে গেলে কি হইবে ভাল করিয়াই বুঝিতে পারিতেছিলাম।

মনে মনে একটু গোপন আশা ছিল, যদি মরে। কিন্তু মরিলে আমার কর্ম্মভোগ হয় কই? তখনও তাহার কিছু বাকী রহিয়াছে যে। কয়েক দিনের মধ্যেই ছাগল সারিয়া উঠিয়া আবার বাড়ির গাছপালা উচ্ছেদ করিতে লাগিয়া গেল। তারপর সময় বুঝিয়া আর একবার অন্তর্দ্ধান!

আতিপাতি করিয়া সমস্ত শহর খুঁজিতে লাগিলাম—ছাগলের টানে নয় আবার কাহাকে খেসারৎ দিতে হইবে, সেই ভয়ে। কিন্তু কোথায় ছাগল? দিনকতক খুঁজিয়া হাল ছাড়িলাম। মনের মধ্যে একটা উৎকট আনন্দ হইতেছিল, কিন্তু স্ত্রীর সম্মুখে তাহা প্রকাশ করিতে সাহস হইল না। শেষটা একদিন তাঁহাকে সান্ত্বনা দিবার অভিপ্রায়ে বলিলাম, "আচ্ছা, খবরের কাগজে একটা বিজ্ঞাপন দিলে হ'ত না?"

তিনি ব্যগ্রকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "না, না, কাজ নেই। ঢের হয়েছে।" অসীম বিস্ময়ে তাঁহার দিকে চাহিয়া, দু-জনেই হাসিয়া ফেলিলাম। ছোট ছেলে কাছেই খেলা করিতেছিল। কোলে তুলিয়া লইয়া, তাহার কপালে ক্ষতচিহ্নটার উপর সস্নেহে হাত বুলাইয়া তিনি বলিলেন, "বাবাঃ! গেছে না বেঁচেছি!"

সানন্দে স্বীকার করিলাম, এ বিষয়ে আমিও তাঁহার সহিত একমত।

আরও তিন দিন পরে। ছাগলের আর কোনো সংবাদ নাই। সকাল বেলায় মালীর সঙ্গে বাগানে বেড়াইয়া ছাগলের ভুক্তাবশিষ্ট গাছগুলিকে আবার বাঁচাইয়া তোলা যায় কি না তাহাই দেখিতেছিলাম। মালীটি নূতন।

"সুরেশ বাবু এ বাড়িতে থাকেন?"

ফিরিয়া দেখিলাম, ছিপছিপে চেহারার একটি ছেলে,—অপরিচিত। তাহার দিকে চাহিতেই আবার প্রশ্ন করিল, 'সুরেশচন্দ্র ব্যানার্জ্জি? কলেজের···"

বলিলাম, "আমিই। কেন?"

একটা নমস্কার করিয়া বলিল, "চিঠি আছে।" বলিয়া

জামার পকেটে হাত পূরিল। চিঠিটা লইতে হাত বাড়াইয়া বলিলাম, "কোথা থেকে আস্‌ছ ?"

সে বলিল, শহর হইতে মাইল-তিনেক দূরে কোথায় একটা কাঠের আড়ত আছে, সেইখানে সে কাজ করে। আড়তদার আমার কাছে একখানা চিঠি দিয়েছেন। একটু বিস্মিতভাবেই চিঠিখানা লইয়া খুলিলাম। কিছুদূর পড়িতেই কিন্তু মনটা একেবারে লাফাইয়া উঠিল। আড়তদার সংক্ষেপে জানাইয়াছেন, তাঁহার আড়তের মধ্যে দুইটা ছাগল মরিয়া রহিয়াছে। তিনি জানিতে পারিয়াছেন, সে দুটি আমারই সম্পত্তি। তাহাদের লইয়া এখন কি করা হইবে? আঃ! বকুবাবুর মত আমারও ইচ্ছা হইতেছিল, মনিব্যাগ্‌টা খুলিয়া ছেলেটির হাতে উপুড় করিয়া দিই। কিন্তু ছাগলেরা যে সেটাকে বেশ কিছু হাল্‌কা করিয়াই গিয়াছে! সুতরাং সে ইচ্ছাটাকে অগত্যা দমন করিয়া ক্ষিপ্রহস্তে আড়তদারকে লিখিয়া দিলাম, তিনি ছাগল যাহা খুশী করিতে পারেন, আমার কোনো আপত্তি বা দাবি নাই।

ছেলেটি চলিয়া গেলে স্ত্রীকে গিয়া সুখবরটা দিলাম। সব শুনিয়া তিনিও সজলচক্ষে আমার আনন্দ-প্রকাশে যোগ দিলেন। চক্ষের জলটা অবশ্য আমাকে দেখাইতে তাঁহার ইচ্ছা ছিল না।

অনেক দিন পর আবার নিশ্চিন্তমনে নিরুদ্বেগে পাড়ায় বেড়াইতে চলিলাম। উঃ, সে মুক্তির স্বাদ কি মধুর! যাহার সঙ্গে দেখা হয় তাহাকেই খবরটা জানাইয়া দিই!

দুপুরে হঠাৎ মনে হইল, ছাগপর্ব্ব ত শেষ হইল। এবারে তাহার লাভ-লোকসানটা হিসাব করিয়া দেখিলে হইত।

শেষ পর্য্যন্ত হিসাবটা মোটামুটি এইরূপ দাঁড়াইল—

দুইটা ছাগল	৪৫৲
সব্জীওয়ালার ক্ষতিপূরণ	২০৲
খোঁটা ও শিকল	৭৷৵০
মুটে ভাড়া	১৲
দুইটা চেয়ার	১৮৲
মাদুর ও খড়	৪৷০
ডাক্তারের বিল	২০৸০
পশু চিকিৎসকের বিল	১০৵০
ছোলা প্রভৃতি	১৭৷৷৴০
	১৪৪৷৵০

নিজেদের কষ্ট ও উৎকণ্ঠার বোঝাটুকু ত ইহার উ[illegible] উপরিলাভ!

মাসের শেষ তারিখে কাঠের আড়তের [illegible] ছেলেটি আবার একখানা চিঠি লইয়া আসিল। খ[illegible] খুলিতে, ছোট একটুক্‌রা কাগজ বাহির হইল। ভী[illegible] নেত্রে পড়িলাম,

মহাশয়,

অনুগ্রহ করিয়া দুইটি ছাগল গোর দিবার খরচ ২[illegible] ও দুইজন ধাঙড়ের মজুরী ৫৲, মোট ৭৷০ পাঠাইয়া [illegible] বাধিত করিবেন।

নিবেদক
শ্রীরাধাচরণ সাহা
কাঠের আড়তদার।

স্ত্রী কহিলেন, "পাঠিয়ে দাও টাকাটা। লো[illegible] ভাল। তবু ভাগ্যি যে শেয়ালে শকুনে খায় নি!"

কিন্তু টাকার ক্ষতির উপরেও একটা জিনিষ আ[illegible] অখ্যাতি। স্ত্রীর খেয়াল, নূতন ছাগলের দুধ, প্র[illegible] বেশীদের বাড়িতে উপহার-স্বরূপ পাঠানো হই[illegible] তাঁহারা আসিয়া জনে জনে বলিয়া যাইতে লাগি[illegible] দুধ খাইয়া ছেলেদের হুটোপাটি দুরন্তপনা বা[illegible] গিয়াছে। একজন ত একটু ইতস্তত করিয়া ব[illegible] বসিলেন, "আর বল্‌ব কি মশাই, ছোট ছেলেটা ঐ[illegible] খেয়েছিল, খানিক পরে দেখি না মাথা নীচু [illegible] কেবলই দেয়ালে ঢুঁ মারছে। নিষেধ করলুম, তা গ্রা[illegible] নেই। তা, হবে না কেন? যা ছাগল আপনার, [illegible] ত দুধ ..."

সাহস করিয়া কথাটা অবিশ্বাসও করিতে পারি না। সত্যই ত। নেহাৎ অসম্ভবও বলিতে পারি না [illegible]

প্র্যাক্‌টিকাল ইকনমিক্‌সের প্রতি ঝোঁকটা আ[illegible] রকম কমিয়া গিয়াছে!*

* ইংরেজী গল্প অবলম্বনে।



কি লিখি

লৈখিক ভাষায় প্রবন্ধ রচিত হইয়া থাকে। লৈখিক ভাষা, হুজন-স্বীকৃত ভাষা। মৌখিক ভাষায় রচিত হইতে পারে না, তাহা হে। দুইটিকে পৃথক্ ভাষা বলা অন্যায়। লৈখিক ভাষায় ক্রিয়াপদ ীর্ঘরূপে লেখা হয়, মৌখিক ভাষায় হ্রস্বরূপ। যেমন, 'করিয়াছি', লিখিতেছিলাম' স্থলে 'করেছি,' 'লিখ্‌ছিলাম'। কয়েকটা সর্ব্বনাম দেও দীর্ঘ ও হ্রস্বরূপ আছে। যেমন, 'আমাদিগের'—'আমাদের,' াহাদিগকে'—'তাদিকে'। বর্ত্তমান লৈখিক ভাষায় সর্ব্বনাম পদের ধ্যাস্থিত 'গ' ও 'হ' লোপ করা হইতেছে। অতএব কেবল ক্রিয়াপদে ভয় ভাষায় কিছু ভেদ আছে। ব্যাকরণের অন্যপদে নাই। কিন্তু ব্দের উচ্চারণে দুই ভাষায় বহু ভেদ আছে। এ বিষয় পরে লিতেছি।

মৌখিক ভাষা সাহিত্যের ভাষা হইতে বাধা কি? অনেক কাল াবৎ এই তর্ক চলিয়া আসিতেছে। অধিকাংশ তর্ক যেমন হইয়া থাকে, খানেও তেমন। গোড়া বাঁধনি না করিয়া তর্ক। প্রথমে "সাহিত্য" ামের অর্থ জানা চাই।...দ্বিতীয়ে, "মৌখিক ভাষা" ইহার লক্ষণ চাই। সাহিত্য" অবশ্য লৈখিক ও স্থায়ী। কেহ উড়া কথাকে সাহিত্য লিবেন না; যে রচনায় স্থায়িত্বের সম্ভাবনা নাই, সেটা সাহিত্য লিবেন না। অভিধেয় অনুসারে ইহার তিন ভাগ করা যাইতে ারে। (১) জ্ঞান-সাহিত্য, (২) ক্রিয়া-সাহিত্য, (৩) ইচ্ছা-সাহিত্য। ে রচনায় পাঠকের অন্ত-র্জ্ঞান-বৃদ্ধি মুখ্য উদ্দেশ্য, সেটা জ্ঞান-সাহিত্য। মেন দর্শন। কর্ম্ম শিখাইবার অভিপ্রায়ে যে উপদেশ, সে উপদেশ ক্রিয়া-সাহিত্য। যেমন, ইতিহাস, বিদ্যা ও কলা। যাহাতে মিথ্যা ষ্টির দ্বারা পাঠকের চিত্তবিনোদন হয়, সেটা ইচ্ছা-সাহিত্য। মেন উপকথা, নাটক। প্রাচীন সত্ত্ব রজঃ তমঃ, এই তিন ভাগ রিলে জ্ঞান-সাহিত্য সাত্ত্বিক, ক্রিয়া সাহিত্য রাজসিক, ইচ্ছা-সাহিত্য ামসিক। ইচ্ছা-সাহিত্য রস-প্রধান। এই হেতু ইহাকে রস-সাহিত্য লা যাইতে পারে। যে রচনায় তিন গুণের একটাও থাকে না, টা টিকিতে পারে না, সাহিত্যও নয়। অধিকাংশ সাহিত্য মিশ্র। কানটায় এ গুণ অধিক, কোনটায় অন্য গুণ অধিক। গুণের মধ্যে পও ধরিতেছি। রচনায় মাধুর্য না থাকিলে লোকে পড়ে না।

এখন মূল প্রশ্নে আসি। মৌখিক ভাষায় সাহিত্য রচিত হইতে ারে কি না। ইহার উত্তর,—পারে, পারে না। মৌখিক ভাষা সাধু ভাষা নয়, অশ্লীল ও অশিষ্ট ভাষা নয়। কিন্তু বিবাদের হেতু খানে নয়। মৌখিক ভাষা মানুষের মুখের ভাষা, মাতৃভাষা। কান্ মানুষের মাতৃভাষা? যোজনান্তে ভাষা ভেদ হয়। এখন াজনান্তে না হউক, তিন চারি যোজনান্তে হয়। ভদ্র ও ইতর শ্রেণীর ধ্যে কিছু ভেদ আছে, অর্থাৎ মৌখিক ভাষা অ-স্থির, দেশকালপাত্র নুসারে বিভিন্ন। লেখক মাত্রেই তাঁহার রচনার স্থায়িত্ব ইচ্ছা করেন; ধু স্থায়িত্ব নয়, তাহা বহুজনাদৃত, দেখিতে ইচ্ছা করেন। মৌখিক াষার সে সম্ভাবনা নাই। কারণ উহা অ-স্থির ও ভেদ-বহুল।...

যখন দেশ ও পাত্র ভেদে মৌখিক ভাষায় ভেদ আছে, তখন কান্ দেশের কোন্ পাত্রের ভাষা আদর্শ ধরা যাইবে? বাদী বলিয়াছেন, কলিকাতার মৌখিক ভাষা সে আদর্শ। কথাটা ঠিক নয়। কলিকাতার ভাষা বলিয়া একটা ভাষা নাই। কলিকাতা নানাস্থানের নানা বাঙ্গালীর মিলনক্ষেত্র বটে, কিন্তু মন দিয়া শুনিলে বুঝি, সকলের পক্ষে বাইরের ভাষা ও ভিতরের ভাষা এক নয়। অর্থাৎ বাহির বলিয়া এক ভেদ আছে। কাহারও পক্ষে সেটা কৃত্রিম, কাহারও পক্ষে অকৃত্রিম।

তবে দাঁড়াইল এই, যাহাদের পক্ষে অকৃত্রিম অর্থাৎ মাতৃভাষা, সেই অল্প সংখ্যক লোকের ভাষা আদর্শ করিতে হইবে। এখানেও অল্প-স্বল্প ভেদ আছে। শব্দের উচ্চারণে ভেদ আছে। এক এক ভদ্রবংশে 'শ' নাই; সব 'স'। এক এক ভদ্রবংশে ঙ্গ নাই; সব ঙ্‌। ইত্যাদি। শব্দেও ভেদ আছে। 'দিদিমণি,' 'কথাখানার ভাবখানা' হইতে 'গানখানা', শুনিলে অনেকস্থলে মেয়েরাও কলিকাতার নগরালীর খোঁটা দেয়। কেহ বলে, ছিলাম, কেহ 'ছিলেম', কেহ 'ছিলুম', কেহবা 'ছিনু'। অসংখ্য লোক 'ছেল' বলে।

যত মানুষ তত কণ্ঠ, তত মন, ভাষাও তত বলিতে পারা যায়। কিন্তু আমরা অন্ধকারে কিম্বা দূর হইতে কথা শুনিয়া লোক চিনিতে পারি। বামাকণ্ঠ কি পুরুষকণ্ঠ, সে প্রভেদ ব্যতীত আরও অনেক অবান্তর থাকে, তদ্দ্বারা আমরা চিনিতে পারি। এক একজন এত দ্রুত কথা বলে যেন ঝড় বহিতে থাকে, পদের পরে পরে বিরাম থাকে না, বর্ণের পরে পরেও থাকে না। হাতের লেখার ছাঁদ সকলের সমান হয় না, হইতে পারে না। কিন্তু আমরা অবান্তর ছাড়িয়া মুখ্যরূপ দেখিয়া পরের লেখা পড়িয়া থাকি। সেইরূপ বহুজনপদবাসী বহুজনের ভাষা অবিকল এক হয় না, হইতে পারে না। যে রূপ সকলে চেনে, মানে, সে রূপই তাহাদের ভাষা। ইহাকে জাত্যভাষা বলিতেছি। সেটা সকল প্রভেদের মধ্যম নিষ্পত্তি নয়, কোনও এক স্থানের ভাষা। পূর্ব্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ ও মধ্য বঙ্গের ভাষা মিশিয়া বাঙ্গালা ভাষা নয়, কোনও এক স্থানের চলিত ভাষা বাঙ্গালা ভাষার প্রকৃতি। সে স্থান, দক্ষিণ রাঢ়।

রাঢ় বলিতে ভাগীরথীর পশ্চিমস্থিত নদীমাতৃক ভূ-ভাগ বুঝায়। ইহার পূর্ব্বসীমা ভাগীরথী, পশ্চিমসীমা দারকেশ্বর, বলা যাইতে পারে। অর্থাৎ বর্ত্তমান পশ্চিমবঙ্গের মাঝদিয়া উত্তর দক্ষিণ এক রেখা করিলে এই রেখার পূর্ব্বে রাঢ় দেশ। রাঢ়েও দুই-ভাগ আছে, উত্তর রাঢ় ও দক্ষিণ রাঢ়। বর্দ্ধমান ও কালনা দিয়া এক রেখা করিলে সে রেখার উত্তরে উত্তর-রাঢ়, দক্ষিণে দক্ষিণ-রাঢ়। ভাষা শুনিয়া দক্ষিণ রাঢ়ও দুই ভাগ করিতে পারা যায়। পূর্ব্বে ও দক্ষিণে ভাগীরথী, পশ্চিমে দামোদর। এই ভূ-ভাগ পূর্ব্বকূল। পূর্ব্বে দামোদর, পশ্চিমে দ্বারকেশ্বর, এই ভূ-ভাগ পশ্চিমকূল। এই যে দক্ষিণ রাঢ়ের পশ্চিমকূল, ইহা বর্ত্তমান হুগলী জেলার পশ্চিমাংশ লইয়া কতকটা দেশ। মৎকৃত ব্যাকরণে এই দেশকে মধ্যরাঢ় বলিয়াছি। এইটি দক্ষিণ-রাঢ় ছিল, এখন দক্ষিণে গঙ্গা পর্য্যন্ত দক্ষিণ-রাঢ় বিস্তীর্ণ হইয়াছে, সে দিনকার হাওড়া দক্ষিণ-রাঢ়ের দক্ষিণের সীমা হইয়াছে। আমি মনে করি, মধ্য-রাঢ়ের চলিত অর্থাৎ মৌখিক ভাষাই জাত্যভাষা। আমি 'আদর্শ' বলিতেছি না, বলিতেছি প্রকৃতি (১৩৩৮)।

কেন বলিতেছি? (১) এই অঞ্চলের শিক্ষিত অশিক্ষিতের, উচ্চ শ্রেণী নিম্ন শ্রেণীর, সকলের এক ভাষা। বঙ্গের অন্য কুত্রাপি এই লক্ষণ পাওয়া যাইবে না। এখানকার নারী ভাষার শব্দে কয়েকটা প্রভেদ আছে। কিন্তু বিশেষ লক্ষ্য না করিলে ধরা পড়িবে না। (২) জাত্যভাষার সহিত এই অঞ্চলের মৌখিক ভাষা মিলাইলে, শব্দে ও ব্যাকরণে, দুই ভাষা প্রায় এক বোধ হইবে। বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহার কৃত বাল-পাঠ্য পুস্তকে এই অঞ্চলের ভাষা লিখিয়াছেন, শুদ্ধ করেন নাই। তাঁহার পিতৃভূমি মলয়পুর, আরামবাগের ৭।৮ মাইল পূ-পূ-উত্তরে, দ্বারকেশ্বর ও দামোদরের প্রায় মাঝে। বীরসিংহ গ্রামে তাঁহার মাতুলালয় ছিল, এবং সে-খানেই তিনি লালিত পালিত হইয়াছিলেন। মলয়পুরের ও বীরসিংহের ভাষার শব্দে একটু প্রভেদ আছে। কিন্তু তিনি মলয়পুর অঞ্চলের ভাষা লিখিয়াছিলেন। উত্তরে ঘনরাম, পূর্ব্বে ভারতচন্দ্র, দক্ষিণে রামমোহন, পশ্চিমে মাণিকরাম ও শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস, ইঁহাদের রচিত বই পড়িলেই ভাষার উদাহরণ পাওয়া যাইবে। ভাষার ভাল মন্দ বলিলে বুঝি, জাত্যভাষার, মান্য ও আদরণীয় ভাষার তুলনায় ভাল কিম্বা মন্দ। অর্থাৎ প্রকৃতির বিকৃতি (variation from the type) তুলনা করি।

যাহাকে কলিকাতার ভাষা, রাজধানীর ভাষা বলি এবং যাহাকে বিজ্ঞ জনে আদর্শ করিতে বলিয়া থাকেন, সে ভাষা মূলে এই মধ্য রাঢ়ের ভাষা। তাহাতে দুই পাঁচটা নূতন শাখা গজাইয়াছে। কিন্তু সে শাখা বিভিন্ন স্থানের বাঙ্গালা ভাষার অঙ্গ নয়, নদীয়া জেলার ও হিন্দীর উড়া পাতা শাখায় জড়াইয়া গিয়াছে। সে সকল শব্দ না পাইলে ভাষা শুদ্ধ থাকিত।

কেহ কেহ মনে করিতে পারেন, বুঝি-বা বিদ্যাসাগর মহাশয় বাল-পাঠ্য বই লিখিয়া তাঁহার দেশের ভাষা চালাইয়া গিয়াছেন। কিন্তু সেটা ভুল, তিনি ভাষা গড়েন নাই. যেমন পাইয়াছিলেন, তেমন রাখিয়া গিয়াছেন। তিনি ক-রি-বে-ক রাখিয়া গিয়াছেন, ক-রি-বে করেন নাই। ই-বে-ক, ই-লে-ক এখনও তাঁহার মাতুলালয়ের দিকে চলিতেছে। রামমোহন রায়ের ও বিদ্যাসাগর মহাশয়ের দেশে এক 'না' প্রয়োগ আছে, সেটার অর্থ 'নাই'। "তাকে চিঠি লিখি না" অর্থাৎ "লিখি নাই"। কেমনে অতীত ও বর্ত্তমান কালে প্রভেদ রাখা হয়, অনুসন্ধান করি নাই। বিদ্যাসাগর মহাশয় এই দ্ব্যর্থ 'না' বর্জ্জন করিয়া তাঁহার পিতৃভূমির মানরক্ষা করিয়াছিলেন।...

রাজা মানসিংহের সময় পর্য্যন্ত দক্ষিণ রাঢ় হিন্দুরাজার অধীন ছিল। ভাষার শুদ্ধি ও সমতা রক্ষার পক্ষে ইহা বিশেষ কারণ হইয়াছিল। উত্তর-রাঢ়ে এই সুবিধা ছিল না। বৈষ্ণব পদাবলীর দেশ পশ্চাতে পড়িয়া রহিল। সে দেশের সকল কবির ভাষা সমান নয়। লোচনদাসের "চৈতন্যমঙ্গল" এবং কৃষ্ণদাস কবিরাজের "চৈতন্যচরিতামৃত" গ্রন্থে বর্দ্ধমান জেলার ভাগীরথীর পশ্চিমাঞ্চলের ইং ষোড়শ শতাব্দের বাঙ্গালা ভাষা আছে। কিন্তু দুই ভাষার মধ্যে বিস্তর প্রভেদ আছে। এই শতাব্দের সপ্তগ্রাম-নিবাসী মাধবাচার্য্যের ও দামিন্যা-বাসী মুকুন্দরামের চণ্ডীর ভাষায় প্রভেদ নাই বলিলেই হয়।

দক্ষিণ রাঢ়ের দক্ষিণ ভাগ অধিক পূর্ব্বে বাসযোগ্য ছিল না। হুগলী চুঁচুড়া শ্রীরামপুর বালি প্রভৃতি সেদিনকার। সে সব অঞ্চলে নানা দেশের লোক গিয়া বাস করিয়াছে, ভাষার উচ্চনীচ ভেদ রহিয়াছে। হুগলীর শিক্ষিত লোকেও বলেন, তা-দে-ঘরে, অর্থাৎ তা-দি-কে। নদীয়ায় তাঁ-দে-র। এই তা-দে-র সম্বন্ধপদ কি কর্ম্মপদ, তাহা সহজে বুঝিতে পারা যায় না। তখন কর্ম্মপদ বুঝাই তা-দে-র-কে বলিতে হয়।

স্থাননির্ণয়ের প্রয়োজন দুইটি। (১) কলিকাতার ভাষার সংগ্রহ হয় নাই। সংগ্রহ হইলে দেখা যাইবে, শব্দ অল্প, তদ্দ নগরবাসীর কাজ চলিবে, গ্রামবাসীর চলিবে না। কলিকাতায় কই? অগণ্য গাছপালা জীবজন্তু কই? দেশে যে বিপুল কৃষি চলিতেছে, তাহার একটি শব্দও পাওয়া যাইবে না। এইরূপ অন্য ক্রিয়াসাহিত্যের শব্দের অভাব হইবে। কোন্‌টি জাত্য, ইহা জানিয়া, লেখক হাতড়াইয়া বেড়ান, কিম্বা নিজের গ্রামের প্রচ শব্দ লেখেন। কিন্তু স্ব-স্ব স্বাধীন হইলে বাঙ্গালাভাষা নামে ভাষ থাকিবে না। আমি বুঝি, মাতৃভাষার তুল্য মধুর ভাষা নাই। কি কি করি, দশজনকে লইয়া সংসার। তাহাঁদিগকে ছাড়িয়া কে বাঁচিব? তাঁহাদের মন যোগাইতেই হইবে, আমি স্বাধীন হই আমিই ঠকিব। অতএব বছর কতক মাতৃভাষার সঙ্গে বিমাতৃভাষা শিখিতে হইবে; পরে বিমাতৃভাষাই মাতৃভাষা হইয়া যাইবে।

একটা উদাহরণ দিই। বৈশাখ মাসের "পথ" নামক মাসি পুস্তক হইতে লইতেছি। ইহাতে "জনৈক পল্লীবাসী" "পাট, ধে গাছ ও ইক্ষু" চাষের ক্রম ও চাষে লভ্য বর্ণনা করিয়াছেন। কয়ে শব্দ তুলিতেছি। তিনি শব্দগুলির অর্থ দিয়াছেন, নইলে কয়ে বুঝিতাম না। বি-দে (কৃষিযন্ত্র), হইবে বি-দে; বাস্তবিক বি (সং বিদ্ধক)। বা-ই-ন, তিনি লিখিয়াছেন, গুড় পাকের চুল্লী; আমি বুঝি গুড়পাকের গো স্তনাকার বৃহৎ মৃৎপাত্র (সং বা-ণ এই অর্থ ঠিক, নইলে 'পাঁচ বাইন' 'সাত বাইন' চুলী বলা চলিত ন খেজুর কিম্বা আখের রসের গা, দ, ইনি লিখিছেন ম-লো। এই যদি এক এক গ্রামে প্রচলিত নাম লিখিতে হয়, প্রত্যেক নামের অ লিখিতে হইবে। আর এক লেখক কা-শ্যা ঘাসের আ করিতে লিখিয়াছেন। তিনি ঠিক বানান করিয়াছেন; দুর্ভাগ্য, ন শিক্ষিত পড়িবেন 'কাশ্‌শা', আর আকাশ পাতাল ভাবি থাকিবেন।

(২) একটা জাত্য ভাষা চাই। নইলে লেখক স্বেচ্ছামত শব্দ লি ভাষায় বিপ্লব ঘটাইতে থাকিবেন। একটা উদাহরণ তুলি। সম্প্র শ্রীযুত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় "বিদ্যাসাগর-প্রসঙ্গ" লিখিয়াছে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী ভূমিকা লিখিয়াছে দ্রষ্টব্য এই, (ভূমিকায়) তিনি আ-ম না লিখিয়া আঁ-ব লিখিয়াছে আঁ-ব বুঝি; কিন্তু "তিনি হাসিতে হাসিতে ন-গি-য়া পড়িতেন। * তিনি অনেকবার ন-গি-য়া ন-গি-য়া পড়িলেন।" বুঝিতে পারি না। লোকে হাসিতে হাসিতে ঢ-লি-য়া পড়ে, লু-টি-য়া পড়ে, গ-লি পড়ে, হাঁ-ফা-ই-য়া পড়ে। কিন্তু ন-গি-য়া পড়িবার হাসি শুনি না ভূমিকায় দেখিতেছি বা-র-গী। লোকে বলে "ব-র্গী র হাঙ্গামা তিনি একই দ্রব্য বুঝাইতে 'চাবি কুলুপ', চাবি 'তালা' লিখিয়াছে তাঁহার ভাষার আরও কিছু বিশেষ আছে, পরে দেখিতেছি।

গত ত্রিশ বৎসরের মধ্যে 'গল্প' ও 'উপন্যাস' দ্বারা বাংলা সাহিত্যে বাজার ভরিয়া গিয়াছে।..."ভারতবর্ষে" প্রকাশিত ও জৈষ্ঠমাসে সমা "বিপত্তি" পড়িয়াছি। মৌখিক ভাষার উদাহরণ নিমিত্ত "বিপত্তি ধরিতেছি। শাস্ত্রী মহাশয়ের লিখিত "ভূমিকা"তেও মৌখিক ভ আছে। "বিপত্তির" ভাষা শুদ্ধ বাংলা, জাত্য বাংলা, বলিতে পা ইহাতে বাক্যের ঘূর্ণিপাক নাই, ইংরেজীর তর্জ্জমা নাই, খাঁটি বাংলা বড় বড় তত্ত্বের আলোচনা আছে। লেখিকা একাগ্রমনে লি গিয়াছেন, বোধ হয় ভাষা দেখিবার মন পান নাই, কিন্তু আশ

ব্যাকরণ-ভুল নাই! অল্প রচনাই এই পরীক্ষার পাশ হইয়া থাকে। "ভূমিকা"ও পাশ হইতে পারে নাই। শুধু পদবিন্যাসে নয়, লৈখিক ও মৌখিক ভাষার ক্রিয়াপদের রূপে বিসম্বাদ ঘটিয়াছে। অত্যল্প জনে শাস্ত্রী মহাশয়ের তুল্য সোজা বাংলা লিখিতে পারেন, তথাপি মতান্তর ঘটিয়াছে। "বিপত্তি"র একটি স্থানে 'সিংহ' স্থানে 'সিংহরা' হইয়াছে, কিন্তু পরবর্ত্তী বাক্যে ভুল সংশোধিত হইয়াছে। বিদ্যালয় পাঠ্য-পুস্তকে 'গোরুরা,' 'গাছেরা' দেখিয়াছি।

"বিপত্তি"র কয়েকটি শব্দ পরীক্ষা করি। ঠা-কু-র্দ্দা অবশ্য ঠা-কু র-দা-দা, সংক্ষেপে রাঢ়ে ঠা-কু-দ্দা, নদীয়ায় ঠা-কু-র্দ্দা, তৎপূর্ব্বে ঠা-উ-র্দ্দা। লেখিকা শব্দের মূল রূপ প্রকাশের পক্ষে। অনেক শব্দে ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু তিনি রাঢ়ের ভাষায় লিখিয়াছেন, সেই সূত্রে ঠা-কু-দ্দা লিখিলে ভাল হইত। বিশেষতঃ যখন দ-এর দ্বিত্ব হইয়াছে, তখন রেফ থাকিতে পারে না। 'গ্রা-ম্ভা-রী চালে সম্মানের পাত্র সাজা'—গ্রা-স্তা-রী শুনিয়াছি মনে হইতেছে। গম্ভীর নয়, স্বাভিমানী অর্থ। কিন্তু কেমনে? বিক্রম-ভারী? 'রসনা ত-ড়-পা-চ্ছে' শুনি নাই; অর্থ, জিহ্বা লাফাচ্ছে। হিন্দী হইতে কলিকাতায় নাকি ত-ড়-পা-চ্ছে আছে। কিন্তু হিন্দী হইলেই পাওক্তেয় হয় না। বোধ হয় 'তল-প্রহার' হইতে; জিহ্বা তল দ্বারা প্রহার করিতেছে। রসনার তড়পানা, অশিষ্ট ভাষা। 'আজে বাজে কাজ'—'বাজে কাজ,' কর্ত্তব্য-বাহ্য কাজ বুঝি, কিন্তু আ-জে? আদ্য? প্রধান কাজ ও অপ্রধান কাজ, এই অর্থ হইতে পারে। তাহা হইলে এখানে আ-জে হইবে না, শুধু বাজে থাকিবে। অলস লোক আ-জে বা-জে কিছুই করে না, এরূপ প্রয়োগ থাকিবার কথা। যদি না থাকে, আ-জু বেগারের কাজ, বা-জে বাহ্য কাজ, প্রয়োগ দেখিলে এই মূল মনে হয়। আ-জু-রু শব্দ সং. প্রচলিত নয়। 'নানা-বাহানা' ছাপায় এক পদ। বা-হা-না, ছল বুঝি, কিন্তু 'নানা-বাহানা? বা-য়-না-ক্কা নারী ভাষায় স্নেহে ভৎর্সনা। কিন্তু মূল কি? 'স্কন্ধে কাটা পেত্নী'? পেত্নীর সর্ব্বাঙ্গ থাকে, কিন্তু দেহ শুষ্ক শীর্ণ। বা-রে-ও্যা, "ভূমিকা"র বা-রা-ও্যা ঠিক। কেহ কেহ মনে করেন, বুঝি ইংরেজী ভে-রা-ও্যা হইতে বা-রা-ও্যা, কিন্তু ঠিক উল্টা। কলিকাতায় ইংরেজী শিক্ষিতা মহিলার মুখে ভেরো্যা হইয়াছে। গিঁ-ট গ্রাম্য, গাঁ ঠ জাত্য। নইলে গাঁঠরি পাই না। গাঁ-ট-কাটাও আছে। হা-য়-রা-ণ হইবে হ-য়-রা-ন। "হায় হায়" বলিতে বলিতে গ্রাম্য হা-য়-রা-ণ। এইরূপ একটা জানা শব্দের উচ্চারণ বশে বালকেরা অন্য শব্দ রূপান্তরিত করিয়া ফেলে। যদি তে-র তাহা হইলে প-নে-র, স-তে-র, আ-ঠে-র। "বিপত্তি"তে প-নে-র, "ভূমিকায়" প-ন-র। 'রো' নাই। বা-র তেও ওকার নাই, "বিপত্তি"তে ম-তো নাই। ট-লা-ন, এ-গো-ন আছে, কিন্তু অন্য শব্দে 'নো' হইয়াছে। "ভূমিকা"য় কেবল 'নো'। "ভূমিকা"য় উ-প-র ও-প-র; ভি-ত-র ভে-ত-র আছে। "বিপত্তি"তে ভি-ত-র নাই, সব ভেতর।

'নাই', 'নেই', 'না', 'নে', 'নি', এই কয়েকটির প্রয়োগ বাঙ্গালীকে শিখাইতে হয় না, কিন্তু দেশভেদে অর্থভেদ আছে। রাঢ়ে পুরুষের ভাষায় 'নাই', নারী ভাষায় 'নেই', এক সাধারণ নিয়ম। ইদানী এই প্রভেদ অস্পষ্ট হইতেছে। শব্দানুষঙ্গে নে-ই উচ্চারণের উৎপত্তি। সে (এ) নে-ই, ঘরে [এ] নে-ই। এই প্রয়োগ ক্রমশঃ বাড়িয়া এক এক লেখককে নে-ই-মুগ্ধ করিয়াছে। "ভূমিকা"য় না-ই, নে-ই দুই আছে, কিন্তু প্রভেদ স্পষ্ট নয়। 'বিদ্যাসাগর নেই', 'ঘর নাই'," 'পুকুর নাই'। 'বিপত্তি"তে 'বলতে নে-ই', বিশ্বাস নে-ই, 'সন্দেহ না-ই'। 'না' স্থানে 'নে' হইবার কারণ ভিন্ন। 'ই' পরে 'আ' থাকিলে মৌখিক ভাষায় 'আ' স্থানে 'এ' হয়। 'উ' পরে 'আ' থাকিলে 'আ' স্থানে 'ও' হয়। এই দুইটি মুখ্য নিয়মে অসংখ্য শব্দের দুই দুইরূপ হইয়াছে। যেমন, চিঁড়া চিঁ-ড়ে ["ভূমিকা"য় চিঁ-ড়া] বু-ড়া বু-ড়ো। "বিপত্তি" ও "ভূমিকা"য় বু-ড়া, বু-ড়ো দুই-ই আছে। "বিপত্তি"তে পু-জা পু-জো, দুই-ই আছে। কিন্তু গু-লা,গুলো হয় নাই। "না" স্থানে "নে" উক্ত নিয়মে হইয়াছে। যেমন, 'আর পারি না'—'আর পারি-নে,' 'বলিস্ না'—'বলিস্-নে'। 'যাস্‌নে'—এখানে যা-ই-স মনে করিয়া 'নে'। অতীতকালে 'নি', যেমন "বলি নি"—'নাই সংক্ষেপে, কিন্তু প্রয়োগে নিশ্চিত অভাবে না-ই, সামান্য অভাবে 'নি'। 'বলি নাই', 'বলি নি', দুয়ের অর্থে প্রভেদ আছে।

দ্বিরুক্ত ধাতুশব্দ ও যুগ্মশব্দ বাংলা ভাষার বিশিষ্ট সম্পত্তি। মৌখিক ভাষায় অধিকার না থাকিলে এই সম্পত্তি ভোগ করিতে পারা যায় না। মৎ-কৃত ব্যাকরণে ইহার প্রকৃতি ব্যাখ্যা করা গিয়াছে। এখানে পুনরুক্তি করিব না। যথাস্থানে প্রয়োগ কঠিন বটে, কিন্তু ধাতু চিন্তা করিলে প্রায় ভুল হয় না। "ভূমিকায়" 'হন্-হন্ হাঁটা', 'দর্ দর্ ঘাম'। "বিপত্তি"তে 'মাথা টন্-টন্', 'থর-থর কাঁপা', 'চোখ ঢুলু-ঢুলু', 'মিটি মিটি, মিট্-মিট', 'প্রাণ ছট্-ফট', 'থতমত খাওয়া', 'প্রাণ তোড়-পাড়', 'হুড়-মুড় করিয়া ভাঙ্গিয়া পড়া' ঠিক হইয়াছে। কিন্তু প্রদীপ দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিতে পারে, নিভিতে পারে না। 'দুচোখে টস্-টস করিয়া' জল পড়িতে পারে না, দুচোখ 'হইতে' পড়িতে পারে। ভয়ে বুক ধড়্-ফড়' করে কি? দুশ্চিন্তা ও ব্যাকুলতায় বুক ধড়্-ফড়্ ধড়্-ফড়্ করে। অজীর্ণরোগে ধড়-ফড় করে; কিন্তু ব্যাকুলতা সে রোগের এক লক্ষণ। মনে হয়, এইবার বুঝি হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন বন্ধ হইবে। ইহাতে ভয় থাকে বটে, কিন্তু দুশ্চিন্তা মাত্রেই ভয় নিহিত। ভয়ে বুক দুর্-দুর্ করে, কি জানি কি ঘটে। অতি-ভয়ে বুক ঢিপ্-ঢিপ ধড়াস্-ধড়াস্ করিতে থাকে, যেন হৃৎপিণ্ডের সঙ্কোচ প্রসারণের শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়। 'ব্রহ্মচারিণী টল-মল করিতেছিলেন', এখানেও প্রয়োগ ঠিক হয় নাই। ব্রহ্মচারিণী মেঝেয় বসিয়াছিলেন, যোগাভ্যাসে তাঁহার দেহ দুর্ব্বল ও অতি লঘু হইয়াছিল, টলটল করিতেছিল অর্থাৎ 'টলিয়া পড়ে পড়ে' হইয়াছিল। 'টলি' আর 'মলি' মর্দ্দিত করিতে গুরুভার চাই [তু° দল্-মল]। বোঝাই না থাকিলে জলের তরঙ্গে নৌকা টল্-টল করে, বোঝাই থাকিলে টল্-মল করে। কিম্বা, সং মল ধাতু ধারণে। [ঝল্-মল শব্দে মল ধারণে।] টলি আর মলি, পড়ি আর ধরি, পড়িতে না পড়িতে স্থির হই। টল্-টল্ যন্ত্রবিদ্যার ভাষায় অ-স্থায়ী ভাব (unstable equilibrium), টল্-মল স্থায়ীভাব, ভার-কেন্দ্র নড়িলেও আধারের বাহিরে যায় না, টলিতে টলিতে আপনি স্থির হয়। দ্বিরুক্ত ধাতু শব্দ এইরূপ অনেক আছে, মৎপ্রণীত কোশে দুইশত আড়াইশত আছে। বৃষ্টি কত রকম? টপ্-টপ, তড়-তড়, ঝম্-ঝম, ঝিম্-ঝিম, টিপ-টিপ, ফোঁটা-ফোঁটা, ফিন্-ফিন্। কবিরা ঝিম্-ঝিম-কে রিমি-ঝিমি করিয়াছেন। বাতাস কত রকম? শোঁ শোঁ, ফুর্-ফুর, ঝির্-ঝির, হুল্-হুল'। সাধু ভাষায় অর্থাৎ কেতাবী ভাষায় 'অল্প অল্প বৃষ্টি' কিংবা 'মুষলধারে বৃষ্টি', এই দুটি আছে। 'প্রবলবেগে বায়ু' 'কিম্বা মৃদু মন্দ বায়ু' এই দুই সম্বল। "বিপত্তি"র 'জপিয়ে সপিয়ে' না 'জপিয়ে-টপিয়ে'? সং সপ ধাতু সম্যক অবরোধ; স্তুতি। 'জপিয়ে সপিয়ে' ঠিক; ভুলিয়ে-ভালিয়ে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে। জপিয়ে-টপিয়ে লিখিলে ভাবান্তর হইত। বাংলায় সপ্ ধাতুর পৃথক প্রয়োগ পাই না। এমন আরও আছে।

চন্দ্রবিন্দু এক বিপত্তি। এটির নাম অর্দ্ধ-অনুস্বার। কোথাও বহুল, কোথাও বিকল, কোথাও অল্প। মধ্যরাঢ়ে অল্প। কিন্তু ঘোঁড়া, ধোঁকা আছে, আশ্চর্য্য বটে। আরও কয়েকটা আছে।

সে দেশে কুঁয়ো, কঁচি, বোঁচকা, ঢেঁকুর, কুঁড়ো [অলস], আঁটি [শাগের। আমের আঁঠি], বাঁসা, হাঁসি, ঘাঁস নাই। "বিপত্তি"র ঢোঁক, বাঁখারি, শিঁটকানো নাই। খোঁ-জ এর অর্দ্ধানুস্বারও গ্রাম্য। গ্রাম্য বি-না জাত্য নয়। পোঁটলা-পুঁটলীও তদ্বৎ। পুঁথী, পুথী, দুই-ই জাত্য; পুঁ-থী ছাড়িতে পারিলেই ভাল। চন্দ্রবিন্দু প্রয়োগের সোজা নিয়ম নাই। বাঁকুড়া জেলা হইতে উত্তররাঢ় এবং গঙ্গার পূর্ব্বপার চন্দ্রবিন্দুর দেশ।

চল্লিশ বৎসর হইল, ঙ্গ স্থানে ঙ প্রথম দেখা দিয়াছে। এখন নব্যলেখকে ঙ্গ বিসর্জ্জন করিতে উদ্যত হইয়াছেন। তাঁহারা ভা-ঙ্গা না লিখিয়া ভা-ঙা লিখিতেছেন। কেন লিখিতেছেন, কেহ তাহা ব্যক্ত করেন নাই। কিন্তু ঙ অক্ষরের চির-প্রচলিত উচ্চারণে ভা ঙা হয়, 'ভা ওঁ আ'। ইহাতে ভা-ঙ্গার ধ্বনি-সাম্য কই? ঙ-অক্ষরের নামেই ইহার উচ্চারণ পাই, ওঁঅ বা উঁঅ। এই উচ্চারণ বলিয়া কাঙুর পড়ি, কা-ওঁ-উ-র। মাণিক গাঙ্গুলী, কা-ঙ রে কামিক্ষা চণ্ডী,—কা-ঙ-রে=কাউঁরে। ঘনরামে, ধাঙ ধাঙ ধাঙসা বাজে,—ভাঙ ভাঙ রণশিঙ্গা বাজে। এখানে ধা-ঙ কদাপি ধাং নয়, ভাঙ ভাং নয়। চৈতন্য চরিতামৃতে, পিঙো পিঙো তত্তু করে,—পিঙো পিওঁ (পান কর, ঙা-তে ওকার অনাবশ্যক ছিল)। চৈতন্য-মঙ্গলে, মো যাঙ আমারে দেহ সংহতি করিয়া,—এখানে 'মো' কর্ত্তা, ইহার স্বর তুল্য যা-ওঁ। জ্ঞানদাসে, কেন গেলাঙ জল ভরিবারে,—এখানে গে-লা-ঙ, কর্ত্তা 'মো'। গেলাঙ—গেলাং নয়। কবি-কঙ্কণে, ভেরী বাজে ধোঙ ধোঙ। শূন্য-পুরাণে, কার্ত্তিকের সোলুঙেতে,—ষোলুঙে-এতে ষেলউঁ-এতে, অর্থাৎ ষোড়শ দিবসে। সে কালের কবি স্ম-রি না বলিয়া সো-ঙ-রি বলিতেন। এখানে 'ম' স্থানে 'ঙ' বটে, কিন্তু উচ্চারণ সো-ওঁ-রি বা সো-উঁ-রি। এখনও গ্রাম্যজন স-ঙ-র-ণ বলে। 'ম' স্থানে 'ঙ' বলিয়া শব্দ কোমল করা হইত। যথা, জ্ঞানদাসে, ডাকে সভে সা-ঙ-লি বলিয়া,—সাঙলি সা-ওঁ-লি শ্যামলী (গাই)। এইরূপ, কু-ঙা-র=কুমার। 'কুমার' হইতে কুমর, কু-ঙ-র,' হিন্দীতে কুঁ-ব-র বাস্তবিক কু-বঁ-র। এই বঁ দেখিলেই ঙ উচ্চারণ পাওয়া যায়। জ্ঞানদাসে, রজনী সা-ঙ-ন ঘন 'দেয়া গরজন। সা-ঙ-ন শা-বঁ-ন, শা-ওঁ-ন। অতএব ভা-ঙা=ভা-বাঁ, ভা-ওঁ-আ।

তর্ক উঠিতে পারে, আমরা সং-খ্যা লিখি, যদিও স-ঙ্খ্যা বানান শুদ্ধ। এইরূপ গ-ঙ্গা না লিখিয়া গং-গা লিখিতে পারি। এবং যেহেতু ং উচ্চারণ ঙ্, সে হেতু ঙ=ং=ঙ্। কিন্তু এই সমীকরণে দোষ আছে, হেতুটি ঠিক নয়। কারণ ং, অনুস্বারের চিহ্ন, অনুস্বারে ব্যঞ্জনবর্ণ যুক্ত থাকিতে পারে না। আমার বিশ্বাস, সংস্কৃতে ঙ বর্ণের দ্যোতক •। এই চিহ্ন কিম্বা বাংলা ং চিহ্নের আকারেও ঙ অক্ষরের পাগড়ীটি সাক্ষী। ক বর্গের অনুনাসিক ঙ। অপর চারি বর্গেরও এক এক অনুনাসিক আছে। কিন্তু য র ল ব শ ষ স হ এই আট বর্ণের কই? সেটি • বা ং, অর্থাৎ ঙ। আমার মনে পড়িতেছে, আমরা বাল্যকালে পাঠশালায় ক, ংশ লিখিয়া পড়িতাম আওংক, আওংশ। অর্থাৎ প্রায় অঙ্ক, অঙশ। অদ্যাপি ওড়িয়াতে অং-শ উচ্চারিত হয় অঙশ। প্রায় তিনশত বৎসর পূর্ব্বে বিষ্ণুপুরে লিখিত এক সংস্কৃত পুথীতে অঙশ বানান দেখিয়াছি। বংশ (বাঁশ) হইতে ওড়িয়া বা-উঁ-শ শব্দ চলিতেছে। নাগরী লিপিতে ব্যঞ্জন অক্ষরের মাথায় বিন্দু দিয়া অনুনাসিক জ্ঞাপিত করা হয়। যেমন শ˙, স˙শয়। এই বিন্দুর নাম পূর্ণ অনুস্বার। পৃথক্ পৃথক্ অক্ষর না পাইলে কোন্ অনুনাসিক তাহা বুঝিতে পারা যায় না। হিন্দীতে ধং-শ, উচ্চারিত হয় বন্স, সিং-হ সিন্‌হ। বোধ হয়, হিন্দীভাষী পণ্ডিতের নিকট হইতে 'সং-স্কৃত', ইংরেজীতে সন্‌স্কৃৎ (sanskrit) হইয়াছে। মরাঠীতে লেখা হয় হিন্দীর তুল্য, সং-স্কৃত; কিন্তু বিজ্ঞজনে বলেন, উচ্চারিত হয় যেন সর্ব্বস্কৃত, অর্থাৎ সঙস্কৃত। সং-সা-র মরাঠীতে সংব-সা-র রূপেও আছে। সংস্কৃতে স-ম্ম-ত সং মত, দুই বানান আছে। পূর্ণ অনুস্বার উচ্চারণে ন হইয়া বাংলা ওড়িয়া মরাঠী হিন্দীতে সন্-ম-ত শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। অন্যদিকে, 'ম' সহিত 'ঙ' উচ্চারণের সাদৃশ হেতু স্ম-র-ণ, স-ঙ-র-ণ হইয়াছে। উৎ+মুখ=উন্মুখ; আবার ফলানাম্ ফলানাং দুই আছে। পণ্ডিত শ্রীবিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয় এই সকল পরিবর্ত্তন ও ব্যাখ্যা করিবেন। ব্যাখ্যা যাহাই হউক, সন্-মুগ, সন্-মত, সন্-মান অশুদ্ধ বলিতে পারি না।

সংস্কৃত-প্রাকৃতে ং চিহ্নের উচ্চারণ ঙ্ হইয়াছিল। তান্ত্রিক বীজ অং বং ইত্যাদির উচ্চারণ অঙ্ বঙ্ করিয়া থাকি। ফোর্ট বিলিয়ম কলেজের পণ্ডিতেরা ইংরেজ ছাত্রকে ঙ্গ 'সংস্কৃত' শিখাইতেন, ছাত্র ইংরেজীতে 'ঙ্গ' বানান করিতেন। পূর্ব্বকালাবধি রঙ্=রং বানান চলিয়া আসিতেছে। এই হেতু রং, র-ঙ্গে-র, রঙ্গিন্ স্বাভাবিকক্রমে লিখিয়া আসিতেছি। ব-ঙ্গ মূল শব্দ হইতে ব-ঙ্গা-ল, ব-ঙ্গা লা, ব-ঙ্গা-লী। ব-ঙ্গা-লী, নাম দেশ-বিদেশে প্রসিদ্ধ। ব-ঙ্গ-লা দেশ ও ভাষাও প্রসিদ্ধ। ঙ্গ উচ্চারণে ঙ্, কারণ পরে 'লা'-তে দীর্ঘস্বর আছে। অতএব বং-লা দেখাও চলে। 'ব' পরে যুক্ত ব্যঞ্জন আছে বলিয়া আমরা বা-ঙ্গা-ল, বা-ঙ্গা-লা, বা বা-ঙ্-লা, বা-ঙ্গা-লী বলি। অতএব বাং-লা=বাঙ্‌লা। বোধ হয়, এক কালে কোথাও কোথাও দেশের নাম ব-ঙ্গ-লা ছিল।

নদীয়া জেলায় এবং মুর্শীদাবাদ জেলার কিয়দংশে ভা-ঙ্গা শব্দের গ ক্ষীণ উচ্চারিত হয়। লোকে বলে ভাঙ্গ-আঁ [প্রায়ই ভাঁঙ্গ-আঁ]। এইরূপ, আ-ঙ্গি-না তাহাদের মুখে আঁঙ্গ-ইঁনা। দক্ষিণ রাঢ়ে ভাঁ-গা, আঁ-গি-না। ভাঁ-গা শব্দে গ প্রবল নয়, ক্ষীণও নয়। অ-ঙ্ক আঁ-ক, শ-ঙ্খ শাঁ-খ, আ-ঙ্গু-ল আঁ-গু-ল, লা-ঙ্গ-ল লাঁগল বা নাগল ইত্যাদি ব্যাকরণের সূত্রানুযায়ী। নদীয়াবাসীর মুখে ভা-ঙ্গা শব্দের গ লুপ্ত নয়। নদীয়া ও রাঢ়ে প্রভেদ, বর্ণবিচ্ছেদে। যেমন উদ্ যোগ, উ-দ্যোগ, কিম্বা অবি-নাশ, অ-বিনাশ। অবি-নাশ, নদীয়ায় ওবি-নাশ। অ-বিনাশ, রাঢ়ে অ-বিনাশ। দেশভেদে সহস্র সহস্র শব্দের উচ্চারণ-ভেদ আছে। বানান দ্বারা সে সব শব্দ সকল লোকের বোধ্য হইয়াছে। মূল শব্দ ভ-ঙ্গ। ইহা হইতে ভ-ঙ্গা, বা˙ ভাং, ভা-ঙ্গ-ড়; ভ-ঙ্গ হইতে বা˙ ভাঁ-গা, ভঁ-গা-নি, ভাংচা বা ভেং-চা, ভাং-চি ইত্যাদি। লোকের কান ও বাগ-যন্ত্রভেদে শব্দের উচ্চারণ ভেদ হয়। সে ভেদ সাহিত্যে স্বীকৃত হয় না। কোন্ জাতীয় শব্দে কি সূত্রানুসারে ঙ গ্রহণ করিতে হইবে, তাহা জানিলে সকলে শিখিতে পারিতাম। রাঢ়ের উচ্চারণ-মত লিখিলে বাঁ-গা-ল, বাঁ-গা-লী, বাং-লা, রাঁ-গা, ভাঁ-গা লেখা উচিত। র-ঙ্গি ন্ পরিবর্ত্তে রঁগিন্ লিখিতে পারি, কিন্তু র ঙি-ন লিখিলে র-ইঁ-ন হইয়া যায়। এই উচ্চারণ যে অভিপ্রেত নয় তাহা জানাইবার নিমিত্ত র-ঙী-ন দীর্ঘ ঈ লেখা হয়। নতুবা ঈ স্বরের কোন হেতু ছিল না।

"বিপত্তি"তে আ-ঙু-ল, ডা-ঙা, ভা-ঙা, ভা ঙ, রূপ তাহার ভাষার সহিত 'মিট' খায় নাই। কিন্তু তবে ভাং-চি কেন? কা-ঙা-রু জন্তুটির ইংরেজী নামে গ লোপের জো নাই। "ভূমিকা"র, দুই দুই রূপ আছে, বা-ঙ্গা-লী, বা ঙা-লী, টং টঙ্। পা ঙ্গা স, ডা-ঙ্গা আছে, ট-ঙে-র, র-ঙে-রও আছে। "এক পাকের তৈরী", এক রকম "তার" নয় কেন? চা-ক-রি ঠিক, কারণ চা-ক রের কর্ম্ম চা-কৃরি। চা-কু-রি ও খি-চু-ড়ি দুই-ই ভুল। কারণ চা-ক-রে চা-কু নাই, খি-চ-ড়িতে চু-ড়ি নাই। এক পাকের তৈরিতে অ্যা-কৃট, এ্যা-সু-ই-টি, এ-না-ট-মি

তিন রকম 'তার' পাইতেছি।, "বিপত্তি"র এ্যা-র-সে, ক্যা-র-সে হিন্দীতে ঐ-সে কৈ-সে। 'ঐ' হিন্দী উচ্চারণে 'এই'। অতএব বাংলায় 'এয়সে কেয়সে' হইবে। "বিপত্তি"র ব্রহ্মচারিণী আমায় এক বিপত্তিতে ফেলিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন,—"কাক অত্যন্ত চতুর, অতি ধড়িবাজ, সেইজন্যে, কোন্ অস্পৃশ্য বস্তু ভোজন করে মরতে হয় জানেন ত?" তাহার শ্রোতা নিশ্চয়ই জানিতেন, আমি কিন্তু একটুও জানি না; কেহ, জিজ্ঞাসা করিলে বলিতে পারিব না। কাক চতুর, নিজের মারাত্মক দ্রব্য খাইবে কেন? (দৃষ্টান্তটি সঙ্গত হয় নাই। বাক্যে ভাষাদোষও ঘটিয়াছে।)...

দেখা গেল, চলিত ভাষায় কেবল ক্রিয়াপদ নয়, বিশেষ্য বিশেষণ শব্দের ভেদ আছে। অর্থাৎ এখনও এই ভাষা টল্-টল করিতেছে।

ভারতবর্ষ, শ্রাবণ ১৩৩৮] শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি

—

সমাচার দর্পণে সেকালের কথা

রামমোহন রায়ের গুরু হরিহরানন্দ তীর্থস্বামীর পরলোকগমন

(১১ ফেব্রুয়ারি ১৮৩২। ৩০ মাঘ ১২৩৮)

"নির্ব্বাণপ্রাপ্তি।—সুখসাগরের সমীপবর্ত্তি পালপাড়া গ্রামে নন্দকুমার বিদ্যালঙ্কার এক জন অধ্যাপক ছিলেন তিনি কলিকাতার সংস্কৃত বিদ্যা মন্দিরের ধর্ম্ম শাস্ত্রাধ্যাপক শ্রীযুত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের অগ্রজ। ন্যায় দর্শনে এবং তন্ত্রে বিদ্যালঙ্কার ভট্টাচার্য্যের এরূপ গতি ছিল যে সংপ্রতি তাদৃশ দুর্ল্লভ বিশেষতঃ তাঁহার সদ্বক্তৃতা শক্তি যেরূপ ছিল যে তাদৃক আমরা প্রায় দেখি না ইনি অল্প বয়সেই গৃহস্থাশ্রম পরিত্যাগ করিয়া নানা দেশ ও দিগ দর্শন করিয়াছিলেন শেষে প্রায় বিংশতি বৎসর হইতে কাশীতে বাস করিতেন কাশীতে রাজাপ্রভৃতি অনেকে এবং কলিকাতা নগর ও পশ্চিম রাজ্যের লোকের মধ্যে অনেকেই তাঁহার নিকট দীক্ষিত হইয়াছিলেন কাশীতে বাসের মধ্যে প্রায় দ্বাদশ বৎসর হইবেক একবার কলিকাতা নগরে আগমন করিয়াছিলেন তৎকালে কুলার্ণবনামে এক গ্রন্থ তাঁহার দ্বারা প্রকাশিত হয় কাশী নগরের জনেরা তাঁহার অত্যন্তমান করিতেন এবং আমরা শুনিয়াছি যে গৃহস্থাশ্রম পরিত্যাগের পরেই তেঁহ হরিহরানন্দনাথ তীর্থস্বামীকুলাবধূত পদবি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন সংপ্রতি তিনি সপ্ততি বর্ষ বয়স্ক হইয়া এই মাঘ মাসের পঞ্চম দিবস পুর্ণিমা তিথিতে পূর্ব্বাহ্নসময়ে কাশীক্ষেত্রে সমাধিপূর্ব্বক পরব্রহ্ম প্রাপ্ত হইয়াছেন ইঁহার মৃত্যুতে আমরা অবশ্য দুঃখিত হইলাম যেহেতু এতাদৃক লোক ইদানীং অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য। তাঁহার পরিবারের মধ্যে কেবল এক পুত্র শ্রীযুত মৃত্যুঞ্জয় ভট্টাচার্য্য পিতৃব্যদের সহিত দেশে বাস করিতেছেন।"

হিন্দুকলেজে মাইকেল মধুসূদন দত্ত

(১২ মার্চ ১৮৩৪। ৩০ ফাল্গুন ১২৪০)

"পুরস্কার বিতরণ।—গত শুক্রবার [৭ মার্চ্চ] টৌনহালে হিন্দুকালেজের ছাত্রেরদিগকে পুরস্কার বিতরণ করা গেল।...কলিকাতায় প্রধান ২ ব্যক্তিরা প্রায় অনুপস্থিত ছিলেন না।...

ইহার পরে নাট্যবিষয়ক প্রস্তাব আবৃত্তি হইল। তদ্বিবরণ এই।

* * *

লার্ড রাণ্ডলফ ও নর্বল ও গ্লিনালবন।

নর্বল ... ... দ্বারকানাথ ঠাকুর

ষষ্ঠ হেনরি ও গ্লাষ্টর।

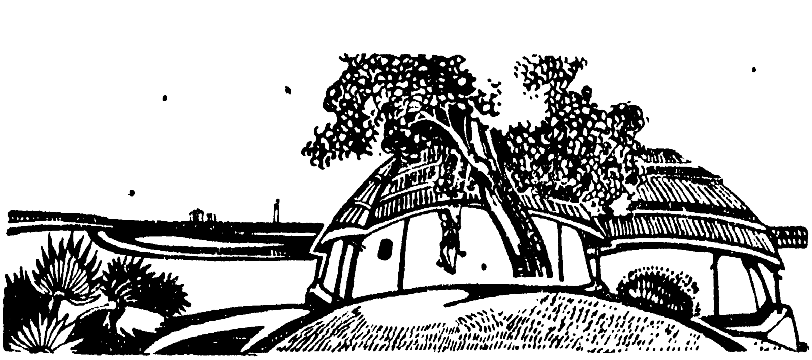
ষষ্ঠ হেনরি। ... ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষাল।

গ্লষ্টর। ... মধুসূদন দত্ত।"

ইনিই স্বনামধন্য কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত। তিনি ১৮৩৭ সালে হিন্দু কলেজে প্রবেশ করেন বলিয়া তাঁহার চরিতকারেরা লিখিয়াছেন, কিন্তু উপরিউদ্ধৃত অংশ হইতে অন্যরূপ জানা যাইতেছে। পুরাতন সংবাদপত্রের পৃষ্ঠা হইতে এখনও তাঁহার সম্বন্ধে অনেক নূতন কথা জানা যায়। ১২৬৪, ২রা বৈশাখ তারিখের 'সংবাদ প্রভাকরে' দেখিতেছি,—

"১২৬৩, শ্রাবণ।—মাইকেল মধুসূদন দত্ত মান্দ্রাজ নগরে কনিষ্ঠ মাজিষ্ট্রেটের ক্লার্কের পদাভিষিক্ত হয়েন।"

ভারতবর্ষ, শ্রাবণ ১৩৩৮] শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়



পাহাড়পুর

শ্রীসরোজেন্দ্রনাথ রায়, এম-এ

উত্তর-বঙ্গ রেলপথে অবস্থিত সান্তাহারের তিন ষ্টেশন উত্তরে জামালগঞ্জ নামে যে ষ্টেশন আছে, তাহার প্রায় তিন মাইল পশ্চিমে পাহাড়পুর নামক গ্রামে এক বিহারের অপূর্ব্ব ভগ্নাবশেষ পাওয়া গিয়াছে। ইহা রাজসাহী জেলার অন্তর্গত। ভারতবর্ষের ইতিহাসের সঙ্গে যাঁহার সামান্য পরিচয়ও আছে, তিনিও এতদিনে জানিতে পারিয়াছেন যে, বাংলা দেশে এ পর্য্যন্ত যত ঐতিহাসিক স্থান আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহাদের মধ্যে পাহাড়পুর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ভারতবর্ষের দীর্ঘ আটটি শতাব্দীর পরিচয় ইহার ধ্বংসাবশেষের মধ্যে লুক্কায়িত ছিল—ভারতীয় সভ্যতার অন্ততঃ তিনটি বিশাল ধারা ইহার উপর প্রবাহিত হইয়াছিল। ইহার প্রত্যেকটি প্রস্তর সেই তরঙ্গরেখার সাক্ষ্য বহন করিতেছে।

পাহাড়পুরের চারিদিকে শস্যশ্যামল ক্ষেত্র বিরাজিত। এককালে ইহার পূর্ব্ব পার্শ্ব দিয়া একটি নদী প্রবাহিত ছিল। তাহার বালুকা ও অভ্রময় গভীরতা এখনও তাহার অতীত চিহ্ন বহন করিতেছে। নদীর দক্ষিণ পারে এখনও কয়েকটি বাঁধা-ধাপ কত না কথা, কত না স্মৃতির সৌরভ আমাদের হৃদয়ের দ্বারে উপস্থিত করিতেছে!

পাহাড়পুর গ্রামের এখন কোন শোভা নাই। সে গ্রামে যে-কয়জন মুসলমান অধিবাসী আছে তাহারাও ইহার অতীত গৌরবের কথা অবগত নহে। তবে তাহারা শুনিয়াছে যে, ইহা মহীদলন বা মহীমর্দ্দন নামে এক রাজার রাজধানী ছিল। মহীদলন রাজার সন্ধ্যামণি নাম্নী এক অপরূপ সুন্দরী কন্যা ছিলেন। একদিন রাজকন্যা স্বপ্নে দেখিলেন যে, বিবাহের পূর্ব্বে তিনি সন্তানের মাতা হইবেন। সেই সন্তান লোকোত্তর যশের অধিকারী হইবেন ও সমস্ত দেশবাসীকে তাঁহার প্রচারিত নূতন ধর্ম্মধ্বজাতলে সমবেত করিবেন। সন্ধ্যামণি জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইহা কি প্রকারে সম্ভব?" তাহার উত্তর হইল যে, তিনি যখন স্নান করিবার জন্য নদীতে অবতরণ করিবেন সেই সময় একটি ফুল তাঁহার দিকে ভাসিয়া আসিবে। তাহার ঘ্রাণ লইলেই তিনি সন্তানের মাতা হইবেন। এই সন্তান পরিশেষে সত্যপীর নামে বিখ্যাত হয়। পাহাড়পুরের নিকট সত্যপীরের একটি স্তূপ আছে। সেখানে সহস্র সহস্র লোক—অধিকাংশই মুসলমান—সত্যপীরের নামে পূজা ও সিন্নি দেয়। সত্যপীর বা সত্যনারায়ণ হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায় কর্ত্তৃক পূজিত। ইহার যে ভোগ দেওয়া হয় তাহা কাঁচা চাউলের গুঁড়া, কাঁচা দুধ, চিনি ও ফল-মূলে প্রস্তুত। উত্তর-বঙ্গে ইহাকে "মক্ষীর" বা মহাক্ষীর বলে। দেখিয়া শুনিয়া মনে হয় যে, মধ্যযুগে যখন হিন্দু ও মুসলমান ধর্ম্মের মধ্যে একটি সমন্বয় প্রচেষ্টা চলিতেছিল, যাহার ফলে আমরা কবীর নানক চৈতন্য দাদূ প্রভৃতিকে পাইয়াছি, সেই প্রচেষ্টার একটি প্রকাশ সত্যপীর-প্রচারিত নব ধর্ম্মের মধ্যে হইয়াছে।

পাহাড়পুরের স্তূপ নিরবচ্ছিন্ন একা নহে। ইহার দূরে ও নিকটে ছোট বড় আরও স্তূপ আছে,—সত্যপীরের স্তূপ, দীপগঞ্জের স্তূপ ইত্যাদি। দীপগঞ্জ হলুদবিহার নামক মৌজার মধ্যে অবস্থিত। অনেকে মনে করেন যে, বৌদ্ধ ভিক্ষুদিগের পীত বসন হইতে ও তাঁহাদের বাসস্থলী বিহার হইতে এই মৌজার নাম "হলুদবিহার" হইয়াছে। এই স্তূপটিও বেশ উচ্চ। পাহাড়-পুরের চতুষ্পার্শ্বস্থ যে-সকল গ্রাম বর্ত্তমান তাহাদের নাম হইতেও পাহাড়পুরের বিহারের বৈশিষ্ট্য অবগত হওয়া যায়। এ সকল গ্রামের নাম রাজপুর, মালঞ্চ, ধর্ম্মপুর, ভাণ্ডারপুর প্রভৃতি। শুনিলেই মনে হয় যেন মধ্যবর্ত্তী বিহারটিকে কেন্দ্র করিয়া এই গ্রামগুলি জন্মলাভ করিয়াছিল। এখনও যেন নামগুলি বিস্মৃত অতীতের লুপ্ত গৌরব কাহিনী বহন করিয়া আসিতেছে।



খননের পূর্ব্বে পাহাড়পুরের দৃশ্য (প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগের সৌজন্যে)

পাহাড়পুর নামটি কিন্তু আধুনিক। খনন করিবার পূর্ব্বে স্তূপটি পাহাড়ের মত দেখাইত। সেইজন্য যে এই নামের জন্ম হইয়াছে তাহা বেশ বোঝা যায়। এই গ্রামের প্রাচীন নাম ছিল সোমপুর। ভগ্নাবশেষের মধ্যে প্রাপ্ত একটি মুদ্রাতে (seal) লেখা আছে, "সোমপুর-ধর্ম্মপাল বিহার"। ১৯০৮-৯ সনের 'আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে'র রিপোর্টের ১৫৮ পৃষ্ঠায় বৌদ্ধ-গয়ায় প্রাপ্ত একটি শিলালিপির উল্লেখ দেখিতে পাই। উক্ত লিপিতে সোমপুর বিহার নিবাসী বীর্য্যেন্দ্র নামে এক স্থবিনয়জ্ঞ মহাযান পন্থী ভিক্ষুর উল্লেখ আছে। ইঁহার পূর্ব্বনিবাস ছিল সমতটে অর্থাৎ কুমিল্লা নোয়াখালীর কোন স্থানে। ইহা হইতে মনে হয় যে, সোমপুর বাংলা দেশের কোন স্থানে অবস্থিত। পাহাড়পুর বিহারে "সোমপুর-ধর্ম্মপাল-বিহার" এই পদাঙ্কিত মুদ্রা পাওয়াতে মনে হইতেছে যে, পাহাড়পুরের পূর্ব্ব নামই সোমপুর। আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, পাহাড়পুরের পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের নাম ওম্পুর।

পাহাড়পুরের বিহারটি সমচতুর্ভুজ ও প্রায় ত্রিশ বিঘা জমির উপর অবস্থিত। এই চতুরস্র ক্ষেত্রের কেন্দ্রস্থানে একটি স্তূপ—প্রায় পচাত্তর ফিট উচ্চ। এই স্তূপটিতে কোন কালে কোন সাধু সন্তের স্মৃতিচিহ্ন রক্ষিত হইয়াছিল। কেন-না ইহার তলদেশ পর্য্যন্ত খনন করিয়া দেখা গিয়াছে যে, সমাধিরূপে ব্যবহার করিবার জন্য ইহাতে সকল প্রকার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। কিন্তু ইহাতে অস্থি বা অন্য প্রকারের কোন চিহ্নই প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই। কেহ কেহ অনুমান করেন যে, এই স্তূপটি সর্ব্বপ্রথমে জৈন স্তূপ ছিল। কেন-না এই ধ্বংসাবশেষের মধ্যে প্রাপ্ত ১৫৯ গুপ্তাব্দের এক তাম্রশাসনে দেখিতে পাওয়া যায় যে, এক ব্রাহ্মণ-পরিবার স্তূপসংলগ্ন বিহারের নিগ্রন্থ বা জৈন অধিবাসীদিগের পূজা ও অন্যান্য কর্ত্তব্য কর্ম্মের ব্যয়নির্ব্বাহার্থ বিহারস্থবির গুহনন্দী ও তাঁহার শিষ্যদিগের উদ্দেশ্যে বটগোহালি গ্রামে একখণ্ড ভূমি দান করেন। পাহাড়পুরের নিকটবর্ত্তী গোয়ালভিটা নামে যে গ্রাম আছে, অনেকের মতে তাহাই



পাহাড়পুরের স্তূপ (প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগের সৌজন্যে



প্রাচীর গাত্রে উৎকীর্ণ জীবমূর্ত্তি প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগের সৌজন্যে)



শ্রীকৃষ্ণ
(প্রত্নতত্ত্ববিভাগের সৌজন্যে)



শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক ধেনুকাসুর বধ
(প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগের সৌজন্যে)

প্রাচীন বটগোহালি। গোয়ালভিটাতে একটি স্তূপ আছে।

যাহা হউক, কালক্রমে স্তূপের চারি পার্শ্বে মন্দির রচিত হয়। স্তূপের উত্তর পার্শ্বের মন্দির খুব সম্ভব সর্ব্বপ্রথমে নির্ম্মিত হয়, কেন-না মন্দিরের প্রধান প্রবেশ-পথ ও তোরণ উত্তর দিকেই অবস্থিত। প্রাচীন ভারতে নিয়ম ছিল যে, শুধু মন্দিরের সম্মুখ দেশেই বাস করিতে হইবে। কিন্তু বিহারের সম্প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল, মন্দিরের পুরোভাগে বাস সকলের পক্ষে সম্ভব নয়, স্থান সঙ্কুলান হওয়া অসম্ভব। সেই অসুবিধা দূর করিবার জন্য স্তূপের অপর তিন পার্শ্বেও ঠিক অনুরূপ মন্দির রচিত হইল।

এই শ্রেণীর মন্দিরের সংস্কৃত পারিভাষিক নাম "সর্ব্বতোভদ্র" অর্থাৎ চারিদিকেই "স্বাগত।" প্রত্যেকটি মন্দিরের তিনটি অংশ। প্রথম পূজা মন্দির। ইহা স্তূপের গায়ে গাঁথা এবং সর্ব্বাপেক্ষা অন্তর্বর্ত্তী। প্রত্যেক মন্দিরের মধ্যবিন্দুরূপে রহিয়াছে একটি প্রস্তর-নির্ম্মিত বেদী। ইহার উপর নিশ্চয়ই কোন-না-কোন দেব-মূর্ত্তি পূজিত হইত। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এখন কোন বিগ্রহ পাওয়া যায় না। পূজা-মন্দিরের বাহিরের দিকে, অথচ তাহার সঙ্গে সংলগ্ন, মণ্ডপ। এখানে পূজারীরা বসিয়া শাস্ত্রালাপ, দেবতার গুণকীর্ত্তন প্রভৃতি ধর্ম্ম-কার্য্য করিত। মণ্ডপের বাহিরে প্রদক্ষিণ-পথ। ইহা মন্দিরের সর্ব্বাপেক্ষা দূরবর্ত্তী অংশ। এখানে দর্শনার্থীরা আসিয়া সমবেত হইত এবং নৈবেদ্য দিবার পর ঐ পথ বাহিয়া অপর মন্দিরের সম্মুখে উপস্থিত হইত।

এইরূপে মন্দিরগুলি প্রদক্ষিণ করা হইত। প্রদক্ষিণ-পথের মাঝে মাঝে ইষ্টকনির্ম্মিত আসন আছে। পূজার্থীদিগের বিশ্রামার্থই এগুলি নির্ম্মিত হইয়াছিল সন্দেহ নাই। বলা বাহুল্য, বাংলা দেশ প্রস্তরপ্রধান না



প্রাচীর গাত্রে খোদিত ভারতমাতার প্রস্তর-মূর্ত্তি
(প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগের সৌজন্যে)

হওয়ায় এখানকার প্রায় সব প্রাচীন মন্দির ইষ্টক রচিত। পাহাড়পুরের মন্দির ও বিহার সে নিয়মের ব্যতিক্রম নয়। তবে বেদী, প্রবেশ-দ্বার, স্তম্ভ প্রভৃতি কতকগুলি বিশেষ বিশেষ অঙ্গ প্রস্তরে গঠিত। ইহার দ্বারা গৃহের প্রাণশক্তি বৃদ্ধি করাই উদ্দেশ্য ছিল।

হিন্দুশাস্ত্রানুসারে উত্তরমুখী প্রবেশ-দ্বার সর্ব্বাপেক্ষা শুভ ও প্রশস্ত। আমরা পাহাড়পুরেও দেখিতে পাই যে, প্রধান প্রবেশ-দ্বার উত্তরমুখী। সমতল ভূমি হইতে কয়েকটি ধাপ উত্তীর্ণ হইয়া আমরা তোরণ-পথে উপস্থিত হই। তোরণ-দ্বার প্রশস্ত বটে, কিন্তু তাহার পশ্চাতে এমন বন্দোবস্ত করা হইয়াছে যে, সহসা বহু লোক একসঙ্গে প্রবেশ করিতে পারে না। কোন শত্রুর হস্ত হইতে মন্দির রক্ষা করিবার জন্য বোধ হয় এই সাবধানতা অবলম্বন করা হইয়াছে। যাহা হউক, এই তোরণের অধিকাংশ অংশ প্রস্তর-নির্ম্মিত ও সুরক্ষিত। প্রহরীদিগের অবস্থানের জন্য প্রবেশ-পথের নিকটে সুরক্ষিত কক্ষের ধ্বংসাবশেষ আজও বিদ্যমান আছে। তোরণ-পথ পার হইয়া আমরা একটি প্রশস্ত অলিন্দে উপস্থিত হই। এই অলিন্দ হইতে প্রদক্ষিণ-পথ পর্য্যন্ত একটি ইষ্টক-নির্ম্মিত প্রশস্ত পথ যে বর্ত্তমান ছিল, তাহা ধ্বংসাবশেষ দেখিয়া অনুমান করা যায়। খুব সম্ভব এই পথের উপরিভাগ আবৃত ছিল। এই পথ হইতে কয়েক ধাপ উঠিলেই প্রদক্ষিণ-পথে যাওয়া যায়। প্রদক্ষিণ-পথের উভয় পার্শ্বে প্রাচীর গাত্র খোদিত করিয়া নানারূপ দগ্ধ মৃত্তিকা (terracotta) নির্ম্মিত মূর্ত্তি সন্নিবেশিত। এই প্রকারের জীবজন্তু বৃক্ষলতা, পক্ষী ও সরীসৃপ, মৎস ও শঙ্খ, নানা প্রকারের ফুল, বিশেষতঃ পদ্ম, সারিবদ্ধভাবে প্রাচীরের শোভা বর্দ্ধন করিতেছে। তের শত বৎসরের কালপ্রবাহ তাহাদের উপর দিয়া চলিয়া গিয়াছে কিন্তু তাহারা আজিও অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে ও অতীতের সেই গৌরব ঘোষণা করিতেছে। এই সব মৃত্তিকা চিত্র শুধু খেয়ালবশতঃ রচিত হয় নাই। তদানীন্তন ধর্ম্মবিশ্বাসানুমোদিত দেবতা, সাধু ও সন্ন্যাসী, ভিক্ষু ও তীর্থঙ্করের মূর্ত্তি ইহাদিগের মধ্যে লক্ষিত হয়। পঞ্চতন্ত্র ও হিতোপদেশের বহু উপাখ্যান এই চিত্রসমূহের মধ্য দিয়া আমরা চিনিতে পারি। রামায়ণ ও মহাভারতের প্রধান প্রধান ঘটনা, যথা—বালীবধ ও সুভদ্রাহরণ ইহাদের মধ্যে জীবন্ত হইয়া রহিয়াছে। শুধু তাহাই নহে। গৃহস্থ জীবনের দৈনন্দিন ঘটনা, আজ সহস্র বৎসর পরেও মানব-জীবনের অন্তর্নিহিত যে ঐক্য তাহার স্মৃতি বহন করিয়া আনিয়াছে। এতদ্ব্যতীত বাংলা দেশের বহু চিরপরিচিত বস্তু ও প্রাণী তাহাদের মধ্যে বর্ত্তমান রহিয়াছে। বঙ্গভূমি সাগরের অতি আদরের কন্যা। তাই বাঙালী সমুদ্রজ মৎস্য শুশুক কুম্ভীর প্রভৃতি বহু জন্তু, শঙ্খ ঝিনুক প্রভৃতি

বহু প্রাণীর সহিত চিরপরিচিত। সেইজন্যই তাহাদের চিত্র বাংলার একটি সুপ্রাচীন ও সুপ্রসিদ্ধ মন্দিরেও স্থানলাভ করিয়াছে। এইরূপে যতদূর এই প্রদক্ষিণ পথ ঘুরিয়া ঘুরিয়া চলিয়াছে, ততদূর দুইপাশে এই সারিবদ্ধ চিত্রাবলীও চলিয়াছে।

প্রদক্ষিণ-পথের ঠিক নীচে যে কার্ণিশ আছে, তাহার তলাতে ভিত্তির ঊর্দ্ধভাগে আর এক দীর্ঘসারি চিত্রাবলী দেখিতে পাওয়া যায়। এগুলিও মাটির প্রতিমা। বিষয়ও পূর্ব্বের মত বিচিত্র।

ভিত্তি প্রাচীরের তলদেশে সম্পূর্ণ অন্য আর এক শ্রেণীর মূর্ত্তি আমাদের বিস্ময়পূর্ণ দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ভিত্তির এই অংশ এখন সমতল ভূমির নীচে বসিয়া গিয়াছে। কিন্তু ইহা নিঃসন্দেহ যে, এই অংশ একদিন সর্ব্বসাধারণের দৃষ্টিগোচর ছিল। কেন-না, মন্দিরের এই অংশে প্রস্তরফলকে খোদিত যে-সকল মূর্ত্তি এখনও আছে তাহারাই সর্ব্বাংশে শ্রেষ্ঠ। কিন্তু দুঃখের বিষয় সেগুলি এখন দেখিতে হইলে দুই তিন হাত মাটি সরাইয়া তবে দেখিতে হয়। এই সকল মূর্ত্তি কৃষ্ণবর্ণের প্রস্তর-ফলকে খোদিত ও অতি মনোহর কারুকার্য্যশোভিত।

এই ফলকগুলি ভিত্তিগাত্রে সমান্তরালভাবে সন্নিবেশিত হইয়াছে। ইহারা শুধু সংখ্যায় বহু নহে। বিষয়-হিসাবেও ইহারা বহু শ্রেণীর। কতকগুলি রাধাকৃষ্ণ ও বলরামকে লইয়া। কতকগুলি ইন্দ্র, শিব, দুর্গা গণপতি কার্ত্তিকেয় প্রভৃতি দেবতার। কতকগুলি বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বের ও। ইহাদের মধ্যে অন্ততঃ একটি জৈন তীর্থঙ্কর—ইহার বুকে জৈন স্বস্তিকা চিহ্ন আছে। রামায়ণ ও মহাভারত বর্ণিত বহু কাহিনীও এখানে শিলালেখের মধ্যে অমর হইয়া রহিয়াছে। বালী ও সুগ্রীবের সেই যে কলহ ও যুদ্ধ তাহা এখনও শেষ হয় নাই। শিলামূর্ত্তির মধ্যে তাহা চিরকালের বস্তু হইয়া রহিয়াছে। সুভদ্রাহরণও এখনও শেষ হয় নাই। যুগে যুগে সহস্র নরনারী স্পন্দহীন দৃষ্টিতে সে চিত্রখানি নিত্য নূতন ভাবে দেখিয়া পুলকিত হইয়াছে। আবার দেখি চন্দ্রশেখর অর্দ্ধচন্দ্রের ভারে স্তিমিত নয়ন হইয়া পড়িয়াছেন। নীলকণ্ঠ পরম উপেক্ষার সহিত হলাহল পান করিতেছেন—এদিকে পার্ব্বতী শোকাকুলা, বিশ্ববাসী ভয়ে কাতর। হলায়ুধ মধুপানে বিভোর হইয়া হলহস্তে উন্মাদ নৃত্য করিতেছেন। ঘণ্টা বাজাইতে বাজাইতে পূজারীরা মন্দিরের পথে চলিয়াছে। নৃত্যশীল অপর একটি মূর্ত্তি তাহার দেহভঙ্গের লালিত্যে দর্শকদিগকে



বলরাম
(প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগের সৌজন্যে)

মোহিত করিতেছে। দেব অবলোকিতেশ্বর বিশ্বমানবের কল্যাণ-কামনায় চিন্তাকুল দৃষ্টিতে চাহিয়া আছেন। এইরূপ কত-না মূর্ত্তি, কত-না লতা পাতা মন্দিরের শোভা বর্দ্ধন করিতেছে!

এই সব কারুকার্য্যের বিশেষত্ব এই যে, ইহাদিগকে দেখিলেই গুপ্তযুগের কথা মনে পড়ে। খুব সম্ভব গুপ্ত-নৃপদিগের রাজত্বকালে এইগুলি রচিত হইয়াছে। আর একটি কথা, যাহা লক্ষ্য না করিয়া পারা যায় না তাহা এই যে, এখানে এত মূর্ত্তি রহিয়াছে, কিন্তু একটিও বর্ত্তমান

বাংলায় আদৃত দশভুজা দুর্গা, কালী, সরস্বতী বা জগদ্ধাত্রীর নহে। এই সব দেবতার পরিকল্পনা তখন যে প্রচলিত ছিল তাহাও সম্ভবপর মনে হয় না। কেন-না তাহা হইলে এই মন্দিরে,—যেখানে বিভিন্ন



উত্তর-পশ্চিমে প্রাচীর গাত্রে খোদিত প্রস্তর-মূর্ত্তি
(প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগের সৌজন্যে)

ধর্ম্মের সহস্র সহস্র দেবমূর্ত্তি বর্ত্তমান, তাহাদিগকে দেখিতে পাইতাম। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, মন্দিরের প্রাঙ্গণটি সমচতুষ্কোণ ও চতুর্ভুজ। উত্তর তোরণের দুই পার্শ্ব হইতে প্রাঙ্গণের বাহির সীমানা ধরিয়া সোজা ভাবে একান্নটি কক্ষ এক একদিকে অবস্থিত। এইরূপে চারিদিকে প্রায় দুই শত কক্ষ ছিল। কক্ষ হইতে কক্ষান্তরে যাইবার জন্য একটি প্রশস্ত বারান্দা—পাথরের বেড়া দিয়া ঘেরা। এখনও তাহার ভগ্নাবশেষ বর্ত্তমান। এই সমস্ত কক্ষের বয়স নির্ণয় করা বড় কঠিন। প্রাচীরের যে অংশ এখন দেখিতে পাওয়া যায় তাহা সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন কি সর্ব্বাপেক্ষা নূতন তাহা বোঝা কঠিন। তবে কক্ষগুলি যে বারে বারে সংস্কার বা পুনর্গঠন করা হইয়াছে তাহা বোঝা যায়, বিভিন্ন প্রকারের ইষ্টক দেখিয়া ও মেঝে খনন করিয়া। প্রত্যেক মেঝের অন্ততপক্ষে তিনটি স্তর আছে। সর্ব্বনিম্নে যে স্তর তাহাই সর্ব্বপ্রাচীন মেঝে। এখনকার যে মেঝে তাহা তুলনায় নিতান্ত আধুনিক। এই সব কক্ষের অনেকগুলিতে একটি প্রশস্ত বেদী দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু কোন মূর্ত্তির চিহ্ন নাই—পরে হয়ত পাওয়া যাইতে পারে। এ পর্য্যন্ত শুধু একটি ক্ষুদ্রকায় বৌদ্ধমূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে। আবার ইহাও মনে হয়, হয়ত বাংলা দেশের প্রচলিত প্রথানুসারে এই-সব বেদীতে মৃত্তিকা-নির্ম্মিত প্রতিমার পূজা হইত। যাহা হউক, এগুলি সবই এককালে যে সংঘারামের অধিবাসীদিগের বাসস্থলী ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। পরে যখন মহাযানের উর্ব্বর কল্পনা-প্রভাবে মূর্ত্তিপূজার জাঁকজমক ও দিন-দিন মূর্ত্তির সংখ্যা বাড়িয়া চলিল, তখন সম্ভবতঃ আসল মন্দিরে তাহাদের আর স্থান কুলাইয়া উঠিল না। কাজেই তখন নূতন নূতন মন্দিরের প্রয়োজন বোধ হইল। স্তূপের দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোণে তিনটি মন্দিরের পীঠ পাওয়া গিয়াছে। ইহারাও নিশ্চয়ই পরবর্ত্তীকালে প্রয়োজনবোধে নির্ম্মিত হইয়াছিল।

এই সব কক্ষে বিহারের ভিক্ষুরা যে বাস করিতেন, তাহার অপরাপর চিহ্নও আছে। তাঁহাদের তৈজসপত্রের শেষ চিহ্নও কিছু পাওয়া গিয়াছে। এই সব কক্ষের নিকটে নিকটে কূপাদি জলাধারের সুবন্দোবস্ত আছে। আর কক্ষ হইতে কক্ষান্তর পর্য্যন্ত সুন্দর পয়োপ্রণালী আছে। প্রণালীর শেষ সীমায় এক একটি করিয়া শিলা-রচিত হাঙ্গর মুখ যোজিত হইয়াছে। ইহা ছাড়া দক্ষিণ-পশ্চিম সীমানায় একটি খাতের উপরে সারি সারি পায়খানা এখনও বর্ত্তমান আছে।

বিহার প্রাঙ্গণের বাহিরে নদীতটে একটি গৃহের ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার সহিত বিহারের কি সম্বন্ধ এখন বুঝিয়া উঠা কঠিন।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, এই বিহারের উপর

ভারতের তিনটি প্রধান ধর্ম্ম তাহাদের প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। প্রায় আট শত বৎসর ধরিয়া বিভিন্ন বংশের নৃপতিগণ ইহার ভাগ্যবিধাতা হইয়াছিলেন। পাহাড়পুর ভগ্নাবশেষের মধ্যে প্রাপ্ত গুহনন্দী তাম্র-শাসনের কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। ইহা এক শত ঊনষাট গুপ্তাব্দে উৎকীর্ণ হইয়াছিল। ঐতিহাসিকগণ স্থির করিয়াছেন যে, ৩১৯-২০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে গুপ্তাব্দ আরম্ভ হইয়াছে। সুতরাং খ্রীঃ ৪৭৮ বা ৪৭৯ এই শাসনে উল্লিখিত বৎসর। ডাঃ রমেশচন্দ্র মজুমদারের মতে ঐ সময়ে গুপ্ত-বংশীয় বুধগুপ্ত (৪৭৬ খৃঃ হইতে ৫০০ খৃঃ) উত্তর-ভারতের সম্রাট। তিনিই গুপ্ত সম্রাটদিগের মধ্যে শেষ সম্রাট। সুতরাং বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, বুধগুপ্তের রাজত্বকালে সোমপুর ধর্ম্মবিহার গুহনন্দী-প্রমুখ নির্গ্রন্থদিগের বাসভূমি ছিল।

এতদ্ব্যতীত স্তম্ভগাত্রে খোদিত অপর একটি শিলা-



রাধাকৃষ্ণ
(প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগের সৌজন্যে)

লিপি হইতে আমরা জানিতে পারি যে, নৃপতি মহেন্দ্র-পালদেবের রাজত্বের পঞ্চম বর্ষে বৌদ্ধ ভিক্ষু স্থবির জয়গর্ভ এই স্তম্ভটি ভগবান বুদ্ধের নামে উৎসর্গ করেন। এই মহেন্দ্রপালদেব যে গুর্জ্জরকুলচূড়ামণি ভোজের পুত্র মহেন্দ্রপাল তাহাতে সন্দেহ নাই। অষ্টম ও নবম শতাব্দীতে পাল-গুর্জ্জর-রাষ্ট্রকূট বংশীয় নৃপগণের মধ্যে কোন প্রকার সদ্ভাব ছিল না। এই শক্তিত্রয়ের



বালী-সুগ্রীব সংগ্রাম
(প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের সৌজন্যে)

মধ্যে কে উত্তর-ভারতের একচ্ছত্র সম্রাট হইবে ও পুণ্যভূমি কান্যকুব্জ অধিকার করিবে তাহা লইয়া একটা নিদারুণ সংগ্রাম চলিতেছিল। ফলে কখনও পাল-বংশের জয় হইয়াছিল, কখনও গুর্জ্জর-বংশের, আবার কখন কখন রাষ্ট্রকূট রাজারা উভয় বংশকে পরাভূত করিয়া নিজ বংশের গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। বঙ্গের সিংহাসনে যতদিন ধর্ম্মপাল ও দেবপাল এবং রাষ্ট্রকূট সিংহাসনে ধ্রুব ও গোবিন্দ আসীন ছিলেন, ততদিন গুর্জ্জরের শতচেষ্টা সত্ত্বেও উত্তর-ভারতের সাম্রাজ্য-গৌরব তাঁহাদের ভাগ্যে হয় নাই। কিন্তু নবম শতাব্দীর মধ্যভাগে গুর্জ্জর-ভূপতি ভোজরাজের সৌভাগ্য-

ক্রমে বঙ্গের সিংহাসনে বসিলেন বিগ্রহপাল ও নারায়ণ-পাল। গুর্জ্জর-রাজ তাঁহার আভ্যন্তরীণ কলহে ব্যাপৃত হইয়া পড়িলেন। উত্তর-ভারতের কলহ হইতে বাধ্য হইয়া দূরে থাকিতে হইল। এই সুযোগে ভোজদেব সমস্ত উত্তর ভারত করায়ত্ত করিলেন। তাঁহার পুত্র মহেন্দ্র-পালদেব (৮৯০—৯১০) পিতা কর্ত্তৃক অধিকৃত কান্যকুব্জের সিংহাসনে উত্তর-ভারতের সম্রাটরূপে অধিষ্ঠিত হইয়া একচ্ছত্র নৃপতি হইবার বাসনায় বঙ্গের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন ও অনায়াসে বঙ্গের অনেক প্রসিদ্ধ স্থান অধিকার করিয়া ফেলিলেন। খুব সম্ভব, এই সময় তিনি উত্তর-বঙ্গের পুণ্ড্রবর্দ্ধন ভুক্তির কোটীবর্ষ-বিষয়ান্তর্গত সোমপুর বিহার অধিকার করেন। এই সময়েই বোধ হয় স্থবির জয়গর্ভ স্তম্ভটি উৎসর্গ করেন।

গুপ্ত-নৃপতিদিগের রাজ্যকালে বিহারের কারুকার্য্যে ও প্রতিমা গঠনে হিন্দু, বিশেষতঃ বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রগাঢ় প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়। যত হিন্দু দেবদেবী এই সময়ে বিহার মধ্যে স্থানলাভ করিয়াছে বলিয়া অনেকের বিশ্বাস। কিন্তু যখন পাল-বংশ বঙ্গে রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করিলেন, সেই সময় হইতে বিহারটি প্রকৃতপক্ষে বিহার ও বৌদ্ধদিগের পীঠস্থান হইয়া উঠিল। এই সময় হইতে বহু বৌদ্ধ এখানে পূজার্থ, শিক্ষার্থ ও ধর্ম্মলাভার্থ আসিতে লাগিল। আমরা স্থবির জয়গর্ভের উৎসর্গ-পত্র হইতে বিহারের বৌদ্ধ সংস্পর্শ বেশ উপলব্ধি করিতে পারি। বৌদ্ধচিত্র, বৌদ্ধমূর্ত্তি, সদ্ধর্ম্মপুণ্ডরীক ও ধর্ম্মচক্র প্রভৃতি বহু বহু নিদর্শন হইতে বুঝিতে পারি যে, সোমপুর বিহার এককালে বৌদ্ধ বিহাররূপে ব্যবহৃত হইয়াছিল। কি এইখানেই শেষ নহে। খ্রীষ্টীয় একাদশ দ্বাদশ শতাব্দী প্রচলিত আদিম বাংলা অক্ষরে স্তম্ভগাত্রে উৎকীর্ণ এক উৎসর্গ-পত্র উদ্ধার হইয়াছে। ইহা হইতে জানা যায় ত্রিরত্নের (ধর্ম্ম, বুদ্ধ ও সংঘ) প্রীতিলাভার্থ শ্রীদশবল এই স্তম্ভটি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। সুতরাং শুধু যে ই বৌদ্ধ বিহারে পরিণত হইয়াছিল তাহাই নহে, খ্রী নবম শতাব্দী অর্থাৎ পাল রাজত্ব হইতে আরম্ভ করি দ্বাদশ শতাব্দী অর্থাৎ সেন-বংশের শেষ পর্য্যন্ত ইহা বৌ বিহারই ছিল। গৌড়ে মুসলমান রাজধানী প্রতিষ্ঠি হইবার পর যখন গ্রামবাসীরা ধীরে ধীরে ইসলাম ধ গ্রহণ করিতে লাগিল ও উত্তর-বঙ্গ মুসলমানপ্রধা হইয়া উঠিল, তখন বোধ হয় বৌদ্ধবিহারগুলি তাহাদে প্রভাব হারাইল। একে ত এই সময় বৌদ্ধধর্ম্ম অতি নিকৃষ্ট হইয়া গিয়াছিল, তাহাতে মুসলমানগণ বৌদ্ধদিগ অধিকতর প্রতিমাসক্ত বোধে তাহাদের উপর নৃশং ব্যবহার করিতে লাগিল। মুসলমানদিগের প্রবল আঘা বৌদ্ধগণ দেশ ছাড়িয়া পলাইয়া যাইতে লাগিল। রা কৃপালোভে ও ইসলামের বিশ্বাসের তেজ ও সাম্যবা মুগ্ধ হইয়া বহু বৌদ্ধ ইস্‌লাম গ্রহণ করিতে লাগিল প্রচলিত হিন্দুধর্ম্মের সঙ্কীর্ণতা ও অন্ধতা আবার ইন্ধ জোগাইল। এইরূপে বঙ্গদেশ তথা ভারত হইতে বৌ ধর্ম্ম নির্ব্বাসিত হইল। সঙ্গে সঙ্গে বৌদ্ধবিহারগুলি পরিত্যক্ত হইল। সাত শত বৎসর পরে আবার তাহাদে খোঁজ পড়িয়াছে!

নবাবিষ্কৃত তাম্রশাসন

শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

প্রায় ছয় বৎসর পূর্ব্বে ত্রিপুরা জিলার গুণাইঘর গ্রামনিবাসী জনৈক ব্যক্তি পুষ্করিণী হইতে মাটি তুলিতে তুলিতে তাম্রশাসনখানি প্রাপ্ত হয়। কুমিল্লার বিখ্যাত প্রত্নতত্ত্বাবিৎ শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ দত্ত মহাশয় লোকপরম্পরায় ইহা অবগত হইয়া গুণাইঘর অঞ্চলের কতিপয় ভদ্রলোকের সাহায্যে তাম্রশাসনখানি পাঠোদ্ধার জন্য ১৩৩৫ সালের বৈশাখ মাসে সংগ্রহ করেন। সময়াভাববশতঃ তিনি স্বয়ং ইহার পাঠোদ্ধার না করিয়া আমার হস্তে সমর্পণ করিয়াছিলেন।

গুণাইঘর কুমিল্লা হইতে প্রায় আঠার মাইল উত্তর-পশ্চিমে এবং দেবীদ্বার থানার দেড় মাইল পশ্চিমে বরদাখাত পরগণায় অবস্থিত। ইতিপূর্ব্বে এই গ্রামেই একটি কষ্টিপাথরের বিষ্ণুমূর্ত্তি বহু বৎসর পূর্ব্বে আবিষ্কৃত হয়। প্রায় ছয় বৎসর পূর্ব্বে একটি দ্বাদশ হস্ত অবলোকিতেশ্বর মূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার পাদপীঠে প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ মন্ত্র "যে ধর্ম্মা" ইত্যাদি উৎকীর্ণ রহিয়াছে। সম্প্রতি আর একটি বিষ্ণুমূর্ত্তিও পাওয়া গিয়াছে বলিয়া শুনা যায়। তদ্ভিন্ন গ্রামমধ্যে একটি প্রাচীন বিষ্ণুমন্দিরের ধ্বংসাবশেষ বর্ত্তমান রহিয়াছে। সুতরাং প্রত্নসম্পদে এই গ্রাম ত্রিপুরা জিলার শীর্ষস্থান অধিকার করিবে।

তাম্রশাসনখানির আয়তন প্রায় ১০ × ৬½ ইঞ্চ এবং ওজন প্রায় দুই সের। লম্বালম্বি ভাবে উভয়পৃষ্ঠে সংস্কৃত লেখা উৎকীর্ণ রহিয়াছে। সম্মুখ ভাগে তেইশ পংক্তি এবং পশ্চাদ্ভাগে মাত্র আট পংক্তি। মধ্যে ধর্ম্মানুশংসি প্রসিদ্ধ তিনটি শ্লোক ভিন্ন সমগ্র শাসন সংস্কৃত গদ্যে লিখিত। সম্ভবতঃ কোন কঠিন বস্তুর আঘাতে স্থানে স্থানে কাটিয়া যাওয়ায় কতিপয় অক্ষর বিলুপ্ত হইয়াছে এবং সম্মুখভাগের শেষ অংশে অনেক অক্ষর প্রায় মুছিয়া গিয়াছে। বাম ভাগে একটি গোলাকার রাজমুদ্রা সংযুক্ত রহিয়াছে। মধ্যে দুইটি সমরেখা দ্বারা মুদ্রাটি দুই অংশে বিভক্ত। ঊর্দ্ধাংশে শৈবধর্ম্মাবলম্বী রাজার কুলচিহ্নস্বরূপ মহাদেবের বাহন বৃষ নিজ দক্ষিণে মুখ উচু করিয়া উপবিষ্ট অবস্থায় অঙ্কিত রহিয়াছে। নিম্ন ভাগে রাজার নাম উৎকীর্ণ ছিল, কিন্তু প্রায় মুছিয়া গিয়াছে—মহারাজশ্রী (বৈ) নাগু (প্তঃ)। রাজমুদ্রার এই কুলচিহ্ন বলভীর মৈত্রক-বংশীয় রাজগণের সম্পূর্ণ অনুরূপ (Gupta Inscriptions, p. 164)। পরবর্ত্তী মহারাজাধিরাজ হর্ষবর্দ্ধনও এই কুলচিহ্নই নিজমুদ্রায় (*Ibid.*, p. 231) উৎকীর্ণ করিয়াছেন। ইহারা সকলেই শৈব ছিলেন এবং হর্ষবর্দ্ধনও নিজকে তাম্রশাসনে "পরমমাহেশ্বর" বলিয়াই ঘোষিত করিয়াছেন। আস্রফপুরের তাম্রশাসনে খড়্গবংশীয় বৌদ্ধরাজা দেবখড়্গের মুদ্রাতেও একটি বৃষ অঙ্কিত রহিয়াছে, কিন্তু তাহার বিন্যাস অনুরূপ নহে।

এই তাম্রশাসন দ্বারা ১৮৮ সম্বৎ ২৪ পৌষ তারিখ জয়স্কন্ধাবার "ক্রীপুর" হইতে মহাদেবানুরক্ত "মহারাজ শ্রীবৈন্যগুপ্ত" (১ পংক্তি) অধীনস্থ "মহারাজ রুদ্রদত্তের" বিজ্ঞাপনাক্রমে (৩ পংক্তি) মহাযান মতাবলম্বী বৌদ্ধাচার্য্য শান্তিদেবের উদ্দেশ্যে উক্ত রুদ্রদত্ত কর্ত্তৃক নির্ম্মিত বিহারের জন্য (৪ পংক্তি) "উত্তর মণ্ডলে" অবস্থিত "কান্তেড়দক" নামক গ্রামে (৭ পংক্তি) পাঁচ খণ্ডে বিভক্ত "একাদশ পাটক" পরিমিত ভূমি অগ্রহাররূপে প্রদান করেন (৮ পংক্তি)। শেষ দিকে (১৮-৩১ পংক্তি) এই পাঁচ খণ্ড ভূমির পরিমাণ ও চতুর্দ্দিকের সীমা-নির্দ্দেশ ব্যতীত বিহারের "তলভূমির" (২৭ পংক্তি) এবং "হজ্জিক খিল ভূমির"ও (৩০ পংক্তি) সীমা নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে। দূতকের নাম "মহারাজ শ্রীমহাসামন্ত বিজয়সেন" (১৬ পংক্তি) এবং লেখকের নাম "করণ-কায়স্থ নরদত্ত"।

তাম্রশাসনের শেষ পংক্তিতে গুপ্তযুগে প্রচলিত সাঙ্কেতিক অঙ্কসংখ্যাদ্বারা "সং ১৮৮ (১০০ ৮০ ৮) পৌষ্যদি ২৪ (২০ ৪)" তারিখ লিখিত রহিয়াছে। ৮ এবং ৪-এর অঙ্কচিহ্ন তৎকালপ্রচলিত চিহ্নের সহিত মিলে না। ৮ কে দেখিতে অনেকটা দাশমিক ৯-এর অঙ্কের মত এবং ৪ দাশমিক ৮-এর অঙ্কের মত। ১৪-১৫ পংক্তিতে সুস্পষ্ট বাক্য দ্বারা এই তারিখই পুনঃ উল্লিখিত থাকায় তারিখ পাঠে কোন সন্দেহের অবকাশ নাই। বলা বাহুল্য, অক্ষরতত্ত্ব দ্বারা এবং গুপ্তান্ত রাজার নামদ্বারা উল্লিখিত সম্বৎ ১৮৮ গুপ্তসম্বৎ বলিয়া নিঃসন্দেহে নির্ণীত হয়। ১৪ পংক্তিতে এই সম্বৎ "বর্ত্তমান" শব্দদ্বারা স্পষ্টাক্ষরে নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে। গুপ্তাব্দের সহিত বর্ত্তমান শব্দের প্রয়োগ বোধ হয় এই প্রথম পাওয়া গেল। গুপ্তাব্দ সম্বন্ধে ফ্লীটের মতই এযাবৎ সর্ব্ববাদি-সম্মত ছিল। সম্প্রতি প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক কে বি পাঠক মহাশয় ফ্লীটের মতের প্রতিবাদ করিয়া গুপ্তাব্দ বিষয়ে কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তনের অবতারণা করিয়াছেন। তদনুসারে বর্ত্তমান শাসনের ইংরেজী তারিখ ১৩ ডিসেম্বর ৫০৬ খৃঃ হয়। সুতরাং উত্তরবঙ্গ বাদ দিলে সমগ্র বঙ্গদেশে ইহা অপেক্ষা প্রাচীন তাম্রপট্ট এ-পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। কারণ, ধনাইদহের গুপ্তশাসন, দামোদরপুরের প্রথম ৪টি তাম্রলিপি এবং নবাবিষ্কৃত পাহাড়পুরের জৈনশাসন ব্যতীত ইহা সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন।

তাম্রশাসনের অক্ষরগুলি ক্ষুদ্র হইলেও সুন্দর এবং সুশৃঙ্খলভাবে উৎকীর্ণ, কিন্তু অনেক স্থানের অক্ষর যথেষ্ট গভীর করিয়া উৎকীর্ণ না হওয়ায় কালক্রমে পাঠের অসুবিধা ঘটিয়াছে। অক্ষরের আকৃতি গুপ্তযুগে প্রচলিত উত্তর-ভারতীয় লিপিমালার প্রাদেশীয় বিভাগের অনুরূপ। হ, ষ, ল প্রমুখ অক্ষরগুলি সর্ব্বত্রই প্রাচ্য আকার-বিশিষ্ট বটে। ফরিদপুরে আবিষ্কৃত শাসন-চতুষ্টয়ের অক্ষরের সহিত এই শাসনের অক্ষরগুলির প্রায়শঃ মিল রহিয়াছে। যৎকিঞ্চিৎ প্রভেদের মধ্যে বর্ত্তমান শাসনে স এবং ষ-এর স্পষ্টতর আকারভেদের উল্লেখ করা যাইতে পারে। পার্জিটার সাহেব যে প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া ফরিদপুর শাসনগুলির কালনির্ণয় করেন, বর্ত্তমান শাসনদ্বারা তাহা সম্পূর্ণরূপে সমর্থিত হইতেছে। তিনি "য" অক্ষরের তিন রকম বিভিন্ন আকারের ব্যবহার দেখিয়া ফরিদপুরের প্রথম তিনখানি শাসনের পৌর্ব্বাপর্য্য ও সময়নির্দ্দেশ করেন। পরে চতুর্থ শাসনে সর্ব্বাপেক্ষা অর্ব্বাচীন রূপটির সর্ব্বত্র প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। বর্ত্তমান শাসনে কেবলমাত্র প্রাচীনতম রূপের সর্ব্বত্র ব্যবহার থাকায় ফরিদপুরের প্রথম শাসন হইতেও ইহা পূর্ব্ববর্ত্তী বটে। সুতরাং উক্ত শাসনচতুষ্টয়ের সহিত এক পর্য্যায়ভুক্ত করিলে, এক শতাব্দকাল মধ্যে (৫০০-৬০০ খৃঃ) পূর্ব্ববঙ্গীয় গুপ্তলিপির য অক্ষরের ধারাবাহিক পরিণতির একটা সম্পূর্ণ অথচ আশ্চর্য্যজনক ইতিহাস পাওয়া যাইতেছে।

শাসনখানি বিশুদ্ধ সংস্কৃত গদ্যে লিখিত। দুই এক জায়গায় মাত্র সামান্য ত্রুটি লক্ষিত হয়। 'ক্ষেত্র' শব্দ একবার ভুলক্রমে পুংলিঙ্গ হইয়াছে (১৯ পংক্তি), 'ত্রিষ্কাল' শব্দটি (৫ পংক্তি) বিশুদ্ধ সংস্কৃত নহে। তৎকালপ্রচলিত কতিপয় বিশিষ্টতা ব্যতিরিক্ত বানান বিষয়ে উল্লেখ করার কিছু নাই—"বিংশতি" শব্দ সর্ব্বত্রই অনুস্বারের পরিবর্তে "ন"কারযুক্ত হইয়াছে। শাসনে কতিপয় উল্লেখযোগ্য নূতন শব্দের ব্যবহার রহিয়াছে। "খাট" (২৮-৯ পংক্তি) শব্দ বর্ত্তমান 'খাড়ী' শব্দের মূলপ্রকৃতি বলিয়া বোধ হয়। পরবর্ত্তী খালিমপুর শাসনে ইহা "খাটিকা" রূপ ধারণ করিয়াছে। "জোলা" শব্দ (২৮ পংক্তি) এখনও বাংলার কোন কোন গ্রাম্য ভাষায় ক্ষুদ্র জলপ্রবাহ অর্থে ব্যবহৃত হইতেছে। খালিমপুর শাসনের 'জোলক' এবং 'জোটিকা' সম্ভবতঃ এই শব্দ হইতে উৎপন্ন। "নৌযোগ" শব্দ সম্পূর্ণ নূতন। 'হজ্জিক' শব্দও তদ্রূপ—বোধ হয় এই শব্দ হইতেই 'হাজা' (যেমন—'শুখা হাজা' গ্রাম্য ভাষায় প্রচলিত) শব্দের উৎপত্তি। এই শব্দগুলি প্রায়শঃ দেশী শব্দ, বিশুদ্ধ সংস্কৃত বলিয়া মনে হয় না এবং আশ্চর্য্যের বিষয় যে, এখন পর্য্যন্ত এই দেড় হাজার বৎসরের পুরাতন শব্দগুলি বিনা পরিবর্ত্তনে গ্রাম্য ভাষার মধ্যে সজীব রহিয়াছে। শাসনের দূতক মহারাজ বিজয় সেনের পরিচয়-প্রসঙ্গে চারিটি বিশিষ্ট পদের উল্লেখ রহিয়াছে

তন্মধ্যে দুইটি পদ নূতন বটে। "পঞ্চাধিকরণোপরিক পাট্যুপরিক" আমরা একটি সমাস রূপে ব্যাখ্যা করিয়াছি—ইহার অর্থ (বিজয় সেন) রাজ্য মধ্যে পাঁচটি বিচারালয়ের প্রধান বিচারক দ্বারা গঠিত "পাটি"র (বোর্ডের) উপরিক অর্থাৎ সভাপতি ছিলেন। "পুরপালোপরিক" পদও নূতন—'পুরপাল' বোধ হয় পুলিস কমিশনার জাতীয় একটা পদ হইবে। লেখক নরদত্তের পরিচয়েও একটু বিশেষত্ব আছে—তিনি "করণ-কায়স্থ" ছিলেন। 'করণ' শব্দ সাধারণতঃ কায়স্থের পর্য্যায়রূপে ব্যবহৃত হয়। উভয় শব্দের যুগপৎ প্রয়োগ থাকায় মনে হয় "করণ" শব্দটি মূলতঃ জাতিবাচক এবং "কায়স্থ" বৃত্তিবাচক। অমরকোষেও 'করণ' মিশ্র শূদ্র জাতির অন্তর্ভূত অথচ 'কায়স্থ' শব্দের উল্লেখই দৃষ্ট হয় না।

শাসনকর্ত্তা "মহারাজ বৈন্যগুপ্ত" সম্পূর্ণ নূতন নাম বটে এবং যে-সময়ে (৫০৬ খৃঃ) তিনি বঙ্গের পূর্ব্বপ্রান্তে স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিতেছিলেন তখন গুপ্ত-সাম্রাজ্যের অতি সঙ্কটাপন্ন অবস্থা ছিল। হূণরাজের প্রবল আক্রমণে গুপ্ত-সাম্রাজ্য ধ্বংসোন্মুখ হওয়ায় সম্ভবতঃ "বৈন্যগুপ্ত" স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়াছিলেন। তখনও "মহারাজাধিরাজ" ভানুগুপ্ত পূর্ব্বভারতে মাথা তুলিতে পারেন নাই। ভানুগুপ্তের রাজত্বের প্রথম শাসন বর্ত্তমান শাসনের তিন চার বৎসর পরে ৫১০ খৃষ্টাব্দে উৎকীর্ণ। যশোধর্ম্মার দিগ্বিজয় অভিযান যে লৌহিত্যতট পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিল তাহাও আটাশ বৎসরের পরবর্ত্তী ঘটনা। বৈন্যগুপ্তের গুপ্তান্ত নাম দেখিয়া মনে হয় তিনি বিরাট "গুপ্ত" বংশের এক শাখার অন্তর্ভূত হইবেন, কিন্তু মূল গুপ্ত-সম্রাটগণের সহিত তাঁহার বিশেষ সম্বন্ধ না থাকারই কথা; কারণ গুপ্ত-সম্রাটগণ সকলেই পরম বৈষ্ণব ছিলেন এবং তাঁহাদের রাজমুদ্রায় বিভিন্ন কুলচিহ্ন অঙ্কিত ছিল। বৈন্যগুপ্তের "মহারাজ" উপাধিদ্বারা যেমন একদিকে বিশাল সাম্রাজ্যের কিংবা বৃহৎ প্রদেশের আধিপত্য সূচিত হয় নাই, অন্যদিকে তেমনি তাঁহাকে কেবল ক্ষুদ্র মণ্ডলাধিপতি বলিয়াও ধরা যায় না, কারণ তিনি স্বনামে রাজমুদ্রা অঙ্কিত করিয়াছেন, একজন "মহারাজ" উপাধিধারী নরপতি তাঁহার "পাদদাস"ত্ব স্বীকার করিতেন এবং অপর একজন "মহারাজ" তাঁহার সামন্তাধিপতি ও দূতকের কার্য্য করিতেন। সুতরাং বৈন্যগুপ্ত একটি নাতিক্ষুদ্র অথচ নাতিবৃহৎ প্রদেশের স্বাধীন নরপতি ছিলেন বলিয়া আমরা ধরিয়া লইতে পারি। তাঁহার রাজত্বের



নবাবিষ্কৃত তাম্রশাসন

অবস্থান কিংবা পরিমাণ বর্ত্তমানে নির্ণয় করা অসাধ্য। তবে ত্রিপুরা জিলার উত্তরাংশ তাঁহার রাজ্যান্তর্গত ছিল, নিশ্চয় করিয়া বলা যায়, কারণ প্রদত্ত ভূমির সীমানা-নির্দ্দেশকালে দুইবার "গুণেকাগ্রহার" নামক গ্রামের উল্লেখ রহিয়াছে। এই গ্রামই যে বর্ত্তমান "গুণাইঘর"

গ্রাম তাহাতে সন্দেহ নাই। অন্যান্য শাসনোল্লিখিত স্থানগুলি এখন পর্য্যন্ত চিহ্নিত করা যায় নাই। যে গ্রামের ভূমি দান করা হয় তাহা "উত্তরমণ্ডলে" অবস্থিত ছিল। অনুমান হয়, বৈন্যগুপ্তের রাজধানী এবং মূল রাজত্ব ত্রিপুরা জিলারই দক্ষিণাংশে অবস্থিত ছিল।

হিন্দু রাজা কর্ত্তৃক বৌদ্ধ বিহারের জন্য ভূমি দান এই প্রথম তাম্রশাসন দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে। বৈন্যগুপ্ত "মহারাজ রুদ্রদত্ত" নামক বৌদ্ধ রাজার বিজ্ঞাপনামতে এই ভূমি দান করিয়াছিলেন; তৎকালে রুদ্রদত্ত বৌদ্ধাচার্য্য শান্তিদেবের জন্য অবলোকিতেশ্বরের নামে উৎসর্গীকৃত যে বিহার নির্ম্মাণ করিতেছিলেন, তন্মধ্যে শান্তিদেব কর্ত্তৃক "প্রতিপাদিত" (মহাযান মতাবলম্বী) "বৈবর্ত্তিক ভিক্ষুসঙ্ঘের" অবস্থান ছিল। এই সঙ্ঘের নাম বৌদ্ধ শাস্ত্রগ্রন্থের কুত্রাপি খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। "বৈবর্ত্তিক" শব্দ শাঙ্কর-বেদান্তের প্রসিদ্ধ "বিবর্ত্ত-বাদ" হইতে উৎপন্ন বলিয়াও মনে হয় না, কারণ, বিবর্ত্তবাদের মূলসূত্র বৌদ্ধ দর্শনে পাওয়া গেলেও তত্তৎস্থানে "বিবর্ত্ত" শব্দের একেবারেই উল্লেখ দৃষ্ট হয় না। সম্ভবতঃ শান্তিদেবের প্রতিষ্ঠিত এই নূতন সঙ্ঘ বেশী দূর এবং বেশী দিন স্থায়ী হইতে সমর্থ হয় নাই এবং প্রতিষ্ঠার পরেই বিলুপ্ত হইয়া যায়। যাহা হউক, বর্ত্তমান শাসন হইতে বেশ প্রতীয়মান হয় তৎকালে বঙ্গদেশের পূর্ব্বপ্রান্ত পর্য্যন্ত মহাযান মত এতটা প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল যে, তন্মতাবলম্বী একজন আচার্য্য হিন্দু এবং বৌদ্ধ রাজার সমান পোষকতায় একটি বিশিষ্ট নূতন বৌদ্ধসঙ্ঘের সৃষ্টি করিতে সমর্থ হইয়াছিল। বৈবর্ত্তিক সঙ্ঘের বিলোপসাধন হিন্দু-রাজা এবং হিন্দুদর্শনের পক্ষপাতদোষহেতু, গোঁড়া বৌদ্ধগণের চেষ্টায় হইয়াছিল কি না বিবেচনার বিষয়। শাসনোল্লিখিত মহাযানমতাবলম্বী আচার্য্য শান্তিদেবের সহিত "শিক্ষাসমুচ্চয়" এবং "বোধিচর্য্যাবতার" গ্রন্থের প্রণেতা প্রসিদ্ধ আচার্য্য শান্তিদেবের অভেদ কল্পনা প্রমাণ দ্বারা সমর্থিত হয় না। গ্রন্থকার শান্তিদেব প্রায় এক শতাব্দী পরবর্ত্তী এবং তিনি নালন্দায় জীবনপাত করেন বলিয়া তারানাথ প্রভৃতি উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন এবং তদ্বিরুদ্ধে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নাই।

বর্ত্তমান তাম্রশাসন হইতে একটি মূল্যবান্ তথ্য সংগৃহীত হইতেছে। ভূমির পরিমাণ রূপে "পাটক" শব্দের প্রয়োগ বঙ্গদেশের অনেক তাম্রশাসনেই পাওয়া যায়, কিন্তু এ যাবৎ তাহার পরিমাণ নির্ণীত হয় নাই। স্বর্গীয় গঙ্গামোহন লস্কর মহাশয় আশ্রফপুরের খড়্গবাজের শাসন হইতে সর্ব্বপ্রথম ৫০ দ্রোণবাপে এক পাটক হয় এইরূপ অবধারণ করিয়াছিলেন। আশ্রফপুরের শাসনোক্ত ভূমি-পরিমাণ অনেকটা স্থূলভাবে প্রদত্ত হইয়াছে, তজ্জন্য পাটক-পরিমাণ বিশুদ্ধরূপে নির্ণীত হয় নাই। বর্ত্তমান শাসনের ভূমির মোট পরিমাণ ঠিক এগার পাটক এবং তাহা দুই স্থানে উল্লিখিত রহিয়াছে (৮ এবং ১৬ পংক্তি)। পাঁচ খণ্ডের প্রত্যেকের পরিমাণ সূক্ষ্মভাবে এইরূপ প্রদত্ত হইয়াছে:—

১ম খণ্ড	৭ পাটক	৯ দ্রোণবাপ
২য় ,,		২৮ ,,
৩য় ,,		২৩ ,,
৪র্থ ,,		৩০ ,,
৫ম ,,	১¾ পাটক	
	মোট ১১ পাটক	

সুতরাং গণনানুসারে চল্লিশ দ্রোণবাপে এক পাটক হইতেছে এবং তাহাই বিশুদ্ধ বলিয়া ধরিতে হইবে। দুঃখের বিষয়, দ্রোণবাপ পরিমাণের বিশুদ্ধ অর্থ এ যাবৎ নির্ণীত হয় নাই এবং হওয়ার উপায়ও নাই। কারণ, সংস্কৃত কোষাদি গ্রন্থে "দ্রোণ" নামক শস্যপরিমাণ বিষয়ে বহু মতভেদ বর্ত্তমান রহিয়াছে। পূর্ব্ববঙ্গে এখনও 'দ্রোণ' শব্দ ভূমি-পরিমাণে ব্যবহৃত হইতেছে এবং তাহাই "দ্রোণবাপ" পরিমাণের একমাত্র বিশ্বাসযোগ্য সূচক বলিয়া ধরা যায়।

সীমানির্দ্দেশমধ্যে দুই স্থানে "প্রদ্যুম্নেশ্বর" দেব-মন্দিরের উল্লেখ আছে। খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে সেন বংশীয় বিজয়সেনের দেবপাড়া প্রশস্তিতে উমাপতি ধরের অমর লেখনী মহাদেবের এই এক মূর্ত্তি-বিশেষকে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছে। বর্ত্তমান শাসনদ্বারা এই "প্রদ্যুম্নেশ্বর" মূর্ত্তি আরও সাত শত বৎসর পূর্ব্বে পূজিত হইত বলিয়া

প্রমাণিত হইতেছে। দেবপাড়া প্রশস্তির দ্বিতীয় শ্লোক হইতে জানা যায়, প্রদ্যুম্নেশ্বর মূর্ত্তিতে হরিহরের "অভিন্ন-তনুতা" সাধিত হইয়াছিল, কিন্তু পরবর্ত্তী অংশে সর্ব্বত্র তাঁহাকে একমাত্র মহাদেব রূপেই নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

উপসংহারে অনাবশ্যক হইলেও একটা ক্ষুদ্র কথার উল্লেখ করিতেছি। প্রথম পংক্তিতে জয়স্কন্ধাবারের নামটি অতি পরিষ্কার রূপেই "ক্রীপুর" বলিয়া লিখিত রহিয়াছে, অন্যরূপ পাঠের সম্ভাবনা নাই। বলা বাহুল্য, এই ক্রীপুরের সহিত বর্ত্তমান ত্রিপুরা রাজ্যের কোনই সম্বন্ধ নাই। ত্রিপুরা শব্দ অপেক্ষাকৃত আধুনিক এবং কোনও প্রাচীন লিপিতে ইহার উল্লেখ পাওয়া যায় না। কতিপয় বৎসর যাবৎ ত্রিপুরার তথাকথিত ইতিহাস আলোচনায় বৈজ্ঞানিক রীতির যেরূপ ঘোরতর বিপর্য্যয় সাধিত হইতেছে তাহার প্রতিবাদ করিয়া এই ক্ষুদ্র মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিলাম।*

শাসন-পাঠ (সম্মুখভাগ)

১। স্বস্তি মহানৌ-হস্ত্যশ্ব-জয়স্কন্ধাবারাৎ=ক্রীপুরাদ্ভগবন্মহাদেব-পাদানুধ্যাতো মহারাজ-শ্রীবৈন্যগুপ্তঃ

২। কুশলী (১) ...স্বপাদোপজীবিনশ্চ কুশলমাশংস্য সমাজ্ঞাপয়তি বিদিতং ভবতামস্তু যথা

৩। ময়া মাতাপিত্রোরাত্মনশ্চ পু (ণ্যা) ভিবৃদ্ধয়েস্মৎ=পাদদাস-মহারাজ-রুদ্রদত্ত-বিজ্ঞাপ্যা দনেনৈব মাহাযানিক-শাক্যভিক্ষ্বা

৪। চার্য্য শান্তিদেবমুদ্দিশ্য গোপ (?) (২)...গ ভাগে (?) কার্য্যমান-কার্য্যাবলোকিতেশ্বরাশ্রমবিহারে অনেনৈ

৫। বাচার্য্যেণ প্রতিপাদিত (ক ?)-মাহাযানিক(?)-বৈবর্ত্তিক (৩)-ভিক্ষু-সঘনা (৪) স্পরিগ্রহে ভগবতো বুদ্ধস্য সততং ত্রিষ্কালং

৬। গন্ধ-পুষ্প-দীপ-ধূপাদি-প্র (৫)...স্য ভিক্ষুসংঘস্য চ চীবর-পিণ্ডপাত-শয়নাসন-গ্লানপ্রত্যয়ভৈষজ্যাদি-

৭। পরিভোগায় (৬) বিহারে (চ) খণ্ডফুট্ট-প্রতিসংস্কারকরণায় উত্তরমাণ্ডলিক-কান্তেডদক-গ্রামে সর্ব্বতো ভো-

৮। গেনাগ্রহারত্বেনৈকাদশ-খিলপাটকাঃ পঞ্চভিঃ খণ্ডৈস্তাম্রপট্টে-নাতিসৃষ্টাঃ (॥) অপি চ খলু শ্রুতিস্মৃতী (৭)

৯। হ্যপবিহিতা (॥) পুণ্য-ভূমিদানশ্রুতিমৈহিকামুত্রিক ফলবিশেষে স্মৃতো ? (৮) ভাবতঃ সমুপগম্য স্বহস্ত পী-

১০। ডামপ্যাবীকৃত্য পাত্রেভ্যো ভূমিং (৯)...দ্বির (?) দ্বিরম্মদ্বচন-গৌরবাৎ=স্বযশোধর্ম্মাবাপ্তয়ে চত্তে

১১। পাটকা অস্মিন্বিহারে শশ্বৎকালমভ্য (১০)...(॥) অনুপালনম্প্রতি চ ভগবতা পরাশরাত্মজেন বেদব্যা-

১২। সেন ব্যাসেন গীতাঃ শ্লোকা ভবন্তি (॥) ষষ্টিং বর্ষ (সহস্রা) ণি স্বর্গে (?) মোদতি ভূমিদঃ (।) আক্ষেপ্তা চানুমন্তা চ তা-

১৩। ন্যেব ন কে (১১) বসেৎ (॥ স্বদত্তাং পরদত্তাম্বা যো হরেত (বসু) ন্ধরাং (।) (স) বিষ্ঠায়াং কৃমির্ভূত্বা পিতৃভিঃ সহ পচ্যতে (॥)

১৪। পূর্ব্বদত্তাং দ্বিজাতিভ্যো যত্নাদ্রক্ষ যুধিষ্ঠির (॥) মহীং মহিমতাং শ্রেষ্ঠ দানাৎ=শ্রেয়োনুপালনং (॥) বর্ত্তমানাষ্টাশীত্যু-

১৫। ত্তর-শতসাম্বৎ=সরে পৌষমাসস্য চতুর্ব্বিংশতিতম-দিবসে দূতকেন মহাপ্রতীহার মহাপীলুপতি-পঞ্চাধি-

১৬। করণোপরিক-পাট্যুপরিক (১২)...পুরপালোপরিক-মহারাজ শ্রীমহাসামন্ত-বিজয়সেনেনৈতদেকাদশ-পাটক-দা-

১৭। নায়াজ্ঞামনুভাবিতাঃ কুমারামাত্য-রেবজ্জস্বামি-ভামহ-বৎ=সভোগিকাঃ ॥) লিখিতং সন্ধিবিগ্রহারি- (১) করণ-কায়-

১৮। স্থ-নরদত্তেন (॥) যত্রৈকক্ষেত্রখণ্ডে নবদ্রোণবাপাধিক-সপ্তপাটক-পরিমাণে সীমালিঙ্গানি পূর্ব্বেণ গুণেকা-

১৯। গ্রহার-গ্রামসীমা বিষ্ণুবর্দ্ধকিক্ষেত্রঞ্চ দক্ষিণেন মিদুবিলাল (?) ক্ষেত্রং রাজবিহারক্ষেত্রঞ্চ পশ্চিমেন সূরীনাশীরস্পূর্ণ্রেক-

২০। ক্ষেত্রং উত্তরেণ দোষীভোগ-পুষ্করিণী (১৪)...বাম্পিয়াকা-দিত্যবন্ধু ক্ষেত্রাণাঞ্চ সীমা (॥)

২১। দ্বিতীয়খণ্ডস্যাষ্টাবিন্শতি-দ্রোণবা (প)- পরিমাণস্য সীমা পূর্ব্বেণ-গুণিকাগ্রহার গ্রামসীমা দক্ষিণেন পক্ক-

২২। বিলাল (?)-ক্ষেত্রং পশ্চিমেন রাজবিহার (ক্ষে) ত্রং উত্তরেণ বৈদ্য (?)...ক্ষেত্রং (॥) তৃতীয়খণ্ডস্য ত্রয়োবিন্শতি-দ্রোণবাপ-

২৩। পরিমাণস্য সীমা পূর্ব্বেণ...ক্ষেত্রং দক্ষিণেন...নখদ্দার্চ্চরিকা(?) -ক্ষেত্রসীমা পশ্চিমেন

* বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ ত্রিপুরা শাখার অধিবেশনে ১৩ই আশ্বিন ১৩৩৬ তারিখে পঠিত।

(১) এখানে প্রায় ৮ অক্ষর মুছিয়া গিয়াছে (২) এস্থলটি মূল্যবান্ তথ্যপূর্ণ ছিল—প্রায় সমস্ত অক্ষর মুছিয়া গিয়াছে। শেষ শব্দ বোধ হয় "দিগ্ভাগে"। বক্ষ্যমাণ বিহারের অবস্থান নিরূপিত থাকার সম্ভাবনা ছিল। (৩) "বৈবর্ত্তিক" শব্দের রেফ মাত্রার নীচে দেওয়া হইয়াছে। ২৮ পংক্তি "পূর্ব্বেণ" শব্দেও তদ্রূপ। অন্যত্র রেফ মাত্রার উপরিস্থিত বটে। (৪) "সংঘানা" পড়িতে হইবে। ঘ অক্ষরের বামপ্রান্তে একটি কুটিল রেখা বর্ত্তমান রহিয়াছে। (৫) 'ধূপাদি'র আকার মাত্রার উপরিস্থিত। এখানেও কতিপয় অক্ষর বিলুপ্ত। সম্ভবতঃ এইরূপ পাঠ ছিল "প্রবর্ত্তনায় তস্য" ইত্যাদি। (৬) 'বিহারে'র আকার মাত্রার উপরে প্রায় একারের মত দেখা যায়। (৭) শ্রুতিস্মৃতী শব্দ দ্বিবচনান্ত কিন্তু বিশেষণ 'অপবিহিতা' একবচনান্ত রহিয়াছে। (৮) 'স্মৃত্বা' কিংবা 'স্মৃতৌ' পড়িতে হইবে। (৯) প্রায় চারিটি অক্ষর অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে। (১০) চার-পাঁচটি অক্ষর সম্পূর্ণ কাটিয়া গিয়াছে। "অভ্যনুমন্তব্যাঃ" কিম্বা এবম্বিধ কোন পাঠ ছিল। (১১) "নরকে" পড়িতে হইবে। সমগ্রশাসনে "বসেৎ" শব্দে মাত্র "ৎ" ব্যবহৃত হইয়াছে; তাহার আকার অদ্ভুত রকমের, উপর্য্যুপরি দুইটি মাত্রা রহিয়াছে। (১২) দুইটি অক্ষর এখানে ঠিক পড়া যায় নাই—"স্থর" কিম্বা "পুর" মনে হয়। "পুর" হইলে ভুলক্রমে দুইবার প্রযুক্ত হইয়া থাকিবে। (১৩) "বিগ্রহাধিকারি" পড়িতে হইবে; ভুলক্রমে অক্ষরচ্যুতি ঘটিয়াছে। (১৪) এস্থলে এবং ২২।২৩ পংক্তির মধ্যস্থলে অনেক অক্ষর প্রায় মুছিয়া গিয়াছে।

(পশ্চাদ্ভাগ)

২৪। জো×লারী-ক্ষেত্রং উত্তরেণ নাগীজোডাক-ক্ষেত্রং (॥) (চতু-,র্থস্য ত্রিংশদ্দ্রোণবাপ-পরিমাণ ক্ষেত্রখণ্ডস্য সীমা পূর্ব্বেণ

২৫। বুদ্ধাকক্ষেত্রসীমা দক্ষিণেন কালাকক্ষেত্রম্ (১৫) পশ্চিমেন (সূ)র্য্যক্ষেত্রসীমা উত্তরেণ মহীপালক্ষেত্রং (॥) (প)ঞ্চমস্য

২৬। পাদোন-পাটকদ্বয়পরিমাণ- ক্ষেত্রখণ্ডস্য সীমা পূর্ব্বেণ খণ্ডবিড়ুগুগূরিক-ক্ষেত্রং দক্ষিণেন মণিভদ্র-

২৭। ক্ষেত্রং পশ্চিমেন যজ্ঞরাতক্ষেত্রসীমা উত্তরেণ নাদডদক-গ্রামসীমেতি (॥) বিহার-তলভূমেরপি সীমালিঙ্গানি

২৮। পূর্ব্বেণ চূড়ামণি-নগরশ্রী-নৌযোগয়োর্ম্মধ্যে জোলা দক্ষিণেন গণেশ্বর-বিলাল-পুষ্করিণ্যা নৌখাটঃ

২৯। পশ্চিমেন প্রদ্যুম্নেশ্বর-দেবকুল-ক্ষেত্র-(১৬) প্রান্তঃ উত্তরেণ প্রডামার-নৌযোগখাটঃ (॥) এতদ্বিহারপ্রাবেশ্য-শূন্যপ্রতিকর-

৩০। হজ্জিক-খিলভূমেরপি সীমালিঙ্গানি পূর্ব্বেণ প্রদ্যুম্নেশ্বর-দেবকুলক্ষেত্রসীমা দক্ষিণেন শাক্যভিক্ষ্বাচার্য্য-জিত-

৩১। সেন-বৈহারিক-ক্ষেত্রাব (সা?) নঃ পশ্চিমেন হ(?) চাতগংগা উত্তরেণ দণ্ডপুষ্কিণ্যী (১৭) চেতি। সং ১০০ ৮০ ৮ পোষ্য দি (১৮) ২০ ৪

বঙ্গানুবাদ

(১-২ পংক্তি) স্বস্তি! ক্রীপুরে স্থিত মহানৌহস্ত্যশ্বপূর্ণ (১) জয়স্কন্ধাবার হইতে ভগবান্ মহাদেবের পাদানুধ্যায়ী কুশলী মহারাজ শ্রীবৈন্যগুপ্ত (২)...এবং নিজভৃত্যদিগকে কুশলপ্রশ্নপূর্ব্বক আদেশ জ্ঞাপন করিতেছেন, আপনাদিগের অবগতি হউক যে

(৩-৮পংক্তি) আমার পিতামাতার এবং নিজের পুণ্যবৃদ্ধির জন্য আমাদের চরণের দাস মহারাজ রুদ্রদত্তের বিজ্ঞাপনাক্রমে, উক্ত (রুদ্রদত্ত) কর্ত্তৃক মহাযানমতাবলম্বী বৌদ্ধভিক্ষু আচার্য্য শান্তিদেবের উদ্দেশ্যে... (দিকে) আর্য্য অবলোকিতেশ্বরের নামে যে আশ্রমবিহার নির্ম্মিত হইতেছে, সেখানে উক্ত আচার্য্যদ্বারা প্রতিষ্ঠিত মহাযানায় "বৈবর্ত্তিক" সংজ্ঞক ভিক্ষুসঙ্ঘের আবাসগৃহে (স্থাপিত) ভগবান্ বুদ্ধের গন্ধপুষ্প-ধূপ-দীপাদি দ্বারা সর্ব্বদা প্রত্যহ তিন বেলা (পূজাপ্রবর্ত্তনের জন্য), ভিক্ষুসংঘের বস্ত্র, আহার, শয্যা, আসন, পীড়িতের ঔষধ প্রভৃতি ভোগের ব্যবস্থার জন্য এবং বিহারের ভাঙ্গা কিম্বা ফাটার সংস্কারসাধন জন্য— উত্তরমণ্ডলে অবস্থিত কান্তেডদক নামক গ্রামে পাঁচ খণ্ডে বিভক্ত ১১ পাটক পরিমিত খিলভূমি (৩) সর্ব্বপ্রকার ভোগসমেত অগ্রহাররূপে তাম্রশাসন দ্বারা মৎকর্ত্তৃক প্রদত্ত হইল।

(ক্রমশঃ)

(১৫) সমগ্রশাসনে এস্থলে একবার মাত্র হসন্ত মকার ব্যবহৃত হইয়াছে। আকার বিভিন্ন রকমের বটে। (১৬) ক্ষেত্র শব্দ শাসনের সর্ব্বত্র দুইটি ত্রকার দ্বারা লিখিত। কেবলমাত্র এখানে (অনবধানতাবশতঃ?) এক তকারে লিখিত রহিয়াছে। (১৭) "পুষ্করিণ্যা" পড়িতে হইবে। 'বেতি' শব্দের পর একবার মাত্র বিরামচিহ্ন দেওয়া হইয়াছে; দেখিতে অনেকটা 'কমা'র মত। (১৮) "পৌষদি" পড়িতে হইবে।

১। জয়স্কন্ধাবারের এই বিশেষণ সমুদ্রগুপ্তের কূটশাসনে (Fleet: p. 256) এবং হর্ষবর্দ্ধনের তাম্রশাসনদ্বয়ে ব্যবহৃত হইয়াছে। (২) বৈন্য শব্দ আদিরাজা পৃথুর নামান্তর — "আদিরাজঃ পৃথুর্বৈণ্যঃ" (ত্রিকাণ্ডশেষ); সাধারণতঃ মুদ্রাণকারদ্বারা লিখিত হয় (বিশ্ববর্ম্মার তাম্রলিপি Fleet: p. 74) কিন্তু ঋগ্বেদে (VIII, IX, 10) দন্ত্যান্ত পাঠই রহিয়াছে — "পৃথী যদ্বা বৈন্যঃ সাদনেষু।" ৩। 'খিলপাটকে' খিল শব্দের অর্থ অনুর্ব্বর না হইয়া সম্ভবতঃ খালি (vacant) হইবে।

(৮-১১ পংক্তি) এ বিষয়ে শ্রুতি এবং স্মৃতি বাক্যও বস্তুতঃ বিহিত (৪) আছে। যে শক্রোরাজগণ(?) ইহলোকে এবং পরলোকে বিশেষ ফলজ্ঞাপক স্মৃতিবাক্যে পবিত্র ভূমিদানবিষয়ক শ্রুতির ভাবার্থ সম্যক উপলব্ধি করিয়া স্বয়ং কষ্ট স্বীকার করিয়াও সুপাত্রে ভূমি (দান করা বিধেয় মনে করেন?), তাঁহারা আমাদের উক্তির গৌরবরক্ষার্থ এবং নিজে যশ ও পুণ্য অর্জ্জনের জন্য এই বিহারে এই 'পাটক'গুলির (স্থিতি) চিরকালের জন্য (অনুমোদন করিবেন)।

(১১-১৪ পংক্তি) অনুপালন বিষয়ে পরাশরপুত্র বেদবিভাগকর্ত্তা ভগবান্ ব্যাসদেবের রচিত শ্লোকসমূহ বিদ্যমান রহিয়াছে। "ভূমিদান-কর্ত্তা ষাট্ হাজার বৎসর স্বর্গে আনন্দলাভ করেন; প্রদত্ত ভূমি যে হরণ করে এবং যে (হরণের) অনুমোদন করে সে ততকালই নরকে বাস করে॥ যে স্বদত্ত কিংবা পরদত্ত ভূমি হরণ করে, সে পিতৃগণ সহ বিষ্ঠার কৃমি হইয়া কষ্ট পায়। হে নৃপশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির, ব্রাহ্মণদিগকে পূর্ব্বের প্রদত্ত ভূমি যত্নপূর্ব্বক রক্ষা করিবে, (কারণ) দান অপেক্ষা অনুপালনই শ্রেয়ঃ॥"

(১৪-১৮ পংক্তি) একশত অষ্টাশী বর্ত্তমানাব্দে পৌষ মাসের চব্বিশ তারিখ মহাপ্রতিহার, মহাপীলুপতি, পঞ্চাধিকরণোপরিকপাট্যুপরিক এবং পুরপালোপরিক পদাধিকারী মহাসামন্ত মহারাজ বিজয়সেন দূতক হইয়া রেবজ্জস্বামী, ভামহ এবং বৎসভোগিক নামক কুমারামাত্যদিগকে এই একাদশ পাটকপরিমিত ভূমিদানের আদেশ জানাইয়াছেন। (এই শাসন) সান্ধিবিগ্রাহিক করণ কায়স্থ নরদত্ত কর্ত্তৃক লিখিত হইয়াছে।

(১৮-২৭ পংক্তি) যে দত্তভূমির প্রথম খণ্ডের পরিমাণ সাত পাটক নয় দ্রোণবাপ, এবং সীমাচিহ্ন পূর্ব্বদিকে গুণেকাগ্রহার নামক গ্রামের সীমানা ও বিষ্ণু নামক বর্দ্ধকির (সূত্রধারের) ক্ষেত্র, দক্ষিণে সিদ্ধবিলাল (?) ক্ষেত্র ও রাজবিহারের ক্ষেত্র, পশ্চিমে সূরীনাশরম্পূর্ণেকের (?) ক্ষেত্র, উত্তরে দোষীভোগের পুষ্করিণী...বম্পিয়াক (?) ও আদিত্যবন্ধুর ক্ষেত্রসমূহের সীমানা॥ দ্বিতীয় খণ্ডের পরিমাণ আঠাইশ দ্রোণবাপ এবং সীমা—পূর্ব্বে গুণিকাগ্রহার গ্রামের সীমা, দক্ষিণে পক্কবিলাল ক্ষেত্র, পশ্চিমে রাজবিহারের ক্ষেত্র এবং উত্তরে বৈদা...র ক্ষেত্র॥ তৃতীয় খণ্ডের পরিমাণ ত্রয়োবিংশতি দ্রোণবাপ এবং সীমা— পূর্ব্বে... ক্ষেত্র, দক্ষিণে...নগশ্রীচ্চারকার (?) ক্ষেত্রের সীমানা, পশ্চিমে জো× লারীর ক্ষেত্র এবং উত্তরে নাগাজোডাকের ক্ষেত্র॥ চতুর্থ ক্ষেত্রখণ্ডের পরিমাণ ত্রিংশৎ দ্রোণবাপ এবং সীমা—পূর্ব্বে বুদ্ধাকের ক্ষেত্র, দক্ষিণে কালাকের ক্ষেত্র, পশ্চিমে সূর্য্যের ক্ষেত্রের সীমানা, উত্তরে মহীপালের ক্ষেত্র॥ পঞ্চম ক্ষেত্রখণ্ডের পরিমাণ পোনে দুই পাটক এবং সীমা—পূর্ব্বে খণ্ডবিড়ুগুগূরিকের ক্ষেত্র, দক্ষিণে মণিভদ্রের ক্ষেত্র, পশ্চিমে যজ্ঞরাতের ক্ষেত্র, উত্তরে নাদডদক নামক গ্রামের সীমানা॥

(২৭-২৯ পংক্তি) বিহারের তলভূমির ও (৫) সীমাচিহ্ন এই—পূর্ব্বে চূড়ামণি ও নগরশ্রী (৬) নামক স্থানের নৌযোগদ্বয়ের (৭) মধ্যস্থিত

৪। 'অপাবিহিতা' শব্দের প্রয়োগ অন্যত্র দুর্লভ। ৫। তলভূমি দ্বারা নিকৃষ্ট রকমের নিম্নস্থান বুঝাইতেছে, সুতরাং এখানে এবং পরবর্ত্তী খিলভূমির পরিমাণ প্রদত্ত হয় নাই। খালিমপুর শাসনে "তলপাটকের" উল্লেখ দৃষ্ট হয়। ৬। চূড়ামণি ও নগরশ্রী দুইটি পৃথক্ স্থানের নাম হওয়াই সম্ভব। "চূড়ামণি নামক নগরের শ্রীনৌযোগ" এরূপ অর্থও করা যায়, কিন্তু তাহাতে 'শ্রী' শব্দ নিরর্থক হইয়া পড়ে। ৭। নৌযোগ শব্দের অর্থ করা দুষ্কর—বোধ হয় নৌবাহিনীর ক্ষুদ্র মিলন স্থান (a small harbour for boats) হইবে।

ডোলা অর্থাৎ ক্ষুদ্র জলবক্স, দক্ষিণে গণেশ্বরের বিলাল (৮) পুষ্করিণীতে নৌকা চলার জন্ম খাড়ি, পশ্চিমে প্রদ্যুম্নেশ্বর মন্দিরের ক্ষেত্রের শেষসীমা, উত্তরে প্রডামার (৯) নামক (স্থানের ?) নৌযোগের খাড়ি ॥

(২৯-৩১ পংক্তি) যে প্রতিকরশূন্য (১০) জলমগ্ন (হাজা) খিল ভূমিতে এই বিহারের 'প্রাবেশ্য' (১১) রহিয়াছে তাহারও সীমাচিহ্ন এই—পূর্ব্বে প্রদ্যুম্নেশ্বর মন্দিরের ক্ষেত্রের সীমানা, দক্ষিণে বৌদ্ধভিক্ষু আচার্য্য জিতসেনের বিহারের ক্ষেত্রসীমা, পশ্চিমে হচাত গঙ্গা (১২) এবং উত্তরে দণ্ডপুষ্করিণী।

সং ১০০ ৮০ ৮ (১৮৮) পৌষ তারিখ ২০ ৪ (২৪)

৮। বিলাল শব্দ প্রাদেশিক বাংলার 'বিলান জায়গা'র মত "বিলের অন্তর্ভূত" এইরূপ অর্থ প্রকাশ করিতেছে। (৯) প্রডামার—স্থানের নাম হওয়াই অধিক সম্ভব।

১০। 'শূন্য-প্রতিকর' অর্থ করা কঠিন। দামোদরপুর শাসনের 'অপ্রতিকর' অর্থ করা হইয়াছে হস্তান্তর ক্ষমতাশূন্য (without the right of alienation). সে অর্থ এখানে বোধ হয় 'শূন্য' শব্দদ্বারা বারিত হইতেছে। প্রতিকর সাধারণ 'কর' (tax) অর্থে প্রযুক্ত হওয়া অসম্ভব নয়। ১১। প্রাবেশ্য অর্থাৎ প্রবেশাধিকার একপ্রকার নিকৃষ্ট জাতীয় (অন্ততঃ অগ্রহারসত্ব হইতে নিকৃষ্টতর) সত্বকে বুঝাইতেছে—তাহার স্বরূপনির্ণয়ের উপায় নাই। Dr. Sukthankar (*Ep. Ind.*, XVII., pp 106-7) প্রাবেশ্য শব্দের যে অর্থ করিয়াছেন—'এক-প্রকার রাষ্ট্রীয় বিভাগ'—সে অর্থ এখানে খাটে না। ১২। গংগা শব্দ নদী অর্থে এখনও পূর্ববঙ্গে প্রচলিত আছে, কেবল গংগা না বলিয়া গাঙ্গ বলে।

নটরাজ

শ্রীসুবলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

অপার প্রান্তর ঘিরে নেমেছে নবেন্দুলেখা শুক্লা রজনীর,—
মদির তিমির-শ্বাস মরমিয়া প্রথম তিমির ;
মন্থর মধুর গন্ধ পূরবী পবনে !
ঝিকিমিকি আলো-ছায়ে ক্ষণে ক্ষণে আন্দোলিছে পর্ব্বত-সমীর,
মর্ম্মরে সেতার বাজে স্পন্দমান অরণ্য-বীথির,
বন-বিহঙ্গীর গান আসিছে স্বপনে !

ছিন্নভিন্ন পল্লবের মর্ম্মে বাজে ধূনিধ্রুমপুঞ্জ কলতান,
অম্বুদ-মন্দ্রের ধ্বনি তরঙ্গিয়া ভরে দুটি কান,
অস্তমান সূর্য্যকরে নাচে মেঘাঙ্গনা !
গভীর রক্তিম ছায়া—ত্রিনয়নে সংহারের বহ্নি লেলিহান,
উন্মত্ত উৎসাহে জাগি বনস্পতি করিছে সন্ধান,
ঝঙ্কার গর্জ্জনমাঝে একটি প্রার্থনা।

*

কখনও কানের কাছে অবিরাম রিম্‌ঝিম্ রণিছে ঝরণা—
করুণ নীহারে যেন নবারুণ-রক্তিম বরণা,—
হাঁসের ডানার ভরে নাচে ছায়াপরী !
কখনও নিঝুম্ ঘুমে, লঘুপদভরে নামি শঙ্কিতচরণা
দুটি চোখে চুপি চুপি রেখে যায় হিমবারিকণা !
রাতির আঁচলে দোলে আঁধার-কবরী !

পূরব-দিগন্তসীমা পরিয়াছে মেঘনীল মোহাঞ্জনরেখা,
কোমল মাটির বাষ্পে বারম্বার ডেকে ওঠে কেকা
নদীর ঝর্ঝরে জাগে অরণ্য-শিহর।
তৃণাঙ্কিত তীর-বাটে ক্ষণে ক্ষণে লুপ্ত হয় পদচিহ্নলেখা—
অনন্ত রাতির তীরে এ-রজনী জেগে আছে একা !
কুলায়ে কপোত-প্রাণ কাঁপে থরথর !

*

সহসা পশ্চিম-নভে দেখা দিল রুদ্ররূপ,—ভীষণ বৈশাখী,
সীমন্ত-সিন্দুররাগ মেঘবর্ণ অন্ধকারে ঢাকি,—
সিন্দুর কপালে জ্বালি আনীল বেদনা !
পশ্চিম পবন বেগে ছিঁড়ে গেল অকস্মাৎ পীতবর্ণ রাখী—
পাণ্ডুর কপোলতল অশ্রুনীরে কাঁপে থাকি থাকি—
ধ্বংসের রাগিণী বাজে ভরিয়া চেতনা।

আন্দোলি উঠিছে কোন্ রোমাঞ্চিত কদম্বের গন্ধাতুর শাখা
যূথীর পরাগ বুঝি মালতীর মর্ম্মমূলে মাখা—
নিশ্বসিয়া ওঠে গৌরী-কেতকীর বীথি !
কিশোরের করস্পর্শে বনবধূ চম্পা যেন মেলিয়াছে পাখা,
কম্পিত পৃথ্বীর চোখে নটেশের হাসি-অশ্রু-আঁকা—
সহসা আনিছে মনে হারানো বিস্মৃতি !

পুস্তক পরিচয়

জাতক—অর্থাৎ গৌতম বুদ্ধের অতীত জন্মসমূহের বৃত্তান্ত, ফৌসবোল-সম্পাদিত জাতকার্থবর্ণনা-নামক মূল পালিগ্রন্থ হইতে শ্রীঈশানচন্দ্র ঘোষ কর্তৃক অনূদিত, ষষ্ঠ খণ্ড, ৪৪০ পৃষ্ঠা, মূল্য ৬৲ ছয় টাকা।

পালি সাহিত্যে জাতকের গল্পগুলি সুপ্রসিদ্ধ ও নানা প্রকারে উপাদেয়। ইহার মূল পালি ছয় খণ্ডে বহু বৎসর পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছিল। শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র ঘোষ মহাশয় বৃদ্ধ বয়সে ষোল বৎসর পূর্ব্বে ইহার অনুবাদে হস্তক্ষেপ করেন। দীর্ঘকাল ধরিয়া অক্লান্তভাবে গুরুতর শ্রম ও অর্থব্যয়ে এক-একখানি করিয়া তিনি শেষ ষষ্ঠ খণ্ডেরও অনুবাদ পরিসমাপ্ত করিয়া বঙ্গবাসীদের হস্তে সমর্পণ করিয়াছেন। ঈশানবাবু ইহা দ্বারা বঙ্গসাহিত্যকে কি সম্পদ দান করিলেন তাহা যে-কোনো শিক্ষিত ব্যক্তি একটু চিন্তা করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন। বঙ্গসাহিত্যসেবীদের প্রত্যেকেই এজন্য তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ। আজ এই কার্য্যের পরিসমাপ্তিতে আমরা আনন্দিত চিত্তে তাঁহার অভিনন্দন করিতেছি।

আমাদের মনে হয়, বিদ্যালয় ও পুস্তকালয়-সমূহে জাতকের সমগ্র অনুবাদটি থাকা নিতান্ত আবশ্যক। পুস্তকখানির গুণ ও আকারের হিসাবে মূল্য খুব কম। ছয় খণ্ডে সমাপ্ত সমগ্র পুস্তকখানির মূল্য ৩০৲ ত্রিশ টাকা মাত্র। ইংরাজী অনুবাদের মূল্য ইহা অপেক্ষা অনেক বেশী।

অনুবাদের দোষ-গুণ সম্বন্ধে পূর্ব্বে আমরা একাধিক বার আলোচনা করিয়াছি। গদ্য অংশের অনুবাদ বেশ চলনসই ও সুখপাঠ্য হইয়াছে, যদিও অনেক স্থানে সংশোধন আবশ্যক। পদ্য অংশের অনুবাদে বহু স্থানে মূলকে একেবারে অতিক্রম করিয়া, মনে হয়, কেবল ছন্দ পূরণের জন্য, অনেক অতিরিক্ত কথা যোগ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ইহা সমর্থন করা চলে না। দুই একটা উদাহরণ দেওয়া যাউক। ৫৩৮তম জাতকের মূল দ্বিতীয় গাথাটি এই :—

করোমি তে তং বচনং যং মং ভণসি দেবতে।
অত্থকামাসি মে অম্ম হিতকামাসি দেবতে॥

ইহার অনুবাদটি এইরূপ (পৃ. ৩)

মা গো, তুমি আমার প র ম হিতৈষিণী
তুমিই আমার স ত্য কল্যাণকামিনী।
দ যা ক রি করিলে যে উপদেশ দান
য ত নে পালিব তাহা হ য়ে সা ব ধা ন॥

এখানে ফাঁক-ফাঁক করিয়া ছাপান শব্দ কয়টির কিছুই মূলে নাই। অপর পক্ষে মূলে দুইবার 'দেবতে' (সম্বোধন) আছে, কিন্তু অনুবাদে তাহা একেবারেই বাদ গিয়াছে।

মহাজনক জাতকের ১০ম গাথাটি এই :—

যো ত্বং এবং গতে ওঘে অপ্পমেয্যে মহণ্ণবে
ধম্মবায়ামসম্পন্নো কম্মনা নাবসীদসি
সো ত্বং তত্থেব গচ্ছাহি যত্থ তে নিরতো মনো।

ইহার অনুবাদ এই (পৃ. [illegible]) :—

অসীম তরঙ্গ ক্ষুব্ধ হেন মহার্ণবে পড়ি
হও নাই নিরুদ্যম, পৌরুষ না পরিহরি
ধর্ম্মানুমোদিত চেষ্টা করিতেছ যথাশক্তি
রাখিতে নিজের প্রাণ ; দেখি আমি তুষ্ট অতি।
দিনু বর, যাও যেথা যেতে তব চায় মন ;
উদ্যমশীলের রক্ষা করেন দেবতাগণ।

ইহার অনেক কথা মূলে মোটেই নাই।

কখনও কখনও গদ্যেও এইরূপ মূলের মর্য্যাদা অতিক্রম করা হইয়াছে। যেমন, মূলে আছে 'অম্ম অম্হাকং গামো পুরতো'ব' (মা, আমাদের গাঁ সামনেই)। ইহার অনুবাদ করা হইয়াছে (পৃ. ২০) 'মা বাড়ীতে পৌঁছিবার জন্য আমাকে আরও খানিকটা রাস্তা চলিতে হইবে।' অনেক স্থানে শব্দার্থেও ত্রুটি রহিয়াছে। যেমন মূলের 'দিবা দিবসস্স' [পৃ. ৩০] বলিতে মধ্যাহ্নকাল বুঝায়, প্রাতঃকাল নহে (পৃ. ২০); 'আমি উদীচ্য ব্রাহ্মণ মহাসার' (পৃ. ২১), এখানে মূলে (পৃ. ৩২) আছে 'মহাসাল,' ইহার অর্থ 'মহাসার' নহে, 'মহাশাল'—যাহার বড় শালা অর্থাৎ ঘর আছে, সমৃদ্ধ গৃহস্থ; ইত্যাদি।

শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য্য

যাত্রী—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত। প্রকাশক বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ২১০ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ৩১৫ পৃষ্ঠা, পাইকা টাইপে ছাপা। মূল্য ২৲ টাকা।

এই পুস্তকে দুটি বিষয় সন্নিবেশিত হয়েছে—পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারী আর জাভা-যাত্রীর পত্র। রবীন্দ্রনাথ একজন মহাপরিব্রাজক, পৃথিবীর বহু দেশ বহু বার পর্য্যটন করেছেন, এখনও তাঁর পরিভ্রমণ ক্ষান্ত হয় নি। রবীন্দ্রনাথ আগে-চলার কবি, গণ্ডী এড়িয়ে ক্রমাগত এগিয়ে চল্‌বার জন্য একটা তাগাদা তাঁর রচনার প্রধান সুর। দ্রুতগামী রেলগাড়ীর জানলার ধারে ব'সে থাকলে যেমন নানা দৃশ্য চোখে পড়ে এবং কোনো একটা দৃশ্যের উপর চোখ ফেলতে না ফেলতে আবার নূতন দৃশ্য এসে চোখের সামনে উপস্থিত হয়, পরিব্রাজক রবীন্দ্রনাথের মনের সাম্‌নে তেমনি বহু চিন্তাধারা ক্রমান্বয়ে প্রবাহিত হয়ে চলেছে, বায়োস্কোপের ফিল্‌মের মত সেগুলি ডায়ারির পাতায় বা পত্রের পৃষ্ঠায় তিনি তুলে রেখেছেন। এ যেন কেবল একজন লোককে মনের সামনে বসিয়ে তাকে উপলক্ষ্য ও নিমিত্ত মাত্র করে কবি নিজের মনের ভাবগুলি অনর্গল প্রকাশ করে চলেছেন। কবি নিজেই তা স্বীকার করেছেন—"স্রোতের জলের যে ধ্বনি সেটা তার চলারই ধ্বনি, উড়ে-চলা মৌমাছির পাখার গুঞ্জন। আমরা যেটাকে বকুনি বলি সেটাও সেই মানসিক

চ'লে যাওয়ারই শব্দ। চিঠি হচ্ছে লেখার অক্ষরে বঁকে যাওয়া। এই বঁকে যাওয়াটা মনের জীবনের লীলা। দেহটা কেবলমাত্র চলবার জন্যেই বিনা প্রয়োজনে মাঝে মাঝে এক-একবার ধাঁ করে চ'লে ফিরে আসে, বাজার করবার জন্যে নয়, সভা করবার জন্যেও নয়, নিজের চলাতেই সে নিজে আনন্দ পায় বলে। তেমনি নিজের বকুনিতেই মন জীবন-ধর্ম্মের তৃপ্তি পায়। তাই বক্‌বার অবকাশ চাই, লোক চাই। বক্তৃতার জন্যে লোক চাই অনেক, বকার জন্যে এক-আধজন।" পত্র লিখতে সেই এক-আধ জন লোকের আবশ্যক হয়, কিন্তু ডায়ারি লেখার বেলা সে বালাইও দরকার নেই। কবি আপনাকে একেবারে ছেড়ে দিয়েছেন আপনার চিন্তাস্রোতের মুখে, আর ভেসে চলেছেন নিরুদ্দেশের অজানা অসীমায়। তাই এই পুস্তকখানিতে কোনো লাগ্নিক বিষয় নিয়ে আলোচনা খুঁজলে পাওয়া যাবে না, অথচ নেই এমন বিষয়ও পাওয়া কঠিন হবে। নর-নারীর প্রেমতত্ত্ব থেকে আরম্ভ করে কবির আলোচনা ভারতের প্রাচীন কীর্ত্তি দূরদূরান্তে নিজের সংস্কৃতি প্রচার পর্য্যন্ত গিয়ে থেমেছে। সাহিত্য দর্শন সমাজতত্ত্ব রাষ্ট্রতত্ত্ব প্রভৃতি সকল প্রধান বিষয়ের আলোচনা এর মধ্যে পাওয়া যাবে। অধিকন্তু জাভাযাত্রীর পত্রের মধ্যে সেই দেশের প্রাকৃতিক দৃশ্য নরনারীর বেশভূষা রীতিনীতি আচার ধর্ম্ম প্রভৃতি বহু বিষয়ের আলোচনা পাওয়া যাবে। কবি নিজের সম্বন্ধে বলেছেন—"আমার মন ম্যাপ-টুবিলাসী মন নয়, সে চিত্রবিলাসী।" সুতরাং এর মধ্যে চিত্রকর কবির অঙ্কিত বহু চিত্রপরম্পরা পাঠকদের মনকেও মুগ্ধ ও মননশীল ক'রে তুলবে।

পত্র ও ডায়ারি লিখতে লিখতে কবির মনে মাঝে মাঝে কবিত্ব যখন তত্ত্বকে অতিক্রম করে প্রবল হয়ে উঠেছে তখন তাঁর মনের চিন্তা কবিতার আকার ধারণ করেছে। এজন্য গদ্য রচনার মধ্যে মধ্যে কয়েকটি কবিতাও এই পুস্তকে স্থান পেয়েছে এবং সেগুলি এখনও কোনো কবিতাসংগ্রহে স্থান পায়নি।

শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

ভ্রমণের নেশা—শ্রীমণীন্দ্রনাথ মুস্তোফী; প্রকাশক এম, সি, সরকার এণ্ড সন্স, ১৫ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা; দাম দেড়টাকা।

'কি করা যায়' কয়েকটি যুবকের এই ভাবনা হইতে একদা উৎপত্তি হইল—কনসার্ট পার্টির নয়, থিয়েটার পার্টির নয়, এমন কি লিমিটেড কোম্পানীরও নয়—এই চক্রীদলের নেশার। ভ্রমণের নেশায় এই যুগে অসাধারণত্ব নাই—টিকেট কাটিয়া কোনওরূপে শুইতে পারিলে চোখ মেলিয়া দেখা যায় অন্তত শ-পাঁচেক মাইল সারা গিয়াছে। কিন্তু কালকাটা হুইলার্সের মত চাকা ঠেলিয়া কাশীধাম, পুরীধাম, শ্রীশ্রী দার্জ্জিলিংধাম বা কাশ্মীর পৌছানো এখনও নূতন জিনিষ। নেশায় না ধরিলে কেহ আটকার জঙ্গল বা কর্ম্মনাশা এ-ভাবে অতিক্রম করিতে যায় না; ঘাট গাঁ ও জঙ্গলে বন্যহস্তীর হাত এড়াইবার পরেও মানুষের সুবুদ্ধির উদয় হয়। তাহার পরিবর্ত্তে, এই দলটি উত্তরপশ্চিম সীমান্ত ও কাশ্মীর পর্য্যন্ত না ঘুরিয়া ছাড়িলেন না।

নেশা সাধারণত ছোঁয়াচে। এই লিপিচাতুর্য্যবর্জ্জিত, সবল ও সরস কাহিনীটি পড়িতে পড়িতে দুই-একজন অত্যন্ত কুনো টিটোটেলরের মনও চঞ্চল হইতে পারে—কিন্তু এত কষ্ট ও অসুবিধার কথা ইহাতে আছে যে, সে সখ বেশীক্ষণ থাকিবে না। পথের নক্‌সা দেখিয়াই তাঁহারা তৃপ্ত হইবেন ও ইহা পাঠ করিয়া পরমানন্দ লাভ করিবেন।

শ্রীগোপাল হালদার

হীরের ফুল—প্রণেতা ও প্রকাশক মোহাম্মদ মোদাব্বের। ১১৫ কড়েয়া বাজার রোড। ৫৬ পৃষ্ঠা, দাম ছয় আনা।

মুসলমানী পুরাণ ও ইতিহাস হইতে বিষয় নির্ব্বাচন করিয়া গ্রন্থকার ছেলেদের জন্য এই বইখানি লিখিয়াছেন। বহিখানির ভাষা ও কাহিনীগুলি ভাল। ছাপা পরিষ্কার।

রহস্যধারা—প্রণেতা শ্রীসৌরেশচন্দ্র চৌধুরী। প্রকাশক শ্রীমুরলীমোহন চৌধুরী। গিরিডি। ৬০ পৃষ্ঠা। দাম আট আনা। ইহাতে পাঁচ ধারা আছে। যথা (১) বিদ্যা-সাগরীয় বর্ণপরিচয়ে বর্ণযোজনার বিশদ ব্যাখ্যা; (২) ধারাপাততত্ত্ব; (৩) বোধোদয়ের ভাষ্য; (৪) ব্যাকরণ রহস্য; (৫) দেহতত্ত্ব। সবগুলিই হাস্যরসাত্মক রচনা। পুস্তকখানিতে লেখকের হাস্যরস সৃষ্টির ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়।

বৈজয়ন্তী—কাব্যগ্রন্থ। প্রণেতা শ্রীবিজয়মাধব মণ্ডল, সাহিত্যসরস্বতী, বি-এ। প্রকাশক শ্রীসুধাংশুশেখর মণ্ডল, রঘুনাথপুর বসিরহাট। পৃষ্ঠাসংখ্যা। ১০৪ দাম একটাকা।

অনেকগুলি নানাবিষয়ক কবিতার সমষ্টি। কবিতাগুলির অধিকাংশই ভাল, ছন্দেও বৈচিত্র্য আছে। বহির ছাপা সুন্দর। মলাটের উপরের ছাপা ছবিখানি বহির উপযুক্ত হয় নাই।

অগ্নিপরীক্ষা—শ্রীরাসবিহারী মণ্ডল, বি-এল প্রণীত উপন্যাস। প্রকাশক নাথ ব্রাদার্স ২০-সি ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট, কলিকাতা। পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৬২। দাম দেড়টাকা।

অরুণপ্রকাশ কলিকাতায় মেসে থাকিয়া আইন পড়ে, সম্প্রতি বাড়ী আসিয়াছিল। বাড়ীতে তাহার বৌদির বিধবা পিসতুত বোন উষার সহিত তাঁহার পরিচয় হয় এবং সেই পরিচয় ক্রমে প্রগাঢ় বন্ধুত্বে পরিণত হয়। উষার সহিত অরুণের স্ত্রী নীহারবাসিনীর সখীত্ব সম্পর্ক ছিল। যক্ষ্মারোগে নীহারের মৃত্যুর পর উষা নীহারের শিশুপুত্র ও অরুণের সেবায় জীবন উৎসর্গ করে। গ্রন্থের শেষে অরুণ বিধবা উষাকে বিবাহ করিবার প্রস্তাব করিলে উষা বলিল, "শুধু ভালবেসে যখন প্রাণে এত সুখ, এত তৃপ্তি, তখন নিরর্থক কেন এই উৎসর্গ-করা দেহটাকে তোমার ভোগে লাগিয়ে প্রাণে অশান্তির আগুন জ্বেলে তুলি?" ইত্যাদি।

গ্রন্থকার দেহসম্বন্ধহীন প্রেমের চিত্র আঁকিতে প্রয়াস পাইয়াছেন, তাহাতে সফল-কাম হইয়াছেন। বইয়ের ছাপা ও বাঁধাই ভাল।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ মৈত্র

গম্ভীরনাথ উপদেশামৃত—ময়মনসিংহ আনন্দমোহন কলেজের দর্শনাধ্যাপক শ্রীঅক্ষয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, এম্ এ প্রণীত। ফেনী বরদা প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য ১৷৹ টাকা।

গ্রন্থখানি গম্ভীরনাথের প্রতি গ্রন্থকারের উচ্ছ্বসিত ভক্তি-শ্রদ্ধার নিদর্শন। আলোচ্য পুস্তকে একটি "প্রস্তাবনা" আছে ও আটটি অধ্যায়ে আটটি উপদেশ আলোচিত হইয়াছে। শেষ অধ্যায়ে গ্রন্থকার "গুরুতত্ত্ব" আলোচনা করিয়াছেন।

"প্রস্তাবনা"তে কিরূপ উপদেশাবলি সংগৃহীত হইয়াছে গ্রন্থকার তাহারই বিবরণ দিয়াছেন। স্মারকলিপি হইতে উপদেশ সংগৃহীত। গ্রন্থকার নিজেও স্মারকলিপি রাখিবেন—তিনিও গম্ভীরনাথের শিষ্য। তিনি স্পষ্টই লিখিয়াছেন—"এই স্মারকলিপির মধ্যেও যোগিরাজের

স্বমুখোচ্চারিত বাণী অবশ্যই অল্প, লিপিকর কর্তৃক ভাবানুবাদ তদপেক্ষা অধিক, মর্ম্মানুবাদ তদপেক্ষাও অধিক।" যখন দেখা যায়, অতিরিক্ত পক্ষপাতিত্ববশতঃ সর্ব্বক্ষেত্রেই গুরুবাক্যের—যে বাক্যের সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ নাই—স্বমতানুযায়ী অর্থান্তর ঘটিয়া থাকে তখন যেখানে বাক্যই পাওয়া যায় না, ভাবানুবাদ মাত্র পাওয়া যায় এবং অধিকাংশ স্থলে লেখক নিজে যাহা বুঝিয়াছেন তাহাই লিখিয়া রাখিয়াছেন, সেখানে গ্রন্থকারের পক্ষে হুবহু গুরুবিশেষের "উপদেশ" বলিয়া গ্রন্থ প্রচার না করিলেই ভাল হইত। আমরা গ্রন্থখানি তাঁহার নিজের কথা বলিয়াই ধরিয়া লইব। লিপিকরের দোষেই বর্ত্তমানে খৃষ্টধর্ম্মের সর্ব্বপ্রধান মত ত্রিত্ববাদ গল্পে ঢুকিয়াছিল। শিষ্যেরা নিজের মত সর্ব্বদাই গুরুর স্কন্ধে চাপাইয়া থাকেন।

গ্রন্থকার গুরুতত্ত্ব ঠিক্ বুঝেন নাই। তিনি নিজেই তাঁহার গুরুর যে-সব কথা উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহারও সবগুলির সত্য অর্থ তিনি ধরিতে পারেন নাই।

পুস্তকে অনেক কথাই আছে। বিচারের সঙ্গে পাঠ করিলে অনেক কথাই উপকারে লাগান যায়। কিন্তু আমাদের আক্ষেপের কারণ এই, যে, গ্রন্থকার অনেক মালমসলা সংগ্রহ করিয়াছেন, ইচ্ছা থাকিলেও চেষ্টা করিলে তিনি সেগুলিকে মানুষকে নিম্নস্তর হইতে উন্নততরস্তরে লইয়া যাইবার যন্ত্রস্বরূপে নিয়োগ করিতে পারিতেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তিনি তাহা করেন নাই। বরং আমাদের মনে হয়, আর দশজনের ন্যায় তিনিও যেন সর্ব্বসাধারণকে ঐ নিম্নস্তরে রাখিয়া দিবারই প্রয়াস পাইয়াছেন। তাদের পিঠে যেন হাত বুলাইয়াছেন। আক্ষেপের সঙ্গে এ কথাগুলি বলিতে হইল এইজন্য যে, আমরা তাঁহার কাছে বেশী কিছু আশা করিয়াছিলাম।

শেষ কথা, আমাদের বিশ্বাস এই, এবং সে বিশ্বাস দিন দিন দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর হইতেছে, যে, দেশের মানুষের মন অনেকদিন হইতেই মায়াবাদের গর্ত্তে পড়িয়া রহিয়াছে। সেখান হইতে মনকে উঠাইতে না পারিলে দেশের কোন কল্যাণ সাধিত হইতে পারিবে না। জগৎটা মিথ্যা, আসল বস্তু নির্গুণ, নির্ব্বিশেষ, নিষ্ক্রিয় এবং ঐটিই একমাত্র লোভনীয়, এই বিশ্বাস মনের অন্তরাল হইতে যে চাপ দেয় সেই চাপে আমাদের কোন চেষ্টাই মাথা তুলিয়া গজাইয়া উঠিতে পারিতেছে না,—আমরা যতই কেন উচ্চ আকাঙ্ক্ষা করি না, মহৎ কর্ম্মের সূচনা করি না। "মায়াবাদং অসচ্ছাস্ত্রম্" বলিয়া ইহাকে চিন্তাজগৎ হইতে সরাইয়া দিতেই হইবে—ইহার সঙ্গে প্রাচীন অর্ব্বাচীন যত কেন বৃহৎ নাম যুক্ত থাকুক না। তাই চৈতন্যদেব বলিয়াছেন—

জীবনিস্তারের তরে সূত্র কৈল ব্যাস,
মায়াবাদী ভাষ্য শুনিলে হয় সর্ব্বনাশ। চৈ. চ।

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী বেদান্তবাগীশ

বিষের হাওয়া—(উপন্যাস) শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দাশগুপ্ত, বি-এ। বীণা লাইব্রেরী, কলিকাতা। পৃঃ ২২২, দাম পাঁচ সিকা।

বইখানির প্রথমে শ্রীযুক্ত চারু বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের দীর্ঘ ভূমিকা। চারুবাবু যদিও ভূমিকায় বলিয়াছেন এখানা মিস্ মেয়োর 'মাদার ইণ্ডিয়া'র পাল্টা জবাব নয়, তবু বইখানি শেষ করিয়া সে কথা বিশ্বাস করা কঠিন হইয়া পড়ে। পরিশিষ্টে বিদেশী সমাজ সম্বন্ধে নানা খবরের কাগজ হইতে উদ্ধৃত যে টুকরা সংবাদগুলি সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, তাহাতেও গ্রন্থকারের এই উদ্দেশ্য আরও পরিস্ফুট হয় না কি? আর্টের দিক হইতেও উপন্যাসের মূল্য এখানে ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। গল্পটির মধ্যেও তেমন বিশেষত্ব নাই। জুসি, রাব্ ও রিংকে আঁকিবার উপযুক্ত অভিজ্ঞতা ও প্রত্যক্ষজ্ঞানের অভাবে ওই অধ্যায়গুলি ধোঁয়া ধোঁয়া ঠেকে। নন্দরাণীর যে আত্মবিলোপী সেবারতা মূর্ত্তি আঁকিবার চেষ্টা করা হইয়াছে—মুন্সিয়ানার অভাবে তাহাও জীবন্ত হইয়া উঠে নাই। কিন্তু তবুও স্বীকার করিতে হইবে বইখানি পড়িতে পড়িতে মাঝে মাঝে চক্ষু অশ্রুসিক্ত হইয়া উঠিয়াছে—তাহা হরিবিলাসের মেয়েলী ঢংএর ভাবাতিশয্য-ও তাহার প্রকাশে নহে—যোগমায়ার মাতৃহৃদয়ের গভীরতার ও সুভদ্রার অনাবিল স্নেহের ও শ্রদ্ধার আন্তরিকতায়। এই দুটি চরিত্র অঙ্কনে লেখক সত্যকার কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন।

সুদখোর সওদাগর—শ্রীনগেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী প্রণীত। তৃতীয় সংস্করণ। এম্, সি সরকার এণ্ড সন্স। দাম দশ আনা।

বইখানি শেক্স্পিয়ারের 'মার্চ্চেণ্ট অফ ভেনিস্'-এর গল্প অবলম্বনে বালকবালিকাদের জন্য লিখিত। এদেশের উপযোগী করার জন্য স্থানে স্থানে মূলের অনেক বিষয়ের পরিবর্জ্জন ও পরিবর্ত্তন করা হইয়াছে। নামগুলি সবই এদেশী করায় ছেলেমেয়েদের পক্ষে গল্পটি উপভোগ করিবার সুবিধা হইয়াছে সন্দেহ নাই। ছবি ও ছাপা ভাল, তাহাদের নিকট এখানি আদরণীয় হইয়াছে। ইহার পূর্ব্বের দুই সংস্করণ নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে দেখিয়াই তাহা বোঝা যায়। বইএর ভাষাও সরল।

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

ক্ষণজন্মা ক্ষণাদেবী—শ্রীমতী চারুবালা সরস্বতী প্রণীত; প্রতিভা প্রেস, ৩৮।২ ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত; মূল্য ৫০।

আমরা শিশুকাল হইতে ক্ষণার বচনের কথা শুনিয়া আসিতেছি। লেখিকা আর্য্যনারী ক্ষণাদেবীর জীবনী সুন্দর ও সরলভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। প্রাচীন ভারতের মহীয়সী নারীদের মধ্যে ক্ষণাদেবীর স্থান অতি উচ্চে। জ্যোতিষশাস্ত্রে এই প্রতিভাময়ী নারীর দান অতুলনীয়। প্রাচীন ভারতের জ্যোতিষশাস্ত্রের প্রচারকল্পে ক্ষণাদেবীর নাম চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। ক্ষণার জীবনী উপন্যাসের মত মনোরম অথচ করুণ। লেখিকা এই জীবন-কথা অল্পের মধ্যে বেশ সুন্দরভাবে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। শেষদিকে লেখিকা বর্ষগণনা, কৃষি, বৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, বন্যা, জন্ম, মৃত্যু, শুভাশুভ গণনা প্রভৃতি সম্বন্ধে যে সকল 'ক্ষণার বচন' প্রচলিত আছে তাহাও দিয়াছেন। 'পরিশিষ্টে' ক্ষণার বচনে যে সব অপ্রচলিত ও কঠিন কথা আছে তাহাদের অর্থ দেওয়া হইয়াছে। এই বইখানি পাঠ করিয়া সকলে যথেষ্ট শিক্ষা লাভ করিবে।

যাদুকর—শ্রীযতীন সাহা প্রণীত; প্রকাশক শ্রীসমর দে ও শ্রীযতীন সাহা, ৫২।১।১ কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা, মূল্য ॥০।

এখান ছেলেমেয়েদের গল্পের বই। চারিটি গল্প আছে। গল্পগুলি ভূতপ্রেত কাপালিক ইত্যাদি লইয়া লিখিত। গল্পগুলি পড়িয়া বিস্ময়ের সঙ্গে সঙ্গে ছেলেমেয়েরা বেশ আমোদ পাইবে। শিশু-চিত্তকে আকৃষ্ট করিবার ক্ষমতা এই গল্পগুলির মধ্যে আছে। কিন্তু 'র' 'ড়' ও চন্দ্রবিন্দুর ভুল প্রয়োগের দরুণ গল্পগুলির সৌন্দর্য্য হানি হইয়াছে। শ্রীসমর দে অঙ্কিত ছবিগুলি বেশ উপভোগ্য হইয়াছে।

ছেলেদের বিদ্যাসাগর—শ্রীযামিনীকান্ত সোম প্রণীত, দ্বিতীয় সংস্করণ, ইণ্ডিয়ান প্রেস, এলাহাবাদ; মূল্য ৷৵০।

'ছেলেদের বিদ্যাসাগর' শিশুদের উপযোগী একখানা উৎকৃষ্ট জীবন-চরিত। লেখক 'ছেলেদের রবীন্দ্রনাথ' লিখিয়া যথেষ্ট খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন; সেই খ্যাতি এই পুস্তকে অক্ষুণ্ণ থাকিবে। বাংলা সাহিত্যে শিশুদের উপযোগী জীবন-চরিত খুব কমই আছে—লেখক 'ছেলেদের বিদ্যাসাগর' লিখিয়া এক প্রকৃত অভাব দূর করিলেন। সহজ, সরল অথচ চিত্তাকর্ষক করিয়া জীবন-কথা লিখিবার ক্ষমতা লেখকের যথেষ্ট আছে। বিদ্যাসাগরের বিচিত্র জীবন-কথা এমন চমৎকার করিয়া তিনি লিখিয়াছেন যে, ছেলেমেয়েরা বইখানি মন্ত্রমুগ্ধের মত পড়িয়া ফেলিবে এবং পড়িয়া একাধারে আনন্দ ও জ্ঞান লাভ করিবে। শিশুদের উপযোগী যে কয়খানি বিদ্যাসাগর জীবনী আছে, তার মধ্যে এইখানাই যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

শ্রীসুধীরচন্দ্র সরকার

কোরাণের আলো—মৌলবী মোহাম্মদ আজহারউদ্দীন, এম-এ সঙ্কলিত। মূল্য একটাকা। প্রাপ্তিস্থান মোহাম্মদী আপিস, ৯১ আপার সাকুলার রোড, কলিকাতা।

কুর'আন মুসলমানদের ধর্ম্মগ্রন্থ। স্বর্গীয় দূত জীবরাইল কর্ত্তৃক ইহা বাহিত হয়ে হজরত মুহম্মদের নিকট প্রকাশিত হয়। কুর'আন আরবী ভাষায় আল্লাহ্‌ বাণী বলে মুসলমানদের বিশ্বাস।

বাংলাদেশে পরলোকগত শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র সেন মহাশয় কুর'আন শরিফ প্রথম বাংলায় অনুবাদ করেন। সেন মহাশয় আরবী ভাষাতে সুপণ্ডিত ছিলেন। তাঁর পরে মৌলভী নৈমুদ্দীন সাহেব ইহার অন্য একখানি অনুবাদ করেন। মৌলবী আব্বাস আলী, খানবাহাদুর তসলিমুদ্দীন, মৌলানা রুহুল আমিন, মৌলবী আবদুল হাকিম, মৌলানা আকরম খাঁ এবং মৌলবী ফজলুল রহীম চৌধুরী এম-এ প্রভৃতি ব্যক্তিগণ স্বতন্ত্রভাবে অনুবাদ করেন। মৌলানা আকরম খাঁ "মোহম্মদী সম্প্রদায়"ভুক্ত বলে অধিকাংশ গোঁড়া সুন্নী মুসলমান তাঁর অনুবাদ পছন্দ করেন না। বাংলা দেশে সুন্নী মুসলমানের সংখ্যাই বেশী।

মৌলবী মুহম্মদ আজহার উদ্দীন সাহেব সমগ্র কুর'আন শরীফ হতে নির্ব্বাচন করে বাংলা ভাষায় অনুবাদ করিয়াছেন। হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোকের জন্যই তিনি এ গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন। তাঁর চয়ন বেশ সুন্দর হয়েছে। ভাষার মাধুর্য্য ও সাবলীলগতি গ্রন্থখানিকে মনোরম করে তুলেছে। এই গ্রন্থখানি পাঠ করে হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোকই অনাবিল আনন্দ পাবেন। বাংলার এই দুই বৃহৎ সম্প্রদায়ের মধ্যে মিলন স্থাপনের ইহা প্রভূত পরিমাণে সাহায্য করিবে। তিনি সঙ্কটসময়ে জাতির মুক্তিলাভে সহায়তা করলেন।

বহির ছাপা, কাগজ ও বাঁধাই ভাল।

কোরাণ কণিকা—মৌলবী মীর ফজলে আলী, বি-এল প্রণীত এবং ডক্টর মুহম্মদ সহীদুল্লাহ্‌ এম-এ-বি-এল, ডী-লীট কর্ত্তৃক ভূমিকাভূষিত। মূল্য একটাকা মাত্র।

কুর'আন শরিফের কতগুলি সুরাহর পদ্যানুবাদ। ডক্টর মুহম্মদ সহীদুল্লাহ সাহেব কোরান যে 'মহামহিম, তদ্বিষয়ে একটি প্রবন্ধ ভূমিকা স্বরূপ লিখে দিয়েছেন। ভূমিকার একস্থানে লিখেছেন, "আমরা বর্ত্তমানে অবনতির যুগে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি এবং এই অধর্ম্মযুগে কোর'আন অনুসরণ ভিন্ন উপায় নাই।"

কবিতার ভাষা মধুর ও গভীর হয় নাই। তবে কুর'আন্‌ শরিফের কিছু অংশ সম্বন্ধে ধারণা জন্মে। মোটের উপর গ্রন্থকারের প্রচেষ্টা প্রশংসনীয়। এই অনুবাদে গ্রন্থকারের স্বধর্ম্মের এবং মাতৃভাষার প্রতি অনুরাগের পরিচয় পাওয়া যায়।

জরীন্‌ কলম

কাব্যদীপালি—শ্রীমতী রাধারাণী দেবী ও শ্রীনরেন্দ্র দেব সম্পাদিত এবং ১৫ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা, হইতে এম-সি সরকার এণ্ড সন্স কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ৪৲ টাকা।

গীতি কাব্যের ভিতর দিয়া শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের যতটা পরিচয় পাওয়া যায়, এমন আর কিছুতে নয়। তাই সকল দেশের সাহিত্যের মধ্যে এই প্রকৃতির কাব্য সংগ্রহের চেষ্টা দেখিতে পাই। ইংরেজীতে anthology-র অসদ্ভাব নাই। বাংলার পদকল্পতরু প্রভৃতি গ্রন্থও এইরূপ গীতিকাব্যের ভাণ্ডার। আধুনিক কবিতার পরিচয় প্রদান করিতে পারে এমন একখানি বাংলা কাব্যচয়নিকার একান্ত অভাব ছিল। 'কাব্যদীপালি'তে সেই প্রয়োজন মিটাইবার প্রথম চেষ্টা হইয়াছে। সম্পূর্ণ নূতন পথের পথিক হইয়া প্রকাশকও আমাদের ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন। কাগজ, ছাপা ও বাঁধাইয়ের পারিপাট্যে পুস্তকখানি নয়নমনোহর হইয়া উঠিয়াছে। বহু প্রখ্যাতনামা চিত্রকরের অঙ্কিত ছবি বইখানিকে অলঙ্কৃত করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ হইতে আরম্ভ করিয়া আধুনিকতম লেখকের রচনা পর্য্যন্ত এ সংগ্রহে স্থান পাইয়াছে। এখানি 'কাব্যদীপালি'র দ্বিতীয় সংস্করণ। প্রথম সংস্করণ অপেক্ষা দ্বিতীয় সংস্করণে বইখানি পূর্ণতর হইয়াছে। অনেকগুলি সুপাঠ্য নূতন কবিতা সন্নিবিষ্ট হইয়াছে এবং পুরাতন কবিদের কাব্যনির্ব্বাচনে সতর্ক দৃষ্টির প্রয়োগ করা হইয়াছে। দেখিতেছি সম্পাদকদ্বয় গীতিকবিতা বলিতে বিশেষভাবে প্রীতিকবিতাই বুঝিয়াছেন। একই প্রধান অংশ হইলেও প্রেমের কবিতাতেই গীতিকাব্য সম্পূর্ণ নয়। এরূপ হইলে কোন সংগ্রহে ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের কবিতাগুলির স্থান পাওয়া ভার হইত। সঙ্গীতময় ছন্দে ব্যক্তিগত অনুভূতির প্রকাশই গীতিকাব্যের বিশেষত্ব। প্রেম জীবনের তীক্ষ্ণতম অনুভূতি হইলেও, মাত্র একতম অনুভূতি নয়। কাব্যসংগ্রহকারদের মধ্যে প্যালগ্রেভের নাম অমর হইয়া থাকিবে। তাঁহার রসানুভূতি 'গোল্ডেন ট্রেজারি'কে গীতিকাব্য সংগ্রহের আদর্শ করিয়া রাখিয়াছে। তাঁহার নির্ব্বাচনে রসবৈচিত্র্যে অতুলনীয়। এই বৈচিত্র্যের অভাব কাব্যদীপালিতে লক্ষিত হইল। দু'একজন ভাল কবির লেখাও এবার বাদ পড়িয়াছে। এমন মুদ্রণপারিপাট্যের মধ্যে বর্ণাশুদ্ধি সত্যই বিসদৃশ লাগে। পরবর্ত্তী সংস্করণে আশা করি এ সকল ত্রুটি থাকিবে না। বঙ্গসাহিত্যে এরূপ উদ্যম নূতন বলিয়া কিছু কিছু অসম্পূর্ণতা থাকিয়া গেলেও এ সংস্করণের 'কাব্যদীপালি' সত্যই উপভোগ্য হইয়াছে।

বুকের বীণা—শ্রীমতী অপরাজিতা দেবী প্রণীত এবং গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

বইখানি সুদৃশ্য। চমৎকার কাগজে পরিষ্কার ছাপা, মার্জ্জিনে ছবি। বাঁধাই ভাল। বহিরবয়বের মত ভিতরের কবিতাগুলিও সুন্দর। বইখানি বড় ভাল লাগিল। কবিতাগুলি সরস এবং মোটেই গতানুগতিক নয়। কবির সাহস এবং কাব্যনৈপুণ্য দুই-ই আছে। কয়েকটি কবিতার মধ্যে দু-একটি চরিত্রচিত্র চমৎকার

ফুটিয়াছে। উদাহরণস্বরূপ 'কলেজ বোর্ডিং' নামক কবিতাটির উল্লেখ করা যাইতে পারে। মীরা প্রেমে পড়িয়াছে। সে বোর্ডিঙে থাকে। বাড়ি হইতে হঠাৎ খবর আসিল তাহার বিয়ে। সখী বুঝাইতেছে, 'কলেজ রোমান্স শুধু কাব্যেই চলে, বাস্তব জগতে নয়'—

"কবি মুকুলের কোন কথা আর থাক্‌বে না মনে তোর
ফুলশয়নেই নয়নে মিলাবে কুমারী স্বপন ঘোর।'
প্রেমে পাগলিনী হয় কি সবাই! মীরা নয় মীরাবাঈ।'

পদ্মরাগ—শ্রীশৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য প্রণীত, এবং কাশিম-বাজার হইতে গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য এক টাকা।

এই পুস্তকের অনেকগুলি কবিতা বিবিধ মাসিকপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। 'পদ্মরাগ' পাঠকের উপভোগ্য হইবে বলিয়া মনে করি। ছন্দের উপর লেখকের আধিপত্য আছে। ভাবগৌরবে গুরু—'জন্মাষ্টমী,' 'কৈশোর স্বপ্নরাজ্য,' 'রথযাত্রা' প্রভৃতি কবিতাগুলি মনকে আন্দোলিত করে। 'নিখিল-ঝুলন' কবিতাটি মিষ্ট লাগিল।

'খুলি পদ্মের অবগুণ্ঠন ফিরে ভৃঙ্গের মধুর মধুচুম্বন,
নব যৌবন-রস- সঙ্গীত-সুরে উদ্বেল কলকূজন।'

'মৃত্যু-দেবতা' কবিতাটি গম্ভীর।

'তোমার বিজয়বাদ্যে দুটি রন্ধ্রে বাজে দুটি সুর
একদিকে রুদ্রভেরী অন্য দিকে বাঁশরী মধুর।'
'খুলে দাও আজি প্রেমালিঙ্গন ভুজবল্লীর ডোর,
আর্ত্ত আজিকে মাগিছে শরণ ঝরে কোটি আঁখিলোর।'

প্রভৃতি পংক্তিগুলি সকলেরই ভাল লাগিবে।

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

অপরাজিত

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

৩২

আরও মাস কয়েক পরে ভাদ্রমাসের শেষের দিকে। দাদামশায়ের বৈকালিক মিছরীর পানা খাওয়ার শ্বেত পাথরের গেলাশটা তাহার বড় মামী-মা মাজিয়া ধুইয়া উপরের ঘরের বাসনের জলচৌকীতে রাখিতে তাহার হাতে দিল। সিঁড়িতে উঠিবার সময় কেমন করিয়া গেলাসটা হাত হইতে পড়িয়া চুরমার হইয়া গেল ভাঙিয়া! কাজলের মুখ ভয়ে বিবর্ণ হইয়া গেল, তাহার ক্ষুদ্র হৃদ্‌পিণ্ডের গতি যেন মিনিট খানেকের জন্য বন্ধ হইয়া গেল, যাঃ সর্ব্বনাশ! দাদামশায়ের মিছরীপানার গেলাশটা যে! সে দিশেহারা অবস্থায় টুক্‌রাগুলো তাড়াতাড়ি খুঁটিয়া খুঁটিয়া তুলিল; পরে, অন্য জায়গায় ফেলিলে পাছে কেহ টের পায়, তাই তাড়াতাড়ি আরব্য উপন্যাস যাহার মধ্যে আছে সেই বড় কাঠের সিন্দুকটার পিছনে গোপনে রাখিয়া দিল। এখন সে কি করে! কাল যখন গেলাশের খোঁজ পড়িবে বিকালবেলা তখন সে কি জবাব দিবে?

কাহারও কাছে কোনো কথা বলিল না, বাকী দিনটুকু ভাবিয়া ভাবিয়া কিছু ঠিক করিতে পারিল না, এক জায়-গায় বসিতে পারে না, উদ্বিগ্ন মুখে ছটফট করিয়া বেড়ায়—ওই রকম একটা গেলাশ আর কোথাও পাওয়া যায় না? একবার সে এক খেলুড়ে বন্ধুকে চুপিচুপি বলিল,—ভাই তো—তোদের বাড়ী একটা পাথরের গেলাশ আছে?

কোথায় সে এখন পায় একটা শ্বেতপাথরের গেলাশ? রাত্রে একবার তাহার মনে হইল সে বাড়ী ছাড়িয়া পলাইয়া যাইবে। কলিকাতা কোন্ দিকে? সে বাবার কাছে চলিয়া যাইবে কলিকাতায়—কাল বৈকালের পূর্ব্বেই।

কিন্তু রাত্রে পালানো হইল না। নানা দুঃস্বপ্ন দেখিয়া সে সকালে ঘুম ভাঙিয়া উঠিল, দুই তিন বার কাঠের সিন্দুকটার পিছনে সন্তর্পণে উঁকি মারিয়া দেখিল গেলাশের টুকরাগুলো সেখান হইতে কেহ বাহির করিয়াছে কি-না। বড়মামীমার সামনে আর যায় না, পাছে গেলাশটা কোথায় জিজ্ঞাসা করিয়া বসে। দুপুরের কিছু পরে বাড়ীর পাশের রাস্তা দিয়া কে এক জন সাইকেল চড়িয়া যাইতেছে দেখিয়া সে নাটমন্দিরের বেড়ার কাছে ছুটিয়া দেখিতে গেল—কিন্তু সাইকেল দেখা তার হইল না, নদীর বাঁধাঘাটে একখানা কাদের ডিঙি-নৌকা লাগিয়াছে, একজন ফর্সা চেহারার লোক একটা ছড়ি ও ব্যাগ হাতে ডিঙি হইতে নামিয়া ঘাটের সিঁড়িতে পা দিয়া মাঝির সঙ্গে কথা কহিতেছে—কাজল অবাক্ হইয়া ভাবিতেছে লোকটা কে, এমন সময় লোকটা মাঝির সঙ্গে কথা শেষ করিয়া এদিকে মুখ ফিরাইল। সঙ্গে সঙ্গে কাজল অল্পক্ষণের জন্য চোখে যেন ধোঁয়া দেখিল, পর-ক্ষণেই সে নাট-মন্দিরের বেড়া গলাইয়া বাহিরের নদীর ধারের রাস্তাটা বাহিয়া বাঁধাঘাটের দিকে ছুটিল। যদিও অনেক বছর পরে দেখা, তবুও কাজল চিনিয়াছে লোকটি কে—তাহার বাবা!

অপু খুলনার ষ্টীমার ফেল করিয়াছিল। নতুবা সে কাল রাত্রেই এখানে পৌছিত। সে মাঝিদের জিজ্ঞাসা করিতেছিল পরশু ভোরে তাহারা নৌকা এখানে আনিয়া তাহাকে বরিশালের ষ্টীমার ধরাইয়া দিতে পারিবে কি না। কথা শেষ করিয়াই ফিরিয়া চাহিয়া সে দেখিল একটি ছোট সুশ্রী বালক ঘাটের দিকে দৌড়িয়া আসিতেছে। পরক্ষণেই সে চিনিল! আজ সারাপথ নৌকায় সে ছেলের কথা ভাবিয়াছে, না জানি সে কত বড় হইয়াছে। কেমন দেখিতে হইয়াছে, তাহাকে ভুলিয়া গিয়াছে, না মনে রাখিয়াছে। ছেলের আগেকার চেহারা তাহার মনে ছিল না। এই সুন্দর বালকটিকে দেখিয়া সে যুগপৎ প্রীত ও বিস্মিত হইল—তাহার সেই আড়াই বছরের ছোট্ট খোকা এমন সুদর্শন, লাবণ্যভরা বালকে পরিণত হইল কবে?

সে হাসিমুখে বলিল—কি রে খোকা, চিন্‌তে পারিস্?

কাজল ততক্ষণে আসিয়া অসীম নির্ভরতার সহিত তাহার কোমর জড়াইয়া ধরিয়াছে—ফুলের মত মুখটি উঁচু করিয়া হাসি-ভরা চোখে বাবার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—না বৈর্ণক? আমি বেড়ার ধার থেকে দেখেই ছুট দিইচি—এতদিন আসনি কে—কেন বাবা?

একটা অদ্ভুত ব্যাপার ঘটিল। এতদিন ভুলিয়া ত ছিল, কিন্তু আজ এইমাত্র—হঠাৎ দেখিবামাত্রই—অপুর বুকের মধ্যে একটা গভীর স্নেহসমুদ্র উদ্বেল হইয়া উঠিল। কি আশ্চর্য্য, এই ক্ষুদ্র বালকটি তাহারই ছেলে, জগতে নিতান্ত অসহায়, হাত-পা-হারা, অবোধ—জগতে সে ছাড়া ওর আর কেহই ত নাই! কি করিয়া এতদিন সে ভুলিয়া ছিল!

কাজল বলিল—ব্যাগে কি বাবা?

—দেখবি? চল দেখাব এখন। তোর জন্যে কেমন পিস্তল আছে, এক সঙ্গে দুম্ দুম্ আওয়াজ হয়, ছবির বই আছে দুখানা। কেমন একটা রবারের বেলুন—

—তো—তো—তোমাকে একটা কথা বল্‌ব বাবা? তো-তোমার কাছে একটা পাথরের গে-গেলাশ আছে?

পাথরের গ্লাশ? কেন রে, পাথরের গ্লাশ কি হবে?

কাজল চুপি চুপি বাবাকে গ্লাশ ভাঙার কথা সব বলিল। বাবার কাছে কোনো ভয় হয় না। অপু হাসিয়া ছেলের গায়ে হাত বুলাইয়া বলিল—আচ্ছা চল্, কোনো ভয় নেই। সঙ্গে সঙ্গে কাজলের সব ভয়টা কাটিয়া গেল, একজন অসীম শক্তিধর বজ্রপাণি দেবতা যেন হঠাৎ বাহুদ্বয় মেলিয়া তাহাকে আশ্রয় ও অভয় দান করিয়াছে—মাভৈঃ।

রাত্রে কাজল বলিল—আমি তোমার সঙ্গে যাব বাবা।

অপুর অনিচ্ছা ছিল না, কিন্তু কলিকাতায় এখন নিজেরই অচল। সে ভুলাইবার জন্য বলিল—আচ্ছা হবে, হবে। শোন্ একটা গল্প বলি খোকা। কাজল চুপ করিয়া বসিয়া গল্প শুনিল। বলিল—নিয়ে যাবে ত বাবা? এখানে সবাই বকে, মারে বাবা! তুমি নিয়ে চল, আমি তোমার কত কাজ করে দেব।

অপু হাসিয়া বলে, কাজ করে দিবি? কি কাজ করে দিবি রে খোকা?

তারপর সে ছেলেকে গল্প শোনায়, একবার চাহিয়া দেখে কখন সে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। খানিক রাত্রি পর্য্যন্ত সে একখানা বই পড়িল, পরে আলো নিভাইবার পূর্ব্বে ছেলেকে ভাল করিয়া শোয়াইতে গেল। ঘুমন্ত অবস্থায় বালককে কি অদ্ভুত ধরণের অবোধ, অসহায়, দুর্ব্বল ও পরাধীন মনে হইল অপুর! কি অদ্ভুত ধরণের অসহায় ও পরাধীন! সে ভাবে, এই যে ছেলে, পৃথিবীতে এ ত কোথাও ছিল না, যাচিয়াও ত আসে নাই—অপর্ণা ও সে, দুজনে যে উহাকে কোন্ অনন্ত হইতে সৃষ্টি করিয়াছে—তাহার পর সংসারে আনিয়া অবোধ নিষ্পাপ বালককে একা এভাবে সংসারে ছাড়িয়া দিয়া পালানো কি অপর্ণাই সহ্য করিবে? কিন্তু এখন বা কোথায় লইয়াই যায়?

প্রাচীন গ্রীসের এক সমাধির উপরে সেই যে স্মৃতি-ফলকটির কথা সে পড়িয়াছিল ফ্রেডরিক হ্যারিসনের বই-এ?

> This child of ten years,
> Philip, his father laid here,
> His great hope, Nikoteles.

সে দূর কালের ছোট্ট বালকটির কথা তাকে ব্যথিত করিয়া তোলে। সুন্দর মুখ, সুন্দর রং, দেব-শিশুর মত সুন্দর দশ বৎসরের বালক নিকোটিলিস্‌কে আজ রাত্রে সে যেন নির্জ্জন প্রান্তরে খেলা করিতে দেখিতে পাইতেছে—সোনালী চুল, ডাগর ডাগর চোখ। তার স্নেহস্মৃতি গ্রীসের সে নির্জ্জন প্রান্তরের সমাধিক্ষেত্রের বুকে অমর হইয়া আছে। শতাব্দী পূর্ব্বের সেই বিরহী পিতৃ-হৃদয়ের সঙ্গে সে যেন আজ নিজের নাড়ীর যোগ অনুভব করিল। মনে হইল, মানুষ সব কালে, সব অবস্থায় এক, এক। বাৎসল্যরসের এমন গভীর অনুভূতি জীবনে তাহার এই প্রথম।

স্ত্রীর গহনা বেচিয়া বই ছাপাইয়া ফেলিল পূজার পরেই।

ছাপানো বইএর প্রথম কপিখানা দপ্তরীর বাড়ী হইতে আনাইয়া দেখিয়া সে দুঃখ ভুলিয়া গেল। কিছু না, সব দুঃখ দূর হইবে। এই বই-এ সে নাম করিবে।

আজ বিশ বৎসরের দূর জীবনের পার হইতে সে নিশ্চিন্দিপুরের পোড়োভিটাকে অভিনন্দন পাঠাইল মনে মনে। যেখানেই থাকি, ভুলিনি। যাদের বেদনার রঙে তার বইখানা রঙীন, কত স্থানে, কত অবস্থায় তাদের সঙ্গে পরিচয়, হয় ত কেউ বাঁচিয়া আছে, কেউ বা নাই। তারা আজ কোথায় সে জানে না, এই নিস্তব্ধ রাত্রির অন্ধকারভরা শান্তির মধ্য দিয়া সে মনে মনে সকলকেই আজ তার অভিনন্দন জানাইতেছে।

মাসকয়েকের জন্য একটা ছোট আপিসে একটা চাকরী জুটিয়া গেল তাই রক্ষা। এক জায়গায় আবার ছেলেও পড়ায়। এসব না করিলে খরচ চলে বা কিসে, বই-এর বিজ্ঞাপনের টাকাই বা আসে কোথা হইতে। আবার সেই সাড়ে নয়টার সময় আপিসে দৌড়ে, সেখান হইতে বাহির হইয়া একটা গলির মধ্যে একতালা বাসার ছোট্ট ঘরে দুটি ছেলে পড়ানো। বাড়ীর কর্ত্তার কিসের ব্যবসা আছে, এই ঘরে তাঁদের বড় বড় প্যাক্‌বাক্স ছাদের কড়ি পর্য্যন্ত সাজানো। তারই মাঝখানে ছোট তক্তপোষে মাদুর পাতিয়া ছেলে দুটি পড়ে—সন্ধ্যার পরে অপু পড়াইতে যখনই গিয়াছে, তখনই দেখিয়াছে কয়লার ধোঁয়ায় ঘরটা ভরা।

শীতকাল কাটিয়া পুনরায় গ্রীষ্ম পড়িল। বই-এর অবস্থা খুব সুবিধা নয়, নিজে না খাইয়া বিজ্ঞাপনের খরচ যোগায়, তবু বই-এর কাটতি নাই। বইওয়ালারা উপদেশ দিল, এডিটারদের কাছে কি বড় বড় সাহিত্যিকদের কাছে যান, একটু যোগাড়যন্ত্র করে ভাল সমালোচনা বার করুন, বই কি হাওয়ায় কাট্‌বে মশাই? অপু সে সব পারিবে না, নিজের লেখা বই বগলে করিয়া দোরে দোরে ঘুরিয়া বেড়ানো তাহার কর্ম্ম নয়। এতে বই কাটে ভাল, না কাটে সে কি করিবে?

অতএব জীবন পুরাতন পরিচিত পথ ধরিয়াই বাহিয়া চলিল—আপিস আর ছেলে-পড়ানো, রাত্রে আর একটা নতুন বই লেখে। ও যেন একটা নেশা, বই বিক্রী হয়-না-হয়, কেউ পড়ে-না-পড়ে, তাহাকে যেন লিখিয়া যাইতেই হইবে।

মেসে লেখার অত্যন্ত অসুবিধা হইতেছে দেখিয়া সে একটা ছোট একতলা বাড়ীর নীচেকার একটা ঘর আট টাকায় ভাড়া লইয়া সেখানে উঠিয়া গেল। নিজে ষ্টোভে রাঁধিয়া খাইবে, তাহাতে খরচ কিছু কম পড়ে। তবে ঘরটাতে দরজা জানালা কম, দক্ষিণ দিকের ছোট জানালাটা খুলিলে পাশের বাড়ীর ইট্‌-বার করা দেওয়ালটা দেখা যায় মাত্র। চারিধারেই উঁচু উঁচু বাড়ী, আলো-বাতাস দুই-ই সমান। ভাবিল—তবুও তো একা থাকতে পারব—লেখাটা হবে।

অনেকদিন গোলদীঘিতে যায় নাই, সেদিন একটু সময় লইয়া বাহির হইয়া পড়িব। রাস্তার পাশেই সেই শ্রীগোপাল মল্লিকের লেনটা···অনেকদিন এদিকে আসে নাই, সেই যে বাহির হইয়াছিল, আর কোনোদিন গলিটার মধ্যে ঢোকেও নাই। অনেকদিন পরে দেখিয়া মনে হইল সেই বাসাটায় তাহার সেই ফুলের টবগুলা কি এখনও আছে···সে ও অপর্ণা কত যত্নে জল দিত—বাসা বদ্‌লাইবার সময় সঙ্গে লইতেও ভুলিয়া গিয়াছিল।

সন্ধ্যার দেরী নাই। স্কোয়ারে ঢুকিয়া একখানা বেঞ্চির উপর বসিল। আজ রবিবার ছেলে-পড়ানো নাই। বাপ্‌! নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল। সেই অতটুকু ঘর, কয়লার ধোঁয়া আর রাজ্যের প্যাক্‌ বাক্সের টার্পিন তেলের মত গন্ধ। আজ কয়েক দিন হইল কাজলের একখানা চিঠি পাইয়াছে, এই প্রথম চিঠি, কাটাকুটি বানানভুলে ভর্ত্তি। আর একবার পত্রখানা বাহির করিয়া পড়িল—বার পনেরো হইল এইবার লইয়া। বাবার জন্য তাহার মন কেমন করে, একবার যাইতে লিখিয়াছে, একখানা আরব্যউপন্যাস ও একটা লণ্ঠন লইয়া যাইতে লিখিয়াছে, যেন বেশী দেরী না হয়। অপু ভাবে, ছেলেটা পাগল, লণ্ঠন কি হবে? লণ্ঠন?··· দ্যাখো তো কাণ্ড।

জ্যৈষ্ঠ মাসের কি একটা ছুটিতে ছেলেকে দেখিতে গেল। আগে চিঠি দিয়াছিল, নৌকা হইতেই দেখে কাজল ঘাটে তাহার অপেক্ষায় হাসিমুখে দাঁড়াইয়া—নৌকা থামিতে-না-থামিতে সে ছুটিয়া আসিয়া তাহাকে জড়াইয়া ধরিল। মুখ উঁচু করিয়া বলিল—বাবা, আমার আরব্যউপন্যাস?···অপু সে-কথা একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছিল। কাজল কাঁদ কাঁদ স্বরে বলিল—হুঁ-উঁ বাবা, এত ক'রে লিখলাম, তুমি ভুলে গেলে—লণ্ঠন?···অপু বলিল, আচ্ছা তুই পাগল না কি—লণ্ঠন কি করবি? কাজল বলিল, সে লণ্ঠন নয় বাবা। হাতে ঝুলোনো যায়, রাঙা কাচ, সবুজ কাচ বের্‌ করা যায় এমনি ধারা। হুঁ-উ, তুমি আমার কোনো কথা শোনো না। একটা আর্শি আন্‌বে বাবা?···আমি আসিতে ছিঁয়া দেখব।

অপর্ণার দিদি মনোরমা অনেকদিন পরে বাপের বাড়ী আসিয়াছেন। বেশ সুন্দরী, অনেকটা অপর্ণার মত মুখ। ছোট ভগ্নিপতিকে পাইয়া খুব আহ্লাদিত হইলেন, স্বর্গগত মা ও বোনের নাম করিয়া চোখের জল ফেলিলেন। অপু তাঁহার কাছে একটা সত্যকার স্নেহ-ভালবাসা পাইল। সন্ধ্যাবেলা অপু বলিল—আসুন দিদি, ছাদের ওপর বসে আপনার সঙ্গে একটু গল্প করি।

ছাদ নির্জ্জন, নদীর ধারেই, অনেকদূর পর্য্যন্ত দেখা যায়।

অপু বলিল—আমার বিয়ের রাতের কথা মনে হয় মনোরমাদি' ?

মনোরমা মৃদু হাসিয়া বলিলেন—সেও যেন এক স্বপ্ন। কোথা থেকে কি যেন সব হয়ে গেল ভাই—এখন ভেবে দেখ্‌লে—সেদিন তাই এই ছাদের ওপর বসে অনেকক্ষণ ধরে ভাবছিলুম—তোমাকেও ত আমি সেই বিয়ের পরে আর কখনও দেখিনি। এবার এসেছিলুম ভাগ্যিস, তাই দেখাটা হ'ল।

হাসির ভঙ্গি ঠিক অপর্ণার মত, মুখের কত কি ভাব, ঠিক তারই মত—বিস্মৃতির জগৎ হইতে সে-ই যেন আবার ফিরিয়া আসিয়াছে।

মনোরমা অনুযোগ করিয়া বলিলেন—তুমি তো দিদি বলে খোঁজও কর না ভাই। এবার পূজোর সময় বরিশালে যেও—বলা রইল, মাথার দিব্যি। আর তোমার ঠিকানাটা আমায় লিখে দিও ত ?

কোথা হইতে কাজল আসিয়া বলিল—বাবা একটা অর্থ জান ?···

— অর্থ ? কি অর্থ ?

কাজলের মুখ তাহার অপূর্ব্ব সুন্দর মনে হয়—কেমন এক ধরণের ঘাড় একধারে বাঁকাইয়া চোখে খুশীর হাসি হাসিয়া কথাটা শেষ করে, আবার তখন বোকার মতই হাসে—হঠাৎ যেন মুখখানা করুন ও অপ্রতিভ দেখায়। ঠিক এই সময়েই অপুর মনে ওই স্নেহের বেদনাটা দেখা দেয়—কাজলের ওই ধরণের মুখভঙ্গিতে।

কাজল বলে, বল দেখি, বাবা, 'এখানে থেকে দিলাম সাড়া, সাড়া গেল সেই বামুনপাড়া', কি অর্থ ?

অপু ভাবিয়া ভাবিয়া বলিল—পাখী।

কাজল ছেলেমানুষি হাসির খই ফুটাইয়া বলিল ইল্লি।··পাখী বুঝি ? শাঁক তো—শাঁকের ডাক। তুমি কিচ্ছু জানো না বাবা।

অপু বলিল - ছিঃ বাবা, ওরকম ইল্লিটিল্লি বলো না, বল্‌তে নেই ও-কথা, ছিঃ।

—কেন বল্‌তে নেই বাবা ?···

—ও ভাল কথা নয়।

আসিবার আগের দিন রাত্রে কাজল চুপি চুপি বলিল—এবার আমায় নিয়ে যাও বাবা, আমার এখানে থাকতে একটুও ভাল লাগে না। অপু ভাবিল নিয়েই যাই এবার, এখানে ওকে কেউ দেখে না, তাছাড়া লেখাপড়াও এখানে থাকলে যা হবে ?

পরদিন সকালে ছেলেকে লইয়া সে নৌকায় উঠিল। অপর্ণার তোরঙ্গ ও হাতবাক্সটা এখানে আট নয় বৎসর পড়িয়া আছে, তাহার বড় শালী সঙ্গে দিয়া দিলেন। ইহাদের তুলিয়া দিতে আসিয়া ঘাটে দাঁড়াইয়া চোখ মুছিতে লাগিলেন, অপুকে বারবার বরিশালে যাইতে অনুরোধ করিলেন। সকালের নবীন রোদ ভাঙা নাট-মন্দিরের গায়ে পড়িয়াছে। নদীজল হইতে একটা আমিষ গন্ধ আসিতেছে। শ্বশুরমহাশয়ের তামাক খাওয়ার কয়লা পোড়ানোর জন্য শুকনা ডালপালায় আগুন দেওয়া হইয়াছে নদীর ধারটাতেই। কুণ্ডলী পাকাইয়া পাকাইয়া ধোঁয়ার রাশ উপরে উঠিতেছে। সকালের বাতাসটা বেশ ঠাণ্ডা। আজ বহু বৎসর আগে যেদিন বন্ধু প্রণবের সঙ্গে বিবাহের নিমন্ত্রণে এ বাটি আসিয়াছিল তখন সে কি ভাবিয়াছিল এই বাড়ীটার সহিত তাহার জীবনের এমন একটি অদ্ভুত যোগ সাধিত হইবে ? আজও সেদিনটার কথা বেশ স্পষ্ট মনে হয়। মনে আছে, আগের দিন একটা গ্রামোফোনের দোকানে গান শুনিয়াছিল—'বরিষ ধরার মাঝে শান্তির বারি।' শুনিয়া গানটা মুখস্থ করিয়াছিল ও সারা পথে ও ষ্টীমারে আপন মনে গাহিয়াছিল। এখনও গুন্ গুন্ করিয়া গানটা গাহিলে সেই দিনটা আবার ফিরিয়া আসে।

কাজল এই প্রথম রেলগাড়ী দেখিল তাহার উৎসাহ দেখে কে ? ছেলেকে সঙ্গে লইয়া অপু প্রথমে মনসাপোতা আসিল। বছর ছয়সাত এখানে আসা ঘটে নাই। এই সময়ে দিনকয়েকের ছুটি আছে, এইবার একবার না দেখিয়া গেলে আর আসা ঘটিবে না অনেকদিন।

ঘরদোরের অবস্থা খুব খারাপ। অপুর মনে পড়িল, ঠিক এই রকম অপরিষ্কার ভাঙা ঘরে এই বালকের মাকে সে একদিন আনিয়া তুলিয়াছিল। তেলিদের বাড়ী হইতে চাবী আনিয়া ঘরের তালা খুলিয়া ফেলিল। খড় নানাস্থানে উড়িয়া পড়িয়াছে, ইঁদুরের গর্ত্ত, পাড়ার গরু বাছুর উঠিয়া দাওয়া ভাঙিয়া নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে, উঠানে বন জঙ্গল।

কাজল চারিদিকে চাহিয়া চাহিয়া অবাক্ হইয়া বলিল—বাবা, এইটে তোমাদের বাড়ী !

অপু হাসিয়া বলিল—তোমারও বাড়ী বাবা। মামার বাড়ীর কোটা দেখেচ জন্মে অবধি, তাতে তো চল্‌বে না, পৈতৃক সম্পত্তি তোমার এই।

সকালে উঠিতে একটু বেলা হইল। কাজল কখন তাহার আগেই ঘুম ভাঙিয়া উঠিয়াছে, এবং তেলি-বাড়ী হইতে আঁকুসি যোগাড় করিয়া আনিয়া উঠানের চাঁপা ফুল পাড়িবার জন্য নীচের একটা ডালে আঁকুসি বাধাইয়া টানাটানি করিতেছে।

দৃশ্যটা তাহার কাছে অদ্ভুত মনে হইল। অপর্ণার

পোঁতা সেই চাঁপা ফুল গাছটা! কবে তাহার ফুল ধরিয়াছে, কবে গাছটা মানুষ হইয়াছে, গত সাত বৎসরের মধ্যে অপুর সে খোঁজ লওয়ার অবকাশ ছিল না—কিন্তু খোকা কেমন করিয়া—

সে বলিল—খোকা ফুল পাড়চিস্ ত, গাছটা কে পুঁতেছিল জানিস্?

কাজল বাবার দিকে চাহিয়া হাসিয়া বলিল—তুমি এস না বাবা, ঐ ডালটা চেপে ধর না! মোটে দুটো পড়েচে।

অপু বলিল—কে পুঁতেছিল জানিস্ গাছটা? তোর মা।

কিন্তু মা বলিলে কাজল কিছুই বোঝে না। জ্ঞান হইয়া অবধি সে দিদিমা ছাড়া আর কাহাকেও চিনিত না, দিদিমাই তাহার সব। মা একটা অবাস্তব কাল্পনিক ব্যাপার মাত্র। মায়ের কথায় তার মনে কোনো বিশেষ সুখ বা দুঃখ জাগায় না।

কাজলকে সে কলিকাতায় লইয়া আসিল পরদিন বৈকালের ট্রেনে। সন্ধ্যার পর গাড়ীখানা শিয়ালদহ ষ্টেশনে ঢুকিল। এত আলো, এত বাড়ীঘর, এত গাড়ীঘোড়া—কি কাণ্ড এ সব! কাজল বিস্ময়ে একেবারে নির্ব্বাক হইয়া গেল। সে শুধু বাবার হাত ধরিয়া চারিদিকে ডাগর চোখে চাহিতে চাহিতে চলিল।

হ্যারিসন রোডের বড় বড় বাড়ীগুলা দেখাইয়া একবার সে বলিল—ও-গুলো কাদের বাড়ী, বাবা? অত বাড়ো?

বাবার বাসাটায় ঢুকিয়া কাপড়-চোপড় ছাড়িয়া সে গলির মোড়ে দাঁড়াইয়া বড় রাস্তার গাড়ীঘোড়া দেখিতে লাগিল। অবাক্ জলপান জিনিষটা কি? বাবার দেওয়া দুটো পয়সা কাছে ছিল, এক পয়সার অবাক্ জলপান কিনিয়া খাইয়া সে সত্যই অবাক্ হইয়া গেল। মনে হইল এমন অপূর্ব্ব জিনিব সে জীবনে আর কখনও খায় নাই। চাল ছোলা ভাজা সে অনেক খাইয়াছে। কিন্তু কি মশলা দিয়া ইহারা তৈরী করে এই অবাক্ জলপান?

অপু তাহাকে ডাকিয়া বাসার মধ্যে লইয়া গেল। বলিল—ও-রকম একলা কোথাও যাস্‌নে এখানে খোকা। হারিয়ে যাবি কি, কি হবে। যাওয়ার দরকার নেই।

কাজলের একটা দুঃস্বপ্ন কাটিয়া গিয়াছে। আর দাদামশায়ের বকুনি খাইতে হইবে না. একা গিয়া দোতালার ঘরে রাত্রিতে শুইতে হইবে না, মামীমাদের ভয়ে পাতের প্রত্যেক ভাতটি খুঁটিয়া গুছাইয়া খাইতে হইবে না। একটি ভাত পাতের নীচে পড়িয়া গেলে বড় মামীমা বলিত—পেয়েচ পরের, দেদার ফেল আর ছড়াও—বাবার অন্ন ত খেতে হল না কোনোদিন।

ছেলেমানুষ হইলেও সব সময়ে এই বাবার খোঁটা কাজলের মনে বড় বাজিত।

অপু বাসায় আসিয়া দেখিল কে একখানা চিঠি দিয়াছে তাহার নামে—অপরিচিত হস্তাক্ষর। আজ পাঁচ ছয় দিন পত্রখানা আসিয়া চিঠির বাক্সে পড়িয়া আছে। খুলিয়া পড়িয়া দেখিল একজন অপরিচিত ভদ্রলোক তাহাকে লিখিতেছেন, তাহার বই পড়িয়া তিনি মুগ্ধ হইয়াছেন, শুধু তিনি নহেন, তাঁহার বাড়ীশুদ্ধ সবাই—প্রকাশকের নিকট হইতে ঠিকানা জানিয়া এই পত্র লিখিতেছেন, তিনি তাহার সহিত দেখা করিতে চাহেন।

৩৩

শীতকালের মাঝামাঝি অপুর চাকুরিটি গেল। অর্থের এমন কষ্ট সে অনেকদিন ভোগ করে নাই। ভাল স্কুলে দিতে না পারিয়া সে ছেলেকে কর্পোরেশনের ফি স্কুলে ভর্ত্তি করাইয়া দিল। ছেলেকে দুধ পর্য্যন্ত দিতে পারে না, ভাল কিছু খাওয়াইতে পারে না। বই-এর বিশেষ কিছু আয় নাই। হাত এদিকে কপর্দ্দকশূন্য।

এই অবস্থায় একদিন সে বিমলেন্দুর পত্র পাইল একবার আলিপুরে লীলার ওখানে পত্রপাঠ আসিতে। লীলার ব্যাপার সুবিধা নয়। তাহারও আর্থিক অবস্থা বড় শোচনীয়। নিজের যাহা কিছু ছিল গিয়াছে, আর কেহ দেয়ও না, বাপের বাড়ীতে তাহার নাম করিবার পর্য্যন্ত উপায় নাই। ইদানীং তাহার মা কাশী হইতে তাহাকে টাকা পাঠাইতেন। বিমলেন্দু নিজের খরচ হইতে বাঁচাইয়া কিছু টাকা দিদির হাতে দিয়া যাইত। তাহার উপর মুস্কিল এই যে, লীলা বড়মানুষের মেয়ে, কষ্ট করা অভ্যাস নাই, হাত ছোট করিতেও জানে না।

এই রকম কিছুদিন গেল। লীলা যেন দিন দিন কেমন হইয়া যাইতেছিল। অমন হাস্যমুখী লীলা তার মুখে হাসি নাই, মনমরা, বিষণ্ণ ভাব। শরীরও যেন দিন দিন শুকাইয়া যাইতে থাকে। গত বর্ষাকাল এই ভাবেই কাটে, বিমলেন্দু পূজার সময় পীড়াপীড়ি করিয়া ডাক্তার দেখায়। ডাক্তারে বলেন, থাইসিসের সূত্রপাত হইয়াছে, সতর্ক হওয়া দরকার।

বিমলেন্দু লিখিয়াছে—লীলার খুব জ্বর। ভুল বকিতেছে, কেহই নাই, সে একা ও একটি চাকর সারারাত জাগিয়াছে, আত্মীয়স্বজন কেহ ডাকিলে আসিবে না, কি করা যায় এ অবস্থায়। অপু গিয়া দেখিল, দোতলায় কোণের ঘরের খাটে লীলা শুইয়া আছে। বিমলেন্দু ও ঝি বসিয়া আছে। পরশু রাত্রে জ্বর হয়!

ঝি বাইরের বারান্দায় শুইয়া ছিল—চাকর নীচে ছিল। জল খাইতে উঠিয়া জরের ঘোরে কি একটা বাধিয়া গিয়া কনুই ও কপালের খানিকটা কাটিয়া গিয়াছে। অপু এখানে আজকাল তত আসিতে পারে না, অনেকদিন লীলাকে দেখে নাই। লীলার মুখ যেন রাঙা, অস্বাভাবিক ভাবে রাঙা ও উজ্জল দেখাইতেছে। কিন্তু গায়ের রং-এর আর সে জলুস নাই।

বিমলেন্দু শুষ্কমুখে বলিল—কাল রঘুয়ার মুখে খবর পেয়ে এসে দেখি এই অবস্থা। এখন কি করি বলুন ত? বাড়ীর কেউ আসবে না, আমি কাউকে বলতেও যাব না, মাকে একখানা টেলিগ্রাম করে দেব?

অপু বলিল—মা যদি না আসেন?

—কি বলেন? এক্ষুনি ছুটে আসবেন—দিদি-অন্ত প্রাণ তাঁর। তিনি যে আজ চার বছর কলকাতামুখো হন্ নি। সে এই দিদির কাণ্ডেই ত। মুস্কিল হয়েচে কি জানেন, কাল রাত্রেও ভুল বকেচে, শুধু খুকী, খুকী, অথচ তাকে আনানো অসম্ভব।

অপু বলিল—আর এক কাজ করতে হবে, একজন নার্স আমি নিয়ে আসি ঠিক করে। মেয়েমানুষের নার্সিং পুরুষের দ্বারা হয় না। ব'স তোমরা।

দুই তিন রাত্রে সবাই মিলিয়া লীলাকে সারাইয়া তুলিল। জ্ঞান হইলে সে একদিন কেবল অপুকে ঘরের মধ্যে দেখিতে পাইয়া কাছে ডাকিয়া ক্ষীণ স্বরে বলিল—কখন এলে অপূর্ব্ব?

রোগ হইতে উঠিয়াও লীলার স্বাস্থ্য ভাল হইল না। শুইয়া আছে ত শুইয়াই আছে, বসিয়া আছে ত বসিয়াই আছে। মাথার চুল উঠিয়া যাইতে লাগিল। আপন মনে গুম্ হইয়া বসিয়া থাকে, ভাল করিয়া কথাও বলে না, হাসেও না। কোথাও নড়িতে চড়িতে চায় না। ইতিমধ্যে কাশী হইতে লীলার মা আসিলেন। বাপের বাড়ী থাকেন, রোজ মোটরে আসিয়া দু'তিন ঘণ্টা থাকেন—আবার চলিয়া যান। ডাক্তারে বলিয়াছে, স্বাস্থ্যকর জায়গায় না লইয়া গেলে রোগ সারিবে না।

দুপুর বেলাটা কিন্তু একটু মেঘ করার দরুণ রৌদ্র নাই কোথাও। অপু লীলার বাসায় গিয়া দেখিল লীলা জানালার ধারে বসিয়া আছে। সে সব সময় আসিতে পারে না, কাজলকে একা বাসায় রাখিয়া আসা চলে না। ভারী চঞ্চল ও রীতিমত নির্ব্বোধ ছেলে। তাহা ছাড়া রান্নাবান্না ও সমুদয় কাজ করিতে হয় অপুর, কাজলকে দিয়া কুটাগাছটা ভাঙিবার সাহায্য নাই, সে খেলাধূলা লইয়া সারাদিন মহা ব্যস্ত—অপু তাহাকে কিছু করিতে বলেও না, ভাবে—আহা, খেলুক্ একটু। পুয়র মাদারলেস্ চাইল্ড!

লীলা ম্লান হাসিয়া বলিল—এস।

—এরা কোথায়? বিমলেন্দু কোথায়?…মা এখনও আসেন কি?

—ব'স। বিমলেন্দু এই কোথায় গেল। নার্স ত নীচে, বোধ হয় খেয়ে একটু ঘুমুচ্চে।

—তারপর কোথায় যাওয়ার ঠিক হ'ল—সেই ধরমপুরেই? সঙ্গে যাবেন কে?…

—মা আর বিমল।

খানিকক্ষণ দুজনেই চুপ করিয়া রহিল। পরে লীলা তাহার দিকে ফিরিয়া বলিল—আচ্ছা অপূর্ব্ব, বর্দ্ধমানের কথা মনে হয় তোমার?

অপু ভাবিল—আহা, কি হয়ে গিয়েচে লীলা!

মুখে বলিল—মনে থাক্‌বে না কেন? খুব মনে আছে।

লীলা অন্যমনস্কভাবে বলিল—তোমরা সেই ওদিকের একটা ঘরে থাক্‌তে—সেই আমি যেতুম—

—তুমি আমাকে একটা ফাউণ্টেন পেন দিয়েছিলে মনে আছে লীলা? তখন ফাউণ্টেন পেন নতুন উঠেচে। মনে নেই তোমার?

লীলা হাসিল।

অপু হিসাব করিয়া বলিল—তা ধর প্রায় আজ বিশ বাইশ বছর আগেকার কথা।

লীলা খানিকটা চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল—তুমি সেই সমুদ্রের মধ্যে কোন্ ডুবো জাহাজ উদ্ধার করে সোনা আন্‌বে বলেছিলে, মনে আছে তোমার? সেই যে মুকুলে পড়ে বলেছিলে?

কথাটা অপুর মনে পড়িল। হাসিয়া বলিল—হাঁ সেই—ঠিক। উঃ, সে কথা মনে আছে তোমার!

—আমি বলেছিলুম কেমন করে যাবে? তুমি বলেছিলে জাহাজ কিনে সমুদ্রে যাবে।

অপু হাসিল। শৈশবের সাধ-আশার নিষ্ফলতা সম্বন্ধে সে কি একটা বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু হঠাৎ তাহার মনে পড়িয়া গেল লীলাও এ ধরণের নানা আশা পোষণ করিত, বিদেশে যাইবে, বড় আর্টিষ্ট হইবে ইত্যাদি—ওর সাম্‌নে আর সে কথা বলার আবশ্যক নাই।

কিন্তু লীলাই আবার খানিকটা চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল—যাবে না? যাও যাও—পরে হাসিয়া বলিল—সমুদ্র থেকে সোনা আন্‌বে তো তোমরাই—পোর্ট্রো গ্রাডা থেকে, না?… দেখো, এখনও ঠিক মনে করে' রেখেচি—রাখি নি? একটু চা খাবে?

—দুপুর বেলা চা খাব কি?…সেজন্যে ব্যস্ত হয়ো না লীলা।

লীলা বলিল—তোমার মুখে সেই পুরোণো গানটা

শুনিনি অনেক দিন—সেই, 'আমি চঞ্চল হে'—গাও তো ?

মেঘলা দিনের দুপুর। বাহিরের দিকে একটা সাহেব বাড়ীর কম্পাউণ্ডে গাছের ডালে অনেকগুলি পাখী কলরব করিতেছে। অপু গান আরম্ভ করিল, লীলা জানালার ধারেই বসিয়া বাহিরের দিকে মুখ রাখিয়া গানটা শুনিতে লাগিল। লীলার মনে আনন্দ দিবার জন্য অপু গানটা দু' তিন বার ফিরাইয়া গাহিল।

গান শেষ হইয়া গেল, তবু লীলা জানালার বাহিরেই চাহিয়া আছে, অন্যমনস্কভাবে যেন কি জিনিষ লক্ষ্য করিতেছে। অপুর মনে হইল লীলা কাঁদিতেছে!

খানিকক্ষণ কাটিয়া গেল। দুজনেই চুপ করিয়া রহিল। পরে হঠাৎ লীলা বলিল—আচ্ছা, একটা কথার উত্তর দেবে ?

লীলার গলার স্বরে অপু বিস্মিত হইল। বলিল—কি কথা ?···

—আচ্ছা, বেঁচে লাভ কি ?

অপু এ প্রশ্নের জন্য প্রস্তুত ছিল না—বলিল—এ কথার কি—এ কথা কেন ?

—বল না ?···

—না, লীলা। এ ধরণের কথাবার্ত্তা কেন ? এর দরকার নেই।

—আচ্ছা, একটা সত্য কথা বল্‌বে ?···

—কি বল ?···

—আচ্ছা, আমাকে লোকে কি ভাবে ?

সেই লীলা! তার মুখে এ রকম দুর্ব্বল ধরণের কথাবার্ত্তা সে কি কখনও স্বপ্নেও ভাবিয়াছিল! অপু এক মুহূর্ত্তে সব বুঝিল—অভিমানিনী, তেজস্বিনী লীলা আর সব সহ্য করিতে পারে, লোকের ঘৃণা তাহার অসহ্য। গত কয়েক বৎসরে ঠিক তাহাই জুটিয়াছে তাহার কপালে। এতদিন সেটা বোঝে নাই—সম্প্রতি বুঝিয়াছে—বুঝিয়া জীবনের উপর টান্ হারাইতে বসিয়াছে।

অপুর গলায় যেন একটা ডেলা আটকাইয়া গেল। সে যতদূর সম্ভব সহজ সুরে বলিল।—এ ধরণের কথা সে এ পর্য্যন্ত কোনো দিন লীলার কাছে বলে নাই, কোনো দিন না।—"দেখো লীলা, অন্য লোকের কথা জানি নে, তবে আমার কথা শুনবে ?···আমি তোমাকে আমার মায়ের পেটের বোন্ ভাবি—তোমাকে কেউ চেনে নি, চিনলে না। এই কথা ভাবি—আজ নয় লীলা, এতটুকু বেলা থেকে তোমায় আমি জানি, অন্য লোকে ভুল করতে পারে, কিন্তু আমি—

লীলা অবাক্ হইয়া গেল, কখনও সে এ রকম দেখে নাই অপুকে। সে জিজ্ঞাসা করিতে যাইতেছিল—সত্যি বল্‌চ ?—কিন্তু অপুর মুখ দেখিয়া বুঝিল প্রশ্নটা অনাবশ্যক। পরক্ষণেই সে তাড়াতাড়ি জানালার বাহিরের দিকে মুখটা ফিরাইয়া লইল।

অপুও বাহিরে চলিয়া আসিল—সে অনুভব করিতেছিল, লীলার মত সে কাহাকেও ভালবাসে না—সেই গভীর অনুকম্পামিশ্রিত ভালবাসা, যা মানুষকে সব ভুলাইয়া দেয়, আত্মবিবর্জ্জনে প্রণোদিত করে।

তিনদিন পরে বিমলেন্দু মা ও বোন্‌কে লইয়া ধরমপুর রওনা হইল।

চাকরি অনেক খুঁজিয়াও পাইল না। বেকার-সমস্যা শহরে অতি ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে, তবে আজকাল লিখিয়া সামান্য কিছু আয় হয়। কোনোরকমে দুজনের চলে। অপু প্রাণপণ চেষ্টা করে মাতৃহারা পুত্রের মায়ের অভাব দূর করিতে. অনেকটা অপটু, আনাড়ি ধরণে। তাহাতে অনেক সময়ে হয়ত কার্য্যের অপেক্ষা কার্য্যের ইচ্ছাটাই বেশী প্রকাশ পায়। এ বিস্কুটগুলা বেশ দেখাইতেছে, খোকা ভালবাসে, লওয়া যাক। রাঙা রবারের বেলুনটার কত দাম ?

রাত্রে শুইয়াই কাজল অমনি বলে—গল্প বল বাবা। আচ্ছা বাবা ওই যে রাস্তায় ইঞ্জিন্ চালায় যারা, ওরা কি যখন হয় থামাতে পারে, যেদিকে ইচ্ছে চালাতে পারে ? সে মাঝে মাঝে গলির মুখে দাঁড়াইয়া বড় রাস্তায় ষ্টীম রোলার চালাইতে দেখিয়াছে। যে লোকটা চালায় তার উপর কাজলের মনে মনে হিংসা হয়। কি মজা ওই কাজ করা।···যখন খুসি চালানো, যতদূর হয়, যখন খুশী থামানো। মাঝে মাঝে সিটি দেয়, একটা চাকা বসিয়া বসিয়া ঘোরায় সব চুপ করিয়া আছে। সাম্‌নের একটা ডাণ্ডা যাই টেপে অম্‌নি ঘটাং ঘটাং বিকট শব্দ।

সকালে একদিন অপু মেঝেতে মাদুর পাতিয়া বসিয়া বসিয়া কাজলকে পড়াইতেছে, একজন কুড়ি বাইশ বছরের চোখে-চশমা ছেলে দোরের কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—আজ্ঞে আস্‌তে পারি ?···আপনারই নাম অপূর্ব্ব-বাবু ? নমস্কার—

—আসুন, বসুন, বসুন। কোত্থেকে আস্‌চেন !

—আজ্ঞে, আমি ইউনিভার্সিটিতে পড়ি। আপনার বই পড়ে আপনার সঙ্গে দেখা করতে এলুম। আমার অনেক বন্ধুবান্ধব সবাই এত মুগ্ধ হয়েচে, তাই আপনার ঠিকানা নিয়ে—

অপু খুব খুশী হইল—বই পড়িয়া এত ভাল লাগিয়াছে

যে বাড়ি খুঁজিয়া দেখা করিতে আসিয়াছে একজন শিক্ষিত তরুণ যুবক। এ তার জীবনে এই প্রথম।

ছেলেটি চারিদিকে চাহিয়া বলিল—আজ্ঞে, হঁয়ে, এই ঘরটাতে আপনি থাকেন বুঝি?

অপু একটু সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল, ঘরের আসবাবপত্র অতি হীন, ছেঁড়ামাদুরে পিতাপুত্র বসিয়া পড়িতেছে। খানিকটা আগে কাজল ও সে দুজনে মুড়ি খাইয়াছে, মেঝের খানিকটাতে তার চিহ্ন। সে ছেলের ঘাড়ে সব দোষটা চাপাইয়া দিয়া সলজ্জ স্বরে বলিল—তুই এমন দুষ্টু হয়ে উঠ্‌ছিস খোকা, রোজ রোজ তোকে বলি খেয়ে অমন করে ছড়াবি নে—তা তোর—আর বাটিটা অমন দোরের গোড়ায়—

কাজল এ অকারণ তিরস্কারের হেতু না বুঝিয়া কাঁদ-কাঁদ মুখে বলিল—আমি কই বাবা, তুমিই তো বাটিটাতে মুড়ি—

—আচ্ছা, আচ্ছা, থাম্, লেখ বানান্‌গুলো লিখে ফেল।

যুবকটি বলিল—আমাদের মধ্যে আপনার বই নিয়ে খুব আলোচনা—আজ্ঞে হ্যাঁ। ওবেলা বাড়িতে থাকবেন? 'বিভাবরী' কাগজের এডিটার শ্যামাচরণ বাবু আপনার সঙ্গে দেখা করতে আসবেন, আমি আরও তিন চার জন সেই সঙ্গে আসব। তিনটে? আচ্ছা, তিনটেতেই ভাল। আরও খানিক কথাবার্ত্তার পর যুবক বিদায় লইলে অপু ছেলের দিকে চাহিয়া বলিল, উস্-স্-স্-স্, খোকা?

ছেলে ঠোঁট্ ফুলাইয়া বলিল—আমি আর তোমার সঙ্গে কথা কব না বাবা—

—না বাপ আমার, লক্ষী আমার; রাগ ক'রো না। কিন্তু কি করা যায় বল্?

—কি বাবা?

—তুই এক্ষুনি ওঠ্, পড়া থাক্ এবেলা, এই ঘরটা ঝেড়ে বেশ করে ভাল করে সাজাতে হবে—আর ওই তোর ছেঁড়া জামাটা তক্তপোষের নীচে লুকিয়ে রাখ্ দিক?...ও বেলা 'বিভাবরী'র সম্পাদক আসবে—

—'বিভাবরী' কি বাবা?

—'বিভাবরী' কাগজ রে পাগলা, কাগজ—দৌড়ে যা তো পাশের বাসা থেকে বাল্‌তিটা চেয়ে নিয়ে আয় তো?

বৈকালের দিকে ঘরটা একরকম মন্দ দাঁড়াইল না। তিনটার পরে সবাই আসিলেন। শ্যামাচরণ বাবু বলিলেন—আপনার বইটার কথা আমার কাগজে যাবে আসচে মাসে। ওটাকে আমিই আবিষ্কার করেচি, মশায়। আপনার লেখা গল্প টল্প আছে? দিন্ না।

চা ও খাবার খাইয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া সাহিত্যের কথা বলিয়া তাঁহারা চলিয়া গেলেন। অপু কিন্তু সন্তুষ্ট হইল না, কোথায় যেন তাঁহাদের সঙ্গে খাপ খাইতেছে না।

পরের মাসে 'বিভাবরী' কাগজে তাহার সম্বন্ধে এক নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ বাহির হইল, সঙ্গে সঙ্গে তাহার গল্পটাও বাহির হইল। শ্যামাচরণ বাবু ভদ্রতা করিয়া পঁচিশটি টাকা গল্পের মূল্যস্বরূপ লোকমারফৎ পাঠাইয়া দিয়া আর একটা গল্প চাহিয়া পাঠাইলেন।

অপু ছেলেকে প্রবন্ধটি পড়িতে দিয়া নিজে চোখ বুজিয়া বিছানায় শুইয়া শুনিতে লাগিল—কাজল খানিকটা পড়িয়া বলিল—বাবা এতে তোমার নাম লিখেচে যে! অপু হাসিয়া বলিল—দেখছিস খোকা, লোকে কত ভাল বলেচে আমাকে? তোকেও একদিন ওই রকম বলবে, পড়াশুনা করবি ভাল করে, বুঝলি?

প্রকাশকের দোকানে গিয়া শুনিল 'বিভাবরী'তে প্রবন্ধ বাহির হইবার পরে বই খুব কাটিতেছে—তাহা ছাড়া তিন বিভিন্ন স্থান হইতে তিনখানি পত্র আসিয়াছে। বইখানার অজস্র প্রশংসা।

একদিন কাজল বসিয়া পড়িতেছে, সে ঘরে ঢুকিয়া হাত দুখানা পিছনের দিকে লুকাইয়া বলিল, খোকা, বল তো হাতে কি?...কথাটা বলিয়াই মনে পড়িয়া গেল, শৈশবে একদিন তাহার বাবা—সেও এম্‌নি বৈকাল-বেলাটা—তাহার বাবা এই ভাবেই, ঠিক এই কথা বলিয়াই খবরের কাগজের মোড়কটা তাহার হাতে দিয়াছিল!... জীবনের চক্র ঘুরিয়া ঘুরিয়া কি অদ্ভুত ভাবেই আবর্ত্তিত হইতেছে, চিরযুগ ধরিয়া! কাজল ছুটিয়া গিয়া বলিল. কি বাবা, দেখি?—পরে বাবার হাত হইতে জিনিষটা লইয়া দেখিয়া বিস্মিত পুলকিত হইয়া উঠিল। অজস্র ছবিওয়ালা আরব্য উপন্যাস! দাদামশায়ের বইয়ে তো এত রঙীন্ ছবি ছিল না? নাকের কাছে ধরিয়া দেখিল কিন্তু তেমন পুরাণো পুরাণো গন্ধ নাই, সেই এক অভাব।

অনেক দিন পরে হাতে পয়সা হওয়াতে সে নিজের জন্যও একরাশ বই ও ইংরেজী ম্যাগাজিন কিনিয়া আনিয়াছে।

পরদিন সে বৈকালে তাহার এক সাহেব বন্ধুর নিকট হইতে একখানা চিঠি পাইয়া গ্রেট্‌ইষ্টার্ণ হোটেলে তার সঙ্গে দেখা করিতে গেল। সাহেবের বাড়ী ক্যানাডায়, চল্লিশ-বিয়াল্লিশ বয়স, নাম এ্যাশ্‌বার্টন। হিমালয়ের জঙ্গলে গাছপালা খুঁজিতে আসিয়াছে, ছবিও আঁকে। ভারতবর্ষে এই দুই বার আসিল। ষ্টেট্‌স্‌ম্যানে তাহার লেখা হিমালয়ের উচ্ছ্বসিত বর্ণনা পড়িয়া অপু হোটেলে

গিয়া মাস দুই পূর্ব্বে লোকটির সঙ্গে আলাপ করে। এই মাসের মধ্যে দুজনের বন্ধুত্ব খুব জমিয়া উঠিয়াছে।

সাহেব তাহার জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। ফ্ল্যানেলের ঢিলা স্যুট্ পরা, মুখে পাইপ, খুব দীর্ঘাকার, সুশ্রী মুখ, নীল চোখ, কপালের উপরের দিকের চুল খানিকটা উঠিয়া গিয়াছে। অপুকে দেখিয়া হাসিমুখে আগাইয়া আসিল, বলিল—দেখ, কাল একটা অদ্ভুত ব্যাপার ঘটেছিল। ও-রকম কোনোদিন হয়নি। কাল একজন বন্ধুর সঙ্গে মোটরে কল্‌কাতার বাইরে বেড়াতে গিয়েছিলুম। একটা জায়গায় গিয়ে বসেচি, কাছে একটা পুকুর, ও-পারে একটা মন্দির, এক সার বাঁশগাছ আর তালগাছ, এমন সময়ে চাঁদ উঠল, আলো আর ছায়ার কি খেলা! দেখে আর চোখ ফেরাতে পারিনে। মনে হল, Ah, this is the East!...the eternal East. অমন দেখিনি কখনও।

অপু হাসিয়া বলিল, And pray who is the Sun?...

এ্যাশবার্টন হো হো করিয়া হাসিয়া বলিল, না, শোনো, আমি কাশী যাচ্ছি, তোমাকে না নিয়ে আমি যাব না কিন্তু। আসচে হপ্তাতেই যাওয়া যাক চল।

কাশী! সেখানে সে কেমন করিয়া যাইবে! কাশীর মাটিতে সে পা দিতে পারিবে না। শত-সহস্র স্মৃতি জড়ানো কাশী, জীবনের ভাণ্ডারে অক্ষয় সঞ্চয়—ও কি যখন তখন গিয়া নষ্ট করা যায়!... সেবার পশ্চিম যাইবার সময় মোগলসরাই দিয়া গেল, কিন্তু কাশী যাইবার অত ইচ্ছা সত্ত্বেও যাইতে পারিল না কেন?...কেন, তাহা অপরকে সে কি করিয়া বুঝায়!...

বন্ধু বলিল, তুমি জাভায় এস না আমার সঙ্গে?... বরোবুদরের স্কেচ আঁকব, তা ছাড়া মাউণ্ট স্যানাকের বনে যাব। ওয়েষ্ট জাভাতে বৃষ্টি কম হয় বলে ট্রপিক্যাল ফরেষ্ট তত জমকালো নয়, কিন্তু ঈষ্ট জাভার বন দেখলে তুমি মুগ্ধ হবে, তুমি তো বন ভালবাস, এস না?...

সপ্তাহের শেষে কিন্তু বন্ধুটির আগ্রহ ও অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া তাহাকে কাশী রওনা হইতে হইল। কাশীতে পরদিন বেলা বারোটার সময় পৌছিয়া বন্ধুকে ক্যাণ্টনমেণ্টের এক সাহেবী হোটেলে তুলিয়া দিল ও নিজে একা করিয়া সহরে ঢুকিয়া গোধূলিয়ার মোড়ের কাছে 'পার্ব্বতী আশ্রমে' আসিয়া উঠিল।

এই কাশীর মধ্যে আরও একটা কাশী আছে, গুপ্ত রহস্যময় ও অপূর্ব্ব, তাহার সন্ধান কে রাখে? তের বছরের এক ক্ষুদ্র বালক এক সময়ে তাহার কথা জানিত, আজ বিশ বছর আগে।

খুঁজিলে পুরাণো গলিটা হয়ত বাহির করাটা কঠিন হইত না, হয়ত তারা ছোট্ট যে সেই বাসাটাতে থাকিত সেটাও বাহির করা যাইত, কিন্তু কি ভাবিয়া সে সেদিকে গেলই না, যাইতে পারিল না।

কিন্তু দশাশ্বমেধ ঘাটের হাত এড়াইতে পারিল না সে।

বৈকালে বহুক্ষণ দশাশ্বমেধ ঘাটে বসিয়া কাটাইল। ওই সেই ষষ্ঠীর মন্দির—ওরই সাম্‌নে বাবার কথকতা হইত সে-সব দিনে। সঙ্গে সঙ্গে সেই বৃদ্ধ বাঙাল কথক ঠাকুরের কথা মনে হইয়া অপুর মন উদাস হইয়া গেল। কোন্ যাদুবলে তাহার বালকহৃদয়ের দুর্ল্লভ স্নেহটুকু সেই বৃদ্ধ চুরি করিয়াছিল—এখন, এতকাল পরেও তাহার উপর অপুর সে স্নেহ অক্ষুণ্ণ আছে—আজ তাহা সে বুঝিল।

পরদিন সকালে দশাশ্বমেধ ঘাট হইতে সে স্নান করিতে নামিতেছে, হঠাৎ তাহার চোখ পড়িল একজন বৃদ্ধা একটা পিতলের ঘটিতে গঙ্গাজল ভর্ত্তি করিয়া লইয়া স্নান সারিয়া উঠিতেছেন—চাহিয়া চাহিয়া দেখিয়া সে চিনিল—কলিকাতার সেই জ্যাঠাইমা! সুরেশের মা!... বহুকাল সে আর জ্যাঠাইমাদের বাড়ি যায় নাই, সেই নববর্ষের দিনটায় অপমানের পর আর কখনও না। সে আগাইয়া গিয়া পায়ের ধূলা লইয়া প্রণাম করিয়া বলিল—চিন্‌তে পারেন, জ্যাঠাইমা? আপনারা কাশী আছেন নাকি আজকাল? বৃদ্ধা খানিকক্ষণ ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন—নিশ্চিন্দিপুরের হরি ঠাকুরপোর ছেলে না?...এস এস চিরঞ্জীবী হও বাবা—আর বাবা চোখেও ভাল দেখিনে—তার ওপর দেখ এই বয়েসে একা বিদেশে পড়ে থাকা—ভারী ঘটিটা কি নিয়ে উঠতে পারি?...ভাড়াটাদের মেয়েটা জলটুকু বয়ে দেয়—তো, তার আজ তিনদিন জ্বর—

—ও, আপনিই বুঝি একলা কাশীবাস—সুনীলদাদারা কোথায়?

বৃদ্ধা ভারী ঘটিটা ঘাটের রাণার উপর নামাইয়া বলিলেন—সব কল্‌কাতায়, আমায় দিয়েচে ভেন্ন করে বাবা। ভাল ঘর দেখে বিয়ে দিলুম সুনীলের, গুপ্তিপাড়ার মুখুয্যে—ওমা, বৌ এসে বাবা সংসারে হ'ল কাল—সে সব বলব এখন বাবা—তিন এর এক ব্রজেশ্বরের গলি—মন্দিরের ঠিক বাঁ গায়ে—একা থাকি, কারুর সঙ্গে দেখাশুনো হয় না। সুরেশ এসেছিল পূজোর সময়, দুদিন ছিল, থাকতে পারে না—তুমি এসো বাবা আমার বাসায় আজ বিকেলে। অবিশ্যি অবিশ্যি।

অপু বলিল—দাঁড়ান জ্যাঠাইমা, চট্ করে ডুব দিয়ে নি, আপনি ঘটিটা ওখানে রাখুন, পৌঁছে দিচ্ছি।

—না বাবা, থাক্, আমিই নিয়ে যাচ্ছি, তুমি বল্‌লে এই যথেষ্ট হ'ল—বেঁচে থাক।

তবুও অপু শুনিল না, স্নান সারিয়া ঘটি হাতে জ্যাঠাইমার সঙ্গে তাঁহার বাসায় গেল। ছোট্ট একতালা ঘরে থাকেন—পশ্চিমদিকের ঘরে জ্যাঠাইমা থাকেন, পাশের ঘরে আর একজন প্রৌঢ়া থাকেন—তাঁহার বাড়ি ঢাকা। অন্য ঘরগুলি একটি বাঙালী গৃহস্থ ভাড়া লইয়াছেন, যাঁদের ছোট মেয়ের কথা জ্যাঠাইমা বলিতেছিলেন।

বলিলেন—সুনীল আমার তেমন ছেলে না। ওই যে হাড়হাবাতে ছোটলোকের ঘরের মেয়ে এনেছিলাম, সংসারটাসুদ্ধ উচ্ছন্ন দিলে। কি থেকে সুরু হ'ল শোনো। ও বছর পোষ মাসে নবান্ন করেচি, ঠাকুরঘরের বারকোষে নবান্ন মেখে ঠাকুরদের নিবেদন করে রেখে দিইচি। দুই নাতিকে ডাকৃচি, ভাবলাম ওদের একটু একটু নবান্ন মুখে দি। বৌটা এমন বদ্‌মায়েস, ছেলেদের আমার ঘরে আস্‌তে দিলে না—শিখিয়ে দিয়েচে, ও-ঘরে যাস্‌নি—নবান্নর চাল খেলে নাকি ওদের পেট কামড়াবে। তাই আমি বললাম, বলি হ্যাঁ গা বৌমা, আমি কি ওদের শত্তুর যে ওদের নতুন চাল খাইয়ে মেরে ফেল্‌বার মতলব করচি? তা শুনিয়ে শুনিয়ে বল্‌চে, সেকেলে লোক ছেলেপিলে মানুষ করার কি বোঝে? আমার ছেলে আমি যা ভাল বুঝব করব, উনি যেন তার ওপর কথা না কইতে আসেন। এই সব নিয়ে ঝগড়া সুরু, তারপর দেখি ছেলেও ত বৌমার হয়ে কথা বলে। তখন আমি বললুম, আমাকে কাশী পাঠিয়ে দাও, আমি আর তোমাদের সংসারে থাকব না। বৌ রাত্রে কি কানে মন্ত্র দিয়েচে, ছেলে দেখি তাতেই রাজী। তাহলেই বোঝো বাবা, এত করে মানুষ করে শেষে কিনা আমার কপালে—জ্যেঠাইমার দুই চোখ দিয়া টপ্ টপ্ করিয়া জল পড়িতে লাগিল।

অপু জিজ্ঞাসা করিল—কেন সুরেশদা কিছু বললেন?

—আহা, সে আগেই বলিনি? সে শ্বশুরবাড়ির বিষয় পেয়ে সেখানেই বাস করচে, সেই রাজসাহী না দিনাজপুর। সে একখানা পত্তর দিয়েও খোঁজ করে না, মা আছে কি মলো। তবে আর তোমাকে বল্‌চি কি?

সুরেশ কল্‌কাতায় থাকলে কি আর কথা ছিল বাবা?

অপুকে খাইতে দিয়া গল্প করিতে করিতে তিনি বলিলেন, ও ভুলে গিয়েচি তোমাকে বল্‌তে বাবা, আমাদের নিশ্চিন্দিপুরের ভুবন মুখুয্যের মেয়ে লীলা যে কাশীতে আছে, জান না?

অপু বিস্ময়ের সুরে বলিল—লীলাদি! নিশ্চিন্দিপুরের? কাশীতে কেন?

জ্যাঠাই মা বলিলেন—ওর ভাসুর কি চাকরি করে এখানে। বড় কষ্ট মেয়েটার, স্বামী তো আজ ছ'সাত বছর পক্ষাঘাতে পঙ্গু, বড় ছেলেটা কাজ না পেয়ে বসে আছে, আরও চার পাঁচটি ছেলেমেয়ে সবসুদ্ধ, ভাসুরের সংসারে ঘাড় গুঁজে থাকে। যাও না, দেখা করে এস আজ বিকালে, বিশ্বনাথের গলিতে ঢুকেই বাঁদিকে বাড়ীটা।

বাল্যজীবনের সেই রাণুদির বড় বোন্ লীলাদি! নিশ্চিন্দিপুরের মেয়ে! বৈকাল হইতে অপুর দেরী সহিল না, জ্যাঠাইমার বাড়ি হইতেই বাহির হইয়াই সে বিশ্বনাথের গলি খুঁজিয়া বাহির করিল—সরু ধরণের তেতলা বাড়িটা। সিঁড়ি যেমন সঙ্কীর্ণ, তেমনি অন্ধকার, এত অন্ধকার যে পকেট হইতে দেশলাই-এর কাঠি করিয়া বাহির না জ্বালাইয়া সে এই বেলা দুইটার সময় পথ খুঁজিয়া পাইতেছিল না। তাহার বুক ঢিপ ঢিপ করিতেছিল, লীলাদিকে দেখিতে পাওয়া যাইবে এখানে!

একটা ছোট দুয়ার পার হইয়া সরু একটা দালান। একটি দশ বারো বছরের ছেলের প্রশ্নের উত্তরে সে বলিল, এখানে কি নিশ্চিন্দিপুরের লীলাদি আছেন? আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেচি বল গিয়ে। অপুর কথা শেষ না হইতে পাশের ঘর হইতে নারী কণ্ঠের প্রশ্ন শোনা গেল, কে রে খোকা? সঙ্গে সঙ্গে একটি পাৎলা গড়নের গৌরবর্ণ মহিলা দরজার চৌকাঠে আসিয়া দাঁড়াইলেন, পরণে আধ ময়লা শাড়ি, হাতে শাঁখা, বয়স সাঁইত্রিশ আটত্রিশ, মাথায় একরাশ কালো চুল। অপু চিনিল, কাছে গিয়া পায়ের ধুলা লইয়া প্রণাম করিয়া হাসিমুখে বলিল, চিন্‌তে পার লীলাদি?

পরে লীলা তাহার মুখের দিকে বিস্ময়ের দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে এবং চিনিতে পারে নাই দেখিয়া বলিল আমার নাম অপু, বাড়ি নিশ্চিন্দিপুর ছিল আগে—

লীলা তাড়াতাড়ি আনন্দের সুরে বলিয়া উঠিল—ও! অপু, হরিকাকার ছেলে! এস, এস ভাই এস। পরে সে অপুর চিবুক স্পর্শ করিয়া আদর করিল এবং কি বলিতে গিয়া হঠাৎ ঝর ঝর করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

অদ্ভুত মুহূর্ত্ত! এমন সব অপূর্ব্ব, সুপবিত্র মুহূর্ত্তও জীবনে আসে। লীলাদির ঘনিষ্ঠ আদরটুকু অপুর সারা শরীরে একটা স্নিগ্ধ আনন্দের শিহরণ আনিল।

গ্রামের মেয়ে, তাহাকে ছোট্ট দেখিয়াছে, সে ছাড়া এত আপনার মনের মত অন্তরঙ্গতা কে দেখাইতে পারে? লীলাদি ছিল তাহাদের ধনী প্রতিবেশী ভুবন মুখুয্যের মেয়ে, বয়সে তাহার অপেক্ষা অনেক বড়, অল্প বয়সে বিবাহ হইয়াছিল, তারপরেই শ্বশুরবাড়ী চলিয়া গিয়াছিল ও সেখানেই থাকিত। শৈশবে অল্পদিন মাত্র উভয়ের সাক্ষাৎ কিন্তু আজ অপুর মনে হইল লীলাদির মত আপনার জন সারা কাশীতে আর কেহ নাই। শৈশব-স্বপ্নের সেই নিশ্চিন্দিপুর, তারই জলে, বাতাসে দুজনের দেহ পুষ্ট ও বর্দ্ধিত হইয়াছে একদিন।

তারপর লীলা অপুর জন্য আসন আনিয়া পাতিয়া দিল, দালানেই পাতিল, ঘরদোর বেশী নাই, বিশেষ করিয়া পরের সংসার, নিজের নহে। সে নিজে কাছে বসিল, কত কথা, কত ইতিহাস, কত খোঁজ-খবর লইল। আপনার কথাও অনেক বলিল, অপুর বারণ সত্ত্বেও ছেলেকে দিয়া জলখাবার আনাইল, চা করিয়া দিল।

লীলা অনেক কথা বলিল। বড় ছেলেটি চৌদ্দ বছরের হইয়া মারা গিয়াছে, তাহার উপর সংসারের এই দুর্দ্দশা। উনি পক্ষাঘাতে পঙ্গু, ভাসুরের সংসারে চোর হইয়া থাকা, ভাসুর লোক মন্দ নন, কিন্তু বড় ভাজ— পায়ে কোটি কোটি দণ্ডবৎ। দুর্দ্দশার একশেষ। সংসারের যত উঞ্ছ কাজ, সব তাহার ঘাড়ে, আপন জন কেহ কোথাও নাই, বাপের বাড়িতে এমন কেহ নাই যাহার কাছে দুইদিন আশ্রয় লইতে পারে। সতু মানুষ নয়, লেখাপড়া শেখে নাই, গ্রামে মুদীর দোকান করে, পৈতৃক সম্পত্তি একে একে বেচিয়া খাইতেছে— তাহার উপর দুইটি বিবাহ করিয়াছে, একরাশ ছেলেপিলে। তাহার নিজেরই চলে না, লীলা সেখানে আর কি করিয়া গিয়া থাকে?

অপু বলিল—দুটো বিয়ে কেন?

—পেটে বিদ্যে না থাক্‌লে যা হয়। প্রথম পক্ষের বৌএর বাপের সঙ্গে কি ঝগড়া হ'ল, তাকে জব্দ করার জন্যে আবার বিয়ে করলে। এখন নিজেই জব্দ হচ্চেন, দুই বৌ ঘাড়ে—তার ওপর দুই বৌএরই ছেলেপিলে। তার ওপর রানুও ওখানেই কিনা!

—রাণু দি? ওখানে কেন?

—তারও কপাল ভাল নয়। আজ বছর সাত আট বিধবা হয়েচে, তার আর কোনো উপায় নাই, সতুর সংসারেই আছে। শ্বশুরবাড়িতে এক দেওর আছে, মাঝে মাঝে নিয়ে যায়, বেশীর ভাগ নিশ্চিন্দিপুরেই থাকে।

অপু অনেকক্ষণ ধরিয়া রাণুদির কথা জিজ্ঞাসা করিবে ভাবিতেছিল, কিন্তু কেন প্রশ্নটা করিতে পারে নাই সেই জানে। লীলার কথার পরে অপু অন্যমনস্ক হইয়া গেল। হঠাৎ লীলা বলিল—দেখ ভাই অপু, নিশ্চিন্দিপুরের সেই বাঁশবনের ভিটে এত মিষ্টি লাগে, কি মধু যে মাখানো ছিল তাতে! ভেবে দেখ্, মা নেই, বাবা নেই, কিছুই তো নেই—তবুও তার কথা ভাবি—সেই বাপের ভিটে আজ দেখিনি এগার বছর—সেবার সতুকে চিঠি লিখলাম, উত্তর দিলে এখানে কোথায় থাক্‌বে— থাক্‌বার ঘরদোর নেই—পূবের বড় দালান ভেঙে পড়ে গিয়েচে, পশ্চিমের কুঠুরীদুটোও নেই, ছেলেপিলে কোথায় থাক্‌বে—এই সব একরাশ ওজর। বলি, থাক্ তবে, ভগবান যদি মুখ তুলে চান কোনোদিন, দেখব— নয় তো বাবা বিশ্বনাথ তো চরণে রেখেইছেন—

লীলা ঝর ঝর করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

সে বলিল ঠিক বলেচ লীলাদি, আমারও গাঁয়ের কথা এত মনে পড়ে! সত্যিই কি মধুমাখানো ছিল, তাই এখন ভাবি।

লীলা বলিল, পদ্মপাতায় খাবার খাস্‌নি কতদিন বল্ দিকি? এ-সব দেশে শাল পাতায় খাবার খেতে খেতে পদ্ম পাতার কথা ভুলেই গিইচি, না? আবার কাগজে এক একদিন এক একটা দোকানে খাবার দেয়। সেদিন আমার মেজ ছেলে এনেচে, আমি বলি, দূর দূর, ফেলে দিয়ে আয়, কাগজে আবার মিষ্টি খাবার কেউ দেয় আমাদের দেশে? অপুর সারা দেহ স্মৃতির পুলকে যেন অবশ হইয়া গেল। লীলাদি মেয়েমানুষ, এ সব খুঁটিনাটি জিনিষ ভারী মনে রাখে, ঠিকই বটে, সেও পদ্মের পাতায় কতকাল খাবার খায় নাই, ভুলিয়াই গিয়াছিল কথাটা। তাহাদের দেশে বড় বড় বিল থাকায় পদ্ম পাতা সস্তা, সব দোকানে তাই ব্যবহার করিত, শাল পাতার রেওয়াজ ছিল না। নিমন্ত্রণ বাড়িতেও পদ্মপাতাতে ব্রাহ্মণ-ভোজন হইত, লীলাদির কথায় আজ আবার সব মনে পড়িয়া গেল।

লীলা চোখ মুছিয়া জিজ্ঞাসা করিল—তুই কতদিন যাস্‌নি সেখানে অপু? তেইশ বছর? কেন, কেন? আমি না হয় মেয়েমানুষ—তুই তো ইচ্ছে করলেই যেতে—

—তা নয় লীলাদি। প্রথমে ভাব্‌তুম বড় হ'য়ে যখন রোজগার করব, মাকে নিয়ে আবার নিশ্চিন্দিপুরের ভিটেতে গিয়ে বাস করব, মার বড় সাধ ছিল। মা মারা যাওয়ার পরেও ভেবেছিলুম কিন্তু তার পরে—ইয়ে—

স্ত্রীবিয়োগের কথাটা অপু আর বয়োজ্যেষ্ঠ লীলাদির

নিকট তুলিতে পারিল না। লীলা ব্যাপার বুঝিয়া বলিল, বৌমা কতদিন বেঁচেছিলেন ?

অপু লাজুক সুরে বলিল—বছর চারেক—

—তা এ তোমার অন্যায় কাজ ভাই—তোমার এ বয়সে বিয়ে করবে না কেন ?…তোমাকে তো এতটুকু দেখিচি এখনও বেশ মনে হচ্ছে ছোট্ট, পাংলা, টুকটুকে ছেলেটি—একটি কঞ্চি হাতে নিয়ে আমাদের ঘাটের পথের বাঁশতলাটায় বেড়িয়ে বেড়িয়ে বেড়াচ্চ—কালকের কথা যেন সব—না ও কি ছিঃ—বিয়ে কর ভাই। খোকাকে কল্‌কাতা রেখে এলে কেন—দেখতাম একবারটি।

লীলাও উঠিতে দেয় না—অপুও উঠিতে চায় না। লীলার স্বামীর সঙ্গে আলাপ করিল—ছেলেমেয়েগুলিকে আদর করিল। উঠিবার সময় লীলা বলিল—কাল আসিস্ অপু, নেমন্তন্ন রইল—এখানে দুপুরে খাবি। পরদিন নিমন্ত্রণ রাখিতে গিয়া কিন্তু অপু লীলাদির পরাধীনতা মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝিল—সকাল হইতে সমুদয় সংসারের রান্নার ভার একা লীলাদির উপর। কৈশোরে লীলাদি দেখিতে ছিল খুব ভাল—এখন কিন্তু সে লাবণ্যের কিছুই অবশিষ্ট নাই—চুল দুচার গাছা এরই মধ্যে পাকিয়াছে, শীর্ণ মুখ,শিরা-বাহির হওয়া হাত, আধময়লা শাড়ী পরণে। রাঁধিবার আলাদা ঘরদোর নাই, ছোট্ট দালানের অর্দ্ধেকটা দরমার বেড়া দিয়া ঘেরা, তারই ও-ধারে রান্না হয়। লীলাদি সমস্ত রান্না সারিয়া তার জন্য মাছের ডিমের বড়া ভাজিতে বসিল, এক একবার কড়াখানা উনুন হইতে নামায়, আবার তোলে, আবার নামায়, আবার ভাজে। আগুনের তাতে মুখ তার রাঙা দেখাইতেছিল—অপু ভাবিল কেন এত কষ্ট করচে লীলাদি, আহা, রোজ রোজ ওর এই কষ্ট, তার ওপর আমার জন্যে আর কেন কষ্ট করা ?

বিদায় লইবার সময় লীলা বলিল—কিছুই করতে পারলুম না ভাই—এলি যদি এত কাল পরে, কি করি বল্, পরের ঘরকন্না, পরের সংসার,-মাথানীচু করে থাকা উদয়াস্ত খাটুনিটা দেখ্‌লি তো ? কি আর করি, তবুও একটা ধরে আছি। মেয়েটা বড় হ'য়ে উঠ্‌ল, বিয়ে দিতে তো হবে ? ঐ বট ঠাকুর ছাড়া আর ভরসা নেই। সন্ধ্যে বেলাটা বেশ ভাল লাগে—দশাশ্বমেধ ঘাটে সন্ধ্যের সময় বেশ কথা হয়, পাঁচালী হয়, গান হয়—বেশ লাগে। দেখিস্ নি ?…আসিস্ না আজ ওবেলা—বেশ জায়গা, আসিস্, দেখিস্ এখন। এস, এস কল্যেণ হোক্। তারপর সে আবার কাঁদিয়া ফেলিল—বলিল—তোদের দেখ্‌লে যে কত কথা মনে পড়ে—কি সব দিন ছিল—

এবার অপু অতিকষ্টে চোখের জল চাপিল।

আর একটি কর্ত্তব্য আছে তাহার কাশীতে—লীলার মায়ের সঙ্গে দেখা করা। বাঙালীটোলার নারদ ঘাটে তাঁদের নিজেদের বাড়ি আছে—খুঁজিয়া বাড়ী বাহির করিল। মেজ বৌরাণী অপুকে দেখিয়া খুব আনন্দ প্রকাশ করিলেন, চোখের জল ফেলিলেন, অনেক গল্প করিলেন। লীলা ধরমপুরেই আছে বিমলেন্দুও সেখানে—অপুও তাহা জানিত।

কথাবার্ত্তা চলিতেছে এমন সময়ে ঘরে একটি ছোট মেয়ে ঢুকিল—বয়স ছয় সাত হইবে, ফ্রক্ পরা কোঁকড়া কোঁকড়া চুল—অপু তাহাকে দেখিয়াই বুঝিতে পারিল—লীলার মেয়ে। কি সুন্দর দেখিতে! এত সুন্দরও মানুষ হয় ?…স্নেহে, স্মৃতিতে, বেদনায় অপুর চোখে জল আসিল—সে ডাক দিল—শোনো খুকী মা, শোনো তো।

খুকী হাসিয়া পলাইতেছিল, মেজ বৌরাণী ডাকিয়া আনিয়া কাছে বসাইয়া দিলেন। সে তার দিদিমার কাছেই কাশীতে থাকে আজকাল। গত বৈশাখ মাসে তাহার বাবা মারা গিয়াছেন—কিন্তু লীলাকে সে সংবাদ জানানো হয় নাই এখনও। দেখিতে অবিকল লীলা—এ বয়সে লীলা যা ছিল তাই। কেমন করিয়া অপুর মনে পড়িল শৈশবের একটি দিনে বর্দ্ধমানের লীলাদের বাড়ীতে সেই বিবাহ উপলক্ষে মেয়ে মজলিসের কথা—লীলা যেখানে হাসির কবিতা আবৃত্তি করিয়া সকলকে হাসাইয়াছিল—সেই লীলাকে সে প্রথম দেখে এবং লীলা তখন দেখিতে ছিল ঠিক এই খুকীর মত অবিকল!

মেজ বৌরাণী বলিলেন—মেয়ে তো ভাল, কিন্তু বাবা ওর কি আর বিয়ে দিতে পারব ? ওর মার কথা যখন সকলে শুন্‌বে—আর তা নাই বা জানে কে—ও মেয়ের কি আর বিয়ে হবে বাবা ?

অপুর দুর্দ্দমনীয় ইচ্ছা হইল একটি কথা বলিবার জন্য—সেটা কিন্তু সে চাপিয়া রাখিল। মুখে বলিল—দেখুন, বিয়ের জন্যে ভাববেন কেন ? লেখাপড়া শিখুক, বিয়ে নাই বা হ'ল, তাতে কি ? মনে ভাবিল—এখন সে-কথা বলব না, খোকা যদি বাঁচে, মানুষ হয়ে ওঠে—তবে সেকথা তুলব। যাইবার সময়ে অপু লীলার মেয়েকে আবার কাছে ডাকিল। এবার খুকী তাহার কাছে ঘেঁষিয়া দাঁড়াইয়া ডাগর ডাগর উৎসুক চোখে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

সেদিনের বাকী সময়টুকু অপু বন্ধুর সঙ্গে সারনাথ দেখিয়া কাটাইল। সন্ধ্যার দিকে একবার বিশ্বনাথের গলিতে লীলাদের বাসায় বিদায় লইতে গেল—কাল সকালেই এখান হইতে রওনা হইবে। নিশ্চিন্দিপুরের

মেয়ে, শৈশব দিনের এক সুন্দর আনন্দ মুহূর্ত্তের সঙ্গে লীলা-দির নাম জড়ানো—বার বার কথা কহিয়াও যেন তাহার তৃপ্ত হইতেছিল না।

আসিবার সময় অপু মুগ্ধ হইল লীলা দির আন্তরিকতা দেখিয়া। তাহাকে আগাইয়া দিতে আসিয়া সে নীচে নামিয়া আসিল, আবার চিবুক ছুঁইয়া আদর করিল, চোখের জল ফেলিল, যেন মা, কি মায়ের পেটের বড় বোন্। কতকগুলা কাঠের খেল্‌না হাতে দিয়া বলিল—খোকাকে দিস্—তার জন্যে কাল কিনে এনেছি।

অপু ভাবিল—কি চমৎকার মানুষ লীলা-দি!···আহা পরের সংসারে কি কষ্টটাই না পাচ্চে! মুখে কিছু বললুম না—তোমায় আমি বাপের ভিটে দেখাব লীলা-দি, এই বছরের মধ্যেই।

ট্রেণে উঠিয়া সারাপথ কত কি কথা তাহার মনে যাওয়া আসা করিতে লাগিল। রাজঘাটের ষ্টেশনে ট্রেণে উঠিল আজ কতকাল পরে! বাল্যকালে এই ষ্টেশনেই সে প্রথম জলের কল দেখে, কাশী নামিয়াই ছুটিয়া গিয়াছিল আগে জলের কলটার কাছে। চেঁচাইয়া বলিয়াছিল—দেখো, দেখো মা, জলের কল সে সব কি আজ? ··

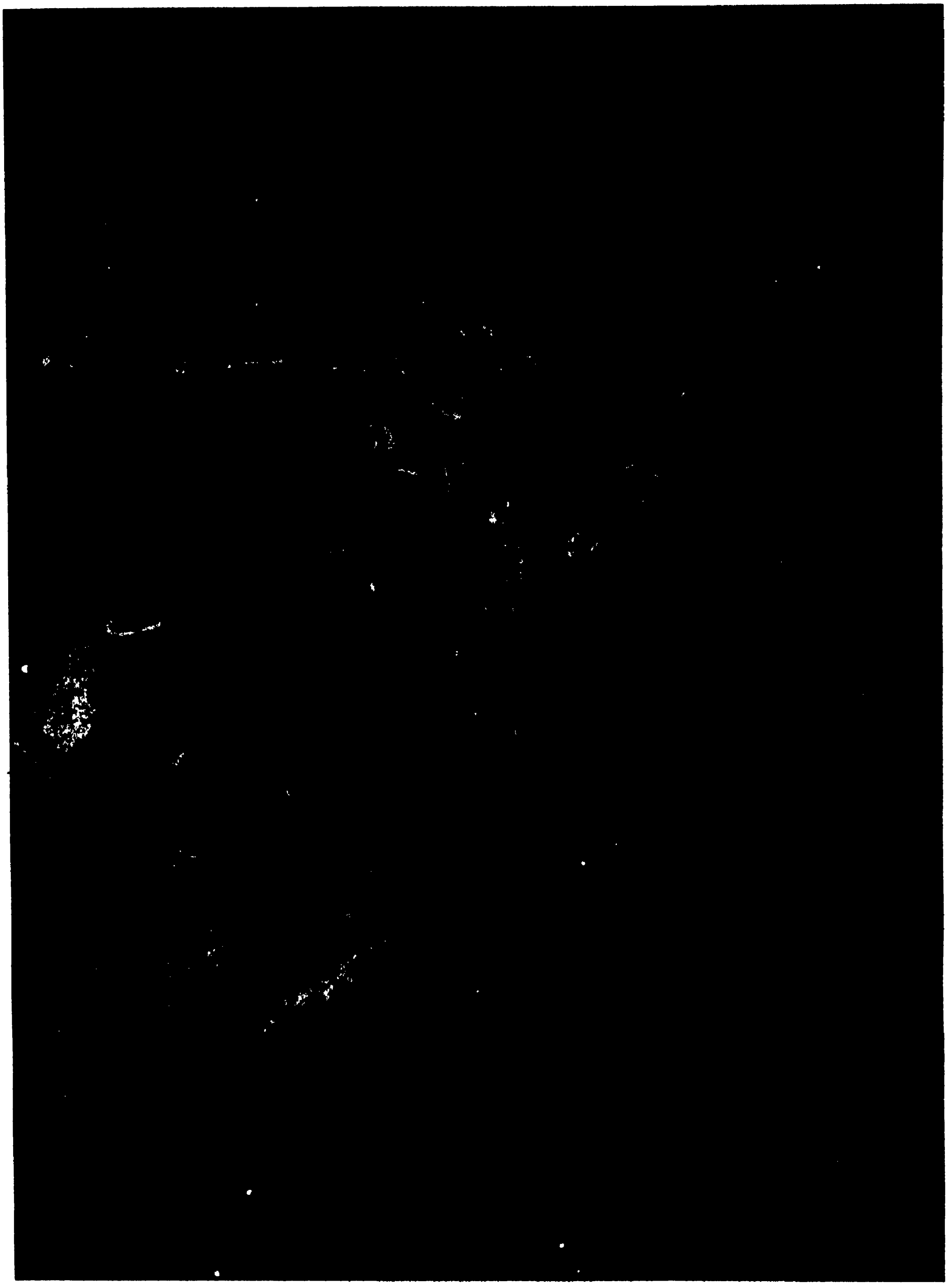
আজ কতকদিন হইতে সে আর একটি অদ্ভুত জিনিষ নিজের মনের মধ্যে অনুভব করিতেছে, কি তীব্রভাবেই অনুভব করিতেছে। আগে তো এ ছিল না? অন্ততঃ এ ভাবে তো কই কখনও এর আগে—সেটা হইতেছে ছেলের জন্য মন কেমন করা। কত কথাই মনে হইতেছে এই কয়দিনে—পাশের বাড়ির বাড়ুয্যে গৃহিণী কাজলকে বড় ভালবাসেন—সেখানেই তাহাকে রাখিয়া আসিয়াছে। এর আগেও একবার দুতিন দিনের জন্য কলিকাতা হইতে কার্য্যোপলক্ষে বাহিরে যাইবার সময় ওখানেই কাজলকে রাখিয়াছিল। সেবার কিন্তু তত মন উতলা হয় নাই, এবার কখনও মনে হইতেছে, কাজল যে দুষ্টু ছেলে হয়ত গলির মোড়ে গিয়া দাঁড়াইয়াছিল, কোনো বদ্‌মাইস লোকে ভুলাইয়া কোথায় লইয়া গিয়াছে। কিংবা হয়ত চুপিচুপি বাড়ী হইতে বাহির হইয়া রাস্তা পার হইতে যাইতেছিল, মোটর চাপা পড়িয়াছে কিন্তু তাহা হইলে কি বাঁড়ুয্যেরা একটা তার করিত না? হয়ত তার করিয়াছিল, ভুল ঠিকানায় গিয়া পৌছিয়াছে। উহাদের আলিসাবিহীন নেড়া ছাদে ঘুড়ি উড়াইতে উঠিয়া পড়িয়া যায় নাই ত? কিন্তু কাজল ত কখনও ঘুড়ি ওড়ায় না? একটু আনাড়ি, ঘুড়ি ওড়ানো কাজ একেবারে পারে না। না—সে উড়াইতে যায় নাই, তবে হয়ত বাঁড়ুয্যে বাড়ীর ছেলেদের দলে মিশিয়া উঠিয়াছিল, আশ্চর্য্য কি!

আটিঃ বন্ধুর কথার উত্তরে সে খানিকটা আগে বলিয়াছিল, সে জাভা, বালি, সুমাত্রা দেখিবে, প্রশান্ত সাগরের দ্বীপপুঞ্জ দেখিবে, আফ্রিকা দেখিবে—ওদের বিষয় উপন্যাস লিখিবে। সাহেবেরা দেখিয়াছে তাদের চোখে—সে নিজের চোখে দেখিতে চায়, তার মনের রঙে কোন্ রঙ ধরে ইউগাণ্ডার দিক্‌দিশাহীন তৃণভূমি। কেনিয়ার অরণ্য। বুড়ো বেবুন রাত্রে কর্কশ চীৎকার করিবে, হায়েনা পচা জীবজন্তুর গন্ধে উন্মাদের মত আনন্দে হি হি করিয়া হাসিবে। দুপুরে অগ্নিবর্ষী, খররৌদ্রে কম্পমান উত্তাপতরঙ্গ মাঠে প্রান্তরে জনহীন বনের ধারে কতকগুলি উঁচুনীচু সদাচঞ্চল বাঁকা রেখার সৃষ্টি করে—সিংহেরা দল পাকাইয়া ছোট কণ্টকবৃক্ষের এতটুকু ক্ষুদ্র ছায়ায় গোলাকারে দাঁড়াইয়া অগ্নিবৃষ্টি হইতে আত্মরক্ষা করে—

কিন্তু খোকা যে টানিতেছে আজকাল, কোনো জায়গায় যাইতে মন চায় না খোকাকে ফেলিয়া। কাজল, খোকা, কাজল, খোকা, খোকন্, ও ঘুড়ি ওড়াইতে পারে না, কিছু বুঝিতে পারে না, কিছু নির্ব্বোধ। কিন্তু ও ওর খোকন, আনাড়ি মুঠোতে বুকের তার আঁকড়াইয়া ধরিয়াছে টানিতেছে, প্রাণপণে টানিতেছে—ছোট্ট দুর্ব্বল হাত দুটি নির্দ্দয়ভাবে মুচড়াইয়া সরাইয়া লওয়া? সর্ব্বনাশ! থামা চাপা থাকুক বিদেশযাত্রা।

কি জানি কেন আজ কত কথাই মনে পড়িতেছে, বিশেষ করিয়া নিশ্চিন্দিপুরের কথা। হয়ত এতকাল পরে লীলাদিদির সঙ্গে দেখা হওয়ার জন্যই। ঠিক তাই। বহু দূরে আর একটি সম্পূর্ণ অন্য ধরণের জীবন-ধারা বাঁশবনের আমবনের ছায়ায় পাখীর কলকাকলীর মধ্য দিয়া, জানা-অজানা বনপুষ্পের সুবাসের মধ্য দিয়া সুখে দুঃখে বহুকাল আগে বহিত—এককালে যার সঙ্গে অতি ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল তার—আজ তা স্বপ্ন—স্বপ্ন, কতকাল আগে দেখা স্বপ্ন! গোটা নিশ্চিন্দিপুর, তার ছেলেবেলাকার দিদি, মা, ও রাণুদি, মাঠ বন, ইছামতী সব অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে, ধোঁয়া, ধোঁয়া মনে হয়, স্বপ্নের মতই অবাস্তব। সেখানকার কথা কতকগুলি অস্পষ্ট স্মৃতিতে আসিয়া দাঁড়াইয়া যায়। অপুর একটা কথা মনে হইয়া হাসি পাইল।

গ্রাম ছাড়িয়া আসিবার বছরখানেক আগে অপু এক-রাশ কড়ি পাইয়াছিল। তাহার বাবা শিষ্যবাড়ি হইতে এগুলি আনে। এত কড়ি কখনও অপু ছেলেবেলায় একসঙ্গে দেখে নাই। তাহার মনে হইল সে হঠাৎ অত্যন্ত বড়লোক হইয়া গিয়াছে—কড়ি খেলায় সে যতই হারিয়া যাক্ তাহার অফুরন্ত ঐশ্বর্য্যের শেষ হইবে না। একটা গোল বিস্কুটের ঠোঙায় কড়ির রাশি রাখিয়া দিয়াছিল।



অমানিশার অর্ঘ্য
শ্রীসুধীররঞ্জন খাস্তগীর

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

সে ঠোঙাটা আবার তোলা থাকিত তাদের বনের ধারের দিকের ঘরটায় উঁচু কুলুঙ্গীটাতে।

তার পর দিদি মারা গেল, খেলাধূলায় অপুর উৎসাহ গেল কমিয়া, তারপরই গ্রাম ছাড়িয়া উঠিয়া আসিবার কথা হইতে লাগিল। অপু আর একদিনও ঠোঙার কড়ি-গুলা লইয়া খেলা করিল না, এমন কি দেশ ছাড়িয়া চলিয়া আসিবার সময়েও গোলমালে, ব্যস্ততায় প্রথম দূর বিদেশে রওনা হইবার উত্তেজনার মুহূর্তে সেটার কথা মনেও উঠে নাই। অত সাধের কড়ি ভরা ঠোঙাটা সেই কড়িকাঠের নীচেকার বড় কুলুঙ্গীটাতেই রহিয়া গিয়াছিল।

তারপর অনেককাল পরে সে কথা অপুর মনে হয় আবার। তখন অপর্ণা মারা গিয়াছে। একদিন অন্যমনস্ক ভাবে ইডেন্ গার্ডেনের কেয়াঝোপে বসিয়া ছিল, গঙ্গার ও-পারের দিকে সূর্য্যাস্ত দেখিতে দেখিতে কথাটা হঠাৎ মনে পড়ে।

আজও মনে হইল।

কড়ির কৌটাটা! কড়ির কৌটাটা! একবার সে মনে মনে হাসিল। ছেলেবেলাকার ঘরের উত্তর দিকের দেওয়ালের কুলুঙ্গীতে বসানো সেই টিনের ঠোঙাটা দূরে সেটা যেন শূন্যে এখনও ঝুলিতেছে তাহার শৈশব জীবনের চিহ্নস্বরূপ। অস্পষ্ট, অবাস্তব, স্বপ্নময় ঠোঙাটা সে স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছে, পয়সায় চারগণ্ডা করিয়া মাকড়সার ডিমের মত সেই যে ছোট ছোট বিস্কুট, তারই ঠোঙাটা। উপরে একটা বিবর্ণপ্রায় হাঁ-করা রাক্ষসের মুখের ছবি দবের কোন্ কুলুঙ্গীটাতে বসানো আছে, তার পিছনে বাঁশবন, শিমুলবন, তাদের পিছনে সোনাডাঙার মাঠ, ঘুঘুর ডাক, তার পেছনে তেইশবছর আগেকার অপূর্ব্ব মায়ামাখানো চৈত্র দুপুরের রোদে ভরা নীলাকাশ......

হাওড়া ষ্টেশন হইতে বাসে যাওয়ার দেরি সহিল না। অপু ষ্টেশনে নামিয়াই ট্যাক্সি ভাড়া করিয়া বাসার দিকে ছুটিল। খোকা না জানি কেমন আছে? কতক্ষণে দেখিব তাহাকে! একস্থানে একটা সার্কাস কোম্পানী বড় বড় হরফে বিজ্ঞাপন দিয়াছে, 'অদ্য শেষ রজনী! অদ্য শেষ রজনী! অদ্য নিতান্তই শেষ রজনী!!

অপুর বুকটা ধড়াস্ করিয়া উঠিল। নিজেদের গলিতে গাড়ী ঢুকাইতে সাহস হইল না। বড় রাস্তা হইতে ভাড়া চুকাইয়া দিয়া গাড়ীটা বিদায় করিয়া দিল। মোড়ের পানের দোকানী তাহাকে চেনে, কাজলকেও চেনে। সে বিবর্ণমুখে দোকানের সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিল, এই যে পরমানন্দ, কাশী থেকে এলুম, পান দাও ত! সঙ্গে সঙ্গে সে উৎসুক ও উদ্বিগ্ন দৃষ্টিতে পরমানন্দের মুখের ভাব লক্ষ্য করিতে লাগিল, পরমানন্দ কিছু ঢাকিতেছে না কি? নাঃ, এমন তেমন কিছু হইলে কি আর পরমানন্দ জানিত না? পরমানন্দ কিছু ঢাকে নাই ত? ঠিক আগেকার মত কেন হাসিল না পরমানন্দ?

অপু কিছু বুঝিতে পারিল না। ভয়ে ভয়ে বাঁড়ুয্যেদের দরজায় আসিয়া কড়া নাড়িল। কে?... নিধে বেয়ারা?... অপুর মুখ শুকাইয়া ধূলা হইয়া গিয়াছে, কাজলের কথাটা জিজ্ঞাসা করিতে সাহসে কুলাইল না। নিধে বেয়ারা বাহিরের ঘরে সুইচ জ্বালাইয়া দিয়া বাড়ির মধ্যে ঢুকিয়াছে, বাহিরে আর কেহ নাই, এক মিনিট দু মিনিট কতকাল, কতযুগ।...

হঠাৎ সিঁড়ির ঘরের পাশের রাস্তা দিয়া ছেলেমানুষী মিষ্টি গলায় আকাশ পাতাল ফাটাইতে ফাটাইতে কাজল হাসিমুখে ছুটিয়া আসিল, বাবা এসেচে, বাবা বাবা—

অপু তাহাকে জড়াইয়া ধরিল।

—তুমি আস না কেন বাবা! তিনদিন বললেন, সাতদিন হয়ে গেল, তোমার সঙ্গে আড়ি—ও—আমি রোজ ভাবি।

—ভাবনা কিসের? তোর যদি এতটুকু বুদ্ধি থাকে? চল্, আমাদের নিজেদের বাসায়। চাবিটা নিয়ে আয়।

নিধে বেহারা আসিয়া বলিল—বাবু, মাসীমা বললেন, খোকা ও আপনি রাত্তিরে আজ এখানেই খাবেন।

ক্রমশঃ

বসন্তকুমারী দেবী ও পুরী বিধবাশ্রম

শ্রীলাবণ্যলেখা দেবী

বাংলা দেশের নগরে ও গ্রামে গ্রামে বহুস্থান ঘুরিয়া যাহা দেখিয়াছি তাহাতে আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে, ভদ্রঘরের বিধবারাই নিম্নশ্রেণী অপেক্ষা পরের অধিক গলগ্রহ, নিরুপায় ও নিঃসহায়। ঢাকায় একটি বিধবাশ্রম থাকায় পূর্ব্ববঙ্গের কয়েকটি বিধবা কিছু কিছু শিক্ষা করিয়া এখন শিল্পকার্য্যের দ্বারা আত্মসম্মান রক্ষা করিতেছেন, এমন কি দুঃস্থ আত্মীয়দেরও কিছু কিছু সাহায্যদান করিয়া থাকেন। কলিকাতা 'বাণীভবনে' এই ভাবে কতকগুলি বিধবার আশ্রয় ও শিক্ষার সুযোগ ঘটিয়াছে, হিরণ্ময়ী শিল্পাশ্রমে এবং সরোজনলিনী নারীমঙ্গল সমিতির বিদ্যালয়েও অনেক বিধবার উপকার হইয়াছে। তথাপি বাংলা দেশের অভাবের তুলনায় এ সকল প্রতিষ্ঠানও যথেষ্ট হইতে পারে না, বরং অত্যল্প বলা চলে। এক বৎসর পূর্ব্বের কথা। একদিন শুনিলাম পরলোকগত স্যর প্রতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের পত্নী বসন্তকুমারী দেবী একটি বিধবাশ্রম খুলিবার জন্য পরামর্শ ও সহায়তা চাহেন। বৈকাল পাঁচটার সময় তাঁহাদের কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীটস্থ বাসভবনে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলাম। মুখে সৌম্য শ্রীমাখা স্থবিরা-গোছের একটি গৌরবর্ণা মহিলা বসিয়া ছিলেন। তিনিই লেডি চ্যাটার্জ্জি। প্রায় দেড়ঘণ্টাকাল তাঁহার সহিত আশ্রম সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা হয়। পূর্ব্বে তিনি একটি বিধবাশ্রম পুরীতে খুলিয়াছিলেন, অর্থব্যয় অকাতরে করিয়াছিলেন, কিন্তু যে-সকল নিয়ম শৃঙ্খলা এবং শিক্ষা ও কার্য্যপ্রণালীর বিধিবদ্ধতা দ্বারা ছাত্রীনিবাস গড়িয়া উঠিতে পারে, তাহার সুযোগ সম্ভবতঃ হয় নাই। তাঁহার প্রাণভরা আগ্রহ ও বহু অর্থব্যয়ের পরিবর্ত্তে সার্থকতা না আসাতে তিনি দুঃখিত হইলেও আশাহীন হইতে পারেন নাই। বস্তুতঃ বিধবা আশ্রম যখন আতুর আশ্রম হইয়া উঠিল—অলস, অক্ষম ফাঁকিদার সুবিধাবাদীদের দ্বারা, তখন তিনি নিঃসন্দেহই মর্ম্মাহত হইয়াছিলেন। আমাকে বলিলেন—প্রথমে কলিকাতাতেই আশ্রম করেন, কিন্তু জাতির বড়াই, ছোঁওয়া-ছুঁই, ঝগড়া এ সকলে তিনি বিব্রত হইয়া পুরীতে স্থানান্তরিত করেন। কিছু শান্তি হইল বটে, কিন্তু কুড়ের আড্ডা ভাঙিল না। অন্নবস্ত্রের চিন্তাহীনাদের তীর্থদর্শনে ভ্রমণেই সময় কাটিয়া যাইতে লাগিল। দাতার দানের সুযোগ লওয়াটাই তাহাদের কাম্য হইয়া উঠিল, ফলে আশ্রম গড়িল না, ভাঙিয়া গেল। তিনি সরোজনলিনী নারীমঙ্গল সমিতির হাতে এই ভার দিতে ইচ্ছুক, যদি তাঁহারা এটি গড়িয়া তুলিতে ও সুপরিচালিত করিতে পারেন, তবে বরাবর ইহা তাঁহাদের হাতেই রাখা হইবে। তিনি পুরীর বাটী ও মাসিক একশত টাকা এই কল্যাণ কার্য্যের আনুকূল্যে দান করিতে পারেন। তিনি আমাকে এই সম্বন্ধে কতকগুলি কাগজপত্র দিয়াছিলেন। আমি তাঁহাকে আমাদের সরোজনলিনী নারীমঙ্গল সমিতির শিক্ষালয় দেখিবার জন্য অনুরোধ করিয়া আসি। তাঁহার পক্ষে অধিক নড়াচড়া সিঁড়ি-ভাঙা কষ্টকর, তৎসত্ত্বেও তিনি সম্মত হইলেন। অবিলম্বে একদিন তাঁহার পুত্র মেজর অনিল চ্যাটার্জ্জীর সহিত তিনি আসিয়া বিদ্যালয় বিশেষ মনোযোগ করিয়া দেখিয়া গেলেন।

প্রথম আলাপেই তাঁহার সৌজন্যে মুগ্ধ হইয়াছিলাম, পরে তাঁহার সহিত কিছুকাল একত্র বাসে তাঁহার মহৎ ভাবের পরিচয় পাই। তাহাতে কি গভীর শ্রদ্ধা তিনি আমার অন্তর হইতে আকর্ষণ করিয়াছেন আমি তাহা সম্যক প্রকাশ করিতে অসমর্থ।

তাঁহাদের লিখিত সর্ত্তগুলি কমিটিতে উপস্থিত করা হয়, সরোজনলিনী নারীমঙ্গল সমিতির গুরুভারের উপর, বিশেষতঃ পুরী কলিকাতা হইতে অনেকটাই দূরে, এই দূরের দায়িত্ব লওয়া সম্ভব হয়ত হইবে না, এইরূপ কথাও উঠে। এই সময়ে শ্রীযুক্তা হেমলতা দেবী বিশেষ

জোরের সঙ্গেই এই দায়িত্ব গ্রহণ করিতে সম্মত হন। বিশেষভাবে জানি আজ প্রায় বার বৎসর পূর্ব্বে তিনি তাঁহার এই শুভ সঙ্কল্প আমাকে জানাইয়াছিলেন। এমন কি এই উদ্দেশ্যে তাঁহার শান্তিনিকেতনের বাড়িতেই একখানি মাটির নূতন গৃহ প্রস্তুত করান। সেই গৃহে তিনি মাঝে মাঝে অসহায় বিধবাদিগকে স্থানদান করিতেন। আমাকে বলিয়াছিলেন—"সর্ব্বদাই অনুভব করিতেছি দেশের বিধবা মেয়েরা বড় বিপন্ন, ইহাদের শিক্ষার জন্য কিছু ব্যবস্থা করিতে প্রাণ ব্যাকুল হইতেছে, স্বামীর অনুমতি পাইয়াছি, কিন্তু বাবা মহাশয় (৺দ্বিজেন্দ্র-নাথ ঠাকুর বৃদ্ধ শশুর) বর্ত্তমানে কোন কর্ত্তৃত্বের ভাবে কিছু করা শোভা পায় না। তিনি সেকেলে লোক, আমি ঘরের বউ, বাহিরের কাজ লইয়া ব্যস্ত থাকিলে যদি পছন্দ না করেন।" স্বর্গগতা কৃষ্ণভামিনী দাস ছিলেন শ্রীযুক্তা হেমলতা দেবীর অন্তরঙ্গ বন্ধু। তিনি পরলোকগতা হইলে এইভাবে তাঁহারই মত বাহিরের কায করারও যে কতখানি প্রয়োজন তাহা ঐ সময়ে হেমলতা দেবী বিশেষভাবেই অন্তরে অন্তরে অনুভব করিতেছিলেন। এই পুরী বিধবাশ্রম গড়িতে তিনি যেরূপ অক্লান্তভাবে পরিশ্রম করিয়াছেন, তাহা নিজের অন্তরে একটি ঐকান্তিক তাগিদ ছাড়া কোন মানুষ পারে না।

গত বৎসর মার্চ্চ মাসের প্রথম দিন শ্রীযুক্তা হেমলতা দেবী, আমি ও ধীরেন্দ্রপ্রসাদ সিংহ, এম-এ (সরোজ-নলিনী সমিতির সর্ব্বপুরাতন কর্ম্মী) পুরী রওনা হইলাম, একটি শিল্প-শিক্ষয়িত্রী সঙ্গে লওয়া হইল। মেজর চ্যাটার্জ্জিই আমাদের কলিকাতা হইতে লইয়া পুরী গেলেন। বসন্তকুমারী দেবী তখন তাঁহার এক ভগ্নী ও দাস-দাসী লইয়া আশ্রম-বাড়িতে ছিলেন, তথায় একটি ছাত্রীও ছিল না, তাঁহাদের সুবিবেচনা দেখিয়া খুশী হইলাম। বুঝিলাম, সম্পূর্ণ নূতন করিয়াই গড়িবার ভার দিতেছেন। মেজর চ্যাটার্জ্জির ছুটি ছিল না বলিয়া খুব তাড়াতাড়িতে একটি সভার উদ্যোগ করা হয়। সেই সভায় কতকগুলি প্রস্তাব তুলিয়া একটি কমিটি গঠিত হয়। সভাভঙ্গের পর বসন্তকুমারী দেবী অত্যন্ত আবেগপূর্ণ কণ্ঠে হেমলতা দেবীকে বলিলেন, "বুঝিলাম এতদিনে বিধাতা আমার অভিলাষ পূর্ণ করিলেন, আমাদের অক্ষমতায় যাহা সফল হয় নাই এখন তাহা হইবে বলিয়া আমার মনে দৃঢ় প্রতীতি জন্মিতেছে।" দুই তিন দিন পর শ্রীযুক্তা হেমলতা দেবী ও ধীরেনবাবু কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন। আমি সতের দিন লেডি চ্যাটার্জ্জির সহিত আশ্রমে বাস করিয়াছিলাম। আমাদের অন্তঃপুরে যে কত মহিয়সী মহিলা বাস করিতেছেন বাহিরের লোক তাহা অল্পই জানিতে পারে। দেবী বসন্তকুমারী আজ ইহলোকে নাই, কিন্তু তাঁহার চরিত্রের মহত্ত্ব স্মরণ করিয়া আমার অন্তর শ্রদ্ধায় অবনত হইয়া পড়িতেছে।

পুণ্যবতী বসন্তকুমারী দেবীর মহৎ উদ্দেশ্য কি ভাবে এত শীঘ্র এমন সফল হইতে পারিবে আমাদেরও সে ধারণা ছিল না। কয়েক মাস পর—এবার ফেব্রুয়ারিতে গিয়া যাহা দেখিলাম তাহা বাস্তবিকই আমাদের আশাতীত আনন্দের সংবাদ। এই বিধবাশ্রম ও তাহাদের শিক্ষালয়টিকে কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে আরও একটি নূতনতর জিনিষ—শিশু-বিদ্যালয়, স্থানীয় ভদ্র-লোকেরা বালকবালিকাদের শিক্ষার জন্য এখানে পাঠাইতেছেন, শিশুদের কলহাস্যে আনন্দক্রীড়ায় বিধবাদের নিরানন্দ জীবনে তাহাদের নিজেদের শিক্ষার উদ্যমের সঙ্গে সঙ্গে বেশ একটি সজীবতা আনিয়া দিয়াছে। আশ্রমটি বিধবা মেয়েদের দ্বারা পরিপূর্ণ হইয়াছে। চারিজন শিক্ষয়িত্রী আশ্রমেই বাস করেন, তাহারাও বিধবা। প্রধানা শিক্ষয়িত্রীর জীবনও বড় দুঃখময়, দুশ্চরিত্র স্বামীর দ্বারা বালিকা বয়সে পরিত্যক্তা হন, মাতা ও ভ্রাতারা দুঃখিনীকে শিক্ষাদানের দ্বারা জীবনের ভিন্ন পথের আনন্দ দিতে সচেষ্ট হন, তারই ফলে ইনি বি-এ পাস করিয়া নিজের পায়ে দাঁড়াইয়াছেন। পরে বিধবাও হন। আর দুটি শিক্ষয়িত্রীও অল্প বয়সে বিধবা একজন ট্রেনিং পাস করিয়াছেন, অন্যটি ছাঁট-কাট সূচী-শিল্প ও তাঁতের কাজে সরোজনলিনী বিদ্যালয় হইতে উত্তীর্ণা। এখানে সকলেরই জীবনের ধারায় একটা মিল আছে বলিয়া যে শান্তি বিরাজ করিতেছে সংসারের মধ্যে তাহা প্রায় থাকে না। সংসারে ভোগের

আয়োজনের মধ্যে অন্য সকলের আশা-আকাঙ্ক্ষা ভিন্নতর, সেখানে বিধবা তাহার পথ পায় না, আশা উদ্দেশ্য কোন্ দিক্ দিয়া তাহাও খুঁজিয়া পায় না, জীবন নিষ্ফল অর্থহীন, বাঁচিয়া থাকাই বিড়ম্বনা এই হয় তাদের ধারণা। এখন শিক্ষার মধ্য দিয়া এই সব মেয়েরাই এখানে একটু একটু করিয়া জগতের ইতিহাসের সহিত পরিচিত হইতেছে। ইউরোপে অনেক মেয়ে স্বেচ্ছায় সমাজসেবায় লোকহিতের আদর্শের মধ্যে জীবনের আনন্দকে লাভ করিয়াছে। কেহ কেহ স্কুল কন্‌ভেণ্ট পরিচালনা করিতেছে, এই ভাবে কেহ-বা বালক-বালিকার শিক্ষার ভার গ্রহণ করিয়া যথার্থ মাতৃভাবের পরিচয় দিতেছে। এই সকল স্বেচ্ছাকৃত সাধনার আনন্দ ব্রহ্মচারিণী 'নান্'দের দৃষ্টান্তে আমরা বুঝি। ভারতের লক্ষ লক্ষ অপুত্রা বিধবার শক্তির যে কত দূর অপচয় হইতেছে তাহা এখন আমাদের বুঝিবার সময় আসিয়াছে। নিয়ম-পালনের আনন্দ একবার মেয়েরা বুঝিতে পারিলে সহজে তাহা ভঙ্গ করিতে চাহে না। মেয়েরা নিয়মিতভাবে প্রত্যূষেই গৃহমার্জ্জন ও স্নানাদি সমাপন করিয়া সমবেতভাবে স্তববন্দনাদি পাঠান্তে দিনের তালিকানুযায়ী নিজ নিজ কর্ম্মে প্রবিষ্ট হয়। পালা করিয়া মেয়েরা বাট্‌না বাটা, কুট্‌না কুটা ও রন্ধন পরিবেশনাদির ব্যবস্থা যেমন করে, তেমনি প্রভাতের দিকে বাগানের কার্য্য ও তাঁতশালার কার্য্যও করিয়া থাকে। সাড়ে দশটায় আহারাদি একত্রে সারিয়া লয়, ঠিক এগারটার সময় স্কুল আরম্ভ হয়। একখানি মোটর-বাসে দুই খেপে শিক্ষার্থী বালক-বালিকা ও মহিলাগণকে (যাহারা বাড়ি হইতে স্কুলে আসে) আনা হয়। ইংরেজী বাংলা সাহিত্য ব্যাকরণ ইতিহাস ভূগোল অঙ্ক চতুর্থশ্রেণী পর্য্যন্ত শিক্ষার ব্যবস্থার সহিত তাঁতের কাজ, সতরঞ্চি, আসন, তোয়ালে, থান প্রভৃতি সূঁচী-শিল্প ছাটকাট দর্জ্জীর কাজ, এম্‌ব্রয়ডারি জরির কাজ, পশমের বুননের কাজ শিক্ষা দেওয়া হয়। গীতবাদ্য শিক্ষারও ব্যবস্থা আছে। সকল মেয়েই অত্যন্ত উৎসাহের সহিত শিখিতে চাহে। তবে সকলের রুচি ও পারদর্শিতা একই বিষয়ে সম্ভব নহে, কেহ কেহ অধিক আগ্রহ করিয়া লেখাপড়া শিখিতেছে, কেহ-বা লেখাপড়া অপেক্ষা শিল্পকার্য্যে বা সঙ্গীতে অধিক অনুরাগ ও নৈপুণ্য দেখাইতেছে। সকলের মধ্যেই নিজের অবস্থাকে কিরূপে উন্নততর করিবে এই লক্ষ্য আছে, ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা আশার কথা।

ড্রিল ও লাঠিখেলার ব্যবস্থা আছে। মালীর হাতেই পূর্ব্বে ছিল বাগানের ভার, এখন এ কার্য্যে মেয়েরাই তাহাকে ছুটি দিয়াছে; সে এখন কেবল হাটবাজার ও বাহিরের ভৃত্যের কাজ করিয়া থাকে। মেয়েরা ক্ষেত্র-পরিষ্কার, বীজবপন ও সলিল-সেচনে গাছ ফসলের পরিচর্য্যা দুইবেলা করিয়া থাকে। আহারের শাকসব্জী মেয়েরা উৎপন্ন কিছু কিছু করিয়াছে, তাহা ছাড়া কিছু ফল-ফুলও করিয়াছে। টিফিনের ছুটিতে বালক-বালিকারা এই দিদিদের কাছেই জলখাবার চাহে। আশ্রমের দু-একটি মেয়ের উপর ভার আছে তাহারা স্কুলে আসিবার পূর্ব্বে এই জলখাবার গৃহে প্রস্তুত করিয়া রাখে ও জমা খরচ ঠিক রাখে। ইহাতে বালক-বালিকাদের বাহিরের অখাদ্য কুখাদ্য খাইতে হয় না। বৃহস্পতিবার বিদ্যালয় অর্দ্ধেক ছুটি ও রবিবার পূর্ণ ছুটি থাকে। বসন্তকুমারী দেবী জীবিত থাকিতে প্রতি বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় ধর্ম্মসঙ্গীত ও গীতা-পাঠ প্রভৃতি হইত। বহুতীর্থবাসিনী বিধবা তাঁহার নিকট সমবেত হইতেন। এখনও ছাত্রী ও শিক্ষয়িত্রীদের মধ্যে ঐরূপ ধর্ম্মসঙ্গীত ও গীতাপাঠ হয়, বাহিরের মেয়েরাও যোগ দিয়া থাকেন। কি সুন্দর আনন্দে উৎসাহে ইহাদের দিন কাটিতেছে। নানাস্থানে বিধবা মেয়েদের কেবল কষ্টের অবস্থা দেখিয়াছি। তাহাদের দুরবস্থা বিষাদ বিরসতা এত সুস্পষ্ট ও এমন সুগোচর যে কেবলই দুঃখ অনুভব করিয়াছি।

তিনটি ব্রাহ্মণ বিধবার করুণ কাহিনী শুনিলাম আজ তাঁহাদেরই মুখে। এখন তাঁহারা খৃষ্টান মহিলা। আজও তাঁহাদের হিন্দুধর্ম্মের প্রতি, সমাজের প্রতি, একান্ত টান। ইঁহাদের দুইজন ছিলেন সন্তানবতী, সন্তানদের অন্নের জন্য, শিক্ষার জন্য নিতান্ত নিরুপায় হইয়া পড়িয়াছিলেন। অন্যটি নিঃসন্তান। চৌদ্দ বৎসর বয়সে বড়জায়ের দ্বারা

উৎপীড়িত ও বহিষ্কৃতা হইয়া এক পতিতার হাতে পড়ে, কিন্তু ঐ ভয়াবহ জীবন হইতে রক্ষা পাইবার জন্য পলায়ন করিয়া বরাহনগর হাসপাতালে ঝির কাজ গ্রহণ করে—সেইখানে মিশনারী মেমের সহিত পরিচয়। তিনি উহাকে মিশনে লইয়া গিয়া লেখাপড়া শিল্পকাজ শিখাইয়াছেন। এখন সে মিশনেই শিক্ষয়িত্রীর কাজ পাইয়াছে,—সম্মানের সহিত নিজের ভরণপোষণ চালাইতেছে। শত শত নানারূপ ঘটনা জানি, কিন্তু বাহুল্যভয়ে এখানে আর বলিতে চাহি না। এইজন্যই বলিতেছিলাম যে, পুরীর বিধবাশ্রম আমাকে অত্যন্ত আশান্বিত করিয়াছে। দেশের লোকের আন্তরিক সহানুভূতি থাকিলে এ সকল আশ্রমের সফলতা অবশ্যম্ভাবী।

মা-হারা

শ্রীজ্যোতির্ম্ময়ী দেবী

শুধু মা নেই।

আর সকলেই আছেন। এপক্ষে ঠাকুমা পিসিমা কাকা জ্যেঠা বাবা খুড়ীমা জ্যেঠীমা, ওপক্ষের দিদিমা মাতামহ মাসীরা মামারা—সবাই বর্ত্তমান। আদরের অবধি নেই, স্নেহের সীমা নেই; ব্যাকুল মমতায় সমস্তক্ষণ সবাই তাকে ঘিরে রাখেন। বাপের বাড়িতে প্রচুর স্নেহ, মামারবাড়িতেও প্রচুর প্রশ্রয়, কোনোখানে ফাঁক নেই।

বাড়িতে এক বাড়ি ছেলে। প্রত্যেক ঘরে কলরব কোলাহল, ঝগড়াঝাঁটি, মিলন খেলার স্রোত বয়ে যায়; যখন যেটা খুশী। দরকার-মত প্রয়োজন-মত এ ওকে পিটিয়ে দেয়, কান মলে দেয়; এবং নালিশ শুন্‌বামাত্র মা'রা এসে একসঙ্গে দোষী-নির্দ্দোষীনির্ব্বিশেষে আপন আপন সন্তানকে বেশ মেরে শায়েস্তা করে যান।

কিন্তু নিতাইকে কেউ মারে না, বকে না, কিচ্ছু না। বরং কোনো ছেলে যদি ছেলেমানুষী ঝগড়া করে, অমনি সবাই বলেন, "ছিঃ, ওর সঙ্গে ঝগড়া কোরো না," কিংবা "ওকে মার্‌তে নেই।"

ছেলেরা মনে মনে চটে,—ভাল জ্বালা, ও কে? ও কোন্ 'নবদ্বীপচন্দ্র'? কেউ বা চুপ ক'রে থাকে, কেউ বলে, 'কেন? ও বুঝি ঝগড়া করে না?'

জননীরা প্রশ্নের জবাব দেন না, শুধু আদেশ করেন, উপদেশ দেন।

মামারা কাকারা খাবার খেল্‌না জামা-কাপড় এনে আগে দেন ওকে, তারপর সবাইকে। সবাই চুপ ক'রে থাকে; কিন্তু নিতাইকে ভাল লাগাও তাদের পক্ষে অসম্ভব হ'তে থাকে।

নিতাইয়ের একঘর খেলনা, সাজানো প'ড়ে থাকে। ভয়ে কেউ খেলে না, ও-জিনিষ না নিয়ে নির্লোভীর মতন খেলা ক'রে কে চলে আস্‌তে পারে? কাজেই সেগুলো পড়ে থাকে। সে ওদের ডাকে খেল্‌তে, রাজার মতন সব ঐশ্বর্য্য দান ক'রে দেয়।

সন্ধ্যাবেলা সবাই মার কাছে যায়, কারও-বা খিদে পায় কারও ঘুম। মা'রা ছেলেদের নিয়ে তাদের প্রয়োজন সাধন করেন। নিতাই ঘুরে ঘুরে বেড়িয়ে এসে ঠাকুমার পূজার ঘরের কাছে দাঁড়ায়। ঠাকুমা বলেন, "এই যে যাই দাদা, হয়েছে যাই।"

বিছানায় উঠে সে দু'হাত দিয়ে ঠাকুমাকে জড়িয়ে শুয়ে থাকে। 'আচ্ছা ঠাকুমা, আমি তোমায় 'মা' বলি না? সবাই তো মা বলে মাদের, তুমি তো আমার মা!

ঠাকুমা ব্যাকুল হয়ে ওঠেন, ওকে জানানো হয় নি ওর মা নেই। "হ্যাঁ দাদা মা বোলো, তবে আমি তোমার বাবার মা।"

"বাবার মা কি নিজের মা হয় না?" নিতাই প্রশ্ন করে।

'হয় বইকি ধন,' উত্তর দিতে চোখে জল আসে। আকাশে তারা ঝিকমিক করে, নিতাই তাকিয়ে থাকে জানলা দিয়ে বাইরে। আবার কি ভাবে, বলে, "আচ্ছা ঠাকুমা, আমার ওই রকম খুড়ীমাদের মতন গয়না কাপড় পরা মা নেই কেন? তোমার মতন মা কেন? আমার ঐ রকম মা বেশ লাগে।"

ঠাকুমা কাতর হয়ে বলেন, "আছে বইকি বাবা, সেই রকম মা; শোনো সেই কড়িগাছের গল্প শোনো।"

গল্প আরম্ভ হয়—সেই কড়িগাছ,—হালুম করে বাঘের আগমন, সেই বামুনদের মেয়ে, তার ভাই, মা বাঘের মুখে গরম ফেন ঢেলে দেওয়া···

নিতাইয়ের গম্ভীর মুখে হাসি ফোটে; ওর মন রচনা করে,—লালপেড়ে কাপড় পরা, ঘোমটা দেওয়া রান্নাঘরে থাকা একজন মা, দিদিদের মত সুন্দর একটি বামুনদের মেয়ে,—তারপর অন্যমনে ঘুমিয়ে পড়ে।

২

বাবা কাকারা বলে, "মা, নিতের লেখাপড়া হচ্ছে না, আর আদর দেওয়া নয়—ওর পরকাল নষ্ট করছ তুমি!"

পিতামহী নির্ব্বাক হয়ে থাকেন, বেশ বুঝতে পারেন নিজের দুর্ব্বলতা, কিন্তু মন কথা শুনতে একেবারে বিমুখ।

নিতাই উন্মনা, আপন মনে ঘোরে ফেরে। সকল ছেলে পড়তে বসে, না পড়লে বাপের কাছে ধমক খায়, মার কাছে শাসিত হয়।

নিতাই নিরঙ্কুশ। তবু ভাবে, "আচ্ছা, তবে কি ঐ রকম ঘোমটা দেওয়া, শাড়ী-পরা মা'রা মারে, আর এই রকম ঠাকুমা ব'লে ডাকা মা'রা মারে না? মারলেই বা মা'রা! ওরা ত ভালই। ওই ত কানাইয়ের মা, লালুর মা কত আদরও করে···"

পড়াশোনা হয় না। দুরন্তপনাও করে না, খেলাও করে না; খেলনা তার অনেক সাজানোই থাকে।

কাজের বাড়িতে গোলমাল, সব ব্যস্ত। ঠাকুমা বাড়ির গিন্নি, তাঁর নিঃশ্বাস ফেলবার সময় নেই।

কতরাত্রে সকলের খাওয়া শোওয়া হ'লে ঠাকুমা বিছানায় ঢুকে বিছানা খালি দেখলেন, ডাকলেন, "হ্যাগা বৌমা, নিতাই কোথায়?"

অনেক খোঁজের পর দেখা গেল বৈঠকখানার ঘরে একটা তাকিয়ার পাসে সে ঘুমুচ্ছে।

জ্যেঠীমা পিসিমা খুড়ীরা সব এসে দাঁড়িয়েছিলেন, জ্যেঠীমা বললেন, "ওমা, তাই ত, আহা! মা ত আজ আসতে সময় পাওনি, তাইতে ও আর ওপরে ওঠেই নি!" নবাগতা ছোট পিসিমা ছিলেন দাঁড়িয়ে, বললেন, "আহা, মা নেই কি-না—আপনিই কেমন হয়ে থাকে।"

ঘুমটা ভেঙে গিয়েছিল, সন্ধ্যেয় পরা মখমলের জামাটা ছাড়তে ছাড়তে সে চকিত হয়ে পিসিমার দিকে চাইলে, তারপর ঠাকুমার দিকে।

ঠাকুমা কন্যাকে ইঙ্গিতে থামিয়ে দিলেন। নিতাই চুপ ক'রে শুয়ে পড়ল। তবে সত্যি মা নয়, ঠাকুমাই? সারারাত্রি একটি বধূ-মায়ের স্বপ্ন নিতাইকে ঘিরতে লাগল।

ভোরের আলোয় ঠাকুমার পাশে শুয়ে সে জাগল। সেদিনও জিজ্ঞাসা করলে, "হ্যাঁ ঠাকুমা, আমার বুঝি একজন মা ছিল? ঐ রকম গহনা কাপড় পরা? কোথায় তিনি?"

আকস্মিক অতর্কিত প্রশ্নে পিতামহী বিব্রত হয়ে বললেন, "কে বললে তোমায়?"

"ঐযে পিসিমা, তাঁকে আনাও না একদিন ঠাকুমা?"

ঠাকুমা তেমনি বিচলিত ভাবেই বললেন, "হ্যাঁ, আসবে বইকি। এই বলব'খন আসতে। এখন এস, খাবার খাও, আমার সঙ্গে যাবে? গঙ্গায় একটা ডুব দিয়ে আসিগে, কেমন?

ঘাটেও কত ছেলে, সবারই ত মা? কেউ ত ঠাকুমা বলে মাকে ডাকে না। অনেক মাটির পুতুল সিঁড়িতে একটি বুড়ী বিক্রি করছে; ছেলেকোলে-মা একটি পুতুল সে এক পয়সা দিয়ে কিনলে।

নিতাই জলে অর্দ্ধনিমজ্জিতা পূজারতা পিতামহীকে প্রশ্ন করলে, "আমি এইটে নিই ঠাকুমা, এই মা-টি?"

ঠাকুমার জলার্ঘ্য পড়ে গেল, মন্ত্র ভুল হয়ে গেল। পার্শ্ববর্ত্তিনী একজন বৃদ্ধা বললেন, "আহা, খোকাটির বুঝি মা নেই।"

ঠাকুমা ইঙ্গিতে সজলনেত্রে বললেন, "নেই।"

নিতাই ঘাটের সিঁড়িতে উপস্থিত সমবয়সী একটি বালককে জিজ্ঞাসা করলে,—"ও কে হয়—তোমার মা বুঝি?"

"হ্যাঁ।"

"ঠাকুমা-মা?"

বালক সবিস্ময়ে বললে, "ঠাকুমা কেন—ও ত মা?"

আহ্নিক সেরে ঠাকুমা ডাকলেন, "ও নিতাই, ডুব দিবি একটা?"

কল্পনা ভাবনার সূত্র ছিঁড়ে সাগ্রহে নিতাই জলে নেমে গেল।

৩

মাষ্টার-মশাই পড়াতে আসেন। ও পড়ে না, কথাও কারুর শোনে না, খেলাও করে না। আপন মনে কি ভাবে, কি স্বপ্ন দেখে, কে জানে? খাবার খেতেও আসে না, চায়ও না কিছু।

সবাই ডাকেন, "ও নিতু, খাবার খা..."

"ওরে, নিতু দুধ খায়নি যে।" সবার আগে নিতাইয়ের সব রাখা হয়, তবু নিতাইকে পাওয়া যায় না!

নিতু আসে আর চলে যায়।

মাষ্টারের কাছে পড়া করে না, মন দেয় না। সন্ধ্যেবেলা জননীর গল্পের আসরে কাকা এসে বললেন, "দেখ্ছ মা, নিতের পড়াশোনা? কিছু পারে না! মা নেই ব'লে কি 'গোমুখ্যু' করে রেখে দেবে? ওর উপকারটা তাতে কি হবে শুনি? তোমার নাম ক'রে পালিয়ে আসে প্রায়ই।"

পিতামহী বিরক্ত মুখে ব্যাকুল কণ্ঠে পুত্রকে বললেন, "আহা, কি বকিস যে..."

কাকা অপ্রতিভ হয়ে চলে গেলেন।

নিতাই ঠাকুমার পাশে চুপ ক'রে শুয়ে ছিল, মা তবে নেই? কোথায়? স্বর্গে? আকাশভরা তারা; স্বর্গ কোন্‌খানে?...কি রকম মা,—গহনা কাপড় পরা খুড়ী-মা, না ছোট মাসীর মতন! আদর করতেন সেই মা? খাবার দিতেন—সে তাঁর কাছে শুতো? কোথায় তিনি?

ঠাকুমা গল্পের ছিন্ন সূত্র তুলে নিয়ে বলতে লাগলেন, "তার পরে হাঁড়িটি ভাসতে ভাসতে নদীর তীরে সেই বুড়ো মালীর ঘাটের সিঁড়িতে গে' ঠেকে... ..। ও দাদা, ও মানিক, এইবার খেতে যাও, রূপকথা শেষ আজ আর হবে না, ঘুমিয়ে পড়েছ।"

"দুষ্টুমী ক'রে মটকা মেরে পড়ে থাকে না, ছিঃ!" আবার বলেন পিতামহী।

ধ্যানমগ্ন বালক কখন স্বপ্ন দেখতে দেখতে ঘুমিয়ে পড়েছে। ঠাকুমা চোখের কাছে নীচু হয়ে দেখলেন, দু' ফোঁটা জল চোখের পাশ থেকে গড়িয়ে এসেছিল, তখনও শুকোয় নি।

তারপর থেকে উন্মন মাতৃহীন বালক সংশয়হীন হয়ে পড়ায় মন দিতে বসে, শ্রম না করিলে লেখাপড়া হয় না......যে লেখাপড়া করে না কেহ তাহাকে ভালবাসে না...।

মহিলা-সংবাদ

শ্রীমতী পিলু এম্ বেসববালা লীড্‌স্ বিশ্ববিদ্যালয়ের মাষ্টার অফ এডুকেশন, এই উপাধি পাইয়াছেন। লীড্‌সে যাইবার পূর্ব্বে তিনি ব্রিষ্টল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা-বিষয়ক ডিপ্লোমা পাইয়াছিলেন।



পুণার ভারতীয় নারী বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন নূতন গ্রাজুয়েট, মধ্যস্থলে বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলার স্যর সি. ভি. মেহ্‌তা, ও মান্দ্রাজ ব্যবস্থাপক সভার ভূতপূর্ব্ব ডেপুটী প্রেসিডেন্ট ডাঃ শ্রীমতী মুথুলক্ষ্মী রেড্‌ডী দাঁড়াইয়া আছেন।



শ্রীমতী মায়ালতা সোম



শ্রীমতী পিলু এম্ বেসববালা

শ্রীমতী মায়ালতা সোম—

বাংলা দেশ হইতে ইনিই প্রথম ডাঃ কুমারী মন্তেসরীর শিক্ষা-প্রণালীর ডিপ্লোমা লইবার জন্য লণ্ডনে যাইতেছেন। লণ্ডনে একটি মন্তেসরী সঙ্ঘ আছে; হ্যাম্পষ্টেড পল্লীতে তাহার প্রধান কেন্দ্র। এই স্থানে প্রতি বৎসর একটি ক্লাস খোলা হয় এবং কুমারী মন্তেসরী নিজে আসিয়া সেই ক্লাসের অধ্যাপনার কাজ করেন। রোম ছাড়া আর কোথাও এখন এইরূপ ক্লাস নাই, সেজন্য ইউরোপ হইতে অনেক শিক্ষয়িত্রী লণ্ডনে আসিয়া ডিপ্লোমা লইয়া যান।

কুমারী মায়ালতা সম্ভ্রান্ত খৃষ্টান-বংশের কন্যা; পরলোকগত জয়গোবিন্দ সোম মহাশয় ইঁহার পিতা। শ্রীমতী মায়ালতা ব্রাহ্মবালিকা শিক্ষালয়ে ট্রেনিং বিভাগের শিক্ষয়িত্রীর কাজ অতি যত্ন ও নিপুণতার সহিত সম্পন্ন করিতেছিলেন।



ভারতবর্ষ

বিমানচারী সমিতি—

সাঁতার কাটা, বাচ খেলা, অশ্বারোহণ, পর্ব্বতারোহণ সভ্য সুস্থ মানুষের ক্রীড়ার মধ্যে গণ্য। ভের্সাই সন্ধির ফলে যুদ্ধে প্রযুক্ত এরোপ্লেনের ব্যবহার বন্ধ হইয়া গেলে জার্ম্মানগণ বিমানে বেড়াইবার নূতন ফন্দি আঁটিয়াছিল। তাহারা ছোট ছোট যন্ত্রবিহীন (motorless) এরোপ্লেন নির্ম্মাণ করিল, এবং চারিদিকে মণ্ডলী স্থাপন করিয়া বিমান বিহার অভ্যাস করিতে লাগিয়া গেল। অন্য দশ-বিশটা খেলার মত ইহাও এখন একটা খেলার বিষয় হইয়াছে। ইহাতে যে শুধু জার্ম্মানীর বিমান-বিহারস্পৃহা তৃপ্ত হইতেছে তাহা নয়, বিমানারোহণের অভ্যাসও অব্যাহত রহিয়াছে। এখন আমেরিকা, ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশেও বিমানচারী সমিতি স্থাপিত হইয়াছে। জার্ম্মানীতে শিক্ষাপ্রাপ্ত শ্রীযুক্ত পি-এম্ কাবালি বোম্বাই শহরে সম্প্রতি এইরূপ একটি বিমানচারী সমিতি (The Indian Gliding Association) স্থাপিত করিয়াছেন। ভারতবাসীকে বিমানবিহার শিক্ষা দেওয়াই এই সমিতির উদ্দেশ্য। এই খেলায় যেমন আমাদের সাহস বাড়িবে, আত্মরক্ষার একটি উপায়ও তেমনই আমাদের আয়ত্ত হইবে। ভারতবাসীমাত্রেরই এই সমিতির সহিত সহযোগিতা করা বাঞ্ছনীয়।

Alice Building, Fort, Bombay—এই ঠিকানায় পত্র ব্যবহার করিলে সমিতির বিষয় জানা যাইবে।

—

আতুরাশ্রম।—

"সঞ্জীবনী" লিখিয়াছেন :—

"প্রায় ৪০ বৎসর পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, ৺ইন্দুভূষণ রায় ৺মৃগাঙ্কধর রায় চৌধুরী, শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র রায় চৌধুরী প্রমুখ ব্রাহ্ম যুবক ও সহানুভূতিকারিগণ দাসাশ্রম স্থাপন করিয়াছিলেন। নিরাশ্রয় বৃদ্ধ ও বিকলাঙ্গ নরনারীদের ভরণপোষণ করিয়া তাঁহারা জীবনের মহাব্রত উদ্‌যাপন করিতেন। কালক্রমে উদারমনা শ্রীযুক্ত আনন্দমোহন বিশ্বাস উঁহাদের সঙ্গে মিলিত হইয়া আশ্রমের সেবাকার্য্যে আত্মনিয়োগ করেন। বিশ্বাস মহাশয় ছিলেন খৃষ্টান সন্ন্যাসী। ক্রমে তিনিই আশ্রমের একমাত্র পরিচালক হইয়াছিলেন। তাঁহারই সময়ে বৃহৎ বাড়ী ও অর্থসঞ্চয় হইল। ইহাই বোধ হয় আশ্রমের পতনের কারণ হইয়াছিল। অবশেষে রায় বাহাদুর প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়ের হাতে ইহার কার্য্যভার পতিত হইয়াছে।

"গত মঙ্গলবার (১২ই শ্রাবণ) ১২৫ বহুবাজার ষ্ট্রীটে আশ্রমের বাড়ীতে উহার বার্ষিক অধিবেশন হইয়াছিল। স্যর চারুচন্দ্র ঘোষ সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন।

"গত বৎসর ২৪২ জন আতুর ঐ আশ্রমে ভর্ত্তি হইয়াছিলেন। আশ্রমবাসীদের মধ্যে ১৫১ জনকে তাহাদের আত্মীয়স্বজনের নিকট দেওয়া হইয়াছে, ৭২ জনকে বিদায় দেওয়া হইয়াছে, ৩৩ জন মারা গিয়াছে। আশ্রমবাসী ব্যতীত অনাহারক্লিষ্ট ব্যক্তিদিগকেও খাইতে দেওয়া হইয়াছে। সারা বৎসরে ৩৯৮৮ ব্যক্তিকে একবার করিয়া ভোজন করান হইয়াছে।

"আশ্রমের আয় কমিয়াছে, গবর্ণমেণ্টের সাহায্য বন্ধ হইয়াছে। কর্পোরেশন প্রতি বর্ষে ৫,০০০৲ টাকা সাহায্য দেন। অতি কষ্টে দিন চলিতেছে।

"আতুরাশ্রমকে রক্ষা করিবার জন্য সকলেরই চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।"

দাসাশ্রমের কাজের যাঁহারা সূত্রপাত করেন, তাঁহাদের মধ্যে ব্রাহ্মসমাজের ৺ক্ষীরোদচন্দ্র দাসও ছিলেন; রামানন্দবাবু তাঁহাদের মধ্যে প্রথম হইতেই ছিলেন না। তিনি ইহার সূত্রপাতের অল্পকাল পর ইহার পরিচালকসমিতির সভাপতি মনোনীত হন। ১৮৯৫ সালে সেপ্টেম্বর মাসে এলাহাবাদ চলিয়া যাওয়া পর্য্যন্ত তিনি সভাপতির কাজ এবং দাসাশ্রমের মুখপত্র "দাসী" মাসিক পত্রিকার সম্পাদকের কাজ করেন। তিনি এলাহাবাদ চলিয়া যাইবার কিছুকাল পরে নানা কারণে শ্রীযুক্ত আনন্দমোহন বিশ্বাসের হাতে প্রতিষ্ঠানটির ভার পড়ে। "দাসী" কাগজখানির সম্পাদনের ভারও অন্য কাহারও কাহারও হাতে গিয়া পড়ে ও পরে উহা উঠিয়া যায়।

শ্যাম দেশে বাঙালী—

শ্রীযুক্ত মহম্মদ আজিজুল হক্ শ্যাম দেশের বাঙ্কক্ হইতে আমাদিগকে জানাইয়াছেন—কলিকাতায় বুদ্ধ গয়ার বৌদ্ধচিত্রালয়ের সত্ত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ রায় বি-এ, এম-আর-এ-এস, তাঁহার চিত্রগুলি প্রচার কল্পে সম্প্রতি এখানে পদার্পণ করিয়াছেন। সিংহলে ও ব্রহ্মদেশে রায়-মহাশয়ের চিত্রগুলির বহুল প্রচার আছে। ভারতবাসী মাত্রেই শুনিয়া সুখী হইবেন যে তাঁহার চিত্রগুলি এখানেও আদৃত হইয়াছে। পরমপূজনীয় প্রিন্স ডুম্বং,—বিদ্যা বুদ্ধি বিনয় সৌজন্যে যাঁহার ন্যায় লোক শ্যাম রাজ্যে নাই বলিলেই চলে—ভারতীয় শিল্পকলা বিশেষ পছন্দ করেন। ইঁহারই অনুমত্যনুসারে রায়-মহাশয়ের চিত্রগুলি শ্যামের জাতীয় মিউজিয়মে দেখান হইতেছে। খ্যাতনামা শিল্পী প্রিন্স নরিসা রায়-মহাশয়ের চিত্রাগারে পদার্পণ করিয়া স্বহস্তে সার্টিফিকেট এবং আশীর্ব্বাদ-বাণী দিয়া গিয়াছেন। শিক্ষামন্ত্রী প্রিন্স ধানী চিত্রগুলি বিদ্যালয়ে বুদ্ধজীবনী শিক্ষার পক্ষে উপযুক্ত মনে করিয়া তৎসম্বন্ধে সমস্ত বিদ্যালয়ে জানাইয়াছেন।

মহাস্থবির প্রিন্স জিনভারা রায়-মহাশয়ের ভারতীয় চিত্রগুলির বিশেষ প্রশংসা করিয়াছেন। রায়-মহাশয়ের এই সম্মানে প্রবাসী ভারতবাসী মাত্রেই সুখী এবং গৌরবান্বিত। এই শ্রেণীর শিক্ষিত লোক মাঝে মাঝে এখানে আসিলে দেশের ও প্রবাসী ভারতবাসীদের গৌরব বৃদ্ধি হয়, সন্দেহ নাই।

শ্যামদেশ এখন শিল্পকলায়, সাহিত্য এবং বিজ্ঞান ইত্যাদিতে অতীব উন্নতি লাভ করিয়াছে। প্রবাসী হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, চীনা ইত্যাদি সকলেই এখানে সুখে সদ্ভাবে বাস করিতেছে। ভারতে হিন্দু-মুসলমানের অনর্থক বিসম্বাদের কথা কাগজে পড়িয়া চক্ষে জল আসে। বহু দূরে বহু বৎসর যাবৎ রহিয়াছি। ভগবান দেশের মঙ্গল করুন, এই প্রার্থনা।

মোটর সাইকেল চালনায় কৃতিত্ব—

শ্রীযুক্ত বিনোদ চট্টোপাধ্যায় হাওড়া কানভালে মোটর সাইকেল



শ্রীবিনোদ চট্টোপাধ্যায়

যোগে বিশেষ কৃতিত্বের সহিত মৃত্যুকূপ (well of death) পরিক্রমণ করিতেছেন। বৃত্তাকার মাঠের দেওয়ালের পার্শ্ব দিয়া বরাবর অতিক্রত দৌড়ানই এই খেলার বিশেষত্ব। এই খেলায় সাহস ও শক্তির প্রয়োজন।

ভবানীপুর ব্যায়াম সমিতি—

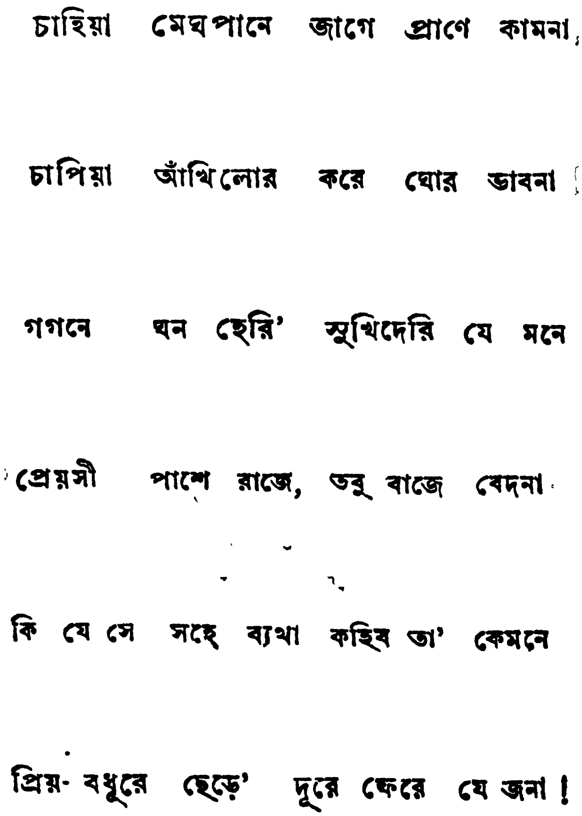
হরিশ মুখুজ্যে রোডে স্থিত ভবানীপুর ব্যায়াম সমিতির ছেলেদের নানা প্রকার ব্যায়াম আমরা দেখিয়াছি। ছোট ছোট ছেলে হইতে যুবক পর্য্যন্ত অনেকে নানাবিধ ব্যায়ামে নৈপুণ্য লাভ করিয়াছে। তাহাতে তাহাদের স্বাস্থ্যেরও উন্নতি হইতেছে। শিক্ষার্থী ছেলেদের সংখ্যা ক্রমাগত বাড়িয়া চলায় কর্তৃপক্ষ এখন বিস্তৃততম ব্যায়ামভূমির অনুসন্ধান করিতেছেন। কলিকাতা মিউনিসিপালিটি ইঁহাদের অভাব পূর্ণ করিলে জমীর সদ্ব্যবহার হইবে।

পরলোকে কবি বিহারীলাল গোস্বামী—

ষাট বৎসর বয়সে কবি বিহারীলাল গোস্বামীর মৃত্যু হইয়াছে। তিনি ত্রিশ বৎসরের উপর পাবনা জেলার পোতাজিয়া হাই স্কুলের

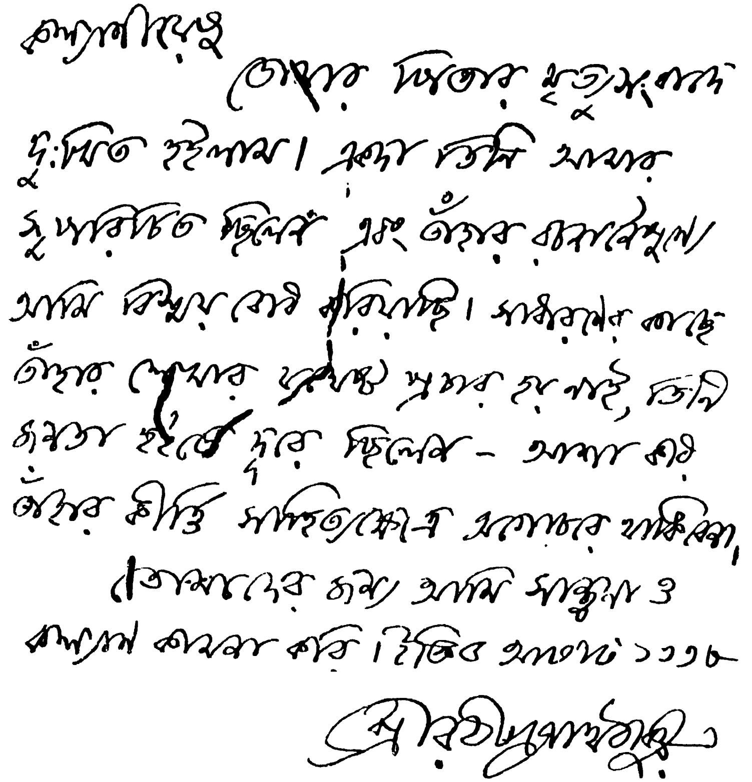


কবি বিহারীলাল গোস্বামী



চাহিয়া মেঘপানে জাগে প্রাণে কামনা,
চাপিয়া আঁখিলোর করে ঘোর ভাবনা;
গগনে ঘন হেরি' সুখিদেরি যে মনে
প্রেয়সী পাশে রাজে, তবু বাজে বেদনা
কি যে সে সহে ব্যথা কহিব তা' কেমনে
প্রিয়-বধূরে ছেড়ে' দূরে ফেরে যে জনা!

বিহারীলালের হস্তলিপি


কল্যাণীয়েষু
তোমার পিতার মৃত্যুসংবাদে দুঃখিত হইলাম। একদা তিনি আমার সুপরিচিত ছিলেন এবং তাঁহার রচনানৈপুণ্যে আমি বিস্ময় বোধ করিয়াছি। সাধারণের কাছে তাঁহার লেখার যথোচিত প্রচার হয় নাই, তিনি খ্যাতি হইতে দূরে ছিলেন— আশা করি তাঁহার কীর্ত্তি সাহিত্যলোকে অগোচরে থাকিবে না, তোমাদের জন্য আমি সান্ত্বনা ও কল্যাণ কামনা করি। ২৮শে শ্রাবণ ১৩৩৮
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

হেডমাষ্টার ছিলেন। সাহিত্য সাধনার ক্ষতি হইবে ভয়ে তিনি অন্য কোনো বিভাগে চাকুরী গ্রহণ করেন নাই। শিক্ষকতা করিবার সময় তিনি বাংলা পদ্যে মেঘদূত ও কুমারসম্ভবের অনুবাদ করেন। রবীন্দ্রনাথ সম্পাদিত বঙ্গদর্শনে তাহার অনেকাংশ প্রকাশিত হয়। তিনি চিত্রাঙ্কনে পটু ছিলেন। তাঁহার অঙ্কিত চিত্রসহ মেঘদূতের কিয়দংশ প্রদীপে প্রকাশিত হয়।

ছন্দে তাঁহার আশ্চর্য্য রকম অধিকার ছিল। সংস্কৃত ছন্দগুলি বিশেষভাবে তাঁহার আয়ত্ত ছিল। তিনি বাংলায় মন্দাক্রান্তা ও মালিনী ছন্দে কিছু কিছু কবিতা লিখিয়াছিলেন।

তাঁহার হাতের লেখা ছাপার অক্ষরের মত ছিল। তাঁহার অনূদিত মেঘদূতের কয়েক ছত্র তাঁহার হাতের লেখায় কেমন দেখায় তাহার নমুনা দেওয়া গেল।

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার কবিত্বের প্রশংসা করিতেন। কুমারসম্ভবের অনুবাদের পাণ্ডুলিপি তাঁহার কাছে সংশোধনের জন্য পাঠাইলে তিনি লিখিয়াছিলেন—"আপনি যে দুঃসাধ্য কাজে আশ্চর্য্য সফলতা লাভ করিয়াছেন তাহা আমাদের কাহারও দ্বারা সম্ভব হইতে পারে বলিয়া আমি মনে করি না অতএব ইহার সংশোধন চেষ্টা করিতে গেলে বিকৃতি ঘটাইবার সম্ভাবনা" ইত্যাদি।

মেঘদূত সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছিলেন—"এরূপ কঠিন ছন্দে এতগুলি মিল সামলাইয়া আপনি যে দুরূহ অনুবাদ এতদূর সুসম্পন্ন করিয়া তুলিয়াছেন তাহাতে ভাষার উপর আপনার আশ্চর্য্য ক্ষমতা প্রকাশ হইয়াছে।" ইত্যাদি।

গীতাবিন্দু নাম দিয়া তিনি সমগ্র গীতার অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছিলেন।

তিনি পারসিক ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। তিনি সেখ সাদীর বান্দ-নামার পদ্যানুবাদ কিছুদিন পূর্ব্বে প্রকাশ করিয়াছেন।

তিনি অত্যন্ত সাদাসিদা ভাবে থাকিতেন। অহঙ্কারের লেশমাত্র তাঁহার ছিল না। তিনি সম্পূর্ণরূপে গোঁড়ামি বর্জ্জিত ছিলেন। মানুষকে জাত হিসাবে না দেখিয়া মানুষ হিসাবে দেখিতেন।

তিনি পারস্য ভাষার প্রথম পাঠ রচনায় নিযুক্ত ছিলেন কিন্তু সমাপ্ত করিতে পারেন নাই। অধিক বয়সেও পাঠানুরক্তি এত প্রবল ছিল যে, একবার পারস্য সাহিত্যে এম-এ পরীক্ষা দিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিলেন কিন্তু উপাধির উপর কোনো মোহ ছিল না বলিয়া দেন নাই।

তাঁহার মৃত্যু সংবাদে তাঁহার পুত্র শ্রীমান্ পরিমল গোস্বামীকে রবীন্দ্রনাথ দার্জ্জিলিং হইতে উপরে উদ্ধৃত চিঠিখানি দিয়াছেন।

বিমান-বিহারে বাঙালী যুবকের কৃতিত্ব—

শ্রীহট্ট-নিবাসী সুপরিচিত চা-বাগানের স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত বি, গুপ্তের পুত্র শ্রীমান বিজয়মাধব কলিকাতার হেয়ার স্কুলে প্রথম শ্রেণীতে অধ্যয়ন করিবার সময়েই জার্ম্মানী চলিয়া যান। তিনি হামবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে মেকানিকাল ও ইলেক্‌ট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ারীং শিক্ষায় তিনি রত আছেন। পুথিগত বিদ্যা ছাড়া ইতিমধ্যেই তিনি বিমান-বিহারেও কৃতিত্ব অর্জ্জন করিয়াছেন। বিজয়মাধব হামবুর্গের নর্থ জার্ম্মান ফ্লায়িং ক্লা

যোগদান করেন। জার্ম্মানীতে বিমান-বিহার শিক্ষার ইহা একটি কেন্দ্র। অল্পকাল মধ্যে বিজয়মাধব এই ক্লাবের প্রাথমিক পরীক্ষায় কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হইয়াছেন এবং পুরস্কার স্বরূপ স্বর্ণ চূড়া যুক্ত টুপী ব্যবহারের সম্মান লাভ করিয়াছেন। ভারতবাসীদের মধ্যে তিনি সর্ব্বপ্রথম এই সম্মান প্রাপ্ত হইলেন।



বিমানচারী বন্ধুগণ সহ শ্রীবিজয়মাধব গুপ্ত

ডক্টর অমিয়াংশুকুমার দাশগুপ্ত—

ঢাকা জিলার ভাটপাড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত অমিয়াংশুকুমার দাশগুপ্ত ইংরেজী সাহিত্যে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছেন। তিনি এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ে সুপণ্ডিত অধ্যাপক গ্রিয়ার্সনের তত্ত্বাবধানে ইংরেজী সাহিত্যে গবেষণা করেন এবং তথা হইতে এই বিষয়ে ডক্টর উপাধি লাভ করেন। সপ্তদশ শতাব্দীর গীতি-কবিতা, ছড়া, গাথা প্রভৃতি তাঁহার গবেষণার বিষয় ছিল। অধ্যাপক গ্রিয়ার্সন এবং ডাঃ জর্জ্জ কিচেন তাঁহার কার্য্যে মুগ্ধ হইয়া ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন।

বিধবাবিবাহ—

গত ২৫শে মে সোমবার ২৪ পরগণার অন্তর্গত কাঁচড়াপাড়া গ্রামনিবাসী শ্রীযুক্ত কালিচরণ সরকার মহাশয়ের সহিত পাবনা জেলার ভোরারা গ্রামনিবাসী পেয়ারীমোহন সরকার মহাশয়ের বালবিধবা কন্যা শ্রীমতী মণিমালা সরকারের শুভবিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত শশিভূষণ চক্রবর্ত্তী মহাশয় পৌরোহিত্য করিয়াছিলেন।

গত ১৫ই জ্যৈষ্ঠ তারিখে যশোহর জেলার বনগ্রাম মহকুমার গোপালপুর গ্রামে রাজবংশী ক্ষত্রিয় সমাজে, শ্রীযুক্ত গিরিজাকান্ত



ডক্টর অমিয়াংশুকুমার দাশগুপ্ত

গোস্বামী কাব্য-সাংখ্য-স্মৃতিতীর্থ মহাশয়ের পৌরোহিত্যে নিম্নলিখিত ছয়টি বিধবা বিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে :—

১। গোপালপুর নিবাসী শ্রীনীলমাধব অধিকারীর সহিত উক্ত গ্রামের শ্রীমতী ভানুমতী দেবীর। বয়স :—৩০ বৎসর ও ১৮ বৎসর

২। ২৪পরগণার চারঘাট নিবাসী শ্রীকালীপদ মণ্ডলের সহিত গোপালপুর গ্রামের শ্রীমতী হরিমতী দেবীর। বয়স ২০ ও ১২ বৎসর

৩। ডহরপোতা নিবাসী শ্রীফকিরচাঁদ বর্ম্মনের সহিত ঘিবা গ্রামের শ্রীমতী কিশোরীবালা দেবী।

৪। ঘিবা নিবাসী শ্রীরতিকান্ত বিশ্বাসের সহিত উক্ত স্থানের শ্রীমতী শিবানী দেবী।

৫। সাসা নিবাসী শ্রীজুড়ানচন্দ্র মণ্ডলের সহিত ঘিবা নিবাসী শ্রীমতী কালা দেবী।

৬। আরমডাঙ্গা নিবাসী শ্রীশ্যামাচরণ বর্ম্মণ মহাশয়ের সহিত চটকপোতা গ্রামের শ্রীমতী তরঙ্গিনী দেবী।

দ্বীপময় ভারত

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

[১৮] প্রাম্বানান্

রবিবার, ১৮ই সেপ্টেম্বার।—

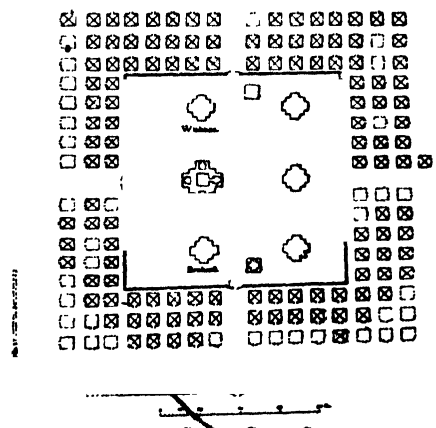
আটটায় তাম্রচূড় বা কোপাস্‌বুব্যাগ, ধীরেনবাবু সুরেনবাবু আর আমি এক মোটরে রওনা হ'লুম যোগ্যকর্ত্তর উদ্দেশে। একটী ওলন্দাজ মেয়ে ডাক্তার যোগ্যকর্ত্তয় যাচ্ছেন, তিনিও সঙ্গে ছিলেন। কবি পরে যাত্রা ক'রবেন—শহরকর্ত্তয় একটী নোতুন রাস্তা হ'য়েছে, এই রাস্তা কবি সাধারণের জন্য উন্মুক্ত ক'রবেন, রাস্তাটীর নাম-করণ হবে কবির নামে—Tagorestraat; মঙ্কুনগরো এই অনুষ্ঠানটী কবিকে দিয়ে করিয়ে' নেবেন। পথে প্রাম্বানান্-এর মন্দিরে কবির জন্য আমরা অপেক্ষা ক'রবো, সেখানে তাঁর সঙ্গে আমরা মিলিত হবো।



যোগ্যকর্ত্ত—রবীন্দ্রনাথ কর্ত্তৃক নূতন রাস্তার প্রতিষ্ঠা
(সঙ্গে টুপী-মাথায় মঙ্কুনগরো)
[শ্রীযুক্ত বাকে-কর্ত্তৃক গৃহীত]

এক ঘণ্টা মোটরে ক'রে গিয়ে বেলা ন'টা আন্দাজ আমরা প্রাম্বানান্-এ পৌছুলুম। প্রাম্বানান বর-বুদুরের মতনই যবদ্বীপের হিন্দু সভ্যতার এক চরম সৃষ্টি—তাবৎ ভারতবাসীর, বিশেষ হিন্দুর পক্ষে তীর্থস্থান ব'লে গণ্য হবার উপযুক্ত স্থান।

Prambanan প্রাম্বানান্-এ বিরাট কতকগুলি হিন্দীতে যাকে বলে 'খঁড়হর' বা খণ্ডগৃহ—অর্থাৎ বিধ্বস্ত প্রাচীন মন্দিরাদির সমাবেশ। মন্দিরগুলি পুরাণোক্ত ব্রাহ্মণ্য দেবতাদের মন্দির। উঁচু জমীতে প্রাকার-

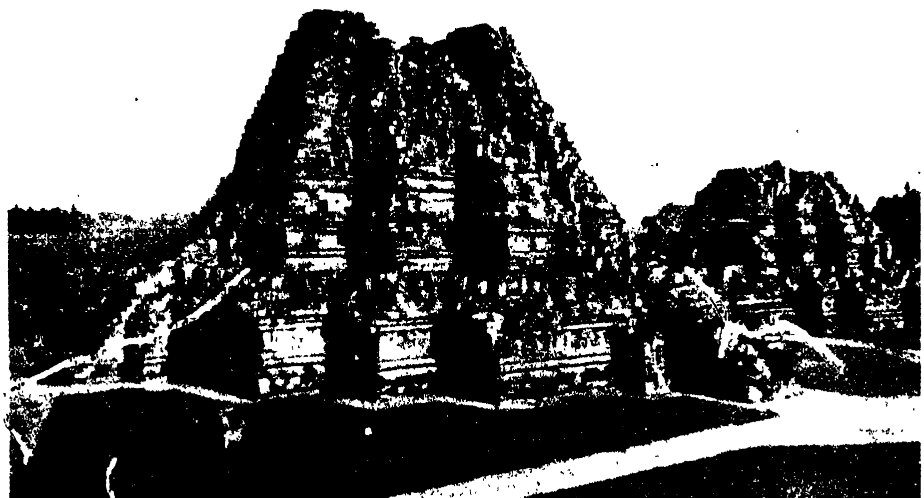


প্রাম্বানান্-তীর্থ—মন্দিরাবলীর সমাবেশ

বেষ্টিত মস্ত এক চাতাল। তার মধ্যে তিনটি বড়ো বড়ো মন্দির, খুঁব উঁচু—অনেকটা সিঁড়ি বেয়ে উঠবে মন্দিরের গর্ভগৃহে পৌছতে হয়; এই তিনটীর মাঝেরটী আবার সবচেয়ে উঁচু, বিরাট আকারের বলা চলে। এই তিনটী মন্দির পর পর সোজা উত্তর দক্ষিণ ক'রে স্থাপিত;

উত্তরেরটী বিষ্ণুর, মাঝের বড়ো মন্দিরটী শিবের, আর দক্ষিণেরটী ব্রহ্মার। এই তিনটী মন্দিরের সামনে এই তিন দেবতার তিন বাহনের মন্দিরের ভগ্নাবশেষ বিদ্যমান—বিষ্ণুর সামনে গরুড়ের, শিবের সামনে শিবের বৃষ নন্দীর, আর ব্রহ্মার সামনে হংসের; আর এ ছাড়া প্রাকারের ভিতরে চাতালের উত্তরে আর দক্ষিণে দুটী ছোটো ছোটো মন্দিরের ভগ্নাবশেষ আছে, এ দুটী কোন্ দেবতার তা এখন আর বলা যায় না। এই তো হ'ল প্রাকারের ভিতরকার কথা—ভিতরে এই আটটী মন্দির ছিল।—শিবের বিরাট মন্দিরটীই হ'চ্ছে কেন্দ্র-স্থানীয়। প্রাকারের বাইরে তিন সার আর চার সার ক'রে চারিদিকে ছোটো ছোটো মন্দির ছিল, এগুলি এখন প্রায় সবই ভেঙে-চুরে গিয়েছে; প্রাকারের বাইরের মন্দিরের সংখ্যা ছিল দেড় শ'র উপর। সমস্ত ধামটীর পশ্চিম দিকে Kali Opak 'কালি ওপাক্' ব'লে একটী ছোটো পাহাড়ে' নদী এঁকে বেঁকে গিয়েছে।

যবদ্বীপে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের এই অতি অপূর্ব্ব শিল্পসম্পদে অতুলনীয় পীঠস্থান দেখে বিস্মিত হ'য়ে যেতে হয়। আমাদের মোটর মন্দিরের সামনে রাস্তায় এসে দাঁড়াল, আমরা ছোটো একটী দেয়াল পেরিয়ে, বাইরের প্রাকার দিয়ে ঢুকে, তিন সার ছোটো মন্দির গুলির ভগ্ন প্রস্তর-স্তূপের মধ্য দিয়ে ভিতরের প্রাকার পেরিয়ে, বড়ো তিনটী মন্দিরের চাতালে এসে উপস্থিত হ'লুম। মাঝখানে শিবের বিরাট মন্দির দেখে একেবারে যেন অভিভূত হ'য়ে গেলুম। প্রাচীরের মধ্যেকার মন্দিরগুলির মাথার চূড়ো ভেঙে গিয়েছে, চাতালের মধ্যে এদিকে ওদিকে সব বড়ো বড়ো পাথরের চাবড়া প'ড়ে আছে। ডচ্ সরকারের প্রত্ন-বিভাগ এই মন্দিরগুলির যতদূর সম্ভব জীর্ণোদ্ধারের চেষ্টা ক'রছেন। বড়ো বড়ো কপি-কল র'য়েছে; তাতে ক'রে মাটি থেকে পাথর তুলে নিয়ে যথা-সম্ভব যথাস্থানে বসিয়ে দেওয়া হ'চ্ছে; এই সকল পাথরের গা কেটে কেটে চিত্র উৎকীর্ণ থাকায় এই রকম সাজানো কাজটি কতকটা সহজ হ'য়েছে। পাঁশুটে রঙের পাথরের ভগ্ন স্তূপময় এই স্থানটি দেখে কিন্তু মনটি বড়ই উদাস হ'য়ে গেল।



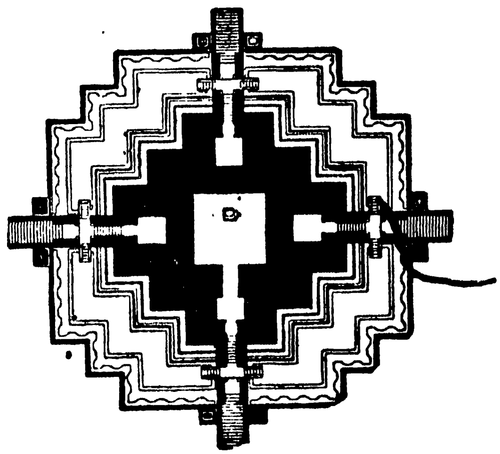
প্রাম্বানান - শিবের মন্দিরের পার্শ্বদৃশ্য ও বিষ্ণুর মন্দির

রবীন্দ্রনাথকে প্রাম্বানান ভালো ক'রে দেখবার জন্য ডচ সরকার সব চেয়ে সেরা বন্দোবস্ত ক'রেছিলেন—দ্বীপময় ভারতের প্রত্ন-বিভাগের কর্ত্তা Dr. F. D. K. Bosch ডাক্তার বস্ স্বয়ং সেখানে উপস্থিত ছিলেন, আর তাঁর সঙ্গে প্রাম্বানান্-এর পুনঃসংস্কারের কাজে নিযুক্ত ডচ ইঞ্জিনিয়ার, আমাদের পূর্ব্ব-পরিচিত প্রত্ন-বিভাগের ডাক্তার কালেন্‌ফেল্‌স্, আর আর কতকগুলি ব্যক্তি ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ শূরকর্ত্তায় একটী অনুষ্ঠান সম্পন্ন ক'রে আস্‌ছেন, তাঁর পৌছতে একটু দেরী হবে—আমরা তাঁর জন্য অপেক্ষা ক'রতে লাগলুম। ডাক্তার বস্ আর ডাক্তার কালেন্‌ফেল্‌স্-এর সঙ্গে আলাপ ক'রতে লাগলুম।

ডাক্তার বস্ আর ডাক্তার কালেন্‌ফেল্‌স্ উভয়েই বেশ পণ্ডিত লোক। ডাক্তার বস্ সংস্কৃত বেশ জানেন, যবদ্বীপের সংস্কৃত অনুশাসন অনেকগুলি সম্পাদন ক'রেছেন, ঐ দেশের প্রাচীন ইতিহাস আর সভ্যতা বিষয়ে তাঁর লেখা প্রমাণ-রূপে গণ্য হয়। ডাক্তার কালেন্‌ফেল্‌স সংস্কৃত চলনসই জানেন, কিন্তু তাঁর বিশেষ বিদ্যা হ'চ্ছে নৃ-তত্ত্ব। ডাক্তার বস্ পাতলা লম্বা একহারা চেহারার ব্যক্তি, বেশ মিশুক লোক, তবে একটু গম্ভীর ধরণের; হো হো ক'রে নিজে হাসছেন আর পাঁচজনকে নিয়ে আমোদ ক'রছেন সুবিশালকায় কালেন্‌ফেল্‌স-এর পাশে এঁকে একেবারে বিপরীত চরিত্রের ব্যক্তি ব'লে মনে হয়।

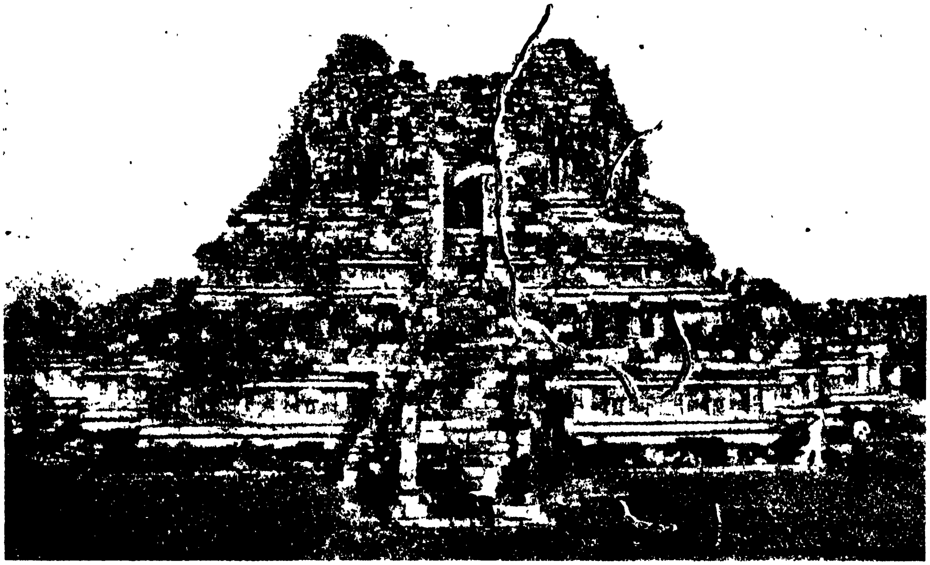
প্রাম্বানান্-এর মন্দির কটী এঁরা আমাদের দেখালেন। সব মন্দির কটী পাথরের তৈরী। মন্দিরগুলি আনুমানিক খ্রীষ্টীয় দশম শতকের তৈরী। যবদ্বীপ নবম শতকে সুমাত্রার শ্রীবিজয় দেশের শৈলেন্দ্রবংশীয় বৌদ্ধরাজাদের অধীনে ছিল; এই শৈলেন্দ্রবংশীয় রাজাদের কারো আমলে নবম শতকে বর-বুদুরের বিখ্যাত বৌদ্ধ স্তূপ তৈরী হয়। তারপরে শৈলেন্দ্রবংশীয় রাজাদের প্রতাপ খর্ব্ব হয়, খাস যবদ্বীপের রাজারা মাথা তুলে' বসেন। এঁরা ছিলেন ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মাবলম্বী, শৈব। এঁদের মধ্যে এক প্রধান রাজা ছিলেন রাজা দক্ষ; কেউ কেউ অনুমান করেন যে প্রাম্বানান-এর মন্দির-রাজি এই রাজা দক্ষেরই কীর্ত্তি। এগুলি যেন কতকটা বর-বুদুরকে টেক্কা দেবার জন্যই তৈরী করা হ'য়েছিল। খাড়াইয়ে শিবের মন্দিরটী বোধ হয় বর-বুদুরকেও অতিক্রম ক'রত।

মূল মন্দির তিনটী ভগ্ন দশায়; কিন্তু সব যায় নি। বিষ্ণু-মন্দিরের গর্ভগৃহের হানি বেশী হ'য়েছে। তিনটী মন্দিরে মানুষের চেয়ে অতিকায় পাথরে তৈরী তিনটী দেব-বিগ্রহ ছিল, তার মধ্যে বিষ্ণু-মূর্ত্তিটী আর নেই, শিব আর ব্রহ্মার মূর্ত্তি এখনও স্ব স্ব স্থানে বিদ্যমান্। বাহন তিনটীর মধ্যে কেবল শিবের বাহন নন্দী যথাস্থানে আছে—ঠিক শিবের সামনেই; আর দুটী বাহন আর নেই। থাকে থাকে এক তালার পরে আর এক তালার



প্রাম্বানান্ তীর্থ—শিব-মন্দিরের নক্শা

মতন ক'রে মন্দিরগুলি উঠেছে। শিবের মন্দিরের চার ধারে সিঁড়ি, কিন্তু বিষ্ণু আর ব্রহ্মার মন্দিরে কেবল মাত্র একধারে, পূব দিক থেকে। সিঁড়ি দিয়ে উঠে, গর্ভগৃহের চারিদিকে একটা ক'রে বারান্দার মতন —এই বারান্দাটী হ'চ্ছে এক-প্রকোষ্ঠময় গর্ভাগার প্রদক্ষিণ করার জন্য চংক্রম-পথ। তিনটী মন্দিরেই এই চংক্রম-পথ বা বারান্দার দেয়ালে ভিতরদিকে, আর বারান্দার লাগাও মন্দিরের গর্ভগৃহের দেয়ালের বাইরের দিকটায় পাথরের উপরে অপরূপ সুন্দর খোদিত চিত্রাবলী বিরাজমান। বর-বদুরের গায়ে উৎকীর্ণ এই রকম চিত্র, আর প্রাম্বানান্-এর এই চিত্রাবলী, যবদ্বীপীয় ভাস্কর্য্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন,



প্রাম্বানান্—শিব-মন্দিরের সম্মুখ দৃশ্য

হিন্দু তথা বিশ্ব শিল্প এই খোদিত চিত্রাবলীর মহিমায় উদ্ভাসিত। বিষ্ণু-মন্দিরের আর শিব-মন্দিরের গায়ে খোদা চিত্রাবলী প্রায় সবটাই অটুট অবস্থায় আছে, কিন্তু ব্রহ্মার মন্দিরের চিত্রাবলী বড়ই ভগ্ন অবস্থায়। শিব-মন্দিরের আর ব্রহ্মার মন্দিরের চিত্রাবলী রামায়ণের ; এর মধ্যে বিষ্ণুর অবতার গ্রহণের জন্য দেবতাদের অনুরোধ এই দৃশ্য, তারপর দশরথের ঘরে রামের জন্ম থেকে বানর-সৈন্য কর্ত্তৃক সেতুবন্ধ আর সাগর পার হওয়া—এই পর্য্যন্ত দৃশ্য-গুলি সুন্দর ভাবে রক্ষিত আছে। ডচ্ প্রত্ন-বিভাগ এই চিত্রগুলিকে চমৎকার ভাবে ছাপিয়ে সস্তায় প্রকাশিত ক'রেছেন। বিষ্ণু-মন্দিরে আছে কৃষ্ণায়ণ বা কৃষ্ণ-লীলা-বিষয়ক চিত্রাবলী—এগুলি এখনও প্রকাশিত হয় নি। রামায়ণের ছবিগুলি সুপরিচিত ['প্রবাসী' পত্রিকায় ইতিপূর্ব্বে এগুলি প্রকাশিত হ'য়ে গিয়েছে—১৩৩৪ সালের আশ্বিন আর কার্ত্তিক মাসের আর ১৩৩৫ সালের বৈশাখ আর কার্ত্তিক মাসের 'প্রবাসী' দ্রষ্টব্য]। ভারতবর্ষের কোনও মন্দিরে এত সুন্দর পৌরাণিক চিত্র একটানা ভাবে খোদিত হয় নি। এই রামায়ণ-চিত্রাবলীর একটু বেশ বৈশিষ্ট্য আছে। যবদ্বীপের প্রাচীন বৌদ্ধ শিল্প যা বর-বুদুরে আর অন্যান্য মন্দিরে মেলে, তার ভাব, আর এর ভাব,—দুই আলাদা জিনিস। বর-বুদুরের ভাস্কর্য্যের মূল কথা শান্তি আর সমাধিতে শক্তির সংহরণ, আর একটি ধীর-ললিত গতি ; প্রাম্বানান-এর ভাস্কর্য্যে পাই—জীবনলীলা, কার্য্যে শক্তির স্ফুরণ, জীবনের দ্রুত-মনোহর গতি। রাম লক্ষ্মণ প্রভৃতির যে চিত্র খোদিত হ'য়েছে তা সর্ব্বতোভাবে বাল্মীকির মহাকাব্যের উপযুক্ত।

বিষ্ণু-মন্দিরের গায়ের চিত্রগুলি নিয়ে ডচ পণ্ডিতেরা আলোচনা ক'রছেন—শ্রীমদ্‌ভাগবতের সঙ্গে মিলিয়ে মিলিয়ে দেখে যাচ্ছেন। সব লীলা ভাগবতের বর্ণনার সঙ্গে মেলে না ; কতকগুলি চিত্র আবার ভাগবত-বহির্ভূত ঘটনা অবলম্বন ক'রে। ডাক্তার বস্ আমাদের সঙ্গে করে নিয়ে দেখাতে লাগলেন—কতকগুলি অজ্ঞাত-বিষয় চিত্রের অর্থ আমিও ক'রতে পারলুম না। দোল-লীলার ছবি আছে। সব চিত্রগুলি ঠিক অবস্থায় নেই—অল্প-বিস্তর ভেঙে-চুরে গিয়েছে। বলরাম আছেন, কিন্তু বৃন্দাবন লীলায় গোপিনীরা নেই। অজ্ঞাত পৌরাণিক কাহিনী নিয়ে আবার অনেকগুলি চিত্র।

উপরের বারান্দা ছাড়া তিনটি মন্দিরের গায়েও



যবদ্বীপ—প্রাম্বানান্ মন্দিরে প্রাপ্ত শিব-মূর্ত্তি

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা



যবদ্বীপ—প্লাওসান মন্দিরে রক্ষিত মৈত্রেয়-মূর্ত্তি

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

বিস্তর খোদিত ফলক-চিত্র আছে। দুই কল্প-বৃক্ষের মাঝখানে একটি সিংহ—এই চিত্রটি খুবই সাধারণ। সাধারণতঃ দুই বা দুইয়ের অধিক অপ্সরা নিয়ে ফলক অনেক আছে। শিব-মন্দিরের উত্তরের সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠতে ডান হাতের দিকে এক রকম তিনটি অপ্সরা নিয়ে একটী অপরূপ প্রতিমা-চিত্র পাওয়া যায়; এই তিনটি মূর্ত্তির প্রশংসা শিল্প-রসিক মাত্রেই ক'রে থাকেন—ইউরোপীয় কলাবিদেরা এদের নাম-করণ ক'রেছেন the Three Graces. পূবের সিঁড়ি বেয়ে উঠে সামনে গর্ভগৃহে বিরাট মহাদেবের মূর্ত্তি, মন্দিরের উপরের ছাদ প'ড়ে গিয়েছে। প্রশান্ত ধ্যান-মগ্ন বদনে চতুর্ভুজ দেবাদিদেব উচ্চ গৌরীপট্টাকার পীঠে দণ্ডায়মান। ভক্তের প্রাণে এইরূপ মূর্ত্তি অপূর্ব্ব আকুলতা আনে। শিবের গর্ভগৃহের তিন দিকে তিনটী আবরণ-দেবতা, এঁদের পৃথক মূর্ত্তি এখনও বিদ্যমান। আবরণ-দেবতারা হ'চ্ছেন গণেশ, ভট্টারক গুরু বা অগস্ত্য-রূপী শিব, আর মহিষ-মর্দ্দিনী; পাথরের উপরে কেটে তোলা মূর্ত্তি এই তিনটী। এদের মধ্যে মহিষমর্দ্দিনী মূর্ত্তিটী যবদ্বীপের এই অঞ্চলে Loro Djonggrang 'লোরো জোঙ্গ্‌রাঙ' নামে বিখ্যাত, আর ইনি এখনও দেশবাসীদের কাছে পূজা পাচ্ছেন। মহিষাসুরের উপরে দণ্ডায়মানা অষ্টভুজা দেবী, বামে নরাকার অসুর দণ্ডায়মান। স্থানীয় লোকেরা মুসলমান-ধর্ম্ম গ্রহণ করবার সঙ্গে সঙ্গে মহিষ-মর্দ্দিনীর কথা ভুলে গিয়েছে, এই মূর্ত্তিকে অবলম্বন ক'রে সৃষ্ট নোতুন কাহিনী এখন প্রাচীন পুরাণের স্থান নিয়েছে। Loro অর্থে 'রাজকুমারী', আর Djonggrang অর্থে 'সুশ্রোণী'; লোক-প্রচলিত কাহিনী অনুসারে, এই নামে এক অসুর-রাজ-কন্যা ছিলেন, তাঁকে এক রাজা বিবাহ ক'রতে চান; এই বিবাহার্থী রাজার হাতেই রাজকুমারীর পিতার মৃত্যু হয় ব'লে এ বিবাহে রাজকুমারী রাজী ছিলেন না। শেষে পীড়াপীড়িতে একটি শর্ত্তে তিনি বিবাহ ক'রতে সম্মত হন—বিবাহার্থী রাজাকে রাতারাতি কতকগুলি কূপ খনন ক'রে দিতে হবে, আর হাজার মূর্ত্তি বিশিষ্ট কতকগুলি মন্দির ক'রে দিতে হবে। রাজার দৈব বল ছিল, তাঁর সহায় ছিল নানা উপদেবতা, এরা সব এসে মাটি কেটে পাথর কেটে কূয়ো খুঁড়তে আর মন্দির গ'ড়তে লেগে গেল। রাজকুমারী এতে প্রমাদ গণে' তাঁর সখীদের নিয়ে ভোর হবার পূর্ব্বে ধান ভানতে সুরু ক'রে দিলেন,



প্রাম্বানান্—'লোরো-জোঙ্গ্‌রাঙ' বা মহিষমর্দ্দিনী

আর যেখানে উপদেবতারা কাজ ক'রছিল সেখানে রাজ-কুমারীর সখীরা সুগন্ধি জলের ছড়া দিতে আর ফুল ছড়িয়ে' দিতে আরম্ভ ক'রলে। ধান ভানার শব্দে ভোর হ'চ্ছে মনে ক'রে আর ফুলের বাস আর সুগন্ধির সৌরভ সহ্য ক'রতে না পেরে উপদেবতারা কাজ অসমাপ্ত রেখেই পালাল। হাজার মূর্ত্তির একটা বাকী। তখন এই ভাবে ব্যর্থ-মনোরথ হ'য়ে রাজা রাজকুমারীকে শাপ দিলেন,

রাজকুমারী পাথর হয়ে গিয়ে হাজার পূরো ক'রলেন; আর এই রাজকুমারী লোরো-জোঙ্গ্রাঙ্-এর মূর্ত্তি ব'লে এখনও যবদ্বীপীয়েরা পূজা করে। অর্থাৎ দুর্গা এখন এই নোতুন নামে এদের পূজা নিচ্ছেন। শিব-মন্দিরের মহিষ-মর্দ্দিনীর সামনে আমরা দেখলুম, ধুনুচীতে ধুনো জ্ব'লছে, মূর্ত্তিটার পায়ের কাছে ফুল র'য়েছে। এই তল্লাটের মেয়েরা এসে দেবীর পূজা ক'রে যায়। তাদের বিশ্বাস, লোরো-জোঙ্গ্রাঙ্ তাদের কামনা সিদ্ধি করেন। কুমারীরা পতিলাভের জন্যই বেশী ক'রে আসে, আর এই বিষয়েই দেবীর বেশী কৃতিত্ব শোনা যায়; তবে বন্ধ্যা পুত্রের জন্য, আর বিবাহে অসুখী স্ত্রী বা স্বামী বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটিয়ে অন্য স্বামী বা স্ত্রী লাভের প্রার্থনা জানবার জন্য আসে। অসুখ সারাতেও লোকে এসে মানত ক'রে যায়। প্রাম্বানান যেন মুসলমান দেশের ব্যাপার নয়—ভক্ত স্ত্রী পুরুষদের সমাগম এত বেশী। পুরুষেরাও আসে। এখানকার দেবী বিশেষ জাগ্রত ব'লে প্রকাশ; যবদ্বীপীয় মেয়েরা ব্যতীত চীনা, কিরিঙ্গী, ইউরোপীয় মেয়েরাও আসে, পাগড়ী-মাথায় হাজীরাও পর্য্যন্ত আসে। দেবীর জয়-জয়কার—কোনও রোমান কাথোলিক গির্জ্জার মাতা-মেরীর, বা মুসলমান পীরের আস্তানার শাহ সাহেবের চেয়ে এঁর ভক্ত কম নয়।

মন্দিরের ভিতরকার শিবের মূর্ত্তিটী এখনও যবদ্বীপীয়দের কাছ থেকে সম্মান পায়। শিবের উঁচু মন্দিরের সামনেই তাঁর বাহন বৃষ আছে, সামনা-সামনি দেবতা আর বাহন। এখানে আর একটী লোক-প্রচলিত বিশ্বাস এই যে, শিবের বৃষভের পিঠে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে সামনের মন্দিরের ভিতরে শিবের মুখের দিকে চেয়ে যে কামনা করা যায়, তা সফল হ'য়ে থাকে। সঙ্গের ইউরোপীয়েরা হাস্‌তে হাস্‌তে নিজের নিজের কামনা নিবেদন ক'রলেন। আমিও এই কামনা ক'রলুম, 'ঠাকুর, আবার যেন এই তীর্থে এসে তোমায় দেখ্‌তে পারি।' ভবিষ্যতে এ কামনা আবার পূর্ণ হবে কিনা জানি না; কিন্তু তার পরের দিনই আর একবার অপ্রত্যাশিত ভাবে এই মন্দিরে এসে এখানে খানিকক্ষণ কাটাবার সৌভাগ্য আমার হ'য়েছিল। সমস্ত স্থানটার সঙ্গে দেবাদিদেব মহাদেবের মাহাত্ম্য জড়িত। ঈশ্বরের প্রতি কতটা ভক্তি এই শিবের প্রতীককে অবলম্বন ক'রে তখন এ দেশের রাজা থেকে জন-সাধারণ সকলকেই অনুপ্রাণিত ক'রেছিল! বিরাট বাস্তুশিল্পে ভাস্কর্য্যে কলায় তার প্রমাণ তো র'য়েইছে; যবদ্বীপের প্রাচীন সাহিত্যেও আছে, অনুশাসনেও আছে। প্রধান মন্দিরের শিবের মূর্ত্তির কথা ব'লেছি; ভাস্কর্য্য-হিসাবে এটী একটী মহনীয় সৃষ্টি। এ ছাড়া, ছোটো খাটো শিবমূর্ত্তিও আছে। একটী মূর্ত্তির কেবলমাত্র ভাঙা মাথাটী এখন এখান থেকে নিয়ে হলাণ্ডে লাইডেন-এর সংগ্রহশালায় রক্ষিত হ'য়েছে। এটী সুপরিচিত মূর্ত্তি, শিবের বিরাট পরিকল্পনা এই রকম মূর্ত্তিতেই যেন আরও উজ্জ্বল আরও মহিমাপূর্ণ হ'য়ে দাঁড়ায়। খ্রীষ্টপূর্ব্ব দ্বিতীয় শতকের দক্ষিণ ভারতের গুড়িমল্লম্-গ্রামের মন্দিরের শিবের মূর্ত্তি থেকে, একদিকে আমাদের দেশের প্রচলিত পেট-মোটা দাড়ীওয়ালা উৎকট রসের পরিচায়ক শিবের মূর্ত্তি, আর ওদিকে কম্বোজ আর চম্পার নিজস্ব শক্তিশালী রীতিতে খোদিত শিবমূর্ত্তি, আর যবদ্বীপের ওআইয়াং-রীতিতে আঁকা কিম্ভূত-কিমাকার শিবের মূর্ত্তি—কত না পৃথক্ পৃথক্ রূপে আমাদের মহাদেবকে বিভিন্ন সময়ের বিভিন্ন জাতি দেখেছে! কিন্তু প্রাচীন ভারতে মহাবলিপুরে আর এলিফান্টা আর ইলোরার গুহায় শিবের যে বিরাট প্রকাশ আমরা দেখি, তামিল জাতির মধ্যে রচিত মধ্যযুগের ধাতুময় আর প্রস্তরময় মূর্ত্তিতে, আর বাঙলা দেশের পাল-যুগের প্রস্তর মূর্ত্তিতেও যে কল্পনাকে রূপ গ্রহণ ক'রতে দেখি, নবীন ভাবে আবার শিবের যে মহীয়সী কল্পনা রবীন্দ্রনাথের কবিতায় আর নন্দলালের তুলিকার রেখাপাতে ধরা দিয়েছে, যবদ্বীপের শিবের মূর্ত্তি সে বিরাট প্রকাশের সে মহীয়সী কল্পনার কোনও রকম খর্ব্বতা করে নি, সম্পূর্ণরূপে তার উপযুক্তই হ'য়েছে; যবদ্বীপের কতকগুলি শিব-মূর্ত্তি হিন্দু চিন্তা আর হিন্দু শিল্পের শ্রেষ্ঠ বিকাশ আর শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি।

আশে পাশে টুক্‌রো-টাক্‌রা পাথরে চিত্রের ভগ্নাংশ বা পূর্ণ চিত্র বিস্তর র'য়েছে। ডচ প্রত্নতাত্ত্বিকেরা সেগুলি

মিলিয়ে মিলিয়ে জোড়া-তাড়া দিয়ে মন্দিরটার জীর্ণোদ্ধার ক'রছেন। বিরাট কীর্ত্তিমুখ কতকগুলি র'য়েছে, এগুলি ক্রমে মন্দিরের উপরে পুনঃ সন্নিবেশিত হবে। নানা দেবদেবীর আর পার্থিব ঘটনাবলীর চিত্র। কতকগুলি পাথর জুড়ে ব্রাহ্মণ-ভোজনের দৃশ্য; মাথায় ঝুঁটী-বাঁধা দাড়ীওয়ালা রুদ্রাক্ষ-পরা ব্রাহ্মণের দল ব'সে 'সেবা' ক'রছেন, সামনে কলাপাতায় আর পাত্রে খাদ্য দ্রব্য অঙ্কিত; একটা জিনিস আমার একটু বিস্মিত ক'রলে— সকলেরই পাতায় মুড়া-শুদ্ধ আস্ত-আস্ত মাছ—মৎস্য-ভোজন তখনকার দিনে যবদ্বীপে ব্রাহ্মণ বা ঋষিদের মধ্যে যে নিষিদ্ধ ছিল না, এটা বেশ বোঝা গেল।



প্রাম্বানান্—প্রধান মন্দিরে রক্ষিত শিবের মূর্ত্তি

এই রকম তো ঘুরে' ঘুরে' দেখতে লাগ্‌লুম— প্রাম্বানান্-এর অধিষ্ঠাত্রী দেবতা শিবের চিন্তায় আর তাঁর প্রসাদে মনটা যেন ভরপূর হ'য়ে গেল। দেশে ফিরে এসে একটা শ্লোক পেয়েছি,—শ্লোকটী কোথা থেকে নেওয়া জানি না; মনে তখন যে ভাব হ'চ্ছিল, সেই ভাব যেন শ্লোকটীতে ধ'রে দেওয়া আছে—

মাতা চ পার্ব্বতী গৌরী, পিতা দেবো মহেশ্বরঃ।
ভ্রাতরো মানবাঃ সর্ব্বে, স্বদেশো ভুবনত্রয়ম্॥

তখন মনে মনে কেবল মহাকবি কালিদাসের কথায় প্রণাম-মন্ত্র আওড়াচ্ছিলুম—'জগতঃ পিতরৌ বন্দে পার্ব্বতী-পরমেশ্বরৌ'। আর সঙ্গে সঙ্গে কালিদাসের নাটকের আর বিশাখদত্তের মুদ্রারাক্ষসের নান্দীতে উদার ছন্দে পরমেশ্বর মহাদেবের বন্দনা-গীতি, আর আবছা-আবছা ভাবে মনে পড়া নানা স্তোত্র আর বন্দনার ছত্র, তানসেনের শিব-ভজন-মূলক ধ্রুপদগানের আর রবীন্দ্রনাথের 'মরণ' প্রমুখ কবিতার ছত্র, আর ইংরিজি অনুবাদে পড়া তামিল ভক্তদের শিব-ভক্তির পদের স্মৃতি, সব মিলে মনে এসে একটা অপূর্ব্ব ভাবাবেশে সমগ্র চিত্তকে যেন সম্মোহিত ক'রে দিচ্ছিল। এই তীর্থ স্থানের অদৃশ্য দেবতার অবস্থান যেন আমাকে ঘিরে' র'য়েছে—এই রকম একটা ভাব, আমার হিন্দু-জাতির অপরিসীম ঈশ্বর-নিষ্ঠার আর বিশ্বাত্মবোধের, তার চিন্তার আর চেষ্টার, তার সুষমাবোধের আর শিল্প-বিজ্ঞানের এই অবিনশ্বর নিদর্শন দেখতে দেখতে আমায় অভিভূত ক'রে ফেল্‌ছিল— ভয় হ'চ্ছিল, মনের মধ্যেকার ভাবাবেগ বাইরে পাছে প্রকাশ হ'য়ে পড়ে। সুদূর যবদ্বীপে এই পুঞ্জীভূত পাথরের ভাঙাচোরা স্তূপের মধ্যে আমি যেন প্রাচীন ভারতের জ্ঞান ভক্তি আর কর্ম্মের ত্রিবেণীর ধারায় মানসিক অবগাহন ক'রে স্নিগ্ধ হ'লুম।

ইতিমধ্যে কবি এসে গিয়েছেন। তাঁকে যোগ্যকর্ত্তায় আমন্ত্রণ করবার জন্য কতকগুলি স্থানীয় সিন্ধী বণিকও এসেছেন। কবির সঙ্গে আমাদের মালবাহী মোটরখানিও এল; আমি তখন মন্দিরের আশে পাশে ঘুরছিলুম। পরে শুন্‌লুম, এক মহা বিভ্রাট হ'য়েছে। একখানি মোটরের পিছনে আমার একটা সুট্-কেস বাঁধা ছিল,

মোটরের ঝাঁকানীতে সেটি হাতল থেকে ছিঁড়ে রাস্তায় কোথায় প'ড়ে গিয়েছে, তার হাতলটা কিন্তু গাড়ীর সঙ্গে বাঁধবার দড়ীতে আট্‌কে আছে। এখন ঐ স্যুট-কেসটীতে আমার এ-যাবৎ সংগ্রহ করা অনেকগুলি ভালো ভালো জিনিস ছিল—বলিদ্বীপের পট, পিতলের মূর্ত্তি, বহু ফোটোগ্রাফ,—এ সব ছিল, আর ছিল শ্রীযুক্ত অর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের কাছ থেকে নেওয়া লণ্ঠনের স্লাইড্-গুলি। স্যুট-কেসটী যে ছিঁড়ে প'ড়ে গিয়েছে এ খবর টের পাওয়া যায় প্রাম্বানান-এ পৌঁছে'; তখনই এক পুলিস অফিসার মোটরে ক'রে বেরিয়ে গিয়েছেন, রাস্তা ধ'রে খুঁজে দেখতে—যদি পাওয়া যায়। মনে ভারী দুঃখ হ'ল, এতগুলি সুন্দর জিনিস হয়তো আর পাওয়া যাবে না; 'oriental fatalism' ছাড়া গত্যন্তর নেই দেখে দুঃখটা মন থেকে ঝেড়ে ফেলে দেবার চেষ্টা ক'রতে লাগলুম—তবে অন্যের ন্যস্ত স্লাইডগুলি যে খোয়া গেল, তার কি হবে—এই ভাবনাটা এল।

যা হোক্, কবি তো একটু ঘুরে ফিরে দেখলেন; দেয়াল ধ'রে সকলে মন্দিরের পশ্চিম দিকটায় নদীর ধারে একটু ঘুরে' এলুম। শিবের মন্দিরের সিঁড়ি বেয়ে উঠতে কবির কষ্টও খুব হ'ল। সেইখানে ব'সে তিনি একটু দেখলেন। প্রাম্বানান্-এর সমস্ত মন্দির প্রভৃতির সমাবেশ দেখে তিনি খুব প্রীত হলেন। তবে দুঃখের বিষয়, বেশীক্ষণ আমাদের থাকা হ'ল না—কবি যদি একলা-একলা ঐ জায়গায় একটু লম্বা সময় কাটাতে পারতেন, অত লোকের ভীড় যদি না থাকৃত, তা'হলে আমাদের সাহিত্য বর-বুদুর-এর উপর যেমন একটী চমৎকার কবিতার দ্বারা সমৃদ্ধ হ'য়েছে, তেমনি প্রাম্বানান-এর উপরও একটী বড়ো কবিতা লাভ ক'রত।

মন্দিরের পাশেই কর্ত্তৃপক্ষ চা খাওয়াবার ব্যবস্থা ক'রেছিল। চায়ের টেবিলের চার ধারে ব'সে খানিকটা বেশ আলাপ চ'লল। বাকে আর সুরেন বাবু ধীরেন বাবু ফোটো নিতে আর স্কেচ্ ক'রতে লেগে গিয়েছেন। চায়ের টেবিলে বিশাল-কলেবর কালেন্‌ফেল্‌স্ সাহেবের রসালাপ খুব জ'মল—আমাদের ক্ষীণ-তনু তাম্রচূড় আর কৃশ-কায় অথচ দীর্ঘ-দেহ ডাক্তার বস্ সাহেবকে উপলক্ষ্য ক'রে। এই কালেন্‌ফেল্‌স্‌কে যবদ্বীপীয়েরা নাম দিয়েছে 'তুআন রকসস' অর্থাৎ 'শ্রীযুত রাক্ষস'; আবার নাকি তাঁকে



প্রাম্বানানে রবীন্দ্রনাথ—বাম হইতে দক্ষিণে 'তাম্রচূড়,' কালেনফেল্‌স্, প্রবন্ধকার, রবীন্দ্রনাথ, বস্; পৃথক্ উপবিষ্ট সিন্ধী বণিক্‌গণ
[শ্রীযুক্ত বাকে-কর্ত্তৃক গৃহীত]

'বৃকোদর' ব'লেও অভিহিত করে। আকারে রাক্ষসের মতনই লম্বা-চওড়া, কিন্তু প্রকৃতিতে শিশুর মতন সরল, আর হাস্য-কৌতুক ক'রে সকলকেই মাতিয়ে রাখেন—এমন তাজা প্রকৃতির লোক বিরল।

ইতিমধ্যে এগারোটা বাজে—এমন সময়ে আমার প'ড়ে-যাওয়া স্যুট-কেসের সন্ধানে যে মোটর বেরিয়েছিল সেটী ফিরে এল; সুখের বিষয়, স্যুট-কেসটী পাওয়া গিয়েছে, পথের ধারে এক গাঁয়ের লোকেরা পেয়ে কাছে থানায় জমা ক'রে দিয়েছিল। আমি একটা আরামের নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলুম। আমরা তখন যোগ্যাকর্ত্ত অভিমুখে যাত্রা ক'রলুম।

আমরা চ'লে যাবার সময়েই দেখলুম—দূর কোনো গ্রাম থেকে এক দল ছেলে-মেয়ে মাষ্টারদের সঙ্গে এসেছে—প্রাম্বানান্ দেখবার জন্য, সঙ্গে কাপড়ে বেঁধে খাবার এনেছে। কোনও ইস্কুলের ছাত্র-ছাত্রী হবে এরা। স্কুলের ছেলেমেয়েদের প্রাচীন কীর্ত্তি দেখানোর রীতি এদেশে প্রবর্ত্তিত হ'চ্ছে দেখে খুশী হ'লুম।

সমস্ত পথটায় দেখলুম—এ অঞ্চলটা খুব উর্ব্বর, আর তেমনি এখানে লোকের ঘন বসতি। সাড়ে এগারোটায় আমরা যোগ্যাকর্ত্তয় পৌঁছুলুম। সরাসরি

এখানকার এক রাজা, Pakoe-Alam 'পাকু-আলাম' যাঁর উপাধি, তাঁর বাড়ীতে উঠলুম। শূবকর্ত্তর সুসুহুনান আর মঙ্কুনগরোর মতন যোগ্যকর্ত্তয় দুটী রাজা আছেন, একজনের পদবী 'পাকু-আলাম', ইনি মঙ্কুনগরোর মতন পদের,—আর একজনের পদবী সুলতান, এঁর পদ সুসুহুনানের মতন উচ্চ। পাকু-আলামের বাড়ীতে সপারিষদ রবীন্দ্রনাথ অতিথি হবেন স্থির ছিল। এঁর বাড়ীর ব্যবস্থা সব মঙ্কুনগরোর বাড়ীর মতন। তবে মঙ্কুনগরোর প্রাসাদটী মনে হ'ল যেন বেশী জায়গা জুড়ে'। ফটক দিকে বাড়ীর প্রকাণ্ড হাতায় ঢুকে সামনে পড়ে বিরাট এক 'পেণ্ডপো', আর একটী গাছে-ভরা আঙিনা। পাকু-আলাম আমাদের অভ্যর্থনা ক'রে বসালেন, কবির সঙ্গে দোভাষীর মারফৎ কথা হ'ল। বরফ-লেমনেড খাইয়ে উপস্থিত সিন্ধী আর অন্যান্য কবি-দর্শনার্থী ভদ্র ব্যক্তিদের আপ্যায়ন করা হ'ল। তাঁরা বিদায় নিলেন। পথশ্রমে কবি ক্লান্ত। আঙিনার দুই ধারে প্রশস্ত কতকগুলি কামরা আছে, আমাদের সেখানে থাকবার ব্যবস্থা করা হ'ল; এখানে আমাদের দিন সাতেক থাকতে হবে। জিনিসপত্র গুছিয়ে' স্নান-টান সেরে প্রায় বেলা দুটোয় আমরা মধ্যাহ্ন-ভোজনে ব'সলুম—পাকু-আলাম আর তাঁর পত্নী তখনও মধ্যাহ্ন-ভোজন সারেন নি। পাকু-আলাম বেশ শিক্ষিত ব্যক্তি, ডচ জানেন, তবে ইংরিজি জানেন না। কবির যোগ্য সমাদর তিনি ক'রলেন। আমাদের বাকে ছিলেন দোভাষী। আহারের পরে এঁর প্রাসাদের একটু আধটু অংশ ঘুরে' দেখলুম—একটী বড়ো প্রকোষ্ঠে বর-ক'নে বসবার জন্য যথারীতি দেবী শ্রীর বিছানা বা গদী আছে, ঘরটীতে দামী দামী সোনা রূপোর তৈজস, আর কাঠের তৈরী দুটী সুন্দর নর-নারী মূর্ত্তি,—বিবাহ-বেশে খাটন-মালা হ'য়ে ব'সে আছে।

পাকু-আলামের একটী ছোট্টো মেয়ে এলো, তার মার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরলো; মেয়েটীর নাম দিয়েছে Costarina—ইউরোপীয় নাম। মঙ্কুনগরোর মেয়ের নাম মনে প'ড়ল—'কুসুমবর্দ্ধনী'। প্রাচীন যবদ্বীপীয় সংস্কৃতির সঙ্গে সংস্কৃত ভাষার প্রতি মঙ্কুনগরোর একটু বেশী অনুরাগ।

সুবিধা-ক্রমে আজ সুলতানের জন্মদিন—রাত্রে 'ক্রাতন্' বা বড়ো রাজবাড়ীতে 'সেরিম্পি' নাচ হবে, সে নাচ দেখবার জন্য ডচ্ রেসিডেণ্ট সাহেবের মারফৎ কবির নিমন্ত্রণ হ'য়েছে। সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় পাকু-আলাম আর তৎপত্নী কবিকে নিয়ে গেলেন রেসিডেণ্ট সাহেবের বাড়ীতে। আমরাও গেলুম। তারপরে খানিক আলাপের পরে, রেসিডেণ্ট সাহেবের আর কবির সঙ্গে আমরা ক্রাতনে গেলুম। এখানকার কায়দা-কানুন সব শূবকর্ত্তরই মতন। আজ রাজবাড়ীতে বিশেষ সমারোহ। বিরাট মণ্ডপটী আলোক মালায় সজ্জিত। যথারীতি রেসিডেণ্ট আর সুলতান একত্র পাশাপশি চেয়ারে ব'সলেন। কবির সঙ্গে সুলতানের পরিচয় হ'ল। সুলতানটীর বয়স ৩০।৩৫ হবে, বড়ো লাজুক ধরণের। আমাদের মণ্ডপের ধারে চেয়ারে ব'সতে দিলে। ডচ ইঞ্জিনিয়ার ডাক্তার মুনস্-এর সঙ্গে শূবকর্ত্তয় মঙ্কুনগরোর বাড়ীতে আলাপ হ'য়েছিল, ইনি, আর ডাক্তার বস্—এঁদের পাশে ব'সলুম—বেশ সুবিধা হ'ল, এঁদের কাছ থেকে নানা খবর পাওয়া গেল, আলাপের বেশ সুযোগ মিল্‌ল। রাজবাটীর চাকরেরা অষ্টাদশ শতকের পোষাক প'রে ঘুরে বেড়াচ্ছে—কালো রঙের পোষাক। প্রথম বিলিতি বাদ্য বেজে উঠ্‌ল, তার পরে দেশী গামেলান্। একজন 'দালাঙ' বা কথক উচ্চৈঃস্বরে পাঠ ক'রতে লাগ্‌লেন—অর্জ্জুন আর তৎপত্নী শ্রীকান্তি (শিখণ্ডী যবদ্বীপে রাজকন্যা শ্রীকান্তি নাম নিয়ে অর্জ্জুনের অন্যতমা পত্নী হ'য়ে গিয়েছেন)—এঁদের উপাখ্যান কিয়ৎকাল ধ'রে গানে চ'ল্‌ল। তার পরে 'সেরিম্পি' নাচের জন্য চার. চার আট জন রাজ-কন্যার প্রবেশ—শূবকর্ত্তয় 'বেডয়ো' নাচের সময়ে যে ভাবে প্রবেশ দেওয়া হ'য়েছিল সেইভাবে। এই নাচের কিছু আভাস পূর্ব্বে দেবার চেষ্টা ক'রেছি—এখানে আবার পুনরুক্তি করবার চেষ্টা ক'রবো না। তবে ঐই নাচকে যেন 'বেডয়ো' নাচের চেয়ে আরও stately আরও আভিজাত্যপূর্ণ ব'লে মনে হ'ল।

স্বপ্নের মত নাচ হ'য়ে গেল, ধীর পদক্ষেপে পদসংবদ্ধ দৃষ্টিতে তরুণী রাজকুমারীরা চ'লে গেল। রেসিডেণ্ট আর

সুলতানের কাছ থেকে কবি বিদায় নিলেন। ব্যাপারটা চুক্‌ল প্রায় সাড়ে দশটায়।

ফিরে এসে রাত এগারোটায় পাকু-আলামের সঙ্গে একত্র ভোজন। পাকু-আলামের সঙ্গে কথা হ'ল—বেশ ভাবুক ব্যক্তি ইনি। যবদ্বীপের কৃষ্টিতে কতটা বা ভারতীয় উপাদান আছে, আর কতকটাই বা দেশীয় ইন্দোনেসীয় উপাদান, সে বিষয়ে আলোচনা হ'ল। এঁর মতে, যবদ্বীপীয় প্রকৃতিতে যে অন্তর্মুখী ভাব—mysticism আছে, সেটা হ'চ্ছে ইন্দোনেসীয় মনোভাব-প্রসূত। খ্রীষ্টান মধ্যযুগে পশ্চিম ইউরোপে বা জার্মানীতে Parsifal পার্সিফাল যেমন এক ধর্ম্মবীর, এক মরমিয়া যোদ্ধা হয়ে দাঁড়ান, যবদ্বীপে মহাভারতের অর্জ্জুনের চরিত্র ও তেমনি আধ্যাত্মিক সাধনার প্রতীক হ'য়ে একটা mystic character হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। এটি ইন্দোনেসীয় প্রকৃতির প্রভাব জাত ব'লে তাঁর বোধ হয়। এঁর কাছে আরও শুনলুম যে যবদ্বীপের কতকগুলি যুবক মুসলমান ধর্ম্ম আর শাস্ত্র অধ্যয়ন ক'রতে ভারতবর্ষে যেতে আরম্ভ ক'রেছে—কোথায় তারা বেশী ক'রে যায়—আলীগড়ে, কি দেওবন্দে, কি লাহোরে, তা তিনি ব'ল্‌তে পারলেন না, তবে যবদ্বীপের যত ছেলে মক্কায় প'ড়তে যায় তত ভারতবর্ষে যায় না। এদেশে communalism হবার জো নেই, কারণ দেশে তাবৎ লোক বাহ্যতঃ অন্ততঃ মুসলমান।

[১৯] যোগ্যকর্ত্ত

সোমবার, ১৯শে সেপ্টেম্বর।—

যোগ্যকর্ত্তর কাছে প্রাচীন কতকগুলি বৌদ্ধমন্দির দেখবার ব্যবস্থা ক'রেছিলেন ডাক্তার বস্‌। আজ সকালে ডাক্তার বস্‌, ডাক্তার কালেনফেল্‌স্‌, ধীরেন বাবু আর আমি সেগুলি দেখবার জন্য বা'র হ'লুম। এই মন্দির গুলি হ'চ্ছে Tjandi Loemboeng, Tjandi Sewoe, Tjandi Plaosan আর Tjandi Kalasan. এই সব মন্দিরগুলিই বর-বুদুর আর প্রাম্বানান-এর যুগের ;—দুইটি আবার বরো-বুদুরের পূর্ব্বেকার, অর্থাৎ খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতকের। বাস্তুবিদ্যার দিক থেকে প্রত্যেক মন্দিরটার বৈশিষ্ট্য আছে। মন্দিরগুলির মধ্যে চণ্ডী-সেবুর মন্দিরটা প্রাম্বানান্-এর মত—মাঝের একটা বিরাট মন্দিরকে ঘিরে চারিদিকে চার সারে প্রায় ২৪০টা ছোটমন্দির র'য়েছে। চণ্ডী-সেবুর ভগ্নস্তূপের পাশে এক অতিকায় প্রত্যালীঢ় ভাবে উপবিষ্ট রাক্ষস বা যক্ষ দ্বারপালের মূর্ত্তি বিশেষ দ্রষ্টব্য—বিকট বর্ত্তুলাকার নেত্রে অসি-চর্ম্মধারী এই মূর্ত্তিটীকে visualised Terror in stone অর্থাৎ বিভীষিকার পাথরে-তৈরী চাক্ষুষ মূর্ত্তি ব'লে বর্ণনা করা হ'য়েছে। চণ্ডী-প্লাওসান-এ কতকগুলি সুন্দর বৌদ্ধ দেবমূর্ত্তি আছে ; তার মধ্যে একটি মৈত্রেয়-মূর্ত্তি অতি সুন্দর ; এগুলি খোলা আকাশের তলায় মন্দিরের ভিতরে প'ড়ে আছে, মন্দিরের ছাত এখন আর



প্লাওসানের মন্দিরে প্রাপ্ত মৈত্রেয় মূর্ত্তি

নেই। এই রকম একটা মৈত্রেয়-মূর্ত্তির মাথাটি কি ক'রে ইউরোপে গিয়ে ডেনমার্কের কোপ্‌নহাগনের সংগ্রহ-

শালায় এখন রক্ষিত হ'য়ে আছে—এই মাথাটী থেকে ভারতীয় ভাবে অনুপ্রাণিত যবদ্বীপীয় শিল্পীরা ধ্যানের দেবতাকে কি রকম সুন্দর ভাবে মূর্ত্ত ক'রতে পারতেন তার বিশেষ একটু পরিচয় পাওয়া যায়।

প্রাম্বানান্ পথে পড়ে, সুতরাং প্রাম্বানান্‌টা আর একবার ঘুরে' আসবার লোভটা আর সামলাতে পারলুম না। ডাক্তার বস্ সানন্দে আমাদের এখানে নিয়ে গেলেন। প্রাম্বানানের ভগ্ন মন্দিরের তদারক করেন একজন ডচ ইঞ্জিনিয়ার। এঁর নাম Van Haan ফান-হান—প্রিয়ভাষী যুবক, ইনি আর এঁর স্ত্রী আমাদের খুব আপ্যায়িত ক'রলেন, চা-টা খাওয়ালেন। এই সকাল বেলাটা প্রত্ন আর শিল্প পরিদর্শন আর আলোচনায় চমৎকার ভাবে কাট্‌ল; আর সঙ্গে ডাক্তার কালেন্‌ফেল্‌স্-এর উদার অনাবিল হাস্য-কৌতুক ছিল ব'লে আরও ভালো লাগ্‌ল।

যোগ্যকর্ত্ত যবদ্বীপীয় সংস্কৃতির একটা প্রধান কেন্দ্র। শূরকর্ত্তয় যেমন, এখানে তেমন নিজ জাতীয় সংস্কৃতিতে আস্থা ও শ্রদ্ধা পোষণ করেন এরূপ যবদ্বীপীয় অভিজাতবর্গ তো আছেনই, অধিকন্তু কতগুলি উচ্চ-শিক্ষিত সহৃদয় শিল্পানুরাগী ইউরোপীয়ও আছেন। উভয় শ্রেণীর লোকের সহযোগিতার এখানে যবদ্বীপীয় কৃষ্টির সংরক্ষণের আর প্রসারণের প্রয়াস খুব দেখা যায়, তার ফল ও বেশ হ'চ্ছে। ডচ ইঞ্জিনিয়ার ডাক্তার Moens মুন্‌স্-এর কথা ব'লেছি; ইনি প্রাচীন যবদ্বীপীয় ইতিহাস আর প্রত্ন-তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করেন; এঁর সহধর্ম্মিণী হলাণ্ডে উপনিবিষ্ট আরমানী ঘরের মেয়ে, ইনিও যবদ্বীপীয় সাহিত্য নাট্যকলা প্রভৃতি বিষয়ে ইংরেজীতে প্রবন্ধ লেখেন। আর একটি ডচ ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হ'ল, এঁর নাম Th. G. J. Resink; ইনি আর এঁর স্ত্রী দুজনে মিলে যবদ্বীপীয় আর দ্বীপময় ভারতের অন্যত্র জাত প্রাচীন আর আধুনিক শিল্প-দ্রব্যের চমৎকার একটী সংগ্রহ গ'ড়ে তুলেছেন। আমরা ডাক্তার মুন্‌স্ আর শ্রীযুক্ত রেজিঙ্ক এঁদের দুজনেরই সংগ্রহ দেখে আসি। যোগ্যকর্ত্তে যবদ্বীপীয় কৃষ্টির সুকুমার দিকটীর আলোচনার জন্য একটি পরিষৎ আছে; রেজিঙ্ক-দম্পতী তার জন্য যথেষ্ট ক'রেছেন। কতকগুলি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সমবায়ে এই পরিষৎটির অস্তিত্ব বিদ্যমান। পরিষদের নাম Darmo Sedjati 'ধর্ম্ম স্বজাতি'—অর্থটা বোধ হয়, জাতীয় ধর্ম্ম বা কৃষ্টি সংরক্ষক পরিষৎ। এই পরিষদের অন্তর্গত প্রতিষ্ঠান এই কয়টি—[১] Krido Bekso Wiromo 'ক্রীড়া বেক্ষ (পেক্ষ? প্রেক্ষা?) বিরাম'—বা যবদ্বীপীয় নৃত্য-গীত-বাদ্য শিক্ষায়তন; Goesti Pangeran Ario Tedjokoesoemo 'গুস্তি পাঙ্গেরান্ আর্য্য তেজকুসুম' নামে একজন উচ্চ-স্থানাধিষ্ঠিত রাজবংশীয় এই শিক্ষায়তনের পরিচালক, এখানে প্রাচীন-রীতি-অনুমোদিত নাচ শেখানো হয়—সাধারণ ঘরের ছেলেও মেয়েদেরও নেওয়া হয়; [২] Wanito Oetomo 'বনিতা-উত্তম' বা 'সন্নারী-সভা'; Raden Ajoe Dr. Abdoelkadir 'রাদেন আয়ু ডাক্তার আব্দুল্‌কাদির' এই সভার প্রধান কর্ম্মী—দেশীয় গৃহ-শিল্প ইত্যাদি মেয়েদের মধ্যে শিক্ষা দেওয়ার আর মেয়েদের সর্ব্ববিধ উন্নতির জন্য এই সভা; [৩] Taman Siswo 'তামান শিশ্ব' বা 'শিশু-উদ্যান'—Raden Mas Suwardi Surjaningrat 'রাদেন মাস্ সুবর্দ্দি সূর্য্যনিঙ্‌রাট্' হ'চ্ছেন এর প্রধান—এটি একটি জাতীয়তা-সংক্ষণ-প্রয়াসী ছেলে-মেয়েদের ইস্কুল; আর [৪] Habirando 'আবিরান্দ'—Raden Mas Ario Gondhoatmodjo 'রাদেন মাস্ আর্য্য গন্ধ-আত্মজ' এর সভাপতি—এটি দালাঙ বা কথকদের শেখাবার ইস্কুল। এর প্রত্যেক আয়তনটির কাজ সুচারুরূপে চ'লছে; এই চারটীর প্রায় সবগুলি আমরা গিয়ে দেখে আসি।

দুপুরে শহরে খুব ঘোরা গেল। এক চীনে পুরাতন জিনিসের দোকান থেকে চামড়ার ওআইয়াঙ্ পুতুল সুরেন বাবু কতকগুলি নিলেন, আমিও গোটাকতক কিনলুম। সিন্ধী মণিহারী চেলারামের দোকানে ব'সে সিন্ধীদের সঙ্গে আলাপ ক'রলুম; সেখানে মেটেবুরুজে বাড়ী বাঙালী মুসলমান দরজী একজনের সঙ্গে দেখা হ'ল—এদেশে সে অনেক দিন আছে—বোধ হয় এখানে বিবাহ ক'রে 'থিতু' হ'য়ে বাস ক'রছে, আমার কাছে

কিন্তু সে-কথা ভাঙলে না। তবে বাঙলায় কথা কইতে পেয়ে খুব খুশী হ'ল, একথা ব'ললে।

রাত্রে আহারের পরে পাকু-আলামের সঙ্গে পেণ্ডপোতে ব'সে ব'সে খানিক গল্প হ'ল। এখানকার স্থলতানের প্রধান মন্ত্রীর নাম Patih বা 'পতি'। তাঁর বাড়ীর আর অন্য রাজবাড়ীর ছেলেদের নিয়ে তিনি নৃত্যে রামায়ণ অভিনয় করিয়ে' দেখাবেন। তাই কবিকে আর তাঁর সঙ্গে আমাদের মন্ত্রীর বাড়ী Ka-patih-an 'কাপাতিহান' বা 'পতি-নিবাস' প্রাসাদে নিয়ে গেল। পতি বা মন্ত্রী বেশ দীর্ঘকায় ব্যক্তি, মস্ত টিকোলো নাক, খুব distinguished বা মহাজনোচিত চেহারা,—রঙীন সারং,সাদা কোট, মাথায় বাতিকের রুমালের ছোট পাগড়ী প'রে কবিকে স্বাগত ক'রলেন। বাড়ীর বড়ো পেণ্ড-পোতে আমাদের চেয়ারে বসালে, পানের জন্য বরফ-লেমনেড দিলে। পেণ্ডপোর একদিকে চেয়ারে নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ, অন্য দিকে ভুঁয়ে ব'সে পাড়ার প্রতিবেশী আর সাধারণ রবাহূত লোক। গামেলান বাজ্ছে—অভিনয় হ'ল রামায়ণের গোড়া থেকে জটায়ু-বধ পর্য্যন্ত সমস্তটা। টাইপ-করা প্রোগ্রাম, তাতে গল্পের সারাংশ লেখা আছে, অতিথিদের জন্য বিতরিত হ'ল—মালাইয়ে, ডচে, আর আমাদের জন্য ইংরাজিতে। ছোটো ছোটো ছেলেরা অনেকগুলি ভূমিকা গ্রহণ ক'রেছে। সাধারণ অভিনয় নয়, নৃত্যাভিনয়। কথাবার্ত্তা হ'চ্ছে গানের স্থরে, তাও আবার গামেলানের বাজনায় চাপা প'ড়্ছে; আবার গামেলানের দলে দোহার গাইয়ে' আছে, তাদের গানও হয় মাঝে মাঝে- আমাদের জুড়ীর মতন। কিন্তু প্রত্যেক কাজ হ'চ্ছে নাচে, বা নাচের ভঙ্গীতে। নাচ এদের ভাবের অভিব্যক্তির প্রধান সাধন হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। দৃশ্যপট নেই—খোলা দালানে আসর, বাঙলাদেশের যাত্রার মতন। দূরে সাজ-ঘর। সাজ-সজ্জা অন্য নৃত্যে যেমন হয় তেমনি—সাবেক চালের যবদ্বীপীয় পোষাক প'রে পাত্র-পাত্রীরা আস্ছে। নাটকে রাক্ষসেরা এল মুখস প'রে, কিন্তু আর কারো মুখে মুখস নেই। আমরা অবশ্য ঘটনা সবটাই বুঝতে পারছিলুম। 'পতি'র একটি ছোটো ছেলে সীতা সেজেছিল; তার নাকি খুব ইচ্ছে ছিল যে লক্ষ্মণ সাজে। যেমন প্রাচীন চালের শিক্ষা পেয়েছে সেই-মতন সকলেই চমৎকার অভিনয় ক'রছিল। সবটা জড়িয়ে' জিনিসটি এমন সুন্দর আর রোচক হ'য়েছিল, যে কি আর ব'লবো।—কবি ও খুব উচ্ছ্বসিত প্রশংসা ক'রছি-লেন। দুই একটি ঘটনা এদের রামায়ণের নোতুন লাগ্‌ল। হাস্য-রসের অবতারণা করবারও চেষ্টা মাঝে মাঝে হ'য়েছে। শূর্পনখার নাক কাটা গেল। এদিকে শূর্পনখার অদর্শনে অধৈর্য্য হ'য়ে ব'সে আছে তার আট স্বামী—রাম-লক্ষ্মণের প্রেমে অধীরা রাক্ষসী শূর্পনখার এই বহুপতিকতা কল্পনা ক'রে যবদ্বীপে একটু হাস্য-রসের আমদানী করবার চেষ্টা হ'য়েছে। আট রাক্ষস স্বামী এল, সকলের এক ধাঁজের পোষাক, আর মুখে শূওর আর মহিষের মুখের ভাব মিলিয়ে তৈরী লম্বা লম্বা কালো রঙের মুখস পরা—সব কয়টার মাথায় শিং,—মুখসগুলি এক ধাঁজের—বর্ব্বরতা নিষ্ঠুরতা আর নির্বুদ্ধিতা যেন এই মুখসগুলিতে মূর্ত্ত হ'য়ে উঠেছে। এরা নেচে গেয়ে শূর্পনখার বিরহে নিজেদের অধৈর্য্য প্রকট ক'রলে। তারপর আকাশ-গমন নাটন ক'রতে ক'রতে শূর্পনখার আগমন; দূর থেকে তাকে দেখেই এই শূকর-মুখ মহিষ-শৃঙ্গ আট রাক্ষস স্বামী সোল্লাসে একত্র উঠে একভাবে একটু নেচে নিলে—সেটা যে কি হাস্যকর ভাবে অভিনীত হ'ল যে কি আর ব'লবো। মায়ামৃগ সেজে একটি ছোটো ছেলে এল, তার হরিণের অনুকারী পোষাক অদ্ভুত, আর সেও অদ্ভুত সুন্দর ভাবে নৃত্যে ঘটনার দ্যোতনা দেখালে। তারপর নাচের সঙ্গে সঙ্গে সীতাকে নিয়ে রাবণের পলায়ন। বিরাট পক্ষপুট যুক্ত পাখীর ঠোঁটের অনুকারী মুখস আর পাখীর গায়ের অনুকারী পোষাক-পরা জটায়ু-কর্ত্তৃক রাবণের পথ-রোধ। তারপরে নৃত্য-ছন্দে রাক্ষসে জটায়ুতে যুদ্ধ, আর শেষটায় একে একে জটায়ুর দুই পক্ষ-চ্ছেদ, মারাত্মক আহত হ'য়ে জটায়ুর পতন, আর নৃত্য-সহযোগে রাবণ কর্ত্তৃক সীতাকে নিয়ে পবন-বেগে প্রস্থান। অতি সুন্দর হ'ল সব জিনিসটা—আমরা কখনও কল্পনা' ক'রতে পারিনি যে এদের কৃষ্টিতে এই সুন্দর জিনিসকে এরা এখনও

বাঁচিয়ে রাখতে পেরেছে। কবির শরীর তত্টা ভালো না থাকায় তিনি ঘণ্টা খানেক থেকে চ'লে গিয়েছিলেন, কিন্তু আমরা মন্ত্র-মুগ্ধের মতন ব'সে ব'সে ন'টা থেকে রাত দেড়টা অবধি দেখলুম। আমাদের সঙ্গে ডাক্তার বস্, ডাক্তার কালেন্‌ফেল্‌স্ আর পাকু-আলাম সমস্তক্ষণ ছিলেন—এমন সজ্জন-সঙ্গে ব'সে এই রূপ নৃত্যাভিনয়-দর্শন এক অপূর্ব্ব ব্যাপার হ'ল।

২০শে সেপ্টেম্বার, মঙ্গলবার।—

কাল সকালে পাকু-আলাম তাঁর পণ্ডিত-মোল্লা ডাকিয়ে তাঁর বংশ-পত্রিকা বা'র করিয়েছিলেন আমাদের দেখাবার জন্য। আজ তিনি আবার বা'র করালেন। ঠিকুজীর ধরণে গোল ক'রে পাকিয়ে রাখা মস্ত পটের আকারের কাগজ, তাতে গাছের ডাল-পালা-পাতা-ফল-ফুল নক্‌শায় এই রাজবংশ-জাত স্ত্রী-পুরুষদের নাম লেখা। সবটা খুব রঙ-চঙ করা। য়িহুদী পুরাণোক্ত মানবের আদি-পুরুষ আদম-থেকে আরম্ভ ক'রে আমাদের পাকু-আলামের পূর্ব্বপুরুষদের নাম দেওয়া হ'য়েছে। হিন্দু পুরাণ-কথার আর মুসলমান পুরাণ-কথার অপূর্ব্ব খিচুড়ী এতে দেখা গেল। বাবা আদম-থেকে শিবের উৎপত্তি, আবার পঞ্চ-পাণ্ডবের উৎপত্তি; পাণ্ডবদের কয় পুরুষ পরে পাকু-আলাম-রাজবংশের আদি পুরুষের উৎপত্তি! এইরূপে যবদ্বীপে নবাগত মুসলমান ধর্ম্মের পুরাণের হিন্দু ইতিহাসের বা পুরাণ-কাহিনীর একটা আপোষ করবার চেষ্টা হ'য়েছে, আর জোড়া-তাড়া দিয়ে বেশ কার্য্যকর আপোষ একটা দাঁড়িয়েও গিয়েছে।

পাকু-আলামের কাছে বাতিক-কাপড়ের নক্‌শার বিস্তর ছবি আছে, তার সব খাতা আনিয়ে দেখালেন। সাজ-ঘরে নিয়ে গিয়ে নাটকের সব সাজ-সজ্জা গহনা-পত্র দেখালেন।

শ্রীযুক্ত রেজিক-দম্পতী আজ সকালে তাঁদের বাড়ীতে কবিকে আমন্ত্রণ করেন, প্রাচীন ইন্দোনেসীয় শিল্প-দ্রব্য দেখাতে। চমৎকার ভাবে এঁদের সংগ্রহগুলি সাজানো হ'য়েছিল। নানা রকমের কিংখাব আর জরীর কাপড়। আমাদের কাশীর আর সুরাটের জরীর সাড়ীকেও টেক্কা দেয় এমন কাপড় সুমাত্রা দ্বীপে তৈরী হয়, তা জানা ছিল না—লাল সিঁদূরে' রেশমের কাপড়, একটু অদ্ভুত ধরণের সোনার জরীর আঁচলা, ফুল আর পাড়। পুরাতন গুজরাটের পাটোলা বিস্তর এঁরা সংগ্রহ ক'রেছেন, এই যবদ্বীপে ব'সে ব'সে। প্রাচীন তৈজসপত্রের—পিতল তামার জিনিসের বেশ সংগ্রহ। কেমন ক'রে ক্রমে ক্রমে তৈজসপত্রের ব্যবহার বিষয়ে যবদ্বীপে সুরুচির লোপ হ'চ্ছে, তা এঁরা পর-পর শতাব্দীর পর শতাব্দী ধ'রে তৈজস সাজিয়ে রেখে দেখিয়েছেন—অতি মনোহর যার রেখা-সুষমা এমন তামার ভৃঙ্গারের বদলে এখন এসে গিয়েছে নল-ওয়ালা টিনের মগ! এঁরা কিছু মিষ্টি-মুখ করালেন,—যবদ্বীপীয় ইসবগুলের শরবৎ খাওয়া গেল। ধন্যবাদ দিয়ে এই শিক্ষিত কলাবিৎ দম্পতীর কাছথেকে বিদায় নেওয়া গেল।

ডচেদের দুটো কারখানা আর দোকান আছে, তাতে যবদ্বীপীয় ঢঙের তৈজস-পত্র, বাতিক-কাপড়, কাঠের কাজ, ওআইয়াং, ব্রঞ্জের মূর্ত্তি প্রভৃতি শিল্প দ্রব্য তৈরী ক'রে বিক্রী হয়। দুটোরই বেশ ভালো অবস্থা। আমরা এই দুইয়ের মধ্যে Ter Horst সাহেবের কারখানা আর দোকান দেখলুম। কারখানায় পিতলের নানারকম জিনিস ঢালাই হ'চ্ছে, কাঠের খোদাইও হ'চ্ছে। যবদ্বীপীয় শিল্পের কেন্দ্র হচ্ছে এই যোগ্যকর্ত্ত। সুলতানের প্রাসাদের আশে-পাশেও বিস্তর কারিকর থাকে, সিন্ধী দোকানী চেলা-রামের সঙ্গে গাড়ী ক'রে গিয়ে সে জায়গাটায়ও ঘুরলুম। অন্য ডচ দোকানটীতেও গেলুম। আজ সারাদিন যবদ্বীপীয় শিল্পদ্রব্য দর্শনেই কেটে গেল। একজন আধুনিক যবদ্বীপীয় মূর্ত্তি-গড় কারিকরের তৈরী বর-বুদুর আর প্রাম্বানান্-এর ভাস্কর্য্যের ধাঁজে গড়া ছোটো একটী ব্রঞ্জ মূর্ত্তি কিনলুম—দেব-দেবীর মিলন মূর্ত্তি, ডচ্ দোকানদার ব'ললে শিল্পীর মতে উমা-সহিত শিবের মূর্ত্তি; শিবের ক্রোড়দেশে গৌরী উপবিষ্টা; এটী অতি সুন্দর কাজ, চমৎকার ভাবে পূর্ণ—আজ-কালকার মুসলমান শিল্পীর হাতে এমন জিনিস যে বেরোয়, তাতেই যবদ্বীপের জীবনে তার প্রাচীন হিন্দু-ধর্ম্মের অনুভূতি এখনও কতখানি প্রবল তা অনুমান করা যায়।

রাত্রে কবি স্থানীয় Kunstkring-সভায় তাঁর কবিতার পাঠ শোনালেন—ইংরিজীতে আর বাঙলায়, প্রায় সওয়া ঘণ্টা ধ'রে।

পাকু-আলাম-এর এক aunt (অর্থাৎ খুড়ী বা মাসী বা পিশী) এসেছেন আজ; ইনি বেশ ইংরিজি ব'লতে পারেন। ইনি ধীর প্রকৃতির মাতৃভাব-মণ্ডিত মহিলা; ভারতবর্ষ সম্বন্ধে অনেক কথা জিজ্ঞাসা ক'রলেন। ইনি আসায় পাকু-আলাম-এর সঙ্গে কথাবার্ত্তার পক্ষে আরও সুবিধা হ'ল।

২১শে সেপ্টেম্বার, বুধবার।—

সকালে কতকগুলি সওদা ক'রলুম—Ter Horst এর দোকানে কিছু যবদ্বীপীর তৈজস, আর অন্যত্র গোটা ছয়েক কাঠের মুখস কিনলুম—নাটকে এগুলি ব্যবহৃত হ'ত, প্রাচীন যবদ্বীপীয় শিল্পের সুন্দর নিদর্শন; আর পূর্ব্বোক্ত হর-গৌরী মূর্ত্তির কারিকরের তৈরী গুটি দুই ব্রঞ্জ মূর্ত্তি—একটী বর-বুদুরের ধরণে উপবিষ্ট বুদ্ধমূর্ত্তি, আর একটী চণ্ডী-সেবুর অনুকরণে যক্ষ দ্বারপাল মূর্ত্তি।

কবির সঙ্গে Taman Siswo 'তামান শিশ্ব' বিদ্যালয় দেখতে গেলুম বেলা দশটায়। শ্রীযুক্ত সূর্য্যনিঙ্‌রাট্‌ ব'লে একটী যবদ্বীপীয় ভদ্রলোক রবীন্দ্রনাথের শান্তি-নিকেতন বিদ্যালয়ের অনুপ্রাণনায় বছর কতক হ'ল ইস্কুলটী করেছেন। ছাত্রের সংখ্যা বেশী নয়—জন পঞ্চাশেক ছাত্র, জন ষাটেক ছাত্রী, এদের নিয়ে ইস্কুল। শিক্ষক চব্বিশ জন, শিক্ষয়িত্রী সাত জন। ছাত্রেরা প্রায় সবই আর ছাত্রীদের জন তেরো ইস্কুলের বোর্ডিং-এ থাকে। সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে যবদ্বীপীয় শিল্প কলা প্রভৃতিও শিক্ষা দেওয়া হয়। কবির সঙ্গে তামচুড়, শ্রীযুক্তা রেজিঙ্ক-পত্নী, ডাক্তার মুনস্‌, আর আমি ছিলুম। কবিকে স্বাগত ক'রলে, তাঁর নামে যবদ্বীপীয় ভাষায় গান বেঁধেছিল তা ছাত্রীরা গাইলে, ইংরিজিতে অভিনন্দন-পাঠ ক'রলে। কবিকে কিছু ব'লতে হ'ল। এরা কবির আগমনে সত্য-সত্যই খুবই খুশী, ইস্কুলের ব্যবস্থা আর এর atmosphere এখানকার ধরণ-ধারণ আমাদেরও চমৎকার লাগ্‌ল। ঘণ্টা দেড়েক এখানে কাটানো গেল।

কবিকে এরা যবদ্বীপীয় গানটীতে 'ভুজঙ্গ' ব'লে উল্লেখ ক'রেছে। মধ্যে-যুগে যে অর্থে যবদ্বীপে এই শব্দ প্রয়োগ হ'ত, আর এখনও হ'য়ে থাকে, সে অর্থ ভারতে এখন অজ্ঞাত; আগে হয় তো সে অর্থ ভারতেও প্রচলিত ছিল। যবদ্বীপের মজ-পহিৎ সাম্রাজ্য যখন দ্বীপময় ভারতে বিস্তীর্ণ হয়, তখন যবদ্বীপ থেকে হিন্দুধর্ম্ম প্রচারের জন্য বিজিত দ্বীপময় ভারতের নানা স্থানে পুরোহিত আর গুরু বা উপদেশক পাঠানো হ'ত।—এঁরা শাস্ত্রে পণ্ডিত, লোক-শিক্ষক হ'তেন, এদের সম্মানিত নাম ছিল Boedjangga বা 'ভুজঙ্গ'। উড়িষ্যার ভুবনেশ্বরে বিন্দুসরোবর-তীরে অনন্ত-বাসুদেব মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা, বাঙলার রাজা হরিবর্ম্মদেবের মন্ত্রী, রাঢ়ের সিদ্ধল-গ্রামের বিখ্যাত পণ্ডিত ভট্টভবদেবের যে সংস্কৃত প্রশস্তি ঐ মন্দিরের গায়ে এখনও বিদ্যমান আছে, তাতে—খ্রীষ্টীয় আনুমানিক ১১০০সালের এই শিলালেখে—ভট্টভবদেবকে 'বালবলভী-ভুজঙ্গ' আখ্যা দেওয়া হ'য়েছে। এখানে এই 'ভুজঙ্গ' শব্দের অর্থ যে কি, তা এখনও স্থির হয় নি, তবে 'বালবলভী' কোনও স্থানের নাম ব'লে স্বীকৃত হয়। 'ভুজঙ্গ' অর্থে শাস্ত্রজ্ঞ ধর্ম্মোপদেশক—যে অর্থ যবদ্বীপে এখনও প্রচলিত—সে অর্থ ধ'রলে, প্রাচীনকালে বাঙলা-দেশেও শব্দটীর যে এই অর্থে প্রয়োগ ছিল তা বোঝা যায়, আর 'বালবলভী-ভুজঙ্গ' পদটীরও একটী সঙ্গত অর্থ হয়।

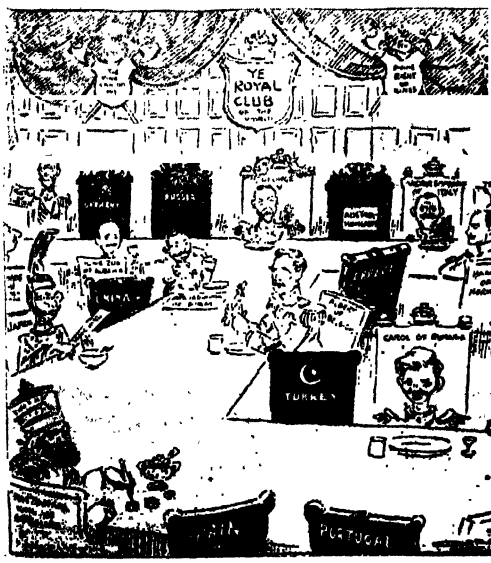
আজ সন্ধ্যায় প্রায় দেড় ঘণ্টা ধ'রে ভারতীয় চিত্রকলা-বিষয়ে লণ্ঠন-যোগে আমার বক্তৃতাটী দিলুম, এখানকার Masonic Lodge-এ, Java Institute-এর ব্যবস্থা অনুসারে। জন পঞ্চাশ মাত্র ডচ্‌ আর যবদ্বীপীয় শ্রোতা ছিলেন; শ্রীযুক্ত বাকে আমার বক্তৃতা ডচে অনুবাদ ক'রলেন।

রাত্রি ন'টা থেকে বারোটা পর্য্যন্ত পাকু-আলাম-এর পেণ্ডপোতে ছায়ানাটকের প্রদর্শন হ'ল। যথারীতি 'দালাঙ্‌' ব'সে কথকতা ক'রে ওআইয়াং পুতুলের ছায়া ফেলে ফেলে অভিনয় ক'রে যেতে লাগলেন। বিষয় ছিল—সীতা-হরণ আর হনুমৎ-সন্দেশ। অভিনয় আরম্ভ

হবার পূর্ব্বে পাকু-আলাম আমাকে একটী অনুষ্ঠান দেখালেন —অভিনয়ের পূর্ব্বে শিবের পুজো। ছায়া-অভিনয়ের পর্দ্দার পাশে দুটী থালার উপরে কলাপাতা পেতে তার উপরে কিছু চা'ল, সুপুরি, না'রকল রাখা হয়, আর কিছু নানা রঙের সুতো,—বোধ হয় বস্ত্রের পরিবর্ত্তে ; আর রাখা হয় দুটী ডিম। এটী হ'চ্ছে 'বটার' গুরু' অর্থাৎ ভট্টারক শিব-গুরুর নৈবেদ্য ; এটী দালাঙ্-এর প্রাপ্য। হিন্দু-যুগে শিব-পূজা ক'রে তবে অভিনয় বা গান হ'ত,—এ তারই স্মৃতি, দেশের লোকে মুসলমান হ'য়ে গেলেও এই অনুষ্ঠান এখনও চ'লে আস্‌ছে। রামায়ণ বা অন্য কিছু গানের সঙ্গে সঙ্গে তার পট দেখানোর রীতি এখনও যবদ্বীপে প্রচলিত আছে, তাতেও এই রকম নৈবেদ্য দিতে হয়। আজকের ছায়াভিনয়ে রেজিক্ক্‌-দম্পতী, ডাক্তার মুন্‌স্‌, ডাক্তার বস্‌ আর ডাক্তার কালেন্‌ফেল্‌স্‌ আমাদের সঙ্গে থাকায় সব বোঝবার পক্ষে বেশ সুবিধা হ'চ্ছিল।

'তামান শিশ্ব' বিদ্যালয়ের একটি শিক্ষকের সঙ্গে বিশেষ ভাবে আলাপ হ'ল—তিনি নিজেকে বৌদ্ধ ব'লে পরিচয় দিলেন। এঁর নাম Soekarsa Mangoenkawatja 'সুকর্ষ মাঙ্গুন্‌-কবচ' ; বয়স অল্প ; খুব উৎসাহী, ডচ জানেন, জারমান জানেন, ইংরেজীও জানেন, কিন্তু প'ড়তে পারেন, ব'লতে পারেন না। আমার যথা-জ্ঞান জারমানে এঁর সঙ্গে আলাপ ক'রলুম। পরে ইনি আমাকে জারমানে চিঠি লেখেন, দেশ থেকে আমি এঁকে হিন্দুধর্ম্ম সম্বন্ধে কিছু বই পাঠিয়ে দিই। ইনি ব'ল্‌লেন, যবদ্বীপে এরূপ কতকগুলি বংশ আছে যারা কখনও মুসলমান হয়নি, এঁদের বংশ সেই রকমের। একথা শুনে আশ্চর্য্য হ'য়ে গেলুম। আমার মনে হয়, মুসলমান সমাজে থাক্‌লেও মুসলমান ধর্ম্মে আস্থা মোটেই নেই এই রকম যবদ্বীপীয় বংশ বিরল নয় ; আগে-কার দিনে বোধ হয় খুবই সাধারণ ছিল ; ইনি এইরকম একটি পরিবারের ছেলে। হিন্দু-দর্শন থেকে বঞ্চিত হওয়া, এঁর মতে, যবদ্বীপের লোকেদের পক্ষে একটি অনপনেয় মানসিক আর নৈতিক হানি ; কর্ম্মদোষে তাঁর স্বজাতি প্রাচীন ভারতের হিমালয়বাসী ঋষিদের প্রোক্ত ব্রহ্মবিদ্যা থেকে দূরে চ'লে গিয়েছে। পরে ইনি আমায় যে চিঠি লেখেন, তাতেও এই ভাবে তাঁর স্বজাতির জন্য আক্ষেপ-প্রকাশ করেন। [আগামী বারে সমাপ্য]

THE VACANT CHAIRS

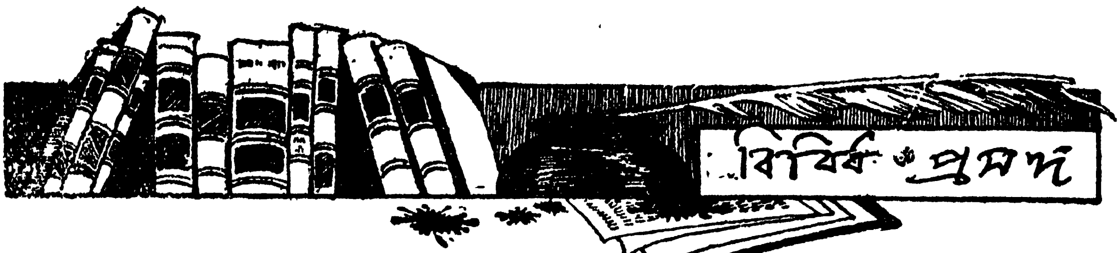


শূন্য সিংহাসন

GRIM MARCH OF PROGRESS



সিংহাসনগুলি নিলামে উঠিয়াছে



রাজনৈতিক বা প্রতিহিংসামূলক হত্যা

ভারতবর্ষের দেশী বা বিদেশী সরকারী কোন কর্ম্মচারী নিহত হইলে, এরূপ হত্যা সাধারণতঃ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে বা প্রতিশোধ লইবার জন্য করা হইয়াছে, এইরূপ অনুমান করা হয়। মোটের উপর এরূপ অনুমান সত্য। হত্যার উদ্দেশ্য যাহাই হউক, যতদিন হইতে এরূপ নরহত্যা হইতেছে, সংবাদপত্রের সম্পাদকেরা এবং জননায়কেরা তাহার নিন্দা করিয়া আসিতেছেন;—সাধারণ নরহত্যার নিন্দা যেরূপ ভাষায় করা হয়, তাহা অপেক্ষা অধিকতর আবেগময় ও তীব্রতর ভাষাতেই করা হইয়া আসিতেছে। গবন্মেণ্টও এরূপ ঘাতকদিগকে ও তাহাদের সহচরদিগকে যথাসাধ্য খুঁজিয়া বাহির করিয়া শাস্তি দিয়া আসিতেছেন। এইরূপ নরহত্যা বন্ধ করিবার জন্য বিশেষ বিশেষ আইনও প্রণীত হইয়াছে। এই প্রকার কাণ্ডের সঙ্গে যোগ বা তাহার সহিত সহানুভূতি আছে এইরূপ সন্দেহে শত শত ব্যক্তির স্বাধীনতা অল্প বা দীর্ঘ কালের জন্য লুপ্ত করা হইয়াছে। ইংরেজদের কাগজের তর্জ্জন-গর্জ্জন, লাটবেলাটের উপদেশ ধমক ইত্যাদিও চলিয়া আসিতেছে।

কিন্তু এরূপ হত্যাকাণ্ড বন্ধ হয় নাই, কখন কখন কিছু দিন বন্ধ থাকিয়া আবার, যেমন বর্ত্তমান সময়ে, বাড়িয়া উঠিয়াছে। কেমন করিয়া এরূপ নরহত্যা বন্ধ করা যায়, সে বিষয়ে সম্পাদকেরা এবং অন্যেরাও অনেক কথা লিখিয়াছেন। গবন্মেণ্টের মতে বে-সরকারী লোকদের এই সব উক্তির কোন মূল্য আছে, গবন্মেণ্টের আচরণে এমন মনে হয় না। যাহারা, যে-কোন উদ্দেশ্যে বা কারণেই হউক, হত্যানীতিতে বিশ্বাস করে, তাহারাও নেতাদের ও সম্পাদকদের কথায় আস্থাবান্, এমন মনে হয় না।

যখনই কোন রাজকর্ম্মচারী নিহত হয়, তখনই এংলোইণ্ডিয়ান্ ও ব্রিটিশ কাগজগুলা ও বণিকরা কংগ্রেসকে, নেতাদিগকে দোষী করে, এবং তাহারা এরূপ হত্যার তীব্র নিন্দা করুক, ধমক দিয়া এইরূপ দাবি করে। বস্তুতঃ এই ব্যক্তিরা অনেকেই ধমক খাইবার আগেই হত্যার নিন্দা করিয়া থাকেন; কাহারও কাহারও কৃত 'নিন্দাবাদ ইংরেজদের কাগজের কটূক্তির পরে ঘটিয়া থাকে—যদিও তাঁহারা ধমক খাইয়া এরূপ নিন্দা করেন, তাহার কোনও প্রমাণ নাই। কিন্তু এংলোইণ্ডিয়ান্ ও ব্রিটিশ কাগজগুলার কাছে কাহারও নিস্তার নাই। "মান্যগণ্য" কোন ব্যক্তি বা কোন সম্পাদক হত্যার নিন্দা না করিলে, তাঁহাকে হত্যার উৎসাহদাতা বা প্রশ্রয়দাতা মনে করা হয়; নিন্দা করিলে তাঁহাকে ভীত ভণ্ড মনে করা হয়। উভয়সঙ্কট। এই সব দেশী লোকদের প্রতি উচ্চপদস্থ ইংরেজ রাজপুরুষদের মনের ভাব বেশ পরিষ্কার ভাষায় প্রকাশ পায় না, অনুমান করিয়া লইতে হয়। এংলোইণ্ডিয়ান ও ব্রিটিশ সম্পাদকেরা এই রাজপুরুষদের জা'তভাই এবং "বাদশার দোস্ত"; সুতরাং তাহাদের লেখা রাজপুরুষদের মনের দর্পণ মনে করা অস্বাভাবিক নয়।

হতভাগ্য দেশী নেতা ও সম্পাদকদের প্রতি সরকারী ও বে-সরকারী ইংরেজদের অনুগ্রহদৃষ্টি ত এইরূপ। যাহারা হত্যানীতির সমর্থক ও অনুসারী, তাহাদের মতেও সম্ভবতঃ হত্যার নিন্দকেরা হয় ভীত ভণ্ড, নয় আহাম্মক। কেন-না, এই সব বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তি পঁচিশ ত্রিশ বৎসর ধরিয়া হত্যার নিন্দা ও তাহার বিরুদ্ধে যুক্তি প্রয়োগ করিয়া আসিলেও বয়ঃকনিষ্ঠ হত্যানীতিসমর্থক দলের মনের উপর তাহার কোন প্রভাব পড়িয়াছে বলিয়া মনে হয় না। আমাদের মত বৃদ্ধ মানুষদিগকে তাহাদের ভীত ভণ্ড মনে করিবার একটা কারণ সম্ভবতঃ এই, যে, ভারতবর্ষে আইনের কবলে না পড়িয়া রাজনৈতিক অনেক বিষয়ের চূড়ান্ত আলোচনা নিঃশেষে করা যায় না ও হয় না। আমরা বৃদ্ধেরা সবাই সরকারী ও বে-সরকারী ইংরেজদের এবং দেশী হত্যানীতির সমর্থকদের ভণ্ডামি অপবাদের উপযুক্ত পাত্র কি-না, তাহার সপক্ষে বা বিপক্ষে কিছুই বলিব না। হত্যানীতির ও হত্যাকার্য্যের উচ্ছেদ সাধনের জন্য, ভয়প্রদর্শন, কঠোর আইন প্রণয়ন এবং শাস্তিদান ছাড়া, গবন্মেণ্টের আরও কি কাজ করা উচিত, সে বিষয়েও কিছুই বলিব না। কারণ, যাহা বলিবার লিখিবার, তাহা পুনঃ পুনঃ বলা ও লেখা হইয়াছে। মনে মনে বা কার্য্যতঃ হত্যানীতির সমর্থন করিবার কোন সাক্ষাৎ বা পরোক্ষ, যথার্থ বা কল্পিত, কারণ যাহাতে দেশে না থাকে,

দেশের এরূপ অবস্থা উৎপাদন করিবার চেষ্টা আমাদের ক্ষুদ্র শক্তি অনুসারে করিতে থাকিব। যে-সকল যুবক বাঁচিয়া থাকিয়া নানাপ্রকারে দীর্ঘকাল ধরিয়া দেশের হিত করিতে পারিত, হত্যানীতির কার্য্যতঃ সমর্থন করিতে গিয়া তাহাদের ক্রোধভাজন কাহারও কাহারও এবং তাহাদের নিজেদেরও অনেকের অকালে প্রাণ যায়। দেশের অবস্থা এরূপ করিবার অবিরাম চেষ্টা আমরা করিব, যাহাতে মূল্যবান্ মানবজীবনের এরূপ অপচয়ের কোন উপলক্ষ্য না থাকে, বা না ঘটে। মানুষের শক্তি, আমাদের মত মানুষের শক্তি, অতি অল্প। কিন্তু চেষ্টা করিবার অধিকার সকলেরই আছে; এবং সেরূপ চেষ্টা একান্ত কর্ত্তব্যও বটে।

—

হত্যানীতি ও মহাত্মা গান্ধী

বোম্বাইয়ের অস্থায়ী গবর্ণরকে হত্যা করিবার চেষ্টা এবং আলিপুরের জজ মিঃ গার্লিককে মারিয়া ফেলা উপলক্ষ্যে সমগ্রভারতীয় কংগ্রেস কমিটির গত অধিবেশনে মহাত্মা গান্ধী হিংসানীতির বিরুদ্ধে যে প্রস্তাব উপস্থাপিত করেন এবং যে বক্তৃতা করেন, তাহাতে সংক্ষেপে রাজনৈতিক ও প্রতিহিংসামূলক হত্যার বিরুদ্ধে যাহা কিছু বলিবার, তাহা বলা হইয়াছে। তিনি তাঁহার বিশ্বাস অনুসারে যাহা বলা উচিত, তাহা বলিয়াছেন। অধিকন্তু ইহার পূর্ব্বে তিনি তাঁহার 'ইয়ং ইণ্ডিয়া' কাগজে লিখিয়াছিলেন :—

The Bhagat Singh worship has done and is doing incalculable harm to the country. Bhagat Singh's character, about which I had heard so much from reliable sources, and the intimate connection I had with the attempts that were being made to secure commutation of the death-sentence, carried me away and identified me with the cautious and balanced resolution passed at Karachi. I regret to observe that the caution has been thrown to the winds. The deed itself is being worshipped as if it was worthy of emulation. The result is *goondaism* and degradation wherever this mad worship is being performed. I hope that students and teachers throughout India will seriously bestir themselves and put the educational house in order.

সরকারী ও বে-সরকারী ইংরেজরা যদি ইহাতেও গান্ধীজীর প্রতি প্রসন্ন না হন, তাহা হইলে তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় হইবে না। কারণ, আমাদের ধারণা, ইংরেজরা রাজনৈতিক হত্যানীতিকে ততটা ভয় ও অপসন্দ করেন না, যতটা ভয় ও অপসন্দ করেন স্বাধীনতা লাভার্থ মহাত্মাজীর প্রবর্ত্তিত অহিংস সত্যাগ্রহকে। ইংরেজ একজনও কোনও কারণে নিহত না হয়, তাহা তাঁহারা অবশ্যই চান; কিন্তু অধিকন্তু এইটি চান, যে, আমরা সবাই মূক গোলাম বা মুখর স্তাবক হইয়া থাকি এবং তাঁহাদের অন্যায় স্বার্থেও কোন প্রতিবন্ধক না ঘটাই।

কংগ্রেসের করাচী অধিবেশনে ভগৎ সিং প্রভৃতি সম্বন্ধে যে-প্রস্তাব গৃহীত হয়, তাহার সম্বন্ধে আমরা বৈশাখের 'প্রবাসী' ও মে মাসের 'মডার্ণ রিভিউ' কাগজে যাহা লিখিয়াছিলাম এখানে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি।

বৈশাখের 'প্রবাসী'র ১৬০ পৃষ্ঠায় লেখা হইয়াছিল :—

"সর্দ্দার ভগৎ সিং ও তাঁহার দুইজন সঙ্গীর ফাঁসী উপলক্ষ্যে মহাত্মা গান্ধী ভগৎ সিং-এর সাহসের প্রশংসা করিবার সময় একথাও বলিয়াছিলেন, যে, কেহ যেন তাহাদের পন্থা অবলম্বন না করে। কিন্তু ভগৎ সিং-এর দুঃসাহসের প্রশংসাই উত্তেজনাপ্রবণ প্রতিহিংসাপরায়ণ অনেক লোকের মনে স্থান পাইয়াছে, মহাত্মাজীর সতর্কতার উপদেশে তাহারা কর্ণপাত করে নাই।"

মে মাসের 'মডার্ণ রিভিউ'-এ যাহা লিখিয়াছিলাম, তাহার কিয়দংশ এই :

"... the public at large have overdone the belauding of Bhagat Singh and his comrades, with the resulting evil effect. Mahatmaji has dutifully dissuaded young men from following Bhagat Singh's bad example. But it is not clear whether the praise or the dispraise of Bhagat Singh has made the greater impression on the public mind."

—

কংগ্রেস ও হত্যানীতি

অনেক ইংরেজ অসহযোগ আন্দোলনকে এবং কংগ্রেসকে হত্যানীতির জন্য দায়ী করিতেছে। তাহাদের মতে কংগ্রেসের মুণ্ডপাত করিলেই হত্যানীতির অনুসরণ বন্ধ হইবে। এই বুদ্ধিমানেরা জানে না কিংবা জানিয়াও না-জানার ভাণ করিতেছে, যে, স্বাধীনতা লাভার্থ কংগ্রেসের অহিংস সত্যাগ্রহ প্রচেষ্টা না থাকিলে, সম্ভবতঃ হত্যানীতি আরও ব্যাপক ভাবে অনুসৃত হইত, এবং যদি ইতিপূর্ব্বেই স্বরাজলাভদ্বারা কংগ্রেসের অহিংস নীতি জয়যুক্ত হইত, তাহা হইলে হত্যানীতি অনাহারে মারা যাইত। কংগ্রেসের মুণ্ডপাত করা, অহিংস সত্যাগ্রহের স্বরাজলাভ চেষ্টা বিফল করা, হিংস্রতাকে উস্কাইয়া দেওয়ার অন্য নাম। ভারতবর্ষের স্বরাজলাভের যাহারা বিরোধী, তাহারা হয়ত অনেকে অহিংস সত্যাগ্রহ অপেক্ষা ভারতীয় অল্পসংখ্যক লোকের অদলবদ্ধ বলপ্রয়োগ-চেষ্টাই পসন্দ করে। কারণ, অহিংস সত্যাগ্রহ অল্প লোকের অদলবদ্ধ বলপ্রয়োগ অপেক্ষা অতি দুঃপরাজেয়।

ডিচারের একটি কথা

ইংরেজদের নানা কাগজে ভারতীয় নেতাদের ও সম্পাদকদের উপর গালিবর্ষণ চলিতেছে। তাহার মধ্যে দু-একটা এমন কথাও বলা হইতেছে, যাহা শাঁখারির করাতের মত দুই দিকে কাটিতে পারে। যেমন, 'ক্যাপিট্যাল' নামক ইংরেজ ধনিকদের কাগজের নামজাদা ছদ্মনামা লেখক ডিচারের নিম্নোদ্ধৃত উক্তি।

"Terrorism without limit on the one side can only result in terrorism without limit on the other."

তাৎপর্য্য। "একদিকে ত্রাসোৎপাদননীতির অসীম প্রয়োগ কেবল অন্যদিকে ঐ নীতির সীমাহীন প্রয়োগেই পর্য্যবসিত হইতে পারে।"

ডিচার এ কথা সম্ভবতঃ এই অর্থে বলিয়াছেন, যে, যদি ভারতীয়েরা (বা তাহাদের কতক অংশ) হত্যাকাণ্ড দ্বারা অন্য পক্ষের মনে ত্রাস উৎপন্ন করিতে চায়, তাহা হইলে তাহার ফলে অন্য পক্ষও উহাদের প্রতি ঐ নীতির সীমাহীন প্রয়োগ করিবে। কিন্তু অদূর ভবিষ্যতে যাহা ঘটিতে পারে বলিয়া ডিচার অনুমান করিয়াছেন, উল্টা দিক্ দিয়া অতীতে ও বর্ত্তমানে তাহাই হয়ত ঘটিয়াছে। অর্থাৎ তিনি যেমন বলিতেছেন, ভারতীয় ত্রাসোৎপাদকদের মত ও আচরণ অন্য পক্ষের মত ও আচরণের পরিবর্ত্তন ঘটাইতে পারে, তেমনই তাঁহাকেও অনুরোধ করা যাইতে পারে, যে, ত্রাসোৎপাদননীতিতে অন্য পক্ষের অপরিসীম বিশ্বাস এবং তদনুযায়ী আচরণ কতকগুলি ভারতীয়ের মনে ঐ বিশ্বাস সংক্রামিত করিয়াছে কি না, তিনি তাহার অনুসন্ধান করুন।

—

বঙ্গে সরকারী-ব্যয়সঙ্কোচ কমিটি অনাবশ্যক !

ভারত গবন্মেণ্ট এবং প্রাদেশিক গবন্মেণ্টসমূহ কমিটি বসাইয়া ব্যয়সঙ্কোচের চেষ্টা করিতেছেন। বঙ্গে সেরূপ কোন কমিটি বসে নাই। রায় বাহাদুর হরিধন দত্ত ও রায় বাহাদুর সতীশচন্দ্র মুখুজ্যের প্রশ্নের উত্তরে বঙ্গের রাজস্ব-মেম্বার মার সাহেব বলিয়াছেন, বাংলা সরকার ওরূপ কমিটি বসাইবেন না ; কারণ, যতটা ব্যয়সঙ্কোচ করা যাইতে পারে, তাহা করা হইয়াছে। ইহা আমাদের বিবেচনায় সত্য নহে। কারণ, বড় বড় চাকুরিয়াদের বেতন ভাতা ইত্যাদি বেশ অনাবশ্যক রকম মোটাই আছে। কিন্তু ব্যয়সংক্ষেপ কমিটি না বসায় আমরা দুঃখিত নহি। কেন-না, কমিটির বিচারে গরীবদেরই অন্ন মারা যাইত। মোটা বেতনের লোকদের আয় আবশ্যকমত কমাইবারমত সাহস ও ন্যায়বুদ্ধি কমিটির হইত না।

বঙ্গে সরকারী ব্যয় কিরূপ কমান হইয়াছে, তাহার একটা মাত্র দৃষ্টান্তই যথেষ্ট হইবে। শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রকুমার বসু ব্যবস্থাপক সভায় বলিয়াছেন, বঙ্গে সরকারী ব্যয়সঙ্কোচ কমিটি ১৯২২ সালে বসিয়াছিল। তাহার পর ১৯২৩-২৪ সালে পুলিসের বরাদ্দ ছিল ১,৭৫,০০,০০০ টাকা, এ বৎসর মোট বরাদ্দ এ পর্য্যন্ত ২,২৪,৭৪,০০০ টাকা হইয়াছে ! সঙ্কোচের সরকারী মানে কি বৃদ্ধি ?

—

বঙ্গে ছাত্রীদের উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা

বঙ্গে কেবলমাত্র ছাত্রীদের শিক্ষার জন্য যথেষ্ট কলেজ নাই। অথচ স্বভাবতঃ, এবং অধুনা বাল্যবিবাহ-নিরোধ আইনের প্রভাবে, উচ্চশিক্ষালাভার্থিনী ছাত্রীদের সংখ্যা বাড়িয়া চলিতেছে। সেইজন্য কলিকাতার কতকগুলি ছেলেদের কলেজে এবং মফঃস্বলেরও কয়েকটি ছেলেদের কলেজে ছাত্রীদিগকে ভর্ত্তি করিবার বন্দোবস্ত হইয়াছে। কোন কোন কলেজে, যেমন কলিকাতায় বিদ্যাসাগর কলেজে, ছাত্রীদের জন্য আলাদা ক্লাসের ব্যবস্থা হইয়াছে। যেমন করিয়াই হউক, যাঁহারা কলেজের শিক্ষা চান, তাঁহাদের তাহা পাওয়া চাই।

—

বাল্যবিবাহ-নিরোধ আইনের প্রয়োগ

আজমীরের রায় সাহেব হরবিলাস শারদা মহাশয়ের চেষ্টায় যে বাল্যবিবাহ-নিরোধ আইন প্রণীত হইয়াছে, গবন্মেণ্ট প্রথম প্রথম তাহা প্রয়োগ করেন নাই। বোধ হয়, গোঁড়া মুসলমান ও গোঁড়া হিন্দুদিগকে হাতে রাখিয়া স্বরাজ্যলাভচেষ্টার ব্যাঘাত জন্মান উদ্দেশ্য ছিল। তাহার পর বাহিরের কোন চাপে হয়ত সরকারী সুবুদ্ধি কিছু জাগিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু এখনও এই আইনভঙ্গকারীরা যথেষ্ট শাস্তি পাইতেছে না।

—

বিদেশী বস্ত্র বর্জ্জন

১৯৩০ সালের ১৮ই জুলাই এবং ১৯৩১ সালের ১৮ই জুলাই যে-যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছিল, সেই সেই সপ্তাহে ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন বন্দরে বিলাতী ধোয়া ও কোরা কাপড় কত আমদানী হইয়াছিল তাহা নীচের ফর্দ্দে দেখান হইয়াছে।

কোরা কাপড়

বন্দর	১৯৩০এর সপ্তাহ	১৯৩১এর সপ্তাহ
কলিকাতা	২৮,৯৩,০০০ গজ	৩,৬৪,০০০ গজ
বোম্বাই	২,৮৮,০০০ "	১৩,৯৯,০০০ "
মাদ্রাজ	৭,৮৫,০০০ "	২,৬৮,০০০ "

ধোয়া কাপড়

কলিকাতা	১১,৪২,০০০ গজ	৫,৮৫,০০০ গজ
বোম্বাই	১০,১৩,০০০ "	১৩,১৮,০০০ "
মান্দ্রাজ	৫,৭৪,০০০ "	৭৬,০০০ "

অন্যান্য কাপড়

কলিকাতা	১১,৪৯,০০০ গজ	৬,৯৩,০০০ গজ
বোম্বাই	১৩,৯৬,০০০ "	১৬,২৭,০০০ "
মান্দ্রাজ	৪,২২,০০০ "	১,৯৮,০০০ "

উপরের ফর্দ্দ হইতে বুঝা যায়, বোম্বাইয়ে বিলাতী কাপড়ের কাট্‌তি বাড়িয়াছে, এবং কলিকাতা ও মান্দ্রাজে কমিয়াছে।

১৯৩০ ও ১৯৩১ সালের ২৫শে জুলাই যে-যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, সেই-সেই সপ্তাহে ঐ তিনটি বন্দরে বিলাতী কাপড়ের আমদানীর ফর্দ্দও দিতেছি।

কোরা কাপড়

বন্দর	১৯৩০এর সপ্তাহ	১৯৩১এর সপ্তাহ
কলিকাতা	২৮,০৯,০০০ গজ	২৫,৬০,০০০ গজ
বোম্বাই	৬,৪১,০০০ "	১৩,৬২,০০০ "
মান্দ্রাজ	৩,২৭,০০০ "	১১,৬৪,০০০ "

ধোয়া কাপড়

কলিকাতা	১৭,৫০,০০০ গজ	৬,৬৭,০০০ গজ
বোম্বাই	৬,৭৮,০০০ "	১২,০২,০০০ "
মান্দ্রাজ	৬,৯২,০০০ "	১০,৮৩,০০০ "

অন্যান্য কাপড়

কলিকাতা	২০,৩৪,০০০ গজ	১৩,৯৮,০০০ গজ
বোম্বাই	১০,৫২,০০০ "	১২,০২,০০০ "
মান্দ্রাজ	১,০১,০০০ "	২,১৪,০০০ "

এই তালিকায় দেখা যাইতেছে, যে, কলিকাতায় বিলাতী কাপড়ের কাট্‌তি কমিয়াছে, কিন্তু বোম্বাই ও মান্দ্রাজে বাড়িয়াছে।

ইহাতে অনুমান হয়, বঙ্গে এবং অন্য যে-সব প্রদেশে কলিকাতা হইতে বিলাতী কাপড় চালান হয়, সেই সব প্রদেশে বিলাতী কাপড়ের প্রতি অনুরাগ কমিয়াছে। অতএব বিলাতী কাপড় পরিহার করিবার চেষ্টা এই সব প্রদেশে আরও প্রবল করা দরকার।

কিন্তু এক দিকে যেমন বিলাতী কাপড়ের কাট্‌তি কমিতেছে, অন্য দিকে তেমনই জাপানী কাপড়ের কাট্‌তি বাড়িতেছে। ইহা অত্যন্ত দুর্লক্ষণ। ১৯২৪-২৫ সালে জাপান হইতে ১৫৫০ লক্ষ গজ কাপড় আমদানী হইয়াছিল। ১৯২৯-৩০ সালে তাহা বাড়িয়া ৫৬২০ লক্ষ গজ হইয়াছিল। তাহার পর আরও হয়ত বাড়িয়াছে। শুধু বিলাতী নয়, জাপানী এবং অন্য সব বিদেশী কাপড়ের ব্যবহার ত্যাগ করিতে হইবে, এবং দেশী কাপড়ে কাজ চালাইতে হইবে। তাহা করিতে হইলে খদ্দর ও দেশী মিলের কাপড় আরও খুব বেশী করিয়া প্রস্তুত করিতে হইবে।

—

বাঙালীর কাপড়

বাংলা দেশে খদ্দর আগেকার চেয়ে বেশী উৎপন্ন হইতেছে, এবং কাপড়ের কলও একটি একটি করিয়া বাড়িতেছে। কিন্তু বাংলা দেশে যত কাপড় দরকার, তত এখনও উৎপন্ন হইতেছে না। এই জন্য খদ্দর উৎপাদনের চেষ্টা যেমন প্রবলতর করিতে হইবে, মিলের সংখ্যাও তেমনই বাড়াইতে হইবে। বঙ্গের মিলগুলি বাঙালীর মূলধনে বাঙালী পরিচালকদের তত্ত্বাবধানে এবং যথাসম্ভব বাঙালী কারিগর ও শ্রমিকদের সাহায্যে চালান দরকার। যদি ইউরোপীয় বা বঙ্গের বাহিরের ভারতীয় ধনিকরা বাংলার মাটিতে মিল স্থাপন করিয়া অবাঙালী শ্রমিকদের দ্বারা তাহা চালায়, তাহাতে বঙ্গের দারিদ্র্য ও লজ্জা দূর হইবে না। অবশ্য, বিদেশীদের চেয়ে অবাঙালী ভারতীয়দের মিলের কাপড় ও সুতা আমরা পসন্দ করিব। আমাদের বিবেচনায় কাপড় কিনিবার সময় বাঙালীদের সাধ্যমত বঙ্গে উৎপন্ন খদ্দর কেনা উচিত। যাঁহারা খদ্দরের দাম দিতে অসমর্থ বা খদ্দর পসন্দ করেন না, বাঙালীদের মিলগুলির কাপড়ই তাঁহাদের কেনা উচিত। তাহা না পাওয়া গেলে, বঙ্গে প্রতিষ্ঠিত অবাঙালী ভারতীয়দের মিলগুলির কাপড় কেনা যাইতে পারে। তাহাতেও না কুলাইলে, বঙ্গের বাহিরে প্রতিষ্ঠিত ভারতীয়দের মিলগুলির কাপড় ব্যবহার্য্য। যাহারা ভারতীয় নহে, তাহাদের মিল ভারতবর্ষের বাহিরে বা ভারতবর্ষে, যেখানেই প্রতিষ্ঠিত হউক, তাহাদের কাপড় কেনা উচিত নয়।

কাপড় কেনার এই নিয়ম বিদ্বেষ- বা সংকীর্ণতাজাত নহে। গৃহী মানুষ যেমন সর্ব্বাগ্রে নিজের পরিবারস্থ লোকদের অভাব দূর করিতে বাধ্য, তেমনই নিজ গ্রামের শহরের জেলার প্রদেশের ও দেশের দারিদ্র্য দূর করিবার চেষ্টা করা তাহার প্রথম ও প্রধান কর্ত্তব্য। মা নিজের ছেলেদের খাওয়ান। তাহার মানে এ নয়, যে, তিনি অন্যের ছেলেদিগকে বিদ্বেষের চক্ষে দেখেন।

—

আহমদাবাদ-মার্কা "স্বদেশী" নীতি

ভারতবর্ষের কয়লার খনির অধিকাংশ বাংলা ও বিহার প্রদেশে স্থিত। এখন যাহা বিহারের অন্তর্গত, পূর্ব্বে তাহারও অন্ততঃ অধিকাংশ বাংলারই সামিল ছিল। এই সব কয়লার খনির দেশী মালিকদের একটি সমিতি বা সঙ্ঘ আছে। তাহার নাম ইণ্ডিয়ান মাইনিং ফেডারেশ্যন। আহমদাবাদের কাপড়ের কলওয়ালারা ভারতবর্ষীয় কয়লা ব্যবহার করেন না, বিদেশী (যথা—দক্ষিণ-আফ্রিকার) কয়লা অপেক্ষাকৃত সস্তা বলিয়া ব্যবহার করেন। সেই সম্বন্ধে ইণ্ডিয়ান মাইনিং ফেডারেশ্যনের সেক্রেটরী আহমদাবাদের মিলওয়ালাদের সভার সেক্রেটরীকে চিঠি লেখায় তিনি জবাব দিয়াছেন, যে, অন্য সব দেশের কয়লার সঙ্গে প্রতিযোগিতায় ভারতীয় কয়লা দামে সস্তা না হইলে আহমদাবাদের মিলওয়ালাদের পক্ষে ভারতীয় কয়লা ব্যবহার করা দুঃসাধ্য হইবে।

সোজা কথায় ব্যাপারটা দাঁড়াইতেছে এইরূপ :— "তোমরা বিহারী ও বাঙালীরা বিলাতী ও জাপানী কাপড় সস্তা হইলেও অপেক্ষাকৃত মাগ্‌গি—আহমদাবাদের কাপড় কিনিও; কেন-না, তোমরাও ভারতবর্ষের লোক, আমরাও ভারতবর্ষের লোক। কিন্তু আমরা তোমাদের খনির কয়লা ব্যবহার করিব না; কেন-না, যে দক্ষিণ-আফ্রিকায় ভারতীয়েরা উৎপীড়িত হয়, সেই দক্ষিণ-আফ্রিকার কয়লা কৃত্রিম উপায়ে 'ভারতবর্ষে তোমাদের কয়লার চেয়ে সস্তায় বিক্রী হয়!"

ইহারই নাম আহমদাবাদ-মার্কা "স্বদেশী" নীতি। শুনিয়াছি, বোম্বাইয়ের কলওয়ালারাও এই নীতির অনুসরণ করেন। তাহা হইলে ইহাকে "বোম্বেয়ে স্বদেশী নীতি" বলিতে পারা যায়।

এ-বিষয়ে আমরা আষাঢ়ের 'প্রবাসী'তে কিছু লিখিয়াছিলাম। তাহার পর, কংগ্রেসের কর্ণধার বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর কংগ্রেস-নেতাদের যাহাতে চোখে পড়ে, সেই উদ্দেশ্যে ইংরেজীতে 'মডার্ণ রিভিউ' কাগজেও আরও বেশী করিয়া কিছু লিখিয়াছিলাম। কিন্তু কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটির বা নিখিলভারতীয় কংগ্রেস কমিটির গত অধিবেশনে এই বিষয়টির কোন আলোচনার বৃত্তান্ত কোন দৈনিক কাগজে পাই নাই। মহাত্মা গান্ধীর বা বোম্বাই অঞ্চলের অন্য কোন কংগ্রেস-নেতার কাছে ব্যক্তিগত দরখাস্ত পাঠাইলে কি হইত জানি না। কিন্তু সম্ভবতঃ কেহ সেরূপ দরখাস্ত পাঠান নাই।

ইণ্ডিয়ান মাইনিং ফেডারেশ্যনের সেক্রেটরী আহমদাবাদের মিলওয়ালাদের সভার সেক্রেটরীর নিকট হইতে শেষ জবাব কি পাইয়াছেন জানি না। এই চূড়ান্ত জবাবটি কাগজে বাহির হওয়া উচিত। যদি উক্ত মিলওয়ালারা আমাদের কয়লা না কেনেন, তাহা হইলে, কংগ্রেস এরূপ বিষয়ে আমাদিগকে প্রাদেশিক কর্তৃত্ব (provincial autonomy) না দিলেও, আমাদের পক্ষেও তাঁহাদের কাপড় না-কেনা উচিত হইবে।

দক্ষিণ-আফ্রিকার গবন্মেণ্ট তথাকার রেলওয়ের ভাড়া ও জাহাজভাড়া সস্তা করান প্রভৃতি উপায়ে, তথাকার কয়লা ভারতবর্ষে ভারতীয় কয়লার চেয়ে সস্তায় বেচিবার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। আমাদের গবন্মেণ্ট যদি স্বাজাতিক (ন্যাশন্যাল) গবন্মেণ্ট হইত, ভারতবর্ষের রেলওয়েগুলা যদি জাতীয় সম্পত্তি হইত, তাহা হইলে আমরাও বিহার ও বাংলার কয়লা ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র বিদেশী কয়লার চেয়ে কম দামে নিশ্চয়ই দিতে পারিতাম। যে-কোন দিকেই আমরা সুবিধা চাই, দেখা যাইবে পূর্ণস্বরাজ ভিন্ন পুরা সুবিধা পাওয়া যাইবে না।

ইসলামের আদর্শ সম্বন্ধে মৌলানা আকরম খাঁ

যশোর জেলার রাজনৈতিক কন্‌ফারেন্সের সভাপতিরূপে মৌলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ যে বক্তৃতা করেন, তাহার মধ্যে নিম্নোদ্ধৃত কথাগুলি আছে।

হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা (দঃ) প্রথম সুযোগ পাওয়া মাত্রই মদিনার সমস্ত মুছলমান, এহুদী, পৌত্তলিক ও খৃষ্টানকে লইয়া এক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেন। এই গণতন্ত্রের ভিত্তিরূপে মক্কার এই "নিরক্ষর আরব" যে সনন্দ বা Magna Charta প্রস্তুত করিয়াছিলেন, তাহার কএকটা ধারা নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি। ইহাদ্বারা এছলামের আদর্শ সম্বন্ধে কতকটা আভাস পাওয়া যাইতে পারিবে। এই সনন্দের দ্বারা স্বীকার ও ঘোষণা করা হইতেছে যে :—

১। "মুছলমানগণ অন্য ধর্ম্মাবলম্বীদের সহিত মিলিয়া এক জাতি।"

৩। "গণতন্ত্রের কোন সমাজ বা ব্যক্তি দেশের সাধারণ শত্রুদের সহিত কোন প্রকার গুপ্ত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইবে না, তাহাদের কোন লোককে আশ্রয় দিবে না, তাহাদের সঙ্কল্পের কোন প্রকার সহায়তা করিবে না।"

৪। "মদিনা আক্রান্ত হইলে দেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য সকলে মিলিয়া যুদ্ধ করিবেন…।"

৫। "এহুদী, মুছলমান প্রভৃতি সকল সম্প্রদায় স্বাধীনভাবে আপন আপন ধর্ম্মকর্ম্ম পালন করিতে পারিবেন, কেহ কাহারও ধর্ম্মগত স্বাধীনতায় কস্মিনকালেও হস্তক্ষেপ বা বাধাদান করিবেন না।"

৬। "অমুছলমানদের মধ্যে কেহ কোন অন্যায় কাজ করিলে তাহা তাহার ব্যক্তিগত অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে—অর্থাৎ, সেজন্য তাহার বা তাহার সমাজের স্বত্বাধিকারের কোন প্রকার খর্ব্ব করা যাইতে পারিবে না।"

৮। "বর্ণ-ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে উৎপীড়িত মাত্রকেই রক্ষা হইবে।"

সকল ধর্ম্মে ও ধর্ম্মশাস্ত্রে নানা উচ্চ আদর্শ আছে। উচ্চতম আদর্শসমূহ অনুসারে কাজ করিলেই সেই-সেই ধর্ম্মের সার্থকতা হয় এবং তাহাদের গৌরব প্রতিষ্ঠিত হয়।

—

দলাদলির একটি দৃষ্টান্ত

বঙ্গের যে-সকল জেলার লোক দুর্ভিক্ষ ও প্লাবনে বিপন্ন তাহাদের সাহায্যের জন্য প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির উদ্যোগে একটি কমিটি গঠিত হইয়াছে, এবং আলবার্ট হলে ২৫শে শ্রাবণ সর্ব্বসাধারণের একটি সভারও অধিবেশন হইয়াছিল। স্যার প্রফুল্লচন্দ্র রায় তাহার সভাপতির কাজ করিয়াছিলেন। 'লিবার্টি' কাগজে ঐ সভার যে রিপোর্ট বাহির হইয়াছে, তাহাতে লিখিত আছে,

"When the meeting was proceeding hundreds of anti-Mahomedan leaflets were distributed among the ladies and gentlemen present but nobody took any notice of them. Afterwards it was learnt from enquiries that these leaflets were issued from the Ananda Bazar Patrika Office."

আমি ঐ সভায় কিয়ৎকাল উপস্থিত ছিলাম, এবং সংক্ষেপে একটি বক্তৃতাও করিয়াছিলাম। উদ্ধৃত ইংরেজী দুটি বাক্যের প্রত্যেকটি কথা সত্য কি-না, তাহার আলোচনা করিব না। 'লিবার্টি'তে যে লেখা হইয়াছে, 'আনন্দবাজার পত্রিকা' আফিস হইতে পত্রীগুলি বাহির করা হইয়াছিল, সেই বিষয়েই কিছু বলিতে চাই। 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় ঐ অপবাদ মিথ্যা বলিয়া মুদ্রিত হইয়াছে। যে ভাষায় তাহা মিথ্যা বলা হইয়াছে, তাহা সংযত হইলে ভাল হইত। 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র কর্ত্তৃপক্ষ আমাকে মৌখিকও জানাইয়াছেন, যে, ঐ পত্রী তাঁহারা বাহির করেন নাই। অন্য দিকে 'লিবার্টি'তে যাহা লেখা হইয়াছে, তাহা কাহার অনুসন্ধানের ফল এবং কবে কি প্রকারে সে অনুসন্ধান হইয়াছিল, তাহা জানি না। সরকারী বা বে-সরকারী কোন গুপ্ত অনুসন্ধানে আমরা আস্থাবান্ নহি। এই সব কারণে আমরা, 'আনন্দবাজার পত্রিকা'কে ঐ পত্রীর সহিত জড়িত করিবার বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ না পাইলে, 'লিবার্টি'র অপ্রকাশিতনামা রিপোর্ট-লেখক অপেক্ষা 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র কর্ত্তৃপক্ষকেই বিশ্বাস করা সঙ্গত মনে করি। 'লিবার্টি' বঙ্গে কংগ্রেসের দুই দলের একটির মুখপত্র, 'আনন্দবাজার' অন্য দলের সম্পত্তি বা মুখপত্র না হইলেও সেই দলের সমর্থক। কোন্ দল ঠিক কাজ করেন ঠিক কথা বলেন, তাহা আমরা নির্দ্ধারণ করিবার চেষ্টা করি নাই, করিবার সময় সুযোগ ও শক্তি নাই। বর্ত্তমান ক্ষেত্রে যে এই ব্যাপারটি সম্বন্ধে এত কথা লিখিলাম, তাহার কারণ প্রধানতঃ দুটি। প্রথম কারণ, 'লিবার্টি'তে রটিত অপবাদটির অনিষ্টকারিতা কংগ্রেসের দুই দলের মধ্যে আবদ্ধ না থাকিয়া ধর্ম্ম-সাম্প্রদায়িক ঝগড়া দ্বন্দ্ব উৎপন্ন করিতে পারে—মুসলমান সম্প্রদায় ইহার দ্বারা অকারণ 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র ও হিন্দুসম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে উত্তেজিত হইতে পারে। যাহা সত্য ও ন্যায়সঙ্গত এবং লোকহিতকর, তাহা প্রকাশ করিতে গিয়া যদি হিন্দু মুসলমান খৃষ্টিয়ান কোন সম্প্রদায়ের বিরাগ-ভাজন হইতে হয়, তাহা হইলেও কর্ত্তব্য করা উচিত। কিন্তু এইরূপ একটি সংবাদ রটনা তাদৃশ কর্ত্তব্য নহে। ইহার কোন প্রমাণ প্রকাশিত হয় নাই। দ্বিতীয় কারণ, আমি আলবার্ট হলের সভায় একজন বক্তা ছিলাম এবং দুর্ভিক্ষ ও প্লাবনপীড়িত লোকদের সাহায্যার্থ গঠিত যে কমিটির উদ্যোগে ঐ সভা আহূত হয়, তাহাতে আমারও নাম আছে। এই জন্য ইহা জানান আবশ্যক মনে করি, যে, ঐরূপ সংবাদের উৎপত্তি সম্বন্ধে কমিটির কোনও দায়িত্ব আছে বলিয়া আমি অবগত নহি।

—

বিপন্নকে সাহায্যদান সম্বন্ধে শ্রেণীভেদ

পৃথিবীর অন্য অনেক দেশের মত ভারতবর্ষেও ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের লোকেরা নিজেদের দুঃস্থ লোকদের সাহায্যের জন্য প্রয়োজন অনুসারে স্থায়ী বা অস্থায়ী বন্দোবস্ত করিয়া থাকেন। ইহা করিবার অধিকার সকল সম্প্রদায়েরই আছে। কিন্তু অমুক ধর্ম্মসম্প্রদায়ের বিপন্ন কোন লোককে সাহায্য করিও না, সাধারণ-ভাবে এমন বলা উচিত কি-না, এই যে প্রশ্ন উঠিয়াছে এবং যাহার প্রকাশ্য আলোচনা স্বভাবতই অপ্রীতিকর বলিয়া কেহ করিতেছেন না, তাহা অন্য প্রকারের প্রশ্ন। ধর্ম্মনিবিশেষে সাহায্যদানের নিমিত্ত গঠিত কমিটির এবং হিন্দুদিগকে সাহায্য দিবার জন্য গঠিত কমিটির, উভয়েরই, সভ্য থাকায়, আবশ্যক বোধে এ বিষয়ে আমাদের মত বলিতেছি।

এই প্রশ্ন উঠিবার কারণ, বাংলা দেশের কতকগুলি শোচনীয় ও লজ্জাকর ঘটনা। পাবনা জেলায়, ময়মনসিংহ জেলার কিশোরগঞ্জ মহকুমায়, ঢাকা শহরে ও তাহার নিকটবর্ত্তী কোন কোন গ্রামে এবং অন্য কোথাও কোথাও যে লুণ্ঠন গৃহদাহ রক্তারক্তি ও হত্যাকাণ্ড অদূর অতীতে হইয়া গিয়াছে, তাহাতে হিন্দুরা মুসলমানদের দ্বারা অত্যাচারিত হইয়াছিল বলিয়া হিন্দুদের ধারণা। মুসলমানদের ইহার বিপরীত কোন ধারণা আছে কি-না তাহার আলোচনা এখানে করিতেছি না; হিন্দুদের মন

কেন তিক্ত হইয়াছে, তাহাই বলিতেছি। এই তিক্ততার আরও একটি কারণ আছে। বহু বৎসর ধরিয়া বঙ্গে শত শত নারী অপহৃতা ও ধর্ষিতা হইয়া আসিতেছেন। কোন কোন স্থলে তাঁহাদের মৃত্যু ঘটিয়াছে বা কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই। নির্যাতিতা নারীদের মধ্যে মুসলমান রমণী নাই কিংবা অত্যাচারীদের মধ্যে হিন্দু নাই, এমন নয়, কিন্তু অধিকাংশ স্থলে নির্যাতিতারা হিন্দু এবং অত্যাচারীরা মুসলমান, হিন্দুসমাজের লোকদের ধারণা এইরূপ। এরূপ ধারণা নির্ভুল কি-না এবং এ অবস্থার জন্য হিন্দুসমাজ কি পরিমাণে দায়ী, এ বিষয়ে মুসলমানদের কোন বিপরীত ধারণা আছে কি-না, তাহা এখানে আলোচ্য নহে। হিন্দুদের ধারণা সম্পূর্ণ সত্য, আংশিক সত্য, বা মিথ্যা, যাহাই হউক, উহা তিক্ততার অন্য একটি কারণ।

এই উভয়বিধ কারণে, শুনিয়াছি, কোন কোন হিন্দু বঙ্গের বর্ত্তমান দুর্দ্দিনে, হিন্দুদের চিরাগত জাতি-ধর্ম্মনির্বিশেষে আর্ত্তকে সাহায্যদান-রীতির পরিবর্ত্তে কেবল হিন্দুকে সাহায্য দিবার ব্যবস্থা করিতে চান। যে-সকল হিন্দু মুসলমানকে সাহায্য দিতে বা যে-সকল মুসলমান হিন্দুকে সাহায্য দিতে চান না, তাঁহাদের মনের ভাব ও বাহ্য আচরণ জোর করিয়া বদলান যায় না, সেরূপ জোর করিবার অধিকারও কাহারও নাই। এখানে কেবল ঔচিত্যানুচিত্যের আলোচনা করিতেছি। হিন্দুদের উপর অত্যাচারের যে-যে ধারণার কথা উপরে বলিয়াছি, যদি তাহা সম্পূর্ণ সত্য হয়, তাহা হইলেও ইহা সত্য নহে, যে, সকল মুসলমানই ঐরূপ অত্যাচার করিয়াছে;—অনেক হাজার লোক দোষী ছিল বটে, কিন্তু সকলে নহে। ইহাও সত্য বলিয়া প্রমাণিত হয় নাই, এবং প্রমাণ করিবার উপায় নাই, যে, ঐরূপ অত্যাচারে সমুদয় মুসলমানের মৌন বা প্রকাশিত সম্মতি ও সমর্থন ছিল; শুধু অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া গুরুতর কোন সিদ্ধান্ত ও তদনুযায়ী কাজ করা উচিত নয়। অন্যদিকে, ইহা বাস্তব ঘটনা, যে, কোন কোন স্থলে কোন কোন মুসলমান হিন্দু-নারীকে অত্যাচার হইতে রক্ষা করিয়াছেন, বা তাহার উদ্ধারসাধন করিয়াছেন। আমরা 'মডার্ণ রিভিউ' ও 'প্রবাসী'তে ঢাকার ভীষণ দাঙ্গা-হাঙ্গামা সম্বন্ধে যে-সকল চিঠি ছাপিয়াছিলাম, তাহাতে ইহা লিখিত ছিল, যে, কোন কোন মুসলমান ভদ্রলোক তাহাতে যোগ দেন নাই, বরং কোন কোন হিন্দুর সাহায্য করিয়াছিলেন। সুতরাং দাঙ্গাহাঙ্গামার জন্যও সকল মুসলমানকে দায়ী করা যায় না।

এই সকল কারণে আমাদের বিবেচনায় বিপন্ন সহস্র সহস্র মুসলমানকে হিন্দুদের সাহায্য হইতে বঞ্চিত করিবার চিন্তা যুক্তিসঙ্গত নহে। যদি কাহাকেও বাস্তবিক অপরাধী বলিয়া জানা থাকে, সেও বিপন্ন এবং সাহায্য-প্রার্থী হইলে তাহার দুঃখ মোচন সকল ধর্ম্ম সম্মত। হিন্দু এবং বৌদ্ধধর্ম্মের উপদেশ এরূপ ত বটেই।

জাতিধর্ম্মনির্বিশেষে বিপন্নের সাহায্যের জন্য যে-সব ফণ্ড খোলা হইয়াছে, তাহাতে যাঁহারা দান করিবেন, তাঁহারা সকল ধর্ম্মের বিপন্ন লোকদিগকে দান করিবার জন্যই টাকা দিতেছেন, বুঝিতে হইবে। কেবল মুসলমান বা কেবল হিন্দুদের সাহায্যের জন্য যে-যে চেষ্টা হইতেছে, তাহাও অনেক লোকের সহায়তা পাইতে পারিবে।

আগে আগে মুসলমানেরা এরূপ সাহায্যদানের কাজ প্রায় করিতেন না, কিছুদিন হইতে করিতেছেন। "মোয়াজ্জিম" নামক পত্রিকা যাঁহারা বাহির করেন, তাঁহারা অনেক দিন হইতে এইরূপ কাজ করিয়া আসিতেছেন; এখনও করিতেছেন। কলিকাতা মাদ্রাসার ছাত্রেরাও সাহায্য সংগ্রহ করিতেছেন।

অবসর ও সামর্থ্যের অভাবে আমি সাহায্য সংগ্রহ ও দানের একটি কমিটিরও মীটিঙে নিয়মিতরূপে উপস্থিত হইতে, দান সংগ্রহ করিতে এবং সংগৃহীত অর্থের ব্যয়সম্বন্ধে দৃষ্টি রাখিতে পারিব কিনা সন্দেহ। অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া এবং কাজটি ভাল বলিয়া, দুই একটি আবেদনপত্রে দস্তখত করিয়াছি বটে, কিন্তু আর করা উচিত হইবে না। যাঁহাদের অনুরোধ রক্ষা করিতে পারি নাই, তাঁহারা আমার অসামর্থ্য মার্জ্জনা করিবেন।

ইংরেজ ব্যবসাদারদের ধর্ম্মবুদ্ধি

গত ২৫শে শ্রাবণ কলিকাতার আলবার্ট হলে প্লাবন ও দুর্ভিক্ষে বিপন্ন লোকদের সাহায্যার্থ যে সভার অধিবেশন হয়, তাহাতে শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু শ্রোতাদিগকে জানান, যে, মাড়োয়ারী সাহায্য-সমিতি (Marwari Relief Society) পাটের কলওয়ালাদের সভাকে বিপন্নের সাহায্যার্থ কিছু থোক টাকা দান করিতে অনুরোধ করেন। বেশী টাকা দেওয়া দূরে থাক, ইংরেজদের ঐ সভা অল্প কিছুও দিতে অস্বীকার করিয়াছে। ইংরেজদের বেঙ্গল চেম্বার অব কমার্স ও ঐরূপ জবাব দিয়াছে। ইংরেজরা চাষীদের পরিশ্রমে লক্ষপতি ক্রোড়পতি হইতে ব্যগ্র, কিন্তু দুর্ভিক্ষ ও প্লাবনে বিপন্ন কৃষকদিগকে বাঁচান তাহাদের কর্ত্তব্য নহে! মাড়োয়ারীরাও ইংরেজদের মত টাকা রোজগার করিতে বাংলা দেশে আসে; কিন্তু

তাহারা দুর্ভিক্ষ ও বন্যা প্রপীড়িত লোকদের সাহায্য সর্ব্বদাই করিয়া থাকে।

—

দুর্ভিক্ষ ও প্লাবনে সরকারী সাহায্য

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় সরকার পুলিসের জন্য পাঁচ লাখের উপর টাকা অতিরিক্ত বরাদ্দ করাইয়া লইয়াছেন, কিন্তু দুর্ভিক্ষের জন্য মোটে ত্রিশ হাজার টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন। স্যার প্রভাসচন্দ্র মিত্র সরকারপক্ষ হইতে টাকার বদলে এই কথা দিয়াছেন, যে, দুর্ভিক্ষ ও প্লাবনে প্রজাদের প্রাণরক্ষার জন্য যত টাকা দরকার হইবে, তত টাকাই গবর্ন্মেণ্ট দিবেন। যাহার শক্তিসামর্থ্য যত, তাহার কথার মূল্য তত। গবর্ন্মেণ্টের উপর স্যার প্রভাসচন্দ্রের এমন প্রভাব আছে কি, তাঁহার এমন শক্তিসামর্থ্য আছে কি, যাহাতে তাঁহার কথা রক্ষিত হইবে? কথায় চিঁড়ে ভিজে না।

হাজার হাজার লোকের দীর্ঘকাল বসিয়া খাইবার ব্যবস্থা করা কঠিন, তাহা আমরা বুঝি। কিন্তু রোজগারের উপায় করিয়া দেওয়া কি অসম্ভব? গবর্ন্মেণ্ট নিরুপায় লোকদের কাজ ও পারিশ্রমিকের ব্যবস্থা করুন।

—

পিঠে খেলে পেটে (অনাহার) সয়?

বাংলায় একটা চলতি কথা আছে, "পেটে খেলে পিঠে সয়।" তাহার উল্টা কথাটাও কি সত্য? পিঠে (মার) খেলে পেটে (অনাহার) সয় কি? পুলিসের বরাদ্দ বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভা পাঁচ লাখ টাকার উপর বাড়াইয়া দিয়াছেন। তাহাতে আরও কনষ্টেবল-আদি বাড়িবে এবং তাহারা সত্যাগ্রহী এবং পিকেটার প্রভৃতি দুষ্ট লোকদিগকে দরকার-মত ঠেঙাইতে পারিবে। প্রহারজনিত পিঠের জ্বালায় প্রহৃত লোকেরা পেটের জ্বালা ভুলিতে সমর্থ হইবে কি?

—

অনাবশ্যক অনুকরণ

বাংলা ভাষায় টাকু, টেকো, টেকুআ শব্দগুলি প্রচলিত আছে। অথচ কংগ্রেসওয়ালা অনেকে গুজরাটী তকলি শব্দটি ব্যবহার করেন। এরূপ অনুকরণ অনাবশ্যক।

গুজরাটী "প্রভাতফেরী" ব্যবহার না করিয়া "বৈতালিক" ব্যবহার করা যাইতে পারে। বৈতালিকের সংস্কৃত অর্থ কিছু আলাদা বটে, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতন আশ্রমে উহার আধুনিক অন্য অর্থ প্রচলিত হইয়াছে।

আগেকার কালে বৈতালিকরা প্রভাতে মঙ্গলগান গাহিয়া রাজা-রাণীদের ঘুম ভাঙাইত। এখন গণতন্ত্রের যুগ। এখন, রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, "আমরা সবাই রাজা।" এখন প্রভাতকালে বৈতালিকরা গান গাহিয়া লোকদের ঘুম ভাঙাইলে কোন অসঙ্গতি হইবে না। সে গান যদি "জাতীয় সঙ্গীত" বা "স্বদেশী" গান হয়, তাহাতেই বা ক্ষতি কি?

—

ভারতীয়ের ও বাঙালীর সংখ্যা

বর্ত্তমান ১৯৩১ সালে ভারতবর্ষের লোক-সংখ্যা মোটামুটি ৩৫,১৫,০০,০০০ (পঁয়ত্রিশ কোটি পনের লক্ষ) বলিয়া গণিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে বিদেশী লোকও কিছু আছে। তাহাদের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত অল্প। বর্ত্তমান বৎসরে বাংলা দেশের অধিবাসীর সংখ্যা ৫,০৯,৭৯,৬৬৭ বলিয়া গণিত হইয়াছে। ইহা ১৯২১ সালের সংখ্যা অপেক্ষা হাজার করা ৭১ (একাত্তর) জন বেশী। ইহার মধ্যে বাংলা দেশের অবাঙালী অস্থায়ী বাসিন্দাদিগকেও ধরা হইয়াছে। তাহাদের সংখ্যা খুব বেশী নয়।

বঙ্গে ও বঙ্গের বাহিরে, সমগ্র ভারতবর্ষে, ১৯২১ সালে বাঙালীর অর্থাৎ বাংলাভাষাভাষীর সংখ্যা ছিল ৪,৯২,৯৪,০৯৯। ১৯২১ হইতে ১৯৩১ পর্য্যন্ত দশ বৎসরে বাংলা দেশের লোক-সংখ্যা যেমন হাজারকরা ৭১ জন বাড়িয়াছে, বঙ্গের বাহিরেও বাঙালীদের সংখ্যা সেইরূপ বাড়িয়া থাকিলে, সমগ্র ভারতবর্ষে এবৎসর বাঙালীদের সংখ্যা ৫,২৭,৯৩,৯৮০ হইবার কথা;—ঠিক কত হইয়াছে ১৯৩১ সালের সমগ্রভারতীয় সেন্সস রিপোর্ট বাহির হইলে জানা যাইবে।

৫,২৭,৯৩,৯৮০ মোটামুটি ৩৫,১৫,০০,০০০এর এক-সপ্তমাংশ। মানুষের সকল রকম কার্য্যক্ষেত্রে, মানুষের সকল রকম আত্মিক মানসিক ও বাহ্য উন্নতি ও প্রগতিতে, সমুদয় ভারতবর্ষের লোকদের কৃতিত্বের ন্যূনকল্পে সপ্তমাংশ বাঙালীর হইলে বুঝিতে হইবে বাঙালীর বিশেষ অবনতি হইতেছে না।

বাঙালীর সর্ব্বপ্রকার কৃতিত্বের পরিমাণ নির্ণয় করা কঠিন। কারণ বঙ্গে অর্দ্ধেকের উপর বাঙালী মুসলমান। মৌলানা আকরম খাঁ বলিয়াছেন মুসলমান বাঙালীদের মধ্যেও বাঙালীর বৈশিষ্ট্য আছে। কিন্তু তাঁহাদের শুধু নাম দেখিয়া তাঁহারা বাঙালী কিনা নির্ণয় করা যায় না। তাঁহাদের মধ্যে কেহ বাংলা বহি লিখিলে বুঝা যায় তিনি বাঙালী। তাঁহাদের কাহারও কাহারও নামের শেষে বিক্রমপুরী, দিনাজপুরী ইত্যাদি শব্দ সংযুক্ত দেখিতে পাই। সকলের নামের শেষে এরূপ

কিছু থাকা মুসলমানী রীতি বিরুদ্ধ হইবে না। এবং তাহা থাকিলে তাঁহাদিগকে বাঙালী বলিয়া জানা যাইবে। গজনবী সুহ্রাবর্দ্দী দেলবী ব্রেল্‌বী কিদোআঈ যদি হইতে পারে, মেদিনীপুরী ফরিদপুরী ইত্যাদি হওয়াতেও কোন বাধা নাই।

—

"বাঙালীর জন্য বাংলা"

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় সম্প্রতি উহার একজন সদস্য এই প্রস্তাব করেন, যে, অন্য কোন কোন প্রদেশের মত বঙ্গেরও সরকারী কাজে কেবল বাঙালীদিগকে নিযুক্ত করা হউক। ইহার উত্তরে সরকার পক্ষ হইতে প্রেন্টিস সাহেব বলেন, এরূপ নিয়ম করিলে বঙ্গের অনেক সরকারী কাজ, উপযুক্ত লোকের অভাবে, খালি থাকিয়া যাইবে, বাঙালীরা আজকাল সিবিল সার্ভিস প্রভৃতির প্রতিযোগিতায় পারদর্শিতা দেখাইতে পারিতেছে না, ইত্যাদি। আমরা প্রস্তাবটি দেখি নাই। কিন্তু আমাদের বোধ হয় প্রস্তাবক সিবিল সার্ভিস প্রভৃতি সমগ্রভারতীয় সরকারী চাকরি সম্বন্ধে তাঁহার প্রস্তাব উত্থাপন করেন নাই, যে-সব পদে প্রাদেশিক গবর্ন্মেণ্ট লোক নিযুক্ত করেন, সেই সকল চাকরির কথাই বলিয়াছেন। এরকম একটি প্রস্তাব যে ব্যবস্থাপক সভায় উপস্থিত করা আবশ্যক বোধ হইয়াছে, ইহা আমরা বঙ্গের পক্ষে অগৌরবের বিষয় মনে করি। বাঙালী জীবনসংগ্রামে টিকিয়া থাকিবে, নিজের যোগ্যতা দ্বারা নহে, পরন্তু ইংরেজ সরকারের দ্বারা প্রবর্ত্তিত নিয়মের দ্বারা, এ চিন্তা আমাদের পক্ষে দুঃখকর। তদ্ভিন্ন, বঙ্গের ছোট বড় বাণিজ্য, পণ্যশিল্পের কারখানা প্রভৃতি ধনাগমের প্রধান উপায় এখন প্রায় অবাঙালীর করতলগত। সেগুলি বাঙালীদের নিজের চেষ্টা ব্যতীত কেমন করিয়া বাঙালীর হইবে?

সিবিল সার্ভিস প্রভৃতি পরীক্ষায় আজকাল বাঙালীদের অপেক্ষাকৃত কম কৃতিত্ব কেবল মাত্র তাহাদের বুদ্ধি ও বিদ্যার হ্রাস বশতঃ না হইতেও পারে। সে বিষয়ের আলোচনা এখানে করিব না।

প্রাদেশিক অপেক্ষাকৃত উচ্চতর সব কাজের সম্পূর্ণ উপযুক্ত বাঙালী যথেষ্ট পাওয়া যায়, এবং মোটের উপর ইহা সত্যও বটে, যে, বাঙালীরাই এই সব কাজে নিযুক্ত হয়। কেবল নীচের দিকের কোন কোন শ্রেণীর সব বা অধিকাংশ কাজে বাঙালী নিযুক্ত হয় না। যেমন ডাকের পিয়াদা, আদালতের পিয়াদা ও চাপরাসী, পুলিস কনষ্টেবল ও হেড কনষ্টেবল, জেলের ওয়ার্ডার (রক্ষী) ইত্যাদি। বাঙালী ডাকের পিয়াদা বঙ্গদেশে মফঃস্বলে বিস্তর দেখিয়াছি; কলিকাতায় কম, বা নাই। আদালতের পিয়াদা ও চাপরাসী এবং পুলিস কনষ্টেবল, হেড কনষ্টেবলের কাজ মফঃস্বলে অনেক বাঙালীকে করিতে দেখিয়াছি। কিন্তু এই রকম কাজের সবগুলিতে বাঙালীরা নিযুক্ত হয় না। সরকার পক্ষের লোকদের মতে তাহার কারণ, বাঙালীদের শারীরিক অপটুতা এবং এই সকল কাজ করিবার অনিচ্ছা। এই সকল কাজ করিবার মত দৈহিক যোগ্যতা যদি এই সব কাজে নিযুক্ত শত শত বাঙালীর থাকে, তাহা হইলে বাকী এই রকম কাজগুলির যোগ্য বাঙালীও নিশ্চয় পাওয়া যাইতে পারে। দৈহিক যোগ্যতা যদি শত শত বাঙালীর থাকে, তাহাতে বুঝিতে হইবে বাঙালীর রক্তমাংস ও বাংলার জলবায়ুর এমন কোন দোষ নাই, যাহাতে অধিকাংশ বাঙালীর দেহ সুপুষ্ট ও সবল হইবার কোন অনিবার্য্য কারণ ঘটিতে পারে। কারণ যাহা আছে, যেমন ম্যালেরিয়া এবং খাদ্যের অল্পতা ও অপুষ্টিকরতা, তাহা নিবার্য্য, এবং তাহা দূর করিবার চেষ্টা করা গবর্ন্মেণ্টেরও একটা কর্ত্তব্য বটে।

বাঙালীরা পিয়াদা কনষ্টেবল আদির কাজ কেন করিতে চায় না, সরকার পক্ষের লোকে তাহা খুলিয়া বলিতে চান না। এগুলি অসম্মানের কাজ হইবার অনেক কারণ আছে। সেই সব কারণ নিবার্য্য। কনষ্টেবলরা পুলিস-বিভাগের উচ্চপদস্থ অফিসারদিগের নিকট হইতে যে ব্যবহার পায়, চাকরেরা তাহা পাইয়া থাকে। তাহাদের প্রতি এরূপ ব্যবহার অনুচিত—চাকরদের প্রতিও অনুচিত। গরীব বাঙালীরাও অনেকে এরূপ ব্যবহার সহ্য করিতে পারে না। সুতরাং তাহারা কনষ্টেবল পিয়াদা ইত্যাদি হইতে চায় না। গবর্ন্মেণ্ট কোন আইন দ্বারা পুলিসের নিম্ন ও উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীদিগকে অত্যাচার ও নিন্দনীয় আচরণ করিতে বাধ্য করেন না সত্য, কিন্তু এরূপ কাজ তাহারা করে বলিয়া তাহাদের দুর্নাম আছে। এই জন্য লোকে তাহাদিগকে ভয় করে, কিন্তু মনে মনে অশ্রদ্ধা করে। ভদ্র সমাজে ইস্কুলের গরীব পণ্ডিত মহাশয় মাষ্টার মহাশয়ের প্রতি যে আন্তরিক শ্রদ্ধা আছে, ধনী পুলিস ইনস্পেক্টারের প্রতি তাহা নাই। এই জন্য, সরকারী সকল বিভাগের নিম্নতম কর্ম্মচারীরাও যাহাতে মনুষ্যোচিত ব্যবহার পায় তাহার ব্যবস্থা করা দরকার, এবং পুলিস আদি সব বিভাগেরই যাহাতে কোন প্রকার অখ্যাতি না থাকে এরূপ উপায় অবলম্বন করা আবশ্যক। তদ্ভিন্ন, বাঙালী কনষ্টেবল বল আদি পাইতে হইলে তাহাদের বেতন কিছু বাড়ান আবশ্যক হইতে পারে; কারণ, জীবনধারণের ব্যয় ও পারিবারিক খরচ সব প্রদেশে সমান নয়। ইংলণ্ডে পুলিস কনষ্টেবলদিগকে যত বেতন দেওয়া হয়, তাহা অপেক্ষা

কম বেতনে ইউরোপেরই অন্য অনেক দেশের লোক সেখানে কাজ করিতে পারে; কিন্তু তা বলিয়া ইংলণ্ডের গবর্মেণ্ট ইংরেজের পরিবর্ত্তে অন্য দেশের লোককে কনষ্টেবল নিযুক্ত করেন না।

এরূপ একটা ধারণা কাহারও কাহারও থাকিতে পারে, যে, জুলুম ও তম্বী করিতে না পারিলে পুলিসের অন্ততঃ নিম্নস্তরের কাজ করা যায় না। এই ধারণা অমূলক। দৃঢ়তার সহিত শিষ্টতা পুলিস-বিভাগেও কৃতিত্বের পন্থা।

সত্যাগ্রহের সময় বোম্বাই প্রেসিডেন্সিতে ও বিহারে পুলিসের সব রকম কাজ স্থানীয় পুলিসের দ্বারা হইত না বলিয়া পাঠান পুলিস আমদানী করা হইয়াছিল। বঙ্গেও দরকার-মত নানা স্থানে গুর্খার আমদানী হইয়া থাকে। সম্পূর্ণ বিদেশী এবং কতকটা বিদেশী লোকদের দ্বারা কোন কোন রকমের কাজ চালান বিদেশী শাসনযন্ত্রের উদ্দেশ্য সাধন ও কার্য্যকারিতার জন্য আবশ্যক; তাহাতে পরাধীন দেশের প্রজারা সায়েস্তা থাকে। বঙ্গে অন্য প্রদেশের কনষ্টেবল, ওয়ার্ডার আদি বেশী করিয়া নিয়োগের ইহা একটি কারণ বলিয়া আমরা অনুমান করি। এইরূপ নিয়োগ হওয়ায় বাঙালী ডবল পরাধীন—ইংরেজের অধীন এবং অবাঙালী কনষ্টেবল প্রভৃতির অধীন।

—

কলিকাতা মিউনিসিপালিটির কেরানীগিরি

১৮ই জুলাই তারিখের কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল গেজেটে দেখিলাম, কলিকাতা মিউনিসিপালিটির সেক্রেটরী শ্রীযুক্ত বি ভি রামাইয়া (B. V. Ramiah.) নোটিশ দিয়াছেন,—মিউনিসিপালিটিতে কেরানী নিয়োগের ও পূর্ব্বনিযুক্ত কেরানীদের পদোন্নতির জন্য তিনটি পরীক্ষা বর্ত্তমান আগষ্ট মাসের মাঝামাঝি হইবে—ঠিক তারিখটি দেওয়া নাই। ইহার মধ্যে যে পরীক্ষাটি উচ্চতর শ্রেণীর (১৫০ হইতে ২৫০ টাকার) কেরানী নিয়োগের জন্য গৃহীত হইবে, তাহাতে পরীক্ষার বিষয়াদি নিম্নলিখিতরূপ দেওয়া হইয়াছে।

Subjects and *Marks.*—The examination will be in the following subjects:—

Compulsory subjects.	Full marks	Pass marks
1. English Composition	200	100
2. Translation from English to Bengali, Urdu, Hindi, Telugu, Mahrati or Uria	200	80
3. Precis writing and drafting	200	80
4. Elementary Mathematics (one paper, *viz.*, Arithmetic and Algebra)	100	30
5. General Knowledge including Civics	200	80
Optional subject.		
Translation from Bengali to English	50	25

'No candidate will be deemed to have passed unless he obtains the minimum pass marks in each subject and 50 per cent of the total marks.

In the case of the optional subject (*viz.*, Translation from Bengali to English) the marks obtained by a candidate will be added to the total provided he has secured the minimum pass marks in the subject.

বাংলার রাজধানী কলিকাতার মিউনিসিপালিটিতে কেরানী নিয়োগের জন্য, যাহাদের মাতৃভাষা উর্দ্দু-হিন্দী, তেলুগু, মরাঠী বা ওড়িয়া, তাহাদিগের পরীক্ষা দিবার ব্যবস্থা কেন করা হইল, বুঝিতে পারিলাম না। অন্যান্য প্রদেশের রাজধানীর মিউনিসিপালিটিগুলি কি ইংরেজী হইতে বাংলায় অনুবাদ পরীক্ষার একটি বিষয় করিয়াছেন? যাহাদের মাতৃভাষা বাংলা, তাহাদের মধ্য হইতে কি কেরানীগিরির যোগ্য যথেষ্ট লোক কলিকাতা মিউনিসিপালিটির জন্য পাওয়া যায় না? যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে নিম্নতর বেতনের কেরানীগিরির জন্য অবাঙালীদিগকে পরীক্ষা দিতে আহ্বান বা ইঙ্গিত কেন করা হইল না? কেবল বেশী বেতনেরগুলিতেই বা কেন করা হইল? এই নিম্নতর পরীক্ষায় অনুবাদের কোন বালাই রাখা হয় নাই। আর একটা বিস্ময়কর ব্যাপার এই, যে, বাংলা হইতে ইংরেজীতে অনুবাদের পরীক্ষা এই উচ্চতর পরীক্ষায় অপ্‌শ্যন্যাল অর্থাৎ বৈকল্পিক, দেওয়া না-দেওয়া পরীক্ষার্থীদের ইচ্ছাধীন, রাখা হইয়াছে! যেন কলিকাতা মিউনিসিপালিটির কেরানীদের বাংলা জানা না-জানা দুই সমান—নিতান্ত তুচ্ছ ব্যাপার! অবশ্য, দয়া করিয়া নিয়ম করা হইয়াছে, যে, কেহ এই স্বেচ্ছাধীন পরীক্ষাটি দিলে ও তাহাতে পাস হইলে, এই বিষয়ে তাহার প্রাপ্ত নম্বর অন্যান্য বিষয়ে প্রাপ্ত মোট নম্বরের সহিত যোগ করা হইবে। ইহার দ্বারা বাঙালী পরীক্ষার্থীদিগকে যে বিশেষ কোনই সুবিধা দেওয়া হয় নাই, তাহা সহজেই বুঝা যায়। কারণ, ইংরেজী হইতে বাংলা তেলুগু প্রভৃতি ভাষায় অনুবাদে পূর্ণ নম্বর রাখা হইয়াছে দুইশত (২০০), কিন্তু বাংলা হইতে ইংরেজীতে অনুবাদের পূর্ণ নম্বর কেবল উহার সিকি অর্থাৎ ৫০ (পঞ্চাশ) রাখা হইয়াছে। ইংরেজী হইতে বাংলা ছাড়া অন্যান্য ভাষায় অনুবাদের পরীক্ষা কে কে করিবেন, জানিতে কৌতূহল হয়। কিন্তু সে কৌতূহল নিবৃত্ত হইবে না, ইহাও একপ্রকার নিশ্চিত।

কলিকাতায় নানা প্রদেশের লোকে প্রধানতঃ ব্যবসাবাণিজ্যের দ্বারা রোজগারের জন্য অস্থায়ী ভাবে থাকে। বাঙালীদের নির্বুদ্ধিতা আলস্য প্রভৃতি বশতঃ লাভজনক বড় ও ছোট প্রায় সব ব্যবসা তাহারা হস্তগত করিতে বসিয়াছে। বাঙালীর প্রধান সম্বল

কেরানীগিরি হইতেও আংশিক ভাবে বাঙালী যুবকদিগকে বঞ্চিত করিবার কৌশল অজ্ঞাতসারে আবিষ্কার অবশ্য দেশভক্তির একচেটিয়া ব্যবসাদার স্বরাজ্যদলের মিউনিসিপ্যাল কর্ত্তৃপক্ষের প্রতিভার পরিচায়ক।

কিন্তু ইংরেজী হইতে কতকগুলি দেশী ভাষায় অনুবাদ কেন পরীক্ষার অঙ্গীভূত হইল, অন্য কয়েকটি ভাষা কেন হইল না, তাহার উত্তর মিউনিসিপালিটির কর্ত্তৃপক্ষের নিকট লোকে দাবি করিতে পারে। প্রশ্নটি বিশদ করিবার জন্য, খাস্ কলিকাতায় বাংলা ছাড়া অন্য কতকগুলি ভারতীয় ভাষা কত লোকের মাতৃভাষা, তাহার সংখ্যা ১৯২১ সালের সেন্সস অনুসারে নীচে দিতেছি।

ভাষা	ভাষীর সংখ্যা
হিন্দী ও উর্দু	৩,৩৩,৮৩০
ওড়িয়া	৩৯,৫৫৬
মরাঠী	৫৪৭
তামিল	১,৮৫৫
তেলুগু	১,৫৯০
পঞ্জাবী	২,৬৩৬
গুজরাটী	৫,৮১৭
রাজস্থানী	৭,২৪৯

মরাঠীভাষীদের সংখ্যা সব চেয়ে কম। মরাঠাদিগকে পরীক্ষা দিবার যে সুযোগ দেওয়া হইবে, তামিল, পঞ্জাবী, গুজরাটী, বা রাজস্থানী যাহাদের মাতৃভাষা, তাহাদিগকে কেন সে সুযোগ দেওয়া হইবে না, জানিতে চাই। খাস্ কলিকাতায় তেলুগুভাষীদের চেয়ে, তামিল পঞ্জাবী গুজরাটী রাজস্থানী যাহাদের মাতৃভাষা, তাহাদের প্রত্যেক সমষ্টির সংখ্যা বেশী। অথচ ইংরেজী হইতে তাহাদের ভাষায় অনুবাদ একটি পরীক্ষণীয় বিষয় করা হয় নাই।

পরীক্ষার বিষয়সমূহ ও পূর্ণ নম্বর ইত্যাদি নির্দ্ধারণ কে করিয়াছে, এবং মিউনিসিপালিটির প্রধান প্রধান কর্ম্মচারীদের মধ্যে তামিল প্রভৃতি বর্জ্জিত ভাষা ভাষীদের প্রতি বিরুদ্ধ ভাব কাহারও থাকিবার কারণ আছে কি-না, তাহা মিউনিসিপ্যাল কোনও কৌন্সিলর অনুসন্ধান করিলে ভাল হয়।

এই সব পরীক্ষাবিষয়ক সমুদয় রহস্য সম্বন্ধে সন্তোষজনক উত্তর না পাইলে, সর্ব্বসাধারণ ইহাকে একটি "জুয়াচুরী" মনে করিতে বাধ্য হইবে। অনেক দেশে অনেক স্থলে দেখা যায়, প্রতিনিধিত্বমূলক কোন কোন প্রতিষ্ঠানের অনেক সভ্যের ব্যক্তিগত দুর্ব্বলতা যাহারা জানে, যা তাহা চরিতার্থ করিতে বা তাহাকে প্রশ্রয় দিতে পা তাহা অবলম্বন করিয়া তাহাদিগকে ভয় দেখাইতে পারে, তাহারা ঐ সভ্যদের দ্বারা নিজেদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিয়া লয়। কলিকাতায় সেরূপ কোন ব্যাপার ঘটিতেছে কি-না, কলিকাতার কর্ত্তব্যপরায়ণ নাগরিকদের তাহা আবিষ্কার করা উচিত, এবং তাহা ঘটিয়া থাকিলে তাহার উচ্ছেদ সাধন করাও উচিত।

—

সংকীর্ণতার অপবাদ

আমাদের দেশের অনেক মহৎ লোক এবং অনেক নেতা সমগ্র মানব জাতির, সমগ্র ভারতীয় লোকসমষ্টির, ভারতবর্ষের সমুদয় প্রদেশের, বা হিন্দু-মুসলমান-খৃষ্টিয়ান সকলের কল্যাণ চিন্তা করেন। ক্ষুদ্রতর অংশগুলির বিষয় চিন্তা করিবার কিংবা চিন্তা করিলেও তাহার ফল প্রকাশ করিবার অবকাশ তাঁহারা অনেকে পান না। অথচ ক্ষুদ্রতর অংশগুলির ক্ষতি নিবারণও আবশ্যক, এবং এই ক্ষতি নিবারণের চিন্তা অন্য ব্যক্তিদিগকে বাধ্য হইয়া করিতে হয়। তাহাতে তাহাদের প্রাদেশিক সংকীর্ণতা, সাম্প্রদায়িকতা ইত্যাদি অখ্যাতি রটে। অখ্যাতির ভয় করিলে কোন কাজ করা চলে না। সে অপবাদ ক্ষালন করিতে ব্যস্ত হইবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু আমরা কেবল এইটুকুই বলিতে চাই, যে, আমরা যে সকল ক্ষুদ্রতর বিষয়ে কিছু লিখি, তাহা বাংলা দেশের বাহিরের সমস্ত প্রদেশ দেশ ও মহাদেশের এবং তাহাদের অধিবাসীদের প্রতি বিদ্বেষবশতঃ নহে; হিন্দুদের জন্য যাহা লিখি তাহা অহিন্দুদের প্রতি বিদ্বেষবশতঃ নহে। আমরাও যথাসাধ্য জগতের সকলের হিতকামী।

বাঙালীরা ও ভারতীয় হিন্দুরা কাহারও ক্ষতি করিয়া বাঁচিয়া থাকুক ও বাড়ুক, আমরা এ অশুভ কামনা করি না। তাহারা অন্যের ক্ষতি না করিয়া, নিজ নিজ ন্যায্য অধিকারে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া বাঁচিয়া থাকুক ও বাড়ুক, ইহাই আমরা চাই। বাঙালীর এবং হিন্দুর অবনতি ও মৃত্যু হইলে ভারতবর্ষের ও জগতের ক্ষতি আছে। কারণ, তাহারা জগতকে কিছু দিয়াছে এবং ভবিষ্যতেও হয়ত দিতে পারিবে।

বঙ্গের যুবকদের আইডিয়্যালিজ্‌ম্, দেশভক্তি, উৎসাহ ও কর্ম্মশক্তি যাঁহারা এক্সপ্লইট্ করেন, অর্থাৎ নিজেদের উদ্দেশ্যসাধনার্থ কাজে লাগান, বাঙালী যুবকদের কার্য্যক্ষেত্র ও উপার্জ্জনের পথ তাঁহাদের দ্বারা জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে, সাক্ষাৎ বা পরোক্ষ ভাবে, যাহাতে বিন্দুমাত্রও সংকীর্ণতর না হয়, তাহা তাঁহাদের দেখা উচিত।

—

বাঙালী কাহারা ?

যাঁহাদের স্থায়ী নিবাস বঙ্গে, বঙ্গের ভাগ্যের সুখ-দুঃখের ইষ্টানিষ্টের সহিত যাঁহাদের ভাগ্য সুখদুঃখ ইষ্টানিষ্ট জড়িত, যাঁহাদের উপার্জ্জিত ধন প্রধানতঃ বঙ্গেই ব্যয়িত ও সঞ্চিত হয়, তাঁহাদের উৎপত্তি যেখানেই হউক, তাঁহারা বা তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষেরা যেখান হইতেই আসিয়া থাকুন, তাঁহাদিগকে বাঙালী বলিয়া গণনা করা উচিত। অনেক বাঙালী বিহারের, আগ্রা-অযোধ্যার, পঞ্জাবের, মধ্যপ্রদেশের স্থায়ী বাসিন্দা হইয়াছেন। তাঁহারা যেমন ঐ সকল প্রদেশের পুরুষানুক্রমিক বাসিন্দাদের সমান অধিকার পাইবার যোগ্য, অন্যান্য প্রদেশ হইতে আগত বঙ্গের স্থায়ী বাসিন্দারাও সেইরূপ বাঙালী বলিয়া গণ্য হইবার যোগ্য।

একটি বিখ্যাত বাঙালীর দৃষ্টান্ত দিতেছি। স্বর্গীয় রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর নামেই বুঝা যায়, তাঁহাদের পরিবার পশ্চিম হইতে আসিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি কনৌজিয়া হইলেও বাঙালী একটুও কম ছিলেন না।

—

বিদ্যাসাগর

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের স্মৃতিসভা এই রাজনৈতিক মাতামাতি দলাদলির দিনেও যে সামান্য ভাবেও এবার হইয়াছিল, তাহা মন্দের ভাল। কিন্তু নেতৃত্বের দাবি যাঁহারা করেন, তাঁহারা এইরূপ স্মৃতিসভার আয়োজন করিলে, অন্ততঃ তাহাতে যোগ দিলে, কর্ত্তব্য করা হইত। যাঁহারা এইরূপ সভার আয়োজন করেন, তাঁহাদেরও রাজনৈতিক এবং অন্য সকল প্রকার কর্ম্মীদের সহযোগিতা চাওয়া উচিত। কারণ, বিদ্যাসাগর সকল বাঙালীর সকল ভারতীয়ের আত্মীয়।

সমাজসংস্কারের জন্য তাঁহার চিন্তা অধ্যয়ন পরিশ্রম আত্মোৎসর্গ এবং কীর্ত্তি অনতিক্রান্ত। সাধারণ শিক্ষা, বালিকাদের শিক্ষা এবং সংস্কৃত শিক্ষার জন্য তিনি অসাধারণ বিচক্ষণতার সহিত অসামান্য পরিশ্রম করিয়াছিলেন। উৎকৃষ্ট বিদ্যালয়পাঠ্য পুস্তকাবলীর রচনায় তাঁহার সমকক্ষ বিরল। বাংলা ভাষা ও সাহিত্য তাঁহার নিকট বিশেষভাবে ঋণী। সংস্কৃতভাষা ও সাহিত্যের শিক্ষা সহজ এবং বৈজ্ঞানিকপ্রণালীসম্মত করিবার চেষ্টা ভারতবর্ষে তিনিই প্রথম করেন। দুর্ভিক্ষে বিপন্ন লোকদের সাহায্য স্বয়ং পরিশ্রম করিয়া করিবার পথ প্রদর্শন তিনি করেন। ওলাউঠা প্রভৃতি সংক্রামক ব্যাধিতে পীড়িত লোকদের চিকিৎসা ও শুশ্রূষা স্বয়ং করিবার দৃষ্টান্ত তিনি প্রদর্শন করেন। মহৎ জীবনের সহিত সাদাসিধা চালচলনের অপূর্ব্ব সমাবেশ তাঁহাতে লক্ষিত হইত। স্বাবলম্বন ও সত্য আচরণ তাঁহার জীবনের মূলমন্ত্র ছিল। সর্ব্বোপরি ছিল তাঁহার খাঁটি মনুষ্যত্ব। তাঁহার মেরুদণ্ড কখনও ধনের কাছে, বলের কাছে নত হয় নাই। দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর একাধারে কুসুমের মত কোমল ও বজ্রের মত দৃঢ় ছিলেন। এই রকম আর একটি মানুষ এপর্য্যন্ত বাংলা দেশে জন্মগ্রহণ করেন নাই।

—

সুরেন্দ্রনাথের স্মৃতিসভা

বাঙালীদের সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে, যে, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় স্বাজাতিকতা এবং ভারতীয়দের একতা প্রচার করিবার জন্য অসামান্য পরিশ্রম করিয়াছিলেন। বঙ্গের বাহিরেও একথা অনেকে স্বীকার করেন। এখন নরম গরম বা চরম পন্থী যিনি যাহাই হউন, জাতিকে জাগাইবার জন্য সুরেন্দ্রনাথ যাহা করিয়াছিলেন, তাহার জন্য ঋণস্বীকার সকলকেই করিতে হইবে।

বহু বৎসর হইতে আমরা দেখিয়া আসিতেছি, কলিকাতায় সুরেন্দ্রনাথের যে স্মৃতিসভা হয়, তাহাতে কেবল মডারেটরাই যোগ দেন, মডারেটরাই সম্ভবতঃ যোগ দিবার আহ্বান পান, এবং মডারেটরাই সভার আয়োজন করেন। সভার আয়োজন যাঁহারাই করুন, চিঠি দ্বারা আহ্বান যদি একজনকেও করা হয়, তাহা হইলে সকল রাজনৈতিক দলের লোককেই আহ্বান করা উচিত।

—

মুনশী আবদুর রহিম

৭২ বৎসর বয়সে মুনশী আবদুর রহিমের মৃত্যু হইয়াছে। তিনি "মিহির ও সুধাকর" এবং পরে "মুসলিম হিতৈষী" কাগজের সম্পাদকরূপে মুসলমান সাংবাদিকদের অন্যতম অগ্রণী ছিলেন। তিনি প্রধানতঃ ইসলাম ধর্ম্ম ও তাহার ইতিহাস সম্বন্ধে বাংলায় অনেক বহি রচনা ও সংকলন করিয়াছিলেন। এই প্রকার কর্ম্মীদের দৃষ্টান্তে, বাংলা যে বাঙালী মুসলমানদের মাতৃভাষা, এই বিশ্বাস তাঁহাদের মধ্যে দৃঢ় হইতেছে।

—

মৌলানা ইস্মাইল হোসেন শিরাজী

মৌলানা ইস্মাইল হোসেন শিরাজী অকালে ৫২ বৎসর বয়সে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। তিনি বাগ্মী, স্বদেশপ্রেমিক, এবং গদ্যে ও পদ্যে সুলেখক ছিলেন। তাঁহার প্রকৃতিতে ও আচরণে সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতা

ছিল না। ১৯০৫ সালে বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদের বিরুদ্ধে এবং স্বদেশীর স্বপক্ষে যে আন্দোলন আরম্ভ হয়, তিনি তাহাতে উৎসাহের সহিত যোগ দিয়াছিলেন। তুরস্কের বিরুদ্ধে বাল্কান যুদ্ধে ডাক্তার আন্সারী যে চিকিৎসক ও শুশ্রূষা-কারীর দল ইউরোপে লইয়া গিয়াছিলেন, শিরাজী মহাশয় তাঁহার মধ্যে ছিলেন। তাহার দ্বারা তুরস্ক ও ভারতবর্ষের মধ্যে বন্ধুতা দৃঢ়ীভূত হয়। তিনি সত্যাগ্রহে যোগ দিয়া কারারুদ্ধ হন। অন্যান্য কর্ম্মীর সহিত তিনি বাল্কান যুদ্ধে তুরস্কের জন্য যাহা করিয়াছিলেন, সম্ভবতঃ তাহা স্মরণ করিয়া তুরস্কের দেশনায়ক মুস্তফা কামাল পাশা তাঁহার পুত্রকে নিম্নমুদ্রিত টেলিগ্রাম পাঠাইয়াছেন।

"আমার পুরাতন বন্ধু মৌলানা সৈয়দ ইসমাইল হোসেন শিরাজীর মৃত্যুতে আমি গভীর দুঃখ প্রকাশ করিতেছি। তিনি কেবল যে ভারতের গৌরব ছিলেন তাহা নহে, কিন্তু তিনি ইসলাম সমাজের নেতা ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে ইসলাম-জগতে এক বিখ্যাত ব্যক্তির অভাব হইল। তুর্কীগণ আপনার শোকে সহানুভূতি প্রকাশ করিতেছে। আপনার মত উপযুক্ত পুত্র রাখিয়া যাওয়াই তাঁহার গৌরব। আমরা আপনার শক্তি অবগত আছি এবং এখানে আপনার উপস্থিতি ইচ্ছা করি। শোকে ধৈর্য্য ধারণ করুন।"

—

ডাক্তার রমাপ্রসাদ বাগচী

আগ্রার প্রাচীন প্রবীণ এবং সমুদয় আগ্রা-অযোধ্যা প্রদেশে চিকিৎসানৈপুণ্যের জন্য সুবিখ্যাত রায় বাহাদুর ডাক্তার রমাপ্রসাদ বাগচী মহাশয়ের মৃত্যু হইয়াছে। তিনি বিশেষ কৃতী ছাত্র ছিলেন। অনেক পদক ও পুরস্কার পাইয়াছিলেন। ১৮৮৩ সালে তিনি কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের এম-ডি উপাধি পান। আগরায় তিনি চল্লিশ বৎসরেরও উপর চিকিৎসা করিয়া গিয়াছেন। তিনি চরিত্রবান এবং দরিদ্রের বন্ধু ছিলেন।

—

রায় বাহাদুর সুরেশচন্দ্র সরকার

রায় বাহাদুর সুরেশচন্দ্র সরকার লোকসমাজে অধিক পরিচিত ছিলেন না। তিনি বিশেষ যোগ্যতা ও সততার সহিত দীর্ঘকাল বিহারে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের কাজ করিয়া অবসর গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং গিরিডির স্থায়ী বাসিন্দা হইয়াছিলেন। কিন্তু ইহা তাঁহার যথেষ্ট পরিচয় নহে। তিনি ও প্রবাসীর সম্পাদক, সতীর্থ, এক সঙ্গে এম্ এ পাস করিয়াছিলেন। আমরা যৌবন কাল হইতেই তাঁহাকে জানিতাম। তিনি যখন কলেজের ছাত্র ছিলেন, তখনই বাংলা উৎকৃষ্ট গদ্য ও পদ্য লিখিতে পারিতেন। সেই অল্প বয়সেই কিংবা তাহার অল্পকাল পরেই "প্রকৃতি-চর্চ্চা" নামক একটি ভাবুকতা-পূর্ণ গদ্য গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। সেকালে "ধর্ম্মবন্ধু" নামক একটি ছোট ধর্ম্মবিষয়ক মাসিক পত্র বাহির হইত। তাহার গোড়ায় প্রতি সংখ্যায় একটি কবিতা থাকিত। সেই কবিতাগুলি প্রায়ই সুরেশবাবু লিখিতেন। নানা বিষয়ে তাঁহার বিস্তৃত ও প্রগাঢ় জ্ঞান ছিল। সুরেশচন্দ্র ইংরেজী গদ্য এবং কবিতাও বেশ লিখিতে পারিতেন। ইংরেজী পদ্যে মেঘদূতের অনুবাদ করিয়াছিলেন। কিন্তু বোধ করি তাহা মুদ্রিত হয় নাই। তাঁহার বিনয়নম্রতার আতিশয্য, লোকচক্ষুর সম্মুখীন হইতে সঙ্কোচ বোধ, এবং বাংলা ও ইংরেজী রচনা সম্বন্ধে খুঁৎখুঁতেপনা তাঁহার সাহিত্যিক শক্তিকে পূর্ণ বিকশিত হইতে এবং জনসমাজে অধিক পরিচিত হইতে দেয় নাই। কেবল তাঁহার স্বভাবের সৌরভ আত্মীয়-বন্ধুগণের স্মৃতিতে রহিয়াছে।

—

অধ্যাপক সতীশচন্দ্র সরকার

ঢাকা ন্যাশন্যাল কলেজের প্রিন্সিপ্যাল পরলোকগত অধ্যাপক সতীশচন্দ্র সরকার পূর্ব্বে জগন্নাথ কলেজে ইংরেজীর অধ্যাপক ছিলেন। ১৯২১ সালে অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভ হইবার সময় তিনি ঐ পদ ত্যাগ করিয়া ন্যাশন্যাল কলেজ স্থাপন করেন। বহু সার্ব্বজনিক প্রতিষ্ঠান ও কাজের সহিত তাঁহার যোগ ছিল। তিনি কয়েক বৎসর ঢাকার অন্যতম মিউনিসিপ্যাল কমিশনার ছিলেন এবং একবার ঢাকা মিউনিসিপালিটির সভাপতি হইয়াছিলেন।

—

বিচারপতি লালমোহন দাস

৮৩ বৎসর বয়সে হাইকোর্টের পেন্স্যনপ্রাপ্ত জজ লালমোহন দাসের মৃত্যু হইয়াছে। তিনি সুবিচারক এবং অমায়িক প্রকৃতির লোক ছিলেন। সার্ব্বজনিক কোন কাজে তাঁহার যোগ না থাকায় লোকে তাঁহাকে জানিত না।

—

অধ্যাপক কালীপ্রসন্ন চট্টরাজ

কলিকাতার সিটি কলেজের সহকারী অধ্যক্ষ পরলোকগত অধ্যাপক কালীপ্রসন্ন চট্টরাজ একজন বিখ্যাত শিক্ষাদাতা ছিলেন। তিনি সংস্কৃতের অধ্যাপক-দিগের বংশে জন্মগ্রহণ করেন, এবং ছাত্রাবস্থা অতিক্রম করিবার পর নিজেও সমস্ত জীবন অধ্যাপনাতেই যাপন করিয়া গিয়াছেন। আচরণে, প্রকৃতিতে ও ধর্ম্মবিশ্বাসে

পূর্ব্বপুরুষদের অনুসরণ করিতেন। সিটি কলেজেই প্রায় চল্লিশ বৎসর গণিতের অধ্যাপক ছিলেন। র প্রণীত বীজগণিতের বহি পড়িয়া বিস্তর ছাত্র গণিত শিখিয়াছে। পাশ্চাত্য ও ভারতীয় জ্যোতিষ নে তাঁহার গভীর ও বিস্তৃত জ্ঞান ছিল। গণিতের পনাতে তাঁহার খুব যশ ছিল। তিনি ছাত্রদের প্রিয় দ্ধাভাজন ছিলেন।

—

অধ্যাপক খুদা বখ্‌শ্

পরলোকগত অধ্যাপক খুদা বখ্‌শ্ ব্যারিষ্টার এবং কাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক ছিলেন। ন উত্তম ইংরেজী লিখিতে পারিতেন। কতকগুলি কর লেখক ও অনুবাদক রূপে তাঁহার প্রভূত ভতোর খ্যাতি আছে। তিনি রসিক এবং মিষ্টালাপী লন। তাঁহার স্বভাবে উৎকট সাম্প্রদায়িকতা ছিল না। তীয় অধিকাংশ মুসলমানের সম্বন্ধে তিনি এই মর্ম্মের লিখিয়াছিলেন, "আমরা হিন্দুদেরই মত ভারতীয়, ব মোগল পারসীক আফগান তুর্ক নহি; আমরা াম ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছি, এই যা প্রভেদ।" তাঁহার বাঁকিপুরের বিখ্যাত খুদা বখ্‌শ্ লাইব্রেরীর িক। তাহার সাহায্যে ঐতিহাসিকদের গবেষণার া হইয়াছে। পিতার জ্ঞানানুরাগ পুত্র পাইয়াছিলেন।

পণ্ডিত মোক্ষদাচরণ সামাধ্যায়ী

পরলোকগত পণ্ডিত মোক্ষদাচরণ সামাধ্যায়ী একদিকে ন বেদাদি শাস্ত্রে পণ্ডিত ছিলেন, অন্যদিকে তেমনি শের স্বাধীনতাকামী ছিলেন। তিনি ব্রহ্মবান্ধব ধ্যায়ের যুগের মানুষ; তাঁহার রাজনৈতিক মতও কটা উপাধ্যায়ের মত ছিল। যাঁহারা রাজনৈতিক ণে একবারও জেলে যান নাই, পলিটিক্সের ট্রিকুলেশ্যান পাসও তাঁহারা করেন নাই। এ হিসাবে, অনেক লোকের মত, সামাধ্যায়ী মহাশয়কে টিক্সের গ্র্যাডুয়েট বলা যাইতে পারিত।

—

বাঙালী মহিলার জার্ম্যান বৃত্তি প্রাপ্তি

শ্রাবণের 'প্রবাসী'তে ৫৭৫ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছিলাম, র্মনীর বিদ্বৎপরিষদের ভারতীয় বিদ্যোৎসাহক প্রতিষ্ঠান lia Institute of Die Deutsche Akademie) তীয়দের জন্য যে কুড়িটি বৃত্তি অঙ্গীকার করিয়া- ন, তাহার মধ্যে দশটি দশ জন বাঙালী বিদ্যার্থী এবং একটি এক জন বাঙালী বিদ্যার্থিনী পাইয়াছেন। ইনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাক্তারী এম-বি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ কুমারী মৈত্রেয়ী বসু। ইনি এখন



কুমারী মৈত্রেয়ী বসু

চিত্তরঞ্জন সেবাসদনে কাজ করেন এবং শীঘ্র জার্মেনী যাইবেন। সেখানে ম্যুনিক বিশ্ববিদ্যালয়ে চিকিৎসা-বিদ্যায় উচ্চতর শিক্ষা লাভ করিবেন এবং গবেষণা করিবেন।

—

কলিকাতায় বক্তৃতার রিপোর্ট

কলিকাতায় বাংলা দৈনিক ও ইংরেজী দেশী দৈনিক কাগজগুলিতে বক্তৃতার রিপোর্ট যেরূপ বাহির হয়, তাহার প্রশংসা করা যায় না। প্রসিদ্ধ বক্তাদের এ বিষয়ে কোন দুঃখ আছে কি না জানি না; না থাকিতেও পারে। হয়ত তাঁহাদের বক্তৃতা রিপোর্টাররা যত্নপূর্ব্বক লিখিয়া থাকেন। আমাকেও আজকাল মধ্যে মধ্যে বক্তৃতা করিতে হয়। এই বক্তৃতাগুলার বিন্দুমাত্রও মূল্য না থাকিতে পারে। তাহা হইলে, সেগুলার কোন রিপোর্ট বাহির না হইলে সেরূপ কোন দুঃখের কারণ হয় না,

যেমন দুঃখ হয় অনেকটা মনঃকল্পিত রিপোর্ট প্রকাশে। আমি যাহা বলি নাই, রিপোর্টে এমন অনেক কথা থাকে; যাহা বলিয়াছি এবং যাহাতে আমার স্বতন্ত্র কোন মত ব্যক্ত থাকে, এমন অনেক কথা রিপোর্টে থাকে না। শ্রীনিকেতনে ও শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতার রিপোর্ট সাধারণতঃ অন্ততঃ চলনসই এবং কোন কোনটি উৎকৃষ্ট হয়। এমন কি, চন্দননগরে, ময়মনসিংহে, মেদিনীপুরে, আমার মত বক্তার কোন কোন বক্তৃতারও রিপোর্ট মোটের উপর ঠিক্ হইয়াছিল। কলিকাতায় আমার মত বক্তাদের দুর্ভাগ্য কেন হয়, জানি না।

কলেজ ষ্ট্রীট্ হত্যাকাণ্ডের রায়

কলেজ ষ্ট্রীটের পুস্তকলেখক, প্রকাশক ও বিক্রেতা ভোলানাথ সেন ও তাঁহার দুইজন কর্ম্মচারীকে হত্যা করার অভিযোগে হাইকোর্টের জজ মিঃ লর্ট উইলিয়মসের বিচারে দুটি পঞ্জাবী মুসলমান যুবকের প্রাণদণ্ড হইয়াছে। বিচারপতি জুরীকে সম্বোধন করিয়া যাহা বলেন, তাহা হইতে আমরা কেবল কয়েকটি কথার অনুবাদ মুদ্রিত করিব। তিনি বলেন :—

> "আমার এবিষয়ে সন্দেহ নাই. এবং আমার বিশ্বাস আপনাদের মনেও এ বিষয়ে কোনরূপ সন্দেহ নাই, যে, অপর কেহ উস্কাইয়া না দিলে এই দুইটি বালকের মনে ঐরূপ ধারণার সৃষ্টি হইত না।"

অভিযুক্ত বালক বা যুবক দুটি পঞ্জাবী ও পঞ্জাববাসী। যে বহিটির জন্য তিন জন মানুষের প্রাণ গেল, তাহা বাংলা ভাষায় লেখা। ঐ দুটি লোক কলিকাতায় থাকিত না এবং বাংলা বহিও পড়িত না। এইজন্য, বিচারপতি লর্ট উইলিয়মস্ যে প্ররোচনা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ, আমরা আষাঢ়ের 'প্রবাসী'তে (পৃঃ ৪৪১) তাহার অস্তিত্ব অনুমান করিয়াছিলাম। রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড ঘটিলে গবন্মেণ্ট ও পুলিস প্ররোচক ও ষড়যন্ত্রকারীদিগকে কোন প্রকারে খুঁজিয়া বাহির করিতে বিশেষ চেষ্টা করেন। আলোচ্য হত্যাকাণ্ড সম্বন্ধেও তাহা করিলে ভারতীয় মুসলমানদের, হিন্দুদের ও অন্য সকলের কল্যাণ হইবে। সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের সকল কারণের উচ্ছেদ বাঞ্ছনীয়। উক্তরূপ অনুসন্ধানে নিষ্ঠাবান মুসলমানদের কোন আপত্তি থাকিতে পারে না। কারণ, তাঁহারা কেহই এ কথা বলেন নাই, যে, তাঁহাদের কোন শাস্ত্রে এরূপ হত্যার বিধান আছে। আমরা তাঁহাদের কোন শাস্ত্রের অনুবাদে এরূপ বিধানের সন্ধান পাই নাই।

এ বিষয়ে আমাদের আহৃত জ্ঞান যদি যথার্থ হয়, তাহা হইলে মুসলমান নেতারা সাক্ষাৎ করিয়া এই দুটি বালককে যদি তাহাদের ভ্রম বুঝাইয়া দেন, তাহাদের দ্বারা প্রাণদণ্ডের পরিবর্ত্তে অন্য দণ্ডের আবেদন করান এবং সেই আবেদনের সমর্থন তাঁহারা করেন, তাহা হইলে ভাল হয়। মানুষের ফাঁসী হওয়া অপেক্ষা ভ্রম সংশোধনের সুযোগ পাওয়া বাঞ্ছনীয়।

আশা করি যুবকদ্বয়ের এখনও ফাঁসী হয় নাই। সেই ধারণাতেই উপরের কথাগুলি লিখিলাম।

কুটীর-শিল্পাদির সরকারী সাহায্য

কুটীর-শিল্প এবং পণ্যদ্রব্য তৈরি করিবার সেই রকম অন্যান্য ছোট ছোট শিল্পের কারখানাকে সরকারী সাহায্য দিবার জন্য একটি আইন পাস হইয়াছে। এরূপ আইনে দেশের উপকার হইতে হইলে, প্রথমতঃ বঙ্গীয় গবন্মেণ্টের হাতে টাকা থাকা চাই, দ্বিতীয়তঃ, বঙ্গের কল্যাণের জন্য টাকা দিবার ইচ্ছা থাকা চাই, এবং তৃতীয়তঃ সং দক্ষ ও কর্ম্মিষ্ঠ লোকদের সেই সাহায্য পাওয়া চাই। বাঙালী ছাড়া বাংলা দেশে আর সকলেই ধনী হইতে পারে (তাহার জন্য অবশ্য 'বাঙালীরাই প্রধানতঃ দায়ী)। বাংলা গবন্মেণ্টেরও অবস্থা বাঙালীরই মত। ভারত গবন্মেণ্ট অনেকটা বঙ্গের দৌলতে ধনী, কিন্তু বাংলা গবন্মেণ্ট দরিদ্র। সুতরাং তাহার টাকা দিবার ক্ষমতা নাই। দেশের প্রকৃত মঙ্গলের জন্য টাকা খরচ করিবার ইচ্ছাও যে তাহার আছে, তাহার অনেক প্রমাণ পাইলে বিশ্বাস করিব। এ সব বাধা সত্ত্বেও যদি কিছু টাকা খরচ হয়, তাহা কুপোষ্য-পোষণে ব্যয়িত হইবে কি না, কে জানে ?

প্লাবন ও দুর্ভিক্ষ

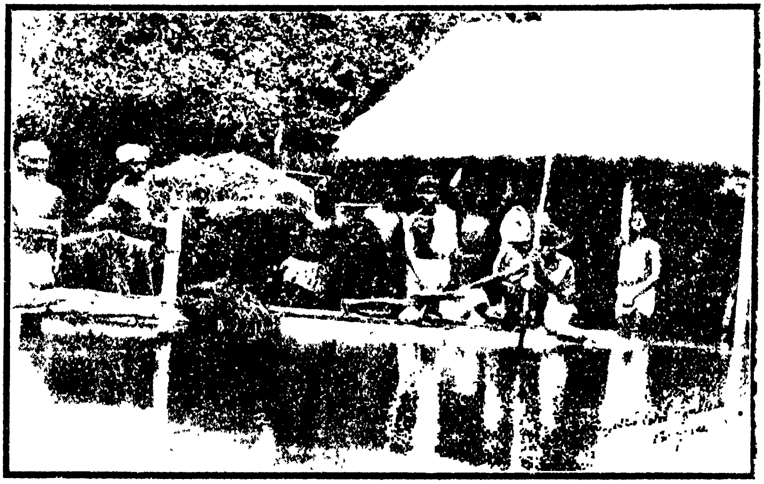
দুর্ভিক্ষ ও প্লাবন এবং প্লাবনজনিত দুর্ভিক্ষ উত্তর-বঙ্গে ও পূর্ব্ববঙ্গে হাজার হাজার লোককে নিঃসম্বল, অসহায়, আশ্রয়হীন ও নিরন্ন করিয়াছে। তাহার বিস্তৃত, পুঙ্খানুপুঙ্খ, ও মর্ম্মভেদী বৃত্তান্ত প্রত্যহ বাংলা ও ইংরেজী দৈনিকগুলিতে বাহির হইতেছে। কোন কোন কাগজে ছবিও বাহির হইতেছে। আমরাও এবিষয়ে মধ্যে মধ্যে চিঠি পাইতেছি। বগুড়া জেলার প্লাবিত অঞ্চলের দুটি ফোটোগ্রাফ আমরা কংগ্রেস দুর্ভিক্ষ ফণ্ডের সেক্রেটরী ক্যাপ্টেন দত্তের সৌজন্যে পাইয়া তাহার প্রতিলিপি প্রকাশ করিতেছি। যাঁহার যত বেশী সাহায্য করিবার সামর্থ্য আছে, তাঁহাকে তাহা করিতে অনুরোধ করিতেছি। অনেক মিশন, সভা, সমিতি ও কমিটির আবেদন দৈনিক কাগজে বাহির হইতেছে। কেহ কেহ

ঙগুলিতেই সাহায্য দিতে র্থ। যাঁহাদের সেরূপ সামর্থ্য ইচ্ছা নাই, তাঁহারা আপনাদের ভিরুচি ও শ্রদ্ধা অনুসারে যে ান কর্ম্মীসমষ্টির সাহায্য করিলে বিপন্ন ও আর্ত্ত ব্যক্তির প্রাণ- া হইবে।

—

ারীহরণবিষয়ক পুলিসের সার্কুলারের ফল

১৯৩০ সালের ২৭শে মার্চ্চ লসের সহকারী ইনস্পেক্টার- নেরাল বাংলার সমুদয় ডেপুটী স্পেক্টর-জেনেরালকে নিম্ন- ত চিঠি লেখেন।



বগুড়া জেলার "মেঘাগছা" গ্রামের বন্যাপীড়িত অধিবাসীদের। নিরাশ্রয়তার করুণ দৃশ্য

Copy of letter No. 3481-88 A. dated the 27th rch 1930, from the Assistant Inspector-General Police, Bengal, to all Range Deputy Inspectors-neral of Police.

1. I am directed to address you on the subject ntrages on women.

2. The matter has for some time past been the se of considerable public comment and it has n urged that proper attention is not paid by the ice to the investigation of such offences. Govern-nt consider that every endeavour must be made oring to justice all persons, whether Hindu or hammadan, who may resort to this class of crime.

3. I am accordingly to request you to impress n your Superintendents the necessity for ching greater importance to this class of crime and to ask them to take special notes of such cases and to see that investigations are generally carried on under the direct supervision of Circle Inspectors. In cases where a prosecution fails, the Superintendent of Police should submit a detailed report which should be forwarded with your remarks to this office for the Inspector-General's information. The Inspector-General also desires you to comment briefly in your inspection notes on districts and subdivisions on offences against women and, in doing so, any increase or decrease in the number of cases, results of cases, the proportion of Hindus and Muhammadans to the total population and the proportion of cases in which Hindus are concerned to those in which Muhammadans are accused, should be considered. Comment should also be made on any apathy or fault on the part of the police in the investigation of these cases which may come to your notice.



বগুড়া জেলার "মাদলা" গ্রামের স্কুলগৃহ বন্যায় ভগ্ন হইয়াছে

এক বৎসর সাড়ে চারি মাস পূর্ব্বে এই সার্কুলার জারি হয়। কিন্তু নারীনির্য্যাতনের সংবাদ পূর্ব্ববৎ ঘন ঘন খবরের কাগজে বাহির হইতেছে। প্রায় একটি দিনও যায় না যে দিন এরূপ ভীষণ ও লজ্জাকর সংবাদ কোন-না-কোন সংবাদপত্রে বাহির না হয়। সরকারী এই সার্কুলার সম্ভবতঃ নথীভুক্ত হইয়া আছে। পুলিসের লোকেরা তথাকথিত বা সত্য রাজনৈতিক ডাকাতি, তথাকথিত বা সত্য রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র

প্রভৃতি বাহির করিতে ব্যস্ত আছেন। তাহা বাহির করিতে পারিলে সম্ভবতঃ সরকারের কাছে কোন-না-কোন প্রকার পুরস্কার পাওয়া যায়। নারীদের উপর অত্যাচার নিবারণের জন্য হয়ত সেরূপ কোন পুরস্কার নাই।

আমাদের বিবেচনায় জেলা ও মহকুমার মোট জনসংখ্যা, হিন্দু ও মুসলমানরা যথাক্রমে মোট জনসংখ্যার শতকরা কত জন এবং এইরূপ মোকদ্দমায় হিন্দু ও মুসলমান অভিযুক্তদের অনুপাত কত, এই প্রকারের সাম্প্রদায়িক অঙ্ক না চাহিলেও চলিত। ইহাতে ফল-লাভের ব্যাঘাত জন্মিবার সম্ভাবনা। আসল কাজ হইতেছে, বদমায়েসদিগকে দমন করা এবং নারীদিগকে রক্ষা করা। হিন্দু দুর্বৃত্ত সংখ্যায় বেশী, কি মুসলমান দুর্বৃত্ত বেশী, তাহা জানিতে না পারিলেও ক্ষতি নাই। এই সার্কুলার অনুসারে কি কাজ হইয়াছে, তাহা ব্যবস্থাপক সভার সভ্যেরা এবং ভারতসভা, হিন্দুসভা প্রভৃতি গবর্মেণ্টকে জিজ্ঞাসা করুন।

—

ভারতের নূতন জাতীয় পতাকা

ভারতবর্ষের যে নূতন জাতীয় পতাকা সমগ্রভারতীয় কংগ্রেস দ্বারা অনুমোদিত হইয়াছে, তাহার ভিন্ন ভিন্ন রংগুলির সাম্প্রদায়িক ব্যাখ্যা যে করা হয় নাই, তাহা সন্তোষের বিষয়। এই পতাকায় সর্ব্বোপরি যে গৈরিক রং থাকিবে, তাহা ভারতবর্ষের সকল সম্প্রদায়ের উচ্চতম আধ্যাত্মিক লক্ষ্য বৈরাগ্য ও মৈত্রীর প্রতীক বিবেচিত হইবে। পতাকায় গৈরিক রঙের সমাবেশ বহু বৎসর পূর্ব্বে শান্তিনিকেতন হইতে ঋষিকল্প দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ অনেকে সমর্থন করিয়াছিলেন। পরেও ইহা মডার্ণ রিভিউ পত্রিকায় একাধিকবার সমর্থিত হইয়াছে।

—

উত্তরবঙ্গে জলপ্লাবন

বঙ্গে জলপ্লাবন নূতন নয়। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে যখন উত্তরবঙ্গ প্লাবিত হয়, যখন স্যার প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের নেতৃত্বে বিপন্ন লোকদের সাহায্যের বিশেষ চেষ্টা হইয়াছিল, সেই সময় এইরূপ প্লাবনের কারণ সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের ভার পড়ে অধ্যাপক প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের উপর। তিনি তখন আলিপুরের মীটিয়রলজিক্যাল আফিসের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী ছিলেন। তিনি অনেক পরিশ্রম করিয়া একটি রিপোর্ট প্রস্তুত করেন, এবং তাহা মুদ্রিতও হয়। কিন্তু তাহার পর সেটি চাপা দেওয়া অবস্থায় আছে। তাহার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কোন কাজ হয় নাই, তাহা খণ্ডন করিবার চেষ্টাও হয় নাই। তাহা যে লোকে পড়ে বা দেখে, তাহাও বোধ করি গবর্মেণ্টের ইচ্ছা নয়। কেন-না, আমরা যতদূর জানি, উহা খবরের কাগজের দেশী সম্পাদকদিগকে অন্যান্য অনেক রিপোর্টের মত বিনামূল্যে দেওয়া হয় নাই। উহার দামটিও কম করিয়া কুড়ি টাকা রাখা হইয়াছে। ব্যবস্থাপক সভার সভ্যেরা এবং রাজনৈতিক ও লোকহিতেচ্ছু সভাসমিতিসমূহের কর্তৃপক্ষ উহা এক এক খানি সংগ্রহ করিয়া গবর্মেণ্টকে জিজ্ঞাসা করুন ঐ রিপোর্ট সম্বন্ধে সরকারী অভিপ্রায় কি এবং সেই অভিপ্রায়ের কারণ কি।

—

বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দু কন্‌ফারেন্স

বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দু কন্‌ফারেন্সের অধিবেশন এবার বর্দ্ধমানে হইয়াছিল। বঙ্গের নানাস্থান হইতে অনেক প্রতিনিধি আসিয়াছিলেন। তদ্ভিন্ন বঙ্গের বাহির হইতে ডাক্তার মুঞ্জে, শ্রীযুক্ত মাধবরাও আনে, লালা জগৎনারায়ণ লাল প্রভৃতি সভায় যোগ দিয়াছিলেন। পূর্ণ অধিবেশনের সময় তিন-চার হাজার লোকের সমাবেশ হইয়াছিল। বর্দ্ধমানের কতকগুলি ভদ্রলোক বিশেষ উৎসাহ সহকারে পরিশ্রম করায় এই কন্‌ফারেন্সের আয়োজন সম্ভব হইয়াছিল।

শহরের সুখ্যাত বণিক শ্রীযুক্ত রাজকৃষ্ণ দত্ত অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির কাজ সুসম্পন্ন করেন। তাঁহার অভিভাষণ সময়োপযোগী ও সুবিবেচনার পরিচায়ক হইয়াছিল। কাশিমবাজারের মহারাজা শ্রীযুক্ত শ্রীশ-চন্দ্র নন্দীর অভিভাষণ উত্তম হইয়াছিল। ইহার ধর্ম্মতাত্ত্বিক অংশের আলোচনা সাধারণ মাসিক কাগজের উপযোগী হইবে না। অন্যান্য কথার মধ্যে কেবল একটির উল্লেখ এখানে করিব। তিনি অসবর্ণ বিবাহের বিরুদ্ধে কিছু লিখিয়াছেন। কিন্তু পুরাকালে ইহা ভারতবর্ষে প্রচলিত ছিল। অনুলোম বিবাহ ত প্রচলিত ছিলই এবং তাহার বিধানও ছিল। প্রতিলোম বিবাহও নিষিদ্ধ ছিল না। তাহার দৃষ্টান্তও দেওয়া যায়। নেপাল ও সিকিমে, সিকিমের অংশ দার্জ্জিলিঙে, হিন্দুদের মধ্যে অসবর্ণ বিবাহ বর্ত্তমান সময়েও একান্ত বিরল নহে। আসাম ও বঙ্গের সীমার উভয় দিকের জেলাতে কায়স্থ ও বৈদ্যদের মধ্যে কখন কখন বিবাহ হইয়া থাকে। এগুলি হিন্দুবিবাহ, ব্রাহ্মসমাজের বিবাহ নহে। গত কয়েক বৎসরে ব্রাহ্মসমাজের বাহিরের শিক্ষিত দু-একটি হিন্দুপরিবারে অসবর্ণ বিবাহ হইয়াছে, এবং এখনও হইতেছে। হিন্দু মিশনের চেষ্টায় সম্প্রতি

কয়েকটি অসবর্ণ বিবাহ হইয়াছে। মহারাজা বাহাদুর তাঁহার পিতার ন্যায় বৈষ্ণব, তাহা তাঁহার অভিভাষণ হইতে জানা যায়। বৈষ্ণব মত ও আচরণে বর্ণভেদের কড়াকড়ি তাহার অভিভাষণের অনুযায়ী কি না, বিবেচ্য।

কন্‌ফারেন্সের রাজনৈতিক প্রস্তাবগুলি খুব কম। তাহা ঠিকই হইয়াছে। এই প্রস্তাবগুলি ভাল। অধিকাংশ প্রস্তাব সমাজ, শিক্ষা, কৃষি, ধনাগমের উপায় প্রভৃতি সম্বন্ধে ছিল। বস্তুতঃ এই সব দিকে কাজ করিয়া হিন্দুসমাজকে রক্ষা করা ও বর্দ্ধিষ্ণু করাই হিন্দু মহাসভার প্রধান কাজ।

হিন্দুসমাজের সকল লোককে মনে রাখিতে হইবে, যে, সকল জা'তের, সকল বর্ণের ধনী-দরিদ্র সকল হিন্দুকে সমাজে অসম্মানমুক্ত স্থান দেওয়ার উপর হিন্দুসমাজের সংহতি, শক্তি, ও ক্ষয়নিবারণ নির্ভর করে। প্রবাসীর সম্পাদক ব্রাহ্মসমাজের লোক, ব্রাহ্মসমাজ জা'ত মানেন না। কিন্তু আমরা এখানে জা'ত-না-মানার পরামর্শ দিতেছি না। আমরা কেবল ইহাই বলিতেছি যে, আধুনিক বঙ্গীয় হিন্দুসমাজে কায়স্থ ব্রাহ্মণ বৈদ্যেরা (নামগুলির উল্লেখ বর্ণমালার অনুক্রমে করা হইল) যেমন পরস্পর ঔদ্বাহিক আদানপ্রদানাদি না করিলেও পরস্পরকে অস্পৃশ্য অনাচরণীয় জ্ঞান বা তাচ্ছিল্য করেন না, সেইরূপ ব্যবহার সকল জা'তের প্রতি করা হউক। কোন জা'তের কেহ কেহ যদি এরূপ ব্যবহারের যোগ্য বিবেচিত না হন, শিক্ষা ও আর্থিক অবস্থা বিষয়ে তাঁহাদের উন্নতিসাধনের চেষ্টা করা হউক।

—

উদারনৈতিক সংঘের অধিবেশন

এবার উদারনৈতিক সংঘের অধিবেশন বোম্বাইয়ে হইয়া গিয়াছে। এলাহাবাদের দৈনিক 'লীডার' কাগজের প্রসিদ্ধ সম্পাদক শ্রীযুক্ত চির্‌বাভরী যজ্ঞেশ্বর চিন্তামণি সভাপতি নির্ব্বাচিত হন। তাঁহার দীর্ঘ অভিভাষণ তাঁহার খ্যাতির সম্পূর্ণ উপযুক্ত। তিনি ভারতবর্ষের জন্য যেরূপ স্বাধীনতা চান তাহা নামে কংগ্রেসের ঈপ্সিত পূর্ণ স্বরাজ না হইলেও মূলতঃ এবং সারতঃ তাহারই মত। বস্তুতঃ শ্রীযুক্ত চিন্তামণি সত্যাগ্রহ করেন নাই বা তাহার সমর্থন করেন না বটে, কিন্তু স্বাধীনতার সুস্পষ্ট দাবিতে এবং গবর্ন্মেণ্টের নির্ভীক ও তীব্র সমালোচনায় তিনি কংগ্রেসের নেতাদের সমশ্রেণীস্থ।

তিনি প্রথম গোলটেবিল কন্‌ফারেন্সের সভ্য ছিলেন, দ্বিতীয় কন্‌ফারেন্সেরও সভ্য। প্রথম কন্‌ফারেন্সে যাহা হইয়াছে, তাহাতে তিনি সন্তুষ্ট নহেন। ভারতবর্ষের হিতের জন্য বলিয়া অভিহিত কিন্তু বাস্তবিক ইংলণ্ডের স্বার্থরক্ষার জন্য অভিপ্রেত যে-যে বিষয়গুলি ব্রিটিশ গবর্ন্মেণ্ট নিজেদের হাতে রাখিতে চান, যেমন সৈনিক বিভাগ, ভারতবর্ষের ও ইংলণ্ডের মুদ্রা বিনিময়ের হার, ভারতবর্ষে মুদ্রার পরিমাণের হ্রাস বৃদ্ধি, শিল্পবাণিজ্যে বিদেশী ইংরেজ ও অন্যান্য জাতিকে নামে ভারতীয়দিগের সমান কিন্তু কার্য্যতঃ এখনকার মত বেশী সুযোগ প্রদান, সেই সব বিষয় তাহাদের হাতে রাখা শ্রীযুক্ত চিন্তামণি অনুমোদন করেন না।

উদারনৈতিক সংঘের অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাবগুলিও মোটের উপর ভাল এবং ভারতবর্ষের স্বাধীনতালাভ ও অন্যবিধ কল্যাণের অনুকূল।

—

গান্ধীজি বিলাত যাইতেছেন না

গোলটেবিল বৈঠকে যোগ দিবার জন্য গান্ধীজীর বিলাত যাইবার কথা ছিল। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সহিত একমত হইয়া তিনি না-যাওয়া স্থির করিয়াছেন। তাঁহার মতে গবর্ন্মেণ্ট চুক্তিভঙ্গ করিয়াছেন, এবং কংগ্রেসের ও গবর্ন্মেণ্টের এ বিষয়ে মতভেদ নিরপেক্ষ সালিসবোর্ডের হাতে দিতে চান না। গান্ধীজির যাওয়া না হওয়ায় আমরা খুব দুঃখিত। কিন্তু তিনি ঠিক কাজ করিয়াছেন মনে হইতেছে;—কেন, তাহা বলিবার সময় ও স্থান নাই। ভারতের স্বরাজের বিরোধী ইংরেজদের চেষ্টা সফল ও মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইল।

—

আকোলায় হিন্দু মহাসভা

হিন্দু মহাসভার গত অধিবেশন গত মাসে আকোলা শহরে হইয়াছিল। সভাপতি হইয়াছিলেন সালেমের শ্রীযুক্ত সী বিজয়রাঘবাচার্য্য। তাঁহার বয়স আশীর কাছাকাছি, কিন্তু তিনি মানসিক শক্তি হারান নাই। তিনি কংগ্রেসের প্রাচীনতম সভ্যদের অন্যতম, তাঁর চেয়ে বৃদ্ধ কংগ্রেসওয়ালা বাঁচিয়া আছেন বোধ হয় একমাত্র স্যার দীনশা এডুলজী ওয়াচা। শ্রীযুক্ত বিজয়রাঘবাচার্য্য রাজনৈতিক জ্ঞান, দৃঢ়চিত্ততা, নির্ম্মল চরিত্র এবং সার্ব্বজনিক নানা কাজে কৃতিত্বের জন্য শ্রদ্ধাভাজন। তাঁহার অভিভাষণটি সমগ্র একসঙ্গে পড়িবার সুযোগ পাই নাই। যাহা দেখিয়াছি, তাহাতে ইহা রাজনৈতিক আলোচনাতেই পূর্ণ বলিয়া মনে হয়। এই আলোচনা বেশ বিশদ, এবং স্পষ্টবাদিতা ইহার সর্ব্বত্র লক্ষিত হয়। হিন্দুসমাজের সামাজিক ও অর্থনৈতিক নানা প্রশ্নের আলোচনা তিনি করিয়াছিলেন কি না, বলিতে পারি

না। দৈনিক কাগজে দেখিয়াছি, হিন্দু মহাসভার এই অধিবেশনে তেত্রিশটি প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। তাহার সবগুলি একত্র দেখিতে না পাওয়ায় কোন মত প্রকাশ করিলাম না।

—

বাংলায় পুলিসের বরাদ্দ

গত মার্চ্চ মাসে এক বৎসরের বঙ্গীয় বজেটের আলোচনার সময় পুলিসের বরাদ্দ ২,১৯,৫৯,০০০ টাকা মঞ্জুর হইয়াছিল। তাহার পর প্রেন্টিস্ সাহেব অতিরিক্ত আরও ৫,১৫,০০০ টাকা কৌন্সিলে মঞ্জুর করাইয়া লইয়াছেন। মোট ২,২৪,৭৪,০০০ টাকা। ইহা বঙ্গের সমগ্র রাজস্বের পঞ্চমাংশের চেয়েও বেশী। শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রকুমার বসু কৌন্সিলে বলিয়াছেন, ১৯১২-১৩ সালে পুলিসের জন্য সরকারী দাবি ছিল ৮৫,৫৫,০০০ টাকা এবং ১৯১৩-১৪তে বরাদ্দ হয় ৯৫,৮২,০০০ টাকা। ১৯২৩-২৪ সালে উহা ১,৭৫,০০,০০০ টাকা ছিল। এ বৎসর কত দাড়াইয়াছে, তাহা উপরে দেখান হইয়াছে। এই যে ক্রমাগত পুলিসের ব্যয় এবং কর্ম্মচারী বৃদ্ধি, ইহার সমর্থনে সরকারপক্ষ বলিবেন, দেশে অপরাধ বাড়িতেছে। কোন দেশে অপরাধ বাড়ার জন্য গবন্মেণ্ট নিশ্চয়ই অনেকটা দায়ী। কিন্তু ইংরেজ সরকার তাহা স্বীকার করিতে চান না। এবারকার অতিরিক্ত বরাদ্দ যে মঞ্জুর করাইয়া লওয়া হইয়াছে, তাহারও কারণ মিঃ প্রেন্টিসের মতে অপরাধ বৃদ্ধি। ব্যবসাবাণিজ্যে মন্দা এবং বেকারসমস্যা যে এই অপরাধ বৃদ্ধির জন্য কতকটা দায়ী, তিনি তাহা অস্বীকার করেন নাই, কিন্তু আইন-অমান্য আন্দোলন এবং বিপ্লবীদের চেষ্টাকেই যেন খুব বেশী দায়ী করিয়াছেন মনে হয়। তাঁর কথাটাই মানিয়া লওয়া যাক্। পুলিসের লোক বাড়ান অপরাধবৃদ্ধি নিবারণের একটা উপায় বটে। কিন্তু মাথাগুন্তিতে কর্ম্মচারী বাড়াইলেই ত কাজ ভাল হইবে না; বুদ্ধিমান্, দক্ষ এবং সৎ লোকও পাওয়া চাই। সেদিকে গবন্মেণ্টের কিরূপ দৃষ্টি, তাহা নরেন্দ্রবাবুর দেওয়া একটা দৃষ্টান্ত হইতে বুঝা যায়। মফিজুদ্দিন আহমদ নামক টাঙ্গাইলের এক পুলিস সব্-ইনস্পেক্টর একটা চুরির তদন্তের সময় একজন গ্রাম্য লোকের কাছে ৮০০ টাকা ঘুস লয়। লোকটি মুন্সেফী আদালতে মোকদ্দমা করায় ৮০০ টাকার ডিক্রী পায়। সব্-ইন্স্পেক্টর জেলাকোর্টে ও হাইকোর্টে আপীল করাতেও ডিক্রী বহাল থাকে। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও মফিজুদ্দিন আহমদের চাকরি ত বজায় থাকেই, অধিকন্তু তাঁহার পদোন্নতি করিয়া তাঁহাকে টিকটিকি বিভাগের ইনস্পেক্টর করা হয়। মিঃ প্রেন্টিস্ এই বিষয়ে ব্যবস্থাপক সভার প্রশ্নের উত্তরে এই মর্ম্মের কথা বলিয়াছেন, যে, "উপযুক্ত কর্ম্মচারী না থাকায় ঐ ব্যক্তিকে অস্থায়ী ভাবে উন্নীত করা হইয়াছে, এবং বিভাগীয় অনুসন্ধানের ফলে দোষী প্রমাণিত না হইলে কেবল আদালতের ডিক্রীর উপর নির্ভর করিয়া কোনও কর্ম্মচারীকে দণ্ড দেওয়া গবন্মেণ্টের নিয়মের বিরুদ্ধ। উক্ত কর্ম্মচারী নিশ্চয়ই ভাল কাজ করিয়াছে, যাহার জন্য তাহার উন্নতি প্রাপ্য হইয়াছে।"

মিঃ প্রেন্টিসের প্রত্যেকটি কথার আলোচনা করিবার স্থান নাই। কিন্তু এ বড় মজার কথা, যে, গবন্মেণ্টের শাসন-বিভাগ গবন্মেণ্টের বিচার-বিভাগের উচ্চতম আদালত হাইকোর্টকে পর্য্যন্ত অগ্রাহ্য করেন, হাইকোর্টের জজদের চেয়ে পুলিসের কোন-না-কোন অজ্ঞাতনামা ধুরন্ধরের বিচারের উপর অধিক আস্থা রাখেন। মিঃ প্রেন্টিস্ আইন-অমান্য আন্দোলনকে অপরাধ-বৃদ্ধির একটা কারণ বলিয়াছেন। কিন্তু শাসন-বিভাগ হাইকোর্টকে অগ্রাহ্য ও অবজ্ঞা করিয়া ঐরূপ দোষই করেন নাই কি, এবং তাহার দ্বারা আইন-আদালতের প্রতি লোকের অশ্রদ্ধা বাড়ে না কি?

বেকার সমস্যা এবং ব্যবসাবাণিজ্যে মন্দা সরকারী মতে অপরাধবৃদ্ধির একটা কারণ। সে কারণটা দূর করিবার চেষ্টা গবন্মেণ্ট কি করিয়াছেন? পুলিস বাড়াইলে ত তাহার প্রতিকার হইবে না।

তাহার পর বিপ্লববাদের কথা। ইতিহাসের একটু জ্ঞানও যাহাদের আছে, তাহারা জানে, দারিদ্র্য ও কাজের অভাব বিপ্লবচেষ্টার এবং বিপ্লবের একটা প্রধান কারণ। দারিদ্র্য দূর করিবার জন্য মোটা বেতন ও ভাতায় পুষ্ট সিবিলিয়ান-পুঙ্গবেরা কি করিতেছেন? সরকারী লোকে যাহাকে বলে আইন অমান্য-আন্দোলন, মহাত্মা গান্ধী তাহাকে বলেন সত্যাগ্রহ। তিনি বলিয়াছেন, তাঁহার প্রবর্ত্তিত সত্যাগ্রহের উদ্দেশ্য স্বরাজলাভ এবং স্বরাজ-লাভের প্রধান উদ্দেশ্য দরিদ্র অধিকাংশ ভারতীয়ের দুরবস্থার উন্নতিসাধন। সুতরাং যে সত্যাগ্রহ এখনও পুনর্ব্বার আরম্ভ হয় নাই এবং যাহার পুনঃপ্রবর্ত্তনের আশঙ্কায় সরকার তাহার সহিত যুদ্ধের আয়োজন করিতেছেন, দারিদ্র্য-নিবারণ ভিন্ন সেই সত্যাগ্রহ প্রচেষ্টাকে শক্তিহীন করা যাইবে না। কিন্তু পুলিসের বরাদ্দ বাড়াইলে দেশের দারিদ্র্য বিন্দুমাত্রও কমিবে না।

—

বেকার সমস্যা

বেকার যুবকেরা একটি সমিতি গড়িয়াছেন। ইঁহারা শহরের ভিন্ন ভিন্ন অংশে সভা করিতেছেন এবং মিছিল বাহির করিতেছেন। তাহাতে সর্ব্বসাধারণের এবং সরকার বাহাদুরের এই সঙ্গীন সমস্যাটির প্রতি দৃষ্টি পড়া উচিত।

ভারতবর্ষের বেকার সমস্যা পাশ্চাত্য সভ্য দেশ-সমূহের মত নহে। ঐ সব দেশে কখন কখন বিশ পঁচিশ ত্রিশ চল্লিশ লক্ষ লোক বেকার হইয়া পড়িতে পারে, কিন্তু সাধারণতঃ প্রায় সকলেরই রোজগারের উপায় থাকে। এদেশে সব সময়েই সাধারণতঃ কোটি কোটি লোকের কোন স্বতন্ত্র রোজগার থাকে না।

বাংলার কথা ধরুন। আমাদের অধিকাংশ লোকের নির্ভর চাষের উপর। ভূমিশূন্য যে-সব শ্রমিক ক্ষেতের কাজ করে চাষের কয়েক মাস তাহারা যাহা পায় তাহাতে তাহাদের সম্বৎসর গুজরান হয় না। বৎসরের বেশী সময় তাহারা বেকার থাকে। ক্ষুদ্র চাষীদেরও ঐ অবস্থা। বঙ্গে এই দুই শ্রেণীর লোকই বেশী। ইহাদের ভাবনা ভাবিতে হইবে। সমস্যার সমাধান কঠিন, কিন্তু অসাধ্য নহে।

তাহার পর কিছু বা বেশী শিক্ষাপ্রাপ্ত বেকার যুবকদের কথা ভাবিতে হইবে। ইঁহাদেরই কেহ কেহ সমিতি গড়িয়াছেন। সবাইকে চাকরি দিবার মত অত চাকরি নাই। দেশে নানা রকমের পণ্যশিল্পের ছোট-বড় কারখানা স্থাপন করিলে এবং ইঁহাদিগকে শিখাইয়া লইয়া তাহাতে কাজ দিলে সমস্যার প্রকোপ অল্প কমিতে পারে। ইহা সময়সাপেক্ষ, কিন্তু চেষ্টা করিতে হইবে। সাধারণতঃ অনেক শিক্ষিত যুবক বিশ-পঁচিশ টাকার কেরানীগিরি পাইলে বর্ত্তিয়া যান। এরূপ রোজগার, এর চেয়ে বেশী রোজগার, সাধারণ অশিক্ষিত মুটে মজুরেরা করে; চটকল কাপড়ের কলের মজুরেরা করে। কাপড়ের কলের মজুরী শিক্ষিত ভদ্রসন্তান-দিগকেও করিতে দেখিয়াছি। অন্য যে-কোন সৎ কাজও তাঁহাদের করা উচিত। ছোট ছোট ব্যবসা করা উচিত।

বঙ্গের নানা প্রাচীন শিল্প নষ্ট বা প্রায় নষ্ট হওয়ায় চাষের উপরই খুব বেশী লোক নির্ভর করিতেছে, সুতরাং চাষের বিস্তৃতি খুব হইয়াছে। তথাপি এখনও চাষের যোগ্য অথচ অকৃষ্ট জমী অনেক আছে। দেশহিতৈষী ভূম্যধিকারীরা শ্রমপটু বেকার ভদ্রসন্তানদের দ্বারা ছোট-বড় ভূখণ্ডে সাধারণ ফসলের চাষ, তরকারীর চাষ বা ফলের চাষ, বা নানা পণ্যশিল্পে ব্যবহৃত কাঁচা মালের ইন্টেন্সিভ চাষ করাইতে পারেন কি-না, বিবেচ্য। ইন্টেসিভ নানা রকম চাষের ও তদুৎপন্ন কাঁচা মাল হইতে প্রস্তুত পণ্যদ্রব্যের সন্ধান বঙ্গীয় হিতসাধন মণ্ডলীর কর্ম্মী শ্রীযুক্ত যামিনীরঞ্জন মজুমদারের নিকট পাওয়া যাইবে। অন্য অনেকেও জানেন।

আলবার্ট হলে বেকার যুবক সমিতির দ্বারা আহূত এক সভায় এইরূপ মর্ম্মের একটা প্রস্তাব হয়, যে, যেহেতু কংগ্রেস পূর্ণস্বরাজের আমলে বেতনের উচ্চতম হার মাসিক ৫০০ টাকা নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, অতএব কলিকাতা মিউনিসিপালিটি এবং বঙ্গের অন্যান্য মিউনিসি-পালিটি ও ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড উচ্চতর বেতনভোগী কর্ম্মচারীদের বেতন কমাইয়া দিউন। এরূপ প্রস্তাব দ্বারা বেকার সমস্যার সমাধান কি প্রকারে হইবে, তাহা প্রস্তাবটিতে বলা হয় নাই। ঐ সভায় আমি সভাপতি ছিলাম। আমি প্রস্তাবটির সপক্ষে বা বিপক্ষে কিছু বলি নাই, কিন্তু কিছু মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলাম। বলিয়াছিলাম, কর্ম্মচারীদের বেতন হঠাৎ কমাইয়া দেওয়া যায় না, কিন্তু কেহ দেশের হিতার্থে যদি স্বেচ্ছায় কম বেতনে কাজ করিতে রাজী হন, তিনি ধন্যবাদার্হ হইবেন। যদি বেতন কমান সুবিবেচনার কাজ বলিয়া স্থির হয়, তাহা হইলে আবশ্যক-মত দু-চার মাস বা এক বৎসরের নোটিস দিয়া তাহা করিতে হইবে। উচ্চ বেতনভোগী লোকদের বেতন কমিলে যে টাকা বাঁচিবে, তাহা হইতে অনেক বিদ্যালয় খোলা যাইতে পারে, এবং তাহাতে অনেক বেকার লোক কাজ পাইতে পারে।

ইহা গেল কলিকাতার কথা।

ভারত গবর্মেণ্ট প্রতিবৎসর পাটের শুল্ক হইতে যে তিন চার কোটি টাকা বাংলা দেশ হইতে পান, বাংলা দেশের

ন্যায্য পাওনা সেই টাকা তাহাকে দিলে তাহার দ্বারা অনেক বিদ্যালয় স্থাপন করা ও চালান যায়। তাহাতে কয়েক হাজার বেকার লোকের কাজ হইতে পারে। পাটশুল্কের টাকা ভারত গবর্ন্মেণ্ট না দিলে আর একটা উপায় আছে। সামান্য সামান্য যুদ্ধে গবর্ন্মেণ্ট বিশ-পঁচিশ-ত্রিশ-চল্লিশ কোটি টাকা খরচ করেন। বঙ্গের শিক্ষার জন্য ঐ পরিমাণ টাকা ধার করিলেও তাহা পরে শোধ হইয়া যাইবে। এইরূপ একটা বৃহৎ মূলধনের আয় হইতে অনেক বিদ্যালয় খোলা ও চালান যাইতে পারে। তাহাতে অনেক হাজার লোকের কাজ হইতে পারে। এই সকল বিদ্যালয়ে সাধারণ লেখাপড়া ছাড়া ছাত্রছাত্রী-দিগকে রোজগারের কাজ কিছু শিখান চাই। তাহারা যাহাতে ন্যূনকল্পে নিজেদের ভাত-তরকারী, নিজেদের কাপড় উৎপন্ন করিতে পারে, তাহার ব্যবস্থা হইলে ভাল হয়। নিজেদের ডালভাত তরকারী নিজেরা উৎপন্ন করিতে পারা কম শিক্ষা নয়।

—

ব্যবসাবাণিজ্য ও শিল্পের কথা

সম্প্রতি "বঙ্গবাণী" ও "আনন্দবাজার পত্রিকা"য় শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বঙ্গের অন্তর্বাণিজ্যে বাঙালীর স্থান প্রভৃতি বিষয়ে যে-সব প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তাহার প্রতি সমাজহিতৈষী লোকদের দৃষ্টি পড়া উচিত। বাঙালী কর্ম্মকার, সূত্রধর, চর্ম্মকার প্রভৃতি কারিগর-দিগের অবনতি, ক্ষয় ও লয় নিবারণ একান্ত আবশ্যক। সমস্ত ব্যবসাবাণিজ্য ও পণ্যশিল্প বাহিরের লোকদের হাতে চলিয়া গেলে তাহা সাতিশয় দুঃখ ও দুর্গতির কারণ হইবে।

৭ই শ্রাবণের "সঞ্জীবনী"তে নোয়াখালীর শিল্প ও বর্দ্ধমানের শিল্প সম্বন্ধে যাহা লেখা হইয়াছে, তাহা হইতে ঐ দুই জেলার অনেক তথ্য জানা যায়। প্রত্যেক জেলা সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞদিগের দ্বারা এইরূপ প্রবন্ধ লিখিত হওয়া উচিত।

—

পাটের দর উঠিতেছে না কেন ?

এবৎসর গত বৎসরের অর্দ্ধেক জমীতে পাটের চাষ হওয়া সত্ত্বেও পাটের দর বাড়িতেছে না। তাহার কারণ, চাষীরা এত গরীব, যে, উচ্চ দরের প্রত্যাশায় তাহারা মাল অবিক্রীত রাখিতে পারে না; অন্য দিকে পাটের ক্রেতারা ধনী এবং, আগে হইতে পাট অনেক কিনিয়া রাখায়, অপেক্ষা করিতে পারে। এ অবস্থায় পাট-উৎপাদকদের সভা (Jute Growers' Association) পাট-বিক্রয় সমিতিগুলি পুনর্ব্বার স্থাপন ও পরিচালনের যে প্রস্তাব গবর্ন্মেণ্টের নিকট পাঠাইয়াছেন, তাহা সমীচীন মনে করি। তাহা করিবার জন্য বাংলা সরকারের টাকা না থাকিলে, ভারত সরকারের টাকা দেওয়া উচিত। ভারত সরকার এ পর্য্যন্ত বাংলা হইতে পাট-শুল্ক ন্যূনকল্পে চল্লিশ কোটি টাকা পাইয়া থাকিবেন। পাট-বিক্রয় সমিতিগুলি আপাততঃ কৃষকদিগকে বর্ত্তমান দরে আগাম টাকা দিতে পারে, এবং পরে দর চড়িলে বিক্রীর টাকা হইতে ঐ আগাম টাকা ফেরত পাইতে পারে।

পাট-উৎপাদকদিগের সভা, ঋণগ্রস্ত কৃষকদিগের নিকট হইতে আপাততঃ নির্দ্দিষ্ট কালের জন্য উত্তমর্ণদের দ্বারা ঋণ আদায় আইন দ্বারা স্থগিত রাখার যে প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহাও বিবেচনার যোগ্য।

—

বিজ্ঞাপনদাতাদের প্রতি

কার্ত্তিক মাসের প্রবাসী আশ্বিন মাসের তৃতীয় সপ্তাহের শেষের দিকে বাহির হইবে। অতএব নূতন বিজ্ঞাপনের কপি ১২ই আশ্বিনের মধ্যে আমাদের আফিসে পাঠাইয়া দিলে বাধিত হইব।

বিজ্ঞাপন-কার্য্যাধ্যক্ষ

পক্কশস্য

কামেট-বিজয়—

গত বৎসর নবেম্বর মাসে দিল্লীতে বসিয়া দশম বার হিমালয় অভিযানের প্রস্তাব হয়। শ্রীযুত ফ্রাঙ্ক এস স্মাইথ পূর্ব্ব বারের ডিরেনফার্থ-অভিযানে যোগদান করিয়াছিলেন। তাঁহারই নেতৃত্বে ছয়জন ইংরেজ গত মে মাসে হিমালয় অভিযান আরম্ভ করেন।



ঘাস্টোলি গ্লাশিয়ার হইতে কামেটের দৃশ্য

পঞ্চান্ন জন ভারতবাসী দোতিয়াল-শ্রমিক দু' হাজার চার শত পাউণ্ড ওজনের মালপত্র এবং একটি কলের গান লইয়া অগ্রে অগ্রে গমন করেন। অভিযানকারীরা রাণীক্ষেত হইতে যাত্রা করিয়া নিটি হইয়া ৩১এ মে কামেট-শৃঙ্গের পাদদেশে উপনীত হন। শ্রীযুক্ত স্মাইথ ভারতীয় দোতিয়াল সঙ্গীদের শ্রমশীলতার সুখ্যাতি করিয়াছেন। নিটি পৌঁছিয়া দোতিয়ালগণকে বিদায় দিয়া অধিকতর শ্রমশীল এবং শৃঙ্গারোহণে ওস্তাদ নিটি-অঞ্চল নিবাসী ভোটিয়াগণকে সঙ্গে লওয়া হয়। কামেট-বিজয়ে তাহাদেরও কৃতিত্ব অনেক।

কামেট বহুদিন ধরিয়াই অভিযানকারীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। ১৯১২ সালে সি-এফ-মিড সাহেব কামেট-শৃঙ্গের দু হাজার ফুটের মধ্যে উপনীত হইয়াছিলেন। গেল বৎসর জনসন-শৃঙ্গ পর্য্যন্ত যাওয়া হয়। এ-যাবৎ যত শৃঙ্গ মানুষের অধিগত হইয়াছিল, এটি তাহাদের মধ্যে সর্ব্বোচ্চ। কিন্তু কামেটশৃঙ্গ বিজয়ে পূর্ব্ব-পূর্ব্ব সকল প্রচেষ্টা হার মানিয়াছে। কারণ কামেট জনসনশৃঙ্গ হইতেও উঁচু এবং পৃথিবীর সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গ সমূহের মধ্যে পঞ্চম স্থান অধিকার করে। কামেট ২৫, ৪৪৭ ফুট উঁচু। এখানে বরফের পাহাড় স্তরে স্তরে শত শত ফুট



কামেট অভিযানের নেতা ফ্র্যাঙ্ক এস্ স্মাইথ

উঁচু হইয়া উঠিয়াছে। বরফ-রাশি যে-কোনো মুহূর্ত্তে ভাঙিয়া ধসিয়া পড়িয়া যাইতে পারে।

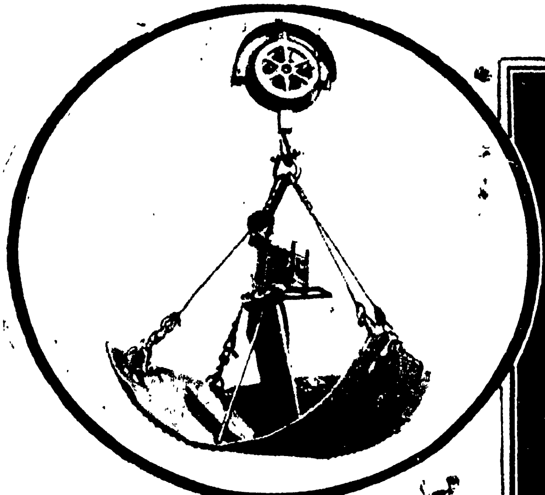
কামেট পৌঁছিতে পথিমধ্যে পাঁচ জায়গায় অভিযানকারীদের ঘাটি করিতে হইয়াছিল। পূর্ব্ব-কামেটের বরফ মণ্ডলে প্রথম ঘাটি, ১৮,৬০০ ফুট উচ্চে দ্বিতীয় ঘাটি, ২০,০০০ ফুটের মাথায় তৃতীয় ঘাটি, ২২,৫০০ ফুটে চতুর্থ এবং শৃঙ্গের মাথায় পঞ্চম ঘাটি করা হইয়াছিল। ভারতীয়রা অগ্রসর হইয়া প্রত্যেক ঘাটিই ঠিক করিয়া দিয়াছিল।

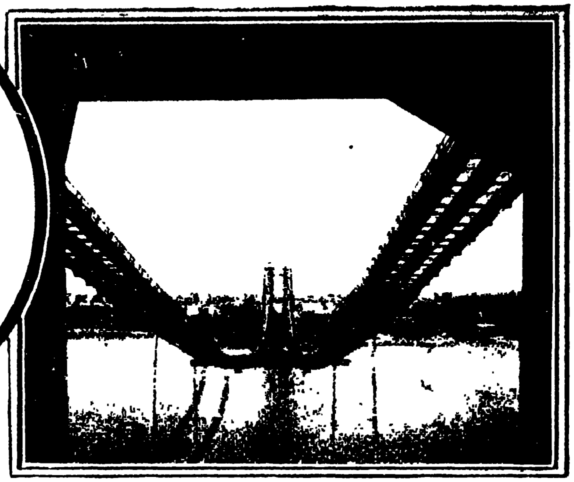
এইরূপ বিপদের সম্মুখীন হইয়া সাফল্য লাভ করা কম গৌরবের বিষয় নহে।

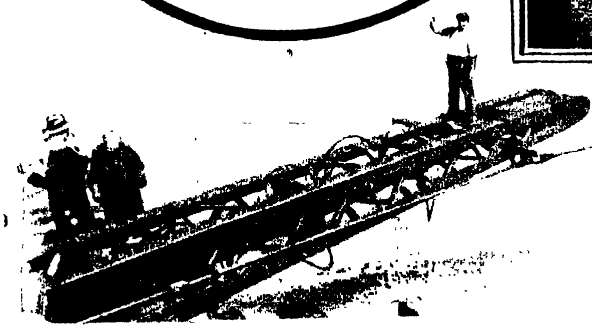
—

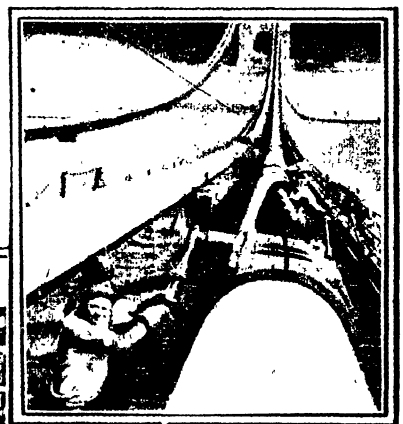
পৃথিবীর সর্ব্বপেক্ষা বৃহৎ সেতু—

নিউইয়র্কের হাডসন নদীর উপর যে নূতন সেতু নির্ম্মিত হইতেছে, তাহাই পৃথিবীর বৃহত্তম সেতু হইবে। নিম্নে উহার কয়েকটি ছবি দেওয়া হইল।











১। উপরে বামে—
ক্রেণে চড়িয়া হাড্‌সন্ সেতুর ফটোগ্রাফ তোলা

২। উপরে দক্ষিণে
অস্থায়ী তারের পুল

৩। মধ্যে বামে
লোহার কড়া চড়ানো হইতেছে

৪। মধ্যে দক্ষিণে
পুলের নির্ম্মাণ কার্য্য চলিতেছে

অর্দ্ধনির্ম্মিত পুলের উপর দিয়া হাঁটা, নীচে নিউইয়র্ক শহর দেখা যাইতেছে



বাপীতটে

শ্রীপঞ্চানন কর্ম্মকার—লক্ষ্ণৌ চিত্রবিদ্যালয়

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

প্রবাসী

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"

"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৩১শ ভাগ, ১ম খণ্ড | আশ্বিন, ১৩৩৮ | ৬ষ্ঠ সংখ্যা

নর-দেবতা

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ, এই চলমান জগতে যা-কিছু চল্‌চে, তারই সঙ্গে আমাদের মনের এবং প্রাণের চলাকে মেলাতে হ'ল তারই নাম জীবযাত্রা।

নিজের দৈহিক মানসিক চলার মূলে মানুষ যে-চালনাকে অনুভব করেচে তাকে মানুষ বলে শক্তি। তারই দৃষ্টান্তে সে স্থির করেচে জাগতিক সমস্ত চলা-ফেরার মূলে তেমনি একটি চালনাশক্তি আছে। এই শক্তির প্রকৃতি কি তাও সে নিজের প্রকৃতি থেকে বুঝে নিয়েচে। একটি মাত্র শক্তিকে সে নিজের মধ্যে অব্যবহিতভাবে একান্তভাবে জানে, সে হচ্চে ইচ্ছাশক্তি। জগতের গোড়াকার শক্তিকেও সে ইচ্ছাশক্তি ব'লে ধরে নিয়েছিল।

কর্ম্ম ব্যাপারটা চোখে পড়ে, ইচ্ছাটা থাকে অলক্ষ্যে। এই অদৃশ্য ইচ্ছা শান্ত থাকলে কর্ম্ম শান্ত থাকে, ইচ্ছা প্রয়োজনের অনুকূল হ'লে কর্ম্ম অনুকূল, প্রতিকূল হ'লে কর্ম্ম বিরুদ্ধ হয়ে ওঠে। এই জন্য যে-ইচ্ছা নিজের বাইরে অন্যের মধ্যে, তাকে ভয়, লোভ বা প্রেমের দ্বারা বশ ক'রে নিজের অভিপ্রায় সিদ্ধ করতে হয়।

জাগতিক ক্রিয়া যে-ইচ্ছার চালনায় ঘটে ব'লে মানুষ স্থির করেচে তাকে নিজের আনুকূল্যে আনবার বিবিধ প্রক্রিয়ায় মানুষের পূজা আরম্ভ। জগতের শক্তিকে নিজের শক্তির সহায় করবার এই সাধনাকে ব্যাবহারিক বিজ্ঞানের প্রথম সোপান ব'লে ধরা যেতে পারে।

মানুষ নিজের মধ্যে একটা বৈপরীত্য দেখেচে। দেখেচে যে, তার কর্ম্ম স্থূল কিন্তু কর্ম্মের উদ্ভব যে ইচ্ছা সেটা ইন্দ্রিয়বোধের অতীত। রূপধারী তার দেহ কিন্তু দেহের গভীরে যে প্রাণ তা অরূপ। চারিদিকের বস্তু তার প্রত্যক্ষ কিন্তু যে মনের কাছে সেই বস্তু গোচর হচ্চে সে নিজে অগোচর।

এর থেকে মানুষের এই প্রত্যয় জন্মেচে বাস্তব ব'লে যা-কিছু সে দেখ্‌চে জানচে সেই দেখা-জানার মধ্যেই তা চরম নয়, এমন কিছুকে সে আশ্রয় করে আছে যা দেখা-জানার মূলে। মানুষ নিজেকে যদি একান্ত বাইরে থেকেই দেখে তবে দেখ্‌তে পাবে পরে পরে কতকগুলি কর্ম্ম ও ছবি। মানুষ পদার্থের বাস্তব প্রমাণএর বেশি আর কিছু নেই। কিন্তু এই সমস্ত কর্ম্ম ও ছবির চেয়েও

নিঃসংশয় ও অব্যবহিতভাবে এমন একটি সত্যকে সে জানে, যে সত্য তার সমস্ত কর্ম্মকে ও প্রত্যক্ষ প্রকাশকে সম্বন্ধযুক্ত ক'রে এক ক'রে তুলেচে। এই হচ্চে তার আত্মোপলব্ধি।

এই যে নিজের মধ্যে ঐক্যোপলব্ধি, এই উপলব্ধিকে মানুষ আপন ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ছাড়িয়ে অনেক দূরে নিয়ে গেচে। এমন কথা বলেচে, যে-মানুষ নিজের মধ্যে সকলকে ও সকলের মধ্যে নিজেকে জানেন তিনিই সত্যকে জানেন। যে ঐক্যতত্ত্ব তার নিজেকে অখণ্ড করেচে সেই তত্ত্বই অন্যের সঙ্গে তাকে সংযুক্ত করেচে।

বস্তুকে বিশ্লেষণ ক'রে তার উপাদান বাহুল্য দেখা যায় কিন্তু সম্বন্ধকে বিশ্লেষণ করা যায় না, তা এক, তা সৃষ্টির মূল রহস্য। বস্তুকে সন্ধান করতে করতে তার মূলে গিয়ে পাওয়া যায় একটি বৈদ্যুতমণ্ডল, সেই মণ্ডলের কেন্দ্রে আছে ধনাত্মক বৈদ্যুতাণু ও সেই কেন্দ্রকে প্রদক্ষিণ ক'রে ঘুরচে ঋণাত্মক বৈদ্যুতাণু। এই আবিষ্কারটি পরম বিস্ময়কর কিন্তু তার চেয়ে বিস্ময়কর এদের সম্বন্ধ-সূত্র। এই সম্বন্ধের বিচিত্র লীলা অনুসারেই বৈদ্যুতকণার নৃত্য ভিন্ন ভিন্ন ধাতুরূপ ধারণ করচে। আবার সেই মূল ধাতুগুলি একটি নিরবচ্ছিন্ন বিরাট সম্বন্ধযোগে বিশ্বজগতকে সংঘটিত করেচে। এই ক্রিয়াশীল সম্বন্ধই বিচিত্রতাকে সৃষ্টি করে, আবার সেই বিচিত্রতার মধ্যে পরিব্যাপ্ত হয়ে তাকে একের যোগে যুক্ত করে থাকে।

এই কথাটিই আছে ঈশোপনিষদে—ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ। বিচিত্র ক্রিয়াশীল জগতকে এক সত্য অধিকার ক'রে আছেন। নিজের আত্মায় আমরা এই সত্যেরই আভাস পাই। এই আত্মা আমার সম্পর্কীয় অসংখ্য নানাকে অধিকার ক'রে এক। তারই যোগে আমার সমস্তকিছু সম্বন্ধযুক্ত। এই পরম রহস্যময় সম্বন্ধকে যাঁরা যত ব্যাপক ক'রে উপলব্ধি করেচেন সত্যকে তাঁরা তত বড় ক'রে জেনেচেন।

যে সত্যকে আমরা কেবল শক্তিরূপে জানি, প্রয়োজন-সিদ্ধির জন্যই আপন শক্তির সঙ্গে তার যোগসাধন করি। আমরা চাই অন্ন। কিন্তু এইখানেই ত শেষ হ'ল না, আরও একটা মস্ত চাওয়া বাকী রইল। বিনা প্রয়োজনে মানুষ চায় আনন্দ,—এই আনন্দের পূর্ণতা পায় যার কাছে, সে শক্তি নয় সে ব্যক্তি। সেই ব্যক্তির সঙ্গে আপন ব্যক্তিস্বরূপের পূর্ণ মিলনেই অহৈতুক তৃপ্তি।

ডাক্তারের কাছে যখন যাই তখন ডাক্তারকে দেখি শক্তিরূপে, আরোগ্যশক্তি। তার কাছে প্রয়োজন-সিদ্ধির দাবি। কিন্তু বন্ধুত্বের টানে সেই ডাক্তারের কাছে যখন যাই তখন তাকে দেখি ব্যক্তিরূপে। তখন তার মধ্যে আত্মা আপন আত্মীয় সম্বন্ধ অনুভব করে। এই সম্বন্ধ অনির্ব্বচনীয়, এই সম্বন্ধ সকল সৃষ্টির মূলে। এই সম্বন্ধের অন্তরতম উপলব্ধিকেই বলে প্রেম। এর কাছে সকল প্রয়োজন গৌণ হয়ে পড়ে। তখনই বলা সহজ হয়, "মা গৃধঃ", লোভ ক'রো না।

কেন না, এই অন্তরতম সত্য-সম্বন্ধের যে সম্ভোগ, সে ত্যাগের দ্বারা, আপনাকে দিয়ে। যেখানে শক্তির দরবার সেখানে নেবার দাবি, যেখানে প্রেমের আহ্বান সেখানে আপনাকে দেবার ঔৎসুক্য। না দিতে পারলে মিলনের মাঝখানে নিজেই আড়াল হয়ে দাঁড়াই। যতক্ষণ ব্যক্তিস্বরূপে না আসি ততক্ষণ ধনের মূল্য পরিমাণে। তাকে মাপা যায়, গণা যায়, ভাঙা যায়। ব্যক্তিস্বরূপে এসে পৌঁছলে তার ঐশ্বর্য্য আনন্দে প্রেমে। লোভ আশ্রয় করে অর্থকে, আনন্দ আশ্রয় করে পরমার্থকে, যাকে ইংরেজীতে বলে Value।

অর্থ নিয়ে আছে বিশেষ ব্যক্তি, বিশেষ রাজা, বিশেষ ধনী। পরমার্থ আছে বিশ্ব-ব্যক্তির অধিকারে। একটা দৃষ্টান্ত দিলে কথাটা বোঝা যাবে। বীণা যন্ত্রটা আছে অর্থের কোঠায়। তাকে নিয়ে দরদস্তুর, কাড়াকাড়ি, মামলা-মকদ্দমা চলে। কিন্তু গীতমাধুর্য্য আছে পরমার্থ-শ্রেণীতে; তার ভোগ নিয়ে সীমানার লড়াই নেই। অবারিত বিশ্বজনীনতাতেই তার সম্মান। বীণার অধিকার নিয়ে যেখানে আমার অহঙ্কার সেখানে আমি ব্যক্তিবিশেষ—সঙ্গীতের রস নিয়ে আমার যে আনন্দ, সেই আনন্দ আমার অন্তরঙ্গ বিশ্বমানবের; সে আনন্দ সকল কালের, সকল জনের। মাথা গণতি হিসাবে প্রত্যেক মানুষই যে তাতে সুখ পায় তা নয়, কিন্তু সেই সুখেরই সদাব্রত তার, কোনো বিশেষ মানুষ

যদি বঞ্চিত হয় তবে সেটা শিক্ষার অভাব, বোধের জড়তা, বিকৃত অভ্যাস প্রভৃতি কোনো আকস্মিক অপূর্ণতাবশত।

নিখিল পুরুষের ব্যক্তিরূপকে যদি নিজের ব্যক্তিরূপের মধ্যে নিবিড় প্রেমে উপলব্ধি করি তা'হলেই বাহিরের ব্যক্তি-বিশেষের ধনে যে লোভ তার বন্ধন কাটে। সংসারে তার প্রমাণ অনেক পাওয়া যায়। ত্যাগী যাঁরা তাঁরা আত্মীয় সম্বন্ধকে বিরাটের মধ্যে পেয়েচেন বলেই ত্যাগী। তাঁরাই মৈত্রেয়ীর মত সহজে বলতে পারেন—যেনাহং নামৃতাস্যাম কিমহং তেন কুর্য্যাম। এই কথাটাই ঈশোপনিষদের প্রথম শ্লোকে—

ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনং।

ঈশ আছেন চলমান জগতের সমস্ত-কিছুকে অধিকার ক'রে; অতএব, ত্যাগের দ্বারা ভোগ করবে, কারও ধনে লোভ করবে না।

এই পরিব্যাপক পরম সত্য সম্বন্ধে ঈশোপনিষৎ বলেচেন, তাঁকে যারা একান্ত সীমাবদ্ধভাবে দেখে তাদের মন তমসাবৃত হয়। কিন্তু যারা তাঁকে একান্ত অসীমভাবে দেখে তাদের অন্ধকার আরও বেশী। যারা সীমাকে অসীমকে মিলিয়ে দেখে তারাই সত্যকে জানে। অর্থাৎ এই পরমপুরুষ বিশেষের মধ্যেও এবং বিশেষকে অতিক্রম করেও। বিশেষকে একেবারে না-ক'রে দিয়ে যে-অসীম সে সম্পূর্ণ অন্ধকার ছাড়া কিছুই নয়।

মানুষের সত্তাও দেখি দুই কোটিকে স্পর্শ ক'রে আছে। একদিকে তার স্বভাব, আর একদিকে বিশ্বভাব। স্বভাবে সে পশুর স্বজাতীয়; প্রাণরক্ষা ও বংশরক্ষার উপযোগী প্রবৃত্তি দ্বারাই সীমাবদ্ধ; এখানে তার অঞ্জলি আছে গ্রহণ করবার অভিমুখে। বিশ্বভাবকে নিয়ে তার মানবধর্ম্ম, এইখানে সর্ব্বমানবের সত্য সে আপনার মধ্যে উপলব্ধি করে, যে-মানব ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমানে অধিষ্ঠিত। এখানে তার অঞ্জলি দানের দিকে। এখানে তার সাধনা এই যে, সম্পূর্ণ ভাল হ'তে হবে, শোভন হ'তে হবে, মহৎ হ'তে হবে, অর্থাৎ তার স্বভাবকে উৎসর্গ করতে হবে বিশ্বভাবের কাছে, প্রাণকে নিবেদন করতে হবে অমৃতের জন্যে; যথার্থ পাওয়া পাবে ব'লে ত্যাগ করতে হবে, যথার্থ বাঁচা বাঁচবে ব'লে মরতে হবে।

যাকে আমরা ভাল বলি সে জিনিষটি বিশেষ মানুষের অধিকার দ্বারা সীমাবদ্ধ নয়। অর্থে এই ভাল নয়, এই ভালো পরমার্থে—এই ভালর সম্বন্ধ সকল মানুষকে নিয়ে। এর জন্যে প্রার্থনা রাজার কাছে নয়, ধনীর কাছে নয়, পরমপুরুষের কাছে। তাঁকেই বলি "যদ্‌ভদ্রংতন্ন আসুব।" যা ভাল তাই আমাদের দাও। তাই ঋষি বলেচেন, "বিচৈতি চান্তে বিশ্বমাদৌ স দেবঃ সনো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু।" যে দেবতা বিশ্বের আদিতে অন্তে, (অর্থাৎ নিখিলকে সম্বন্ধযুক্ত ক'রে আছেন) তিনিই আমাদের সকলকে শুভবুদ্ধির দ্বারা যোগযুক্ত করুন।

অন্য জীবজন্তুর প্রয়োজনবুদ্ধি আছে কেবল মানুষেরই শুভবুদ্ধি। তার কারণ, মানুষই অন্য সত্তার উপলব্ধিকে নিজ সত্তার উপলব্ধির সঙ্গে যে-পরিমাণে এক ক'রে দেখে সেই পরিমাণেই সে মহামানুষ মহাত্মার পরিচয় দেয়, ধনী হ'তে হবে এ ইচ্ছা মানুষের বিষয়বুদ্ধিতে, ভাল হ'তে হবে এই ইচ্ছা তার ধর্ম্মবুদ্ধিতে। অর্থাৎ এইটেতেই তার সত্য মানবপ্রকৃতি প্রকাশ পায়। পূর্ব্বেই শাস্ত্রবাক্যে বলা হয়েচে, যে-মানুষ অন্যের মধ্যে নিজেকে ও নিজের মধ্যে অন্যকে জানে সে-ই সত্যকে জানে।

এমন আশ্চর্য্য কথা কেবল মানুষই বলতে পেরেচে, অন্য কোনো প্রাণী পারে নি। এবং এই আশ্চর্য্য কথাটির পরেই তার ধর্ম্মসাধনার প্রতিষ্ঠা। সকলকে নিয়ে মানুষ এইটিকে অভিব্যক্ত করবার জন্যেই তার যত কিছু ধর্ম্মমত।

ধর্ম্মের সাহায্যে মানুষ মুক্তিকামনা করেচে। কিসের থেকে মুক্তি? যা অসত্য তার থেকে। কি অসত্য? অন্য জন্তুর মত নিজের সত্তাকে আর-সব থেকে পৃথক জানার বুদ্ধি অসত্য। বিরাট পুরুষের মধ্যে মানুষ সত্য। সেই জন্যেই মানুষকে পূর্ণতা চাইতে হবে ভালর মধ্যে, সুন্দরের মধ্যে, প্রেমের মধ্যে—অর্থাৎ অন্তরতম বিশ্ববোধের মধ্যে। যে-সব প্রবৃত্তিকে রিপু বলা যায় তারা পশুধর্ম্ম থেকে মানবধর্ম্মে মানুষকে মুক্তি দেবার বিরুদ্ধে শত্রুতা করে।

মানুষ এই আশ্চর্য্য কথা বলেচে, এ এবং সে এই দুইটিকে নিয়ে তার পরম ঐক্যের ক্ষেত্র।

এষাস্য পরমা গতিঃ এষাস্য পরমা সম্পৎ
এষোঽস্য পরমো লোকঃ এষোঽস্য পরম আনন্দ।

ইনি এর পরমা গতি, ইনি এর পরমা সম্পৎ, ইনি এর পরমা আশ্রয়, ইনি এর পরম আনন্দ। পশুর পক্ষে এ আছে, সে নেই, তাই পরমের কোনো অর্থ নেই। তার গতি, তার সম্পদ, তার আশ্রয়, তার আনন্দ, তার স্বভাবের সঙ্কীর্ণ সীমানার মধ্যেই। মানুষের যা পরম তা মহান্ পুরুষকে নিয়ে। সেখানে তার গতি কোনো সুযোগকে নিয়ে নয়, তা'র সম্পদ অর্থকে নিয়ে নয়, তা'র আশ্রয় আরামকে নিয়ে নয়, তা'র আনন্দ ভোগসুখ নিয়ে নয়। এখানে তার আনন্দ সেই গভীর সম্বন্ধকে নিয়ে যে-সম্বন্ধে সকলের যোগে সে সত্য। মানুষের অমরত্ব নিয়ে অনেক মত অনেক তর্ক। উপনিষৎ কাল-গণনামূলক অমরতার কথা বলচেন না। উপনিষৎ বলেন, য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি—যাঁরা এঁকে জানেন তাঁরা অমৃত হ'ন। কে তিনি?

এষ দেবো বিশ্বকর্ম্মা মহাত্মা
সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ—

তিনি সেই দেবতা যাঁর কর্ম্ম সকলকে নিয়ে, সকলের আত্মায় যিনি মহাত্মা, সর্ব্বদা যিনি সকলের হৃদয়ে সন্নিবিষ্ট।

তং বেদ্যং পুরুষং বেদ যথা মা বো মৃত্যুঃ পরিব্যথাঃ—মৃত্যুভয় দুঃখ দেবে না আত্মা যদি সেই বেদনীয় পুরুষকে আত্মীয় জানে। স্বতন্ত্র আমিই মরে, কিন্তু সকলকে নিয়ে যিনি আছেন তাঁর সঙ্গে যোগে আমার মৃত্যু নেই। ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা, ত্যাগের দ্বারা সর্ব্বব্যাপী পুরুষের মধ্যে আনন্দ পাও, লোভ যাবে কেটে; তং বেদ্যং পুরুষং বেদ, সর্ব্বব্যাপী পুরুষের মধ্যে আপনাকে জানো, মৃত্যুভয় যাবে দূরে। সীমাকে নিয়ে লোভ, ভূমাকে নিয়ে আনন্দ, সীমার মধ্যে মৃত্যু, ভূমার মধ্যে অমৃত। ভোগকে সত্য করো ভোগকে বর্জ্জন না করে, সীমাকে বর্জ্জন করে। আনন্দভোগই ব্যক্তিস্বরূপের (পার্সোনালিটির) চরম ইচ্ছা। এই ইচ্ছাকে পরমের অভিমুখে না নিয়ে গিয়ে সঙ্কীর্ণের মধ্যে অবরুদ্ধ করলেই যত মারামারি কাটাকাটি। সত্য ইচ্ছাতেই শান্তি। সত্য ইচ্ছা সেই পরমপুরুষের ইচ্ছা যাঁর ইচ্ছা সকলকে নিয়ে। তাঁর ইচ্ছাকে নিজের ইচ্ছা করার সাধনাকেই বলি ধর্ম্ম-সাধনা। ভালো হওয়া তাকেই বলে। এই ভালোর ইচ্ছা মানবের ধর্ম্ম।

নিজের জীবনে পরিপূর্ণ পুরুষের সাধনাই নানা নামে নানা ধর্ম্মরূপে স্বীকৃত। যিশু বলেচেন, আমি মানুষের পুত্র, পরিপূর্ণ মানুষের মধ্যে আপন পুত্রত্ববোধ তিনি একান্ত ভাবে অনুভব করেচেন, তাই বলতে পেরেচেন দীনতম মানুষকে অন্ন যে দেয় সে আমাকেই দেয়।

এতক্ষণ এই বলবার চেষ্টা করেছি যে, যে-পূর্ণপুরুষ "সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ," তিনি বিশেষভাবে মানবিক, তাঁর মধ্যে মানব-সম্বন্ধের চরমোৎকর্ষ। তাই তাঁকে বলি "পিতৃতমঃ পিতৃণাং," তাঁকে বলি, "স এব বন্ধুর্জনিতা স বিধাতা" তিনিই বন্ধু, তিনিই পিতা, তিনিই বিধাতা।

সূর্য্যে আগুনে বাতাসে যে জাগতিক ক্রিয়া তার মধ্যে ভালমন্দের আদর্শ নেই, তার মধ্যে মানব-সম্বন্ধের তৃপ্তি নেই। তার সঙ্গে আমাদের বিজ্ঞানের সম্বন্ধ, ব্যবহারের সম্বন্ধ, কিন্তু প্রেমের সম্বন্ধ, সেবার সম্বন্ধ নয়। অর্থাৎ সেখানে আমাদের অর্থ, কিন্তু পরমার্থ নয়।

এক সময়ে জাগতিক শক্তির কাছ থেকে অন্ন, ধন ও শত্রুপরাভবের প্রত্যাশা করেছিলুম; বিজ্ঞানের কাছে আজও সেই প্রত্যাশা ক'রে থাকি। কিন্তু যখন থেকে প্রেয়ের উপরে শ্রেয়কে বড় করেচি, অর্থের উপরে পরমার্থকে, তখন থেকে যাঁর কাছে আমাদের প্রার্থনা তিনি মানবিক। তার সঙ্গে ব্যবহারের যোগ নয় ভালোবাসার যোগ। সংসারযাত্রায় সিদ্ধিলাভ জাগতিক নিয়মে, আত্মার চরিতার্থতালাভ পরমাত্মার প্রেমে বৈষয়িক অভাব, সাংসারিক ব্যর্থতা দ্বারা তার ন্যূনতা ঘটে না—সেই প্রেমের পূর্ণতা প্রেমেরই মধ্যে।

"আত্মানমেব প্রিয়মুপাসীত। স য আত্মানমেব প্রিয়মুপাস্তে ন হাস্য প্রিয়ং প্রমায়ুকং ভবতি।" পরমাত্মাকে ভালবেসে উপাসনা করতে হবে, যিনি তাঁকে ভালবেসে উপাসনা করেন তাঁর প্রিয় মরণধর্ম্মী হন না। নির্গুণ সত্তা বলে যদি কোনো পদার্থ থাকে

সম্ভব হয় তবে তার প্রতি প্রেমের কোনো অর্থ নেই। মানবিক গুণের পরমতা যাঁর গুণে, মানুষ তাঁকেই এমন প্রেম দিতে পারে যা সকল প্রেমের উপরে।

এই প্রেমের সত্য প্রমাণ কোথায়? ভাবুকতায় নয়, বিশ্বকর্ম্মে। সাধকের সংজ্ঞা এই—"আত্মরতিঃ ক্রিয়াবান," পরমাত্মায় তাঁর আনন্দ; কিন্তু সেই আনন্দ ক্রিয়াবান, ভাবরসে অন্তর্বিলীন নিষ্ক্রিয়তা নয়।

"সর্ব্বব্যাপী স ভগবান, তস্মাৎ সর্ব্বগতঃ শিবঃ।" ভগবান সর্ব্বব্যাপী, অতএব তিনি সর্ব্বগত কল্যাণ। তাঁকে প্রিয় ব'লে যে উপাসনা করবে সেই পরম প্রিয়ের সঙ্গে তার যোগ হবে সকলের কল্যাণ কর্ম্মে।

পরমপুরুষকে কেন মানবিক বলচি এই কথাটাকে স্পষ্ট করা চাই। বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের সাহায্যে দেখতে পাই এই দেহ অসংখ্য পৃথক জীবকোষের সমবায়। প্রত্যেকের স্বতন্ত্র জীবনক্রিয়া, আয়তনের অনুপাতে পরস্পরের মধ্যে তাদের ব্যবধান যথেষ্ট। শুধু দেশের ব্যবধান নয়, কালেরও ব্যবধান। যে-সব জীব-কোষ অতীত, আর যারা এখনও আসেনি এই দেহ তাদের মধ্যেকার সেতু। বস্তুত এই দেহের অধিকাংশই বর্ত্তমানে নেই।

এই জীবকোষগুলি একদিকে স্বতন্ত্র অন্যদিকে সমগ্র দেহের সম্পর্কে বিধিতন্ত্র। সমস্ত দেহের সম্বন্ধেই তারা সত্য, একান্ত পার্থক্যে তারা নিরর্থক, সমস্ত দেহের কাছে সম্পূর্ণ আত্মদানের দ্বারা তারা সার্থক।

কল্পনা করা যাক্ এই সমস্ত জীবকোষের একটা সাধনা আছে। সে সাধনা কী হ'তে পারে? দেহাত্মবোধের সাধনা। মনে করা যেতে পারে সমগ্র দেহ ব'লে একটা কিছু আছে এ বোধ তাদের অধিকাংশেরই নেই। যদি মনে করা যায় তাদের মধ্যে কেউ সমগ্র দেহের অনুভূতি নিশ্চিতরূপে পেয়েচে তাহ'লে সন্দেহ নেই যে সেই অনুভাবে তার অবরুদ্ধ চৈতন্য একটি বিরাট সত্যের মধ্যে মুক্তিলাভ করে। এই মুক্তির আনন্দ সমগ্র দেহের কর্ম্মকে আপন কর্ম্মরূপে সচেষ্টভাবে গ্রহণ করে। সমগ্র দেহে তার আনন্দ, সমগ্র দেহের কর্ম্মে সে ক্রিয়াবান।

এমনি করেই মহামানবের চেতনা যাঁর কাছে বাধা-হীন তিনি জানেন মানুষে মানুষে যে-ব্যবধান আছে সেই ব্যবধানটি একটি সক্রিয় অদৃশ্য সম্বন্ধের দ্বারা অধিকৃত। এই সম্বন্ধের স্বভাব হচ্চে আনন্দ, অর্থাৎ প্রেম। সম্বন্ধের পূর্ণতাতেই আনন্দ, তাকেই বলে প্রেম। তাই উপনিষৎ বলেন, "কোহেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ।" আকাশ, যাকে শূন্য মনে করি, তা যদি আনন্দময় সম্বন্ধের দ্বারা বিরাজিত না থাকৃত তাহ'লে কেই-বা প্রাণ চেষ্টা করত! বাইরে থেকে যাকে মনে হয় পৃথক প্রাণচেষ্টা, সেটা সম্ভবপর হয়েচে একটি সর্ব্বব্যাপী সত্য সম্বন্ধের যোগে।

এই সম্বন্ধ-তত্ত্ব মানুষের মধ্যে শক্তিমান হয়েচে ব'লেই মানুষের দ্বারা সমাজ-সৃষ্টি সম্ভব হ'ল। সমাজে মানুষের প্রয়োজন সাধন হয় সন্দেহ নেই, কিন্তু প্রয়োজন-সম্বন্ধের চেয়ে সত্যতর আনন্দের সম্বন্ধ। এই সম্বন্ধটি যদি সমাজে কাজ না করে তবে কেবল স্বার্থবুদ্ধি দ্বারা কোনো সমাজ বেশী দিন টেঁকে না। দশের প্রয়োজনের চরমে নিজের প্রয়োজন, সমাজের ব্যাখ্যায় মানুষ এমন কথা ব'লতে পারে না। তা যদি বল্ত তাহ'লে দশের প্রয়োজনের উদ্দেশে নিজের মৃত্যু বা চরম ক্ষতি স্বীকার করত না। সমাজে প্রয়োজনসিদ্ধির স্থান আছে, কিন্তু সেটা বাহিরের এবং তা নিয়ে বিরোধ বেধে ওঠে। এক শ্রেণীর সঙ্গে অন্য শ্রেণীর স্বার্থে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ঘটে, ধনিকে কর্ম্মিকে লাগে হানাহানি। এইক্ষেত্রে সমাজ নিজের ধর্ম্মকে আঘাত করে ব'লেই আত্মঘাতী হয়। তখন সে "মা গৃধঃ" এই বাণীকে উচ্চারণ করতে পারে না, কেননা, যে বিরাট পুরুষের আসন সমস্ত সমাজকে ব্যাপ্ত করে ব্যক্তিগত বা শ্রেণীগত স্বার্থ তাঁর উপলব্ধিকে খণ্ডিত করে। সমাজ মরে এই রাস্তায়।

সমাজে আর একটি বাহ্যিকতা আছে, তারও আতিশয্যে বিপদ। সে হচ্চে আচার। প্রেমে সত্যের উপলব্ধি পূর্ণ হয় তাই মিলন সেখানেই, শান্তি সেখানে। আচার সত্যের চেয়ে প্রবল হয়ে উঠে সর্ব্বব্যাপী যে

ভগবান সর্ব্বগত শিব তাঁকে অতিক্রম ক'রে নিজেকে দাম্ভিকতার সঙ্গে প্রচার করে, সমাজেরই দোহাই দিয়ে সমাজের নিত্য ধর্ম্মকে খর্ব্ব করতে থাকে। তখন আচারীতে আচারীতে সর্ব্বনাশ বাধে।

বিষয়ের অভিমান যেমন, আচারের অভিমানও তেমনি। বৈষয়িকতা সর্ব্বজনীনতার বিরুদ্ধ, আচারিকতাও তাই। আচার সাম্প্রদায়িক অহংবুদ্ধিকে প্রবল করে, এই অহং-এর তাপ ব্যক্তিগত অহং-এর চেয়ে বেশী বই কম নয়। একথা মনে রাখা চাই যে, সেই সকল প্রবৃত্তিতে আমরা পরস্পরকে নিষ্ঠুর ক'রে মারি যারা বিশ্বমানবের বোধকে বাধা দেয়। সাধারণতঃ ধর্ম্মে, সমাজে, রাষ্ট্রতন্ত্রে এই বাধা পদে পদে। এই কারণেই বড় বড় নামের আড়ালে মানুষ মানুষকে যেমন সাংঘাতিক পীড়া দেয় এমন আর কিছুতে নয়। মানুষের যিনি দেবতা তাঁর বোধ বাধাগ্রস্ত হ'লে মানুষকে মারবার জন্যে ঠকাবার জন্যে ধার্ম্মিক নামধারীরা মানৎ দিয়ে থাকে।

দেবতাকে মানুষ ডেকেচে, পিতানোঽসি, তুমি আমাদের পিতা। পিতা নামের মধ্যে মানবের বোধ প্রকাশ পায় একথা মানতেই হবে। পিতা নো বোধি—প্রার্থনা এই যে, তুমি পিতা এই বোধটি সত্য হোক্, তুমি সকল মানুষের পিতা এই বোধটি সত্য হওয়ার সঙ্গে সকল মানুষের মধ্যে আত্মীয়তার বোধ স্বীকার করতে হবে। মানুষ-মারা লড়াই করতে যাবার পূর্ব্বে একথা বলার মতো কপটতা ও অপরাধ আর নেই—যে তুমি আমাদের পিতা। এতে মানবের পিতাকে দানব বলাই হয়। আমরা যেন জিতি এ দাবি আমাদের দলের লোকের কাছে, আমরা যেন মিলি এ প্রার্থনা তাঁর কাছে যিনি সর্ব্বগতঃ শিবঃ। সনো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু, তিনি আমাদের পরস্পরকে শুভবুদ্ধি দ্বারা সংযুক্ত করুন।

"নাট্যকে রামনারাণ"

শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন, এম-এ

গত পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে বাঙালীর অনেক কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে; রাজনীতি, ধর্ম্মপ্রচার, নব যুগের সাহিত্য-রচনা প্রভৃতি নানাবিষয়ে বাঙালী কৃতিত্ব দেখাইয়াছে। যদি অন্যান্য সকল বিষয়ের একটা পরীক্ষা করা যায়, তবে তাহার স্থান কোথায় হইবে বলা কঠিন; কিন্তু নাট্যশালার মধ্য দিয়া একটা নূতন জিনিষ বাঙালী যে গড়িয়া তুলিয়াছে, বাঙালী প্রতিভার যে একটা সম্পূর্ণ নূতন পরিচয় আমরা পাই, আশা করি তাহা আর কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না। রঙ্গমঞ্চ, অভিনয়োপযোগী নাটক, সাজসজ্জা, উপযোগী সঙ্গীত,—সব দিক দিয়া আমাদের জাতীয়তার একটি ধারা যেন আপনা হইতেই বহিয়া যাইতেছে। পঞ্চাশ বৎসরের ইতিহাস আলোচনা করিলে আমরা বুঝিতে পারি মাইকেল মধুসূদন হইতে আরম্ভ করিয়া কি ভাবে এই নাট্যপ্রিয়তা চলিয়া আসিয়াছে, মাইকেল-দীনবন্ধু-গিরিশচন্দ্রের কীর্ত্তি, রাজকৃষ্ণ-দ্বিজেন্দ্রলাল-অমৃতলাল প্রভৃতির সহযোগিতায় পুষ্টিলাভ করিয়া কোথায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে; নাট্যসাহিত্যে মাইকেলেরও আবির্ভাবের পূর্ব্বে অভিনয় করিতে বাঙালীর মন চাহিয়াছিল, কিন্তু অভিনয়ের উপযোগী নাটক ছিল না; তখন তাহার রঙ্গমঞ্চের উপাদান যোগাইত ইংরেজী ও সংস্কৃত নাটক; সেই অভাবের দিনে সংস্কৃত শাস্ত্রে সুপণ্ডিত যে রসিক-চূড়ামণি তাহার অভাব মোচন করিয়াছিলেন, তাঁহার পরিচয় ও নাট্যসাহিত্যের তিনি কতটুকুই বা করিয়াছিলেন সে সম্বন্ধে বর্ত্তমান প্রবন্ধে কিছু আলোচনা করিতে চাই।

রামনারায়ণ তর্করত্ন মহাশয় প্রথমেই নাটক-রচনায় প্রবৃত্ত হন নাই। নাটকের পূর্ব্বে তাঁহার নামে এক উপাখ্যান দেখিতে পাই, 'পতিব্রতোপাখ্যান,' ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে জানুয়ারি প্রকাশিত, প্রণেতার নাম দেওয়া আছে "কলিকাতা সংস্কৃত-বিদ্যামন্দিরে শিক্ষিত সুশিক্ষিত শ্রীযুক্ত রামনারায়ণ তর্কসিদ্ধান্ত ভট্টাচার্য্য রচিত।" রঙ্গপুরের অন্তর্গত কুণ্ডীর অধিবাসী ভূম্যধিকারী শ্রীযুক্ত বাবু কালীচন্দ্র রায় চৌধুরী সেকালে নানাভাবে বিদ্যাচর্চ্চার ও গ্রন্থ-রচনার উৎসাহ দিতেছিলেন, তাঁহারই নির্দ্দেশমত ও বিজ্ঞাপিত পারিতোষিকের জন্য ইহা রচিত হয়। ৯৪ পৃষ্ঠাব্যাপী পুস্তক লিখিয়া তর্কসিদ্ধান্ত মহাশয় ৫০৲ পারিতোষিক প্রাপ্ত হন; পুস্তকের মুদ্রণ জন্য যে ১৫০৲ লাগে তাহাও উক্ত জমীদার মহাশয় নির্ব্বাহ করেন। পতিব্রতোপাখ্যানের প্রথমে নানারূপ সমাজ-সংস্কারের কথা আছে এবং শেষের দিকে আছে শুধু উপাখ্যান-ভাগ। ইহাতে বাক্যচ্ছেদের পরিমাণ অতি অল্প। ইহার বাক্য-গঠন-রীতির পরিচয় হিসাবে কিয়দংশ উদ্ধৃত করা গেল :—

"এই বসুন্ধরা মধ্যে প্রায় যাবতীয় ভদ্রব্যক্তি এক্ষণে স্ব স্ব পুত্রকে সাদরে বিদ্যাশিক্ষা করাইতেছেন, পুত্রেরাও বিবিধ বিদ্যামন্দিরে সৎসঙ্গে সদালাপনে সময়-যাপন-পূর্ব্বক অপূর্ব্বপ্রকৃতি হইতেছে কিন্তু এতদ্দেশীয় অভাগা যোষাজাতির প্রতি কেহই দৃষ্টিক্ষেপ করেন না। ইহারা কন্যাসন্তানকে অনাস্থা করিয়া যে বিদ্যা শিক্ষা করান্ না এমত নহে অস্মদ্দেশীয়েরা অতিধনলোভি, ইঁহারা কহেন কন্যারা কি ধনোপার্জ্জন করিবে যে তাহাদিগকে বিদ্যা শিক্ষা করান আবশ্যক কিন্তু আমি এই ধনদাস দেশীয়দিগকে জিজ্ঞাসা করি ধনই কি কেবল তাঁহাদিগের সংসার যাত্রার উদ্দেশ্য, বিদ্যাভ্যাস করিলে বোধ-বিধুর উদয় হয়, তাহাতে অজ্ঞানান্ধকার দুরীভূত হইয়া যায় এবং সচ্চরিত্রতারূপ চন্দ্রিকার প্রচার অন্তঃকরণে কৈরব প্রফুল্ল, সুখসাগর বর্দ্ধমান, সৎপথে দৃষ্টিপাত, সাহসিক ব্যাপারের সঙ্কোচ হয়, বিদ্যার এই সকল ফল কি তাঁহারা দেখিতে পান্ না অতএব বিদ্যারসে স্ত্রীজাতিকে বঞ্চিত রাখা কদাপি যুক্তিযুক্ত নহে। স্ত্রীজাতিকে বিদ্যাশিক্ষা না করাইলে অনেকানেক দুষ্ট দোষ আছে তাহার মধ্যে এই এক প্রধান দোষ কহি।"

এই ভাবে উপাখ্যান চলিতেছে।

পতিব্রতোপাখ্যান লিখিয়া কিন্তু তর্করত্ন মহাশয় বঙ্গসাহিত্যে ও তদানীন্তন সমাজে বিশেষ নাম করিতে পারেন নাই, তবে সংস্কারে অনুরাগ ও উপাখ্যান লিখিবার আগ্রহ, তাঁহার লেখা এই পুস্তকে আমরা পাই। তাঁহার খ্যাতি প্রথম হইল "কুলীন কুলসর্ব্বস্ব" নাটকে। রামনারায়ণের নাটকগুলির মধ্যে ইহা এখনও পাওয়া যায়; সুতরাং এখানে ইহার কিঞ্চিৎ বিস্তৃত আলোচনা অসঙ্গত বা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। তখনকার দিনে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মত সংস্কারের পক্ষে যাঁহারা ছিলেন, বিবাহ-বিষয়ক বিবিধ কুরীতির বিরুদ্ধে তাঁহারা বদ্ধপরিকর হইয়া বিধবা-বিবাহের পক্ষে ও বহুবিবাহের বিপক্ষে দাঁড়াইয়াছিলেন। রামনারায়ণ তাঁহাদেরই একজন এবং এই পুস্তকে উভয়বিধ আন্দোলনেরই ইঙ্গিত আছে। "কুলীন কুল-সর্ব্বস্বে" তাঁহার হৃদয়ের ও পাণ্ডিত্যের, সরসতার ও অলঙ্কারপ্রিয়তার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়, কিন্তু নাট্যশিল্পে তাঁহার যে এই প্রথম আলোচনা, ইহা যে প্রবেশ মাত্র, সে কথাও স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। "কুলীন কুলসর্ব্বস্বে"র আখ্যানভাগ সহজ, কোথাও কিছুমাত্র জটিলতা নাই, কিন্তু দীর্ঘ বক্তৃতা, এবং মাঝে মাঝে সংস্কৃত ও বাংলা ভাষায় রচিত শ্লোক ও কবিতা, প্রাচ্য আদর্শ বা রীতির অনুযায়ী হইলেও আধুনিক যুগের সহিত তাহার কোনও সঙ্গতি নাই। তাহার সহিত আছে গ্রাম্যতা দোষ। রামনারায়ণের পরিহাস-রসিকতা যে তাঁহাকে মাঝে মাঝে গ্রাম্যতার দিকে লইয়া গিয়াছে, সে বিষয়ে যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়,—তবে গ্রাম্য চরিত্র সৃষ্টি করিতে গেলে ইহা অপরিহার্য্য ও স্বাভাবিক, নাট্যকার নিশ্চয় এই উত্তর দিতেন। পতিব্রতোপাখ্যানের মত ইহাও রঙ্গপুরের জমিদার শ্রীযুক্ত বাবু কালীচন্দ্র চৌধুরীর নির্দ্দেশে লিখিত এবং তাঁহার দত্ত ৫০৲ পারিতোষিক প্রাপ্ত। কুলীন কুলসর্ব্বস্ব নাটকখানি বঙ্গের নাট্য-সাহিত্যে অনুরাগী মাত্রেই পাঠ করিয়া থাকিবেন আশা করি। গ্রন্থকার যে বিদ্যাসুন্দরের সহিত বিশেষ পরিচিত ছিলেন নাটক পাঠকালে তাহা বার-বার মনে হয়।

"আর রামা বলে আমি কুলীনের মেয়ে।
যৌবন বহিয়া গেল বর চেয়ে চেয়ে॥
যদি বা হইল বিয়া কিছু দিন বই।
বয়স বুঝিলে তার বড়দিদি হই॥
... ...
... ...

বিবাহ করেছে সেটা কিছু বাটিঘাটি।
জাতির যেমন হৌক কুলে বড় আঁটি ॥
দুচারি বৎসরে যদি আসে একবার।
শয়ন করিয়া বলে কি দিবি ব্যাভার ॥
সুতা বেচা কড়ি যদি দিতে পারি তায়।
তবে মিষ্ট মুখ নহে রুষ্ট হয়ে যায় ॥

বিদ্যাসুন্দরের এই কয় পঙ্‌ক্তি কুলীন কুলসর্ব্বস্বের তৃতীয় অঙ্কে যশোদা-ফুলকুমারী প্রসঙ্গের মূল; নাটকে ইহাকে ফেনাইয়া পল্লবিত করিয়া দেখানো হইয়াছে।

নাটকখানি পড়িয়া অনেক কথা মনে হয়; সামাজিক দুর্নীতি দূর করিবার জন্য রচিত হইলেও ইহা বিয়োগান্ত নহে,—ইহার শেষভাগে 'বিবাহ নির্ব্বাহ' হইতেছে। ইহাতে হাস্য রসের উপাদান এত প্রচুর যে, কুলীন কুলের দুঃখ দৈন্য দুর্দ্দশার ছবিই শুধু লেখকের কাছে স্পষ্ট হইয়া উঠে নাই, কৌলীন্য ব্যবস্থার মধ্যে যে প্রচণ্ড অসঙ্গতি রহিয়া গিয়াছে, তাহা দেখিয়া তর্করত্ন মহাশয় হাস্য সম্বরণ করিতে পারেন নাই; 'কুলসর্ব্বস্ব কুলীনে'র তিনি ব্যাখ্যা করিয়া দিতেছেন,—'কু'তে লীন, কুলীন, অর্থাৎ কুক্রিয়াসক্ত। আর, অনুকম্পা করিবেন কাহাকে, দুঃখ বোধ করিবেন কাহার জন্য? কুলীন যে অনুকম্পা চায় না, তাহার দৃষ্টি যে দূষিত। গ্রন্থকার নিজে ছিলেন দাক্ষিণাত্য বৈদিক শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত,—বল্লালী প্রথার সহিত তাঁহার সমাজের কোনও সম্পর্ক ছিল না, তিনি তাহার অধীন ছিলেন না; তাই বোধ হয় তাঁহার দৃষ্টি খুলিয়াছিল ভাল,—বংশগত কুসংস্কারে মলিন হয় নাই। সে কথা নাটকে বহুবার বলিয়াছেন এবং 'উদরপরায়ণ' নামে জনৈক বৈদিক ব্রাহ্মণের সৃষ্টি করিয়াছেন। সেই উদরপরায়ণের মুখে উত্তম, মধ্যম ও অধম এই তিন প্রকার ফলারের কথা অনেকেই জ্ঞাত আছেন। বাহুল্য-ভয়ে এস্থলে তাহা উদ্ধৃত হইল না। 'কুলীন কুলসর্ব্বস্বে' সংস্কৃত শাস্ত্রবচন; রীতিমত নান্দী, প্রস্তাবনা ইত্যাদি অঙ্গ; ঋতু বর্ণনা, ও স্থানে স্থানে ছন্দোবদ্ধ বাক্যপ্রয়োগ; প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড দীর্ঘ সমাসবদ্ধ বাক্য;—নাটকে যাঁহারা নব্য মত পোষণ করেন তাঁহাদের রসাস্বাদের পরিপন্থী। কিন্তু এই নাটকেই আবার ছড়া কাটার, অনুপ্রাস প্রয়োগ করার অনেক দৃষ্টান্ত আছে; তাহা হইতে মনে হয়, পণ্ডিত মহাশয় তখনকার যাত্রা, পাচালী প্রভৃতি সাহিত্যের সহিত সুপরিচিত ছিলেন; তাঁহার গ্রামে এ বিষয়ে যে বিশ্বাস আজও চলিত আছে, কুলীন কুল-সর্ব্বস্বের ভাষা হইতে সে বিশ্বাসের সমর্থন করা যাইতে পারে।

নাটকে উল্লিখিত ও তখনকার দিনে প্রচলিত মেয়েদের অর্থার্জ্জনের একটি সাধারণ উপায় এস্থলে উল্লেখ করা যাইতেছে। চরকার সঙ্গে আজকাল রাজনীতির সংশ্রব অতি ঘনিষ্ঠ, উহা এখন অহিংস অসহযোগ যুদ্ধের সুদর্শন চক্র, তখন কিন্তু সুতাকাটা ঘরে ঘরে চলিত ছিল। সুতা কাটিয়া কাটনা কাটিয়া মেয়েদের দু-পয়সা রোজকার হইত, দুর্দ্দিনে কুলীন স্বামীর তুষ্টিও সম্পাদন করিত; তাই প্রবাদবাক্য হইয়া গিয়াছিল, রামনারায়ণ নাটকে বহুবার প্রয়োগ করিয়াও গিয়াছেন, উদাহরণ-স্বরূপ কয়েকটি স্থল উদ্ধৃত করা হইল।

"যার বে তার মনে নাই, কাটনা কামাই
পাড়া পড়সীর।"
'কাটনা কাটা কড়ি যত করিনু বাহির।'
(৩য় অঙ্ক)
'এবার এই অবদি কাটনাটা মাটনাটা কেটে—
কিছু হাতে ক'রে রাখ' (ঐ)
'ভাল, ব্রাহ্মণীর কাটনা-কাটাও কি কিছু নেই?'
(৪র্থ অঙ্ক)

কুলীন কুলসর্ব্বস্বে লিপিচাতুর্য্য যথেষ্ট আছে কিন্তু অভিনয়ের উপযোগিতা সম্বন্ধে অভিজ্ঞতার অভাবও যথেষ্ট;—প্রথমটির পক্ষে বহু দৃষ্টান্ত মিলিবে, নানাপ্রকার প্রবচন, কথার কাটাকাটি,—

'যেথায় পড়া মেয়ের বে, সেথায় বরের পড়ার প্রয়োজন কি?'
'আম ফুরালে আমসি, যৌবন ফুরালে কাঁদ্যে বসি'
'যদি পাই রূপার কুচি তবে মুচিকেও করি শুচি'
'পরেরধনে ধোবার নাট', 'এদেশে কেবল দ্বেষ বই নাই,'

আবার পূর্ব্বে বলিয়াছি সুদীর্ঘ বক্তৃতাজালের অসদ্ভাব নাই, তাহার উদাহরণ উদ্ধৃত করিবার চেষ্টাও বিড়ম্বনা। কুলপালকই হউন আর ধর্ম্মশীলই হউন উভয়েই পণ্ডিত, সুতরাং উভয়েই কথার ঝুড়ি তাহার উপর আবার একজনের নিজের দুঃখে, অন্যে

পরের দুঃখে হৃদয় ব্যথিত, সুতরাং কথা বলা চাই-ই, নতুবা মনের দুঃখ বাহিরে প্রকাশ হইবে কেমন করিয়া, ব্যথা দেখান হইবে কি করিয়া? তারপর ব্রাহ্মণীর অপক্ক-নিদ্রা-কষায়িত লোচনের উভয় করে মার্জ্জন আছে, তাহার সঙ্গে ১৮ লাইনে পয়ার প্রবন্ধে রচনা চাই। শুধু ব্রাহ্মণী নন, তাঁর মেয়েরাও সুন্দর ভাবে অনর্গল পয়ার প্রবন্ধ বলিয়া যাইতে পারেন। আবার নট আসিয়া গ্রন্থের শেষ করিয়া যাইতেছেন! এই সব দেখিয়া মনে হয় কুলীন কুলসর্ব্বস্ব যে কবির প্রথম বয়সের রচনা সে বিষয়ে গ্রন্থ হইতেই যথেষ্ট প্রমাণ সংগৃহীত হইতে পারিত।

মূল নাটক রচনা ব্যতীত রামনারায়ণ কতকগুলি সংস্কৃত নাটকের অনুবাদও করিয়াছেন। রত্নাবলী "চলিত ভাষায় অনুবাদিত।" ইহার বিজ্ঞাপন (Preface) এখানে উল্লেখযোগ্য।

"বালকদিগের স্বভাব আছে যে ক্রীড়াকালে দৈবায়ত্ত কোন কৌতুকজনক কার্য্য করিয়া উপস্থিত গুরুজনদিগের প্রতি নিরীক্ষণ করিলে তাহাতে যদ্যপি কেহ প্রসন্নবদনে হাস্য করেন তবে আহ্লাদ-পূর্ব্বক সেই কার্য্যই পুনঃ পুনঃ করিতে থাকে; আমার এই নাটক প্রণয়নও তদ্বৎ। পূর্ব্বে কতিপয় গ্রন্থ রচনা করাতে সজ্জন-সমূহ বিশেষ অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন, সেই ভরসায় আমি পুনর্ব্বার রচনাকার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছি, এবং পূর্ব্ববৎ অনুগ্রহের প্রত্যাশায় সাধারণ সমীপে পুনর্ব্বার উপস্থিত হইতে সাহসিক হইলাম। গ্রন্থকারদিগের আদরাকাঙ্ক্ষা দরিদ্রের ধনাশার ন্যায়, একবার সফল হইলেই ক্রমশঃ বৃদ্ধিমতী হইয়া থাকে।

"অশেষ আনন্দের বিষয় যে অধুনাতন লোকদিগের নাট্যব্যাপারে বিশিষ্ট অনুরাগ জন্মিতেছে। সরস সংস্কৃত ও ইংরাজী ভাষার নাটক সমূহের অতুল্য রসমাধুরী অবগত হইয়া প্রচলিত ঘৃণিত যাত্রাদিতে সকলেরই সমুচিত অশ্রদ্ধা হইয়া উঠিয়াছে। নির্ম্মল সুধাকর বিনিঃসৃত সুধাধারার আস্বাদন পাইলে কাঞ্জিকাতে কাহারও অভিরুচি হয় না। কিন্তু সজ্জন সমূহের এরূপ প্রবৃত্তি পরিবর্ত্তন হওয়া যদিও নিরতিশয় আহ্লাদের বিষয় বটে, তথাপি বঙ্গভাষার নাটক সংখ্যা অতি অল্পমাত্র থাকাতে তদ্বিষয়ে সকলের ঐ নবীন অনুরাগ সম্যক সফল হইতেছে না; অতএব সেই অভাব দূরীকরণ পক্ষে সাধ্যানুসারে যত্নশীল হওয় আবশ্যক। অতি অকিঞ্চিৎকর ক্ষমতাসত্ত্বে এই গুরুতর অধ্যবসায়ে আমার প্রবৃত্তি হওয়ারও ইহাই এক প্রধান কারণ। প্রত্যাশা যে দীপশিখার অনুপস্থিতিতে খদ্যোতের দীপ্তিদ্বারা কথঞ্চিৎ উপকার হইলেও হইতে পারে। পাঠকবর্গও এই বিবেচনাতে নিশাকরের প্রতি বামনের কর প্রসারণের ন্যায় আমার এ দুরাশাদোষ অনুকূল নয়নে অবলোকন করিতে পারেন।

"সকলেই স্বীকার করিবেন যে অভিনব কোন নাটক প্রস্তুত করা অতীব সুকঠিন; কিন্তু অন্য ভাষা হইতে অনুবাদ করা যে তদপেক্ষা নিতান্ত সহজ এমতও নহে। যেমন কাশ্মীর দেশস্থ উপত্যকার স্বভাবোৎফুল্ল কুসুমনিচয় অতি যত্নেও এতদ্দেশের নিম্নভূমিতে বিকশিত হয় না, তদ্রূপ অশেষ রসশালিনী সংস্কৃত ভাষার চিত্তরঞ্জক ভাবাদি আধুনিক ও সঙ্কীর্ণ বঙ্গভাষায় পরিরক্ষিত হওয়া সুদূর পরাহত। তন্নিমিত্ত রত্নাবলী নাটকের অবিকল অনুবাদ করণে ক্ষান্ত থাকিয়া মূলগ্রন্থের স্থূল মর্ম্ম মাত্র গ্রহণ করা গেল; এবং কথোপকথনে এতদ্দেশে যেরূপ ভাষা সচরাচর প্রচলিত আছে তাহাই অবলম্বন করিয়া অনুবাদ করিলাম; তাহাতে স্থানে স্থানে কিয়দংশ পরিত্যক্ত ও স্থানে স্থানে কোন কোন ভাব পরিবর্ত্তিত করা হইয়াছে। বিশেষতঃ এইক্ষণে নাটকাভিনয় বিষয়ে যে অনেকেরই ঔৎসুক্য জন্মিয়াছে, তাহা বিশেষরূপে পরিজ্ঞাত থাকায় এ গ্রন্থ তদুপযোগী করণ মানসে যথাসাধ্য যত্ন করিয়াছি, এবং তন্নিমিত্ত শ্রীযুক্ত গুরুদয়াল চৌধুরী মহোদয়দ্বারা কতিপয় সংগীতও সংগ্রহ করিয়া স্থান বিশেষে যোজনা করা গিয়াছে। যদিচ যাত্রার প্রতি আমাদিগেরও অসীম অশ্রদ্ধা আছে, তথাপি এককালে সংগীতমাত্র উচ্ছেদ করা অভিমত কখনই নহে। প্রত্যুত নাটক অভিনয়ে সংগীত সম্পদ নিতান্ত পরিবর্জ্জিত হইলে তাহাতে রস ও সৌন্দর্য্যের বিশেষ হানির সম্ভাবনা। বোধ করি পাঠকমণ্ডলীও এই অভিপ্রায়ে অসম্মত হইবেন না।"

রত্নাবলীর উপরোক্ত ভূমিকা হইতে জানা যায় যে রামনারায়ণ তর্করত্ন মহাশয় সংস্কৃত নাটকের বাংলা অনুবাদ কালে অভিনয়ের প্রতি সর্ব্বদাই লক্ষ্য রাখিতেন,—অবিকল অনুবাদ বা লিপিচাতুর্য্যের জন্য অভিনয়োপ-যোগিতা ক্ষুণ্ণ না হয়, তাহার জন্য তিনি সতর্ক ছিলেন। বাংলা ভাষার ভাবপ্রকাশিকা শক্তির বিষয়ে তাঁহার ধারণা তেমন উচ্চ ছিল না; তাই সংস্কৃতের তুলনায় তাহাকে সঙ্কীর্ণ বলিয়া গিয়াছেন। শ্রীযুক্ত গুরুদয়াল চৌধুরী মহাশয়ের সহযোগিতা অন্যান্য নাটকে তিনি কতখানি পাইয়াছিলেন তাহা অনুসন্ধানের বিষয়; ১২৭৪ সালে লিখিত মালতীমাধবের অনুবাদে যে কয়েকটি সঙ্গীত আছে তাহা শ্রীযুক্ত বনওয়ারীলাল বাবুর রচনা। অনুবাদ করিতে গিয়া তিনি যে নূতনত্ব দেখাইয়াছেন তাহার কথা সকল নাটকের পরিচয়েই বলিয়াছেন। মালতীমাধবের সম্পর্কে তাহার উক্তি পাঠ করিলে উপরের মন্তব্যের পোষকতা হইবে। "অভিনয়ের উপযোগী করিবার নিমিত্ত স্থানে স্থানে অনেক পরিবর্ত্ত, পরিত্যক্ত ও প্রক্ষিপ্ত করিতে হইয়াছে।" রত্নাবলীর পূর্ব্বে তিনি 'কতিপয় গ্রন্থ রচনা' করিয়াছিলেন, সুতরাং অভিজ্ঞতার ফলে তাঁহার সাহস বাড়িয়াছিল, এ কথা বলিতে হইবে। এমন কি, রত্নাবলীর দ্বিতীয় সংস্করণে (১৯১৮ সম্বতে) প্রাথমিক যোগন্ধরায়ণের প্রস্তাবটি অনুপযোগী মনে করিয়া বাদ দিয়াছিলেন। উপাখ্যান ভাগ ব্যতীত

নামকরণেও মৌলিকতার পরিচয় পাওয়া যায় ;—অন্য অনেক নাটকে অঙ্কের বিভাগের নাম দিয়াছেন গর্ভাঙ্ক, তাহা সংস্কৃত নাট্যশাস্ত্রের সংজ্ঞার বিপরীতার্থবোধক, রত্নাবলীতে অঙ্কবিভাগের নাম করিয়াছেন "প্রকরণ"। ১২৬৭ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত অভিজ্ঞানশকুন্তলের অনুবাদে তর্করত্ন মহাশয় প্রবেশক বিষ্কম্ভক প্রভৃতি বিভাগ 'প্রস্তাব' নাম দিয়া অঙ্কেরই অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন ; এই প্রসঙ্গে চতুর্থ ও পঞ্চম অঙ্ক দ্রষ্টব্য। ষষ্ঠ অঙ্কে দুইটি প্রস্তাবের অবসর ও উপলক্ষ্য ঘটিলেও সেরূপ বিষয়-বিভাগ ঘটিয়া উঠে নাই।

রত্নাবলীর অনুবাদ ও অভিনয় বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাসে স্মরণীয় অধ্যায়। পাশ্চাত্য ভাষায় ও সাহিত্যে সুপণ্ডিত মাইকেল মধুসূদনের সাহিত্য-সাধনার সঙ্গে ইহা নিবিড়ভাবে সংশ্লিষ্ট। কিন্তু সে কথা বঙ্গ সাহিত্যে অনুরাগী মাত্রেরই জানা থাকিবার সম্ভাবনা। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত গুরুদয়াল চৌধুরীর সঙ্গীতের এক নমুনা এস্থলে উদ্ধৃত করিয়া তর্করত্ন মহাশয়ের রত্নাবলীর নিকট বিদায় গ্রহণ করিলাম।

চিত্তে চমকি চিন্তা করি,
প্রকাশি সরস রস মাধুরী,
নবরস-বশ রসিক জনেরি,
মন কি তুষিতে পারিব রঙ্গে।
মনোহর স্বর মধুর তান,
নাহি কোন গুণ কবি কি গান,
এই ভয়ে হলো ব্যাকুল প্রাণ,
সাহসে কি করে মরি আতঙ্কে ॥
বামন হইয়ে ধরিতে সাধ,
প্রফুল্ল বদনে গগন-চাঁদ,
উপহাস ভাবি ত্রাসে
কাঁপিছে থর থর কায়।
সুজন-মানস মরাল সমান,
জানিয়ে সাহসে করিতেছি গান,
নিজ নিজ গুণে রাখিবে মান,
হেরি দীন জনে করুণাপাঙ্গে ॥

বাংলা ১২৬৩ সালে রামনারায়ণ বেণীসংহার অনুবাদ করেন। কালীপ্রসন্ন সিংহের ব্যবস্থায় ইহার প্রথম অভিনয় হয়। প্রথম সংস্করণের ভূমিকার তারিখ ২৮ জ্যৈষ্ঠ, সম্বৎ ১৯১৩। ১৭ বৎসর পরে দ্বিতীয় সংস্করণ হয়। অনুবাদের বিজ্ঞাপন এস্থলে উদ্ধৃত করা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

"মহাকবি ভট্টনারায়ণ কুরুপাণ্ডবদিগের যুদ্ধবৃত্তান্ত বিষয়ে বেণী-সংহার নামে যে এক সংস্কৃত নাটক রচনা করেন, তাহা বীরকরুণা-রসে পরিপূর্ণ, ও স্বভাবোক্তি প্রভৃতি বিবিধ অলঙ্কারে অলঙ্কৃত, সুতরাং এতদ্দেশে সুপাঠ্য-নাটক মধ্যে পরিগণিত রহিয়াছে। এই মনোহর নাটক পাঠ করিলে নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিবৃন্দের প্রতিমূর্ত্তি চিত্তপটে অবিকল চিত্রিত হইয়া থাকে, তাহাতে যেরূপ আনন্দহ্রদে নিমগ্ন হইতে হয়, তাহা উক্ত নাটক পাঠকের পরোক্ষ নহে। কিন্তু সংস্কৃত ভাষানভিজ্ঞ বিজ্ঞগণ তাহার রস আস্বাদনে অসমর্থ, এই হেতু আমি বহু পরিশ্রমে চলিত ভাষায় উক্ত নাটকখানি অনুবাদিত ও মুদ্রিত করিলাম। এ অনুবাদ অবিকল অনুবাদ নহে, স্থানবিশেষে কোন অংশ পরিবর্ত্তিত ও পরিত্যক্ত হইয়াছে। এক্ষণে দেশীয় ভাষানুরাগী মহোদয়গণ দৃষ্টিগোচর করিলে পরিশ্রম সফল জ্ঞান করিব ইতি।"

ইহা হইতে বুঝিতে পারিতেছি যে রামনারায়ণ অনুবাদ করিতে গিয়াও মাছিমারা কেরাণীর মত প্রতিলিপি করিয়া তুষ্ট হন নাই ; যে-পরিবর্ত্তন ও নির্ব্বাচন মৌলিক-তার ও মনস্বিতার লক্ষণ, তাহার পরিচয়ও তাহার অনুবাদের মধ্যে আছে। জগতের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকগণের মধ্যে এই শ্রেণীর অনুবাদ পাওয়া যায়। বিশেষতঃ তাঁহার দৃষ্টি ছিল অভিনয়ের উপযোগিতার দিকে, দ্বিতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপনে তিনি লিখিতেছেন—

"...সম্যকরূপে অভিনয়োপযোগী করিবার নিমিত্ত এবার অনেক পরিবর্ত্ত করিলাম এবং তাদৃশ প্রয়োজন নাই বলিয়া আখ্যায়িকাটী পরিত্যাগ করিলাম।"

এই মন্তব্যটি উপেক্ষণীয় নহে। তৃতীয় অঙ্কে দুই গর্ভাঙ্কের অনুবাদের মধ্যেও তাঁহার নব্য রীতির প্রতি অনুরাগ সূচিত করিতেছে, কারণ "গর্ভাঙ্ক" কথা ও বস্তু দুই-ই পুরাপুরি দেশীয় নহে, অঙ্কে পুনরায় অভিনয় বসাইলে তাহাকে সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রে গর্ভাঙ্ক বলিত। বেণীসংহারের উপসংহারভাগে উভয় রীতির সামঞ্জস্য দেখা যায়,—ইহা প্রাচ্য নিয়মের অনুবর্ত্তী হইলেও সে নিয়ম যেন একটু প্রচ্ছন্ন আকার ধারণ করিয়াছে।

কৃষ্ণ। মহারাজ আজ্ঞা করুন্ আপনার আর কি প্রিয়কার্য করবো।

যুধি। ভাই কৃষ্ণ, তুমি যার প্রতি প্রসন্ন তার কি না করে থাক, আর না করবেনই বা কি। আমার সকল শত্রু ক্ষয় হলো, আমাদের পাঁচটী ভায়ের কোন অনিষ্ট হোল না। আমার দুর্ব্বুদ্ধিতে দ্রৌপদীর যে দুর্দ্দশা ঘটেছিল, তাও গেল, আর কি প্রার্থনা করবো? তবে বরং এই প্রার্থনা করি, দাতালোক দীর্ঘজীবী হৌন, তোমাতে সকলের ভক্তি থাক, সজ্জনেরা পণ্ডিতের গুণগ্রহণ করুন, রাজা নিষ্কণ্টকরাজ্য পালন করে সুখী হৌন্।

কৃষ্ণ। ধর্ম্মপথে থাক্‌লে তাই হবে।

(যবনিকাপতন)

পৌরাণিক উপাখ্যান অবলম্বনে রচিত রুক্মিণী-হরণ কিন্তু অনুবাদ নয়। ইহা পঞ্চমাঙ্ক নাটক, ১২৮ সালে রচিত এবং শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরকে সংস্কৃত শ্লোকে উৎসর্গীকৃত। ১ম, ৩য়, ৪র্থ, এই তিনটি অঙ্কে নূতন অর্থে দুইটি করিয়া গর্ভাঙ্ক আছে, নাটকে পাঁচখানি সঙ্গীতও আছে। ইহার ভাষা এমন সহজ যে দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়, তাহার সঙ্গে অদ্ভুত সংযম মিশিয়াছে; কোথাও দীর্ঘ বক্তৃতা নাই। তবে ভাষা ও ভাবে মধ্যে মধ্যে চিত্রার কথায় ও অন্যত্র গ্রাম্যতার একটু ছড়াছড়ি হইয়াছে, যেমন,—

—(কৃষ্ণের) বিদ্যার মধ্যে খোল মওয়া আর গাই দোওয়া।

নাটকটিতে দুই স্থলে সমসাময়িক পরিবর্ত্তনের প্রতি ইঙ্গিত আছে বলিয়া মনে হয়; যেমন,—

যুবরাজ।...ঐ গয়লার বেটা এক্ষণে মূর্খসমাজে ভগবানের অবতার বলে পরিচিত হচ্চো। এ কি। খাঁ? এখন দেখ্‌চি যত প্রতারক সকলই অবতার হয়ে উঠ্‌লো?

[ইহা কি ঐ সময়কার ধর্ম্মান্দোলনের প্রতি কটাক্ষ-পাত নহে?]

আবার কৃষ্ণ বলিতেছেন, কালো বলিয়া তাঁহাকে কেউ মেয়ে দেয় না, তাহাতে নারদ বলিলেন,—

"কালো বলে মেয়ে দেয় না? তা এক কর্ম্ম কর না।
কৃষ্ণ। কি কর্ম্ম?
নারদ। এখন কেউ কেউ শুভ্রকেশ দ্রব্যগুণে কালো করে থাকে, এমন দেখা যাচ্চে—তা তুমি কালো গায়ে কোন দ্রব্য দিয়ে কি সুন্দর হতে পারো না?"

রুক্মিণীহরণ মিলনান্ত নাটক, মিলন সঙ্গীতে ইহার পরিসমাপ্তি।

পূর্ব্বোক্ত নাটকগুলি ছাড়া রামনারায়ণ আরও অনুবাদ করেন, আরও মূল নাটক রচনা করেন; তাঁহার শকুন্তলা, ধর্ম্মবিজয়, স্বপ্নধন, চক্ষুদান প্রহসন—নানাদিকে তাঁহার নাট্যরচনা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। কিন্তু নব-নাটকে তিনি প্রচুর খ্যাতিলাভ করেন বলিয়া এবং উহার দ্বারা ঠাকুরবাড়ির জোড়াসাঁকো থিয়েটারের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ স্থাপিত হয় বলিয়া এস্থলে নব-নাটকের কিছু আলোচনা করা যাইতেছে।

এই সময়ের খবরের কাগজে নাটকের জন্য রীতিমত বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়। জোড়াসাঁকোতে থিয়েটারের একটা 'কমিটি' হয়; তাহার বিজ্ঞাপনের এক নমুনা ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে আগষ্টের 'ইণ্ডিয়ান মিরর' হইতে আমরা পাই। হিন্দু নারীর অসহায় অবস্থা এবং গ্রাম্য জমিদারদের কথা লইয়া বাংলাতে দুটি নাটক লিখিবার জন্য প্রতিযোগিতার বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়; প্রথমটির জন্য পুরস্কার ২০০্, দ্বিতীয়টির জন্য ১০০্। নাটক দুইটিই জোড়াসাঁকো থিয়েটারের নামে উৎসর্গ করিতে হইবে এরূপ সর্ত্ত দেওয়া ছিল। সেই সঙ্গে বলা হইয়াছে :—

The subject of Polygamy which was advertized in the *Indian Daily News* of the 22nd instant, is, after due consideration, withheld from public competition, as the commitee have been able to secure the services of Pundit Ram Narian Tarkorutno for the task. The following gentlemen have kindly taken upon themselves task of examining the same :—

Pundit Eshwar Chunder Bidyasagar.
Baboo Raj Krishna Banerjee.

নাটক রচনার ইহাই ইতিহাস।

পরে পরে নাটক লিখিয়া রামনারায়ণের 'নাটুকে' নামে পরিচয় হয়। 'নব-নাটকে' আমরা এই নামের কিছু আভাষ পাই। ইহা বহুবিবাহ লইয়া রচিত।

"বহুবিবাহ প্রভৃতি কুপ্রথা বিষয়ক নব-নাটক। শ্রীরামনারায়ণ তর্করত্ন প্রণীত।"

ইহার উৎসর্গপত্র পাঠকবর্গের অবগতির জন্য উদ্ধৃত করিলাম :—

উপহার।

অগণ্য সৌজন্যাদিগুণসম্পন্ন
শ্রীল শ্রীযুক্ত বাবু গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহোদয়
মহনীয় চরিতেষু।—

মহাশয়!

আমি আপনকার এই অল্পবয়সে অনল্প দেশহিতৈষিতা, বদান্যতা এবং রসজ্ঞতাদি গুণগ্রাম সন্দর্শনে সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া সন্তোষ প্রকাশার্থ এই নব-নাটক স্বরূপ কুসুমমালা মহাশয়কে প্রদান করিলাম। ইহা বহুবিবাহ প্রভৃতি বিবিধ কুপ্রথা নিবারণের নিমিত্ত সদুপদেশসূত্রে নিবদ্ধ। মুক্তাফল অনুত্তম বা কৃত্রিম হইলেও মহতের কণ্ঠে মূল্যবানের শোভাধারণ করে; অতএব এই কুসুমমালা সুরভিযুক্ত হৌক বা না হৌক এবং ইহার গ্রন্থনের পারিপাট্য থাকুক বা না থাকুক মহাশয় অনুগ্রহপূর্ব্বক গ্রহণ করিলেই ইহার গৌরব সৌরভ প্রবৃদ্ধ হইতে পারিবে এবং আমারও পরিশ্রম সফল হইবে।

কলিকাতা, সংস্কৃত কলেজ।　　ভবদীয়ানুগ্রহাকাঙ্ক্ষী
শ্রীরামনারায়ণ শর্ম্মা।

নব-নাটক ছয় অঙ্কে সমাপ্ত। প্রথমেই নান্দী—

সজ্জনগণপরিতোষনিদানং সুললিতরস—
নবনাটক গানং।
কর্ত্তুং বাঞ্ছতি ভবদভিধানং ক্ষণমিহ
ময়ি কুরু করুণাদানং॥

প্রস্তাবনাও একেবারে খাঁটি সংস্কৃত রীতিতে রচিত। নান্দীর পরেই নটী ও সূত্রধারের প্রবেশ;

নটী। "এ নব-নাটকে দেশে নব নাটকের অপ্রতুল কি? কত চটকওয়ালা নাটক এখন দিন দিন হয়ে উঠ্‌চে দেখ্‌চো না?"—
... "ভাল, সম্প্রতি শ্রীরামনারায়ণ তর্করত্ন মহাশয় যে বহুবিবাহ বিষয়ক নবনাটক প্রণয়ন করেছেন সেখানি তো নিতান্ত মন্দ নয়, তাই কেন অভিনয় কর না?"

ইহাকেও যদি প্রাচীন ভাবতীয় আদর্শের অভিন্ন মনে না হয় তবে পরবর্ত্তী নটীর সঙ্গীতে;—

"মলয় নিলয় পরিহার পুরঃসর দূর সমাগম ধাবে,
বিকচ কমলকুল-কলিকা পবিমলবাহিনী বহতি সমাবে।
বহুপরিণায়ক নাথ বনবনসাদতি সপদি শরীরে,
মলদতিবিরহ কৃশাঙ্গকৃশা কিল মজ্জতি লোচন নীরে॥"

এইভাবে প্রস্তাবনা হইয়া গেলে প্রথমাঙ্কে সারি-ভগি দুই দাসী চল্‌তি ভাষায় কথা কহিয়া গেল; চল্‌তি ভাষায় ও লেখা ভাষায় উভয়তঃই তর্করত্ন মহাশয় যে সমান নিপুণ ছিলেন তাহার পরিচয় তাঁহার লেখায় বহুশঃ পাওয়া যায়। দাসীদের প্রস্থানের পরে নরেশবাবুর প্রবেশ; সঙ্গে সুধীর, চিত্ততোষ ও বিধর্ম্মবাগীশ, এই অংশের নাম 'গর্ভাঙ্ক' (?) দেওয়া হইয়াছে; এখানে তর্করত্ন মহাশয় সংস্কৃতঘেঁষা হইয়াছেন এরূপ মনে করিতে পারা যায় না। চতুর্থ অঙ্কে আবার এইরূপ 'গর্ভাঙ্ক' (?) আছে।

'নব-নাটকে'র সমস্তটা বর্ণনা করা বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে, করিলে তাহাতে পাঠকবর্গের ধৈর্য্যচ্যুতিরও সম্ভাবনা; শুধু যে-যে অংশ আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে তাহাদের উল্লেখ করিব। ইতিপূর্ব্বে চল্‌তি ভাষায় রামনারায়ণের দক্ষতার কথা বলিয়াছি। বর্ত্তমান যুগেরও অনেকে নিশ্চয় তাঁহার এই দক্ষতা দেখিয়া মুগ্ধ হইবেন। যেমন—

'দেখ, যাদের সঙ্গে জন্মাবধি ঘর করা হয়নি, যাদের চক্ষেও একবার দেখ নি। সেই সকল আকামানে কেঁবুটে বোড়ার সঙ্গে সংসার করা বিষম সমিস্থে।'

চল্‌তি ভাষার প্রতি প্রীতি জন্যই এই নাটকে এমন অনেক কথা পাওয়া যায় যাহা প্রবাদবাক্য বলিয়া ধরা যাইতে পারে। যেমন,—

—'আলতার গুটি আর তুলোর মাকাটি।'
'মুখে মধু হৃদে ক্ষুর, সেই তো বিষম ক্রূর'
'পাঠ্‌শালে শট্‌কে পড়োই শট্‌কে পড়িছি' (৫৩ পৃঃ)

'বাঙ্গলাতো ছেড়ে যেতে দেবেন না—তা বাঙ্গলা যে কেন ছাড়ালেন তা তিনিই জানেন' (ঐ)

'পাশ করা নয় পাশ কাটান'
'অপূর্ব্ব জ্ঞানীপণ্ডিত অপর্ব্ব—জ্ঞানা অর্থাৎ অজ্ঞানা।'
'ঘর নাই তার উত্তর শিউরা' (১০২ পৃঃ)

মধ্যে মধ্যে ছড়া কাটিয়াছেন, যেমন—

'কালি ছিলেম বস্ত্রে স্বর্ণ পীঁড়ে.
আজ বসেছি আস্তাকাঁড়ে।' (৭১ পৃঃ)
'আটে পিটে দড়ো,
তবে ঘোড়ার উপর চড়ো।' (৮১ পৃঃ)

রামনারায়ণ, সম্ভবতঃ সংস্কৃত নাটকের রীতি অনুসরণ করিয়া, শুধু ছড়া কাটিয়াই ক্ষান্ত হন নাই,—মাঝে মাঝে কবিতা বসাইয়াছেন, সে কবিতায় ঈশ্বর গুপ্ত মহাশয়ের প্রভাব দেখা যায়:—

বলো না বলো না দিদি,
বিদরিয়ে যায় হৃদি,
সে সব কঠিন কথা তুলো না গো তুলো না।
ও কথায় কাজ নাই,
মনে ব্যথা লাগে ভাই,
পুরোনো দুঃখের দ্বার খুলো না গো খুলো না॥ (৩৫ পৃঃ)

তার কথা বল দেখি কার কাছে কই,
দিদি কার কাছে কই।
এমন মনের মত লোক মেলে কই,
বলো লোক মেলে কই॥ ইত্যাদি (৩৬ পৃঃ)

আবার ৩ পৃষ্ঠার পরেই—

পুরুষ পরশমণি সত্যি দিদি বটে,
পরশে কাঞ্চন তার তাও লোকে রটে।
কিন্তু সে পরশে যদি অন্যে গে পরশে,
অমনি পরুষ হয়ে সে পরশ বসে।

তর্করত্ন মহাশয় উদারমতাবলম্বী ছিলেন, সন্দেহ নাই। ইংরেজীনবিশদের ব্যঙ্গ করিয়াছেন, তাহারা ইংরেজীতে কথা বলে, ভাবে, স্বপ্ন দেখে, তাহাদেরই একজনকে দিয়া বলাইয়াছেন,—

আমি থিঙ্ক্ করি, তাঁর সে ডেঞ্জার এখনো হ্যাং কচ্চো

কিন্তু সমাজ সংস্কার যাহাতে হয়, প্রকৃত দোষ যাহাতে দূর হয়, তাহার প্রতিও তাঁহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। বিধবা-

বিবাহের সম্বন্ধে তাঁহার মন্তব্য যথেষ্ট অনুকূল। একজন বলিতেছেন,—

'বিধু এই ফাল্গুণ মাসে রাঁড় হয়েছিল, এর মধ্যে সেদিন আবার তার বিয়ে হয়ে গেল।'

উত্তরে,—'হবে না কেন? ওদের যে বাড়ি ভাল।'

নব-নাটকের সহিত দীনবন্ধুর লেখার কতক কতক মিলে; ভাবের আতিশয্যে পয়ার ছন্দের আবির্ভাব উভয়ের মধ্যেই পাওয়া যায়:—যেমন, নব-নাটকে, ১২৮ পৃঃ —সাবিত্রী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতেছে—

কি বলিব দিদি মোর কপালের গুণ।
দেখ কপালের গুণ লো কপালের গুণ॥ ইত্যাদি

ইহার সহিত নীলদর্পণের বিলাপ তুলনীয়। দুই স্ত্রী থাকিলে বেচারা স্বামীকে মারধর খাইতে হয়, এ কথার মূলও দীনবন্ধুর রচনায় আছে। শেষ অঙ্কে যে দুর্দ্দশার চরম, কষ্ট যে ঘনীভূত হইয়া উঠিল,—মাতা সাবিত্রী উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিলেন, পিতা গবেশ বিষপ্রয়োগে পীড়িত হইয়া অকালে মৃত্যুমুখে পতিত, দুঃসংবাদে পুত্র সুবোধ মৃতবৎ ভূতলে পড়িয়া রহিলেন; নীলদর্পণের শেষের অবস্থাও এইরূপ। উপসংহারে কিন্তু নটী ও সূত্রধার রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করিলে সূত্রধার সভায় আসীন ব্যক্তিদিগকে জিজ্ঞাসা করিল—"...আর কি আপনারা বহুবিবাহ প্রথার অনুমোদন করবেন?"

দেখা যাইতেছে নব-নাটক বিয়োগান্ত। রামনারায়ণের অন্য কোনও নাটক বিয়োগান্ত বলিয়া জানি না, সুতরাং নব-নাটক বাস্তবিকই নব-নাটক, নব্য রীতিতে রচিত। নীলদর্পণের প্রভাবেই হউক, আর অন্য যে কারণেই হউক, ঘনীভূত বিষাদের ছায়ায় ইহার আখ্যানভাগ শেষ হইয়া গিয়াছে।

বাংলা নাটক ছাড়া সংস্কৃত রচনায়ও পণ্ডিত রামনারায়ণ তর্করত্ন মহাশয় বিশেষ দক্ষ ছিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ সহোদর ছিলেন প্রাণকৃষ্ণ বিদ্যাসাগর মহাশয়; এবং হরিনাভির প্রসিদ্ধ পণ্ডিত মধুসূদন বাচস্পতি মহাশয়ের নিকট প্রথমে ব্যাকরণ, স্মৃতি ও কাব্য অধ্যয়ন করিয়া ন্যায়শাস্ত্র আলোচনার জন্য পূর্ব্বদেশস্থ পোড়া নামক গ্রামে কিছুকাল বাস করেন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে অধ্যাপক নিযুক্ত হইলে তিনিও সেখানে ছাত্র-হিসাবে প্রবেশ করিয়া শিক্ষালাভ করেন। ভ্রাতার মৃত্যুর পরে সংস্কৃত কলেজের অলঙ্কারের অধ্যাপকের পদ তাঁহাকে দেওয়া হয়। সংস্কৃত ভাষায় তাঁহার রচনা 'আর্য্যাশতক' ও 'দক্ষযজ্ঞ'; দক্ষযজ্ঞের জন্য কাউয়েল তাঁহাকে ইংলণ্ড হইতে 'কবিকেশরী' উপাধি দিয়া পাঠান।

গ্রন্থ-রচনা ভিন্ন শুদ্ধ অভিনয়ে যে তর্করত্ন মহাশয়ের অনুরাগ ও উৎসাহ ছিল তাহা হরিনাভিতে অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারিয়াছি। উক্ত গ্রামে ইংরেজী ১৮৬২ সালে যে বঙ্গ-নাট্যসমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়, তিনিই একরূপ তাহার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন এবং উহার রঙ্গমঞ্চে তাঁহার নাটক রত্নাবলীর অভিনয় যাঁহারা দেখিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ এখনও জীবিত আছেন। তিনি অভিনয়ের সময় উপস্থিত থাকিয়া উৎসাহ দিতেন এবং আখড়ায় গিয়া কিরূপ ভাবে অভিনয় করিতে হইবে, ভাবভঙ্গী পর্য্যন্ত তিনি শিখাইতেন; অভিনয়ের জন্য ছেলে সংগ্রহ করিয়া আনাও তাঁহার দ্বারাই হইত।

মৃত্যুর পূর্ব্বে তাঁহার প্রতিভার সম্মান তিনি পাইয়া গিয়াছেন। ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বেঙ্গল ফিল-হার্মোনিক অ্যাকাডেমি হইতে পারিতোষিকপত্র, কাব্যোপাধ্যায় উপাধি ও তাহার চিহ্নস্বরূপ স্বর্ণ কেয়ূর প্রাপ্ত হন। তাঁহার সুযোগ্য ভ্রাতুষ্পুত্রেরা তাহার স্মৃতির উদ্দেশ্যে যে লাইব্রেরী স্থাপন করিয়াছেন তাহারই সংলগ্ন কক্ষে এই পারিতোষিক পত্র টাঙান আছে, পাঠকবর্গের অবগতির জন্য তাহার প্রতিলিপি এখানে প্রদত্ত হইল।

THE BENGAL PHILHARMONIC ACADEMY.

Patrons:

The Hon'ble Sir Ashley Eden, K. C. S. I.,
Lieutenant-Governor of Bengal.
A. W. Croft, Esq., M. A.,
Director of Public Instruction, Bengal.
Rajah Comm. Sourindro Mohun Tagore, Mus. Doc.,
Sangita-Náyaka,
Companion of the Order of Indian Empire.

Diploma of Honor

No. 14

The Executive Council of the above-named Academy has, at its sitting of the 9th March, 1882, conferred upon Pandita Rámanáráyana Tarkaratna of Harinabhi the title of Kávyopádhyáya,

together with a gold Harakumara Tagore Keyura, the insignia thereof, in consideration of his proficiency in dramatic writing and of his being the first writer of Bengali dramas in a systematic form.

Calcutta Pathuriaghata... The 22d A...1882 } (Illegible) Hon. Secy. শ্রী ক্ষেমোহন গোস্বামী Director Sourindra Mohan Tagore Founder & President.

ইহার কিছুকাল পরে তিনি সংস্কৃত কলেজ হইতে অবসর লইয়া পেন্‌সন ভোগ করিতে থাকেন। দেড় বৎসরাবধি পেন্‌সন ভোগ করার পর তাঁহার উদরী হয়; এই রোগে তিনি প্রায় ছয় মাসকাল কাতর ছিলেন, অবশেষে ১২৯২ বঙ্গাব্দের ৭ই মাঘ মঙ্গলবার তিনটি পুত্র ও দুইটি কন্যাকে রাখিয়া তিনি পরলোকে গমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ছিল ৭৫ বৎসর। নিকটস্থ চাঙড়ীপোতা গ্রামে প্রখ্যাতনামা পণ্ডিত দ্বারিকানাথ বিদ্যাভূষণ বাস করিতেন; তাঁহার সহিত তর্করত্ন মহাশয়ের বৈবাহিক সম্পর্ক ছিল।

আমাদের দেশে এই পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে এত ওলট-পালট হইয়া গিয়াছে;—১৮৮০ ও ১৯৩০এর মধ্যে এত প্রভেদ, যে উভয়ের মধ্যে আর কোনও সম্পর্কের চিহ্ন দেখিতে পাওয়া দুষ্কর। রামনারায়ণ লাইব্রেরীর মধ্যে পূর্ব্বোক্ত পারিতোষিক পত্র এবং একখণ্ড বাঁধান হস্তলিখনের প্রতিলিপি (কোনও গুরুজনকে লিখিত পত্রের শেষাংশটুকু)- তাঁহার কথা মনে করাইয়া দিতেছে। তাঁহার ফোটো ছিল, শুনিলাম তাহাও নাকি চুরি হইয়াছে। তাঁহার নামে যে পুস্তকাগার প্রতিষ্ঠিত, তাহাতে তাঁহার পুস্তক একখানিও নাই। আধুনিক বঙ্গসাহিত্যের সেবক যাঁহারা, তাঁহাদের পক্ষে হরিনাভি তীর্থবিশেষ, কিন্তু সে তীর্থে স্মৃতিচিহ্ন বড় সামান্য। শুধু সমাজের অন্তর্নিহিত ভাবের পরিবর্ত্তন, শুধু আত্ম-বিস্মৃতি, তাহাতেই রাজনৈতিক ঘোর বিপ্লব অপেক্ষা অনেক অধিক অপকার করিয়াছে, অথবা রাজনৈতিক অবস্থার তাহা গৌণ কিন্তু অবশ্যম্ভাবী ফল।

পরিশিষ্ট

সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট নিম্নলিখিত তথ্যগুলির জন্য কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছি।

(১) কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে অধ্যাপনা-কার্য্যে ব্রতী হইবার পূর্ব্বে রামনারায়ণ হিন্দু মেট্রোপলিটন্ কলেজের প্রধান অধ্যাপকরূপে দুই বৎসর কার্য্য করিয়াছিলেন। "১৮৫৩ সালের ২ মে সোমবার সিঁদুরিয়াপটির ৺রামগোপাল মল্লিক মহাশয়ের বৃহদ্বাটীতে" হিন্দু মেট্রোপলিটন কলেজের কার্য্য আরম্ভ হয়।* কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ১১ আশ্বিন ১২৬০ অর্থাৎ ২৬ সেপ্টেম্বর ১৮৫৩ তারিখের 'সংবাদ প্রভাকরে' লিখিয়াছিলেন:—

"শ্রীযুক্ত রামনারায়ণ তর্কসিদ্ধান্ত মহাশয় হিন্দু মিট্রোপলিটন কালেজের প্রধান পণ্ডিতের পদে অভিষিক্ত হওয়াতে ছাত্রদিগের বাঙ্গালা শিক্ষা অতি সুচারুরূপে নির্ব্বাহ হইতেছে, ইনি অতি সুপণ্ডিত, ও সংস্কৃত কালেজের একজন বৃত্তিধারি ছাত্র ছিলেন। বঙ্গভাষা লেখন পঠনেও বিশেষ পারদর্শী, পতিব্রতোপাখ্যান নামক পুস্তক লিখিয়া রঙ্গপুরের কুণ্ডি পরগণার বিখ্যাত ভূম্যধিকারি শ্রীযুত কালীচন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয়ের প্রদত্ত প্রাইজ গ্রহণ করিয়াছেন, অতএব এতাদৃশ সুযোগ্য মহাশয়ের সংযোগ দ্বারা অভিনব কালেজ বিদ্যালোকে পরিদীপ্ত হইবেক তাহার সন্দেহ নাই।"

(২) তর্করত্ন মহাশয়ের হরিনাভির বাটী হইতে অধ্যাপক শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় কতকগুলি কাগজপত্র পান; তন্মধ্যে একখানি পণ্ডিতের স্বহস্ত-লিখিত। ইহাতে তিনি নিজের সম্বন্ধে লিখিতেছেন:—

"সন ১২২৯ সালে আমার জন্ম। আমার পিতৃঠাকুরের নাম ৺রামধন শিরোমণি মহাশয়। ২৪ পরগণার অন্তঃপাতি হরিনাভি নামক গ্রামে আমার বাস। আমি বাল্যাবস্থাতে দেশে ও বিদেশে চোবাড়িতে ব্যাকরণ, কাব্য ও স্মৃতির কিয়দংশ এবং ন্যায়শাস্ত্রের অনুমানখণ্ড প্রায় অধ্যয়ন করি। পরিশেষে ইং ১৮৪৩ অর্থাৎ ১২৫০ সালে গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত কলেজে পাঠার্থ প্রবিষ্ট হই। ইং ১৮৫৩ বাঙ্গলা ১২৬০ সালে কলেজ পরিত্যাগ করিয়া প্রথমতঃ হিন্দু মিট্রোপলিটন কলেজের প্রধান পাণ্ডিত্যপদে নিযুক্ত হই। দুই বৎসর তথায় কর্ম্ম করিয়া

* সংবাদ প্রভাকর, ১৯ বৈশাখ ১২৬০ (৩০ এপ্রিল ১৮৫৩)। ১ জ্যৈষ্ঠ ১২৬০ (১৩ মে ১৮৫৩) সালের সংবাদ প্রভাকরে দেখিতেছি:—

"১২৬০ সালের বৈশাখ মাসের ঘটনার সংক্ষেপ বিবরণ।... সিন্দুরিয়াপটিতে ৺রামগোপাল মল্লিকের বিখ্যাত ভবনে কতিপয় ধনি হিন্দুর বিশেষ চেষ্টা ও যত্নে 'হিন্দু মিট্রোপলিটন কালেজ' নামে এক নূতন বৃহদ্বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে, ঐ কালেজের সহিত শীলস্ কালেজ এবং ডেবিড হেয়ার একাডিমির সংযোগ হইয়াছে।...

জানবাজার নিবাসিনী সুশীলা পুণ্যশীলা, সৎকীর্ত্তিশালিনী শ্রীমতী রাসমণি 'হিন্দু মিট্রোপলিটন' কালেজের শ্রীবৃদ্ধির নিমিত্ত ১০,০০০ দশ সহস্র মুদ্রা দান করিয়াছেন।"

১৮৫৫ সালের ১৬ই জুন তারিখে (বাঙ্গলা ১২৬২ সালে) সংস্কৃত কলেজে অধ্যাপনা-কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া অদ্যাপি সেই কর্ম্মই করিতেছি।

"১২৫৯ সালে পতিব্রতোপাখ্যান প্রস্তুত করি। রঙ্গপুরের ভূম্যধিকারী বাবু কালীচন্দ্র রায় উক্ত পুস্তকে ৫০৲ টাকা পারিতোষিক দেন।

"কুলীন কুলসর্ব্বস্ব নাটক ১২৬১ সালে রচিত হয়, উহাতেও রঙ্গপুরের উক্ত ভূম্যধিকারী বাবু কালীচন্দ্র রায় ৫০৲ টাকা পারিতোষিক দেন; এবং পুস্তক মুদ্রাঙ্কনের সাহায্যে আরো ৫০৲ টাকা দান করেন। এই নাটক কলিকাতা নূতন বাজারে বাঁশতলার গলিতে ও চুচুঁড়াতে অভিনীত হয়।

"বেণী সংহার নাটক। ১২৬৩ সালে প্রস্তুত হয়। এই নাটক কলিকাতা জোড়াশাঁকোস্থ বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহের বাটীতে ও নূতনবাজারে বাবু জয়রাম বসাকের বাটীতে অভিনীত হয়।

"রত্নাবলী। ১২৬৪ সালে প্রস্তুত হয। ইহাতে কান্দিনিবাসী রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ বাহাদুর ২০০৲ টাকা পারিতোষিক দেন। উক্ত রাজার কলিকাতার সন্নিকট বেলগেছিয়ার বাটীতে ৬।৭ বার ঐ নাটক অভিনীত হয়। তদ্ভিন্ন গীতাভিনয় প্রস্তুত হইয়া এক্ষণেও নানাস্থানে অভিনীত হইতেছে।

"অভিজ্ঞান-শকুন্তল নাটক। ১২৬৯ [১২৬৭ ?] সালে প্রস্তুত হয়। এই নাটক কলিকাতা শাঁকারিটোলার বাবু ক্ষেত্রমোহন ঘোষের বাটীতে ৫ বার অভিনীত হয।

"নবনাটক ১২৭৩ সালে রচিত হয়। ইহাতে কলিকাতা জোড়াশাঁকোবাসি বাবু গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর ২০০৲ টাকা পারিতোষিক দেন। এই নাটক তাঁহার বাটীতে ৯ বার অভিনয় হয়।

"মালতীমাধব নাটক ১২৭৪ সালে প্রস্তুত করিয়া কলিকাতা পাথুরিয়াঘাটার সুপ্রসিদ্ধ রাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর বাহাদুরকে প্রদান করি। তিনি উহাতে ১০০৲ টাকা পারিতোষিক দেন। তাঁহার বাড়ীতে ঐ নাটক ১০।১১ বার অভিনীত হয়।

"সুনীতিসন্তাপ নাটক ১২৭৫ সালে প্রস্তুত করিয়া কলিকাতা কাশারীটোলানিবাসি বাবু কালীকৃষ্ণ প্রামাণিককে প্রদান করি। তিনি আমাকে ২০০৲ টাকা পারিতোষিক দেন। ঐ নাটক কোন কারণে মুদ্রিত হয় নাই।

"১২৭৮ সালে রুক্মিণীহরণ প্রস্তুত করিয়া পূর্ব্বোক্ত রাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর বাহাদুরের নিকট ৫০৲ টাকা পারিতোষিক পাই। ঐ নাটক তাঁহার বাটীতে ১০।১১ বার অভিনীত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত যেমন কর্ম্ম তেমন ফল, উভয় সঙ্কট এবং চক্ষুর্দ্দান নামে আরো ৩ খানি প্রহসন অর্থাৎ হাস্যরসবাঞ্জক ক্ষুদ্র নাটক প্রস্তুত করিয়া উক্ত রাজা বাহাদুরের নিকট যথাযোগ্য পুরস্কৃত হইয়াছি, সে সকল নাটকও প্রত্যেকে ৭।৮ বার করিয়া তাঁহার বাটীতে অভিনীত হইয়াছে।

"মধ্যে মধ্যে কল্কিপুরাণ, সমুদয় উত্তররামচরিত নাটক ও যোগবাশিষ্টের কিয়দংশ অনুবাদ করিয়া সর্ব্বার্থপূর্ণ...দয়...[সর্ব্বার্থ পূর্ণ-চন্দ্রোদয়] নামক পত্রিকাতে ক্রমশঃ প্রকাশ করা হইয়াছে।

"কেরলীকুসুম * নামে একখানি নাটক প্রস্তুত করা গিয়াছে; অদ্যাপি মুদ্রিত হয় নাই।

* ইহাই বোধ হয় 'স্বপ্নধন' নামে পর বৎসর (১২৮০ সাল) প্রকাশিত হইয়াছিল।

সংস্কৃত গ্রন্থ

"১২৭৮ সালে মহাবিদ্যারাধন নামে দশমহাবিদ্যার স্তোত্র ও গীতিকা এবং বর্ত্তমান বর্ষে আর্য্যাশতক* প্রস্তুত করিয়াছি।"+



পণ্ডিত রামনারায়ণ তর্করত্ন

(৩) রামনারায়ণের যে কয়খানি গ্রন্থ ব্রজেন্দ্রবাবুর দেখিবার সুবিধা হইয়াছে তাহাদের নামধামের এইভাবে উল্লেখ করিয়াছেন :—

বহরমপুরে ডক্টর রামদাস সেনের লাইব্রেরী :—

১। রত্নাবলী নাটক। শ্রীরামনারায়ণ তর্করত্ন কর্তৃক চলিত ভাষায় অনুবাদিত। কলিকাতা সম্বৎ ১৯১৪। এই পুস্তকের 'ভূমিকা'র তারিখ :—"কলিকাতা সংস্কৃত বিদ্যালয়, ২৮ ফাল্গুন, সম্বৎ ১৯১৪।"

২। বহুবিবাহ প্রভৃতি কুপ্রথা বিষয়ক নব-নাটক। শ্রীরামনারায়ণ তর্করত্ন প্রণীত। শকাব্দাঃ ১৭৮৮।

* 'আর্য্যাশতক' ১২৭০ সালে রচিত ও প্রকাশিত (১২৭৯, ২৭ মাঘ তারিখের "মধ্যস্থ" নামক সাপ্তাহিক পত্র দ্রষ্টব্য), সুতরাং জানা যাইতেছে যে রামনারায়ণের এই আত্মকাহিনী ঐ সালেই লিখিত হয়।

+ "বঙ্গভাষার আদি নাটক"—শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, এম্-এ, ভারতবর্ষ, ১৩২৩ কার্ত্তিক, পৃঃ ৭১১।

"বিজ্ঞাপন।—আমি যোড়াসাঁকো নাট্যশালা কমিটী কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া এই বহুবিবাহ বিষয়ক নব-নাটক প্রণয়ন করিলাম।…

১৫ বৈশাখ, ১২৭৩ সাল শ্রীরামনারায়ণ শর্ম্মা, কলিকাতা সংস্কৃত কালেজ।"

৩। বেণীসংহার নাটক। শ্রীরামনারায়ণ তর্করত্ন কর্ত্তৃক চলিত-ভাষায় অনুবাদিত ২য় সংস্করণ সংবৎ ১৯৩০

ইহার প্রথম সংস্করণের 'বিজ্ঞাপন'-এর তারিখ :—"কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ ২৮ জ্যৈষ্ঠ, সংবৎ ১৯১৩।" দ্বিতীয় সংস্করণের 'বিজ্ঞাপন'-এর তারিখ :—"২৫ চৈত্র, সংবৎ ১৯৩০।"

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ গ্রন্থাগার :—

৪। পতিব্রতোপাখ্যান।…১২৫৯ শাল ১১ মাঘ। ইংরেজি ১৮৫৩ শাল ২৩ জানুআরি।

৫। মালতীমাধব নাটক। শ্রীরামনারায়ণ তর্করত্ন প্রণীত। বাং ১২৭৪। ইং ১৮৬৭। ইহার 'বিজ্ঞাপন'-এর তারিখ :—"১৫ আশ্বিন ১২৭৪ সাল। শ্রীরামনারায়ণ শর্ম্মা। সংস্কৃত কলেজ।"

৬। রুক্মিণীহরণ নাটক। ১২৭৮ সাল। 'উপহার' পৃষ্ঠার তারিখ :—"সংস্কৃত কালেজ, ১২৭৮। ভাদ্র।"

৭। কুলীন কুলসর্ব্বস্ব। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ গ্রন্থাগারে ইহার পঞ্চম সংস্করণের একখণ্ড আছে। তবে ইহার প্রথম সংস্করণ যে ১৮৫৪ সালের শেষাশেষি প্রকাশিত হয় তাহার প্রমাণ আছে।—

"কুলীন কুল সর্ব্বস্ব।—আমরা কুলীন কুল সর্ব্বস্ব নামক এক নব্য নাটক প্রাপ্ত হইয়াছি হিন্দু মিট্রোপলিটন কালেজের প্রধানাধ্যাপক শ্রীযুক্ত রামনারায়ণ তর্কসিদ্ধান্ত মহাশয় ইহা রচনা করেন এই পুস্তকের অনুষ্ঠান বিষয় ভাস্কর পত্রে পূর্ব্বে প্রকাশ হইয়াছিল. পাঠকবর্গের স্মরণ থাকিবে তর্কসিদ্ধান্ত মহাশয় এই গ্রন্থ রচনা করিয়া রঙ্গপুরস্থ মহানুভব ভূম্যধিকারি শ্রীল শ্রীযুক্ত বাবু কালীচন্দ্র রায়চৌধুরী মহোদয়ের নিকট ৫০ টাকা পারিতোষিক প্রাপ্ত হন, এবং উক্ত গুণগ্রাহি বদান্যবর ভূম্যধিকারি মহাশয় ভট্টাচার্য্যকে ঐ পুস্তক প্রতিপ্রদান করেন, তর্কসিদ্ধান্ত মহাশয় তাহা স্বয়ং মুদ্রাঙ্কিত করাইয়াছেন…।" সম্বাদ ভাস্কর, ২৩ ডিসেম্বর ১৮৫৪ (৯ পৌষ ১২৬১)।

চৈতন্য লাইব্রেরী :—

৮। অভিজ্ঞানশকুন্তল নাটক। শ্রীরামনারায়ণ তর্করত্ন কর্ত্তৃক চলিত গৌড়ীয় ভাষায় অনুবাদিত। সম্বৎ ১৯১৭।

"মঙ্গলাচরণ।—…সুপ্রসিদ্ধ মহাকবি কালিদাসের কবিত্ব সৌরভের কল্পদ্রুমতুল্য যে অভিজ্ঞান শকুন্তল নাটক তাহা আমি অনুবাদ করিয়াছি—অনুবাদে প্রবৃত্ত হইয়া অধুনাতন নিয়মানুসারে নাটক অভিনয়োপযোগি করিবার নিমিত্ত স্থানে স্থানে রসভাবাদি পরিবর্ত্তিত, পরিত্যক্ত ও সন্নিবেশিত করিয়াছি,…।

কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ ১০ আশ্বিন, ১২৬৭ শ্রীরামনারায়ণ শর্ম্মা।"

৯। স্বপ্নধন নাটক। শ্রীযুক্ত রামনারায়ণ তর্করত্ন প্রণীত। সিমুলিয়া বঙ্গ রঙ্গভূমি হইতে প্রকাশিত। সম্বৎ ১৯৩০।

রামনারায়ণ এই পুস্তকখানির স্বত্বাধিকার বঙ্গ রঙ্গভূমির কর্ত্তৃপক্ষকে বিক্রয় করেন। নাটকখানি বঙ্গ রঙ্গভূমিতে অভিনীত হয়। ইহার 'বিজ্ঞাপন'-এর তারিখ :—"সিমুলিয়া কার্ত্তিক,—১২৮০।"

চন্দননগর লাইব্রেরী ও বাগবাজার রিডিং লাইব্রেরী :—

১০। ধর্ম্ম-বিজয় নাটক। শ্রীরামনারায়ণ তর্করত্ন প্রণীত। হরিনাভি বঙ্গ নাট্যসমাজের সম্পাদক শ্রীকালীপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক প্রকাশিত। 'যতো ধর্ম্মস্ততো জয়ঃ।' হরিনাভি। ইষ্ট ইণ্ডিয়া প্রেসে মুদ্রিত। ১২৮২।"

"বিজ্ঞাপন। সুপ্রসিদ্ধ নাটককার শ্রীযুক্ত পণ্ডিত রামনারায়ণ তর্করত্ন হরিশ্চন্দ্রের আখ্যায়িকা অবলম্বন করিয়া এই ধর্ম্ম-বিজয় নাটক খানি প্রণয়ন করিয়াছেন।…

ইহার শেষ ভাগে যে সকল সঙ্গীত সন্নিবেশিত হইল, তজ্জন্য শ্রীযুক্ত বাবু কালীকুমার চক্রবর্ত্তী এবং শ্রীযুক্ত বাবু কালীনাথ সান্যাল মহাশয়ের নিকট কৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ রহিলাম।…

হরিনাভি ২০এ ভাদ্র ১২৮২ শ্রীকালীপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য। বঙ্গ নাট্যসমাজের সম্পাদক।"

১২৮২, ১০ই ভাদ্র তারিখে রামনারায়ণ 'ধর্ম্ম-বিজয় নাটক'খানি "সভ্যগণের আকিঞ্চনে" হরিনাভি বঙ্গ নাট্যসমাজের সম্পাদক কালীপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্যকে বিক্রয় করেন।

কলিকাতা … কলেজ লাইব্রেরী :—

১১। দক্ষযজ্ঞ :—(…মাত্র) পাঁচ সর্গে সংস্কৃত খণ্ডকাব্য (১৮৮১)।

ইহা ছাড়া রামনারায়ণ এই প্রহসন ও নাটকগুলিও রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায় :—

প্রহসন :—যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল, উভয়সঙ্কট ও চক্ষুদান (১৮৬৯)।

নাটক :—ধনুর্ভঙ্গ ও কংসবধ (অপ্রকাশিত)।

রামনারায়ণের জীবন-চরিত :—

(১) "বাঙ্গালার আদি-নাটাকার" (সচিত্র)—শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়, বি-এ।—শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত "রঙ্গমঞ্চ" মাসিক-পত্রের ১৩১৭ সালের শ্রাবণ (পৃ. ২৯-৩২) এবং ভাদ্র (পৃ. ৪৯-৫১) সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

(২) "আদি বাঙ্গালা নাটকের জন্মরহস্য"—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী ("রঙ্গমঞ্চ"—১৩১৭, কার্ত্তিক, পৃ. ১২০-২৫)। 'পতিব্রতোপাখ্যান' ও 'কুলীন কুলসর্ব্বস্ব' সম্বন্ধে অনেক জ্ঞাতব্য তথ্য এই প্রবন্ধে আছে।

পাশাপাশি

শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র

মাঝখানে একটি দরমার বেড়া আছে। কিন্তু সে কোন কাজের নয়। তাহাতে আরব্রু রক্ষা হয় না।

বেড়া দরমার না হইয়া আর কিছু মূল্যবান জিনিষের হইলেও লাভ ছিল না। কল পাইখানা এক। সুতরাং সামান্য ভাড়ার ভাড়াটে দুই পরিবারের আবরুর আদর্শকে অনেকখানি নামাইয়া আনিয়া পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে খানিকটা রক্ষা না করিলে চলে না।

অসুবিধা আছে অবশ্য অনেক।

মেজ বৌ স্বামীর ভাতের থালার সামনে বসিয়া পাখা করিতে করিতে বলিল, "আর একটা একানে বাড়ি দেখ বাপু; নইলে এমন করে ত আর পারি না।"

বিধুভূষণের আপিসের সময় হইয়া আসিয়াছে। কোন রকমে বড় বড় ভাতের গ্রাসগুলা সে চর্ব্বণের হাঙ্গামা বাঁচাইয়া গলাধঃকরণ করিয়া যায়। শুনিতে পাক্ বা না পাক্ কোন উত্তর দেয় না।

মেজ বৌ বলিয়া চলিল, "কল ত একটি মিনিটের জন্যে খালি পাবার জো নেই। যখনই যাব দেখি ওদের পিসি বুড়ী বসে আছে, ধুয়ে ধুয়ে হাত পা হেজে গেল তবু বুড়ীর ছুঁচিবাই যায় না।"

বিধুভূষণের খাওয়া প্রায় তখন সাঙ্গ হইয়া আসিয়াছে। নিঃশ্বাস ফেলিবার অবসর পাইয়া সে শুধু বলিল, "হুঁ।"

"না, শুধু হুঁ নয়, পুরোপুরি ভাড়া গুণে এত অসুবিধে কেন সইব বল ত। বাড়ি তোমায় দেখতেই হবে এবার।" গেলাসের জলটি নিঃশেষ করিয়া উঠিয়া পড়িয়া বিধুভূষণ বলিল, "পান সাজা আছে ত?"

মেজ বৌ রাগিয়া বলিল, "আছে গো আছে! এতক্ষণ ধরে ব'কে মরলুম তা মানুষ শুনলে না পাথরকে বললুম জানবার জো নেই। আমার কথায় ত তুমি গা কর না, চিরদিন দেখে আস্‌ছি।"

আঁচাইয়া আসিবার পর পান দিতে দিতে মেজ বৌ আবার বলিল, "তোমার কি বল না! ঝক্কি ত আর তোমায় পোয়াতে হয় না। দিব্যি বাইরে বাইরে থাক, বাড়িতে এসে বাড়া ভাতটি খাও আর নাক ডাকাও।"

বিধুভূষণ জামার বোতাম লাগাইতে লাগাইতে বলিল, "হুঁ।"

"একদিন আমার জায়গায় থাকৃতে হ'ত ত বুঝতে, এমন করে একসঙ্গে থাকার কি জ্বালা! চার বছরের ছেলেটাকে পর্য্যন্ত সামলান দায়! এই এটা ভাঙছে, এই সেটা ফেল্‌ছে! তা মা কি শাসন করবে একটু?"

বিধুভূষণ জুতা পায়ে গলাইয়া একবার একসঙ্গে অনেকগুলা কথা বলিয়া ফেলিল—"কাপড়টা রিপু করতে ভুলো না যেন—নইলে অমনি ধোপার বাড়ি চলে যাবে।"

মেজ বৌ অত্যন্ত চটিয়া গিয়া জবাব দিল—"যাবে ত যাবে! পারব না আমি। বকে বকে আমার মুখে ব্যথা হয়ে গেল তাতে একটু ভ্রূক্ষেপও নেই, না?"

কিন্তু বিধুভূষণ ততক্ষণে সদর দরজা পার হইয়া গিয়াছে।

মেজ বৌ স্বামীকে চেনে সুতরাং রাগ তাহার বেশীক্ষণ থাকে না। ওই লোকটির কাছে মানুষের ভাষা যে একটা বাহুল্য বিলাস মাত্র এবং অত্যন্ত প্রয়োজনে ছাড়া সে যে তাহা ব্যবহার করিতে একবারে নারাজ, একথা এই দশ বৎসরের বিবাহিত জীবনে সে ভাল করিয়াই বুঝিয়াছে। সুতরাং খানিক আপন মনে গজ-গজ করিয়া সে চুপ করে।

ওধারের ঘর হইতে অমল ডাকিয়া বলিল, "শীগগির শুনে যাও বৌদি, তুমি না বিচার করলে চল্‌বে না।" এবং বৌদির সাড়া দিতে বিলম্ব দেখিয়া নিজেই একহাতে স্ত্রীকে এবং অপর হাতে ছেলেকে টানিয়া আনিয়া হাজির হইল।

মেজ বৌকে হাসিয়া ফেলিয়া জিজ্ঞাসা করিতেই হইল, "আবার কি হ'ল ?"

অমল উত্তেজিত কণ্ঠে বলিল, "দেখ দিকি আস্পর্দ্ধা তোমার জায়ের !"

স্ত্রী কাননবালা তাহার হাত ছাড়াইবার চেষ্টা করিয়া চাপা রাগের স্বরে তাহার কথায় বাধা দিয়া বলিল, "বুড়ো মদ্দ ! এখনও ন্যাকামি গেল না। এক্ষুণি পিসিমা এসে পড়বে। ছাড় হাত।"

অমল বেশ ভাল করিয়া তাহাকে ধরিয়া রাখিয়া বলিল, "উহুঁ আগে বিচার হোক্।" তাহার পর বৌদির দিকে ফিরিয়া বলিল, "এই যে চাঁদের মত ছেলেটি দেখছ বৌদি, তোমার জা বলে কিনা ও মামাদের দিক থেকে সুন্দর হয়েছে।"

মেজ বৌ হাসিয়া ফেলিল, অমল গম্ভীর স্বরে বলিল, "হাসির কথা নয় বৌদি ! তোমায় বিচার করতে হবে। ওর মামাদের ত সেদিন দেখলে বৌদি। বিধাতা গড়া শেষ করতে-না-করতে কোন রকমে পৃথিবীতে গলে পড়েছে ব'লে মনে হ'ল কিনা বল ! আর এই ছেলে বলে কি না তাদের মত।"

কাননবালা রাগিয়া হাত ঝাঁকানি দিয়া বলিল, "যাও ! বেহায়া কোথাকার !" ছোট ছেলেটি হাসিয়া উঠিল।

মেজ বৌ হাসিয়া বলিল, "তা আমি কি বিচার করব ?"

"কেন ! এই পদ্মপলাশ চোখ, এই বাঁশির মত নাক, এই তপ্তকাঞ্চনের মত রঙ সব আমার মত, তাই বল্‌বে ! তোমার ত সোজা রায় পড়ে রয়েছে। পা-গুলো হয়ত মামাদের মত গোদা গোদা ; ওইটুকু শুধু তোমার রায়ে জুড়ে দিতে পার।"

"যেমন রূপ তেমনি কথার ছিরি" বলিয়া কানন এবার হঠাৎ ঝাঁকানি দিয়া হাত ছাড়াইয়া পলাইয়া গেল।

অমল বলিল, "তাহলে আমার পক্ষেই এক তরফা ডিক্রি ত বৌদি ?"

মেজ বৌ হাসিতে লাগিল।

*

অমল কথা বলে একটু বেশী। হাসি তামাশা করিতে গিয়া একটু বাড়াবাড়িই হয়ত করিয়া ফেলে, কিন্তু তাহার উপর বিরক্ত হইতে মেজ বৌ পারে না। তাহার আচরণে কথাবার্ত্তায় কোথায় যেন সত্যকার একটি সরলতা আছে।

অসহ্য তাহার স্ত্রী কাননবালার ব্যবহার। মেয়েটি যেমন স্বার্থপর তেমনি অহঙ্কারী।

মেজ বৌ গোপনে স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিল, "হ্যাঁগা বি-এ পাস না হ'লে নাকি বায়স্কোপের টিকিট বিক্রীর কাজে নেয় না।"

বিধুভূষণ ঈষৎ হাসিয়া বলিল, "শুনিনি ত এমন কথা !"

মেজ বৌ আশ্বস্ত হইয়া বলিল, "বাবা, আমার সঙ্গে কি তর্কটাই না করলে কানন, ওর বর নাকি বি-এ পাস ! তা না হ'লে বায়স্কোপের টিকিট বিক্রি কাউকে করতেই দেয় না।"

একটু হাসিয়া মেজ বৌ আবার বলিল, "দোষের মধ্যে আমি শুধু বলেছি 'সেবারে উনি অসুখে না পড়লে বি-এ পাস হতেন।' অমনি বলে কি না, 'আমাদের উনি ভাই কিন্তু বি-এ পাস দিয়ে জলপানি পেয়েছেন।' হ্যাঁগা, বি-এ পাস দিয়ে জলপানি পেলে কি বায়স্কোপের টিকিট বিক্রী করে ?"

বিধুভূষণ চোখ বুজিয়া শুইয়া রহিল, উত্তর দিল না।

মেজ বৌ বলিল,—"আমি বাপু আর সহ্য করতে পারলুম না, দিয়েছি ওকথা বলে। তারপর আমার সঙ্গে কি ঝগড়া ! বলে ও ত বি-এ পাসেরই চাকরি ! মেয়েটার দেমাক দেখলে গা জ্বলে যায়।"

স্বামীর নাক-ডাকার শব্দ পাইয়া মেজ বৌ বলিল, "বাঃ ঘুমোচ্ছ নাকি !"

বিধুভূষণ সংক্ষেপে বলিল, "না।"

মেজ বৌ উৎসাহিত হইয়া বলিয়া চলিল, "বর ত টিকিট বিক্রী ক'রে পঁচিশটে টাকা মাইনে পায়, তার বড়াই কত ! লাখ পঞ্চাশ ছাড়া কথা নেই মুখে। সেদিন তুমি আম এনেছিলে না ! তা ছেলেটার জন্যে দুটো দিতে গেলাম ! ওমা, কোথায় খুশী হবে তা না বলে কিনা 'দিচ্ছ

ত ভাই, আমার ছেলের মুখে ও আবার রুচলে হয়, দিশী আম খাওয়া ওদের অভ্যাস নেই কিনা।' তারপর ওঁর বাপের বাড়িতে ন্যাংড়া ফজলী ছাড়া কিছু ঢোকবার হুকুম নেই, কি তার আদিখ্যেতার গল্প! নেহাৎ ছেলেটা খেতে পাবে না, নইলে আমগুলো সেদিন ফিরিয়েই আনতাম।"

বিধুভূষণের নাক-ডাকার শব্দ ততক্ষণে ক্রমশঃ প্রবল হইতে সুরু করিয়াছে।

"ভাল লোকের সঙ্গে গল্প করতে এসেছিলাম" বলিয়া মেজ বৌ উঠিয়া গেল।

*

ছোট একটি বাড়ির মধ্যে শুধু দারিদ্র্যের প্রয়োজনে দুইটি পরিবার এমনি করিয়া জোড়াতালি দিয়া বাস করে।

গরমিল যথেষ্ট আছে কিন্তু মিলও একেবারে নাই বলা যায় না।

অমল আসিয়া রান্নাঘরে চুপি চুপি বলিল, "শুন্‌ছ বৌদি, দাদা আছে নাকি ঘরে?"

চুপি চুপি কথা শুনিয়া অবাক হইয়া মেজ বৌ বলিল, —"না, কেন বল ত!"

"নেই ত? বাঁচলাম বাবা! সত্যি কথা বলতে কি বৌদি, দাদাকে দেখলেই আমার ভয় করে। ওই যে মুখে কথাটি নেই, ও-সব লোক সোজা নয়। দাদা আমার দিকে চাইলেই ত আমার মনে হয় ভাঁড়ার ঘরে আমসত্ত্ব চুরি করতে গিয়ে বুঝি সবেমাত্র ধরা পড়ে গেছি, এক্ষণি কান মলে দেবে।"

মেজ বৌ হাসিয়া বলিল—"এবার না হয় তাই দিতে বল্‌ব। কিন্তু ব্যাপারটা কি?"

অমল গলার স্বর নামাইয়া আবার বলিল, "পিসিমাকে একটু ক্ষ্যাপাতে হবে! দোহাই বৌদি. তোমার না গেলে চলবে না।"

মেজ বৌ আপত্তি করিয়া বলিল,—"না না, বুড়ো মানুষ! ও সব আমি ভালবাসি না।"

কিন্তু অমল ছাড়িবার পাত্র নয়। হাতজোড় করিয়া বলিল—"তা হবে না বৌদি, তুমি না এলে মজাই হবে না।"

মেজ বৌ তথাপি আপত্তি করিল, কিন্তু অমলের অনুরোধ এড়ান অসম্ভব। হাতে-পায়ে ধরিয়া শেষ পর্য্যন্ত সে তাহাকে নিমরাজী করাইয়া ছাড়িল।

পিসিমার সবে তখন আহ্নিক সারা হইয়াছে।

অমল গিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়িয়া বলিল, "পিসিমা, এদিকে ত সর্ব্বনাশ হয়ে গেছে, শুনেছ ত!"

পিসিমা উদ্‌গ্রীব হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"না বাবা, কি হ'ল কি?"

পরম বিস্ময়ের ভাণ করিয়া অমল বলিল,—"বাঃ, জান না তুমি। কাল সারা কলকেতার লোক যে প্রাচিত্তির করবে।"

পিসিমা অবাক্ হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"কেন বাবা?"

"কেন! ওই বৌদিকেই জিজ্ঞেস কর না। দাদা ত আজ খবরের কাগজেই পড়েছে। কাল জল খেয়েছিলে ত? কলের জল!"

পিসিমা ঘাড় নাড়িয়া জানাইলেন যে খাইয়াছেন।

"তবেই সর্ব্বনাশ হয়েছে! একেবারে সদ্য মোষের রক্ত!"

পিসিমা শিহরিয়া উঠিয়া বলিলেন,—"বলিস্ কিরে, মোষের রক্ত কি?"

"আর কি! কাল কলের জলের ট্যাঙ্কে কেমন ক'রে একটা মোষ পড়ে গেছল যে। অনেক কষ্টে সেটা তুলে ফেলেছে কিন্তু তোলবার পর দেখা গেল, মোষের একটা পা কাটা। সে পাটা ট্যাঙ্কের ভেতরেই পড়ে আছে।"

পিসিমা রুদ্ধ নিঃশ্বাসে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তারপর—"

অমল গম্ভীর ভাবে বলিল—"তারপর খোঁজাখুঁজি। কিন্তু কোথায় পাবে সে ঠ্যাং! জলের কলের চাকায় ছাতু হয়ে ততক্ষণ সে শহরময় লোকের পেটে চলে গেছে।"

জলের কলে এমনটি হইতে পারে কি না সে প্রশ্ন পিসিমার মনে জাগিল না। অত্যন্ত শুচিবায়ুগ্রস্ত লোক, তিনি ভীত স্বরে বলিলেন—"তাহ'লে কি হবে বাবা!"

হতাশ স্বরে অমল বলিল, "হবে আর কি!

পণ্ডিতেরা ত ব্যবস্থা দিয়েই দিয়েছে এরই মধ্যে। বল না বৌদি, দাদা আজ খবরের কাগজ পড়ে কি বললে!"

মেজ বৌ ও কানন অনেক কষ্টে হাসি চাপিয়া রাখিল।

অমল বলিল—"দেশসুদ্ধ লোকের প্রাচিত্তির। সোজা কথা ত নয়। গরীব বড়মানুষ সবার কুলোন ত চাই! তা ব্যবস্থা ভালই হয়েছে। ক্ষেমতা না থাকলে কমপক্ষে তিনটি ব্রাহ্মণ ভোজন আর ঠাকুরের স্থানে সাড়ে পাঁচ আনার পুজো। এ আর বেশী কি বল!"

পিসিমার একটু হাতটানের অখ্যাতি আছে। কিন্তু দেশসুদ্ধ লোক প্রাচিত্তির করিলে তিনি কেমন করিয়া চুপ করিয়া থাকেন। অমল বৌদির দিকে চোখ টিপিয়া ইসারা করিয়া বলিল—"আমি আর দাদা ত আছিই—পাশের বাড়ির নন্দকেও বলা যাক্ তাহলে, কি বল?" মেজ বৌ ও কানন মুখে কাপড় চাপা দিয়া পলাইয়া গেল।

আর একটি মিলনের সূত্র ছেলেটি।

ছেলেটা অত্যন্ত হ্যাংলা। যখন-তখন আসিয়া সে হাত পাতিয়া দাঁড়ায়। একটা কিছু ভোজ্যদ্রব্য না পাইলে নড়িবার নাম করে না। সুবিধা থাকিলে চুরি করিয়া লইয়া যাইতে তাহার কিছুমাত্র আপত্তি নাই।

মেজ বৌয়ের ছেলেপুলে নাই। হইবার আশাও নাই। অনভ্যস্ত বলিয়া ছেলেটার দুরন্তপনায় এক এক সময়ে সে ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠে, কিন্তু তাহাকে দূরে ঠেলিয়াও রাখিতে পারে না। ছেলেটা কেন বলা যায় না তার অত্যন্ত ন্যাওটা হইয়া পড়িয়াছে।

সকাল হইতে না হইতে যে-কোন উপায়ে একটা বাটি কোথাও হইতে যোগাড় করিয়া সে দরজায় আসিয়া ডাকে, "জ্যোঠি, লুচি!"

কবে একদিন রাত্রে বুঝি তাহাদের লুচি হইয়াছিল। রাত্রে ঘুমন্ত থাকার দরুণ খাওয়াইতে পারে নাই বলিয়া মেজ বৌ ছেলেটার জন্য কয়েকটা লুচি তুলিয়া রাখিয়াছিল। সেই হইতে প্রতিদিন সকালে সে লুচির প্রত্যাশা করিয়া আসিয়া দাঁড়ায়। না দিলে নিস্তার নাই। কাঁদিয়া-কাটিয়া সে একাকার করে।

মেজ বৌ এক এক সময়ে এই অকারণ উপদ্রবে বিরক্ত হইয়া উঠে, কিন্তু প্রতিদিন রাত্রে সব কাজ ঠেলিয়াও লুচি সে না ভাজিয়া পারে না।

স্বামী ও স্ত্রী এই দুইটি মাত্র প্রাণী লইয়া সংসার। ঘরদোর তাহাদের একটু গুছান পরিপাটি রাখাই অভ্যাস, কিন্তু খোকার জন্য আজকাল আর তাহা রাখিবার জো নাই।

তাহাদের শুইবার ঘরটাই খোকার সব চেয়ে প্রিয় খেলাঘর, বিছানার সমস্ত বালিশ একত্র করিয়া তাহার মোটর খাটের উপর তৈরি হয়। শুধু তৈয়ারী করিয়াই তাহার সুখ নাই। জ্যোঠিমাকে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া সেই মোটরের সশব্দ চলা দেখিতেও বাধ্য হইতে হয়। দরকার হইলে সে মোটরের তলায় কোন কোন দিন চাপা পড়িয়া চীৎকার না করিলেও নিস্তার নাই।

মেজ বৌয়ের আলমারিতে সাজান বহুদিনের পুতুল-গুলির এক এক করিয়া অনেকগুলিই খোকার নির্ম্মম হাতে নিধনপ্রাপ্ত হইয়াছে।

সে-সব কথা ভাবিবার কোন প্রয়োজন কোন দিন হয় নাই মেজ বৌকে আজকাল তাহা লইয়াই মাথা ঘামাইতে হয়।

দেশলাই সারাদিন তাহাকে সাবধানে লুকাইয়া ফিরিতে হয়। কেরোসিন তেল রাখিবার জন্য আলমারির উপর নূতন স্থান নির্ব্বাচন করিতে হইয়াছে। কেশ-প্রসাধনে খোকার ওই তেলটির প্রতিই পক্ষপাতিত্ব একটু বেশী।

দেরাজ হইতে সম্প্রতি তাহার নতুন একটা ভাল আসন বাহির করিতে হইয়াছে। বিধুভূষণের সকাল বিকালে চা খাইবার সময়টি খোকা ঘড়ির কাঁটার মত জানে। তখন শুধু চা পাইলেই তাহার চলে না বিধুভূষণের মত আসন ও পেয়ালা দুই-ই চাই। মেজ বৌ দু-দিন অন্য কিছু দিয়া ভুলাইবার চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু ফল হয় নাই। ভাল-মন্দের তফাৎ খোকা ভাল করিয়াই চেনে।

কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত এই খোকাকে লইয়াই একদিন এই দুই পরিবারের গভীর বিচ্ছেদ ঘটিয়া গেল।

সকাল হইতেই খোকার অসুখ। অসুখ এমন বেশী

কিছু নয়। বার-দুই বুঝি সামান্য একটু বমি হইয়াছে, পেটটাও ভাল নয়। তবে ছেলেমানুষ; তাহাতেই একটু নির্জীব হইয়া পড়িয়াছে।

মেজ বৌ সকল কথা শুনিয়া, স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিয়া হোমিওপ্যাথিক কি-একটা ঔষধ দিতে গিয়াছিল। সেখানে পিসিমার কথায় একেবারে অবাক হইয়া গেল।

পিসিমা বলিলেন, "ওষুধ ত দেবে মা, তবে কি না গোড়ায় কুড়ুল মেরে আগায় জল দেওয়াটা ত আর ভাল নয়।"

কথাটা মেজ বৌ প্রথমে ভাল করিয়া বুঝিতে না পারিয়া বিস্মিত ভাবে চাহিয়া রহিল।

পিসিমার কথাটা অস্পষ্ট রাখিবার ইচ্ছা ছিল না। কাননের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "তোমাদের কাছে যা দহরম মহরম! আমি ভয়ে কোন কথা বলি না। ভাবি, কাজ কি আমার বাপু এসব কথায় থেকে! তবে এই ক'রে বুড়ো হলুম, রাম না হ'তে রামায়ণ আমি এঁচে রেখেছি। একটা কিছু যে হবে আমি সে গোড়া-গুড়ি থেকে জানি।

কানন মুখখানা ভার করিয়া বলিল, "আমি কি করব বলুন। ওসব গলাগলি ঢলাঢলিতে আমি নেই। মানুষের নিজের যদি লজ্জা-সরম না থাকে ত কে কি করতে পারে?"

'এই লজ্জাসরমহীন মানুষ' যে কাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইতেছে তাহা বুঝিতে মেজ বৌয়ের বাকী রহিল না কিন্তু তবু এসব কথার কারণ সে আন্দাজ করিতে পারিল না।

এবার সোজাসুজিই তাহাকে সে কথা জানাইয়া দিতে পিসিমার বিলম্ব হইল না। বলিলেন, "ঠিক মাফিকসই রান্না আর কোন্ গেরস্তর হয় মা? সংসারে খাবার-দাবার বাঁচে বইকি, কিন্তু তাই ব'লে ওই দুধের ছেলেকে সেগুলো যখন-তখন কি খাওয়ায় মা! দেখছ ত মা, হাঁড়ির তলানি, পাতকুড়োন খেয়ে ছেলেটার কি অবস্থা হয়েছে?"

এই অন্যায় আক্রমণে রাগে ঘৃণায় মেজ বৌয়ের সমস্ত শরীর একেবারে রী রী করিয়া উঠিল। গত রাত্রে তাহাদের পায়েস হইয়াছিল, তাই ছেলেটাকে আদর করিয়া ডাকিয়া অন্য দিনের মতই সে খাওয়াইয়াছে। ছেলেটার আগ্রহাতিশয্যে খাওয়ানটা হয়ত একটু অতিরিক্তই হইয়াছিল, কিন্তু সেই খাওয়ানো ব্যাপারটার এমন বিকৃত করিয়া যে কেহ ব্যাখ্যা করিতে পারে, একথা তাহার কল্পনায়ও আসে নাই।

সে ক্রুদ্ধস্বরে বিদ্রূপ করিয়া বলিল, "যেচে ত দিতে আসি না পিসিমা। পেট ভরে খেতে দিতে পার না, ছেলেটা যে তাই ওই পাতকুড়োন খাবার জন্যেই হাঁ হাঁ করে বেড়ায়।"

কাননের সমস্ত রাগ পড়িল ছেলেটার উপর গিয়া। সজোরে সেই রুগ্ন শিশুর কানটাই মলিয়া দিয়া বলিল, "হ'ল ত হতচ্ছাড়া ছেলে, হ'ল ত? পই পই করে বারণ করেছি যাস্‌নি হতভাগা, যাস্‌নি। কিছুতে শুনবে না গা!"

ছেলেটা, "জ্যোঠিমা গো" বলিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

পিসিমা কিন্তু গলার স্বরে একেবারে মধু ঢালিয়া দিয়া মেজ বৌকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, "রাগের কথা ত নয় মা, ছেলেরা অমন হাঁ হাঁ ক'রে বেড়ায়! বিধেতা তোমায় বঞ্চিত করেছেন, ছেলেপুলের কথা তুমি জানবেই বা কি ক'রে বল!"

মেজ বৌ আর থাকিতে পারিল না, রাগে দুঃখে অভিমানে কাঁদ-কাঁদ হইয়া সেখান হইতে চলিয়া আসিল। কিন্তু পিসিমার শেষ কথাগুলি তবু তাহার শুনিতে বাকী রহিল না। পিসিমা বলিতেছিলেন, "ভয় ত আমার ওই জন্যেই বৌমা। কপালে যাদের আদর করা নেই, তাদের আদর যে সয় না কিছুতে—শাপ হয় যে!"

সঙ্গে সঙ্গে ছেলেটার কান্নাও শোনা গেল— "জ্যেঠিমার কাছে যাব" বলিয়া সে বায়না ধরিয়াছে।

মেজ বৌ সেদিন বিধুভূষণের কাছে অভিযোগ অনুযোগ কিছুই করিল না, শুধু সংক্ষেপে জানাইয়া দিল, "এ বাড়িতে আমি কিছুতেই থাক্‌ব না, তুমি অন্য বাড়ি দেখ।"

স্ত্রীর এমন মুখের চেহারা বিধুভূষণ কখন দেখে নাই। সে শুধু বলিল, "আচ্ছা।"

*

খোকার অসুখ অবশ্য সহজেই সারিয়া গেল, কিন্তু দুই পরিবারের ব্যবধান দূর হইল না। খোকা এখনও মাঝে মাঝে মায়ের সতর্ক দৃষ্টি এড়াইয়া জ্যোঠিমার কাছে আসিয়া দাঁড়ায়, কিন্তু মেজ বৌ দেখিয়াও ভ্রূক্ষেপ করে না, হাজার ডাকিলেও সাড়া দেয় না। খোকা কাঁদে, উৎপাত করিয়া তাহার কাছে দুর্বোধ জ্যোঠিমার এই ঔদাসীন্য দূর করিবার চেষ্টা করে, কিন্তু কোন ফল হয় না। শেষ পর্য্যন্ত পিসিমা বা কানন আসিয়া তাহাকে জোর করিয়া তুলিয়া লইয়া যায়। বিধুভূষণ স্বভাবতই নির্ব্বাক, এই বিবাদের ফলে তাহার কোন পরিবর্ত্তন চোখে পড়ে না। আর পরিবর্ত্তন হয় না শুধু অমলের। এসব ব্যাপারের কিছুই সে জানে না। তেমনিই আগের মত সে হাসি-ঠাট্টা করে। মেজ বৌকেও বাধ্য হইয়া উৎসাহ না হোক সায় দিতে হয়।

ইহারই ভিতর একদিন শোনা গেল অমলের টিকিট-বিক্রীর চাকরিটি গিয়াছে।

অমল বলিল, "চাকরি এ বাজারে আর মিলবে না, বৌদি। ভাবছি এবার লোটাকম্বল নিয়ে বেরিয়েই পড়ব। বৌটাকে দিও বাপের বাড়ি পাঠিয়ে। পিসিমার দশ টাকা মাসহারা আছে; কাশীবৃন্দাবন যেখানে হোক থাকলে চলে যাবে। দাদাকে ব'লে ছেলেটাকে শুধু তোমাদের হাতে দিয়ে যাব। মানুষ করবে ত?"

মেজ বৌকে বাধ্য হইয়া একটু হাসিমুখ দেখাইতে হয়।

কয়েক দিন পরে স্বামীকে ঘরের মধ্যে ডাকিয়া মেজ বৌ অত্যন্ত গম্ভীরভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি বাড়ি দেখছ কি!"

বিধুভূষণ জিজ্ঞাসা করিল, "কেন?"

মেজ বৌ রাগিয়া উঠিয়া বলিল, "এখনও কেন জিজ্ঞাসা করছ? অমল ঠাকুরপোর ত চাকরি গেছে। অন্য খরচ দূরের কথা দুবেলা খাবার পয়সা নেই। সমস্ত বাড়ির ভাড়াটা কি একলা গুণবে?"

বিধুভূষণ চুপ করিয়া রহিল।

মেজ বৌ হাতের তেলের টিনটা তাহার সামনে সশব্দে নামাইয়া রাখিয়া বলিল—"আরও বুঝতে চাও ত এই দেখ। মাসের সবে সাত দিন, এক টিন তেলের সিকি ভাগও খরচ করি নি। আর দেখ দিকি তেল একেবারে তলায় গিয়ে ঠেকেছে।"

বিধুভূষণ বিস্মিত হইয়া চাহিয়া দেখিল। মেজ বৌ বলিল, "অত যার দেমাক তার এত হীন পিরবিত্তি হবে আমি সত্যি ভাবতে পারিনি, ছি, ছি! এ নিয়ে আমি ঝগড়া করতে পারব না বাপু, তুমি বাড়ি দেখবে কি না বল?"

"দেখছি" বলিয়া বিধুভূষণ চলিয়া গেল।

সামান্য সামান্য জিনিষপত্র চুরি তাহার পর চলিতেই থাকিল। মেজ বৌ বাধ্য হইয়া রান্নাঘরে তালা লাগায়। কাননদের অভাব সে বোঝে, কিন্তু সামনা-সামনি চাহিতে যাহার অহঙ্কারে আঘাত লাগে গোপনে তাহার চুরি করিতে বাধে না দেখিয়া তাহার কাননের উপর ঘৃণার আর অবধি থাকে না। এক হিসাবে কাননের এই পরাজয়ে তাহার উল্লসিত হইবার কথা, কিন্তু শুধু অমলের আর ছেলেটার কথা ভাবিয়া কাননের এই দর্প চূর্ণ হওয়াতেও কেন বলা যায় না সে সুখী হইতে পারে না।

অমল সারা দিন বৃথা চাকরির চেষ্টায় ঘুরিয়া শুষ্ক মুখে রাত্রে বাড়ি ফেরে, কিন্তু মুখে তাহার তবু হাসি মুছিতে চায় না।

সেদিন মেজ বৌকে ডাকিয়া বলিল, "আর ভাবনা নেই বৌদি, আজ কি হয়েছে জান?"

মেজ বৌয়ের নীরবতা লক্ষ্য না করিয়াই বলিল, "রাস্তায় ঘুরতে ঘুরতে হায়রাণ হয়ে এক জায়গায় একটু দাঁড়িয়েছি এমন সময় দেখি না, আমার পাশ থেকে সতৃষ্ণনয়নে একজন আমার দিকে চেয়ে আছে। সে কি কাতর চাউনি যদি দেখতে বৌদি! না না, ভিখিরী ভেবো না যেন—গণক ঠাকুর গো, গণক ঠাকুর! রাস্তার ধারে বটতলার ছাপান একটা এক পয়সার হাত-আঁকা বই পেতে সারাদিন বসে থাকে। দেখে সত্যি দয়া হ'ল। পকেট হাতড়ে দেখি দুটো পয়সা আছে।"

মেজ বৌ রুটি বেলিতেছিল। তাহার হাত হইতে বেলনটা কাড়িয়া লইয়া অমল বলিল, "আহা, রুটি পরে

বেলবে'খন, গল্পটাই শোন আগে! ভাবলাম ছুটো পয়সায় না-হয় পানবিড়ি আজ নাই খেলাম, এ বেটার চিঁড়ে গুড় ত হবে। তার সামনে গিয়ে দিলাম তারপর হাতটা বাড়িয়ে। কি তার আহ্লাদ যদি দেখতে! হাতটা নিয়ে কি করবে, সে যেন ভেবেই পায় না। তারপর কি বল্‌লে জান?"

মেজ বৌ নিজের অজ্ঞাতে কৌতূহলী হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি বল্‌লে?"

মুখের এক অপরূপ ভঙ্গী করিয়া অমল বলিল, "এই সামনে আষাঢ় মাস আসছে না, তার পনেরইটি পেরুতে দাও। তারপর আমিই বা কে, আর গাইকওয়াড় অফ্‌ বরোদাই বা কে? একটা অত্যন্ত কুচক্রে কুরুটে গ্রহ—নামটা ভুলে গেছি বৌদি—বেটার আকাশে বোধ হয় কোন কাজ নেই, তাই আমার পেছু নিয়ে এই সব বিপদ ঘটিয়েছে। কিন্তু এত অবিচার সইবে কেন! আষাঢ়ের পনেরই গেলেই বাছাধন একেবারে কাবু হয়ে যাবেন। তারপর যাতে হাত দেব তাতেই সোনা ফলবে। মিছে কথা নয় বৌদি, গণৎকার এমনি করে পৈতেটি বার ক'রে ধরে আমার হাতে হাত দিয়ে বলেছে—রাস্তার ধারে বসে ব'লে তাকে হেলাফেলা যেন না করি, কত বড় বড় রাজার বাড়ি তার পায়ের ধুলো পাবার জন্য ব্যাকুল। সুতরাং আমার ভাগ্য ফিরবেই; আর তখন যেন এসে আমি তার সঙ্গে দেখা করে যাই।"

একটু থামিয়া অমল বলিল, "তাকে একটি ভাল ক'রে নমস্কার ক'রে বল্‌লাম, ঠাকুর তোমার গণনায় আমার অটল বিশ্বাস। আজ এই দু-পয়সা আগাম দিলাম, তারপর আমার হাতে প্রথম যে সোনা ফলবে ঝুড়িসুদ্ধ এনে তোমার কাছে নামিয়ে দেব, এই কথা রইল। লোকটা কিন্তু যেরকম ভাবে আমার দিকে চাইল বৌদি, তাতে সে আমাকে না তার গণনাকে অবিশ্বাস করলে ঠিক বুঝতে পারলাম না!"

অমলের উচ্চ হাসিতে মেজ বৌও এবার যোগ দিল। এ বাড়ির ভিতরকার গুমোট তাহাদের হাসিতে কিছুক্ষণের জন্য যেন কাটিয়া গেল মনে হইল। কিন্তু সে আর কতক্ষণ!

*

বিধুভূষণ বাড়ি দেখিয়াছে। কয়েক দিনের ভিতর তাহারা উঠিয়া যাইবে তাহাও ঠিক হইয়াছে। ইহার ভিতর হঠাৎ একদিন অমলদের সংসারের সত্যকার অবস্থা উপলব্ধি করিয়া মেজ বৌ একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গেল। তাহাদের দুরবস্থা হওয়া আশ্চর্য্য নয়, কয়েক দিন বাসন-ওয়ালার কাছে বাসন-কোষন বিক্রয় করিয়া তাহাদের চলিতেছে একথাও সে জানে, কিন্তু সংসার তাহাদের এরই মধ্যে এতদূর অচল হইয়াছে সে ভাবে নাই।

ছেলেটা আজকাল তাহার নিরবচ্ছিন্ন ঔদাসীন্য দেখিয়া কি ভাবিয়া বলা যায় না, কাছে বড়-একটা ঘেঁষে না। তবুও সেদিন সকাল হইতে তাহার রান্নাঘরের দরজা দিয়া কাতর নয়নে বার-দশেক সে ঘুরিয়া গিয়াছে, মেজ বৌ জানে। গোপন ইচ্ছা হাজার থাকিলেও মেজ বৌ তাহাকে ডাকিতে সাহস করে নাই।

এইবার রান্নাঘর হইতে সে শুনিতে পাইল ছেলেটা কাঁদিতেছে। সকাল হইতে লুচি খাইবে বলিয়া সে বায়না ধরিয়াছে। তাহার বদলে তাহাকে বুঝি মুড়ি দেওয়া হইয়াছে, সে তাহা খাইতে চায় না।

অন্যদিনও সে এমনি করিয়া বায়না ধরে কিন্তু কিছুক্ষণ বাদেই ভুলিয়া যায়। আজ কিন্তু কেন বলা যায় না, তাহার কান্না আর কিছুতেই থামিতে চায় না। কানন ও পিসিমা তাহাকে ভুলাইবার নানা চেষ্টা করিয়া অবশেষে হার মানিল। কানন রাগিয়া পিঠে তাহার এক ঘা চড় বসাইয়া দিল। ছেলেটার কান্না আরও প্রচণ্ড হইয়া উঠিল।

রান্নাঘরে বসিয়া কাজ করিতে করিতে মেজ বৌ সমস্তই শুনিতে পাইল। নিজের অহঙ্কার বিসর্জ্জন দিয়া একবার তাহার ইচ্ছা হইল ছেলেটাকে ধরিয়া তুলিয়া লইয়া আসে, কিন্তু পিসিমার সেদিনের শ্লেষকথাটা সে কিছুতেই ভুলিতে পারে নাই। মেয়েমানুষের অতিবড় বেদনার স্থানে অমন করিয়া আঘাত যাহারা দিয়াছে, তাহাদের কাছে কেমন করিয়া আর ছোট হওয়া যায়?

তাহার রান্নাঘরের পাশেই কাননদের শোবার ঘর—সেখান হইতে পিসিমার উচ্চকণ্ঠ আজ স্পষ্টই শোনা

গেল। আজ আর তাঁহার কিছু গোপন রাখিবার প্রয়াস নাই।

কানন বলিল, "তোমার পায়ে মাথা খুঁড়ছি পিসিমা, চুপ করো না! মান-সম্ভ্রম কিছু কি থাকতে দেবে না?"

পিসিমা উষ্ণ স্বরে বলিলেন, "কি আমার নবাবের বৌ-গো; তার আবার মান-সম্ভ্রম। আমি বলে আধ-পেটা খেয়ে উপোস করে দিন কাটাই। দশটি টাকা সম্বল। তা সব ডেঁড়েমুষে খেয়ে আবার বলে মানসম্ভ্রম! নবাবের বেটা আবার বলে, লুচি খাব। চাল বিনে আজ হাঁড়ি চড়বে না যে রে হতভাগা! লুচি খাবি কি, তোর বাবা যে একমাসে একটা পয়সা ঠেকাতে পারেনি, সব যে এই বুড়ীর ঘাড় দিয়ে চলছে!"

মেজ বৌ আর শুনিতে পারে না। রান্নাঘরের দরজাটা ভেজাইয়া ধীরে ধীরে নিজের ঘরে চলিয়া গেল।

কিন্তু সেখানে গিয়াও নিস্তার নাই। পিসিমার কণ্ঠস্বর ও খোকার কান্না সেখানেও সমান পৌছায়।

মেজ বৌ উঠিয়া পড়িল এবং কিয়ৎক্ষণ বাদে কাননদের দরজায় গিয়া ডাকিল, "পিসিমা।"

পিসিমা বিস্ময়ে নির্ব্বাক হইয়া তাহার দিকে তাকাইয়া রহিলেন। তাঁহার মুখে কথা সরিল না। হাতের থালাটা আগাইয়া দিয়া মেজ বৌ বলিল, "আর-মাসে একদিন ছু-কুনুকে চাল ধার করেছিলাম তাই দিতে এলাম।"

থালার উপরকার চাল কিন্তু ছু-কুনুকের কিছু বেশী বলিয়াই মনে হইল এবং তাহার সহিত অন্যান্য যে-সমস্ত জিনিষপত্র দেখা গেল সেগুলাও সম্ভবতঃ ধার করা হয় নাই।

পিসিমা বিমূঢ় হইয়া তেমনি বসিয়া রহিলেন। শুধু কানন পিসিমার দিকে ফিরিয়া বলিল, "ধার ত আমরা কই দিইনি, পিসিমা; তা ছাড়া দিলেও আমরা চাল ফেরৎ নিই না।"

এবার পিসিমার চমক ভাঙিল এবং আজ কাননের পক্ষ অবলম্বনের কোন উৎসাহ তাঁহার দেখা গেল না। অত্যন্ত রূঢ়ভাবে তাহাকে ধমকাইয়া তিনি বলিলেন, "থাক বৌমা, তোমায় অত সাউখুড়ি করতে ত কেউ ডাকেনি।"

"দাও মা দাও" বলিয়া তিনি নিজেই সাগ্রহে হাত বাড়াইয়া থালাটা নামাইয়া লইলেন।

*

অনেক রাতে সকল কাজ সারিয়া মেজ বৌ ঘরে ঢুকিয়া দরজা দিল।

বিধুভূষণ অবাক হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার হাতে কি?"

মেজ বৌ সংক্ষেপে বলিল, "কিছু না! রান্নাঘরের তালা।"

বিধুভূষণ অবাক হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তালা দিয়ে এলে না?"

মেজ বৌ অকারণে রাগিয়া উঠিয়া বলিল, "জানি না বাপু। দেখছ ত দিয়ে আসিনি!"

তাহার পর নিজের মনেই গজ-গজ করিয়া বলিল, "ঢের ঢের মেয়ে দেখেছি বাপু, এমন নচ্ছার মেয়ে হয় জানতাম না। দেমাকে এদিকে মাটিতে পা পড়ে না, অথচ চুরি করতে বাধে না।"

এসব অসংলগ্ন কথার কোন অর্থ খুঁজিয়া না পাইয়া বিধুভূষণ জিজ্ঞাসু ভাবে তাহার দিকে চাহিয়া রহিল।

মেজ বৌ তাহার সামনে আসিয়া হাত নাড়িয়া বলিল, "কি করব বল? সামনা-সামনি দিতে গেলে ত নেবেন না। নবাবের বেটীর যে তাতে মান যায়! তা ব'লে ওই দুধের ছেলেটা উপোস করে মরবে!"

বিধুভূষণ খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিল, "তাহ'লে বাড়ি বদল আর দরকার নেই?"

মেজ বৌ উচ্চস্বরে বলিল, "দরকার নেই কি রকম! অমল ঠাকুরপোর একটা চাকরি হোক্ না, তারপর এই ছোটলোকদের সঙ্গে আমি আর একদিনও থাকব ভেবেছ!"

মৃণালিনী

শ্রীমৈত্রেয়ী দেবী

পথযাত্রী ফেরে ঘরে,
বুঝি রাত্রি আসে
ছড়ায়ে উন্মুক্ত কেশ অনন্ত আকাশে,
অরণ্যের মর্ম্ম প'রে
সেই কেশছায়া পড়ে
উতল হিল্লোল
তরঙ্গে তরঙ্গে লাগে দোল
সে স্কন্দ তরঙ্গকোলে
মুদিত নয়নে দোলে
মৃণালিনী ক্ষীণ,
স্বপ্নময় তারা-জ্যোতি রবি দীপ্তিহীন।
আনন্দে অপার
বেপথু পল্লবে নামে ঘন অন্ধকার,
অরণ্য পর্ব্বতময়
আঁধারে রচিত হয়
নবমুগ্ধ মায়া।
নীল অম্বরাশি কোলে
ঘন ঘোর হয়ে দোলে
মায়াময় ঘন বনচ্ছায়া।
নাহি মেলে তল,
সে আঁধারে অশ্রুময়
ব্যথিত হৃদয়ে রয়
দুখিনী কমল।
তবু থাকে আশা
তবু আলোকের লাগি পরম পিপাসা
সুকোমল ব্যথাময় মুগ্ধ হৃদিতল
নিমেষে করিয়া দেয় সুগন্ধ উতল,
সে সুগন্ধ মধুময়
পল্লবে পল্লবে রয়
আঁধারের নেশা করে দূর
আশাভরা বিরহের ব্যথায় মধুর।
সিক্ত নদীতটপাশে
আকুল হইয়া আসে
নিশীথের হাওয়া।
সে বাতাসে হিমময়
কমলের মনে হয়
দিনের আলোতে তারে
কাছে যাবে পাওয়া।
সে রাত প্রভাত হয়
না জানি কখন
সুরভিত কুসুমের আলোকিত বন।
কমলের চিত্ত হ'তে
উদ্বেলিত সুখ
সে অরুণরাগে হয় প্রকাশ-উন্মুখ।
হৃদয়ের গাথায় গাথায়
এই উচ্ছ্বসিত রাগে
তবু কোন্ দ্বন্দ্ব লাগে
উন্মোচিত নয়নের পাতায় পাতায়।
নিশীথেরি ছায়ার সমান
এ আলো বিছান হয়
রবি বহু দূরে রয়
মাঝে তারি আলোকের তপ্ত ব্যবধান
করে ছল ছল
সে নব রবির করে
দোলে কি পাতার 'পরে
দুখিনী কমল।
দিনের আলোতে আর নাহি রয় আশা,
চরম বিরহে জাগে পরম পিপাসা।

রাজপুতানার মন্দির

শ্রীনির্ম্মলকুমার বসু

কিছুদিন পূর্ব্বে লখ্‌নৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বনামধন্য অধ্যাপক শ্রীরাধাকমল মুখোপাধ্যায় মহাশয় আগ্রা-অঞ্চলের সম্বন্ধে গবেষণা করিতে গিয়া আবিষ্কার করেন যে সে দেশের কূয়ায় আজকাল যত নীচে জল পাওয়া যায়, পূর্ব্বে তাহা অপেক্ষা আরও কাছে জল পাওয়া যাইত; তখন যত হাত দড়িতে কুলাইত আজকাল আর তাহাতে কুলায় না। ইহা হইতে মনে হয় যে, আগ্রা-অঞ্চলের জমি উত্তরোত্তর শুখাইয়া যাইতেছে। হয়ত এমন দিন আসিতে পারে যখন জলাভাবের জন্য এ প্রদেশে চাষবাস পর্য্যন্ত কঠিন ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইবে।

ইহার শেষ পরিণতি যে কি হইতে পারে তাহা রাজপুতানার পশ্চিমাঞ্চলের বর্ত্তমান অবস্থা হইতে বুঝা যায়। আরাবল্লী পর্ব্বতের পশ্চিমে রাজপুতানার যে-অংশ অবস্থিত, তাহার মধ্যে নদী নাই বলিলেই হয়। অবশ্য লুনী ও পশ্চিমা বনাস নামে দুইটি নদী থাকিলেও বৎসরের অধিকাংশ কাল তাহাতে জল থাকে না, চাষবাসও তেমন কিছু হয় না। লুনী হইতে পশ্চিমে, বায়ুকোণে বা উত্তরে যতই যাওয়া যায়, ভূমি ততই মরুভূমির আকৃতি ধারণ করে। আরাবল্লী পাহাড়ের কাছে তবু কিছু জল হয়, গরু-বাছুর ঘাস খাইতে পায়, লোকেও দুধ খাইয়া বাঁচে। কিন্তু যতই পশ্চিমে যাওয়া যায়, ততই গরুবাছুরের পরিবর্ত্তে ছাগল ও ভেড়ার পাল দেখিতে পাওয়া যায়। জয়সলমীর বা বিকানীর অঞ্চলে লোকে ছাগলের দুধ ও সেই দুধের দই খাইয়া থাকে। জলাভাবের জন্য সেদিকে গরুবাছুর পোষা যায় না।

কিন্তু এই প্রদেশটি চিরকাল যে এত শুষ্ক ছিল তাহা মনে হয় না। যোধপুর নগরী হইতে বায়ুকোণে প্রায় বত্রিশ মাইল দূরে ওসিয়াঁ নামে একটি গ্রাম আছে। ওসিয়াঁ এখন মরুভূমির মধ্যে অবস্থিত একটি ক্ষুদ্র গ্রাম হইলেও এক সময়ে ইহা খুব সমৃদ্ধিশালী নগর ছিল। বাংলা দেশে মুর্শিদাবাদ জেলায় নাহার, সিং প্রভৃতি পদবীধারী যে-সকল মারওয়াড়ী-পরিবার বাস করেন তাঁহারা সকলে ওসওয়ালী জৈন, ওসিয়াঁ তাঁহাদের আদি বাসস্থান ছিল। ওসিয়াঁতে এখনও একটি পুরাতন জৈনমন্দির ও কালীর মন্দির আছে। সেইজন্য ওসিয়াঁ রাজপুতানার মধ্যে একটি বিখ্যাত তীর্থস্থান বলিয়া পরিগণিত হয়। উল্লিখিত দুইটি মন্দির ভিন্ন ওসিয়াঁতে আরও দশ-বারটি পুরাতন ও জীর্ণ মন্দির আছে। সেগুলিতে পূজা হয় না এবং কাল-ক্রমে তাহারা ক্রমশঃ জীর্ণ হইয়া আসিতেছে। এই সকল মন্দির খৃষ্টীয় অষ্টম ও নবম শতাব্দীতে নির্ম্মিত হইয়াছিল বলিয়া জানা যায়। মন্দিরগুলি গ্রামের যেদিকে অবস্থিত তাহার কাছে একটি পুরাতন পুষ্করিণীর চিহ্নও পাওয়া যায়। পুষ্করিণীর চারিদিকে পাথর দিয়া বাঁধান ঘাট ছিল, সেগুলি আজও অটুট রহিয়াছে। কিন্তু তাহাতে এখন বিন্দুমাত্র জল নাই। কেবল গর্ত্তের শুষ্ক বালুকা-রাশির মধ্যে অসংখ্য মূষক গর্ত্ত করিয়া মনের আনন্দে বাস করিতেছে। ইহা হইতে সহস্র বৎসরের মধ্যে ওসিয়াঁর কিরূপ পরিণতি হইয়াছে তাহা বুঝিতে পারা যায়।

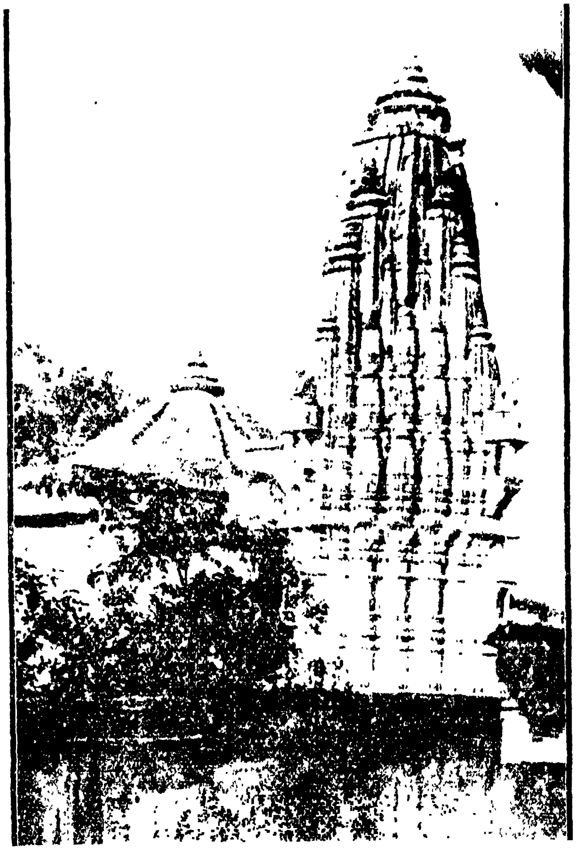
ওসিয়াঁতে আজকাল জলের এত টানাটানি যে, যে-জলে স্নান করা হয় বা কাপড় কাচা হয়, তাহাকেই চৌবাচ্চায় ধরিয়া রাখা হয়; এবং গ্রামের উট, গরু, ছাগল, গাধা প্রভৃতি সেই জলই পান করিয়া থাকে।

যোধপুর-রাজ্যে লুনী জংশন হইতে যে রেলপথটি সিন্ধু অভিমুখে গিয়াছে, তাহার পার্শ্বে বাড়মেরের সন্নিকটে দু-একটি পুরাতন মন্দির দেখা যায়। এগুলি মরুভূমির বালুকারাশির দ্বারা এমনভাবে প্রোথিত হইয়া গিয়াছে যে এখন উপর হইতে গর্ত্ত খুঁড়িয়া মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করা ভিন্ন গতি নাই। ওসিয়াঁতে একটি গল্প প্রচলিত আছে যে এক সময়ে এই প্রদেশটিতে জলের কোন অভাব ছিল না। কিন্তু কোন সময়ে স্থানীয়

লোকেরা জনৈক সাধুর প্রতি অসদ্ব্যবহার করে এবং তাঁহারই অভিশাপের ফলে দেশ ক্রমে মরুভূমিতে পরিণত হয়। অবশ্য ইহার মধ্যে কোনও ঐতিহাসিক সত্য থাকিতে পারে না, কিন্তু তবু প্রকৃতির দুর্ঘটনার জন্য মানুষ কি ভাবে নিজেদের দায়ী মনে করে তাহা ভাবিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়।

রাজপুতানার ইতিহাসের বিষয়ে মোটামুটি জানা যায় যে ইহা এক সময়ে অশোকের সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। তাহার পরে কিছুকাল ইহা সামন্ত গ্রীক ক্ষত্রপগণের করতলগত হয়। কিন্তু তাহার পরে আবার ইহা আর্য্যাবর্ত্তের হিন্দু রাজ্যমণ্ডলীর অন্তর্ভুক্ত হয়। দ্বাদশ শতাব্দীর পর হইতে মুসলমানগণ যখন গঙ্গা ও সিন্ধুনদীর তীরবর্ত্তী প্রদেশগুলি ক্রমে অধিকার করিতে লাগিলেন তখন অনেক ক্ষত্রিয় নরপতি রাজপুতানার মধ্যে যাইয়া আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং প্রায় ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত তাঁহারা মোটের উপর নিজেদের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিয়াছিলেন। এতদিন ধরিয়া হিন্দু রাজন্যবর্গের অধিকারে থাকার ফলে রাজপুতানায় অনেকগুলি দেবমন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল। আর্য্যাবর্ত্তের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া রাজপুতানায় আমরা আর্য্যাবর্ত্তে প্রচলিত যত রকম মন্দির আছে তাহার সকলগুলিই প্রায় দেখিতে পাই; কিন্তু সে-সকল মন্দিরের পরিণতি রাজপুতানায় ক্রমে একটি বিশিষ্ট ধারা অবলম্বন করিয়াছিল। আদিযুগের রাজপুত অথবা মধ্যভারতের বা উড়িষ্যার মন্দিরের যতটা মিল আছে পরবর্ত্তী কালের মন্দিরগুলিতে ততটা নাই। অর্থাৎ, রাজপুতানার শিল্পিগণ ক্রমে নিজেদের শিল্পধারায় একটি বৈশিষ্ট্য আনিয়া ফেলিলেন।

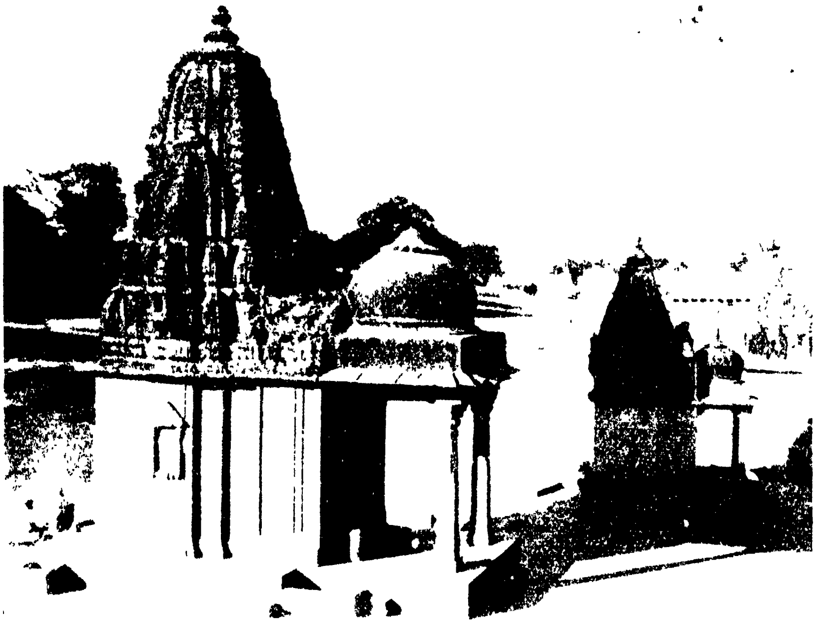
কবে, কোন্ রাজ্যে রেখমন্দির নির্ম্মাণের পদ্ধতি প্রথম প্রচলিত হয় এবং কি করিয়াই বা তাহা ক্রমে নবম শতাব্দীর মধ্যেই সমগ্র আর্য্যাবর্ত্তে ছড়াইয়া পড়ে তাহা আমাদের জানা নাই। হয়ত বিভিন্ন দেশের রেখমন্দিরের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে আমরা ক্রমে তাহা জানিতে পারিব। উপস্থিত আমরা রাজপুতানায় প্রচলিত বিভিন্ন জাতীয় মন্দিরনির্ম্মাণের পদ্ধতিগুলি ও তাহাদের ইতিহাস যথাসম্ভব আলোচনা করিব।



অম্বরের একটি মন্দির

ওসিয়াঁর রেখমন্দির উড়িষ্যার পুরাতন মন্দিরগুলির মত চতুরস্র ও তাহাদের বাড় ত্রি-অঙ্গবিশিষ্ট অর্থাৎ তাহাদের দেওয়ালের খাড়া অংশ পাদ, জাংঘ ও বরণ্ড নামক তিনটি অঙ্গের সমাবেশে রচিত হইয়া থাকে।* উড়িষ্যায় পরবর্ত্তী কালে যখন মন্দিরকে আরও বড় করিয়া নির্ম্মাণ করার আবশ্যকতা হইল, তখন শিল্পিগণ বাড়কে গণ্ডীর সঙ্গে সঙ্গে বেশ বড় করিয়া গড়িলেন, এবং জাংঘের মধ্যে বান্ধনা নামে একটি অলঙ্কার দিয়া জাংঘকে তল জাংঘ, বান্ধনা ও উপর জাংঘ এই তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া ফেলিলেন। ফলে যে বাড় তিন অঙ্গে রচিত হইত, তাহা পাঁচটি

* পারিভাষিক শব্দের অর্থের জন্য আষাঢ় মাসের 'প্রবাসী'তে 'উড়িষ্যার মন্দির' নামক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

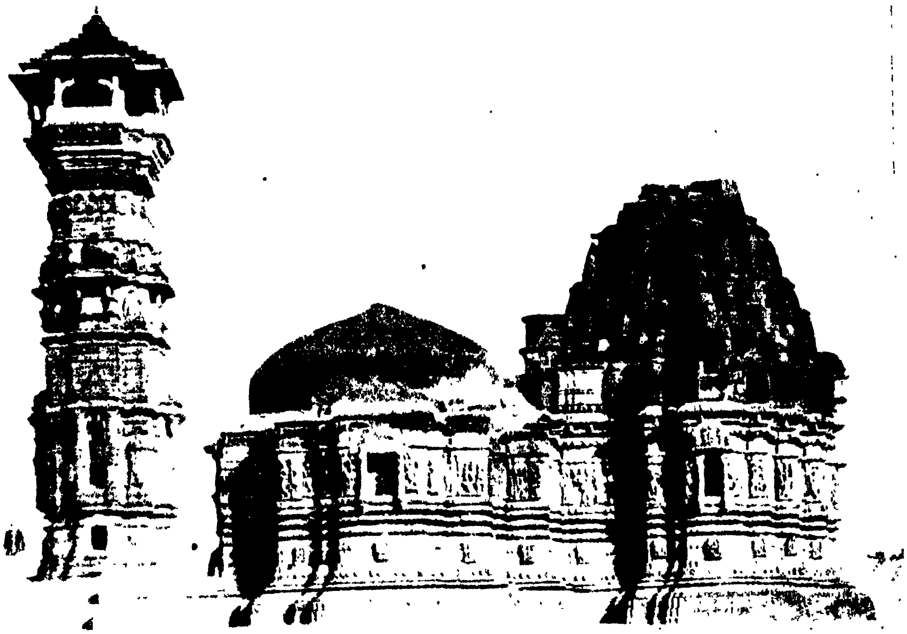


শিপ্রা তীরবর্ত্তী মন্দির—উজ্জয়িনী

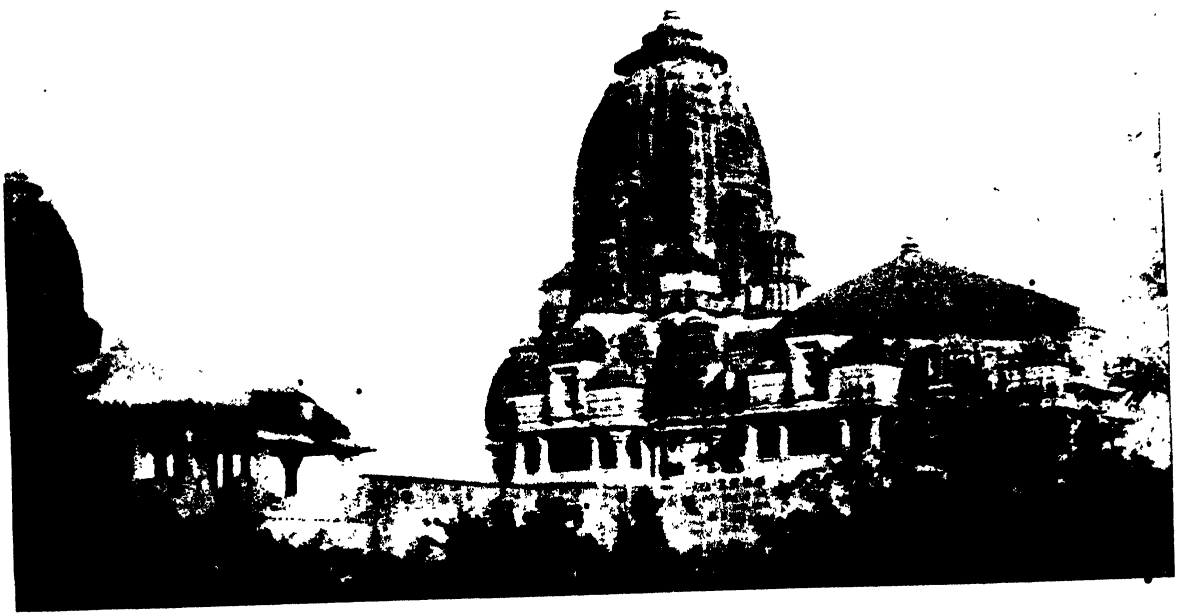
অঙ্গের দ্বারা গঠিত হইতে লাগিল। রাজপুতানার শিল্পিগণ পরবর্ত্তীকালে মন্দিরকে উচ্চ করিয়া গড়িবার সময়ে বাড়ে জাংঘকে না বাড়াইয়া পাদ ও বরণ্ডের কামগুলিকে দৈর্ঘ্যে বড় করিয়া দিতেন। জাংঘ যেমন ছিল, প্রায়ই তেমনই রহিয়া গেল। এতদ্ভিন্ন রাজপুতানায় বাড়ের পরিবর্ত্তে গণ্ডীকে অপেক্ষাকৃত বেশী উচ্চ করিয়া দেওয়া হইল। বাড়ের সহিত গণ্ডীর অনুপাত উড়িষ্যায় পূর্ব্বে ১ঃ ১৷৷০ ছিল, উত্তরকালে পঞ্চাঙ্গ-বাড়বিশিষ্ট মন্দিরের ক্ষেত্রেও তাহাই প্রায় বজায় রহিল। কিন্তু রাজপুতানায় উহা বাড়িয়া প্রায় ১ঃ২-এর কাছাকাছি দাঁড়াইয়াছিল।

রেখদেউলের গণ্ডী ভিতর দিকে ঈষৎ হেলিয়া থাকে, উপরদিকে গণ্ডীর পরিধি ক্রমে ছোট হইয়া আসে। অতএব গণ্ডীকে যত উচ্চ করা যাইবে মস্তকের পরিধিও তত ক্ষুদ্র হইয়া আসিবে। সেইজন্য মধ্যযুগে রচিত রাজপুতানার মন্দিরে মস্তকের মধ্যে আমলক এত স্বল্পাকৃতি হইয়া গিয়াছে যে উড়িষ্যায় বা ওসিয়াঁয় আমলকের জন্য মন্দির যে বিশিষ্ট শোভা ধারণ করে, তাহা হইতে সে মন্দিরগুলি বঞ্চিত হইয়া গিয়াছে। অম্বর নগরীর একটি মন্দিরের আকৃতি হইতে তাহা স্পষ্ট বুঝা যাইবে। এ মন্দিরটি সম্ভবতঃ তিন চারি শত বৎসর পূর্ব্বে নির্ম্মিত হইয়াছিল।

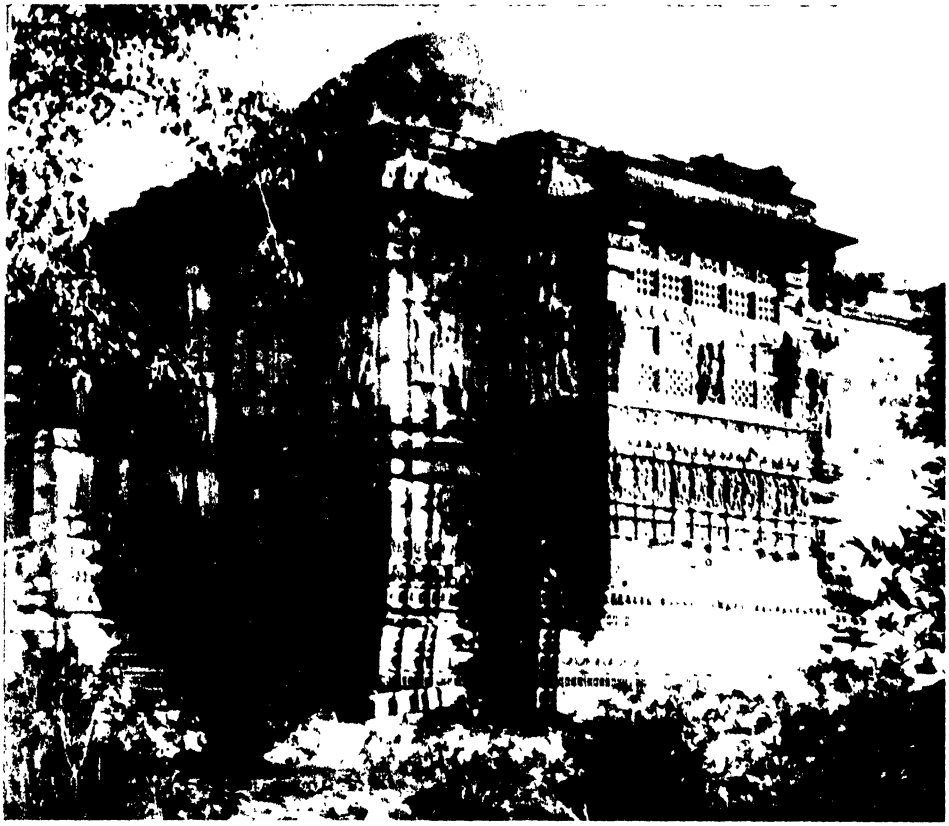
নবম শতাব্দীর উড়িয়া ও রাজপুত রেখদেউলে বাড়ের গঠন হিসাবে সাদৃশ্য থাকিলেও কয়েকটি বিষয়ে তাহাদের প্রভেদ আছে। ওসিয়াঁর প্রত্যেক মন্দির ভূমি হইতে সু-উচ্চ ও বিস্তীর্ণ মহাপিষ্টের উপরে স্থাপিত। এ হিসাবে খাজুরাহোর মন্দিরগুলির সহিত তাহাদের মিল আছে। তাহা ছাড়া ইহাদের গর্ভগৃহের দরজার ঠিক সম্মুখে একটি ক্ষুদ্র বারাণ্ডা থাকে। তাহার সামনের দিকে দুইটি কারুকার্য্যমণ্ডিত স্তম্ভ থাকে। উড়িষ্যায় এরূপ বারাণ্ডা নাই, ঠিক এই রকম ক্ষুদ্র বারাণ্ডা অপর কোথাও প্রায় দেখা যায় না। গুপ্ত-যুগের ক্ষুদ্রাকৃতি মন্দিরগুলিতে ইহা অপেক্ষা কিঞ্চিৎ প্রশস্ত বারাণ্ডা থাকিত, কিন্তু সে মন্দির রেখদেউল নহে। রেখদেউলের সম্মুখে এই জাতীয় বারাণ্ডার আভাস নর্ম্মদাতীরবর্ত্তী ওঁকারেশ্বরের মন্দিরে বা খাজুরাহোর কোন



একটি পুরাতন জৈন মন্দির, চিতোর দুর্গ



মীরাবাঈ-এর মন্দির, চিতোর



শৃঙ্গারচৌরী, চিতোর দুর্গ



পিছোলা হ্রদ ও মর্ম্মরপ্রস্তরনির্ম্মিত জগনিবাস, উদয়পুর



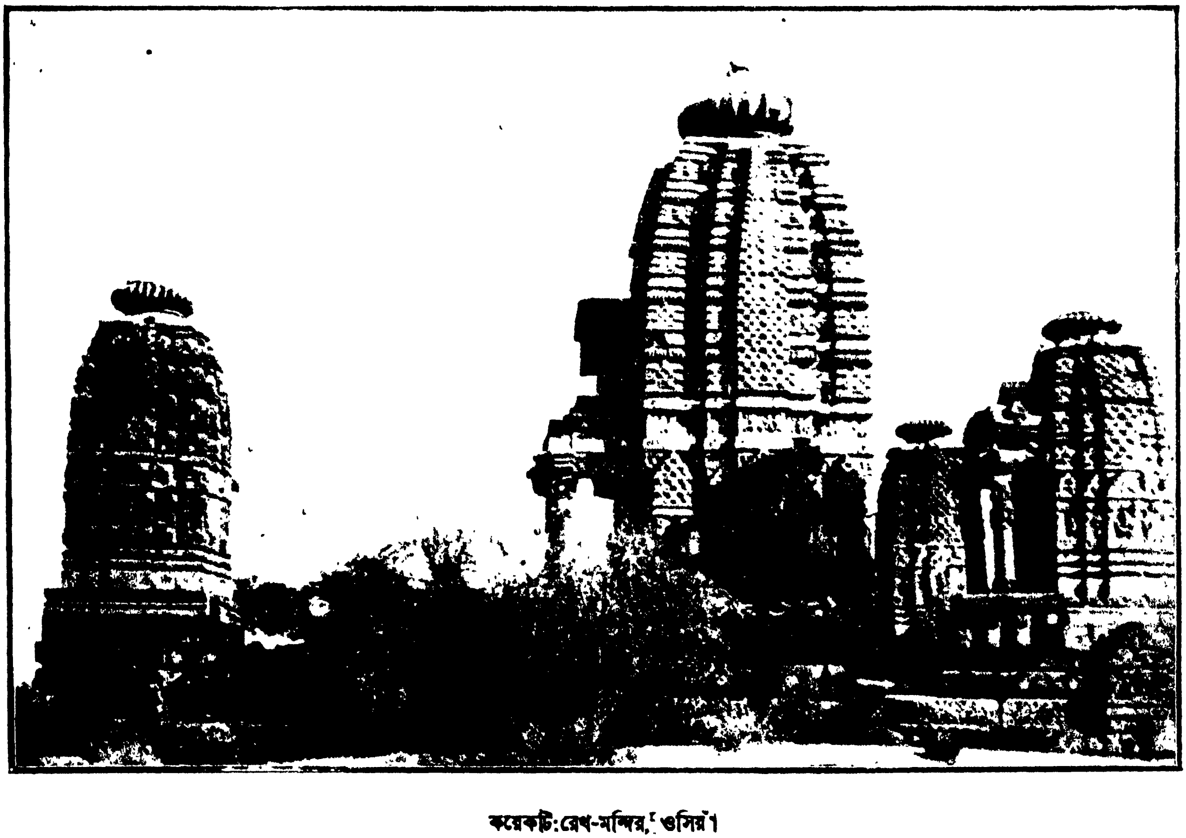
আঢ়াই-দিন-কা-ঝোঁপড়া, আজমীর



রেখ-দেউল ও ভদ্র-দেউল, ওসিয়াঁ



ওসিয়াঁয় আয়ত আসন বিশিষ্ট মন্দির



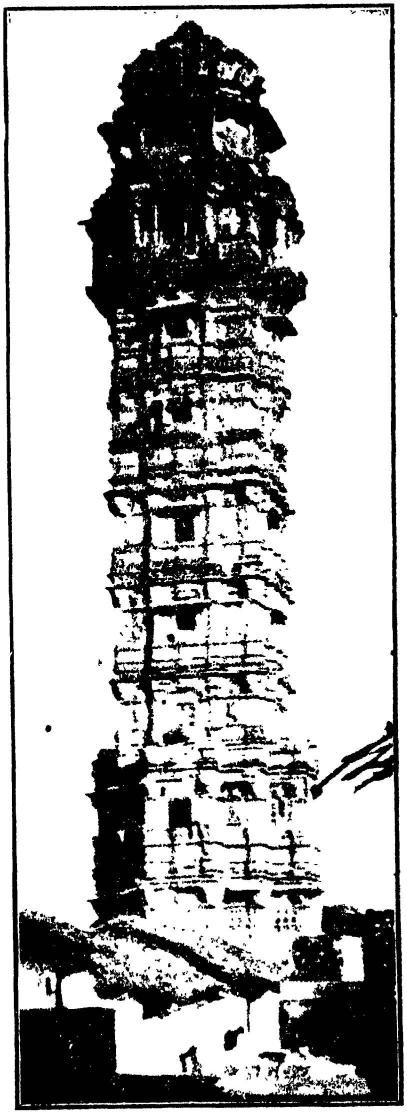
কয়েকটি রেখ-মন্দির, ওসিয়াঁ।

কোন মন্দিরে পাওয়া যায়। ওসিয়াঁতে মন্দিরের সম্মুখে কয়েক ক্ষেত্রে এই ক্ষুদ্র বারাণ্ডাটিকে বিস্তীর্ণ করিয়া অনেকগুলি স্তম্ভে শোভিত মণ্ডপ নির্ম্মাণ করা হইত। মণ্ডপের ধারে কিছু উচ্চে বসিবার জন্য পাথরের পাট বসাইয়া আসনের মত করা হইত। যাঁহারা বসিবেন, তাঁহাদের হেলান দিবার জন্য ঈষৎ হেলানো দেওয়াল সেই আসনের ধারে গড়িয়া দেওয়া হইত। এরূপ আসন খাজুরাহোতে প্রায় প্রত্যেক মন্দিরেই দেখা যায়। আর্য্যাবর্ত্তের পূর্ব্বভাগে ইহার ব্যবহার কখনও ছিল বলিয়া মনে হয় না।

রাজপুতানায় রেখ-জাতীয় বহু মন্দির থাকিলেও তদ্ভিন্ন আর কোন শৈলী প্রচলিত ছিল না, ইহা ভাবিবার কোন কারণ নাই। বস্তুতঃ ওসিয়াঁ গ্রামেই আমরা একটি ভদ্রদেউলের সন্ধান পাই। ভদ্রদেউলের আসন (ground-plan) চতুরস্র ও গণ্ডী ত্রিকোণাকৃতি এবং কতকগুলি পিঢ়ার সমাবেশে গঠিত। উড়িষ্যায় ও খাজুরাহোতে ভদ্রদেউল অনেকগুলি আছে, রাজপুতানাতেও পিঢ়ার সমাবেশে তৈয়ারী ভদ্র-জাতীয় দেউল অনেকগুলি আছে। দাক্ষিণাত্যে ভদ্রদেউল আছে বলিয়া জানা নাই; অতএব ভদ্রদেউল আর্য্যাবর্ত্তেরই আবিষ্কার বলিয়া বিবেচনা করা যাইতে পারে।

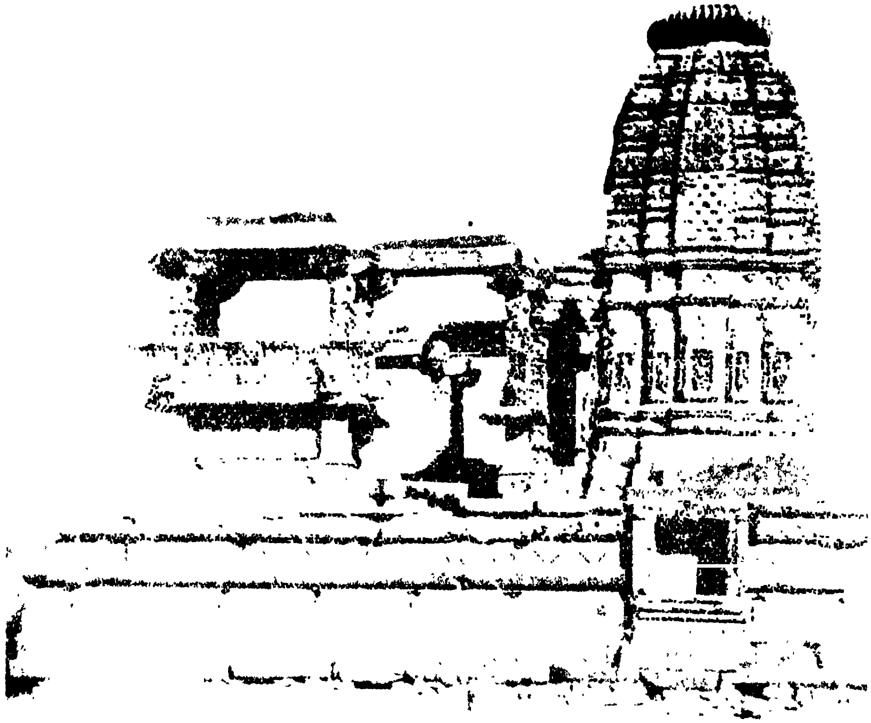
রেখ ও ভদ্র দেউল, উভয়ের আসন চতুরস্র। কিন্তু ওসিয়াঁতে ইহা ছাড়া আয়ত (rectangular) আসন-বিশিষ্ট একটি মন্দির দেখিতে পাওয়া যায়। হঠাৎ কোথা হইতে এরূপ একটি মন্দিরের উদয় হইল তাহা ভাবিবার বিষয়। ওসিয়াঁর মন্দিরটির গর্ভগৃহের পরিমাপ ৮´৬½´´ × ৪´১১½´´। বাহিরে দেওয়ালের পরিমাপ ১২´ × ৮´।

রাজপুতানায় জৈনগণের নির্ম্মিত অনেক মন্দির আছে। ইহাদের মন্দিরে এক প্রকার গম্বুজের ব্যবহার দেখা যায়। গম্বুজটি বাহিরে কারুকার্য্যবিহীন, কিন্তু তাহার ভিতরে প্রস্ফুটিত পদ্ম ও স্তরে স্তরে নানাবিধ মূর্ত্তি বা অলঙ্কার চিত্রিত থাকে। চিতোর দুর্গের উত্তরাঞ্চলে একটি জৈনমন্দিরের সহিত সংলগ্ন জগমোহনে এইরূপ গম্বুজের ব্যবহার দেখা যায়। জয়মল্লের প্রাসাদের নিকট শৃঙ্গারচৌরী নামক জৈনমন্দিরেও ঐরূপ একটি গম্বুজ আছে। শৃঙ্গারচৌরীর বাহিরের দেওয়াল চমৎকার কারুকার্য্যে মণ্ডিত, কিন্তু মাথার



রাণা কুম্ভের জয়স্তম্ভ—চিতোর

উপরের গম্বুজটি বাহিরের দিকে একান্ত কারুকার্য্যবিহীন। আজমীরে তারাগড় পর্ব্বতের পাদদেশে অঢ়াই-দিন-কা-ঝোপড়া নামে যে মুসলমান তীর্থ আছে তাহাও এক সময়ে জৈনগণের মন্দির ছিল। একটি বিস্তীর্ণ মণ্ডপের উপর চিতোরের মত পাঁচটি গম্বুজ এখনও



ওসিয়াঁর একটি রেখ-মন্দির ও তাহার সম্মুখে মণ্ডপ

বিদ্যমান রহিয়াছে। মণ্ডপের স্তম্ভে ও গম্বুজের ভিতরের দিকে এখনও বহু মূর্ত্তি দেখা যায়। মুসলমানগণ এগুলিকে ভাঙিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু বোধ হয় সকলগুলি ভাঙিয়া উঠিতে পারেন নাই। তাঁহারা মণ্ডপের পূর্ব্বদিকে পাঁচটি তোরণে শোভিত একটি প্রাচীর গড়িয়া ইহাকে মসজিদে পরিণত করিয়া লন। কিন্তু মণ্ডপটির গঠন ও অলঙ্কার এবং ইতস্ততঃবিক্ষিপ্ত রেখদেউলের ক্ষুদ্র প্রতিকৃতি বা আমলকের ভগ্নাংশ এই স্থানের অতীত ইতিহাসের সাক্ষ্য দিতেছে। দিল্লীতে কুতবমিনারের পার্শ্বে আজমীরের মত স্তম্ভ-শ্রেণী ও গম্বুজের দ্বারা রচিত একটি পুরাতন মণ্ডপ আছে।

উল্লিখিত কয়েক প্রকারের মন্দির ব্যতীত চিতোরের দুর্গমধ্যে দুইটি প্রাচীন স্তম্ভ দেখিতে পাওয়া যায়। একটি দুর্গের উত্তর দিকে স্থাপিত পুরাতন জৈনমন্দিরের ঠিক পার্শ্বে অবস্থিত, অপরটি দুর্গের পশ্চিমাঞ্চলে মীরাবাঈয়ের মন্দিরের নিকটে অবস্থিত। দ্বিতীয়টি মহারাণা কুম্ভ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল। মহারাণা কুম্ভের জয়স্তম্ভের ভিতরে হিন্দু দেবদেবীর অসংখ্য মূর্ত্তি আছে। মূর্ত্তিগুলি শিল্পের দিক দিয়া খুব সুন্দর নহে, কিন্তু মূর্ত্তি-শাস্ত্রের দিক হইতে এগুলির খুব মূল্য আছে। বিভিন্ন হিন্দু দেবদেবী ছাড়া গ্রীষ্মবর্ষা প্রভৃতি ঋতু, জ্বরশূল প্রভৃতি রোগেরও এক একটি মূর্ত্তি রচনা করা হইয়াছে। প্রতি মূর্ত্তির নীচে নাম লেখা আছে বলিয়া যাঁহারা হিন্দু দেবমূর্ত্তির বিষয়ে আলোচনা করিয়া থাকেন, তাঁহাদের বিশেষ সুবিধা হইবার কথা।

চিতোরের উল্লিখিত স্তম্ভের মত স্তম্ভ আর কোথাও আছে বলিয়া জানা নাই। এরূপ স্তম্ভনির্ম্মাণের রীতি খুব প্রচলিত না হইলেও ইহা রাজপুতানার স্বতন্ত্র সৃষ্টি বলিয়া ধরা যাইতে পারে। তদ্ভিন্ন আমরা পূর্ব্বে যে তিন প্রকার মন্দির-নির্ম্মাণ-রীতির আলোচনা করিয়াছি সেইগুলিই রাজপুতানায় সমধিক প্রচলিত ছিল।

পূর্ব্বের আলোচনায় আমরা দেখিয়াছি যে, খৃষ্টীয়

অষ্টম ও নবম শতাব্দীতেই রাজপুতানায় আর্য্যাবর্ত্তের অন্যান্য প্রদেশে প্রচলিত রেখ ও ভদ্র দেউল নির্ম্মাণের রীতি প্রচলিত হইয়া পড়ে। তাহা ছাড়া এই স্থানে জৈনগণ একপ্রকার গম্বুজবিশিষ্ট মন্দির অথবা স্তম্ভশোভিত মণ্ডপও গঠন করিতেন। দেবতার প্রধান দেউলকে রেখ শৈলীতে গড়া হইত এবং তাহার সম্মুখে পিঢ়া বা গম্বুজবিশিষ্ট মণ্ডপ স্থাপিত হইত। উত্তরকালে রেখের কতকগুলি পরিণতি হইল। বাড়ে জাংঘ অপেক্ষা পাদ অনুপাতে বেশী বড় করা হইল, গণ্ডীকে বাড়ের অনুপাতে বেশী উচ্চ করা হইল। সম্মুখের পিঢ়া ও গম্বুজবিশিষ্ট মণ্ডপেও কতকগুলি পরিবর্ত্তন সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া পড়িল। মুসলমানী গম্বুজের দ্বারা জৈন গম্বুজ পরে কিঞ্চিৎ প্রভাবান্বিত হইয়াছিল। যে-সকল স্থানে মুসলমান প্রভাব অপেক্ষাকৃত বেশী সেখানে জৈন গম্বুজের পরিবর্ত্তে উত্তরকালে মুসলমানী গম্বুজই ব্যবহৃত হইত। মালব দেশে রাজপুতানা অপেক্ষা মুসলমানগণের প্রভাব অনেক বেশী স্থায়ী ও কার্য্যকরী হইয়াছিল। উজ্জয়িনীতে শিপ্রা নদীতীরবর্ত্তী মন্দিরের সহিত সংযুক্ত মণ্ডপ স্থাপত্যের দিক দিয়া আজও তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

বিনা মূল্যে ও বিনা মাশুলে

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

১

আপিস হইতে আসিয়া সবেমাত্র জামা কাপড় ছাড়িবার উদ্যোগ করিতেছি, এমন সময় পাশের বাড়ি হইতে খুব একটা হট্টগোল উঠিল। কোলাহল প্রত্যহই উঠে, আজিকার মাত্রা কিছু অধিক বলিয়া বোধ হইল। আমাদের দ্বিতলের জানালায় দাঁড়াইয়া ও-বাড়ির সঙ্গে আলাপ-পরিচয় ভাল রকমই চলে। বাড়িতে কর্ত্তা,—কর্ত্তার পাঁচ ছেলে এবং স্ত্রীলোকের মধ্যে এক মাত্র গৃহিণী। কিন্তু একমাত্র হইলেও কণ্ঠস্বরে তিনি অদ্বিতীয়। প্রতিদিন সকাল, বৈকাল ও রাত্রিতে সেই শক্তির তালিম দিয়া, আপনার পরিবারবর্গের ত বটেই সেই সঙ্গে আমাদের (অর্থাৎ আশপাশে যে-সব হতভাগ্য ভাড়াটিয়া আছি) প্রাণ মন অতিষ্ঠ করিয়া তোলেন। অপরাহ্নে আপিস-প্রত্যাগত কর্ত্তাকে দেখিয়া কণ্ঠস্বর রাগরাগিণীতে সুরেলা হইয়া উঠে এবং সেই ধ্বনি একটানা ঝড়ের মত চলিতে থাকে শয়নের পূর্ব্বক্ষণ পর্য্যন্ত।

আজিকার উষ্ণতা ও উগ্রতা অত্যধিক।

জানালায় আসিয়া দাঁড়াইতেই কানে গেল গৃহিণীর অগ্নিস্রাবী বাণী, "মর, মর হাভাতে, তোর বুদ্ধি তোরই থাক্।"

সঙ্গে সঙ্গে চপ্ চপ্ করিয়া শব্দ।

বোধ হয় শতমুখীর স্তবস্পর্শ।

প্রহারের পরক্ষণেই করুণ কণ্ঠের আর্ত্তনাদ উঠিল, "কেঁউ—কেঁউ—কেঁউ।"

সবিস্ময়ে ভাবিলাম,—কর্ত্তা কি অবশেষে—

পর মুহূর্ত্তেই আমার সন্দেহকে ভঞ্জন করিয়া কর্ত্তাই কথা কহিলেন অতি উষ্ণ-করুণ কণ্ঠে, "মারলে, মারলে ওটাকে ঝাঁটার বাড়ি? কি করেচে ওই অবোলা জীব?"

বুঝিলাম কুকুর।

কর্ত্তার কণ্ঠস্বর উষ্ণ হইয়াছিল এই জীবটির প্রতি অকারণ অত্যাচারে, মুখখানিতে বিনীত ভাব মাখান ছিল গৃহিণীর রণচণ্ডী মূর্ত্তি দেখিয়া।

গৃহিণী উগ্র কণ্ঠেই কহিলেন, "বেশ করেছি--আমার খুশী। ওটাকে যতক্ষণ না বিদেয় করা হবে, ততক্ষণ,

কুকুর ত কুকুর, কুকুরের চোদ্দ পুরুষের নাম ভুলিয়ে দেব না ?"

কুকুরের অভিভাবক কহিলেন, "দূর ছাই—একটুও বুঝবে না। এমন বিপদেও মানুষ পড়ে ? এই যে কলকাতায় খুন-জখম হচ্চে, একটা কুকুর পোষা থাকলে—"

গৃহিণী পূর্ব্ববৎভাবে কহিলেন, "গয়ায় পিণ্ডি দেবে। বলে, বাপ পিতো মোর নাম গেল—হিদে জোলার নাতি! নিজের নেই মুরোদ একটা বামুন রাখবার, বার মাস ত্রিশ দিন খেটে খেটে গতর জল করচি—আবার কুকুর নিয়ে সোহাগ নাচন। ঝাঁটা মা—রি অমন দরদে।

কর্ত্তা শেষ চেষ্টাস্বরূপ কহিলেন, "মাথা ঠাণ্ডা ক'রে একটু বোঝ। ধর আমরা কেউ বাড়ি নেই—"

গৃহিণী শেষ অবধি না শুনিয়াই কহিলেন, "বাড়ি না থাকলে দোরের খিল ত আছে, তাই দিয়ে থাকব। ভারি আমার ভয় রে। এখন ওটাকে বিদেয় করবে কি-না ?"

বলিয়া আর একবার সজোরে শতমুখী আস্ফালন করিলেন। আস্ফালন করিলেন মেঝের উপর—ভয়ে কুকুরটা আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল,—কেঁউ—কেঁউ—কেঁউ।

জানালায় ঝুঁকিয়া দেখিলাম,—ছোট্ট এতটুকু একটি কুকুর-বাচ্চা—কর্ত্তার পায়ের কাছে কুণ্ডলী পাকাইয়া প্রহারভয়ে মৃদু মৃদু আর্ত্তনাদ করিতেছে। কর্ত্তার এক হাতে শিকল অন্য হাতে ছোট একখানা পাঁউরুটি। ছেলেগুলা দুয়ারের সামনে ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়া আশ্রয়-দানের খণ্ডযুদ্ধ পরম উল্লাসে উপভোগ করিতেছে।

কোনো যুক্তিই খাটিল না দেখিয়া কর্ত্তা এবার মরিয়া হইয়া করুণ কণ্ঠে বলিলেন, "জান এর দাম ? সায়েব এর মাকে ও বাপকে কিনেছিল এক-শো পঞ্চাশ টাকায়। এটা যদিও মাদী, তবু পনের টাকার কম হবে না। সায়েব আদর ক'রে এর নাম রেখেছিল, মেরি গোল্ড। আমায় বললেন,—বোস, আজকাল যে-রকম খুনখারাপী হচ্চে, এটাকে নিয়ে গিয়ে রাখ—উপকার দেবে। দাম একটি পয়সা নিলেন না। অমন সায়েব—"

ছপাৎ করিয়া দেওয়ালে সম্মার্জ্জনীর আঘাত করিয়া গৃহিণী বলিলেন. "সাত ঝাঁটা মারি সায়েবের মাথায়, সাত ঝাঁটা এই কুকুরকে, আর ওটাকে না তাড়ালে—" বলিয়া সম্মার্জ্জনীর অবশিষ্টাংশ কোথায় গিয়া পড়িবে তাহার একটা সুস্পষ্ট ইঙ্গিত কর্ত্তাকে জানাইয়া দিলেন।

কর্ত্তা এবার রাগিয়া গিয়া কহিলেন, "আর সাত ঝাঁটা তোমার বুদ্ধির মাথায়।" বলিয়া গৃহিণীকে প্রত্যুত্তরের অবকাশ না দিয়াই চেনসুদ্ধ কুকুরটাকে হিড়হিড় করিয়া টানিতে টানিতে জানালার কাছে আনিয়া আমাকে উদ্দেশ করিয়া কহিলেন, "ধরুন—ধরুন অজিতবাবু। বলে, 'কপালে নেইক ঘি, ঠক্‌ঠকালে হবে কি ?' নিন, ধরুন।"

কি করি, কুকুরটিকে ধরিয়া ঘরের মধ্যে নামাইতেই তিনি হাত বাড়াইয়া পাঁউরুটিখানা আমার হাতে গুঁজিয়া দিয়া বলিলেন, "মরুক গে ডাকাতের হাতে খুন হয়ে। গলা কেটে রেখে গেলেও আমরা দেখব না। যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল। ব'লব কি মশাই—" পরে কণ্ঠস্বর যথাসম্ভব নামাইয়া ফিস্‌ফিস্ করিয়া কহিলেন, "সায়েব-ফায়েব মিছে কথা। আজ শুক্রবার গিছলুম বৈঠকখানার বাজারে—বুঝলেন না ?" বলিয়া হাতের চারিটি আঙুল দেখাইয়া চুপ করিলেন।

সমস্তই বুঝিলাম।

মনিব্যাগে হাত দিতেই ভদ্রলোক শশব্যস্ত হইয়া বলিলেন, "রাম, রাম, তা কি হয় ? সখ ক'রে এনেছিলুম, আপনি রাখুন। তবু বুঝব, একটা ভাল আশ্রয়ে আছে। কি জানেন, ওসব যত্নের জিনিষ।" বলিয়া করুণ কটাক্ষে গৃহপানে চাহিয়া জানালা ত্যাগ করিলেন।

২

বিনমূল্যে কুকুর মিলিল, কিন্তু রাখিবার অসুবিধাও কম নহে। এক বাড়িতে আমরা সাত ঘর ভাড়াটে। প্রত্যেকের একখানি করিয়া শয়ন-ঘর ও ঘরের পাশে যে ফালি বারান্দা আছে সেখানে রন্ধনাদি হয়। ছোট কুকুর, রাত্রিতে না হয় ঘরে থাকিল, কিন্তু চঞ্চলতা তার ছোট নহে। 'প্রকৃতি'র ডাকও সে মানিয়া চলে!

কি জানি, শেষকালে হয়ত কি বিভ্রাট বাধাইয়া বসিবে—ফলে বাসা পরিত্যাগ করিবার পথ পাইব না। সুরমা বলিল, "এক কাজ কর, ওকে দেশে মা'র কাছে পাঠিয়ে দাও। তিনি ত একলা থাকেন।"

উৎফুল্ল হইয়া বলিলাম, "সেই ভাল। আজ শুক্রবার, কাল সকালেই ওটাকে বাড়ি নিয়ে যাব।"

...সেক্‌শনে আমার বন্ধু রাজেন কাজ করে। তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "সত্তর মাইল একটা কুকুর নিয়ে যেতে কত পড়বে রে?"

সে বলিল, "রেলে কাজ ক'রে কুকুরের মাশুল গুণতে হবে? দূর! কত বড় কুকুর?"

বলিলাম, "ছোট, মাস-দুয়েকের বাচ্চা।"

রাজেন বলিল, "কুচ পরোয়া নেহি। কাল দুটোর সময় আমার আপিসে আসিস, ওর ডেসপ্যাচের ভার আমার।"

পরদিন সকালে বাড়ি হইতে এক পত্র আসিল। মা লিখিয়াছেন,—বাড়ি আসিবার সময় আমার জন্য এক জোড়া নয় হাত ধুতি আনিবে। একখানা কাপড়কাচা সাবান ও আধ সের পোস্ত আনিবে। কিছু লিচু আনিবে। সরি গয়লানীর জন্য এক শিশি তিল তৈল আনিবে। দাম সে আমার কাছে দিয়া গিয়াছে। আর ও-বাড়ির রাঙা ঠাকুরদার জন্য ভাল চ্যবনপ্রাশ আধ সের আনা চাই। ষোল টাকা সেরের ভাল জিনিষ লইবে। ঐগুলি অতি অবশ্য করিয়া আনিবে। আমার আশীর্ব্বাদ জানিবে ও বৌমাকে দিবে। ইতি

সকালেই চিঠির ফর্দ্দ মাফিক জিনিষগুলি কিনিয়া ফেলিলাম।

পাশের ঘরে হরিবাবুর ছেলে আমাকে 'কাকা' বলিয়া ডাকে। বয়স চোদ্দ পনের। গরীব বলিয়া বাড়িতে মাষ্টার নাই, বিনামূল্যে কিছু কিছু পড়া আমিই বলিয়া দিই। সেজন্য সে আমার কাছে খুব কৃতজ্ঞ।

তাহাকে বলিলাম, "ওরে মণ্টু, আজ দুটোর সময় এই কুকুরটা নিয়ে শেয়ালদা ষ্টেশনে দিয়ে আস্‌তে পারবি?"

সে আনন্দিত হইয়া কহিল, "হাঁ। বাড়ি নিয়ে যাবেন বুঝি! ক' নম্বর প্ল্যাটফরম্?"

বলিলাম, "পাঁচ নম্বরের বুকিং আপিসের কাছে থাকিস্, খুঁজে নেব।"

সে ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, থাকিব।

বেলা দুটায় রাজেনের আপিসে উপস্থিত হইতেই সে বলিল, "একটু দাঁড়া, সিংহাসন তৈরি হচ্চে।"

বিস্মিত হইয়া বলিলাম, "সিংহাসন!"

সে হাসিয়া বলিল, "কুকুরটাকে তা'তে করে নিরাপদে চালান দেবার জন্য তৈরি হচ্চে। দেখ্‌বি আয়।"

সিংহাসন তৈয়ারী হইয়া গিয়াছিল।

ছোট একটি কেরোসিন কাঠের বাক্স, মাথার কাছে একখানা তক্তা খোলা। এতটুকু সরু পথ, আর সব আঁটা। বাক্সের গায়ে দুধারে দুটি নাতিবৃহৎ ছিদ্র—বায়ু-চলাচলের জন্য।

রাজেন তাহার উড়িয়া চাপরাসীকে বলিল, "ঐটে নিয়ে আমার সঙ্গে ষ্টেশনে আয়।"

আমি বলিলাম, "ষ্টেশনে লোক গিস্ গিস্ করচে। তাদের সামনে কুকুরটাকে কি করে বাক্সে ভরবি।"

সে বলিল, "থাকলেই বা লোক। তারা না-হয় একটু মজাই দেখ্‌বে। গেট পার হবার সময় ব'লব ফ্রেশফ্রুট নিয়ে যাচ্চি।"

বলিলাম, "যদি ট্রেনে কেউ ধরে?"

রাজেন অভয় দিয়া বলিল, "ধরলেই হ'ল আর কি! আর যদিই ধরে ফুল ফেয়ার না হয় নেবে—একসেস্ ত নেই কুকুরের।"

পাঁচ নম্বর প্ল্যাটফরমের বাহিরের দিকে কুকুরটা তখন ফুরফুরে হাওয়ায় ঘুমাইতেছিল।

উড়িয়া বাক্স নামাইল ও মণ্টু কুকুরের গলা হইতে চেন খুলিয়া সেটাকে বাক্সের মধ্যে ভরিয়া দিল। কুকুর ঈষৎ আপত্তি করিল বটে, কিন্তু সে আপত্তি তত মারাত্মক নহে।

রাজেন উড়িয়াকে বলিল, "নে, মাথায় তোল্।"

উড়িয়া ভীতিবিহ্বল চক্ষে আমাদের পানে চাহিয়া

সভয়ে বলিল, "মাথায় করব কি বাবু? এ যে কুকুর।"

অতি কষ্টে মুখ ফিরাইয়া হাসি দমন করিলাম। দু-চারজন দর্শকও হাসিয়া উঠিল।

রাজেন গম্ভীর হইয়া কহিল, "তবে বুকে ক'রে নিয়ে চল্" বলিয়া উড়িয়াটা অন্য কোনো আপত্তি করিবার পূর্ব্বেই গটগট করিয়া অগ্রসর হইয়া গেল।

উড়িয়া অপ্রসন্নমুখে বিড়-বিড় করিয়া কি-সব বকিতে বকিতে কুকুরটাকে বাক্স-সমেত বুকে তুলিয়া লইল।

নির্ব্বিঘ্নে গেট পার হইলাম।

রাজেন বলিল, "ছোট একটা কামরা দেখে উঠ্‌তে হবে। একটা কোণ নিয়ে বস্‌বি, ক্রুম্যানের যে দৌরাত্ম্য।"

মনের মত কামরা মিলিল। বাক্স-সমেত কুকুর সেখানে উঠিল। বেঞ্চের তলায় বাক্সটা ঠেলিয়া দিয়া রাজেন কহিল, "হাঁ, ফলটলগুলো ভাল ক'রে নিয়ে যাস্। আমি চল্লুম।"

সে নামিতে যাইতেছে এমন সময় সহসা বাক্সের ডালা তুলিয়া সাদা কালো মুখখানি বাহির করিয়া বাচ্চা বোধ হয় কৃতজ্ঞতা জানাইল, "কেঁউ—কেঁউ—কেঁউ।"

রাজেন ফিরিয়া কহিল, "অ্যাঁ, আবার কৃতজ্ঞতা? দাঁড়া এর উত্তর আমি দিচ্ছি।" বলিয়া মণ্টুর নিকট হইতে শিকলটা চাহিয়া লইয়া কুকুরটাকে বাক্সের মধ্যে ঠেলিয়া দিয়া কাঠের ডালাখানা চাপা দিল ও তাহার উপর শিকলের বেড় দিয়া রাখিল। ডালা খুলিবার কোনো উপায়ই আর রহিল না।

হাসিমুখে আমায় বিদায়-সম্ভাষণ জানাইয়া অতঃপর সে নামিয়া গেল।

৩

মিনিট কয়েক নিরাপদে কাটিল। মণ্টুকে গোটা-দুই পয়সা দিয়া বলিলাম, "একখানা 'শিশির' ও একখানা 'বাঙ্‌লা' কিনে আন্‌ ত।"

মণ্টু ষ্টল হইতে কাগজ কিনিয়া দিয়া বিদায় লইল।

ট্রেন ছাড়িতে তখনও মিনিট-পাঁচেক বিলম্ব আছে। এমন সময় বাক্সের মধ্য হইতে বাচ্চার মৃদু বিলাপধ্বনি শোনা গেল। দেখিতে দেখিতে মৃদু বিলাপ আর্ত্তনাদে পরিণত হইল। চারি পা দিয়া বাক্স আঁচড়াইতে আঁচড়াইতে বাচ্চা প্রবল কণ্ঠস্বরে ট্রেনের কামরা প্রতিধ্বনিত করিয়া তুলিল। তখন অনেক লোকই গাড়ীতে উঠিয়া বসিয়াছেন। লজ্জায় আমার কর্ণমূল আরক্ত হইয়া উঠিল। বুঝিলাম, এই আর্ত্তনাদ আর কিছুক্ষণ চলিলে কাহারও জানিতে বাকী থাকিবে না যে, এই লোকটা বিনামাশুলে গাড়ীতে কুকুর লইয়া যাইতেছে, এবং ক্রু হয়ত ভাড়ার জন্য একটা অপ্রীতিকর ও লজ্জাকর মন্তব্য করিয়াও বসিতে পারে। যা থাকে কপালে বলিয়া চেনটা খুলিয়া কুকুর বাহির করিলাম।

আমি যেখানে বসিয়াছিলাম তার পাশেই পায়খানা। সুতরাং নিরাপদ কোণ একটি ছিল। কুকুরটাকে কোণে বসাইতে গিয়া নজরে পড়িল রাঙা ঠাকুরদার জন্য ক্রীত শালপাতায় মোড়া বিশুদ্ধ 'চ্যবনপ্রাশ' সেখানে রহিয়াছে। চাপাচাপিতে পাছে ঔষধ নষ্ট হইয়া যায় সেই ভয়ে পুঁটুলিতে রাখি নাই। শালপাতের ঠোঙা বাক্সের ভিতর রাখিয়া কুকুরটাকে সেই কোণে বসাইলাম ও তাহাকে ঠাণ্ডা করিবার জন্য ধীরে ধীরে তাহার গায়ে হাত বুলাইতে লাগিলাম।

দারুণ গ্রীষ্ম, খোলা জায়গায় বসিয়া আমাদেরই প্রাণ যায় যায়, বন্ধ বাক্সের ভিতর কুকুরটার যে কি অবস্থা হইয়াছিল সহজেই অনুমেয়।

বাহিরে আসিয়া সে হাঁফাইতে লাগিল ও কোণ ছাড়িয়া খোলা হাওয়ায় বসিবার জন্য ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল।

ঢং ঢং করিয়া গাড়ী ছাড়িবার ঘণ্টা বাজিল। আমার পরিচিত এক ব্যক্তি ছুটিতে ছুটিতে আসিয়া আমার সম্মুখে বসিয়া পড়িয়া কহিল, "খুব ট্রেনধরা গেছে, যা হোক। যা দৌড় দিয়েছি, ওকি দাদা, মুখ বার করচে ওটা কি! কুকুর?"

ইসারায় চোখ টিপিয়া জানাইলাম, হাঁ।

সে আমার ইসারা বুঝিল। বুঝিয়া মুখ গম্ভীর করিয়া কহিল, "তাই ত যে ক্রু গাড়ীতে—পারবেন কি?" বলিতে বলিতে গাড়ী ছাড়িয়া দিল ও সেই ব্যক্তি

চোখের ইসারায় আমাকে জানাইল ঐ কামরায় ক্রু উঠিয়াছে।

সাবধান হইয়া বসিলাম। হাঁটুর বেড়া দিয়া কুকুরটাকে ঘিরিয়া ফেলিলাম। এক পয়সার 'শিশির'-খানা উপরে বিছাইয়া দিলাম। যেন সংবাদ-সংগ্রহে আমার উৎসাহ ও আগ্রহের অন্ত নাই। কাগজের তলা দিয়া কুকুরের গলা ধরিয়া রহিলাম, এদিক ওদিক না মুখ বাহির করে। অন্য হাতে প্রাণপণে তাহার গায়ে হাত বুলাইতে লাগিলাম। একটু আরাম পাইয়া যাহাতে চক্ষু মুদিয়া চুপচাপ পড়িয়া থাকে।

দারুণ গুমোট, সুতরাং প্রচুর ঘর্ম্মের হেতুটা কেহ জানিবার জন্য ব্যাকুল হইবেন না, জানিতাম। বুকের মধ্যে ঢিপঢিপ করিতে লাগিল'। মনে মনে হয়ত বা বলিয়াছিলাম, "দেখিস্ মা, মুখ রাখিস্।"

তা বলিয়া পাঁচ সিকার পূজা মানত করিয়া বসি নাই, সেটুকু সাংসারিক জ্ঞান তখনও ছিল।

কুকুরটা নিরুপায় হইয়া ঈষৎ শান্ত হইল।

টিকেট চেক হইতে হইতে গোল বাধিল আমারই পরিচিত সেই ভদ্রলোককে লইয়া।

লোকটির নাম বিশ্বনাথ। সে বলিল, "কেন, ই-আই-আর—"

ক্রু বলিল, "রিটার্ন পার্ট নিয়ে ওরা শনিবার ফিরতে দেয়, আমাদের সে নিয়ম নেই। ভাড়া চাই।"

বিশ্বনাথ বলিল, "আমার পয়সা নেই।"

দেখ একবার আহাম্মুখের কাণ্ড! যত গোল এই গাড়ীতেই বাধাইয়া বসিতে হয়!

ইচ্ছা হইতেছিল, যদি হাত দুখানি কুকুর-পরিচর্য্যায় নিযুক্ত না থাকিত ত উহারই একখানি বাহির করিয়া বিশ্বনাথের গালে প্রকাণ্ড একটা চড় কসাইয়া দিয়া বলি, 'ওরে আহাম্মুক—নিয়ম জানিস্ না ত রেলে চড়েছিস্ কেন? আবার পয়সা নেই, হতভাগা কোথাকার, নিজে ত মরবিই আমাকেও না মেরে ছাড়বিনে।'

হাতের মধ্যে কুকুর চঞ্চল হইয়া উঠিল। কটমট করিয়া বিশ্বনাথের পানে চাহিলাম।

বিশ্বনাথের সেই এক কথা, 'পয়সা নাই, যাহা ইচ্ছা কর।'

ভাবিলাম বলি, 'ঘৃণ্যদ্রব্য গায়ে মাখ্‌লেও যমে ছাড়ে না, দে হতভাগা, ভাড়াটা মিটিয়ে দে।'

সে ভাড়া দিল না। ক্রু তাহার টিকেটখানি পকেটে ফেলিয়া অন্য গাড়ীতে চেক করিতে লাগিল।

সেখানেও এক 'ডব্লিউ-টি' (বিনা টিকিটের যাত্রী)। নাঃ, বাছিয়া বাছিয়া লোকগুলি আজ এই কামরাতেই উঠিয়াছে আমাকে জব্দ করিবার জন্য। কি যে করি—কাগজের অন্তরাল হইতে সে কথার উত্তর আসিল, কেঁউ—কেঁউ—কেঁউ।

নাঃ, সব মাটি করিবে এই একফোঁটা বাচ্চাটা। এত ডাকও ডাকিতে পারে এই অস্থিচর্ম্মসার প্রাণীটি! প্রাণপণে তাহার গায়ে হাত বুলাইতে লাগিলাম।

কুকুর থামিল না, একভাবেই চেঁচাইতে লাগিল। ভাগ্যে সেই সময়ে সেই বিনা টিকিটের যাত্রীর সঙ্গে ক্রু মহাশয়ের প্রবল বচসা আরম্ভ হইয়াছিল। তাই তাঁহাদের হট্টগোলে এদিকের গণ্ডগোল পাকিয়া উঠিবার বিশেষ সুযোগ ঘটিল না। একজন যাত্রী আমাকে উদ্দেশ করিয়া মৃদু হাস্যে কহিলেন, "উঃ, আপনি যে বেজায় ঘামছেন, মশায়।"

অতি কষ্টে উত্তর দিলাম, "হুঁ।" গরমের দোহাই দিতে জিহ্বাটা কেমন যেন আড়ষ্ট হইয়া গেল।

বারাকপুরে গাড়ী থামিতেই সেই বিনা-টিকিটের যাত্রী ও তর্ক-রত ক্রু নামিয়া গেল। আমিও হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলাম।

গাড়ী ছাড়িল, এই কক্ষে আর ক্রু উঠিল না।

কিন্তু হতভাগা বিশ্বনাথ এক বিভ্রাট বাধাইয়া রাখিয়াছে।

উচ্চস্বরে তাহাকে বলিলাম, "তোরা দিন-দিন সব খোকা হয়ে যাচ্ছিস, জানিস না এদের নিয়ম?"

বিশ্বনাথ বলিল, "কি ক'রব? নিয়ম ক'রে মাথা কিনেছেন। রীতিমত পয়সা দিয়েছি, অমনি ত যাচ্ছি না।"

আহাম্মককে কি বুঝাইব, চুপ করিয়া কুকুরের প্রতি মনোনিবেশ করিলাম।

কুকুরটা তখন জিব বাহির করিয়া হাঁফাইতেছিল।

বিশ্বনাথকে বলিলাম, "যা দেখি পায়খানার কল থেকে আঁজলা ভ'রে জলে নিয়ে আয়।, ওটাকে খাওয়াই।"

বিশ্বনাথ জল আনিলে কুকুরটা চুক্ চুক্ করিয়া সবটুকু জল পান করিল ও আমার হাত চাটিতে চাটিতে সেই কোণেই ঘুমাইয়া পড়িল। এতক্ষণে একটু নিশ্চিন্ত হইলাম।

পূর্ব্বোক্ত যাত্রী আমায় বলিলেন, "ঘামটা আপনার হবারই কথা, কিন্তু খুব বেঁচে গেছেন মশাই।"

তাহার রহস্যটা পরিপাক করিয়া মাথা হেঁট করিয়া 'শিশির' পড়িতে লাগিলাম।

৪

কয়েকটা ষ্টেশন চলিয়া গেল, ক্রু আর উঠিল না। জানিতাম সে নিশ্চয়ই এই কক্ষে উঠিবে, কারণ বিশ্বনাথের টিকিট তাহার কাছে আছে।

গন্তব্য স্থানের গোটা-দুই ষ্টেশন পূর্ব্বে কুকুরটাকে পুনর্ব্বার বাক্সজাত করিলাম। বাক্সের ডালাখানি ফেলিয়া শিকল বেড়িয়া দিলাম।

কুকুরটা বার-কয়েক ক্ষীণ আপত্তি করিল। তারপর আর চীৎকার করিল না।

বুঝিলাম জলপানে উপকার দর্শিয়াছে।

তারপর ক্রু উঠিল, বিশ্বনাথের সঙ্গে তুমুল বচসা আরম্ভ হইল এবং অবশেষে পুলিসের ভয় দেখাইয়া ভাড়াও সে আদায় করিল। কিন্তু এই সুদীর্ঘ সময়ের মধ্যে সুবোধ কুকুরটা আর উচ্চবাচ্য করিল না। মানুষের সঙ্গ পাইয়া মনুষ্যত্ব অর্জ্জন করিয়া ফেলিল না কি?

আমাদের গ্রামের ষ্টেশনে তাহাকে লইয়া অতি সহজেই বাহির হইলাম।

মাষ্টার মহাশয় বলিলেন, "বাঃ, বেশ বাচ্চাটি ত! আসল ফক্স টেরিয়ার বোধ হয়। ভারি বুদ্ধি মশায়, তা কত দিয়ে?"

হাসিয়া বলিলাম, "বিনামূল্যে।"

মাষ্টারও হাসিয়া বলিলেন, "এবং বাক্সটা দেখে বোধ হচ্চে বিনা মাশুলেও।"

প্রাণ খুলিয়া তাঁহার হাসিতে যোগ দিলাম।

অলক্ষ্যে বিধাতাপুরুষও নিশ্চয়ই সেই হাসির সঙ্গে যোগ দিয়াছিলেন। বাড়ি আসিয়াই তাঁর অলক্ষিত হাসিটুকু বুঝিতে পারিয়া মুখ আমার অন্ধকার হইয়া গেল।

মায়ের ফর্দ্দ-মাফিক সব জিনিষই পাইলাম। পাইলাম না শুধু সেই চ্যবনপ্রাশের ঠোঙাটা! ট্রেনে ফেলিয়া আসিলাম না-কি?

অনেক ভাবিয়া মনে পড়িল—ঠিক কথা। কুকুরটাকে বাহির করিয়া সেটি বাক্সের মধ্যে রাখিয়াছিলাম।

বাক্সের মধ্যে হাত দিতেই বাহির হইল ছেঁড়া শালপাতের টুকরা কয়েকখানি। ঠোঙা নাই, চ্যবনপ্রাশও নাই!

মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলাম।

এখন রাঙাঠাকুরদাকে বলি কি?

একটা নয়, দুইটা নয়, আট আটখানি মুদ্রা ঐ রাক্ষুসে কুকুরটা উদরসাৎ করিয়াছে!

তাই দ্বিতীয়বার বাক্সের মধ্যে গিয়া সে টু শব্দটি করে নাই। পেট ভরাইয়া দিব্য নিশ্চিন্তে শুইয়াছিল। শয়তান কুকুর!

মারিবার জন্য হাত তুলিতেই মনে হইল, ঠিকই হইয়াছে।

পনের আনা মাশুল ফাঁকি দিতে গিয়া যে উদ্বেগ আশঙ্কা সারা পথ ভোগ করিয়া আসিয়াছি, এই কটা টাকাও সেই মহাপাপে প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ দক্ষিণান্ত করিতে হইল।

যাহার মূল্য ও মাশুল ফাঁকি দিবার চেষ্টা করিয়াছিলাম, সেই অবোলা জীবটি আমারই অলক্ষ্যে সুদ-সমেত তাহা আদায় করিয়া লইয়াছে।

পরদিন রাঙাদাদা বলিলেন, "বাঃ, বেশ কুকুর ত নাতি, কতয় কিনলি?"

গম্ভীরভাবেই উত্তর দিলাম, "আট টাকায়।"

দুর্দ্দিন

শ্রীসজনীকান্ত দাস

জীর্ণকন্থাপরিহিতা ভিখারিণী চলে রাজপথে,—
পাশে, উড়াইয়া ধূলি চলিয়াছে জনতা বিপুল
দলে দলে, উচ্চ হতে কণ্ঠে উচ্চতর স্ব স্ব মতে
সগর্ব্বে বাখানি ; কেহ নাহি ছাড়ে তর্কে এক চুল
নিজ সীমা, চলিয়াছে গর্ব্বান্ধ কর্কশ কলরবে,
ব্যর্থ কোলাহলে মত্ত। কারো নাহি ক্ষণ অবসর
আঁখি মেলি দেখিবারে, ঘনাইছে স্বচ্ছ নীল নভে
প্রাবৃটের কালো ছায়া। আসন্ন দুর্য্যোগ। স্তব্ধ ঝড়
কালবৈশাখীর। তন্দ্রাচ্ছন্ন ধরাবক্ষে অকস্মাৎ
দিবে হানা বন্ধহারা উন্মাদ পবন, আয়োজন
চলে তার গগনে গগনে। নিরলস পক্ষাঘাত
হানিয়া বায়ুর স্তরে, শান্ত নীড়ে করে উত্তরণ
আকাশ-বিহঙ্গ যত।

ভিখারিণী চলে কায়-ক্লেশে,
ললাটে স্বেদের বিন্দু। কেবা দিবে আশ্রয় তাহারে
আজি এ দুর্য্যোগ দিনে ; নাহি জানে, দীর্ঘ পথশেষে
কোথায় বিশ্রাম তার। জনতা বিপুল অহঙ্কারে
চলিয়াছে ; নাহি দেখে চাহি, আকাশ ঢাকিছে মেঘে,
নাহি দেখে এক পাশে ক্লান্তপদে চলে ভিখারিণী।
উচ্চ-কণ্ঠ কোলাহলে, অনিশ্চিত ব্যাকুল আবেগে
ছুটিয়া চলেছে তারা ; কে দেখিবে, কে লইবে চিনি
ভিখারিণী জননীরে!

তারা জানে পাষাণ-আগারে
বন্দী মাতা, কঠিন শৃঙ্খলে বদ্ধ যুগ যুগ ধরি।
জননীর মুক্তি লাগি চলিয়াছে, নাহি জানে হা রে,
কারাগার ত্যজি মাতা শতচ্ছিন্ন জীর্ণ বাস পরি'
বাহির হয়েছে পথে।

জননীর বন্ধন মোচন
কে করিবে তাই লয়ে বাধিয়াছে ঘোর কোলাহল,
হানাহানি পরস্পরে, ভায়ে ভায়ে হিংস্র আচরণ,
ধূলি ও কর্দ্দম ছুঁড়ে কলঙ্কিত করে নভোতল।
কারামুক্তা জননীর ম্লানকণ্ঠে কে পরাবে মালা,
অহিংস সংগ্রামে আজি কে উড়াবে বিজয়-কেতন,
তারি লাগি দলাদলি, ঘোরতর হিংসা-বিষজ্বালা
অন্তরে ঘনায়ে উঠে, দলে দলে বাধে মহা রণ!

জননী সভয়ে হেরে সন্তানের এ আত্ম-লাঞ্ছনা,
জননীর মুক্তি নহে, আপনার যশের কাঙালী
অভাগা সন্তানদল—কারো নাই মৃত্যুর সাধনা,
মুক্তি-সাধনার নামে পথে পথে ছড়াইছে কালী!
বিষণ্ণা জননী চলে সসঙ্কোচে অসীম ধিক্কারে
জনতার সাথে সাথে, যশোলোভী চলে বীর দল।

সহসা কাঁপিল শূন্য ঘন ঘন বিদ্যুৎ-প্রহারে,
কালো হয়ে এল চারিধার, আলোড়িয়া শান্ত নভোতল
উন্মাদ পবন মাতে ; ধূলিজাল উঠে আবর্ত্তিয়া
দিগন্ত আঁধার করি। কোথা পথ? নিমিষে হারায়—
সুবিপুল সে জনতা অকস্মাৎ ভয়ত্রস্ত হিয়া,
ব্যাকুল আগ্রহে সবে আপনারে বাঁচাইতে চায় ;
সম্মুখে সৃজিছে বাধা হয় তো বা নিজ প্রিয়জন,
নাহি দ্বিধা তারে হানি আপনার পথ রচিবারে,
অশান্ত উদ্বেগ ভরে ফেলে সবে বিক্ষিপ্ত চরণ ;
মূর্চ্ছাহত কে পড়িল, কে দলিত অন্ধ অন্ধকারে
কে করে গণন? শুধু ব্যথিতের আর্ত্ত কোলাহল,
রহি রহি মুমূর্ষুর 'প্রাণ যায়' 'প্রাণ যায়' রব,—
কে কোথায় ক্ষীণ কণ্ঠে মাগিতেছে একবিন্দু জল,
কেহ অর্দ্ধমৃত কারো দেহ হ'ল প্রাণহীন শব!

কখন কাটিল মেঘ, শুক্ল দশমীর চন্দ্রালোকে
উঠিল হাসিয়া ধীরে শান্ত নীল গগন-প্রাঙ্গণ,
সহসা হেরিল সবে আর্ত্ত ক্লান্ত উচ্ছ্বসিত শোকে
রমণী লুটায় পথে, ক্ষীণ কণ্ঠে কহে, "ওরে শোন্—
কোথা চলেছিস তোরা, কার মুক্তি করিস্ কামনা
অন্ধ মদগর্ব্বভরে? আমি যে রে জননী তোদের,
দীনা, হীনা ভিখারিণী—জানিলি না, ওরে ভ্রান্তমনা,
আত্ম প্রবঞ্চনা পথ নহে মোর মুক্তি-সাধনের ;
নহে আত্ম-কোলাহল! আমি আছি কারার বাহিরে
তবু ঘৃণ্য ভিখারিণী! আমার মুক্তির লাগি, হায়,
আমারই সন্তান করে হানাহানি বিস্মৃতি-তিমিরে!
মূঢ় সন্তানের লাগি হিয়া মোর কাঁদিছে ব্যথায়—
আমি অসহায়া শুধু আপন ললাটে কর হানি,
শুধু ভাসি ব্যর্থ অশ্রুজলে।"

চমকি উঠিল সবে,
অকস্মাৎ মেঘাচ্ছন্ন দিশি, অন্ধকার! কোথা কার বাণী
কে শুনাল? কোথা মাতা? পুছে সবে আর্ত্ত কলরবে।

ক্রমোন্নতিবাদ ও বেদান্ত

শ্রীরাজেন্দ্রনাথ ঘোষ

সঙ্গের গুণে লোকের মতিগতির পরিবর্ত্তন যেমন হয়, তদ্রূপ পাশ্চাত্যসংস্পর্শে আমাদের দার্শনিক চিন্তারও পরিবর্ত্তন বহুল পরিমাণে হইতে বসিয়াছে। ইহার একটি দৃষ্টান্ত আমাদের মধ্যে ক্রমোন্নতিবাদের প্রভাব বলা যাইতে পারে। আজকাল আমাদের দেশে সর্ব্বাপেক্ষা প্রচলিত বেদান্তসিদ্ধান্তও এই ক্রমোন্নতি-বাদের সাহায্যে ব্যাখ্যাত অর্থাৎ বিকৃত হইতেছে। সুতরাং বেদান্তসিদ্ধান্তের উপর যে আমাদের প্রামাণ্য-বুদ্ধি ছিল, আমাদের যে অভ্রান্ত জ্ঞান ছিল, তাহা ক্রমশঃই নষ্ট হইয়া যাইতেছে। ইহাতে ভাল হইতেছে কি মন্দ হইতেছে, এবং ক্রমোন্নতিবাদটি কতদূর যুক্তিসহ, এই প্রবন্ধে আমরা তাহারই কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

এই ক্রমোন্নতিবাদের কতকটা অনুরূপ মতবাদ আমাদের দেশে এক শ্রেণীর মীমাংসা বা কর্ম্মবাদীর মতবাদ এবং বিশিষ্টদ্বৈতবাদী প্রভৃতি উপাসক সম্প্রদায়ের মতবাদ, আর পাশ্চাত্য দেশে এই মতবাদটি মহামতি ডারুইন প্রবর্ত্তিত ক্রমবিকাশবাদটি রূপান্তরতা প্রাপ্ত হইয়া যেরূপ আকার ধারণ করিয়াছে তাহাই বুঝিতে হইবে। এই পাশ্চাত্য ক্রমোন্নতিবাদই ভারতে আসিয়া শিক্ষিত সম্প্রদায়-বিশেষের মধ্যে আবার যে নূতন রূপ ধারণ করিয়াছে, তাহাই এস্থলে আলোচ্য ক্রমোন্নতিবাদ।

আমাদের দেশের উক্ত এক শ্রেণীর মীমাংসক বা কর্ম্মবাদীর মতে ক্রমোন্নতিবাদের পরিচয় এইরূপ—এ মতে বেদোক্ত যাগযজ্ঞাদি করিলে মানবের স্বর্গসুখ হইয়া থাকে। এই স্বর্গে সর্ব্ববিধ সুখ-সম্ভোগ হয়, যাহা কামনা হয় তাহাই পূর্ণ হইয়া থাকে; মানবের কোন অভাব থাকে না, মানব সুখ-সাগরে ডুবিয়া বা ভাসিতে ভাসিতে আত্মহারা হইয়া যায়। অবশ্য কর্ম্মফলের ক্ষয় হইলে পতন অবশ্যম্ভাবী বটে, কিন্তু তাহাতে আবার উন্নত জন্মই হয়। আর একবার যাগবিশেষের ফলে যদি একশত বৎসর স্বর্গ হয়, তাহা হইলে, এখানকার এক বৎসর দেবলোকের এক দিন বলিয়া এখানকার অনুপাতে ৩৬,৫০০ শত বৎসর স্বর্গই সেই যাগবিশেষের একবার অনুষ্ঠানের ফল হইয়া থাকে। এইরূপ যাঁহারা নিত্য বা পুনঃপুনঃ যাগাদি করেন, তাঁহাদের তাদৃশ স্বর্গ এক প্রকার অক্ষয় স্বর্গই হইয়া যায়। আর কর্ম্মফলের শেষে পতন হইলেও আবার তাদৃশ যাগের অনুষ্ঠানে আবার সেইরূপ স্বর্গ হয়। আর এই সঙ্গে যোগবিদ্যার অনুশীলনে ইচ্ছামৃত্যু ও নীরোগশরীর প্রভৃতিও হইতে পারে। সুতরাং যাগযজ্ঞাদি কর্ম্মবিশেষের ফলে মানবের উন্নতি অনন্ত উন্নতিতে পরিণত হয়। মানবের যেমন আকাঙ্ক্ষার শেষ নাই, তদ্রূপ তাহার উন্নতিরও শেষ থাকে না, তাহার সুখেরও সমাপ্তি হয় না।

এই মতে আপত্তি করিয়া যদি কেহ বলেন যে, এই যাগাদির অনুষ্ঠানে ত দুঃখও আছে, সময়বিশেষে পতন ঘটায় তজ্জন্য দুঃখও হয়, অতএব দুঃখশূন্য সুখ লাভ ত আর হইল না। এজন্য এই মতে বলা হয় যে, দুঃখ-শূন্য সুখ নাই, উহা অসম্ভব কথা। সুতরাং কৌশলে দুঃখমাত্রা কমাইয়া সুখের মাত্রা বর্দ্ধিত করাই বুদ্ধিমানের কার্য্য। বস্তুতঃ বেদোক্ত কর্ম্মানুষ্ঠানদ্বারা তাহাই হইয়া থাকে। অতএব ইহাই পুরুষার্থ, ইহারই জন্য জীব-মাত্রের যত্ন কর্ত্তব্য। সুখ যদি প্রাণিমাত্রের অভীষ্ট হয়, আর সেই সুখ যদি দুঃখ শূন্য সুখ না হয়, আর সেই সুখ যদি বেদোক্ত কর্ম্মদ্বারা যথাসম্ভব অধিক মাত্রায় লব্ধ হয়, তাহা হইলে তাহাই মানবমাত্রের কর্ত্তব্য।

আমাদের দেশে এই মতবাদটিকে এক প্রকার ক্রমোন্নতিবাদ বলা যাইতে পারে। ইহার আভাস ভগবদ্গীতার মধ্যে—

> কামাত্মানঃ স্বর্গপরা জন্মকর্ম্মফলপ্রদাম্।
> ক্রিয়াবিশেষবহুলাং ভোগৈশ্বর্য্য গতিং প্রতি।

ইত্যাদি বাক্যেও পাওয়া যায়। এতদ্ব্যতীত—

"অপাম সোম অমৃতা অভূম"

অর্থাৎ সোম পান করিয়া অমৃত হইব—এই বেদবাক্য-মধ্যেও এই কথারই আভাস পাওয়া যায়। ইহাতে মানব কখন পূর্ণতা প্রাপ্ত হইবে না, কখন অসঙ্গ ব্রহ্ম-স্বরূপতা লাভ করিতে পারিবে না—কিন্তু অনন্তকামনার অনন্তপরিপূর্ত্তি অনন্ত কাল ধরিয়া হইতে থাকিবে। আর এজন্য ইহা একপ্রকার ক্রমোন্নতিই হইতেছে।

কিন্তু ভারতীয় পাশ্চাত্য ক্রমোন্নতিবাদে সকলেরই উন্নতি অনন্ত স্বীকার করা হয়। এই উন্নতির সীমা নাই, ইহার আদিও নাই। জগতের প্রত্যেক বস্তুরই অনন্তকাল হইতে উন্নতি হইয়া আসিতেছে এবং অনন্ত-কাল এই উন্নতি হইতে থাকিবে।

তন্মধ্যে কেহ বলেন—এই উন্নতি জাতি ও ব্যক্তি উভয়েরই হইতেছে। জাতি যেমন বানরজাতি, মনুষ্য-জাতি এবং ব্যক্তি যেমন একটি বানর বা একটি মনুষ্য। কেহ বলেন—ইহা জাতিরই উন্নতি, ব্যক্তির নহে; যেমন বানর জাতি হইতে মানব জাতির বিকাশ।

জাতির উন্নতির ফলে পূর্ব্বেকার সাধারণ মানব হইতে বর্ত্তমানের সাধারণ মানব সুখ শান্তি জ্ঞান বল ও ঐশ্বর্য্যে উন্নত। অতীতের সাধারণ মানবের এত সুখ শান্তি জ্ঞান বল ও ঐশ্বর্য্য ছিল না। আর ব্যক্তির উন্নতির ফলে প্রত্যেক জীবের, এমন কি উদ্ভিজ্জাদি পদার্থেরও প্রত্যেকের আকৃতি প্রকৃতি ক্রিয়া জ্ঞান বুদ্ধি প্রভৃতি যথাযোগ্য সকল বিষয়ে তাহারা পূর্ব্বের অপেক্ষা মোটের উপর অনেক উন্নত।

যদি বলা যায় সকল জাতিরই প্রাচীন কাহিনী দেখিলে মনে হইবে, তাহারা জ্ঞান বল ঐশ্বর্য্যাদিতে বর্ত্তমান অপেক্ষা উন্নতই ছিল, ইত্যাদি; তাহা হইলে তাহার উত্তর এই যে, উহা সত্য ঘটনা নহে, উহা গালগল্প বিশেষ, উহা কবি-কল্পনা ভিন্ন কিছুই নহে; মানবের আদর্শের উন্নতির জন্য উহা কল্পিত মাত্র। যেহেতু আদর্শ অনুসারেই মানবের ভবিষ্যৎ হইয়া থাকে। অতএব, অতীত অপেক্ষা বর্ত্তমান উন্নতই বটে, ইহাতে সন্দেহ নাই। বস্তুতঃ, এই সব বিষয় প্রমাণিত করিয়া পাশ্চাত্য মতাবলম্বিগণ বহু বৃহৎ বৃহৎ গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। তাহাদের উল্লেখ এস্থলে নিষ্প্রয়োজন।

এক্ষণে উক্ত জাতি ও ব্যক্তি উভয়ের উন্নতিবাদী ও জাতি মাত্রের উন্নতিবাদীর মধ্যে যাঁহারা ব্যক্তিরও উন্নতি স্বীকার করেন, তাঁহাদের মধ্যে দুই দল আছেন। একদল ব্যক্তির আত্মার উন্নতিবাদী এবং অপর দল আত্মার ধর্ম্মের উন্নতিবাদী, অর্থাৎ আত্মার প্রকৃতির বা দেহাদির সামর্থ্যাদির উন্নতিবাদী। অন্য কথায় একমতে আত্মার উন্নতি হয় না, আত্মা অবিকৃত থাকে, আত্মার ধর্ম্মের বা আত্মার দেহাদির উন্নতি হইয়া থাকে বলা হয়। ইহাদের মধ্যে স্বস্বমতানুকূলে যুক্তিতর্ক যথেষ্ট প্রদর্শন করা হয়। অনেকের অনেক কথাই যে যুক্তিযুক্ত তাহাতে সন্দেহ নাই। বাহুল্যভয়ে সে-সব কথার আর অবতারণা করা গেল না।

এই উভয়বিধ ব্যক্তি-উন্নতিবাদীর মতে কাহারও আর অবনতি স্বীকার করা হয় না। ইহাদের মধ্যে যাঁহারা জীবের পুনর্জ্জন্ম স্বীকার করেন, তাঁহাদের মতে প্রত্যেক জন্মেই ইহাদের পূর্ব্বজন্ম হইতে উন্নতি হয়, আর এই উন্নতি, অনন্তকাল ধরিয়া চলিতেছে—ইহার শেষ নাই। সুতরাং মানবাত্মা বিশ্বাত্মার ভাব উত্তরোত্তর পাইতেছে। মানব পূর্ণ হইতে পূর্ণতরের দিকে চলিয়াছে। সেই পূর্ণতরতা প্রাপ্তির শেষ হইবে না, অন্যকথায় মানব কখন একেবারে সর্ব্বতোভাবে পূর্ণ হইবে না। মানবাত্মা কিঞ্চিৎ অপূর্ণ থাকিয়াই—কিঞ্চিৎ অভাবগ্রস্ত থাকিয়াই পূর্ণ হইতে পূর্ণতরতাপ্রাপ্তির সুখে সুখী হইবে। আর এই গতি অনন্ত বলিয়া এই সুখও অনন্তই হইতে থাকে। এইরূপ অনন্ত সুখপ্রাপ্তিই ইহার পূর্ণতা, বা পূর্ণতরতা। অনন্তসুখপ্রাপ্তিরহিত হইয়া সর্ব্বতোভাবে পূর্ণতাপ্রাপ্তি ঘটিলে অর্থাৎ অভাবশূন্য পূর্ণতাপ্রাপ্তি ঘটিলে সুখপ্রাপ্তি সম্ভবপর হয় না বলিয়া তাদৃশ সর্ব্বতোভাবে পূর্ণতাপ্রাপ্তি যথার্থ পূর্ণতাই হইতে পারে না; অতএব অনন্ত অপূর্ণের মধ্য দিয়া যে অনন্ত পূর্ণতার অভিমুখে যে গতি, তাহাই প্রকৃত পূর্ণতা। ইহারই দিকে মানব চলিয়াছে। ইহাই মানবের স্বভাব, ইহাই মানব চায়, ইহার অন্যথা হয় না।

ইহার কারণ—সমগ্র জগতের সর্ব্বত্রই এই পূর্ণতার অভিমুখে গতি দেখা যায়। আর মানব সেই জগতেরই একটা অংশ, সুতরাং সেই অংশী জগতের স্বভাবই অংশমানবের স্বভাব হইতে বাধ্য। অংশের স্বভাব অংশীর স্বভাবের বিরোধী হইতে পারে না। এজন্য স্বভাবতঃ মানব অনন্ত উন্নতির দিকে চলিয়াছে। ইহাই সার সত্য, ইহাই অখণ্ডনীয় সত্য। ইহার অন্যথা যুক্তি তর্ক দ্বারা সম্ভাবিত নহে।

আর এইরূপ হইয়া থাকে বলিয়া এইমতে জীব পাপপুণ্য, ন্যায়-অন্যায় যাহাই কিছু করুক না, তাহা সে স্বভাববশেই করে, সে ব্যক্তি জগতেরই পূর্ণতা-প্রাপ্তির সহায়তা করিয়া থাকে। আর তাহার ফলে তাহার অধোগতি আর কোনরূপেই সম্ভবপর নহে। স্বভাবের অনুরোধে তাহার উন্নতি অবশ্যম্ভাবী। তাহাকে আর কেহ স্থাবর জঙ্গম ও পশুযোনিতে নিক্ষিপ্ত করিতে পারিবে না। তাহার পুণ্য পাপের ফল তাহার এখানেই ভোগ হইয়া যাইবে। সাময়িক দুঃখ বা যন্ত্রণা হইলেও তাহার উন্নতিই হয়। নরকাদি কথা কল্পনামাত্র। ইহা তাহার হইবে না। উহা নাই, হইবে না, হইতেও পারে না। মানবকে অন্যায় কর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত করিবার জন্য এই নরকাদি কল্পনা করা হয়। অতএব মানুষ যাহাই করুক না কেন, জগতের প্রকৃতিবশে সে অনন্ত উন্নতির পথেই চলিয়াছে।

আর যাঁহারা পুনর্জ্জন্ম মানেন না, অথচ আত্মা স্বীকার করেন, তাঁহাদের মতে আত্মা কোনরূপ সূক্ষ্মদেহে থাকিয়া উন্নতির পথেই চলেন। সে সূক্ষ্মদেহের কথা আমরা না জানিতে পারিলেও তাহা অবশ্যই স্বীকার্য্য। অতএব জাতির ব্যক্তির উন্নতিবাদী সকলের মতেই অনন্ত উন্নতি, সকলের মতেই ক্রমোন্নতি স্বীকার করা হয়।

ইঁহাদের মতে, যাঁহারা বলেন—অভাবশূন্য পূর্ণতাই পূর্ণতা পদের প্রকৃত অর্থ, পূর্ণতায় দ্বৈতগন্ধ থাকিতে পারে না, পূর্ণতা—নির্ব্বিশেষ নিগুর্ণ—স্বগতস্বজাতীয়-বিজাতীয় ভেদশূন্য এক অদ্বিতীয় বস্তুরই ধর্ম্ম। দেশ-কাল ও বস্তুগত পরিচ্ছেদশূন্য অসঙ্গ বস্তুই পূর্ণ। [illegible] বস্তু কখন পূর্ণ পদবাচ্য হয় না। এজন্য দ্বৈত মিথ্যা মাত্র ইত্যাদি—তাঁহারা মহা ভ্রান্ত। সুতরাং শূন্যবাদী বৌদ্ধ বা অদ্বৈতবাদী শঙ্করমতাবলম্বিগণ মহাভ্রান্ত, মহা অসত্য কথার প্রচারে বদ্ধপরিকর। তাঁহারা জগৎতত্ত্ব, জ্ঞানতত্ত্ব, প্রকৃতিতত্ত্ব প্রভৃতি সম্যক আলোচনা না করিয়াই এই সব কথা বলিয়া থাকেন। ক্রমোন্নতিবাদের ফলে তাঁহাদের ভুল ধরা পড়িয়াছে। তাঁহাদের মতানুসরণ আর সঙ্গত নহে। বস্তুতঃ ক্রমোন্নতিবাদই সত্য।

আর যাঁহারা জাতিমাত্রের ক্রমোন্নতিবাদী তাঁহারা একথা বলেন না। তাঁহারা বলেন—নিম্নজাতীয় প্রাণিবর্গ হইতে উচ্চ জাতীয় প্রাণিবর্গের আবির্ভাব হইয়াছে, যেমন বানর জাতি হইতে মনুষ্য জাতির আবির্ভাব হইয়াছে। বস্তুতঃ এ মতের সহিত আমাদের বেদান্তাদি মতের বিরোধ করিবার প্রয়োজন নাই। কারণ ইহারা আত্মার সম্বন্ধে কিছুই বলে না।

কিন্তু দার্শনিক ক্রমোন্নতিবাদটি যে ঠিক্ পাশ্চাত্য-গণেরই মতবাদ, আর তাহাই ভারতে আসিয়া একটা সম্পূর্ণ নূতন মতবাদ হইয়াছে তাহাও নহে। কারণ, আমাদের দেশের উপাসকসম্প্রদায়ের যে মতবাদ তাহাকে উক্ত মতবাদ অতিক্রম করে না। পাশ্চাত্য-গণের এই মতবাদের বহু পূর্ব্ব হইতে আমাদের দেশে যে বিশিষ্টাদ্বৈত, দ্বৈত বা দ্বৈতাদ্বৈতপ্রভৃতি মতবাদ প্রচলিত হইয়া আসিতেছে, তাহাতে উক্ত ক্রমোন্নতির যাহা আসল কথা তাহা সর্ব্বতোভাবেই স্থান পাইয়াছে আর এই জন্যই আজকালকার পাশ্চাত্য দার্শনিক চিন্তা-পরায়ণগণ রামানুজাচার্য্য, নিম্বাকাচার্য্য প্রভৃতির মতবাদের প্রতি অনুরাগ প্রদর্শন করিয়া থাকেন অথচ তাঁহাদের মতকে নিম্নাসনই প্রদান করেন, কখন বা উপেক্ষাও করেন।

এই পাশ্চাত্য দার্শনিক ক্রমোন্নতিবাদ এবং আমাদের দেশীয় বিশিষ্টাদ্বৈত প্রভৃতি উপাসকসম্প্রদায়ের মতবাদের মধ্যে কোথায় ঐক্য—চিন্তা করিলে দেখা যায়, ক্রমোন্নতি বাদী যেমন নিজত্ব রাখিয়া পূর্ণত্বের প্রতি অগ্রসর, তদ্রূপ আমাদের দেশের উপাসকসম্প্রদায়গণও জীব ও ব্রহ্মে [illegible] বা বিশেষ স্বীকার করেন এব

অনন্ত সুখের অভিলাষী বলিয়া নিজত্ব রাখিয়া পূর্ণত্ব প্রাপ্তি স্বীকার করেন। তাঁহারা যেমন মানবাত্মার বিশ্বাত্মভাবপ্রাপ্তিতে অনন্তসুখসম্ভোগের পক্ষপাতী, ইঁহারাও তদ্রূপ নিত্য ভগবানের অনন্ত সঙ্গ-সুখ বা অনন্ত সেবা-সুখের পক্ষপাতী হইয়া থাকেন। সুতরাং উক্ত পাশ্চাত্যমতে যেমন মানবাত্ম ও বিশ্বাত্মার মধ্যে অর্থাৎ জীবাত্মাও পরমাত্মার মধ্যে ভেদ ও অভেদ থাকে, বিশিষ্টা-দ্বৈতাদিমতেও তদ্রূপ জীবাত্মা ও পরমাত্মার মধ্যে ভেদাভেদ থাকে। দ্বৈতবাদিগণ ভেদবাদী হইলেও চিন্ময়ত্ব অংশে জীব ব্রহ্মের একজাতীয়ত্ব স্বীকার করেন বলিয়া তাঁহাদের সঙ্গেও ঐক্য আছে বলা যায়। সুতরাং একপ্রকার ক্রমোন্নতিবাদ আমাদের দেশের উপাসক সম্প্রদায়মধ্যেও বহুকাল পূর্ব্ব হইতেই আছে।

বাহুল্য ভয়ে ইঁহাদের মধ্যে প্রভেদের কথা আর উল্লেখ করিলাম না।

এইবার দেখা যাউক, উক্ত পাশ্চাত্য ক্রমোন্নতিবাদটি কতদূর যুক্তিসহ। ইঁহাদের প্রধান কথা এই যে, আমরা অনন্ত কাল ধরিয়া ক্রমাগত পূর্ণতাভিমুখে যাইতেছি, অথবা অনন্তকাল ধরিয়া আমরা পূর্ণ হইতে পূর্ণতরের অভিমুখে যাইতেছি। কিন্তু ক্রমোন্নতিবাদীর এই দুইটি কথাই অসঙ্গত, কারণ, প্রথম কল্পে অনন্তকাল ধরিয়া আমরা পূর্ণাভিমুখে যাইতেছি বলিলে, আমরা অনন্ত-কালই অপূর্ণই থাকিব, কখনই পূর্ণ হইব না—ইহাই সুনিশ্চিত। আর পূর্ণতাভিমুখে গতিও আমাদের সম্ভবপর হয় না, কারণ, আমরা যদি কস্মিন্‌কালেও পূর্ণ না হই, তবে আমাদের গতি পূর্ণতার অভিমুখে—ইহা কি করিয়া বলা যায়? যেমন আমি কাশীর অভিমুখে যাইতেছি, অথচ যদি কস্মিন্‌কালেও কাশী না পঁহুছিতে পারি, তাহা হইলে আমার গতি কাশীর অভিমুখে ইহা কিছুতেই বলা যায় না। অতএব আমরা অনন্তকাল ধরিয়া পূর্ণতার অভিমুখে চলিয়াছি—এই প্রথম কল্পটি একান্ত অসঙ্গত।

আর যদি আমরা অনন্ত কাল ধরিয়া পূর্ণ হইতে পূর্ণতরের অভিমুখে যাইতেছি—এই রূপ বলা হয়, অর্থাৎ এই দ্বিতীয় কল্প গ্রহণ করা যায়, তাহা হইলেও সঙ্গত কথা বলা হইবে না। কারণ, পূর্ণ অর্থ—সর্ব্ববিধ অভাবশূন্য ভাব। আর পূর্ণতর অর্থ—তাদৃশ অভাবশূন্য ভাবের আধিক্য। এখন পূর্ব্বোক্ত যুক্তিতে আমরা যখন পূর্ণই হইব না, তখন আবার পূর্ণতর হইব কি করিয়া? আর অনন্তকাল পূর্ণ হইতে পূর্ণতর হইতে গেলে পূর্ণতর হইতে আবার পূর্ণতর হইতে হয়। কিন্তু তাহা আরও অসম্ভব কথাই হয়।

তাহার পর পূর্ণ যদি সর্ব্ববিধ অভাবশূন্য ভাব হয়, তাহা হইলে তাহার আবার পূর্ণতরতা অর্থাৎ আধিক্য কি করিয়া সম্ভব হয়। অতএব অনন্তকাল গতির অনুরোধে এবং পূর্ণ হইতে পূর্ণতরতা প্রাপ্তির অনুরোধে এই পূর্ণতাও অপূর্ণতা, এবং এই পূর্ণতরতাও অপূর্ণতা। আর আমরা ত অপূর্ণ আছিই। সুতরাং এই উভয় পক্ষের অর্থই হইতেছে—অনন্তকাল অপূর্ণতা হইতে অপূর্ণতাপ্রাপ্তিই আমাদের ক্রমোন্নতি। অতএব এ মতের ন্যায় অসঙ্গত মত আর কি হইতে পারে?

তাহার পর পূর্ণতার অভিমুখে গতি—এই কথাটাই সঙ্গত হয় না। কারণ, পূর্ণতার অর্থ—সর্ব্ববিধ অভাবশূন্যতা হইলে দুইটি বস্তুই স্বীকার করা যায় না। আর বহু বস্তুর পূর্ণতাপ্রাপ্তিও সম্ভব হয় না। দুইটি বস্তু স্বীকার করিলে তাহারা সসীম হয়, সুতরাং দেশগত অভাব তাহাদের থাকে। বস্তুতঃ এক অদ্বৈতবস্তুই পূর্ণপদবাচ্য হয় বলিয়া আর সেই পূর্ণের ধর্ম্ম পূর্ণতা বলিয়া বহু বস্তুতে পূর্ণতাধর্ম্মও আসিতেও পারে না। অতএব পূর্ণতার অভিমুখে গতিই অসম্ভব কথা।

যদি বলা হয়—সর্ব্ববিধ অভাবশূন্যতাই পূর্ণতা, আর তাদৃশ পূর্ণতাপ্রাপ্তি ঘটিলে, অথবা অনন্তসুখ প্রাপ্তিরহিত হইয়া সর্ব্বোতোভাবে পূর্ণতাপ্রাপ্তি ঘটিলে, অর্থাৎ সর্ব্বতোভাবে অদ্বৈততত্ত্বে পরিণত হইলে সুখপ্রাপ্তি সম্ভব হয় না বলিয়া তাদৃশ সর্ব্বতোভাবে পূর্ণতাপ্রাপ্তি বা তাদৃশ অভাবশূন্য পূর্ণতাপ্রাপ্তি—পূর্ণতাপদবাচ্যই হয় না, ইত্যাদি। তাহা হইলে বলিতে হইবে—সেস্থলে অনন্ত ভাবের হস্ত হইতে নিষ্কৃতিলাভ হইল না। এতাদৃশ সুখপ্রাপ্তিতে অবস্থান্তর অনিবার্য্য হওয়ায় পূর্ব্বাবস্থানাশজন্য দুঃখও অনিবার্য্য কি হইবে না?

প্রথম স্ত্রীপুত্রের পরিবর্ত্তে অন্য উত্তম স্ত্রীপুত্রপ্রাপ্তি ঘটিলে কি প্রথম স্ত্রীপুত্রের দুঃখ বিস্মৃত হওয়া যায়? যতই সুখ হউক, পূর্ব্বে সুখাবস্থার নাশজন্য দুঃখ কিছুতেই বিলুপ্ত হইতে পারে না। বস্তুতঃ এতাদৃশ দুঃখমিশ্রিত সুখের জন্য অপূর্ণতাবরণ, আর পূর্ণতার জন্য তাদৃশ সুখবিসর্জ্জন—এই দুইটির মধ্যে কোনটি শ্রেয়ঃ বলিলে বুদ্ধিমান ব্যক্তি পূর্ণতারই পক্ষপাতী হইবে না। যেহেতু অপূর্ণের দুঃখশূন্য সুখ কখন হয় না।

যদি বলা যায়—পূর্ণতার অনুরোধ অদ্বৈতভাব যেমন প্রয়োজন, তদ্রূপ দ্বৈতভাব বা অপূর্ণভাবও প্রয়োজন, কারণ; পূর্ণ মধ্যে যেমন অপূর্ণতার অভাব আবশ্যক, তদ্রূপ অপূর্ণতা থাকাও ত প্রয়োজন; যেহেতু, পূর্ণমধ্যে পূর্ণতা ও অপূর্ণতা সকলই থাকা উচিত। সব থাকিলেই সে পূর্ণ হয়, নচেৎ নহে। অপূর্ণতা না থাকাতে তাহার পূর্ণতার ব্যাঘাত ঘটিবে, অর্থাৎ তাহার অপূর্ণতাই হইবে। অতএব পূর্ণমধ্যে পূর্ণতা ও অপূর্ণতা—উভয়ই থাকা আবশ্যক। সুতরাং পূর্ণতত্ত্ব সম্বন্ধে দ্বৈতাদ্বৈত বা ভেদাভেদবাদই সঙ্গত হয়। অদ্বৈতবাদ কোনরূপেই সঙ্গত হয় না; ইত্যাদি। তাহা হইলে বলিব—পূর্ণমধ্যে পূর্ণতা ও অপূর্ণতা উভয়ই থাকিলে বিরুদ্ধ ধর্ম্মের সমাবেশ হয়। বিরুদ্ধ ধর্ম্মের সমাবেশ স্বীকার আর "কিছু না বলা"—সমান কথা। যে অপূর্ণতার অভাবে পূর্ণতার সিদ্ধি, সেই অপূর্ণতার দ্বারা পূর্ণতা সিদ্ধ হইলে ভাব ও অভাব এক হইয়া যায়। অতএব সেই পূর্ণতা ও অপূর্ণতা সমানবিষয়ে সমবল-সম্পন্ন বা সমান-সত্তাক হইতে পারে না। উভয়ে সমবল বা সমসত্তাসম্পন্ন হইলে বিরোধ ঘটে। বিরুদ্ধ বস্তু একই কালে একই ভাবে জ্ঞানের বিষয় হয় না। সুতরাং থাকেও না। অতএব পূর্ণের ধর্ম্ম পূর্ণতাকে অক্ষুণ্ন রাখিয়া অপূর্ণতাকে ক্ষুণ্ন করিয়া অপূর্ণতার মিথ্যাত্ব স্বীকার করাই সমাধানের একমাত্র পথ। অথবা উভয়কে সমবল বলিয়া স্বীকার করিয়া পূর্ণতা ও অপূর্ণতা উভয়কেই অনির্ব্বচনীয় বা মিথ্যা বলিয়া একমাত্র সদ্রূপে নির্ব্বচনীয় পূর্ণস্বরূপ বস্তু-মাত্রকেই স্বীকার করিতে হইবে। অর্থাৎ পূর্ণকে পূর্ণতা ও অপূর্ণতা ধর্ম্মদ্বয় হইতে বিরহিত করিয়া পূর্ণ বস্তুকে নির্ধর্ম্মক বলিলে আর ওসব কথার সম্ভাবনাই থাকে না। বস্তুতঃ জ্ঞাতার সত্তা থাকিলেই ধর্ম্মধর্ম্মিভাবের কল্পনা সম্ভব হয়। পূর্ণতার অনুরোধে জ্ঞাতৃত্বের অভাবে ধর্ম্মধর্ম্মিভাবই সত্য নহে, কিন্তু উহা কল্পিত মাত্র বলিতে হয়। ইহাই অদ্বৈত বেদান্তের সার কথা। অতএব পূর্ণের পূর্ণতার জন্য অপূর্ণতাকে তন্মধ্যে গ্রহণ করিয়া পূর্ণতার হানি করা কখনই সঙ্গত হয় না। এজন্য অপূর্ণতাকে মিথ্যা বলা হয়। অর্থাৎ পূর্ণতার মধ্যে উহা নাই, অথচ দৃশ্য বা জ্ঞেয় হয় মাত্র, অর্থাৎ অপূর্ণতাটি কল্পিত মাত্র। যাহা নাই অথচ দৃশ্য হয় তাহারই নাম মিথ্যা। আমাদের দেশের উপাসকসম্প্রদায় অদ্বৈতবিরোধী হইলেও সত্যানুরোধে অপূর্ব্ব জগদ্ব্যাপারকে ভগবানের নিত্যলীলা বলিয়া স্বীকার করিয়া প্রকারান্তরে সেই জগদ্ব্যাপাররূপ লীলার মিথ্যাত্বই স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু অনন্ত উন্নতিবাদী তাহা না স্বীকার করায় একটা অসম্ভব ও অসঙ্গত কল্পনাই করিয়াছেন। লীলা অর্থই নিজে স্বস্বরূপে থাকিয়া অন্যথাভাবধারণ। যেমন নটের অভিনয়—তাহার লীলা। বালকবালিকার পুতুলখেলা প্রভৃতি—তাহাদের লীলা। তাহাদের খেলা যে মিথ্যা, তাহা তাহারাই জানে অথচ খেলা করে। এইজন্য লীলা ও মিথ্যা একই কথা। লীলাবাদ ও বিবর্ত্তবাদ একই কথা। বিবর্ত্তবাদে যেমন স্বরূপে চ্যুতি না ঘটিয়া কার্য্য হয়, লীলাতেও সেইরূপই হয়। বিবর্ত্ত-বাদের কার্য্য যেমন যথার্থ কার্য্য নহে, লীলার কার্য্যও তদ্রূপ যথার্থ কার্য্য নহে। পক্ষান্তরে ক্রমোন্নতিবাদ ও পরিণামবাদ একই কথা। ব্রহ্মের পরিণাম জগৎ বলিলে ব্রহ্ম আর এখন ব্রহ্ম নাই বলিতে হয়। দুগ্ধ দধি হইয়া গিয়াছে এইরূপ বলিতে হয়। এইজন্য পরিণামবাদ যুক্তিসহ নহে। এজন্য অদ্বৈতবেদান্তী জগৎকে মায়ার পরিণাম ও ব্রহ্মের বিবর্ত্ত বলিয়া স্বীকার করেন। আর মায়া মিথ্যা বলিয়া মায়ার পরিণাম স্বীকার করা ও মিথ্যার পরিণাম স্বীকার করা—একই কথা হয়। চৈতন্য-সম্প্রদায় অদ্বৈতমতখণ্ডনে প্রবৃত্ত হইয়াও ভগবৎ-শক্তি মায়ার পরিণাম এই জগৎ—ইহা স্বীকার করিয়া প্রকৃতপ্রস্তাবে

অদ্বৈতসিদ্ধান্তেরই সমর্থন করিয়াছেন। অতএব পূর্ণতার অনুরোধে পূর্ণে পূর্ণতার ন্যায় অপূর্ণতা স্বীকার করা সঙ্গত নহে। পূর্ণে পূর্ণতা ধর্ম্ম স্বীকার করিলে অপূর্ণতাকে অল্পসত্তাক বলিতে হইবে, অথবা পূর্ণকে পূর্ণতা অপূর্ণতা ধর্ম্মহীন নির্ধর্ম্মক বস্তু মাত্র বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। অতএব পূর্ণতার অনুরোধে এতাদৃশ অনন্তসুখসম্ভোগবাদই বর্জ্জনীয়, অথবা দ্বৈত বা দ্বৈতাদ্বৈতবাদই বর্জ্জনীয়।

আর যদি 'আমরা অনন্তকাল ধরিয়া পূর্ণতার দিকে চলিয়াছি' না বলিয়া 'অনন্ত উন্নতির পথে চলিয়াছি' বলিতে ইচ্ছা হয়, তাহা হইলেও সুবিধা নাই। কারণ, উন্নতি শব্দের অর্থ—পূর্ব্বাবস্থার অভাব নাশপূর্ব্বক অধিক লাভ বুঝায়। কিন্তু এই উন্নতি যদি অনন্ত হয়, তাহা হইলে অভাবও অনন্ত হইবে। অভাবের সর্ব্বতোভাবে নাশ আর কস্মিন্ কালেও বুঝাইবে না। উন্নতির শেষ না হইলে আর অভাবের সম্পূর্ণ নাশ সম্ভবপর হয় না। কিন্তু অনন্ত উন্নতি বলিলে ত আর উন্নতির শেষ বলা হয় না। অতএব আমরা অনন্ত উন্নতির পথে চলিয়াছি বলিয়া অনন্ত অভাবপ্রাপ্তির পথেই চলিয়াছি বলিতে হয়। অনন্ত উন্নতিতে অনন্ত অভাব অপরিহার্য্য।

যদি বলা হয়, অনন্ত উন্নতিতে অনন্ত সুখ হয়—একথাটি ভুলিলে চলিবে কেন? সুখ যদি অনন্ত হয় তাহা হইলে তাহা কে না চাহে? সুখ ত দুঃখশূন্য হয় না। সুখের যে উহা স্বভাবই। অভাব না থাকিলে যে সুখ তাহা সুখই নহে, আর তাহা বাঞ্ছনীয়ও নহে। অতএব বস্তুগতি অনুসারে অভাবসমন্বিত অনন্ত উন্নতিই বাঞ্ছনীয়। অর্থাৎ ক্রমোন্নতিবাদই স্বীকার্য্য। কিন্তু একথাও অসঙ্গত, কারণ, সুখ যদি দুঃখশূন্য না হয়, তাহা হইলে সুখের মাত্রা যতই বাড়িবে দুঃখের মাত্রাও ততই বাড়িবে। দুঃখ কমিবে আর সুখ বাড়িবে এরূপ কখনও সম্ভবপর হয় না। অতএব অনন্ত উন্নতিতে অনন্ত অভাব অবশ্য স্বীকার্য্য, আর ইহা সকলের অভীষ্ট হইতে পারে না।

যদি বলা হয় উন্নতির মধ্যে অভাব একটা অঙ্গ নহে। বর্ত্তমান অভাব মোচনপূর্ব্বক অধিক লাভ উন্নতি কেন বলিব? পরন্তু উত্তরোত্তর অধিক লাভই উন্নতি। অভাব না থাকিয়াও উত্তরোত্তর অধিক লাভ সম্ভবপর হইতে পারে। লক্ষপতি যদি সহসা কোটিপতি হয়, কোটিপতি যদি সহসা তদতিরিক্ত ধন পায়, তাহা হইলে যেমন অভাব না থাকিয়াও উন্নতি হয়, এস্থলে সেইরূপ হইবে না কেন? তাহা হইলে বলিতে হইবে, যে, দেশকালদ্বারা পরিচ্ছন্ন বস্তুর লাভে অভাব থাকা অবশ্যম্ভাবী হয়। পরিচ্ছন্ন বলিলেই অভাব স্বীকৃত হইয়া যায়। বস্তুতঃ আশাপথের কি অন্ত আছে? যে লক্ষপতি সহসা কোটিপতি হয় সে ব্যক্তির আকাঙ্ক্ষা যে কত বাড়িয়া যায়, আর তাহাতে যে কত দুঃখ হয়, তাহাত সহজেই বুঝিতে পারা যায়। অতএব ক্রমোন্নতির মধ্যে অভাব থাকা অবশ্যম্ভাবী। অবশ্য উন্নতির শেষ যদি স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে একদিন অভাবশূন্য অবস্থা সম্ভবপর হয়। নচেৎ ইহা কখনই সম্ভবপর হয় না। কিন্তু উন্নতির শেষ স্বীকার করিলে আর ক্রমোন্নতি সম্ভবপরই হয় না।

যদি বলা হয়—প্রাণীমাত্রেরই অনন্ত সুখই কামনার বিষয়, আর সেই অনন্ত সুখের সম্ভাবনাতেই ক্রমোন্নতি বা পূর্ণতাভিমুখে গতি স্বীকার করা হয়। পূর্ণতাভিমুখ গতি না হইলে ক্রমোন্নতিই সম্ভব হয় না। কিন্তু যখনই দেখা যায় যে, ক্রমোন্নতিতে অভাব আছে, দুঃখ আছে, আর কখনও পূর্ণতাপ্রাপ্তি না হইলে পূর্ণতাভিমুখে গতিই সম্ভবপর হয় না, আর পূর্ণতা স্বীকার করিলে তাহার নিজের পৃথক্ সত্তাই থাকে না, তখনই পূর্ণতার অনুরোধে অদ্বৈতস্বীকার করিতে হয়, আর তাহার ফলে অনন্ত সুখসম্ভোগ অসম্ভব হয়, আর পূর্ণতার অভিমুখে গতিও সম্ভব হয় না, সুতরাং সুখভোগের অনুরোধে দ্বৈত এবং পূর্ণতার অনুরোধে অদ্বৈত স্বীকার করায় দ্বৈতাদ্বৈতই স্বীকার্য্য হয়। বস্তুতঃ এস্থলে আমাদের কামনানুসারেও তত্ত্ব নির্ণীত হওয়া উচিত। কেবল যুক্তির অনুরোধে অদ্বৈতস্বীকার সমীচীন নহে, ইত্যাদি। তাহা হইলে তাহার উত্তর এই যে, লোকে যেমন প্রবৃত্তির অনুরূপ প্রবৃত্ত হয়, তদ্রূপ যুক্তি অনুসারেও লোকে প্রবৃত্ত হয়। প্রত্যুত যুক্তির দ্বারা লোকে তাহার প্রবৃত্তিই নিয়মিত করে। যুক্তিই প্রধান, আর প্রবৃত্তি তাহার অধীন—

এই ভাবেই মনুষ্যত্বের বিকাশ। প্রবৃত্তিটি প্রধান আর যুক্তি তাহার অধীন—এইভাবে পশুত্বের প্রকাশ। অতএব যুক্তির দ্বারা যে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়, তাহাই সমীচীন সিদ্ধান্ত।

যদি বলা যায়—প্রবৃত্তির অনুসারে যে তত্ত্বনির্ণয়, তাহাও যুক্তিসাহায্যে নির্ণীত হয়,এবং যাহাকে যুক্তির দ্বারা নির্ণয় বলা হয়, তাহাও বস্তুগতি অনুসারেই যুক্তির দ্বারা নির্ণয় বলিতে হয় অতএব এই দ্বিবিধ নির্ণয়ের মধ্যে কোন তারতম্য নাই। তাহা হইলে বলিতে হইবে যে, প্রবৃত্তির অনুসরণ ও বস্তুগতির অনুসরণ—এই উভয়ের মধ্যে বস্তু-গতির অনুসরণই সত্যানুগামী ; আর প্রবৃত্তিকে বস্তুগতির দ্বারা নিয়মিতই করা হইয়া থাকে। অতএব প্রবৃত্তির অনুসারে ভোগের অনুরোধে দ্বৈতস্বীকারের দ্বারা পরস্পর বিরুদ্ধ দ্বৈতাদ্বৈত স্বীকার অসঙ্গত।

আর যদি বলা যায়—এই দ্বিবিধ নির্ণয়ই সমবল হউক, উহাই বস্তুগতি। তাহা হইলে বলিব—দ্বৈত ও অদ্বৈত পরস্পর বিরোধী কিনা? যদি পরস্পর বিরোধী হয়, তাহা হইলে তাহারা একস্থানে থাকিতে পারে না। আর যদি অবিরোধী হয়, তবে সহাবস্থান সম্ভব হয়। অতএব দ্বৈতাদ্বৈত স্বীকারে দ্বৈতকে অদ্বৈতের অবিরোধী বলাই হইল। আর তাহা হইলে "দ্বৈতাদ্বৈত" শব্দ প্রয়োগ না করিয়া "দ্বৈত" শব্দ প্রয়োগই উচিত। কারণ, দ্বৈতবস্তুমধ্যে অনেক সমান ধর্ম থাকে, স্বীকার করা হয়। আর সেই সমান ধর্মানুসারে তাহাদিকে "এক" বা অদ্বৈতও বলিতে পারা যায়।

আর যদি দ্বৈত ও অদ্বৈতকে পরস্পর বিরোধীই স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে এই দুইটি ধর্মই সেই প্রকৃত তত্ত্ববস্তুর ধর্ম নহে, কিন্তু উহারা একটি অনির্বচনীয় ভাব-বিশেষ হয়। প্রকৃত যে তত্ত্ববস্তু, তাহা নির্ধর্মক এবং কেবল "আছে" এই মাত্ররূপে জ্ঞেয়, আর তদতিরিক্তরূপে অজ্ঞেয়ই হয়। আর উহা উক্ত "আছে" মাত্র হইতে ভিন্ন হওয়ায়, অথচ দৃশ্য হইতেছে বলিয়া উহা সদসদ্‌ভিন্নই হয়। অর্থাৎ মিথ্যাই হয়। যেহেতু মিথ্যার অর্থই এই যে, যাহা নাই অথচ দৃশ্য হয়, তাহাই মিথ্যা। সুতরাং প্রকৃত তত্ত্ববস্তুটি একটি নির্ধর্মক বস্তুই বলিতে হয় এবং তাহার দ্বৈতাদ্বৈত ভাবটি অনির্ব্বচনীয় মিথ্যা ভাব বলিতে হয়।

আর যদি সেই প্রকৃত তত্ত্ববস্তুতে দ্বৈত ও অদ্বৈত—এই বিরুদ্ধভাব দুইটিকে ধর্ম্ম বলিয়া স্বীকার করিবার আগ্রহ হয়, তাহা হইলে একটিকে অধিকসত্তাক এবং অপরটিকে অল্পসত্তাক বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। নচেৎ বিরোধের পরিহার হয় না। সম্পূর্ণবিরুদ্ধ বস্তু কখনই দৃশ্য বা বিশেষরূপ জ্ঞানের বিষয় হয় না। অথচ সেই দ্বৈতাদ্বৈতের এক অংশ দ্বৈতের বিশেষরূপ জ্ঞানই হইয়া থাকে। আর তাহা হইলে অদ্বৈতভাবকেই অধিক সত্তাক বলিতে হয়। কারণ, দ্বৈতভাব নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল, অদ্বৈত কিন্তু নিয়ত একইরূপ।

যদি বল তাহা হইলেও ত দ্বৈত এবং অদ্বৈতভাবের কোনও এককালে ত বিরোধ অনিবার্য্য হইল। দ্বৈত-ভাব অল্পসত্তাক বলিয়া যে কালে দ্বৈত থাকিবে না, সেকালে দ্বৈতাদ্বৈতের বিরোধ না থাকিলেও যে কালে তাহা থাকে, সেকালেও বিরোধ থাকেই। তাহা হইলে বলিব যে বস্তুটি নাই, অথচ দৃশ্য হয়, অর্থাৎ মিথ্যা, তাহার যে দ্বৈতভাব, আর যে-বস্তুটি আছে, অথচ দৃশ্য নহে, অর্থাৎ সদ্রূপ ব্রহ্ম, তাহার যে অদ্বৈতভাব, সেই ভাবের মধ্যে যে বিরোধ, তাহা মিথ্যার সঙ্গে সত্যের বিরোধ হয়। অর্থাৎ সেই বিরোধটিও মিথ্যাই হয়। অতএব ইহা প্রপঞ্চসত্যতাবাদী বা দ্বৈতবাদী বা ক্রমোন্নতিবাদীর ন্যায় বিরোধ নহে। তাঁহাদের মতে প্রপঞ্চ সত্য বলিয়া অর্থাৎ দ্বৈতও সত্য বলিয়া সত্য দ্বৈতের সঙ্গে সত্য অদ্বৈতের বিরোধ হইল, অর্থাৎ সত্যের সহিত সত্যের বিরোধ হয়। অতএব ক্রমোন্নতিবাদীর দ্বৈতাদ্বৈতবাদ সঙ্গত শোভন বাদ নহে। যাঁহারা ব্রহ্ম সত্য ও জগৎ মিথ্যা বলেন, তাঁহাদের মতই শোভন ও সঙ্গতবাদ হইতেছে। অতএব উত্তরোত্তর বর্ত্তমান সুখসম্ভোগের পর পূর্ণতাপ্রাপ্তি যে মতে ঘটে, সেই মতেই জীবের প্রবৃত্তি ও যুক্তির সামঞ্জস্য থাকে, অন্য মতে নহে। সেই মতেই জগৎতত্ত্বের ব্যাখ্যা যত সুন্দর হয়, এত আর অন্য মতে নহে। ইহাই অদ্বৈত-বেদান্তের মত। শূন্যবাদী বৌদ্ধও অদ্বৈতবাদী বটে, কিন্তু

সে মতে অসৎ অর্থাৎ সদ্‌ভিন্ন শূন্য হইতে সৎ জগতের আবির্ভাব হইয়াছে। অতএব সে মতে এই দ্বৈতাদ্বৈতের বিরোধ না থাকিলেও অসৎ হইতে সতের উৎপত্তি—ইহা অসম্ভব কথাই হয়। অতএব বেদান্তের অদ্বৈতবাদই সঙ্গত, ক্রমোন্নতিবাদ প্রভৃতি কোনবাদই সঙ্গত নহে।

তাহার পর ক্রমোন্নতিবাদে পরিবর্ত্তন অবশ্য স্বীকার্য্য। কিন্তু কাহার পরিবর্ত্তন এই কথার উত্তরে অপরিবর্ত্তনশীলেরই পরিবর্ত্তন হয়—বলিতে হয়। যেহেতু পরিবর্ত্তনশীলেরই পরিবর্ত্তন বলিলেও বিশেষ্য বিশেষণের ভেদ থাকায়, বিশেষণরূপ পরিবর্ত্তনশীলতা হইতে তাহার বিশেষ্যের ভেদ থাকে বলিতে হয়। বস্তুতঃ যাহা নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল তাহাকে এই 'এই' বলিয়া নির্দ্দেশ করাও যায় না। কারণ, যে সময় "এই" বলা যায়, তাহার পরক্ষণেই সে নাই। তাহার সত্তার জ্ঞান কালেই তাহা আর থাকে না। যেহেতু তাহার সত্তার জ্ঞান "এই" জ্ঞানের পরক্ষণেই স্বীকার্য্য। অতএব অপরিবর্ত্তনশীলের পরিবর্ত্তন স্বীকার করিতে হইতেছে বলিয়া অপরিবর্ত্তনশীল বস্তুটি সত্য, আর তাহার পরিবর্ত্তনটি একটি মিথ্যা ব্যাপার। কারণ, উহা দেখা যায়, অথচ থাকে না, আর যে কারণে অপরিবর্ত্তনশীলের পরিবর্ত্তন জ্ঞান হয়, তাহাও সুতরাং অনির্ব্বচনীয় বলিয়া তাহাই মায়া বলা হয়। ইহাই অদ্বৈতবেদান্তের সিদ্ধান্ত। এতদপেক্ষা জগৎ তত্ত্ব সম্বন্ধে সত্য কথা আর বলা যায় না।

এখন অবশ্য ক্রমোন্নতিবাদী বলিবেন সর্ব্ববিধ দ্বৈতগন্ধশূন্য বস্তুই হইতে পারে না। সম্পূর্ণ অদ্বৈত বস্তু মানব স্বীকারই করিতে পারে না। আর ইহা জ্ঞেয় হয় না বলিয়া এরূপ বস্তুই স্বীকার্য্য নহে। তাহার পর প্রত্যক্ষাদি সকল প্রমাণই এইরূপ অদ্বৈত বস্তু স্বীকারের বিরোধী। তাহার পর মানবের সুখ অভীষ্ট বলিয়া আর তজ্জন্য পূর্ণতাই কামনার বিষয় বলিয়া ও-রূপ অসম্ভব অদ্বৈত স্বীকার না করিয়া দ্বৈতাদ্বৈতবাদ স্বীকার করাই শ্রেয়ঃ। ইহাতে ক্রমোন্নতিবাদই সঙ্গত হয়।

এতদুত্তরে বেদান্তী বলিবেন অদ্বৈত ব্রহ্ম পরিচ্ছিন্ন ঘটপটাদির ন্যায় জ্ঞেয় বা প্রমেয় হন না সত্য, তবে পরিচ্ছিন্ন বলিলে একটা অপরিচ্ছিন্নের জ্ঞান হয় বলিয়া অপরিচ্ছিন্ন ব্রহ্ম একেবারে অপ্রমেয় বা অজ্ঞেয় হন না। ঘটাদির ন্যায় জ্ঞেয় না হইলে যে জ্ঞেয় হয় না—একথা বলা চলে না। পূর্ণতা শব্দের দ্বারাও সেই অপরিচ্ছিন্নেরই জ্ঞান হয়। অতএব অদ্বৈত পূর্ণবস্তু নাই, আর তজ্জন্য যে দ্বৈতাদ্বৈতবাদ স্বীকার্য্য বলিতে হইবে, তাহার কোন কারণ নাই। বাস্তবিক যাহা সকলের মূল, তাহার জ্ঞান হইতে গেলে তদ্‌ভিন্ন জ্ঞাতা আবশ্যক হয়, কিন্তু এই জ্ঞাতা থাকিলে ত আর এই জ্ঞাতার মূলানুসন্ধান হইল না। অতএব সর্ব্বমূলরূপে এক অদ্বৈত সদ্রূপ বস্তুই স্বীকার্য্য।

তাহার পর জীব যদি অনাদি হয়, এবং ক্রমোন্নতির অনুরোধে তাহা স্বভাবতঃই অপূর্ণ বা অভাবগ্রস্ত বলিয়া স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে তাহার পূর্ণতাপ্রাপ্তির সম্ভাবনাই থাকিতে পারে না। আর যাহা তাহার স্বভাবতঃ অপ্রাপ্য বস্তু, তাহার জন্য তাহার আকাঙ্ক্ষাও থাকিতে পারে না। কিন্তু এই পূর্ণতার জন্য আকাঙ্ক্ষা থাকায় জীবের পূর্ণতাপ্রাপ্তি সম্ভব বলিয়াই স্বীকার করিতে হয়। আর সম্ভব হইলে জীবকে স্বভাবতঃই পূর্ণ বলিতে হয়। কিন্তু স্বভাবতঃ পূর্ণের অপূর্ণতা কি করিয়া সম্ভব হয়? এজন্য জীবের সত্য পূর্ণাবস্থা স্বীকার করিয়া তাহার মিথ্যা অপূর্ণ অবস্থা এবং তাহার সেই মিথ্যা অপূর্ণ অবস্থার অপনোদনরূপ মিথ্যা ব্যাপার বা লীলাই—চলিতেছে বলিতে হয়। এইরূপে এক সত্য বস্তুরই এই মিথ্যা ব্যাপাররূপ লীলাই—এই জগতের রহস্য। তবে নির্গুণ ব্রহ্মজ্ঞানে এই লীলারও অবসান হয়। আর ইহাই অদ্বৈতবেদান্তের সিদ্ধান্ত। এইরূপে যতই দেখা যাইবে, ততই দেখা যাইবে—ক্রমোন্নতিবাদ অসঙ্গত এবং একমাত্র অদ্বৈতবাদই সঙ্গত। অর্থাৎ এই মতে ক্রমোন্নতিও থাকে, কিন্তু তাহা অনন্ত হয় না, এই মতে পূর্ণতার প্রতি গতি হয়, এবং তাহা লভ্যও হয়; এই মতে পূর্ণতামধ্যে কোন অভাব থাকে না, এই মতে অপূর্ণের পূর্ণতাপ্রাপ্তি হয়—বলা যায়, যেহেতু অপূর্ণ প্রকৃতপ্রস্তাবে পূর্ণই। ব্রহ্ম অনাদি সান্ত মায়াশক্তিবশতঃ জগদ্রূপ হইয়াও নির্ব্বিকার নির্গুণ নিষ্ক্রিয়ই থাকেন। সুতরাং সর্ব্বপ্রকার সামঞ্জস্য এই মতেই সম্ভব হয়।

আর যদি বলা হয়, যুক্তিতর্কের শেষ নাই, সুতরাং উভয় পক্ষেই অফুরন্ত যুক্তি আছে, এজন্য দ্বৈতাদ্বৈতকে অযুক্ত বা হেয় জ্ঞান করিবার আবশ্যকতা নাই। তাহা হইলে বলিতে পারা যায়—যদি দুইটি বিরুদ্ধ মতের অনুকূলে সমবল বিরুদ্ধ যুক্তি স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে কোন কিছুই নির্ণয় হয় না, অর্থাৎ নির্ণেয় তত্ত্বটি অনির্ব্বচনীয়ই হয় বলিতে হইবে। কিন্তু তজ্জন্য যে "একটা কিছু নাই" ইহা স্বীকার্য্য হয় না। এই "একটা কিছুর" বিশেষ স্বীকার করিতে গেলেই উভয় পক্ষের বিরুদ্ধ যুক্তি-র সম্ভাবনা হইবে। অতএব নির্ব্বিশেষ এক অদ্বৈততত্ত্ব ব্যতীত যাহা, তাহাই অনির্ব্বচনীয় অর্থাৎ মিথ্যা—ইহাই বলিতে হয়। বস্তুতঃ, ইহাই অদ্বৈত-বেদান্তের মত। যাহা হউক, এইরূপ দার্শনিক বিচার বহু আছে। তাহার অবতারণা আর প্রবন্ধ মধ্যে সম্ভবপর নহে। যাঁহারা এই জাতীয় দার্শনিক যুক্তি অনুসন্ধান করেন, তাঁহাদের পক্ষে মহামতি মধুসূদন সরস্বতী বিরচিত অদ্বৈতসিদ্ধি গ্রন্থ আলোচনা কর্ত্তব্য। ফলতঃ বিচারদৃষ্টিতে ক্রমোন্নতিবাদ যে কোন মতেই যুক্তিসহ নহে, তাহা এই আলোচিত বিষয় হইতে বুঝা গেল।

গ্রাস

শ্রীহেমচন্দ্র বাগচী

ছোট গ্রামখানির বক্ষ বিদার্ণ করিয়া যে ধূলি-ধূসর পথ মানুষের দৃষ্টি-সীমা ছাড়াইয়া মাঠের প্রান্তে ঘন আমবনের মধ্যে বিলীন হইয়াছে, একদিন সন্ধ্যাকালে দেখা গেল, সেই পথেরই শেষপ্রান্তে অনেকগুলি মশাল একসঙ্গে জ্বলিয়া উঠিয়াছে। পথ দেখা যায় না, কিন্তু নির্জ্জন অন্ধকার মাঠে মশালের আলো অতি সুস্পষ্ট; দড়াম্ করিয়া একটা কিসের আওয়াজ হইল, এবং পরক্ষণেই পুঞ্জীভূত অন্ধকারের বক্ষ বিদ্ধ করিয়া একটা নিতান্ত দুঃসাহসী হাউই বহু ঊর্দ্ধে উঠিয়া দুই চারিটা আলোর ফুল ফুটাইয়া নিবিয়া গেল।

গ্রামের শেষে অশ্বত্থের নীচে কয়েকটি লোক বসিয়া তামাক খাইতেছিল। সোমনাথ ঠাকুর হঠাৎ মাঠের দিকে অঙ্গুলি দেখাইয়া বলিলেন,—এসে পড়েছে রে; নে, ওঠ ওঠ; দেরি করিস্ নে, উঠে আয়, উঠে আয়!

একজন তামাক ফুঁকিতে ফুঁকিতে নিতান্ত তাচ্ছিল্য-ভরে বলিল—তাড়াতাড়ি কিসের? তুমি তোমার কাজে যাও না ঠাকুর! 'বেলে জোলে'র খালটা ওদের আগে পেরুতে দাও, তবে ত!

—তবে তোরা থাক্, আমি চল্লাম!—বলিয়া সোমনাথ ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়াইয়া চলিলেন।

সোমনাথ বাহির-বাড়িতে আসিয়া তারস্বরে চীৎকার করিতে লাগিলেন,—কর্ত্তা, ওঁরা সব এলেন ব'লে। শব্দ শুন্‌তে পেলেন না বোমের! চায়ের জল চাপিয়ে দিতে বলুন—খাবার-টাবার—আর, এদিকে লগ্নের সময়ও হয়ে এল!—ব্যস্তবাগীশ সোমনাথ কাঁধে গামছা ফেলিয়া ক্রমাগত ছুটাছুটি করিতে লাগিলেন।

—আপনি অত ব্যস্ত হবেন না ভট্‌চাজ মশায়, চার-চারটে মেয়ের বিয়ে আমি দিয়েছি, জানেন ত সব,—তখনও আপনি, এখনও আপনি, কাজেই অত ব্যস্ত হয়ে লাভ কি?

কর্ত্তার উপদেশ সোমনাথের কানে গেল না—তিনি একবার রন্ধনশালায়, একবার মেয়েদের

ভিড়ের মধ্যে আর একবার বাহির-বাড়িতে ঘোরা-ফেরা করিতে লাগিলেন।

ওদিকে পাল্কী-বেহারাদের শব্দ, মশালের আলো, হাউই আর ঢোল-শানাইয়ের শব্দ প্রায় গ্রামের মধ্যে শোনা যাইতে লাগিল এবং আর একদিকে পশ্চিম প্রান্তে ঘন বাঁশবনের মাথার উপরে বিদ্যুৎ-ঝলকিত প্রকাণ্ড একখানি কালো মেঘ ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছিল।

কর্ত্তার চেয়ে সোমনাথের ভাবনা যেন বেশী; সোমনাথ মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন।

অবশেষে বর আর ঝড় একসঙ্গে ছোট গ্রামখানিকে আলোড়িত করিয়া তুলিল। ঝড়ের সঙ্গে সঙ্গে জোরে বৃষ্টি নামিল। মুহূর্ত্তমধ্যে বিবাহ-বাড়ির পাল-শামিয়ানা প্রভৃতি বৃষ্টিতে ভিজিয়া ভারী হইয়া একেবারে মাটিতে গড়াইতে লাগিল। তাহারই মধ্যে লোকজনের ছুটাছুটি, চা-সরবৎ ডাব লইয়া বরযাত্রীদের হুড়াহুড়ি এবং আর একদিকে 'লগ্ন ব'য়ে যায়—তোমরা সব কি করছ ছাই মাথামুণ্ডু' প্রভৃতি বলিতে বলিতে সোমনাথের চীৎকার ঝড ও বৃষ্টির সঙ্গে পাল্লা দিয়া চলিল।

কর্ত্তা সমস্ত দিন উপবাস করিয়া ছিলেন, কোনো কালেই এত হাঙ্গামা সহ্য করিবার অভ্যাস তাঁহার নাই; তিনি 'তোমরা সব দেখে শুনে ব্যবস্থা করো' 'বিয়ের সময় আমাকে ডেকে দিও' বলিয়া ঘরে গিয়া খিল দিলেন।

কোলাহলের আর একদিকে একখানি ছোট ঘরে আলিপনা-আঁকা একখানি পিঁড়ীর উপরে একটি দশ-এগার বছরের মেয়ে নিঃশব্দে বসিয়া ছিল। দুরু-দুরু বুকে ভাবী জীবনের অতর্কিত মুহূর্ত্তের প্রতীক্ষায় তাহার চোখ ঘুমে ঢুলিয়া আসিতেছিল। সাজ-পোষাকের বাহুল্যে তাহার মুখের পাউডার ঘামে ভিজিয়া উঠিয়াছিল। মেয়েটি কালো; শুধু তাহার দু'খানি সোনার চুড়ীপরা নিটোল হাত চেলীর মধ্য হইতে কোলের উপর বাহির হইয়া ছিল। প্রদীপের ক্ষীণ আলোতে সেই হাত দু'খানি বড় সুন্দর দেখাইতেছিল। বাহিরে বৃষ্টির বিরাম নাই; ক'নে অন্নপূর্ণা পিঁড়ীর উপর শুইয়া ঘুমাইতে পারিলে যেন বাঁচে!

বিবাহের লগ্ন উপস্থিত। সোমনাথ তাড়াতাড়ি গিয়া বরকে এক রকম করিয়া টানিতে টানিতে লইয়া আসিলেন। পিঁড়ীর উপর বসাইয়া দিয়া গা-হাত-পা ঝাড়িতে ঝাড়িতে বলিলেন—আর কি সেদিন আছে? বর হ'ল গিয়ে ইয়া জোয়ান্, আমি পারব কেন?

বরযাত্রীর দল জলস্রোতের মত বাড়ির মধ্যে আসিয়া পড়িল। সোমনাথ অমনি তাড়াতাড়ি গলায় কাপড় দিয়া তাহাদের দিকে ফিরিয়া বলিলেন—আজ্ঞে না, ঐটি মাপ করতে হ'বে। ও-সব শহর-বাজারে চলে; আমাদের এ নিতান্ত কুপল্লী স্থান—এখানে ও-সব বিয়ে দেখার নাম ক'রে এসে 'স্ত্রী-আচার' দেখা চলবে না মশায়।

ভয়ানক আপত্তি উঠিল। অবশেষে কর্ত্তা ঘর হইতে বাহির হইয়া সব মিটমাট করিয়া দিলেন। বরযাত্রীদের জন্য একটি পৃথক্ আসন করিয়া দেওয়া হইল।

বিবাহ আরম্ভ হইল; শুভদৃষ্টির সময় ক'নে অন্নপূর্ণার পিঁড়ী বরের মাথা ছাড়াইয়া অনেক ঊর্দ্ধে তুলিলেও বয়সের দিক্ দিয়া বরের শ্রেষ্ঠত্ব সকলেই মনে মনে স্বীকার করিলেন। বিষ্ণুচরণ গোঁফগুলি ছাঁটিয়া আসিয়াছিল, কিন্তু কপাল ও চোখের রেখাতে বুঝা গেল, তাহার বয়স পঁচিশ ছাব্বিশের কম নয়; বিষ্ণুচরণ দ্বিতীয় পক্ষের বিবাহ করিতেছে বলিয়া অনেকে সন্দেহ প্রকাশ করিল।

গৃহিণীর ইচ্ছা ছিল মেয়ের বয়সের অনুপাতে একটি ছোটখাট ছেলেমানুষ জামাই পাইবার। কর্ত্তা জামাই দেখিয়া আসিয়া বলিয়াছিলেন—খাসা জামাই, একেবারে কার্ত্তিকের মত। খুব ছেলেমানুষ, আমাদের আন্নার সঙ্গে ঠিক সাজন্ত হবে।

বিবাহের পরে গৃহিণীর সঙ্গে কর্ত্তার এই উপলক্ষ্যে খানিকটা ঝগড়া হইয়া গেল। গৃহিণী অবশ্য কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন—তা হয়েছে, হয়েছে, বেশ হয়েছে—আমি কি আর কিছু বলছি!—তুমি বলেছিলে কি-না, তাই!

কর্ত্তা রাগিয়া উঠিয়া বলিলেন—বেশ হয়েছে, না ত কি? যে কালো মেয়ে তোমার—ঐ এখন জামাইয়ের পছন্দ হ'লে হয়!

ষ্ণুচরণ যখন প্রবেশিকা পরীক্ষা দেয়, তখনই তাহার কয়েকটি সমবয়সী বন্ধুর বিবাহে সে বরযাত্রী গিয়াছিল। ভাল-মন্দ কিছুই সে বুঝিত না—তবু বিবাহ-উৎসবের একটা আমেজ নেশার মত তাহার মন স্পর্শ করিয়াছিল। সেই দিন হইতে মনের একটি প্রচ্ছন্ন অংশে সে আপনার বিবাহ কামনা করিত। প্রবেশিকা গেল, আই-এ পরীক্ষা গেল, অবশেষে বি-এ পরীক্ষার স্বর্ণ-সিংহদ্বারে বিষ্ণুচরণ ভীতি-উদ্বেল চিত্তে বারকতক আঘাত পাইয়া ফিরিয়া আসিল—তবু বাড়িতে কেহই তাহার বিবাহের নাম করে না। বিষ্ণুচরণ একেবারে মর্ম্মাহত হইয়া পড়িল।

অবশেষে সেই দারুণ দুর্য্যোগময়ী রাত্রে বিষ্ণুচরণের বিবাহ হইয়া গেল। বিষ্ণু আশা করিয়াছিল অনেক, কিন্তু ষ্টেশনে নামিয়া এক অখ্যাতনামা দুর্গম পল্লীর উঁচু-নীচু অসমতল অন্ধকার পথে পাল্কীর দোলায় মাথায় বারকতক আহত হইয়া তাহার বহুদিনের মনগড়া রোমান্সের ভিত্তি অনেকখানি ধ্বসিয়া গেল।

তবু রোমান্সের যেটুকু বাকী ছিল, বৃষ্টি আসায় তাহাও আর রহিল না। কল্পনাশক্তি প্রখর হইলে এই অত্যন্ত অপ্রীতিকর পারিপার্শ্বিকের মধ্যে বিষ্ণু হয়ত খানিকটা স্বপ্নরাজ্যের মায়া দিয়া অভাব পূর্ণ করিয়া লইতে পারিত, কিন্তু বিষ্ণুর কল্পনার একটা সীমা ছিল—তার উপর সমস্ত দিন উপবাসের পর ক্লান্ত দেহে ও রুক্ষ মনে কল্পনা থাকেই বা কতক্ষণ?

তথাপি বাসরঘরে বিষ্ণুর ব্যবহার মেয়েদের চোখে বেশ ভালই লাগিল। তাঁহাদের দেওয়া খাবার সে অকুণ্ঠিত মনে গ্রহণ করিল—গোপনে জানালা গলাইয়া ফেলিয়া দিল না। তাঁহাদের চিরকালের পুরাতন সব পরিহাস নিমের পাতার মত তিক্ত লাগিলেও বিষ্ণু সেগুলিকে অবলীলায় ছোট ছোট উত্তরে শুদ্ধ করিয়া দিল। বিষ্ণু সুপটু।

মেয়েরা সহজেই বুঝিলেন বিষ্ণুর তেমন উৎসাহ নাই। কাজেই তাঁহারা একে একে একটু রাত্রি বেশী হইলেই বিদায় লইলেন। যাঁহারা রহিলেন, তাঁহারা বাসর-জাগার উৎসাহ একটু কমিয়া আসিলে লম্বা ঢালা বিছানার একধারে জড়সড় হইয়া ঘুমাইয়া পড়িলেন।

শুভদৃষ্টির সময় ভাল করিয়া মুখ দেখা হয় নাই। ঘরের কোণে একটি গ্যাসের আলো প্রায় নিবিয়া আসিতেছে; বিষ্ণু দীর্ঘকাল প্রতীক্ষা করিয়া আছে, তাহার অর্দ্ধজাগ্রত মনে বহু বিচিত্র ছবি কোথা হইতে ভাসিয়া আসিয়াছে আবার শূন্যে মিলাইয়া গিয়াছে; একমুহূর্ত্ত পরে বিষ্ণু অবগুণ্ঠন খুলিয়া যে-মুখ দেখিবে, সে মুখের সহিত তুলনা করিবার মত মুখ তাহার মনে একখানিও নাই।

সেই স্তিমিত আলোকে কম্পমান হস্তে বিষ্ণু বধূর অবগুণ্ঠন একটু সরাইয়া দিল। বিষ্ণু প্রথমেই ভাবিল—এ যে একেবারে খুকী; পরমুহূর্ত্তেই তাহার মনে হইল,—এই বেশ! কিন্তু কেন 'বেশ' তাহা ভাবিবার শক্তি তাহার হয় নাই। মনটা বড়ই ফাঁকা-ফাঁকা বোধ হইতে লাগিল, স্বপ্নলোকের স্বল্প একটু অনুভূতি তাহার মনের কোণে মৃতপ্রায় হইয়া পড়িয়াছিল, সেটুকু যেন কোন্ এক যাদু-মন্ত্রবলে মরুভূমির মধ্যে বিন্দু বারিকণার মত কোথায় বিলীন হইয়া গিয়াছে।

যে-মালাটি ছিঁড়িয়া গিয়াছে, ছিন্নসূত্র কুড়াইয়া বিষ্ণু সেটিকে আবার গাঁথিতে চেষ্টা করিল। বিছানায় শুইয়া বিষ্ণু গুন্‌গুন্ করিয়া গান করে, ভাবে—অন্নপূর্ণা নামটা তেমন সুবিধার নয়। 'আন্না'ই বা কি এমন ভাল নাম? আচ্ছা, 'আনু'—তাই বা এমন কি? 'আ'-টি বদ্‌লাইয়া 'রা' বসাইলে কেমন হয়? 'রাণু' নামটি বেশ! যদিও শতকরা নিরানব্বই জন স্বামী এই নামেই তাহাদের স্ত্রীকে ডাকে, তবু বিষ্ণু এই নামই পছন্দ করিয়া লইল।

রাণু অথবা রাণী, আর সে রাজা! কি অদ্ভুত রাজা সে! বিষ্ণুর বিস্ময় লাগিল। ছোট্ট একটি দশ বছরের খুকী রাণী, আর সে ছাব্বিশ বৎসরের রাজা! চমৎকার!

বিষ্ণু আপন মনেই বলিতে থাকে—কি-ই বা যায় আসে? এ রকম অনেক আছে। ঠাকুর্দ্দাই ত একটি আড়াই বছরের মেয়ে বিয়ে ক'রে এনেছিলেন শুনেছি—তখন তাঁর বয়স পঁচিশ! আর এর ত তবু দশ বছর বয়স। এই বেশ!

বিষ্ণুর আত্মীয়-পরিজন আন্নাকে পাইয়া খুব খুশী



গৌড়ী রাগিণী

প্রাচীন চিত্র হইতে

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

হইলেন। সকলেরই মন্তব্য—খাসা বৌ হইয়াছে। কেবল বাড়ির মেজবৌ বিষ্ণুকে একটু নির্জ্জনে পাইয়া বলিলেন—বেশ হয়েছে, কি বলো ঠাকুরপো! এখন, বসে বসে কে দিন গুণবে?

'দূর'!—বলিয়া বিষ্ণু সেখান হইতে সরিয়া পড়ে।

আন্না প্রথম দিনকতক ভাল ভাল কাপড়-জামা পুতুল, ভাল ভাল রংচঙে বাক্স পাইয়া খুব খুশী হইয়াছিল। ভাল ভাল খাবার, আদর-যত্ন কিছুরই ত্রুটি নাই, তবু তিন বছরের ছোট বোন উমারাণীর জন্য আন্নার মন কেমন করিতে লাগিল। এটা যে তাহার শ্বশুরবাড়ি, তাহা আন্না জানে, কিন্তু 'শ্বশুরবাড়ি' শব্দের নিহিত অর্থ তাহার কাছে অত্যন্ত অস্পষ্ট। তাই একদিন দেশের ঝিকে সে চুপি চুপি বলিল—বোষ্টম-মাসী, চল আমরা পালিয়ে যাই!

বোষ্টম-মাসী গালে গোটাকতক পান পুরিয়া দ্বিপ্রহরে বসিয়া বসিয়া ঝিমাইতেছিল। আন্নার কথা শুনিয়া শাসনের ভঙ্গীতে তাহার দিকে চাহিয়া বলিল—ওমা, সে কি লা? দশ বছরের বুড়ো সেয়ানা মেয়ে—তোর কি একটু আক্কেল নেই?

আন্না অত্যন্ত অসহায়ভাবে তাহার কাছে ঘেঁষিয়া বলিল—পথ জান না বুঝি বোষ্টম-মাসী? কেন, পথ ত আমি রেলগাড়ী থেকে দেখেছি; গঙ্গার ধার দিয়ে দিয়ে গেলেই ত বাড়ি যাওয়া যায়!

তিরিশ চল্লিশ ক্রোশের ব্যবধান। আন্না কতদিন গঙ্গায় স্নান করিতে করিতে দেখিয়াছে, চরের বাব্‌লা বনের ওপারে ঘন হইয়া মেঘ নামিয়াছে, ঠাকুরমা বলিতেন আরও অনেক দূরে গঙ্গার বাঁক ছাড়াইয়া মেঘের সীমানা পার হইলেই তাহার শ্বশুরবাড়ি! সে কথা আন্নার মনে ছিল। তাই নিমেষ মধ্যে চল্লিশ ক্রোশের ব্যবধান লঙ্ঘন করিয়া তাহার বালিকা-মন তাহাদের বাড়ির পেয়ারা-তলায় ভটচাজ-মশায় যেখানে তাহার খেলাঘর বাঁধিয়া দিয়াছেন সেখানে ঘুরিতে লাগিল।

আন্না স্পষ্ট দেখিতে পাইল, তাহার মা দালানে বসিয়া সেই সুন্দর কাঁথাখানি সেলাই করিতেছেন। পা-দুটি ছড়াইয়া দিয়াছেন, পুরানো কাপড়ের পাড় হইতে তোলা নানারঙের সুতাগুলি পাশেই রহিয়াছে আর সঙ্গীহীন উমারাণী জানালার খড়্‌খড়ির কাছে আন্‌মনে বসিয়া আছে।

আন্নার চোখ দুটি ছল্ ছল্ করিয়া উঠিত। বোষ্টম-মাসী তাহাকে কাছে টানিয়া চোখ মুছাইয়া দিত।

দেখিতে দেখিতে সাত-আট দিন কাটিয়া গেল। আট দিনের দিন, শুকমুখে এক হাঁটু ধূলা লইয়া সোমনাথ আন্নার শ্বশুরবাড়ি আসিয়া হাজির। কোনো সঙ্কোচ না করিয়া সোজাসুজি বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করিয়া চীৎকার করিয়া সোমনাথ বলিলেন—কোথায় গো সব? জামাই মেয়ে নিতে এসেছি!—আন্নার সেদিনের উৎসাহ একটা দেখিবার জিনিষ!

সেদিনের পল্লীর সে সৌন্দর্য্য, সে প্রাচুর্য্যের আর অবশিষ্ট মাত্র নাই। তবু সেখানকার দৈন্যক্লিষ্ট মানুষের মনে সেদিনের সংস্কারের একটি রেখাপাত আছে। জামাই দেখিতে তাই লোকের ভিড় কম হইল না। মলিন বসন, শীর্ণকায় নর-নারীর দল বহুক্ষণ ধরিয়া জামাই দেখিল। নূতন জামাই—কর্ত্তা তাঁহার সাধ্যাতীত আয়োজন করিয়াছিলেন।

ঝকঝকে থালের উপর মন্দিরের চূড়ার মত সাজানো অন্নের চারিপাশে ক্ষুদ্রবৃহৎ অসংখ্য বাটীর সমাবেশ। তাহারই চারিদিকে পাড়ার ছোট-বড়-মাঝারি অনেকগুলি মেয়ে জামাই ঠকাইবার আয়োজনে ব্যস্ত। সকলেরই মুখে একটা সন্তোষ, তৃপ্তি ও কৌতুকের ছায়া। কোথায় ছিল বিষ্ণুচরণ, অবহেলিত অজ্ঞাত—বৃহৎ পরিবারের উদার আলস্যের মধ্যে লুক্কায়িত; অতীত জীবনে এই দিনটিকে সে কি কল্পনায় আনিতে পারিয়াছিল? অন্ন-পানীয়ের এই বিপুল ভোগোপকরণের মধ্যে, হাস্য-কৌতুকের এই অবিমিশ্র সরল সৌন্দর্য্যের মধ্যে সে তাহার অন্তরে একটা প্রচ্ছন্ন গৌরব ও একটা শান্তিময় মহিমা বোধ করিতে লাগিল। সে যেন আজ আর দশজনের মত সোজা হইয়া দাঁড়াইতে পারে এবং বুক ঠুকিয়া বলিতে পারে—হাঁ, আমি আছি।

মনের অতি গভীরতম অংশে সামান্য একটু ক্ষোভ মাথা নীচু করিয়া রহিয়াছে, কিন্তু বিষ্ণুচরণ তাহাকে আর তত আমল দেয় নাই।

ক্রমে রাত্রি আসিল। সন্ধ্যার দিকে এক ভদ্রলোক, সঙ্গীতের নাম করিয়া বহুক্ষণ চীৎকার করিলেন। তারপরে লণ্ঠনের আলোয় পল্লীর আসরে তাসখেলা চলিতে লাগিল। কর্ত্তা বহুক্ষণ বাহিরে নিঃশব্দে বসিয়া ছিলেন। কিছুক্ষণ পূর্ব্বে মনের একটু অস্থিরতায় তিনি ক্রমাগত পায়চারি করিয়া বেড়াইতেছিলেন। মেয়ের বিবাহকে দায়িত্ব বলিয়া ধরিয়া না লইয়া তিনি দায় মনে করিয়াছিলেন—কোনোরকমে কন্যাদায় হইতে উদ্ধার পাওয়াকে তিনি চরম সার্থকতা বলিয়া মনে করিতেন।

আজ, তাঁহার মনে হইল, কোথায় যেন একটা অসামঞ্জস্য রহিয়া গিয়াছে। কিন্তু এখন সে চিন্তা করিয়া কোনো লাভ নাই—অনেক দেরি হইয়া গিয়াছে। অবশেষে মনে মনে একটা সঙ্কল্প স্থির করিয়া লইয়া তিনি বাড়ির ভিতরে চলিয়া গেলেন।

বিষ্ণু তখন তাসের আসরের একপাশে চুপ করিয়া বসিয়া ছিল। তাহার সম্মুখে গ্রামের একটি প্রৌঢ় ভদ্রলোক চীৎকার করিয়া বলিতেছিলেন—মেয়ে যখন হয়েছে, বুঝেচ ভায়া, তখন তার ঢের আগে কোথাও-না-কোথাও তা'র বরের জন্ম হয়ে গিয়েছে—এ একেবারে বিধিলিপি না হয়ে যায় না। নইলে কোথায় ছিলে তুমি, হেঁ-হেঁ, আর কোথায় বা আমাদের আন্না?

আহারের কিছু পূর্ব্বে আসর যখন একে একে ভাঙিয়া গেল, তখনও বিষ্ণুচরণ একাকী নিঃশব্দে বসিয়া ছিল। মনে মনে সে কত কথাই ভাবিতেছিল—আন্নাকে সে পড়াইবে। কিন্তু সময় কই? সময় যথেষ্ট আছে, রাত্রে ত পড়াইতে পারে। কঠিন শিক্ষকের মত তাহার উপর স্থির লক্ষ্য রাখিয়া একে একে তাহাকে অনেক জিনিষ শিখাইতে হইবে। কিছু বোঝে না আন্না—কথা বলিলে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া চোখের দিকে চাহিয়া থাকে। একেবারে ছোট্ট খুকী—নাঃ, আর ভাবিতে পারা যায় না! ভাবিতে ভাবিতে বিষ্ণুচরণ কিন্তু অনেক অগ্রসর হইয়া যায়। ভবিষ্যতের ঘন অন্ধনিশা শেষ হইয়াছে; একদিন রৌদ্রোজ্জ্বল প্রভাতে বিষ্ণুচরণ সহসা যেন দেখিতে পায় অন্নপূর্ণা (তখন আর আন্না নয়) তাহার সম্মুখে সহাস্যে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে—যৌবন তাহার চোখে বুদ্ধির দীপ্তি দিয়াছে, অধরে কৌতুকের তীক্ষ্ণ রশ্মি প্রসারিত করিয়াছে এবং তাহার পদনখ হইতে মস্তক অবধি একটা অধীর কিন্তু সংযত গতির সুষমা দিয়াছে।

ক্রমে আহার শেষ হইল। বিষ্ণুচরণ আবার বাহিরে আসিয়া একাকী নিঃশব্দে বসিয়া রহিল। গ্রীষ্মের দিনের অগাধ ক্লান্তিতে বাহিরে যে-যেখানে পারিয়াছে, শুইয়া ঘুমাইতেছে। দক্ষিণবায়ুর উদাস মর্ম্মরধ্বনি ছাড়া কোথাও আর কোনো শব্দ নাই। বিষ্ণুচরণ উৎকর্ণ হইয়া বসিয়া রহিল—তাহাকে তাহার শয়নকক্ষে যাইবার জন্য এখনই বোধ হয় কেহ ডাকিতে আসিবে। মন তৃপ্ত নয়, কিন্তু ভবিষ্যতের একটা অস্ফুট স্বপ্ন আছে। তাই, অধীর প্রতীক্ষার সঙ্গে সঙ্গে কোথা হইতে একটা বিশুষ্ক অবসাদ আসিয়া তাহার সমস্ত মনকে যেন আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে।

ঢং ঢং করিয়া ঘড়ীতে বারটা বাজিয়া গেল। বিষ্ণুচরণ তখনও একাকী বসিয়া। সকলেই ঘুমাইতেছে, কিন্তু বাড়ির গৃহিণীর চোখে ঘুম নাই—তিনি নিতান্ত গম্ভীর বিষণ্ণমুখে এ-ঘর সে-ঘর করিয়া সোমনাথকে খুঁজিতেছিলেন। সোমনাথের তখন নিদ্রার সপ্তম লোক; তাঁহাকে বহুক্ষণ ডাকাডাকির পর তিনি উঠিলে, গৃহিণী অতি ধীরে তাঁহাকে বলিলেন—জামাই বোধ হয় বাইরে ব'সে আছেন, ভট্চাজ-মশায়, আপনি তাঁকে ডেকে নিয়ে গিয়ে শুইয়ে দিন।

সোমনাথ তাড়াতাড়ি উঠিয়া বাহিরে গিয়া দেখেন বিষ্ণু অধোবদনে নিঃশব্দে বসিয়া আছে। তাহার পিঠে হাত রাখিয়া সোমনাথ বলিলেন—ওঠ হে, আর কাঁহাতক ব'সে থাকবে ভায়া? চল, শোবে চল!

বিষ্ণু তড়িৎ-গতিতে উঠিয়া দাঁড়াইল এবং সোমনাথের পিছু পিছু আসিয়া যে ঘরে প্রবেশ করিল, সেই ঘরেই সে সমস্ত দ্বিপ্রহর কাটাইয়াছে। সবিস্ময়ে শয্যার দিকে চাহিয়া সে দেখিল, সেই একই শয্যা একটু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিয়া রাখা হইয়াছে মাত্র। সেই শয্যায় তাহাকে অদ্বিতীয় হইয়া থাকিতে হইবে।

আন্না তখন তাহার ঠাকুরমার কোলের কাছ ঘেঁষিয়া অঘোরে ঘুমাইতেছে। বিষ্ণু আবিষ্টের মত সেই বিছানায় শুইয়া পড়িল। সোমনাথ এবার আর চীৎকার করিলেন না; ধীরে ধীরে বোধ হয় একটু ভয়ে ভয়েই বলিলেন—ঘুমোও ভায়া, আমি চল্‌লাম।

বিষ্ণুর চোখে ঘুম আসিল না; গভীর নিশীথরাত্রে ভগ্নস্বপ্ন বিষ্ণু বহুক্ষণ জাগিয়া পড়িয়া রহিল। কেহ আর জাগিয়া নাই; বিষ্ণুর মনে হইল, তাহার মত পরিহাসাস্পদ বোধ হয় আর কেহ নাই—বায়ুস্রোতে বেলফুলের গন্ধ ভাসিয়া আসিতেছিল; বিষ্ণুর কাছে সে সুগন্ধের কোনো অর্থ নাই। বিবাহ হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত ব্যাপারটাই তাহার কাছে একটা নিষ্করুণ উপহাস বলিয়া মনে হইল।

পরক্ষণেই তাহার মনে হইল, ছি-ছি, এমন বিবাহ সে কেন করিতে গেল? এই বিশাল পরিবারচক্রে তাহার নিজের ইচ্ছার কি কোনো মূল্য নাই? বেশ ত ছিল সে, আপনার তৃপ্তি-অতৃপ্তির মধ্যে একান্ত একাকী, কাহারও কাছে কোনো কৈফিয়ৎ দিবার ছিল না, কাহারও নিকট দাবি করিবার বা অধিকার জানাইবারও কিছু ছিল না। কোথা হইতে এ আপদ সে জুটাইল?

এই-সব ভাবনার মাঝে মাঝে বিষ্ণু ভাবিতেছিল, না, এত ভাবিয়া কি হইবে? এখনই হয়ত আন্নার পায়ের তোড়ার শব্দ শুনিতে পাওয়া যাইবে। মিছামিছি সে এত ভাবিতেছে কেন? কিন্তু ঢং করিয়া ঘড়িতে ১টা বাজিয়া গেল।

কোথায় পৃথিবীর সমস্ত বায়ুমণ্ডলে যেন একটা প্রবল চাপ পড়িয়াছে। বিষ্ণু তাহার পূর্ণজাগ্রত মন লইয়া বিছানা ছাড়িয়া উঠিল।

অন্ধকার যেন স্তূপে স্তূপে ঘরগুলিকে ছাইয়া ফেলিয়াছে। বিষ্ণুর চোখ জ্বালা করিতে লাগিল। সে পা টিপিয়া টিপিয়া ঘর হইতে বাহির হইল। সম্মুখেই বাড়ির ভিতরে যাইবার দালান; সংশয়, ক্ষোভ, ক্রোধের তাড়নায় বিষ্ণুর মন তখন উদ্দাম; তবু সন্তর্পণে যাইতে হইবে—যদি কেহ জাগিয়া থাকে। আস্তে আস্তে সিঁড়ী দিয়া বিষ্ণু উপরে উঠিল—পাশেই যে ঘরখানি, সেই ঘরে সে বাসর-রাত্রি যাপন করিয়াছে। হইলই বা ছেলেমানুষ, তাহাকে কাছে পাইলে একটা তৃপ্তি আছে—সে যে তাহার আপনার। বিষ্ণু সেই ঘরের দিকে চাহিয়া দেখিল—দেখিল ঘরটি শূন্য, কেহ নাই। সে-রাত্রির কথা মনে হইল। মনে হইল, আন্নার ঘুম ভাঙাইতে সে কত চেষ্টাই না করিয়াছে—গল্প শুনিতে শুনিতে আন্না ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। তাহার তন্দ্রাতুর সরল সুকুমার মুখের দিকে চাহিয়া চাহিয়া বিষ্ণু কত স্বপ্নই না রচনা করিয়াছে। কিন্তু আজ একি? একবার যদি তাহাকে দেখিতে মাত্র পাইত।

আবার বিষ্ণু ধীরে ধীরে নীচে নামিল। দালানের শেষপ্রান্তে একটি দরজা; সেইটি অতিক্রম করিলেই একেবারে বাড়ির মধ্যে যাওয়া যায়। বিষ্ণু সেই দরজার কাছে গিয়া দাঁড়াইল। দরজা বন্ধ; বিশ্বসংসারের সকলেই যেন আজ বিষ্ণুর বিরুদ্ধে চক্রান্ত করিয়াছে। দরজা ধরিয়া জোরে টানিলে বিড়ালটি পর্য্যন্ত জাগিয়া উঠিবে। অগত্যা বিষ্ণু কড়াটি সন্তর্পণে ধরিয়া শরীরের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিয়া টানিতে লাগিল; কিন্তু বৃথা, বাড়ির মধ্য হইতে কোনো অতি সাবধানী সদাজাগ্রত ব্যক্তি শিকলটি উঠাইয়া দিয়াছেন। ইহারা আন্নাকে একবার দেখিতেও দিবে না। শুধু একবার আন্নার কচিমুখটি দেখিয়া সে চিরদিনের মত চলিয়া যাইবে ভাবিল, কিন্তু তাহারও উপায় নাই।

ছেলেমানুষ হইলে বিষ্ণু বোধ হয় কাঁদিয়া ফেলিত, কিন্তু সে পুরুষ, তাহার পৌরুষ-অভিমানকে আজ ইহারা পদদলিত করিয়াছে; ক্রোধে তাহার সর্ব্বশরীর কাঁপিতে লাগিল। সমস্ত অন্ধকারকে বিদীর্ণ করিয়া কেবলই কে যেন তাহার কানে কানে বলিতে লাগিল—না, প্রতিশোধ লইতে হইবে।

আর এখানে তিলার্দ্ধ থাকা চলে না; এই মুহূর্ত্তে এই স্থান ত্যাগ করিতে হইবে।

কিন্তু সেই মুহূর্ত্তেই বিষ্ণু সে স্থান ত্যাগ করিতে পারিল না। সেই ঘরের মধ্যে দাঁড়াইয়া মনের রুদ্ধ উত্তেজনায় সে ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল। খানিকটা

পায়চারি করিতে করিতে তাহার মনে হইল, এই গভীর রাত্রে কাহাকেও কিছু না জানাইয়া নিঃশব্দে এ বাড়ি পরিত্যাগ করিয়া যাওয়াও ঠিক যুক্তিসঙ্গত হইবে না। তাহা ছাড়া নির্জ্জন বিশাল মাঠে নির্দ্দিষ্ট কোনো পথ নাই—সরু ফালি আলের পথ; দুইধারে বৈঁচি আর শেঁয়াকুলের ঝোপ—এদেশের উৎকট গোখুরা সাপগুলি সেই পথের ধারে ধারে শুইয়া শীতল নৈশবায়ু সেবন করে বলিয়া শোনা গিয়াছে। তাহা ছাড়া সেই অতলস্পর্শী নিঃশব্দতার মধ্যে একাকী পথ চলিলে হঠাৎ কেমন যেন সমস্ত শরীর আতঙ্কে শির্ শির্ করিয়া উঠে!

এমনি ভাবিতে ভাবিতে বিষ্ণু তাহার পরিত্যক্ত বিছানায় আসিয়া বসিল। মনের ভিতরটা যেন একেবারে শুকাইয়া যাইতেছে। সমস্ত রাত্রি বিষ্ণু আর ভাল করিয়া ঘুমাইতে পারিল না।

সোমনাথের অতি প্রত্যূষে শয্যা ত্যাগ করার অভ্যাস। পঞ্চকন্যার স্তোত্র আওড়াইতে আওড়াইতে সোমনাথ একবার বিষ্ণুর ঘরের দিকে উঁকি দিয়া দেখিলেন; দেখিলেন, বিষ্ণু বিছানায় স্থির হইয়া বসিয়া আছে। জানালাটি খোলা; বাহিরে রাত্রির চিহ্ন ধীরে ধীরে অপগত হইতেছে। জানালা দিয়া একটা স্নিগ্ধ বাতাস চঞ্চল গতিতে ঘরের মধ্যে আসিয়া দেওয়ালের পুরানো ক্যালেণ্ডারটি লইয়া খেলা করিতেছে। সোমনাথ ধীরে ধীরে ঘরের মধ্যে বিষ্ণুর কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন; বলিলেন—ভায়া, রাত্রে বোধ হয় ভাল ঘুম হয় নি তোমার, কেমন? আর কি করেই বা হবে? যা মশা এখানে, তা মশারিটাও ত টাঙানো ছিল্, ফেলনি দেখছি।

বিষ্ণু এ কথার কোন উত্তর দিল না। শুধু সোমনাথের দিকে চাহিয়া বলিল,—বসুন, ভটচাজ-মশায়, কথা আছে!

—বল ভায়া, কি কথা তোমার—বলিয়া সোমনাথ বসিলেন।

বিষ্ণু বলিল—বাড়িতে বাবার শরীর দেখেছেন ত। আমার আর বেশী দিন এখানে থাকা চলবে না। আমি আজই যেতে চাই। একখানা গাড়ীর ব্যবস্থা ক'রে দেবেন?

সোমনাথ হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন, বলিলেন—সে কি হে? বাড়িতে তো তোমার দাদা আছেন; দুই এক দিনে এমন আর কি অসুবিধে হবে?

—না, ভট্‌চাজ-মশায়, সে সব হবে না; এঁদের ব'লে দিন, আমি আজই চলে যাব। একবার আসা উচিত ব'লেই এসেছি, কিন্তু বেশীদিন থাক্‌বার জন্যে নয়!

বিষ্ণুর কথাগুলির মধ্যে সোমনাথ কোনো কোমলতার আভাস পাইলেন না। বলিলেন,—আচ্ছা, তা কর্ত্তাকে আমি বল্‌ছি—বলিয়া তিনি ধীরে ধীরে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

গত রাত্রির মানসিক সংগ্রাম, তাহার উপর মনের চাঞ্চল্যে বিষ্ণু আর এক মুহূর্ত্তও শ্বশুরবাড়িতে থাকিতে প্রস্তুত নয়; তাহার কেবলই মনে হইতে লাগিল গৃহের কোনো এক অদৃশ্য স্থান হইতে কেহ যেন তাহার গত রাত্রির গতিবিধি সমস্তই লক্ষ্য করিয়াছে। দিবসের আলোয় সে চোখ তুলিয়া কাহারও মুখের দিকে আর চাহিতে পারিল না। এমনি একটা গ্লানি আর অবসাদে তাহার সমস্ত মন আচ্ছন্ন হইয়া গেল।

অবশেষে সোমনাথকে অনেক অনুনয়-বিনয় করিয়া সে সেদিন সন্ধ্যার পূর্ব্বেই গরুর গাড়ীতে গিয়া উঠিল। সোমনাথ ষ্টেশন অবধি সঙ্গে চলিলেন।

সোমনাথ ষ্টেশন হইতে ফিরিয়া আসিলে কর্ত্তা বলিলেন,—ভট্টচাজ, জামাই কি রাগ করেছেন মনে হ'ল? বাড়িতে ত আমাকে অস্থির ক'রে তুলেছে সব, বল্‌ছে নিশ্চয়ই রাগ করেছেন। আপনার কি রকম মনে হ'ল বলুন দেখি?

—না, কই সেরকম ত কিছু বুঝ্‌লাম না। নতুন জামাই কি-না; প্রথম প্রথম শ্বশুরবাড়িতে এসে ঠিক মন বসে না। তবে, বড় গম্ভীর মনে হ'ল, বোধ হয় বাবার অসুখ শুনে ও-রকম চিন্তিত হয়ে পড়েছে!

—দেখুন ভট্‌চাজ, এরা মেয়ের বাপের কোনো কসুরই মাফ্ করে না! আমার দোষের মধ্যে এই যে, আমি একখানা পুরনো গহনা নাকি দিয়েছি—এই

নিয়ে কত কথা উঠেছে শুনলাম, তা সে সম্বন্ধে বাবাজী কিছু বল্‌লেন না কি ?

—আরে রামঃ ! না, না জামাই সে-সম্বন্ধে কি কিছু বলে ?

—আর দেখুন ভট্‌চাজ, মেয়ের বিয়ে আমি এখন দিতাম না, বুঝলেন ? কিন্তু পাত্তরটি হাতে পেয়ে গেলাম, দু-দশ বিঘে জমি আছে, কিছু না করলেও দু'টো খেতে পাবে। এই দেখে বিয়েটা দিয়ে দিলাম। তারপর, আমার মেয়ে, আমি যদি এখন দু-বছর রেখেই দি, তাতে ওরা কিছু কি বল্‌তে পারে ?

—সে কি কথা, আপনি যদি রাখেন, আর, তা ছাড়া মেয়েও ছোট, শ্বশুরবাড়ির ও কি জানে ?

—তা হ'লে অন্যায় করিনি, কি বলেন ভট্‌চাজ ?

কর্ত্তা মনে-মনেই আশ্বস্ত হইয়া দিন অতিবাহিত করেন। গৃহিণী কিন্তু জামাই-বাড়িতে মাঝে মাঝে চিঠিপত্র দেন, বলেন,—যোগাযোগ রাখা দরকার। ছোট মেয়ে !

অন্নপূর্ণা ঠিক তেমনই রহিয়া গেল। বিবাহ হইয়াছে নামমাত্র। কিন্তু পেয়ারা-তলায় তাহার যে-সংসারটি সে পাতিয়াছিল, সেটি ঠিক তেমনি আছে। ছোট্ট বালিকা মেয়ে সীঁথিতে সিঁদুর পরিয়া হাসিয়া খেলিয়া বেড়ায়। গৃহিণী তাহার দিকে চাহিয়া চাহিয়া নানা অমঙ্গলের আশঙ্কা করিতে লাগিলেন।

বিবাহের আলোক-উৎসব-ধূমধামের কথা প্রতিদিনের অভ্যাসের পাকে সকলে যখন প্রায় ভুলিতে বসিয়াছে তখন একদিন কর্ত্তা মেঘগম্ভীর মুখ লইয়া বাড়ি প্রবেশ করিলেন। হাতে একখানি টেলিগ্রাম—বিষ্ণু বিশেষ পীড়িত, অন্নপূর্ণাকে আজই পাঠানো দরকার।

সকলেই বলিয়া উঠিল,—সর্ব্বনাশ, কি হবে ?

কর্ত্তা দুঃখের হাসি হাসিয়া বলিলেন,—পীড়িত ! আরে পীড়িত, তা ঐটুকু মেয়ে সেখানে গিয়ে কি করবে ? হায় ভগবান, বিয়ে দিয়ে কি অন্যায় কাজই করেছি !

গৃহিণী বলিলেন,—তোমার ঐ ত দোষ, কাজ ক'রে ফেলে শেষে পস্তানো ! হাড়মাস কালি হ'ল আমার ! ন্যাকামি রেখে মেয়েটাকে রেখে এস গিয়ে !

—হ্যাঁ, আমার ত আর খেয়ে-দেয়ে কাজ নেই ! ভট্‌চাজ-মশায়কে পাঠাব, বেশী ব'কো না।

তার পরদিন একখানি গরুর গাড়ীতে ভটচাজ মহাশয় আন্নাকে লইয়া চলিলেন। গৃহিণী মেয়ের পা মুছাইয়া লইয়া এক ঘড়া জল গাড়ীর পিছনে ঢালিয়া দিয়া উদ্‌গত অশ্রু সংবরণ করিতে পারিলেন না। ছোট মেয়ে, তাহার উপর আর কোনো অধিকার খাটিবে না, তাহার উপর দ্বিতীয় আর এক দলের প্রবলতর অধিকার অল্প কয়েক-দিনের মধ্যেই কেমন করিয়া হইল ! আন্না সোমনাথের কোনো প্রবোধ বা সান্ত্বনা মানিল না। এত শীঘ্র তাহাকে বাপ-মা কেন শ্বশুরবাড়ি পাঠাইলেন, এই দুঃখে সে ক্রমাগত ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল। গভীর দুঃখের একটা অস্পষ্ট আভাস তাহার মনের উপর ভাসিয়া বেড়াইতে লাগিল।

সোমনাথ পরদিন ফিরিয়া আসিলেন; অত্যন্ত বিষণ্ণ মুখে কর্ত্তার সম্মুখে আসিয়া বলিলেন—কাজ খুবই অন্যায় হয়েছে কর্ত্তা, মেয়ে আপনার ওখানে সুখী হবে না। অসুখ-বিসুখ কিছুই নয় মশায়, দিব্যি ইয়া চেহারা—বসে আছেন; আমার সঙ্গে বাক্যালাপ পর্য্যন্ত করলেন না! শুধু শুধু জেদের বশে মেয়েটাকে নিয়ে গেলেন—এর চেয়ে—

—থাক্, ভট্‌চাজ ! ওসব আমার জানা; আগে থেকেই সব নির্দ্দিষ্ট হয়ে আছে—আপনার বা আমার কোনো হাতই নেই ওতে।

সাত বৎসর পরে। প্রতিটি দিন তাহার চাঞ্চল্য, জড়তা, অবসাদ, সুখ লইয়া একে একে চলিয়া গিয়াছে। কেবল একটি ছোট সরল চঞ্চল মেয়েকে তাহার পিত্রালয়ে আর দেখিতে পাওয়া যায় নাই। গৃহিণী তাহার নাম করিয়া কত কাঁদিতেন। বালিকা আন্নার নববধূবেশ কেবলই তাঁহার মনে পড়িত। কতদিনের কত ছোট ছোট ঘটনা, তাহার হাসি, তাহার কথা বলার ভঙ্গী, সেই যে রোয়াক হইতে পড়িয়া যাওয়ায় তাহার সম্মুখের একটি আধ-ভাঙা দাঁত, দেখিতে ঠিক প্রতিমার হাতের মত সোনার চুড়ী-পরা তাহার

দু'খানি নিটোল হাত,—তারপর সব শেষে সেই পা মুছাইয়া তাহাকে গাড়ীতে তুলিয়া দেওয়া—এই-সব স্মরণ করিতে করিতে তিনি নিদ্রালেশহীন কত রাত্রি শুধু কাঁদিয়া কাটাইয়াছেন। সোমনাথ তাহাকে আনিতে গিয়া কতবার বৃথা ঘুরিয়া আসিয়াছেন। অবশেষে কর্ত্তাকে এক রকম জোর করিয়া টানিয়া লইয়া গৃহিণী মেয়ে দেখিতে গিয়াছিলেন।

দুই তিনটি ছেলেমেয়ে লইয়া আন্না শ্বশুরঘর করিতেছে। বৃহৎ পরিবার—অসংখ্য কাচ্চা-বাচ্চা, সংখ্যাতীত অভাব-অভিযোগ, রোগ-ব্যাধি, ঝগড়া-বিবাদ—তাহার মাঝখানে নিয়তির পরিহাসে শীর্ণ কঙ্কালসার আন্না মায়ের কোলের উপর পড়িয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কত কাঁদিয়াছিল। উৎসাহহীন, স্বাস্থ্যহীন বিষ্ণু কোথায় একটি সামান্য মাহিনার কাজ করে। শ্বশুর-শাশুড়ীকে সে গড় হইয়া প্রণাম করিল; মনের কোণে কোনো অভিযোগই আর যেন তাহার নাই। এবার কেহ লইতে আসিলেই সে আন্নাকে পাঠাইয়া দিবে বলিল। সংসারের নানা ঝঞ্ঝাটে সে এতদিন তাহাকে পাঠাইতে পারে নাই। সেজন্য তাঁহারা যেন তাহাকে ক্ষমা করেন। কর্ত্তা গৃহিণী মেয়েকে সান্ত্বনা দিয়া শীঘ্রই তাহাকে লইয়া যাইবেন বলিয়া ফিরিয়া আসিলেন।

বিষ্ণুচরণ সেই যে আন্নাকে লইয়া গিয়াছিল, একটি দিনের জন্যও তাহাকে আর চোখের আড়াল করে নাই। যে-কাজগুলি সে স্বেচ্ছায় নিজের দায়িত্বে গ্রহণ করিতে পারিত, গ্রহণ করিয়া এবং সম্পন্ন করিয়া আনন্দ পাইত, সেই কাজগুলি তাহাকে একটি যন্ত্রের মত কোনো রকমে শেষ করিতে হইত। কাঁচায় বাঁশ না নমিয়া পড়িলে, পাকিলে সে যে ক্রামগত ট্যাশ্ ট্যাশ্ করিবে, এ কথা তাহাকে উঠিতে বসিতে শুনিতে হইত। এমনি শাসনে আর ক্রন্দনে আন্নার দিনগুলি কাটিয়া যাইত।

বিষ্ণুচরণ একদিন যৌবনময়ী আন্নাকে স্বপ্ন দেখিয়াছিল। আবর্ত্ত-সংক্ষুব্ধ জীবনের কোলাহলে বিষ্ণুর সে প্রতীক্ষা কোথায়? অভিশপ্ত জীবন মরুভূমির মত; বর্ষণের প্রতীক্ষা করিবার আঁকাঙ্ক্ষা তাহার নাই। রৌদ্রতপ্ত ঘূর্ণিক্ষুব্ধ বালুরাশির দীর্ঘশ্বাসের মধ্যে সে জড়বৎ পড়িয়া থাকে—কোথায় বা তাহার কামনা আর কোথায় বা তাহার আশা? যৌবনও শুধু স্বপ্ন ও কল্পনার। কেহ কি যৌবন দেখিয়াছে? যৌবন অনুভূতির মধ্যে ক্ষণস্বপ্নের ইন্দ্রজাল সৃষ্টি করে। হয়ত কোনো চঞ্চল চৈত্র-রাত্রে সে বাতায়নে আসিয়া দাঁড়ায়—উদাসীন পথিক তাহার অভ্যর্থনার কোনো আয়োজন নাই দেখিয়া নিঃশব্দে ফিরিয়া যায়।

একটি রাত্রে আন্না তাহার নিভৃত হৃদয়ে যৌবন-দেবতার নিঃশব্দ পদধ্বনি অনুভব করিয়াছিল। কিন্তু সে শুধু একটি রাত্রেই। সংসারের শাসন সেদিন তুচ্ছ মনে হইয়াছিল। মনের সমস্ত শূন্য অংশগুলিতে একটি সুগন্ধি নিঃশ্বাস কে যেন সঞ্চারিত করিয়াছিল—শাশুড়ীর অত কর্কশ কণ্ঠস্বর, সেদিন তাহাও কত মধুর মনে হইয়াছিল! দেহ যেন পালকের মত লঘু—অকারণে চোখমুখ হাসিতে ভরিয়া উঠিল। বৈকালে দক্ষিণ হইতে যে-হাওয়াটি বাহিয়া আসিল, আন্নার মনে হইল, সেই হাওয়াতে স্বচ্ছন্দে সে যেন দু'টি বাহু প্রসারিত করিয়া উড়িয়া বেড়াইতে পারে।

কিন্তু সেদিনের কি অদ্ভুত পরিসমাপ্তি! রাত্রে বিষ্ণুচরণ আসিয়া বলিল—পায়ে তেল মালিশ ক'রে দিতে হবে। বড্ড হাঁটুনী হয়েছে আজ।

আন্না তেল মালিশ করিয়া দিতে দিতে বলিল—'একটা গল্প বল্‌বে?

আন্নার প্রগাঢ় কণ্ঠস্বর, কৌতুকস্মিত দু'টি চোখ বিষ্ণু একটু লক্ষ্য করিলেই বুঝিতে পারিত।

বিষ্ণু কথা কহিল না।

আন্না বলিল—দক্ষিণ দিকের জানালাটি আজ খুলে দি, কেমন?

বিষ্ণু অমনি 'না-না' করিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল;—ঠাণ্ডা লাগবে। সময়টা ভারী খারাপ।

সময়টা যে খারাপ, সেদিন আন্নার তাহা মনে ছিল না। বলিল—একটা গান গাও, আমি শুনি।

বিষ্ণু কর্কশকণ্ঠে বলিল—নাও, নাও, ঢের হয়েছে! ন্যাকামি রেখে ভাল ক'রে তেলটা মালিশ ক'রে দাও

দেখি। পা'টা খোঁড়া হ'লে যে আসচে মাসে আর পিণ্ডী জুটবে না, সে খেয়াল আছে ?

বিষ্ণুর কথাগুলি আন্নার কাছে আজ আর তেমন কঠিন বলিয়া মনে হইল না। সমস্ত অনাদর সে আজ উপেক্ষা করিয়াছে। তাহার অন্তরে আজ একটি প্রদীপ জ্বলিতেছে। বদ্ধ ঘরে কোথা হইতে চাঁপা ফুলের গন্ধ ভাসিয়া আসে—উগ্র কিন্তু মনোরম; আন্নার মনে হইল তাহাদের বাড়ির দক্ষিণ দিকের সেই চাঁপাগাছটি ফুলে ভরিয়া উঠিয়াছে। তেল মালিশ করিতে করিতে আন্নার চোখ তবু অশ্রুতে ভরিয়া আসিল।

বিষ্ণুর অন্তরে আজ আর একটুও দরদ নাই। বলিয়া বসিল—আবার চোখ মুছ্‌চ কেন? ঘুম আসে ত, শুয়ে পড়; কানের কাছে কেউ ফোঁস্ ফোঁস্ করলে আমাকে না ঘুমিয়ে কাটাতে হবে।

অল্পক্ষণ পরেই বিষ্ণুর নাসিকা-গর্জ্জন আরম্ভ হইল। আন্না ঘুমাইতে পারিল না। খোলা জানালার ধারে গিয়া দাঁড়াইল; শহরতলীর রাস্তা মোড় ঘুরিয়া বহুদূর চলিয়া গিয়াছে; লোকচলাচল নাই—অদূরে একটি শীর্ণ নিমগাছ ফুলে ফুলে আচ্ছন্ন; ভাবনা বোধ হয় পাপ—কিন্তু সত্যই আন্নার মন সে রাত্রে নিগড়মুক্ত বিহগীর মত পক্ষ প্রসারিত করিয়া ঐ পথের রেখা অনুসরণ করিয়া ফিরিতে লাগিল।

সতের বছরের আন্না আজ তিনটি ছেলেমেয়ের মা! গৃহিণী এই কথা ভাবেন আর বলেন,—মেয়েকে আমার ওরা খেয়ে ফেল্‌লে। পাঁজরের হাড় ক'খানি তা'র সার হয়েছে! কথা বল্‌ত কেমন চমৎকার—এখন ওদের দেশের মত কথা বলে—টানা টানা কথা। একেবারে বদ্‌লে ফেলে ওকে নতুন ক'রে গড়েছে।

কর্ত্তা বলেন—সব মেয়েই ও-রকম হয়!

—হ্যাঁ, হয়! তুমি আর কথা ব'লো না—সব জান কি না! জামাই পাঠিয়ে দেবে বলেছে, যাও না, তাকে নিয়ে এস!

—আচ্ছা, সে হবে, বলিয়া কর্ত্তা সেখান হইতে সরিয়া পড়েন।

গৃহিণী আপন মনেই বলেন—পাড়াগেঁয়ে মেয়ে পেয়েছে, তা'কে খাটিয়ে খাটিয়ে অস্থিচর্ম্মসার ক'রে তবে ছেড়ে দেবে। এমনি সমস্ত দিনরাত আন্নার কথা ভাবিতে ভাবিতে অবশেষে একদিন তিনি সোমনাথকে ধরিয়া বসিলেন—আপনাকে একবার যেতে হচ্ছে ভটচাজ-মশায়—ওরা তা'কে পাঠিয়ে দেবে বলেছে।

সোমনাথ দ্বিরুক্তি না করিয়া রওনা হইলেন; এমন কতবার তাঁহাকে গিয়া ঘুরিয়া আসিতে হইয়াছে। এবার গেলে পাঠাইয়া দেয় কি না, দেখিবার জন্য সোমনাথ সেইদিনই চলিয়া গেলেন।

বিষ্ণুর কয়েক টাকা মাহিনা বাড়িয়াছে। মনটা অন্যদিন অপেক্ষা আজ একটু ভাল ছিল। সোমনাথ আসিতেই সে বলিল—তা নিয়ে যাবেন বই কি! অনেক দিন যায় নি! তা আজ রাত্রিটা থেকে কাল বৈকালের ট্রেনে নিয়ে যাবেন।

সোমনাথ তাহাতেই রাজী হইলেন। পরদিন সকালে একবার জিজ্ঞাসা করিতেই বিষ্ণু বলিল—হ্যাঁ, সে ত কাল ব'লে দিয়েছি; তবে একবার দাদাকে জিজ্ঞেস করুন। উনি থাক্‌তে শুধু আমার মতটা নেওয়া ঠিক হয় না।

সোমনাথ মনে মনে বলিলেন—তথাস্তু; বলিয়া বিষ্ণুর দাদার কাছে গিয়া সমস্তই বলিলেন; বিষ্ণুর দাদার পঁয়তাল্লিশ বৎসর বয়স; ইহার মধ্যেই তিনি একেবারে বাতে, কাসিতে অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়াছেন; তবু বসিয়া বসিয়া তামাক খাওয়াটা তাঁহার নিত্যকর্ম্ম। সমস্ত শুনিয়া তিনি চোখের ইসারায় সোমনাথকে বসিতে ইঙ্গিত করিলেন। সোমনাথ বসিলে তিনি ফিস্‌ফিস্ করিয়া বলিলেন—আমাকে শুধোতে কে বল্‌লে? ছোটবাবু বুঝি!

সোমনাথ তৎক্ষণাৎ বলিলেন—না, তা কেন? আপনি হ'লেন গিয়ে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, আপনাকেই প্রথমে জিজ্ঞাসা করা উচিত মনে ক'রে জিজ্ঞাসা করছি—অপরাধ নেবেন না, মেয়েটি বহুদিন হ'ল এসেছে।

—বহুদিন কি মশায়? সাত বচ্ছর কি আবার বহুদিন? আমার স্ত্রীকে আমি বার বচ্ছর বাপের বাড়ি পাঠাই নি—শেষটায় হাতে পায়ে ধরে—

সোমনাথ ছোট্ট একটি 'ও' বলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন, বলিলেন—তা হ'লে কি বল্‌ছেন, বলুন।

—আমি কি জানি, ছোটবাবুর ও-সব ধাষ্টোমো—বুঝ্‌লেন? তামাকের চারটে ক'রে পয়সা মশায় আমার লাগে—বাবা দিতেন; তিনি গত হবার পর ওটা এমন চামার, চারটে ক'রে পয়সা দিতেও ওর বাধে! বলিতে বলিতে তিনি এমন জোরে কাসিতে আরম্ভ করিলেন যে, সোমনাথ সেখানে আর দাঁড়াইলেন না।

বেলা যতই বেশী হইতে লাগিল, বিষ্ণুর ততই চিন্তা বাড়িতে লাগিল। ভদ্রলোককে সে 'পাঠাইয়া দিবে' বলিয়াছে, অথচ সাত আট বছরের অভ্যাসের জড়তা তাহার মনকে কেবলই সংক্ষুব্ধ পীড়িত করিতে লাগিল। কখন খাওয়া-দাওয়া শেষ করিয়া সে তাহার কাজে বাহির হইয়া গিয়াছে, সোমনাথ কিছুই জানিতে পারেন নাই। তিনি অধীর চিত্তে একবার ভিতর একবার বাহির করিতে লাগিলেন।

আন্না বাক্স সাজাইয়া গুছাইয়া লইয়াছে। ছেলে-মেয়ে তিনটিকে খাওয়াইয়া দাওয়াইয়া কাপড় জামা পরাইয়া দিয়াছে। এদিকে বিষ্ণু আপিস হইতে আর আসে না। এই আসে, এই আসে করিয়া বহুক্ষণ কাটিয়া গেল; অবশেষে বৈকালের ট্রেনের সময় শেষ হইয়া গেল। এমন সময় গম্ভীর মুখে বিষ্ণু ফিরিয়া আসিল।

সে বিশ্রাম করিবে—জলখাবার খাইবে। সোমনাথ আশা ছাড়িয়া দিলেন। ধীরে ধীরে বাড়ির মধ্যে আসিয়া বিষ্ণুকে বলিলেন—ভায়া, তা হ'লে আমি চলে যাই। তোমার অবসর-মত একদিন ওকে নিয়ে যেও, কি ব'লো?

বিষ্ণু তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল,—না, না, সে কি হয়? আজকার রাতটা অনুগ্রহ ক'রে থাকুন, কাল সকালে নিশ্চয়ই পাঠিয়ে দেব।

অগত্যা সোমনাথকে থাকিতে হইল।

সমস্ত রাত্রি বিষ্ণু আন্নাকে বুঝাইল—এবার আর যেও না, আমিই তোমাকে নিয়ে যাব। নিশ্চয়ই নিয়ে যাব, বিশ্বাস করো।

—তোমাকে আমি বিশ্বাস করি নে; পাঠিয়ে দেবে ব'লে দাদামশাইকে ধরে রেখে দিলে; এখন আবার কোন্‌ মুখে ও-কথা বলো?

বিষ্ণু চুপ করিয়া রহিল; তাহার একবার মনে হইল, না-পাঠানোটা অন্যায় হইবে! কিন্তু আন্না চলিয়া গেলে তাহাকে দেখিবে কে? বড়-বৌ দিন রাত পড়িয়া পড়িয়া ঘুমায়। যাহা হয়, হইবে। আন্নাকে সে এবার পাঠাইয়া দিবে। নহিলে সম্মান থাকে না।

রাত্রি প্রভাত হইল। সোমনাথ সকাল সকাল উঠিয়া গাড়ী ডাকাইয়া আনিলেন। বিষ্ণু কিন্তু আর বাহির হয় নাই; গুম্‌ হইয়া ঘরের মধ্যে চেয়ারে বসিয়া ছিল। আন্না সাজিয়া-গুজিয়া ছেলেমেয়েদের লইয়া বিষ্ণুর কাছে গিয়া প্রণাম করিল। বলিল—চল্‌লাম, চিঠি দিও!—বলিয়া যেই ঘরের বাহির হইবে অমনি বিষ্ণু চেয়ার ছাড়িয়া ছুটিয়া আসিয়া বলিল—কোথা যাও?

আন্না বিষ্ণুর মুখের দিকে চাহিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল! তাহার হাত ধরিয়া টানিতে টানিতে বিষ্ণু চেয়ারের কাছে আসিয়া ধপ্‌ করিয়া বসিয়া পড়িল। তাহার চোখে তখন একটা অস্বাভাবিক দীপ্তি—হাত-পা কাঁপিতেছে!

আন্না তেমনি কঠিন মুখে বিষ্ণুর দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। বিষ্ণু অত্যন্ত অপ্রকৃতিস্থ ভাঙা গলায় বলিল—আমি তোমার কে? যে তুমি—ছেলেমেয়েগুলি পিছনে পড়িয়া চীৎকার করিতেছিল, আন্না অত্যন্ত শুষ্ককণ্ঠে ধীরভাবে বলিল—তুমি আমার যে-ই হও, তুমি যে মানুষও নও, দেবতাও নও, একথা খুব সত্যি!—বলিয়া দ্রুতপদে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। সদর দরজার কাছে সোমনাথ প্রতীক্ষা করিতেছিলেন,—আন্না তাড়াতাড়ি কোনো রকমে অশ্রু দমন করিয়া রুদ্ধ কণ্ঠে তাঁহাকে বলিল,—দাদা-মশাই, আমার আর এ-জন্মে বাপের বাড়ি যাওয়া হবে না; মাকে গিয়ে বল্‌বেন, আন্না মরে গেছে।

সোমনাথ কিছুক্ষণ বজ্রাহতের মত দাঁড়াইয়া রহিলেন, তারপর ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গাড়োয়ানের ভাড়া

মিটাইয়া দিয়া তাহাকে বিদায় করিলেন। কাপড়ের খুঁটে চোখ-মুখ একবার ভাল করিয়া মুছিয়া লইয়া ধীরে ধীরে ষ্টেশনের দিকে অগ্রসর হইলেন।

আন্না নিঃশব্দে কাপড় জামা বদ্‌লাইয়া ভাতের হাঁড়ি উনুনে চাপাইয়া দিল। ছেলেমেয়েগুলা খানিকটা কাঁদিয়া আবার যথানিয়মিত খেলা করিতে লাগিল। আর বিষ্ণু ঘর হইতে নিতান্ত অপরাধীর মত বাহির হইয়া স্নানাহার শেষ করিয়া আপিসে চলিয়া গেল।

বিষ্ণু যথানিয়মিত সন্ধ্যায় বাড়ি আসিল। বাড়ির বাহিরে গিয়া সমস্তক্ষণ তাহার মনে হইতেছিল—এ কি কাণ্ড সে আজ করিল? নিশ্চয়ই তাহার মাথা খারাপ হইয়াছিল, নহিলে এ কি?

গভীর অনুতাপ লইয়া বিষ্ণু ফিরিয়া আসিল। সে মনে মনে স্থির করিল, কালই আন্নাকে, তাহার বাপের বাড়িতে রাখিয়া আসিবে। ছি, ছি, নহিলে সমাজে সে মুখ দেখাইবে কি করিয়া?

বাড়ি ফিরিয়া সে দেখিল প্রদীপ জ্বালা হয় নাই। বাড়িতে একটিও আলো নাই। ঘরের সম্মুখেই বড়-বৌ মাদুর বিছাইয়া তাহার কাচ্চা-বাচ্চা লইয়া শুইয়া আছে। ইহাতে নূতন কিছুই নাই। ঘরের মধ্যে আসিয়া বিষ্ণু আলো জ্বালিল; সবিস্ময়ে দেখিল, আন্না তাহার সেই পুরানো বাক্সটির উপর হাতে মাথা রাখিয়া রুদ্ধকণ্ঠে কাঁদিতেছে।

বিষ্ণুর মুখ দিয়া কথা বাহির হইল না। অপরাধের গ্লানি তাহার সমস্ত চিত্তকে যেন মাটিতে মিশাইয়া দিয়াছে। সে আলোটি রাখিয়া ধীরে ধীরে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

উঠানে পায়চারি করিতে করিতে তাহার মনের বাষ্পাচ্ছন্ন জড়তা ক্রমশঃ কাটিয়া যাইতে লাগিল। আত্মীয়-স্বজনের ব্যবহারে কবেকার কি সামান্য ত্রুটি—সে-কথা সে ত ভুলিয়াই গিয়াছিল, তবু কাহার উপর রাগ করিয়া আন্নাকে সে যে আজ সাতটি বৎসর চোখের আড়াল করিতে পারে নাই এ কথা আজ সে ভাবিয়া স্থির করিতে পারিল না। কত অশ্রুজল, অনুতপ্ত হৃদয়ের কত বেদনা এই দীর্ঘ সাত বৎসরের উপর দিয়া বহিয়া গিয়াছে। এ সবের পরিবর্ত্তে, যে-মেয়েটিকে সে মিথ্যা বলিয়া একরকম ছিনাইয়া লইয়া আসিয়াছিল, তাহাকে কতটুকু সুখ-শান্তি সে দিয়াছে? নিজেই বা কি আনন্দ পাইয়াছে?

ভাবিতে ভাবিতে অন্যমনস্ক বিষ্ণু আকাশের দিকে চাহিল; চতুর্থীর ক্ষীণ চাঁদ আকাশের একটি কোণকে উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছে—আর তাহারই পাশে একখণ্ড কালো মেঘ সেই শীর্ণ চন্দ্র-রশ্মিকে গ্রাস করিবার অভিপ্রায়ে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছে।

পিছনে চাহিয়া বিষ্ণু দেখিল, আন্না একটি আলো জ্বালিয়া নিঃশব্দে রান্নাঘরের দিকে চলিয়া গেল। তাহাকে কাছে ডাকিয়া বিষ্ণু যে দুই-একটা সান্ত্বনার কথা বলিবে এমন ক্ষমতাও তাহার আর অবশিষ্ট ছিল না।

শরৎচন্দ্র

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

নর্ম্মাল স্কুলে সীতার বনবাস পড়া শেষ হ'ল। সমাসদর্পণ ও লোহারামের ব্যাকরণের যোগে তার পরীক্ষাও দিয়েচি। পাস করে থাকব কিন্তু পারিতোষিক পাইনি। যাঁরা পেয়েছিলেন তাঁরা সওদাগরী আপিস পার হয়ে আজ পেন্‌সন্ ভোগ করচেন।

এমন সময় বঙ্গদর্শন বাহির হ'ল। তাতে নানা বিষয়ে নানা প্রবন্ধ বেরিয়েছিল—তখনকার মননশীল পাঠকেরা আশা করি তার মর্য্যাদা বুঝেছিলেন। তাঁদের সংখ্যা এখনকার চেয়ে তখন যে বেশি ছিল তা নয়, কিন্তু প্রভেদ এই যে, তখনকার পাঠকেরা এখনকার মতো এত বেশি প্রশয় পান নি। মাসিক পত্রিকা, বলতে গেলে, ঐ একখানিই ছিল। কাজেই সাধারণ পাঠকের মুখরোচক সামগ্রীর বরাদ্দ অপরিমিত ছিল না। তাই পড়বার মনটা অতিমাত্র বিলাসী হয়ে যায় নি। সামনে পাত সাজিয়ে যা-কিছু দেওয়া যেত তার কিছুই প্রায় ফেলা যেত না। পাঠকদের আপন ফরমাসের জোর তখন ছিল না বল্‌লেই হয়।

কিন্তু রসের এই তৃপ্তি রসদের বিরলতাবশতই এটা বেশি বলা হ'ল। বঙ্গদর্শনের প্রাঙ্গণে পাঠকেরা যে এত বেশি ভিড় করে এল, তার প্রধান কারণ, ওর ভাষাতে তাদের ডাক দিয়েছিল। আধুনিক বাংলা ভাষার প্রথম আবির্ভাব ঐ পত্রিকায়। এর পূর্ব্বে বাঙালীর আপন মনের ভাষা সাহিত্যে স্থান পায় নি। অর্থাৎ ভাষার দিক থেকে দেখলে তখন সাহিত্য ছিল ভাসুরের বৈঠক, ভাদ্রবৌ ঘোমটা টেনে তাকে দূরে বাঁচিয়ে চলত, তার জায়গা ছিল অন্দর মহলে। বাংলা দেশে স্ত্রীস্বাধীনতা যেমন ঘেরাটোপ ঢাকা পাল্কী থেকে অল্পে অল্পে বেরিয়ে আসচে ভাষার স্বাধীনতাও তেমনি। বঙ্গদর্শনে সব প্রথম ঘেরাটোপ তোলা হয়েছিল। তখনকার সাহিত্যিক স্মার্ত্ত পণ্ডিতরা সেই দুঃসাহসকে গঞ্জনা দিয়ে তাকে গুরুচণ্ডালী ব'লে জাতে ঠেলবার চেষ্টায় ছিলেন। কিন্তু পাল্কীর দরজার ফাঁক দিয়ে সেই যে বাংলা ভাষার সহাস্য মুখ প্রথম একটুখানি দেখা গেল, তাতে ধিক্কার যতই উঠুক এক মুহূর্ত্তেই বাঙালী পাঠকের মন ভুলেছিল। তারপর থেকে দরজা ফাঁক হয়েই চলেচে।

প্রবন্ধের কথা থাক্। বঙ্গদর্শনে যে জিনিষটা সেদিন বাংলা দেশের ঘরে ঘরে সকলের মনকে নাড়া দিয়েছিল সে হচ্চে বিষবৃক্ষ। এর পূর্ব্বে বঙ্কিমচন্দ্রের লেখনী থেকে দুর্গেশনন্দিনী কপালকুণ্ডলা মৃণালিনী লেখা হয়েছিল। কিন্তু সেগুলি ছিল কাহিনী। ইংরেজীতে যাকে বলে রোম্যান্স। আমাদের প্রতিদিনের জীবযাত্রা থেকে দূরে এদের ভূমিকা। সেই দূরত্বই এদের মুখ্য উপকরণ। যেমন দূরদিগন্তের নীলিমায় অরণ্য পর্ব্বতকে একটা অস্পষ্টতার অপ্রাকৃত সৌন্দর্য্য দেয় এও তেমনি। সেই দৃশ্যছবির প্রধান গুণ হচ্চে তার রেখার সুষমা, অন্য পরিচয় নয়, কেবল তার সমগ্র ছন্দের ভঙ্গিমা। দুর্গেশনন্দিনী কপালকুণ্ডলা মৃণালিনীতে সেই রূপের কুহক আছে। তা যদি রঙীন কুহেলিকায় রচিত হয় তবুও তার রস আছে।

কিন্তু নদী গ্রাম প্রান্তরের ছবি আর সূর্য্যাস্তকালের রঙীন মেঘের ছবি এক দামের জিনিষ নয়। সৌন্দর্য্যলোক থেকে এদের কাউকেই বর্জ্জন করা চলে না, তবু বলতে হবে ঐ জনপদের চেহারায় আমাদের তৃপ্তির পূর্ণতা বেশি। উপন্যাসে কাহিনী ও কথা উভয়ের সামঞ্জস্য থাকলে ভালো—নাও যদি থাকে তবে বস্তুপদার্থটার অভাব ঘটলে দুধ খেতে গিয়ে শুধু ফেনাটাই মুখে ঠেকে, তার উচ্ছ্বাসটা চোখে দেখতে মানায়, কিন্তু সেটা ভোগে লাগে না।

বঙ্কিমচন্দ্রের গোড়ার দিকের তিনটে কাহিনী যেন দৃঢ় অবলম্বন পায়নি—তাদের সাজসজ্জা আছে, কিন্তু

পরিচয়পত্র নেই। তারা ইতিহাসের ভাঙা ভেলা আঁকড়ে ভেসে এসেচে। তাদের বিনা তর্কে মেনে নিতে হয়, কেননা, তারা বর্ত্তমানের সামগ্রী নয়, তারা যে-অতীতে বিরাজ করে, সে-অতীতকে ইতিহাসের আদর্শেও সওয়াল-জবাব করা চলে না, আমাদের সাধারণ অভিজ্ঞতার আদর্শেও নয়। সেখানে বিমলা আয়েষা জগৎসিংহ কপালকুণ্ডলা নবকুমার প্রভৃতিরা যা-খুশী তাই করতে পাবে কেবল তাদের এইটুকু বাঁচিয়ে চলতে হয় যে, পাঠকদের মনোরঞ্জনে ক্রটি না ঘটে।

আরব্য উপন্যাসও কাহিনী, কিন্তু সে হ'ল বিশুদ্ধ কাহিনী। সম্ভবপরতার জবাবদিহি তার একেবারেই নেই। যাদুকর গোড়া থেকে স্পষ্ট করেই বলচে, এ আমার অসম্ভবের ইন্দ্রজাল, সত্য মিথ্যা যাচাই করার দায় সম্পূর্ণ ঘুচিয়ে দিয়ে আমি তোমাদের খুশী করব—যেখানে সবই ঘটতে পারে সেখানে এমন কিছু ঘটাব, যাতে তোমরা শাহারজাদীকে বলবে, থেমো না, রাত্রের পর রাত্রি যাবে কেটে। কিন্তু যে-সব কাহিনীর কথা পূর্ব্বে বলেচি সেগুলি দো-আঁস্‌লা, তারা খুশী করতে চায়, সেই সঙ্গে খানিকটা বিশ্বাস করাতেও চায়। বিশ্বাস করতে পারলে মন যে নির্ভর পায় তার একটি গভীর আরাম আছে। কিন্তু যে-গল্পগুলি বিশুদ্ধ কাহিনী নয় কাহিনীপ্রায়, তাদের মধ্যে মনটা ডুব-জলে সঞ্চরণ করে, তলায় কোথাও মাটি আছে কি নেই সে কথাটা স্পষ্ট হয় না, ধরে নিই যে মাটি আছে বইকি।

বিষবৃক্ষে কাহিনী এসে পৌঁছল আখ্যানে। যে-পরিচয় নিয়ে সে এল তা আছে আমাদের অভিজ্ঞতার মধ্যে। সাহিত্য থেকে অস্পষ্টতার আবরণ এক পর্দ্দা উঠে গেল—ক্লাসিকাল অস্পষ্টতা বা রোম্যাণ্টিক অস্পষ্টতা অর্থাৎ ধ্রুপদী বা খেয়ালী দূরত্ব, সীতার বনবাসের ছাঁদ বা রাজপুতকাহিনীর ছাঁদ। মনে পড়ে আমার অল্প বয়সের কথা। তখন চোখে কম দেখতুম অথচ জানতুম না যে কম দেখি। ঐ কম দেখাটাকেই স্বাভাবিক ব'লে জানতুম, কোনো নালিশ ছিল না। এমন সময় হঠাৎ চশমা পরে জগতটা যখন স্পষ্টতর হ'ল তখন ভারি আনন্দ পেলুম। বিজয়বসন্তকে একদিন বাঙালী পাঠক সন্তুষ্ট ছিল, তখন সে জানত না গল্পে এর চেয়ে স্পষ্টতর জগৎ আছে। তারপরে দুর্গেশনন্দিনীতে চমক লাগল, এটা তার কাছে অভূতপূর্ব্ব দান। কিন্তু তখনও ঠিক চশমাটি সে পায়নি, তবু দুঃখ ছিল না, কেননা, জানত না যে সে পায়নি। এমন সময়েই বিষবৃক্ষ দেখা দিল। কৃষ্ণকান্তের উইল সেই জাতেরই, সে যেন আরও স্পষ্ট।

তারপরে এলেন প্রচারক বঙ্কিম। আনন্দমঠ, দেবী-চৌধুরাণী, সীতারাম, একে একে আসরে এসে উপস্থিত, গল্প বলবার জন্যে নয়, উপদেশ দেবার জন্যে। আবার অস্পষ্টতা সাধু অভিপ্রায়ের গৌরবগর্ব্বে সাহিত্যে উচ্চ আসন অধিকার ক'রে বসল।

আনন্দমঠ আদর পেয়েছিল। কিন্তু সাহিত্যরসের আদর সে নয়, দেশাভিমানের। এক-এক সময়ে জনসাধারণের মন যখন রাষ্ট্রিক বা সামাজিক বা ধর্ম্ম-সাম্প্রদায়িক উত্তেজনায় বিচলিত হয়ে থাকে সেই সময়টা সাহিত্যের পক্ষে দুর্যোগের সময়। তখন পাঠকের মন অল্পেই ভোলানো চলে। শুঁটকি মাছের প্রতি আসক্তি যদি অত্যন্ত বেশি হয় তাহ'লে রাঁধবার নৈপুণ্য অনাবশ্যক হয়ে ওঠে। ঐ জিনিষটার গন্ধ থাকলেই তরকারির আর অনাদর ঘটে না। সাময়িক সমস্যা এবং চল্‌তি সেণ্টিমেণ্ট, সাহিত্যের পক্ষে কচুরি পানার মতই, তাদের জন্যে আবাদের প্রয়োজন হয় না, রসের স্রোতকে আপন জোরেই আচ্ছন্ন ক'রে দেয়।

আধুনিক য়ুরোপে এই দশা ঘটেচে,—সেখানে আর্থিক সমস্যা, স্ত্রী-পুরুষের সমস্যা, বিজ্ঞান ও ধর্ম্মের দ্বন্দ্ব-সমস্যায় সমাজে একটা বিপর্য্যয় কাণ্ড চল্‌চে। লোকের মন তাতে এত বেশি প্রবলভাবে ব্যাপৃত যে, সাহিত্যে তাদের অনধিকারপ্রবেশ ঠেকিয়ে রাখা দায়, নভেলগুলি গল্পের মালমসলামাখা প্রবন্ধ হয়ে উঠ্‌ল। এতে ক'রে সাহিত্যে যে স্তূপাকার আবর্জ্জনা জমে উঠেচে সেটা আজকের পাঠকদের উপলব্ধিতে পৌঁচচ্চে না, কেননা, আজ সাহিত্যের বাহিরের মাল নিয়ে তাদের মন ষোল-আনা ভর্ত্তি হয়ে রয়েচে। আরেক যুগে এই সব আবর্জ্জনা বিদায় করবার জন্যে গাড়িতে যমের বাহন মহিষ অনেককালের জঞ্জাল ঠেলতে হবে।

আমার বক্তব্য এই যে আর্টিষ্টের, সাহিত্যিকের প্রধান কাজ হচ্চে দেখানো, বিশ্বরসের পরিচয়ে আবরণ যত কিছু আছে তাকে অপসারণ করা। রসের জগতকে স্পষ্ট ক'রে মানুষের কাছে এনে দেওয়া, মানুষের একান্ত আপন ক'রে তোলা। সীতার বনবাস ইস্কুলে পড়েছিলেম। সেটা ইস্কুলেরই সামগ্রী। বিষবৃক্ষ পড়েছিলুম ঘরে, সেটা ঘরেরই জিনিষ। সাহিত্যটা ইস্কুলের নয়—ওটা ঘরের। বিশ্বে আত্মীয়তা ঘনিষ্ঠ করবার জন্যেই সাহিত্য।

বিষবৃক্ষের পর কৃষ্ণকান্তের উইলের পর অনেক দিন কেটে গেল। আবার দেখি গল্প-সাহিত্যে আর একটা যুগ এসেচে। অর্থাৎ আরও একটা পর্দ্দা উঠল। সেদিন যেমন ভিড় ক'রে রবাহূতের দল জুটেছিল সাহিত্যের প্রাঙ্গণে আজও তেমনি জুটেচে। তেমনি উৎসাহ, তেমনি আনন্দ, তেমনি জনতা। এবারে নিমন্ত্রণকর্ত্তা শরৎচন্দ্র। তাঁর গল্পে যে-রসকে তিনি নিবিড় ক'রে জুগিয়েচেন সে হচ্চে সুপরিচয়ের রস। তাঁর সৃষ্টি পূর্ব্বের চেয়ে পাঠকের আরও অনেক কাছে এসে পৌঁছল। তিনি নিজে দেখেচেন বিস্তৃত ক'রে, স্পষ্ট ক'রে, দেখিয়েচেন তেমনি সুগোচর ক'রে। তিনি রঙ্গমঞ্চের পট উঠিয়ে দিয়ে বাঙালী সংসারের যে আলোকিত দৃশ্য উদ্ঘাটিত করেচেন সেইখানে আধুনিক লেখকদের প্রবেশ সহজ হ'ল। তাদের আনাগোনাও চল্‌চে। একদিন তারা হয়ত সে কথা ভুলবে এবং তাকে স্বীকার করতে চাইবে না। কিন্তু আশা করি পাঠকেরা ভুলবে না। যদি ভোলে সেটা তাদের অকৃতজ্ঞতা হবে। তাও যদি হয় তাতে দুঃখ নেই; কাজ সমাপ্ত হয়ে গেলে সেই যথেষ্ট। কৃতজ্ঞতাটা উপরি-পাওনা মাত্র; না জুটলেও নালিশ না করাই ভাল। নালিশের সময়ও বেশি থাকে না, কারণ সব শেষে যাঁর পালা তিনি যদি-বা দলিল-গুলোকে রক্ষা করেন স্বত্বাধিকারীকে পার ক'রে দেন বৈতরণীর ওপারে।*

২৭শে শ্রাবণ, ১৩৩৮

* এই প্রবন্ধটি প্রেসিডেন্সী কলেজের বঙ্কিম-শরৎ সমিতির অনুরোধে লেখা এবং তাঁহারা শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে তাঁহার আসন্ন জন্মদিনে যে পুস্তকখানি বাহির করিতেছেন তাহাতে প্রকাশিত হইবে।

পোর্ট-আর্থারের ক্ষুধা

শ্রীসুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

১৯

তাকুশান্ দখল

পোর্ট-আর্থার কেল্লার পূর্ব্বদিকে বেলাভূমির উপরে সমুচ্চ বন্ধুর পর্ব্বত, তার পার্শ্বদেশ প্রায় খাড়া উঠিয়াছে, ঝুঁকিয়া-পড়া পাথরে আর ফাটলে এখানে-ওখানে বেঁটে গাছের মেলা। দূর থেকে সমস্তটা দেখিলে মনে হয় যেন এক প্রাচীন বাঘ পাহাড়ের উপর বসিয়া আছে। সেটি তাকুশান্ বা বড় 'অনাথ'; সিয়াওকুশান্ বা ছোট 'অনাথ' দক্ষিণে অবস্থিত, লাওলুৎসুই কেল্লার নিকটে এবং তার মুখোমুখি। তাকুশান্-শৃঙ্গ একক, তার দক্ষিণ-পশ্চিম পাশ পোর্ট-আর্থারের কেল্লার দিকে নামিয়াছে, তার উত্তর-পশ্চিম পাশ আমাদের বামের ও মাঝের অবরোধক সৈন্যশ্রেণীর উপরে রহিয়াছে। আমাদের অবরোধের ব্যবস্থা, প্রত্যেক দলের চলাফেরা, গোলন্দাজের সংস্থান সেখান থেকে স্পষ্ট দেখা যায়। পাহাড়ের যে-পাশ আমাদের সামনে তা বিশেষ রকম খাড়া; তার উপর চড়া প্রায় অসম্ভব—কেন্‌জান্ ও তাইপোশানের মতই দুরারোহ। পাহাড় দুটি থেকে

শত্রু যেমন আমাদের লক্ষ্য করিতে পারিত, তারাও তেমনি আমাদের কামানের লক্ষ্য হইয়া উঠিয়াছিল। তাদের সম্বন্ধে আমাদের 'ডিভিসনের' নায়ক বলিতেন—ওই পাহাড় দুটির সঙ্গে মুর্গির পাঁজরের মাঝের মাংসের তুলনা করা যেতে পারে। আয়ত্ত করা কঠিন, অথচ ছাড়তেও মন সরে না। ওই দুই পাহাড় যতক্ষণ শত্রুর হাতে থাকবে ততক্ষণ তারা ওপর থেকে আমাদের ওপর তোপ দাগবে, আবার আমরা যখন পাহাড় দুটো দখল করব তখনও শত্রুর কামানের লক্ষ্য না হয়ে উপায় থাকবে না।

স্বভাবতই যে-স্থান এমন সুরক্ষিত তা দখল করা যত কঠিন, দখলে রাখা ততোধিক। অবর্ণনীয় সংগ্রামের পর যদিই বা নেওয়া যায়, তখন আশপাশের কেল্লা থেকে গোলার ঘায়ে অস্থির হইতে হইবে। প্রয়োজনের খাতিরে, ঐ জায়গা দখল করাই চাই, নায়কেরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছিলেও, আমরা একটি গোলাও না ছুঁড়িয়া সুযোগের প্রতীক্ষায় রহিলাম—শত্রু যদিও অবিরাম তোপ দাগিতেছিল। দুর্ভেদ্য অবরোধের আয়োজন শেষ করার জন্য আমরা ব্যস্ত হইয়া উঠিলাম।

শেষ পর্য্যন্ত সাতই আগষ্ট আক্রমণের দিন ধার্য্য হইল। ইহারই মধ্যে খুব গোপনে রকমারি কামান যথাস্থানে বসান হইয়াছে। বেলা চারিটার সময় সমস্ত কামান একত্রে গোলাবর্ষণ সুরু করিল দুই পাহাড়ের শীর্ষরেখা লক্ষ্য করিয়া।

কামানের গুরুগর্জ্জনে শূন্য যেন ছিঁড়িয়া টুকরা টুকরা হইয়া গেল, সাদা ধোঁয়ার আড়ালে আকাশ অদৃশ্য হইল। কেবল ওই দুই পাহাড়ের কেল্লা থেকে নয়, পিছনের পান্‌লুং, চিকুয়ান্, লাওলুংসুই পাহাড়ের কেল্লা থেকেও তখনই আমাদের তোপের জবাব সুরু হইয়া গেল। যতদূর দেখা যায় সমস্তই ধোঁয়ায় ঢাকা, অন্ধকার আসন্ন-বর্ষণ আকাশ ভেদ করিয়া শত শত বজ্রের ভীষণ আওয়াজ যুগপৎ ছুটিতে লাগিল। আমাদের গোলা তাকুশানের শিলাময় দেহে আঘাত হানে, আর অমনি হরিদ্রাভ সাদা আগুনের ফিন্‌কি আর ছিন্নভিন্ন পাথর দূরে দূরান্তরে ছড়াইয়া পড়ে। শত্রুর কামান আমাদের চেয়ে সংখ্যায় বেশি, তা ছাড়া শত্রু আমাদের উপরে রহিয়াছে—সে-সুবিধা ত আছেই। আমাদের গোলন্দাজেরা নানা অসুবিধা ও কষ্টের মধ্যে লড়িতে লাগিল, তাদের ক্ষতিও হইল বিস্তর। কিন্তু, আমাদের বড় কামান সমস্তই উপত্যকার মাঝে আছে—মনে হইল শত্রুর গোলন্দাজেরা তাহা জানে না; তাই তারা আমাদের সৈন্যশ্রেণীর সঙ্গের কামানের উপর এবং আমাদের পদাতিকের উপরই তোপ দাগিতে লাগিল। ফলে, আমাদের বড় কামানের কোনো ক্ষতিই হইল না, সূর্য্যাস্তের কিছু পূর্ব্বে শত্রুর উপর তাদের প্রভাব অনেকটা বোঝা গেল—তাকুশানের উপর রুশেদের কামান প্রায় নীরব হইয়া আসিল।

বেলা চারিটার সময় আমাদের রেজিমেণ্ট যাত্রা সুরু করে। উদ্দেশ্য ছিল, আমাদের কামান পথ খোলসা করিলেই তারা তাকু-নদী পার হইয়া শত্রুকে আক্রমণ করিবে।

এই ভয়ানক যুদ্ধ বর্ণনা করার আগে, যুদ্ধের ঠিক আগে আমি কি ভাবিয়াছিলাম ও করিয়াছিলাম তাহাই বলিব। 'এই অভিজ্ঞতা কেবল আমার নয়—কঠিন যুদ্ধের আগে প্রায় সকল সৈনিকেরই এমনি হইয়া থাকে। সৈনিকের যে-সব দুর্ব্বলতা থাকে, তার মধ্যে একটি ইহার দ্বারা বোঝা যায়। আমি অতি নগণ্য ও তুচ্ছ ব্যক্তি, তবুও লিয়াওতুঙের মাটিতে পা দিবার পর গত তিন মাস যাবৎ রেজিমেণ্টের পতাকা বহন করিয়া আসিতেছি—যে-পতাকা স্বয়ং সম্রাটের প্রতীক। কেন্‌জান্, তাইপোশান্ ও কান্তাশান্—এই তিন যুদ্ধ পার হইয়া আসিয়াছি। সৌভাগ্যই বলুন আর দুর্ভাগ্যই বলুন, এ পর্য্যন্ত গায়ে একটি আঁচড়ও লাগে নাই। অথচ সেই পতাকার তলে অনেক সাহসী যোদ্ধা মারা পড়িয়াছে, পতাকাটিও শত্রুর গোলার ঘায়ে ছিঁড়িয়াছে। উক্ত ঘটনার সময় আমার খুব কাছে এক সৈনিক দাঁড়াইয়া ছিল, সে মারা পড়িল, কিন্তু আমি অক্ষত রহিলাম। সে যাই হোক, আমার মৃত্যুর গুজব বার-বার দেশে রটনা হয়, সংবাদপত্রে আমার আহত হওয়ার মিথ্যা খবরও

বাহির হয়। এ সব যুদ্ধক্ষেত্রে থাকার সময়ই শুনিতে পাই। একটা গুজব রটিয়াছিল যে, জাহাজ থেকে নামার সময় বিষম ঝড়ে আমার 'সাম্পান্'* উল্টাইয়া যায় এবং সমুদ্রের ঢেউ আমাকে গ্রাস করে! তবে মরার আগে আমি না-কি অনেকক্ষণ নিশান কামড়াইয়া ধরিয়া সাঁতার দিয়াছিলাম! আর একবার রটনা হয় যে, আমি জাহাজ থেকে নামিয়াই শত্রুর মুখে পড়িয়া আমাদের প্রথম দলের কাপ্তেনের সঙ্গে মারা পড়ি! এই সব ভুল খবরের কল্যাণে আমি ইতিমধ্যে 'বীর' আখ্যা লাভ করিয়াছিলাম; তারপর প্রায়ই আমার আহত হওয়ার সংবাদ বাহির হইতে লাগিল এবং প্রতিবারই সে-ঘটনার পরমাশ্চর্য্য খুঁটিনাটি বর্ণনা প্রকাশিত হইল! কিন্তু নিজেকে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পাইলাম আমি গুণলেশহীন এবং আমার দেহে একটা তুচ্ছ আঘাতও নাই! লজ্জিত না হইয়া কি করি, মনে হইল আমার উপর বন্ধুবান্ধবের অনেক আশা, আমি একেবারেই তার অযোগ্য। এই চিন্তা আমার শান্তি হরণ করিল। মনে মনে ঠিক করিয়া ফেলিলাম এই তাকুশানের যুদ্ধে মরিয়া হইয়া লড়িয়া প্রাণত্যাগ করিব। আক্রমণ সুরু হইবার দিনকয় আগে ভৃত্যকে বলিলাম, ঠিক করেছি এবার মরবই! তোমার সেবা ও স্নেহের জন্য কেমন করে ধন্যবাদ দেব জানি না—আমার এই মৃত্যুপণকেই কৃতজ্ঞতার নিদর্শন বলে গ্রহণ করো! তাহাকেও সবিক্রমে লড়িতে অনুরোধ করিলাম। আমার কথা শুনিয়া বেচারার চোখে জল আসিল, সে বলিল, আপনার যে-পথ আমারও সেই পথ!

তাহাকে বলিলাম, আমার ভস্মাবশেষের জন্য একটি কৌটা তৈরি করিব; তবে যদি এমন সুন্দর মৃত্যু হয় যাহাতে অস্থির চিহ্ন পর্যন্ত না থাকে, তবে সে যেন বাড়িতে আমার কিছু চুল আর কয়েকটা নখ পাঠাইয়া দেয়! তারপর, বড় গোলা প্যাক করার বাক্সের তক্তার টুকরা দিয়া এক কৌটা তৈরি করিলাম; আমার ভৃত্যের তৈরি বাঁশের পেরেক দিয়া তক্তাগুলা জোড়া হইল। ইঞ্চি তিনেক চৌকা একটা যেমন-তেমন কৌটা খাড়া করিয়া তার মধ্যে আমার একগোছা চুল, নখের টুকরা, আর দেহভস্ম মোড়ার জন্য কয়েকখানি কাগজ রাখিয়া দিলাম। কৌটার ঢাকার উপর আমার নাম এবং মৃত্যুত্তর বৌদ্ধ নামও লিখিলাম। 'কফিন' তৈরি হইয়া গেল, এবার কেবল প্রাণপণ চেষ্টায় মরিয়া সম্রাটের ও দেশের দয়ার ঋণ পরিশোধ করিলেই হয়। বলা বাহুল্য, শেষ পর্য্যন্ত সে-কৌটা আমার ভস্মাবশেষ বহন করে নাই, এখন তাহা নিজের ও বন্ধুবর্গের পরিহাসের বস্তু হইয়া আছে।

সেদিন সন্ধ্যায় তোকিয়োতে দাদার কাছে পত্র দিলাম। সম্প্রতিকার যুদ্ধের খবর দিয়া লিখিলাম পরদিন আমাদের আক্রমণ সুরু হইবে। লিখিলাম, মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইয়াছি—আমার দেহ পোর্ট-আর্থারে ধ্বংস হইলেও আমার আত্মা 'সাত জন্ম' রাজভক্তি ভুলিবে না! চিঠিখানি আমার শেষ বিদায়-লিপিরূপেই পাঠাইয়াছিলাম। সেই দিনই আবার দাদার এক পত্র আসিল। তিনি লিখিয়াছিলেন—

"মানের কথা বা গুণের কথা ভাবিও না, কেবল আপন কর্ত্তব্য করিয়া যাও।

"নেল্‌সন্ যখন ট্রাফালগারের যুদ্ধে মহান্ মৃত্যু বরণ করিলেন, তখন বলিয়াছিলেন—Thank God I have done my duty!"

সাতই আগষ্ট বেলা পাঁচটায় কামানের গর্জ্জনের সঙ্গে প্রবল বৃষ্টি মিলিত হইল। অপরাহ্ণ-আকাশ অন্ধকার নিরানন্দ হইয়া উঠিল। তলায় তাকু নদী, উপরে উচ্চভূমিতে আমরা বসিয়াছি—আগে চলার আদেশের অপেক্ষা করিতেছি। ক্রমে বৃষ্টি বাড়িতে লাগিল, আকাশ আরও অন্ধকার হইল। শত্রুর সন্ধানী আলো পাহাড় ও উপত্যকার এক পাশে পড়িয়া শ্বেতাভ নীল আলো ছড়াইয়া আমাদের পদাতিকের চলায় বাধা দিতে লাগিল। শত্রুর তোপের বিক্রম ক্রমেই বাড়িয়া উঠিতেছে। তোপের শব্দ বৃষ্টির শব্দে মিশিয়া একটা অদ্ভুত আওয়াজ সৃষ্টি করিতেছে। [illegible]

* চীনা নৌকা।

লেফ্‌টেন্যাণ্ট হায়াশি ও আমি মাঝে মাঝে কথা কহিতেছি।

হঠাৎ হায়াশি বলিল, যে কোনো মুহূর্ত্তে আমাদের ছাড়াছাড়ি হতে পারে! মনে হইল সে তার মৃত্যুর কথা ভাবিতেছে।

উত্তরে বলিলাম, আমিও আজ রাতে মরবই!

শুনিয়া হায়াশি বলিল, কতদিন একসঙ্গে আছি বল ত!

বাক্যালাপ চালাইবার আর সুযোগ হইল না, আমাদের ছাড়াছাড়ি হইল। দেশে বহুদিন দুজনে একই মেসে বাস করিয়াছি, যুদ্ধেও আমরা পরস্পরে সঙ্গী ছিলাম। এই হায়াশিই তাইপোশান্‌ আক্রমণের সময় সবার আগে তলোয়ার ঘুরাইয়া শত্রুর কেল্লায় প্রবেশ করে। এই আমাদের শেষ দেখা।

আগে বলিয়াছি, সন্ধ্যার দিকে আমাদের তোপের ফল ফলিতে সুরু হইল। তখন 'প্ল্যান্‌' অনুযায়ী আমাদের দল অগ্রসর হইতে সুরু করিল। বৃষ্টি বাড়িয়াই চলিয়াছে—তার আর বিরাম নাই; সরু পথগুলো ডোবায় পরিণত হইল। হাঁটুজল ও কাদা ভাঙিয়া বহু-কষ্টে চলিতে লাগিলাম। ভাবিয়াছিলাম, তাকুশানের উপর শত্রুর কামান অকর্ম্মণ্য বা নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছে, এখন বুঝিলাম সে ধারণা ভুল। যেই তারা দেখিতে পাইল ধোঁয়া ও বৃষ্টির মাঝ দিয়া 'মার্চ' করিয়া চলিয়াছি অমনি আবার নূতন উদ্যমে তোপ দাগিতে সুরু করিল।

তাকু নদীতে পৌঁছিয়া দেখি ঘোলা জল কূল ছাপাইয়া উঠিয়াছে, নদীর গভীরতা বুঝিবার উপায় নাই। প্রবল বৃষ্টির সুযোগে শত্রু কিছুদূরে নীচে স্রোতের মুখে বাঁধ তুলিয়া বন্যার সৃষ্টি করিয়া আমাদের গতিরোধ করিবার চেষ্টা করিতেছে। যতই সাহসী হই রুশেদের এই অপ্রত্যাশিত মিত্রকে তুচ্ছ করিতে পারিলাম না। তাহা করিলে শত্রুর তোপের মুখে না মরিয়া হয়ত কেবল জলে ডুবিয়া মরিব যে! দেখিতে দেখিতে আমাদের একদল বেপরোয়া ইঞ্জিনীয়ার অন্ধকার জলে ঝাঁপ দিয়া পড়িয়া বাঁধ ভাঙিয়া দিল, তার ফলে কিছুক্ষণের মধ্যেই জল নামিয়া গেল। তখন পদাতিক দল জল ঠেলিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল। এবার তারা ডুবিল না বটে, কিন্তু অনেকেই জলের মধ্যে শত্রুর গোলার ঘায়ে মরিল —তাদের মৃতদেহ এমন জড়ামড়ি করিয়া পড়িল যে নদীর এপার থেকে ওপার পর্য্যন্ত প্রায় যেন সেতু গড়িয়া উঠিল।

অবশেষে আমরা তাকুশানের তলায় গিয়া পৌঁছিলাম। এবার তারের কাঁটা-বেড়া ভাঙার পালা, সেই সঙ্গে 'মাইন্‌' মাড়াইবার আশঙ্কা। এক বিপদ শেষ হয়, ত অন্য বিপদ আসে। কিন্তু এখন ইতস্তত করিবার সময় নয়—আমরা হাতে-পায়ে হামা দিয়া পাহাড়ে উঠিতে সুরু করিলাম। ঘন অন্ধকার ও প্রবল বৃষ্টি আমাদের অসুবিধা বাড়াইয়া তুলিল। নদী পার হওয়ার সময় একচোট ভিজিয়াছি, তারপর এই বৃষ্টি পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত ভিজিয়া সপসপ করিতেছে; তবুও রক্ত চলাচল করাইবার জন্য ইচ্ছামত পেশী চালনার উপায় নাই। তার উপর, যতই রুশেদের ট্রেঞ্চের কাছাকাছি আসিতেছি, ততই তারা আমাদের মাথার উপর গুলি চালাইতেছে; কখনও বা পাথর ও কাঠের চাঁই ফেলিতেছে—অগ্রসর হওয়ার বাধা পদে পদে। আমাদের কাছাকাছি একটা দল 'ট্রেঞ্চে'র নিকটে পৌঁছিয়াছে— পাহাড়ের গায়ে প্রায় মাঝপথে 'ট্রেঞ্চ'গুলি ঘোড়ার ক্ষুরের আকারে রচিত।

আমাদের দিকে পাহাড়ের পাশে পাথরের উপর দৃঢ়ভাবে দাঁড়াইবার ব্যবস্থা হইতে লাগিল—শত্রুকে রাত্রিকালে অতর্কিতে আক্রমণ করা হইবে। ওদিকে শত্রু সন্ধানী আলো আর তারাবাজির সাহায্যে আমাদের অগ্রগমনে বাধা দিবার জন্য অতিমাত্রায় তৎপর হইয়া উঠিল। ফলে নিশীথ আক্রমণ অসম্ভব মনে হওয়ায় সে-মতলব আমরা ত্যাগ করিলাম; প্রত্যূষে আক্রমণ করাই স্থির হইল। অতঃপর আমরা দুইদল পরস্পর এবং শত্রুর মুখোমুখি দাঁড়াইয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলাম— অবারিত বৃষ্টিধারা আমাদের উপর অবিরাম ঝরিতে লাগিল।'

পূবের আকাশ ফরসা হইয়া আসিল, বৃষ্টি তখনও পড়িতেছে। তাকু নদীতে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত, সৈন্যদের

দেহ সংগ্রহ করা গেল না, নদীর পরপারে কোনো আরদালিও পৌঁছিতে পারিল না। শত্রুর ঠিক দৃষ্টির তলে আছি, তবুও আরদালি পাঠাইবার কামাই নাই—তারা প্রত্যেকেই গুলির ঘায়ে পড়িতে লাগিল, একজনও বাদ গেল না। নিদারুণ নিষ্ফলতা! কারও কোনো প্রস্তাব নাই, জানি না কখন বা কি উপায়ে শত্রুর উপর হানা দেওয়া সম্ভব। সেই সময় সার্জ্জেণ্ট-মেজর ঈনো তাকুশানের তলায় পড়িয়া যন্ত্রণায় ছটফট করিতেছিলেন। তাঁর পেটে গুলি বিঁধিয়াছে। যে-কেহ তাঁর পাশ দিয়া যাইতেছে তাহার কাছেই অনুনয় করিতেছেন—আমাকে মেরে ফেল, আমাকে মেরে ফেল—যন্ত্রণা আর সহ্য হয় না!

ওদিকে রুশেদের এগারখানি জাহাজ য়েন্‌চ্যাঙের কাছে বাহির হইয়া আমাদের পদাতিকদলের পিছনে তোপ দাগিতে লাগিল। আমাদের কোনও আড়ালই নাই—শত্রুর অগ্নিবাণের আমরা নিশ্চিত লক্ষ্য হইয়া উঠিলাম। তারা যথেচ্ছ আমাদিগকে মারিতে লাগিল। আমাদের আর আশা নাই—সামনের ফটকে বাঘকে আটকাইতেছি এমন সময় পিছনের ফটকে নেকড়ের হানা!

২০

গিরিশিরে সূর্য্য-পতাকা

বারুদের ধোঁয়া তরঙ্গভঙ্গের মত সকল দিক আচ্ছন্ন করিয়া আছে; কালো বৃষ্টিধারা যেন ক্রুদ্ধ কেশরীদল। মাথার উপরে খাড়া পাহাড় আকাশ চুম্বন করিতেছে—তার উপর চড়া বাঁদরের পক্ষেও কষ্টকর। উপর পানে প্রতি পদক্ষেপের সঙ্গে পাহাড়ের চড়াই ক্রমে দুরারোহ হইতেছে—এক চড়াইয়ের অন্তে দ্বিতীয় চড়াইয়ের সুরু; তাহা আরোহণ করা আরও কষ্টকর। সেই উচ্চতা থেকে ভয়ঙ্কর 'রুশ ঈগল' বিপদের সূচনা করিতেছে। সকল দিক থেকে আমাদের অগ্নিবর্ষণ শত্রুর ঘাঁটি তাকুশানের উপর কেন্দ্রীভূত। এই আক্রমণের জবাব দিবার জন্য সম্মুখে রুশেদের বড় কামানগুলো রক্তজিহ্বা মেলিতেছে, আর পিছনে আসিতেছে তাদের রণতরী আমাদের পিঠ চূর্ণ করার জন্য। শত্রুর সুবিধা অনেক, আক্রমণ প্রতিরোধের ব্যবস্থাও প্রবল, তাদের পরাজিত করা সহজ নয়। কিন্তু এ জায়গা দখল করিতে না পারিলে আমাদের সমস্ত সেনার গতি রুদ্ধ হইবে, পোর্ট-আর্থারের কেল্লা আক্রমণ সম্ভব হইবে না, পোর্ট-আর্থার অবরোধের ভিত গাড়া যাইবে না। তাই যতই কঠিন হোক এবং যত ক্ষতিই হোক শত্রুকে সেখান থেকে হটান চাই।

প্রবল বারি ও গোলা বর্ষণের তলে পাহাড়ের ধারে আমাদের দল সেই রাত ও পরদিনের সকাল কাটাইল। বিকাল তিনটায় আক্রমণের সুযোগ আসিল। আমাদের গোলন্দাজেরা শত্রুর জাহাজকে কিছুকালের জন্য পিছু হটিতে বাধ্য করায় সুবিধা হইল। নায়কের আদেশ পাওয়া মাত্র দুই ধারের দলই এক সঙ্গে যাত্রা সুরু করিল। খাড়া পাহাড়, প্রচণ্ড গোলাগুলি, বিরূপ প্রকৃতি—সমস্তই উপেক্ষা করিয়া দেবতার মত অবিচলিত শক্তি ও সাহসে সকলে উপরে ঠেলিয়া উঠিতে লাগিল। সৈনিকের চীৎকার ও হুঙ্কার, কামানের গুরুগর্জ্জন, কিরীচ ও তলোয়ারের ঝিলিক, উড়ন্ত ধুলা, রক্তের প্রবাহ, চূর্ণ অস্ত্র ও মস্তিষ্ক—লণ্ডভণ্ড ব্যাপার, ভীষণ হাতাহাতি লড়াই। শত্রু উপর থেকে প্রকাণ্ড পাথর গড়াইয়া ফেলিতেছে, তার ঘায়ে অনেক হতভাগ্য গভীর উপত্যকার মাঝে গিয়া পড়িতেছে, অনেকে পাহাড়ের গায়ে গুঁড়া হইয়া যাইতেছে। চিকুয়ান্‌শান ও এরলুংশানের বড় কামানের লক্ষ্য ভাল—গোলাগুলো ঠিক তাকুশানের চূড়ায় ফাটিতে লাগিল। বৃত্তাকার ও অন্যবিধ গোলার আগুনের বোঝা উজ্জ্বল আলোর সুদীর্ঘ রেখায় সকল দিক থেকে আনাগোনা ও কাটাকাটি করিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে বিপুল 'বান্‌জাই' ধ্বনি যুগপৎ গিরিমূল ও শীর্ষদেশ থেকে উঠিয়া পাহাড় কাঁপাইয়া দিল। এ কি? কি হইল? ঐ না ধোঁয়ার মেঘের মাঝে সূর্য্য-পতাকা উড়িতেছে? আমাদের আক্রমণ সফল হইয়াছে! দেখিয়া আনন্দে কাঁদিয়া ফেলিলাম।

ভস্মবর্ণ ধোঁয়ায় মোড়া তাকুশান এখন আমাদের দখলে। কিন্তু সেই ব্যাপার ঘটিবামাত্রই শত্রুর সকল কেল্লা পাহাড়ের উপর আমাদের প্রধান আস্তানা লক্ষ্য

করিয়া তোপ দাগিতে সুরু করিল। বড় কামানের গোলাগুলো, আকারে সাধারণ জলের কুঁজার মত, বাতাস কাঁপাইয়া ইঞ্জিনের মত হুসহুস করিয়া ছুটিয়া আসিতে লাগিল। বিকট শব্দে ফাটার সময়, সাদা ধোঁয়া যেখানে উঠিতেছে সেখানে একটা অদ্ভুত আলো ঝকমক করিতেছে, আর যেখানে অন্ধকার মেঘ ঝুঁকিয়া আছে সেখানে পাহাড় চূর্ণ হইতেছে। পৃথিবীর মেরুদণ্ড যেন নড়বড়ে হইয়া উঠিল, মৃত সৈনিকের দেহগুলো টুকরা টুকরা হইয়া গেল। আমাদের অবস্থা নিরাপদ ত নহেই, বরং বিশেষ সঙ্কটাপন্ন। জায়গাটা যারা দখল করিয়াছে আমাদের সেই সৈন্যদলের স্বস্থানে টিকিয়া থাকা দায়। শত্রু যদি আবার ফিরে-ফিরতি আক্রমণ করে,—এবং তা সে করিবেই,—তাহা হইলে এই বিপদসঙ্কুল গিরিশীর্ষে তাহাকে ঠেকান যাইবে কি উপায়ে? ঢালুর ওপারে শত্রুর ঘাঁটি দেখিবার জন্য একটু গলা বাড়াইলেই তাদের গুলি চলিতে থাকে—এক পা নড়িবার জো নাই। পাহাড়ের মাথায় শত্রুর ছয়টা কামান আমাদের হাতে পড়িয়াছিল, একজন সৈনিক সেগুলোর পাহারায় মোতায়েন ছিল, একটা গোটা গোলা আসিয়া বেচারাকে আঘাত করিয়া একেবারে ছাতু বানাইয়া দিল। তার এক টুকরা মাংস আমাদের মাথার উপর দিয়া উড়িয়া গিয়া আমাদের পিছনে এক পাথরের উপর আঁটিয়া বসিল—সেইটুকুই তার ধ্বংসাবশেষ। আর একটা গোলা একদল সৈনিকের মাঝে পড়ায় এক মিনিটে ছাব্বিশ জন লোক উবিয়া গেল; আর সেই গোলার ঘায়ে চূর্ণ পাথরের তলায় তিন জন সৈনিকের জীবন্ত সমাধি লাভ হইল।

সেইদিন লেফটেন্যাণ্ট কুনিওর পেটে গুলি বিঁধিল। সন্ধ্যার দিকে অবস্থা খুব খারাপ হইয়া উঠিল, তার ভৃত্য ও অন্য কয়েকজন তার সেবায় নিরত, এমন সময় তার দাদা কাপ্তেন সেগাওয়া আসিয়া উপস্থিত। ভাই যে আহত, তার যে মৃত্যু আসন্ন—সে কিছুই জানে না। তাহাকে দেখিয়া সকলে বলিল, তোমার ভাই যে যেতে বসেছে! যাও, যাও, তার মুখে শেষবারকার মত একটু জল দিয়ে এস! কাপ্তেন তাড়াতাড়ি ভাইয়ের কাছে গিয়া হাঁকিল, কুনিও! কুনিওর তখন অন্তিম দশা—সে চোখ বুজিয়া পড়িয়া ছিল, কিন্তু দাদার ডাক তার কানে পৌঁছিল; মনে হইল, সে যেন সেই ডাকটি শুনিবার আশায় এতক্ষণ মরিতে পারে নাই! খোলাটে দৃষ্টি মেলিয়া সে দাদার মুখের পানে চাহিল, হাত বাড়াইয়া তার হাত খানা ধরিল, কিছুক্ষণ কারও মুখ দিয়া কথা বার হইল না। শেষে কাপ্তেন বলিল, সাবাস কুনিও, সাবাস! কিছু কি বলবে ভাই? বলিয়া সে মরণাহত ভাইয়ের মুখখানি সযত্নে মুছাইয়া দিল, তারপর নীচু হইয়া নিজের বোতল থেকে তার মুখে জল ঢালিয়া দিল।

কুনিও ঈষৎ একটু মাথা নাড়িল, তারপর বলিল, দাদা! দাদা!··· আর কিছু বলিতে পারিল না। দাদাকে হয়ত কত কথা বলার ছিল, কিন্তু মরণ তার অবসর দিল কই!

দুই সপ্তাহ পরে, ২৪ আগষ্ট তারিখের যুদ্ধে কাপ্তেন সেগাওয়া বিদেহী অনুজের কাছে যাত্রা করিল!

যে কেল্লার শ্রেণী জাপানী আক্রমণ প্রতিরোধ করিবে, তাকুশান তার চাবি। সেই তাকুশান্ হাতছাড়া হওয়ায় রুশেরা যে খুব ক্রুদ্ধ ও নিরাশ হইবে ইহা স্বাভাবিক। তাকুশান্ আবার দখল করার জন্য বার-বার তারা আক্রমণ করিতে লাগিল, কিন্তু প্রতিবারেই বিতাড়িত হওয়ায় তাদের নৈরাশ্য বাড়িয়া গেল।

ঐ পাহাড় দখলের দিনকয় পরে গিরিশীর্ষে স্থাপিত আমাদের এক শান্ত্রী একদিন প্রত্যূষে রুশ সন্ধানী চরের গুলিতে মারা পড়িল। যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইয়া আমাদের দ্বিতীয় দল ছুটিয়া গিয়া পাহাড়ের মাথায় উঠিল। দেখিতে পাইল তাদের দশ পনেরো ফুট নীচেই জনকয় রুশ কর্মচারী প্রায় ত্রিশ জন সৈনিকের আগে আগে তলোয়ার ঘুরাইতে ঘুরাইতে উঠিয়া আসিতেছে। আর এক মুহূর্ত ইতস্তত না করিয়া শত্রুর দিকে বন্দুক ঘুরাইয়া জাপানীরা গুলি চালাইতে সুরু করিয়া দিল। এই অপ্রত্যাশিত অভ্যর্থনায় শত্রুদলের চমক লাগিল, ফিরিয়া তারা পলায়ন করিল—তাড়াতাড়িতে উলটিয়া পালটিয়া প্রায় গড়াইয়া গেল। বলা বাহুল্য, আমাদের দল এমন সুযোগের সম্পূর্ণ সদ্ব্যবহার করিল—পলায়নপর শত্রুর দিকে

অবিরাম গুলি চলিতে লাগিল। একজনকেও প্রাণ লইয়া ফিরিতে হইল না—পাহাড়ের গায়ে তাদের মৃতদেহ ছড়াইয়া রহিল মসীচিহ্নের মত।

রুশেদের প্রচণ্ড একগুঁয়েমি দেখিয়া অবাক হইয়া যাই। হয়ত তাহাদের কোনো জায়গা আক্রান্ত হইয়াছে এবং তার এক অংশ বেদখল হইয়াছে, তখন অপর অংশের সৈন্যদের সেখান থেকে হটিয়া যাওয়া দরকার হইতে পারে—অন্যথায় হয় মৃত্যু, নয় বন্দীদশা প্রাপ্তি। এমন অবস্থায়ও তারা স্থান ত্যাগ না করিয়া সেইখানেই লাগিয়া থাকে—যতক্ষণ না তারা মারা পড়ে। সকলে মারা পড়িবার পর হয়ত একজনে আসিয়া ঠেকিয়াছে, তখন সেই একজনই গুলি চালাইতে থাকে। কাছাকাছি হইলে বন্দুকে কিরীচ চড়াইয়া সে লড়িতে থাকে যতক্ষণ না আত্মসমর্পণের চিন্তা তার মনে উদিত হয়। কেন্‌জান, তাইপোশান্‌, আর তাকুশানে এমন ব্যাপার প্রায়ই ঘটিত। শুনিয়াছি, নানশানের যুদ্ধের পরে, কোথা থেকে কেহ জানে না, গুলি ছুটিয়া আসিয়া আমাদের জন দশেক লোককে জখম ও নিহত করে। চারিদিকে খোঁজ খোঁজ রব উঠিল, অনেক সন্ধানের পর দেখা গেল, রান্নাঘরে এক রুশ সৈনিক লুকাইয়া জানালা দিয়া নিভয়ে পরমাগ্রহে গুলি চালাইতেছে। রুশবন্দীকে যখনই এরূপ করার কারণ জিজ্ঞাসা করিয়াছি, তারা উত্তর দিয়াছে—নায়কের হুকুম অমান্য করিতে পারি না!

একজন মার্কিন সামরিক কর্মচারী জাপানী সেনাদলের সঙ্গে কয়েকমাস মাঞ্চুরিয়ায় ছিলেন। তিনি বলেন, "জাপানী দলের মধ্যে, উঁচু থেকে নীচু পর্য্যন্ত সবার মধ্যে একটি সখ্যভাব ও একত্ব-বোধ বর্ত্তমান। তেমনটি আর কোনো জাতির সেনাদলের মধ্যে দেখা যায় না, এমন কি ইংলণ্ড বা গণতান্ত্রিক আমেরিকাতেও নয়। তাহাদের এই বিশেষত্ব মনকে আকর্ষণ করে।" কিন্তু রুশ সৈনিকের বিশেষত্ব যে একরোখা সাহস—তাও আমাদের প্রশংসার যোগ্য। পোর্ট-আর্থার আঁকড়াইয়া থাকার সময় তাদের গোলাগুলি রসদ ইত্যাদির যথেষ্ট অভাব ঘটে, তার ফলে সৈনিকেরা হাজারে হাজারে মারা পড়ে—তাদের দুরবস্থা হয় ঝোড়ো হাওয়ার মুখে দীপশিখার মত; সেই নিরাশার মধ্যেও তারা অবিচলিত ছিল, শত্রুকে বাধা দেওয়ার দৃঢ় সঙ্কল্প এতটুকু শিথিল হয় নাই। রুশেদের সামরিক বিধিতে আছে—যুদ্ধে জয়মাল্য লাভ হয় কিরীচ ও রণহুঙ্কারের দ্বারা! গুলি ফুরাইয়া গেলে বন্দুকের বাঁটের ঘায়ে শত্রুকে নিপাতিত কর! বন্দুকের বাঁট যদি ভাঙে তবে কামড়াইয়া দাও!

আক্রমণে ও বাধা দেওয়ায় তারা একরোখা, একথা খুব সত্য; কিন্তু আবার নিজেদের প্রাণ বাঁচাইবার জন্য তারা বিশেষ সতর্ক। রুষ চরিত্রের এই দুইটি বিশেষ লক্ষণ পরস্পর বিরোধী। "বরং ইটের টালি হইয়া বাঁচিয়া থাকিবে তবুও মণি হইয়া ভাঙিবে না"—মনে হইত ইহাই তাদের আদর্শ। জাপানী আদর্শ তার বিপরীত—সুন্দর মরণ বরণ করিও, কিন্তু অসম্মানের জীবন চাহিও না!

শুনিতে পাই এক বন্দী রুশ বলিয়াছিল—বাড়িতে আমার প্রেমিকা পত্নী আমার জন্য নিশ্চয়ই খুব ব্যাকুল হইয়া আছে। আমাদের নায়ক বলিতেন, জাপানী সেনা মাটির মূর্ত্তির মত ভঙ্গুর; কিন্তু দেখিতেছি ঠিক তার উল্টো, তারা অসুরের মত শক্তিমান। যুদ্ধে মারা যাওয়ার চেয়ে স্ত্রীর জন্য প্রাণটা রাখাই ভাল—আমি মারা পড়িলে শোকে সে পাগল হইয়া যাইবে। জাপানীকে আঁটিতে পারিব না। তাদের হাতে মৃত্যু নিশ্চিত জানিয়াও লড়িতে থাকা মূর্খতা নহে কি?

শত্রুর আঘাতের মুখে তাকুশান্‌ রক্ষা করা ও আয়ত্তে রাখা খুব কঠিন হইলেও আমরা তাই করিলাম, শেষ পর্য্যন্ত রুশেরা রণে ক্ষান্ত দিয়া তাদের অধিকারভুক্ত স্থান দৃঢ়তর করার চেষ্টায় নিরত হইল, এবং বিভিন্ন কেল্লা থেকে বড় বড় কামান অবিরাম দাগিয়া আমাদের কাজে বাধা দিতে লাগিল। তাকুশানের যে পাশ শত্রুর দিকে অবস্থিত সেই দিকটা সুদৃঢ় করা; অবরোধের মাল-মসলা সংগ্রহ, অতিকায় কামানের ভিত্তি-রচনা, শত্রুর 'মাইন'এর খবর লওয়া, তাদের কাঁটা-

তারের বেড়ার অবস্থা ও আমাদের 'মার্চ' যে পথে হইবে তাহা কতটা শত্রুর তোপের অধীন তাহা নির্ণয় করার জন্য হুঁসিয়ার গুপ্তচর নিয়োগ—এইরূপে আমরা ভাবী যুদ্ধের আয়োজন করিতে লাগিলাম। সমস্ত ব্যবস্থা ও সন্ধান সম্পূর্ণ হইলে ১৯ আগষ্ট প্রথম আক্রমণের দিন ধার্য্য হইল। আমাদের দলের প্রধান লক্ষ্য পূর্ব্ব-চিকুয়ান্‌শান্।

ক্রমশঃ

দ্বীপময় ভারত

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

[২০] বর-বুদুর স্তূপ

২২শে সেপ্টেম্বার, বৃহস্পতিবার।—

আজ সকালে আমরা বর-বুদুর দেখ্‌তে যাত্রা ক'রলুম সাড়ে নটার দিকে। একটী ডচ্ ভদ্রলোক তাঁর গাড়ী পাঠিয়ে দিয়েছিলেন, তাতে, আর পাকু-আলাম্-এর গাড়ীতে আমরা রওনা হ'লুম।

বর-বুদুর যোগ্যকর্ত্ত-র বায়ু কোণে প্রায় ছাব্বিশ মাইল দূরে অবস্থিত। যোগ্যকর্ত্ত থেকে মোটরে ঘন্টা দেড়েকের মধ্যে যাওয়া যায়। মোটর ছাড়া, যোগ্যকর্ত্ত থেকে Moentilan মুন্তিলান গ্রাম পর্য্যন্ত ট্রাম আছে,

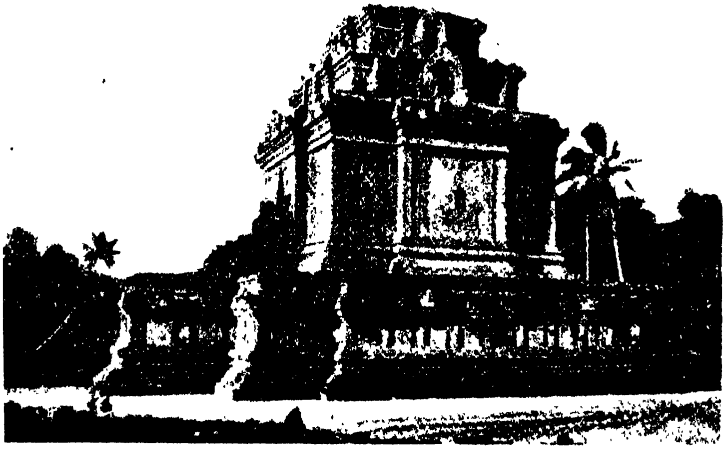


চণ্ডী মেন্দুৎ—জীর্ণোদ্ধারের পূর্ব্বে

মুন্তিলান থেকে বর-বুদুর ন' মাইল পথ, এটুকু ঘোড়ার গাড়ীতে যায়।

বর-বুদুর আর তার কাছাকাছি আর দুটী ছোটো মন্দির—Tjandi Mendoet 'চণ্ডী মেন্দুৎ' আর Tjandi Pawon 'চণ্ডী পাওন'—এই তিনটী নিয়ে একটা মন্দির-চক্র। সংশ্লিষ্ট আরও দু-চারটী মন্দির ছিল। এই মন্দিরগুলি মোটামুটী ৭৫০—৮৫০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে সুমাত্রার শৈলেন্দ্রবংশীয় রাজাদের সময়ে নির্ম্মিত হয়। এগুলির অবস্থা অত্যন্ত খারাপ হ'য়ে গিয়েছিল—বিশেষতঃ ছোটো মন্দিরগুলি জঙ্গলের চাপে প'ড়ে আর ভেঙে-চুরে গিয়ে ধ্বংস-প্রায় হ'য়ে গিয়েছিল। ডচ্ প্রত্নবিভাগ নানা প্রতিকূলতার আর প্রথমটায় নানা ব্যর্থতার মধ্য দিয়ে শেষটায় এদের জীর্ণসংস্কার ক'রেছেন। এই সুন্দর মন্দিরগুলিকে এঁরা যেন নোতুন ক'রে আবার বিশ্বমানবকে দান ক'রলেন। বিশেষ ক'রে ভারতবর্ষের মনে এর জন্য কৃতজ্ঞতাবোধ হওয়া উচিত।

আমরা প্রথমে চণ্ডী-মেন্দুৎ-এ পৌছুলুম। সেখানে ডাক্তার বস্ আর ডাক্তার কালেন্‌ফেল্‌স্ কবির জন্য অপেক্ষা ক'রছিলেন। উঁচু পোস্তার উপর মনোহর রেখা-সমাবেশযুক্ত মন্দিরটী নিজ মহিমায় প্রতিষ্ঠিত। মন্দিরের গায়ে ভাস্কর্য্য আছে, কিন্তু অল্প-স্বল্প। মন্দিরটীর শুদ্ধ শালীনতা দেখে চিত্তপ্রসন্নতা জন্মে। আমরা মন্দিরটী প্রদক্ষিণ ক'রলুম। উপরের পোস্তায় বা পীঠে উঠতে একটীমাত্র সিঁড়ি। এই সিঁড়ির ধারে কতকগুলি খোদিত চিত্র আছে, ডাক্তার বস্-



চণ্ডী মেন্দুৎ—জীর্ণোদ্ধারের পরে

এদের মুখমণ্ডলে যে একটা গাম্ভীর্য্য-মণ্ডিত ধ্যানস্তিমিত স্নিগ্ধ ভাব আছে, তা অতুলনীয়। মুখ-গুলি দেখে আমার খালি বোম্বাইয়ের কাছে এলিফাণ্টা দ্বীপে যে বিরাট ত্রিমুখ শিবের মূর্ত্তি আছে—ডাইনে উগ্র বা ভৈরব, মাঝে প্রসন্ন-বদন শিব, বাঁয়ে শক্তি বা উমা, এ তিন মুখের সমাবেশে শিবের আবক্ষ ত্রিমূর্ত্তি,—তার মুখগুলির অপার্থিব মহত্ত্ব মনে আসছিল। চণ্ডী মেন্দুতে বুদ্ধ আর বোধিসত্ত্ব-মূর্ত্তি ক'টা আমাদের দেখালেন—সেগুলি পঞ্চতন্ত্রের নানা গল্পের ছবি। আর আছে বৌদ্ধদের শিশু-পরিবৃত পঞ্চিক বা কুবের আর দেবী হারিতীর দুইটি চিত্র। মন্দিরের গায়ে যে সব বোধিসত্ত্ব আর অন্য বৌদ্ধ দেবমূর্ত্তি খোদিত আছে, উপরের পীঠে উঠে আমরা সেগুলি দেখ্‌লুম।

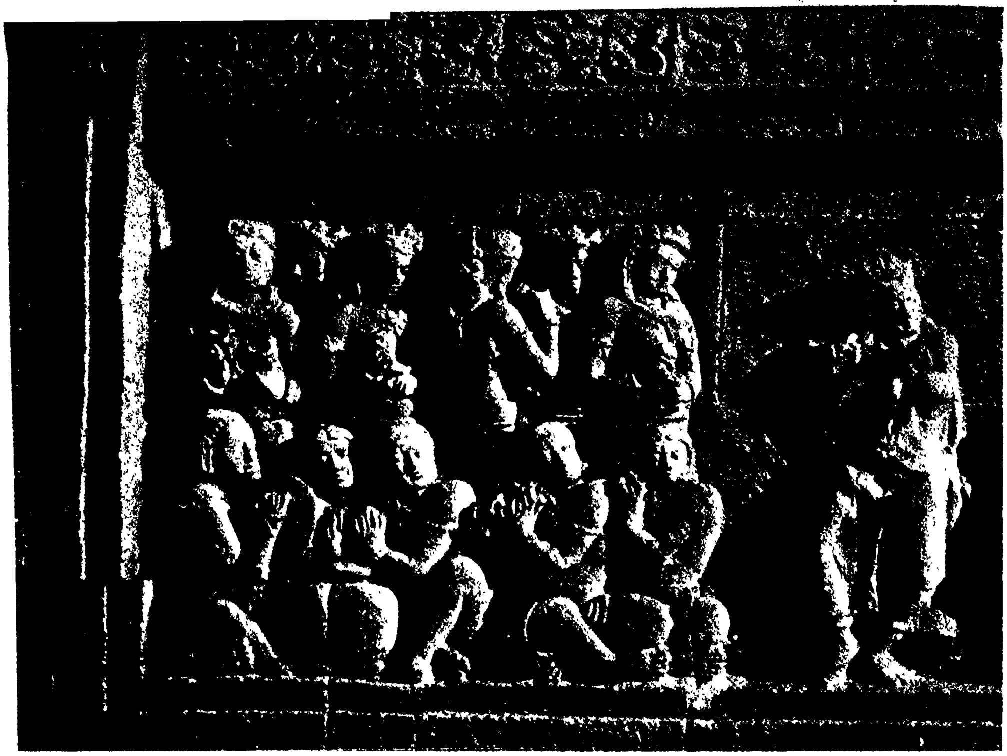
তারপরে মন্দিরের ভিতরে ঢোকা গেল। প্রথমটায় একটু অন্ধকার মতন লাগ্‌ল, তার পরে বুঝতে পারা গেল—ভিতরে তিনটী অতি সুন্দর অতিকায় মূর্ত্তি র'য়েছে। মাঝে বুদ্ধ শাক্যমুনির একটী মূর্ত্তি—পদ্মময় পাদপীঠের উপরে দুই পা রেখে কেদারায় বসার ভাবে সিংহাসনে ব'সে আছেন, হাত দুটীতে ধর্ম্মচক্র-প্রবর্ত্তন করার বা কাশীতে প্রথম উপদেশ দেওয়ার মুদ্রা ক'রে আছেন। অপূর্ব্ব ভাবদ্যোতক মূর্ত্তিটীর মুখমণ্ডল; মন্দিরের দ্বারের সামনেই এই মূর্ত্তিটী র'য়েছে, বাইরের আলোক-রশ্মি এসে এর মুখ উদ্ভাসিত ক'রে দেয়। দুই পাশে আর দুটী মূর্ত্তি আছে—অবলোকিতেশ্বর আর মঞ্জুশ্রীর—অতিকায় বটে, কিন্তু মাঝের মূর্ত্তিটীর মতন অত বড় নয়। এঁরাও সিংহাসনে উপবিষ্ট, তবে একটী ক'রে পা মুড়ে আসনের উপরে রেখেছেন, আর একটী পা পাদপীঠের উপরে বিকসিত পদ্মফুলের উপর। এই দুটী মূর্ত্তি-ও অতি সুন্দর, অতি মহনীয়;



চণ্ডী মেন্দুৎ—অবলোকিতেশ্বর



অবলোকিতেশ্বর
(চণ্ডী-সেন্দুং মন্দির, যবদ্বীপ)



বৌদ্ধ জাতক চিত্র





ার-বুদুর চৈত্য, যবদ্বীপ)



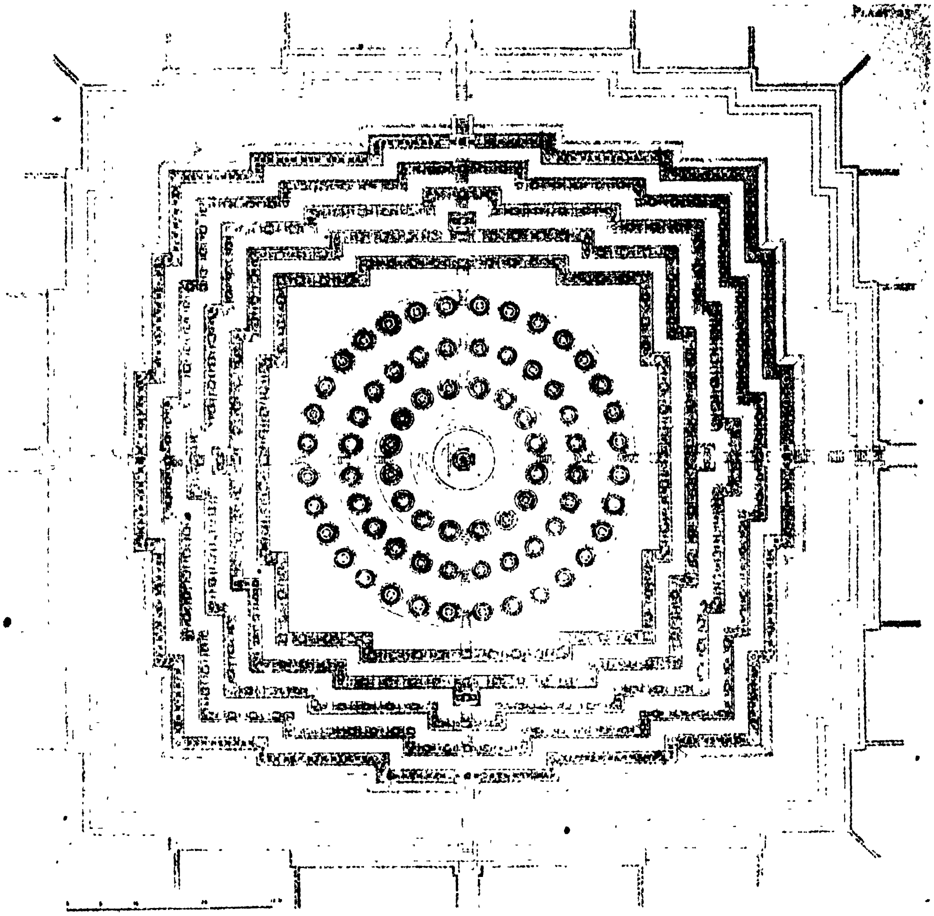
বর-বুদুর সমক্ষে রবীন্দ্রনাথ ও তাঁহার সঙ্গীগণ



বর-বুদুরে রবীন্দ্রনাথ



বর-বুদুরের পাদমূলে বাম হইতে দক্ষিণে—বাকে-পত্নী, প্রবন্ধকার, রবীন্দ্রনাথ, কালেনফেল্‌স্‌, 'তাম্রচূড়,' ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ
শ্রীযুক্ত বাকে-কর্তৃক গৃহীত



বর-বুদুর চৈত্যের ভূমির নক্‌শা

এখনও ভক্তের কাছে পূজা পেয়ে থাকেন,—বুদ্ধ মূর্তির পাদপীঠে তাম্র নির্ম্মিত পাত্রে ধূনো জ্ব'লছে, আর তিনটী মূর্তিরই পায়ের কাছে ফুল র'য়েছে। ডাক্তার বস্ ব'ল্‌লেন, যবদ্বীপের থিওসফিস্‌ট্‌-এরা আর স্থানীয় বৌদ্ধ অল্প-স্বল্প যারা আছে তারা মিলে বছরে এক দিন ক'রে এই চণ্ডী-মেন্দুং মন্দিরে উৎসব করে, দীপ পুষ্পাদি নিবেদন ক'রে এ দেশে ভগবান্ বুদ্ধের পুণ্য স্মৃতি একটু বাঁচিয়ে রাখ্‌তে চায়।

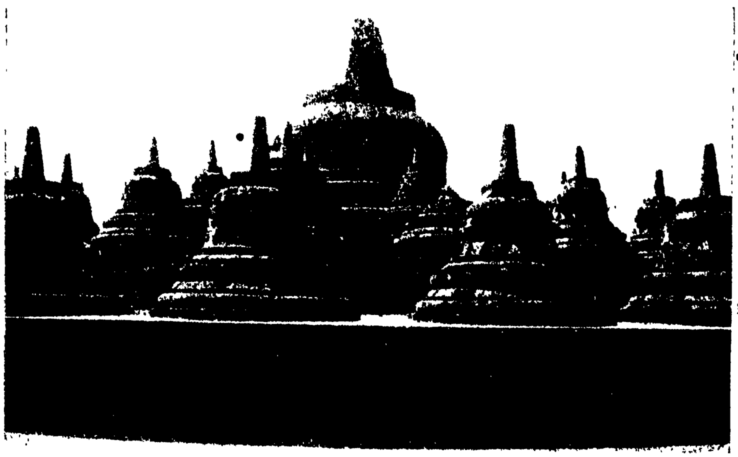
চণ্ডী-মেন্দুং দেখে আমরা প্রায় সাড়ে দশটা আন্দাজ বর-বুদুরে পৌঁছুলুম। বর-বুদুর একটা টিলার মতন উঁচু জায়গার উপরে অবস্থিত। চৌকো আকারের উঁচু চাতাল, তাথেকে থাকে থাকে আটটী ভূমি বা তালা উঠেছে, এক এক দিকে এক প্রস্থ ক'রে চারিদিকে চারপ্রস্থ সিঁড়ি আছে, তা দিয়ে উঠ্‌তে হয়। প্রথম পাঁচটী ভূমি চৌকো আকারের—তবে এক একটী বাহু সমান ভাবে না গিয়ে সরল রেখায় দুই তিন ভঙ্গে ভঙ্গ হ'য়ে গিয়েছে। উপরের তিনটী ভূমি গোলাকার। সর্ব্বোপরি ধাতুগর্ভ চৈত্য। পাঁচটী চৌকো ভূমিতেই একটী ক'রে বা gallery অর্থাৎ অলিন্দ বা বারান্দা, প্রদক্ষিণ-পথ বা চংক্রম-পথ আছে,—এই পথের দুই ধারের দেয়ালের গা পাথর খোদিত চিত্রে ভরা। এই চিত্রগুলি সংখ্যায় তের' শ', পাশাপাশি রেখে



বর-বুদুরের প্রদক্ষিণ-পথ

গেলে তিন মাইলের উপর লম্বা হয়। এগুলি বিশ্বশিল্পের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি ব'লে স্বীকৃত। ডচ পণ্ডিতেরা এগুলির আলোচনা ক'রেছেন। কিছুকাল হ'ল ডচ্ সরকার কয় খণ্ডে বিরাট এক পুস্তক প্রকাশ ক'রেছেন, তাতে এই স্তূপের সমস্ত খোদিত চিত্রের প্রতিলিপি সুন্দরভাবে ছাপিয়ে ডচ ভাষায় ভূমিকা আর বর্ণনা সমেত প্রকাশিত হ'য়েছে। গৌতম বুদ্ধের আর জাতকে বর্ণিত বোধিসত্ত্বের জীবন চরিত্রের সব দৃশ্য এই আশ্চর্য্য চিত্রাগারে খোদিত হ'য়ে র'য়েছে। এই খোদিত চিত্র ছাড়া, চংক্রমপথের মাঝে মাঝে কুলুঙ্গীতে বহু উপবিষ্ট বুদ্ধ আর বোধিসত্ত্বমূর্ত্তি আছে। মাঝের মূল চৈত্যকে ঘিরে যে তিনটী গোলাকার ভূমি আছে, সেগুলির প্রত্যেকটীতে ঘণ্টার মত কতকগুলি অপেক্ষাকৃত ছোটো চৈত্য আছে, এগুলি ফাঁপা, এর প্রত্যেকটীর ভিতরে একটী ক'রে অতিকায় উপবিষ্ট বুদ্ধ বা বোধিসত্ত্ব মূর্ত্তি; এই ছোটো চৈত্যগুলির আবরণ পাথরের মধ্যে রুইতনের আকারের বিস্তর ফাঁক রাখা হ'য়েছে, তার মধ্য দিয়ে ভিতরের উপবিষ্ট মূর্ত্তিটীকে দেখা যায়। উপরের গোলাকার তিনটী ভূমির চৈত্যে আর নীচেকার পাঁচটী ভূমির মধ্যে কুলুঙ্গীতে অবস্থিত যতগুলি এই রকম উপবিষ্ট বুদ্ধ আর বোধিসত্ত্ব মূর্ত্তি আছে, সবগুলি সংখ্যায় পাঁচ শ'র উপর হবে। তবে সবগুলি এখন নেই —ভেঙে চুরে গিয়েছে কতকগুলি, আর কতকগুলি লোকে নিয়ে গিয়েছে।

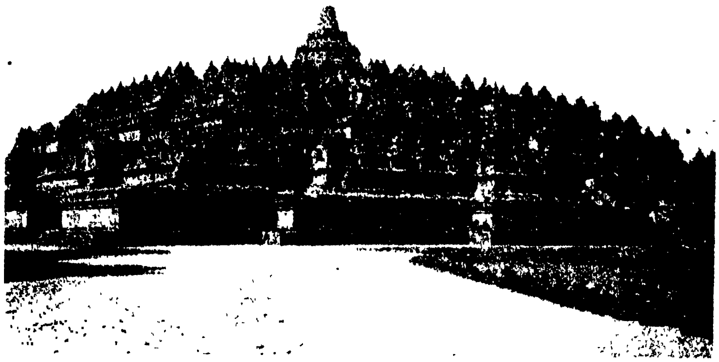
বর-বুদুর পৃথিবীর অন্যতম আশ্চর্য্য কীর্ত্তি। দূর থেকে এর ভিতরকার কলা-সৌন্দর্য্যের শুচিতা আর প্রাচুর্য্য সম্বন্ধে কোনও ধারণাই হ'তে পারে না; সমস্ত জিনিসটী একসঙ্গে যেখান থেকে বেশ দেখতে পাওয়া যায়, এমন কাছাকাছি গিয়ে হঠাৎ দেখে মনে হয়—এটা তো বাড়ী বা মানুষের হাতের তৈরী প্রাসাদ নয়, এ যেন পাঁশুটে রঙের একটি ছোটো পাহাড়; উপরের চৈত্য-গুলিকে যেন পাহাড়ের গায়ের উপকার বনস্পতি ব'লে ভ্রম হয়; একটু ভালো ক'রে দেখলে অবশ্য ভ্রম তখন কেটে যায়, দূর থেকেও চৈত্যের সামঞ্জস্য-পূর্ণ গঠন-রীতি



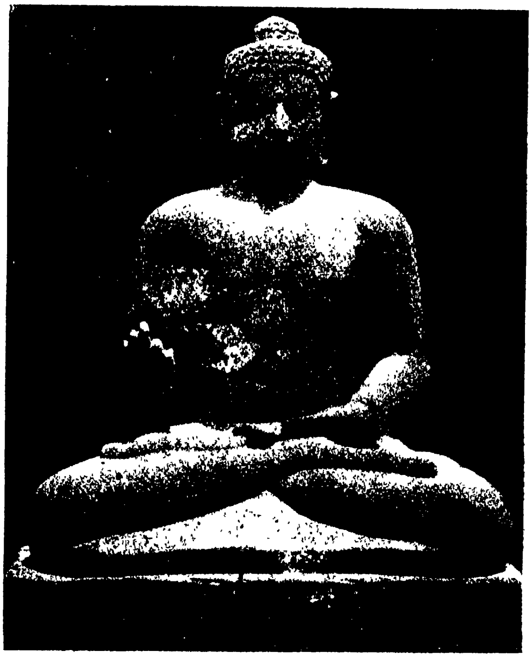
বর-বুদুর—উপরের তলায় ঘণ্টাকৃতি চৈত্য (অভ্যন্তরে বুদ্ধ মূর্ত্তি)

আর তার কুলুঙ্গী আর খোদাই-কাজের আভাস চোখে ঠেকে।

বর বুদুরের পাদদেশেই ডচ সরকার একটি 'পাসাঙ্গ্রাহান' বা ডাক-বাঙলা ক'রে দিয়েছে, এটি এখন হোটেল-রূপে ব্যবহৃত হয়। এখানেই আমরা উঠলুম। এই হোটেলের বারান্দায় ব'সে অনতিদূরে বর-বুদুরের অরণ্যানী-আবৃত গিরিবৎ সৌন্দয্য বেশ উপভোগ করা যায়। আমরা এই তীর্থস্থানে পৌঁছে তখনি 'ধূলো পায়ে' একবার চৈত্য-দর্শন ক'রে এলুম। একে একে আমরা সব কয়টি ভূমি দিয়ে ঘুরে চৈত্যের



বর-বুদুর চৈত্য—সাধারণ দৃশ্য

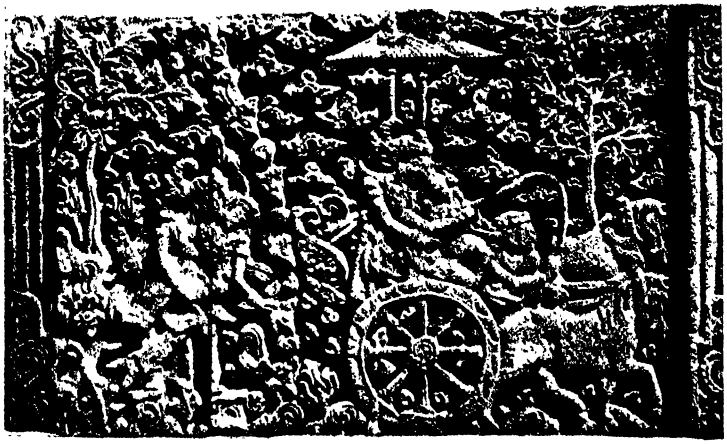


বর-বুদুর—বুদ্ধ মূর্ত্তি

শিখরদেশে উঠলুম। ব্যাপারটা বড়ো সোজা নয়। প্রথম ভূমির বেড়টা ঘুরে চংক্রম-পথের দু দিককার দেয়ালের খোদিত চিত্র দেখতে দেখতে কোমর ব্যথা ক'রে যায়। আমরা একটু মোটামুটী ভাব দেখে নিলুম। সব কয়টা ভূমির গ্যালারী ঘুরে সমস্ত চিত্রগুলি ভালো ক'রে দেখা মাসাধিক কালের কাজ, দুই একদিনে কিছুই হয় না। আমরা উপরে যখন উঠলুম, চৈত্যের এই সু-উচ্চ সপ্তভূমিক শীর্ষে আরোহণ ক'রলুম, তখন চারিদিকে তাকায়ে এক অতি উদার সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্য আমাদের দৃষ্টি-গোচর হ'ল। দিনটা মেঘলা ছিল, তার জন্য বেশ আরামেই দেখা যাচ্ছিল; সূর্য্যদেব এদেশে আমাদের দেশের মতই খরকিরণ বর্ষণ করেন। বর-বুদুরের পূব দিকে Merapi 'মেরাপি' নামে আগ্নেয় গিরি, আর তার সংশ্লিষ্ট উচ্চ পর্ব্বত-মালা; পাহাড়ের শ্রেণীর কোলে না'রকল বন; পশ্চিমদিকে আবার বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত না'রকল বন। মেঘের কোলে পর্ব্বত-শ্রেণী চমৎকার স্নিগ্ধ বর্ণ গ্রহণ ক'রেছে; আর মেঘের কোলে না'রকল গাছের পাতাকে আরও সবুজ দেখাচ্ছে। অবর্ণনীয় সুন্দর এই প্রাকৃতিক দৃশ্য—আর মন্দিরের ভাস্কর্য্যের সৌন্দর্য্যের তো সীমা নেই।

বর-বুদুর, প্রাম্বানান্ প্রভৃতি প্রাচীন যুগের দ্বীপদ্বীপীয় মন্দিরগুলির ভাস্কর্য্য, যাকে বলে classic style-এর—সরল উদার অনাড়ম্বর ভাবের; এগুলি ভাস্কর্য্য-শিল্পের ধ্রুপদ-চৌতাল। পরবর্ত্তী যুগের যবদ্বীপীয় আর বলি-দ্বীপীয় ভাস্কর্য্যে এই classic dignity, প্রাচীনের এই বিরাট গাম্ভীর্য্য আর রইল না—ভাস্কর্য্য খুব কারিগরী-করা

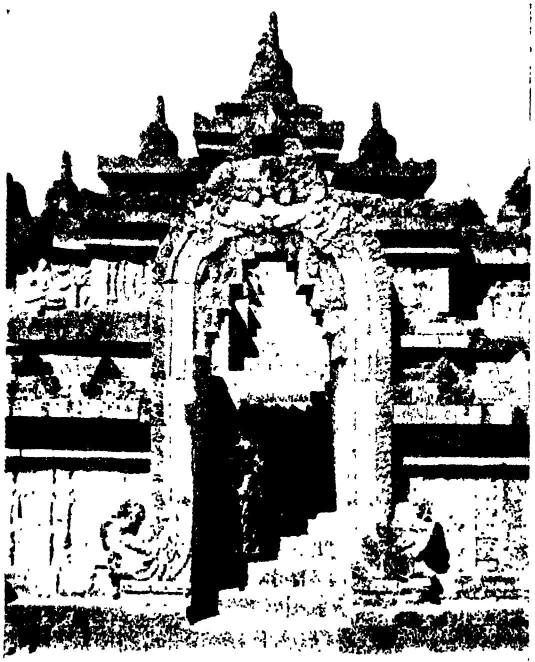
টপ পা-ঠুমরীতে রূপান্তরিত হ'লে। বর-বুদুরের একখানি খোদিত চিত্রের পাশে অর্ব্বাচীন যুগের যবদ্বীপীয় বা বলিদ্বীপীয় চিত্র একখানি রাখলেই পার্থক্য ধরা যায়।



আধুনিক অলঙ্কার-বহুল বলিদ্বীপীয় ভাস্কর্য্য

নাম্‌তে ইচ্ছে ক'রছিল না। সঙ্গে ডাক্তার বস্, ডাক্তার কালেন্‌ফেল্‌স্ আর অন্য বন্ধুরা ছিলেন। কতকগুলি বিশেষ চিত্রের দিকে এঁরা আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রলেন। এক জায়গায় একটী জাহাজ-ডোবার দৃশ্য—এক বিরাট কচ্ছপের পিঠে চ'ড়ে ডোবা জাহাজের যাত্রীরা রক্ষা পায়, এই হ'চ্ছে কথা। এই চিত্র-শিলাটী এখন যবদ্বীপীয়দের নিকটে বিশেষ ভাবে পূজা পায়—কেন, তার কারণ কেউ জানে না; এর সামনে ধূনো জালায়, এর গায়ে ফুল দেওয়া লেগেই আছে। চৈত্যের চারিদিকে যে চার প্রস্থ সিঁড়ি আছে—পর পর আটটী ভূমিতে যে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে হয়,—সেই সিঁড়ির মাঝে মাঝে বিরাট 'কাল-মকর' বা 'কীর্ত্তি-মুখ' যুক্ত তোরণ আছে। মন্দিরটী এখন একটি সুবিশাল পাথরের চাতালের উপরে যেন প্রতিষ্ঠিত; এই চাতালটী মন্দিরটীকে দৃঢ় করবার জন্য পরে তৈরী হয়,—চাতালটীর দ্বারায় মূল চৈত্যের সব তালার নীচেকার একটি তালা বা 'ভূমিকে তার খোদিত চিত্র আর অন্য অলঙ্কার সমেত ঢেকে দেওয়া হয়।

বেলা হ'য়ে যায়, হোটেলে ফিরে এসে স্নান সেরে নিয়ে আহারে বসা গেল। আমাদের দলটী জ'মেছিল মন্দ না। কিন্তু হাসি ঠাট্টা মস্করায় সকলকে মাতিয়ে' রেখেছিলেন বিরাট-বপু কালেন্‌ফেল্‌স্। তাঁর পাশে ব'সেছিলেন বেচারী 'তাম্রচুড়',—কালেন্‌ফেল্‌স্-এর রসিকতা কতকটা তাঁর উপর দিয়ে প্রবাহিত হ'চ্ছিল বটে, কিন্তু ডাক্তার বস্ বা আর কেউও বাদ যাচ্ছিলেন না। আহারান্তে ডচ রীতি-অনুসারে সকলে একটু দিবা-নিদ্রার জন্য যে যার ঘরে গেলেন। কবি আর ডাক্তার বস্ বারান্দায় ব'সে ব'সে অনেকক্ষণ ধ'রে খুব আলাপ ক'রলেন। ডাক্তার বস্‌কে কবির খুবই ভালো লেগেছিল।



বর-বুদুর—বিভিন্ন ভূমির মধ্যকার তোরণ

সাড়ে পাঁচটার সময়ে সকলে ঘুম থেকে উঠে স্নান-টান সেরে পোষাক প'রে চা-পানের জন্য হোটেলের

সামনে খোলা ময়দানে সমবেত হ'লেন। কালেন্‌ফেল্‌স্ এলেন তাঁর শোবার কাপড়-চোপড় প'রে—'তুয়ান রক্‌সস' বা 'শ্রীযুক্ত রাক্ষস' ছাড়া তাঁর অন্য কতকগুলি নাম আছে, তার মধ্যে একটি হ'চ্ছে 'কুম্ভকর্ণ'—সেটা সার্থক নাম—সকলের শেষে তিনি তাঁর ঘর থেকে বা'র হ'লেন, স্নান করার বা পোষক বদলাবার তাঁর সময় বা প্রবৃত্তি ছিল না। আমি সকালে স্নানের সময়ে ধুতি চাদর পাঞ্জাবী প'রেছিলুম—তাই প'রেই রইলুম। চা-পানের মজলিসও কালেন্‌ফেল্‌স মাতিয়ে রাখলেন—লোকটীর heartiness—বেশ দিল-খোলা ভাবটী কবিরও খুব ভালো লাগ্‌ছিল।

ইতিমধ্যে কবিকে নিয়ে আমরা দলবদ্ধ হ'য়ে আর একবার চৈত্যের উপরে উঠ্‌লুম। কবি তিনটী ভূমির উপরে উঠতে উঠতেই শ্রান্তি অনুভব ক'রলেন, আমরা তাঁকে আর না উঠতে অনুরোধ ক'রলুম। দ্বিতীয় ভূমির কতকগুলি চিত্র তিনি দেখলেন। তাঁর মতন সূক্ষ্ম অনুভূতি-শক্তি কয়জনের আছে? এই মন্দির আর এর ভাস্কর্য্যের অন্তর্নিহিত ভাবটী তিনি চৈত্যের বিরাট স্তব্ধতার মধ্যে ব'সে উপলব্ধি ক'রলেন। পরে তিনি চৈত্যে আর এক বার আসেন, আর দূর থেকে পাসাংগ্রাহান্-এর বারান্দায় ব'সে ব'সে এর প্রত্যক্ষ অনুধ্যাননাও করেন। কবি আমাদের ব'ললেন—এই চৈত্যের শিল্প-সম্ভার আর এর মহনীয় গাম্ভীর্য্য আমাদের বৈচিত্র্যময় আর জটিলতাময় জীবনের মধ্যে অন্তর্নিহিত 'বুদ্ধ-আইডিয়া' বা বুদ্ধ-ভাবকেই যেন প্রকাশ ক'রছে।

বর-বুদুরের মতন বিরাট শিল্প-নিকেতনের সৌন্দর্য্য-সম্ভারের মধ্যে—প্রাচীন ভারতের জীবন্ত প্রাণের স্পন্দনে সৃষ্ট এই অবিনশ্বর কীর্ত্তির আবেষ্টনের মধ্যে দণ্ডায়মান, ভারতের শ্রেষ্ঠ রসস্রষ্টাদের মধ্যে অন্যতম শ্রীরবীন্দ্রনাথ;—যে ভারতের ঋষিদের, যে ভারতের বুদ্ধের সাধনার অনুপ্রাণনার ফলে এই বর-বুদুর, এই প্রাম্বানান, সেই ঋষিদের সেই বুদ্ধের বাণী নবীন ভাবে যিনি জগতে প্রচার ক'রছেন, প্রাচীন ঋষিদের সেই অদ্ভুত-কর্ম্মা



বর-বুদুর—চা-পানের মজলিস (শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ কর কর্ত্তৃক গৃহীত)
বাম হইতে দক্ষিণে - রবীন্দ্রনাথ, 'তাম্রচূড়', বস্, প্রবন্ধকার, কালেন্‌ফেল্‌স্

বংশধর শ্রীরবীন্দ্রনাথ, তিনি স্বয়ং সেখানে উপস্থিত। ভারতের প্রাচীন প্রতিভার লীলাক্ষেত্রে এসেছেন ভারতের আধুনিক যুগের এক শ্রেষ্ঠ পুরুষ, প্রাণরসের উৎসের সন্ধানে;—এ দৃশ্য অপূর্ব্ব; রবীন্দ্রনাথের এই তীর্থে আগমনে যেন তাঁর দ্বারাই ভারতের প্রাচীন পিতৃপুরুষগণের আত্মার উদ্দেশে তাঁদের এক বিশেষ কৃতিত্ব বা কীর্ত্তি স্মরণ ক'রে শ্রদ্ধা-নিবেদন করা হ'ল। বর-বুদুর—রবীন্দ্রনাথ;—ভারতের শাশ্বত চিন্তা আর কল্পনাশক্তির দুইটী বিরাট প্রকাশ—একদিকে ভাস্কর্য্য-মণ্ডিত সৌধে, অন্য দিকে অলৌকিক কবি-প্রতিভায়।

রবীন্দ্রনাথ আর আমরা যে ভাবের ভাবুক হ'য়ে বর-বুদুর দেখ্‌ছিলুম, সে ভাব টুরিস্‌ট্-জাতীয় দর্শকদের ভাব নয়। যে অজ্ঞাতনামা শৈলেন্দ্র-রাজবংশাবতংস নরেন্দ্র এই বিশাল চৈত্য রচনা ক'রে ভগবানের উদ্দেশে তাঁর ভক্তির অর্ঘ্য নিবেদন ক'রেছিলেন; যে সকল সহস্র সহস্র যবদ্বীপীয় আর অন্য দেশীয় ভক্ত এই প্রস্তরময় মহাকাব্য পাঠ ক'রে চিত্ত-প্রসন্নতা লাভ ক'রত, আর এই ভাবে রাজার প্রণামের সঙ্গে

মিলিত ক'রে তাদের প্রণামকেও সার্থক ক'রত,—তাদের কথা মনে হ'চ্ছিল। এই রকম এক একটী সৌধ—বর-বুদুর আর প্রাম্বানান্, আর কম্বোজের আঙ্কর-থোম্-এর মতন বিরাট মন্দির—এদের অবলম্বন ক'রেই যে যবদ্বীপের আর বহির্ভারতের অন্য প্রদেশের সংস্কৃতি মূর্ত্ত হ'য়ে আছে; আর ভারত-ও এদের অন্তরালে তার মহান্ মৌনভাব নিয়ে বিদ্যমান। এখানে তো আমার মনে উচ্চ অঙ্গের ধ্রুপদ শুনলে যেমন হয় তেমনি একটা অব্যক্ত আকুলতা, একটা উপাসনা বা আত্ম-নিবেদনের প্রবল ইচ্ছা এনে দিচ্ছিল। এই প্রাচীন কীর্ত্তিগুলির গৌরব সম্বন্ধে আমাদের সঙ্গেকার ডচ বন্ধুরা সকলেই খুব সচেতন ছিলেন। স্থানগুলির সংরক্ষণের জন্য ডচ্ প্রত্নবিভাগকে মুক্তকণ্ঠে আমাদের সাধুবাদ দিতে হ'ল। আমরা বর-বুদুর দেখে যে আন্তরিক প্রীত হবো, এঁরা তা জান্তেন। সাধারণ ইউরোপীয়, আর বিশেষ ক'রে আমেরিকান যাত্রীরা যে ভাব নিয়ে আসে, তার সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বর-বুদুরের উপরে যে চমৎকার কবিতাটী লিখেছেন তাতে ব'লেছেন—

> অর্থশূন্য কৌতূহলে দেখে যায় দলে দলে আসি'
> ভ্রমণ-বিলাসী।—
> বোধ-শূন্য দৃষ্টি তার নিরর্থক দৃশ্য চলে গ্রাসি'।

ডাক্তার বস্ এদের হাড়ে-হাড়ে চেনেন—দু'চার বার এদের নিয়ে তাঁকে বিব্রতও হ'তে হ'য়েছে। এই রকম আমেরিকান একদল এসেছিল, খোদিত চিত্রগুলি যেখানে উঁচু ক'রে খোদা আছে সে-রকম একখানি শিলাপট্ট থেকে একটী মূর্ত্তির মাথা হাতুড়ি দিয়ে ভেঙে নিয়ে যাবার চেষ্টা ক'রছিল। এই সব বর্ব্বরতার জন্য এদের চোখে-চোখে রাখতে হয়। এক আমেরিকান দর্শক সম্বন্ধে ডাক্তার বস্ একটী মজায় গল্প ব'ললেন। ফিলিপাইন দ্বীপ-পুঞ্জের এক গবর্ণর—আমেরিকান—একবার যবদ্বীপ বেড়াতে আসেন। যথারীতি তিনি বর বুদুরে পদার্পণ করেন। ডাক্তার বস্কে পাঠানো হয়, তাঁকে সব বুঝিয়ে দেখাবার জন্য। বস্ সাহেব তো উপস্থিত—বর-বুদুরের চৈত্যের প্রথম ভূমি থেকে দেখাবেন মতলব ক'রে আছেন, কিন্তু গবর্ণর সাহেব বিভিন্ন গ্যালারী বা বারান্দার দিকে তাদের মধ্যেকার উৎকীর্ণ চিত্রের দিকে ফিরেও দেখলেন না, সিঁড়ি দিয়ে সরাসরি চৈত্যের সব উপরের ভূমির উপরে উঠে গেলেন, সেখানে পৌঁছে, চারিদিকে একবার সিংহাবলোকন ক'রলেন। তার পরে আগ্নেয় গিরি মেরাপি পাহাড়ের দিকে দৃষ্টিপাত ক'রে ডাক্তার বস্কে ব'ললেন—'দেখুন মশায়, আপনাদের এই ডচ জাতিটির বুদ্ধির প্রশংসা ক'রতে পারি না; কি কতকগুলো ভাঙা পাথর নিয়ে আপনারা এত মাথা ঘামাচ্ছেন, সেগুলোর জন্য আবার খরচ-পত্র ক'রছেন। দেখুন দেখি সামনে, অত বড়ো একটা আগ্নেয় গিরি; যদি ওইটাকে কোনও রকমে বাগে আন্তে পারেন, তাহলে আপনাদের এই সমগ্র দ্বীপময় ভারতের জন্য যত ইচ্ছে বৈদ্যুতিক শক্তি সংগ্রহ ক'রতে পারেন; কিন্তু সেদিকে তো কিছুই ক'রছেন না, যত বাজে কাজ নিয়ে আছেন আপনারা।'

সারা বিকালটা কালেন্‌ফেল্‌সের অবিশ্রান্ত ঠাট্টা মস্করা আর গল্প চ'লল। ডচেরা এক বিষয়ে আমাদের মতন বেশ ঢিলে-ঢালা, সর্ব্বদা ধনুকে ছিলে জুড়ে' নেই, আর টঙ্কার-ও দেয় না। ইংরেজ অফিসার যদি কোথাও একা-ও থাকে, তা আফ্রিকার জঙ্গলেই হোক আর চিত্রালের পাহাড়েই হোক, সে তার সামাজিকতার সব খুঁটি-নাটী অনুষ্ঠান এই বিরলে ব'সেও অত্যন্ত ধর্ম্মভীরু লোকের মতন নিখুঁত-ভাবে পালন ক'রবে—সেই রোজ-রোজ দাড়ি কামানো, সেই ড্রেস-স্যুট প'রে নৈশ ভোজন করা। দল হ'লে তো কথাই নেই। এগুলো তার জাতীয়তার, তার সম্প্রদায়ের বর্ণ-চিহ্ন; কে এক ইংরেজ লেখকই ব'লেছিল, ভারতের হিন্দু যেমন তার সম্প্রদায়ের চিহ্ন চন্দন কেসর বিভূতি খড়িমাটী সিঁদুর ইত্যাদি দিয়ে কপালে আর গায়ে মেখে ব'সে থাকে, মুসলমান যেমন গোঁফ ছেঁটে লম্বা দাড়ী রাখে,—এগুলো সেই রকমই ব্যাপার, তার ইংরেজ জাতীয়তার বা সাম্প্রদায়িকতার এসব ছাপ তাকে সর্ব্বাঙ্গে লাগিয়ে ব'সে থাকতেই হবে, নইলে জা'ত যাবে। ডচেদের মধ্যে কিন্তু ও ভাবটা নেই। তাই ওদের সঙ্গে বনিয়ে নিতে দেরী হয় না। কালেন্‌ফেল্‌স্ কতকগুলি মজার মজার

গল্প ব'ললেন। পূর্ব্ব-যবদ্বীপের পানাতারান-এর মন্দিরের গায়ে নানা পৌরাণিক চিত্র উৎকীর্ণ আছে, তার মধ্যে দুই তপোনিরত ব্রাহ্মণের কাহিনী চিত্রিত আছে। এদের মধ্যে একজন ছিলেন স্থূলকায়, ভোজন-প্রিয়; অন্যজন ছিলেন ক্ষীণকায়, ভোজনে বীতস্পৃহ; এদের নামও ছিল দেহ আর প্রকৃতি অনুসারে যথাক্রমে Boeboeksa 'বুভুক্ষা' আর Gagang Aking 'গাগাঙ্‌ আকিঙ্‌' বা 'শর-কাঠি'; বুভুক্ষাটী ছিলেন আকার-সদৃশ প্রাজ্ঞ, কিন্তু ভালোমানুষ,আর 'শর-কাঠি' ঠাকুর ছিলেন একটু পেঁচোয়া বুদ্ধির; এঁদের নানা হাস্যকর কাহিনী আছে, আর শেষটায় এদের স্বর্গে যাওয়ার ব্যাপার নিয়ে স্বয়ং ইন্দ্রকে ও একটু বিব্রত হ'তে হ'য়েছিল; সে সব কাহিনী ব'লে ইনি নিজের পরিচয় দিলেন—আমিই সেই বুভুক্ষা, আর ঐ হ'চ্চেন আমার নমস্য ভ্রাতা 'গাগাঙ্‌-আকিঙ্‌'—এই বলে তুলনায় বিশেষ ক্ষীণকায় ডাক্তার বসকে দেখিয়ে দিলেন। Engelbert van Bevervoordc 'এঙ্গেল্‌বার্ট-ফান্‌-বেফর্‌ফর্ডে' বলে এক ডচ রেসিডেন্ট বা ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন, তাঁর মেজাজটা একটু রুদ্র ছিল; তাঁর সম্বন্ধে দু একটা গল্প ব'লে কালেন্‌ফেল্‌স্‌ ব'ললেন, তাঁর মেজাজ অনুসারে যবদ্বীপীয়েরা তাঁর নামটা বদলে' দেয়—Angel Banget Bimo Koerdo 'আঙ্গেল বাঙেৎ বীমো কুর্দ্দো' অর্থাৎ 'ভীষণ ঝঞ্ঝাটে' ক্রুদ্ধ ভীম'। এই নাম ডচ্‌ মহলেও চ'লেছিল। শূরকর্ত্ত-র সুসুহুনান-এর এক আত্মীয় কালেন্‌-ফেল্‌স্‌-এর সঙ্গে বলিদ্বীপ-ভ্রমণে যান; স্বদেশে ইনি একজন পরম ধর্ম্মধ্বজী আনুষ্ঠানিক মুসলমান ছিলেন, কিন্তু দেশের বাইরে বলিদ্বীপে শূকর-মাংসের মোহে প'ড়ে যান—জিনিসটী তাঁর এত প্রিয় হ'য়ে উঠেছিল ওটা না হ'লে তাঁর আহারই হ'ত না—একটি ক'রে শূকর-শিশু অগ্নি-দগ্ধ ক'রে রোজ তাঁর জলপান হ'ত, তাই তাঁর নাম দাঁড়িয়ে যায় Babi Goeling 'বাবি-গুলিঙ' অর্থাৎ 'বরাহ-নন্দন'। দেশে ফিরে এসে এসব কথা তিনি যেন ভুলে যান, খুব মালাজপ আর কোরান-আওড়ানো নিয়েই সকলের সম্মান কুড়োতে থাকেন। কিন্তু একদিন তাঁর এই নবীন নামটী আর সেই সঙ্গে সঙ্গে তার বলিদ্বীপের কীর্ত্তি সুসুহুনান জান্‌তে পেরে রাজসভায় প্রচার ক'রে দেন, আর সেই থেকে লোকটীর ধার্ম্মিক বলে যে পসারটুকু জ'মে উঠ্‌ছিল সেটুকু একেবারে মাটী হ'য়ে গেল।

সন্ধ্যার পরে ডাক্তার বস্‌ আর প্রাম্বানান-এর ইঞ্জিনিয়ার ফান-হান বিদায় নিলেন। ডাক্তার বস্‌ Koninklijke Bataviaasche Genootschap van Kunst en Wetenschap অর্থাৎ বাতাবিয়ার রাজকীয় কলা-বিজ্ঞান পরিষদের তরফ থেকে তাঁদের পরিষদে একটা প্রবন্ধ পড়বার জন্য আমায় আমন্ত্রণ ক'রে আমাকে বিশেষ সম্মানিত ক'রেছিলেন—প্রবন্ধটা লেখবার মতলব আঁটা গেল। বর-বুদুর মন্দিরের সংরক্ষক হ'চ্ছেন একজন অবসর-প্রাপ্ত ডচ্‌ ফৌজী অফিসার; ইনি বাড়ীতে রেডিও এনেছেন—সুদূর হলাণ্ডের থিয়েটারে বা মজলিসে গীত গান যবদ্বীপে ব'সে শুনতে পান—শ্রীযুক্ত বাকে আর ডাক্তার বস্‌ তাঁর বাসায় গেলেন ঐ গান শুনতে।

'বর-বুদুর', বা 'বোরো-বুদুর' শব্দটীর অর্থ নিয়ে মত-ভেদ আছে। একটা মত হ'চ্ছে এই—'বুদুর' গ্রামের বিহার; যবদ্বীপে লোকমুখে সংস্কৃত 'বিহার' শব্দের বিকৃতি ঘটে—Vihara—Bioro—Boro, এইরূপ নাম পরিবর্ত্তনের ধারা।

রাত্রে গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি হওয়ায় বেশ ঠাণ্ডা প'ড়েছিল।

শুক্রবার, ২৩শে সেপ্টেম্বার।—

আজ সকালেও মেঘলা-ভাবটা চ'ল্‌ল। বর-বুদুরের উপর থেকে সূর্য্যাস্ত আর সূর্য্যোদয়ের চমৎকার দৃশ্য দেখা যায়, কাল সন্ধ্যায় আর আজ ভোরেও মেঘ আর বৃষ্টি হওয়ায় আমাদের ভাগ্যে তা আর দেখা হ'ল না। সকালে অনেকক্ষণ বর-বুদুরেরই কাটানো গেল,—আর দুপুরেও। কাব সকালে পাসাঙ্‌গ্রাহানে ব'সে ব'সে বর-বুদুরের শোভা দূর থেকে দেখতে লাগলেন, আর এই সময়েই বর-বুদুর সম্বন্ধে তাঁর সুন্দর কবিতাটী লিখলেন। দুপুরে তিনি বর-বুদুরে গেলেন, সেখানে তাঁর কতকগুলি ছবি নিলে। 'বর-বুদুরে রবীন্দ্রনাথ'—এই ছবিখানি ওদেশের কতকগুলি পত্রিকায় আগ্রহের সঙ্গে প্রকাশ ক'রেছিল।

আজই দুপুরের পরে আমরা বর বুদুর থেকে যোগ্য-কর্ত্তায় প্রত্যাবর্ত্তন ক'রলুম। কালেন্‌ফেল্‌স্ আমাকে তাঁর গাড়ীতে করে নিয়ে এলেন, পথে Tjandi Pawon 'চণ্ডী পাওন' আর Tjandi Ngawen 'চণ্ডী ঙাওএন্' নামে দুটী ছোটো মন্দির দেখিয়ে আন্‌লেন। চণ্ডী-পাওনটী চমৎকার ছোট্ট একটী মন্দির, ভগ্ন দশাথেকে জীর্ণোদ্ধার ক'রে অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে রক্ষিত হ'য়ে আছে। চণ্ডী-ঙাওএন্‌টীর সামনে একটী তোরণদ্বার আছে, এর পোস্তার বা চাতালের চার কোণে চারটী সিংহ মূর্ত্তি, এ মন্দিরটীর. বেশ একটু বৈশিষ্ট্য আছে। দুটাই খুব প্রাচীন,· বর-বুদুরের যুগের। চণ্ডী-পাওনের দেয়ালে কতকগুলি সুন্দর বৌদ্ধ দেবী মূর্ত্তি খোদিত আছে। চণ্ডী-ঙাওএন্-এ পৌছুবার পথটা অত্যন্ত বিশ্রী ছিল, মাঠের মধ্যে দিয়ে এবড়ো-খেবড়ো একটা যেমন-তেমন রাস্তা ব'ল্‌লেই হয়। কালেন্‌ফেল্‌স্-এর পুরাতন ঝরঝরে' একখানি মোটরগাড়ী, আমার আশঙ্কা হ'চ্ছিল এই অতি খারাপ রাস্তায় গাড়ী কোথাও ভেঙে না পড়ে। কালেন্-ফেল্‌স্ আমায় আশ্বাস দিলেন, দরকার হ'লে তাঁর গাড়ী নিয়ে তিনি তালগাছেও চ'ড়তে পারেন, তাঁর গাড়ীর নাম তিনি দিয়েছেন Wilmono ; সংস্কৃত 'বিমান' শব্দ যবদ্বীপে হ'য়ে দাঁড়িয়েছে Wilmono ; 'বিমান' বা 'পুষ্পক রথ' আকাশে ওড়ে, আকাশচারী যান, অতএব তাতে ইন্দ্রজাল-বিদ্যার প্রভাব আছে ; যবদ্বীপীয় ভাষায় Wil 'বিল্' মানে যাদুবিদ্যা ; অপরিচিত সংস্কৃত শব্দ Wimana বা Wimono শব্দের সঙ্গে পরিচিত Wil শব্দ মিলিয়ে যবদ্বীপীয় ভাষায় নূতন শব্দসৃষ্টি হ'য়েছে Wilmono।

দুটোর সময়ে যোগ্য-তে পৌছুলুম। বিকালটা কালেন্‌ফেলস্-এর সঙ্গে শহরটার পুরাতন জিনিসের দোকানে খানিক ঘুরলুম। বিকাল পাচটায়. আমার একটী বক্তৃতা ছিল, Taman Siswo 'তামান-শিশ্ব' বিদ্যালয়ে—ভারতের শিক্ষাপ্রণালী আর শান্তিনিকেতন সম্বন্ধে। বিদ্যালয়ের শিক্ষক আর ছাত্রেরা আর নিমন্ত্রিত জন কতক ভদ্র ব্যক্তি ছিলেন। শ্রীযুক্ত বাকে ডচ ভাষায় দোভাষীর কাজ ক'রলেন। বক্তৃতার পরে ছেলেরা দু চারটে প্রশ্ন ক'রলে। বেশ জ'মেছিল, পৌনে সাতটা অবধি এই সভা চ'লেছিল।

শ্রীযুক্ত রাদেন্ তেজকুসুম' একজন স্থানীয় রাজবংশীয় ব্যক্তি, ইনি Krido Bekso Wiromo বা যবদ্বীপীয় সঙ্গীত ও নৃত্য বিদ্যালয়ের পরিচালক। পাতলা লম্বা ছিপ-ছিপে চেহারার প্রৌঢ় বয়সের লোকটী, নিজে নাকি একজন অসাধারণ ভালো নাচিয়ে', যবদ্বীপের প্রাচীন রীতির নৃত্যবিদ্যায় অসাধারণ দক্ষ ; রাজ-ঘরানা হ'য়েও তিনি তাঁর এই বিদ্যালয়ে সব শ্রেণীর ছাত্রদের শেখান্—এটা এ দেশের সামাজিক দিক থেকে খুবই অভাবনীয় ব্যাপার। এঁর বাড়ীতে ব্যাখ্যা ক'রে ক'রে যবদ্বীপীয় নাচ আমাদের দেখানো হ'ল। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা আর শ্রীযুক্ত তেজকুসুম' নিজে নাচ দেখালেন। সঙ্গে ডচ বন্ধুরা ছিলেন, তাই আমরা কিছু কিছু বুঝতে পারলুম। এখানে লাল মুখস্ প'রে একটা প্রেমাভিনয়ের নাচ দেখালে। এই নাচের সভায় দেখি, শূরকর্ত্ত থেকে শ্রীযুক্ত মঙ্কনগরো আর তৎপত্নী 'রাতু তিমোর' এসেছেন। সাতটা থেকে আটটা এই এক ঘণ্টা বেশ কাট্‌ল।

রাত্রে পাকু-আলাম আজ কবির সম্মাননার জন্য একটা বড়ো ডিনার-পার্টি দিলেন। যোগ্যকর্ত্ত-র ডচ আর যবদ্বীপীয় তাবৎ গণ্য-মান্য ব্যক্তি আমন্ত্রিত হ'য়েছিলেন, অনেকগুলি লোক এসেছিলেন। খুব ঘটার ডিনার, রাত সাড়ে নটা থেকে সাড়ে বারোটা পর্য্যন্ত তিন ঘণ্টা ধ'রে খাওয়া আর তার পরে বক্তৃতাদি চ'ল্‌ল। কবি রাত পৌনে একটায় ছাড়া পেলেন। অভ্যাগতদের মধ্যে জনকতক আরও রাত পর্য্যন্ত পানে আর গল্প-গুজবে কাটালেন, গৃহস্বামীও অবশ্য বরাবর উপস্থিত ছিলেন। আমাদের বাকে-কে গান ক'রতে অনুরোধ করা হ'ল,—ডচ গান, তার পরে বাঙলা গান ; বাকে শান্তিনিকেতনে থাকবার সময়ে বাঙলা গান শিখেছিলেন, আর ইউরোপীয় সঙ্গীতের তিনি তো একজন ওস্তাদ। আমি সেখানে ছিলুম ব'লে বাকের লজ্জা হ'চ্ছিল, আমি উৎসাহ দিতে তিনি গোটা দুই তিন বাঙলা গান শুনিয়ে দিলেন। ইঞ্জিনিয়ার মুন্‌স্, কালেন্‌ফেল্‌স প্রমুখ সকলের সঙ্গে খুব খানিকটা হাসি-

মস্করা গল্প-গুজবে কাটানো গেল—রাত পোনে দুটোয় নিমন্ত্রিতদের এই আড্ডা ভাঙ্‌ল।

২৪শে সেপ্টেম্বর, শনিবার।—

যবদ্বীপীয়দের মধ্যে মুসলমান ধর্ম্মকে সুদৃঢ় করবার জন্যে আর সঙ্গে সঙ্গে জাতীয়তাকেও অটুট রাখবার জন্যে একটা চেষ্টা চ'ল্‌ছে, যোগকর্ত্ত-য় আজ তার সঙ্গে একটু পরিচয় হ'ল। এই চেষ্টার সঙ্গে ভারতবর্ষ থেকে আগত আহমদীয়া সম্প্রদায়ের প্রচারক দুই একজন জড়িত আছেন। মীর্জ্জা আলী বেগ ব'লে বোম্বাই-প্রদেশের মারহাট্টী-ভাষী একটী ভদ্রলোক এখানে আছেন, তিনি ভারতের মুসলমান আর যবদ্বীপের মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষা আর ধর্ম্ম-গত ব্যাপারে যোগসূত্রের কাজ ক'রছেন। ভদ্রলোক আমাদের সঙ্গে দেখা ক'রতে পাকু-আলাম-এর বাড়ীতে এসেছিলেন, কবির সঙ্গে এঁর সাক্ষাৎ হয়, আমার সঙ্গেও হয়। এঁকে বেশ উদার-হৃদয় ব'লে মনে হ'ল। নিজে একটু সংস্কৃত প'ড়েছেন ব'ল্‌লেন। যবদ্বীপীয় জীবনে যা কিছু সুন্দর আর শোভন আছে তার সংরক্ষণের অনুমোদন করেন ইনি। আহমদীয়া সম্প্রদায়ের মুসলমানেরা অপেক্ষাকৃত উদার হন, এটা আমার অভিজ্ঞতা। এঁর অনুরোধে আমি এঁদের 'মোহম্মদীয়া' নামে প্রতিষ্ঠানটী আজ সকালে দেখতে যাই। এঁদের কাজ বেশ চ'ল্‌ছে। সমগ্র যবদ্বীপে এঁদের ৩২টি ডচ-যবদ্বীপীয় ইস্কুল আর ৬০টী প্রাথমিক পাঠশালা আছে। যোগ্যকর্ত্তয় এঁদের একটী বড়ো ইস্কুলে আমায় নিয়ে গেলেন, তাতে প্রায় দুশো ছেলে পড়ে। এই ইস্কুলের পুস্তকাগারে এই প্রতিষ্ঠানের কর্ত্তাদের সঙ্গে দেখা হ'ল। ভারতবর্ষে গিয়ে আরবী ফারসী প'ড়েছে, এই রকম দুটী যবদ্বীপীয় যুবকের সঙ্গে দেখা হ'ল, তবে তারা ভালো উর্দু ব'ল্‌তে পারলে না। খুব হৃদ্যতার সঙ্গে এঁরা আমায় স্বাগত ক'রলেন। রবীন্দ্রনাথের কবিতা ডচ ভাষায় প্রায় সকলেই প'ড়েছেন। এই ইস্কুল দেখার পরে, শ্রীমতী Dachlan দাখ্‌লান নামে একটী যবদ্বীপীয় মহিলার প্রতিষ্ঠিত একটী মেয়েদের ইস্কুল দেখতে এঁরা আমায় নিয়ে গেলেন। এদেশে পর্দ্দা নেই, মেয়ে-ইস্কুলে একজন বিদেশীকে নিয়ে গিয়ে সব তন্ন তন্ন ক'রে দেখাতে এদের আটকায় না। কতকগুলি ক্লাসে গেলুম। এখানে কিছু কিছু শিল্প-কার্য্যও শেখানো হয়। একটী ক্লাসে মুসলমানেরা নমাজে যে আরবী মন্ত্র পড়েন সেই মন্ত্রগুলি শেখানো হ'চ্ছে; জিজ্ঞাসা ক'রে জান্‌লুম, মন্ত্রের অর্থ শেখানো হয় না। মেয়েরা মাথায় ঘোম্‌টার মতন ক'রে গায়ের চাদরগুলি জড়িয়ে' এই ক্লাসে ব'সেছে। কিছু কিছু কোরান মুখস্থ করানো হয়।—'মোহম্মদীয়া' প্রতিষ্ঠানটীকে যবদ্বীপে মুসলমান সংস্কৃতির কেন্দ্র আর মুসলমান মনোভাবের একটী প্রধান উৎস বলা যায়। কিন্তু এখানেও যবদ্বীপীয় জাতীয়তা বেশ জোরের সঙ্গে বিদ্যমান। লাল তুর্কী টুপীর চলন এদেশে একেবারেই নেই—এখানেও না, তবে 'মোহম্মদীয়া' সভার জনকতক কর্ত্তা ব্যক্তি, আর মোল্লা হবে ব'লে আরবী প'ড়ছে এমন জনকতক যুবক আরবদের ধরণে মাথায় রুমাল জড়িয়ে থাকে। সকাল সাতটা থেকে সাড়ে আটটা পর্য্যন্ত দেড় ঘণ্টা এঁদের এই দুইটী ইস্কুল পরিদর্শন ক'রে আসা গেল।

শহরে দুই চারিটী জিনিস কিনে, বাসায় ন'টার সময় ফিরে এসে প্রাতরাশ সারা গেল। আমাদের বাকে-গৃহিণী সঙ্গে সাড়ী নিয়ে গিয়েছিলেন, সেই সাড়ী শ্রীযুক্ত পাকু-আলামের পত্নীকে প'রিয়েছেন—সাদা রেশমের সাড়ীতে এই যবদ্বীপীয় মহিলাকে খুব যে মানাচ্ছিল তা ব'লতে পারি না; ওঁদের মুখশ্রী আর গায়ের রঙের সঙ্গে রঙীন সারঙ যেন বেশী মানায়। তার পরে পাকু-আলাম-এর সঙ্গে কবির আর আমাদের ছবি তোলা হ'ল।

আজ আমরা যোগ্যকর্ত্ত ছেড়ে যাবো। জিনিস-পত্র সব গোছানো হ'য়ে আছে। সাড়ে এগারোটায় ট্রেণ, আমরা শ্রীযুক্ত মুন্‌স্‌-এর সঙ্গে কাছেই এক সরকারী Paandhuis বা জিনিস বাঁধা রেখে টাকা ধার দেওয়ার আপিসে নিলাম হ'চ্ছিল তাই দেখতে গেলুম। দুটী চমৎকার গুজরাটী পাটোলা কাপড় ছিল, মঙ্কুনগরোর এই রকম কাপড় কেনার দিকে ঝোঁক আছে, মুন্‌স্‌ কাপড় দুখানা তাঁর জন্যে নিলেন।

আমরা যাত্রা ক'রে ১১টায় ষ্টেশনে পৌছুলুম। ট্রেনে ক'রে পূব-দিকে বাতাবিয়ার পথে Bandoeng বান্দুঙ্ শহরে যাবো। ষ্টেশনে কবিকে তুলে দিতে বিস্তর লোক এসেছিলেন। মঙ্কুনগরো সস্ত্রীক এসে বিদায় নিলেন; পাকু-আলাম, পতি বা যোগ্যকর্ত্ত-র স্থলতানের মন্ত্রী, ডচ বন্ধুরা, 'ধর্ম্ম-স্বজাতি' পরিষদের পরিচালকেরা, আর স্থানীয় সিন্ধী বণিকেরা উপস্থিত ছিলেন।



যবদ্বীপীয় রামায়ণের নৃত্যাভিনয়ে জটায়ু
(গত সংখ্যার 'প্রবাসী' ৭২০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

এগারোটা পঁয়ত্রিশে গাড়ী ছাড়্‌ল। সারাদিন ধ'রে আমাদের রেল গাড়ী ক'রেই যেতে হল। আমাদের সঙ্গে Pigeaud পিঝো আর 'তাম্রচূড়' ছিলেন। রাত আটটায় আমরা বান্দুঙ্-এ পৌছুলুম। ষ্টেশনে দেখি খুব ভীড়—ডচ লোক ছাড়া স্থানীয় সুন্দা জাতীয় ভদ্রব্যক্তি কিছু এসেছেন, আর সিন্ধী আর পাঞ্জাবী বণিক ও অনেকে এসেছেন। যাঁর বাড়ীতে আমরা থাকবো স্থির হ'য়েছিল, শ্রীযুক্ত Demont দেমণ্ট সস্ত্রীক আমাদে নিতে এসেছিলেন। এঁরা এঁদের বাড়ীতে আমাদের নিয়ে গেলেন—শহরের বাইরে নির্জ্জন স্থানে পাহাড়ের উপরে অতি সুন্দর এঁদের বাড়ীটি।

[২১] বান্দুঙ্

২৫ শে সেপ্টেম্বর, রবিবার.—

বান্দুঙ শহরটি পাহাড়ে অঞ্চলে, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে অতুলনীয়। বান্দুঙ-এর কাছেই Garoet 'গারুৎ' নামে একটি পাহাড়ে' জায়গা। আশে পাশে অনেকগুলি আগ্নেয় গিরি আছে। এই অঞ্চলটিতে অনেক ডচ লোক পরিবার নিয়ে বাস করে। বান্দুঙ প্রাচীন স্থান নয়। এখানকার লোকেরা সুন্দা জাতীয়; মধ্য আর পূর্ব্ব যবদ্বীপীয় থেকে এরা ভাষায় পৃথক্, তবে এদের প্রাচীন সংস্কৃতি মূলে একই। এই সুন্দাজাতি দেখতে অত্যন্ত সুন্দর—এদের মেয়েদের তো বিশেষ সুন্দরী বলা যায়। পোষাক-পরিচ্ছদে চাল-চলনে এদের মধ্যে এমন একটি মনোহর সৌকুমার্য্য আছে যে তার দ্বারা দর্শকের চিত্ত আকৃষ্ট না হ'য়ে যায় না। সুন্দা জাতীয় মেয়েদের দেখে কোনও ইউরোপীয় ভ্রমণকারী এদের আখ্যা দিয়েছেন, Parisiennes of the East.

বান্দুঙে আমরা দু' দিন মাত্র থাকবো ঠিক হ'য়েছিল। শ্রীমতী Demont দেমণ্ট-এর সঙ্গে আমাদের আলাপ হ'য়ে ছিল বালিদ্বীপে। ইনি নিজে অষ্ট্রিয়ান, এঁর স্বামী ডচ। ইনি কবিকে বান্দুঙ-এ তাঁর বাড়ীতে এসে থাকতে নিমন্ত্রণ করেন। স্বামী স্ত্রী উভয়েই বৃদ্ধ, দুজনে সৌজন্যের অবতার। শ্রীযুক্ত দেমণ্ট খুব জমী নিয়ে অনেকগুলি বাড়ীঘর তৈরী ক'রে country gentleman-এর মতন বাস ক'রছেন। একটী বড়ো বাড়ী, চমৎকার ভাবে পাহাড়ের উপরে প্রতিষ্ঠিত,—এটাতে একটী হোটেল ক'রেছেন; এই বাড়াটীতেই আমাদের থাকবার ব্যবস্থা ক'রেছিলেন। নিজেরা বাঁশের দেয়ালে ঘেরা একটী ছোটো সুন্দর বাঙলায় থাকেন। আলাদা আলাদা কতকগুলি বাড়ীতে স্থায়ী ভাবে কতকগুলি ইউরোপীয় লোক ভাড়া দিয়ে বাস ক'রছেন; এঁদের মধ্যে Weighart ভাইগ্‌হার্ট্ ব'লে একজন চিত্রকর আছেন, তিনি সুন্দা মেয়েদের চমৎকার কতকগুলি তৈল-

চিত্র এঁকেছেন, আরও অন্য ছবি আঁকছেন; আর একটী মেয়ে ভাস্কর আছেন। শ্রীযুক্ত দেমণ্ট-এর জমীতে একটী ছোটো রেস্তোরাঁ-ও আছে, বান্দুঙ থেকে ডচ আর অন্য লোকেরা এই পাহাড়ে বেড়াতে এসে এঁর রেস্তোরাঁয় খাওয়া দাওয়া করে। এঁর অনেকগুলি গাইগোরু আছে, শিকারী কুকুর আছে; সব নিয়ে বেশ জমিয়ে ব'সেছেন।

আজ সারা দিনটা আমাদের প্রচুর বিশ্রাম। শ্রীযুক্ত দেমণ্টের বাড়ীঘর জমী জেরাৎ সকালে দেখে এসে, বাতাবিয়ার জন্য আমার প্রবন্ধ লিখতে ব'সলুম। সকালে আর দুপুরে স্থানীয় সিন্ধীদের আগমন—সঙ্গে প্রচুর দেশী মিঠাই—বালুশাহী গজা, বেসনের বরফী। তেজ্‌মল ব'লে একটী সিন্ধী যুবকের সঙ্গে আলাপ হ'ল। তিনি রাত্রে ধীরেনবাবু, সুরেনবাবু আর আমাকে তাঁর ওখানে খেতে নিমন্ত্রণ ক'রলেন।

রাত্রে কবি স্থানীয় Kunstkring-এর আহ্বানে বক্তৃতা দিলেন, Concordia সভার সুন্দর হল ঘরে। বিষয় ছিল, What is Art? রাত সওয়া দশটায় বক্তৃতা চুকল। ভীড় হ'য়েছিল খুব।

২৬শে সেপ্টেম্বার, সোমবার।—

বান্দুঙ থেকে প্রায় আধ ঘণ্টা মোটরের পথে Lembang 'লেম্বাঙ' ব'লে একটী গ্রামে থিওসফিস্টদের একটী শিক্ষকদের জন্য বিদ্যালয় আছে, বিদ্যালয়টীর নাম Goenoeng Sari 'গুনুঙ-সারি', অর্থাৎ 'তেজোগিরি'। ইউরোপের আর সব দেশের চাইতে হলাণ্ডে থিওসফীর প্রভাব সব চেয়ে বেশী, আর কতকটা সেই জন্য হলাণ্ডের অধীনস্থ দ্বীপময় ভারতেও, জন সাধারণ বহুশঃ মুসলমান হ'লেও থিওসফীর ভক্ত অনেক আছে। এই বিদ্যালয়টী থিওসফী-মতবাদের একটী প্রধান প্রতিষ্ঠান। এতে বিস্তর ছাত্র দ্বীপময় ভারতের নানা স্থান থেকে এসে থেকে পড়াশুনো করে। কবিকে এরা আহ্বান ক'রে নিয়ে গেল আজকের সকালে,—আমরাও গেলুম। চমৎকার পাহাড়ে' রাস্তা দিয়ে পথ, পরে সুন্দর সমতল স্থানে অনেকটা জায়গা জুড়ে' বিদ্যালয়টী। অধ্যক্ষ, অধ্যাপক আর ছাত্রেরা আমাদের স্বাগত ক'রলেন। ছাত্রদের মধ্যে যবদ্বীপীয়, সুন্দানী, মাদুরী, সুমাত্রার লোক, বোর্ণিও সেলেবেস্ এর লোক—সব জায়গার ছাত্র ছাত্রী আছে। এরা মালাই আর ডচ ভাষা ব্যবহার করে। আমরা পৌঁছতেই আমাদের নিয়ে গেল এক খোলা মাঠে—সেখানে সমবেত-ভাবে ছাত্রেরা উপাসনা করে, নিজের নিজের ধর্ম্মের মন্ত্র প'ড়ে। মোহম্মদ-প্রোক্ত মুসলমান-ধর্ম্ম সব চেয়ে নবীন ব'লে আগে মুসলমান ধর্ম্মের মন্ত্র কোরানের প্রথম অধ্যায় সুরা ফাতেহাটী পড়া হয়, তারপর খ্রীষ্টান ধর্ম্মের 'প্রভুর প্রার্থনা', তার পরে বৌদ্ধ ধর্ম্মের ত্রিশরণ মন্ত্র, য়িহুদী ধর্ম্মের একটী উপাসনা, শেষে হিন্দু ধর্ম্মের—উপনিষদের কতকগুলি মন্ত্র আর গায়ত্রী পড়া হয়। এই উপাসনা-সভায় কবিকে গিয়ে ব'সতে হ'ল, আর হিন্দু আমরা উপস্থিত আছি ব'লে আমাকে অনুরোধ করা হ'ল হিন্দুশাস্ত্রের কতকগুলি মহাবাক্য সংস্কৃতে আমি পড়ি। এই রূপে উপাসনান্তে কবিকে কিছু উপদেশ দিতে হ'ল। তারপরে বিদ্যালয় পরিদর্শন ক'রে আমরা বিদায় নিলুম। কথা-প্রসঙ্গে স্থির হ'ল যে আজ সন্ধ্যেয় আমি এসে শান্তিনিকেতন সম্বন্ধে লণ্ঠনে ছবি দেখিয়ে বক্তৃতা দেবো। ছাত্র ছাত্রীদের কেউ কেউ ইংরিজি জানে। বছর তিনেক পূর্ব্বে যখন বন্ধুবর শ্রীযুক্ত কালিদাস নাগ এখানে আসেন, তখন এদের অনেকে তাঁকে দেখেছিল, তাঁর বক্তৃতা শুনেছিল; এরা আমার ঘিরে কথা কইতে লাগ্‌ল, কালিদাস বাবুর কথা ছাত্র আর ছাত্রীরা আমায় ব'ল্‌লে। বিদ্যালয়টী দেখে আমরা খুব প্রীত হ'লুম। বাস্তবিক, থিওসফিস্টরা এদেশে যথার্থ শিক্ষা বিস্তারের জন্য খুব ক'রছেন। রাত্রে আমায় এঁরা নিয়ে আসেন, সাতটা থেকে পৌনে ন'টা পর্য্যন্ত আমি এঁদের মধ্যে বক্তৃতা দিই, বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ডচে অনুবাদ ক'রে দেন, বক্তৃতা জ'মেছিল বেশ। (পরে এই বিদ্যালয় থেকে দুটী সুমাত্রা-দ্বীপের ছেলে শান্তিনিকেতনে আসে, এসে এরা অনেক দিন ধ'রে থাকে।) এই রকম প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে আমাদের দেশের পূর্ণ যোগ থাকা উচিত।

দুপুরে তেজ্‌মল আমাদের নিয়ে শহর দেখালে, আর

তার ওখানেই মধ্যাহ্ন-ভোজন হ'ল। কবি আমাদের বাসাতেই রইলেন, তিনি দুপুরে আর বেরুলেন না।

বিকালে সাড়ে পাঁচটায় স্থানীয় ভারতীয়দের এক সভা হ'ল আমাদের বাসায়, চা-পান হ'ল, ছবি তোলা হ'ল কবির সঙ্গে। কবিকে মান-পত্র দেওয়া হ'ল। ভারতীয় ব'ল্‌তে সিন্ধী আর পাঞ্জাবী মুসলমান বণিক জনকতক মাত্র, তবে এঁদের অবস্থা ভালো। ৬৫ ভদ্রলোক কতকগুলি নিমন্ত্রিত হ'য়ে এসেছিলেন। একজন কবিকে Personality সম্বন্ধে কিছু জিজ্ঞাসা ক'রলেন। সকলের হৃদ্যতায় এই সান্ধ্য-সম্মেলনটী জ'মেছিল বেশ।

'গুনুং সারি' বিদ্যালয়ে বক্তৃতা দিয়ে বাসায় ফিরে আহারাদির পরে শ্রীযুক্ত দেমণ্ট্-এর বাড়ীতে লণ্ঠনের স্লাইডগুলি হাতে-হাতে দিয়ে দেখিয়ে, দেমণ্ট-এর বাড়ীতে থাকেন যে চিত্রকর আর ভাস্কর আর অন্য জন কতক ব্যক্তি, তাঁদের কাছে ভারতীয় ভাস্কর্য্য আর চিত্রবিদ্যা সম্বন্ধে প্রায় ঘণ্টা দুই ধ'রে বক্তৃতা দিয়ে বা আলোচনা ক'রে রাত বারোটায় ছুটী পাওয়া গেল।

মঙ্গলবার, ২৭শে সেপ্টেম্বর।—

কাল আর আজ দুদিন ধ'রে খুব লিখে বাতাবিয়ার জন্য প্রবন্ধটী শেষ ক'রে ফে'ললুম। সকালে চিত্রকর Weighart আর মেয়ে ভাস্করটী কবির ছবি আর প্রতিমূর্ত্তি তৈরী করবার জন্য তাঁকে বসিয়ে স্কেচ ক'রলেন। দেমণ্ট-গৃহিণী আমাদের প্রত্যেককে উপহার দিলেন—যবদ্বীপের পিতলের তৈজস দুই একটা ক'রে। দেমণ্ট-দম্পতী এই দুই দিন আমাদের অতি যত্নে রেখেছিলেন দেমণ্ট-পত্নী তো যেন মায়ের মতন আমাদের প্রত্যেকের সুখস্বচ্ছন্দতার দিকে দেখতেন। এঁদের সৌজন্য ভুলবো না।

বেলা সাড়ে দশটায় তিনটী সুন্দানী যুবক কবির সঙ্গে দেখা ক'রতে এলেন। একজনের নাম Soekarno 'সুকর্ণ'। ইনি ইংরিজি বেশ জানেন, হলাণ্ড-ফেরৎ ইঞ্জিনিয়ার। এঁরা যবদ্বীপের স্বরাজকামী দলের নেতা। কথাবার্ত্তায় বোঝা গেল, এঁরা আমাদের দেশে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে কি হ'চ্ছে তার খুব খবর রাখেন—মহাত্মাজী, চিত্তরঞ্জন, মোতীলাল এঁদের লেখা আর কার্য্য-কলাপের সঙ্গে বেশ পরিচিত, আর সরোজিনী নাইডুরও নাম ক'রলেন। এঁরা শুধু কবিকে দেখতে এসেছিলেন। যবদ্বীপে আমরা বিশেষ ক'রে প্রাচীন কীর্ত্তিই দেখ্‌তে যাই, এদেশের রাজনৈতিক আন্দোলন আর স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম যাঁরা ক'রছেন তাঁদের সঙ্গে বেশ মেশবার সুযোগ আমাদের পক্ষে সম্ভবপর হয় নি। তাই এদিকটায় আমাদের ভ্রমণ অপূর্ণ র'য়ে গিয়েছে। শ্রীযুক্ত সুকর্ণ বেশ বুদ্ধিমান, প্রিয়দর্শন যুবক; কবির আর আমাদের এঁদের বেশ লাগ্‌ল।

দুপুরে শহরে এসে, ষ্টেশনে টিকিট কিনে মাল-টাল পৌঁছে দিয়ে কবির সঙ্গে আমরা তেজুমলের বাড়ীতে এসে মধ্যাহ্ন-ভোজন সমাধা ক'রলুম। আরও কতকগুলি সিন্ধী ভদ্রলোক এসেছিলেন। পাঞ্জাবী ব্রাহ্মণের রান্না—আমিষ আর নিরামিষ ভোজ্যগুলি অতি উপাদেয়ই লেগেছিল।

বেলা দেড়টার ট্রেনে আমরা বাতাবিয়া যাত্রা ক'রলুম, বিকাল সাড়ে পাঁচটায় আমরা বাতাবিয়ায় পৌঁছুলুম।

[২২] বাতাবিয়া—যবদ্বীপ হইতে বিদায়

বাতাবিয়ায় কবি, সুরেনবাবু আর বাকে এঁরা Hotel des Indes যেখানে আমরা প্রথমবার উঠেছিলুম সেখানে গিয়ে উঠ্‌লেন। বাকের এক ভাই বান্দুঙ-এ সপরিবারে বাস করেন, বাকে-পত্নী তাঁদের কাছেই র'য়ে গেলেন। ধীরেনবাবু আর আমি আগেকার বন্দোবস্ত মতন সিন্ধী বণিক Messrs. Wassiamall Assoomall এর ম্যানেজার শ্রীযুক্ত রূপচন্দ্ নবলরায় মহাশয়ের অতিথি হ'য়ে তাঁদের দোকানে গিয়ে উঠলুম। শ্রীযুক্ত রূপচন্দ পৃথিবীর অনেক জায়গায় ঘুরেছেন, অষ্ট্রেলিয়ায় অনেক দিন ছিলেন, মেলবর্ণে এঁদের দোকান ছিল,—এখন ভারতীয়-বিদ্বেষের ফলে সেখানকার দোকান-পাট উঠিয়ে দিয়ে চ'লে আসতে হ'য়েছে। ইনি বেশ ভদ্র, প্রিয়ভাষী ব্যক্তি, বছর চল্লিশ বিয়াল্লিশ বয়স হবে। এঁদের মধ্যে থেকে এঁদের বিধি ব্যবস্থা অনেক জানতে পারি।

২৮শে সেপ্টেম্বর বুধবার।—

সকালে হোটেলে গিয়ে কবির সঙ্গে দেখা ক'রে, আমরা ব্যাঙ্কে টাকা ভাঙানো, জাহাজের টিকিট প্রভৃতির ব্যবস্থা করবার জন্য পুরাতন বাতাবিয়ায় গেলুম। পুরাতন বাতাবিয়ায় খানিক ঘুরে বেড়ানো গেল। বাতাবিয়ার সেই সাধারণ দৃশ্য—খালের ধারে মেয়েদের কাপড়-কাচার ধুম। দুপুরে প্রত্নবিভাগের আপিসে আর মিউজিয়মে ডাক্তার বসের সঙ্গে অনেকক্ষণ কাটানো গেল। মিউজিয়মের সংশ্লিষ্ট রাজকীয় কলাবিজ্ঞান পরিষৎ—এখানে পরশু রাত্রে আমায় বক্তৃতা দিতে হবে। এই পরিষদের পক্ষ থেকে এঁদের প্রকাশিত কতকগুলি বই এঁরা আমাকে উপহার দিলেন, তার মধ্যে Darmo Lelangen নামে তালপাতায় লোহার লেখনের আঁচড়-কেটে আঁকা প্রাচীন বলিদ্বীপীয় চিত্র-পুস্তকের প্রতিলিপিময় বই একখানি বিশেষ মূল্যবান। মিউজিয়ম বা পরিষদের পুস্তকালয়ে একজন যবদ্বীপীয় ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হ'ল—এঁর নাম হ'চ্ছে Poerbatjaraka 'পূর্ব্বচরক'—ইনি সম্প্রতি হলাণ্ড থেকে ফিরেছেন, লাইডেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টর উপাধি নিয়ে। সেখানে সংস্কৃত প'ড়েছেন; প্রাচীন যবদ্বীপীয় ধর্ম্ম আর সাহিত্য নিয়ে এখন বাতাবিয়ার পরিষদেই কাজ ক'রছেন। দ্বীপময় ভারতে শিব-গুরুর অবতার অগস্ত্য মুনির প্রতিষ্ঠা ও পূজা—এই বিষয়ে গবেষণাত্মক একখানি বই লিখেছেন, এই বই একখানি আমার উপহার দিলেন। বইখানি ডচ ভাষায় লেখা, কিন্তু তাতে গোড়ায় উৎসর্গ-পত্রে মঙ্গলাচরণ-স্বরূপ সংস্কৃত ভাষায় এঁর স্বরচিত কতকগুলি শ্লোক রোমান অক্ষরে ছাপিয়ে দিয়েছেন—শ্লোকগুলি শিবের স্তোত্রময়;—সেগুলি হ'চ্ছে এই—

মঙ্গলম্।
ওম্ অবিঘ্নম্ অস্তু, নমঃ শিবায়।
যঃ সর্ব্বং সৃজতি প্রপালয়তি চাশেষং হরিষ্যত্যপি,
দেবানাং জগতোঽপি যঃ সুশরণো গৌরীপতির্যো হরঃ।
তং দেবম্ প্রণমামি শূলিনম্ অচিন্ত্যং নীলকণ্ঠং শিবম্
ভো দেবেশ মম প্রশাম্যতু মলং পাপঞ্চ সর্ব্বং সদা॥
এবং নমামি ভগবন্তম্ অগস্ত্যমেষং
দ্বীপান্তরে নিবসতাং সুমুনির্মহান্ যঃ।
তেষাম্ মহাগুরুরপি প্রবরোঽধিনেতা
কালে পুরা স পরিপূজিত একবিপ্রঃ॥

দুপুরটা আমার সঙ্গে যে সব বই আর জিনিসপত্র জ'মে গিয়েছে সেগুলিকে বাক্সে প্যাক ক'রে বাড়ীতে পাঠাবার ব্যবস্থা ক'রলুম—শ্রীযুক্ত রূপচন্দ অনুগ্রহ করে এ বিষয়ের ভার নিলেন। বিকালে সিন্ধী বন্ধুদের সঙ্গে মোটরে ক'রে শহরে আর শহরতলীতে খুব খানিকটা ঘুরে আসা গেল।

রাত্রে Kunstkring আর Java Institute উভয়ের মিলিত ব্যবস্থায় আমার বক্তৃতা হ'ল লণ্ঠন-চিত্র যোগে, ভারতীয় চিত্র-কলার উপর। জন কুড়ি পঁচিশ মাত্র শ্রোতা ছিলেন। বক্তৃতার পরে এঁরা আমাকে ডচ শিল্পীর তিনখানি etching-চিত্র উপহার দিলেন।

২৯শে সেপ্টেম্বর, বৃহস্পতিবার।—

কবি সকালে মিউজিয়ম দেখে এলেন। শ্রীযুক্ত বস্ সঙ্গে ছিলেন।

দশটায় আমি 'বালাই পুস্তাকা'র আপিসে গিয়ে, বলিদ্বীপীয়, যবদ্বীপীয়, মাদুরী, সুন্দা, মালাই,—এই কয় ভাষার উচ্চারণ-তত্ত্ব আলোচনার জন্য এই সব ভাষা যাঁরা মাতৃভাষা-রূপে ব্যবহার করেন তাঁদের পাঠ শুনে' শুনে' উচ্চারণ লিখে নিলুম। শ্রীযুক্ত Drewes দ্রেউএস এই কাজে আমায় বিশেষ সহায়তা করেন। 'বালাই-পুস্তাকা'-তে কিছু বই কিনলুম, কিছু উপহার স্বরূপ-ও পাওয়া গেল।

দুপুরে কবি আমাদের পাড়ায় এলেন, সিন্ধী বণিক শ্রীযুক্ত মেথারাম কবিকে আর আমাদের খাওয়ালেন।

রাত্রে Kunstkring-এ কবির ইংরিজী আর বাঙলা কবিতা পাঠ হ'ল। বিশেষতঃ বাঙলা ভাষার ঝঙ্কার কবির মুখে শুনে' এরা ভারী আনন্দিত। একটী ডচ মহিলা গামেলান বাজনার বড়ো ভক্ত, তিনি উচ্ছ্বসিত প্রশংসা ক'রে ব'লে উঠলেন—'এ ভাষায় পাঠ—ঠিক গামেলানের মতন শ্রুতি-মধুর।' পূর্ব্ব-যবদ্বীপের মজ-পহিতের খনন-কার্য্যে নিযুক্ত প্রত্নতত্ত্ববিৎ শ্রীযুক্ত Maclaine-Pont-এর সঙ্গে এই কবিতাপাঠ সভায় আলাপ হ'ল—ইনি বেশ দিল-খোলা পণ্ডিত লোক,—অল্প পরিচয়েই হৃদ্যতা জ'মে উঠল, সভা শেষের পরে এঁর সঙ্গে একটা হোটেলে গিয়ে

লেমনেড খেতে খেতে গল্প করা গেল, তার পরে ইনি আমায় বাসায় পৌঁছে দিয়ে গেলেন।

বান্দুঙ-এর সিন্ধী বন্ধু তেজূমল এখানে এসে উপস্থিত, আমাদের বাসায় রূপচন্দ্রের অতিথি হ'য়ে রইলেন। রাত্রে সিন্ধীদের এই দোকানে গান-বাজনার মজলিস হ'ল। ধীরেনবাবু তাঁর সেতার বাজিয়ে আর বাঙলা গান গেয়ে এঁদের খুশী ক'রে দিলেন। অনেক রাত্রে আহার ক'রে শুতে যাওয়া গেল।

এই সিন্ধীদের সঙ্গে একত্র থেকে আর একটু ঘনিষ্ঠ ভাবে মেলা-মেশা ক'রতে পেয়ে এদের আমার বেশ লেগেছে। রেশমের আর curio-র বা মণিহারী আর কৌতুককর শিল্প দ্রব্যের একচেটে' ব্যবসা এদের হাতে। বোধ হয় পৃথিবীর সব দেশেরই বড়ো শহরে এদের প্রতিষ্ঠাপন্ন ব্যবসা। এরা জাতে বেনে, সাধারণতঃ এদের 'সিন্ধ-ওঅর্কী' ব'লে থাকে—'সিন্ধ-ওঅর্কী' অর্থে যারা সিন্ধের সব চেয়ে বড়ো কাজের—work-এর কাজী। এরা মাংস খায়, মুসলমানের ছোঁয়া বা রান্না খায়, কিন্তু ধর্ম্মানুষ্ঠান-পালনে আর মনোভাবে আস্থাশীল হিন্দু। এদের দোকানের নিয়ম বেশ। একটু বড়ো দোকান হ'লেই তার নিজের বাড়ী থাকে। বাড়ীর নীচের তালায় দোকান, ভিতরে গুদাম, উপরে দোতালায় বা তেতালায় দামী জিনিস কিছু থাকে, আর দোকানের কর্ম্মচারীরা থাকে। ম্যানেজার কিংবা মালিক, আর চার-পাঁচজন থেকে পশ-পনেরো জন পর্য্যন্ত কর্ম্মচারী। প্রতি দোকানের উপরে একটী ক'রে কুঠরী থাকে, সেটী ঠাকুর-ঘর। ঠাকুর-ঘরে হিন্দু দেব-দেবীর ছবি থাকে, আর সিন্ধী ছাড়া দেবনাগরী আর গুরুমুখীতে ছাপা ধর্ম্মগ্রন্থ থাকে; আর থাকে একখানা ক'রে বড়ো গ্রন্থ-সাহেব। এরা শিখ না হ'লেও, সনাতনী হিন্দু হ'লেও, নবীনযুগের এই বেদগ্রন্থকে খুব সমাদর করে। প্রত্যেক দিন দোকানের একজন কেউ ভোরে স্নান সেরে এই গ্রন্থের কিছু অংশ পাঠ ক'রে দীপ জ্বেলে ঘণ্টা বাজিয়ে ঠাকুরদের ছবির আরতি করে। ঠাকুরের সামনে এক কড়া মোহনভোগ বা অন্য খাদ্য নিবেদন ক'রে দেওয়া হয়, ঠাকুরের এই প্রসাদেই সকলের জল খাওয়া হয়। তার পরে দোকান খোলে, ঝাঁট দেয়, খ'দ্দেরের জন্য তৈরী হ'য়ে থাকে। দশটা থেকে ন'টা রাত্রি পর্য্যন্ত দোকানে বিকিকিনি হয়। এরই মাঝে একে একে এসে স্নান সেরে খেয়ে যায়। একজন ক'রে রাধুনি সিন্ধ-দেশথেকে এরা আনে।

এদের জীবন বড়ো একঘেয়ে; আর কর্ম্মচারীরা দেড় বছর দু'বছর, কখনও কখনও তিন বছর পর্য্যন্ত এই সব দূর দেশে একা স্ত্রীপুত্রাদি আত্মীয় থেকে বিচ্যুত হ'য়ে কাটায়। দেশে দু-পাঁচ মাসের জন্য আসে, তার পরে আবার প্রবাসে চ'লে যায়। মেয়েদের নিয়ে যাওয়া ব্যয়-সাপেক্ষ ব'লে কর্ম্মস্থানে স্ত্রী-পুত্রদের নিয়ে আসতে পারে না। কিন্তু এরূপ জীবন এদের পক্ষে আর এদের মেয়েদের পক্ষে মোটেই স্বাভাবিক বা স্বাস্থ্যকর নয়। এর উপায় কিন্তু এরা কিছু ক'রতে পারছে না। ভারতের বহু মুসলমান প্রবাসী ও-সব দেশে গিয়ে আর একটা বা একাধিক চিরস্থায়ী বা ক্ষণস্থায়ী বিয়ে ক'রে বসে—বহু-বিবাহ মুসলমান ধর্ম্মের আর সমাজের অনুমোদিত ব্যাপার ব'লে এই সব মুসলমানদের বিবেক বা বিচার-বুদ্ধিতে এতে কোনও খটকা লাগে না; কিন্তু সিন্ধী বন্ধুরা এ-সব কথায় জিভ কেটে ব'ললেন—'ডক্টর সাব, হম ঐসা কাম কৈসে কর্ সকেঁ, হম্ হিন্দু হৈঁ, হম ঘর-ওালী স্ত্রীকো ভুল নহীঁ সক্তে।' হিন্দু ব'লে, কঠোর ব্রহ্মচর্য্যের আদর্শকে এরা এমনি স্বাভাবিক জিনিস ব'লে মনে করে—তাই দীর্ঘ প্রবাসেও এইভাবে কর্ত্তব্য পালন ক'রে যেতে চেষ্টা করে। এদের নিয়ম-কানুন ও অনেকটা এইদিকে দৃষ্টি রেখে। যখন এরা বেড়াতে বেরোয়, এদের মধ্যে নিয়ম হ'চ্ছে যে একজন বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তি ছেলে-ছোকরাদের সঙ্গে থাকবে। সকলেই এক 'বিরাদরী' বা 'রিশ্‌তামন্দী' অর্থাৎ একই সমাজ বা আত্মীয়-গোষ্ঠীর লোক, সুতরাং অনেকটা আত্মরক্ষা ক'রে চলাটা এদের পক্ষে স্বভাবসিদ্ধ হ'য়ে পড়ে। তবুও স্খলন যে না হয় তা নয়। স্ত্রীলোকের মোহে প'ড়ে এই প্রবাসী সিন্ধীদের দুই একজন দেশের স্ত্রী-পুত্রকে ভুলে গিয়ে ধর্ম্মান্তর গ্রহণ ক'রেছে, এ কথাও শুনলুম। মোট কথা, স্ত্রী পুত্রাদির সঙ্গে বাস ক'রতে না পারাটা এদের জীবনের পক্ষে সব

চেয়ে অস্বাস্থ্যকর ব্যাপার। তবে এরা যে রকম ভাবে জীবনে হিন্দু আদর্শ গুলিকে বাঁচিয়ে রাখবার চেষ্টা করে, তা দেখে এদের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা হয়।

৩০শে সেপ্টেম্বার, শুক্রবার।—

আজ কবি সকাল বেলা বিপুল-জনসমাগমের মধ্যে যবদ্বীপ থেকে বিদায় নিয়ে Mijer 'মাইয়র' জাহাজে ক'রে যাত্রা ক'রলেন। স্থানীয় বিশিষ্ট ডচ আর ভারতীয় বহু ব্যক্তি ছিলেন, যবদ্বীপীয়ও ছিলেন। আজ রাত্রে বাতাবিয়ার কলাবিজ্ঞান পরিষদে আমার বক্তৃতা ব'লে আমি র'য়ে গেলুম, কাল অন্য জাহাজে যাত্রা ক'রে ধীরেন বাবু আর আমি, কবি আর সুরেনবাবুর সঙ্গে সিঙ্গাপুরে মিলিত হবো, তার পরে. সিঙ্গাপুর থেকে আমাদের শ্যাম্-দেশে গমন হবে—শ্যাম থেকে নিমন্ত্রণ এসেছে।

ক্রেউএস-ও কবিকে তুলে দিতে এসেছিলেন; কবির জাহাজ ছেড়ে গেলে, তাঁর সঙ্গে 'বালাই-পুস্তাকা' আপিসে এসে স্থানীয় ভাষা নিয়ে কাজ করা গেল, 'বালাই-পুস্তাকা'-র লেখকদের সঙ্গে।

রাত্রে মিউজিয়মে বাতাবিয়ার কলাবিজ্ঞান পরিষদের সমক্ষে আমার বক্তৃতা পাঠ ক'রলুম। জন পঞ্চাশেক শ্রোতা ছিলেন। বক্তৃতার বিষয়টী ছিল the Foundations of Civilisation in India. বক্তৃতান্তে এক-শ' গিলডার দক্ষিণা পাওয়া গেল। এই পরিষদের ডচ-ভাষায় প্রকাশিত পত্রিকায় আমার এই ইংরিজি বক্তৃতাটী পরে প্রকাশিত হ'য়েছে।

তাম্রচূড় তাঁর এক বন্ধুর কাছে নিয়ে গেলেন Hotel Koningsplein-এ—সেখানে নানা বিষয়ে বেশ খানিক গল্প করা গেল।

১লা অক্টোবার, শনিবার।—

সকালটা মিউজিয়মে আর ডক্তার বসের আপিসে কাটিয়ে, দুপুরে বিশ্বভারতীর জন্য প্রাপ্ত জিনিসগুলির প্যাকিং-কেস দেশে পাঠাবার ব্যবস্থা ক'রে, আমরা তৈরী হ'লুম যাত্রার জন্য। সিন্ধী বন্ধুরা জাহাজে তুলে' দেবার জন্য সঙ্গে গেলেন, আর জাহাজ-ঘাটে ভারতীয় বন্ধু অন্য জন কতক এলেন, বন্ধু 'তাম্রচূড়' এলেন, ডাক্তার হুসেন জয়দিনিংরাট সৌজন্য ক'রে যাত্রাকালে বিদায় দিতে এলেন। বিকালে চারটার সময়ে সিঙ্গাপুর যাত্রী একদল ইংরেজ যুবক আপিসের চাকুরে' তাদের বন্ধুদের হল্লার মধ্যে আমাদের সঙ্গে এই Melchior Treub জাহাজে রওনা হ'ল।

Tandjong Priok তান্‌জঙ্‌-প্রিওক্‌ এর বন্দর ক্রমে অদৃশ্য হ'ল। যবদ্বীপের পর্ব্বত-চূড় দৃশ্য দূরে দেখা যেতে লাগল, সন্ধ্যার ঘনায়মান অন্ধকারে ক্রমে সব বিলীন হ'য়ে গেল। একটা বর্ণোজ্জ্বল স্বপ্নের মতন আমাদের দ্বীপময়-ভারত দর্শন সমাপ্ত হ'ল। কিন্তু এই স্বপ্নের প্রভাব আমার মানসিক আর আধ্যাত্মিক জীবনে চিরকালের জন্য থাকবে, কারণ এই দ্বীপময়-ভারত দর্শনের ফলে আমি আমার ভারতীয় জাতির গৌরব কিছু পরিমাণে উপলব্ধি ক'রতে পেরেছি, প্রাচীন ভারতের স্বরূপের সঙ্গে কিছু পরিচিত হ'য়েছি,—আর সৌন্দর্য্য-বোধের মধ্যে দিয়ে আধ্যাত্মিক অনুভূতির যৎসামান্য দ্যোতনা লাভ ক'রে নিজেকেও আগের চেয়ে ভালো ক'রে জানতে সমর্থ হ'য়েছি।

[সমাপ্ত]



শিক্ষার আদর্শ

আমাদের দেশে যে শিক্ষার ব্যবস্থা তার মূলে সাময়িক প্রয়োজনের তাগিদ ছিল। বিদেশীর সঙ্গে যে যোগের ব্যবস্থা রয়েছে তারই জন্য ওদের ভাষা শিক্ষা এবং কর্ম্মচারী যোগানর জন্য শিক্ষার আয়োজন হয়েছিল। এর ভূমিকা বা ভিত্তি এমন কিছুই মহৎ বা বড় ছিল না যা'তে করে সমগ্র দেশকে জাতিকে উচ্চ আদর্শে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে।

বিদ্যাশিক্ষার যত আয়োজন রয়েছে আমাদের দেশে, তার মুখ্য উদ্দেশ্য বিদেশীর রাজকর্ম্মশালায় কি উপায়ে জায়গা করে দেবে; এবং এই শিক্ষার জন্যই আমরা চেষ্টা করে থাকি। এই শিক্ষাই আমাদের চিত্তকে সঙ্কীর্ণ করে তুলেছে, দুর্ব্বল করে তুলেছে। জ্ঞানে যে চিত্তকে মুক্তি দান করে, সেখানে এই জ্ঞানহীন শিক্ষা স্বার্থবুদ্ধিকে প্রবল করে তুলেছে। এই শিক্ষার চেষ্টা শুধু পাস করবার, কেরাণী তৈরি করবার, মনুষ্যত্ব উদ্ভাবিত করবার নয়।

আজ কত দেশ কত ভাবে বড় হয়ে উঠেছে তারা জগৎকে অনেক কিছুই দিচ্ছে। এমন কি নবজাগ্রত জাপান জ্ঞানবিজ্ঞানের অর্ঘ্য দিয়ে সমস্ত পৃথিবীকে কৃতজ্ঞ করচে। কিন্তু আমরা জোগাচ্ছি শুধু কেরাণী আর ডেপুটি আর দারোগা। তার কারণ আমাদের শিক্ষার অনুষ্ঠানগুলির মধ্যে যথার্থ বিদ্যার ভিত্তি নেই।

অন্যান্য দেশে বিদ্যার একটা বড় ভূমিকা আছে। সেখানে সমগ্র দেশের সঙ্গে শিক্ষার যোগ। আমাদের দেশে গোড়া থেকেই তার ব্যাঘাত ঘটে এসেছে। আমাদের বিদ্যার সাধনাকে স্বার্থবুদ্ধি ও বিষয়বুদ্ধি ছোট করেচে, সঙ্কীর্ণ করেচে—একে শৃঙ্খলিত করেচে। ছাত্র যে শিক্ষা অর্জ্জন করে তা' স্বার্থবুদ্ধি নিয়ে করে। কোনো মহৎ আদর্শকে তারা অনুসরণ করতে শেখেনি। ওরা যে বিদ্যাবুদ্ধি লাভ করে তার মূল্য শুধু হাটে বাজারেই আছে, কিন্তু তার পেছনে মনুষ্যত্ব নেই।

পুরাকালে জ্ঞানের একটা মহৎ সাধনা ছিল। তার আদর্শ ছিল সমগ্র জীবনকে পরিণতি দেওয়া। গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ, ব্রহ্মচর্য্য এগুলি সেই সাধনারই অঙ্গ এবং শিক্ষা তারই অন্তর্গত। এই সাধনার ভিতরে আমরা দেখতে পাই আত্মার আবরণ মোচন এবং এর ভিত্তি হচ্ছে মনুষ্যত্বের উদ্ভাবনা শক্তি। কিন্তু বর্ত্তমানের বিদ্যালয়ে ছাত্ররা এম্-এ, বি-এ পাস করছে এবং সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দেশের শিক্ষার অন্তরতম লক্ষ্যকে উপেক্ষা করতে শিখেছে। আমার ইচ্ছা আমাদের এখানকার শিক্ষা সাধনার মূলে থাকবে অন্তরাত্মার আবেদন। ধর্ম্ম হচ্ছে মানুষের জীবনের ভূমিকা। কিন্তু সমগ্র দেশ লক্ষ্যহীন শিক্ষার দ্বারা নিজের গভীরতম ধর্ম্মকে আঘাত দিয়েছে। পশ্চিম মহাদেশে ধর্ম্ম থেকে মূঢ়তার ভার লাঘব করবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা চলে এসেছে; আমরাই শুধু তাকে জড়িয়ে ধরবার চেষ্টা করছি। এই আশ্রমের আদর্শ হচ্ছে তপোবনের আদর্শ। ছাত্ররা বিশুদ্ধচিত্তে পরস্পরের সঙ্গে স্নেহের ভালবাসার যোগ রেখে যাতে নিজেদের জীবনের প্রতিকর্ম্ম সাধন করে যেতে পারে এবং যা কল্যাণ যা সত্য তার প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা জাগ্রত হতে পারে সেইটিই ইচ্ছে করে এই প্রান্তরের প্রান্তে আসন পেতেছিলাম। আমার অন্তরে বাসনা ছিল যে, ছেলেরা আত্মসংযমকে জীবনের প্রধান অঙ্গ করে নেবে, শ্রদ্ধাবান হবে। আমি মনে করি বিজ্ঞান, ভূগোল বা ইতিহাস শিক্ষা এগুলো গৌণ। কিন্তু বিদ্যালয়ের মূল আদর্শের দিকে আমাদের হয়ত দৃষ্টি বিক্ষিপ্ত হয়েচে; এ সম্বন্ধে নানান্ দিক থেকে অনেক রকম বাধাও ঘটেচে। বাইরের আন্দোলনের হাওয়ার মধ্যে থেকে যারা এখানে প্রবেশ করচে তাদের মনের সঙ্গে এখানকার সাধনার সংঘর্ষ হওয়া স্বাভাবিক। তাতে করে এই আশ্রমটি ক্রমে ক্রমে একটি সাধারণ ইস্কুল কলেজ মাত্র হয়ে ওঠবার আশঙ্কা ঘটে; এর বিশেষ মূলটিকে পূর্ণ করে রাখা দুষ্কর হয়ে ওঠে। যারা এই অনুষ্ঠানটির উদ্দেশ্য ঠিক বুঝতে পারে না, পাছে তারা আমার এই একমাত্র প্রিয় আশ্রমটিকে বিকৃত করে এই আমার আশঙ্কা এবং এই আশঙ্কাই আমাকে পীড়িত করে।

শাস্ত্রে বলেছে—অভ্যাসের চেয়ে জ্ঞান বড়। যে সকল ক্রিয়াকর্ম্ম আমরা অন্ধভাবে করি জ্ঞান তাকে আলোকিত করে। তাতে হয় আত্মশুদ্ধি এবং চিত্তকে সত্যের উপর নিষ্ঠাবান করে তোলে। আবার ধ্যান জ্ঞানের চেয়ে বড়। সমস্ত জ্ঞানকে আপনার করে নেওয়া যায় ধ্যান সাধনার দ্বারা। এই বিদ্যালয়ে জ্ঞানের সঙ্গে ধ্যানের যোগ-সাধন করবার কথা। ধ্যান যদি সফল হয় তবে আমাদের সব কাজ সব চেষ্টা সফল হবে।

(মুক্তধারা—বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৮) শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

—

শিশু-মনোবৃত্তির ক্রম-বিকাশ

বর্ত্তমান জগতের পণ্ডিতগণ বিবেচনা করেন, শৈশব হইতে যৌবনের প্রারম্ভ পর্য্যন্ত মানবজীবনকে পাঁচটি ভাগে ভাগ করা যায়। ১। জন্ম হইতে তিন বা পাঁচ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত শৈশব। ২। তিন বা পাঁচ হইতে সাত বা নয় পর্য্যন্ত বাল্য। ৩। সাত বা নয় হইতে এগার বা তের পর্য্যন্ত বালক বয়স বা বালিকা বয়স। ৪। এগার বা তের হইতে চৌদ্দ বা ষোল পর্য্যন্ত অপূর্ণ কৈশোর। ৫। চৌদ্দ বা ষোল হইতে আঠার বা কুড়ি পর্য্যন্ত পূর্ণ কৈশোর।...

ছোট শিশুটি যখন নগ্ন, অসহায় অবস্থায় জন্মগ্রহণ করে, তখন সে সম্বল স্বরূপ শুধু দুই একটি সহজ জ্ঞান লইয়া আসে। যদি তাহার

ক্ষুধা পায়, তৃষ্ণায় গলা শুকাইয়া যায়, বিছানা ভিজিয়া যায়, পিঠে কিছু কামড়ায়, কি বেশী গরম বোধ হয়, কিংবা অপর কোনও দৈহিক কষ্ট বোধ হয়, বেচারী খালি ক্ষীণ স্বরে একটুখানি কাঁদিতে পারে। স্নেহভরা মাতৃ-হৃদয়, সতত সজাগ নয়ন দুইটি তাহার অভাব বুঝিয়া তাহা পূরণ করে। তাহার ওষ্ঠে মাতৃ-স্তনের স্পর্শ পাইলে সে তাহার আহার চুষিয়া লইতে ও ক্ষুৎ-পিপাসা নিবারণ করিতে পারে। কিন্তু ইহা বাদে প্রথম সাত দিনের মধ্যে আর কোনও পরিবর্ত্তন দেখা যায় না।...

ক্রমে বাহিরের আলোক সহিয়া আসে, শিশু চোখ খুলিয়া তাকায় ও দেখে।...প্রথম কয়েকদিন জাগরণ ও নিদ্রার ভিতর দিয়া সে কেবল আভাসমাত্র পায়, কিন্তু মনে হয়, পরে সে দেখে কতকগুলি কি বিরাট পদার্থ তাহার চোখের সম্মুখে ভাসিয়া বেড়াইতেছে, দৈত্যাকৃতি কাহারা আসে যায়, তাহাদের মধ্যে একখানি মুখ খুব বেশী কাছে আসে, সেখানি কাছে আসিলে তাহার ক্ষুধাতৃষ্ণা দূর ও সকল অভাব পূর্ণ হয়। যতদূর জানা যায়, পনর দিনের পূর্ব্বে শ্রবণশক্তি লাভ হয় না, কেহ কেহ বলেন একমাস, কিন্তু তাহার আগে স্পর্শশক্তির স্ফুরণ হয়, অর্থাৎ শিশু শীত ও গ্রীষ্মের, শৈত্য ও উত্তাপের এবং বেদনার অনুভূতি লাভ করে। খুব সম্ভবতঃ তাঁহাদের আস্বাদন জ্ঞানও হয়; কারণ দেখা যায় মধু আঙুলে লইলে তাহা চুষিতে থাকে, কিন্তু কুইনাইন লইলে সেই ক্ষুদ্র জিহ্বাটি তার অতিক্ষুদ্র বলে ঠেলিয়া দিতে চায়। যদি শিক্ষিতা মাতারা এ সম্বন্ধে তাঁহাদের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করেন, অনেক ভ্রম-সংশোধন হয়।

ক্রমে শিশু তার হাত, পা একটু একটু করিয়া নাড়িতে চাড়িতে আরম্ভ করে। এই সময়ে শিশুর মনে প্রথম ভয়-সঞ্চার হয়। ঘুমন্ত শিশুকে হঠাৎ ঠেলিলে, কিংবা গায়ের কাপড় টানিয়া লইলে বা জোরে চীৎকার করিলে, অপরিচিত কোনও ব্যক্তি বা জন্তু দেখিলে শিশু ভয় পায়। এই ভয়ের মূলেও আত্মরক্ষা-প্রবৃত্তি বিদ্যমান। মনে ভয়-সঞ্চারের পর এই আত্মরক্ষা-প্রবৃত্তি হইতেই ক্রোধের সঞ্চার দেখা যায়। কিন্তু ঠিক্ কোন্ বয়সে শিশু প্রথম ক্রোধের লক্ষণ প্রকাশ করে তাহা বলা মুস্কিল। তবে শিশু কিছু চাহিয়া পায় নাই, কিংবা কিছু করিতে গিয়া বাধা পাইয়াছে, এইরূপ অবস্থাতেই এই সহজ বৃত্তির প্রথম লক্ষণ প্রকাশ পায়। ক্রোধ যদিও আত্মরক্ষা-প্রবৃত্তির অন্তর্গত, কিন্তু বিশেষ অনুধাবন করিলে দেখা যায়, ক্রোধের সঙ্গে সঙ্গে আর একটি বৃত্তির বিকাশ হইতেছে, তাহা আত্ম-প্রভুত্ব, অন্যের ইচ্ছার বিরুদ্ধে নিজ ইচ্ছার সংগ্রাম ও তাহার প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা। অবশ্য শিশু এ সব কথার কিছুই জানে না, কিন্তু সর্ষপ-প্রমাণ বীজ হইতে যেমন প্রকাণ্ড বটবৃক্ষের উৎপত্তি হয়, তেমনি এই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৃত্তির ভিতরেই ভবিষ্যতের প্রচণ্ড মনোবৃত্তি সকল লুক্কায়িত থাকে ও ক্রমে আত্মপ্রকাশ করে।

ক্রমে ক্রমে শিশুর সকল জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলি সজাগ হইয়া উঠে। শিশুর সম্মুখে রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শে ভরা ধরণী আপনার ভাণ্ডার খুলিয়া দেন। শিশু দর্শন, স্পর্শন, শ্রবণ, ঘ্রাণগ্রহণ, আস্বাদন দ্বারা জগতের সহিত পরিচিত হয়। অনেকেই দেখিয়াছেন শিশুরা কোনও জিনিষ পাইলে বাঁ হাত দিয়া ধরিয়া ডান হাতে চাপড়ায়, ডান হাতে ধরিয়া বাঁ হাত চাপড়ায়, মুখে পুরিয়া লালা মাখায় এবং আহ্লাদে কলরব করিতে থাকে। এই ক্রীড়াশীলতার ভিতর দিয়াই তাহারা দ্রব্যের দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, আপেক্ষিক গুরুত্ব, নৈকট্য ও দূরত্ব, শৈত্য, উষ্ণতা প্রভৃতি সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করে।

এই সময়কার সকল জ্ঞানার্জ্জনই প্রায় ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে হয় এবং দর্শন ও স্পর্শনেন্দ্রিয় অন্যান্য ইন্দ্রিয়াপেক্ষা বেশী সাহায্য করে।... ধরিয়া ছুঁইয়া শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে শিশুর মনে কৌতূহলের সঞ্চার হয়। কৌতূহলের সঙ্গে সঙ্গে অনুসন্ধিৎসা আসে।...এইখানে মাতা পিতা বা শিক্ষকের দরকার। তিনি ঠিক্ যতটুকু সাহায্য না করিলে শিশু অগ্রসর হইতে পারে না ততটুকু সাহায্য করিবেন, তারপর শিশু আপনার পথে আপনিই চলিতে পারিবে।

এবয়সে শিশু চুপচাপ বসিয়া থাকিতে ভালবাসে না। সে চায় নড়াচড়া করিতে, কথা বলিতে ও কিছু কাজ করিতে। সাধারণতঃ তাহার এই প্রচেষ্টাকে আমরা 'চঞ্চলতা' বা 'দুষ্টামি' নামে অভিহিত করি, কিন্তু এই চঞ্চলতাই শিশুর ভবিষ্যৎ জীবনের সাফল্যের পথ-প্রদর্শিকা। ইহারই ভিতর দিয়া সে আপন দুর্ব্বল মাংসপেশীকে সবল করিতেছে, ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে জগতের সহিত পরিচিত হইতেছে, ক্রীড়াচ্ছলে ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য প্রস্তুত হইতেছে। সে কখনও দৌড়ায়, কখনও হামা দেয়, আবার তালে তালে পা ফেলিয়া নাচে, দৌড়াইয়া মাকে জড়াইয়া ধরে, তাঁর আঁচলে মুখ ঢাকিয়া বলে—মা, আমি হারিয়ে গেছি, এই মিস্ত্রী সাজে, এই মটর গাড়ী চালায়, এই বলে "আমি গাড়োয়ান চল্ ঘোড়া টক্ টক্"—ইহার কিছুই নিরর্থক নহে। প্রকৃতিদেবী যথাসময়ে আনন্দের ভিতর দিয়া তাহাকে আত্মবিকাশের পথে লইয়া যাইতেছেন।

রঙীন জিনিষ শিশু বড় ভালবাসে। রঙীন ফুলটি, ফলটি, পাতা, পাখী, প্রজাপতি, ঝুমঝুমিতে তাহার প্রবল অনুরাগ। এডিনবরাতে ডাক্তার ড্রিভার কোন্ বয়সে শিশুর বর্ণবৈচিত্র্যের প্রতি অনুরাগের সঞ্চার হয় তৎসম্বন্ধে বহু গবেষণা করিয়াছেন। তিনি বলেন, চারি মাস বয়সেই শিশুর মনে বর্ণবিশেষের প্রতি অনুরাগ সঞ্চার দেখা যায়। তিনি বিভিন্ন রঙের কাগজ বা ঝুমঝুমি লইয়া শিশুর চোখের সম্মুখে নাড়িয়া দেখাইয়াছেন, কোন কোন রং শিশুর দৃষ্টি আকর্ষণ করে, এবং কোনও কোনও রং করে না। দুইটি রঙীন জিনিষ দেখাইলে, সে একটি না লইয়া অপরটি লয়। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই সকল ঝুমঝুমি, রংবেরঙের খেলনা শিশুকে প্রচুর আনন্দ দান করে। এই সকলের ভিতর দিয়া শিশু যে শুধু বর্ণবৈচিত্র্যের জ্ঞানলাভ করে তাহা নয়, তাহার সৌন্দর্য্যপ্রিয়তাও বিকাশ লাভ করে। একজন পণ্ডিত বলিয়াছেন, মানুষ অন্যান্য প্রাণী হইতে যে শ্রেষ্ঠ তাহার প্রথম এবং প্রধান কারণ সে সৌন্দর্য্যের উপাসক, দ্বিতীয়তঃ, তাহার নীতিজ্ঞান ও হিতাহিত বিচার ক্ষমতা আছে, তৃতীয়তঃ, পরিদৃশ্যমান জগতের অন্তরালে যে স্রষ্টা আপনাকে লুকাইয়া রাখিয়াছেন, তাঁহার প্রতি সে ভক্তিশীল; সুতরাং সৌন্দর্য্যপ্রিয়তা মানবত্ব উন্মেষের পরিচায়ক।

এই বর্ণবৈচিত্র্যানুরাগের সঙ্গে সঙ্গে আরও দুইটি বৃত্তির উন্মেষ দেখা যায়, তাহা শিশুর সঙ্গীত ও কবিতার প্রতি অনুরাগ। শিশু গানের তালে তালে তালি দিতে ও নাচিতে এবং ছোট ছোট কবিতা মুখস্থ করিতে ভালবাসে, ব্যাণ্ডের বাজনা শুনিলে অস্থির হইয়া যায়। যে শিশু ভাল করিয়া কথা বলিতে পারে না, তাহারও কবিতা বলিবার পরম আগ্রহ দেখা যায়।...

অনেক শিশু ছড়া ও গান দুই তিন বার শুনিয়াই দিব্য মুখস্থ বলিতে পারে। একটি শিশুকে দেখিয়াছি, সে দাদা, দিদির পড়া শুনিয়া গুণনের নামতা আগাগোড়া মুখস্থ বলিতে পারিত। যদিও ইহা স্মৃতিশক্তির পরিচায়ক, কিন্তু ইহা দ্বারা এই বুঝা যায় যে, বেচারী শিশু আনন্দ লাভ করিবার মত আর কিছু না পাইয়া অগত্যা নামতা মুখস্থ করিয়াছে। নামতার ভিতরে যে গানের সুর বা তাল তাহার কানে বাজিয়াছে, তাহারই আনন্দে সে বিভোর।

যাঁহারা শিশু-জীবন পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন, খেলা শিশু-জীবনে কি প্রয়োজনীয়। মা যদি দেখেন কোলের শিশুটি মাই চুষিয়া খাইয়াছে ও হাত-পা নাড়িয়া খেলা করিয়াছে, তিনি নিশ্চিন্ত থাকেন। একমাস পূর্ণ হইবার পরই শিশু খেলিতে আরম্ভ করে, এবং কোন কোন শিশু তাহার আগেই সে প্রচেষ্টা করে। এই খেলা প্রথমে আর কিছুই নহে, খালি একটু হাত-পা নাড়া মাত্র। প্রায় তিন বৎসর বয়স পর্য্যন্ত শিশু অন্যের সহিত মিশিয়া খেলা করিতে পারে না।

প্রথম হইতেই সে দেখিয়া আসিতেছে, তাহার জন্যই যেন এই জগৎখানি সৃষ্ট হইয়াছে। বাবা, মা, দাদা, দিদি, কাকা, মামা, ঠাকুরমা সকলে তাহার সুখ ও সুবিধা বিধান করিবার জন্য রহিয়াছেন। তাহার ক্ষুধা পাইয়াছে, একটু কাঁদিলেই হইল, অমনি যাদুবলে সকলে তাহার মনোভাব জানিয়া ফেলেন এবং তাহার অভাব পূর্ণ হয়। গরম বোধ হইতেছে; কাঁদিলেই অমনি কেহ কি মন্ত্রবলে তাহা জানিয়া, কি যেন নাড়েন অমনি আরাম বোধ হয়। সুতরাং যে পর্য্যন্ত না অপরের ইচ্ছার সহিত তাহার অমিল হয়, সে পর্য্যন্ত শিশু বুঝিতেই পারে না, অপরের ইচ্ছা বলিয়া জগতে কিছু আছে। সে আপনাতেই আপনি মগ্ন থাকে, এবং আপনাতেই আপনি সম্পূর্ণ। তাহা বাদে জীবনের প্রথম তিন বৎসর আপনার অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সহিত পরিচিত হইতে ও তাহাদের ব্যবহার জানিতেই চায়, অপরাপর শিশুদের বিষয় ভাবিবার মত মনের অবস্থা থাকে না। তাহা ব্যতীত এই সময়ে শিশুর কোনও বিষয়ের প্রতি মনোনিবেশ করিবার ক্ষমতা অত্যন্ত অল্পকালস্থায়ী ও সঙ্কীর্ণ। সে একটার বেশী বিষয়ে মন দিতে পারে না, এবং খুব বেশীক্ষণ তাহার মনোযোগ স্থায়ী থাকে না। কোথায় একটু শব্দ হইল, কে হাসিল, কে কথা বলিল, অমনি তাহার মন সেদিকে যায়। পাঁচ জনে মিলিয়া খেলা করিতে গেলে, খেলার একটা উদ্দেশ্য থাকা চাই, তাহা ভবিষ্যৎ জ্ঞানের পরিচায়ক, নিজের কার্য্য ও অধিকার ছাড়া অপরের কার্য্য ও অধিকার সম্বন্ধে চিন্তা করা চাই, তাহা সামাজিক-জীবনের পরিচায়ক। কিন্তু এই বয়সে শিশু বর্ত্তমানে নিবদ্ধ, পরে কি হইবে তাহা ভাবিতে পারে না, এবং সে অসামাজিক, এই জন্যই সে নিজে নিজে খেলা করিতে ভালবাসে।...

জননীরা লক্ষ্য করিয়া দেখিবেন, তিন বৎসর বয়স পর্য্যন্ত শিশুরা পরস্পর মারামারি করে, কিংবা খামচা-খামচি করিয়া কাঁদে বটে, কিন্তু কথা বলিয়া ঝগড়া করে না। কারণ, ঝগড়া করিতে হইলে প্রথমতঃ কথা বলার দরকার; দ্বিতীয়তঃ, অন্যের মনের ভাব বোঝা এবং তৃতীয়তঃ, তাহার উত্তর দেওয়ার দরকার। এ সকলের জন্য ভাষার উপর দখল, অন্যের কথা শুনিবার ও বুঝিবার মত মনোযোগ ও বুদ্ধিশক্তি এবং বুঝিয়া উত্তর দেওয়ার মত বিচার-ক্ষমতা দরকার।...

শিশুর প্রথম অস্ফুট কাকলী নিরর্থক নহে। মায়েরা বলেন, শিশু যখন কাঁদে, তখন তাঁহারা দূর হইতেই শুনিয়া বলিতে পারেন, শিশু কেন কাঁদিতেছে। ক্ষুধা-তৃষ্ণার কান্না এক প্রকার, ভয় পাইলে সে কান্না অন্য প্রকার, আবার অভিমানের কান্না অন্য প্রকার। যদি ভাষার অর্থ মনের ভাব শব্দে প্রকাশ করা হয়, তবে শিশুর ক্রন্দন ও কাকলী নিশ্চয়ই ভাষার অন্তর্গত। ক্রমে শিশু শব্দ শুনিয়া তাহা অনুকরণ করিতে চেষ্টা করে। তখন পর্য্যন্ত সে বোঝে না, এই সকল শব্দের কোনও অর্থ আছে, অর্থাৎ তাহা দ্বারা কোনও প্রয়োজন সাধিত হয়। কিন্তু ক্রমে দেখে 'মা' বলিলে যিনি কাছে আসেন, তাঁর মুখখানি বড় সুন্দর, হাসিতে ভরা এবং তাঁর আগমনে ক্ষুধা, তৃষ্ণা ও অন্যান্য অভাব দূর হয় তখন সে সেই মুখখানির সঙ্গে 'মা' নামটি যুক্ত করে। কিন্তু তার পরেই সে তাহার সকল মনোভাব এই একাক্ষর মধুর শব্দ 'মা' দ্বারা ব্যক্ত করিতে চেষ্টা করে। শিশু যখন 'মা' বলে তখন তাহার অর্থ হয়ত 'মা কাছে এস' কিংবা 'মা, কেমন সুন্দর ফুল দেখ', কিংবা 'মা বিড়ালছানাটা পালিয়ে গেল', কিংবা 'মা কোলে নাও,' 'আমায় নিয়ে বেড়াও' ইত্যাদি। তারপর হয়ত শিশু আরও কয়েকটি কথা শিখে, যথা, দাদা, বাবা, দুদু, নানা ইত্যাদি। ইহারও প্রত্যেকটি শব্দ বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন অর্থে প্রয়োগ করে। তখন তাহার সকল বাক্যই একশব্দযুক্ত।...কিন্তু ক্রমে যখন সে বাহিরের লোকের সহিত পরিচিত হয়, তখন দেখে যে, তাঁহারা একশব্দযুক্ত বাক্য বোঝে না, তাঁহাদের মনের ভাব বুঝাইতে আরও শব্দের প্রয়োজন হয়। খেলা করিতে গিয়া সে দেখে, অন্যান্য শিশুরা বড়দের অপেক্ষাও নির্ব্বোধ, তাহারা কিছুই বোঝে না, এবং সে যাহা করিতে চায়, ঠিক তাহার উল্টা করিয়া বসে। ইহার ফলে শিশু ক্রমে বেশী শব্দ ব্যবহার করিতে এবং অন্যকে নিজের মনোভাব বুঝাইতে ও অন্যের মনোভাব বুঝিতে চেষ্টা করে।

যতদিন না শিশু এ অবস্থায় উপনীত হয়, ততদিন সে সম্পূর্ণ অসামাজিক। আশ্চর্য্যের বিষয় এই, শিশুর সামাজিক জীবন কলহের ভিতর দিয়া সূত্রপাত হয়।...

তিন বৎসর বয়স পর্য্যন্ত শিশুরা গল্প বলিলে শোনে বটে, কিন্তু ভাল বোঝে না। তিন হইতে পাঁচ পর্য্যন্ত যেসব গল্পে কল্পনার আশ্রয় বেশী লইতে হয় না, যাহা সে চোখের সামনে দেখে ও যাহা তাহার মনোযোগকে বেশীক্ষণ আটকাইয়া রাখে না তাহা সে শুনিতে ভালবাসে। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা ভালবাসে, সেই সব গল্প যেগুলির মাঝে সে হাততালি দিতে, নাচিতে বা অন্য কোনও অঙ্গভঙ্গী করিতে পারে।...

শিশুর কার্য্যকারণ সম্বন্ধে ধারণা অতি কৌতূহলপ্রদ। তাহার বিশ্বাস কার্য্য থাকিলে তাহার সঙ্গে সঙ্গে কারণ থাকিতেই হইবে, এবং সে কারণ কার্য্যের সঙ্গেই বর্ত্তমান আছে, তাহার নিমিত্ত প্রমাণ-প্রয়োগের দরকার নাই। যে-কোনও কারণ দ্বারা যে-কোনও কার্য্য হইতে পারে। যথা, একটি শিশুকে জিজ্ঞাসা করা হইল, 'নৌকা জলে ভাসে কেন?' উত্তর 'নৌকা যে ছোট, তাই' 'জাহাজ জলে ভাসে কেন?' 'জাহাজ যে বড় তাই।'

একথা সে বোঝে না, যে, নিজে প্রথমে যাহা বলিয়াছে, পরে তাহারই উল্টা বলিতেছে।...

শুধু পাঁচ নয়, সাত, আট বৎসর বয়স পর্য্যন্ত শিশুদের কার্য্যকারণ জ্ঞান ও বিচার-ক্ষমতার বিকাশ আরম্ভ হয় না। এই জন্যই এই বয়স পর্য্যন্ত শিশুদের সকল বিষয়ই যথাসম্ভব জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সাহায্যে শিখান দরকার।

এই সকল বিষয়ে পাশ্চাত্য মাতাপিতারা নিজেদের সন্তানের জীবন পর্য্যবেক্ষণ করিয়া যে দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা পড়িলে অবাক হইয়া যাইতে হয়। এ বিষয়ে এত বলিবার আছে, যে, বলিতে গেলে প্রকাণ্ড পুঁথি লিখিতে হয়। আমরা আশা করি, আমাদের শিক্ষিত মাতা-পিতারাও তাঁহাদের অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করিয়া জগতকে নূতন নূতন তথ্য দান করিবেন।

(জয়শ্রী—ভাদ্র, ১৩৩৮) শ্রীসুনীতিবালা গুপ্ত

—

যশোবন্ত সিংহ ও যশোবন্ত রায়

রাজা যশোবন্ত বা যশোমন্ত সিংহ মেদিনীপুর কর্ণগড়ের রাজা ছিলেন। বহু পুরুষ হইতেই তাঁহারা কর্ণগড়ে রাজত্ব করিতেছিলেন।…কর্ণগড়ের রাজবংশীয়রা জাতিতে সদ্গোপ। ইঁহাদের আদিপুরুষ লক্ষ্মণসিংহ মেদিনীপুরের তদানীন্তন মাজি রাজা সুরতসিংহের সেনাপতি হইয়াছিলেন। তিনি উড়িষ্যার কেশরি-বংশীয় কোন রাজার সাহায্যে সুরতসিংহের হস্ত হইতে মেদিনীপুরের অধিকার বিচ্ছিন্ন করিয়া লন ও কর্ণগড়ে আপনার রাজধানী স্থাপন করেন। লক্ষ্মণসিংহের পর রাজা শ্যামসিংহ ও ছত্রসিংহের উল্লেখ দেখা যায়। ছত্রসিংহের পর রঘুনাথসিংহ কর্ণগড়ের রাজা হইয়াছিলেন। এই রঘুনাথই রামসিংহের পিতা। রাজা রামসিংহের পুত্র রাজা যশোবন্ত সিংহই শিবায়ন-প্রণেতা কবি রামেশ্বর ভট্টাচার্য্যের প্রতিপালক এবং তৎপুত্র অজিত সিংহকেও কবির আশীর্ব্বাদভাজন বলিয়া দেখা যায়। অজিতসিংহের রাণী ভবাণী ও রাণী শিরোমণি নামে দুই পত্নী ছিলেন। তাঁহারা নিঃসন্তান হওয়ায়, ক্রমে কর্ণগড়ের সম্পত্তি তাঁহাদের আত্মীয় নাড়াজোলের খাঁ-বংশীয়দের হস্তগত হয়। অদ্যাপি নাড়াজোল-বংশীয়রা তাহা ভোগ করিতেছেন।…

কবি রামেশ্বরের পূর্ব্বনিবাস ছিল মেদিনীপুরের অন্তর্গত বর্দ্দা পরগণার যদুপুর গ্রামে। এই বর্দ্দা পরগণা সভাসিংহের জমীদারী ছিল। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে এই সভাসিংহ ও উড়িষ্যার পাঠান সর্দ্দার রহিম খাঁ পশ্চিম-বঙ্গে বিদ্রোহের পতাকা উড়াইয়া সকলকে সন্ত্রাসিত করিয়া তুলিয়াছিল। সভাসিংহের ভ্রাতা হেম্মতসিংহের অত্যাচারে রামেশ্বর যদুপুর পরিত্যাগ করিয়া কর্ণগড়ের রাজা রামসিংহের আশ্রয়ে আসিয়া অযোধ্যাবাড় নামক গ্রামে বাস করেন।…

এক্ষণে যশোবন্ত রায় সম্বন্ধে ঐতিহাসিকরা যাহা বলিয়াছেন, আমরা তাহার উল্লেখ করিতেছি। ইতিহাস হইতে জানা যায় যে, যশোবন্ত রায় মুর্শিদাবাদের প্রতিষ্ঠাতা নবাব মুর্শিদকুলী জাফর খাঁর মুন্সী ও তাঁহার দৌহিত্র সরফরাজ খাঁর ওস্তাদ বা শিক্ষক ছিলেন। পরে মুর্শিদকুলী খাঁর জামাতা নবাব সুজাউদ্দীনের সময় ঢাকার দেওয়ান নিযুক্ত হইয়াছিলেন। প্রথমে আমরা 'রিয়াজুস সালাতীন' হইতে তাঁহার কথা উদ্ধৃত করিতেছি। "নবাব মুর্শিদকুলী খাঁ (নবাব সুজাউদ্দীনের জামাতা দ্বিতীয় মুর্শিদকুলী) উড়িষ্যার শাসনকর্তৃপদে নিযুক্ত হইলে সরফরাজ খাঁ (নবাব সুজাউদ্দীনের পুত্র) জাহাঙ্গীর নগরের (ঢাকা) কার্য্যভার প্রাপ্ত হন; কিন্তু তিনি ইরাণ (পারস্য) রাজবংশোদ্ভব গালেব আলী খাঁকে তথায় স্বীয় নায়েবরূপে প্রেরণ করেন। নবাব মুর্শিদকুলী খাঁর (মুর্শিদাবাদের প্রতিষ্ঠাতা) মুন্সী ও সরফরাজ খাঁর শিক্ষক যশোবন্ত রায় দেওয়ান ও মন্ত্রীর পদে বৃত হইয়া গালেব খাঁর সহযোগী নিযুক্ত হন। ভগিনী নফিসা বেগমের সন্তোষবিধান জন্য সৈয়দ রজি খাঁর পুত্র মুরাদ আলী খাঁকে নাওয়ারা বিভাগের কর্তৃত্ব প্রদান করা হয়। রাজস্ব ও শাসন বিভাগ, খালসা ও জায়গীর মহাল, নৌ-বিভাগ, তোপখানা, খাসনবিসি ও সহর অমিনার কার্য্যের ভার রায়ের উপর ন্যস্ত ছিল। মুন্সী যশোবন্ত রায় নবাব জাফর খাঁর (মুর্শিদাবাদের প্রতিষ্ঠাতা মুর্শিদকুলী খাঁ) নিকট শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। সুতরাং তিনি আপন অভিজ্ঞতা ও সাধুতাবলে এবং প্রত্যেক কার্য্য পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরিদর্শন করিয়া যাহাতে সরকারের রাজস্ব বৃদ্ধিলাভ করে এবং প্রজাগণ সুখস্বচ্ছন্দে কালযাপন করিতে পারে, তদনুরূপ কার্য্য করিলেন। তৎপর তিনি সওদার খাস তুলিয়া দেন এবং (জামাতা) মুর্শিদের সময় মির হবির অর্থশোষণ জন্য যে-সকল প্রথা প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন, তাহা রহিত করেন। তিনি শস্যাদি সুলভ মূল্যে বিক্রয়ের জন্য বন্দোবস্ত করিয়া দুর্গের পশ্চিমদ্বার উদ্ঘাটন করেন। নবাব শায়েস্তা খাঁ এই দ্বার রুদ্ধ করিয়া তাহার প্রস্তর-ফলকে নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন যে, যাঁহার শাসনকালে তাঁহার সময়ের মত দামরীতে এক সের শস্য বিক্রীত হইবে, তিনিই উহা উদ্ঘাটন করিয়া দিবেন। তদবধি কোন শাসনকর্ত্তা পশ্চিম দ্বার উদ্ঘাটন করিতে পারেন নাই। তিনি দানশীলতা, ন্যায়বিচার ও অপক্ষপাত অবলম্বন করিয়া জাহাঙ্গীর নগরকে স্বর্গ-উদ্যানে পরিণত করেন। ইহাতে সরফরাজ খাঁও সর্ব্বসাধারণের নিকট যশস্বী হইয়া উঠেন।

নফিসা বেগমের অনুরোধে গালেব আলী খাঁর পরিবর্ত্তে সরফরাজ খাঁর জামাতা মুরাদ আলী খাঁ জাহাঙ্গীর নগরের শাসনকর্তৃপদে নিযুক্ত হইলেন। মুরাদ আলী খাঁ নৌ-বিভাগের মুহুরী রাজবল্লভকে পেশকারী প্রদান করিলেন। তাঁহার শাসনকালে উৎপীড়ন আরম্ভ হইল। এজন্য যশস্বী মুন্সী যশোবন্ত রায় দুর্নামগ্রস্ত হইবার ভয়ে দেওয়ানী পরিত্যাগ করিলেন। অত্যাচারী শাসনকর্ত্তার হস্তে পতিত হইয়া দেশ শ্রীভ্রষ্ট হইতে লাগিল।"—(রামপ্রাণ গুপ্তের অনুবাদ)

সরফরাজ খাঁ নবাব হইলে মুন্সী যশোবন্তকে রায়রায়ান বা রাজস্ব-মন্ত্রীর পদে নিযুক্ত করিবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন বলিয়া সালাতীনে উল্লেখ দেখা যায়। ষ্টুয়ার্টও যশোবন্ত রায়কে সরফরাজ খাঁর শিক্ষক ও নবাব মুর্শিদকুলী জাফর খাঁর নিকট শিক্ষাপ্রাপ্ত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন এবং ঢাকার দেওয়ানী পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার মুর্শিদাবাদে যাওয়ার কথাই বলিয়াছেন।…

যশোবন্ত রায় ও যশোমন্ত সিংহ এক ব্যক্তি কি না, তাহার বিশেষ কোন প্রমাণ নাই।…কর্ণগড়াধিপতি রাজা যশোমন্ত সিংহ বহুপুরুষ হইতে মেদিনীপুর প্রদেশের রাজা ছিলেন। যশোমন্তের পিতা রামসিংহ কর্ত্তৃক স্থাপিত হইয়া কবিবর রামেশ্বর ভট্টাচার্য্য শিবসঙ্কীর্ত্তন রচনা করেন। ১৬৩৪ শকে বা ১৭১২ খৃষ্টাব্দে রাজা যশোমন্ত সিংহের রাজসভায় তাঁহার গ্রন্থ সমাপ্ত হয়। সুতরাং তৎকালে রাজা যশোমন্ত যে কর্ণগড়ে বিদ্যমান ছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। আবার সেই সময়ে আমরা দেখিতেছি যে, যশোবন্ত রায় নবাব মুর্শিদকুলী খাঁর মুন্সীর কার্য্য ও সরফরাজ খাঁর ওস্তাদী বা শিক্ষকতা করিতেছেন। যশোমন্ত সিংহরা যেরূপ পরাক্রান্ত রাজা ছিলেন, তাহাতে নবাবের মুন্সীগিরি বা নবাব দৌহিত্রের ওস্তাদী করিতে আসা কদাচ সম্ভব বলিয়া বোধ হয় না। কোন প্রদেশের সহকারী শাসন-কর্তৃত্ব প্রভৃতি প্রাপ্ত হইলে আমরা দুজনের অভেদে কথঞ্চিৎ বিশ্বাস করিতে পারিতাম। বিশেষতঃ দুই জনের উপাধির সম্পূর্ণরূপ ও নামেরও কিছু কিছু পার্থক্য আছে। ঢাকা পরিত্যাগের পর যশোবন্ত রায় মুর্শিদাবাদেই অবস্থিতি করিতেন। সরফরাজ খাঁর রাজত্বকালে তাঁহাকে একবার রায়রায়ানের পদ প্রদানের প্রস্তাব হইয়াছিল। ফলতঃ মেদিনীপুর-রাজ যশোমন্ত সিংহ যশোবন্ত রায় হইতে স্বতন্ত্র ব্যক্তি বলিয়াই আমাদের ধারণা।…

(মাসিক বসুমতী—শ্রাবণ, ১৩৩৮) শ্রীনিখিলনাথ রায়

পুস্তক পরিচয়

"পতনোন্মুখ বেলুড় মঠ (সহজিয়া-সাধনা-লীলা-কাহিনী)!—জি, এস্, রায়। To be had of:—Praja Sangha Office, 17 Dihi Entally Road, Calcutta. সর্ব্বস্বত্ব সংরক্ষিত। মূল্য ৷৷৹ আনা।" এই কথাগুলি বহির আখ্যা-পত্রে আছে।

এই বহিখানির পৃষ্ঠাসংখ্যা ৷৷৹+১২৯। তার মধ্যে আমি দু-চার পৃষ্ঠা মাত্র পড়িয়াছি। বাকী পড়ি নাই, এইজন্য, যে, ইহার সমালোচনা আমি করিতে চাই না, এবং এই রকমের জিনিষ পড়িতে আমার ইচ্ছা নাই। আমি ব্রাহ্মসমাজের লোক। ব্রাহ্মসমাজের লোকদের সমালোচনা দুরভিসন্ধি প্রসূত বলিয়া রামকৃষ্ণ মিশনের লোকেরা মনে করিতে পারেন, এই আশঙ্কাও আমাকে কিয়ৎ পরিমাণে এই বহির সমালোচনা হইতে নিবৃত্ত করিয়াছে।

রামকৃষ্ণ মিশনের দ্বারা জনসমাজের যে কল্যাণ হইয়াছে, ক্ষুদ্র ও ক্ষণভঙ্গুর জিনিষ সম্বন্ধে বৈরাগ্য, মহৎ ও শাশ্বতের প্রতি অনুরাগ, এবং দরিদ্র ও অজ্ঞের সেবার ভাব হইতে তাহা হইয়াছে। রামকৃষ্ণাশ্রিত মণ্ডলীর কাহারও কাহারও বা অনেকের মধ্যে এই সকল গুণের অভাব হইয়া থাকিলে তাহা দুঃখের বিষয়। তাহাতে বাঙালীর অগৌরব বলিয়াও তাহা দুঃখকর। কারণ, বাঙালী ছাড়া ভারতবর্ষে রামকৃষ্ণ মিশনের মত একটি জিনিষ কেহ দেখাইতে পারে না।

শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

স্বাধীনতার পথ—শ্রীনারায়ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত, সরস্বতী লাইব্রেরী হইতে প্রকাশিত, মূল্য পাঁচ সিকা।

ইউরোপে রাষ্ট্র ও সমাজের মধ্যে যে-সকল সংস্কারের প্রচেষ্টা হইতেছে তাহার সহিত বাঙালী পাঠকের পরিচয় খুবই কম। অন্য দেশের সংস্কারের চেষ্টা ও কর্ম্মকুশলতা দেখিলে, তাহাদের সফলতা ও বিফলতার কথা শুনিলে, আমাদের উৎসাহও বাড়ে, নিজেদের সংস্কার-চেষ্টায় মনে ভরসা ও ধৈর্য্যও পাওয়া যায়। আর এ সকল কথা ইউরোপের লোকের মুখেই শোনা ভাল।

বর্ত্তমান লেখক বার্ট্রাণ্ড রাসেল মহাশয়ের "Roads to Freedom"-এর ভাবানুবাদ প্রকাশ করিয়া এইজন্য বাঙালী পাঠকের উপকার সাধন করিয়াছেন। বইখানির ভাষা কিঞ্চিৎ আড়ষ্ট হইয়া থাকিলেও মোটের উপর ইহা সহজপাঠ্য হইয়াছে। অর্থশাস্ত্রের যে পরিভাষা লেখক ব্যবহার করিয়াছেন তাহা কোন কোন ক্ষেত্রে শ্রুতিকটু হইয়াছে। যে-সকল বাঙালী পাঠক ইংরেজী জানেন না, তাঁহাদের পক্ষে এগুলি বুঝা দুষ্কর হইবে, আর যাঁহারা ইংরেজী জানেন, তাঁহারা মনে মনে অনুবাদ করিয়া সেগুলি বুঝিয়া লইতে পারিবেন। পুস্তকের শেষে পারিভাষিক শব্দের সরল অর্থ দিলে মন্দ হইত না। আরও সহজ ও সরল ভাষায় এই জাতীয় পুস্তকের বহুল প্রচার হওয়া প্রয়োজন।

বিপ্লব পথে স্পেন—শ্রীসতীশচন্দ্র সরকার প্রণীত, সরস্বতী লাইব্রেরী হইতে প্রকাশিত, মূল্য চৌদ্দ আনা।

স্পেন দেশের বিপ্লবের একটি ধারাবাহিক ইতিহাস দিবার চেষ্টা হইয়াছে। দিনের পর দিন খবরের কাগজ পড়িলেও যেমন ভিতরে কি ঘটিতেছে তাহা বুঝা যায় না, এ পুস্তকখানিতেও তেমনি নানা ঘটনার বর্ণনার মধ্যে ভিতরে কোথায় কি ভাবধারা কাজ করিতেছে তাহার সন্ধান পাওয়া যায় না। সেইজন্য পাঠকের মনে স্পেনের ইতিহাস সম্বন্ধে কোনও স্থায়ী চিত্র থাকিয়া যায় না।

লেখকের শৈলী অত্যন্ত রোমান্টিক-ভাবাপন্ন। ভাষার মধ্যে 'সীমাহীন' 'অন্তহীন' খেয়াল-খুশী জাতীয় শব্দ ও চিহ্নের মধ্যে '!' চিহ্নটির কিঞ্চিৎ বাহুল্য দেখা যায়, ইতিহাসের ভাষা আরও গম্ভীর হইলে দোষের হইত না। পুস্তকের পত্রসংখ্যা 'বায়ান্ন' 'ছষট্টি' প্রভৃতি না লিখিয়া অঙ্কে লিখিলেই মানাইত ভাল।

শ্রীনির্ম্মলকুমার বসু

কবি-পরিচিতি—রবীন্দ্র পরিষদ্ সম্পাদিত। ১ ডি রসা রোড, ভবানীপুর হইতে কান্ত পাবলিশিং হাউস কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য দুই টাকা।

সপ্ততিতম রবীন্দ্র জন্মতিথি উপলক্ষে এই 'পরিচিতি' প্রকাশিত হইয়াছে। বইখানি সুমুদ্রিত এবং সৌষ্ঠবসম্পন্ন। কবির একখানি প্রতিকৃতি আছে। ইহাতে রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে পরিষদে পঠিত কতকগুলি বক্তৃতা সন্নিবেশিত হইয়াছে। প্রথমেই 'রবীন্দ্র-পরিষদে কবির অভিভাষণ,' দ্বিতীয় প্রবন্ধ কবির 'সাহিত্য-বিচার,' রবীন্দ্রনাথের এই দুইটি রচনা ও একটি কবিতা ছাড়া আরও কয়টি সুপাঠ্য প্রবন্ধ আছে। শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী, সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, সোমনাথ মৈত্র, নীহাররঞ্জন রায়, গিরিজা মুখোপাধ্যায় ও শ্রীমতী রাধারাণী দত্ত নানাদিক দিয়া রবীন্দ্র-সাহিত্যের আলোচনা করিয়াছেন। সকল প্রবন্ধই সুচিন্তিত। শ্রীপ্রমথ চৌধুরীর চিত্রাঙ্গদা সম্বন্ধে আলোচনা চমৎকার।

পথের-স্মৃতি—শ্রীঅসমঞ্জ মুখোপাধ্যায় প্রণীত এবং ১৫ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা হইতে কমলালয় বুক ডিপো কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য দুই টাকা চারি আনা।

এখানি উপন্যাস। উপন্যাসখানি সুবৃহৎ। পুস্তকের কাগজ ছাপা ও বাঁধাই ভাল। উপন্যাসের প্রথম দিকটি পুরাতনের স্মৃতি ও গ্রন্থকারের অভিজ্ঞতা দিয়া রচিত বলিয়া ভালই লাগে। শেষ দিকটি উৎকট ও আজগবী ঔপন্যাসিক কল্পনার নিদর্শনস্থল। বিনুদার চরিত্রের অদ্ভুত পরিণতি ও সীতার শেষ দেখিয়া মনে হয়—লেখক গল্প লিখিতে না গিয়া পুরাতন কাহিনী লিখিলে ভাল হইত। উপন্যাস-হিসাবে সার্থক না হইলেও অন্য দিক দিয়া বইখানি উপভোগ্য।

আমার কথাটি ফুরোল—শ্রীপ্রবোধকুমার সান্যাল প্রণীত এবং ২০৩।২, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট হইতে বাগচী এণ্ড সন্স কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

এখানি ছেলেদের গল্পের বই। বইখানিতে চারিটি গল্প ও রূপকথা আছে। শিশু ও কিশোর মনের উপযোগী লেখা। বালক-বালিকাদের জন্য লেখা বলিয়া যে-সব সাহিত্য-রসহীন অপাঠ্য গল্পের বই বাজারে বাহির হয়, এখানি সেরূপ নয়। রচনাকৌশলে পুস্তকখানি উপভোগ্য হইয়াছে, মনে করি। গল্পগুলি ছেলেদের ভাল লাগিবে।

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

ভারত-মহিলা—১ম খণ্ড, শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত। দি ষ্টুডেন্টস্ এম্পোরিয়াম, ২০৪ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে শ্রীরামকৃষ্ণ সাহা, বি-এ কর্ত্তৃক প্রকাশিত। পৃঃ ১৫০; ১৩৩৮; মূল্য দুই টাকা।

এই নারী-জাগরণ ও নারী-প্রগতির দিনে প্রাচীন ভারতের "মহীয়সী মহিলা"দের কথা জানিতে সকলেরই ইচ্ছা হয়। গ্রন্থকার সেই উদ্দেশ্যে জীবনের নানা দিকে যে সব নারীর মহত্ত্ব ফুটিয়া উঠিয়াছিল তাঁহাদের পুণ্যকথা এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত করিয়াছেন। যদিও ভারতীয় বিদুষীদের কথাই এই গ্রন্থে বেশী করিয়া জানা যায় তবু কর্ম্ম ও সেবার ক্ষেত্রে যাঁহারা প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন তাঁহাদের কথাও দেওয়া হইয়াছে। বর্ত্তমান খণ্ডে বৈদিক যুগ, উপনিষদ্ যুগ পৌরাণিক যুগ ও বৌদ্ধযুগের সর্ব্বশুদ্ধ ৩৭ জন মহিলার কথা ও পরিচয় আছে। এই ধরণের বই বাংলাতে আরও আছে, কিন্তু গ্রন্থকার ধারাবাহিক ভাবে যে চেষ্টা করিতে ইচ্ছুক—"এইরূপ চেষ্টা ইহার পূর্ব্বে অনেকে করিয়াছেন; কিন্তু বিস্তারিত ভাবে ঐতিহাসিক ক্রম-পদ্ধতিক্রমে প্রকাশ করিবার উদ্যম বোধ হয় এই প্রথম।" তাঁহার এই সাধু উদ্দেশ্য সফল হইলে সকলেই সুখী হইবেন। যে-সব যুগের কথা এই গ্রন্থে আছে সে সময়কার কোন্ মহিলার জীবনী সত্যসত্যই ঐতিহাসিক এবং কোন মহিলার কথা ভারতীয় মনের উচ্চ আদর্শের পরিচায়ক মাত্র তাহা বুঝিয়া ওঠা শক্ত। সেইজন্য প্রাচীন ইতিহাস ও কাহিনী এমন করিয়া জড়াইয়া গিয়াছে যে দুটিকে আলাদা করিবার উপায় নাই। যথা, এই গ্রন্থের আত্রেয়ী ও সুমাগধার কথা শুধু নাটকের চরিত্র ও অবদানের গল্প বলিয়াই মনে হয়। সুতরাং এই গ্রন্থকে নারীজাতির ইতিহাস ও অবদান হিসাবে দেখিতে হইবে। বর্ণিত চরিত্রগুলি হইতে প্রাচীন ভারতীয় নারীর জীবনের আদর্শ অতি সুন্দরভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। একটি কথা বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার মত। ভারতীয় নারীরা যে 'অবলা' ছিলেন না, তাঁহাদের যে আত্মপ্রত্যয় ছিল তাহা সুলভা (পৃঃ ৬২) এবং বিশাখার (পৃঃ ৯১) কথায় জ্বলন্ত হইয়া আছে। যাহাতে সাধারণের মনোরঞ্জন হয় সেই চেষ্টায় এই বই লেখা হইয়াছে, সুতরাং ভাষা আরও সহজ হইলে ভাল হইত। "তুরঙ্গারোহণে"(পৃঃ ৫৩) ও "শীতাংশুশতমালা দ্বারা যেন জগৎ শীতল হইয়া গেল" (পৃঃ ১০৯) বিদ্যাসাগর মহাশয়ের যুগের কথা মনে করাইয়া দেয় না কি? গ্রন্থের নানা স্থানে সংস্কৃত ও পালি কবিতার অনুবাদ আছে এবং বাংলা কবিতাও কোথাও কোথাও উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাতে গ্রন্থের আদর বাড়িবে। বর্ণিত ঘটনা বুঝাইবার জন্য অনেকগুলি চিত্রও দেওয়া হইয়াছে। রামায়ণ মহাভারতের স্ত্রীচরিত্রগুলি সুপরিচিত বলিয়াই বোধ হয় গ্রন্থকার ঐ দুই মহাকাব্যের বেশী ব্যবহার করেন নাই। কিন্তু আমাদের মনে হয় আরও দুই চারিটি চরিত্র সন্নিবেশিত করিলে ভালই হইত—যথা, মহাভারতের উদ্যোগপর্ব্বের শৌবীর রাজমহিষী বিদুলার কথা। মোটের উপর গ্রন্থকারের উদ্যম খুব প্রশংসার যোগ্য।

শ্রীরমেশচন্দ্র বসু

দীপশিখা—শ্রীসুরেশ বিশ্বাস। প্রকাশক এম, সি, সরকার এণ্ড সন্স্, ১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। আট আনা।

কবিতার বই। কবিতাগুলি সরল ও সহজ। অনাবশ্যক শব্দাড়ম্বর বা কসরৎ নাই। পুস্তকে বিশেষ ভাব ও বিশেষ ভঙ্গী না থাকিলেও কবিতাগুলি সুখপাঠ্য।

কলিকাতায় চলাফেরা (সেকালে আর একালে)—শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর। আদি ব্রাহ্মসমাজ, ৫৫, আপার চিৎপুর রোড কলিকাতা। বারো আনা।

সেকাল ও একালের কলিকাতার সচিত্র পরিচয়। সেকাল বলিতে লেখক ত্রিশ চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বেকার কাল বলিয়াছেন; এবং সে সময়ে কলিকাতার রাস্তাঘাট কিরূপ ছিল তাহার বিবরণ ও সেই সঙ্গে একালের রাস্তাঘাটের পরিচয় ইহাতে দেওয়া হইয়াছে। কলিকাতা নগরীর ইতিহাসের একটা অধ্যায় হিসাবে পুস্তকটির মূল্য আছে।

আলোচ্য পুস্তকে আবর্জ্জনা অপসারণের পদ্ধতি, আগেকার ও এখনকার যান-বাহন, রাস্তাঘাটের ক্রমোন্নতি ইত্যাদি রাস্তা-সম্পর্কীয় বহু বিষয় বেশ সরল ভাষায় চিত্তাকর্ষকভাবে বিবৃত হইয়াছে। ইহাতে বহু জ্ঞাতব্য বিষয় সংগৃহীত হওয়ায় ইহা সাধারণের কৌতূহল পরিতৃপ্ত করিবে।

নমিতা—শ্রীযতীশচন্দ্র বসু। প্রকাশক শ্রীজগদীশচন্দ্র বসু, ৯৩।১ জি, বৈঠকখানা রোড, কলিকাতা। দশ আনা।

কবিতার বই। কবিতাগুলিতে তেমন কিছু বিশেষত্ব নাই। তবুও বইটি মন্দ লাগিল না। কয়েকটি কবিতা ভালই হইয়াছে।

জ্যেঠামহাশয়ের গল্প—শ্রীপরেশনাথ সেন। বরিশাল, আলেকান্দা হইতে গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত। বারো আনা।

ছেলেমেয়েদের উপযোগী শিক্ষাপ্রদ গল্পের সমষ্টি। কেবলমাত্র শিক্ষা দিবারই উদ্দেশ্যে গল্প লিখিতে বসিলে অনেক সময় গল্পের মাধুর্য্য নষ্ট হইয়া যায়। আলোচ্য পুস্তকের কয়েকটি গল্পে এই দোষ ঘটিয়াছে। পুস্তকটির ভাষাও সর্ব্বত্র সরল নহে। তবে ছেলেদের ভাল লাগিবার মত কয়েকটি গল্পও ইহাতে আছে। তাহা হইতে ছেলেরা শিক্ষালাভও করিতে পারিবে।

শ্রীপ্যারীমোহন সেন-গুপ্ত

আলাদীনের আশ্চর্য্য প্রদীপ—শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী প্রণীত। প্রকাশক 'জ্ঞান পাবলিশিং হাউস', ৪৪, বাদুড়বাগান ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ৫২ পৃষ্ঠা, মূল্য ।৵০ আনা।

আরব্যোপন্যাসের সেই বিখ্যাত গল্পটি লইয়া এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি লিখিত। বাজারে আরব্যোপন্যাসের বাংলা অনুবাদের অভাব নাই; কিন্তু দুই-একখানি ব্যতীত কোনটিই উল্লেখযোগ্য নহে। হয় ভাষার দোষে, নয় লেখার দোষে, কিংবা অশ্লীলতা দোষে প্রায়

প্রত্যেকখানিই দুষ্ট; নির্ভয়ে ছেলেদের হাতে তুলিয়া দিবার জো নাই। কিন্তু আরব্য-উপন্যাসের মত এমন অপূর্ব্ব-সুন্দর গল্প-গ্রন্থ বিশ্ব-সাহিত্যে দুর্লভ। পাশ্চাত্যে Galland, Burton, Lang, Payne, Cazotte, Weil, Von Hammer, Scott, Lane, Poole প্রভৃতি মনীষী প্রণীত ইহার অসংখ্য সুন্দর সংস্করণ বাহির হইয়াছে। আলোচ্য পুস্তকখানিতে কেবলমাত্র একটি গল্প আছে, তাও লেখার দোষে আড়ষ্ট ও প্রাণহীন হইয়াছে। ছাপার ভুল অনেকগুলি চোখে পড়িল। গল্পটি মোটেই জমাট বাঁধিতে পারে নাই।

তারাবাঈ—শ্রীমতী প্রীতিকণা দত্ত-জায়া প্রণীত। প্রকাশক ডেভেনহ্যাম এণ্ড কোং; ২০, কলেজ রো, কলিকাতা। ২৯ পৃষ্ঠা, মূল্য ।৵০ আনা।

লেখিকার গল্প বলিবার ও গল্প লিখিবার ক্ষমতার পরিচয় এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানিতে পাইলাম। রাজপুতদের গৌরবকাহিনী শিশুদের মধ্যে যতই প্রচারিত হয় ততই মঙ্গল। রাজপুত-বীরাঙ্গনা তারাবাঈয়ের জীবনকথা লেখিকা অতি সংক্ষেপে সহজ ও সুন্দর ভাষায় লিখিয়াছেন। গল্পের শেষাংশের প্রশান্ত বেদনার সুরটিও বেশ সুন্দরভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। ছাপা, কাগজ অতি সুন্দর। কতকগুলি রঙ্-বেরঙের ছবিও পুস্তকে দেওয়া হইয়াছে। আমাদের দেশের কিশোর-কিশোরীরা এই পুস্তকপাঠে বিশেষ উপকৃত হইবে।

শ্রীরমেশচন্দ্র দাস

বিদেশ প্রত্যাগত হিন্দু ও প্রায়শ্চিত্ত বিচার—শ্রীসূর্য্যকুমার তর্কসরস্বতী প্রণীত। শিলচর প্রেসে প্রিণ্টার শ্রীগোকুলচন্দ্র দাস দ্বারা মুদ্রিত। মূল্য ।০ আনা মাত্র।

এখনকার দিনে এই পুস্তকের কোন প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে হয় না। প্রায়শ্চিত্ত করিলেও বিদেশ-প্রত্যাগত ব্যক্তি সমাজে আদরণীয় হইবে কি না, এ বিচার এখন নিতান্তই হাস্যকর। বিশেষতঃ বঙ্গ যখন নিজেই পতিত দেশ।

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ বেদান্তবাগীশ

ভারতীর মন্দির—শ্রীমতিলাল রায়। প্রকাশক—প্রবর্ত্তক পাবলিশিং হাউস, ৬৬ নং মাণিকতলা ষ্ট্রীট্, কলিকাতা। পৃঃ ১৫৫ পাঁচ সিকা।

আটটি ছোট গল্পের সমষ্টি। সবগুলি কাহিনীকে ছোট গল্পের পর্য্যায়ে ফেলা না গেলেও যে তীব্র অথচ উদার স্বজাতি-প্রীতি প্রত্যেকটি কাহিনীতে প্রকাশ পাইয়াছে তাহার জন্যও অন্ততঃ এই বইখানি প্রত্যেক স্বজাতি-প্রেমিক নরনারীর অবশ্যপাঠ্য। কাহিনীগুলিকে সমষ্টিবদ্ধ ভাবে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করিয়া লেখক এবং প্রকাশক জাতির পরম কল্যাণসাধন করিয়াছেন। ছাপা ও বাঁধা উত্তম।

মুকুলিকা—কুমারী সিন্ধুবালা আতর্থী। প্রকাশক—শ্রীশচীন্দ্রচন্দ্র আতর্থী, তীস্তা রংপুর। পৃঃ ৬০, আট আনা।

কতকগুলি কবিতার সমষ্টি। গ্রন্থ-ভূমিকায় কবিশেখর শ্রীযুত কালিদাস রায় বলিতেছেন, "কবিতাগুলিতে ঋজুমতী জনপদ বালার স্বভাব সারল্য, স্বচ্ছ মধুর অনুভূতি ও নিবিড় আন্তরিকতার পরিচয় পাওয়া যায়।" বিশেষ করিয়া 'জ্যেষ্ঠা ভগিনীর পরিণয়ের পরে' শিরোলেখ দিয়া গ্রন্থকর্ত্রী যে কবিতা কয়টি লিখিয়াছেন সেগুলি অনুভূতি ও প্রকাশের দিক্ দিয়া জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ মৈত্র

মেঘমল্লার—শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। প্রকাশক—বরেন্দ্র লাইব্রেরী। মূল্য দুই টাকা।

পুস্তকখানি দশটি ছোট গল্পের সমষ্টি; অধিকাংশ গল্পই 'প্রবাসী' ও 'বিচিত্রা'তে বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত হইয়াছিল।

ভাষার সমৃদ্ধিতে এবং ভঙ্গীর মৌলিকতায় গল্পগুলি বড়ই উপভোগ্য। গল্পের বিষয়ের রেঞ্জ বেশ সুবিস্তৃত এবং ভাষাও বেশ পাল্লা দিয়া গিয়াছে। প্রথম গল্প দু'টিতে বৌদ্ধযুগের স্বরূপটি যে অত পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে, অনুরূপ ভাষা তাহার একটা প্রধান কারণ।

'মেঘমল্লার' 'অভিশপ্ত', 'বৌচণ্ডীর মাঠ' গল্প তিনটি অতিপ্রাকৃত বিষয় লইয়া; কিন্তু লেখার গুণে সত্য-মিথ্যা বিচারের কথাটা মনেই ওঠে না,—একটানা পড়িয়া শেষ করিয়া ছাড়িতে হয়।

'মেঘমল্লার' প্রথম গল্প। তাহাতে, আর প্রায় অন্য সমস্ত গল্পগুলিতেই একটা উদাস সুর আছে যাহা মনের কোথাও রণরণিয়া উঠিয়া খানিকটা অশ্রুর বাষ্প ঘনাইয়া তোলে। এদিক দিয়া বইয়ের নামটি বেশ সার্থক হইয়াছে। মাঝে মাঝে মূল গল্প ছাড়িয়া হঠাৎ গুটিকতক লাইন বসাইয়া দেওয়ার বেশ একটি ভঙ্গী আছে। মনে হয় অবান্তর, অথচ রসটি বেশ জমিয়া ওঠে। চালটি লেখকের একেবারে নিজস্ব। আর একটা—তাঁহার অরণ্য-প্রীতি। বিশাল, গম্ভীর অরণ্যানীর ত কথাই নাই, বাংলার ছোট ছোট বনঝাড় আর তা'দের ফুলপাতা—যা-লইয়া বাংলা—সে-সবের এমন সস্নেহ উল্লেখ আর কোথাও দেখি নাই।

প্রত্যেক গল্পই শেষ হওয়ার পরও মনটিকে খানিকক্ষণ টানিয়া রাখে;—পরেরটি সঙ্গে সঙ্গেই ধরা যায় না।

আমাদের সবচেয়ে ভাল লাগিল 'মেঘমল্লার' 'নাস্তিক' আর 'পুঁইমাচা'। 'নাস্তিক' বাংলা ভাষায় একটি অনুপম সৃষ্টি; একবার পড়িয়া মন ওঠে না।

সাধারণভাবে এগুলি বলার পর আরও দু-একটি কথা বলা দরকার। এমন চমৎকার ভাষা দু-এক জায়গায় যেন একটু ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। যেমন সরস্বতী দেবীর অঙ্গের আভা "জোনাকী পোকার ছল থেকে যেমন আলো বার হয়"—তাহার সহিত তুলনা না করিলেই ভাল হইত; আর "ঝিঁঝিঁ পোকার রব" কোন কিছুর সাক্ষী থাকা সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয় না। তবে এরকম ত্রুটি আর চোখে ঠেকিল না।

ছাপা, বাঁধাই, কাগজ ভালই, তবুও মূল্য কিছু অধিক। তাহা হইলেও সাহিত্যরসলিপ্সুদের বইখানি পড়িতে অনুরোধ করি।

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

অপরাজিত

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

৩৪

চৈত্র মাসের প্রথমে একটা বড় পার্টিতে সে নিমন্ত্রিত হইয়া গেল। খুব বড় বাড়ী, গাড়ী-বারান্দা, সামনের 'লনে' ছোট ছোট টেবিল ও চেয়ার পাতা, খানিকটা জায়গায় সামিয়ানা টাঙানো। নিমন্ত্রিত পুরুষ ও মহিলাগণ যাঁহার যেখানে ইচ্ছা বেড়াইতেছেন। একটা মার্ব্বেলের বড় চৌবাচ্চায় গোটাকতক লাল ফুল, ঠিক মাঝখানে একটা মার্ব্বেলের ফোয়ারা—গৃহকর্ত্রী তাহাকে লইয়া গিয়া জায়গাটা দেখাইলেন, সেটা নাকি তাঁদের 'লিলি পণ্ড'। তারপর জয়পুর হইতে ফোয়ারাটা তৈয়ারী করিয়া আনিতে কত খরচ পড়িয়াছে, তাহাও জানাইলেন।

পার্টির সকল আমোদপ্রমোদের মধ্যে একটি মেয়ের কণ্ঠ-সঙ্গীত সর্ব্বাপেক্ষা আনন্দদায়ক মনে হইল অপুর। একটি, দুটি, তিনটি অনেকগুলি গান গাহিল মেয়েটি। ব্রিজের টেবিলে সে যোগ দিতে পারিল না, কারণ ব্রিজখেলা সে জানে না, গান শেষ হইলে খানিকটা বসিয়া বসিয়া খেলাটা দেখিল। চা, কেক্, স্যাণ্ডউইচ, সন্দেশ, রসগোল্লা, গল্প-গুজব, আবার গান। ফিরিবার সময় মনটা খুব খুসি ছিল। ভাবিল—এদের পার্টিতে নেমন্তন্ন পেয়ে আসা একটা ভাগ্যের কথা। আমি লিখে নাম করেচি, তাই আমার হ'ল। যার তার হোক দিকি? কেমন চমৎকার কাট্‌ল সন্ধ্যেটা। আহা, খোকাকে আন্‌লে হ'ত, ঘুমিয়ে পড়বে এই ভয়ে আন্‌তে সাহস হ'ল না যে। খান দুই কেক্ খোকার জন্য চুপি-চুপি কাগজে জড়াইয়া পকেটে পুরিয়া রাখিয়াছিল, খুলিয়া দেখিল সে-গুলা ঠিক আছে কি না।

খোকা ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, ডাকিয়া উঠাইতে গিয়া বলিল, ও খোকা, খোকা, ওঠ্, খুব ঘুমুচ্চিস্ যে—হি হি—ওঠ রে। কাজলের ঘুম ভাঙিয়া গেল। যখনই সে বোঝে বাবা আদর করিতেছে, মুখে কেমন এক ধরণের মধুর দুষ্টামির হাসি হাসিয়া ঘাড় কাৎ করিয়া কেমন এক অদ্ভুত ভঙ্গী করিয়া আদরের প্রতীক্ষায় থাকে, আর এত আদর খাইতেও পারে।

অপু বলিল, শোন্ খোকা, গল্প করি, ঘুমুস্ নে—

কাজল হাসিমুখে বলে, বল দিকি বাবা একটা অর্থ?

হাত কন্ কন্ মাণিকলতা
এ ধন তুমি পেলে কোথা
রাজার ভাণ্ডারে নেই, বেণের দোকানে নেই—

অপু মনে মনে ভাবে—খোকা তুই। মুখে বলে, কি জানি, জাঁতি বুঝি?

—আহা হা, জাঁতি কি আর দোকানে পাওয়া যায়! তুমি বাবা কিচ্ছু জান না—

—ভাল কথা, কেক এনিচি, দ্যাখ বড়লোকের বাড়ীর কেক্, ওঠ—

—বাবা তোমার নামে একখানা চিঠি এসেচে, ঐ বইখানা তোলো তো?…

আর্টিষ্ট বন্ধুটির পত্র। বন্ধু লিখিয়াছে,—সমুদ্রপারের বৃহত্তর ভারতবর্ষ শুধু কুলী-আমদানীর সার্থকতা ঘোষণা করিয়া নীরব থাকিয়া যাইবে? তোমাদের মত আর্টিষ্ট লোকের এখানে আসার যে নিতান্ত দরকার। চোখ থাকিয়াও নাই শতকরা নিরানব্বুই জনের, তাই চক্ষুষ্মান মানুষদের একবার এ-সব স্থানে আসিতে বলি। পত্র পাঠ চলিয়া এস, ফিজিতে মিশনারীরা স্কুল খুলিতেছে, হিন্দি জানা ভারতীয় শিক্ষক চায়, দিনকতক মাষ্টারী তো ক'র, তারপর একটা কিছু ঠিক হইয়া যাইবে, কারণ চিরদিন মাষ্টারী করিবার মত শান্ত ধাত তোমার নয়, তা জানি। আসিতে বিলম্ব করিও না।

পত্র শেষ করিয়া সে খানিকক্ষণ কি ভাবিল, ছেলেকে বলিল, আচ্ছা খোকা, আমি তোকে ছেড়ে কোথাও যদি চলে যাই, তুই থাক্‌তে পার্‌বি নে? যদি তোকে মামার বাড়ী রেখে যাই?…

কাজল কাঁদ কাঁদ মুখে বলিল, হ্যাঁ তাই যাবে বৈকি! তুমি ভারী দেরী কর, কাশীতে বলে গেলে তিন দিন হবে, ক'দিন পরে এলে? না বাবা—

অপু ভাবিল অবোধ শিশু! এ কি কাশী? এ বহুদূর, দিনের কথা কি এখানে ওঠে? ...বছর বছর...থাক্, কোথায় যাইবে সে? কার কাছে রাখিয়া যাইবে খোকাকে? অসম্ভব!

কাজল ঘুমাইয়া পড়িল। ছাদে উঠিয়া সে অনেকক্ষণ একা বসিয়া রহিল।

দূরে বাড়ীটার মাথায় সার্কুলার রোডের দিকে ভাঙা চাঁদ উঠিতেছে, রাত্রি বারোটার বেশী—নীচে একটা মোটর লরি ঘস্ ঘস্ আওয়াজ করিতেছে। এই রকম সময়ে এই রকম ভাঙা চাঁদ উঠিত দূরের জঙ্গলের মাথায়, পাহাড়ের একটা জায়গা, যেখানে উটের পিঠের মত ফুলিয়া উঠিয়াই পরে বসিয়া গিয়া একটা খাঁজের সৃষ্টি করিয়াছে—সেই খাঁজটার কাছে পাহাড়ী ঢালুতে বাদাম গাছের বনে দিনমানে পাকা পাতায় বনশীর্ষ যেখান রক্তাভ দেখায়! এতক্ষণে বন-মোরগেরা ডাকিয়া উঠিত, কক্ কক্ কক্—

সে মনে মনে কল্পনা করিবার চেষ্টা করিল, সার্কুলার রোড নাই, বাড়ীঘর নাই, মোটর লরির আওয়াজ নাই, ব্রিজের আড্ডা নাই, লিলি পণ্ড নাই, তার ছোট্ট খড়ের বাংলো ঘরখানায় রামচরিত মিশ্র মেজেতে ঘুমাইতেছে, সাম্নে পিছনে ঘন অরণ্যভূমি, নির্জ্জন, নিস্তব্ধ, আধ-অন্ধকার রাত্রি। সঙ্গে সঙ্গে মনে আসিল সেই মুক্তি, সেই রহস্য, সে সব অনুভূতি, ঘোড়ার পিঠে মাঠের পর মাঠ, উদ্দাম গতিতে ছুটিয়া চলা, সেই দৃঢ়, পরিচ্ছন্ন, পৌরুষ জীবন আকাশের সঙ্গে ছায়াপথের সঙ্গে, নক্ষত্রজগতের সঙ্গে প্রতি সন্ধ্যায় প্রতি রাত্রে সে অপূর্ব্ব মানসিক সম্পর্ক।

এ কি জীবন সে যাপন করিতেছে এখানে? প্রতিদিন একই রকম একঘেয়ে নীরস, বৈচিত্র্যহীন, আজও যা, কালও তা। অর্থহীন কোলাহলে ও সার্থকতাহীন ব্রিজের আড্ডার আবহাওয়ার, টাকা রোজগারের মৃগতৃষ্ণিকায় লুব্ধ জীবন-নদীর শুদ্ধ, সহজ, সাবলীল ধারা যে দিনে দিনে শুকাইয়া আসিতেছে, এ কি সে বুঝিয়াও বুঝিতেছে না?

ঘুমের ঘোরে কাজল বিছানার মাঝখানে আসিয়া পড়িয়াছে, তাহাকে এক পাশে সরাইয়া শোয়াইল। একেই ত সুন্দর, তার উপর কি সুন্দর যে দেখাইতেছে খোকাকে ঘুমন্ত অবস্থায়—যত পবিত্রতা, যত নিষ্পাপতা ওর মুখে...

দিন দুই পরে সে কি কাজে হ্যারিসন্ রোড দিয়া চিৎপুরের দিকে ট্রামে চড়িয়া যাইতেছিল, মোড়ের কাছে শীলেদের বাড়ীর রোকড়-নবিশ রামধনবাবুকে ছাতি মাথায় যাইতে দেখিয়া সে তাড়াতাড়ি ট্রাম হইতে নামিল, কাছে গিয়া বলিল, কি রামধনবাবু, চিন্‌তে পারেন? রামধনবাবু হাত তুলিয়া নমস্কার করিয়া বলিলেন, আরে অপূর্ব্ববাবু যে! তারপর কোথা থেকে আজ এতকাল পরে! ওঃ আপনি একটু অন্যরকম দেখতে হয়ে গিয়েছেন, তখন ছিলেন ছোক্‌রা—

অপু হাসিয়া বলিল—তা বটে। এদিকেও চৌত্রিশ পঁয়ত্রিশ হ'ল—কতকাল আর ছোক্‌রা থাক্‌ব—আপনি কোথায় চলেচেন?

—আপিস যাচ্চি, বেলা প্রায় এগারোটা বাজে—না? একটু দেরী হয়ে গেল। একদিন আসুন না? কতদিন তো কাজ করেচেন, আপনার পুরোণো আপিস, হঠাৎ চাকরীটা দিলেন ছেড়ে, তা নইলে আজ এসিষ্টেণ্ট ম্যানেজার হতে পারতেন, হরিচরণবাবু মারা গিয়েচেন কি না।

সত্যিই বটে বেলা সাড়ে দশটা। রামধনবাবু পুরোণো দিনের মত ছাতিমাথায়, লংক্লথের ময়লা ও হাতা ছেঁড়া পাঞ্জাবী গায়ে, ক্যাম্বিসের জুতা পায়ে দিয়া অপু দশ বৎসর পূর্ব্বে যে আপিসটাতে কাজ করিত, সেখানে গুটি গুটি চলিয়াছেন।

অপু জিজ্ঞাসা করিল, রামধনবাবু, কতদিন কাজ হ'ল ওদের ওখানে আপনার সবশুদ্ধ?

রামধনবাবু পুরাণো দিনের মত গর্ব্বিতস্বরে বলিলেন, এই সাঁইত্রিশ বছর যাচ্চে। কেউ পারবে না বলে দিচ্চি,—এক কলমে এক সেরেস্তায়। আমার দ্যাখতায় পাঁচ পাঁচটা ম্যানেজার বদল হ'ল—কত এল, কত গেল—

আমি ঠিক বজায় আছি। এ শর্ম্মার চাকরী ওখান থেকে কেউ নড়াতে পারচেন না—যিনিই আসুন। হাসিয়া বলিলেন,—এবার মাইনে বেড়েচে, এই পঁয়তাল্লিশ হ'ল।

অপুর মাথা কেমন ঘুরিয়া উঠিল—সাঁইত্রিশ বছর একই অন্ধকার ঘরে, একই হাতবাক্সের উপর ভারী খেরো বাঁধানো রোকড়ের খাতা খুলিয়া বালি ও ষ্টিলপেনের সাহায্যে শীলেদের সংসারের চালডালের হিসাব লিখিয়া চলা—চারিধারে সে একই দোকান-পসার, একই পরিচিত গ'ল, একই সহকর্ম্মীর দল, একই কথা ও আলোচনা বারোমাস, তিনশো ত্রিশ দিন!··· সে ভাবিতে পারে না—এই বদ্ধজল, পঙ্কিল, পচা পানা পুকুরের মত গতিহীন, প্রাণহীন, ক্ষুদ্র জীবনের কথা ভাবিলেও তাহার গা কেমন করিয়া উঠে!

বেচারী রামধনবাবু দরিদ্র বৃদ্ধ, ওর দোষ নাই, তাও সে জানে! কলিকাতার বহু শিক্ষিতসমাজে আড্ডায় ক্লাবে সে মিশিয়াছে। বৈচিত্র্যহীন, একঘেয়ে জীবন—অর্থহীন, অপবিত্র, ছন্দহীন—কি ঘটনাবিহীন দিনগুলি! শুধু টাকা, টাকা,—শুধু খাওয়া, পানাসক্তি, ব্রিজখেলা, ধূমপান, একই তুচ্ছ বিষয়ে একঘেয়ে অসার বকুনি—তরুণ মনের শক্তিকে নষ্ট করিয়া দেয়, আনন্দকে ধ্বংস করে, দৃষ্টিকে সঙ্কীর্ণ করে, শেষে ঘোর কুয়াসা আসিয়া সূর্য্যালোককে রুদ্ধ করিয়া দেয়—ক্ষুদ্র পঙ্কিল, অকিঞ্চিৎকর জীবন কোনো রকমে খাত বাহিয়া চলে। ··সে শক্তিহীন নয়—এই পরিণাম হইতে সে নিজেকে বাঁচাইবে।

তারপর সে রামধনবাবুর অনুরোধে ও কতকটা কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়া শীলেদের বাড়ী গেল। সেই আপিস, ঘরদোর, লোকের দল বজায় আছে। খুব আদর অভ্যর্থনা করিল সকলে। মেজবাবু কাছে বসাইয়া জিজ্ঞাসাবাদ করিলেন। বেলা এগারটা বাজে, তিনি এই মাত্র ঘুম হইতে উঠিয়াছেন—বিলিয়ার্ড ঘরের সামনের বারান্দাতে চাকর তাঁহাকে এখনই তৈল মাখাইবে, বড় রূপার গুড়গুড়ীতে রেশমের গলাবন্দ-ওয়ালা নলে বেহারা তামাক দিয়া গেল।

এ বাড়ীর একটি ছেলেকে অপু পূর্ব্বে দিনকতক পড়াইয়াছিল, তখন সে ছোট ছিল, বেশ সুন্দর দেখিতে ছিল—ভারী পবিত্র মুখশ্রী ছিল, স্বভাবটিও ছিল ভারী মধুর! সে এখন আঠার উনিশ বছরের ছেলে, কাছে আসিয়া পায়ের ধূলা লইয়া প্রণাম করিল—অপু দেখিয়া ব্যথিত হইল যে, সে এই সকালেই অন্তত দশটা পান খাইয়াছে—পান খাইয়া খাইয়া ঠোঁট কালো—হাতে রূপার পানের কৌটা—পান ও জর্দ্দা। এবার টেষ্ট পরীক্ষায় ফেল করিয়াছে, খানিকক্ষণ কেবল নানা ফিল্মের গল্প করিল, বাষ্টার কিটন্‌কে মাষ্টারমশায়ের কেমন লাগে?··· চার্লি চ্যাপলিন? নর্ম্মা শিয়ারার—ও সে অদ্ভুত! এখনও সে ছেলেমানুষ—সম্পূর্ণ সরলভাবে আগ্রহের সহিত সে ডগলাস ফেয়ারব্যাঙ্কস্‌ সম্বন্ধে মাষ্টারমশায়ের মতামত জিজ্ঞাসা করিল, তাহার উত্তর সাগ্রহে শুনিল!

ফিরিবার সময় অপুর মনটা বেদনায় পূর্ণ হইয়া গেল। বালক, উহার দোষ কি? এই আবহাওয়ায় খুব বড় প্রতিভাও শুকাইয়া যায়—ও তো অসহায় বালক—ওর দোষ কি?···

রামধনবাবু বলিলেন, চল্‌লেন অপূর্ব্ববাবু? নমস্কার, আস্‌বেন মাঝে মাঝে।

গলির বাহিরে সেই পচা খড় বিচালী, পচা আপেলের খোলা, শুঁটকি মাছের গন্ধ।

রাত্রিতে অপুর মনে হইল সে একটা বড় অন্যায় করিতেছে, কাজলের প্রতি একটা গুরুতর অবিচার করিতেছে। ওরও ত সেই শৈশব। কাজলের এই অমূল্য শৈশবের দিনগুলিতে সে তাহাকে এই ইট, কংক্রিট, সিমেণ্ট ও বার্ড কোম্পানীর পেটেণ্ট ষ্টোনে বাঁধানো কারাগারে আবদ্ধ রাখিয়া দিনের পর দিন তাহার কাঁচা, উৎসুক, স্বপ্নপ্রবণ শিশুমন তুচ্ছ বৈচিত্র্যহীন অনুভূতিতে ভরাইয়া তুলিতেছে—তাহার জীবনে বন-বনানী নাই, নদীর মর্ম্মর নাই, পাখীর কলস্বর, মাঠ, জ্যোৎস্না, সঙ্গীসাথীদের সুখদুঃখ—এ-সব কিছুই নাই, অথচ কাজল অতি সুন্দর ভাবপ্রবণ স্নেহপ্রবণ বালক—তাহার পরিচয় সে অনেকবার পাইয়াছে।

কাজল দুঃখ জানুক, জানিয়া মানুষ হোক্। দুঃখ তার শৈশবে গল্পে-পড়া সেই সোনা-করা যাদুকর। ছেঁড়া-খোঁড়া কাপড়, ঝুলিঘাড়ে বেড়ায়, এই চাঁপদাড়ি, কোণে

কাঁদাড়ে ফেরে, কারুর সঙ্গে কথা কয় না, কেউ পোঁছে না, সকলে পাগল বলে, দূর দূর করে, রাতদিন হাপর জ্বালায়, রাতদিন হাপর জ্বালায়!

পেতল থেকে, রাং থেকে, সীসে থেকে ও-লোক কিন্তু সোনা করতে জানে, করিয়াও থাকে।

নিশ্চিন্দিপুর একবারটি ফিরিবার সঙ্কল্প সে একটু শীঘ্রই করিয়া ফেলিল। কাশীতে লীলাদিকে পঁচিশ টাকা পাঠাইয়া দিয়া লিখিল, পত্রপাঠ যেন লীলাদি তার দেওরকে সঙ্গে লইয়া কলিকাতায় চলিয়া আসে, অপু শীঘ্রই ছেলেকে তার পিতামহের ভিটা দেখাইতে চায়, লীলাদি যেন কাল বিলম্ব না করে।

৩৫

ট্রেনে উঠিয়া যেন অপুর বিশ্বাস হইতেছিল না, সে সত্যই নিশ্চিন্দিপুরের মাটিতে আবার পা দিতে পারিবে—নিশ্চিন্দিপুর, সে তো শৈশবের স্বপ্নলোক! সে তো মুছিয়া গিয়াছে, মিলাইয়া গিয়াছে, সে শুধু একটা অনতিস্পষ্ট সুখস্মৃতি মাত্র, কখনও ছিল না, নাই ও।

মাঝেরপাড়া ষ্টেশনে ট্রেন আসিল বেলা একটার সময়। খোকা লাফ দিয়া নামিল, কারণ প্লাটফর্ম্ম খুব নীচু। অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে ষ্টেশনটার, প্ল্যাটফর্ম্মের মাঝখানে জাহাজের মাস্তলের মত উঁচু যে সিগ্‌নালটা ছেলেবেলায় তাহাকে তাক্ লাগাইয়া দিয়াছিল, সেটা আর এখন নাই। ষ্টেশনের বাহিরে পথের ওপর একটা বড় জাম গাছ, অপুর মনে আছে, এটা আগে ছিল না। ওই সে বড় মাদার গাছটা, যেটার তলায় অনেককাল আগে তাহাদের এদেশ ছাড়িবার দিনটাতে মা খিচুড়ী রাঁধিয়াছিল। গাছের তলায় দুখানা মোটর বাস্ যাত্রীর প্রত্যাশায় দাঁড়াইয়া, অপুরা দাঁড়াইয়া থাকিতে থাকিতে দুখানা পুরাণো ফোর্ড ট্যাক্সিও আসিয়া জুটিল। আজকাল নাকি নবাবগঞ্জ পর্য্যন্ত বাস্ ও ট্যাক্সি হইয়াছে, জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল। জিনিষটা অপুর কেমন যেন ভাল লাগিল না। কাজল নবীনযুগের মানুষ, সাগ্রহে বলিল—মোটর কার্টে করে যাব বাবা? অপু ছেলেকে জিনিষপত্র সমেত ট্যাক্সিতে উঠাইয়া দিল, বটের ঝুরি দোলানো স্নিগ্ধ ছায়াভরা সেই প্রাচীন দিনের পথটা দিয়া নিজে সে মোটরে চড়িয়া যাইতে পারিবে না কখনই। এ দেশের সঙ্গে পেট্রোল গ্যাসের গন্ধ কি খাপ্ খায়?

এই সেই বেত্রবতী! এমন মধুর স্বপ্নভরা নামটি কোন্ নদীর আছে পৃথিবীতে? খেয়া পার হইয়া আবার সেই আষাঢ়ুর বাজার। ডিডোল ও ডান্‌লপ্ টায়ারের বিজ্ঞাপন-ওয়ালা পেট্রোলের দোকান নদীর ওপরেই। বাজারেরও চেহারা অনেক বদল হইয়া গিয়াছে। তেইশ বছর আগে এত কোঠাবাড়ী ছিল না। আষাঢ়ু হইতে হাঁটিয়া যাওয়া সহজ, মাত্র দু মাইল, জিনিষপত্রের জন্য একটা মুটে পাওয়া গেল, মোটর বাস্ ও ট্যাক্সির দরুণ ভাড়াটিয়া গরুর গাড়ী আজকাল নাকি এদেশ হইতে উঠিয়া গিয়াছে। মুটে বলিল—ধঞ্চে-পলাশগাছির ওই কাঁচা রাস্তাটা দিয়ে যাবেন্ তো বাবু? ধঞ্চে-পলাশগাছি?···নামটাই সে কতকাল শোনে নাই, এতদিন মনেও ছিল না। উঃ, কতকাল পরে এই অতি সুন্দর নামটা সে আবার শুনিতেছে।···

চৈত্রের শেষ, বেলা পড়িয়া আসিয়াছে, এমন সময়ে পথটা সোনাডাঙা মাঠের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল—পাশেই মধুখালির বিল—পদ্মবনে ভরিয়া আছে। এই সেই অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যভূমি, সোনাডাঙার স্বপ্নমাখানো মাঠটা সে বিশ্রাম করিবার ছুতায় ক্ষুধার্ত্ত চোখে খানিকক্ষণ বসিয়া বসিয়া দেখিল—মনে হইল এত জায়গায় তো বেড়াইল, এমন অপরূপ মাঠ ও বন কই কোথাও তো দেখে নাই! সেই বনঝোপ, ঢিবি, কুঁচবন, ফুলে-ভর্ত্তি বাব্‌লা গাছ—বৈকালের এ কি অপূর্ব্ব রূপ!

তার পরই দূর হইতে ঠাকুরঝি-পুকুরের সেই ঠ্যাঙাড়ে বট গাছটার উঁচু ঝাঁকড়া মাথাটা নজরে পড়িল—যেন দিক্-সমুদ্রে ডুবিয়া আছে—ওর পরেই নিশ্চিন্দিপুর··· ক্রমে বটগাছটা পিছনে পড়িল—অপুর বুকের রক্ত চল্‌কাইয়া যেন মাথায় উঠিতে চাহিতেছে, সারা দেহ এক অপূর্ব্ব অনুভূতিতে যেন অবশ হইয়া আসিতেছে। ক্রমে মাঠ শেষ হইল, ঘাটের পথের সেই আমবাগানগুলা—সে রুমাল কুড়াইবার ছলে পথের মাটি একটু তুলিয়া মাথায়

ঠেকাইল। ছেলেকে বলিল—এই হল তোমার ঠাকুরদাদার গাঁ, খোকা, ঠাকুরদাদার নামটা মনে আছে তো—বল তো বাবা কি ?

কাজল হাসিয়া বলিল—শ্রীহরিহর রায়, আহা, তা কি আর মনে আছে ? অপু বলিল, শ্রী নয় বাবা, ঈশ্বর বল্‌তে হয়, শিখিয়ে দিলাম যে সেদিন ?—

রাণুদির সঙ্গে দেখা হইল পরদিন বৈকালে।

সাক্ষাতের পূর্ব্ব ইতিহাসটা কৌতুকপূর্ণ, কথাটা রাণীর মুখেই শুনিল।

রাণী অপু আসিবার কথা শোনে নাই, নদীর ঘাট হইতে বৈকালে ফিরিতেছে, বাঁশবনের পথে কাজল দাঁড়াইয়া আছে, সে একা গ্রামে বেড়াইতে বাহির হইয়াছে।

রাণী প্রথমটা থতমত খাইয়া গেল—অনেককাল আগেকার একটা ছবি অস্পষ্ট মনে পড়িল—ছেলেবেলায় ওই ঘাটের ধারের জঙ্গলে ভরা ভিটাটাতে হরিকাকারা বাস করিত, কোথায় যেন তাহারা উঠিয়া গিয়াছিল তারপরে। তাদের বাড়ীর সেই অপু না ?···ছেলে বেলার সেই অপু ? পরক্ষণেই সামলাইয়া লইয়া সে কাছে গিয়া ছেলেটির মুখের দিকে চাহিল—অপুও বটে, নাও বটে। যে বয়সে সে গ্রাম ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছিল তার সে সময়ের চেহারাখানা রাণীর মনে আঁকা আছে, কখনও ভুলিবে না—সেই বয়স, অনেকটা সেই চেহারা অবিকল। রাণী বলিল—তুমি কাদের বাড়ী এসেছ খোকা ?

কাজল বলিল—গাঙ্গুলীদের বাড়ী—

রাণী ভাবিল গাঙ্গুলীরা বড়লোক, কলিকাতা হইতে কেহ কুটুম্ব আসিয়া থাকিবে, তাদেরই ছেলে। কিন্তু মানুষের মতও মানুষ হয় ? বুকের ভিতরটা ছাঁৎ করিয়া উঠিয়াছিল একেবারে। গাঙ্গুলীবাড়ীর বড় মেয়ের নাম করিয়া বলিল—তুমি বুঝি কানুপিসির নাতি ?

কাজল লাজুক চোখে চাহিয়া বলিল—কানুপিসি কে জানিনে তো ? আমার ঠাকুরদাদার এই গাঁয়ে বাড়ী ছিল—তাঁর নাম ৺হরিহর রায়—আমার নাম শ্রীঅমিতাভ রায়।

বিস্ময়ে ও আনন্দে রাণীর মুখ দিয়া কথা বাহির হইল না অনেকক্ষণ, সঙ্গে সঙ্গে একটা অজানা ভয়ও হইল। রুদ্ধনিঃশ্বাসে বলিল তোমার বাবা—খোকা ?···

কাজল বলিল—বাবার সঙ্গেই তো কাল এলাম। গাঙ্গুলীবাড়ীতে এসে উঠলাম রাত্রে। বাবা ওদের বাইরের ঘরে বসে গল্প করচে, মেলা লোক দেখা করতে এয়েচে কি না, তাই।

রাণী দুই হাতের তেলোর মধ্যে কাজলের সুন্দর মুখখানা লইয়া আদরের সুরে বলিল—খোকন, খোকন, ঠিক বাবার মত দেখ্‌তে—চোখ দুটি তো অবিকল! তোমার বাবাকে এ পাড়ায় ডেকে নিয়ে এস খোকন্। বল গে রাণুপিসি ডাক্‌চে। সন্ধ্যার আগেই ছেলের হাত ধরিয়া অপু রাণীদের বাড়ী ঢুকিয়া বলিল—কোথায় গেলে রাণুদি, চিন্‌তে পার ?···রাণী ঘরের ভিতর হইতে ছুটিয়া আসিল, অবাক্ হইয়া খানিকক্ষণ তাহার দিকে চাহিয়া রহিল, বলিল—মনে করে যে এলি এতকাল পরে ?···তা ও'পাড়ায় গিয়ে উঠ্‌লি কেন ? গাঙ্গুলীরা আপনার লোক হ'ল তোর ?··· পরে লীলাদির মত সেও কাঁদিয়া ফেলিল।

কি অদ্ভুত পরিবর্ত্তন! অপুও অবাক্ হইয়া দেখিতেছিল, চোদ্দ বছরের সে বালিকা রাণুদি কোথায়! বিধবার বেশ, বাল্যের সে লাবণ্যের কোনো চিহ্ন না থাকিলেও রাণী এখনও সুন্দরী—কিন্তু এ যেন সম্পূর্ণ অপরিচিত, শৈশব-সঙ্গিনী রাণুদির সঙ্গে ইহার মিল কোথায় ?···এই সেই রাণুদি।···সে কিন্তু সকলের অপেক্ষা আশ্চর্য্য হইল ইহাদের বাড়ীটার পরিবর্ত্তন দেখিয়া। ভুবন মুখুয্যেরা ছিলেন অবস্থাপন্ন গৃহস্থ, ছেলেবেলার সে আট দশটা গোলা, প্রকাণ্ড চণ্ডীমণ্ডপ, গরুবাছুর, লোকজনের কিছুই নাই। চণ্ডীমণ্ডপের ভিটা মাত্র পড়িয়া আছে, পশ্চিমের কোঠা ভাঙিয়া কাহারা ইট লইয়া গিয়াছে—বাড়ীটার ভাঙা, ধসা, ছন্নছাড়া চেহারা, এ কি অদ্ভুত পরিবর্ত্তন!

রাণী সজলচোখে বলিল—দেখ্‌চিস্ কি, কিছু নেই আর। মা বাবা মারা গেলেন, টুনু, খুড়ীমা এঁরাও গেলেন, সতুর মা-ও মারা গেল, সতু মানুষ হ'ল না তো, এতদিন বিষয় বেচে বেচে চালাচ্চে। আমারও—

অপু বলিল—হাঁ, লীলাদির কাছে সব শুনলাম সেদিন কাশীতে—

—কাশীতে! দিদির সঙ্গে দেখা হয়েচে তোর? কবে—কবে?···

পরে অপুর মুখে সব শুনিয়া সে ভারী খুসি হইল। দিদি আসিতেছে তাহা হইলে? কতকাল দেখা হয় নাই।

রাণী বলিল—বৌ কোথায় থাকে? বাসায়—তোর কাছে?

অপু হাসিয়া বলিল—স্বর্গে!

—ও আমার কপাল! কতদিন? আর বিয়ে করিস্ নি আর?···

সেইদিনই আবার বৈকালে চড়ক। আর তেমন জাঁকজমক হয় না, চড়কগাছ পুতিয়া কেহ ঘুরপাক খায় না। সে বাল্যমন কোথায়, মেলা দেখার অধীর আনন্দে ছুটিয়া যাওয়া—সে মনটা আর নাই, কেবল সে সব অর্থহীন আশা, উৎসাহ, অপূর্ব্ব অনুভূতির স্মৃতিটা মাত্র আছে। এখন যেন সে দর্শক আর বিচারক মাত্র, চব্বিশ বৎসরে মনটা কেমন বদলাইয়া গিয়াছে, বাড়িয়াছে-তাহার একটা মাপ-কাঠি আজ পাইয়া দেখিয়া অবাক হইয়া গেল। চড়কতলায় পুরাণো আমলের কত পরিচিত বন্ধু নাই, নিবারণ গোয়ালা লাঠি খেলিত, ক্ষেত্র কাপালী বহুরূপীর সাজ দিত, হারাণ মাল বাঁশের বাঁশি বাজাইয়া বিক্রয় করিত, ইহারা কেহ আর নাই, কেবল পুরাতনের সঙ্গে একটা যোগ এখনও আছে। চিনিবাস বৈরাগী এখনও তেলে-ভাজা খাবারের দোকান করে।

আজ চব্বিশ বছর আগে এই চড়কের মেলার পরদিনই তারা গ্রাম ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছিল—তারপর কত ঘটনা, কত দুঃখ বিপদ, কত নূতন বন্ধুবান্ধব সব, গোটা জীবনটাই—কিন্তু কেমন করিয়া এত পরিবর্ত্তনের মধ্যে দিয়াও সেই দিনটির অনুভূতিগুলির স্মৃতি এত সজীব, টাট্‌কা, তাজা অবস্থায় আজ আবার ফিরিয়া আসিল!

সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। চড়কের মেলা দেখিয়া হাসি-মুখে ছেলেমেয়েরা ফিরিয়া যাইতেছে, কারও হাতে বাঁশের বাঁশি কারও বা হাতে মাটির রং করা ছোবা পাল্‌কী। একদল গেল গাঙ্গুলীপাড়ার দিকে, একদল সোনাডাঙা মাঠের মাটির পথ বাহিয়া, ছাতিম বনের তলায় তলায় ধুলজুড়ি মাধবপুরের খেয়াঘাটে—চব্বিশ বছর আগে যাহারা ছিল ছোট, এই রকম মেলা দেখিয়া ভেঁপু বাজাইতে বাজাইতে তেলেভাজা জিবে গজা হাতে ফিরিয়া গিয়াছিল, তাহারা অনেকদিন বড় হইয়া নিজ নিজ কর্ম্মক্ষেত্রে ঢুকিয়া পড়িয়াছে—কেউ বা মারা গিয়াছে, আজ তাদের ছেলেমেয়ের দল ঠিক আবার তাহাই করিতেছে, মনে মনে আজিকার এই নিষ্পাপ, দায়িত্বহীন জীবন-কোরকগুলিকে সে আশীর্ব্বাদ করিল।

খোকাকে লইয়া রোজ রোজ বেড়াইতে বাহির হইয়া বনের গাছপালা চিনাইয়া দেয়, বাল্যের পুরাতন সঙ্গী হাপরমণি লতার ফুল, আলকুশী, কেলে-কোঁড়ার ফুল, সোদালি বন··· চলিতে চলিতে শরীর শিহরিয়া উঠে, নদীর ধারের সুগন্ধ তৃণভূমিতে চুপ করিয়া হাতে মাথা রাখিয়া শুইয়া থাকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা, কিছুই করে না, রৌদ্রভরা নীল আকাশটার দিকে চাহিয়া শুধু চুপ করিয়া থাকে—কিছু ভাবেও না···আবার যেন ছেলেমানুষ হইয়া যায় সবুজ ঘাসের মধ্যে মুখ ডুবাইয়া মনে মনে বলে—ওগো মাতৃভূমি, তুমি ছেলেবেলায় যে অমৃতদানে মানুষ করেছিলে, সেই অমৃত হ'ল আমার জীবন-পথের পাথেয়—তোমার এই বনের ছায়ায় আমার সকল স্বপ্ন জন্ম নিয়েছিল একদিন, তুমি আবার শক্তি দাও, হে শক্তিরূপিনী।

দুঃখ হয় কলিকাতার ছাত্রদুটির জন্য। এদের বাপের বাড়ী বৌবাজারে, মামার বাড়ী পটুয়াটোলায়, পিসির বাড়ী বাগবাজারে—বাংলাদেশকে দেখিল না কখনও। এরা কি মাধবপুর গ্রামের উলুখড়ের মাঠের ও-পারের আকাশে রং ধরা দেখিল? স্তব্ধ শরৎ-দুপুরে ঘন বনানীর মধ্যে ঘুঘুর ডাক শুনিয়াছে? বন-অপরাজিতা ফুলের নীরব মহোৎসব এদের শিশু আত্মায় তার আনন্দের স্পর্শ দিয়াছে কোনো কালে? ছোট্ট মাটির ঘরের দাওয়ায় আসনপিঁড়ি বসিয়া নারিকেল-পত্রশাখায় জ্যোৎস্নার কাঁপন দেখে নাই কখনও?···এরা অতি হতভাগ্য।

বৈশাখের প্রথমেই লীলা তার দেওরের সঙ্গে নিশ্চিন্দিপুরে আসিল। দুই বোনে অনেকদিন পরে দেখা, দুই জনে গলা জড়াইয়া কাঁদিতে বসিল: অপুকে লীলা বলিল—তোর মনে যে এত ছিল, তা তখন কি জানি? তোর কল্যাণেই বাপের ভিটে আবার দেখলুম, কখনও আশা ছিল না যে আবার দেখব। খোকার জন্য কাশী হইতে সে একরাশ খেল্‌না ও খাবার আনিয়াছে, দিন কয়েক মহা খুসির সহিত পাড়ায় পাড়ায় ঘুরিয়া সকলের সঙ্গে দেখাশুনা করিল।

অপু এক একদিন বৈকালে ছেলেকে লইয়া নৌকায় খাবরা-পোতার ঘাট পর্য্যন্ত বেড়াইতে যায়। প্রকৃতির সঙ্গে ভাল করিয়া পরিচয় করাইয়া দিতে হইবে ছেলেকে। নদীজলের আর্দ্র সুগন্ধ উঠে, তেঁতুলতলার ঘাটের পাশে দক্ষিণদেশের ঝিনুকতোলা বড় নৌকা বাঁধা, হাওয়ায় আলকাৎরা ও গাবের রস মাখানো বড় ডিঙিগুলার শৈশবের সেই অতি পুরাতন বিস্মৃত গন্ধ···নদীর উত্তর পারে ক্রমাগত নলবন, ওকড়া ও বন্যেকুড়োর গাছ, ঢালু ঘাসের জমি জলের কিনারা ছুঁইয়া আছে, মাঝে মাঝে ঝিঙে পটলের ক্ষেতে উত্তরে মজুরেরা টোকা মাথায় নিড়ান দেয়, এক এক স্থানে নদীর জল ঘন কালো, নিথর, কলার পাটীর মত সমতল—যেন মনে হয় নদী এখানে গহন, গভীর, অতলস্পর্শ,—ফুলেভরা উলুখড়ের মাঠ, আকন্দবন, ডাঁসা খেজুরের কাঁদি দুলানো খেজুর গাছ, উইটিবি, বকের দল, উঁচু শিমুল ডালে চিলের বাসা—সবাই দূরের মাঠের দিক হইতে বড় এক ঝাঁক শামকুট পাখী রোজ এ সময় মধুখালির বিলের দিকে যায়—একটা বাব্‌লাগাছে অজস্র বনধুঁধুল ফল দুলিতে দেখিয়া খোকা একদিন আঙুল দিয়া দেখাইয়া বলিল—ওই দেখ বাবা, সেই যে কলকাতায় আমাদের গলির মোড়ে বিক্রী হয় গায়ে সাবান মাখবার জন্যে, কত ঝুলচে দেখ, ও কি ফল বাবা?

অপু কিন্তু নির্ব্বাক হইয়া বসিয়া ছিল। কতকাল সে এ সব দেখে নাই!···পৃথিবীর এই মুক্ত স্বরূপ তাহাকে যে আনন্দ দেয়, সে আনন্দ উগ্রবীর্য্য সুরার মত নেশার ঘোর আনে তাহার শিরার রক্তে, তাহা অভিভূত করিয়া ফেলে, আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে, তাহা অবর্ণনীয়। ইহাদের গোপনবাণী শুধু তাহারই মনের কানে কানে যে মুখে তাহা বলিয়া বুঝাইবে সে কাহাকে?

দূর গ্রামের জাওরা বাঁশের বন অস্ত-আকাশের রাঙা পটে অতিকায় লায়ার পাখীর পুচ্ছের মত খাড়া হইয়া আছে, এক ধারে খুব উঁচু পাড়ে সারি বাঁধা গাঙ্‌শালিকের গর্ত্ত, চারি ধারে কি অপূর্ব্ব শ্যামলতা, কি সান্ধ্য শ্রী!

কাজল বলিল—বেশ দেশ বাবা—না?

—তুই এখানে থাক্ খোকা—আমি যদি রেখে যাই এখানে, থাক্‌তে পারবি নে? তোর পিসিমার কাছে থাক্‌বি, কেমন তো?

কাজল বলিল—হ্যাঁ, ফেলে রেখে যাবে, বৈ কি? আমি তোমার সঙ্গে যাব বাবা।

৩৬

রাণীর যত্নে আদরে সে মুগ্ধ হইয়া গেল। সতুদের বাড়ীর সে-ই আজকাল কর্ত্রী, নিজের ছেলেমেয়ে হয় নাই, ভাইপোদের মানুষ করে। অপুকে রাণী বাড়ীতে আনিয়া রাখিল—কাজলকে দুদিনে এমন আপন করিয়া লইয়া ফেলিয়াছে যে, সে পিসিমা বলিতে অজ্ঞান—দিদিমার মৃত্যুর পর এত আদর আর কাহারও নিকট সে পায় নাই। রাণীর মনে মনে ধারণা অপু শহরে থাকে যখন, তখন খুব চায়ের ভক্ত,—দুটি বেলা ঠিক সময়ে অপুকে চা দিবার জন্য তার প্রাণপণ চেষ্টা। চায়ের কোনো সরঞ্জাম ছিল না, লুকাইয়া নিজের পয়সায় সতুকে দিয়া নবাব-গঞ্জের বাজার হইতে চায়ের ডিস্-পেয়ালা আনাইয়া লইয়াছে—অপু চা তেমন খায় না কখনও, কিন্তু এখানে সে সে কথা বলে না। ভাবে—যত্ন করচে রাণুদি, করুক্ না। এমন যত্ন আর জুটবে কোথায় অদৃষ্টে? তুমিও যেমন!

দুপুরে একদিন খাইতে বসিয়া অপু চুপ করিয়া চোখ বুজিয়া বসিয়া আছে। রাণীর দিকে চাহিয়া হাসিয়া বলিল—একটা বড় চমৎকার ব্যাপার হ'ল—দেখ, এই টকে যাওয়া এঁচড়-চচ্চড়ি কতকাল খাই নি—নিশ্চিন্দিপুর ছেড়ে আর কখনও নয়—তাই মুখে দিয়েই ছেলেবেলার কথা মনে পড়ে গেল রাণুদি—

রাণুদি বোঝে এ সব কথা—তাই রাণুদির কাছে বলিয়াও সুখ।

এ কয়দিন আকাশটা ছিল মেঘ মেঘ। কিন্তু হঠাৎ কখন মেঘ কাটিয়া গিয়াছে সে জানে না—বৈকালে ঘুম ভাঙিয়া উঠিয়া সে অবাক্ চোখে চুপ করিয়া বাহিরের রোয়াকে বসিয়া রহিল—এমন বৈকাল এখানে আসিয়াও এ কয়দিন পায় নাই, বাল্যের সেই অপূর্ব্ব বৈকাল—যাহার জন্য প্রথম প্রথম বিরহী বালক-মন কত হাঁপাইয়াছে বিদেশে, ক্রমে একটা অস্পষ্ট মধুর স্মৃতিমাত্র মনে আঁকিয়া রাখিয়া যেটা কবে মন হইতে বেমালুম অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছিল—সেই শান্ত ছায়া-ভরা বিল্ব-পুষ্প সুরভি, কত কি পাখীর কাকলীতে তান-বাঁধা অপরূপ বৈকাল আবার ফিরিয়া আসিয়াছে!

মনে পড়ে ছেলেবেলায় এই সব সময়ে ঘুম ভাঙিয়া তাহার মনটা কেমন অকারণ খারাপ হইত—কখনও বা হইত রামায়ণ বা মহাভারতের নানা নায়ক-নায়িকার, কখনও বা দিদির বা মায়ের কাল্পনিক দুঃখে। এক এক দিন কেমন কান্না আসিত, বিছানায় বসিয়া ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিত—তাহার মা ঘাট হইতে আসিয়া বলিত—ও-ও-ওই উড়ে গেল—ও-ও-ওই!... কেঁদো না খোকা, বাইরে এসে পাখী দেখ-সে। আহা হা, তোমার বড় দুখ্খু খোকন্—তোমার নাতি মরেচে, পুতি মরেচে, সাত ডিঙে ধন সমুদ্দুরে ডুবে গিয়েচে, তোমার বড় দুখ্খু—কেঁদো না, কেঁদো না, আহা হা!...

আবার সে সব দিন ফিরিয়া আসে না!...

রাণী পাতকুয়া হইতে জল তুলিয়া লইয়া যাইতেছে, অপু বলিল—মনে পড়ে রাণুদি, এই উঠোনে এমন সব বিকেলে বৌ-চুরি খেলা খেল্‌তুম কত, তুমি, আমি, দিদি, সতু, নেড়ী—

রাণু বলিল—আহা, তাই বুঝি ভাবচিস্ বসে বসে! সে সব দিনের কথা ভাবলেও—কত মালা গাঁথতুম, মনে আছে বকুলতলায়? সারাদিন বকুলতলাতেই পড়ে আছি, আমি, দুগ্‌গা—আজকাল ছেলেমেয়েরা আর মালা গাঁথে না, বকুল ফুলও আর তেমন পড়ে থাকে না—কালে কালে সবই যাচ্ছে।

লীলারা আসিবার কিছুদিন পরে রাণী অপুকে বলিল—এক কাজ কর না কেন অপু, সতু তো তোদের নীলমণি জ্যাঠার দরুণ জমাটা ছেড়ে দেবে, তুই কেন গিয়ে বাগানটা নিগে যা না?...তোদেরই তো ছিল—ও যার নিজের জমিজমাই বিক্রী করে ফেল্‌লে সব, তা আবার জমার বাগান রাখ্‌বে—নিবি তুই? অপু বলিল—মায়ের বড় ইচ্ছে ছিল, রাণুদি। মরবার কিছুদিন আগেও বল্‌ত, বড় হ'লে বাগানখানা নিস্ অপু। আমার আপত্তি নেই, যা দাম হবে আমি দোবো।

প্রতি সন্ধ্যায় সতুদের রোয়াকে মাদুর পাতা হয়, রাণী, লীলা, অপু, ও ছেলেপিলেদের মজ্‌লিস্ বসে। সতুও যোগ দেয়, তবে তামাকের দোকান বন্ধ করিয়া আসিতে তাহার রাত হইয়া যায়। অপু বলে—আচ্ছা আজকাল তোমরা ঘাটের পথে ষাঁড়াতলায় পিটে দাও না রাণুদি? কই সে ষাড়াগাছটা তো নেই সেখানে? রাণী বলে—সেটা মরে গিয়েচে—তার পাশেই একটা চারা, দেখিস্ নি সিঁদুর দেওয়া আছে?...নানা পুরাণো কথা হয়। অপু জিজ্ঞাসা করে—ছেলেবেলায় একবার পঙ্গপালের দল এসেছিল, মনে আছে লীলাদি?...গ্রামের একটি বিধবা যখন নববধূরূপে এ গ্রামে প্রথম আসেন, অপু তখন ছেলেমানুষ। তিনিও সন্ধ্যার পরে এ-বাড়ীতে আসেন। অপু বলে—খুড়ীমা, আপনি নতুন এসে কোথায় দুধে আল্‌তার পাথরে দাঁড়িয়েছিলেন মনে আছে আপনার? বিধবাটি বলেন—সে সব কি আর এ জন্মের কথা, বাবা? সে সব কি আর মনে আছে?

অপু বলে—আমি বলি শুনুন, আপনাদের দক্ষিণের উঠোনে যে নীচু গোয়ালঘরটা ছিল, তারই ঠিক সামনে। বিধবা মেয়েটি আশ্চর্য্য হইয়া বলেন—ঠিক্, ঠিক্ এখন মনে পড়েচে! এত দিনের কথা তোমার মনে আছে বাবা!...

তাঁদেরই বাড়ীর আর এক বিবাহে কোথা হইতে তাঁদের এক কুটুম্বিনী আসেন, খুব সুন্দরী—এত কাল পরে তাঁর কথা উঠে। সবাই তাঁকে দেখিয়াছিল সে সময়, কিন্তু নামটি কারুর মনে নাই এখন। অপু বলে—দাঁড়াও রাণুদি, নাম বলচি—তার নাম সুবাসিনী। সবাই

আশ্চর্য্য হইয়া যায়। লীলা বলে—তোর তখন বয়েস আট কি নয়, তোর মনে আছে তার নাম? ঠিক্, সুবাসিনীই বটে। সবারই মনে পড়ে নামটা। অপু মৃদু মৃদু হাসি-মুখে বলে—আরও বলচি শোনো, ডুরে শাড়ী পড়ত, রাঙা জমির ওপর ডুরে দেওয়া—না? বিধবা বধূটি বলেন - ধন্যি বাপু, যা হোক্, রাঙা ডুরে পরতো ঠিকই, বয়েস ছিল বাইশ তেইশ। তোমার তখন বয়েস বছর আষ্টেক হবে। ছাব্বিশ বছর আগের কথা যে!

অপুর খুব মনে আছে, অত সুন্দরী মেয়ে তাদের গাঁয়ে আর আসে নাই ছেলেবেলায়। সে বলিল—রাঙা শাড়ী পরে আমাদের উঠোনের কাঁঠালতলায় জল সইতে গিয়ে দাঁড়িয়েচে, ছবিটা দেখ্‌তে পাচ্চি এখনও।

•

এখানকার বৈকালগুলি সত্যই অপূর্ব্ব। এত জায়গায় তো সে বেড়াইল, মাসখানেক এখানে থাকিয়া মনে হইল এমন বৈকাল সে কোথাও দেখে নাই। বিশেষ করিয়া বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসের মেঘহীন এই বৈকালগুলিতে সূর্য্য যেদিন অস্ত যাবার পথে মেঘাবৃত না হয়, শেষ রাঙা-আলোটুকু পর্য্যন্ত বড় গাছের মগ্‌ডালে, বাঁশঝাড়ের আগায় হালকা সিঁদুরের রং মাখাইয়া দেয়, সেদিনের বৈকাল। এমন বিল্বফুলের অপূর্ব্ব সুরভি মাখানো, এমন পাখী-ডাকা উদাস বৈকাল—কোথায় এর তুলনা? এত বেলগাছও কি এদেশটায়, ঘাটে, পথে, এ-পাড়া, ও-পাড়া, সর্ব্বত্র বিল্বফুলের সুগন্ধ।

একদিন কি অপূর্ব্ব ব্যাপারই ঘটিল—জ্যৈষ্ঠের প্রথমটা বৈকালে আকাশ অন্ধকার করিয়া ঈশান কোণ হইতে কালবৈশাখীর মেঘ উঠিল, তার পরেই খুব ঝড়, এ বছরের প্রথম কালবৈশাখী। অপু আকাশের দিকে চাহিয়া চাহিয়া দেখিল—তাদের পোড়োভিটার বাঁশবনের মাথার উপরকার দৃশ্যটা কি সুপরিচিত! বাল্যে এই মাথাদুলানো বাঁশঝাড়ের উপরকারের নীলকৃষ্ণ মেঘসজ্জা মনে কেমন সব অনতিস্পষ্ট আশা, আকাঙ্ক্ষা জাগাইত, কত কথা যেন বলিতে চাহিত, আজও সেই মেঘ, সেই বাঁশবন সবই আছে, কিন্তু সে অপূর্ব্ব জগৎটা আর নাই। এখন যা আনন্দ সে শুধু স্মৃতির আনন্দ মাত্র। এবার নিশ্চিন্দিপুর ফিরিয়া অবধি সে ইহা লক্ষ্য করিতেছে—এই বন, এই দুপুর, এই গভীর রাত্রে চৌকীদারের হাঁকুনি, কি লক্ষ্মীপেঁচার ডাকের সঙ্গে এক অপূর্ব্ব স্বপ্ন মাখানো ছিল। দিগন্ত রেখার ওপারের এক রহস্যময় কল্পলোক তখন এক ক্ষুদ্র কল্পনাপ্রবণ গ্রাম্য বালককে হাতছানি দিয়া আহ্বান করিত—তার সন্ধান আর মেলে না।

সে পাখীর দল মরিয়া গিয়াছে, যে চাঁদ এমন সব বৈশাখীরাত্রে খড়ের ঘরের দাওয়ার ধারের নারিকেলপত্র-শাখায় জ্যোৎস্নার কম্পন আনিয়া এক বালকের মনে মূলহীন, কারণহীন আনন্দের বান ডাকাইত, সে সব চাঁদ নিবিয়া গিয়াছে। সে বালকও আর নাই, পঁচিশবৎসর আগেকার এক দুপুরে বাপমায়ের সঙ্গে দেশ ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছিল, আর ফেরে নাই। জাওরা বাঁশের বনের পথে তার ছোট ছোট পায়ের দাগ অস্পষ্ট হইয়া মুছিয়া গিয়াছে বহুদিন।

তার ও তার দিদির সে সব আশা পূর্ণ হইয়াছিল কি?

হায় অবোধ বালকবালিকা!…

রোজ রোজ বৈকালে মেঘ হয়, ঝড় ওঠে। সেই অপূর্ব্ব ভিজে মাটির গন্ধ! যেমন ঝড়টা ওঠে, অপু বলে—রাণুদি, আম কুড়িয়ে আনি। রাণী হাসে। অপু ছেলেকে লইয়া নতুন-কেনা বাগানে আসিয়া দাঁড়ায় —সবাইকে আম কুড়াইতে ডাকে, কাহাকেও বাধা দেয় না। কাজলও মহা উৎসাহে আম কুড়ায়। বাল্যের সেই পটুলে, তেঁতুলতলী, নেকো, বাঁশতলা,—ঘন মেঘের ছায়ায় জেলেপাড়ার তো আবালবৃদ্ধ-বনিতা ধামা হাতে আম কুড়াইতে আসে। অপু ভাবে, আহা, জীবনে এই এদের কত আনন্দের, কত সার্থকতার জিনিষ! চারিধারে চাহিয়া চাহিয়া দেখে, সমস্ত বাগানের তলাটা ধাবমান, কৌতুকপর, চীৎকাররত বালকবালিকাতে ভরিয়া গিয়াছে!

এই বাগানে আম কুড়াইবার অপরাধে দিদি দুর্গা কত অপমানিত না হইয়াছে কতদিন, আজ অদৃশ্যলোক হইতে সে কি এসব কিছু দেখিতেছে না!

অপু কি করিবে আমবাগান দিয়া? তাহার দিদির

স্মৃতির উদ্দেশে সে এ গ্রামের গরীব-ঘরের বালক-বালিকাদের দান করিয়া যাইবে।

অপু কি করিবে আম বাগানে? এই সব গরীব ঘরের ছেলে মেয়েরা সাধ মিটাইয়া আম কুড়াইবে এ বাগানে, কেহ তাহাদের বারণ করিবার নাই, বকিবার নাই, অপমান করিবার নাই, অদৃশ্যলোক হইতে দিদি দুর্গা কি দেখিতে পাইবে না এ সব কাজ!

এতদিন সে এখানে আসিলেও নিজেদের ভিটাটাতে ঢুকিতে পারে নাই, যদিও বাহির হইতে সেটা প্রতিদিনই দেখিত, কারণ ঘাটের পথটা তার পাশ দিয়াই। পথে দাঁড়াইয়া কতদিন চাহিয়া চাহিয়া দেখিয়াছে, বৈকালের দিকে সে একদিন একা চুপি-চুপি বনজঙ্গল ঠেলিয়া সেখানে ঢুকিল। বাড়ীটা আর নাই, পড়িয়া ইট স্তূপাকার হইয়া আছে, লতাপাতা, শ্যাওড়াবন, বন্-চাল্‌তার গাছ, ছেলেবেলাকার মত কালমেঘের জঙ্গল। পিছনের বাঁশ ঝাড়গুলা এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে বাড়িয়া চারিধারে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে—এক অতীত অপরূপ শৈশব-লোক। তাহার চোখ ঝাপসা হইয়া আসিল। কিন্তু কি অদ্ভুত অনুভূতি। সে যে আবার দশ বৎসরের বালকটি হইয়া গেল এক মুহূর্ত্তে, ভিটের মাটিতে পা দিবার সঙ্গে সঙ্গে!

কোনো ঘরের চিহ্ন নাই, বন জঙ্গল, রাঙা রোদ বাঁশের মগডালে কত কি যে পাখী কিচকিচ করিতেছে ডালে পালায়—অনুভূতির যেন প্রবল বন্যা, সে অভিভূত, দিশেহারা হইয়া পড়িল। পশ্চিমের পাঁচিলের গায়ে সেই কুলুঙ্গিটা আজও আছে, ছেলেবেলায় যে কুলুঙ্গিটাতে সে ভাঁটা, বাতাবীলেবুর বল, কড়ি রাখিত। এত নীচু কুলুঙ্গিটা তখন কত উঁচু বলিয়া মনে হইত, তাহার মাথা ছাড়াইয়াও উঁচু ছিল, ডিঙাইয়া দাঁড়াইলে তবে নাগাল পাওয়া যাইত! ঠেসদেওয়ালের গায়ে ছেলেবেলায় একটা ভূত আঁকিয়াছিল, সেটা এখনও আছে। পাশেই নীলমণি জ্যাঠামশায়ের পোড়োভিটা—সেও ঘন বনে ভরা, চারিধার নিঃশব্দ, নির্জ্জন—এ পাড়াটাই জনহীন হইয়া গিয়াছে, এ ধার দিয়া লোকজনের যাতায়াত বড় কম। এই সে স্থানটি, কতকাল আগে যেখানে দিদি ও সে একদিন চড়ুই-ভাতি করিয়াছিল! কণ্টকাকীর্ণ শেঁয়াকুল বনে দুর্গম দুর্ভেদ্য হইয়া পড়িয়াছে সারা জায়গায়টা। পোড়োভিটার সে বেলগাছটা—একদিন যার তলায় ভীষ্মদেব শরশয্যা পাতিতেন তাহার নয় বৎসরের শৈশবে—সেটা এখনও আছে, পুষ্পিত শাখা-প্রশাখার অপূর্ব্ব সুবাসে অপরাহ্ণের বাতাস স্নিগ্ধ করিয়া তুলিয়াছে।

পাঁচিলের ঘুলঘুলিটা কত নীচু বলিয়া মনে হইতেছে, এইটাতেই অপু আশ্চর্য্য হইল—বার বার এ কথাটা তার মনে হইতেছিল। কত ছোট ছিল সে তখন! খোকার মত অতটুকু বোধ হয়!

কাঁচাকলায়ের ডালের মত সেই কি লতার গন্ধ বাহির হইতেছে!...কতদিন গন্ধটা মনে ছিল না, বিদেশে আর সব কথা হয়ত মনে পড়িতে পারে, কিন্তু পুরাতন দিনের গন্ধগুলা তো মনে পড়ে না—তাহার হারানো দশ বৎসরের শৈশবটা তাই যেন টাটকা, তাজা হইয়া সকল বর্ণে, রূপে, রসে ভরপুর হইয়া আবার নবীনরূপে দেখা দিল—সমস্ত শৈশবে তার সকল দুঃখ, আশা, নিরাশা, দৈনন্দিন শত অনুভূতির মাদকতা সুদ্ধ।

এ অভিজ্ঞতাটা অপুর এতদিন ছিল না। সেদিন বাঁওড়ের ধারে বেড়াইতে গিয়া পাকা বটফলের গন্ধে অনেকদিনের একটা স্মৃতি মনে উদয় হইয়াছিল—ছোট্ট কাঁচের পরকলা বসানো মোম বাতির সেকেলে লণ্ঠন হাতে তাহার বাবা শশী যুগীর দোকানে আলকাৎরা কিনিতে আসিয়াছে,—সেও আসিয়াছে বাবার কাঁধে চড়িয়া বাবার সঙ্গে—কাঁচের লণ্ঠনের ক্ষীণ আলো, আধ-অন্ধকার বাঁশবন, বাঁওড় হইতে লাল ফুল তুলিয়া বাবা তাহার হাতে দিয়াছে—কোন শৈশবের অস্পষ্ট ছবিটা। অবাস্তব, ধোঁয়া ধোঁয়া! পাকা বটফলের গন্ধে কতকাল পরে তাহার সেই অত্যন্ত শৈশবের একটা সন্ধ্যা আবার ফিরিয়া আসিয়াছিল সেদিন।

পোড়োভিটার সীমানায় প্রকাণ্ড একটা খেজুর গাছে কাঁদি কাঁদি ডাঁসা খেজুর ঝুলিতেছে—এটা সেই চারা খেজুর গাছটা, দিদি এর ডাল কাটারি দিয়া কাটিয়া গোড়ার দিকে দড়ি বাঁধিয়া খেলাঘরের গরু করিত ·· কত বড় ও উঁচু হইয়া গিয়াছে গাছটা ! ·

এইখানে খিড়্কীদোরটা ছিল, চিহ্নও নাই কোনো। এইখানে দাঁড়াইয়া দিদির চুরি করা সেই সোনার কৌটাটা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়াছিল একদিন। এই চুরির ঘটনাটা তাকে চিরদিন কি অদ্ভুত দুঃখ ও আনন্দ দিয়া আসিয়াছে. যখনই মনে হইয়াছে ধনী প্রতিবেশীর বাড়ী হইতে সেটা চুরি করিয়া যথেষ্ট অপমান ও মারধর জুটিয়াছিল দিদির ভাগ্যে, অথচ ভোগে হয় নাই— অল্পদিন পরেই মারা গেল—তখুনই এক প্রকার বেদনা-ভরা প্রেরণা জীবনে দিয়া আসিয়াছে। এরা জীবন দিয়া অপুকে গড়িয়া গিয়াছে—নিজেরা পুড়িয়া সুগন্ধভরা ধূমে অপুর সারাজীবন ছাইয়া গিয়াছে যে !

কত সুপরিচিত জিনিষ এই দীর্ঘ পঁচিশ বছর পরে আজও আছে ! রাঙী গাইয়ের বিচালি খাওয়ার মাটির নাদাটা কাঁটালতলায় বাঁশপাতা ও মাটি বোঝাই হইয়া এখনও পড়িয়া আছে। ছেলেবেলায় ঠেস-দেওয়াল গাঁথার জন্য বাবা মজুর দিয়া এক জায়গায় ইট জড় করিয়া রাখিয়াছিল—অর্থাভাবে গাঁথা হয় নাই—ইটগুলা এখনও বাঁশবনের ছায়ায় তেমনি পড়িয়া আছে। কতকাল আগে মা তাকের উপর জলদানে পাওয়া মেটে কলসী তুলিয়া রাখিয়াছিল সংসারের প্রয়োজনের জন্য—পড়িয়া মাটিতে অর্দ্ধপ্রোথিত হইয়া আছে। সকলের অপেক্ষা সে যেন অবাক্ হইয়া গেল—পাঁচিলের সেই ঘুলঘুলিটা আজও নতুন, অবিকৃত অবস্থায় দেখিয়া—বালিচুণ একটুও খসে নাই, যেন কালকের তৈরী—এই জঙ্গল ও ধ্বংসস্তূপের মধ্যে কি হইবে ও কুলুঙ্গিতে ?

ঘন বনে ঘুঘু ডাকে ঘুঘু—ঘু—

সে অবাক্ চোখে রাঙারোদ মাখানো সজ্‌নে গাছটার দিকে আবার চায়···

মনে হয় এ বন, এ স্তুপাকার ইটের রাশি, এ সব স্বপ্ন—এখনি মা ঘাট হইতে সন্ধ্যায় গা ধুইয়া ফিরিয়া ফরসা কাপড় পরিয়া ভিজা কাপড়খানা উঠানের বাঁশের আল্‌নায় মেলিয়া দিবে, তারপরে প্রদীপ হাতে সন্ধ্যা দেখাইয়াই তাহাদের ভাত বাড়িয়া দিবে রান্নাঘরের দাওয়ায়···দিদি কোথা হইতে ছুটিয়া আসিয়া বলিবে—ও অপু, কাঁক্‌রোল ভাজা খাবি রে—চল, কাল্ তুল্‌তে যাবি এক জায়গায় ?

সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসে।

সেই আগেকার দিনের মত সন্ধ্যা। কাঁটালতলাটা অন্ধকার হইয়া পড়ে।

ভিটার চারিধারে খোলাংকুচি, ভাঙা কলসী, কত কি ছড়ানো – ঠাকুরমায়েদের পোড়ো ভিটাতে তো পা রাখিবার স্থান নাই, বৃষ্টির ধোয়াটে কতদিনের ভাঙা খাপ্‌রা খোলাংকুচি বাহির হইয়াছে। এগুলা অপুকে বড় মুগ্ধ করিল, সে হাতে করিয়া তুলিয়া দেখিতে লাগিল। কত দিনের গৃহস্থজীবনের সুখ-দুঃখ এ গুলার সঙ্গে জড়ানো! মা পিছনের বাঁশবনে এক জায়গায় সংসারের হাঁড়িকুড়ী ফেলিত, সেগুলি এখনও সেখানেই আছে। একটা আস্কে পিঠে গড়িবার মাটির মুচি এখনও অভগ্ন অবস্থায় আছে। অপু অবাক হইয়া ভাবে। কোন্ আনন্দ-ভরা শৈশব-সন্ধ্যার সঙ্গে ওর সম্বন্ধ ছিল না জানি ! উঠানের মাটির খোলাংকুচিরাশির মধ্যে সবুজ কাঁচের চুড়ির একটা টুক্‌রা পাওয়া গেল। হয় ত তার দিদির হাতের চুড়ির টুক্‌রা—এ ধরণের চুড়ি ছোট মেয়েরাই পরে—টুক্‌রাটা সে হাতে তুলিয়া লইল। এক জায়গায় আধ-খানা বোতল-ভাঙা—ছেলেবেলায় এ ধরণের বোতলে মা নারিকেল তৈল রাখিত—হয় ত সেটাই।

একটা দৃশ্য তাকে বড় মুগ্ধ করিল। তাদের রান্নাঘরের ভিটার ঠিক যে কোণে মা রাঁধিবার হাঁড়িকুড়ি রাখিত—সেখানে একখানা কড়া এখনও বসানো আছে, মরিচা ধরিয়া বিকৃত হইয়া গিয়াছে, আংটা খসিয়া গিয়াছে, কিন্তু মাটিতে বসিয়া যাওয়ার দরুণ একটুও নড়ে নাই !

তাহারা যেদিন রান্না-খাওয়া সারিয়া এ গাঁ ছাড়িয়া

রওনা হইয়াছিল—আজ চব্বিশ বৎসর পূর্ব্বে, মা এঁটো কড়াখানাকে ওইখানেই বসাইয়া রাখিয়া চলিয়া গিয়াছিল—কে কোথায় লুপ্ত হইয়া গিয়াছে, কিন্তু ওখানা ঠিক আছে এখনও।

বাহির হইয়া আবার সে ফিরিয়া চাহিল।

সারা ভিটার উপর আসন্ন সন্ধ্যা এক অদ্ভুত, করুণামাখা ছায়া ফেলিয়াছে, মনে হয় বাড়ীটার এই অপূর্ব্ব বৈকাল কাহার জন্য বহুকাল অপেক্ষা করিয়া করিয়া ক্লান্ত, জীর্ণ, অবসন্ন ও অনাসক্ত হইয়া পড়িয়াছে—আর সাড়া দেয় না, প্রাণ আর নাই।

বার বার করিয়া ঘুলঘুলিটার কথাই মনে পড়িতেছিল। ঘুলঘুলিদুটো এত ভাল আছে এখনও, অথচ মানুষেরাই গেল চলিয়া।

সারাদিনটা আজ গুমট গরম, প্রতিপদ তিথি—কাল গিয়াছে পূর্ণিমা। আজ এখনি জ্যোৎস্না উঠিবে।

এই নদীতে ছেলেবেলায় যে সব বধূরা জল লইতে আসিত, তারা এখন প্রৌঢ়া, কত নাই-ও, মরিয়া হাজিয়া গিয়াছে, যে সব কোকিল সেই ছেলেবেলাকার রাসনবমী দিনের পুলকমুহূর্ত্তগুলি ভরাইয়া দুপুরে কু কু ডাক দিত, সে পুরাণো কোকিলদল মরিয়া গিয়াছে। কচি পাতা ওঠা বাঁশবনে তাদের ছেলেমেয়েরা আবার তেমনি গায়।

শুধু তার দিদি শুইয়া আছে। রায়পাড়ার ঘাটের ওধারে ওই প্রাচীন ছাতিম গাছটার তলায়। সে দিদির বয়স আর বাড়ে নাই, মুখের তারুণ্য বিলুপ্ত হয় নাই—তার কাঁচের চুড়ি, নাটাফুলের পুঁটুলি অক্ষয় হইয়া আছে এখনও। প্রাণের গোপন অন্তরে যেখানে অপুর শৈশব কালের কাঁচা শিশুমনটি প্রবুদ্ধ জীবনের শত জ্ঞান, অভিজ্ঞতা, উচ্ছাশা ও কর্ম্মস্তূপের নীচে চাপা পড়িয়া মরিয়া আছে—সেখানে সে চিরবালিকা, শৈশব জীবনের সে সমাধিতে জনহীন অন্ধকার রাত্রে সে-ই আসিয়া নীরবে চোখের জল ফেলে—শিশু-প্রাণের সাথীকে আবার খুঁজিয়া ফেরে।

আজ চব্বিশ বৎসর ধরিয়া সাঁঝ-সকালে তারই আশ্রয় স্থানটিতে সোনার সূর্য্য কিরণ পড়ে। বর্ষাকালের নিশীথে মেঘ ঝর ঝর জল ঢালে, ফাগুন দিনে ঘেঁটুফুল, হেমন্ত দিনে ছাতিমফুল ফোটে। জ্যোৎস্না ওঠে। কত পাখী গান গায়। সে এ সবই ভালবাসিত। এ সব ছাড়িয়া যাইতে পারে নাই কোথাও।

৩৭

অমৃতসর ষড়যন্ত্র মাম্‌লার আসামী প্রণব রায়কে লেখা চিঠি···

নিশ্চিন্দিপুর
১৫ই জ্যৈষ্ঠ

ভাই প্রণব,

অনেকদিন তোমার কোনো সংবাদ পাইনি, কোনো সন্ধানও জান্‌তুম না—হঠাৎ সেদিন কাগজে দেখ্‌লুম তুমি আদালতে কম্যুনিজ্‌ম্‌ নিয়ে এক বক্তৃতা দিয়েচ, তা থেকেই তোমার বর্ত্তমান খবর সব জান্‌তে পারি।

তুমি জান না বোধ হয় আমি অনেকদিন পরে আমার গ্রামে ফিরেচি। অবশ্য দুদিনের জন্য, সে-সব কথা পরে লিখ্‌ব। খোকাকেও এনেচি। সে তোমায় বড় মনে রেখেচে, তুমি ওর মাথায় জল দিয়ে বাতাস করে জ্বর সারিয়েছিলে সে কথা ও এখনও ভোলেনি।

এখানে নিজের পোড়ো পৈতৃক ভিটেতে রোজই একবার করে গিয়ে বসি, ঠিক যখন বিকেলের ছায়া ওর নিবিড় ছায়া ফেলেছে, ঠিক সেই সময়। সারা শৈশব জীবনটা যেন স্বপ্নের মত মনে আসে—এখনও সেই গন্ধ যেন পাই, সেই বাতাস গায়ে লাগে, মাটির পথের ঘনিষ্ঠ স্নেহের সুর কানে বাজে—তার স্মৃতিটা আবার ফিরে এল—কোন্ দূর জন্মে দেখা স্বপ্নের মত।

দেখ প্রণব, আজকাল আমার মনে হয়,—অনুভূতি, আশা, কল্পনা, স্বপ্ন—এ সবই জীবন। এবার এখানে এসে জীবনটাকে একটা নতুন চোখে দেখ্‌তে পাই এমন সুবিধে ও অবকাশ আর কোথাও হয়নি—এক নাগপুর ছাড়া। কত আনন্দের দিনের যাওয়া-আসা হ'ল জীবনে। যেদিনটিতে ছেলেবেলায় বাবার সঙ্গে প্রথম কুঠীর মাঠ দেখ্‌তে যাই সরস্বতী পূজোর বিকেলে—যেদিন আমি ও দিদি রেলরাস্তা দেখ্‌তে ছুটে যাই—যেদিন

বিয়ের আগের রাত্রে তোমার মামার বাড়ীর ছাদটিতে বসেছিলুম সন্ধ্যায়, জন্মাষ্টমীর তিমিরভরা বর্ষণসিক্ত রাত জেগে কাটায়েছিলুম আমি ও অপর্ণা মনসাপোতায় খড়ের ঘরে, জীবনের পথে এরাই ত আনন্দের অক্ষয় পাথেয়—যে আনন্দ অর্থের উপর নির্ভর করে না, ঐশ্বর্য্যের উপর নির্ভর করে না, মানসম্মান বা সাফল্যের উপরও নির্ভর করে না, যা সূর্য্যের কিরণের মত অকৃপণ, অপক্ষপাতী উদার, ধনী দরিদ্র বিচার করে না, উপকরণের স্বল্পতা বা বাহুল্যের উপর নির্ভর করে না। বড়লোকের মেয়েরা নতুন মোটর কিনে যে আনন্দ পায়, মা অবিকল সেই আনন্দই পেতেন যদি নেমন্তন্ন থেকে আমি ভাল ছাঁদা বেঁধে আন্‌তে পারতুম, আমার দিদি সেই আনন্দই পেত যদি বনঝোপে কোথাও পাকা-ফলে ভরা মাকাললতা কি বৈঁচিগাছের সন্ধান পেত।

কিছুতেই আমাদের দেশের লোকে বিস্মিত হয় না কেন বল্‌তে পার প্রণব? বিস্মিত হবার ক্ষমতা একটা বড় ক্ষমতা। যে মানুষ কোনো কিছু দেখে বিস্মিত হয় না, মুগ্ধ হয় না, সে তো প্রাণহীন! কল্‌কাতায় দেখেছি কি তুচ্ছ জিনিষ নিয়েই সেখানকার বড় বড় লোকে দিন কাটায়? জীবনকে যাপন করা একটা আর্ট—তা এরা জানে না বলেই অল্প বয়সে আমাদের দেশে জীবনের বাক্সায়ে দেউলে হয়ে পড়ে, নতুন বিস্ময়, নতুন অনুভূতি হয় না, নবতর জীবনের পথ চিরগুপ্ত রয়ে যায় এদের কাছে। মানুষ দমে যায় জানি, মনের শক্তি কিছুদিনের জন্য ক্ষীণতর হতে পারে জানি, কিন্তু জীবন্ত যে মানুষ, সে আবার জেগে উঠবে—নবতর বংশীরব শুনবে, নব জীবনের সন্ধান পাবে, বি-জর ও বি-মৃত্যু আনন্দ তার চির-শ্যামল মনে আবার আসন পাতবেই।

হাঁ তোমায় লিখি। আমি বাইরে যাচ্ছি। খুব সম্ভব যাবো ফিজি ও সামোয়া—এক বন্ধুর কাছ থেকে ভরসা পেয়েচি। কাজলকে কোথায় রেখে যাই এই ছিল সমস্যা। তোমার মামার বাড়ী রাখব না—তোমার মেজমামীমা লিখেচেন কাজলের জন্যে তাদের মন খারাপ, সে চলে গিয়ে বাড়ী অন্ধকার হয়ে গিয়েচে। হোক্ অন্ধকার, সেখানে আর নয়। আমার এক বাল্যসঙ্গিনী এখানে আছেন। তাঁর কাছেই ওকে রেখে যাব। এঁর সন্ধান না পেলে বিদেশে যাওয়া কখনও ঘটে উঠত না, খোকাকে যেখানে সেখানে ফেলে যেতে পারতুম না তো?

আজ আবার ত্রয়োদশী তিথি, মেঘশূন্য আকাশ সুনীল, খুব জ্যোৎস্না উঠবে—ইচ্ছা হয় তোমায় নিয়ে দেখাই এ-সব, তোমার ঋণ শোধ দিতে পারব না জীবনে ভাই—তুমিই অপর্ণাকে জুটিয়ে দিয়েছিলে—কত বড় দান যে সে জীবনের তা তুমিও হয়ত বুঝবে না।

তোমারই চিরদিনের বন্ধু

অপূর্ব্ব

ছেলেবেলার আরও কয়েকটি জিনিষের সঙ্গে আবার সংযোগ সাধিত হইল। সাধু কর্ম্মকারেরা তাহাদের কাঠের খাটখানা কিনিয়া লইয়াছিল এদেশ হইতে তাহারা যাইবার সময়। এখন তাহাদের অবস্থা খারাপ হইয়া গিয়াছে, সাধু কর্ম্মকারের পুত্রবধূ খাইতে পায় না, রাণীর যোগাযোগে খাটখানা অপুর কাছে বেচিয়া ফেলিল—ছেলেবেলার যে খাটে সে দিদি ও মা পুবের ঘরের জানালাটার ধারে পাশাপাশি শুইত সারা শৈশব! প্রথম দিন খাটে শুইয়া অপু সারারাত চোখের পাতা বুজাইতে পারিল না—অসম্ভব! লুপ্ত অতীত কালের মনোভাব এমন অদ্ভুতভাবে আবার ফেরে মানুষের জীবনে! মশারী-ফেলার সে অনুভূতিটা আবার মনে আসে, মা মশারী ফেলিয়া খাটের চারিধারে গুঁজিয়া দিবার সময় একটা কেমন গন্ধ বাহির হইত, একটা শান্তি, আরামের ভাবের সঙ্গে অন্ধকারভরা অজ্ঞাত রজনীর রহস্যের স্মৃতি এর সঙ্গে জড়ানো—মশারিটা নাই, অথচ মনে আসিল তখনই।

সপ্তাহের শেষে সে বিমলেন্দুর হাতে ঠিকানা-লেখা একখানা পত্র পাইল। খুলিয়া দেখিয়া সে অনেকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। চিঠিখানা ছোট। একটা ছত্র বার বার পড়িয়াও যে সে অর্থ করিতে পারিতেছিল না! লেখা আছে, "কাল রাত্রি দশটার সময় দিদি আমাদের ফাঁকি দিয়ে চলে গেছে। জিনিষটা যদিও অপ্রত্যাশিত নয়, কিন্তু এত হঠাৎ যে আসবে তা ভাবিনি।"

কথাটার মানে কি ? লীলা বাঁচিয়া নাই ?

অত জীবন্ত লীলা, অত হাসিমুখ, স্নেহময়ী মমতাময়ী লীলা, সে নাই আর দুনিয়ায় কোথাও ?

অপু যেন এ-কথাটার সত্যটা মনের মধ্যে হঠাৎ গ্রহণ করিতে পারিল না।

কাহাকেও কোনো কথা বলিল না, সারা সকাল ও দুপুরের মধ্যে পত্রখানা মাঝে মাঝে পড়িল ও কি ভাবিল। চুপ করিয়া বিছানায় শুইয়া শুইয়া কড়িকাঠের দিকে চাহিয়া রহিল।

বৈকালে পত্রখানা হাতে করিয়াই অভ্যাসমত বেড়াইতে গেল। সন্ধ্যার ছায়াচ্ছন্ন আকাশের তলায় নদীর ধারে দাঁড়াইয়া পত্রখানা আবার পড়িল। লীলাকে সে বলে নাই, কিন্তু কতদিন ভাবিয়াছে, হীরক সে ত লীলাকে আশা দিয়াছিল বিদেশে লইয়া যাইবে, শেষে ঠকাইয়াছিল—লীলা সারিয়া উঠিলে সে একদিন-না-একদিন তাহাকে বিদেশ দেখাইবে, যেখানে লীলা যাইতে চায় সেখানে লইয়া যাইবে সঙ্গে করিয়া, এই সেদিনও কথাটা ভাবিতেছিল।

কতকাল আগে নদীর ধারের ওইখানটিতে একটা সাঁই-বাব্‌লাতলায় বসিয়া এই রকম বৈকালে সে মাছ ধরিত—আজকাল সেখানে সাই-বাব্‌লার বন,ছেলেবেলার সে গাছটা আর চিনিয়া লওয়া যায় না। আকাশের রং হইয়াছে অদ্ভুত, বর্ষার মেঘস্তূপ এখানে ওখানে, একটা গোলাপী পাহাড়ের পাশে কোন্ জগতের সান্ধ্যছায়াচ্ছন্ন বনানী, দূরে দূরে দেবলোকের মেরুপর্ব্বত, একজায়গায় একটা নিথর, হীরাকষের সমুদ্র—ওপারে বহুদূর পর্য্যন্ত ঘন সবুজ নবীন উলুবন ও আউশ ধানের ক্ষেত।

আজকাল নির্জ্জনে বসিলেই তাহার মনে হয় এই পৃথিবীর একটা আধ্যাত্মিক রূপ আছে, এর ফুলফল, আলোছায়ার মধ্যে জন্মগ্রহণ করার দরুণ ও শৈশব থেকে এর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের বন্ধনে আবদ্ধ থাকার দরুণ, এর প্রকৃত রূপটি আমাদের চোখে পড়ে না। এ আমাদের দর্শন ও শ্রবণগ্রাহ্য জিনিষে গড়া হইলেও যে আমাদের সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ও ঘোর রহস্যময়, এর প্রতি অণু যে অসীম জটিলতায় আচ্ছন্ন—যা কিনা মানুষের বুদ্ধি ও কল্পনার অতীত, এ-সত্যটা হঠাৎ চোখে পড়ে না।...

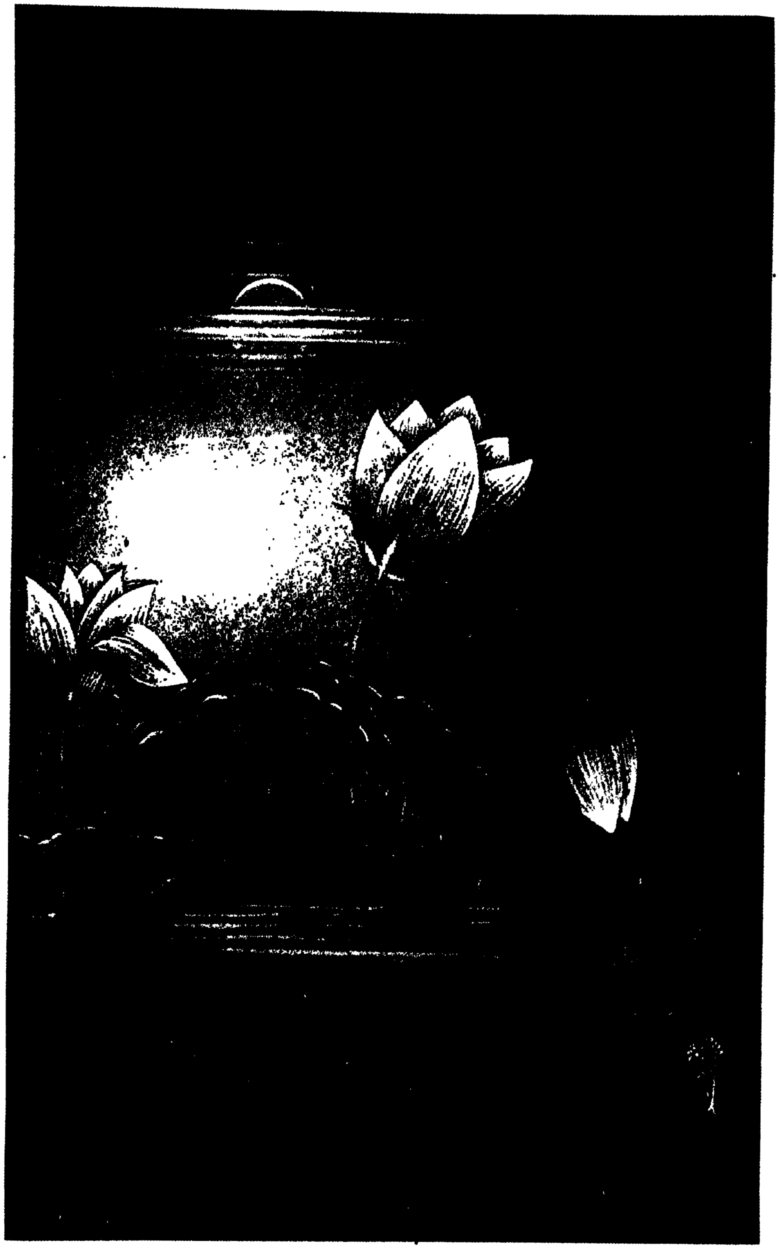
মৃত্যুকে একটা নতুনরূপে যেন দেখিল আজ।

মনে হইল তাহার এই সন্ধ্যায়...যুগে যুগে এ জন্ম-মৃত্যুচক্র কোন্ বিশাল-আত্মা দেবশিল্পীর হাতে আবর্ত্তিত হইতেছে, তিনি জানেন কোন্ জীবনের পরে কোন অবস্থায় জীবন আনিতে হয়, কখনও বা সঙ্গতি কখনও বা বৈষম্য—সবটা মিলাইয়া অপূর্ব্ব রসসৃষ্টি।

ছ' হাজার বছর আগে হয়ত সে জন্মিয়াছিল ইজিপ্টে, সেখানে নলখাগড়ার বনে, নীলনদের রৌদ্রদীপ্ত তটে কোন দরিদ্রঘরের মা বোন্, বাপ ভাই বন্ধুবান্ধবদের দলে সে এক অপূর্ব্ব শৈশব কবে কাটিয়া গিয়াছে, আবার হয়ত জন্ম নিয়াছিল সে রাইন নদীর ধারে—কর্ক-ওক্,বার্চ্চ, বীচ্ বনের শ্যামল ছায়ায় বনেদী ঘরের প্রাচীন প্রাসাদে মধ্যযুগের আড়ম্বরপূর্ণ আবহাওয়ায়, সুন্দরমুখ সাথীদের দলে। হাজার হাজার বছর পরে হয়ত আবার সে ফিরিবে পৃথিবীতে, তখন কি মনে পড়িবে এবারকারের এ জীবনটা ? কিংবা কে জানে আর পৃথিবীতে আসিবেই না। হয়ত ওই যে বট গাছের সারির মাথায় সন্ধ্যার ক্ষীণ প্রথম তারাটি, ওদের জগতে হয় ত এবার নবজন্ম। বৃহত্তর জীবনের এ স্বপ্ন—এ যে শুধুই কল্পনা-বিলাস, এ যে হয় না, তা কে জানে ? বৃহত্তর জীবনচক্র কোন দেবতার হাতে আবর্ত্তিত হয় কে জানে ? হয়ত এমন সব প্রাণী আছেন যাঁরা মানুষের মত ছবিতে, উপন্যাসে, কবিতায় নিজেদের শিল্পসৃষ্টির আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করেন না—তাঁরা এক এক বিশ্বসৃষ্টি করেন, তার মানুষের সুখে দুঃখে, উত্থানে পতনে আত্মপ্রকাশ করাই তাঁদের পদ্ধতি—কোন্ মহান্ বিবর্ত্তনের জীব তাঁর অচিন্ত্যনীয় কলাকুশলতাকে গ্রহে গ্রহে নক্ষত্রে নক্ষত্রে এ রকমভাবে রূপ দিয়াছেন, কে তাঁকে জানে ?

সারাদেহে একটা কিসের শিহরণ! কি অপূর্ব্ব আনন্দের !

ওপারে মাধবপুরের বাঁশবনের সারি অস্পষ্ট হইয়া আসিয়াছে, আউশের ক্ষেতের আল্‌পথ বাহিয়া কৃষকবধূরা কলসীতে জল লইয়া ফিরিতেছে—সব সেই বাল্যদিনের



চন্দ্র ও কমল

শ্রীনীলিমা বসু

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

মত···তার মনে হইল সে দীন নয়, দুঃখী নয়, তুচ্ছ নয়—এটুকু শেষ নয়, এখানে আরম্ভও নয়। সে জন্মজন্মান্তরের পথিক আত্মা, দূর হইতে কোন্ সুদূরের নিত্যনূতন পথহীন পথে তার গতি, এই বিপুল নীল আকাশ, অগণ্য জ্যোতির্লোক, সপ্তর্ষিমণ্ডল, ছায়াপথ, বিশাল অ্যাণ্ড্রোমিডা নীহারিকার জগৎ, বহির্ষদ পিতৃলোক—এই শত, সহস্র শতাব্দী তার পায়ে-চলার পথ—যুগে যুগে তাহা তার ও সকলের মৃত্যুদ্বারা অস্পৃষ্ট, সে বিরাট জীবনটা নিউটনের মহাসমুদ্রের মত সকলেরই পুরোভাগে অক্ষুণ্ণ ভাবে বর্ত্তমান—নিঃসীম সময় বাহিয়া সে গতি সারামানবের যুগে যুগে বাধাহীন হউক।···

অপু তাহাদের ঘাটের ধারে আসিল। ওই স্থানটিতে এমন এক সন্ধ্যায় অন্ধকারে বনদেবী বিশালাক্ষী স্বরূপ চক্রবর্ত্তীকে দেখা দিয়াছিলেন কতকাল আগে।

আজ যদি আবার তাহাকে দেখা দেন?

—তুমি কে?

—আমি অপু।

—তুমি বড় ভালছেলে। তুমি কি বর চাও?

—অন্য কিছুই চাইনে, এ গাঁয়ের বন ঝোপ, নদী, মাঠ, বাঁশবাগানের ছায়ায় ছায়ায় অবোধ, উদ্‌গ্রীব, স্বপ্নময় আমার সেই যে দশ বৎসর বয়সের শৈশবটি—তাকে আর একটি বার ফিরিয়ে দেবে দেবী?···

ঠিক দুপুর বেলা।

রাণী কাজলকে আটকাইয়া রাখিতে পারে না—বেজায় চঞ্চল। এই আছে, কোথা দিয়া যে কখন বাহির হইয়া গিয়াছে—কেহ বলিতে পারে না।

সে রোজ জিজ্ঞাসা করে—পিসিমা, বাবা কবে আসবে—কতদিন দেরী হবে?···

অপু যাইবার সময় বলিয়া গিয়াছিল—রাণু-দি, খোকাকে তোমার হাতে দিয়ে যাচ্চি, ওকে এখানে রাখবে, ওকে বলো না আমি কোথায় যাচ্চি। যদি আমার জন্যে কাঁদে, ভুলিয়ে রেখো—তুমি ছাড়া ও কাজ আর কেউ পারবে না।

রাণু চোখ মুছিয়া বলিয়াছিল—ওকে এ রকম ফাঁকি দিতে তোর মন সরুচে? বোকা ছেলে তাই বুঝিয়ে গেলি—যদি চালাক হ'ত?

অপু বলিয়াছিল, দেখ আর একটা কথা বলি। ওই বাঁশবনের জায়গাটা—তোমায় চল দেখিয়ে রাখি—একটা সোনার কৌটা মাটিতে পুঁতে আছে আজ অনেকদিন, মাটি খুঁড়লেই পাবে। আর যদি না ফিরি আর খোকা যদি বাঁচে—বৌমাকে কৌটোটা দিও সিঁদুর রাখতে। খোকাও কষ্ট পেয়ে মানুষ হোক্—এত তাড়াতাড়ি স্কুলে ভর্ত্তি করার দরকার নেই। ও এই গাছপালা, নদী, মাঠ, আকাশের তলায় বাড়ুক—যেখানে যায় যেতে দিও—কেবল যখন ঘাটে যাবে, তুমি নিজে নাইতে নিয়ে যেও—সাঁতার জানে না, ছেলেমানুষ ডুবে যাবে। ও একটু ভীতু আছে, কিন্তু সে-ভয় এ নেই তা নেই বলে ভেঙে দেওয়ার চেষ্টা করো না—কি আছে কি নেই তা কেউ বলতে পারে না, রাণু-দি। কোনো দিকেই গোঁড়ামি ভাল নয়—তা ওর ওপর চাপাতেও যাওয়ারও দরকার নেই। যা বোঝে বুঝুক, সেই ভাল।

অপু জানিত কাজল শুধু তার কল্পনা-প্রবণতার জন্য ভীতু। এই কাল্পনিক ভয় সকল আনন্দ, রোমান্স ও অজানার কল্পনার উৎস-মুখ। মুক্ত প্রকৃতির তলায় খোকার মনের সব বৈকাল ও রাত্রিগুলি অপূর্ব্ব রহস্যে রঙীন্ হইয়া উঠুক—মনেপ্রাণে এই তাহার আশীর্ব্বাদ।

অপু চলিয়া গিয়াছে মাস পাঁচ ছয় হইল।

কাজলের ঝোঁক পাখীর উপর। এত পাখী সে কখনও দেখে নাই—তাহার মামার বাড়ীর দেশে ঘিঞ্জি বসতি, এত বড় বন, মাঠ নাই—এখানে আসিয়া সে অবাক্ হইয়া গিয়াছে। রাত্রে শুইয়া শুইয়া মনে হয় পিছনের সমস্ত মাঠ, বন রাত্রির অন্ধকারের মধ্যে দৈত্যদানো, বাঘ, ভূত ও শিয়ালের ভিড়ে ভরিয়া গিয়াছে—পিসিমার কাছে আরও ঘেঁষিয়া শোয়। কিন্তু দিনমানে আর ভয় থাকে না, তখন পাখীর ডিম ও বাসা খুঁজিয়া বেড়াইবার খুব সুযোগ। রাণু বারণ করিয়াছে—গাছের

ধারের পাখীর গর্ত্তে হাত দিও না কাজল, সাপ থাকে। কিন্তু সে শোনে না, সেদিনও গিয়াছিল পিসিমাকে লুকাইয়া, কিন্তু অন্ধকার হইয়া গেলেই তার কর্ত্তে ভয়।

দুপুরে সেদিন পিসিমাদের বাড়ীর পিছনে বাঁশবনে পাখীর বাসা খুঁজিতে বাহির হইয়াছিল। হেমন্ত-দুপুর, সবে বর্ষাকাল শেষ হইয়া রৌদ্র বেজায় চড়িয়াছে, আকাশে বাতাসে বনে কেমন গন্ধ। বাবা তাহাকে কত বনের গাছ, পাখী চিনাইয়া দিয়া গিয়াছে, তাই সে জানে কোথায় বনমরিচার লতায় থোকা থোকা সুগন্ধ ফুল ধরিয়াছে—কেলেকোঁড়ার লতার কচি ডগা ঝোপের মাথায় মাথায় সাপের মত দুলিতেছে।

কখনও সে ঠাকুরদাদার পোড়ো ভিটাটাতে ঢোকে নাই। বাহির হইতে তাহার বাবা তাকে দেখাইয়াছিল, বোধ হয় ঘন বন বলিয়া ভিতরে লইয়া যায় নাই। একবার ঢুকিয়া দেখিতে খুব কৌতুহল হইল।

'জায়গাটা খুব উঁচু ঢিবিমত। কাজল এদিক-ওদিক চাহিয়া ঢিবিটার উপরে উঠিল—তারপরে ঘন কুঁচকাঁটা ও শ্যাওড়া বনের বেড়া ঠেলিয়া নীচের উঠানে নামিল। চারিধারে ইট, বাঁশের কঞ্চি, ঝোপঝাপ। পাখী নাই এখানে? এখানে ত কেউ আসে না—কত পাখীর বাসা আছে হয় ত—কে বা খোঁজ রাখে?

বসন্তচৌরী ডাকে—টুকৃলি, টুকৃলি, টুকৃলি—তার বাবা চিনাইয়াছিল। কোথায় বাসাটা? না, এমনি ডালে বসিয়া ডাকিতেছে?

মুখ উঁচু করিয়া খোকা ঝিকুড়ে গাছের ঘন ডাল-পালার দিকে উৎসুক চোখে দেখিতে লাগিল। এক ঝলক হাওয়া যেন পাশের পোড়ো ঢিবিটার দিক হইতে অভিনন্দন বহন করিয়া আনিল—সঙ্গে সঙ্গে ভিটার মালিক ব্রজ চক্রবর্ত্তী, ঠ্যাঙাড়ে বীরু রায়, ঠাকুরদাদা হরিহর রায়, ঠাকুরমা সর্ব্বজয়া, পিসিমা দুর্গা—জানা অজানা সমস্ত পূর্ব্বপুরুষ প্রভাতের তরুণ আলোয় অভ্যর্থনা করিয়া বলিল—এই যে তুমি আমাদের হয়ে আবার ফিরে এসেচ—আমাদের সকলের প্রতিনিধি যে আজ তুমি—আমাদের আশীর্ব্বাদ নাও, বংশের উপযুক্ত হও।

আরও হইল। সোঁদালি বনের ছায়া হইতে জল আহরণরত সহদেব, ঠাকুরমাদের বেলতলা হইতে শরশয্যাশায়িত ভীষ্ম, এ ঝোপের ও ঝোপের তলা হইতে বীর কর্ণ, গাণ্ডীবধারী অর্জ্জুন, অভাগিনী ভানুমতী, কপিধ্বজ রথে সারথি শ্রীকৃষ্ণ, পরাজিত রাজপুত্র দুর্য্যোধন, তমসাতীরের পর্ণকুটীরে প্রীতিমতী তাপসবধূবেষ্টিতা অশ্রুমুখী ভগবতী দেবী জানকী, সরযূতটের বনে মরণাহত কিশোর বালক সিন্ধু, স্বয়ংবর সভায় বরমাল্যহস্তে ভ্রাম্যমাণা আনতবদনা সুন্দরী সুভদ্রা, মধ্যাহ্নের খররৌদ্রে মাঠে মাঠে গোচারণরত সহায়সম্পদহীন দরিদ্র ব্রাহ্মণ-পুত্র ত্রিজট—হাতছানি দিয়া হাসিমুখে অভ্যর্থনা করিয়া বলিল—এই যে তুমি, এই যে আবার ফিরে এসেচ! চেন না আমাদের? কত দুপুরে ভাঙা জানালাটায় বসে বসে আমাদের সঙ্গে মুখোমুখি যে কত পরিচয়।...এস...এস...

সঙ্গে সঙ্গে রাণুর গলা শোনা গেল—ও খোকা, ওরে দুষ্টু ছেলে, এই একগলা বনের মধ্যে ঢুকে তোমার কি হচ্চে জিজ্ঞেস করি—বেরিয়ে আয় বল্‌চি। খোকা হাসিমুখে বাহির হইয়া আসিল। সে পিসিমাকে মোটেই ভয় করে না। সে জানে পিসিমা তাকে খুব ভালবাসে—দিদিমা'র পরে এক বাবা ছাড়া তাকে এমন ভাল আর কেউ বাসে নাই।

হঠাৎ সেই সময় রাণুর মনে হইল অপু ঠিক এমন দুষ্ট মুখের ভঙ্গি করিত ছেলেবেলায়—ঠিক এমনটি।

যুগে যুগে অপরাজিত জীবন-রহস্য কি অপূর্ব্ব মহিমাতেই আবার আত্মপ্রকাশ করিল!

খোকার বাবা একটু ভুল করিয়াছিল।

চব্বিশ বৎসরের অনুপস্থিতির পরে অবোধ বালক অপু আবার নিশ্চিন্দিপুরে ফিরিয়া আসিয়াছে।

সম্পূর্ণ

আত্মীয়-বিরোধ

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কল্যাণীয়াসু

কাজের ঝঞ্ঝাট বেড়ে উঠেচে। নানা লোকের নানা রকমের ফরমাস খাটতে হয়; তবু সে আমার বহুদিনের অভ্যাসে কতকটা সহ্য হয়ে এসেচে।

কিন্তু নিরতিশয় পীড়িত ক'রে তোলে অত্যাচারের কথা। আমার বেদনাবহ নাড়ী এই রকম কোনও সংবাদের নাড়া খেয়ে যখন ঝন্‌ঝন্ করে ওঠে, তখন সে যেন কিছুতে থামতে চায় না। সম্প্রতি দেহমনের উপর সেই উপদ্রব দেখা দিয়েচে।

এতদিন বন্যাপ্লাবনের দুঃখ দেশের বুকের উপর জগদ্দল পাথরের মত চেপে বসে ছিল; তার উপরে চট্টগ্রামের বিবরণটা সাইক্লোনের মত এসে তার সমস্ত বাসাটা যেন নাড়া দিয়েচে।

আমাদের আপন লোক যখন নির্ম্মম হয়, তখন কোথাও কোন সান্ত্বনা দেখিনে। এর পিছনে আর কোনো দুর্গ্রহের যদি দৃষ্টি থাকে, তবে তা নিয়ে আক্ষেপ ক'রে কোনো লাভ নেই। বল্‌তে হবে—'এহ বাহ্য।' সকলের চেয়ে আমাদের সাংঘাতিক ক্ষতি এই যে, হিন্দুরা পাছে সমস্ত মুসলমান সমাজের প্রতি বিরুদ্ধ হয়ে ওঠে। এ কথা বলাই বাহুল্য, এবং আমার অভিজ্ঞতা থেকে এ আমি নিশ্চিত জানি মোটের উপরে ভাল মত পরিচয়ের অভাব থেকেই আমাদের পরস্পর আত্মীয়তার ব্যাঘাত ঘটে। কোনো জাতের একদল মাত্র যখন অপরাধ করে, তখন সেই জাতের সকলের উপরেই কলঙ্ক লাগে এটা অনিবার্য্য—কিন্তু এ রকম ব্যাপক অবিচার কঠিন দুঃখেও আপন লোকের উপর করা চলবে না।

দেশের দিক দিয়ে মুসলমান আমাদের একান্ত আপন, এ কথা কোনো উৎপাতেই অস্বীকৃত হ'তে পারে না। একদিন আমার একজন মুসলমান প্রজা অকারণে আমাকে একটাকা সেলামী দিয়েছিল। আমি বললুম, আমি তো কিছু দাবি করিনি। সে বললে, আমি না দিলে তুই খাবি কি। কথাটা সত্য। মুসলমান প্রজার অন্ন এতকাল ভোগ করেছি। তাদের অন্তরের সঙ্গে ভালবাসি, তারা ভালবাসার যোগ্য। আজ যদি তারা হঠাৎ আমাকে আঘাত করতে আসে, তা হ'লে পরমদুঃখে আমাকে এই কথাই ভাবতে হবে, কোনো আকস্মিক উত্তেজনায় তাদের মতিভ্রম ঘটেচে—এটা কখনোই তাদের স্বাভাবিক বুদ্ধি নয়। দুর্দ্দিনে এমন ক'রে যদি আমি ভাবতে পারি, তা হলেই এই ক্ষণকালের চিত্তবিকার দূর হতে পারবে। আমিও যদি রাগে অধীর হয়ে তাদেরই অস্ত্র কেড়ে তাদের উপর চালাই, তা হলেই এ বিকার চিরদিনের মত স্থায়ী হবে—শেষকালে আসবে বিনাশ।

মুসলমান যদি কোনোরকম প্রবর্ত্তনায় হিন্দুকে নিপীড়ন করতে কুণ্ঠিত না হয়, তো হ'লে এ কথা মনে রাখতে হবে যে, এ শেল বাইরের নয়, এ মর্ম্মস্থানের বিস্ফোটক—এ নিয়ে রাগারাগি লড়াই করতে গেলে ক্ষত বেড়ে উঠ্‌তে থাকবে। বুদ্ধি স্থির রেখে এর মূলগত চিকিৎসায় লাগা ছাড়া আর কোন উপায় নেই। বিলম্ব হলেও সে-ই একমাত্র পন্থা।

যে পরজাতির পক্ষে ভারতবর্ষ অন্নের থালি, তারা যদি সেই অন্ন হ্রাস বা নাশের আশঙ্কায় আমাদের 'পরে কঠোর হয়ে ওঠে, তা হ'লে বুঝতে হবে সেটা স্বাভাবিক, এবং সেটা স্বার্থের জন্যে। এস্থলে তাদের শ্রেয়োবুদ্ধি বিচলিত হ'লে পরমার্থের দিকে না হোক, অর্থের দিকে একটা মানে পাওয়া যায়। কিন্তু আপন লোকের কৃত অন্ধ অন্যায় তাদের নিজেরই স্বার্থের বিরুদ্ধ। তারা চিরদিনের মত দেশের চিত্তে অবিশ্বাসকে আবিল ক'রে তোলে; তাতে চিরদিনের জন্যই তাদের নিজের

ক্ষতি। যে নৌকোয় সবাই পাড়ি দিচ্ছি, দাঁড় মাঝি বা কোনো আরোহীর 'পরে রাগ ক'রে তার তলা ফুটো ক'রে দেওয়াকে জিৎ হওয়া মনে করা চলে না। ইংরেজ যখন একদা সমস্ত চীনদেশের কণ্ঠের মধ্যে তলোয়ারের ডগা দিয়ে আফিমের গোলা ঠেসে দিয়ে তাদের আরাধ্য দেবতাকে চিরদিনের মত অপমানিত করলে, তখন এ পাপ থেকে অন্তত তারা বৈষয়িক পুরস্কার পেয়েছে। কিন্তু কল্পনা কর, দক্ষিণ-চীন যদি রাগের মাথায় উত্তর-চীনের মুখে বিষ ঢালতে থাকে, তাতে চীনের যে মৃত্যুর সঞ্চার হবে, তাতে দক্ষিণ তার থেকে নিষ্কৃতি পাবে না। আত্মীয়দের শত্রুতাস্থলে জিৎলেও মৃত্যু, হারলেও মৃত্যু। আমাদের মধ্যে যে-কোনো সম্প্রদায় উগ্র উৎসাহে স্বাজাতিক সত্তার মূলে যদি কুঠার চালায়, তবে নিজে উচ্চ শাখায় নিরাপদে আছে মনে ক'রে খুসি হওয়াটা অধিকদিন টেকে না। দুঃখে এই, এই সব কথা দুঃখের দিনেই কানে সহজে পৌঁছয় না। যখন মানুষের রিপু যে-কোনো কারণেই উত্তেজিত হয়, তখন আত্মীয়কে আঘাতের দ্বারা মানুষ আত্মহত্যা করতেও কুণ্ঠিত হয় না। ইতিহাসে শোচনীয়তম ঘটনা যা ঘটে, তা এমনি করেই ঘটে। মরবার বুদ্ধি পেয়ে বসলে মানুষ আপনিই মরবে জেনেও অন্যকে মারে। আমাদের সাধনা আজ কঠিন হয়ে উঠল। আজ অসহ্য আঘাতেও আত্ম-সম্বরণ করতে যদি না পারি, তবে আমাদের তরফেও আত্মহত্যার আয়োজন করা হবে, শত্রুগ্রহের হবে জয়।

মন ক্ষুব্ধ আছে বলেই তোমার চিঠির মধ্যে এ-সব কথা লিখ্‌লুম। কথাটা এ-স্থলে প্রাসঙ্গিক না হ'তে পারে, কিন্তু মর্ম্মান্তিক। ইতি ২০শে ভাদ্র, ১৩৩৮।

জাল

শ্রীব্রতীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ফুলঝোর নদীতে জেলেরা চট্‌কা বেঁধেছে। সারা দিনরাত তারই শব্দ হাওয়ায় ভেসে আসে; যেন হাওয়ার সঙ্গে নদীর কি খেলা চলেছে, করতালির আর শেষ নেই।

জলের ধারে ছোট্ট গ্রাম; বাঁশ আর বাবলা গাছের ঝোপে ঢাকা বাড়ি আর গরুর বাথান দেখায় যেন বাবুই পাখীর বাসা।

গ্রাম থেকে একটু তফাতে জলের ধারেই ছমির মিয়ার ঘর। ছিল এককালে সে বড় জোৎদার, এখন তার সেই দোচালা ঘর, ধানের গোলা, গরুর বাথান, ভেঙে চুরে স্তূপাকার হয়ে পড়ে আছে তার আম-বাগানের শুখ্‌নো ডাল আর পাতার সঙ্গে মিশিয়ে।

জমির উঁচু পাড় থেকে ছমির বেঁধেছে মাচা। তারই উপর সে বসে থাকে ফুলঝোরের কালো জলে জাল ফেলে। তার ছেঁড়া জালে মাছ যে কত পড়ে তা সবাই জানে। তবু যতবারই ঐ পথে গেছি, ছমিরকে দেখেছি সেই একই ভাবে বসে থাকতে।

গ্রামের লোকে বলে ছমিরের বয়েস হয়েছে এক-শো বছরের বেশী। তার গায়ের রং ঐ ফুলঝোরের বুকের পলিমাটির মতই। ঝোড়ো হাওয়ায় তার শাদা দাড়ি আর চুল উড়তে থাকে যেন নদীর জলের ফেনা। তার প্রকাণ্ড শরীরের অনেক জায়গায়ই টোল খেয়েছে এখন, যেন শিকড় বের করা প্রাচীন বট জলের উপর ঝুঁকে আছে। ছমিরের চোখ নীল, যেন শরতের আকাশ। লোকে বলে ছমির পাগল। এক সময়ে সে ছিল ডাকাতের সর্দ্দার। তার হাতের লাঠির দাগ পঞ্চাশ ক্রোশের মধ্যে অনেকের গায়েই পরিস্ফুট থেকে তার বীরত্বের পরিচয় দিত। এখন তার মধ্যে একজনও বেঁচে নেই।

খুব ছোট বয়স থেকেই ছমিরের আপন বল্‌তে কেউ ছিল না। নিজের দু'খানা কঠিন হাতের জোরেই সে হয়ে উঠেছিল গ্রামের মোড়ল। দল বেঁধে সে টান্‌ত নদীর উপরে ছিপ্‌; কালবৈশেখীর দিনে বানের সময় ঝাঁপিয়ে পড়ত নদীর জলে। তার কৈশোরের উদ্দামতা যৌবনেতে দেখা দিলে অন্যরূপে। ছেলেবেলা থেকে যে-জিনিষ জীবনে কখনও পায়নি তাই সে এখন নিতে চাইলে কেড়ে গায়ের জোরে। ছিল সে ভালবাসার চিরকাঙাল, এখন সুরু করলে দস্যুবৃত্তি।

শ্রাবণের বর্ষণ শেষ হয়েছে; ফুলঝোর নদী কূলে কূলে ভরে উঠেছে; কাছিম মার্‌বার সময় এল। ইস্পাতের ফলায় শান্‌ দিয়ে ছমির বেরুল বেলতলীর দিকে; ওখানকার জলে কাছিম জমে ভাল।

রাত্রে ছিপ বেঁধেছিল শর ঝোপের আড়ালে, কোন্‌ ঘাটে তার ঠিক নেই। ভোরের ঝাপ্‌সা আলোয় সেই ঘাটে এল জল নিতে আব্‌দাল সর্দ্দারের মেয়ে মোতিয়া —মেয়ে নয় ত যেন শ্বেতকরবীর গুচ্ছ।

ছমিরের নীল চোখে কি আলো জ্বলে উঠেছিল জানি না, কিন্তু তারই পানে চেয়ে মোতিয়া মুখের উপর ঘোম্‌টা টান্‌তে ভুলে গেল।

কল্‌সীতে জল ভ'রে যখন ফিরবে, এমন সময় ছমির তার বর্শা তুলে নিয়ে ছুঁড়ে মারলে; আমগাছের গুঁড়িতে বিঁধে মোতিয়ার ফেরবার পথে সে যেন প্রকাণ্ড আগল হয়ে রইল। ছমির হেসে উঠ্‌ল। মোতিয়া মাথা নীচু ক'রে ঘরের দিকে ফিরল। ভাগ্যদেবতা তখন ভোরের আকাশে সোনার আলোয় এদের ভাগ্যলিপি রচনা করতে আরম্ভ করেছেন।

বেলতলীর সে ঘাট থেকে ছমির নৌকা খুল্‌ল না। হাঁটাহাঁটি সুরু করলে আব্‌দালের ঘরে—মোতিয়াকে তার চাই-ই। বুড়ো আবদাল ভয় পেলে; ছমির—সে যে ডাকাত! শেষে তার হাতে মেয়েটাকে দিয়ে কি চির-দুঃখিনী ক'রে রাখবে? আবদালের মত হ'ল না। ছমিরের নৌকা বাঁধাই রইল বেলতলীর ঘাটে।

কোন দিন সে আনে প্রকাণ্ড মাছ; কোন দিন আনে গাছের ফল। আবদালের ঘরের আঙিনায় এনে নামিয়ে রাখে। যেখানের জিনিষ সেইখানেই পড়ে থাকে; কেউ উঠায় না। কোথা থেকে একদিন ছমির নিয়ে এল এক মেষ-শিশু; উঠানের মাঝে এনে ছেড়ে দিলে তাকে। নধর জীব-শিশু ত্রস্ত দুই চোখ মেলে খুঁজে ফির্‌তে লাগল তার হারানো মা'কে। মোতিয়া আর পারলে না থাক্‌তে; মাথায় ঘোমটা টেনে বেরিয়ে এল ঘর থেকে; মেষ-শাবককে কোলে ক'রে নিলে, তারপর চাপা গলায় বল্‌লে, 'আর এসো না তুমি।'

কে শোনে তার কথা; ছমিরের দৌরাত্ম্য বেড়েই চল্‌ল। একদিন ভোরের অন্ধকারে সে এল আবদালের ঘরের কাছে। তার কপালের উপর ঝাঁকড়া চুলের মাঝে তখনও কাঁচা রক্ত জমাট বেঁধে আছে; মোতিয়াদের আঙিনায় সে এক থলি লুটের টাকা ঝনাৎ ক'রে ফেলে দিয়ে চলে গেল ঘাটের দিকে। সকাল বেলা আবার সে টাকা ফিরে এল তার নৌকায়।

গ্রামের লোকে পরামর্শ দিলে আবদালকে—মেয়ের আর কোথাও বিয়ে দিয়ে দাও। হ'লও তাই।

পাশের গ্রামের বুড়ো মকবুলের তেজারতির কারবার; অনেক টাকা। সম্প্রতি স্ত্রী গেছে তার মারা। চোখের জলে বুকের ওড়না ভিজিয়ে মোতিয়া একদিন গেল তার ঘরের ঘরণী হয়ে।

ছমির স্থির হয়ে রইল—যেন বজ্রে ভরা বর্ষার মেঘ।

বুড়ো মক্‌বুল তেজারতি কারবার করতে করতে নিজের জীবনের জমা-খরচের প্রায় শেষ অঙ্কে এসে পৌঁচেছিল। হঠাৎ একদিন সেই অঙ্ক শেষ ক'রে দিলে সে; জের টানবার আর অবকাশ হ'ল না।

মোতিয়া ফিরল বাপের ঘরে, তার পরিপূর্ণ যৌবন আর মক্‌বুলের দেওয়া একরাশ টাকা নিয়ে।

ছমিরের কোনও উদ্দেশ নেই। কেউ খোঁজও রাখে না। শুধু মোতিয়ার দুই কালো চোখ নিয়তই জলে ভরে থাকে।

সন্ধ্যাবেলা যখন কাশের বনে হাওয়া ব্যাকুল হয়ে ওঠে তখন মোতিয়ার মন যেন কেমন করে। ভাঙা

ঘাটে এসে দাঁড়ায়; শূন্য ঘর ঝোপটার পানে চেয়ে বুক ব্যথিয়ে ওঠে। ছমির একদিন ঐখানে তারই ঘাটে নৌকা বেঁধেছিল; কি প্রচণ্ড অভিমান সে বুকে ক'রে নিয়ে গেছে। এমনি ক'রে মোতিয়ার দিন কাটে। তার স্বপ্ন-লতায় ফুল ফোটে, আবার ঝরেও যায়, কুড়িয়ে নেবার মানুষ কোথায়?

এমনি ক'রে কতদিন কেটে গেল। সেবার ফুলঝোর নদীতে এল বন্যা। গ্রামের পাড়ে পাড়ে ভাঙন সুরু হ'ল; মোতিয়ার গ্রাম বেলতলী, নদীর বাঁকে; সেইখানেই ভাঙন ধরেছে সব চেয়ে বেশী। সারা দিনরাত পাড় ধসার প্রচণ্ড শব্দ হাওয়ায় ভেসে আসে।

মোতিয়াদের ঘরের কিনারায় নদীর জল এসেছে। তারা গরু-বাছুর, তৈজস-পত্র দিয়েছে পাঠিয়ে অন্য গাঁয়ে। বাপ আর মেয়েতে দুজনে আছে জলের মাঝে মাচা বেঁধে।

মোতিয়ায় মনেও বুঝি বান ডেকেছে। রূপ-সাগরের ছল ছল ঢেউ তার সারা অঙ্গে তরঙ্গিত হ'তে থাকে। সে স্থির থাকতে পারে না, জলের মাঝে পা ডুবিয়ে বিনা কাজে ঘুরে বেড়ায় এ-ধারে ও-ধারে। ফুলঝোরের অশান্ত কালো জল মনে করিয়ে দেয় তাকে ছমিরের কথা; ব্যথায় বুক ভরে ওঠে।

সেদিন রাত্রে হঠাৎ এল ঝড়; নদীর জল কলরোল ক'রে উঠল। আম-কাঁঠালের বনে সুরু হ'ল মাতামাতি। পঞ্চমীর চাঁদ ঢাকা পড়ল কালো মেঘের ছেঁড়া পর্দায় মোতিয়াদের বাঁশের মাচা গেল ভেসে।

ভোর রাত্রে সোঁতার মুখে নৌকা বেঁধেছিল ছমির। সেইখানে সে কুড়িয়ে পেলে মোতিয়াকে। নিয়ে গেল তাকে নিজের ঘরে। ছেঁড়া কাঁথায় শুইয়ে দিয়ে চুপ ক'রে বসে রইল।

সকালের আলোয় মোতিয়া চোখ মেলে চেয়ে দেখলে ছমিরের দুই নীল চোখের পানে। সে চোখের আগুন নিবে গেছে কবে। তারই বদলে ফুটে আছে বেদনায় ভরা একটি অনন্ত আশা।

এই কদিনেই ছমিরের কালো চুলে পাক ধরেছে; মোতিয়া একটা নিঃশ্বাস ফেলে উঠে বসল, তারপর ভিজে কাপড় মাথার উপর টেনে উঠে দাঁড়াল।

ছমির জিজ্ঞাসা করলে, 'কোথায় যাচ্ছ?' মোতিয়া হাত বাড়িয়ে দেখিয়ে দিলে ঘাটের দিকটা। ছমির বাধা দিলে না, মোতিয়া অদৃশ্য হয়ে গেল বাঁশঝাড়ের আড়ালে।

মোতিয়া আর ফিরল না। বুড়ো আবদালের শ্বেত-করবীর গুচ্ছ ফুলঝোরের কালো জলে ভেসে গেল।

ছমির ছুটে গিয়ে জলের মাঝে জাল ফেললে মোতিয়াকে যে তার ফিরে পাওয়া চাই-ই।

সেই থেকে সে জলে জাল ফেলে বসে থাকে; জিজ্ঞাসা করলে বলে "মাছ ধরছি।" গ্রামের লোকে সবাই বলে ছমির পাগল।



প্রাচীন রাজপুত-সমাজে বিবাহ-পদ্ধতি

শ্রীঅমৃতলাল শীল

উত্তর-ভারতে মুসলমানদের রাজ্য স্থাপিত হইবার পর, মুসলমান ঐতিহাসিকেরা রীতিমত ইতিহাস রচনা করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। তাহার পূর্ব্বে প্রত্যেক হিন্দু রাজার সভার চারণ বা ভাট কবিরা রাজবংশের যোদ্ধাদের কীর্ত্তিগাথা রচনা করিতেন; প্রসঙ্গক্রমে তাহাতে অন্য সমসাময়িক রাজবংশের, বা যাহাদের সহিত যুদ্ধ হইয়াছিল তাহাদের, বর্ণনাও থাকিত। এই কবিতাগুলিই সে-কালের বিশ্বাসযোগ্য ইতিহাস। এই কবিরা প্রায়ই ভ্রমণশীল ছিলেন, ক্ষত্রিয়সমাজে তাঁহাদের অবারিত দ্বার ও যথেষ্ট সম্মান ছিল। তাঁহারা যখন যে-দেশে যাইতেন সেখানে রাজপুত সামাজিক সভাতে আপনার রাজার ও অন্যান্য রাজপুত যোদ্ধাদের যুদ্ধ-সংবাদ ও কীর্ত্তি-গাথা শুনাইতেন ও সে-দেশের সকল বংশের সংবাদ সংগ্রহ করিতেন। দেশের লোকেরা আগ্রহ করিয়া তাঁহাদের গান শুনিত ও আপনাদের সংবাদ দিত। এইরূপে কোন যোদ্ধা কোন প্রশংসনীয় কার্য্য করিলে অতি অল্প সময়ে সে-সংবাদ সমস্ত ক্ষত্রিয়-সমাজে প্রচারিত হইয়া যাইত। ক্ষত্রিয়-সমাজে কাহারও বিবাহযোগ্যা কন্যা থাকিলে এইরূপ সংবাদ পাইয়া সে জামাতা নির্ব্বাচন করিত, ও কীর্ত্তিমান্ যুবকদের গ্রামে ঘটক বা টীকা পাঠাইত। এইরূপ অনেক গাথাই নষ্ট হইয়া গিয়াছে, তথাপি যেগুলি পাওয়া যায়, তাহাদের মধ্যে চন্দবরদাই রচিত পৃথ্বীরাজ রাসোর স্থান অতি উচ্চে, তাহাতে ঈশীয় দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ চরণে আজমীর-পতি বা সম্ভরীনাথ পৃথ্বীরাজ চোহানের কীর্ত্তি ও পতন এবং দিল্লীতে মুসলমান রাজ্যস্থাপনের সবিস্তার বর্ণনা আছে, ও তাহার সমসাময়িক অন্য সকল দেশের রাজাদের কথা সংক্ষিপ্তভাবে আছে। যে পুস্তক এখন রাসো নামে পরিচিত, তাহাতে প্রক্ষিপ্ত ও বিকৃত অংশ এত বেশী যে, প্রাচীন পুস্তকে ইহার ভিতর কতটুকু ছিল খুঁজিয়া পাওয়া কার্য্যতঃ অসম্ভব। ১৮০০ ঈশাব্দের কাছাকাছি টড (Tod) যে রাসো পাইয়াছিলেন, তাহা হইতে কোন কোন অংশ তাঁহার রাজস্থানে উদ্ধৃত করিয়াছেন, এখনকার কাশীর বিশুদ্ধ সংস্করণে সে-সকল অংশ নাই বা সম্পূর্ণ ভিন্নরূপে বর্ণিত। কোন্‌টা চন্দবরদাইয়ের রচনা জানিবার উপায় নাই।

সে সময়ে চিতোর-পতি গিহ্‌লোট-বংশীয় মহারাণা ছাড়া উত্তর-ভারতে আজমীরে পৃথ্বীরাজ চোহান, কনোজে জয়চন্দ কমধ্বজ, মহোবাতে পরমর্দ্দিদেব [পরমাল] চন্দেল, ও গুজরাটে সোলঙ্কী-বংশীয়রাই প্রবল রাজা ছিলেন; ইহার মধ্যে পৃথ্বীরাজ ও জয়চন্দ উভয়ে চক্রবর্ত্তী সম্রাট উপাধির দাবি করিতেন। মহোবার সেনাপতি ও সামন্ত, বনাফর-বংশীয় দুই ভাই, আল্‌হা ও উদনের (উদয়সিংহ) যুদ্ধ বর্ণনা করিয়া ঐ রাসোতে "মহোবা সময়" নামক এক অধ্যায় আছে। ইহা ছাড়া আল্‌হার গান নামক স্বতন্ত্র এক গাথা রচিত হইয়াছিল, কিন্তু সে গানগুলি কখনও লেখা হয় নাই। মুখেমুখেই রক্ষিত হইয়াছিল বলিয়া আধুনিক গান এত পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে যে, প্রাচীন পুস্তকে কি ছিল এখন জানিবার উপায় নাই। তথাপি ঐ গানে কয়েকটি বিবাহের ও যুদ্ধের বর্ণনা আছে, তাহা হইতে সেকালের বিবাহ-পদ্ধতি কতক কতক বুঝিতে পারা যায়; সেই বিবাহ-পদ্ধতি সংক্ষেপে বর্ণনা করিতেছি।

ভ্রমণশীল কবিদের গাথা শুনিয়া কন্যার পিতা বাঞ্ছনীয় যুবকদের এক ফর্দ্দ করিতেন, ও আপনার নির্ব্বাচিত বরদের বাটী টীকা পাঠাইয়া দিতেন। টীকা প্রায়ই কন্যার ভ্রাতা লইয়া যাইত, ভ্রাতা না থাকিলে কোনও আত্মীয়কে ধর্ম্মভ্রাতারূপে বরণ করিয়া, টীকার (ক্ষমতা-মত) যৌতুক তাহার সহিত পাঠান হইত। টীকা প্রথা এখনও যুক্তপ্রদেশে প্রচলিত আছে, উহা বাংলার পাকাদেখা স্থানীয়; পাত্র স্থির হইলে তাহার কপালে টীকা দিয়া

আশীর্ব্বাদ করা হয় ও কিছু আশীর্ব্বাদী দেওয়া হয়। এই প্রক্রিয়াকে "টীকাচড়ান" বলে। এই টীকা লইয়া যে যায়, তাহার সহিত চারজন নেগী (অর্থাৎ এমন লোক যাহাদের শুভকর্ম্মে উপস্থিত থাকা একান্ত প্রয়োজনীয়) পাঠান হইত। নিম্নলিখিত চারজন নেগীর বিবাহের সময়ে উপস্থিত থাকা চাই।

১। নাউ অর্থাৎ নাপিত

২। বারী—ক্ষত্রিয়দের এক জাতীয় সেবক যাহারা ক্ষত্রিয়দের সংসারের সকল কাজ করে, আহারের জন্য পাতা ও দোনা প্রস্তুত করে, প্রভুর কাপড়-চোপড় রক্ষা করে, কোন স্থানে যাইবার সময়ে মশাল ধরিয়া লইয়া যায়, সভাতে প্রবেশ করিলে জুতা রক্ষা করে, ইত্যাদি।

৩। ভাট বা রাও বংশতালিকা পাঠ করিয়া সভাতে প্রভুর পরিচয়, বংশ, পূর্ব্বপুরুষের ও তাঁহার নিজের কীর্ত্তিগুলির পরিচয় দেয়। সেকালে বিদেশে বা কোনও সভাতে যাইতে হইলে সঙ্গে ভাট লইতে হইত, কেন না, নিজের মুখে আপনার ও আপনার বংশের কীর্ত্তি বলা অসভ্যতা বিবেচিত হইত, অথচ এগুলির যথেষ্ট সম্মান ছিল বলিয়া প্রকাশ করাও প্রয়োজনীয়।

৪। পুরোহিত—বিবাহ বা শুভকর্ম্মে পুরোহিতের কার্য্য সর্ব্ববাদিসম্মত।

এই চারজন ছাড়া বড়লোকদের অন্য সেবকরাও নেগী-পদবাচ্য। রাজাদের সঙ্গে পঁচিশ ত্রিশ জন নেগী থাকে। কন্যার পিতা টীকা-বাহককে বরের শক্তিসামর্থ্য সম্বন্ধে কি কি সন্ধান লইয়া, বা কিরূপে পরীক্ষা করিয়া তবে টীকা দিতে হইবে সবিস্তারে বুঝাইয়া দেন, কোথায় কোথায় যাইতে হইবে তাহাও বলিয়া দেন। তাহার হাতে প্রায় এক পত্র লিখিয়া দেন, সে পত্রখানি প্রকৃতপক্ষে প্রকাশ্য যুদ্ধে একখানি আহ্বান-পত্র মাত্র; তাহাতে কন্যার পিতা লেখেন—'আমার একটি পরমাসুন্দরী পদ্মিনী কন্যা আছে, তাহার বিবাহ দিতে চাই। নিয়ম-মত যুদ্ধ করিয়া আমার সমান শ্রেণীর যে ক্ষত্রিয় যুবকের সাহস হয়, সে আসিয়া বিবাহ করুক।' কেহ কেহ ইহাও লিখিয়া দেন যে, বরকে এই এই রূপে বলের পরীক্ষা দিতে হইবে। টীকা-বাহক যখন কোনও উপযুক্ত পাত্রের সন্ধান পায়, অথবা কন্যার পিতা কর্ত্তৃক দত্ত ফর্দ্দমত পাত্রের অভিভাবকের গ্রামে যায়, তখন পাত্রের পিতা অথবা অভিভাবকের কাছে পত্র দেখাইয়া বলে, 'আমি অমুক রাজার* বা ক্ষত্রিয়ের কন্যার জন্য টীকা আনিয়াছি; শুনিয়াছি আপনার বাটীতে অমুক অবিবাহিত কুমার (অথবা বিবাহিত যুবক) পাত্র আছে, আপনি টীকা স্বীকার করিবেন কি?' তিনি যদি টীকা স্বীকার না করেন, তবে পত্রখানি ফেরৎ দেন, টীকাবাহী স্থানান্তরে চলিয়া যায়। যদি স্বীকার করেন, তবে টীকার উদ্যোগ আরম্ভ হয় ও শুভদিনে টীকা দেওয়া হয়। তবে বাটীতে বিবাহের উপযুক্ত অবিবাহিত যুবক থাকিলে টীকা ফেরৎ দেওয়া অপমানের কথা, কেন-না, বিবাহের সময়ে যুদ্ধ করিতে হয়; যাহারা কন্যাপক্ষীয়কে অত্যন্ত বলবান্ দেখে, তাহারা যুদ্ধের ভয়ে টীকা স্বীকার করে না, অতএব টীকা ফেরৎ দিলে প্রকারান্তরে আপনাকে হীনবল বলিয়া স্বীকার করা হয়। অনেক সময়ে টীকা স্বীকার করিবেন কি-না তাহার উত্তর দিতে বরপক্ষের দু-চার মাস বিলম্ব হয়; কারণ বরের পিতা আপনার নিকটের ও দূরের কুটুম্বদের পরামর্শ লয়েন, যদি তাঁহার পক্ষে যথেষ্ট বলবান যোদ্ধা থাকেন, ও তাঁহারা ঐ কন্যার পিত্রালয়ে বরযাত্রীরূপে যুদ্ধ করিতে স্বীকৃত হয়েন, তবে তিনি টীকা গ্রহণ করেন, নতুবা টীকা ফেরৎ দেন। এই ক্ষত্রিয়রা প্রত্যেকেই একাধিক বিবাহ করিতেন, অতএব কোন বিবাহিত ব্যক্তির টীকা ফেরৎ দেওয়ায় অপমান হইত না, কেন-না, তিনি ভয় পাইয়া অস্বীকার করিলেন, কিংবা আর বিবাহ করিতে চাহেন না বলিয়া অস্বীকার করিলেন, জানিবার উপায় নাই।

পাত্রের পিতা টীকা স্বীকার করিলে পাত্রের বাটীতে প্রাঙ্গণ পরিষ্কার করিয়া এক স্থানে চন্দ্রাতপতলে ঘট স্থাপন করা হইত, পাত্র-পক্ষীয় নেগীরা উপস্থিত থাকিত,

---

* স্মরণ রাখিতে হইবে যে রাজপুত শব্দের অর্থই "রাজপুত্র"। অতএব রাজপুত মাত্রেই রাজা রূপে সম্বোধিত হইবার অধিকারী। রাজপুত-সমাজে রাজা ও প্রজার সম্মান সমান। অতি দরিদ্র কিন্তু বলবান রাজপুতও দেশের বড় রাজার কন্যা বিবাহ করিবার উপযুক্ত পাত্র বিবেচিত হয়।

আঙ্গিনাতে একদিকে কয়েকজন বেদপাঠী বেদপাঠ করিত। গ্রামের "সখী"রা, অর্থাৎ সকল বর্ণের বিবাহিত বা অবিবাহিত ও বিধবা স্ত্রীলোকরা ঢোলক বাজাইয়া "মঙ্গলাচার" করিত অর্থাৎ বিবাহের মঙ্গলগীত গাহিত। পাত্র ঘটের কাছে এক চিত্রিত পিঁড়া পাতিয়া বসিত, তখন টীকা-বাহক আপনার নেগীদের সঙ্গে করিয়া আসিতেন, পাত্রের সহিত কথাবার্ত্তা কহিয়া নানা ছুতা করিয়া তাহার শারীরিক বল পরীক্ষা করিতেন। টীকা-বাহক প্রায়ই আপনার সহিত প্রায় একহাত ব্যাসের লোহার পাত্‌লা বা বেশ পুরু চাদরের কয়েকটি তাওয়া আনিত, ও তিন হইতে সাতটি তাওয়া একটির উপর আর একটি রাখিয়া প্রাঙ্গণে পুঁতিয়া দিত। পরে আপনার (আধ মণ হইতে এক মণ লোহার তিনচার ফুট লম্বা বর্ষা বা) "সাঙ্গ" সজোরে পোঁতা তাওয়ার উপর মারিত, "সাঙ্গ" তাওয়া ফুঁড়িয়া অনেকটা মাটিতে বসিয়া যাইত। এইরূপে আপনার বলের পরীক্ষা দিয়া বলিত, 'আমাদের বংশের আচার অনুসারে পাত্রকে টীকা দিবার পূর্ব্বে এই সাঙ্গ নাড়া না দিয়া, কেবল টানিয়া তুলিতে হইবে। পাত্র সাঙ্গ তুলিতে না পারিলে অন্যরূপে পরীক্ষা করিত, চিহ্নিত স্থানে লক্ষ্য করিয়া 'সাঙ্গ' মারিতে বলিত বা আপনার তীর ধনু দিয়া লক্ষ্য করিতে বলিত, অথবা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হইলে পাত্রকে অপদার্থ ভাবিয়া স্থানান্তরে যাইত। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে পাত্রের কপালে চন্দন, রোরী (এক প্রকার লাল গুঁড়া) অক্ষত (তণ্ডুল) দূর্ব্বা দিয়া টীকা পরাইয়া দিত ও টীকার যৌতুক দিত, পরে পাত্রের বংশের নেগীদের গহনা কাপড় ইত্যাদি পুরস্কার দিত। কখন টীকা-বাহক স্বয়ং বিতরণ করিত, কখন পাত্রের অভিভাবককে বিতরণ করিতে দিত। পরে উভয় পক্ষের পুরোহিত মিলিয়া গৃহকর্ত্তার সুবিধামত বিবাহের দিন স্থির করিত, টীকা-বাহক আপন দেশে ফিরিয়া যাইত ও উভয়পক্ষে বিবাহের উদ্যোগ করা হইত। পাত্র-পক্ষীয়রা এরূপ বল পরীক্ষার কথা বেশ জানিতেন, পাত্র যদি সেরূপ বলবান্ না হয় তবে পরীক্ষায় অপমানিত হওয়া অপেক্ষা কোনও ছুতা করিয়া টীকা অস্বীকার করাই নিরাপদ ছিল। আজকাল আমাদের সমাজে পাত্র অপেক্ষা পাত্রীদের বেশী উদ্যোগ করিতে হয়, কিন্তু সেকালে ক্ষত্রিয়দের উভয় পক্ষেই যুদ্ধ করিতে এবং বন্ধু-বান্ধব ও কুটুম্বদের একত্র করিতে হইত, বিশেষতঃ পাত্র-পক্ষীয়কে বেশী ব্যয় করিতে হইত।

পাত্র ও পাত্রী উভয় পক্ষীয়রা আপনার কুটুম্ব ও বন্ধুদের নিমন্ত্রণ করিতেন। ইহা কেবল লুচি খাইবার নিমন্ত্রণ নহে, তাঁহাদের রীতিমত যুদ্ধ করিতে হইত। অনেক নিমন্ত্রিত অতিথি বিবাহ দেখিতে আসিয়া নিহত হইতেন, অতএব নিমন্ত্রিত ব্যক্তিরা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইয়া সসৈন্য আসিতেন। যাহারা যুদ্ধে যোগদান করিতে অনিচ্ছুক তাহারা কোন ছুতা করিয়া আসিত না। যে প্রকারে হউক, নিমন্ত্রণ করিবার পূর্ব্বে বা টীকা গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে উভয় পক্ষই আপনার বলাবল দেখিয়া লইতেন, বল না থাকিলে বিবাহের মত দুঃসাহসের কার্য্যে হাত দিতেন না। অনেকে বিবাহ করা বা বরযাত্র যাওয়া অপেক্ষা চির কৌমার ব্রত গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয় বিবেচনা করিত।

বরযাত্রীরা নির্দ্দিষ্ট সময়ে বরের বাটীতে সৈন্য সহিত একত্র হইলে বরকে "তেল" মাখান হইত, অর্থাৎ আমাদের ভাষাতে গায়ে হলুদ হইত। কন্যার বাটীতে সেরূপ ক্রিয়া কিছুই হইত না, কেন না, বর যুদ্ধে নিহত হইতে পারে, অতএব বিবাহের কোনও নিশ্চয়তা থাকে না। পাত্রের মাতা অথবা বাড়ির প্রধান গৃহকর্ত্রী "সখী"-দের (অর্থাৎ গ্রামের সকল বর্ণের স্ত্রীলোকদের) নিমন্ত্রণ করিয়া আনিতেন, তাহারা ঢোলক বাজাইয়া "মঙ্গলাচার" করিত, অর্থাৎ মঙ্গলগীত গাহিত। সকল শুভকার্য্যেই এরূপ মঙ্গলাচার করা অবশ্যকর্ত্তব্য। পরিষ্কৃত আঙ্গিনাতে একটি ঘট স্থাপন করিয়া নিকটে ঘৃতের প্রদীপ জ্বালিয়া দেওয়া হইত, আঙ্গিনার এক কোণে ব্রাহ্মণেরা বেদপাঠ করিত। নাপিত নখ কাটিয়া ক্ষৌর করিয়া দিলে এক সুদৃশ্য চন্দ্রাতপতলে পাঁচ বা সাতজন এয়ো মঙ্গলগীত গাহিতে গাহিতে বরের গায়ে অল্প পরিমাণে তেল লাগাইয়া দিত। বরের গায়ে তেল মাখান হইলেই বরের বাটীর নেগীরা পুরস্কার পাইবার আশায় বাটীর গৃহিণীর সহিত কোন্দল করিত, গৃহিণী সকলকে পুরস্কৃত

করিতেন। এই নেগীদের ঝগড়া করা এখনও এদেশে অবশ্যকর্ত্তব্য বিবেচিত হয়। শ্রাদ্ধ ইত্যাদি অশুভ কর্ম্মের সময়ে দান করিবার সময়ে নেগীরা কোন প্রকার দ্বিরুক্তি করে না, অল্প-বিস্তর যাহা পায় তাহাতেই তুষ্ট হয়, কিন্তু শুভকর্ম্মের দানের সময়ে তাহারা কিছুতেই তুষ্ট হয় না, আরও বেশী প্রার্থনা করে। অতএব নেগীরা বাদ-প্রতিবাদ না করিয়া পুরস্কার গ্রহণ করিলে অশুভ কর্ম্ম বলিয়া বোধ হয়, সেইজন্য নেগীদের ঝগড়া করা শুভ-কর্ম্মের চিহ্ন ও একান্ত বাঞ্ছনীয়। এ পদ্ধতি এদেশে এখনও প্রচলিত আছে, যে-প্রভু যত ধনবান্, সম্মানিত ও মুক্তহস্ত, তাহার বাটীর নেগীরা তত বেশী পুরস্কার-লাভের জন্য কোন্দল করিতে বাধ্য। ইহার পর নাপিত বাদাম, তিল, সরিষার খৈল, ও সুগন্ধ দ্রব্য ইত্যাদি একত্রে পিষ্ট "রূপটান" মাখাইয়া বরের শরীরের ময়লা তুলিয়া দিত ও সুগন্ধ জলে স্নান করাইয়া দিত। আধুনিক সাবান মাখানর পরিবর্ত্তে এই রূপটানের ব্যবহার এখনও আছে। বোধ হয় ইহাতে চর্ম্ম মসৃণ ও নির্ম্মল হয়। তাহার পর বিবাহের বেশ করা হইত। প্রয়োজন-মত কেশের সংস্কার ও চন্দনচর্চ্চিত করিয়া বরকে লাল রঙের বস্ত্র পরান, সুগন্ধি মাখান ও কতকগুলি অলঙ্কার পরান হইত। এ সময়ে প্রায় অঙ্গুলীতে মুঙ্গরী বা আংটী, হাতে কঙ্কণ, নবরত্ন, জওশন, বাজু, গলায় একাধিক হার, কর্ণে কুণ্ডল ও বালা, কটিদেশে মেখলা ও মাথায় সরপেচ এবং মোর (টোপর স্থানীয়) পরান হইত। ইহার মধ্যে মোর কেবল বিবাহের চিহ্ন, বিবাহের পর জলে বিসর্জ্জন দেওয়া হয় ও প্রায়ই অল্প মূল্যের অথবা শোলার করা হয়। ইহা ছাড়া বর ক্ষত্রিয়ের আবশ্যকীয় ঢাল, তরবারি, তীর, ধনু, কটার ও রাজপুতদেয়ের জাতীয় অস্ত্র "যমধার" ধারণ করিত। এই রূপে যাত্রার জন্য বর প্রস্তুত হইত।

বর যখন অন্তঃপুর হইতে বাহির বাটীতে যাত্রা করিত তখন তাহার ভগ্নী ও ভগ্নীস্থানীয়া রমণীরা তাহার মাথার উপর দিয়া চারিদিকে রাই ও লবণ ছড়াইতে ছড়াইতে যাইত। তাহারা বিশ্বাস করিত যে, এরূপ করিলে বর অপদেবতার দৃষ্টি হইতে নিষ্কৃতি পায়। বর ইহার পর কুলদেবতা ও গ্রাম্য দেবতার পূজা করিয়া বাহির বাটীতে কূপের কাছে আসিত; সেখানে দেখিত যে, তাহার মাতা বা মাতৃস্থানীয়া কেহ, বা বাড়ির প্রধান কর্ত্রী কূপের মধ্যে পা ঝুলাইয়া পাড়ের উপর বসিয়া আছেন। বর মাতা ও কূপকে একবার প্রদক্ষিণ করিয়া বলিত, 'মা তুমি কূপ হইতে পা তুলিয়া লও, আমি তোমার নামে একটি উদ্যান করিয়া দিব, বা মন্দির স্থাপন করিব, বা কূপ খনন করাইব।' মা কিন্তু কথা কহিতেন না, গম্ভীরভাবে সেইরূপেই পা ঝুলাইয়া বসিয়া থাকিতেন। বর আবার একবার প্রদক্ষিণ করিয়া অন্য এক প্রকার প্রতিজ্ঞা করিত। মাতা তথাপি নীরব, এই রূপে ছয়বার পুত্রের প্রলোভন অগ্রাহ্য করিলে সপ্তম বারে পুত্র বলিত, 'আমি বিবাহ করিয়া আনিয়া বধূকে তোমার দাসী করিয়া দিব।' এই কথা শুনিয়া মাতা কূপের পাড় হইতে উঠিয়া আসিতেন ও পুত্রকে আশীর্ব্বাদ করিয়া নেগী চতুষ্টয়ের সহিত পাল্‌কীতে বসাইয়া বিদায় করিতেন। এ প্রক্রিয়াকে "কূয়া বিয়াহনা" বলিত; এখন এ প্রথা ক্ষত্রিয়সমাজে চলিত নাই। কিন্তু ইহার একটি বিকৃত বা পরিবর্ত্তিত সংস্করণ বঙ্গীয় সমাজে এখনও প্রচলিত আছে, আশা করি বিবাহিত পাঠকরা অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন। সেকালে (ও এখনও) পুত্রের বিবাহের সময়ে মাতার বড় ভয় হইত যে বধূ আসিলে আর তাঁহার কর্ত্তৃত্ব থাকিবে না, সেইজন্য কূপে পড়িয়া আত্মহত্যা করিবার অভিনয় করিতেন। যাত্রার পূর্ব্বে বরকর্ত্তা সৈনিক ও বরযাত্রীদের সম্বোধন করিয়া বলিতেন, 'আমরা অমুক স্থানে, অমুকের কন্যার সহিত অমুকের বিবাহ দিতে যাইতেছি, যাহারা স্ত্রী-পুত্রের জন্য চিন্তিত, তাহারা গৃহে ফিরিয়া যাইতে পারে, কেবল যাহারা সম্মুখ সমরে প্রকৃত ক্ষত্রিয়ের মত মৃত্যু আলিঙ্গন করিয়া বীরগতি পাইতে ও স্বর্গে যাইতে ভীত নহে, তাহারাই আমাদের সহিত চলুক।' এ বক্তৃতার পর কেহই ফিরিত না, কেননা, যুদ্ধের কথা সকলেই জানিত ও সকলেই মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইয়া আসিত।

পাত্রীর গ্রামের কাছে পৌঁছিয়া বর-যাত্রীরা একটি

স্থান নির্ব্বাচন করিয়া আপনাদের বস্ত্রাবাস খাটাইতেন ও সকলে বিশ্রাম করিতেন। সেকালে সকল কাজই শুভদিন শুভমুহূর্ত্ত দেখিয়া করা হইত। বরযাত্রীদের সহিত একাধিক দৈবজ্ঞ থাকিত, তাহারা শুভসময় স্থির করিয়া দিলে একজন বারীকে পাত্রীপক্ষকে আপনাদের আগমন-সংবাদ দিতে পাঠাইয়া দেওয়া হইত। পাত্রী-পক্ষ অবশ্য পূর্ব্বেই তাঁহাদের আগমন-সংবাদ পাইত, ইহা বাহ্যপদ্ধতি মাত্র। যে বারী সংবাদ বহন করিত, সে সেবক-শ্রেণীভুক্ত হইলেও বিশেষরূপে শিক্ষিত যোদ্ধা হইত, তাহাকে ভাল পরিচ্ছদ পরাইয়া অস্ত্রশস্ত্র দিয়া ভাল বলবান্ শিক্ষিত অশ্বপৃষ্ঠে পাঠান হইত। তাহার সহিত অল্প কয়েকজন যোদ্ধা সঙ্গীও থাকিত। সে গিয়া পাত্রীর পিতার সভাতে উপস্থিত হইত। পাত্রীর পিতা পূর্ব্বেই সংবাদ পাইয়া আপনার বন্ধু-বান্ধব লইয়া সভায়ত বসিয়া থাকিতেন। বারী সভাতে প্রবেশ করিয়া অশ্বপৃষ্ঠে থাকিয়াই পাত্রীর পিতার সম্মুখে একটি 'অয়পন বারী' রাখিয়া বলিত, 'আমি অমুক ক্ষত্রিয়ের বা রাজার বারী, তিনি আপনার অমুক কন্যাকে বিবাহ করিতে আসিয়াছেন, ও আমাকে সংবাদ দিতে পাঠাইয়াছেন, এখন আমার 'নেগ' অর্থাৎ মর্য্যাদা পাইলেই আমি বিদায় হই।' পাত্রী-পক্ষীয় কোনও ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিত, 'তোমার নেগ কি দিতে হইবে?' বারী উত্তর করিত, 'আমি বীর ক্ষত্রিয়ের বারী, আপনাদের মধ্যে যদি কাহারও সাহস হয় আমার সহিত দুই চার দণ্ড যুদ্ধ করুন, একটি ছোটখাট রক্তের নদী বহিলেই আমার মর্য্যাদা রক্ষা করা হইবে।' এই কথা শুনিয়া পাত্রীর পিতা কুপিত হইয়া বলিতেন, 'কি? একটা চাকরের এমন স্পর্দ্ধা, উহার মাথা কাটিয়া লও।' ইহার পর কিছুকাল উভয়পক্ষে অসিযুদ্ধ হইত। অবসর বুঝিয়া বারী আপনার আনীত অয়পন বারী বর্ষার অগ্রভাগ দিয়া তুলিয়া লইত ও বরযাত্রীদের বিশ্রাম স্থানে চলিয়া যাইত। এই শুভকর্ম্মে কিছু রক্তপাত হওয়া শুভ বিবেচিত হইত। যে যুদ্ধ হইত তাহা অলীক নহে, প্রকৃত যুদ্ধ, তাহাতে কখন কখন জীবন হানিও হইত, কিন্তু এরূপ ঘটনাকে কেহ দুর্ঘটনা মনে করিত না, বা ইহার জন্য মনোমালিন্য হইত না। অয়পন বারী কোনও বিশেষ প্রকারে নির্ম্মিত কানবালা ছিল বোধ হয়, বিবাহের চিহ্নস্বরূপ প্রেরিত হইত, ইহার অন্য ব্যবহার ছিল না। এখন কিন্তু এ প্রথা আর নাই, এমন কি ইহা ঠিক কি প্রকার ছিল কেহ বলিতেও পারে না। কোন কোন ইংরেজ টীকাকার বারী শব্দের অর্থ জল বিবেচনা করিয়া লিখিয়াছেন যে, মঙ্গলের চিহ্ন-স্বরূপ হলুদ ও সিন্দূর দিয়া চিত্রিত একটি হাঁড়িতে জল রাখিয়া পাঠান হইত, তাহাই অয়পন বারী। কিন্তু সকল বিবাহের যুদ্ধ বর্ণনাতেই দেখিতে পাই যে, বাহক অশ্বপৃষ্ঠে বসিয়াই বর্ষার অগ্রভাগ দিয়া বারী তুলিয়া লইল ও ঘোড়া ছুটাইয়া চলিয়া গেল, অতএব জলপূর্ণ মাটির হাঁড়ি হইতে পারে না। এখানে বারী অর্থে জল না হইয়া বালা হইবে। এ প্রদেশে এখনও কানবালাকে বালী অথবা বারী বলে।

যাহা হউক, ইহার পর প্রায়ই পাত্রীর পিতা বরযাত্রীদের বিশ্রাম স্থান দূরে বা অসুবিধামত হইলে সুবিধামত স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিতেন। সেখানে বরযাত্রীরা বস্ত্রাবাস খাটাইত। পরে তাহাদের জন্য শরবৎ ইত্যাদি জলখাবার পাঠাইয়া দিতেন, কিন্তু কখন কখন শরবতের সহিত বিষ মিশ্রিত করিয়া দিতে ছাড়িতেন না। এরূপ ব্যবহার অন্যায় বিবেচিত হইত না, ও ইহাতে কেহ বিরক্ত হইত না। খাবার আসিলে বরযাত্রীরা কুকুরকে খাওয়াইয়া বিষাক্ত কি-না পরীক্ষা করিতেন, বিষাক্ত না হইলেও কেহ বিশ্বাস করিয়া খাইত না, সেগুলি নষ্ট করিয়া ফেলা হইত।

বিবাহের দিবস শুভমুহূর্ত্তে সশস্ত্র বর, নিতবরের দল নেগী ও বরযাত্রীদের লইয়া অশ্বারোহণে কন্যার বাটীতে যাত্রা করিতেন। বরযাত্রীরা সকলেই যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইয়া যাইত। এই সময়ে বর ও কন্যা কর্ত্তার মধ্যে প্রায়ই কথাকাটাকাটি হইত। কন্যাকর্ত্তা বরকর্ত্তার কাছে আসিয়া বলিতেন, 'আপনার মত লোক যে আমার অতিথি হইয়াছেন, ইহা আমার সৌভাগ্য, তবে আমাদের একটা কুলাচার আছে, সেটা আপনাদের সম্মান করিতে হইবে। আমাদের বাটীতে বর নিরস্ত্র ও

একক আসে, আপনি আমার সহিত বরকে পাঠাইয়া দিন, আমি বিবাহ দিয়া আপনার কাছে বর ও কন্যা আনিয়া দিব।' বরকর্ত্তা বলেন, 'আমাদেরও একটা কুলাচার আছে যে বর আপনার সহিত নিতবর ও নেগী লইয়া যায়, আর ক্ষত্রিয়দের নিয়ম ত আপনি জানেন, তাহাদের কোনও স্থানে নিরস্ত্র যাইতে নাই।' কন্যাকর্ত্তা গঙ্গাজল তামা তুলসী হাতে করিয়া শপথ করেন, তিনি বরপক্ষীয়দের সহিত কোন প্রকার শত্রুতা করিবেন না। বরপক্ষীয়রা সে কথা শুনিয়াও শুনিত না। বর আপনার সঙ্গীদের লইয়া কন্যার বাটীর দ্বারে উপস্থিত হইত। বর আসিলে বিবাহের প্রথম যুদ্ধ অর্থাৎ দ্বারের যুদ্ধ হইত। এ যুদ্ধে প্রায়ই একজন বর-যাত্রী একজন কন্যাযাত্রীকে সম্মুখসমরে আহ্বান করিত বা বরণ করিত, তাহাদের মধ্যে ধর্ম্মযুদ্ধ হইত, কেহ কাহাকে অন্যায়রূপে আক্রমণ বা প্রহার করিত না। কন্যার পিতা বা ভ্রাতার সহিত যুদ্ধে বরযাত্রীদের বেশ বেগ পাইতে হইত, কেননা, কন্যার পিতা বা ভ্রাতা নিহত হইলে আর সে বাটীতে বিবাহ করা নিয়মবিরুদ্ধ, তাহা হইলে বরকে অবিবাহিত অবস্থায় ফিরিয়া যাইতে হয়, ইহা বরের পক্ষে কম অপমান নহে। এ যুদ্ধে কন্যার পিতা ও ভ্রাতা সজোরে আঘাত করিতেন, কিন্তু বরযাত্রীরা তাহাদের পরাজিত করিয়া বন্দী করিত। কখনও কখনও বর স্বয়ং যুদ্ধ করিয়া নিহত হইত। কখনও কন্যার পিতা বরের শারীরিক বল বা যুদ্ধকৌশল পরীক্ষা করিবার জন্য বলিত, 'আমাদের কুলাচার অনুসারে বরকে এইরূপ লক্ষ্যবেধ করিতে হইবে অথবা একজন মল্লের সহিত যুদ্ধ করিতে হইবে' ইত্যাদি ইত্যাদি। কন্যাপক্ষীয়রা বরযাত্রীদের বিরুদ্ধে যে-সব ষড়যন্ত্র করে, সেইগুলি কন্যা আপনার সখীদের সাহায্যে জানিয়া লইয়া গোপনে বরযাত্রীদের সতর্ক করিয়া দিত। এরূপ বিবাহের কন্যারা বয়স্থা হয়, তাহারা বেশ বুঝিতে পারে যে, বিবাহের পূর্ব্বে বর নিহত হইলে তাহাকে চিরকাল কুমারী রূপে পিত্রালয়ে জীবনযাপন করিতে হইবে, আর কোন বর তাহাকে বিবাহ করিতে আসিবে না। যদি বিবাহের পর বর নিহত হয়, তবে কন্যা চিরজীবন বৈধব্য যন্ত্রণা ভোগ করা অপেক্ষা সতীরূপে পুড়িয়া মরা সহস্র গুণে ভাল বিবেচনা করিত। অতএব বিবাহের সময়ে যতদূর সম্ভব বরপক্ষীয়দের সাহায্য করিত। যুদ্ধে কন্যার পিতা ও ভ্রাতারা বন্দী না হওয়া পর্য্যন্ত যুদ্ধ চলিতে থাকে, কখনও কখনও তাহারা ইচ্ছা করিয়াই বন্দী হইত। তখন কন্যার পিতা বরের পিতাকে বলিত, 'এইবার আমাকে ও আমার পুত্রদের ছাড়িয়া দাও এবং বরকে সঙ্গে দাও, মণ্ডপে গিয়া কন্যাদান করিয়া দিতেছি। বরযাত্রীরা অবিশ্বাস করিলে গঙ্গাজল ছুঁইয়া শপথ করিলে তাহাদের মুক্ত করিয়া দেওয়া হইত। বর এইবার অন্তঃপুরের আঙ্গিনাতে মণ্ডপে চলিল। আঙ্গিনা পরিষ্কৃত করিয়া একটি ছোট অস্থায়ী চালা, বা চন্দ্রাতপ দেওয়া ঐ চালার তলে একটি কাঠের স্তম্ভ পোঁতা স্তম্ভের কাছে ঘটস্থাপন করা হয়. একদিকে পুরোহিত বসেন অন্যদিকে দু-চার জন ব্রাহ্মণ বেদপাঠ করিতে থাকেন। দূরে বা আঙ্গিনার অন্য অংশে গ্রামের সখীরা মঙ্গলাচার করিত। বর আসিয়া স্তম্ভের কাছে দাঁড়াইলে কন্যার পিতা কন্যাদান করিত। কন্যা বর ও স্তম্ভকে সাতবার পাক দিয়া ঘুরিয়া আসিলে বিবাহ হইত। কিন্তু যদিও কন্যাকর্ত্তা ফাঁকি দিবে না বলিয়া গঙ্গার শপথ করিয়াছিল, তথাপি এই সময়ে তাহারা বর ও বরযাত্রীদের আবার আক্রমণ করিত। কখনও বরের আবার শারীরিক বলের পরীক্ষা দিতে হইত। কন্যার পিতা বলিত, 'আমাদের কুলাচার অনুসারে বরকে অন্য এক স্তম্ভে লৌহশৃঙ্খল দিয়া বাঁধিয়া তবে কন্যাদান করিতে হয়।' বরকে স্তম্ভের সহিত বাঁধা হইলে সে কোনও আপত্তি করিত না। বরকে বাঁধিয়া তবে কন্যাকে সভাতে আনা হয়, কিন্তু বর তখন বলে, 'আমাদের কুলাচার অনুসারে ভাবী পত্নীর সম্মুখে শৃঙ্খলিত থাকিতে নাই।' এই বলিয়া শৃঙ্খল ছিঁড়িয়া মণ্ডপে আপনার স্থানে পিঁড়ার উপর আসিয়া দাঁড়াইত। দর্শকেরা তাহার বলের প্রশংসা করিত। কন্যা আসিলেই কন্যাযাত্রীরা বরকে আক্রমণ করে, বর প্রায় আত্মরক্ষা করে না, তাহার নিতবরেরা ও অন্য বন্ধুরা যাহারা বন্ধুরূপে অথবা নেগীরূপে প্রবেশ করে, বরকে রক্ষা করিতে থাকে। এই সময়ে যুদ্ধে দু-চার জন বরযাত্রী

ও কন্যাযাত্রী নিহত হইত, মণ্ডপের কাছে মৃতদেহ, রক্তাক্ত ছিন্ন শরীরাংশ ইত্যাদি দ্বারা একটি বীভৎস দৃশ্য হইত। কখনও কখনও মণ্ডপের চালা ভাঙিয়া পড়িলে ঢাল দিয়া নূতন চালা করিয়া লওয়া হইত। কখন প্রথমে যুদ্ধ না হইয়া প্রত্যেক প্রদক্ষিণ সময়ে এক এক জন কন্যাযাত্রই বরকে আক্রমণ করে, ও এক এক নিতবরের সহিত যুদ্ধ করে। এইরূপ যুদ্ধের মধ্যে সাতপাক ফেরা হইত। আল্‌হার গানে, আল্‌হার কনিষ্ঠ উদনের বিবাহের গাথাতে আছে যে, উদনের ভাবীপত্নীর সহিত তাহার বিবাহের পূর্ব্বে দেখা হইয়াছিল, তখন উদন বিবাহ করিতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন। প্রতিজ্ঞা শুনিয়া কন্যা বলিল, 'তবে আমি আমার পুরোহিতকে ডাকি না কেন, এখানে এখনই বিবাহ হউক ?' উদন উত্তরে বলিতেছেন, 'ছি রাণী, এ কথা তোমার উপযুক্ত হইল না, আমি চোর নহি, চোরের মত গোপনে বিবাহ করিতে পারিব না, আমাকে রাজপুতের ধর্ম্ম ও তরবারি ধারণ করিবার সম্মান রক্ষা করিতে হইবে। আমাদের যখন বিবাহ হইবে তখন কলস (মণ্ডপের ঘট) রক্তে ডুবিয়া যাইবে, স্তম্ভে নিহত যোদ্ধাদের চর্ব্বি জড়াইয়া যাইবে, চারিদিকে রক্তের নদী বহিবে, যোদ্ধাদের মৃতদেহ পড়িয়া থাকিবে, তাহার মধ্যে আমাদের বিবাহ হইবে, তবে ত বিবাহ !'

কন্যা দান হইলেই বিবাহ শেষ হইত, দ্বিতীয় যুদ্ধও শেষ হইত। তখন বরযাত্রীরা আপনার বিশ্রাম স্থানে যাইবার উদ্যোগ করিতেন। কন্যাকে লইয়া যাইবার জন্য পূর্ব্বেই পালকী প্রস্তুত থাকিত। কিন্তু কন্যাকর্ত্তা বরকর্ত্তার কাছে আসিয়া "কলেওয়া" অর্থাৎ ভোজনের নিমন্ত্রণ করেন। ভোজনের স্থান মণ্ডপের কাছেই করা হয়, যুদ্ধে মৃতদেহগুলি সরাইবার প্রয়োজন হয় না, কেন-না, যুদ্ধে অস্ত্রদ্বারা কাটা দেহ অতি পবিত্র বস্তু, অনেকে মড়াগুলি টানিয়া তাহার উপর বসিয়াই আহার আরম্ভ করেন। এখনও লোকে বিশ্বাস করে, যুদ্ধে অস্ত্র দিয়া কাটা পড়িলে সব পাপ দূর হয়, শরীর পবিত্র হইয়া যায়, ও আত্মা স্বর্গে যায়। আমি একজন প্রায় আশী বৎসর বয়স্ক বৃদ্ধকে বলিতে শুনিয়াছি, 'জীবনে অনেক পাপ করিয়াছি, শরীরটি পাপপূর্ণ। এখন অস্ত্রে কাটা পড়িয়া মরিতে পারিলে দেহটা শুদ্ধ হয়, পাপ দূর হয় ও অন্তিমে স্বর্গলাভ হয়, কিন্তু যে দিনকাল পড়িয়াছে, কিরূপে যে দেহ শুদ্ধ করিব চিন্তা করিয়া স্থির করিতে পারিতেছি না।'

বরযাত্রীরা নিমন্ত্রণ স্বীকার করিয়া মণ্ডপের কাছেই বসিয়া যান, তখন ভাত অর্থাৎ "কচ্চী রসোই" পরিবেশন করা হয়। সকলে এক এক গ্রাস মুখে দেয় মাত্র, কেন-না, পরিবেশন শেষ হইয়া আহার আরম্ভ করিলেই কন্যাকর্ত্তানিযুক্ত বীরেরা বরযাত্রীদের আক্রমণ করে। বরযাত্রীরা নিকটে নিষ্কাশিত অসি লইয়া খাইতে বসেন, সকলেই যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করে। কখনও কখনও কন্যা-কর্ত্তা বলেন, 'আমাদের কুলাচার অনুসারে বিবাহের পর আর বিবাদ করিতে নাই ও কলেওয়ার সময়ে অসি লইয়া আসিতে নাই।' কন্যাকর্ত্তা আবার গঙ্গাজল স্পর্শ করিয়া শপথ করেন। যদি বরযাত্রীরা অস্ত্রহীন হইয়া খাইতে বসেন, তবে প্রায়ই দেখেন কন্যার কোনও সখী ইঙ্গিত করিয়া দেখাইয়া দিতেছে কোনও গুপ্ত স্থানে ইতিপূর্ব্বে কন্যা কতকগুলি অসি সংগ্রহ করিয়া পাতা বা খড় চাপা দিয়া রাখিয়াছে। কখনও কন্যা বলে, তোমরা খাইবার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিও না। শীঘ্র পাল্‌কী আন ও আমাকে লইয়া আপনাদের বিশ্রাম-স্থানে লইয়া চল।' কিন্তু নিমন্ত্রণ অস্বীকার করিলে কন্যার পিতা প্রায়ই চটিয়া ওঠেন, 'আমার অপমান করিতেছ' বলিয়া আক্রমণ করেন। যে রূপে হউক, খাইবার সময়ে তৃতীয় যুদ্ধটি বাদ যায় না। এ সময়ে অন্য বরযাত্রীর মত বরকেও যুদ্ধ ও আত্মরক্ষা করিতে হয়, কখনও কখনও নিহতও হইতে হয় ও কন্যা এক দণ্ডের মধ্যে কন্যা, সধবা, বিধবা হইয়া পুড়িয়া সকল কষ্টের অবসান করে। বরপক্ষীয়রা যুদ্ধ আরম্ভ হইলেই কন্যাকে লইয়া বিশ্রাম স্থানে পলাইবার চেষ্টা করে।

পরদিবস কন্যার পিতা দান দ্রব্যাদি, যৌতুকাদি বর-কর্ত্তাকে বুঝাইয়া দেয় ও নিহত সঙ্গীদের সৎকার করিয়া বরযাত্রীরা আপনার দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করে।

প্রায় প্রত্যেক বিবাহ-যুদ্ধে দেখিতে পাওয়া যায় যে, কন্যাকর্ত্তা গঙ্গাজল, তুলসী ইত্যাদি দ্রব্য লইয়া শপথ

করিতেছে যে, বর বা বরপক্ষীয়দের পীড়িত করিবে না, কিন্তু কয়েক মুহূর্ত্ত পরে শপথ-বিরুদ্ধ কাজ করিতেছে। বরপক্ষীয়রা বেশ জানিতেন যে, ঐ শপথের কোনও মূল্য নাই, তথাপি স্বীকার করিতেন। সাধারণতঃ রাজপুতের প্রাণ যায়, তথাপি বাক্য মিথ্যা হয় না। শপথ পরের কথা, কথা-প্রসঙ্গে চিন্তা না করিয়াও যদি রাজপুত বাক্যদান করিয়া ফেলে, তবে তাহা রক্ষা করিতে সহস্র বিপদ বরণ করিয়া লয়, তথাপি বাক্য মিথ্যা হইতে দেয় না। কিন্তু সকল বিবাহের যুদ্ধের গাথাতেই দেখিতে পাই কন্যাকর্ত্তা "গঙ্গাউঠালিয়া" বা "গঙ্গাকরলিয়া" ও তাহার পর দশ-পনের মিনিটের মধ্যেই আক্রমণ করিয়া বসিল। এ ব্যবহারের একমাত্র উত্তর :

> বিবাহকালে রতি সম্প্রযোগে প্রাণাত্যয়ে সর্ব্ব ধনাপহারে।
> বিপ্রস্য চার্থে হ্যনৃতং বদেৎ পঞ্চানৃতান্যাহুর পাতকানি॥

অর্থাৎ বিবাহকালে মিথ্যা বলাতে পাতক হয় না। ইংরেজ টীকাকাররা এ বিবাহবর্ণনাকে কল্পিত বলিয়াছেন, কেন-না, অন্য কোনও স্থানে রাজপুতদের শপথ করিবার পর বিপরীত ব্যবহার করিতে দেখা যায় না, ইহা ছাড়া এইরূপ বিরুদ্ধতা করিয়া বিবাহ করিবার পর উভয়পক্ষে বন্ধুত্ব ও সদ্ভাবের অভাব দেখা যায় না। এইরূপ যুদ্ধ কেবল ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম পালনের জন্য করা হইত, ইহাতে পরস্পর বৈরিভাব ছিল না। যখন যে ক্ষত্রিয় ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় যে-পক্ষ অবলম্বন করিত, তখন তাহার জন্য ক্ষত্রিয়-ধর্ম্মানুসারে দেহত্যাগ করিতে অথবা আপনার নিকট-আত্মীয় বা বন্ধুকে নিহত করিতে কুণ্ঠিত হইত না। মহাভারতে ইহার এক দৃষ্টান্ত পাই। মদ্ররাজ শল্য যুধিষ্ঠিরের পক্ষে যুদ্ধ করিতে সসৈন্য পাণ্ডব শিবিরে যাইতেছিলেন, পথে সুরাপানে মত্ত অবস্থায় দুর্য্যোধনকে যুধিষ্ঠির ভাবিয়া সাহায্য করিতে প্রতিজ্ঞা করিয়া ফেলিলেন। নেশা কাটিলে দুর্য্যোধনের ছলনা বুঝিতে পারিলেন, কিন্তু প্রতিজ্ঞামত দুর্য্যোধনের পক্ষে থাকিয়া আপনার ভাগিনেয়দের সহিত যুদ্ধ করিলেন, ও শেষে যুধিষ্ঠিরের হস্তে নিহত হইলেন। ক্ষত্রিয়-ধর্ম্মানুসারেই কৃতজ্ঞ পাণ্ডবেরা গুরু দ্রোণাচার্য্য ও পরম হিতৈষী ভীষ্মের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। পৃথ্বীরাজ রাসোতে আছে যে, কনোজের জয়চন্দ্রের এক ভ্রাতুষ্পুত্র নিডডুর রায়, সংযুক্তা-হরণের পূর্ব্বে রাগ করিয়া জয়চন্দ্রকে ছাড়িয়া পৃথ্বীর আশ্রয়ে বাস করিতেছিলেন। সংযুক্তাহরণের যুদ্ধে দেখিলেন তাঁহার বিপক্ষ তাঁহারই সহোদর বলভদ্র জয়চন্দ্রের পক্ষে যুদ্ধ করিতে আসিয়াছেন। দুই ভাই-ই যুদ্ধে নিহত হইয়াছিলেন, জয়চন্দ্র উভয়কে যুদ্ধক্ষেত্রে পতিত দেখিয়া একজনকে কনোজ ও অন্যকে দিল্লী (বা অজমীরে) পাঠাইয়া দিলেন।

বিবাহের যুদ্ধে যদি কেহ না মরিত, বা অল্প লোক মরিত, তবে লোকে তাহাকে কাপুরুষোচিত ছেলেখেলা বলিয়া বর্ণনা করিত। সকল বিবাহে ঠিক একরূপ ঘটনা ঘটা অসম্ভব। তবে প্রথমে অয়পনবারীর যুদ্ধ ছাড়া দ্বারের যুদ্ধ, মণ্ডপের যুদ্ধ ও ফলেওয়ার (ভোজনকালের) যুদ্ধ এই তিনটি যুদ্ধ অবশ্য ঘটিত। এ সকল যুদ্ধে কুটুম্বের সহিত কোনপ্রকার মনোমালিন্য ঘটিত না। কিন্তু এই প্রথাফলে অনেক বংশের বংশধররা নিজের বিবাহে বা পরের বিবাহে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে গিয়া দেহরক্ষা করিয়াছে এবং এইরূপে সে বংশ লোপ পাইয়াছে। কেহ বা ইচ্ছা করিয়াই বিবাহ-ব্যাপারে যোগ দেয় নাই। তাহাদের বংশে কেবল দাসীপুত্রই থাকিয়া গিয়াছে। যখন আর যুদ্ধ করিবার লোক জুটিত না, তখন এ প্রথা আপনা-আপনি লোপ পাইয়াছে, এখন গানে ছাড়া কার্য্যতঃ আর এ প্রথার বিবাহ দেখিতে পাওয়া যায় না।

যে-বিবাহ-পদ্ধতি বর্ণিত হইল, তাহা আল্হার গান হইতে সংগ্রহ করা। উহার সমসাময়িক পৃথ্বীরাজ রাসোতে পৃথ্বীরাজের অনেকগুলি বিবাহের বর্ণনা আছে। কিন্তু রাসো দেখিয়া ঠিক বুঝিতে পারা যায় না যে, পৃথ্বীরাজের কয়টি বিবাহ হইয়াছিল। সংযুক্তাকে লইয়া এক স্থানে (৫৯ সময়) দশটি রাণীর নাম আছে, কিন্তু অন্য স্থানে (৬৫ সময়) তেরটি নাম পাই। ইহা ছাড়া আরও চার-পাঁচটি নাম অন্য অন্য স্থানে পাওয়া যায়। কিন্তু সকল বিবাহেই কন্যাদান করা হইয়াছে, কোনও স্থানে কন্যার পিতা দান করিয়াছে, কোনও স্থানে হরণ করিয়া ঘরে আনিয়া বিবাহ হইয়াছে ও পৃথ্বীর পুরোহিত

দান করিয়াছে। সংযুক্তাকে তিনি গোপনে বিবাহ করিয়াছিলেন, পুরোহিত ছিল ও এক দাসী দান করিয়াছিল। রাসোতে বর্ণিত এক বিবাহে কিছু নূতনত্ব আছে, অর্থাৎ বিবাহের দিন স্থির হইবার পর, বিবাহের দুই-তিন দিবস পূর্ব্বে পৃথ্বী মুসলমান-আক্রমণের সংবাদ পাইলেন, তিনি আর বিলম্ব করিতে পারিলেন না, বিবাহের জন্য আপনার তরবারি রাখিয়া যুদ্ধ করিতে চলিয়া গেলেন। যুদ্ধের পর তিনি আপন রাজধানীতে গিয়া দেখেন খড়্গের সহিত বিবাহিতা কন্যা আসিয়া পৌছিয়াছে। রাজধানীতে আবার বিবাহ হইল। এরূপ খড়্গের সহিত বিবাহ কেবল বড় রাজাদের হইত, যাহারা কন্যার পিত্রালয়ে যাইতে অপমানিত বিবেচনা করিত। কন্যা হরণ করিয়া আনিলেও গৃহে আনিয়া ব্রাহ্ম বিবাহ হইত। মহাভারতেও হরণের পর ব্রাহ্ম বিবাহ হইত, দ্রৌপদী ও সুভদ্রার হরণের পর বর কন্যাকে আনিয়া রীতিমত বিবাহ হইয়াছিল। মহাভারতের মদ্রকরা বিদেশী, বোধ হয় পারস্য দেশবাসী মীড (Medes,) তাহাদের আচার-ব্যবহার অন্যপ্রকার। ভীষ্ম যখন শল্যর কাছে গিয়া পাণ্ডুর জন্য শল্যর ভগ্নীকে চাহিলেন, তখন শল্য বলিয়াছিলেন, 'আমাদের কুলাচার অনুসারে শুল্ক না লইয়া কন্যা দিই না।' ভীষ্ম শুল্ক দিয়া কন্যা আনিলেন, পরে শুভদিনে পাণ্ডুর সহিত বিবাহ দিলেন, অর্থাৎ আসুর ও ব্রাহ্ম দুই বিবাহই হইল। আল্‌হার গানে একস্থানে জয়চন্দ্রের ভ্রাতুষ্পুত্র লক্ষ্মণকে একজন বিদ্রূপ করিয়া বলিতেছে :—'পৃথ্বীরাজ যখন সংযুক্তাকে আনিয়াছিল তখন কনোজের বীরেরা ত আটকাইতে পারিলেন না।' তাহার উত্তরে লক্ষ্মণ বলিতেছে :—'রাজবাটীতে অনেক দাসী, বাঁদী থাকে, পৃথ্বীরাজ একটা লইয়া গিয়াছে, তাহাতে তাহার বীরত্ব কোথায় ? সে যদি জয়চন্দ্রকে দিয়া কন্যা দান করাইয়া লইতে পারিত, তবে তাহাকে প্রকৃত বীর বলিয়া স্বীকার করিতাম।'

কন্যাদান করাকে ক্ষত্রিয়রা এত হীন কার্য্য বিবেচনা করিত যে, তাহারা সহজে স্বীকৃত হইত না। ক্ষত্রিয়রা সেইজন্য প্রায়ই জন্মের সময়ই কন্যাকে মারিয়া ফেলিত। যাহারা কন্যা প্রতিপালন করিত, তাহারাও প্রায় কন্যার বিবাহ দিত না, কন্যাকে চিরকাল অনূঢ়া অবস্থায় থাকিতে হইত। এই সকল কারণে ক্ষত্রিয়-সমাজে কন্যা অতি দুর্লভ হইয়া পড়িয়াছিল ও সেকালের ক্ষত্রিয়দের বাধ্য হইয়া ভিন্ন বর্ণের কন্যা গ্রহণ করিতে হইত।

স্বয়ম্বরের বর্ণনা কোথাও পাই নাই। সংযুক্তার স্বয়ম্বর সভা হইয়াছিল, তখন পৃথ্বী সভাতে আসেন নাই, জয়চন্দ্র তাঁহার মূর্ত্তি গড়াইয়া দ্বাররক্ষক রূপে রাখিয়াছিলেন, সংযুক্তা সেই মূর্ত্তির গলায় মালা দিয়াছিল। পরে, যখন সংযুক্তা এক প্রাসাদে বন্দিনী, তখন গোপনে পৃথ্বীর সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল ও বিবাহ হইয়াছিল। এ বিবাহ কতক গান্ধর্ব্ব বটে, কিন্তু এখানেও পৃথ্বীর সহিত তাহার পুরোহিত রক্ষী সেনাপতিরূপে ছিল ও একজন দাসী সংযুক্তাকে দান করিয়াছিল, অতএব বিবাহ ব্রাহ্ম। বোধ হয় স্বয়ম্বরে কন্যা আপনার পতি নির্ব্বাচন করিত, সেই নির্ব্বাচন-মত পরে কন্যাদান করা হইত। আল্‌হার গানে স্বয়ং আল্‌হার বিবাহে অনেকটা এইরূপ স্বয়ম্বর, হরণ, ও ব্রাহ্ম তিন প্রকারে মিশ্রিত বিবাহ হইয়াছিল। আল্‌হার বিবাহে তাঁহার পত্নী সোনা, আল্‌হার কনিষ্ঠ সহোদর উদনকে এক পত্রে লিখিয়াছিল, 'আমি আল্‌হার বলবীর্য্যের যশ শুনিয়া পণ করিয়াছি যে হয় আল্‌হাকে বিবাহ করিব, নয় চিরজীবন কুমারী থাকিব। আমি তোমাকে দেবর বলিয়া সম্বোধন করিলাম, তুমি যদি প্রকৃত ক্ষত্রিয় হও, তবে আমার পণ পূর্ণ করিবে, নতুবা তোমার ক্ষত্রিয়ত্বে ধিক্।' এই পত্র পাইয়া আল্‌হা বন্ধুবান্ধব লইয়া বিবাহ করিতে গিয়াছিলেন। তাঁহাকে নিয়ম-মত দ্বারে, মণ্ডপে ও ভোজন সময়ে যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল। তিনি কন্যার পিতা ও ভ্রাতাদের বন্দী করিয়া কন্যাদান করিতে বাধ্য করিয়াছিলেন।



দেশ-বিদেশের কথা

ভারতবর্ষ

ভারতবাসী ছাত্রের জন্য শিক্ষা-বৃত্তি—

হল্যাণ্ডের অন্তর্গত লাইডেন বিশ্ববিদ্যালয়ে আর্য্যভাষা ও সাহিত্যে গবেষণা করিবার জন্য একজন ভারতীয় ছাত্রকে ১৯৩১-১৯৩২ সনে একটি বৃত্তি দিবার প্রস্তাব হইয়াছে। বৃত্তির পরিমাণ বৎসরে পঞ্চাশ পাউণ্ড। প্রথম বৎসর স্বকার্য্যে কৃতিত্ব দর্শাইতে পারিলে পর পর আরও দুই বৎসর তাঁহাকে অনুরূপ বৃত্তি দেওয়া হইবে। কারণ, গবেষণা কার্য্য শেষ করিয়া তথাকার পি-এইচ-ডি উপাধি লাভ করিতে তিন বৎসর লাগিবে বলিয়া ধরা হইয়াছে।

পি-এইচ-ডি পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতে গেলে প্রত্যেক ছাত্রকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে হয়। সংস্কৃত ভাষায় গবেষণা-যোগ্য জ্ঞানের পরিচয় দিতে পারিলে ভারতীয় ছাত্রকে আর এ পরীক্ষা দিতে হইবে না। ফরাসী বা জার্ম্মান জানা ছাত্রকেই বেশী পসন্দ করা হইবে। প্রবেশিকা পরীক্ষা দিতে না হইলে, ছাত্রদের নিকট হইতে এ-বাবদ যে ফি লওয়া হয় তাঁহার নিকট হইতে তাহাও আর লওয়া হইবে না। তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ আশা করেন, তিনি ইহার প্রতিদান স্বরূপ অগ্রসর ছাত্রগণকে হিন্দী ও সংস্কৃত ভাষা শিখাইবেন।

সেপ্টেম্বর মাসের শেষভাগে বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ আরম্ভ হয়। উক্ত বৃত্তি প্রার্থীরা নাম, বয়স, ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের লব্ধ উপাধি প্রভৃতি জ্ঞাতব্য বিষয়সহ এই ঠিকানায় অবিলম্বে আবেদন করিবেন— Rector Magnificus, Leyden University, Leyden, Holland.

—

বাংলা

উত্তর ও পূর্ব্ববঙ্গে জল-প্লাবন—

সুখ দুঃখ চক্রবৎ ঘুরিয়া আসে—সংস্কৃতে একটি প্রবচন আছে। বাংলার বিধিলিপিতে সুখ কথাটির উল্লেখ আছে কিনা জানি না, তবে দুঃখ যে নানা আকারে বৎসরান্তে বাংলার পথে ঘাটে মাঠে বাটে দেখা দিয়া থাকে তাহা কাহারও অবিদিত নাই। দুর্ভিক্ষ, ম্যালেরিয়া, জলপ্লাবন যেন পালা করিয়া বাংলার বুকের উপর তাণ্ডবনৃত্যে আপনাদের বিজয় ঘোষণা করিয়া থাকে। হাড়ভাঙা খাটুনিতে অর্জ্জিত শেষ সম্বল কানা কড়িটি পর্য্যন্ত, দিনান্তে আশ্রয় মাটি ও চালার ঘরখানি এবং চাষের গরু বাছুর ও সামান্য তৈজসপত্রটুকু পর্য্যন্ত গত মাসের মারাত্মক প্লাবনে ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছে। বাংলার উত্তর-পূর্ব্ব অঞ্চলের কৃষককুল আজ গৃহহারা, অর্থহারা, অন্নবস্ত্রের কাঙ্গাল। ১৯২২ সনের প্লাবনের পর প্লাবন-রোধের উপায়সম্বলিত রিপোর্ট সরকারের হুজুরে পেশ হইয়াছিল। কিন্তু সরকার এ-যাবৎ দেশের শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষায় এতই ব্যস্ত ছিলেন যে লক্ষ লক্ষ লোকের প্রাণ রক্ষার উপায় অবলম্বন করা আর হইয়া উঠে নাই। প্লাবন রোধের উপায় যতদিন অবলম্বিত না হয় ততদিন আমাদের এ বিপদের সম্মুখীন হইতেই হইবে। আজ দেশের এক অঙ্গ যখন বিকল হইতে চলিয়াছে তখন অন্য অঙ্গসমূহের কর্ত্তব্য রসদ জোগাইয়া সমগ্র জাতিকে সক্রিয় রাখা। অন্ন বস্ত্র কড়ি পয়সা যাহা যিনি দিতে পারেন তাহাই মহা উপকারে আসিবে। বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতি, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের নেতৃত্বে শঙ্কট-ত্রাণ-সমিতি, প্রবাসী-সম্পাদক শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের অধীনে বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দু-সভা, রবীন্দ্রনাথের কর্তৃত্বে বিশ্বভারতী এবং অন্যান্য আরও বহু প্রতিষ্ঠান প্লাবিত অঞ্চলে সাহায্য ভাণ্ডার খুলিয়াছেন। এই সকল ভাণ্ডারের মারফত অর্থ, বস্ত্র, তণ্ডুলাদি যিনি যাহা প্রেরণ করিবেন তাহাই সহস্র সহস্র লোকের প্রাণ রক্ষার কারণ হইবে। বাংলার বিপদে বাঙালী অবাঙালী, প্রবাসী বাঙালী প্রভৃতি আজ নিশ্চয়ই সাড়া দিবেন।

উমেশচন্দ্র স্মৃতি-পদক পুরস্কার—

বৈদ্য-বান্ধব সমিতির সম্পাদক শ্রীললিতমোহন মল্লিক জানাইতেছেন—

"এসিয়াখণ্ডে প্রাগৈতিহাসিক যুগে মানবের অস্তিত্বের নিদর্শন" বিষয়ে যিনি একটি সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রবন্ধ রচনা করিতে পারিবেন, তাঁহাকে স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র গুপ্তের স্মৃতির উদ্দেশ্যে একটী মূল্যবান স্বর্ণ-পদক পুরস্কার দেওয়া হইবে। প্রবন্ধ লেখক বৈদ্য হওয়া চাই, এবং উক্ত প্রবন্ধ বর্ত্তমান ১৯৩১ সনের ৩১এ ডিসেম্বর মধ্যে বৈদ্য-বান্ধব সমিতির সম্পাদকের নিকট ১১ নং হরি বোস লেন, বিডন ষ্ট্রীট পোঃ, কলিকাতা, এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে। বৈদ্য-বান্ধব সমিতি কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত সমিতির বিশিষ্ট সভ্যগণের উপর উক্ত প্রবন্ধের বিচার ভার অর্পণ করা হইবে।

পাহাড় অঞ্চলে হিন্দুমিশনের কার্য্য—

হিন্দু-মিশন ময়মনসিংহের উত্তর সীমায় গারো পাহাড় অঞ্চলের গারো, হদী, হাজং, বানাই প্রভৃতি জাতির মধ্যে যে আন্দোলনের সৃষ্টি করিয়াছেন তাহা বাস্তবিকই প্রশংসার্হ। স্থানে স্থানে মিশনের কর্ম্মীরা প্রাইমারী স্কুল স্থাপন করিতেছেন। মিশন পাহাড়িয়া নারীদের মধ্যে হিন্দুর আচার ব্যবহার, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ও পৌরাণিক গল্প সাহায্যে নীতি-শিক্ষা দেওয়ার জন্য মহিলা প্রচারক নিযুক্ত করিয়াছেন। এই অঞ্চলের দুর্ভিক্ষপীড়িত লোকদের সাহায্যের জন্য অর্থ ও তণ্ডুল বিতরণ করিতেছেন। সৎশিক্ষা প্রভাবে এবার আর অন্ন বস্ত্র বা অন্য কিছুর প্রলোভনে পড়িয়া তাহারা খৃষ্টান হইতেছে না। মিশনের কার্য্য সম্বন্ধে নিম্ন ঠিকানায় পত্র ব্যবহার করিলে সমস্ত জানিতে পারিবেন—

ব্রহ্মচারী হরিবিনোদ, পোঃ রূপসা, বিহারাঙ্গা হিন্দু মিশন, ময়মনসিংহ।

শিক্ষামন্দির—

বাংলার নারীশক্তি গত সত্যাগ্রহ আন্দোলনে কর্ম্মতৎপরতার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া দেশ-বিদেশের নরনারীকে চমৎকৃত করিয়াছিল। নারীগণ এতদিন গৃহ মধ্যেই সেবায় নিয়োজিত ছিলেন। এবার স্পষ্ট প্রমাণিত হইল যে, সংহত হইলে রাজনীতিক্ষেত্রেও তাঁহারা বিলক্ষণ কৃতিত্ব দেখাইতে পারেন। আইন-অমান্য আন্দোলনের তিরোভাবের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারা দেশের স্থায়ী হিতকর কর্ম্মে মনোনিবেশ করিয়াছেন। বঙ্গীয় মহিলা সম্মেলন, নিখিল-বঙ্গ জাতীয় নারীসংঘ স্ব স্ব আদর্শ অনুযায়ী কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন। নিখিল-বঙ্গ নারীসংঘ নারীগণের শিক্ষাদানের সুব্যবস্থার জন্য একটি বিদ্যায়তন প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। বিদ্যায়তনে তিনটি বিভাগ -বাল-বিভাগ, বয়স্কা-বিভাগ, এবং শিল্প বিভাগ। বাল-বিভাগে কিণ্ডারগার্টেন রীতি অনুসারে শিক্ষা দেওয়া হয়। বাংলা, হিন্দী ইংরেজী, ইতিহাস, ভূগোল, হিসাব লিখন রীতি, পৌর বিদ্যা, রাষ্ট্রনীতি, অর্থনীতি, প্রভৃতি বিষয় বয়স্কাগণকে শেখান হয়। শিল্প বিভাগে সূতাকাটা, তাঁত বোনা, দর্জ্জির কাজ, সূচী-কর্ম্ম, গৃহশিল্প, সর্ট হ্যাণ্ড, টাইপ-রাইটিং প্রভৃতি অর্থকরী বিদ্যা শিখাইবার ব্যবস্থা হইতেছে। ছাত্রীগণের থাকিবার জন্য একটি ছাত্রী-নিবাস খোলা হইয়াছে। ৯৬ বি, বারাণসী ঘোষ ষ্ট্রীটস্থ ভবনে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয় গত ১ই ভাদ্র বিদ্যালয়ের দ্বার উদ্‌ঘাটন করিয়াছেন। নিখিল-বঙ্গ জাতীয় নারী সংঘের সম্পাদিকা শ্রীযুক্তা জ্যোতির্ম্ময়ী গাঙ্গুলী, এম্-এ মহোদয়ার সঙ্গে বিদ্যালয় ভবনে দেখা করিলে বা পত্র দিলে শিক্ষা-মন্দিরের বিষয় সবিশেষ জানা যাইবে।

বঙ্গীয় কারুশিল্প প্রতিষ্ঠান—

নূতনের মোহে আত্মহারা হইয়া আমরা যে এতদিন আলেয়ার পিছনেই ছুটিয়াছি, তাহা আজ শিক্ষিত অশিক্ষিত প্রত্যেক বাঙালী তথা ভারতবাসী মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতেছে। শুধুমাত্র কাঁচা মাল উৎপাদনে দেশের, জাতির ধনসম্পদ বৃদ্ধি হয় না। যাহারা শিল্প এবং কৃষি উভয় বিষয়ে সমৃদ্ধ তাহাদের সঙ্গে আঁটিয়া উঠিতে পারে জগতে এমন শক্তি বিরল। আমেরিকা ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। কৃষি এবং শিল্প উভয় সম্পদেই ভারতবর্ষ একদা সমৃদ্ধ ছিল। পর-সেবা এবং পর-চর্চ্চা করিয়া সে আপন কর্ত্তব্য ভুলিতে বসিয়াছিল। আর্থিক দৈন্যের চাপে এবং রাষ্ট্রিক প্রয়োজনের তাগিদে আজ আমাদের চক্ষু খুলিয়াছে। যেমন কৃষি তেমনই শিল্পে আমাদের অগ্রসর হইতে হইবে। এই উদ্দেশ্যে স্থানে স্থানে কারু শিক্ষালয় ও কারখানাদি স্থাপনের চেষ্টা হইতেছে। গত ১লা জ্যৈষ্ঠ শিল্পাচার্য্য ডাঃ অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পৌরহিত্যে ৬ নং আর জি কর রোডে একটি কারুশিল্প প্রতিষ্ঠানের উদ্বোধন ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। ভারতীয় মূর্ত্তি শিল্প ও খেলনা শিল্প একদা কতখানি উন্নত ছিল, বর্ত্তমানে এই সকল কিরূপ হীন দশায় উপনীত হইয়াছে, এবং কি উপায় অবলম্বিত হইলে ইহার প্রতীকার ও উন্নতি সম্ভব—তাহা অবনীন্দ্রনাথ বিশদভাবে উপস্থিত জনগণকে বুঝাইয়া দেন।

বিদ্যালয়ে দুইটি বিভাগ আছে—শিল্প বিভাগ, কারু বিভাগ। শিল্প বিভাগে (১) মৃৎশিল্প ও তৎ সংশ্লিষ্ট সমুদয় কার্য্য, (২) চিত্রাঙ্কণ ও প্রাচ্যকলা সম্মত দেবদেবীর মূর্ত্তি গঠনের সংস্কার, (৩) প্রতিকৃতি নির্ম্মাণ, (৪) প্রাচীন রীতির অনুকরণে মূর্ত্তি ও অট্টালিকার জন্য খোদিত টালি নির্ম্মাণ, (৫) উদ্যান সাজাইবার মূর্ত্তি ও আসবাব পত্র, এবং ধাতুময় মূর্ত্তি ইত্যাদি নির্ম্মাণ প্রণালী এবং ছাঁচ তৈয়ারী শিক্ষা দেওয়া হইবে। নানাবিধ পুতুল ও খেলনা, শিক্ষা বিষয়ক মডেল, শরীর ব্যবচ্ছেদ বিষয়ক মডেল, শিশু মঙ্গল ও স্বাস্থ্য বিষয়ক মডেল, বিজ্ঞাপন সম্বন্ধীয় মডেল প্রভৃতি কারু বিভাগে শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। প্রতিষ্ঠানটির প্রধান উদ্যোক্তা শ্রীযুক্ত নিত্যাইচরণ পাল মহাশয়ের নিকট প্রতিষ্ঠান-ভবনে অনুসন্ধান করিলে এ-বিষয়ে সকল তথ্য জানা যাইবে। বাংলা দেশে এইরূপ আরও বহু প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হওয়া উচিত।

ডাঃ কালীপদ বসু—

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডাঃ কালীপদ বসু, ডি-এস্-সি (ঢাকা) দুই বৎসর পূর্ব্বে ডয়চ্‌শে একাডেমি হইতে বৃত্তি লাভ



ডাঃ শ্রীকালীপদ বসু

করিয়া জার্ম্মানীতে গমন করেন। তিনি ১৯২৭ সালে নোবেল প্রাইজ প্রাপ্ত ডাঃ হ্বিল্যাণ্ডের তত্ত্বাবধানে গবেষণা করিয়া বায়ো কেমিষ্ট্রী বিভাগে পি-এইচ্-ডি (প্রথম শ্রেণী) উপাধি পাইয়াছেন। ডাঃ বসু অধ্যাপক প্রিগুলের (১৯২৩ সনে যিনি নোবেল প্রাইজ পান) কাছে মাইক্রো-এনালিসিস শিক্ষা করিয়াছেন।

শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী আশ্রম—

শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী আশ্রম ও অবৈতনিক হিন্দু বালিকা বিদ্যালয়ের ১৩৩৭ সালের রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীশ্রীগৌরী দেবী ১৩০১ সালে বারাকপুরে এই আশ্রমের প্রতিষ্ঠা করেন। ১৩৩১, ২৭এ অগ্রহায়ণ তারিখে আশ্রমটি কলিকাতা ২৬নং রাণী হেমন্তকুমারী ষ্ট্রীটস্থ বর্ত্তমান নবনির্ম্মিত ত্রিতল গৃহে উঠিয়া আসে। আলোচ্য বর্ষে আশ্রমবাসিনীদের সংখ্যা ছিল পঁয়তাল্লিশ জন। তন্মধ্যে উনিশ জন ব্রাহ্মণ, পাঁচ জন বৈদ্য এবং একুশ জন কায়স্থ। চব্বিশ জনের ব্যয় অভিভাবক বহন করিয়াছেন, অবশিষ্ট সকলের ব্যয় আশ্রম হইতে সাধারণের দানে নির্ব্বাহ হইয়াছে। আশ্রমসংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ে এ বৎসর ছাত্রীসংখ্যা ছিল দুই শত জন। চৈত্র মাসে

বাৎসরিক পরীক্ষা হইয়া বৈশাখ মাসে নূতন পাঠ আরম্ভ হয়। বিদ্যালয়ে বাঙ্গালা, সংস্কৃত, ইংরেজী, গণিত, ইতিহাস, ভূগোল, স্বাস্থ্যনীতি, গৃহশিল্প, সংস্কৃত স্তোত্র, ধর্ম্ম সঙ্গীত, আবৃত্তি প্রভৃতি শিক্ষা দেওয়া হয়। পাঠ শেষ করিতে আট বৎসর লাগে।

ইহা ছাড়া বিদ্যালয়ে উচ্চ শিক্ষা ও গৃহশিল্প শিক্ষা দিবারও ব্যবস্থা আছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের এবং সংস্কৃত বোর্ডের উচ্চতর পরীক্ষার জন্য প্রতি বৎসর আশ্রমবাসিনীগণ প্রস্তুত হইয়া থাকেন। আশ্রম হইতে একজন ছাত্রী বি-এ পরীক্ষায় এবং চারিজন ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। দুই জন মহিলা সংস্কৃত ব্যাকরণে গভর্ণমেণ্ট উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া "ব্যাকরণতীর্থা" উপাধি লাভ করিয়াছেন। আশ্রমবাসিনী দুইটি কুমারী সাংখ্যদর্শনের আদ্য পরীক্ষায়, একজন মধ্য পরীক্ষায়, ও একজন উপাধি পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়া বৃত্তি পাইয়াছেন। বিদ্যালয় বিভাগের ছাত্রা শ্রীমতী রেণুকা দেবী প্রথম বিভাগে এবং শ্রীমতী গৌরীরাণী বসু দ্বিতীয় বিভাগে সংস্কৃত বোর্ডের আদ্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। গত বৎসরে দুইজন ছাত্রী মধ্য পরীক্ষায় এবং এক জন আদ্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। বর্ত্তমান বৎসরেও একজন আশ্রমনিবাসিনী এবং বিদ্যালয়ের একটি ছাত্রী ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

আশ্রমে তাঁত, চরকা এবং সেলাইয়ের কল আছে। বালিকারা চরকায় সুতা কাটেন, তাঁতে কাপড়, তোয়ালে, চাদর, গামছা এবং জামার ছিট প্রভৃতি বুনিয়া থাকেন এবং সেলাই ও ছাঁট কাট শিক্ষা করেন। আশ্রমবাসিনীগণকে জামা সেমিজ প্রভৃতি স্বহস্তে তৈয়ার করিয়া লইতে হয়। ইহা ব্যতীত মখমল, কার্পেট, পাপোষ, চটের আসন, সুক্ষ্ম সূচীশিল্প এবং উল ও পুঁতির কার্য্যও শিক্ষা দেওয়া হয়। বাহিরের মহিলারাও এখানে আসিয়া শিল্প-কার্য্য শিক্ষা করিতে পারেন। বিদ্যালয়টি মহিলা কর্ম্মীদের দ্বারা পরিচালিত। আমরা ইহার উন্নতি কামনা করি।

সোনারঙে মহিলা প্রগতি—

বিক্রমপুরের সোনারং গ্রামের ছয়টি মহিলা এবার বি-এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন, তন্মধ্যে একজন প্রথম শ্রেণীর অনার্স পাইয়াছেন।

বরিশালের রামকৃষ্ণ মিশনে দান—

বরিশালের সন্নিকট কাশীপুর নিবাসী বর্ত্তমানে ময়মনসিংহের সিনিয়র গবর্ণমেণ্ট প্লীডার শ্রীযুক্ত রায় সারদাচরণ ঘোষ বাহাদুরের পত্নী শ্রীযুক্তা জ্ঞানদা সুন্দরী ঘোষ মহোদয়া বরিশালের রামকৃষ্ণ মিশনে প্রায় পাঁচশত টাকা মূল্যের ২২ শতাংশ পরিমাণ জমি দান করিয়াছেন। বরিশালস্থ শ্রীযুক্ত দলীতারঞ্জন রায় তাঁহার স্বর্গীয় পিতা কুলচন্দ্র রায়ের স্মৃতিকল্পে মিশনের গ্রন্থাগারে প্রায় একশত টাকা মূল্যের দুইশত খানি পুস্তক দান করিয়াছেন।

বাংলা লাটদম্পতির বদান্যতা—

ঢাকার নিম্ন লিখিত প্রতিষ্ঠান সমূহে লাট দম্পতি নিম্নলিখিত রূপ দান করিয়াছেন:—

শ্রীযুক্ত লাটসাহেবের দান:—(১) পূর্ব্ববঙ্গ সারস্বত সমাজ ৭৫০৲ (২) মুসলিম অনাথ আশ্রম ৭৫০৲ (৩) মূক বধির বিদ্যালয় ২৫০৲ (৪) রামকৃষ্ণ মিশন ১৫০৲ (৫) হিন্দু মুসলিম সেবাশ্রম ১০০৲ (৬) চৈতন্য সেবাশ্রম ৫০৲।

শ্রীযুক্তা লাট পত্নীর দান:—(১) মূক বধির বিদ্যালয়ের ২৫০৲ (২) মুসলিম অনাথ আশ্রম ২৫০৲ (৩) ঢাকা মাতৃমঙ্গল সমিতি ৫০০৲ (৪) হিন্দু বিধবা আশ্রম ২০০৲ (৫) হিন্দু অনাথ আশ্রম ২০০৲।

—

বিদেশ

সপ্তশক্তি সম্মেলন ও জার্ম্মানীর দুরবস্থার প্রতিকার—

মার্কিন রাষ্ট্রপতি হুভারের প্রস্তাব অনুযায়ী অধমর্ণ জাতিদের নিকট হইতে বৎসরেক কাল ঋণ আদায় স্থগিত রাখিতে হইলে জার্ম্মানীকেও এক বৎসরের জন্য ঋণ পরিশোধ হইতে রেহাই দিতে হইবে। ইয়ং-প্লান অনুসারে ইতিপূর্ব্বে বিজেতা জাতিবৃন্দকে মহাযুদ্ধের ক্ষতিপূরণ বাবদ বিজিত জার্ম্মানীর বাৎসরিক দেয় কিস্তী বরাদ্দ হইয়াছে। কাজেই, হুভারের প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হইতে হইলে ইয়ং-প্লানে স্বাক্ষরকারী শক্তিবর্গের পরামর্শ ও ঐকমত্য প্রয়োজন। এই হেতু, গত জুলাই মাসের শেষভাগে ইয়ংপ্লানে স্বাক্ষরকারী জাতিবর্গের সম্মেলন লণ্ডনে হইয়া গিয়াছে। সম্মেলন জার্ম্মান রাজস্ব-সচিব ডাঃ ক্রুয়েনিং প্রমুখাৎ জার্ম্মানীর ভীষণ অর্থসঙ্কটের কথা শ্রবণ করিয়া হুভারের প্রস্তাব আশু কার্য্যকরী করিবার জন্য কতকগুলি সিদ্ধান্তে উপনীত হন এবং একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি নিয়োজিত করেন।

জার্ম্মানীর আর্থিক অবস্থা যৎপরোনাস্তি খারাপ হওয়ার দরুণ বিদেশী মূলধন, যাহা সেখানকার ব্যবসা ও শিল্পে এ-যাবৎ খাটিতেছিল—তাহার অধিকাংশই তুলিয়া লওয়া হইতেছিল। এই কারণে জার্ম্মানী ভীষণ বিপ্লবের সম্মুখীন হইয়াছিল। সপ্তশক্তি সম্মেলন নির্দ্ধারণ করিয়াছেন যে, (১) অন্তর্জাতিক ব্যাঙ্কের কর্ত্তৃত্বে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক ইতিপূর্ব্বে জার্ম্মান রাইস্‌ব্যাঙ্ককে দুই কোটি পঞ্চাশ লক্ষ পাউণ্ড ধার দিলেও প্রয়োজন হইলে আরও তিন মাস ধরিয়া তাহাকে নূতন করিয়া টাকা ধার দিতে হইবে। (২) জার্ম্মানীকে পূর্ব্বে বিস্তর টাকা ধার দেওয়া হইয়াছে। তাহার এই ধার-গ্রহণ শক্তি বজায় রাখিবার জন্য বিভিন্ন দেশের আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলির সম্মিলিত চেষ্টা প্রয়োজন। (৩) বর্ত্তমানে জার্ম্মানীর আরও টাকা ধার করা আবশ্যক কি-না, এবং অল্পকালিক (short-term) ধার দীর্ঘকালিক (long-term) ধারে পরিণত করা যায় কি-না—এই সকল বিষয় অনুসন্ধান করাইবার জন্য আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্ক কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের পরিচালকগণ কর্ত্তৃক মনোনীত প্রতিনিধি লইয়া একটি কমিটি অবিলম্বে গঠন করিবেন। এ দিকে, জার্ম্মানীর শিল্প ও বাণিজ্যের কর্ণধারগণ স্বর্ণবাটা ব্যাঙ্ক (gold discount bank) গবর্ণমেণ্টের হস্তে সম্যক ছাড়িয়া দিবার সম্মতি জ্ঞাপন করায় বিভিন্ন জাতির সঙ্গে জার্ম্মানীর আর্থিক আদান-প্রদান সহজসাধ্য হইয়াছে।

সপ্ত-শক্তি সম্মেলন কর্ত্তৃক যে বিশেষজ্ঞ কমিটি নিয়োজিত হইয়াছিল তাহার সিদ্ধান্তগুলিও সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে। (১) আগামী ১৯৩৩ সনের ১লা জুলাই হইতে পরবর্ত্তী দশ বৎসরে জার্ম্মানীকে বর্ত্তমান বৎসরের দেয় কিস্তী সুদসমেত পাওনাদার জাতি সমূহকে শোধ করিতে হইবে। শতকরা তিনটাকার বেশী সুদ লওয়া হইবে না। (২) বিনা সর্ত্তে দেয় বার্ষিক কিস্তী (Unconditional annuity) তাহাকে দিতে হইবে বটে, কিন্তু তাহা অবিলম্বে জার্ম্মানীর রেল কোম্পানীকে

পুনঃ ধার দেওয়া হইবে। (৩) বিজেতা জাতিবৃন্দকে যে সব জিনিষপত্র প্রতিবৎসর দিবার বরাদ্দ আছে তাহা আদায় করিতে যাহাতে জার্ম্মান সরকারের অর্থে টান না পড়ে সে-দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। অন্যান্য কতকগুলি খুঁটিনাটি ব্যাপারেও একটা মিটমাট হইয়া গিয়াছে।

হুভারের ঘোষণা ও সপ্তশক্তি সম্মেলনের নির্দ্দেশাবলী জার্ম্মানী, ইউরোপখণ্ড তথা জগতের আর্থিক সচ্ছলতা ফিরাইয়া আনিতে কথঞ্চিৎ সাহায্য করিবে।

বিলাতে মন্ত্রীসভায় অদল বদল—

গেল বৎসর বিশ্বব্যাপী ব্যবসা-বাণিজ্য মন্দা হাওয়ায় এবং অন্যান্য নানা কারণে সর্ব্বত্র অর্থসঙ্কট উপস্থিত হইয়াছে। জার্ম্মানীর ন্যায় ইংলণ্ডেরও এবার ঘাট্‌তি বজেট। হুভার মরেটরিয়াম (অর্থাৎ এক বৎসর ঋণ আদায় স্থগিতের প্রস্তাব) এই দুর্দ্দিনে আশার রেখাপাত করিয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু ইদানীং ইংরেজ সরকারের আয়ের অনুপাতে ব্যয়ের মাত্রা এত বাড়িয়া গিয়াছে যে সমস্যা সমাধানের জন্য তাহাকে অন্য উপায়ও খুঁজিতে হইয়াছে। গত মে মাসে অর্থ-কৃচ্ছ্রতা দূর করিবার উপায় নির্দ্দেশের জন্য বিটিশ সরকার একটি কমিটি বসাইয়াছিলেন। কমিটি ব্যয়-সঙ্কোচের যে ফিরিস্তি প্রকাশ করেন তাহাতে পার্লামেণ্টের শ্রমিকদলের মধ্যে ঘোর মতভেদ দেখা দেয়। বেকারদের ভাতা ও রাজকর্ম্মচারীদের বেতন হ্রাস, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও সাধারণ জনহিতকর অনুষ্ঠানে ব্যয়-সঙ্কোচ প্রভৃতি বিষয়ে শ্রমিকদল কোন মতেই সায় দিতে পারেন না। অথচ দেশের এই সঙ্কট কালে যে ভাবেই হউক ব্যয় সঙ্কোচ করিতেই হইবে। এই উদ্দেশ্যে বিটিশ সরকারের কর্ণধার শ্রমিক দলপতি মিঃ র‍্যামজে ম্যাক্‌ডোনাল্‌ড উদারনৈতিক ও রক্ষণশীলদলের নেতৃবৃন্দের মতামত জানিবার জন্য গুপ্ত-বৈঠকে আহ্বান করেন। দেশের আর্থিক সমস্যা তাঁহাদের গোচরীভূত হইলে তাঁহারা সরকারকে সাহায্য করিতে রাজি হন। এ দিকে র‍্যামজে ম্যাক্‌ডোনাল্‌ড শ্রমিকদলকে স্বমতে আনয়ন করিতে না পারায় স্বয়ং মন্ত্রীপদে ইস্তফা দিলেন, এবং মন্ত্রীসভা ভাঙিয়া দিয়া বিরোধী দুইদল লইয়া পুনঃ মন্ত্রীসভা গঠন করিলেন। এবার মাত্র দশজন লইয়া মন্ত্রীসভা গঠিত হইয়াছে—শ্রমিক মাত্র চার জন, রক্ষণশীল চার জন এবং উদারনৈতিক দুই জন। সঙ্কট কাল উত্তীর্ণ হইলেই তাঁহারা মন্ত্রীসভার সংশ্রব ত্যাগ করিবেন—সরকার বিরোধী উভয় দলই মন্ত্রিত্ব গ্রহণ কালে এই মত স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন।

এতকাল যে দলের সুখদুঃখভাগী হইয়া কর্ণধার হইয়া মিঃ ম্যাকডোনাল্‌ড দেশ-সেবা করিয়া আসিয়াছেন সেই শ্রমিকদল তাঁহার নেতৃত্ব আর মানিয়া লইতে রাজি নন্। তাঁহার আজীবন সঙ্গী মিঃ আর্থার হেণ্ডারসন আজ তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী। শ্রমিকসভা মিঃ হেণ্ডারসনকেই তাঁহাদের নেতা বলিয়া অভিনন্দন জানাইয়াছেন। শ্রমিকদলের মতে মার্কিনী ব্যাঙ্কের ধমকীতে ভয় খাইয়া মিঃ ম্যাকডোনাল্ড, মিঃ স্নোডেন প্রভৃতি এইরূপ ব্যয় সঙ্কোচ করিয়া দেশের অনিষ্ট সাধনে অগ্রসর হইয়াছেন। দেশের ধনিকদের ট্যাক্স দেওয়ার ক্ষমতা বিলক্ষণ থাকা সত্ত্বেও দরিদ্রের মুখের গ্রাস কাড়িয়া লওয়া আদৌ যুক্তিসঙ্গত নহে।

শ্রমিকদলের মিঃ ওয়েজউড বেন্ পদত্যাগ করিলে ভারত-সচিবের পদে রক্ষণশীল স্যর স্যামুয়েল হোর নিযুক্ত হইয়াছেন। তিনি ভারতবর্ষ সম্বন্ধে নিজেকে বস্তুতান্ত্রিক (realist) বলিয়া একাধিকবার ঘোষণা করিয়াছেন। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, ভারতবর্ষের স্বরাজ বা স্বায়ত্তশাসন লইয়া অধুনা যে-সব সরকারী জল্পনা-কল্পনা চলিতেছে, ভারতবর্ষে দৈনন্দিন ঘটিত ব্যাপারের উপর লক্ষ্য রাখিয়াই তাহা সাধন করা হইবে। হিন্দু-মুসলমানে বিরোধ, ইংরেজ বণিকদের স্বার্থ, সেনাবিভাগের ইংরেজী অস্তিত্ব, ভারতীয় ঋণ বিষয়ে ইংরেজ সরকারের দায়িত্ব—শাসনতন্ত্র প্রণয়ন-কালে এই সকল বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখিলেই বস্তুতান্ত্রিকতা বজায় থাকিবে।

স্বামীর দান

শ্রীঈশানচন্দ্র মহাপাত্র

সরকার হইতে আদেশ প্রচারিত হইয়াছে—'গরীবখানা'কে এক সপ্তাহের মধ্যে ভাঙিয়া-চুরিয়া শহরের বুক হইতে তাহার চিহ্ন লোপ করিয়া দিতে হইবে।

'গরীবখানা' একটা প্রকাণ্ড একতালা বাড়ি। ছোট ছোট কুঠ্‌রী অনেকগুলি;—নোংরা, স্যাঁৎসেঁতে, অন্ধকারময়, ময়লা ও আবর্জ্জনায় পূর্ণ; কাজেকাজেই নানাবিধ রোগের আকর। মুটে মজুর গাড়োয়ানের আড্ডা, ভাড়া দেয় এক এক কুঠ্‌রীর জন্য পাঁচ-ছ টাকা।

শহরের বড় রাস্তার ফুটপাথের ধারেই বাড়িখানা। গরীবখানার ধার দিয়া যাইবার সময় লোকে নাকে রুমাল দিয়া কিংবা নাক টিপিয়া যায়। সকলের ঘৃণা, বিরক্তি অবজ্ঞা বহন করিয়া গরীবখানা বহুদিন কোনরূপে শহরের বুকে মাথা খাড়া করিয়া ছিল। প্রতিবেশীরা যখন শুনিল যে, তার পরমায়ু মাত্র আর একটি সপ্তাহ তখন তাহাদের আনন্দের পরিসীমা রহিল না।

শহর-সংস্কার-সমিতি শহরের অনেকগুলি পথ প্রশস্ত করিয়া পুরাতন বাড়ি সব ভাঙিয়া দিয়া আধুনিক রুচি-বিশুদ্ধ নূতন ঢংয়ের বাড়ি নির্ম্মাণ করাইবার সঙ্কল্প

করিয়াছে। গরীবখানার সামনের রাস্তাটারও ঐরূপ উন্নতি হইবে, তাই এক সপ্তাহের মধ্যে গরীবখানাকে ভাঙিয়া দিবার পরওয়ানা জারি হইয়াছে।

রাস্তার প্রথম হইতে আরম্ভ করিয়া অনেকগুলি বাড়ি ধূলিসাৎ করা হইয়াছে। আজ গরীবখানার পালা।

পুলিস ইন্‌স্‌পেক্‌টার সদলবলে কক্ষে কক্ষে ঘুরিয়া ধমক দিয়া ভয় দেখাইয়া তাহাদের বাহির করিবার চেষ্টা করিতেছে।

হতভাগ্যদের করুণ আবেদন, উচ্ছ্বসিত অশ্রুজল, অসহায় ক্রন্দন সবই ব্যর্থ, অতীত জীবনের সুখ-দুঃখের স্মৃতি মাখান আশ্রয়স্থলে আজ তাহাদের আর থাকিবার অধিকার নাই। তাহারা যেখানে ইচ্ছা আশ্রয় খুঁজিয়া লউক—সরকার সে বিষয়ে আদৌ মাথা ঘামাইতে ইচ্ছুক নয়; কিন্তু এক সপ্তাহের মধ্যে বাড়িখানার একবারে ভূমিসাৎ করিয়া তাহার অস্তিত্ব বিলুপ্ত করিতে না পারিলে সরকারের কর্ত্তব্যহানি ঘটিবে।

এখনও অনেকে বাড়ি ছাড়িয়া যায় নাই। তাই রাত্রিতে পুলিসের লোক আসিয়া জোর করিয়া উহাদিগকে বাহির করিয়া না দিলে সকাল হইতে কার্য্য আরম্ভ করা সম্ভব হইবে না।

ভাগ্যহীন ভাড়াটিয়ার দল নিরুপায় হইয়া নিজ নিজ কক্ষ হইতে বাহির হইতেছিল। কারও ঘর হইতে ছোট টিনের বাক্স, কারও ঘর হইতে ময়লা ছেঁড়া বিছানা, কোনো ঘর হইতে দুই একখানা ভাঙা বাসন বাহির হইতেছে।

সুখবিলাসের নন্দন-কানন শহরের বুকে দীনতার এইরূপ চিত্র অত্যন্ত অশোভন তাই হতভাগ্যগণকে তাহাদের আশ্রয় ছাড়িয়া যাইতে হইবে। সুদীর্ঘকাল বসবাসের পর হতভাগ্যদের এ ঘরে থাকিবার আর কোনো দাবি নাই, দু' দণ্ডের জন্যও নহে।

ঘরগুলা এত কুৎসিত এত নোংরা এত অস্বাস্থ্যকর, কিন্তু এর প্রতি তাহাদের কত মায়া। ঘরের দূষিত বায়ু সেবন করিয়াও তাহাদের আনন্দ, আবর্জ্জনার দুর্গন্ধ অনুভব করিয়াও তাহাদের সুখ। জীবনের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্নার সহস্র স্মৃতি মাখান ঘরখানি তাহাদের চোখে স্বর্গ। সমস্ত দিন উদরান্নের জন্য প্রাণান্তকর পরিশ্রম করিয়া রাত্রিতে আত্মীয়-স্বজন, পুত্রকন্যাদের হাসি হর্ষ কোলাহলের মধ্যে তাহারা অপরিসীম তৃপ্তি লাভ করিত।

ভাড়াটেদের শেষ দল বাহির হইয়া গেল। কেহ অন্য আশ্রমের আশায়, কেহ কারখানায়, কেহ ধরমশালায় আশ্রয় খুঁজিতে ছুটিল।

শহর সংস্কার সমিতি গত কয়েক মাসের মধ্যে গরীবখানার মত দীনহীনের অনেকগুলি আশ্রয়-গৃহ ভাঙিয়া তাহার স্থলে নূতন প্রণালীতে অনেকগুলি বাড়ি নির্ম্মাণ করাইয়াছে।

সুপ্রশস্ত পথের পার্শ্বে বৈদ্যুতিক আলোকমালামণ্ডিত চারু অট্টালিকা তুলিয়া দিতে হইবে ঐ সব হতভাগ্যদের ন্যায় কুলীমজুরকে মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া, কিন্তু তাহাতে বাস করিবার অদৃষ্ট তাহাদের কোথা!

আইনে তাহাদিগকে বাসচ্যুত করিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে, কিন্তু আশ্রয় প্রদান করিবার কোনো বিধান নাই।

দলে দলে ভাড়াটেরা গভীর বুকভাঙা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া ম্লানমুখে ধীরে ধীরে বাহির হইতেছিল। কেহ কেহ নিজেদের স্থাবর জীর্ণ বা রোগক্লিষ্ট আত্মীয়কে পিঠে করিয়া বহিয়া আনিতেছিল। কেহ কেহ রোরুদ্যমান ছেলেমেয়েগুলির হাত ধরিয়া জোর করিয়া টানিয়া আনিতেছিল।

একটি কক্ষ হইতে বাহির হইল একটি রমণী। পরিধানে তার অত্যন্ত মলিন শততালিযুক্ত একখানি কাপড়, দেহ অত্যন্ত দুর্ব্বল ও বিশীর্ণ। বহিঃপ্রকৃতির সহিত বোধ হয় সুদীর্ঘ দিন তার সাক্ষাৎ হয় নাই। কেহ বলিতে পারে না কেন? গরীবখানার কক্ষগুলিতে এইরূপ কত অজানা করুণ কাহিনীর স্মৃতি জড়ান আছে, কে বা তার সন্ধান রাখে।

অন্য একটি কক্ষ হইতে বাহির হইল, একজন বৃদ্ধ, পশ্চাতে বৃদ্ধাপত্নী। দশ-বার বছরের একটি অন্ধ মেয়ে তাহাদিগকে পথ দেখাইয়া বাহিরে আনিতেছিল। স্বামী-স্ত্রীতে ঘরে বসিয়া মাটির খেলনা প্রস্তুত করিত, নাতনীটি বাজারে বেচিয়া যাহা পয়সা পাইত তাহাতে অতিকষ্টে তাহাদের দিন কাটিত।

বেলা দুইটা হইতে রাত্রি পর্য্যন্ত গরাবখানার করুণ দৃশ্যগুলি সরকারী কর্ম্মচারীর চোখের সামনে বিয়োগান্ত-নাটকের দৃশ্যাবলীর মত একটির পর একটি করিয়া সরিয়া যাইতে লাগিল।

তাহাদের কার্য্য শেষ! ঘরগুলি প্রায় জনহীন।

শেষে যে দু-একজন ছিল তাহারা পুলিসের হাতে ধাক্কা খাইয়া ঘরের মধ্যে থাকা আদৌ নিরাপদ নহে বুঝিয়া সরিয়া পড়িল।

পুলিসের লোকেরা আর একবার অনুসন্ধান করিয়া দেখিল কেউ কোথাও আছে কি-না। চারিদিকে ভগ্ন ভাণ্ডের স্তূপ ও আবর্জ্জনারাশি হতভাগাদের স্মৃতিচিহ্ন-স্বরূপ মাটি কামড়াইয়া পড়িয়া আছে।

ও আবার কি! কোণের ঘরে একটা স্ত্রীলোক, তার পার্শ্বে ছেঁড়া কাঁথা মুড়ি দেওয়া একটা বুড়ো!

স্ত্রীলোকটির চক্ষু দুটি কোটরগত, গণ্ডস্থল ক্ষীণ ও শ্রীহীন। বৃদ্ধ বহুকষ্টে ছেঁড়া কাঁথার ভিতর হইতে বাহির হইয়া পত্নীকে বলিল,—'আর দেরি করে কি হবে। এখুনি ত পুলিসের লাঠি ঘাড়ে পড়বে।'

কম্পজ্বরে তাহার অস্থির প্রতি অণুটি যেন ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতেছিল, বৃদ্ধ অতিকষ্টে পত্নীর হাত ধরিয়া ধীরে ধীরে বাহির হইয়া আসিল।

আজ পাঁচ বৎসরের কথা। একদিন পৌষের প্রভাতে বৃদ্ধার ভাগ্যে শেষ স্বামী দর্শন ঘটিয়াছিল।

বৃদ্ধা কাজ করিত বারুদের কারখানায়, মাসিক বেতন তার ছিল আটটি টাকা। হঠাৎ একদিন বারুদস্তূপে আগুন লাগায় অনেক লোককে প্রাণ হারাইতে হইয়াছে। অগ্নিদেব বৃদ্ধার জীবনের পরিবর্ত্তে তাহার চক্ষু দুইটি লইয়া তাহাকে নিষ্কৃতি দিলেন। সে সম্পূর্ণ উপার্জ্জন-শক্তিহীনা হইল। স্বামীর সামান্য আয়ে দুজনে অতিকষ্টে দিন কাটে।

বুড়া কাজ করিত আয়নার দোকানে। দীর্ঘদিন আয়নার দোকানে পারদের কাজ করিতে করিতে ক্রমেই তাহার শরীরে পারদ প্রবেশ করিল। তাহার দেহ দুর্ব্বল ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলিতে কম্পন দেখা দিল। মৃত্যুর চেয়ে ইহা বুড়ার পক্ষে অধিকতর দুর্ব্বিষহ বোধ হইতে লাগিল।

বুড়ার শক্তি হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে তাহার আয় কমিতে লাগিল, মাসিক পনের টাকা বেতন দশ টাকায় দাঁড়াইল। কাজেকাজেই বুড়া অন্ধ পত্নীর হাত ধরিয়া মাসিক দশ টাকা আয়ে কোনরূপে জীবিকানির্ব্বাহের আশায় গরাবখানার সর্ব্বাপেক্ষা খারাপ কুঠরীটিতে আসিয়া ঢুকিয়াছিল।

পত্নীর দৃষ্টিহীনতা একদিকে বুড়ার পক্ষে সান্ত্বনার কারণ হইয়াছিল; কারণ বুড়ী স্বামীর দৈন্যপীড়িত, অনশনক্লিষ্ট ক্ষীণ শরীরটা দেখিতে পাইত না। যেদিন খাবার অভাব ঘটিত বুড়া সমস্ত অন্নব্যঞ্জন বুড়ীকে দিয়া নিজে ভুক্ত দ্রব্য চর্ব্বণের ছল করিয়া দাঁতে দাঁত লাগাইয়া শব্দ করিত এবং ঠোঁটে জিভ লাগাইয়া ভুক্ত দ্রব্য আস্বাদন করিবার ভাণ করিত। বুড়ী স্বামীর এ কৌশল বুঝিতে না পারিয়া সানন্দে স্বামী দত্ত অন্ন ও ব্যঞ্জন উদরস্থ করিত।

দৃষ্টিহীনতার সঙ্গে সঙ্গে অন্ধদের অনুভব শক্তি খুব প্রবল হইয়া উঠে। বুড়া যতই গোপন করুক না কেন, বুড়ী বুঝিতে পারিল সর্ব্বনেশে পারা তাহার স্বামীর দেহে প্রভাব বিস্তার করিয়া দিনে দিনে তাহাকে ক্ষীণ ও শক্তিহীন করিয়া তুলিতেছে। কিন্তু উপায় কি?

এইরূপ ভাঙা শরীর লইয়াও বুড়াকে কঠোর পরিশ্রম করিয়া পয়সা রোজগার করিতে হইত। কি করিবে? উদরান্নের আর যে কোনো উপায় ছিল না। রুগ্নদেহে কঠিন পরিশ্রমের জন্য তাহার দেহ রক্তমাংসহীন হওয়ায় বুড়া পাড়ার ছেলেমেয়েদের কাছে জুজু বুড়ো আখ্যা পাইল। শীতকালে সে বড়ই কাবু হইয়া পড়িত; তবুও খাটুনি বন্ধ করিবার উপায় নাই। প্রতিমাসে যে-কোনো উপায়ে তাহাকে আটদশ টাকা রোজগার করিতে হইত।

আজ যখন তাহাদের একমাত্র আশ্রয়স্থল গরাবখানা ধ্বংসের মুখে, তখন তাহাদের নিঃসহায় অবস্থা ভাবিয়া বুড়া কাতর হইয়া পড়িল।

পৌষের কন্‌কনে শীতে সে এরূপ জড়সড় হইয়াছিল যে, উঠানে দাঁড়াইবার সামর্থ্যও তাহার লোপ পাইয়াছিল।

খুঁজিতে স্বামীর দেহে তাহার হাত পড়িতে তাহার প্রাণ কাঁপিয়া উঠিল, দুই তিন বার ডাকিয়া দেখিল কোন উত্তর দেয় না। ঠেলা দিয়া দেখিল কোন সাড়া নাই। তবে কি তাহার স্বামী তাহাকে জন্মের মত ছাড়িয়া গেল!

এই ভগ্ন ইষ্টক স্তূপের অন্তরালে জনমানবহীন স্থানে এত রাত্রিতে দৃষ্টিহীনা সে কি উপায় করিবে।

বৃদ্ধা ভাবিল তাহার জন্য আজ তাহার স্বামীর এ দশা, সে অন্ধ হইলেও আজ প্রাণ দিয়া একবার চেষ্টা করিয়া দেখিবে।

স্ত্রী স্বামীর মুখে হাত দিয়া দেখিল নিঃশ্বাস চলিতেছে। তবে ত তাহার স্বামী বাঁচিয়া আছে। নিশ্চয় এ মূর্চ্ছা!

সে দুই তিন বার জোরে চীৎকার করিয়া কাহারও কোনো সাড়াশব্দ পাইল না।

কান পাতিয়া শুনিল, তখনও রাস্তায় গাড়ী ঘোড়া চলার শব্দ শোনা যাইতেছে। সেই শব্দ লক্ষ্য করিয়া স্ত্রী ধীরে ধীরে অতিকষ্টে ভগ্ন ইষ্টকরাশির উপর পা ফেলিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল।

একে দৃষ্টিহীনা, তাহাতে অনাহারে দুর্ব্বল—পথও ইষ্টকময়। কিছু দূর যাইবার পর হঠাৎ একটা ভাঙা দেওয়াল মাথায় লাগিয়া—'বাপ রে' বলিয়া চীৎকার করিয়া পড়িয়া গেল ও সঙ্গে সঙ্গেই তাহার জ্ঞান লোপ হইল।

* * *

সংজ্ঞালাভ হইলে বুড়ী বুঝিল সে খাটের উপর নরম বিছানায় শুইয়া আছে। সর্ব্বাঙ্গ তার কম্বল দিয়া মোড়া, কপালে অসহ্য যন্ত্রণা ও ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। সে ভাবিল সে কি স্বপ্ন দেখিতেছে?

বুড়ী বলিয়া উঠিল—ওগো কে আছ কোথা, ঐ দিকে ইটের উপর আমার স্বামী মূর্চ্ছা গেছে।

পাশে নার্স বসিয়াছিল, সে ভাবিল রোগিণী ভুল বকিতেছে। নার্স জিজ্ঞাসা করিল—কোথা তোমার স্বামী?

গরীবখানা হইতে বাহির হইবার পর নিজের মূর্চ্ছা যাইবার পূর্ব্ব মূহূর্ত্ত পর্য্যন্ত সব ঘটনা তাহার চিত্তে অসহ্য যাতনার উদ্রেক করিল।

—আমি কোথা আছি? আমার স্বামী কোথা?

নার্স শান্তভাবে উত্তর দিল—তুমি হাসপাতালে।

রোগিণীকে উত্তেজনার হাত হইতে মুক্ত করিবার আশায় বলিল—তোমার স্বামী সে বেশ ভাল আছে। তার জন্য কোনো চিন্তা করো না। তুমি একটু স্থির হও, নইলে অসুখ বেড়ে যাবে।

বুড়ী জিজ্ঞাসা করিল—আমায় কে হাসপাতালে নিয়ে এল?

নার্স উত্তর দিল—বাজারে ভাঙা বাড়ির ইটের উপর মূর্চ্ছিত অবস্থায় তুমি পড়েছিলে, একজন কনেষ্টবল তোমায় হাসপাতালে দিয়ে গেছে।

বুড়ী বলিল—তার একটু দূরে যে আমার স্বামী পড়েছিল, তাকে কি হাসপাতালে আনা হয়েছে?

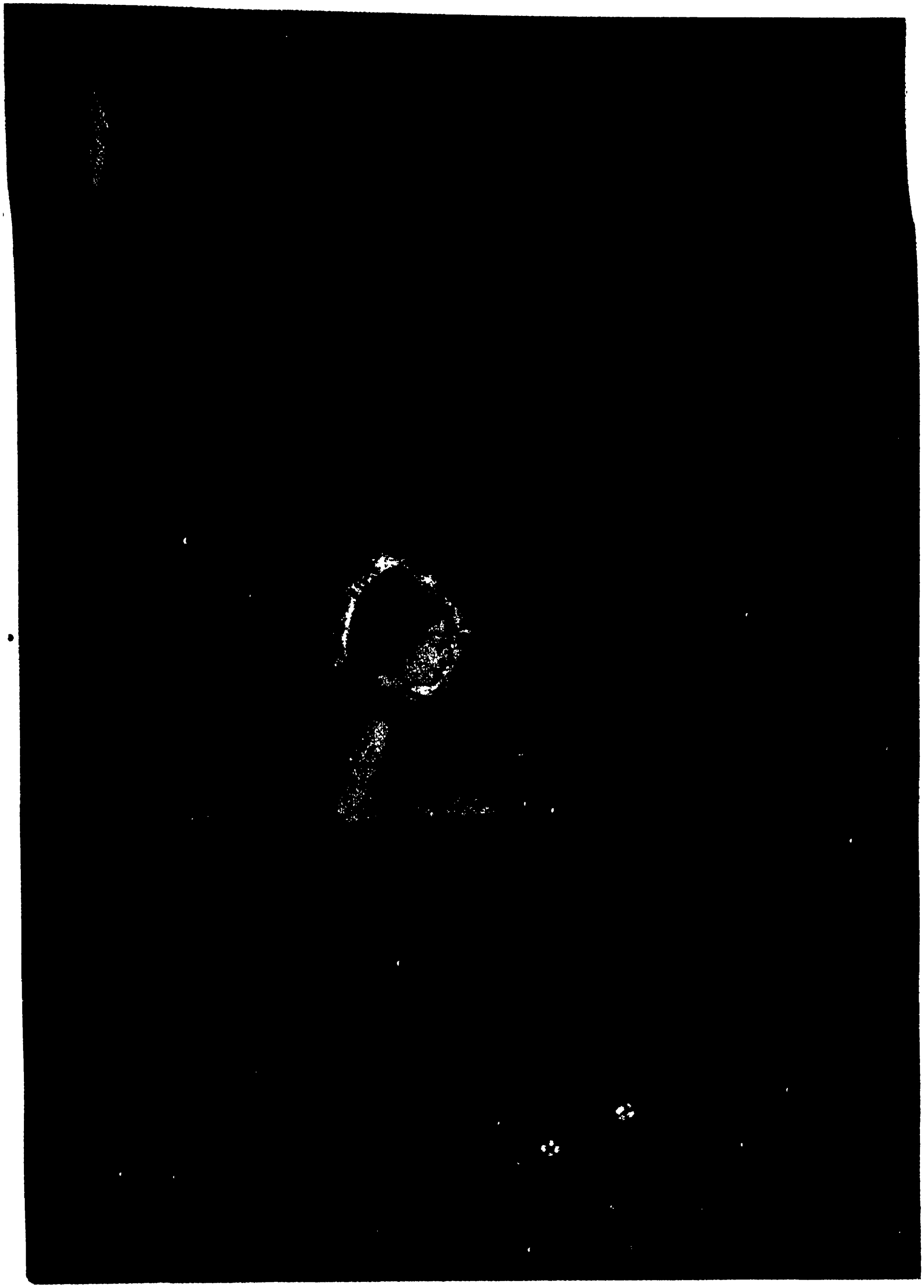
নার্স তাহাকে চুপ করিবার জন্য ধমক দিয়া কক্ষ হইতে বাহির হইয়া গেল।

নার্স ফিরিয়া আসিয়া তাহার ঘুমের জন্য এক দাগ ওষুধ দিল। ঘুমাইয়া পড়িলে আর কোনরূপ উত্তেজনার ভয় নাই। নতুবা তাহার জীবনের আশঙ্কা রহিয়াছে বলিয়া ডাক্তার নার্সকে বার-বার সাবধান করিয়া দিয়া গিয়াছে।

বুড়ী পতনের সময় যে 'বাপ রে' শব্দ করিয়াছিল সেই শব্দ অদূরে একজন কনেষ্টবলের কানে যায়, সে আসিয়া দেখে একজন অন্ধ স্ত্রীলোক মূর্চ্ছা গিয়াছে ও তাহার কপাল কাটিয়া কয়েকখানি ইট রক্তাক্ত হইয়াছে। কনেষ্টবল তাড়াতাড়ি একখানা ভাড়াটে গাড়ী ডাকিয়া তাহাকে হাসপাতালে পৌছাইয়া দিয়া গিয়াছে। এবং যেখানে যে অবস্থায় তাহাকে পাওয়া গিয়াছিল তাহার একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ হাসপাতালে লিখাইয়া দিয়া গিয়াছে।

বুড়া পড়িয়াছিল একটু দূরে ইষ্টক স্তূপের আড়ালে। সে কাহারও দৃষ্টিপথে পড়ে নাই। কেউ জানিতে পারে নাই যে ইহারই অদূরে ভগ্ন দেওয়ালের পার্শ্বে হতভাগ্য বৃদ্ধের সংজ্ঞাহীন দেহ মৃত্যুর অপেক্ষায় পড়িয়া রহিয়াছে।

পরদিন প্রভাতে যখন কুলীরা কাজ করিতে আসিল তখন দেখিল একটা মৃতদেহ ভাঙা ইটগুলার তলায় পড়িয়া আছে। দু-একজন কুলী তাহাকে চিনিত; কিন্তু তাহারা বুঝিতে পারিল না যে, কি করিয়া এমন শোচনীয় ভাবে হতভাগ্যের জীবনের অবসান হইল।



বুদ্ধ

শ্রীসুকুমার বসু

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

পুলিসে খবর দেওয়া হইল। পুলিস লাস চালান দিল।

তাহার কুর্ত্তার পকেটে পাওয়া গেল আট আনা পয়সা ও একজোড়া জুতা বাঁধা দেওয়ার একখানি রসিদ!

নার্সের কাছে সব ব্যাপার শুনিয়া ডাক্তার থানায় গিয়াছিল। সেই সময় বুড়ার মৃত্যুর সংবাদ থানায় আসে। পুলিস ইনস্‌পেক্টার ডাক্তারকে লইয়া ঘটনাস্থলে গিয়াছিলেন। ডাক্তারের মুখে সব বৃত্তান্ত শুনিয়া ইন্‌স্‌পেক্টার বুঝিল যে ইহারা স্বামী-স্ত্রী।

পুলিস ইন্‌স্‌পেক্টার সেই রসিদখানি লইয়া মুচীর দোকানে গিয়া বুড়ার জুতা জোড়াটি ছাড়াইয়া ডাক্তারের সঙ্গে দিলেন।

আট দশ দিন পরে বৃদ্ধা সুস্থ হইয়া উঠিল। হতভাগিনী প্রতিদিন স্বামীর কথা জিজ্ঞাসা করিয়া উত্তর পাইয়াছে যে, তার স্বামী ভাল আছে।

আজ হাসপাতাল হইতে তাহার বাহির হইবার দিন। অন্ধ সে কোথায় যাইবে।

ডাক্তারবাবুর অনুগ্রহে বৃদ্ধা ডাক্তারের বাড়িতে আশ্রয় পাইয়াছে। ডাক্তার সব কথা তাহাকে বলিয়া স্বামীর জুতা জোড়াটি তাহাকে দিয়াছেন।

* * *

বুড়ী যতদিন বাঁচিয়াছিল সে বালিশ মাথায় দিত না। সে মৃত স্বামীর ঐ জুতা জোড়াটি মাথায় দিয়া শুইত। প্রত্যহ সকালে দেখা যাইত যে, তাহার চোখের জলে জুতার অনেকখানি স্থান ভিজিয়া গিয়াছে। এ যে তার স্বামীর শেষদান।*

* ইংরেজী হইতে অনূদিত

কালিদাসের যুগের দু-একটি কথা

শ্রীরঘুনাথ মল্লিক

মহাকবি কালিদাসের নাম শোনেন নাই এমন লোক আমাদের দেশে খুবই কম আছেন। কিন্তু দুঃখের কথা এই যে, আমরা কালিদাস সম্বন্ধে কেবল 'কালিদাস', 'বিক্রমাদিত্য,' 'শকুন্তলা ও 'মেঘদূত' এই দুই চারিটা কথা ছাড়া আর কিছুই জানি না। মহাকবি যে শকুন্তলা মেঘদূত ছাড়া আরও অনেক কাব্যনাটক লিখিয়া গিয়াছেন, সে খবর আমাদের কয়জনই বা জানেন? অবশ্য কালিদাসের নাম করিবার সময়ে বা তাঁহার সম্বন্ধে তর্ক করিবার সময়ে কালিদাসকে আমরা খুবই বড় করিয়া দেখাই!

মহাকবি নিজের সম্বন্ধে নিজে কিছুই লিখিয়া যান নাই, তাঁহার সমসাময়িক কোনো লোকও কিছুই লেখেন নাই, এমন কি, তাঁহার কাব্যের প্রধান টীকাকার মল্লিনাথও এ-বিষয়ে একেবারে নীরব।

তাঁহার নিজের সম্বন্ধে তেমন কোনও কথা জানা যায় না বটে, তবে তিনি যে-যুগে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, সে-যুগের অনেক খবর তাঁহার লেখা হইতে আমরা পাই।

তাঁহার সমস্ত কাব্যনাটকগুলি পড়িবার সুযোগ ও সৌভাগ্য যাঁহারই হইয়াছে, তিনিই বুঝিতে পারিবেন, সে সময়কার লোকেদের শিল্পকলার উপর যথেষ্ট অনুরাগ ছিল। কি চিত্রবিদ্যা, কি গীতবাদ্য, কি ভাস্কর্য্য বা কারুকার্য্য, সকল বিষয়েই তাঁহাদের অপরিসীম অনুরাগ ছিল।

তখনকার দিনে রাজাদের প্রাসাদে প্রায়ই একটি করিয়া 'চিত্রশালা' থাকিত, এই সব চিত্রশালায় চিত্রকরেরা আসিয়া রাজারাণীদের আদেশমত চিত্র আঁকিয়া দিতেন (মালবিকা—১ম অঙ্ক)। কোনও কোনও

প্রাসাদে আমরা যাহাকে আর্ট গ্যালারী বলি, সেই ধরণের নানা রকমের চিত্র সংগ্রহ থাকিত। কেবল যে চিত্রকরেরাই চিত্র আঁকিতেন তা নয়, অনেক সময়ে রাজারা নিজেরাই চিত্রবিদ্যার আলোচনা করিতেন। অনেকে চিত্র আঁকিয়া বেশ উন্নতিও করিয়াছিলেন। 'শকুন্তলার' রাজা দুষ্মন্ত, 'বিক্রমোর্ব্বশীর' পুরূরবা, 'রঘুবংশের' রাজা অগ্নিবর্ণের চিত্র আঁকিবার বিবরণ পাই। 'মেঘদূতের' যক্ষও মাঝে মাঝে ছবি আঁকিবার চেষ্টা করিতেন।

সে-কালের মেয়েরাও এ-বিষয়ে পশ্চাৎপদ ছিলেন না, তাঁহাদের মধ্যে কেউ কেউ ছবি আঁকিতে পারিতেন। 'মেঘদূতের' যক্ষপত্নী প্রবাসী স্বামীর চিত্র আঁকিতেন (উ-মে—২৪)। 'কুমারসম্ভবের' পার্ব্বতী যে ছেলে-বেলায় অন্যান্য বিদ্যার মত চিত্রবিদ্যাও শিখিয়াছিলেন, সে-খবর আমরা তাঁহার সখীর মুখ হইতেই পাই (কুমার—৫।৫৮)।

ভাস্কর্য অর্থাৎ প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ কার্য্যেও তখনকার লোকেরা যথেষ্টই উন্নতি করিয়াছিলেন। মহাকবির লেখার অনেক জায়গায় দেখা যায় রাজপথ বা উদ্যানে নারীর অর্দ্ধনগ্ন মূর্ত্তি সেই স্থানের শোভা বৃদ্ধি করিতেছে, 'রঘুবংশে'র একস্থানে মল্লিনাথ বলিয়াছেন যে, এই মূর্ত্তিগুলি ছিল দারুময়ী অর্থাৎ কাঠের। মল্লিনাথ বলিয়াছেন বটে, তবে মহাকবি এমন কোনও কথাই বলেন নাই যাহাতে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে, এই মূর্ত্তিগুলি কাঠের কিম্বা প্রস্তরের। উৎসবের দিনে সোনার তোরণে ও চীন দেশের রেশমের পতাকায় নগর সাজাইবার বিবরণ হইতে তখনকার দিনের শিল্পকার্য্যেরও অনেক পরিচয় পাওয়া যায় (কুমার—৭।৩)।

সেকালে হস্তীদন্তের দ্রব্যাদিরও খুব আদর ছিল। কোন কোন রাজা স্বর্ণসিংহাসনের পরিবর্ত্তে হস্তীদন্তের সিংহাসনে বসিতেন (রঘু—১৭।২১)। বস্ত্রের উপরও তখনকার লোকেরা অতি সূক্ষ্ম কাজ করিতে পারিতেন (রঘু—১৭।২৫)।

গীতবাদ্যেও তাঁহাদের খুব অনুরাগ ছিল। রাজা-রাণীদের কেহ কেহ একসঙ্গে গান বাজনা করিতেন (রঘু—৮।৬৭)। রাণীদের নিজেদের সঙ্গীতশালা থাকিত, তাঁহারা সেখানে ইচ্ছামত গান বাজনা করিতেন (শকু—৫ম অঙ্ক)। বেতন-ভোগী গায়ক, বাদক, নর্ত্তকী সবই ছিল সে সময়, ছিল না কেবল এখনকার থিয়েটারের মত নর্ত্তকীর দল। রাজার সভায় নর্ত্তকীরা দল বাঁধিয়া নৃত্য করিতেছে, এরূপ ব্যাপারের উল্লেখ তাঁহার কোনো কাব্য-নাটকেই পাওয়া যায় না। বাদ্যযন্ত্রেরও অনেক রকম নাম পাওয়া যায়। ঢাক, ঢোল, শিঙা ত ছিলই (কুমার—১১।৩৬)। মৃদঙ্গ অর্থাৎ তবলা, সেতার, বাঁশী সবই ছিল। গান বাজনা শিখাইবার সুবিধার জন্য কোনো কোনো রাজা নিজের ব্যয়ে 'সঙ্গীত-বিদ্যালয়'ও করিয়া দিতেন (মালবিকা—১ম অঙ্ক)।

সে-যুগের বিদ্যাচর্চ্চার কথা বলাই বাহুল্যমাত্র। কারণ, যে সময়ের সামান্য চেটী, প্রহরিণী ও পরিচারিকারা লিখিতে পড়িতে জানিতেন, কুমারীরাও সুললিত পদ্যে প্রেমপত্র লিখিতে পারিতেন, রাণীদের পত্র লিখন ও পঠন করিবার জন্য 'লিপিকরী' পাওয়া যাইত, সে সময়ের মেয়েরাও শিক্ষার জন্য উচ্চ উপাধি (পণ্ডিতা কৌশিকী) প্রাপ্ত হইতেন, মহিলা কবির লেখা নাটকের অভিনয় পুরুষেরাও আগ্রহসহকারে দেখিতেন, সে যুগে বিদ্যাশিক্ষা যে কতদূর উন্নতিলাভ করিয়াছিল তাহা সহজেই অনুমেয়।

বিজ্ঞান ও জ্যোতিষেও সে সময়ে লোকের জ্ঞান ছিল অসীম। এখনকার মত তখনকার লোকে কলের জল পাইতেন না বটে, তবে তাঁহাদের মধ্যেও কেহ কেহ জল পরিশুদ্ধ (filter) করিয়া খাইতেন। 'কতক' পুষ্পের দ্বারা তাঁহারা জল শোধন করিতেন (মালবিকা—২য় অঙ্ক), তবে কোন্ পুষ্পকে যে তখনকার লোকেরা 'কতক' পুষ্প বলিতেন, বলিতে পারি না। এখনকার মত যন্ত্রপাতি তখন ছিল না, তবু তখনকার লোকেরা বিদেশ হইতে আমদানী না করিয়াই এমন এক রকম যন্ত্র নির্ম্মাণ করিতেন, যার দ্বারা জল ঊর্দ্ধে উঠিয়া ফোয়ারার মত নীচে পড়িত (রঘু—১১।৪৯) তখনকার দিনে ইলেক্ট্রিক লাইট ছিল না, তবে তাঁহারা এত তেজস্কর আলোকের ব্যবস্থা করিতে পারিতেন যে, সে আলোর সাহায্যে শহরের অনেকখানি স্থান আলোকিত

করিতে পারা যাইত। সাধারণত তাঁহারা এক বিরাটকায় শিবের প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া সেই প্রতিমূর্ত্তির কপালের উপর চন্দ্রের আকারে আলো জ্বালাইতেন, সেই আলোর তেজে অন্ধকার রাত্রিও জ্যোৎস্নাময় মনে হইত (রঘু—৬।৩৪)। সেই সময়ে কেহ কেহ আবার হীরক প্রভৃতি বহুমূল্য প্রস্তরের সুন্দর নকল করিতেও পারিতেন (বিক্রম—২য় অঙ্ক)।

চন্দ্রের যে নিজের আলোক মোটেই নাই, সূর্য্যের আলোক চাঁদের উপর পড়ে বলিয়াই আমরা চাঁদের জ্যোৎস্না উপভোগ করি, এ-কথা তাঁহারাও জানিতেন (রঘু—৩।২২)। চন্দ্রের আকর্ষণে সমুদ্রের জল স্ফীত হয়, নদীর বুকে জোয়ার ভাটা খেলে এ খবর তাঁহারাও রাখিতেন (রঘু—৩।১৭)। শরৎকালের নীল আকাশে আমরা যে 'ছায়াপথ' দেখিতে পাই (ইংরেজীতে যাহাকে 'Milky Way' বলে), সেই 'ছায়াপথ' কথাটি এখনকার যুগের নয় (রঘু—১৩।২)। সে-যুগের লোকেরাও জানিতেন যে অমাবস্যার পর চাঁদ সূর্য্যের নিকট হইতে দূরে চলিয়া যায় (রঘু—৭।৩৩), আর বসন্তের পর সূর্য্য উত্তর দিকে ও বর্ষার সময় দক্ষিণ দিকে চলিতে থাকে। পৃথিবীর ছায়া চাঁদের উপর পড়ে বলিয়াই চন্দ্রকে মলিন দেখায় অর্থাৎ চন্দ্রগ্রহণ হয়, সে রহস্যও তখন অজানা ছিল না (রঘু—১৪।৪০)।

তখনকার দিনে কেউ কেউ 'নালীক' বা বন্দুকের ব্যবহারও জানিতেন (নলোদয়—১।৩৪)। মহাকবি বলিতেছেন, 'শত্রুর প্রতি মহারাজ নল অত্যন্ত দীপ্তি-বিশিষ্ট নালীক ছুঁড়িতেন'। তিনি এমন ভাবে বলিয়াছেন যেন নালীকের ব্যবহার সে সময়ে খুব একটা বাহাদুরীর কাজ ছিল।

মহাকবির কাব্যে আমরা 'জামিত্র' কথাটিও পাই (কুমার—৭।১)। য়ুরোপীয় কোনো কোনো পণ্ডিতের মতে এই 'জামিত্র' শব্দটি Geometry-র অপভ্রংশ, গ্রীকদের নিকট হইতে ধার করা।

জাহাজ নির্ম্মাণে তখনকার লোকেরা খুব পারদর্শী ছিলেন। জাহাজে চড়িয়া সমুদ্র-পথে বাণিজ্য করিতে যাইবার অনেক কথাই মহাকবির কাব্যের মধ্যে আমরা পাই। বাণিজ্যপোত ত ছিলই, এমন কি বড় বড় যুদ্ধ-তরণীও যে তাঁহারা নির্ম্মাণ করিতে পারিতেন সে বিষয়েও কোন সন্দেহ নাই। বাংলা দেশই এ-বিষয়ে খুব উন্নতি করিয়াছিল। বাঙালীরা গঙ্গার বক্ষে নৌবহর লইয়া বহিঃশত্রুর আক্রমণ হইতে দেশরক্ষা করিতেন (রঘু ৪।৩৬)। পারস্যদেশে (তখনকার দিনে সিন্ধুনদীর ওপার হইতে আরম্ভ করিয়া বেলুচিস্থান ও তাহার আরও উত্তর-পশ্চিম স্থানকে পারস্য দেশ বলা হইত) যাইতে হইলে জল ও স্থল উভয় পথই ব্যবহার হইত; যে-সব জাহাজ আরবসাগর অতিক্রম করিত তাহারা মজবুত নিশ্চয়ই ছিল।

তখনকার দিনে রাজারাই হইতেন বিচারপতি। কখন কখন তাঁহার আদেশ লইয়া বা তাঁহার অনুমতি লইয়া মন্ত্রীও বিচার করিতেন। রাজাদের একাধিক মন্ত্রী থাকিত, সৈন্যদের উপর সেনাপতি থাকিত। নগরের শান্তিরক্ষার জন্য থাকিত নগরাধ্যক্ষ; দূরের দেশ শাসন করিবার জন্য থাকিত 'রাষ্ট্রীয় মুখ'; রাজ্যের সীমা নিরাপদ রাখিবার জন্য থাকিত 'অন্তপাল' (মালবিকা—১ম অঙ্ক)। তা ছাড়া আরও অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজা তাঁহার অধীনে থাকিত, তাহাদিগকে 'সামন্ত রাজা' বলা হইত। যে রাজা অন্য সকল রাজাকে যুদ্ধে পরাস্ত করিতে পারিতেন তাঁহাকে বলা হইত 'সম্রাট' (রঘু—৪।৮৮)। তখনকার দিনে সব রাজপুত্রেরাই যে খুব পিতৃভক্ত হইতেন, তা' নয়, পিতা বর্ত্তমানে অসদুপায়ে সিংহাসন করতলগত করাও একান্ত বিরল ছিল না (রঘু—৮।২)।

রাজকার্য্য সকাল হইতে বেলা দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত করা হইত (মালবিকা—২য় অঙ্ক)। এখনকার মত দশটা পাঁচটা আপিস করিবার রীতি ছিল না। রাজারা প্রায় সকল বিষয়েই নিজেদের একটা স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিবার চেষ্টা করিতেন। তাঁহারা যে তীর ছুঁড়িতেন, তাহাতে নিজেদের নাম লিখাইয়া রাখিতেন, তখনকার দিনে যোদ্ধাদের ইহাই ছিল রীতি বা ফ্যাশান (বিক্রম—৫ম অঙ্ক)। তাঁহারা যে রথে চড়িতেন অনেক সময় তাহারও একটি করিয়া নাম রাখিতেন। কেউ নিজের রথের নাম

রাখিয়াছিলেন 'সোমদত্ত' (বিক্রম—১ম অঙ্ক), কেউ 'বিজিত্বর' (কুমার—১৪।২)। রথের পতাকারও তখনকার দিনে বিশেষত্ব থাকিত। কাহারও পতাকায় অঙ্কিত থাকিত 'হরিণ', কাহারও 'মৎস্য' (রঘু—৭।৪০) ইত্যাদি। অনেকে সখ করিয়া বিভিন্ন প্রাসাদের বিভিন্ন নাম রাখিতেন। কাহারও প্রাসাদের নাম ছিল 'দেবচ্ছন্ন', কাহারও নাম ছিল 'মেঘচ্ছন্দ', কাহারও বা 'বৈজয়ন্ত', কাহারও বা নাম ছিল 'মণিহর্ম্ম্য'। যক্ষপতি কুবেরের বাগানের নাম ছিল 'বৈভ্রাজ' (উ. মে—১০)।

য়ুরোপের যোদ্ধারা পূর্ব্বে যুদ্ধ করিতেন লোহার বর্ম্ম পরিয়া, আর আমাদের দেশের অনেক যোদ্ধারা যুদ্ধ করিতেন তুলার বর্ম্ম (কুমার—১৫।৫) পরিয়া। অবশ্য, লৌহের বর্ম্মও আমাদের দেশে অজানা ছিল না, অশ্বের গাত্রে ধাতুময় বর্ম্ম পরানরও উল্লেখ পাওয়া যায়।

শিকার করিতে যাইবার সময় শিকারীরা অনেক সময় 'সবুজ রংয়ের' বর্ম্ম পরিতেন (রঘু—৯।৫১), হয়ত এতে শিকারীর জঙ্গলে লুকাইয়া থাকিবার সুবিধা হইত।

সে সময়ে ব্যবসা-বাণিজ্যেরও অনেক বিবরণ পাওয়া যায়। কাশ্মীরের কুঙ্কুম বা জাফরাণ (রঘু-৪।৬৭), কাম্বোজের আখরোট (রঘু-৪।৬৯), চীনদেশের রেশম (কুমার—৭।৩), মলয় পর্ব্বতের মরীচ (রঘু-৪।৪৬), মহীশূরের চন্দন কাঠ (রঘু-৪৪৮), দক্ষিণসমুদ্রের মুক্তা, পারস্যদেশের ঘোড়া (রঘু-৫।৭৩) তখকার দিনে খুব বিখ্যাত ছিল। এই সমস্ত দ্রব্যাদির আমদানী রপ্তানি ত হইতই, তা ছাড়া নিত্যব্যবহার্য্য জিনিষ ও নানা রকমের বস্ত্রেরও রীতিমত কেনাবেচা হইত। ভারতের বাহিরেও বণিকেরা সমুদ্রপথে যাতায়াত করিতেন তাহারও প্রমাণ মল্লিনাথ দিয়াছেন (নৌভিঃ সমুদ্রবাহিনীভিঃ রঘু—১৪।৩০)।

তখনকার দিনে অন্ততঃ ক্ষত্রিয়দের মধ্যে অল্পবয়সে বিবাহ প্রচলিত ছিল না, বিবাহ একটু বেশী বয়সেই হইত। গন্ধর্ব্ব বিবাহ, স্বয়ংবর বিবাহ তখনও একেবারে লোপ পায় নাই, অসবর্ণ বিবাহও প্রচলিত ছিল। (মাল—১ম অঙ্ক ও শকু—১ম অঙ্ক)। পণপ্রথা না থাকিলেও মেয়ের বাপ নিজের সামর্থ্য অনুসারে যৌতুকাদি দিতে ইতস্ততঃ করিতেন না, তবে কোথায়ও কোথায়ও আবার বরকে পণ দিয়া বধূ ঘরে আনিতে হইত ('দুহিতৃশুল্কং' রঘু—১১।৩৮)। কোথাও আবার কনে দেখিবার পূর্ব্বে কনের চিত্র চাহিয়া পাঠানও রীতি ছিল (রঘু—১৮।৫৩)।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, সে-যুগের বেশীর ভাগ মেয়েরাই লেখাপড়া শিখিতেন, নৃত্যগীতাদিও জানিতেন, ছবি আঁকিতে পারিতেন, নাটক লিখিতেন, লেখাপড়ার জন্য উপাধি পাইতেন, সাধারণের ব্যবহারের উদ্যানে পুরুষের সমক্ষেও বেড়াইতে বাহির হইতেন, কেহ কেহ আবার একটু-আধটু মদ খাইয়া নেশা করিতে ভালবাসিতেন। তপস্যাতেও সে সময়ের মেয়েদের অধিকার ছিল। কাজেই সমাজে তাঁহারা তখন একেবারে হীন বা পঙ্গু হইয়া কখনও থাকিতেন না এ কথা বেশ বুঝিতে পারা যায়। তাঁহারা রকমারি অলঙ্কার ত পরিতেনই, তা ছাড়া বিলাসেরও অন্যান্য অনেক জিনিষই ব্যবহার করিতেন। লোধ্র পুষ্পের রেণু মুখে মাখিলে এখনকার 'পাউডারে'র কাজ হইত, ধূপের ধূমে তাঁহারা কেশপাশ সুগন্ধি করিয়া লইতেন, আর দেহ সুগন্ধি করিতেন অগুরু কালীয়ক কিংবা মৃগনাভি মাখিয়া। বড়ঘরের মেয়েরা পাখী পুষিতেন, ময়ূর নাচাইতেন, যবন দেশীয় দাসীবাঁদীও রাখিতেন। সতীদাহ প্রথাটা (রঘু—১৭।৬) তখনও ছিল, তবে আমাদের একশো দেড়শো বছর আগেকার বাংলা দেশের মত তখন সে প্রথা অত ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করে নাই।

মৃতের দেহ পোড়ানই হইত, তবু দু'এক জায়গায় কবর দিবার ব্যবস্থারও উল্লেখ পাওয়া যায় (রঘু—৮।২৫, ও ১২।৩০)। সে সময় চোর, ডাকাত, গাঁটকাটাও যেমন ছিল, তেমনি এখনকার মত পুলিশের মারপিট, জুলুমও কম ছিল না। তবে মারপিট জুলুমটা সন্দেহ বা প্রমাণ পাইলেই তাঁহারা করিতেন। তখনকার দিনেও বাগানের গাছে বা ক্ষেতে জল দিবার জন্য অনেকেই বড় বড় খাল কাটাইয়া দিতেন (রঘু ১২।৩)

সময় ও দিক দেখিবার জন্য কোন কোন রাজারা 'দিগবলোকন' বা মান-মন্দির নিৰ্ম্মাণ করাইতেন, বড় বড় নদী পার হইবার জন্য হাতীর পিঠে তক্তা বাঁধিয়া 'পুল' তৈয়ার করিতেন (রঘু—৪।৩৮)।

দর্শন বা ধৰ্ম্মশাস্ত্র এখনও যেমন তখনও তেমন ছিল, সেই 'জন্মান্তরবাদ', 'কর্ম্মফল', 'মোক্ষ' (রঘু—১৩।৫৮) প্রভৃতি হিন্দু দর্শনের মূল তথ্য বা সত্যগুলি মহাকবির আবির্ভাবের শত শত বৎসর পূর্ব্বেও আমাদের দেশের ঋষিরা আবিষ্কার করিয়াছিলেন। তবে দেবপূজা বা পূজা-পদ্ধতির কিছু কিছু পরিবর্ত্তন হইয়াছে বটে। আমাদের দেশে এখন আর অগ্নিপূজা হয় না, তখন কিন্তু অগ্নিদেবের পূজা না হইলে চলিত না। ক্ষত্রিয় রাজাদের ও মুনি ঋষিদের এক একটি স্বতন্ত্র অগ্নিগৃহ থাকিত। সূর্য্যদেবের মন্দির ও সূর্য্যপূজার বৃত্তান্তও অনেক পাওয়া যায় (বিক্রম—১ম অঙ্ক)। বৈদিক যুগের অনেক দেবতারা যাঁহাদের আজকাল আর পূজা হইতে বড়-একটা দেখা যায় না, তাঁহারা মহাকবির সময়েও রীতিমত পূজা পাইতেন। দেবরাজ ইন্দ্রের মন্দির ছিল, সেখানে তাঁহার নিয়মিত ভাবে পূজা হইত (বিক্রম—৩য় অঙ্ক)। চন্দ্রদেব ও শচীদেবীর জায়গায় জায়গায় পূজার ব্যবস্থা ছিল। তবে গো-ব্রাহ্মণের সে সময়ে সম্মানের অন্ত ছিল না। অজ্ঞানকৃতকর্ম্মের জন্যও ব্রাহ্মণের অভিশাপ, ও গো-মাতার দীর্ঘশ্বাস যে জীবনে সদ্য সদ্য পরিবর্ত্তন আনিতে পারে কত তাহাও মহাকবি নিজের লেখায় দেখাইয়া দিয়াছেন। তবে ব্রাহ্মণেরা সে সময়ে ধর্ম্ম লইয়াই থাকিতেন, এবং তাঁহাদের মধ্যে অনেকেরই তপস্যালব্ধ শক্তি দেখা যাইত বলিয়াই লোকে তাঁহাদিগকে না মানিয়া থাকিতে পারিত না।

চৈতন্য-যুগের উড়িয়া বৈষ্ণবগণ

শ্রীপ্রভাত মুখোপাধ্যায়

উড়িষ্যার ধর্ম্ম-জীবনের ইতিহাস আলোচনা করিতে গেলে আমরা দেখিতে পাই, ধর্ম্মভাব জাতীয় ভাবকে চিরকালই অনুপ্রাণিত করিয়া গিয়াছে। চৈতন্য-যুগে আমরা ধর্ম্মভাবের পূর্ণ বিকাশ দেখিতে পাই। রাজাধিরাজ হইতে পথের ভিক্ষুক সেদিন একই উদ্দাম আনন্দে মাতিয়াছিল। বাংলা দেশের সভ্যতা ও সংস্কৃতির সহিত উড়িষ্যার সাহিত্য ও সংস্কৃতির অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। এ সম্বন্ধ চৈতন্য-যুগেই আরও সুদৃঢ় হইয়া উঠিয়াছিল।

প্রাচীন উড়িষ্যার গৌরবোজ্জ্বল দিনগুলির সম্বন্ধে অনেকেই ইতিহাস লিখিয়াছেন। কিন্তু ধর্ম্মজীবনের ইতিহাস জাতীয় জীবনের ইতিহাস নহে। এ-বিষয়ে আলোচনা করিতে হইলে উড়িয়া সাহিত্যিকদের মতামতও আলোচনা করা দরকার। কারণ বাঙালী ঐতিহাসিকগণের সহিত অনেক বিষয়েই তাঁহাদের মতদ্বৈধ রহিয়া গিয়াছে। সেগুলিকে উপেক্ষা করিয়া চৈতন্য-যুগের প্রাতঃস্মরণীয় উড়িয়া বৈষ্ণবগণের সম্বন্ধে লেখা যুক্তিযুক্ত হইবে না।

বৈষ্ণবধর্ম্ম শ্রীচৈতন্যের দ্বারা উড়িষ্যায় প্রবর্ত্তিত হয় নাই। নবম শতাব্দীর রণভঞ্জদেবের ধৃতিপুর তাম্রশাসন হইতে জানা যায়, তিনি বিষ্ণুর উপাসক ছিলেন (৺রাখালদাস বাবুর উড়িষ্যার ইতিহাস)। গঙ্গা-বংশীয় রাজারা বৈষ্ণব ছিলেন। জগন্নাথ দেবের বর্ত্তমান মন্দির তাঁহাদের রাজত্বকালে নির্ম্মিত হয়। চৈতন্য-পূর্ব্ব-যুগেও উড়িয়া ভক্ত কবিদের অভাব নাই।

উড়িয়া ভাষায় মার্কণ্ডদাসের 'কেশব কোইলি' ও সারলাদাসের মহাভারত, বিলঙ্কা রামায়ণ ইত্যাদি

সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন ধর্ম্ম-সাহিত্য। সারলাদাস কপিলেন্দ্র-দেবের সমসাময়িক। তাঁহার আসল নাম বিশ্বেশ্বরদাস। ইনি জগন্নাথকে বুদ্ধের রূপান্তর কহিয়াছেন। তারপর জয়দেব। গীতগোবিন্দের কবি যে উড়িয়া ছিলেন তাহা অনেক উড়িয়া লেখক প্রমাণ করিয়া ফেলিয়াছেন। এমন কি কেন্দুবিল্ব গ্রামও পুরী জিলায় আবিষ্কৃত হইয়াছে (এ বৎসরের উড়িয়া "সহকার" মাসিকপত্র দ্রষ্টব্য)।

মৈথিলী চন্দ্র-দত্ত কৃত 'ভক্তমালা' হইতে ইঁহারা প্রমাণ উদ্ধৃত করেন,—

"জগন্নাথ পুরী প্রান্তে দেশে চৈবোৎকলা বিধে
কিন্দুবিল্ব ইতি খ্যাতো গ্রামো ব্রাহ্মণ সঙ্কুলঃ
তত্রোৎকলে (১) দ্বিজো জাতো জয়দেব ইতি শ্রুতঃ।

উড়িয়া মাসিকপত্র 'সহকারে' আরও অনেক প্রমাণ উদ্ধৃত হইয়াছে। তবে জয়দেব নামে যে বাঙালী একজন কবি ছিলেন না, বা গীতগোবিন্দ তাঁহারই লেখা হইতে পারে না, এবিষয়ে অকাট্য প্রমাণ এখনও কেহ দেখাইতে পারেন নাই। গীতগোবিন্দের উড়িয়া অনুবাদক বৃন্দাবনদাস চৈতন্য-পূর্ব্ব যুগের লোক। গীতগোবিন্দের আরও অনেক উড়িয়া অনুবাদ আছে। বৃন্দাবনদাসের 'রসবারিধি'র পর পিণ্ডীক শ্রীচন্দনের অনুবাদ উল্লেখ-যোগ্য। তাঁহার অনুবাদ, শুনিয়াছি বাংলায়। মূল সাহিত্য পরিষদকে এ বইটির সন্ধান লইতে অনুরোধ করিতেছি। তাহা ছাড়া ধরণীধর, উদ্ধবদাস, কমলাকর, রাজা পুরুষোত্তম দেব (?) প্রভৃতি উড়িয়া কবিদেরও অনুবাদ আছে।

রাজা প্রতাপরুদ্র দেব রায় রামানন্দ প্রভৃতি শ্রীচৈতন্যের আগমনের পূর্ব্বেও প্রেমভক্তির জন্য বিখ্যাত ছিলেন। চৈতন্যচরিতামৃতে দেখি সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য মহাপ্রভুকে বলিতেছেন—রামানন্দের সহিত সাক্ষাৎ করিতে।

"পৃথিবীতে রসিক ভক্ত নাহি তাঁর সম
পাণ্ডিত্য আর ভক্তিরসের দুহেঁর তিহোঁ সীমা।"

জগন্নাথ, বলরাম, অচ্যুতানন্দ, যশোবন্ত ও অনন্ত এই পঞ্চসখার মধ্যে প্রথম দুইজন শ্রীচৈতন্যের আগমনের পূর্ব্বেও প্রেমভক্তির জন্য উৎকলে পূজিত ছিলেন। প্রতাপরুদ্র ভণিতায় 'বাঙ্গলাপ্রাচীন পুঁথির বিবরণে' (৩য় খণ্ড, ২য় সংখ্যা) রাধার উদ্দেশ্যে পদ্য আছে। "তোমার লাগিয়া রাধে তোমা আরাধিনু—মনের মানস ব্রত সকল সাধীনু" ইত্যাদি। পদ্যটি সত্যই রাজা প্রতাপরুদ্রের কি না তাহা বলিতে পারিব না।

উড়িষ্যার ধর্ম্মজীবনের ইতিহাসে শ্রীচৈতন্যের উড়িষ্যায় আগমন এক স্মরণীয় দিন। মহাপ্রভু প্রেমভক্তির মন্ত্রে এক শাশ্বত সুন্দর দ্বার উদ্ঘাটিত করিয়া দিলেন। যে বৈষ্ণবধর্ম্ম উড়িষ্যায় এতদিন বৌদ্ধধর্ম্মের সহিত অস্তিত্বের জন্য যুদ্ধ করিতেছিল, তাহার ভাবোচ্ছ্বাস সমস্ত দেশব্যাপী এক নূতন প্রেরণা ধ্বনিয়া তুলিল। রাজনৈতিক দিক দিয়া ইহার ফল সাংঘাতিক হইলেও উড়িষ্যার সমাজ-জীবনে সেদিন এক নূতন যুগের বিকাশ হইল। কিন্তু গোলযোগের সূত্রপাত হইয়াছে, সে যুগের আসল রূপটি লইয়া। উড়িষ্যায় পঞ্চসখা মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ ভক্তদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান পাইয়াছে।

মহাপুরুষ যশোবন্তের 'শিবস্বরোদয়' গ্রন্থে দেখি

"অনন্ত অচ্যুত আদি যশোবন্ত বলরাম জগন্নাথ
এ পঞ্চ সখাহি নৃত্য করি গলে গৌরাঙ্গ চন্দ্র সঙ্গত" (১)

বাংলা দেশে রামানন্দ রায়ের নাম যেমন সুপরিচিত, এ পাঁচজনের নাম সেরূপ নহে। চৈতন্যচরিতামৃতে একবার মাত্র বোধ হয় 'মহাসোয়ার' বলিয়া জগন্নাথ-দাসের নামের উল্লেখ আছে।

দেবকীনন্দনদাসের বৈষ্ণব-বন্দনায় দেখিতে পাই, "বন্দ্যো উড়িয়া বলরাম দাস মহাশয়—জগন্নাথ বলরাম যার বশ হয়। জগন্নাথদাস বন্দ সঙ্গীত পণ্ডিত—যার নাম রসে জগন্নাথ বিমোহিত।" শুধু এই দুই সখার নাম 'বৈষ্ণব দিগ্দর্শনে'ও দেখিতে পাওয়া যায়। "উৎকলে জন্মিলা উড়্যা বলরাম দাস—জগন্নাথ দাস আর তথাই প্রকাশ।" মাধবাচার্য্যের বৈষ্ণব-বন্দনাতেও বোধ হয় উড়িয়া বলরাম দাসকে উল্লেখ করা হইয়াছে।

"সঙ্গীত সুখের রসে বন্দো বলরামদাসে জার নৃত্য নিত্যানন্দ-ধ্যান।" বাকী তিন সখার নাম কোন গ্রন্থেই

(১) পাঠান্তর:—আন্তে দ্বিজো

(১) সঙ্গে

নাই। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উড়িয়া ভাষার অধ্যাপক পণ্ডিত বিনায়ক মিশ্র তাঁহার উড়িয়া সাহিত্যের ইতিহাসে বৈষ্ণবদের শালগ্রামপূজক শ্যামানন্দপন্থী শ্রীসম্প্রদায় ও গৌতম পণ্ডিতের সম্প্রদায় এই চার সম্প্রদায়ভুক্ত বলেন। অধিকাংশ উড়িয়া সাহিত্যিক তাঁহার সে মত মানেন না। তাঁহারা মোটামুটি দুই শ্রেণীতে উড়িয়া বৈষ্ণবদের ফেলিয়াছেন—জ্ঞান-মিশ্র ও শুদ্ধ-ভক্ত। গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত "জৈব-ধর্ম্মে" এ সম্বন্ধে লেখে—

"হে পরমেশ তুমিই ব্রহ্ম। আমি মায়াগর্ত্তে পড়িয়াছি, তুমি আমাকে উঠাইয়া লইয়া তোমার সহিত অভেদ কর" এই প্রকার উচ্ছ্বাস সকল জ্ঞানবিদ্ধ ভক্ত্যাভ্যাস। ইহাকে মহাত্মগণ "জ্ঞানমিশ্র" ভক্তি বলিয়াছেন, ইহাও আরোপসিদ্ধা। এসমস্ত শুদ্ধভক্তি হইতে পৃথক। 'শ্রদ্ধাবান ভজতে যো মাম্' এই শ্রীমুখ বাক্যে যে ভক্তির উদ্দেশ আছে তাহা শুদ্ধভক্তি। সেই শুদ্ধভক্তিই আমাদের সাধন ও সিদ্ধাবস্থায় তাহা প্রেম।"

উড়িষ্যার সাহিত্য তথা ধর্ম্ম-জীবনের ইতিহাস আলোচনা করিতে গেলে অধ্যাপক আর্ত্তবল্লভ মহান্তী মহাশয়ের সম্পাদিত "প্রাচী" গ্রন্থমালা পড়া দরকার। উড়িয়া সাহিত্যে তাঁহার একনিষ্ঠ সেবার অর্ঘ্য এই গ্রন্থমালা। তবে, মতামতের দ্বৈধ চিরকালই সাহিত্যক্ষেত্রে দেখা যায়। তাঁহার অনেক মতও আমরা গ্রহণ করিতে পারি নাই। আমাদের প্রথম আপত্তি চৈতন্যদাসের সময়-নিরূপণ লইয়া। চৈতন্যদাসও পঞ্চসখার তুল্য প্রসিদ্ধ ভক্ত-কবি। বুদ্ধেশ্বরের ঔরসে কটক জিলার বড়মূল গ্রামে তাঁর জন্ম হয়। ইনি প্রতাপরুদ্রের সমসাময়িক। শ্রদ্ধাস্পদ নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় লিখিয়াছেন,"He was not their [পঞ্চসখার] contemporary but flourished shortly afterwards।" শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক মহাশয় তাহা স্বীকার করেন নাই। কিন্তু বসু মহাশয়ের মতও তিনি খণ্ডন করিতে যান নাই। চৈতন্যদাস নাম শুনিলেও 'শ্রীচৈতন্যের ভক্ত—এরূপ সন্দেহ হয়। তবে এ বিষয়ে তিনি বলেন, তাঁহার চৈতন্যদাস নাম গুরু দিগম্বর সন্ন্যাসী ধ্যানদাসের প্রদত্ত।

আর একজন কবিকেও চৈতন্য-যুগের বলিয়া ধরা যাইতে পারে কি না ইহা লইয়া গোল আছে। 'রহস্য মঞ্জরী'র কবি দেবদুর্লভ দাসকে তিনি অচ্যুতানন্দের পূর্ব্ববর্ত্তী, বড়-জোর সমসাময়িক, ধরিয়া লইতে হইবে, লিখিয়াছেন (রহস্যমঞ্জরীর ভূমিকা দ্রষ্টব্য)। কিন্তু সমসাময়িক হইলে তিনি মহাপ্রভুর নাম করিতেন। তিনি রাধার উপাসক ও তাঁহার বইয়ে বৌদ্ধ শূন্যবাদের গন্ধ নাই। তাহা ছাড়া তাঁহার বই পড়িয়া জানা যায়, সে সময় ভয়ানক যুদ্ধবিগ্রহ চলিতেছিল। এই সব প্রমাণে আমাদের মনে হয় তিনি মুসলমান আক্রমণের সময়ে এই বই লেখেন। প্রতাপ রায়ের শশীসেনার ভূমিকায় শ্রদ্ধাস্পদ অধ্যাপক মহাশয়ও প্রকারান্তরে সে কথা স্বীকার করিয়াছেন। পঞ্চসখার 'ধর্ম্মমত' লইয়াও যথেষ্ট মতদ্বৈধ রহিয়াছে। তাঁহার ও অধিকাংশ উড়িয়া সাহিত্যিকের মতে "অচ্যুতানন্দ যে প্রকৃত বৈষ্ণব থিলে সেথিরে অনুমাত্র সন্দেহ নাহি।" (নিরাকার সংহিতার ভূমিকা)। বসু মহাশয়ের "কলিযুগে বৌদ্ধ রূপে নিজ রূপ গোপ্য"র তর্জমা, "It is desirable in Kali yuga that followers of Buddha should be disguised" তিনি "অযথার্থ" বলিয়াছেন। কিন্তু "সিদ্ধান্ত উড়ুম্বরে" (শূন্যপুরাণে উদ্ধৃত) "বাউরির বেদপাঠ" প্রতাপরুদ্রের ভয়ে গোপন রাখা, "ধর্ম্ম-পূজার, দেহারা ভঙ্গের গীত", "সত্যপীরের পূজা", প্রভৃতি পড়িলে সেকালে ধর্ম্মমত এরূপ গোপন করা, অবিশ্বাস্য বলা যায় না।

পঞ্চসখা, বিশেষতঃ বলরাম ও অচ্যুতানন্দ, বুদ্ধকে অবতার বলিয়া স্বীকার করিতেন তাহাতে সন্দেহ থাকিতে পারেন না। তাঁহারা যে শূন্যবাদও মানিতেন, বসু মহাশয় তাঁর Modern Buddhism and Its Followers in Orissa গ্রন্থে তাহা প্রমাণ করিয়াছেন। তাঁহারা বৌদ্ধ নন, এ প্রমাণ দেখাইতে গিয়া অনেকে বলেন "অচ্যুতানন্দাদি পঞ্চসখা মানে সাকার ও নিরাকার উপাসক থিলে।" তাঁহার রচিত 'অনাকার সংহিতা'য় অচ্যুতানন্দ বলিতেছেন, "অনাকার ব্রহ্ম আকাররে মিশি অবাত মধ্যারে রহি।" বৌদ্ধধর্ম্মের এক ক্রম-বিকশিত শাখা "ধর্ম্ম-পূজা" পদ্ধতিতেও ঠিক সেই ভাব নিহিত। শূন্যপুরাণে দেখি "পূজি শ্রী নিরাকার; শূন্য মূর্ত্তি ধ্যান করি সাকার মূর্ত্তি ভজি।"

ধর্ম্মপূজায় কল্পিত শূন্যবাদের সঙ্গে চৈতন্যদাস প্রভৃতির শূন্যবাদের বিশেষ তফাৎ নাই। তিনি লিখিতেছেন, "শূন্য সঙ্গতে যে শূন্য শূন্যরূপী—শূন্য সঙ্গতে মিশি অছি সকল স্থান ব্যাপী। শূন্য হিঁটি (১) তাহার অটহি (২) নিজ ঘর—শূন্য রে থাই সে শূন্য করই বিহার।'

তবে কথা উঠিতে পারে পঞ্চসখা ও চৈতন্যদাস যাঁহারা উড়িষ্যায় মহাপুরুষ রূপে কীর্ত্তিত, তাঁহারা সত্যই কি প্রতাপরুদ্র বা ব্রাহ্মণদের চক্ষে ধূলা দিতেই বৈষ্ণব সাজিতেন। এক উড়িয়া সাহিত্যিকের ভাষায় "তেবেকণ এহি পঞ্চসখা যাক ধর্ম্মশঠ থিলে? সেমানঙ্কর নৈতিক বল কণ এতে উণা (৩) থিলা?" * * "অচ্যুতানন্দ কণ (৪) মিথ্যাবাদী ধর্ম্মধ্বজী থিলে?" শেষটায় তিনি স্থির করিয়া ফেলিলেন, "পঞ্চসখা যাক সহজিয়া বৈষ্ণব নথিলে। বঙ্গলারু এহি (৫) ঢুয়াটিয়ে আসি ওড়িশাবে সবু ধর্ম্মরে বাজিবাকু বসি অছি।"

প্রমাণ অভাবে এরূপ সিদ্ধান্ত মানিয়া না লইলেও আমাদেরও মনে হয় তাঁহারা বৌদ্ধ-সাধনা তন্ত্রমন্ত্রাদি হিন্দুধর্ম্মের অংশ বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছিলেন। অনেক বৌদ্ধ-পূজাপদ্ধতি আজকালকার দিনেও হিন্দু পূজা-পদ্ধতিতে দেখিতে পাওয়া যায়। অচ্যুতানন্দ ও যশোবন্ত তাঁহাদের ব্রহ্মসংহিতায় ও মালিকায় "প্রভু বুদ্ধনারায়ণ" বলিয়াছেন। অচ্যুত এ-ও বলেন, "তন্ত্রমন্ত্র যে জানে, সেই-ই বৈষ্ণব।" পঞ্চসখার সংক্ষিপ্ত জীবনী, অনেকে জানেন না বলিয়া দিতেছি। যশোবন্তের কটক জেলার অড়ঙ্গ গ্রামে বাস ছিল। পিতা জগুমল্লিক ক্ষত্রিয় ছিলেন ও কুজঙ্গ রাজার অধীনে সিপাহী ছিলেন। ইনি 'শিব স্বরোদয়,' 'গোবিন্দচন্দ্র গীত,' 'প্রেমভক্তি-গীতা,' 'হেতু উদয় ভাগবত' প্রভৃতি বই লিখিয়াছিলেন। পণ্ডিত বিনায়ক মিশ্র ইঁহাকে সহজিয়া বৈষ্ণব বলিয়াছেন। সে মত গ্রহণযোগ্য নহে। শিশু অনন্তের নিবাস বালিপাটনায়। তিনি অচ্যুতানন্দের সমবয়সী। মহাপ্রভুর উড়িষ্যা আসার পর না-কি তাঁহার জন্ম হয়। তিনি অন্য চার জনের মত বিখ্যাত নন। তাঁহার লেখা কতক-গুলি ভজন এখনও প্রচলিত।

মহাপুরুষ বলরাম দাস আসলে মহাপাত্র ছিলেন। তাঁহার পিতা গোপীনাথ রাজমন্ত্রী ছিলেন। পণ্ডিত মহাশয় ইঁহাকেও সহজিয়া বলেন। তাঁহার মতে তিনি না কি 'চৈতন্যের প্রেমভক্তির মর্ম্ম বোঝেননি (!)' তিনি মহাপ্রভুর আদেশে জগন্নাথদাসকে দীক্ষা দেন। 'সমগ্রা পাটে' (পুরী?) তিনি সমাহিত হন। তাঁহার রচিত বই 'গুপ্তগীতা,' 'তুলাভিণা', 'কান্ত কোইলি,' মৃগুণি স্তুতি,' 'অর্জ্জুন গীতা,' 'কমললোচন চৌতিশা' প্রভৃতি। 'ব্রহ্মাণ্ড ভূগোল' যে তাঁহার রচনা এ-কথা অধ্যাপক আর্ত্ত-বল্লভ মহান্তী মহাশয় বিশ্বাস করেন না। তিনি স্বয়ং মহাপ্রভুর দ্বারা দীক্ষিত হইয়াছিলেন। বসু মহাশয়ের মতে তিনি প্রতাপরুদ্র কর্ত্তৃক প্রথমে সম্মানিত হইলেও শেষ জীবনে নিগৃহীত হইয়াছিলেন। প্রতাপরুদ্রের মারা যাইবার বাইশ বৎসর পরে বৌদ্ধ মতাবলম্বী রাজা মুকুন্দদেবের রাজত্বকালে তিনি পুনরায় সম্মানিত হন। কিন্তু 'প্রণবগীতা'র অনেক স্থানেই ঐতিহাসিক সত্যতা সম্বন্ধে সন্দিহান হইতে হয়। মহাপুরুষ জগন্নাথদাসের রচিত বইয়ের নামও 'তুলাভিণা'। তবে উড়িয়া ভাগবত লিখিয়াই তিনি যশস্বী হইয়াছেন।

জগন্নাথদাস পুরী জেলার কপিলেশ্বর পুরে ভগবান পুরাণপাণ্ডার ঔরসে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সংস্কৃত জানিতেন ও তাঁহার অমর গ্রন্থ 'ভাগবত' মূল হইতে অনুবাদ। অধ্যাপক বিজয়চন্দ্র মজুমদার তাঁহার Typical Selections from Oriya Literature পুস্তকের ভূমিকায় লিখিতেছেন—

No poet of old times enjoys so much popularity as Jagannath does. There is not a single Hindu village in Orissa, where at least a portion of Jagannath's Bhagavat is not kept and daily recited.

পুরীতে তাঁহার মঠ আছে ও তিনি বোধ হয় সেইখানেই দেহত্যাগ করেন। তাঁহার ভাগবত-পাঠে সন্তুষ্ট হইয়া প্রভু তাঁহাকে "অতিবড়" উপাধি দেন। মহাপুরুষ অচ্যুতানন্দের নিবাস ত্রিপুর বানেমাল (?) গ্রামে

(১) শূন্যটিই (২) হয় (৩) কম (৪) কি (৫) ঢেউটা

ছিল। তাঁর পিতার নাম দীনবন্ধু খুঁটিয়া। তিনি শূন্যসংহিতায় এই বলিয়া পরিচয় দিতেছেন যে, তিনি পূর্ব্বজন্মে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সুন্দরানন্দ ছিলেন। সুন্দরানন্দ প্রভুর সঙ্গে পুরীতে আসেন ও সেখানেই মারা যান। সত্যযুগে তিনি কৃপাঞ্জল, ত্রেতায় কলি, দ্বাপরে সুদাম ও কলিতে নবদ্বীপে সুন্দরানন্দ ছিলেন। তারপর অচ্যুতানন্দ হইলেন। সনাতন গোস্বামী প্রভুর আদেশে অচ্যুতানন্দের সাত বৎসর বয়সের সময় তাঁহার নামকরণ করেন। তারপর দশবর্ষ দশমাস পর্য্যন্ত স্বগ্রামে থাকিয়া প্রাচী নদীর কূলে 'নাগান্তী', 'বেদান্তী', 'যোগান্তী' বিদ্যা, অলেখ, অনাদি, অনাকার বিষয়ক ধর্ম্মতত্ত্ব তিনি যোগীদের কাছে শিক্ষা করেন।

তারপর এক গভীর বনে তাঁহাকে এক রাত্রে

"প্রসন্ন হোইল পরমব্রহ্ম যে অনাক্ষর মন্ত্র দেলে"—"উপদেশ দেই ব্রহ্মাণ্ড ঠাকুর অন্তর্ধান হোই গলে।" (শূন্যসংহিতা)।

বসু মহাশয় ইঁহাকে Lord Buddha বলিয়াছেন। অধ্যাপক মহান্তি মহাশয়ের রচনায় "কেতকঙ্ক (১) মত রে সে স্বয়ং জগন্নাথ, আউ কেতেক আঙ্ক, চৈতন্য চন্দ্র বোলিকহন্তি। চৈতন্য চন্দ্রঙ্ক ঠারু অনাক্ষর মন্ত্র অচ্যুতানন্দ প্রাপ্ত হোইথিলে, এহা 'গুরু ভক্তি-গীতা'র লিখিত অছি।" কিন্তু মন্ত্র-দাতা লইয়া মতদ্বৈধ দেখি। "অনাকার সংহিতা"য় "আবাণে অপণে অব্যকত ব্রহ্ম শ্রীগুরুর রূপেন আসি" "অন অক্ষর" মন্ত্র দিয়াছিলেন; আবার এও দেখি "প্রথমে অনঅক্ষর কহি দেবা শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমুখ বাণী"। নানা কারণে মনে হয়, প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয়ের মত

"Yet in heart of their hearts, they were but sincere and staunch pioneers and champions of the long neglected and almost forgotten religion of the Mahayana School.

সবটা ঠিক নহে। আমাদের মনে হয় পাল-বংশীয়দের রাজত্বকালে উড়িষ্যা যখন বাংলা রাজ-শক্তির অধীন ছিল তখন রামাই পণ্ডিতের "দিকে দিকে গমন করিয়া সসাগরা পৃথিবী মধ্যে ধর্ম্মের স্থাপন ও তাঁহার পুত্র ধর্ম্মদাসের কলিঙ্গ-রাজ রণজিৎকে দীক্ষিত করিবার ফলে ধর্ম্মপূজা উৎকলেও ছড়াইয়া পড়ে।" "বলরামদাসের সৃষ্টিতত্ত্ব, রামাই পণ্ডিতের সৃষ্টিতত্ত্বের হুবহু অনুরূপ। জগন্নাথ বুদ্ধ হইয়া যাওয়ায় উড়িষ্যায় সমস্ত ধর্ম্মবাদ খিচুড়ীতে পরিণত হইল। উড়িষ্যার সে কালের ধর্ম্মসাহিত্যে বৌদ্ধদের নিন্দা একেবারে নাই বলিলেও হয়। পঞ্চসখা, চৈতন্যদাস বৈষ্ণব চূড়ামণি রূপেই উড়িষ্যায় পূজিত। বৌদ্ধমত তাঁহারা হিন্দুমত বলিয়াই ভাবিতেন, সে কথা আগেই বলিয়াছি। তাহার প্রমাণস্বরূপ একটি বিষয়ের উল্লেখ করিলেই যথেষ্ট হইবে। চৈতন্যদাসের মতে জগন্নাথ—"শখিলা কাঠ দারুব্রহ্ম তহুঁ অছন্তি পরংব্রহ্ম।" সারলাদাস বলেন "সংসার জনঙ্কু তারিবা নিমন্তে—বৌদ্ধরূপে নিজে অছি জগন্নাথ।" ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণের কৃষ্ণজন্ম অধ্যায়ে দেখি, "মথুরারু আসি সে 'ব্রহ্মমণি' বউদ্ধ রূপে কলিরে প্রকাশি"। গুরুভক্তি গীতায় কৃষ্ণ চৈতন্য হইলেন ও সত্যভামা বিষ্ণুপ্রিয়া হইলেন। শূন্যসংহিতায় 'শূন্যবর বোলি থিলা বোলন্তি কৃষ্ণঙ্ক', অথচ বলরামদাসের বিরাট গীতায় 'মহাশূন্যরূ শূন্যহেলা শূন্য পুরুষ শূন্যদেহী··· শূন্যরে ব্রহ্ম সিনা থাই।"

অচ্যুতানন্দের 'কল্পসংহিতায়' অনাদি ব্রহ্ম তাঁহার পুত্র নিরাকারকে (অন্য এক বইতে আদিকে) রাধার অবতার ভীম ভোইর জন্মবৃত্তান্ত বলিতেছেন। অচ্যুতানন্দ 'শূন্যসংহিতা'য় বলিতেছেন "বুদ্ধমাতা আদি শক্তি সজ্যচ্ছন্তি কহি"—অথচ নিরাকার সংহিতায় "পামর অচ্যুত শ্রীকৃষ্ণ ভৃত্য শ্রীহরি করুণা যেণু।" এ-সব কারণে জোর দিয়া বলা উচিত নয় যে, তাঁহারা প্রকৃত পক্ষে বৌদ্ধ ঠকাইবার জন্য ও শুধু ব্রাহ্মণদের বৈষ্ণব সাজিতেন। অচ্যুতানন্দ কৃষ্ণ-লীলা অনেক বইতে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি মহামায়া ও মহাদুর্গার বন্দনা করিয়াছেন। জগন্নাথদাসের অমর "ভাগবত" একজন বৌদ্ধের লেখা কিম্বা প্রেরণাপ্রসূত, তাহা বলা বড় শক্ত। তাঁহারা আত্মায় বিশ্বাস করিতেন। "জীব আত্মা বাধা বলি পরম (আত্মা) মুরারি"—চৈতন্যদাস ও অচ্যুতানন্দ আলেখ পুরুষের স্তুতি করিয়াছেন।

চৈতন্যদাসের মতে অলেখের রূপ নিরাকার এবং

(১) কাহারও?

তিনি ধর্ম্মকে সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনি নির্গুণ সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বব্যাপী। অচ্যুতানন্দও বলেন 'হিন্দু ভজে অলেখ, তুর্কী ভজে অলেফ" (উড়িয়া সাহিত্যের ইতিহাস দ্রষ্টব্য)। এই অলেখ স্বামী মহিমাগুরু বা বুদ্ধস্বামী রূপে উনবিংশ শতাব্দীতে ভীম ভোই প্রভৃতিকে দীক্ষা দিয়াছিলেন। নব প্রকাশিত 'মহিমা ধর্ম্ম-প্রতিপাদন' নামের বিরাট গ্রন্থে দেখি মহিমা গোঁসাই "মগধ দেশরে হেমসদনর ঔরসরে বিষ্ণুর অংশরে বুদ্ধ সাক্ষাৎ স্বয়ং প্রভু রাজচক্রবর্ত্তী রূপে উদ্ভব" হইয়াছিলেন। গোঁসাইর বুদ্ধ রূপ ধরিয়া আবির্ভাবের কথা যশোবন্ত তাঁহার 'মালিকা'য় ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া গিয়াছেন। তাঁরা যে অলেখ-ভক্ত তা ত দেখা গেল। এদিকে অচ্যুতানন্দ ইহাও বলেন, "যন্ত্রং মন্ত্রং তন্ত্রং চৈব ছায়া জ্যোতির্ বাডকং হঞ্জ সমাধি রসগুণং চ যো জানাতি স বৈষ্ণবঃ" অচ্যুতানন্দ অনেক অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন ছিলেন, অনেক উড়িয়া সাহিত্যিক লিখিয়াছেন। তিনি নাকি ইচ্ছাবিহারীও ছিলেন ও তিনি নাকি মহিমাধর্ম্ম-প্রচারক ভীম ভোইর "কুন্তী বাকল পরা", "জন্মরু অন্ধতানয়ন", "বাল্য কালুর সোহি বড় দুখী" "তু রাধা জন্মিবু সে মহী,—নাম তোহর ভীম ভোই' প্রভৃতি ভবিষ্যদ্ বাণী করিয়া গিয়াছিলেন। দুঃখের বিষয়, এসব অলৌকিক শক্তির কাহিনী ইতিহাসের দিক দিয়া দেখিতে গেলে বিশ্বাস করা কঠিন হইয়া দাঁড়ায়। তাছাড়া ভীম ভোই জন্মান্ধ ছিলেন, তাহাতে সন্দেহ আছে।

ভীম ভোইর 'ব্রহ্মনিরূপণ গীতা'র ভূমিকায় স্যর বীর-মিত্রোদয় সিংহ মহোদয় লিখিত ভীম ভোইর জীবনী উদ্ধৃত হইয়াছে। সোনপুরের মহারাজার মত সবচেয়ে প্রামাণ্য ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। তিনি লিখিতেছেন, "ভীমভোইঙ্কর পরবর্ত্তী কেতেক শিষ্যমানে তাঁহাঙ্কু জন্মান্ধ বোলি লেখি অছন্তি। পরন্তু মহাত্মা ভীমভোই জন্মান্ধ বোলি বিশ্বাস হেউ নাহিঁ। কারণ ভীমভোই গ্রামীয় গোচারণ কার্য্য করিবাদ্বারা তাহাঙ্ক অধিক বাল্যজীবন যাপন করি অছন্তি···অনেক সময় পর্য্যন্ত তাহাঙ্কর আঁখিকু দিশুথিলা।" শ্রদ্ধেয় মজুমদার ও বসু মহাশয়রাও তাঁহাকে জন্মান্ধ লিখিয়াছেন। তাঁহাদের লেখাতে ঢেঙ্কানাল, রেড়াখোল প্রভৃতি রাজ্যে ভীমের জন্ম হওয়ার কথা লিখিত আছে। কিন্তু আসলে তাঁহার জন্ম হয় সোনপুর রাজ্যে।

উড়িষ্যায় প্রচলিত শূন্যবাদের কল্পনা উদ্ধৃত করিয়া পঞ্চসখার কাহিনী শেষ করিব। 'স্তুতিচিন্তামণি'র (ভীম ভোই রচিত) ভূমিকায় দেখি "বর্ত্তমান শূন্যবাদের সত্তা অছি, তাহা মহাকাশ কহিলে ভ্রম হেব নাহিঁ। সেই শূণ্যবু পিণ্ডব্রহ্মাণ্ডর মূর্দ্ধাদেহস্থ স্থান, বিশেষ রূপে উৎকলর কবি অচ্যুতানন্দ বলরামাদি গ্রহণ করি অছন্তি।" শূন্যস্থানের অধিবাসী নিরাকার ব্রহ্ম। ষটচক্র প্রভৃতি যোগ-সাধনাদ্বারা 'পিণ্ড মধ্যে ব্রহ্মাণ্ডের দর্শন' ও অনুভূতি করিতে হয়। কেহ কেহ বলেন, ব্রহ্মাণ্ড মানে রাধাকৃষ্ণের লালা। এ বিষয়ে যশোবন্তের "প্রেম-ভক্তি চন্দ্রগীতা" সকলকে পড়িয়া দেখিতে অনুরোধ করিতেছি।

মোটামুটি আমরা ধরিয়া লইতে পারি, জ্ঞানমিশ্র ভক্তরা সকলেই "চৈতনঙ্কর প্রেম সাধনরে তন্ত্র মন্ত্র যোগ মিশ্রিত করিথিলে।" ভালমন্দ বিচারের দিকে মোটেই না গিয়া বলা যাইতে পারে 'শুদ্ধভক্তি' ও 'জ্ঞানমিশ্র'-ভক্তদের মধ্যে ক্রমেই শ্রেণীগত পার্থক্য শেষটা দ্বেষে দাঁড়াইয়াছিল। কতকগুলা কারণও দেওয়া যাইতে পারে। দিবাকরদাস চৈতন্যদেবের তিরোধানের বহু পরে "জগন্নাথ চরিতামৃত" লেখেন। (৪) তার অধ্যায়ে তিনি লিখিতেছেন, নিত্যানন্দ আদি গৌড়ীয় ভক্ত সকলে প্রেমতত্ত্ব জানিতেন না! তাহা ছাড়া চৈতন্যদেব পুরী হইতে নড়িতে চান না, পুরীধামকে শ্রেষ্ঠ তীর্থ ভাবিতেন—এ-সব কারণে গৌড়ীয় বৈষ্ণবেরা ক্রমেই ক্ষুব্ধ হইতে লাগিলেন। "এভাবে গলা কেতে দিন পুরুষোত্তমে শ্রীচৈতন্য॥ অতিবড় বোলি বোলন্তে—(গৌড়ীয়) বৈষ্ণবে দুঃখ কলেচিতে॥ ওড়িয়া ব্রাহ্মণ অণাই—বোইলে অতিবড় এহি আজি পর্য্যন্ত সেবা কলু—সমস্তে সান পদে গলু (পদমর্য্যাদা ছোট হইয়া গেল) এহাঙ্কসঙ্গে যেবে থিবা এহি কথা সিনা শুণিবা।"

(৪) তিনি শিষ্য-প্রশিষ্যক্রমে জগন্নাথদাসের ষষ্ঠ অধস্তন পুরুষ বলিয়া কথিত।

মহাপ্রভু অতিবড় উপাধি প্রত্যাহার করিলেন না। তাঁহারা তখন রাগিয়া বলিলেন.

"পুরুষোত্তম ত'ন থিবা।
কেউ আশ্রে ভক্তি করিবা।
পূর্ব্বে গোবিন্দ লীলা স্থান।
চালথিবা শ্রীবৃন্দাবন।
প্রতি সম্বৎসরে আসস্তি
গুণ্ডিচা (১) গহণে খটস্তি
অতিবড পদে রুষস্তি (২)
লেউটি বৃন্দাবনে যাস্তি। (৩)

শুধু কি তাই! সেখানে লক্ষ গ্রন্থ জোর গলায় বলিয়া বেড়াইতে লাগিলেন, বৃন্দাবন পুরুষোত্তম অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। (বৃন্দাবনের মাধুর্য্য, লীলা)। কিরূপ নীচমন দেখুন! শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক মহান্তি মহাশয়ের মতে "দিবাকর দাস জগন্নাথ চরিতামৃতরে যাহা লেখি অছন্তি তাহা সম্পূর্ণ সত্য এথিরে অনুমাত্র সন্দেহর অবকাশ নাহি।"

দুঃখের বিষয় আমাদের কিন্তু কিছু সন্দেহ আছে। দিবাকরদাসের এই মনোমালিনা-বিষয়ের কাহিনী অন্য কোন গ্রন্থে সমর্থিত হইয়াছে কিনা তাহা তিনি উদ্ধৃত করিয়া দেখান নাই।

যে রূপগোস্বামী রামানন্দের সম্মুখে বলিতেছেন, "রূপ কহে কাঁহা তুমি সূর্য্য সম ভাস—মুঞি কোন ক্ষুদ্র যেন খদ্যোত প্রকাশ।" তিনি উড়িষ্যার শ্রেষ্ঠ ভক্তকবিকে (উপেন্দ্র ভঞ্জকে ছাড়িয়া দিলে) "অতিবড়" উপাধি দেওয়ায় বৃন্দাবনে গিয়া জোর করিয়া বৃন্দাবনকে বড় বলিতে লাগিলেন,—বিশ্বাস করা শক্ত। তাহা ছাড়া প্রাচীন উড়িয়া কবি-মাত্রেই পুরীকে বড় বলিয়া তাঁহাদের গ্রন্থে লেখেন নাই, দেবদুর্ল্ভ দাস "রহস্য মঞ্জরী"তে ও ভক্তচরণ দাস "মথুরামঙ্গল" গ্রন্থে মথুরা, গোকুল, প্রভৃতির মহিমা কীর্ত্তন করিয়াছেন।

তবে দিবাকরদাসের রচনা হইতে জানিতে পারা যায়, গৌড়ীয় ও উৎকলীয় বৈষ্ণবদের মধ্যে নানা কারণে মতদ্বৈধের সৃষ্টি হইয়াছিল।

(১) রাগ করেন (২) ফিরিয়া (৩) যাত্রা

এবার উড়িয়া শুদ্ধ ভক্তদের সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক। ইঁহাদের বিষয় গৌড়ীয় বইগুলিতে প্রচুর উল্লেখ আছে।

ইঁহাদের অনেকে বাংলায় পদ্য বা গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন কিন্তু বাংলা বইগুলি হইতে ইঁহাদের নাম বাছিয়া লওয়াই বিপদ। বলরামদাস নামের আগে উড়িয়া আখ্যা না থাকিলে তাঁহাকে উড়িয়া বলিয়া স্থির করা দায়। "বয়োজন" প্রণেতা জগন্নাথ দাস বাংলায় বইটি লিখিয়াছেন। তিনি "ভাগবতকার" নন্। সদানন্দ দাস (যিনি মহাপ্রভুকে হরিনাম মূর্ত্তি আখ্যা দিয়াছেন) ও সদানন্দ দাস কবিসূর্য্যব্রহ্ম একই লোক নন্। নির্গুণ মাহাত্ম্যের চৈতন্য-দাস শালেবেগ বা কবিকর্ণপুরের বড় ভাই নন্। বৃন্দাবন দাসও ত খুব কম দুজন দেখিতে পাই। "পদকল্পতরু"তে উড়িয়া কবিদের রচনা কতগুলি সে সম্বন্ধে কেহ জানাইলে উপকৃত হইব। "শালেবেগে"র পদাটির সম্বন্ধে না হয় নিশ্চিন্ত হওয়া যাইতে পারে কিন্তু মাধবী দাসীর পদ্য বাছিয়া লওয়া তত সহজ নয়। কারণ "ব্রজের মধুর ভাব করয়ে ভজন—মাধব আচার্য্য শ্রীমাধবী সখী হন।" (প্রেমবিলাস)। তবে "নীলাচল হইতে শচীরে দেখিতে। আইসে জগদানন্দ" পদ্যটি মাধবী দাসীর রচনা বলিয়া সুপ্রসিদ্ধ। পদকল্পতরুতে ১৭৮৬ সংখ্যক পদ্যটিতে বোধ হয় তাঁহারই সন্ন্যাস গ্রহণের কথা বর্ণিত; "ইহ মাধবী··· বসন তনু সুখ ছোড় অবধরল কৌপিন ডোর।" চৈতন্যকে দেখিতে পুরী যাত্রী নিত্যানন্দ "কলহ করিয়া ছলা আগে পহু চলি গলা ভেটিবারে নীলাচল রায়।···নিতাই বিরহ অনলে ভেল ধন্দ" পদ্যটিও তাঁরই মনে হয়। "মাধবী" (১) ভণিতাযুক্ত "রসপুষ্টি মনোশিক্ষা" নামক বই পাওয়া গিয়াছে। শ্যামানন্দ "দীনকৃষ্ণ দাস" ভণিতায় অনেক বাংলা পদ্য লিখিয়াছেন। উড়িয়া ভাষায় "দীনকৃষ্ণদাস" ও "রসকল্লোলে"র কবি রূপে বিখ্যাত। সুতরাং লোক সনাক্ত শুধু নাম দেখিয়াই করা এরূপ ক্ষেত্রে অসম্ভব। রায় রামানন্দ ভবানন্দ পট্টনায়কের পুত্র। তিনি বিদ্যানগরের শাসনকর্ত্তা ছিলেন।

(১) বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১ম সংখ্যা, ১৩৩৪।

মহাপ্রভুর কথায়—"রামানন্দ রায় কৃষ্ণরসের নিধান—তিহোঁ জন্মাইল কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান তাঁতে প্রেম ভক্তি পুরুষার্থ শিরোমণি রাগমার্গে প্রেমভক্তি সর্ব্বাধিক জানি দাস্য সখ্য বাৎসল্য মধুর ভাব আর দাস সখা গুরুকান্তা আশ্রয় যাঁহার।" এক পূর্ব্বলীলায় তিনি অর্জ্জুন ছিলেন; আর এক পূর্ব্বলীলায় "বিশাখা সখী" ছিলেন। অকিঞ্চন দাস, বাংলায় রামানন্দের "জগন্নাথ বল্লভ" নাটক অনুবাদ করেন। অনেকের মতে এ নাটক মহাপ্রভুর উড়িষ্যা আগমনের পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছিল। একজন উড়িয়া সাহিত্যিক (শ্রীজগবন্ধু সিংহ) লিখিয়াছেন, "বিজ্ঞান খন্ড শ্লোক" "গৌরপদ তরঙ্গিণী" প্রভৃতি তাঁহার আরও অনেক গ্রন্থ আছে। মাধবীদাসীর কথা আমরা আগেই উল্লেখ করিয়াছি। রাজা ইন্দ্রভূতির কন্যা "অদ্বয় সিদ্ধি সাধন নাম" লেখিকা, রাজকুমারী লক্ষ্মীঙ্করাকে ('বৌদ্ধগান ও দোহা' দ্রষ্টব্য) ছাড়িয়া দিলে বোধ হয় তিনিই প্রথম উড়িয়া মহিলাকবি। (শুনিয়াছি কমলা কর তাঁহার অপেক্ষা প্রাচীন স্ত্রী-কবি। এ-সম্বন্ধে কেহ কিছু জানাইলে বাধিত হইব)। মাধবীদাসীর নাম বাংলাদেশে খুব পরিচিত। অথচ তাঁহার কিছু কাল পরবর্ত্তী আর এক মহিলা-ভক্তকবির নাম একেবারেই অপরিচিত সেখানে। বৃন্দাবতী দাসীর "পূর্ণতম চন্দ্রোদয়" অতি সুন্দর বৈষ্ণব গ্রন্থ। সে যাক, মাধবী দাসীর পরিচয় হইতেছে "শিখি মাহিতির ভগিনী শ্রীমাধবী দেবী"—বৃদ্ধা তপস্বিনী তেহোঁ পরম বৈষ্ণবী॥ প্রভুলেখা করে যাঁরে রাধিকার গণ। জগতের মধ্যে পাত্র সাড়ে তিন জন॥" স্বরূপ গোঁসাই আর রায় রামানন্দ শিখি মাহিতি আর তাঁর ভগিনী অর্দ্ধজন (চৈঃ চঃ) তিনি বোধ হয় মহাপ্রভুকে দেখেন নাই। "যে দেখয়ে গোরামুখ সে-ই প্রেমে ভাসে—মাধবী বঞ্চিত হইল নিজ কর্ম্মদোষে" (পদকল্পতরু)। শিখি মাহিতি জগন্নাথের মন্দিরে লিখনাধিকারী ছিলেন। রাজপুরোহিত, "কাশী-মিশ্র পরম বিহ্বল কৃষ্ণরসে আপনি রহিলা প্রভু যাহার আবাসে" (চৈঃ ভাঃ)। আর এক বিখ্যাত উড়িয়া ভক্ত হইতেছেন শ্রীপ্রদ্যুম্ন ব্রহ্মচারী—নৃসিংহের দাস। যাঁহার শরীরে শ্রীনৃসিংহের পরকাশ (চৈঃ ভাঃ)।

চৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীচৈতন্যের সমসাময়িক আরও অনেক উড়িয়া বৈষ্ণবের নাম দেখিতে পাওয়া যায়। প্রভু ভবানন্দ রায়কে (পট্টনায়েক) বলিতেছেন,—

"রামানন্দ রায়, পট্টনায়ক গোপীনাথ
কলানিধি সুধানিধি নায়ক বাণীনাথ।
এই পঞ্চ পুত্র তোমার মোর প্রিয় পাত্র।
রামানন্দ সহ মোর দেহ ভেদ মাত্র॥
তা ছাড়া প্রতাপরুদ্র রাজা আর ওঢ্র কৃষ্ণানন্দ।
পরমানন্দ মহাপাত্র ওঢ্র শিবানন্দ॥
ভগবান আচার্য্য ব্রহ্ম নন্দাখ্য ভারতী।
শ্রীশিখি মাহিতি আর মুরারি মাহিতি॥"

অন্যত্র,—

"কানাঞি খুঁটিয়া আছেন নন্দ বেশ ধরি
জগন্নাথ মাহিতি হৈয়াছেন ব্রজেশ্বরী।
আপনি প্রতাপরুদ্র আর মিশ্র কাশী
সার্ব্বভৌম আর পড়িছা পাত্র তুলসী।"

এই কানাই খুঁটিয়াকে প্রভু "পিতা জ্ঞানে নমস্কার কৈল।"

তাঁহার মহিমা অনেক কবিতায় কীর্ত্তিত আছে। "কানাঞি খুঁটিয়া বন্দোবিশ্বের প্রচার—জগন্নাথ বলরাম দুই পুত্র (সম) যাঁর," তাহা ছাড়া বৈষ্ণববন্দনায় দেখি—"জয় কানাঞি খুঁটিয়া শিখি মাহিতি গোপীনাথাচার্য্য।" পদরত্নাবলীতে কানাইর দুইটি পদ্য দেখিতে পাই। "মনচোরার বাঁশী বাজিও ধীরে ধীরে" ও "যে-দেশে আছিল বাঁশী সে দেশে মানুষ নাই"—(অপ্রকাশিত পদরত্নাবলী। সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা, ১ম সংখ্যা, ১৩৩৪)। প্রবন্ধের দৈর্ঘ্য দেখিয়া আর উপসংহার ফাঁদিতে ইচ্ছা নাই। আশা করি, কটক সাহিত্য-পরিষদের চেষ্টায় উড়িষ্যার তমসাচ্ছন্ন প্রাচীন সাহিত্যের ইতিহাসে নূতন নূতন আলোকপাত হইবে।*

* প্রাচীন গ্রন্থমালার বইগুলির যথেচ্ছ ব্যবহার করিতে দিয়া শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক শ্রীলক্ষ্মীকান্ত চৌধুরী মহাশয় যথেষ্ট উপকার করিয়াছেন। কটক বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদের সহকারী ব্যবহর্ত্তা, বন্ধুবর বিমলকৃষ্ণ পাল, বি-এ-র সাহায্য না পাইলে প্রবন্ধই লেখা হইয়া উঠিত কি-না সন্দেহ। ইঁহাদের নিকট আমি বিশেষ ঋণী।

বাংলার কুটীর-শিল্প ও পাট

শ্রীসুধীরকুমার লাহিড়ী

সম্প্রতি পূর্ব্ববঙ্গের ও উত্তরবঙ্গের নানাস্থান বন্যায় ভাসিয়া গিয়াছে। সেই সকল অঞ্চলের অধিবাসীরা প্রায়ই কৃষি-জীবী। তাহাদের দুর্দ্দশার অবধি নাই। ক্ষেতের ফসল তাহাদের একমাত্র সম্বল; কিন্তু ভীষণ বন্যায় ফসল তো ধ্বংস হইয়াছেই, মানুষের প্রাণ লইয়া টানাটানি। এই দুর্দ্দিনে কুটীর-শিল্পের প্রয়োজন বিশেষভাবে উপলব্ধি করা যায়; যদি এই সকল বন্যা-প্লাবিত অঞ্চলের কৃষকদের কৃষি ছাড়া দ্বিতীয় কোন জীবিকার উপায় থাকিত তাহা হইলে তাহারা আজ এত অসহায় হইত না। বাংলা দেশে প্রতি বৎসরই তো হয় বন্যা, নয় অজন্মা, একটা না একটা অঘটন লাগিয়াই আছে। মাঝে মাঝে আবার অত্যধিক ফসল হইয়াও সর্ব্বনাশ ঘটায়, গত বৎসরের পাটে তাহা আমরা ভাল করিয়াই টের পাইয়াছি। যে-বৎসর ভাল ভাবে যায় সেই বৎসরও যে কৃষকেরা খুব কিছু লাভ করে তাহা নয়, খরচ খরচা বাদে যাহা থাকে তাহাতে কোনো রূপে তাহাদেব গ্রাসাচ্ছাদন চলে মাত্র। অথচ সারা বৎসরই কৃষকদের ক্ষেতে কাজ করিতে হয় না। অনেক সময়ই তাহাদের হাতে কিছু কাজ থাকে না, তাহার উপর বন্যা বা অজন্মা হইলে তো কথাই নাই। তখন বাধ্য হইয়া তাহাদের দলে দলে বেকার হইতে হয়। বেকার হওয়া মানে হয় উপবাস, নয়, ভিক্ষা করা।

কৃষকদের এই দুর্দ্দশার প্রতিকারের জন্য মহাত্মা গান্ধী চরকার প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। কুটীর-শিল্প হিসাবে চরকার উপযোগিতা আজ প্রায় সর্ব্বত্র স্বীকৃত হইতেছে। কিন্তু চরকা অপেক্ষা বেশী লাভজনক বা সুবিধাজনক কুটীর-শিল্প প্রবর্ত্তনের সম্ভাবনা যেখানে আছে সেখানে চরকার পরিবর্ত্তে না হউক, চরকার সঙ্গে সঙ্গে তাহা প্রবর্ত্তনের চেষ্টা করা যে নিশ্চয়ই উচিত, বোধ হয় এ সম্বন্ধে কেহ দ্বিমত হইবেন না। চরকার প্রবর্ত্তন করিতে গেলে তুলার চাষ করা দরকার। দুঃখের বিষয়, বাংলাদেশে তুলা অল্পই জন্মায়। এই প্রদেশে ব্যাপক-ভাবে চরকাপ্রবর্ত্তনের ইহা একটি অন্তরায়। এই অন্তরায় দূর করিবার চেষ্টা করা উচিত। কিন্তু যতদিন উপযুক্ত পরিমাণে তুলার চাষ আরম্ভ না হয় ততদিন হাত গুটাইয়া বসিয়া না থাকিয়া অন্য কি কুটীর-শিল্প প্রবর্ত্তন করা যাইতে পারে তাহা চিন্তনীয়।

বাংলাদেশে চরকা ছাড়া আরও কোন কোন কুটীর-শিল্পের যথেষ্ট সুযোগ ও সুবিধা আছে। তন্মধ্যে একটি রেশম-শিল্প। বাংলাদেশে নানা স্থানে রেশমের চাষ হয়। রেশমের সূতা কাটা ও এই সূতা হইতে বস্ত্র বয়ন বহুদিন হইতে বাংলাদেশে চলিয়া আসিতেছে। কিন্তু নানা কারণে এই কুটীর-শিল্পটির অবস্থা বিশেষ ভাল নয়। ইহার উন্নতির চেষ্টা করা উচিত। আর একটি শিল্প—পাটের সূতা হইতে নানাবিধ দ্রব্য প্রস্তুত করা; অবশ্য কলে নয়, হাতে।

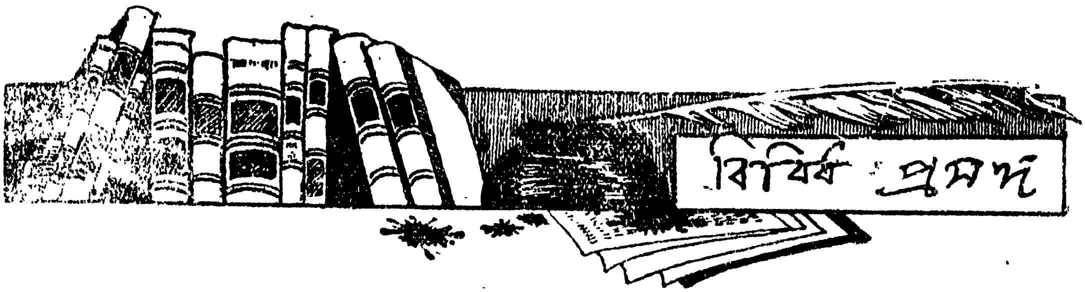
পাট বাংলাদেশের একপ্রকার একচেটিয়া সম্পত্তি। প্রায় প্রত্যেক পাটের চাষীই পাটের সূতা কাটিয়া থাকে। এক সময়ে বাংলাদেশে অত্যন্ত সূক্ষ্ম পাটের সূতা প্রস্তুত হইত ও গ্রামে গ্রামে তাঁতিরা এই সূক্ষ্ম সূতা হইতে বহুল পরিমাণে ছালা বুনিত। ক্রমে বহু পাটের কল স্থাপিত হইল; সঙ্গে সঙ্গে গ্রামে গ্রামে পাট-বয়ন-শিল্পও লোপ পাইল। এখন বোধ হয় একমাত্র দিনাজপুর, রংপুর ও জলপাইগুড়ি জিলাতে এই শিল্প টিঁকিয়া আছে। কিন্তু সূক্ষ্ম পাটের সূতা আর লোকে চায় না, তাই সূক্ষ্ম সূতা বোনাও উঠিয়া গিয়াছে। এখন যে মোটা সূতা তৈয়ারী হয় তাহা শুধু গরু মহিষ বাঁধিবার দড়ি বা খেড়া দিবার বা ঘরের চালা বাঁধিবার কাজে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু পাট আরও অনেক কাজে লাগানো যাইতে পারে।

গত ১৩৩৭ সালের অগ্রহায়ণ মাসের 'প্রবাসীতে' শ্রীযুক্ত সুধীরকুমার সেন মহাশয় 'পাট-ব্যবসায়ে মন্দা' প্রবন্ধে পাট কি কি কাজে লাগানো যায়, অর্থাৎ পাটকে ভিত্তি করিয়া কি কি কুটীর-শিল্প প্রবর্ত্তন করা যায়, এসম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। বাংলা-দেশের অন্তত দুইটি স্থানে পাটকে অবলম্বন করিয়া কুটীর-শিল্পের প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে। এই দুইটি স্থানে চতুস্পার্শ্বস্থ গ্রাম হইতে পাটের সূতা সংগ্রহ করিয়া তাহা বেশ পাকা রঙে রঞ্জিত করা হয় ও এই রঙ্গীন সূতা দিয়া আসন, সতরঞ্চি, পাপোষ, ডেক চেয়ারের ও ক্যাম্প-খাটের কাপড়, টেনিস্ ও ব্যাড্‌মিনটন্ খেলিবার জাল প্রভৃতি নানা দ্রব্য প্রস্তুত হয়।

এই কেন্দ্র দুইটির একটি হইল রংপুর জিলার নীলফামারি সহরের একটি সমবায়-সমিতি। এই সমিতির কারখানায় দশটি তাঁত বসানো হইয়াছে। স্থানীয় যে সকল কৃষক এই সমিতির সভ্য তাঁহাদের নিকট হইতে সূতা সংগ্রহ করিয়া এই তাঁতগুলিতে উল্লিখিত নানা দ্রব্য বয়ন করা হইতেছে। আর একটি কেন্দ্র হইল রাজসাহী জিলার অন্তর্গত নওগাঁ নামক স্থানের সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের সহিত সংলগ্ন বয়ন-বিদ্যালয়। প্রতি বুধবার নওগাঁয় হাট বসে। কৃষকেরা হাটে আসিবার সময় সূতা আনিয়া এই বিদ্যালয়ে দিয়া যায় ও ইহার যে-দাম পায় তাহা দিয়া হাট করিয়া বাড়ী ফিরে। এই দুইটি কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠা রাজসাহী বিভাগের সমবায়-সমিতি-সমূহের সহকারী রেজিষ্ট্রার শ্রীযুক্ত সুকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের উৎসাহ ও উদ্যোগের জন্যই সম্ভব হইয়াছে।

বর্ত্তমানে পাটের দাম প্রতি সের চার পয়সা বা পাঁচ পয়সা। এই পাট হইতে তৈরী সূতা ঠিক মত হইলে তাহার দাম সাড়ে পাঁচ আনা হইতে আট আনা পর্য্যন্ত হয়। ক্ষেতের কাজ যখন খুব বেশী তখনও কৃষকেরা প্রত্যূষে ও সন্ধ্যার পর ছয় সের সূতা কাটিতে পারে, আমরা এই শুনিয়াছি। ক্ষেতের কাজ কমিয়া গেলে বা একেবারেই না থাকিলে অবশ্য এই সূতার পরিমাণ আরও অনেক বেশী হইবে। সুতরাং পাটের সূতা কাটিয়া কৃষকেরা অন্ততঃ মাসে কুড়ি টাকা উপার্জ্জন করিতে পারে অনুমান করা যাইতে পারে।

আর একটি কথা, এই শিল্পের প্রবর্ত্তন হইলে বহুলোকের অন্নের সংস্থান হইতে পারে এবং তাহাতে বাংলাদেশের বেকার-সমস্যার সমাধানে কথঞ্চিৎ সাহায্য হইবে সন্দেহ নাই। নওগাঁ ও নীলফামারিতে প্রস্তুত অনেক দ্রব্য আমি দেখিয়াছি। এই দ্রব্যগুলি যে উৎকৃষ্ট ও নানা ভাবে ব্যবহারযোগ্য তাহা আমি বলিতে পারি। এই জাতীয় যে-সকল জিনিষ কলিকাতার বাজারে বিক্রয় হয় তাহাদের তুলনায় ইহারা সস্তা এবং মজবুত। এই কাজ যাঁহারা আরম্ভ করিয়াছেন তাঁহাদের অভিজ্ঞতা বেশী দিনের নয়, মাত্র পাঁচ ছয় মাসের, সুতরাং আরও বেশী দিন কাজ করিলে আরও ভাল এবং আরও নানারকমের জিনিষ তাঁহারা তৈয়ারী করিতে পারিবেন আশা করা যায়। এই নব-প্রতিষ্ঠিত কুটীর-শিল্পটির বাংলাদেশের যথেষ্ট প্রসারের সম্ভাবনা আছে। সুতরাং যাঁহারা কৃষকের হিতাকাঙ্ক্ষী তাঁহাদের সকলেরই উচিত ইহার সহায়তা করা।



১ স্বরাজ চাই

গোলটেবিল বৈঠকে এস্পার কি ওস্পার একটা কিছু মীমাংসা যত নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিতেছে, দলবদ্ধ বহুসংখ্যক লোকের দ্বারা লুট সম্পত্তিনাশ গৃহদাহ মারপিট রক্তারক্তি তত বাড়িয়া চলিতেছে। এরূপ ঘটনায় কেহ কেহ স্বরাজের জন্য আগ্রহ হারাইতে পারেন; কেহ কেহ ভাবিতে পারেন, ইংরেজের প্রভুত্ব থাকিতেই এরূপ, ইংরেজের প্রভুত্ব গেলে না-জানি আরও কি ভীষণতর ব্যাপার ঘটিবে। তাঁহাদিগকে স্থির চিত্তে বিবেচনা করিয়া দেখিতে বলি, দুঃখকর লজ্জাকর অপমানকর যে-সব ব্যাপার ঘটিতেছে তাহা স্বরাজের আমলে ঘটিতেছে না, ব্রিটিশ-রাজের আমলে ঘটিতেছে; সুতরাং এগুলা স্বরাজের নমুনা ও পূর্ব্বলক্ষণ নহে। স্বরাজই এগুলার একমাত্র প্রতিকার। এখন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাহাঙ্গামা হইলে, হিন্দুকে মুসলমানের মুসলমানকে হিন্দুর সহিত বুঝাপড়া মিটমাট করিতে হয়, অধিকন্তু স্থায়ী ও অকপট এরূপ বোঝাপড়া ও মিটমাট প্রভুপদে অধিষ্ঠিত ইংরেজের অভিপ্রেত ও মনঃপূত কি-না, সে ভাবনাও ভাবিতে হয়। পূর্ণস্বরাজ হইলে শেষোক্ত ভাবনাটা ভাবিতে হইবে না। সুতরাং বুঝাপড়া মিটমাট তখন সহজতর হইবার কথা।

আমরা চাই অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক স্বরাজ। তাহাতে ধনিক, শ্রমিক, লিখনপঠনক্ষম নিরক্ষর, নারী ও পুরুষদের মধ্যে জাতিধর্ম্মবর্ণনির্বিশেষে যাঁহারা যোগ্যতম নির্ব্বাচিত হইবেন, তাঁহাদের দ্বারা রাষ্ট্রীয় কার্য্য নিয়মিত ও নির্ব্বাহিত হইবে। এরূপ ব্যবস্থায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাহাঙ্গামা কম হইবার কথা। এক আধটা ঘটিলেও তাহা সহজে ও শীঘ্র নিবারিত হইবে এবং তাহার নিষ্পত্তিও সহজে ও শীঘ্র হইবে।

স্বরাজ যদি আমাদের আদর্শ অনুযায়ী অসাম্প্রদায়িক ও গণতান্ত্রিক না হয়, যদি আপাততঃ কোন সম্প্রদায় অতিরিক্ত অধিকার বা ক্ষমতা পায়, তাহা স্থায়ী হইবে না, তাহার অপব্যবহারও স্থায়ী হইবে না। হিন্দু মুসলমান প্রভৃতি সম্প্রদায়গুলির এ বিষয়ে আত্ম-শক্তিতে বিশ্বাস থাকা চাই। আমাদের সে বিশ্বাস আছে।

সকল সম্প্রদায়ের মানুষেরাই বুদ্ধিবিশিষ্ট জীব। বুদ্ধি চিরকাল মোহাবিষ্ট থাকে না। যখন ইংরেজের কাছে দরবার করিবার ইংরেজের পিঠচাপড়ানি ও প্রশ্রয় পাইবার পথ থাকিবে না, তখন সকলের স্বার্থবুদ্ধি সকলকে পরস্পরের সহিত মিলিয়া মিশিয়া চলিতে প্রবৃত্ত করিবে। স্বরাজলাভের আগে কানাডার ইংরেজ ও ফরাসীর মুখ দেখাদেখি বন্ধ হইয়াছিল, ঝগড়া দাঙ্গাও খুব হইত। স্বরাজ পাইবার পরই সে অবস্থার সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন হইয়াছে।

কোন সম্প্রদায়ের লোকদের যদি আশঙ্কা হয়, যে, তাঁহারা তখন অন্য কোন সম্প্রদায়ের পদানত হইবেন কিংবা লুপ্ত হইবেন, তাঁহারা ভাবিয়া দেখিবেন, পদানত এখনও আছেন, এবং পরে মানুষের মত জীবনলাভ করিতে না-পারিলেও মানুষের মত চেষ্টা করিয়া লুপ্ত হওয়া ভাল। এখন দিনরাত্রি সংবৎসর পদানত থাকিতে হয় ইংরেজের, এবং তদুপরি মধ্যে মধ্যে পদানত হইতে হয় সাময়িক গুণ্ডাদের। সুতরাং আগে হইতে কল্পনায় চিত্রিত স্বরাজের দুরবস্থা হইতে এখনকার অবস্থা ভাল কিসে?

স্বরাজ, অর্থাৎ ভারতবর্ষের স্থায়ী বাসিন্দাদের প্রভুত্ব চাই—তাহা যে-রকমেরই হউক। কোনও বিদেশীর প্রভুত্ব এখন আর দেশের পক্ষে মঙ্গলকর হইবে

না—আগে কল্যাণকর হইয়াছিল কি-না তাহার আলোচনা অনাবশ্যক।

—

বেকার যুবকদের আত্মহত্যা

গত কয়েক মাসের মধ্যে বেকার কয়েকজন যুবকের আত্মহত্যার সংবাদ খবরের কাগজে বাহির হইয়াছে। আর্থিক বিষয়ে দেশের দুরবস্থার এগুলি অন্যতম শোচনীয় প্রমাণ।

বাল্যকালে "সম্ভাবশতক" গ্রন্থে পড়িয়াছিলাম,

"চিরসুখী জন ভ্রমে কি কখন
ব্যথিত বেদন বুঝিতে পারে ?
কি যাতনা বিষে বুঝিবে সে কিসে
কভু আশীবিষে দংশেনি যারে ?"

আমরা "চিরসুখী" নহি। চাকরি ত্যাগ স্বেচ্ছায় করিয়াছিলাম বটে, কিন্তু ঠিক্ বেকার হই নাই। এই জন্য বেকার হইবার দুঃখ কল্পনায় কিয়ৎপরিমাণে বুঝিতে পারিলেও উহার প্রত্যক্ষ অনুভূতি আমাদের নাই। তথাপি আশা করি বেকার যুবকেরা আমাদের দু-একটি কথা বিবেচনা করিয়া দেখিবেন।

যে-সব দেশের রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা আছে এবং কৃষি-শিল্পবাণিজ্যাদি বিষয়েও যাহারা স্বাধীন ও আত্মনির্ভর-সমর্থ, সেখানে মানুষের রোজগারের যত উপায় আছে, আমাদের দেশে উপার্জ্জনের তত পথ খোলা নাই, ইহা সত্য কথা। কিন্তু এই বাংলা দেশে মুটে৷ মজুরের কাজ হইতে আরম্ভ করিয়া বড় সওদাগরের কাজ পর্য্যন্ত করিয়া কত দেশের ও প্রদেশের লোক রোজগার করিতেছে। তাহাতে তাহাদের নিজের জীবিকা নির্ব্বাহ ত হইতেছেই, অধিকাংশের পারিবারিক ব্যয়নির্ব্বাহও হইতেছে; এবং অনেকে ধনীও হইতেছে। বস্তুত, বাংলা দেশে বাঙালী ছাড়া আর সবাই ধনী হইতে পারে, একথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য না হইলেও বহু পরিমাণে সত্য। অথচ, অবাঙালী যাহারা বঙ্গে ধনী হয়, তাহারা যে গড়ে বাঙালীদের চেয়ে বুদ্ধিমান্ তাহা নহে। তাহা হইলে তাহারা উপার্জ্জন করিতে পারে, বাঙালী পারে না, ইহার কারণ কি? তাহারা যে সবাই বঙ্গে অনেক মূলধন লইয়া আসিয়া কারবার করিতে বসে, এমন নয়। মুটে৷ মজুররা ত মূলধন লইয়া আসেই না; পরে যাহারা লক্ষপতি হইয়াছে, এমন অনেকেও নিঃস্ব অবস্থায় বঙ্গে আসিয়াছিল। বাঙালীরা অবাঙালী অনেকের মত সব রকমের দৈহিক ও অন্যবিধ শ্রম করিতে রাজী থাকিলে, চাকরির নিশ্চিত স্বল্প বেতনকে অন্য বৃত্তির অনিশ্চিত অথচ সম্ভাবিত অধিক উপার্জ্জন অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ মনে না করিয়া নিকৃষ্ট মনে করিবার মত মনের ভাব বাঙালীদের হইলে, এবং অনিশ্চিত ভবিষ্যতের উদ্বেগ সহ্য করিবার সাহস ও ক্ষমতা বাঙালীরা অর্জ্জন করিতে পারিলে, বঙ্গদেশ বাঙালীদের পক্ষেও নিশ্চয়ই সোনার খনি হইতে পারিবে।

বাঙালী যুবকেরা সামান্য কোন কারবারে বা অন্য কাজে হাত দিলে, আয় কম হইলেও, তাহা হইতেও কিছু কিছু সঞ্চয় করিয়া মূলধন সংগ্রহের চেষ্টা করিবেন; খাওয়া-পরার চালচলন কিছু খাট করিবেন।

যতীন্দ্রনাথ দাস দেখাইয়া গিয়াছেন, ৭০ দিন না খাইলেও মানুষ আরও কয়েক ঘণ্টা বাঁচিয়া থাকিতে পারে। অতএব যে-সব যুবক একান্তই বেকার, তাঁহারা আত্মহত্যা করিবেন না; কোনও প্রকাশ্য স্থানে মৃত্যুর স্বাভাবিক আগমনের প্রতীক্ষা করিতে থাকিবেন। অবশ্য, যতক্ষণ চলাফিরা করিবার ক্ষমতা থাকিবে, ততক্ষণ কাজের চেষ্টা দেখিবেন। মনে রাখিবেন, আত্মহত্যা দুর্ব্বলতার লক্ষণ।

—

পত্নীর রঙের নিন্দায় আত্মহত্যা

সদ্য সদ্য মৃত ব্যক্তির প্রতিকূল সমালোচনা না করিবার একটি রীতি প্রচলিত আছে। আমরা সেরূপ কাহারও নিন্দা করিবার জন্য নীচের কথাগুলি লিখিতেছি না।

সম্প্রতি খবরের কাগজে একটি সংবাদ বাহির হইয়াছে, যে, একটি বাঙালী যুবক বিবাহের পর দিন

তাহার পিতৃগৃহের আত্মীয়ারা নবপরিণীতা বধূর রং কাল বলায় এবং রূপের নিন্দা করায় আত্মহত্যা করিয়াছে। খবরটিতে এরূপ কথাও ছিল, যে, সে বধূ-নির্ব্বাচন নিজেই করিয়াছিল—অন্ততঃ স্বেচ্ছায় বিবাহ করিয়াছিল, কেহ তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাহার বিবাহ দেয় নাই।

বধূটির প্রতি এই যুবকের মমতা ছিল, মনে করিতে হইবে; নতুবা বধূর নিন্দায় সে কেন আত্মহত্যা করিবে? কিন্তু আত্মহত্যা দ্বারা সে মমতার পরিবর্ত্তে মূঢ়তা ও নিষ্ঠুরতারই পরিচয় দিয়াছে। সে যাহাকে ভালবাসিত, বাঁচিয়া থাকিয়া সকল উপহাস বিদ্রূপ প্রতিকূল সমালোচনা হইতে তাহাকে রক্ষা করাই তাহার কর্ত্তব্য ছিল। সে কেন মনে করিল না "কালো জগৎ-আলো?"

ভীরুর বিবাহ অকর্ত্তব্য

যাহারা প্রাণপণ করিয়া পত্নীকে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিতে পারিবে না, তাহাদের বিবাহ করা উচিত নয়। যাঁহারা বিবাহিত অথচ সাহসী নন, নারীরক্ষার সাহস তাঁহারা সর্ব্বপ্রযত্নে সর্ব্বাগ্রে অর্জ্জন করুন। যাহারা স্বভাবতঃ সাহসী নয়, তাহারাও সর্ব্বপ্রকার ভয় ও মৃত্যুর অকিঞ্চিৎকরতার বিষয় ক্রমাগত চিন্তা করিয়া এবং অন্যবিধ সাধনা দ্বারা সাহসী হইতে পারে। ইহা মানুষের অভিজ্ঞতাপ্রসূত সত্য। সকল দেশে অভয় চিরকালই শ্রেষ্ঠ সম্পদ। বাংলা দেশে ইহা অপেক্ষা বাঞ্ছনীয় সম্পদ অধুনা অন্য কিছু নাই।

হিন্দুর ধর্ম্মান্তর গ্রহণ

প্রায় তিন মাস হইল, খবরের কাগজে দেখিয়াছিলাম, শ্রীহট্ট জেলার সুনামগঞ্জ মহকুমার সব নমশূদ্র "উচ্চ" জাতীয় হিন্দুদের উৎপীড়নে এবং একজন মুসলমান মৌলবীর প্রচারের ফলে মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে উদ্যত হইয়াছে। তাহার পর হিন্দুসভা হিন্দু-মিশন প্রভৃতির চেষ্টায় এই নমশূদ্রেরা ঐ সঙ্কল্প ত্যাগ করে। ইঁহাদের চেষ্টা প্রশংসনীয়।

"উচ্চ" জাতির হিন্দুরা সম্ভবতঃ সর্ব্বত্র দল বাঁধিয়া নমঃশূদ্রদিগকে মার ধর করে না। কারণ, তাহাদের সংখ্যা এবং বাহুবল নমশূদ্রদের চেয়ে কম। কোন কোন স্থলে কোন কোন সঙ্গতিপন্ন "উচ্চ" জাতীয় হিন্দু কোন কোন নমশূদ্রের প্রতি ঐরূপ অত্যাচার সম্ভবতঃ করে। সেরূপ অত্যাচার বামুনও বামুনের উপর করে। তাহার জন্য বামুনেরা দল বাঁধিয়া স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিতে উদ্যত হয় না।

"নিম্ন" শ্রেণীর হিন্দুদের প্রতি "উচ্চ" শ্রেণীর হিন্দুদের অন্যবিধ অত্যাচার মারধরের চেয়ে কম পীড়াদায়ক ও অপমানকর নহে। কোনও জাতিকে পুরুষানুক্রমে তুচ্ছতাচ্ছিল্য ও অবজ্ঞা করিলে, তাহাদিগকে অস্পৃশ্য ও অনাচরণীয় করিয়া রাখিলে, তাহাদের ধোপানাপিত বন্ধ করিলে, এরূপ ব্যবহার কালক্রমে অসহ্য হইয়া উঠে। তথাপি আমরা "নিম্ন" শ্রেণীর হিন্দুদিগকে হিন্দুসমাজ ত্যাগ না করিতে অনুরোধ করি।

"হিন্দু" কথাটি আমরা প্রশস্ত অর্থে ব্যবহার করিতেছি, যে-অর্থে হিন্দু মহাসভা উহা ব্যবহার করেন।

ভারতবর্ষে এবং বাংলাদেশে "নিম্ন" শ্রেণী হিন্দুদের সংখ্যাই বেশী। তাঁহারাই হিন্দুসমাজের প্রধান অংশ। সুতরাং হিন্দু বলিতে প্রধানতঃ তাঁহাদিগকেই বুঝায়। হিন্দুত্বে অধিকার তাঁহারা যাঁহারা সংখ্যায় অল্প তাঁহাদিগকে কেন ছাড়িয়া দিবেন? সংখ্যাভূয়িষ্ঠ যাঁহারা তাঁহারা হিন্দুত্বের যাহা কিছু ভাল সমুদয়েই অধিকারী। হিন্দুশাস্ত্রের শ্রেষ্ঠ যে-সব অংশ তাহা "উচ্চ" জাতির লোকেরাই রচনা করিয়াছে, ইহাও সত্য নহে। শাস্ত্রকার ঋষিদের মধ্যে খুব নিম্নবংশজাত, এমন কি অজ্ঞাতকুলোদ্ভব অনেকে ছিলেন। সুতরাং শাস্ত্রগুলিতে কেবল ব্রাহ্মণদেরই অধিকার আছে ইহা মিথ্যা কথা। মহাত্মাজী নিজেই নিজের ধোপা-নাপিতের কাজ করিয়াছেন। দরকার-মত অন্যদেরও তাহা করা উচিত।

অধিকাংশ হিন্দু বহু দেবদেবীর পূজা করেন। এই জন্য "নিম্ন" শ্রেণীর হিন্দুরা বলিতে পারেন, ব্রাহ্মণরা আমাদিগকে মন্দিরে ঢুকিতে দেবপূজা করিতে দেয়

না, এই জন্য আমরা অহিন্দু হইতে চাই। কিন্তু অহিন্দু হইয়াও তাঁহারা দেবদেবীর মন্দিরে ঢুকিয়া পূজা করিতে পারিবেন না। অতএব, যদি তাঁহারা দেবদেবীর পূজা করিতে চান, নিজেদের মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে পূজা করিতে ও করাইতে পারিবেন। পয়সা দিলে অনেক বামুন পুরোহিত পাওয়া যাইবে।

আর যদি তাঁহারা বহুদেবদেবীর পূজা ছাড়িয়া এক ঈশ্বরের পূজা করিতে চান, তাহা হইলেও মুসলমান হইবার দরকার নাই। তাঁহারা শিখ হইতে পারেন, ব্রাহ্ম হইতে পারেন, আর্য্যসমাজী হইতে পারেন। যদি তাঁহারা সামাজিক সাম্য চান, নিজ ধর্ম্মাবলম্বী অন্য সকলের সঙ্গে একত্র খাওয়া-দাওয়া করিতে চান, তাহা হইলে সে সুবিধাও ব্রাহ্মসমাজে, খাঁটি শিখদের মধ্যে ও খাঁটি আর্য্যসমাজীদের মধ্যে পাইবেন। যদি পরাক্রমশালী সাহসী সমাজ চান, তাহা হইলে জানিয়া রাখুন, শিখেরা সংখ্যায় কম হইলেও প্রতাপে সাহসে ভারতীয় কোন সমাজ অপেক্ষা কম নয়। নিষিদ্ধ মাংস ভোজন সম্বন্ধে আজকাল অনেক উপবীতধারী ব্রাহ্মণও মুসলমানদের চেয়েও নিরঙ্কুশ; কারণ এই ব্রাহ্মণেরা বরাহমাংসও বাদ দেন না, যাহা খাঁটি মুসলমানেরা বাদ দিতে বাধ্য। শিখরাও, এক দিকে যেমন গোমাংস বর্জ্জন করেন, যাহা মুসলমানেরা করেন না, তেমনি অন্য দিকে বরাহমাংস ভোজন করেন, যাহা মুসলমানেরা করিতে পারেন না।

মুসলমান হইলে একটা "সুবিধা" থাকে—বিবাহ অনেকগুলা করা চলে। কিন্তু নমশূদ্র ও অন্যান্য হিন্দু জাতির লোকেরা তাহা ত হিন্দু থাকিয়াই করিতে পারে; তাহার জন্য মুসলমান হইবার কি প্রয়োজন?

ভারতবর্ষজাত বৌদ্ধ ধর্ম্মও রহিয়াছে। মুসলমান হইলে পৃথিবীর কয়েকটি স্বাধীন জাতির সঙ্গে কল্পিত স্বাজাত্য ঘটে বটে। কিন্তু বৌদ্ধ হইলেও তাহা ঘটে। বৌদ্ধ চীনরা সংখ্যায় মুসলমানদের চেয়ে কম নয়। তাহারা সভ্য এবং স্বাধীনও বটে। বৌদ্ধ জাপানীরা পৃথিবীর মুষ্টিমেয় কয়েকটি প্রবলতম জাতিদের অন্যতম; কোন মুসলমান দেশের কোন স্বাধীন জাতি তাহাদের সমকক্ষ নহে। বৌদ্ধ শ্যাম দেশও স্বাধীন। বঙ্গের কোন জেলার কোন বাঙালী বৌদ্ধ হইতে চাহিলে কলিকাতার এবং চট্টগ্রামের বৌদ্ধ ভিক্ষুরা তাঁহাকে বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত করিতে পারিবেন। বৌদ্ধদের মধ্যে সামাজিক সাম্যও আছে।

শিক্ষিত নমশূদ্র এবং তথাকথিত অন্য "নিম্ন" শ্রেণীর শিক্ষিত হিন্দুরা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন, যে, আজকাল শিক্ষার প্রভাবে, যুগধর্ম্মের প্রভাবে, মহাত্মা গান্ধীর প্রভাবে, এবং হিন্দু মহাসভা ও হিন্দু-মিশনের চেষ্টায় অস্পৃশ্যতা অনাচরণীয়তা প্রভৃতি কুসংস্কারের প্রকোপ কমিতেছে।

"নিম্ন" শ্রেণীর হিন্দুদের মধ্যে বৌদ্ধ, শিখ, ব্রাহ্ম এবং আর্য্যসমাজের লোকদের নিজ নিজ ধর্ম্ম ও সামাজিক আদর্শ প্রচার করিবার চেষ্টা প্রবলতর ও বিস্তীর্ণতর হওয়া একান্ত আবশ্যক।

"নিম্ন" শ্রেণীর হিন্দুরা যদি ঐহিক কোন কোন সুবিধা অধিক পাইবেন মনে করিয়া ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিতে চান, তাহা হইলে হয়ত তাঁহারা কোন কোন সুবিধার জন্য বিদেশজাত কোন ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে ব্যগ্র হইতে পারেন। আমরা সাংসারিক কোন সুবিধার জন্য কাহারও ধর্ম্মান্তর গ্রহণের সমর্থন করি না। আমরা তাহার বিরোধী। কেহ একান্ত প্রয়োজন মনে করিলে কেবল ধর্ম্মের জন্যই ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিতে পারেন। কিন্তু ভারতবর্ষের লোকদের তাহার জন্য বৈদেশিক কোন ধর্ম্ম গ্রহণ আবশ্যক নহে; অন্য দেশের লোকদের তাহা আবশ্যক হইতে পারে। ভারতবর্ষে উদ্ভূত হিন্দুধর্ম্মের নানা সম্প্রদায়, জৈন ধর্ম্ম, বৌদ্ধ ধর্ম্ম, শিখ ধর্ম্ম, ব্রাহ্ম ধর্ম্ম ও আর্য্যসমাজের ধর্ম্ম—ইহাদের মধ্যে কোন-না-কোনটির শিক্ষা ও আদর্শ ভারতবর্ষীয় মানুষের সর্ব্ববিধ ধর্ম্মপিপাসা মিটাইতে সমর্থ। তদ্ভিন্ন, হিন্দুদের পক্ষে অন্যান্য ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ উপদেশ ও আদর্শ গ্রহণে কোন বাধা নাই। কিন্তু আগেই বলিয়াছি, কেহ কেহ হয়ত সাংসারিক সুবিধার জন্য কোন বৈদেশিক ধর্ম্ম গ্রহণে ইচ্ছা করিতে পারেন। সেস্থলে খ্রীষ্টিয়ান হইলে শিক্ষালাভের সুবিধা মুসলমান হওয়া অপেক্ষা নিশ্চয়ই বেশী হয়। ভারতবর্ষীয় খ্রীষ্টানদের মধ্যে লিখনপঠনক্ষম

লোকদের শতকরা সংখ্যা মুসলমানদের চেয়ে অনেক বেশী ত বটেই, হিন্দুদের চেয়েও বেশী। বেশী হইবার কারণ এই, যে, মিশনরীরা কাহাকেও বাপ্তাইজ করিয়া খ্রীষ্টিয়ান করিয়াই ক্ষান্ত থাকেন না, তাহাদের শিক্ষার ও উপার্জ্জনের ব্যবস্থা করিতেও সচেষ্ট হন। মুসলমানেরা কাহাকেও নিজধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া শিক্ষাদানের চেষ্টা করেন না, বা খুব কম স্থলেই করেন। খ্রীষ্টিয়ান হইলে চাকরি পাইবার সুবিধাও অনেক স্থলে ঘটে।

বৈদেশিক ধর্ম্ম গ্রহণ যদি করিতেই হয় তাহা হইলে খ্রীষ্টিয়ান হওয়া বাঞ্ছনীয় আর একটি কারণে মনে করি। ভারতবর্ষের মধ্যে মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীতে, আগ্রা-অযোধ্যা প্রদেশে, এবং বঙ্গেরও কোন কোন জেলায় খ্রীষ্টিয়ান-প্রধান গ্রাম আছে। আগ্রা-অযোধ্যা প্রদেশের কোথাও কোথাও চামার প্রভৃতি জাতির লোকেরা গ্রামকে গ্রাম খ্রীষ্টিয়ান হইয়া গিয়াছে। কিন্তু ভারতের নানা অঞ্চলে অবস্থিত এই সব গ্রামবাসী খ্রীষ্টিয়ানদের কিংবা নাগরিক খ্রীষ্টিয়ানদের মধ্যে দলবদ্ধভাবে লুণ্ঠন, প্রতিবেশীর গৃহদাহ, দাঙ্গা খুনাখুনি এবং নারীহরণ প্রভৃতি অপরাধের প্রাদুর্ভাব দেখা যায় না। তাহাতে মনে হয়, যে, খ্রীষ্টিয়ান হওয়ায় এই সব বিষয়ে তাহাদের নৈতিক অবনতি হয় নাই। গ্রাম্য ও নগরবাসী মুসলমানদিগের এই রূপ সুখ্যাতি করিতে পারিলে সুখী হইতাম। মুসলমান মাত্রেই অসাধু প্রকৃতির লোক, এরূপ ইঙ্গিত করা আমাদের অভিপ্রেত নহে; কারণ তাহা সত্য নহে। কিন্তু ইহা অস্বীকার করা যায় না, যে, সুশিক্ষার অভাবে বা অন্যান্য যে-যে কারণেই হউক, মুসলমানদের মধ্যে পূর্ব্বোক্ত অপরাধসমূহের প্রাদুর্ভাব যেরূপ দেখা যায়, অন্য কোন ধর্ম্মাবলম্বীদের মধ্যে ভারতবর্ষে সেরূপ দেখা যায় না।

ভারতীয় লোকদের পক্ষে বৈদেশিক কোন ধর্ম্ম গ্রহণ করা অনাবশ্যক, তাহা আগেই বলিয়াছি। কিন্তু যদি তাহা করিতেই হয়, তাহা হইলে যে-যে কারণে মুসলমান হওয়া অপেক্ষা খ্রীষ্টিয়ান হওয়া বাঞ্ছনীয়, তাহাও কিছু উল্লেখ করিলাম।

—

"বাপের বাড়ির ডাক"

যাঁহারা 'সঞ্জীবনী' ও অন্যান্য কাগজে নারীহরণ ও নারীনিগ্রহের সংবাদ পড়িয়া থাকেন তাঁহারা জানেন অনেকস্থলে কোন দুষ্ট ভৃত্য বা প্রতিবেশী, বিধবা বা সধবা স্ত্রীলোককে এই মিথ্যা কথা বলিয়া বাড়ির বাহিরে তাহাদের সঙ্গে আসিতে সম্মত করে, যে, ঐ নারীদের পিতা মাতা ভ্রাতা বা অন্য আত্মীয় পীড়িত এবং তাঁহাদিগকে দেখিতে চাহিয়াছেন। যদি এই প্রতারিতা স্ত্রীলোকেরা লেখাপড়া জানিতেন, তাহা হইলে তাঁহারা নিশ্চয়ই পীড়িত আত্মীয়দের লিখিত আহ্বান চাহিতে পারিতেন। কিন্তু দেশে অজ্ঞতা, বিশেষতঃ স্ত্রীলোকদের মধ্যে নিরক্ষরতা এত বেশী, যে, মৌখিক সংবাদই অনেকস্থলে বাপের বাড়ির বা অন্যস্থানের সংবাদ জানিবার একমাত্র উপায়।

এই নিরক্ষরতাবশতঃ কত নারীর সম্মান ও সতীত্ব গিয়াছে, কত নারীকে অগত্যা বিধর্ম্মীর সমাজে কিংবা পতিতালয়ে আশ্রয় লইতে হইয়াছে, কত নারীর কোন সংবাদই পাওয়া যায় নাই, কত নারীর প্রাণ গিয়াছে, কেহ তাহার সংখ্যা করিতে পারে না।

নারীদিগকে আত্মরক্ষায় সমর্থ করিতে হইলে, তাহাদিগকে লেখাপড়া শিখান একান্ত আবশ্যক। তাহাতে তাঁহাদের সাহস এবং মনের দৃঢ়তাও বাড়িবে। তাহার উপর দৈহিক আত্মরক্ষার জন্য অস্ত্রব্যবহার ও জিউজিৎসু প্রভৃতি কৌশলও শিক্ষা দেওয়া একান্ত আবশ্যক।

—

ভারতীয় ও বৈদেশিক ধর্ম্ম

আমরা আগে যে লিখিয়াছি, ভারতীয়দের কোন বৈদেশিক ধর্ম্মগ্রহণের প্রয়োজন নাই, তাহা এ-কারণে নহে, যে, কোন ধর্ম্ম বৈদেশিক বলিয়াই নিকৃষ্ট বা গ্রহণের অযোগ্য। বৈদেশিক বলিয়াই কোন বস্তুর প্রতি আমাদের কোন অশ্রদ্ধা বা বিদ্বেষ থাকা উচিত নয়। কোন দেশের লোকেরই বৈদেশিক কোন ধর্ম্ম গ্রহণ করা উচিত নহে, এরূপ কোন সাধারণ নিয়মের

অনুবর্ত্তন করিয়াও আমরা ভারতীয়দিগের বৈদেশিক ধর্ম্মগ্রহণের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করি নাই। কারণ, এরূপ কোন সাধারণ নিয়ম নির্দ্ধারণ করা যায় না। প্রাচীন প্রসিদ্ধ যতগুলি ধর্ম্মমত প্রচলিত আছে, তাহার কোনটিরই উদ্ভব ইউরোপ, আফ্রিকা বা আমেরিকার কোন দেশে হয় নাই। অথচ ঐ সকল দেশের লোকের ধর্ম্মের প্রয়োজন আছে। তাহারা স্বভাবতঃ এশিয়াজাত কোন-না-কোন ধর্ম্ম স্বীকার করিয়াছে, যদিও ঠিক্ তাহার অনুসরণ করিতে পারে না, আপনাদের প্রকৃতি প্রবৃত্তি ও সুবিধা অনুসারে তাহার পরিবর্ত্তন করিয়া লইয়াছে। ধর্ম্ম একটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র শ্রেণীর পদার্থ নহে। দর্শন, সাহিত্য, ললিতকলা ও বিজ্ঞানের সহিত কোন কোন দিকে ইহার সাদৃশ্য ও যোগ আছে। বৈদেশিক কোন ধর্ম্ম গ্রহণ করা অনুচিত বা অনাবশ্যক, এরূপ নিয়ম করিলে, ঐরূপ আরও একটি নিয়ম করিতে হয়, যে, বৈদেশিক সাহিত্য প্রভৃতির প্রভাব অনুভব করা, তাহার দ্বারা উপকৃত হওয়া, তাহা উপভোগ করা অনুচিত ও অনাবশ্যক। কিন্তু তদ্রূপ নিয়মের অনুসরণ কোন চিন্তাশীল ব্যক্তিই করিতে পারেন না। অবশ্য, প্রত্যেক দেশের লোকেরই দর্শন সাহিত্য প্রভৃতি ক্ষেত্রে নিজেদের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী নূতন কিছু করা উচিত। প্রত্যেক দেশের সাহিত্যিক ও অন্যবিধ সৃষ্টিতে অন্য কোন কোন দেশের প্রভাব লক্ষিত হইতে পারে। কিন্তু তাহার দ্বারা কোন জাতির সৃষ্ট বস্তুর বৈশিষ্ট্য লোপ পায় না।

ধর্ম্ম সম্বন্ধেও এরূপ কথা কতকটা খাটে। ইউরোপ ও আমেরিকার অধিকাংশ লোক খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম মানে, কিন্তু তাহা ঠিক্ ইহুদী দেশে জাত প্রাচীন খ্রীষ্টীয় উপদেশ নহে। তাহার উপর অন্য দার্শনিক ও ধার্ম্মিক মতের প্রভাব পড়ায় তাহা পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মমত যতটা পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, মুসলমানদের ধর্ম্মমত ততটা পরিবর্ত্তিত হয় নাই। খ্রীষ্টিয়ানরা জ্ঞাতসারে ও অজ্ঞাতসারে অন্য কোন কোন ধর্ম্মের মত অনুষ্ঠান রীতিনীতি যতটা লইয়াছেন ও লইতে প্রস্তুত, মুসলমানেরা ততটা নহে। তথাপি, ইহা সত্য, যে, ভারতবর্ষে মুসলমানদের ধর্ম্ম এবং পারিবারিক ও সামাজিক প্রথা অনুষ্ঠানাদির উপর তাহাদের প্রতিবেশী হিন্দুদের মত বিশ্বাস আচার অনুষ্ঠান রীতিনীতির প্রভাব কিছু পড়িয়াছে। অবশ্য, কোরান ও হাদিস আরব দেশে যাহা, ভারতবর্ষেও তাহাই। কিন্তু আরব দেশের মুসলমানের এবং ভারতবর্ষের মুসলমানের ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক জীবন ঠিক্ এক রকম নয়, ঠিক এক রকম অলিখিত মত, বিশ্বাস, আদর্শ ও রীতিনীতির দ্বারা নিয়মিত নহে।

হিন্দুধর্ম্ম এবং হিন্দুর বাস্তব জীবনের উপরও খ্রীষ্টীয় ও মোহম্মদীয় প্রভাব পড়িয়াছে—যেমন প্রাচীনকালে তাহার উপর বৌদ্ধ প্রভাব পড়িয়াছিল। ইহা অনিবার্য্য এবং ইহার দ্বারা হিন্দুত্বের বৈশিষ্ট্য লুপ্ত হয় নাই, হইতে পারে না।

আমরা যে-কারণে ভারতবর্ষের লোকদের পক্ষে বৈদেশিক কোন ধর্ম্ম গ্রহণ অনাবশ্যক বলিয়াছি, তাহা এই, যে, কোন বৈদেশিক ধর্ম্মে এমন কোন প্রধান, শ্রেষ্ঠ এবং সকল মানুষের গ্রহণযোগ্য উপদেশ ও আদর্শ নাই, যাহা ভারতবর্ষের কোন-না-কোন ধর্ম্মে পাওয়া যায় না, কিংবা ভারতবর্ষের কোন-না-কোন ধর্ম্মের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া তাহার অঙ্গীভূত করা যায় না। এরূপ কথা বৈদেশিক ধর্ম্মগুলির সম্বন্ধেও বলা যায় কি-না, তাহা সেগুলির অনুসরণকারীরা বিবেচনা করিবেন। আমাদের পক্ষে যাহা বিবেচ্য, তাহা আমরা বলিলাম, এবং আমরা যাহা বলিলাম তাহা সত্য হইলে (সত্য বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস) বৈদেশিক কোন ধর্ম্ম গ্রহণ ভারতীয়দের পক্ষে অনাবশ্যক।

ভারতবর্ষের যাঁহারা স্থায়ী বাসিন্দা—বিশেষতঃ যাঁহারা পুরুষানুক্রমে স্থায়ী বাসিন্দা—তাঁহাদের ধর্ম্ম ভারতীয় হউক বা বৈদেশিকই হউক, রাষ্ট্রীয় স্বাজাতিকতা, স্বদেশপ্রীতি ও স্বদেশহিতৈষণা তাঁহাদের সকলেরই হইতে পারে; এবং বৈদেশিকধর্ম্মাবলম্বী অনেক ভারতীয়ের তাহা আছে বলিলে আমরা তাহার প্রতিবাদ করিতে অসমর্থ।

রাষ্ট্রীয় দিক্ দিয়া ভারতবর্ষের প্রতি এই যে মনের ভাব, ইহা ছাড়া ভারতবর্ষের প্রতি ভারতীয় কোন-না-

কোন ধর্ম্মাবলম্বী আমাদের আর একটি ভাব আছে। ভারতবর্ষই আমাদের ধর্ম্মের উৎপত্তিস্থান এবং আমাদের সাধুসাধ্বী সাধক-সাধিকাদের ও আমাদের বীরাঙ্গনা, বীর পুরুষ, কবি, সাহিত্যিক, দার্শনিক, শিল্পী, বৈজ্ঞানিক প্রভৃতির কর্ম্মভূমি বলিয়া আমরা ভারতবর্ষকে পৃথিবীর অন্য কোন দেশ অপেক্ষা নিকৃষ্ট মনে করি না। জন্মিবার, মরিবার, পঞ্চভূতে দেহ মিলাইবার স্থাননির্ব্বাচনের অধিকার আমাদিগকে দিলে আমরা ভারতবর্ষের বাহিরের কোন স্থান নির্ব্বাচন করিতে পারি না।

—

মহাত্মা গান্ধীর বিলাত যাত্রা

গোলটেবিল বৈঠকে যোগ দিবার জন্য মহাত্মা গান্ধী বিলাত গিয়াছেন এবং 'প্রবাসী'র বর্ত্তমান সংখ্যা বাহির হইবার পূর্ব্বেই সেখানে পৌছিবেন। তিনি গোলটেবিল বৈঠকে যোগ দিতে যাওয়ায় ভালই হইয়াছে। ভাল হইয়াছে, এজন্য বলিতেছি না, যে, ভারতবর্ষের জন্য স্বাধীনতার যে দাবি তিনি করিবেন, ইংরেজদের তিন রাজনৈতিক দলের লোক তাহা মানিয়া লইবে। সেরূপ আশা আমরা করি না। গান্ধীজীও জাহাজে উঠিবার আগে এবং জাহাজে যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার এরূপ কোন আশা থাকার কথা বলেন নাই। অবশ্য যাহা আশা করা যায় না, কখন কখন তাহাও ঘটে। এক্ষেত্রে তাহা ঘটিলে সুখের বিষয় হইবে। গান্ধীজী গোলটেবিল বৈঠকে যোগ দিতে যাওয়ায় আমরা যে-কারণে সন্তুষ্ট হইয়াছি, বলিতেছি। তিনি ভারতবর্ষের জন্য যে-প্রকার স্বাধীনতা যতটা চান, এদেশের ও বিদেশের অনেকে তার চেয়ে কিছু ভিন্ন রকমের ও বেশী স্বাধীনতা চাহিতে পারেন। অথবা স্বাধীনতা শব্দটি ব্যবহার না করিয়া স্বরাজ কিংবা রাষ্ট্রীয় আত্মকর্ত্তৃত্ব শব্দ প্রয়োগ করিলে তাহা এক্ষেত্রে অধিকতর উপযোগী বিবেচিত হইতে পারে। কিন্তু মহাত্মার মতাবলম্বী লোক ভারতবর্ষে যত আছে, অন্য কাহারও মতাবলম্বী লোক তত নাই; এবং তিনি কয়েক বৎসর ধরিয়া তাঁহার মতানুবর্ত্তী কংগ্রেস ও কংগ্রেসওয়ালা-দিগকে যেরূপ দক্ষতার সহিত কর্ম্মে নিযুক্ত রাখিয়া পরিচালিত করিয়াছেন, আর কেহ তাহা পারেন নাই। কংগ্রেসকে ভারতবর্ষের স্বরাজ বিরোধী ইংরেজরা চরমপন্থী মনে করে বটে। কিন্তু কংগ্রেসের চেয়ে চরমপন্থী দল আছে। অতএব, ইহা বলা অন্যায় হইবে না, যে, কংগ্রেস ভারতবর্ষে সকলের চেয়ে বড় ও প্রবল মধ্যপন্থীর দল। মহাত্মা গান্ধী এই কংগ্রেসের মত গোলটেবিল বৈঠকে উপস্থিত করিবেন। তাহা হইতে পৃথিবীর স্বাধীন ও স্বাধীনতাপ্রিয় লোকেরা বুঝিতে পারিবে, ভারতবর্ষের অধিকাংশ রাজনৈতিকবোধবিশিষ্ট লোকেরা কি চায়। কেহ বলিতে পারেন, গান্ধীজী ত ভারতবর্ষেই অনেকবার কংগ্রেসের ও নিজের মত ব্যক্ত করিয়াছেন; তাহা করিবার জন্য লণ্ডন যাইবার কি প্রয়োজন ছিল? প্রয়োজন এই, যে, ভারতবর্ষে তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহা পৃথিবীর সর্ব্বত্র না পৌছিয়া থাকিতে পারে। গোলটেবিল বৈঠক একটি বিশেষ উপলক্ষ্য। ইহার উপর পৃথিবীর সব সভ্য দেশের লোকের লক্ষ্য থাকিবে, সেখানে কি হইতেছে সবাই জানিতে চাহিবে; এবং ভারতবর্ষ হইতে পৃথিবীর সব দেশে সব কথা টেলিগ্রাফ চিঠি প্রভৃতি দ্বারা পাঠাইবার যেরূপ বাধা আছে, ইংলণ্ড হইতে পাঠাইবার সেরূপ বাধা নাই। এই জন্য মহাত্মাজীর ভারতবর্ষে উচ্চারিত যে-সব কথা সকল সভ্য দেশে পৌছে নাই, গোলটেবিল বৈঠকে উচ্চারিত সে-সব কথা সকল সভ্য দেশে পৌছিতে পারে। কংগ্রেস ও গান্ধী মহাশয় এখানে যাহা দাবি করিয়াছেন, গবন্মেণ্ট তাহাতে রাজী কি গররাজী তাহা বলিতে বাধ্য ছিলেন না, বলেনও নাই। কিন্তু গোল-টেবিল বৈঠকে তিন বিলাতী দলের প্রতিনিধিদিগকে বলিতে হইবে, তাঁহারা কংগ্রেসের দাবিতে রাজী কি-না। তাঁহাদের সম্মতি বা অসম্মতির সংবাদও কংগ্রেসের দাবির সহিত পৃথিবীর সকল সভ্য দেশে পৌছিবে তাঁহারা রাজী হইলে উত্তম। না-হইলে পৃথিবীর স্বাধীন ও স্বাধীনতাপ্রিয় লোকেরা বুঝিবে, যে, কংগ্রেসের মত শান্তিপ্রিয় অহিংস মধ্যপন্থী অথচ প্রবলতম ও সংখ্যাভূয়িষ্ঠ দলের মাঝারি গোছের দাবিতেও ইংরেজ জাতি কর্ণপাত করিল না। এরূপ হইলে পৃথিবীর এই স্বাধীন ও স্বাধীনতাপ্রিয় লোকদের মত আমাদের পক্ষে

হইতে পারে এবং তাহার প্রভাব ইংরেজ জাতির উপর পড়িবে।

কেহ যদি বলেন, এটা কিছু বড় লাভ নয়, তাহার প্রতিবাদ আমরা করিব না। আমরা বুঝি, ভারতবর্ষের পূর্ণস্বরাজ প্রতিষ্ঠা ভারতীয়দিগকে ভারতবর্ষে চেষ্টা করিয়াই করিতে হইবে। কিন্তু যদি সে চেষ্টায় বিদেশীদের অনুকূল মতের সমর্থন পায়, তাহার কোনই মূল্য নাই মনে করি না।

মহাত্মাজীর গোলটেবিল বৈঠকে যোগদান হইতে যদি ভারতবর্ষ স্বরাজ পায়, তাহা ত পরমলাভ; কিন্তু যদি না পায়, তাহাও লাভ। কারণ, সত্য জানার চেয়ে বড় লাভ আর নাই। তখন বুঝিতে হইবে স্বরাজলাভ-চেষ্টার এক অধ্যায় শেষ হইল, পরবর্ত্তী অধ্যায়কে দৃঢ়তর প্রতিজ্ঞা, মহত্তর ত্যাগ ও দুঃখস্বীকার এবং অভূতপূর্ব্ব আত্মোৎসর্গে পূর্ণ করিতে হইবে। অনিশ্চয়ের অবস্থায় থাকিলে কর্ত্তব্যনির্দ্ধারণ করিতে পারা যায় না এবং কর্ত্তব্য করিবার জন্য প্রস্তুত হওয়াও যায় না।

—

গোলটেবিল বৈঠকের কাজে মহাত্মাজী সম্বন্ধে আশঙ্কা

"রাজপুতানা" নামক যে জাহাজে মহাত্মা গান্ধী বিলাত যাইতেছেন, তাহা এডেন পৌঁছিলে রয়টারের একজন সংবাদ-সংগ্রাহক লণ্ডনে মহাত্মাজীর কার্য্যতালিকা সম্বন্ধে প্রশ্ন করেন। উত্তরে গান্ধীজী বলেন, "আমি এমন একটি কন্সটিটিউশন (রাষ্ট্রীয় কার্য্যনির্ব্বাহ-বিধি) পাইতে চেষ্টা করিব যাহা ভারতবর্ষকে সমুদয় দাসত্ব ও মুরুব্বিয়ানা হইতে মুক্ত করিবে, এবং তাহাকে, প্রয়োজন হইলে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সংস্রব ত্যাগ করিবার অধিকার দিবে। আমি ভারতবর্ষের এরূপ অবস্থার জন্য খাটিব যাহাতে দরিদ্রতম ব্যক্তিরাও অনুভব করিবে যে, ইহা তাহাদের দেশ এবং ইহা গড়িতে তাহাদের মতের প্রভাব কার্য্যতঃ অনুভূত হইবে—এরূপ ভারতবর্ষ যাহাতে উচ্চ শ্রেণীর ও নিম্ন শ্রেণীর লোক বলিয়া প্রভেদ থাকিবে না, এরূপ ভারতবর্ষ যাহাতে সকল সমাজের লোক সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যে বাস করিবে। এরূপ ভারতবর্ষে অস্পৃশ্যতা-রূপ অভিসম্পাতের কিংবা মাদকদ্রব্য-রূপ অভিশাপের স্থান থাকিবে না। নারীরা পুরুষদের সমান অধিকার ভোগ করিবেন। যেহেতু আমরা পৃথিবীর সমুদয় অবশিষ্ট অংশের সহিত শান্তিতে থাকিব—কোন দেশকে আমাদের স্বার্থসিদ্ধির উপায় করিব না এবং কোন দেশকে আমাদের দেশকে তাহার স্বার্থসিদ্ধির উপায় রূপে ব্যবহার করিতে দিব না, সেই জন্য আমাদের সৈন্যদলকে যতটা সম্ভব ছোট করা হইবে। ভারতীয় মূক জনসাধারণের অধিকার সুবিধাস্বার্থের অবিরোধী, দেশী বা বিদেশী লোকদের এরূপ অধিকার স্বার্থ সুবিধা যাহা, তাহা সর্ব্বপ্রযত্নে রক্ষিত হইবে। ব্যক্তিগত ভাবে আমি দেশী ও বিদেশীর প্রভেদ করি না। ইহাই আমার স্বপ্নের ভারতবর্ষ, যাহার জন্য আমি গোলটেবিল বৈঠকে লড়িব। আমার চেষ্টা ব্যর্থ হইতে পারে; কিন্তু যদি আমাকে কংগ্রেসের বিশ্বাসপাত্র থাকিতে হয়, তাহা হইলে আমি ইহার কম কিছুতে সন্তুষ্ট হইব না।"

ভারতবর্ষে এমন লোক আছেন, যাঁহারা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সহিত ভারতবর্ষের সংস্রব ত্যাগের অধিকার মুখের কথায় বা কাগজের লেখায় পাইলে সন্তুষ্ট হইবেন না, যাঁহারা প্রথম হইতেই কার্য্যতঃ ভারতবর্ষ ও ইংলণ্ডের পৃথক অস্তিত্ব চান। এমন লোক আছেন, যাঁহারা রাষ্ট্রীয় কার্য্যনির্ব্বাহ-বিধিতে আরও এমন কিছু চান যাহা গান্ধীজী বলেন নাই। কিন্তু, আমাদের মতে, গান্ধীজী যাহা বলিয়াছেন তাহা পাইলেই আপাততঃ ভারতবর্ষের স্বরাজের ভিত্তি স্থাপিত হইতে পারিবে।

আমাদের আশঙ্কা এই, যে, গান্ধীজী যে-সকল ভারতীয় লোকের দ্বারা বেষ্টিত থাকিবেন এবং যে-সব ইংরেজের সহিত তাঁহাকে কাজ করিতে হইবে, তিনি তাঁহাদের প্রভাব হইতে আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ না হইতেও পারেন। তাঁহার পরিবেষ্টকদের প্রভাবে তিনি হয়ত এমন রফায় রাজী হইয়া পড়িবেন, যাহা তাঁহার পূর্ব্ববর্ণিত স্বপ্নের ভারতবর্ষ হইতে অনেকটা পৃথক অবস্থা উৎপন্ন করিতে পারে। বিলাত যাইবার আগে ভারত গবর্মেণ্টের সহিত তাঁহার যে বুঝাপড়া হইয়াছে

তিনি নিজেই বলিয়াছেন, পণ্ডিত জবাহরলাল সিমলায় থাকিয়া জেদ না ধরিলে, সেই বুঝাপড়া আরও অসন্তোষ-জনক হইত। সেই জন্য রফার কথা উঠিলে মহাত্মাজীর কাছে পরামর্শদাতা শক্ত লোক থাকা দরকার। তিনি নিজে দৃঢ়চিত্ত বটেন। কিন্তু হাজার হউক, তিনি মানুষ, কখন কখন তিনি বিভ্রান্ত এবং দুর্ব্বল হইয়া পড়িতে পারেন। তা ছাড়া, তিনি নিজেই স্বীকার করিয়াছেন তিনি প্রতিপক্ষের সদাশয়তায় বিশ্বাসবান্। যাঁহারা কোন একটা মীমাংসায় উপনীত হইবার জন্য প্রতিপক্ষের সহিত রাজনৈতিক কথাবার্ত্তা চালান তাঁহাদের প্রকৃতিতে এরূপ বিশ্বাসবত্তার আধিক্য সুবিধাজনক নহে! রফার কথা এখানে উল্লেখ করিলাম এই জন্য, যে, প্রতিপক্ষের সহিত আপোষে মীমাংসার দ্বারা স্বাধীনজনোচিত অধিকার পাইতে হইলে দাবি অপেক্ষা কমে রাজী হওয়া কখন কখন আবশ্যক হয়। স্বাধীনজনোচিত অধিকার পূর্ণমাত্রায় আপনাদের দাবি অনুযায়ী পাইতে হইলে তাহা শক্তির আধিক্য দ্বারা পাইতে হয়। সত্য বটে, এপর্য্যন্ত মানুষের ইতিহাসে শক্তির এই আধিক্য সশস্ত্র যুদ্ধ দ্বারা প্রমাণিত ও প্রতিষ্ঠিত হইয়া আসিয়াছে। কিন্তু অতীতে যাহা হইয়াছে, ভবিষ্যতে তাহা হইতে পৃথক কিছু নিশ্চয়ই হওয়া সম্ভব। অহিংস অসহযোগ এবং অহিংস বিদেশী পণ্যবর্জ্জন দ্বারা অধিকতর শক্তিমত্তা প্রমাণিত ও প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। এখনও তাহা হয় নাই, কিন্তু আবশ্যক হইলে ভবিষ্যতে হইবে।

—

কংগ্রেসের সহিত গবর্মেণ্টের দ্বিতীয় চুক্তি

কংগ্রেসের সহিত গবর্মেণ্টের প্রথম চুক্তি অনুসারে অসহযোগ আন্দোলন বন্ধ হইয়া আছে। আমাদের বিবেচনায় সেই চুক্তির সর্ত্তগুলি দেশের লোকদের পক্ষে সন্তোষজনক হয় নাই। তাহা যথাসময়ে বলিয়াছিলাম। দ্বিতীয় চুক্তি হওয়ায় মহাত্মাজী গোলটেবিল বৈঠকে যোগ দিবার নিমিত্ত বিলাত যাইতে পারিয়াছেন বটে; কিন্তু আমাদের বিবেচনায় এক্ষেত্রেও রাজনৈতিক চা'লে ডিপ্লোম্যাটিক দ্বন্দ্বে, কংগ্রেসের পরাজয় হইয়াছে।

মহাত্মাজীর প্রমুখাৎ কংগ্রেস চাহিয়াছিলেন, নানা প্রদেশে রাজকর্ম্মচারীদের দ্বারা প্রথম চুক্তিভঙ্গের কংগ্রেস কর্তৃক বর্ণিত অভিযোগসমূহ-সম্বন্ধে নিরপেক্ষ সালিসের দ্বারা বিচার। কংগ্রেস পাইয়াছেন, ভারতবর্ষের বোম্বাই প্রদেশের গুজরাট অঞ্চলের সুরাট জেলার বারদোলি মহকুমার এগারটি গ্রামের ভূমির খাজনা সরকারী কর্ম্মচারীরা বলপূর্ব্বক বেশী আদায় করিয়াছে কি-না সে বিষয়ে গবর্মেণ্টেরই একজন কালেক্টর গর্ডন সাহেবের দ্বারা তদন্ত। মহাত্মা গান্ধী ইহাতেই সন্তুষ্ট হইয়াছেন; অগত্যা সন্তুষ্ট হইয়াছেন কি-না, জানা যায় নাই। তিনি বারদোলির ব্যাপারটির তদন্তের ফলের দ্বারা কংগ্রেসের সমুদয় অভিযোগের কতকটা পরখ হইবে মনে করিয়া থাকিতে পারেন। কিন্তু সব জায়গার অভিযোগ এক রকম নহে। সুতরাং বারদোলির অভিযোগ সত্য বা মিথ্যা বলিয়া প্রমাণিত হইলে অন্যান্য স্থানের অভিযোগগুলাও সত্য বা মিথ্যা বলিয়া মানিয়া লওয়া যাইবে না।

আমরা এরূপ মনে করি না—মনে করিলে বলিতাম যে, গান্ধী মহাশয় কেবল বারদোলি সম্বন্ধে তদন্তে রাজী হইয়া জ্ঞাতসারে ভারতবর্ষের অন্য সব প্রদেশ ও স্থানের প্রতি তাচ্ছিল্য প্রদর্শন করিয়াছেন। কিন্তু তিনি ও তাঁহার ভক্ত কংগ্রেসওয়ালারা যাহাই মনে করিয়া থাকুন, অন্য ভারতীয় লোকদের কাছে চুক্তিটির মানে এইরূপ দাঁড়ান আশ্চর্য্যের বিষয় হইবে না, যে, বারদোলির এগারটি গ্রামের কৃষিজীবীদের (চুক্তিভঙ্গজনিত) দুঃখ ভারতবর্ষের অন্য সব জায়গার তদ্বিধ দুঃখসমষ্টি অপেক্ষা গুরুতর এবং মহাত্মাজীর ও কংগ্রেসের পক্ষে অধিকতর পীড়াদায়ক হইয়াছে। সরকারী ও বেসরকারী ইংরেজদের কাছে দ্বিতীয় চুক্তিটির মানে অন্য এইরূপও দাঁড়াইতে পারে, যে, বারদোলির কয়েকটি গাঁয়ের অভিযোগগুলা ছাড়া আর সমস্ত অভিযোগ এতই অমূলক, যে, মিস্টার গান্ধী তৎসমুদয়ের তদন্ত সম্বন্ধে বেশী জেদ করিতে সাহস করেন নাই। কোন ইংরেজ এরূপ অনুমান করিলে তাহা অবশ্য মিথ্যা অনুমান।

এরূপ কথা আমরা শুনিয়াছি, যে, বারদোলি সম্বন্ধে মহাত্মাজী বেশী জেদ করিয়াছেন এইজন্য, যে, তথাকার অভিযোগ সম্বন্ধে সমুদয় প্রমাণ তাঁহার বা সর্দ্দার পটেলের হাতে ছিল ও আছে। কিন্তু অন্য সব জায়গার না হউক, অনেক জায়গারই, সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য কংগ্রেসওয়ালাদের দ্বারা প্রমাণিত হইতে পারিত, এমন অভিযোগও বিস্তর আছে।

—

কংগ্রেসের অভিযোগ-পত্র ও বঙ্গদেশ

গবন্মেণ্ট কর্ত্তৃক চুক্তিভঙ্গ সম্বন্ধে কংগ্রেস যে অভিযোগ-পত্র প্রস্তুত করিয়াছেন, তাহা গত ১০শে আগষ্ট তারিখের ইয়ং ইণ্ডিয়া কাগজে মহাত্মা গান্ধী প্রকাশ করিয়াছিলেন। গবন্মেণ্ট যখন উহার অধিকাংশ দফা সম্বন্ধেই কোন তদন্ত করিবেন না, তখন আমাদের উহার আলোচনা করিবার কোন প্রয়োজন নাই। তাহা করিবার মত সম্যক্ জ্ঞানও আমাদের নাই। আমরা কাগজ পড়িয়া বাংলা দেশ সম্বন্ধেই অল্প কিছু জানি; কংগ্রেস কর্ম্মী বা কোন কংগ্রেস কমিটির সভ্য হইলে আরও কিছু জানিতে পারিতাম। যাহা হউক, বাংলা দেশে গবন্মেণ্ট দ্বারা চুক্তিভঙ্গ যতটা হইয়াছে বলিয়া আমাদের ধারণা, কংগ্রেসের অভিযোগ-পত্রে তাহার তুলনায় বঙ্গের উল্লেখ অতি সামান্যই আছে দেখিতেছি। অভিযোগ-পত্রটি ইয়ং ইণ্ডিয়ার প্রায় চারিপৃষ্ঠাব্যাপী। উহাতে ৫০২ লাইন লেখা আছে। তাহার মধ্যে বাংলা দেশের উল্লেখ কেবল দু জায়গায় এইরূপ আছে :—

Bengal—peaceful picketers were severely assaulted at Paglarhat near Calcutta.

In Bengal—workers doing peaceful constructive work have been arrested at Contai.

বাংলা দেশটা নিতান্ত ছোট নয়। ব্রিটিশ ভারতের লোকসমষ্টির পঞ্চমাংশ পাঁচ কোটি লোক এখানে বাস করে। এখানকার কংগ্রেস কর্ত্তৃপক্ষ কিংবা কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটিতে বঙ্গের প্রতিনিধিদ্বয় কি অভিযোগ-প্রণেতাদের হাতে বাংলা দেশে চুক্তিভঙ্গ সম্বন্ধে যথেষ্ট উপাদান দেন নাই? অথবা প্রণেতাগণ বঙ্গের অনেক অভিযোগ পাইয়াও সামান্য দুটি ছাড়া অন্যগুলির উল্লেখ করেন নাই? ইহাও হইতে পারে যে, বঙ্গের কংগ্রেস-ওয়ালারা কংগ্রেসের প্রকৃত কাজ সম্বন্ধে উদাসীন এবং দলাদলিতে পরম উৎসাহে প্রবৃত্ত থাকায় গবন্মেণ্ট কর্ত্তৃক এখানে চুক্তিভঙ্গের বেশী উপলক্ষ্য ঘটে নাই।

বাংলাদেশের একটা বিষয় উল্লেখ অভিযোগ-পত্রে নিশ্চয় থাকা উচিত ছিল, কিন্তু তাহা নাই। তাহা ছাত্রদের নিকট হইতে ভবিষ্যতে অসহযোগ আন্দোলনে যোগ না-দিবার অঙ্গীকারপত্র গ্রহণ, তাহা না দিলে ছাত্রদিগকে ভর্ত্তি না-করা, ইত্যাদি। ইয়ং ইণ্ডিয়ায় প্রকাশিত অভিযোগ-পত্রে এই বিষয়ে উনত্রিশ পংক্তি বর্ণনা আছে। তাহাতে আসাম, আহমদাবাদ, আঙ্কোলা, আজমের-মেরোয়ারা, আগ্রা-অযোধ্যা এবং দিল্লীতে ছাত্রদের প্রতি কিরূপ ব্যবহার হইয়াছে লিখিত আছে। বঙ্গের কোন উল্লেখ নাই। কিন্তু বাঙালী ছাত্রেরা এবং বাঙালী সংবাদপত্র-পাঠকেরা জানেন, বাংলা দেশের কতকগুলি স্কুল ও কলেজে অসহযোগ আন্দোলনের সহিত সংশ্লিষ্ট ছাত্রদিগকে ভর্ত্তি করা সম্বন্ধে কিরূপ ব্যবহার হইয়াছিল।

—

ইংলণ্ডে গবন্মেণ্ট পরিবর্ত্তন

ইংলণ্ডে যখন পার্লেমেণ্টের সভ্যদের নূতন করিয়া সাধারণ নির্ব্বাচন হয়, তখন সেই নির্ব্বাচনের ফলে যে রাজনৈতিক দলের বেশী সভ্য নির্ব্বাচিত হয়, সেই দল মন্ত্রীমণ্ডল গঠন করে। এই মন্ত্রীমণ্ডলকে তথাকার "গবন্মেণ্ট" বলে। এই গবন্মেণ্ট কোন গুরুতর ভুল বা অক্ষমতা বশতঃ হাউস অব কমন্সের বিশ্বাস হারাইলে এবং তাহার প্রমাণ স্বরূপ কোন গুরুতর বিষয়ে ভোটে হারিয়া গেলে, আবার নূতন সাধারণ নির্ব্বাচন হয়। সেই নির্ব্বাচনে যে-দলের সভ্যসংখ্যা বেশী হয়, তাহারা নূতন মন্ত্রীমণ্ডল গঠন করে। ইহা হয় নূতন "গবন্মেণ্ট।" সাধারণ নির্ব্বাচন ব্যতিরেকেও কখন কখন নূতন মন্ত্রীমণ্ডল ও গবন্মেণ্ট গঠিত হইতে পারে। সম্প্রতি তাহা হইয়াছে। এই পরিবর্ত্তনে ভারতবর্ষের লাভালাভের কথা উঠিয়াছে।

যতদিন শ্রমিক দলের গবন্মেণ্ট ছিল, ততদিন

তাঁহারা এমন কিছু কার্য্যতঃ করেন নাই যাহার দ্বারা বুঝা যায়, যে, তাঁহারা, উদারনৈতিক ও রক্ষণশীল দল রাজী না হইলেও, ভারতবর্ষকে স্বরাজ দিবার চেষ্টা করিবেন। বরং ইহাই বুঝা গিয়াছিল, যে, উক্ত দুই দলের সহিত একযোগে যাহা করা যায় তাহাই তাঁহারা করিবেন। এখন তিন দলের লোক লইয়া মন্ত্রীমণ্ডল ও গবর্ন্মেণ্ট গঠিত হইয়াছে—যদিও মন্ত্রীদের মধ্যে রক্ষণশীলদের সংখ্যাই বেশী। সুতরাং এখনও সেই আগেকার নীতিই অনুসৃত হইতে পারিবে; তিন দলে যাহা করিতে চাহিবেন, তাহাই হইবে। সুতরাং গবর্ন্মেণ্ট পরিবর্ত্তনে ভারতবর্ষের বিশেষ ক্ষতিবৃদ্ধি হইবে মনে হয় না। কেবল পার্লেমেণ্টে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তর্কবিতর্ক হইলে, একটু তফাৎ এই হইতে পারে, যে, শ্রমিক দলের যে-সব পার্লেমেণ্ট সভ্য, গবর্ন্মেণ্ট তাঁহাদের বলিয়া, আগে দলের খাতিরে মন খুলিয়া কথা বলিতেন না, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ এখন দু-চারটা চোখাচোখা বাক্যবাণ ছাড়িতে পারেন।

—

আক্রান্ত বা নিহত রাজভৃত্যের তালিকা

মিস্টার ওয়েজউড বেন্ ভারতসচিব থাকিবার সময় ভারতবর্ষে একটা নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কত জন রাজকর্ম্মচারী আক্রান্ত বা হত হইয়াছিল, তাহার একটা তালিকা প্রকাশ করিয়াছিলেন। এরূপ তালিকা এ দেশেও প্রকাশিত হইয়াছিল। সম্প্রতি মুদ্রাযন্ত্র এবং খবরের কাগজগুলিকে সরকারী আয়ত্তের অধিকতর অধীন রাখিবার জন্য যে আইনের খসড়া ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় উপস্থিত করা হইয়াছে, তাহার প্রয়োজন প্রমাণ করিবার জন্যও ঐরূপ কিন্তু তদপেক্ষা দীর্ঘতর একটি তালিকা প্রকাশিত হইয়াছে। অনুমান হয়, এইরূপ তালিকাগুলি ইহাই দেখাইবার জন্য প্রণীত হয়, যে, দেশের লোক বা দেশের এক দল লোক সশস্ত্র বলপ্রয়োগ দ্বারা গবর্ন্মেণ্টের উচ্ছেদসাধন করিবার জন্য কিরূপ চেষ্টা করিতেছে।

রাজকর্ম্মচারীদিগকে যাহারা হত্যা বা হত্যার চেষ্টা করে, তাহারা একই দলের বা সমান উদ্দেশ্য বিশিষ্ট ভিন্ন ভিন্ন দলের লোক কি-না, এবং প্রত্যেকটি হত্যা বা হত্যা-চেষ্টা গবর্ন্মেণ্টের বিরুদ্ধে অভিপ্রেত কি-না, সে বিষয়ে আমাদের কোন জ্ঞান নাই, থাকিবার কথাও নহে। হত্যা বা হত্যা-চেষ্টার উদ্দেশ্য যাহাই হউক, আইন-অনুসারে অপরাধী লোকদের শাস্তি হওয়া উচিত—উদ্দেশ্য রাজনৈতিক হইলেও শাস্তি হওয়া উচিত, না হইলেও শাস্তি হওয়া উচিত। আমাদের আলোচ্য এই, যে, রাজকর্ম্মচারী আক্রান্ত বা নিহত হইলেই যে অপরাধ রাজনৈতিক বলিয়াই ধরিয়া লওয়া হয়, তাহা সকল স্থলে ঠিক না হইতে পারে। রাজকর্ম্মচারী মাত্রেই যে-কোন কাজ করে, তাহাই রাজকর্ম্মচারীরূপে করে না। সুতরাং কোন রাজকর্ম্মচারী জনসমাজের একজন মানুষ হিসাবে ব্যক্তিগতভাবে (রাজকর্ম্মচারী রূপে নহে) যদি কোন অন্যায় কাজ করে, এবং যাহার প্রতি অন্যায় ব্যবহার করা হয়, সে কিংবা তাহার কোন আত্মীয় বা বন্ধু যদি অন্যায় আচরণের প্রতিশোধ লইতে গিয়া আইনভঙ্গ করে, তাহা হইলে সেই অপরাধটাকে রাজনৈতিক অপরাধ মনে করা উচিত নয়। অবশ্য, তাহা রাজনৈতিক অপরাধ না হইলেও, তাহার জন্য আইন অনুযায়ী শাস্তি হওয়া আবশ্যক। যদি কোন রাজকর্ম্মচারী নিজের পদের কাজ আইনবিরুদ্ধভাবে করিতে গিয়া অপরের প্রতি ভীষণ অত্যাচার করে, এবং তজ্জন্য প্রতিহিংসাবশে ঐ কর্ম্মচারীকে কেহ আক্রমণ করে, তাহা আইন অনুসারে দণ্ডনীয় হইলেও তাহাও রাজনৈতিক অপরাধ নহে, গবর্ন্মেণ্টের বিরুদ্ধে চেষ্টাও নহে; কারণ, গবর্ন্মেণ্ট ঐরূপ অত্যাচার করিবার আদেশ দেন নাই।

এই জন্য আমাদের মনে হয়, রাজকর্ম্মচারীদের হত্যা এবং হত্যা-চেষ্টার যতগুলি অপরাধ তালিকাভুক্ত করা হয়, সবগুলি গবর্ন্মেণ্টের উচ্ছেদসাধনের জন্য অভিপ্রেত বা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত না-হইতে পারে।

রাজকর্ম্মচারীদের বিরুদ্ধে প্রতিহিংসামূলক অপরাধ

কমাইবার জন্য বিচারপূর্ব্বক শাস্তিদান ব্যতীত অন্য উপায়ও অবলম্বিত হওয়া উচিত। তন্মধ্যে গবন্মেণ্ট যে-একটি উপায় অবলম্বন করিতে পারেন, তাহা এই, যে, বেসরকারী লোকদের বিরুদ্ধে নালিশ হইলে, তাহারা যেরূপ অপকর্ম্ম করিলে, তাহার বিচার ও শাস্তি হয়, সরকারী লোকদের বিরুদ্ধে সেইরূপ অপকর্ম্মের নালিশ হইলে তাহার বিচার ও শাস্তি তেমনি হইবে। সরকারী লোকদের এরূপ বিচার নিষিদ্ধ নহে—আইন অনুসারে তাহা হইতে পারে, কিন্তু সচরাচর হয় না। এ বিষয়ে কেবল যে গবন্মেণ্টের কর্ত্তব্য আছে তাহা নহে। যাহাদের প্রতি মন্দ ব্যবহার বা অত্যাচার হইয়াছে তাহাদের এবং সাক্ষীদের সাহসের সহিত প্রমাণ উপস্থিত করিতে পারা চাই। শুধু গবন্মেণ্টকে দোষ দিলে চলিবে না।

যে-সব হত্যাপরাধ ও হত্যাচেষ্টার অপরাধ আতঙ্ক-উৎপাদকদিগের (terrorists) কৃত রাজনৈতিক অপরাধ বলিয়া পরিগণিত হয়, তাহার কারণ ও উদ্দেশ্য দুই প্রকার বলিয়া অনুমিত হইয়াছে; প্রতিহিংসা এবং ভারতবর্ষকে স্বাধীন করিবার ইচ্ছা। কোন্ কোন্ অপরাধ, সংখ্যায় কত এরূপ অপরাধ, কোন্ উদ্দেশ্য ও কারণ হইতে উদ্ভূত, জানিবার উপায় নাই। কিন্তু এরূপ অপরাধের কারণ ও উদ্দেশ্য যাহাই হউক, উভয় শ্রেণীর অপরাধই আইন অনুসারে দণ্ডনীয়।

অসভ্য দেশসকলে এবং মানবজাতির ইতিহাসের অসভ্যযুগে কেহ কাহারও প্রতি অত্যাচার করিলে অত্যাচরিত ব্যক্তি নিজে বা তাহার কোন আত্মীয় বা বন্ধু অত্যাচারীকে শাস্তি দিত বা দিবার চেষ্টা করিত। সভ্য দেশে এবং সভ্য যুগে রাষ্ট্রশক্তি বিচারপূর্ব্বক শাস্তিদানের ভার নিজের হস্তে লইয়াছেন, এবং অসভ্যযুগে প্রচলিত ব্যক্তিগত প্রতিহিংসাকে বেআইনী এবং নীতিবিগর্হিত বলিয়া স্থির করিয়াছেন। শুনিয়াছি, শাস্তিবিজ্ঞানবিদেরা (penologists) বলেন, রাষ্ট্রশক্তি-কর্ত্তৃক বিচারপূর্ব্বক শাস্তিদানের উদ্দেশ্য, প্রতিশোধ দিবার সামাজিক ইচ্ছা চরিতার্থ করা, সামাজিক ন্যায়বোধকে তৃপ্ত করা, অপরাধীকে দণ্ডিত করিয়া ভয়োৎপাদন দ্বারা ঐ প্রকার অপরাধ হইতে অন্য লোকদিগকে নিবৃত্ত করা এবং দণ্ডিত ব্যক্তির মনে অনুতাপ উৎপাদন দ্বারা তাহার চরিত্রসংশোধনে সহায়তা করা। যে-সব সভ্যদেশে লোকমত প্রবল এবং তজ্জন্য রাষ্ট্রশক্তি দ্বারা সরকারী বেসরকারী সকল প্রকার অভিযুক্ত লোকদের বিচারপূর্ব্বক শাস্তি বা অব্যাহতির ব্যবস্থা করা হয়, সেখানে সরকারী বেসরকারী কাহাকেও সাক্ষাৎভাবে অত্যাচরিত বা অভিযোক্তার পক্ষ হইতে ব্যক্তিগতভাবে শাস্তি দিবার অসভ্য রীতি লোপ পাইয়াছে। ইংলণ্ড এইরূপ একটি সভ্য দেশ। অন্য সকল দেশ হইতেও অসভ্য দেশের ও যুগের ঐ রীতি কি অবস্থার প্রভাবে ও কি প্রকারে অন্তর্হিত হইতে পারে, ইহা হইতে তাহার আভাস পাওয়া যাইতে পারে।

দ্বিতীয় যে কারণ বা উদ্দেশ্যে আতঙ্ক-উৎপাদকদের দ্বারা সরকারী লোকদের হত্যা বা হত্যার চেষ্টা হয় বলিয়া অনুমিত হইয়া থাকে, তাহা রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা-লাভ। এরূপ অপরাধ নিবারণের নিমিত্ত, পুনঃ পুনঃ এই সত্য কথা বলা হইয়াছে, যে, ঐ উপায়ে কোনও দেশের স্বাধীনতা লাভের দৃষ্টান্ত ইতিহাসে পাওয়া যায় না। তদ্ভিন্ন ঐরূপ অপরাধকে গর্হিত বলিয়া নিন্দা বার-বার নানা কাগজে ও সভায় করা হইয়াছে, এবং অপরাধীদের চূড়ান্ত বা লঘুতর শাস্তিও হইয়াছে। ইংলণ্ডে এরূপ অপরাধ অনুষ্ঠিত হয় না। তাহা হইতে এই সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে, যে, রাজনৈতিক এই প্রকার অপরাধ নিবারণের আর এক উপায়, দেশের রাজনৈতিক অবস্থা ইংলণ্ডের এবং তত্তুল্য অন্যান্য স্বাধীন দেশের মত করা। গোলটেবিল বৈঠকে মহাত্মা গান্ধী ভারতবর্ষের পক্ষ হইতে যে রাষ্ট্রীয় দাবি উপস্থিত করিবেন, ইংলণ্ডের তিন রাজনৈতিক দলের লোকেরা তাহাতে রাজী হইলে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক অবস্থা কতকটা ইংলণ্ডের মত হইতে পারিবে।

—

বিলাতী গবন্মেণ্ট পরিবর্ত্তন হইতে শিক্ষা

ভারতবর্ষের স্বরাজলাভের বিরোধী ইংরেজরা

বলিয়া থাকে, ভারতীয়েরা নিজের দেশের কাজ চালাইবার ক্ষমতা পাইলে তাহা চালাইতে পারিবে না, নানা গুরুতর ভুল করিবে। ভুল যে করিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। সকল স্বাধীন দেশের লোকেই নিজেদের দেশের কাজ করিতে গিয়া মধ্যে মধ্যে ভুল করে। যে-ইংলণ্ডের লোকেরা আমাদের অক্ষমতা এবং ভ্রান্তিশীলতার ওজুহাতে আমাদের স্বরাজলাভে রাজী হয় না, তাহারাও ত মধ্যে মধ্যে অক্ষমতার ও ভ্রান্তিশীলতার পরিচয় দেয়। ইংলণ্ডে কত বার মন্ত্রীমণ্ডল বা গবর্ন্মেণ্টের পরিবর্ত্তন হইয়াছে, সম্প্রতিও হইয়াছে। এই পরিবর্ত্তনই একটি অকাট্য প্রমাণ, যে, ইংলণ্ডের শ্রেষ্ঠ রাজনীতিজ্ঞেরাও ভ্রম করে ও অক্ষমতার পরিচয় দেয়। আবার সে ভ্রম সংশোধিতও হয়; কারণ ইংলণ্ডের স্বাধীনতা আছে। আমাদের স্বাধীনতা থাকিলে আমরা যেমন ভ্রম করিব, তাহার সংশোধনও তেমনি করিতে পারিব। সুতরাং আমাদের ভুলচুকের সম্ভাবনা আমাদের স্বরাজপ্রাপ্তির ন্যায্য প্রতিবন্ধক হইতে পারে না।

—

কেশবচন্দ্র রায়

দিল্লীতে বিখ্যাত সাংবাদিক কেশবচন্দ্র রায় মহাশয়ের অকস্মাৎ মৃত্যুতে ভারতবর্ষের বিশেষ ক্ষতি হইল। তিনি এসোসিয়েটেড্ প্রেস্ নামক সংবাদ সংগ্রহ ও বিতরণের এজেন্সীর প্রধান কর্ম্মী ছিলেন। সংবাদ সংগ্রহে তাঁহার বিশেষ দক্ষতা ছিল। এসোসিয়েটেড প্রেস্ গবর্ন্মেণ্টের অনুগ্রহভাজন। এইজন্য ইহাকে অনেকটা সরকারের মন জোগাইয়া চলিতে হয়। কিন্তু তাহা হইলেও রায় মহাশয় নিজের স্বাধীনচিত্ততা বিসর্জ্জন দেন নাই। ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্যরূপে তিনি অনেকবার সরকারী বিলের এবং সরকারপক্ষ হইতে প্রকাশিত মতের বিরুদ্ধে নিজের মত প্রকাশ করিয়াছেন। সম্প্রতি গবর্ন্মেণ্ট দেশী সংবাদপত্রগুলির স্বাধীনতা বর্ত্তমান অপেক্ষাও সীমাবদ্ধ করিবার নিমিত্ত যে আইন করিতে উদ্যত হইয়াছেন, রায় মহাশয় বাঁচিয়া থাকিলে নিশ্চয়ই তাহার প্রতিকূল সমালোচনা করিতেন।

—

সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হ্রাস চেষ্টা

সকলেই জানেন, আমাদের দেশের খবরের কাগজগুলির সংবাদ প্রকাশ ও মত প্রকাশের স্বাধীনতা অনেক স্বাধীন দেশের চেয়ে খুব কম। তাহাদের যতটুকু স্বাধীনতা আছে, তাহা আরও কমাইবার জন্য দুটি আইন সম্প্রতি করিবার উদ্যোগ হইয়াছে। এদুটি আইন কোন-না-কোন প্রকারে পাস হইয়াও যাইবে। কেন-না, ব্যবস্থাপক সভার স্বাধীনচিত্ত ও দৃঢ়চিত্ত সদস্যের সংখ্যা এখন কম। তা ছাড়া, বড়লাট নিজের ক্ষমতাতেই আইনের মত বলবৎ অনেক অর্ডিন্যান্স জারি করিতে পারেন।

সংবাদপত্রসমূহের গলা টিপিয়া ধরিবার নিমিত্ত একটি আইন করিবার ওজুহাত এই, যে, অনেক খবরের কাগজ সাক্ষাৎ বা পরোক্ষ ভাবে রাজনৈতিক হত্যা ও হত্যাচেষ্টার প্ররোচনা দিয়া থাকে। এরূপ প্ররোচনা যাহারা সাক্ষাৎ বা পরোক্ষ ভাবে দেয়, তাহাদিগকে শাস্তি দিবার একাধিক উপায় বর্ত্তমানে কোন কোন আইনেই আছে; তাহার জন্য নূতন আইন করিবার প্রয়োজন নাই। দ্বিতীয় আপত্তি এই, যে, অতীত অভিজ্ঞতা হইতে জানা গিয়াছে, মুদ্রাযন্ত্র ও সংবাদপত্রের বিরুদ্ধে যে উদ্দেশ্যে যে আইন হয়, তাহা ঠিক সেই উদ্দেশ্যে প্রযুক্ত হয় না—মোটের উপর মুদ্রাযন্ত্র ও সংবাদপত্র দলনে প্রযুক্ত হয়। তৃতীয় আপত্তি, এরূপ আইনের বলে বিনা বিচারে সরকারের বিরাগভাজন মুদ্রাযন্ত্র ও সংবাদপত্রের নিকট বিস্তর টাকা জামীন লওয়া হয়, বিনা বিচারে তাহা বাজেয়াপ্ত হয়, এবং বিনা বিচারে ঐ মুদ্রাযন্ত্র ও সংবাদপত্রও বাজেয়াপ্ত এবং বন্ধ করিয়া দেওয়া যায়। পরে হাইকোর্টে আপীল আছে, কিন্তু ওরূপ আপীল অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য, এবং আপীলে একজন আপীলকারীরও অভীষ্ট সিদ্ধি হইয়াছে বলিয়া মনে পড়িতেছে না। এক আধবার হইয়াছে কি না জানি না। এরূপ আইন করা অনাবশ্যক ও অনুচিত। একান্ত যদি করিতেই হয়, তাহা হইলে জামিন চাহিবার, জামিন বাজেয়াপ্ত করিবার, এবং মুদ্রাযন্ত্র ও পুস্তকপত্রিকাদি বাজেয়াপ্ত করিবার ক্ষমতা ম্যাজিষ্ট্রেটদিগকে না দিয়া বিচার-বিভাগের বিচারক-

দিগকে দেওয়া উচিত, এবং সচিত্র বা অচিত্র খাঁটি সংবাদ প্রকাশ দণ্ডনীয় করা উচিত নয়।

সাক্ষাৎ বা পরোক্ষ ভাবে যে-সব কাগজ রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডে প্রশ্রয় দেয়, গবর্ন্মেণ্ট তাহা হইতে নানা লেখা উদ্ধৃত করিয়া একটি পুস্তিকা মুদ্রিত করিয়াছেন। ব্যবস্থাপক সভার সদস্যদিগকে তাহা দেওয়া হইয়াছে শুনিতেছি। তাহাতে শুধু অনুবাদ আছে, না দেশী ভাষায় লেখা মূল বাক্যগুলিও আছে, জানি না। কাহারও লেখা উদ্ধৃত করিলে তাহার সমগ্র বক্তব্য ও যুক্তি উদ্ধৃত করা উচিত। নতুবা, হত্যায় উৎসাহ দেওয়া মোটেই যাহার উদ্দেশ্য নহে, তাহাকেও হত্যার উৎসাহদাতা মনে করা যাইতে পারে। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ একজন মুসলমান ভদ্রলোকের এই বিষয়ে একটি কথা মনে পড়িল। তিনি বলিতেছিলেন তাঁহাদের শাস্ত্রে এরূপ মর্ম্মের কথা আছে: হস্তপদ প্রক্ষালন না করিয়া প্রার্থনা করিও না (Do not pray until you have washed your hands and feet)। এই বাক্যের অন্য সব কথা বাদ দিয়া কেহ যদি কেবল "Do not pray" ("প্রার্থনা করিও না") কথাগুলি উদ্ধৃত করে, তাহা হইলে সে বলিতে পারে, প্রার্থনা করা শাস্ত্রে নিষিদ্ধ বলা হইয়াছে।

সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হ্রাসের জন্য দ্বিতীয় যে আইনটি করিবার উদ্যোগ হইয়াছে, তাহা অর্ডিন্যান্সের আকারে বিদ্যমান আছে। অর্ডিন্যান্সের আয়ুও ছয় মাস। এইজন্য তাহার আয়ুঃশেষের পূর্ব্বেই আইনের দেহ ধারণ করিয়া তাহার জন্মান্তর পরিগ্রহের ব্যবস্থা হইতেছে। যাহাতে ভারতীয় সংবাদপত্রসকলের লেখা দ্বারা ইংলণ্ডের বিদেশী মিত্র রাজ্যের সহিত মনোমালিন্য না জন্মে, এই প্রস্তাবিত আইনটির উদ্দেশ্য তাহাই" বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। প্রধানতঃ আফগানিস্থান, এবং কতকটা পারস্যকে লক্ষ্য করিয়া এই আইন হইতেছে। ইহার সমতুল্য অর্ডিন্যান্স অনুসারে পাঞ্জাবের কোন কোন সম্পাদক দণ্ডিতও হইয়াছেন। সরকার পক্ষ হইতে বলা হইয়াছে, ইংলণ্ডে এইরূপ আইন আছে। ইহা অতি অদ্ভুত যুক্তি। ইংলণ্ডের রাজনৈতিক অবস্থা যেরূপ, ভারতের অবস্থা সেইরূপ হইলে এই যুক্তির কিছু সার্থকতা থাকিত। ইংলণ্ডের লোকদের রাষ্ট্রীয় সুবিধা ও অধিকারগুলি আমরা ভোগ করি না, করিতে পাইব না, কিন্তু আমাদিগকে অসুবিধা-গুলিই ভোগ করিতে হইবে, ইহা চমৎকার ব্যবস্থা! আর একটা কথাও ভাবিয়া দেখুন। ইংলণ্ডে এরূপ আইন থাকা সত্ত্বেও, তথাকার সম্পাদকেরা মিত্র অমিত্র ও নিরপেক্ষ সকল দেশের সব ব্যাপারের ইচ্ছানুরূপ স্বাধীন সমালোচনা করে; কিন্তু তাহার জন্য কোন সম্পাদকের বিচার বা শাস্তি হইয়াছে বলিয়া আমরা অবগত নহি। হইয়া থাকিলেও, তাহাদের সংখ্যা অত্যন্ত কম। কিন্তু ভারতবর্ষের অর্ডিন্যান্সটার জোরেই ইতিমধ্যেই কয়েকজন সম্পাদকের শাস্তি হইয়াছে।

ইংলণ্ডে এ বিষয়ে যে আইন আছে ভারতবর্ষে যে সেরূপ আইন থাকা উচিত নয়, তাহার একটা প্রধান কারণ, ইংলণ্ডে লোকমতের ও গবর্ন্মেণ্টের মতের যতটা ঐক্য আছে, ভারতবর্ষে তাহা নাই। ইংলণ্ডের লোকেরাই সেখানকার গবর্ন্মেণ্ট ভাঙে গড়ে। এইজন্য তথাকার কাগজে বিদেশ সম্বন্ধে যাহা লেখা হয়, তাহা কতকটা তথাকার গবর্ন্মেণ্টেরও মত বলিয়া বিদেশের লোকেরা ন্যায়তঃ মনে করিতে পারে। সুতরাং তথাকার সংবাদ-পত্রে প্রকাশিত কোন বিদেশী রাষ্ট্রসম্বন্ধীয় প্রতিকূল মত ঐ বিদেশী রাষ্ট্রের সহিত ইংলণ্ডের মনোমালিন্যের কারণ হইতে পারে। কিন্তু ভারতবর্ষের লোকমতের সহিত গবর্ন্মেণ্টের মতের ঐক্য ত নাই-ই, অনেক সময়েই সরকারী মত লোকমতের বিপরীত। সুতরাং ভারতবর্ষের কোন কাগজে আফগানিস্থান বা পারস্য বা অন্য দেশ সম্বন্ধে কোন লেখা বাহির হইলে, নিতান্ত নির্ব্বোধ ভিন্ন কেহ তাহাকে ইংরেজ গবর্ন্মেণ্টের মত মনে করিতে পারে না। সুতরাং তাহাতে ইংরেজ গবর্ন্মেণ্টের সঙ্গে উক্ত রাষ্ট্রের মনোমালিন্য জন্মিবার কোন ন্যায়সঙ্গত কারণ নাই।

এরূপ আইন করিবার অনুমিত প্রকৃত উদ্দেশ্য, আফগানিস্থানের ও পারস্যের বর্ত্তমান রাজাদিগকে খুশী রাখিয়া তাহাদের সহিত রুশিয়ার ঘনিষ্ঠতা নিবারণ।

আমরা ভারতীয় ব্রিটিশ গবর্ন্মেণ্টের ন্যায্য সমালোচনা

পূর্ণমাত্রায় করিতে গেলে আইন বাধা দেয়, ভারতীয় দেশী রাজাদের পূর্ণমাত্রায় সমালোচনাও আইন করিতে দেয় না। বিদেশী রাষ্ট্রের সমালোচনাও ভারতীয় সংবাদপত্রের পক্ষে বিপৎসঙ্কুল। সুতরাং ভারতীয় সম্পাদকদের বড়ই সুদিন উপস্থিত!

আগষ্ট মাসের 'মর্ডার্ণ রিভিউ" কাগজে রামমোহন রায়ের ফারসী কাগজ "মিরাৎ-উল-আখবার" তিনি কেন বন্ধ করিয়াছিলেন, সে বিষয়ে একটি প্রবন্ধ আছে। তাহা হইতে জানা যায়, আফগানিস্থান ও পারস্য দেশেও ঐ কাগজের গ্রাহক ছিল। রামমোহন রায় কোথাও অনাচার অত্যাচারের বিষয় অবগত হইলে তাহার সমালোচনা না-করিবার লোক ছিলেন না। সম্ভবতঃ তিনি "মিরাৎ-উল-আখবারে" আফগানিস্থানের ও পারস্যের রাজনৈতিক অবস্থার সমালোচনা করিয়া থাকিবেন। তখনকার "অনুন্নত" ভারতবর্ষে তাহার বিরুদ্ধে কোন আইন ছিল না। তখন হইতে এক শতাব্দীর ব্রিটিশ শাসনের গুণে "উন্নত" ভারতবর্ষে এখন ঐরূপ আইন হইতেছে। ইহা ভারতের রাষ্ট্রীয় প্রগতির একটি প্রমাণ!

নিজেদের দেশে উৎপীড়িত হইয়া, কিংবা নিজেদের দেশের শাসন-প্রণালীর পরিবর্ত্তন চেষ্টায় স্বদেশে স্থান না পাইয়া, কত বিদেশী লোক ইংলণ্ডে পলাইয়া আসিয়া স্বদেশের কুশাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলন করিয়াছেন। ইংলণ্ডের লোকমত ও আইন তাহাতে বাধা দেয় নাই। এইরূপই ত হওয়া চাই। মানুষ পরিবর্ত্তন চেষ্টায় স্বদেশেও কিছু করিতে পারিবে না, বিদেশ হইতেও কিছু করা চলিবে না;—পৃথিবীর অবস্থা এরূপ হইলে কোন দেশের ভাগ্যপরিবর্ত্তনের চেষ্টা কি মঙ্গলগ্রহ বা চন্দ্রলোক হইতে করিতে হইবে? স্বদেশ হইতে পলায়িত কুচক্রী লোক সকল জাতিরই অল্পাধিক থাকিতে পারে; কিন্তু তাহাদের কুচেষ্টা বিফল করিতে গিয়া, বিদেশে আশ্রয়প্রাপ্ত প্রকৃত স্বদেশভক্তদের কিংবা বিদেশী বন্ধুদের চেষ্টাও ব্যর্থ করা, আগাছা নষ্ট করিবার চেষ্টায় ক্ষেত্রের সমুদয় শস্য পুড়াইয়া ফেলার সমতুল্য।

—

"অসমীয়া হিন্দুদিগের বিবাহপদ্ধতি"

শ্রীযুক্ত বিজয়ভূষণ ঘোষ চৌধুরী উক্ত নাম দিয়া একখানি বই লিখিয়াছেন। ইহা অনেক পর্য্যটন ও অনুসন্ধানের ফল। ইহার ২৫২ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত মুদ্রিত হইয়াছে। অর্থাভাবে তিনি বাকী শতাধিক পৃষ্ঠা ছাপাইতে পারিতেছেন না। ইহা প্রকাশিত হইলে, বাংলা সাহিত্যভাণ্ডারে নানা তথ্যপূর্ণ একটি উৎকৃষ্ট বই বাড়িবে। ইহা পড়িতেও লোকের ভাল লাগিবে। গ্রন্থকার পুস্তকখানির মূল্য ১৸০ রাখিয়াছেন। ডাক-মাশুলাদির জন্ম আরও ।৷০ আনা ধরিলে ক্রেতারা উহা ২।০ আনায় পাইবেন। ষাট সত্তর জন ক্রেতা গ্রন্থকারকে আগাম মূল্য ২।০ করিয়া দিলে বইখানি সহজেই ছাপা হইয়া যাইতে পারে। গ্রন্থকারের ঠিকানা, গ্রাম ও ডাকঘর ঘাটেশ্বর, জেলা চব্বিশ পরগণা।

—

মিঃ সেন-গুপ্ত ও কলিকাতা মিউনিসিপালিটী

ডাঃ নারায়ণচন্দ্র রায় কলিকাতা মিউনিসিপালিটীর অন্যতম কৌন্সিলর ছিলেন। তিনি কারারুদ্ধ হওয়ায় তাঁহার স্থানে অন্য এক জন কৌন্সিলার অর্থাৎ কমিশনার নিয়োগের প্রয়োজন হইয়াছে। কলিকাতার ভূতপূর্ব্ব মেয়র শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সেন-গুপ্ত এই পদের প্রার্থী হইয়াছেন। মিউনিসিপালিটীর কাজের তাঁহার বহু বৎসরব্যাপী অভিজ্ঞতা আছে। তিনি দেশের কাজের জন্য অনেক ক্ষতি স্বীকার করিয়াছেন, এবং লোকহিতসাধনে অনেক সময় ও শক্তি নিয়োগ করেন। তিনি নির্ব্বাচিত হইলে উপযুক্ত ব্যক্তির গুণের আদর করা হইবে।

বাংলা দেশে কংগ্রেসের দুটি প্রধান দল আছে। এখন প্রধানতঃ সুভাষবাবুর দলের লোকদের দ্বারাই কলিকাতা মিউনিসিপালিটীর কাজ নির্ব্বাহিত হয় শুনিয়াছি। সব দেশেই এরূপ প্রতিষ্ঠানে কোন না-কোন দলের লোকের সাময়িক প্রাধান্য হইয়া থাকে। কিন্তু অন্য দলের লোকও থাকা আবশ্যক। কারণ, তাহা হইলে লোকের সকল বিষয়ে সব দিক্ জানিয়া

শুনিয়া একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার সুবিধা হয়। এই কারণেও সেন-গুপ্ত মহাশয়ের নির্ব্বাচন বাঞ্ছনীয়।

—

চট্টগ্রামের বিপন্ন লোকদের সাহায্য

চট্টগ্রামে সম্প্রতি যে লুণ্ঠন, গৃহদাহ, সম্পত্তিনাশ প্রভৃতি হইয়াছে, তাহাতে এক কোটি টাকার অধিক সম্পত্তি অপহৃত বা নষ্ট হইয়াছে বলিয়া হিসাব বাহির হইয়াছে। বহুসংখ্যক হিন্দু সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছে। ক্ষতি অপমান কেবলমাত্র হিন্দুদেরই হইয়াছে। যত ক্ষতি হইয়াছে, তত টাকা তুলিয়া ক্ষতিপূরণ করা যাইবে না। আপাততঃ যাহাতে বিপন্ন হিন্দুরা আশ্রয় ও অন্নবস্ত্র পাইয়া বাঁচিয়া থাকিতে পারে, তাহারই চেষ্টা করিতে হইতেছে। উত্তর ও পূর্ব্ব বঙ্গে বন্যায় ও অন্নাভাবে বিপন্ন লোকদের জন্য নানা কমিটির দ্বারা যে অর্থ সংগৃহীত হইয়াছে, তাহার কিয়দংশ চট্টগ্রামের বিপন্ন লোকদের সাহায্যার্থ ব্যয় করিলে তাহাতে কোন নৈতিক দোষ হয় না। কিন্তু ঐসব টাকা অন্য উদ্দেশ্যে সংগৃহীত বলিয়া দাতাদের অনুমতি ভিন্ন চট্টগ্রামের বিপন্ন লোকদের জন্য খরচ করা নিয়মবিরুদ্ধ হইবে। এইজন্য বিশেষ করিয়া চট্টগ্রামের বিপন্ন হিন্দুদের জন্যই টাকা তোলা আবশ্যক হওয়ায় বঙ্গীয় হিন্দুসভা সেই উদ্দেশ্যে টাকা তুলিতেছেন। সদাশয় ব্যক্তিগণ যিনি যত বেশী পারেন, নীচের ঠিকানায় সাহায্য পাঠাইয়া দিলে বড় উপকার হইবে।

টাকা পাঠাইবার ঠিকানা—শ্রীসনৎকুমার রায়-চৌধুরী, ৯ উইলিয়ম্‌স্ লেন, শিয়ালদহ, কলিকাতা।

আমাদের নামে কেহ টাকা পাঠাইবেন না। আমরা এখন কলিকাতার বাহিরে থাকায় আমাদের নামে প্রেরিত টাকা যথাস্থানে পৌঁছিতে বিলম্ব হইবে।

—

মানবেন্দ্রনাথ রায়ের বিচার

১৯২৪ সালের এক মোকদ্দমার অভিযোগে কানপুরে বিখ্যাত রাজনৈতিক নেতা মানবেন্দ্রনাথ রায়ের বিচার হইতেছে। তিনি দীর্ঘকাল ইউরোপে ছিলেন। তিনি আদালতে নিজেই আত্মপক্ষ সমর্থন করিতেছেন। তাঁহার জেরায় গবর্মেণ্ট পক্ষের একজন সাক্ষীর রহস্যময় ইতিহাসের উপর আলো পড়িয়াছে। এই বিচারের বৃত্তান্ত সংবাদপত্র পাঠকেরা মন দিয়া পড়িতেছে। কানপুরের আদালতেও খুব ভিড় হইতেছে।

—

"জনৈক বাঙালী মহিলার সাহস"

এই নাম দিয়া কলিকাতার খ্রীষ্টীয় ইংরেজী সাপ্তাহিক "গার্ডিয়ান" শ্রীহট্ট জেলার একটি গ্রামে এক গৃহস্থের বাড়িতে ডাকাইতির বর্ণনা করিয়া গৃহকর্ত্রীর উপস্থিত-বুদ্ধি ও সাহসের প্রশংসা করিয়াছেন। ডাকাতরা যখন সদরদরজা জোর করিয়া খুলিয়া ফেলে, তখন বাড়ির কর্ত্তার সঙ্গে তাহাদের ধস্তাধস্তি আরম্ভ হয়। এই সময় দুর্বৃত্তদের একজন পিছনের একটা জানালা দিয়া ঢুকিয়া পশ্চাৎ দিক্ হইতেও গৃহস্বামীকে আক্রমণের চেষ্টা করে। তাহা দেখিয়া গৃহিণী একটা দা লইয়া তাহা এরূপ দক্ষতার সহিত ব্যবহার করেন, যে, লোকটা আহত হইয়া ভূমিসাৎ হয়। তাহার সঙ্গী ডাকাতরা ইহা দেখিয়া তাহাকে তুলিয়া লইয়া পলায়ন করে; কিন্তু তাহার একটা বুড়া আঙুল কাটা পড়িয়াছিল, তাহা তাহারা দেখে নাই। আঙুলটার সাহায্যে তাহার অধিকারী ও তাহার আর এক আহত সঙ্গী ধরা পড়িয়াছে, এবং হয়ত অন্যান্য ডাকাতরাও ধরা পড়িবে।

"গার্ডিয়ান" শ্রীহট্টের এই মহিলার কার্য্য বঙ্গের বালিকাবিদ্যালয়গুলিতে প্রশংসার সহিত সমুদয় বালিকার গোচর করা উচিত বলিয়াছেন। এই কাগজটির মতে সমুদয় বালিকাবিদ্যালয়ে দৈহিক বল বৃদ্ধির অনুকূল শিক্ষা দিবার বন্দোবস্ত করা কর্ত্তব্য। "অল্পবয়স্কা নারীদিগকে হরণ, তাহাদের অলঙ্কারপত্র ছিনাইয়া লওয়া এবং তাহাদের উপর আক্রমণ প্রায় প্রত্যহ ঘটিতেছে। লোকলজ্জাভয়ে অনেক ঘটনা চাপা দেওয়া হয়, কিন্তু ইহা সুপরিজ্ঞাত, যে, এরূপ দুষ্কার্য্য দুর্বৃত্তেরা খুব ঘনঘন করিতেছে। দৈহিক শিক্ষা, বিদ্যালয়সমূহের শিক্ষণীয় বিষয়ের অন্তর্ভূত করা অবশ্যকর্ত্তব্য। পনের বৎসর পূর্ব্বে ইহার বিরুদ্ধতা হয়ত কেহ কেহ করিতে

পারিতেন, এখন সে দিন গিয়াছে। পুরুষেরা যখন সব দিকে অগ্রসর হইতেছেন, মহিলাদেরও অগ্রসর হওয়া চাই।"

মহিলারা সাহসের সহিত অস্ত্র ব্যবহার করিলে যে দুর্বৃত্ত লোকেরা ভয় পায়, তাহা চট্টগ্রামের পৈশাচিক ঘটনাবলীতেও দেখা গিয়াছে। জনৈক হিন্দুমহিলা লুণ্ঠনকারীরা তাঁহার বাড়ি আক্রমণ করিলে দা লইয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করেন। তাহাতে তাহারা পলাইয়া যায়। আশা করা যাইতে পারে, বঙ্গের পুরুষেরা মহিলাদের দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিতে সমর্থ হইবেন।

—

চট্টগ্রামের পুলিস ইন্‌স্পেক্টর হত্যা সাম্প্রদায়িক নহে

চট্টগ্রামের নিহত পুলিস ইনস্পেক্টর মুসলমান, হত্যাকারী বলিয়া ধৃত বালক হিন্দু। কিন্তু এই হত্যাকার্য্য সাম্প্রদায়িক নহে। কারণ, (১) মুসলমান বলিয়াই যে এই ইনস্পেক্টরকে তাহার হত্যাকারী বধ করিয়াছে, তাহার কোন প্রমাণ নাই (কোনও হিন্দুই যে হত্যাকারী তাহা এখনও আদালতে প্রমাণিত না হইলেও তাহা সত্য বলিয়া ধরিয়া লইতেছি); (২) এস্থলে হিন্দুরা সমষ্টিগত-ভাবে মুসলমান ইনস্পেক্টরের বা মুসলমানসম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে কিছু করে নাই, একজন মুসলমানকে মারিয়াছে বলিয়া একজন হিন্দু বালক ধৃত হইয়াছে, ঘটনাটি কেবল এই; (৩) হত্যাকারী আতঙ্ক-উৎপাদক দলের লোক বলিয়া অনুমিত হইতেছে, সেই দলের লোকেরা জাতিধর্ম-নির্ব্বিশেষে স্বদেশী বিদেশী হিন্দুমুসলমান খ্রীষ্টিয়ান অনেককে বধ বা বধের চেষ্টা করিয়াছে বলিয়া সরকারী তালিকায় অনেক বার দেখান হইয়াছে; (৪) অনেক বৎসর পূর্ব্বে হাইকোর্টে অন্য এক জন মুসলমান ইনস্পেক্টর নিহত হওয়ার সময় কেহ একথা বলে নাই, যে, তাহা সাম্প্রদায়িক হত্যা, তাহার সহিত বর্ত্তমান হত্যাকাণ্ডের এমন কোন প্রভেদ নাই যাহাতে ইহাকে সাম্প্রদায়িক হত্যা বলা যাইতে পারে। কোন সমাজের এক জন লোক অন্য সমাজের এক জন লোকের সম্বন্ধে অসাম্প্রদায়িক কারণে কিছু করিলে ব্যাপারটা নিশ্চয়ই সাম্প্রদায়িক, বলা যায় না।

এত কথা বলিতে হইতেছে এই জন্য, যে, অনেকে চট্টগ্রামের লুণ্ঠন, গৃহদাহ প্রভৃতির কারণ নির্দ্দেশ করিতে গিয়া তাহা তথাকথিত সাম্প্রদায়িক হত্যা হইতে উৎপন্ন মনে করিতেছেন।

—

চট্টগ্রামের লুণ্ঠনাদি কতদূর সাম্প্রদায়িক

চট্টগ্রামের লুণ্ঠনাদির জন্য প্রকৃত-প্রস্তাবে দায়ী কে, সে-সম্বন্ধে টাউনহলের বক্তৃতায় শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সেন-গুপ্ত মহাশয় স্পষ্টভাষায় তাঁহার মত ব্যক্ত করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে আমাদের যাহা বক্তব্য তাহা আমরা নিম্নে বলিব কিন্তু তাহার পূর্ব্বে আমরা চট্টগ্রামের ঘটনা সাম্প্রদায়িক কি অসাম্প্রদায়িক সে-বিষয়ে কয়েকটি কথা বলিতে চাই।

অবশ্য নামে কিছু আসে যায় না। চট্টগ্রামের লুণ্ঠন গৃহদাহাদি ঘটনা অসাম্প্রদায়িক বলিয়া প্রমাণিত হইয়া গেলেই লুণ্ঠিত বা ভস্মীভূত দোকান ও বাসগৃহগুলি পূর্ব্ব অবস্থা প্রাপ্ত ও আগেকার মত সম্পত্তিশালী হইবে না এবং লাঞ্ছিত প্রহৃত অপমানিত ক্ষতিগ্রস্ত বা মৃত ব্যক্তির দুঃখ ও মৃত্যু দুঃস্বপ্ন বলিয়া প্রমাণিত হইবে না; পক্ষান্তরে উহা সাম্প্রদায়িক প্রমাণিত হইলেও উক্তরূপ কোন লাভ হইবে না; তথাপি এই ঘটনা সাম্প্রদায়িক কি না, তাহার আলোচনা আবশ্যক। কেন-না, উহাকে এককথায় অসাম্প্রদায়িক বলিয়া ছাড়িয়া দিলে; উহার জন্য আমাদের দেশেরই বহুসংখ্যক লোক যে সমষ্টিগতভাবে দায়ী ও দোষী, তাহা অনেকে ভুলিয়া যাইতে পারেন।

আমরা চট্টগ্রামের ঘটনার জন্য সমগ্র মুসলমান সমাজকে দোষী মনে করি না। মুসলমান সমাজের মধ্যে যাহারা এই কাজ করিয়াছিল, যাহারা পশ্চাতে থাকিয়া উস্কাইয়াছিল এবং পরামর্শ ও প্রশ্রয় দিয়াছিল, তাহাদিগকেই দোষী ও দায়ী মনে করিতেছি। তথাপি এই ঘটনাকে সাম্প্রদায়িক মনে করিবার যে কারণ আছে,

খবরের কাগজে যাঁহারা ইহার সব বৃত্তান্ত পড়িয়াছেন, তাঁহারা তাহা জানেন।

যাহাদের দোকান ঘরবাড়ি লুণ্ঠিত লণ্ডভণ্ড বা ভস্মীভূত হইয়াছে, যাহারা অপমানিত ও প্রহৃত হইয়াছে, তাহারা সবাই হিন্দু। অন্য দিকে কোন হিন্দু লুট করে নাই, ঘর পোড়ায় নাই, আততায়ী হইয়া কোন অহিন্দুকে অপমান করে নাই বা মারে নাই (আমরা অবশ্য এই বাক্যে বেসরকারী হিন্দুদের কথাই বলিতেছি)। যে হাজার হাজার চট্টগ্রামবাসী লুণ্ঠনাদি কাজ করিয়াছে (আমরা বেসরকারী লোকদের এবং প্রকাশ্য দিবালোকে দোকানপাট লুটের কথাই বলিতেছি), তাহারা মুসলমান। এই কারণে আমরা ব্যাপারটাকে সাম্প্রদায়িক বলিতেছি।

কেহ কেহ বলিয়াছেন, মুসলমানেরা তৃতীয় পক্ষের উস্কানিতে এবং আস্কারায় এই কাজ করিয়াছে; অতএব ইহা সাম্প্রদায়িক নহে। দুর্বৃত্ত লুণ্ঠনকারীরা যদি উস্কানিতেই দুষ্কার্য্য করিয়া থাকে, তাহা হইলেও তাহারা তাহাদের কাজের জন্য দায়ী। বিচারপতি লর্ট উইলিয়মস্ ভোলানাথ সেন প্রভৃতি তিন জন পুস্তক-বিক্রেতাকে হত্যা করার অপরাধে দু' জন পঞ্জাবী যুবককে প্রাণদণ্ড দিবার পূর্ব্বে বলিয়াছিলেন, যে, তাহাদের পশ্চাতে উস্কাইবার অন্য লোক ছিল; কিন্তু সেই কারণে তাহাদিগকে নির্দ্দোষ মনে করেন নাই। চট্টগ্রামে, পেছনে কেউ থাক বা না-থাক, কাজটা যাহারা করিয়াছে তাহারা মুসলমান, এবং লুণ্ঠনাদি করিবার সময় বা তাহার পরে তাহারা নিজ সমাজ ত্যাগ করে নাই বা নিজ সমাজ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হয় নাই।

অত্যাচরিত লোকসমষ্টি হিন্দুসমাজভুক্ত, এবং অত্যাচারী বেসরকারী লোকসমষ্টি মুসলমান সমাজভুক্ত; ব্যাপারটাকে সাম্প্রদায়িক মনে করিবার পক্ষে ইহাই যথেষ্ট।

যাঁহারা তৃতীয় পক্ষের অনুমিত উস্কানির উপর বেশী জোর দিতেছেন, তাঁহারা ভাবিয়া দেখিবেন, মুসলমান সমাজেই উস্কানির প্রভাবে কাজ করিবার লোক এত বেশী আছে কেন? হিন্দু সমাজের অন্তর্ভূত সব লোকই সাধু ও শান্তশিষ্ট নহে। কিন্তু এই ধরণের যত দাঙ্গা-হাঙ্গামা হইয়াছে, তাহার তালিকা প্রস্তুত করিলে দেখা যাইবে, অধিকাংশ স্থলে আততায়ীরা মুসলমান সমাজভুক্ত লোক। কানপুরের মত দু-এক জায়গায় হিন্দুসমাজভুক্ত লোকেরাও দাঙ্গা-হাঙ্গামা করিয়াছে। তাহার অন্ততঃ কিয়দংশ গুরুমারা বিদ্যার ফল।

কেহ কেহ বলিতেছেন, চট্টগ্রামে যাহারা লুণ্ঠনাদি করিয়াছে, তাহারা গুণ্ডা, এবং গুণ্ডাদের কোন ধর্ম্ম নাই—তাহারা হিন্দু মুসলমান খৃষ্টিয়ান কিছুই নয়। একথা সত্য নহে, যে, চট্টগ্রামের লুণ্ঠনাদিকারীরা পেশাদার গুণ্ডা। চট্টগ্রাম শহরের লুণ্ঠনকারীরা কারিগর দোকানদার মুটে মজুর গাড়োয়ান ইত্যাদি, এবং তাহারা গৃহস্থ মানুষ। চট্টগ্রাম শহরে বা জেলায় দশ বিশ পঁচিশ হাজার গুণ্ডা আছে, এমন কথা আমরা আগে শুনি নাই। গবর্ন্মেণ্টের টিকটিকি বিভাগ একথা জানিলে শুধু লুণ্ঠনকারীদের শিকার হিন্দুদের উপর পিটুনি পুলিস বসিত কি-না, ব্যবস্থাপক সভায় কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন। এই সব পুরুষ মানুষ যদি গুণ্ডাই হয়, তাহা হইলেও তাহাদের স্ত্রী ও ছেলেমেয়েরাও কি গুণ্ডা? তাহারাও ত লুটে যোগ দিয়াছিল ও সাহায্য করিয়াছিল।

ব্যাপারটা গুণ্ডাদের কাজ হইলে এবং গুণ্ডারা বিশেষ কোন ধর্ম্মের লোক নহে ইহা মনে রাখিয়া অনুমান করিলে, অনুমান এই হইত, যে, লুণ্ঠনকারীদের মধ্যে এবং লুণ্ঠিত দোকান ঘরবাড়ির মালিকদের মধ্যে হিন্দু ও মুসলমান উভয় সমাজেরই লোক আছে। কিন্তু বস্তুতঃ দেখা যাইতেছে, লুণ্ঠনকারীরা মুসলমান, হৃতসর্ব্বস্বেরা হিন্দু। ইহাতেও কি কেহ বলিবেন, ব্যাপারটা জাতিধর্ম্মসমাজহীন গুণ্ডাদের কাজ?

যদি মানিয়া লওয়া যায়, যে, গুণ্ডারাই লুণ্ঠন করিয়াছে, তাহা হইলেও শিক্ষিত ও ভদ্র মুসলমানগণ এই আত্ম-জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, যে, তাঁহাদের সমাজেই গুণ্ডার এত প্রাচুর্য্য কেন? বৃথা কেহ প্রশ্ন করে না। অনেক মুসলমান চট্টগ্রামের ব্যাপারটার নিন্দা করিতেছেন বলিয়া এরূপ প্রশ্ন করা বৃথা হইবে না মনে হয়। মুসলমানেরাও এই পাল্টা প্রশ্ন করিতে পারেন, হিন্দু সমাজেই বা

রাজনৈতিক হত্যাকারীর এত প্রাচুর্য্য কেন? তাহারও নিশ্চয়ই কারণ আছে, এবং তাহা হিন্দুসমাজের লোকদের বিচার্য্য।

মোটের উপর আমাদের বক্তব্য এই যে, আগে আগে যে-সব সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাহাঙ্গামা হইয়া গিয়াছে—যেমন ডেরা ইস্মাইল খাঁ, কানপুর, ঢাকা, কিশোরগঞ্জে—তাহাতেও সমগ্র হিন্দু বা সমগ্র মুসলমান সমাজ যোগ না দিলেও যেমন উহারা সাম্প্রদায়িক বলিয়াই পরিগণিত, চট্টগ্রামের দাঙ্গাহাঙ্গামাও সেইরূপ। এই শোচনীয় ব্যাপারের মূল কারণ যাহাই হউক, বা যাহার উস্কানিতেই উহা হইয়া থাকুক, কয়েকটি ঘটনার কথা ছাড়িয়া দিলে এ-কথাটা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, এই সকল কাজ যাহারা করিয়াছে তাহারা প্রধানতঃ মুসলমান ও যাহারা উৎপীড়িত হইয়াছে তাহারা হিন্দু। লুণ্ঠনের পূর্ব্বরাত্রে চট্টগ্রাম শহরে খানাতল্লাসীর সময়ে যে-সকল ঘটনা ঘটে, তাহার জন্য মুসলমানরা দায়ী নহে, 'পাঞ্চজন্য' প্রেস ভাঙিবার জন্য তাহারা দায়ী নহে, গ্রামে গ্রামে হিন্দুর বাড়িতে ও স্কুলে যে-সকল অত্যাচার হইয়াছে তাহার জন্যও তাহারা দায়ী নহে। শুনিয়াছি মফস্বলে মুসলমানদের দ্বারা হিন্দুর বাড়ি লুট করাইবার প্ররোচনা করা হইয়াছিল, কিন্তু তাহা সফল হয় নাই। ইহা যদি সত্য হয় তবে গ্রামবাসী মুসলমানগণের বিবেকবুদ্ধি ও রাজনৈতিক বুদ্ধি প্রশংসার্হ। কিন্তু এই কয়েকটি ব্যাপারের কথা ছাড়িয়া দিলে চট্টগ্রাম শহরে প্রকাশ্য দিবালোকে যে-সকল লুণ্ঠন, গৃহদাহ প্রভৃতি বহুক্ষণ ধরিয়া বিস্তৃত ভাবে চলিয়াছিল তাহা মুসলমানদের দ্বারাই কৃত। এই লুটতরাজে কোন হিন্দু যোগ দেয় নাই বা কোন মুসলমান ক্ষতিগ্রস্ত হয় নাই। সেই জন্য 'অ্যাডভান্সে' প্রকাশিত বক্তৃতাগুলি পড়িবার পরও চট্টগ্রামের ব্যাপার যে অনেকাংশে সাম্প্রদায়িক এই মত আমরা পরিবর্ত্তন করিতে পারিলাম না।

—

চট্টগ্রামে সরকারী লোকদের কৃতিত্ব বা অকৃতিত্ব

সরকারী লোকেরা যে সরকারী কর্ম্মচারীদের মধ্যে মধ্যে অতর্কিতে হত্যা নিবারণ করিতে পারেন না, তাহার জন্য তাঁহাদিগকে কিংবা গবন্মেণ্টকে অকর্ম্মণ্য বলা যায় না। কারণ, বিলাতের ম্যাঞ্চেষ্টার গার্ডিয়ান কাগজ ঠিকই বলিয়াছেন, যে, খুব কর্ম্মিষ্ঠ গবন্মেণ্ট খুব সাবধান হইলেও রিভলভারের মত ছোট একটা অস্ত্রের বেআইনী আমদানী সম্পূর্ণ নিবারণ করা অসম্ভব। কিন্তু দলবদ্ধ ভাবে হাজার হাজার লোক অনেক ঘণ্টা ধরিয়া দুই শত দশটা দোকানের এক কোটীর উপর টাকার [illegible] করিল, অনেক ঘরবাড়ি পুড়াইয়া দিল, ইহা যে-সব সরকারী লোক নিবারণ করিতে পারিল না, তাহাদিগকে খুব কর্ম্মিষ্ঠ ও কর্ত্তব্যপরায়ণ মনে করিবার কারণ দেখা যাইতেছে না।

বস্তুতঃ, নিরপেক্ষ লোকমাত্রেই মনে করিবে, চাটগাঁয়ে হয় লুণ্ঠনাদি নিবারণ করিবার ক্ষমতা সরকারী লোকদের ছিল না, নয় ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তাহারা তাহা নিবারণ করে নাই। এই দুটা অনুমানের মধ্যে যেটাই সত্য হউক, চাটগাঁয়ের সব শাসক ও পুলিস কর্ত্তাদিগকে অবিলম্বে অন্যত্র চালান করা কর্ত্তব্য। তাহাদের পদচ্যুতি বা অন্য শাস্তি হওয়া উচিত কি-না, তাহাও বিচারান্তে বিবেচিত হওয়া উচিত। তাহাদের বদলী হওয়া এই কারণেও একান্ত আবশ্যক, যে, তাহারা ওখানে থাকিতে ভালরূপ তদন্ত হইতে পারে না। তাহাদের সাক্ষ্য লওয়া দরকার হইলে তাহাদিগকে সস্পেণ্ড করিয়া ঐখানেই রাখা যাইতে পারে।

ভারপ্রাপ্ত শাসক ও পুলিস কর্ম্মচারীদের চোখের সামনে বা তাহাদের জ্ঞাতসারে কিংবা তাহাদের অবস্থিতির জায়গা হইতে অতিনিকটে বিনাবাধায় লুণ্ঠনাদি কাজ চলিয়াছিল, অপহৃত জিনিষও এইভাবে স্থানান্তরিত হইয়াছিল, পুলিস ও গুর্খারা রাত্রে বহু বাড়ি বিনা ওয়ারেণ্টে প্রবেশ করিয়া লোকজনকে মারধর করিয়াছে, জিনিষপত্র ভাঙিয়াছে, বহুসংখ্যক হিন্দুযুবককে কোতোয়ালিতে লইয়া গিয়া প্রহার করিয়াছে, গুর্খা এবং ইউরোপীয় পোষাকধারী লোকেরা গিয়া "পাঞ্চজন্য" প্রেসের ছাপিবার যন্ত্রাদি ভাঙিয়া দিয়া আসিয়াছে, ইত্যাদি নানা অভিযোগ খবরের কাগজে বাহির হইয়াছে। এরূপ অভিযোগ অভূতপূর্ব্ব নহে। দাঙ্গাহাঙ্গামার সময় এরূপ অভিযোগ অন্যত্রও হইয়াছিল। চাটগাঁয়ে এরূপ হইয়াছিল কি-না, তাহার তদন্ত অত্যাবশ্যক।

এরূপ অভিযোগও বাংলা ও ইংরেজী কাগজে বাহির হইয়াছে, যে, একজন ভদ্রলোক ম্যাজিষ্ট্রেটকে দুঃখ জানাইতে গিয়াছিলেন, এবং উত্তরে ম্যাজিষ্ট্রেট জানাইয়াছিলেন, যে, যেহেতু চাটগাঁয়ের লোকেরা বিপ্লবীদিগকে প্রশ্রয় দিতেছে গবন্মেণ্টের সাহায্য করিতেছে না, অতএব তিনি অভিযোক্তার সাহায্য করিবেন না, সাহায্যের জন্য অভিযোক্তাকে দেশের নেতাদের নিকট যাইতে হইবে, ইত্যাদি। ম্যাজিষ্ট্রেট এরূপ কথা বলিয়াছিলেন কি-না, নির্দ্ধারিত হওয়া উচিত। তিনি তাহা বলিয়া থাকিলেও গবন্মেণ্ট কর্ত্তৃক গোপনেও তিরস্কৃত হইবেন, এমন আশা করা যায় না। কিন্তু সত্য নির্দ্ধারণের জন্য প্রয়োজন আছে। ব্যক্তিগতভাবে কোন লোক বা সমষ্টিগতভাবে কোন স্থানের লোকেরা

বিপ্লবীদিগকে আশ্রয় বা প্রশ্রয় দিলে বা অন্য প্রকারে সাহায্য করিলে, আইন অনুসারে তাহার বা তাহাদের বিচার ও শাস্তি হইতে পারে; এবম্বিধ কারণে চাটগাঁ জেলার বাহান্নটি গ্রামে পিটুনি পুলিসও বসান হইয়াছে। কিন্তু ব্রিটিশ ভারতীয় কোন কোন আইন ও অর্ডিন্যান্স সভ্যতম দেশের বিধিব্যবস্থা হইতে পৃথক্ হইলেও, এই আইন এবং অর্ডিন্যান্সগুলিতেও একথা কোথাও লেখা নাই, যে, কোন জায়গার লোক বিপ্লবীদিগকে প্রশ্রয় বা সাহায্য দিলে তাহারা সাময়িকভাবে গুণ্ডায় পরিণত হাজার হাজার লোকের যথেচ্ছ অত্যাচারের পাত্র হইবে এবং সরকারী কর্ম্মচারীদের দ্বারা অত্যাচার হইতে রক্ষিত হইবে না।

একটি ইংরেজী দৈনিকে দেখিলাম, ম্যাজিষ্ট্রেট হুকুম প্রচার করিয়াছিলেন, যে, কেহ লুট করিবার সময় ধরা পড়িলে (caught in the act of looting) তাহার শাস্তি হইবে, ইত্যাদি। এই হুকুম লুট হইয়া যাইবার পর প্রচারিত হইয়াছিল। হুকুমটি সম্পূর্ণ আইনসঙ্গত, এবং চাটগাঁয়ে ইহার প্রচার যথাযোগ্য এবং দেশকালপাত্রোপযোগীও হইয়াছিল। সম্ভবতঃ আইনের এরূপ নির্দ্দেশ চাটগাঁয়ে জানা ছিল না বলিয়াই লুটপাট হইয়া থাকিবে। দুঃখ এই, যে, "চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ে" ম্যাজিষ্ট্রেটের কার্য্যটি এই প্রবাদবাক্যের দৃষ্টান্তস্থল হইয়াছিল। এরূপ সন্দেহও লোকের মনে হইতে পারে, যে, ঠিক লুটে নিমগ্ন অবস্থায় ধরা না পড়িয়া পরে বমাল সহিত বা অন্য অবস্থায় কোন লুট্যেরা ধরা পড়িলে তাহার শাস্তি হইবে কি-না।

ম্যাজিষ্ট্রেটের হুকুমটি আমাদের একটি বাল্যস্মৃতি জাগাইয়া দিল। তখন আমরা বাঁকুড়ার ইস্কুলে পড়ি। মাচান তলায় মতি রায়ের যাত্রা হইতেছিল। ভোরের দিকে সঙের আবির্ভাব হইল। শুনিলাম, যাত্রার দলের অধিকারী স্বয়ং মতিলাল রায় মহাশয় সং সাজিয়া আসিয়াছেন। একজন কোমরভাঙা হাড্ডিসার ব্যক্তি চৌকিদার রূপে আসরে উপস্থিত হইয়া অতি করুণ স্বরে চোরকে আহ্বান করিয়া বলিতে লাগিলেন, "ও চোর, তুই আয়, আমি তোকে ধোরবো।"

চাটগাঁয়ের দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তারা নিশ্চয়ই এরূপ কোমরভাঙা হাড্ডিসার চৌকিদার নহেন।

কিন্তু শুধু তাহাই নহে, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সেন-গুপ্ত মহাশয় টাউনহলের সভায় জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিষ্টার কেম্-এর বিরুদ্ধে অতিশয় গুরুতর অভিযোগ উত্থাপিত করিয়াছেন। তিনি স্পষ্ট ভাষায় বার-বার বলিয়াছেন—মিষ্টার কেম্ ইচ্ছা করিয়া কর্ত্তব্য পালন করেন নাই, এবং তাঁহার আচরণ হইতে প্রমাণিত হয়, যে, তিনি [illegible] শুনিয়া চট্টগ্রামের নিরপরাধ শহরবাসীদের বাড়িঘর ও দোকানপাট লুঠ করিবার জন্য (গুণ্ডাদের) প্ররোচনা দিয়াছেন। সাহস থাকিলে এই উক্তি করিবার জন্য মিষ্টার কেম্ যেন তাঁহাকে (সেন-গুপ্ত মহাশয়কে) আদালতে অভিযুক্ত করেন। মিষ্টার কেম্ কি করেন, তাহা দ্রষ্টব্য। তাঁহার কর্ত্তব্য প্রকাশ্য আদালতে নিজকে এই অভিযোগ হইতে মুক্তি করা, তাহা না করিতে পারিলে তাঁহার অবিলম্বে কর্ম্মচ্যুত হওয়া উচিত। ইতিমধ্যে বঙ্গীয় সরকার গত ১৫ই সেপ্টেম্বর তারিখে এক ইস্তাহার দ্বারা চট্টগ্রামের বিভাগীয় কমিশনারকে সরকারী কর্ম্মচারীদের অভিযোগ সম্পর্কে তদন্ত করিবার ভার অর্পণ করিয়াছেন। এই তদন্তে পুলিসের কর্ম্মচারীদের কার্য্যকলাপ সম্পর্কে কমিশনারের সাহায্য করিবার জন্য বঙ্গের পুলিসের বড় কর্ত্তা ইন্‌স্পেক্টর জেনারেল অব পুলিস মনোনীত হইয়াছেন। এতদিন পরে হঠাৎ বেসরকারী তদন্তের রিপোর্ট বাহির হইবার পূর্ব্বক্ষণে সরকার চট্টগ্রামের ব্যাপারে এই প্রথম কোনও রূপ তদন্ত করিবার ব্যবস্থা করিতেছেন। এইরূপ ব্যবস্থার উদ্দেশ্য কি? বর্ত্তমান ম্যাজিষ্ট্রেট জেলার কর্ত্তা থাকা পর্য্যন্ত, যে-সব কর্ম্মচারীর বিরুদ্ধে অভিযোগ তাহারা সসপেণ্ড না হওয়া পর্য্যন্ত, এইরূপ তদন্ত যে চলিতে পারে না, তাহা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। কিন্তু তাহা করা হইলেও সরকারী তদন্তের দ্বারা সরকারী কর্ম্মচারীদের দোষক্ষালন ভিন্ন অন্য কোন উদ্দেশ্য যে সিদ্ধ হইবে, তাহা আমরা মনে করি না।

চাটগাঁয়ে অরাজকতা নিবারণের সরকারী সামর্থ্য

গত বৎসর চাটগাঁয়ে একটি অস্ত্রাগার লুট হয়। সেই উপলক্ষ্যে সরকারী বেসরকারী কতকগুলি লোকের প্রাণ যায়, এবং বিদ্রোহী ও বিপ্লবী বলিয়া কতকগুলি যুবক ধৃত হয়। তাহাদের বিচার হইতেছে। এই প্রকার লুট ও হত্যাকাণ্ডের জন্য গবর্ন্মেণ্টের ধারণা হইয়াছে, যে, চাটগাঁ শহর ও জেলার বিস্তর লোক—অবশ্য হিন্দু—গবর্ন্মেণ্টের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিয়াছে। তাহা দমন করিবার জন্য সেখানে অনেক পুলিস ও গুর্খা প্রভৃতি আমদানী হইয়াছে, বাহান্নটি গ্রামে পিটুনী পুলিস বসান হইয়াছে, এবং চাটগাঁ শহরে প্রায়ই এই হুকুম লাগিয়াই আছে, যে, রাত্রিকালে সন্ধ্যার পর কেহ বাড়ির বাহির হইতে ও রাস্তায় চলাফেরা করিতে পারিবে না। সন্ধ্যানন্তর রাত্রিকালের এই অবরোধের বিশেষত্ব এই, যে, হিন্দু যুবকেরা ঐ অবরোধ ভঙ্গ করিলে তাহাদের গ্রেপ্তারের হুকুম তাহার একটি অঙ্গ।

ইংরেজ গবর্ন্মেণ্ট যে-যে উদ্দেশ্যে ভারতবর্ষে হাজির

মারামারি কাটাকাটি নিবারণ তাহার অন্তর্গত বলিয়া বর্ণিত হইয়া থাকে। অতএব উদ্দেশ্য যখন এই রূপ, তখন ধরিয়া লইতে হইবে, যে, সরকার বাহাদুর দেশের সর্ব্বত্র অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা নিবারণের ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন। তাহা সত্ত্বেও যে নানা প্রদেশে ভীষণ দাঙ্গাহাঙ্গামার সংখ্যা বাড়িয়া চলিতেছে, তাহার কৈফিয়ৎ সরকারী কর্ম্মচারীরা হয়ত এই দিবেন, যে, তাঁহারা সাধারণ রকম অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা নিবারণের জন্য প্রস্তুত থাকেন ও তাহার জন্যই দায়ী, অসাধারণ কিছু ঘটিলে তাঁহারা হঠাৎ কিছু করিতে পারেন না। তাহার উত্তরে বলা যাইতে পারে, সাধারণ ও অসাধারণের মধ্যে দাঁড়ি টানিয়া ভাগ করা কঠিন, এবং কিছু কাল হইতে অসাধারণ দাঙ্গাহাঙ্গামাও খুবই সাধারণ হইয়া পড়িয়াছে; সুতরাং তাহা নিবারণের জন্যও গবর্ন্মেণ্টের প্রস্তুত থাকা উচিত ছিল। এই সেদিনও ত গবর্ন্মেণ্ট পুলিসের বরাদ্দ পাঁচ লক্ষ টাকার উপর বাড়াইয়া লইয়াছেন।

যাহা হউক, সরকার পক্ষের উক্ত অনুমিত কৈফিয়ৎ সঙ্গত বলিয়া মানিয়া লইলেও দেখা যাইতেছে, যে, চাটগাঁয়ে লুট ঘরপোড়ান প্রভৃতি ঘটিবার আগে হইতেই নানা রকমের নানা জাতীয় সশস্ত্র রক্ষীর অসাধারণ সমাবেশ করা হইয়াছিল। তাহা সত্ত্বেও, শহরের মুসলমান সমাজভুক্ত বিস্তর লোক দিনে দুপুরে লুট করিল, ঘর জ্বালাইয়া দিল, ইত্যাদি ইত্যাদি। খবরের কাগজে বাহির হইয়াছে, লুটের আগে রাস্তায় রাস্তায় গাড়ীর ছাদ হইতে উচ্চৈঃস্বরে প্রচার করা হইয়াছিল, যে, বেলা ১০টা হইতে অপরাহ্ণ ৩টা পর্য্যন্ত লুট হইবে। 'পাঞ্চজন্য' প্রেস ভাঙা এবং কোন কোন ইস্কুলের ছাত্র ও শিক্ষকদিগকে বেদম প্রহারও অরাজকতার অঙ্গ; কিন্তু অত্যাচারীরা অন্য লোক।

লুটের সময় কতকগুলা দুর্বৃত্ত এক গৃহস্থের বাড়ি আক্রমণ করিতে উদ্যত হইলে ঐ বাড়ির জনৈক মহিলা দা হাতে করিয়া তাহাদের দিকে অগ্রসর হন। তাহাতে তাহারা পলাইয়া যায়। ইহা হইতে মনে হয়, চাটগাঁয়ের সরকারী রক্ষীরা সামান্য চেষ্টা করিলেও অরাজকতা নিবারণ বা বন্ধ করিতে পারিত।

অবশ্য সরকারী লোকদের সপক্ষে অনেক প্রবল যুক্তি উপস্থিত করা যাইতে পারে। যথা—

চাটগাঁ শহরে সন্ধ্যার পর রাত্রিকালে হিন্দু যুবকেরা আইনসঙ্গত উদ্দেশ্যেও বাহির হইলে তাহাদিগকে ধরিবার হুকুম ছিল। সুতরাং সন্ধ্যার আগে দিনের বেলায় অহিন্দু আবালবৃদ্ধবনিতা আইনবিরুদ্ধ উদ্দেশ্যে রাস্তায় বাহির হইলে যে তাহাদিগকেও ধরিতে হইবে, ইহা পুলিসের লোকেরা কেমন করিয়া বুঝিবে বলুন। নাই। আমরা বাল্যকালে আমাদের ছোট শহরটির একটি বুদ্ধিমান্ যুবককে জানিতাম, যে বাজার করিতে গিয়া বাজার না করিয়াই এই কারণে ফিরিয়া আসিয়াছিল, যে, তাহার বাড়ির লোকেরা কোন্ পয়সাটি দিয়া কোন্ জিনিষ কিনিতে হইবে, তাহা চিহ্নিত করিয়া না দেওয়ায় সে ভুলিয়া গিয়াছিল। ভিন্ন ভিন্ন রকমের অশান্তি বিশৃঙ্খলা প্রভৃতি নিবারণের জন্য এবং ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী অপরাধী ধরিবার জন্য আলাদা আলাদা পুলিসের লোক মোতায়েন করা গবর্ন্মেণ্টের উচিত ছিল।

—

"সাত খুন মাফ" ধারণার কারণ অনুসন্ধান

কলিকাতা টাউনহলের সভায় স্পষ্টই বলা হইয়াছে এবং অন্য অনেকেও এরূপ অনুমান ও সন্দেহ করিতেছেন, যে, চাটগাঁয়ে লুটেরারা যাহা করিয়াছে, তাহা সরকারী কোন কোন কর্ম্মচারীর সাক্ষাৎ বা পরোক্ষ প্ররোচনা বা প্রশ্রয়েই করিয়া থাকিবে; নতুবা এমন নির্ভয়ে বিনা বাধায় এমন ভয়ানক বে-আইনী এত কাজ তাহারা কেমন করিয়া করিতে পারিল? এইরূপ সন্দেহ ও অনুমানের সত্যতা বা অসত্যতা প্রকাশ্য প্রমাণ প্রয়োগে কখনও প্রতিষ্ঠিত হইবে বলিয়া মনে হয় না। সুতরাং অন্য কি কি কারণেও দুরাত্মারা তাহাদের কাজের কোন শাস্তি হইবে না মনে করিয়া থাকিতে পারে, তাহা বিবেচনা করা আবশ্যক।

ঢাকায় ও কিশোরগঞ্জে যে অরাজকতা হইয়াছিল, তাহার পূর্ব্বে এইরূপ কথা রটিত হইয়াছিল বলিয়া শুনা যায়, যে, সাত দিনের জন্য নবাবী রাজত্ব হইয়াছে, তখন লুটপাট করিলে কোন সাজা হইবে না। চাটগাঁয়েও এরূপ গুজব রটিয়া থাকিতে পারে। পাবনা, ঢাকা, কিশোরগঞ্জ প্রভৃতি স্থানে হাজার হাজার লোক দলবদ্ধ হইয়া আইন ভঙ্গ করিয়াছিল। দুর্বৃত্তদের সংখ্যার তুলনায় শাস্তি খুব কম লোকেরই হইয়াছিল। অপরাধের গুরুত্বের তুলনায় অনেকের লঘু দণ্ডই হইয়াছিল। কিশোরগঞ্জে ত সকল অপরাধীকে ধরিলে চাষ হইবে না ও অজন্মাবশতঃ দুর্ভিক্ষ হইবে, এই ওজুহাতে অধিকাংশ অপরাধীকে গ্রেপ্তারই করা হয় নাই। অন্যত্র কতক কতক আসামীকে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছিল। ইহাতে ঐ সকল স্থানের দুর্বৃত্তদের সমশ্রেণীস্থ চাটগাঁয়ের লোকদের মনে এরূপ ধারণা উৎপন্ন হইয়া থাকিলে তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় মনে করা চলিবে না, যে, হিন্দুদের ঘরবাড়ি দোকান লুটপাট ও তাহাদিগকে প্রহারাদি করিলে শাস্তি হইবে না। অধিকন্তু চাটগাঁ শহরে ও জেলায় সন্ধ্যানন্তর অবরোধ ও পিটুনী পুলিস হিন্দুদের

যে, হিন্দুরা সরকার বাহাদুরের বিশেষ অসন্তোষভাজন, সুতরাং তাহাদিগের ক্ষতি করা দোষের বিষয় নহে।

ষ্টেট্‌স্‌ম্যান কাগজ ও পাঞ্চজন্য প্রেস

ষ্টেট্‌স্‌ম্যান কাগজের সহিত আমাদের বিনিময় নাই এবং উহা আমরা ক্রয় করি না। সুতরাং উহা আমরা প্রায়ই দেখি না। কিন্তু অন্য কাগজে পড়িয়াছি, ঐ এংলো-ইণ্ডিয়ান কাগজখানা রাজকর্ম্মচারী হত্যার জন্য দেশী অনেক সংবাদপত্র ও তাহার সম্পাদকগণ দায়ী, এই মর্ম্মের কথা লিখিয়াছিল, তাঁহাদের নাম ও ঠিকানা দিয়াছিল, এবং ঠারেঠোরে এমন সব কথাও লিখিয়াছিল যাহাতে প্রতিশোধের সম্ভাবনার ইঙ্গিত ছিল; যে-সব কাগজের উল্লেখ ষ্টেট্‌স্‌ম্যান করিয়াছিল, তাহার মধ্যে চট্টগ্রামের দৈনিক "পাঞ্চজন্য"ও ছিল। এই কাগজের ছাপাখানা ও তাহার যন্ত্রপাতি মুসলমান জনতা কর্ত্তৃক বিনষ্ট হয় নাই, গুর্খা ও ইউরোপীয় পোষাকধারী কতকগুলা লোকদের দ্বারা ভগ্ন ও বিধ্বস্ত হইয়াছে বলিয়া খবরের কাগজে বর্ণনা বাহির হইয়াছে। ষ্টেট্‌স্‌ম্যান যদি পাঞ্চজন্যের নাম করিয়া থাকে, এবং এই কাগজটির ছাপাখানা যদি বর্ণনার অনুরূপ লোকদের দ্বারা বিনষ্ট হইয়া থাকে, তাহা হইলে পাঞ্চজন্যের ক্ষতির জন্য ষ্টেট্‌স্‌ম্যানের সাক্ষাৎ বা পরোক্ষ আংশিক দায়িত্ব আছে কি-না তাহার অনুসন্ধান হওয়া উচিত।

হিন্দুদের ভাবিবার বিষয়

চাটগাঁয়ের ঘটনাবলী সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত যাহা লিখিয়াছি, তাহা অপেক্ষা গুরুতর চিন্তনীয় বিষয়, বার-বার হিন্দুদের উপর এত অত্যাচার কেন হইতেছে এবং তাহার প্রতিকারই বা কি? ইহার সম্পূর্ণ ও যথেষ্ট উত্তর দিবার সামর্থ্য আমাদের নাই। সম্পূর্ণ উত্তর দেওয়া যায় এবং প্রতিকার অবিলম্বে করা যায়, ভারতবর্ষের এবং হিন্দুসমাজের বর্ত্তমান অবস্থা সেরূপ নহে। তথাপি চুপ করিয়া বসিয়া থাকা যায় না। কিছু যে বলা করা যায় না, তাও নয়। হিন্দুদের দোষ দুর্ব্বলতা যাহার জন্য দায়ী নহে, তাহাদের উপর বারংবার অত্যাচারের এরূপ কোন কোন কারণ অনুমান করা যায়—যদিও অনুমান সত্য কি-না তাহার কঠোর পরীক্ষা আবশ্যক। যথা:—ভারতবর্ষে স্বরাজস্থাপনের জন্য হিন্দুরা বেশী চেষ্টা করিয়া আসিতেছে এবং বেশী আগ্রহান্বিত। এই কারণে স্বরাজবিরোধীরা স্বতঃপরতঃ হিন্দুদিগকে শাস্তি দিতে চায়। সমগ্র ভারতবর্ষ অধিবাসীদের বিষয় বিবেচনা করিলে হিন্দুরা শিক্ষায়, বিদ্যায়, ব্যবসা-বাণিজ্যে, ওকালতী ব্যারিষ্টারী ডাক্তারী চাকরিতে, এবং ধনে মুসলমানদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ বলিয়া ঈর্ষাভাজন। বিদেশীদের দ্বারা ও তাহাদের অনুকরণে লিখিত ভারতবর্ষের ইতিহাস হিন্দুমুসলমানে বিদ্বেষ উৎপত্তির একটি কারণ। মুসলমানদের অনগ্রসরতার জন্য হিন্দুরা দায়ী, হিন্দুরা তাহাদের অনিষ্ট করিয়া আসিতেছে এবং ভবিষ্যতে তাহাদিগকে বশে রাখিবার ও তাহাদের উপর অত্যাচার করিবার জন্য সর্ব্বদা চক্রান্ত করিতেছে, এই অমূলক বিশ্বাস মুসলমানদের মধ্যে জন্মান হইয়াছে ও হইতেছে।

কারণগুলি সম্বন্ধে বক্তব্য

কাহাকেও খুশী করিবার জন্য হিন্দুরা স্বরাজলাভচেষ্টা ছাড়িয়া দিতে পারে না; ইংরেজ প্রণীত আইনের অনুযায়ী শাস্তির কিংবা বেআইনী শাস্তির ভয়েও তাঁহারা স্বরাজস্থাপনের চেষ্টা ছাড়িয়া দিবে না। মুসলমানদের মধ্যে যাহারা হিন্দুদের ঈর্ষা করে, তাহাদের সকল বিষয়ে প্রগতি ও উন্নতি হইলে ঈর্ষা কমিবে এবং কালক্রমে নষ্টও হইতে পারে। এই প্রগতি ও উন্নতি যাহাতে হয়, সে বিষয়ে সহায়তা করা সমুদয় অমুসলমানের কর্ত্তব্য—অগ্রসর মুসলমানদের কর্ত্তব্য ত বটেই। এই কর্ত্তব্য পালন করিতে অনেক হিন্দু প্রস্তুত, এবং অনেকে পালন করিতেছেন। ভারতবর্ষের ইতিহাস বৈজ্ঞানিকের নিরপেক্ষ মনোভাব লইয়া বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে বৈজ্ঞানিকের উচ্ছ্বাসরাগদ্বেষউত্তেজনাবিহীন ভাষায় লিখিত হওয়া উচিত। মুসলমানদের যে ধারণা উপরে অন্যতম কারণ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা আমাদের বিবেচনায় মোটের উপর অমূলক। ব্যক্তিগত-ভাবেও কোন কোন হিন্দুর এরূপ দোষ ও দুরভিসন্ধি নাই, বলিতে আমরা অসমর্থ; কারণ আমরা সকল হিন্দুর সকল কাজ ও চিন্তা অবগত নহি। কিন্তু সমষ্টিগতভাবে মোটের উপর হিন্দুদের ওরূপ দোষ ও কদভিপ্রায় নাই, ইহাই আমাদের বিশ্বাস। এবিষয়ে মুসলমানদের অন্যবিধ ধারণা যদি কখনও দূর হয়, তাহা হইলে তাহা অংশতঃ হিন্দুদের সুব্যবহারের অভিজ্ঞতার দ্বারা দূরীভূত হইবে।

হিন্দুদের দোষ দুর্ব্বলতার প্রতিকার

এখন হিন্দুদের দোষ ও দুর্ব্বলতার কথাও কিছু বলিতে হইবে।

মুসলমানরা হিন্দুদিগকে অবজ্ঞা ও বিদ্বেষ করে কি না, এবং তাহা তাহাদের ব্যবহারে প্রকাশ পায় কি-না, তাহা এখানে বিবেচ্য নহে। কিন্তু হিন্দুদের সামাজিক ব্যবহারে মুসলমানদের প্রতি অবজ্ঞার কোন চিহ্ন থাকা উচিত নয়। সার্ব্বজনীন সভাস্থলে হিন্দুমুসলমানের একত্র উপবেশনের ব্যবস্থাই থাকে; কোথাও তাহার ব্যতিক্রম

গৃহস্থের বৈঠকখানা প্রভৃতিতে মুসলমানদের বসিবার আসন সম্বন্ধে কোথাও কোন অপমানকর প্রভেদ থাকিলে তাহা রাখা উচিত নয়। হিন্দুর দেবমন্দিরে প্রবেশ করিবার কিংবা হিন্দুর সামাজিক ক্রিয়াকলাপে নিমন্ত্রিত হইয়া হিন্দুদের সহিত পংক্তি ভোজন করিবার দাবি মুসলমানেরা করিতে পারে না; কারণ তাহা হিন্দুর ধর্ম্মবিশ্বাসের বিরোধী।

হিন্দুদের প্রতি অত্যাচার নিবারণ করিতে হইলে সমষ্টিগত ও সমাজগত ভাবে হিন্দুদের শক্তিশালী হওয়া একান্ত আবশ্যক। "তৃণৈর্গুণত্বমাপন্নৈর্বধ্যন্তে মত্তদন্তিনঃ"। এক এক গাছি ঘাসকে সহজেই ছেঁড়া যায়, কিন্তু ঘাসের মোটা দড়ায় মত্ত হাতীও বাঁধা পড়ে। হিন্দুদের মধ্যে ভেদ এত বেশী, যে, তাহাদিগকে সংহত ও সংঘবদ্ধ করা কঠিন। সংঘবদ্ধ হওয়ার কথা উঠিলেই কেহ কেহ ভাবে হিন্দুরা দল বাঁধিয়া অন্যের উপর অত্যাচার করিবে, উদ্দেশ্যটা তা নয়। সংঘবদ্ধ যাহারা হয় তাহারা সংঘবদ্ধ হওয়ার প্রভাবেই অপরের সম্মান পাইয়া থাকে, অপরে তাহাদিগকে আক্রমণ করিতে সাহস পায় না। পঞ্জাবের শিখরা হিন্দুদের চেয়েও সংখ্যায় কম; কিন্তু সেখানে হিন্দুরা যত আক্রান্ত হয়, শিখরা তত হয় না। কারণ শিখরা সংঘবদ্ধ ও শক্তিমান;—কিন্তু অন্য লোকদিগকে শুধু শুধু আক্রমণ করা শিখদের রীতি নয়। দুর্ব্বল গোবেচারী যাহারা, তাহারা অন্যের আক্রমণ অত্যাচার টানিয়া আনে। অতএব "আমি নিরীহ" ইহা বলিয়া দুর্ব্বল কেহ অত্যাচার হইতে অব্যাহতি দাবি করিতে পারে না। দুর্ব্বলতা ও গোবেচারী হওয়া একটা নেগেটিভ অর্থাৎ অভাবাত্মক অপরাধ। কথিত আছে, একটি ছাগলছানা ব্রহ্মার কাছে গিয়া আরজি করে, "প্রভু, শেয়াল নেকড়ে বাঘ হইতে আরম্ভ করিয়া মানুষ পর্য্যন্ত আমাকে যে দেখে সেই খাইয়া ফেলিতে চায়; আপনি আমাকে রক্ষা করুন।" প্রজাপতি ব্রহ্মা বলিলেন, "বাপু, তুমি এমন নিরীহ, কোমল ও দুর্ব্বল, যে, আমারও তোমাকে ভোজন করিতে লোভ হয়।" ব্রহ্মা প্রতিকারের উপায় কি করিয়াছিলেন তাহা আমরা অবগত নহি। হয়ত অজত্ব ত্যাগ করিয়া জন্মান্তরে অন্য কিছুত্ব অর্জ্জন করিবার উপদেশ দিয়া থাকিবেন।

হিন্দুদিগকে ব্যক্তিগতভাবে এবং সমষ্টিগতভাবে শক্তিশালী ও সাহসী হইতে হইবে। এক হওয়াতেই, সংহত হওয়াতেই, সংঘবদ্ধ হওয়াতেই, একটা জোর আসে। অনেকগুলা অকেজো পুরাতন লোহার টুকরাকে এক করিয়া কাজের উপযুক্ত একটা বড় কিছু গড়িতে হইলে টুকরাগুলিকে বার-বার প্রচণ্ড আগুনে ফেলিতে হয়, এবং বার-বার হাতুড়ি-পেটা করিতে হয়। আগুনের তাপে ও দাহিকা শক্তিতে খাদ যাহা অসার যাহা তাহা বর্জ্জিত হয়, এবং খাঁটি ধাতুখণ্ড যতগুলি সেগুলি এক হইয়া যায়। হিন্দুরা যে এখনও এক হইতে পারিতেছে না, তাহার কারণ বোধ হয় এখনও তাহাদের যথেষ্ট অগ্নিপরীক্ষা হয় নাই, এখনও তাহাদের মধ্যে খাদ যথেষ্ট আছে, এখনও হাতুড়ি-পেটা অনেক বাকী আছে।

অগ্নিপরীক্ষা ও হাতুড়ি-পেটা আমাদের দ্বারা হইবার কথা নয়; কে কখন তাহা করিবে, সে বিষয়ে আমরা পরামর্শ দিতে অনুরোধ করিতে অসমর্থ। স্থানকাল-পাত্র ও কর্ত্তা সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করিবার ক্ষমতাও আমাদের নাই। কেবল গুটিকয়েক পুরাতন মামুলী কথা বলিবার সামর্থ্য আমাদের আছে।

হিন্দুদের মধ্যে যে অস্পৃশ্যতা-বোধ আছে, তাহা মন হইতে ও বাহ্য আচরণ হইতে নির্ম্মূল করিতে হইবে। কোন্ জাতির জল ব্যবহার্য্য, কোন্ জাতির জল অব্যবহার্য্য, মানসিক ও বাহ্য এরূপ বিচার ত্যাগ করিতে হইবে। যাহার কোন সংক্রামক পীড়া নাই, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন এরূপ মানুষ মাত্রেই স্পৃশ্য। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন এরূপ হিন্দু মাত্রেরই জল ব্যবহার্য্য। বস্তুতঃ এরূপ মানুষ মাত্রেরই জল ব্যবহার্য্য; কিন্তু সমগ্র হিন্দু-সমাজ আপাততঃ এই মত গ্রহণ না করিতে পারে—যদিও বিস্তর হিন্দু যার তার জল, যার তার রান্না-করা শাস্ত্রীয় অশাস্ত্রীয় সকল রকম খাদ্য খাইয়া থাকেন। বেশ ভাল বামুনের মুসলমান বাবুরচী আছে, কিন্তু "জাত' হিসাবে" নিম্নশ্রেণীর হিন্দু বাবুরচী রাখিতে আপত্তি আছে, এমন দৃষ্টান্তও জানি। হিন্দুর মত হিন্দুকে ঘৃণা আর কেউ করে না, হিন্দুর মত হিন্দুর কার্য্যতঃ এত বড় শত্রুও কেহ নাই।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস, হিন্দুরা যদি হিন্দুনাম-সমেত সমষ্টিগতভাবে বাঁচিয়া থাকিতে এবং সংখ্যায় না-কমিতে চান, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে বর্ত্তমান জাতি-ভেদ প্রথাও ত্যাগ করিতে হইবে। অন্য ধর্ম্মের লোকেরা দীনতম হীনতম স্বধর্ম্মীকে যে সামাজিক মর্য্যাদা দিয়া থাকেন, হিন্দুদিগকেও নিজের সমাজের দীনতম হীনতম ব্যক্তিকে সেই মর্য্যাদা দিতে হইবে। ইহা ভিন্ন হিন্দুসমাজ টিকিবে না। সমাজ টিকাইয়া রাখিবার জন্য আমরা কাহাকেও অধর্ম্ম করিতে বলিতেছি না। মানুষকে মানুষের মর্য্যাদা দেওয়া পরম ধর্ম্ম। সেই ধর্ম্ম হিন্দুদিগকে পালন করিতে অনুরোধ করিতেছি।

যে-সকল সধবা, বিধবা, কুমারী হিন্দুসমাজের অন্যায় ব্যবহারে, কাপুরুষোচিত ব্যবহারে, ও কুপ্রথার বশে মুসলমান সমাজে থাকিতে বা যাইতে বাধ্য হয়, তাহারা ও তাহাদের বংশধরেরা হিন্দুদের টিকিয়া থাকিবার ও শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিবার জন্য চেষ্টিত হইবে,

এমন আশা কেহ করেন কি? তাহারা হিন্দুসমাজকে অশ্রদ্ধা ও বিদ্বেষের চক্ষে দেখিলে বিস্ময়ের কারণ আছে কি? ধর্ষিতা লাঞ্ছিতা নারীদিগকে হিন্দুসমাজে যত্নপূর্ব্বক রাখিতে হইবে; বিবাহযোগ্যা সমুদয় বিধবার বিবাহ উৎসাহের সহিত দিতে হইবে এবং যাহারা বিবাহ করিবে, তাহাদের ও তাহাদের আত্মীয় বন্ধুগণের সহিত সামাজিক সম্পর্ক সম্পূর্ণ অব্যাহত রাখিতে হইবে; বরপণ এবং কন্যাপণ প্রথার মূল উচ্ছেদ করিতে হইবে।

বলা বাহুল্য, হিন্দুদিগের কেবল সর্ব্ববিধ উপায়ে বাহুবল সঞ্চয় করিলেই চলিবে না; মনের বল, সাহস অর্জ্জন করিতে হইবে। পরাজিতের মনোভাব (defeatism) নির্মূল করিতে হইবে। কে কবে কাহাকে পরাজিত করিয়াছিল বা না করিয়াছিল, তাহার খবরে প্রয়োজন কি? এখন জীবিত যাঁহারা তাঁহাদিগকে ত কেহ পরাজিত করে নাই? তাঁহাদের দেহটাকে যদি কেহ ভূমিসাৎ করিয়া ফেলে, তাহাতেও মন অপরাজিত থাকিতে পারে। বাঙালীর ছেলেমেয়েরা জানুন, সাহসীতম জাতিদের লোকদের মতই তাঁহারা মানুষ। তেমনি বলবীর্য্য তাঁহাদের মধ্যে আছে। অনেকের মনুষ্যত্ব জাগিয়াছে। সাধনা দ্বারা অন্যেরাও নিজেদের সুপ্ত মনুষ্যত্ব জাগাইতে পারিবেন।

হিন্দুরা সংঘবদ্ধ ও শক্তিমান হইবার চেষ্টা করিলে তাহার উপর গবন্মেণ্টের সন্দিগ্ধ কোপদৃষ্টি পড়িতে পারে। কিন্তু এরূপ অমূলক সন্দেহের জন্য কর্ত্তব্য সাধনে বিরত থাকিলে চলিবে না।

সনির্ব্বন্ধ নিবেদন, হিন্দুরা অহিন্দু কাহারও প্রতি নির্মম না হইয়া হিন্দুসমাজভুক্ত লোকদের প্রতি আত্মীয়তা অনুভব ও প্রদর্শন করিতে অভ্যস্ত হউন। কলিকাতা সমেত পশ্চিম বঙ্গের হিন্দুদিগকে বিশেষ করিয়া এই প্রার্থনা জানাইতেছি। সহৃদয় ব্যক্তিরা ইহাতে বিরক্ত হইবেন না, এই অনুরোধ।

—

কলিকাতা মিউনিসিপালিটী ও চট্টগ্রামে অরাজকতা

নরহত্যা যে-কোন দেশে যে-কোন অবস্থায় ঘটে, তাহা শোচনীয় ও নিন্দার্হ।

গত ৩১শে আগষ্ট কলিকাতা মিউনিসিপালিটী চট্টগ্রামের পুলিস ইনস্পেক্টর খাঁ-বাহাদুর আসানুউল্লার প্রাণনাশের নিন্দা করেন। এই মিউনিসিপালিটী ভোলানাথ সেন ও তাহার দুইজন সহকারীর প্রাণবধের নিন্দা করিয়া থাকিলে মিস্টার মোহম্মদ রাফিক তদুপলক্ষে সেরূপ হত্যায় হিন্দু মুসলমানের মধ্যে অমিল বাড়িবার আশঙ্কা প্রকাশ করিয়াছিলেন কি-না জানি না। বক্ষ্যমান উপলক্ষ্যে কিন্তু তিনি অন্যান্য কথার মধ্যে বলেন,—

"By the murder of a Mohammadan officer the assailant had widened the gulf already existing between the two communities. He was afraid that perhaps some people might take retaliatory measures and India might see herself plunged into an internecine war the like of which (she?) had never seen." *The Calcutta Municipal Gazette*, 5th September, 1931.

মিস্টার রাফিক চট্টগ্রামের অরাজকতার বিষয় না জানিয়া ভবিষ্যৎ প্রতিশোধের অনুমান করিয়াছিলেন কি-না, বুঝা যাইতেছে না। ইতিপূর্ব্বে তিনি যত বক্তৃতা করিয়াছেন, তাহার মধ্যে শ্রদ্ধানন্দ স্বামীর ও মহাশয় রাজপালের হত্যা দ্বারা হিন্দু মুসলমানের অমিল বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্বন্ধে কোন উক্তি আছে কি-না, জানি না।

৩রা সেপ্টেম্বর কলিকাতা মিউনিসিপালিটী চট্টগ্রামের অরাজকতারও নিন্দা করেন এবং তদ্বিষয়ে অনুসন্ধানের দাবি করেন। শ্রীযুক্ত সনৎকুমার রায় চৌধুরী এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব উপস্থিত করেন। তাঁহার প্রস্তাবের প্রথম অংশে ছিল,—

"The Corporation expresses its horror and condemnation at the outrages, loot and arson to which the Hindus of Chittagong have been subjected at the hands of a mob."

তিনি আপনা হইতেই লুট্যেরাদিগকে শুধু "মব" (জনতা) বলিয়াছিলেন, মুসলমানদিগের অপ্রীতির উদ্রেক না করিবার নিমিত্ত "মুসলমান মব" বলেন নাই। কিন্তু মিউনিসিপালিটীর ডেপুটী-মেয়র রজ্জক সাহেব তাহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া বলেন, যে, চাটগাঁয়ের হিন্দুরা অত্যাচরিত হইয়াছে, এরূপ না-বলিয়া চাটগাঁয়ের লোকেরা অত্যাচারিত হইয়াছে, বলা হউক। সনৎকুমার বাবু এই পরিবর্ত্তনেও রাজী হন। কিন্তু ইহা কি খাঁটি সত্য নহে, যে, লুট গৃহদাহ আদি কেবল হিন্দুদের অদৃষ্টেই ঘটিয়াছিল? রজ্জক সাহেবের প্রস্তাবিত পরিবর্ত্তনে মিউনিসিপালিটীর রেকর্ডগুলি ভবিষ্যতে মিথ্যা ধারণার সৃষ্টি করিবে—এই ধারণা জন্মাইবে, যে, চাটগাঁয়ের সকল ধর্ম্মাবলম্বী সকল জাতির লোকদের উপরই অত্যাচার হইয়াছিল।

সনৎকুমার বাবুর প্রস্তাবের আলোচনা উপলক্ষ্যে শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বলেন,—

In connexion with the inquiry the result of the withdrawal of prosecution against such perpetrators in other parts of the province should be taken into account. After such outrages, when criminal proceedings had been instituted, Government took upon itself the responsibility to withdraw the prosecution against perpetrators of such crimes. The withdrawal had certain effect on the minds of the people and that must be taken into account in deciding the course of action in the present case.

—

চাটগাঁয়ের অরাজকতার তদন্ত

যে-সব বেসরকারী ভদ্রলোক চাটগাঁয়ের অরাজকতার তদন্ত-সম্পর্কে সেখানে গিয়া কয়েক শত সাক্ষীর সাক্ষ্য লইয়াছেন, তাঁহারা সাধারণের কৃতজ্ঞতার পাত্র। আশা করি সমুদয় সাক্ষ্য সহ তাঁহাদের রিপোর্ট মুদ্রিত ও প্রকাশিত করা সত্বর সম্ভবপর হইবে।

রয়টার সম্ভবতঃ অরাজকতার সংবাদ বিলাতে পাঠায় নাই। কিংবা পাঠাইয়া থাকিলেও এক্ষেত্রে তথাকার কাগজগুলা কংগ্রেসকে বা বিপ্লবীদিগকে দোষ দিতে না পারায় চুপ করিয়া আছে।

তদন্ত কমিটিতে হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের সভ্য আছেন।

খণ্ডিত বাংলা জোড়া দেওয়া

গবর্ণর-শাসিত নূতন প্রদেশ গড়িবার উদ্যোগ এবং তাহার সমর্থক আন্দোলন চলিতেছে। যাঁহারা এইরূপ প্রদেশ চাহিতেছেন, তাঁহারা স্বয়ং খরচ চালাইতে পারিলে প্রবলতম একটা আপত্তি খণ্ডিত হয়। এক ভাষাভাষী লোকদের এক একটা স্বতন্ত্র প্রদেশে স্থাপন, এরূপ স্বতন্ত্র প্রদেশ গঠনের একটা ওজুহাত, উদ্দেশ্য বা কারণ। বাঙালীদের বেলায়ও এই উদ্দেশ্যে কাজ হওয়া উচিত। বর্ত্তমান সরকারী বাংলার সীমার সন্নিহিত কয়েকটি অন্যান্য প্রদেশভুক্ত জেলার ভাষা বাংলা, সেগুলিকে সরকারী বাংলার অন্তর্ভূত করিয়া খণ্ডীকৃত বঙ্গকে অখণ্ড করা উচিত। তাহার ব্যয়নির্ব্বাহ করিতে বাংলা দেশ পারিবে।

লর্ড কার্জ্জনের আমলে বাংলা দেশকে প্রধানতঃ দুটা টুকরায় পরিণত করায় আন্দোলন হয়। সেই আন্দোলনের ফলে বাঙালীদের দাবি গ্রাহ্য হইয়াছে, এইরূপ একটা অভিনয় হয়। কিন্তু খণ্ডিত বাংলাকে অখণ্ড করিবার ওজুহাতে বঙ্গদেশ নূতন রকমে আবার কর্ত্তিত হয়। তখন ইংলণ্ডেশ্বর আশ্বাস দেন, যে, বাংলার সীমার বিষয় আবার বিবেচিত হইবে। সেই বিবেচনা এখনও করা হয় নাই। অবিলম্বে করা উচিত।

এখন কিন্তু বঙ্গের সীমা সম্বন্ধে নূতন মীমাংসা করিতে গিয়া যেন আবার বাঙালীদিগকে আঘাত না করা হয়। যে-প্রদেশের প্রধান ভাষা যাহা, তাহার সহিত অল্পসংখ্যক অন্যভাষাভাষীর জেলা দু-একটা জুড়িয়া দিলে এই সংখ্যান্যূনদের শিক্ষা, সরকারী চাকরি আদি প্রাপ্তি, প্রভৃতিতে ব্যাঘাত ঘটে; সুতরাং তাহারা আন্দোলন করিতে থাকে। এ রকম অবস্থায় প্রধান ভাষাভাষী সংখ্যাভূয়িষ্ঠ লোকদের সুখসোয়াস্তি সম্ভোগ পূর্ণ মাত্রায় ঘটে না। এই কারণে আমরা আশা করি, কতকগুলি বাঙালী জেলাকে অন্য কোন কোন প্রদেশের লোক গ্রাস করিবার বা করিয়া

বাংলাভাষী কয়েকটি জেলা ও মহকুমা অন্য দুই প্রদেশ ভুক্ত করায় বাঙালীদের কেবল একটা সেন্টিমেণ্ট্যাল অভিযোগের সৃষ্টি হয় নাই, বাংলা দেশকে দরিদ্রও করা হইয়াছে। তাহার একটা দৃষ্টান্ত, গত ৫ই এপ্রিল তারিখে ইণ্ডিয়ান মাইনিং ফেডারেশ্যনের বার্ষিক সভায় সভাপতি শ্রীযুক্ত এস. সি. ঘোষ মহাশয়ের বক্তৃতার নিম্নোদ্ধৃত অংশ হইতে পাওয়া যাইবে,—

"Whatever may be the measure of political autonomy granted at the Centre, it is certain that in the revised constitution the provinces will receive a completely autonomous status. The question of provincial autonomy, in my opinion, throws into clear relief the need for the reconstitution of Indian provinces along the natural limits of the economic zone of each province. We in the coal industry are specially interested in the reconstitution of the boundaries of the province of Bengal. The economic coal-bearing zone, known as the Ranigunge and Jharia coal-fields, cuts at present across the provincial borders. The result has been that a part of the coal-fields is now situated within the province of Bihar and Orissa and a part within the province of Bengal. It would, in my opinion, make for distinctly greater advantage to the coal industry, if the Ranigunge and Jharia coal-fields could be placed under one provincial administration. I anticipate that under the new constitution the provinces will have to do much more on their own unfettered responsibility than at present. In order, therefore, to rule out the possibility of any divergence of treatment by two provincial Governments in regard to two-halves of the same industry, it seems imperative that the district of Manbhum should be included within the territorial boundaries of the province of Bengal."

মানভূমের ভাষা যে বাংলা তাহা সর্ব্ববাদিসম্মত। মানভূমকে বাংলার বাহিরে ফেলায় শুধু কয়লা সম্বন্ধেই কি ক্ষতি হইয়াছে, ১৯২৯ সালে বাংলা এবং বিহারে খনি হইতে উত্তোলিত কয়লার পরিমাণ হইতে তাহা বুঝা যায়। বাংলায় উত্তোলিত হইয়াছিল ৪৯,৬৫,১০৪ লং টন এবং বিহারে ১,৫১,২৩,১৪৪ লং টন। এখন বিহারের অন্তর্ভূত কয়লার আকর মানভূম ত আগে বঙ্গের সামিল ছিলই, অন্যতম প্রধান কয়লার আকর হাজারিবাগ জেলাও বঙ্গের অন্তর্গত ছিল। সাঁওতাল পরগণাও বঙ্গের অন্তর্গত ছিল।

কয়েকটা নূতন জেলা সরকারী বঙ্গে জুড়িয়া তাহাকে স্বাভাবিক বঙ্গে পরিণত করিলে উহা শাসনকার্য্যের পক্ষে অত্যন্ত বড় হইয়া যাইবে, তাহাও বলিবার জো নাই। বর্ত্তমানে বড় বড় কোন্ প্রদেশের আয়তন কত তাহা নীচের তালিকায় দেখান হইল।

ব্রিটিশ ভারতের প্রদেশ।	কত বর্গ মাইল।
বাংলা	৭৬,৮৪৩
বিহার-উড়িষ্যা	৮৩,১৬১
বোম্বাই প্রেসিডেন্সী	[illegible]

বৃটিশ ভারতের প্রদেশ।	কত বর্গ মাইল।
মধ্যপ্রদেশ ও বেরার	৯৯,৮৭৬
মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সী	১,৪২,২৬০
পঞ্জাব	৯৯,৮৪৬
আগ্রা-অযোধ্যা	১,০৬,২৯৫

অতএব বড় প্রদেশগুলির মধ্যে বিস্তৃতিতে বাংলাই সকলের চেয়ে ছোট। এক একটি প্রদেশের অন্তর্গত দেশী রাজ্যগুলিকে সেই সেই প্রদেশের সঙ্গে ধরিলে বাংলা প্রদেশ অপেক্ষাকৃত আরও ছোট প্রতীত হইবে। কারণ, বঙ্গে কেবল দুটি ছোট দেশী রাজ্য আছে, অন্য বড় প্রদেশগুলিতে তাহা অপেক্ষা বড় ও অধিকসংখ্যক দেশী রাজ্য আছে।

সুতরাং বঙ্গের স্বাভাবিক অংশ কয়েকটি জেলাকে সরকারী বাংলার সহিত জুড়িয়া দিলে অখণ্ড বঙ্গ অন্য সব প্রদেশের চেয়ে বড় হইবে না, কয়েকটির চেয়ে ছোটই থাকিবে।

ভারতীয় ও বিদেশী কয়লা

আহমদাবাদের কাপড়ের কলগুলি বাংলা ও বিহারের কয়লা ব্যবহার না করিয়া, অপেক্ষাকৃত সস্তা বলিয়া অন্য কয়লা ব্যবহার করায় এ বিষয়ে ইণ্ডিয়ান মাইনিং ফেডারেশ্যনের অভিযোগের আমরা উল্লেখ ও সমর্থন করিয়াছিলাম। ফেডারেশ্যন সাক্ষাৎভাবে তাহাদের অভিযোগ কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির গোচর করেন। তাহাতে কমিটি এই প্রস্তাব ধার্য্য করিয়াছেন,—

> Whereas coal mining is of great importance as a basic industry essential for the development of the industrial life of the country in all directions, the Committee is of opinion that all possible encouragement should be extended to the Indian enterprises in this field. The Committee, therefore, recommends to all industrial concerns in this country, particularly textile mills, to confine their purchase of coal, as far as possible, to the produce of the Indian-owned and managed collieries.
>
> The Committee resolved further that an authorized list of Indian-owned and managed collieries subscribing to Congress conditions be prepared."—Free Press.

প্রস্তাবটির "as far as possible" (যতদূর সম্ভব) ছাড়া আর সমস্ত কথা সম্পূর্ণ সমর্থনযোগ্য। কংগ্রেস দেশী কাপড় ব্যবহার সম্বন্ধে ত লোকদিগকে "যথাসম্ভব" তাহা করিতে বলেন নাই, কেবলমাত্র দেশী কাপড়ই ব্যবহার করিতে বলিয়াছেন।

কংগ্রেস ও প্রেস আইনের খসড়া

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি আর একটি প্রস্তাবে প্রেস আইনের খসড়াকে সরকারপক্ষ হইতে যুদ্ধের উদ্যম এবং যুদ্ধ স্থগিত রাখিবার চুক্তিভঙ্গ বলিয়াছেন। অন্যায় বর্ণনা এমন ব্যাপক, স্থিতিস্থাপক এবং স্পষ্টনির্দ্দেশহীন, যে, উহা পাস্ হইলে সরকার বাহাদুরের অপ্রিয় কাগজ ও প্রেসগুলাকে জব্দ বা নষ্ট করা অতি সহজ হইবে, এবং যুদ্ধবিরতির চুক্তি অনুসারে যাহা করার অনুমতি আছে কংগ্রেসের সেরূপ কাজও শাসক ও পুলিস কর্ম্মচারীরা বন্ধ করিতে পারিবে।

"কেন" ও তাহার উত্তর

যাঁহাদের বাড়িতে শিশু আছে, তাঁহারাই জানেন, শিশুরা কত রকমের প্রশ্ন করে যাহার উত্তর বিজ্ঞ লোকেরাও দিতে পারেন না। অনেকে কাল্পনিক আন্দাজি উত্তর দেন, অনেকে "যাঃ, জ্যাঠামি করিস্‌নে" বা অন্য প্রকার ধমক দিয়া তাহাদিগকে নিরস্ত করেন। কিন্তু শিশুদের সব প্রশ্নের তাহাদের বোধগম্য উত্তর দেওয়া সম্ভবপর না হইলেও কোন কোন প্রশ্নের এরূপ উত্তর দেওয়া যায়। আমরা এই প্রসঙ্গ উত্থাপন করায় শান্তিনিকেতনের সুবিদিত বৈজ্ঞানিক লেখক অধ্যাপক জগদানন্দ রায় মহাশয় এ বিষয়ে একটি বহি লিখিতে রাজী হইয়াছেন। এই বিষয়ক একটি ইংরেজী বহির সন্ধান তাঁহাকে দেওয়ায় তিনি তাহাও আনাইয়াছেন। কিন্তু সব দেশের শিশুদের প্রশ্ন ত এক রকম নয়। এই জন্য বাঙালী শিশুদের নানা প্রশ্ন তাঁহাকে সংগ্রহ করিতে হইতেছে। শিশুসম্পদশালী গৃহস্থেরা তাঁহাকে শিশুদের প্রশ্ন পাঠাইলে তিনি উপকৃত হইবেন। অবশ্য প্রত্যেকের পত্রের প্রাপ্তিস্বীকার তিনি করিতে পারিবেন না।

দয়া করিয়া আমাদিগকে কেহ এরূপ প্রশ্ন পাঠাইবেন না।

পাট-নির্ম্মিত পণ্যদ্রব্য

পাট হইতে চাষীদের ঘরে বা তাহাদের গ্রামস্থ অন্য লোকেদের ঘরে যে—সব পণ্যদ্রব্য প্রস্তুত কোথাও কোথাও হইতেছে এবং অন্যত্রও হইতে পারে, সে-বিষয়ে শ্রীযুক্ত সুধীরকুমার লাহিড়ী প্রবাসীর বর্ত্তমান সংখ্যায় যে প্রবন্ধটি লিখিয়াছেন, তাহার প্রতি পাটোৎপাদক জেলার পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। এরূপ জিনিষের উৎপাদন ও বিক্রী হইতে অনেকের অন্ন জুটিতে পারে।

পূজার ছুটি

পূজার ছুটি হইবার আগে কার্ত্তিকের প্রবাসীও বাহির হইবে। তথাপি এই সংখ্যাতেই আমরা ছুটির জন্য উন্মুখ ছাত্র এবং শিক্ষক ও অন্যান্য কর্ম্মীদিগকে, অনাবশ্যক হইলেও, দেশের সাময়িক ও দীর্ঘকালব্যাপী নানা দুঃখ-দুর্গতির কথা, ক্ষমাপ্রার্থনার সহিত, স্মরণ